ভারতী

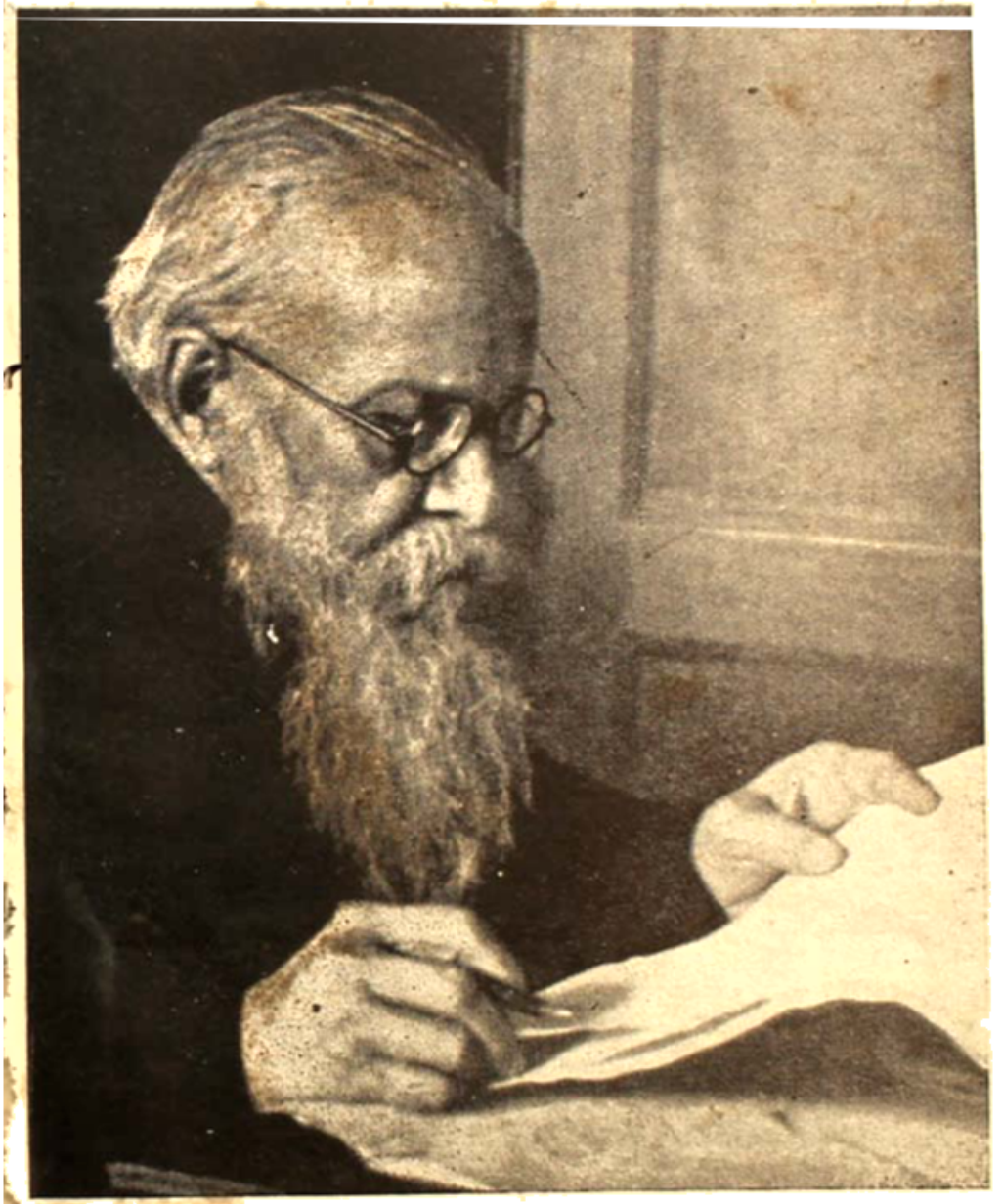

সম্পাদিকা—লীলা রায়

RC-JE/18

দেশ বিদেশে ঘরে ঘরে... ঊষা পাখা

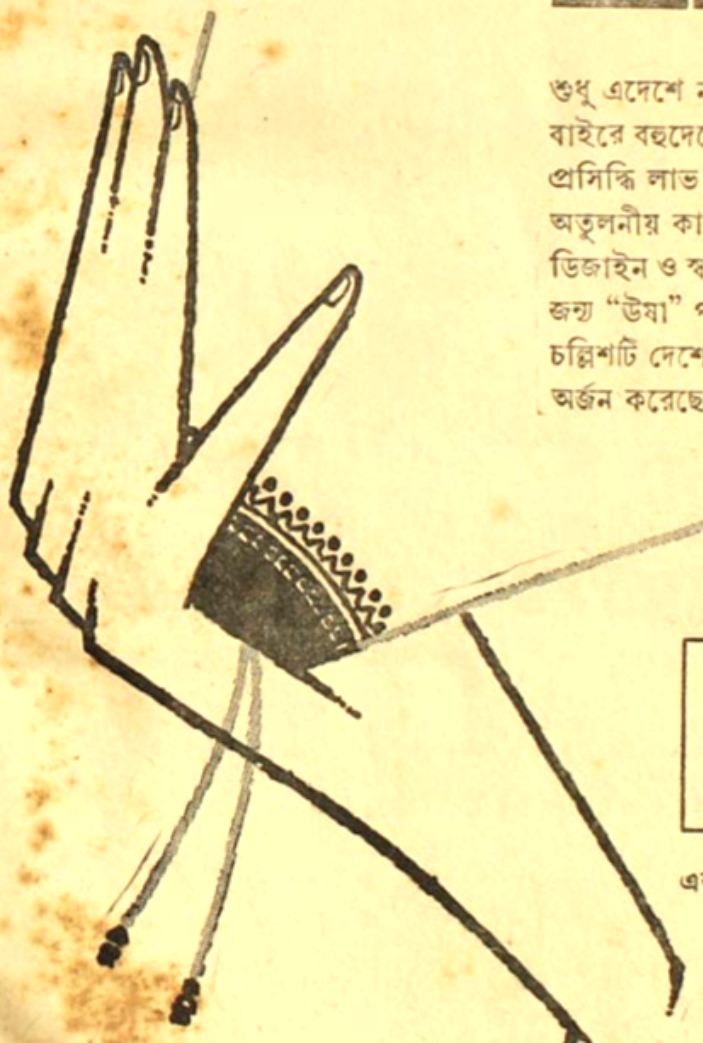

শুধু এদেশে নয়, ভারতবর্ষের বাইরে বহুদেশে "ঊষা" পাখা প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। অতুলনীয় কারিগরি, সর্বাধুনিক ডিজাইন ও স্বচ্ছন্দ কার্য্যকারিতার জন্য "ঊষা" পাখা আজ পৃথিবীর চল্লিশটি দেশে বহুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।

একটি JAY সামগ্রী

দি জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্ লিঃ. কলিকাতা-৩১

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি নাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

আপনার
ছেলেমেয়েদের

- ডিপথিরিয়া
- টিটেনাস
- হুপিংকাশি

এই তিনটি মারাত্মক
রোগের হাত থেকে
রক্ষার জন্য

ট্রিপল এনটিজেন বি.আই.

টীকা দিন

চিকিৎসকের পরামর্শ নিন

বেঙ্গল ইমিউনিটি কোং লিঃ
১৫৩, ধর্ম্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

সূচীপত্র

জয়শ্রী : বৈশাখ : ১৩৭২

বিষয়	লেখক		পৃষ্ঠা
৩০শে বৈশাখ, ১৩৭২	লীলা রায়	১ প্রবাসী	শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল ৩৫
চতুর্দ্দিনিসর্গ এক (কবিতা)	অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত	২ বাংলা সাময়িক পত্র প্রসঙ্গ	
রামানন্দ : আন্তরিক চিত্র ও স্মৃতিচারণ		আদি ও মধ্যযুগ (১৮১৮-১৮৭২)	সুধেন্দ্রনারায়ণ সরকার ৪৩
শান্তিনিকেতনে রামানন্দ বাবু : শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী		৩ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও সাময়িক পত্রপত্রিকা	
স্মৃতির আলোয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়			ডাঃ ব্রজপ্রসাদ মিত্র ৫২
	শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়	৯ রবীন্দ্র যুগ	শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় ৫৫
স্বাধীনতার পূজারী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়		বাংলা সাময়িক পত্র : কল্লোল পর্ব	
	বিমলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৪	ডাঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায় ৬১
রামানন্দ স্মরণে	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র	১৫ বাঙলা সাময়িক পত্র : কল্লোল থেকে	
রামানন্দ : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী		সমসাময়িকাল	সুশান্ত বসু ৬৫
	শ্রীসুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়	১৭ রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা	
বিচিত্র চিন্তায় ও কর্মে রামানন্দ			পবিত্র কুমার ঘোষ ৮০
	দেবদাস জোয়ারদার	সম্পাদকীয়	৮৭

অতিরিক্ত কলেবর বৃদ্ধির আশঙ্কায় এই বিশেষ সংখ্যাটিতে ধারাবাহিক, হেগেলীয় দর্শন, বলেশ্বরী ও জোয়ার দেয়া সম্ভব হোল না। আশাকরি পাঠকেরা ক্ষমা করবেন। জঃ সঃ

রবীন্দ্রপরিচয় গ্রন্থমালা

আমাদের গুরুদেব। শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

রবীন্দ্রজীবনের ও রবীন্দ্রনাথের সাধনার কেন্দ্র সম্বন্ধে সর্বপ্রথম আলোচনা। ৩·৫০

আমাদের শান্তিনিকেতন। শ্রীসুধীরঞ্জন দাস

সরল স্বচ্ছ সন্ত্রস্ত এবং মাঝে মাঝে মৃদু কৌতুকের ছোপ দেওয়া শান্তিনিকেতনের কাহিনী। ৫·০০

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ। শ্রীরানী চন্দ

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা-আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। ৩·৫০

কাব্যপরিক্রমা। অমিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্রনাথের জীবনদেবতা রাজা ডাকঘর জীবনস্মৃতি ছিন্নপত্র ধর্মগীত গীতাঞ্জলি ও গীতিমাল্য সম্বন্ধে আলোচনা। ২·২৫

গুরুদেব। শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্রজীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। ৫·০০

নির্বাণ। শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবিজীবনের সর্বশেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ১·০০

পঁচিশে বৈশাখ। সুধাংশুকুমার মুখোপাধ্যায়

'পঁচিশে বৈশাখের তাৎপর্য বিষয়ে' ছোটদের উপযোগী করে লেখা রবীন্দ্রনাথের কথা। ১·০০

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅমিয়কুমার সেন

প্রকৃতির কবি রবীন্দ্রনাথের যথার্থ রূপটি ব্যক্ত হয়েছে এই গ্রন্থে। ৫·০০

ব্রহ্মবিদ্যালয়। অমিতকুমার চক্রবর্তী

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয়ের প্রারম্ভ-যুগের ইতিহাস ও আদর্শ। ১·৮০

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ। শ্রীঅমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্মৃতিকথা। ৩·৫০

রবীন্দ্রসমীক্ষা। অমিতকুমার চক্রবর্তী

রবীন্দ্র-সাহিত্য-বিষয়ক প্রথম রীতিমত সমালোচনা। ২·০০

রবীন্দ্রনাথ : বিশ্বভারতীর শ্রদ্ধাঞ্জলি। শ্রীপ্রবোধচন্দ্র সেন-সম্পাদিত

বিশ্বভারতীর প্রাক্তন ও বর্তমান অধ্যাপক ও কর্মীদের রচিত রচনার সংগ্রহ। ১২·০০

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী

সুন্দর গদ্যে এবং পরিচ্ছন্ন ভাষায় রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের উপভোগ্য-বিবরণ। ৪·০০

রবীন্দ্রসংগীত। শ্রীশান্তিদেব ঘোষ

নূতন পরিবর্ধিত সংস্করণ। ৭·০০

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

চলিত কথায় যাকে গান-ভাঙা বলা হয় দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা।

রবীন্দ্রস্মৃতি। ইন্দিরাদেবী চৌধুরানী

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। ৩·৫০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

P 2915

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ ১ম সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৭২

বাংলার যে দুইজন মনীষীর সস্নেহ আশীর্বাদ, উপদেশ ও আনুকূল্য জয়শ্রী পেয়ে এসেছে তার জন্মলগ্ন থেকে, তাঁদের স্মরণ ও স্মৃতিতর্পণ করবার এই অভূতপূর্ব সুযোগ পেয়ে জয়শ্রী নিজেকে ধন্য মনে করছে। এতাবদ্‌কাল জয়শ্রীর বার্ষিক সংখ্যা রবীন্দ্রসংখ্যা রূপে প্রকাশিত হয়ে এসেছে। ৩১শে মে ১৩৭২, মনীষী রামানন্দ শতবার্ষিকী পূর্তি, অতএব এবারের বৈশাখ সংখ্যা এই দুই মনীষীর স্মরণে উৎসর্গ করে সার্থকতার আনন্দ লাভ করছে জয়শ্রী।

১৯৩১ সালে যখন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনোত্তর বিপ্লবীবাংলার উপর বৃটিশ রাজরোষ নির্যাতন ও ব্যক্তি স্বাধীনতাহরণের নিত্য নূতন হাতিয়ার নিয়ে প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়েছে তখন সংগঠনকে আদর্শের পথে একনিষ্ঠ রাখবার এবং তার চারপাশে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার একটী পরিমণ্ডল সৃষ্টি করবার উদ্দেশ্য নিয়ে জয়শ্রীর জন্ম। সেই দুর্যোগপূর্ণ দিনে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সহায় সম্বলহীন অবস্থায় পত্রিকা পরিচালনার বিষয়ে যাঁদের উপদেশ প্রার্থনা করেছিলাম ও পেয়েছিলাম, তাঁদের মধ্যে ছিলেন কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ও সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ মনীষী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের উৎসাহিত আশীর্বাদ, উপদেশ, পথনির্দ্দেশ ও অকুণ্ঠ সহায়তা। কিছুদিন পরেই গ্রেপ্তারের সময় পুলিশ তাঁর সুন্দর চিঠিখানা নিয়ে যায়, দেশবিদেশে বসবাসকারি বাঙ্গালী সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, দেশপ্রেমিক, ও পাঠরত বহু প্রবাসী ছাত্রছাত্রীদের জয়শ্রির উদ্দেশ্যে লেখা চিঠিগুলির সহিত। উপরে উল্লিখিত মূল্যবান চিঠিতে তিনি জানান—যতদূর মনে পড়ে—পত্রিকা পরিচালনার পক্ষে তিনটি অনিবার্য সর্ত। কিছু টাকা, প্রয়োজনে সম্পাদকের সর্বপ্রকার লিখবার ক্ষমতা, এবং একটি নির্ভরযোগ্য লেখকগোষ্ঠি। প্রবাসী দপ্তর থেকে প্রয়োজনীয় লেখক গোষ্ঠীর নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করবার নির্বাধ অধিকার তিনি দিয়েছিলেন তখনকার অজ্ঞাত উদ্যোগীদের। আজ তাঁর শতবার্ষিকী জন্মজয়ন্তী-স্মরণ সংখ্যার মধ্য দিয়ে তাঁর মহান জীবনী ও আদর্শের আলোচনা করবার এই সুযোগ জয়শ্রীর পক্ষে এক পরমমূল্যবান অধিকার।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ দশক থেকে রুশ দেশে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার সূচনার পরিপ্রেক্ষিতে সারা বিশ্বে এবং বিশেষভাবে সাম্রাজ্যবাদ-কবলিত দেশগুলিতে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তার ঢেউ ভারতবর্ষেও—বিশেষভাবে বাংলার বুদ্ধিজীবীদের উপরে,—তীব্র তীক্ষ্ণভাবে অনুভূত হয়েছিল। মার্ক্সীয় মতবাদ, ইতিহাস ব্যাখ্যা, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিচার ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগের এক নির্বিচার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল : আরো উদ্বেগের কারণ ভারতীয় ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব ও সাংস্কৃতিক অবদান সম্বন্ধে এক আশ্চর্য উদাসীনতা সেই মানসিকতাকে ব্যাপ্ত করেছিল। রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন ও সাহিত্যসাধনা এই মানসিকতার প্রবল প্রতিবাদ ও সার্থক প্রতিরোধ। যতদূর দেখেছি বাংলা পত্রিকার ইতিহাস বর্ণনায় এই সংস্কৃতি-সঙ্কটের পটভূমিকাতে ভারতীয় আদর্শ ও প্রতিভার এই দুই শ্রেষ্ঠ ধারক ও বাহকের মূল্যায়ন করা হয়নি। যার প্রত্যাশা ছিল।

লীলা রায়

৩০শে বৈশাখ ১৩৭২

চতুর্দশ নিসর্গ এক অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

সেই পাখি
গাঙপালা, কালো পাথরের সঙ্গে দিনশেষে
ত্রিকোণ তৈরী ক'রে ঝুলে থাকতো।
সেই পাখি
মুখ দেখাতে এল যেই, বারোবছরের ছেলে যেন,
নষ্ট হয়ে গেল সব।
ক্ষতিপূরণের লোভে
যেদিকেই যাই, সেই কাঙাল পাখির নিষ্যাচার,
নদীর ওপারে যাই সেখানেও নগ্ন ব্যাভিচার পাখিটার।
কালো পাথরের কাছে ফিরে এসে পাথরের মতো
বসে থাকি তখনই সে ট্যুরিস্টের দিকে উড়ে যায়।

রামানন্দ : আন্তরিক চিত্র ও স্মৃতিচারণ

শান্তিনিকেতনে রামানন্দবাবু

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে আমি সর্বপ্রথম কোথায় এবং কবে দেখেছিলাম সেটা আমার ঠিক স্মরণ নাই। তবে এটা নিশ্চয়ই মনে আছে যে তাঁকে প্রায় প্রত্যহই দেখবার সৌভাগ্য হয়েছিল ১৯১৭ সালে যখন তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। শান্তিনিকেতনে এসে যেখানে ছিলেন সেটি শান্তিনিকেতনের "বেহলীর" সংলগ্ন ঘরে ছাওয়া সাদাসিধে ধরণের কুটীর বললেই হয়।

যখন রামানন্দবাবু শান্তিনিকেতনে সপরিবারে এসেছিলেন, তখন শান্তিনিকেতন ছোটখাটো আশ্রম-বিদ্যালয়ই ছিল. দু একটি নতুন ছাত্রাবাস তৈরী হতে আরম্ভ হয়েছিল। সমস্ত আশ্রমটি যেন তখনো ছিল একটি পরিবারভুক্ত আশ্রম। আশ্রমবাসীদের সংখ্যাও ছিল না বেশী। সকলের সঙ্গেই প্রায় সকলের প্রতিদিনই দেখা হতো। ছাত্রদের মধ্যে যাদের বয়স একটু বেশী ছিল তাঁদের সঙ্গেও শিক্ষকরা এমন ভাবে মিশতেন যেন ছেলেরা তাঁদেরই সমবয়সী। ছেলেরাও অসংকোচে তাঁদের কাছে অভাব অভিযোগের কথা বলতো। এই সহজ ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ থাকা সত্ত্বেও ছাত্রেরা শিক্ষকদের প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ ক'রত। রামানন্দবাবুকে ছাত্র-শিক্ষক সকলেই যথেষ্ট শ্রদ্ধা করতেন। তিনিও সকলের সঙ্গেই যদিও সহজ ভাবে মেলামেশা করতেন এবং স্থানীয় সভার সমিতিতে যোগদান করতেন ও প্রয়োজনানুসারে আলোচনায় যোগও দিতেন তবুও লক্ষ্য করেছিলাম তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং বৈশিষ্ট্য। তাঁর মধ্যে একটি শান্ত গাম্ভীর্য ছিল. তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন, পরিহাস-রসিক ছিলেন। যদিও তাঁর পরিহাস-রসিকতায় যথেষ্ট বাক্যের সংযম ছিল। তিনি খুব সাদাসিধে ধরনের মানুষ ছিলেন। পোশাকেপরিচ্ছদেও ছিলেন সাদাসিধে, কিন্তু এই সাদাসিধে ভাবের মধ্যেও কি পোশাকে কি কথা-বার্তায় তাঁর ছিল বিশেষ রকমের একটা লালিত্য বা ডিগ্নিটি। তিনি সাধারণ হয়েও আমাদের কাছে ছিলেন সত্যই একজন অসাধারণ ব্যক্তি। অন্য কথায় বলতে গেলে তাঁর সাধারণ জীবন-ধারা অসাধারণত্বের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত ছিল যেন বইয়ের একটি পাতার এপিঠ আর ওপিঠ। নিয়মানুবর্তিতাও ছিল তাঁর স্বভাবের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যাচ্ছে তিনি যখন বিশ্বভারতী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ছিলেন তখনকার কথা। তাঁর সহযোগী শিক্ষক ছিলেন সি. এফ. এণ্ড্রুজ এবং শ্রীগুরুদয়াল মল্লিকজী। সেকালে কোন শিক্ষক দু একদিনের জন্য কিংবা তিন চারদিনের জন্য কাজে অনিবার্য কারণে অনুপস্থিত থাকলে প্রধান শিক্ষকের কাছে মুখে আবেদন জানিয়েই ছুটি নিতেন এবং সে ছুটি পাওয়াও হতো। কিন্তু রামানন্দবাবু কলেজে প্রিন্সিপ্যাল থাকা কালে এই প্রচলিত নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটেছিল। রামানন্দবাবু মনে করতেন ছাত্রদের নিয়মানুবর্তিতা কিংবা নিয়ম পালনের প্রতি নিষ্ঠা নির্ভর করে শিক্ষকদের নিয়মানুবর্তিতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার উপরে।

আর একটা কথা মনে পড়ে গেল যে রামানন্দবাবু এবং সি. এফ. এণ্ড্রুজ দুজনেই কোনরকম পারিশ্রমিক নিতেন না কলেজে শিক্ষকতার কাজে। পারিশ্রমিক নেওয়া তো দূরের কথা যখনই বিশ্বভারতীর অর্থকোষে টাকার টানাটানি পড়ত এণ্ড্রুজ সাহেব তাঁর সাধ্যমত তাঁর বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা সংগ্রহ করে এনে বিদ্যালয়ের সেই অর্থসংকট কিছুটা মোচন করতেন। এণ্ড্রুজ সাহেব বিশ্বভারতী কলেজে রামানন্দবাবুর অধীনে কিংবা রামানন্দবাবু কলেজে প্রিন্সিপাল থাকা কালে শিক্ষকতা করলেও তাঁদের দুজনের মধ্যে এমন একটা পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব ছিল যার বর্ণনা করা ঠিক সম্ভব নয়। এণ্ড্রুজ সাহেব শান্তিনিকেতনে যদিও কায়েমীভাবে বাস করতেন তবুও থেকে থেকে কখনো ফিজি, কখনো সাউথ্ আফ্রিকায় কিংবা অন্য কোন জায়গায়, কখনো দিল্লী, কখনো পাঞ্জাব, কখনো কলকাতায়, আরো কত জায়গায় নানারকম জনকল্যাণের কাজে প্রয়োজন মনে করলেই ছুটে যেতেন। এইজন্যই কলেজে তাঁকে শিক্ষকরূপে পাওয়াটা যেন কাউন্টরূপ ছিল। কাউন্টরূপ ছিল বলেই তাঁর ক্লাশে পড়ানোর ব্যাপারে রামানন্দবাবু একটা স্বতন্ত্র ব্যবস্থা রেখেছিলেন অর্থাৎ এণ্ড্রুজ সাহেবের অনুপস্থিতিতে তাঁর ক্লাশের কর্তব্য যেন আর একজন শিক্ষক করতে পারেন। এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে যে কলকাতা ইউনিভার্সিটি এখানকার কলেজের ছাত্রদের পরীক্ষা সম্বন্ধে যে সর্ত আরোপ করেছিলেন সে সর্ত রামানন্দ বাবুর মনঃপুত না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত রামানন্দ বাবু কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করেছিলেন। কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করলেও শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর সঙ্গে তাঁর আন্তরিক প্রীতির সম্বন্ধ তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। তিনি ১৯২৫ সালে, যতদূর আমার মনে পড়ে, শান্তিনিকেতনে কলেজের প্রিন্সিপালের পদ গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে। রামানন্দবাবুর জামাতা স্বনামধন্য ডঃ কালিদাস নাগ মহাশয়ের কাছ থেকে জানতে পেরেছি যে রামানন্দবাবুকে শান্তিনিকেতনে পেয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"আপনাকে আমাদের এই আশ্রমে আবদ্ধ করে ফেলবার জন্য অনেকদিন থেকে সাধনা করেছি।" আমরাও জানি যে যখন ১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটির পর রামানন্দবাবু তাঁর দুই কন্যা শান্তা দেবী, সীতা দেবী ও কনিষ্ঠ পুত্র মুকুলকে নিয়ে শান্তিনিকেতনে বাস করতে শুরু করলেন তখন রবীন্দ্রনাথের কি আনন্দ! সে আনন্দ যেন একটা দুষ্প্রাপ্য জিনিষ পাওয়ার আনন্দ।

(২)

১৯১৭ সাল থেকেই বলতে গেলে রামানন্দবাবুর শান্তিনিকেতনের সঙ্গে যোগ সক্রিয়ভাবে আরো গভীর হয়ে উঠেছিল। মাঝে মাঝে তিনি কখনো একবৎসর কখনো দু বৎসর কখনো এরচেয়েও কমবিন থাকতেন। এখন যেখানে "চীনা ভবন" সেইখানে ছিল একটি ছোট মাটির বাড়ি। সেই মাটির বাড়ির তিনদিকেই ছিল পাকা বারান্দা, বাড়িটি ছিল খড়ে ছাওয়া। ঐ বাড়িতে থাকতেন ক্ষিতিন্দ্র নাথ ঠাকুর ও তাঁর স্ত্রী সুকেশী দেবী (ক্ষিতিন্দ্র নাথ ঠাকুর দ্বিজেন্দ্র নাথ ঠাকুরের পুত্র)। ক্ষিতি বাবু এবং সুকেশী দেবী দুইজনেই আর ইহ জগতে নাই। ঐ মাটির বাড়িটিও আর নাই, তার চিহ্নও আর নাই। সেই জায়গায় অনেকটা ভূখণ্ড জুড়ে এখন দাঁড়িয়ে আছে প্রকাণ্ড "চীনা ভবন"। ১৯৩০ এবং ৩১ সালে ঐ মাটির বাড়িটি ভাড়া নিয়ে রামানন্দবাবু ছিলেন।

১৯১৭ সালের গ্রীষ্মের ছুটিতে তিনি শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন সপরিবারে সেটা পূর্বেই বলেছি। তারপরেও শান্তিনিকেতনে তাঁকে দেখেছি ১৯২৪ সালে, ১৯২৫ সালে, ১৯৩৫ এবং ৩১ সালেও। ১৯১৭ সালে "দেহলী"র সংলগ্ন খড়ে ছাওয়া বাড়ির একাংশে কিছুদিন থাকলেও গ্রীষ্মের ছুটির পরে (জুলাই মাসে সম্ভবতঃ) সেই সময়কার

শান্তিনিকেতনের একটি চার কক্ষ বিশিষ্ট খড়ে ছাওয়া মাটির বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন দুই কন্যা ও ছোট পুত্র সহ থাকবার জন্য। কিছুদিন সেখানে থাকবার পর ঐ বাড়িটি তিনি কিনে নেন। ঐ বাড়িতে প্রায় দুই বৎসর রামানন্দবাবুরা ছিলেন। তারপর মৃণু মারা যাওয়ার পর রামানন্দবাবু এখান থেকে কলকাতায় চলে যান এবং ঐ বাড়িটি তখন থেকেই শান্তিনিকেতনের সম্পত্তির অন্তর্গত হয়। আজ আর সেই মাটির বাড়ি নাই, আছে সেই মাটির বাড়ির ভূখণ্ডে পাকা বাড়ি "হিন্দীভবন"। পূর্বেই বলেছি শান্তিনিকেতনে রামানন্দবাবু বহু বার এসেছেন মৃণু মারা যাবার পর, এবং প্রতিবারই সাময়িক ভাবে কখনো ক্ষিতি বাবুর মাটির বাড়িতে, কখনো বা উত্তরায়ণে কখনো বা প্রতিমার দেনের বাড়িতে, কখনো বা অন্য কোথাও থেকেছেন। এই যাওয়া আসার মধ্যে সময়ের ব্যবধানের সঠিক দিন, সাল, মাস ও তারিখ মনে নাই। মনে না থাকবার প্রধান কারণ কিছুদিন পূর্বেও একথা আমাকে কেউ অনুরোধ করেননি যে রামানন্দবাবু সম্বন্ধে স্মৃতি-কথা আমার লেখা উচিত। ১৯৬৪ সালের মে মাসে শ্রদ্ধেয় কালিদাস নাগ মহাশয়ের কাছ থেকে অনুরোধ এল যে রামানন্দবাবু সম্বন্ধে আমার স্মৃতিকথা লেখা উচিত। ১৯৬৩ সালে আমি কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হই এবং দীর্ঘ দিন শয্যাশায়ী থাকি। সেই কঠিন পীড়া থেকে সেরে উঠব বলে আমার কোন আশাই ছিল না। সেই জন্য এই স্মৃতিকথা লিখবার ইচ্ছা থাকলেও লিখে উঠতে পারিনি। আজো আমি সম্পূর্ণ সুস্থ নই, তবে এখন আর শয্যাশায়ী হয়ে সর্বক্ষণ থাকি না, সামান্য চলাফেরাও করতে পারি, উঠতে বসতেও পারি। কিন্তু সোজা হয়ে বসে লেখাপড়ার কাজ অল্পক্ষণও বিনা কষ্টে করতে পারিনা। যা কিছু লিখি স্মৃতি-লেখকের সহায়তায়। ফলে বক্তব্য বিষয়গুলো একটু এলো-মেলো হয়ে যায়। ডিক্টেশন দিয়ে কোন কিছু লিখতে গেলে এই অসুস্থ অবস্থায়, সত্তর বছর বয়সে যাহোক্‌ হয়ের দুর্ঘটনায় পড়া অনিবার্য। অনিবার্য হলেও স্মৃতিকথা লেখার অনুরোধ রক্ষা করাও অনিবার্য হয়ে উঠেছে অনুরোধকারীদের জন্য এবং কতকাংশে আমার বর্তমান মনোভাবের জন্য।

রামানন্দবাবুর স্মৃতিকে কেন্দ্র করে কত কথাই মনে পড়ে যায়. সবকথা ভেবেচিন্তে ভাল একটি প্রবন্ধের মতন লেখা এখন আমার সাধ্য নয়। তবু এই ভেবে লিখছি যে পাঠকবর্গ বক্তব্যের বিষয়বস্তু পরিবেশনের ব্যাপারে একটা ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনার যোগের অসঙ্গতিকে উপেক্ষা করে ঘটনাগুলিকেই প্রাধান্য দেবেন।

মনে পড়ে আমাদের বালক বয়সের অথবা যৌবনের প্রারম্ভ বয়সের কথা। সেই সময় একদিন কলকাতার সিমলা থেকে কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীট ধরে কলেজ ষ্ট্রীটের দিকে যাচ্ছিলাম, ব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরের সামনে যখন এসে পড়েছি দেখলাম ঐ সমাজপাড়ার ছোট গলির ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ বেরিয়ে আসছেন। তিনি ফুটপাতে এসে উপস্থিত হতেই তাঁকে প্রণাম করলাম। যতদূর মনে পড়ে রামানন্দবাবুও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। রামানন্দবাবুর বাড়িতে অর্থাৎ তখনকার প্রবাসী কার্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ প্রায়ই পদব্রজেই তাঁর জোড়াসাঁকোর বাড়ি থেকে মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীটের ভিতর দিয়ে, ছোট বড় অলি গলির পথ ধরে যেতেন কর্ণওয়ালীশ ষ্ট্রীটের সমাজ পাড়ায়। কখনো হেঁটেই ফিরতেন কখনো বা ফিরতেন তৎকালে প্রচলিত ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে। তখন তিন রকমের ভাড়াটে ঘোড়ার গাড়ির খুব প্রচলন ছিল, তাদের ফার্স্ট ক্লাশ, সেকেণ্ড ক্লাশ ও থার্ড ক্লাশ বলা হতো। এই তিন রকম গাড়ির রঙ ছিল বিভিন্ন তিন রকমের, যতদূর মনে পড়ে থার্ড ক্লাশ গাড়িগুলোর রঙ গাঢ় বাদামী রঙের, চকোলেটের রঙের মত। দ্বিতীয় শ্রেণীর গাড়িগুলির রঙ ছিল নীল রঙের। প্রথম শ্রেণীর গাড়িগুলোর রঙ ছিল মসৃণ আর বেগুনী রঙে মেশানো। যতদূর মনে আছে অধিকাংশ প্রথম শ্রেণীর গাড়ী টানত বলিষ্ঠ একটা ঘোড়া,

দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ী টানতে ছুড়ি-ঘোড়া প্রথম, দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির আকার এবং আরোহণ তৃতীয় শ্রেণীর গাড়ির চেয়ে বড় ছিল। ভাড়ারও তারতম্য ছিল। তখনকার দিনে ট্যাক্সির চলন ছিল না বললেই হয়, প্রাইভেট মোটরকারও যথেষ্ট দেখা পাওয়া যেত বলে মনে পড়ে না। বাস (Bus), লরী এবং ট্রাকের আবির্ভাব তখনো হয়নি বললেই চলে। মানুষ টানা রিক্সারও প্রচলন ছিল কি না মনে পড়ছে না। যাইহোক সেদিন ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরের ফুট-পাতের ওপারের রাস্তার ফুটপাতের কাছেই একটি থার্ড ক্লাশ গাড়ি দাঁড়িয়েছিল, সেই গাড়িতেই তাঁর সঙ্গে আমিও ভোঁসাঁকোতে তাঁর বাড়িতে গেলাম এবং সকালের সেই দিনের সারা বেলাটা কাটিয়েছিলাম, কেন তাঁর সঙ্গে সেই গাড়িতে গিয়েছিলাম তাঁর বাড়িতে এবং কেনই বা বিকেলের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ছিলাম সে বিষয় উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শ্রীরামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ও মাঝে মাঝে রামানন্দবাবুর বাড়িতে যেতেন। এই প্রসঙ্গে একটা মজার গল্প মনে পড়ে গেল। জনৈক বন্ধুর কাছে শুনেছি (তিনি রামানন্দবাবুর পুত্রদের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত) যে রবীন্দ্রনাথ ও রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয় একসঙ্গে একদিন রামানন্দ বাবুর "প্রবাসীর" অপিসে গিয়ে উপস্থিত। সেখানে তখন দাঁড়িয়ে ছিলেন রামানন্দবাবুর বড় ছেলে শ্রীকেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়, তখন তাঁর বয়স বেশী নয়, তিনি বালক। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন—রামানন্দবাবু কোথায়? উত্তরে বালক কেদারবাবু গম্ভীর ভাবে সংক্ষেপে বললেন বাবা "অজত্র" গেছেন। কেদার-নাথের মুখে 'অজত্র' শব্দ শুনে রবীন্দ্রনাথ স্মিতহাস্যে বললেন "কুত্র"? রবীন্দ্রনাথের মুখে "কুত্র" শব্দ শুনে বালক কেদারনাথ অমনি চট্ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে মায়ের কাছে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের "কুত্র" শব্দের অর্থ জিজ্ঞেস করলেন। পাঠকবর্গ এই প্রসঙ্গ হতে বুঝতে পারবেন রবীন্দ্রনাথ বালকদের সঙ্গেও কেমন সহজভাবে কথাবার্তা বলতেন পরিহাস রস মিশিয়ে।

১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩১ সাল পর্যন্ত রামানন্দবাবুর শান্তিনিকেতনে আসা যাওয়ার কথা পূর্বেই বলেছি। শান্তিনিকেতনের ঐ যুগটা ছিল একটা অবিস্মরণীয় যুগ। ঐ সময়ের মধ্যে কত মনীষীদেরই আমরা শান্তিনিকেতনে দেখেছি, যেমন উইন্টারনিৎস, টুচি, করমিকি, সিল্‌ভাঁ লেভি, জাপানের প্রসিদ্ধ কবি নগোচি। যতদূর মনে পড়ে এঁরা যখনই এসেছেন তখনই এঁদের সঙ্গে রামানন্দবাবুর আলাপ হয় কালিদাস নাগ মহাশয়কেও দেখেছি। যাঁরা বিদেশী তাঁদের সঙ্গে প্রায়ই আসতেন ডঃ কালিদাস নাগ। তখনকার যুগে ডঃ কালিদাস নাগ, ডঃ সরোজ দাস, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় এখানে এসে এক একটা উপলক্ষে ভাষণ দিতেন। আরো মনে পড়ে বিভুদিন ধরেই সপ্তাহে সপ্তাহে বিশ্বভারতীর শিক্ষক এবং ছাত্রদের কাছে কলকাতার থেকে এসে ডঃ নাগ, ডঃ সরোজ দাস, শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায় আরো অনেকে, (যাঁদের নাম মনে পড়ছে না) এক একটা বিষয় বক্তৃতা দিতেন আম্রকুঞ্জে। মনে পড়ছে স্যার যদুনাথ সরকারও এখানে এসে মাঝে মাঝে থাকতেন। তাঁর বিশেষ অনুরাগ ছিল তখনকার শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর প্রতি, ছোট লাইব্রেরী হলেও। রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায় তখন ছিলেন লাইব্রেরীয়ান। স্যার যদুনাথ সরকারও মাঝে মাঝে ছাত্র শিক্ষকদের কাছে ভাষণ দিতেন। এখনকার জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ও মাঝে মাঝে আসতেন, এঁকে প্রথম এখানে দেখি ১৯১১ সালে। সঙ্গে স্থানীয় পণ্ডিতেরা যেমন, ক্ষিতীমোহন সেনশাস্ত্রী, পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী প্রভৃতি মনীষীরা আলাপ আলোচনা করতেন। এইসব আলাপ-আলোচনা শোনবার সুযোগ

আমাদের সকলেরই ছিল, কোন বাধা ছিলনা। অন্যের কথা বলতে পারিনা, আমি তখন যুবক, বিদ্যাবুদ্ধি তেমন কিছু আমার ছিলনা, কাজেই এঁদের আলোচ্য বিষয়-বস্তুর মর্ম ষোলআনা বুঝতে না পারলেও অনেক আলোচনা-ক্ষেত্রেই উপস্থিত থাকবার সুযোগ গ্রহণ করতাম। এই সুযোগের ফলে ভালকরে লেখাপড়া না শিখেও নানা বিষয়ে যতটুকু জ্ঞানলাভ করেছি আমার বিশ্বাস এখানে না থাকলে এ জ্ঞান আমার হতো না, বই পড়লেও না। বই পড়লেও না এইজন্য বলছি যে সাধারণ লোকের পক্ষে নানা বিষয়ের গ্রন্থ পাঠ করা সম্ভব নয়। অথচ নানা বিষয় সম্বন্ধে সুপণ্ডিত মনীষীদের কথাবার্তা শুনলে, তাঁদের পরস্পরের মধ্যে আলাপ আলোচনা শুনলে স্বভাবতই একটা সাধারণ জ্ঞান হয়। তাছাড়া এই রকম সব মনীষীদের আগমনে এবং তাঁদের ব্যবহার ও আচরণের দ্বারা যে আবহাওয়ার কিংবা পরিবেশের সৃষ্টি হয় সেই পরিবেশে চব্বিশ ঘণ্টা থাকলে অতি সাধারণ মানুষেরও মনে একটা সাংস্কৃতিক ছাপ পড়ে, সে ছাপ উজ্জ্বলই হোক আর ফিকেই হোক।

শান্তিনিকেতনের ভূখণ্ডের দুই দিকে ছিলেন দুই মহত্তমী; শান্তিনিকেতন ভূখণ্ডের উত্তরে নিচু বাংলোয় দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং দক্ষিণে রবীন্দ্রনাথ। এই দুজনের সঙ্গেই কতদিন ঘরোয়া আলাপ আলোচনা করতে দেখেছি রামানন্দবাবুকে। এই ঘরোয়া আলাপ-আলোচনা যে নিতান্তই ঘরোয়া আলাপ আলোচনা হতো তা নয়, এই আলোচনার মধ্যে থাকত দর্শন শাস্ত্রের আলোচনা, ইতিহাস-বিষয়ের আলোচনা, শিক্ষা-নীতি বিষয়ক আলোচনা, সমাজ সংস্কার আলোচনা, নানা জাতির আচরিত ধর্মচিন্তার আলোচনা, আরো কত কি গভীর বিষয়। যে সব মনীষীরা এখানে আসতেন তাঁদের অনেককেই দেখেছি শ্রদ্ধা ও সম্মানের ভাব নিয়ে নিচু বাংলোয় দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হতে। অনেক ক্ষেত্রেই দেখেছি যাঁরা দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে যেতেন দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা শোনবার জন্যই, নিজেদের কথা অল্প স্বল্পই বলতেন। বিশেষ ভাবে মনে পড়ে এই প্রসঙ্গে মহাত্মা গান্ধীজীর কথা। তিনি বড়দাদার (দ্বিজেন্দ্রনাথের) পায়ের কাছে বসে মুগ্ধ ভক্তের মতন দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাই কেবল শুনতেন। যেদিন মহাত্মাজীর মৌনাবলম্বনের দিন থাকত, সেদিনও তিনি কিছুক্ষণের জন্য দ্বিজেন্দ্রনাথের পায়ের কাছে বসেই দ্বিজেন্দ্রনাথের কথা শুনতেন মৌনাবলম্বন করেই। দ্বিজেন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা এবং ভক্তি আর দ্বিজেন্দ্রনাথও মনে করতেন ভারতবর্ষের প্রাচীন উন্নত আদর্শের জীবন্ত প্রতীক গান্ধীজী। গান্ধীজীকে তিনি শুধু যে শ্রদ্ধা করতেন তা নয়, তাঁর প্রতি একটা স্নিগ্ধ অকৃত্রিম স্নেহ পোষণ করতেন। রামানন্দবাবুকেও দেখেছি দ্বিজেন্দ্রনাথের কাছে বসে আছেন যেতের চেয়ারে বেশির ভাগ শ্রোতা হিসাবেই। অনেকবার লক্ষ্য করেছি আলোচনার কালে কারোর সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের মতের সঙ্গে মিল না হলেও তর্ক না করে তাঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রনাথের কথাই শুনে যেতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে এই আলোচনার মনোভাব বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করতাম রবীন্দ্রনাথের, রামানন্দবাবুর, এণ্ড্রুজ সাহেবের এবং বিধুশেখর শাস্ত্রীর। রবীন্দ্রনাথ তো প্রতিবাদ করবার ইচ্ছা থাকলেও আলোচ্য বিষয় নিয়ে সহজে তাঁর বড়দার সঙ্গে গৌণভাবেও প্রতিবাদ করতেন না, চুপ করে প্রগাঢ় শ্রদ্ধার সঙ্গে যেন নিতান্ত বালকের মতন বড়দার কথা শুনতেন। বড়দাও আলোচনার সময় ভুলে যেতেন যে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বড় হয়েছেন, শিক্ষিত সমাজে তিনি একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি মনে করতেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সেই ছোট ভাইটিই আছে। এবং সেই মনোভাব নিয়েই একদিন আমার সামনেই রবীন্দ্রনাথকে খুব এক চোট ধমক দিয়েছিলেন, গান্ধীজীর কোন একটি নীতির বিরুদ্ধে

রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ মনোভাব সম্বন্ধে। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গুরুদেব, আমরা তাঁকে যেমন শ্রদ্ধাও করি, ভয়ও করি। আর সেই রবীন্দ্রনাথকে আমাদেরই মতন একটি বালক মনে করে বন্ধুত্ব করবার মতন শান্তিনিকেতনে একজন ক্ষমতাশালী মানুষ আছেন এই ভেবে আমার তখনকার বালকসুলভ মনে সত্যই খুব ধন্যবোধ করতাম।

রামানন্দবাবু প্রসঙ্গে "প্রবাসী" মাসিক পত্রের কথা আপনা হতেই মনে পড়ে। আমাদের যৌবনকালে আমরা মনে করতাম যে বাঙালা দেশের মধ্যে রামানন্দবাবু সম্পাদিত "প্রবাসী" এবং "মডার্ন রিভিউ" এই দুটি পত্রিকাই অন্যান্য পত্রিকার চেয়ে সব দিক দিয়েই শ্রেষ্ঠ। এই পত্রিকা দুটির শ্রেষ্ঠত্ব আমরা বিচার করতাম এই দুটি পত্রিকায় বিশিষ্ট লেখকদের সুচিন্তিত নানা বিষয়ের প্রবন্ধ পড়ে এবং বিশেষ করে "প্রবাসীর" বিবিধ প্রসঙ্গ (অর্থাৎ নানা বিষয়ের সম্পাদকীয় মন্তব্য) পড়ে। তখন আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকতাম কবে প্রবাসী আর মডার্ন রিভিউ দেখতে পাব। তখন রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ প্রবন্ধ, কবিতা ও গল্প প্রবাসীতেই বেরুত। আমাদের মধ্যে যাঁরা প্রবন্ধ কবিতাদি লিখতেন তাঁরা আত্মপ্রসাদ লাভ করতেন তাঁদের লেখা প্রবাসীতে ছাপা হলে। আমার ব্যক্তিগত কথাই বলি, কতবার আমি কত কবিতা, কত গল্প প্রবাসীতে ছাপাবার জন্য পাঠাতাম, মনে ভাবতাম রামানন্দবাবু যখন আমাকে স্নেহ করেন, ভালবাসেন তখন নিশ্চয়ই লেখাগুলি প্রয়োজনীয় সংশোধন করে প্রবাসীতে ছাপাবেন। কিন্তু সব লেখাই ফেরত আসত। ফেরত পাঠান লেখাগুলির সঙ্গে সম্পাদকীয় মন্তব্য আসত যে "এই লেখাগুলি ফেরত দেওয়া হলো বলে এটা যেন মনে না করি যে পুনরায় লেখা পাঠালে ছাপান হবে না।" এই ভরসাতেই কিছুদিন অন্তরই যে 'পুনরায়' লেখা পাঠিয়েছিলাম তার ঠিক নাই, তবু তার অধিকাংশই ফেরত আসত। ঐ লেখাগুলির মধ্যে যে কয়েকটি ছাপা হয়েছিল তাও "পঞ্চশস্য"—বিভাগে ছাপা হতো। আমাদের মতন কয়েকজন অপটু নবীন লেখকদের লেখায় উৎসাহ দেবার জন্য রবীন্দ্রনাথ কয়েকটি ইংরাজী পত্রে প্রকাশিত বিশেষ বিশেষ বিষয় সম্বন্ধে লিখিত প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত সংকলন লিখতে দিতেন তারপর সেগুলির ভাষা ঘষে-মেজে ঠিক করে দিতেন প্রকাশযোগ্য হবার মতন। রবীন্দ্রনাথ এরকম ভাবে অন্য নবীন লেখকদের সংকলনের ভাষা ঘষে মেজে দিতেন কিনা সেটা আমার জানা নাই। আমার কথাই বললাম। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের মন্দিরে যেসব উপদেশাদি দিতেন আমরা কয়েকজন তাঁর সেই মুখের কথা কাগজে পেন্সিলে যথা সম্ভব লিখে নিতাম নিজেদের মতো। তারপর রবীন্দ্রনাথ সেগুলিকে নিজের ভাষায় ভাল করে লিখে দিতেন এবং সেগুলি রবীন্দ্রনাথের নামেই প্রবাসীতে ছাপা হতো। এই রকম করেই আমরা প্রবন্ধ লেখার ভাষায় ধীরে ধীরে হাত পাকাতাম। রবীন্দ্রনাথ নিজের অমূল্য সময়ের অনেকাংশ আমাদের কাঁচা হাতের লেখা খুব যত্ন সহকারে সংশোধন করে দিতেন। আমাদের প্রতি তাঁর এই অকৃত্রিম স্নেহ চিরদিন ভক্তিভরে স্মরণ করি। "পঞ্চশস্যে"র জন্য সংকলন লেখার বিষয় রামানন্দবাবুর কাছেও যথেষ্ট উৎসাহ পেয়েছি। এই সংকলন যাঁরা লিখতেন তাঁরা ষোলআনা নাম কিন্তু সংকলনের নিচে লিখতেন না। যাঁরা পাকা ছিলেন তাঁরাও না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে রবীন্দ্র-জীবনীকার শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম। তিনিও সংকলনের নিচে লিখতেন প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিবর্তে—প্র. কু. মু.। বহ্নি চন্দ্র রায় লিখতেন—ব. চ. র.। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা পরিহাস-রসিকতা মনে পড়ে গেল। আমার সামনেই একদিন তিনি রামানন্দবাবুকে বললেন "আমাদের এখানকার একটি ছাত্রের বড় ইচ্ছে সেও "পঞ্চশস্যে"র জন্য কিছু লেখে। তাকে কোন রকম করে নিরস্ত করেছি এই বলে যে তোর

নাম গোবিন্দ তুই সংক্ষেপে যদি নিজের নাম "গো" লিখিস তাহলে তো লোকে হাসবে অতএব তুই কিছুদিন ভাল করে লেখায় হাত পাকিয়ে নে তারপর যা লিখবি তার নিচে নিজের নাম সম্পূর্ণ লিখিস।"

রামানন্দবাবু একটু মৃদু হেসে আমার দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রনাথকে বললেন "আপনি যেরকম ভাবে এঁদের লেখা সংশোধন করবার ভার স্বীকার করেন এর থেকেই এঁদের বোঝা উচিত যে আপনি এঁদের কত স্নেহ করেন" ইত্যাদি। এই সময় শান্তিনিকেতনের পাকা লিখিয়ের দল, যেমন অজিত কুমার চক্রবর্তী, জ্ঞানেন্দ্র নারায়ণ রায় এবং সন্তোষ চন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি প্রবাসীতে প্রবন্ধ লিখতেন। ক্রমে ক্রমে আমরাও কয়েকজন কবিতা লেখায় হাত পাকিয়ে ছিলাম। সেগুলির অনেকগুলির না হোক কতকগুলি প্রবাসীতে ছাপা হয়েছিল সে আজ প্রায় ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগেকার কথা।

রামানন্দবাবু সম্বন্ধে শুধু যে বাংলা দেশের শিক্ষিত সমাজেই যথেষ্ট শ্রদ্ধার ভাব ছিল তা নয়। ম কর্ণেই শুনেছি পণ্ডিত মদন মোহন মালব্য রামানন্দবাবু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথকে বলেছিলেন—"রামানন্দবাবু শুধু বাঙলা দেশের লোকেদের কাছে গর্বের পাত্র নন সমস্ত ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজ, যাঁরা মডার্ন রিভিউর সঙ্গে পরিচিত তাঁরা রামানন্দবাবুকে একজন অসাধারণ জার্নালিষ্ট বলেই যে শ্রদ্ধা করেন তা নয় তাঁরা এই ভেবেও গর্ব অনুভব করেন যে রামানন্দ ভারতবর্ষের একজন বিশেষ চিন্তাশীল ব্যক্তি।" এই স্মৃতি কথা শেষ করার পূর্বে এটা বলা প্রয়োজন মনে করি যে যেদিন একদা বাইশে শ্রাবণে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তার বহুক্ষণ পূর্ব হতেই রামানন্দবাবু রবীন্দ্রনাথকে শেষ দেখবার জন্য জোড়া-সাঁকোর বাড়িতে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। শ্রদ্ধেয়া ইন্দিরা দেবীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথের জীবন প্রদীপ নিভবার পূর্বে (তখন রবীন্দ্রনাথ সম্পূর্ণ অচৈতন্য) রামানন্দবাবুই রবীন্দ্রনাথের শয্যাপার্শ্বে থেকে সময়োচিত প্রার্থনা করেছিলেন। ঐ প্রার্থনার সময় ঐ ঘরে ছিলেন যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সেবা শুশ্রূষা করছিলেন। আমিও ছিলাম ঐ ঘরে।

স্মৃতির আলোয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুর খ্যাতনামা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম-শতবার্ষিকীতে বিশেষ করে মনে পড়ছে শান্তিপুর-সাহিত্য-পরিষদ-অনুষ্ঠিত জয়োদশ সাহিত্য-সম্মিলনীর কথা। ওই উৎসবের সভাপতি ছিলেন মনীষী রামানন্দ। সে ১৩৪৪ সালের কথা।

তার আগে মানুষটি ছিলেন অনেক দূরে,—সত্যসন্ধ, নির্ভীক, দেশপ্রেমিক সাংবাদিকরূপে আমাদের শ্রদ্ধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। তাঁকে আহ্বান জানিয়ে নিকটে আনার বা কোন সূত্রে তাঁর সান্নিধ্যলাভের সুযোগ আমাদের ছিল না। ওই সময়ে শহরের সভা-সমিতিতে তাঁর নাম কদাচিৎ বিজ্ঞাপিত হতে দেখেছি—মফঃস্বলের কোন অনুষ্ঠানে তো নয়ই। বক্তৃতা-মঞ্চে তিনি ছিলেন দুর্লভ-দর্শন। তা ছাড়া সেই ১৩৪৪ সালে বয়সের ভার চেপেছে তাঁর সর্বাঙ্গে। তিনি কেন আসবেন আমাদের মফঃস্বল শহরে সামান্য একটি সাহিত্য-সম্মিলন-উপলক্ষ্যে। ওঁদের মত খ্যাতনামা ব্যক্তিদের গ্রামে আনার কল্পনা যে হাত বাড়িয়ে আকাশ ছোঁয়ার মত—এই অভিজ্ঞতা তার আগেকার সাহিত্য-সম্মিলনে আমাদের হয়েছিল।

তথাপি কার্যকরী সমিতির অধিবেশনে স্থির হয়েছিল ওঁকে সভাপতি করে আনতেই হবে। ওঁকে না আনতে পারলে অনুষ্ঠানের মর্যাদা বাড়বে না। বিশেষ করে এবারকার আয়োজন ছিল বিশিষ্ট বয়সের। এই বছরেই সাহিত্য-পরিষদের জমি কেনা হয়েছিল—আর সেই নিজস্ব জমিতে কতগুলি তৈরী করে সভা বসাবার আয়োজন চলেছিল।

প্রস্তাবানুযায়ী একদিন পরিষদ সম্পাদক প্রভাস রায় (আজও উনি সম্পাদক) আমাকে বললেন, চলুন আমরা

দু'জনে ওকে সাদর নিমন্ত্রণ জানিয়ে আসি। আপনাকে সঙ্গে নিতে চাইছি যেহেতু আপনি অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

আমাকে সঙ্গী নির্বাচন করার আরও একটি হেতু ছিল। ওই সময়ে গত আট বছর যাবৎ প্রবাসীতে আমার লেখা যা'র হচ্ছিল নিয়মিতভাবে। এর থেকে প্রভাস বাবুর ধারণা হয়ে থাকবে—রামানন্দবাবুর সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ আলাপ পরিচয় আছে—আমাকে উনি স্নেহ করেন। আমি সঙ্গী হলে সহজেই ওঁর সম্মতি মিলবে। কিন্তু ওঁর ধারণা ঠিক ছিল না। প্রবাসীতে নিয়মিতভাবে লেখা যা'র হলেও তখনও পর্যন্ত সম্পাদকের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ পরিচয় ঘটেনি। তবে লেখার মাধ্যমে ওঁর স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পেরেছিলাম সেটি অনুভব করতে পারতাম। সে প্রমাণও পরে পেয়েছি।

যাই হোক—প্রস্তাবমত একদিন সকালবেলায় ওঁর মুলেন স্ট্রীটের বাড়িতে দু'জনে হাজির হলাম। ভৃত্য বাইরের ঘরে আমাদের বসিয়ে স্লিপ নিয়ে চলে গেল।

ঘরকার বাইরে দুটো ভীষণ দর্শন ভুতুর ঘোরাফেরা করছিল—এবং আমাদের পানে সন্দেহজনক ভাবে চাইছিল। ওদের সন্দেহ বৃদ্ধি হলে দুয়োরের পর্দাটা আমাদের দাঁড়াকে ঠেকাতে পারবে না ভেবে বেশ শঙ্কিত ও আড়ষ্ট হয়ে বসে ছিলাম। একটু পরে ছোট মেয়েরা নেমে এসে যেভাবে ওদের ঘাড়পিঠ মর্দন করে খেলা সুরু করল—তাতে আশ্বস্ত হয়ে ঘরের মধ্যে দৃষ্টিপাত করতে পারলাম।

বাব্বারি ঘর। র‍্যাক আর আলমারিতে নানা আকারের বই ও পত্র-পত্রিকা ঠাসা। টেবিলের উপর দৈনিক ও মাসিক পত্রিকাগুলির কোন কোনটিতে লাল পেন্সিলের দাগ দেওয়া, একটা ট্রেতে কিছু পত্রিকার কর্তিতাংশ জমা হয়েছে। এই গুলি বোধ করি 'বিবিধ প্রসঙ্গের' উপকরণ। আরও রয়েছে সামুদ্রিক কড়ি দিয়ে তৈরী পেপার ওয়েট, রবীন্দ্রনাথের একটি ছোট মূর্তি—প্যারিস প্লাস্টারের, দেশ বিদেশ থেকে আহৃত কতকগুলি ব্রোঞ্জ নির্মিত মূর্তি ও তাম্র মুদ্রা—কতক ভারত-বর্ষের-চীনের-যবদ্বীপের-জাপানের। মোটামুটি সংগ্রহটি বিচিত্র।

একটু পরে রামানন্দবাবু ঘরে ঢুকলেন। ইতিপূর্বে দূর থেকে ওঁকে কয়েকবার দেখেছি। এখন মনে হল বয়সের অগ্রগতিতে সেই উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, শুভ্রশ্মশ্রুশোভিত সৌম্যমুখ-মণ্ডল মনীষাদৃপ্ত দুটি নয়ন—আরও প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ভারতের কোন আশ্রম থেকে গভীর জ্ঞান সঞ্চয় করে যেন কোন ঋষি এই মুলেন স্ট্রীটের সাজানো গোছানো ঘরটিতে এসে উপস্থিত হয়েছেন।

আসন গ্রহণ করলে আমাদের প্রার্থনা জানালাম।

বললেন, আপনাদের নিমন্ত্রণ-পত্র আগেই পেয়েছি। তা কোন সময়ে যেতে হবে?

এ যে একেবারেই অপ্রত্যাশিত! আমাদের নিমন্ত্রণ উনি তাহলে গ্রহণ করেছেন!

আমরা সোৎসাহে বললাম, কোন্ সময়ে আপনার সুবিধা হবে—

উনি বললেন, ট্রেনের সময় ঠিক করে আপনাদের সুবিধা-মত সময়ে আসবেন। সকাল আটটা-ন-টা যে সময়ে বলবেন—আমি তৈরী হয়ে থাকব। একখানা গাড়ী নিয়ে আসবেন, সোজা স্টেশনে যাব।

আমরা সসঙ্কোচে বললাম, আপনার মধ্যাহ্ন ভোজনের কি রকম ব্যবস্থা রাখব—

আমাদের কুণ্ঠা দেখে উনি হাসলেন। বললেন, মাছ-মাংস আমি খাই না। নিরামিষ তরকারী গোটা দুই, একটা ডাল, ছাল আর একটু দই! ব্যস, আর বেশি আয়োজন করলে নষ্ট হবে।

জানালাম—তাই হবে।

কথায় কথায় বললেন, কিন্তু আমার মত অসাহিত্যিককে কেন সাহিত্য-সম্মিলনের সভাপতি করছেন?

সে কি কথা! আপনি অসাহিত্যিক?

হেসে বললেন, চিরটাকাল খবরের কাগজের খবর ঘেঁটে কাটল—শুকনো নীরস কাজ। সাহিত্যের চর্চা আর করলাম কবে!

আপনার বিবিধ প্রসঙ্গ সাহিত্যের চেয়ে অনেক বেশি। —বললাম।

ওতো আর রসসৃষ্টি নয়—স্ট্যাটিস্টিক্স কবে সভাবত প্রকাশ। একটু থেমে বললেন, গল্প-উপন্যাস যে পড়ি না তা নয়, ভালও লাগে। তবে সৃষ্টি করার প্রতিভা আলাদা।

ওঁর বিনয়ে অভিভূত হলাম।

উনি প্রসঙ্গ পালটে দেশ-বিদেশের গল্প আরম্ভ করলেন। প্রসঙ্গত য়ুরোপের কথাই বললেন। ওদের ত্রুটির উল্লেখ করলেন—গুণভাগের প্রশংসা করলেন। বললেন, এক একটা জাতির পিছনে আছে বহু শতাব্দীর সঞ্চয়। বংশধারার মত জাতিরও ট্রাডিশন আছে—দোষে গুণে সেখানো ট্রাডিশন। জাতির চরিত্র।

একটু থেমে বললেন, স্বাধীন জাতির একটা গুণ লক্ষ্য করেছেন নিশ্চয়—স্বাধীন মত প্রকাশে ওরা কুণ্ঠাহীন। বলিষ্ঠ চরিত্রের এই গুণটি সহজাত।

এমনি ধরণের অনেক কথা বললেন। ইতিহাস-সমাজ-ব্যবস্থা ভৌগোলিক সংস্থান—বক্তিত্বের বিক্ষোভ ইত্যাদি অনেক কথা। এই সব কথা বক্তৃতা মঞ্চেও বলেছিলেন। শাসক-জাতির নিষ্ঠুরতা, শোষণ-দক্ষতা, বর্বরতার বহু দৃষ্টান্ত উদ্ধৃতি দিয়ে বুঝিয়েছিলেন। দেশ-বিদেশের শাসন-ব্যবস্থার তুলনা দিয়ে বৃটিশ শাসনের অন্তরে অসত্য ফাঁকির দিকটা উদ্‌ঘাটিত করেছিলেন। বিদেশী শাসনের সমালোচনাও যেমন করেছিলেন—তেমনি নিজেদের দোষ ত্রুটি দুর্বলতার সন্ধানও দিয়েছিলেন। স্বসংযত, নিরুচ্ছ্বসিত, যুক্তিগ্রাহ্য ভাষণ ছিল ওঁর বিশেষত্ব। সভার কথা পরে আসবে, এখন প্রায় ঘণ্টাখানিক আলোচনার পর আমরা বিদায় নিলাম।

যথানির্দিষ্ট দিনে শান্তিপুর স্টেশনে ওঁর জন্য অপেক্ষা করছিলাম। এক ঘণ্টা দেরিতে ট্রেন এলো। স্টেশনেই অভ্যর্থনা-পরিচয়-ফটো নেওয়া ইত্যাদি সেরে নলিনী-মোহন সান্যালের বাড়িতে ওঁকে নিয়ে যাওয়া হ'লো। সম্মিলনের মূল সভাপতি ছিলেন রামানন্দবাবু, সাহিত্য-শাখার সভাপতি ছিলেন কবি বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। উনিও রামানন্দবাবুর সঙ্গে একই গাড়ীতে এসেছিলেন।

অতিথি-সৎকারের যথোচিত আয়োজন করেছিলেন সান্যাল মহাশয়। কর্মজীবন থেকে অবসর নিয়ে উনি তখন সাহিত্য-সাধনায় মনোনিবেশ করেছেন। স্ত্রী-ব্যক্তি—অনেকগুলি ভাষায় ব্যুৎপত্তি থাকায় ভাষাতত্ত্ব নয় উপাধি পেয়েছেন। বহু হিন্দী পত্রপত্রিকায় ওঁর লেখা বার হয়—তামিলেও কুরল গ্রন্থের অনুবাদ করে যশস্বী হয়েছেন। বাংলা ও ইংরেজিতে অনেকগুলি বই আছে। ওঁর রচিত সমস্ত বই এক এক খণ্ড করে সাজিয়ে রেখেছিলেন টেবিলে—অতিথিদের উপহার দেবেন বলে।

উপহার পেয়ে রামানন্দবাবু হেসে বললেন, আপনাদের কাছে অনেক গল্প করে যেতে হবে বুঝতে পারছি।

আহারে বসে বললেন, এত আয়োজন কেন করেছেন, সব তো খেতে পারব না।

আহারান্তে নলিনী বাবু বললেন, খানিক বিশ্রাম করুন।

না। আপনাদের সঙ্গে খানিক গল্প করি। ঘরুয়ার কথা বলতে ভাল লাগে—ছেলেবেলার কথা।

সেই গল্পই আরম্ভ করলেন। স্মৃতির পাতা উল্টাতে উল্টাতে বাল্যকালে ফিরে গেলেন। কৈশোর-স্মৃতিতে

পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো ঘরটি। আমরা প্রত্যেকেই সেই কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিলাম।

পাল্লা দিয়ে পাকা আম খাওয়ার কথা বললেন। কে কত বেশি পাকা আম খেয়েছে সেটা জিভের গাঢ় নীল রঙ দেখিয়ে প্রমাণ করতে হতো। আমার আম চুরি করতে গিয়ে নিজেদের বীরত্ব প্রকাশের কাহিনীই কি কম রোমহর্ষক। উদ্যান রক্ষকের তাড়া খেয়ে আমগাছের ডাল বেয়ে দুপ্ দুপ্ লাফিয়ে পড়ে সে দৌড়। অতঃপর নিরাপদ দূরত্বে এসে উঁচু ঢিবির উপর দাঁড়িয়ে টিল ছুঁড়ে অনুসরণকারীদের নাকাল করা। শীতের রাতে খেজুর রসের সন্ধানে মাঠে মাঠে টহল দেওয়া—আর ছোট একটি নালার উৎস সন্ধানে মাইলের পর মাইল মাঠ বন ঝোপ ঝাড় ঠেলে এগিয়ে যাওয়া। পল্লী বাংলার সর্বত্রই প্রায়বয়স্ক উদ্বেল কৈশোরক এমনি অজস্র অভিযান-কাহিনীই তো রচনা করে থাকে।

এমনি করে গাম্ভীর্যের মুখোস খুলে অকপট কৌতুক রসে উনি মেতে উঠলেন—আমরাও ওঁকে অত্যন্ত নিকটে পেয়ে-অভিভূত পুলকিত।

সহসা গল্প থামিয়ে কৌতুক-উজ্জ্বল কণ্ঠে বললেন, না. আর বেশি বলব না। ভয় হচ্ছে।

নলিনীবাবু হাসতে হাসতে বললেন, ভয়? কেন?

বললেন, কি জানেন—নিজেদের দুষ্টুমির কথা তো। সামনেই রয়েছেন একজন গল্প লেখক—ওঁকে বিশ্বাস নেই। হয়তো দেখব আমারই কাঁধে আমার কীর্তি-কলাপের কাহিনী প্রকাশ হয়ে গেছে।

সবাই হেসে উঠলেন।

এমনি হাসি-কৌতুক ছাড়া আসরে দুটি ঘণ্টা কাটল। একবারও রাজনীতি সাহিত্য কি ধর্ম-প্রসঙ্গে এলেন না, বিশ্রাম নেওয়া হল না। কর্ম-কর্তারা এসে জানালেন—সভার সময় হয়েছে।

আমরা গাত্রোত্থান করলাম।

এর আগে আর একটি ঘটনা ঘটেছিল। তরুণ চিত্রশিল্পী সুনাথ মুখোপাধ্যায় এক খুড়ি এঁটেল মাটি আনিয়ে রেখেছিল রাধানন্দ বাবুর একটি ক্লে মডেলিং তৈরী করবে বলে। ওর ইচ্ছা সভা বসলে সেই সময়ে ও কাজ আরম্ভ করবে। ইচ্ছাটা ও রাধানন্দ বাবুর কাছে ব্যক্ত করল।

রাধানন্দ বাবু হেসে বললেন, আমি তো এখন আপনাদেরই হাতে—যা খুশি করতে পারেন।

বোটয়ে উঠে বললেন, অভিভাষণ কিন্তু লিখে আনিনি—ইচ্ছে আছে খানিকটা বলব।

আমরা বললাম, তাতেই হবে। প্রবন্ধ কবিতা খুব বেশি নেই বক্তৃতাও কমিয়ে দেব। আপনি অনেকক্ষণ ধরে বলবেন—আমরা শুনব।

খুশি হলেন। বললেন, অবশ্য আমার দীর্ঘ বক্তৃতা বহুক্ষণ আপনাদের ভাল লাগবে আমি না।

'বন্দে মাতরম্' গানের দ্বারা সভার উদ্বোধন হল। পণ্ডিত লক্ষ্মীকান্ত মৈত্র তাঁর গলায় মালা দিয়ে অভ্যর্থনা জানালেন। অভিভাষণাদি পাঠ হলো। কবি বিজয়লালের বক্তৃতার পর উনি ভাষণ দিতে উঠলেন।

প্রথমেই বক্তব্য করলেন ঔদ্বোধনী সঙ্গীত সম্বন্ধে। সঙ্গীত সুনীত হয়নি, তাতারও কিছু অদলবদল করেছিলেন গায়ক।

রাধানন্দবাবু বললেন, জাতীয় সঙ্গীতের সুর, আমার মনে হয়, একটিই থাকা উচিত। আর যারা গান করবেন—তাঁদেরও কর্তব্য গানটিকে ঠিকমত বুঝে প্রত্যেকটি শব্দ উচ্চারণ করা। সঙ্গের সোলফা হলে—ভিন্ন ভিন্ন সুরে গীত হলে জাতীয় সঙ্গীতের মর্যাদাহানি হয়।

এর পর অভিভাষণ পত্রের উল্লেখ করলেন।

অভিভাষণ পত্রে একটি শব্দ ছিল—'পথিকৃৎ'—ইংরেজি Pioneer-এর অনুবাদ। শব্দটি রাধানন্দবাবুর সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। তাই দানকালে এই প্রসঙ্গে বললেন,

শব্দটি আমার ভাল লেগেছে। ইংরেজির তর্জমা কালে সাংবাদিকরা মাঝে মাঝে ভারি অসুবিধায় পড়েন। অল্প সময়ের মধ্যে যথাযথ অর্থবাহী প্রতিশব্দ খুঁজে পাওয়া যায় না। এই রকম সুন্দর প্রতিশব্দ তৈরী হলে তর্জমার কাজটি অনায়াসসাধ্য হয়।

অতঃপর দেশের কথা, সাংবাদিকদের আদর্শ, শাসকদের সত্যবিকৃতি ও স্বৈরাচারের উদাহরণ, জাতীয় চরিত্র বিশ্লেষণ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে একঘণ্টারও অধিককাল বক্তৃতা করলেন। অনতা মন্ত্রমুগ্ধের মত স্থির হয়ে বসে রইল। অগ্রহায়ণের সন্ধ্যা—রীতিমত ঠাণ্ডা পড়েছে—তবু সভা ত্যাগের আগ্রহ দেখা গেল না কারও।

রামানন্দবাবু খুসি হলেন। শীত সম্বন্ধে তিনিও সচেতন ছিলেন। আরও পনেরো মিনিটকাল ভাষণ দিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করলেন।

শিল্পী সুনাথ ইতিমধ্যে কে স্কেচিং প্রায় সমাপ্ত করেছিল। সভা অন্তে রামানন্দবাবু এসে দাঁড়ালেন সেখানে। অভিনিবেশ সহকারে মূর্তিটি দেখে মন্তব্য করলেন, মন্দ হয়নি। তবে একটু বেশি অভ্রতা-মাখানো বোধ হচ্ছে। আমি কি এতটাই গম্ভীর? বলে হাসলেন।

আমরা চাইলাম রামানন্দবাবুর দিকে—কর্মঠ মূর্তির দিকে।

ওঁর বয়স হয়েছে—বার্ধক্যের ছাপ সর্বত্র অল্পস্পষ্ট, কিন্তু দৃষ্টিতে অদম্য প্রাণশক্তি বিচ্ছুরিত। তেজ এবং অন্তরলাবণ্যে ভরা অন্তরখানি দৃষ্টির আয়নায় প্রতিফলিত। "একটু বেশি অভ্রতা-মাখানো হয়েছে"—এই মন্তব্যের দ্বারা শিল্পীর অনবধানতাকেই কটাক্ষ করেছেন মনে মনে হল। তবু বহিরঙ্গের যথাযথ চিত্রণে প্রকৃত শিল্পের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয় না—অন্তর্দৃষ্টি ও গভীর হৃদানুভূতির সঙ্গে প্রয়োগবিধির মিলন ঘটলে যথার্থ একটি মূর্তি সৃষ্টি করা সম্ভব। অন্তর আর বাহির দুই মিলিয়ে সৃষ্টি হবে মর্মের মহিমা। মনীষী শিল্পযোদ্ধা মানুষটি তাঁর প্রতিমূর্তির মধ্যে এই সত্যকেই প্রত্যক্ষ করতে চেয়েছিলেন।

তবু ঘরোয়া পরিবেশে—সভাসঙ্কে-বক্তৃতার কৌতুকপ্রিয় মুক্তিনিষ্ঠ শিল্প-সচেতন নির্ভীক দেশপ্রেমী মানুষটির সম্পূর্ণ পরিচয় সেদিন আমরা পাইনি। সে পরিচয় উদ্ঘাটিত হলো পরের দিন সকাল বেলায় ব্রাহ্মসমাজে প্রার্থনা কালে। আচার্যের বেদীতে-বসা সেই বীরস্থির ভক্তিবিনম্র মূর্তির পানে চেয়ে আমরা তো বিস্মিত-পুলকিত-রোমাঞ্চিত দেহ। ভাববাষ্প-ব্যাকুলিত গদগদ কণ্ঠস্বর, পুলকরোমাঞ্চ-কণ্টকিত আবিষ্ট দেহভঙ্গী, ধ্যানস্তিমিত নেত্র, অশ্রু-পরিপ্লাবিত গণ্ড-যুগল……অকল্পিত অনির্বচনীয় সে দৃশ্য। প্রার্থনার দীপদণ্ডে প্রাণময় ওমুটি যেন প্রদীপ হয়ে জ্বলছে, স্নিগ্ধ স্বল্পতিত আলোকচ্ছটায় গৃহপরিবেশ বহু থেকে ভাবলোকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছে—চারিদিকে আনন্দ—আনন্দ—আর আনন্দ।

কোন্ নীতি-কোন্ শক্তি-কি অটল বিশ্বাস আর ঐকান্তিক নিষ্ঠা নির্ভরতা সেই মানুষটিকে দেশবরেণ্য করেছে—সে রহস্য আর গোপন রইল না। ভারতীয় ভাবধারা সমৃদ্ধ একটি চরিত্র পরিপূর্ণ মহিমায় আমাদের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল।

স্বাধীনতার পূজারী ৺রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়

বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

১৫. ১০. ৩৮ খ্রীস্টাব্দে ঘাটশিলা হইতে লিখিত একখানি পত্রে তিনি আমাকে লিখেছিলেন :

"ভিন্ন ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে, culture যাহাদের ভিন্ন তাহাদের মধ্যে, বিবাহ আমিও বাঞ্ছনীয় মনে করি না। ব্রাহ্মসমাজও করেন না। এই কারণেই, অন্য ধর্মাবলম্বী কেহ ব্রাহ্মসমাজে বিবাহ করিতে চাহিলে ব্রাহ্মসমাজ ইচ্ছা করেন যে, তিনি ব্রাহ্মধর্মাবলম্বী হউন এবং ব্রাহ্ম অনুষ্ঠান করুন। কিন্তু বিবাহ বিষয়ে আমার মত যাহাই হউক, মানুষের স্বাধীন ইচ্ছায় এবং সামাজিক ভাবে প্রেম ও আনন্দ-লিপ্সার অনুবর্তনে বাধা দেওয়া আমি উচিত মনে করি না।"

সামাজিক ভাবে underline রামানন্দবাবুর মন্তব্যের। চিঠির original আমার কাছে আছে যাহা হইতে উপরের অংশ উদ্ধৃত করলাম। তিনি বাস্তববাদীও ছিলেন। আদর্শবাদী তো ছিলেনই। বিবাহের ব্যাপারে নর-নারীর পরস্পরের প্রতি গভীর অনুরাগ তো সর্বাগ্রে প্রয়োজন। বিবাহ-বন্ধনকে দুঃখে সুখে অটুট রাখতে হ'লে বর ও কন্যার হৃদয়ের দিকটাকে মূল্য তো দিতেই হবে। কিন্তু বিবাহের একটা সামাজিক দিকও আছে যার মূল্য দাম্পত্যজীবনে অকিঞ্চিৎকর নয়। কবি প্রতিম রামানন্দ ভালো ক'রেই জানতেন, যেখানে বরপক্ষের এবং কন্যাপক্ষের মধ্যে সংস্কৃতিগত পার্থক্য বিপুল সেখানে দাম্পত্যজীবনের তরী যদি পাক-দরিয়ায় বানচাল হ'য়ে যায়, আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। দুই পক্ষের ধর্মীয় বিশ্বাস যদি ভিন্ন ভিন্ন হয়—সেটাও বিবাহিত জীবনের সুখের পথে অন্তরায় সৃষ্টি করতে পারে। 'শেষের কবিতা'র লাবণ্যের এবং অমিতের মধ্যে অনুরাগের ক্ষতি ছিল না। অমিত রায় আভিজাত্যরুচি, সুশিক্ষিত। তবু লাবণ্য শেষ পর্যন্ত বরমাল্য দিলো শোভনলালের কণ্ঠে যাকে সে একদা প্রত্যাখ্যান করেছিল। বিবাহের ব্যাপারে কেবল দুজন-শুজনই সব নয়; আরও অনেক দিক তলিয়ে দেখবার আছে—এই সাবধান বাণীর সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে লাবণ্য-অমিতের বিচ্ছেদের মধ্যে। যাকে বিয়ে করি সে তো প্রেয়সী যার অনেকখানি স্বপ্ন দিয়ে তৈরী। প্রেয়সী কখন গৃহিণীতে রূপান্তরিত হ'য়ে যায়। দৈনন্দিন জীবনের খুঁটি-নাটির মধ্যে স্বপনচারিণী প্রিয়াকে কোথায় হারিয়ে ফেলি! তখন জীবন সঙ্গিনীর অনেক কিছু অপূর্ণতাকেই মেনে নিতে হয়। না মেনে নিলে, সহজভাবে না থাকলে বিবাহ প্রহসন হয়ে দাঁড়ায়। শোভনলালের সেই ক্ষমতা ছিল।

রামানন্দবাবু সামাজিক শৃঙ্খলার প্রয়োজনকে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতেন। মুক্তি আর বন্ধন নিয়েই তো জীবনের নৃত্যলীলা। এদের একটাকে উপেক্ষা করলে জীবন-নৃত্যের তাল কেটে যায়, জীবন-কাব্যের ছন্দঃপতন হয়। রামানন্দবাবু বুদ্ধিজীবী ছিলেন; আত্ম-সংযমে বিশ্বাস করতেন, শৃঙ্খলায় আস্থা রাখতেন। তিনি রসিক ছিলেন নিশ্চয়ই কিন্তু Puritanও কি ছিলেন না? নরনারীর আনন্দ লিপ্সাকে তার প্রাপ্য মূল্য দিতে তিনি কখনোই কার্পণ্য করতেন না—কিন্তু তাকে অপরিমেয় মূল্য দিবারও পক্ষপাতী ছিলেন না। পার্থিব সুখভোগকে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে যেখানে বাঁচার জন্যে বেঁচে থাকাই জীবনের লক্ষ্য হ'য়ে ওঠে সেখানে সেই জান্তব জীবনে আমরা শুধু ক্লান্তি অনুভব করি। তাই জীবনে এমন কিছুর অবতারণা প্রয়োজন আছে যার মধ্যে বাজে অসীমের পদধ্বনি, যাকে স্পর্শ করতে পারে না কালের কর্তা। রামানন্দবাবু প্রবৃত্তির জীবনকে স্বীকার করলেও আসলে তিনি ছিলেন ঈশ্বরে বিশ্বাসী ধর্ম জগতের মানুষ।

আধ্যাত্মিকতার একটী ফল্গুধারা তাঁর কর্ম্ম জীবনের অন্তরালে নিয়তই ছিল প্রবহমান।

কিন্তু সামাজিক শৃঙ্খলাকে যিনি এতটা জোরের সঙ্গে স্বীকার করতেন, বিবাহের ব্যাপারে সমস্ত বেড়াকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন না তাঁর আত্মার গভীরতম সঙ্গীত ছিল কিন্তু স্বাধীনতা। তিনি নিজে বাঁকুড়ার এক নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু শেষে ব্রাহ্ম ধর্ম্ম গ্রহণ করেছিলেন স্বাধীনতার অকুণ্ঠ আহ্বানে। ধর্ম্মীয় ব্যাপারে যে-স্বাধীনতা তিনি নিজের জন্যে দাবী করতেন সেই স্বাধীনতা অপরের জন্যেও সর্ব্বক্ষেত্রে অকুণ্ঠচিত্তে তিনি দাবী ক'রে গেছেন। মার্কিন কবি হুইটম্যান Myself and Mine কবিতায় শিষ্যদের প্রতি নির্দ্দেশ দিয়ে গেছেন, "I charge you to leave all free, as I have left all free." "তোমাদের প্রতি আমার নির্দ্দেশ, সকলকে মুক্ত থাকতে দাও যেমন আমি কাউকে বাঁধতে চাই নি।"

দেশের স্বাধীনতা, সমাজের স্বাধীনতা, ব্যক্তির স্বাধীনতা, সমস্ত মানুষের স্বাধীনতা—এরই জন্যে লেখনীকে হাতিয়ার ক'রে সাংবাদিকের ভূমিকায় তিনি সংগ্রাম করে গেছেন। ফরাসী মনীষী মণ্টেনের (Montaign) লেখার পড়েছিলাম : Although I am tied down to one line of conduct, I do not, as others do, oblige the world to follow it,..." রামানন্দবাবু মণ্টেনের আর হুইটম্যানের সগোত্র ছিলেন। তাঁর আচরণের একটা প্যাটার্ণ ছিল নিশ্চয়ই ; কিন্তু পৃথিবী শুদ্ধ সবাইকে সেই আচরণ অনুসরণ করতে বাধ্য করতেন না। যারা তাঁর থেকে রুচিতে, মতে, বিশ্বাসে এবং কর্ম্মে স্বতন্ত্র ছিল তাঁদেরও তিনি শ্রদ্ধা করতে জানতেন। আজকের এই রামানন্দ শতবার্ষিকীতে স্বাধীনতার সেই অক্লান্ত, একনিষ্ঠ পূজারী রামানন্দকেই বিশেষ করে আমরা স্মরণ করবো।

রামানন্দ স্মরণে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মিত্র

গত শতাব্দীর শেষ ভাগে যে সকল প্রখ্যাত ব্যক্তি জন্ম-গ্রহণ করিয়া আমাদের জাতীয় জীবনকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অন্যতম। দেশ হিতৈষণা ও সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি জাতীয় স্থান প্রতিষ্ঠার মধ্যেই শুধু নয় চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মানসিক ঔজ্জ্বল্যতার মধ্যেও তাঁর জীবনের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়।

ব্যক্তিগতভাবে রামানন্দবাবুর সংস্পর্শে আসিবার দুর্লভ সৌভাগ্য আমি লাভ করিয়াছিলাম। তৎকালীন বাংলার সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন এক বিপুল বিস্ময়। কিন্তু সেই গাম্ভীর্য্য ও বহুতার অন্তরালে স্বতোৎসারিত ছিল তাঁর প্রসন্নতা। সেই প্রসন্নতার স্পর্শে আমার কবি সংক্রান্ত প্রবন্ধ রচনার প্রচেষ্টা ধন্য হইয়াছিল। ১৯১০-১১ খৃষ্টাব্দের মডার্ন রিভিউ ছিল সমগ্র ভারতের অন্যতম অভিজাত মাসিক পত্র ; প্রখ্যাত ব্যক্তিবৃন্দের রচনাবলীতে তাহা পূর্ণ থাকিত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও বঙ্গবাসী কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র থাকাকালীন অবস্থায় তিনি আমার অপটু হস্তের রবীন্দ্রনাথের পোস্ট মাস্টার গল্পের ইংরাজী অনুবাদ মডার্ন রিভিউতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। সম্পাদক-সুলভ ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের বেড়া দিয়া আপনাকে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে তাঁহাকে দেখি নাই ; তাই একটি লেখার মধ্য দিয়াই তাঁহার সহিত আমার পরিচয় নিবিড় হইয়াছিল। ইহার পর কবি-কলেজের (সাবোর) ছাত্র থাকার সময় ১৩১৯ সালের প্রবাসীতে "ফুল কপির চাষ" সংক্রান্ত আমার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। রামানন্দবাবুর কর্মফল ছিল কলিকাতা কিন্তু হৃদয়ের মধ্যেই যে নিহিত আছে দেশোন্নতি তাহা তিনি অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাসীতে কৃষি-

সাময়িক প্রবন্ধ-নিবন্ধ রচনা করিবার জন্য আমাকে উপদেশ নির্দেশ দান করিতেন। ১৩১৯ সাল হইতে এতাবৎ প্রবাসীতে আমার কত প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে তাহার সংখ্যা নিরূপণ দুষ্কর। রামানন্দবাবু ব্যক্তি ছিলেন না, ছিলেন এক প্রতিষ্ঠান; প্রবাসী আর মডার্ন রিভিউ ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের দুই অঙ্গ। কি বিষয়বস্তু নির্বাচনে, কি সংবাদ পরিবেষণে উভয় পত্রিকা ভারতে অনন্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। নিঃস্বার্থ ও নিরপেক্ষ ছিল পত্রিকাদ্বয়ের দান। একটি ঘটনা এ সম্পর্কে আমি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলাম। বাঁকুড়ার এক কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন ভাষণ দিয়াছিলেন স্বয়ং আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র; আমা কর্তৃক অনুলিখিত সেই ভাষণটি আচার্যদেব প্রবাসীতে প্রকাশ করিবার জন্য ব্যক্তিগতভাবে রামানন্দবাবুকে অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু বাঁকুড়া রামানন্দবাবুর নিজস্থান হওয়ায় তিনি পক্ষপাত দোষে দোষী হইবার সম্ভাবনা থাকায় উহা প্রকাশ করিতে অস্বীকৃত হইয়াছিলেন; তাঁহার নিকট "প্রবাসী"র উচ্চ আদর্শই ছিল অধিকতর বিচার্য, আচার্যদেবের সম্মানিত ব্যক্তিত্ব নহে; এইরূপ দৃষ্টান্ত বর্তমানে সচরাচর দেখা যায় না।

নির্ভীক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের দেশপ্রেমের জলন্ত স্বাক্ষর ছিল রিভিউ ও প্রবাসীর পাতায়। বৃটিশ সরকারের ঘোষিত নীতি ও আচরিত কর্মের তীব্র সমালোচনা তিনি প্রকাশ করিতেন; তাঁহার সমালোচনা বহু সময় বিদেশী কর্তৃপক্ষের উষ্মার কারণ ঘটাইয়াছে; কিন্তু তাহাদের রোষবহ্নি তাঁহাকে আদর্শচ্যুত করিতে পারে নাই। এমন কি মুক্তাক্ষর যাদুর অন্তর্ধানের সেই সঙ্কট মুহূর্তেও তিনি এই সম্পর্কে দুঃসাহসিক মন্তব্য প্রকাশ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা তাঁহার স্বাধীনচিত্ততাকে প্রভাবিত করিতে পারে, এরূপ ধারণা তাঁহার ছিল; তাই রাষ্ট্রসঙ্ঘে যাইবার কালে রাষ্ট্রসঙ্ঘ প্রদত্ত আর্থিক সাহায্য গ্রহণে তিনি অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া নিজ অর্থে তিনি জেনিভা নগরে গমন করিয়াছিলেন। আজীবনব্রাহ্মের একনিষ্ঠ পূজারী রামানন্দ কংগ্রেসী আন্দোলনের ত্রুটি সমূহকে সমালোচনা করিতেও পিছাইয়া আসেন নাই।

রামানন্দবাবুর গভীর প্রজ্ঞা, মনীষা ও ধীরচিত্ততা বহুই ভারতবর্ষের সনাতন আদর্শকে স্মরণ করাইয়া দেয়। জ্ঞানের বেদীমূলে সমর্পিত-প্রাণ রামানন্দকে দেখিয়া ফ্রান্সিস বেকনের উক্তি স্মরণে আসে "I have taken all knowledge to be my province." বর্তমানের এই পরিপ্লবতার মধ্যে তাঁহার ন্যায় মুক্ত-প্রাণ মুক্ত-হৃদয় ব্যক্তি অতীতের বস্তু বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। তাঁহার যেটুকু সংস্পর্শে আসিয়াছি তাহাতেই নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি; মনে পড়ে আমার কোন পুস্তকের সমালোচনার সমালোচক মহাশয়কে প্রবাসীতে আমাকে "চাষা" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছিলেন; আমার বয়স-সুলভ অভিমানকে প্রবোধ দিয়া রামানন্দবাবু ঐ আখ্যার জন্য গর্ব অনুভব করিতে বলিয়াছিলেন; স্মৃতির আলোকে যহ ঘটনা আজ উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছে, তাহারই দুই একটি নিবেদন করিলাম মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রকাশন

বাংলার উৎসব
শ্রীতারিণীশঙ্কর চক্রবর্তী
১·২৫

বাংলার লোকনৃত্য ও গীতিবৈচিত্র্য
শ্রীমণি বর্ধন
২·৯০

বাংলার শিকার-প্রাণী
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মিত্র
৩·০০

পশ্চিমবংগের শিল্পচেতনা
শ্রীআশীষ বসু
১·২৫

চিত্রে ভারতের ইতিহাস
৪·৬২

গান্ধী রচনাবলী
প্রথম খণ্ড (১৮৯৪-১৮৯৬)

রতের প্রত্নতত্ত্ব
২·০০

দ্বিতীয় খণ্ড (১৮৯৬-৯৭)
প্রতিখণ্ড ৫·০০

ডাকযোগে অর্ডার দিবার
ও মণি অর্ডারের টাকা
পাঠাইবার ঠিকানা।

প্রকাশন শাখা।
পশ্চিমবঙ্গ সরকারী মুদ্রণ
৩৮, গোপাল নগর রোড, কলিকাতা-২৭

॥ স্থানীয় বিক্রয়কেন্দ্র ॥

প্রকাশন বিক্রয়কেন্দ্র
নিউ সেক্রেটারিয়েট
১, হেস্টিংস স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ডব্‌লিউ, বি. (পি.) এডিভি— ডি, 3049/৬৫

আপনার সোনা এবং সোনার জিনিষগুলিকে

১৯৮০ সালের শতকরা ৭ টাকার স্বর্ণবণ্ডে

পরিবর্ত্তিত করে নিন

১৯৬৫ সালের ৩১শে মে পর্য্যন্ত এগুলি বিক্রী করা হবে

- এই বণ্ডগুলি সম্পত্তি কর এবং মূলধন লাভ-কর থেকে মুক্ত
- এই বিনিয়োগের উৎস সম্পর্কে অথবা স্বর্ণ নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী এই সোনার কথা কেন ঘোষণা করা হয়নি সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয় না।

নিকটবর্ত্তী ভারতের রিজার্ভ ব্যাঙ্কের অফিস থেকে, ভারতের ষ্টেট ব্যাঙ্কের শাখা এবং এর সহযোগী ব্যাঙ্কগুলির শাখা অফিস থেকে বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়।

রামানন্দ : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী

শ্রীসুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। উভয়েই উভয়কে শ্রদ্ধা করতেন এবং অত্যন্ত ভালবাসতেন।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ লিখেছিলেন :

"আকাঙ্ক্ষা ছিল কবির আগে আমার মৃত্যু হয়। রবীন্দ্র-বিহীন জগতের কল্পনা করি নাই। ভাবি নাই রবীন্দ্রবিহীন জগৎ দেখতে হবে। চোখ কান যাই বলুক বিশ্বাস হচ্ছে না যে তিনি নাই। এখনো মনে হচ্ছে শান্তিনিকেতনে গেলেই আবার তাঁর বার্ধক্যের সেই শুচিস্নিগ্ধ সুন্দর রূপ দেখতে পাব, যার ভিতর দিয়ে তাঁর অন্তরের অনুপম শ্রী বিচ্ছুরিত হোতো।"

বেশি দিন রবীন্দ্রবিহীন জগতে তাঁকে বাস করতে হয় নি। দু বছর পরেই ১৯৪৩ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়।

রামানন্দের প্রতি রবীন্দ্রনাথের শ্রদ্ধা ও প্রীতি কিরূপ ছিল তা এই নিম্নোদ্ধৃত পত্রখানি হতে বোঝা যাবে :

"হঠাৎ দেখা গেল, পঞ্চাশ বছরের ভারতী পঁচিশ বছরের প্রবাসীর সঙ্গে কলহ উপলক্ষ্যে স্নেহ-নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। সরস্বতীরা যখন নিজের মর্যাদা ভোলে, তখন এরকম অশোভন ব্যাপার ঘটে থাকে। তাই ভেবেছিলাম এ সম্বন্ধে ব্রহ্মবাদিনীকে (শ্রীযুক্তা সরলা দেবী চৌধুরানীকে) আড়ালে দাঁড়িয়ে কিছু বলব। কিন্তু আমার কথাটা তেমন করে চালা দিলে সাময়িকতা করা হবে, কর্তব্য করা হবে না।

ভারতীর গৌরবের তালিকা প্রকাশ উপলক্ষ্যে সম্পাদিকা লিখছেন :

"আর একটি কীর্তিও ভারতীর সনাতনী। অনেক সম্পাদক পরিবর্তন হইয়াছে কিন্তু কেহই অর্থ-নিপায় ভারতীর সেবা করেন নাই···ভারতীর সেবা, জীবিকার অবলম্বন করেন নাই।"

এর মধ্যে তিনটি কথা বলবার আছে। প্রথম, ভারতীর অনেকগুলি সম্পাদক আদরে নেচেছেন, লক্ষ্মীর কোনো না কোনো বরপুত্র তাঁদের আশ্রয় ছিল। ক্ষুধিত পরিবারকে অন্ন থেকে বঞ্চিত করে' সরস্বতীর নৈবেদ্য তাঁদের রচনা করতে হয় নি। সুতরাং এক্ষেত্রে নিস্পৃহতার বড়াই শুনে লোকে যে ভক্তিবিহ্বল হয়ে উঠবে, এমন আশা করা যায় না।

দ্বিতীয়, তৎসত্ত্বেও ভারতীর উপসত্ত্ব থেকে যদি কিছিৎ আয় করতে পারতেন, তবে তাঁদের কেউ যে লজ্জিত হতেন— একথা আমি স্বীকার করতে পারি নে।·····

তৃতীয়, কথা হচ্ছে এই, প্রাণ ধারণে আমাদের সকলেরই প্রয়োজন আছে। যারা পৈতৃক বা পরোপার্জিত সম্পত্তির অধিকারী নন, বাধ্য হয়ে তাঁদের উপার্জনের পন্থা অবলম্বন করতে হয়। মানুষের পাকযন্ত্র আছে বলে যদি সেটা লজ্জার বিষয় হয়, তবে সে লজ্জা সার্বজনীন। এ স্থলে মানুষকে কেবল এই কথাই ভাবতে হবে যে, উপজীবিকা যাতে অপ-জীবিকা না হয়। জ্ঞানতঃ সত্যের অপলাপ, অন্যায়ের সমর্থন বা মানুষের কুপ্রবৃত্তির উত্তেজনের দ্বারা যদি অন্নের পথ প্রশস্ত করবার চেষ্টা কোনো সম্পাদকের মধ্যে দেখা যায়, তা হলেই বলতে পারব কর্তব্যবুদ্ধির চেয়ে বিষয়বুদ্ধিই তাঁর প্রবল।

যার যার দেখেছি প্রবাসী-সম্পাদক সাধারণের অথবা কোনো কোনো ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের অপ্রিয়তা করে নিজের

ক্ষতির কারণই ঘটিয়েছেন। সকল সময়ে তাঁর উত্তেজনা আমার ভালো লাগে নি, অনেক সময়ে মনে হয়েছে, অমুক বিচারবুদ্ধির বিস্তৃততা রক্ষা হচ্ছে না; কিন্তু বরাবর দেখেছি, ঠিক করেই হোক ভুল করেই হোক, সম্পাদক যা সত্য বলে মনে করেছেন, ভয়ে বা লোভে তার বিরুদ্ধাচরণ করেন নি।.....

সব শেষে আমার নিজের একটা কৈফিয়ৎ আছে। ভারতী-সম্পাদিকার টিপ্পনীর মধ্যে এক জায়গায় লিখছেন :— "(প্রবাসী-সম্পাদক) বাল্মীকি-প্রতিভার কবিকেও সরস্বতীর বিনাপণের বহল হইতে ছুটাইয়া লক্ষ্মীর পণ্যশালায় বন্দী করিয়াছেন।"

পূর্বেই বলেছি লক্ষ্মী আমার লেখনীর উপর অর্থবৃষ্টি করলে দুঃখিত হব এত বড় উদাসীন কোনো কালেই আমি নই। এই ঔদাসীন্য যদি বা আমার দেশবাসীও থাকত, স্বয়ং সরস্বতীই আজ তাকে দেশছাড়া করেছেন। তিনিই স্বয়ং তাঁর কবির হাতে ভিক্ষার ঝুলি দিয়ে লক্ষ্মীর দ্বারে অবধানিত করতে ত্রুটি করেন নি। অন্য অনেক হতভাগ্য ভিক্ষুর মত লক্ষ্মীদেবীর মুষ্টি আঘাত পাইনে বটে, কিন্তু অধিকাংশ স্থলে মুষ্টিভিক্ষাও জোটে না। পাই প্রচুর পরিমাণে হাততালি; কারণ দানের হাতে তেমন তালি বাজে না। যেমন বাজে রিক্ত হাতে। এই ব্যাপারে যে পরিমাণে শরীরটাকে জীর্ণ করে ফেলেছি, তার সিকি পরিমাণেও ঝুলিটাকে পূর্ণ করতে পারি নি। কত শত যুযুক্ষিত দিনে পরিশ্রান্ত চিত্তে মনে মনে বাগদেবীর পুণ্যনাম জপ করেছি। কিন্তু অভাগ্যের অদৃষ্টে সেই নামমন্ত্রফলও ফলে নি। এমন অবস্থায় ভারতী-সম্পাদিকার সঙ্গে প্রবাসী-সম্পাদকের প্রভেদ এই যে, পরম দুঃখের দিনে তিনি আমার প্রবন্ধকে অর্থমূল্য দিয়েছেন— এমন সময় দিয়েছেন, যখন যাচী কবলে বিনামূল্যেই পেতেন।

সে কথা আজ মনে আছে। তখন আমার বিদ্যালয়ের ক্ষুধা মেটাবার জন্যে হিতবাদীর তৎকালীন ধনশালী কর্তৃপক্ষের কাছে আমার চার পাঁচটা বইয়ের স্বত্ব বন্ধক রেখে সামান্য কিছু টাকা সংগ্রহ করেছিলাম। প্রায় পনেরো বৎসরেও তা শোধ হয় নি। আমার অন্য বইয়ের আয়ও তখন বাধাগ্রস্ত ছিল। অর্থাৎ সেদিন দান পাওয়ার পথে দয়া ছিল না, উপার্জনের পথে বুদ্ধির অভাব, সম্পত্তির উপর শনির দৃষ্টি। অথচ শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের নামে সরস্বতীর যাত্রী উদ্ভরোত্তর বেড়েই চলেছে।

এমন সময় প্রবাসী-সম্পাদক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার প্রবন্ধের মূল্য দিয়েছিলেন। মাসিকপত্র থেকে এই আমার প্রথম আধিক পুরস্কার। তারপরে এই ইতিহাসের দ্বারা আর অধিক বর্ণনা করবার প্রয়োজন নেই।

প্রবাসী-সম্পাদক যদি সেদিন আমাকে অর্থমূল্য দিতে পেরে থাকেন তবে তার কারণ এ নয় যে, তিনি ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেছেন। তার কারণ এই যে, ভাগ্য উপায়ে পত্রিকা থেকে লাভ করতে তিনি সক্ষম হয়েছিলেন। তাতে কেবল যে তাঁর সুবিধা হয়েছে তা নয়, আমারও হয়েছে; এবং এই সুবিধা দেশের কাজে লাগাতে পেরেছি।

কিন্তু অর্থই ত একমাত্র আনুকূল্যের উপায় নয়। প্রবাসী-সম্পাদক সর্বদা তাঁর লেখার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা বন্ধুত্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্ব-ভারতীর যথেষ্ট আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্য দ্বারা তিনি আমার এই অতিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন। দুঃসাধ্য কর্তব্যভারে অর্থদানের চেয়েও সম্মান, প্রীতিদান অনেক সময়ে বেশি মূল্যবান। সুদীর্ঘকাল আমার ব্রতপালনে আমি যে কেবল অর্থহীন ছিলেম তা নয়, সঙ্গহীন ছিলেম; ভিতরে বাহিরে বিরুদ্ধতা ও অভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ একা সংগ্রাম করে এসেছি। এমন অবস্থায় যাঁরা আমার এই দুর্গম পথে ক্ষণে ক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, তাঁরা আমার রক্তসম্পর্কগত আত্মীয়ের চেয়ে কম আত্মীয় নন, বরঞ্চ বেশি। বস্তুত আমার জীবনের

লক্ষ্যকে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয়দান করেছেন। সেই আমার স্বল্প-সংখ্যক কর্মবন্ধুদের মধ্যে প্রবাসী-সম্পাদক অন্যতম। আজ আমি তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করি।[১]"

Hotel Bristol,
Wien
২০শে জুলাই, ১৯২৬

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রামানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ উভয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্বের মাধুর্য পত্রটির ছত্রে ছত্রে উচ্ছ্বসিত। বিশেষ করে তাই, পত্রটির প্রায় সমস্ত অংশই উদ্ধৃত করলাম।

পত্রটি একটি ইতিহাস। একটি মূল্যবান দলিল। অপূর্ব দলিল। কেননা এমন স্থললিত ভাষায়, এমন অপরূপ ভঙ্গিতে কোনো দলিল লেখা হয় নি।

এ কেবল দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর বন্ধুত্বের পরিচয়ই দিচ্ছে না—এ রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র কর্মজীবনের একটা দুঃখপূর্ণ অধ্যায় সাধারণের নিকট উদ্ঘাটিত করছে। রবীন্দ্রনাথের তপোবন—শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর জন্য রবীন্দ্রনাথ যে তপশ্চর্যা করেছেন—এ তারও পরিচয় দিচ্ছে।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে শান্তিনিকেতনে যাঁরা দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেছেন, তাঁরা জানেন—কথাগুলি অক্ষরে অক্ষরে সত্য। "দম্পতির উপর শনির দৃষ্টি" বা "ধনস্থানে শনি" এরূপ কথা রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা বহুবার শুনেছি।[২]

সে-যুগে নীরবে লোকচক্ষুর অন্তরালে, শান্তিনিকেতনের মরুপ্রান্তরে, কবি রবীন্দ্রনাথ কী কাজে ব্যাপৃত আছেন—সে কথা বাংলাদেশের অধিকাংশেরই অজ্ঞাত ছিল। সাধারণের কথা দূরে থাক, দেশের বহু খ্যাতনামা ব্যক্তিরও শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে ধারণা ছিল অস্পষ্ট। সহানুভূতি দূরে থাক বহু মহাজনের পদধূলি পর্যন্ত তখন রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ভাগ্যে জোটেনি।

কবি ছিলেন তখন সত্যই সঙ্গহীন। এমত অবস্থায় রামানন্দের এই বহুমুখী সহায়তা রবীন্দ্রনাথের অতিভার-পীড়িত আত্মকে যথার্থই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছে। কবি তাঁর কাব্যে বলেছেন :

"যারা আমার সাঁঝ-সকালের গানের দীপে জ্বালিয়ে দিলে আলো
আপন হিয়ার পরশ দিয়ে ; এই জীবনের সকল লাজা কালো
যাদের আলোক-ছায়ার লীলা ; মনের মানুষ বাইরে বেড়ায় যারা
তাদের প্রাণের ঝরণাস্রোতে আমার হৃদয় হয়ে হাজার ধারা
চলছে বেয়ে চতুর্দিকে।" পলাতকা (রচনা ১৯২৪)।

এই যাদের কথা কবির কাব্যে ধ্বনিত হচ্ছে, সেই মনের মানুষ রামানন্দ, এণ্ড্রুজ, পিয়ার্সন, এলমহার্স্ট, কিতিমোহন, বিধুশেখর, মন্মথলাল, অমদানন্দ, হরিচরণ, নেপালচন্দ্র, অজিতকুমার, সতীশচন্দ্র, সন্তোষচন্দ্র প্রভৃতি কেউ রবীন্দ্রনাথের রক্তসম্পর্কগত আত্মীয় ছিলেন না—কিন্তু তাঁরা ছিলেন রক্ত-

১ প্রবাসীর রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে এই পত্রটির কথাই আমার সর্বপ্রথম স্মরণ হয়। পত্রের প্রথম দুই পংক্তি মনে ছিল। কিন্তু পত্রটি কোথায় প্রকাশিত হয়—তা মনে ছিল না। পরম স্নেহাস্পদ শ্রীগোকুলদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাহায্যে পত্রটি "সবুজপত্র" হতে উদ্ধার করি।—সবুজপত্র (দশম বর্ষ), আশ্বিন, ১৩৩০। এ সম্বন্ধে সবুজপত্রের সম্পাদক প্রমথ চৌধুরীকে লেখা (২১শে জুলাই, ১৯২৬) রবীন্দ্রনাথের পত্র দ্রষ্টব্য। পত্রটির কাছে এইরূপ : "প্রবাসী, যে-বাসার পলাশবীথিকা ভারতী পড়ে অন্যান্য বিষয়ে বোধ করেছি।—তাই বিরতিপর ক্লান্তি ও অন্যমনস্কতার মধ্যেও আমি যে লেখাটা লিখেছি সবুজপত্রের জন্যে পাঠাচ্ছি।...চিঠিপত্র, ৭, পৃ—২৮৩।

২ লেখক ১৯১৭ সাল থেকে ১৯৩৪ পর্যন্ত শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

৩ প্রমথ চৌধুরীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্র (৩১ চৈত্র ১৩৩৪) দ্রষ্টব্য। চিঠিপত্র, ৭, পৃ—৪৩।

সম্পর্কিত আত্মীয়ের চেয়ে বেশি আত্মীয়। তাঁরা তাঁর "জীবনের লক্ষ্যকে সাধ্যমত করার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর দৈহিক জীবনকেও সেই পরিমাণে আশ্রয় দান করে গেছেন। দুর্গমপথে পলে পলে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সুহৃদ রামানন্দের জীবনও কৃচ্ছ্র-সাধনার মধ্য দিয়ে বিকাশ লাভ করেছিল।

রামানন্দ ধনবানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেন নি। প্রবেশিকা পরীক্ষায় কুড়ি টাকা বৃত্তির উপর নির্ভর করে তিনি তাঁর জন্মস্থান বাঁকুড়া হতে কলকাতায় যান এবং কলেজে ভর্তি হন। তিনি বি. এ পরীক্ষায় ইংরেজি অনার্সে প্রথম স্থান লাভ করেন। সরকারী বৃত্তি লাভ করে তাঁর বিলেত যাবার কথা—কিন্তু সরকারী চাকরি করবেন না বলে তিনি সেই বৃত্তি প্রত্যাখ্যান করেন।

বি. এ. পাস করে সিটি কলেজের তিনি অধ্যাপক হন এবং ঐ অধ্যাপনাকালেই এম. এ পাস করেন।

তারপর ১৮৯৫ খ্রীঃ, ৩০ বৎসর বয়সে, কায়স্থ পাঠশালা নামক কলেজের অধ্যক্ষ হয়ে রামানন্দ সপরিবারে এলাহাবাদ যান। সেখানে তিনি দীর্ঘকাল বাস করেন।

১৩০৪ সালের পৌষ মাসে (১৮৯৭ এর ডিসেম্বরে) রামানন্দ-সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'প্রদীপ' প্রকাশিত হয়। এই 'প্রদীপ' এবং 'প্রবাসী' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

"প্রথম যখন রামানন্দবাবু 'প্রদীপ' ও পরে 'প্রবাসী' বের করলেন—তাঁর রুচিত্ব ও সাহস দেখে শুনে বিস্ময় লাগল। আকারে বড়ো, ছবিতে অলংকৃত, রচনায় বিচিত্র, এমন দামী জিনিষ যে বাংলা দেশে চলতে পারে—তা বিশ্বাস হয়নি।"

'প্রদীপে' রবীন্দ্রনাথের—"সময় হয়েছে নিকট, এখন বাঁধন ছিঁড়িতে হবে", "আজি কি তোমার মধুর মূরতি", "তোমার খেলার সাথের সাথে, তব নদীতীরে", "ভালবেসে সখী, নিভৃতে যতনে" প্রভৃতি কবিতা ও গান প্রকাশিত হয়।

১৩০৭ সাল পর্যন্ত 'প্রদীপ' চলতে থাকে। ১৩০৮ সালের বৈশাখ মাসে 'প্রবাসী' প্রকাশিত হয়। প্রবাসীর প্রথম সংখ্যার ২২ পৃষ্ঠায়, রবীন্দ্রনাথের—"সব ঠাঁই মোর ঘর আছে, আমি সেই ঘর করি খুঁজিয়া"—এই প্রসিদ্ধ কবিতাটি "প্রবাসী" শিরোনামায় প্রকাশিত হয়।

প্রবাসীর প্রথম সংখ্যাতেই কবি তার সঙ্গে যে-যোগ স্থাপন করেন, আমরণ তা রক্ষা করে গেছেন।

১৯০৭ সালের জানুয়ারী মাসে "মডার্ণ রিভিউ" প্রকাশিত হয়। রামানন্দ তখনও এলাহাবাদে। প্রবাসীর সঙ্গে যেমন মডার্ণ রিভিউ-এর সঙ্গে তেমনি রবীন্দ্রনাথের যোগ অবিচ্ছিন্ন ছিল।

দীর্ঘকাল ধরে' রবীন্দ্রনাথের অসংখ্য কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, চিঠিপত্রাদি এবং নাটক ও উপন্যাস প্রবাসী এবং মডার্ণ রিভিউ-এ প্রকাশিত হতে থাকে। গোরা, জীবনস্মৃতি, মুক্তধারা, অচলায়তন, রক্তপুরী বা রক্তকরবী, শেষের কবিতা প্রভৃতি প্রবাসীতে এবং চোখের বালি, চতুরঙ্গ, শারদোৎসব, ঘরে বাইরে, গোরা, জীবনস্মৃতি, মুক্তধারা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদ মডার্ণ-রিভিউ পত্রিকাতেই প্রথম প্রকাশিত হয়।

এলাহাবাদে ১১ বছর চাকরি করার পর, রামানন্দ (১৯০৬এ) চাকরিতে ইস্তফা দেন। জীবনে আর তিনি চাকরি করেন নি।

এই প্রসঙ্গে আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন বলেছেন :

"রামানন্দবাবু কায়স্থ পাঠশালা কলেজের প্রিন্সিপালের পদ ত্যাগ করেন। ইহাও সত্য যে কলেজের কর্তৃপক্ষের সঙ্গেও তাঁহার মতভেদ ঘটিতেছিল। তখন তিনি পরিবার-ভারগ্রস্ত, আত্মীয় স্বজনদিগকেও অনেক সাহায্য করিতে হয়, "প্রবাসী"তে তখনও লাভ দাঁড়ায় নাই। কিন্তু এই তেজস্বী ব্রাহ্মণ এই সব কিছু না ভাবিয়া তাঁহার কর্মে ইস্তফা দিলেন। ইহাতে আর একজন রাঢ় দেশীয় ব্রাহ্মণের কথা মনে হয়, তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। উভয়েরই জন্ম-

তুমি হাঁচ দেশে, কাছাকাছি স্থানে। এই ভেলভিতার জন্যই তিনি লীগ অফ নেশনস-এ নিযুক্ত হইয়া সিমাও পাথের বাবদ বহু সহস্র টাকা প্রত্যাখান করিলেন। সরল অনাড়ম্বর ব্রাহ্মণ বলিয়াই তিনি নিজের এই স্বাধীনতাটুকু ক্ষুণ্ণ দিলেন না। এতগুলি টাকা অস্বীকার করা বড় সহজ কথা নয়।"

"নিবেদিতা বলেছিলেন: "ভারতের অন্তর্নিহিত ব্যথাকে প্রকাশের ভার যাঁহাকে বিধাতা দেন, তাঁহার কি আর চাকুরী করা চলে? শুধু বাংলার কথা বলিয়াই তাঁহার নিষ্কৃতি নাই, তাঁহাকে সকল ভারতের কথা বলিতে হইবে এবং সকল জগতের কথাও তুলিলে তাঁহার চলিবে না। তিনি বাঙ্গালী, তিনি ভারতীয়, তিনি বিশ্ববাণী।"—ক্ষিতিমোহন সেন: রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা—পৃ—১০-১১।

১৯০৮ সালে রামানন্দ কলকাতায় প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর যোগ বর্ধিত হতে থাকে। এলাহাবাদে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দের যোগ কেবল যে চিঠিপত্রাদিতেই সীমাবদ্ধ ছিল, তা নয়; রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাড়ীতেও গেছলেন। কিন্তু কলকাতায় উভয়ের দেখা-সাক্ষাৎ সহজ হওয়ায়—সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো। রামানন্দ শান্তিনিকেতনে এবং রবীন্দ্রনাথ কলকাতায়, রামানন্দের বাড়ীতে যাতায়াত করতে লাগলেন।

১৯১১ (১৩১৭) সালে মোলের সময় রামানন্দ, জ্যেষ্ঠ-কন্যা শান্তার সঙ্গে প্রথম শান্তিনিকেতন দর্শন করেন। ১৯১১ (১৩১৮) সালের ২২শে বৈশাখ, দুইকন্যা শান্তা ও সীতার সহিত তিনি পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন করেন। সেপ্টেম্বর মাসেও তিনি আশ্রমের "শারদোৎসবে" যোগদান করেন।

তখন থেকে প্রতি বৎসরই তাঁর শান্তিনিকেতনে আসা-যাওয়া চলতে থাকে। রামানন্দ তখন রবীন্দ্রনাথের একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিদ্যালয় বিষয়ক সর্বপ্রকার আলাপ আলোচনা রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের মধ্যে চলতে থাকে। এ বিষয়ে রামানন্দের উপর রবীন্দ্রনাথ কতটা নির্ভর করতেন—তা এই উদ্ধৃত পত্রখানি থেকে জানা যায়।

"বিদ্যালয়ের জন্য একটি অন্যরূপ সভা স্থাপনের প্রস্তাব আপনাকে পূর্বেই জানাইয়াছি। আপনি ছাড়া আর কাহারও নাম মনে পড়িতেছে না। আপনার সঙ্গে রথীন্দ্র ও সুরেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যাইতে পারে।...আমি এখানে থাকিতে আপনি কি দুই-একদিনের জন্য এখানে আসিবার অবসর করিতে পারিবেন? একবার যদি আসা সম্ভব হয় ত আরও অন্যান্য অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যাইতে পারেন।" ২৬শে মাঘ, ১৩১৮ (১৯১২)।[৪]

রামানন্দের সমস্ত পরিবারসহ (স্ত্রী পুত্র কন্যাসহ) শান্তি-নিকেতনে আগমন, ১৯১৭ সালের বৈশাখ মাসে, রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে। এই সময়ে গ্রীষ্মের ছুটিতেও তিনি সপরিবারে শান্তিনিকেতনে ছিলেন।

অতঃপর ১৯১৭ সালের জুলাই মাসে, শান্তিনিকেতনে একটি বাড়ী কিনে রামানন্দ সপরিবারে আশ্রম বাস করতে থাকেন। এই সময় তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র "মুনু" (মুক্তিদাপ্রসাদ বা প্রসাদ) কে বিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। স্বাস্থ্য তার ভাল ছিল না বলেই বিশেষ করে ঐ বাড়ীটি কেনা হয়।

এই বাড়ীর প্রত্যেক ঘর থেকে 'দেহলী'র উপর তলার কুটীরটি দেখতে পাওয়া যেত। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের দৈনন্দিন গতিবিধি রামানন্দ-পরিবারের সতত দৃষ্টিগোচর হতো। বাড়ীটির এই বিশেষত্বের কথা, রামানন্দ এবং তাঁর কন্যাগণ উল্লেখ করেছেন।

এই সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে রামানন্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় বিবিধ বিষয়ের আলাপ আলোচনা চলতো।

আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন লিখেছেন: "পরে যা 'বিশ্ব-বিদ্যাসংগ্রহ' রূপে প্রকাশিত হয়, এই সময় থেকেই তাঁরা তার পরিকল্পনা করেন। যে-সব ইংরেজি গ্রন্থ সাধারণ পাঠকদের

৪ রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ—১০৪।

P 2950

জন্য অনুবাদ করা আবশ্যক—তার একটা তালিকা পর্যন্ত তাঁরা করেছিলেন।

"এইসব আলোচনার মধ্যেই একদিন রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষা-সত্রের" (A Poet's School) পরিকল্পনার কথা প্রকাশ করেন।"

এ হলো বিনামূল্যে অথবা নামমাত্র মূল্যে শিক্ষাদানের পরিকল্পনা। এ বিদ্যালয়ের—উদ্দেশ্য—সাধারণ শিক্ষাদানের সঙ্গে সঙ্গে, কৃষিবিদ্যা, পশু ও পক্ষী পালনবিদ্যা, বয়নবিদ্যা, কাগজ ও বাহুর তৈরি, বুননশিল্প ও বিবিধ কারুশিল্প প্রভৃতি গার্হস্থ্যজীবনের নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের শিক্ষাদান।

এইসব বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য স্বভাবত সৃজনোন্মুখ শিশুমনকে সৃষ্টিকার্যে নিয়োগ করা। এবং তারই আনন্দে নিমগ্ন রাখা। এই "শিক্ষাসত্র" প্রথমে শান্তিনিকেতনে খোলা হয়েছিল—এখন এর অবস্থান শ্রীনিকেতনে। গ্রামের ও শ্রীনিকেতনের (এবং শান্তিনিকেতনেরও কিছু কিছু) ছেলেমেয়ে এখানে অল্পব্যয়ে শিক্ষালাভ করে।

"স্ত্রীশিক্ষা, শিশুশিক্ষা, উপেক্ষিত শিল্পবিদ্যা—যথা সঙ্গীত ও চিত্রকলা, এইরূপ বিচিত্র বিষয়ের শিক্ষা সম্বন্ধে এই দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু আলাপ আলোচনা করতেন।

"তাঁদের বন্ধুত্ব ছিল প্রগাঢ়। গভীর প্রীতি ও শ্রদ্ধার উপর ছিল এই বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত। আমরণ তা বজায় ছিল।"

"রামানন্দ বিনা দ্বিধায় তাঁর এক অধিকার বিশ্বভারতীকে দান করেন। এ হলো রবীন্দ্রনাথের বাংলা গ্রন্থের হিন্দী অনুবাদের অধিকার।"

Visva-Bharati News, December 1943, pp. 65 66.

বিশ্বভারতীর ১৯২৬ সালের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখি 'মুক্তধারা' নাটকের ৫০০০ কপি (অর্থাৎ সমস্তই) রামানন্দ বিশ্বভারতীকে দান করেছেন।

এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন :

"শ্রদ্ধাস্পদেষু

"মুক্তধারা"র বইগুলি বিশ্বভারতীকে উপহার দিতে ইচ্ছা করিয়াছেন ইহাতে আমি বড় আনন্দ পাইলাম। আমাদের সকলের হৃদয়ের নমস্কার গ্রহণ করিবেন। ইতি ৭ই মাঘ, ১৩২৯।" প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৪৮।

"মুক্তধারা" ১৩২৯ সালের বৈশাখে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। বৈশাখ মাসেই 'প্রবাসী'তে নাটকটি সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছিল। নাটকটির ইংরেজি অনুবাদও Modern Review (May, 1922) এ প্রকাশিত হয়।

সেকালে প্রবাসী ও Modern Review পত্রিকার এক এক পৃষ্ঠা পাতা বিশ্বভারতীর বিজ্ঞাপনের জন্য দান করা হতো।

১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হতে ১৯১৯ এর এপ্রিল পর্যন্ত প্রায় দুবছর রামানন্দ ঐ পূর্বোক্ত (মাটীর) বাড়ীটিতে বাস করেছিলেন।

বাড়ীটি পরে অধিগৃহীত হয়ে নষ্ট হয়—এখন তার স্থিতির উপর কলেজের হোস্টেলাদি নির্মিত হয়েছে। বর্তমান হিন্দী-ভবনের উত্তর দিকে রাস্তার ধারে বাড়ীটি বর্তমান ছিল।

অতঃপর ১৯২৪ সালের আগষ্ট মাস থেকে পুনরায় কয়েক মাস রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বাস করেছিলেন।

এই সময়ের কথা তাঁর কন্যা শান্তাদেবী রামানন্দের চিঠি-পত্র হতে উদ্ধার করেছেন। এই পত্রাংশ হতে রামানন্দের শান্তিনিকেতনে অবস্থানের সঠিক তারিখ এবং সে-যুগের শান্তিনিকেতনের বা বিশ্বভারতীর কার্যকলাপের একটা চিত্র পাওয়া যাবে :

"শান্তিনিকেতন ১লা ভাদ্র। আমি নির্বিঘ্নে শান্তি-নিকেতনে পৌঁছিয়াছি ও ভাল আছি।"

"১লা সেপ্টেম্বর ১৯২৪। আমি বেড়াইবার জন্য বাহির হই না বটে কিন্তু এখন আশ্রম এরূপ হইয়াছে যে যেখা সাক্ষাৎ করিতে এবং বিটিতে বক্তৃতা শুনিতে হইলেই যথেষ্ট

বেড়ান হয়। তা ছাড়া, ইতিমধ্যে দুদিন সুরুল (শ্রীনিকেতন) গিয়াছিলাম। আমি এখানে কোনরূপ কাজের ভার লই নাই। এবং লইব না।

"৮-১২-২৪। আমি কাল ১০টার পর সুরুল গিয়াছিলাম। স্নান করিয়া গিয়াছিলাম। রবিবাবুর সেই গাছের উপর নীড়টিতে আমার আহ্বান হইয়াছিল। স্নানের বন্দোবস্তও ছিল।"

কাশাহারা নামক এক জাপানী শিল্পী এই নীড়টি নির্মাণ করেছিলেন। কবি এখানে মাঝে মাঝে বাস করতেন। বাসস্থানটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল।

"২২-৮-২৪। মঙ্গলালবাবু আজ একটা বড় রেশমী কাপড়ে আঁকা ছবি জাপানী ধরণে mount করিতেছেন দেখিলাম। এখানে একদিন সন্ধ্যার পর এণ্ড্রুজ সাহেব চীন সম্বন্ধে বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তারপর ক্ষিতিমোহনবাবু ঐ দেশ বিষয়ে অনেক বলিয়াছিলেন। – কলাভবনে গিয়াছিলাম। ছবি আঁকা চলিতেছে।—রথিবাবু বোধহয় কাল আসিবেন।

"৩১-১০-২৪। এখানে সন্ধ্যার পর একটু ঠাণ্ডা পড়ে। এইজন্য বাহিরে বসিয়া থাকিতে হইলে ঠাণ্ডা লাগা নিবারণের জন্য (শীতের জন্য নয়) একটা কিছু গরম গায়ে দিতে হয়। কাল এখানে প্রধানত মেয়েরা গান ও অভিনয় করিয়াছিল। তাহাদের নাচ, নৃত্য গান বেশ হইয়াছিল···ডাঃ রজনীকান্ত দাস কালই ফিরিয়া আসিয়াছেন।"

এখানে বলা আবশ্যক সে-যুগে মেয়েদের নৃত্য, হিন্দু ও ব্রাহ্ম সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তিই পছন্দ করতেন না। "সঞ্জীবনী" পত্রিকায় এ বিষয়ে কড়া সমালোচনা হতো। রবীন্দ্রনাথের এই নৃত্যনাট্য প্রবর্তনে রামানন্দের পূর্ণ সমর্থন ছিল।

"১৮-১-২৫। এখানে কাল মহর্ষির মৃত্যুদিন উপলক্ষে উপাসনা ও সভা হইবে. এখানে অনেক ছাত্র ও অধ্যাপক আছেন তাঁহাদের মাতৃভাষা বাংলা নহে। এইজন্য এই উপাসনা ইংরেজীতে হইবে। তাহা আমাকে করিতে হইবে। সভার কতক কাজ ইংরেজীতে হইবে। আমি ইংরেজীতে কিছু বলিব।

"এণ্ড্রুজ কার্ভনের কন্যা ও জামাতা এখানে কাল আসিয়াছেন। লোকের যাতায়াত এখানে বেশ আছে। সুতরাং জায়গাটা সহর না হইলেও কাজের ব্যাঘাত মধ্যে মধ্যে হয়।"

এই সময় হতেই বিশ্বভারতীর বিশ্বজনীন রূপ পরিস্ফুট হচ্ছে। অতিথি অভ্যাগতের ভিড়ও শুরু হচ্ছে। চিঠিটি বর্তমান বিশ্বভারতীর সূচনা দিচ্ছে।

"১৩।১।২৫। এখানে কাল রাত্রি থেকে খুব বৃষ্টি হইয়াছে। ছেলেরা সকলে দলে দলে ভিজিতে বাহির হইয়াছিল। আমিও খালি পায়ে বর্ষাতি গায়ে ছাতা মাথায় দিয়া খুব বেড়াইয়াছি। • •"

ব্রহ্মচর্যাশ্রমের প্রারম্ভ হতে ছেলেদের এই রীতি ছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ছেলেদের সঙ্গে বৃষ্টিতে ভিজতে বেরোতেন। বর্ষার ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র-দিনেন্দ্রের সুরের ধারা বইতো।

"১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দেও রামানন্দ বছরের গোড়া হইতে শান্তিনিকেতনে দীর্ঘকাল ছিলেন। মার্চ মাসে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব একটি বাড়ীতে তাঁহাদের খুব কাছেই ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আবার নিজের জন্য ছোট একটি বাড়ী করিবার ইচ্ছা তাঁহার ছিল।

"অল্প কয়েক মাসের মধ্যে নানা বাড়ীতে ছিলেন। সকল সময়েই আশ্রমের সকলে তাঁহার প্রতি অনুরাগের নানা পরিচয় দিয়াছিলেন।···মেয়েদের মধ্যে কেহ কেহ তাঁহার খাওয়া দাওয়া ওষারক করা, তাঁহার ভৃত্যকে রান্না শেখান, তাঁহার কখন কি প্রয়োজন, তাঁহার কন্যাকে কলকাতায় জানান, ইত্যাদি নানাভাবে তাঁহার প্রতি ভক্তির পরিচয় দিতেন।

• ১৯।১।২৫ ? তারিখগুলিতে ছাপার ভুল আছে কিনা জানি না। বোধহয় ক্রমানুযায়ী লেখা হয় নি।

"১৯০৭ এবং ১৯০৮ এ তিনি কিছুদিন বর্ণীয়া স্বকেশী দেবীর বাড়ীটি ভাড়া করিয়াছিলেন। কিছুদিন প্রাক্তন ছাত্রদের পুরাতন বাড়ীতে আশা ও ভক্তি অধিকারীদের (অধ্যাপক ক্ষীতীশ অধিকারীর কন্যা) সহিত ছিলেন।" রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ—১৮১-৮২

স্বদেশী দেবীর বাড়ী ভেঙ্গে চীনভবন এবং প্রাক্তন ছাত্রদের বাড়ী ভেঙ্গে চীনভবনের পশ্চিম দিকের ছাত্রাবাস নির্মিত হয়েছে।

বিশ্বভারতীর শিক্ষাভবন যখন কলেজে পরিণত হয়, তখন ১৯২৪ সালে রামানন্দই তার প্রথম অধ্যক্ষ হন। এ বিষয়ে তাঁর কন্যা শান্তাদেবী লিখেছেন:

"১৯২৪ এর জুলাই মাসে রামানন্দকে কলেজের প্রিন্সিপ্যাল করার কথা হয়। এই সময় হইতে শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিতে অনুমতি পান। সেই উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ও বিশ্বভারতীর পক্ষ হইতে একজন অধ্যাপক ১১ই জুলাই শান্তিনিকেতন যান। তাঁহারা ১২ই জুলাই কলিকাতা ফিরিয়া আসেন। রামানন্দ বিশ্বভারতী কলেজের আবৈতনিক প্রিন্সিপালের পদ সেই সময় না গ্রহণ করিলে কলেজের অনেকগুলি অসুবিধা হইত। একথা তাঁহার নিকট শুনিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলাম।"

শ্রীপ্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় লিখছেন: "১৯২৪ সন হইতে বিশ্বভারতীর নূতন ব্যবস্থা হইল।...বিশ্বভারতীর পূর্ব বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে একদল বিশ্বভারতীর নিজস্ব ধারায় ও একদল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হতে থাকেন।.....'কলেজের নাম 'শিক্ষাভবন' ও স্কুলের নাম 'পাঠভবন' হইল। এই শিক্ষাভবনের প্রথম অধ্যক্ষ হন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।" শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী, পৃ, ২২২।

রামানন্দ প্রথমত অধ্যক্ষ, তবু কোন কোন ক্লাস নিতেন। রামানন্দের কর্তব্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে বিদ্যাভবনের (Post-graduate Research Dept.) তৎকালীন অধ্যক্ষ বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় লিখেছেন:

"শিক্ষাভবনের অধ্যাপকগণের মধ্যে তখন এণ্ড্রুজ সাহেবও ছিলেন। বিশ্ববন্ধু দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বিশ্বজোড়া কাজ, এজন্য বাহিরের কাজে তাঁহাকে অনেক সময় যাইতে হইত। এবং তাহাতে কলেজের ছাত্রদের পড়াবার ক্ষতি হইত। রামানন্দবাবু ইহা লক্ষ্য করিয়া এণ্ড্রুজ সাহেবকে একটু মৃদুমন্দ তিরস্কার করিয়া স্পষ্টভাবে বলিয়াছিলেন যে, তিনি যখন অধ্যাপক তখন তিনি কিছুতেই নিয়মিতভাবে না পড়াইয়া পারেন না। উদারমতি এণ্ড্রুজ ইহাতে কোনরূপ অসন্তুষ্ট না হইয়া সরলভাবে নিজের ত্রুটি স্বীকার করিয়াছিলেন এবং আর কখনও ওরূপ করিতেন না। রামানন্দবাবুর কর্তব্যনিষ্ঠা কেমন ছিল তাহা এই সামান্য ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে।"

রামানন্দ ও অর্ধশতাব্দীর বাংলা, পৃ ১৮০।

১৯২৪ সাল হইতে ১৯২৬ সালের মধ্যে বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের তিনজন অধ্যক্ষের নাম পাওয়া যায়। প্রথম অধ্যক্ষ রামানন্দ, দ্বিতীয় নেপালচন্দ্র রায় এবং তৃতীয় (১৯২৬ জুলাই) জাহাঙ্গীর তর্কিল।

রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে বহু প্রকারে সাহায্য করতেন। রবীন্দ্রনাথকে সাহায্য করবার জন্য তিনি যেন সতত উন্মুখ থাকতেন।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদেও রামানন্দ কখনো কখনো সহায়তা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখছেন:

"কবিকার কবিতাগুলি Modern Review তে বাহির হইয়াছে শুনিয়া প্রথমটা বড় ভয় পাইয়াছিলাম। কেননা, সে-গুলা কাঁচা অবস্থায় লেখা। তাহার পরে আবার প্রায় নূতন করিয়া লিখিয়াছিলাম। যাহা হউক পড়িয়া, মোটামুটি ভয়ের কোনো কারণ নাই—আপনি লাগসোহা

দাঁড়িয়া থাকিয়া প্রাণ নূতন করিয়া দিয়াছেন। নভেম্বর ১৯১৩।"

রামানন্দ যখন শান্তিনিকেতনে থাকতেন তখন কোন কোন দিন, রবীন্দ্রনাথ ২।১টা ইংরেজি লেখা রামানন্দের হাতে দিয়ে বলতেন, "এই নিন মশাই, আপনি ইস্কুল মাষ্টার মানুষ; ব্যাকরণের ভুলগুলো দেখে মনে ঠিক করবেন।"

রামানন্দ কিন্তু কখনোও বলতেন—"আমি কখনও তাঁহার লেখার উপর কলম চালাইবার প্রস্তাব করি নাই, যদিও এরূপ গল্প আমার নামে রটিয়াছে। কবির লেখায় আর্টিকেলের গোলমাল ও কমা সেমিকোলন ছাড়া বিশেষ কিছু বদলাইবার প্রয়োজনও হইত না।"

রামানন্দ ও তৎকালীন বাংলা, পৃ ১৭৩।

রামানন্দের কনিষ্ঠ পুত্র "মুনু" পিতার বহু সদ্‌গুণের অধিকারী ছিলেন। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় বাল্যকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। ১৩০১ সালের ২৩শে চৈত্র তাঁর জন্ম এবং ১৩২৬ সালের ১৯শে ভাদ্র ১৬ বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু ঘটে।

মৃত্যুর পর তাঁর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লেখেন :

"তার জীবনের কীর্তিও কিছু আছে এখানে। স্থবন-ডাঙার গরীবদের জন্যে সে এখানে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে গেছে। তাঁরা সংগ্রহ করে আমরা অনেক সময় ধনসাধ্য অনুষ্ঠানের চেষ্টা করে থাকি। কিন্তু তার চেয়ে বড় হচ্ছে নিজের শক্তি দ্বারা নিজের উপার্জনের অর্থের দ্বারা কাজ করা। নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন সম্বন্ধে মুনু তাই করেছে। সে পুরানো কাগজ নিজে বোলপুরে ঘরে নিয়ে বিক্রী করে এই বিদ্যালয়ের ব্যয় নির্বাহ করত। সে নিজে তাদের পড়াত, তাদের আমোদ দিত। এ সম্বন্ধে আশ্রমের কর্তৃপক্ষের কোনো সাহায্য সে নেয় নি। এই অনুষ্ঠানটি কেবল যে তার ইচ্ছা থেকে প্রসূত তা নয়, তার নিজের ত্যাগের দ্বারা গঠিত। তার এই কাজটি এবং তার চেয়ে বড় তার এই উৎসাহটি আশ্রমে রয়ে গেল।" [শান্তিনিকেতন পত্রিকা, অগ্রহায়ণ, ১৩২৬]

মুনুর মৃত্যুর পর রামানন্দ এই বিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ১০০০ টাকা দান করেন। এর নাম হয়—"প্রসাদ নৈশ-বিদ্যালয়"।

পূর্বেই বলেছি—বিশেষ করে "মুনুর" জন্যই রামানন্দ একটি (মাটির খোড়ো) বাড়ী বেঁধেন। বর্তমান হিন্দী-ভবনের উত্তরদিকে রাস্তার ধারে এই বাড়ীটি তৈরি হয়েছিল। মুনুকে নিয়ে রামানন্দ পরিবারের অনেকে এবং অধিকাংশ সময় স্বয়ং রামানন্দ শান্তিনিকেতনে বাস করতেন।

রামানন্দ লিখছেন :

"প্রায় ২৩ বছর পূর্বে আমি শান্তিনিকেতনে অনেক সময় থাকতাম। তাঁর (রবীন্দ্রনাথের) বাড়ীর (দেহলীর) সামনেই একটা বাড়ীতে থাকতাম। মাঝখানে ছিল একটা মাঠ। তিনি তখন এমন পরিশ্রমী ছিলেন যে, একদিনও রাত্রে তাঁর লিখবার পড়বার ঘরের আলো নিবতে দেখিনি। প্রত্যূষে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, হয় তিনি বারান্দায় উপাসনায় বসেছেন; নতুবা উপাসনা সেরে লেখা বা পড়ার কাজে লেগে গেছেন। সেকালে দুপুরে খাবার পরও তাঁকে কখনো শুতে বা হেলান দিতে দেখিনি; গ্রীষ্মে কাউকে তাঁকে পাখার বাতাস দিতে বা তাঁকে নিজে হাতপাখা চালাতে দেখিনি। তখন শান্তিনিকেতনে বৈদ্যুতিক আলো বা পাখা ছিল না। বহু বৎসর পরেও তাঁর প্রবলতায় বিস্মিত হয়েছি। পরে বার্ধক্যে ও রুগ্নাবস্থায় তিনি ঠিক তেমনটি ছিলেন না বটে, কিন্তু তখনও অনেক যুবকের চেয়ে তিনি বেশী পরিশ্রম করতেন। এই সেদিনও গান্ধিজী তাঁকে দুপুরে বিশ্রাম করতে অনুরোধ করিয়েছিলেন।" প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৪৮ (বিবিধ প্রসঙ্গ)।

এই প্রসঙ্গে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে একটি ঘটনার উল্লেখ করি :

মৃত্যুর ২।৩ বৎসর পূর্বে ১৯৩৮-৩৯ সালে রবীন্দ্রনাথ দুপুরে কি করেন জানার জন্যে আমার বড় কৌতূহল হয়। সপ্তাহের বিভিন্ন সময়ে তাঁর ঘরে প্রবেশ করে আমি তাঁকে কখনো শয়ান অবস্থায় দেখেনি। তিনি তখন এক হেলান চেয়ারে বসে বিজ্ঞানের বই পড়তেন। কখনো বা 'বেঙ্গল' প্রভৃতি বেঙ্গলমুদ্রণালয় পাঠ করতেন। সেই তাঁর বিশ্রাম (বা recreation)। আমি তাঁকে বলি—"দুপুরের নানা সময়ে আপনার ঘরে ঢুকে পড়ার আমার একটা উদ্দেশ্য ছিল।" তিনি বিস্ময়ান্তে বলেন—"উদ্দেশ্যটা কি?' আমি উত্তর দিই—"আপনি দিনে ঘুমোন কিনা দেখা।"

তিনি পরিহাসবিকম্পিত স্বরে বলেন—"শৈশবের সময় প্রতিজ্ঞা করতে হয়েছিল—না দিবা স্বাপীঃ। "দিনে ঘুমিয়োনা।" "আমরা সেকেলে মানুষ। প্রতিজ্ঞা করলে তা রক্ষা করতে হয়—এই আমাদের বিশ্বাস।"

রামানন্দের মত রবীন্দ্রনাথের যথার্থ গুণগ্রাহী অন্তরঙ্গ সুহৃদ খুব বেশি ছিল না। কবিকে তিনি গভীরভাবে ভালবাসতেন। সেই ভালবাসার জন্যই তিনি কবির অন্তরের অন্তঃস্থলে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। তাঁর এই ভালবাসা বিচারবুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে নাই বরং উজ্জ্বলতর করেছিল।

১৯১৯ সালে পঞ্জাবের জালিয়ানাবাগে নিরস্ত্র নিরীহ স্ত্রী পুরুষ শিশুর উপর যখন নৃশংস গুলিবর্ষণ হয়—তখন রবীন্দ্রনাথ তাঁর "নাইট" উপাধি পরিত্যাগ করে তদানীন্তন বড়লাট লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে যে-পত্র লেখেন সেই ঐতিহাসিক পত্র সম্বন্ধে রামানন্দ মন্তব্য করেছিলেন:

"পত্রখানিতে পঞ্জাবের আধুনিক ঘটনাবলী ও অবস্থা সম্বন্ধে দেশের লোকের ধারণা ও মনের ভাব ঠিক প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা রবীন্দ্রনাথের উপযুক্ত হইয়াছে। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহা আদ্যোপান্ত সত্য। "কবিজন সুলভভাবপ্রবণতা" বশতঃ হঠাৎ বিচলিত হইয়া তিনি এই কাজ করেন নাই। বীর, সত্যনিষ্ঠ, হৃদয়বান, নির্ভীক, মানব-প্রেমিকের যাহা করা উচিত, তিনি তাহাই করিয়াছেন।

"ইতিহাসে এবং মানবপ্রকৃতিতে অন্তর্দৃষ্টি থাকিলে নানা ঘটনার কারণ ও প্রকৃতি, সহজে সামান্য উপকরণ হইতে বুঝা যায়। ইতিহাসের স্রোত কি কি কারণে কোন্ পথে ধাবিত হয়, জাতীয় অভ্যুত্থান ও পতন কি কি কারণে হয়, জনসমাজ কি কি কারণে সংক্ষুব্ধ, উত্তেজিত, অবসাদগ্রস্ত বা নববল-শালী হয়, ঐতিহাসিক নানা ঘটনার নিগূঢ় কারণ কি কি, এসব বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি অসাধারণ; তিনি ইতিহাসের তত্ত্বদর্শী, উহার মর্মস্থলে তিনি পৌঁছিয়াছেন। এইজন্য দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথ অন্তর্দৃষ্টির বলে ভারতেতিহাসের কোন কোন যুগ সম্বন্ধে বহু বৎসর পূর্বে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হন, বহু অধ্যয়ন-ও-গবেষণা পরায়ণ নিরপেক্ষ ও সত্যান্বেষী ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যদুনাথ সরকার নানা ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ ও অধ্যয়নের পর সেই সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া স্বরচিত কোন কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে নিবদ্ধ করিয়াছেন। যে-শক্তির বলে রবীন্দ্রনাথ পুঞ্জীকৃত মূল ঐতিহাসিক উপাদানে পরিবেষ্টিত না হইয়াও ইতিহাসের মর্মস্থলে পৌঁছিতে পারিয়াছিলেন, সেই শক্তি অল্প সংবাদ হইতেও তাঁহাকে পঞ্জাবের ঘোর দুর্ঘটনা উপলব্ধি করিতে সমর্থ করিয়াছে। তিনি কেবল বুদ্ধি দ্বারা উপলব্ধি করেন নাই, হৃদয়েও অনুভব করিয়াছেন। কবিদের বিশেষত্ব এই যে তাঁহারা কল্পনা ও অনুকম্পার (Sympathy) বলে সকল রকম মানুষের সঙ্গে অভিন্নাত্মা ও অভিন্নহৃদয় হইতে পারেন, সকল রকম মানুষের চিন্তা, ধারণা, ভাব, উত্তেজনা, অবসাদ, বেদনা ও হর্ষ আপনাদের আত্মায় উপলব্ধি করিতে পারেন। অন্য মানুষদের বিষয় যখন তাঁহারা ভাবেন ও লেখেন, তখন তাঁহারা আপনাদের ব্যক্তিত্ব হারাইয়া যেন ঐ সব মানুষ হইয়া যান। রবীন্দ্রনাথের এই কবিশক্তি অসাধারণ। এই শক্তি থাকায় মানবপ্রেমিক রবীন্দ্রনাথ পঞ্জাবের দুর্ঘটনা সম্যকরূপে উপলব্ধি করিতে

পারিয়াছেন, পঞ্জাবীদের অপমান, নিগ্রহ ও বেদনা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিয়াছেন ; উহা তাঁহার মর্মে বিঁধিয়াছে।

রবীন্দ্রনাথ জগৎ বিখ্যাত লোক ; তাঁহার পত্র চাপা থাকিবে না। সভ্য জগতের বহু "সাধারণ" লোক ও বহু মনীষী তাঁহার পত্রের গুরুত্ব বুঝিতে পারিবে। প্রভুভক্তি ও স্বার্থান্ধতা বশতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ানরা বুঝিবে না, কিংবা না বুঝিবার ভান করিবে। লর্ড চেমসফোর্ড যদি এংলো-ইণ্ডিয়ান দলভুক্ত হন, তাহা হইলে তিনিও চিঠিটির দ্বারা উপকৃত হইবেন না। কিন্তু সভ্য জগতের লোকে চিঠিটি পড়িয়া কি ভাবিবে, এংলো-ইণ্ডিয়ানদিগকে, ইংরেজদিগকে ও বড়লাটকে চিঠিটি কি ভাবাইবে ও করাইবে, তাহা আমাদের প্রধান চিন্তার বিষয় নহে। কারণ চিঠিটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষভাবে, কাহারও কাছে আবেদন ও ভিক্ষুকের ক্রন্দন নহে।

"...আমাদের মধ্যে যদি সাংসারিক ক্ষমতা, সম্মান ও পদমর্যাদার কাহারও মাথা ঘুরিয়া গিয়া থাকে, তিনি বুঝুন যে, "badges of honour make our shame glaring in their context of humiliation" এবং রবীন্দ্রনাথের মত অন্তরের সহিত বলুন, "I for my part wish to stand, shorn of all special distinctions, by the side of those of my countrymen who, for their so-called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings" তাহারা উপাধীধারী তাঁহাদিগকেই বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া আমরা একথা বলিতেছি না। আমাদের প্রত্যেকেরই কোন না কোন রকমের অহংকার আছে, আভিজাত্যের, ধনের, শিক্ষার, বিদ্যার, পদমর্যাদার, শক্তির বা রূপের অহংকার আছে। এই সব অহংকার বিসর্জন দিয়া যদি আমরা, দেশে ও সমাজে প্রভাবশতঃ তুচ্ছ অকিঞ্চিৎকর বা ইতর বলিয়া বিবেচিত সকল মানুষের পাশে তাহাদেরই একজন বলিয়া কথায় কাজে ও অন্তরে দাঁড়াইতে পারি, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের পত্র সার্থক হইবে। আর যদি আমরা আশা করিয়া বসিয়া থাকি যে, তাঁহার পত্র পড়িয়া সভ্য জগৎ বা সভ্য জগতের কোন অংশ বরাবর হইয়া আমাদের দুঃখ মোচন করিবে, তাহা হইলে রবীন্দ্রনাথের ইহা অপেক্ষা গুরুতর অপমান আমাদের দ্বারা হইতে পারে না, আমরাও ইহা অপেক্ষা আমাদের নিজের গুরুতর অপমান করিতে পারি না এবং অধিকতর আত্মপ্রতারিত হইতে পারি না। যে নিজের দুঃখ মোচন করিতে পারে না, নিজের দুঃখ মোচন জন্য সর্বোৎসর্গের সত্যাগ্রহ করিতে পারে না, অন্য কেহ তাহার দুঃখ মোচন করিতে পারে না।" প্রবাসী, (বিবিধ প্রসঙ্গ) আষাঢ়, ১৩২৬।

রামানন্দের এই সুচিন্তিত আলোচনায় ভাবাবেগের চেয়ে যুক্তি, বস্তুপ্রীতির চেয়ে তীক্ষ্ণ অন্তর্দৃষ্টি অধিকতর প্রকাশ পেয়েছে। সর্বোপরি মানুষ রামানন্দের, মনীষী রামানন্দের চরিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। এ মন্তব্য তীক্ষ্ণবুদ্ধি, শান্ত, মনীষী-মানসের অগ্নিগর্ভ রামানন্দের উপযুক্ত হয়েছে।

এখানে উল্লেখ প্রয়োজন রামানন্দ রবীন্দ্রনাথের অতি গুণগ্রাহী ঘনিষ্ঠ বন্ধু হলেও সব সময়েই যে তিনি রবীন্দ্রনাথকে সমর্থন করে যেতেন তা নয়, প্রয়োজন হলে তাঁর বিরোধিতাও করতেন।

রবীন্দ্রনাথ রামানন্দের যুক্তি প্রত্যুত্তরে প্রবণ করতেন এবং অনেক সময়েই তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করতেন। ফলে রবীন্দ্রনাথ "অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা পেয়েছেন।"

২৩।১।১৯০৮ তারিখে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন :

"আপনি আমাকে অনুতাপের সম্ভাবনা থেকে রক্ষা করেছেন।"

১১।১০।১৯২৮ তারিখে লিখেছেন :

"সেদিন...সম্বন্ধে চিঠিখানা লেখার পরই মনে সংশয় উপস্থিত হয়েছিল...আপনি ওটা ছাপাতে চান না শুনে

আরাম বোধ করলুম।" প্রবাসী, আশ্বিন, ১৩৫৮। রামানন্দ ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা, পৃ ২৬২।

যে অল্প সংখ্যক মনীষী বিশ্বভারতীর একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী সেবক ছিলেন রামানন্দ তাঁদের অন্যতম। ব্যক্তিগতভাবে এবং তাঁর পত্রিকাগুলির দ্বারা বিশ্বভারতীর যে-সেবা তিনি করে গেছেন—তার তুলনা নাই। তার সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য রবীন্দ্রনাথের ঐ পূর্বোদ্ধৃত পত্রে রয়েছে :

"তাঁর সেবার দ্বারা, নিজের দ্বারা, পরামর্শ দ্বারা, মনস্বের বহুবিধ পরিচয়ের দ্বারা বিশ্বভারতীর বুদ্ধিকে আনুকূল্য করেছেন। আমি নিশ্চিত জানি সেই আনুকূল্যের দ্বারা তিনি আমার অভিভারপীড়িত আয়ুকেই রক্ষা করবার চেষ্টা করেছেন।"

রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি অতিশয়োক্তি নয়—এ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। আমরা যারা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বা বিশ্বভারতীতে দীর্ঘকাল এঁদের উভয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বিচরণের সৌভাগ্য লাভ করি—তারা জানি, রামানন্দ, রবীন্দ্রনাথের ও বিশ্বভারতীর কত আপন জন ছিলেন।

শান্তিনিকেতনের আকর্ষণ যে কী প্রবল তা যাঁরা শান্তিনিকেতনে বাস করেছেন, তাঁরা জানেন। যখনই সুযোগ পেতেন রামানন্দ শান্তিনিকেতনে চলে আসতেন। বৃদ্ধ বয়সেও তাঁর এই আসা যাওয়া কমেনি। প্রতিবারের শেষ দশদিন তিনি শান্তিনিকেতনে কাটিয়ে যেতেন। অনেকবার তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন—তবু কলকাতা ফিরে যাবার ইচ্ছা করেন নি। শান্তিনিকেতনে অবশ্য তাঁর সেবার কোনো ত্রুটি হতো না। তাঁর অগণিত বন্ধু বান্ধব এবং ছাত্রছাত্রীদের স্নেহ প্রীতি শ্রদ্ধা তাঁকে ঘিরে রাখতো।

শেষ দিকে তিনি তাঁর পরম স্নেহাস্পদ শ্রীধীরেন্দ্র মোহন সেনের বাড়ীতে থাকতেন। এইখানেই সেবার (১৯৪০) তিনি অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাঁকে প্রায় জোর করে কলকাতা নিয়ে যাওয়া হয়।

রামানন্দের সর্বশেষ শান্তিনিকেতনে আগমন রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর তাঁর শ্রাদ্ধবাসরে (৩২শে শ্রাবণ, ১৩৪৮)। সন্ধ্যার উপাসনায় তিনি উপাসনা করেন। মর্মস্পর্শী ভঙ্গিতে তিনি বলেন—"যে মহামানবকে গড়িয়া তুলিতে বিধাতার এত যুগ লাগিয়াছিল তাঁহাকে শুধু এই আশীটি বৎসরের জন্য তিনি সৃষ্টি করিয়াছিলেন বিশ্বাস করিতে পারিতেছি না।"

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রামানন্দ প্রবাসীতে লিখেছিলেন :

কবি মহাত্মা গান্ধীকে লিখেছিলেন—বিশ্বভারতীরূপ নৌকাতে তাঁর জীবনের সব ধনরত্ন নিহিত রয়েছে। এই বিশ্বভারতীর যে আদর্শ তিনি ব্যক্ত করে গেছেন তা সম্পূর্ণ বজায় রেখে এটিকে স্থায়ী করা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের শ্রেষ্ঠ উপায়। সেই উপায় অবলম্বন করা হোক।

"সম্ভব হওয়া উচিত বিশ্বভারতীকে স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করা। তা অনেকদিন আগে বলেছি।" প্রবাসী, (বিবিধ প্রসঙ্গ) ভাদ্র, ১৩৪৮।

রামানন্দের সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছে। বিশ্বভারতী আজ স্বতন্ত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছে। যার অস্তিত্ব বিলোপের আশংকা দেখা দিয়েছিল, তাকে রবীন্দ্রনাথ ও রামানন্দের দেশবাসী, জাতীয় সরকারের সহায়তায় রক্ষা করেছেন।

যে অর্থের জন্য রবীন্দ্রনাথ সুদীর্ঘকাল ভিক্ষা সাধনা করে গেছেন, বৃদ্ধ বয়সেও ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন,—আজ বিশ্বভারতীতে সে অর্থের প্রাচুর্য এসেছে। কোথাও তার দারিদ্র্যের চিহ্ন নাই।

শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমেরই এক বিদ্যার্থী বালক পরিণত বয়সে আজ বিশ্বভারতীর কর্ণধার হয়েছেন। তাঁর অক্লান্ত উদ্যোগে শান্তিনিকেতন এক কবিজন বাঞ্ছিত মনোরম উদ্যানে পরিণত হয়েছে। "বিবিধ-দেশ-চর্চিত-বিচিত্র বিদ্যাকুসুমের বালিকা" * বিশ্বভারতীর কণ্ঠাভরণ রূপে শোভা পাচ্ছে।

নির্জন নিস্তব্ধ প্রান্তর বিশ্বভারতীর অধ্যাপকবৃন্দের নব নব বাসভবনে পূর্ণ এবং শিশুদের কলধ্বনিতে মুখরিত হয়েছে। ধূসর তৃণলেশশূন্য কঠিন ভূমি আজি সুষমা, শস্যশ্যামলা হয়ে উঠ্‌ছে। অন্ধকার দিগন্ত আলোকিত হয়েছে। শান্তিনিকেতন ও শ্রীনিকেতনের ব্যবধান ঘুচে গেছে।

নানাদেশসমাগত প্রতিভাবান, আদর্শপরায়ণ তরুণ অধ্যাপকগণ আজ বিশ্বভারতীর নিষ্কাম ভার গ্রহণ করেছেন। মন্ত্র, বিনয়ী অথচ তেজস্বী, ত্যাগপরায়ণ এই উদীয়মান তরুণ প্রতিভা বিশ্বভারতীর ভবিষ্যৎ গড়ে তুলছে।[৬]

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ও সবান্ধব রবীন্দ্রনাথের সাধনা সার্থক হবে।

---

৫ বিশ্বভারতীর "শান্তিনিকেতন" : দেবেন্দ্রনাথের যে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়প্রতিষ্ঠাভিত্তিটির বিস্তারিত বিবরণ।

৬ প্রবন্ধ রচনায় রামানন্দের দুই কন্যা সীতাদেবী ও শান্তাদেবীর "পুণ্যস্মৃতি" এবং "ভারত-মুক্তি-সাধক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও অর্ধ শতাব্দীর বাংলা" গ্রন্থ হতে যথেষ্ট সাহায্য পেয়েছি।

অনিল ব্লাকেন্সর

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতোগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন

"... নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—

৩১২, শামুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

বিচিত্র চিন্তায় ও কর্মে রামানন্দ

সেবাদাস জোয়ারদার

...র চেয়ে সৃষ্টি অনেক কঠিন কাজ। পরাধীন ...বর্ষে বৃটিশ শাসনের ধ্বংস ছিল আমাদের পরম কাম্য। স্বাধীনতালাভের পর নবা ভারত গঠন সম্পর্কে সেই ...নতার বেদনাহত দিনগুলিতে সুস্পষ্ট ধারণার অভাব ...শের মধ্যে না থেকে, সাধারণ গণমানসে ছিল। আর ...কেরও সেই চিন্তা কতোদূর সুস্পষ্ট ছিল, একথাও ...র অপেক্ষা রাখে। এ বিচার এখানে থাক্।

...স যুগে যে মুষ্টিমেয় কয়জনের মধ্যে সেই চিন্তা সুস্পষ্ট ...তাঁদের মধ্যে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় একজন। প্রথমেই ...প্রয়োজন, তিনি তাঁর সংগঠনী চিন্তার উপর গুরুত্ব ...প করতে গিয়ে মুহূর্তের জন্যেও বৃটিশ শাসনের অবসানের ...া থেকে সরে আসেননি। কিন্তু এই অবসানকেই তিনি ...বাসীর সর্বরোগহর ভাবেননি। আগে স্বাধীনতা ..., পরে আপনা-আপনি সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ...তীয় আত্মপ্রতারণা তিনি মনে মনে ঘৃণাও প্রশ্রয় ...।

...ষ্ঠ ও সমৃদ্ধ ভারতের জন্যে প্রথম চাই এ দেশের প্রতিটি ...র দৃঢ় জাতীয়তাবোধ। এই জাতীয়তাবোধের মূল ভিত্তি ...। শিক্ষার অভাবে এই মূল ভিত্তি দুর্বল হয়। ইংরেজের ...র্শ আমার পর শিক্ষার দ্রুত প্রসার চলছে। কিন্তু এই ...র জাতীয়তাবোধ জন্মায় না। আর সর্বোপরি এই ...প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে লোকশিক্ষার ধারাটি লুপ্ত হতে চলছে। শিক্ষকতায় যাঁর কর্ম-জীবনের আরম্ভ, সেই রামানন্দ শিক্ষার ত্রুটির কথা ভুলতে পারেননি। তাই এণ্ট্রান্সের পরিবর্তে যখন প্রথম ম্যাট্রিকুলেশনের পাঠ্যক্রম প্রবর্তিত হয়, তখন দেশের ভূগোল ও ইতিহাস প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের জন্যে নির্দিষ্ট আবশ্যিক বিষয়ের বহির্ভূত দেখে তিনি তাঁর সম্পাদকীয় আলোচনায় প্রতিবাদ জানালেন। কেননা ভূগোল দেশের মাটির সঙ্গে তরুণ বিদ্যার্থীর পরিচয় ঘটায়, আর ইতিহাস দেশের স্মৃতির সঙ্গে। তাই অতীত স্মৃতি দিয়ে যেরা দেশের মাটির সঙ্গে পরিচয় লাভের ফলে দেশাত্মবোধ জাগানোর জন্যে ইতিহাস ও ভূগোল পড়া অত্যাবশ্যক। সম্প্রতি উচ্চতর মাধ্যমিক পরীক্ষার পাঠ্যক্রম প্রবর্তনের নামে নবমশ্রেণী থেকেই ১৩ বছরের ছাত্রছাত্রীদের বিশেষীকরণের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে যখন আমরা বন্দী করেছি, তখন রামানন্দের অতো দূরদৃষ্টি নিয়ে এ সম্পর্কে আমরা ক'জন ভেবেছিলাম? শুধু আমাদের পাঠ্যক্রম সম্পর্কেই নয়, এ শিক্ষার ভিত্তি-হীনতার কথা তিনি এভাবে বলেছেন, "এই যে অধিকাংশ প্রবাসী ও অপেক্ষাকৃত দুঃখী ও গরীব লোক, তাহাদের জীবন ও জীবিকার উপায়ের সহিত যে শিক্ষার সম্পর্ক নাই তাহা জাতীয় শিক্ষা নহে।"

বাঙালী ও বিশেষতঃ প্রবাসী বাঙালীর স্বার্থ নিয়ে সারাজীবন যিনি লিখেছেন, তাঁর জাতীয়তাবোধ যে কোন দৃঢ়ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল, তার প্রমাণ পাই তাঁর নিজের কথায়, "ঠিক বলিতে গেলে আমরা প্রথমতঃ ভারত-সন্তান, দ্বিতীয়তঃ বাঙালী।" জাতীয় ঐক্যের ভাবনায় উদ্বুদ্ধ রামানন্দ অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। তাঁর 'বিশাল ভারত' নামে হিন্দী সাময়িক পত্রে তিনি রবীন্দ্রনাথের

UNIVERSITY

তথাকথিত উচ্চশিক্ষার সমস্যাপীড়িত আজকের যুগে এ বিষয়টি ভাবতে হবে। রামানন্দ অনুন্নতশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষার প্রসারের ও উন্নতশ্রেণীর আত্মাভিমান ছেড়ে ঐ শ্রেণীর সঙ্গে সামাজিক ও ব্যক্তিগত জীবনে মেলামেশার কথা বারবার 'প্রবাসী'র বিবিধ প্রসঙ্গে লিখেছেন। জনশিক্ষার কথা যখন রামানন্দ-প্রসঙ্গে উঠেছেই, তখন উনিশ শতকের দুজন বিস্মৃত-প্রায় মনীষীর কথা না বলে পারছি না। একজন লালবিহারী দে, অন্যজন শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়। লালবিহারী ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বঙ্গীয় সমাজ বিজ্ঞান সভায় পঠিত তাঁর 'Compulsory Education in Bengal' প্রবন্ধে প্রাথমিক শিক্ষাকে আবশ্যিক করার জন্যে সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। আর শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৮৭২ খৃষ্টাব্দে বিলেত থেকে ফিরে এসে 'ভারত শ্রমজীবী' নামে এক পয়সামূল্যের একটি সচিত্র মাসিকপত্র প্রকাশ করেছিলেন. শ্রমজীবী ও সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাপ্রসারের জন্যে। এই পত্রিকা মাকি সে যুগে পনেরো হাজার সংখ্যায় মুদ্রিত হতো ও কলে কারখানায়, গ্রামে গ্রামান্তরে প্রচারিত হতো। শিক্ষকতা ছেড়ে রামানন্দ সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে লোকশিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। পত্রিকার মধ্য দিয়ে তিনি শিক্ষাসত্র খুলে ছিলেন। এ শিক্ষা শুধু উচ্চশিক্ষিতদের জন্যে নয়, সমাজের সর্বস্তরের জন্যে। নিরক্ষরদের সাক্ষর করা সম্পর্কে তিনি অজস্রবার লিখেছেন। সম্প্রতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়ন পশ্চিম বঙ্গের ছাত্রছাত্রীদের ছুটীর সময়গুলিতে নিরক্ষরতা বিরোধী অভিযান চালানোর এক মহান চেষ্টায় ব্রতী হয়েছেন। এই চেষ্টা যদি সফল হয়, তাহলে রামানন্দ শতবার্ষিকী পালনের এর চেয়ে মহত্তর উপায় আর হতে পারে না। শুধু বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টাই যথেষ্ট নয়। ভারতের সমস্ত শিক্ষক-শিক্ষিকার নেতৃত্বে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীকে ছুটির সময় গ্রামে ও বস্তিতে কাটাতে হবে—এমন একটি নিয়ম আমাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে আবশ্যিক করতে হবে। তাহলে দেশের তরুণ সমাজের ছাত্রজীবনেই সমাজের প্রত্যক্ষ বাস্তব পরিচয়ের ফলে দেশাত্মবোধের ভিত্তিটি দৃঢ়তর হবে। তাহলে তাঁরা পরবর্তী জীবনে প্রশাসক বা বুদ্ধিজীবী হিসেবে সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন একশ্রেণীর কৃত্রিম জীব হয়ে উঠবেন না।

জনশিক্ষাপ্রসঙ্গে রামানন্দ বাংলা সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির দিক থেকে কি ভাবে দেখেছেন, তা আলোচনা করা যেতে পারে। প্রথম জীবনে তিনি 'দাসী' পত্রিকায় বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে লোক-প্রচলিত ভাষার শব্দের অর্থসহ একটি তালিকা প্রস্তুত করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। এ সম্পর্কে তিনি দ্বিতীয় বর্ষের 'প্রদীপ' (১৮৯৮ খৃঃ) পত্রিকায় লিখেছিলেন,

"তাহা হইলে অনেক তথাকথিত অপ্রচলিত শব্দ আর অপ্রচলিত বলিয়া বোধ হয় না, এবং বঙ্গসাহিত্যের শব্দ-দারিদ্র্য ও দূর হইবে। ইহাতে আরও এক লাভ হয় যে অনেক সময় নূতন কথার সৃষ্টি করিতে হয় না। তদ্ভিন্ন চাষাভুষার ভাষা কথাসাহিত্যে অধিক প্রচলিত হইলে উহা জনসাধারণের প্রেমের দৃঢ় ও প্রশস্ত ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়, এবং উহা বাঙ্গালীর প্রাণের কথা ভাল করিয়া বলিবার ক্ষমতা লাভ করে।"

৬৭ বছর আগেকার এই কথাগুলিতে বাংলা সাহিত্য কিভাবে 'মাটির কাছাকাছি' যেতে পারে, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট মত দেওয়া হয়েছে। বিশ্বজনের আধুনিক বাংলাসাহিত্যকে বাঙালী সর্বসাধারণের সাহিত্য এ ভাবেই শুধু করা যেতে পারে।

দেশের কল্যাণ সম্পর্কে রামানন্দের মন বিচিত্র পথে ঘুরেছে। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে বদিরহাটপুর মহকুমার অন্তর্গত জালালপুর গ্রামে কয়েকজন যুবকের চেষ্টায় প্রতিষ্ঠিত 'দাসাশ্রমের' সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগ ছিল। 'দাসাশ্রম' প্রতিষ্ঠার পরে তিনি 'দাসী' নামে এক সাময়িক পত্র প্রকাশ করে এর আয় 'দাসাশ্রমে' দান

করতেন। 'প্রবাসী'তে তিনি 'পতিতা রমণীর দুর্দশা মোচন' 'স্ত্রীজাতির দুঃখবিমোচন' প্রভৃতি বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতেন। এই পত্রিকায় তিনি অন্ধ-মূক ও বধিরদের দুঃখ মোচন সম্পর্কে লিখতেন। প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দের মহত্তম কীর্তি অক্ষরের অন্তে বাংলায় হ্রস্বই অক্ষরের প্রবর্তন। এ তথ্য আমরা ভুলেই যেতে বসেছিলাম। কিন্তু কাল আগে ডাঃ সুবোধচন্দ্র রায় নামে এক অন্ধ-হিতৈষীর চেষ্টায় জানতে পেরেছি। একেবারে প্রথমজীবনে সিটি কলেজে অধ্যাপনার সময় তিনি কুলি সমস্যা নিয়ে 'ধর্মবন্ধু'তে লিখতেন। পরে ফিজি, ট্রান্সভালের ভারতীয় প্রবাসী ও অন্যান্য উৎপীড়িতদের হয়ে তিনি 'প্রবাসী'তে লিখেছেন। এইসূত্রেই দক্ষিণ আফ্রিকাবাসী ভারতীয়দের মুক্তিযোদ্ধা গান্ধীজীর পরিচয় প্রথম তিনি 'মডার্ন রিভিউ'তে তাঁর ছবিসহ প্রকাশ করেন। মনে রাখতে হবে তখনো গান্ধীজীর নাম ভারতবর্ষে প্রায় অজ্ঞাত। সমাজের সামগ্রিক কল্যাণকামী রামানন্দের আরেকটি পরিচয় তাঁর অকৃত্রিম শিশু-প্রীতি। শিশুদের জন্যে তাঁর পাঠ্য বইয়ের কথা আগেই লিখেছি। শিশু শিক্ষা সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক আলোচনা তাঁর পত্র-পত্রিকায় অনেককে দিয়ে করিয়েছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর ছোটোদের 'মুকুল' পত্রিকার রামানন্দ নিজে 'নানাবতী রাজকন্যা', 'ভোলাচাষা' প্রভৃতি উপকথা ও অন্য গল্প লিখেছিলেন। আর 'মুকুল' প্রকাশের মূলেও ছিলেন রামানন্দ ও যোগীন্দ্রনাথ সরকার। 'প্রবাসী'র ছোটোদের বিভাগটিও তিনি নিরুপমোহর করে তোলার চেষ্টার ত্রুটি করতেন না। রামানন্দ দেশব্যাপী শিক্ষার স্বপ্ন দেখতেন। মাতৃভাষায় ইংরেজি ছোম ইউনিভার্সিটি সিরিজের মতো লোক শিক্ষার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়ে গ্রন্থমালা প্রকাশের পরিকল্পনা তিনিই প্রথম রবীন্দ্রনাথকে দেন। এই পরিকল্পনা অনুযায়ীই 'বিশ্বভারতী'র 'লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা' প্রকাশিত হতে থাকে। 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত বিভিন্ন বিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশের—যার দিয়ে বাংলাভাষা জাতির মননের বাহন কিভাবে হয়ে উঠেছে, এ বিষয়টি গবেষণা-সাপেক্ষ।

আমাদের সমাজ ব্যক্তিপূজা আর অবতারবাদে স্থির বিশ্বাসের ফলে আত্মপ্রত্যয়হীন। এ সমাজে সাধারণের মূল্য নগণ্য। মহান্ পুরুষেরাই সমাজের ত্রাণকর্তা। আর আমরা অসহায় দর্শক। এমন দুর্ভাগা দেশের জন্যে রামানন্দের একটি অমৃতবাণী চয়ন করে এই দীর্ঘ প্রবন্ধ শেষ করা যাক।

"মানবজীবনের সকল বিভাগেই সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ মানুষে বড় বেশী প্রভেদ কল্পনা করা হইয়াছে; এবং তাহাতে এই কুফল ফলিয়াছে যে সাধারণ মানুষেরা দৈহিক স্বাস্থ্য সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যলাভের অধিকার, মানসিক শক্তি, রাষ্ট্রীয় অধিকার ও আধ্যাত্মিকতা, সকল বিষয়েই আপনাদিগকে অত্যন্ত হীন বলিয়া বিশ্বাস করিতে ও নিজ নিজ হীন অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিতে অভ্যস্ত হইয়াছে; কিন্তু এরূপ বিশ্বাসও অমূলক, এবং এই প্রকার সন্তোষও মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশের পক্ষে অন্তরায়। ... অবতার আদি নামে অভিহিত লোককে একটা দূরবিগম্য উচ্চ আসনে উপবিষ্ট স্বতন্ত্র শ্রেণীতে ফেলিয়া রাখিয়া সর্বসাধারণ আমরা ছোট হইয়া আছি।"

এই শতবার্ষিকীর বর্ষকে (১৯৬০-৬১) আমরা যেন কোনো মনীষীরই প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে 'দূরবিগম্য উচ্চ আসনে' তাঁকে বসিয়ে নিজেদের অসার ও অপদার্থ না ভাবি। তাহলেই শতবার্ষিকী পালন আমাদের জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে।

---

৬৭ পাঠকের: পাঠকদের 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ও তৎকালীন বাংলা' বইটি এবং যোগেশ চন্দ্র বাগলের 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, মাঘ-চৈত্র ১৩৭১) প্রবন্ধটি থেকে অনেক সাহায্য এই প্রবন্ধ রচনায় করা হয়েছে।

প্রবাসী

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের জন্ম শতবার্ষিকী উৎসব আসন্ন। তিনি আমৃত্যু প্রবাসী ও মডার্ন রিভিউ'র প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক ছিলেন। বাংলাভাষীর নিকট প্রবাসীর সম্পাদক বলিয়াই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। তাঁহার মত চিন্তানায়ক ও কর্মবীরের পরিচয় শুধু ইহাতেই নিবদ্ধ নহে, তাঁহার মননশীলতা ও কর্মশক্তি বাংলা তথা ভারতের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনে সম্যকরূপে নিয়োজিত হইয়াছে। 'রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়' শীর্ষক আমার সাম্প্রতিক গ্রন্থে সাহিত্য-সাধক রামানন্দের আলোচনা প্রসঙ্গে এসব বিষয়েও আলোকপাত করিতে প্রয়াস পাইয়াছি। প্রবাসী জাতীয় জীবনকে যে, বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করিয়াছে সে বিষয়ে আমার কিছু অবতারণা করিব।

বর্তমান শতকে প্রথম পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের মধ্যে যাঁহাদের কৈশোর ও যৌবন কাটিয়াছে, ব্যক্তিগত জীবনের উপর প্রবাসীর গভীর প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহারা যথেষ্ট সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় রামানন্দের মৃত্যুর পূর্বে ও পরে নানা প্রবন্ধে সশ্রদ্ধ চিত্তে ইহার স্বাক্ষর রাখিয়াছেন। ব্যক্তি লইয়াই সমষ্টি, কাজেই ব্যক্তির উপর যে প্রভাব তাহা সমষ্টিকেও প্রভাবিত না করিয়া পারে না। কাজেই এ কথা বলিলে এতটুকুও অত্যুক্তি হইবে না যে, ব্যক্তি ও সমষ্টি উভয়কেই প্রবাসী ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনের নানা দিকে প্রেরণা জোগাইয়াছে। শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, স্বাধীনতা-প্রচেষ্টা, সমাজ-উন্নয়ন কার্য, সব দিকেই ইহার স্বকৃতি মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিবার দিন সমাগত। ইহারই পরিপ্রেক্ষিতে ব্যক্তিগত কথাই আমি এখানে পূর্ব স্মৃতি মন্থন করিয়া যৎকিঞ্চিৎ লিখিতেছি। তবে প্রবাসীর কথা বলিতে গেলে অনেক বিষয়ই মাথার মধ্যে হুড়মুড় করিয়া আসে, কোনটি আগে কোনটি পরে বলিব ঠিক করিতে পারিতেছি না। বলার কিছু গরমিল হইলে পাঠক-পাঠিকা আমায় ক্ষমা করিবেন।

কলিকাতা হইতে অনূন দুইশত মাইল দূরের সাধারণ-শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও অল্পবিত্ত ব্যবহারজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল ১৯১২ খ্রীস্টাব্দে। যশোহর নিবাসী ব্যবহারজীবী প্রধান রায় বাহাদুর যদুনাথ মজুমদার ঐ সময়ে ওখানে গিয়া এ বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার দুই বৎসর পরে আমি পার্শ্ববর্তী গ্রাম হইতে গিয়া ঐ বিদ্যালয়ে ভর্তি হই এবং এক নাগাড়ে আট বৎসর সেখানে অধ্যয়ন করি। ঐ বিদ্যালয়টির আশে পাশে চার-পাঁচ মাইলের মধ্যে আর কোন ইংরাজী স্কুল ছিল না। কাজেই নিকটবর্তী গ্রামগুলির তথাকথিত ভদ্র শ্রেণীরও এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় ফলে উচ্চ শিক্ষা লাভের বিশেষ সুযোগ হয়। ভর্তি হইবার পর প্রথম তিন চারি বৎসরের মধ্যে মাসিক পত্র পড়ার কথা মনে আসে নাই, তখন নীচের ক্লাসের ছাত্র। পাঠ্য বই পড়াতেই কম বেশি মনোযোগ ছিলাম। উপরের ক্লাসে উঠিয়া দেখি, স্কুলে কয়েকখানি বেশ ভাল ভাল সচিত্র মাসিকপত্র আসিতেছে। প্রবাসী, ভারতবর্ষ, সবুজ পত্র, কিছুকাল পরে মাসিক বসুমতী এই কখানিই

ছিল তাহার মধ্যে প্রধান। পড়িবার আকাঙ্খা তখন প্রবল হইয়াছে। যাহা পাই তাহাই পড়ি। মাসিক পত্রগুলিও একে একে পড়িতে লাগিলাম। কোন্ দিন, কোন্ সংখ্যা প্রবাসী প্রথম আমার হাতে প্রথম পড়ে স্মরণ নাই। কিন্তু মনে হইতেছে ঐ সব কখানি পত্রিকার মধ্যে প্রবাসী নানা দিক দিয়া আমার নিকট ভাল লাগিয়াছিল, এবং আমি প্রবাসীরই একান্ত পোড়া হইয়া উঠি। প্রবাসীর মধ্যে কত বিচিত্র বিষয়ের সমাবেশ। কোনটি রাখিয়া কোনটি আগে পড়িব? পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছুকালের মধ্যে আমার একটা নিজস্ব ধরণ গড়িয়া উঠিল। এই কথাই এখন বলিব, আর. ইহার মধ্যে প্রবাসীর বিচিত্রতা ও জীবনের উপরে গভীর প্রভাব হয়তো কিছু স্পষ্ট হইয়া উঠিবে।

কেন প্রবাসীর পোড়া হইয়া উঠিলাম বুঝাইয়া বলিতে পারিব না। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র পাঠে ইহার খানিকটা আঁচ পাওয়া যাইতে পারে। শরৎচন্দ্র রেঙ্গুন হইতে ভারতবর্ষ মাসিকের পরিচালককে বারবার লেখেন, প্রবাসী উৎকৃষ্ট মানের কাগজ, ভারতবর্ষকে ইহার অনুরূপ করিয়া তুলিতে পারা যায় না কি? প্রবাসীর উৎকর্ষ শরৎচন্দ্রকে খুবই মুগ্ধ করিয়াছিল।

প্রবাসীর জন্য প্রতি মাসে আবেগ ভরে অপেক্ষা করিতাম। স্কুলে পৌঁছুলে প্রথমে শিক্ষক মহাশয়েরা পড়িবেন, তাহার পরে তো আমরা ছাত্রেরা? পরে দেখিয়াছি আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া শ্রদ্ধাস্পদ প্রধান শিক্ষক মহাশয় কখন কখন আমাকেই আগে পড়িতে দিতেন। প্রবাসী হাতে পাইলেই প্রথমে, পাছে পূজোয় যে সব ছোট ছোট কবিতা থাকিত তাহা পড়িয়া ফেলিতাম। আজ কবি রাধাচরণ চক্রবর্তী এবং চণ্ডীচরণ মিত্র মজুমদারের ছোট ছোট কবিতার কথা বেশি করিয়া মনে পড়ে। অপরাপর কবিতাও আগে বা পরে পড়িতাম। কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের বহু প্রসিদ্ধ কবিতা প্রবাসীতে বাহির হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার তো কথাই নাই। যখন করেক বৎসর তিনি সমুদ্র পথের কতই বেশি লিখিতেন, প্রবাসীতে কবিতা ও গান কিছু কিছু বাহির হইত। অন্যত্র প্রকাশিত তাঁহার রচনা বিশেষ করিয়া কবিতা 'কড়ি পাতে' উদ্ধৃত হইত। এ সমুদয় খুবই আগ্রহ সহকারে পাঠ করি। হয়তো এই সময় নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, এবং কথা ও কাহিনী বই তিনখানি আমার হাতে আসে। প্রথম দুইখানিকে আমি গীতা বাইবেলের মত প্রত্যহ পাঠ করিতাম। খুব সম্ভব ইহা কিঞ্চিৎ পরের কথা। এ কথা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, প্রবাসীর মারফৎই রবীন্দ্রনাথ তথা রবীন্দ্রকাব্য-সাহিত্যের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয়। তাঁহার প্রতি কিস্তি "গোরা" পাঠের জন্য আকুতি ডক্টর সুনীতিকুমার একটি প্রবন্ধে কি চমৎকার বর্ণনা করিয়াছেন। তখন বন্ধুদের মুখে একটি কথা শুনিতাম, রবীন্দ্রনাথের কবিতা বুঝা যায় না। আমার কানে ইহা বড় বে-সুরা ঠেকিত। কৈ, প্রবাসীতে রবীন্দ্রনাথের যে সব কবিতা পড়ি, আমাদের তো তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। ঐ সময় কোন কোন কবিতার অন্তর্নিহিত গূঢ় ভাব হয়তো ধরিতে পারিতাম না, কিন্তু এমন সুন্দর ছোট ছোট জানা শব্দের গাঁথুনি ঝাঁথুনি ছন্দোবদ্ধ হইয়া আমাদের নিকট হাজির হইত, যে আমরা তাহা পাঠ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ পাইতাম।

এই তো গেল কবিতার কথা। রবীন্দ্রনাথের অপরাপর দুই একটি যুগান্তকারী রচনার কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করি। তাঁহার গোরা, অচলায়তন, জীবন-স্মৃতি ও সংকলনাদি যখন বাহির হয় তখন আমাদের প্রায় বাল্যকাল। প্রবাসীর পাতায় এ সব পড়িবার সুযোগ তখন না হইবারই কথা। কৈশোরে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠে যেমন মুগ্ধ হইতাম, তেমনি তাঁহার দুইটি বহু প্রবন্ধ পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া যাই। প্রবন্ধ দুইটি— "কর্তার ইচ্ছায় কর্ম" এবং "ছোট ও বড়"। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা পড়ি নাই, হয়তো কিছু পরে পড়িয়াছি। প্রবন্ধোক্ত গভীর বিষয়গুলি ছিল অনেকটা আমাদের আয়ত্তের

বাহিরে। কিন্তু তাঁহার গল্প রচনাও যে ভাল লয় সংবন্ধ ও পড়িতে তখন যে কত ভাল লাগিয়াছিল তাহা এখন বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। "ছোট ও বড়" প্রবন্ধটির বিষয়বস্তু আজও কিছু কিছু স্মরণ হইতেছে। আমাদের শাসক ইংরেজদের লইয়া কথা। ইংরেজ জাতির মধ্যে যেমন 'বড়' ইংরেজ আছে তেমনি 'ছোট' ইংরেজও আছে। আমাদের দেশের শাসনরত 'ছোট' ইংরেজদের দেখিয়া সমগ্র ইংরেজ জাতিকে যেন ভুল না বুঝি। আমার পূর্ব ধারণা হইতেই এখানে লিখিতেছি। টাটকা পড়ুয়ারা আমার কথার যাথার্থ্য বিচার করিতে পারিবেন। পরে অসহযোগের সময় শিক্ষার 'দিলন, সত্যের আহ্বান' এবং এইরূপ আরও কোন কোন প্রবন্ধ পাঠ করি। তখন কৈশোরের শেষ প্রান্তে। এ সকলের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে ঐ সময় বেশি অসুবিধা হয় নাই। কৈশোরের কথাই বলিতেছি, তাই পরবর্তী কথায় যাইব না।

প্রবাসী হাতে আসিলেই কবিতার পরে পড়িতাম ছোট অক্ষরের অধ্যায় বা বিভাগগুলি। যেমন কষ্টি পাথর, পঞ্চশস্য, পুস্তক পরিচয় ও দেশের কথা। পরে আরও কতকগুলি নূতন বিভাগ খোলা হয় ইহার কথা কিঞ্চিৎ পরে লিখিতেছি। কষ্টি পাথরে সমসাময়িক বিভিন্ন পত্র পত্রিকার উৎকৃষ্ট ও জ্ঞানগর্ভ রচনা সমূহ সংকলিত হইত। পল্লীগ্রামের ছেলে আমরা, বিভিন্ন ধরণের পত্র পত্রিকা পাওয়া আমাদের সাধ্যায়ত্ত ছিল না। এ বিভাগটির মাধ্যমে উহাতে প্রকাশিত প্রবন্ধাদির রসাস্বাদ করিতে পারিতাম। পঞ্চশস্য বিভাগটি ছিল ভারি চমৎকার। বিজ্ঞানের প্রগতির দিনে উন্নত দেশ সমূহে তুচ্ছ জিনিসপত্রের সদ্ব্যবহার দ্বারাও কত কি বিচিত্র কারুশিল্প তৈরী হইত তাহার আভাস পাইতাম। অনুন্নত দরিদ্র দেশে টুকরা কাগজ বা ছেঁড়া ন্যাকড়া যাহা তুচ্ছ বলিয়া দূরে সরাইয়া রাখি তাহাকে আদৌ উপেক্ষা করা হইত না। [illegible] দেখি তৈলহীন নারী পুরুষ এই পল্লীগ্রামেও কাগজের টুকরা কুড়াইয়া বস্তা বন্দী করে এবং তাহা কলিকাতায় ও সহরতলীতে লইয়া যায়। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে এই টুকরা কাগজের সদ্ব্যবহারের কথা পড়িয়াছি। আজ টুকরা কাগজ কুড়ান দেখিয়া তাহারই সার্থকতা উপলব্ধি করি। পুস্তক পরিচয় প্রথম হইতেই প্রবাসীর একটি বৈশিষ্ট্য। ভাল মন্দ কত বই বাজারে বাহির হয়। বিজ্ঞাপন দেখিয়া ইহার উৎকর্ষ অপকর্ষ বিচার করা সম্ভব নয়. সমালোচনার মাধ্যমেই আমরা উহা অনেকটা বুঝিতে পারি। ইহার দ্বারা লেখক ও পাঠকের মধ্যে যোগসাধন ঘটা সহজতর হইয়া থাকে। ছোট অক্ষরে পরিবেশিত সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে কত বইয়ের সন্ধান যে সময় পাইয়াছি। দূরে থাকিয়া পড়িবার সম্ভাবনা না হইলেও উহার বিষয় বস্তুর সঙ্গে আমরা অনেক ক্ষেত্রে পরিচিত হইতাম। কোন কোন বইয়ের কথা আজিও মনে আছে।

এখন দেশের কথা বিভাগটির বিষয়ে আসা যাক। দেশের কথা—'বাস্তবিকই দেশের কথা।' ইহার মারফৎ বাংলা দেশের দূর দূর অঞ্চলের অধিবাসীদের সঙ্গে আমরা যেন একাত্ম হইয়া যাইতাম। তাহাদের আনন্দ-বেদনা আমাদিগকে বিশেষভাবে স্পর্শ করিত। বঙ্গের প্রায় প্রতি জেলা হইতেই এক কি একাধিক সাপ্তাহিক বা পাক্ষিক সংবাদপত্র তখন প্রকাশিত হইত। বর্ধমান, মেদিনীপুর, মালদহ, রংপুর, ঢাকা, পাবনা, মানভূম, ময়মনসিংহ, বীরভূম, বাঁকুড়া, শ্রীহট্ট, চট্টগ্রাম এই রকম বিভিন্ন জেলার সংবাদপত্র হইতে নানা সংবাদ সংকলন করিয়া দেওয়া হইত এই বিভাগটিতে। অনাবৃষ্টি, বন্যাভাব, আধি-ব্যাধি আর এ সকল কারণে লোকের অশেষ দুঃখ কষ্ট; আবার শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির জন্য বিদ্যালয় স্থাপনে, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠায় জলাশয় খননে, রাস্তাঘাট নির্মাণে পল্লীর দাতাকর্ণদের দানের কথা—এই সমুদয়ের তথ্য-মূলক সংবাদ বিভিন্ন অঞ্চলের বিবিধ পত্র পত্রিকার পৃষ্ঠা হইতে সংকলন করিয়া

দেওয়া হইত। আমরা ছেলেবেলায় এই বিভাগটি হইতে কত বিষয়ই না জানিতে পারিতাম। বাংলাভাষী মনুষ্য সমষ্টির মধ্যে আত্মীয়তা বোধ জাগাইয়া তুলিতে তখন ইহা খুবই কার্যকরী হইয়াছিল বলিয়া আজও আমার ধারণা। রামানন্দবাবু নিজে এবং অন্যান্য লেখকদের (যেমন রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রাধেশ্যাম ভট্টাচার্য প্রভৃতি) দিয়া পরিদর্শনান্তে ভিত্তিক পল্লীর সুখ দুঃখের কথা লিখিতেন ও লিখাইতেন। পল্লীর তথা পল্লীবাসীর উন্নতিই যে সমগ্র দেশের উন্নতি এই ধারণা ঐ যুগের কিশোর মনে প্রবাসীই বোধ হয় বেশি করিয়া জাগায়।

প্রবাসীর একটি প্রধান আকর্ষণ ও বৈশিষ্ট্য—ইহার বিবিধ প্রসঙ্গ। 'বিবিধ'ই বটে। তখন অত শত বুঝিতাম না। এখন বুঝি—বাঙালী জাতির সর্বাঙ্গীন উন্নতিই ছিল রামানন্দের কাম্য। ভারতবর্ষের উন্নতির সঙ্গে ইহার কোন বিরোধ নাই। বাঙালীর উন্নতি ভারতবর্ষের উন্নতিকে যেমনই ত্বরান্বিত করিবে এই উদ্দেশ্যেই রামানন্দ লেখনী পরিচালনা করিতেন। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সাহিত্য, কলা, কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য, রাজনীতি, সরকারী শাসন ব্যবস্থা, সমাজ উন্নতি সম্বন্ধে আলোচনা কোন কিছুই বিবিধ প্রসঙ্গ হইতে বাদ যাইত না। প্রতি মাসেই যে প্রত্যেকটি বিষয়ে লেখা হইত বা মন্তব্যাদি করা হইত তাহা বলি না। কিন্তু আপনি যদি যে সময়ের যে কোন বৎসরের প্রবাসীর ফাইল দেখেন তাহা হইলে এই ধারণা অবশ্যই জন্মিবে। এই সকল বিষয়ের আলোচনার দ্বারা আমাদের চিত্তবৃত্তির অনুশীলন, ভাবনার বৃত্তি, জ্ঞান স্পৃহা, জাগ্রত করা হইত। আমরা যে স্বাধীনের উপযোগী এ কথা তিনি মহাত্মা গান্ধীর আবির্ভাবের বহুপূর্বেই বার বার বিবিধ প্রসঙ্গে ব্যক্ত করিয়াছেন। আমাদের কিশোর মন এই সব পাঠে কখন উদ্বেলিত, কখনও বা ক্ষোভিত ও প্রভাবিত হইত। ব্যক্তিগতভাবে বলিতে পারি ইহার পরিবেশন রীতির প্রভাব আমার উপরে বেশি করিয়া পড়িয়াছে। প্রতিটি বিষয়ের যে দুই দিক আছে—ভাল ও মন্দ দিক এবং আবার প্রত্যেক মানুষেরই বিবেচনায় কোনটি ভাল কোনটি মন্দ এবং কোনটিই বা ভালতর ও মন্দতর, এই বোধ আমাদের মধ্যে রামানন্দের যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনা হইতে বেশি করিয়া জন্মিয়াছে। দীর্ঘকাল পরে আজ এ কথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করিতে দ্বিধাবোধ করি না।

ইহার একটি দৃষ্টান্ত দি'। মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে রামানন্দবাবু প্রবাসীতে আলোচনা করেন। স্কুল কলেজ বর্জন সম্বন্ধে তাঁহার বিশেষ আপত্তি। ইহার অনুসরণে আমাদের কি লাভ ক্ষতি সে সম্বন্ধে তাঁহার যুক্তিনিষ্ঠ মন্তব্যাদি আমাদের—স্কুলের কিশোর ছেলেদের মনকেও বিশেষ ভাবে নাড়া দিয়াছিল। আমরা স্কুলে তাঁত করিলাম। চরকা আনাইলাম। (অবশ্য শিক্ষক মহাশয়দের আনুকূল্যে ও সহযোগিতায়)। কিন্তু স্কুল বর্জন করিব তখন আমরা ইহা কল্পনাও করি নাই। দিকে দিকে স্কুল কলেজ বয়কট হইতেছে সংবাদ আসিত। কিন্তু ইহা আমাদের মনে তখন তেমন দোলা দেয় নাই। তবে কি বলিব—বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের ময়মনসিংহ-এর অন্তর্ভুক্ত নেত্রা সূর্য সোবের স্কুল কলেজ বয়কট সম্বন্ধে বক্তৃতা যখন শুনিলাম, তখন আর স্থির থাকিতে পারি নাই। ফিরিয়া আসিয়া স্কুলে ধর্মঘট করিলাম। এই ধর্মঘট সাতদিন মাত্র চলে। তাহার পর আবার যে কে সেই, স্কুলে ফিরিয়া গেলাম। রামানন্দবাবুর যুক্তি আমাদের মনে পুনরায় প্রবলতর হইয়া উঠে। হয়তো স্বাধীনতা সংগ্রামে দুই একবার যুব-শক্তিকে কাজে লাগাইবার উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজ বয়কট যুক্তিযুক্ত হইতে পারে, কিন্তু মোটের উপর ইহা বর্জন করা বা অন্য বয়কটের বর্জন করিতে প্ররোচিত করা আদৌ সমীচীন নয়। আজও রামানন্দবাবুর যুক্তিতে পূর্ণ আস্থাবান রহিয়াছি।

প্রবাসীর "আলোচনা" বিভাগটির কথাও এখানে একটু বলা যাক। এই বিভাগে পূর্ব-প্রকাশিত প্রবন্ধ-নিবন্ধের ভুলভ্রান্তি ও অসঙ্গতির উপর বাদ-প্রতিবাদ ছাপানোর ব্যবস্থা ছিল। কখন কখন আলোচনা খুব বড় হইত, কোন কোনটি যে খুবই বিতর্কের সৃষ্টি করিত তাহা এখনও মনে পড়ে। কলিকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ের কার্যকলাপ সম্বন্ধে রামানন্দ বাবুর বিরূপ সমালোচনা বাহির হইলে রমাপ্রসাদ চন্দ দীর্ঘ প্রতিবাদ লেখেন এবং রামানন্দবাবু স্বয়ং ইহার পুঙ্খানুপুঙ্খ জবাব দেন। ইহা তখনই আমাদের মনে বিশেষ সাড়া দেয়। আর একটি বিতর্ক ওঠে মহাত্মা গান্ধীর পুরীতে প্রদত্ত এক বক্তৃতা হইতে। তিনি লোকমান্য তিলক সম্বন্ধে বলিতে গিয়া সমাজসংস্কার ধর্মসংস্কারক কবীর নানক ও চৈতন্যের উল্লেখ করেন এবং প্রসঙ্গতঃ বলেন, ইহাদের তুলনায় রামমোহন রায় একটি 'পিগ্‌মি' বা বামন। রামানন্দবাবু প্রবাসীতে ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। মনে পড়ে কবি দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচী এবং সম্পাদক রামানন্দবাবুর মধ্যে খুবই বাদানুবাদ হয়। রবীন্দ্রনাথও বোধ হয় এই বিতর্কের আসরে নামিয়াছিলেন। আমরা পল্লীর কিশোরেরা এই সকল পড়িয়া আশ্চর্য হইয়া যাইতাম।

প্রবাসীর বিভাগগুলির কথা সামান্যমাত্র উল্লেখ করিলাম। প্রবন্ধ গৌরবে ইহা যে বরাবর সমৃদ্ধ ছিল তাহা পাঠকমাত্রেই স্বীকার করিবেন। আমাদের তখন বয়স কম। সব কথা বুঝিয়া উঠিতে পারিতাম না। তবে কোন কোন বিষয় এখনও স্পষ্ট হইয়া আছে। রবীন্দ্রনাথের রচনার কথা বলিয়াছি। দার্শনিক প্রবর দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ক্যাণ্ট, হেগেল ও ভারতীয় দর্শনের কথা নানা প্রবন্ধে পরিবেশিত হইয়াছে। নৃতত্ত্ববিদ শরচ্চন্দ্র রায়ের (রাঁচী) ওরাওঁ, হো, মুণ্ডা প্রভৃতি আদিবাসীদের কথা বহুচিত্র সহযোগে প্রবাসীতে বাহির হয়। আমরা ঐ সময় আগ্রহে ও সবিস্ময়ে ইহা পাঠ করি। হেমলতা দেবীর "তিব্বত যাত্রা তিন বৎসর" দীর্ঘ ভ্রমণ কাহিনী দীর্ঘকাল ধরিয়া প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়। রহস্যাবৃত তিব্বতের কাহিনী জানিয়া লইবারও তখন আমাদের সুযোগ ঘটে। আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের অন্ন সমস্যা, বাঙালীর মস্তিষ্ক ও তাহার অপব্যবহার এবং সমাজ সংস্কার ও বিবিধ সমস্যামূলক রচনা আমাদের খুবই অনুপ্রাণিত করে। একটু বড় হইলে প্রবাসীর পুরনো বাধান ফাইল স্কুল লাইব্রেরি হইতে লইতাম। রজনীকান্ত গুহের সক্রেটীসের চারিটি কথোপকথন সেই সময়ে পড়ি এবং পড়িয়া বড়ই মুগ্ধ হই।

কৈশোরের প্রান্তে পৌঁছিয়া প্রবাসীকে আমরা নূতন রূপে পাইলাম। যুদ্ধ শেষ হইয়াছে। আগে যে লালচে রঙের দিদি কাগজে প্রবাসী ছাপা হইতেছিল তাহা পরিবর্তিত হইল, এবং পত্রিকার কলেবরও বৃদ্ধি পাইল। কিন্তু তখন যুগ সন্ধিক্ষণ। মহাসমর অন্তে ভারতবাসীর রাষ্ট্রীয় আশা আকাংখা বলিষ্ঠ মহিমা করিয়া লোকমান্য দিব পাল হইয়া গেল। মহাত্মা গান্ধী ইহার প্রতিবাদে সত্যাগ্রহ আন্দোলন সুরু করিয়া দিলেন। ফলে হইল বিভিন্ন অঞ্চলে তীব্র অনাচার, অত্যাচার, রক্তপাত নরহত্যা প্রভৃতি। জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডে ইহার চরম পরিণতি। ঐ সময় ব্রিটিশ চণ্ড নীতির প্রতিবাদে রবীন্দ্রনাথ নাইটহুড বর্জন করিলেন। রামানন্দবাবু প্রবাসীতে স্ব-শাসনের কথা বরাবর লিখিয়াছেন। ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রের অনাচার অত্যাচারের বিরুদ্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে যুক্তি সহকারে বক্তব্য করিয়াছেন। পঞ্জাবের এতাদৃশ অনাচারের কথাও নিভিক চিত্তে প্রবাসীতে মাসের পর মাস লিখিয়া চলিলেন। রবীন্দ্রনাথের নাইটহুড ত্যাগ সম্পর্কিত ঐতিহাসিক পত্রখানি প্রবাসী ও মডার্ন রিভিয়ুতে তিনি সপ্রশংস মন্তব্যসহ প্রথম প্রকাশিত করেন এরূপ যেন মনে হইতেছে। রামানন্দের নির্ভীক সমালোচনা আপোষ-বিহীন মনোভাব, প্রবাসীর তরুণ পাঠক সমাজকে

যে কিরূপ আকোলিত করে বর্তমান লেখকের মত আরও শত শত ব্যক্তি ইহার সাক্ষী।

মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ প্রস্তাবের কোন কোন অংশের কথা একটু আগে বলিয়াছি। রামানন্দের যুক্তিনিষ্ঠ চুলচেরা আলোচনার ফলে ইহার সঙ্গে আমরা সম্পূর্ণ সায় দিতে পারি নাই বটে কিন্তু ইহার মূল লক্ষ্য ছিল স্বরাজ লাভের অনুকূলে। রামানন্দবাবুর আন্তরিক সমর্থন, প্রবাসীতে যাহা প্রকাশিত হয় আমরা তাহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিলাম। রামানন্দ ছিলেন ব্রিটিশ সম্পর্ক বিরহিত পূর্ণ স্বাধীনতার পূজারী। তাঁহার এই উদ্ধৃতিগুলি—"সর্বং আত্মবশং সুখং, সর্বং পরবশং দুঃখম্"; "স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়!" ইত্যাদি - আমাদের তরুণ মনে একেবারে গাঁথিয়া গেল।

অসহযোগ প্রস্তাবের আর একটি অংশ অস্পৃশ্যতা বর্জন। ইহাও কিন্তু আমাদের নিকট তখন তেমন নূতন ঠেকে নাই। বঙ্কিমচন্দ্র বিবেকানন্দ-রবীন্দ্রনাথের তেজ বৈষম্য বিরোধী সাহিত্য তখনও আমাদের আলোচ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'মুক্ত করে দিতে হবে তারা' প্রভৃতি কথা আমরা পল্লীর ছেলেরা তখনও শুনি নাই। কিন্তু জাতীয়তা তথা স্বাদেশিকতার মূলে যে মানব প্রেম ও মানব সেবা এই কথাগুলি ঐ সময়েই আমাদের তরুণ মনে সন্নিবদ্ধ হয়, আর এই পাঠ আমরা প্রথম দেই রামানন্দের প্রবাসীর মারফত। সমাজদেহে তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর অনাচার অবিচার ও ভেদমূলক কার্যকলাপের রামানন্দ স্পষ্ট ভাষায় নিন্দা করিতেন। তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর যাহারা জাতির বিরাট অংশ সাধারণ মানুষ তাহাদের ভিতরকার অশিক্ষা, অস্বাস্থ্য এবং কদাচারজনিত দারিদ্র্য—এ সমুদয় দূরীভূত হওয়া আশু আবশ্যক এবং তথাকথিত উচ্চ শ্রেণীর লোকেরা যাহারা শিক্ষায় অগ্রসর এবং অর্থ ও বিত্তশালী তাহারা অগ্রণী হইয়া ইহাদের মধ্যে সেবা কার্যে লিপ্ত হইলে ভেদাভেদ তো নিরাকৃত হইবেই, উপরন্তু সেবার মাধ্যমে উভয়ে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইবে। সমাজের অতি নিম্নস্তরের লোকদেরও—যেমন ধাঙড়, মেথর, মুচি মুদফরাস, আচরণ দ্বারা ইহা বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, আমরা সকলেই ভারতীয়, এক জাতিভুক্ত। আমাদের আদর্শ ও লক্ষ্য এক। এই বোধ না জন্মিলে আমাদেরই 'শিল নোড়া' দিয়া স্বার্থান্ধ শাসক জাতি আমাদেরই 'দাঁত' ভাঙিতে কসুর করিবে না। কি আশ্চর্যের কথা, ইহার মাত্র পনর বৎসর পরে শাসকগোষ্ঠী এই উপায়ই অবলম্বন করিয়াছিল আমাদিগকে বাগাইয়া রাখিবার জন্য।

তবে একথাও রামানন্দ বিশ্বাস করিতেন যে, শ্রেণী বৈষম্য সম্পূর্ণ তিরোহিত না হইলেও আমরা স্বরাজ লাভ করিতে পারিব না, এমন কথা নাই। কিন্তু মানব প্রেম ও মানব সেবার উচ্চ আদর্শ দ্বারা চালিত হইয়াই আমাদের এইরূপ করা আবশ্যক। রামানন্দ কিন্তু সুসভ্য ও অগ্রসর পাশ্চাত্য স্বাধীন দেশ সমূহের মধ্যেও যে কিরূপ ভেদাভেদ দৃষ্ট হয় এবং তজ্জনিত সাধারণ মানুষ কতখানি দুঃখ ভোগ করে তাহারও দৃষ্টান্ত বিবিধ প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে বিরত হইতেন না। সুসভ্য মার্কিনীরা কথায় কথায় শ্বেতকৃষ্ণ নির্বিশেষে নিগ্রোদের প্রতি কিরূপ অন্যায় আচরণ করে এবং কখন কখন তাহাদের কাহাকেও কাহাকেও ধরিয়া 'লিনচিং' অর্থাৎ জ্যান্ত পুড়াইয়া মারিতে প্রবৃত্ত হয়, এই সকল ঘটনাও তিনি অতি দুঃখের সঙ্গে উল্লেখ করিতেন। পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা আফ্রিকার ও অন্যত্র স্বাধীন অধিবাসীদের উপর যে অত্যাচার উপদ্রব করিয়া থাকে তাহার কথাও তিনি হামেশা লিখিতেন। আবার যেখানে বা যাহাদের মধ্যে প্রেম ও সেবা মূলক কার্য দেখিতেন তাহার বিবরণও সশ্রদ্ধ উল্লেখ করিতেন। আমরা ঐ কিশোর বয়সে রামানন্দের একদিকে স্বাধীনতা এবং অপরদিকে প্রীতি ও সেবামূলক ভাবনার দ্বারা বিশেষ অনুপ্রাণিত হইয়াছিলাম।

আর একটি বিষয়ও অজ্ঞাতসারেই যেন আমাদের ভিতরে

অনুপ্রাণিত হয়। ইহা হইল উদার দৃষ্টিভঙ্গী এবং পরমত-সহিষ্ণুতা। রামানন্দ বরাবর এই মর্মে লিখিতেন যে, পূর্ণ স্বাধীনতা যাহাদের লক্ষ্য তাহাদের পক্ষে নিম্নতর আদর্শের —যেমন ডোমিনিয়ন স্টেটাস—যাহারা অনুসারী তাহাদিগের প্রতি ব্যবহারে যেন আমরা স্বাভাবিক উদারতা বিসর্জন না দি। ভারতবর্ষের উন্নতির পক্ষে প্রত্যেক ভারতবাসী, শ্রেণী বা দলের করণীয় অনেক কিছুই রহিয়াছে। রাষ্ট্রীয় উন্নতি বা রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা শুধু কথার কথা নয়, ইহার মধ্যে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, ভাষা সাহিত্য, কৃষি শিল্প, ব্যবসায় বাণিজ্য সব কিছুরই উন্নতি নিহিত। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে দলাদলির ফলে আসল উদ্দেশ্য আমরা যেন ভুলিয়া না যাই। যিনি বা যাহারা আমার মতাবলম্বী নহেন, তিনি বা তাহারা যে নিকৃষ্ট বা নিম্ন স্তরের এইরূপ বোধ স্বদেশের উন্নতিকে পদে পদে বিঘ্নিত করিয়া থাকে। এ কারণ আমাদের পরমত সহিষ্ণু হওয়া একান্ত আবশ্যক।

কিশোর মনের উপর প্রবাসীর প্রভাবের কথা এখানে কিছু বলিতে প্রয়াস পাইলাম। কতটা সফল হইয়াছি জানি না। সাধারণের মধ্যে জ্ঞান বিতরণও ছিল প্রবাসীর একটি প্রধান লক্ষ্য। আমাদের—তখনকার কিশোরদের পক্ষে ইহা যে তখন কত হিতকর হইয়াছিল পূর্বেই তাহার খানিকটা আভাষ দিয়াছি। যুগ-সন্ধিক্ষণে আমাদের রাষ্ট্রীয় আদর্শ যখন একটা স্পষ্টরূপ ধারণ করিতে চলিয়াছে এবং ইহার ব্যাখ্যায় ও প্রতিপোষকতায় তখন প্রবাসী সবিশেষ তৎপর তখনও এই জ্ঞান বিতরণ কার্যে ইহা অধিকতর রূপেই যেন নিযুক্ত হইয়াছিল। স্কুল কলেজে আমরা কতটুকু পড়ি বা পাঠ্য বই পড়িয়া কতটুকুই বা জানি। ইহার বাহিরেও যে কত জ্ঞাতব্য বিষয় রহিয়াছে তাহার প্রথম পরিচয় পাই প্রবাসীর পৃষ্ঠায়। শুধু বিদ্যালয়ের অধীত বিষয়ের পরিপূরক রূপে নয়, এই বিচিত্র জগতে বিচিত্রতর কত আবিষ্কার, কত কাহিনী, কত দুঃসাহসিক কার্য, স্বাধীনতা প্রচেষ্টার কত আশ্চর্য আশ্চর্য বিবরণ—এই রকম কত কথাই না ইহার মধ্যে প্রথম এবং নূতন পাই।

যুগ-সন্ধিক্ষণে প্রবাসীর কলেবর বৃদ্ধি হইল। পূর্বোক্ত বিভাগগুলি বাদে ইহাতে আরও অনেকগুলি নূতন বিভাগও সন্নিবেশিত হইল, যেমন বেতারের বৈঠক, ছেলেদের পাতাড়ি, মহিলা মজলিশ, পারাপারের চেউ প্রভৃতি। "দেশের কথা" "দেশ বিদেশের কথার" মধ্যে ব্যাপকতর রূপ লাভ করে। কৈশোরের প্রান্তে তখন পৌঁছিয়াছি, এই সকলের মধ্যে যুযুৎসু মনের তের নূতন খোরাক জুটিল। বোধ হয় বর্তমান কালে সাময়িক সাহিত্যের শিশুবিভাগ প্রবর্তনের প্রথম কৃতিত্ব প্রবাসীর। কবি পারীমোহন সেনগুপ্তের 'কাফ্রিদের দেশ আফ্রিকায়' শীর্ষক ধারাবাহিক অ্যাডভেঞ্চারের কাহিনীটি ঐ সময়কার কিশোর মনের পক্ষে যে কতখানি উপযোগী হইয়াছিল তাহা বলিবার বুঝি ভাষা নাই। রামানন্দ নারীজাতির সর্বপ্রকার উন্নতির বরাবর পক্ষপাতি। স্বাস্থ্যরক্ষা এবং আত্মরক্ষার নিমিত্ত নারীদেরও যে শরীর-চর্চা—ব্যায়াম, বিবিধ খেলা এবং অস্ত্রের ব্যবহার শিক্ষা ইত্যাদি দরকার সে সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ছিল সুস্পষ্ট। মহিলা মজলিশে নারীদের শিক্ষা সাহিত্যাদির বিষয় তো থাকিতই তদুপরি এই সব বিষয় সম্বন্ধেও দেশ বিদেশের ঘটনার উল্লেখ ও আলোচনা স্থান পাইত।

প্রথম মহাসমরের পর জেতা বিজেতা সকলেই (হয়ত বাকিন যুক্তরাষ্ট্র বাদে) বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। তখন বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে কত সন্ধি ও চুক্তির ছড়াছড়ি। কোন কোন দেশে ধর্মঘটেরও প্রাদুর্ভাব হইল, আবার কোথায় কোথায় নূতন স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটিল এবং নূতন নূতন শাসনতন্ত্র রচিত হইতে সুরু হইল। প্রবাসীর পারাপারের চেউ এবং দেশ বিদেশের কথার বিশেষ অংশে বিভিন্ন লেখকের লেখা পাঠে ইহা জানিতে পারি। তুরস্কে কামাল

পাশার (পরে কামাল আতাতুর্ক) আবির্ভাব বিশ্বের স্বাধীনতার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় শুধু নয়, অত্যাশ্চর্য ঘটনা। তিনি এঙ্গোরায় (বর্তমানে, আংকারা) রাজধানী লইয়া গেলেন। গ্রীস ও তুরস্কের মধ্যে লোক বিনিময় হইল। কামাল নেতৃত্ব গ্রহণের অনতিকাল মধ্যেই জাতির পুরাতন কুসংস্কারগুলি আবর্জনা স্তূপে ফেলিয়া দিলেন। তবে তাঁহার প্রথম ও প্রধান কার্য যাহা আমাদের কিশোর মনকে বিশেষ আলোড়িত করে তাহা হইল খিলাফৎ কে বুলিসাৎ করা। এই খিলাফতের সপক্ষে আমাদের দেশে কত আন্দোলন হয়। রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টায় ধর্মভিত্তিক আন্দোলনকে জুড়িয়া দেওয়া জাতির পক্ষে যে কত ক্ষতিকর কোন কোন মনীষি ঐ সময় তাহার উল্লেখ করিয়াছিলেন। তখনকার ঐ খিলাফত সিপাহের অগ্রদূত কামাল পাশার প্রতি আমরা সবিস্ময়ে চাহিয়া রহিলাম। এইরূপে কত অঘটন ঘটার কথাই না আমরা পল্লীর ছেলেরা যাহাদের নিকট দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্র পত্রিকা কদাচিৎ পৌঁছিত তাহারা প্রবাসীর মাধ্যমেই প্রথম জানিতে পারি।

আর একটি কথা বলিয়া আমার কৈশোরের প্রবাসীর কথা শেষ করিব। পাঠক লক্ষ্য করিয়াছেন আমি মননশীল সাহিত্য মূলক বিষয়েরই উল্লেখ করিয়াছি। প্রবন্ধ গৌরবে সমসাময়িক পত্র পত্রিকার মধ্যে প্রবাসী শীর্ষস্থান অধিকার করিলেও গল্প, উপন্যাস প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইহার স্থান কম উচ্চে ছিল না। তৎকালীন নামজাদা ও উদীয়মান লেখক লেখিকার বহু গল্প উপন্যাস ইহাতে স্থান পাইত। কিন্তু আমরা পল্লীর ছেলে, তখন এই সব পুস্তকাকারে পাইবার সুবিধা আমাদের ছিল না। পল্লীতে গ্রন্থাগার নাই, স্কুল লাইব্রেরিই ছিল আমাদের একমাত্র সম্বল। স্কুলের লাইব্রেরি —গল্প উপন্যাসের স্থান ইহাতে ছিল না বলিলেই হয়। মনে পড়ে আমরা যখন দশম শ্রেণীতে পড়ি তখন বঙ্গবাসী সংস্করণ বঙ্কিম গ্রন্থাবলী সবে বাজে কেনা হয়। স্কুল হইতে যে সব বই পাইতাম তাহা প্রায়ই ছিল প্রাচীন ও আধুনিক কালের মনীষিদের জীবনী, জীবন সংক্রান্ত নানা কাহিনী, এই ধরণের আরও কোন কোন বই। হয়তো আলিকার দিনে এ সমুদয়ের তেমন চল নাই ; এই জন্য কয়েকখানির নাম মাত্র এখানে উল্লেখ করি। মনের রত্নমালা ; সতী বেহুলা, অতি ভারত ; আর্য কীর্তি ; প্রতিভা ; প্রভাত চিন্তা, নিশিথ চিন্তা ; বিদ্যাসাগর চরিত (বিহারীলাল সরকার ও চণ্ডী চরণ বন্দ্যোপাধ্যায়) রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ ভক্তিযোগ, দেশের কথা দেশবাসীর সপেশ দেউস্কর প্রভৃতি। যা শ্রেণী হইতে এই ধরণের বই একে একে পড়ি। আর অগোচরেই যেন মনন সাহিত্য পাঠে আমার অনুরাগ জন্মে। কাজেই প্রবাসী ও অন্যান্য পত্রিকায় যে সব গল্প বাহির হইত তাহা পড়িতে তেমন আগ্রহ জন্মে নাই।

এই নিয়মের কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটে প্রবাসী হইতেই। কি জানি কেন শ্রীযুক্ত বিশ্বপতি চৌধুরীর "ঘরের ডাক" প্রথম কিস্তি হইতেই আমার দৃষ্টিতে পড়িল। এখানি উপন্যাস। যতদূর স্মরণ হয় বার কিস্তিতে শেষ হইয়াছিল। প্রথম কিস্তি পড়িয়াই আগ্রহ বাড়িয়া যায় এবং পরবর্তী সংখ্যাগুলি পাইবার জন্য উদগ্রীব হইয়া থাকিতাম। হিন্দু নারী তারপরে খ্রীস্টান হইয়া গেল। কি কারণে খ্রীস্টান হইল তাহা আজ মনে পড়িতেছে না। এই মহিলাটি নানা ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে পড়িয়া শেষে আবার পূর্ব সমাজে ফিরিয়া আসিতে উন্মুখ হয় ; এ কারণ ইহার নাম ঘরের অর্থাৎ পূর্ব সমাজের ডাক। বড় ভাল লাগিয়াছিল। ইহাই প্রবাসীতে আমার প্রথম উপন্যাস পাঠ। বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'উপেক্ষিতা' গল্পটি পড়িয়াও চমৎকৃত হই। কলসী কাঁখে পল্লী বধূর সঙ্গে গল্পের নায়কের প্রথম আলাপ, এই আলাপ পরে আরও জমিয়া যায়। একদিন নায়ককে বধূটি পিঠাপুলি তৈরী করিয়া খাওয়াইল। 'পথের পাচালির' বিভূতি ভূষণের লেখা এই গল্পটি তাঁহার ভাবী সাহিত্য কীর্তির নিশানা দিয়াছিল, এরূপ বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না। আমাদের সময়কার কিশোর ও যুব সমাজ প্রবাসী পাঠে জ্ঞান ও ভাবনার দিক হইতে নানাভাবে কতখানি উপকৃত হয় ও প্রেরণা পায় তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এই দিক হইতে প্রবাসীর স্মৃতি অনন্যতুল্য ও অবিস্মরণীয়।

বাংলা সাময়িক পত্র প্রসঙ্গ

আদি ও মধ্যযুগ (১৮১৮–১৮৭২)

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারী হ্যালহেড সাহেব কলকাতা থেকে বাংলা ভাষার একখানি ব্যাকরণ বই (The Grammar of the Bengali Language) প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থপ্রকাশের সময়ই সর্বপ্রথম বাংলা অক্ষর ছাপার কাজে ব্যবহৃত হয়। হরফ বানিয়ে দেন কোম্পানিরই অন্য এক কর্মচারী চার্লস্ উইলকিন্স। শ্রীরামপুরের পঞ্চানন কর্মকার এঁর কাছে হরফ তৈরী করা শেখেন। শ্রীরামপুরে উইলিয়ম কেরী মুদ্রাযন্ত্রের জন্যে এই পঞ্চানন কর্মকারের বানানো অক্ষর কিনেছিলেন। সত্যি বলতে গেলে, হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা মুদ্রণব্যবস্থারও সূত্রপাত। তালপাতার বা খুলট কাগজে পুঁথি লেখার যুগের অবসান হল। শুরু হল মুদ্রাযন্ত্রের যুগ। আধুনিকতার যাত্রাপথে মুদ্রাযন্ত্রের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। জনমানসকে নবযুগের চিন্তাচেতনে আহ্বান জানাবার জন্যে সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের সহায়তা সর্বাধিক কার্যকরী। কারণ শিক্ষা এবং সংবাদ যত বেশী প্রচারিত হবে ততই জনচিত্তের ব্যাপক উন্মোচন সম্ভব হবে। এই কাজে মুদ্রাযন্ত্রের সহায়তা অপরিহার্য। তাই ঐতিহাসিক প্রয়োজনেই বোধ হয়, হ্যালহেডের ব্যাকরণ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে মুদ্রণব্যবস্থার পত্তন এবং তার কিছুকাল পরেই বাংলা তথা ভারতের প্রথম সংবাদপত্রের আত্মপ্রকাশ। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দের ২৯শে জানুয়ারী হিকি সাহেবের 'বেঙ্গল গেজেট' প্রকাশিত হয়। এ দেশের প্রথম সংবাদপত্র ইংরেজী। কিন্তু একথা মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না যে, পলাশীর যুদ্ধের পর জাতীয় জীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, তার প্রথম সার্থক স্তরণ এই সংবাদপত্র এবং মুদ্রাযন্ত্রের উৎস থেকে নীলায়িত হয়েছিল। মোগল আমলের 'ওয়াকেয়া-নবিস' (সংবাদ-লেখক)-দের মত সংবাদ লিখে পাঠিয়েই সন্তুষ্ট থাকা নতুন কালের সংবাদপত্রের পক্ষে সম্ভব হয়নি। সমালোচনার প্রবর্তন হয় সঙ্গে সঙ্গে। এরই ফলে সে যুগের কোম্পানির সরকার বাহাদুর সংবাদপত্রকে প্রথম থেকেই বিষনজরে দেখতে থাকেন। হিকির কাগজের আয়ু দু' বছর না পেরোতেই শেষ হয়ে গেল। বড়লাট ওয়ারেন হেস্টিংসের পরিবার এবং কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী সম্পর্কে আপত্তিকর প্রবন্ধ প্রকাশ করাই ছিল এর কারণ।

হিকির প্রস্তাবনা থেকে জানা যায়, আর্থিক সংবাদ এবং বিজ্ঞাপনাদি পরিবেশন করা তাঁর গেজেটের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। সময়টা ছিল নতুন অর্থসন্ধানীদের উচ্চাকাঙ্ক্ষার আবহাওয়াতে পূর্ণ। বাস্তবপ্রয়োজনেই এ ধরণের সংবাদপত্র তখন জন্মলাভ করেছিল। দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ সমীক্ষারও সূচনা হল এই প্রথম পত্রিকাতেই, যার পরিণতির কথা কিছুপূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হিকির পত্র ছাড়াও 'ইণ্ডিয়া গেজেট', 'ক্যালকাটা গেজেট' 'হরকরা' প্রভৃতি কয়েকটা ইংরেজী সংবাদপত্র প্রকাশিত হয়েছিল।

১৭৮০ থেকে ১৮১৮। এই আটত্রিশ বছরের মধ্যে বেশ কিছু ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। প্রথম উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ১৭৯৯ সালে ওয়েলেসলি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাহরণ করে আইন পাশ করলেন। প্রথম থেকেই সংবাদপত্রের প্রতি সরকারের বিরূপ লক্ষ্য করা গেছে। বিশেষতঃ অগণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থায় শাসকবর্গ নিজেদের স্বার্থেই সাধারণের তরফ থেকে স্বাধীন মতামত প্রকাশ পছন্দ করেন না। তখন কোম্পানি সরকার সবে আসন পেতেছে। এ অবস্থায় সংবাদপত্রের অধিকার হরণ করা তাদের পক্ষে অস্বাভাবিক কিছু নয়। আজকের এই মধ্যবিংশ শতাব্দীর গণতন্ত্র এবং সমাজতন্ত্রের যুগেও কি সংবাদপত্র তার স্বাধীন গতি বজায় রাখতে পারছে? অষ্টাদশ শতাব্দীর কথা তো অনেক আগের ব্যাপার। তবে আমার কথা এই, সেদিনও সরকার সংবাদ-পত্রের অধিকার হরণ করার প্রয়াসে বেশি দিন অটল থাকতে পারেন নি। অবস্থাচক্রে লর্ড হেষ্টিংস সেনসর প্রথা তুলে দিয়ে সম্পাদকদের জন্য কতকগুলি সাধারণ নিয়ম প্রবর্তন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সে হল ১৮১৮ খ্রীস্টাব্দের ১৯শে আগষ্ট। কিন্তু তার আগেই ১৮১৮ সনের এপ্রিল মাসে বাংলা ভাষার প্রথম সাময়িকী 'দিগ্দর্শন' মুদ্রিত হয়।

১৮০০ খ্রীস্টাব্দে শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়, মিশন প্রেসও প্রায় সঙ্গে সঙ্গে স্থাপিত হয়। এই বছরই সেখান থেকে Gospel of St. Mathew-এর অনুবাদ 'মঙ্গল সমাচার মাত্তিউর' প্রকাশিত হয়। রামমোহন কলকাতায় 'আত্মীয়সভা' স্থাপন করলেন এবং ১৮১৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁর বেদান্তগ্রন্থ প্রকাশিত হল। বাংলা ভাষার যে হুহুহ বেদান্তের তত্ত্ব পর্যন্ত আলোচনা করা যায়, রাম-মোহন তাঁর প্রমাণ দিলেন। ১৮১৭ খ্রীস্টাব্দে নব্যবাংলার পীঠভূমি হিন্দু কলেজের পত্তন হল। এই অবিস্মরণীয় ঘটনাধারার মধ্যেই বাংলার প্রথম সাময়িক পত্র আত্মপ্রকাশ করল।

১৮১৮ খ্রীস্টাব্দে পর পর তিনখানি বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হল—'দিগ্দর্শন' (এপ্রিল; মাসিক), 'সমাচার-দর্পণ' (২৩শে মে; সাপ্তাহিক), 'বাঙ্গাল গেজেটি' (সম্ভবতঃ জুন সাপ্তাহিক)। 'দিগ্দর্শন' এবং 'সমাচারদর্পণ' শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশন থেকে প্রকাশিত হয়। দু'টি পত্রিকারই সম্পাদক ছিলেন জোশুয়া মার্শম্যানের পুত্র জন ক্লার্ক মার্শম্যান। 'বাঙ্গাল গেজেটি' কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন শ্রীরামপুর মিশনের ছাপাখানার প্রাক্তন কম্পোজিটর গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য। তাঁর সহযোগী ছিলেন হরচন্দ্র রায়। 'ইহাই বাঙালী-পরিচালিত প্রথম সংবাদপত্র' (ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়)। ব্রজেন্দ্রনাথের মতে, "এখন পর্যন্ত যতদূর জানা যায়, 'সমাচারদর্পণই' বাংলা ভাষার প্রথম সংবাদপত্র। আর 'দিগ্দর্শন' হল প্রথম বাংলা মাসিক।

সে যুগের পরিপ্রেক্ষিতে 'সমাচারদর্পণ'কে একটি উচ্চ শ্রেণীর সংবাদপত্র বলেই চিহ্নিত করা যায়। ১৮১৮ থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এতে প্রকাশিত সংবাদাদি সংকলন করে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' গ্রন্থ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ থেকে প্রকাশ করেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে ইদানীং বিনয় ঘোষ 'সংবাদ প্রভাকর' এবং 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকার বিষয় সংকলন করে 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড) নামে গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। বিভিন্ন পর্যায়ে দর্পণ প্রায় ১৮৫২ খ্রীস্টাব্দ অবধি জীবিত ছিল। 'বাঙ্গাল গেজেটি'র আয়ু বছর খানেকের বেশি হয়নি।

১৮২১ খ্রীস্টাব্দের ১৪ই জুলাই 'সমাচারদর্পণ' একখানি পত্র প্রকাশ করেন। এতে হিন্দুধর্মের প্রতি অহেতুক আক্রমণ থাকাতে রামমোহন রায় প্রতিবাদ করা কর্তব্য বিবেচনা করলেন। উক্ত পত্রে কতকগুলি প্রশ্ন উত্থাপিত

হয়েছিল। রামমোহন শিবপ্রসাদ শর্মার নামে প্রশ্নগুলির উত্তর 'সমাচারদর্পণে' পাঠান। দর্পণ-সম্পাদক পত্রটি অবিকল ছাপাবার ব্যাপারে গড়িমসি করায় রামমোহন এই বৎসর সেপ্টেম্বর মাসে 'ব্রাহ্মণ সেবধি ব্রাহ্মণ ও মিসিনরি সম্বাদ' নামে সাময়িক-পত্র প্রকাশ করেন। এ পত্রের এক পৃষ্ঠায় বাংলা এবং অন্য পৃষ্ঠায় তার ইংরেজী অনুবাদ থাকতো। 'ব্রাহ্মণ সেবধি' তিনটি সংখ্যার বেশি প্রকাশিত হয়নি বলেই ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন। প্রথম সংখ্যা থেকে একটু উদ্ধৃতি দিলেই বোঝা যাবে যে, রামমোহন এই পত্রিকার মাধ্যমে হিন্দুধর্মের পক্ষে লেখনী ধারণ করেছেন। তিনি বেদান্তসূত্রকে বাংলা ভাষায় প্রকাশ করেছেন, বিভিন্ন উপনিষদেরও অনুবাদ করেছেন। য়েরোপীয়দের উদ্‌গাতা হিসেবে প্রাচীন জ্ঞানবিজ্ঞানের প্রতি তাঁর এই মনোভাব স্বাভাবিক। তবে একথাও ঠিক, তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মের মহত্তর দিকের প্রতিই দৃষ্টি দিয়েছেন, বিকৃতির প্রতি নয়। উক্ত পত্রে তিনি বলেন—

"শতার্দ্ধ বৎসর হইতে অধিককাল এদেশে ইংরেজের অধিকার হইয়াছে তাহাতে প্রথম ত্রিশ বৎসরে তাঁহাদের বাক্যের ও ব্যবহারের দ্বারা ইহা সর্বত্র বিখ্যাত ছিল যে তাঁহাদের নিয়ম এই যে কাহারো ধর্মের সহিত বিপক্ষতাচরণ করেননা ও আপনার আপনার ধর্ম সকলে করুক ইহাই তাঁহাদের যথার্থ বাসনা পরে পরে অধিকারের ও বলের আধিক্য পরমেশ্বর ক্রমে ক্রমে করিতেছেন। কিন্তু ইদানীন্তন ত্রিশ বৎসর হইল কতক ব্যক্তি ইংরেজ যাঁহারা মিসনরি নামে বিখ্যাত হিন্দু ও মোহলমানকে বাক্যরূপে তাঁহাদের ধর্ম হইতে প্রচ্যুত করিয়া খৃষ্টান করিবার ঘর নানা প্রকারে করিতেছেন।' (প্রথম সংখ্যা)

নবজাত বাংলা গদ্যকে যুক্তি-তর্ক তথা বাদানুবাদের বাহন করে তুলে রামমোহন তার সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটিত করলেন। বাংলা গদ্য পরবর্তীকালে জ্ঞান বিজ্ঞানের সমস্ত বিভাগেই তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পাঠ্যগ্রন্থের সীমানা থেকে বাংলা গদ্য জীবনের প্রাঙ্গনে অবতীর্ণ হল। রামমোহন এই অসাধ্যসাধনের প্রথম অগ্রদূত। তিনিই প্রথম সংস্কারমুক্ত গদ্যের মাধ্যমে যুক্তি-নিষ্ঠতার সঞ্চার করলেন। আর এর প্রত্যক্ষ ফলশ্রুতি হল, পরবর্তীকালের শক্তিমান লেখকদের বাংলা গদ্যের ভারবহন ক্ষমতা উপলব্ধি। শুধু তাই নয়, ভাষা জীবনব্যাপারের মানসিককে প্রকাশ করার শক্তি অর্জন করলো প্রধানতঃ সংবাদপত্র-সাময়িকীর মাধ্যমে।

১৮২১ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও তারাচাঁদ দত্ত 'সম্বাদ কৌমুদী' নামক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রথম সংখ্যার নিবেদন থেকে জানা যায়, 'ধর্ম, রাষ্ট্র-বিষয়ক আলোচনা, আভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী, দেশ বিদেশের সংবাদ ও জ্ঞাতব্য তথ্য-সম্বলিত প্রেরিত পত্রাবলী প্রকাশ—এক কথায় লোকহিতসাধনই এই সংবাদপত্র প্রচারের প্রধান লক্ষ্য।' রামমোহন রায় এই কাগজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তারাচাঁদ দত্তের পুত্র হরিহর দত্ত এই পত্রিকার সহকারী থাকাকালে সহমরণপ্রথার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতে উদ্যত হলে ভবানীচরণ অসন্তুষ্ট হলেন। তিনি ১৮২২ খৃষ্টাব্দের মার্চ মাসে 'সমাচারচন্দ্রিকা' নামক সাপ্তাহিক প্রকাশ করলেন। কৌমুদীর প্রথম তেরো সংখ্যার প্রকাশক তিনিই ছিলেন। কিন্তু 'অংশিগণের সহিত ধর্মবিষয়ে ঐকামত্য না হওয়ায়' তিনি এর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে চন্দ্রিকা প্রকাশ করলেন। 'কৌমুদী এবং চন্দ্রিকায় ঘোরতর সংগ্রাম হইয়াছিল।' একথা জানা যায় অন্য একটি পত্রিকা (সম্বাদতিমিরনাশক) থেকে 'সমাচারদর্পণের' (২১শে জানুয়ারী, ১৮৩২) উদ্ধৃতি থেকে। কৌমুদীর সম্পাদন ব্যাপারে রামমোহনের যথেষ্ট হাত ছিল বলে মনে করা হয়। তাই এই দুই পত্রিকার 'সংগ্রাম' উদারনৈতিক রামমোহনপন্থীদের সঙ্গে রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের দ্বন্দ্ব। ভবানীচরণ এই রক্ষণশীলদের মুখপাত্রস্বরূপ

থাকিয়েছিলেন। তবে একথা ঠিক, এই বাদানুবাদের মধ্য দিয়ে নবজাগরণের বিপ্লব-দুন্দুভি বিলম্বমান পঙ্ক্তিগুলির জ্ঞাতসারেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক, বেজে উঠেছিল। কিন্তু সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ করার জন্যে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দে আবার আইন জারি হল। কৌমুদী-চন্দ্রিকা, বাকিংহামের 'ক্যালকাটা জার্নাল' নামক ইংরেজী পত্রিকা এবং দুখানি ফার্সী সাপ্তাহিকের সম্বন্ধে আপত্তিকর প্রবন্ধাদি প্রকাশের অভিযোগ উঠেছিল। ফার্সী কাগজগুলির নাম 'জাম-ই-জাহান-নুমা' এবং 'মীরাৎ-উল্ আখ্‌বার'। আখ্‌বার রামমোহন রায়ের পত্রিকা এবং ফার্সীভাষায় মুদ্রিত প্রথম সংবাদপত্র। খ্রীস্টীয় ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে রামমোহনের অভ্রান্ত শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পেয়েছি। এ সময় কাগজে ১৮২৩ খ্রীস্টাব্দের চৌঠা এপ্রিল সুপ্রীম কোর্টে তৎকালীন অস্থায়ী গভর্নর জেনারেল আডাম প্রেস-আইন বিধিবদ্ধ করেন। এই আইন অনুযায়ী, কোন সাময়িক-পত্র প্রকাশের আগে পত্রিকার মালিক, মুদ্রক এবং প্রকাশককে সরকারের কাছ থেকে লাইসেন্স নেবার নির্দেশ ছিল। 'আইনবিরুদ্ধ' কোন কিছু কাগজে প্রকাশ করলেই অনুমতি-পত্র বাতিল হয়ে যেত এবং বে-আইনী কাগজ পরিচালনার জন্যে চারশ টাকা অবধি জরিমানার ব্যবস্থা ছিল। এই নূতন আইনের প্রথম ফলভাজন রামমোহন রায়—সম্পাদিত 'মীরাৎ-উল্-আখ্‌বার' বন্ধ হইয়া গেল। পত্রের শেষ সংখ্যায় (৪ এপ্রিল ১৮২৩) রামমোহন জানাইলেন যে, নূতন আইনের অপমানজনক সর্তে রাজী হইয়া তিনি কাগজ প্রকাশ করিতে অসমর্থ" (ব্রজেন্দ্রনাথ)।

উপরি-উক্ত প্রতিকূলতাকে স্বীকার করে নিয়েও এই সময় কয়েকটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। 'সমাচারদিগ্‌দর্শন' (অক্টোবর, ১৮২৩) এবং 'সমাচার' (মে, ১৮২৯) এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। এছাড়া 'সর্বশুভকরী পত্রিকা এবং ব্যবহার দর্পণ' (জুলাই, ১৮২৯), 'জ্ঞানপ্রকাশ' (১৮৩০) প্রভৃতি কাগজের আত্মপ্রকাশ ঘটে।

নতুন সংবাদপত্র-আইন ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত চালু ছিল। এই সময়ের মধ্যে প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির নামধাম সরকারী দপ্তর থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। যে সমস্ত পত্রিকায় সংবাদ বা রাষ্ট্র সম্পর্কীয় আলোচনা থাকতো না, তাদের প্রকাশের জন্যে অনুমতি নেবার দরকার হতো না। কাজেই সব পত্রিকার হদিশ সরকারী দপ্তরেও পাওয়া সম্ভব নয়। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সে যুগের সরকারী নথিপত্র ঘেঁটে এ সময়কার পত্রিকা সমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত করেছেন। তবে মোটামুটিভাবে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দ অবধি আমরা বাংলা সংবাদপত্রের প্রথম পর্বকে চিহ্নিত করতে পারি। এই সময়ের মধ্যে সংবাদপত্র এবং সাময়িক পত্রের উদ্ভব এবং প্রাথমিক বিকাশ ঘটেছে। ১৮০১ খৃষ্টাব্দের ২৮শে জানুয়ারি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদ প্রভাকর' সাপ্তাহিক পত্রিকা হিসাবে প্রকাশিত হয়। প্রভাকর থেকেই আমরা বাংলা পত্রিকার দ্বিতীয় যুগকে চিহ্নিত করতে পারি। এই পত্রিকা প্রথমে সাপ্তাহিক, পরে বাইত্রিক (সপ্তাহে তিনবার, ১৮৫৮) দৈনিক (১৮৩৯), এবং মাসিক (১৮৫৩, রূপেও আত্মপ্রকাশ করে। প্রভাকরই বাংলা ভাষার প্রথম দৈনিক। পরবর্তী পত্রগুলির তালিকা দেবার আগে প্রথম পর্বের পত্রিকাগুলির ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্দেশ করা যাক বিনয় ঘোষের অনুসরণে —"বাংলা সংবাদ-পত্র-সাময়িকপত্রের এই প্রথম পর্বে দেখা যায় যে বাঙালী মধ্যবিত্তশ্রেণীর প্রাথমিক বিকাশ হয়েছে, পত্রিকায় তাঁদের অভিনন্দন জানানো হচ্ছে এবং পত্রিকায় লেখকতাও তাঁরা করছেন। সমাজনীতি অর্থনীতি রাজনীতি ইত্যাদি বিষয় নিয়ে এই নবজাত মধ্যবিত্তের মধ্যে যে মতান্তরের সংঘর্ষ হয়েছে তা সমকালীন সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় পরিষ্কার প্রতিফলিত হয়েছে। বিরোধ প্রধানত ধর্মমত ও সমাজসংস্কারের ঔচিত্য

ক্ষেত্র করে ঘনিয়ে উঠেছে। একদিকে রামমোহনপন্থীরা অন্যদিকে সাধারণ হিন্দুসমাজ ও রক্ষণশীলরা বিতর্কে অবতীর্ণ হয়েছেন নিজেদের পত্রিকার পৃষ্ঠায়। এ রকম দৃশ্য এদেশের সমাজে পূর্বে আর কখনও দেখা যায় নি। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত মতামতের যে সামাজিক গুরুত্ব আছে তা পূর্বে কখনও ব্যক্তিমানসে বাস্তব সত্যরূপে প্রতিভাত হয়নি। এই প্রথম একটা যুগান্তকারী সত্য মামুলি শাস্ত্রকথার কুয়াশা ভেদ করে ভোরের সূর্যের মতো হেসে উঠল দেশের লোকের সামনে।...কৌমুদী-চন্দ্রিকার বিরোধ-বিতর্কের মধ্যে এদেশের মানুষের স্বাধীন গণতান্ত্রিক মতামতের জন্মবার্তা ধ্বনিত হয়ে উঠলো। নবযুগের উদ্বোধন হল দেশীয় সংবাদপত্রে।"

"...বিদ্যাবুদ্ধি যুক্তি আশ্রিত জ্ঞানগর্ভক বিষয়বস্তু লঘুভাষার ভিতর দিয়ে পরিবেশন করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল এই প্রথম পর্বের বাংলা পত্রিকাগুলি। ... বাংলা লেখাপড়ার চর্চা এদেশে সাময়িকপত্র প্রকাশের পর থেকে শুরু হয়েছে বললে অতিশয়োক্তি হয় না।" (উত্তরসূরী, সাময়িকপত্র ও বাংলা সাহিত্য সংখ্যা, শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩৬৯ ; পৃঃ ৪২২-২৩)

বিনয় ঘোষের মতে, "উনিশ শতকের তিরিশের গোড়া থেকে কোম্পানির আমলের শেষ পর্যন্ত (১৮৫৭-৫৮) বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্ব বা মধ্য পর্ব বলা যায়" (ঐ)। এই পর্বে সমাজের বিভিন্ন স্তরে অভাবনীয় পরিবর্তন এবং গতি লক্ষ্য করা যায়। হিন্দুকলেজের ছাত্রগোষ্ঠী ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে এক প্রবল নবচেতনার ধারকরূপে প্রতিষ্ঠিত, বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে, শিক্ষার বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে নবচেতনার ছোঁয়ায় উদ্বুদ্ধ হয়েছে, নবীন এবং প্রবীণের সংঘর্ষ একটা সুস্থ পরিণতির মুখে অগ্রসর হয়েছে এবং "বিদেশ চক্রাবর্তনের দেশের গ্রামীণ ও নাগরিক সমাজে অভাবনীয় শ্রেণীরূপান্তর হয়েছে।" বাংলার গ্রামীণ সমাজের ভিত্তি ভেঙে গিয়ে একদল রাজস্ববাবসায়ী এবং মধ্যস্বত্বভোগী ধনিক শ্রেণীর উদ্ভব ঘটলো। এই সহসা-বড়লোকদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা সংবাদপত্র উপকৃত হয়েছিল। আর এই অর্থভিত্তিক আভিজাত্যকে বজায় রাখবার জন্য এঁরা নতুন শিক্ষাগ্রহণেও অগ্রণী হলেন। এক কথায়, অভূতপূর্ব এক সামাজিক রূপান্তরের পটভূমিকায় বাংলা সংবাদপত্রের স্বর্ণযুগ তার যাত্রা আরম্ভ করে চূড়ান্ত পরিণতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। বিভিন্ন সভা স্থাপনের মধ্যেও এই পর্বের সামাজিক এবং মানসিক অভিজ্ঞান লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গভাষার প্রতি ক্রমবর্ধমান আগ্রহ এবং তার সেবার জন্যে বিদগ্ধজনের প্রভূত প্রয়াসের স্বাক্ষর বহন করছে এ যুগের অনেক পত্রিকা এবং সমিতি। জ্ঞানবিজ্ঞান অনুশীলনের আগ্রহও ক্রমবর্ধমান আকারে প্রসারিত হয়েছে। নিম্নলিখিত সভাগুলি এই আগ্রহের প্রমাণ—

সর্বতত্ত্বদীপিকা সভা (১৮৩২); বঙ্গভাষা প্রকাশিকা সভা (১৮৩৪-৩৬); সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা (১৮৩৮); তত্ত্ববোধিনী সভা (১৮৩৯); বঙ্গভাষানুবাদসমাজ (১৮৪০); বেথুন সোসাইটি (১৮৪১); বিদ্যোৎসাহিনী সভা (১৮৪৩)। (দ্রঃ বিনয় ঘোষের পূর্বোক্ত প্রবন্ধ) বঙ্কিমচন্দ্র ঈশ্বরগুপ্ত প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি সভার উল্লেখ করেছেন—টাকীর নীতিতরঙ্গিনী সভা, বলিপাড়ার নীতিসভা। বঙ্কিমচন্দ্র কৌতুকের সঙ্গে বলেছেন, "সৌভাগ্যক্রমে তিনি (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত) আজিকার দিনে বাঁচিয়া নাই; তাহা হইলে সভার জ্বালায় বাতিব্যস্ত হইতেন। রাধরঙ্গিণী, শ্যামতরঙ্গিণী, নবরাগিণী, ভবদায়িনী প্রভৃতি সভার জ্বালায়, তিনি কলকাতা ছাড়িতেন সন্দেহ নাই। কলিকাতা ছাড়িলেও নিষ্কৃতি পাইতেন, এমন নহে। গ্রামে গেলে দেখিতেন, গ্রামে গ্রামরঙ্গিণী সভা, ঘাটে ঘাটতরঙ্গিণী, মাঠে মাঠসঞ্চারিণী, ঘাটে ঘাটসাধনী, জলে জলতরঙ্গিণী, স্থলে স্থলবাহিনী, খানায় বিষাতিনী, ডোবায়

নিমজ্জিনী, বিদ্যে বিলবাসিনী, এবং যাচার নীচে অলাবুসদৃশ-বাহিনী সভা সকল সভা সংসারের অঙ্গ আকুল হইয়া বেড়াইতেছে।' (ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকা—জীবনচরিত ও কবিত্ব)। বঙ্কিমের পরিহাসের মধ্যেও একটি কথা সূর্যালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তত্ত্ববোধিনী, নীতিতরঙ্গিনী এবং নীতি সভার সদস্য ছিলেন, আর পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর অজস্র সভা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সভাগুলি সেযুগের শিক্ষিত ব্যক্তিদের জ্ঞানস্পৃহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। আজকের দিনের সভাগুলিকে বাস্তবিক বঙ্কিমের ভাষায় 'নিমজ্জিনী' নাম দেওয়া যেতে পারে। সেই গভীরতাই (high seriousness) বা কোথায়, সেই অন্তর আস্পৃহাই বা কোথায়? কিন্তু সেকালের এই সমস্ত সভা সম্বিকারের 'জ্ঞানোপাদিকা' নাম লাভ করার উপযুক্ত ছিল।

এই পটভূমিতেই গুপ্ত কবির 'সংবাদপ্রভাকরে'র আত্ম-প্রকাশ। প্রভাকর ছাড়া এ যুগের প্রতিনিধিস্থানীয় পত্রিকা হল—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা (মাসিক, ১৮৪৩); বিবিধার্থ সংগ্রহ (মাসিক, ১৮৫১); মাসিক পত্রিকা (মাসিক, ১৮৫৪); সোমপ্রকাশ (সাপ্তাহিক, ১৮৫৮)। এ ছাড়া ছোটবড় অনেক পত্রিকা এ যুগের দান। ব্রজেন্দ্রনাথ প্রদত্ত তালিকা থেকে তাদের নাম সংকলন করে দিলাম—সম্বাদ সুধাকর (সাপ্তাহিক, ১৮৩১); সমাচার সভারাজেন্দ্র (সাপ্তাহিক ১৮৩১); জ্ঞানান্বেষণ (সাপ্তাহিক, ১৮৩১); অনুবাদিকা (সাপ্তাহিক ১৮৩১); সম্বাদ রত্নাকর (সাপ্তাহিক, ঐ); সম্বাদ সারসংগ্রহ (সাপ্তাহিক, ঐ); জ্ঞানোদয় (মাসিক, ঐ)। ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত পত্রিকার তালিকা—বিজ্ঞানসেবধি (মাসিক), জলযুক্তাস্ত (সাপ্তাহিক?); সংবাদ রত্নাবলী (সাপ্তাহিক); জ্ঞানসিন্ধু-তরঙ্গ (মাসিক?)। ১৮৩৩ এ প্রকাশিত পত্রিকা—বিজ্ঞানদারসংগ্রহ (পাক্ষিক); চার আনা পত্রিকা (মাসিক?)। ১৮৩৪—সংবাদ পূর্ণ চন্দ্রোদয় (মাসিক); ভক্তিসূচক (সাপ্তাহিক)। ১৮৩৭—সম্বাদ সুধাসিন্ধু (সাপ্তাহিক); সম্বাদ তিমিরনাশক (অর্ধ-সাপ্তাহিক)। ১৮৩৮—সংবাদ দিবাকর (সাপ্তাহিক); সংবাদ সৌদামিনী (সাপ্তাহিক); সংবাদ মৃত্যুঞ্জয়ী (সাপ্তাহিক)। ১৮৩৯—সম্বাদ ভাস্কর (সাপ্তাহিক); সম্বাদ গগনরাজ (সাপ্তাহিক); সংবাদ অরুণোদয় (দৈনিক)। ১৮৪০—মুর্শিদাবাদ সম্বাদপত্রী (সাপ্তাহিক, মফস্বল থেকে প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র), সংবাদ সুজনরঞ্জন (সাপ্তাহিক); আয়ুর্বেদ দর্পণঃ (মাসিক); গভর্মেণ্ট গেজেট্ (সাপ্তাহিক); জ্ঞানদীপিকা (সাপ্তাহিক)। ১৮৪১—সংবাদ ভারতবন্ধু (সাপ্তাহিক); সংবাদ নিশাকর (সাপ্তাহিক)। ১৮৪২—বেঙ্গল স্পেকটেটর (মাসিক, ইংরেজী-বাংলা দ্বিভাষিক, পরে সাপ্তাহিক এবং পাক্ষিকরূপে প্রকাশিত); বিদ্যাদর্শন (মাসিক); সংবাদ ভূমদূত (সাপ্তাহিক)। ১৮৪৩—বঙ্গদেশীয় পত্র (মাসিক)। ১৮৪৪—কালস্য কৌমুদী; সর্ব্বশুভকরিণী (সাপ্তাহিক); সংবাদ রাজরাণী (সাপ্তাহিক); পক্ষির বিবরণ। ১৮৪৬—নিত্য ধর্মানুরঞ্জিকা (পাক্ষিক); জগদ্দীপক ভাস্কর (সাপ্তাহিক); পাষণ্ড পীড়ন (সাপ্তাহিক); সত্য সঞ্জীবনী পত্রিকা (মাসিক); সমাচার জ্ঞানদর্পণ (সাপ্তাহিক); জগদ্বন্ধু (মাসিক)। ১৮৪৭—উপদেশক (মাসিক); দুর্জ্জন দমন বহ্নিবর্ষী (মাসিক); সংবাদ জ্ঞানার্জন (সাপ্তাহিক); হিন্দু ধর্ম চন্দ্রোদয় (মাসিক); সংবাদ কাব্য রত্নাকর (সাপ্তাহিক); হিন্দু বন্ধু (মাসিক); রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ (সাপ্তাহিক); সংবাদ সাধুরঞ্জন (সাপ্তাহিক); জ্ঞান সঞ্জীবনী (পাক্ষিক); সংবাদ সুজনবন্ধু (সাপ্তাহিক); সংবাদ বিবিধার্থ (সাপ্তাহিক); সংবাদ মনোরঞ্জন (সাপ্তাহিক); আক্কেল গুড়ুম (সাপ্তাহিক, ইংরেজী-বাংলা)। ১৮৪৮—সংবাদ জ্ঞান রত্নাকর (সাপ্তাহিক); সংবাদ রত্নবর্ষণ (পাক্ষিক); সংবাদ মুক্তাবলী (সাপ্তাহিক); সংবাদ অরুণোদয় (সাপ্তাহিক) সংবাদ কৌস্তুভ (সাপ্তাহিক); জ্ঞানচন্দ্রোদয় (মাসিক?); সংবাদ দিনমণি (সাপ্তাহিক)। ১৮৪৯—সংবাদ রসসাগর

(সাপ্তাহিক) : বারাণসী চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক) : সত্যার্ণব-প্রকাশিকা (মাসিক), সংবাদ রসমুদ্গর (সাপ্তাহিক), কৌস্তুভ কিরণ (মাসিক) ; মহাজনদর্পণ (দৈনিক, সম্ভবতঃ বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত প্রথম পত্রিকা) ; ভৈরবদণ্ড (সাপ্তাহিক) ; সংবাদ সজ্জনরঞ্জন (সাপ্তাহিক), সংবাদ বর্দ্ধমান জ্ঞান প্রদায়িনী (সাপ্তাহিক) ; বর্দ্ধমান চন্দ্রোদয় (সাপ্তাহিক) ; সংবাদ রসরত্নাকর (পাক্ষিক)। ১৮৪০—সত্যপ্রদীপ (সাপ্তাহিক) ; ধূমকেতুকিকা (মাসিক) ; ধর্ম্ম ধর্ম্ম প্রকাশিকা (মাসিক) ; সত্যার্ণব (মাসিক) ; সর্ব্ব শুভকরী পত্রিকা (মাসিক) সংবাদ সুধাংশু (সাপ্তাহিক) ; সংবাদ বর্দ্ধমান (সাপ্তাহিক)। ১৮৫১ থেকে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অজস্র পত্র-পত্রিকা আত্ম-প্রকাশ করেছিল। বাহুল্যবোধে সবগুলির নাম আর দিলাম না। 'বিবিধার্থ সংগ্রহ', 'মাসিক পত্রিকা' এবং 'সোমপ্রকাশ' ছাড়া এই দশকের উল্লেখযোগ্য পত্রিকা হল—কালীপ্রসন্ন সিংহের 'বিদ্যোৎসাহিনী পত্রিকা' (মাসিক, ১৮৫৫) এবং রেঃ ওঁত্রয়ান স্মিথ সম্পাদিত এবং হুজসন প্র্যাট সাহেব কর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতাপ্রাপ্ত 'এডুকেশন গেজেট ও সাপ্তাহিক বার্ত্তাবহ' (সাপ্তাহিক ১৮৫৬, ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ভূদেব মুখোপাধ্যায় এই কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হন)।

মধ্যপর্বের পাঁচটি কাগজকে আমরা এ যুগের প্রতিনিধি-স্থানীয় পত্রিকা বলে চিহ্নিত করেছি। কারণ এই কাগজ-গুলির মধ্যেই উনিশ শতকের মধ্যভাগের আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং বাংলা ভাষা-সাহিত্যচর্চার সর্বাধিক প্রতিফলন ঘটেছে। প্রথমেই ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের 'সংবাদপ্রভাকর'। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বোধ হয় বাংলা ভাষার প্রথম প্রতিভাবান সাংবাদিক। প্রভাকর বাংলা ভাষার সম্ভাবনাকে অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। গুপ্তকবির সহজাত কবিপ্রতিভার বিকাশ ঘটেছে এই পত্রিকার পাতায়। এ ছাড়া, তিনি সে যুগের একদল শক্তিশালী লেখককে প্রেরণাদান করে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে উদ্ঘাটিত করেছিলেন।[৭] তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন—অক্ষয়কুমার দত্ত, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীনবন্ধু মিত্র, মনোমোহন বসু এবং বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। বঙ্কিমচন্দ্র স্বয়ং স্বীকার করেছেন, 'আমি নিজে প্রভাকরের নিকটে বিশেষ ঋণী। আমার প্রথম রচনাগুলি প্রভাকরে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত আমাকে বিশেষ উৎসাহদান করেন।' (ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাসংগ্রহের ভূমিকা)—স্বকালমনস্কতা বোধ হয় সাংবাদিকতার প্রথম গুণ, আর প্রধান গুণ সমাজ-সচেতনতা। এ হিসেবে গুপ্তকবি বাংলা সংবাদপত্রের যে প্রবাহ বিস্তার করেছিলেন, তার মূল্য অপরিমেয়। তিনি শুধু দেশীয় ভাষার প্রথম দৈনিকের জন্মদাতাই নন, প্রথম সার্থক সাংবাদিক সম্পাদক। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায়, 'নিত্য-নৈমিত্তিকের ব্যাপার, রাজকীয় ঘটনা, সামাজিক ঘটনা, এ সকল যে রসময়ী রচনার বিষয় হইতে পারে, ইহা প্রভাকরই প্রথম দেখায়। আজ বিধের যুদ্ধ, কাল পৌষপার্বণ, আজ বিলবরি, কাল উমেদারি, এ সকল যে সাহিত্যের অধীন, সাহিত্যের সামগ্রী, তাহা প্রভাকরই দেখাইয়াছিলেন।' (ঐ) আর প্রভাকর সে যুগের সমাজজীবনকে তার পৃষ্ঠায় কত নিখুঁতভাবে ধরে রেখেছে। বিনয় ঘোষের 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রভাকরের এই ঐতিহাসিক ভূমিকাকে আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করেছে। এ ছাড়া, বিস্মৃত এবং পুরাতন কবিদের জীবনী এবং কবিতা সংগ্রহের কাজে গুপ্তকবি প্রশংসনীয় উদ্যমের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁরই চেষ্টায় আমরা বেশ কয়েকজন কবিওয়ালাকে বিস্মৃতির হাত থেকে উদ্ধার হতে দেখেছি। সাহিত্যপ্রীতি, দেশপ্রীতির সঙ্গে বাঙ্ময়মিশ্রিত মনোভাব মিশ্রিত হয়েই তাঁর সম্পাদকজীবন সার্থকতালাভ করেছে। এই জন্যেই বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, 'প্রভাকর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অক্ষয়কীর্তি।'

১৮৩১ সালে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন মহর্ষি

দেবেন্দ্রনাথ। এই সভার মুখপত্র হিসেবে ১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র জন্ম। এ সময়ে নবাগুপ্তী ফিরোজিয়ানদের সঙ্গে স্বদেশীয় আদর্শ-ঐতিহ্যের দ্বন্দ্ব চরমে উঠেছিল। নব্যশিক্ষিতদের মধ্যে দেশীয় আদর্শের প্রতি অবজ্ঞা এবং ঔদাসীন্য ছিল পর্বতপ্রমাণ। "এই স্বদেশোৎঘাত চিত্ত ও চিন্তাকে স্বদেশাভিমুখী করার সামাজিক-ঐতিহাসিক আবশ্যকতা ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয় তিরিশ থেকে বাংলাদেশে দেখা দিয়েছিল। সেই ঐতিহাসিক আবশ্যকতার দাবী পূরণ করেছিল 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩৯) ও তার মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪৩)। (বিনয় ঘোষ, সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র, দ্বিতীয় খণ্ড, সম্পাদকীয়)। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়' সম্পাদক নিযুক্ত হন ঊনবিংশ শতকের আরেক অদ্ভুতকর্মা মনীষী অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর চেষ্টায় তত্ত্ববোধিনী ব্রাহ্মসমাজের পত্রিকা হয়েও জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত দিকে তার পক্ষবিস্তার করলো। 'সাহিত্য দর্শন বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাবৃত্ত জীবনচরিত রাজনীতি অর্থনীতি শিক্ষা সমাজনীতি' প্রভৃতি জ্ঞান-বিজ্ঞানের সমস্ত বিষয়ই তত্ত্ববোধিনীতে স্থান পেতে থাকে। অক্ষয়কুমারই বাংলা ভাষায় যথার্থ বৈজ্ঞানিক আলোচনার অগ্রদূত। বারো বৎসর তিনি এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। এই পত্রিকার পৃষ্ঠাতেই তাঁর অধিকাংশ গ্রন্থ প্রথমে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থগুলির নাম 'বাহ্য বস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' (প্রথম ভাগ ১৮৫২, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৩); 'চারুপাঠ' (প্রথম ভাগ ১৮৫৩, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৫৪, তৃতীয় ১৮৫৯); ধর্মনীতি (১৮৫৫); 'পদার্থবিদ্যা' (১৮৫৬, পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক পাঠ্যপুস্তক); 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়' (প্রথম ভাগ ১৮৭০, দ্বিতীয় ভাগ ১৮৮৩)। ভূদেব মুখোপাধ্যায় সেদের অভিমত—'পাশ্চাত্য প্রথায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে বাঙ্গালা ভাষায় জ্ঞান বিজ্ঞানের অনুশীলন ও প্রচার সার্থকভাবে করেন সর্বপ্রথম অক্ষয়কুমার। অক্ষয়কুমার রসস্রষ্টা সাহিত্যিক ছিলেন না। সুতরাং অক্ষয়কুমারের রচনাভঙ্গিতে মাধুর্যগুণ প্রাধান্য লাভ করে নাই। তবে তাঁহার রচনার বিষয়বস্তুর উপযোগিতা অনুসারে লেখা ছিল প্রকাশক্ষম, বাহুল্যবর্জিত, ব্যবহারোপযোগী এবং প্রসাদগুণবিশিষ্ট।' (বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, তৃতীয় সংস্করণ, পৃঃ৫৮)। বাংলা ভাষার এই প্রকাশক্ষমতা এবং বিচিত্রবিষয়ে আলোচনাযোগ্যতা তত্ত্ববোধিনীতে নিঃসংশয়রূপে প্রতিষ্ঠিত হল। অক্ষয়কুমারের সঙ্গে এই কৃতিত্ব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরেরও প্রাপ্য। বিদ্যাসাগর এর নিয়মিত লেখক এবং পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তত্ত্ববোধিনীর পাঠকসংখ্যা এককালে প্রায় সাতশ' পর্যন্ত হয়েছিল। রামগোপাল ঘোষ (যাকে বলা হত 'এক্‌স্‌রাজ' অর্থাৎ নব্যশিক্ষিতদের রাজা), রামতনু লাহিড়ীর মত ইংরেজী শিক্ষিত যুবকবৃন্দ পর্যন্ত তত্ত্ববোধিনীকে অভিনন্দন জানিয়েছিলেন। প্রায় আশি বছর এই পত্রিকা স্বদেশ ও মাতৃভাষার সেবা করে গিয়েছে। এই দীর্ঘসময়ে তার সম্পাদকমণ্ডলীও কম গুরুত্বপূর্ণ নন। এমন সম্পাদকীয় ঐতিহ্য অন্য কোন পত্রিকার আছে কিনা সন্দেহ। অক্ষয়কুমারের পর নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এর সম্পাদক হন। পরবর্তী সম্পাদকবৃন্দ হচ্ছেন—সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৫৯-৬২; ১৯০৯-১০; ১৯১৫-২৩); অযোধ্যানাথ পাকড়াশী (১৮৬৫-৬৭; ১৮৬৯-৭২); হেমচন্দ্র বিদ্যারত্ন ১৮৬৭-৬৯; ১৮৭৭-৮৪); দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৮৪-১৯০৮); রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১০ ১৯১৫); ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৯১৫-২৩)। বাংলা গদ্যসাহিত্যের বিকাশে তত্ত্ববোধিনীর দান যেমন অপরিমেয়, তেমনি তা গভীর প্রদর্শে তুলনারহিত। এর মূক সমাজজীবনের বহুধা প্রতিফলনের আলেখ্য বিনয় ঘোষের 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' নামক প্রশংসনীয় গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের পাতায় পাতায় পাঠকবৃন্দ লক্ষ্য করবেন।

রাজেন্দ্রলাল মিত্রের বিবিধার্থ-সংগ্রহ (অক্টোবর, ১৮৫১) তত্ত্ববোধিনীর পরবর্তী উল্লেখযোগ্য পত্রিকা। রবীন্দ্রনাথ 'জীবনস্মৃতি'তে বিবিধার্থ-সংগ্রহের সপ্রশংস উল্লেখ করেছেন। ইতিহাসপুরাবৃত্ত সাহিত্যশিল্প প্রাণিবিদ্যা প্রভৃতি বিবিধ বিষয় এই পত্রিকাতে আলোচিত হত। আলোচ্য বস্তুকে চোখসমা করার জন্যে নানাবিধ ছবি থাকতো। বিবিধার্থই বাংলা ভাষার প্রথম 'ছবিওয়ালা মাসিক পত্র'। তত্ত্ববোধিনীর মত সাহিত্যোৎকর্ষ না থাকলেও 'আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলের পাঠযোগ্য' করার প্রচেষ্টাতে এই পত্রিকার প্রধান গৌরব।

প্যারীচাঁদ মিত্র ও রাধানাথ শিকদারের সম্পাদনায় ১৮৫৪ সনের ১৬ই আগষ্ট 'মাসিক পত্রিকা' প্রকাশিত হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যাতেই ঘোষণা করা হয়—'এই পত্রিকা সাধারণের বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের জন্যে ছাপা হইতেছে, যে ভাষায় আমাদিগের সচরাচর কথাবার্তা হয়, তাহাতেই প্রস্তাব সকল রচনা হইবেক। বিজ্ঞ পণ্ডিতেরা পড়িতে চান, পড়িবেন, কিন্তু তাঁহাদের নিমিত্তে এই পত্রিকা লিখিত হয় নাই।' প্যারীচাঁদ হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবক। তিনি ও সেযে মাতৃভাষার সর্বজনবোধ্য বাহনে সাহিত্য-চর্চা শুরু করলেন। মধুসূদনের সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভাবের অব্যবহিত পূর্বের এই ঘটনার তাৎপর্য তাই স্মরণীয়। 'কথ্যভাষার রীতিতে কাব্যরচনা, প্রচুর তদ্ভব এবং চলিত ক্রিয়াপদের ব্যবহার, এবং ক্রিয়াপদের সাধু ও কথ্যভাষার মিশ্রণ—ইহাই হইতেছে মাসিক পত্রিকার রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য' (সুকুমার সেন)। এই বৈশিষ্ট্য ধারণ করে আছে প্যারী চাঁদের চেঁকচাদে ছদ্মনামে লিখিত 'আলালের ঘরের দুলাল' নামক উপন্যাস। এই উপন্যাসটি 'মাসিক পত্রিকা'য় ক্রমশঃ প্রকাশিত হয়। প্যারীচাঁদই প্রথম সচেতনভাবে কথ্যরীতিকে সাহিত্যে প্রয়োগ করে ভাষার ক্ষেত্রে যুগান্তর সূচনা করলেন। তাঁরই ধারা বহন করেছেন কালীপ্রসন্ন সিং (হুতোম), মধুসূদন (ছুটি প্রহসনে), দ্বিজেন্দ্রনাথ, প্রমথ চৌধুরী, এমন কি রবীন্দ্রনাথ।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই নভেম্বর সাপ্তাহিক 'সোমপ্রকাশ' বার করেন। "রাজনৈতিক বিষয়ে আলোচনা প্রকৃত পক্ষে 'সোমপ্রকাশেই' প্রথম সুরু হয়।" বিদ্যাসাগর এই পত্রিকার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। দ্বারকানাথ ছিলেন নিভীক সম্পাদক। কোন নীচতা, দলাদলি, তদ্বতীতির তিনি পরোয়া করতেন না। সে যুগের বাংলাদেশের জনচেতনার উদ্বোধনে তাঁর প্রচেষ্টা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয়।

'সোমপ্রকাশের' পর 'রহস্য-সন্দর্ভ' (১৮৬৩), 'অবোধবন্ধু (১৮৬৩), 'অমৃতবাজার' (১৮৬৮) প্রভৃতি সাহিত্য-রাজনীতি-সমাজনীতি বিষয়ক কাগজ প্রকাশের পর বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' (১৮৭২) প্রকাশিত হয়। 'বঙ্গদর্শনের' জন্ম থেকে বাংলা সাময়িক পত্রের স্বর্ণ যুগ। এর দ্যুতিতে বাংলা-ভাষার সমস্ত 'অন্ধকার', 'একাকার' ঘুর ঘুরে গেল। বাংলা ভাষা যৌবনে উপনীত হল। এই যৌবনের অগ্রগমের গমনপথ রচিত হয়েছে 'বিদর্শন' থেকে শুরু করে 'অমৃতবাজার' পর্যন্ত। সেই পথে বাংলা সাহিত্যের নতুন সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাব ত্বরান্বিত হল। এই সুদীর্ঘধারায় বাংলা সংবাদপত্র-সাময়িকপত্রের যে ভূমিকা তা আগামীদিনের অনুসন্ধিৎসু পাঠকের বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হবে।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও সমসাময়িক পত্রপত্রিকা

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্র

কিশোরীচাঁদ মিত্রের 'ইণ্ডিয়ান রিফর্মার' পত্রিকায় ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাস 'রাজমোহনের স্ত্রী' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে,—এবং তারও কিছু আগে তিনি 'এডুকেশন গেজেট'-এ লিখেছেন। ১৮৬০ থেকে ১৮৬৪-র মার্চের প্রায় প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত তিনি খুলনায় ছিলেন। ১৮৬৪-র ৫ই মার্চ তিনি বারুইপুরে বদলি হন। ঐ সময় থেকে পরবর্তী বছর-খানেকের মধ্যে,—অর্থাৎ 'বঙ্গ দর্শন' বেরোবার আগেই,—১৮৭১ এ 'দি ক্যালকাটা রিভিয়ু' পত্রিকায় 'Bengali Literature' এবং 'Buddhism and the Sankhya Philosophy' নামে তাঁর দুটি প্রবন্ধ ছাপা হয়। 'বঙ্গদর্শন' বেরোবার পরে,—১৮৭২-এর ডিসেম্বর এবং ১৮৭৩ এর মে মাসে শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পত্রিকা 'মুখার্জিস ম্যাগাজিন'-এ তাঁর আর দুটি প্রবন্ধ বেরোয়—একটির নাম 'The Confessions of a Young Bengal, অন্যটির—'The Study of a Hindu Philosophy'। প্রথম দফায় ১৮৭২ থেকে ১৮৭৬-এর মার্চ পর্যন্ত বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬-এর প্রথম দিকেই বঙ্কিমকে কিছু কিছু পারিবারিক অশান্তি ভোগ করতে হয়। তারপর 'বঙ্গদর্শন' আবার দ্বিতীয় দফায় জীবিত ছিল ১৮৮০-র মার্চ পর্যন্ত। সেবার বেরোয় সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় (বৈশাখ ১২৮৪ থেকে ১২৮৯ এর বৈশাখ-চৈত্র পর্যন্ত) তারপর, ১৮৮৩-র অক্টোবরে চন্দ্রনাথ বসুর উৎসাহে এবং শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় তৃতীয় দফায় বেরিয়ে অচিরেই বন্ধ হয়ে যায়। (১২৯০-এর কার্তিক থেকে মাঘ)।

'বঙ্গদর্শন' যখন তৃতীয় দফায় প্রকাশিত হয়, তারই কাছাকাছি সময়ে অক্ষয়চন্দ্র সরকারের সম্পাদনায় 'নবজীবন' পত্রিকা আত্মপ্রকাশ করে। তার পনেরো দিন পরেই বঙ্কিমচন্দ্রের নেতৃত্বে এবং তাঁর জামাতা রাখালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় (শ্রাবণ ১২৯১) 'প্রচার' নামে একটি মাসিক পত্রের পত্তন হয়। সঞ্জীবচন্দ্রের সম্পাদনায় 'বঙ্গদর্শন' এর প্রকাশে ছেদ পড়বার আগে পর্যন্ত তাতে বঙ্কিমের 'দেবী চৌধুরাণী' চলছিল,—'প্রচার' পত্রিকায় তাঁর 'সীতারাম' বেরোয়। কিন্তু 'প্রচার' প্রধানতঃ তাঁর সাহিত্য-প্রেরণার পত্রিকা নয়, তাতে তিনি ধর্মতত্ত্বের আলোচনা করেন। 'বঙ্গদর্শনে'র তৃতীয় বছরে [১২৮১] অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্যসংগ্রহ' বইখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে তিনি কৃষ্ণলীলাতত্ত্ব-অনুসন্ধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করেন। সেই সংকল্পের ফল 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'নবজীবন'-এর প্রথম সংখ্যাতেই তাঁর 'ধর্ম জিজ্ঞাসা' প্রবন্ধটি ছাপা হয়। 'প্রচার'-এ তাঁর দেবতত্ত্ব-সম্পর্কিত ধারাবাহিক আলোচনা বেরোয় এবং গীতার ব্যাখ্যাও চলতে থাকে। শেষ বয়সে বঙ্কিম এই সব প্রসঙ্গেই মগ্ন ছিলেন। ১২৯১-এর জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যার 'প্রচার'-এ দেখা দেয় সম্পাদকীয় এই উক্তিটি :

> 'যখন 'প্রচার' প্রথম প্রকাশ হয়, তখন আমাদের এমন অভিপ্রায় ছিলনা যে, প্রচার কেবল ধর্ম-বিষয়ক পত্র হইবে। কিন্তু প্রচারের লেখকদিগের রুচির গতিকে, বিশেষতঃ প্রধান লেখকের অভিপ্রায় অনুসারে, ইহাতে এক্ষণে ধর্মবিষয়ক প্রবন্ধ ছাড়া আর কিছু থাকে না।'

কিন্তু এই একপেশে আয়োজন তিনি বদলাতে চেয়েছিলেন। এই লেখাটিতেই বলা হয়—'আগামী বৎসরে যাহাতে প্রচার বিচিত্র ও বহুবিষয়ক হয়, আমরা তাহা করিবার উদ্যোগী হইয়াছি। প্রচারের প্রধান লেখকেরাও এ বিষয়ে অনুমতি প্রদান করিয়াছেন।

• • •

ঈশ্বর গুপ্তের সংবাদ-প্রভাকর পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্রের যখন গদ্য পদ্য রচনা শুরু হয়, তখন তিনি ছিলেন হুগলী কলেজের ছাত্র। তাঁর সাহিত্য-জীবনে সমাচার-দর্পণ, সংবাদ-প্রভাকর, মাসিক পত্রিকা, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গ দর্শন, বান্ধব, ভারতী, নব্যভারত, বঙ্গবাসী, সঞ্জীবনী, প্রচার, নবজীবন ইত্যাদি নানা পত্র-পত্রিকার অল্পবিস্তর সম্পর্কের প্রসঙ্গ প্রণিধানযোগ্য। 'সংবাদ-প্রভাকরে' এবং 'সমাচার দর্পণে' তাঁর চৌদ্দ-পনেরো বছর বয়সে লেখা কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়। 'মাসিক পত্রিকা'র গদ্য-রীতি তিনি মন দিয়ে লক্ষ্য করেছেন। ১৮৭২ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত মোট কুড়ি বছর বিশেষভাবে 'বঙ্গদর্শন',—সঞ্জীবচন্দ্র-সম্পাদিত 'ভ্রমর,'—অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'নবজীবন'—এবং রাধালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'প্রচার' ছিল তাঁর প্রধান প্রিয় পত্রিকাগুলির মধ্যে গণ্য। শেষ বয়সে 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের 'একটি পুরাতন কথা' পড়ে তিনি ভারতী, নবজীবন, তত্ত্ববোধিনী, সঞ্জীবনী, বঙ্গদর্শন ইত্যাদি পত্র-পত্রিকার নাম একযোগে স্মরণ করেন। এ সব তাঁর পত্রিকা-মনোযোগেরই উদাহরণ।

•

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৭শে ফেব্রুয়ারী থেকে ১৮৯৪-এর মার্চ পর্যন্ত, মোট প্রায় বিয়াল্লিশ বছর বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক জীবনের বিস্তার। এই বিয়াল্লিশ বছরের সাধনাকাল পর পর চারটি পর্বে ভাগ করে দেখিয়েছিলেন স্বর্গত সজনীকান্ত দাস এবং ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম পর্বের বিস্তার ১৮৫২তে 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশের ঘটনা থেকে ১৮৬৫তে 'দুর্গেশনন্দিনী' প্রকাশ অবধি। 'দুর্গেশনন্দিনী' থেকে শুরু করে ১৮৭২-এ 'বঙ্গদর্শন'-এর অন্তকাল পর্যন্ত সেই দ্বিতীয় পর্ব। এটির নাম দেওয়া হয়েছিল 'উদ্যোগপর্ব'। তারপর তৃতীয় পর্ব,—অর্থাৎ 'যুদ্ধপর্ব'। 'বঙ্গদর্শন' থেকে 'প্রচার' পত্রিকার শেষ সীমা, অর্থাৎ ১৮৮৩ অবধি—মোট সতেরো বছর এই 'যুদ্ধ পর্বে'র বিস্তার। তারপর অন্তাপর্ব, অর্থাৎ চতুর্থ পর্ব,—যার নাম 'শান্তিপর্ব'—সেটির বিস্তার ১৮৮৯ থেকে তাঁর মৃত্যু অবধি মোট পাঁচ বছর।

বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্যিক প্রতিভার উদ্দেশে রবীন্দ্রনাথ যে সশ্রদ্ধ নতি জানিয়ে গেছেন, তাতে ব'ঙ্কিমের সৃষ্টিক্ষমতা, বিদ্যাবত্তা, সংযম, সুরুচি ইত্যাদি গুণের উল্লেখ সুপরিচিত। তিনি লিখেছিলেন—'বিবেচনা করিয়া দেখিতে গেলে ঈশ্বর গুপ্ত যখন সাহিত্যগুরু ছিলেন বঙ্কিম তখন তাঁহার শিষ্য শ্রেণীর মধ্যে গণ্য ছিলেন। সে সময়কার সাহিত্য অন্য যে-কোনো প্রকার শিক্ষা দিতে সমর্থ হউক ঠিক সুরুচি শিক্ষার উপযোগী ছিল না।'

রবীন্দ্রনাথই লেখেন—'বঙ্কিম সাহিত্যে কর্মযোগী ছিলেন। তাঁহার প্রতিভা আপনাতে আপনি স্থিরভাবে পর্যাপ্ত ছিল না। সাহিত্যের যেখানে যাহা কিছু অভাব ছিল সর্বত্রই তিনি আপনার বিপুল বল এবং আনন্দ লইয়া ধাবমান হইতেন। কী কাব্য, কী বিজ্ঞান, কী ইতিহাস, কী ধর্মতত্ত্ব—যেখানে যখনই তাঁহাকে আবশ্যক হইত সেখানে তখনই তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া দেখা দিতেন।'

১২৭৯ বঙ্গাব্দের বৈশাখে 'বঙ্গদর্শন' প্রথম প্রকাশিত হয়। দীনবন্ধু মিত্র, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জগদীশ নাথ রায়, তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, অক্ষয় চন্দ্র সরকার প্রভৃতি ছিলেন বঙ্গদর্শনের লেখকগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। এঁরা তো ছিলেনই, তাছাড়া রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রনাথ বসু, রজনীকান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, লাল-মোহন বিদ্যানিধি, রাধাদাস সেন, নবীন চন্দ্র সেন, যোগেন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, সঞ্জীব চন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রভৃতি আরো অনেকেই বঙ্গদর্শন-এর নিয়মিত লেখক হন।

১২৭১ থেকে ১২৮২-র চৈত্র পর্যন্ত 'বঙ্গদর্শনে'র প্রথম পর্ব। তারপর আবার—১২৮৪-র বৈশাখে বঙ্গদর্শনের পুনরুজ্জীবন ঘটে। ১২৮২-র চৈত্র সংখ্যায় যখন লিখেছিলেন—'যখন বঙ্গদর্শন প্রকাশারম্ভ হয়, তখন সাধারণের পাঠযোগ্য উত্তম সাময়িক পত্রের অভাব ছিল। এক্ষণে তাদৃশ সাময়িক পত্রের অভাব নাই। যে অভাব পূর্ণ করিবার ভার বঙ্গদর্শন গ্রহণ করিয়াছিল, এক্ষণে বান্ধব, আর্যদর্শন প্রভৃতির দ্বারা তাহা পূরিত হইবে।' সাহিত্য-পত্রিকা সম্পাদনার লক্ষ্য সম্বন্ধেও এই লেখাটিতে কয়েকটি ইঙ্গিত ছিল। তাঁর জীবনের কর্মযোগ সম্বন্ধে তাঁর সেই আত্মকথা সংক্ষিপ্ত হলেও তা নিঃসন্দেহে তাৎপর্যময়। তিনি লেখেন :

> 'যখন আমি এই বঙ্গদর্শনের ভার গ্রহণ করি, তখন এমত সঙ্কল্প করি নাই যে, যতদিন বাঁচিব এই বঙ্গদর্শনে আবদ্ধ থাকিব। ব্রতবিশেষ গ্রহণ করিয়া কেহই চিরদিন তাহাতে আবদ্ধ থাকিতে পারে না। মনুষ্যজীবন ক্ষণস্থায়ী; এই অল্পকাল মধ্যে সকলকেই অনেকগুলি অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে হয়; এজন্য কোন একটিতে কেহ চিরকাল আবদ্ধ থাকিতে পারে না। ইহসংসারে এমন অনেক গুরুতর ব্যাপার আছে বটে যে, তাহাতে এই জীবন মৃত্যুকাল পর্যন্ত নিবদ্ধ রাখাই উচিত। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বঙ্গদর্শন তাদৃশ গুরুতর ব্যাপার নহে, এবং আমিও তাদৃশ গুরুতর ব্যাপারে নিযুক্ত হইবার যোগ্য পাত্র নহি।'

১৮৭৩ খ্রীস্টাব্দে দীনবন্ধুর মৃত্যু বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে তো বটেই, তাছাড়া তাঁর এই বঙ্গদর্শন সম্পাদনার স্বল্প সময় বিস্তারের মধ্যেও খুবই অর্থপূর্ণ ঘটনা। ১২৮১-র ১ চৈত্র-সংখ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র সে-ঘটনা স্মরণ করেন—

> 'এই বঙ্গদর্শনের বয়ঃক্রম অধিক হইতে না হইতেই দীনবন্ধু আমাকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার জন্য তখন বঙ্গসমাজ রোদন করিতেছিল, কিন্তু এই বঙ্গদর্শনে আমি তাঁহার নামোল্লেখও করি নাই।...অন্যের কাছে দীনবন্ধু সুলেখক—আমার কাছে প্রাণ-তুল্য বন্ধু—আমার সঙ্গে সে লোকে পাঠকের সহৃদয়তা হইতে পারে না বলিয়া, তখনও কিছু বলি নাই, এখনও আর কিছু বলিলাম না।'

ইণ্ডিয়ান অবজারভার, ইণ্ডিয়ান মিরর, হিন্দু পেট্রিয়ট, এডুকেশন গেজেট, সাধারণী, সাপ্তাহিক সমাচার প্রভৃতি পত্র-পত্রিকার আনুকূল্য সম্বন্ধে তাঁর স্বীকৃতি ছিল। তিনি লেখেন—

> 'অবজর্বর এক্ষণে গত হইয়াছেন, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে মিরর অদ্যাপি উন্নতভাবে দেশের মঙ্গল সাধন করিতেছেন। বঙ্গদর্শনের সহিত অনেক গুরুতর বিষয়ে থাকাতেও তিনি যে এইরূপ সহৃদয়তা প্রকাশপূর্বক বল প্রদান করিতেন, ইহা তাঁহার উদারভাব সামান্য পরিচয় নহে।'

১৮৮২-তে 'ন্যাশনাল' পত্রিকার রেভারেণ্ড বেটি—'রামচন্দ্র' (বঙ্কিমের ছদ্মনাম)-কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় বিতর্ক বেরোয়। সেও প্রসিদ্ধ ঘটনা। সাময়িক পত্রের গুরুত্ব বঙ্কিম-জীবনেও কম ছিল না। এইসব উদাহরণ থেকেই এ-সিদ্ধান্তের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি নিজেও সে-কথা আরো স্পষ্টভাবে জানিয়ে গেছেন। ১২৯১-এর শ্রাবণের 'প্রচার'-এ এই নতুন মাসিক-পত্রিকার সূচনা ব্যাখ্যা করে তিনি লেখেন :

> 'দেখ, ইউরোপীয় এক একখানি সাময়িক পত্র, আমাদের দেশের এক-একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের তুল্য আকার—দৈর্ঘ্যে, প্রস্থে, গভীরতা এবং গাম্ভীর্যে অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা মার্কণ্ডেয় বা অষ্টাদশ পুরাণ-প্রণেতা

বেদব্যাসেরই আরও বলিয়া বোধ হয়। আমরা যদি মনে করিতে পারিতাম যে রাবণ কুম্ভকর্ণ মেঘনাদ পড়িতেন, তাহা হইলে তাঁহারা কনটেম্পোরারি বা মাইটির লেছুরি পড়িতেন সন্দেহ নাই। ইউরোপে বা লন্ডনে সে সব সম্ভবে, ক্ষুদ্র-প্রাণ বাঙ্গালীর দেশে সে সকল সম্ভবে না। ক্ষুদ্র প্রাণ বাঙ্গালী বড় অধ্যয়ন-পর হইলেও ছয় ফর্মা সুপার-রয়ল মাসে মাসে পাইলে পরিতোষ লাভ করে।'

বাঙ্গালী পাঠকের সঙ্গে ইউরোপীয় পাঠকের এই কৌতুকজনক তুলনার পরে তিনি সাধারণ শিক্ষা-বিস্তার এবং সাহিত্য সৃষ্টি ও প্রচার,—উভয় উদ্দেশ্যেই সাময়িক পত্রের গভীর যোগ অনুভবের আবেদন জানান। উপস্থিত আলোচনার উপসংহারে তাঁর সেই কথাগুলি স্মরণযোগ্য। তিনি লেখেন—

'আমাদের বিবেচনায় সভ্যতা-বৃদ্ধির এবং জ্ঞান-বিস্তারের সাময়িক সাহিত্য একটি প্রধান উপায়।'

রবীন্দ্রযুগ

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায়

যাঁর প্রতিভা বাংলা সাহিত্যকে সুদীর্ঘকাল আলোকিত করে রেখেছিল, তিনি বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের একটি অধ্যায়কেও দীপ্ত করে গিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের তিরোধানের পর থেকে কল্লোল পত্রিকার প্রকাশ পর্যন্ত আঠারখানের ত্রিশ বছরকে বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসের রবীন্দ্র-যুগ বলা যায়।

এই সময়ের মধ্যে যে সমস্ত বিশিষ্ট সাময়িক-পত্র প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে কয়েকটির সম্পাদক ছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পত্রিকা-সম্পাদনার হাতে-খড়ি ১২৯২ বঙ্গাব্দে (১৮৮৫ খৃঃ)। ঐ বছরে 'বালক' নামে একটি বালকপাঠ্য পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। নামে তার সম্পাদিকা ছিলেন জ্ঞানদানন্দিনী দেবী; রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার কার্যাধ্যক্ষ ছিলেন, কিন্তু এই পত্রিকার সম্পাদনা থেকে সুরু করে যাবতীয় কাজ তাঁকেই করতে হত। অধিকন্তু তাঁকে নিজের লেখা দিয়ে এই পত্রিকার অধিকাংশ পৃষ্ঠা ভরাতে হত। গল্প, উপন্যাস, কবিতা, চিঠি মিলিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রায় পঞ্চাশটি লেখা 'বালকে' প্রকাশিত হয়। 'বালক' এক বছর প্রকাশিত হবার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এর পরে রবীন্দ্রনাথ সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র সাহিত্য-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই পত্রিকা ১২৯৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। এর প্রথম প্রধান সম্পাদক ছিলেন আচার্য কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রতি সংখ্যায় একটি করে ছোট গল্প লিখতে থাকেন। কিন্তু সাপ্তাহিক 'হিতবাদী'র সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছয় মাসের বেশী স্থায়ী হয়নি। অবশ্য সাপ্তাহিক 'হিতবাদী' দীর্ঘজীবন লাভ করে বাংলার শ্রেষ্ঠ সংবাদপত্রে পরিণত হয়েছিল এবং এজন্য

কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদই বিশেষভাবে কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন।

১২৯৭ বঙ্গাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র সুধীন্দ্রনাথের সম্পাদনায় 'সাধনা' নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ 'হিতবাদী'র সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর থেকে ঐ পত্রিকাতেই তাঁর রচনা প্রকাশ করতে থাকেন। 'সাধনা'র চতুর্থ ও শেষ বছরে (১৩০১ বঙ্গাব্দ) রবীন্দ্রনাথই তার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উঁচু আদর্শের সঙ্গে তাল রেখে চলা অন্যান্য লেখকদের পক্ষে দুঃসাধ্য ছিল, তাই 'সাধনা' সম্পাদনা করার সময়ে তার বেশীর ভাগ রচনাই রবীন্দ্রনাথকেই লিখতে হত ; এ কাজ খুব শ্রমসাধ্য বলে রবীন্দ্রনাথ এক বছর সম্পাদনা করার পর 'সাধনা' বন্ধ করে দিলেন। 'সাধনা'য় রবীন্দ্রনাথের বহু রচনা প্রকাশিত হয়েছিল, তাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখ-যোগ্য বোধহয় তাঁর সমালোচনামূলক প্রবন্ধগুলি।

১৩০৫ বঙ্গাব্দে (১৮৯৮ খ্রীঃ) রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী' নামক বিখ্যাত মাসিক পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকাটি রবীন্দ্রনাথের পরিবারভুক্ত লোকেরাই চালাতেন। ১২৮৪ বঙ্গাব্দ (১৮৭৭ খ্রীঃ) থেকে ১৩০৩ বঙ্গাব্দ (১৯২৬ খ্রীঃ) পর্যন্ত সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর ধরে পত্রিকাখানি চলেছিল। এর প্রথম সম্পাদক দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ মাত্র এক বছর 'ভারতী'র সম্পাদক ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি বিখ্যাত গল্প 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় এই বছরেই। এই বছরেই তিনি 'ভারতী'তে ইংরেজের 'প্রেস অ্যাক্ট'-এর প্রতি-বাদ করে 'কণ্ঠরোধ' এবং প্যারীমোহন মুখোপাধ্যায়ের মতের প্রতিবাদ করে 'মুক্তধারা বনাম বাঁধুজ্জে' প্রবন্ধ লেখেন। এই বছরের চৈত্র সংখ্যা 'ভারতী'তে রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'বর্ষশেষ' প্রকাশিত হয়। এর পরই রবীন্দ্রনাথ 'ভারতী'র সম্পাদনাভার ত্যাগ করেন এবং তাঁর ভাগিনেয়ী সরলা দেবী ঐ পত্রিকার সম্পাদিকা হন।

এর দু' বছর বাদে—১৩০৮ বঙ্গাব্দ (১৯০১ খ্রীঃ) থেকে বঙ্গদর্শন পত্রিকা নবপর্যায়ে প্রকাশিত হতে সুরু করল। এই পত্রিকার পরিচালক শ্রীশচন্দ্র মজুমদার রবীন্দ্রনাথের উপর পত্রিকাটির সম্পাদনাভার ন্যস্ত করেন। ১৩১২ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত — দীর্ঘ পাঁচ বছর রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সম্পাদনা করেন। এই পাঁচ বছর তিনি যে শুধু সম্পাদক হিসাবে অসীম যোগ্য-তার পরিচয় দিয়েছিলেন তাই নয়, এ পাঁচ বছরে 'বঙ্গদর্শন'-এর পৃষ্ঠায় তিনি তাঁর বহু বিশিষ্ট রচনাও প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর 'চোখের বালি' ও 'নৌকাডুবি' উপন্যাস এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয় বঙ্গভঙ্গের সময়ে রাখীবন্ধন-সম্বন্ধে এবং তাঁর বিখ্যাত রাখীবন্ধন সঙ্গীত "বাংলার মাটি বাংলার জল"। পাঁচ বছর নিজে সম্পাদনা করার পর 'বঙ্গদর্শনে'র সম্পাদনাভার শৈলেশচন্দ্র মজুমদারের হাতে ন্যস্ত করে রবীন্দ্রনাথ অবসর নেন।

১৩১২ বঙ্গাব্দে (১৯০৫ খ্রীঃ) কেদারনাথ দাশগুপ্ত 'ভাণ্ডার' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশ করতে সুরু করেন। কেদারনাথের অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার সম্পাদনা-ভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকার লক্ষ্য ছিল দেশের বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাধারার সংকলন করা। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা সুচারুভাবে সম্পাদন করেন। তাঁর বহু বিখ্যাত স্বদেশী গান এই 'ভাণ্ডার' পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু 'ভাণ্ডার' পত্রিকা মাত্র দু' বছর চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। এর পর রবীন্দ্রনাথ আর কোন বাংলা পত্রিকা সম্পাদন করেন নি।

পূর্বোল্লিখিত পত্রিকাগুলি ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ এই যুগে প্রকাশিত আরও কয়েকটি সাময়িক পত্রিকার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। এই পত্রিকাগুলি তিনি সম্পাদনা করেন নি বটে, কিন্তু তিনিই ছিলেন এদের বিশিষ্টতম লেখক এবং এই পত্রিকাগুলি গৌরব অর্জন করেছিল প্রধানত তাঁকে অবলম্বন করেই।

এদের মধ্যে সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য 'প্রবাসী'র নাম। এই পত্রিকাটি ১৩০৮ বঙ্গাব্দের (১৯০১ খ্রীঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকার আবির্ভাবের সময় থেকেই এর সম্পাদক ছিলেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ১৩৪০ বঙ্গাব্দে তাঁর মৃত্যু হবার আগে পর্যন্ত তিনিই এর সম্পাদক ছিলেন। 'প্রবাসী' প্রথমে প্রকাশিত হত এলাহাবাদ থেকে। তখন রামানন্দ এলাহাবাদেই থাকতেন। কয়েক বছর বাদে রামানন্দ কলকাতায় চলে আসেন; তার ফলে 'প্রবাসী'র প্রকাশ-স্থানেরও পরিবর্তন ঘটে। 'প্রবাসী' প্রথম থেকেই প্রথম শ্রেণীর পত্রিকা। বাংলা দেশের প্রায় সমস্ত শ্রেষ্ঠ লেখকেরই রচনা 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়েছিল, একমাত্র ব্যতিক্রম বোধহয় শরৎচন্দ্র। 'প্রবাসী'তে যে গ্রন্থ সমালোচনা প্রকাশিত হত, তার মান খুবই উঁচু ছিল। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের অন্যতম বন্ধু ছিলেন। তাই 'প্রবাসী'র প্রথম সংখ্যা থেকেই রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকায় লিখতে থাকেন। তাঁর বহু গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা ও কয়েকটি উপন্যাস 'প্রবাসী'তে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম উপন্যাস 'গোরা' 'প্রবাসী'-তেই প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন, ততদিন 'প্রবাসী'র এমন সংখ্যা খুব কমই প্রকাশিত হয়েছে, যাতে রবীন্দ্রনাথ লেখেন নি। 'প্রবাসী'র অনেক সংখ্যায় রবীন্দ্রনাথের একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। এ ছাড়া রবীন্দ্রনাথ 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় অন্যের লেখা অনেক গ্রন্থের সমালোচনাও করেছিলেন। রামানন্দ প্রথম থেকেই বুঝেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ সর্বদেশের ও সর্বকালের একজন শ্রেষ্ঠ লেখক এবং তাঁর এই উপলব্ধি তিনি 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় বিশ্বাসীর চিত্তে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার প্রাপ্তির আগেই। রবীন্দ্রনাথের রচনা 'প্রবাসী'তে প্রকাশ করার সম্বন্ধে রামানন্দ রবীন্দ্রনাথকে উপযুক্ত দক্ষিণা দিতেন। তখনকার দিনে রবীন্দ্রনাথ অন্য কোন পত্রিকায় লিখে এত বেশী অর্থ পেতেন না। এর থেকে বোঝা যাবে রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সমাদর যাঁরা সর্বপ্রথম করেছিলেন, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম এবং সেই সমাদরের স্মারক 'প্রবাসী' পত্রিকা।

এরপর উল্লেখযোগ্য 'সবুজ পত্র' নাম। এই বিখ্যাত মাসিক পত্রিকাটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রীঃ) প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অগ্রজ সত্যেন্দ্রনাথের জামাতা প্রমথ চৌধুরী ওরফে বীরবল। প্রমথ চৌধুরী নিজে বিশ্বাস সাহিত্যিক ছিলেন। প্রবন্ধ, ছোট গল্প ও কবিতা—তিন বিষয়েই তিনি ছিলেন সর্বোচ্চ স্তরের লেখক। কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সর্বপ্রধান কৃতিত্ব সাহিত্য-সৃষ্টির বাহন হিসাবে চলিত ভাষাকে কৌলীন্য দান করা। চলিত ভাষায় বাংলা সাহিত্যসৃষ্টির পথ প্রথমে প্রদর্শন করেন কালীপ্রসন্ন সিংহ তাঁর 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'য়। এর পরও কোন কোন লেখক এই ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, যেমন রবীন্দ্রনাথের 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' ও 'য়ুরোপ যাত্রীর ডায়ারী' চলিত ভাষায় লেখা কিন্তু 'সবুজ পত্রের' মাধ্যমে প্রমথ চৌধুরী দেখালেন যে গদ্য সাহিত্যের সর্ববিভাগেই—গল্প, উপন্যাস, লঘু প্রবন্ধ, গম্ভীর প্রবন্ধ সর্বত্রই—চলিত ভাষা তার বাহন হতে পারে। শুধু তাই নয়, বাঙালী লেখকরা যাতে সাধু ভাষাকে বর্জন করে একমাত্র চলিত ভাষাকেই লেখার মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করেন, তার জন্যে প্রমথ চৌধুরী এই পত্রিকার মাধ্যমে ব্যাপক আন্দোলন উপস্থিত করলেন। তাঁর আন্দোলন আংশিকভাবে সফল হল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ প্রমথ চৌধুরীর হাতে দায় ছিলেন এবং চলিত ভাষায় গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ লিখে 'সবুজ পত্রে' ও অন্যত্র প্রকাশ করতে লাগলেন। এখন থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রধানতঃ চলিত ভাষাকেই তাঁর গদ্যসৃষ্টির বাহন হিসাবে গ্রহণ করলেন। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রসাহিত্যের রচনারীতিতে এক বিরাট পরিবর্তন ঘটানোর কৃতিত্ব প্রমথ চৌধুরী ও 'সবুজ পত্রের'। 'সবুজ পত্রের' আর একটি কৃতিত্ব এই যে, এই

পত্রিকা বাংলা সাহিত্যকে ভাবার্দ্রতা থেকে মুক্ত করে যুক্তিবিচারের পথ গ্রহণ করতে অনেকখানি সাহায্য করেছে এবং এই সাহিত্যকে বিশ্বজনীনতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে তুলেছে। সুতরাং বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে 'সবুজ পত্র' যে একটি অবিস্মরণীয় নাম, তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই পত্রিকায় বহু শ্রেষ্ঠ রচনা প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, 'বলাকা'র কয়েকটি বিখ্যাত কবিতা, এবং অন্য অনেক রচনা এই পত্রিকাতেই প্রকাশিত হয়। তা ছাড়া প্রমথ চৌধুরীর অনেক শ্রেষ্ঠ রচনা এবং অতুল গুপ্তের 'কাব্য জিজ্ঞাসা'র অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি 'সবুজ-পত্রে'ই প্রথম প্রকাশ লাভ করে।

এই যুগের আর একটি পত্রিকার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঘনিষ্ঠ-ভাবে যুক্ত ছিলেন। পত্রিকাটি স্বল্পজীবী হলেও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এর নাম 'ঐতিহাসিক চিত্র'। এটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা—১৩০৪ বঙ্গাব্দের পৌষ মাস (জানুয়ারী, ১৮৯৯ খ্রী:) থেকে প্রকাশিত হতে শুরু করে এবং এক বছর চলার পরেই বন্ধ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকা প্রকাশে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন এবং তাঁরই অনুরোধে অক্ষয় কুমার মৈত্রেয় এর সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। এই পত্রিকায় "ভারতবর্ষের, এবং বিশেষতঃ বঙ্গদেশের, পুরাবৃত্তের উপকরণ সংকলন" করা হত। রবীন্দ্রনাথ এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় এর একটি "সূচনা" লিখে দেন এবং প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হলে 'ভারতী' পত্রিকায় এর এক বিস্তৃত সমালোচনা লেখেন।

আলোচ্য পর্বের যে সমস্ত পত্রিকা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট, সেগুলির সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম। এখন এই পর্বের অন্যান্য বিশিষ্ট পত্রিকা সম্বন্ধে আলোচনা করছি।

'বসুমতী' এই পর্বের একটি বিখ্যাত পত্রিকা। এখনও এর বিভিন্ন সংস্করণ নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। 'বসুমতী' সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক আকারে—২৫শে আগষ্ট, ১৮৯৬ খ্রী: তারিখে।) এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় লেখা হয় যে, রাজনীতি, দেশের অভাব-অভিযোগাদির কথা, ভারতের ইতিহাস, দেশনেতাদির বিবরণ, চাষবাসের কথা, ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা, হিন্দুর পুরাতন মহিমার কথা, ধর্মশাস্ত্রাদির কথা, উপন্যাস, রঙ্গরহস্য প্রভৃতি সুখপাঠ্য বিষয়" এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হবে। এই প্রতিশ্রুতি যে রক্ষিত হয়েছিল, তা বলাই বাহুল্য। তা ছাড়া পত্রিকার প্রকাশকরা পাঠকদের বিনামূল্যে "মূল্যবান পুস্তকাবলী, চিত্রাবলী, সৌভাগ্য উপহার" দানের ব্যবস্থা করেন। তার ফলে পত্রিকাটি অল্পদিনের মধ্যেই বেশ জনপ্রিয় হয়। সাপ্তাহিক 'বসুমতী'র সম্পাদক প্রথমে হন যোগেশ মুস্তফী, তাঁর পরে কালীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। ১৩২১ বঙ্গাব্দ থেকে 'বসুমতী'র দৈনিক সংস্করণ এবং ১৩২৯ বঙ্গাব্দ থেকে তার মাসিক সংস্করণ প্রকাশিত হতে শুরু করে।

এই পর্বের আর একটি বিশিষ্ট ও দীর্ঘজীবী পত্রিকা 'ভারতবর্ষ'। বিখ্যাত পুস্তক প্রকাশক প্রতিষ্ঠান গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স এই পত্রিকাটি প্রকাশ করেন এবং তাঁদের অনুরোধে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। দ্বিজেন্দ্রলাল এই পত্রিকার প্রথম সংখ্যা সম্পাদন করেন এবং এর একটি সূচনাও লেখেন, কিন্তু ঐ সংখ্যা প্রকাশিত হবার আগেই তিনি আকস্মিকভাবে পরলোকগমন করেন। এরপর অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও জলধর সেন যুগ্মভাবে এই পত্রিকার সম্পাদক হন। কয়েক বছর বাদে অমূল্যচরণ বিদায় গ্রহণ করেন এবং জলধর সেন একক ভাবে 'ভারতবর্ষ' সম্পাদনা করতে থাকেন। 'ভারতবর্ষ' একটি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এর জন্যে জলধর সেনই বোধহয় সবচেয়ে বেশী কৃতিত্ব দাবী করতে পারেন। শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রথম থেকেই 'ভারতবর্ষে'র সঙ্গে লেখক হিসাবে যুক্ত ছিলেন।

তাঁর অনেকগুলি উপন্যাস ভারতবর্ষের পৃষ্ঠায় ধারাবাহিক-ভাবে প্রকাশিত হয়েছে। শেষ দিকে তিনি 'ভারতবর্ষ' ভিন্ন অন্য কোন পত্রিকায় বড় একটা লিখতেন না। ১৩২০ বঙ্গাব্দের (১৯১৩ খ্রীঃ) আষাঢ় মাসে 'ভারতবর্ষ' প্রথম প্রকাশিত হতে সুরু করে। এখনও এই পত্রিকাটি চলছে। অপর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক সংখ্যক রচনা প্রকাশ করা ছাড়া বহু শ্রেষ্ঠ সাহিত্যস্রষ্টাকে প্রথম আত্ম প্রকাশে ও পূর্ণ প্রতিষ্ঠালাভে সাহায্য করার জন্যও 'ভারতবর্ষ' গর্ব অনুভব করতে পারে। ('ভারতবর্ষের' আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, বাংলার শ্রেষ্ঠ মনীষী ও চিন্তাশীল লেখকদের মূল্যবান প্রবন্ধরাজি এই পত্রিকায় নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হত।)

এখন আর একটি পত্রিকার নাম করছি, যেটি দীর্ঘজীবী হতে না পারলেও বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে স্থায়ী চিহ্ন রেখে গেছে। এই পত্রিকাটির নাম 'যমুনা'। ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯ খৃঃ) পত্রিকাটি প্রথম আবির্ভূত হয়। এর সম্পাদক হন প্রথমে বীরেন্দ্রনাথ পাল, তারপর ফণীন্দ্রনাথ পাল। ফণীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্রের বিশেষ স্নেহভাজন ছিলেন, তাই 'যমুনা'য় শরৎচন্দ্রের বহু লেখা প্রকাশিত হয়েছিল। শরৎচন্দ্র এই পত্রিকায় শুধু নিজের নামে লিখতেন না, তাঁর দিদি অনিলা দেবীর নামে এবং অন্যান্য ছদ্মনামেও লিখতেন। কিন্তু 'ভারতবর্ষ' আবির্ভূত হবার পর যখন শরৎচন্দ্র 'ভারত-বর্ষে' নিয়মিতভাবে লিখতে থাকেন, তখন ফণীন্দ্রনাথের সন্দেহ হয় যে শরৎচন্দ্র বুঝি 'যমুনা'য় সেরকমভাবে আর লিখবেন না। ফণীন্দ্রনাথ তাঁর সন্দেহের কথা নানাভাবে ব্যক্ত করেন এবং 'যমুনা'র সঙ্গে শরৎচন্দ্রকে স্থায়ী বন্ধনে বেঁধে রাখবার উদ্দেশ্য নিয়ে ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রীঃ) 'যমুনা'র যুগ্ম সম্পাদক হিসাবে শরৎচন্দ্রের নাম দেন। শরৎচন্দ্র ফণীন্দ্র-নাথের এই সন্দেহের কথা জানতে পেরে অত্যন্ত বিরক্ত হন এবং শেষ পর্যন্ত 'যমুনা'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। শরৎচন্দ্রের 'চরিত্রহীন' 'যমুনা'য় ধারাবাহিকভাবে অনেকখানি প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু সম্পূর্ণ হতে পারে নি।

এখন এই পর্বের দুটি বিখ্যাত অভিজাত পত্রিকার নাম করছি। একটি হল 'মানসী'। এটি ১৩১৫ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় ইন্দুপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়, ফকিরচন্দ্র চট্টো-পাধ্যায়, শিবরতন মিত্র ও সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায়। ২য় বর্ষে শিবরতন মিত্র সরে দাঁড়ান, তাঁর জায়গায় আসেন যতীন্দ্রমোহন বাগচী। মোট সম্পাদকের সংখ্যা চারজনই থাকে। ষষ্ঠ বর্ষে এর সম্পাদনা ভার একক-ভাবে যতীন্দ্রমোহন বাগচীর উপর ন্যস্ত হয়। অপর পত্রিকা-টির নাম 'মর্মবাণী'। এটি প্রথম প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক পত্রিকা রূপে,—১৩২২ বঙ্গাব্দে। এর সম্পাদক ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায় ও অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। ১৩২২ বঙ্গাব্দেই 'মানসী ও মর্মবাণী' নাম দিয়ে একটি মাসিক পত্রিকা বেরোতে সুরু করে, তার সম্পাদক ছিলেন জগদিন্দ্রনাথ রায় ও প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। 'মানসী', 'মর্মবাণী' এবং 'মানসী ও মর্মবাণী'—তিন পত্রিকাতেই বাংলার শ্রেষ্ঠ লেখকরা লিখতেন। বিশেষভাবে উৎকৃষ্ট গল্প ও কবিতা প্রকাশের জন্যই এই তিনটি পত্রিকা স্মরণীয় হয়ে আছে।

এই পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য মাসিক পত্রিকা 'বাণী'। ১৩১২ বঙ্গাব্দে অমূল্যচরণ ঘোষের সম্পাদনায় এটি প্রকাশিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলাল রায় ও অন্যান্য বিশিষ্ট লেখকরা এতে লিখতেন। যে সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল অবিশ্রান্ত-ভাবে রবীন্দ্রনাথকে বিভিন্ন পত্রপত্রিকার মাধ্যমে আক্রমণ করে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে এই 'বাণী' পত্রিকাতেই দ্বিজেন্দ্রলাল রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের সমালোচনা করেন এবং উচ্ছ্বসিত ভাষায় তার প্রশংসা করেন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ-যোগ্য যে, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের বিরোধকে তীব্র করে তুলতে বাংলার অনেক সাময়িক পত্রিকা উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ করেছিল। এইসব পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ও দ্বিজেন্দ্র-

লালের পক্ষপাতী লেখকরা নিজেদের প্রিয় কবিকে সমর্থন করে লিখতেন এবং এক কবির সমর্থকরা প্রায়ই অপর কবি ও তাঁর সমর্থকদের প্রতি কর্কশ নিক্ষেপ করতেন। স্বয়ং দ্বিজেন্দ্রলালও রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে অনেকবার বিভিন্ন পত্রিকায় লিখেছেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ কোনদিন দ্বিজেন্দ্রলালের বিরুদ্ধে কিছু লেখেননি।

যে সমস্ত পত্রিকায় এই দুই দলের বিতর্ক প্রকাশিত হত, তার মধ্যে 'অর্চনা' নামে একটি পত্রিকার নাম উল্লেখযোগ্য। ১৩১০ বঙ্গাব্দে এই পত্রিকাটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এর সম্পাদক প্রথমে ছিলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, তারপর কেশবচন্দ্র গুপ্ত। এই পত্রিকাটি বহু বছর ধরে কোনরকমে নিজের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল।

আমরা এই প্রবন্ধের সূচনা করেছি রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত বিভিন্ন সাময়িকপত্র সম্পর্কে আলোচনা দিয়ে। এখন আমরা প্রথম কয়েকটি পত্রিকার নাম করব, যাদের সম্পাদকরা বিশিষ্ট লেখক হয়েও রবীন্দ্রনাথের বিরোধিতায় জীবনের এক বৃহদংশ ব্যয় করে গিয়েছেন। এই পত্রিকাগুলির প্রথমটি হল 'সাহিত্য'। ১২৯৭ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাসে এই পত্রিকাটি আবির্ভূত হয়। এর সম্পাদক সুরেশচন্দ্র সমাজপতি নিজে প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন এবং এই পত্রিকায় নিজের ও অপরের অত্যুৎকৃষ্ট রচনাবলী প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে গিয়েছেন, কিন্তু এই পত্রিকারই অধিকাংশ সংখ্যায় তিনি আবার রবীন্দ্রনাথের শ্রাদ্ধ করতেন। তিন বছর 'সাহিত্য' সম্পাদন করার পরে ১৩০৭ বঙ্গাব্দে সমাজপতি পত্রিকাটি বন্ধ করে দেন এবং পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহিত্য'র সম্পাদনাভার গ্রহণ করেন। ১৩৩০ বঙ্গাব্দ পর্যন্ত 'সাহিত্য' প্রকাশিত হয়েছিল। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ও প্রথম শ্রেণীর লেখক ছিলেন, তাঁর গদ্যরচনাশৈলী ও সমালোচনা শক্তি ঈর্ষণীয় ছিল; কিন্তু তিনিও রবীন্দ্রনাথের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করতেন এবং তাঁকে তিনি অনেকবার আক্রমণ করে প্রবন্ধ লিখেছেন। 'সাহিত্যে'র সম্পাদক হবার আগে পাঁচকড়ি 'প্রবাহিনী' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদন করেছিলেন অমরেন্দ্রনাথ রায়ের সঙ্গে যুগ্ম-ভাবে। পত্রিকাটি ১৩২০ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং দীর্ঘকাল চালু থাকে। চিত্তরঞ্জন দাশ সম্পাদিত 'নারায়ণ' ও রবীন্দ্র-বিরোধিতায় অল্প সুখ্যাতি অর্জন করেছিল। এই পত্রিকা প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩২১ বঙ্গাব্দে। এই পত্রিকায় বিভিন্ন লেখক চিত্তরঞ্জনকে রবীন্দ্রনাথের চেয়ে বড় কবি প্রমাণ করতে চেষ্টা করে প্রবন্ধ লিখতেন। 'নারায়ণে'র অন্যতম লেখক ছিলেন সত্যেন্দ্র দত্ত গুপ্ত। ইনি নিম্নবর্গের মানুষদের জীবন নিয়ে সার্থক উপন্যাস রচনা করে স্মরণীয় হয়ে আছেন। দীনেশচন্দ্র সেন ও বিমল চন্দ্র মজুমদার কর্তৃক সম্পাদিত ও ১৩২৮ বঙ্গাব্দে প্রথম প্রকাশিত 'বঙ্গবাণী'ও এই পর্বের একটি বিশিষ্ট পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদকেরা রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, তবে রবীন্দ্রনাথের কোন কোন মতবাদের তীব্র সমালোচনা তাঁরা অনেক সময় প্রকাশ করতেন। শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম' প্রবন্ধটির যে সুদীর্ঘ সমালোচনা করেছিলেন তা 'বঙ্গবাণী'তেই প্রকাশিত হয়।

এই পর্বে অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ শিশু-মাসিক-পত্রিকা প্রকাশিত হয়। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য শিবনাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত 'মুকুল' (প্রথম প্রকাশ ১৩০২ বঙ্গাব্দ) উপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী ও পরে সুকুমার রায় চৌধুরী সম্পাদিত 'সন্দেশ' (প্রথম প্রকাশ ১৩২০ বঙ্গাব্দ) এবং ইন্দ্রনাথ সরকার সম্পাদিত 'মৌচাক' (প্রথম প্রকাশ ১৩২৭ বঙ্গাব্দ)। এদের মধ্যে একমাত্র মৌচাক'ই প্রথম প্রকাশের সময় থেকে আজ পর্যন্ত তার ধারা অব্যাহত রেখেছে। 'সন্দেশ' মাঝে বহু বছর বন্ধ থাকবার পর কয়েক বছর ধরে আবার নব পর্যায়ে প্রকাশিত হচ্ছে।

এই পর্বে প্রথম প্রকাশিত দুটি বিশিষ্ট অথচ স্বতন্ত্র

বাংলা সাময়িক পত্র : কল্লোল পর্ব

ডাঃ অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়

ধরণের পত্রিকার নাম উল্লেখ করে এই প্রবন্ধ শেষ করছি। এদের মধ্যে একটি 'উদ্বোধন'। ১৩০৫ বঙ্গাব্দে পাক্ষিক পত্রিকার আকারে এটি প্রথম প্রকাশিত হতে সুরু করে, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দ থেকে মাসিক পত্রে পরিণত হয়। এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন স্বামী ত্রিগুণাতীত। স্বামী বিবেকানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, সারদানন্দ, গিরিশচন্দ্র ঘোষ প্রভৃতির রচনা 'উদ্বোধন'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। এই পত্রিকায় ধর্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, দর্শন, বিজ্ঞান, কৃষি, শিল্প, সাহিত্য, ইতিহাস, ভ্রমণ প্রভৃতি নানা বিষয়ের রচনা প্রকাশিত হয়ে আসছে। পত্রিকাটি এখনও চলছে। অপর পত্রিকাটির নাম 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা'। এই পত্রিকাটি ১৩০১ বঙ্গাব্দ থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে ত্রৈমাসিক গবেষণামূলক পত্রিকা হিসাবে নিয়মিতভাবে প্রকাশিত হয়ে আসছে। বাংলা সাহিত্য সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রকে সুবিস্তীর্ণ করে তোলার ব্যাপারে এর দান অসামান্য।

প্রথম বিশ্বসমর মাথার নিচে সবুজপত্রের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সবুজপত্র থেকেই আমাদের নব্য-সংস্কৃতির যাত্রা শুরু, একথা অস্বীকার করা যায় না। বাংলাদেশ ও বাঙালি জাতিকে সবুজপত্র বিশ্বব্যাপী ভাব-বিবর্তন ও ভাঙা-গড়ার আবর্তে নামিয়ে এনেছিল।

সময়টা তখন প্রথম বিশ্বসমরের কাল (১৯১৪-১৮)। উনিশ শতকের শেষ দুই দশক থেকে বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে পশ্চিমী দুনিয়াতে বিজ্ঞানের যে আশ্চর্য অগ্রত্যাশিত অভিনব অগ্রগতি ঘটেছে, তার ফলে আমরা পুরনো পৃথিবীর ভাবলোক থেকে নোতুন পৃথিবীর ভাবলোকে উপনীত হয়েছি। এই কালেই আমাদের পুরনো প্রত্যয় ও স্বীকৃত মূল্যমানগুলি উল্টে পাল্টে গেছে। আধুনিক সাহিত্য-শিল্প-চিন্তকলার জন্ম এই ভাঙনের মধ্যে।

এইকালে সমাজবিজ্ঞান, ধনবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন বিদ্যা, প্রাণি বিদ্যা ও ইতিহাস বিদ্যার ক্ষেত্রে নোতুন নোতুন চিন্তা আবিষ্কৃত ও স্বীকৃত হয়েছে। একে একে ভেঙে পড়েছে পুরনো মূল্যবোধ ও সযত্নলালিত সংস্কার। এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রসারিত ভাঙনের পটভূমিতে যাঁদের মানসিকতা নোতুন 'আলো-কলমা দিয়ে তৈরী হয়েছে, তাঁরা অনিবার্যভাবেই জগৎ ও জীবনকে দেখেছেন নোতুন দৃষ্টিকোণ থেকে। তাঁরা উপলব্ধি করেছেন "পুরনো সঞ্চয় নিয়ে, বেচাকেনা আর চলিবে না", তাঁরা মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন "অন্ধকারে কাল হল শেষ", "নূতন সমুদ্র পথে দিতে হবে পাড়ি।"

জীবন-অভিজ্ঞতা, ধারণা ও মূল্যবোধের যে নোতুন সমুদ্রপথে পশ্চিমী দুনিয়া রক্তস্নানশেষে পাড়ি দিয়েছিল, তার প্রথম ইশারা বাংলাদেশে পাওয়া গেল 'সবুজপত্রে' (১৯১৪-

২৮)। আমাদের মনের আকাশে তখন যে ঝড় উঠেছে, তার মাতাল হাওয়ায় সমাজের অচলায়তন কেঁপে উঠেছে। 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে, 'বলাকা'র কবিতায় ও 'কালান্তরে'র প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন। এইসব রচনা সবুজপত্রে প্রথম প্রকাশিত হয়। বলা যেতে পারে, রবীন্দ্র-সাহিত্যে নোতুন সুরের যথার্থ পটভূমি সবুজপত্র।

সুতরাং সবুজপত্রকেই আধুনিকতার প্রথম গণনীয় দিক-চিহ্ন মনে করা যেতে পারে। নোতুন জীবনদর্শনের সূচনা সবুজপত্রে। পুরনো প্রত্যয় ও মূল্যবোধের সমাধি রচিত হল সবুজপত্রে। এখানেই আমরা বিশ্বমানসিকতার পটভূমিতে উপনীত হলাম।

বাংলা সাহিত্যের স্যাঁতসেঁতে ভাবালুতা ও হিঁচ্‌কাঁদুনির অবসান ঘটিয়ে সেখানে বিচারসিদ্ধ বিশ্বনাগরিকতার পটভূমি সবুজপত্রে রূপ পেল। দর্শন, বিজ্ঞান, ইতিহাস, শিল্পকলা, সাহিত্য, সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে সবুজপত্র বাঙালিকে সমসাময়িক দ্রুতগতি কালের সঙ্গে যুক্ত করে দিল। এই স্বাদ থেকেই বাংলা সাহিত্য বিশ্বসাহিত্যের ও বিশ্বচিন্তার সহযাত্রী হয়ে উঠল। নিছক বাঙালিত্বের মিথ্যা আত্মপ্রসাদ ও সংকীর্ণ গণ্ডী ভেঙে বাহির বিশ্বে পদার্পণ করল।

সবুজপত্রের (১৯১৪-২৮) মূলধন আত্মসাৎ করে দেখা দিল 'কল্লোল' (১৯২৩-৩০), 'কালি-কলম' (১৯২৬)। সবুজপত্র আধুনিক মানসিকতা সৃষ্টি করেছে, কিন্তু বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টি করতে পারে নি। সবুজপত্রের ঝোঁকটা ছিল মননচিন্তার দিকে, বিশ্বীক্ষার দিকে। সবুজপত্র বাইরের ভেতর দিয়ে দুনিয়া দেখেছে, দেখা-দুনিয়া থেকে সুকুমার সাহিত্য সৃষ্টি করে নি। তা সৃষ্টি করল কল্লোল-কালি-কলম। নোতুন যুগ-চেতনাকে গল্প-উপন্যাসে কল্লোল-গোষ্ঠী প্রথম রূপ দিলেন। সমাজে যারা বঞ্চিত, নিষ্পিষ্ট, সেইসব মানুষের জীবন নিয়ে গল্প উপন্যাস লেখা হল। সাহিত্যে যারা অচ্ছুৎ ছিল, তারা কবিতায় স্থান পেল। মানুষের প্রাথমিক প্রবৃত্তিগুলি (ক্ষুধা-তৃষ্ণা-যৌনকামনা) গল্প-উপন্যাসে সাদরে গৃহীত ও রূপায়িত হল। জৈব কামনাই মানুষের জীবনে আদ্যাশক্তি—এই ধারণা ঐসব গল্প-উপন্যাসের প্রেরণা।

কিন্তু বিশ শতকের তৃতীয় দশকে বাংলা সাময়িকপত্রে কেবল কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি ছিল না: প্রবাসী, বিচিত্রা, বঙ্গবাণী, শনিবারের চিঠি, বঙ্গশ্রী, ভারতী, মানসী ও মর্মবাণী, উপাসনা, বিজলী, পরিচয়, জয়শ্রী, পঞ্চপুষ্প, নবশক্তি, সংহতি, আত্মশক্তি—এরাও ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বসমর-পূর্ববর্তীকালে বাংলা সাময়িকপত্রে নোতুন পুরনো, প্রগতিশীল রক্ষণশীল, রাজনীতিক অ-রাজনীতিক, সংস্কারপন্থী, সংস্কার-বিরোধী, রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্রবিরোধী দল ও কণ্ঠস্বরের অভাব ছিল না।

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-গোষ্ঠীর নির্ভীকতা, নবীনতা, মানবমুখিতা এত তীব্রস্বরে আত্মপ্রকাশ করল যে কেউ তাকে অস্বীকার করতে পারল না। সীমাবদ্ধ জীবনবোধ, অল্প অভিজ্ঞতা, পুঁথিপড়া বোহেমিয়ান-আদর্শের প্রতি অনুরক্তি, বৃহৎ সাহিত্য সৃষ্টির পথে এঁদের অন্তরায় হয়েছে। এঁদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ পরে বলেছিলেন, 'লালসার অসংযম ও দারিদ্র্যের আস্ফালন' আধুনিক সাহিত্যে প্রবল হয়ে উঠেছে। এর দ্বারা কখনো বৃহৎ স্থায়ী কীর্তি রচনা করা সম্ভব নয়। তথাপি বাংলা সাহিত্যে এক নোতুন বাতাবরণ উন্মুক্ত করে দিলেন এঁরাই।

১৯২৭ খৃষ্টাব্দে এই তরুণ সাহিত্যিকের দল (কল্লোল-গোষ্ঠী) রবীন্দ্র-সাহিত্যের বিরুদ্ধে অভিযান উত্থাপন করেন। এঁদের অভিযোগ ছিল, রবীন্দ্র-সাহিত্যে আধুনিকতা ও বাস্তবতার অভাব। এই সময়কার বিচিত্রা, প্রবাসী, কল্লোল, বঙ্গবাণী পত্রিকায় এই অভিযোগ, তার উত্তর-প্রত্যুত্তর, বাদ-প্রতিবাদের পরিচয় লিপিবদ্ধ আছে। বিরুদ্ধ পক্ষে সেদিন প্রধান ছিলেন নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত (কল্লোলের অন্যতম নেতা) ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। রবীন্দ্রনাথের 'সাহিত্যধর্ম'

(বিচিত্রা ১৩৩৪ শ্রাবণ) ও 'সাহিত্যে নবত্ব' (প্রবাসী ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), দ্বিজেন্দ্রনারায়ণ বাগচীর 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা বিচার' (বিচিত্রা ১৩৩৪ আশ্বিন), এক পক্ষে ; অপর পক্ষে নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তের 'সাহিত্য-ধর্মের সীমানা' (বিচিত্রা ১৩৩৪ ভাদ্র) ও 'সাহিত্য ধর্মের সীমানা' বিচার-এর উত্তর। (বিচিত্রা ১৩৩৪ অগ্রহায়ণ), শরৎচন্দ্রের 'সাহিত্যের রীতি নীতি' (বঙ্গবাণী ১৩৩৪ আশ্বিন) ও মুন্সীগঞ্জ সাহিত্য সম্মেলনের অভিভাষণ, এবং কৃত্তিবাস ওঝা ওরফে প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'কল্লোলের জবানবন্দী' এই সাহিত্যতর্কের পরিচয়স্থল।

বিচিত্রা ও কল্লোল পত্রিকায় সাহিত্য ধর্ম নিয়ে যে বিতর্কের সূত্রপাত হয়, তা পরে প্রবাসী পত্রিকায় স্থানান্তরিত। প্রবাসী তার কঠোর শুচিতা ও উচ্চ সাহিত্যাদর্শ রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর হল এবং সেজন্য তর্কক্ষেত্রে পরিণত হল। এবার তর্ক ওঠে নবত্ব বা আধুনিকতার পরিপূরক প্রসঙ্গরূপে। তা হ'ল সাহিত্যের রস-আদর্শ নিয়ে, শ্লীলতা-অশ্লীলতা, নিম্নরুচি ও সুরুচি নিয়ে। জোড়াসাঁকোর 'বিচিত্রা'-ভবনে ১৩৩৪ বঙ্গাব্দের ৪ঠা ও ৭ই চৈত্র (১৯২৭ খৃ. দুদিন প্রবীণ ও নবীন দলের বিরোধে উভয়পক্ষের বক্তব্য উপস্থিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ মধ্যস্থতা করেন। তার বিবরণী সংগৃহীত হয়েছে 'প্রবাসী'তে। প্রথম দিনের প্রতিবেদন—'সাহিত্যরূপ' (প্রবাসী ১৩৩৪ বৈশাখ), দ্বিতীয় দিনের প্রতিবেদন 'সাহিত্য-সমালোচনা' (প্রবাসী ১৩৩৫ জ্যৈষ্ঠ)। আধুনিকতার উগ্র তামসিকতাকে ও অসংযমকে কবি ভর্ৎসনা করলেন। সেই সঙ্গে যন্ত্রিকাবৃত্তিযুক্ত সমালোচনারও নিন্দা করলেন।

এই সব বাদপ্রতিবাদের ফলে সেদিনের (১৯২৭-২৮ খৃ) বাংলা সাহিত্যের পরিবেশ উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল। আজ সেদিন থেকে আমরা অনেক দূরে সরে এসেছি। আজ শান্ত চিত্তে ভেবে দেখলে মনে হয়, সেদিন বাংলা সাময়িকপত্রগুলি তাদের কর্তব্য যথাযথ পালন করেছিল। এইসব রবীন্দ্র-বরণ ও রবীন্দ্র-বিরোধের ধন্দ দিয়ে বাংলা সাহিত্যকে যেতে হয়েছে বলেই আজ তা সুসহ হয়েছে। এইসব তর্ক-বিতর্কের সবচেয়ে বড় সুফল রবীন্দ্র-সাহিত্যে নব সৃষ্টির প্রকাশ। একদিন সবুজপত্রে লেখা দিয়েছিল নোতুন সুরের লেখা—'ঘরে বাইরে' উপন্যাস, 'বলাকা'র কবিতা ও 'কালান্তর'-এর প্রবন্ধগুলি সবুজপত্রেই প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রবাসী-বিচিত্রার পাতায় এইকালে দেখা দিল 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'তপতী', 'রক্তকরবী', 'মহুয়া'। আধুনিক জীবনের সমস্যা এইসব নাটক-কবিতা-উপন্যাসে ভাষারূপ পেয়েছে। সাহিত্যে নবত্ব ও প্রগতি বলতে যথার্থ কী বোঝায়, রবীন্দ্রনাথ তা তর্কে নয়, স্পষ্ট রচনায় দেখিয়ে দিলেন।

তিরিশের দশকে বাংলা গল্পের আকাশে অনেক তারার অভ্যুদয় হল। কল্লোল-কালিকলম সেদিনের গল্পের একমাত্র দর্পণ নয়, তার পাশেই আছে প্রবাসী-বিচিত্রা-বঙ্গশ্রী-শনিবারের চিঠির দর্পণ। জগদীশ গুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রবোধ কুমার সান্যাল ও মণীশ ঘটক কল্লোল-গোষ্ঠীর গল্প লেখক। তাঁরা সমরোত্তর দুনিয়ালোড়া সংশয় নৈরাশ্য ও আশাভঙ্গের বেদনাকে গল্পের রূপ দিয়েছেন। সমরোত্তর স্কান্ডিনেভীয়, রুশ, ফরাসি ও ইংরেজি গল্পের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বোদ্ধিহীন জীবনালেখ্য অংকনে তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন, আর সমাজের নীচুতলার মানুষকে বন্দরে-খামারে-কয়লাখনিতে-কারখানায় আবিষ্কার করলেন।

কিন্তু জীবনের সমগ্র রূপটি তাঁরা দেখেন নি। জীবনের নেতিবাচক দিকটি তাঁদের গল্পে প্রধান হয়ে উঠেছিল। এই অভাববোধ পূরণ করলেন প্রবাসী-বিচিত্রা-বঙ্গশ্রী-শনিবারের চিঠি-ভারতবর্ষ পত্রিকার নবীন লেখকরা। পশ্চিমী জীবনের ছবি পাওয়া গেল অন্নদাশংকর রায় ও মণীন্দ্রলাল বসুর গল্পে ; প্রকৃতির পরিবেশে মানুষের স্বাভাবিক অন্তরঙ্গ রূপটি দেখা

থেকে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, নরেন্দ্র কুমার রায় চৌধুরীর গল্প; বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে জীবনের বিশ্লেষণ-চিত্র পাওয়া গেল মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গল্পে; সার্বজনীন জীবনের অনুভবাদী পরিবেশটি রূপ লাভ করল সীতা দেবী, শান্তা দেবী, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় ও মনোজ বসুর গল্পে; ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-হাসিতে সাধারণ জীবন অসাধারণ হয়ে উঠল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বনফুল, বনবিহারী মুখোপাধ্যায় সুবুদ্ধ, শচীন্দ্রনাথ সান্যাল, অমলা দেবী, প্রবোধনাথ বিশী ও পরিমল গোস্বামীর গল্পে।

কল্লোল-গোষ্ঠীর লেখকরা তাঁদের গল্পে পূর্ব-ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু এঁরা কখনো তা করেন নি।

প্রবাসী (১৩০১)-যমুনা (১৩০৯)-ভারতবর্ষ (১৩১৩) সবুজপত্রের পূর্ব থেকেই বাংলা সাহিত্যের সেবা করে এসেছে। সবুজপত্রের কালে 'নারায়ণ' (১৩১৪), কবিরাজ গল্পোপাধ্যায়ের ভারতী (১৩১৫), মানসী ও মর্মবাণী (১৩১৪), বঙ্গবাণী (১৩২১) সাহিত্যের আসরে দেখা দেয়। তারপরই কল্লোল (১৩২৩) ও কালিকলম (১৩২৬)। তারপরই বিচিত্রা (১৩২৭) ও পরিবারের চিঠি (মাসিক, ১৩২৭)।

এতক্ষণ এইসব সাহিত্যপত্রের ভূমিকার কথা আলোচনা করেছি। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে, সবুজপত্রের (১৩১৪) যথার্থ ভূমিকাটি এরা কেউ-ই নিতে পারে নি। যে-ভূমিকা গ্রহণ করল দৈ-মাসিক পরিচয় (১৩৩১)। এই সময়েই দেখা দিল ধরিত্রী (১৩৩১) ও বসুধা (১৩৩২)।

সবুজপত্র যেখানে যার্থাচ ধ, রাজেন, বেদর্শী-র ভক্ত, সেখানে কল্লোল সুট হামিয়ন, জোহান বোয়ার, হ্যামলি, গল্পের ভক্ত। সবুজপত্রের সাধনা বুদ্ধিপ্রধান মননশীলতার সাধনা, কল্লোলের সাধনা আবেগপ্রধান অতি তরুণ তারুণ্যের সাধনা। সবুজপত্রের মূল ফসল প্রবন্ধের ফসল, কল্লোলের মূল ফসল গল্প-উপন্যাস-কবিতা। প্রমথ চৌধুরী যতে চেয়েছিলেন ব্যাপনাশিল্প, কল্লোলপন্থীরা হয়েছিলেন ইমোশনাশিল্পী। বারবার থেকে যমুনা ও ভারতবর্ষ পত্রিকার পরংচন্দ্র তাঁর আবেগাভিভূতা ও ভাবানুভাবন বরে গল্প-উপন্যাসের ছুক্তি-বাড়ি হাঁকিয়ে গেলেন। ফলে প্রমথ চৌধুরীর যুক্তি, বুদ্ধি ও মননচর্চা ব্যাপক প্রসার লাভ করতে পারল না, একটি সংকীর্ণ গোষ্ঠিতে আবদ্ধ হয়ে রইল।

দৈ-মাসিক পরিচয় পত্রিকা সবুজপত্রের কর্তব্য ও দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। পরিচয়-এ সুধীন্দ্রনাথ দত্ত যে লেখকগোষ্ঠী গড়ে তুললেন, তাঁদের উপদেষ্টা ছিলেন প্রমথ-শিষ্য সূর্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং সেই সূত্রে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরী। পরিচয়ের প্রথম যুগের প্রধান ফসল কবিতা, প্রবন্ধ ও সমালোচনা। এইসব রচনায় সবুজপত্রের আদর্শের অনুসরণ ও আরো অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায়। পরিচয়পন্থীরা আবেগমুক্ত যুক্তিভিত্তিক নির্মোহ নিরিখে সংস্কৃতি-সাহিত্য-চর্চায় বিশ্বাস করতেন। বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে মননচর্চার দায়িত্ব দৈ-মাসিক পরিচয় সাফল্যের সঙ্গে পালন করেছিল। কল্লোলের অনকল্লোলে সবুজপত্রের যুক্তি ও যুক্তির চর্চা প্রায় ঘুমে যেতে বসেছিল, তাকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেছিল দৈ-মাসিক পরিচয়। সবুজপত্রের পর দৈমাসিক পরিচয় বাংলা সাময়িকপত্রের ইতিহাসে নিঃসন্দেহে একটা বৃহৎ দিকচিহ্ন।

এইসব পত্র-পত্রিকার যৌবন ও তারুণ্য অবসিত হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে। তারপর সমরোত্তর বাংলাদেশের জীবনের সর্বক্ষেত্রে একটি নোতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-৪৫ খৃ) কালেই বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে প্রচণ্ড আঘাত পড়ে। মুদ্রা, বস্ত্র, দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তরের ছাপ স্পষ্ট হয়ে দেখা দেয় বাংলার জীবনে। যুদ্ধ ও মন্বন্তর যেসব যে দুর্নীতি, চোরাকারবার ও জালিয়াতির পথ খুলে দিল, সে পথ ধরে যে সমূহ সর্বনাশ এলো তা বাংলার সমাজজীবন ও নৈতিক জীবনকে কোঁপরা করে দিল। তারপরই এলো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। দাঙ্গার ছত্রছায়ায়

বাঙলা সাময়িক পত্র : কল্লোল থেকে সম্প্রতিকাল

সুশান্ত বসু

(তেরশো তিরিশ সালে বেরিয়েছিল কল্লোল)—বাঙলা সাহিত্যের যৌবরাজ্যভূমির নতুনতর রাজপত্র, (সবুজপত্রের ঠিক পরেই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য) যে কাগজ সবুজতর প্রাণপ্রতিষ্ঠার জন্য, আর এখন এই মুহূর্তে, তেরশো বাহাত্তর সালের বৈশাখ মাস : মাঝখানে দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছরের ব্যবধান। এই বেয়াল্লিশ বছরের বাঙলাদেশে অনেক অনেকগুলো সাময়িক পত্রের জন্মমৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করেছে, কখনো কখনো সাময়িক নীরবতার ভস্মপ্রাবরণী থেকে আবার জ্বলে উঠেছে নোতুনতর জন্মের হোমাগ্নিশিখা, সাময়িকতার পথে এবং প্রবাসে যে পত্রিকাগুলির জন্ম ঘটেছে বিরোধে বিক্ষোভে, সমতল সহমর্মিতায় কিম্বা বন্ধুর পথাতিক্রমণে, উচ্চাবচ অভিজ্ঞতার পথে প্রান্তরে তারা কখনো মরমী সহযাত্রী, কখনো বা তির্যক কটাক্ষে বঙ্কিম, কখনো বা বিশ্বতীর্থিকতার ব্রতধ্যানে উন্মুখ, কখনো বা সমাজের সন্দিগ্ধ সমীক্ষতার নিত্যজাগর কোনো বিশ্বাসের বেদীতলে প্রণত, কখনো বা পূর্বাশার প্রাচীতোরণে প্রতীচ্যভুবনের নিরুক্ত বাণীপুঞ্জের আবাহনবার্তা ঘোষণায় উন্মীলমানস,—কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি-শনিবারের চিঠি-উত্তরা বিচিত্রা, নবশক্তি, পরিচয়, অরণি, বঙ্গশ্রী, কবিতা পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, নিরুক্ত, এক্ষণ, বিশ্বভারতী পত্রিকা, সাহিত্য-পত্র, উত্তরসূরী, ক্রান্তি, উচ্চারণ, পূর্বপত্র, কৃত্তিবাস, মধুপর্ক, ধ্রুব, সীমান্ত, চতুষ্কোণ, নন্দন ইত্যাদি আরও অজস্র নামকে অজস্র অভিজ্ঞতার সম্মিলিত সমাধার এই মুহূর্তে উচ্চারণ করা যেতে পারে ; বাঙলাদেশের তারুণ্যরাগরঞ্জিত অভিজ্ঞতাবালা সাময়িকতার মুকুরে এমনি করে তার প্রাণপ্রতিমা খুঁটিয়ে তুলেছে।

শেষে বাংলা যখন ভয়ে ভয়ে চোখ মেলছে, তখনি এলো স্বাধীনতা ও দেশ-বিভাগ। পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হ'ল, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষ ছুটে এলো পশ্চিমবঙ্গে। ভারতের বৃহত্তর রাজনীতিক্ষেত্রে গৌরব ও সম্মানের আসন থেকে বিভক্ত বাংলাদেশ বিচ্যুত হল, দুঃখ মৃত্যু ও অপমানের পালা শুরু হল। আজো তার অবসান হয় নি। ১৯৪২-এর আগষ্ট আন্দোলনে যে বাংলাদেশ ঝাঁপ দিয়ে পড়েছিল, তিন বছর বাদে ১৯৪২-র বাংলাদেশ, তা থেকে কত দূরে চলে গেছে। এই তিন বছরে আমাদের জীবনে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হয়েছে, তা শতাব্দীকালের অভিজ্ঞতাকে ছাড়িয়ে যায়।

(সাহিত্য-নিয়ন্ত্র সংস্কৃতি-চর্চা সম্পর্কে আমাদের ধারণা গুরুতর পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে গিয়েছে।) বিশুদ্ধ সাহিত্য-চর্চার কাল আজ অবসিত। সবুজপত্র, কল্লোল বা বিচিত্রার মতো বিশুদ্ধ সাহিত্যপত্র বোধহয় আর কোনোদিনই প্রকাশিত হবে না। তার জন্য কেবল অর্থনৈতিক বাধা দায়ী নয়, আমাদের মানসিকতাও দায়ী। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, সবুজপত্র থেকে ত্রৈ-মাসিক পরিচয় (১৩১৪-১৩৫৯) —এই পঁচিশ বৎসরের পূর্বে বাংলাদেশে সাহিত্য চর্চা ও সাময়িকপত্র প্রকাশের যে বাতাবরণ ছিল, তা আর কোনো-দিন ফিরে পাওয়া যাবে না। সুস্থ শান্ত চিত্তে সাহিত্য সাধনার দিন চিরকালের মতো অবসিত হয়েছে। (সবুজপত্র কল্লোল বিচিত্রা ত্রৈ-মাসিক পরিচয়ের মতো পত্রিকা এখানে আর দেখা যাবে না।) এরা পথ ছেড়ে দিয়েছে নোতুন কালের পত্রিকাকে। বরজলালের গান সমাপ্ত হয়েছে, এখন নবীন যুবা কানীনাথের গান বাংলা সাময়িকপত্রের আসরে শোনা যাচ্ছে।

যে কোনো সময়ের সাময়িকপত্র কেবল নিছক সেই সময়ের চলচ্চিন্তার অক্ষয় প্রাণাধার নয়, পরন্তু একদিন পরবর্তীকালের কাছে যা উৎসুক ইতিহাসের মর্যাদা পায় চিরন্তনের পুনর্বিচারের কিম্বা স্রোহদীপ্ত আধুনিকতার, কর্মঠবৃত্ত রক্ষণশীলতার কিম্বা কুণ্ঠাক্রীড়িত মধ্যপন্থার ধ্বনিনোজ্জ্বল দর্পণ হিসেবেও তার মূল্য কম নয়। কল্লোলের সম্মিলিত সাধারণীকৃতির অন্তরে বাঙ্‌লাদেশের বিমূঢ় বিভ্রান্ত বিচলিত এবং বিক্ষুব্ধ যৌবন সেদিন একটি পথের সন্ধান করেছিল, যে পথযাত্রার সারথি ছিলেন তপোব্রত দীনেশরঞ্জন দাশ এবং অগ্রদূতী 'পথিক' গোকুলচন্দ্র নাগ, যাঁর সাত বছরের প্রতিভাস্পর্শের অন্তিত্বের মধ্য দিয়ে আজকের আধুনিক সাহিত্যের পুরোধাগ্রন্থির বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য, প্রেমেন্দ্র মিত্র নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, শৈলজানন্দ, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্র, জীবনানন্দ প্রমুখদের পরিচয় এবং প্রতিষ্ঠাভূমি যে কল্লোল, তার উৎসারণের তীর্থসত্রে অভিভাবকত্ব ছিল সাহিত্যগুরু প্রমথ চৌধুরী কিম্বা, আপাতবিস্মৃত বাঙ্‌লাদেশের পুনরাবিষ্কর্তা শরৎচন্দ্রের মত কথাব্রতীর, আর সর্বোপরি ছিলেন রবীন্দ্রনাথ সেদিনের জাগ্রত জীবনকুরুক্ষেত্রের পার্থসারথি যেন; জাগ্রত দৃষ্টি দৃষ্টির দিগন্তে নিত্য, উদ্ভাসমান বাঙলা সাহিত্য সেদিন তাঁর সপ্রশ্ন প্রশ্রয় এবং স্নেহ তিরস্কার উভয়কেই শিরোধার্য করে নিয়েছিল।

আমি কল্লোল তবু কলরোল দুরন্তরা দিশাহীন
অজানা জানার নয়নের বারি
নীল চোখে মোর ঢেউ তুলে তারি
পাষাণ শিলায় আছাড়িয়া পড়ি ফিরে আসি চিরদিন।

মনে নাই মোর কোন আদিকালে কে দিল এমন ধরা।
মোর নীল জলে কোন গতিহীন
ঝাঁপ দিল আসি কবে কোন দিন
চিরদিন তরে লাগাইল এই বিপুল রোষের কান্না।

আমি এই কালি জনমে মরণে হবে নাক' তার সারা।
যাবে না শুকায়ে সাগরের বুক
যাবে না ঘুচিয়া মানুষের দুখ
তবু নিরুপায় কেঁদে দিন যায় আদি যে বাক্যহারা।

আশা আছে তবু যদি কোনদিন শতশত যুগ পরে
ধরির শিলায় ফেটে যায় বুক
গুঁড়াইয়া যায় তার নিরসুখ
জলকল্লোল তুলি ভীমরোল তাহার বক্ষ পরে।[১]

শিলীভূত প্রাণস্থবিরতার বিরুদ্ধে কল্লোলের জন্মলগ্নের এই যে প্রাণপ্রবাহিনী—উনিশশো-তেইশ-চব্বিশ খৃষ্টাব্দের বাঙলাদেশের পটভূমিকায় তা একটি গভীরতর আন্দোলনের প্রস্তুতি-প্রয়াসী নান্দীমুখ।

'বর্তমান সেই নীচ পদার্থ, যার ছোটমুখে সবসময়েই বড় কথা'—একথা চার অধ্যায়ের অভীনের মুখে এলার প্রতি স্বগতোক্তি মাত্র নয়, স্বাধু রক্ষণশীলতার মুখে 'স্থবিরের শাসন-নাশন' বিদ্রোহী যৌবনের প্রতি এ ধরণের উক্তি প্রতিটি যুগের শাশ্বত সত্য; কিন্তু বাঁশরীর মত স্রোহবুদ্ধি নবীন যৌবনেরও অজানা নয় যে বুলাত্মক বাক্যকে সত্যাত্মক করে তোলার মধ্যেই প্রকৃত কাব্যের মর্যাদা লুকিয়ে আছে। 'কাব্য' কথাটাকে যদি একটি বিস্তৃততর অর্থে সাহিত্যের বিকল্প হিসেবে ধরা যায় তাহলে কল্লোলও জেনেছিল তার বিদ্রোহ:

> চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ। নতুন স্রোহবাণী সত্যভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে, তেমনি ছিল অচলপ্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে।"[২]

১। কল্লোল। ১ম বর্ষ: ১ম: সংখ্যা 'কল্লোল' (কবিতা)
দীনেশরঞ্জন দাশ

২। কল্লোল যুগ: অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত (৩য় সং): পৃ: ৮১

রাজনীতির ক্ষেত্রে বোহেমিয়ার সম্পর্কে কল্লোলের ভূমিকা নিয়ে বিতর্ক উঠতে পারে কিন্তু সবুজপত্রের শ্যামলিমা তখনও স্মৃতিমাত্রজীবী সংস্কারে পর্যবসিত হয়নি; বাঙলা দেশ নামক একটি অভিজ্ঞতা তখন কেবলমাত্র প্রাদেশিকতার সীমাবদ্ধতায় একটি অভিজ্ঞানমাত্র নয় বৃহত্তর আন্তর্জাতিকতার আকাশে তখন যুবমানসের অভিজ্ঞতার নীহারিকাগুলি দলবদ্ধমান, স্বপ্নজীব আকাঙ্ক্ষাগুলির প্রতিমান তখন দেশে-বিদেশে দুর্লভ নয়; আর পাশাপাশি উত্তরঙ্গ 'যৌবন বাসনার ঝঞ্ঝোমাঝে' ক্রন্দনপর নিরুদ্ধ স্ফুর্তিত যৌবনের 'বন্দীর বন্দনাগুলো' থেকে থেকে, সুস্মিত যৌবন তখন 'লরেন্সিয়ে' উচ্চকণ্ঠ. জীবনের অবগুণ্ঠনহীন বিপন্নগীমাঝে জীবন-মহাদেবের কণ্ঠ যেমন শুনতে পাওয়া যায়, তেমনি ত্রাতা, অকিঞ্চন, অবহেলিত অন্বেষাণী জনসাধারণের জীবনের বক্রবন্ধুর অথবা উচ্চতরবিহারী জীবনরঙ্গশালীর অনভিপ্রোচের ব্যালোপলীবিত চিত্রগুলি আমাদের সামনে তুলে ধরে এই কল্লোল পত্রিকায়। প্রকাশের ক্ষেত্রে শিল্পের শাসন এবং সুষমা হয়ত সর্বত্র সুপরিপোচের নয়, ভাষার প্রকাশভঙ্গিতে এবং বিশেষ করে ছন্দরীতিতে রবীন্দ্রনাথ সহজ বিজ্ঞাপন সত্ত্বেও হয়তো তখনও অনতিক্রমনীয় প্রভাব, কিন্তু যৌবন এবং বিশ্বের পরিচিত এবং বহুপোচর জীবনের বিচিত্রমুক্তিকায় শিল্পের যে প্রাণপ্রতিমা গড়ে ওঠে কল্লোল ছিল তার নিত্যজাগর অধিরাজ্ঞা। প্রবীণ বিজয়চন্দ্র মজুমদার থেকে নবীন নজরুল, প্রবীণ নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কিম্বা প্রখ্যাত মণীন্দ্রলাল বসু থেকে অখ্যাত অমরেন্দ্র ঘোষ, অজ্ঞাতপূর্ব তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে অরণীয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় অতুল গুপ্ত পর্যন্ত সবাই সেদিন এই মাতাল ওরুইর যাত্রী বরেছিলেন: আর আজকের হারিয়ে যাওয়া অনেকগুলি নাম কেবল অচিন্ত্যকুমারের চিরস্মরণীয় স্মৃতিতর্পণে যাদের কিছু কথা আছে সবাই সেদিন এই প্রথম কল্লোলে অবগাহন করেছিলেন। ইন্দুলেখা দেবী, কেতকী দেবী, নৃসিংহবালা দেবী, বিভাবতী দেবী, সুরুচিবালা দেবী, অনিন্দিতা দেবী এরা হয়তো অধুনা গবেষণার বিষয়ে কয়েকটি উৎসাহব্যঞ্জনা নাম যার, সত্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত কিম্বা জগদীশ গুপ্ত সাহিত্যের উৎসাহী ছাত্র ছাড়া আর কারও হয়তো একথা জানা নেই যে মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায় নিতান্তই একটি ছদ্মনাম নাম যার নয়, তাঁর সাহিত্যিক পূর্বসূরীদের এঁদের মধ্যেই যেমে, অধুনা অর্থে মনস্তত্ত্বের অপূর্ব সম্ভাবিত নিরীক্ষাপদ্ধতি, জীবনের নিস্পৃহ, নিরাসক্ত অথচ একটি তীব্র বৈজ্ঞানিক অবলোকনকলা এঁদের রচনাতেই সেদিন উদ্ভাবিত হতে দেখি। একটি আর্ত বিশ্বতারীক্ষিত কণ্ঠস্বর কল্লোলকে কেন্দ্র করে সেদিন উচ্চারিত, তাই প্যাত্রিয়েল স আমুনসিও (প্রবন্ধ: লেখক গিরিজা মুখোপাধ্যায়) আনাতোল ফ্রাঁস (প্রবন্ধ: কালিদাস নাগ) লেনার্ড্যাগারলাক, টমাস হার্ডি, কিম্বা কবি কেরদৌসী (প্রবন্ধ: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়); কিম্বা দি টুয়েলভ পাউণ্ড লুক (নাটক: জে. এম্. ব্যারিক: অনু: মণীন্দ্রলাল বসু) কিম্বা জঁ ক্রিসতফের মত অসাধারণ উপন্যাস কল্লোলের পাতায় প্রকাশ পায়, কিম্বা কল্লোলের অন্তর্পটে স্যাট হামসুন কিম্বা টমাস মানের ছবি মুদ্রিত হয়। সেদিনের সেই সচকিত মুহূর্তমালিকাগুলি কেবল যে কল্লোলেরই একমাত্র সম্বল ছিল তা নয়, অনুমাত্র কালিকলম (প্রথম প্রকাশ: ১৩৩১ ম বর্ষ: সম্পাদক: মুরলীধর বসু, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও প্রেমেন্দ্র মিত্র) ও প্রগতি (প্রথম প্রকাশ: ঢাকা ১৩৩৪-৩৫) এবং লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তী সম্পাদিত উত্তরা বাঙলা সাহিত্যের এই বিলিত সংসারের মিশ্রযাগ প্রকাশের সম্মিলিত দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। কালিকলমেও দেখি একদিকে যেমন স্পর্ধিত তারুণ্যের নির্বাধ নিমন্ত্রণ, তেমনি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কিম্বা অরবিন্দ ঘোষের রচনা থেকে সুরু করে, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, অতুলচন্দ্র গুপ্ত, মহেন্দ্রচন্দ্র রায় কিম্বা নলিনীকান্ত গুপ্ত সকলেরই তাত্ত্বিক চিন্তা এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর আলো পড়ছে চতুর্দিকে, আবার সঙ্গে সঙ্গে কল্লোলের

সমস্ত তারুণ্যসঞ্জীবিত যুবজনের জীবনভাবনা রূপ লাভ করে এই কালিকলমেরই পাতায়। অবনীশ গুপ্ত কালিকলমেরও নিয়মিত লেখক, আছেন সমাজের পঙ্কপ্রবণ থেকে জীবনের উৎপল-সম্ভাবনা যাঁর অন্বিষ্ট সেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, যাঁর 'পাঁক' উপন্যাস ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে, আছেন শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় জীবনের হৃদবিমুখ দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যিনি "মহাযুদ্ধের ইতিহাস" (বড় গল্প) শোনান, আছেন প্রবোধকুমার সান্যাল যাঁর গল্পের উপচার হাতে নিয়ে, আর কল্লোল-কালিকলম-প্রগতি সর্বত্রই দেখি দুটি মন্ত্রমুগ্ধ অথচ রূপমুগ্ধ কণ্ঠের সজাগ উপস্থাপনা, পানপাত্রের শেষবিন্দু পর্যন্ত জীবনরস পান করবার জন্য যাঁরা উৎসুক এবং উন্মুখ, সেই তান্ত্রিক আচার্য মোহিতলাল এবং ঔদাসীন্য গৃহচর নজরুল ইসলাম।

এই দুটি ব্যক্তিত্বের সর্বগ্রাস প্রভাব সেদিন সমস্ত সাম্প্রতিক চিন্তাকে আবিষ্ট করেছিল, তাই 'কালিকলমে'নজরুলের 'মাধবী প্রলাপ,' 'অনামিকা' 'গোপন প্রিয়ার' উচ্ছ্বসিত দেহলীলার যে উদ্বেল স্রোতের রচনা করেছিল ; 'তীর্থ-পথিক', 'নাগার্জুন' মোহিতলালের 'নারী-বন্দনা' সেদিন যে গুরুগাঢ় নারী-আবাহন মন্ত্রের উচ্চারণ করেছিল, অচিন্ত্যকুমার কিম্বা বুদ্ধদেবের কবিকৃতিতে কিম্বা সামগ্রিকভাবে অপাবৃত সত্যের অসঙ্কোচ প্রকাশে তার প্রেরণা সেদিন কম ছিল না। আর একইরকমভাবে লিও টলস্টয়, আন্দ্রে জেহত (গোকীর স্মৃতি-কথা থেকে : মুকুলীয়র বসু), লিওনিদ আন্দ্রিভ, নোঙটি (নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়) ইত্যাদি বিশ্ববিখ্যাত নামগুলিকে কেন্দ্র করে কিম্বা ছাঁয়তন্ত্রী অথবা আধুনিক ফরাসী সাহিত্যের সতিপ্রবৃত্তি (সত্যেন্দ্রপ্রসাদ বসু) অবলম্বনে আমাদের বিশ্ববিচারগ্রাহী আকাঙ্ক্ষাগুলি সেদিন উন্মীলিত হচ্ছিল। প্রগতি এবং উত্তরা এঁদেরও লেখক তালিকায় আগ্রহতন্ত্রী এই আধুনিকদের অধিকারেরই সম্মিলন, 'তাই প্রগতির' পাতায় দেখি "আজকালকার ফরাসী কথাসাহিত্য" সম্বন্ধে প্রমথনাথ বিশীর রচনা, দেখি "টুর্গেনিভের একদিক" সম্বন্ধে সুকুমার দত্তের চিন্তা ; আর সবচেয়ে বিতর্কমূলক "অতি আধুনিক কথাসাহিত্য" সম্বন্ধে আলকের ধ্যানভাষ্য। অধ্যাপক অমলেন্দু বসুর সাহিত্যচিন্তা, যার অনুবৃত্তি দেখা যায় প্রগতির পাতায় সুকুমার দত্তের "অতি আধুনিক সাহিত্যের রূপ সন্ধান" কিম্বা বুদ্ধদেব বসুর "অতি আধুনিক বাঙলা সাহিত্য" কিম্বা "বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ-মুখী চিন্তায়।"

কল্লোল কালিকলম প্রগতি উত্তরা বেরোবার আগে নিঃসন্দেহে সত্যকারের সমুজ্জ্বল কিম্বা নিয়মিত-প্রকাশিত একমাত্র ছিল বাঙলাসাহিত্যের সর্বজনোপাস্য পত্রিকা। কিন্তু সমুজ্জ্বলত্বের পাত্তায় মনন এবং হৃদয়ের সহাবস্থান ছিল সুদূর, ফলে, তার চতুর্দিকে বুদ্ধিবাদিত দর্পণের স্বচ্ছতা বজায় রেখেও অধিকন মানুষের জন্য হৃদয়ের প্রণয় আতিথ্যই ছিল অনেকাংশে অনুপস্থিত ; প্রবাসী কি আজ আজ অনেক আধুনিক লেখকের জন্য সেদিন আশ্রয় যেন করেনি ?, অবশ্যই এ ভূমিকা তার ছিল। তবুও মূলতঃ রবীন্দ্রনাথের নিত্যপ্রজ চিন্তাধারা এবং অন্যান্য রচনাবলী প্রকাশের মধ্যে প্রবাসীর সীমাপরিচ্ছন্ন নিষ্ঠিই ছিল ; তাই আধুনিকদের এই মুখপত্রগুলি সেদিন একটি স্বতন্ত্র মূল্যে চিহ্নিত হয়েছিল। ইংরেজ সমালোচক এ যুগটাকে চিহ্নিত করেছেন "প্রশ্ন-জনকতার যুগ" হিসেবে,৩ জিজ্ঞাসার উত্তর রূপায়ণ হাতে প্রবাসীর অচলায়তনের অসহিষ্ণু বাস্তবনিরুদ্ধ সেদিন তাই একটি স্বতন্ত্র পথে যাত্রা সুরু করেছিলেন। এঁদের সমালোচক তাই তাঁদের ভূমিকা সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক মন্তব্য করেছেন :

> এরপর এলো কল্লোল কালি কলম প্রভৃতি পত্রিকা এবং এরা যে সাহিত্য পরিবেশন করেছে দেশে, তার মধ্যে রূপ পেলো সুস্পষ্ট একটি নতুন যুগ

৩। Twentieth Century Literature. :-A. C. Ward.

> চেতনা।···যে সমস্ত ক্ষুধা, তৃষ্ণা, কাম ও কল্পনাকে মানুষ জীবনে স্বীকার করেছে কিন্তু সাহিত্যে শিল্পে অনাচরণীয় বলে মনে করেনি, তাদের ভাষা দেওয়া সুরু হলো কবিতায়, কথাসাহিত্যে। প্রবাসীর শুচিতা ও সবুজপত্রের বৈদগ্ধ্যের বন্যা মাটিতে নব যৌবনের জোয়ার এল একটা। ৪

কিন্তু অগ্রগতির পথ কি সর্বদাই বাধাহীন সরল সমতল? অবশ্যই নয়। বাঙলা সাময়িকপত্রের প্রতিটি পর্বই কিছু না কিছু প্রতিক্রিয়ার প্রতিহত, বিরোধে পঙ্কিল, দ্বন্দ্বে ধূসর। তাই সেদিনের তরুণ প্রগতিপন্থা কিঞ্চিৎ প্রতিরুদ্ধ, এবং ক্রোধ ও নিন্দাবাদের ভাজন হয়েছিল 'শনিবারের চিঠি'র বঙ্কিম কটাক্ষে। প্রথমে যোগানন্দ দাস পরে সজনীকান্ত দাসের সম্পাদনায় শনিবারের চিঠি কল্লোলের এই উত্তরঙ্গ গতিবিভঙ্গকে তির্যকতার উপল-প্রহত করতে ব্রতী হয়েছিল। অগ্রগতির দিকে মুখ ফিরিয়ে স্থবির প্রাচীনত্বের কায়েমী স্বত্বকে কখনো সাহিত্যের আসরে যৌরসী পাট্টা দিতে রাজী ছিলেন না ঋষিপ্রতিম রবীন্দ্রনাথ। তাই রবীন্দ্রনাথ থেকে সুরু করে তরুণতম নব্যবাদীটি পর্যন্ত 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণ-পন্থা থেকে কেউই পরিত্রাণ পাননি। সর্বমান আধুনিকতা তাদের কাছে সেদিন সমস্ত সাহিত্যপন্থা বলে বিবেচিত হয়নি, কথাসাহিত্যের স্বাধীন-ক্ষাণ্ড অসঙ্কোচ জীবনা বলাহন, কিম্বা কবিতার অমুক্ত অনিয়ন্ত্রণ তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য বাগ্‌বিলাস বলে প্রতীয়মান হয়েছিল, তাই একে একে আসন করে নিচ্ছিলেন যাঁরা কল্লোলের ছদ্ম নামী স্যাবল রায় তাঁদের কিছু যে, কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির 'নীলিমা'-সন্ধানী খাওয়াসন্ধীণ্ড রোমান্টিক সামাজিক জীবনানন্দ দাশ (গুপ্ত), কিম্বা প্রতিষ্ঠিত নজরুল মোহিতলাল ও হেমেন্দ্র কুমার রায়, এবং অন্যান্য বহুতর সাহিত্যব্রতী এঁদের বক্রোক্তির অবলম্বন হয়েছিলেন। সাহিত্যের ঐতিহাসিকের সাক্ষ্য উদ্ধার করা যাক :

> শনিবারের চিঠির ব্যঙ্গবাণের প্রথম এবং প্রধান লক্ষ্য ছিলেন তিনজন। কাজী নজরুল ইস্‌লাম, মোহিতলাল মজুমদার এবং শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রকুমার রায়। শনিবারের চিঠিতে ইঁহাদের বিকৃত নাম ছিল "গাজী আব্বাস বিটকেল" 'মধুকরকুমার কালিদাস' এবং 'যীশেন্দ্র হেমেন্দ্র রায়'।"
>
> কিছুকাল বন্ধ থাকিবার পর পত্রিকাটি মাসিক রূপ ধারণ করিল। এবং বিকারের ক্ষেত্রেও বাড়িয়া গেল। তখন সহজ ও সুপ্রচুর লক্ষ্য হইল "আধুনিক সাহিত্য" ও "আধুনিক সাহিত্যিক"। বাছা বাছা অংশ উদ্ধৃত করিয়া বিদ্রূপ করে সাধারণ (প্রধানত অল্পবয়স্ক?) [জিজ্ঞাসা চিহ্ন আমার] পাঠক আধুনিক সাহিত্যের মনোভাবের পরিচয় পাইল এবং আধুনিক সাহিত্যিকদের নাম সুপরিচিত হইল।"[৫]

ঐতিহাসিকের নিরাসক্তি এখানে ব্যক্তিগত অনীহায় বিচলিত হলেও, শনিবারের চিঠির ভূমিকা আমা করি এর দ্বারা অনস্বিগোচর নয়। শনিবারের চিঠির 'অনিমুক্তা' এবং 'চলন্ত কথা' সেদিনের নব্যপন্থী সাহিত্যসাধনার পরিবানী রচনার পরিকীর্ণ থাকতো। যে কোনও একটি দৃষ্টান্তই তার প্রমাণ হিসেবে স্মরণ করা যাক :

> আষাঢ়ের 'কবিতায়' কবি জীবনানন্দ দাশের (জীবনানন্দ নহে) 'মনোবীজ' ভট্টর গিরীন্দ্রশেখর

৪। অমল হোমের সম্পাদিত : "সাময়িকপত্র ও বাঙলা সাহিত্য" গ্রন্থ আধুনিক বাঙলা সাময়িকপত্র ও বাঙলা সাহিত্যের একমাত্র বাংলা গ্রন্থ। শ্রীব্রজগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

৫ বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাস : ৩য় খণ্ড : ডক্টর সুকুমার সেন : পৃ : ২০৫

বন্ধুর হাতে পড়িবে না, এই যা দুঃখ। পৌঢ়ত্বে তিনি মনোবিজ্ঞানমতে চিকিৎসাব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া পণ্ডিচারী যোড় দিতেন, অনেকের পক্ষে সে কঠিন ব্যাপার হইত।"[৬]

আবার সামগ্রিকভাবে আধুনিক কাব্যের বিরুদ্ধে তার ফরিয়াদ :

কাব্যের ক্ষেত্রে ইক্ষুদণ্ডতা এখন হবল। অতি অর্বাচীন তরুণেরা এবং শিশুভাঙা তরুণসঙ্ঘ কবীদেরা যে অসভ্য ব্যবহার শুরু করিয়াছেন তাহাতে ইতিমধ্যেই বীণাপাণির মাহি মাহি আর্তনাদ মর্মভেদী হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যে স্বৈরাচার বৃদ্ধি পাওয়াতে রসিকের চিত্ত বিকল হইয়াছে। বিচিত্র এবং বিলম্বিত শব্দ-সমাবেশ, উদ্ভট উদ্ভাবনসুলভ উপমা, বিজাতীয় ব্যাকরণ ও পুরাণ অনুসরণ—ইহার মধ্যে সুস্থ সবল মনের কোন পরিচয় নাই, পথভ্রান্ত বিকৃত মনোবৃত্তিরই নিদর্শন মিলিতেছে।"[৭]

এ প্রসঙ্গে সবচেয়ে বিস্ময়কর তথ্য যে আধুনিক অতি-যন্ত্রের অগ্রচারী অতিক মোহিতলাল মজুমদারই সর্বপ্রথম 'সত্য' এবং 'সুন্দরের' 'শাসন'—প্রেরণায় কল্লোল-কালি-কলমের রাস্তার বাতির নিচে দাঁড়িয়ে কবিতা-পড়ার অধিক দিনগুলোকে ভুলে গিয়ে 'শনিবারের চিঠি'র রশ্মিরশ্মির অগ্রণী ধারকরূপে নিজেকে চিহ্নিত করলেন। তাঁকে নিয়ে কিছুদিন আগে পর্যন্ত সমস্ত তরুণ সম্প্রদায় উচ্ছ্বসিত প্রগতির পাতায় দেখি তাঁকে কেন্দ্র করে উৎসুক বিচার :

বাঙলা কাব্যের নবতম সম্ভাবনার প্রতি যিনি অঙ্গুলি নির্দেশ করলেন, রবীন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথের অনুকরণে তিনিও প্রথমে স্বপ্ন কিরি করে বেড়াতেন, কিন্তু সেই কবিরই পরিণত বয়সের রচনায় বর্তমান অতি-আধুনিকতার বীজ লুকিয়ে আছে।[৮] আর এই মোহিতলালই শনিবারের চিঠির কটুকণ্ঠে নিজের সুর মেলালেন আর কিছুদিনের মধ্যেই প্রেমেন্দ্র মিত্র, শৈলজানন্দ, নজরুল, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ এবং অব্যবহিত মুহূর্তে তারাশঙ্কর সবাই এই শনিবারের চিঠির নিয়মিত লেখকতালিকায় নিজেদের চিহ্নিত করেন। আজকে মনে হয় : অনেক উত্তাপের জলবিম্ব যখন কালের প্রকীর্ণ পবনে মিলিয়ে গিয়েছে, তখন মনে হয়, হয়তো এ ভালোই হয়েছিল, কেননা তাহলে 'সাহিত্য-বিচারের' কিম্বা 'কবি শ্রীমধুসূদনের' অন্তর্জীবনের ভাষ্যকার দ্বিতপত্র সমালোচক মোহিতলাল মজুমদারকে আমরা পেতাম কি? আর একটি কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। সীতা দেবী এবং শান্তা দেবী দুই রামানন্দ-তনয়াকে 'প্রবাসী'র আভিজাত্য অতিক্রম করে কল্লোলের পণযাত্রার সহযাত্রিনী হতে দেখেছিলাম, 'কল্লোল' এবং 'কালি কলম' উভয়েই তাঁদের রচনা প্রকাশিত হতে দেখা গেছে; কিন্তু রামানন্দ তনয় শ্রীযুক্ত অশোক চট্টোপাধ্যায় 'শনিবারের চিঠি'র' তনুদরের অন্যতম প্রধান জোতা ছিলেন।

'The Parodist must criticise by creating' —বার্করা হার্ডির এই সূত্র মনে রেখে 'শনিবারের চিঠি'র দিকে তাকালে দেখবো "শুধু ভাঙা নয়" গঠনের কিছু সঙ্গীতও তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছিল, বাঙ্গের দৃষ্টিলোচন অঙ্গার-ফলীর থেকে সৃজনের প্রাণ-প্রদ উত্তাপ উৎসারিত হয়েছিল। বাঙলা সাহিত্যের ব্রতব্রত সেবাব্রতীরূপে সজনীকান্ত কেবল ব্যঙ্গ বিদ্রূপেই নিজেকে প্রকাশিত করেন নি নিঃসন্দেহ গবেষণার ক্ষেত্রে তাঁর এবং সহচারী ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বাঙলা সাহিত্যে অবশ্যই সম্ভ্রম স্মরণ্য; আর বাঙলা উপন্যাসের বিচিত্রবর্ণ নিরীক্ষাকার বনফুল (বলাইচাঁদ

---

৬ শনিবারের চিঠি : শ্রাবণ : ১৩৫০ : সাময়িক-সাহিত্য

৭ শনিবারের চিঠি : কার্তিক : ১৩৫১

৮ প্রগতি : আষাঢ় : ১৩৩৩

মুখোপাধ্যায়), বহুকর্মা পরিষদ গোষ্ঠী কিম্বা পরবর্তী-কালের তরুণতর নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রমুখের প্রতিষ্ঠা:-প্রয়াসেও শনিবারের চিঠির ভূমিকা কম নয়।

কল্লোল-কালিকলম-প্রগতির পথ বেয়ে একে একে আসছিলেন কতজন, সেদিনের 'আসিসী চক্রে' কবিতা রচনাকার মনোজ বসু, লণ্ডনপ্রবাসী সাহিত্য-সম্ভিৎসু গৃহলীবি বন্দী প্রবিবিউস অন্নদাশঙ্কর রায়, রূপকথার কল্পভুবনচারী টুসু ওরফে অজিত দত্ত, জোয়ান ঘোড়ার মত প্রাণশক্তিতে উদ্বেলিত-হৃদয় সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আরো আরো কতজন নাম-জাগানো নাম-হারানোর দল।

কিন্তু শনিবারের চিঠির এই প্রতিক্রিয়া আর অগ্রপথীদের ঐ অঘোরপন্থা এরই মধ্যে কি সমবের সমস্ত আস্তি এবং আকাঙ্ক্ষার পর্যবসান ঘটেছে? নিশ্চয়ই তা নয়। ধূমকেতু, নবযুগ, নাচঘর, বঙ্গলক্ষ্মী, নবশক্তি, আত্মশক্তি, বিজলী, বাসন্তিকা আরো কতো বিচিত্র বিষয়াবলম্বী পত্রিকা সেদিন প্রকাশিত হয়েছে: কখনো বা সন্ত্রাসকারী উচ্চকণ্ঠ গণ-মুক্তি বার্তাবার্তা, কখনো বা অভিনয়লীপিত রঙ্গশালীর পাদ-প্রদীপ, কখনো শান্ত গৃহচারী নিভৃত মনের প্রকাশলিপিস্থ লিখনাবলী, আবার কখনো বা রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র অতিপ্রাজ লেখনীর প্রসর স্বাক্ষিপাকে শিরোধার্য করে নিয়ে সুরু হয়েছিল তাঁদের অভিযাত্রা, বিদ্রোহের বহ্নিকেতু ছিল হয়তো তাঁদের অপেক্ষাকৃত অনেক কম আরক্তিম, বহুর দৈনন্দিনের কৃতার্থ লখ্যরসে তাঁদের দিনাতিবাহিত, কিন্তু কতকগুলি প্রকাশীপ্ত প্রাণের লিপিমালিকাকে তাঁরাও ত জ্বেলে রেখেছিলেন।

(উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় বিচিত্রা বেরিয়েছিল নব্যপন্থা এবং প্রাচীন-পন্থার সেতুসন্ধির ভূমিকা নিতে। কিন্তু বহুতর বিরোধের হেতুভূত হয়ে বিচিত্রা বাঙলা সাহিত্যে স্মরণীয় হয়ে আছে।) সজনীকান্ত আলি পেশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথের কাছে, আধুনিকদের অভব্যতার একটা বিহিত করবার জন্যে, কিন্তু কী আশ্চর্য শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সবাই-ই যে কোনও প্রসঙ্গে এই আবির্ভূত নবীনকে স্বাগত জানায়। মুসলিম সাহিত্য সম্মিলনীর অভিভাষণে শরৎচন্দ্র বললেন :

> এমনই ত হয়। সাহিত্যসাধনায় নবীন সাহিত্যিকের এই ত সবচাইতে বড় সান্ত্বনা। সে জানে আজকের লাঞ্ছনাটাই জীবনে তার একমাত্র এবং সবটুকু নয়; অনাগতের মধ্যেও তার দিন আছে। ... আজ তাকে বিদ্রোহী মনে হতে পারে, প্রতিষ্ঠিত বিধিব্যবস্থার পাশে তার রচনা আজ অদ্ভুত দেখাবে, কিন্তু সাহিত্য ত খবরের কাগজ নয়। বর্তমানের প্রাচীর তুলে দিয়ে তার ত চক্ষুকর্ণ বন্ধ করা যাবে না। গতি তার ভবিষ্যতের মধ্যে।
>
> আগেকার দিনে বাঙলা সাহিত্যের বিরুদ্ধে আর যা নালিশই থাক, দুর্নীতির নালিশ ছিল না; এটা বোধ করি তখন খেয়ালও হয়নি। এটা এসেছে হালে।...সমাজ জিনিসটাকে আমি মানি, কিন্তু দেবতা বলে মানিনে, নরনারীর বহুদিনের পুঞ্জীভূত বহু কুসংস্কার, বহু উপদ্রব এর মধ্যে এক হয়ে মিশে আছে। কিন্তু একান্ত নির্মম মূর্তি দেখা যায় কেবল নরনারীর ভালোবাসার বেলা।
>
> ...তবে একটা নালিশ এই করা যেতে পারে যে, পূর্বের মত রাজারাজড়া জমিদারের দুঃখদৈন্যসম্বহীন জীবনেতিহাস নিয়ে আধুনিক সাহিত্যসেবীর মন আর ভরে না। তারা নীচের স্তরে নেমে গেছে। এটা আপশোষের কথা নয়। বরঞ্চ এই অভিশপ্ত অশেষ দুঃখের দেশে নিজের অভিমান বিসর্জন দিয়ে কল সাহিত্যের যত যেদিন সে আরও সমাজের নীচের স্তরে নেমে গিয়ে তাদের সুখদুঃখবেদনার

দাঁড়াতে পারবে, সেদিন এই সাহিত্য-সাধনা কেবল স্বদেশ নয়, বিশ্বসাহিত্যেও আপনার স্থান করে নিতে পারবে।" ৯

"কয়লার খনির বা পানওয়ালীদের কথা অনেকে মিলে লিখলেই কি নবযুগ আসে? এই রকমের কোনো একটি ভঙ্গিমার দ্বারা যুগান্তরকে সৃষ্টি করা যায়, এরকম মানতে পারব না," কিম্বা কোনো একটা উদ্ভট রকমের ভাষা বা রচনাভঙ্গী বা সৃষ্টিছাড়া ভাবের আমদানির দ্বারা যদি একথা বলবার চেষ্টা হয় যে, যেহেতু এমনতর ব্যাপার ইতিপূর্বে কখনো হয়নি সেইজন্যেই এটাতে সম্পূর্ণ নূতন যুগের সূচনা হোলো, সেও অসঙ্গত। পাগ্‌লামীর মত অপূর্ব আর কিছুই নেই—কিন্তু তাকে ওরিজিন্যালিটি বলে গ্রহণ করতে পারিনে। ১০ আধুনিক সাহিত্য প্রসঙ্গে এরকম সন্দেহ রবীন্দ্রনাথের মনে উদিত হলেও, সায়েন্সেই বলো আর্টেই বলো নিরাসক্ত মনই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বাহন" এ ভরে তাঁর বিশ্বাস ছিল নিবিষ্টচিত্ত, তাই বেদের অচিন্ত্যকুমারকে তিনি সস্নেহ শ্রদ্ধায় লিখতে পারেন: 'তোমার প্রতিভা আমি স্বীকার করি,' জীবনানন্দের চিত্রকল্পময়তা তাঁর দৃষ্টি এড়ায় না সুধীন্দ্রনাথ তাঁর বনস্পতি-দাক্ষিণ্যে লালিত হন।

বিচিত্রা কিন্তু সেদিন এই ভরকে অনেকখানি প্রসারিত পরিধিতে আলোচনা করেছিল। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সাহিত্য-ধর্মের সীমানা, প্রতিবাদী নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, তত্ত্ব প্রতিবাদী কবি দিজেন্দ্রনারায়ণ বাগ্‌চী, নরেশচন্দ্র তার পুনঃপ্রতিবাদক। ওঁদের পাশাপাশি সুপণ্ডিত নলিনীকান্ত গুপ্ত তাঁর মতব্য জানালেন:

'আধুনিক সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ইউরোপেরই মনের প্রাণের একটা বিপর্যয়ের ফলে, ইউরোপের চেতনার ধারার সহিত তাহার রহিয়াছে জীবন্ত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ। আমাদের দেশের চেতনায় সেসকল জিজ্ঞাসা সজীব পার্থিব হইয়া দেখা দেয় নাই—এখনও তাহারা অনেকখানি আমাদের খোলসেরই কথা, জীবনের প্রয়োজন হইতে বা অন্তরাত্মার গভীর উপলব্ধি হইতে তাহারা উঠিয়া দাঁড়ায় নাই। তাই দেখি আমাদের অধ্যে অধিকাংশের হাতে আধুনিক সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য কৃত্রিম হইয়া উঠিয়াছে' একটা ঢঙে পর্যবসিত হইতে চলিয়াছে।"

কিন্তু তবুও এঁদের অসহায় প্রতি তাঁর প্রশ্নযুক্ত আস্থা:

তবুও স্বীকার করিব, আজ যাঁহারা বঙ্গবাণীর জন্য বৈকেক আহরণ করিতে গিয়া পাতাল রসাতল চুঁড়িতেছেন, সাহিত্যের সাধক যাঁহারা হাতে ছাড়িয়াছে 'লজ্জা, ঘৃণা, ভয়,' এই তিনকে বিসর্জন দিয়া বসিয়াছেন, এই যেসব অবধূতমার্গ অঘোরপন্থী তাঁহারা সকলেই স্রষ্টা হিসাবে যে অক্ষম অপটু তাহা নয়। ১১

সাহিত্যের সীমানা নিয়ে বিতর্ক কিম্বা বিচারেই মাত্র নয় অন্ততঃ তিনজন প্রসিদ্ধনামা সাহিত্যানুব্রতীর লালনভূমি হিসেবে 'বিচিত্রার' ভূমিকা উজ্জ্বলচিহ্নিত। "অন্নদাসের অন্নবর্ধন" যাদিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনও এক প্রতিজ্ঞাপূরণের প্রোজ্জ্বল প্রত্যয়ে এসেছিলেন 'অতসী মামী'-র গল্প নিয়ে, সেই থেকে তাঁর আসন সবস্ত ভবিষ্যতের জন্য চিহ্নিত হয়ে গেল গভীরভাবে, 'পথের প্রবাসের' জাগ্রতচক্ষু অন্নদাশঙ্কর নোতুন করে দেখালেন ইয়োরোপের সঙ্কর জীবনযাত্রাকে, আর রূপদক্ষ বিভূতিভূষণ, আমাদের শৈশবের, বৈশোরের, বয়ঃসন্ধির আনন্দ-বেদনার স্মৃতি সুরভিত বাঙলাদেশের এক ভিন্নতর পল্লীপাঞ্চালিকা শোনালেন তাঁর 'পথের পাঁচালী'র অভিজ্ঞতামালায়।

কল্লোল কালিকলম প্রগতি উত্তরা বাঙলা সাহিত্যে অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র শক্তি।) কিন্তু সে শক্তির চতুর্দিকে আয়েসের জ্যোতির্বলয়িত যে একটি পরিমণ্ডল ছিল, সেখানে

৯। কল্লোল যুগ দ্রষ্টব্য: পৃ: ২১৩-১৪

১০। সাহিত্যতত্ত্ব: প্রবাসী: ১৩৩৪

১১। আধুনিকতম সাহিত্য: নলিনীকান্ত গুপ্ত (বিচিত্রা চৈত্র: ১৩৩৫)

কবিতার তুলনায় বুদ্ধির ছিল একটি উনতর ভূমিকা ; আর নিস্পৃহ বিচারে একথা ও অবশ্য স্বীকার্য প্রতীচী সাহিত্যরুচি কিম্বা প্রতীচী মতাদর্শ তা আমাদের চিন্তায় যতখানি আরোপিত ছিল, ততখানি স্বভাবজ অধিকার অর্জন করেনি, সমালোচকের ভাষায় : "দেশের জীবন ও সমাজের মাটিতে তার শিকড় প্রোথিত হয়নি, আমাদের অনুভূতির মধ্যে তা একাত্মতা লাভ করেনি।"১২ অচিন্ত্যকুমারের ভাষায় তারা ছিলেন : "স্বপ্নের নিশান নিয়ে সত্যের চাষুণেরা।"১৩ কিন্তু নিশানটা স্বপ্নের ; আর স্বপ্ন এবং সত্যের বিবাহ নিছক আবেগের পৌরোহিত্যে ঘটে না, প্রয়োজন বাক্-প্রোচ, এলিয়টের শব্দটি একটু ভিন্ন অর্থে ঘটকের ; আর সেইজন্যই আসতে হোলো পরিচয়, পূর্বাশা, চতুরঙ্গকে মননের আভিজাত্যে জীবনের রঙ-চিত্রকে নোতুন নিরাসক্ত আসক্তির দূরবীক্ষণ এবং অণুবীক্ষণে দেখবার প্রয়োজনে, আসতে হল কবিতা কিম্বা পরবর্তীকালে 'একক' প্রভৃতির নিরুত্তর মতো কবিতার মুক্তি-যুদ্ধার্থী পত্রিকাপুঞ্জকে। আসতে হোলো শতাব্দী 'অরণি' 'ভবিষ্যৎ' 'মাতৃভূমি' 'মন্দিরা' কিম্বা 'পত্রিকা'র মতো সাহিত্যপত্রগুলি। পাশাপাশি আবহমান বঙ্গ সংস্কৃতির স্রোতস্বিনী ধারাপথটি উজ্জ্বল করে রেখে গেছে আজকের সর্বাধিক প্রচারিত সাহিত্য সাপ্তাহিক "দেশ"-এর মতো কিম্বা 'জয়শ্রীর' মতো সাহিত্যপত্রিকাগুলি।

কল্লোলের শেষ পর্ব অবশ্যই কিঞ্চিৎ জনতোষিণী ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, তার প্রমাণ অচিন্ত্যকুমারও দিয়েছেন : "কল্লোল ও শেষের দিকে হয় বেশ খাদে নামিয়ে আনবার চেষ্টা করেছিল, জনরঞ্জনের প্রলোভনে।"১৪ আর তার আবেগ যে বিশুদ্ধ মননের শোধনাগারে সর্বদা পরিস্রুত ছিল না, একথা আগেই বলা হয়েছে তাই এলো পরিচয় তার খজু স্বঠাম, এগিয়ে না পড়া গদ্যের পৌরুষ নিয়ে খোলা চোখে সমস্ত পরিবর্তমান বিশ্বকে দেখার এবং দেখানোর এবং আবৃতচক্ষু সমস্ত আদ্যের অপাবৃতির মন্ত্র নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ দীর্ঘদিন ধরে মানসপ্রস্তুতির একটি অধ্যায়ে আধুনিকতার অন্তঃস্বরূপ নিয়ে বিব্রত হয়েছেন, বিচলিত হয়েছেন, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কবিতার ধর্ম এবং কনটেন্ট নিয়ে দীর্ঘ বিতর্কে মেতেছেন, য়ুনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটের সভায় 'কাব্যের মুক্তি' বিষয়ক বক্তৃতায় তাঁর দীর্ঘলালিত চিন্তাকে মেলে ধরেছেন, 'প্রবাসী' পরাঙ্মুখ, প্রকৃত বিশ্বতাদীক্ষিত কোনও পত্রিকা একান্ত অনুপস্থিত, তাই বন্ধু দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আজকের জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, গিরিজাপতি ভট্টাচার্য, শাহেদ সুরাবর্দি, 'উত্তরা'-র সুরেশ চক্রবর্তী সুশোভন সরকার ইত্যাদি অগ্রণী চিন্তাজীবীদের নিয়ে বের করলেন 'পরিচয়' ১৩৩৮ সালের শ্রাবণ মাসে। আগে আগে লেখক তালিকায় দেখা গেল নীরেন্দ্রনাথ রায়, অপূর্বকুমার চন্দ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, প্রশান্ত মহলানবীশ, সুধীন্দ্রনাথের মেসোমশায় "পুরানো কথা"র চারুচন্দ্র দত্ত, বিনয় সে, বুদ্ধদেব বসু, অন্নদাশঙ্কর সবাইকে ; আর কল্লোল থেকে সুরু করে শিল্পব্রতী যামিনী রায়কে দেখেছি এঁদের অনুব্রত সহযাত্রীরূপে।) "বাঙলা সাহিত্যের চিন্তার জগতে, মনন ও মুক্ত উদার বুদ্ধিবাদের প্রেক্ষিতে পরিচয়-এর অবদান এখনও পর্যন্ত উদাহরণস্বরূপ।"১৫ সুধীন্দ্রনাথের ভ্রাতা পরিচয়েরই অন্যতম লেখক হরীন্দ্রনাথ দত্তেরও মন্তব্য বাঙলা মননের ইতিহাসে স্মরণীয়। কবি সুধীন্দ্রনাথ যিনি "কবিতাকেও গদ্যের কঠোর ব্রহ্মচর্যের ব্রত দিয়েছিলেন"১৬ আর গদ্যকে মুক্ত করেছিলেন কবিতার সমস্ত প্রকার সম্ভাব্য সংক্রাম থেকে সম্পাদকের মনীষাতেও তাঁর

১২। পূর্বোক্ত প্রবন্ধ : বন্ধগোপাল সেনগুপ্ত

১৩। কল্লোল যুগ : অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত পৃ: ২৮৭

১৪। কল্লোল যুগ : পৃ: ২১৫

১৫। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও পরিচয়-এর প্রকাশ : হরীন্দ্রনাথ দত্ত : আজাদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত।

১৬। সুধীন্দ্রনাথের মন : অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত কবিতা বর্ষ ২৩ সংখ্যা ১-২।

তাৎপর্যতা বিন্দুমাত্র নিষ্প্রভ নয়, বরং বহুগুণিত দীপ্ততে উজ্জ্বলতর। পরিচয়-এর একদা বিজ্ঞাপন ছিল 'অভিনব' মাসিক পত্রিকা। বাস্তবিক এই 'অভিনব' শব্দটির আপাত-গাম্ভীর্যের অন্তরালে এর অন্তঃ যন্ত্রী আধুনিকতার জীবনবাণী প্রচ্ছন্ন রয়েছে। তাই দার্শনিক বঙ্কিমচন্দ্র কিম্বা বৌদ্ধ দর্শনের রহস্যসম্পন্না বিষয়ে যেমন আচার্য হীরেন্দ্রনাথ দত্ত এবং কটাক্ষ ঘোষের মত নৈয়ায়িক ব্যক্তিরা ভেবেছেন; তেমনি ভারতীয় জাতীয়তার জন্ম'-রহস্য প্রসঙ্গে হীরেন মুখোপাধ্যায়-এর চিন্তা-উদ্রেকী রচনা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না। আবার লাপাশী কবিতা' প্রসঙ্গিত প্রবন্ধও নিকট-প্রাচ্য সম্পর্কে আমাদের অবহিতি এড়ায় না।

সমালোচনা প্রসঙ্গে শ্রীমতী ভার্জিনিয়া উল্‌ফের একটি মন্তব্যোক্তি, বিশেষ করে আজকের সহনবিমুখ কণ্ডুয়নবৃত্ত সমালোচনার দিকে তাকালে বিশেষ করে মনে পড়ে: Reviewers we have, but no critic, a million of competent and incorruptible policemen, but no judge."১৭ কিন্তু পরিচয় সম্ভবতঃ একথার দৃপ্ত প্রতিবাদ ছিল। স্পেনের গৃহযুদ্ধ কিম্বা পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ, অর্থনীতির জন্য বিলাপ (Lament for Economics: Barbara Wooton), "পাশ্চাত্য সুকী কবিদের" বিচার ক্রিস্টোফার ইশারউডের নাট্যকৃতির বিচার কিম্বা সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক গতিশীলতার তত্ত্ববিচার (Social and Cultural Dynamics. Pitrim Sorokin) পর্যন্তই দর্শন পর্যা. সমালক্ষক ঘোষ. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, হিরণকুমার সান্যাল, প্রবীরচন্দ্র বসুমল্লিক, দুর্গাটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, আশানন্দ বাগ প্রমুখের তীব্র মননী বিচার আজকের দিনে আদর্শ হিসেবে গ্রহণের সঙ্গে পুনঃস্মরণ করা যেতে পারে। সমালোচনা যে নিছক বন্ধুকৃত্য নয় তার একটি ছোট্ট প্রমাণ ধরা যাক দিলীপকুমার রায়ের সাহিত্যিকী প্রসঙ্গে অনুলোচক হারীতকৃষ্ণ দেবের মন্তব্য:

> বইটি উচ্ছ্বাসবহুল। লেখক দিলীপকুমার ও... গ্রন্থকার দিলীপকুমারের এ বিষয়ে খুব মিল।" ১৮

ই. এম্. ফর্স্টারের প্রসিদ্ধ গ্রন্থ A passage to India' সংক্ষিপ্ত অনুবাদ (ভারতপথে: অনুবাদক. হিরণকুমার সান্যাল). তিলান টমাসের গল্পের অনুবাদ ইত্যাদি নানা অবাবহিত্ব প্রতীচী-প্রসঙ্গও পরিচয়ের সীমাবহির্ভূত ছিল না।

সাহিত্য এবং সাময়িকতা একদা অত্যন্ত বিপ্রতীপ সম্পর্ক বলে গণ্য হোতো. কিন্তু যেহেতু নিছক বাঙলাদেশের চতুঃসীমায় আমাদের সমস্ত অনুভবের সর্বাত্মকরণ সমর্থন মেলে না, তাই ফলতঃ আমাদের তাকাতে হয় "দেশবিদেশের" দিকে, (পরিচয়ের এই বিশ্বদীক্ষা আমাদের মনে পড়িয়ে দেয় 'জয়শ্রী'র বিশ্বাবর্ত, কিম্বা 'কল্লোলের' 'নবাচার' কথাকে।) বিশুদ্ধ রাষ্ট্রগত অর্থে রাজনীতিচর্চাও যে সাহিত্যের প্রাণবত্তা হতে পারে না মার্ক্সীয় বিশ্বাসের বেদীতলে নিবেদিত পরবর্তী নবপর্যায়ে পরিচয়ের জনপ্রিয় অনুযাত্রা আমাদের এ সত্যের মুখোমুখী করে তোলে। (ত্রিপুরার "সন্ত্রাসবাদের আলাধরা ছবির মত" একটি ছোট্ট শহরে, একটি ছোট্ট চায়ের দোকানে অজয় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, সত্যপ্রসন্ন দত্ত প্রমুখের একটি সাময়িক আবাহায় জন্ম হয়েছিল পূর্বাশার ১৩৩৯ এর বৈশাখ মাসে যার উল্লেখ ছিল কেমন, সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যের উক্তিতেই জানা যাক:

> কিন্তু পত্রিকার চরিত্র হবে কেমন? অজয় ভট্টাচার্য বললেন: 'কল্লোল' 'কালিকলম' 'প্রগতি' এখন আর নেই। তাদের স্থান নিতে হবে।" ১৯

১৭। 'পরিচয়' পত্রিকায় হেমেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরীর 'পিরিচিয়ন' গ্রন্থের সমালোচনায় হরপ্রসাদ মিত্র উদ্ধৃত

১৮। পরিচয়: কার্তিক ১৩৩৮ (পৃঃ ৬৯০)

১৯। নব পর্যায় পূর্বাশা: ৮ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা: মাঘ ১৩৭০: সম্পাদকীয় পূর্বাশার কথা [পূর্বাশা প্রারম্ভিক সমস্ত তথ্যই এখান থেকে সংগৃহীত]

আর আজ পর্যন্ত সাহিত্যকে জীবনের বিকল্প হিসেবে মেনে নিয়ে সকল ভট্টাচার্য, এবং লোকালোচর সত্যপ্রসন্ন দত্ত, সহস্র বাধা বিপত্তিকে উপেক্ষা করে পূর্বাশার পুনঃপ্রকাশ করে চলেছেন।

পূর্বাশা প্রথম সংখ্যার উল্লেখ্য রচনা : প্রবোধচন্দ্র সেন, 'ত্রিপুরার ইতিহাস' অচিন্ত্যকুমারের গল্প এরিখ মারিয়া রেমার্কের রোড্‌ব্যাকের অনুবাদ। "তাছাড়া তখনকার এ্যাংগ্লি ইয়ং মেন হিসেবে আমরা একটি বিভাগ খুলেছিলাম যার নাম ছিল 'দুর্বাশা,' যিনি এক ক্রোধী ঋষি। 'প্রবাসী, ভারতবর্ষ, বিচিত্রা, শনিবারের চিঠির দুর্বল রচনার উপর ক্রোধবর্ষণ ছিল সে বিভাগের কাজ।/ প্রধান লেখক : শ্রীসুধীর চক্রবর্তী, ইংরেজীর এম এ, শনিবারের চিঠিতে তাঁর কিছু ব্যঙ্গ রচনা ছাপা হয়েছিল।"২০ ত্রিপুরা থেকে কলকাতায় এল পূর্বাশা। এলেন কল্লোলের সমস্ত খ্যাতনামা অগ্নিহোত্রীগণ, সম্বর্ধনা দিলেন,'পরিচয়ে'র সুধীন্দ্রনাথ প্রমুখেরা, অশ্লীলতার অপবাদ ; একে একে ছাপা হতে লাগলো গ্রন্থ গুরুত্বপূর্ণতার কল্লোলী সাহিত্যবীক্ষাকৃতবিদ্য চিন্তানায়কদের শিল্প-সমালোচনা (মার্সেল প্রুস্ত্‌), বুদ্ধদেব, অচিন্ত্যকুমারের 'রাধারাণীর নিজের বাড়ি', 'হুইসল্‌' আর সিম্পোসিয়াম ইত্যাদি কিংবা পূর্বাশাকে উপলক্ষ্য করে যেন সমস্ত আধুনিক সাহিত্যের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সস্নেহ স্বীকারোক্তি :

অচেনারে তবে দিই আমি নমস্কার
যাহিরে নিখিল বিশ্ব করে তা স্বীকার।

একে একে এলেন গল্পকার তারাশঙ্কর, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখে গল্প তারপর তাঁর বিখ্যাত 'পদ্মানদীর মাঝি'র ধারাবাহিক প্রকাশ, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, হরপ্রসাদ মিত্র ইত্যাদি তরুণ কবিদের আত্মপ্রকাশ এবং আত্ম-প্রতিষ্ঠা প্রসঙ্গে পূর্বাশার ভূমিকা কম স্মরণীয় নয়। ইতিমধ্যে পূর্বাশার নানা অবস্থান্তর এবং মতাদর্শগত পরিবর্তন ঘটেছে, প্রায় বছরখানেক বেরিয়েছে সাপ্তাহিক রূপে তারপর 'স্বাধীন ভারতের মুক্ত মানসিকতার মুখপত্র' এবং যে রোমান্টিকতায় কবি-মনের পূর্ণ মুক্তি "বাংলা কবিতার সেই নবযাত্রার পথে" পূর্বাশা নিজেকে নিয়োজিত করেছিল, সাহিত্য, সঙ্গীত চিত্রকলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, বিজ্ঞান, ধর্ম, ইতিহাস প্রভৃতি সব বিষয়ের নিরপেক্ষ আলোচনা ছিল তার ভিত্তিভূমি এবং তার এই দশ বছরের লেখকগোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, শিবনারায়ণ রায়, অরবিন্দ পোদ্দার, অমিয়ভূষণ মজুমদার, সন্তোষকুমার ঘোষ, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, বীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, রমাপদ চৌধুরী, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, প্রতিভা বসু, দিনেশ দাস প্রমুখেরা। 'কল্লোল যুগ' পূর্বাশাতেই ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত, যেমন আমরা আগ্রহের সঙ্গে স্মরণ করতে পারি ক্রমিক অধুনা প্রকাশিত 'পূর্বাশার কথা' কিম্বা পরিচয়ে আংশিক প্রকাশিত হিরণকুমার সান্যালের স্মৃতি বিবরণীর স্বাদুতার কথা।

পূর্বাশার ছ' বছর পরে প্রকাশিত চতুরঙ্গের (প্রথম প্রকাশ আশ্বিন ১৩৪৫) কথা স্বভাবতই মনে পড়বে তার সুরুচিশোভন বহিরঙ্গ এবং অন্তরঙ্গ সজ্জার কথা ভেবে। চতুরঙ্গের মননের আভিজাত্য আজ পর্যন্ত সমান সক্রিয়, পত্রিকাটি বার বার প্রথম আমাদের পরিচয়ের রুচিশালীনতা এবং বিদ্যাবৈদগ্ধকে মনে পড়িয়ে দেয়, প্রথম সংখ্যাতেই দেখি প্রসরপানি রবীন্দ্রনাথের "নারী" নাম্নী কবিতা, আজকের দিনে যাযাবর নামে যা যুগপৎ নন্দিত এবং নিন্দিত সেই 'সাম্যবাদের উৎপত্তি ও পরিণতি' প্রসঙ্গে সুশোভনচন্দ্র সরকারের তত্ত্বান্বেষী চিন্তা, গ্রন্থ সমালোচনা প্রসঙ্গে 'রাজনীতি সংস্কৃতি ও শান্তি' বিষয়ক বুদ্ধদেব বসু-র প্রস্তাব, 'প্রগতি ও পরিবর্তন' নামের সুধীন্দ্র

১০ ঐ

নামের অন্তর্মুখী অন্বেষণ। আরও কয়েকটি স্মরণীয় রচনার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে' 'গণতন্ত্রের সংকট' (সুশোভন সরকার), 'ধনিকের আবির্ভাব' (কার্ল মার্কসের ক্যাপিটালের অনুবাদ: হীরেন মুখোপাধ্যায়) ইয়েটস প্রাসঙ্গিক প্রবন্ধ (হুমায়ুন কবীর), মুসলিম সংস্কৃতির হেরফের (সৈয়দ মুজতবা আলী) রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাঙলা ভাষা (বুদ্ধদেব বসু), অনুরাধা রায় (একাঙ্ক: গীতিনাট্য: বুদ্ধদেব বসু) এছাড়া বুদ্ধদেব প্রমুখের গল্প প্রভৃতির প্রকাশও স্মরণ করা যেতে পারে।

চতুরঙ্গের আর একটি বিষয় বিভিন্ন বৈদেশিক এবং প্রাদেশিক সাহিত্যপ্রসঙ্গে তার সতর্ক অবীক্ষা এক্ষেত্রে স্মরণ করা যেতে পারে।) উদাহরণত: বর্তমানের ইংরাজী সাহিত্য (১ম সংখ্যা) তামিল গল্প, 'উর্দু ভাষার উদ্ভব' (ইস্রাৎ হোসেন ভুবেরী), 'ইংরাজী সাহিত্য' (বিষ্ণু দে): ২য় সংখ্যা) 'আধুনিক বাঙলা ছোট গল্প' (বুদ্ধদেব বসু ২য় সংখ্যা), 'ইংরাজী ব্যক্তিগত প্রবন্ধ,' 'গুজরাটের নাটক' (৩য় সংখ্যা) কিম্বা 'হিন্দী সাহিত্য' (রাসবিহারীলাল: ৬ষ্ঠ সংখ্যা) উল্লেখ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রভাষা প্রেমীরূপে যারা হিন্দীর প্রতাপান্বিত প্রতিষ্ঠা চান তাঁদের নিম্নোদ্ধৃত মন্তব্যটি স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে: 'যে হিন্দী সাহিত্য রাষ্ট্রভাষা হবার স্পর্ধা রাখে, সে সাহিত্য অথচ অপরিণত এবং তার এখনও কিশোর অবস্থা।'২১

সুখের কথা পরিচয় চতুরঙ্গ এবং পূর্বাশা বাঙলা জাগ্রত সাহিত্যবিবেক রূপে আজও বাঙলাদেশে প্রকাশিত হয়। আর একটি প্রসঙ্গে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে কল্লোলের সম্মানিত অস্বীকৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ সেদিন ছিলেন সর্বাপেক্ষা স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব, যাকে এড়াতে চাইলেও আটঘাট বেঁধে অস্বীকৃতির কোনও যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণপঞ্জী উপস্থিত করা হয়নি, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সম্পাদিত 'বাঙলা কাব্য পরিচয়ের' সমালোচনা সূত্রে অশোক মিত্র তাঁকে নির্মম ভাবে সমালোচনা করেন; উক্ত সংকলনে কিছু অনাধুনিক কবিদের প্রশ্রয়ের সমালোচনা করে তিনি লেখেন: "ভাবতে অবাক লাগে, মহাকবির কাছে সত্যের চেয়ে চক্ষুলজ্জাই বেশি হয়ে দেখা দিল" তাঁদের কাব্য গুটিকে তিনি বলেছেন "চোখাচুখি ধরণের ব্যাপার" আর রবীন্দ্রনাথকে সামনে রেখে তাঁর নির্মম ব্যঙ্গোক্তি: "যাদের জীবনে কাব্যের প্রয়োজন আছে তাঁরা ঝুড়ো খোকার ছড়া নিয়ে ছেনালি সইতে পারেন না" আর তাঁর প্রাসঙ্গিক সিদ্ধান্ত:

> বাঙলা সাহিত্যের বিশেষ দুর্ভাগ্য এই যে রবীন্দ্রনাথের কীর্তি শুধু বিরাট একটি অন্তরায়ের হয়েই উঠেছে, এবং সে পাহাড় বাঙলা কাব্যযাত্রার পথ আটকে রেখেছে, সুতরাং সে যাত্রাকে এখন পাহাড় পরিক্রমণ করে পথ খুঁজতে হচ্ছে:" ২২

সেদিনের সমালোচনা কতখানি ঋজু এবং একমুখী ছিল তা চতুরঙ্গের পাতায় বিষ্ণু দে-র চোরাবালি প্রসঙ্গিত সমালোচনার নিম্নোক্ত উদ্ধৃতিটি পড়ে দেখলেই বোঝা যাবে।

> "ভালো কবিতা লেখার চেয়ে ঘোড়দৌড়ে হঠাৎ টাকা পেলে নাম হয় এখানে বেশি।
>
> বিষ্ণুবাবু পণ্ডিত লোক, এবং তিনি শক্তিশালী সন্দেহ নেই। নিপুণভাবে নিজের পাণ্ডিত্যকে তিনি কাব্যে স্থান দিয়েছেন। কিন্তু এক এক জায়গায় তাঁর পাণ্ডিত্য রসবোধের পথে কাঁটার মত বিঘ্ন হয়ে দাঁড়ায়।"

'কবিতা' পত্রিকা (প্রথম প্রকাশ: ১৩৩২) বাঙলা কাব্যের ক্ষেত্রে একটি প্রাতিষ্ঠানিক বিগ্রহের মর্যাদা অর্জন করেছে। কবিতার কৃতার্থ প্রেমিক বুদ্ধদেব বসু দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে অনিকেত আধুনিক কবিতার নিঃসঙ্গ নায়ক রূপে

২১। রাসবিহারীলাল: হিন্দী সাহিত্য: চতুরঙ্গ ১ম বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা (পৃ: ৪৩৩)

২২। চতুরঙ্গ: ১ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা ১৩৩৪: আশ্বিন

নিজেকে চিহ্নিত করেছেন : বিবর্তমান বিশ্বের প্রতিটি ভাবনা তরঙ্গকে ধরে রাখবার চেষ্টা করেছেন এই ত্রৈমাসিক পত্রটির মাধ্যমে,) বিরূপ বিমুখকে তিনি করেছেন উন্মুখ, প্রত্যাগতকে জানিয়েছেন সাগ্রহ স্বাগত, এক পয়সায় একটি সিগ্নিফের মধ্য দিয়ে বাংলা কবিতাকে তিনি সর্বগ্রাহী করার প্রয়াস পেয়েছেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের' বুদ্ধদেব অধুনা প্রবাসী এবং শোচনাযোগ্য সংবাদ 'কবিতা'র প্রকাশ বন্ধ হয়ে গেছে।) 'প্রগতি'র পরিষদ রাধাকে মনে রাখতো কজন, ক'জন জানতো কবি ফাল্গুনী রায় এবং সুকুমার সরকারের কথা, অমিয় চক্রবর্তীর একমুঠো এখন করে ছড়িয়ে দিত কে, এমন অন্তরঙ্গ আত্মীয়তায় জানাতো কবি সুনীলচন্দ্র সরকার, বিশিকান্ত রায় চৌধুরী কিংবা মৃণালকান্তির একমুঠো লিগ্নিফের কথা, জানাতো জীবনানন্দ বিষ্ণু দে কিংবা সুধীন্দ্রনাথের অন্তরঙ্গ অন্তর্জীবন, জানাতো অসামান্য ছন্দকুশল শক্তিমান সুভাষ মুখোপাধ্যায় কিংবা সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা, কিংবা সমর সেনের ? যদি না থাকতো কবিতা আর কবিতায়-জন্মে-ওঠা বুদ্ধদেববাবুর অসামান্য গদ্য।) এই সেদিনের তরুণতম মণিভূষণ ভট্টাচার্য কিংবা তরুণ দত্ত পর্যন্ত তাঁর ঐ সন্ধানী চোখের নাগাল এড়ায়নি। (আর সহযাত্রীদের তিরোধানকে উপলক্ষ্য করে কবিতার 'জীবনানন্দ' এবং 'সুধীন্দ্রনাথ স্মৃতি'-সংখ্যার অমূল্য মূল্যবত্তা ভোলা যায় না।)

(সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং প্রেমেন্দ্র মিত্রর সম্পাদনায় বেরিয়েছিল কবিতার কাগজ 'নিরুক্ত',) তাতে মনে পড়ছে রবীন্দ্রনাথের সতর্ক বাণীটি : "মানুষ কাশফুলের ডাঙায় দীর্ঘকাল নিজেকে ব্যাপ্ত করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়বেই।"২৩ এবং এ প্রসঙ্গে তিনি সম্পাদকদের উপদেশ দিয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ সততায় বিশুদ্ধ কবিতার সাধনা করতে।

শ্রদ্ধাস্পদ অতুলচন্দ্র গুপ্ত মহাশয় আধুনিক কাব্যকে সাহিত্যের alien corn বলতে দ্বিধা করেননি, বিষ্ণু দে-র কবিতা তাঁর কাছে প্রতীয়মান হয়েছিল 'বিশুদ্ধ ইয়ার্কি' বলে, সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্য, তাঁর মনে হয়েছিল "কাব্যের Waste Land' কিন্তু আশ্চর্য এই যে পৃথিবীর কবিতা ও মরে না ; তা শনিবারের চিঠি বললেও মরে না, অতুল গুপ্ত মশাই-এর সাময়িক ভ্রান্তিমানেও না, তাই জন্মমৃত্যুর মালা পাঁথা নানা কবিতা পত্রিকা আজও বেরোয়, বন্ধ হয়ে যায় আবার বেরোয়, তাদের নুড়িদের নাম ক্রন্দসী, মধুমুখ, সভ্যতিষা, কবিপত্র, পূর্বমেঘ, কৃত্তিবাস, একক, সীমান্ত, আধুনিক কবিতা, উচ্চারণ, অনিন্দ্য, বাংলা কবিতা, হাড়পত্র, মৃত্তপট ইত্যাদি।

Creative Literature এর সম্ভার ছাড়া বিশেষ করে Critical Literature-এর কাগজ নিছক অন্বীক্ষু-র কাছে ছাড়া অন্যদের কাছে হয়তো তেমন সজীব কৌতূহলের বিষয় নয়। তবুও নিছক কৌতূহল থেকে কখনো কখনো আমরা জানতে পাই বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে তথা এবং বিচার-সুনিষ্ঠ একটি পত্রিকা 'সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা' মাঝে মাঝে প্রকাশিত হয়, আর আছে শত বুড়ি বছরেরও অধিককাল ধরে হুগলীর শোভন, প্রাচীন এবং উপলক্ষ্যচারী প্রতীচী চিন্তার শরণীয় আধার বিশ্বভারতী পত্রিকা ; নীহাররঞ্জন রায় এবং ত্রিদিব চৌধুরী সম্পাদিত অধুনালুপ্ত "ক্রান্তি", (পরে অরবিন্দ পোদ্দার সম্পাদিত : ক্রান্তিকাল) সাহিত্যপত্র, কিংবা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক চিন্তার একনিষ্ঠ সেবাব্রতী প্রবন্ধ পত্রিকার নামটিও বিস্মৃতিযোগ্য নয়। কবিতা এবং প্রবন্ধের যুগলোপ-চারে শত বারো বছর ধরে প্রকাশিত উত্তরসূরী পত্রিকার নাম কিংবা খুবই ক্ষণকায় কিন্তু উল্লেখযোগ্য 'নির্বাচন' এবং অনিয়মিত প্রকাশ 'উত্তরণ' নামধেয় প্রবন্ধ পত্রিকা দুটির নামও মনে রাখা যেতে পারে।

নিছক তথ্য তালিকা হিসেবে সমস্ত পত্রিকার নাম না করেও বলা যায় যে আমাদের জন্মন চিন্তার সমস্ত রূপরেখা

২৩। নিরুক্ত : ১৩৫৭। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ

এই সমস্ত পত্রিকাগুলির সর্বত্র বর্তমান। এ প্রসঙ্গে আরও দুটি নাম এ মুহূর্তে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না, একটি এখনও সম্পাদকহীন অথচ ব্রতনিষ্ঠ; অন্যটি মৃত অথচ সংস্কৃতিমনা মানুষের স্মৃতিজীবিত: একটি 'সমকালীন', অন্যটি 'অমুক'। 'অমুককে' বিশেষ করে স্মরণ করি, এবং জীবনানন্দও একজন কুশল গল্পলেখক ছিলেন এই আশ্চর্য বিস্মৃত পরিচয়টিকে তুলে ধরার জন্য।

আমাদের গল্পসাহিত্যকে কেন্দ্র করে আমাদের হতাশার অন্ত নেই। কিন্তু একটি উচ্চকিত মুহূর্তের আলোয় জীবনের বৈছাতিক মুহূর্ত প্রকাশকে দেখতে আমাদের আকাঙ্ক্ষা নেই; আমাদের অর্থাৎ অন্তত: কিছু লেখক এবং পাঠকের; তাই ছোট গল্প 'বিদিশা' 'প্রচ্ছদপট' প্রভৃতি সম্প্রতি বিলুপ্ত পত্রিকায় নোতুন [redacted] প্রবাহী গল্পকারকে দেখবার চেষ্টা হয়েছে. [redacted] নামক পত্রিকায়, কিম্বা "ছোট গল্প : নোতুন [redacted] নামক সমীক্ষা পত্রে, কিম্বা হচ্ছে 'শুকসারী' নামক ছোট গল্প বিষয়ক পত্রিকায়, কিম্বা সম্প্রতি প্রকাশিত 'চতুষ্পর্ণা-উত্তরঙ্গ' এবং প্রতিষ্ঠিত "দেশ" এবং গত পাঁচবছর প্রকাশিত "অমৃত পত্রিকায়" এবং আর একটি স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত পত্রিকা 'এক্ষণে'। অনেক ভিড়ে 'একক্ষে' বিশেষ ভাবে মনে পড়ে, কারণের বিকাশের গভীরবৃদ্ধিতে দৃষ্টি তার আবিল নয়; সংস্কৃতির একটি সর্বাত্মক চারিত্র্য তার সাধ্য প্রসঙ্গ; তথাকথিত মূঢ় 'ঐতিহ্যিক' উপন্যাস থেকে উৎকলিত বাঙ্‌লাদেশকে চেনা নয়, সমগ্র বাঙ্‌লাদেশের বিস্মৃত-প্রায় সংস্কৃতি নিদর্শন এবং বিতর্কসাধ্য সাম্প্রতিক চিন্তাবালিকা যেহেতু তার জিজ্ঞাসার কেন্দ্রে। এছাড়া পরিচিত 'পরিচয়' 'চতুরঙ্গ' পূর্বাশা ইত্যাদির নামও অবশ্যই মনে পড়বে। এবং উৎসাহী পাঠক অবশ্যই 'নতুন সাহিত্য' 'অগ্রণী' কিশ শতাব্দী প্রভৃতি পত্রিকার নাম ভুলে যাবেন না।

সুধীন্দ্রপ্রসাদ ১৩৪০ বঙ্গাব্দ পূর্বাশা গোষ্ঠিকে 'ক্লাসিক' বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[২৪] তারপর যুদ্ধোত্তর মুহূর্তে ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলন ইত্যাদি গড়ে উঠেছিল; তারপর স্পষ্টতই সাহিত্যে বামপন্থা এবং দক্ষিণপন্থা নামক দুটি সুস্পষ্ট পর্যায়কে আমরা অতিব্যক্ত হতে দেখেছি বর্তমান, চতুষ্কোণ, নবপর্যায় পরিচয় এঁরা এই বামমার্গের মানব-পরিহিত সাহিত্যসাধনার বিশিষ্ট একটি দর্পনে নিজেদের চিহ্নিত করেছেন। (অধুনা বামপন্থাও সুস্পষ্ট রাজনৈতিক কারণে দ্বিধাবিভক্ত, তাই একদিকে 'পরিচয়', 'কালান্তর' ইত্যাদি অন্যদিকে 'মনন' 'নতুন পরিবেশ' চিন্তাশিবিরে বিভক্ত।)

বাঙ্‌লা সাহিত্যের এই একটি শাখার পরিব্যাপ্তপরিকল্পনায় কোনও বৈজ্ঞানিক সূত্র গৃহীত হয়নি, তাই জন্য মৃত্যুর সঠিক পরিসংখ্যান চেনানো যাবে না আধুনিক বাঙ্‌লা সাময়িক পত্রের সংখ্যা এবং স্বরূপ; (ক্রীড়াকৌতি থেকে রহস্যচিন্তা, চলচ্চিত্রের প্রয়োগ এবং প্রকাশ সমস্যা নিয়ে ভাবনাপর প্রচুর নিষ্ঠাযুক্ত পত্রিকা ('চলচ্চিত্র' 'চিত্রপট', চিত্রবন্ধ) থেকে আন্ততোষ পাঠক সাধারণের জন্য, বিচিত্র সাজে বত্রিশ ভাজা সিনেমা পত্রিকাগুলি (ত্রিশ পৃষ্ঠার উপন্যাস এবং দশ পৃষ্ঠার বড়ো গল্প সমন্বিত), সত্যিকার শিল্পভাবনায় উন্মুখ সাময়িক পত্র (অধুনালুপ্ত সুন্দরম্, অধুনা প্রকাশমান দর্শক, মহেন্দ্রোদয়ো প্রভৃতি); এবং ঐতিহাসিক চিন্তা থেকে শুরু করে (ইতিহাসে) দর্শন 'অক ভাবনা' কিম্বা বিজ্ঞান প্রসঙ্গ (জ্ঞান ও বিজ্ঞান ইত্যাদি), রাষ্ট্রনীতি নির্ধারণ থেকে (আন্তর্জাতিক রাষ্ট্র, দর্পণ, কম্পাস, যুগবাণী ইত্যাদি) শুরু করে অন্যান্যপ্রসঙ্গ [redacted] রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ কিম্বা সঙ্গীত সম্পর্কিত স্বতন্ত্র পত্রিকা, [redacted] সম্প্রদায়ের জন্য স্বতন্ত্র চিহ্নিত পত্রিকা (শ্রীমতী, বরনী [redacted] বাইরের ইত্যাদি) থেকে শুরু করে বাঙ্‌লা দেশের নাব [redacted] আন্দোলনের সহযাত্রী বিদ্বন্নাট্যভাবনায় উন্মুখ নাট্যবিষয়ক

২৪। পূর্বাশা বর্ষপঞ্জী: শ্রাবণ: ১৩৬৯ ১৪ বর্ষ ১৭ সংখ্যা

পত্রিকাবলী (অধুনালুপ্ত শারদীয়া, নিত্য প্রকাশমান 'পর্ব', 'বহুরূপী' 'পণ্যনাট্য' 'মুক্তধারা' প্রভৃতি)। বাঙলা শিশু-সাহিত্যের ক্ষীণতোয়া শাখাটিও এর পাশে অনভিগোচর নয়, সেখানে 'সন্দেশ' পুনরায় নিয়মিত প্রকাশিত হয়, আর আছে শুকতারা, মৌচাক, রামধনু, কিম্বা রোশনাই এর মতো ঝাকারিগোছের শিশু পত্রিকাগুলি। এর পাশাপাশি বয়োপ্রবীণ ভারতবর্ষ, উত্তরা, শনিবারের চিঠি, পল্লভারতী, প্রবাসী প্রভৃতি আমাদের প্রশ্ন কৌতূহলকে যতটা চরিতার্থ করে তার চেয়ে অনেক কম আমাদের সাহিত্যিক কৌতূহলকে। এ ছাড়া 'মাসিক বসুমতী এবং 'সাপ্তাহিক বসুমতী', একটি প্রাচীন প্রতিষ্ঠা অন্যটি অনতি প্রবীণ আজও : প্রবীণ এবং নবীন উভয়েরই বিষয়ণ এখানে অবাধ হলেও, সত্যি কথা বলতে কি এঁদের বিশেষ সাহিত্যিক চরিত্র সম্পর্কে আমাদের সন্দেহ নিরসিত হয় না। পাশাপাশি ব্যঙ্গপত্র 'খুড়ি বসু' কিম্বা অচলপত্রের নাম ঐতিহাসিক ভাবে স্মরণ করা উচিত।)

বিষ্ণু দে তাঁর মধুসূদন প্রাসঙ্গিক একটি উল্লেখ্য প্রবন্ধে লর্ড ক্যানিং এর একটি প্রবন্ধ উদ্ধার করে আমাদের "reasoning by analogy from Europe to India"২৪ প্রভৃত নিন্দাবাদ করেছেন, কিন্তু আজও অবধি মজার কথা এই analogy by reasoning এই প্ররোচনার বীটবংশের কাছে আমাদের কবিতার একাংশের অগ্রগতির দীক্ষা গ্রহণ করতে 'ফুৎকোত্তর প্রজন্মের' সূচনা করে, প্রজনন-সংক্রান্ত যাবতীয় অভিজ্ঞতাকে নিজের অন্যতম প্রধান সর্ত বলে ভুল করতে হয়, [redacted] ভুল ভেঙে দিতে হয় আবার সেই স্রোতঃ ঘনা [redacted] কেরই চেনা পরকে।

[redacted] ও কখনও কখনও শিল্পকে গ্রাস করে প্রবন্ধে প্রজন্ম [redacted] বোধ। বাঙলা সাময়িকপত্র কল্লোল থেকে সুরু করে আজ পর্যন্ত এই বিস্রস্রোতা সংস্কৃতির স্রোতপথটিকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছে যে পথটি বিরোধে বিক্ষোভে আবর্তে আবিলতায় স্বচ্ছতায়, শোভনতায় কদু এবং বঙ্কিম। এছাড়া আছে বিভিন্ন বৎসরের শারদ শস্য সম্ভার, নামী অনামা অজস্র অর্থে উপচারিত শারদ সম্ভারের মূল্য অর্ঘ পত্রমুক্ত জনসাধারণের জন্য নিবেদিত, পাশাপাশি কথা সাহিত্যের কিছু পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং প্রবন্ধসূত্রে কিছু চিন্তাবালিকা, এবং কবিতা নামধেয় অজস্র পদ্যবন্ধ সমারোহ সহিষ্ণু দর্শকাঞ্জনী যার অধিকাংশকেই নির্মম ভাবে উপেক্ষা করে। শহর কোলকাতার পাশাপাশি সুদূর মফঃস্বলও প্রধানতঃ ব্যবসায়িক প্রেরণায়, পরোক্ষত সাহিত্য প্রাপনার শারদীয় সাহিত্য অর্চনায় ব্রতী হয়।

আবার বিভিন্ন সাময়িক প্রসঙ্গ, কোনও শতাব্দী [redacted] সাহিত্যব্রতীর শতবার্ষিক ভ্রতোদ-যাপন, কিম্বা [redacted] কোনও সাহিত্যিকের সামগ্রিক সাহিত্য কর্ম বিচারণ [redacted] কোনও বিদেশী সাহিত্য স্মারক বিশেষ সংখ্যা অথবা বিশেষ সমালোচনা অথবা গল্প সংখ্যার প্রবর্তনা সূত্রে সাহিত্য বিচার এবং বিকাশের নোতুনতর কিছু সূত্র আমাদের হাতে এসে পড়ে। এ ব্যাপারে সাম্প্রতিককালে 'পরিচয়' 'অরণি' পূর্বাশা কিম্বা উত্তরসূরী পত্রিকার কথা বিশেষ করে মনে পড়ে।

দৈনিক পত্রিকাগুলির সাহিত্য বিভাগ এবং রবিবাসরীয় আলোচনা বিভাগগুলির কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সংবাদপত্রগুলি অবশ্যই আবর্তমান বিশ্বসংবাদের দর্পণ, কিন্তু বিভিন্ন স্রোতা সাহিত্যের চিরন্তনী কৌতূহল এবং জিজ্ঞাসা যে তাদেরও উদ্দীপিত করে উপরি উক্ত বিভাগগুলি তারই প্রমাণ পত্রী মেলে ধরে।

To the general lowering of the status of literature and of the interest in it, the innumerable little magazines have been a natural and

---

২৪। [redacted] ও আমাদের মেধোদাস : বিষ্ণু দে : সাহিত্যের মেধাবিদ্যাস দ্রষ্টব্য।

heroic response.২৬ এ অভিযোগ তুলেছেন সমালোচক লায়োনেল ট্রিলিং তাঁর একটি স্মরণীয় প্রবন্ধে। আমাদের পল্লবগ্রাহিতার প্রতি কটাক্ষ সম্পন্ন এ উক্তি অবশ্যই যুক্তি-ভূয়িষ্ঠ। এবং আমাদের প্রকাশিত সাময়িক পত্রগুলির উদ্দেশ্যেও সমানভাবে ব্যবহৃত হতে পারে। কিন্তু ত্বরিতগতি সাম্প্রতিকের সহযাত্রায় না হয় হলামই বা আমরা কিঞ্চিৎ পল্লবগ্রাহী, অনেক বন্ধ দরজার আলো, আসতো না যখন একেবারেই, এলোই না হয় একটু জ্ঞানজ্যোতি: বন্ধ জানলাটায় এলো খানিকটা দূরসঞ্চারী বাতাস, আর আমাদের এই পল্লোক্ত জ্ঞান সম্বন্ধে ই এম্, ফর্স্টারের মত আমরা সবাইত জানি এবং প্রসন্ন চিত্তে মানি: Pseudo-scholarship is the homage paid by ignorance to learning. ২৭ তাই সমস্ত নিন্দাবাদী মেনে নিয়েও বলতে পারি এই বেয়াল্লিশ বছরের সাহিত্যপত্র সকল আমাদের আপাতবদ্ধ চিন্তায় বঙ্গপ্রান্তরে স্মরণ-সুভগ পাদপাদপ।

• [বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক, তাই স্থানাভাবশতঃ অনেক উল্লেখযোগ্য পত্রিকার বিচার পরিধির বহির্ভূতেই সমাপ্ত করতে হয়েছে, ভিন্ন কোন অভিপ্রায় থেকে নয়। শ্র-ব]

২৬। Liberal Imagination, Lionel Trilling [The Function of the Little Magazine প্রবন্ধ]

২৭। Aspects of the Novel: E. M. Forster পৃ: ৯৭

রাজনৈতিক চেতনাবিকাশে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা

পবিত্রকুমার ঘোষ

ঐতিহাসিক ধারাবিবরণী দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। সাম্প্রতিককালে আমাদের সংবাদ ও সাময়িকপত্রগুলি দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে যে ভূমিকা পালন করছে আমার আলোচনা সে সম্পর্কেই সীমাবদ্ধ থাকবে। যদি অতীতের কোন তথ্য উপস্থিত করি সে শুধু পটভূমি ও দৃষ্টান্তেরই উদ্দেশ্যে। স্বাধীনতালাভের পর সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের ক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন এসে গেছে এবং বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতার নানাবিধ দিক সম্পর্কে আমাদের অবহিত হওয়া দরকার মনে করি।

১

অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিরা তাঁদের বালক-বালিকাদের দেশী স্কুলে দেওয়া পছন্দ করেন না। রাইটার্সার পদ থেকে ইংরেজি খাদ্যের বিষয় যারা অত্যন্ত উদ্যোগী তাঁরাও তাঁদের পরিবারের সন্তানদের ইংরেজি স্কুলে ইংরেজি শিক্ষা দান বাঞ্ছনীয় মনে করেন। সমাজের এই মধ্যমণিদের গৃহের বালক বালিকারা উত্তরজীবনে সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করা বিভিন্ন উচ্চাশার মধ্যে একটি বলে গণ্য করতে সুরু করেছে আজকাল—এবং তাদের পিতামাতারাও তাতে উৎসাহ দেন অবাধে। সাংবাদিকতা সমাজে আজ আর একটা অপাংক্তেয় জিনিস নয়; উচ্চাশার ক্ষেত্র এবং অভিজাত সমাজে সম্মাননীয় বিষয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিকতার শিক্ষার যে ব্যবস্থা করেছেন সেখানে নয়; বিলেতে বা আমেরিকায় সাংবাদিকতা শিখতে পুত্রকন্যাদের পাঠানোর জন্য অর্থব্যয়ে বহু অভিভাবকই এখন অকাতর। সাংবাদিকতার সামাজিক মূল্য সত্যই বেড়ে গেছে।

তারি সঙ্গে আরও দুটি জিনিস বেড়েছে। সংবাদ ও সাময়িকপত্র এখন শুধু লাভজনকই নয়, বৃহৎ লাভজনক শিল্প-প্রতিষ্ঠানদের মতোই তাদের অবস্থা। অর্থ উপার্জনের ক্ষমতা তাদের পূর্বের তুলনায় বহুগুণ বেড়ে গেছে। এবং তারই ফলে, সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠানগুলিও বৃহৎ আকার নিতে সুরু করেছে। এক একটি বড় বড় মালিক গোষ্ঠীর প্রতিষ্ঠাও এক্ষেত্রে বাড়ছে। এবং তারই পাশাপাশি ছোট ছোট সংবাদ ও সাময়িকপত্র, যাদের উদ্দেশ্য ব্যবসা নয়, স্বাধীন মত প্রচার এবং যারা বৃহৎ গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত নয়, তাদের অস্তিত্ব বজায় রাখা অসম্ভব হয়ে দাঁড়াচ্ছে। নতুন করে ছোট সংবাদ বা সাময়িকপত্র সুরু করার কথাও আজ আর ভাবা প্রায় সম্ভব নয়। বহু টাকা, বড় গোষ্ঠী এবং ব্যবসায়িক লাভের উদ্দেশ্য—আজকের সাংবাদিকতার অন্তরালে এই তিনটি বাস্তব সত্য জীবন্ত হয়ে উঠেছে এবং আজকের সাংবাদিকতার মান এই তিনটি দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

২

পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিতের হার শতকরা ২৯ জন—এটা লজ্জারই কথা। এই সংখ্যার মধ্যে অনেকেই আবার শুধু অক্ষরপরিচয়-সম্পন্ন। তবু একথা অস্বীকার করা যায় না যে, এক নতুন পাঠক শ্রেণী দেশে গড়ে উঠেছে যারা বই, সংবাদ-পত্র ও সাময়িক পত্র প্রায়ই পড়ে এবং এরা এই সব দ্রব্যের ক্রেতাও বটে। এদের অর্থোপার্জনের ক্ষমতা সীমিত, অর্থ-ব্যয়ের ক্ষেত্রেও এদের সংযত থাকতে হয়, অর্থাৎ বই বা পত্রিকা ক্রয়ের ব্যাপারে এদের ক্রয়ক্ষমতা অল্পই। তবু এরাই পাঠক এবং ক্রেতা হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ। বিত্তসমাজ এদের পরিতুষ্ট করতে উন্মুখ। এদের সমর্থন আজ কে না চায়? এদের সমর্থন তথা পৃষ্ঠপোষকতা না কোন লেখক বা সাংবাদিক হতাশ না হয়?

পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে প্রভাবশালী ও সুপরিচিত সাময়িক পত্রগুলি বৃহৎ সংবাদপত্র মালিকদের দ্বারা পরিচালিত। আমাদের লেখক সম্প্রদায় এবং বিশেষত তরুণ লেখককুল এই পত্রিকাগুলির প্রধান অভিভাবকাকাঙ্ক্ষার। অভিজ্ঞতা হতে আমি বিশেষ বিশেষ সংবাদপত্রের বার্তা-সম্পাদকের ঘরে এবং সুপ্রসিদ্ধ সাপ্তাহিকদের বিভাগীয় সম্পাদকদের আশেপাশে তরুণ লেখকদের যে পরিমাণ ভীড় জমে এবং তোষামোদের বন্যা বয় তা জানা না থাকলে অবাস্তব ও অবিশ্বাস্য মনে হয়। এরকম ঘটে এ কারণেই যে বড় বৃহৎ সংবাদপত্রগোষ্ঠী পরি-চালিত বহুল প্রচারিত সাময়িকপত্রের সঙ্গে যুক্ত না থাকলে, দেশের নবোদিত বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর দরবারে পৌঁছতে পারা যায় না, এবং তা না পারলে তাদের সমাদর লাভেরই বা সম্ভাবনা কোথায়?

অর্থাৎ, আজকের বিত্তসমাজ চায় বৃহৎ পাঠকগোষ্ঠীর আনুকূল্য, কেননা অর্থ ও যশ এবং আত্মপ্রসাদ লাভের সেটাই পথ; এর জন্য তাদের অনিবার্য কৌশল হয় বৃহৎ সংবাদপত্র-গোষ্ঠী পরিচালিত সংবাদ বা সাময়িকপত্রের স্নেহাশ্রয় লাভ করা। এবং এই সংবাদ ও সাময়িকপত্রদের সুবিধা থেকে সুবিধা। পাঠক ও লেখক দুই দলই তাদের অনুকূল, তাদের বশ। গোটা দেশের ভাবনা-চিন্তার নিয়ন্ত্রণে এদের ক্ষমতা অপরিসীম—নতুন পাঠকসমাজের মন ও মতামত গঠনে এদের ভূমিকা ব্যাপক। অথচ তার সঙ্গে আদা উচিত যে দায়িত্ববোধ তার বালাই এদের নেই। কেন নেই তারও আছে সমাজতাত্ত্বিক কারণ।

৩

আমাদের বৃহৎ পত্রিকাগুলি যারা পরিচালনা বা সম্পাদনা করেন তাঁদের অনেক বাধ্যবাধকতা তথা সীমার মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। একটা বড় প্রতিষ্ঠানকে যে সমস্যাগুলির সম্মুখীন হতেই হয় সেগুলি প্রধানত এই: এক, শ্রমিক ও

কর্মচারীদের সংখ্যা ও বেতন দুইই এখন বেশি ; দুই, শ্রম-বন্ধকের নিয়মাবলী অনুসারে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা কর্তৃ-পক্ষকে গ্রহণ করতে হয় যার ফলে কর্মচারী খাতে আরও ব্যয়বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী ; তিন, সরকারী আয়কর বিভাগের কাছে সর্বদা তটস্থ হয়ে থাকতে হয় এবং হিসেবের কারচুপি যতই কেননা করা হোক আয়কর-দপ্তরের অফিসারদের দৃষ্টি এড়ানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। বিশেষত সংবাদ ও সাময়িক পত্রদের ক্ষেত্রে। এক, সিউলেশনের হিসাব দেখানোই একটা বিরাট সমস্যা। পদে পদে কর্তৃপক্ষকে ভীতিকর অবস্থায় পড়তে হয়। এই অবস্থা হতে আত্মত্রাণের জন্য সরকারের সঙ্গে বোঝাপড়ায় না এসে তাদের উপায় থাকে না। বড় বড় শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানগুলির হয়তো এ সমস্যার মুখোমুখি হতে হয় না, যে রাষ্ট্রনৈতিক প্রতিষ্ঠান সরকার গড়ে সেই প্রতিষ্ঠানকে মাঝে মাঝে দান ও খয়রাতি করলেই তাদের কাজ চলে যায়। কিন্তু বৃহৎ সংবাদ ও সাময়িক পত্রদের পক্ষে শুধু শুটসুতেই পার পাবার উপায় থাকে না ; আর্থিক বদান্যতা তাদের কাছে বরং প্রত্যাশাই করা হয় না, উপরন্তু সরকারী তরফ হতে তারা পায় আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা। তাদের কাছে সরকার-গঠনকারী রাষ্ট্রনৈতিক দলটির আশা থাকে, নীতিগত সমর্থন লাভ। গণতান্ত্রিক আবহাওয়ায় সংবাদ ও সাময়িক পত্রদের জনমত গঠন ও পরিচালনার যে অপরিসীম ক্ষমতা থাকে, সংবাদ পরিবেশন ও সংবাদের বিশ্লেষণের দ্বারা গোটা জনসাধারণকে যে ভাবে প্রভাবান্বিত তারা করতে পারে তা সরকার ও সরকারী দলের পক্ষে উপেক্ষণীয় নয়। আজকের দিনে সরকারী প্রেস নোট, বিজ্ঞাপন বা বন্ধুদের বিবৃতিতে আস্থা আরোপ করতে কাউকেই বড় একটা দেখা যায় না ; কিন্তু সংবাদপত্র নিরপেক্ষতার ভাণ বজায় রেখে যে তথ্য পরিবেশন করে এবং কোন নীতি ও কার্যক্রমের যে ব্যাখ্যা করে, সংবাদপত্রের পাঠককুল তাতে অন্তত অংশত সায় না দিয়ে পারে না। আগেই বলেছি, অধুনা মুদ্রণ ও সাময়িকপত্রের দ্বারা পাঠক তাদের অধিকাংশ স্বল্পশিক্ষিত ; (দেশী ভাষায় প্রচারিত সংবাদ ও সাময়িকপত্রের পাঠকসংখ্যা এজন্যেই ক্রমবর্ধমান) এবং শিক্ষিতাভিমানীরাও প্রত্যেকে নিজের মত নিজে গঠনে উৎসাহী নয়। আধুনিক যুগে মানুষের জীবন যে পরিমাণ ব্যস্ততা লাভ করেছে এবং যে বহুবিধ বাস্তব ও কাল্পনিক সমস্যার দ্বারা মানুষ ভারাক্রান্ত, তাতে সব জিনিসে একটা নিজস্ব মত গঠনের সময় তার নেই। তাগিদও নেই, কেননা নিজের মত গঠন ব্যাপারটি যেমন কষ্ট-সাধ্য, তেমনি অনাবশ্যক ; সমাজের দায় তাতে নেই। আজকের সমাজ, ডেভিড রিসম্যানের প্রযুক্ত শব্দ ব্যবহার করতে গেলে, চায় conformity ; ব্যক্তি-মানুষের উন্নত ব্যক্তিত্ব তার কাম্য নয়। সমাজ চায় একটা গড়পড়তা, প্রথা, সংস্কার প্রভৃতির যুগোপযোগী, সামাজিক প্রয়োজনীয় প্যাটার্ন থাকবে—সেই প্যাটার্নের সঙ্গেই নিজেকে সবাই খাপ খাইয়ে নেবে। অতীতকালেও এই কনফর্মিটির দাবী ছিল। সে ছিল ঐতিহ্যগত, চিরকালাগত প্যাটার্নের সঙ্গে খাপ খাওয়াবার দাবী ; প্রাচীন ধর্ম, মূল্যবোধ, সামাজিক অনুশাসন ও কাম্যতা মেনে নিত তখন মানুষ, নির্বিচার বাস্তবতা ছিল সেসময়কার বৈশিষ্ট্য। আধুনিক যুগের সূত্রপাতে, রেনেসাঁস-প্রভাবিত সময়ে মানুষ তার কালাগত ঐতিহ্যকে প্রশ্ন করতে সুরু করে, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে, প্রচলিত প্রথা ও সংস্কারকে সরাসরি অমান্য করে। ব্যক্তি তখন পথ চলতে চেয়েছে নিজের আন্তর-চেতনার আলোয়, নিজের স্বার্থবশে। স্বার্থের নিরীখে পথ চলতে চাওয়ার ফলে তাকে অনুসরণ করতে হয়েছে প্রতিপদে নিজের বিবেক, নিজের যুক্তির নির্দেশ এবং প্রচলিত মূল্যবোধের সঙ্গে সংঘাত লাগলে তাকে হয় সে ডিঙিয়ে গেছে নয়তো ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছে। রিসম্যান এই অবস্থার মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন inner-directed, এই মানুষ বিজ্ঞানের আবিষ্কারক, সাহিত্যে

নতুন শৈলীর প্রবর্তক, নিজের মতামত ও আদর্শ প্রচারে উদগ্রীব, মনের গোপন চিন্তা ও বাসনাকে অস্বীকার করতে, তার জন্য লজ্জা অনুভব করতে নারাজ ; যে চিন্তাকে প্রকাশ করা যায় না তার অসংবদ্ধতা, অসংলগ্নতা ও অস্পষ্টতার অভাবের ধরুণ সে চিন্তাতেও তার নিজস্বতার স্পর্শ আছে বলেই তাকে পরিহার করতে সে অগ্রাজি এবং তাকে লিপিবদ্ধ করতে সে উন্মুখ। এ জন্য সে ব্যক্তিগত ডায়েরি রাখে। এই ডায়েরি রাখার অভ্যাস বা প্রেরণা সম্পূর্ণভাবেই নতুন কালের জিনিস—প্রাচীন কালে এ জিনিসটার চল ছিল না, কেন না এর প্রয়োজনীয়তা তখন উপলব্ধি হয়নি।

সংঘবদ্ধ শিল্প-সংগঠনের যুগে এই আন্তর-তাগিদে চলমান লোকটিরও মৃত্যু ঘটেছে—রিসম্যান বলছেন, আজকের সমাজে মানুষের মনের প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন আকার নিয়েছে। বিদ্রোহের বদলে সে আবার চলে গেছে বাস্তবতার দিকে, ঝুঁকেছে সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক mores-এর দিকে। এই বাস্তবতাই অধুনাকালে মানুষের সাফল্যলাভের চাবিকাঠি। চাকরিলাভ, চাকরিতে উন্নতি, ব্যবসায়ে সুযোগ-সুবিধা লাভ এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা এ সকলই এখন নির্ভর করে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের রুচিপ্রদর্শন, আলাপচারিতা, ব্যবহার, এটিকেট ইত্যাদির ওপর। আজকের দিনে দারিদ্র্য বা অস্বচ্ছলতা বহুনিন্দিত জিনিস, আদর্শবাদের জন্য, নিজের বিশ্বাসে অটল থাকার জন্য যে বৈষয়িক সাফল্য পরিহারের চিন্তা, যার একটা সামাজিক সম্মানজনক স্বীকৃতি ছিল আমাদের দেশে স্বাধীনতা লাভের পূর্বযুগে, আজ তা মূঢ়তা, অপরিণামদর্শিতা, হাস্যকর ও মূল্যহীন বলে কথিত। আজকের জীবনযাত্রার একটা সমাজসাপ্ত প্যাটার্ন গড়ে উঠেছে ; বাসস্থল, কর্মফল, পুত্রকন্যাকে শিক্ষাদান, সর্বাধুনিক জীবন-ভোগের উপকরণগুলি সংগ্রহ ও ব্যবহার, কথাবার্তার আভেলেকচুয়েল মূলভত্তা, শ্রবণ—এইসব দিয়ে আজকাল একজনের সামাজিক প্রতিষ্ঠা নির্ণয় হয়। এই যে নতুন মূল্যমান গড়ে উঠেছে এর দর্পণে নিজেকে প্রতিবিম্বিত করতে সবাই উৎসুক, এমনকি রাবণরাজ,—আর এর জন্য একান্তভাবে যা দরকার তার নাম বৈষয়িক সাফল্য। জমিদারি প্রথা উঠে গেছে, বৈষয়িক সাফল্যের নিশ্চিত অন্য কোন ভিত্তি আর নেই। প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে তা অর্জন করে নিতে হয়। অর্জন করবে কি ভাবে? অফিসে, ক্লাবে, এসোসিয়েশনে বেশে, এটিকেটে, আলাপের নিখুঁত কৌশলে, অর্থব্যয়ের সামর্থ্যে এবং সর্বোপরি যে মত সর্বগ্রাহ্য, যাতে কেউ তেমন আপত্তি করবে না, সেই মত একান্তভাবে নিজের মত বলে সূক্ষ্ম নিপুণতার সঙ্গে পেশ করায়। জীবনযাপনে যারা মুর্জোয়াদের মধ্যেও মুর্জোয়া, নিজেদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য আর অপরিমিত বিলাসে যারা ডুবে আছে চিরকাল, তারাও কমিউনিস্ট মতবাদের পোষকতা দেখায়, বামপন্থী শ্লোগান নিজেদের বাক্যালাপের মাঝখানে টুকরো টুকরো করে ছড়িয়ে দেয়, কেননা এটা একটা সাম্প্রতিক সামাজিক more; যেমন ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দান ও একটা more. এইসব পরস্পরবিরোধী আচরণের মাঝে যে একটা অসঙ্গতি আছে সেটাও গ্রাহ্য নয়—কেননা, আগেই বলেছি যে মানুষের কথা আমরা আলোচনা করছি, উন্নত শিল্পযুগের সেই মানুষ, রিসম্যানের ভাষায় other-directed ; নিজের আচরণ ও বাক্যের, বিভিন্ন সময়কার বিভিন্ন ধরণের মতবাদ পরিপোষণের, বিভিন্ন মূল্যবোধের, এমনকি বিশ্বাসেরও মাঝে যে অসঙ্গতি আছে, অন্তরায় আছে তা আবিষ্কার করা এই মানুষের উদ্দেশ্য নয়, আত্মবিশ্লেষণ তাঁর কাম্য নয়—আত্ম-সমীক্ষার প্রশ্ন তাই তাঁর কাছে অবান্তর। কারণ এতে তাঁর বৈষয়িক ও সামাজিক লাভের পথ সুগম করে না। চাকরির ইন্টারভ্যু, রাষ্ট্রের পরিচালক নেতা ও উঁচুধাপের অফিসারদের মনোরঞ্জন, যা সমাজের উচ্চতর স্তরে নিজের সাফল্যের পথ নিজস্ব মৌলিক মতামত উপস্থাপনে পাকা হয় না ; অপরের মতে এমনভাবে সায় দেওয়া যেন সেটা নিজেরই মত—এটাই

সবাই চায়; শুধু রাজনৈতিক মতামত নয়, জীবনের বহিরঙ্গ আকরণের ক্ষেত্রেও এই মাতব্বরই একান্ত দরকার, কেননা it pays.

মানুষ তাই প্রশ্ন করতে ভুলে গেছে, আত্মনির্ভরশীল হয়ে যুক্তির ধারা অনুসরণ করতে ভুলে গেছে, সৎ ও নিষ্ঠাবান বিশ্লেষণে তার আস্থা বা প্রবৃত্তি নেই। সমাজের ভিতর তার ভাগিদও নেই। যথাযুগস্থলভ অন্তর্বিষাদ বা সংস্কারাচ্ছন্নতার প্রশ্ন এটা নয়। কিন্তু আধুনিক যুগের সূত্রপাতে, রেনেসাঁসী মূল্যবোধ ও বৈজ্ঞানিক চেতনার প্রসারের কালে মানুষ যে সর্ববিষয়কে যাচাই ও তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণের দৃষ্টিতে দেখতে শিখেছিল আজ তার সে প্রয়োজন ও প্রবণতা নেই; সমাজে প্রতিষ্ঠিত, প্রচলিত, সম্মানিত মত, আচার ও জীবনভঙ্গী এমনভাবে নিজের করে নেওয়া যেন নিজেরই যুক্তিবুদ্ধিবলে এই জিনিসগুলিকে উদ্ভাবন ও উপযুক্ততম বলে নির্ধারিত করা গেছে; অন্ধসংস্কার নয়, আত্মার ভিতরে এই কলকব্জির বাদ্য এমন সহজ ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে, যে এটা আধুনিক মানুষের স্বরূপলক্ষণ বলেই এখন মেনে নিতে হয়।

যুগের স্বভাবে যখন মেনে নেবার বৃত্তি এমন চারিয়ে গেছে তখন সমাজে totalitarian মতবাদ ও দৃষ্টিভঙ্গী সহজেই দানা বেঁধে ওঠে। রাষ্ট্র হয়ে ওঠে এই মতবাদের আশ্রয় ও যন্ত্রস্বরূপ। আধুনিক রাষ্ট্রের তাই সব বিষয়ে বক্তব্য ও পরিকল্পনা আছে: অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনা, জনসাধারণের জীবনযান, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কার, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের ফলাফল নির্ণয় ও তার ব্যবহার, সাহিত্য, রাজনৈতিক দর্শন, পরিবার পরিকল্পনা, শিক্ষা, মায় শিশুপালন পর্যন্ত। আধুনিক রাষ্ট্রকে, মার্ক্সীয় ভাষায়, শুধু পুঁজিবাদী বা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণীর হাতিয়ার বললেই সব বলা হয় না; কেননা এই রাষ্ট্র নিজে ব্যবসা বাণিজ্যে অংশ নিচ্ছে, নিজে বড় কারখানা ও কৃষিকর্মের মালিক হয়ে উঠছে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা জাতির অহং চরিতার্থতার প্রধান উপকরণ হয়ে উঠেছে—আলকের রাষ্ট্র যেমন করেই একটা গোটা জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করার হাতিয়ার হয়ে উঠছে, তেমনি বিপুল ও ব্যাপক শক্তি ও ক্ষমতা অর্জন করার এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী লোকায়ত্ততা লাভের সুযোগে রাষ্ট্র জাতির ওপর চাপিয়ে দিচ্ছে যান্ত্রিক জীবনভঙ্গী, যান্ত্রিক ভাবনা-কল্পনা, যান্ত্রিক আদর্শ ও মননের প্যাটার্ন। রাষ্ট্রকে আজ আর leviathan বললেও যথেষ্ট বলা হয়না, সর্বক্ষমতার অধীশ্বর বলাও যথেষ্ট নয়—এই রাষ্ট্র বাস করছে অন্তর্ভাবে, অপ্রত্যক্ষভাবে নাগরিক মানুষের মনের কন্দরে, এমনকি তার আত্মার মাঝে। রাষ্ট্রকে সে ভয় করে, ভালবাসে, ঘৃণা করে, আবার তারই মাঝে নিজের ব্যাপ্ত অহং চেতনার প্রতিবিম্বন দেখে রাষ্ট্রকে সে নিজের সত্তা বলেই অনুভব করে; রাষ্ট্র যেন তার নিজেরই বিরাট রূপ, বৃহৎ ব্যক্তি writ large. ঈর্ষা, ঘৃণা, ভালবাসা ও আপন বলে অঙ্গীকার করে নেওয়া—এসব যুগপৎ চলে বলেই আধুনিক রাষ্ট্রের প্রতি আধুনিক মানুষের মিশ্রানুভূতির উদ্ভব; সে কখনো রাষ্ট্রকে পীড়নকারী, অত্যাচারী ও অসহনীয় পরিমাণ ক্ষমতার অধিকারী বলে মনে করে, আবার সে এই রাষ্ট্রেরই ছত্রচ্ছায়ার খোঁজে নিরাপদ আশ্রয়, জীবনের নিরাপত্তা, জীবনের বিকাশের সকল অনুকূল ব্যবস্থা—চায় রাষ্ট্র এনে দেবে তার অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান, তার সন্তান-সন্ততিদের শিক্ষার দায়িত্ব নেবে রাষ্ট্র, তার পরিবারের রোগ-চিকিৎসার দায়িত্বও নেবে রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের কাছে কী আশা চাই না! এমনকি বিদেশে আমি ভারতীয় বলে যেন সম্মান পাই—এ দায়িত্বও রাষ্ট্রকে নিতে হবে।

রাষ্ট্রকে যে আমরা শ্রদ্ধা করি তা নয়—তাহলে রাষ্ট্র-পরিচালকদের প্রতি আমাদের সম্মানবোধ আরও প্রখর হত। রাজনীতি জিনিসটাই যে সর্বগ্রাসে শ্রদ্ধার আসন হারিয়ে ফেলছে তার কারণ রাষ্ট্র আমাদের আনুগত্য যতটা পায়, শ্রদ্ধার অধিকারী সে তত পরিমাণে নয়। অথচ আমাদের মনের অন্তরালে যত গোপন বাসনা সবগুলই প্রতিদ্বন্দ্বী আজ রাষ্ট্র এবং

আমাদের অন্তরের বাসনার মাঝে রাষ্ট্রের ভিৎ আজ পাকা। রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রপরিচালকদের প্রতি আমাদের অবিশ্বাস মাঝে মাঝে ঘনায়মান হয়ে ওঠে, তাই চতুর্দিকে তার সম্পর্কে এত সন্দেহ ও সমালোচনা ;—কিন্তু আবার তার প্রতি আনুগত্য ও বাস্তবতাও আমাদের পক্ষে স্বভাবসিদ্ধ, আমাদের মনের মাঝেই তার প্রতিষ্ঠা।

রাষ্ট্রপরিচালকরা আধুনিক মানুষের মনের এই দোলাচলতা সম্পর্কে অভিশয় ওয়াকিবহাল। তাই তাঁরা জানেন তাঁদের বক্তৃতা, বিবৃতি ও ভাষ্য লোকে সন্দেহাতীতভাবে মেনে নেবে না—কিন্তু তাঁদের বক্তব্যই যদি কোন এজেন্ট নিরপেক্ষতার ছদ্মবেশ পরে, জনসাধারণের মুখপাত্র সেজে, প্রচার করে তবে সেই বক্তব্য সমাজে প্রতিষ্ঠা পেতে দেরি হবে না ? কেননা সেই বক্তব্যকে মেনে নেবার তাগিদ জনতার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে। সংবাদ ও সাময়িকপত্র এ পক্ষে রাষ্ট্রের সবচেয়ে কার্যকরী ও সবচেয়ে শক্তিশালী এজেন্ট। তার আর এক কারণ এই যে জনসাধারণের অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রবণতাকে উস্কে দেওয়ারই ভিত্তিতেই সংবাদ ও সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা ও প্রসার সম্ভব হয় :—তারা দেখাবে যে রাষ্ট্রযন্ত্রে কত চুরি ও দুর্নীতি ঘটছে, কত জনবিরোধী নীতি রাষ্ট্র অনুসরণ করছে, রাষ্ট্রপরিচালকদের ব্যক্তিগত স্ক্যাণ্ডালও তারা রটনা করবে—আধুনিক মানুষ ঠিক এই সবই চায়। তারপর ঐ সংবাদ ও সাময়িকপত্ররাই সূক্ষ্মভাবে এমন মতামত গড়ে তুলবে, এমন একটা চিন্তার আবহাওয়া দেশে সৃষ্টি করবে যা সম্পূর্ণই রাষ্ট্রপরিচালকদের অনুকূল। কেন করবে ? না করে উপায় নেই। আজকের সংবাদ ও সাময়িকপত্রকে যেমন একদিকে হতে হবে জনপ্রিয়, তেমনি আর একদিকে তার চাই বিজ্ঞাপন —সরকার ও শিল্পপতি উভয়েরই—তার চাই কণ্ট্রোল দরে কাগজ পাবার ও প্রয়োজনের চেয়েও বেশি পরিমাণে পাবার উপায়, তার চাই আয়কর বিভাগের দৌরাত্ম্য হতে মুক্তি এবং রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতা তার stability ও শিল্প প্রতিষ্ঠান হিসাবে তার prestige দুইই বাড়িয়ে তোলে। আজকের যে কোন সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রতিষ্ঠানে কত জন লোক কর্মনিযুক্ত, কত জন অফিসার আছে, তাদের বেতনের স্কেল কী রকম, কতজন প্রতিনিধিকে তারা বিদেশে পাঠাতে পারে বা নিযুক্ত করতে পারে—এগুলি প্রতিষ্ঠানের সম্মানের পক্ষে খুব মূল্যবান প্রশ্ন। কোন সংবাদপত্র 'ক' শ্রেণীভুক্ত এ প্রশ্নও অতি জরুরী আজ—কি দেশের পাঠকসম্প্রদায়ের চোখে, কি সরকারের চোখে এবং কি সংবাদপত্রের পরিচালক ও কর্মীদেরও কাছে। একটি সংবাদপত্রের আদর্শবাদ ও সত্যনিষ্ঠা কতটা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হচ্ছে প্রতিষ্ঠান হিসাবে সেই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানটি কত বড়, কতটা টেঁকসই এবং তার prestige কতখানি—অর্থাৎ সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তিরা তাকে কতখানি দাম দেয়। একখানি 'ক' শ্রেণীভুক্ত সংবাদপত্র যে মতবাদ সম্পন্নই হোক না, তাকে সরকার, শিল্পপতিরা, দক্ষিণ ও বাম উভয়পন্থী রাজনৈতিক দলগুলি এবং পাঠক-সম্প্রদায় সমভাবে দাম দেয়। একখানি ক্ষুদ্র পত্রিকা যত সত্যনিষ্ঠ, আদর্শবাদী ও বিশ্লেষণনিপুণই হোক না কেন লোকচক্ষে তার আসন আজকাল খুব উর্ধ্বে হতে পারে না। লেখককুলের চক্ষেও না। যে কোন পত্রিকা সম্পর্কেই লেখককুলের প্রথম প্রশ্ন : "লিখলে টাকা দেয় ? কত টাকা দেয় ?" যে পত্রিকা যত বেশি টাকা দেয় লেখকের চোখে তার স্থান তত উচ্চে। সমাজের যারা সবচেয়ে স্পর্শকাতর ও সচেতন ব্যক্তি, যারা লোককে আদর্শের সন্ধান, রসের সন্ধান সত্যের সন্ধান দেয় বলে কথিত—তাদেরই মানসিক প্রতিক্রিয়া যখন এই তখন বৃহৎ সংবাদ ও সাময়িক পত্র প্রতিষ্ঠানকে মারে কে ? বস্তুতঃ এই কারণেই ক্ষুদ্র পত্রিকা প্রকাশ বাণবিলাসের অপপ্রয়াস বলে ধরে নিয়েছে সমাজ—শুভানুধ্যায়ীরা তাতে বাধা দেয়, শিল্পপতিরা হাসে এবং সরকার তাদের অস্তিত্বকে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনেনা। পাঠক ? তার সমাদর হতেও ক্ষুদ্র পত্রিকা বঞ্চিত। সত্যনিষ্ঠা, আদর্শবাদ ও

দীপ্ত যখন আজ সংবাদ ও সাময়িকপত্রের পক্ষে সম্পদ নয়, গৌরবের বিষয়ও নয়। বৃহৎ প্রতিষ্ঠান, বহুল বিজ্ঞাপন, ঘাট অঙ্গসজ্জা, সমাজের প্রতিষ্ঠিত শক্তিদের সমর্থন—এসবই আজকের সংবাদ ও সাময়িকপত্রকে সহনীয় ও গৌরবান্বিত করে। এমনকি জনসাধারণের চোখেও।

৪

বাংলাদেশে সংবাদপত্র যখন ভূমিষ্ঠ হয় সে সময়ের পরিস্থিতি আর আজ যখন সমাজের উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষী বালক ও যুবকদেরও সাংবাদিকতাকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করার একটা অনিবার্য তাগিদ দেখা যাচ্ছে—সাংবাদিকতার এই গৌরবকালের পরিস্থিতির মধ্যে কত তফাৎ। বাংলা গদ্যের, বাংলা ছাপা হরফের মতোই বাংলা সংবাদ ও সাময়িকপত্রের জন্মলগ্নে খ্রীষ্টান মিশনারিদের অবদান আমাদের স্বীকার করে নিতে লজ্জা নেই। এই মিশনারিরা এদেশে সম্মান কুড়োতে আর ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করতে আসেননি: তাঁদের ছিল আদর্শের প্রেরণা, নিজেদের আদর্শে বিশ্বতর জনসাধারণকে দীক্ষা দেবার প্রেরণা। এদেশের ধর্ম, লোকাচার, জ্ঞান বিদ্যা এ সমস্তকেই তাঁরা অন্ধকারের জিনিস, স্থূল মনে করতেন আর সেই অন্ধকার হতে এ দেশবাসীকে উদ্ধারের মহৎ ব্রত ও সঙ্কল্প তাঁদের ছিল। অন্ধকারত্বের স্বরূপ নিয়ে এবং উদ্ধারের পথ নিয়ে তাঁদের সঙ্গে এদেশের মনীষীদের ঘোরতর মতভেদ ও বিবাদ উপস্থিত হয়েছিল—এবং সমাজের সমস্যা ও বেদনাকে প্রতিবিম্বিত করা, সমাজ সংস্কার ও নতুন জাতীয় চেতনার প্রসার ঘটানোর আড়ি নিয়ে আমাদের দেশীয় লোকদের পরিচালনায় একের পর এক সংবাদ ও সাময়িক পত্রের প্রকাশ সুরু হয়। রাজা রামমোহন, ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত হতে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় পর্যন্ত বাংলা দেশে সংবাদ ও সাময়িকপত্র প্রকাশের এক সুদীর্ঘকাল কেটেছে মূলত: আদর্শের পূজা, জাতির অবনতির জন্য ক্রন্দন, অকুণ্ঠোভয় সত্যনিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। তখন সংবাদ ও সাময়িকপত্রে চাকরি সুখকর, লাভজনক ও সম্মানপ্রদ ছিল না—লেখা দিয়ে সাহায্য করেও বিনিময়ে অর্থ সুলভ ছিল না। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত ভারতখ্যাত পত্রিকাগুলিতে লিখেও লেখকরা টাকা পেতেন কি না এবং পেলে কত পেতেন তা জানতে ইচ্ছা করে, এবং যাঁরা ঐ পত্রিকাদের চাকরি করতেন তাঁরা যৎসামান্য বেতন পেতেন তাতেও সন্দেহ নেই—কিন্তু সেই পত্রিকার সত্যনিষ্ঠা আদর্শবাদ ও অকুণ্ঠোভয় দেশসেবার তুলনা খুঁজে থাক, কোনো প্রতিবিধানই যেন আজকের বৃহৎ ও প্রসিদ্ধ পত্রিকাদের কাছে দুষ্প্রাপ্য, আশার অতীত বিষয়। দীর্ঘকাল আমাদের সংবাদ ও সাময়িকপত্রদের প্রকাশের মূলে ছিল সুতীব্র বিদ্রোহচেতনা, দীর্ঘকাল আমাদের সংবাদপত্রসেবীদের সাধনা ছিল প্রচলিত ভাবধারার বিরুদ্ধে নতুন বিচার তোলা, নতুন মত ও আদর্শের উদ্ভাপনা; আজ তার বদলে শুধু অর্থলাভই মুখ্য হয়ে ওঠেনি, উঠেছে বৃহৎ ও প্রচারবহুল সংবাদ ও সাময়িকপত্রের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করার দুর্বার বাসনাও। এবং তার সঙ্গে অবশ্যম্ভাবীরূপে সাংবাদিকদের জীবনে এসেছে বশ্যতা, বাধ্যতা, প্রতিষ্ঠিত শক্তির প্রতি আনুগত্য। দেশবাসীর রাজনৈতিক চেতনা-বিকাশে এটা কতখানি সহায়ক হবে এবং আদৌ সহায়ক হবে কি না, তা গবেষণাযোগ্য বিষয়।

সম্পাদকীয়

পরলোকে প্রাক্তন বিপ্লবী নেতা মাখনলাল সেন

অনুশীলন সমিতির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা বিপ্লবী নেতা এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক প্রবীণ মাখনলাল সেন পরিণত বয়সে পরলোক গমন করেছেন। যাদের প্রেরণা প্রতিভা ও নেতৃত্বে বাংলার অগ্নিযুগ ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে অক্ষয় স্বাক্ষর রেখে গেছে পরলোকগত শ্রীমাখনলাল সেন তাঁদের অন্যতম। বৈপ্লবিক কর্মপ্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সাংবাদিকতায়ও নিজের প্রতিভাকে সফল করে তুলেছিলেন। পরবর্তী যুগে বিচ্ছেদ সত্ত্বেও, আনন্দবাজার পত্রিকা যে দুই জন ব্যক্তির অক্লান্ত প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠা অর্জনে সক্ষম হয় মাখনবাবু ছিলেন তার অন্যতম। এই আজন্ম বিপ্লবীর স্মৃতির প্রতি জানাই গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। লোকান্তরিতের পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি।

পাকিস্তানি আক্রমণ

সমগ্র পাক-ভারত সীমান্ত এলাকায় সশস্ত্র বাহিনীর সমাবেশে পাকিস্তান ব্যাপক সমরায়োজনে উদ্যত হয়েছে। এরই মধ্যে গত ৯ই এপ্রিল সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্ত লঙ্ঘন করে পাকিস্তানী সশস্ত্রবাহিনী ভারতীয় অঞ্চল কঞ্জরকোট দখল করে নিয়েছে। অতঃপর ২৩শে ও ২৪শে এপ্রিল এক ব্রিগেড পদাতিক, প্রচুর শস্ত্র-সম্ভার ও ট্যাঙ্কবহর সমেত এই সীমান্তে ভারতীয় এলাকার ছয় সাত মাইল অভ্যন্তরে পয়েন্ট ৮৪ ও বিয়ারবেট প্রচণ্ড পাকিস্তানী আক্রমণে প্রতিরোধকারী মাত্র এক কোম্পানী ভারতীয় সেনাবাহিনী পর্যুদস্ত হয়ে এই ঘাঁটি দুইটি ছেড়ে দিয়ে পশ্চাদপসরণে বাধ্য হয়।

কিন্তু পাকিস্তানী সমরায়োজনের পূর্বাভাস সত্ত্বেও সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণের আঘাত প্রতিহত করবার প্রস্তুতি ভারতের ছিল না, বিয়ারবেট ও পয়েন্ট ৮৪ এলাকা বে-দখল হয়ে তা সপ্রমাণ করে দিলো। লজিস্টিকের দুর্গমতার আড়ালে ভারতীয় এলাকার বহু বর্গমাইল পাকিস্তানী দখলে চলে যাবার যে সরকারী যুক্তি; সেই যুক্তির বলেই লজিস্টিকের দুর্গমতার নিরিখে সীমান্তের আরও অন্যান্য ভারতীয় এলাকাও পাকিস্তানী দখলে তুলে দেবার সামরিক বাধ্যবাধকতা অনায়াসেই মেনে নিতে হয়। সে-অবস্থায় পাকিস্তানী আক্রমণের সামনে লজিস্টিকের অবরোধ ভারতবর্ষের ভৌগলিক সার্বভৌমত্বকে প্রহসনে পরিণত করবে। কিন্তু পাকিস্তানের আক্রমণাত্মক নীতিকে নিরস্ত্র করবার জন্য তাদের ক্ষেত্রে সীমান্তের যে অঞ্চলে লজিস্টিকের দুর্গমতা রয়েছে, সেখানে প্রত্যাঘাত হানতে ভারত সরকারের দ্বিধা কেন? ভৌগলিক সার্বভৌমত্ব রক্ষার এবং আক্রমণকারী সেনাবাহিনীকে প্রতিহত করবার সরকারের যে অনিবার্য দায়িত্ব রয়েছে, সে-দায়িত্ব পালনের অন্য কোনো পন্থা নাই। আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে দেশের সেনাবাহিনীকে একদিকে হীনমন্য করে তুলে পরাজয়ের মনোভাবে জর্জরিত করে তুলবে অপর দিকে শত্রুকে স্পর্ধান্বিত করে উত্তরোত্তর সীমান্ত আক্রমণে উৎসাহিত করবে। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণের পরও ভারত সরকার যে এই শিক্ষা গ্রহণ করে নাই, সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণের মধ্য দিয়ে সে কথাই মূর্ত হয়ে উঠলো।

ভারত সরকার বৃটিশের আপোষ-মীমাংসার ফাঁদে পা দিয়ে সামরিক-যুদ্ধবিরতি স্বীকার করে নিয়েছে এবং উইলসনের প্রস্তাবের আলোচনায় কালক্ষেপণ করে যে ভাবে ভারতীয় এলাকার উপর পাকিস্তানী দখলের স্বীকৃতি দিচ্ছে, আক্রমণকারীর কাছে তা আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। ১৯৬৫র ১লা জানুয়ারীর স্থিতাবস্থায় ফিরে আসার লজ্জাপ্রসূত সর্তের পুনরাবৃত্তি করে প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রী সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্তে দ্বিতীয় কাশ্মীরের ভূমিকাই রচনা করছেন, তাছাড়া ভারত সরকারের সিন্ধু-কচ্ছ সীমান্ত ইংরেজ আমলেই সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত হয়ে গেছে। আজ উইলসনী প্রস্তাব ও বক্তৃতা পাকিস্তান ও ভারত—দুই পক্ষকেই একই পংক্তিতে দাঁড় করিয়ে বিচার

করে চিরাচরিত সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবেরই পরিচয় দিয়েছে।

পাকিস্থান কচ্ছ আক্রমণে মার্কিনী ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য অস্ত্রশস্ত্রের নিরঙ্কুশ ব্যবহারের পরও আমেরিকা এ-বিষয়ে প্রকাশ্য কোনো প্রতিবাদ কিম্বা দুঃখ জানায় নি অথচ ভারত সীমান্তে মার্কিনী সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারত-কর্তৃক কচ্ছে কোনো মার্কিনীনির্মিত-সম্ভার ব্যবহৃত হয়েছে কিনা সে-সম্পর্কে তদারক করে গেছে। ইঙ্গ-মার্কিণ স্বার্থের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার নগ্নরূপ কচ্ছ সীমান্তে আর একবার প্রকট হল।

স্বস্থানে শেখ আবদুল্লা

হজ প্রত্যাগত শেখ আবদুল্লা ও আবদুল বেগকে গ্রেপ্তার ও উটকামণ্ডে অন্তরীণ করে বর্তমান বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে ভারত বিভাগ এক অপরিহার্য কর্তব্য পালন করেছেন। হজের নাম করে অথবা এরূপ তীর্থযাত্রার অবকাশে শেখ আবদুল্লা একাধারে চৌ-এন লাইয়ের সঙ্গে এবং অন্যদিকে লণ্ডনস্থ পাকিস্থানী হাই কমিশনের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে কার্যত রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অপরাধী হয়েছেন। শেখ আবদুল্লা তীর্থযাত্রার সুযোগে ভারতের রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমিকতার পক্ষে ক্ষতিকর কার্যকলাপে লিপ্ত হয়েছিলেন। কাশ্মীরী নাগরিকদের অধিকারসহ শেখ আবদুল্লাকে বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহারের উদার সুযোগ দিয়ে ভারত সরকার যে অবিবেচনার কাজ করেছিলেন শেখ সাহেবকে বর্তমানে অন্তরীণ করার নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়ে ভারত সরকার কাশ্মীরে ও ভারতের বাইরে অপপ্রচারের সুযোগ করে দিয়েছেন। এবং এই ফলশ্রুতি ভারত সরকারের অদূরদর্শিতার পরিণাম। ১৪. ৪. ৬৫

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

পীতাম্বরী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.	
বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

২০২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত মৌবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ] ২য় সংখ্যা [জ্যৈষ্ঠ ১৩৭২

সম্পাদকীয়

বিপ্লবী বীর উল্লাসকর দত্তের লোকান্তর

ফরিদপুরের প্রবীণ বিপ্লবী নেতা প্রখ্যাত আলিপুর বোমার মামলার অভিযুক্তদের অন্যতম, উল্লাসকর দত্ত গত ১৭ই মে শিলচরে ৮১ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। বাংলাদেশে বিপ্লব আন্দোলনের এই অন্যতম পরিচালকের আজীবনের নির্বাসনে কারাপ্রাচীরের অন্তরালে, দুরন্ত অত্যাচারে মস্তিষ্ক বিকৃতি হয়। বাংলাদেশের দুর্ভাগ্য, কঠোর সংগ্রামের মধ্যে অকলুষ ও বিস্ময়প্রায় হয়ে এই বিপ্লবী এতো দীর্ঘদিন জীবিত ছিলেন, অথচ তাঁর ক্লেশ-লাঞ্ছনা-পীড়ন লাঘবের কোনো স্থায়ি ব্যবস্থা সরকার অথবা দেশবাসী এগিয়ে আসেন নাই। এ-লজ্জা আমাদের সকলের। বিপ্লবী পরিবারের প্রকৃত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাহেলা ও কৃতজ্ঞতার লক্ষণ পরিশোধের প্রয়োজন রয়েছে। সে-দায়ও আমাদেরই। আমরা লোকান্তরিতের স্মৃতির প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

পরলোকে কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়

গত ৩রা মে 'প্রবাসী' ও 'মডার্ন রিভিউর' সম্পাদক কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় চুয়াত্তর বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। সাংবাদিক-শ্রেষ্ঠ ঋষি রামানন্দের কর্ম-শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনের মাত্র কয়েকদিন পূর্বে তাঁর সুযোগ্য জ্যেষ্ঠপুত্রের পরলোকগমন একটি নিদারুণ মর্মন্তুদ ঘটনা। কেদারনাথ লণ্ডনের ইন্সিটিয়াল কলেজ অব সায়েন্স এণ্ড টেক্‌নলজি কলেজে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় কেন্দ্রে একটি অস্ত্র নির্মাণ কারখানার ম্যানেজার পদে অধিষ্ঠিত থাকা কালীন আকস্মিক বিস্ফোরণে আহত হন। অতঃপর ভারতে ফিরে এসে সাংবাদিকতায় আমৃত্যু আত্মনিয়োগ করেন। কেদারনাথের চরিত্রের অমায়িক মাধুর্য এবং তাঁর মানসিক আভিজাত্য দুর্লভ বস্তু ছিল। আমরা লোকান্তরিতের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা ও তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

এভারেষ্ট বিজয়ে ভারতীয় অভিযাত্রীদল

কর্নেল কম্যাণ্ডার কোহলীর নেতৃত্বে উনিশ সদস্য-বিশিষ্ট একটি ভারতীয় এভারেষ্ট অভিযাত্রী দলের নয়জন সদস্য পর পর চারটি দলে বিভক্ত হয়ে এভারেষ্ট জয় করে সমগ্র বিশ্বে অভূতপূর্ব ইতিহাস স্থাপন করেছেন।

স্বর্গমের অভিযাত্রীদের ১৯২২ সাল থেকেই পৃথিবীর সর্বোচ্চ গিরিশৃঙ্গ এভারেষ্ট (২৯,০২৮) আকর্ষণ করে এসেছে এবং বহু অভিযাত্রীর সাহসিক অভিযান এবং আত্মত্যাগের পর ১৯৫৩ সালে এডমণ্ড হিলারী ও তেনজিং নোরগে সর্বপ্রথম এভারেষ্ট জয় করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালে একটি সুইস দল পর পর দুইবার এবং ১৯৬৩ সালে একটি আমেরিকান দল পর পর তিনবার এভারেষ্ট জয় করে ইতিহাস স্থাপন করেছিল। কিন্তু এদের সকল রেকর্ড ছাপিয়ে এবং ১৯৬০ ও ১৯৬২ সালে এভারেষ্ট অভিযাত্রী দুইটি ভারতীয় দলের ব্যর্থতার গ্লানি মুছে দিয়ে ১৯৬৫ সালের অভিযাত্রী দল বিস্ময়কর সাফল্য অর্জন করেছে, যে রেকর্ড অতিক্রম করা বোধ হয় আর কোনো দিন কারো পক্ষেই সম্ভব হবে না।

লেঃ কর্ণ্যাণ্ডার কোহলীর নেতৃত্বে এই দলটি ২২শে ফেব্রুয়ারী দিল্লী ত্যাগ করে ২২শে মার্চ ১৭,৮০০ ফুট উচ্চে প্রাথমিক ক্যাম্প স্থাপন করে এবং ১২শে মে তারিখে ২৭,৯২০ ফুট উচ্চে সর্বশেষ ক্যাম্প স্থাপন করে। ইতিপূর্বে এত উচ্চে অন্য কোনো বিদেশী দল সর্বশেষ ক্যাম্প স্থাপন করতে পারে নাই। এই শীর্ষ ক্যাম্প থেকে ২০শে মে সাড়ে চার ঘণ্টায় প্রথম দলের ক্যাপ্টেন এ. এস. চীমা (২৮) নাওয়াং গম্বু এভারেষ্ট জয় করেন। এদের সহযোগী পাঁচ জন শেৰ্পা ছিলেন। নাওয়াং গম্বুই পৃথিবীতে প্রথম যিনি দুইবার এভারেষ্ট জয় করেছেন। ১৯৬৩ এ আমেরিকান দলের সঙ্গে গোপু প্রথমবার এভারেষ্ট জয় করেন। ২৭শে মে দ্বিতীয় দলের সোনাম গিয়াৎসো (৪২) সোনাম ওয়াং গিয়াল (২৩) শীর্ষ ক্যাম্প থেকে ছয় ঘণ্টায় এভারেষ্ট জয় করেন। এদের সহযোগী ছিলেন তিন জন শেৰ্পা। ২৯শে মে তারিখে তৃতীয় দলের দি. পি. জোরা (৩১) ও আং কামী (২৪) পাঁচ ঘণ্টা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে শীর্ষ ক্যাম্প থেকে এভারেষ্ট শীর্ষে পৌঁছান। এদের সাহায্য করেছেন চার জন শেৰ্পা। ২৯শে মে চতুর্থ দলের ক্যাপ্টেন আলুওয়ালিয়া, এইচ, পি, রাওয়াত ও মু ডোরজি পাঁচ ঘণ্টায় শীর্ষ ক্যাম্প থেকে হিমালয়ের শীর্ষ মুক্তে পৌঁছান। সাতজন শেৰ্পা এদের সহযোগী ছিলেন। হিমালয় শীর্ষে একত্র তিনদলের আরোহণ এই প্রথম। মু ডোরজি নেপালের অধিবাসী।

লেঃ কর্ণ্যাণ্ডার কোহলীর দলের বিস্ময়কর সাফল্য ভারতীয় দলের সংহতি ও সংগঠনের উৎকর্ষতা সূচিত করে। পর পর চারটি দলের পক্ষে নিরাপদে এভারেষ্ট পৌঁছে প্রত্যাবর্তন কখনই সম্ভব হোতো না যদি নেতৃত্বের ধৈর্য, স্থৈর্য, সাহস, দূরদর্শিতা ও সংগঠনী প্রতিভার সঙ্গে শেৰ্পাদের সহায়তা এবং সদস্যদের গোষ্ঠিসুলভ মনোভাবের সমন্বয় না ঘটতো। আমরা স্বর্গমের অভিযাত্রী দলের নেতা, দলের অন্যান্য সদস্য, সহযোগী শেৰ্পা দল ও এভারেষ্ট বিজয়ী অভিযাত্রীদের পর্বতারোহণে পৃথিবীর এই শীর্ষস্থানীয় সাফল্যের জন্য অভিনন্দন ও অভিবাদন জানাচ্ছি।

শাস্ত্রীজীর কূটনৈতিক নির্বুদ্ধিতা

কচ্ছের ঘটনার গুরুত্ব একরের মাপ দিয়ে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। এই ঘটনা ভারতীয় জাতীয় মর্যাদাবোধের মর্ম-মূলে আঘাত করেছে। কচ্ছের ঘটনা শুধু পাকিস্তানী ঘটনাও নয়—এই ঘটনা নেফার সামরিক ঘটনার দ্বিতীয় কূটনৈতিক পুনরাবৃত্তি। নেফার ঘটনা ভাটো, দিয়াটো এবং অনেকাংশে সেন্টো গোষ্ঠিকে চীন-বৈরী ও ভারত-সমর্থক করে তুলেছিল। কিন্তু কচ্ছের ঘটনায় একই সঙ্গে এই গোষ্ঠির সঙ্গে পাকিস্তানের বিচ্ছেদ এবং ভারতের বৈরী সম্বন্ধ সৃষ্টির পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কচ্ছের সামরিক রাজনীতি চীন-পাক-ইন্দোনেশিয়ান অক্ষকে শক্তিশালী করে তোলার পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। কচ্ছের ঘটনায় পাকিস্তান একক পক্ষ নয়—রাজনৈতিক এবং সামরিক উভয় তাৎপর্যেই সাথে চীন পাকিস্তানের

পশ্চাতে রয়েছে ; এই মূল কথাটির গুরুত্ব শাস্ত্রীজী অনুধাবন করেছেন বলে মনে হয় না।

পাকিস্তানের বর্তমান জঙ্গী রাজনীতির সবচেয়ে দুর্বল স্থান হলো সিয়াটো-সম্পর্ক ও পূর্বাঞ্চল পাকিস্তান। পাকিস্তান আমেরিকান সম্পর্ক ত্যাগ করে সম্পূর্ণরূপে চীনের পক্ষে যেতে রাজী নয়—কিন্তু চীন ও রাশিয়া পাক-তোষণ করে এবং ঘটনার পর ঘটনা সৃষ্টি করে পাক-মার্কিণ সম্পর্ককে তিক্ত ও দ্বিধ করার জন্য ব্যগ্র। পাক-কাশ্মীরের চিত্রল ও গিলগিটে যে মার্কিণ ঘাঁটি রয়েছে সেই ঘাঁটি দুইটিকে নিষ্ক্রিয় করা রুশ-চীন সামরিক নীতির একটি বড় লক্ষ্য। চিত্রল ও গিলগিটের ঘাঁটিকে কেন্দ্র করে রাশিয়া ও চীনের জঙ্গীচক্রকে বিব্রত করা মার্কিণের পক্ষে সম্ভব। তাই, পাক-তোষণে রাশিয়া ও চীন সমভাবেই আগ্রহী।

পূর্বাঞ্চল পাকিস্তান সামরিক দিক দিয়ে অরক্ষণীয় এবং রাজনৈতিক দিক থেকে সিভি-শাসনের প্রতি বিদ্রোহী। চীনের সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানকে রক্ষণীয় করার জন্য পাকিস্তান ব্যগ্র এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে চীনা কমিউনিজমের ঢেউ পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানে অনুপ্রবেশের সুযোগ দিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের বাঙালীত্বের মনোভাবকে খর্ব ও নিষ্ক্রিয় করতে ব্যস্ত।

কচ্ছে পাক-আক্রমণের বিষয়টি নিয়ে লোকসভায় যেভাবে শাস্ত্রীজী চঞ্চলতা ও 'বেশি কথার' লক্ষণ দেখিয়েছেন এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর পছন্দসই স্থানে প্রত্যাঘাত করার নীতির কথা মৌখিক ঘোষণা করেই যেভাবে বৃটিশ মধ্যস্থতার কূটনীতির জালে জড়িয়ে পড়েছেন এবং মুহুর্মুহু যেভাবে লোকসভায় এবং নানা জনসভায় সেই ঘোষণার ভাষ্য ও বিবৃতি দিয়ে চলেছেন তার ফলে একথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে শাস্ত্রীজী কচ্ছে প্রত্যাঘাত করে ভারতের হৃত জাতীয় মর্যাদাকে উদ্ধারের জন্য কোন সামরিক কার্যক্রম গ্রহণে রাজী নন। বৃটিশ মৈত্রীর সঙ্গে সহযোগিতা করে কচ্ছের সামরিক প্রত্যাঘাতের সময় ও সুযোগই শুধু হারান হলনি—কচ্ছের ঘটনাটিকে সীমান্ত দ্বন্দ্বের ক্ষেত্রে পর্যবসিত করার সুযোগও দিয়েছেন। কচ্ছ সংঘাতকে সীমান্ত দ্বন্দ্ব বলে স্বীকার করে ক্ষেত্রান্তরে প্রত্যাঘাত করার রাজনৈতিক যুক্তিকে নিজেই খণ্ডন করে দিয়েছেন শাস্ত্রীজী।

হৃত জমি দখলের চেয়েও হৃত জাতীয় মর্যাদা পুনরুদ্ধারের জন্যই যে আজ পাকিস্তানকে ক্ষেত্রান্তরে প্রত্যাঘাত করা প্রয়োজন ক্ষণিকের জন্য সেকথা উপলব্ধি করে, অথবা ভারতীয় আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির চাপে পড়ে লোকসভায় একটি ঘোষণা করে প্রায় পরক্ষণেই শাস্ত্রীজী পশ্চাদপসরণ শুরু করেছেন। ভারতীয় মর্যাদায় ও সামরিক বাহিনীতে কচ্ছের ঘটনা যে প্রচণ্ড আঘাত দিয়েছে তার প্রতিক্রিয়া এড়িয়ে ভারতীয় মনকে আশ্বস্ত করার জন্য শাস্ত্রীজী কূটনৈতিক প্রয়াস শুরু করেছেন এবং পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতীয় মনোভাব সৃষ্টি করার চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এই প্রচেষ্টার সূচনাতেই তিনি মার্কিণ সমরের ঘটনাটি নিয়ে এক অত্যদ্ভুত অপরিণত মনোভাব প্রকাশ করে কূটনৈতিক অর্বাচীনতার পরিচয় দিয়ে চীনের ট্যাক্টিকীকেই সাহায্য করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে কানাডা সমরের প্রোগ্রামের উপরে জোর দিয়ে মার্কিণ সরকার ও জনগণকে অপ্রয়োজনে ভারত-বিরোধী করার ক্ষেত্র তৈরী করার সুযোগ দিয়েছেন। আমেরিকান সরকারকে জব্দ করার মনোভাব নিয়ে শাস্ত্রীর কানাডা সমরের কর্মসূচী বহাল রাখার জেদ ভারত সরকারের পক্ষে এক কূটনৈতিক নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা স্বরূপ।

শাস্ত্রীজীর রুশ ভ্রমণের ঘটনাকে খুব ঢাকঢোল পিটিয়ে এক অপূর্ব কূটনৈতিক সাফল্যের নিদর্শন বলে প্রচার করার চেষ্টা করেছেন ভারত সরকার। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে রুশ কূটনীতির কাছে শাস্ত্রীজী সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে ফিরেছেন। রাশিয়া খুব আতিথ্য দেখিয়েছে, এবং চতুর্থ পরিকল্পনায়

বহিত সাহায্যের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছে। কিন্তু কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নিজের কাজ হাসিল করে নিয়েছে, পক্ষান্তরে ভারতকে বাস্তব ক্ষেত্রে কিছুই দেয়নি। শাস্ত্রী-কোসিগিন যৌথ বিবৃতিতে শাস্ত্রীজী উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিন বোমাবর্ষণের নিন্দা করে এবং বোমা বর্ষণ বন্ধ করার দাবী করে রুশ কূটনীতির উদ্দেশ্য পূর্ণ করেছেন কিন্তু কচ্ছে পাক আক্রমণের নিন্দা করে বা এ সম্বন্ধে সামান্যতম বিরূপ উক্তি করে কোসিগিন শাস্ত্রীজীর ইচ্ছা পূর্ণ করেন নি। রুশ নেতারা গোপনে শাস্ত্রীজীকে কি আশ্বাস দিয়েছেন সেকথাই সাড়ম্বরে ব্যক্ত করে শাস্ত্রীজী নিজের দুর্গতি জাহির করেছেন। ভারতে বহু সংকট এবং পাক-চীন-ইন্দোনেশিয়ার ভারত বিরোধী অক্ষের কথা স্মরণ করলে এই সিদ্ধান্ত না করে উপায় নেই যে শাস্ত্রীজীর রুশ সফর সফল হয় নি। আমেরিকাকে শিক্ষা দেবার 'আন সাইকোলজিক্যাল' মনোভাব নিয়ে শাস্ত্রীজীর কানাডা সফরও সফল হবে মনে হয় না। রুশ সফরে যাওয়ার আগে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে ব্যক্তিগত চিঠিতে নিজের দুর্বলতা প্রকাশ করে শাস্ত্রীজী ভারতীয় কূটনীতিকে আরও দুর্বল করে দিয়েছেন এবং সেই চিঠিটির কথা ব্যক্ত হওয়ায় রুশ ভ্রমণের গুরুত্বকেও হাস্যাস্পদ করে ফেলেছেন।

কচ্ছের ঘটনা নেফা বিপর্যয়ের ন্যায় ভারতীয় সামরিক মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শাস্ত্রীজী যে পন্থা অনুসরণ করেছেন তা'ও দূরদর্শী নয়—কারণ, রাশিয়া যে এখন পাক-তোষণ নীতিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিচ্ছে ষ্ট্রাটেজিক কারণে সেই শোচার কথাটিও শাস্ত্রী বিস্মৃত হয়েছেন। চীনের আক্রমণে ভারত স্বতঃস্ফূর্তভাবে পশ্চিমী গোষ্ঠির সাহায্য পেয়েছিল কিন্তু পাকিস্তানের আক্রমণে পশ্চিমী গোষ্ঠি বা রুশ গোষ্ঠি কারও সমর্থন লাভেই সক্ষম হয় নি। যুগল পাক-চীন সম্ভাব্য আক্রমণে শাস্ত্রী নেতৃত্ব ভারতকে কোন বিপাকে ঠেলে দেবে আজ তাই ভারতের চরম দুশ্চিন্তার বিষয়। আরও আশঙ্কার কথা যে শাস্ত্রীজীও দেখা যাচ্ছে বিশ্বভ্রমণ, বিশ্বনেতা ও বিশ্ব শান্তির মোড়লী করার মেগালোম্যানিয়া রোগে আক্রান্ত হয়ে বাস্তব বিমুখতার দিকে ঝুঁকে পড়ছেন।

নূতন ভাষা নীতি

গত ২৮।৫ জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দীর্ঘ অপেক্ষার পর নূতন ভাষা নীতি গ্রহণ করেছেন। নূতন নীতির সূত্রগুলি নিম্নরূপ :

১) রাজ্যের শিক্ষাক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় স্তর পর্যন্ত ত্রি-ভাষা সূত্রের নিশ্চিত প্রয়োগ চাই।

২) ইংরাজী হিন্দিসহ সংবিধানের অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত অন্যান্য জাতীয় ভাষায় ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে দ্রুত ব্যবস্থাপনা গৃহীত হবে।

৩) ইউনিয়ন পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় হিন্দি ও ইংরাজীতে আবশ্যিক পরীক্ষা গৃহীত হবে। এই পরীক্ষায় যাদের মাধ্যম হিন্দি ভাষা, অষ্টম পরিচ্ছেদে উল্লেখিত অন্য একটি ভাষায় তাদের আবশ্যিক পরীক্ষা হবে ৪) উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য (ক) যতশীঘ্র সম্ভব প্রতিটি রাজ্যের জাতীয় ভাষা সেই রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষারূপে এবং শিক্ষার মাধ্যমরূপে নিয়োজিত হবে (খ) হিন্দি শিক্ষার স্থান বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং স্কুলে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করতে হবে। (গ) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণের প্রস্তুতির পক্ষে প্রকৃতিতে ইংরাজী ভাষার শিক্ষা চলতে থাকবে ৫) কার্যকরীভাবে ভারত ইউনিয়নের সরকারী ভাষার এবং সমগ্র দেশে যোগাযোগের ভাষার স্থান গ্রহণের উপযোগিতা লাভের জন্য হিন্দির উন্নয়নের উদ্দেশ্যে ক্রমভিত্তিক কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে। সংবিধানের ৩৫১ ধারার সীমানার মধ্যেই হিন্দির উন্নয়নের বিধান করতে হবে।

৬) অন্যান্য আঞ্চলিক ভাষারও উন্নয়নের কর্মসূচী গ্রহণ করে প্রয়োগ করতে হবে।

সরকারী ভাষা আইন সংশোধন করেও হিন্দির পাশাপাশি ইংরেজীর আবশ্যিক ব্যবহারের সীমানা সুনির্দিষ্ট না হলে, হিন্দির প্রচ্ছন্ন আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা এই নূতন ব্যবস্থারও নিহিত থাকবে। ওয়াকিং কমিটির প্রস্তাবে এই গুরুতর বিষয়টি একেবারেই অস্পষ্ট রয়ে গেছে। বিরোধের আর একটি বিষবৃক্ষ রয়ে গেছে সরকারী ভাষারূপে হিন্দির পুরোপুরি অধিকার স্বীকৃতি ও ইংরাজীর নির্বাসন ভবিষ্যতে কি ভাবে নির্ধারিত হবে তার অনুল্লেখের মধ্যে। পূর্বের গৃহীত নীতি অনুযায়ী অহিন্দিভাষীরা হিন্দি গ্রহণ না করা পর্যন্ত ইংরাজী অপসারণ করে হিন্দি না চালানো স্থির ছিল। ওয়াকিং কমিটির ব্যবস্থায় বিভিন্ন রাজ্য বিধান সভা এবং লোকসভায় প্রস্তাব-পাশকে হিন্দির পূর্ণ প্রয়োগের সিদ্ধান্তের মধ্যে এই নীতি-বর্জনের ইশারা রয়েছে। এর পরিবর্তে কেবলমাত্র অহিন্দি-ভাষীদের এ বিষয়ে সম্মতি গ্রহণের ব্যবস্থা থাকা উচিত। ১৪ ভাষায় পরীক্ষা গ্রহণের নীতি চালু করার পূর্বে বিভিন্ন ভাষার পরীক্ষার মানের সমতা নির্ণয়ের নির্ভুল ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় এই ব্যবস্থার একদিকে ভারতের সংহতি বিনাশ ও অপরদিকে ইংরাজী ও হিন্দিভাষী পরীক্ষার্থীদের পক্ষে বৈষম্যমূলক সুবিধা করে দেওয়া হবে।

ত্রি-ভাষার কর্মসূচী মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলনে পূর্বেই গৃহীত হয়েছিল কিন্তু বাস্তবে হিন্দী অঞ্চলে তা অনুসৃত হয়নি। কেন্দ্রীয় বিষয়ে হিন্দি ও ইংরেজী সম-মর্যাদা সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও হিন্দী অঞ্চলের অধিকাংশ ষ্টেশনে ইংরেজী সাইন বোর্ডের চিহ্নও দেখা যায় না। সমস্ত আঞ্চলিক ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদা দেওয়া সত্ত্বেও এই ভাষাগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে হিন্দীর সমমর্যাদা দেওয়া হয় না। অহিন্দী ভাষা সম্বন্ধে যদি ঔদার্য্যের সঙ্গে ভারত সরকার অগ্রসর হন এবং হিন্দী ও ইংরেজীকে কেন্দ্র ভাষারূপে সমভাবে গুরুত্ব দেন,—তা' হলে বর্তমানে ঘোষিত ভাষা নীতি কার্যকরী হতে পারে। কি ভাবে ও কি মনোভাব নিয়ে এই নীতি প্রয়োগ করা হবে তার উপরেই বর্তমান ভাষা ফর্মুলার সাফল্য নির্ভর করবে।

ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সম্পর্কে নূতন সংযোজনা

ভারত-সোভিয়েট বৈষয়িক সম্পর্কে নূতন অধ্যায় সংযোজনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। চতুর্থ ভারতীয় প্ল্যানের বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কটের আশঙ্কা সোভিয়েটের অধিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতির ফলে দূর হবে আশা করা যায়। সোভিয়েট সাহায্যের প্রতিশ্রুতি নির্দিষ্ট পরিমাণগত রূপ না নিলেও, সাহায্যের সম্ভাব্য গঠন, ভারতের বৈষয়িক উন্নয়নে সোভিয়েট রুশের উৎসাহ ও আগ্রহ, রুশ-ভারত সম্পর্কে সম্প্রীতি ও পারস্পরিকতার সুদৃঢ় সেতু রচনা করবে।

চতুর্থ প্ল্যানে ভারতের ৬০০ কোটী টাকার প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা সর্বতোভাবে সোভিয়েট রুশের সূত্রে পাওয়া যেতে পারে—প্রধান মন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান অশোক মেহতার সাম্প্রতিক সোভিয়েট সফরে এই সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। ১৯৭০ সালের মধ্যে ভারত-রুশ বাণিজ্য দ্বিগুণিত হবে। বর্তমানে রুশে ভারতের রপ্তানির পরিমাণ ১১০ কোটি টাকা, ১৯৭০ সালে এই পরিমাণ হবে ২২০ কোটি টাকা। মামুলী পণ্যের রপ্তানি ছাড়াও ভারতের শিল্পজাত পণ্যও অতঃপর সোভিয়েট রুশে রপ্তানি হবে। এছাড়া চতুর্থ প্ল্যানের নির্দিষ্ট প্রজেক্টের অর্থ—যার দুই তৃতীয়াংশ পুরাতন প্রজেক্ট সম্প্রসারণের জন্য এবং অবশিষ্ট অর্থ নতুন প্রজেক্টে ব্যয়িত হবে—৬০০ কোটি টাকার সোভিয়েট সাহায্য চাওয়া হয়েছে। তেল, সার, কয়লা উত্তোলন, এলুমিনিয়াম, তার

(শেষাংশ ১৫৪ পৃষ্ঠায়)

উল্লাসকর

স্মরণে

শ্রী প্র ভা ত চন্দ্র গ ঙ্গো পা ধ্যা য়

যে দুর্জ্জয় সাহসী, সদা প্রফুল্লচিত্ত বিপ্লবী নায়ক জীবন বাজীকে পায়ের ভৃত্যরূপে গণনা করিয়া রাজদণ্ডে নিশ্চিত মৃত্যু সম্ভাবনার সম্মুখীন হইয়াও আপন মনোবলে কেবল নিজের চিরানন্দ অম্লান রাখিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, পরন্তু সহ-কর্ম্মীদের কাহারও চিত্ত বিষাদিত না হইতে পারে সেজন্য সকলের জন্য কারাগারে ও বিচারালয়ে নানাপ্রকার গল্প কৌতুক ও জাতীয় ভাব উদ্দীপক সঙ্গীত পরিবেশন করিয়া সকলকে মাতাইয়া রাখিতেন। সেই বীরোত্তম উল্লাসকর দত্ত আন্দামান হইতে মুক্তিলাভের পর যখন তাঁহার জন্মভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিলেন তখন রাজরোষের ভয়ে ভীত দেশবাসী তাঁহার প্রাপ্য অভ্যর্থনা জানায় নাই। প্রায় অবজ্ঞাত জীবন যাপনও তিনি আনন্দের সহিত বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। দেশবাসীর এই অকৃতজ্ঞতার সম্পর্কে একদিনের জন্যও কোনও অভিযোগ তাঁহার নিকট হইতে শোনা যায় নাই। স্বাধীনোত্তর ভারতে তাঁহার প্রাপ্য মর্য্যাদা তাঁহাকে অর্পণ করিতে যখন কোনও বাধা নাই, তখনও সুদূর শিলচরে তাঁহার দেহাবসানের পরও আমরা আমাদের কৃত্য সম্পাদনে ব্যর্থ হইয়াছি। তাঁহার সম্পর্কে কোনও কথা বলিতে হইলে সেই বাধাই সর্ব্বাগ্রে মনে বাজে। তাঁহার মহাপ্রয়াণের পর এদেশের সংবাদপত্রগুলিতে যৎসামান্য কিছু লেখা হইল। তাহার অধিকাংশই ভুলে ভরা এবং তাঁহার চরিত্রে যেরূপ অসামান্য সেই বৃহত্ত্ব ভরাভীত চিত্তের আনন্দময় পরিবেশের কথা কেহই উল্লেখ পর্যন্ত করিলেন না। তিনি সার্থকনামা পুরুষ ছিলেন। পিতৃপ্রদত্ত নাম উল্লাসকর তাঁহার জীবনে সার্থকভাবে প্রকটিত ছিল। যেখানে যখন তিনি থাকিতেন সেখানেই আনন্দ হিল্লোল বহাইয়া দিয়া তিনি পিতৃপ্রদত্ত নামকে সার্থক করিয়াছেন। একাধারে তিনি জাতিকে বৃহত্ত্ব ভয়াতীত হইবার পথ দেখাইয়াছেন। অপর দিকে বিশ্ব জগৎ যে আনন্দের আকর জীবনভোর তাহার পরিচয় বহন করিয়া দুঃখ জয়ের পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। ইহাই তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয়। তাঁহার মত প্রফুল্লচিত্ত নির্ভীক মানুষ দুর্লভ। এমন কি অনন্য বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। বিপ্লব সাধনায় তাঁহার অতুলনীয় অবদান হইল এই নিরস্ত্র জাতির পক্ষে শত্রু নিধনের জন্য অস্ত্রশস্ত্র যখন সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন, তখন তিনি একাগ্র সাধনবলে সর্ব্ব প্রথমে দেশবাসীকে অত্যন্ত ভেজস্কর সাংঘাতিক এবং সফল বোমা নির্ম্মাণকৌশল এবং প্রচেষ্টায় এদেশেই প্রস্তুত প্রণালী আবিষ্কার করিয়া বিপ্লবী-দের উপহার দিয়াছিলেন। সামান্য চেষ্টায় উহা প্রস্তুতের উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটু ঘর পাইলেই এরূপ বারুদের অধিকারী হওয়া যায় তাহা জানিয়া বিপ্লবী বন্ধুদের মনোবল খুব বর্দ্ধিত হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। বিপ্লব সাধনায় উল্লাসকরের ইহাই শ্রেষ্ঠতম কীর্ত্তি। তিনি যখন এই পদ্ধতি আবিষ্কার করিয়া অত্যাচারী শাসকদের মনে সন্ত্রাস সৃষ্টির উপায় সহজ করিলেন তখন পর্য্যন্ত ইউরোপ হইতে এই বিদ্যা আয়ত্ব করিয়া কেহ প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। অবশ্য ইহার অনতিপরে শ্রীহেমচন্দ্র দাস ও ডাক্তার চারুচন্দ্র চক্রবর্ত্তী তথা হইতে বোমা প্রস্তুতের বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে শিক্ষিত

হইয়া প্রত্যাবর্তন করেন এবং স্থানীয় হক বর্মা ও ম্যাডান ভিকাজীরতনজী কোম্পানির সহায়তায় উত্তর প্রদেশের হোতিলাল বর্মা এবং মধ্য প্রদেশের আকবাদে আলি মির্জাও ওই বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া ফিরিয়া আসেন। কিন্তু যখন এদেশে এরূপ সহজলভ্য নারগাছ সংগ্রহের কোনও উপায় ছিল না, সেই সময়ে উল্লাসকরের সাধনবলে প্রাপ্ত এই আধুনিক বিপ্লবীদের যে কত উৎসাহ বর্ধক হইয়াছিল, তাহার পরিচয় যাঁহারা দিতে পারিতেন নারায়ণগড়, চন্দননগর ও মুরারীপুকুরের তাঁহার সেই সহকর্মীদলের প্রায় সকলেই লোকান্তরিত হইয়াছেন। বাকি আছেন মাত্র তিনজন। তাঁহারা হইলেন সিলেট বানিয়াচঙ্গের বীরেন সেনগুপ্ত, এক্ষণে পণ্ডিচেরী আশ্রমের আশ্রমিক, বিভূতি সরকার, ইনি রোগগ্রস্ত পঙ্গু জীবন যাপন করিতেছেন ও মেদিনীপুরের পূর্ণচন্দ্র সেন, ইনি ডোভার লেনে নিজস্ব বাটিতে বাস করেন। বারীন্দ্র-উল্লাসের বিপ্লব প্রচেষ্টার পূর্ণ কাহিনী ইঁহারাই বলিতে পারেন। তবে উল্লাসকরের বোমা প্রস্তুত সম্পর্কে যে কাহিনী সম্প্রতি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে তাহার প্রতিবাদ না করিতে প্রত্যবায় হয়, কেননা সে কাহিনী এক হাস্যকর প্রচেষ্টারই বর্ণনা মাত্র। তাহাতে উল্লাসের সুগভীর অধ্যবসায় এবং অভিনিবেশপূর্বক রসায়ন শাস্ত্র মন্থন প্রভৃতি নিরলস সাধনা উপেক্ষিত। বলা হইয়াছে যে দিয়াশলাই উৎপাদন কুটীর শিল্পরূপে করিবার মতলবে উল্লাসকর, কলিকাতা কালীকচ্ছ নিবাসী পিতৃবন্ধু মহেন্দ্র নন্দীর নিকট হইতে দিয়াশলাই প্রস্তুতের মাল মসলার বিষয় জানিয়া লইয়া উল্লাসকর উহাদ্বারা বোমা প্রস্তুত করেন। এরূপ দাস মশলা সাহায্যে প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটানো যে অসম্ভব, উহাদ্বারা যে শ্যামাপূজার সময় ব্যবহৃত কালীপটকা-জাতীয় যে বোমা ভিন্ন কিছু করা সম্ভব নহে তাহা জানা না থাকাতে এরূপ গালগল্প প্রচার সম্ভব হইয়াছে। উল্লাস নির্মিত বোমার শক্তি পরীক্ষা করে দেওঘর দীঘারিয়া পাহাড়ে বিস্ফোরণের ফলে বাঙলার আধুনিক বিপ্লবের প্রথম শহীদ রঙ্গপুরের স্বদেশী আন্দোলনের নেতা ঈশান চক্রবর্তীর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীপ্রফুল্ল চক্রবর্তীর যে শোচনীয় মৃত্যু ঘটে, অথবা খড়্গপুরের সন্নিকটবর্তী নারায়ণগড়ে স্যার অ্যাশ্‌লে ইডেনের ট্রেন উড়াইয়া দিবার প্রচেষ্টায় বোমা রাখা হয়, বা চন্দননগরের মেয়র টার্ডিভ্যালকে হত্যা করিবার উদ্দেশ্যে তাহার বাসভবনে যে বোমা নিক্ষিপ্ত হয় সেই সমস্ত প্রচণ্ড শক্তিশালী বোমার নির্মাতা উল্লাসকর এবং সেগুলি দিয়াশলাই এর মসলা দিয়া প্রস্তুত হইতে পারে না। বিস্ফোরণ সংক্রান্ত রসায়ন শাস্ত্রের পুস্তকাদি অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া ২৪ নম্বর গোয়া বাগান ষ্ট্রীটস্থ নিজের আবাসে পরীক্ষাগার নির্মাণ করিয়া বহু কষ্টসাধ্য পথে পরীক্ষানিরীক্ষার পর উহা নির্মাণে সমর্থ হন। নির্মাণ সময়ে মধ্যে মধ্যে শ্রীপূর্ণ সেন উপস্থিত থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তাঁহার নিকট হইতে আমি এ সংবাদ পাইয়াছি। মুক্তি সংগ্রামে এইভাবে নূতন পথ বাহির করিয়া উল্লাসকর সত্য পরিচিত হইলেন। অবশ্য এই আবিষ্কারের অনতিপরেই হেমচন্দ্র দাস ও চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তী বিদেশের শিক্ষাকে বোমার সফল নির্মাণে রূপায়িত করেন এবং এদেশে নিজ প্রচেষ্টায় বীরেন সেন ও টাঙ্গাইলের যোগেশ চৌধুরীও বোমা প্রস্তুতে সমর্থ হন। উল্লাসকর মহেন্দ্র নন্দীর নিকট বোমা প্রস্তুত শিক্ষায় অলীকগল্পের স্রষ্টা, বীরেন ও যোগেশ চৌধুরীর বোমা নির্মাণেও মহেন্দ্র নন্দী মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত শিক্ষার ফল বলিয়াছেন। ইহাও সম্পূর্ণ মনগড়া কাহিনী। বীরেন্দ্রের মাতুল মহেন্দ্র যে মহাশয় রসায়ন বিদ্যায় সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ন্যাশন্যাল কাউন্সিল এফ এডুকেশন নামে যে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় তাহার রসায়নের অধ্যাপক ছিলেন। বীরেন্দ্রের শিক্ষা তাঁহার নিকট হইতে আর যোগেশ চৌধুরী, প্রিয়নাথ সেনগুপ্ত, প্রভাস চন্দ্র দে প্রভৃতি কয়জন চন্দ্রকান্ত চক্রবর্তীকে গুরু মানিয়া মুক্তকে পাচার করিবার পূর্বে যোগেশ চৌধুরীর সাত

সময় আশ্রয়ের দেব দেনে গোপনে আশ্রয় দিয়া তাহার নিকট হইতে বোমা প্রস্তুত শিখিয়াছিলেন। এ সম্পর্কে আমার প্রত্যক্ষজ্ঞান আছে এবং সম্ভবতঃ নির্বাসনবাসী ও (নাটোরের মহীশ সরকার) পরিজ্ঞাত আছেন।

উল্লাসকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমদাসের সিটি স্কুলে আমার সহপাঠি ছিলেন এবং উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাস দত্ত আমার মাতৃদেবীর অধ্যাপক ছিলেন। এই উভয় সূত্রে আমার উল্লাসকরের শিবপুরস্থ বাসায় আনাগোনা ও উল্লাসকরের সহিত পরিচয় ঘটে। উল্লাসকরের জীবনাবসানের পর একজন লিখিয়াছেন যে উল্লাসকরের পিতা দ্বিজদাসবাবু ইংলণ্ড হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়া এদেশে আইনের ব্যবসায়ে হত হন এবং একজন ব্রাহ্মণ মক্কেল কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করাতে তাহা ঘোরতর পাপ মনে করিয়া আইন ব্যবসায় চিরতরে ত্যাগ করেন। এ কাহিনী সর্ব্বৈব অ-সত্য। দ্বিজদাসবাবু ব্যারিষ্টার হইবার জন্য ইংলণ্ডে যান নাই। তিনি সরকারি বৃত্তি লাভ করিয়া চিচেষ্টারে কৃষি বিদ্যালয় হইতে কৃষিবিদ্যায় উচ্চতর শিক্ষা লইয়া এদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। সে সময়ে এদেশের সরকারি কৃষি বিভাগ এত পুষ্ট ছিল যে এরূপ কৃতবিদ্য লোককে চাকুরীতে বাহাল করা সম্ভব ছিল না। তাই এই বিভাগের শিক্ষাপ্রাপ্ত অধিকাচরণ সেন ও দ্বিজেন্দ্রলাল রায় (ডি, এল, রায় নামে খ্যাত) চিচেষ্টার হইতে প্রত্যাবর্তনান্তে বিচার ও শাসন বিভাগে চাকুরীতে নিয়োজিত হন ও দ্বিজদাসবাবু শিক্ষা বিভাগে অধ্যাপকপদে নিযুক্ত হন। আমার মাতৃদেবী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় যখন সর্ব্ব প্রথম একজন মহিলা ছাত্রী হিসাবে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার নারী জাতীর জন্য উদ্ঘাটিত করিলেন তখন তাঁহার উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে সরকার যেমন স্কুলের সঙ্গে কলেজ বিভাগ খুলিতে বাধ্য হইলেন। কিন্তু নারীদের শিক্ষা দিতে প্রস্তুত অধ্যাপক জোগা করিন সমস্যা-রূপে দেখা দেয়। কেননা সে যুগে কেশব চন্দ্র সেনের ন্যায় প্রগতির ধারক ও নারীর পক্ষে পুরুষের সমশিক্ষা আপত্তিকর বিবেচনা করিতেন, রক্ষণশীল সমাজ তো ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। সেই সময়ে যে দুইজন ব্রাহ্ম অধ্যাপক এই ব্রত পালনেইচ্ছুক হইয়া আগাইয়া আসেন তাঁহারা হইলেন শশীভূষণ দত্ত ও দ্বিজদাস দত্ত। আমার মাতৃদেবী বরাবর ইঁহাদের দুইজনকে শিক্ষাগুরু হিসাবে মান্য করিতেন এবং তাঁহাদের পরিবারের সকলের সহিত ঘনিষ্ঠতা রক্ষা করিয়া চলিয়াছেন। দ্বিজদাসবাবু যৌবনকাল হইতেই ব্রাহ্ম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং সেজন্য দেবদ্বিজে ভক্তিহেতু ব্যবসায় পরিত্যাগের কাহিনীর মূলে কিছু সত্য থাকিতে পারে না। উহার জনক এই মহাপ্রাণ লোকটি যখন শিবপুর কলেজের অধ্যাপক তখন সুবিধা ঘটিলেই আমার মাতৃদেবী দ্বিজদাসবাবুর গৃহে যাইতেন এবং সেই সঙ্গে বহুবার আমি তাঁহার সাথী হইয়াছি। তখন আমার বয়স বারো কিম্বা তের। সে সময়ে এই গৃহে উল্লাস-করের হাস্যপরিহাস প্রবণ মনের বহু পরিচয় পাইয়াছি। প্রাণখোলা হাসি ও উচ্চকণ্ঠের সঙ্গীত তাঁহাকে এক বিশিষ্টতা দান করিয়াছিল। সেই আনন্দোজ্জ্বল মনের মধ্যে যে দেশের মুক্তি সাধনার সঙ্কল্প বজ্রকঠোর অগ্নিগর্ভরূপ সঞ্চিত ছিল, তাহা বুঝা সম্ভব হয় নাই। অবশ্য মুরারিপুকুর আবিষ্কারের পূর্বেই আমি বিপ্লবী দলের সহিত যুক্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তখন যে দল যে কাজের ভারপ্রাপ্ত তাহা ভিন্ন অন্য দলের কোনও সংবাদ তাহাদের অতি অল্পই নিলিত, এরূপ ছিল ব্যবস্থা; সেজন্য উল্লাসকরের কর্ম্মধারার আর বিশেষ কোনও পরিচয় আমার জানা নাই। উল্লাসকরের বিশাল হৃদয়ে যেমন দেশোদ্ধারের কঠিন সঙ্কল্প বিদ্যমান ছিল ও দেশপ্রেমে ভরপুর ছিল তেমন মানুষের প্রতি প্রেম এবং নরনারীর প্রেমেও সে অতুলনীয় ছিল। যৌবনে সে দেশনায়ক বিপিনচন্দ্র পালের কন্যা লীলা দেবীকে ভালবাসিয়াছিল এবং সেই ভালবাসার প্রতিদানও

লাভ করিয়াছিল। উন্মাদকরের অন্তরের এই প্রেমাগ্নি দীপান্তরেও ম্লান হয় নাই এবং সেই দীপ্ত প্রেম প্রত্যাবর্তনের পরও আগ্রহ ছিল। কিন্তু লীলাদেবী উন্মাদকরের যাবজ্জীবন দীপান্তরের আদেশে তাঁহাকে লাভ করার আশা নাই মনে করিয়া অন্য আর এক জনের সহিত পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। সেই ভদ্রলোক লীলাদেবীকে পত্নীর মর্যাদায় প্রতিপালন করিলেও তাহার সহসা সন্ন্যাসরোগে মৃত্যু হওয়ার পূর্বেই লীলাদেবী পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইয়া চির পঙ্গু হইয়া পড়েন। উন্মাদকর প্রত্যাবর্তনের পর সেই সংবাদ পাইয়া অতি নিয়মিতভাবে লীলাদেবীকে প্রত্যহ দুইবেলা হাসপাতালে দেখিতে যাইতেন। পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ লীলাদেবীর পীড়া নিরাময় অসাধ্য বিবেচনা করিয়া তাঁহাকে আর অধিক-কাল আশ্রয় দিতে প্রস্তুত না থাকায় রুগ্ন এই বন্ধুপত্নীর সেবা শুশ্রূষা করিবার জন্য কেহ নাই বুঝিয়া উন্মাদকর নিজেই সেই ভার লইলেন। কিন্তু সম্পর্কহীন নারীর সহিত এরূপ নিবিড় সাহচর্য্য সামাজিক রীতিতে দুষ্টব্য হইবে বোধে তাঁহাকে রেজেষ্ট্রী করিয়া বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়া হাসপাতাল হইতে সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজের একটি অংশে লইয়া আসেন। এ বিবাহে দৈহিক লালসাহীন অনাবিল প্রেমের পরিচায়ক কঠোর তপস্যার যে চিত্র আমরা দেখিয়াছি তাহা ভুলিবার নহে। যে যত্ন সহকারে তিনি লীলাদেবীর পরিচর্য্যা করিতেন তাহা সত্যই অতুলনীয়। তাঁহার স্নেহপ্রেম যেমন গভীর ছিল, মানবসুলভ রমণীর প্রতি আকর্ষণও দৈহিক কামনাকে অতিক্রম করিয়া একদেবোপম স্বর্গীয় ভালবাসায় রূপান্তরিত হইয়াছিল। আমার সৌভাগ্য যে তাঁহার প্রেমের এই দুই বিভিন্ন মূর্ত্তির পরিচয় আমি লাভ করিয়াছি। মানুষ উন্মাদ-কর মানবিকতার ঊর্দ্ধে উত্তরণ করিয়া যে অতি মানবতা লাভ করিয়াছিল সেই নরোত্তমের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি স্বরূপ এই স্মৃতি-কথা বলিবার অবসর দেওয়ার জন্য "নবশক্তি"কে আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমার শ্রদ্ধা নিবেদন শেষ করলাম। অপরাজের এই প্রেমের তুলনা নাই।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

৮

ডায়লেকটিক (খ)

ডায়লেকটিক নীতিকে এক কথায় "বিরুদ্ধ-সমন্বয়-নীতি" (Synthesis of opposites) বলা যেতে পারে। হেগেলের সমস্ত দর্শনের মূলতত্ত্ব এই ডায়লেকটিক। এই বিরুদ্ধ-সমন্বয়ের আসল তত্ত্বটিকে ধরা খুব শক্ত, কারণ এ অত্যন্ত জটিল ও দুর্বোধ্য। অথচ হেগেলের ও হেগেলীয়গণের সমাজ-তত্ত্ব, ইতিহাসতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব ইত্যাদি সবকিছুকে বুঝতে হলে এই তত্ত্বকে আয়ত্ত করতে হবে। ম্যাক্ টাগার্ট (Mc Taggart) একজন বিখ্যাত হেগেলীয়। তিনি বলছেন :

"This idea of the synthesis of opposites is perhaps the most characteristic in the whole of Hegel's system. It is certainly one of the most difficult to explain." (Studies in the Hegelian Dialectic, pp. 1-2)

কাজেই এই "বিরুদ্ধ-সমন্বয়"কে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

হেগেলের মতে বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ—এই দুই-এর কোনো সত্যিকার পার্থক্য নেই। জড় ও চেতন (Being & Consciousness), বাহির ও ভিতর—এই দুই রাজ্যকে আলাদা রাজ্য মনে করা, খণ্ডিত করে দেখা, সংকীর্ণ বুদ্ধির ফল বা বিড়ম্বনা। এ দুটি জগৎ আসলে একই ব্যাপক সত্তার প্রকাশ। কাজেই জড়লোক ও চেতনলোক, এই দুই লোকেই একই রীতি, একই নীতির শাসন অব্যাহত রয়েছে। জড় ও চেতন দুই রাজ্যেই সকল ঘটনা, সকল বিকাশ বা পরিবর্তন একই তত্ত্বের নির্দেশে ঘটে চলেছে ; সেই নীতি বা তত্ত্বই, হেগেলের মতে, এই ডায়লেকটিক বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় নীতি। আমাদের মনোলোকে যত মনন স্রোতের মত অবিচ্ছিন্ন ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে, সেই সব প্রবহমান মননের গতি এই ডায়লেকটিক নীতির দ্বারাই নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। জড় জগতেও বস্তুরাশি যত আবর্ত, যত আলোড়ন ও ভাঙন-গড়নের মধ্য দিয়ে রূপান্তর লাভ করে চলেছে, সেই সব ভাঙন-গড়ন ও পরিবর্তনের ছন্দও ডায়লেকটিকের অনুশাসন মেনেই ছন্দিত হচ্ছে।

আমাদের চেতন-লোকের কথা বলতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে আমাদের মনন-বুদ্ধির একটা রূপ আছে যার প্রকৃতিই হচ্ছে সব কিছুকে খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন করে দেখানো। এই খণ্ডবুদ্ধিকে হেগেল নাম দিয়েছেন Understanding বা বিশ্লেষণী-বুদ্ধি (analytic thinking)। এই বুদ্ধি বিশ্বের সব কিছুকেই আলাদা করে, টুকরো টুকরো করে দেখে। এর দৃষ্টিতে সব কিছুই খণ্ডিত, অচল ও অনড় হয়ে দেখা দেয় এবং এই দৃষ্টিতে সকল খণ্ড সত্তাকেই স্বতন্ত্র ও সম্পূর্ণ সত্তা বলে ভ্রান্তি হয়। বিচ্ছিন্ন করে, অনড়

করে দেখানোই এই খণ্ডবুদ্ধি বা Understanding-এর ধর্ম।*

আসলে বিশ্বের কোনও খণ্ড বস্তুই কিন্তু স্বতন্ত্র ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। খণ্ডবুদ্ধি দিয়ে যাদের আলাদা ও বিচ্ছিন্ন বলে মনে হয় তারা প্রকৃতপক্ষে তেমন নয় মোটেও। প্রত্যেকটি বস্তু বিশ্বলোকের অন্য প্রত্যেকটি বস্তুর সঙ্গে নিবিড় যোগে যুক্ত হয়ে আছে। প্রত্যেকটি অংশ এমনভাবে পরস্পরের সঙ্গে জড়িত যে, কোন একটিকে বাদ দিয়ে অন্যটিকে দেখা কোন রকমেই সম্ভব হয় না। প্রতিটি অণু-পরমাণু আপাতদৃষ্টিতে আলাদা ও স্বয়ং-সম্পূর্ণ মনে হলেও, আসলে তারা সবাই নিখিল বিশ্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত ; একটিকে বুঝতে হলে অপরকে বুঝতে হবেই। রামকে জানতে বা চিনতে হলে, রাম ছাড়া পৃথিবীর অন্য সকলকেই চিনতে হবে, তবেই রামকে সত্যি সত্যি চেনা সম্ভব হবে। "রামের" সঙ্গে "যারা রাম নয় এমন সবার (Not Ram)" পার্থক্য কি ও সাদৃশ্য কি তা ধরতে পারলেই রামকে সত্যি ক'রে চেনা হবে। রামকে জানতে হলে, পৃথিবীর অন্য সব মানুষ, জীব, জন্তু, গাছ পাথর থেকে অর্থাৎ এক কথায় সকল বস্তু থেকে তাকে বিশিষ্ট করে জানতে হবে। তার মানে এই যে রাম বিশ্বের সকল কিছুর সঙ্গে জড়িত ও যুক্ত হয়ে আছে। বিশ্বের থেকে আলাদা করে, বিচ্ছিন্ন করে রামকে যদি কেউ জানতে চায়, তবে সে রামের সত্যিকার পরিচয় জানতে পারবে না। তেমনি 'হাঁসের ডিম'কে সত্যি করে চিনতে চাইলে কাকের ডিম, বকের ডিম থেকে শুরু করে পৃথিবীর সব রকম ডিম থেকে এর বৈশিষ্ট্য জানতে হবে, তবে 'হাঁসের ডিমকে' ঠিক ঠিক চেনা হবে। কেবল ডিম নয়, আসলে আরও সব রকম জিনিষ থেকেই হাঁসের ডিমের পার্থক্য ভালো করে জানতে হবে। 'হাঁসের ডিম' যে খাটপালঙ্ক নয়, গাছ-পাথর নয়, জীবজন্তু নয়, তরুলতা নয়, ফলফুল নয়, তা ভাল করে জানলেই 'হাঁসের ডিম'কে আসল পরিচয়ে চেনা যাবে। 'হাঁসের ডিম' তথা বিশ্বের অন্য সব বস্তুই "বিশ্বসাথে যোগে যেথায়" বিহার করছে, সেইখানে তাদের চিনতে হবে। তবেই সেইসব বস্তু সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞানলাভ হবে। তাই 'হাঁসের ডিম'কে জানতে হলে, "হাঁসের ডিম নয় যারা" (Not duck's eggs") তাদেরকে জানতে হবে।

মানুষের বুদ্ধিই মানুষকে টেনে নিয়ে যায় সত্যিকার জ্ঞানের দিকে। খণ্ডবুদ্ধি যখনই কোন বস্তুকে বিচ্ছিন্ন করে দেখে, তখনই সঙ্গে সঙ্গে নিজের অসম্পূর্ণতা ধরা পড়ে যায় এবং ঐ বস্তুর গণ্ডীকে অতিক্রম করে অন্য বস্তুর দিকে মানুষের মনন-চেতনাকে নিয়ে যায়। খণ্ড-বুদ্ধিই নিজেকে নিজে খণ্ডন বা অতিক্রম করে সীমার অতীতে জ্ঞানকে নিয়ে যায়। হেগেল বলেছেন যে এই Understandingটি এমন ভাবে গঠিত যে চরমে নিয়ে গেলে, সেটা তার 'বিরুদ্ধ যা' তারই (opposite) পানে ছিটকে যায়।* একটি খণ্ডিত বস্তুকে জানতে গিয়ে সেই বস্তু নয় যারা এমন সব বস্তুকেই জানতে হয়। Understanding-ই নিজেকে অতিক্রম করে আত্মবিরুদ্ধতা করে থাকে। যে কোনও মননই এইরূপে নিজের স্বভাব-বশেই আপনার বিভিন্ন বা বিপরীত মননের দিকে ধাবিত হয়। হেগেলের মতে আমাদের বুদ্ধি

* Thought, as 'Understanding', sticks to fixity of characters, and their distinctness from one another ; every such limited abstract it treats as having a subsistence and being of its own." (Logic of Hegel, Wallace, Art 180)

* "Understanding is so constituted that when carried to extremes it veers round to its opposite (Logic of Hegel, Wallace, p. 146) ।

বা মননের সকল ক্রিয়ার মূলেই এই প্রবণতাটুকু রয়েছে যে সে নিজের গণ্ডীকে পার হয়ে "তার স্ব-বিরুদ্ধ বা তারই" (own opposite) মধ্যে ছড়িয়ে ও জড়িয়ে পড়বেই। আত্ম-বিরুদ্ধ সত্তার দিকে এই যে উন্মুখতা, তাকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয়ে থাকে মনন বা চিন্তার ডায়লেকটিক প্রকৃতি।[৩]

এই তত্ত্বকেই হেগেলীয় ভাষায় বলা হয় এইরূপে যে, প্রত্যেক চিন্তাই নিজেকে নিরসন ক'রে ক'রে (negating) অনবরত বিকশিত হচ্ছে। হেগেলের কথায়: "...the result that ensues from its action is presented as a mere negation." (Art 81, Logic of Hegel Wallace, p. 147) আসলে কোনও বস্তুই খণ্ডিত ও বিচ্ছিন্ন নয়, কারণ নিখিল বিশ্ব একটি সম্পূর্ণ ও সংহত ঐক্য; এর কোন অংশকেই কোন অংশ থেকে ছিঁড়ে নিয়ে সত্যিকার পরিচয়ে চেনা যায় না। প্রত্যেকটি খণ্ডিত সত্তা বা চিন্তা এই কারণে বিরুদ্ধতা দোষদুষ্ট। সে অহরহ-ই কেবল নিজের সীমার বাইরে অপরাপর সত্তার দিকে আঙুল দিয়ে দেখাচ্ছে। তাকে জানতে হলে তাকে অতিক্রম করে, তাকে নিরসন করে (negating) তার থেকে বিভিন্ন বা বিপরীত সত্তাগুলোকেও জানতে হবে।[৩৩]

এই ডায়লেকটিক প্রকৃতি মানুষের সকল মননেরই অন্তর্নিহিত। সকল চিন্তা, সকল মনের অন্তর্লোকে তার চিরকালের অধিবাস। প্রত্যেক চিন্তাই নিজের ভিতরের প্রেরণায় নিজেকে বিরুদ্ধতা করে, অপরেতে ব্যাপ্ত হয়। "Indwelling tendency outwards" এই জন্যেই। কিন্তু কোনও খণ্ড বিচ্ছিন্নতার মধ্যে মানুষের মনন স্থির হয়ে থাকতে পারে না। আলোকার অবস্থাকে অতিক্রম করে মনন যে 'অপর' সত্তাতে উত্তীর্ণ হয়েছে সেই "অপর" সত্তাটিও আবার পূর্ববৎ একটি খণ্ডিত সত্তা বা অবস্থা মাত্র; কাজেই আবার একেও নিরসন (negate) ক'রে মনন আবার এর থেকে 'অপর' চিন্তায় বা সত্তায় উত্তীর্ণ হয়। এই রকম ক্রমাগত মানুষের খণ্ড বুদ্ধি (Understanding) একটির পর একটি খণ্ড সত্তাকে অতিক্রম বা নিরাস করে এগিয়ে চলে। পরবর্তী প্রত্যেকটি অবস্থা আগেকার প্রত্যেকটির অবস্থার নিরসন (negation)।[৩৩]

এইভাবে মনন ক্রমাগতই কেবল নিজের বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে পড়ছে এবং আগেকার অবস্থাকে পার হয়ে, অস্বীকার ক'রে পর পর নতুন অবস্থাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। মননের স্বভাবই এই ধরণের dialectic বা বিরুদ্ধ-সমন্বয় রীতি অনুসরণ করে চলা।[৩৩]

---

[৩] "In the Dialectical stage three finite characterisations or formulae supersede themselves and pass into their opposites." (Logic of Hegel, Wallace: Art 81, p. 147)

[৩৩] "But in its true and proper character, Dialectic is the very nature and essence of everything predicated by mere understanding,—the law of things and of the finite as a whole.....But by Dialectic is meant the indwelling tendency outwards by which the outsidedness and limitation of the predicates of understanding is seen in its true light and shown to be the negation of them. For anything to be finite is just to suppress itself and put itself aside." (Logic of Hegel, Wallace, p. 147)

[৩] "While thus occupied, thought entangles itself in contradictions i.e. loses itself in the hard and fast non-identity of its thoughts and so, instead of reaching itself, is caught and held in its counterpart." (Art. 11, Logic of Hegel, Wallace, p. 18)

[৩৩] "Thought in its very nature is dialectical

খণ্ডিত সত্যে মানুষের বুদ্ধির তৃপ্তি নেই। যতক্ষণ না বুদ্ধি বৃহৎ সামঞ্জস্যকে খুঁজে পায় ততক্ষণ পর্যন্ত মননশক্তির অগ্রগতির বিরাম নেই। অনবরত কেবল ক্ষুদ্র সীমাকে ডিঙিয়ে সে দূরের দিকে এগোতে থাকে, যেখানে সকল দ্বন্দ্বের চূড়ান্ত অবসান ঘটে। বুদ্ধি যেমন খণ্ডিত সত্যকে চোখের সামনে ধরে, তেমনি আবার সেই খণ্ড সত্যকে অতিক্রম করে যাবার তাগিদও মানুষের মননেরই ধর্ম। মননশক্তির এই ধর্মটির হেগেল নাম দিয়েছেন 'Reason' বা সমন্বয়ী বুদ্ধি। Understanding যেমন বিশ্লেষাত্মক এই Reason হচ্ছে তেমনি Synthetic বা সমন্বয়ী ও সংশ্লেষাত্মক। মানুষের গভীরতম প্রদেশে এই প্রেরণা কাজ করছে এবং মানুষকে ছাড়ায় খণ্ডিত সত্যকে পার হয়ে বৃহত্তর সামঞ্জস্যের দিকে উত্তীর্ণ করছে। এটাই মানুষের শ্রেষ্ঠতম প্রেরণা—মানুষের গভীর ঐক্যবুদ্ধি। একে তৃপ্ত না করে মানুষের উপায় নেই। মানুষ এই প্রেরণার বশবর্তী হয়েই সকল অসঙ্গতি (inconsistency) এড়াতে চায়। সকল রকম contradiction বা বিরোধ ও অসামঞ্জস্যের প্রতি মানুষের গভীরতম চেতনার পরম বিরাগের উৎস এই ঐক্যবুদ্ধি বা ব্যাপিবুদ্ধী মননশক্তি। সকল দেশের, সকল কালের মানব এই কারণেই অসামঞ্জস্য ও অসঙ্গতিকে ঘৃণা করে এবং অতিক্রম করতে চায়।*

যখনি খণ্ডবুদ্ধি (Understanding) মানুষকে আত্ম-বিরুদ্ধতায় জড়িয়ে ফেলে ও খণ্ডিত অচলতায় স্তব্ধ করে দেয় তখনি মানুষের এই উচ্চতম গভীরতম মনোবৃত্তি খণ্ডবুদ্ধিকে বাধা দেয় এবং সকল বিরোধের (contradiction) সমাধান করে উচ্চতর সত্যে মানুষের মননকে নিয়ে যায়।**

মানুষের গভীর মনন খণ্ড সত্যকে পার হয়ে শেষে এমন এক স্থানে উত্তীর্ণ হয় যেখান থেকে প্রতীত হয় বিশ্বলোকের পরম ঐক্য ও চরম সঙ্গতি। এই সকল দ্বন্দ্বের অতীতে যে দ্বন্দ্বাতীত ভূমা রয়েছে চিরদিন ও চিরকাল, এই সমগ্র দৃষ্টিতে সেই বৃহৎ ঐক্য ধরা পড়ে। তখন এই সত্য ধরা দেয় যে পরস্পরবিরোধী, সসীম ও ক্ষুদ্র সত্যগুলো নিতান্ত অসম্পূর্ণ ও আংশিক বৈ আর কিছু নয় এবং এই সব খণ্ডিত সত্যকে ঐক্যে বিধৃত করে অনাদি অনন্ত চিরব্যাপক ভূমা। এই ভূমাকে হেগেল নাম দিয়েছেন 'Absolute' বা পরম।

শ্রীযুক্ত হীরালাল হালদার এই ডায়লেকটিকের প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করে লিখেছেন :

যে পদ্ধতি এ Reality র আংশিক ধারণাকে বিরোধাত্মক প্রমাণ করে ক্রমশ: পূর্ণতর ধারণার দিকে আমাদের এগিয়ে দেয় এবং এইরূপে একটি অখণ্ড অ-বিরোধী পরম সত্তার (Absolute Idea) নির্দেশ দেয়, সেই পদ্ধতি হল ডায়লেকটিক।**

---

and···as understanding, it must fall into contradiction—the negative of itself." (Art 11, Logic of Hegel, Wallace, p. 18)

*"The mind has also to gratify the cravings of its highest and most inward life. That inner-most self is thought." (Logic of Hegel, Wallace, Art 11, p. 18)

**"This result to which honest but narrow thinking leads the mere understanding, is resisted by the loftier craving of which we have spoken. That craving expresses the perseverance of thought, which continues true to itself.....'that it may overcome' and work out in itself the solution of its own contradictions." (Logic of Hegal, Wallace, Art 11,p. 18)

**"....the method which seeks to show that a partial and inadequate conception of Reality is inherently contradictory and

সত্যকে মানুষের চাই-ই। তার এই অনুসন্ধানের যাত্রাপথে মানুষের মন কেবলি বৃহত্তের দিকে এগিয়ে চলে। ক্ষুদ্রকে ডিঙিয়ে সে বৃহতে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে এসে দেখে বৃহৎ নিজেও খণ্ডিত। বৃহৎকে পেরিয়ে তাই আসতে হয় বৃহত্তরে, বৃহত্তর তাকে উত্তীর্ণ করে বৃহত্তমে। এই রকম করে ধাপের পর ধাপ পার হয়ে মানুষের সংমনন ব্যাপকতম ভূমায় এসে উন্নীত হয়। সংমননের এই গতিকে প্রগতি ও উন্নতি বলা যায়। প্রত্যেকটি ধাপে এসে প্রতীতি হয় যে এখানেও বিরোধ (contradiction) রয়েছে এবং পরক্ষণেই পরের ধাপে যাত্রা আরম্ভ। পরের ধাপটি পূর্ব ধাপ থেকে উন্নততর পূর্ণতর সন্দেহ নেই। কিন্তু এটিও আবার অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত বলে বোধ হয়। এই ক্রমকে অনুসরণ করে মানুষের জ্ঞান ধর্মাতীত ভূমিতে স্থিতি লাভ করে।

মানুষের চিন্তাজগৎ সম্বন্ধে যেমন ডায়লেকটিক নীতি খাটে, তেমনি জড়জগতেও এই একই নীতির অনুশাসন চলছে। জড়লোকের প্রত্যেকটি বস্তু এই ডায়লেকটিক নীতি অনুসারে ক্ষয় ও বৃদ্ধির পথে চলেছে। জড়জগতের বস্তুগুলির পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে সেখানে ডায়লেকটিক নীতিই বলবতী। জড়জগতের কোন বস্তুকে বুঝতে হলে জগতের অপরাপর বস্তুগুলিকেও বুঝতে হবে। জড়জগতেও প্রতিটি অংশ পরস্পরের সঙ্গে নিবিড় ঐক্যে বিধৃত হয়ে রয়েছে এবং কাউকে বাদ দিয়ে কাউকে চেনা এখানে অসম্ভব। 'ক'-কে চিনতে গেলে ক-ছাড়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্যান্য সব কিছুকে জানতে হয় তবেই 'ক'-কে সত্যিকারে জানা যায়। আগে যে 'ইঁদের ডিম''-এর দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়েছে, সেখানে এই তত্ত্ব পরিষ্কার হয়েছে। আসলে জড়জগতেও কোন বস্তুর সঙ্গে কোন বস্তুরই পরম বিরোধ নেই; এখানেও সবাই পরস্পরের সঙ্গে জড়িত হয়ে, মিলে-মিশে এমনভাবে আছে যে কোনো একটিকে জানতে গেলে অপরকে না জেনে উপায় নেই। একটি বস্তুকে বুঝতে গেলেই দেখা যায়, সে খণ্ডিত হয়েছে অন্যান্য বস্তু দ্বারা। কোন বস্তুই স্বয়ং-সম্পূর্ণ নয়। প্রত্যেক বস্তুরই অস্তিত্ব পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তদ্-ব্যতিরিক্ত অপর বস্তুদ্বারা। একেই হেগেলের ভাষায় বলা যায়, প্রত্যেক বস্তু contradicted হচ্ছে সেই বস্তুর "বিপরীত-সত্তার" (counterpart) দ্বারা। পরে আবার দেখা যাবে, এই বস্তু এবং তার "বিপরীত সত্তা" দুই-ই অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে এদের চাইতে ব্যাপকতর সত্তার মধ্যে। কিন্তু সেই ব্যাপকতর সত্তাও আবার খণ্ডিত বা পরিচ্ছিন্ন হচ্ছে তার "বিপরীত সত্তা" দ্বারা এবং এরা উভয়েই অন্তর্ভুক্ত হয়ে ঐক্যে মিলে আছে আরো বৃহত্তর সত্তার মধ্যে। এই ক্রমানুসারে ধাপের পর ধাপ পার হ'য়ে মানুষের জ্ঞান এসে উত্তীর্ণ হয় এক দ্বন্দ্বহীন ভূমায় যেখানে সত্য জেগে আছে অনাদি সামরস্য ও চিরকালের ঐক্যে। ধাপের পর ধাপকে নিয়ন্ত্রন করে এই যে যাত্রা এগিয়ে চলেছে, হেগেলের মতে এ একটা নির্দিষ্ট ছক বা ফর্মূলা অনুসারে বিবর্তিত হয়। এই ছকই ডায়লেকটিকের ছক। একটি স্তরকে খণ্ডিত করে অপর স্তরের সত্তা। হেগেল বলেন এই অবিশ্রান্ত খণ্ডন বা পারস্পরিক নিয়ন্ত্রনের একটি বিশেষ রীতি বা ধরণ আছে। তাঁর মতে তিনটি ধাপ বা স্তরের মধ্য দিয়ে এই বিশ্ব-বিবর্তন এগিয়ে চলেছে; এর প্রথম স্তরের তিনি নাম দিয়েছেন 'Thesis' (স্থিতি)। এই ধাপকে যে স্তর খণ্ডন, নিয়ন্ত্রন বা বিরোধিতা করে সেই পরবর্তী স্তরের নাম 'Antithesis' (প্রতিস্থিতি); এর পরে

---

therefore leads on to a fuller and more adequate conception, which, in turn, is found to be equally onesided, and defective, till we reach the conception of a systematic totality of things in which a single spiritual principle is manifested or what Hegel calls the Absolute Idea." (pp. 43-44, 'Hegelianism & Human Personality')

anti-thesis বা প্রতিস্থিতিকেও নিরসন করে যে তৃতীয় স্তর বা ধাপের অস্তিত্ব, তার নামকরণ হয়েছে Synthesis (সংস্থিতি)। এই ধাপে আগেকার দুই স্তরের অর্থাৎ স্থিতি-প্রতিস্থিতির (thesis-antithesis) বিরোধ বা দ্বন্দ্বের অবসান ঘটেছে। কারণ, এই তৃতীয় স্তর অর্থাৎ সংস্থিতি (Synthesis) আগেকার দুই স্তর থেকে ব্যাপকতর এবং স্থিতি-প্রতিস্থিতি (Thesis-Antithesis) এখানে বৃহত্তর সাম্যে ও সামঞ্জস্যে বিধৃত ও সুরক্ষিত হয়ে আছে। স্থিতিকে (thesis) নিরসন বা negate করে প্রতিস্থিতির (anti thesis) অস্তিত্ব সার্থক হচ্ছে এবং প্রতিস্থিতিকে (Antithesis) পুনরায় নিরসন বা negate ক'রে সংস্থিতির (Synthesis) সার্থকতা। যেমন, 'চেয়ার'কে বুঝতে হলে 'না-চেয়ার'কে বুঝতে হবে। তার মানে চেয়ার ছাড়া, যে সব একই শ্রেণীর বস্তু আছে, যেমন, 'টেবিল', 'বেঞ্চি', 'টুল', 'টিপয়', 'খাট-পালঙ্ক' ইত্যাদি—এদের সম্বন্ধে ধারণা হলে তবেই চেয়ারের সত্যিকার ধারণা হবে। কোনো লোক যদি শুধু সারাজীবনে এক "চেয়ার"ই দেখে, "না-চেয়ার" সম্বন্ধে কোন ধারণাই তার না থাকে, তবে তার "চেয়ারের" সম্বন্ধেও বিশদ জ্ঞান হবে না। যে লোক চেয়ার ছাড়া অন্যান্য বস্তু থেকে "চেয়ার"কে পৃথক ও বিশিষ্ট জেনে চেয়ারের সব বিশেষত্বের জ্ঞান লাভ করেছে, "চেয়ার" সম্বন্ধে তার জ্ঞানই পাকা ও পুরা জ্ঞান। "চেয়ার"কে যদি নাম দেওয়া হয় স্থিতি (Thesis), তবে "না-চেয়ার" (অর্থাৎ টেবিল, বেঞ্চি ইত্যাদি) হবে চেয়ারের প্রতিস্থিতি (Anti-thesis), কিন্তু এই "চেয়ার" ও "না-চেয়ার"—স্থিতি ও প্রতিস্থিতি (Thesis ও Antithesis) দুই-ই পরস্পরকে বিরুদ্ধতা করলেও, এরা আসবাবপত্র (Furniture) এই তৃতীয় সত্তায় অন্তর্ভুক্ত হয়ে আছে, সুরক্ষিত ও ঐক্যে মিলিত হয়ে। আসবাবপত্র (Furniture) বললে চেয়ার ও না-চেয়ার এই দুই শ্রেণীর বস্তুই বোঝা যায়, এবং এদের ঐক্যও খুব পরিষ্কার হয়ে ধরা দেয়। কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যাবে যে, আসবাবপত্রও খণ্ডিত ও অপূর্ণ সত্তা মাত্র। আসবাবপত্র নির্দেশ করে তার কৃত্ব সত্তা হিসেবে না-আসবাবপত্রকে (Not-Furniture)। 'না-আসবাবপত্র' বলতে বাড়ী, ঘর, দেয়াল ইত্যাদি সবই বোঝায়। কাজেই আসবাবপত্রকে যদি স্থিতি (Thesis) বলা হয়, তবে না-আসবাবপত্র হবে প্রতিস্থিতি (Anti-thesis)। কিন্তু না-আসবাবপত্র নিজে অসম্পূর্ণ ও খণ্ডিত সত্তা মাত্র। একে নিরসন করে কঠিন (Solid) নামে তৃতীয় স্তরের ব্যাপকতর সত্তা রয়েছে যাকে আগের দুই স্তরের সংস্থিতি (Synthesis) বলা যেতে পারে। আবার কঠিনকে 'স্থিতি' ধরলে তরল (Liquid) হবে প্রতিস্থিতি এবং বস্তুমাত্র বা "Thing"কে ধরা যাবে ব্যাপকতর সংস্থিতি (Synthesis) হিসেবে। এমনি করে প্রত্যেক স্তর আগেকার স্তরের নিরসন করছে এবং পরের স্তরের দ্বারা নিজেও নিরস্ত হচ্ছে। পরপর তিনটে ধাপকে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (Thesis, Anti-thesis, ও Synthesis) বলা হয়। এই তিনটে ধাপের প্রত্যেকটি পরস্পরের সঙ্গে এমন ভাবে সংশ্লিষ্ট আছে, যে প্রথমটাকে বিশ্লেষণ করে দেখলে দেখা যাবে সে দ্বিতীয়টিকে নির্দেশ করে এবং তার সঙ্গে এমন ভাবে জড়িত আছে যে একটিকে বাদ দিয়ে অপরটিকে বুঝতে চেষ্টা করলে বিরোধ বা অসঙ্গতি (contradiction) ঘটে।*

*"Hegel's primary object in his dialectic is to establish the existence of a logical connection between the various categories which

কাজেই দেখা যাচ্ছে হেগেলের মতে আমাদের অনুভূতিতে যত চিন্তা, যত বস্তু, বা যত ঘটনা আসছে, সে-সবই এই একটি বিশেষ পদ্ধতিকে মেনে নিয়ে চলেছে। সকলেই আত্ম-বিরুদ্ধতা করছে এবং নিজেকে খণ্ডন ও নিরসন করছে।

একটা বিষয় এখানে উল্লেখযোগ্য। এতক্ষণ সবাই জানে, যত সব ঘটনা ঘটছে সে সবই ঘটছে দেশে ও কালে। যত বস্তু রয়েছে সবই দেশ ও কালের রাজ্যেই রয়েছে। দেশ ও কাল এই দুই পদার্থকে ছাড়িয়ে কোনো বস্তু বা ঘটনার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। বস্তু বা ঘটনাগুলিকে দুইভাবে আমরা দেখতে পাই। প্রথমতঃ, একই কাল-বিন্দুতে (Point of Time) বহু বস্তু থাকতে পারে পাশাপাশি বহু দেশ-বিন্দুতে (Points of space) ব্যাপ্ত হয়ে। কিম্বা একই কালে বহু ঘটনা ঘটতে পারে বহু দেশবিন্দুতে ব্যাপ্ত হয়ে। দ্বিতীয়তঃ, একই দেশবিন্দুতে (point of space) বহু বস্তু থাকতে পারে পর পর বহুকাল বিন্দুতে (point of time) ব্যাপ্ত হয়ে। কিম্বা একই দেশে বহু ঘটনা ঘটতে পারে বহু কালবিন্দুতে (points of time) ব্যাপ্ত হয়ে। প্রথম শ্রেণীর বস্তু বা ঘটনাগুলিকে বলা হয় এক-কালীন বা সমকালীন (contemporary) আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বস্তু বা ঘটনাগুলিকে বলে কালানুক্রমিক (successive)। এই দুই শ্রেণীর ঘটনা বা বস্তুগুলি সম্বন্ধেই হেগেলীয় ডায়লেকটিকের এই স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (Thesis-Antithesis-Synthesis) ক্রমনীতি খাটবে বলে হেগেলীয়রা বলেন। পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে যে সব বস্তু রয়েছে বা যে-সব ঘটনা ঘটছে, তার একে অন্যকে খণ্ডন করছে। অপরপক্ষে আবার যে সব ঘটনা পর পর কালে ঘটছে বা যে সব বস্তু পর পর কালে রয়েছে তারাও একে অন্যকে নিরসন করছে। বীজ পর পর তিনটে ধাপের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে : বীজ, চারা, বৃক্ষ। এখানে বীজকে নিরসন বা খণ্ডন করে চারার আবির্ভাব হ'ল এবং পরে চারাকে নিরসন করে বৃক্ষের অস্তিত্ব সম্ভব হ'ল। এই কালক্রমিক তিনটে ধাপকে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি বলা যাবে। স্থিতিকে নিরসন করে প্রতিস্থিতি এবং এই প্রতিস্থিতিকে নিরসন করে সংস্থিতি আবির্ভূত হয়। কাজেই সংস্থিতি বা সমন্বয় (Synthesis) হলো দুটো নিরসনের (negation)-এর ফল। এইজন্য সংস্থিতি বা Synthesis 'negation of negation' বা 'নিরসনের নিরসন'ও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এ-বিষয়ে লক্ষ্য রাখা দরকার যে স্থিতি (Thesis) ইত্যাদি তিনটে শব্দই আপেক্ষিক (relative)। যে কোনো ঘটনাকে স্থিতি বললে, তার পর পর দুটো ধাপ প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতির জায়গা নেবে। আবার স্থিতিটি নিজেও এর আগেকার দুটো ধাপের সংস্থিতি। কারণ ঐ দুটো ধাপ পর পর খণ্ডিত অর্থাৎ নিরস্ত হয়েই অর্থাৎ negation of negation হয়ে বর্তমান ধাপ (বা বর্তমান স্থিতি) জন্ম লাভ করেছে। বীজ-এর দৃষ্টান্তে 'বৃক্ষ'ও আবার ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে হবে স্থিতি। কারণ, বৃক্ষকে নিরসন করে আবার তার পরবর্তী ধাপ এলো বীজের আকারে। সুতরাং এই বীজ হলো বৃক্ষের প্রতিস্থিতি। আবার বীজকে নিরসন করে দেখা দেবে নতুন বৃক্ষ—যাকে বলা যাবে সংস্থিতি। এমনি করে বিকাশের বা পরিবর্তনের যাত্রা চলেছে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি (Thesis, Antithesis ও Synthesis) ক্রমিক সিঁড়ি বেয়ে। (ক্রমশঃ)

---

are involved in our experience. He teaches that this connection is of such a kind that any category, if scrutinised with sufficient care, is found to lead on to another and to involve it, in such a manner that an attempt to use the first of any subject while we refuse to use the second of the same subject results in a contradiction. The category thus reached leads on in a similar way to a third and the process continues until at last we reach the goal of the Dialectic in a category which betrays no instability. (Studies in Hegelian Dialectic Mc Taggart—Art 1 :)

ভিয়েৎনাম

সুনীল দাস

বিশ্বসংঘাতের ভারকেন্দ্র অপ্রতিহত গতিতে ভিয়েৎনামের দিকে প্রসারিত হয়ে চলেছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সমগ্র পৃথিবী জুড়ে আরও বহু কেন্দ্রবিন্দুতে সংঘাতের উত্তেজিত আবেগ সৃষ্টি হয়ে সঙ্কটের সীমানা কখনও কখনও আর একটি মহাযুদ্ধের কিনারা পর্যন্ত প্রসারিত হলেও, শেষ পর্যন্ত সীমাংসার জোড়াতালির মধ্য দিয়ে তা প্রশমিত হয়েছে। বিভক্ত জার্মানীর সঙ্কট একটি অমীমাংসিত সমস্যা হলেও, আপাততঃ তার উত্তেজনার ভাটা পড়েছে। কোরিয়ার সঙ্কট ১৯৫০ সালে উল্কার বেগে সামরিক সংঘাতে পরিণত হয়েছিল; বিভক্ত কোরিয়ার মধ্য দিয়ে সে সঙ্কটের আপাত-উত্তরণ সম্ভব হয়েছিল। কিউবার সঙ্কটও এমনি আর একটি সাম্প্রতিক ঘটনা। ক্রুশ্চেভের গুপ্তবুদ্ধি ও কিউবাকে রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটিতে পরিণত করার বিরুদ্ধে কেনেডির অনমনীয় দৃঢ়তা শেষ রক্ষা করেছিল। এ-ছাড়া পশ্চিম এশিয়া, সুয়েজ, কঙ্গো, রোডেশিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, এঙ্গোলা, সাইপ্রাস প্রভৃতি উত্তেজনার আকীর্ণ অঞ্চলগুলির সঙ্কটের, স্থানীয় আবর্ত অতিক্রম করে বিশ্বাবর্তের দিকে যাত্রা আজো সম্ভব হয় নাই। স্থানীয় আবর্তের মর্যাদায়ই এদের আয়ু অবসিত হবে। ভারত ও পাকিস্তানের সংঘাতের পরিধিও আপাতত বহুযুদ্ধ-বিস্তৃত নয়। অবশ্য চীন-পাকিস্তান যৌথ কর্মশালায় সঙ্কটের সীমানা বিস্তৃততর করবার অবিরাম উদ্যোগ চলেছে। আলজিরিয়ার সঙ্কট, তদানীন্তন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলেই অতিক্রান্ত হয়েছে। তা না হলে মূল ফরাসীদেশে অন্তর্বিপ্লবের দিনগুলি এগিয়ে আসতো।

কিন্তু ভিয়েৎনাম? এই অঞ্চলে লাওসও রয়েছে সঙ্কট-জর্জরিত হয়ে। ভিয়েৎনাম-সঙ্কটের মধ্যেই লাওসের সঙ্কট প্রতিফলিত ও সমর্পিত। অবশ্য ভিয়েৎনাম ও লাওসের-সঙ্কটের উৎস ইতিহাসের একই বিন্দুতে, একই পৃষ্ঠভূমিতে। ফরাসী ইন্দো-চীনের ভস্মস্তূপ থেকে লাওস ভিয়েৎনাম ইতিহাসে উৎসারিত। ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে ইন্দোচীনের জাতীয় স্বাধীনতার আন্দোলনকে নিষ্ঠুর অত্যাচারে ফরাসীরা দমন করতে সচেষ্ট ছিল বিশ দশক থেকেই। স্থানীয় কম্যুনিষ্টরা তখন দুর্বল ছিল, ফরাসী অত্যাচারের ঝাপটা থেকে তাই তারা রক্ষাও পেয়ে গেছে সে-সময়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাপানীরা এলো ইন্দো-চীনের-দখলদার হয়ে। সঙ্গে সঙ্গেই তাদের বিরুদ্ধে গোপন প্রতিরোধ-আন্দোলনও গড়ে উঠেছিল, ইন্দো-চীনের জন্য-স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য। দ্বিতীয় যুদ্ধ চলাকালীন সেদিনকার জাতীয়তাবাদী চীনাসরকার, জাপানী দখলের বিরুদ্ধে এই গোপন স্বাধীনতা আন্দোলনকে সহায়তা করে এসেছে। ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্টরাও এই সুযোগ গ্রহণ করতে কিন্তু না করে ভিয়েৎনামী স্বাধীনতা ও প্রতিরোধ আন্দোলনের নেতৃত্বের দায়িত্ব নিতে এগিয়ে এলো। যে পরিমাণে কম্যুনিষ্টরা এ-ব্যাপারে সফল হল, সেই পরিমাণে জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব পিছু হটতে বাধ্য হয়। এর কারণও ছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্বে ইন্দোচীনে ফরাসী দখলদারীর আমলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ফরাসীদের চরম পীড়নের সম্মুখীন হয়েও ভিয়েৎনামী স্বাধীনতার অ

চূড়ান্ত আত্মত্যাগ করেছে, আর সে-সময় সেখানকার কম্যুনিষ্ট আন্দোলন ফরাসী শাসকদের সঙ্গে চূড়ান্ত সংঘাতে এড়িয়ে গেছে। বরং তারা কখনও কখনও ভিয়েৎনামী স্বাধীনতাকামী জাতীয়তাবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘাতে লিপ্ত হয়ে তাদের হীনবল করতে সহায়তা করেছে। সুতরাং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পূর্বে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা আন্দোলন, পাশবিক ফরাসী নির্যাতনে ক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছিল অথচ কম্যুনিষ্টরা সে-সময় স্বাধীনতা আন্দোলনের বাইরে থেকে এবং প্রয়োজন মত এই আন্দোলনের বিরোধিতা করে নিজেদের অক্ষত রেখে সংহত হয়েছে। কম্যুনিষ্টদের এই ছল-কলা-কৌশল প্রতিটি ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রেই নিয়োজিত হয়েছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনেও কম্যুনিষ্টরা এই ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

জাপানীদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে কম্যুনিষ্টরা তাদের সুপরিচিত কৌশল—ফ্রন্ট-এর আশ্রয় গ্রহণ করে তাদের কর্মসূচীর সফল সাংগঠনিক বনিয়াদ রচনা করেছিল। কখনও বা তারা 'ভিয়েৎমিন লীগ' নামে ফ্রন্ট গঠন করেছে, কখনও বা 'লিয়েন-ভিয়েৎ' নামে, আবার একসময় 'কাথারসিস ফ্রন্ট' নাম নিয়েও কাজ করেছে। জাপানী দখলের আমলে, তারা এইভাবে ভিয়েৎনামে, বিশেষ করে ভিয়েৎনামের উত্তরাঞ্চলে শক্তিসঞ্চার করেছিল। ১৯৪৫-এ জাপানী আত্মসমর্পণের পর ইন্দো-চীনে জাপানী শক্তির অন্তর্ধানের অবসরে এই অঞ্চলে শক্তি-বিন্যাসে অবশ্যম্ভাবীরূপে যে বিরাট শূন্যতার সৃষ্টি হলো। শক্তি-বিন্যাসে এই শূন্যতা (power vacuum) পূরণের জন্য ইন্দো-চীনে যুদ্ধপূর্ব ঔপনিবেশিক শক্তি-পরম্পরার ক্রান্তে এগিয়ে এলো। কিন্তু জাপানী দখলের আমলে ইন্দো-চীনে শক্তি-বিন্যাসের নানা পরিবর্তন হয়ে গেছে। প্রবল কম্যুনিষ্ট ফ্রন্ট এবং ইন্দো-চীনের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলন,—ইন্দো-চীনে ফরাসী ঔপনিবেশিক শাসনের প্রত্যাবর্তনের পথে প্রবল অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। শেষ পর্যন্ত সমগ্র ইন্দো-চীন এলাকায় যুদ্ধ সুরু হয়ে গেলো—ফরাসী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে ইন্দো-চীনের জাতীয় স্বাধীনতার যুদ্ধ। কার্যত, এই যুদ্ধ ফরাসী শক্তির সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের সংঘাতের রূপ নিল। আট বছর এই রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে, বিপুল মার্কিনী সাহায্য সত্ত্বেও, ফরাসী-শক্তি ক্রমশ পর্যুদস্ত হয়ে ১৯৫৪ সালের মে 'দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসী সামরিক শক্তির চূড়ান্ত পরাজয় হল। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে হয় ইন্দোচীন সঙ্কটের রাজনৈতিক মীমাংসার পৌঁছাবার জন্য বৃহৎ শক্তিবর্গের অবিলম্বে তৎপর হতে হবে, না হয় 'দিয়েন বিয়েন ফু'তে এশিয়ায় ফরাসী সাম্রাজ্যবাদের ভগ্নস্তূপের উপর, ইন্দোচীন সঙ্কট মীমাংসার জন্য, পশ্চিমী শিবির ও কম্যুনিষ্ট শিবিরের মধ্যে সামরিক সংঘাত অনিবার্য হয়ে উঠবে। তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশুভ ছায়ার অকস্মাৎ পদসঞ্চারণে বৃহৎ শক্তিবর্গের চৈতন্যোদয় হওয়ার ফলে তারা জেনেভায় ১৯৫৪ সালের ২৬শে এপ্রিল তারিখে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মিলিত হয়ে ২০শে জুলাই জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে। জেনেভার এই চুক্তিতে ভিয়েৎনামে ফরাসী শাসনের অবলুপ্তির স্বীকৃতির পাশাপাশি ইন্দোচীনের স্বাধীনতাও স্বীকৃতি পেলো; ফরাসী ইন্দোচীনের ভগ্নস্তূপের উপর খণ্ডিত ভিয়েৎনাম, লাওস ও কাম্বোডিয়া, এই চারটি নূতন রাষ্ট্রের পত্তনের মধ্য দিয়ে। খণ্ডিত ভিয়েৎনামের উত্তরাংশে কম্যুনিষ্ট শাসন স্বীকৃত হল এবং দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নোগো দিন দিয়েমের প্রধান মন্ত্রীত্বে একটি অকম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র গঠিত হল। সপ্তদশ অক্ষরেখা এই রাষ্ট্রের সীমারেখা রূপে চিহ্নিত হল। ১৯৫৪ সালের জেনেভা সম্মেলন ফ্রান্সের অনুরোধে আহূত হয়েছিল এবং এই সম্মেলনে ব্রিটেন ও সোভিয়েত রুশের উপর যৌথ

(শেষাংশ ১২৯ পৃষ্ঠায়)

বড়োই আশ্চর্য লাগে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বড়োই আশ্চর্য লাগে এইসব ক্লান্ত পরিক্রমা।
সবাই প্রত্যহ যেন ছুটে যাচ্ছি উচ্চতার দিকে,
কোনো তীক্ষ্ণ আকাঙ্ক্ষার পাহাড়ের শীর্ষে পৌঁছাবার
দুরন্ত প্রস্তুতিতে অপরিমান দৃশ্য ফেলে।
যেমন মুষিকগুলো খুঁদকুড়ো মুখে দুদণ্ডেই
কোথাও বিবরে যায়, লক্ষ লক্ষ মনুষ্য মুখের
তেমনি বিলুপ্তি যেন ধাবমান সংসারের স্রোতে
অজ্ঞতার ব্যর্থতায় সুতীব্র ঢেউয়ের অন্তরালে।
কেউই কোথাও যেন স্থিত নয়, শান্ত সমাহিতি
নেই কোনো উচ্চারণে, স্তবে কিংবা প্রতিনিবেদনে;
কেবল বেলুন নিয়ে খেলা করে শিশুরা যেমন
সমস্ত মনুষ্য সৃষ্টি অনুরূপ মিথ্যা মোহময়
আকাঙ্ক্ষার উত্তোলেই সংসারে নিয়ত চুপসে যায়।

কোথাও বাড়ির কোনে, বারান্দায় অথবা বাগানে
দু' চারটি সঙ্গী নিয়ে যদি বসা যেত একবার
চণ্ডীমণ্ডপের স্মৃতি ফুকে নিয়ে। কিম্বা সেকালের
রথের মেলায় কিংবা চড়কের প্রমত্ত গাজনে
শিশুদের বিস্ময়ের অন্তত খানিক যদি পাওয়া যেত;
মুখোস মুখশ্রী যদি একাকার হ'তো স্থিতধায়।
অথবা ধবল সেই অমলিন দেখি না কোথাও,
কিটন গাড়ীর সেই বহমান সৌন্দর্যের স্মৃতি।

সমস্ত নগরীময় অন্ধ নিয়মের নাগপাশে
বড়োই বিভ্রান্ত লাগে এইসব স্থিতে পরিক্রমা;
পাহাড়ে উঠতে সাধ একবার পতনের আগে।

সুখ দুঃখ আশা ইচ্ছা : নচিকেতা ভরদ্বাজ

সুখ দুঃখ আশা ইচ্ছা আকাঙ্ক্ষার ওপারে যে মন
তাকে আমরা কখনো পাইনি।
অথচ আশ্চর্য এই তারই কাছে কবি
থেকে চাই—চিরকাল,—সমস্ত জীবন
তার দিকে মুখ করে পথ চলি,—পথ চলতে গিয়ে
কেবল অথবা ক্লান্ত হতে থাকি—, জীবনের মানে
কেমন ধূসর স্থির রিক্ততার কাছে
সমর্পিত হতে থাকে। যদিও প্রত্যহ এক অন্যতাকে নিয়ে—
সুখী হয়ে যেতে চাই : পরিচিত ঘানে
ছকা পাতা খেলে কেউ সমস্ত প্রয়াসে
অন্য আকাঙ্ক্ষার দিকে যেতে গিয়ে—অতন্ত্র বিবিক্ত গভীর
হয়ে যায় আমি দেখেছি এখানে।

যাদু নারী-আভিজাত্য—এই সব মানান ফসলে
পূর্ণতার স্বাদ খুঁজি; যৌবনের ক্ষয়িষ্ণু স্মৃতির
সমস্ত উচ্ছাস আলো—ভুলে গিয়ে জলে
নাম লিখি। প্রস্তাবনা শুধু নাটক
এখানে জমে না—; এক আলোকিত দূর সময়
এখানে ঘটে না। আমরা অতঃপর মৃত্যুর ভাবক
তাও হতে পারি না যে। মাটির গভীরে
কী যেন অদ্ভুত স্বাদ মরে গেছে;—এই সব পরিচিত
পৃথিবীর দিনে
নতুন রৌদ্রের স্নেহে বার বার আমরা বিস্ময়।

আমরা তাই পথ চলি এই নোনা সমুদ্রের তীরে
অনায়াসে—বৃষ্টি, হাওয়া, সূর্যের স্মৃতিকে
কী এক মহিমান্বিত "দুরাদয়শ্চক্র নিভস্যতন্বী"
"তমালতালিবনরাজিনীলা"·····—"
বুঝি না বুঝি না কিছু—; তবু এক প্রতীকী বহ্নির
আবেগে আমরা জ্বলি—অথচ দুয়ারে
নৌকা বাঁধা আছে ঠিক—। প্রস্তুত হয়েছে রসিদ।

চৈত্রচিন্তন গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

তুমি ছিলে চিরকাল,—মনহীন কায়ার মতন ;
খেলেছি তোমাকে নিয়ে একগুচ্ছ পুষ্পের আহ্লাদে ;
সেতো লুকোচুরি খেলা—ভয়েভয়ে আনন্দে বিষাদে ;
কপালীবী স্পর্শ দিতো, খুলে দিতো মায়ার ভুবন।

তুমি ছিলে ভাবকল্প—দেহহীন মনের মতন ;
স্মৃতির সুতোকে টেনে বুনেছি স্বপ্নের ইন্দ্রধনু ;
প্রতি মানুষীর অঙ্গে খুঁজেছি তোমার বরতনু ;
বাহিরে যেদেনা তাকে হৃদয়ে যে করে সঞ্চরণ।

কিংশুক, শিমুল ঝরলেও, অশোক, শিরীষ ঝরে যায় ;
চৈতালি হাওয়ার পিঠে বৈশাখের আতপ্ত নিশ্বাস ;
দীর্ণ নদী পূর্ণ হবে, কাশবনে আশ্বিন-বাতাস
আমাকে শুধাবে : "কবে আসবেন নিরঞ্জনা রায় ?"

আমার চৈত্রের সন্ধ্যা বন্ধ্যা হয়, বৈশাখী-প্রহর
ভরে আগুন জ্বালবে, বর্ষা করবে, কিন্তু তারপর ?

শিল্পীর বীক্ষা : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

[কবি সুনীলকুমার চট্টোপাধ্যায়ের উদ্দেশে]

আশ্চর্য শিল্পের বীক্ষা—শোণিতে সে এঁকে যায় ছবি,
কতো মুখ, কতো চোখ, ন্যাড়কেপ—হাসিঅশ্রুমাখা ;
উচ্ছল যৌবন, আর প্রৌঢ়তার স্তিমিত লহর ;
সব রেখা বর্গোজ্জ্বল নয়, কিছু অস্পষ্ট ধূসর !
অন্বেষার পাখি তার বেদনার কাপটায় পাখা।
মনের তুলির টানে বুকের ইজেলে ফোটে সবই।

তথাপি বাস্তবে স্থিতি ; পড়েনা সে কল্পনা-বাসর,
কতো ছবি হারিয়েছে ; জীর্ণ-মোছা আঙনের দাগ,
এখন কলঙ্ক বলে মনে হয়। মনের রোশনাই
একবার জ্বলে গেলে তা-কি শুধু একমুঠো ছাই !
জীবনের রূপায়ণে তপ্তনক্ত অন্তরের রাগ ;
চেতনার মূলে তার যুগের যন্ত্রণা প্রজাগর।

মৃত্যুকে করেনি ভয়। দীপে দীপে কতো মৃত্যু, নারী
হয়ে গেছে ; ক্ষয়ে গেছে মৃত্তিকাও অনুশোচনায় ;
তবুও শিল্পীর মন নিরুপম, শিল্পায়ন তারই
অন্তরের আবেদনে রসসিক্ত অনুভাবনায়।

তার মন, এষণার সাথে, যেন নারীপুরুষের
সহজাত প্রেমকৃষ্ণা,—অবগ্রিত ভাবানুষঙ্গের
রূপরেখা, নিরীক্ষায় নূতন নূতন রূপে আঁকে ;
সে জানে শিল্পকে তার, কে তার প্রতীক্ষা করে থাকে।

তিনটি কবিতা

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

১

কালকে হবে বিচারসভা।
এখন তুমি অন্ধকারে
চুল খুলে দাও, বক্ষোপাশে
যে সব পাখি উড়তে আসে
তাদের তুমি রাগ কোরো না।

এখন তুমি তীব্র সুখে
রঙ করো না ও হৃদয়খানা
সারা দেহে আবীর মেখে
হোলি খেলে যাও পূর্ণিমাতে।
দেখনি কি চতুর্দিকে
দিন কেটে যায়, দিন কেটে যায়!

দেখনি কি, ক্রমাগত
অহংকারে ব্যথার তাপে
চাঁদের মধ্যে অস্ত্র হাতে
সবাই কিছু খেলতে আসে;
দেখনি কি, জ্যোৎস্না ফোঁড়ে
স্বভাব দোষে রক্তপাতে
বিপর্যস্ত ব্যথার ভাসে।

কালকে হবে বিচার সভা।
এখন তুমি অন্ধকারে
চুল খুলে দাও, বক্ষোপাশে
যে সব পাখি উড়তে আসে
তাদের তুমি রাগ কোরোনা।

২

এক এক দিন বদলে যায়
চাঁদটাকে খুব কাছে লাগে,
ইচ্ছে হলে আকাশ খানা
হাতে ধরা আয়শি হবে।
প্রচণ্ড দূর পাহাড়টাকে
অনায়াসে দোরের কাছে
দাঁড় করিয়ে যতুন চলে।
অথচ এই হাতের কাছে
তুমি কেমন দূরে ফুটে—
তুলতে কেন সময় লাগে?

৩

ঐখানেতে ফুটতো করবীরা
সন্ধ্যেবেলা রঙ ছড়াতে বেশ
একটি দুটি হলুদ বরণ পাখি
অন্তমিতে ডেকে উঠত কাছে।

ঐখানেতে বসেছি সারা বেলা
দোলনা নিয়ে দুলত মৃদু হাওয়া
রোদ্দুরগুলো সব ধাক্কা দিয়ে শেষ
জলের জলে ডুবত ছায়া ফেলে।

ঐ খানেতে এখন সন্ধ্যা হোল
বিষণ্ণতার বতোন আলো ভাসে।
অন্তমিত আলোর মাঝে একা
ওখানে এক আঁধার দাগে রাজা।

ধ লে শ্ব রী

প্র বো ধ ব ন্ধু অ ধি কা রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

হাজী খালের গোঁয়ার গোঁতা জেদী শঙ্খচূড়ের মতন সোঁদায়, গর্জায়। প্রবল জলধারার তীব্র টান একদিকে, আর একদিকে অভিমানী বাতাসের আড়ষ্কা ঝাপটা—শিবচরণের দুই মাল্লাই কিরায়া নাওখান দুই পক্ষের টানা-হ্যাঁচড়ার মধ্যে পড়ে যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। বেতড়িপর ঢেউগুলো এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। গাঙ-কান্দির পারের টান হামেশা হাত বাড়াচ্ছে। গাঙ্গিতে তোলা বাদামখান যদি থেকে থেকে ওঠা বাতাসের ঝাপটা ধরতে না পারত, তবে হাজী খালের উন্মত্ত স্রোত খোরের ভোঙ্গার মতন নিমেষে টেনে নিত আধকাঠের কিরায়াদারী নাও। মাল্লা আর সওয়ারী চোখ খুলে অবাক হন্ত—না, বামুনপাইলা না, পাঁজের পানিতে বুক রেখে পক্ষিরাজের নাহাল তারা উড়ে যাচ্ছে উল্টা পথে; জামুরকির নয়াখাল ধরে নাও ছুটছে ঘুরপালার ঠাকুরপাড়ার দিকে।

কুন গাঁও? পিছ-নাওয়ের চরাটে বসে বেদিশা জাহেদ পারের দিকে তাকাল। হৈতান হিজল জলডুমুর আর বড়ই গাছের ঘন জঙ্গলাপটি এখানে নেই। ফাঁকা অফিন, কিন্তু বাড়ির চিহ্ন জেগে নেই কোথাও। ঘুরের আউস আর কাওনের পুরন্ত ডগাগুলো আনুপাকু করছিল। কোন নির্জন পোড়ো বাড়ির চৌহদ্দি থেকে বন্দী অসহায় শিয়াল কেঁদে কেঁদে উঠছিল। শুধু বেপারীর আর বেদিশাই হননি জাঁদরেল আদুর কারবারী জাহেদ মিঞা, এখন কিছুতেই আর ধৈর্য বাগ মানছে না। হালের বাঁট ধরে বসে থাকতে থাকতে তার বেলাজের গোস ইবলিশে খাচ্ছিল। আশ-নাওয়ের কিছু দেখা যাচ্ছে না, দেখতে পারছে না জাহেদ মিঞা। কেবল, পিছ-ছামড়ের আক্রখান চোখের সামনে বাতাসের কাপটায় থেকে থেকে পৎপৎ করে উড়ছে। গলা বাড়িয়ে দিয়েছিল জাহেদ বাপারী, ছইয়ের অন্দরে বুঝিন বিবি আর পোলা-পানরা ঘুমে অচেতন হয়ে আছে। না, উড়ন্ত অস্থির আক্র জাহেদকে অন্দর ছই দেখবার সুযোগ বয়ে দেয় নি। ওখানে, লণ্ঠনের নিবু নিবু আলো; দোলখাওয়া লণ্ঠনের চিমনিতে পুরু হয়ে কালি পড়েছে।

আকাশে ওকাল জাহেদ, গোটা আসমান নদীর আগে অজু করা মোনার মুখের মতন ধীর শান্ত সৌম্য। তারাদের ঘন ভিড় কমে এসেছে, চাঁদ চালু পথ ধরে অনেকটা নেমে গেছে পশ্চিমে। রোশনীর অভাবে হাজিখালের পানি কালীবদরের জলের তুল্য কালশিটা মেরেছে।

গোটা দিগন্তের চেহারাও পালটে যাচ্ছিল আস্তে আস্তে। যাচ্ছেও। চারদিকের সোনার রোশনী মুছে নিয়ে ঘোর ঘোর আবছা আন্ধার নেমে আসছিল। জলের ওপর জেগে থাকা ধান কাওন আর পাটের ডগাগুলো যেন মিহি বোরখার

ওপাশে নড়ছে। গাছপাছালি গুটা আসুর তুল্য কাপসা মনে হচ্ছিল। অনেকদূরে কোথায় যেন শ্মশান আছে—লখবেত গলার অস্ফুট ধ্বনি শুনে চমকে চমকে উঠছিল জাহেদ। আর সঙ্গে সঙ্গে কনজোরী ভয়, নাড়া পোড়ার ধুমার তুল্য সারা মনে ছড়িয়ে পড়ে জোরদার হচ্ছিল।

কোথায় যেন আছে বাই মারল কি চাঙাড় ভাঙল হাজী-খালের তীব্র সোঁত—আর অমনি ওড়াক করে লাফিয়ে উঠল জাঁদরেল আসুর ব্যাপারী জাহেদালী। 'মা-বা-মাজি-অ···মাজি···'

'কন···' আগ নাও থেকে শিবচরণের রাও ভেসে এল।

'নাও খান কেমুন করে।' বার কয়েক ঘন ঘন টোক গিলল জাহেদ, 'বাপান থাকরায়, বাসাতে টান নাইকা।' গলা কাঁপছিল জাহেদের। 'তুমার হালখান বাগে আছে না কই···'

'বাটে যে'চড় খান, নাও ভিড়ানের কাম এহন।'

'ক্যান, ভিড়াইয়া হইব কী!' শুকনো শংকিত গলায় দ্রুত প্রশ্নটা করে ফেলল জাহেদ, যেন ভয় পেয়েছে। 'আপা-খান মাজি ভাল মানুষ হইত্যাচে না···'

'মিত্যার ডর খাইলেন মনে লয়!'

'না না মাজি, না—' জাহেদালী ততক্ষণে দাঁড়িয়ে পড়েছে। বার কয়েক ঘন ঘন টোক গিলল, 'ডর খামু কিয়ে লেইখ্যা? তা যদ তুমরা তো লগেই রইচ ডরডা কিয়ের···' হাজী খালের দুই কিনারে শংকিত দৃষ্টি বুলিয়ে এনে অল্প নীচু গলায় কথা কইল আইস্যা পরপরার জাঁদরেল আসুর ব্যাপারী জাহেদালী। 'বেলানপয়চান আপা মাজি, তাই কইচিলাম নাওখান না ভিড়াইলে হয় না!'

'না।' ওপাশ থেকে দৃঢ় গলার জবাব ভেসে এল। 'গাছির থনে যাদাবখান লাবানের কাম আছে মিত্যা।'

সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল না জাহেদ। তার বুকের অন্দরে অজানা এক ভয় ফারফরফর করে। সে ধরে নিয়েছে, এতক্ষণ, এতরাত ধরে একটি নিরালা নির্জন প্রান্তরের অপেক্ষায় ছিল বুঝি এ নাওয়ের দুই যাত্রা—এবার মনাজ্জি মতন জায়গা পেয়ে কাজটা হাসিল করবার মতলব আঁটছে। বুকের ভেতরটা ঢিবঢিব করছিল অনেক আগে থেকেই, এবার সেই শঙ্কাটা যেন হাজারগুণ জোর পেয়েছে। গলা শুকিয়ে এসেছে জাহেদের। তবু জাহেদ তার শেষ কর্তব্য স্থির করল। অল্প বিনয় এবং নরম গলায়, খানিক নিস্তব্ধতার পর ডাকল জাহেদ 'মাজি···'

আগ পানুই থেকে জবাব এল না।

'হুনলা নি বুড়া মাজি?'

'হুন···'

'খালের কিনার ঠাহরে আছে না মাজি। নাওখান ভিড়াইবা বুঝায়?'

'আইব ঠাহরে। চৈখ খুইলা থাহেন, ডাঙ্গা একখান পাওয়া যাইবই।'

কিন্তু ডাঙ্গা পাওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করা হ'ল না। যাত্রা আর বিরায়াধারের বাৎচিৎ শুনে বিপিন উঠতে চাইল, 'খুড়া···' পাটাতনের ওপর ভর দিয়ে উঠতে যাচ্ছিল বিপিন, 'আমি হালে যাইত্যাচি খুড়া···'

'না—।' ঠিক ধমক না, শিবনাথ আদেশের গলায় জবাবই শুধু দিল না, বিপিনকে ধরে বসিয়ে দিল পাটাতনের ওপর। 'আর একখান ঘটনা ঘটাইবার কাম নাই তুমার।'

'আমার কিচু হয় নাইক্যা খুড়া—' বিপিন ঘাড় গুঁজে বলে পড়েছিল, এবার শিবনাথের দিকে তাকাল। 'এট্টুন কাহিলও হই নাই আমি···'

'না, হদাই কিটখান পড়লা ওইলে।' বিপিনের পিঠে হাত রাখল শিবচরণ। আদরের হাত, স্নেহের হাত। 'চুপ যাইয়া বইয়া থাক, জিরান ভাও···'

ভাঁজ করা হাঁটুর ওপর কপাল রাখল বিপিন। কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না। বলে দেবে নাকি আসল কথাটা?

বলবে নাকি যে, সেদিনের সেই হারানো মাইয়াডারে কিরৎ পাওয়া গেছে। আনিয়ে দেবে নাকি, নাওয়ের ওই লাখনের আক্রখান তুলে ফেললেই যাও মুতিখান দেখা যাবে সে সেদিনের সেই হৈম। শিবচরণের বড় আদরের মেয়ে হৈমবতী। মুখ তুলে একবার ছইয়ের বাতার গুঁজে দেওয়া শাড়ির আক্র দেখল বিপিন। তার বুক ঠেলে বেরিয়ে এল দীর্ঘনিশ্বাস।

'কী যান হইল খুড়া, খাড়ইবার পারি নাইকা' বিপিন অনেকটা স্বগোতোক্তির মতন গলায় বলছিল। বলতে বলতে তাকাল শিবচরণের চোখে, 'কেমুন আছার কইরা আনল…'

'শরীলের দুখ কি, ঠিক মতন নাওয়া খাওয়া নাই—' শিবচরণ তার হাতখান বিপিনের পিঠের ওপর থেকে তুলে নিয়ে মাথার রাখল, 'চিড়া ভিজাইয়া দেই, দুই মুট খাইয়া লও…'

'থামুনি।' বিপিন ঘুরে বসল। 'তুমি যাও খুড়া, বিজা সাব বেসামাল হইয়া পড়চে।'

অন্ধর ছইয়ে, আক্রর এ-পাশে বসা নারীত্বে ছটফট করছিল। এ এক বিষম যন্ত্রণা। প্রান্ত ছইয়ের বাতার সঙ্গে টাঙানো শাড়ির খুটোর ওপর ধরে রাখা চোখ ভিজে এসেছে। খুতনি, ওষ্ঠ কাঁপছে—অন্তরের অন্তস্তল থেকে ভীষণ এক কান্নার দমক উঠে আসছিল। হৈম মুখ সরিয়ে আনল। দাঁতে দাঁত চাপল না, নীচের ওষ্ঠ কামড়ে ধরল প্রাণপণে। মন ছিঁড়ার মতন শরীর কাঁপিয়ে কান্নার দমক উঠে আসছিল। চোখ বুঁজল হৈম, নিশ্বাস বন্ধ করে ফেলেছিল। গলার নীল শিরাগুলো ফুলে উঠেছে। 'খুড়া বলেজ,' হৈম তার কণ্ঠাটা মুঠোয় খামচে ধরেছে। প্রাণপণে—যেন পিষে ফেলবে, ছিঁড়ে নেবে। 'আমারে লাজা ডাও আল্লা-ঘুবারক, জীবনের সব লইয়া আমারে তুমি পুরানা দিন ফিরাইয়া ডাও। আমি ভুল করচি, ভুল করচি…' নারী শরীর ধরে রাখতে পারছিল না হৈম। আচমকা ভেঙে পড়ল। ভেঙে পড়ল বালিশের উপর। বালিশে মুখ গুঁজে সে যন্ত্রণায় কান্না কাঁদছিল।

এই তার বাপ, শিবচরণ—দেউলীর বাবা মাঝি শিবচরণ কৈবিত্তি। মাথনের মতন নরম মন, হৈমমন্ত পরাণ। আজ, যখন, সামান্য সময় আগে শিবচরণ বিপিনের পিঠে মাথার হাত বুলোচ্ছিল, হৈমর মনে হ'ল ওই দু'টি সুঘ্রাণের হাত তার শরীলে আদর দিচ্ছে। হৈম কৈশোরে চলে যেতে পেরেছিল। মনে অতীত ভর করতে অধিক যন্ত্রণায় কাহিল পড়ল। ভেজা চোখ খুলে আক্রর ছিদ্রপথে গোটা দৃশ্যটি দেখে নিয়ে কাঠ হয়ে বসে ছিল সে। বাস্তবিক তার সব আছে। সেই বাপ, সেই মনের মানুষ বিপিন। হাত বাড়ালেই নাগাল পেতে পারে তাদের। তবু হৈম হাত বাড়াতে পারছে না। মনে প্রবল ইচ্ছা তর করলেও, বটকায় আক্রখান তুলে কোথায় আর মুখ বাড়িয়ে বলতে পারছে হৈম, বাবা, বাবালো, এই যে আমি। আমি তুমার হৈম। হৈমবতী।…

কিন্তু এত সুহাগ যার মনে, এত নরম মন যার কী করে সে লোকটা নিজের আদরের মেয়েকে মরণের মুখে ঠেলে দিয়েছিল, কী করে পেরেছিল মহাদেবের মতন অমন বাপ অতটা কঠিন হতে! সেদিন যদি তাকে বিন্দুমাত্র ভরসাও দিত, একবার চোখ তুলে হৈমর মুখের দিকে তাকাত তার বাপ তা হ'লে, তা হ'লে এমন যন্ত্রণায় পুড়তে হত না হৈমকে। সে দিন এক এক করে গাঁওয়ের সকল মাতব্বরের পায়ে মাথা খুঁড়েছিল হৈম: আমার দুখ নাই-অন্না আমারে মাপ ডাইতে জোর কইরা ঘরের বাইর কইরা লইয়া গেচিল। আমি যাই নাই, যাই নাইক্যা…কিন্তু কেউ না, কেউ কথা শোনে নি। মুখ ফুইট্যা রাও কাটে নাই দেউলী মাঝিপাড়ার কোনো মাতব্বরেরই, মায়না হেরনি হৈমকে।

অনেক অনুনয় বিনয়, কাঁদিল কাতর আবেদন ব্যর্থ হ'লে বাতাসের কাপটায় মতন হৈম বাহিরে ছুটে গিয়ে পড়েছিল

শিবচরণের পায়ের ওপর। ছায় হুমড়ি খেয়ে। অনেক মাথা কুটেছিল, চোখের জলে ভিজিয়ে দিয়েছিল বাপের পা। কিন্তু জবাব আসে নি। পাথরের মূর্তির মতন অটল অনড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল দেবতার মতন বাপ।

রাগে ক্ষোভে দুঃখে ব্যর্থতায় পরাজিত হৈম গাঁও ছেড়েছিল। শেষ মৌসুমের কাটা, চষা মাঠের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে কোথায় কোনদিকে যে সে যাচ্ছে জানত না। বিকেল গড়িয়ে টেউয়া বন্দরের পাশে এসে তার জ্ঞান ফিরে এল। সামনে আবার বলেশ্বরী। হৈমর আবালোর সই, পরাণের বন্ধু গাঙ বলেশ্বরী যেন অস্পষ্ট টানা গলায় কিছু বলে যাচ্ছিল।

আস্তে আস্তে নেমে এল হৈম। বলেশ্বরীর অল্প চালু পারের দিকে। নয়া জলের বান ডেকেছে গাঙে। কলকল ছলছল করে বয়ে যাচ্ছে বলেশ্বরী। তার বুকে অসংখ্য ঘূর্ণির চক্র। ঘোলাটে জল পাক খাচ্ছে-ক্ষ্যাপা শুওরের মতন ছুটে চলেছে জলধারা। দূরে মাইঠানের সীমানার চড়ায় কাশের বনে হাওয়ার দোল দিয়ে যাচ্ছিল।

ঝিকেল গড়েছিল অনেক আগে, আস্তে আস্তে সন্ধ্যা নেমে এল। ডাঙপাঁও থেকে শেষ খেয়ানাওও পারে এসে ভিড়েছিল। অদূরে টেউয়ার কোলে ভিড়ানো নাও গুলোতে বাতি জ্বলে উঠল এক এক করে। একটা দু'চৌ বাদাম তোলা বালদারী নাও চলে যাচ্ছে। পুব আকাশে তখন চাঁদের বুঝি উঠিউঠি ভাব। দেখতে দেখতে ঘোলা জল কালো হয়ে এল—অন্ধকার আকাশের মতন। আশ্রয় বিমূঢ় হৈম উদাস চোখে তখনও তাকিয়ে রয়েছে গাঙ বলেশ্বরীর বুকে। চেতনা নেই, অনুভূতি না—সবকিছু কেমন অবশ অবশ ভালাভালা মতন। হৈমর মনে হচ্ছিল, সে নেই। সামনে আদিগন্ত বিস্তৃত বিশাল গাঙের গহীন পানি। উদাস উতাল। চোখের সামনের নদী হৈমর চেতনা কেড়ে নিয়েছিল। ভীষণ এক শূন্যতা এবং নিঃসঙ্গ যন্ত্রণাদায়ক একাকীত্ব এ মুহূর্তে নেই। হৈমর ভালবাসা চেতনা, গাঙের সোঁতে টেনে নেওয়া পানার মতন অনির্দেশের পথে ছুটছিল।

কখন যে চক বীরপুরের ওপারে সূর্য ডুবেছিল খেয়াল নেই, সন্ধ্যার পাতলা আঁধার ক্রমে গাঢ় হতে হতে রাত নেমেছিল কখন হৈম জানে না। যেন অন্ধকারের সঙ্গে সে মিশে গিয়েছে। এখানে তার শরীর বলতে কিছু নেই। গাঙ বলেশ্বরীতে তখনকার ধরাজন্মী নাওয়ের ভিড় বাড়ছে। আশপাশে খলাই, কাঙ্কার আর বন বেতের ঝোঁপ থেকে দলে দলে বেরিয়েছে জোনাক পোকা। খাটাস ডাকছিল কোথাও। হৈম কিছু জানে না, কিছু শুনতে পায় নি।

অনেক পরে আচমকা চড়া গলায় গেয়ে ওঠা একটি গানের সুরে চমক ভাঙল হৈমর। অন্ধকার। গাঙ বলেশ্বরী আদর খাওয়া পোলাপান মানুষের মতন আহ্লাদে কলকল করে ছুটে যাচ্ছে। বাদাম তোলা বহরেকটি নাও উজান পথে এগিয়ে যাচ্ছে, তার আলো ঝরা রাইতের পরভাতিরা তারার তুল্য থাকবায়, চিকনি মারে। বাতাস তখনকে জোরদার হয়েছে; মাথার ওপরে ছেঁড়া নীলাম্বরী শাড়ির নাহাল আকাশে জোনাক জ্বলা তারার মেলা। গাঙের কোথাও থেকে রূপ রূপ শব্দ ভেসে আসছিল। ভাঁটাপথে ছুটন্ত কোনো নাওয়ের দাঁড়া বুঝি দ্রুত বৈঠা টেনে যায়। দূরের নাও থেকে কেউ চড়া গলায় গাইছিল :

ও, পারের বন্ধু রে,
তুমারে দেইখাছি আমি
ভরপুরের ঘাটে
সেদিন থনে দিবানিশি বন্ধু
বিনাসুতোতে কাটে।

হু হু করে বাতাস বইছিল। নীচে বলেশ্বরীর টানা ডাক। হৈমর চিন্তা চেতনা অনুভব দৃষ্টি সব যেন কেমন জটা পাকাচ্ছিল। ভীষণ এক বেদনায় শরীরের কোথাও পুড়ছে—

তীব্র দহনে পুড়ে যাচ্ছে। হৈমর আচ্ছন্ন চেতনা জেগে ওঠার পর, অতীতের কথা স্মরণ করতে পারে। এবং আশ্চর্য সব কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত পরাণ-গলা জল চক্ষে উঠে এল। হৈম নিশ্বাস বন্ধ করল। দাঁতে দাঁত চাপল। চোখ বুঁজে থাকল অনেকক্ষণ। তার বুক গলা খালি খালি। চোখ খুলে হৈম আবার দেখল।…আমি মরুম, অস্ফুটে অন্ধকার গাঙের কানে কানে সে বলল।…আমি মরুম—নিজেকে বলল হৈম। আর কি আশ্চর্য সঙ্গে সঙ্গে হৈমর মনে হ'ল, তার পাশ থেকে কেউ হাসে। না না, হাসে না কথা কয়।…কে ?… আমি।… সই ?…হয়।…আমি মরুম সই…।…আয়, গাঙ থলেশ্বরী হাত বাড়িয়ে ডাকে,…আয় আয় হৈম, আমার কুলে আইকা ঘুমা। এমুন পরম সুখ আর পাবি না। তুমার হাতখান বাড়াইয়া দাও, আমি চক্ষে দেখি না সই—হৈম ফিসফিস করে বলে যায়, অরা আমারে তুমার কাচেই পাঠাইল, আমারে তুমি শান্তি দাও…হৈম যন্ত্র-চালিতের মতন জলে নামল। নেমে যাচ্ছিল।

পানি ডাকে। তার পরাণের সই গাঙ থলেশ্বরী ফিস-ফিসাইয়া কয়: অরা সমাজ, মন নাইকা উয়াগো সই। হাত বাড়াইয়া আমরা পরাণের মানুষ পাইনা হৈম, আমাগো মনের আগুনে বুকখান পুইড়া খাক কইরা যায়, তবু কইবার পারি না, চাইবার পারি না—সই দুনিয়ার আমাগো কেউ নাই।…সাচাই কইচ সই…হৈম তেমনি চাপা গলায় বলে। …আমারে তুমি ডাও।…আয় আয়, এই যে আমি · এই যে…। হৈম এগোয়। ক্ষণিকের জন্য তার মনে হ'ল পা থেকে ঠাণ্ডা হিমের ভাব ক্রমশ ওপর দিকে উঠে আসছে। আহ্ শান্তি। আশপাশে ডাক। অনেক ডাক। হৈম দেখল, সদা গাঙ বিকা মানুষের তুল্য একখান মূর্তি হাতের ইশারা দিয়া কয়, আমার সুহাসের হিমু আইস, আইস, এই যে আমি, দেখবার পার না ?…না, হৈম বলল। তাকাল। অন্ধকার। সেই ঘন আন্ধারে সদ্য গাঙের মূর্তিখান গাঙের পানির উপুর পা রাইখা আওগাইয়া আছে—হৈমর দিকে। তার মাথার ঘুমটা। দুইখানে হাত বাড়াইয়া দিচে ছায়ার তুল্য মানুষডা।…এই ত, এই ত আইচ ?…হয়। কে ? মা। অস্ফুট চাপা আর্তনাদের গলায় বলল হৈম। ডাক শুনে থেমে গেল মায়ের সেই ভাসা ভাসা মূর্তিখান।…হাঁ, আমি …মাথার ঘুমটা সরাইয়া দিচে মায়…আমার হিমু, আইস সোনা, আমার বুকখান জুড়াইয়া যাও…।—মা ! হৈম প্রাণ-পণে ডাকল। সে ডাক ফুটল না। এবার সে মায়ের কোলে ঝাপিয়ে পড়ল।

'সামাল সামাল মাঝি'…অন্তহীন শিকার আর্তগলার পরিত্রাহি চিৎকার শেষ রাত্রির নিস্তব্ধতাকে ফালা ফালা করে ছড়িয়ে পড়ল এ-দিগরে। হাজীখালের পানি পায়ের আগাছার জঙ্গল আর অসুরের জলপ্লাবিত ক্ষেতখামারে সেই ভয়ার্ত গলার ভয়ঙ্কর চিৎকার আছড়ে পড়ে ধ্বনি প্রতিধ্বনিত হ'ল। প্রভাত-প্রত্যাশী পাখির দল তীব্র ত্রাসে কলরব ভুলে ডানা ঝাপটে উড়তে শুরু করে দিয়েছিল। শুধুই পাখি আর প্রকৃতি না—আজো শিকার তাঙা খনখনে গলার সেই সচিৎকার আওয়াজে বালিশে মুখ গোঁজা আচ্ছন্ন ফুলজানও চমকে উঠল। জেগে যা দেখল, তাতে শরীরের রক্ত হিম হয়ে আসার কথা। হাঁ, মেউলী মাঝিপাড়ার দুই মাল্লাই কিরায়াদারী নাওখান গোঁ গোঁ করে ছুটছে, আর সেই সঙ্গে নাওয়ের ডানকান্দি নীচু হতে হতে জলের সীমা ছুঁয়েছে বুঝি। থেকে থেকে আচমকা কাঁকি খাচ্ছে নাও। আর বলকে বলকে জল উঠে আসছে। ছায়ার স্তিমিতে পাটাতনের তলায় ভরাট হচ্ছে হাজীখালের পানি।

মাল্লাদের তীব্র চিৎকারে মুখর গোলা দুইখান আচমকা কেঁপে উঠল।

ঘটনাটা ঘটে গিয়েছিল আচমকা। বিপিনকে আগ-

নাওয়ে রেখে শিবচরণ হালে এসেছিল। সোঁতের টান তীব্র, বাদামে হাওয়া নেই। শিবচরণ ভিন্ন পথে নাও চালাবার মতলবে রুকসা বিলের দিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিল নাওয়ের মুখ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঈশানকোণী হাওয়ার দাপট আচমকা ভেঙে পড়ল বাদামের উপর। সেই দাপটের টানে দুই বাল্লাই কিরাতধারী নাওখান ডানদিকে হেলে গোঁ গোঁ করে ঢুকে পড়ল বাঁওড় ছেড়ে রুকসী বিলের জলঘাসের বনে। ভাগ্যি চনক ভেঙেছিল বিপিনের। নাওয়ের এই ভয়ঙ্কর অবস্থা দেখে ধড়মড়িয়ে উঠে পড়ল বিপিন। 'খুড়া ···' বিপিন হুমড়ি খেয়ে পড়ল কাল্লিতে বাঁধা বাদামের ডানকানির ওপর।

'কানি কাট, কানি কাটরে বিপক্ষা ···' শিবচরণের গলা কাঁপছিল, 'কানিখান ছাইচা দে তড়তড়ি'

কলকা গেঁড়োর কাদাটা একটানে ছেড়ে দিয়েছিল বিপিন। প্রাণ ধরে রশি ঢিলা দিয়েছে। আর চক্ষের নিমেষে বাদামের ডানকানিটা সুতা-কাটা পক্ষিরের মতন সাঁ ···করে উঠে গিয়ে শূন্যে কাপটা মারছিল ফংফং·· ফংফং···। বাদামে ধরা হাওয়ার দাপট ওই কানি পথে যদি কাটতে না পারত তবে এ নাওয়ের বাল্লাবাল্লি আর সওয়ারীরা এতক্ষণে হালীখালের অগাধ পানিতে হাবুডুবু খেত।

জলঘাসের বন ছাড়িয়ে, জলডুমুর গাছের তলা দিয়ে একখান বাঁকড়া পাকুড় গাছের পাশ কাটিয়ে রুক্সা বিলের বুকের ওপর উঠে এল নাও। এবার বাধা-বন্ধনহীন সোজা পথ। ক্ষেত-খামারের চিহ্ন নেই এখানে। মাথা বাড়িয়ে জানান দিচ্ছে না আউশের ডগা, পুরুষ্টু ছাতার তুল্য কাওনের থোকা কি আখনিড়ানী ক্যাদা পাটের হাতখয়েনী আবাদের অস্তিত্ব। এখন শুধুই জল আর জল। দিগন্ত বিস্তারী বিশাল জলরাশি। কূল নেই কিনারা নেই, রুকসা বিলের সহীন পানি ঘাটা বুড়ির তুল্য পাতা রয়েছে। পানাপগ্গলের চিহ্ন পর্যন্ত কোথাও লেগে নেই।

রুকসার বুকে পড়ে শান্ত হল বাল্লাধারী নাও। অদ্ভুত এক শান্ততায় মগ্ন রয়েছে বিশাল বিল। বাতাসের তীব্র তোড় নেই, মাঝারি টানের বাতাস ছোট ছোট ঢেউয়ের সারি তুলেছে। একের পর এক সারিবাধা অগণন মৃদু ঢেউ ছুটে আসছে নাওয়ের দিকে। আর ঢেউয়ের সারি চিরে তরতর করে এগিয়ে যাচ্ছিল। সংকোচহীন চিত্তে এতক্ষণে আকালে তাকাল শিবচরণ। তারাগুলো যেন ফুরমো পিদিমের মতন শেষরাত্র. ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে। চাঁদ নেমে এসেছে প্রায় দিগন্তে। তার জলজলে ভাবটি আর নেই, আধাজা কাঁসার থালকির তুল্য চাঁদখান পশ্চিম আকাশে ঝুলছে।

'মিত্রাসাহেব শিবচরণ নিবন্ত্রণ আগলে আড়িয়ে দিয়ে, কষি সাজাচ্ছিল। হঠাৎ আব্রুর কাহ-ঘেঁসে বসা আহেদালীর ওপর চোখ পড়তে ডাকল।

চোখ তুলে তাকাল আহেদ, জবাব দিল না।

'রুকসী দিয়া যাইতাচি···' কষিতে ফুঁ দিচ্ছিল শিবচরণ। 'এট্টুন ঘুমা হইল, পথ কি চিনবার পারবেন?'

'পারুম···' আহেদ উঠল। উঠে দাঁড়াল। নৌসারি হইয়া বাতাসীতে পড়ন লাগবো আজি। পরে দেখবা সুজা পথ। বাজারের নজদিগ আমার মুকাম।'

'কিসের কারবার আপনের?' শিবচরণ হুকা টানছিল। বার কয়েক ঘন ঘন টান দিয়ে থামল। মুখ থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোচ্ছিল।

'আপুর।' আহেদ হাই তুলল। কথা জড়িয়ে এসেছে। মুখের সামনে তুড়ি মেরে ঘুরে দাঁড়াল, 'নিদ আইয়া গেচে আমার, নাও বাতাসীর জলে পড়লে আমারে জানান দিও মাজি···'

'হিমু···' শিবচরণ বলল।

রাত এইবার শেষ প্রহর পেরিয়ে এল। আকাশ পাণ্ডুর।

আন্ধার কেটে একটু একটু করে তীক্ষ্ণ রোশনী ফুটে উঠছিল। নদীপারের শেরওবর থেকে লক্ষলাখা মুরগীর ডাক ভেসে আসছে। ঘুর ও কাহের গাছগাছালির ডালে পইখপাখালির দল জেগে উঠেছে। তাদের কলকাকলির, প্রভাতী গুঞ্জনের স্বর ভেসে আসছিল। পুব দিগন্তে ততক্ষণে উজ্জ্বল একটু আলোর আভাষ লেগেছে।

রুকলা ছাড়িয়ে, নীলধারির দীঘল বিল পেরিয়ে ছই গাড়াই কিরায়া নাওখান এইবার বাতাসী গাঙের পানিতে পড়ল। বর্ষা এখানেও উত্তাল উত্তরল। বিল থেকে টেনে আনা পানার ঝাঁক সোঁতের টানে নিজেদের ছেড়ে দিয়েছে। গুটিকয়েক পানকৌড়ি ডুপ ডুপ ডুব মারল। বালিহাঁসের খণ্ড খণ্ড ঝাঁক পূবপথে উড়ে আসছে। কাপসা মলিন পাণ্ডুর আলোয় নদীপারের শেরওবাড়িগুলো কাপসা দেখাচ্ছিল।

গাড়ির আক্রু রাত্রির শেষ প্রহরের অন্তিমকালের বাতাসে দোল খাচ্ছে। মাঝখানে এই একচিলতে আক্রুর ব্যবধান। এপাশে, প্রায় আক্রু ছুঁয়ে বসে রয়েছে বিপিন। নির্ঘুম চোখে। সারারাত ধরে অনেক অপেক্ষা করেও তার আশ মেটেনি। বিপিন একটি মুহূর্তের মুখ চেয়ে বসে রয়েছে। আর একবার, মাত্র একটিবারের জন্য সে হৈমকে দেখবে। সুযোগ যদি আসে তো দুশ্চা কথা জিগিয়ে নেবে। শুধোবে, 'হৈম, কুন মুখে তুমি আমের ঘরে গিয়া বিবি সাজতে পারলা?'

মাঝখানে সত্যি একটি পাতলা শাড়ির ব্যবধান। ওপাশে, ছইয়ের অন্দরে সেদিনের হৈম আজকের ফুলশয্যার ছইয়ের বাতায় হেলান দিয়ে বসে রয়েছে। ঘ্রাণ করছে চুলুনির। কিন্তু সত্যিকারের ঘুম অনেক আগে চক্ষের চৌহদ্দি থেকে উধাও হয়ে গেছে। ঘুম আসছে না; আসবে না হৈম জানত। তবু তাকে ঘুমের ভান করতে হচ্ছে। কারণ সে বুঝতে পেরেছে ছইয়ের ওপার বিহ্বল বিনেত্র আবেশ ঘুমোতে পারছে না। খুব সম্ভব টের পেয়েছে বিপ্রদাস। আঁচ করার পর সন্দেহ লেগেছে আর তারি জন্য নিপ্রদাস সারারাত ধরে এপাশ ওপাশ করেছে। ঘুমোতে পারে নি। দু'একবার উঠেও বসেছিল আবেশে। তার দুটি চোখ আগ ছইয়ের আক্রুর ওপর স্থির নিবদ্ধ ছিল।

হৈমর কথা ফুরোয় নি, আবার করে বিপিনকে দেখবার বাসনাও তার মনে জেগে রয়েছে। সে বুঝতে পেরেছিল, ঠিক তারই মতন তার মনের মানুষটি আক্রুর ওপারে ঠায় বসে একটু সুযোগের প্রত্যাশায়। বিপিন কিছু বলবে। বলুক; হৈম সেই বলা কথাটা শোনবার জন্যে ব্যগ্র। ঘুমের চুলুনির ভান করে কয়েকবার হৈম আক্রুর ছিদ্রপথে বিপিনকে দেখে নিয়েছে। ভেতর এবং বাইরের দুটি মানুষ উনমুন করছে। এ এক ভিন্নতর যন্ত্রণা। সেই যন্ত্রণার তীব্র আঁচড় প্রতি মুহূর্তে দুটি মনকে ক্ষত বিক্ষত করছিল। তবু সুযোগ এল না। হৈম খুক খুক করে কেশেছে অনেকবার। বিপিন গলা-খাঁকারি দিচ্ছিল থেকে থেকে। এমনি করে আকাঙ্ক্ষার আহত পাখিটা ডানা ঝাপটে ঝাপটে এখন যেন নিস্তেজ হয়ে এসেছে।

রাত্রির শেষে অন্ধকারটুকু ফিকে হয়ে আসতে আসতে আলো ফুটে উঠল। মুকনা আর পাখিরা পুরা জেগেছে। দূরে, অনেক দূরে বাদুনপাইয়ার গাঁও ছাড়িয়ে বুঝি সূর্য উঠেছে। পুব আকাশ আরও ঝলমলে আরও উজ্জ্বল। পীতাভ রঙে ছেয়ে গেছে তামাম দিগন্ত। গ্রামের কোন প্রান্ত থেকে টানা উদাস গলার গান ভেসে এল।

বন্ধুরে, তুমার লেইগ্যা ঘুম গিয়াছে
ঝরে চক্ষের পানি
পরান হইল উথল পাথল বন্ধুরে
অন্ধ চক্ষের মণি
বাথার কিরা দিলাম তুমার
আইল না আর কাছে

তুমার লেইগ্যা পরাণবন্ধু গো
চক্ষের ঘুম গিয়াছে।

অন্দর হইতে গলা-খাঁকারির শব্দ। জাগেছে উঠেছে, হৈম দেখল। বলে আতুপোড়া ভালে আগে, বার দুই হাই তুলল, শেষে আড় মটকিয়ে বেড়িয়ে গেল পিছ-নাওয়ে, উদার উন্মুক্ত আকাশের নীচে।

এই সুযোগ, শেষ সুযোগ। ঘরিতে টাঙানো শাড়ির আড়খান এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিল হৈম। চমকে উঠল বিপিন। মুগ্ধ আবিষ্ট চোখে তাকাল ফ্যাল ফ্যাল করে। কী রূপ কী রূপ! যেন হৈমর মুখ না, অতল বিলের তল থেকে ভেসে উঠল সদ্যফোটা নিটোল একটি পদ্ম।

'হৈম···!' চাপা অস্ফুট ফ্যাসফেসে গলায় বলল বিপিন।

'আমারে ভুল বাই তুমি?'

'ভুমারে?' দ্রুত মাথা নাড়ল বিপিন, ধরা গলায় বলল, 'ভুলবার পারলে বাঁচতাম, তুমি আমারে জান্ত খাইয়া রাখচ···'

'আমার কুন পথ আছিল না, তুমি বিশ্বাস কর···'

'তাই বইল্যা অন্যের ঘর ··'

'পাকে প্রকারে কইয়া দিলোম নিজেরে, পরমেশ্বর আমার সরল সাথে নাইক্যা বিপিনদা'

'হৈম ··'

'কও।'

'নাওয়ে খুড়া আছে··'

'জানি। তুমার পায়ে পড়ি বিপিনদা, বাবারে জানান দিও না···'

আর নীরবতা। পিছ নাওয়ে শিবচরণ আর আরোহীরা কথা বলছে, ওরা শুনতে পেল।

'বিপিনদা···' হাত বাড়িয়ে দিল হৈম, গলা বাড়িয়ে মুহূর্তকের মধ্যে বিপিনের প্রশস্ত বক্ষে নিজের মুখটা গুঁজে নিল, 'আমারে তুমি বাঁচাও···বাঁচাও ··'

ঘরিতে বিপিন নিজের মুখটা হৈমর মাথায় গুঁজে নিল। চক্ষে টস টস করছে জল। 'তুমারলৈসোধানীর মুকামে আমি যামু, তৈয়ার হইয়া থাইকো··'

'আইচ্ছা, তুমার পথ চাইয়া থাকুম আমি দিনে রাইতে···।'

বেলা সবে চড়তে শুরু করেছে। প্রভাতী রোদ্দুরে সোটা দিগন্ত উদ্ভাসিত। এমন সময় বাদুনপারার মুকামে নাও ভিড়ল। হাঁকডাক করে কামলা ডাকল জাহেদ, খালওয়ারী নামছিল। সবশেষে পোলা দুইখান লইয়া ঘোমটাপরা বিবিজান পারের ঘাটিতে পা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল।

পুরা একখান পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিল জাহেদ শিবচরণের দিকে। আলনাওয়ে দাঁড়িয়ে হুকা টানছিল শিবচরণ, নোট দেখে খুশীর হাত যেন ধরল। না, শুধু পাঁচটা টাকাই না, জাহেদ আর একখান রূপার টাকা শিবচরণের হাতে গুঁজে দিয়ে মোটা গোঁফের তলায় হাসল, 'টাকাখান দিয়া তামুক খাইও বুড়া মাজি···'

সওয়ারী নামলে, পায়ে পোঁতা লগির বাঁধন খুলে নাও ছাড়তে ছাড়তে বিপিন সওয়ারীদের দেখছিল। দেখছিল শিবচরণও। বড় খুশী মনে। পাঁচের ওপরে বখশিস দিয়েছে মিঞার। ঠিক এমন সময় অভাবিত ঘটনাটা ঘটে গেল। সওয়ারী দলের পেছনে যাচ্ছিল মিঞার ঘোমটা পরা বিবি। যেতে যেতে হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। এক ঝটকায় মুখের কালো ঘোমটার অংশটা সরিয়ে সোজাসুজি তাকাল বিবি নাওয়ের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে বুকি বাজ পড়ল আগ নাওয়ের চাটের ওপর। 'কে···!' ভীষণ চমকে ওঠাতে শিবচরণের হাত থেকে ফসকে হুকাকল্কি সশব্দে

আছড়ে পড়ল পাটাতনের ওপর। 'কে · কে···কে · !' ষ্টেশনীর বুড়া বাঘের গলা গমগম করে উঠল, ঝাপ দিয়েছিল, আর একটু হলেই লটান গিয়ে পড়ত পারের মাটিতে। তার আগেই শিবচরণের দেহটা আপটে ধরে ফেলেছে বিপিন। 'খুড়া, ক্যান ডাও···'

বাঁধনহীন বিন বাওয়া দুই বাল্লাই কিরাণাদারী নাওখান ততক্ষণে গাঙ বাতাসীর সোঁতের টানে মুকাম ছেড়ে উঁচা পথে ছুটে চলেছে ঘুংপাক খেতে খেতে।

'কে যায়! বিপত্তা ক্যারা···ক্যারা

'হৈম।'

'কী কইলি!'

'সাচাই কই খুড়া, হৈম। আমাগো হৈম···'

নির্বাক মুহূর্তে প্রাণপণে বিপিনকে ধরে টাল সামলেছিল শিবচরণ। এবার বিপিনের ধরা গলায় শেষ কথাটা উচ্চারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিশাল থাবা দিয়ে প্রবল আক্রোশে শিবচরণ তার মুখটা চেপে ধরে হুঙ্কার ছাড়ল 'চুপ যার, চুপ যার কইলাম বিপত্তা। উ নাম মুখে আনলে তর চুপড়া আমি ফাইড়া ফ্যালান্···' থরথর করে কাঁপছিল শিবচরণ। বিপিন কোনোক্রমে তাকে পাটাতনের ওপর বসিয়ে দিল। মাত্র কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হয়ে রইল দুই বাল্লাই কেরাণাদারী নাওয়ের দুইজন মাঝি। তারপর কোঁপানী কান্না উঠল আগে—পরে হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল বুড়া গজার গাছের তুল্য বলিষ্ঠ মানুষ শিবচরণ।

মাথার ওপরে মধ্যদিনের সূর্য। চড়া রোদ ছড়িয়ে পড়েছে গোটা দিগন্তে। বর্ষায় ডোবা নদীনালা গাঙ পেরাম এক একাকার। কোথায় যেন ক্ষুধার্ত চিল ডাকছিল। গাঙের সোঁত ক্যাপা ষাঁড়ের তুল্য গোঙরাচ্ছে। আশপাশে ঝাঁ ঝাঁ করছে চড়া প্রখর রোদ। মাথায় গামছা বেঁধে ঠায় হালে বসে রয়েছে শিবচরণ। আর নাওয়ে বিপিন লগি ঠেলছে।

বিপিন লগি ঠেলছে। গা গতর বেয়ে দরদর করে নেমে আসছে ঘাম। কিন্তু জিরান নেই। মইষের পেটির তুল্য চওড়া কাঁধের মাংসগুলো থাকে থাকে শক্ত ডালার মতন ফুটে উঠছে। প্রশস্ত বিশাল বুকখান চেতিয়ে লগি ফেলছে বিপিন। পর মুহূর্তেই লগি ঠেলবার দরুন তার পাশ পাঁজরের পেশীতে ঢেউ উঠছে।

স্থির চোখে বিপিনকে দেখছিল শিবচরণ। ষ্টেশনী বাড়ি পাড়ার আর একখান বাঘ। যেমন তাগৎ তেমনি সাহস। শিবচরণ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলল। সারা বুক খালি করে। আগে কিছুই সে জানত না। পরে কে যেন জানান দিয়েছিল, বিপত্তার ঘরে যাওনের ইচ্ছা আছিল হৈমর। 'আবাগী', শিবচরণ আপন মনে বলল। আগে কেন আমারে কস্ নাইক্যা মনের কথা? এত রূপ লইয়া জন্মাইলি, তাকের ঘর হইল তর পরম গতি? দুখ কি আমার? শিবচরণ নিজেকে শুধালো। আর সঙ্গে সঙ্গে কেমন অবশ আচ্ছন্ন চেতনা তার করল তার মনে। শিবচরণ অতীতের ঘরে পা দিতে পারল।

বিয়ের পর মাত্র দু'টো বছর। দু বছরেই মেয়ের কপাল থেকে সিঁদুর মুছে নিতে হয়েছিল। শ্মশান ফেরৎ লোকেরা নির্মম হাতে ভেঙে দিয়েছিল হৈমর হাতের শাখা। বিধবা মাইয়া, অল্প বয়স; অনেক ভেবে চিন্তে শিবচরণ মেয়েকে ফিরিয়ে এনেছিল ষ্টেশনীতে। সুখেই ছিল মেয়েটা। কিন্তু তখন কে জানত যে, এত রূপই কাল হবে হৈমর। বিয়ের আগে হিমানগরের সমাজন কত্তর সম্বন্ধ এনেছিল। পাত্র মুকুন্দ দাস—কয়েক শ' কানি ক্ষেতি জমির মালিক। এ পরগণার আকসাইটে চাষী। এই উপলক্ষে মুকুন্দ নিজেও এসেছে ষ্টেশনীতে। বার কয়েক। কিন্তু মত দেয় নি শিব-

চরণ। ছ্যাতু বয় অলেই শুধু নয়। অমি চাষ করা কৈবিত্তির সঙ্গে কেয়ারাদার কৈবিত্তিদের অলচল নেই। নীচু ঘরে মেয়ে দিয়ে বংশের অগৌরব ডেকে আনতে সম্মত হয় নি শিবচরণ। অমত করার পর আর আসে নি মুকুন্দ। কিন্তু হাতের নোয়া খুইয়ে মেয়েটা যখন খান পড়ে বাপের বাড়ি ফিরল, তার ক-দিন পর থেকেই মাঝে মাঝে মানান অছিলায় আসা শুরু হয়েছিল মুকুন্দর। তখন যদি মতলব জানতে পারত, তবে ঘড় নিয়ে মুকুন্দ ফিরে যেতে পারত না ব্যাতরাইলে। পাইকা কাঠের হাতবৈঠাটা মুকুন্দর টাক-পড়া চান্দিখানকে দুই ভাগ করে ফেলত।

তখন বর্ষাকাল। বাগারীপুর থেকে ফিরায় কেরুৎ আসছিল শিবচরণের নাও। পুরান দেউলীর পোড়ো মাঝি-ঘাটার কাছ বরাবর আসতেই অনেক চিৎপিরের শব্দ কানে এল। হৈ হৈ গোলমাল। 'বিপন্ন।…' শিবচরণ আগচরাটে বসে বৈঠা বাইছিল, লম্ব শুনে ডাকল বিপিনকে। 'আমাগো পাড়া শুনে গোলমাল আইতাচে মনে লয়…'

'হয়', বিপিন হালে বসেছিল, লহমায় উঠে দাঁড়াল। 'জ্বরর কাইজা লাগচে মনে লয় খুড়া…' গলা বাড়িয়ে, ভেউ দিয়ে ব্যাপারটা আঁচ করছিল বিপিন। আচমকা কেঁপে উঠল, 'খুড়া—' বিপিন হাল ছেড়ে দিয়ে খরিতে ছুটে এসে ছইয়ের বাতা চেপে ধরলো নির্বাক মূর্তিতে 'ধশালের আগুন দেখবার পাইতাচি, মনে লয় ডাকাইত পড়েচে পাড়ায়…'

'ডাকাইত—'জল থেকে বৈঠা তুলে নিয়ে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতন লহমায় টানটান হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল শিবচরণ 'বাঘের ঘরে শিয়াল আছে? হৈ—ই—ই' বিশাল একখান হুঙ্কার ছাড়ল দেউলীর বাঘ। আর সঙ্গে সঙ্গে ঝপাং করে একটা শব্দ। শিবচরণ লাফিয়ে পড়েছে গাঙের পানিতে। একটানামাত্র মুহূর্তে। তারপরই, মঘা রাইতের চান্দের আলোয় বিপিন দেখল, কালোপানা বিশাল দেহটা নদী পার হয়ে বিদ্যুৎ গতিতে ছুটছে। হাতের বৈঠাটা শূন্যে উঠে রয়েছে দেখতে পেল বিপিন।

প্রথমটা ঘাবড়ে গিয়েছিল। পর মুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিল বিপিন। আগ নাওয়ের কান্দিতে যাঁরা লম্বা কাছির প্রান্তটা হাতের মুঠোয় চেপে জলে ঝাঁপ দিল। মাঝে দুটো টানের ব্যাপার। কিনারে উঠে এসে হিজল গাছের সঙ্গে কোনোক্রমে দাড়িখান বেঁধে, নরা বউয়া বাঁশের লগিখান সজোরে টেনে নিয়ে প্রাণপণে ছুট দিল বিপিন। ছুটন্ত দুরান বাঘের পশ্চাদ্দেশে পলার জিগির গোটা দিগন্তের নিস্তব্ধতাকে খান খান করে ফেলল।

বড় দেন্ডিতে জানান পেয়েছিল, নইলে মুকুইন্দ্যার গোটা দলের লাগগুলো দেউলী মাঝিপাড়ার আনাচে কানাচে পচে থাকত। গাঙ ধলেশ্বরীর পানি তাজা রক্তে লাল হয়ে উঠত। কিন্তু তা হ'ল না। অলখ্যে লাইঠ্যাল নিয়ে ঝাপিয়ে পড়ে ব্যাতরাইলের মুকুইন্দ্যার হৈদ্দকে নিয়ে পালিয়েছে। জোয়ান আর যুক্তা, দেউলী মাঝিপাড়ার দুইখান বাঘ যখন পাড়ায় এসে পা দিল ততক্ষণে গণ্ডা দুয়েক ছিপ নাও মধ্যগাঙে চলে গেছে।

গোটা পাড়া লণ্ডভণ্ড। এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত। ইতস্তত দু'একটা লাশ, অথর্ব মানুষের আর্তনাদ আর সেই সঙ্গে এপাড়ার ওপাড় থাইকা-ছাওয়ালের কান্দন। প্রথমটা হকচকিয়ে গিয়েছিল শিবচরণ আর বিপিন। মুহূর্তেকের ঘোর ভাঙলে আবার পরিত্রাহি একখান জিগির। বিপিন হুঙ্কার ছেড়েছে 'হৈই মাঝিপাড়ার জওয়ানেরা, আওপাংরা আয়, আমাগো হৈদ্দরে লইয়া যায় ডাকাইতে…'

কেবল ওই জিগির। তারপর বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে গিয়েছিল বিপিন। শিবচরণ অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল প্রপন্ন উঠানে। তাকে দেখবার কেউ নেই।

দেউলী মাঝিপাড়ার গণ্ডা দুয়েক নাও ধলেশ্বরী আর পাশের গাঙ গেরাম আতিপাতি করে খুঁজে সারারাত

ঝাড়বাইল ঘিরে পাহারা দিয়েছিল। কিন্তু মুকুন্দর দল ফিরে আসেনি আর। সাত দিনের অতন্দ্র প্রহরা আর দিবস খোঁজা-খুঁজির পরও সন্ধান মেলে নি। কেউলী বাঙ্গিপাড়ার ইজ্জত কেড়ে নেওয়া মুকুন্দ দাসের। সেই সঙ্গে হৈমরও খোঁজ পাওয়া যায় নি।

দিনের পর হপ্তা গেল, হপ্তার পর পক্ষ। কেউলী বাঙ্গিপাড়ার অস্বাভাবিক অশান্ত দিন শান্ত হয়ে এসেছিল। এমন সময় হৈম এল। সে একা। এলাসিনের জাহাজ-ঘাটা থেকে হাঁটা পথে ঘুরে এসেছে সেরাবে।

হৈম এসেছিল। অনেক আশা নিয়ে ঢুকেছিল গ্রামে। কিন্তু পুরুষ মেয়ে সবাই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল, কেউ তাকায় নি। হৈম অস্পৃশ্য, অশুচী। গ্রামের জনসমিতিরা এক হয়েছিল এ-উপলক্ষে। সমাজের কঠিন বিচারে হৈম পতিতা। কৈবিত্তির ঘরে তার আর ঠাঁই হবে না।

কেঁদে ফেলেছিল হৈম। এক এক করে পড়েছিল তাদের মানুষের পায়ে। চোখের জলে পা ভিজিয়ে দিয়ে মাথা কুটে বলেছিল কুন দোষটা আমার আছিল তুমরা কও। নিজের ইচ্ছায় আমি ঘর ছাইড়া যাই নাইক্যা। অরা আমারে জুর কইরা লইয়া গেছিল। তুমাগো পা ছুঁইয়া কই, আমার ইজ্জত আছে আছে আছে…'

কিন্তু কেউ শুনল না। কেউ না। অবশেষে বাপের পায়ে এসে লুটিয়ে পড়ল হৈম। 'বাবা' হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল নরম শরীরখান।

দাঁতে দাঁত চেপে, নিশ্বাস বন্ধ করে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল শিবচরণ। পায়ের নীচে তার পাপ। চোখ খুলে একটি বারের জন্যেও সে পাপকে চোখে দেখল না শিবচরণ। তার বোজা চোখের কোল বেয়ে টসটস করে ঝরে পড়ছিল চোখের গরম পানি। না না না মুখ ঘুরিয়ে মাথা নেড়ে যাচ্ছিল শিবচরণ।

শেষে কালনাগিনীর ভুলা ফুঁসে উঠল হৈম। তার চোখে আগুন। গলায় ঘৃণা। 'ঠাঁই যদন নাইক্যা, তদন আমি যামু। কিন্তুক যাইবার আগে কইয়া যাই, তুমরা যারা বিচার করবার বইচ, সেদিন তারা আছিলা কুথায়? পাস নাই কুনবার। লাজ সরম নাইক্যা? ঘরের বাইয়্যারে টাইন্যা লইয়া গেল বাইনমে তারে ফিরাইবার পারলা না. কোন মুহে তার বিচার করবার বইচ? কোন মুহে তাই আমারে কও…'

(ক্রমশঃ)

জোয়ার

উপন্যাস
শরৎবাবুর পত্র

বিজন কুমার ঘোষ

আট

বৈদ্যুতিক ট্রেন থেকে নামতে নামতে আলোকের মনে পড়ল কেয়াকে নিয়ে একবার পুরী গিয়েছিল। পুরী প্যাসেঞ্জার শেষ রাত্রে কোন এক অচেনা ষ্টেশনে এসে ঘুম ভাঙিয়ে দিল - চাই গরম চা—। কি মধুর লেগেছিল আধো ঘুমের মধ্যে সেই ডাক। মনে পড়ে, কেয়াকে নিয়ে ছোট ছোট স্মৃতি—ছোট ছোট ফুলের মতন সুরভিত।

ষ্টেশনের বাইরে আসতেই রিকশাওয়ালা ছেঁকে ধরল। তার ভিতর একটা রিকশায় উঠে বসল ওরা। কেয়া হুকুম দিল চন্দননগর ষ্ট্যাণ্ডে চল—

—কেউ আছে সেখানে? কোন দরকারী কাজ?—আলোক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করল।

—না, কেউ নেই সেখানে।

—তবে?

কেয়া এই প্রথম হাসল।

—তোমাকে গঙ্গায় ফেলে দেব না।

—দিলেও ক্ষতি নেই।

দু'জনেই হেসে উঠল।

চন্দননগরে এই প্রথম এল আলোক। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্নই মনে হল। কলকাতার পাশে আরেকটা ছোট কলকাতা যেন। বড় বড় বাড়ি। সেকেলে ধনীদের দুর্গা। হাট বাজার সিনেমা হল—জমজমাট। সাইকেল রিকশা—মোড়ে মোড়ে নতুন চেহারার ছোকরার দল। ঘুরিয়ে বেশী, চলেন যিনি—ইত্যাদির সহযোগ। সৌধিন ফরাসীদের উপনিবেশ। 'জীবন স্মৃতি'তে বহুবার চন্দননগরের উল্লেখ দেখেছে। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, মোরান সাহেবের বাগান আর 'এইখানে বাঁধিয়াছি ঘর তোর তরে কবিতা আমার'। আলোকের সেই সব নীলকান্ত মনির মত ছায়াগুলি মুহূর্মুহু মনে পড়তে লাগল। সহসা কৃতজ্ঞ হল। কেয়ার জন্যেই হঠাৎ চন্দননগরে আসা হল।

খৃষ্টানদের কবরখানা, চার্চ, ঘুরে বলেল, প্রশস্ত ছায়া ঘেরা খানিকটা স্থান, তারপরেই গঙ্গা। স্নিগ্ধ-স্নিগ্ধ বাতাস। মস্ত বড় চাঁদ জলের মধ্যে ডুবে আছে। গঙ্গার অনেকখানি ধার ঘেঁসে পাথর দিয়ে বাঁধান। বিশাল বৃক্ষ সারি সারি। নিচে বায়ুসেবনকারীদের আস্তানা। এর নাম চন্দননগর ষ্ট্যাণ্ড। আলোকের মনে হল, এর কাছে গড়ের মাঠ লেকও বুঝি হার মানে। ষ্ট্যাণ্ডের পাশে একটা সুন্দর বাড়ির পাশে রিকশা দাঁড়াল। নীল আলোয় লেখা দেখতে পেল আলোক। হোটেল ডি প্যারিস। কেয়ার সঙ্গে তাহলে এই হোটেলে রাত্রি বাস করবে। ভাবতেই বুকের মধ্যে আনন্দ ভয় উল্লাস আশঙ্কা শিহরণ সব এক সঙ্গে কোলাহল করে উঠল। কেয়া ওর হাত ধরে সবুজ গালিচার দন পেরিয়ে বারান্দায় উঠতেই টাকপড়া বুড়ো সাহেব ম্যানেজার শশব্যস্তে দৌড়ে এল। বেশ পড়তির মুখে হোটেল ব্যবসা, চারিদিকে তাকালে বোঝা যায়। ফরাসী আমলের ঐশ্বর্য আর নেই। বিশেষত রাতের অতিথিদের কদাচিৎ সমাগম ঘটে। ম্যানেজার তাই

বারবার কুর্নিশ জানিয়ে গঙ্গার ধারের সবচেয়ে ভাল ঘরখানা খুলে দিলেন। কি কি খানা, পানীয় আসবে তার একটা লিষ্ট তৈরী করে নিলেন। ঘরের সামনে বারান্দা। বারান্দার চবে দিখি বিলিতি ফুলের বাড়। তাদের মিলিত সুবাস বাতাসে। বারান্দার ঠিক নিচেই গঙ্গা। জ্যোৎস্না—যত-দূর দৃষ্টি চলে জ্যোৎস্নার চাদর ছড়ান। হোটেলের বয় বেয়ারা গুছিয়ে বিছানা পেতে দু'খানা বড় বড় আরাম চেয়ার বারান্দায় রেখে গেল। গা' এলিয়ে দিতেই নিমেষে আলোকের সমস্ত ক্লান্তি ঝরে পড়ল। নদীর জলে চাঁদটাকে যেন গুড়ো গুড়ো করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বাতাস কোন সময় দুরোধ বালকের মতন, কোন সময় দুষ্টুমি করছে চুল উড়িয়ে দিয়ে। মহাস্থানগড়ের কথা মনে পড়ে। কতদিন বাবলা গাছে ছাওয়া পথ বেয়ে নদীর ধারে গিয়ে বসেছে পাশের পালে শিশুর মতন; জ্যোৎস্না দেখতে, ঢেউ এর সঙ্গে বাতাসের লুকোচুরির খেলা দেখতে। কেয়া সব ভুলিয়ে দিয়েছে। সেই সব স্বপ্নের দেশ এখন অনেক দূরে। আলোক যেন মুক্ত পুরুষ হয়ে গেছে, বিলিতি অফিসের পদমর্যাদা উটের ছেড়া পাতার মতন অকিঞ্চিৎকর। ফুলের বাগানের নুন অতিথিদের খোঁজ-খবর নিতে ভুলেই গেছে কতকাল। বাড়ির প্রধান ধারা শহরে উত্তেজনার পরপারে সুস্থতা, স্বর্গ, প্রশান্তি থেকে বিচ্যুত হয়ে স্খলিত নক্ষত্রের মতন প্রচণ্ড দুঃখের মধ্যে ঘুরপাক খাচ্ছিল। যেন আশা নেই, আলো নেই। প্রেম কি, ভালবাসা কাকে বলে—সব এক লহমায় ভুলতে পেরেছে 'কেয়া নেই' এই বোধ থেকে। মনে হয়েছে কেয়া চেঙ্গিশ খানের মতই নিষ্ঠুরা, তৈমুরের মতই ভীষণা। ঐ ষাদশ-নবম শরীরে এত দাহ পদার্থ মজুত ছিল? ভাবা যায় না।

কেয়া বাথরুম থেকে গা' ধুয়ে এল। মুখে এখনো বিন্দু বিন্দু জল। জ্যোৎস্না ঠিকরে পড়েছে। মুক্তার মত জ্বলছে ঘাড়ে, গায়ে, মুখে। কি মহার্ঘ দেখাচ্ছে কেয়াকে। এক রাতের সুলতান কেয়া। চির জীবনের হবে না কি?

নদীর ওপারে বনরেখার দিকে তাকিয়ে কেয়া আলগোছে আলোকের তৃষিত হাতখানা তুলে নিল। এক সময় বলল, আমার ওপর রাগ করনি তো?

আলোক একটু উশখুশ করল। শেষে বলেই ফেলল, রাগ করিনি বললে মিথ্যে বলা হয়। তোমার কাছে মিথ্যে বলব না।

—জানি আমার দোষ—কেয়া আনমনে বলল, তোমাকে আঘাত দেওয়া ঠিক হয়নি। আমি তখন অসুস্থ ছিলাম, এই অজুহাত কি আমি তোমার কাছে ক্ষমা চাইতে পারি না?

—তোমার কোন দোষ নেই। আমিও তোমাকে যথেষ্ট আঘাত দিয়েছি—জড়িত স্বর আলোকের: বিশ্বাস কর, তোমাকে দুঃখ দিয়ে আমি চতুর্গুণ দুঃখ পেয়েছি। কিভাবে যে আমি এতদিন বেঁচে ছিলাম। কেন যে পাগল হয়নি? কেন যে আত্মহত্যা করিনি?

—ছিঃ আলোক—

—আমার খুব শিক্ষা হয়েছে কেয়া—আলোক যেন নিজেকে একটুও সামলাতে পারছিল না: তুমি যে আমার আত্মার অংশ এই খবর আমি ভুলে ছিলাম। আর কোনদিন ভুল হবে না।

আলোর উদ্ভাসিত কেয়ার মুখ।

—আমার মত সুখি কেউ নয়। তুমি আমাকে ভালবাস—আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই আলোক।

—আমাকে ভুল বুঝো না কেয়া। তুমি একদিনের সুলতান হতে চাও। কেন চিরদিনের হতে চাও না?

চাঁদের আলোয় চমকে উঠল কেয়া? একটু অন্যমনস্ক, একটু চিন্তিত। যেন গোপন ব্যথা হজম করছে।

তাকিয়ে রইল আলোক—

—উত্তর দাও। চুপ করলে কেন কেয়া? বল—হাতটা টেনে নিল সজোরে।

—উত্তেজিত হয়ো না লক্ষ্মীটি। আমি সব বলব, সব বলছি—

—এতদিন তোমার দেখা পাইনি, তোমার মনে কি একটুও কষ্ট হয়নি? আমি কতদিন কিয়স্কোতে গেছি, যদি তুমি আস। অনেকদিন মেট্রোর নিচে দাঁড়িয়ে থেকেছি তোমার জন্যে।

—বললাম তো, তুমি ভালবাস, তার জন্যে আমি গর্বিত। তোমার ভালবাসা আমার জীবনের সম্পদ।

—তুমি আমার ভালবাসাকে অপমান করছ—ফিরিয়ে দিচ্ছ।—ভগ্নকণ্ঠ।

ছিঃ আলোক।

—তাহলে কেন দূরে থাকতে চাও?

—তোমাকে ভালবাসি তাই দূরে থাকতে চাই। খুব কাছে থাকলে গভীর ভালবাসাতেও চিড় ধরে।

—ও সব পুরোন সেকেলে কথা।

—পুরোন কথা হলেও মূল্যহীন নয়।

—তোমার কাছে জ্ঞানের কথা শুনতে চাই না।

—রাগ ক'রো না আলোক—

—রাগ করবার অধিকার কি আমার?

কেয়া কিছুই বলতে পারল না। আলোকের মুখের দিকে তাকাল। আলোক ওপারে চেয়ে আছে। বাতাস দু'জনের মাঝখানে লুকোচুরি খেলায় মত্ত। কেয়া আপন মনে আঁচলটা আঙুলের সঙ্গে জড়াতে লাগল।

—আমাকে এখানে আনলে কেন?—আলোক এবার সোজাসুজি তাকাল: অপমান করতে?

—না।

—তাহলে?

—কতগুলি কথা বলতে। নাহলে চিরকাল আমি তোমার চোখে ছোট হয়ে থাকব।

—কেয়া আমি তোমাকে ভালবাসি, তার জন্যে এই ভাবে তুমি প্রতিশোধ নিচ্ছ?

আলোক লক্ষ্য করল কেয়া নিঃশব্দে চোখ মুছছে। মাঝে মাঝে জোরে শ্বাস হচ্ছে, বাতাসের গুমরানির মত। চট করে মনে পড়ল এরা শহরের মেয়ে। মোহময়ী। এদের এক চোখে প্রেমের আগুন, আরেক চোখে ছুরি। হাসতে হাসতে কেঁদে ফেলে, কাঁদতে কাঁদতে হাসে। ক্ষণে ক্ষণে বিভ্রম হয়। আলোক আর ভুল করবে না। কেন এল? কোন দুর্বলতা নেই আর। কখন ভোর হবে আর উষার মেঘে ছুটে চলে যাবে কলকাতায়—হালদুতে তাক থেকে পুরোন কবিতার বই তুলে নেবে আবার। রাত নিঝুম হলে পুকুর ঘাটে বসে থাকবে একলা। আর তখনি জলের মত একরাশ স্নিগ্ধতা নিয়ে, বাতাসের মতন কোমলতা নিয়ে চুপি চুপি আসবে মিনতি। প্রাণের কাছাকাছি। হাঁ, কেয়ার জন্যে কোন খেদ নেই। থাকুক ওরা চিরকাল শহরে। উত্তেজনার কড়াপাকে বিস্বাদ হতে হতে এনামেল করা দেহ, শেষ হয়ে যাক একদিন। কেন দুঃখ হবে আলোকের? বরং বাপ-ঠাকুর্দার গ্রামনীর জীবনধারা বিশ্বস্তভাবে অনুসরণ করবে। গভীর শোণিতে যা প্রবাহিত, কতকাল তা ভুলে থাকতে পারে? আলোকের হঠাৎ টাইম টেবিলের কথা মনে পড়ল। কলকাতার ফিরে যাবার ট্রেন থাকলে বেশ হত।

কিন্তু কয়েকটি মুহূর্ত—

জোৎস্না ছিল। হঠাৎ মেঘে চাপা পড়ায় ছায়া নামল নদীর জলে। মনেও যেন তা সংক্রামিত হল। দূর থেকে ভল্লুকের মত প্রবল কান্না গুড়ি মেরে এগিয়ে আসছে। আলোক দিশাহারা হল। প্রচণ্ড বিষাদ সমস্ত দেহমন অধিকার করল বিকারের ঘোরের মত। এই মুহূর্তে হৃৎপিণ্ডটা যেন দেহ থেকে খুলে নেওয়া হল। এক টানে মাথাটা ছিঁড়ে

কেলসে মুরলীর দেহটা হাতের মধ্যে ছটফট করে; আলোক সেই ছটফট করা দেহ—বিফলতার শক্ত মুঠিতে ধরা। কান্না এগিয়ে আসছে। গলার কাছে। বাধা মানছে না। নিঃশব্দে ঝরতে লাগল। রুমাল চাপা দিল। কেয়া যাতে না দেখতে পায় একটু ঘুরে বসল। এই মুহূর্তে কেয়াকে খুব দামী মনে হল—দুষ্প্রাপ্য হীরকের খনির মত। হীরকের খনি চলে যাচ্ছে লক্ষিত মুখার্জীর কাছে। বিহারে পাঁচ পাঁচটি কয়লার খনি নিয়েও যে তৃপ্ত নয়। কেয়ার দিকে তাকাল। বুক ভেঙে যাচ্ছে নিঃশব্দে। কি যেন হারিয়ে ফেলছে, আর কোনদিন ফিরে পাবে না জীবনে। যাদুকরের মত শরীর, জ্যোৎস্নার মত রং—আর কোনদিন ছুঁতে পারবে না। লক্ষিত মুখার্জী দস্যুর মত সব হরণ করে নিয়েছে। বুকের খুব গোপনে অচিন দুঃখের মত বাধা বাজতে লাগল। একটু আগে যা প্রতিজ্ঞা করেছিল, কেয়াকে ছেড়ে কলকাতার ভিতর দিয়ে হালতুর নিরালা জীবনে ফিরে যাবে—ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কেয়াকে ফেলে পৃথিবীর কোথাও গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যেও স্বস্তি পাবে না। মিনতি পারবে কি ক্ষত স্থানে স্নিগ্ধতার প্রলেপ বুলিয়ে দিতে? কেয়াকে ভুলিয়ে দিতে? অসম্ভব। কেয়ার স্থান কেয়াই পূরণ করতে পারে। সেই কেয়া হারিয়ে যাচ্ছে। চোখের সামনে বিন্দু হয়ে চোখের আড়ালে অন্য গগনের তারা হয়ে ফুটছে। আর কোনদিন আলোক জ্যোৎস্নার মত রং—যাদুকরের মত শরীর ছুঁতে পারবে না। সেই কান্না আবার ছেলেমানুষের মত অবুঝ হতে শুরু করেছে। রুমালের কোন অংশ ভিজতে বাকী নেই। প্রিয়জন হারা পেলে বাড়ির কর্তা কান্নায় ভেঙে পড়েন না, শুধু বুকের মধ্যে প্রচণ্ড শূন্য হাপাহাপি করে বেড়ায়। আলোক ভিতে ভিতে জলতে জলতে শূন্যের হাপা-হাপি অনুভব করতে লাগল। অসহ্য। ওই তো কেয়া বসে রয়েছে। হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যায়। ছোঁবে নাকি। খুব বেশী দূরে যাল করছে কি এখন? কেয়া কোন্ গগনের তুল, কোন্ গগনের তারা? যদি ছোঁয়-ই তাহলে খুব বেশী ছাংলামো দেখান হয় কি? কেন হবে? আলোক তো ভালবাসে। প্রকৃত ভালবাসায় কোন দোষ থাকে না। কেয়া শহরের প্রতীক। আলোক শহরও ভালবাসে। শহরে বারো আনা সময় কাটায়। শহর ছাড়া এ যুগে জীবন অচল।

হাতটা তুলে নিল আবেগে। গালে রাখল। উষ্ণ অশ্রু। স্পর্শের ভিতর দিয়ে যেন করুণ অনুনয় জানাতে লাগল, আমাকে ছেড়ে যেও না কেয়া—। জীবনে কখনো এমন ভাবে মুষড়ে পড়েনি, ভেঙ্গে পড়েনি। একটা মেয়ে জীবনে এসে কি এমন চতুর্বর্গ ফল দিতে পারে? কেয়ার ভিতরে কি এমন সোনার খনি আছে? কেয়ার শরীরে যা আছে লক্ষ লক্ষ মেয়েরও তাই আছে। তবে কেন একটা মেয়ের জন্যই পাগল হয়? ইচ্ছে করলে আলোক কেয়ার চাইতে আরো ভাল মেয়ে পেতে পারে। কিন্তু মনে মনে এও জানে কেয়াকে যা দেওয়া যায় অন্য কাউকে তা দেওয়া যায় না। প্রেম একবার-ই আসে জীবনে। নিপুণ গোপ যেমন নিঃশেষে দুধ দুইয়ে নেয় তেমনি কেয়াও হৃদয় থেকে সমস্ত ভালবাসা দুইয়ে নিয়েছে। কিছু অবশিষ্ট নেই যা অন্যকে দেওয়া যায়। কেয়াহীন আলোক চিরকাল পথপ্রান্তে নিঃস্ব হয়ে পড়ে থাকবে ভাবতেই শিউরে উঠল।

—কেয়া!—আলোক মৃদুস্বরে ডাকল।

ফুঁপিয়ে কাঁদছে কেয়া। আলোকের মুখের দিকে তাকাল।

—আমাকে ক্ষমা কর কেয়া—আলোক যেন আর সইতে পারছে না: আমাকে এ ভাবে নিঃস্ব করে যেওনা—

—আমার চরম ভুল তোমাকে ভালবাসা। আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত না।

—কেন একথা বলছ? আমি কি তা মনে করেছি?

—না করনি। আমি জানতাম আমাদের ভালবাসা ব্যর্থ হতে বাধ্য। তবু তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

—কি করে জানতে যে ব্যর্থ হবেই?

—অনেক আগেই সঞ্জিত মুখার্জী এসেছে আমার জীবনে। আমি বাগদত্তা আলোক।

'স-ঞ্জি-ত-মু-খা-র্জী' মনে মনে বার কয়েক আওড়াল; বাধা বেদনাগুলি কোলাহল করে উঠল সঙ্গে সঙ্গে। অভাবনীয়, তবু যেন সম্পূর্ণ অভাবনীয় নয়। ফেটে পড়তে ইচ্ছে হল এক সময়, তবু প্রাণপণে নিজেকে সংযত রেখে বলল, তুমি জানতে তুমি বাগদত্তা তবু আমার সঙ্গে একটু খেলা করলে। একটু মজা লুটে নিলে।

—কেন ওভাবে বলছ আলোক?

—আমি সত্যি কথাই বলছি।

—সঞ্জিত আমার জীবনে অনেক আগে এসেছে। অনেক পরে তুমি।

—অনেক পরে এসেছি সেই অপরাধে নিষ্ঠুরতম আঘাত দিতে বাধল না।

—আলোক!—কান্না ছাপিয়ে উঠল: ভুল সব মানুষেরই হয়। আমি ভুল করেছি। আমি কি এখন সেটা সংশোধন করতে পারি না?

—পরীক্ষার খাতার কারেক্ট ও ফলোইং সেক্টেন্স চলতে পারে। জীবনের খাতায় তা মারাত্মক। তোমার কি, তুমি চলে যাবে সঞ্জিত মুখার্জীর কাছে। আমার জীবনটাই নষ্ট হল শুধু।

—আমি কি করতে পারি আলোক? আমার কি উপায় আছে?

—সে তুমি জান।

—সঞ্জিতকে ছেড়ে এলেও ঠিক একই ব্যাপার হবে। কি করব, দু'জনকে তো একসঙ্গে বিয়ে করতে পারি না—

অথচ দুজনকে একসঙ্গে প্রেম নিবেদন করা যায়।

—ঠিক আছে, আমারই দোষ। তোমাকে যেদিন প্রথম দেখি সেদিনই ভাল লেগেছিল। তোমার সুন্দর শিল্পানুরাগ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম। এখন বুঝি সেই ভাল লাগা বা মুগ্ধ হওয়া ভীষণ দোষের—

আলোক কি উত্তর দেবে মনে মনে ঠিক করতে পারল না। ওপারের দিকে চেয়ে রইল। পুনরায় ঝকঝকে জ্যোৎস্না নেমেছে। দিনের মতন। তীব্র বেগে জল ছুটে যাচ্ছে সমুদ্রে। ওপারে বনরেখা ফুঁড়ে মাঝে মাঝে পাট-কলের চিমনি। সারি সারি ইলেকট্রিকের আলো। স্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে একটি দুটি নৌকো চোখের পলকে অদৃশ্য হচ্ছে। মাঝির গলায় ভ্রান্ত গান। আলোকের মনে পড়ল একশ' বছর আগে এই দৃশ্যই দেখা যেত, তবে একটু আলাদা। একশ বছর আগে এইখানে মোহান সাহেবের বাগান নামে এক আশ্চর্য বাগানবাড়ি ছিল। উঁচু নিচু ঘর। বকুল গাছে হাওয়া। তার ভাড়াটে হয়ে এসেছিলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর। সঙ্গী হয়েছিলেন বিলেত ফেরতা সত্যেন্দ্রনাথের কিশোর রবীন্দ্রনাথ। "সে তো খুব বেশী দিনের কথা নহে, তবু ইতিমধ্যেই সময়ের অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। আমাদের তরুচ্ছায়াপ্রচ্ছন্ন গঙ্গাতটের নিভৃত নীড়গুলির মধ্যে কলকারখানা উর্ধ্বশ্বাস সাপের মত প্রবেশ করিয়া সোঁ সোঁ শব্দে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসিতেছে। এখন ঘর মধ্যাহ্নে আমাদের মনের মধ্যেও বাংলা দেশের প্রখর রিক্তচ্ছায়া সংকীর্ণতম হইয়া আসিয়াছে। এখন দেশের সর্বত্রই অনবসর আপন সহস্রবাহু প্রসারিত করিয়া ঢুকিয়া পড়িয়াছে। হয়ত সে ভালোই—কিন্তু নিরবচ্ছিন্ন ভালো, এমন কথাও জোর করিয়া বলিতে পারি না।"—সমগ্র রবীন্দ্রসাহিত্য মন্থন করতে করতে এই জায়গায় এসে হঠাৎ আলোককে থমকে দাঁড়াতে হয়। সমস্ত বাধা বেদনা তিক্ত করে এইখানে এসে; বুকের মধ্যে হু হু করে।' এই বাড়ির অনন্ত আকাশের কোণে কবিতা লেখবার একখানা আশ্চর্য ঘর ছিল। মনে পড়ে—

"গঙ্গা হইতে উঠিয়া ঘাটের সোপানগুলি পাথরে বাঁধানো একটি প্রশস্ত সুদীর্ঘ বারান্দায় গিয়া পৌঁছিত।.....ঘাটের উপরেই বৈঠকখানা ঘরের দাবিগুলিতে রঙিন ছবিওয়ালা কাচ বসানো ছিল। একটি ছবি ছিল, নিবিড় পল্লবে বেষ্টিত গাছের শাখায় একটি দোলা, সেই দোলায় রৌদ্রছায়া খচিত নিভৃত নিকুঞ্জে দু'জনে দুলিতেছে; আর একটি ছবি ছিল, কোনো দূর্গ প্রাসাদের সিঁড়ি বাহিয়া উৎসব-বেশে সজ্জিত নরনারী কেহবা উঠিতেছে কেহবা নামিতেছে। দাবির উপরে আলো পড়িত এবং এই ছবিগুলি বড়ো উজ্জ্বল হইয়া দেখা দিত। এই দুটি ছবি সেই গঙ্গাতীরের আকাশকে যেন দুটির সুরে ভরিয়া তুলিত। কোন দূরদেশের, কোন্ দূর-কালের উৎসব আপনার শব্দহীন কথাকে আলোর মধ্যে কলমল করিয়া মেলিয়া দিত, এবং কোথাকার কোন্ একটি চিরনিভৃত ছায়ার যুগলদোলনের রসমাধুর্য নদীতীরের বন-শ্রেণীর মধ্যে একটি অপরিস্ফুট গন্ধের বেদনা সঞ্চার করিয়া দিত।"—মোরান সাহেবের আশ্চর্য বাগান আর নেই। মহাকালের অংশে গঙ্গা গ্রাস করেছে। সেই চিরনিভৃত ছায়ার যুগল দোলনের ছবি এই গঙ্গা দিয়ে একদিন ভেসে গেছে সমুদ্রে—বঙ্গোপসাগরে—ভারত মহাসাগরে। কেয়া-আলোকের ছবিও ভেসে যাবে গঙ্গায়—সমুদ্রে—মহাসাগরে। ...আলোক একটু যেন খুশি হল এখন। গঙ্গার বাতাস এতক্ষণ পরে বন্ধুর লাগছে। ঘাম জমে গিয়েছিল সারা গায়ে। সেই ঘামগুলি বাতাসের স্পর্শে নিহত হচ্ছে। উৎপিণ্ড জলাসত বুক বুক শব্দ করে এখন ক্লান্ত। কেয়ার দিকে তাকাল। কেয়াকে নিতান্ত তুচ্ছ মনে হচ্ছে এখন। হাত দুটো তেমনি জড়াজড়ি করে আছে। সরিয়ে নিল।

ঘড়িতে চেয়ে দেখল অনেক রাত হয়েছে। চাঁদ মাথার ওপর। বয় রাতের খাবার ঢেকে রেখে গেছে টেবিলে। খেতে ইচ্ছে করছে না। 'চোখ গেল' পাখির ডাকে রাত্রির নীরবতা প্রকাশিত হচ্ছে। পাথরের মূর্তি কেয়া। একাবেশ কথা কারার শব্দ শোনা যাচ্ছে না। কেন আলোক এখানে এল? ভেবেছিল কি এক রাতের সুলতান হবে, কি কেয়ার সঙ্গে নির্জনে দু' দণ্ড কাটাতে পারলে আলোক সুখি হবে? কি জানি, প্রতি মুহূর্তেই প্রতিজ্ঞার শরীর ধূলিসাৎ হচ্ছে। আশা মানুষকে পাগলের মত যুক্তিহীন করে। আজকের এই চাঁদনী রাতে, গঙ্গার তীরে তীব্র বাতাসের মধ্যে আলোক ভিলে ভিলে পুড়তে পুড়তে অনুভব করতে লাগল জীবনে এমন আঘাত কখনো পায়নি। কত দূরের কেয়া, সাত সমুদ্র তেরো নদীর দেশের। অথচ মাত্র আধ হাত ফাঁক। মন সরে গেলে দেহও বহু দূরে চলে যায়। দেহটা খোলস মাত্র। একটু আগে মনে হয়েছিল কেয়া তুচ্ছ। মিথ্যে কথা। আঙুর ফল টকের মতই। তুচ্ছ হলে যদি কেয়ার হাত থেকে মুক্তি পায় তাই মিথ্যেটাকে সত্যির রূপ দিতে চেয়েছিল।

—ছিঃ আলোক!—কেয়া বুকের মধ্যে ওর পরিশ্রান্ত মাথাটা তুলে নিল। হাত বুলোতে লাগল কপালে, মাথায়। ঘেমে উঠেছে। জামার বোতামগুলো খুলে দিল। দিনের মত জ্যোৎস্নার মুখের দিকে তাকাল। মুখের ভাঁজে ভাঁজে, রেখার পরতে পরতে কত গভীর বেদনা লুকিয়ে আছে অনুভব করতে চাইল। চোখের পাতায় ঠোঁট ছোঁয়াল: ছিঃ আলোক! তুমি কত বড় অফিসার, তোমার ওপর কত লোক নির্ভর করছে আর তুমি এভাবে কাঁদছ? একেবারে ছেলেমানুষ।

—তুমি জান না, তোমাকে ছাড়া ভাবতে পারি না।

—আমি জানি।

—জানলে তোমার কাছে আসতে বারণ করতে না।

—আমি আসতে বারণ করি?

—হ্যাঁ, কর।

—আমি তোমাকে আসতে বারণ করি যা মোটেই। তুমি আস বন্ধুর মত। আমাকে বন্ধুর মত দেখতে পার না?

—তুমি আজ থেকে আমাকে কাকা বলে ভাবতে পার?

থাকে বাসিয়া? আমি তোমাকে এতদিন যেভাবে দেখে এসেছি সেই ভাবেই দেখতে চাই। মুহূর্তে মুহূর্তে আমার মন বদলায় না।

—অথচ তুমিই একদিন বলেছিলে এক নদীতে দু'বার স্নান করা যায় না। নদীর মত নাকি আমাদের মন প্রবাহিত—

—সব সময় ওই কবুলো খাটে না। তাহলে বিশ্বাস নির্ভরতা কথাগুলো মূল্যহীন হয়ে যেত।

—ঠিক আছে। তাহলে আমাকে এখন কি করতে হবে?

—কিছু করতে হবে না।

—তাহলে কাঁদছ কেন ছেলেমানুষের মত?

—তুমি তাকিও না।—আলোক কোল থেকে মাথাটা তুলে নিল: কিন্তু সে উত্তর তো পেলাম না, তুমি কেন এখানে এনেছ? কি উদ্দেশ্য?

—উদ্দেশ্য আর কিছুই না, আমাদের ব্যাপারটা ফয়সলা করতে। কলকাতায় আমরা সময় কম পাই। রেস্টুরেন্ট সিনেমার ট্যাক্সিতে, কি ড্রইংরুমে আমরা ঠিক ঠিক কথাগুলি বলতে পারি না। পরস্পরকে জানতেও পারি না। তাই প্রকৃতির পরিবেশে নিয়ে এলাম। তোমার ভাল লাগবে জেনেই।

—আমার ভাল লাগেনি।

—আগে জানলে আসতাম না। ঠিক আছে তোমার অসুবিধে হলে চলে যেতে পার।

—তুমি মানুষকে অনবরত আঘাত করতে ভালবাস।

—আমি তোমার মত সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারি না। তাই সবাই আমাকে ভুল বোঝে।

—অর্থাৎ তুমি যখন যা যা বল তার উল্টোটা বুঝতে হবে। 'চাই না' বললে 'চাই' ধরে নেব।

—তুমি বড্ড প্যাশনেট।

—না আমি সম্পূর্ণ সুস্থ এবং স্বাভাবিক। একজন পূর্ণ-বয়স্ক মানুষের যেটুকু প্রয়োজন আমি সেটুকুই চাই। তার বেশী নয়।

—আলোক, দেহছাড়া ভালবাসা যায় না?

—না। আমি তোমার মনকে যেমন ভালবাসি, তেমনি দেহকেও।

—আমি শরীর দিতে পারি না। ভালবাসা দিতে পারি। দেবও।

—দেহ ছাড়া ভালবাসা যায় না। সে ভালবাসায় ফাঁক থাকে।

—একটু থাকল-ই বা ফাঁক। পরিপূর্ণ ভাবে তো সংসারের কিছুই পাওয়া যায় না।

—এক দিন তো দেহ দিয়েছিলে!

- দিইনি। তুমি জোর করে নিয়েছিলে।

—তুমি-ই তো বল, ইচ্ছে না থাকলে নাকি কেউ জোর করে নিতে পারে না।

—হ্যাঁ, বলেছিলাম। তা মানুষের মনে একেক সময় দুর্বলতা আসে বৈ কি।

—এখন দুর্বলতা নেই?

—নেই।

—তার মানে ভালবাসাও নেই।

—তুমি যা বোঝ।

আলোককে তর্কে পেয়ে বসেছে। কিছুতেই হার মানা চলবে না। বিশেষত কেয়ার মত একটা সাধারণ মেয়ের কাছে। আঘাতে আঘাতে জীর্ণ করতে চায়। তাহলে যেন শান্তি পায়। গর্জে উঠল, তাহলে একটু আগে তোমার বুকে আমার মাথা নিয়েছিলে কেন? অভিনয়?

চমকে উঠল কেয়া। মুখের রেখাকে কঠিনতর করল। যা দুর্গা অসুরের দিকে তাকিয়ে আছে।

—অভিনয় জানি না। মাত্র এক রাত্তের জন্যে তোমার হতে চেয়েছিলাম। গঙ্গা সাক্ষী রেখে গঙ্গায় ডুব দিয়ে শুদ্ধ হয়ে ফিরে যেতে চেয়েছিলাম তারপর।

—আমি ভিখিরী নই।

—আমিও বেশ্যা নই। (ক্রমশঃ)

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

ভিয়েৎনাম—(১০৬ পৃষ্ঠার পর)

সভাপতিত্বের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিল। আমেরিকার পক্ষ থেকে এই সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধি তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব জন ফস্টার ডালেস অবশ্য এই চুক্তিতে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন; কারণ কম্যুনিষ্টদের হাতে উত্তর ভিয়েৎনাম তুলে দিবার তিনি ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রাখার মার্কিনী প্রতিশ্রুতি সেদিন থেকেই প্রসারিত। প্রসঙ্গত, উল্লেখ করা প্রয়োজন যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামও জেনেভা চুক্তিতে স্বাক্ষর দেয় নাই।

জেনেভা চুক্তি অনুযায়ী ভিয়েৎনামের বিভাগ একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা মাত্র। ১৯৫৬ সালে সমস্ত ভিয়েৎনামে স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনের মধ্য দিয়ে দুই ভিয়েৎনাম পুনরায় যুক্ত হবে,—জেনেভা সিদ্ধান্তে এই সর্ত আরোপিত ছিল। তার পূর্বে ১৯৫৫ সালের ২০শে জুলাই থেকে এই সর্তপূরণের ব্যবস্থাপনার জন্য উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উভয় সরকারের মধ্যে আলাপ-আলোচনা শুরু হবার বিধানও জেনেভা সর্তে উল্লেখিত ছিল।

জেনেভা সম্মেলনের স্বাক্ষরকারীদের উপর সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র-সমূহের সার্বভৌমত্ব, স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা বজায় রাখবার এবং অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ থেকে বিরত থাকার নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও, জেনেভা-চুক্তি সম্পাদনের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই নির্দেশ লঙ্ঘিত হয়। ১৯৫৬ সালের নির্বাচনে সমগ্র ভিয়েৎনাম দখলের আশায় কম্যুনিষ্টরা তৎপর হয়ে উঠলো। উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী প্রায়-দশ লক্ষ ভিয়েৎনামী প্রাণের দায়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। ফলে উত্তর ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টরা নিষ্কণ্টক হল। ভিয়েৎনাম বিভাগের পরও ফরাসী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামকারী কম্যুনিষ্ট গরিলাদের একটি বৃহৎ অংশ দক্ষিণ ভিয়েৎনামেই রয়ে গেল। উপরন্তু, এদের অনেকেই উত্তর ভিয়েৎনামে পাকাপোক্তভাবে গরিলাপদ্ধতি শিক্ষা করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে অনুপ্রবেশ করল। এরাই বর্তমানে ভিয়েৎকং নামে সুপরিচিত। এদের সংখ্যা ২৫,০০০। কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়ে ৪০,০০০। এরা সর্বক্ষণের গরিলা এবং এছাড়া প্রায় একলক্ষ আংশিক সময়ের গরিলার ও প্রায় কেন্দ্রের স্থানীয় ভিয়েৎনামীদের সমর্থনপুষ্ট। দক্ষিণ ভিয়েৎনামেও কম্যুনিষ্ট প্রাধান্য সৃষ্টির জন্য ১৯৫৯ সাল থেকেই এরা তৎপর। এদের সেদিনকার উদ্দেশ্য ছিল ১৯৫৬এর নির্বাচনেই দক্ষিণ ভিয়েৎনাম করায়ত্ত করা।

লাওসের ক্ষেত্রেও এই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়। জেনেভা চুক্তির পর কম্যুনিষ্ট পাথেট লাও, উত্তর লাওসের দুইটি প্রদেশের শাসন ক্ষমতা দখল করে, যদিও এই দুটি প্রদেশ নামে মাত্র লাওসের কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন রইলো। সেই সঙ্গে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম-সংযোগকারী লাওসের একটি 'করিডর' পাথেট লাও-এর করায়ত্ত হয়ে তার মধ্য দিয়ে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ভিয়েৎকংদের সাহায্যার্থে সেনাবাহিনী ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহিত হতে থাকে। ১৯৫৬-এর প্রস্তাবিত নির্বাচনের পূর্বে ভিয়েৎকংরা এই ভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট প্রভাব বিস্তারের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে। কাম্বোডিয়ার মধ্য দিয়েও ভিয়েৎকং এর সরবরাহ দক্ষিণ ভিয়েৎনামে পৌঁছেছে। ইতিমধ্যে ভিয়েৎকং-এর অন্তর্ঘাতী কার্যকলাপের পরিবেশ ধাপে ধাপে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

জেনেভা চুক্তির সর্ত : "...To refrain from interference in their internal affairs..."...'to respect the sovereignty, the independence, the unity and territorial integrity...' লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে এবং স্বাধীন ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচন সম্পর্কে গভীর আশঙ্কা প্রকাশ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী দিয়েম ১৯৫৬ সালের নির্বাচনের বিরোধিতা করলো। ফলে ১৯৫৫-এর জুলাই-

এর প্রাক-নির্বাচন আলোচনা কিম্বা ১৯৫৬ সালের নির্বাচন কোনটাই সম্ভব হল না। জেনেভা সম্মেলনের যৌথ-সভাপতি সোভিয়েত রুশ ও ব্রিটেনের মধ্যে দুই ভিয়েৎনামের সংযুক্তির জন্য নির্বাচনী কার্যক্রমের অপ্রয়োগ সম্পর্কে কয়েকবার ব্যর্থ আলোচনায় এই কার্যক্রমের অপমৃত্যু ঘোষিত হল। কৌশলে নির্বাচন নিয়ন্ত্রণ করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম করায়ত্ত করবার আশা। অতঃপর কম্যুনিষ্টরা ত্যাগ করে অন্য পথ গ্রহণ করলো।

১৯৫৮-এর সেপ্টেম্বরে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান ডং দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন: হয় বছরের উত্তর ভিয়েৎনাম কর্তৃক উত্থাপিত আলাপ-আলোচনা বৈঠকে সম্মতি দিতে হবে, না হয় ভিয়েৎনাম-বিভাগকে চিরস্থায়ী করবার অভিযোগে অভিযুক্ত হতে হবে। উত্তর ভিয়েৎনামের প্রস্তাবে সম্মতি না পেলে দক্ষিণীদের বিরুদ্ধে বলপ্রয়োগের আভাসও পাওয়া যায় ডং-এর বক্তৃতায়। অতঃপর ১৯৫৭-এ হানয়-এর উদ্যোগে দক্ষিণাঞ্চলে খণ্ড-বিদ্রোহের একটি দীর্ঘমেয়াদী কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৫৯-এর ৫ মাসে উত্তর ভিয়েৎনামের শাও ডং (কম্যুনিষ্ট) পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে বলপ্রয়োগে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম দখলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সন্ত্রাসবাদী ও নাশকতামূলক কার্যক্রমের তীব্রতা এইভাবে ১৯৬০সাল পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ-বছর সেপ্টেম্বর মাসে হানয়তে অনুষ্ঠিত শাও ডং পার্টি কংগ্রেসে (Lao Dong)—কম্যুনিষ্ট পার্টি—পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারী লে ডুয়ান-এর প্রস্তাব অনুযায়ী ব্যাপকতর ভিত্তিতে যুক্ত ফ্রন্ট—'Broad United Front'—গঠন করে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের উপরোক্ত নির্দিষ্ট লক্ষ্যে অগ্রসর হবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবই দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, ভিয়েৎকং গরিলাদের রাজনৈতিক সংগঠন 'National Liberation Front'-এর জন্ম দিল। এইভাবে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহে গতিবেগ সঞ্চারের জন্য দুইটি শক্তিশালী হাতিয়ার উৎপন্ন হয়ে উঠল। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রতিফলন দেখা যায় ত্রৈমাসিক 'Foreign Affairs' পত্রিকার এপ্রিল সংখ্যায় (১৯৬৫) ভর্জ. এ কার্তার-এর 'The Real Revolution in South Vietnam' প্রবন্ধে।

"South Vietnam, as is obvious to any one with the most cursory interest in world affairs, is in the midst of a war, and equally obvious is the fact that this war is being waged by a communist-controlled insurgent movement supported and directed from Hanoi."

১৯৬০ সালের ২০শে ডিসেম্বর, উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে National Liberation Front গঠিত হবার পর পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি হয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, উত্তর ভিয়েৎনামের হস্তক্ষেপ সে-সময় আরও স্পষ্ট, ভিয়েৎকং-এর প্রভাব তখন ক্রমবর্ধমান হয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলে পরিব্যাপ্ত, ভিয়েৎকং-এর সন্ত্রাস, মর্যাদার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। এই সময়কার পরিস্থিতির উল্লেখ রয়েছে "Foreign Affairs"-এর উপরোক্ত প্রবন্ধে:

"At that point, the scale and intensity of the communist subvertion campaign began to increase by quantam jumps, and within a year became what it is today—a full-fledged civil war supported and directed by communist leaders in Hanoi in order to further their political ambitions."

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, ভিয়েৎকং-বিদ্রোহ বহিরাক্রমণাত্মক

যুদ্ধ না দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক পরিস্থিতি থেকে উৎসারিত অন্তর্বিপ্লব—এ-নিয়ে বিতর্ক চলেছে। কম্যুনিষ্ট ও তাদের সমর্থকেরা ভিয়েৎকং বিদ্রোহকে 'indigenous', অর্থাৎ দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অভ্যন্তরে সঞ্জাত শক্তির দ্বারা পরিচালিত, বহিঃশক্তি-নিরপেক্ষ অন্তর্বিদ্রোহ বলে প্রচার করেন। ফরাসী ঔপনিবেশিক শক্তি বিতাড়নে উদ্যোগী বিদ্রোহী জাতীয়তাবাদীরাই, কম্যুনিষ্টদের দৃষ্টিতে বর্তমানের বিদ্রোহী ভিয়েৎকং। তাদের মতে ফরাসী বিতাড়নের পর ইন্দোচীনে তাদের শূন্যস্থান মার্কিনী শক্তি পূর্ণ করার ফলে সেদিনকার জাতীয় বিপ্লব অসমাপ্ত রয়ে গেছে। সুতরাং, সেই জাতীয় বিপ্লবের সার্থক পরিণতির জন্যই মার্কিন-পুষ্ট দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে ভিয়েৎকং-এর অভিযান।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের বিরুদ্ধে মার্কিনী সামরিক সহযোগিতার অভিযোগ সম্পূর্ণ সত্য। কিন্তু উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে করায়ত্ত করার কম্যুনিষ্ট নীতিই এই সামরিক সহযোগিতার সুযোগ করে দিয়েছিল। কারণ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য জেনেভা চুক্তির কাল থেকে মার্কিনীরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ১৯৪৯ সালে চীনে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাফল্যের পর সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় স্বভাবতই কম্যুনিষ্ট পার্টিগুলির অসপত্ন প্রভুত্বের আশায় শক্তি সঞ্চারিত হয়েছিল। ইন্দো-চীনে 'দিয়েন বিয়েন ফু'র যুদ্ধে ফরাসী ঔপনিবেশিকদের চূড়ান্ত পরাজয়ে, ইন্দোচীনে সেই সম্ভাবনা প্রবল হয়ে উঠলো। সেদিনই ইন্দোচীন, কম্যুনিষ্ট করায়ত্ত হলে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট দখল অনতিকালেই প্রসারিত হবে,—এই সম্ভাবনার সম্মুখে পশ্চিমী শক্তিবর্গ নিরুদ্যোগ হয়ে নিজেদের অস্তিত্বকে বিপন্ন করে তুলবে, এমন ঘটনা অবাস্তব। সুতরাং সেদিন যুদ্ধ-বিরতি হয়ে ইন্দো-চীন সঙ্কটের সুরাহা না হলে, আর একটি বিশ্বযুদ্ধের কিনারায় পৃথিবী এসে হাজির হতো। শুধু পশ্চিমী শক্তিই বা কেন, সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় কম্যুনিষ্ট চীনের সম্প্রসারণ, কম্যুনিষ্ট রাশিয়ার পক্ষেও সুখকর সম্ভাবনা নয় এবং এই সম্ভাবনাকে কেন্দ্র করে বিশ্বসংঘাতও তাদের পক্ষে আর একটি মারাত্মক সম্ভাবনা। সুতরাং ১৯৫৪-এর জেনেভা চুক্তির প্রয়োজনীতা ছিল এবং সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষেরই চুক্তির জন্য সচেষ্ট না হয়ে উপায়ান্তর ছিল না। কিন্তু জেনেভার চুক্তি, বিরোধের হেতু টানতে পারে নাই। সাময়িক বিরতি এনেছিল মাত্র। জেনেভা চুক্তিতে স্বীকৃত লাওস ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নিরপেক্ষতার তাৎপর্যও এর বেশী ছিল না। ভিয়েৎনাম বিভাগের পর দক্ষিণের কম্যুনিষ্টদের ও পরিণামে অনেকেই এই অঞ্চলে রয়ে গেলো। ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র গোপনে মজুদ করে রাখা হোলো। কিছু পরিমা পাহাড়ে-জঙ্গলে ভবিষ্যৎ নির্দেশের অপেক্ষায় আত্মগোপন করে রইলো এবং প্রায় ৯০,০০০জন উত্তর ভিয়েৎনামে চলে গেলো।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকংদের বিদ্রোহে হানয়-এর অদৃশ্য হস্তের সঙ্কেত গোড়া থেকেই সুস্পষ্ট ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে দক্ষিণাঞ্চলে হানয়ের গোপন সামরিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলি কম্যুনিষ্টরা ঢেলে সেজে ফেলে। ভিয়েৎকং পরিমারা হানয়ের নির্দেশে এদের মারফৎ পরিচালিত হয়। প্রমাণ পাওয়া গেছে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে লাওসের পথে কিম্বা সমুদ্রপথে কিম্বা অন্য গোপন সুড়ঙ্গ পথে প্রায় ২৯,০০০ ভিয়েৎকং পরিমা ১৯৫৯ সাল থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এসেছে-যারা সামরিক অফিসার, সৈন্য কিম্বা কারিগর। এছাড়াও আরও হাজার হাজার গোপন অনুপ্রবেশকারীর দল উত্তর থেকে দক্ষিণে এসেছে। একমাত্র ১৯৬২ সালেই ৪০০০ এর বেশী অনুপ্রবেশকারী পরিমা, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এসে পৌঁচেছে। যার ফলে এই কয় বছরে হতাহত হবার পরও বর্তমানে দক্ষিণে কট্টর ভিয়েৎকংদের সংখ্যা প্রায় ৩৫,০০০ হাজার-এ

দাঁড়িয়েছে যদিও ১৯৬১ এদের সংখ্যা ২০,০০০ এরও কম ছিল। এদের সহযোগী স্থানীয় গরিলাদের হিসাব আলাদা—তাদের সংখ্যা ৬০,০০০ থেকে ৮০,০০০। দক্ষিণে হৃত গরিলাদের কাছ থেকে সংগৃহীত সংবাদে জানা গেছে গোড়ার দক্ষিণ ভিয়েৎনামবাসী গরিলারা উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে আরও শিক্ষাপ্রাপ্ত হয়ে দক্ষিণে প্রেরিত হয়েছে। কিন্তু গত কয়েকবছর যাবৎ বহু উত্তর ভিয়েৎনামবাসী গরিলাদের দক্ষিণে প্রেরণ ও অবস্থানের সংবাদ পাওয়া গেছে।

অস্ত্রশস্ত্রের ক্ষেত্রেও তাই। প্রথম প্রথম ফরাসীদের সঙ্গে যুদ্ধের আমলের গোপন মজুত অস্ত্রশস্ত্র গরিলারা সঞ্চিত ছিল। তারপর দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনীর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে এদের কাজ চলেছে। কিন্তু ১৯৬১ সাল থেকে মার্কিনী সামরিক সাহায্য বৃদ্ধি হবার পর ভিয়েৎকংদের ওপর প্রবল আঘাত সামলাবার জন্য নূতন অস্ত্রশস্ত্রের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং লাওসের রাস্তায় গোপন স্থলপথে কিম্বা সমুদ্রপথে জাহাজ বোঝাই হয়ে প্রচুর পূর্ব ইয়োরোপীয় এবং চীনা আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম ভিয়েৎকংদের হাতে এসে পৌঁছেছে। তার চাক্ষুষ প্রমাণও রয়েছে। তবুও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিষ্টদের বিদ্রোহ যে জানয় থেকে উত্তর ভিয়েৎনামের কম্যুনিষ্ট পার্টি দ্বারা পরিচালিত এবং এই বিদ্রোহ যে 'indigenous' নয় তা তর্কাতীত।

প্রশ্ন হচ্ছে এর শেষ কোথায়? এই যুদ্ধ কি কোনো রাজনৈতিক পরিবর্তনের ফলে সামরিক সমাধানের দিকে নিরবচ্ছিন্ন গতিতে এগিয়ে যাবে, না এই সংঘাতের কোনো রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব? না কম্যুনিষ্ট সম্প্রসারণের গতিবেগ রোধিত করে দিয়ে একটা 'না জয়ে না জয়ে'—stalemate অবস্থায় বিভিন্নে থাকা সম্ভব হবে?

এ-পর্যন্ত এবিষয়ে উত্তর ভিয়েৎনামের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট: "U-S troops, military personnel, arms, war material and equipment must be completely withdrawn from South Vietnam and the people of South Vietnam must decide their own affairs."

(North Vietnamese Foreign Ministry Statement, Feb 11, 1964

অপরপক্ষে আমেরিকার বক্তব্যও দ্ব্যর্থহীন:

"...Until the regime in Hanoi decides to halt its intervention in the South, or until effective steps are taken to maintain peace and security in the area, the Governments of South Vietnam and the United States will continue necessary measures of defense against the Communist armed aggression coming from North Vietnam."

[Aggression from the North, issued by the U. S State Dept. Feb, 27, 1965]

আমেরিকার এই প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ১৯৬৪-র ২রা আগষ্ট মার্কিন নৌবাহিনীর ডেষ্ট্রয়ার 'মাডক্স'-এর উপর টনকিন উপসাগরের আন্তর্জাতিক এলাকায় উত্তর ভিয়েৎনামের টর্পেডো বোটের অতর্কিত আক্রমণের উত্তরে ৪ঠা আগষ্ট মার্কিন বিমানবাহিনী এই উপসাগরে ২৫টি উত্তর ভিয়েৎনামী টর্পেডো বোট এবং প্রচুর মজুত পেট্রোলের ডিপো ধ্বংস করে দেয়। সেই একই যুক্তিতে গত ৭ই ফেব্রুয়ারী দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মধ্যাঞ্চলে অবস্থিত প্লিকু শহরে মার্কিনী সেনাবাহিনীদের একটি প্রধান ঘাঁটির ওপর ও অপর একটি বিমান ঘাঁটির ওপর প্রচণ্ড অতর্কিত আক্রমণের পর পরই মার্কিনী ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী যোদ্ধৃ বিমান উত্তর ভিয়েৎনামের সুনির্দিষ্ট সামরিক

ঘাঁটি বোমা-বিধ্বস্ত করে। উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা আক্রমণ সেদিন থেকে শুরু হয়ে আজ পর্যন্ত অব্যাহত গতিতে চলেছে—মাঝখানে এপ্রিল মাসে মাত্র কয়েকদিন বিরতি ছিল,—হ্যানয়কে শান্তিসংলাপের উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনায় রাজী হতে সুযোগ দেবার জন্য। প্রসঙ্গত, ৭ই ফেব্রুয়ারী হ্যানয়-এ সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিজিন উপস্থিত ছিলেন এবং সেখানে একটি সমাবেশে বলেন: 'উত্তর ভিয়েৎনাম আক্রান্ত হলে সোভিয়েত তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসবে।' এই বোমা বর্ষণের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ চীনদের People's Daily চড়া সুরে বলে: Debts are debts and they must be repaid, when debts accumulate, they will have to be repaid at compound interest." (9th Feb, 1965)

ভিয়েৎনাম সমস্যা সমাধানের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছে। ফরাসী বলেছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সহ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সংশ্লিষ্ট অঞ্চল নিরপেক্ষ ঘোষিত হউক (neutralisation), ভারতবর্ষও এই প্রস্তাব সমর্থন করেছে। প্রেসিডেন্ট জনসন উত্তর ভিয়েৎনামের নিরপেক্ষতার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখতে প্রস্তুত থাকলেও কম্যুনিষ্টরা উত্তর ভিয়েৎনামের নিরপেক্ষতার ঘোরতর বিরোধী। ভারতের প্রধানমন্ত্রী অবিলম্বে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ বন্ধের জন্য আমেরিকার নিকট দাবী জানালেও, একই সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনাম ও চীনের নিকট দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গোপনে অস্ত্রশস্ত্র ও অনুপ্রবেশকারী প্রেরণ বন্ধ করার দাবী না জানিয়ে, পরোক্ষে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে এই দুই রাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ সমর্থন করে গেছেন। গত ১লা এপ্রিল, ১৭টি নন্-এলাইনড রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ভিয়েৎনামে সংশ্লিষ্ট সকল পক্ষকে অস্ত্রসম্বরণ করে সর্তহীন আলোচনা আরম্ভের জন্য অনুরোধ জানানো হলে, প্রেসিডেন্ট জনসন সর্তহীন আলোচনার প্রস্তাবে স্বীকৃতি দেন; অবশ্য উত্তর ভিয়েৎনামে মার্কিনী বোমাবর্ষণে বিরতির পূর্বসর্ত স্বীকার করতে আমেরিকা নারাজ। পিকিং ও হ্যানয় ১৭টি রাষ্ট্রের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। রাষ্ট্রপতি রাধাকৃষ্ণন এফ্রো-এশীয়ান বাহিনীর হাতে দুই দেশের সীমান্ত-রক্ষার প্রস্তাব দিয়ে ভিয়েৎনাম সঙ্কটের শান্তিসংলাপের সূত্রপাত করেছিলেন। উত্তর ভিয়েৎনাম তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ভিয়েৎনামে বিনাসর্তে আমেরিকার সামরিক সম্ভার ও হস্তক্ষেপ প্রত্যাহারের দাবীতে হ্যানয়-পিকিং অবিচল। অন্য কোনো সর্ত তাদের কাছে অগ্রহণীয়। হ্যানয় অবশ্য গত বছর (১১ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬৪) দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সমস্যার যথাযথ ও শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য জেনেভা চুক্তির (১৯৫৪) পূর্ণপ্রয়োগের দাবী জানায়। জেনেভা চুক্তির পূর্ণ প্রয়োগের সঙ্গে হ্যানয়ের পূর্বোক্ত অবিচল দাবীর বিরোধ রয়েছে, হয়তো হ্যানয়ের সে-কথা স্মরণ নাই। কারণ জেনেভা চুক্তির বলে (১) ১৯৫৪ সালের যুদ্ধবিরতির সময় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যে ৬০০ মার্কিনী সামরিক 'পরামর্শদাতা' উপস্থিত ছিল, যুদ্ধ-বিরতির পরও দক্ষিণ ভিয়েৎনামে তাদের অবস্থান জেনেভাচুক্তি মেনে নিয়েছিল; (২) উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনাম কোনো শক্তিজোটের অন্তর্ভুক্ত হবে না। এই দুইটি সর্তই হ্যানয়ের নিকট অগ্রহণীয়।

একদিকে পিকিং-হ্যানয়, অপর দিকে আমেরিকা—এই দুই প্রতিপক্ষের অনমনীয়তা ভিয়েৎনামের সঙ্কটকে যুদ্ধের কিনারায় ঠেলে দিচ্ছে। মার্কিন সামরিক সম্ভার পিকিং-হ্যানয়ের চাইতে বহুগুণ বেশী হলেও, উত্তর ভিয়েৎনামে অবিশ্রান্ত বোমা বর্ষণ দ্বারাই যে পিকিং-হ্যানয় নিঃসর্ত আপোষ-মীমাংসার আলোচনায় সম্মত হবে, সে বিষয়ে সংশয় রয়ে গেছে। ইতিমধ্যে, উত্তর ভিয়েৎনামের সামরিক ও শিল্পগত লক্ষ্য বস্তুর উপর প্রচুর বোমা বর্ষিত হয়েও হ্যানয়-পিকিংকে টলাতে পারে নাই। তার কারণও রয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের গ্রামাঞ্চলের বহু

অংশ—সংখ্যায় প্রায় ৬০ হাজার—আজ ভিয়েৎকং-এর করায়ত্ত এবং সেখানে তাদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান। আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সৈনিক ও যুদ্ধ পণ্যের জন্য ডলার—গত ফেব্রুয়ারীর পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে—ব্যয় করে এবং প্রায় ১৬,০০০ মার্কিনী 'সামরিক পরামর্শদাতা'—আসলে পূর্ণাঙ্গ সামরিক বাহিনী—দিয়ে সাহায্য করেও সেখানে কোনো নির্ভরযোগ্য জনপ্রিয় সরকার দাঁড় করাতে ব্যর্থ হয়েছে। উপরন্তু নয় বছর মেয়াদী দিয়েমের পুলিশী শাসনকে অকাতরে অর্থ দিয়ে সাহায্য করে সেখানে একটী দখলদারী ঔপনিবেশিক সৈন্যের ভূমিকা নিয়েছে। ১৯৬৩-র ১লা নভেম্বর দিয়েমের পতনের পর গত সতের মাসে আট-নয়বার সরকার পরিবর্তন, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক অস্থৈর্যের পরিমাপক। সেখানকার ক্যাথলিক-বৌদ্ধ সংঘাত, সামরিক শক্তি ও বেসামরিক রাজনীতিকদের দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন সামরিক উপদলে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও বিরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সেখানে রাজনৈতিক স্থিতি একটি অসম্ভব ঘটনা, যে স্থিতির ভিত্তিভূমিতে দাঁড়িয়ে গণতন্ত্রের স্বপক্ষে কম্যুনিষ্ট বিদ্রোহ প্রতিহত করবার উদ্যোগ চলতে পারে। মার্কিনী সামরিক সাহায্য তাই রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিক্রিয়ার পরিপোষণে ব্যয়িত হয়ে গোটা দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে মার্কিনী দখলদারদের ঘাঁটিতে পরিণত করেছে।

এই অবস্থায় উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে পরিচালিত ও সাহায্যপুষ্ট হয়েও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের জনমানসে,—বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে—ভিয়েৎকং বাহিনী জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির আধার আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোনো সামরিক বাহিনীর প্রতিরোধ শক্তি চূর্ণ করার জন্য প্রতিপক্ষের দলে তাদের শক্তির অনুপাত ১৫ : ১ হওয়া প্রয়োজন। এই অনুপাত আলজিরিয়া ও মালয়ের সামরিক বিদ্রোহ দমনে সরকারী শক্তির সংখ্যাতের অভিজ্ঞতালব্ধ। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কিছুদিন পূর্বেও এই অনুপাত ছিল ৫ : ১। বর্তমানে এই অনুপাত কিছু বৃদ্ধি পেলেও ভিয়েৎকং দমনে আরও প্রচুর সৈন্য দক্ষিণ ভিয়েৎনামে নিয়োগ করতে হবে। উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা-বর্ষণের ফলে যদি দক্ষিণে ভিয়েৎকংদের নিকট সেখান থেকে কোনো সাহায্য না এসেও পৌঁছায়, সেই অবস্থায় দক্ষিণ-ভিয়েৎনামের ভিয়েৎকং এলাকাগুলিকে বোমাবিদ্ধস্ত করে তাদের নষ্ট করা যাবে কি না সে সম্বন্ধে সংশয় আছে। ভিয়েৎকং বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে প্রতিটি মার্কিনী বিমানঘাঁটিগুলির চতুষ্পার্শে উৎপন্ন; বর্তমানে তাদের গতি শহরের দিকে প্রসারিত। মেকং নদীর অস্ত-ভাণ্ডারও তাদের আয়ত্তের আওতার বাইরে নয়। বর্ষা শুরু হলেই চূড়ান্ত সংঘাতের জন্য তাদের প্রস্তুতি চলেছে। ভিয়েৎকংদের শক্তিবৃদ্ধির পরিমাপ পাওয়া যাবে গত ২৪শে মে সাইগন থেকে প্রচারিত একটি সংবাদে। তাতে জানা যায় দক্ষিণ ভিয়েৎনামে বৃটিশ উপদেষ্টা পরিষদের প্রাক্তন প্রধান পরিচালক মিঃ আর, পি, কে, টমসন লণ্ডনে বলেছেন দক্ষিণ ভিয়েৎনামী ও মার্কিনীরা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধের গেরিলা পর্যায়ে পরাস্ত হয়েছে—"to all intents and purposes lost the guerilla phase of the fighting in South Vietnam"। "গ্রামাঞ্চলের অধিকাংশ এলাকা ভিয়েৎকংদের করায়ত্ত এবং তারা শহরের দিকে অগ্রসর হবার জন্য প্রস্তুত। যুদ্ধের পরের পর্যায়ে চূড়ান্ত মীমাংসা অনিবার্য: "The Vietcong are very largely in charge of the country-side and are now ready to move against the towns. The next phase of the war will be the decisive one."

তবে কি ভিয়েৎনাম সঙ্কটের সামরিক মীমাংসাই অনিবার্য? একদিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে রাজনৈতিক

স্থিতি বজায় রাখতে ও অন্যদিকে পিকিং-হানয়কে নিঃসর্ত আলাপ-আলোচনায় বাধ্য করতে উত্তর ভিয়েৎনামে অনির্দিষ্টকাল বোমা বর্ষণের ঝুঁকি নিয়ে, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এবং খাদ মার্কিণ মুলুকে, জনসন সরকার অপাংক্তেয় হতে চাইবে না। ইতিমধ্যে জনসন সরকারের ভিয়েৎনামের নীতির বিরুদ্ধে আমেরিকায় বিক্ষোভের ঝড় বয়ে গেছে। অবশ্যি একথাও সত্য যে অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আমেরিকার বোমার উত্তর ভিয়েৎনামের ধ্বংসস্তূপের দিকে তাকিয়ে চীন কিম্বা রাশিয়া কারো পক্ষেও নিষ্ক্রিয়তা ও নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করা সম্ভব হবে না। ঘটনার পরিবেশ আমেরিকার বোমা বর্ষণে আগে ছেদ টানবে, না ভিয়েৎনাম সংঘাতে চীন-রাশিয়ার সক্রিয় হস্তক্ষেপ তার আগেই অনিবার্য করে তুলবে, সময় সীমার এই ব্যবধানের মাঝখানে ভিয়েৎনাম সংকটের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে। ঘড়ির কাঁটা ঘুরে এসার বছরের পূর্বেকার 'দিয়েন বিয়েন ফু'র পরিস্থিতিতে ভিয়েৎনামের সঙ্কটকে এনে দাঁড় করিয়েছে। ভিয়েৎনাম-সঙ্কটের মহাযুদ্ধে কিম্বা আশু আলোচনা বৈঠকে পরিণতি, এই দুইয়ের মাঝে অন্য কোনো বিকল্প পথ নাই। এই অঞ্চলে সোভিয়েট রুশের পূর্বেকার প্রভাব বজায় থাকলে কিউবার মত এবারও যুদ্ধের কিনারা থেকে চীনকে ফিরে আসতে বাধ্য করে নিঃসর্ত আলোচনায় সম্মত করাতো। কিন্তু চীন-সোভিয়েট সংঘাতের পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েট প্রভাব নিঃশেষিত হয়েছে। ১৯৬৪ সালের মে মাসে লাওসে 'Plain of Jars'-এ প্যাথেট লাও-এর আক্রমণের পর এই চীন-রুশ শক্তির ভারসাম্য বিনষ্টির এবং সোভিয়েট রুশের অসহায়ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়, সে সময় জেনেভা সম্মেলনের যৌথ-সভাপতিত্ব বর্জনের সোভিয়েট সিদ্ধান্তে। সোভিয়েটের নেতৃত্বে ও বৃটেনের সহযোগিতায়—এরাই জেনেভা সম্মেলনের যৌথ-সভাপতি—১৯৬২ সালে দ্বিতীয়বার জেনেভা সম্মেলন আহ্বান করে লাওসে-এ কম্যুনিষ্ট ও অকম্যুনিষ্ট শক্তি সমাবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে শান্তি ও স্থিতি ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। তারপরই চীনের প্রয়োচনায় প্যাথেট লাও তা ছেড়ে দিলে অভিধানভুক্ত সোভিয়েট রুশ যৌথ-সভাপতিত্ব বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশ্যি বৃটেনের সনির্বন্ধ অনুরোধে বিরত থাকে।

গত ফেব্রুয়ারীতে হানয়ে কোসিগিনের উপস্থিতি এই অবস্থার কোনো বিশেষ পরিবর্তনে সক্ষম হয়েছে মনে হয় না। সুতরাং চীনই শেষ পর্যন্ত এই সঙ্কটের নিয়ামক। ইতিমধ্যে চীনা সেনাবাহিনীর উত্তর ভিয়েৎনামের সীমান্তে সমাবেত হবার সংবাদও পাওয়া গেছে। যাও সে তুঙ-এর দৃষ্টিতে যুদ্ধ অনিবার্য এবং '...the gun is the ultimate political weapon.' সেকথা সত্যই কি তার পরখ হবে? এই ধারাক্রম পরিণতির বিকল্প, আপোষ-রফার পথ দিয়ে সীমাংসার সূত্রপাতের জন্য আমেরিকা শক্তিমানের পীঠভূমি থেকে—'from a position of strength'—আলোচনায় বদ্ধপরিকর হয়েছে। চীন-হানয়ের মনোভাবের উপর তা বহুলাংশে নির্ভরশীল। ভিয়েৎনাম থেকে পরিণতি-নিরপেক্ষ মার্কিণী-অপসারণে জনসন সরকার কখনই সম্মত হবে না। সুতরাং ভিয়েৎনাম সীমাংসার চাবিকাঠি বর্তমানে চীনের হাতে নিঃসর্ত আলোচনায় সম্মতি দিয়ে। বিরুদ্ধে সেই কারণে যুদ্ধেরও।

ভিয়েৎকং-এর প্রভাব যদি দক্ষিণাঞ্চলের জনমানসে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, যদি তাদের আদর্শের আবেগ প্রবল-ভাবে সেখানকার সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করে থাকে, যদি ভিয়েৎকং এর প্রতি তাদের আনুগত্য সন্ত্রাসবাদ ও ত্রাসের আঘাতে উৎসারিত না হয়ে থাকে, মার্কিণী ডলার কিম্বা গোলা-বারুদ-বিমান তাদের নিরস্ত করতে পারবে না। সেক্ষেত্রে আলাপ-আলোচনায় চীনাদের ভয়ের কি কারণ থাকতে পারে? আলাপ-আলোচনায় অসম্মতি যুদ্ধের কিনারায় ভিয়েৎনাম সঙ্কটকে পৌঁছে দেবেই। গত ১৩ই মে টেলিভিশন-বক্তৃতায় জনসনের বাস্তবানুগ বিবৃতির—"no purely military solution in sight for either side"—পর ভিয়েৎনাম-সঙ্কট মোচনে চীনের দায়িত্ব বহুগুণ বৃদ্ধি পেলো।

২৪. ৫. ৬৫

ক্লিশের ক্লেশ
এবং তৎসত্ত্বেও

অশ্রুকুমার সিকদার

শ্রীযুক্ত শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা' [চতুর্থ পর্যায় : পশ্চিম অলিন্দ]-র প্রকাশ বাঙালী কাব্যপ্রেমিকের কাছে একটি সৌভাগ্যের ঘটনা। কবিতার সংকলন বাংলা-দেশে কম বেরোয়, যদি বেরোয়—তার অন্য দায়ি অসাহিত্যিক কারণ, হয়তো বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকার প্রয়োজন। দূরকালের কবিতার সংকলন কিছু বেরোয়, সেই কাজ তুলনায় সহজ—কারণ সেখানে সম্পাদনার কাজ করে প্রধানত কালের ফুলো, পাঠকের যৌথরুচি। কিন্তু নিকটের কালের কবিতার সম্পাদনাকর্ম সহজ নয়, কারণ কাল সেখানে সম্পাদককে সাহায্য করে না। তাছাড়া সম্পাদক নিজে কবি হলে, কবিরা যেহেতু সমব্যবসায়ী সেই কারণে মানবিক দুর্বলতাও সম্পাদনাকর্মের নিরিপ্ত দক্ষতাকে অপ্রস্তুত করতে পারে। অথচ এই কালীন সংকলন বিশেষ প্রয়োজন—, কারণ অজস্র পত্রিকায়, এমন পত্র পত্রিকার যাদের প্রচার-পরিধান সামান্য, স্বল্পায়ু পত্রিকায়, যে প্রচুর কবিতা প্রতি-মাসে মুদ্রিত হচ্ছে, তার সঙ্গে যোগ রাখা নিতান্ত উৎসাহী পাঠকের পক্ষেও সম্ভব নয়। ফলে বর্তমান কালের রচনার সঙ্গে পাঠকের সামগ্রিক পরিচয়ের জন্য এই গ্রন্থটির মতো সংকলনের খুব প্রয়োজন। তাছাড়া 'বাংলা কবিতা' পড়ে মনে হলো কবিরাও পরস্পরের আয়নায় এক সঙ্গে বেশি সময় মুখ দেখলে কবিতার উপকার হবে, ফলে কবিরাও উপকৃত হবেন। এই সব কারণে সম্পাদক এই সুমুদ্রিত গ্রন্থটি সম্পাদনা করে এবং প্রকাশক প্রকাশনার দায়িত্ব নিয়ে আমাদের মতো সাধারণ কবিতা প্রেমিকের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। "আলোচ্য গ্রন্থে দ্বিতীয়রঞ্জন কবির মোট একশো পঞ্চাশটি কবিতা সংকলিত হয়েছে।" কবিদের বয়স পঁচিশ থেকে চল্লিশ—একই সময়ের আকাশ, একই যন্ত্রণার উৎ-পীড়নের এবং আনন্দ-মধু-র এঁরা অংশীদার। অতি-ভক্ত-গতিমান জেটের যুগে যেখানে দশকে-দশকে নাকি কবিতার চরিত্র বদলায়, তার বিচারে এই সংকলনভুক্ত কবিগণ মূলত পঞ্চাশের দশকের কবি।

সংকলনের একটি কবিতায় অশোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য লাইন পাই—

> শব্দ সব, শব্দই সোপান,
> বাঞ্ছিত পুষ্পের স্তর পার হয়ে পার হয়ে, সবাই
> পরিণত অনুবাহ হয়ে যায় প্রৌঢ় হয়ে যায়,
> কারণ প্রৌঢ়তা মানে পরিণতি। দায়িত্ববিহীন
> বালক বা কবিদের মুখ ব্যবহারে সুকুমারী
> লজ্জা মুখ ঢেকে থাকে। শব্দ নারী। নারী চিরন্তনী,
> সামগ্রিক মুহূর্তের অমোঘ বন্ধারে সেই নারী
> হঠাৎ দণ্ডিতা হয়, সুর তার সমস্ত শরীর,
> স্পর্শাতীত, অতীন্দ্রিয় : শব্দের ইন্দ্রিয় স্পর্শাতীত,
> অতীন্দ্রিয়।
>
> [শাদা মেঘ দাবী করে]

শব্দই কবিতার ভিত্তি, কবিতার যে চিত্র সঙ্গীত ও অর্থ-গুণ তা নিহিত থাকে শব্দেরই মধ্যে। সুতরাং শব্দের শুচিতা-রক্ষা কবির এক প্রাথমিক দায়। যে কবি ব্যবহারে ব্যবহারে ব্যবহারে ক্লিন্নতার অশুচিস্পর্শ থেকে শব্দের পবিত্র নিখাদকে অনুকূল উদ্ধত রাখতে পারেন না তাঁর কবিতার অমরত্বের

পরিহার করে সঙ্গতভম শব্দটির সন্ধানে তাঁরা নিরস্ত হবেন না এই কবির কাছে পাঠকের দাবী, কবিতার দাবী। সম্প্রতিকালে দীর্ঘ কবিতাকে আমরা সন্দেহের চোখে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছি, কয়েক পংক্তি সমন্বিত গীতি কবিতাকেই কবিতার সারাৎসার রূপে গণ্য করি; মনে করি গদ্যের ভেজাল বিনা দীর্ঘ কবিতা হয় না। একথা ঠিক যে অধিকাংশ দীর্ঘ কবিতায় গদ্যের ভেজাল থাকে—কি মিল্টনে, কি মধুসূদনে। কিন্তু ক্ষুদ্রতম কবিতাই শুদ্ধতম কবিতা এই ধারণা অতিরিক্ত প্রশ্রয় পেলে কবিতা হবে এক চরণের বা দুই চরণের, শেষ পর্যন্ত হয়তো মৌনের নিরঞ্জনে। এক এক সময় সন্দেহ হয় ক্ষুদ্রতমই শুদ্ধতম কবিতা এই সূত্রের পরিষার পিছনে আশ্রয় নিয়েছে প্রশ্রয় ও পরিশ্রম-বিমুখতা। আবেগানুভূতিকে, কবিতার প্রতর্ককে দীর্ঘ পংক্তি পর্যায় অতিক্রম করে টেনে নেবার জন্য যে ধৈর্য ধারণ যে পরিশ্রম করতে হয়, সঙ্গত শব্দের সন্ধানে যে অনলস যাদুকরী-বুদ্ধি করতে হয় তাতে কবিরা বুঝি আর প্রস্তুত নন। একটি দীর্ঘ কবিতার জন্য দু বছর সময় ব্যয় অপচয় নয়, সমস্ত জীবন ব্যয় করে কিছু শুদ্ধ অমর পদাবলী রচনা অনেক ভালো। তাই কবিদের অন্য অর্থে মৌনের সাধনা করা চাই। বহু পত্র পত্রিকা প্রকাশের ফলে কবিতা ছাপানো সহজ হয়েছে, কবিরা নিজেরাই যেহেতু কবিতার পত্রিকা ছাপান সেইজন্য প্রচারিত কবির কবিতা প্রত্যাখ্যাত হয় না। যেখেন বহু, ছাপা হয় তৎক্ষণাৎ। ফলে যে অতন্দ্র চেষ্টায় পদ্য কবিতা হয়, প্রতিটি অনাঘ্রাত শব্দকে উৎখাত করা যায়, অভ্যস্ত বাগ্‌ভঙ্গির নাগপাশ থেকে কবিতাকে করা যায় স্বাধীন স্বতন্ত্র, তার অভাবে যার লক্ষ্য ছিল অবয়বের অভিসার, সে নিতান্ত এক দশক আয়ু পেলেই সুখী ও আত্মতৃপ্ত হয়। অবশ্য এই সব ব্যাপারের জন্য এই সংকলনের সম্পাদককে দায়ী করা যায় না, কারণ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই দশকের কাব্যচর্চাকে সংকলনে বিধৃত করা, এবং তা তিনি যথাসাধ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে করেছেন।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও হতাশা অনেকাংশে কেটে যায়, যখন মাঝে মাঝে এই সব পদাবলী পড়ি—

(ক) সুন্দরী, দূতের প্রতি নির্দয় হয়ো না। আগে শোনো তার বার্তা। ঝঞ্ঝা, ঘূর্ণি, ভূমিকম্প, কুটিল কুয়াশা ইত্যাদির ভয়াবহ বর্ণনা সে দেবে না কখনো এ-কথা বলি না; হয়তো সে তার বিপরীত ভাষা ব্যবহার করবে—আর্দ্র বালু, রম্য, মুক্তা, মেখলেশী, শস্যশালী প্রান্তরের উন্মুক্ত অর্থের সমাচার···।

(সম্রাটের দূত—অরবিন্দ গুহ)

(খ) জোড় বেঁধে বহু দূর রাজহংস চলে যায় বিপরীত স্রোতে
নিমেষের দীপ্তি মুছে অন্ধকার নীচে ফের ব্যঞ্জনাবিহীন।
আকর্ষণ ক্ষেত্রে টানে আজনের পুরু এক নক্ষত্র প্রেমিক।

(তারকা-প্রহর—শান্তি কুমার ঘোষ)

(গ) একটি মাত্র পথ। সেই পথে সে এসেছিল।
এবং একটি তরুণ পাখি আলোর চূড়ায় বসেছিল
ঐ বাড়িটির উপর।
নিচে দুয়ার ঘাতাল হলো ধাপাধাপির দুপুর
উড়াল দিল পাখি!
ঘরের দরজা খুলে গেল
দুপুরে সব দূরে গেল
উড়াল দিল পাখি।

(দুপুরের পাখি—শঙ্খ ঘোষ)

(ঘ) রেখেছিলাম পদচ্যুত নূপুরখানি
যখন তুমি চাইবে জানি
অনন্তোপায়—দিতেই হবে
অনুভবে
অবিনশ্বর থাকবে কেবল পা দুখানি।

(স্থায়ী—শক্তি চট্টোপাধ্যায়)

স্বপ্নের সমুদ্র সে কি তরঙ্গের চেউহীন, শব্দহীন, যেন
তিনদিন পরেই আত্মঘাতী হবে, হারানো আংটির মতো
ঘুরে
তোমার দিগন্ত, দুই উরু ডুবে গেছে নীলজলে
তোমাকে হঠাৎ মনে হলো কোনো জুয়াড়ীর সঙ্গিনীর মত,
অথচ একলা ছিলে, ঘোরতর স্বপ্নের ভিতরে তুমি একা।
(হঠাৎ নীরার জন্য—সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়)
বালিতে পাগল পাখি খুঁজে যাচ্ছে খুঁজে যাচ্ছে কী যে ··
(জীবনীর অংশ—শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়)
নৌকোর বাতি জ্বলে, দিক্‌নির্ণয়ের সংকটে সূর্যের শেষ
পরিশ্রম নিতে গেছে ; কেননা বয়স
ক্রমে অবলুপ্তি ভালোবাসে, চায় অস্তিত্বহীনতা।
(নোঙর নৌকো—সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত)

এর কটি মনলা-বনেও কবিতা যে জীবিত এমন স্তবক
ক্তিগুলি তার প্রমাণ। এগুলির মধ্যেই আশা। কোনো
ই অন্তত ভালো কবিতা লেখা হয় না, এই দশকেও লেখা
নি তাতে দুঃখ নেই ; দুঃখ এইখানে যে যথেষ্ট আত্ম-
জনের বিনিময়ে আরো কিছু কবিতাকে হয়তো আও
গ্রাসের থেকে উদ্ধার করা যেতো। সংশয়, আত্মপীড়া,
নিক সত্তাতার অন্তর্তাপের মধ্যে পৃথিবীর এক কোণে,
যেতে, পুরধার কালের এক দশকে কিছু কবিতার যে
-ফসল ফলেছে তার সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেবার জন্য
প্রকাশের উদ্যোক্তাদের ধন্যবাদ প্রাপ্য।

অনিল ব্যানার্জীর
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"…সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" … (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন

"… নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সুজাবাদের
টমসন্ সাহেব

মিহির মুখোপাধ্যায়

আমরা ছুটে পালাচ্ছি। আমরা সাতজন। আমি, লিচু, সুদর্শী, পল্টু, গোবিন্দ। বিনোদ আর বলরাম কোথায় ছিটকে পড়েছে খেয়াল নেই। উঁচু-নিচু জমির উপর দিয়ে, ছোট ছোট ঝোপঝাড় ভেঙে প্রাণপণে ছুটছি। পেছনে পাগলা টমসন সাহেব তাড়া করেছে। মাটির ঢেলা আর ইটের টুকরো ছুঁড়ছে। আমাদের কারো কারো হাতে হাড়ি, কড়াই, হাতা। আমরা বনভোজন খেতে এসেছিলাম। বনভোজন মাথায় উঠেছে। এখন পালাতে পারলে বাঁচি।

লিচু আবার বললো—পালাচ্ছি কেন, আমরা এতগুলো ছেলে, একবার ঘুরে দাঁড়াই না, ও একা কি করবে। পেতলের মস্ত হাতাটা তুলে মাথার ওপর ঘোরাল একবার। লিচুটা বরাবরের গোঁয়ার।

গোবিন্দর হাতে ভারি লোহার কড়াই, একটু থেমে বললো—দাঁড়াই না, কি হবে? সঙ্গে সঙ্গে মস্ত একটা ঢেলা পড়ল পায়ের কাছে। আর কি হবে। ছুট ছুট। ছুটতে ছুটতে গজগজ করলো লিচু—দেখে নেব শালা, যাবেনা আবার চকবাজারে মুরগী বেচতে।

—আরে দেখিস তুই পরে—হাঁফাতে হাঁফাতে বললো পল্টু—এখন ভাখ নৌকো পাই কি না। আমাদের লক্ষ্য কালিন্দিয়া নদীর খেয়াঘাট। নদী আমাদের বাঁ পাশে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই আছে।

কিন্তু খেয়াঘাট কিছুটা ঘুরে। পেছনে টমসন সাহেব ভাঙা গলায় ইংরেজি-হিন্দী মিশিয়ে গাল দিচ্ছে।

চকবাজারে যাবেন খলিফার দোকানের সামনে মস্ত বোয়াকের একপাশে ভাঙাচুরা চেয়ার পেতে বসে থাকত টমসন সাহেব। বসে বসে ইংরেজি খবরের কাগজ পড়তো। চোখে চাঁদির চশমা, নাকের ডগায় ঝুলে পড়েছে। মুখে একটা পাইপ আর পক্ষম জর্জের মতো দাড়ি। চুলদাড়ি সব সাদা। গায়ে পেল্লির উপর তালিমারা ছাইছাই রঙের কোট, খাকি রঙের প্যান্ট। কখনো গরমের জন্য কোটটা চেয়ারের পেছনে ঝুলিয়ে রাখত। বসে বসে ঘামতো টমসন সাহেব আর আবদুল মিঞা পাশে দাঁড়িয়ে হাতপাখা নেড়ে হাওয়া দিত, মাছি তাড়াত। সাহেবের পাশে ডিমের ঝুড়ি, গোটা দুই মুরগীর খাঁচা। সাহেবের পোলট্রি আছে। খুব ভাল জাতের বড় বড় মুরগী, ডিমও হয় প্রচুর। সপ্তাহে তিনদিন, সোম বুধ শনি, শহরের বাজারে আসে সাহেব ডিম আর মুরগী বেচতে। সেই কথাই বলছিল লিচু। শহরের বাজারে আবার যখন দেখা হবে, তখন বোঝাপড়া করব। আমরা ছুটতে ছুটতে জেলাবোর্ডের মাঝ রাস্তায় উঠে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম। আর ভয় নেই। আমাদের অনেক পেছনে অনেকখানি জায়গা জুড়ে উঁচু মাটির ঢিবি। পুরনো ইট আর পাথরের দেওয়াল। মস্ত বটগাছ একটা সেই ঢিবির অনেকটা জুড়ে। কচু, ভাট, আগাছার জঙ্গল।

শাহজাদা সুজার দুর্গ। দশ আর পর্তুগীজ জলদস্যুদের বাধা দেবার জন্য কালিন্দিয়া নদীর পারে এই দুর্গ বানিয়েছিলেন সম্রাট শাজাহানের মেজছেলে সুজা।

শাহজাদা সুজার নামে এই গাঁয়ের নাম সুজাবাদ। আমাদের জেলাশহর থেকে মাইল পাঁচেক দূর। ছোটবেলা থেকে অনেক অনেক গল্প শুনেছি আমরা। এই দুর্গের অনেকটাই মাটির নিচে। সেখানে এক গোপন জায়গায় নাকি সুজার ধনভাণ্ডার। ছোট ভাই আওরঙ্গজেবের সঙ্গে যুদ্ধে হেরে পালিয়ে যাবার সময় সুজা নাকি এখানে এসে টাকাকড়ি ধনদৌলত সব লুকিয়ে রেখেছিলেন। এখান থেকে পালালেন মুঙ্গিরের পথে। ইচ্ছে ছিল আবার ফিরে এসে সব উদ্ধার করবেন। ধনদৌলত, রাজ্য, মসনদ। কিন্তু সুজা আর ফিরে আসেননি, ফিরতে পারেননি।

সুজার সাঙ্গোপাঙ্গরা কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছিল, গা ঢাকা দিয়েছিল হদিশ নেই। দুর্গটা প'ড়ে রইল। কেউ আর এল না। আওরঙ্গজেবের লোকজনেরও কোন খোঁজ খবর নিল না। তারপর অনেক নবাব, অনেক নায়েব, অনেক নায়েব-নাজিম, অনেক সুবাদার ফৌজদার বাংলা দেশে এসেছে, চলে গেছে।

কিন্তু কেউ আর এ দুর্গটার খোঁজখবর করেনি। ঢাকা, মুর্শিদাবাদ, কলকাতা। বাংলাদেশের রাজধানীগুলি এখান থেকে অনেকদূরে। সেসব জায়গায় অনেক ধনদৌলত, অনেক লোভ, অনেক হত্যা আর ষড়যন্ত্র।

সে সব ছেড়ে এতদূরে এই ভাঙা দুর্গটার দখল নিতে কেউ আসেনি। দুর্গটা আগাছার জঙ্গলে ভরে উঠল। সাপ-শেয়াল-ভোঁদর-চামচিকার আস্তানা হল। এদেশের নরম সোনা মাটিতে কোন কিছুই বেশিদিন খাড়া থাকে না। আস্তে আস্তে মাটির নিচে ঝরে যায়, ইটগুলো সোনার ঘরে নষ্ট হয়। মাটির নিচে যেসব গোপন ঘর ছিল, সেগুলো একেবারে চাপা পড়ে গেল। তারপর ছিল কালিন্দিয়া নদীর তাজন। দুর্গের উত্তরে নদী। একেবারে নদীর কিনারা ঘেঁষে দুর্গের দেয়াল উঠেছিল। সেদিকের অনেকটা ভেঙে গেছে। সেই ভাঙা দিকটা থেকে কেউ কেউ নাকি সোনাদানা পেয়েছে।

রতনপুরের বিশ্বাসরা তো বড়লোক হয়ে গেল। এসব গল্প আমরা ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি। আমাদের বয়স তখন তেরো-চোদ্দ-পনেরোর ঘরে। ক্লাস নাইন-টেনের ছাত্র আমরা। এ্যাডভেঞ্চারের বই পড়ে পড়ে আমাদের রক্ত গরম। গুপ্তধন খুঁজে বার করব।

আমরা সাতজন। কোন্ সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিলাম ধনভোজনের নাম করে। এখন বেলা দুপুর গড়িয়ে গেছে। শীতের বেলা। আমরা জেলাবোর্ডের রাস্তায় হাঁটছি। তুলসীর পায়ের নখ উড়ে গেছে। রাস্তার পাশে শীতের ঝরা ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটছে তুলসী। কোঁচা কোঁচা রক্তের দাগ। পল্টুর জামাটা ছিঁড়ে গেছে। ভারি কড়াইটা হাতে ঝুলিয়ে একটু খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে হাঁটছে গোবিন্দ। ছুটোছুটিতে হাঁফিয়ে পড়েছে। এমনিতেই ওর পায়ে দোষ আছে। কয়েক বছর আগে খেজুরগাছ থেকে কাঁটা ঘুড়ি নামাতে গিয়ে পড়ে গিয়েছিল। বাঁ-পায়ের হাড় ভেঙেছিল। ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলে বললো—কাওয়ার্ড তোরা সব, ভীতুর দল, বুড়ো লোকটার ভয়ে পালিয়ে এলি।

লিচু চেঁচিয়ে বললো—আমি পালাইনি, তোরা সবাই দৌড় দিলি কেন?

—আরে ধ্যাৎ তুই—পল্টু ধমকে উঠল—খুব বোঝা গেছে কার কত সাহস।

গোবিন্দ বললো—বিনোদটার মুখে যত ঘুষিতুষি, সবার আগে দৌড় দিয়েছে—

—বলরাম আবার একটা ভোজালি এনেছিল—তুলসী খোঁড়াতে খোঁড়াতে বললো—সাহস না থাকলে শুধু ভোজালি হাতে লম্বা লম্বা কথা বললেই হয় নাকি—

গুপ্তধন খুঁজতে গেলে সাহসের দরকার। চন্দন সাহেবের রুদ্রমূর্তি দেখে আমরা কেমন ভয় পেয়ে পালিয়ে

এসব। সাহস না থাকলে এসব হয় না। সাহস ছিল বটে রতনপুরের দিগম্বর বিশ্বাসের।

রতনপুরের বিশ্বাসরা তিনভাই। লোকে বলত পাঠা-বেচা বিশ্বাস। পাঠা-খাসির ব্যবসা ছিল। নৌকোয় করে পাঠা-খাসি নিয়ে গ্রামে গ্রামে হাটে-বাজারে বেচতে যেতো।

একবার নৌকো ভর্তি এককুড়ি পাঠা নিয়ে যাচ্ছিল তিনভাই। কালিন্দিয়া নদীর প্রবল স্রোত। আগের দিন খুব ঝড়-বৃষ্টি গেছে। আকাশ মেঘলা। নদীর কিনারা ঘেঁষে নৌকো যাচ্ছে। হাল ধরে আছে দিগম্বর বিশ্বাস। রোজ সকালে ঘুরঘুড়ি খেয়ে বেরোয় তিনভাই। আজ ঘুর খাওয়া হয়নি।

রোজ দুধের যোগান দেয় যে নরহরি ঘোষ, সে আজ দুধ নিয়ে যায় নি। এদিকে বেলা হয়ে যাচ্ছে দেখে কোচড় ভর্তি মুড়ি নিয়ে বেরিয়েছিল তিনভাই। হঠাৎ নজরে পড়লো, নদীর পাড় ধরে আসছে নরহরি, মাথায় দুধের কলসী। বড় ভাই দিগম্বর বিশ্বাস ডাক দিল—এই নরু, আজ দেরি হ'ল কেন?

ডাক শুনে যেন চমকে উঠল নরহরি। কোন জবাব না দিয়ে ওদের ছাড়িয়ে হনহন করে চলে গেল উল্টো দিকে।

আরে এই নরু, কথা বলছিস না যে বড়—আবার হাঁক দিল দিগম্বর।

কিন্তু কার কথা কে শোনে ঘোষের পো তখন লম্বা লম্বা পা ফেলে যাচ্ছে। চোখের আড়াল হ'লে বলে। ব্যাপার সুবিধের নয়, কিছু একটা হয়েছে। দিগম্বর বিশ্বাস নৌকো ভেড়াল। ভাইদের বললো—"এই শিবু, এই নীলু, ধর দেখি ব্যাটাকে।" অন্য দুই ভাই পীতাম্বর আর নীলাম্বর। নৌকো থেকে লাফিয়ে নামল।

নরহরি ঘোষ তখন ছুটতে শুরু করেছে, মাথায় দুধের কলসী। মেঘলা আকাশ, শনশন হাওয়া বইছে। কাছে পিঠে জনমানব নেই। মাটির কাঁচা রাস্তার একপাশে নদী, আরেক পাশে ধানক্ষেত। ঘোষের পো রাস্তা ছেড়ে ক্ষেতের মধ্যে নেমেছে। ক্ষেতের আল ধরে জল কাদার মধ্যে ছুটছে। কিন্তু বেশি দূর যেতে পারল না। পীতাম্বর আর নীলাম্বর চেপে ধরল—কিরে পালাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে?

নরহরির মুখ শুকিয়ে গেছে। রোগা মানুষটা থরথর করে কাঁপছে, শুধু বলছে—আমায় ছেড়ে দেন গো বাবু, আমায়—টানতে টানতে নৌকোর কাছে নিয়ে এল। মাথার কলসীটা টেনে নামাল। ভীষণ ভারী লাগছে মুখে আবার গামছা-বাঁধা।

—কি আছে এতে, খোল্ শালা, খুলে ভাখা—বলতে বলতে দিগম্বর বিশ্বাস নিজেই গামছা খুলে কলসীটা নদীর পাড়ে কাদার মধ্যে কাত করে ফেললো। তিন ভাইএর চোখ কপালে উঠে গেল। কলসী থেকে বেরোচ্ছে সোনা আর রুপোর টাকা। সোনার টাকাই বেশি, যার নাম মোহর। নরহরি কাদার মধ্যে বসে পড়েছে। নীলাম্বর তার গলা টিপে ধরে বলছে—কোথায় পেলি এসব বল্, সত্যি কথা বলবি। নরহরি কাঁপতে কাঁপতে জড়িয়ে জড়িয়ে সব বললো। দুর্গাবাড়ির একবাড়ি দুধের যোগান দিয়ে রতনপুর যাচ্ছিল সে। ভাঙা দুর্গের পাশ দিয়ে রাস্তা। রাস্তাটা ঘুরে এসেছে নদীর পারে। কাল রাতের ঝড়-বৃষ্টিতে নদী ফুলে উঠে দু' কূল হয়েছে। দুর্গের পাশ আরো খানিকটা ভেঙেছে। সকাল থেকে পেট কামড়াচ্ছিল নরহরির। পেট খোলসা করার জন্য রাস্তা থেকে নেমে এল নদীর পারে। দুর্গের সেই ভাঙা জায়গাটার কাছাকাছি নেমেছিল। দুধের কলসী নামিয়ে রেখে সুবিধে মত একটা জায়গা দেখে বসেছিল। হঠাৎ নজরে পড়ল, ভাঙা পাথরের দেয়ালের গায়ে একটা ফাটল। সেই ফাটল দিয়ে সোনা রুপোর টাকা গড়িয়ে পড়ছে নদীর জলে। কিছু কিছু জলের কিনারায় ভাঙা ইট পাথরের ওপরও পড়ে আছে। কলসীর দুধ ফেলে ফেলে, যতটা পারলো মুড়িয়ে নিয়ে বাড়ি ফিরছিল নরহরি।

ইচ্ছে ছিল লোহার একটা শাবল নিয়ে আ
দিন। এদিকটায় জনমানব কেউ নেই।

বিশ্বাসরা তিনভাই পাঠাগুলি সব ছেড়ে দিয়ে ঘোরর-ভর্তি ধলদী আর নয়হরিকে নিয়ে নৌকোয় উঠল। তারপর সেই ফাটলের নিচে নৌকো নিয়ে গেল। খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে সেই ফাটলের ভেতর থেকে সোনা রুপোর টাকা বার করে নৌকো বোঝাই করল। অল্প জলে ডুবে ডুবে ঘটটা পারল তুলে আনল। কাপড়-গামছা কচুপাতা দিয়ে টাকার রাশি ঢেকে নিয়ে বাড়ি ফিরে এল। নয়হরি ঘোষের কি হ'ল কেউ জানে না।

লোকে বলে, বিশ্বাসরা তিনভাই তাকে খুন করে গলায় পাথর বেঁধে কালিন্দিয়া নদীর প্রবল স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল। বিশ্বাসদের সাহস ছিল। না'হলে দিন-দুপুরে খুন করা সহজ ব্যাপার নয়। যদিও ঝড় বৃষ্টির দিন, নির্জন নদীর তীরে কাছাকাছি কোন লোকজনের বাস নেই। তবু সাহস না থাকলে বিশ্বাসরা বড়লোক হতে পারত না।

আমরা অতই রবিন হুড্, ট্রেজার আইল্যাণ্ড, আর মন্টি-ক্রিস্টোর গল্প পড়ে পড়ে রক্ত গরম করিনা কেন, আসল কথা আমাদের সাহস নেই। না'হলে আমরা সাতজন, সাতটা জোয়ান ছেলে টমসন সাহেবের নাম শুনে পালিয়ে এলাম কেন। টমসন সাহেবেরও সাহস আছে। বয়স হয়েছে ষোলোর আশীর ওপর। এই বুড়ো বয়সে চাকরি থেকে অবসর নেবার পর বিলেতের কোন মুলুক, সেই নিজের দেশে ফিরে না গিয়ে এই মুলাবাদের মত একটা অজ-পাড়াগাঁয়ে একটা ভাঙা দুর্গ আগলে পড়ে আছে। সাহস না থাকলে এসব পারে কেউ। দুর্গের জমিটা নাকি ইজারা নিয়েছিল টমসন সাহেব। নিরানব্বই বছরের মেয়াদ। ওই আবদুস মিঞার ঠাকুর্দার কাছ থেকে ইজারা নিয়েছিল। তাও তো প্রায় পঁচিশ বছর হয়ে গেল। আমাদের জন্মের আগে থেকে টমসন সাহেব ওখানে আছে।

যখন খলিফার দোকানে যেতাম আমরা জামা-প্যাণ্ট বানাবার জন্য। খুব কাছে দাঁড়িয়ে টমসন সাহেবকে দেখ-তাম। আমাদের ছোটবেলায় অত কাছে দাঁড়িয়ে সাহেব দেখা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার ছিল।

বিনোদ সব ব্যাপারে মোড়লী করত। সেই প্রথম আলাপ করেছিল সাহেবের সঙ্গে। সাহেব বেশ বাংলা বুঝত, বলতেও পারত। তার উচ্চারণ শুনে কিন্তু হাসতুম আমরা।

—অবশ্য যাবে টোমরা, পিকনিক্ করটে যাবে, হামি তোমাদের মুরগী ডেব, ডিম ডেব।—

সাহেব আমাদের খুব উৎসাহ দিয়ে যেতে বলেছিল, বনভোজন করবার জন্য।

খুব সকালে বেরিয়েছিলাম আমরা সাতজন। কিছু হাড়ি কড়াই, তেল নুন চাল ডাল নিয়েছিলাম। সাহেব আমাদের সঙ্গায় মুরগী দেবে। কালিন্দিয়া নদীর কিনারায় পাহাড়ের পুরনো দুর্গের কাছে আমরা বনভোজন করব। সারাদিন থাকব সেখানে। দুর্গটা ঘুরে ঘুরে দেখব। জেলাবোর্ডের রাস্তা ধরে কালিন্দিয়া নদীর খেয়াঘাটে আমরা হেঁটে এলাম। তখন বেশ রোদ উঠেছে। খেয়াপার হয়ে আবার কিছুদূর হাটতে হল। তারপর জেলাবোর্ডের পাকা রাস্তা ছেড়ে কাঁচা রাস্তায় গ্রামের দিকে এলাম। লাল টালি-ঢাকা বাংলো ধরনের একতলা ছোট বাড়ি টমসন সাহেবের। পাশে অনেকটা জায়গা জুড়ে হাঁস-মুরগীর খোঁয়াড়। দুটো গরুও আছে দেখলাম। প্রথমটায় আমাদের খুব সমাদর করেছিল সাহেব। সঙ্গায় তিনটে মুরগী দিয়েছিল। নিজেই সঙ্গে করে ঘুরে ঘুরে দেখাল। দুর্গের কোনদিকে কি ছিল। দেখে কিছু বোঝার উপায় নেই। ভয়ানক জঙ্গল। গাছপালায় সব ঢেকে আছে। মাঝামাঝি এই বিশাল ঝুরি নামানো বটগাছ। ঝোপ জঙ্গলের বন্য দিয়ে সরু পায়ে চলা পথে আমরা দুর্গের মধ্যে ঢুকলাম। চারদিকে ভাঙা দেয়াল।

একটা পুরনো কামান দেখলাম, বটগাছেরমুড়ির মধ্যে আটকে আছে। আর একটা কামান টমসন সাহেব তার বাড়ির সামনে একটা ইটের বেদীর ওপর এনে শুইয়ে রেখেছে। গাঁয়ের বৌ-ঝিরা সেটার গায়ে তেল সিঁদুর মাখিয়ে রেখেছে। এক জায়গায় দেখলাম একটা সুড়ঙ্গের মুখ। কয়েকটা সিঁড়ির পরেই শক্ত কাঠের দরজা। দরজার গায়ে লোহার কারুকাজ, মস্ত মুটো। দরজা ধরে বোধহয় বাড়ির নিচের ঘরগুলোয় যাওয়া যেত। সেখানে সুজার সোনা ধনভাণ্ডার। সাহেবের মুখে শুনলাম, ভেতরে নাকি বেশিদূর যাওয়া যায় না। ইট পাথর জমে সুড়ঙ্গের মুখ বন্ধ হয়ে গেছে। সাহেবের ইচ্ছে ছিল, লোকজন এনে সমস্ত জায়গাটা খুঁড়ে সব বার করে। তার ধারণা ছিল, সুজার সেই জীবনের কিছু পরিচয় উদ্ধার করা যেতে পারে। কিন্তু সাহেবের বয়স হয়ে গেছে, টাকার জোরও নেই। এসব কাজে অনেক লোক দরকার। মাসের পর মাস সময় লাগবে। অনেক টাকা না হলে, অনেক লোক না হলে এসব হবে না। সাহেবের সে টাকা নেই, বয়স নেই। তবু ইতিহাসের নতুন কোন পরিচয় উদ্ধারের আশায় বছরের পর বছর এই ভাঙা দুর্গ আগলে পড়ে আছে সাহেব। সরকারী প্রত্নতত্ত্বের বিভাগেও অনেক লেখালেখি করে কোন কাজ হয়নি। হবে কি করে?

ইউরোপে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেছে। প্রায় গোটা ইউরোপ হিটলারের দখলে। লণ্ডনের ওপর শিলাবৃষ্টির মত বোমা পড়ছে। সরকারি কর্তারা এখন ব্যস্ত। দু'চার লাইনে দুঃখ প্রকাশ করে এসব কাজের এখন সময় নেই বলে চিঠি দিয়েছে তারা। সেই সব চিঠি আমরা দেখলাম সাহেবের দপ্তরে। আরো দেখলাম কয়েকটা সোনারুপোর টাকা, মরচে ধরা চাল-তলোয়ার, বল্লম। যাদুঘরের মতো সাজানো রয়েছে সাহেবের বসবার ঘরে। জঙ্গলের ভেতর সাহেবের সঙ্গে সঙ্গে অনেক ঘুরলাম আমরা। ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম। সাহেব শুধু বলে—কাম অন্, কাম অন বয়েজ, ইট আর সো ইজি, অলমোস্ট প্লেনট্ হোয়ে কেন, এই দেখো এখানে সেন্ট্রি চেকিট, এখানে কামান রাখা হোতো।

কোথায় কামান রাখা হত আর কোথায় সান্ত্রী দাঁড়াত—সব ঘুরে ঘুরে দেখাল সাহেব। জঙ্গলে সাপের ভয়। সাহেবের হাতে মোটা একটা রুপো বাঁধান লাঠি। সেই লাঠি দিয়ে ঝোপের গায়ে পিটিয়ে পথ পরিষ্কার করে আগে আগে যাচ্ছে সাহেব আর বিড়বিড় করে কি যেন বলছে। এক একবার একটু থেমে লাঠি তুলে এক একটা জায়গা দেখিয়ে পরিচয় দিচ্ছে সাহেব। যেতে যেতে একবার বললো—রিভারসাইডে, যাচ্ছি আমরা, ঘাটে যাবার আণ্ডারগ্রাউণ্ড আউটলেট ছিল, এখন নাই।—সাহেব নিজের মনেই বকে যাচ্ছে—কটো রকমের নৌকা ছিল, ছিপ, কোষ, ঘুরাব, ঘুরাব কাহাকে বলে জানো?—সাহেবের কথায় মাথা নাড়লাম আমরা।

পল্টু ফিস্ ফিস্ করে বললো—ব্যাটার মাথা খারাপ আছে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আমাদের?

সাহেব নিজেই বুঝিয়ে দিল। ঘুরাব হ'ল একরকম যুদ্ধের নৌকো, ছোট ছোট কামান থাকত তাতে। নদী-নালার পথে পাহারা দিত সেইসব যুদ্ধের নৌকো। কালিন্দিয়া নদীর কিনারায় এসে দাঁড়ালাম আমরা। দুর্গের এদিকটা ভেঙে গেছে।

প্রায় কুড়ি বাইশ হাত নিচে প্রবল নদীর স্রোত। বড় বড় পাথরের চাঁই, ইটের স্তূপ। একটু একটু করে দুর্গটা গ্রাস করছে নদী।

আমরা উঁচু জমির ওপর দাঁড়িয়ে আছি। দশবারো হাত নিচে বড়বড় ফাটল। ওইরকম একটা ফাটলের মধ্য থেকে টাকা পেয়েছিল বিশ্বম্ভর বিশ্বাস। এই স্রোতের মধ্যে নৌকো নিয়ে দুর্গের তলায় এসেছিল বিশ্বাসরা তিনভাই। নৌকোয় সোনা বোঝাই করে ফিরে গিয়েছিল। যাবার আগে

হতভাগা নক্ষ ঘোষকে খুন করে ওই স্রোতের মধ্যে ফেলে দিয়েছিল।

মুখ নিচু করে স্রোতের দিকে তাকিয়েছিল টমসন সাহেব। মুখে দুশ্চিন্তা, বিষাদ আর বয়সের রেখা। খাকি হাফপ্যান্ট, শেভি, পায়ে কেড্‌স, চোখে সেই চাঁদির চশমা। হাতের লাঠিটা দিয়ে মাটি ঠুকে ঠুকে দেখছিল সাহেব। তার সমস্ত আশা, পরিশ্রম, ধৈর্য—সব নষ্ট করে দেবে এই নদী, নদীর স্রোত। বিড়বিড় করে নদীকে গাল দিচ্ছিল সাহেব। কয়েকটা মাটির ঢেলা আর ইটের টুকরো জোরে জোরে নদীর দিকে ছুঁড়ে দিল। হাওয়ায় সাহেবের চুল উড়ছে, মাথার ওপর দুপুরের রোদ। এই শীতের দিনেও ঘামছিল সাহেব। ক্যাপার মতো গাল দিতে দিতে নদীর কিনারায় পায়চারী করতে লাগলো। মাঝে মাঝে নদীর জলে ঢিল ছুড়তে লাগলো।

পল্টু বললো—পাগলা সাহেব একেবারে ক্ষেপে গেছে, চল পালাই।

বলরাম বললো—না পালাবো না, ওই ঘরজার তালা ভেঙে দেখবো ভেতরে কি আছে—

ভোজালী দিয়ে টিনটে মুরগী কেটে বলরামের রক্ত গরম। বিনোদ আর নিচুও সায় দিল।

বিনোদ বললো "আমার মনে হয়, ওই ঘরজার ভেতর সুরঙ্গটা দিয়ে গুপ্তধনের ঘরে যাওয়া যাবে।"

বিনোদের হাতে একটা লোহার শাবল। বনভোজনের উনুন খোঁড়ার জন্য আবদুল মিঞার কাছ থেকে শাবলটা আনা হয়েছিল।

বিনোদ, বলরাম, নিচু—তিন মূর্তি আগে আগে চললো। আমি আর পল্টু পেছন পেছন। গোবিন্দ আর তুলসী তখন দুর্গের বাইরে একটা সজনে গাছের নিচে রান্নার আয়োজনে ব্যস্ত ছিল। টমসন সাহেব আমাদের চলে আসা লক্ষ্য করেনি। তখনো সে আপনমনে নদীর কিনারায় পায়চারী করছিল আর বিড়বিড় করে বকছিল।

আমরা একরকম পালিয়ে এলাম। পালিয়ে এসে সেই বড় দরজাটার সামনে দাঁড়ালাম।

বিনোদ লোহার শাবল দিয়ে তালার ওপর ঘা মারতে লাগলো। মুরলীর রক্তমাখা ভোজালী হাতে বলরাম আর পেতলের বড় হাতা নিয়ে নিচু ঠিক পাশেই দাঁড়িয়েছিল। পল্টুর পাশে একটু পেছনে ছিলাম আমি। বিনোদ এক একবার তালার ওপর ঘা মারে, আর আমার বুকের ভেতর যেন সেই ঘা মারার শব্দ হতে থাকে। হঠাৎ পেছন থেকে টমসন সাহেবের চিৎকার শুনলাম—এই বাচ্চা বদমাস্, হোআট্‌স্ আপ্, ব্রাডি, সোয়াইন, শুয়ার কি—

চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ল সাহেব। বড় বড় চিল পড়ছে। আমরা দিশেহারার মতো কোপ জঙ্গল ভেঙে ছুটলাম। দুর্গের বাইরে এসে সজনেতলা থেকে গোবিন্দ আর তুলসীকে ডেকে নিলাম। ওরা ব্যাপারটা ভাল করে না বুঝেই ভয় পেয়ে আমাদের সঙ্গে ছুটতে লাগলো। তুলসীর হাতে পেতলের হাড়ি, গোবিন্দর হাতে লোহার কড়াই। চাল, ডাল-মাংস—সব সজনেতলায় পড়ে রইল। খেয়াঘাটের কাছে এসে দেখি বিনোদ আর বলরাম আগেই অন্যপথে এসে গেছে।

বিনোদ তার স্বভাবমত হাত ডাক শুরু করল—তোদের নিয়ে কোন কাজ হয় না, ভীতুর দল সব, ভয় পেয়ে পালিয়ে এলি—

—থাক্ থাক্ খুব হয়েছে,— পল্টু থামিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করল—আবদুল মিঞার শাবল ফেললি কোথায়?

মনে নেই বিনোদের, কোন কোপের মধ্যে শাবলটা ফেলে পালিয়ে এসেছে খেয়াল নেই।

আমরা সাতজন। ঘাটের কাছে এক মুদি দোকান থেকে মুড়ি-বাতাসা কিনে চিবুতে চিবুতে খেয়া নৌকোয় উঠলাম। তখন শীতের দুপুর ফুরিয়ে কালিন্দিয়া নদীর জলে বিকেল ঘরে আসছিল।

পুস্তক পরিচয়

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ অমিয়া মুখোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। সাড়ে তিন টাকা।

ভিক্টোরীয় আদর্শে স্ত্রী-স্বাধীনতা স্ত্রী-ভোটাধিকার কথা-গুলি আজ প্রায় ইতিহাস হতে চলেছে, ইতিহাসের উপকথা, ইতিহাসের মত সুদূর। এমন কি নারীকে আপন ভাগ্য জয় করবার রবীন্দ্রোক্ত বাণীও আজ কিছু নতুন শোনায় না; তবু আমরা আমি না আমাদের মনাতনী বিবেক তার আত্ম-স্থরিতা কতখানি বিসর্জন দিতে পেরেছে—রামমোহন-বিদ্যাসাগর-রবীন্দ্রনাথের নারীকল্যাণ-সম্পর্কিত চিন্তাগুলি কতখানি আত্মগত করেছে। সে গেল একদিক। অন্যদিকে নারীদের চিন্তা কী তা যেমন সুদূর প্রাগাকলে মহিলা সমিতি-গুলির মধ্যে স্পষ্ট, তেমনি স্পষ্ট এযুগের মহামানব রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের সংস্পর্শে, তাঁর স্নেহধন্য প্রকাশমুখরতায়।

বইখানির পরিকল্পনা আকর্ষণীয় সেই দিক থেকে। শিক্ষক-কর্মী ইত্যাদি নানালোকের সঙ্গে দিনেদিনে রবীন্দ্রনাথের যে আত্মিক পরিবার গড়ে উঠেছিল শান্তিনিকেতনের আদিযুগে সেই জীবনেরই সহজ সরল নিরাভরণ প্রকাশ ঘটেছে সেই সব শিক্ষক-কর্মীদের স্ত্রীদের মুখের ভাষায়, শিক্ষিকাদের কথায়, নিকট আত্মীয়াদের বক্তব্যে। লেখিকা অতি অল্পের সঙ্গে সে-যুগের শান্তিনিকেতনের বহু মহিলার রবীন্দ্রসম্পর্কিত স্মৃতিগুলি লিপিবদ্ধ করেছেন, যার ফলে কিছু বিশিষ্ট সম্পদ বিস্মৃতির অতল থেকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। রবীন্দ্রস্মৃতিচারণ-গ্রন্থগুলির মধ্যে এ বইটি অনন্য সংযোজন। শান্তিনিকেতনে স্ত্রীশিক্ষার আদিযুগ থেকে আরম্ভ করে নারীশিল্পী ইত্যাদি আবিষ্কারের অনেক স্মৃতিচারণই এই বইয়ের পাতায় পাতায়। মেয়েরা নকল ডাকাত সেজে মেয়ে-বাসিন্দাদের মনে একদা রাত্রে যে কৌতুককর আতঙ্কের সৃষ্টি করেছিল সেকথা একজন বলেছেন। তেমনি আছে বহু মহিলার হাতের রান্না খেয়ে রবীন্দ্রনাথের সাধুবাদ। স্বর্ণীয়া বসু, প্রতিমা ঠাকুর, ইন্দিরা চৌধুরানী প্রমুখ বহু জনের স্মৃতিকথা বিধৃত হয়েছে, এবং কোথাও সেই মূল চরিত্রটি আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না—সেটি রবীন্দ্রনাথ নিজে। মহামানবের বৈশিষ্ট্য যে তার মানবিক-তাতেই, অলৌকিকতায় নয় একথা বারবার মনে পড়বে এই গ্রন্থপাঠে। ছোটখাট কত ঘটনায় মানুষ রবীন্দ্রনাথের মানবিক গুণটি এত বেশি ফুটে উঠেছে যে সেটা যে মহামানবেরই গুণ তা আমাদের চিনে নিতে ভুল হয় না। মানুষের মত আচরণ যে কত শক্ত আচরণ তা বহুত মহামানবেরাই তাঁদের সকল দৃষ্টান্তের মাধ্যমে আমাদের বুঝিয়ে গেন।

পরবর্তী সংস্করণে যদি সম্ভব হয় বিদেশী মহিলাদের রবীন্দ্রস্মৃতিচারণকথা সন্নিবেশের প্রস্তাব করছি। বইটির ভাষা স্মৃতিকথার উপযোগী সহজ ও সুন্দর। স্মৃতিপ্রকল্পের মধ্যে নির্মলকুমারী মহলানবিশের অনুপস্থিতি চোখে লাগলো। এতদ্সত্ত্বেও আমরা এরকম বইয়ের পরিকল্পনার জন্যে সাধুবাদ জানাই।

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

ইংরেজী সাহিত্য পরিচয় : ডক্টর অরবিন্দ পোদ্দার। ইণ্ডিয়ানা ২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২, দাম ৮·০০

বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের মূল্যায়ন পর্ব লিপিবদ্ধ

করা এবং ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাস বাঙালী সাধারণ পাঠকগোষ্ঠীর গোচরীভূত করবার উদ্যোগ যে কত দুরূহ ব্যাপার ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই তা সুবিদিত। প্রায় হাজার বছরেরও অধিককাল ধরে যে সাহিত্যের ধারা অফুরন্ত লীলায় নিরন্তর নির্ঝরের মতই প্রবাহিত, বাংলা অক্ষরের সংক্ষিপ্ত পরিসরের মধ্যে তার পরিচয় বিধৃত করবার দায়িত্ব অত্যধিক। তবু, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস অধ্যয়নের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায় ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসের ও কিছুটা জ্ঞান সাধারণ ইংরেজি সাহিত্যে অনভিজ্ঞ পাঠকসমাজও অর্জন করবেন এটাই যদি অভিপ্রেত হয়ে থাকে তাহলে দুরূহ চেষ্টার সাফল্যের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে সন্দেহ থাকলেও বিরত হওয়ার উপায় থাকে না।

সুখের বিষয় 'ইংরেজী সাহিত্য পরিচয়' ইংরেজি ভাষায় অপারগ, বাংলা সাহিত্যে অমনোযোগী, একদল ছাত্র ছাত্রীর উদ্দেশে নিবেদিত সহজপাচ্য গ্রন্থ নয়; ইংরেজি সাহিত্যের বিভিন্ন যুগের বিশদ আলোচনা ও মূল্যায়নের মাধ্যমে একটি ব্যাপক উপলব্ধির দিকে পাঠক মনকে নিয়ে যাওয়া সম্ভবপর হয়েছে বলেই বইটির সপ্রশংস উল্লেখ অপরিহার্য। নিছক সন-তারিখে কণ্টকিত, শুষ্ক ও সংক্ষিপ্ত নামোল্লেখে পীড়িত সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের পাতায় অনেক ক্ষেত্রেই যে সপ্রাণ প্রয়াস নজরে পড়ে শ্রীঅরবিন্দ পোদ্দারের 'ইংরেজী সাহিত্য পরিচয়' নিঃসন্দেহে তার ব্যতিক্রম। গ্রন্থকার নিজে ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র এবং সাহিত্য সমালোচকরূপেও সুপরিচিত। সমালোচনার ক্ষেত্রে তাঁর অন্যান্য গ্রন্থে যে সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টির পরিচয় পাওয়া যায় তার পরিচয়ও এই গ্রন্থটিতে উপস্থিত। যদিও সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে অপরিহার্য মূল সন-তারিখ গুলো যথাস্থানে সন্নিবেশিত তবু বিভিন্ন কালের পরিবর্তিত সামাজিক জীবনের পটভূমিকায় ইংরেজি সাহিত্যের গতি ও প্রগতির বিস্তারিত ব্যাখ্যাই সম্ভবত লেখকের মূল লক্ষ্য। অপেক্ষাকৃত অধিক উল্লেখ্য বিভিন্ন যুগের সাহিত্য-আন্দোলনের সবর উল্লেখে ও পর্যালোচনায় অতএব গ্রন্থটির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। 'রেনেসাঁসের ইশারা' 'প্রথম এলিজাবেথের আমলের সাহিত্য' 'পিউরিটান যুগ—জন, মিলটন' এবং অষ্টাদশ শতক ও রোমান্টিক যুগ বিষয়ে অরবিন্দবাবুর বিচার-বিশ্লেষণ অমনোযোগী পাঠককেও আকৃষ্ট করবে বলতে পারা যায়। ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ ব্যুৎপত্তি যে-সব পাঠকের আছে তাঁরাও এই গ্রন্থের অনেক ক্ষেত্রেই লেখকের সতর্ক ও সজাগ দৃষ্টিভঙ্গিজনিত প্রয়াস ও উদ্যমকে অভিনন্দন জানাবেন বলে আমার বিশ্বাস।

তথ্য ও তথ্যের পরিবেশনায় অরবিন্দবাবুর 'ইংরেজি সাহিত্য পরিচয়' যথোপযুক্ত ভারসাম্য রক্ষা করেছে। অপেক্ষাকৃত উল্লেখযোগ্য যুগ তাঁর আলোচনায় বিস্তারিত পরিসরে যোগ্য মর্যাদা পেয়েছে। চসার এবং চসার-পরবর্তী রেনেসাঁস যুগ, এলিজাবেথীয় যুগ, অষ্টাদশ শতকের গদ্য ও পদ্য রোমান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগ প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ প্রস্তর-ফলকগুলো তাঁর গ্রন্থে বিষয়োচিত মর্যাদায় বিস্তারিতভাবে আলোচিত হওয়ায় বইটির গুরুত্ব বেড়েছে। বলা যায়, কৃতিত্বের সঙ্গে অরবিন্দবাবু মূল বক্তব্যগুলোকে স্পর্শ ক'রে গিয়েছেন, অবান্তর পুনরুক্তিতে কিংবা অবান্তর বিষয়ের উল্লেখে বইটি কোথাও ভারাক্রান্ত হয়নি। শেষের দিকে বিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের আলোচনায়, বিষয়ের সর্বমুখীতা ও ব্যাপকতা সত্ত্বেও অরবিন্দবাবু মাত্র পঞ্চাশ পাতার পরিসরে সমকালীন পাঠককে সমসাময়িক কালের সাহিত্য-আন্দোলন সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। মোটের ওপর, আড়াইশ পাতার এই গ্রন্থে ইংরেজি সাহিত্যের পরিচয় আশানুরূপ স্বচ্ছন্দে চিহ্নিত এবং সাহিত্যের ছাত্রছাত্রীর আগ্রহের বস্তু এবিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গেই বলতে পারা যায়। গ্রন্থটিতে একটি নির্ঘণ্ট থাকলে ভালো হ'তো।

আমার বিশ্বাস, এ জাতীয় গ্রন্থে বর্ণাশুদ্ধিক নির্ঘণ্ট অপরিহার্য।

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

দিবসরজনী। প্রবোধবন্ধু অধিকারী। স্ট্যাণ্ডার্ড পাবলিশার্স। ৪·৫০ পঃ

রীতিপ্রকরণ ও কথাবস্তুর দুর্লভ সামঞ্জস্যে যে মহৎ সাহিত্যের সৃষ্টি হয় তার আর একবার আস্বাদ পেলাম আলোচ্য উপন্যাসপাঠে। তরুণতর যে কজন কথাশিল্পী আমাদের পরিচিত, প্রবোধবন্ধু নিঃসংশয়ে তাদের মধ্যে একজন শক্তিমান লেখক। নতুন রীতি, পুরনো রীতি, আইসৌরে রীতি, ঘরোয়া রীতি ইত্যাদি নানারকম রীতির কথা শুনে শুনে আমরা ক্লান্ত—কিন্তু কথা শেষ পর্যন্ত সেই একটাই থেকে যায় যে, কথাবস্তু না থাকলে শুধু রীতিতে কিছু এসে যায় না। 'দিবসরজনী'র মধ্যে একটি সুন্দর কথাবস্তু আছে যাকে উজ্জ্বল করেছে প্রকরণগত পরিমিতি। এই উপন্যাস পড়ে যে কোন পাকা ঔপন্যাসিকও ঈর্ষা বোধ করবেন। ভাষার ব্যবহারে, চরিত্রচিত্রণে, ঘটনার উপস্থাপনে, ভির্যকতার আভাসে, আলোছায়ার দক্ষ প্রয়োগে উপন্যাসটি একটি পরিশীলিত মননের পরিচয় দেয়।

যক্ষ্মারোগাক্রান্ত একটি যুবকের রোগ থেকে মুক্তি, তথা অপ্রেম থেকে প্রেমের অভিযানের ইতিহাস এই গ্রন্থটি। ছাদের চিলেকোঠা ঘরে তার আবাস। তার দিন কাটার সঙ্গে সঙ্গে তার একমাত্র সহচরী সুবর্ণর বয়স বেড়ে ওঠা, এবং নায়কের ভূতপূর্ব প্রেমিকা বর্তমানের সেজবৌদি রীণার অপ্রকাশ উপস্থিতি সব কিছু মিলে এক আশ্চর্য মধুর আবেশ রচনা করেছে। এই উপন্যাসের দুটি ঘটনা পাঠকের মনে নিশ্চিত রেখাপাত করবে। সুবর্ণর যৌবনের স্বাদ নেবার জন্যে যখন নায়ক অরুণ তার দেহলগ্ন এবং যখন সেই মুহূর্তেই রীণার আবির্ভাব ঘটেছে দরোজায়—এই ঘটনাটি এত সুমিত ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে তার জন্য সাধুবাদের ভাষা মেলে না। দ্বিতীয় ঘটনা, শেষ দৃশ্যটি। রোগমুক্তির পর অরুণকে চেঞ্জে পাঠানোর ব্যবস্থার যখন কোন ত্রুটিই বহন করতে চাইছে না, তখন রীণার গয়না খুলে দেওয়া ও সুবর্ণকে অরুণের সহচরী করে পাঠানোর প্রস্তাব যেমন উপস্থিত অন্যান্য চরিত্রদের বিস্মিত করেছে, আমাদের তেমনি মোহিত করেছে।

যেহেতু এই উপন্যাসের কথাবস্তুর নিজস্ব একটি শক্তি রয়েছে এবং যা প্রবলতর হয়েছে পরিমিতজ্ঞানের কারণে সেই জন্যে লেখক প্রথমদিকে বেশ কয়েকপাতা ধরে রীতিসর্বস্ব আবহরচনার অনাবশ্যক প্রয়াস না করলেও পারতেন।

আর্য দেব

বিশ্বাবর্ত

চীনা বোমা : দ্বিতীয় কিস্তি

গত ১৪ই মে চীনের পশ্চিমাঞ্চলে লপ নর-এ দ্বিতীয় চীনা বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। ১৯৬৪-র ১৬ই অক্টোবর প্রথম চীনা বোমা বিস্ফোরণের পর থেকেই দ্বিতীয় বোমার অদূর সম্ভাবনা সম্পর্কে সকলেই সচেতন ছিল। বাস্তবিক পক্ষে গত ফেব্রুয়ারী থেকেই মার্কিণী মহল এই দ্বিতীয় বোমার জন্য অপেক্ষমান ছিল। তৃতীয় বোমাও নাকি অদূরবর্তী। প্রথমটির ওজন ২০ কিলোটন ; দ্বিতীয়টির আনুমানিক ৭০ কিলোটন।

চীনের বোমা সম্পর্কে প্রাথমিক সমুচিত প্রতিক্রিয়ার পরিবর্তে গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষা সুরু হয়েছে। গোড়ায় ধারণা ছিল, চীনা বোমা বুঝি অপেক্ষাকৃত সহজ পদ্ধতিতে প্লুটোনিয়াম সঞ্জাত, এ-অনুমান বদলে গেছে। অনুসন্ধানে নিশ্চিত হওয়া গেছে যে জটিল, কষ্টসাধ্য ও ব্যয়সাধ্য প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইউরেনিয়াম ২৩৩-ই চীনা বোমার উৎস। অর্থাৎ, বীক্ষণাগারে প্রভূত বৈজ্ঞানিক উন্নতি সাধন করে চীনা আনবিক প্রস্তুতি দ্রুত হাইড্রোজেন বোমা উৎপাদনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে ক্ষেপণ-ব্যবস্থাও। সুতরাং মাও সে তুং-এর যুদ্ধের অনিবার্যতার সঙ্গে চীনা আনবিক শস্ত্র-সম্ভারের স্বল্পোন্নত অদূর ভবিষ্যতে যুদ্ধের এক অন্যতম ইঙ্গিত দিচ্ছে। ইন্দোনেশিয়া, জাপানী কম্যুনিষ্ট পার্টি ও উত্তর ভিয়েৎনাম চীনের এই সাফল্যে আনন্দে আত্মহারা। পাকিস্তান এবার নীরব, প্রথমবারের মত উচ্চকণ্ঠ প্রশংসায় আপ্লুত নয়। সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন আনবিক বিস্তারের বিরুদ্ধে হলেও চীনা বোমায় এশিয়ায় কোনো বিপদের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করেন, তাঁর মতে আনবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা তো আদৌ নাই ! কোসিগিনের কথায় চিঁড়ে ভিজবে না। ভিয়েৎনামে মার্কিণী সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে আনবিক যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দেবার সোভিয়েট আশঙ্কার পাশাপাশি কোসিগিনের আনবিক যুদ্ধ সম্বন্ধে প্রশান্তি, মনকে চোখ ঠারা ছাড়া আর কিছু নয়। বোমা বিস্ফোরণের মধ্য দিয়ে উত্তর ভিয়েৎনামে প্রচণ্ড মার্কিণী আঘাতের সামনে চীনা নির্লিপ্ততার একটা কৈফিয়ৎ দেবারও যেমন চেষ্টা আছে, তেমনি শক্তিবলের ভিত্তিভূমি থেকে ভিয়েৎনাম-সঙ্কট নিরসনের জন্য আপোষ-আলোচনার পথ পরিষ্কারের সূক্ষ্ম চীনা-প্রচেষ্টাও নিহিত থাকতে পারে। কারণ কিছুদিন পূর্বে, চীনা সূত্র থেকে শোনা গেছে, কোনো কোনো অবস্থায় সাম্রাজ্যবাদী-দের সঙ্গে আপোষ-আলোচনায় সম্মত হওয়াই কৌশলের দিক থেকে সুবিধাজনক, "...reach certain agreements with the imperialist countries." ভিয়েৎ-নামের সঙ্কট মনে রেখেই কথাগুলি উচ্চারিত হয়েছে।

আরব দুনিয়ার ঝড়ের সঙ্কেত

গত বছরের জানুয়ারী মাসে প্রখানত ইসরাইল-বিরোধি-তার ভিত্তিতে আরব রাষ্ট্র সমূহের প্রথম শীর্ষ সম্মেলনে যে ঐক্যবদ্ধ মানসিকতা গড়ে উঠেছিল, তা বর্তমানে ভাঙার মুখে। সেদিন আশু সমস্যাটা ছিল জর্ডনের জল কে নেবে। ইসরাইল মরুদ্যান করে জর্ডনের জলের গতিমুখ পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর, অন্যথায় ইসরাইলের অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। অন্য দিকে আরব রাষ্ট্রগুলির পক্ষেও এই সমস্যা একাধারে অর্থ-নৈতিক ও রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জের সামিল, যে চ্যালেঞ্জের শেষ পরিণতি সামরিক সংঘাতে। গত বছরই ইসরাইল জর্ডনের

জলের গতিমুখ পরিবর্তন করে নিয়েছে। সে-সময় সামরিক সংঘাতের সম্ভাবনা থাকলেও আরব রাষ্ট্রগুলি সে পথে না গিয়ে জর্ডনের গতিমুখ পরিবর্তনের প্রকল্প গ্রহণ করে সেই অনুযায়ী কাজে অগ্রসর হচ্ছে। সিরিয়া-ইসরাইল সীমান্তে জর্ডনের শাখা-প্রশাখাগুলির গতিমুখ ইসরাইলের নাগালের বাইরে সরিয়ে নেবার জন্য নানা নির্মাণ কার্য সুরু হয়ে গেছে। আর ইসরাইলও এই কাজে বিঘ্ন ঘটাবার উদ্দেশ্যে কয়েকবার অলক্ষ্য আক্রমণ করে নির্মাণের কাজ সাময়িকভাবে বন্ধও করে দিয়েছে। গত ১লা মে ইসরাইলের পররাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রীমতী গোল্ডা মীর আরবদের শাসিয়ে বলেছেন তারা যদি যুদ্ধ না চায় তবে যেন জর্ডনের গতিমুখ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা বন্ধ করেন: "to stop works to divert the waters of Jordon river if they wanted to avert a war." জর্ডনের প্রধান মন্ত্রী কালক্ষেপণ না করে উত্তরে বলেছেন, সম্ভাব্য ইসরাইল আক্রমণের জন্য আমরা প্রস্তুত: "all measures have been taken against a possible Israeli aggression." (May 1) গত তিনমাস যাবৎ-ই অলক্ষ্য ও খণ্ড খণ্ড ইসরাইলী আক্রমণ আরব রাষ্ট্রসমূহের বিরুদ্ধে অনুষ্ঠিত হয়েছে। জর্ডনে সাম্প্রতিক আক্রমণ (২৭শে মে) তাই কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়।

কিন্তু এই ঘটনাসমূহের অব্যবহিত পূর্বেই আরব-ইসরাইল দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য শান্তির প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছে আরব এবং ইসরাইল উভয় পক্ষ থেকেই। টিউনিশিয়ার বোরগুইবার এমনি একটি প্রস্তাবে তিনি আরব রাষ্ট্রসংঘের বিরাগভাজন তো হয়েছেনই: আরব ঐক্যে কাটলও ধরিয়েছেন, যে ঐক্যের ক্রমবর্ধমান শিথিলতা ইসরাইলকেও খণ্ড খণ্ড অলক্ষ্য আক্রমণে উৎসাহিত করেছে। বোরগুইবার প্রস্তাব ছিল আরব রাষ্ট্রসমূহ ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেবে এবং ইসরাইল প্যালেস্টাইন-উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের জন্য জমি ছেড়ে দেবে। বোরগুইবার এই মীমাংসার সূত্রকে কেন্দ্র করে আরব দুনিয়াতে ঝড় উঠেছে। টিউনিশিয়ার কায়রো ও অন্যান্য দূতাবাসের সম্মুখে মুহুর্মুহু টিউনিশিয়া-বিরোধী বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়েছে। বোরগুইবার দুওপাত করে আরব লীগে তাঁকে বহিষ্কারের প্রস্তাবও উত্থাপিত হয়েছিল; যদ্যপি, লিবিয়া ও সৌদী আরব তার প্রবল বিরোধিতা করেছে। গত ২৯শে এপ্রিল ইসরাইলের সঙ্গে আলোচ-আলোচনার বিরুদ্ধে আরব লীগের প্রস্তাবে বলা হয়েছে "...a violation of Arab unity on the Palestine Problem, a violation of Arab League Charter and a criticism of the plans adopted by Arab Rulers and Heads of the States."

বোরগুইবার বিরুদ্ধে নাসেরের তীব্র কণ্ঠ গত ২রা মে গর্জন করে বলেছে, পশ্চিমীরা ইসরাইলকে যতই অস্ত্র দিক না কেন, ২০ থেকে ৩০ লক্ষ আরবী সৈন্য সমাবেশ হলেই প্যালেস্টাইন উদ্ধার করা হবে: 'Arab would liberate Palestine and restore the rights of Palestinians when the Arabs could mobilise two to three million troops." লেবাননের রাষ্ট্রপতি হেলু এবং নাসের যৌথ বিবৃতি দিয়ে এ-কথারই পুনরাবৃত্তি করেছেন, 'firm stand against Zionist aggression in Palestine' এবং তাদের 'determination to take back, the usurped rights of Arab Palestinians.' এই ধমক ও শাসানি বোরগুইবাও নীরবে হজম করে যান নাই। নাসেরের অসহিষ্ণুতা ও শাসানিকে লক্ষ্য করে বোরগুইবা বলেন, 'Tunisia was not prepared to surrender its sovereignty to any leadership whatsoever." (May 9)

আরব রাষ্ট্র সমূহের অন্তর্দ্বন্দ্বের মুখে ইসরাইলের পক্ষ থেকেও প্রধানমন্ত্রী এশকল সুযোগ বুঝে ইসরাইলের সীমানার

স্থিতাবস্থার ভিত্তিতে এক শান্তির প্রস্তাব করেন : 'on the basis of Israel as it is.' যদে যা হবার তাই হয়েছে, আরবরা সরাসরি এ-প্রস্তাব অগ্রাহ্য করেছে। তবুও বলতে হবে এই প্রথম আরব এবং ইসরাইল উভয় পক্ষ থেকে শান্তির প্রস্তাব উত্থাপিত হয়ে ইসরাইল-আরব বিরোধের প্রাচীরে কিছুটা শুভবুদ্ধির ছিদ্র পথ রচিত হয়েছে। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী এশকল বোরগুইবার প্রস্তাবকে লক্ষ্য করে যথার্থই বলেছেন : 'A prominent Arab leader has finally arisen suggesting peace.'

কিন্তু এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ইসরাইল এবং টিউনিসিয়া উভয় দেশেই দেখা দিয়াছে। টিউনিসিয়ার স্বাধীনতা আন্দোলনকালে বোরগুইবার অন্যতম সহকর্মী এবং পরবর্তী কালে বোরগুইবার বিরোধী সালা বেন ইউসুফের আততায়ীর হাতে ১৯৬১ সালে জার্মানীতে মৃত্যু হলেও তার অনুসারীরা আজও বোরগুইবা-বিরোধী। তারা নূতন করে কাজ সুরু করেছে এবং তাদের প্রথম ও প্রধান কর্মসূচী বোরগুইবার সঙ্গে চূড়ান্ত লড়াই ; কারণ, বোরগুইবা তাদের চোখে নূতন সাম্রাজ্যবাদীদের চর—'a battle to the end against Bourguiba, agent of neo-colonialism.'

ইসরাইলের এশ্বলের বিরুদ্ধেও সংঘাত ঘুমায়িত। এশকল নরমপন্থী এবং ইসরাইলের আরব প্রতিবেশীদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপনে পক্ষপাতী। অপরপক্ষে, প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন ও তার অনুসারীরা,—যারা এশকল-বিরোধী-উদ্বস্ত, কট্টর আরব-বিরোধী—'activist and aggressive.' মন্ত্রীসভায় বেন গুরিয়নের শেষ প্রতিনিধি ছয়জন পদত্যাগ করেছেন। মন্ত্রীসভায় তারা সেনাবাহিনীরও প্রতিনিধি ছিলেন। জর্ডনের জল নিয়ে আরব রাষ্ট্রসমূহের সহিত ইসরাইলের সংঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে কট্টর ও আগ্রাসী শাসনের প্রয়োজনীয়তার দাবী-মুখর হয়ে সেনাবাহিনীর সমর্থনে বেন গুরিয়নের শাসন ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন অসম্ভব নাও হতে পারে।

ইসরাইলে ইতিমধ্যে আর একটি পরিস্থিতি, আরব-ইসরাইল সংঘাতের আন্তর্জাতিক রূপান্তর ঘটিয়েছে। গত ১৩ই মে পশ্চিম জার্মানী ইসরাইলকে স্বীকৃতি দিয়ে পারস্পরিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ফলে, লিবিয়া, টিউনিসিয়া এবং মরোক্কো ছাড়া বোধহয় অন্যান্য সকল আরব রাষ্ট্রই পশ্চিম জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করবে। ইরাক, সিরিয়া, লেবানন, সৌদী আরব, জর্ডন, সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, সুদান ইতিমধ্যে সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। কুয়াইত, ইয়েমেন, আলজিরিয়াও এদের অনুসরণ করবে। এরা পশ্চিম জার্মানীকে অর্থনৈতিক বয়কট করবে কিনা তা এখনও স্থির হয় নাই। সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র, পূর্ব জার্মানীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে অগ্রসর হচ্ছিল। পশ্চিম জার্মানীর চ্যান্সেলার এরহার্ড নাসেরকে এ কাজ থেকে বিরত থাকবার জন্য সা[illegible] করে দিয়েছেন। সেই সঙ্গে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন যে ইসরাইলকে অস্ত্র সরবরাহ করা হবে না—নূতন এবং পুরাতন কোনো চুক্তি অনুসারেই। এই প্রতিশ্রুতি বোধহয় নাসেরকে বিরত করবে এবং আরব রাষ্ট্র সমূহকেও পশ্চিম জার্মানীর অর্থনৈতিক বয়কট থেকে বিরত করবে।

ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে বিদ্রোহ

বিগত ২৪শে এপ্রিল ল্যাটিন আমেরিকার ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে যে বিদ্রোহ শুরু হয়েছিল, আজও তা প্রশমিত হয় নাই। ১৯৬২-র ডিসেম্বরে এই, রিপাব্লিকের বৈধানিক রাষ্ট্রপতি জুয়ান বসকে ক্যাথো ও কম্যুনিষ্ট সমর্থক—এই অভিযোগে সেনাবাহিনী বিতাড়িত করে। এবারকার বিদ্রোহের আশু লক্ষ্য ছিল, জুয়ান বসকে তার পুয়ের্টো রিকোর নির্বাসন থেকে ফিরিয়ে আনা। এই উদ্দেশ্য নিয়ে সেনাবাহিনীর একাংশ মার্কিন সমর্থিত ডোমিনিক্যান রাষ্ট্রপতি

ডোনাল্ড রীড ক্যাব্রালের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কিন্তু বিমান বাহিনী এই বিদ্রোহের বিরুদ্ধে। তারা একটি সামরিক চক্রের শাসন চায় এবং জুয়ান বসের প্রত্যাবর্তনেরও বিরোধী। নৌবাহিনী বিমান বাহিনীর সঙ্গে একমত হয়। ২৮শে এপ্রিল রাতে ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে অবস্থিত মার্কিনীদের রক্ষার অজুহাতে আমেরিকান নৌবহরের সেনাবাহিনী সেখানে অবতরণ করায় অপর রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ পরিস্থিতিতে হস্তক্ষেপের অভিযোগে সোভিয়েত কর্তৃক আমেরিকান অভিযুক্ত হয়। মুখে মার্কিনীদের কথা, কাজে কম্যুনিষ্ট ও ক্যাস্ট্রোপন্থীদের দস্তাবা থেকে ডোমিনিক্যান রিপাব্লিককে মুক্ত রাখার জন্যই এই মার্কিনী অভিযান। অল্পকালের মধ্যেই ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে ১৯,০০০ মার্কিন নৌবহরের সেনাবাহিনীর অবতরণ থেকেই মার্কিনীদের আসল উদ্দেশ্য সপ্রকাশ হয়েছে। জুয়ান বস-বিরোধী প্রথম ত্রয়ী সামরিক চক্রের দুই দিনের শাসনের পর ব্রিগেডিয়ার জেনারেল এক্টোনিও ইমবার্ট বারেয়াসের নেতৃত্বে দুইজন সামরিক এবং তিনজন বেসামরিক প্রতিনিধি নিয়ে নূতন শাসনযন্ত্রের গঠিত হয়েছে এবং বস-সমর্থক 'বৈধানিক' বিদ্রোহী গভর্ণমেন্ট কর্ণেল ক্যানাবোর নেতৃত্বে পরিচালিত। মার্কিনীরা ইমবার্টোকে সহায়তা করলেও সকল বিষয়ে সে মার্কিনীদের সঙ্গে একমত নয় এবং এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কম্যুনিষ্টদের প্ররোচনা সম্পর্কে ইমবার্টোর দৃষ্টিভঙ্গি যে মার্কিনীদের চাইতে কত পৃথক তা বোঝা যায় ৮ মে সেন্ট ডোমিঙ্গোতে তার একটি উক্তিতে: 'প্রতি দরজার পেছনেই কম্যুনিষ্টরা নেই যদিও তারা কিছু সংখ্যক এখানে রয়েছে' ["We dont see communists behind every door although we know there are some of them here."]

মার্কিনী সেনাবাহিনীর ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে অবতরণ কেন্দ্র করে অর্গ্যানাইজেশন অফ আমেরিকান ষ্টেটস-এর অন্যান্য সদস্যরা বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। গত ২২শে মে এই সংস্থার সভায় ব্রেজিলিয়ান অফিসারের নেতৃত্বে একটি আন্তঃ-আমেরিকান ঐক্যবদ্ধ ও সংহত সেনাবাহিনী গঠন করে ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকে শান্তি ও শৃঙ্খলা পুনঃ স্থাপন স্থির হয়েছে। ক্যানাবোর সমর্থকেরা ও ও. এস-এর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। তাদের এ মনোভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে গত ১৬ই মে যখন মেজর জেনারেল রিবির নেতৃত্বে রাষ্ট্র সংঘের তথা নির্ধারক মিশন সান্টো ডোমিংগোতে ক্যানাবোর প্রধান দপ্তরে পৌঁছায়। সেখানে রিবির প্রতি বিপুল অভ্যর্থনার পাশাপাশি তারা ও. এ. এস-এর বিরোধিতায় মুখর হয়ে ওঠে।

২১শে মে সেন্ট ডোমিংগোর পথ-ঘাট থেকে অসংখ্য মৃতদেহ অপসারণের জন্য ইমবার্টো ২৪-ঘন্টা যুদ্ধ বিরতির জন্য সম্মত হয়েছিল, রাষ্ট্র সংঘের এবং কর্ণেল ক্যানাবোর অনুরোধে সামরিক যুদ্ধ-বিরতির সময়-সীমা আরও বৃদ্ধি করতে ইমবার্টো সরাসরি অস্বীকার করে ডোমিনিকো সঙ্কটের জটিলতা বৃদ্ধি করেছে। ইমবার্টোর পশ্চাতে মার্কিনী সমর্থনের সংবাদ মার্কিনী সেনাবাহিনীর ডেপুটি সেক্রেটারী মিঃ সাইরাস ভান্সে সেন্ট ডোমিংগোতে সাংবাদিকদের কাছে স্বীকার করেছেন। ডোমিনিক্যান রিপাব্লিকের সঙ্কট বিলম্বিত করবার দায়িত্ব তাই পুরোপুরি মার্কিনীদের।

সম্পাদকীয়—(১৩ পৃষ্ঠার পর)

এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যাপক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি ইতিমধ্যেই সোভিয়েট রুশের নিকট থেকে পাওয়া গেছে। এই সাহায্যের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকার কম হবে না। বোকারো ইস্পাত কারখানার জন্য প্রয়োজনমত অতিরিক্ত ৭৫ কোটি টাকার বরাদ্দ এবং ভারী যেন্ত্রিক নির্মাণ শিল্পের সম্প্রসারণেও সোভিয়েট সাহায্য অব্যাহত থাকবে। যন্ত্রপাতির স্পেয়ার পার্টস, কম্পোনেন্টস ইত্যাদি ক্রয় করবার জন্য ভারতের পক্ষ থেকে যে দুইশত কোটি টাকার প্রকেট-বহির্ভূত রুপ চাওয়া হয়েছিল, ভারত-সোভিয়েত বাণিজ্যের প্রস্তাবিত বিস্তারের ফলে তার আর প্রয়োজন হবে না। কেবলমাত্র ট্রাক্টর কারখানা স্থাপনে এবং খনি অপসারণের বৃহৎ যন্ত্র সরবরাহে সোভিয়েট সক্ষমতা প্রকাশ করেছে। ভিলাই ইস্পাত কারখানার উৎপাদন ক্ষমতা ৩৪ লক্ষ টনে বৃদ্ধি করতে সোভিয়েট সাহায্য করবে। পশ্চিমী দেশগুলির সাহায্য ব্যতিরেকে ভারতের উন্নয়নের এই সম্ভাবনায় রাজনৈতিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াও লক্ষ্য করবার বিষয়।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্মেলন

সম্প্রতি কলকাতায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল। ভারতবর্ষে এবং বিশেষ করে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনের প্রচেষ্টা নূতন ঘটনা নয়। ১৯০৫ সনের সাম্প্রদায়িক অশান্তির পর ১৯২৬ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ফিরিয়ে আনবার জন্য জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের সংগ্রামীরা সর্বদাই সচেষ্ট ছিলেন। কলকাতার ১৯৪৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বীভৎসতার মুখে বিপন্ন হিন্দু-মুসলমানদের উদ্ধার ও রক্ষা করবার জন্য নেতাজীর অনুগামীরা সকল প্রকার বাধা-বিপত্তি অগ্রাহ্য করে এগিয়ে এসেছিলেন। সেকালে সেদিন খুব কম লোকই পাওয়া গিয়েছিল। দেশবিভাগের পরও ১৯৫৭ ও ১৯৫০ সালে সাম্প্রদায়িক হানাহানির মধ্যে তাঁদের এই প্রচেষ্টা প্রসারিত হয়েছে, কিন্তু সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কোনো কার্যকরী স্থায়ী রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নাই। কারণ, এ-দেশের সাম্প্রদায়িক অ-সম্প্রীতির মূলে রাজনৈতিক কার্যকারণ নিহিত রয়েছে, দেশ বিভাগে যে রাজনীতি চূড়ান্ত পরিণতি পেয়েছে। আজ যাঁরা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কথা বলেন, তাঁদের অনেকেই সেদিন দেশবিভাগে সায় দিয়েছিলেন। এদিক থেকে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের শুভপ্রচেষ্টা, সাম্প্রদায়িক সমস্যার অন্তিম মূল্যায়নে ব্যাহত না হওয়াই আশ্চর্যের কারণ তাঁরা সমস্যাটিকে সামাজিক সমস্যারূপে চিহ্নিত করে সমাধানে অগ্রসর হয়েছেন। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির জন্য সামাজিক শুভবুদ্ধি জাগ্রত করবার নিরন্তর প্রচেষ্টা সাধু সন্দেহ নাই কিন্তু যতদিন পর্যন্ত পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র পাকিস্তানে সংখ্যালঘুদের উপর অত্যাচারের নির্মম স্বাক্ষরের কলুষ প্রবাহ বহন করে এনে এদেশে সাম্প্রদায়িক প্ররোচনার বিষাক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করবে, ততদিন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি সুদূরের বস্তুই থেকে যাবে। সম্মেলন এ সম্বন্ধে নিরুত্তর থেকে সমস্যার বাস্তব প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও সমাধান এড়িয়ে গিয়েছেন।

খাদ্য সমস্যা

চালের দাম আবার চোরাকারবারীদের রক্ত-শোষণকারী খেলার বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে সর্বত্র চাউলের দাম অস্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেক স্থানে খোলা বাজারে চাল পাওয়াও যাচ্ছে না। উত্তর বঙ্গের ন্যায় ট্র্যাডিশনাল অঞ্চলে চালের দাম তুলনামূলকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে,—কোন কোন অঞ্চলে প্রতি কেজির দাম দেড়টাকায় গিয়ে

দাঁড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন এলাকায় রেশনিংয়ের মাধ্যমে যে চাল দেওয়া হয় তার পরিমাণ প্রয়োজনের তুলনায় অতি সামান্য এবং বিতরণ ব্যবস্থাও অনিয়ন্ত্রিত। চালের সমস্যা সম্বন্ধে জনসাধারণের পক্ষ থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সরকার সন্তোষজনক ভাবে আশ্বাস দিয়ে থাকেন, কিন্তু গ্রামাঞ্চলে চাল সরবরাহ করার এবং চোরাকারবারীদের শায়েস্তা করার কোন কার্যকরী ব্যবস্থা করা হয়েছে বলে প্রমাণ পাওয়া যায় নি। বর্ষা আগত প্রায় —চাল সম্বন্ধে সতর্ক নীতি ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব না হলে পশ্চিম বঙ্গে এবারও সঙ্কটজনক খাদ্য পরিস্থিতির সম্ভাবনা রয়েছে। কলকাতায় রেশনের চালের দাম দুই বার পয়সা বৃদ্ধি করে এবং পাড়া বাংলা দেশে গমের দাম দুই বার পয়সা বৃদ্ধি করে সরকার একদিকে ক্রূরতার পরিচয় দিয়েছেন অপর দিকে কেন্দ্রীয় সরকার থেকে রাজ্যগুলিতে খাদ্য শস্যের বরাদ্দের পরিমাণ প্রতিমাসে ছয় লক্ষ টন থেকে হ্রাস করবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে সঙ্কট ঘনীভূত করেছেন।

ধোরীর কয়লা খনির দুর্ঘটনা

ধানবাদের নিকটে ধোরীর কয়লা খনির সর্বাধুনিক দুর্ঘটনায় কত শ্রমিক ও কর্মচারী নিহত হয়েছেন তার সঠিক সংবাদ এখনও পাওয়া যায় নি। দুইশতের উপরে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে,—খনি কর্তৃপক্ষ মৃতের সংখ্যাকে তিন-শতের কম বলে বর্ণনা করার চেষ্টা করছে। ক্ষতিপূরণদানের প্রশ্নে এরূপ ভয়াবহ ও হৃদয়বিদারক ঘটনাকেও লঘু করে দেখাবার চেষ্টায় খনির মালিক মুনাফালোভী পুঁজিপতিদের ঘিরা করতে দেখা যায় না।

কি কারণে এই খনিতে দুর্ঘটনা ঘটলো, এই দুর্ঘটনায় কত লোক নিহত ও আহত হয়েছে, এই দুর্ঘটনার জন্য দায়ী কে কিভাবে এরূপ মারাত্মক দুর্ঘটনার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা যায়, নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গকে কত ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে—সে সম্বন্ধে ঘটনা ও নীতি নির্ধারণের জন্য কয়লার খনির বিশেষজ্ঞ লোকসভার সদস্য এবং কয়েকজন বিচার-পতিসহ অবিলম্বে একটি তদন্ত কমিটি গঠিত হওয়া প্রয়োজন। রাষ্ট্রপতি থেকে আরম্ভ করে সরকারী মুখপাত্রের অধিকাংশই এই শোচনীয় দুর্ঘটনার জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। কিন্তু ভবিষ্যতে যেন আর এরূপ শোক প্রকাশ করতে না হয় সেজন্য সতর্কতা অবলম্বনের ব্যবস্থা করার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। অন্যথায় কয়লা উৎপাদনেও বিঘ্ন ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে।

এই দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের পরিবারবর্গের প্রতি আমরা গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পূর্ববঙ্গে প্রাকৃতিক তাণ্ডব

প্রকৃতি যেন পূর্ববঙ্গের উপরে বিদ্বেষকরভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছে। গত চৌদ্দ বছরে পূর্ববঙ্গে পর পর কয়েকটি গুরুতর ঝড় হয়েছে এবং তাতে বহু লোক নিহত হয়েছে এবং বহু ধন-সম্পত্তি ও পশু-পাখী নিহত হয়েছে। এবারে যে মাসে পূর্ববঙ্গে যে ঝড় হয়েছে তাকে এক মহা তাণ্ডব আখ্যা দেওয়া যায়। স্মরণীয় কালের মধ্যে এত বড় ঝড় পূর্ববঙ্গে হয় নি। বরিশাল, নোয়াখালি ও অন্যান্য সমুদ্র তীরবর্তী অঞ্চলে ঝড়ের সঙ্গে সমুদ্রের জল-স্ফীতি মৃত্যু ও ধ্বংসের মর্মান্তিকতাকে আরও মারাত্মক করে তুলেছে।

সরকারী হিসাবে এই ঝড়ে ১৩ হাজার, কিন্তু বেসরকারী হিসাবে ৫০ হাজার লোক নিহত হয়েছে এবং দু' লক্ষের উপরে গুরুতরভাবে আহত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ গবাদি পশু নিহত হয়েছে—কোন কোন অঞ্চলে পাখী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। বরিশাল, নোয়াখালি ও ফরিদপুরের অনেক গ্রামে একটি কাঁচা বাড়িও অবশিষ্ট নেই। কিন্তু এরূপ দুর্দৈবের মধ্যেও পূর্ববঙ্গ বিপর্যস্ত হলেও এই ঘটনা সিতি

নেতাদের মনে বিশেষ কোন শোক বা দুশ্চিন্তার সৃষ্টি করে নি। গত বৎসর সিন্ধুর হায়দ্রাবাদে একটি বন্যায় বন্যার্তদের উদ্ধারের জন্য ফৌজ পাঠিয়েছিলেন এবং কয়েক কোটি টাকা পুনর্বাসনের জন্য ব্যয় করেছেন। কিন্তু পূর্ববঙ্গের প্রতি পিতি সরকারের বৈরী মনোভাব এই প্রকট যে ফৌজের সাহায্য দূরে থাকুক, কোন কোন ক্ষতিগ্রস্ত স্থানে ১৫ দিনের মধ্যেও সামান্য সরকারী সাহায্যও পৌঁছে নি। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কয়েক সপ্তাহ পরে প্রেসিডেন্ট আয়ুব বিমানে করে বিধ্বস্ত অঞ্চল দেখে গেছেন এবং এযাবৎ মাথা পিছু দশ পয়সা করে সাহায্যের ব্যবস্থা করেছেন।

পূর্ববঙ্গে জনসাধারণের এই চরম বিপর্যয়ে আমরা গভীরভাবে মর্মবেদনা অনুভব করছি এবং তাদের সর্বভাবে সাহায্যদানের জন্য আবেদন জানাচ্ছি।

উত্তর বঙ্গে চালের আর্থিক অনুপ্রবেশ

উত্তর বঙ্গ থেকে উদ্বেগজনক সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যে চোরাকারবারীদের সুগম পথে এখনও চাল, চিনি, পেট্রল এবং মোটর পার্টস তিব্বতে চালান হচ্ছে। চোরাকারবারীদের এই ভারতীয় প্রতিরক্ষাব্যবস্থায় প্রবেশ করার জন্যও উদ্যত হয়ে উঠেছে। উত্তর বঙ্গের বাজারে চীনা টর্চ, লাইটার, ঘড়ি, পেন ইত্যাদি জিনিস পাওয়া যাচ্ছে এবং প্রবল গুজব ছড়িয়ে পড়ছে যে চীনে-রাপা প্রচুর ভারতীয় নোট চোরাকারবারীদের মাধ্যমে উত্তর বঙ্গে চালু হচ্ছে। চীনের অর্থনৈতিক-নাশকতামূলক এরূপ কার্যকলাপ সম্বন্ধে বহু অভিযোগ উত্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও সরকার এ সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

গুণ্ডকারণ্যে শিল্পায়ন

পশ্চিমবঙ্গে কৃষির জমি আর অবশিষ্ট নেই এই অজুহাতে কৃষি ব্যবস্থায় পুনর্বাসনের নীতির কথা ঘোষণা করে উদ্বাস্তুদের পশ্চিমবঙ্গের বাইরে পাঠান হয়েছে। কিন্তু কৃষির মাধ্যমে পুনর্বাসন সম্ভব নয় বলে দুই কোটি টাকার মূলধনে দণ্ডকারণ্যে একটি সুতিকল স্থাপনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। উড়িষ্যায় প্রেরিত উদ্বাস্তুদের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপনের উদ্দেশ্যেও কয়েক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। ছোট বড় শিল্পের মাধ্যমেই যদি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয় তবে তাদের বাংলার বাইরে পাঠানোর সমস্ত যুক্তি অসার হয়ে যায়। উদ্বাস্তুদের ছোট বড় শিল্পের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে পুনর্বাসনের নীতি গৃহীত হলে কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত মূলধন পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নের কাজে ব্যবহার করে শুধু উদ্বাস্তু নয় সর্বসাধারণের আর্থিক উন্নয়নের কাজে ব্যবহার করা সম্ভব হতো। কিন্তু একটি ক্ষুদ্র রাজনৈতিক গোষ্ঠীর ক্ষমতারক্ষার চক্রান্তের জন্য উদ্বাস্তু পুনর্বাসনের কেন্দ্রীয় অর্থ অন্য প্রদেশের উন্নয়নে ব্যয়িত হবে, অথচ, পশ্চিমবাংলার জন্য তা পাওয়া যাবে না।

৫. ৬. ৬৫

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়ন্তী

৩০ বর্ষ] ৩য় সংখ্যা [আষাঢ় ১৩৭২

সম্পাদকীয়

খাদ্য বিতর্ক

সরকারী খাদ্যনীতি নিয়ে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করেছেন। সম্প্রতি আমেদাবাদের এক বক্তৃতায় মহারাষ্ট্র মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ভি, পি, নায়েক বলতে দ্বিধাবোধ করেন নাই, যে 'দিল্লীতে একটি দুষ্টচক্র আছে বলে মনে হয়, যারা হয় খাদ্য সমস্যার মৌলিক প্রশ্নগুলি সম্পর্কে অজ্ঞ অথবা জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে হৃদয়হীন।' কেন্দ্রীয় খাদ্যনীতির সমালোচনা সূত্রে শ্রীনায়েকের মত (১) উৎপাদকদের কেন্দ্র-নির্ধারিত মূল্যের চাইতে শস্যের মূল্য আরও কিছু বেশী ধার্য না করলে উৎপাদকেরা অধিক উৎপাদনে উদ্যোগী হবে না। বিভিন্ন বৈদেশিক বিশেষজ্ঞরাও এই মত পোষণ করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থবিদরা ইনফ্লেশনের ভয়ে সে-ব্যবস্থা গ্রহণে নারাজ। (২) খাদ্য এলাকা অপসারণ (৩) খাদ্য শস্যের একচেটিয়া আবশ্যিক সরকারী প্রকিওরমেণ্ট। সারের উৎপাদন, যোগান ও ব্যবহার সম্পর্কে অবশ্য কেন্দ্র ও মহারাষ্ট্র একমত।

সরকারী খাদ্যনীতির ফলে ঘাটতি রাজ্যগুলির সহিত কেন্দ্রের সম্পর্ক ঘাতা ও প্রতীতার সম্পর্কে পরিণত হয়ে তীব্র তিক্ততার সৃষ্টি হয়েছে। মহারাষ্ট্রের খাদ্য সঙ্কট, এই তিক্ততায় ইন্ধন জুগিয়ে এই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রকাশ্য বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছে। মহারাষ্ট্রে জোয়ার সংগ্রহের একচেটিয়া অধিকার প্রয়োগই, এই রাজ্যের খাদ্য সঙ্কটের কারণ বলে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীসুব্রহ্মনিয়ম ইঙ্গিত করার পর এই উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পায় অথচ এই কেন্দ্রীয় মন্ত্রীই মহারাষ্ট্রে একচেটিয়া জোয়ার-সংগ্রহনীতি অনুমোদন করেছেন। আবশ্যিক একচেটিয়া খাদ্য সংগ্রহ—সে উদ্বৃত্ত রাজ্য কিম্বা ঘাটতি রাজ্যই হউক বা কেন্দ্র—বড় বড় শহরগুলিতে র‍্যাটুটারী রেশনিং এবং অন্যান্য এলাকায় মডিফায়েড রেশনিং, উৎপাদকের জন্য উপযুক্ত মূল্য —এই কয়েকটি মূলনীতি প্রয়োগ না করলে কেবলমাত্র বিদেশ থেকে পর্বতপ্রমাণ খাদ্য আমদানী করে খাদ্য সমস্যার সমাধান যে হবে না, এই অভিজ্ঞতা কোনো কোনো রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী-দের পরিচালিত করতে সুরু করেছে। সব চাইতে বিস্ময়ের কথা পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এতোকাল আবশ্যিক খাদ্য সংগ্রহের বিরুদ্ধাচরণ করে বর্তমানে এই ব্যবস্থার প্রবল সমর্থক হয়েছেন। বিলম্বে হলেও পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী রেশনিং ও মূল্য নিয়ন্ত্রণের অপরিহার্য আনুসঙ্গিক ব্যবস্থা,

আবশ্যিক প্রতিশ্রুতিটের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছেন এটা সুখের। আশাকরি বাঙ্গালোরে আগামী খাদ্যমন্ত্রী সম্মেলনে এই মৌলিক বাধ্যবাধকতাগুলি গৃহীত হয়ে ভারত সরকার বাস্তবানুগ খাদ্যনীতি গ্রহণে উদ্যোগী হবে এবং রাজ্য ও কেন্দ্রের অশোভন ও অসঙ্গত বিবাদের ফাঁকে জনসাধারণের খাদ্য সম্পর্কিত দুর্গতি দূর করতে সত্য সত্যই উদ্যোগী হবে। অন্তত মুনাফা শিকারীদের দাদাচর্যের অভিযোগ থেকে তারা নিষ্কৃতি পাবেন না।

পশ্চিমবঙ্গের আয়

পশ্চিমবঙ্গের আয়তন সারা ভারতবর্ষের শতকরা ৩ ভাগ হলেও, জাতীয় আয়ের শতকরা ৮ ভাগ পশ্চিমবঙ্গে সংগৃহীত হয়। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের অনুপাত মহারাষ্ট্রের পরে—মহারাষ্ট্রের অনুপাত সব চাইতে বেশী ; শতকরা ৬·৪ ভাগ—হলেও বছরে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গে শতকরা মাত্র ১·৬ ভাগ, বিহারে ৩·৯ ভাগ, মধ্যপ্রদেশে ২·৪ এবং মহারাষ্ট্রে ৩·৭ ভাগ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক দুর্বলতা নিহিত রয়েছে, উন্নয়নের কেন্দ্রীভূত উৎসের মধ্যে। কারণ কলকাতা এবং পার্শ্ববর্তী শিল্পাঞ্চলের তিনটি জেলা পশ্চিমবঙ্গের আয়ের শতকরা ৫০ ভাগের উৎস। এই সঙ্গে মেদিনীপুর ও বর্ধমান যুক্ত করলে পশ্চিমবঙ্গের শতকরা ৭০ ভাগ আয়ের ক্ষেত্রের হিসাব পাওয়া যায়। অবশিষ্ট ১০টি জেলা— পশ্চিম দিনাজপুর, মালদহ, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, দার্জিলিং, নদীয়া, মুর্শিদাবাদ, বাঁকুড়া, বীরভূম, পুরুলিয়া—খুবই অনুন্নত। পশ্চিমবঙ্গের আয়ের উৎসের এই ভারসাম্যের অভাব, পশ্চিমবঙ্গের আপাত-সমৃদ্ধি সত্ত্বেও, মাথাপিছু আয় সারা ভারতের অনুপাতের চাইতে অনেক নীচে নামিয়ে রেখেছে। ১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৬০-৬১র মধ্যে সামগ্রিক উন্নয়নের হার পশ্চিমবঙ্গে শতকরা ৪·৭ ভাগ এবং এই সময়ে সারা ভারতের এই হার শতকরা ৩·৮ ভাগ। কিন্তু এই সময়কার পশ্চিমবঙ্গের মাথাপিছু শতকরা ১·১ ভাগের তুলনায় সারা ভারতের মাথাপিছু উন্নয়নের হার ১·৮ ভাগ। দ্বিতীয় পরিকল্পনায় এই হার পশ্চিমবঙ্গে ও সারা ভারতে যথাক্রমে শতকরা ১·৬ ও ১·৮ ভাগ। তা সত্ত্বেও শিল্পে অনুন্নত অন্যান্য রাজ্য থেকে দ্বিতীয় পরিকল্পনার আমলে পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের হার অপেক্ষাকৃত কম ছিল। এই সঙ্গে একথাও উল্লেখযোগ্য যে ১৯৬০-৬১র তুলনায় ১৯৬১-৬২তে ভারতের জাতীয় আয়—আসল আয়ের হিসাবে—শতকরা ২·৬ ভাগ বৃদ্ধি পেলেও এই সময়ে পশ্চিমবঙ্গের আয় পূর্ববৎসরের তুলনায় হ্রাস পেয়েছিল। ১৯৬২-৬৩তে পশ্চিমবঙ্গে এই আয় আরও নিম্নগামী হয়েছিল। ১৯৬৩-৬৪তে এই আয় কিছুটা বৃদ্ধির দিকে। পশ্চিমবঙ্গে আয়বৃদ্ধির অসঙ্গতি ১৯৪১-৪২ থেকে ১৯৬৩-৬৪—এই বার বছরের হিসাব থেকে আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে। এই সময়ে প্রতি বছর গড় মূল্যের সামগ্রিক আর্থিক উন্নতির হার শতকরা ৪ ভাগ হলেও মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির হার মাত্র শতকরা ·৭ ভাগ। শিল্পোন্নতির মধ্যেও আর্থিক দুর্গতিই পশ্চিমবঙ্গের মানুষের ভাগ্যে পরিকল্পনার পরিহাস।

উন্নয়নের খড়্গ

চতুর্থ পরিকল্পনায় প্রস্তাবিত বিনিয়োগের জন্য ৩০০০ কোটি টাকা ঘাটতি পূরণের দায়িত্ব কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহ পরস্পরের উপর চাপিয়ে দেবার জন্য উদ্যোগী হয়েছিল। কিন্তু নূতন ট্যাক্স সংগ্রহের অবাঞ্ছিত দায়িত্ব নিতে দু-পক্ষই নারাজ। বিশেষ করে আগামী নির্বাচন যেখানে আর বেশী দূরে নয়। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী যোজনা কমিশনের অনুরোধে পূর্বাঞ্চলের মুখ্যমন্ত্রীদের একটি বৈঠক ডেকে এ-বিষয়টি উপস্থাপিত করলে তারা একবাক্যে এ-দায়িত্ব কেন্দ্রকে বহন করতে বলেন এবং অতিরিক্ত খাজনা বৃদ্ধি করে কিম্বা উন্নয়ন কর বসিয়ে পরিকল্পনার জন্য অর্থ সংগ্রহের তারা সরাসরি বিরোধিতা করেন। মাত্র কয়েকদিন পূর্বে জাতীয় উন্নয়ন পরিষদের

ফিসোর্সেস কমিটি এ-বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করেছেন যে কেন্দ্র ও রাজ্যসমূহকে যৌথভাবে এ-দায়িত্ব নিতে হবে। এ-ছাড়া এ-যাবৎ কেন্দ্র ও রাজ্যের ট্যাক্স সংগ্রহের অনুপাত ৭৮:২২ কে পরিবর্তন করে রাজ্যের ভাগ বৃদ্ধি করতে হবে। নূতন ট্যাক্সের বোঝা বহনের জন্য দুর্গত জন-সাধারণের প্রতি এই সময় জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে সে-সম্বন্ধে সরকারী সচেতনতা সন্তোষ আছে বলে মনে হয় না। খাদ্যসঙ্কট ও মূল্যস্তরোধে ব্যর্থতার পাশাপাশি ট্যাক্স-বৃদ্ধির কর্মসূচী এই সিদ্ধান্তই অনিবার্য করে তোলে।

সীমান্ত সুরক্ষা

সম্প্রতি সীমান্ত পরিভ্রমণ করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নব সীমান্ত সুরক্ষার ব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন বলে সংবাদপত্রে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু সুরক্ষার প্রশ্নটিকে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারত সরকার দেখছেন সেসম্বন্ধে মূলনীতি স্থির না হলে সীমান্ত রক্ষার যথাযথ ব্যবস্থা করা সম্ভব হবে বলে আমরা মনে করি না। পাক চীন সীমান্তে চোরা-কারবারী, চুরি, রাহাজানি, ডাকাতি, চাষের জমি বেদখল, মত কেটে নেওয়া, বে-আইনিভাবে সীমান্ত পারাপার ইত্যাদি সমস্যার সঙ্গে মূলত দেশরক্ষা অর্থাৎ সামরিক কার্যকলাপের প্রশ্ন গভীরভাবে জড়িত হয়ে রয়েছে।

চীনের সামরিক শক্তি মূলত গেরিলা বাহিনীরূপে গঠিত, পাকিস্তান এবং বিশেষ করে পূর্ব-পাকিস্তানে সম্প্রতি চীনের অনুকরণে গেরিলা বাহিনী গঠনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে পাকিস্তান এক অর্ডিনেন্স জারী করে আনসার, পূর্ব-পাক রাইফেল্‌স ও মোজাহেদ বাহিনীকে নিয়মিত সামরিক সংগঠন ও নীতির অন্তর্ভুক্ত করে এই নতুন সীমান্ত বাহিনীর উপরে দেশরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণ ও নেতৃত্ব প্রবর্তন করেছে। পাকিস্তানের এই নতুন সামরিক নীতির অর্থ হলো এই যে সীমান্তবাহিনীকে পাক-সরকার শুধু প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃত্বমুক্তই করেনি—পাকিস্তান নিয়মিত মিকানাইজড্ আর্মীর সঙ্গে ব্যাপক সংখ্যায় এক গেরিলা আর্মী গঠনেরও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

সাম্প্রতিক সংবাদে আরও প্রকাশ যে গেরিলা যুদ্ধের চীনা বিশেষজ্ঞেরা পূর্বাঞ্চল পাকিস্তানের নবগঠিত গেরিলা বাহিনীর শিক্ষাদানে সাহায্য করছে এবং চীনা বিশেষজ্ঞেরা ভারত সীমান্ত, বিশেষ করে, সুন্দরবনের অবহেলিত ও দুর্গম সীমান্ত অঞ্চলগুলি পর্যবেক্ষণ করে গেছে। যদি কোন সময়ে পাক-ভারত সংঘর্ষ সুরু হয় তা' হলে ভারতের পূর্ব সীমান্ত থেকে নিয়মিত মিকানাইজড্ আর্মী অপেক্ষা গেরিলা বাহিনীর আক্রমণের বিশেষ করে আশঙ্কা থাকবে—পূর্ব-পাক অঞ্চলে নিয়মিত গেরিলা বাহিনী গঠনের 'এটা'ই মূল সামরিক তাৎপর্য।

পাকিস্তানের পরিবর্তিত সামরিক পুনর্গঠনের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে পূর্বাঞ্চল ভারতীয় সীমান্তবাহিনীকে পুলিস বাহিনীরূপে নয়,—একটি সম্পূর্ণ মিলিটারী সংগঠনরূপে গড়ে তোলা প্রয়োজন। এজন্য সীমান্ত রক্ষার বিশেষ কর্তব্য পালনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় দেশরক্ষা বিভাগের নীতি ও নিয়ন্ত্রণে একটি 'বর্ডার মিলিটারী ফোর্স' গঠন করা প্রয়োজন। এরূপ বর্ডার মিলিটারী ফোর্স গঠন ও পরিচালনার দায়িত্ব ভারতীয় দেশরক্ষা বিভাগকে দেওয়া হবে কিনা—এটাই ভারতের পূর্বাঞ্চল সুরক্ষার পুনর্গঠনের নীতিগত মূল প্রশ্ন। দেশরক্ষার দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্বাঞ্চল সুরক্ষার সমস্যা বিবেচিত হলে এরূপ সীমান্ত বাহিনীর কর্তৃত্ব কেন্দ্রের অথবা রাজ্যের হবে—সেই বিতর্কের অবকাশ থাকবে না। দেশরক্ষা বিভাগ সরাসরিভাবে এই বিশেষ কর্তব্য—নির্দিষ্ট সীমান্ত বাহিনীর গঠন, নিয়ন্ত্রণ ও পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করবে এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের একটি সংযোগ কমিটির মাধ্যমে সীমান্ত সুরক্ষার অন্যান্য কর্তব্য পালন করবে।

ভারতীয় সীমান্ত রক্ষার প্রশ্নে আরেকটি জটিল সমস্যার সমাধান করার জন্য ভারত সরকারের পক্ষে সুস্পষ্ট-নীতি গ্রহণ করা প্রয়োজন। পূর্বাঞ্চলে পাকিস্তানের সীমান্ত থেকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সম্পূর্ণরূপে উৎখাত করে দেওয়া হয়েছে পক্ষান্তরে ভারতের অন্তর্ভুক্ত পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও ত্রিপুরা সীমান্ত অঞ্চলের অধিকাংশ এলাকায় সংখ্যালঘুরা বসবাস করছে। অস্বাভাবিকভাবে ভারতীয় জাতীয়তা বিভক্তিত হওয়ার ফলে এদেশের সীমান্তবর্তী সংখ্যালঘুরা এক অস্বস্তিকর মানসিক অস্থায়ীত্বের পরিবেশে বসবাস করছে এবং মুসলীম জাতিত্বের নামে দেশভাগ হওয়ার পরিণামে স্বাভাবিকভাবেই সক্রিয় ও কার্যকরী পাক-প্রতিরোধাত্মক মনস্তত্ত্ব এদের কাছে আশাকরা যায় না। অথচ পাকিস্তানের গেরিলা তৎপরতারোধ করার জন্য সীমান্ত বাহিনীর সঙ্গে সীমান্তবাসী জনসাধারণের সক্রিয় ও সুদৃঢ় পাক-প্রতিরোধকামী দেশপ্রেম উৎসারিত সচেতনতা প্রয়োজন। দেশরক্ষার মূল দৃষ্টিভঙ্গীতে যদি সীমান্ত সুরক্ষার প্রশ্ন বিচার করা হয় তা' হলে সীমান্তের একটি চিহ্নিত এলাকা থেকে সংখ্যালঘুদের নিরাপদ স্থানে এনে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে বসবাস করার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। গতানুগতিক রাজনীতি এবং ভোটাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গীতে এরূপ কার্যক্রম বিতর্কমূলক হতে পারে কিন্তু দেশরক্ষার প্রশ্ন সর্বাগ্রে গণ্য হলে বিবেচিত হলে অন্য সমস্ত প্রশ্ন গৌণ প্রতীয়মান হবে।

পাক সীমান্ত ও চীন সীমান্ত,—উভয় সীমান্তেই সীমান্ত বাহিনীর সঙ্গে সীমান্তবাসীদের সীমান্ত সংগঠন গড়ে তোলার কার্যসূচী গ্রহণ করা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে একথাও স্মরণীয় যে পূর্ববঙ্গ থেকে আসত নমশূদ্র, সাঁওতাল চাকমা ইত্যাদি সামরিক ঐতিহ্যবাহী সম্প্রদায়ের লোকদের পশ্চিম বাংলার বাইরের শিবিরগুলিতে না পাঠিয়ে ফেরে তাদের সীমান্তে পুনর্বাসন দেবার এবং সীমান্ত বাহিনীতে রিক্রুট করার কার্যক্রম গ্রহণ করা প্রয়োজন। সীমান্তের জনসাধারণের মনোবল রক্ষা এবং তাদের প্রতিরোধ শক্তি সক্রিয় করে তোলার জন্য সীমান্তের আর্থিক সমস্যা বিশেষ করে খাদ্য সমস্যার প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন। সীমান্ত এলাকায় বিধিবদ্ধ রেশনিং ব্যবস্থা এবং চীনা সীমান্তের পার্বত্য জনসাধারণের বিশেষ অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যা সমাধানের জন্যও বিশেষ কর্মসূচী গ্রহণ করা কর্তব্য।

দেশরক্ষার মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পরিপ্রেক্ষিতে একদিকে দেশরক্ষা বিভাগের নিয়ন্ত্রণে সীমান্ত বাহিনী গঠন এবং অন্যদিকে সীমান্তবাসীদের সমস্যা সমাধানে অগ্রণী হয়ে তাদের সহযোগিতায় সীমান্তের সুরক্ষা ব্যবস্থার পুর্নগঠনের জন্য সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা গ্রহণ আজ জাতির সামনে এক অপরিহার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কমনওয়েলথ্ সম্মেলন

হৃত-গৌরব বৃটিশ সাম্রাজ্য শক্তির ঐতিহ্যরক্ষার সাহায্য করা ছাড়া কমনওয়েলথের সংগঠনের যে সার্থকতা আছে প্রগতি ও জাতীয়তা সচেতন বৃহত্তর ভারতীয় জনতার কাছে তা' দুর্বোধ্য। প্রতিটি কমনওয়েলথ্ বৈঠক বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধীনতার গ্লানি এবং হীনম্মন্যতার অতীত-স্মৃতি জাগিয়ে রেখে ভারতের জাতীয়তাবোধের মর্যাদা ও গৌরব যে কিভাবে ক্ষুণ্ন করে এবং বিগত যুগের সাম্রাজ্য শাসনের প্রেতছায়া যে ভারতীয় জনমনকে কত ক্লিষ্ট করে দেকথা অনুধাবনের মত বাস্তবিক ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি দিল্লীর কংগ্রেসী নেতৃত্ব আজও দেখাতে পারে নি। দেশভাগের পদ্ধতিতে বৃটিশ সরকারের দাক্ষিণ্যে ক্ষমতা লাভ করে এবং একদিকে 'ইউন কালচার' এবং অন্যদিকে মাউন্টব্যাটেন পরিবারের প্রভাবে নেহেরু-নেতৃত্ব এতকাল ভারতের স্বাধীন রাষ্ট্রীয় সত্তাকে কমনওয়েলথ সংগঠনের নামে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যশক্তির উপগ্রহে পরিণত করে রেখেছিলেন। ষোল বছর পরেও ব্রিটিশ-ঐতিহ্যযুক্ত নেহেরু-নীতির রাহু-গ্রাস থেকে দিল্লীর দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন

হলো না। বৃটিশ যুক্তরিষ্টানার পুচ্ছবদ্ধ হয়ে থাকার ফলে বিশ্ব-রাজনীতিতে ভারতের পক্ষে একটি-স্বতন্ত্র রাষ্ট্রীয় শক্তিরূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করা যে অসম্ভব সেই সাধারণ আন্তর্জাতীয় মনস্তত্ত্বটুকু অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা নেহেরু-উত্তর কংগ্রেসী নেতৃত্বের নেই। আজ একথা অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় ভারতের পক্ষে ব্যক্ত করা প্রয়োজন যে কমনওয়েলথের গ্রন্থী ভারতের রাষ্ট্রসত্তা, ব্যক্তিত্ব এবং আন্তর্জাতীয় মর্যাদার সম্পূর্ণ পরিপন্থী।

প্রতিবার যখনই যে কমনওয়েলথ বৈঠক বসে এবারে জুন মাসে অনুষ্ঠিত প্রায় পক্ষব্যাপী অধিবেশনও তার ব্যতিক্রম নয়। একদা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রের মন্ত্রীদের রাষ্ট্রী সম্মর্দনা, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রীর আতিথ্যে তথা প্রাক্তন রাজপরিবারে খানাপিনা, চিত্রে ও ভাষণে সংবাদপত্রের খোরাক সৃষ্টি করা, আন্তর্জাতীয় সমস্যা নিয়ে কিছু বিতর্ক এবং পরিশেষে অর্থহীন ও কার্যকারিতা-শূন্য কতগুলি কূটনৈতিক বয়ানের সুকৌশল বিন্যাসে একটি সর্বসম্মত 'কম্যুনিকে' প্রকাশ করা।' তীক্ষ্ণদৃষ্টির কাছে কমনওয়েলথ বৈঠকের এই যথার্থ চিত্র। এবারেও সেই একঘেঁয়েমির একই উপসংহার হয়েছে কমনওয়েলথের সম্মেলনে।

একশ্রেণীর ক্ষমতা-স্তাবক সংবাদপত্রও সংবাদবাহী কমনওয়েলথ বৈঠককে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় চিত্রিত করার জন্য ব্যস্ত এবং এই উদ্দেশ্যে স্বাভাবিক ভাবেই এই গোষ্ঠি কমনওয়েলথ বৈঠকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শাস্ত্রীর নেতৃত্বকে কৃত্রিম গৌরবে চকচকে করার চেষ্টা করেছেন। কমনওয়েলথ ভিয়েৎনাম শান্তি-মিশন গঠন এবং আলজেরিয়ায় আফ্রো-এশীয়ান সম্মেলন স্থগিত রাখার কৃতিত্ব নাকি শাস্ত্রীজীর। কিন্তু ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি ছাড়া আর কোন দেশের সাংবাদিকেরা সেকথা উল্লেখ করেনি। ভিয়েৎনাম সম্পর্কে রুশ নীতির অন্ধ সমর্থন করে এবং উত্তর ভিয়েৎনামের বন্ধুত্বের চেষ্টা করেও শাস্ত্রীজী শান্তির কোন সুরাহা করতে পারেননি। যে নাগায়ের উপরে তিনি অতিরিক্ত নির্ভর করেছেন, সেই বিশ্বনেতাও যে সুকর্ণ-চৌ আঁতাতের দিকেই ঝুঁকতে আরম্ভ করেছেন সেকথা ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আফ্রিকান জাতির অধিকার ও মর্যাদা সম্বন্ধে যে তীব্র সংগ্রামী ভূমিকা গ্রহণ করে কমনওয়েলথ বৈঠকে আফ্রিকান প্রধানমন্ত্রীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতা স্থাপন করা উচিত ছিল,—শাস্ত্রীজী তাহাননি করেন নি। বস্তুত, শাস্ত্রীজী কমনওয়েলথের আর দশ জন প্রধানমন্ত্রীর মতই একটি গতানুগতিক ভূমিকা গ্রহণ করেছেন মাত্র।

পশ্চিমবঙ্গে বেকারের সংখ্যা বৃদ্ধি

যে মাসে পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থান কেন্দ্রগুলিতে ৪৯৫,০০০ কর্মেচ্ছুদের নাম তালিকাভুক্ত ছিল আর এপ্রিল মাসে এই সংখ্যা ছিল ৪৮৯,০০০। যে মাসে নূতন দরখাস্তের সংখ্যা ছিল ৩১,০০০। এদের সংখ্যা এপ্রিলে ছিল ২৮,৬০০। মহিলা-বেকারদের অনুপাতও বৃদ্ধির দিকে। পশ্চিমবঙ্গের কর্মসংস্থানের আর একটি শোচনীয় দিক হচ্ছে অবাঙালী প্রতিষ্ঠানগুলিতে বাঙালী কর্মেচ্ছুদের ক্রমহ্রীয়মান নিয়োগ। প্রাদেশিকতার প্রশ্ন না তুলেও স্থানীয় কর্মেচ্ছুদের নিয়োগের ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারকে স্বীকৃতি দিতেই হবে—অবশ্য এ-ব্যবস্থা কর্মেচ্ছুর গুণাগুণের উপযোগিতানাপেক্ষ, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই মাপকাঠি লঙ্ঘন করেও বাঙালী কর্মেচ্ছুদের কোণঠাসা করার গুরুতর অভিযোগ পশ্চিমবঙ্গে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ভারত ও পরমাণু বোমা

শাস্ত্রীজী যখন শান্তির নামাবলী গায়ে জড়িয়ে উদাত্তকণ্ঠে পরমাণু বোমা তৈরী না করার নৈতিক সংকল্প ঘোষণা ও বিঘোষিত করে চলেছেন, ঠিক সেই সঙ্গেই উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণের ব্যাপারে মার্কিন সরকারের

বিরুদ্ধে তীব্র অভিমত ব্যক্ত করার জন্য অতি ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন। একই সময়ে কয়ানী দেশের পারমানবিক অস্ত্রের বিশেষজ্ঞ লেঃ জেনারেল পিয়ারে গ্যালয়স এক তাত্ত্বিক বিবৃতিতে ভারত কর্তৃক পরমাণু বোমা না-নির্মানের যুক্তি গুলিকে নস্যাৎ করে দিয়েছেন। নৈতিক ও আর্থিক দুই দিক দিয়েই ভারতের মত রাষ্ট্রের পক্ষে পরমাণু বোমা তৈরী করা অনুচিত বলে যারা উদাত্ত কণ্ঠে সরব হয়ে উঠেছেন. তথা দিয়ে তিনি শুধু তাদের এই যুক্তিকেই খণ্ডিত করেন নি.—তিনি অ্যাফ্রো-এশীয়ান গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গুলিকে একথা বলেও সতর্ক করে দিয়েছেন যে যথা সময়ে সতর্ক ও প্রস্তুত না হলে পশ্চিম ইয়োরোপের মতই অসহায় হয়ে মার্কিণ পারমানবিক শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ করে তাদের মার্কিন রাজনীতির উপগ্রহে পরিণত হতে হবে।

প্রচলিত সামরিক শস্ত্রাদি উৎপাদনে বিপুল ব্যয় করা যদি অনৈতিক না হয় এবং এজন্য ভারত যদি দেশরক্ষার ব্যয় প্রায় চারগুণ বৃদ্ধি করাকে অন্যায় না মনে করে তা' হলে পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণ অনৈতিক কাজ বলে গণ্য হতে পারে না। বস্তুত, অনৈতিকতার কোন পরিমাপগত মানদণ্ড নেই এবং পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ সম্ভব না হওয়া পর্য্যন্ত পারমানবিক যুদ্ধের আতঙ্কই বিশ্বযুদ্ধকে ক্রমশ দূরে সরিয়ে দিচ্ছে। জেনারেলের মতে আমেরিকা. রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স এবং বর্তমানে চীন ব্যতীত' ভারত ও জাপানের ন্যায় রাষ্ট্রগুলিও যদি পরমাণু বোমা তৈরী করতে সক্ষম হয় তা' হলে, অন্তত, এশিয়ায় পারমানবিক যুদ্ধাস্ত্র নিরসনে 'ইকুইলিব্রিয়াম' স্থাপিত হবে। প্রচলিত অস্ত্রের চেয়ে পারমানবিক অস্ত্রের ব্যয় কম,—এরূপ উক্তি করে ভারতীয় পারমানবিক কমিশনের চেয়ারম্যান শাস্ত্রীজীর কাছে 'বাহবানি' পেয়েছিলেন। কিন্তু লেঃ জেনারেল গ্যালয় ফ্রান্সের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন যে পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণের ফলে তাঁর দেশে সামরিক বাজেটের ব্যয় কমিয়ে অর্ধেক করা সম্ভব হয়েছে এবং তার ফলে শিক্ষা খাতে ব্যয় দ্বিগুণ করা হয়েছে। পারমানবিক অস্ত্র বহনের জন্য 'বোমার' নির্মাণ সস্তাই ব্যয়বহুল বলে যারা প্রচার করেন তাদের জবাবে তিনি বলেছেন যে বার্ষিকীক প্রয়োজনে নির্মিত ৩টি 'মিরাজ' জাতীয় ফেটলাইনার তৈরী করতে যে খরচ পড়েছে ফ্রান্স তারচেয়েও কম খরচে পারমানবিক অস্ত্রবাহী ৬২টি 'মিরেজ বোমার' তৈরী করেছে।

লেঃ জেঃ গ্যালয় এই সাবধানবাণীও উচ্চারণ করেছেন যে এশিয়ার যে রাষ্ট্রগুলি মার্কিন পারমানবিক ছত্রের উপরে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার শেষ আশ্রয়রূপে আস্থাবান, যথাসময়ে সেই 'ছত্র' খুলে যে তাদের মাথা বাঁচাতে মার্কিন রাষ্ট্র অগ্রসর হবে তার কোন স্থিরতা নেই। প্রথমত, প্রতিটি রাষ্ট্রই আগে নিজের চামড়া বাঁচাতে ব্যগ্র এবং যথাসময়ে অন্য রাষ্ট্রের সাহায্যে অগ্রসর হয়ে পারমানবিক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে আমেরিকা অগ্রসর হবে কিনা বা হওয়া সম্ভব হবে কিনা তাও সন্দেহের বিষয়। রাশিয়া ও চীনের হাতে পারমানবিক অস্ত্র থাকা সত্ত্বেও উত্তর ভিয়েৎনামের রক্ষায় রাশিয়া বা চীন পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহার করতে অগ্রসর হয় নি। মার্কিন শক্তিও যে অনুরূপ ক্ষেত্রে কোন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সাহায্যে পারমানবিক অস্ত্র ব্যবহারে অগ্রসর হবে তারও কোন স্থিরতা নেই।

লেঃ জেঃ গ্যালয় জানিয়েছেন যে চীনের হাতে এরই মধ্যে ক্ষেপণযোগ্য করেকটি পারমানবিক অস্ত্র সংগৃহীত হয়েছে এবং ১,২০০ মাইল দূরপাল্লায় বর্ষণ করার যোগ্যতানুযায়ী চীনের প্রায় ৩০০ বোমারু বিমান আছে। তিনি একথাও জানিয়েছেন যে চীন পাঁচ বছরের মধ্যেই অধিক গুরুত্বের সঙ্গে পারমানবিক বোমার 'ব্লাক-মেইল' সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। চীনের আক্রমণাত্মক কম্যুনিষ্ট দর্শনের সঙ্গে এই পারমানবিক অস্ত্রের শক্তি সংযোজনার তাৎপর্য অতি সুস্পষ্ট।

অতি দার্শনিকতার দেশ ভারতবর্ষ দার্শনিক নৈতিকতার

আয়লন্ডটিতে গত এক হাজার বছরে বিভিন্ন বিদেশী রাষ্ট্রের হাতে বারবার চরমভাবে বিপর্যস্ত ও পরাধীন হয়েও এই আধুনিক যুগেও বাস্তববাদের শিক্ষা গ্রহণ করে নি। সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ, অথবা রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদের মাধ্যমে পারমানবিক যুদ্ধের আশু অবসান ও বাস্তব কার্যক্রমের ব্যবস্থা না হলে ভারতের পক্ষে পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণে অগ্রসর না হয়ে উপায় নেই এবং এজন্য প্রাথমিক প্রস্তুতিও প্রয়োজন। পারমানবিক বারুদ সংগৃহীত হলে প্রয়োজনবোধে তা' বিদ্যুতাগারের আগানীর কাজেও ব্যবহার করা যায় কিন্তু প্রচলিত বারুদ অপ্রয়োজনে মাটির ওলায় বা সমুদ্রের জলে নিক্ষেপ করতে হয়। তাই, পারমানবিক বারুদ প্রয়োজন বোধে আত্মরক্ষার্থে ধ্বংসাত্মক কাজে এবং সেরূপ প্রয়োজন না হলে রচনাত্মক কাজেও ব্যবহার করা যায়। পারমানবিক অস্ত্র নির্মাণ সম্বন্ধে নতুন চিন্তা আজ ভারতের একান্ত ও অবশ্যম্ভাবী প্রয়োজন।

জলমগ্ন কোলকাতা

কয়েদিনের অবিচ্ছিন্ন বৃষ্টিতে কোলকাতার রাস্তাঘাট ডুবে শুধু চলাচলে বিঘ্ন ঘটিয়েছে তাই নয়,—যাদবপুর হাসপাতাল ইত্যাদির ন্যায় সহরপ্রান্ত সহরতলীর অবস্থা শোচনীয় করে তুলেছে। বৃষ্টিপাতের ফলে জল জমে কলকাতার চলাচল ও নগরজীবন বিপন্ন হওয়ার ঘটনা আকস্মিক নয়। কিন্তু বছরের পর বছর এরূপ দুর্ভোগের সম্মুখীন হয়েও বৃষ্টির জল নিকাশের যথাযথ ব্যবস্থা করে কলকাতার নগরজীবনকে রক্ষার কোন কার্যকরী উদ্যম আজও সরকারের পক্ষ থেকে দেখা যায় নি। বর্ষাকালে দুর্ভোগ এবং সেই সঙ্গে জলনিকাশের সরব বার্তালাপ, বর্ষান্তে বার্তা বিনিময়ের বিরতি এবং পরের বছরই আবার সেই দুর্ভোগের পুনরাবৃত্তি,— এই চক্রের আবর্তনে কোলকাতার নাগরিকেরা জনিক ব্যাধিগ্রস্তদের মত যেন অসীম সহনশীলতা ও অবাধ অপেক্ষায় স্থবির হয়ে ভাগ্যের হাতে আত্মসমর্পণ করে নির্জীব হয়ে রয়েছে।

রাস্তায় বলি

প্রতিদিন প্রভাতে খবরের কাগজ খুলেই কলকাতার পাঠকদের মন ভীত ও বেদনার্ত হয়ে ওঠে অনিবার্য পথ-দুর্ঘটনার সাম্প্রতিক সংবাদ দেখে। কলকাতার পথের বলির সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলছে। কোলকাতা সহরে কেউ বাইরে গেলে ঘরে ফিরে না আসা পর্যন্ত দুশ্চিন্তার অন্ত থাকে না। ফুটবোর্ডে দাঁড়ান নিষেধ করেও কোন ফল হয়নি— কারণ বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি না হলে ফুটবোর্ডে ঝোলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি করলেও কলকাতার প্রধান সড়ক-গুলির পরিধি না বাড়ালে এবং আরও কতকগুলি উপ-রাস্তাকে প্রধান সড়কে পরিণত না করা পর্যন্ত বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি করেও কোন লাভ নেই। সকাল আটটা থেকে রাত্রি দশটা পর্যন্ত যানযুগতি যান-নিয়ন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে সামান্য কিছু সুফল পাওয়ার আশা আছে। কিন্তু কলকাতায় দুর্ঘটনা ঘটে ট্রাকের জন্য সবচেয়ে বেশি। ট্রাকের ক্ষেত্রে রাস্তা ও চলাচলের সময় নিয়ন্ত্রণ করাও একান্ত প্রয়োজন। কোলকাতার রাস্তার আয়তন যে হারে প্রসস্ত করা হচ্ছে তার চেয়ে আনুপাতিক হারে জনসংখ্যা ও যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সুতরাং কোলকাতার রাস্তায় দুর্ঘটনার বলি হ্রাস করতে হলে অবিলম্বে কতকগুলি উপ-সড়ককে প্রধান সড়কে পরিণত করা দরকার, সাবওয়ে বা চিউব রেল স্থাপন করা প্রয়োজন এবং সেই সঙ্গে বিশেষ ধরণের যানচলাচলের জন্য প্রধান সড়কগুলি নিয়ন্ত্রিত করে বাসের সংখ্যাবৃদ্ধি করা আবশ্যক। কিন্তু কলকাতার রক্ত অপচয়ে সারা ভারতের জন্য ব্যয় হলেও কোলকাতার জন্য সারা ভারতের বিশেষ কোন দায়িত্ববোধ আছে বলে মনে হয় না।

পরলোকে শ্রীপ্রফুল্ল ত্রিপাঠি

বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের অন্যতম নির্ভীক যোদ্ধা এবং পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গের সুপরিচিত জননেতা শ্রীপ্রফুল্ল

ত্রিপাঠি ৬২ বৎসর বয়সে বহরমপুরে পরলোকগমন করেছেন। আন্তরিক আদর্শ প্রীতি, অমায়িক আচরণ ও বন্ধুত্বের প্রগাঢ় অনুভূতির জন্য প্রফুল্লবাবু সবাইকার কাছে আদর্শবাদী রাজনীতিক ও সার্বজনীন সম্প্রীতির প্রতীক ছিলেন। এই ঘনিষ্ঠ সহকর্মীর দেহান্তরে আমরা মর্মাহত। তাঁর পরিবারবর্গের প্রতি আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

পূর্বাঞ্চলে চীনের অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ

উত্তর বঙ্গের সীমান্তে চোরাই পথে আগত চীনা জিনিস-পত্র ক্রয়-বিক্রয়ের সংবাদ অনেক দিন থেকেই শোনা যাচ্ছিল। কিন্তু এসম্বন্ধে সরকারী গাফিলতি ও নিষ্ক্রিয়তার জন্য এখন চীনের চোরা-চালান কলকাতার বাজারেও ব্যাপকভাবে অনুপ্রবেশ করেছে'। কলকাতায় এখন খোলাখুলিভাবেই দোকানে দোকানে চীনা পেন, লাইটার, টর্চ এবং অন্যান্য জিনিসপত্র বিক্রি হচ্ছে এবং এক শ্রেণীর পিকিং-পন্থী ব্যক্তিরা বিশেষ উদ্দেশ্যে এরূপ চীনা সামগ্রীর ব্যাপিজ্যে উৎসাহ দিচ্ছে। চীনা পেন যে কত সুলভ এবং কত সুন্দর—এরূপ প্রচারও কলকাতার বাজারে সমপরিমাণ হয়ে উঠেছে। এই প্রচারের প্রাথমিক ভূমিকার পরেই এক শ্রেণীর ব্যক্তিরা সর্বস্তরে একথা প্রমাণ করার চেষ্টায় উৎপন্ন হয়ে উঠেছেন যে চীনের কম্যুনিষ্ট অর্থনীতি ভারতীয় অর্থনীতি চেয়ে কত উন্নত। চীনের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য যখন আইনসঙ্গত ভাবে নিষিদ্ধ এবং ভারত ও চীনের মধ্যে যে সময়ে অঘোষিত বৈরী সম্পর্ক বিদ্যমান সেই সময়ে চীনা জিনিসপত্রের ভারতীয় বাজারে অবৈধ প্রবেশ যে জাতীয় অর্থনৈতিক সংহতির পক্ষে কত ক্ষতিকর সে সম্বন্ধে সরকারী দৃষ্টিভঙ্গী এখনও অন্ধ হয়ে আছে। চীন উত্তর সীমান্ত অঞ্চলে ভারতীয় নোট চোরা চালান দিচ্ছে বলে উত্তর বঙ্গে প্রবল জনরব থাকা সত্ত্বেও এসম্বন্ধে সরকারের কোন চৈতন্য দেখা যায় নি। নেপাল এবং প্রধানতঃ পাকিস্তানের পথেই যে চীনা জিনিসপত্র ভারতে চোরাই চালান হচ্ছে তা' সহজেই অনুমেয়। সম্প্রতি চীনের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি করে ব্যাপক পরিমাণে চীনা সামগ্রী পূর্ববঙ্গে আমদানী হচ্ছে এবং তারই একাংশ চোরাপথে পশ্চিম বঙ্গে আসছে। যে দোকানে চোরাই চীনা জিনিসপত্র পাওয়া যাবে তার বিরুদ্ধে কঠোর দণ্ডদানের ব্যবস্থা করা এবং চীন কর্তৃক ভারতীয় নোট আমদানী সম্বন্ধে অচিরে ব্যবস্থা অবিলম্বে প্রয়োজন।

সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টির উন্মত্ততা

ডঃ লোহিয়ার প্রবল চাপে সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টি গায়ের জোরে এবং হিংসাত্মক পন্থায় হিন্দী ভাষা প্রবর্তনে রাজনৈতিক উন্মত্ততার কার্যক্রম গ্রহণ করতে উদ্যত হয়েছে। হিন্দী এলাকায় টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার, পোষ্ট অফিস, রেলওয়ে, সরকারী দপ্তর, বিদ্যালয় ইত্যাদিতে জোর করে ইংরেজী বন্ধ করে হিন্দী চালাবার জন্য কর্মসূচী নিয়েছে এই দল। ডঃ লোহিয়ার ভক্তদের এই হিন্দী-গোড়ামীর কার্যক্রমের প্রস্তাবে হিন্দী-কংগ্রেসী ও জনসংঘ উৎফুল্ল হয়ে উঠেছে এবং হিন্দী এলাকার এই তিনটি দলের এক অলিখিত মোর্চা গঠিত হতে চলেছে। হিন্দী ভাষীদের ভাষাগত ভাবাবেগের সুযোগ নিয়ে রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এবং ভারতীয় রাষ্ট্রীয় সত্তায় হিন্দী ভাষীদের প্রাধান্য কায়েম করবার প্রচ্ছন্নতা-বশেই যে এই আন্দোলন—তা'র নির্গলিত তাৎপর্য অনায়াসেই অহিন্দী ভাষী-দের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। দেশে খাদ্য বেকারী, দারিদ্র এবং দেশরক্ষার চরম সমস্যা সত্ত্বেও যারা এই ভাষার গোড়ামী সৃষ্টি করে ধ্বংসাত্মক আন্দোলন চায়, সোশ্যালিজমের উর্দ্ধে থাকলেও তাদের কার্যক্রমকে যথার্থ সোশ্যালিষ্ট বলা যায় কিনা তাই বিচার্য। সংযুক্ত সোশ্যালিষ্ট পার্টির ভক্তদের সহযোগে ডঃ লোহিয়া এই হিন্দীর উন্মত্ততার ডাক দিয়ে ভারতবর্ষকে রক্তাক্ত ভাষাগত গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছেন।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

কলকাতায় কলেজে

কলকাতার কলেজে পড়ার উদ্দেশ্যে সুভাষ এলেন ১৯১৩ সালে। বাংলায় ও ভারতে তখন একটা যুগ শেষ হয়ে গেছে, আর একটা যুগ সুরু হয়নি। বাস্তবানের সেই সময়টা ঠিক যে শান্ত সুরু হয়ে আছে তাও বলা যায়না। তবে সমাজ-জীবনের ওপর দিকে তখন আর তেমন কোনো আলোড়ন নেই। তলে তলে চলছে নানা মন্ত্রণা, দল গড়া ও ভাঙা, ঘুরোপেও তখন যুদ্ধের পূর্বাবস্থা।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন তখন শেষ হয়ে গেছে, বঙ্গভঙ্গ রদও হয়েছে। প্রকাশ্য জাতীয় আন্দোলনের সামনে তাই আর কোনো আশু লক্ষ্য ও কর্মপন্থা নেই। নিবেদিতার মৃত্যু হয়েছে ১৯১১ সালের ১৩ই অক্টোবর, অরবিন্দ বাংলা দেশ ছেড়ে গেছেন ১৯০৯ সালে, তিনি তখন পণ্ডিচেরিতে এবং তখনো তাঁর নতুন আদর্শ ও লক্ষ্য সম্পর্কে দেশবাসীর বিশেষ কিছু জানার সুযোগ হয়নি। সেজন্য তাঁর প্রত্যাবর্তনের একটা আশা দেশের মানুষের মনে রয়েছে, জাতীয় আন্দোলনে তাঁর নেতৃত্ব যে আর পাওয়া যাবেনা লোকে তখনো বিশ্বাস করেনি। সুভাষচন্দ্র সে সময়কার কথা নিজেই লিখছেন: "তখনকার দিনে সকলেই বলাবলি করত যে অরবিন্দ বারো বছরব্যাপী ধ্যান করার জন্যই পণ্ডিচেরি গিয়েছেন। বারো বছর পূর্ণ হলে তিনি গৌতম বুদ্ধের মতো সিদ্ধিলাভ করে দেশ উদ্ধার করতে আবার কর্মজীবনে ফিরে আসবেন। অনেকেই এই কথা বিশ্বাস করত।" অরবিন্দ নেই, তিলকও নেই। লোকমান্য তিলক আর অরবিন্দ—এঁরা দুজনেই ছিলেন বাম-পন্থী নেতা—তখনকার দিনে Extremist বা চরমপন্থী বলে পরিচিত। ১৯০৭ সালে সুরাট কংগ্রেসে এঁরাই গোখলে, সুরেন্দ্রনাথ বানার্জী প্রভৃতি পরিচালিত মডারেট বা নরমপন্থী নেতাদের সঙ্গে মতাদর্শগত সংঘর্ষে কংগ্রেসকে দুই দলে বিভক্ত করেছিলেন। ১৯০৮ সালে তিলক রাজদণ্ডে দণ্ডিত হন, সে বৎসরই ২৩শে সেপ্টেম্বর তিনি মান্দালয়ে পৌঁছন জেল খাটতে। তাঁর হয়েছিল ছয় বৎসরের কারাদণ্ড। ১৯১৪ সালের ৮ই জুন তিনি দেশে ফিরে আসেন। কাজেই যে সময়ের কথা আমরা বলছি সে সময়ে তিনিও মান্দালয় জেলে। গান্ধীজী ভারতীয় রাজনীতিতে তখন পর্যন্ত যোগ দেননি, তিনি সে সময়ও দক্ষিণ আফ্রিকায়। গান্ধীজী আইন ব্যবসার উদ্দেশ্যে দক্ষিণ আফ্রিকা যান ১৮৯৩ সালে, তার তিন বছর পর ১৮৯৬ সালে ছয় মাসের জন্য একবার তিনি দেশে আসেন। তখনকার সংবাদপত্রগুলি ও নেতাদের দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয়দের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত করার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, খুব বেশি সফল হননি। বিশেষ করে বাংলার নেতারা তাঁর কথা শোনেননি, বাংলার সংবাদ-পত্রেও তাঁর বক্তব্য প্রকাশিত হয়নি। সেই অবহেলার কথা আত্মজীবনীতে গান্ধীজী দুঃখের সঙ্গেই উল্লেখ করেছেন। গান্ধীজী ভারতে বরাবরের জন্য ফেরেন ১৯১৪ সালে, বিলাত হয়ে ও গোখলের নির্দেশে। ১৯১৫ সালে তিনি আবার

কলকাতায় এসেছিলেন, শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেছিলেন এবং সে বৎসরই ২৫শে মে আমেদাবাদে ভারতের তাঁর প্রথম কর্মকেন্দ্র 'সত্যাগ্রহ আশ্রম' প্রতিষ্ঠা করেন। রাজনীতিতে তিনি যোগ দেন আরও পরে, ১৯১৭ সালে, চম্পারণ সত্যাগ্রহের মধ্য দিয়ে। কাজেই সুভাষ যখন কলকাতায় এলেন স্থায়ীভাবে, পড়াশুনা করতে, তখনও গান্ধীজীর পদক্ষেপ ভারতের রাজনৈতিক মঞ্চে ঘটেনি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'আনন্দমঠ' লিখেছিলেন উনিশ শতকের শেষ দিকে। তাঁর সেই গ্রন্থে কল্পনা ছিল দেশমুক্তিব্রতে দীক্ষিত একদল তরুণ বিদ্রোহী সন্ন্যাসীর। গ্রন্থের পাতা হতে বাস্তবের মাটিতে এল সেই সন্ন্যাসীরা। বিশ শতকের প্রথমেই অরবিন্দ বরোদা হতে কলকাতায় এসেছিলেন একবার—সে ১৯০২ সাল। আনন্দমঠের সত্যানন্দ যেন রূপ পরিগ্রহ করল এই ক্ষীণকায় ঘুমভোলা প্রেমিক বাঙালীর মধ্যে—রূপ পরিগ্রহ করলনা, বঙ্কিমের কল্পনাকে শতগুণে শতধারে ছাড়িয়ে গেল বাস্তব, অরবিন্দের সঙ্গে সত্যানন্দের তুলনাই হয়না। শুধু বাংলার মাঠ ও প্রান্তর হতে বৈশাখী ঝড়ের মতোই অকস্মাৎ এল একদল যুবক, সংখ্যায় স্বল্প, কিন্তু ত্যাগে, বীরত্বে সকল দিক থেকেই তাদের তুলনা মেলা ভার। কয়েকটি বছরের কালপর্বে তারা যে দেশের ভিতর বিশেষ কিছু একটা গড়ে তুলেছিল তা নয়, গড়ার প্রতিভা তাদের হয়তো ছিলনা, কিংবা ছিলনা সে পথে চলার অন্তরের সায়। তারা স্বরূপের সর্বনাশা খেলায় নিজেরা মাততে ও দেশকে মাতাতে এসেছিল। উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন :

'বাংলার সে একটা অপূর্ব দিন আসিয়াছিল। আশার রঙীন নেশায় বাঙালীর ছেলেরা তখন ভরপুর। "লক্ষ পরাণে শঙ্কা না মানে, না রাখে কাহারো ঋণ।" কোন দৈব স্পর্শে যেন বাঙালীর ঘুমন্ত প্রাণ সজাগ হইয়া উঠিয়াছিল। কোন্ অজানা দেশের আলোক আসিয়া তাহার মনের যুগযুগান্তের আঁধার যেন মুছিয়া দিয়াছিল। "জীবন-মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন"—রবীন্দ্রনাথ যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহা সেই সময়কার বাঙালী ছেলেদের ছবি। সত্য সত্যই তখন একটা অসম্ভব বিশ্বাস আমাদের মনের মধ্যে জাগিয়া উঠিয়াছিল। আমরাই সত্য ; ইংরেজের তোপ, বারুদ, গোলাগুলি, পল্টন, মেশিনগান—ওসব শুধু মায়ার ছায়া! এ ভোগবাদীর রাজ্য, এ তাসের ঘর—আমাদের এক ফুৎকারেই উড়িয়া যাইবে। নিজেদের লেখা দেখিয়া নিজেরাই চমকিয়া উঠিতাম ; মনে হইত যেন দেশের প্রাণ-পুরুষ আমাদের হাত দিয়া তাঁহার অন্তরের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করিতেছেন।

(নির্বাসিতের আত্মকথা)

উপেন্দ্রনাথ প্রথম যোগ দেন 'যুগান্তর' পত্রিকায়, তারপর বারীন্দ্রের সঙ্গে আসেন মানিকতলার বাগানে। সেখানেই তাঁরা গ্রেপ্তার হন। দীর্ঘকাল বিচারের পর ১৯০৯ সালের ১৯ মে তাঁদের বিচারের রায় বেরোয় ; তাঁরা আপীল করেন, হাইকোর্টে আপীলের রায় বেরোয় নভেম্বরে। ক্ষুদিরামের ঘটনা ঘটে গেছে এঁদের গ্রেপ্তার হবার আগে। তারপর আলিপুর জেলে থাকাকালে নরেন গোস্বামীর হত্যা ও ফলে কানাই ও সত্যেনের ফাঁসি। নিম্নলিখিত কয়েকজন যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়ে আন্দামান যাত্রা করেন ১৯০৯ সালের ডিসেম্বরে :

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ	শ্রীউল্লাসকর দত্ত
শ্রীউপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	শ্রীহৃষিকেশ কাঞ্জিলাল
শ্রীইন্দুভূষণ রায়	শ্রীহেমচন্দ্র দাস
শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার	শ্রীঅবিনাশচন্দ্র ভট্টাচার্য

এই সাহসিক বীরেরা কেউ গেলেন ফাঁসি, কেউ রইলেন কারাগারে, কেউ গেলেন দ্বীপান্তরে—কিন্তু বাংলার আগুন তখনো নেভেনি। বোমা-পিস্তলের যুগ চলছে। ১৯১০-১১ সালে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড হয়েছে গড়ে প্রতি এক পক্ষে একটি।

'সন্ত্রাসবাদ এমন একটি অস্ত্র যার ঘুরিয়েই মার। সরকারী চাকুরিয়ারা এর ফলে যেমন আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়ত তেমনি দমনমূলক আইন প্রণয়ন ও কঠোর পীড়ন করার অজুহাত হিসাবে সরকার সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপকে ব্যবহার করত—সাধারণ রাজনৈতিক জীবনও তার ফলে উৎখাত হয়ে যেত বলত।'[১]

কিন্তু ১৯১০ সালে সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপও সাময়িকভাবে বন্ধ ছিল মনে হয়—অবশ্য ভিতরে ভিতরে যে দল গড়ার কাজ চলছিল, সেকথা আগেই বলেছি।

১৯০৭ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলার লাট এণ্ড্রু ফ্রেজারের ট্রেনে বোমা ছোঁড়া হয় নারায়ণগড় স্টেশনে। বাংলা এই প্রথম ইংরাজের ওপর আঘাত হানল। ফ্রেজারের কিছু ক্ষতি হয়নি সেদিন। ১৯০৮ সালের ৩০শে এপ্রিল প্রফুল্ল চাকী ও ক্ষুদিরাম বসু জজ কিংসফোর্ডকে হত্যার উদ্দেশ্যে মজঃফরপুরে কিংসফোর্ডের গাড়িতে বোমা ফেলেন। কিংসফোর্ড সে গাড়িতে ছিলেন না, সুতরাং তাঁরও কোন ক্ষতি হয়নি। ঐ গাড়িতে কেনেডি নামক জনৈক নির্বিরোধী ইংরেজের স্ত্রী ও কন্যা ছিলেন, তাঁরা মারা যান। প্রফুল্ল চাকী পুলিশে ধরা পড়ার সম্ভাবনা দেখে নিজের শিরশ্ছেদ নিজেই আত্মহত্যা করেন। ক্ষুদিরাম ধরা পড়েন ১লা মে। ২রা মে পুলিস হানা দেয় মাণিকতলার ৩২ মুরারি পুকুর রোডে বারীনবাবুদের বাগানে। যুগান্তর দলের যুবকরা কিছু সেখানে, কিছু অন্যত্র ক্রমে ধরা পড়েন। মোট ৩৪ জন গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয় ১১ই আগস্ট। আলিপুর জেলেই রাজসাক্ষী নরেন গোঁসাইকে হত্যা করেন কানাইলাল দত্ত ও সত্যেন বসু। এঁদের দুজনেরই ফাঁসি হয়। প্রফুল্ল চাকীকে যে ধরিয়ে দিতে সিয়েছিল সেই গোয়েন্দা নন্দলালকেও হত্যা করা হয়। সরকারী উকিল আশুতোষ বিশ্বাসকে হত্যা করেন চারুচন্দ্র বসু—তাঁরও ফাঁসি হয়। গোয়েন্দা সাবস্থল হক নিহত হন বীরেন্দ্র মল্লিকের গুলিতে—মল্লিকেরও ফাঁসি হয়। এর পর কয়েক বছর যুগান্তর দলের কার্যকলাপ আর দেখা যায়নি। সেদিক থেকে ১৯১০ সালে বাংলাদেশে বিপ্লব প্রচেষ্টার একটা অধ্যায় যেন শেষ হয়। কিন্তু আর একটি দল, অনুশীলন সমিতি, ১৯১০ থেকে ১৯১৩ সালের মধ্যে ১৪টি বড় বড় স্বদেশী ডাকাতি করে। যতীন্দ্রনাথ মুখার্জি তখনো বাংলার বিপ্লবীদের নায়কপদে বৃত হননি। তিনি সরকারী চাকরী করতেন। সাবস্থল হক হত্যা মামলায় তিনি গ্রেপ্তার হন, কিন্তু প্রমাণাভাবে ১৯১১ সালেই ছাড়া পান। এ ছাড়া ১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর রাসবিহারী বসুর নির্দেশে দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের ওপর বোমা ছোড়েন বসন্ত বিশ্বাস।

সুভাষ যখন কলকাতায় এলেন তখন বাংলার বা ভারতে নেতারা আছেন, কংগ্রেসও আছে কিন্তু সব আন্দোলন থেমে গেছে। সে বছর কংগ্রেসের অধিবেশন হয় করাচীতে—সভাপতি ছিলেন নবাব সৈয়দ মামুদ। উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনা ঘটেনি, কোন ঐতিহাসিক প্রস্তাবও নেওয়া হয়নি সে অধিবেশনে। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি তখনো জনপ্রিয়, কিন্তু তিনি যেন রণক্লান্ত, এবার যেন ইংরেজের সঙ্গে পুরনো বিবাদ সব মিটিয়ে ফেলতে চান তিনি। সব নরমপন্থী নেতাদেরই ঐ এক দশা—আর এঁরাই তখন জেলের বাইরে, কর্মক্ষেত্রে রয়েছেন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস অরবিন্দের মামলায় খ্যাতির শিখরে উঠেছেন, কিন্তু সে ব্যারিস্টার হিসাবে, রাজনীতিতে তাঁর বিশেষ কোন ভূমিকা নেই। তাঁর নেতৃত্ব এল আরও পরে। আর জওহরলাল?

১ Terrorism was, however, a two-edged weapon; it threw the official world into panic, and provided specious pleas for repressive legislation and strong-arm methods which had the effect of emasculating even normal political life,

[B. R. Nanda : The Nehrus, p. 124.]

নেহরু পরিবারের আশ্চর্য্য ব্যাপার এই যে মতিলাল ও জওহরলাল, পিতাপুত্র একই সঙ্গে রাজনীতিতে প্রবেশ করেন বলা যায়। অবশ্য আক্ষরিক অর্থে সেকথা সত্য নয়। কেননা মতিলাল কংগ্রেস কর্তৃপক্ষকে ১৯১০ সালের অধিবেশন এলাহাবাদ বসাতে নিমন্ত্রণ করেন ও নিজে হন অভ্যর্থনা সমিতির উপ-সভাপতি। জহওরলাল তখন কেম্ব্রিজে বিজ্ঞান পড়ছেন,—আর পাঠ্য-পুস্তকের তালিকা ছাড়িয়ে তিনি নিজের আনন্দে পড়ছেন ইতিহাস, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব। জহওরলাল ষোলো বছর বয়সে পিতামাতা ও ভগ্নীর সঙ্গে বিলেত যান। মতিলাল ইতিমধ্যেই আইন ব্যবসায়ে শীর্ষস্থানে পৌঁচেছেন, তাঁর প্রতিপত্তি ও বিত্তের প্রাচুর্য তখন বহুজনের ঈর্ষার কারণ। তিনি একবার পুত্রকে ইংলণ্ডে ভালো শিক্ষা দেবার জন্য নিয়ে আসেন, জওহর ভর্তি হন হ্যারোয়। পরে ১৯০৭ সালের ৩১শে জুলাই হ্যারো ত্যাগ করে জওহর উচ্চতর পর্যায়ের শিক্ষার জন্য আসেন কেম্ব্রিজে।

বিলেতে ছাত্ররূপে থাকাকালে জওহর দেশের খবর রাখতেন, দেশের স্বাধীনতার কথা ভাবতেন, আয়ার্ল্যাণ্ডের সিন্‌ফিন দলকে সমর্থন করতেন, বাবার নরমপন্থী মতামতকে সমালোচনা করতেন পত্রে, তিলক-অরবিন্দের চরমপন্থাকে সমর্থন করতেন। ১৯১২ সালের আগস্ট মাসে জওহরলাল লেখাপড়া শেষ করে দেশে ফিরে আসেন। তিনি তখন যুবক, তাঁর বিবাহের কথাবার্তা চলছে।

'জওহরলাল বিলেত হতে দেশে আসার চার মাস পর ১৯১২ সালের ডিসেম্বরে বাবার সঙ্গে একত্রে বাঁকিপুর কংগ্রেস অধিবেশনে যান। তাঁরা দেখলেন অধিবেশনের কাজকর্মে যেন কোন প্রাণ নেই। বঙ্গভঙ্গ রদ হবার আগে থেকেই রাজনৈতিক উত্তাপ একেবারে নেমে গিয়েছিল। সুরাটের ভাঙনের ফলাফল কংগ্রেস তখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। পার্টি সংগঠন যখল করে আছে নরমপন্থীরা। তারা চরমপন্থীদের দল থেকে বের করে দিয়েছে। চরমপন্থীদের নেতা তিলক তখন জেলে।'২

মুস্লিম লীগ ১৯০৬ সালে জন্মলাভ করে ইংরেজ রাজনীতির অস্ত্ররূপে—১৯১৪ সালের পর তাদের মধ্যে কয়েকটি বৃটিশ-বিরোধী ভাবনা ঢুকেছিল, কিন্তু সে পরের কথা। ১৯১৩ সালে মুস্লিম লীগ ঘোর সাম্প্রদায়িকতাবাদী ও বৃটিশ সমর্থক দল রূপে গড়ে উঠেছে। রাজনীতিতে তারা তখনো কোন আলোড়ন আনেনি।

বাংলা দেশে ও গোটা ভারতেই এই সময় আর একটি ঘটনাকে উপলক্ষ করে বিশেষ আনন্দের কারণ ঘটেছিল। রবীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেছিলেন। তার ঠিক আগে তিনি ইংলণ্ড ও আমেরিকা ঘুরে সবে দেশে ফিরেছেন। ১৯১২ সালের ২৭শে মে বম্বে থেকে রওনা হয়ে তিনি প্রথম যান লণ্ডন, তারপর ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে তিনি গিয়েছিলেন আমেরিকা। সেখানে ছয় মাস কাটিয়ে দেশে যখন ফিরলেন তখন শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মের ছুটি চলছে। বিদ্যালয় খুলবার কয়েকদিন পর তাঁর নোবেল পুরস্কার পাবার সংবাদ আসে। বাঙালীর জীবনে সে এক

২ In December, 1912, within four months of his return from England, Jawharlal attended the Bankipur Congress with his father. They found the proceedings rather tame. The political temperature had dropped even before the reversal of the partition of Bengal removed the running sore in Indo-British relations. The Congress had not yet recovered from the shock of the Surat split. The moderates, who were in possession of the party machine, had slammed and bolted the door against the Extremists, whose leader Tilak had been clapped into prison. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১২৪)

বিশাল গর্ব ও আনন্দের দিন। সুভাষ তখন কলকাতায়। তিনি কলেজে ভর্তি হয়েছেন, কিন্তু ক্লাস হয়তো শুরু হয়নি। বেনেনা গ্রীষ্মের বন্ধের পর কলেজ সে সময় খুলেছে কিনা জানা নেই। সুভাষের জীবনের গোড়ার দিকে রবীন্দ্রপ্রভাব বেশি পড়েছিল বলে মনে করার কারণ আছে, কিন্তু তাঁর জীবনের এই সময়কার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি অন্য অনেকের কথা যতটা উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করেছেন, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সে তুলনায় তিনি যেন নীরব। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তিনি যে কতখানি সচেতন ছিলেন, সেকথা জানাতে ভোলেননি। দেশের পুনর্গঠন সম্পর্কে সুভাষ ও তাঁর কিশোর বন্ধুরা যখন ভাবতে বসেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনের আদর্শের কথা তাঁদের বিশেষ-ভাবেই মনে এসেছিল। তিনি লিখছেন :

'অনেক আলাপ-আলোচনার পর ভেবেচিন্তে শেষটায় ঠিক হল, সত্যিকারের ভালো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমরা গড়ে তুলব। চতুর্দিকে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা থাকবে। দলের কয়েকজন এই উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এবং উত্তর ভারতের গুরুকুল বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো সমসাময়িক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিদর্শন করতে শুরু করল।' (ভারত পথিক)

সুভাষের দলের কয়েকজন শান্তিনিকেতন গিয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে কি যাননি? গিয়েছিলেন। সে কথাও লিখেছেন :

'কখনো মাঝেমধ্যে লোকজনের সঙ্গে দেখা করতে যেতাম—১৯১৪ সালে আমরা কবি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে যাই, সে সময়ে তিনি পল্লীসংস্কার সম্বন্ধে আমাদের নানা উপদেশ দেন।'

এ প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনার সুযোগ পাব, এখন শুধু এটুকুই বক্তব্য যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সুভাষ পর্যাপ্ত মাত্রায় অবহিত ছিলেন। না হয়ে উপায় ছিলনা। সুভাষের যে প্রকৃতি তাতে খেয়া, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলির গান ও কবিতা মুখস্থ করে ফেলাটাই স্বাভাবিক ; এবং শুধু অধ্যাত্ম বিষয়ক কাব্য নয়, সুভাষের জীবনের আদর্শ তখন যেদিকে মোড় নিচ্ছে তাতে রবীন্দ্রনাথের দেশপ্রেম, তখনকার দিনের রাজনীতির প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গী, সন্ত্রাসবাদী কার্য-কলাপের প্রতি তাঁর বিরূপতা, দেশের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক গঠন সম্পর্কে তাঁর চিন্তা ও কর্মধারা, পল্লীসংস্কারের প্রয়াস ইত্যাদি সমস্তই সুভাষের অবহিত থাকার কথা। কবি যে মরমী ও তত্ত্বত অন্তরে নিগূঢ় বিশ্বাসী হয়েও দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবেসেছেন, বৃহত্তর জগতের কথা চিন্তা করেছেন এটা সুভাষের পক্ষে বিশেষ আনন্দের কারণ এজন্য যে সুভাষও ঠিক একই আদর্শে বিশ্বাসবান হয়ে উঠেছিলেন, তিনি যেন ঠিক এই পথই খুঁজছিলেন। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও কাজের সঙ্গে সুভাষের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছিল একথা যদি অনুমান করা অযৌক্তিক না হয় তবে এই সিদ্ধান্ত অনায়াসেই করা যায় সুভাষ তাঁর জীবন-বিকাশের এই পর্বে রবীন্দ্রনাথ হতে প্রভূত সাহায্য পেয়েছেন। আর সেদিন বাংলা দেশে কম বেশি সব শিক্ষিত তরুণ সম্পর্কেই সেকথা খাটে। জাতির জীবনে রবীন্দ্রনাথ তখন শুধু আর জনপ্রিয় একটি নাম মাত্র নয়, তিনি একটা শক্তি,—এমন কি সমনক সজ্ঞানের অগোচরেও তাঁর প্রভাব ধীরে ধীরে জাতির চিত্তকে গড়ে তুলছে ; তিনি তাদের ভাবনা-বেদনাকে শুধু প্রতিবিম্বিত করছেন না, নতুন আকার দিচ্ছেন, আনছেন জাতির চিন্তা, আদর্শ ও সৌন্দর্য-বোধে রূপান্তর ; আমাদের প্রাত্যহিক সংলাপের ভাষাকে পর্যন্ত তিনি বিবর্তিত করে তুলছেন। সুভাষ, বাঙালী সমাজের আর সবার মতোই রবীন্দ্রপ্রভাবের ঋতের মাঝেই বড় হয়ে উঠেছেন—কাজেই তাঁর জীবনের গঠমানতার কালে রবীন্দ্রনাথের প্রভাব তাঁর অগোচরেই ক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই—সম্ভবত এ কারণেই পৃথক ও সবিশেষ উল্লেখের প্রয়োজন তিনি অনুভব করেননি।

বাঙালীর ও ভারতীয়ের জীবনে আরও গৌরবের উৎসমূল তখন স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়। বিদেশে এঁদের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা তখন ঈর্ষাতীত। এঁরা দুজনেই ছিলেন প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক। এঁদের কাছে পড়ার সুযোগ সুভাষের হয়নি। তিনি এঁদের দেখেছিলেন, মৌন শ্রদ্ধা জানিয়েছিলেন, এঁদের অনন্ত দেশ-প্রেমের আলোয়, নিজের পথের সার্থকতা বুঝতে নিশ্চয়ই তাঁর সুবিধা হয়েছিল। পরে কর্মজীবনে আচার্য রায়ের নেতৃত্বাধীনে কাজ করার সুযোগ সুভাষের এসেছিল—সেই কাজের মাধ্যমে দেশ যেমন আচার্য রায়ের মহত্ত্ব ও কর্মকুশলতার পরিচয় পেয়েছিল আর একবার, তেমনি সুভাষকেও নতুন করে চিনতে পেরেছিল। সে প্রসঙ্গ আলোচনা করব পরে। কিন্তু এখানে এটুকু উল্লেখ করা যায় যে আচার্য বসু ও আচার্য রায়ের উপস্থিতি কলেজ জীবনের গোড়ার দিনগুলি সুভাষের নিকট আনন্দকর করে তুলেছিল—তাঁদের স্বাস্থ্যকর প্রভাবের মুক্ত পদচারণা করে সুভাষ তৃপ্তি পেয়েছিলেন। জীবন-বিকাশের ইতিহাসে সেদিনের এই তৃপ্তিটুকুর দাম কম নয়। কলেজীয় আবহাওয়ার স্বাস্থ্যকর দিকের আলোচনা করতে সুভাষ তাই ভোলেননি। লিখেছেন :

'আজকের প্রেসিডেন্সীর সঙ্গে সে যুগের প্রেসিডেন্সি কলেজের অনেক প্রভেদ ছিল। অধ্যাপকমণ্ডলীতে সে সময়ে জগদীশচন্দ্র বসু এবং প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উপস্থিতি এর একটা কারণ।

সুভাষ এঁদের কী দৃষ্টিতে দেখেছিলেন তা বোঝা দুরূহ নয়। জগদীশচন্দ্র ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির, অধ্যাপনা ভিন্ন ছাত্রদের অন্যান্য কাজকর্মে তিনি যোগ দিতেন না। তারপর সুভাষ যখন কলেজে এলেন ছাত্র হয়ে জগদীশচন্দ্র তখন আবার য়ুরোপ-আমেরিকা সফরে বেরিয়ে পড়েছেন—আবার নিজের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আন্তর্জাতিক বিজ্ঞানের দরবারে উপস্থিত করে যুগপৎ বিস্ময় ও শ্রদ্ধা উদ্রেক করেছেন। দেশবাসীর সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররাও তাতে যে বিশেষ উল্লসিত ও গৌরবান্বিত হয়েছিল কী পরিমাণে আমরা তা পরে আলোচনা করছি। সুভাষও এই গৌরবের অংশীদার হয়েছিলেন। কিন্তু তবু জগদীশচন্দ্র ছিলেন তাঁর কাছে দুরন্তর জগতের লোক—মনের মধ্যে তাঁর জন্য ছিল অপরিমেয় সম্ভ্রম, কিন্তু মেলা-মেশার কোন সুযোগ ছিল না, একটু নিকটতর করে পাবার উপায় ছিল না। আচার্য রায় কিন্তু এদিক থেকে ছিলেন মুক্ত প্রকৃতির লোক—সাদাসিদে ভাবের। ছাত্রদের সঙ্গে তিনি অন্তরঙ্গভাবে মিশতেন।

সুভাষ কলেজজীবনে এঁর সঙ্গে মিশেছিলেন—সরাসরি তাঁর ছাত্র না হয়েও। তিনি লিখছেন :

'নিজের থেকেই আমি বিখ্যাত রসায়নবিদ অধ্যাপক স্যর পি. সি. রায়ের সঙ্গে আলাপ করেছিলাম। পি. সি. রায় অবিশ্যি আমাদের পড়াতেন না, তাঁর মহানুভবতার জন্য ছাত্র মহলে তিনি অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিলেন।'

সুভাষ যখন কলকাতায় ছাত্ররূপে এলেন তখন বাংলাদেশে আরও দুজন প্রসিদ্ধ নেতা ছিলেন—যাঁরা সর্বভারতীয় নেতা রূপে সর্বত্র সম্মান লাভ করেছিলেন। স্বাদেশিকতার প্রচারে এঁদের অসামান্য অবদান সর্বজনস্বীকৃত। সেদিনের বাংলার সমাজবিকাশ বিশ্লেষণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে এঁদের কথা না বললে। একজন সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় বিপিন চন্দ্র পাল।

সুরেন্দ্রনাথের জন্ম ১৮৪৮ সালে, বাংলার নবজাগৃতি পর্বের তখন প্রথম ভাগ। তাঁর পিতামহ যেমন ছিলেন গোঁড়া রক্ষণশীল, তেমনি তাঁর পিতা ডাক্তার দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন প্রগতিপন্থী, ব্রাহ্ম, ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষার বিশ্বাসী। বিশ বছর বয়সে ১৮৬৮ সালের ৩রা মার্চ সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ড যান আই সি এস পরীক্ষা দেবার উদ্দেশ্যে, পরের বছর, অর্থাৎ ১৮৬৯ সালে সসম্মানে পরীক্ষা পাশও করেন তিনি। তাঁর সঙ্গে এক জাহাজেই গিয়েছিলেন তাঁর সমবয়সী রমেশচন্দ্র

পর, তিনিও আই সি এস হন। এঁরা দুজনেই পরে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন।

পরীক্ষায় পাশ করলেও সুরেন্দ্রনাথের বয়স নিয়ে ভুল বোঝাবুঝির দরুণ চাকরি পাওয়া নিয়ে গোলযোগ ঘটেছিল। শেষে চাকরি তিনি পেলেন, কিন্তু ভারতে ফিরে কিছুকাল কাজ করার পর তিনি উপরওয়ালার অসন্তোষভাজন হন, তাঁর চাকরি যায়। প্রতিকারার্থে আবার তিনি বিলেত যান ১৮৭৪ সালে, কিন্তু ফল তো হলই না, উপরন্তু তিনি ব্যারিষ্টারি পড়ার চেষ্টা করলেন, সে সুযোগও তাঁকে দেওয়া হল না। সেই তরুণ বয়সে উচ্চাভিলাষী সুরেন্দ্রনাথের সামনে জীবিকা অর্জনের সব পথ রুদ্ধ হয়ে গেল, দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা ও আপীল করা ব্যাপারে তাঁর সব টাকাও তখন শেষ হয়ে গেছে, পিতাও মৃত। সর্বস্বান্ত সেই যুবক সেদিন উপলব্ধি করলেন :

'আমি বুঝলাম যে আমাকে দুঃখভোগ করতে হল শুধু এই কারণে যে আমি ভারতীয়। ভারতের জনসাধারণ তখন সংগঠিত নয়, জনমত বলে কোন জিনিস নেই এবং দেশের প্রশাসনে ভারতবাসীর কথা বলার কোন উপায়ও নেই। যৌবনের সমস্ত উত্তপ্ত আবেগ দিয়ে আমি অনুভব করলাম যে আমরা আমাদের জন্মভূমিতে দাসানুদাস মাত্র, হুকুম তামিল করাই আমাদের একমাত্র কাজ। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হল সে আমাদের দেশবাসীর অসহায় অক্ষমতার একটা দৃষ্টান্ত মাত্র। যে দুঃখ আমি পেয়েছি আমার জীবনে, অন্যদেরও কি ভবিষ্যতে সেরকম দুঃখ ভোগ করতে হবে? নিশ্চয়ই করতে হবে, আমার মনে হল, যদি না আমরা ভারতবাসীরা ব্যক্তিগত ও জাতিগতভাবে আমাদের প্রতি কৃত অন্যায়ের প্রতিকার করতে পারি ও আমাদের অধিকার রক্ষা করতে পারি। সেই সর্বনাশ ও অন্ধকার ভ্রূকুটিকুটিল দুর্ভাগ্যের মধ্যে দাঁড়িয়ে আমি গ্রহণ করলাম এই সঙ্কল্প যে এই বিষয়ে আমার অসহায় দেশবাসীকে সাহায্য করার কাজে আমি ব্রতী হব।'*

সেবার সুরেন্দ্রনাথ ইংলণ্ডে ছিলেন ১৮৭৩ সালের এপ্রিল মাস থেকে ১৮৭৪ সালের মে মাস পর্যন্ত—এই তেরো মাস। এই সময়ে শুধু তাঁর জীবনের লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়ে গেল তাই নয় তিনি সেই লক্ষ্য সাধনের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করতেও সুরু করলেন। ইষ্ট মোলেসি নামে এক গ্রামে তিনি একখানি ঘর নিলেন আর রাতদিন সেখানে পড়াশোনা করতে লাগলেন বিশেষ করে ইতিহাস ও বিভিন্ন দেশে জাতীয়তাবাদের বিকাশ ও আন্দোলন সম্পর্কে। মাজিনি তাঁকে গভীরভাবে প্রভাবিত ও উদ্বুদ্ধ করলেন : তিনি লিখেছেন যে সে বছরটা ছিল তাঁর জীবনে প্রস্তুতির বছর। পরাধীনতা অবসের সেবায় নিঃস্বার্থ জীবনোৎসর্গের আদর্শ যত তাঁর হৃদয়ে উজ্জ্বল

---

* I felt that I had suffered because I was an Indian, a member of a community that lay disorganised, had no public opinion, and no voice in the counsels of their Government, I felt with all the passionate warmth of a youth that we were helots, hewers of wood and drawers of water in the land of our birth. The personal wrong done to me was an illustration of the helpless impotency of our people. Were others to suffer in the future as I had suffered in the past? They must, I thought to myself; unless we were capable as a community of redressing our wrongs and protecting our rights, personal and collective. In the midst of impending ruin and dark, frowning misfortune, I formed the determination of addressing myself to the task of helping our helpless people in this direction.'

(A Nation in Making, pp 30-31)

হয়ে উঠল তাতেই হতাশা ও মনঃপীড়া কেটে গেল, তিনি দেশে ফিরলেন নতুন মানুষ হয়ে।

বিদ্যাসাগর তখনো জীবিত। তিনি সুরেন্দ্রনাথকে তাঁর মেট্রোপলিটান কলেজে অধ্যাপনার চাকরি দিয়ে ডেকে নিলেন। ছাত্রদের মধ্যে দেশাত্মবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করতে থাকলেন সুরেন্দ্রনাথ এবং কলকাতা ও তার আশ-পাশের অঞ্চলে ছাত্র সংগঠনেও তিনি মন দিলেন। এরপর ১৮৭৬ সালের ২৬শে জুলাই তিনি ভারত সভা (Indian Association) প্রতিষ্ঠা করেন একটি সর্বভারতীয় আন্দোলনের কেন্দ্র রূপে। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর প্রভৃতি কয়েকজন Bengal Association নামে একটি সংস্থা গড়তে চেয়েছিলেন, যদিও কার্যত সেটা ঘটেনি। সুরেন্দ্রনাথ দেখলেন শুধু বাংলার কথা চিন্তা করলে হবে না, সারা ভারতের ঐক্যের কথা ভাবতে হবে এবং সর্বভারতীয় সংগঠন গড়তে হবে। তাই তিনি উপরোক্ত নামটি বেছে নিলেন। তাঁর সামনে তখন চারটি লক্ষ্য ছিল : (১) The creation of a strong body of public opinion in the country (২) The unification of the Indian races and peoples upon the basis of common political interests and aspirations (৩) The promotion of friendly feeling between Hindus and Mohammedans (৪) The inclusion of the masses in the great public movements of the day. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ৩১ নং পৃষ্ঠা) অর্থাৎ দেশে একটা প্রবল জনমত গড়ে তোলা, সাধারণ রাজনৈতিক স্বার্থ ও আশা-আকাঙ্ক্ষার ভিত্তিতে ভারতের সকল নীতি ও জনগোষ্ঠীকে ঐক্যবদ্ধ করা, হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাবের বিকাশ ঘটানো, সেদিনের বহুতীগণ আন্দোলন-গুলির মধ্যে জনসাধারণকে অংশ গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করা। যোগ্য নায়ক, প্রখর ও পরিণত রাজনৈতিক চেতনা নিয়েই সুরেন্দ্রনাথ কর্মক্ষেত্রে নেমেছিলেন।

সুরেন্দ্রনাথ এই নতুন জাতীয়তাবাদ প্রচার করতে সারা ভারত পরিভ্রমণ করেছিলেন, একবার নয়, বারবার। প্রথমবার তিনি গিয়েছিলেন লাহোর, অমৃতসর, এলাহাবাদ, দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, বারানসী। পর বৎসর তিনি যান মাদ্রাজ, বম্বে, সুরাট, আমেদাবাদ, পুণা ইত্যাদি শহরে। এই সব স্থানে তিনি জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছিলেন, বিপুল পরিমাণে সম্বর্ধিত হয়েছিলেন, এবং তাঁর ভারত-সভার শাখাও স্থাপিত হয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হবার বহু আগেই সুরেন্দ্রনাথ একটি নিখিল ভারতীয় রাজ-নৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন এবং ১৮৮৫ সালে যারা কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা করেন, দশ বৎসর আগেই সুরেন্দ্রনাথ নিতান্ত যুবক বয়সেই তাঁদের চেয়ে অধিক রাজনৈতিক চেতনা, স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী, কর্মদক্ষতা ও নেতৃত্বগুণের পরিচয় দিয়েছিলেন। ১৮৮৫ সালে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার প্রথম অধিবেশন হয় বম্বে তখন সে খবরটি পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের নিকট গোপন রাখা হয়েছিল শুধু এই ভয়ে যে তাঁকে এই প্রতিষ্ঠানের বাইরে না রাখলে নেতৃত্ব তাঁর হাতে চলে যাবে। কিন্তু একথা বুঝতেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাতাদের বিলম্ব হয়নি যে সুরেন্দ্রনাথকে বাদ দিলে কংগ্রেস কখনোই শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হবে না। সুরেন্দ্রনাথ তখন অতিশয় জনপ্রিয়, ১৮৮০ সালে ৪ঠা মে থেকে ৩১শে জুলাই পর্যন্ত মাত্র তিনি নির্ভীক সাংবাদিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে যখন জেল খাটেন তখনই তিনি বাংলাদেশের অবিসম্বাদিত নেতা এবং ভারতের নির্ভীক জাতীয়তাবাদী নেতাদের অগ্রণণ্য রূপে পরিচিত হয়ে গেছেন। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে ১৮৮০ সালেই কলকাতায় তিনি প্রথম জাতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন ডাকেন। অ্যালবার্ট হলে এই অধিবেশন বসেছিল ২৮শে ডিসেম্বর থেকে ৩০শে ডিসেম্বর

(শেষাংশ ১৮২ পৃষ্ঠায়)

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

দ্বন্দ্ব

হেগেলের মতে বিশ্বজগৎ অশ্রান্ত গতিতে বিকাশের পথে চলেছে। জগতের অণু, পরমাণু সব কিছু প্রতি মুহূর্তে পরিবর্তিত হতে হতে সামনের দিকে প্রবাহিত হয়ে চলেছে এবং সারা বিশ্বে কোথাও এমন কোনো কিছু নেই যা' কোনো কালে গতিহীন বা অচল হয়ে থেমে ছিলো বা থাকবে। অনাদি কাল থেকে এই বিপুল বিশ্বলোক বিবর্তনের তাড়নায় চঞ্চল। কিন্তু এই যে চির-চলিষ্ণু হয়ে ছুটে চলেছে ভবিষ্যতের পানে, এই চলিষ্ণুতা তার অন্তর্নিহিত ধর্ম। একে কেউ বাইরে থেকে তার ওপর চাপিয়ে দেয় নি। বিশ্বের মর্মে মর্মে বয়ে যাচ্ছে পরিবর্তনের স্রোত, এ আমাদের চোখে কখনো পড়ে, কখনো পড়ে না। কিন্তু গতির বিরাম নেই। ছোট, বড়ো, সূক্ষ্ম, স্থূল, নতুন-পুরণো—সব কিছুই গোপন প্রেরণায় বিবর্তিত হতে হতে চলেছে। যারা বস্তু বা ঘটনাকে অচল, অনড় ও খণ্ডিত দেখে, তারা প্রকৃত সত্যকে ধরতে পারে নি, কারণ তারা বিশ্লেষাত্মক খণ্ডবুদ্ধির (Understanding) যাদুতে পড়েছে। বিশ্লেষাত্মক বুদ্ধিই বস্তুরাশিকে বিচ্ছিন্ন ও খণ্ডিত করে দেখায় এবং ফলে মানুষ মনে করে বস্তুগুলো খণ্ড খণ্ড, গতিহীন ও স্থাণুবৎ বা স্থির। কিন্তু আসলে গতিই (movement) জীবনের ও জগতের মৌলিক ও সনাতন সত্য। এই গতির পোড়ার সত্যই হল ডায়লেকটিক এবং এই গতির ছন্দই ডায়লেকটিকের ত্রিতাল।*

সমস্ত বিশ্ব প্রত্যেক স্তরকে ছাড়িয়ে আরো, আরো এবং আরো বিকাশের পথে চলেছে। এই 'আরো'র পথে যেতে তাকে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হচ্ছে। এই ছাড়িয়ে যাবার তত্ত্বই ডায়লেকটিক তত্ত্ব।† এর উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল বস্তুকে অনড় ও গতিশীলরূপে অনুধাবন করে বিশ্লেষণী বুদ্ধির সসীম খণ্ডতায় প্রদর্শন করা।

কাজেই যেখানেই পরিবর্তন সেখানেই ডায়লেকটিকের রাজত্ব। ডায়লেকটিককে ছাড়িয়ে যেতে পারে না বিশ্বের কোনো অংশই। সকল অভিজ্ঞতায় ও সর্বস্তরের চেতনায় যে বিধি

---

* "Wherever there is movement, wherever there is life, wherever anything is carried into effect in the actual world, there dialectic is at work." (Logic of Hegel : Wallace, p. 148)

† "Its purpose is to study things in their own being and movement and thus to demonstrate the finitude of the partial categories of understanding." (Life of Hegel : Wallace, p. 149)

অনুভূত হয় তাকেই প্রকাশ করে', রূপদান করে ডায়লেক-টিক ।*

কোনো অবস্থাকেই আঁকড়ে থাকবার উপায় নেই, কালের যাত্রীর সবাইকেই অংশী হতে হবে। মহাকালের পদচিহ্ন তাই পড়েছে সব কিছুর বুকের ওপরে—সব সত্তা, সব বস্তু সবের পথ ধরে চলেছে বিকাশের দিকে। এই বিলয়ের পথই জগতের বিকাশের পথ এবং এই বিলয়ের ছন্দই ধরা পড়েছে ডায়লেকটিকের ত্রিমূর্তিতে।**

তা হলে ডায়লেকটিকের সার বা নির্যাস হল পরিবর্তন বা গতি এবং এই পরিবর্তনও আবার স্থিতি-প্রতিস্থিতি ইত্যাদি তিনটে সিঁড়িতে পা ফেলে ফেলে চলেছে সর্বত্র ও সর্বকালে। প্রত্যেক বস্তুই জগতে আত্মবিরোধে জর্জরিত। কারণ প্রত্যেক বস্তুই নিজেকে নিয়ন্ত্রন করছে অহরহ। আগেই বলা হয়েছে যে স্থিতি (Thesis) অবিমিশ্র (homogeneous) বস্তু নয়, কারণ প্রত্যেকটি স্থিতি (Thesis) প্রকৃতপক্ষে এর আগেকার স্থিতি-প্রতিস্থিতির (Thesis ও Antithesis) সমন্বয় বা সংস্থিতি (Synthesis)। এই স্থিতির (Thesis) মধ্যেই ভবিষ্যৎ প্রতিস্থিতির (Antithesis) বীজ রয়েছে সুপ্ত হয়ে এবং সেই সুপ্ত বিরুদ্ধশক্তি স্থিতিকে নিয়ন্ত্রন করে প্রতিস্থিতিরূপে জন্ম নেবে। প্রত্যেক বস্তুর মধ্যেই এই আত্মবিরুদ্ধতার প্রবণতা লুকিয়ে কাজ করছে, যেমন কোন কোন নিম্নস্তরের প্রাণী নিজে নিজেই দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি সন্তানে পরিণত হয় কিম্বা কেউ নিজে মরে গিয়ে সন্তানকে জন্ম দিয়ে যায়। এ সম্বন্ধে হেগেল বলেন :

"But when we look more closely, we find that the limitations of the finite do not merely come from without; that its *own nature is the cause of its abrogation*, and that by its own act it passes into its counterpart."

সমস্ত খণ্ড খণ্ড বস্তুর মর্মেই আত্মবিরোধ এবং আত্মখণ্ডন (self-abrogation)। প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যেই তার বিরুদ্ধ-সত্তা লুকিয়ে আছে। হেগেল এই তত্ত্বকে বুঝিয়েছেন কতগুলো দৃষ্টান্ত দিয়ে : যেমন,

(ক) জীবন ও মৃত্যু। জীবনের প্রতিস্থিতিই (Antithesis) মরণ এবং জীবনের গর্ভেই লুকিয়ে আছে মৃত্যুর অমোঘ বীজ। "মানুষ মরণশীল" একথার মানে এই যে জীবনেরই মধ্যে রয়েছে মৃত্যু ; মৃত্যু বাহির থেকে আসে নি ; কিম্বা বাহিরের অবস্থা বা ঘটনার জন্যে মৃত্যু হিসেবে একথাও ঠিক নয়। জীবন নিমিষটাই বিরোধী, কারণ খণ্ডিত ও সসীম।*

(খ) প্রাকৃতিক আবহাওয়াতেও ডায়লেকটিক বিরোধ দেখা যায়। শান্ত আবহাওয়া ও ঝড়। শান্ত আবহাওয়ার মধ্যেই লুকিয়ে আছে ঝড়ের বীজ। ঝড় কোনো আলাদা, বাইরের বস্তু নয়।**

---

* "...Dialectic gives expression to a law which is felt in all grades of consciousness and in general experience. Everything that surrounds us may be viewed as an instance of Dialectic. We are aware that everything finite, instead of being stable and ultimate is rather changeable and transient." (Logic of Hegel, p. 150)

** "All things, we say,—that is, the finite world as such,—are doomed, and in saying so, we have a vision of universal and irresistible power before which nothing can stay, however secure and stable it may deem itself." (Logic of Hegel : Wallace : p. 150).

* "...life, as life, involves the germ of death and that the finite being radically self-contradictory involves its own self-suppression." (Logic of Hegel : Wallace, p. 145)

** "The process of meteorological action is

(গ) মনোজগতেও এই নীতি দেখা যায় : যথা, আইন ও নীতির ক্ষেত্রে। একদিকে অত্যধিক ক্রিয়া বলে, অন্যদিকে তার বিরোধী প্রতিক্রিয়াও সমান তীব্রতা নিয়ে দেখা দেয়। চরম শব্দ অনেক সময়েই চরম ভাবোকে জন্ম দেয়।*

১। রাজনীতি ক্ষেত্রে : অত্যধিক অরাজকতা থেকে অত্যধিক স্বেচ্ছাতন্ত্র জন্ম নেয় এবং অতিমাত্রায় স্বেচ্ছাচারতন্ত্র থেকে অরাজকতা আসবেই।†

২। ব্যক্তিগত নীতির ক্ষেত্রে : অত্যধিক আনন্দে চোখে জল আসে দেখা যায়। আনন্দ এখানে বেদনার রূপকে জন্ম দেয়। আবার গভীর বেদনা অনেক ক্ষেত্রেই সকরুণ মৃদু হাসির মধ্য দিয়ে আত্ম-প্রকাশ করে।**

এই সব দৃষ্টান্ত দিয়ে হেগেল প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে প্রত্যেক বস্তুর বুকের মধ্যেই রয়েছে তার বিরোধী শক্তি। এ হচ্ছে বিশ্ব-বিধান এবং জড়-প্রকৃতির রাজ্যে ও চেতন মনোজগতে—উভয়ত্র এই স্ব-বিরোধ (self-contradiction) অপরূপ রাজত্ব করছে।*

এতক্ষণে এইটুকু বোঝা গেল যে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল বস্তুতেই স্ব-বিরুদ্ধ শক্তি অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে। সকল বস্তুই বিরোধ দ্বারা অনুস্যূত—interpenetration of opposites-এর দৃষ্টান্ত। এই পরমাশ্চর্য তত্ত্ব হেগেল পূর্ববর্তীদের কাছ থেকে আংশিকভাবে পেয়েছেন, একথা সত্য। এই তত্ত্বকে হেগেল একেবারে আনকোড়া নতুন তত্ত্ব হিসেবে এই জগতে সর্বপ্রথম এনেছেন, একথা ঠিক নয়। আমরা আগেই দেখেছি যে পূর্বাচার্যদের মধ্যে কান্টও এই ডায়ালেকটিক তত্ত্বকে তাঁর বিখ্যাত "Antinomy" তত্ত্বের সূত্রে ব্যাখ্যা করেছেন।

আমাদের বুদ্ধি যখন বিশ্বের প্রকৃত স্বরূপকে জানতে চেষ্টা করে, তখনি বুদ্ধি Antinomy বা আত্মবিরোধিতার জালে জড়িয়ে পড়ে। অর্থাৎ, একই বিষয়ের সম্বন্ধে এমন দুইটি বিরোধী প্রতিজ্ঞা (proposition) করে বসে যাদের প্রত্যেকটিই সমান যুক্তিযুক্ত রূপে প্রমাণিত হতে পারে। কান্ট চারটি antinomy বিবৃত করে গেছেন :

১। Thesis (স্থিতি) : এই জগৎ দেশকালের দ্বারা

---

the exhibition of their Dialectic. It is the same dynamic that lies at the root of every other natural process and as it were, forces nature out of itself.' (Logic of Hegel, p. 150)

* "...we have only to recollect how general experience shows us the extreme of one state or action suddenly shifting into its opposite : a Dialectic which is recognised in many ways in common proverbs" (Logic of Hegel, p. 150).

† "Extreme anarchy and extreme despotism naturally lead to one another." (Logic of Hegel, p. 151)

** "Even feeling, bodily as well as mental, has its dialectic. Everyone knows how the extremes of pain and pleasure pass into each other : the heart overflowing with joy seeks relief in tears, and the deepest melancholy will at times betray its presence by a smile." (Logic of Hegel, p. 151)

* "We are aware that everything finite, instead of being stable and ultimate, is rather changeable and transient and this is exactly what we mean by that Dialectic of the finite, by which the finite, as implicitly other than what it is, is forced beyond its own immediate or natural being to turn suddenly into its opposite."

(Logic of Hegel : p.130)

সীমাবদ্ধ। Antithesis (প্রতিস্থিতি): এই জগৎ দেশকালাতীত অসীম।

Thesis (স্থিতি): Matter (বস্তু) অনন্ত ভাগে বিভাজ্য অর্থাৎ বস্তু যৌগিক (Composite) নয়। Antithesis (প্রতিস্থিতি): অনন্ত ভাগে বস্তু বিভাজ্য নয়, বরং এমন পরমাণুর (Atom) সমষ্টি বা অবিভাজ্য।

Thesis (স্থিতি): বস্তুনিচয় সম্পূর্ণ স্বাধীন (Free)। Antithesis (প্রতিস্থিতি): বস্তুনিচয় সম্পূর্ণরূপে অবস্থার দাস (determined) ও পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

৪। Thesis (স্থিতি): বিশ্বের আদি কারণ নিশ্চয়ই আছে। Antithesis (প্রতিস্থিতি): বিশ্বের আদিকারণ থাকতেই পারে না।

এখানে চারটি বিষয়ের সত্যিকার প্রকৃতি নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেকটি প্রশ্ন বা বিষয় সম্বন্ধেই দুরকম জবাব বা প্রতিজ্ঞা করা চলতে পারে। কাণ্ট বলছেন, একই বিষয় সম্বন্ধে যে দুটি বিরুদ্ধ প্রতিজ্ঞা (স্থিতি প্রতিস্থিতি বা Thesis and Antithesis) করা হয়েছে তাদের দুটোকেই সমান সত্য বলে যুক্তি দেওয়া যেতে পারে এবং দুটোকেই সমানভাবে প্রমাণিত করা যেতে পারে। এই চারটে বিষয়ে অনুসন্ধান করতে গিয়ে, প্রত্যেকটি বিষয় সম্বন্ধে বিরুদ্ধ উক্তি করা হয়েছে যাদের কাণ্ট Thesis ও Antithesis (স্থিতি ও প্রতিস্থিতি) নাম দিয়েছেন। এই অসঙ্গতির কারণ দেখিয়ে কাণ্ট বলছেন যে আসলে বস্তুগুলোতে কোনো বিরুদ্ধতা বা অসঙ্গতি নেই; আমাদের যুক্তি বা মনন (Reason) এদের সত্যিকার স্বরূপ কখনো জানতে পারে না, কারণ এই বিরুদ্ধতা আমাদের মননের মধ্যেই আছে (subjective)। *

হেগেলের মতে কাণ্ট যে কেবল চারটি antinomy দেখতে পেয়েছেন, এ তাঁর বিষম ভুল। Antinomy বা Contradiction যে কেবল চারটে ক্ষেত্রে আছে তা নয়। পৃথিবীর সকল বস্তুরই মধ্যে Antinomy বা আত্মবিরুদ্ধতা বাসা বেঁধে রয়েছে চিরদিন। এই নিখিল বিশ্বের ছোটবড়ো সকল সত্তাই যে antinomy (বিরুদ্ধতা) দ্বারা বিধৃত হয়ে আছে, এ-তত্ত্ব কাণ্টের চোখে ধরা পড়েনি। হেগেলের মতে কাণ্টের দ্বিতীয় ভুল হচ্ছে এই যে কাণ্ট এই antinomy কে আত্মমুখ বা ভাবগত (subjective) জিনিষ বলে মনে করেছেন। কাণ্ট বস্তু-জগতকে বিরুদ্ধতা দোষ দুষ্ট মনে করতে পারেন নি। মানুষের বুদ্ধিই রঙীন চশমা চোখে দিয়ে জগৎকে দেখছে বলে জগতের এই চারটি antinomy (বিরুদ্ধতা) মানুষের চোখে ধরা পড়েছে। হেগেল একথায় তীব্র প্রতিবাদ করে বলেছেন যে বিশ্বসত্তা ও মনঃসত্তার তুলনা করে একথা বললে অদ্ভুতই শোনায় যে বিরোধের ভূমি বা আসল বিশ্ব নয়, মন বা বুদ্ধি।*

হেগেলের মতে এই antinomy (বিরোধ) বাস্তব জগতের প্রত্যেক বস্তু, প্রত্যেক অণু-পরমাণুর মধ্যে অব্যাহত হয়ে রয়েছে। Antinomy বা বিরুদ্ধতা বিষয়মুখ,

* "According to Kant, however, thought has a natural tendency to issue in contradictions and antinomies, whenever it seeks to apprehend the infinite." (Logic of Hegel p. 94)

* "But if a comparison is instituted between the essence of the world and the essence of the mind, it does seem strange to hear,.....That thought or Reason and not the world is the seat of contradiction." (Logic of Hegel, p. 98)

(objective) বস্তু জগতের প্রকৃত ও অর্থার্থ সত্তা, বুদ্ধির মিথ্যা কল্পনা বা গঠন নয়।*

কাজেই যে-তত্ত্বকে কান্ট সংকীর্ণ ক্ষেত্রে সত্য বলে মনে করেছিলেন, সেই তত্ত্বকেই হেগেল বিস্তারিত করে সকল বিষয়ে আরোপ করলেন। দ্বিতীয়তঃ যে তত্ত্বকে কান্ট বাস্তবজগতের ধর্ম্ম না বলে বুদ্ধির রচনা বলে নির্দ্ধারণ করে দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বকেই হেগেল বুদ্ধি-জগৎ ও বস্তু জগৎ এই দুই ক্ষেত্রেরই শাশ্বত ও বিশ্বজনীন ধর্ম্ম বলে নির্দ্দেশ করলেন এবং এই তত্ত্বেরই নামাকরণ করলেন ডায়লেকটিক তত্ত্ব।**

একই বিষয় সম্বন্ধে একই কালে দুটো পরস্পরবিরুদ্ধ উক্তি করা চলতে পারে একথা কান্টই বিশেষভাবে ও স্পষ্ট করে সর্বপ্রথম বলে গেছেন তাঁর antinomy তত্ত্বের সম্পর্কে। এজন্য হেগেলও কান্টকে যথোচিত সাধুবাদ দিয়েছেন। হেগেলের মতে এই antinomy তত্ত্ব হলো আধুনিক দর্শনের অগ্রগতিতে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ধাপ ও বিরাট কীর্ত্তি।*

বিশ্বের সকল জড় ও চেতন বস্তুর গর্ভেই দুটি পরস্পর বিরুদ্ধ শক্তি বর্ত্তমান। প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় সম্বন্ধে একই সঙ্গে একই কালে পরস্পর-বিরুদ্ধ উক্তি করা যায়: এই তত্ত্বই হেগেলীয় con'radiction বা বিরোধ-তত্ত্ব এবং এই বিরোধই জগতের ভিত্তি। এখানেই হেগেলীয় লজিকের পূর্বতন আকারনিষ্ঠ (formal) লজিক থেকে পার্থক্য স্পষ্ট। হেগেলীয় লজিক এখানে একেবারে বিপরীত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আকারনিষ্ঠ লজিকের বিরুদ্ধতা করছে।

আমরা আগেই দেখেছি যে আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) ভিত্তি হচ্ছে অ-বিরোধ নীতি (Law of non-Contradiction): যে বস্তু যা আছে, তাই আছে; একই কালে কোনো বস্তু তার বিরুদ্ধ বস্তু হতে পারে না। হেগেলীয় লজিক বলছে, বিরোধই বিশ্বের সকল চিন্তা ও সকল বস্তুর ধর্ম্ম। বিরোধ-নীতিই (Law of Contradiction) জগৎ বিবর্ত্তনের সব চাইতে বড়ো তত্ত্ব: যে বস্তু যা, সে একই সঙ্গে তাই এবং তা নয়। সে বস্তু স্বয়ং ও স্ব-বিরুদ্ধ, এই দুই-ই। এই কারণে হেগেল আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক বিধি—অভেদ-নীতিকে (Law of identity) তীব্র আক্রমণ করেছেন এবং তাকে অলীক ও ভিত্তিহীন প্রমাণ করতে চেয়েছেন। তাঁর বিপরীতের অনুস্যূতি তত্ত্ব (Interpenetration of opposites) আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের মৌলিক বিধিগুলির একেবারে বিপরীত মূর্ত্তি। তিনি বলেন, প্রতিটি প্রকৃত বস্তুতে একই কালে দুইটি বিরুদ্ধ উপাদান বর্ত্তমান; কাজেই ঐ বস্তুটিকে জানা মানে তাকে ঐ দুটি বিরুদ্ধ উপাদানের একীভূত সত্তারূপে জানা।*

---

* "Here it will be sufficient to say that the Antinomies are not confined to the four special objects taken from cosmology: they appear in all objects of every kind, in all conceptions, notions and ideas (Wallace, Logic of Hegel, p. 99)

** For the property thus indicated is what we shall afterwards describe as the Dialectical influence in Logic." (Logic of Hegel, Wallace : p. 99)

* "One of the most important steps in the progress of modern philosophy" এবং "a great achievement for the Critical philosophy."
(p. 98-99, Logic of Hegel)

* "Every actual thing involves a co-existence of opposite elements. Consequently, to know or in other words, to comprehend an object is equivalent to being conscious of it as a concrete unity of opposed determinations. (p. 100, Logic of Hegel, Wallace)

অভেদনীতি (Law of Identity) সম্বন্ধে হেগেল বলেন যে, এতে জ্ঞানের বৃদ্ধি হয় না এবং এই বিধি অনুযায়ী কোনো প্রতিজ্ঞা (proposition) গঠন করলে, বিধেয় (predicate) নতুন কিছুই বর্ণনা করে না উদ্দেশ্য (Subject) সম্বন্ধে। "A = A" বললে, কিম্বা "চাঁদ চাঁদই" অথবা "সমুদ্র সমুদ্রই"—এই সব প্রস্তাবে আসলে কিছুই বলা হল না। প্রতিজ্ঞা গঠনের (Proposition formation) প্রাথমিক নিয়মকেই এই সব প্রস্তাবে অস্বীকার করা হয়েছে : কারণ উদ্দেশ্য (Subject) ও বিধেয়ের (Predicate) মধ্যে ভেদ থাকবে এই ব্যবস্থাই হোলো যে কোনো প্রতিজ্ঞার প্রধান বিশেষত্ব।*

তারপর হেগেল আরো এক যুক্তি দিয়েছেন যে, এই অভেদনীতি (Law of Indentity) আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায় বা ইন্দ্রিয়জ্ঞানেরও বিরোধী।**

হেগেলের মতে, সত্যিকার অভেদ (Identity) হল ভেদের ভাষান্তর। শুধু অভেদ (Identity) বললে যা বোঝা যায় সে হলো অবাস্তব—"abstract Identity to the exclusion of all difference." অভেদ (Identity) সর্বদাই ভেদকে (difference) লুকিয়ে রাখে নিজের মধ্যে। খণ্ডবুদ্ধি (understanding) যখন প্রত্যেকটি বস্তুকে আলাদা আলাদা করে দেখে, তখন সেই বস্তুগুলির অভেদকে (Identity) দেখে না, প্রকৃতপক্ষে তখন বস্তুগুলির মধ্যে পরস্পরের ভেদকেই (difference) সে প্রবল করে দেখে। "সাগর হল সাগর," "চাঁদ হল চাঁদ" একথা বললে প্রায় এই ধারণাই হয় যে সমুদ্র, চাঁদ ইত্যাদি সবগুলি বস্তুই পরস্পর থেকে প্রখর ও উগ্র পার্থক্যে আলাদা হয়ে আছে। কারুর সঙ্গেই কারুর কোনো সম্পর্ক নেই। জগতের সবগুলি বস্তুই যেন বিচ্ছিন্ন, একান্ত নির্লিপ্ত ও পরস্পরের প্রতি একান্ত উদাসীন ও বিমুখ হয়ে রয়েছে। হেগেল তাই বলছেন,

আমাদের সামনে যা আছে তা অভেদ নয়, ভেদ। কিন্তু বস্তুগুলিকে পৃথক মনে করেই আমরা ক্ষান্ত হই না। আমরা তাদের তুলনা করি এবং তখন তাদের সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুইই প্রকাশ হয়ে পড়ে।*

---

* This maxim instead of being a true law of thought, is nothing but the law of abstract understanding. The propositional form itself contradicts it : for a proposition always promises a distinction between subject and predicate."

(Logic of Hegel, p. 213-14)

** "To this alleged experience of the logic books *may be opposed the universal experience* that no mind thinks or forms conceptions or speaks, in accordance with this law and that no existence of any kind whatever conforms to it. Utterances after the fashion of this pretended law (A plant is a plant ; Magnetism—magnetism ; Mind is—mind) are as they deserve to be, reputed silly. That is certainly matter of general experience. The logic which seriously propounds such laws and the scholastic world in which alone they are valid *have long been discredited with practical common sense* as well as with the philosophy of reason."

(p. 214, Logic of Hegel)

* "What we have before us therefore is not identity but difference. (p. 217, Logic of Hegel)." "We do not stop at this point, however, or regard things merely as difference. We compare them one with another, and they discover features of likeness and unlikeness." (p. 217, Logic of Hegel)

জগতের সকল বস্তুই তাহলে একই সঙ্গে সদৃশ ও অ-সদৃশ। সাদৃশ্যকে ছেড়ে অসাদৃশ্য নেই, এবং অসাদৃশ্যকে ছেড়ে সাদৃশ্যের অস্তিত্ব সম্ভব নয়। সাদৃশ্যের মধ্যেই অনুস্যূত হয়ে রয়েছে ভেদ (difference)। এই অনুস্যূত ভেদই (implicit difference) হেগেলের মতে বিরোধ (opposition)।*

কাজেই Identity বা অভেদ বলতে হেগেল বোঝেন সভেদ-অভেদ (difference-cum-identity); কারণ জগতে বিশুদ্ধ ও পরম অভেদ (absolute identity) বলে কিছু নেই। এই স-ভেদ তাদাত্ম্যকেই হেগেল "বিরুদ্ধতা" বা opposition বলে আখ্যাত করেছেন এখানে।

তারপর জগতে কোনো বস্তুই স্থির হয়ে বসে নেই। চরাচরে সর্বত্র অণু-পরমাণু সবই পলে পলে বদলে যাচ্ছে, কারণ গতি বা বিবর্তনই জগতের অমোঘ সত্য। যেখানে সবাই সর্বক্ষণ কেবলি বদলে যায় ও নিত্য নূতনরূপে রূপান্তরিত হয়ে চলে, সেখানে একান্ত অভেদ বলে কিছু থাকতে পারে কি করে? কোন জিনিষই অ-ভিন্ন (identical) হয়ে থাকছে না। চলিষ্ণু জগতে অভেদ নীতি Law of Identity) নিতান্ত কল্পিত বিধি এবং এর জন্ম হয়েছে সেই থেকে—যা-খণ্ডবুদ্ধির স্বর্গ; আর সে স্বর্গ হল বিমূর্তন "(native intelligence of abstraction)।"

এই রকমে অভেদ নীতিকে (Law of Identity) বিদ্রূপ করে হেগেল বহির্ভূক্ত মধ্যপদ নীতির (Law of Excluded Middle) প্রতি তীব্র অস্ত্র প্রয়োগ করেছেন। তিনি বলেন, এই নীতিও অসঙ্গতিকে এড়াতে গিয়ে নিজেই অসঙ্গতিতে (contradiction) জড়িয়ে গেছে। পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা একই কালে একই বস্তুর ওপরে আরোপিত হতে পারে না, একথা ঠিক নয়। হেগেল বলেন, সকল বিরোধের উপরে এমন একটা ভূমি আছে যেখানে বিরুদ্ধ দুটো সংজ্ঞাই সুরক্ষিত হয়ে সামঞ্জস্যে বিধৃত হয়। "পূবে ৬ মাইল" বললে এবং "পশ্চিমে ৬ মাইল" বললে তখনি মনে হয় যে পূব-পশ্চিম ইত্যাদি সংজ্ঞার সঙ্গে সর্ব-সম্পর্কশূন্য একেবারে শুদ্ধ ও অবিশেষিত "৬ মাইল" বলে একটা কিছু আছে, যা পূবও নয়, পশ্চিমও নয়, কিংবা পূবও হতে পারে, পশ্চিমও হতে পারে।**

আসলে অস্তি ও নাস্তি দুটো আলাদা বস্তু নয়। এদের খোড়ার গেলে দেখা যাবে অস্তি-নাস্তি মিলে এরা একই জিনিষ।***

যে বস্তু একদিক থেকে দেখলে 'অস্তি'মূলক, অন্য দিক থেকে দেখলে সেই বস্তুই 'নাস্তি' মূলক। একই সত্তার

* "Difference implicit is essential difference, the Positive and the Negative···the one is made visible in the other, and is only in so far as the other is. Essential difference is therefore opposition, according to which the different is not confronted by 'any' other but by 'its' other." (p. 214, Logic of Hegel)

** "A must be either + A or — A, it says. It virtually declares in these words a third A which is neither + nor —, and which at the same time is yet invested with + and — characters. If + W mean 6 miles to the West and — W mean 6 miles to the East, and if + and — cancel each other, the 6 miles of way or space remain what they were with and without the contrast." (p. 220, Logic of Hegel)

*** "The two however are at bottom the same: the name of either might be transferred to the other. (p. 222, Logic of Hegel).

এ-পিঠ ও-পিঠ বৈ এরা আর কিছু নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ হেগেল বলেন :

১। দেনা ও পাওনা (debts and assets) স্বতন্ত্র জিনিষ নয়। এরা একই পদার্থ। যা দেনাদারের কাছে নাস্তিমূলক, পাওনাদারের কাছে তাই একান্ত অস্তিমূলক।

২। পূবের পথ ও পশ্চিমের পথ (the way to the East & the way to the West) আসলে একই পথ। যে পথ পূবের দিকে গেছে বলে মনে হয়, অপরদিক থেকে তাই পশ্চিমমুখো মনে হবে।

৩। উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু আলাদা করা মুস্কিল। একটাকে ছেড়ে অন্যটি হতে পারে না।

৪। ধনাত্মক ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ আলাদা কিম্বা স্বতন্ত্র সত্তা নয়। একে অপরকে অর্থপূর্ণরূপে সূচিত করে।

৫। জৈব ও অজৈব প্রকৃতি (Organic & Inorganic Nature) : পরস্পর সংশ্লিষ্ট ও অবিচ্ছেদ্য।

৬। জড় প্রকৃতি ও মন (Nature & Mind) : মন ছাড়া জড় নেই ও জড় প্রকৃতি বাতীত মনের অস্তিত্বও নেই।

এখানে হেগেল opposition মানে বলেছেন দুটো বস্তুর মুখোমুখী প্রখর দ্বন্দ্ব ; কেবল পার্থক্য বা বিভিন্নতা নয়—যে বিভিন্নতা কোনো বস্তুর অপর হাজার হাজার বস্তুর সঙ্গে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় যে 'দেনা' জিনিষটা কেবল 'পাওনা' থেকে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য অগণিত জিনিষ, যেমন 'হাঁসের ডিম', 'পাথর' 'সৌন্দর্য' ইত্যাদি থেকেই পৃথক। এখানে কেবল পার্থক্য বা difference বর্তমান রয়েছে, দ্বন্দ্ব নেই। কিন্তু 'পাওনা'র সঙ্গে 'দেনা'র একটা মুখোমুখী সোজা দ্বন্দ্ব রয়েছে যা অন্য বস্তুর সঙ্গে নেই। এই রকম ধনাত্মক বিদ্যুৎ ও ঋণাত্মক বিদ্যুৎ, পূর্ব ও পশ্চিম ইত্যাদির সম্বন্ধেও ঐ একই কথা বলা চলে। এসব ক্ষেত্রে সাধারণ ভেদ মাত্র (more difference) নয়, এখানে প্রধান হয়ে দাঁড়া উচিয়ে আছে বিষম দ্বন্দ্ব। হেগেলের কথায় :

> In opposition, the different is not confronted by 'any' other, but by '*its*' other··· The other is seen to stand over against '*its*' other. Thus, for example, inorganic nature is not to be considered merely something else than organic nature, but the necessary antithesis of it." (p. 222., Logic of Hegel)

পদার্থ বিজ্ঞানের মতানুসারেও বিরোধই (opposition) প্রকৃতির রাজ্যের সাধারণ বা বিশ্বজনীন বিধি ("universal law pervading the whole of nature" p.223 Logic of Hegel.)। বিজ্ঞান সর্বপ্রথমে চৌম্বকতত্ত্বে (magnetism) মেরুবৈপরীত্য (polarity) আবিষ্কার করেছে, এবং এই মেরুধর্ম (polarity) বিপরীততার দৃষ্টান্ত বৈ আর কিছুই নয়। কাজেই হেগেল বহির্ভূক্ত মধ্যপদের নীতিকে (Law of Excluded Middle) অস্বীকার করে বলছেন, বিশ্বের সর্বত্রই একই সঙ্গে একই কালে পরস্পর বিরোধ বিসেমিশে বাস করছে, এবং কোথাও 'এটা কিম্বা ওটার' ("Either-or") কোনো স্থানই নেই। বিরোধই হল বিশ্বের প্রেরণা-নীতি (moving principle), কাজেই 'বিরোধ অচিন্তনীয়' একথা বলা হাস্যকর।*

* "Instead of speaking by the maxim of excluded middle (which is the maxim of abstract understanding) we should rather say : Every thing is opposite. Neither in heaven nor in earth, neither in the world of mind nor of nature, is there anywhere such an abstract 'Either—or' as the understanding maintains. *Whatever exists is concrete,*

হেগেলের কাছে বিশ্বজগতের মূলতত্ত্বই হোলো 'বিরোধ' বা contradiction এবং বিশ্বনাট্যের সকল অধ্যায়েই কেবল একই তত্ত্বের জয়যাত্রার ইতিহাস লিখিত হচ্ছে। জড় ও চেতন, বহির্জগৎ ও মনোলোক – সর্বক্ষেত্রেরই আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলা হচ্ছে এই Law of Contradiction বা স্ববিরোধ তত্ত্বের জটিল বিলাসের বিচিত্র ইতিহাস। কাজেই আকারনিষ্ঠ ন্যায়ের (Formal Logic) মৌলিক ও বিশ্বলৌকিক বিধিগুলি কেবলি বিভ্রান্তবুদ্ধির কল্পনা। অভেদনীতি (Law of Identity) এবং তারই অপর পিঠে বিরোধ নীতি (Law of Contradiction) ও বহির্ভূক্ত মধ্যপদের-নীতি (Law of Excluded Middle) ভিত্তিহীন, অবাস্তব ছেঁদো কথার কচকচি মাত্র ; সুতরাং বর্জনীয়।

স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি (Thesis, Antithesis Synthesis) প্রত্যেকেই আগেকার থাপকে নিরসন করে (negate) নিজের আসন পাতছে। জগতের সব বস্তুই যদি এমনি করে স্থিতি-প্রতিস্থিতি-সংস্থিতি ইত্যাদি ক্রমে পরস্পরকে নিরসন করে করেই পরিবর্তিত হতে থাকে, তবে এই গতির নগদ ফল কি দাঁড়ায়? সকলেই যদি পূর্ববর্তীকে বাতিল করে (abrogate) নিজেকে কায়েম করে, তবে শেষ পর্যন্ত ফল দাঁড়ায় "সহস্রী বিনষ্টি:।" মন্দ কি?

---

with defference and opposition in itself..... Contradiction is the very moving principle of the world ; and it is ridiculous to say that contradiction is unthinkable." (p.225, Logic of Hegel)

(ক্রমশ:)

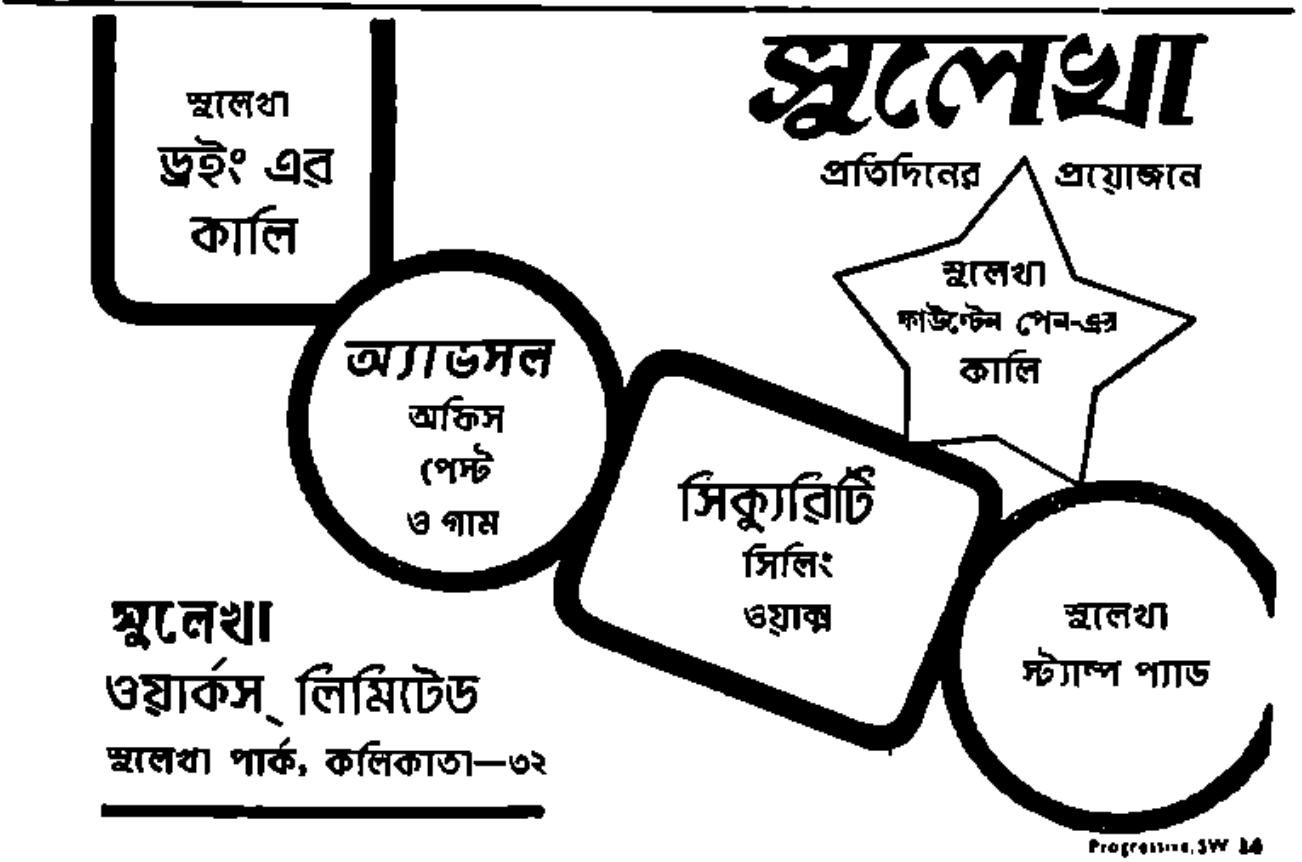

সুভাষচন্দ্র—(১৭২ পৃষ্ঠার পর)

পর্যন্ত। সারা ভারত থেকে প্রতিনিধিরা যোগ দিয়েছিলেন। ১৮৮৪ সালে সুরেন্দ্রনাথ আবার ভারত ভ্রমণে বের হন এবং ১৮৮৫ সালে কলকাতায় দ্বিতীয়বার জাতীয় কনফারেন্সের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় (২৫শে-২৭শে ডিসেম্বর)। এই রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানটি তখন সারা ভারতে বিকৃত পেয়েছে। পরের বছর, ১৮৮৬ সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন বসে এবং সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসে যোগ দেন। সেই হতে জাতীয় কনফারেন্সের কাজ চাপা পড়ে যায় ও কংগ্রেস জাঁকিয়ে ওঠে। ১৮৯৫ সালে সুরেন্দ্রনাথ কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন প্রথমবার।

জীবনে বহু আন্দোলন তিনি করেছেন এবং সাফল্যও লাভ করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে বৃহত্তম যে আন্দোলনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন সে হচ্ছে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন। সে আন্দোলন সম্পর্কে পরে বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ আমাদের হবে। এইটুকু শুধু এখানে উল্লেখ্য যে এই আন্দোলন চলাকালেই সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্ব বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়, মেদিনীপুরে ও সুরাটে কংগ্রেসের ভিতরে বামপন্থী দলের সঙ্গে তাঁকে শক্তি পরীক্ষা করতে হয় এবং তখনকার মতো জিতলেও পরাজয়ের সেই তাঁর সূচনা। ততদিনে অরবিন্দ, বিপিন পাল, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আর এক ভিন্নতর জাতীয়তাবাদ, স্বরাজ, দেশপ্রেম ইত্যাদির কল্পনা দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেছেন, নিঃস্বার্থ ত্যাগব্রতী একদল যুবক রক্তের স্বাক্ষরে ভিন্নতর আর এক পথের দিশা দিতে সুরু করেছেন—সুরেন্দ্রনাথ সেই নবযৌবনের শক্তি ও প্রতিজ্ঞাকে ভুল বুঝলেন, যদিও এঁদের প্রতি তাঁর যে সহানুভূতি আদপেই ছিল না তা নয়। তিনি মনে করলেন এই আন্দোলনের এই যে নতুন ভাষা ও রূপ এ নৈরাজ্যপন্থী যায়, এর ফল শুভ নয়। এ সম্বন্ধে স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন :

'নৈরাজ্যবাদের প্রতি কারও কোন সহানুভূতি থাকতে পারে না। হত্যা হত্যাই—যে নামেই তার বর্বরতাকে মোলায়েম করার চেষ্টা হোক, কিংবা যে উদ্দেশ্য দেখিয়েই তাকে গ্রহণীয় করার চেষ্টা হোক না কেন।*

দেশের নতুন বাণীর সঙ্গে সুরেন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিচ্ছেদ ঘটে গেল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরিসমাপ্তিতেই তিনি সরকার পক্ষে যোগ দেওয়া স্থির করলেন। পরে ১৯২১ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তিনি মন্ত্রীরূপে লাট পরিষদে প্রবেশ করেন। জনমতের সমর্থন শেষ জীবনে তিনি এতদূর হারিয়ে ফেলেন যে নির্বাচনেও তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়। কিন্তু সে পরের কথা।

সুভাষ কলকাতায় এসে সুরেন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন। তাঁর বক্তৃতা শুনেছিলেন। কিন্তু তাঁর বক্তব্য ও আদর্শ সুভাষকে আকৃষ্ট করেনি। সুরেন্দ্রনাথের রাজনৈতিক আদর্শ ও কর্মপন্থা সুভাষের কলকাতা আসার আগেই তরুণের দল পরিত্যাগ করেছে ও সুভাষের তাই সে কর্মপন্থা আরও খারাপ লাগারই কথা। এমন কি সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতায় যে দৈবশক্তির পরিচয় পাওয়া যেত তাতেও সুভাষ মুগ্ধ হননি—একটা বিশেষ অভাব সুরেন্দ্রনাথের কথার মাঝে তিনি অনুভব করেছিলেন। তিনি লিখছেন :

'সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির লোক ছিলেন সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি। তাঁকে একসময়ে বাঙলার মুকুটহীন রাজা বলা হত। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতাদের তিনি অন্যতম। যতদূর মনে

* With anarchism no one can have any sympathy. Murder is murder, no matter by what name the deed is sought to be palliated, or by what motives excused.

(পূর্বোক্ত গ্রন্থ, ২১৮ পৃঃ

পড়ে ১৯১৩ সালের শেষে কিংবা ১৯১৪ সালের গোড়ায় দক্ষিণ আফ্রিকায় মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ সম্পর্কে কলকাতার টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি সভায় তাঁকে প্রথম দেখি। তখন পর্যন্ত সুরেন্দ্রনাথের অসাধারণ বাগ্মিতায় দেশ মুগ্ধ। সভার মধ্যেই তিনি প্রচুর টাকা তুলে ফেললেন। কিন্তু অত ভালো বক্তা হলেও সুরেন্দ্রনাথের মধ্যে সেই প্রাণস্পর্শ ছিল না যা অরবিন্দের অতি সাধারণ কথার মধ্যেও পাওয়া যেত।'

বিপিন পাল সুরেন্দ্রনাথের চরিত্রের এই অভাবটা কী ও কেন তা একটি কথাতেই পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন :

'সুরেন্দ্রনাথ আজি পর্যন্তও তাঁর স্বদেশের প্রাণবস্তুর সংস্পর্শ লাভ করিতে পারিয়াছেন কি না সন্দেহ।' (চরিত-কথা)

সুরেন্দ্রনাথ যখন লোকমান্যতার চরম শিখরে আরূঢ় তখনই সুদূর মফঃস্বল হতে আগত কিশোর সুভাষের চোখে সুরেন্দ্রনাথের এই ব্যর্থতার দিক ধরা পড়ে গেল। ধরা পড়ল এই কারণে নয় যে সুরেন্দ্রনাথ সত্যিই ব্যর্থ ছিলেন, বা তিনি সাধারণ পর্যায়ের লোক ছিলেন। তা নয়। তাঁর যা দেবার ও বলবার দেশ তা বহুদিন আগেই শুনেছে ও গ্রহণ করেছে—এখন দেশের নতুন যুগ, নতুন প্রয়োজন, নতুন তার আকাঙ্ক্ষা ; অরবিন্দের বাণী তার উপযোগী. সুরেন্দ্রনাথ তখন পূর্বযুগের মানুষ বলে কথিত ; সেটাই স্বাভাবিক। সুরেন্দ্রনাথ যখন প্রথম রাজনৈতিক কর্মে নামেন ও তাঁর বক্তব্য প্রথম দেশবাসীর কাছে তুলে ধরেন তখন তাঁর আগ্রহী শ্রোতাদের মধ্যে ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ—তাঁর দশ কৈশোর তখন। সেই বিবেকানন্দ বড় হলেন, সাধনা করলেন, জগতে নতুন ভাবের তরঙ্গ আনলেন, দেশকে আলোড়িত করলেন, দেহরক্ষাও করলেন। সুরেন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও চরম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠা লাভ এসবের পরের ঘটনা। কিন্তু দেশ তখন বিবেকানন্দের ভাবধারায় পূর্ণ, ত্যাগ ও বীর্যই তখন দেশের সামনে প্রধান আদর্শ, সুভাষ বালা হতে সেই আদর্শে দীক্ষিত। সুরেন্দ্রনাথের বৈধ, আপোষকামী আন্দোলন, নিখুঁত লাভালাভের বিচার ও প্রাণ দেওয়া-নেওয়ার ভীতি ও বিরক্তি—সে সময়কার যৌবনধর্মের ভালো লাগার কথা নয়, সুভাষের তাই তা এক মুহূর্তও ভালো লাগেনি। এই ঘটনায়ই বোঝা যাচ্ছে, সুভাষ নতুন কালের নতুন মানুষ হয়ে উঠতে চাইছেন, নবযুগের নতুন ভারত-পথিক হওয়ারই স্বপ্ন তাঁর। পুরাতনের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা আছে, কিন্তু তাকে আঁকড়ে ধরতে তিনি নারাজ।

আর একজনের প্রসঙ্গ আলোচনা করলেই আপাতত সুভাষের কলকাতা আগমনের সময়কার যুগচিত্রখানি পূর্ণতা পাবে। তাঁর নাম বিপিন চন্দ্র পাল, এবং সুভাষ এঁর কথা নিজ জীবন প্রসঙ্গে আদৌ উল্লেখ করেননি। কিন্তু বিপিন পালের সঙ্গে তাঁর যে পরিচয় হয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, তিনি যে তাঁকে শ্রদ্ধা করেছিলেন সে বিষয়েও সন্দেহ নেই এবং তার চেয়েও প্রধান কথা বিপিন পালের চিন্তাধারা সুভাষের নিজের চিন্তাধারা ও উপলব্ধির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে।

বিপিন পালের জন্ম হয় ১৮৫৮ সালে ৭ই নভেম্বর, সিলেটে। পিতা রামচন্দ্র পাল, মা নারায়ণী দেবী। তেরো বছর বয়সে স্কুলের শিক্ষা শেষ করে বিপিনচন্দ্র কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে এবং তিন বছর কলকাতায় তিনি লেখাপড়া করেছিলেন। এই সময়টা ছিল বাংলা দেশের পক্ষে এক উল্লেখযোগ্য সময় এবং আত্মচরিতে বিপিনচন্দ্র নিজেই লিখেছেন :

'১৮৭৪-১৮৭৮ সাল—এই সময়টায় আমি কলকাতায় ছাত্ররূপে ছিলাম। সে সময়ই নব জাতীয়তাবাদের জন্ম হয়। এই নব জাতীয়তাবাদের উৎসভূমি হচ্ছে নতুন বাংলা সাহিত্য।'*

* The years 1875-1878 which synchronised with my life in the University in Calcutta saw the birth of our new Nationalism. This new Nationalism had its origin in a renaissance in Bengali literature.
[—Memoirs of My Life and Times, vol. I.]

বিপিনচন্দ্র নব জাতীয়তাবাদের প্রথম বিকাশ পর্ব হতেই সংযুক্ত হয়েছিলেন। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, আনন্দমোহন বসু প্রভৃতি এর যে রাজনৈতিক রূপ দিয়েছিলেন তাঁরও সঙ্গে যেমন বিপিনচন্দ্র প্রথমাবধি যোগাযোগ রেখেছিলেন, তেমনি এর যে আরেকটা ধারা আছে যার উৎস বাংলা সাহিত্য—বিপিনচন্দ্র সে সম্পর্কেও যে কতখানি সচেতন ছিলেন তা উপরের উদ্ধৃতি হতেই বোঝা যায়।

বিপিনচন্দ্র কলকাতায় আসার আগেই সুরেন্দ্রনাথ সম্পর্কে কিছু সংবাদ জানতেন। কেননা বিলেত হতে আই সি এস হয়ে সুরেন্দ্রনাথ ম্যাজিস্ট্রেটের চাকরি নিয়ে আসেন সিলেটে। সেখানেই গোলযোগের ফলে তাঁর চাকরি যায়। সুরেন্দ্রনাথ তাঁর প্রতি অন্যায় ব্যবহার করা হচ্ছে এই অভিযোগ নিয়ে আবার বিলেত গিয়েছিলেন সুবিচার পাবার ও চাকরিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হবার আশায়। কিন্তু বিফল মনোরথ হয়ে তাঁকে ফিরে আসতে হয়েছিল। এসব ঘটনা তখনকার দিনে সারা দেশে চাঞ্চল্য আনার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। বিশেষতঃ সিলেটের মতো জায়গায় এ একটা বিরাট ঘটনা—কেননা তারতীয়রাও যে আই সি এস হতে পারে, ম্যাজিস্ট্রেট হতে পারে এসব তখনকার দিনে প্রায় কল্পনাতীত ব্যাপার এবং যে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে সে যে জনসাধারণের বিশেষ শ্রদ্ধার পাত্র এ বিষয়েও সন্দেহ থাকে না। কিন্তু প্রায় বিনাপরাধে যখন তাঁর চাকরি গেল ও বিলেতে গেরেও সুবিচার পেলেন না সেদিন ইংরেজের প্রতি ক্ষোভ ও সুরেন্দ্রনাথের প্রতি সহানুভূতিতে গোটা সিলেট আলোড়িত হয়েছিল। বিপিন চন্দ্র তাঁর আত্মচরিতে এ প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন।

বিপিনচন্দ্র সুরেন্দ্রনাথ হতে দশ বৎসরের ছোট; তিনি কলকাতায় যখন এলেন কিশোর ছাত্ররূপে, তখন সুরেন্দ্রনাথ ছাত্রমহলে একটা নতুন উদ্দীপনা সৃষ্টি করতে সুরু করেছেন। মেট্রোপলিটান কলেজ থিয়েটারে সুরেন্দ্রনাথ প্রথম যেদিন প্রকাশ্য বক্তৃতা করেন, সেদিন বক্তব্য বিষয় ছিল: শিবজাতির উত্থান। এই এক বক্তৃতাতেই সুরেন্দ্রনাথ বাগ্মীশ্রেষ্ঠ রূপে কলকাতার সমাজে পরিচিত হয়ে যান। বিপিনচন্দ্র তখন কলকাতায়ই আছেন। যদিও সেদিন বক্তৃতা শুনতে তিনি যাননি, কিন্তু সুরেন্দ্রনাথের বক্তৃতার ফলাফল লোকমুখে তিনিও শুনলেন। সেই থেকে তিনি সুরেন্দ্রনাথের গুণমুগ্ধ অনুসারী হন।

সুরেন্দ্রনাথ যে জাতীয়তাবাদের সমর্থক ও প্রচারক ছিলেন, তা ধর্মভিত্তিক নয়, secular এবং সেটা নিছক রাজনৈতিক আন্দোলনের ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ। একটা দিকে এর বিশেষ শুভফল ছিল এই যে, ধর্মপ্রভাবমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক জাতীয়তাবাদ প্রচারিত হলে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ পরবর্তী কালে এত মারাত্মকভাবে দেখা দিত না। স্বাধীনতার সংগ্রাম যদি রাজনৈতিক কর্মের ধারেই শুধু প্রবাহিত হত তবে মুসলমানদের পক্ষেও হিন্দুর পাশে এসে দাঁড়াতে বাধা হতনা। সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে যে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন পরিচালিত হয় তাতে মুসলমানদের যোগ দিতে অসুবিধা হয়নি - ১৯০৬ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত যে প্রাদেশিক সম্মেলনে সুরেন্দ্রনাথ যোগ দেন, বক্তৃতা করেন, সাধারিকভাবে গ্রেপ্তার হন, এবং যে সম্মেলনের কর্মীদের ওপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হয় সরকারী তরফ হতে বিছিল করা ও 'বন্দেমাতরম' বলার অপরাধে, এবং যে সম্মেলনের ফলাফল সম্পর্কে মন্তব্য করতে গেয়ে সুরেন্দ্রনাথ নিজেই মন্তব্য করেছেন: Barisal conference was a turning point. Revolutionary movement gathered momentum after it. অর্থাৎ, বরিশাল সম্মেলন দেশের রাজনীতিতে একটা পরিবর্তন এনে দেয়—বৈপ্লবিক আন্দোলন এই সম্মেলনের পরই শক্তি সঞ্চয় করে—সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন আব্দুল রসুল। বিহারের সিয়াকৎ হোসেন, মাদ্রাজের নবাব সৈয়দ মহম্মদ বাহাদুর, মৌলভী আবুল হোসেন—এঁরা ছিলেন রাজনৈতিক আন্দোলনে সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মী।

সুরেন্দ্রনাথের জাতীয়তাবাদের এই অসাম্প্রদায়িক শুভ

দিক সত্ত্বেও এর ভিত্তিমূল খুব শক্ত ছিল না, দেশের প্রাণস্পর্শ করতেও পারেনি। নবোদ্বোধিত মধ্যবিত্তদের এ ছিল মানস-বিলাসের একটা ভঙ্গীমাত্র, ব্রিটিশ কৃষ্টির আলোচনার যুগে এই জাতীয়তাবাদ ছিল অধিকতর শোভমান। তাই এর পাশে অনিবার্যভাবে গড়ে উঠল জাতীয়তাবাদের আর একটা ধারা,—তার উদ্গাতা বঙ্কিমচন্দ্র তিনি মানুষের হৃদয়ের মাঝে এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি আবিষ্কার করলেন, এদেশীয় মানুষের সংস্কার, চিত্তবৃত্তি, ভাবকল্পনার সঙ্গে সম্পূর্ণ সঙ্গত এক স্বদেশপ্রেমের উদ্বোধন ঘটালেন, এবং বললেন, দেশের মুক্তির জন্য আত্মবলি চাই, বীর্য, অধ্যবসায়, দৃঢ়সঙ্কল্প, একনিষ্ঠ ব্রত চাই, বললেন, যুদ্ধ, বিপ্লব, লোকক্ষয় ছাড়া স্বদেশ সাধনা পূর্ণ হতে পারে না। জাতির হৃদয়কে বঙ্কিম স্পর্শ করলেন। এদেশে স্বদেশী যুগের সূচনায়, বিশ শতকের গোড়ায় এই বঙ্কিমী ধারাকে সমৃদ্ধ, ও পরিপুষ্ট ও বেগবান করে তুললেন অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্র, ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায় ইত্যাদি। বিপিনচন্দ্রের ছিল এ বিষয়ে অনন্যসাধারণ অবদান, অরবিন্দ তাঁর উত্তরপাড়া ভাষণে তাই বিপিনচন্দ্রকেই স্বদেশমন্ত্রের শ্রেষ্ঠতম প্রবক্তা রূপে অভিহিত করেন। বিপিনচন্দ্র এই নব জাতীয়তাবাদের উৎস বঙ্কিমের 'বঙ্গ-দর্শন' বলেই উল্লেখ করেছেন তাঁর পক্ষে সে যুগের সমস্ত কালপটকে বিচার করার একটা বিশেষ সুযোগ ছিল, কেন না তিনি সেযুগের প্রধান প্রধান ব্যক্তি, যেমন সুরেন্দ্রনাথ, রাজনারায়ণ বসু, কেশব সেন, শিবনাথ শাস্ত্রী, নবগোপাল মিত্র, প্রধান প্রধান ঘটনা, যেমন হিন্দুমেলা, কংগ্রেসের অধিবেশন, ব্রাহ্ম সমাজ ইত্যাদির সংস্পর্শে এসেছিলেন। তাঁর জীবনটিও বিচিত্র। ছাত্রাবস্থায় ব্রাহ্মধর্মগ্রহণ ব্যাপারে তাঁর পিতার সঙ্গে তীব্র মতভেদ হয় এবং পিতা তাঁকে ত্যাজ্য পুত্র রূপে ঘোষণা করেন। লেখাপড়া অসমাপ্ত রেখেই তাঁকে চাকরি করতে চলে যেতে হয়—১৮৭৯ সালে কটকে এক স্কুলে তিনি প্রধান শিক্ষক রূপে যোগদান করেন। দশ এগারো মাস শিক্ষকতা করার পর বর্ধমানের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় চাকরি ত্যাগ করে তিনি চলে আসেন। ১৮৮০ সালে স্বদেশ সিলেটে ফিরে তিনি জাতীয় স্কুলে শিক্ষকতা ও "পরিদর্শক" নামে একখানি বাংলা সাপ্তাহিক প্রতিষ্ঠা ও সম্পাদনা করেন। ১৮৮১ সালে সেসব কাজ ছেড়ে দিয়ে মহীশূরে একটি উচ্চ ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক হয়ে তিনি চলে যান। ১৮৮২ সালেই আবার সে চাকরি ছেড়ে চলে আসেন কলকাতায় ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ পরিচালিত The Bengal Public Opinion-এ সম্পাদক হিসাবে যোগ দেন ও 'বঙ্গবাসী', 'সঞ্জীবনী', ইত্যাদি তখনকার দিনের প্রসিদ্ধ পত্রিকাগুলিতে লিখতে থাকেন। মৃত্যুশয্যাশায়ী পিতার আহ্বানে ১৮৮৬ সালে তিনি এসব ছেড়ে চলে যান স্বগ্রামে। পিতার মৃত্যু ঘটল অনতিবিলম্বে, তিনি সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করে কলকাতায় চলে এলেন ও সে বছরই কলকাতায় অনুষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় সম্মেলনে যোগ দেন সিলেটের প্রতিনিধিরূপে। ১৮৮৭ সালে তিনি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার একখানি জীবনী লেখেন অতিশয় শ্রদ্ধার সঙ্গে—ইংরেজের শ্রেষ্ঠতা ও ইংরেজ রাজত্বের গুণকীর্তনে তখন তাঁর বিশ্বাস ছিল তাঁর সমকালীনদের মতোই অটুট। সেই বৎসরই তিনি লাহোরের 'ট্রাইবুন' পত্রিকার সাব-এডিটর হয়ে লাহোর যান। পত্রিকাটি প্রতি সপ্তাহে তিনবার বেরোত। কিন্তু কয়েক মাস কাজের পর ১৮৮৭ সালেই 'ট্রাইবুনে'র কাজে তিনি ইস্তফা দেন। সে বছর কংগ্রেসের তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলন বসেছিল মাদ্রাজে—বিপিনচন্দ্র সেখানে যোগ দিয়েছিলেন বাংলার একজন প্রতিনিধিরূপে এবং এই সম্মেলনে তিনি খানিকটা নেতৃত্বও করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, কোন চাকরিই বেশি-দিন তিনি করতে পারেননি, প্রতি ক্ষেত্রেই মতভেদ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে এবং তারপর মানিয়ে চলার বদলে সোজাসুজি পদত্যাগ করেছেন, পত্নী ও সন্তানদের নিয়ে অনিশ্চিতের মাঝে বারবার দাঁড়াতে তিনি ইতস্তত: করেননি। এটা তাঁর

স্বভাবের একটা বৈশিষ্ট্য, আর নিজেই সেই বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা করে তিনি বলেছেন: Freedom in the sense of revolt against restraint was an inherited instinct in me.

[Memoirs of My Life and Times vol, I p. 295]

অর্থাৎ, বাধা, সংযম ও দমনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই অর্থে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা আমার অন্তরে একটা সহজাত প্রবৃত্তিরূপে উত্তরাধিকার সূত্রে আমি পেয়েছিলাম।'

কলকাতায় বিপিনচন্দ্র বিলয়কৃষ্ণ গোস্বামীর নিকট দীক্ষা নেন, এবং তারপর ১৮৮৪ সালে চাকরি গ্রহণের সঙ্কল্পমাত্রই তিনি ত্যাগ করেন। ঈশ্বর সেবাই হয় তাঁর জীবনের ব্রত এবং এজন্য তিনি আকাশবৃত্তি অবলম্বন করেন। আকাশবৃত্তি সাধকদের জীবনে একটা সুপরিচিত জিনিস; এর অর্থ হচ্ছে জীবিকা অর্জনের জন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন না করা, কোন চেষ্টা না করা, কারও কাছে কিছু যাচ্ঞা না করা। ঈশ্বরের ইচ্ছায় যা আসবে তাই হাসিমুখে গ্রহণ করতে হবে। আকাশ-বৃত্তির তাৎপর্য হচ্ছে জীবনের মূল জৈবিক, প্রাথমিক প্রয়োজনের ব্যাপারেও সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বর-নির্ভর হয়ে থাকা। বিপিনচন্দ্র যে উত্তর-যৌবনে (তখন তাঁর সাঁইত্রিশ বছর বয়স) স্ত্রীপুত্রকন্যা নিয়ে জীবিকা অর্জনের প্রয়াস একেবারে ছেড়ে দিয়ে অনন্যভাবে ঈশ্বর-নির্ভর হলেন এতে তাঁর যেমন অসীম ঈশ্বর বিশ্বাস ও প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তেমনি তাঁর অটুট মনোবল ও দৃঢ় চিত্তেরও নিদর্শন মেলে। যাই হোক, ১৮৯৮ সালে তিনি বিলেত যান সেখানকার আবহাওয়ায় এবং ১৯০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রেও গিয়েছিলেন।

যুক্তরাষ্ট্রেই তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার পরিচয় হয়—প্রথম কলকাতায়, তারপর বন্ধুত্ব গড়ে ওঠে। নিবেদিতার সংস্পর্শে আসায় বিবেকানন্দের ভাবধারা ও আকৃতির পরিচয় বিপিনচন্দ্র আরও ঘনিষ্ঠভাবে পান এবং স্বদেশ সেবার মাঝেই যে তাঁর ধর্মসাধনারও মুক্তি একথা তিনি বোঝেন। এই উদ্দেশ্যে দেশে ফিরে এসে ১৯০২ সালে তিনি New India নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করেন এবং এই পত্রিকারই মারফতে নতুন জাতীয়তাবাদের প্রচার তিনি শুরু করেন। সে সময়কার লেখা থেকেই নতুন জাতীয়তাবাদের স্বরূপ লক্ষণ বোঝা আমাদের পক্ষে সহজ হবে। ১৯০২ সালেই তৎকাল প্রচলিত কংগ্রেসী জাতীয়তাবাদের ব্যর্থতা ও দুর্বলতার দিক স্বচ্ছ ভাষায় বিশ্লেষণ করে তিনি নতুন জীবন দেশপ্রেমের দাবী জানিয়ে লিখলেন The Test of Patriotism প্রবন্ধ তাঁর পত্রিকায়:

'আমাদের বিশ্বাস, বহুদিন ধরে আমরা দেশাত্মবোধ নিয়ে অতিরিক্ত বাগাড়ম্বর করে আসছি। কিন্তু দেশপ্রেমের কথা বললেই প্রকৃত দেশপ্রেম হয়না। আমরা সোচ্চারে যে দেশপ্রেমের কথা বলছি তা কতখানি খাঁটি, অদূর ভবিষ্যতে কঠোর পরীক্ষার মধ্য দিয়েই তার যাচাই হবে। দেশপ্রেমের অর্থ হচ্ছে নিজের দেশকে ভালবাসা, সে ভালবাসার সত্যতা যাচাই হবে ত্যাগের মধ্য দিয়ে।

আমরা সর্বদাই ভিক্ষা, ভিক্ষা এবং ভিক্ষা করেই চলেছি। এদেশের কংগ্রেস এবং লণ্ডনে তার ব্রিটিশ কমিটি রয়েছে—এ দুটিই ভিক্ষা-প্রতিষ্ঠান। আমরা ভিক্ষাকে নতুন নামে অভিহিত করেছি; আমরা এর নাম দিয়েছি আন্দোলন। এই ভ্রান্ত বিশ্বাস আমাদের থাকা উচিত নয় যে এই ধরণের আন্দোলনের ফলে কোন প্রকৃত বাস্তব ফসল আমরা পেয়েছি। এ ধরণের আন্দোলন মধ্য দিয়ে কোনভাবেই আমাদের দেশপ্রেম যাচাই হতে পারে না। একমাত্র স্ব-নির্ভরতা এবং আত্ম-ত্যাগই দেশপ্রেম যাচাইয়ের মাপকাঠি।'*

* We have babbled much too long, we believe, of patriotism. But the word is not the thing. Whether our loud-tounged patriotism is a word or a thing will possibly be put to a severe test in the near future.

কিন্তু সুভাষচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গেলে বিপিন চন্দ্রের কথা আমরা এত বেশি গুরুত্বের সঙ্গে আলোচনা করছি কেন এ প্রশ্ন উঠতে পারে। এর উত্তর এই যে, সুভাষ নব-জাতীয়তাবাদের মর্মবাণী আত্মসাৎ করেছিলেন, তিনি জাতীয়তাবাদের এই ধারাকেই অবলম্বন করেছিলেন। সুভাষের চিন্তা, আদর্শ ও কর্মজীবনের ভিত্তি হচ্ছে এই নব-যুগের নতুন জাতীয়তাবাদ—আর তারই রূপকার ছিলেন বিপিনচন্দ্র। সুভাষের পশ্চাৎপট রচনায় বিপিনচন্দ্রের অবদান সম্ভবতঃ বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের পরই :—পূর্বোক্ত দুজনের কথা আমাদের পুনঃ পুনঃ আলোচনার দরকার পড়বে, কিন্তু বিপিনচন্দ্রের প্রসঙ্গ আর আমরা তুলবনা। তাই তাঁর কথা আমরা এখানেই শেষ করে নিতে চাই। বিশেষত নব-জাতীয়তাবাদের মূল সূত্রগুলি আমাদের এখনই বুঝে নেওয়া দরকার।

১৯০২ সালে বিপিনচন্দ্র স্বদেশপ্রেমের রাজনৈতিক দিকটিই দেখেছিলেন, কিন্তু ১৯০৬ সালে বঙ্কিমের ভাবনাকে যেন আশ্রয় করে দেশপ্রেমের এক গভীরতর তাৎপর্য তিনি আবিষ্কার করলেন। মানুষের হৃদয়ের গূঢ় অনুভবের স্তরে দেশপ্রেমের প্রতিষ্ঠা দিলেন তিনি। লিখলেন The cult of Patriotism প্রবন্ধে :

'দেশপ্রেম শুধুমাত্র পিতৃভূমির প্রতি প্রেম নয়। এ-একটি সংগঠিত জীবনবেদ যার মধ্যে দিয়ে এই প্রেম বিকশিত হয়ে সার্থকতা খোঁজে। স্বদেশকে যারা ভালবাসে এ তাদের ধর্ম। অর্থাৎ দেশপ্রেমিকদের এটা 'ইজম' যেমন ক্রিশ্চিয়ানিটি, ক্রিশ্চিয়ানদের 'ইজম' কিংবা যেমন হিন্দুদের হিন্দুয়ত্ব।'*

হৃদয়ের যে গভীরতম আকুতি ও অনুভব ধর্মজিজ্ঞাসা ও ধর্মসাধনার মূলে, দেশপ্রেমকে সেই একই আকুতি ও অনুভবের উৎসভূমি হতে উৎসারিত দেখলেন তিনি। বললেন, দেশপ্রেমই ধর্ম, দেশপ্রেমিকের অন্য ধর্ম নেই।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের কর্মপন্থা নির্ণয় করতে গিয়ে The Patriotic Agitation প্রবন্ধে তিনি লিখলেন :

'আন্দোলন আমরা নিশ্চয়ই করব, সন্দেহ নেই ; কিন্তু সমস্ত আন্দোলনের উদ্দেশ্য হবে জাতির মধ্যে দেশাত্মবোধকে উদ্দীপিত করে তোলা, সরকারের দরজায় দয়া ভিক্ষা নয়।'*

Agitation বলতে তিনি তখনকার দিনের সভাসমিতিতে বক্তৃতা দান, সংবাদপত্রে লেখা ও সরকারের নিকট

Patriotism is love of one's country, and love's test is sacrifice.

We have always been begging, and begging, and begging. The Congress here, and its British committee in London, are both begging institutions. We have given a new name to begging ; we call it agitation.

Let us not, therefore, continue in the grievous mistake that our agitations have brought us any real, solid advantage.

Agitation is not, in any sense, a test of true patriotism. That test is self-help and self-sacrifice.

* Patritiosm is not mere love of the Fatherland but an organised *cult*, through which this love develops and seeks to fulfil itself. It is the religion of those that love their country—the ism of the patriot, just as Christianity is the *ism* of the Christian, and Hinduism that of the Hindu—Swadeshi and Swaraj, p. 13

* We must agitate, no doubt ; but the objective of all our agitations should be to awaken the patriotic spirit of the nation, and not knock at the door of the Government. —পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৪৭

আবেদনপত্র পাঠানোর নীতিকে ধুবিয়েছেন। বলছেন এভাবে প্রতিবাদ জানিয়ে কোন কাজ তো হবেই না, বরং এর প্রতিক্রিয়া হবে অত্যন্ত ক্ষতিকর। ১৯০৫ সালের ১২ই আগষ্ট Passing and Making Resolutions নামে তাঁর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তিনি তাতে লিখছেন :

'যদি আমরা কোন কর্ম না করে শুধু প্রতিবাদ করেই ক্ষান্ত হই তবে তাতে আমাদের মনোবল ভেঙ্গে পড়বে। সরকারের জনপ্রিয়তাহীন বা দুরভিসন্ধিপ্রসূত বিভিন্ন ব্যবস্থার প্রতিবাদ আমরা যখন তখন করি, কিন্তু আমাদের প্রতিবাদকে সফল করে তোলার মতো কর্মের শক্তি আমাদের নেই। আমাদের দেশের শিক্ষিত শ্রেণীর মনোবল এর ফলে একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। এই কারণেই লর্ড কার্জন আমাদের সভা-সমিতির প্রতি আশাময়ী ভাষণগুলিকে সোডার বোতলের বুদ্বুদ বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর কথার মধ্যে সত্য আছে। আমরা এই বিদ্রূপের যোগ্য।*'

পুরনো জাতীয়তাবাদ, যা হিন্দুমেলা, কংগ্রেস ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান ও আনন্দমোহন বসু, সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ আমাদের উপহার দিয়েছিলেন তার সঙ্গে নতুন জাতীয়তাবাদের চরিত্রগত পার্থক্য কোথায় তা নির্দেশ করে বিপিনচন্দ্র ১৯০৬ সালে The New Spirit নামে একটি প্রবন্ধমালা লেখেন এবং ১৯০৭ সালে বারাণসীতে এই বিষয়ে The New Movement শীর্ষক কয়েকটি বক্তৃতাও দেন। পূর্বোক্ত প্রবন্ধমালায় তিনি লিখেছিলেন :

'পরনির্ভরতার পুরনো মনোভাব এখন পরিবর্তিত হয়েছে। আগে এদেশের লোকদের বিশ্বাস ছিল যে ইংরেজ রাজই এ দেশের উদ্ধারকর্তা। সে বিশ্বাস আজ আর নেই। বিদেশী শক্তির ওপর লোকের আস্থা যে পরিমাণে কমছে সেই পরিমাণেই নিজেদের ওপর একটু নতুন ও অবিচল আস্থা গড়ে উঠছে। আগে আমরা ভাবতাম সরকারের হাত থেকে রাজনৈতিক অধিকার ও সুবিধা পেতে হবে। আর আজকের এই নতুন আশা দেখা দিয়েছে যে আমাদের নিজেদের শক্তি ও বিবর্তনের দ্বারাই এইসব অধিকার ও সুযোগ আমরা লাভ করব। আজ ভারতে এই বোধটি সর্বব্যাপক হয়ে উঠেছে যে আত্ম-নির্ভরতা ও আত্ম-বলই আসল সহায়। চিন্তায় বা কর্মে কোনপ্রকার নির্ভরতা বা দাসত্বভাব লক্ষ করার মতো মনোভাব আজকের দেশপ্রেমিকের নেই। এদেশে ইংরেজ রাজত্বকে "আমাদের শাসন" বলে কেউ উল্লেখ করলে—এমনকি ভারতের হিতাকাঙ্খী ইংরেজরাও যদি সে উল্লেখ করে—দেশপ্রেমিকরা তাতে ক্ষুব্ধ হয়।*'

* A protest is always demoralising unless it is followed by action. The educated classes among us have been exceedingly demoralised owing to their readiness to protest against unpopular or mischievous measures of the Govt, while they lack the strength and the courage to follow these protests by adequate action. This is why Lord Curzon characterised, with some amount of truth it must be said, our platform orations as mere soda water eloquence. The ridicule was deserved.—পূর্বোক্ত গ্রন্থ. পৃ: ৪৮

* The old attitude of dependence has been changed. The old faith of the people in the British Government as the saviour of their country is almost dead. And in proportion as they have been losing their faith in the foreign agencies at work among them, in that proportion they have been acquiring a new and intrepid faith in themselves. The old idea was to get political rights and privileges from the Government. The new hope is to help the people to grow into these by their own internal strength and evolution. The spirit that is abroad in India today is

মাদ্রাজের বক্তৃতায় বিপিন চন্দ্র বলেছিলেন :

'আমাদের দৃষ্টি এখন সরকারী ভবন, পার্লামেন্ট ভবন, সিমলা বা কলকাতা হতে সরে গেছে। আমরা এখন ক্ষুধার্ত, নগ্ন, সহিষ্ণু এবং চিরদুঃখভোগী ৩০ কোটি ভারতবাসীর দিকে আমাদের দৃষ্টি ফিরিয়েছি। আগে তাদের ভালবাসিনি, আজ ভালবাসছি। সেই ভালবাসার চোখে আজ তাদের ভিতরকার বহু সম্ভাবনা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। সেই অসংখ্য, ক্লেশসহিষ্ণু, পরিশ্রমী, ক্ষুধার্ত, নগ্ন মানুষ—দেখতে পাচ্ছি তাদের ভিতর অসীম শক্তি আর অনন্ত সম্ভাবনা। আজকের নতুন আন্দোলনের ভিত্তি হচ্ছে আমাদের এই নব-লব্ধ দৃষ্টি, এই নব-চেতনা। জনসাধারণের ওপর আস্থা, যুগ যুগ ধরে ঐতিহাসিক বিবর্তনের ফলে সমৃদ্ধ আমাদের জাতীয় প্রতিভার আস্থা, ভারতবাসীর গৌরবজনক ভবিষ্যৎ ভূমিকার আস্থা—নতুন আন্দোলনের এই হচ্ছে মূল ভিত্তি।'

বিবেকানন্দের কথার মাঝেই বিপিন চন্দ্র যে নতুন যুগের দিশা খুঁজে পেয়েছেন, ভারতবর্ষ, তার অতীত ঐতিহ্য ও বর্তমান দৈন্য নিয়ে, কোটি কোটি দরিদ্র, নিরন্ন, অধ্যবসায়ী কষ্টসহিষ্ণু জনসাধারণ নিয়ে আবার নতুন করে জেগে উঠছে, সেই জাগরণে বিশ্বাসই নবীন দেশপ্রেমের মূল কথা। বিপিনচন্দ্র আরও অগ্রসর হলেন। দেখালেন, বিবেকানন্দ যে বেদান্ত প্রচার করেছেন সেই বেদান্তেরই ওপর নতুন জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত। তাঁর মাদ্রাজ বক্তৃতায় তিনি সেকথাও স্পষ্ট করে বলেছিলেন। সুভাষ কটক হতে কলকাতায় এসেছিলেন দেশপ্রেমিক হয়ে। কলকাতায় এসে তাঁর দেশপ্রেম যে নতুন জাতীয়তাবাদকে আত্মীকরণ করে পরিপুষ্ট হয়ে উঠল সেই জাতীয়তাবাদের মাঝে তাঁর স্বাধীনমুক্তি ঘটার উপাদান ছিল প্রচুর। বাল্য বয়স হতে সুভাষের মধ্যে ধর্মজিজ্ঞাসার উন্মেষ ঘটেছিল, পরদেবার তীব্র আকুতি ছিল তাঁর—এবং দেশকেও তিনি ভালবাসতে সুরু করেছিলেন। সেবাব্রত ও আত্মানুচেতনা অঙ্গাঙ্গীভাবে তিনি মিলিয়ে নিতে পেরেছিলেন একটা বিশেষ ভিত্তির ওপর—সেই ভিত্তি তিনি পেয়েছিলেন বিবেকানন্দের রচনাবলী পাঠ করে। এবং বিবেকানন্দ ছিলেন সর্বোত্তম দেশপ্রেমিক।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় যে জাতীয়তাবাদের মন্ত্র প্রচার করেন সুভাষের পক্ষে তাতে তৃপ্তি পাওয়া সম্ভব ছিলনা। এমন কি যুগান্তর বা অনুশীলন সমিতির বোমারুদের সঙ্গেও তিনি সায় দিয়ে চলতে পারতেন না। আরও গভীরতর, গুরুতর অভীপ্সার প্রজ্বলন তাঁর হৃদয়ে কবেই প্রায় ঘটে গেছে; কলকাতায় এসে, নিবেদিতা, অরবিন্দ, বিপিনচন্দ্রের প্রচারিত জাতীয়তাবাদ, যা একটি নতুন ধর্মের আবির্ভাব

---

spirit of self-assertion and self-reliance. It is the spirit of a sensitive patriotism that can brook, neither in thought nor in deed, any shape or form of dependence and servitude. It resents the constant reference, even by British friends of India to the British administration in the country as, "our rule"—পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ৫৪ (ঘ)

* Our eyes have been turned away from the Govt. House, away from the Houses of Parliament, from Simla and Calcutta, and our faces have turned now to the starving, the naked, the patient and long suffering 300 millions of our people, and in it we see a new potency, because we view them now with an eye of love which we never had felt before, and in the teeming, toiling, starving and naked populations of India, we find possibilities, potentialities, germs that have given rise to this New Movement, namely Faith in the people, Faith in the genius of the nation through ages by historic evolution, Faith in the eternal destiny of the Indian people. পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃ: ১৩৭

হলে তখন প্রতীত হয়েছিল, এবং যার পশ্চাৎপটে ছিল বিবেকানন্দের বেদান্ত, দেশপ্রেম ও দুঃস্থ মানুষের জন্য বিশাল বেদনা—সুভাষের হৃদয় তাতেই নিজের আর্তি ও আকুতির সমর্থন পেল, তৃপ্তি পেল ; কটক থেকে কলকাতায় আসা তাঁর সার্থক হল। যেন তাঁর অন্তর্যামী পুরুষই হাত ধরে তাঁকে কলকাতায় নিয়ে এলেন। কেননা কটকের বাল্যসঙ্গীদের প্রভাব এড়িয়ে সুভাষ যাতে পাঠে অধিকতর মনোযোগী হন সেই উদ্দেশ্যেই তাঁর পিতৃদেব তাঁকে কলকাতায় পাঠিয়ে-ছিলেন। ফল অবশ্য হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কিন্তু সুভাষের নিজের দিক হতে, সেদিনের বাংলায় এসে যান করা তাঁর জীবনসমস্যা সমাধানের পথে একটা অত্যাবশ্যকীয় পদক্ষেপের মতো ছিল। এইখানে এসে বাইরের জগৎ আর নিজের বিকাশমান অন্তর্জগতের মাঝে একটা সঙ্গতি ও মিল খুঁজে পেয়েছিলেন তিনি। বাইরের জগতের চিত্রখানি আমরা দেখেছি, কিন্তু তাঁর অন্তর্জগতের সে সময়ের পরিচয়টি কী? সুভাষ-চরিত্রের বিকাশধারা অনুসরণ করতে হলে এই প্রশ্নের উত্তর না পেলে চলে না।

(ক্রমশঃ)

প্রস্তাবনা : মণিভূষণ ভট্টাচার্য

— — — — — — — — — — — — — —

বুকের রেখায় বিলাসিতা করা চলে।
রেখারা দেখায়, দেখে না চরিত্রখানি ;
প্রবীন বৃক্ষ দাবদীপ্ত বহ্নিতে
পল্লবায়ু পায়, সোনায় গঠিত বাঁশী।

বুকের রেখায় শ্লীলতা থাকে না, কিন্তু,
আয়তন পায় প্রাক্-জ্যামিতিক বিন্দু,
ব্ল্যাকবোর্ড কেন ক্রত পিছু নেয় সখী।
রুধিরে খচিত রুমাল, নয়নে রচিত সপ্তসিন্ধু।

সূর্যোদয়ের প্রতিভা বুঝিনি বজ্র বেলায় উঠে,
চায়ের পেয়ালা শ্রীমতীর করপুটে
দেখেছি এবং দেখেছি খবরে ভেসে যায় সারাবেলা
শ্রীমতীর করপুটে···।

বুকের রেখায় বংশ ছিলোনা, অর্জুন বৃত্ত, তুমি
র'চে দিতে পারো বন্দর, রণভূমি—
বুকের, বুকের দ্বিধাবলম্বিত ঘোরতর রজনীর
সহচরী তুমি, কার সহচরী খুঁড়ে গেলে বনভূমি!

কোনো বৃক্ষ নাই : দুর্গাদাস সরকার

সাভার্স লেনের ধারে শুকিয়ে গিয়েছে বৃক্ষগুলি।
তখনো দুপুর রৌদ্রে আনমিত ছায়া দুটি হাঁটে।
গাছে বাঁধা আধ-পাগলা ঘোড়াটার চোখে ঝুলছে ঠুলি।
একটা কাক বাসা বাঁধছে শাখার উপর শুকনো কাঠে।

সাভার্স লেনের ধারে বীজ পুঁতে ফলাবে না গাছ
আর কেউ? অনেকেই আসবে, যাবে, তাকাবে না ফিরে?
সাভার্স লেনের কাঠ কিনে নেবে উনুনেতে আঁচ।
ঠকরাবে কাকেরা এসে ঘরে ঘরে শিশুর শরীরে।

তোমরাও পারবে না যেতে সাভার্স লেনের কাছাকাছি।
পথের দু' মোড়ে ঘিরে দাঁড়াবে পুলিশ ভ্যান। ট্রাক
সারি সারি দাঁড়াবে নির্দেশে। ড্রাইভারদের হাঁচি,
গোপন লোহার শব্দ, চলমান আদালতে ডাক,
গাড়ি চাপা বেড়ালের গন্ধ—যাবে ট্রামের জানলায়।

সাভার্স লেনের ধারে সেইদিন কোনো বৃক্ষ নাই।

সংশয় : প্রতিমা সেনগুপ্তা

সুন্দরীর মুখে পড়েছে প্রদীপের আলো,
পদ্মপাতায় কালির আঁচড় চোখের কালো।
আচমকা হাওয়া এসে নিভিয়ে দিল দীপ,
মনটা বিতৃষ্ণায় ভরে গেল,
কপালের রাঙা টিপটা কোথায় হারিয়ে গেল।
ভালবেসেছিলাম কাকে? আলোকে না টিপকে?
ফুলটাকে রোজ বুকে নিয়ে ঘুমাই,
অথবা ঐকাই ওকে, কি মধুর সুবা-ই!
খসে গেল পাতাগুলি, দিলাম ছুঁড়ে ফেলে।
ভালবেসেছিলাম কাকে? ফুল না সুবাসকে।
বৃষ্টিটা সারারাত ঝরছে,
হাসনার গন্ধটা কেঁদে মরছে,
বৃষ্টিটা চায় বুঝি সৃষ্টিকে ডাকতে।
ভালবাসি কাকে? বৃষ্টি না সৃষ্টি?
তুমি কথা দিয়েছিলে,
সে কথা তো রাখলে না,
আমিও রাখিনি তোমার কথা।
ভালবেসেছিলাম কাকে? তোমাকে না কথাকে?

বাধা : সুশান্ত ঘোষ

ভিতরে বাইরে বাধা, স্তব্ধতার শব্দশব্দ নেই,
সবত্র স্মৃতির সার নির্জনতা ; উন্মোচিত ঘরে
কেপে থাকো মুহূর্তের শূন্যতায় যত তুমি সেই
নৈঃশব্দ্য ও স্পন্দনের উচ্চকিত ঘড়ির কাঁটায়
শরীর চিহ্নিত করে, চিরদিন গোধূলির পরে
জ্যোৎস্নার পিপাসা দ্রুত নিশ্বাসের মত মনে হয়।

যেন কেউ পুচ্ছতর স্পষ্টতর ধ্বংসের ভিতরে
একলক্ষ হাহুতের কাতর কঠিন শব, ইচ্ছাগুলি
টেনে ছিঁড়ে ফেলে, যার রক্তে ধ্বংসে সমুদ্রের স্বাদ
জোয়ারে উত্তাল খেলা ; উঁচু নিচু নারকী বাতাস, প্রাচীন
অঙ্গুলি
শীতল দেহের ভাঁজে ডুবে-থাকা, অস্থির বিষাদ
শুধু সুখের দর্পণে তার উন্মাদতাটার ছায়া পড়ে।

ভোরঙ্গ : সুনীল বসু

ভোরঙ্গে সেই শাড়িটিতে ছিল টকটকে লাল গোলাপ ফুল
ভোরঙ্গে কালো রঙমল সেই ব্লাউজটিতে ছিল সোনালি ফুল
ভোরঙ্গে ঠিক সেইখানে ছিল নরম রুমাল রেশমী নীল
সেইখানে ছিল বিশ্রী চিঠি এক বান্ডিল
সেইখানে ছিল ধবধবে শুভ্র বহুদিনকার ন্যাপথলিন
সেইখানে ছিল লুকনো পকেট অতি উজ্জ্বল হীরার দুল
সেইখানে ছিল মুঘল যুগের মুদ্রা এক্
ভোরঙ্গে সেই শাড়িটিতে ছিল টুকটুকে লাল গোলাপ ফুল
সেইখানে ছিল ইতিহাসখ্যাত মুর্শিদাবাদ
সেইখানে ছিল ইলোরার এক ঠাণ্ডা ছবি
সেইখানে ছিল সেইখানে ছিল সেইখানে ছিল
স্মৃতি কর্পূর মুঘল হারেম সকল স্মৃতির ন্যাপথলিন
সেইখানে ছিল চুনী ও পান্না এবং গভীর মুক্তোমালা
সেইখানে ছিল হাতির দাঁতের সিংহল-কৌট রুপোর কাঁটা
বিমুক বোতাম
ভোরঙ্গে ঠিক সেইখানে ছিল, ঠিক সেইখানে আমার হৃদয়
একদিন সাদা ন্যাপথলিনের ভিতরে ছিল।

কলঙ্কিত কচ্ছ চুক্তি

সমর গুহ

কচ্ছ-চুক্তি ভারতের পক্ষে জাতীয় কলঙ্কের এক অনুপম নিদর্শন। পরাজয় ও আত্মসমর্পণের মনস্তত্ত্বকে শান্তিবাদী উচ্চতত্ত্বের মোড়ক দিয়ে এরই মধ্যে আরেক জাতীয় ক্রিয়কের ক্ষেত্র প্রস্তুতিও আরম্ভ হয়ে গেছে। কচ্ছ-চুক্তির অনুসরণে চীনের সঙ্গে সীমান্ত মীমাংসার প্রস্তাব উত্থিত হয়েছে ভারতের উচ্চতম মহল থেকে। অথচ, কচ্ছ-চুক্তির সর্ত ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে এই ঘটনাটি লাদাক ও নেফা-পূর্বের জাতীয় অবমাননার দ্বিতীয় পুনরাবৃত্তি।

কচ্ছ-চুক্তি অনুযায়ী আক্রমণকারী পাকিস্তানী ফৌজ ভারতের বিজিত অঞ্চল থেকে সরে যাবে এবং ভারতীয় ফৌজ ও ভারতীয় এলাকা থেকে সরে আসবে। পাকিস্তান কর্তৃক আক্রান্ত ও বিজিত এবং পরিশেষে পরিত্যক্ত ভারতীয় অঞ্চল ভারতীয় সিভিল কর্তৃত্বের অধিকারে থাকবে এবং ভারতীয় পুলিশ এই অঞ্চলে আন্তর্জাতীয় সীমানা পর্যন্ত টহল দিতে পারবে। কচ্ছের সাহির পথে ছাদবেত থেকে কাঞ্জার-কোট এলাকা পর্যন্ত অঞ্চল থেকে পাক-সৈন্য অপসারিত হবে কিন্তু ভারতের দিঙ্গ-সুরাই অঞ্চলের যে ২০ বর্গ মাইল এলাকায় পাকিস্তান সড়ক নির্মাণ করেছে সেই সড়ক পাকিস্তানী-দের দখলে থাকবে এবং পাকিস্তানী পুলিশ সেই অঞ্চল চেকপোষ্টসহ নিজের পাহারাধীনে রাখতে পারবে। ভারতীয় পুলিশ পেট্রল দেবার সময়ে পাক-পুলিসের সঙ্গে সংঘর্ষ পরিহার করবে।

পাকিস্তান কচ্ছের যে ৩,৫০০ বর্গ মাইল এলাকা দাবী করেছে ভারত সেই দাবীকে স্বীকার না করলেও কচ্ছের সীমানা পুনঃ নির্ধারণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরের দুই মাসের মধ্যে মন্ত্রীপর্যায়ে পাক-ভারত আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই আলোচনায় সীমানা নির্ধারণের সমস্যায় উভয় রাষ্ট্র সম্মত না হলে একটি তিন-ব্যক্তিগঠিত আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনালের উপরে সেই দাবির অর্পণ করা হবে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্র এই ট্রাইব্যুনালের এক এক জন করে বিদেশী সদস্য মনোনীত করবে এবং তৃতীয় সদস্য মনোনীত হবে পাক-ভারত কর্তৃক যুক্তভাবে। কিন্তু ট্রাইব্যুনালের তৃতীয় সদস্যের মনোনয়নে উভয় রাষ্ট্র সম্মত না হলে চুক্তি স্বাক্ষরের চার মাসের মধ্যে ইয়ুনাইটেড নেশনের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্ট এই তৃতীয় সদস্যকে মনোনীত করে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠন সম্পূর্ণ করবেন। এই ট্রাইব্যুনালের রায় উভয় রাষ্ট্রের উপরে বাধ্যতামূলক হবে এবং এই রায় অনুযায়ী সীমানা নির্ধারণের কাজ কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত এই আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনাল বহাল থাকবে।

একটু বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে আয়তনে না হলেও নীতি প্রকৃতিতে কচ্ছের ঘটনা লাদাক ও নেফার ঘটনারই অনুরূপ। ১৯৫৪ সালে ভারতের ১৪,০০০ বর্গমাইল এলাকা দখল করে চীন আকসাই চীনে একটি সড়ক নির্মাণ করে। নেহেরু সরকার এই সংবাদটি গোপন রাখে এবং ১৯৫৮ সালে সেই সংবাদ লোক সভায় প্রথম প্রকাশ করে। সেইরূপ পাকিস্তান কচ্ছে দিঙ্গ-সুরাই এলাকার ২০ বর্গ মাইল এলাকা দখল করে সেখানে যে রাস্তা তৈরী করেছে সেকথা কচ্ছ চুক্তির পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় লোক সভায় এবং জনতার কাছ থেকে গোপন রাখা হয়। লাদাক ও নেফার চীন ৪৫,০০০ বর্গ মাইল ভারতীয় এলাকা দাবী করেছে এবং

ম্যাকমোহন লাইনকে অস্বীকার করেছে। পাকিস্তানও তেমনি র‍্যাডক্লীফ রোয়েদাদকে অস্বীকার করে কচ্ছের অন্তর্ভুক্ত ভারতের ৩,৫০০ বর্গ মাইল এলাকার স্বত্ব দাবী করেছে।

ভারতীয় সার্বভৌমিকতার মর্যাদার প্রতি কোনরূপ তোয়াক্কা না করে ১৯৬২ সালে লাদাক ও নেফায় চীন ভারত ভূমির উপর আক্রমণ চালায় এবং নেফা অঞ্চলে বমডিলা পর্যন্ত দখল করে, প্রায় পাঁচ হাজার ভারতীয় সৈন্যকে নিহত করে, ও পাঁচ হাজারের মত ভারতীয় জোয়ানদের বন্দী করে, ও ভারতীয় যুদ্ধ সামগ্রী দখল করে এবং প্রায় তিন মাস এই অধিকৃত ভারতীয় এলাকা নিজেদের সামরিক কর্তৃত্বের অধিকারে রেখে পরে স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন করে। এই সংঘর্ষে ভারতীয় বাহিনী মৃত বা জীবন্ত অবস্থায় চীনের একটি সৈন্যকেও বন্দী করতে পারে নি।

ঠিক চীনের মতই পাকিস্তান এই বছরের মে মাসে ভারতের কচ্ছ এলাকায় বিনা প্ররোচনায় এবং সুপরিকল্পিত-ভাবে আক্রমণ চালায়, ভারতীয় এলাকা দখল করে। বহু ভারতীয় সৈন্য নিহত করে এবং অজ্ঞাত সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য ও অফিসারকে বন্দী করে ও ভারতীয় যুদ্ধাস্ত্র দখল করতে সক্ষম হয়। কচ্ছের ক্ষেত্রে অবশ্য কিছু সংখ্যক পাক সৈন্যকেও নিহত ও বন্দী করার দাবী ভারতের পক্ষ থেকে করা হয়েছে। কিন্তু চীনের মতই ভারতীয় এলাকা পাকিস্তান দখল করে অন্তত দু মাস কাল সেখানে অবস্থান করে এবং ভারতীয় প্রত্যাঘাতে নয়,—বৃটিশ প্রধান মন্ত্রীর চেষ্টা ও কচ্ছ চুক্তির পরে স্বেচ্ছায় অধিকৃত ভারতীয় এলাকা থেকে সৈন্য সরিয়ে নেয়।

নেফা থেকে প্রত্যাবর্তনের সময়ে চীন হুমকি দিয়ে বলে যায় যে ম্যাকমোহন লাইনের নির্দিষ্ট এলাকায় ভারত কোন সৈন্য পাঠাতে পারবে না। শুধু সিভিল কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। লিখিত চুক্তি না হলেও পরাজিতের পক্ষে মনোবৃত্তি নিয়ে ভারত সরকার চীনা সেই হুমকি মেনে নেয় এবং আজও নেফার সেই ভারতীয় এলাকায় ভারতীয় সৈন্য পাঠাতে দিল্লী সরকার সাহস করেনি এবং আকসাই চীনে ১৪,০০০ বর্গ মাইল ভারতীয় এলাকা এখনও চীনের কবলেই আছে। উপরন্তু ভারত ভারতীয় এলাকা থেকে নিজের সৈন্য সরিয়ে এনে চীনের হুকুম মত চীনাসৈন্যের পরিত্যক্ত অঞ্চলে শুধু সিভিল পুলিস পাঠিয়ে ক্ষান্ত থাকে।

কচ্ছেও ঘটেছে সেই একই ঘটনা। পাকিস্তান আক্রান্ত ও বিজিত ভারতীয় এলাকা থেকে নিজের আক্রমণকারী সৈন্য সরিয়ে নিয়েছে। এবং ভারতীয় পরিত্যক্ত অঞ্চলে ভারতীয় সৈন্যের প্রবেশাধিকার দিতে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে ভারত নিজের এলাকায় নিজের সৈন্য দূরে সরিয়ে আনতে রাজী হয়েছে। পাকিস্তান গোপনে ও বেআইনি-ভাবে ভারতীয় ডিফেন্স-হরাই অঞ্চলে যে মাটি ও রাস্তা তৈরী করেছিল আকসাই চীনের ন্যায় তাও পাকিস্তানের দখলেই আছে ও থাকবে এবং এই ভারতীয় এলাকায় পাক পুলিস টহলও দিতে পারবে।

কচ্ছের চুক্তিটিতে স্বাক্ষর করে ভারত সরকার আরও এক মারাত্মক নজীর সৃষ্টি করেছে ভারতীয় জমির উপরে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনালের নামে আন্তর্জাতীয় সালিসী মেনে নিতে রাজী হয়ে। ভারত সরকার ৩,৫০০ বর্গমাইল ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানী সীমান্ত বিরোধের দাবীকে স্বীকার করেনি বটে কিন্তু ট্রাইব্যুনাল পাকিস্তানের এই দাবীকে বিবেচনা করতে পারবে না এরূপ শর্তও চুক্তিতে লিপিবদ্ধ করা হয় নি। যেহেতু ট্রাইব্যুনালের রায় পাকিস্তান ও ভারত মানতে বাধ্য থাকবে এবং যেহেতু ভারতীয় ৩,৫০০ বর্গমাইল এলাকার পাকিস্তানের দাবী বিবেচনা করার ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের পক্ষে চুক্তিগত কোন বাধানিষেধ নেই, তার ফলে ট্রাইব্যুনাল সুনিশ্চিতভাবে পাকদাবী বিবেচনা করবে এবং ট্রাইব্যুনাল

শব্দটি ব্যবহৃত হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এটি একটি 'সালিসী' তথা 'আরবিট্রেশনের' মর্যাদা ও অধিকার লাভ করবে।

একথা স্বতঃসিদ্ধ যে পাক-ভারত বহ্নী পর্যায়ে কচ্ছ সীমানা নির্ধারণ করা সম্ভব হবে না এবং তার ফলে অনিবার্যভাবে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠিত হবে এবং গঠিত হবে তিন জন বিদেশী দ্বারা। পাক জমির উপরে ভারতের সামান্যতম দাবীও নেই, পাকিস্তানের একতরফা দাবী সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় এলাকার উপরে। অর্থাৎ ভারতীয় জমি ভারতের না পাকিস্তানের তার মীমাংসা করবে একটি বিদেশী ট্রাইব্যুনাল। ভারতীয় সার্বভৌমিকতার মর্যাদা যথার্থই আজ দিল্লী কর্তৃপক্ষের কাছে এক খেলার পুতুলে পরিণত হয়েছে। পৃথিবীতে ভারতের পক্ষে আজ একটি বন্ধু রাষ্ট্রও নেই,—না কম্যুনিষ্ট গোষ্ঠিতে, না ইঙ্গ-মার্কিন মহলে। নাসের-টিটো-শাস্ত্রী অক্ষও আজ নাসের-সুকর্ণ-আয়ুব চক্রে রূপান্তরিত হয়েছে। বান্দুংপন্থীরা বা আফগানিস্তান অথবা অন্য যে কোন রাষ্ট্র থেকেই ভারতীয় মনোনীত সদস্য নির্বাচিত হোক না কেন—তিনজন বিদেশী সদস্যদ্বারা গঠিত ট্রাইব্যুনালের রায় যে ভারতের বিরুদ্ধে যাবে এবং ভারতীয় দখলে অবস্থিত তেল-প্রাপ্তির সম্ভাব্য ৩,৫০০ বর্গ মাইলের ভারতীয় এলাকা সর্বাংশে যদি নাও হয় তা' হলেও অধিকাংশে যে পাকিস্তানের ভাগে যাবে তা এখন থেকেই এক সুনিশ্চিত সিদ্ধান্ত বলে ধরে নেওয়া যায়।

শাস্ত্রীজী বড়াই করে বলেছেন যে সামান্য বিরোধ নিয়ে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের কার্যক্রমকে কোন সাধারণ নীতিরূপে গ্রহণ করা হয় নি এবং এরূপ 'ট্রাইব্যুনাল' কোন 'আরবিট্রেশন' নয় এবং পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসার ক্ষেত্রান্তরে এই নীতি প্রযোজ্যও হবে না। ট্রাইব্যুনালের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যের যে ব্যাখ্যা শাস্ত্রীজী করছেন তাদ্বারা তিনি কংগ্রেসী পার্লামেন্টারী কমিটিকে নিজ বক্তব্যের যাথার্থতা হয়তো বোঝাতে পারবেন কিন্তু আন্তর্জাতীয় অভিমত কার্যক্ষেত্রে এই ট্রাইব্যুনালকে সম্পূর্ণরূপে আরবিট্রেশন রূপে এবং পাক-ভারত বিরোধ মীমাংসায় এক স্বীকৃত নীতি ও ঐতিহ্যরূপে গ্রহণ করবে। পাকিস্তান কাশ্মীরের ব্যাপারে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনালের দাবী করেছে এবং আন্তর্জাতীয় মত কার্যত পাক-সমর্থক। কচ্ছ চুক্তি কাশ্মীরের ক্ষেত্রেও আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনাল গঠনের যে চাপ সৃষ্টি করবে তা' কাশ্মীর প্রশ্নকে আরও জটিল করে পাকিস্তানের পক্ষে নিয়ে যাবে।

পাকিস্তানের হাতে এক তরফা মার খেয়ে, সামরিক সংঘর্ষে পরাজয় বরণ করে, আক্রমণকারী পাক-ফৌজের হাতে ভারতীয় মাটি ছেড়ে দিয়ে, অধিকৃত ভারতীয় অঞ্চলের বুকে পাক পুলিশের বসে থাকার চরম অবমাননাকর পরিস্থিতিতে ভারতীয় এলাকা থেকে ভারতীয় ফৌজ অপসারণ করে, ভারতীয় এলাকায় অবস্থিত পাকঘাটি ও রাস্তার টহলদারীর অধিকার পাকিস্তানকে দিয়ে এবং ৩,৫০০ বর্গ মাইল ভারতীয় অঞ্চলকে আন্তর্জাতীয় ট্রাইব্যুনালের সালিসীর হাতে ছেড়ে দিয়েও ভারতীয় সার্বভৌমিকতার মর্যাদার সঙ্গে সামান্যতম 'কমপ্রোমাইজ' শাস্ত্রীজী করেন নি বলে মন্তব্যে বিবৃতি প্রচার করেছেন। শুধু তাই নয়, চীনের ন্যায় আক্রমণকারী ও বিজয়ী পাকিস্তানের কাছে আত্মসমর্পণের এই নজীরকে 'বরং আন্তর্জাতীয় বিরোধের শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় এক মহান ঐতিহ্য' বলে তিনি অভিনন্দিত করেছেন।

কংগ্রেস দলের ক্ষমতা-ভাবক গোষ্ঠিতো শাস্ত্রী-কীর্তিকে সমর্থন করেছেনই, সেই সঙ্গে পাকিস্তানের প্রবক্তক রাজাজী ও বৃটিশ রাজশক্তি এবং অন্যদিকে চৌ-আয়ুবের তোষণ পিকিং পন্থী কম্যুনিষ্টরাও এই চুক্তিকে অভিনন্দিত করেছেন। রাজাজী মনে করেন যে পাক ভারত দেশরক্ষার চুক্তি করে চীনের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার পথে কচ্ছ চুক্তি একটি ইংগিত। পক্ষান্তরে পিকিং পন্থী কম্যুনিষ্টরা মনে করে যে 'ভারত-চীন মিতালী' পুনঃ প্রতিষ্ঠার দাবী তোলার পক্ষে এটি এক মস্ত

সুযোগ। শাস্ত্রীজীর দল বরং দ্বিতীয় ঘনত্বের দিকেই ঝুঁকতে সুরু করেছে। চীনের সঙ্গে আলাপ সুরু করার ক্ষেত্র তৈরী করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে একটি ইংগিতাত্মক বিবৃতিও দেয়ানো হয়েছে, দিল্লীর সরকারী নেতৃত্বের পক্ষ থেকে।

একদিকে 'ইমার্জেন্সী' এখনও জারী রয়েছে এবং বার্ষিক জাতীয় বাজেটের অর্ধাংশ এখনও দেশরক্ষার জন্য ব্যয় হচ্ছে। ঠিক সেই পরিবেশে নেফার পরেই ঘটেছে লাদাখের এই পরাজয় ও আত্মসমর্পণ। জাতীয় মর্যাদা ও সার্বভৌমিকতা রক্ষায় ভারতীয় জনতা ও সামরিক শক্তির মনোবলকে এরূপ ঘটনা-বলী যে হিমাংকের দিকে কিরূপ ধারাত্মকভাবে ঠেলে দিচ্ছে বর্তমান রাজনৈতিক নিলিপুটেরা ক্ষমতার সুখ সায়রের নিশ্চিন্ত আরামে বসে তার মর্মবাতনা অনুভব করবেন তা' আশা করা যায় না। গান্ধীবাদের ধুয়া তুলে কংগ্রেসীনেতৃত্ব আজ নির্বীর্য ক্লীবতার ঘনত্বে ভারতবর্ষকে পঙ্গু করে দেওয়ার উপক্রম করেছে। পরাজয় ও আত্মসমর্পণের ঘনত্বকে ঢাকবার জন্য গান্ধীবাদের দোহাই দিয়ে শান্তি-প্রবচনের ভণ্ডামী আর নয় —ভারতবর্ষকে বাঁচাবার জন্য আজ অপরিহার্য প্রয়োজন নেতাজীর শক্তিময়ী কাত্রবাদ।

'পঞ্চভূত'-প্রসঙ্গে

নির্মল দাশ

১

রচনাসাহিত্য, ইংরিজীতে যাকে Essay literature বলে তার সঙ্গে রেনেসাঁসের একটা নিবিড় যোগ আছে। রচনাসাহিত্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য আত্মনিষ্ঠতা, সেখানে প্রবন্ধের মতো যুক্তি-তথ্য-সিদ্ধান্তের কোনো শৃঙ্খলাপরায়ণ প্রকৃষ্ট বন্ধন নেই, নির্দিষ্ট কোনো মীমাংসারও কঠোর দায়িত্ব নেই, সর্বত্র লেখকের ব্যক্তি হৃদয়ের স্বগত অভিব্যক্তি একটি স্বেচ্ছা-বিহারী শিথিলতা বিস্তার করে একটি সর্বতোশোভন শিল্প-সুষমার মধ্যে সঙ্গতি লাভ করে। সুতরাং রচনাসাহিত্যের দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্য বন্ধনমুক্তি ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যায় রেনেসাঁসের মূল লক্ষণ বন্ধনমুক্তি ও ব্যক্তিত্বের উদ্বোধন। ধর্মসংস্কারের বন্ধন থেকে যুক্তির মুক্তি এবং রাজতন্ত্র, সমাজশাসন ইত্যাদির নিয়ন্ত্রণ থেকে ব্যক্তিত্বের উদ্ধার রেনেসাঁসের প্রধান কর্ম। প্রকৃতপক্ষে, রেনেসাঁসের ফলে দেশের চিন্তাশীল মনীষায় যে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ ঘটেছিল, সেই আত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিত্বই একদা প্রথাগত প্রবন্ধ-রচনারীতির প্রকৃষ্ট বন্ধনগুলিকে অস্বীকার করে আপন ব্যক্তিত্বের নিগূঢ় অনাবিষ্কৃতপূর্ব উপলব্ধিগুলিকে স্বচ্ছন্দভাবে আত্মবিকাশের সুযোগ দিয়েছিল। রচনাসাহিত্যের আদিস্রষ্টা যিনিই হোন না কেন, রচনাসাহিত্যের সৃষ্টির এই হচ্ছে প্রক্রিয়াগত ইতিহাস।

রচনাসাহিত্যের ইতিহাসে ফরাসী দেশের Michel Eyquem de Montaigne (১৫৩৩-৯২)-কেই আদি শিল্পী হিসাবে নির্দেশ করা হয়। কর্মজীবনে ইনি ছিলেন রাজপুরুষ, বোর্দো (Bordeaux)-র শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থাপনায় ইনি বারবার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ছেলেবেলা থেকে প্রগাঢ় লাতিন সাহিত্য পাঠ করবার যে দুর্মর স্পৃহা তিনি সঞ্চয় করেছিলেন, সেই বহু পঠনের অভ্যাস তাঁকে বহুবার chateau of Montaigne-এর লাইব্রেরীর চিন্তকোঠায় আবদ্ধ রেখেছে। দেশের বাড়ির চিন্তকোঠার নিভৃত নির্জনতায় বিভিন্ন মনস্বীর মনীষার আলোকে তিনি নিজের স্বরূপকে চিনতে শুরু করলেন। আত্মউপলব্ধিকে লিখে যেতে লাগলেন একে একে। এই আত্মমূলক রচনার কোনো পূর্ব-দৃষ্টান্ত নেই। সাহিত্য জগতে এ এক নতুন প্রচেষ্টা, অভিনব 'essai', তাই রচনাগুলি সঙ্কলিত করে নাম দিলেন Essais অর্থাৎ প্রচেষ্টা। সত্যিই বক্তব্যে ও রীতিতে এর কোনো পূর্ব-নিদর্শন নেই। রীতিতে যেমন তথ্য-যুক্তি-সিদ্ধান্তের কোনো সুকঠোর অনুক্রম নেই, বক্তব্যেও তেমনি আত্মসচেতন কণ্ঠস্বর :

> Reader, this is a book of good faith. My intention is that everyone see me in my book just as I am, without any sham or artifice.

ইংরিজী গদ্যসাহিত্যে Francis Bacon (১৫৬১-১৬২৬) হচ্ছেন ইংলণ্ডীয় রেনেসাঁসের দীপ্রতম প্রতিনিধি। বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর স্বাধীন চিন্তার মুক্ত অবকাশকে সুভাষিত-সুলভ বাক সংহতি, বৈজ্ঞানিকসুলভ সামঞ্জস্যস্থাপন, কবি-সুলভ রূপকনির্মাণের দ্বারা পরিশীলিত করে রচনার

আত্মতত্ত্বকে প্রবন্ধের স্তর থেকে স্বাতন্ত্র্য দান করলেন। তাঁর রচনায় Montaigne-এর স্বচ্ছন্দ এবং অন্তরঙ্গ আত্মবিস্তার হয়ত নেই। কিন্তু প্রবন্ধের মুহূর্মুহু তথ্যসন্নিবেশ ও অযোধ মীমাংসায়ও বাসনা নেই, তাঁর রচনা বেকন-মনীষার স্বাধীন চিন্তার বিকাশ, 'fertile in illustration, luminous in suggestion, and with considerble power to challenge and arrest the attention. (Arthur Compton-Rickett)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ইংলণ্ডে গৃহবিবাদ ও ধর্মবিবাদে অতিবাহিত হয়েছে, সেইজন্য এই সময়কার গদ্যে ধর্ম-অনুভূতি একটি প্রধান বিষয় হিসাবে গৃহীত হয়েছে। Thomas Browne কিংবা Jeremy Taylor-এর অধ্যাত্মতাদুরতার আশ্রয় কাব্যিক গদ্য ইংরিজী রচনাসাহিত্যকে আত্মমুখীনতার পথে নিয়ে গেল।

শতাব্দীর শেষ অর্ধে এলেন Daniel Defoe (১৬৬০-১৭৩১), Richard Steele (১৬৭২-১৭২৯), Joseph Addison (১৬৭২-১৭১৯)। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এঁরা প্রকাশ করলেন বিভিন্ন সাময়িক পত্র, The Review, Tatler, Spectator। সাময়িক পত্রের মাধ্যমে এঁরা ইংরিজী রচনাসাহিত্যকে অভিনব বৈচিত্র্যের সৌরভ দান করলেন। এই সব সংবাদপত্রের উদ্দেশ্য ছিল 'to banish vice and ignorance out of the territories of Great Britain'। কিন্তু শুধুমাত্র প্রাত্যহিক সংবাদ ছাপলে পত্রিকার আকর্ষণও বাড়ে না, উল্লিখিত উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয় না। সেজন্য পত্রিকাগুলিতে এক একটি নির্দিষ্ট স্তরে এক একটি নির্দিষ্ট চরিত্রের আবির্ভাব ঘটল। বলাবাহুল্য এই সব চরিত্র উপন্যাসের বহুল চরিত্র নয়, সম্প্রসারণশীল বিবর্তনের অভাবে Forster-কথিত অনুন্নত চরিত্র। এই সব চরিত্র তার নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর আলোকে সমসাময়িক সমাজবিধি, সমাজব্যবহার, আচার-বিচার, রাজনীতি, চরিত্রনীতি, সাহিত্য-নীতির উপর বিচিত্র আলোচনার সূত্রপাত করল। এই জাতীয় চরিত্রের উজ্জ্বলতম উদাহরণ Sir Roger de Coverley.

এই জাতীয় চরিত্রমুখ্য রচনা প্রবন্ধ নয়। তার কারণ এতে প্রবন্ধের মতো বিষয়-নির্দেশ থাকলেও প্রবন্ধের মতো তথ্য-যুক্তি-সিদ্ধান্তের নিগড় পারম্পর্য নেই। ছোটগল্প নয় তার কারণ ছোটগল্পের চরিত্রসৃষ্টি ও আয়তন সংহতি এতে থাকলেও ছোটগল্পের সুষমাজড়িত শাশ্বত জীবনব্যঞ্জনা এতে নেই। আসলে এটি পূর্বতন রচনাসাহিত্যেরই একটি প্রকারভেদ। পূর্বতন রচনাসাহিত্য ভাবপ্রধান, সংবাদপত্রজীবী নতুন রচনা-সাহিত্য চরিত্রপ্রধান। প্রথম ক্ষেত্রে লেখক কোনো অভিজ্ঞতা, ঘটনা, অধ্যয়ন, চিন্তাবেশ ও আবেগমুহূর্তের সূত্র অবলম্বন করে আত্মজিজ্ঞাসার অন্তর্মুখী রূপ, এই অন্তর্মুখী আত্মপ্রকাশে জড়িত থাকে হৃদয়ের সমস্ত ভালো মন্দের স্পর্শ, বাসনার বর্ণ, প্রবণতার প্রভাব। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সমাজ-বিধি, আচার প্রকরণ, রাজনীতি, শিল্পতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়কে অবলম্বন করে লেখকের পরিশীলিত অস্তিত্বের বুদ্ধি, বৈদগ্ধ্য, নাগরিকতাবোধ ও পরিহাসপটুতা যে উদার সম্ভাবনা-ক্ষেত্রের জন্ম দেয় আলোচ্য বিষয়ের সমস্যাসূত্রগুলি সেইখানে সামঞ্জস্যলাভ করে সর্বজনরোচনীয় হয়ে ওঠে। উভয় ক্ষেত্রেই লেখকের আত্মপ্রকাশ সুস্পষ্ট। তবে ভাবপ্রধান শাখায় ভাবতন্ময় বিহ্বলতার অবকাশে লেখকের আবেগের, ব্যক্তিত্বের নির্জনতম অংশের প্রকাশ, আর চরিত্রপ্রধান শাখায় একটি ক্ষুদ্র চরিত্রের অন্তরালে লেখকের বুদ্ধির, ব্যক্তিত্বের নাগরিক অংশের প্রকাশ। প্রথম রচনার ফলশ্রুতি হৃদয়ের, দ্বিতীয় রচনার ঐশ্বর্য মস্তিষ্কের।

২

আমাদের আধুনিক বাংলা সাহিত্য সব ব্যাপারেই একটু

আওচেতন। মধ্যযুগের দীর্ঘ বন্ধন দশায় বাংলা সাহিত্যের যে যৌবনলক্ষ্মী একদিন সত্তামুগতিকতার যুগে অবরুদ্ধ ছিল, উনিশ শতাব্দীর রেনেসাঁসের রাজপুত্রের এসে সোনার কাঠি ছোঁয়াতেই বাংলা সাহিত্যে বিচিত্র ভাববৈভব, বর্ণাঢ্য যৌবন-ঐশ্বর্য প্রকাশিত হল। সাধারণতঃ পাশ্চাত্য দেশে যে নব প্রবণতাগুলি দীর্ঘ শতাব্দীর সাধনায় ঐশ্বর্য অর্জন করে, আমাদের সাহিত্যে দেখা যায় উনিশ শতকেই তার সূচনা এবং উনিশ শতকেই তার পরিণতি না হোক ঐশ্বর্যের সম্ভাবনা।

রেনেসাঁসের অন্যতম ফসল হিসাবে বাংলা রচনা সাহিত্য উনিশ শতাব্দীর আগে প্রত্যাশা করা অযৌক্তিক। সেজন্য উনিশ শতাব্দীর আগে মধ্যযুগে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য-জীবনীর অবকাশে বর্ণনপ্রবন্ধ রচনা করেছেন, সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের বৈষ্ণব শাখা গ্রন্থগুলি প্রবন্ধের অপরিণত রূপ। অজ্ঞাতব্যক্তিত্ব মধ্যযুগ কোনো রচনাসাহিত্যের জন্ম দেয় নি, দেয়া তার পক্ষে সম্ভবও ছিল না।

উনিশ শতাব্দীতে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মজীবনী রচনা সাহিত্যের রূপসীমা রক্ষিত না হলেও সেখানে তাঁর প্রকৃতি সম্ভোগ ও অধ্যাত্মভাবুকতা যে আত্মমগ্ন ভাবের সৃষ্টি করেছে তার সঙ্গে রচনাসাহিত্যের শিল্পবৈশিষ্ট্যের সাধর্ম্য আবিষ্কার করা যায়। এটি রচনাসাহিত্যের ভাবপ্রধান শাখার নিদর্শন। বাংলা সাহিত্যে চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্যের প্রাদুর্ভাব শতাব্দীর প্রথম থেকেই শুরু হয়েছিল—তবে একটু অস্পষ্ট এবং আরো একটু বেশী অপরিচ্ছন্ন ভাবে। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ঈশ্বর গুপ্ত, গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খুড়ো-ভাইপো সংবাদ)—এঁদের হাতেই চরিত্র-প্রধান রচনাসাহিত্যের অপরিণত ও অবাধিত সূত্রপাত। তারপর হুতোম প্যাঁচার নক্‌শায় এই শাখার একটি সুবিধিত রূপাবয়ব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের কমলা-কান্তের দপ্তর উনিশ শতকের শ্রেষ্ঠ চরিত্রপ্রধান রচনা সাহিত্য—এতে চরিত্রের মাধ্যমে বঙ্কিমের সমাজ-সমালোচনা এবং ভাবানুসরণের বিকাশ একই রূপকল্পের আধারে সুষ্ঠুভাবে ধরা পড়েছে।

বঙ্কিমের পরে উনিশ শতাব্দীর শেষ সীমান্তে রবীন্দ্রনাথই বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ রচনা-সাহিত্যকার। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্যের প্রথম পর্বের কোনো কোনো রচনায় বিষয়নিষ্ঠা থাকলেও প্রধানতঃ ভাবমূলক রচনাগুলি তাঁর রোমান্টিক লিরিসিজমের পরিপূরক হিসাবে অপূর্ব শিল্পশ্রী লাভ করেছে। প্রথম পর্যায়ের 'বিবিধ প্রসঙ্গে'র কতকগুলি রচনা এবং 'পুষ্পাঞ্জলি' সমস্তই ভাবমূলক রচনার নিদর্শন। 'বিচিত্র প্রবন্ধ' উনিশ শতাব্দীর শেষার্ধের রচনাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সঙ্কলন, কবির ভাষায়, বিষয়গৌরব অপেক্ষা রচনার রস সম্ভোগই এর একমাত্র ফলশ্রুতি।

বিচিত্র প্রবন্ধের বিভিন্ন রচনা এবং পঞ্চভূতের বিভিন্ন রচনার মধ্যে কালগত সাদৃশ্য বিদ্যমান, তাছাড়া 'বিচিত্র প্রবন্ধ' ও 'পঞ্চভূতে'র আস্বাদের মধ্যে এমন কিছু প্রবন্ধ-দুর্লভ বৈচিত্র্য ও অপূর্বতা ছিল যে উভয় গ্রন্থের রচনাকেই রবীন্দ্রনাথ একসময়ে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' শীর্ষক একটি নামের ছায়ায় পোষণ করেছেন। "১৩১৪ বৈশাখ গদ্য গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ড 'বিচিত্র প্রবন্ধ' মধ্যে পঞ্চভূত স্থান লাভ করে। কিন্তু স্থানে স্থানে পরিবর্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছিল। ১৩১৪ হইতে ১৩৪২ পর্যন্ত ইহার পৃথক গ্রন্থসত্তা ছিল না। ১৩৪২ সালে রবীন্দ্র-নাথ পুনরায় গ্রন্থখানি ভালো করিয়া দেখিয়া দেন; সেই সময়ে 'সাধনা' হইতে প্রায় সবই এই নবতর সংস্করণে যথাযথ-স্থানে যোজিত হয়। এছাড়া কোন কোন অংশ এই সময়ে নূতন করিয়া লিখিয়া দেন" (রবীন্দ্র জীবনী ১ম খণ্ড)।

পঞ্চভূত যে বিচিত্র প্রবন্ধের অন্তর্গত ছিল, অথবা পঞ্চভূত যে বিচিত্র প্রবন্ধের প্রবন্ধহীনতার অংশভাজন তার প্রমাণ পঞ্চ-ভূতের দুটি রচনা :- 'মন' ও 'পরিপ্রেক্ষে',—এই দুটি রচনায় পঞ্চভূতের চিরাচরিত আঙ্গিক উপেক্ষিত হয়ে কবির আত্মমগ্ন ভাবতন্ময়তা প্রাধান্য লাভ করেছে। তবে শেষ পর্যন্ত বিচিত্র

প্রবন্ধ থেকে পঞ্চভূতকে যে পৃথক অস্তিত্ব দান করতে হল তার কারণ পঞ্চভূতে প্রকৃষ্ট বন্ধন না থাকলেও বিচিত্র প্রবন্ধের বৈচিত্র্যের সঙ্গে পঞ্চভূতের বৈচিত্র্যের উপস্থাপনাগত পার্থক্য খুব স্পষ্ট। বিচিত্র প্রবন্ধ রচনাসাহিত্যের ভাবপ্রধান শাখার অন্তর্গত, সেই কারণে সেখানে কবি জীবনের কোনো বাঁধা বিষয় নিয়ে সংক্রান্ত হন নি। এখানে 'বিচিত্র প্রবন্ধ' মানসী-সোনার তরীর গদ্য সহচর, রোমান্টিক কবিকল্পনার অপরিহার্য পরিপূরক. আর রোমান্টিকেরা তো 'Knew that their business was to create, and through creation to enlighten the whole sentient and conscious self of man, to wake his imagination to the reality which lies behind or in familiar things, to rouse him from the deadening routine of custom to a consciousness of immeasurable distances and unfathomable depths, to make him see that mere reason is not enough and that what he needs is inspired intuition' (C. M. Bowra)। সুতরাং চৈতন্যের এক অপরিচিত অন্তর্দৃষ্টি আলো ফেলে তিনি জীবনের বিবিধ অপোচর রহস্য,—প্রেম, বৃহৎ, সৌন্দর্যবোধ ইত্যাদির তাৎপর্য ও স্বরূপ নির্ণয় করেছেন। কিন্তু পঞ্চভূতে কবি অ-রোমান্টিক না হলেও কতিপয় বিভিন্নধর্মী চরিত্রের স্রষ্টা, সুতরাং কিছু পরিমাণে নাটকীয় বস্তুনিষ্ঠতার অধিকারী, আর পঞ্চভূত যেহেতু রচনা-সাহিত্যের চরিত্রপ্রধান শাখার অন্তর্গত, সেইজন্য প্রেম, বৃহৎ, সৌন্দর্য ছাড়াও শিল্পকলা, ব্যক্তিবল, সৌন্দর্যবোধের বিবিধ বাস্তব প্রসঙ্গ, বিজ্ঞানচর্চা, সমাজে ভদ্রতার আদর্শ, সাহিত্য সমালোচনা, বঙ্গসমাজে নরনারীর আপেক্ষিক প্রাধান্য বিচার ইত্যাদি দেশকালবদ্ধ প্রত্যক্ষ প্রসঙ্গেও লিপ্ত হয়েছেন। তাছাড়া, এর চরিত্রগুলি এবং আলোচনার স্থান নির্বাচনেও এমন একটি নাগরিক পারিপাট্য এবং বাতাবরণ আছে যা একমাত্র চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্যেই আশা করা যায়। সুতরাং চরিত্রপ্রাধান্য, বিষয়চেতনা ও নাগরিকতা এই তিনটি পঞ্চভূতের সামান্য লক্ষণ।

কিন্তু পঞ্চভূতের বিষয়বিন্যাস চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে সাধিত হলেও সাধারণ চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্য থেকে এর পার্থক্য খুব স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্যে সাধারণতঃ চরিত্র থাকে একটি, সেই চরিত্রের জন্য আবার একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী ও বাচনশৈলী পূর্বনির্দিষ্ট থাকে, এই পূর্বনির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যে রচনাটির আপাত-বিচ্ছিন্নতা একটি সামগ্রিক ঐক্য অর্জন করে। কিন্তু 'পঞ্চ-ভূতে' বক্তা 'আমি' শুদ্ধ চরিত্রের সংখ্যা ছয়টি। তাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে অপরিবর্তমান নির্দিষ্টতা থাকলেও তাদের পার-স্পরিক দৃষ্টিবৈষম্যে রচনাসাহিত্যের পূর্বকথিত সামগ্রিক এক-মুখীনতা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্নিরীক্ষ্য হয়ে পড়ে। এই সব দৃষ্টান্ত বিবেচনা করতে গিয়ে পঞ্চভূতের লেখক নির্দেশ ভূয়োদর্শী পাঠকেরা Plato-র The Symposium, Landor-এর Imaginary Conversations, Oliver Wendell Holmes-এর The Breakfast Table Series-এর কথা স্মরণ করেন। কিন্তু পঞ্চভূতের ঐকান্তিক রস গ্রহণের জন্য এই সব গ্রন্থের সঙ্গে তুলনায় প্রবেশ করার প্রয়োজন দেখি না। কেননা, রবীন্দ্রনাথের রচনায় এই সব রচনার সচেতন প্রভাব তো নেই-ই, ইতস্ততঃ সাদৃশ্য যা আছে তা নিতান্তই ভঙ্গীগত এবং বহিরঙ্গমূলক, তাছাড়া পঞ্চভূতের বিষয় পরিধির ওই সব রচনা থেকে পৃথক। আর ভঙ্গীগত সাদৃশ্য যদি অন্বেষণ করতে হয় তবে ভারতীয় তথা বঙ্গভূমীর বাংলা সাহিত্যে এর ঐতিহ্য দুর্লভ নয়। সংস্কৃত সূক্ত, পালি সুত্ত কিংবা ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ, ভাষা পরিচ্ছেদের অনুবাদ কিংবা আরো কাছাকাছি বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি,—এই সব ক্ষেত্রে বিভিন্ন চরিত্রের কথোপকথনের মাধ্যমে আলোচ্য বিষয়কে উপস্থাপিত করা

হয়েছে। পঞ্চভূতের সঙ্গে এই সব গবেষণানিরূপিত ঐতিহ্যের প্রকৃত কোনো যোগ আছে কি না তা স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়, বর্তমানে এইটুকু নিশ্চিতভাবে বলা চলে যে 'পঞ্চভূত' রচনাসাহিত্যের অন্যীভূত এবং রবীন্দ্রনাথের কারয়িত্রী প্রতিভার একটি নানাপুষ্টিবিধিত সন্তান।

৩

পঞ্চভূতের প্রকাশকাল ১৩০৪ সাল, তার পূর্বে রচনাগুলি ১২৯৯ সাল থেকে ১৩০২ সালের মধ্যে বিভিন্ন সময়ে 'সাধনা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তখন এগুলির পরিচয় ছিল ডায়ারি, পঞ্চভূতের ডায়ারি, বা পাঞ্চভৌতিক ডায়ারি। গ্রন্থাকারে প্রকাশের সময় কবি এর 'ডায়ারি' নাম পরিবর্তিত করে শুধু 'পঞ্চভূত' নামকরণ করেন। তার কারণ, সাধারণে রবীন্দ্রনাথের বা বিশেষতঃ পঞ্চভূত—এর কোনোটিই ডায়ারির অনুরূপ বা অনুকূল নয়। ডায়ারির ধর্ম, প্রতিদিনের ঘটনা, অনুভব, আবেগ, সংবাদ ইত্যাদিকে প্রাত্যহিক বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকাশ করা, কিন্তু তাতে প্রাত্যহিক বস্তুতথ্য হয়ত রক্ষিত হতে পারে কিন্তু স্থানকালাতীতরূপ জীবনসত্য প্রকাশিত হয় না :

> "প্রতিদিন আমরা যাহা অনুভব করি, তাহা প্রতিদিন লিপিবদ্ধ করিতে গেলে তাহার যথার্থ পরিমাণ থাকে না।.....ডায়ারি রাখিতে গেলে একটা কৃত্রিম উপায়ে আমরা জীবনের প্রত্যেক তুচ্ছতাকে বৃহৎ করিয়া তুলি, এবং অনেক কচি কথাকে জোর করিয়া ফুটাইতে গিয়া ছিঁড়িয়া অথবা বিকৃত করিয়া ফেলি।"
>
> (পরিচয় : পঞ্চভূত)

পঞ্চভূতে বিষয়চেতনা থাকলেও প্রবন্ধসুলভ বিষয়নিষ্ঠা যেমন নেই তেমনি সংবাদপত্র বা ডায়ারিসুলভ দৈনন্দিন তথ্য সঙ্কলনও নেই। এখানে পঞ্চমুখী আলোচনা যেমন প্রবন্ধের বিষয়তন্ময়তাকে বিনষ্ট করেছে, অন্যদিকে কথোপকথনের মাধ্যমে 'সত্যের মতের চেয়ে 'সত্যের আনন্দ' লাভের উদ্দেশ্য তেমনি পঞ্চভূতের বিষয়পরিধিকে ডায়ারির সীমা থেকে দূরবর্তী রেখেছে। তাছাড়া, পঞ্চভূতে বস্তুভেদী দুর্ধর্ষ সত্য-নিরীক্ষাও অনুপস্থিত। এখানে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের বিভিন্ন জিজ্ঞাসার আলোচনা করা হয়েছে। এখানে আলোচনাটাই বড় কথা, নিশ্চিত কোনো সিদ্ধান্ত নয়, 'এ সভায় কোনো কথার পূরা মীমাংসা না হইলেও ক্ষতি নাই, সত্যের কিয়দংশ পাইলেও আমাদের চলে। এমন কি সত্যাক্ষের গভীররূপে কর্ষণ না করিয়া তাহার উপর দিয়া লঘুপদে চলিয়া যাওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য' (কৌতুক-হাস্যের মাত্রা)।

এই 'লঘুপদে চলিয়া যাওয়া' ব্যাপারটা আরো একটু বিস্তৃত করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন 'কথোপকথন সভার একটি নিয়ম—সহজে এবং দ্রুতবেগে অগ্রসর হওয়া। অর্থাৎ মানসিক পায়চারি করা।..... কথোপকথন সমাজে আমরা যদি প্রত্যেক কথার অংশকে শেষ পর্যন্ত তলাইবার চেষ্টা করিতাম তাহা হইলে একটা জায়গাতেই এমন নিরুপায়ভাবে বিদ্ধ হইয়া পড়া যাইত যে, আর চলা ফেরার উপায় থাকিত না।...এমন সকল বিষয় আছে যাহাতে প্রতিপদে গভীরতার দিকে তলাইয়া যাইতে হয় : কথোপকথনকালে সেই সকল অনিশ্চিত সন্দেহতরল বিষয়ে পদার্পণ না করাই ভালো।'

(কৌতুকহাস্যের মাত্রা)

কোনো বিষয়বস্তুর উপর ঐকান্তিক পক্ষপাতের বদলে এই বিষয়তারযুক্ত লঘু সঞ্চরণশীলতাকেই তো পাশ্চাত্য সমালোচক রচনাসাহিত্যের লক্ষণ রূপে নির্দেশ করেছেন : It is the humour of essays···rather to glance at all things with a running conceit than to insist on any. সুতরাং 'পঞ্চভূত' রচনাসাহিত্য, এবং চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্য।

চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্যে সাধারণতঃ একটি চরিত্র, পঞ্চভূত পাঁচটি বা ছয়টি চরিত্রের কথোপকথন। কিন্তু চরিত্রের

সংখ্যা বৃদ্ধিতে এই জাতীয় রচনার মৌল অভিপ্রায় ক্ষুণ্ণ হয় নি। আসলে পঞ্চভূত পাঁচটি দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিভূ, 'The Five Elements were the Five points of view of the philosophy of life.' (দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়)।

"শাস্ত্রমতে পঞ্চভূতের সমষ্টিই জগৎ। মানুষও তাই। প্রত্যেক মানুষই প্রায় পাঁচটা মানুষ মিলিয়া। ভিতরেও পাঁচটা, বাহিরেও পাঁচটা।...কোনো মানুষ আপনাতে আপনি সম্পূর্ণ নহে। ...কিন্তু পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে গুটিকতক বিশেষ-মানুষ বিশেষ সংলগ্ন হইয়া একটি বিশেষ ঐক্য নির্বাণ করে। তাহার অসংখ্য আলাপী আত্মীয়দের মধ্যে সেই কয়েকটি লোকই যেন তাহার সীমানা নির্দেশ করিয়া দেয়।...রচনার সুবিধার জন্য তাঁহাদের মধ্য হইতে কেবল পাঁচজনকে লওয়া যাক। এবং তাঁহাদের পঞ্চভূত নাম দেওয়া যাক। ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম।" (সাধনা, ১২৯৯ মাঘ)

প্রকৃতপক্ষে, মর্ত্য জগৎ পাঁচটি ভূতের সমবায়ে গঠিত। এই পাঁচ ভূতের বাইরে মর্ত্যের অস্তিত্ব আর কোথাও নাই। সুতরাং সমস্ত মর্ত্য প্রপঞ্চ এই বিভিন্ন উপাদানের সাধারণ সীমায় নির্দেশিত—এই বিবেচনায় পাঁচটি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর মাধ্যমে মর্ত্যের বিভিন্ন প্রপঞ্চগুলিকে চূড়ান্তভাবে নয় বরং একটি সাধারণ আত্মস্থতা দিয়ে পরিব্যাপ্ত ভাবে অনুলোকন করবার জন্য পাঁচটি চরিত্র বেছে নিয়েছেন। আর উদ্ভব পুরুষ ভূতনাথ হিসাবে "গ্রীক কোরাসের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু পাত্রপাত্রীর সংলাপের ব্যাখ্যা বা সমালোচনা করেন নি—আত্মবিরোধের সমস্ত ধারা-উপধারা সামনে রেখে সর্ববিরোধাতিশয়ী, পূর্ণ আত্মোপলব্ধির আনন্দ পেয়েছেন" (সাহিত্যপাঠকের ডায়ারি : ২য় পর্যায়। শ্রী হরপ্রসাদ মিত্র)।

আগেই বলেছি পঞ্চভূতের রবীন্দ্রনাথ চূড়ান্তবাদী নন, বিচিত্রদিকচারী; সত্য সম্পর্কে বিবিধ আলোর বিচ্ছুরণে তিনি তৃপ্ত; এই ব্যক্তিচিত্রের মনোবৃত্তির জন্য তাঁকে পঞ্চভূতের দার্শনিক পরিভাষার কিঞ্চিৎ পরিবর্তন সাধন করে দুটি নারী চরিত্র সৃষ্টি করতে হয়েছে, অপ্ অর্থাৎ স্রোতস্বিনী, তেজ অর্থাৎ দীপ্তি। রবীন্দ্রজীবনীকারের সাক্ষ্যে জানা যায়, ঠাকুরবাড়ির 'বিভিন্ন সাহিত্য-চক্রের অধিবেশনে পঞ্চভূতের আনুষঙ্গিক বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়ির সাহিত্য চক্রে 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি' নামে একখানি হাতে লেখা খাতা হইতে আমরা জানিতে পারি যে, বাড়ির লোকেরা ও বাড়ির বন্ধুরা ঐ খাতায় নানা বিষয় সম্বন্ধে নিজ নিজ মনের ভাব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, দ্বিজেন্দ্রনাথ, বলেন্দ্রনাথ, লোকেন পালিত, প্রমথ চৌধুরী, যোগেন চৌধুরী প্রভৃতির বিচিত্র মন্তব্য উহাতে আছে। কোনো কোনো স্থলে একটা বিষয় লইয়া পাঁচজনের মত আছে। সাহিত্য বিষয়ক কয়েকটি রচনা এবং পঞ্চভূতের কয়েকটি প্রবন্ধের খসড়া এখানে খুঁজিলে পাওয়া যায়' (রবীন্দ্রজীবনী ১ম খণ্ড, ৩৪৩ পৃঃ)। পঞ্চভূত রচনার আনুষঙ্গিক বাতাবরণ নির্ণয় করতে গিয়ে শ্রীযুক্ত প্রভাত মুখোপাধ্যায় আরও একটি তথ্যের উপর আলোকপাত করেছেন। ১৮৯২ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসে রাজসাহীর তদানীন্তন জেলাজজ লোকেন পালিতের বাড়িতে রবীন্দ্রনাথ আতিথ্য গ্রহণ করেন, সঙ্গে আছেন প্রমথ চৌধুরী। অক্ষয় মৈত্রেয়, শরৎ কুমার রায়ও এসে সান্ধ্য সভায় যোগদান করেন। সেখানে নানা বিষয়ের আলোচনা চলে। "প্রমথ চৌধুরী বলেন এই সময় হইতে কবির মাথায় পঞ্চভূতের ভাবারির আইডিয়াটা ঘুরিতেছে, এবং বলত এইখানেই তাহা শুরু করেন, কারণ মাঘ মাসের (১২৯৯) সাধনায় পঞ্চভূতের ভূমিকা অংশ বাহির হয়" (রবীন্দ্রজীবনী, পৃ ২২৪)। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির সাহিত্য-চক্র অথবা রাজসাহীর বিদৎ সভায় পঞ্চভূতের আদি প্রেরণা অনুসন্ধান করলেও সেখানেই পঞ্চভূতের

সামগ্রিক শিল্পস্বরূপ ধরা পড়ে নি, বিষয়চেতনাতেও না, মৌল অভিপ্রায়েও না, রচনাপারিপাট্যেও না। পঞ্চভূতে কবির চৈতন্য সত্যের চূড়ান্ত রূপকে অন্বেষণ করে নি, সত্যের আবহাওয়ায় নিশ্বাস নিতে চেয়েছে. দৃষ্টিভঙ্গীতে তিনি তত্ত্বজিজ্ঞাসু দার্শনিক নন, রসপিপাসু রসুকর, গভীরতার চেয়ে বৈচিত্র্যের দিকে তাঁর পক্ষপাত বেশী। দৃষ্টিভঙ্গীর এই সঙ্কল্পশীল সর্বব্যাপিতার জন্যই ব্রাহ্মণ-রোমানক্যাথলিক সংবাদ, ভাষাপরিচ্ছেদ-অনুবাদ কিংবা বঙ্কিমচন্দ্রের গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলি থেকে রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' সুনির্দিষ্টভাবে পৃথক। ব্রাহ্মণ-রোমান ক্যাথলিকের ব্রাহ্মণ ও ক্যাথলিক যাজক, ভাষাপরিচ্ছেদের গুরু-শিষ্য কিংবা গৌরদাস বাবাজির ভিক্ষার ঝুলির রামবল্লভবাবু, হরিদাস বৈরাগী ও উত্তম পুরুষ চরিত্রগুলিতে কোনো ব্যক্তিত্ব সঞ্চারিত হয় নি। ওগুলি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন এবং উত্তরের প্রতিনিধি মাত্র। চরিত্রগুলির উল্লেখ না করে শুধু 'প্রশ্ন' এবং 'উত্তর' 'প্রশ্ন' এবং 'উত্তর'—Catechism-এর এই পদ্ধতি অবলম্বন করলেও এদের রচনাগত উদ্দেশ্য কোনো অংশে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। কিন্তু পঞ্চভূতে এই পদ্ধতি অবলম্বন করলে উদ্দেশ্য ছাড়াও এর শিল্পগৌরবের অনেকখানিই খর্ব হয়ে আসে। কেননা, পঞ্চভূতের চরিত্রগুলিতে এক একটি নির্দিষ্ট ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য রয়েছে, আর চরিত্রগুলির নির্দিষ্ট ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য আছে বলেই একে ঠাকুরবাড়ির পারিবারিক স্মৃতিলিপি কিংবা রাজসাহীর বিষৎসভার আলোচ্য বিষয়ের পরিশোধিত সংস্করণ বলে স্বীকার করতে দ্বিধা হয়। এইখান থেকে তাঁর মনে নাগরিক আলোচনা চক্রের আইডিয়াটি মাথায় আসতে পারে। কিন্তু পঞ্চভূতের আলোচ্য বিষয়ের উপর যে পরিচ্ছন্ন এবং সর্বতোমুখী অবলোকনভঙ্গী প্রসারিত হয়েছে, তার জন্য রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টি ও শিল্পপ্রতিভার সচেতন কারুকর্মের অপেক্ষা ছিল। পাঁচটি ভূতে পৃথিবীর সীমা নির্দেশিত, সুতরাং আলোচ্য বিষয়কে পাঁচ ভূতের মনোভঙ্গীর দ্বারা বিন্যস্ত করলে মোটামুটি সত্যের কাছাকাছি কিংবা সত্যের আবহাওয়ায় পৌঁছানো যেতে পারে এই জন্য তিনি পাঁচটি ভূতকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতিনিধি করে উপস্থাপিত করেছেন।

ক্ষিতি : ক্ষিতি অর্থে বৃত্তিকা, অর্থাৎ বুদ্ধিকাবনিষ্ঠ স্থূল বাস্তব দৃষ্টি, 'তিনি যাহাকে প্রত্যক্ষভাবে একটা দৃঢ় আকারের মধ্যে পান. এবং আবশ্যক হইলে কাজে লাগাইতে পারেন, তাহাকেই সত্য বলিয়া জানেন।'

সলীল : বায়ু যেমন অদৃশ্য অথচ অস্পর্শগোচর নয়, তেমনি জীবন সম্পর্কে রোমান্টিক মনোভঙ্গী যা বস্তুসর্বস্ব নয় অথচ অলভ্যও নয় : 'মানুষের সহিত জড়ের সম্বন্ধ লইয়াই সংসার নহে। মানুষের সহিত মানুষের সম্বন্ধটাই আসল সংসারের সম্বন্ধ।'

ব্যোম : আকাশে যেমন ধরিত্রীর স্থূল স্পর্শ এবং সলীলের হিল্লোলিত চাঞ্চল্যের ঊর্ধ্বে একটি গম্ভীর, অবিচল এবং শুভ্র উৎক্ষেপ বিদ্যমান, ব্যোম চরিত্রের মাঝখানে তার সমস্ত অটল গাম্ভীর্য। লোকপ্রচলনের বহির্ভূত বেসুরোর মাঝখানে জীবন সম্পর্কে তেমনি একটি অ-বাস্তব, অরোমান্টিক অটল গম্ভীর ঊর্ধ্বগামী তত্ত্বনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গী উপস্থাপিত হয়েছে, 'ঠিক মানুষের কথা যদি বল, যাহা অনাবশ্যক তাহাই তাহার পক্ষে সর্বাপেক্ষা আবশ্যক।'

এই তিনটি ভূত ছাড়া অন্য দুটি ভূত নারী জাতীয়। অপ্ (স্রোতস্বিনী) এবং তেজঃ (দীপ্তি) কে নারী চরিত্রে রূপায়িত করবার পিছনে পঞ্চভূতকার রবীন্দ্রনাথের জীবনদৃষ্টির সেই পূর্বকথিত পরিচ্ছন্ন, সর্বতোমুখী, বিচিত্রচর মনোভাবই সক্রিয় হয়েছে। তিনি লক্ষ্য করেছেন, আলোচ্য বিষয়ে বিভিন্ন দৃষ্টি-প্রদীপের আলোকপাত সম্পূর্ণ করতে গেলে সেখানে শুধু পুরুষ চরিত্র উপস্থাপিত করলে খণ্ড দর্শনের উপলব্ধি ঘটে. কেননা পৃথিবীতে এবং মনুষ্যজীবনে নারী-সমাজের স্থান সর্বত্র হলেও তার একটা নির্দিষ্ট এবং অপরিহার্য ভূমিকা আছে। পঞ্চভূতের শিল্পসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য যদি

আত্যন্তিকতার পরিবর্তে সামগ্রিকতা হয় তবে এই ভূমিকাকে অস্বীকার করা চলে না। তাই তিনি দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরকে নারী চরিত্রে রূপান্তরিত করেছেন, এবং দুটি মাত্র নারী চরিত্রের দ্বারা নারীজীবনের দৃষ্টিভঙ্গীর বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন, তার কারণ রবীন্দ্রদৃষ্টিতে নারী জাতির সব শুদ্ধ দুটি রূপ : কল্যাণী এবং উর্বশী। একজন অন্তর নিশিরস্নানে জীবনের সন্তাপ মুছে দিয়ে হেমন্তের সকল শান্তির পূর্ণতায় জীবনকে অভিষিক্ত করেন. ইনি কল্যাণী—শ্যামলী, কাজলী, উর্বশী নারী মেয়েরা এঁর রূপান্তর। অন্যজন বসন্তের পুষ্পিত প্রলাপে জীবনকে মোহচঞ্চল করে তোলে, এর নাম উর্বশী—'নাগরী' মেয়ের মধ্যে এর বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়। স্রোতস্বিনী এবং দীপ্তির ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কোনো পৃথক ধরণের দৃষ্টিভঙ্গীর অবতারণা করেন নি। স্রোতস্বিনী অনেক ক্ষেত্রেই সখীর অর্থাৎ রোমান্টিসিজমের পক্ষপাতী। আবার দীপ্তি প্রকৃতপক্ষে কোনো নির্দিষ্ট বক্তব্য প্রকাশ করে না; সে শুধু কথা প্রসঙ্গে তর্কে উদ্দীপিত হয়ে আলোচ্য বিষয়কে কোনো পরিণামগত পুষ্টি না দিয়ে প্রকারগত স্বাদুতা দান করে। পুরুষের জীবনে নারী কোনো পরিণামগত সংযোজন নয়, সে হয় তার সেবা-তিতিক্ষা-সহিষ্ণুতা দিয়ে পুরুষের জীবনকে প্রকারগত স্বাচ্ছন্দ্য দান করে অথবা বুদ্ধি, বিতর্ক, অন্য ব্যক্তিত্ব দিয়ে পুরুষের জীবনকে বিচলিত করে। এ ক্ষেত্রেও স্রোতস্বিনী ও দীপ্তির সংলাপ পাক্ষভৌতিক সভায় কোনো নতুন বক্তব্যের পরিণামগত বৃদ্ধি ঘটায় নি। আসলে স্রোতস্বিনী তার সহিষ্ণুতা, কোমলতা, নম্রতা দিয়ে সমস্ত কেন্দ্রীয় প্রসঙ্গকে একটা স্নিগ্ধ কান্তি দেবার চেষ্টা করেছে, অন্য দিকে দীপ্তির তীক্ষ্ণতা, কণ্ঠস্বরতা এবং বৈতার্কিক অনধিকৃতা আলোচ্য প্রসঙ্গকে প্রাণচঞ্চল করে রেখেছে।

বস্তুতঃ নারীচরিত্র দুটির নামের মধ্যেই উভয় প্রকার দৃষ্টি-ভঙ্গীর ব্যঞ্জনা নিহিত আছে। অপ্ অর্থে স্রোতস্বিনী : জলের সঙ্গে মেয়েদের একটা সহজ সাদৃশ্যের কথা রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন প্রসঙ্গে বারংবার উল্লেখ করেছেন। এখানেও 'আমাদের বাম পার্শ্বে আমাদের রমণীগণ নিম্নপথ দিয়া বিনম্র সেবিকার মতো আপনাকে সংকুচিত করিয়া সুধাস্রোতে প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে।...যেদিকে জলস্রোত, যেদিকে আমাদের নারীগণ, কেবল সেই দিকে সমস্ত শোভা এবং ছায়া এবং সফলতা।' তাই স্রোতস্বিনী 'তর্কের কোনো রীতিমতো উত্তর করিতে পারেন না। তিনি কেবল মধুর কাকলি ও সুন্দর গ্রীবাভঙ্গিতে ঘুরিয়া ফিরিয়া বলিতে থাকেন,...তাঁহার সহিত আর কোনো যুক্তি নাই, কেবল একটি তরল সঙ্গীতের ধ্বনি, একটি অনুনয় স্বর, একটি তরঙ্গ-নিন্দিত গ্রীবার আন্দোলন—'না, না নহে নহে। আমি অনাবশ্যককে ভালবাসি। অতএব অনাবশ্যকও আবশ্যক। অনাবশ্যক অনেক সময় আমাদের আর কোনো উপকার করে না, কেবলমাত্র আমাদের স্নেহ, আমাদের ভালোবাসা, আমাদের করুণা, আমাদের স্বার্থবিসর্জনের স্পৃহা উদ্রেক করে। পৃথিবীতে সেই ভালোবাসার আবশ্যকতা কি নাই।' স্রোতস্বিনীর সঙ্গীতধ্বনির তরলতা, গ্রীবাভঙ্গের তরঙ্গ নিন্দা, স্নিগ্ধ প্রীতির অমল প্রবাহ—এ সবের সঙ্গে জলের নিবিড় সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

শ্রীমতী তেজ অর্থে দীপ্তি : এর মধ্যে মেয়েদের তেজস্বিনী প্রতিবাদস্পৃহা পরিস্ফুট হয়েছে। এই মেয়েরই স্বরূপ বর্ণনায় রবীন্দ্রনাথ অন্যত্র বলেছেন :

বিদুষী নিয়েছে বিদ্যা শুধু চিত্তে নয়,
আপন রূপের সাথে ছন্দ তারে দিল অনায়াস ;
বুদ্ধি তার সলাটিকা।
চক্ষুর তারায় বুদ্ধি জ্বলে দীপশিখা ;
বিদ্যা দিয়ে রচে নাই পণ্ডিতের ঘুম অহংকার,
বিদ্যারে করেছে অলংকার।

আর পঞ্চভূতের দীপ্তিও 'একেবারে নিষ্কাষিত অসিলতার মতো ঝিকমিক করিয়া উঠেন।'

৪

বস্তুতঃ পঞ্চভূত শুধু বাংলা চরিত্রপ্রধান রচনাসাহিত্যের এক বিচিত্র ঐশ্বর্য এবং বিবর্ধমান শক্তিমত্তারই পরিচয় নয়। সাধনাপর্বের 'গল্প পল্পের জুড়ি'-চালক রবীন্দ্রপ্রতিভার এক বিস্ময়কর অভিব্যক্তি। সাধনাপর্বে রবীন্দ্রনাথ রাজনীতি, সমাজনীতি, সমাজব্যবহার, ধর্ম, সাহিত্যতত্ত্ব নিয়ে প্রবন্ধ রচনা করেছেন। পঞ্চভূতে রবীন্দ্রনাথের এই প্রবন্ধসুলভ পরিপার্শ্ব-চেতনা বিদ্যমান। কিন্তু প্রবন্ধের একনিষ্ঠ বিষয়তন্ময়তা নেই। এই পর্বে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিস্ময়কর উন্মেষ ছোট গল্পের উদ্ভব সমষ্টিতে, পঞ্চভূতে ছোট গল্পের চরিত্ররচনার কৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, কিন্তু গল্পগুচ্ছের প্রাথমিক পর্বের নিসর্গ, ভাবুক বিচিত্র জীবনবেদনা অনুপস্থিত। সাধনাপর্বের ঘানেসী-সোনার তরী-চিত্রার প্রেম, সৌন্দর্য ও মর্ত্যমমতা পঞ্চভূতে আছে, কিন্তু এই কাব্যগুচ্ছের ভাবকল্পনাপুষ্ট অনুস্যূত লিরিসিজম এখানে নেই। পঞ্চভূতে 'Out of three sounds be frames not a fourth sound, but a star'।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৪·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

জোয়ার

চপলার
শ্বশুরবাড়ির গল্প

বিজন কুমার ঘোষ

নয়

স্তব্ধতা। ছুটন্ত হরিণযূথের মতন সাঁই সাঁই বাতাস। উজ্জ্বল জ্যোৎস্না। অবিরাম গান শুনিয়ে স্রোতের যাওয়া-আসা। জীবনে এই ক্ষণটি, এই জ্যোৎস্না-ছাওয়া রাত্রিটি কখনো ফিরে আসবে না। এই সুন্দর রাত্রি কত দুঃখ দিতে জানে! কেয়াকেও বুঝি এত কাছে পাওয়া কোনদিন সম্ভব হবে না। গাছের হলুদ পাতার মতন সেই সব দিন ঝুঁরে ঝরে গেছে। কোনদিন ফিরে আসবে না। কেয়া কি সুন্দর! কি স্নিগ্ধ! ওর কোমল ছেলেমানুষীটাই আলোককে আরো বেশী করে সব চাইতে বেশী। পৃথিবীটা সুন্দর হয়ে ওঠে যদি এমনি কেয়া বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কেয়া এত দুঃখ দেয়, এত আঘাত করে তবু সেবার দিকে ওর মন হরিণের মত ছুটে যায়। বাধা মানে না। কেয়া জানে না, আলোক ওকে কত ভালবাসে। ওকে হারাবার আশঙ্কাই আলোককে পাগল করেছে। কেয়াকে দুঃখ দেয়, তার অনেকগুণ দুঃখ নিজে পায়। কেয়া তা কোনদিন জানবে না। অথচ কি আছে কেয়ার মধ্যে? বড়লোকের আদুরে মেয়ে। চপল-মতি। সাজতে-গুজতে ভালবাসে। সিনেমা দেখতে, দামী রেঁস্তোরায় বসে গল্পগুজব করতে কিম্বা মটরে চড়ে ঘুরে বেড়াতে ওর প্রচুর আনন্দ, অফুরন্ত উৎসাহ। জীবনে গভীরতার সম্মুখে কোনদিন দাঁড়ায় নি। কবিতার বই মুড়ে রেখে সিনেমা পত্রিকার সচিত্র জীবনকাহিনী পড়তে ভালবাসে। যা কিছু নতুন উত্তেজনার স্রোত সবার আগে তাতেই গা' ভাসাতে চায়। প্রচুর টাকা ভালবাসে—আরো সুখ আরো স্বাচ্ছন্দে সাঁতার কাটতে চায়। প্রেমটেম ও ভালবাসে যতক্ষণ না তা থেকে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয়। তবে হয়ত মাঝে মাঝে অবসাদ আসে। জীবন বিস্বাদ লাগে। তখন আলোককে বড় প্রয়োজন। আলোকের কাঁধে মাথা রেখে আলোকের শরীরে প্রবাহিত পূর্বপুরুষের শান্তি, স্নিগ্ধতা, আনন্দের আস্বাদ পেতে চায়। বলে, আলোক ইচ্ছে হয় এদিন রোড ছেড়ে এসে তোমার পাখিডাকা বেশে বাস করি। এ কথা আলোক বহুবার শুনেছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যেই ওকে হালতুর বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে অমনি সাপ ব্যাং পোকা মাকড় ইত্যাদি কল্পিত প্রাণীরা পথরোধ করে দাঁড়ায়। তাই আলোক পারত-পক্ষে ওকে আর যেতে বলে না। সত্যি, কোন দিক দিয়েই আলোকের সঙ্গে তেমন মিল নেই। তবু যে কেন মন ভোলে! কার ইচ্ছায়—কার সুতোর টান-পোড়েনে আলোক কেয়া এই বিশাল রঙ্গমঞ্চে নেচে বেড়ায়—কে জানে কে জানে! কার বিশেষ ইচ্ছা ওরা পূরণ করে বেড়ায়—কি যে এর মানে—কে জানে কে জানে!

কেয়াকে আলোকের একান্ত প্রয়োজন। এ কথাটা ও তিলে তিলে অনুভব করেছে, নাহলে বেঁচে থাকার কোন সার্থকতা থাকে না; জীবনটা শুকিয়ে বিস্বাদ হবে—এ

কথাটা ও চোখের জলে বুঝেছে। অথচ এই চোখের জলকে আলোক বড়ই ঘৃণা করত। ন্যাকামী মনে হত। নিজের বৈজ্ঞানিক মন দিয়ে গর্ব অনুভব করত। অফিসের টেবিল নানান্ দেশের সায়েন্স আর্নালে আকীর্ণ। পৃথিবীর কোথায় কোন্ বৈজ্ঞানিক সভ্যতার কোন্ স্তরে পৌঁছবার জন্যে গবেষণায় অতন্দ্র—আলোক সাগ্রহে তা পাঠ করে। আনন্দ পায়। আলোক জানে ঘুমকে যথাযথ ফোটাবার জন্যেও বিজ্ঞান প্রয়োজন। হয়ত একশো বছর আগে তেমন বৈজ্ঞানিক থাকলে গঙ্গার গতিপথ ঘুরিয়ে মোঘল সাহেবের আশ্চর্য বাগানখানা রক্ষা করতেন। মোটকথা প্রতি পদে বিজ্ঞান। ওপরে উঠতেও বিজ্ঞান, নিচে নামতেও। আর এই আধুনিক বিজ্ঞানের আধার হচ্ছে আধুনিক শহর। কেয়া শহরের প্রতীক। কেয়ার ভিতর দিয়ে আলোক বিজ্ঞানের প্রতি অনুরাগ জানায়। সত্যি ওদের এই সম্পর্কটাকে আবেগ-হীন বুদ্ধি দিয়েই বিচার করে এসেছে এতকাল। কেয়া ছিল, আছে, থাকবেও - এই রকম একটা নিশ্চিন্ততায় পেয়ে বসে-ছিল আলোককে। ফলে আবেগহীনতা প্রকাশ করতে, কি চোখের জলকে ন্যাকামী বলতে একটুও বাধেনি। পেটের, মনের আর দেহের খিদে নিয়েই মানুষ। পেটের জন্যে চাকরী করি, মনের জন্যে বই পড়ি কি থিয়েটার দেখি আর দেহের জন্যে প্রেম করি অথবা কেয়ার কাছে যাই। এতে কোন অন্যায় নেই, বাহাদুরীও নেই। এটাই জীবজগতের অমোঘ কানুন। বয়ঃসন্ধিকালে শরীরে নানা রকম গ্ল্যাণ্ডের গোপন ক্রিয়াকলাপের ফলে ভিন্ন লিঙ্গের প্রতি অনুরাগ জন্মায়। আমরা যতই কাব্য করে বলি না কেন যাহান প্রেম, আসলে অনুরাগের প্রকৃত অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর বিপুল ভাঁড়ার পূর্ণ করা। আমরা সারা জীবন প্রকৃতির এই আজ্ঞাই বহন করে চলি, আমরা ভৃত্য মাত্র। তাই প্রেম বা কেয়ার অন্য কোন অর্থ নেই, শুধু পৃথিবীতে রায়বাড়ির ধারা অব্যাহত রাখবার উদ্দাম ইশারা। এখানে যন্ত্রণার পরস্পর নির্ভরশীলতা। সুতরাং কেয়া কোন বিশেষ অর্থ বহন করে না। ওই উদ্দাম ইশারা কেয়ার মত হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়েও পূরণ করতে পারে। অতএব এই তথাকথিত প্রেমে কোন অচিন রহস্যময়তা নেই যার জন্যে গোঁটুকুলকে গোলাপের পাশে দাঁড় করাবে, কি কাঠকাটা রোদকে জ্যোৎস্না বলে ভ্রম হবে। বরং এসব ব্যাপারে সে নিরাসক্তিই দেখিয়েছে এতদিন। কোন রকম উচ্ছ্বাস ছিল না প্রেমে। অফিসের পর প্রায়ই দেখা হয়েছে কেয়ার সঙ্গে। সন্ধ্যেটা একভাবে কেটে গেছে। কিরণপোতে কিম্বা নেহ্রোতে। মাঝে মাঝে উদয়শঙ্কর অথবা পি. দি. সরকার। বা রেড রোডে ঘটরে চড়ে ঘুরে বেড়ান। এখানে ওখানে যাওয়া। একেক বার ওরা খুব ঘনিষ্ঠ হয়েছে। কি নরম কেয়ার শরীর! আইভি লতার মত লতান দেহ। তবু আলোকের উত্তপ্ত নিঃশ্বাস এক সময় স্বাভাবিক হত। বুকের দ্রুত হৃৎকম্প নিভে আসত। কেননা, আলোকের ঘনিষ্ঠ হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই মনে হত, ওতো পরের আজ্ঞা বহন করছে মাত্র। সুতরাং এর মধ্যে নিজস্বতা নেই, কি নতুনত্ব। মনে হয়েছে একটি নারী পুরুষের জীবনে কি দিতে পারে? সন্তান? বোধহয় আজকাল খুব বেশী পুরুষ পিতা হওয়ার জন্যে লালায়িত হবে না। ওটা মেয়েদের ব্যাপার। তবে হ্যাঁ, বায়োলজিক্যাল নেসেসিটি। কিন্তু ওতো কর্তার ইচ্ছায় কর্ম। সুতরাং তখনি কেয়ার দেহের সুধা ওর কাছে মেডিসিন হয়ে গেছে। ওর বোহমর চোখ, লালাসিক্ত ঠোঁট, চুম্বকশক্তি বিশিষ্ট বাংলাপিও নখদন্তহীন সিংহের মতন করুণা জাগায়। আর তখনি ক্লান্তি ঘুরে আসত সমস্ত শরীরে। ঘুম উড়ে আসত সমস্ত মনে।

কিন্তু একি? একি অদ্ভুত রকমের অনুভূতি? রাতারাতি সামান্য কয়েকটা কথা কাটাকাটির পরই যন্ত্রী কেয়া স্বর্গের দেবী হয়ে গেল! হীরকের খনি হয়ে গেল! কেন এমন হয়? সমস্ত রোমকূপ শিহরিত হয়ে বলে, কেয়াকে চাই। সমস্ত মন

উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, কেয়াকে চাই। রক্তের নদীতে কেয়া নামের ভেলা ভেসে যায় হৃদয় গহনে। বিস্মিত—অভিভূত আলোক। এত ভালবাসা ছিল প্রাণে। কোনদিন বোঝেনি, কোনদিন জানেনি এত ভালবাসা নিঃশব্দে বহন করে বেড়াচ্ছিল। যেন ঘুমিয়ে ছিল ভালবাসা এতদিন। আজ কোন্ যাদুমন্ত্রের স্পর্শে বুকের মধ্যে প্রচণ্ড ভালবাসা মহান সমুদ্রের মত গান গেয়ে উঠছে। আলোক সইতে পারছে না। কেয়া অনন্তা। অসাধারণ। আলোকের এতদিনের ধারণা সম্পূর্ণ মিথ্যে। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মেয়ে কিছুতেই কেয়ার স্থান পূরণ করতে পারে না। নারী পুরুষের জীবনকে অনেক কিছু দিতে পারে—দেয়। আধুনিক বিজ্ঞান তার কোন বিকল্প খুঁজে বের করতে পারেনি। কেয়াকে চাই—এ কথার ভিতর যতই একঘেয়েমী প্রকাশ পাক—আলোকের কাছে তা নিঃশ্বাসের বাতাস। বস্তুত, হাজার বছর আগের কোন মানুষের সঙ্গে আজকের আলোকের মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। পার্থক্য যা কিছু তা বাইরের, ভিতরে সেই হুকথাধা জীবন। আলোক বা রাম শ্যাম যদু মধুরা একচুলও বাইরে যেতে পারে না। তাই প্রেম পরিবর্তনহীন। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষ কেবলই প্রেমে পড়ে চলেছে। অবিরাম পুরোন প্রেমটাকে উল্টে পাল্টে নতুন চোখে দেখবার অফুরন্ত প্রয়াস। তাই প্রেম খাদ্যবস্তুর মত একবার আস্বাদেই ফুরিয়ে যায় না। প্রেম মানুষের জীবনে কবিতার মতন—শিল্পের মতন; বার বার আস্বাদে প্রেমের অনন্ত রূপ প্রকাশিত। 'আমরা প্রকৃতির আজ্ঞাবহ'—এই কথার মধ্যে যেটুকু সত্য তা অতি বিকট, আমরা সে সত্যের সম্মুখীন হতে চাই না। সে সত্য হয়ত আছে জীবনে, থাকুক তা চোরের মত ঘুরে ঘুরে। কেননা, ওই বিকট সত্য মেনে নিলে আমরা আর রক্ত মাংসের মানুষ থাকব না, প্রকৃতি যন্ত্রের বাটকলটু হয়ে যাব।

চমকে উঠল আলোক।

ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত প্রায় সাড়ে তিনটে। চাঁদ হেলে পড়েছে পশ্চিমে। কেয়া নেই। কখন নিঃশব্দে বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়েছে খেয়াল নেই। কঙ্কালের হাড়ের মত কর্কশ জ্যোৎস্না। একটা লঙ্ক চলে গেল বারান্দার দিকে। ঢেউগুলি পায়ে এসে আছড়ে পড়ছে। চোখ গেল পাখিটা এখন কোন্ দূর বন থেকে ডাকছে। কেয়া চলে গেল বিছানায়, একবারও অনুরোধ করল না, শোবে চল। খাবার ঢাকা পড়ে রয়েছে। একবারও অনুরোধ করল না, খাবে এসো। সব ভুল। আলোক এক প্রকাণ্ড ভুলের সমুদ্রে হাবুডুবু খাচ্ছে। পৃথিবীতে সবচেয়ে সহজ কাজ কারো মনে বিষাদ উৎপাদন করে বিশ্বাসঘাতকতা করা। এই তো কিছুদিন আগেকার কথা, কেয়ার জন্মদিন। রাত তখন দেড়টা, হালকা নিরালা জ্যোৎস্নায় আলোক অভিভূত হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি তোমাকে ভালবাসি? উত্তরে, সে কথা বলবার সময় এখনো যায়নি—একটুখানি ফাঁক রেখে দিয়েছিল কেয়া। আলোকের মনে হয়েছিল, নিশ্চয়ই ওর প্রেমে কিছুটা খাদ মেশান আছে। কেয়ার নজরে এড়ায়নি। সেদিন কেয়ার কাছে নিজেকে ছোট মনে হয়েছিল। কেয়ার বুকে মাথা রাখতে হয়েছিল শিশুর মতন অনুতাপে। কত ছোট ছোট স্মৃতি! সেই সব স্মৃতি জানিয়ে দিচ্ছে কেয়াকে ভোলা অসম্ভব। গত বছরে ফাল্গুন এক চৈত্রের দুপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে গিয়েছিল। লং আর্মি। বালিগঞ্জ থেকে হাওড়া। হাওড়া থেকে বেলঘরিয়া বাসে শিবপুর। বেলা একটা তখন। মাথার ওপর খাড়া সূর্য। শূন্য বাস। শিব কনডাক্টর পরিষ্কার বাংলায় কেয়াকে বলেছিল, মাসুন বৌদি শিবপুর এসে গেল। কেয়া অমনি কানে কানে বলেছিল, আমাকে তোমার বৌ ভেবেছে বুঝলে? আলোক খুশি হয়ে উত্তর দিয়েছিল, বাঃ বেশ। আমাদের পাড়া হলে ওকে এক্ষুণি চা খাইয়ে দিতাম। লজ্জি

সেদিন ব্যালেণ্ডারে লাল তারিখ ছিল না। লোকজনের সাড়াশব্দ ছিল না। গার্ডেন ফাঁকা। ঘাসের জমিতে, গাছপালার পাতায় সবুজ তুলির আঁচড় বোলান। কি ভালই যে লাগছিল কেয়াকে। গাছপালার সঙ্গে মেলান সবুজ শাড়ি, কিংবা সবুজ ব্লাউজ। যেন আলোকের পাশে পাশে একটি জীবন্ত চারাগাছ হেঁটে চলেছে। গঙ্গায় তখন জোয়ার ছিল। গার্ডেনের সীমা উপচে এসে বাঁশবনের মধ্যে ছলাৎ ছলাৎ শব্দ —আলোকের ভিতরটা আকুল হয়ে উঠেছিল। কি গভীর দুঃখ বইছিল হু-হু, কি গভীর আনন্দ উড়ে আসছিল মুহুর্মুহু। আলোক বুঝতে পারছিল না, কিসের আনন্দ— কিসের দুঃখ। বকুলের মুখ বরাবর চৈত্রের দুপুর কি গভীর লাগছিল। যেন হৃদয়ের ঠিক মাঝখানে কোন্ এক মহানিষ্ঠুর সুখের বেহালার দুঃখের ছড় টেনে কি এক অচিন রাগিণী সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। বাগানের সীমা ছাড়িয়ে সেই সুর আকাশে উধাও হয়ে চলেছিল।

যেন প্রথম মানুষ আদম আর ইভ। বাগানটা পৃথিবী। প্রচুর ছেলেমানুষী। ছুটতে ছুটতে ঘাসের ওপর একবার পড়েই গেল কেয়া। আলোক টেনে তুলল। তুলতে গিয়ে একটু নিচু হয়ে আদর করল। মেয়েরা সাধারণত যা বলে থাকে, ছাড়, কে কোথায় দেখে ফেলবে। ছেলেরা এক্ষেত্রে যা উত্তর দেয়, দেখুক না, আমি কাউকে ভয় করি? উত্তরে, মুখ তাকাচ্ছিল। অথচ কার্যকালে উল্টোটা ঘটতেই দেখা গেল। ঘন অন্ধকারে পামকুঞ্জের ভিতর আলোক সহসা জড়িয়ে ধরল। কেয়াও তৎক্ষণাৎ ওর ঠোঁটের ঘাম প্রথম করতে লাগল। হঠাৎ সেখানে লতাপাতার ফাঁকে রহস্য-লোভী এক ছোকরার চোখ উঁকি মারতেই আলোক থমকে গেল। কেমন যেন হঠাৎ বোকা হয়ে গেল। কিন্তু তখনি ধপ করে জ্বলে উঠতে দেখল কেয়াকে। কি তেজ! যেন চোখের রোষবহ্নিতে যা দুর্গার মত তখন করে ফেলবে চপলমতি ছোকরাকে। ছোকরা দেখে পালিয়ে বাঁচে। আলোক মুগ্ধ বিস্ময়ে বার বার তাকিয়েছিল সেদিন।

সবুজ ঘাসের ওপর শুয়েছিল আলোক। কেয়ার লেখা প্রথম চিঠি, গ্রীষ্মের প্রথম বৃষ্টির মত— তোমাকে আমার বড় প্রয়োজন আলোক, তোমাকে ছাড়া আমার চলতে পারে না, ভিতরে ভিতরে আমি মিথ্যে—আলোক একটি ছুটি লাইন পড়ে আর সম্রাটের মত চেয়ে চেয়ে দেখে। কেয়া ঘাসে উড়ে বেড়াচ্ছে। যেন ফুল বনের এক বড় প্রজাপতি। ফুল তুলে তুলে খোপায় পরছে।

—কি গো মশাই, পড়া হল?

—হ্যাঁ হল।—আলোকের বিস্ময় কাটে না। সেই সাত রঙা বড় প্রজাপতিটা ওর কাছে? ছেলেবেলায় বহুবচনের প্রজাপতির পেছনে কত ছোটাছুটি করেছে। একটাও সুন্দর প্রজাপতি ধরতে পারেনি।

—দাও চিঠিটা।

আলোক বার কয়েক না না করে শেষে দিয়েছে। তার-পর ওরা উঁচু জমিটা পেরিয়ে ঝিলের ধারে চলে গেছে। কেয়া সেখানে চিঠিটা কুটি কুটি করে ছিঁড়ল তারপর জলের ওপর ভাসিয়ে দিল। আলোক একটা ছোট গাছের ডাল ধরে ঝুঁকে পড়ে ছায়া দেখতে দেখতে ভাবছিল—প্রেম—ভালবাসা —ইত্যাদি। মনে হচ্ছিল, জীবনে বাঁধ-ভাঙা ভালবাসাও প্রয়োজন, প্রচণ্ড দুঃখ পাওয়াও দরকার। এই দারুণ ভাল-বাসা, প্রচণ্ড দুঃখ শিকলের মত পৃথিবীর সঙ্গে আমাদের আষ্ট-প্রহর জড়িয়ে রাখে। নাহলে আমরা উড়ে উড়ে বেড়াই, সমাজের পরগাছা হয়ে থাকি।

তবু আলোক উদ্বেলিত হয়নি খুব একটা। কেননা, নিঃশ্বাসের বাতাসের মতন কেয়া ছিল, আছে, থাকবে।

অথচ এই তো সেদিন, বছর দুয়েক আগেকার কথা। ল্যান্সডাউন রোডে বন্ধু সুপ্রিয়র বিয়ে। অফিস ফেরৎ আলোক গেছে সেখানে অনেকগুলি কবিতার বই আর এক-

শুদ্ধ রজনীগন্ধার নবযুক্ত শিষ নিয়ে। সুপ্রিয়র বোন লিলির বান্ধবী রেখা। একসঙ্গে কিছুদিন কনভেন্টে পড়েছিল। বাসর ঘরেই আলাপ। তখন কি জানত, এই আলাপ থেকে একদিন প্রলাপ বকতে হবে! জানলে সেদিন ছোট্ট একটি সৌজন্য-নমস্কার করেই উঠে পড়ত। কেননা, কে আর জলে ডুবে বেদনা জাগাতে ভালবাসে। ঘরে আরো অনেক সুশ্রী মেয়ে ছিল। তাদের মনোহারী সাজপোষাক। প্রত্যেকের সঙ্গেই আলাপ হল। শুধু মনে হল, রেখা অনন্যা। গায়ের রং ঈষৎ কৃষ্ণ। স্নিগ্ধ। দীর্ঘাঙ্গী। কমনীয় মুখশ্রী। প্রচুর হাসে। একটা কথা বলার আগেই হেসে গড়িয়ে পড়ে। বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা। অপরকে আঘাত করতে যেমন পটু, তেমনি, আলোকের মনে হল, অপরকে ভালবাসতেও বুঝি সমান দড়। সর্বদা অপরের প্রশংসায় ব্যস্ত। মোটকথা, বিয়ে বাড়ির একঘর লোকের মধ্যেও ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রে উজ্জ্বল। এমন কাউকে ভালবাসলে ক্ষতি কি?

আলাপ হল। লিলি করিয়ে দিল, আমার বন্ধু রেখা মিত্র। আমরা একসঙ্গে কনভেন্টে পড়েছি।

—ও, নমস্কার। আমার নাম আলোক রায়।

—শুনেছি আপনার নাম।

—কি করে শুনলেন?

—শুনেছি আপনি কবি, অথচ ইন্টারভিউতে কেউ কবিতা ভালবাসি বললে সঙ্গে সঙ্গে আপনি ছাটাই করে দেন।

একটা প্রবল হাসির ঝড়া বাঁধ ছাপিয়ে পড়ল ঘরময়। শাড়ি ব্লাউজে মোড়া সুন্দর সুন্দর শরীরগুলি নদীর মত একেবেঁকে গেল। ভীষণ ভাল লাগল আলোকের। প্রথম আলাপেই ওর একটা বিশেষ মনোভঙ্গী নিয়ে সবার মধ্যে এমন সহজে বলতে বোধহয় আর কেউ-ই পারত না। ঠিক তখনি চেতনায় কয়েকটি মৃদু ঢেউ খেলে গেল যেন।

—শুধু তাই নয়—আরো কিছু গরম মশলা যোগ করতে এগিয়ে এল স্বয়ং সুপ্রিয়, বাইরে এরকম বিলিতি চেহারা দেখলে কি হবে, ও কিন্তু ভিতরে ভিতরে একঘর পেঁয়ো। বালিগঞ্জ লেভেল ক্রসিং-এর দুই দিকে কিন্তু দুই রকম চেহারা। সাক্ষাৎ ডক্টর জেকিল এ্যাণ্ড মিস্টার হাইড—

—কি রকম? কি রকম?—চোখে চোখে নতুন কৌতূহল উঁকি দিল। আলোক বিব্রত। গোপনে একটা চিমটি কাটল। সুপ্রিয় চকিতে ঘুরে সরে গিয়ে চকি হেসে আবার আরম্ভ করল, ওর দিকে তাকিয়ে দেখ, যেন এইমাত্র ইংরেজের দেশ থেকে এল। ওর স্যুটে একটুও ভাঁজ নেই। স্যুটের সঙ্গে মিলিয়ে নেকটাই। স্যাম্পু করা রেশমী চুল। পণ্ডের সঙ্গে নেকটি রেজারের নিত্য যোগাযোগ। মুখে বিলিতি গানের সুর। কিন্তু যেই লেভেল ক্রসিং পেরোল অমনি টাই পকেটে ঢুকে গেল। কোট ঘাড়ের ওপর। বিলিতি গানের বদলে শ্যামাসঙ্গীত—আমায় যে মা পাগল করে।

খিল খিল হাসির ফুয়ারা ছুটল।

—এ্যাই, কি হচ্ছে?—আলোকের সলজ্জ প্রতিবাদ।

থামলেন কেন, বলুন বলুন—। অমনি রহস্যের পাপড়ি খুলে উঁকি দিতে সবাই যেন অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

সুপ্রিয়র মুখ যেন খুলে গেছে। শুধু কি তাই, ছুটির দিনে ওকে ঘরে পাবে না। 'আরাম হারাম হায়' শিরোধার্য করে দুপুরে নিজের হাতে খাপলা জাল ফেলবে, বাটি কোপাবে, পিছু পাছে টিন বেঁধে বাঘুড় তাড়াবে, বার জন্যুর দোকানে হাঁটুর ওপর লুঙ্গি তুলে বাটির ভাঁড়ে চা পিবে—

—আঃ সুপ্রিয়, থামবে কি?—আলোকের পুলক দেখানো ধমক হাসির দমকে উড়ে গেল। অনেকগুলি নদীতে যেন জোয়ার এল একসঙ্গে। হাসি থামতেই চায় না। নানান রকম কথার তুবড়ি উড়তে লাগল ঘরময়। কেউ বলল, হাসলুর মহাত্মা গান্ধী; কেউ বলল, হাসলের দুধ খোয়ালেই এখন পূর্ণ হয়। কারো একটু কড়া মন্তব্য, সৌদিন

মজদুরি। আলোকের সাহেবী মুখ রং-এ সোনালি সর পড়ল। এখন প্রসঙ্গান্তর প্রার্থনা করা ছাড়া উপায় নেই।

মনে আছে, ঠিক তখনি এগিয়ে এসেছিল যে, তার নাম কেয়া।

—বাঃ, ভারী চমৎকার মানুষ তো আপনি!

আলোক প্রথমে ভেবেছিল, এ বুঝি ঠাট্টারই প্রকারভেদ। তাই একটু লজ্জিত হয়ে বলেছিল, বিদ্রূপ করেছেন?

—বিদ্রূপ কোথায়? বসুর প্রশংসা করছি। আমরা তো লেভেল ক্রসিং-এর একদিকেই পড়ে থাকি। হয় এপারে, নয় ওপারে। আপনার দুই দিকেই যাতায়াত। আপনিই প্রকৃত প্রগতিশীল—

আলোকের ভাল লাগল কথাগুলি। বয়বেশী সুপ্রিয়র দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে তাকাল। ভাবখানা, কেমন জব্দ। সবার মধ্যে খুব তো অপদস্থ করার চেষ্টা। এখন বোঝ, কে বেশী প্রগতিশীল!

সুপ্রিয় নীরব। বেলফুলের মালা দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছিল। যেন আলোককে জোর করে জলে ফেলে দেওয়া এবং দক্ষ সাঁতারুর মত তীরে এসে বসা যেখানে—নিঃশব্দে উপভোগ করছিল। কিন্তু মুখরা লিলি এগিয়ে এসে এবার কেয়াকেই জলে ফেলে দিতে চাইল। কিরে কেয়া, এর মধ্যেই আলোকবাবুর হয়ে ওকালতি শুরু করলি? দেখিস, লেভেল ক্রসিং-এর ওপারে যেতে চাসনে। ওখানে প্রচুর সাপ ব্যাং টিকটিকি পিঁপড়ে আছে। তোদের এসপিন রোডের মত সভ্য নয় একটুও—

আলোক লক্ষ্য করল, কনভেন্টে পড়লে কি হয়, ওর মুখেও সোনালি সর পড়ে গেল। কৌতূহল বাসা বাঁধল চোখে চোখে। এলোমেলো মন্তব্য খসতে লাগল মুখ থেকে মুখে—দুজনে দুজন চেনে—আমরা লেভেল ক্রসিং পেরোতে চাইলে কি হবে আলোকবাবু নেবেন কেন—সাপ ব্যাং-এর ভয় না করলেই বা আমরা কি সে ভাগ্য করে জন্মেছি—ইত্যাদি। আলোকের কান দুটো লাল হলেও স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। বিয়ে, পৈতে, অন্নপ্রাশন, জন্মদিন ইত্যাদি সামাজিকতার ব্যাপারে আলোক চিরদিন-ই আনাড়ী। বিশেষ কোথাও যায় না। তবে কলেজে পড়তে আসুলে গোণা যে কয়জনের সঙ্গে মিশেছিল সুপ্রিয় তাদের মধ্যে একজন। আর কলকাতায় আসার পর বিয়ে বাড়িতে উপস্থিত থাকার সুযোগ বোধহয় এই প্রথম ঘটল। নেমন্তন্ন মাঝে মধ্যে পাবে না কেন। তবে কোথাও বড় বিশেষ যায় না। আলোক বিলিতি ফার্মের এক্সিকিউটিভ অফিসার, অল্প বয়েস, বিলেত যাওয়ার সম্ভাবনা যোলোশী আনের মত দিনে দিনে টুকটুকে হচ্ছে—কেমন করে যেন এই সমস্ত খবর মেয়েদের, বিশেষ করে মায়েদের মহলে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে বিপদ বাড়ে। আলোক যদি কোন অফিসের কনিষ্ঠ কেরাণী হত তো কেউ ফিরেও তাকাত না। ভিতরের আসল মানুষটাকে কেউ দেখে না, তার দ্বারা কত বেশী টাকা রোজগার হতে পারে সবার নজর তার ওপর। ফলে এই সব দামী দামী শাড়ি ব্লাউজে মোড়া সুন্দর সুন্দর দেহগুলি আলোকের চোখে বড় সস্তা হয়ে গেছে। ওদের দিকে তাকাবার কোন প্রয়োজন নেই। আগে একটা ভাল চাকরী জোগাড় করলেই হল। তখনি শুরু হল লুটোপুটি খাওয়া! মেয়েদের সহ্য হয়, লজ্জাভয় রঙিন আবরণ থাকে। কিন্তু প্রাথমিক দায়িত্বটা যেহেতু মায়েদের, তাই ওদের ইচ্ছেটা বড় নগ্ন আর প্রকট। একেক সময় চোখে লাগে। তবু সব বুঝতে পেরেও কেন যে এতদিন কেয়ার থাকে স্পষ্ট উচ্চারণে মাসিমা ভেকেছে। হয়ত এর মূলে কেয়া। কেয়া উঁচু নিচু পার্থক্যগুলি সমান করে দিতে পারে। হয়ত বন্ধু থেকে জামাই-এ রূপান্তরিত হওয়া এই বাড়িতে খুব সহজ ব্যাপার ছিল। কিন্তু বেহালায়? নিবারণবাবু ভুলেও মনে স্থান দিতে পারেননি কথাটা। আলোককে জামাই রূপে পাওয়া আকাশের মাটি ছোঁয়ার সামিল। কিন্তু মিনতির বেলায়? ভেবেছে কি, বড়লোকের

সাময়িক বিলাস? হয়ত সোপন ইচ্ছে ছিল। কিন্তু সেই ইচ্ছেটা বড় ভীরু আর মৃদু। মিনতির অন্ধকার মনেই বেড়ে উঠেছিল। বাইরের আলোকের সাহায্য বড় বিশেষ পায়নি। আলোকও অনেক সময় সমগ্র ব্যাপারটা মনে মনে চারিয়ে দেখেছে। সামনে হিন্দু কোড বিল। একসঙ্গে দু'জনকে ভালবাসা যায়, কিন্তু বিয়ে করা যায় না। কত ধারা মতে যেন কে-আইনী। সুতরাং শেষ পর্যন্ত একজনকে বাছতেই হয়। কিন্তু কাকে? বার বার আলোক এই একটি জায়গায় এসে থমকে দাঁড়িয়েছে। মেলেনি উত্তর। কাকে বেশী ভালবাসে, শহর না গ্রাম? কাকে বেশী ভালবাসে, কেয়া না মিনতি? উত্তর মেলেনি। শেষে অস্থির হয়েছে। মাথার চুল ছিঁড়েছে। তারপর এক রকম জোর করেই চলে গেছে কেয়ার কাছে, ভিনদেশী আধুনিক জীবন দেখতে সেন্ট্রলহেডের পর্যায়; অথবা মিনতির কাছে, জিজিরা পোলের পাশে খোলা মকে পুরোন দিনের গল্প শুনতে। আলোক কোন্ দিকে যাবে? কেননা, কোন ইচ্ছের মধ্যেই এতটুকু মিথ্যে নেই। কি নিদারুণ দুই নৌকোয় পা' রাখা। নৌকোর মধ্যে ব্যবধান ক্রমাগত বেড়ে যাচ্ছে। কি দুঃসহ যন্ত্রণা ছিঁড়ে যাওয়া।

(ক্রমশঃ)

অনিল ব্লাকেন্সর
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা।

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতোগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"
(ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

সামান্য শাস্তি

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

অনেকদিন আগের কথা। ঘটনার স্বচ্ছন্দ, তাল, লয়, সৌন্দর্য ও সুষমায় হয়তো সেদিন ঢেলে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয় কিন্তু যে বিদেশিনী আমার মনোভূমিতে সুধা বর্ষণ করে গেছে তা চিরদিন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করব।

বর্দ্ধমান থেকে কলকাতায় ফিরছি। বর্দ্ধমান স্টেশনে অশান্তভাবে পায়চারী করছি; চিন্তার কোন সমতা নেই—নেই কোন তান, লয়—বলিষ্ঠতা বলতেও কিছু নেই। এক একবার একটা চিন্তা আসছে, কিছুটা ছুটে গিয়ে কিসের সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে লজ্জিত হয়ে যেন ফিরে আসছে—উঁকি মেরে দেখছে কেউ পাছে দেখে ফেলো কিনা?

এ অবস্থা থেকে রেহাই দিলো কলকাতার কোলাহল। বোম্বাই মেল আসছে। শান্তি পাবার জন্য বেশী পয়সা খরচ করেও ফার্ষ্ট ক্লাস টিকিট কিনে বোম্বাই মেলে চাপতে হলো। নতুবা আমাকে প্যাসেঞ্জার ট্রেনের জন্য আরো অনেক সময় অপেক্ষা করতে হতো।

গাড়ীতে উঠে বসতেই দেখি একটি মেমসাহেব তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করছে কিছু ইণ্ডিয়ান স্যুইটস্ নেবার জন্য—তাঁর মায়ের জন্য। বিনীত পরিচয়ের সুরে আন্তরিক ইচ্ছাই প্রকাশ করলো মেমসাহেব স্বামীর নিকট—বললো মায়ের কাছে যাচ্ছি কিছু মিষ্টি নিলে ভাল হয়। বলবার ভঙ্গীটি আমাকে খুব মুগ্ধ করলো। মিষ্টির প্যাকেটগুলো হস্তগত হলে যেরকম একটা তৃপ্তির ভাব—সেরূপ একটা ভাব তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো। ওদিকে ভদ্রলোক পত্নিসঙ্গী বয়ে গ্রাউণ্ড নেবে এদিক ওদিক করতেই গাড়ী ছাড়বার প্রথম হুইসল করে গেল। সাহেব আরো কিছুটা চেষ্টা করবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন—পারেন না এ ভাবনাতে মুখখানা একটু মলিনও হয়ে গেল। আমি কামরার মধ্যে বসে সবই দেখতে পেলাম। মিষ্টি না নিতে পারলে স্ত্রীর মনে যে দুঃখ হবে সে চিন্তাতেও যে তার দুঃখ হচ্ছিল তাও আমি অনুভব করলাম।

শুধু হাতে ফিরে আসবার শক্তি যেন হারিয়ে ফেললেন স্বামীটি। গাড়ীতে উঠতে পারে জোর পাচ্ছিলেন না। আমি অনুভব করছিলাম স্বামী-স্ত্রীর নতুন প্রেম, ভালবাসা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ, উচ্ছ্বাস। স্ত্রীর প্রথম সন্তান হবার জন্য মায়ের কাছে আসবার চিত্র সব আমার মনের গভীরে উজ্জ্বল রেখাপাত করে চলছিল। আমাকে যেন পূর্ব-বাংলার কোন বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামের এক শিক্ষিত ভদ্রঘরের বলিষ্ঠ নতুন বিবাহিত যুবকের ঘরে নিয়ে ফেললো। আমি যেন তাদের প্রেমের ঝলমল রূপের আলোকে চোখ ধাঁধিয়ে বন্ধ করে তাদের হৃদয়ের ভাল-বাসার সুরভি ন শুনতে লাগলাম—বিহ্বল হয়ে গেলাম।

বিহ্বলতার মধ্যে সাহেব অতি দম্ভপূর্ণে নিঃশব্দে গাড়ীতে উঠে স্ত্রীর মুখের উপর ভালবাসার দৃষ্টি মেলে ধরলেন। মেমসাহেব চোখ না তুলেই যেন তাঁকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন—দুঃখ করবার কিছু নেই। ভাববার কি আছে। মা আমাদের দেখলেই যেমন সব বুঝতে পারবেন।

ধীরে ধীরে আমার আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। তাঁদের উদ্দেশ্যে ইংরেজীতেই বললাম—যদি আপনারা কিছু মনে না করেন আমার সঙ্গে অনেক মিষ্টি আছে আপনারা নিলে

আমি অত্যন্ত আনন্দিত হব। মেমসাহেব মৃদু আপত্তি করতেই আমি জোর দিয়ে বললাম আপনাদের লজ্জিত হবার কিছু নেই, প্রয়োজনের অনেক বেশী মিষ্টিই কিনেছি। আপনারা তার অংশভাগী হলে সবিশেষ প্রীত হব। আমার আন্তরিকতায় তাঁরা উভয়েই মনেপ্রাণে খুশি হলেন। তাঁদের মুখে স্নিগ্ধ প্রশান্তি ফুটে উঠলো। মেমসাহেব চটপট ব্যাগ খুলে তাঁরা চাদ্দে বের করে আমার মিষ্টির চেয়ারি থেকে মিহিদানা ও গীতাভোগ নিলেন। নেবার মধ্যে কোন জড়তা নেই। এক একবার চোখ মেলে আমাকে দেখছে, কতটুকু নেবার সম্মতি আমার চোখে মুখে ফুটে উঠছে। মেয়েটি বুদ্ধিমতী, আদুক ও বিশেষ শিক্ষিতা, তাঁর ভাব-ভঙ্গীতেই বোঝা গেল। শুধু একবার মৃদুস্বরে আমাকে দামের কথা তুললেন। আমার বিস্ফারিত চোখ দুটি দেখেই সে কথা আর তুলতে সাহসী হলেন না।

গাড়ীর মধ্যে আমাদের দু চারটি কথা হলো। হাত থেকে চা ছেলে প্যাট্রি সহযোগে আমাকে সানন্দে পরিবেশন করলেন। কথাপ্রসঙ্গে আমার বাড়ীর ঠিকানাটাও জেনে নিলেন।

হাওড়া স্টেসনে এসে গেলাম। ভদ্রলোক বিদায়ের জন্য হাত বাড়িয়ে দিলেন। আমি আন্তরিকতাবে হাত চেপে ধরলাম। চিন্তার বাইরে যা ছিল তা এসে গেল যখন মেম-সাহেব সলজ্জভাবে হাত বাড়িয়ে দিলেন আমার দিকে। গ্রামের ছেলে—বিশেষ করে এক রক্ষণশীল পরিবারে মানুষ হয়েছি; একটু হকচকিয়ে গেলাম। নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে আবেগে কি করে যে বলে ফেলনুম—I shall be glad to have you as my sister. মেমসাহেব হাত না ছেড়েই যেন আমার বুকের কাছে ঘেঁসে এলেন। দুজনে দুজনার চোখের দিকে গভীর আনন্দ ও তৃপ্তি নিয়ে দেখলাম। বিদেশী মেয়েটি যেন সত্যিই আমার বোন হয়ে গেল। কি যে শান্তি সেদিন পেয়েছিলাম সে একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।

এ ঘটনার মাস তিনেক পরে একদিন সন্ধ্যার সন্ধ্যায় বাসায় ফিরেছি। বাসার কাছাকাছি এসেই আমার ঘর থেকে বেহালার সুন্দর সুর শুনতে পেলাম। ঘরে ঢুকতেই আমার বিদেশিনী বোন আমার কোলে তাঁর নবজাত কন্যাকে তুলে দিল। আমি আনন্দে মেয়েটিকে চুমু খেলুম। শেষ হয়নি।

বিলাতে হতে আজও মাঝে মাঝে বোন রাফিনোর চিঠি আসে—আসে রুমাল, সেন্ট, শ্রীঅরবিন্দের বাঁধানো ছবি। আসে অসামান্য শান্তি।

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধ লে শ্ব রী

প্র বো ধ ব ন্ধু অ ধি কা রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ছয়

চাঁটা পড়ার মতন বিশাল একখানা শব্দে ঘুমের বাঁধন কেটে গিয়েছিল ; পরে পরিত্রাহি, দিগন্ত আপানিয়া চিৎকারে বেহুঁশ মন জেগে উঠল। বেজাজের মাথায় হাই তুলে, দুইখান চক্ষু ডলতে ডলতে আয়েস করে ওঠার আরাম পেল না জলধর। কারণ আচমকা চিৎ-বিয়ের জন্তুর আওয়াজখান জোর কাইজার কালে বোইক্যা দেওয়া বারালো ছুরির চুল্যাই তার কানের পরদা ফালাফালা করেছে. প্রচণ্ড ধাক্কা মেরেছে বুকের পিঞ্জরায়। চক্ষু খোলা না খোলার মধ্যিখান সময়ে লম্বায় ওড়াক করে উঠে পড়ল সে।···কী হইল, হইল কী···। টানা বেড়ালালে আটকা পড়া বেহুঁশি কাওইনা কাৎলার মতন একখান সাঁইবারী কাল দিল জলধর। সেই এক কালে উঁচু-ডোরা বারান্দার ওপরকার বিছনা থেকে ছিটকে এসে পড়ল উঠানের ওপর।

চিখচির আর চিখচির—দেউনী মাঝিপাড়ার পশ্চিম দিক থেকে কয়েক জুড়ি মানুষের গগনফাটা আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। আর সেই সঙ্গে, হ্যাঁ, জলধর সহসায় কান পেতে শুনতে পেল, আশেপাশে কান্দনের রোল উঠেছে। জলধার সর্বহারা ধনিস্থির মতন অনেক গলার কান্না। পৈঠার কোনার গুঁতা-খাওয়া আধেক দাঁতু থেকে রক্ত উঠছিল ঝিনঝিন দিয়ে ; সেদিকে খেয়াল নেই জলধরের। উঠান থেকে সে দড়বাড়ি বরাবর দৌড় মেরেছিল একটা। প্রাণপণ দৌড়। ঠিক হিজল তলাটায় এসে গোঁত-খাওয়া পক্ষিতের মতন সহসা টানটান দাঁড়িয়ে পড়ল সে।···কী হ্যান যায়!

কে···! যেন চাঁটার শব্দ চুরি করা গলায় প্রচণ্ড একটা হুঙ্কার ছাড়ল চন্দ্র কৈবিত্তির বাইজ্যা পুলা জলধইরা। আর কথার সঙ্গে সঙ্গে সহসা বিশাল হাতের চওড়া পাঞ্জাখান দিয়ে বাঁধা খেয়ে ঘরে কেপল চৌচা দৌড়খানা আর একখান মানুষের মাথার লম্বা বাবরি চুলের মুঁটি। তারপর এক হ্যাঁচকা টান সঙ্গে সঙ্গে। সেই জন্তুর টানে চোরের তুল্য ছুটে যাওয়া মানুষটার ক্ষীণ দেহ মাথা-থুবড়ে পড়া বোঝার মতন হুমড়ি খেয়ে পড়ল এসে জলধরের পায়ের কাছে, মাটিতে। বাবরি ছেড়ে দিয়ে আচমকা মানুষটার বুকের ওপর পা তুলে দিয়ে গর্জে উঠল জলধর 'পলাস কুথায় হালা জিওলের ছাও···'

রাত শেষ হয়েছে, দিগন্তে সকাল ফুটিফুটি। আকাশের শেষপ্রান্তে পরতাড়ী তারাখান তেল ফুরানো পিদিমের নিমু-নিমু আলোর মতন শেষ টিকনি মারছিল। মেলে দেওয়া কোনো পুরান শাড়ির ওপাশ থেকে কুঁচি দেওয়া পোলাপানের কাপড়া মুখের মতন চান্দখান আবছা অস্পষ্ট। গাছগাছালির

তলায় তলায়, ঝোপঝাড় জঙ্গলের আশপাশে আশশ্যাওড়া, ছাইত্যান আর হেঁতুল গাছের ডালপালায় কালো কাপড়ের নাহাল আন্ধার ঝুলছে। ছিলল তলায় কিন্তু রোশনী কিছু আন্ধার। ঘোলা জলের মতন সেই ঝাপসা আলোয় জলধর ঠাহর করতে পারল না মানুষটারে, মালুম হ'ল না মুখখান। 'মায়নীর পুত, তর জান শ্যাষ কইরা ফ্যালামু আইজ···। হালায় ক, ক কি করচস ?'

'মইরা গেলাম, মইরা গেলাম' প্রাণপণে কেঁদে উঠল জলধর কৈবিত্তির পায়ের কাছে চিৎ হ'য়ে পড়া মুটিয়ার মানুষটা। 'আমারে মাইরো না, মাইরো না, আমি গণইনা···'

'তর গণইনার পুতের গুষ্টি ঘাস্নি হালা।' কিন্তু যাযের চুলা একখান সরোষ গর্জন বেরিয়ে এল জলধর কৈবিত্তির গমগমে গলা থেকে। 'কার মাল লইয়া পলাস ক আগে ?'

'আমি চুর না, চুর না মাজি···' জলধরের পায়ের চাপে প্রায় থেমে যেতে নিশ্বাস। গণন গোঙাচ্ছে। 'ছুতরছুইরা কানাইয়ের বড় ছুটুর আমি···'

'ছুতরছুইরা কানাই !' ···জলধরের চাপ দেওয়া পা আলগা হয়ে আসছিল।

'হয়, হয়···।' বুকের ওপর চেপে-বসা জলধরের পাওখান দুই হাতে প্রাণপণে তুলবার চেষ্টা করছিল গণন। এখন একটু আলগা পেয়ে ভরসায় এবং আশায় তার চোখ দু'টো চকচক করে উঠল। 'জান বাঁচাও মাজি, আমারে ছাইড়া দাও।'

অদূরের বহু মানুষের পদক্রিয়াদি গলার তীব্র চিৎকার তখনও ভেসে আসছিল। যেন ভয়ানক কাইল্যার ছয়খান হয়ে পড়া অনেক আহত মানুষ পরান ভরে পালাচ্ছে। হৈ হৈ, চিৎকার, চেঁচামেচি আর কান্নার অনেক শব্দ এক সঙ্গে এসে আছড়ে পড়ছে ছিলল তলার তেপাথার।

গণনের বুকের ওপর থেকে জলধর গোচের পাওখান নামিয়ে নিল জলধর। সামান্য অন্যমনস্ক। মুখে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা। 'তর পরান কা ?'

'গাঙ···গাঙ···' মুক্তি পেয়ে উঠে দাঁড়াল গণন, 'জননীর গুঁসা হইচে মাজি···' থরথর করে গলা কাঁপছিল। জলধরের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বার কয়েক চোখ পিটপিট করে, হাউহাউ কেঁদে ফেলল গণন। 'মাজি · মাজি—সব শ্যাষ হইয়া গেল গা মাজি···'

শ্যাষ হইয়া গেল !—তীব্র যন্ত্রণায় গলার অস্ফুটে কথাটা আওড়াল জলধর, আপন মনে। তার চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে কপালে উঠে এসেছে। লহমায় দু'পা পেছনে ছিটকে গিয়েছিল, ভয়ে। গায়ের লোমগুলো লঙ্কাকর কাঁটার মতন দাঁড়িয়ে পড়েছে, সারা মুখ পাংশু বিবর্ণ। ওষ্ঠ কাঁপছিল জলধরের, দাঁত আটকে আসছে বুঝি। দু' মুহূর্তের কল্পনায় গোটা গাঁয়ের রূপরূপ কল্পনা করে নিল জলধর। অল্পক্ষণ স্থির স্থাণু হয়ে থাকবার পর, ছুটিতে গণনের কাছে ছিটকে এল, দু'টো কাঁধ শক্ত মুঠিতে চেপে ধরেছিল, 'তুমি সাচাই কইতাছ বড় ছুটুর ··'

'হয় ··' একটানা কেঁদে যাচ্ছিল গণন, জলধরের শক্ত মুঠির প্রচণ্ড ঝাঁকুনি খেয়ে থক মেরে গেল মুহূর্তের জন্য। কয়েকটা ঢোঁক গিলে ফেলল পরপর। 'মাজি···' অকস্মাৎ সমস্ত শক্তি দিয়ে টানা উদ্বাস কান্নার ভেঙে পড়ল, কাঁপা, থাবা গলায় বলল 'মাজি গাঙে আমার বুইনরে খাইয়া ফ্যালাইচে মা—জি – ই—ই···।' দু'হাতে কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বসে পড়ল গণন।

'আচমকা, আচমকাই ঘটনাটা ঘটে গেল এখানে। কী যেন হ'ল, ওরাদে ভেঙে পড়তে দিবেও পড়ল না জলধর। তার মাথার মধ্যে একসঙ্গে হাজার চৈতপুজার অসংখ্য ঢাকের বাদ্যি এলোপাথারি বেজে উঠল। কয়েক শ কাসির চড়া বাজনা ঝনঝন করে নাড়া দিয়েছে ঝিলুকে। ওড়াক করে নিশ্বাসের আগে ঘুরে দাঁড়াল জলধর। তারপর প্রচণ্ড প্রাণ-

পশ দৌড়, 'সুবাসী রে···'। জলঘরের সেই গগণভেদী গলার বুকফাটা পরিত্রাহি আর্ত চিৎকার হিজলের ডালে, ছাইচালে, আলতাওড়া আর জলডুমুরের শাখায় শাখায় আছাড় খেয়ে খেয়ে বেড়াতে লাগল।

'জলঘর চলে যাবার পর, হিজলতলার ভেষাখাড় তার সেই টানা গলার সচিৎকার ডাক অনেকক্ষণ জেগে রইল। গগন তখনও কাঁদছিল, চাপা নীরব কোপানো কান্না। ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল গগন, 'ওর পূজা দিমু, ভূতা পাঠা দিমু ওরে যাও বনেশ্বরী, আমার দুইনেরে তুই ফিরাইয়া দে, ফিরাইয়া দে কই···।'

• • •

'মধু কৈবিত্তির গাই বিইয়েছে। শ্যামলা গাই, এই নিয়ে তিন বিয়োন দিল। তার আটদিন কেটেছে; নতকাল গেছে ন দিনের দিন। সুতরাং সকাল থেকেই তড়িঘড় আয়োজন চলছিল মধুর বাড়িতে। এমনিতে একটু কেমন মানুষ মধু, আমোদ স্ফূর্তিতে তার মতিগতি নেই সুতরাং শ্যামলা গাইয়ের ভেসরা বিয়োনে নিয়ম-আনতে পরয়াজি ছিল সে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তার ওজর আপত্তি টেঁকে নি। মধুর মা দামদাসুন্দরী যতদিন বেঁচে আছে, কার সাধ্যি এ-সংসারে অনিয়ম করে। মধু কৈবিত্তির একমাত্র ছেলে পরাণের বউ এসে বুড়িকে বলে বিয়েছিল বস্তুরের গড়িমসির কথা। আর যায় কোথায়। বিয়াশী বছরের কুঁজো বুড়ি লাঠিতে ভর করে কাঁপতে কাঁপতে চলে এল পুলার ঘরে। 'বইজা···' দামদা-সুন্দরী কড়া করে, মুখ তুলে তাকাল। তার পুলাখান মাচানের উপর বসে ছুআইরে সানের দিচ্ছিল।

মায়ের ডাক শুনে চোখ তুলে তাকাল না মধু। নিষ্টি মনে ছুআইরে বাঁশের সিটি মারতে মারতে রাও করল, 'হুম···'

'চইখোর মাথা খাইয়া চাইয়া দেখবার পারস না!'

'আঃ', বিরক্ত হয়ে মধু তাকাল মায়ের দিকে। 'কি কইবা কও।'

এতক্ষণে শান্ত হ'ল বুড়ি। লাঠিখান বেড়ার ঠেকনা দিয়ে মেঝের বসে পড়ল। 'কই, ওর মতলব খান কি ক আগে···'

মধু যে বোঝে নি এমন নয়। তবু সে যেন কিছুই বুঝতে পারছে না এমনভাবে বলল, 'কিসের মতলবের কথা কইতাচ তুমি?'

'গুরুদু পূজার কথা কই—। তুই নাহি মতলবে আচস পূলা দিবি তা···'

'দিমু না হি কথা কই নাইক্যা। পূজা-পরব বইল্যা কথা, খরচার দিকখানও তো ভাবন লাগবো···'

'তাই বইল্যা তুই অধম্ম ভাইক্যা আনবি।'

'কিসের অধম্ম···'

'অধম্ম না? গাই বিয়াইলে দুধ দেওন লাগে গাভে। শাস্তরে কইচে;

পেরথম বিয়ানে এক কুড়ি একদিন
দুই বিয়ানে দশাধিক
তিনবার বিয়াইলে গাই
পিরত তুমি জাইনো ঠিক
হপ্তার পরও একটা দিন
গাভে দিয়া বিষ দুধ
গুরুদু মহারাজের পূজা দিবা
দুধের লগে দিবা দুধ—'

শেষ পর্যন্ত আপত্তি করে নি মধু। বুড়িটা যতদিন বেঁচে আছে উপায় কি নিয়ম না মেনে; অতএব উদ্যোগ আয়োজন শুরু হয়েছিল। দুই কুড়ি পুরা, দুধের জোগান আসবে টেউয়া থেকে, তার লগে শ্যামলা গাইয়ের পাঁচ পুরা মিশিয়ে হবে ক্ষীর। ক্ষীর থেকে ক্ষীরের নাড়ু। তাই দিয়া হবে গুরুদু মহারাজের পূজা।

ভোর ভোর সকালে উঠে দামদাবুড়ি হুকুম দিয়েছিল তার

সোনার চান্দ নাতি পরাণের দুয়ারে। 'অ পরাইত্তা, পরাইত্তা —উঠ, উইঠ্যা পর। বিহান হইয়া গেচে ...।' কিন্তু পরাণের মুখে রাও নাই। আগ রাইতে আহালঘাটা থনে বেরাবুচাই-ভার পান্সিতে তুলেছিল নাওয়ে। সওয়ারী ঘরে পৌঁছে দিয়ে যখন ফিরেছে তখন রাইত দুইকর। এত সকালে কি তার ঘুম ভাঙে? কিন্তু বুড়ি ছাড়বার পাত্র নয়। নাতির সাড়া পাওয়া যায় নি বলে থামল না যামদা, সে নাওবৌয়ের নামের উপর ভর করেছে। 'চারু লো, অ নাওবউ বিহান বেলায় পিরতর বউ ঘুমায় না। উঠ, উইঠ্যা পর...' কিন্তু কে কার কথা শোনে। মনিষ্যি দুইখান যেন ঘরে পড়ে রয়েছে ঘরে। বিরক্ত কুপিত গলায় চিৎখিত্তর শুরু করেছিল যামদা-বুড়ি। 'আলো আমার সোয়ামী সুহাগী লো! ডাকি, ডা নি কানে লয়। অ পরাইত্তা, অ চারু খাইট্যাল্লা কানের মাথা খাইয়া বইয়া আচস নাকি লো...'

চড়া গলার শালমন্দ কাজে লেগেছিল। বুড়ির বাজখাই গলায় চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল চারুর। ধড়মড় করে উঠে এসে দরজা খুলে দিয়ে, মাথার ঘোমটা তুলে সামনে এসে দাঁড়াল আজা শাউরীর। যামদাকে আর কথা বলতে হয় নি। মুখোমুখি দাঁড়াতেই মানুষ হয়েছিল, আজ গুরুনাথের পূজা। অনেক কাজ তার।

অনেক অনেক কাজ করতে হয়েছে সারারাত। সূর্য ওঠার আগে গাঙ হলেধরীর জলে নেমে এসে, ভেজা কাপড়ে স্নানসা গাইয়ের দুধ দুইয়েছে চারু। দুধে আর ফেনায় ছুকিখান যখন ভরভর, চারু যামদাকে ডাকল 'আজা মা...'

কুঁজো যামদাবুড়ি পাশেই দাঁড়ানো ছিল। ঝুঁয়ল হয়েছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না। নাতবউয়ের গলা শুনে জবাব দিল যামদাবুড়ি, 'কী কস লো চারু...'

'ছুকি চাপুচুপুর হইয়া গেচে আজা মা, ফেনা পড়ায়...'

'কস কি লো!' যামদা অবাক। 'সাচাই কস না ঝুলা দেওনের মতলব?'

'সাচাই আজা মা।' চারু সাবাস্ত করে এসে হাত বাড়িয়ে যামদার কাপড় ধরে টানল। 'আওগাইয়া আইয়া যেহ না, ফেনা কেমুন পরাইয়া থাইআতে গা।'

'নাওবৌ ...' খুশীখুশী গলায় ডাকলো যামদা।

'আজা মা...' ওরা ছুকি নিয়ে উঠে এল চারু। দেখল, যামদাবুড়ি চক্ষু দুইখান খুইলা তাবা জুড়ে দিয়েছে। ঘনঘন দু' হাত ঠেকাচ্ছে কপালে, আর বিড়বিড় করে কী যেন বলে যাচ্ছে অনর্গল।

অল্পক্ষণ সময় তেমনি কাটল। তাবা সারা করে তাকাল যামদা, তার চক্ষের কোল দুইখান পানিতে ভিজে গেছে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রুর ধারা। 'মাইয়ার রূপন দেখাইচিল আমারে। তুই বিশ্বাস যাবি না নাওবউ, একখান ঘুমটা দিয়ে আইচিল গাঙে। কয়, মাওলো, তর স্নানসা গাইয়ের দুধ খাইয়া পরাণ জুড়াইল আমার।' পাশ থেকে খানের খাঁচল তুলে চক্ষু মুছল যামদা। ফস করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল একখান। বলল, দুধ যখন অনেক হইচে, তার দিগা এক পুরা বাইর কইরা দে নাওবউ, আমি নিজের হাতে তারে দিয়া আহি...'

'আমি দিবুনি...।' চারু ছুকি থেকে বোকনায় দুধ ঢালতে ঢালতে বলল। 'চক্ষে তাহ না, গাছে খাটায় ঠিক মাইক্কা আজা মা, কুথায় থনে কুথায় পড়বা, আর খুইজা পাওয়া যাইব না দুমারে।' চারু ছুকি খালি করে গাইয়ের খাটের দিকে যাচ্ছিল। ডাক শুনে ফিরে তাকাল। কাঠের মতন স্থির হয়ে রয়েছে যামদাসুন্দরী। সাদা মুখখান ধবধবে।

'আজা মা...'

দু' পা এগিয়ে এল বুড়ি। কেমন উদ্বিগ্ন চাপা এবং ধরা গলায় ফিসফিস করে বলল, 'চারু, তাইন কেপচে!'

'হ আজা মা। ঘুমার নাতি কইতে আচিল ইস্কুলার পাঠশালা আর নাইক্যা। কাইলকা নাকি বজিবখানও মেয়ালে নইচেন তাইন ...'

ওঁসা হইচে যাইবার।' যেন আপন মনে বলল মানদা। বলে চক্ষু দুইখান বুইজা থাকল, নিশ্বাসও বন্ধ করে রাখল খানিক। শেষে কষ করে নিশ্বাস ফেলে তাকাল চারুর দিকে। চোখ কপাল কুঁচকে বলল, 'আধোদীর যে বড় ভ্যাজ। রাইগ্যা গেলে ভাইনের মাথার ঠিক থাকে না।'

গোটা গোয়ালঘরে তারপর আর কথা নেই। গাইয়ের বাঁট থেকে টিপে নামানো দুধের ধারা আগে চ্যানচুল করে শব্দ তুলছিল, এখন আধভরা ডুকিতে গাদুর গুদুর করে পড়ছে দুধের ধারা।

উত্তাল উদাম বনেশ্বরীর ক্ষ্যাপা ডাক নিরন্তর করে যাচ্ছে এখানে। যেন গাচে না, প্রথম ভাদ্রের কালো আকাশে মেঘেরা গর্জে যাচ্ছে সারাদিন ধরে, সারারাত ধরে। গোটা বর্ষা শরৎ হেমন্তে এ ডাকের বুঝি নিবৃত্তি নেই। মেউলীর মাঝিপাড়ার পা ঘেঁষে বয়ে যাচ্ছে মহাপ্রলয় সৃষ্টিকারী বিশাল-কায় রুদ্ররোষী গাঙ বনেশ্বরী। প্রতি মুহূর্তে মনে হয় সমস্ত পৃথিবীটাই বুঝি থেকে থেকে হড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে বনেশ্বরীর গহীন গর্ভে।

ঝাঁপা মাথা আরও বেশি করে, অনেকক্ষণ সময় ধরে আপন মনে নাড়তে নাড়তে একসময় চুপ করল মানদাবুড়ি। চারু ততক্ষণে উঠে এসে বাছুর ছেড়ে দিয়েছিল। কাজ শেষ হয়েছে। হওয়া সত্ত্বেও কিছুক্ষণ সে মানদাবুড়ির এই অদ্ভুত আচরণ লক্ষ্য করল। করে ডাকল। 'আলা মা…'

'নাডবউ…'

'বাছুর ছাইড়্যা দিচি, এহন যাওন লাগব…'

'হয়।' ঘুরে দাঁড়াল মানদাবুড়ি। অতি কষ্টে মুখ তুলে তাকাল চারুর দিকে। 'ওরে একখান কথা কই নাডবউ। কাউরে ন্যান কইয়া কালাইস না।'

'কও…'

'তাইলে দুই পুরা দুধই তুই বাইর কইর‍্যা দে। আমি যাইয়া তাইনের কলাখান ভাঙাইয়া আনি…'

চারু অল্প হাসল, মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল যে, সে দুই পুরা দুধই বের করে দেবে। 'কিন্তুক তুমারে আমি একলা যাইবার দিমু না আলা মা।' যেতে যেতে চারু বলছিল, 'তাইনের এহন বিকবিকিক জ্ঞান নাইক্যা।'

সেই রাত-সকালে, বাড়ির সকলে জেগে ওঠবার আগে চুপিসারে দু'জন মানুষ নেমে এল পাড় বনেশ্বরীর জলের কিনারে। অশান্ত দুর্বার গাঙ ফুঁসছে, দুলছে। হাইতাল গাছের তুল্য উঁচু বিশাল ঢেউ গড়াতে গড়াতে এসে প্রবল শব্দে আছড়ে পড়ছে তীরের খাড়াই পারের গায়ে। কী ভয়ঙ্কর, ভয়াবহ তার গোঙানী, যেন অশরীরা ক্ষ্যাপা দেওর গোটা গাঙের বুকে তোলপাড় করে বেড়াচ্ছে।

লাটির ওপর ভর করে কোনোক্রমে কিনারে এসে দাঁড়িয়েছিল মানদা। ইসারা করতে চারু তাকে বসিয়ে দিল। হাতে দুধের পালিখান নিয়ে দুধ চালতে চালতে অনেকক্ষণ বিড়বিড় করে কি সব বলল মানদা। শেষে জলের ওপর হাত রেখে বলল, 'শান্ত হও, শান্ত হও বাপো, ওঁসা কইরা সন্তানের ক্ষেতি কইরো না।'

• • • • •

দিনভর উত্তোল আয়োজন। সাত নামলে গোটা মাঝি-পাড়ার পুলাপানের বেলা ভেঙে পড়ল বনু কৈবিত্তির উঠানে। পুব-পাড়া' পশ্চিমপাড়ার তাবাম মাইনষের ভিড়। এলাদিনের বাজার ধিক্কা হাজাক বাতি ভাড়া করে এনেছিল পরাণ। একটা নয়, দু' দু'টো। তার উজ্জ্বল আলোয় ম ম করছে গোটা বাড়িখান। পুলাপানের দল হলস্থূল করছিল। মাঝ উঠানে চার বাল্লকোল ফীরের লাড়ু পড়েছে। তাকে ঘিরেই অতেক হলস্থূল। হৈ হৈ চিৎকার চেঁচামেচি। বেন্দাবন কৈবিত্তি না আইলে বন্ধনা গাওন শুরু হইব না। অথচ ততক্ষণে সাত গড়িয়ে মন রাত নেমে এসেছে মেউলীর মাঝি-পাড়ার বিশাল এলাকায়।

ব্যস্ত মানদা এইমাত্র এসে বসেছিল দাওয়ার উপর।

আচমকা সে চিল্লাতে শুরু করল। মইষারে, অ মইষা—পুলাপানের ওর সইবার নাইচে না। ফইকরার বাপরে ডাহন লাগে যে।' কিন্তু ওই পর্যন্তই। পুলারে ডেকে ডেকে হয়রান হয়ে, শেষে পরাণ পরাণ বলে চেঁচাতে লাগল খানিকা বুড়ি। পুলাদ পড়ল আঙনায়, পুজা হইয়া গেল, বন্ধনার পাওনাখান হইব কহন?

অনেক ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকির পর, ফইকরার বাপ বেন্দাবন সাধুর চরণের ধুলা পড়ল মধু কৈবিত্তির দাওয়ায়। আর সঙ্গে সঙ্গে তামাম পোলাপানেরা জিগির তুলে নাচতে শুরু করে দিয়েছিল। লম্বা লম্বা পেশীবহুল চেহারা। চুল দাঁড়ি গোঁফ সব দুধের তুলা ধুলুধুলা। বেন্দাবন সাধুর বিশাল দাঁড়ির আগা নাভির কাছ ছুঁয়েছে। হলদা শুনে সাধু, হাত তুলল, 'চুপ যার চুপ যার বাচ্চা সাধুরা। তুমরা এইবার শুদ হইয়া বইসা যাও। আমি পাওন শুরু কইরা দেই।'

কথা মতন কাজ। মুহূর্তের মধ্যে হুটাপুটি করে তামাম শিশু কিশোরেরা পুলার থান ঘিরে বৃত্তাকারে বসে গেল। বেন্দাবন কৈবিত্তি জোর গলায় বলল, 'সাবাস ভুখানেরা, সাবাস সাধুরা। এইবার আমি তুমাগো কাছে এউটা নিবেদন করি। উবলা হইয়া যে ভুখান সাউবার মুখে সাদু তুইলা নিবার পারব, ওই যে দেখতাচ একখান কলসী আমের মাহাল ফীরের দলা রইচে, ওইডা খালি পাওনা হইব। উবলা খাইয়া সাদু খাইবা ক্যারা ক্যারা খাড়াও।'

ভিড় করা পুলাপানের দলে গুঞ্জন উঠল। একসঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়ল কুড়িখানেক চ্যাংড়া। তারা ডিগবাজি খেয়ে হাতে না ছুঁয়ে মুখে সাদু তুলে নেবে।

'বইস, বইসা যাও তুমরা।' বেন্দাবন কৈবিত্তি নিজে বসতে বসতে বলল, 'আমি পাওনা কইরা যামু, তুমরা সাট কইরা যাইও।' বেন্দাবন শুরু করে দিল। চোখ বুজে, মাথা নেড়ে বলে যাচ্ছিল।

'খুব রে খুব সাজে
গড়াগড়ি যুগল রাজে
যাজুক যুগল বাজুক খাল
এই বরষান জগৎপাল।

জগৎপালের ঝিনিঝিনি
সোনাবান্ধা পাঁচ সিনি
সোনারে আনন্দ ভাই
পাঁচ দুয়ারে লিখুম তাই
নাম লেইখ্যা সিধা কই
গুরুকুনাথের ভাবা হই…'

বেন্দাবন সাধুর পাওনার সঙ্গেসঙ্গে শতাধিক শিশু কিশোর দোঁহার দিয়ে যাচ্ছিল। লাইনে লাইনে, পঙক্তিতে পঙক্তিতে। সেই উদাস দোহার পাওয়ার শব্দে, দুয়ারের ওপরে বসে থাকা ক্যাপা ধলেশ্বরীর ত্রিভুবন কাঁপানো গর্জন চাপা পড়ে গিয়েছিল।

পাকঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়েছে এসে পরাণ। ভেতরে চারু পাটাপুতা নিয়ে বসেছে। না, মরিচ বলল্লা নয়, পুজার প্রসাদ বিলি হবার পর সারা রাত আগনের পালা আছে। পাচার দু' একজন মাতব্বর এসেছে, আর এসেছে পরাণের সমবয়সী বন্ধুরা। তিন বিয়াইনা গাইয়ের দুধ দিয়া খাঁটা ভাতের সরবৎ খেয়ে তারা নেশা করবে। নেশা করে সারা-রাত ধরে হলদা করবে। তাই চারু ভাত বাঁচছিল পাটার। পরান দাঁড়িয়ে তদারক করছে, দেখিয়ে দিচ্ছে বউকে।

ভাত বাটতে বাটতে চারু সোয়ামীর মুখের দিকে তাকাল। অনেকক্ষণ বলি বলি করছিল, এবার বলবে ঠিক করে তাকাল।

'শুনচ…'

'কি?'

'দুয়ারে একখান কথা কমু ভাবচিলাম…'

'ভাইব্যা কাম নাই, দিয়া কইয়া ফ্যালাও দেহি···'

'তুমি গুলা করবা না কও ··'

'আইচ্ছা আইচ্ছা, কইলাম গুলা করুম না।'

'আর কাউরে কিন্তুক কইবার পারব না···'

'না, কমু না···'

'তাইলে কই।' চারু দিদা হয়ে বসল। স্বামীর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকল। কিন্তু বলছিল না।

'কি অইল, কও···?'

ফৎ করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল চারু। মুখ নামিয়ে নিল। সোয়ামীর মুখের দিকে সে তাকাতে পারছিল না। নীচু মুখে ধরা গলায় অত্যন্ত দ্রুত কথাটা বলে ফেলল চারু, 'আমার কেমুন যান ডর লাগতাচে গো।'

'ডর!' পরাণ অবাক চোখে তাকাল চারুর দিকে।

'হয়।'

পরাণ চৌকাঠ ছেড়ে এগিয়ে এল। এসে বসল পাটাপুতার সামনে, চারুর মুখোমুখি। তামাম দুয়ার হালাক রাত্তির রোশনীতে ম ম করলেও, পাক ঘরে কুপি জ্বলছিল একখান। সেই কুপির মলিন আলোয় চারুর পাণ্ড-মুখ দেখা যাচ্ছে। দু'একটা খুচরো চুল লুটোপুটি খাচ্ছে ভুরভুরা গালের উপর। মুগ্ধের মতন অনেকক্ষণ এই রূপ দেখল পরাণ। পরে, একখান হাত বাড়িয়ে দিল চারুর কাঁধে। 'ডর কিয়ের ডর লাগে কও?'

'কি যান, আমি কইবার পারি না।'

সারা ঘরে হঠাৎই নীরবতা নামল। চারু মুখ নামিয়ে আছে। পরাণ আন্মনা। গুরুকুনাথের বন্ধনা গাওনার উচ্চগ্রাম সুর তখনও বয়ে চলেছে। মাঝে মাঝে ভেসে আসছে উত্তাল উন্মাদ ধলেশ্বরীর দিগন্ত আগানিয়া ভয়ঙ্কর গর্জন। বাতাসের জোর বেড়েছে। পাইয়া আর নিম গাছের ডালের ওপর দিয়ে হুহু করে হাওয়া বয়ে যাচ্ছিল ওরা শুনতে পেল। হঠাৎ গোটা বাড়িটা কেঁপে উঠল বুঝি। বিশাল একখান শব্দ। বুঝি রাক্ষসী ধলেশ্বরীর মুখে আর একটা দিগন্ত নিদারুণ শব্দে ধ্বসে পড়ল। ওই শব্দে চমকে উঠল চারু। সে কাঁপছিল।

'বউ', পরাণ আর ঠেলা দিল চারুকে। চারু সোয়ামীর মুখের দিকে বিস্ময় চোখ তুলে তাকাল। 'পাছের ডর ডর লাগে?'

কথা বলল না চারু। মাথা নেড়ে না জানালো।

'দুৎ, উডা মিথ্যা ডর।' পরাণ হেসে উড়িয়ে দিতে চাইল সব কিছু। 'গাঙ হইল গ্যা আমাগোর একজন। অরে কি ডরায় মাইয়া?'

কিন্তু সত্যি তাই হ'ল। চারু বুঝি আগেই জানান পেয়েছিল। বাতাস তাকে বলছিল: চারু, ও চারুবালা, সমন আইত্যাচে। রাক্ষসী আইজ তামাম সেরাদ কইরা ফেলাইব--তুই ঘুমাইস না চারু, ঘুমাইস না···। ধলেশ্বরীর ক্রুদ্ধ গর্জনে তার কথার জানান পেয়েছিল চারু। সোঙানী আর গর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গাঙ ধলেশ্বরী যেন বলছিল, 'হুঁশিয়ার মায়ার পুতেরা, হুঁশিয়ার···'

• • •

আসর জমে উঠেছিল অনেক রাত্রে। গুরুকুনাথের গাওনা শেষ হ'লে উবু হয়ে লাড্ডু খেয়েছিল পাঁচ জন। কিন্তু এক কি দুবার। রেবতী কৈবিত্তির পুলা সুবল, ছয়বারের বার লাড্ডু তুলে অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল। 'যান যায়, ধন্য যায়' যানদা বুড়ি-কেঁদে উঠেছিল বুক থাবড়ে। 'অরে তুরা কে আচল কুথায় ড্যালাখান জল কইরা দ। নাইলে সব্বনাশ হইয়া যাইব। গাঙে নিষ্কৃতি দিব না ওলো···'

ছোটদের বদলে এলো বড়রা। এক দুই তিন-হারে আর হার। শেষে ভুরভুইরা কানাইয়ের সম্বন্ধী গগন যান রক্ষা করল। পটাপট সাতখান ডিগবাজি খেয়ে সে যখন ক্ষীরের ড্যালাখান হাতে তুলি নিল, দুয়ারের অসংখ্য মানুষেরা শিশির ছেড়ে উঠল তখন: জয় বাবা গুরুকু মহারাজ, জয়

যা জননী ধরেশ্বরী। পরাণ ছুটে এসে আপটে ধরে কেবল পবনকে। তারপর উদ্দাম নাচ।

সেই সুবাদে নেশার আসরে পবন মাল পেয়েছিল বেশি। এক আধটা নয়, ছয় পালি ভাতের সরবৎ খেয়ে ফুর্তি উথলে উঠেছিল। তড়াক করে কল থেকে উঠে পবন নেশার ঘোরে নাচন গাওন শুরু করল :

পরাণের হুকারে,
তার নাম কে রাখিল ডাকা?
পরাণের হুকারে,
তার নাম কে রাখিল ডাকা?

হুকার মধ্যে গঙ্গাজল
নইলচার বইতে পানি—
তারে লইয়া রে আমি
হাকুর হুকুর টানি—
পরাণের হুকারে···।

পানের সঙ্গে বিচিত্র এক নাচ। গামছা উড়িয়ে, কোমর দুলিয়ে, হাত নেড়ে, লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে উদ্দাম নাচ গান। বাকি নেশাড়ে মানুষেরাও উঠে এসেছিল ততক্ষণে। এসে ভিড় করে গাইছিল নাচছিল—মধু কৈবিত্তির বিশাল আঙিনায় উন্মত্ত ফুর্তির জোয়ার বয়ে যায়।

কিন্তু ওরা কি জানত যে, পবন আসর? আকাশে কেওয়ার মেঘ চিরে কালাকালা হ'য়ে গেছে, ধরেশ্বরীর গহীন থেকে ধীরে ধীরে উঠে আসছে বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধারূপী এক ভয়ঙ্কর দৈত্য। এবং রাত শেষ হবার আগেই রাক্ষসী তার বিশাল মুখের হা করে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসবে এ-দিকে —এই বেউলী খালিপাড়ার দিকে? জানত না।

(ক্রমশঃ)

ভুল সংশোধন

জ্যৈষ্ঠ সংখ্যার পুস্তক পরিচয়ে 'মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ' পুস্তকটির লেখিকার নাম অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় হবে, অমিয়া মুখোপাধ্যায় নয়। এ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

জঃ সঃ

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনাম সঙ্কট ইতিমধ্যে আরও তীব্রতর হয়েছে। বর্ষার মাসগুলি সুরু হতে না হতেই জুলাই মাসের প্রথম দিকেই ভিয়েৎকং গুরুতর সংঘাতের সূচনা করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের উত্তরাংশে ও মধ্যাংশে তার ফলে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী ও মার্কিনীদের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। মার্কিনীরা ভিয়েৎকং গেরিলাদের হতাহতের সংখ্যা বৃদ্ধির দাবী করলেও তাদের ওপর ভিয়েৎকং-এর ক্রমবর্ধমান চাপ অনস্বীকার্য হয়ে উঠেছে। মার্কিনীদের বিমানশক্তির প্রাচুর্য, বর্ষার মাসগুলিতে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মেঘাবৃত আকাশের আড়াল থেকে ভিয়েৎকং-এর আক্রমণের গতিবেগ রোধ করতে কতটা সক্ষম হবে, সে-সম্বন্ধে সংশয় রয়ে গেছে। অবশ্য মার্কিনী বিমানশক্তির এই সম্ভাব্য অকার্যকারিতার উপর নির্ভর করে ভিয়েৎকং তাদের যৌথবী আক্রমণের পরিকল্পনা করলেও, মার্কিনীরাও বর্ষার মাসগুলিতে চূড়ান্ত পরাজয় ঠেকিয়ে রাখতে বদ্ধপরিকর এবং এই উদ্দেশ্যে তারা একদিকে বিমানশক্তির বহর বৃদ্ধি করেছে এবং অন্য দিকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সেনাবাহিনীর সংখ্যাও ইতিমধ্যে সত্তর-পঁচাত্তর হাজারে বৃদ্ধি করেছে। এই সংখ্যা প্রয়োজন হলে এক লাখ বিশ হাজারেও বৃদ্ধি পেতে পারে, অনুমান করা যাচ্ছে। এদের মধ্যে যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিয়োগের উপযুক্ত সেনাবাহিনীর সংখ্যা ইতিমধ্যেই বিশ হাজারে পৌঁছেছে। সোভিয়েট রুশের জেট বোমারু বিমান হানয়ে পৌঁছবার সংবাদও পাওয়া গেছে।

গত ৮ই-৯ই জুন তারিখে ভিয়েৎনামের যুদ্ধক্ষেত্রে মার্কিনী সামরিক বাহিনী নিয়োগের নীতিও মার্কিন সরকার গ্রহণ করেছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারের আহ্বানেই মার্কিনী সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের পাশাপাশি যুদ্ধ করবে—এই আক্রটুকু নিয়ে মার্কিনীদের ক্রমবর্ধমান দখলদারী ভূমিকা আড়ালের নিষ্ফল চেষ্টার মধ্য দিয়ে ভিয়েৎনাম সংঘাত এক নূতন পর্যায়ে পৌঁছেছে। এ-পর্যন্ত মার্কিনী সামরিক বাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনামে মার্কিনী ঘাঁটিগুলি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল এবং কখনও কখনও এই ঘাঁটিগুলি চতুষ্পার্শ্বস্থিত এলাকায় গেরিলাদের উচ্ছেদ অভিযানও পরিচালনা করেছে। কিন্তু তাদের সম্মুখ যুদ্ধের আয়োজন এই প্রথম, সুতরাং আগামী তিনমাসের প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের জন্য উভয়পক্ষই প্রস্তুত। এই তিনমাসের মধ্যে মার্কিনী পরিকল্পনার 'সীমাবদ্ধ যুদ্ধ' দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সীমানা অতিক্রম করে উত্তর ভিয়েৎনামে উপচে পড়বে কিনা, কিম্বা আরও প্রসারিত হবে কিনা সে-সম্বন্ধে স্থির-নির্দেশ কেউ দিতে পারবে না; ঘটনার পরিণতি তার পথ করে নেবে।

ভিয়েৎনামের অস্থির রাজনীতিরও ইতিমধ্যে পরিবর্তন হয়েছে। গত ১২ই জুন তিনমাসের পুরাতন কোয়াট সরকারকে অপসারিত করে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকার আবার সামরিক নেতৃত্বাধীন হয়েছে। নূতন সামরিক সরকারের প্রধানমন্ত্রী, বিমান বাহিনীর অধিনায়ক এয়ার-মার্শাল নোগুয়েন কাও কাই, ফরাসী সরকারের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছেন, ভিয়েৎকং-এর বিরুদ্ধে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন, সায়গনের ৩৬টি সংবাদপত্রের প্রকাশ এক-মাসের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়ে আবার কয়েকটিকে পুনঃ প্রকাশের অনুমতি দিয়েছেন। রাত্রি ১০টা থেকে ৫টা পর্যন্ত সাইগনে কারফিউজারী করে সাইগনের রাত্রির প্রমোদ জীবনে স্তব্ধতা এনেছেন এবং দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

কাই-এর নূতন বিধানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অবসন্ন রাজনীতির জীবনে কতটা প্রাণসঞ্চার সঞ্চারিত হয়ে স্থৈর্য ও আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনবে, সে-সম্পর্কে কিছু অনুমান করা মুস্কিল হলেও, মৌসুমী যুদ্ধের প্রস্তুতিতে এই রাজনৈতিক অনমনীয়তার পৃষ্ঠপটের অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তবে প্রধানমন্ত্রী কাই উত্তর ভিয়েৎনামে 'মুক্তি ফ্রন্ট' গঠনের হালফর প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার রাজনৈতিক দৃঢ়তার পূর্বতন প্রতিশ্রুতিগুলিকে লঘু করে ফেলেছেন।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধের মার্কিনী রাজনীতি আর একবার মোড় নিয়েছে, তার সামরিক নীতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। আলোচনা বৈঠকে হ্যানয়ের উপস্থিতি অনিবার্য করে তোলা পর্যন্ত ভিয়েৎকং-এর ওপর মার্কিনী চাপ বৃদ্ধির মৌলিক রাজনীতির কোনো পরিবর্তন না করেও, আলোচনা বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদলে ভিয়েৎকং-এর উপস্থিতি সম্পর্কে এ-যাবৎ মার্কিনীরা যে প্রবল অনমনীয় আপত্তি দেখিয়ে এসেছে, তার পরিবর্তন হয়েছে। সিনেটের ফরেন রিলেশন্স্ কমিটির চেয়ারম্যান সেনেটর ফুলব্রাইটের গত ১৮ই জুনের এক বক্তৃতায় এই পরিবর্তনের আভাস প্রথম পাওয়া যায়। এই বক্তৃতায় ফুলব্রাইট বলেন আলোচনার বৈঠকে ভিয়েৎকং-এর উপস্থিতিতে মার্কিণ সরকারের আপত্তির কারণ থাকবে না। ফুলব্রাইট মনে হয় প্রেসিডেন্ট জনসনের অনুমোদন নিয়েই আরও বলেন :

"It cannot be denied that there have been mistakes over the years in our policy on Vietnam, not the least of which was the encouragement given in the mid-50's to President Ngo Dien Diem to violate certain provisions of Geneva Accord of 1954." মার্কিনীদের মুখে আত্মসমালোচনার সুরে অভিনবত্ব আছে ছাড়া।

ভিয়েৎকংদের বৈঠকে উপস্থিতি সম্পর্কে বৃটিশ পররাষ্ট্র সচিব মাইকেল ষ্টুয়ার্টও ১৬ই জুন তারিখে অক্সফোর্ড ডিবেটিং সোসাইটির এক বক্তৃতায় উল্লেখ করেন। ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত ১৯৫৪ সালে জেনেভা সম্মেলনে উপস্থিত রাষ্ট্রগুলির আর একটি সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে ষ্টুয়ার্ট বলেন "Then it would be possible – and I don't see how it could it prevented—that the Government of North Vietnam includes in its delegation representatives of the National Liberation Front." ১৮ই জুন তারিখে লণ্ডনে কমনওয়েলথ রাজনৈতিক বৈঠকে ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের উদ্দেশ্যে ভিয়েৎনাম সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত রাষ্ট্রসমূহের সহিত যোগাযোগ স্থাপনের জন্য, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসনের নেতৃত্বে ঘানা, নাইজিরিয়া, ত্রিনিদাদ ও টোবাগো এবং সিংহলের প্রতিনিধিত্বের নিয়ে একটি কমনওয়েলথ শান্তি মিশন গঠিত হয়। কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত অষ্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যাণ্ড সেনাবাহিনী দিয়ে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত। প্রকৃতপক্ষে অষ্ট্রেলিয়ার সেনাবাহিনী ইতিমধ্যে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে যুদ্ধে নিযুক্ত হয়েছে। তাছাড়া, বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন, জনসনের ভিয়েৎনাম নীতির পুরোপুরি সমর্থক। এই অবস্থায় কমনওয়েলথের ভিয়েৎনাম মিশনের উপযোগিতা সম্পর্কে স্বভাবতই কমনওয়েলথ সম্মেলনে প্রশ্ন উঠেছিল, বিশেষ করে প্রবল আপত্তি উঠেছিল উইলসনের এই মিশনের নেতৃত্ব নিয়ে। কিন্তু রাশিয়া, চীন ও উত্তর ভিয়েৎনাম এই মিশনকে প্রত্যাখ্যান করে উইলসনকে অস্বস্তির হাত থেকে রক্ষা করেছে।

কিন্তু উইলসন আর এক সূত্র ধরে ভিয়েৎনাম আলোচনা বৈঠক সম্পর্কে হ্যানয়ের মতামত নির্ধারণের জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে গত ৮ই জুলাই পেকিং যান বৃটিশ পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী হ্যারল্ড ডেভিস—যিনি হো চি মিনের একজন ব্যক্তিগত বন্ধু—হ্যানয় পাঠানো হয়েছেন।

ডেভিস মিশনের হ্যানয়ে উপস্থিতির সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েৎ-

মাসে মার্কিনী রাজনীতির আর একটি সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ঘটে গেছে। ২রা জুলাই তারিখেই ওয়াশিংটন থেকে ঘোষিত হয়েছে সাধারণে মার্কিনী রাষ্ট্রদূত জেনারেল ম্যাকলওয়েল টেলার পদত্যাগ করেছেন এবং তার পরিবর্তে রিপাবলিক্যান নেতা ও সাধারণের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত হেনরী ক্যাবট লজ রাষ্ট্রদূত রূপে ফিরে আসছেন। দক্ষিণ ভিয়েৎনামে গত একবছর যাবৎ মার্কিনী সমরনীতির নিয়ামক, আমেরিকার অন্যতম সামরিক নেতা, ম্যাকলওয়েল টেলারের ভিয়েৎকংদের মৌসুমী যুদ্ধের দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে আকস্মিক বিদায়, আমেরিকার ভিয়েৎনাম সংক্রান্ত নীতিতে তাদের আপোষকামনার মূর্ত প্রতিশ্রুতিরূপেই চিহ্নিত হয়েছে, যদিও মৌসুমী যুদ্ধের জন্য মার্কিনী প্রস্তুতির গতিবেগ শৈথিল্যের সম্ভাবনাকেও সঙ্গে সঙ্গে অস্বীকার করা হয়েছে। তবে লজের উপস্থিতি হয়তো দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাজনীতির সঙ্গে মার্কিনী সামরিক নীতির সামঞ্জস্য ঘটাতে সহায়ক হবে। শান্তি ও সংঘাত দুই নেক প্রান্তের স্বার্থহীন প্রতিশ্রুতিই ভিয়েৎনামে মার্কিনী নীতি বহন করতে পরম আগ্রহী।

বেন বেল্লা : আলজিয়ার্সে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন

গত ১৯শে জুন ঘরিৎ সামরিক অভ্যুত্থানের পর আলজিরিয় মুক্তি-সংগ্রামের অন্যতম প্রধান নায়ক ও স্বাধীন আলজিরিয়ার রাষ্ট্রপতি বেন বেল্লা সামরিক বাহিনীর প্রধান কর্ণেল বুমেদিয়েন কর্তৃক পদচ্যুত হন। বেন বেল্লার আকস্মিক অপসারণ বিভিন্ন রাষ্ট্রে, বিশেষ করে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। কারণ আর মাত্র দশদিন পর ৯৯ শে জুন তারিখে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন এবং ২৪ শে জুন তারিখে পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের বৈঠক নির্ধারিত ছিল। আরও বিস্ময়ের বিষয় কর্ণেল বুমেদিয়েন বেন বেল্লার বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদ্রোহিতার ও অন্যান্য গুরুতর অভিযোগ উত্থাপন করে তাকে একজন ঘৃণ্য অত্যাচারী 'Diabolical despot' রূপে চিহ্নিত করেছেন। অথচ অপসারণের মাত্র দুইদিন পূর্বে, অর্থাৎ ১৭ই জুন তারিখে পশ্চিম আলজিরিয়াতে এক বক্তৃতায় বেন বেল্লা বলেন তার বিপ্লবী সরকার আভ্যন্তরীণ সংঘাত মুক্ত :

"Our socialist revolution, our country, our regime is more united than ever, more decided than ever to meet all conspiracies from wherever they come."

বেন বেল্লাকে অপসারণের পশ্চাতে চীনের হাত আছে কিনা, তা নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল। তার কারণ বেন বেল্লা আফ্রো-এশীয় সম্মেলনে রাশিয়া ও মালয়েশিয়ার অন্তর্ভুক্তির দৃঢ় সমর্থকরূপে চীনের বিরাগভাজন হয়েছিলেন। তাছাড়া, বেন বেল্লার অপসারণের সঙ্গে সঙ্গেই চীন নূতন সরকারকে স্বীকৃতি দেয়। কিন্তু বুমেদিয়েনের পশ্চাতে চীনের ইসারার অনুমান পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হয়েছে। বুমেদিয়েন কম্যুনিষ্টদের প্রভাব খর্ব করতে উদ্যোগী হয়েছেন এবং তার ধর্মীয় উগ্রতার মানসিকতাও ইতিমধ্যে প্রচারিত হয়েছে। সুতরাং দ্রুত স্বীকৃতির কৃতজ্ঞতায় বুমেদিয়েনের চীন-অনুরাগী হবার সম্ভাবনা আদৌ নাই। বরং বুমেদিয়েন সোস্যালিজমের নামে যদি প্রতিক্রিয়ার সমর্থক হয়ে দাঁড়ায়, তাহলে কূটনৈতিক স্বীকৃতি দিয়ে পরবর্তীকালে চীন অনুতপ্তও হতে পারে।

এই আকস্মিক আঘাত থেকে এ-অনুমান সহজেই করা যায় যে আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বেন বেল্লার সঙ্গে সামরিক শক্তির বিরোধ ক্রমশ ঘনা বেঁধে উঠছিল। বেন বেল্লার সঙ্গে, তার সমকক্ষ এবং বিপ্লবের সতীর্থ কেরহাত আব্বাস, বেল কাসিম ক্রীশ, মহম্মদ খিদার, শক্তির পরীক্ষায় পরাজিত ও নির্বাসিত। প্রকৃতপক্ষে বেল কাসিম ক্রীমের হাত থেকে আলজিয়ার্স দখলের অভিযানে সেদিন বেন বেল্লার প্রধান সহায়ক ছিল আলজিরিয় সেনাবাহিনীর প্রতিষ্ঠাতা-অধিনায়ক বুমেদিয়েন। আজ বুমেদিয়েনের হাতেই বেন বেল্লার লাঞ্ছনা, আলজিরিয় শাসন-ব্যবস্থায় সামরিকবাহিনীর প্রভাব সূচিত করছে। বেন

বেল্লার সমর্থকদের ছিকোত তাই বিদ্রোহের আকার ধারণ করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বুমেদিয়েন আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের প্রাক্ মুহূর্তে কেন বেল্লাকে অপসারিত করে তার রাজনৈতিক শক্তি ও মর্যাদার স্বাভিষের সুযোগ থেকে তাকে বঞ্চিত করলেন। আফ্রো-এশীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়ে গেলে, সামরিক বাহিনীর শক্তি সত্ত্বেও, কেন বেল্লার অপসারণ সম্ভব হোতো না। আফ্রিকার নয়টি রাষ্ট্রের, যুক্ত সরকারকে অস্বীকৃতির মধ্য দিয়ে সেই সম্ভাবনাই পরিস্ফুট হয়েছে। তাছাড়া তেরটি আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রের কেন বেল্লার জীবন রক্ষার জন্য আবেদন, কেন বেল্লার অপসারকদের প্রতি কিউবার কাস্ট্রোর তীব্র ধিক্কার, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে কেন বেল্লার প্রতি প্রবাদ সহানুভূতির ইঙ্গিত বহন করে এনেছে।

বুমেদিয়েনের আত্মকেন্দ্রিকতা এবং বিভিন্ন কারণে চীন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রচার এবং তদ্বির সত্ত্বেও দ্বিতীয় আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আলজিরিয়াতে অনুষ্ঠিত হল না। আগামী এই নভেম্বর পর্যন্ত এই সম্মেলন মুলতুবী হয়ে গেছে। তারপরও এই সম্মেলন আদৌ হবে কিনা সে-সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেন বেল্লাকে অপসারণ করেও নির্ধারিত সময়ে সম্মেলন অনুষ্ঠিত করে আফ্রো-এশীয় আন্তর্জাতিক পরিবারে বুমেদিয়েন মর্যাদার শিখরে পৌঁছাবেন, কেন বেল্লার সমর্থকদের কয়েকদিনের ছিকোতের ফলে, এই আশা ভবীভূত হয়ে গেছে। তাছাড়া, আলজিরিয়ার সমর্থক আফ্রিকান রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের সম্মেলন অনুষ্ঠানে অনুপস্থিতি আলজিরিয়া অগ্রাহ্য করতে পারে যাই, যদিও আরব রাষ্ট্রগুলির সমর্থন ছিল সম্মেলন অনুষ্ঠানের পক্ষে।

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন বানচাল হলে, কেন বেল্লাকে যারা সাহায্য করেছে, তাদেরও লাভ্যিত করবে এবং আফ্রো-এশীয় গোষ্ঠির নানা বিরোধ মূর্ত হয়ে উঠলো। আরব রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির বিরোধ, নন-এলাইনডদের মধ্যে বিরোধ, এশীয়দের মধ্যে বিরোধ, কমনওয়েলথ বনাম-অ-কমনওয়েলথদের বিরোধ এবং সর্বোপরি চীন ও তার সমর্থকদের অন্যান্য এশীয় ও আফ্রিকান রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছে। এই বিরোধের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আলজিরিয়ার ২৯শে জুন থেকে ২৬শে জুনের মধ্যে আরও পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আলজিরিয়ার উপস্থিতি সত্ত্বেও তাদের উপেক্ষা করে ২৬শে জুন সম্মেলনের প্রস্তুতিকমিটি সম্মেলন মুলতুবী রাখার বিষয় নিয়ে এই অভিযোগই দপ্তরখানা করলো। এই মুলতুবীর সিদ্ধান্তপ্রস্তুতি কমিটি কর্তৃক ঘোষিত হবার পূর্বে ২০টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধি,—যাদের নেতৃত্বে কোনো কোনো ক্ষেত্রে পররাষ্ট্রমন্ত্রীরাও ছিলেন, স্থানীয় রাষ্ট্রদূতগোষ্ঠি ও সংবাদপত্রের প্রতিনিধি ও অন্যান্যদের সমবায়ে আহূত সভায় আলজিরিয়ার পররাষ্ট্র দপ্তরের সাধারণ একটি কর্মচারীর এক মিনিটের ঘোষণায় সভাটি সমাপ্ত হয়। ঘোষণাটি ছিল প্রস্তুতি কমিটির সভায় ঘোষণা, যে সভায় সম্মেলন মুলতুবীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই গুরুত্বপূর্ণ এক মিনিটের সভাটিতে চীন, ইন্দোনেশিয়া, পাকিস্তান, উত্তর কোরিয়া, উত্তরভিয়েৎনাম ও সংযুক্ত আরব রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা অনুপস্থিত ছিলেন। কারণ মুলতুবীর সিদ্ধান্তটি তাদের কাছে আগেই পৌঁছে গেছে। সব চাইতে তাজ্জবের ব্যাপার—পাকিস্তান মুলতুবী রোধের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, অথচ মুখে মুলতুবী প্রস্তাব করে সম্মেলন রক্ষার ভাঁওতাবাজী লুটেছে। সুতরাং, আফ্রো-এশীয়ার এই রূপান্তর থেকে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আবার কবে উঠবে কিনা সে-সম্বন্ধে গুরুতর সংশয় দেখা দিয়েছে।

আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের ব্যর্থতায় সব চাইতে বিপর্যস্ত হয়েছে চীনের কূটনীতি, কারণ, এই সম্মেলনে আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রগুলিতে চীনের পাকিস্তান প্রভাব উদ্ধারের সুযোগ উপস্থিত

হত। তাছাড়া, সোভিয়েট রুশের সম্মেলনে যোগদানের সমস্যা নিয়ে সোভিয়েটের বিরুদ্ধে প্রচারের, ভিয়েৎনাম সংঘাতে আমেরিকার বিরুদ্ধে প্রবল বিস্ফোরণের আশোলনে আফ্রো-এশীয় সংগঠনকে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণের এবং ভারতের বিরুদ্ধে আফ্রো-এশীয় ভোটাধিক্যের সুযোগ চীনের পক্ষে উপস্থিত হত। এমন গত কয়েকমাস ধরেই চীনের দীর্ঘ প্রস্তুতি একেবারেই ব্যর্থ হল। ইন্দোনেশিয়ার উদ্যোগও ব্যর্থ হল, কারণ মালয়েশিয়ার বিরুদ্ধে বিস্ফোরণের একটি মূর্ত সুযোগ তার হাত ছাড়া হয়ে গেলো। পাকিস্তানের মনস্তাপও প্রায় ঐ রকমের। তাদেরও ভারত বিদ্বেষ প্রচারের সুযোগটা হাত ছাড়া হয়ে গেল। আর সংযুক্ত আরব রাষ্ট্র হয়তো মনে মনে খুশীই হয়েছে, কারণ আলজিরিয়া আরব রাষ্ট্র হলেও কায়রোতে সম্মেলন না হয়ে আলজিরিয়ায় কেন?

সোভিয়েট রুশ মহলের বিশ্বাস ফেলেছে, চীনের সঙ্গে সংঘাতের সম্ভাবনা আপাতত মুলতুবী হইলো বলে। ভারতবর্ষের পক্ষে বাঁচোয়া, আফ্রো-এশীয় মানসিকতার যথার্থ পক্ষপাতাক্ষ করে এ-যাবৎ ভারতবর্ষের কূটনৈতিক পরাজয়ই ঘটেছে এবং বরাবরই আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে মনস্তাপের অনুশোচনা নিয়ে ভারতীয় প্রতিনিধিরা ঘরে ফিরেছে। এবার সেই গ্লানির হাত থেকে ভারতবর্ষ রক্ষা পেলো।

১২।৭।৬৫

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিশোরীমোহন মিত্র কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

UPPER GANGES SUGAR MILLS LTD.
THE OUDH SUGAR MILLS LTD.
NEW INDIA SUGAR MILLS LTD.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS LTD.
BHARAT SUGAR MILLS LTD.
GOBIND SUGAR MILLS LTD.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

THE COTTON AGENTS PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতী

৩০ বর্ষ] ৪র্থ সংখ্যা [শ্রাবণ ১৩৭২

সম্পাদকীয়

দেবী অবলা বসু

গত ৮ই শ্রাবণ দেবী অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়েছে। এই শতাব্দীর গোড়ায় যাঁরা বাংলার নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সুযোগ সৃষ্টিতে অগ্রণী হয়েছিলেন দেবী অবলা বসু তাঁদের অন্যতম। ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ের সম্পাদিকা পদে দীর্ঘকাল অধিষ্ঠিত থেকে, স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের জন্য নারী শিক্ষা সমিতি স্থাপন করে এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষিকারূপে জীবিকার সন্ধান ও প্রাথমিকে শিক্ষাবিস্তারে উপযোগী ভূমিকা গ্রহণের জন্য দেবী অবলা বসুর অমূল্য অবদান তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে স্মরণ্য। আচার্য জগদীশচন্দ্রের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠার ও বসু বিজ্ঞান মন্দির স্থাপনের পশ্চাতে দেবী বসুর প্রেরণা ও সাহচর্যের ইতিহাসও বাংলাদেশে অপরিজ্ঞাত নয়। তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে বসু দম্পতির ভগিনী নিবেদিতার প্রতি অকৃত্রিম সৌহার্দ ও প্রীতির প্রসঙ্গও উল্লেখ্য। নিবেদিতার কাজে বসু দম্পতির আনুকূল্য ও তাঁর মৃত্যুর পরে এদের সাহচর্য ও সেবা বাংলাদেশের সঙ্গে নিবেদিতার সম্পর্কের ইতিহাসে একটি মধুময় ও মর্মস্পর্শী স্থান অধিকার করে আছে।

কান্তকবির জন্ম শতবার্ষিকী

কান্তকবি রজনীকান্ত সেনের জন্মশতবার্ষিকী এ-বছর, ঘুলাইঘাসে উদ্‌যাপিত হল। অতীতদিক্ত বাঙালী মানসে কান্তকবির গান বিস্মৃতির অন্তরাল থেকে উৎসারিত হয়ে আজও উজ্জ্বলতার জোয়ার এনে দেয়। তাঁর গানে ধর্মের নির্ঝর, অশ্রুর প্লাবন, স্বাদেশিকতার আত্ম সমর্পণ, ও ভক্তির স্নিগ্ধ মাধুর্য চিরকালই বাঙালী হৃদয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করবে। রবীন্দ্রনাথ যাঁর মধ্যে 'মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশ' দেখেছিলেন, যিনি তাঁর কাব্য ও সঙ্গীতের মধ্য দিয়ে মনুষ্যত্বের মহিমা ও আত্মীয়তার আদর্শ বিকীর্ণ করে গেছেন, তাঁর শতবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর স্মৃতির প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধার নিবেদন করছি।

কাশ্মীরে ব্যাপক পাকিস্তানী আক্রমণ

গত ৫ই আগষ্ট থেকে পাকিস্তানী বখনী কাশ্মীর এলাকা থেকে সেনাবাহিনী ও মুজাহিদ বল বেসামরিক পোষাকে গোলাগুলি অস্ত্র-শস্ত্রসহ ব্যাপকভাবে কাশ্মীরে আক্রমণাত্মক অনুপ্রবেশ করে পুনরায় সামরিক আক্রমণের চেষ্টা করেছে। এমন কি শ্রীনগরের অভ্যন্তরেও তারা এসে পৌঁছেছে এবং সহরের সীমান্তবর্তী এলাকায় গোপনে রক্ষিত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে ধ্বংসাত্মক কার্য পরিচালনা করেছে। ৯ই আগষ্ট তারিখে প্রেসিডেন্ট জনসনের আহ্বানে আবহুল্লার গ্রেপ্তারের প্রতিবাদ দিবস পালনের আড়ালে ব্যাপক বিদ্রোহাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টির সুযোগ নেবার জন্য এই পাকিস্তানী আক্রমণ নির্ধারিত হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্য ব্যর্থ হলেও, পাকিস্তানী আক্রমণের ব্যাপকতা ও গভীরতা—কচ্ছের চুক্তি সম্পাদনের প্রায় অব্যবহিত পরেই—সমূহ যুদ্ধের গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য নিয়েই দেখা দিয়েছে। শ্রীনগরের বেতারকেন্দ্র দখল করে বিদ্রোহের সাফল্য ঘোষণার পাকিস্তানী সূচি ব্যর্থ হলেও, কাশ্মীরের গভীরে এই আক্রমণের পূর্ব লক্ষণ ভারতীয় সামরিক গুপ্তচর বিভাগের অগোচরেই ঘটে থাকে। অথচ হুত পাকিস্তানী অফিসার ও সৈনিকদের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় এই গেরিলা আক্রমণের প্রস্তুতি ২৯ শে মে থেকেই সুরু হয়েছে। অর্থাৎ কচ্ছ আক্রমণের প্রায় সমসাময়িক কালেই গেরিলা কায়দায় আক্রমণের প্রস্তুতির পশ্চাতে চীনা অনুপ্রেরণা ও চীনা সামরিক শিক্ষার অনস্বীকার্য্য স্বাক্ষর রয়েছে। এই আক্রমণের পরও কাশ্মীর সীমান্তে সঙ্কটের গুরুত্ব লঘু করে দেখাবার চেষ্টা হয়েছে সরকারী পক্ষ থেকে। কাশ্মীরের প্রধানমন্ত্রী মুক্তভোগী-রূপে এই আক্রমণকে 'Full-fleged attack' রূপে চিহ্নিত করলেও ঘটনার পূর্ণবিবরণ জানবার পরও ভারত সরকারের মুখপাত্রেরা "infiltration of 1000 to 1200 armed Pakistani Saboteurs" বলে দায়িত্ব খালন করেছেন।

কাশ্মীরের এই আক্রমণ আরও ব্যাপক, আরও দূরপ্রসারী আক্রমণের পূর্বলক্ষণ সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই আক্রমণ চীনা-আক্রমণের পূর্বাভাস কি না সে সম্পর্কেও সন্দেহ রয়েছে। সুতরাং, 'বল দিয়ে বল প্রতিহত' করবার অঙ্গীকারাবদ্ধ বন্ধুরাষ্ট্রের কর্তব্য সম্পাদনের দিন অতীত হয়ে গেছে, একথা বুঝতে হবে।

ট্রাম-ভাড়া পুনর্বিন্যাস না বৃদ্ধি

ট্রাম ভাড়া পুনর্বিন্যাসের নামে দুই দিনের নোটিশে গত ২৬শে জুলাই থেকে ট্রাম কোম্পানী ভাড়া বৃদ্ধি করেছে। যদিও এই পরিবর্তনকে 'র‍্যাশনালাইজেশন' নাম দিয়ে বলা হয়েছে প্রথম শ্রেণীতে পাঁচটি ষ্টেজে ভাড়া কমবে ও চারটি ষ্টেজে ভাড়া বাড়বে এবং দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাতটি ষ্টেজে ভাড়া কমবে ও দুইটি ষ্টেজে ভাড়া বাড়বে ও অন্যান্য ষ্টেজে ভাড়া অপরিবর্তিত থাকবে, ভাড়া সংশোধনের মোট ফল ট্রাম কোম্পানীর ২৪ লক্ষ টাকা আয়বৃদ্ধি। এই আয়ের মধ্যেকার চৌদ্দ লক্ষ টাকা ট্রাম শ্রমিক কর্মচারীদের বাকী ভাতা মেটাতে যাবে—যে ভাতা কোম্পানী দিয়ে আসছে; দুয় লক্ষ টাকা বর্ধিত বিজলী খরচ খাতে ব্যয় হবে। অবশিষ্ট অর্থ নূতন সাজসরঞ্জাম ক্রয় ও পুরাতন সাজ সরঞ্জাম পরিবর্তনের জন্য ব্যয় হবে। সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় কোম্পানীর এই দ্রুতিগতি ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করেছে। ৩০শে জুলাই ও এই আগষ্ট যথাক্রমে কলকাতায় এবং সমস্ত পশ্চিম বাংলায় হরতালও হয়ে গেলো। ট্রাম কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন কমিশন কর্তৃক অনুসন্ধান সাপেক্ষে এই সংশোধিত ভাড়া মুলতুবী রাখলেই গণবিক্ষোভ শান্ত হত। সরকার সে পথে অগ্রসর না হয়ে পুলিশের লাঠি দিয়ে বিক্ষোভ দমিয়ে কোম্পানীর সংশোধিত ভাড়ার হার চালু রাখতে বদ্ধপরিকর হয়েছেন। বিলাতী ট্রাম কোম্পানীর আয়-ব্যয়ের হিসাব

সম্পর্কে দুইটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন তথ্যানুসন্ধানের নজীর রয়ে গেছে। কোম্পানীর হিসাব সম্বন্ধে তাদের কটাক্ষ সুবিদিত। তাছাড়া মাত্র কিছুকাল পূর্বে ভাড়া বৃদ্ধি করেও এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে পুনরায় ভাড়া সংশোধনের কি প্রয়োজন দেখা দিল সে সম্পর্কেও অনুসন্ধান হওয়া দরকার। যে সময় চালের মূল্য অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে, আলু পটল-বেগুন-ঝিঙে-কচুর দামও অস্বাভাবিকভাবে ঊর্ধ্বগামী অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্যের মূল্যও তাই, ঠিক সেই সময়টিকে বাছাই করে ট্রাম-ভাড়া সংশোধনের নামে বর্ধিত হারে ভাড়া চাপিয়ে কোম্পানীর অতিরিক্ত আয়ের প্রলোভনে সায় দিতে সরকারী ব্যস্ততা অত্যন্ত অশোভন এবং অসঙ্গতও বটে। গত কয়েকদিন যাবৎ কলকাতার রাস্তায় ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থে যে পুলিশী পাহারা পড়েছে তার এক ভগ্নাংশও কালোবাজারী ও মুনাফাখোরদের ধরন করে চাল ডাল তেল-আটা ইত্যাদির নির্ধারিত মূল্য বজায় রাখবার জন্য সরকারী প্রয়োগ উদ্যত হোলে, জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবন আজ অনাহারের দুঃস্বপ্নে আতঙ্কগ্রস্ত হোতো না। জনসাধারণের দৈনন্দিন জীবনে নিরাপত্তা আনবার দায়িত্বের চাইতে বিদেশী ট্রাম কোম্পানীর স্বার্থরক্ষার দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট অনেক বেশী গুরুতর। তাই দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির আঘাতে জর্জরিত জনসাধারণের ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির প্রতিবাদকে লাঠির আঘাতে মূক করে দেবার সমারোহ কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় বিভীষিকা সৃষ্টি করেছে। ওয়েলফেয়ার স্টেট বটে!

জাতীয় খাদ্যনীতি

জাতীয় খাদ্যনীতির বহুবারক্ত, সমুক্রিয়ার পরিণতি পেয়েছে। গত ২২শে জুলাই বাঙ্গালোরে জাতীয় খাদ্যনীতি নির্ধারণের জন্য বৈঠকে বসেছিল, পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, অন্ধ্র মাদ্রাজ, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী ও পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি নিয়ে একটি সাবকমিটি গঠন করেই মুখ্য-মন্ত্রীরা কর্তব্য সম্পাদন করেন। ৩১শে জুলাই ও ১লা আগষ্ট দিল্লীতে এই উপসমিতির বৈঠক বসে। এই বৈঠকে সিদ্ধান্ত হয়—(১) উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি সকল রাজ্যের একলক্ষাধিক জন-সংখ্যাবিশিষ্ট সহরগুলিতে পূর্ণ রেশনিং চালু হবে। যদি সম্ভব হয় ক্রমে ক্রমে পাঁচহাজারের অধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট সহর-গুলিতে রেশনিং সম্প্রসারিত হবে। একবছরের মধ্যেই এই ব্যবস্থা কার্যকরী হবে। তিনলক্ষাধিক জনসংখ্যাবিশিষ্ট সহরগুলিতে আগামী জানুয়ারী থেকে পূর্ণ রেশনিং চালু হবে (২) উদ্বৃত্ত ও ঘাটতি উভয় রাজ্যেই পূর্ণ রেশনিং চালু রাখবার জন্য ব্যাপকভাবে খাদ্য সংগ্রহের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। ঘাটতি রাজ্যগুলি কেন্দ্রের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত রাজ্যগুলি থেকে নির্ধারিত পরিমাণ চাউল ও গম পাবে, ন্যায্যমূল্যের দোকান-গুলির জন্য অবশিষ্ট চাউল, গম নিজ রাজ্যে সংগ্রহ করতে হবে। সুতরাং, বৈদেশিক খাদ্য সরবরাহের উপর ন্যায্য-মূল্যের দোকানগুলির নির্ভরতা হ্রাস পাবে। (৩) এক এক-টি রাজ্য নিয়ে একটি খাদ্য-এলাকার কোনো পরিবর্তন না হলেও, কোনো রাজ্যের উদ্বৃত্তের কিম্বা ঘাটতির পরিমাণ নির্ধারণে দায়িত্ব কৃষিপণ্য মূল্য কমিশনের সহায়তায় পরিকল্পনা কমিশনের উপর বর্তাবে। সহরাঞ্চলগুলি কর্ডন দিয়ে রাখা হবে। (৪) কৃষিপণ্য-মূল্য কমিশনের সাম্প্রতিক প্রকাশিত রিপোর্টে উচ্চতম মূল্য নির্ধারণের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ সত্ত্বেও মুখ্য-মন্ত্রীরা চাষীকার ও ক্রেতাদের জন্য সর্বোচ্চ মূল্য নির্ধারণের সুপারিশ করেছেন। উপরোক্ত জাতীয় খাদ্যনীতির আবশ্যিক প্রয়োগ চতুর্থ পরিকল্পনার সমাপ্তি পর্যন্ত মূলতুবী থাকবে। খাদ্য সংগ্রহ সম্পর্কে পশ্চিমবঙ্গের ও মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী আবশ্যিক অনোপলি প্রকিওরমেন্টের উপর জোর দিলেও, শেষটায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পশ্চাদপসরণ করেন। কারণ কি বোঝা গেল না। যার ফলে প্রকিওরমেন্ট সম্পর্কে কোনো নির্দিষ্ট নীতি গৃহীত না হয়ে, প্রকিওরমেন্টের পদ্ধতি বিভিন্ন রাজ্যের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। মুখ্যমন্ত্রীদের

সম্মেলনে যে কয়টি মূল সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল, মনোপলি প্রতিযোগিতের নীতি বর্জিত হয়ে, তার সব কয়টিকেই অনিশ্চিত করে তুলেছে।

কিন্তু এই অগাষ্টের মুখ্যমন্ত্রীদের বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি একেবারে পরিত্যক্ত হয়ে যাওনীতি যেখানে ছিল, সেখানে এসেই ফিরিয়ে গেছে। এক লক্ষাধিক লোকসংখ্যাবিশিষ্ট ৮টি সহরে পূর্ণ রেশনিং চালু করবার যে সিদ্ধান্ত গত বছর মুখ্যমন্ত্রীরা গ্রহণ করেও কার্যকরী করেন নাই, সেই সিদ্ধান্তেই তারা এসে পৌঁছালেন। সর্বোচ্চ মূল্য সম্পর্কেও 'যারা যখন তাদেরই প্রবর্তিত' এই নীতি স্বীকৃতি পেলো। ফলে বিহার ও বম্বাইয়ে সর্বোচ্চ মূল্যের আওতার বাইরে রইলো।

জাতীয় খাদ্যনীতির প্রহসন এইভাবে আপাতত সমাপ্ত হয়েছে। এই নূতন নীতি জাতীয়ও নয়, আসলে কোনো নীতিই নয়। কারণ, বিভিন্ন রাজ্যের জন্য বিভিন্ন-প্রয়োগের সুযোগ নিহিত থেকে নূতন খাদ্যনীতি নীতিহীন নীতিতে পরিণত হয়েছে। ফলে, যারা কালোবাজার ও মুনাফাখোরীর অব্যাহত সুযোগে খাদ্যমন্ত্রীরা তাদের আশীর্বাদার্থ হয়েছেন। তথাকথিত জাতীয় খাদ্যনীতির আড়ালে কালো-বাজারীদের জয়ধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

বাঙ্গালোরে কংগ্রেসী বৈঠক

বাঙ্গালোরে গত ২৪শে জুলাই থেকে দুদিন এ, আই, সি, সির বৈঠক হয়ে গেলো। এই সম্মেলনে জাতীয় জীবনের জ্বলন্ত সমস্যাগুলির আলোচনা ও সমাধানের জন্য কোনো পদক্ষেপ দেখা গেলো না। বস্তুত, এই বাস্তব-কঠিন সমস্যা-গুলিকে এড়িয়ে গিয়ে সাংগঠনিক ও আন্তঃ-রাজ্য ঐক্যের ভালা ভালা আবেদন করেই কংগ্রেস নেতৃত্ব তাদের গুরু দায়িত্ব সমাধান করেছেন। এ ছাড়া অন্ধ্রে যে কয়টি সমস্যা উত্থাপিত হয়েছিল, তার সমাধানের কিস্তিগুলি পিছিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের চক্র ঘড়ির নিঃশ্বাস ফেলেছেন। পিছিয়ে দেবার পার্লামেন্টারী বোর্ডের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গোয়া সমস্যার অন্তিম মীমাংসার জন্য এই বছরের শেষে সাধারণ নির্বাচন হবার কথা। কিন্তু বাঙ্গালোরে সে সিদ্ধান্ত বদলে গেলো। তার কারণ, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গোয়াবাসীদের প্রবল বিক্ষোভ। গোয়ার নির্বাচনের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে গোয়াবাসীরা বাঙ্গালোরে প্রধানমন্ত্রীকে কৃষ্ণ পতাকা দেখিয়েছেন এবং বাঙ্গালোর অধিবেশন চলাকালীন হরতাল অনুষ্ঠিত হয়। গোয়া সম্পর্কে গোয়াবাসীর বক্তব্য কোনো নূতন কথা নয়। তা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত গ্রহণের এতো অল্প সময়ের মধ্যেই তার দ্রুত পরিবর্তন করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের দিনগুলি পিছিয়ে দেবার মধ্যে নেতৃত্বের দুর্বলতাই প্রকাশ পেয়েছে। সমস্যা এড়িয়ে জোড়াতালি দেবার মনোভাবই গোয়া-প্রসঙ্গে পরিস্ফুট হয়েছে।

এই মনোভাবই বাঙ্গালোর বৈঠক পরিব্যাপ্ত করে রেখে-ছিল। অক্ষুণ্ণ বাঙ্গালোর বৈঠকে মূল্য সঙ্কট, খাদ্য সঙ্কট, বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্কট, সাধারণভাবে আর্থিক সঙ্কট, সীমান্ত সঙ্কট, বৈদেশিক সম্পর্কের সঙ্কট, ভিয়েৎনাম সঙ্কট, ইত্যাদি বহুবিধ সঙ্কটের বলিষ্ঠ আলোচনার মধ্য দিয়ে জাতিকে পথনির্দেশের উদ্যোগ দেখা যেতো। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব সে পথে অগ্রসর হওয়া বুদ্ধিমানের লক্ষণ বলে মনে করেন নাই। সেক্ষেত্রে কংগ্রেসের আপাত-ঐক্যের আড়ালে যে গভীর সংঘর্ষ আত্মগোপন করে আছে, তা প্রকাশিত হয়ে পড়তো। আদর্শগত বিরোধের দিনগুলিকে পিছিয়ে রাখবার কৌশলই গান্ধী-কামরাজ নেতৃত্ব নেহেরু উত্তরাধিকারস্বরূপে আয়ত্ত করেছেন। কংগ্রেসের বিভিন্ন সমাবেশে তারই পৌনঃপুনিক প্রয়োগের দিগ্বিদিকে তারা একাত্মভাবে ব্যগ্র।

এই ব্যগ্রতাই বাঙ্গালোরে কচ্ছের আত্মসমর্পণের আলো-চনার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। কচ্ছ চুক্তির সমর্থন লাভের জন্য এ, আই, সি, সিতে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের প্রাথমিক সদিচ্ছা পরিত্যাগ করে এই কারণেই প্রধানমন্ত্রী

একটি বিবৃতির ধোঁয়াটে অস্পষ্টতার আশ্রয় নিয়েছেন। কারণ, কচ্ছ-চুক্তি এ. আই. সি. সিতে প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হত এবং শেষ পর্যন্ত হয়তো সংখ্যাধিক্যের জোরে এই চুক্তি অনুমোদিত করে নিতে হতো। তাই বিরোধ ধামা-চাপা দেবার সহজ পথই প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছিলেন। আর সব চাইতে হাস্যকর ব্যাপার এই যে, যে কচ্ছ চুক্তির বিরুদ্ধে আত্মসমর্পণের দুরন্ত অভিযোগ কংগ্রেসীদেরও আন্দোলিত করেছে, তারই ব্যাখ্যার মুখে প্রধানমন্ত্রীর কংগ্রেসীদের মনে সন্তরনের জন্য ঐক্যের বহৎ প্রেরণার আবেদন জানিয়েছেন। আদর্শবর্জিত ঐক্যের কপট আস্ফালন বহুদূরবিস্তারী নয়।

আজ রাজ্য বিরোধের প্রস্তাবটির কোনো প্রয়োজন ছিল না। নিজেদের ছলনা করা ছাড়া এর কোনো বাস্তব মূল্য নেই। সংবিধানে এই প্রশ্নের বিরোধ-মীমাংসার বিধান রয়েছে। তাছাড়া এ-যাবৎ দুর ওয়ার্কিং কমিটি, নয় কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারী বোর্ড, নয়তো প্রধানমন্ত্রী নিজে এই ধরণের বিরোধে হস্তক্ষেপ করে এসেছেন। সুতরাং কংগ্রেস থেকে এই ধরণের প্রস্তাব একেবারে নিষ্প্রয়োজন। এই প্রস্তাবে গঠনে বিরোধের অস্তিত্বই প্রকট হল,—বিরোধ যে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই স্বীকৃতি পেলো।

যাদোরের আসলে এবং একমাত্র কাজ ছিল ১৯৫৮ সালে হায়দারাবাদে গৃহীত প্রস্তাবের সংশোধন; এই প্রস্তাব অনুযায়ী কংগ্রেসের কর্মকর্তাদের একাধিকবার পদাধিকারী থাকা নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু শাস্ত্রী-কামরাজ অক্ষের আনুকূল্য বৃদ্ধির জন্য প্রস্তাবটি সংশোধন করে—'in special circumstances'—বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রমের অধিকার ওয়ার্কিং কমিটির হাতে দেওয়া হয়েছে। এ. আই. সি. সিতে এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে শ্রীযোগরাজী দেশাই-এর বক্তৃতার কামরাজ-শাস্ত্রী বিরোধ নগ্ন রূপে যোগরাজীকেই আঘাত করেছে। কারণ, শেষ পর্যন্ত শাস্ত্রীর অনুরোধে বিষয়টি ভোটে দিতে বিরত থেকে প্রস্তাবের প্রকাশ্য বিরোধিতার জন্য যে নৈতিক মর্যাদা পেয়েছিলেন, তার সবটুকুই যোগরাজী খুইয়েছেন। নীতির প্রশ্নে শেষটায় আপোষ করে যোগরাজী আতও হারিয়েছেন, মানও খুইয়েছেন। শাস্ত্রীর মন্ত্র-শিষ্য আচরণের চতুরতায় কংগ্রেস সংগঠনে যোগরাজীর পায়ের তলার শেষ মাটিটুকুও সরে গেলো কিনা সেটাই লক্ষ্য করবার। শাস্ত্রী-কামরাজ অক্ষের নিকট যোগরাজীর এই শোচনীয় পরাজয়, এই অক্ষের বিরোধীদেরও চূড়ান্ত পরাজয়।

সম্মেলন বিচার

সাতটি ক্যাবিনেট বৈঠকের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার হুগলি অঞ্চল থেকে কলকাতা ও সন্নিহিত ৩৪টি মিউনিসিপ্যালিটির অন্তর্ভুক্ত এলাকায় দুধ সরবরাহ বৃদ্ধির জন্য সম্মেলন ও অন্যান্য ব্যবস্থার তৈরী বিস্তৃত বিবরণ দেবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। বরানগর, পাণ্ডুয়া, চন্দন, শ্রীরামপুর ও শ্যামগঞ্জ অঞ্চলে রেহাই পাবে। হরিণঘাটার দুগ্ধাগারে ৪০,০০০ লিটার দুধে জল মিশিয়ে ৮০,০০০ লিটার দুধ তৈরীর জন্য দৈনিক ৬ টন বিদেশী দুধের গুঁড়োর প্রয়োজন। এজন্য প্রায় বৈদেশিক মুদ্রার অঙ্কটার পরিমাণ চলতে পারে। এই ৮০,০০০ লিটার দুধ ১৩২,০০০টি পরিবার, ১০৮টি হাসপাতাল এবং ৪,৫০০-এর অধিক দরিদ্র শিশুদের সরবরাহ করা হয়। গুঁড়ো দুধ বন্ধ হলে ২৫,০০০ পরিবারের দুধ যোগান বন্ধ করতে হবে।

গত কয়েক বছর পরিচালনার পর এবং কলিকাতা পৌরনিগম লাইসেন্সিং আইন চালু হবার পর হরিণঘাটার গোয়ালে মাত্র ৫০,০০০ লিটার দুধ সংগৃহীত হয় কেন? হরিণঘাটার গোয়ালে ২২,৫০০ গরুর বাসের যোগ্য ব্যবস্থা থাকলেও, মাত্র ৪,৫০০ গরুর বাস কেন? পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পশুপালন বিভাগ এই প্রশ্নগুলির কোনো সদুত্তর দেবার চেষ্টা করে নি। এযাবৎ তারা ৫০,০০০ লিটার দুধে জল মিশিয়ে ৮০,০০০ লিটার দুধ তৈরী করে ৬ টন গুঁড়া দুধের সাহায্যে

এই ছোলো দুধ সুস্বাদু করতেই ব্যস্ত ছিলেন। এখন গুঁড়া দুধ বন্ধের মুখে অনন্যোপায় হয়ে ছানা তৈরী বন্ধ করে ছানা তৈরীর জন্য ব্যবহৃত ১২০,০০০ লিটার দুধের মধ্যে অন্তত ৪৫,০০০ লিটার সংগ্রহের আশায় রয়েছেন। তাছাড়া সরকার তাদের দেয় দুধের মূল্য লিটার প্রতি এক টাকা পাঁচ পয়সার স্থলে ১৭ আগষ্ট থেকে শতকরা ২৫ ভাগ বাড়িয়ে দিয়ে দুধ সংগ্রহের পরিমাণ বৃদ্ধির আশা করেন।

২৪শে আগষ্টের ছানার মিষ্টি নিয়ন্ত্রণ আইনের (Channa Sweet Control Order) পর অক্টোবর মাস থেকে দুগ্ধ ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ আইন (Milk Trade Control Order) জারী হবে। এই দুই আইনের বলে হরিণঘাটার দুগ্ধ সরবরাহের পরিমাণ বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা। কিন্তু এই সম্ভাবনার কতটা কার্যকরী হবে, সে-সম্বন্ধে সংশয় রয়েছে। সরকারেরও সংশয় দূর হয় নাই। কারণ, আগামী মার্চের মধ্যে হরিণঘাটায় ৬,৭০০টি দুগ্ধবতী গরু ক্রয়ের সরকারী পরিকল্পনা গৃহীত হয়েছে। ফলে হরিণঘাটার ১২০০ সরকারী গরু ১৯৬৮-র মার্চের মধ্যে ৬,৭০০তে বৃদ্ধি পাবে। দুধের দাম বৃদ্ধির ফলে বেসরকারী গরুর সংখ্যাও হরিণঘাটার সোয়াদে বৃদ্ধি পাবে এবং সরকারী অনুমান, হরিণঘাটা-কল্যাণীর মোট গরুর সংখ্যা ১০,০০০ হবে। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শুধুমাত্র বর্তমান দুধের সরবরাহ যে বজায় থাকবে তা নয়, সরবরাহের পরিমাণ ১০০,০০০ লিটারে পৌঁছাবে। অর্থাৎ, আরও অনেক পরিবারে দুধ যোগান দেওয়া সম্ভব হবে। এই হলো সরকারী যুক্তি।

গুঁড়ো দুধ বিদায় নিলে সন্দেশ বিদায় হবে এবং তার ফলে দুধের সরবরাহ বৃদ্ধি পাবে। সরকারী যুক্তির এই পারম্পর্য অপদার্থতার আড়াল পায়। সন্দেশ বন্ধ করার পূর্বে হরিণঘাটার গরুর সংখ্যা বৃদ্ধি করে, সেখানকার সংগৃহীত দুধের দর ব কিয়ে দুগ্ধ ক্রয় কেন্দ্রগুলি থেকে সরবরাহ বৃদ্ধি করে গুঁড়ো দুধের বিকল্প ব্যবস্থা করা অনেক পূর্বেই সম্ভব ছিল। সন্দেশ বন্ধ করে, ৮০০০ হাজার দোকানের ১০০,০০০ কর্মচারীদের বেকার বানাবারও প্রয়োজন ছিল না। সন্দেশ যজ্ঞের অভিযান পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অপদার্থতার অক্ষয়কীর্তি হয়ে থাকবে।

শিক্ষা সঙ্কোচন

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রী এম, সি চাগলা পশ্চিমবঙ্গে কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধির ও কলেজে ভর্তির বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের প্রস্তাব শিক্ষার দান উন্নয়নের অজুহাতে অগ্রাহ্য করে প্রকারান্তরে শিক্ষা সঙ্কোচনেই সায় দিয়েছেন। অথচ একই সময়ে শ্রীচাগলা উচ্চ শিক্ষাভিলাষীদের শিক্ষার সুযোগ দেবার জন্য সমযোগে শিক্ষাব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন। প্রতি বছর যে বিপুলসংখ্যক ছাত্র বিভিন্ন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তাদের উৎকর্ষ অনুযায়ী উচ্চশিক্ষার সুযোগ গ্রহণে ব্যর্থ ও অপচিত হয়, তাদের শিক্ষার আনুকূল্যের সুযোগ সরকারকে অবশ্যই করে দিতে হবে। অন্যথায় বিপুল অপচয়ের গুরুভারে শুধু শিক্ষাব্যবস্থা নয়, সমাজব্যবস্থা ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বিপন্ন হতে বাধ্য। বাহির এড়িয়ে সরকার সেই বিপদকেই ডেকে আনছেন। ১৩।৮।৬৫

ভুল সংশোধন

আষাঢ় সংখ্যা অন্তর্শ্রীতে "স্বতন্ত্রতন্ত্র" প্রবন্ধে ১৬৭ পৃষ্ঠার ডান কলামের ষষ্ঠ লাইনে দুইটী ভুলের প্রতি কোনো কোনো পাঠক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। লালমুখ হক ও বীরেন্দ্র মল্লিকের স্থানে যথাক্রমে লালমুখ আলম ও বীরেন্দ্রনাথ দত্ত হবে। এ ভুলের জন্য লেখক ও আমরা দুঃখিত। অঃ সঃ

জয়শ্রী

শারদীয়া সমাচার

নেতাজী সম্পর্কে

নেতাজী সম্পর্কে সকল মনে আজ একটিই প্রশ্ন : তিনি কি জীবিত? তাহলে তিনি কোথায়?

শা নওয়াজ তদন্তকমিটির রিপোর্ট সর্বৈব মিথ্যা তা আজ ভারত সরকারও পরোক্ষভাবে স্বীকার করে। ইতিমধ্যে গত কয়েক বছরে তাঁর সম্পর্কে ভারতের নানাস্থান থেকে নানা সংবাদ মুখে মুখে এবং পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হতে হতে দেশমানসে তাঁর সম্পর্কে একটি বিচিত্র, ব্যাকুল, অনুভূতিপ্রবণ আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি হয়েছে : তাঁর মহাবির্ভাবের প্রতীক্ষায় উদ্বেলিত লোকমানস মহাপ্রত্যাশার তীক্ষ্ণতম তুঙ্গে আজ অবস্থান করছে বলা যায়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, ইনটারপ্রেস আন্তর্জাতিক জীবনী-সংস্থা থেকে প্রচারিত একটি জার্মান রচনার এই প্রথম বঙ্গানুবাদ

শ্রীবসু : দৃষ্টিপথের অন্তরালে অপেক্ষারত মানুষ

একান্ত সময়োপযোগী বিবেচনায় আমরা পূজা সংখ্যার অন্তর্গত করলাম।

জাপান ও ভারত

নেতাজী সম্পর্কে সমান মূল্যবান আর একটি বৈদেশিক রচনার বঙ্গানুবাদ

প্রাচীনকাল থেকে জাপান ও ভারতের সম্পর্ক মৈত্রী, পরস্পরের উপর উভয়ের প্রভাব, অনুরাগ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের শেষপর্বে জাপানের অনিবার্য অপরিহার্য সহযোগিতা—এই পটভূমির উপর নেতাজী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিচার ও মূল্যায়ন সম্পূর্ণ নূতন ভঙ্গিতে।

মূল্য ২·০০/সডাক ২·৬৩ পাঠিয়ে পূর্ব থেকে বুক করুন। নির্দিষ্ট সংখ্যা মাত্র ছাপা হবে।

জয়শ্রী

শারদীয়া সমাচার

গল্প

বিমল কর, নরেন্দ্রনাথ মিত্র, শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, প্রবোধবন্ধু অধিকারী, দিব্যেন্দু পালিত, মিহির মুখোপাধ্যায়, শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজনকুমার ঘোষ।

বিবিধ প্রবন্ধ

সরোজেন্দ্রনাথ রায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, নিরঞ্জন হালদার, অচিন্ত্যেশ ঘোষ, অজয়কুমার সিকদার, শচীন্দ্রনাথ বসু, সুজিৎকুমার মুখোপাধ্যায় অম্বুজ বসু ও পবিত্রকুমার ঘোষ।

এছাড়া

সত্যব্রত বসুর

শরৎচন্দ্র অজানা

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে শোনা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অপ্রকাশিত কাহিনী।

কবিতা

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল ভৌমিক, বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত, জগন্নাথ চক্রবর্তী, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, অরুণকুমার সরকার, গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত, প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত, মানস রায় চৌধুরী, শান্তি লাহিড়ী, শোভন সোম, সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়, মোহিত চট্টোপাধ্যায় দুর্গাদাস সরকার, নচিকেতা ভরদ্বাজ, অরবিন্দ গুহ, সুনীল বসু, গণিভূষণ ভট্টাচার্য ও আরো অনেকে।

দাম প্রতি সংখ্যা ২·০০ ডাকে ২·৬০

প্রাপ্তিস্থান

জয়শ্রী। ৩১২, গাঙ্গুলিবাগান, কলিকাতা-৪৭

ধারাবাহিক রচনা

বি ভা ব কি ভি

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

অন্তর্জীবনের বিকাশ

সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় এলেন কলেজে পড়তে তখন তাঁর ষোলো বছর বয়স। জীবনের সে একটা সন্ধিলগ্ন। বহু প্রশ্ন তখন তাঁর মনে জেগে উঠেছে, কোনো প্রশ্নেরই সদুত্তর তখনো মেলেনি। জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে গভীরভাবে তিনি চিন্তা করছেন এবং জীবনকে একটা বিশেষ রূপ দেবার প্রয়োজনীয়তাও তিনি অনুভব করছেন। জাতীয়তা বোধ ও দেশপ্রেম সে যুগের হাওয়ায় মেশানো, স্পর্শকাতর সচেতন তরুণদের চিত্ত তারই উদ্দীপনায় ভরপুর। সুভাষ কলকাতায় আসার আগেই দেশপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছেন। দেশসেবার ব্রতও তিনি স্বীকার করেছেন। কিন্তু তাঁর হৃদয় শুধু এটুকুতেই তৃপ্ত হয়নি। আরও গভীরতর বিষাদ ও সংশয়, পথ-অন্বেষণ ও লক্ষ্যনির্ণয়-স্পৃহা তাঁকে তখন ব্যাকুল করেছে। এবং কলকাতায় আসার তাঁর নিজের উদ্যোগের কারণও তাই। কণ্টকের পরিবেশে ফুলের ছাত্ররূপে জীবন-জিজ্ঞাসার যতদূর সদুত্তর মেলানো সম্ভবপর ছিল, চেষ্টার বিন্দুমাত্র ত্রুটি না করে তিনি তা মেলাতে অগ্রসর হয়েছিলেন, এবং সেই একই প্রেরণায় বৃহত্তর পটভূমি ও পরিপ্রেক্ষিতের প্রয়োজনে কলকাতায় আসা সেদিন প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

স্কুল জীবন শেষ হবার সময়কার অন্তর্জীবনের চিত্র সুভাষচন্দ্র নিজেই খানিকটা এঁকেছেন তাঁর আত্মচরিতে, কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর সে সময়ে লেখা চিঠিপত্রে এবং তাঁর সঙ্গীদের সাক্ষ্যে। রাজনৈতিক চেতনা ও আত্মবোধ যুগপৎ তাঁর মধ্যে তখন প্রবল হয়ে উঠেছে। জীবনের এই দুটি মৌল তাগিদকে তিনি মেলাতে চাইছেন জনসেবার মধ্যে —স্বামী বিবেকানন্দের পদাঙ্ক অনুসরণ করে। তাঁর চরিত্রের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যও এই সময়েই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—তা এই যে, তাঁর জিজ্ঞাসা ও অন্বেষণ যতই ভাবপ্রধান ও অন্তর্মুখী হোক না কেন এবং সময় কাটাবার প্রচলিত ও স্বাভাবিক পথ যতই তিনি পরিহার করুন না কেন, নিজের পথে চলার কালে সঙ্গী জুটিয়ে নিতে তাঁর অসুবিধা হয়নি, এবং শুধু তাই নয়, নিজের চারপাশে তিনি হয় দল গঠন করে নিয়েছেন, নয়তো কোনো স্বাভিপ্রায়ানুসারী দলের সঙ্গে নিজে যুক্ত হয়েছেন। অন্তরে তিনি চিরদিনই একক ও স্বতন্ত্র, কিন্তু বাইরে দলছাড়া তিনি প্রায় কখনোই নন। তার কারণ শুধু এই নয় যে সহজাত নেতৃত্বপ্রতিভা কিংবা জন-আকর্ষণী ক্ষমতা তাঁর ছিল; তাঁর চরিত্রে একটা প্রচণ্ড কর্মের বেগ ছিল, কর্মের অনুরূপ প্রেরণা তাঁকে নিঃসঙ্গ বিলাসী হতে দেয়নি। এই কর্ম উদযাপনেরই খাতিরে দলবদ্ধ হবার প্রয়োজন তাঁর ছিল, বিশেষত আরও এই কারণে যে নিজের স্বার্থবুদ্ধির সীমানার মধ্যে তাঁর কর্মপ্রয়াসকে আবদ্ধ রাখার কথা তিনি কখনও চিন্তা করেননি, কর্মের পরিধিকে সব সময়ই তিনি বৃহৎ ও ব্যাপক দেখেছিলেন। দল ছাড়া সে কর্ম উদযাপন হওয়া সম্ভব নয়। বিবেকানন্দের চরিত্র যে তাঁকে দুর্বার বেগে আকর্ষণ

করেছিল তার কারণ সুভাষচন্দ্র তাঁর নিজের চরিত্রের অন্তর্নিহিত মৌল প্রবণতা ও শক্তিগুলির প্রতিরূপ আবিষ্কার করেছিলেন বিবেকানন্দের মাঝে। নিজের স্বধর্মের দলে এতখানি সাদৃশ্য বিশ্বের আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তির মাঝে তিনি পাননি। এই কথাটাই পরবর্তী কালের একখানি চিঠিতে আকস্মিকভাবে ব্যক্ত হয়েছে। ব্যাণ্ডেল জেল থেকে ১৯।৩।২৪ তারিখে দিলীপকুমার রায়কে একখানি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন: "তুমি শ্রীঅরবিন্দ সম্বন্ধে যা লিখেছ, তার সবটা না হলেও বেশির ভাগই আমি মানি। তিনি ধ্যানী—আর আমার মনে হয়, বিবেকানন্দের চেয়েও গভীর, যদিও বিবেকানন্দের প্রতি আমার শ্রদ্ধা প্রগাঢ়। আমিও তোমার কথায় সায় দিই যে, "নীরব ভাবনা, কর্মবিহীন বিজন সাধনা" সময়ে সময়ে দরকার হয়, এমন কি দীর্ঘ কালের জন্যও। কিন্তু আশঙ্কা এই যে, সমাজের বা দেশের জীবনস্রোত থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে মানুষের কর্মের দিকটা পঙ্গু হয়ে যেতে পারে, আর তার প্রতিভার এক পেশে বিকাশের ফলে সে সমাজবিচ্ছিন্ন অতি-মানুষের মতন কিছু একটা হয়ে উঠতে পারে।—নানা কারণে আমাদের জাতির কর্মের দিকটা শূন্য হয়ে এসেছে, এখন আমাদের দরকার ব্রহ্মোত্তরের—double dose।" (পত্রাবলী, পৃঃ ১৭৭) আরও পরিণত বয়সে অরবিন্দ প্রসঙ্গেই তিনি লিখেছিলেন: "অরবিন্দ শুধু যদি সেসময়ে কর্মজীবনে ফিরে আসতেন তবে বিনা দ্বিধায় তাঁকে মানবজাতির আদর্শ গুরু বলে মেনে নিতাম।" (ভারতপথিক), যোগাভ্যাসরত অরবিন্দের জীবনের যে দিকটা সুভাষচন্দ্রের নিকট অভাবাত্মক মনে হয়েছিল, বিবেকানন্দের চরিত্রে তার বিপরীত দিকটি, অর্থাৎ কর্মমুখরতা প্রবলভাবে বর্তমান থাকায় সুভাষ তাঁরই মাঝে নিজের আকাঙ্ক্ষার সমর্থন ও তৃপ্তি খুঁজে পেয়েছিলেন। বালকবয়সে সুভাষচন্দ্র নিজের আন্তর ভাগিদে বিবেকানন্দের আদর্শ মেনে নিয়েছিলেন কেননা সেই আদর্শের মাঝে তিনি তাঁর নবীন দেশপ্রেম, রাজনৈতিক চেতনা ও অধ্যাত্মপিপাসার সমন্বয় দেখতে পেয়েছিলেন এবং নিজের উদার, ব্যাপক, ঘন্দ্বমুক্ত কর্মসাধনার দার্শনিক সমর্থনও পেয়েছিলেন সেই আদর্শে। পরিণত বয়সে কর্মজীবনে মাঝে মাঝে যখন ক্লান্তি, হতাশা, সংশয় ও ক্ষোভে তাঁর মন ভেঙে পড়েছে এবং বিশেষত রাজনৈতিক কর্মের ঈর্ষাদ্বেষ সঙ্কীর্ণতা কণ্টকিত পরিবেশে যখন নিজেকে অত্যন্ত পীড়িত অনুভব করেছেন তিনি, তখন সমস্ত ফেলে সন্ন্যাসীর নৈষ্কর্মিক ভূমিতে হারিয়ে নির্জন তপস্যার জন্য চলে যাবার জন্য একটা ব্যাকুলতাও তাঁকে দোলায়িত করেছে—কিন্তু সেইসব দুঃসময়ে তিনি তাঁর স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত ও উজ্জীবিত হয়ে উঠতে পেরেছেন কৈশোর কালেই জীবন জিজ্ঞাসার সঙ্কটসঙ্গে যে সমাধান বিবেকানন্দের দৃষ্টান্ত ও আদর্শ সামনে রেখে তিনি নিজের মাঝে উদ্ভূত করেছিলেন সেই সমাধানেরই জোরে। দ্বিতীয়বার কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হবার পর ভীষণ অসুস্থ হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র, তখন তাঁর বয়স বিয়াল্লিশ। সেই সময়কার তাঁর আন্তরজীবনের কয়েকটি কূট প্রশ্নের কথা তিনি লিখেছিলেন My Strange Illness নামক একটি প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধে তিনি বলেছেন যে হিমালয়ের ডাকই তাঁর জীবনের প্রথম প্রেম, রাজনৈতিক কর্মের ঘূর্ণিঘূসরতা ছেড়ে অরবিন্দের মতো দিব্য জীবনচর্যার অভিলাষে শান্ত তপোবনে প্রস্থানই তাঁর কাম্য হতে পারে। আরও একবার খানিকটা হতাশার মধ্যে বসে এই কথাটাই তিনি লিখেছিলেন বাসন্তী দেবীকে: "এই সব দেখে শুনে কয়েকদিন যাবৎ আমি ভাবছি—আমারই বা এত মাথা ব্যথা কেন যে নিজের আত্মিক অকল্যাণ সাধন করে আমাকে এই ভূতের বোঝা বইতে হবে। রাজনীতি আমার উপযুক্ত কর্মক্ষেত্র নয়; আমি কেবল ঘটনাচক্রে রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তের মধ্যে এসে পড়েছি।" (শিলং থেকে ১৫, ১০, ২৭ তারিখে লেখা চিঠি, পত্রাবলী)। রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে অধিকাংশ জীবনটা যাঁর কাটল তিনি প্রায় প্রথম হতেই জানতেন যে রাজনীতি তাঁর আত্মধর্ম নয়, পলিটিশান হবার

মতো মেজাজও তাঁর নয়। রাজনীতির আবর্তে তাঁর আসাটা আকস্মিক যেন তা একটা দুঃখেরই কারণ, অন্তত সূচক,—তাতে তাঁর আত্মার অকল্যাণ। অথচ রাজনীতির অঙ্গন তিনি পরিহারও করেননি, বরং এ খেলার আসরের নিয়ম কানুনগুলির ওপর অপরিসীম দখল তাঁর আয়ত্তে এসেছিল। কূটনীতি, রণনীতি, প্রচার, সংগঠন, বাস্তববুদ্ধি, কৌশল—রাজনৈতিক সাফল্য লাভের সবগুলি সোপানই তিনি ব্যবহার করেছেন এবং তাঁর সমকালীন কয়েকজন রাজনৈতিক সহকর্মীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে—বিশেষত গান্ধী ও নেহেরুর সঙ্গে তুলনায়—তিনি নিজেকে cold blooded realist আখ্যা দিয়েছেন। ঠাণ্ডা মাথার কাজ সুখোড় রাজনৈতিক চাল দিতে তাঁকে অনেকবারই দেখা গেছে। অথচ আশ্চর্য এই যে তাঁর সেই রাজনৈতিক নৈপুণ্য তাঁর চরিত্রের খানিকটা বহিরঙ্গেরই জিনিস। অন্তরে যাঁর অধ্যাত্ম আকুতি প্রবল, বাইরে তাঁকেই প্রখর বাস্তববাদী রাজনৈতিক নেতার ভূমিকা নিতে হয়েছে—আমাদের প্রত্যাশা আগে, এক্ষেত্রে একটা আন্তঃসংঘাত দেখা দেবেই এবং তারই ফলে তাঁর হৃদয় একসময় ক্লান্ত হয়ে উঠবে। সংঘাত একটা ছিল, একটা নাটকীয় দ্বন্দ্ব বলা যায় তাকে, আর সেই দ্বন্দ্বের সোপান পেরিয়ে তবে সুভাষ-চরিত্রের অন্দর মহলে আমাদের প্রবেশাধিকার ঘটে। কিন্তু অন্তর-বাহিরের দ্বন্দ্ব কখনো তাঁর মাঝে মারাত্মক রূপ নেয়নি, তাঁর আত্মার রক্তক্ষোক্ষণ ঘটায়নি, এমন কি 'আত্মিক অকল্যাণ'ও বিশেষ কিছু হয়েছে মনে হয়না। তার কারণ আত্মপ্রেরণা ও বাহিরের কর্মক্ষেত্র—এ দুয়ের ভিতরকার বিরোধ ও দ্বন্দ্বের একটা বলিষ্ঠ, প্রাণপূর্ণ সমন্বয় তিনি করতে পেরেছিলেন, আগেই বলেছি, বিবেকানন্দের প্রদর্শিত পথে, আর তার জীবনের কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালেই। এই সমন্বয়ই তাঁকে দিয়েছিল বল ও বীর্য, তাঁর সাধনার কর্মগুলির মধ্যে এনেছিল একটা পূর্ণতার দ্যোতনা, তাঁর জীবনকে তা দিয়েছিল মহত্ত্বের দীপ্তি আর তাঁর সকল বাস্তবধর্মী পদক্ষেপকে একটা অনবদ্য সুষমায় মণ্ডিত করে তুলেছিল।

বিবেকানন্দের আদর্শের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের পরিচয় ঘটেছিল অন্তর্জীবনের এক সঙ্কট কালেই। স্কুল জীবনের তখন শেষ দিক, তাঁর বয়স প্রায় পনেরো হবে। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন: "এমন একটা আদর্শের তখন আমার প্রয়োজন ছিল, যার উপরে ভিত্তি করে আমার সমস্ত জীবনটাকে গড়ে তুলতে পারব—সবরকম প্রলোভন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে যাবে। এমন একটি আদর্শ খুঁজে বের করা সহজ ছিলনা। মানসিক অশান্তি আমাকে ভোগ করতে হতনা, যদি আমি আর দশজনের মতো জীবনের বাহিরকে সহজভাবেই মেনে নিতাম কিংবা দৃঢ়ভাবে জীবনের সমস্ত প্রলোভনকে তুচ্ছ করে যে কোনো একটা আদর্শকে আঁকড়ে ধরতাম। কিন্তু কোনোটাই আমি পারিনি। জীবনের সাধারণ প্রলোভনে ধরা দিতে আমি রাজি ছিলাম না, কাজেই সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।.....এই সংঘর্ষ আমার পক্ষে অত্যন্ত প্রাণান্তকর হয়ে উঠেছিল।" এই আন্তঃসঙ্কটের পটভূমিতে বিবেকানন্দের ভাবধারার পরিচয় পেলেন তিনি। সেই ভাবধারার মাঝে তিনি তাঁর সঙ্কটমুক্তির পথ দেখতে পেলেন। তাঁরই ভাষায়: "হঠাৎ সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই যেন সমস্যার সমাধান খুঁজে পেলাম। আমাদের এক আত্মীয় (সুহৃৎচন্দ্র মিত্র) নতুন কটকে এসেছিলেন। আমাদের বাড়ির কাছেই থাকতেন। একদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে তাঁর ঘরে বসে বসে বই ঘাঁটছি হঠাৎ নজরে পড়ল স্বামী বিবেকানন্দের বইগুলোর উপর। কয়েক পাতা উল্টেই বুঝতে পারলাম এই জিনিসই আমি এতদিন ধরে চাইছিলাম। বইগুলো বাড়ি নিয়ে এসে গোগ্রাসে গিলতে লাগলাম। পড়তে পড়তে আমার হৃদয়মন আচ্ছন্ন হয়ে যেতে লাগল।...বিবেকানন্দের আদর্শকে যে সময়ে জীবনে গ্রহণ করলাম তখন আমার বয়স পনেরো হবে কিনা সন্দেহ। বিবেকানন্দের প্রভাব আমার জীবনে

আমূল পরিবর্তন এনে দিল।...তাঁর মধ্যে আমার মনের অনেক্ষা জিজ্ঞাসার সহজ সমাধান খুঁজে পেয়েছিলাম।...স্বামী বিবেকানন্দের পথই আমি বেছে নিলাম।" এই আদর্শের মূল যে কথাটা সুভাষচন্দ্রের পক্ষে সবচেয়ে গ্রহণীয় হয়েছিল তা হচ্ছে মানবজাতির সেবা ও আত্মার মুক্তি—এবং মানবজাতির সেবা বলতে স্বদেশের সেবাও তিনি বুঝেছিলেন।

এই আদর্শ চর্চার উদ্দেশ্যে কটকেই একদল ছেলে জুটিয়ে ফেললেন সুভাষ। বিবেকানন্দ ও তাঁর গুরু রামকৃষ্ণের প্রতি শ্রদ্ধাবান দলটি স্কুলে ও স্কুলের বাইরে সুযোগ পেলেই তাঁদের জীবন ও উপদেশ নিয়ে আলোচনা করত। আলোচনা যত এগোল ততই দেখা দিল এই চিন্তা যে জীবনে এই আদর্শকে কী করে সফল করে তোলা যাবে।

রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের প্রভাব সুভাষের চিত্তে প্রথম আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতাই জাগিয়ে তোলে। ঈশ্বরলাভই হয় তখন তাঁর জীবনের লক্ষ্য এবং উপায় স্থির করেন যোগ-সাধন। "লেখাপড়া ছেড়ে এখন আমার একমাত্র কাজ হল যোগ অভ্যাস করা। যোগ শেখাতে পারে এরকম গুরু তখনো আমার জোটেনি, কাজেই বই পড়ে যতটুকু শেখা যায় তাই দিয়েই কাজ চালাতাম।" কিন্তু কিছুকাল বইয়ের নির্দেশ মতো যোগসাধনার পর গুরুলাভের আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল তীব্রভাবে। "ভাবলাম হয়তো একজন গুরুর অভাবেই সাধনা আর এগোচ্ছে না—অনেককেই বলতে শুনতাম কিনা গুরু বিনা যোগসাধনা কখনো সফল হয়না। অগত্যা গুরুর সন্ধানে মন দিলাম।" এইভাবে যুক্তিতর্ক, সাধনা, গুরু-লাভের প্রয়াসে সাধুসঙ্গ করা ও সাধুর উপদেশ কঠোরভাবে অনুসরণ করা ইত্যাদি চেষ্টার পর সুভাষচন্দ্রের নিকট বিবেকা-নন্দের আদর্শের নিকটি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে এবং সেটাই তাঁর নিকট অধিকতর গ্রহণীয় মনে হয়। দৃষ্টিভঙ্গীর এই পরিবর্তন ঘটেছিল অল্প দিনেই, কিন্তু এটা তাঁর জীবনে একটা স্থায়ী পরিবর্তন। তিনি লিখছেন: "কিছুদিন আমি যোগ নিয়ে একটু বেশি রকম মেতে উঠেছিলাম, কিন্তু ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলাম আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য জনসেবা অপরিহার্য। এই বাণীও বিবেকানন্দই আমাকে দিয়েছিলেন, তিনি জনসেবা তথা দেশসেবার আদর্শ প্রচার করেছিলেন।"

দেশসেবার আগ্রহ প্রথম রূপ পায় পল্লীসংস্কারের কাজে। কটকের কাছেই একটি গ্রামে দল বেঁধে এই কাজ সুরু হয়। দেশসেবার সূত্রপাত এই ক্ষুদ্র সীমানার মধ্যে ক্ষুদ্র আকারে আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই বৃহত্তর দেশ ও তার সমস্যা সম্পর্কে ভাববার অবকাশ তাঁর এসেছিল এবং দেশমুক্তি ব্রতে দীক্ষিত বাংলা দেশের একটি ছাত্রদলের সঙ্গে যোগাযোগও ঘটেছিল। এই যোগাযোগটি আরও ঘনিষ্ঠতর হয় কলকাতায় সুভাষচন্দ্র কলেজে পড়তে আসার পর।

সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় আসেন সে সময়ে দেশের বাস্তব সমস্যার বাস্তববাদীর মতো বিচার ও বিশ্লেষণ তিনি করেননি—ষোলো বছরের কিশোরের পক্ষে সেটা আশাও করা যায়না। কিন্তু দেশের দুঃখ ও অধঃপতন তাঁকে তখন মর্মাহত করেছে—দেশের দুঃখ তিনি অনুভব করেছেন,—কিন্তু সেই অনুভব তাঁর এসেছিল ধর্মচিন্তার মাধ্যমে, ধর্মের অধঃ-পতনই যে দেশের শোচনীয় অধঃপতনের কারণ তাঁর মনে ছিল সেই প্রতীতি। কলকাতায় আসার কয় পূর্বে জননী প্রভাবতী দেবীকে ও জ্যেষ্ঠদাদা শরৎচন্দ্রকে লেখা কয়েকখানি চিঠি হতে তাঁর সে সময়কার মনের ভাব অনেকখানি স্পষ্ট বোঝা যায়। একখানি পত্রে তিনি লিখছেন: "ভাবিলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়! আমাদের ধর্ম নাই, কিছুই নাই—জাতীয় জীবন পর্যন্তও নাই। আমরা এখন এক দুর্বলসরীর পরদাসত্ব-ব্যবসায়ী, নষ্ট ধর্ম, পাপিষ্ঠ জাতি। হায়। পরমেশ্বর! সেই ভারতের এখন কি শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত! তুমি কি আমাদের উদ্ধার করিবে না?" (পত্রাবলী, পৃষ্ঠা, ১৭) আর একটি পত্রে তিনি লিখছেন: "মা, একবার চক্ষু খুলিয়া দেখুন, আপনার সন্তান-দের দুরবস্থা। পাপে, তাপে, সর্বপ্রকার কষ্টে, অন্নাভাবে,

ভালবাসার অভাবে—এবং হিংসা ও স্বার্থপরতার জন্য এবং সর্বোপরি ধর্মের অভাবের জন্য তাহারা যেন নরকের অগ্নিকুণ্ডে অহোরাত্র জ্বলিতেছে। আর দেখুন, সেই পবিত্র সনাতন ধর্মের কি অবস্থা! দেখুন, সেই পবিত্র ধর্ম এখন লোপ পাইতে চলিল। অবিশ্বাস, নাস্তিকতা এবং কুসংস্কারে আমাদের সেই পবিত্র ধর্ম এখন কতদূর অধঃপতিত ও অপভ্রষ্ট হইয়াছে।" (পৃ. ২২) ঐ পত্রেরই আর এক স্থানে তিনি লিখছেন: "বলিয়া বলিয়া আর কয়দিন দেশের এবং ধর্মের এই অবস্থা দেখিব? আর বলা চলেনা—আর ঘুমান চলেনা—এখন নিদ্রা ত্যাগ করিয়া আলস্য ত্যাগ করিয়া কর্মসাগরে ঝাঁপ দিতে হইবে, কিন্তু হায়! এ স্বার্থপর যুগে নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়া কয়জন স্বার্থত্যাগী সন্তান মা-এর জন্য কর্ম-সাগরে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত? মা, আপনার এ সন্তান কি প্রস্তুত নহে?" (পৃঃ ২৩) জীবনের প্রধান কর্তব্য ঈশ্বরলাভ—শ্রীরামকৃষ্ণের এই উপদেশবাণী সুভাষচন্দ্রের সকল মনকে তখন অধিকার করে আছে এবং তাঁর পরবর্তী কালের সকল কর্মপ্রয়াসের মূলেও এই বিশ্বাসই ছিল। রাজনীতি ছিল তাঁর দেশসেবার উপায় এবং দেশসেবা ছিল ঈশ্বরলাভের জন্য সাধনার অঙ্গ। মায়ের নিকট আর একখানি পত্রে এই ঈশ্বর-লাভের জন্য ব্যাকুলতার প্রকাশ দেখতে পাই: "যদি মানুষ জন্ম লাভ করিয়া মানুষ জীবনের উদ্দেশ্য না সফল করিতে পারিলাম—যদি গন্তব্যস্থানে পহুঁছিতে না পারিলাম তবে আর কি হইল? যেমন সকল নদীর গন্তব্যস্থান সমুদ্র সেইরূপ সমস্ত জীবনের গন্তব্যস্থান—ঈশ্বর। যদি মানুষ ঈশ্বরলাভ না করিতে পারে তবে মানুষ জন্ম বৃথা—আর পূজা, জপ, ধ্যান সবই বৃথা—সব কেবল ভণ্ডামী।" (পৃঃ ২৬) প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে যখন জানা গেল যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষায় সুভাষ দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেছেন তখন উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে কলেজে ভর্তি হবার চিন্তাই তাঁর মনে আসা স্বাভাবিক; কিন্তু সে সময়ে তিনি মনে মনে বিচার করতে বসলেন যে উচ্চ শিক্ষালাভের উদ্দেশ্য কী? লেখাপড়া জিনিসটারই বা সার্থকতা কোথায়? এই বিষয়ে নিজের মনের সরল ভাব ব্যক্ত করে মাকে তিনি লিখছেন: "প্রথম দুই আর লাস্ট দুই আমি স্থির রূপে বুঝিয়াছি লেখাপড়া ছাত্রের প্রধান উদ্দেশ্য নহে—বিশ্ববিদ্যালয়ের 'চাপ্রাস' পাইলেও যদি কেহ প্রকৃত জ্ঞান না লাভ করিতে পারে—তবে সে শিক্ষাকে আমি ঘৃণা করি। তাহা অপেক্ষা মূর্খ থাকা কি ভাল নয়? চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রধান কর্তব্য—বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা চরিত্র গঠনকে সাহায্য করে—আর কার কিরূপ উন্নত চরিত্র তাহা কার্যেই বুঝিতে পারা যায়। কার্যই জ্ঞানের পরিচায়ক। বই পড়া বিদ্যাকে আমি সর্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি। আমি চাই চরিত্র জ্ঞান-কার্য। এই চরিত্রের ভিতরে সব যায়; ভগবদ্ভক্তি, স্বদেশপ্রেম,—ভগবানের জন্য তীব্র ব্যাকুলতা—সবই যায়। বই পড়া বিদ্যা ও অতি তুচ্ছ সাধারণ জিনিস—কিন্তু হায়! কত লোকে তাহা লইয়া কত অহঙ্কার করিয়া থাকে।" (পৃঃ ৩০) কলকাতায় আসার কালে সুভাষচন্দ্রের মনের ভাব কী ছিল, তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষা কী ছিল এবং জীবনের উদ্দেশ্য ও কর্তব্য সম্পর্কে তাঁর ধারণাই বা কী ছিল তা খুব পরিষ্কারভাবেই বোঝা যায়, কেননা মনের কথা সরল ও স্পষ্টভাবে এবং আবেগের সঙ্গেই তিনি ব্যক্ত করেছিলেন তাঁর অন্তরের সবচেয়ে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ভক্তির পাত্র, তাঁর মাতৃদেবীর নিকট। বোঝা যায়, ভারতের ভবিষ্যৎ ভেবে তিনি সেসময় খুব ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ, সম্মুখে আশার আলোক কিছু দেখতে পাচ্ছেন না। এই পরিস্থিতিতে তাঁর যে বিশেষ একটা কর্তব্য ও ভূমিকা আছে এ বোধও তাঁর মনে জন্ম নিতে সুরু করেছে। কিন্তু তার জন্য চাই সবর আত্ম-প্রস্তুতি ও আত্মগঠন। শিক্ষালাভ এ বিষয়ে তাঁকে সহায়তা করতে পারে এবং শিক্ষার মূল্যও ততটুকুই। চরিত্রগঠনের কথা তিনি গভীরভাবে ভাবছেন তখন। কেননা উন্নত চরিত্র

যেমন মনুষ্যত্ব লাভের একমাত্র পথ, তেমনি দেশসেবা ও ঈশ্বরলাভের জন্যও তা অপরিহার্য। আগেই বলেছি দেশ-প্রেমের সার্থকতা ও দেশসেবার প্রয়োজনীয়তা তিনি দেশবন্ধুর উপলব্ধি করেছেন—ঈশ্বরলাভের পক্ষে সাধনার অঙ্গরূপে। ঈশ্বরলাভই তাঁর জীবনের তখন মূল উদ্দেশ্য। দেশসেবা ও সমাজসেবাও ঈশ্বরলাভের জন্য ব্যাকুলতার কাছে গৌণ বিষয়। এমন কি কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার পর রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সঙ্গে জড়িয়ে পড়ার পরও তাঁর ঈশ্বর-ব্যাকুলতা কমেনি। সুভাষচন্দ্রের চরিত্রের এই দিকটির একটি বর্ণনা দিয়েছেন সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্ম-চরিতে। তিনি লিখেছেন: "তখন তার (সুভাষের) ধর্মের ভাবই ছিল প্রধান, কর্মের ভাব গৌণ। কর্মের দিকে মাথা ঘামাইতেই চাহিতো না। আমাদের ক্লাসের আশুতোষ দাস আমার পাশের ঘরেই থাকিতো। আজ সুভাষকে একদিন কি জানি কি কাজের কথা বলিতেছিলো। আজর কথা শুনিয়া কাঁদ কাঁদ মুখে সুভাষ আসিয়া আমায় বলিলো—সুরেশদা, আমায় নাকি কাজ করতে হবে। আমি তাকে সান্ত্বনার সুরে তাড়াতাড়ি বলিলাম—না, না, কে বলে তোমায় কাজ করতে হবে—ভগবান লাভেই তোমার সারাজীবন কাটবে। আমার কথা শুনিয়া সে ভারী খুসী হইলো—তার কাঁদ কাঁদ ভাব দূর হইলো—এমনি সহজ সরল ছিল তখন তার প্রাণ।" (জীবন-প্রবাহ, পৃঃ ৭৭০-৭১)

এই বিশ্বাস, এই উদ্দেশ্যচেতনা, এই মন ও এই প্রাণ নিয়ে সুভাষ কলকাতায় এসেছিলেন। দেশের চারিদিকে চেয়ে আশা ও উৎসাহের বদলে তিনি দেখেছিলেন অন্ধকার, এমনকি অসহযোগ আন্দোলন ও স্বদেশী যুগের ভাবিবন্যাও তাঁকে আশান্বিত করেনি। সম্ভবতঃ কলকাতায় আসার আগে তিনি দেশের সম্পর্কে সম্যক অবহিতও হননি। তাঁর হৃদয়ে তখন একমাত্র আলো ও আশার দিশারি বিবেকানন্দ। বেলুড়ের কাছে এক পত্রে সেকথাই তিনি লিখেছিলেন: "চৈনিদন বলিষ্ঠ আশাবাদী এবং তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস জগৎ উত্তরোত্তর প্রগতির পথে চলিয়াছে, কিন্তু ইহা কি সত্য? আমরা কি আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যের দিকে চলিয়াছি? আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি, ভারতবর্ষ কি প্রগতির পথে চলিতেছে? আমার মনে হয় না।...বিচার বুদ্ধি ও দূরদৃষ্টির দ্বারা যতদূর দেখা যায়—সবই অন্ধকার—গভীর অন্ধকার...কিন্তু...আশার দূত আমাদের মধ্যে আসিয়াছেন আমাদের প্রাণের সকল ভয় নাশ করিয়া হৃদয়ে অনির্বাণ শিখা জ্বালাইতে। তিনি স্বামি বিবেকানন্দ। তিনি তাঁহার দিব্য কান্তি, বিশাল ও অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লইয়া সন্ন্যাসীর বেশে হিন্দুধর্মের অন্তর্নিহিত বাণী বিশ্বের নিকট প্রচার করিতে আবির্ভূত হইয়াছেন। সন্ধ্যাতারা উঠিয়াছে। চন্দ্রোদয় নিশ্চয়ই হইবে।" সুভাষচন্দ্রের হৃদয়াকাশে বিবেকানন্দই তখন একমাত্র আশার সন্ধ্যাতারা। কৈশোর-যৌবনের সন্ধিকালে এক বলিষ্ঠ আদর্শবাদ ও ত্যাগময় সেবার সঙ্কল্প নিয়ে কলকাতায় এলেন সুভাষচন্দ্র কটক হতে; তাঁর হৃদয়ে তখন শক্তির আগমন ঘটতে শুরু করেছে, অনিশ্চয়তা ভাব ও দোলাচল মনোবৃত্তি তাঁর নেই। দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি সংশয়াচ্ছন্ন হলেও নিজের জীবনের লক্ষ্য সম্পর্কে কোনো সংশয় তাঁর নেই। ভবিষ্যতে তিনি কী হবেন,—এটা তাঁর কাছে তখন বড় প্রশ্ন নয়; তিনি যে সাধারণ প্রচলিত পথের পথিক হবেন না, এবং দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির পটভূমিতে নিজের গুরু দায়িত্ব পালন করবেন এ বিষয়ে তিনি স্থিরসঙ্কল্প। বিবেকানন্দের আদর্শের আলোয় তাঁর পথ চিহ্নিত ও দূর প্রসারিত। কলকাতায় আসা তাঁর সেই পথে চলার প্রারম্ভলগ্নে একটি প্রধান পদক্ষেপ।

(ক্রমশঃ)

তোমার জন্য

বন্ধুর দাশগুপ্ত

ছাদের উপরে পাঢ় অন্ধকারে মুখ ঢেকে বসেছিলে তুমি :
পাশের তালগাছে ব'সে ভীরু চিলশম্পতির ফিস্‌ফিস্ কথা
শুনেছিল শুধু চাঁদ—হাওয়া বর্ষায়িত তারা অদূর আবেগে
কেঁপেছিল। দূরের বিজন মাঠে দর্শনীর সমুদ্র-মুহুতা।

এই একই দৃশ্যপটে শতবার……শতবার দেখেছি তোমাকে
অনেক হরিণবনে শতবার····· শতবার দিশাহারা হয়ে
একটি বিদ্রুমবিদ্ধ হৃদয়ের হাহাকার কর্ণার প্রণয়ে
বেজে বেজে ওঠে জানি। আজো সেই চিরচেনা
এই অচেনাকে
বড় ভয়ে দেখলাম ছাদের উপরে গাঢ় রাত্রিতে আঁধারে :
পারি না কিছুতে ছুঁতে—কাছে থেকে কতদূরে সেতো
থেতে পারে।

আমার অগম পারে মাঝে মাঝে তুমি যাও—তুমি
থেতে পারো
সেখানে তোমার জন্য—হয়তো তা প্রয়োজন তোমারো·····
আমারো।

এবার ভ্রূমধ্য-ধ্যানে

মোহিত চক্রবর্তী

এবার ভ্রূমধ্য-ধ্যানে দেখো যাও কিনা তার দীপ্ত প্রতিভাস
কেন না কখনও ইতিহাস
দুর্গন্ধ পাথরকুচি লতাজালে অসংখ্য জড়ানো
যেমন কোন গল্পে যদি, শোনো :
সেই যে আকাশীরঙা নীলছায়া অরণ্যকে ঘিরে
বুড়ো অশথের মেলা। শতাব্দীর ভীড়ে
সেখানে অসংখ্য ঝুড়ি নেমেছে নতুনও শিরে
কালবৈশাখীর কোন প্রচণ্ড সমীরে
বুড়ো অশথের মৃত্যু—শুধু ইতিহাস থাকে লেখা—
সকলই সন্তপ্ত—ঝুড়ি, শাখা ও প্রশাখা—
পুরাতনী ইতিহাস অনুধ্যানে দুষ্ট হয় সৃষ্টির বলাকা।

এবার ভ্রূমধ্য-ধ্যানে দেখো না সে সৃষ্টির বিন্যাস।
রূপ, রস, সৌন্দর্য, বিভাস
অথবা কৃষ্ণকেশ, শিশুচাঁদ প্রসন্ন আনন—
সব ভুলে গিয়ে দেখো তাহার যৌবন।
হয়তো হারিয়ে যাবে যযাতি যৌবন পরিশীলা,
হয়তো অতীত স্মৃতি শূন্যতায় শুধু নিষ্পন্দন,
শুধু ভালোবেসো তারে, সে তোমার রূপসী প্রতিমা।

যাদুঘর শান্তি লাহিড়ী

একদিন এখানে আমি কিছুক্ষণ দাঁড়িয়েছিলাম।
এই তৃণাকীর্ণ মাঠে—সন্ধ্যা ডুবু ডুবু, অন্ধকারে প্রাচীন
দুর্গের প্রায় কাছে
ঘুরে চূর্ণ রেণুআবা রক্তস্রোত। পৃথিবীর পশ্চিম আঙিনা জুড়ে
হোলিখেলা।
একদিন রাত্রির—নিশিথরাত, ঘুম নেই, অতন্দ্র চোখের
দৃষ্টিমুটো
জ্বলছে; বাইরে করছে সেই চাঁদে সেই তীক্ষ্ণ অজস্র বিদ্যুৎ
প্রাচীরে প্রাচীরে ঘর, শয্যা আজ চিতার মতন দাউ দাউ।

মনের গহনে আমি একদিন হারিয়েছিলাম।
যেন কোন গভীর কোটরে, কোন একাকীত্বে—অন্ধকার
তরুমূলে
বিলাপের শব্দ ওঠে। যেন কোন প্রাগৈতিহাসিক শহরের
ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ি রি রি করছে করুণ কান্নায়।

একদিন কাগজের নৌকাগুলো ভাসিয়েছিলাম।

উপকরণ প্রফুল্লকুমার দত্ত

পাথর, নরম মাটি, টুকরো কাঠ, রং ইত্যাদি কত যে সুষমা
বারুদে সফল। এই সুবিন্যস্ত ঘরে ওরা কথা বলে ওঠে।
মনের বিচিত্র ভাষা শিখিয়েছি। অনুভূতি, নিগূঢ় উপমা
আরোপ করেছি যতো তারে: বেশী ওতোপ্রোত চুলে, চোখে ঠোঁটে।

এ তোমার প্রতিচ্ছবি কিংবা প্রতিমূর্তি নয়—আমার জীবন;
সৃষ্টির আদিম লতা—তুমি একে কোনো দিন চেনোনি সহজে।
যে প্রদীপ শিখা জেলে রেখেছি চেতনা-স্তরে তার বিবর্তন
অনাদৃত। উৎপীড়িত মানুষেরা সে আলোয় শান্তি, স্থিতি খোঁজে।

তোমাকে পেরিয়ে যেতে করেছি যে অবিচ্ছিন্ন কতো বেদনত—
পারিনি। গড়েছি তাই ভিন্নে-ভিন্নে ভিন্নোত্তমা এ-সৌধ এবং
তোমাকে। সর্বিনী ঈর্ষা আমার সমস্ত সুখ, দুঃখ, ভবিষ্যৎ
চেকেছে—সম্বল শুধু পাথর, নরম মাটি, টুকরো কাঠ, রং।

কান্ত কবি রজনীকান্ত

শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন

ঈশ্বর গুপ্তের কবিতার আলোচনা প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছিলেন—'এই কবিতাগুলি মায়ের প্রসাদ।' কান্তকবি রজনীকান্তের কবিতা বা গান-সম্পর্কেও আমরা অনুরূপ উক্তি করিতে পারি। বিশেষতঃ, রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেম-মূলক ও ভক্তিরসাশ্রিত সংগীত সম্পর্কে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, এই রচনাগুলি মায়ের প্রসাদের ন্যায় পবিত্র ও জীবনপ্রদ। রবীন্দ্রযুগে জন্মগ্রহণ করিয়াও রবির দীপ্যমান ও ভাস্বর প্রভাপুঞ্জের পার্শ্বে রজনীকান্ত 'রজনীকান্তের' স্নিগ্ধ শুভ্র রশ্মিজালের ন্যায় একদিন বিরাজ করিয়াছিলেন। ইহার কারণ, কান্ত কবির গানগুলি তাঁহার অন্তরের আনন্দ-বেদনা হইতে স্বত-উৎসারিত হইয়াছিল। রজনীকান্তের গানে যে আন্তরিকতা ও অনুভূতির প্রগাঢ়তা আমরা লক্ষ্য করি, তাহা অন্যত্র দুর্লভ। রজনীকান্তের অধিকাংশ গান শুনিলেই মনে হয় যে তিনি সচেতন শিল্পী ছিলেন না, বিলাস কলা-কুতূহলী কবি ছিলেন না, অলঙ্করণ-নৈপুণ্যের দিকে তাঁহার আদৌ লক্ষ্য ছিল না, তাই বৈষ্ণব গোবিন্দদাসের ন্যায় তিনি বলিতে পারেন নাই—

'রসনা রোচন শ্রবণ-বিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস'।

তথাপি তাঁহার 'কান্ত কবি' এই নামকরণ সার্থক হইয়াছে। 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' গানের শুচিতায় রজনীকান্ত স্বয়ং 'কান্ত' কথাটির প্রয়োগ করিয়াছেন। ভক্ত কবি জয়দেব বলিয়াছেন—

'যদি হরিস্মরণে সরসং মনঃ
যদি বিলাসকলাসু কুতূহলম্।
মধুর কোমলকান্ত পদাবলীম্
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীম্।'

যদি হরিস্মরণে মনকে সরস করিতে চাও, বিলাসকলায় যদি কুতূহল থাকে, তবে জয়দেবের বাণী শ্রবণ কর, সেই বাণীতে আছে মধুর, কোমল ও কান্ত পদাবলী। এখন কথা হইতেছে, জয়দেব তিনটি প্রায় সমার্থক শব্দের প্রয়োগ করিলেন কেন? আমার মনে হয়, এখানে 'মধুর' বলিতে বোঝায় শ্রুতিসুখকর বা শ্রবণসুভগ কাব্যের মাধুর্যের আবেদন প্রধানত শ্রবণেন্দ্রিয়ের কাছে, 'কোমল' বলিতে বোঝায় যাহা আমাদের অন্তরে বা হৃদয়ে দোলা দেয়, কোমলতার আবেদন হৃদয়ের কাছে, আর কান্ত বলিতে বোঝায় কমনীয় ও প্রিয়, ইহার আবেদন চক্ষুরিন্দ্রিয় ও মনের কাছে। রজনীকান্তের গান শুনিয়া একদিন বাঙালী হাসিত, কাঁদিত, অশ্রুতে বিগলিত হইত, স্বদেশ-প্রেমে উদ্বুদ্ধ হইত, তাই বলিতেছিলাম, তাঁহার 'কান্ত কবি' নামকরণ সার্থক হইয়াছে।

রজনীকান্ত উত্তরাধিকার-সূত্রে কবিত্ব-শক্তি ও ভগবদ্-ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতা গুরুপ্রসাদ সেন ব্রজবুলি ভাষায় 'পদচিন্তা মণিমালা' রচনা করিয়া সকলের শ্রদ্ধা ও প্রশংসা অর্জন করিয়াছিলেন। প্রত্যেকটি পদের ভণিতায় নাম ছিল প্রসাদ দাস। রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহের পদাবলী প্রকাশিত হইবার কয়েক বৎসর পূর্বেই 'পদচিন্তা-মণিমালা' প্রকাশিত হইয়াছিল। এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থখানি এক সময়ে কান্তকবির অন্যতম পুত্র জ্ঞানসেনের সৌজন্যে আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছিলাম। গ্রন্থখানি একজন শ্রেষ্ঠ মহাজনের রচনা বলিয়া ভ্রম হয়। বৈষ্ণবীয় সাধনার মর্মে অনুপ্রবিষ্ট

ও বৈষ্ণবীয় ভাবধারায় নিষ্কাত না হইলে এরূপ পদাবলী রচনা করা সম্ভবপর নয়। গুরুপ্রসাদ 'অন্তরা-বিহার' নামে শাক্ত পদাবলীও রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সতীর জন্ম হইতে দেহত্যাগ পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। দুর্ভাগ্যবশত গ্রন্থখানি মুদ্রিত হয় নাই। গুরুপ্রসাদ শুধু কবি ছিলেন না, সঙ্গীতেও তাঁহার গভীর অনুরাগ ছিল। রজনীকান্তের জ্যেষ্ঠ-ভাত-কন্যা অমৃতাসুন্দরীও ধর্ম্মনিষ্ঠ মহিলা ছিলেন ও কবিত্ব-শক্তির অধিকারিণী ছিলেন। তাঁহার স্বদেশপ্রেমও গভীর ছিল। লর্ড কার্জ্জন কর্ত্তৃক বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের প্রতিবাদে তিনি এক সময়ে প্রতি বৎসর অন্নগ্রহণ-ব্রত পালন করিতেন।

কান্ত কবির গানগুলিকে প্রধানত তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়—স্বদেশ-প্রেমমূলক গান, হাস্যরসাত্মক গান ও ভক্তিমূলক গান। এতদ্ব্যতীত রজনীকান্ত কিছু নীতি কবিতাও (didactic poems) রচনা করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী কবিগণের মধ্যে যাঁহারা নীতি-কবিতা রচনা করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে ঈশ্বর গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ রায় ও 'সদ্ভাবশতক' রচয়িতা কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের নাম বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র পথ-গামিনী প্রতিভা যে এ পথেও বিচরণ করিয়াছে, 'কণিকা' নামক কাব্য গ্রন্থই তাহার প্রমাণ। দেশের ভবিষ্যৎ আশার স্থল শিশুগণকে মনুষ্যত্ব ও মহত্ত্বের আদর্শে অনুপ্রাণিত করিয়া তুলিবার জন্যই কান্ত কবি দুইখানি পদ্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—'অমৃত' নামক অষ্টপদী কবিতামালা ও 'সদ্ভাবকুসুম'। 'সদ্ভাবকুসুমের' কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ, এই কাব্যগ্রন্থে লেখক গল্পচ্ছলে বা রূপকচ্ছলে বালক-বালিকাগণকে উপদেশ দিয়াছেন। এই কাব্যগ্রন্থের 'সুন্দর ও বেচারামের' কাহিনী পড়িলে মনে হয়, কান্ত কবির মধ্যে কথা সাহিত্যিকের প্রতিভা ছিল। 'সদ্ভাবকুসুমের' একটি গল্পের নাম 'কৃষ্ণদাস ও দেবদূত'। গল্পটি এইরূপ—

নবদ্বীপের গ্রামে কৃষ্ণদাস নামে এক পরম নিষ্ঠাবান বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি প্রতিদিন অন্তত একজন অতিথি ভোজন করাইতেন। যেদিন গৃহে অতিথি সমাগম না হইত, সেদিন নিজে অভুক্ত থাকিতেন। একদিন কৃষ্ণদাসের গৃহে কোন অতিথি সমাগম হইল না। কৃষ্ণদাস পথে পথে ঘুরিয়া বহু জনের নিকট প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু কেহই তাহার গৃহে আসিল না। কৃষ্ণদাস ভাবিলেন—'প্রভু আজ দিয়াছেন মোরে উপবাস'। কিন্তু রাত্রি দ্বিপ্রহরে তাহার দ্বারে করাঘাত হইল। কৃষ্ণদাস দ্বার খুলিয়া দিলে এক ক্ষুধার্ত্ত অতিথি গৃহে প্রবেশ করিল। অতিথি কিন্তু ইষ্টদেবকে অন্ন নিবেদন করিল না, খাদ্যসামগ্রী উপস্থিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই সোগ্রাসে ভোজন করিতে আরম্ভ করিল। দেখিয়া কৃষ্ণদাস ক্রুদ্ধ হইয়া বলিল—

'যার করুণায় এই ক্ষুধার সময়,
পাইলি আহার তাঁরে মনে নাহি হয়।
ওঠ, তুই, তোর আর খেয়ে কাজ নাই,
অভুক্ত রহিব আমি অতিথি না চাই'।

এই বলিয়া কৃষ্ণদাস অতিথির পাতে চপেটাঘাত করিল। অপমানিত অতিথি সেই মুহূর্ত্তেই গাত্রোত্থান করিল।

এমন সময়ে এক দেবদূত এসে,
দাঁড়াল সম্মুখে, সাধু-উদাসীন-বেশে।
দূত কহে, কৃষ্ণদাস, কি করিলে, হায়।
ক্ষুধার্ত্তের অন্ন নাকি কেড়ে নেয়া যায়?

পাঠাইল প্রভু মোরে তোমার সকাশে,
বলে দিল, সাবধান কর কৃষ্ণদাসে।
পূর্ব্বকৃত সুবিমল পুণ্য করি নাশ,
গভীর পাপের পঙ্কে ডুবে কৃষ্ণদাস।

যে প্রভুর অন্ন, পাপী করিছে ভোজন,
কোন দিন করে নাই তাঁরে নিবেদন—

তথাপি দয়াল তার আহার যোগান,
দয়া করে চিরকাল ক্ষমা করে যান।

কেন বিপরীত বুদ্ধি হইল তোমার?
এ অন্নে তোমার, বল, কোন্ অধিকার?
তুমি প্রতিনিধিমাত্র দয়াল প্রভুর,
তুমি তাড়াইলে কেন ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর?'

দেবদূতের কথায় কৃষ্ণদাস লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া অতিথির সন্ধানে বাহির হইলেন। পরে তিনি অতিথিকে পরিতৃপ্তি পূর্ব্বক আহার করাইয়াছিলেন।

'অমৃত' ও 'সদ্ভাবকুসুমের' ন্যায় কাব্যগ্রন্থ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে পাঠ্যরূপে নির্দ্দিষ্ট হইলে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা ভক্তি ও মনুষ্যত্বের প্রেরণা লাভ করিবে, ফলে আমাদের জাতির ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে।

ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ কবিতা সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র বলিয়াছেন —'এই ব্যঙ্গ কবিতাগুলির মধ্যে কোন বিদ্বেষ নাই।' রজনীকান্তের হাস্যরসাত্মক কবিতা বা গান সম্পর্কে এ কথা সত্য। কান্ত কবির হাসির গানে নিছক কৌতুকরস আছে, বিভ্রান্ত ও উন্মার্গগামী দেশবাসীর চৈতন্যসম্পাদনের প্রয়াস আছে, তীব্র বিদ্রূপ আছে, আত্মসমীক্ষা বা আত্মবিশ্লেষণ আছে কিন্তু বিদ্বেষ নাই। সমালোচকেরা বলেন—দ্বিজেন্দ্রলালের নিকট হইতে তিনি হাসির গান রচনার প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন।

কান্ত কবির কোন কোন গানে ভারতের অতীত ঐতিহ্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার 'সেথা আমি কি গাহিব গান' এই গীতটি এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহার 'মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই' গানটি স্বদেশী যুগে ও পরবর্ত্তী অসহযোগ আন্দোলনের সময় জাতির মনে বিদেশী বর্জ্জনের প্রেরণা জোগাইয়াছিল।

কিন্তু ভক্তিরসাত্মক গানের মধ্যেই রজনীকান্তের অন্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায়। কান্ত কবির সম্পর্কে সব চেয়ে বড় কথা এই যে, গীতিকার রজনীকান্ত ও মানুষ রজনীকান্তের মধ্যে কোন বিরোধ ছিল না। রজনীকান্তের রচিত 'তুমি নির্ম্মল কর মঙ্গল করে মলিন মর্ম্ম মুছায়ে', 'কেন বঞ্চিত হব চরণে', 'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়', 'কবে তৃষিত এ মরু ছাড়িয়া যাইব তোমারি রসাল নন্দনে' প্রভৃতি গানগুলি আমাদের অন্তরকে গভীরভাবে স্পর্শ করে। কর্কট রোগের নিদারুণ যন্ত্রণার মধ্যেও কবির রুদ্ধ কণ্ঠ হইতে দেবতামুখে গান উৎসারিত হইয়াছে, বিধাতার কঠোরতম দণ্ডকেও কবি পরম আশীর্ব্বাদরূপে মাথা পাতিয়া লইয়াছেন। মৃত্যুপথযাত্রী কবির মধ্যে মানবাত্মার জ্যোতির্ম্ময় প্রকাশ দেখিতে পাইয়া রবীন্দ্রনাথ বিস্মিত হইয়াছেন।

মাতৃভক্ত সন্তান রজনীকান্ত পার্থিব জননীকে দেখিয়াছেন জগন্মাতার প্রতিনিধিরূপে। তাঁহার 'মা' কবিতাটি আনন্দ চন্দ্র মিত্রের কবিতার সঙ্গে তুলনীয়। কান্ত কবি লিখিয়াছেন—

'স্নেহ-বিহ্বল, করুণা-ছলছল,
শিয়রে জাগে কার আঁখিরে!
বিতিল সব ক্ষুধা, সঞ্জীবনী সুধা,
এনেছে, অমরণ লাগিরে।
ভ্রান্ত অবিরত যামিনী-জাগরণে,
অবশ কুশ তনু মলিন অনশনে,
আত্মহারা, সদা বিমুখী নিজ সুখে,
তপ্ত তনু মম, করুণা-ভরা বুকে,
টানিয়া লয় তুলি, যাতনা-তাপ ভুলি,
বদনপানে চেয়ে থাকি রে!'

পড়িতে পড়িতে 'My mother' কবিতার Who fed me on her gentle breast' প্রভৃতি পংক্তিগুলি মনে পড়িয়া যায়।

বাংলা ভাষায় 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' গানের প্রবর্ত্তন

করিয়াছেন শ্রীরামপ্রসাদ। পরবর্তীকালে বহু কবি ও সাধক এ বিষয়ে রামপ্রসাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। রোগ-ক্লিষ্ট মুমূর্ষু কবিও 'আগমনী' ও 'বিজয়ার' গান রচনা করিয়াছেন। এই গানগুলি 'আনন্দময়ী' নামক কাব্যগ্রন্থে প্রকাশিত হইয়াছে।

'আনন্দময়ীর' ভূমিকায় মনস্বী সারদাচরণ মিত্র লিখিয়াছেন—

"আধুনিক কবিতায় আমি প্রায়ই কবিত্ব দেখিতে পাই না; অনেক সময়েই কেবল বাক্যের সমষ্টি দেখিতে পাই। 'আনন্দময়ী' বাক্যের সমষ্টি নহে। প্রত্যেক পদেই হৃদয় বিকাশের উপযোগী ভাব আছে।"

মনস্বী সারদাচরণ যে অতিশয়োক্তি করেন নাই, 'আনন্দময়ীর' পাঠকমাত্রেই সে কথা স্বীকার করিবেন।

উপনিষদে শ্রীভগবানকে রসস্বরূপ বলা হইয়াছে। রজনীকান্তও এই রসের সাধনার মধ্য দিয়াই জীবনের গভীরতম দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিলেন।

পিতা গুরুপ্রসাদের ন্যায় পুত্র রজনীকান্তের মধ্যেও শাক্ত ও বৈষ্ণব সাধনার সমন্বয় ঘটিয়াছিল। কান্ত কবির শাক্ত পদাবলীতে কোথাও কোথাও লীলারস ও তত্ত্বরসের মিশ্রণ ঘটিয়াছে। এ বিষয়ে তিনি পূর্ব্বগামী পদকর্ত্তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছেন। 'গ্রন্থকারের নিবেদনে' রজনীকান্ত লিখিয়াছেন—

"পাঠকগণ পুনঃ পুনঃ শুনিয়াছেন—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্', 'যাহারা যে ভাবে আমার শরণাপন্ন হয়, আমি সেই ভাবেই তাহাদিগকে অনুগ্রহ করি'। সুতরাং সম্যক্ ও যথাবিধি একাগ্র সাধনায় যে ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়া যায় না, তাই বা কেমন করিয়া বলি? তিনি তো ভক্তের ঠাকুর, যে তাহাকে যে ভাবে পাইয়া তুষ্ট হয়, তিনি সেই ভাবেই তাহাকে দর্শন দেন। এ কথা সত্য না হইলে যে তাঁহার করুণাময়ত্বে, তাঁহার ভক্তবৎসলতায় কলঙ্ক হয়।"

কথাগুলি ভক্ত রজনীকান্তের অন্তর হইতে উৎসারিত হইয়াছে। কান্ত কবি জ্ঞান-বিচারের পথে অগ্রসর হন নাই, তিনি জানিতেন, 'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর।' তাঁহার এই দৃঢ় প্রত্যয় ছিল যে বৈজ্ঞানিক বহু প্রশ্নেরই জবাব দিতে পারে না, দার্শনিকও অনেক সমস্যারই সমাধান করিতে পারে না। তাই মঙ্গলময় ভগবানে অচল বিশ্বাসই একমাত্র শান্তির পথ।

'হাসপাতালের রোজনামচায়' কান্ত কবি লিখিয়াছেন—

'ভগবানকে কন্যারূপে আর কোনও জাতি ভজন করেনি। যশোদার গোপাল, আর মেনকার উমা ভগবানকে সন্তানরূপে পাওয়ার দৃষ্টান্ত। সেই বাৎসল্য ভাবটা পরিস্ফুট করে তোলাই আমার উদ্দেশ্য ছিল ও আছে। প্রেমই নানা আকারে খেলা করে। বাৎসল্য একটা আকার, যে বাৎসল্যে জগৎ চলছে, শুধু দাম্পত্যপ্রেমের ফলে সন্তান জন্মগ্রহণ করতো, মানে সৃষ্টি হোতো, কিন্তু বাৎসল্য না থাকলে সৃজন পর্য্যন্তই থাকতো—পালন আর হোতো না, একেবারেই সংহার এসে উপস্থিত হোতো। সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার এই তিনটি অবস্থার মধ্যে স্থিতিটাই বাৎসল্য। এই ভাবটা মনে করে বই আরম্ভ করেছি, এই ভাব দিয়েই বই শেষ করবো।'

শাক্ত পদকর্ত্তাগণ উমার লীলা ও মেনকার বাৎসল্য রসের বর্ণনা করিলেও উমাই যে ভীমা প্রলয়ঙ্করী মহাশক্তি, সে কথা আমাদিগকে বিস্মৃত হইতে দেন নাই। 'রাণীর স্বপ্ন-কথা' কবিতায় কান্ত কবিও মেনকার মুখে স্বপ্নকথা বিবৃত করিয়াছেন। মাতা মেনকা বলিতেছেন—

'কভু দেখি, মা, তোর ঘোর রণবেশ,
দেহ কৃষ্ণবর্ণ, আলুথালু কেশ,
প্রলয়াগ্নি নাচে, ত্রিনয়ন-মাঝে
বিলম্বিত মুণ্ড পদতলে রয়।

কভু দেখি, মা তুই কেশরী-উপরে,
দশ হাতে অস্ত্র, দৈত্য পদে পড়ে,
রাঙ্গা পায়ে জবা, কি কব সে শোভা।
শূন্যে দেবগণ বলে 'জয় জয়'।
কান্ত বলে, মাগি, সর্ব্বরূপা তারা,
কল্পান্তেহে তুমি, তত্ত্বজ্ঞান-হারা ;
দেখি জ্ঞান-আঁখি, ঠিক দেখ দেখি
অনন্তরূপিণীর রূপ বিশ্বময়'।

আবার 'যাত্রা' কবিতায় কান্ত কবি বলিতেছেন—

'জগদ্ধাত্রী যিনি পালেন অবনী,
রাণী যেন তাঁর বদনে নবনী,
নয়নে কজ্জল, ললাটে সিন্দুর,
যাবক, রাতুল পায়।
"ভবের পথে হবে জীবের মঙ্গল"
বলে, যে মা যেন পথের সম্বল,
তাঁরি পথের সম্বল রাণী দিলেন বেঁধে,
মায়ের লীলা বোঝা দায়'।

শাক্ত পদাবলীর বাৎসল্য রস কান্ত কবিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কবির কোন কোন গানে ভগবানের প্রতি অভিমানের সুরও আছে, কিন্তু রামপ্রসাদের গানে যে বীরভাব আছে, যে বীরভাবে প্রণোদিত হইয়া শ্রীরামপ্রসাদ গাহিয়াছেন—

'দূর হবে যা যমের ভটা,
আমি ব্রহ্মময়ীর বেটা'

অথবা

'আমি নই মা আটাশে ছেলে,
আমি ভয় করি না চোখ রাঙ্গালে'

সে ভাব কান্ত গানে অনুপস্থিত। বরঞ্চ তাঁহার গানে আছে বৈষ্ণবোচিত দৈন্য ও আর্ত্তি, তিনি নিজেকে পাতকী বলিয়া জানিয়াছেন কিন্তু শ্রীভগবানের কৃপাময়ত্বে কখনও সন্দিহান হন নাই। তাই বর্ত্তমান সংশয়বাদ ও নাস্তিক্য-বাদের যুগে রজনীকান্তের ভক্তিরসাত্মক গানগুলি বাস্তবিকই 'মায়ের প্রসাদের' ন্যায় আমাদের কল্যাণ বিধান করিতে পারে।

কান্ত কবির শতবার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপন করিতে হইলে একদিকে যেমন নূতন ভাবে তাঁহার রচনার মূল্য বিচার করিতে হইবে, অপর দিকে তেমনই তাঁহার গান হইতে জীবনে নূতন প্রেরণা লাভ করিতে হইবে। কান্ত কবির রচনাবলী যদি আমাদের মনে বন্ধুত্বের প্রেরণা জাগায় ও আমাদের হৃদয়কে ভক্তিরসে অভিষিক্ত করে, তবেই আমাদের শত-বার্ষিক উৎসব সার্থক হইয়া উঠিবে।

রজনীকান্ত : কবি ও গীত সাধক

প্রদ্যোত সেনগুপ্ত

কাব্যক্ষেত্রে রজনীকান্ত নিজেকে স্বতন্ত্র করে রেখেছিলেন একান্তীয় আত্মনিবেদনের প্রত্যয়ে। এ প্রত্যয় অনন্য মহিমায় বিশিষ্ট, নির্মোহ মানসিকতায় স্বয়ংসীম। এই বিশিষ্ট কবিচেতনাই রবীন্দ্রনাথকে আকৃষ্ট করেছিল—কবিতাদের বিশিষ্টতায় তিনি একে চিহ্নিত করেছিলেন 'মানবাত্মার জ্যোতির্ময় প্রকাশরূপে'। কান্তকবির মনোজীবনের এই বিশিষ্ট সুরটিকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন থেকে আলাদা করে বিচার করা হয়তো সম্ভব নয়। তাঁর জীবন স্বল্পায়ু হলেও কবিকীর্তি থেকে তা মহত্তর। করুণা, মাধুর্য ও অন্তরাত্মার আত্মনিবেদন তাঁর কাব্যে রূপলাভ করেছে—শান্ত ও সমাহিত নির্বেদ নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে জীবন সম্বন্ধে বিষণ্ণ-করুণ অথচ উজ্জ্বল-মধুর এক স্বাদিষ্ট অনুভবের প্রত্যয় এনে দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে সমালোচক বলেছেন :

"এর মধ্যে কবির জীবনের সমস্ত সুখদুঃখ, সমস্ত বেদনা-সাধনা বিগলিত হয়ে আকৃতি লাভ করেছে। সেখানে কাঁকি ছিল না বলে একই আসরে রবীন্দ্রনাথ দ্বিজেন্দ্রলালের গানের সঙ্গে কান্তকবির গানও একদিন সমাদর পেয়েছিল। সত্য জীবনবোধের সরল প্রকাশেই রজনীকান্তের বৈশিষ্ট্য।"[১]

সরল জীবনবোধের পরিপূর্ণতা উপলব্ধির মধ্যেই রজনীকান্তের চিত্ত জীবিত ছিল। কবি-ভিন্ন রজনীকান্ত তাই নিজের জীবিকার ক্ষেত্রেও আত্মতৃপ্তে সুখ খুঁজেছেন—তাঁর কবিচরিত্রের প্যাটার্ন অদৃষ্টের আত্মবিড়ম্বনা এনেছে—ওকালতির ব্যবসায়ে চিত্ত যাঁর পড়েনি। অপরাজিত প্রসন্নতার প্রসার-প্রতিপত্তির নিশ্চিন্ত জীবন-গণ্ডীর সীমানাকে অতিক্রম করেছেন। তিনি তাই বলতে পেরেছেন—"আমি শিশুকাল হইতে সাহিত্য ভালবাসিতাম, কবিতার পূজা করিতাম, কল্পনার আরাধনা করিতাম। আমার চিত্ত তাই লইয়া জীবিত ছিল।' ব্যক্তিগত জীবনে অর্থের পায়ে পরমার্থকে নিবেদন করতে তাই তিনি কখনই পারেননি—তাঁর মানে জীবনের মর্মকথার মধ্যেই এই উপলব্ধির স্বরূপ নিহিত ছিল।

রজনীকান্ত ব্যক্তিগত জীবনেও এই উদারতা ও অন্তরবৈভবের জন্যে সর্বজনের হৃদয়ের প্রীতির দুর্লভ আনুকূল্যও সহজাত স্বভাববৈচিত্র্যেই লাভ করেছিলেন। তিনি ছিলেন সামাজিক, বন্ধুবৎসল, সদালাপে পারঙ্গম, সংগীতের স্বতোৎসারে অনুরক্ত এবং প্রাণপ্রাচুর্যে তুলনাহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী। সভাসমিতিতে তিনি গান গেয়েই চলতেন ক্লান্তি-বিহীন হয়ে, মুহুর্মুহুর আনন্দ-অভিব্যক্তিতে শ্রোতারা অজস্র অভিনন্দন জানাতো। "সমস্ত সন্ধ্যা তাঁহারা অন্নবিদ্বা, ক্ষুধা ও সময় নষ্ট হওয়ার ক্ষোভ ভুলিয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিত।' আত্মপ্রচার বিমুখ রজনীকান্ত প্রাণের অকুণ্ঠ সারল্যে বৈঠকী

১ কান্তকবি ও তাঁহার নিবন্ধ

কিংবা মজলিসী পদ্যের ক্ষেত্রেও ছিলেন স্বরাজ্যে স্বরাট—তিনি ছিলেন রাজশাহী শহরের 'উৎসবরাজ।' সত্য জীবনানন্দের সহজ প্রকাশে তাই কান্তকবি অনন্য। তাঁর জীবনবোধের এই সূত্রটিই আবার তাঁকে স্বভাব-কবি করে তুলেছিল। রাজশাহী লাইব্রেরীর কোন এক অনুষ্ঠিত সভায় অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়ের অনুরোধে রচনা করেছিলেন :

'তব, চরণ-নিম্নে, উৎসবময়ী শ্যাম ধরণী সরসা,
ঊর্দ্ধে চাহ, অগণিত শশি-রঞ্জিত-মভোনীলাকাশা,
সৌম্যমধুর-বিভাবনা, শান্ত-সুশীল-করুণা।'

এই শান্তরসাশ্রিত নির্বেদ-কাব্যকণিকাটুকু রচনার পশ্চাতে কোন চেষ্টাকৃত অনুভূতি স্বতঃস্ফূর্ত নয়—স্বভাব-কবির অন্তরানুভূতির মর্ম থেকেই বিনম্র প্রণামের মতো নিবেদিত হয়েছে। তিনি ছিলেন ঘরোয়ার জ্যোতির্ময় প্রকাশ। এ প্রকাশ আত্মপ্রচারের পথে কখনও সম্ভব নয়। তাই কবি বহুপ্রার্থী হয়ে আত্মপ্রচারের পথ তিনি জীবনের ক্ষেত্রে অনিবার্যরূপে স্বভাবগত পথেই প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এ-বিষয়টিতেই আলোকপাত করবে অক্ষয়কুমারের মন্তব্য : "কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া রজনীকান্ত রচনা-প্রতিভা বিকাশে যথেষ্ট উৎসাহ লাভ করিয়াছিলেন। অনেক সংগীত আমার সম্মুখে রচিত হইয়াছে, অন্যকে শুনাইবার পূর্বে আমাকে শুনান হইয়াছে। মজলিসে সভা-মঞ্চে পুনঃ পুনঃ প্রশংসিত হইয়াছে।...তথাপি সংগীতগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিতে রজনীকান্তের ইচ্ছাভাবের অভাব ছিলনা।" কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য—আত্মপ্রচার বিমুখ কবির জীবনে যখন যশ ও সৌভাগ্যের দিন এলো—নিষ্ঠুর মৃত্যু তখন কবির জীবনে যবনিকা টানলো। তথাপি মৃত্যুর আতঙ্ক-পাণ্ডুর ছায়ায় জীবনপ্রত্যুষের প্রসন্ন কেন্দ্রবিন্দু থেকে তিনি ভ্রষ্ট হননি—মৃত্যুর ক্ষণেও তিনি ভগবদ্বিশ্বাসী—তিনি আত্ম-নিবেদনের কথাকার :

'ভাবিতাম, "আমি নিধি লুটি কেন,
আমার সংগীত ভালবাসে কেন,"
তাই, লুটিয়া লয়ন্ত ব্যাধি দিল মোরে,
বেদনা দিল প্রচুর ;
আমায় কতো না যতনে শিক্ষা দিয়েছে,
গর্ব করিতে চূর।"

মৃত্যুর ছায়ায় এ বক্তব্য বিবর্ণ নয়। আত্মদহনে ও শান্ত-নম্র আত্মোপলব্ধিতে উজ্জ্বল। আধ্যাত্মিক দৈবী আনন্দের উদ্বেলতা ও ঐশ্বর্য সমস্ত রিক্ততাকে পরাজিত করেছে।

২

রজনীকান্তের রচিত সাহিত্যসৃষ্টি পরিমাণের দিক দিয়ে বিপুল সংখ্যক নয়। তাঁর রচিত কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা মোট আটখানি :

১। বাণী (১৯০২)
২। কল্যাণী (১৯০৫)
৩। অমৃত (১৯১০)
৪। আনন্দময়ী (১৯১০)
৫। বিশ্রাম (১৯১০)
৬। অভয়া (১৯১০)
৭। সন্ধ্যাকুসুম (১৯১৩)
৮। শেষ দান (১৯২৭)

এর অধিকাংশই হল গীতাত্মক পদ্য। ভগবানের প্রতি নিবিড় ভক্তি ও অটল বিশ্বাসের দিকটিই কবিচেতনায় আর একটি বিশিষ্ট যোগের অনিবার্য জন্ম দিয়েছিল—সেটি হল নীতিচেতনার উন্মোষন। কবির অন্তরে ভক্তির ভাবটিও স্বতোৎসারিত। নিতান্ত অপরিণত বয়সে সাংসারিক দারিদ্র্যের চাপে নিঃসহায় কবি জীবনের প্রতি নৈরাশ্যপূর্ণ ক্ষুব্ধ অসীহা উপলব্ধি করেছেন। কিন্তু ক্ষুব্ধ চেতনাকে অতিক্রম করেছেন যে পরমাশ্রয়ে,—সে হল ভক্তির পথে পরমেশ্বরের সন্ধান—

সমস্ত সংশয়তা থেকে উত্তীর্ণ হবার জন্যে তাঁরই পদপ্রান্তে আকুলিত অন্তরের নিবেদন : তাই তিনি বলেন :

'পাতকী বলিয়ে কি গো পায়ে ঠেলা ভাল হয়?
তবে কেন পাপী তাপী এত আশা করে রয়?'

—পাতকী : কল্যাণী

কিংবা : 'এই, পাপচিত্ত, সদা তাপ লিপ্ত রহি,
এনেছে স্মরণের মৃত্যু বিকার বহি,
দিতেছে দারুণ দাহ জ্বর-দেহ দহি
দেবতা গো, দয়া করি করো পরিত্রাণ।

—পরিবেদনা : বাণী

ভক্তিরসের এই স্বগত ভাবপূর্ণ একজাতীয় কবিতা কবি রচনা করেছেন। এ আধ্যাত্মিক প্রকৃতি বিপুলতার আড়ম্বর বা ঐশ্বর্য থেকে মুক্ত। ভাব থেকে ভাবান্তরে এ ঈপ্সিত কবিমানসের দার্শনিক প্রত্যয়লব্ধ জটিলতারও স্মারক নয়। সহজ সুরে সহজ কথাকেই তিনি করুণাময়ীর পদপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছেন—

যদি, বরষে সুকায়ে র'বে, হৃদয়ে শুকায়ে যাবে,
কেন প্রাণভরা আশা দিলে গো?
তব, চরণ-শরণ তরে, এত ব্যাকুলতা তরে,
কেন ধাই, যদি নাহি দিলে গো?

—কেন : কল্যাণী

এ-ক্ষেত্রে বিশ্বাসের আত্মিকাশ্রয়ভূমিতে কবি দৃঢ়-নিশ্চিত—

কেন বঞ্চিত হব চরণে?
আমি, কত আশা করে বসে আছি,
পাব জীবনে, না হয় মরণে।

—বিশ্বাস : কল্যাণী

এই দৃঢ়নিশ্চিত প্রত্যয়েই কবি পরম-করুণাঘনের স্পর্শ পেতে আকুল হয়ে বিহ্বল কণ্ঠে ভক্তি গীতি উচ্চারণ করেছেন—

কবে, তৃষিত এ মরু, ছাড়িয়া যাইব,
তোমার রসাল নন্দনে,
কবে, তাপিত এ চিত, করিব শীতল,
তোমারি করুণা-চন্দনে।

বিশ্বাসের মুক্তে পরমতত্ত্বের করুণাকে তিনি সর্বজনের কাম্য রূপেই পেতে চেয়েছেন। ভক্তের বিনতি ও প্রণতির সুরই এ জাতীয় কবিতায় জাগ্রত উৎকণ্ঠার সঙ্গে উচ্চারিত হয়েছে। ভক্তিমূলক বিষয়ক কবিতাগুলিই তাঁর প্রতিভার স্ব-ক্ষেত্রের ফসল। তাঁর অন্তর্জীবনের গূঢ়তম সংকেতই[২] অভ্রান্তরূপে এই ধারার কবিতার মধ্য দিয়ে প্রকাশিত এবং রসোত্তীর্ণতায় শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখে।

৩

রজনীকান্তের কবি-স্বভাবে ভক্তির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে নীতির চেতনা। নীতির চেতনা পূর্বতন চেতনার পরিপূরক হয়েই দেখা দিয়েছে। তিনি বলেছিলেন—"আমি 'কণিকা'র আদর্শে 'অমৃত' লিখেছি। ঐ আদর্শে লিখে ধন্য হয়েছি। সমালোচক প্রথমনাথ বিশী এ-জাতীয় নীতি কবিতাগুলির যথাযথ মূল্যায়ন করে বলেছেন—'ইহারা সরলতায়, ছুরোধর্শনে ও মৌলিকতায় 'কণিকা'র অনুজ।' বাংলা কবিতায় ওল্ডশ্রেণী নীতি-কবিতার একটি বিশিষ্ট ধারা আছে। মধুসূদন থেকে কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার পর্যন্ত অনেক কবিই নীতি চেতনামূল্য কাব্য রচনা করেছিলেন। দ্বারকানাথ রায় রচনা করেছিলেন সুলপাঠ্য নীতি কবিতার সমষ্টি—রঙ্গলালের 'নীতিকুসুমাবলি' ও স্মরণীয়। নীতিকে রজনীকান্ত সংসারতত্ত্ব কিংবা ছুরোধর্শনের শুষ্ক-কঠিন ব্যাপার করে তোলেননি—রসগ্রাহী করে সার্বজনীন আবেদন এনেছেন তার

২ ব্যাকুল জিজ্ঞাসা ও ঈশ্বরের প্রতি আবেগতপ্ত আকুতি ব্যক্ত করেছিলেন কবি হার্বার্ট, ক্র্যাশ, অক্ষয়কুমার, কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদার প্রভৃতি

(শেষাংশ ২১৮ পৃঃ)

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

ফল

হেগেল এই প্রশ্নের জবাবে বলেছেন যে ডায়লেকটিকের ফল সর্বদাই অস্তিমূলক বা positive। প্রতিস্থিতি যদিও স্থিতিকে নিরসন করছে এবং সংস্থিতি যদিও প্রতিস্থিতিকে নিরসন করছে, তবুও সংস্থিতি নিজে অস্তিমূলক; কারণ নিরসন (negation) মানে এখানে একেবারে পুরো নিরসন নয়; অর্থাৎ নিরসন সবটুকুকেই নিরস্ত করে না; কিছু অংশকে বাঁচিয়ে রেখে সংস্থিতির ভাণ্ডারে জমা রেখে দেয়। সংস্থিতি যদিও নিরসনের নিরসন (negation of negation) তবুও তার নিজের পর্বপুটে—স্থিতি ও প্রতিস্থিতি এই দুইয়েরই খানিকটা অংশকে সযত্নে রক্ষা করে' এবং স্বকীয় ভাণ্ডারে থেকেও কিছু দান করে' একটা উচ্চতরের সংস্থিতিজাত উপাদানকে গড়ে তোলে। এই ভাবে প্রত্যেকটি সংস্থিতি প্রতি স্তরেই উচ্চতর সৃজন করে করে জগৎকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। ডায়লেকটিকের এই সৃজনী প্রতিভা আছে বলেই বিশ্বের বিবর্তন সততই সৃজনমূলক, ধ্বংসমূলক নয়। *

কাজেই হেগেলীয় নিরসন (negation) কেবলি নেতিবাচক নয়; অস্তিবাচকও বটে। এর এই অত্যাশ্চর্য রক্ষণশীলতা প্রাকৃতজনের বিদ্যাবুদ্ধির কাছে নিতান্ত দুর্বোধ্য ও চমৎকারী বলে মনে হয়। এই নিরসন (negation) নাস্তিও বটে, আবার নাস্তিত্ব নয়ও বটে। অর্থাৎ অস্তি-নাস্তি দুইয়ের সমাবেশেই এর অলৌকিক রূপ-বৈচিত্র্যে আমাদের এই লৌকিক জগতে অচিন্তনীয় নূতনত্ব সৃজন করেছে। যাকে ডায়লেকটিক বাতিল করছে, তাকেই আবার অভিনব কৌশলে বাঁচিয়ে রেখে জগৎ গতিকে সমৃদ্ধ করছে। ফলে এই গতি (movement) শুধুমাত্র গতি থাকছে না; হয়ে দাঁড়াচ্ছে "প্রগতি" (progress)। *

---

* For the negative, which emerges as the result of dialectic, is, because a result, at the same, time the positive: it contains what it results from, absorbed into itself and made part of its own nature." (p 152, Logic of Hegel)

* The result of the Dialectic is positive, because it has a definite content, or because its result is not empty and abstract nothing, but the negation of certain specific propositions which are continued in the result for the very reason that it is a resultant and not an immediate nothing." (Logic of Hegel, p. 152)

ডায়লেকটিকের ফল অস্তিমূলক, সকল নিরসনের পরেও একটা নিশ্চিত অবশিষ্ট থেকেই যায়, যা কখনো অতীতের অঙ্গ হয়ে মিশে থাকে। কাজেই জগদ্ব্যাপারে সব পরিবর্তনের ফলস্বরূপ বৃদ্ধি বা ঊর্ধ্বগতিই দাঁড়িয়ে যায়। এখানে ডায়লেকটিক ক্রমবিবর্তন (evolution) প্রগতিমূলক হয়েই এগিয়ে চলেছে, ধাপের পর ধাপ পার হয়ে। সমস্ত বিশ্বে এই ক্রমিক বিবর্তন হয়ে চলেছে অগ্রগতির পথে। কেবল জড় জগতে নয়, মানুষের চিত্তজগতে ও সংস্কৃতির জগতেও এই ক্রমবিবর্তন একটা সত্য।

সকলেই জানে, 'ক্রমবিকাশ' তত্ত্বকে ডারুইন জগতে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। কিন্তু ডারুইনের আগেই হেগেলের বিশাল কল্পনা জগৎ-গতির ছন্দকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছিল। তবে হেগেলীয় ক্রমবিকাশের রীতি অনেকটা স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট। ডায়লেকটিকের ত্রিপাক্ষিক (triadic) ছক হেগেলীয় ক্রম-বিকাশের বিশেষত্ব। তাঁর মতে এই তিনটি ধাপকে ঘেরেই ক্রমবিবর্তন সম্মুখে বিসর্পিত হয়; এবং নিরসন (negation) বা বিরোধই (contradiction) এই বিসর্পণের গোড়ার রহস্য। এই ক্রমবিকাশতত্ত্ব সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা হবে। এখন এইটুকু বললেই হবে যে হেগেলীয় ক্রমবিকাশ ত্রিপাক্ষিক ছক (triadic pattern) অনুযায়ী বিকশিত হচ্ছে এবং progress বা প্রগতিই এর ফল। হেগেলের History of Philosophyও এই নীতিকেই অবলম্বন করেই ইতিহাস ও সভ্যতাকে ব্যাখ্যা করেছে। সেখানেও দেখানো হয়েছে যে Oriental (প্রাচ্য), Classical (ক্লাসিকাল) ও Teutonic (টিউটনিক) এই ক্রম অনুসরণ করে জগতের সভ্যতা ও সংস্কৃতি অগ্রসর হয়েছে। সংস্কৃতির সর্বনিম্ন স্তরে এশীয় সংস্কৃতি (Asiatic culture)। তার পরের ধাপে সৃষ্ট হলো গ্রীক-রোমক সংস্কৃতি এবং এই সংস্কৃতি এশীয় সংস্কৃতি থেকে উন্নততর। পরের স্তরে মানব সভ্যতা আরো এক ধাপ এগিয়ে গেছে। এই তৃতীয় স্তরে জন্ম নিয়েছে জার্মান সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি আগেকার দুটি সংস্কৃতি নিরসন করে তাদের চাইতে উচ্চতর ভূমিতে আসন প্রতিষ্ঠা করেছে। পৃথিবীর সভ্যতাও এই ত্রিপাক্ষিক ক্রমে পুলিত হয়ে উঠেছে জার্মান সংস্কৃতিতে এবং এই জার্মান সংস্কৃতি পূর্ব সভ্যতার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ ও রূপ। এই রকম সকল ক্ষেত্রেই হেগেলের ডায়লেকটিক নীতিতে বিশ্বজগৎ অবোধ নিয়মে উন্নতির দিকে চলেছে। এই চলা হলো 'onward movement' বা অগ্রগতি এবং একে হেগেল বলেছেন 'Development' বা উন্নতি।

আরেকটি তত্ত্ব হেগেল বিবৃত করেছেন যার সঙ্গে এই ক্রমবিকাশ তত্ত্বের সম্পর্ক রয়েছে। সে তত্ত্ব হচ্ছে গুণ (quality) ও পরিমাণ (quality) তত্ত্ব। Being সম্বন্ধে আলোচনা করতে গিয়ে হেগেল বলেছেন যে, সমস্ত খণ্ডিত সত্তার (Being Determinates) একটা বিশিষ্টতা (character বা mode) আছে যাকে তার গুণ (quality) বলা যায়।*

অপরপক্ষে, পরিমাণও (quantity) বস্তুর একটা বিশিষ্টতা বটে; কিন্তু এ বিশিষ্টতা বাইরের জিনিষ. এর সঙ্গে বস্তুর স্বরূপের কোনো গূঢ় সংযোগ নাই। কিন্তু তাই বলে 'গুণ' ও 'পরিমাণ' পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও সম্পর্কহীন নয়। এদের পরস্পরের মধ্যে নিগূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে; একে অপরের মধ্যে লুপ্ত বা বিকশিত হচ্ছে। একদিকে এক যেমন অপরকে খণ্ডিত করছে তেমনি অন্যদিকে এক অপরে পরিণত হচ্ছে। গুণের পরিবর্তনে পরিমাণের পরিবর্তন হচ্ছে, আবার পরিমাণের পরিবর্তনে গুণও পরিবর্তিত হচ্ছে।†

---

* "A something is what it is in virtue of its quality and losing its quality it ceases to be what it is." (Art. 90, Logic of Hegel, p. 171)

† "These two transitions, from quality to quantum and from the latter back again to quality may be represented under the image

কোন বস্তুর পরিমাণ বাড়াতে থাকলে, সঙ্গে সঙ্গে ঐ বস্তুর গুণেরও যে পরিবর্তন হবে তা নয়। কিন্তু ক্রমাগত পরিমাণ বাড়াতে থাকলে এমন একটা সময় আসে যখন ঐ বস্তুর গুণের পরিবর্তন হয়ে যায়। *

হেগেল অনেকগুলি দৃষ্টান্ত দিয়ে এই পরিবর্তনকে বুঝিয়েছেন। যেমন জল: জলের উত্তাপ আছে। কিন্তু এই উত্তাপের সঙ্গে জলের তরলত্বের সম্পর্ক প্রথম অবস্থায় চোখে পড়ে না। কিন্তু জলের তাপ ক্রমাগত বাড়ালে এমন একটা সীমায় এসে পৌঁছবে যেখানে জলের স্বরূপগত একটা বিপুল পরিবর্তন ঘটে যাবে, জল বাষ্প হয়ে যাবে। তেমনি জলের ভিতরকার তাপ যদি ক্রমাগত কমানো যায় তবে কোনো একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ তাপ হ্রাসের ফলে জল জমে বরফ হয়ে যাবে। এমনি করে একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় জলের গুণগত গভীর একটা পরিবর্তন হয়ে গেল দেখতে পাওয়া যায়।

দৈনন্দিন জীবনেও দেখা যায়, "খরচের" পরিমাণ বাড়াতে বাড়াতে এমন একটা জায়গায় এসে পৌঁছবে যেখানে খরচকে 'লোভ ও অমিতব্যয়িতা' বলা হবে। সাধারণ অর্থে 'খরচ' আর খরচ নেই, রূপান্তরিত হয়ে একেবারে ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়েছে। গানের জগতেও এর দৃষ্টান্ত অনেক দেখা যায়।

এই পরিমাণগত (quantitative) পরিবর্তন থেকে শেষে যে গুণগত (qualitative) পরিবর্তন হয়ে দাঁড়ায়, একে হেগেলের মতানুযায়ী একটা বিপ্লবও বলা যেতে পারে। বস্তুর গুণ-সংঘাতের মধ্যে এমন একটা সাংঘাতিক বা আমূল বিপ্লব নাহিত হয়ে যায়, যার ফলে একে আর সাধারণ পরিবর্তন নাম দেওয়া সঙ্গত নয়। একটা বিশেষ সীমা আসার আগে পর্যন্ত গুণগত পরিবর্তন তেমন চোখে পড়ে না বা তেমন কিছু হয়ও না। কিন্তু ঐ বিশেষ সীমাতে এসেই গুণজগতে যেন একটা আকস্মিক বিপ্লব ঘটে যায়—যার ফলে আগেকার অবস্থা থেকে পরের অবস্থা একেবারে সম্পূর্ণ অভিনব হয়ে দেখা দেয়। *

প্রকৃতির ও মানুষের রাজ্যে এই ধরণের আকস্মিকতা সর্বদাই দেখা যাচ্ছে। হেগেলের সমস্ত স্থানেরই একটা বাঁধাধরা ছক, এবং এই ছকের সবগুলি বৈশিষ্ট্যই জগতের ছোট-বড়ো সকল ক্ষেত্রে সকল পরিবর্তনের উপর খাটবে। পরিমাণ থেকে গুণেতে এই আকস্মিক রূপান্তরও জগতের সর্বকালিক ও সর্বদেশিক রীতি। প্রকৃতি যেন সমান বেগে চলেন না কখনো; মাঝে মাঝে ঘাটিতে ঘাটিতে এসে প্রকৃতিদেবী যেন উল্লম্ফনে (jump) চলার গতিকে বাড়িয়ে নেন।

এতে এই দাঁড়ায় যে হেগেলীয় ক্রমবিবর্তনের প্রকৃতি বৈপ্লবিক এবং এর প্রগতি ধাপে ধাপে এগিয়ে আকস্মিক-ও আমূল রূপান্তরের ভিতর দিয়ে বিবর্তিত হয়। সমস্ত বিশ্বে পরিবর্তন ঘটছে অহরহ। দিনেরাতে, অলক্ষ্যে অতি ধীরে

---

of an infinite progression..." (Logic of Hegel, p. 201)

* "On the one hand, the quantitative features of existences may be altered, without affecting its quality. On the other hand, this increase and diminution, immaterial though it be, has its limit, by exceeding which the quality suffers change." (Logic of Hegel, p. 202)

* "This process of measure, which alternates as a mere change in quantity, and then as a sudden revulsion of quantity into quality, may be envisaged under the figure of a nodal (knotted) line." (Logic of Hegel, p. 204)

এই নীরব পরিবর্তন সূক্ষ্ম আকারে তিল তিল করে জমে উঠছে ; এই ছোট ছোট মাত্রা পরিবর্তনের পরিমাণ বাড়তে বাড়তে একদিন এমন একটি সংকট-সীমাতে এসে পৌঁছাবে, যেখানে অতি সামান্য ও ক্ষুদ্র একটা পরিবর্তন ঘটলেই অকস্মাৎ অভাবনীয় একটা বিস্ফোরণের মত বিরাট বিপ্লব ঘটে যাবে। এই বিপ্লব প্রকৃতির বিবর্তনকে এক নিমেষেই উচ্চতর ভূমিতে তুলে দিয়ে এক অচিন্ত্য ও অভূতপূর্ব প্রগতির পথ খুলে দেয়। এই হিসাব অনুসারে স্থিতি থেকে প্রতিস্থিতি হচ্ছে একটা গুণগত পরিবর্তন (qualitative change) বা আকস্মিক আমূল বিপ্লব ; তেমনি প্রতিস্থিতি থেকে সংস্থিতিও আরেকটা গভীর ও উচ্চতর পরিবর্তন। হেগেলীয় ক্রমবিকাশের এই হলো মূলতত্ত্ব এবং মোটামুটিভাবে এই ডায়লেকটিক প্রগতির গোড়ার কথা কথাকে এখানে অতি সংক্ষেপে বিবৃত করা গেল। হেগেলের ডায়লেকটিক তাঁর দর্শনের মূলতত্ত্ব ; তারই প্রয়োগ নানাভাবে বিশ্বের সকল গতি ও সত্তার ওপরে করা হয়েছে তাঁর ন্যায় শাস্ত্রের সর্বত্র। এই ডায়লেকটিকের সবগুলি প্রয়োগ, তথা তাঁর দর্শনের সবগুলো তথ্য আমাদের এখানে দরকারে আসবে না। শুধু ডায়লেকটিক জড়বাদ যে তত্ত্বটুকুকে চয়ন করে নিয়ে স্বকীয় মতকে পোষণ ও প্রতিষ্ঠা করার কাজে লাগিয়েছে সেই তত্ত্বটুকুকেই এখানে সংক্ষেপে দেওয়া গেল। তার বেশী আমাদের পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক।

উপরের আলোচনায় দেখা গেল যে ডায়লেকটিক নীতি হলো নিয়মনের নিয়মন বা বিরুদ্ধ সমন্বয় নীতি। (১) সমস্ত বিশ্বের সকল পরিবর্তন ও বিকাশ এগিয়ে চলেছে স্থিতি, প্রতিস্থিতি ও সংস্থিতি এই তিন ধাপের মধ্য দিয়ে এবং এই তিন ধাপের প্রত্যেকটি ধাপ পূর্বের ধাপকে নিয়মন করে বা তার বিরুদ্ধতা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করছে। সংস্থিতি হল আগেকার দু'ধাপের নিয়মন সমন্বয় দুই-ই। (২) প্রত্যেকটি সত্তাই জগতে স্ব-বিরোধী (Inherently self-contradictory) এবং প্রত্যেক সত্তার মধ্যেই অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে দুটি বিরুদ্ধ শক্তি (Interpenetration of opposites) ; (৩) পূর্বের ধাপ থেকে পরের ধাপ সর্বদাই প্রগতিকে সূচনা করে, কারণ প্রত্যেক ধাপে গুণগত বিপ্লব (qualitative change) ঘটে যাচ্ছে আমূল ও সুগভীর।

কাজেই হেগেলীয় নীতিতে ক্রমবিকাশ এমনি করে হয়ে দাঁড়াচ্ছে একটা অ-পরিচ্ছিন্ন প্রগতি বা উন্নতি। কারণ, সংস্থিতি থেকে সংস্থিতিতে ক্রমাগত উত্তীর্ণ হয়ে হয়ে চলেছে এই ধারা।

ডায়লেকটিকের সমালোচনা

আগেই বলা হয়েছে যে ডায়লেকটিককে যখন সবাই ত্যাগ করেছিলেন তখন একমাত্র মার্ক্স একে কুড়িয়ে নিয়ে নিজের সমাজতান্ত্রিক কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অস্ত্র হিসেবে এই ডায়লেকটিক খুব কার্যকর হবে বলেই মার্ক্স একে সমাদর করে গ্রহণ করেছেন। দার্শনিক সত্য হিসেবে বিচার করে মার্ক্স একে গ্রহণ করেছেন বলে আমাদের মনে হয় না। কোন নীতির কার্যকারিতা ও সুবিধাজনকত্ব দেখতে গেলে তার সত্যাসত্যকে ঠিক নিরপেক্ষ দার্শনিক দৃষ্টিতে বিচার করবার সুযোগ বজায় থাকে না। কোন দার্শনিক মতবাদকে সত্য বলে নিতে গেলে তাকে যুক্তির নিকষে পরীক্ষা করে দেখতে হবে, সে objectively সত্য কিনা। অবশ্য একথা ঠিক যে মানুষের পক্ষে পুরোপুরি বিষয়মুখ হওয়া (objectivity of outlook) সম্ভব নয়। মানুষ দেশকাল দ্বারা পরিচ্ছিন্ন এবং যে ভূমি বা কালের পীঠে দাঁড়িয়ে সে দেখছে সেই ভূমির অবস্থান তার জ্ঞানকে অবচ্ছিন্ন করবেই। তবু একথাও ঠিক যে মানুষের নিছক অনপেক্ষ (absolute) সত্যের উপর লোভের অন্ত নেই। মানুষ তাই সাধ্যমত চেষ্টা করে দেশ-কালের সীমার উপরে উঠে সব কিছুকে দেখতে। এইজন্যে

তার সাধারণত বিষয়মুখ হবার (objective বা disinterested) সাধনা করতেই হয়। বিজ্ঞান এই চিত্তবৃত্তির জোরেই আজ বিচিত্র পথ ও বিবিধ ভঙ্গীকে অনুসরণ করে সত্যকে খুঁজতে বেরিয়েছে। দর্শন-বিচারের পথ ও ভঙ্গীও এই একই পথ ও ভঙ্গী। জগৎকে জানা ও বোঝা—এই একটি মাত্র লক্ষ্য হবে বিজ্ঞানের ও দর্শনের। জগৎকে জানতে গিয়ে যদি দেখি যে অপ্রিয় সত্য ও অকাম্য তথ্য এই চেষ্টার ফলে আবিষ্কৃত হয়েছে, তাতে আক্ষেপের নেই। প্রিয় হউক, অপ্রিয় হউক, সত্যকে সন্ধান করে বার করতে হবে। এই মনোবৃত্তিই দর্শনের ও বিজ্ঞানের।*

সুবিধাবাদ দর্শন বা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে হুঁকো পায় না, রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে পেতেও বা পারে। যদি সুবিধাই মানুষের সত্যাসত্যের ধারণাকে গড়ে তুলত, তবে যুক্তি-তর্ক বা লজিকের প্রয়োজন ছিল না। মনোগত মতবাদকে খুশীমত সত্য বলে চালালেই চলতো এবং মানুষের কামনাই ধর্মের জনক হ'তো···কিন্তু তা হয়নি। মানুষ সত্যকে নিরপেক্ষভাবে খুঁজেছে, এবং এই মানসিকতার ফলেই পৃথিবী পেয়েছে বিজ্ঞান ও দর্শন। ডায়লেকটিককে হেগেল এই বিশ্ববিবর্তনের চরম সত্য বলেই বিশ্বাস করেছিলেন, কোনো বিশেষ কার্যোদ্ধারের সুবিধাজনক অস্ত্র হিসাবে নয়। আমরা যদি ডায়লেকটিকের সত্যাসত্যকে নির্ধারণ করতে চাই, তবে এই নিরপেক্ষ মানসিকতা নিয়েই একে বিচার করতে হবে। কোনো বিশেষ কাজের উপযোগী বলে একে সত্য মনে করলে চলবে না। ডায়লেকটিক হেগেলীয় প্রাধান্যের যুগে প্রায় সকল দার্শনিক কর্তৃকই বর্জিত হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যদি আজকের দিনে একে দার্শনিক নীতি হিসেবে অকাট্য বলে গ্রহণ করবার প্রস্তাব এসে থাকে, তবে আর একবার চুলচেরা যুক্তির সাহায্যে বিচার করে দেখা যাক, এই নীতি টেকে কিনা।

যে কোনো বিষয়ে আলোচনা করতে হলে তার পরিভাষার ও অর্থের নির্দিষ্টতা ও স্থিরতা চাই। ন্যায়শাস্ত্রের এ-কথা হচ্ছে একেবারে মূলতত্ত্ব। ভাষা ছাড়া চিন্তা করা চলে না এবং প্রত্যেকটি কথার একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ রয়েছে। যদি ভাষার অন্তর্গত প্রত্যেকটি কথার নির্দিষ্ট মানে না থাকত, তবে ভাষার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হোতো এবং পরস্পরের ভাব বিনিময় অসম্ভব ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। একই আলোচনায়, একই বিষয়গত বিবৃতিতে যদি একটি শব্দ নানা অর্থে ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবের দ্যোতক হিসেবে ব্যবহৃত হয়, তবে সমস্ত আলোচনাই অর্থহীন প্রলাপ হ'য়ে দাঁড়ায়। রামকে 'রাম' বলে, শ্যামকে আবার 'না-রাম' বললে, কিংবা পঙ্কজকে একবার 'পঙ্ক' বলে পরক্ষণেই 'পাঙ্ক' বললে, আমরা বক্তার বুদ্ধিভ্রংশ হয়েছে বলে সন্দিহান হয়ে উঠি। পৃথিবীতে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও ব্যবহারের ফলে ভাষার প্রত্যেকটি কথার একটি পরিষ্কার অর্থ বা ভাব জমে উঠে রূপ পেয়েছে। যেমন 'জল', 'পাতা', 'মানুষ', 'পাথর' ইত্যাদি যা-ই বলি না কেন, সকলেই ধারণা করছে একটা বিশেষ বস্তুকে। 'জল' বললে 'জল'কেই বোঝাবে, অন্য কোনো জিনিষকে বোঝাবে না। তেমনি 'পাতা' কেবল 'পাতা'কেই বোঝাবে, 'মানুষ'কে নয়। এই হলো সকল মানুষের সাধারণ ও অব্যর্থ জ্ঞান ও ধারণা। একই 'ভাষা' একবার একরকম অর্থে ব্যবহার করে আবার সঙ্গে সঙ্গে অন্য অর্থে প্রযুক্ত হলে কথার মানে বোঝা দুষ্কর হয় এবং ভাষার ও বাক্-ব্যবহারের উদ্দেশ্য নিরর্থক হয়ে যায়। ফলে যা দাঁড়ায় তাতে জ্ঞানরাজ্যে বিজ্ঞানোৎসব না হয়ে সৃষ্টি হয় বক্ত-বজ্ঞ। জ্ঞানের ও চিন্তা-

---

* "Philosophy comes as near as possible for human beings to that large, impartial contemplation of the universe as a whole which raises us for the moment far above our purely personal destiny." (Outlook of Philosophy, Russel)

বিনিময়ের রাজ্যে তাই চাই পরিভাষার সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট ভাব-ব্যঞ্জনা।

কিন্তু হেগেলের ডায়লেকটিক দর্শনের আগাগোড়াই এই পরিভাষার দোষ-দুষ্ট প্রয়োগ এবং মানের অনির্দিষ্টতা অর্থ-সঙ্কট সৃষ্টি করেছে। তাঁর ব্যাপক দূর-প্রসারী প্রতিভা সমস্ত বিশ্বের উত্থান-পতনকে কয়েকটি মাত্র সূত্রে গেঁথে ফেলতে গিয়ে যে অভিনব পরিভাষার সৃজন করেছে তার মানে খুঁজতে গিয়ে বিদগ্ধ গোলকধাঁধায় আটকে পড়তে হয়। একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন ও বিপরীত মানে তিনি ভিন্ন ভিন্ন প্রয়োগ করেছেন। কোথাও আবার ভিন্ন ভিন্ন বিপরীত অর্থসূচক শব্দ একই অর্থে ব্যবহার করেছেন নানা স্থানে। তার ফলে না-বোঝার প্রয়োস অন্ধকার সর্বত্রই কোণে কোণে জমাট বেঁধে রয়েছে এবং হেগেলের বক্তব্যও দুর্বোধ্য ও ঘোলাটে হয়ে উঠেছে। অথচ দর্শন আলোচনা যদি ভাষা ব্যবহারের দোষে কুয়াশাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়ায় তবে জিজ্ঞাসুদের আর উপায় থাকে না। কারণ, দর্শন শাস্ত্রের বিষয়বস্তু এমনিতেই কঠিন ও দুর্বোধ্য। হেগেলের বক্তব্য পরিষ্কার করে বুঝতে পারে এমন শক্তিধর লোক একে বিরল তার ওপরে পরস্পর-বিরোধী ও অনির্দেশ্য ভাষা ও ভাবপ্রয়োগের ফলে তার ডায়লেকটিক দর্শন আরো কুয়াশাচ্ছন্ন ও অসঙ্গতিময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ, আগাগোড়াই তিনি একটা সুসম্বদ্ধ ও ব্যাপক system খাঁড়ে তুলবার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সুসম্বদ্ধ ছাঁচ গড়ে তুলতে গিয়ে তিনি গড়ে তুলেছেন এক অতি অসম্বদ্ধ ও ভ্রান্তিমূলক তত্ত্বসংঘাত (system), যাকে প্রথম দৃষ্টিতে দেখলেই চোখে চমক লাগে কিন্তু বিশেষ নিরীক্ষণে যার অসংখ্য অসঙ্গতি চোখকে ও বুদ্ধিকে পীড়া দেয়। এই কারণেই বিখ্যাত আর্মান দার্শনিক ইমানুয়েল হেরমান ফিশ্‌টে (১৭৯৭-১৮৭৯) হেগেলীয় দর্শনকে বলেছেন: "Masterpiece of erroneous consistency or consistent error." (১৮৩২)। ভুল করার মধ্যেও তাঁর সৌন্দর্য রয়েছে, কারণ ভুলগুলিকে সাজিয়েই তিনি দাঁড় করেছেন এক মনোহর সুসঙ্গতি যা সকলকে মুগ্ধ করে। অসঙ্গতি ও ভুলগুলোকেই মার্ক্স তাঁর প্রতিভার যাদুতে দিয়েছেন একটা বিধিবদ্ধ যৌক্তিকতা ও consistency-র চেহারা। হেগেলীয় ডায়লেকটিকের কিছুমাত্রও দার্শনিক অবদান নেই, একথা বলছি না। আগেই আলোচনা করা হয়েছে যে, সব দর্শনেরই মতো হেগেলীয় দর্শনেরও কৃতিত্ব আছে এবং হেগেলের প্রতিভাও জগৎকে অনেক সমৃদ্ধি দান করে গেছে, যা চিরদিনের ও চিরকালের। নিখিল বিশ্বকে এক সমগ্র দৃষ্টিতে ও পূর্ণতার স্থিতিভূমি থেকে দেখবার যে ভঙ্গীটি তা হেগেল জোরালো ও সুষ্ঠু ভাষায়ও অ-পূর্ব রীতিতে প্রচার করে গেছেন। দেশ ও কালের দ্বারা খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ দর্শনকে পেরিয়ে দেশ-কালাতীত অখণ্ড দৃষ্টিভূমির বার্তা হেগেলই ইউরোপে সুতীব্র করে জানিয়ে গেছেন। কিন্তু আপেক্ষিক সত্য তাঁর দর্শনে থাকলেও পুরোপুরি সত্য তার দর্শনে নেই। সত্য তথ্যেরই পাশাপাশি সেখানে ছড়িয়ে আছে অনেক অসত্য ও অনেক অসঙ্গতি। তাই জে, এইচ, ফিশ্‌টের বহুদিন পরে বিশ্ব-বিখ্যাত উইলিয়াম জেম্‌সও আরেকবার জগৎকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, হেগেলীয় দর্শনে গুণ যাই থাক না কেন, বহু দোষ ও ত্রুটিতে সে দর্শন সমাকীর্ণ। তাঁর ভাষায়:

"Hegel's philosophy mingles mountain-loads of corruption with its scanty merits."

(On Some Hegelism—W. James, p. 263)

হেগেলের ডায়লেকটিক দর্শনের পাতায় পাতায় ছড়িয়ে আছে 'Negation', 'Opposition', 'Contradiction', ইত্যাদি পরিভাষা। তাঁর ডায়লেকটিকের মূলতত্ত্ব ও সত্যের ভিত্তিতেই রয়েছে এই শব্দগুলি এবং এদের অর্থ ও ইঙ্গিতের সঙ্গেই জড়িয়ে আছে তাঁর ডায়লেকটিক নীতি ও দর্শন। অথচ এই বহু-ব্যবহৃত গুরুতর শব্দগুলির সত্যিকার মানে যে কি তা সারা দর্শন খুঁজেও চূড়ান্তভাবে বোঝবার উপায় নেই।

কোথাও এদের একই অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে, কোথাও বা এদের আলাদা অর্থের ইঙ্গিত করা হয়েছে। পরস্পর বিরোধী উক্তির ফলে এদের মানে স্পষ্ট করে বার করা কঠিন। তারপরে ডায়লেকটিক নামের কেন্দ্রস্থলটি হচ্ছে প্রতিস্থিতি (antithesis) নামে পদার্থটি; অথচ, "Antithesis" বা প্রতিস্থিতির একটা মূলগত অর্থ হেগেল দিতে পারেন নি। Antithesis-কে বোঝাতে গিয়ে পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যের ঝড় তুলেছেন এবং নিজেই নানা অসঙ্গতির জালে জড়িয়ে গেছেন। এই Antithesis-এর অন্তর্গত 'anti' শব্দটির মানে নিয়েই যতো গোল। এই 'Anti' নামক prefixটির মানের সঙ্গে আগেকার negation ইত্যাদি শব্দগুলির গভীর যোগ রয়েছে। সমস্ত ডায়লেকটিক নীতির অর্থবত্তা নির্ভর করছে এই শব্দগুলির সঠিক অর্থের উপরে। অথচ ঠিক এইখানেই হেগেল তাঁর সমস্ত গোল পাকিয়ে রেখেছেন এবং এ-জট খুলতে গেলে হেগেলের ডায়লেকটিকের যে বিশিষ্ট অভিনবত্বটুকু দাবী করা হয়, তা আর টিকে না। জার্মানীর আরেকজন দার্শনিক হেগেলীয়-উত্তর যুগে (kreuzhage) হেগেলীয় দর্শনকে লক্ষ্য করে বলেছিলেন, "The very logical but erroneous Hegelian philosophy." এখানে 'logical' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, 'consistent' অর্থাৎ বিধিবদ্ধ।

সমস্ত জ্ঞানের মূলে আছে ভেদাভেদ জ্ঞান। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সাদৃশ্য ও অ-সাদৃশ্য নির্ণয় করেই মানুষের বস্তু সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মে। সাধারণ লোকেরও যেমন জ্ঞানলাভের পদ্ধতি এই, বৈজ্ঞানিকেরও তেমনি। "গরুকে অন্যান্য পশু"র সঙ্গে তুলনা করে এবং সাদৃশ্য লক্ষ্য করে তবেই মানুষ তাকে 'গরু' বলে নির্ণয় করে থাকে। অন্যান্য পশুর সঙ্গে যেমন 'সাদৃশ্য' রয়েছে তেমনি 'ঘোড়া' ইত্যাদির সঙ্গে এর 'অসাদৃশ্য' রয়েছে। এই একদিক-কার সাদৃশ্য ও অন্যদিকের অসাদৃশ্যই মানুষের সঠিক জ্ঞানের ভিত্তি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও তেমনি নানা বস্তুর গুণগত ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য ও বৈষম্য নির্ণয়ের উপরই দাঁড়িয়ে আছে। দার্শনিকের পক্ষেও তেমনি distinguish করা অর্থাৎ সাদৃশ্য ও পার্থক্যকে নির্ণয় করা সমস্ত দার্শনিক বিচারের গোড়ার কথা। সদৃশ (like) ও অ-সদৃশের (unlike) আলোচনায় হেগেল নিজেও একথা ব্যাখ্যা করেছেন: "We discover···likeness and unlikeness. The work of the finite sciences lies to a great extent in the application of these categories·····ইত্যাদি (p. 217)। কিন্তু হেগেল নিজে এ-সম্পর্কে সাবধান হননি। হেগেল এইখানেই অপকর্ম করেছেন,—'negation', 'contradiction', 'opposition', 'otherness' ইত্যাদি দার্শনিক সংজ্ঞা বা পদার্থ (category) সম্বন্ধে সূক্ষ্ম পার্থক্য বিচার করে এদের সত্যিকার মিল ও তফাৎ কোথায় সে তত্ত্ব বের করতে তিনি চেষ্টা করেন নি। নির্লিপ্তভাবে তিনি এই সংজ্ঞার অসতর্ক ব্যবহার করে চলেছেন; অথচ এদের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্বরূপ সম্বন্ধে অবহিত হয়ে ওঠেননি কোথাও। এইখানেই হেগেলের আরম্ভিক ভুল হয়েছে এবং ডায়লেকটিক নীতিও এই ভুলের জন্যেই ত্রুটি-জর্জরিত হয়ে রয়েছে। জেমস বলেছেন:

"Hegel's sovereign method of going to work and saving all possible contradiction lies in pertinaciously refusing to distinguish." (On Some Hegelism, p. 260)

"Refusing to distinguish"—হেগেলের সেরা অপরাধই এইখানে। সকলের বিরুদ্ধ, বিসদৃশ ও সদৃশ সংজ্ঞাতে মিলিয়ে মিশিয়ে এক দুর্বোধ গণ্ডগোল পাকিয়ে হেগেল পাঠকের বুদ্ধিকে আত্মহারা করে তুলবার জন্য

তৈরী করেছেন। এই অংশেরই নাম ডায়লেকটিক। ডায়লেকটিকের মূলসূত্রগুলি বোঝানো হয়েছে; এখন হেগেলীয় ডায়লেকটিককে কেন যে দার্শনিকগণ ভুলের মূল বলে অভ্রান্ত করেছেন এবং কোথায় এই ডায়লেকটিকের অসঙ্গতি রয়েছে, সেই আলোচনা করব। প্রত্যেকটি অংশের বিরুদ্ধে যা যা বলবার আছে, আমরা এখন সেই যুক্তি ও তথ্যগুলি বিবৃত করব। Negation বা নিষেধন ইত্যাদি শব্দেই বা গলদ কোথায়, প্রতিবিধির (Antithesis) ধারণায়ই বা কোথায় ত্রুটি, সে-তত্ত্বও সংক্ষেপে আলোচিত হবে।

(ক্রমশঃ)

সমুদ্র-কন্যাকে : প্রভাকর বাগচি

সমুদ্র দেখিনি। কিন্তু দেখেছি সে নাও মেয়েদিকে
অনেক সমুদ্র চোখে। যে দূরে বিরহ বাড়িকে
বারে বারে ডাক দিয়েছে শোনিতে জাগিয়ে দুঃসাহস,
আরেক দিগন্তে দিয়ে পান করতে তীব্র সোমরস।

মাঝে মাঝে মনে হয়, সোনা মুখে মায়াবী রৌদ্রের
নিবরণ। নাকি ঘিয়? পরক্ষণে ঘিয় কণ্ঠ কেন
উচ্চারিত। তারপর অন্ধকার। অনন্ত তৃষ্ণায়
ধূসর বালিকা-মন জলে পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

মূখবন্ধতা : সীজার ভালেজো
Cesar Valley (1895-1937)
অনুবাদ : দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

যুদ্ধ থেমে গেলে,
যখন সৈনিক মৃত, কেন কে একজন তার পাশে উঠে এল
জানালো : "মরো না ; আমি এত ভালোবাসি যে তোমায়!"
হায়, সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

এবার দুজন তার কাছে এল আবার জানালো :
"যেও না যেওনা ছেড়ে আমাদের! শক্তি ধরো। আবার
জীবনে ফিরে এস!"
হায়, সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

তারপর বিশজন জন্মে শত সহস্র অযুত
চেঁচিয়ে উঠলো : "এত ভালোবাসা, অথচ মৃত্যুর হাতে
এত অসহায় হয়ে থাকা!"
হায়, সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

তারপর কোটি কোটি অনন্ত তাকে ঘিরে দাঁড়ালো। সবাই
একসঙ্গে মিনতি জানালো : "থাকো, ওগো যেওনা,
দাঁড়াও।"
হায়, সেই শব তবু মরণে তখনও অব্যাহত।

সেই অনন্তজোড়া সমস্ত জনতা তার চারদিকে তখন
ঘিরে এল : আর সেই বিষাদার্ত শব সেই সবার মুখের
দিকে চেয়ে
ধীরে আন্দোলিত হল, ধীরে উঠে দাঁড়ালো, এগিয়ে,
প্রথম মানুষটিকে আলিঙ্গন করে, পায়ে পায়ে .....

এলিয়ট, এডিথ সিটোএল ও কবিতার ঝড়

অমিতাভ দাশগুপ্ত

১৯০৭ সালের এক দারুণ শীতের রাত। বাইরে ব্রিলার্ডের ঘূর্ণী। ইতিয়ানা-র অন্তর্গত ক্রাফোর্ডসভীল-এর একটি কলেজের ফরাসী ও স্প্যানিশ ভাষার অধ্যাপক সেই দুরন্ত রাতে একটি চিঠি পোস্ট করতে বেরিয়েছেন।

দুয়ারের ঝড়ের ভিতর দিয়ে চলতে চলতে হঠাৎ তাঁর চোখে পড়ল বাতিঘরে, কি এক বস্তু পুঁটুলীর মত শুয়ে রয়েছে ও থেকে থেকে কাঁপছে। কাছে যেয়ে দেখলেন ছেঁড়া কাপড়কোট গায়ে একটি শুরুণী। বরফ তাকে কামড়াতে শুরু করেছে, আর কিছুক্ষণ বাইরে থাকলে মৃত্যু নিশ্চিত। তরুণ অধ্যাপক মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করে বাইরে নিয়ে এলেন। মেয়েটিকে বাইরে বাইরে নিজের বিছানায় শুইয়ে তিনি তাঁর পড়ার ঘরের মেঝেতে রাত কাটালেন। (১৯০৭ সালে এ কথা বিশ্বাস করা যেতে পারে।)

পরদিন সকালে অধ্যাপক ক্লাশ নিতে গেলেন। ল্যাণ্ড-লেডি তাঁর ঘর গুছোতে এসে দেখে বিছানায় একটি মেয়ে অঘোরে ঘুমোচ্ছে। প্রচণ্ড ক্ষেপে গিয়ে সে তক্ষুণি কলেজের অধ্যক্ষ আর পরিচালক সমিতির সদস্যদের ফোন করে সব জানায়। বাইশ বছরের তরুণ অধ্যাপক কলেজ থেকে চাকরী খতমের নোটিশ পেয়ে সেদিনই নিউ-ইয়র্কগামী জানোয়ার ভর্তি জাহাজে চেপে বসেন। স্পেন, ফ্রান্স ও ইতালীর বহু অঞ্চল ঘুরতে ঘুরতে ভদ্রলোক অনেকগুলি কবিতা লিখে ফেলেন। ভেনিস থেকে তিনি প্রথম কবিতা-সংকলন প্রকাশ করলেন, নাম A Lume Spento. সেখান থেকে ইংল্যাণ্ডে এসে স্থায়ীভাবে বসলেন। রইলেন ১৯২১ সাল পর্যন্ত। এই তরুণ অধ্যাপক বিশ শতকের বোধহয় সবচেয়ে দুর্বোধ্য, নিন্দিত ও বন্দিত কবি এজরা পাউণ্ড।

পাউণ্ড জানতেন তিনি কি চান। ইংল্যাণ্ডের বাজার জমাতে তিনি বেশী সময় নিলেন না। ইমপ্রেসারিও-হিসেবে তাঁর কিছু খ্যাতি ছিল। হ্যারিয়েট মনরো-র সঙ্গে Poetry ও হ্যারিয়েট উইভার-এর সাথে The Egoist—এই কবিতা পত্র দুটি সম্পাদনার মাধ্যমে পাউণ্ড সারাদেশে নতুন কবিতার আন্দোলনের আবহাওয়া তৈরী করলেন। ১৯১৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝি একটি ভারী খাম তাঁর হাতে এসে পৌঁছল। অহ্সফোর্ডের মেটন কলেজে গ্রীক দর্শনের পড়ুয়া এক ছাত্র-কবি কবিতা পাঠিয়েছে। সম্পাদকীয় নিরাসক্তির সঙ্গে তিনি খাম খুললেন ও তার দুদিন পর হ্যারিয়েট মনরো-কে চিঠিতে লিখলেন—He has sent in the best poem I have yet had or seen from an American. PRAY GOD IT BE NOT A SINGLE AND UNIQUE SUCCESS. He is the only American I know of who has made what I call adequate preparation from writing. He has

actually trained himself and modernised himself on his own' এই 'The best poem' টির নাম 'The Love Song of J. Alfred Prufrock', কবির নাম টমাস স্টার্নস্ এলিয়ট। Poetry-র জুন সংখ্যায় কবিতাটি প্রকাশিত হয়।

পাউণ্ডের চেয়ে মাত্র তিন বছরের ছোট হয়েও এলিয়ট একটু দেরীতেই কবিতা লেখা শুরু করেন। ১৯০৯ থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে তাঁর কয়েকটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল, কিন্তু পাঠককুলের কাছে স্মরণযোগ্য কিছু এসময় এলিয়টের পক্ষে লেখা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। পরের পর পর Poetryতে 'The love song of J. Alfred Prufrock', Blast এর জুলাই সংখ্যায় দুটি Preludes' ও 'Rhapsody on a Windy Night' এবং Others-এ 'Portrait of a Lady' ছাপা হল। একটি বছরের রচনার মাধ্যমে এলিয়ট অশেষ সিদ্ধিলাভ করে দাঁড়ালেন।

এই বছরের নভেম্বর মাসে পাউণ্ড সম্পাদিত 'Catholic Anthology' বেরোল। পাউণ্ডের মতে এই সংকলনের কবিতাগুলি রুচির দিক থেকে ক্যাথলিক। এই সংকলনে এলিয়টের পাঁচটি কবিতা ছাড়া ইয়েট্স্, কার্ল স্যাণ্ডবার্গ, উইলিয়ম কার্লস্ উইলিয়ম্স্, র‍্যামোএল ডেন্হাইম এবং অন্যান্য কয়েকজন কবির কবিতা ছাপা হয়। ১৯১৬-র Poetryতে এলিয়টের আরো চারটি কবিতা এবং '১৭-র প্রথম কাব্যগ্রন্থ Prufrock and Other Observations লণ্ডনের ইগোইষ্ট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়।

ইংরিজী কবিতায় ইমেজিষ্ট ও ভরটিসিষ্ট (পাউণ্ডের দেয়া নাম) আন্দোলন এই সময় থেকেই সুসংহতভাবে শুরু হয়। পাউণ্ড ও এলিয়টের প্রতিভা একটি বিরাট মোহানা সৃষ্টি করল। কবিতার আসর যখন চারদিকে গানুল সরগরম, দুর্ভাগ্যবশতঃ এমনি সময় বিশ শতকের বুক চেরে প্রথম মহাসমরের বাজনা বেজে উঠল। কিছুদিনের মধ্যেই পুইস ও ফোর্ড লেলেন ভিনদেশে বোমা ছুঁড়তে, অমর জিমেজ ও জুরীদেরই রইলেন (অবশ্য The Egotist-এ তাঁর 'Portrait of the Artist as a Young Man' ধারাবাহিক ভাবে বেরোচ্ছিল), লরেন্সের মাথার ওপর আইনের খাঁড়া ঝুলতে লাগল, পাউণ্ড আর ইয়েট্স্ সব কিছু থেকে সভয়ে গা ঢাকা দিতে চাইলেন। এলিয়টও সাংবাদিকতা করে কিছু রোজগারের চেষ্টা করতে লাগলেন।

ফলে স্বাভাবিকভাবেই পাউণ্ড-এলিয়টচালিত নতুন কবিতার আন্দোলন, রাষ্ট্রনৈতিক ঘটনার সংঘাতে অসহায়ভাবে মুখ থুবড়ে পড়ল। শান্তি এবং নিরাপত্তা প্রত্যেক যুগের কবিদের নতুন কাব্যভাষা ও আন্দোলন গড়ে তুলবার যে সুযোগ দেয়, এঁরা সময়ের প্রতিকূলতায় নিষ্ঠুরভাবে সে সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলেন। কেবল প্রৌঢ়ত্বের প্রান্তদেশে এসে প্রাজ্ঞ ইয়েট্স্ এঁদের বন্দনা করে গেলেন তাঁর অনবদ্য 'I have met them at the close of day' কবিতায় এবং কুয়ালা প্রেস থেকে ১৯১৭ ও ১৯২১ সালে প্রকাশিত তাঁর শেষ দুটি কাব্য গ্রন্থে। রক্তশীল ইংল্যাণ্ড কিন্তু কোন সর্তেই কবিতায় শুদ্ধ অমি নতুন আন্দোলনের ফসল দিয়ে ভরাট করতে প্রস্তুত ছিল না। পাউণ্ড ও এলিয়টের সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে মৌখ সংগ্রামকে প্রখ্যাত সাহিত্য-সমালোচক সিরিল কনোলী বলেছেন—Our brief literary renaissance.'

এজরা পাউণ্ড শান্তি ও সম্পদের বুকের ওপর বসে ও পারিপার্শ্বিককে সম্পূর্ণভাবে নিজের আওতায় পেয়ে কাব্য-সৃষ্টি শুরু করেছিলেন। প্রতিভা ও অনায়াসে অর্জিত খ্যাতি পাউণ্ডের অহংকে উদ্ধত করে তুলল। যুদ্ধের অনুচিত্ত রণলীলা নিরন্তর রক্তক্ষয় ও একাকীত্ববোধের নির্জন তমসা অসহায়ী পাউণ্ডকে যখন চারপাশ থেকে ঘিরে ধরল, পাউণ্ড

যেন তাঁর মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেললেন। কবিতার আরম্ভায় কখনো এলো অভিমান, আত্মক্ষয়ী চীৎকার, কখনো বা দুরূহতম পাণ্ডিত্যের পোষাকে অহং-এর ভিতর বাইরে চলে যাওয়া। সমালোচক এলাজারটন পাউণ্ডের শোচনীয় পরিণতি ও এলিয়টের উত্থানের ছবি সংহত শক্তায় এঁকেছেন—'Ezra started out in a time of peace and prosperity, with everything in his favour, and muffed his chances of becoming literary dictator—to which he undoubtedly aspired—by his own conceit, folly and bad manners. Eliot started in the enormous confusion of war and post war England handicapped in every way. Yet by merit, tact, prudence and pertinacity, he succeeded in doing what no American has ever done—imposing his personality, taste and even many of his opinions on post war England.'

কবিতার সৌভাগ্য যে পাউণ্ডের মত ঐশ্বরিক অধৈর্য এলিয়টকেও অবশ্য ভ্রমণক্লান্ত করে লণ্ডনের কূলে নিয়ে এসেছিল। ইয়েট্‌স্, ফোর্ড ম্যাডক্স-ফোর্ড, হ্যারল্ড মনরো ও উইণ্ডহ্যাম লুইস তাঁকে বরণ করে নেবার জন্যে যেন অধীরতম অপেক্ষায় ছিলেন। এলিয়টের পুঁজি ছিল প্রখর শ্রেণীর মনীষা, ভীষণ খুঁতখুঁতে সমালোচকের কান, ও বৈপ্লবিক অনুভূতি এবং রুচি। সম্ভবতঃ বিশ্বযুদ্ধের কঠোর বাস্তবতা এসব গুণের সঙ্গে যারালো রহস্যপ্রিয়তার স্বাদ মিশিয়ে তাঁর কবিতাকে একান্ত বিশ শতকের করে তুলেছিল। শহরে কবির কথাটির সবচেয়ে খাঁটি ও তাৎপর্যপূর্ণ অর্থ এলিয়টের কবিতায় খুঁজে পাওয়া পাঠকের পক্ষে তাই কোন সময়েই অসম্ভব হয়নি।

কবিতাকে সংগীতের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়া এলিয়টের কাম্য ও সাধ্য ছিল। ধরা যাক Prufrock বিষয়ক সুবিখ্যাত কবিতাটির প্রথম চার পংক্তি। যেন দেবুসি কোয়ার্টেটের প্রথম স্পন্দন, পাশ্চাত্য আধুনিক সংগীতের মহাসময়কালীন বেদনাপ্রবণ চাঞ্চল্য কবিতাটির সংঘাত ঘনে ঘনে ওঠে। তৃতীয় পংক্তি, 'Like a patient etherised upon a table'-এ হঠাৎ সুরপ্রবাহ মোটা আঙুলের বেচ্ছাচারে ছিঁড়ে যায়, এলিয়ট আমাদের স্বপ্নে কর্কশ পাথর কেরি করে বেড়াতে আনেন। একমুহূর্তে এতকালের রোমান্টিকতা মেদুর কল্পকাব্যের নরম অনুভূতি বিশ শতকীয় দর্পহীন নির্বস্ত্রতায় ছিঁড়ে যায়। কবিতাটির শেষাংশে সারা কবিতার টুকরো টুকরো আপাতঃ অসংলগ্ন ছোট তানগুলি একটি অন্বয়ান্বিকতায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ে। তারপর সেই মিলিত সুরের গর্জন ঝাড়ি ছাপিয়ে সকল যন্ত্রের মত আর্তনাদ করতে থাকে। কঠিন ও আশ্চর্য ব্যাঞ্জনধ্বনি ও ছন্দপরম্পরা এলিয়টের এ শতকের মানুষের সমস্ত বিদ্রোহের পরিণতি হিসেবে নিবিড় ও আন্তরীন বিষাদের অলঙ্কার তুলে ধরেন।

সাংবাদিকতার স্বর্ণযুগ এলিয়টের কাছে ধরা দেয়নি। বাধ্য হয়ে তাঁকে একটি ব্যাংকে কাজ নিতে হল। ১৯১৭-র জুলাই মাসে The little Review-এ চারটি কবিতা (তিনটি ফরাসী ভাষায় লেখা) একই সনের সেপ্টেম্বরে আরো চারটি, ১৯১৯-এ তিনটি কবিতা, ১৯২০-এ সুবিখ্যাত Gerontion—সবশুদ্ধ এই কটি কবিতা লিখে এলিয়ট যেন একটু ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। সমালোচক হিসেবে তিনি ক্রমশঃ আত্মপ্রকাশ করছিলেন। ১৯২০ সালে তাঁর প্রথম সাহিত্য সমালোচনা-গ্রন্থ The Secred Wood প্রকাশিত হল। পরবর্তী কালের কাছে এলিয়ট সাহিত্যসমালোচক রূপে যে যশ ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছেন, তা তাঁর অনভিপ্রেত ছিল। তাঁর প্রবন্ধ নিয়ে পাঠকদের গবেষণা ও হৈ চৈ এলিয়ট বরাবরই কৌতুকের সঙ্গে লক্ষ্য করতেন। লরেন্স ডুরেলকে তো তিনি কবুলই করেছিলেন যে কবিতা বা

কাব্যনাট্য যখন কিছুতেই জমেনা, তখন লেখার অভ্যাস পাছে খারাপ হয়ে যায় কেবল এই ভয়ে তিনি প্রবন্ধ বা সমালোচনা মকশো করেছেন। এলিয়টের কবিতার পরিবর্ধিত সংকলন ১৯১৯-এ Hogarth press poems এবং ১৯২০-র Gerontion কবিতাটি যুক্ত হয়ে poems নামে আমেরিকায় ছাপা হল। ভগ্নস্বাস্থ্য এলিয়ট সুইজারল্যাণ্ড থেকে পাউণ্ডকে পাঠালেন ইংরিজী সাহিত্যের উনিশটি অরণীয় পৃষ্ঠা—Waste land কবিতাটি। এই একটি কবিতা যেন আমাদের অসার বিচারবুদ্ধিকে প্রবল আঘাতে জাগিয়ে তুলল। পাউণ্ড কবিতাটিকে মন্থিত করে বললেন—The true poetic movement of our time. পাঠক সম্ভবতঃ সেই প্রথম অবহিত হলেন যে কবিতা নিশেষারা আবেগের একরাশ পরপাছো নয়, কবির ব্যক্তিচৈতন্য ও প্রখর অস্তিত্ব উপলব্ধির সদর্প চিহ্ন। Waste Land একই সঙ্গে এই বিপন্ন সময়ের হুবহু ছবি ও বিপন্নতার রক্ষাকবচ।

একালের সাধারণ কাব্যপাঠক জানেন যে বিশশতক একটি রণক্ষেত্র, কিন্তু জানেন না সংগ্রামের বিষয় ও কারণগুলি কি, যুদ্ধ কার বিরুদ্ধে ও কেন। এলিয়টের কবিতার চাতুর্যে পাঠক বহু সময় নিজেকে নির্বোধ মনে করেন এমনকি ভেবে বসেন যে কবি তাঁর মূর্খতা বা অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে ইন্টেলেকচুয়াল লেগ পুল (ছুয়েল) করছেন। এ ধারণা আরো নিশ্চিত হয়ে ওঠে যখন কানাঘুষো রটে, এলিয়টের কবিতার ভিতরের কথাটি ঠাট্টা বা তামাশায় অন্তরাল। পাঠক যেন কিছুতেই তাঁর কবিতার খুশিমত অর্থ বের করে নিতে না পেরে ক্রমশঃ অস্থির ও বিরক্ত হয়ে ওঠেন।

অনেক সমালোচক এলিয়টের বাকচাতুর্য, অসাধারণ পঙ্‌ক্তিবেশ সৃষ্টির ক্ষমতা ও নৈরাজ্যবাদের উৎস খুঁজেছেন বদলেয়র, ভর্ন ও লাফোর্গের কবিতায়। অবশ্য এই সূত্র থেকেও খুব বেশী কিছু আবিষ্কার করা কঠিন। বহু কবি সবসময়ই ঐতিহ্য থেকে ঋণ নেন ; কিন্তু তাকে ঋণশোধ সুদ সমেত ফিরিয়ে দেন। তাছাড়া এলিয়টের কাব্যের যা সবচেয়ে বড় প্রসাদগুণ—যাকে সমালোচকের ভাষায় বলা যায় intellectual control এবং predetermined end—তা উপরোক্ত তিনজন কবির কারো কবিতায় ছিল না। প্রাক-য়ুরোপীয় যুগের কোন কবির পক্ষে বলেয়র, ভর্ন এমনকি র‍্যাঁবো-র মতন অর্ধচৈতন্য মানসের হাতে আত্মসমর্পণ করা যে সম্ভব নয়, এলিয়টই তা ভালো করে প্রমাণ করেছেন। অন্ধ আবেগের জায়গা দখল করছে শাণিত তথ্যঅন্বেষা, একান্ত যুক্তিভিত্তিক নতুন মূল্যবোধ। অগ্রজের বিশ্বাস ক্রমশঃ শিথিল, পুরানো ও প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহগুলির অস্থির পদকম্পনের অনিরাপত্তা চতুর্দিকে। বিশ শতকের এই ঐতিহ্য-বিচ্ছিন্ন কালে বুদ্ধিজীবির জিজ্ঞাসু মানসের সবচেয়ে সবাক কবিতা সম্ভবতঃ এলিয়টই লিখতে পেরেছেন। অরেল ছুয়েল কয়েকটি অসামান্য পংক্তির আঘাতে Waste Land-এর সমালোচনা প্রসঙ্গে এলিয়টের কবিতার আত্মাকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন—from the point of view of technique the poem is exactly the same sort of thing—the camera pans slowly over the whole intellectual battlefield of the twentieth century, picking up here a prayer-wheel, there a quotation from Tacitus or Baudelaire, stopping to peep into a mediaeval missal or to eavesdrop upon the love affair of a city typist, to wander down a grimy London street, or to remind itself that the Elizabethans, gorgeously clad, walked this exhausted stage on which the modern man (in search of belief) wanders. 'The Waste Land' embalms the twentieth century in a series of images, some disgusting, some beautiful, some

vague, some sharp as crystal. সত্যতা নামক্ষের নানাবিধ জটিলতা, এক ছন্নছাড়া সমস্যা ও যান্ত্রিক মূল্যবোধের অর্থহীনতাকে সচেতনভাবে তীক্ষ্ণতম বিশ্লেষণ করে এলিয়ট মূলতঃ মানুষের আদিম ও অমল শৈশবের অকৃপণ ঔদার্যেরই ভিক্ষুক ও প্রার্থী হয়েছেন। অথচ কবির সকালে এই অভীপ্সাপূরণ অসম্ভব। তাই এলিয়টের কবিতা একই সঙ্গে শৈশবের অনুভব ও সভ্যতার নষ্টনীড়ের ধারাবাহিক ইতিহাস।

সমকালের অনুদারতা ও বিশেষতঃ পশ্চিমী সংস্কৃতির দেউলেপণা এলিয়টকে অন্তর্মুখী করে তুলেছিল। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, সাম্যবাদ ইত্যাদি বহু ঘোষিত এবং প্রত্যাশিত সামাজিক স্বপ্নগুলির বিকৃতি ও পচনে ক্ষুব্ধ হয়ে এলিয়ট সত্যান্বেষণের আশ্রয় খুঁজলেন সাবেকী রাজতন্ত্রে, নিজে ক্লাসিক-পন্থী ও ধর্মবিশ্বাসে এ্যাংলো-ক্যাথলিক হয়ে উঠলেন। ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত Ash Wednesday-তে তাঁর সমকালের ওপর প্রবল অভিমান ও অনীহার ছাপ ধর্মান্তিকভাবে প্রকট হয়েছে। যোগাভ্যাসের নিহিত তত্ত্ব তাঁকে আকৃষ্ট করল, বৌদ্ধ ও জৈন নির্বাণতত্ত্বে তিনি প্রগাঢ় বিশ্বাসী হয়ে পড়লেন। ১৯৩৯-এ লিখলেন Four Quartets—যে কবিতাগুচ্ছকে একালের তাৎপর্যমণ্ডিত অধ্যাত্ম উপলব্ধির প্রকাশ বলে অনেকে মনে করে থাকেন। তিরিশের দশক এলিয়ট তিনটি কাব্যনাট্য রচনায় ব্যয়িত করলেন—The Rock (১৯৩৪) Murder in the Cathedral (১৯৩৫) ও The Family Reunion (১৯৩৯)।

অতীত কথা ও সমকালের ধর্মীয়, রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক বিভিন্ন পর্যায় ও বিবর্তনের পরিপ্রেক্ষী হাত এলিয়ট তাঁর পরবর্তী রচনাগুলির মাধ্যমে একটি দেশাতীত ও কালাতীত চৈতন্যে নিখিলসত্তাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেন। কেবল বিশ শতকের আলেখ্য নয়, সভ্যতার পালাবদলের তরঙ্গগুলি পরম্পরা একটি সতীর্ণ ঐক্যবোধক চেতনা দিয়ে মণ্ডিত করার প্রয়াস এলিয়টের উত্তরজীবনের প্রবন্ধ এবং কাব্যনাট্যগুলির একমাত্র বিষয় হয়ে উঠেছিল। বক্তব্যের স্নেহতীক্ষ্ণতা ও চাতুর্য তখনো তাঁর রচনায় উপস্থিত কিন্তু সেগুলি প্রজ্ঞতায় ও নিগূঢ় অর্থে অধিকতর ফলবান। এলিয়ট যেন ক্ষমা করলেন তাঁর চেউলে সমকালকে, প্রাচ্য বাউল ও সুফীদের মত সহজিয়া মতাদর্শকেই একমাত্র অধিষ্ঠ বলে মেনে নিলেন। এলিয়টের মত এমন করে আর কেউ পাঠককুলকে বোকাতে পারেন নি যে এ শতক জ্ঞানবিজ্ঞানের চরম প্রাপ্তির কালে হৃদয় ভালোবাসা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এক নতুন রক্তাক্ত আঁধার যুগে প্রবেশ করেছে। বড়ো বড়ো শহরের বুকে বহু অতলান্তিক, স্পার্সাই, মিউমিক চুক্তির পরও কতো বাধা জমে আছে। ফলে অবিসংবাদিত ভাবে এই শতকের সাহিত্যের আন্তর্জাতিক বৃত্তের সর্বজনস্বীকৃত একনায়কত্বের স্বীকৃতি মুকুট এলিয়টকেই মাথায় তুলে নিতে হ'ল।

২

লরেন্স্ ডুরেল অডেন ও এডিথ সিটোএলের লেখায় অথো একটি আশ্চর্য সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর মতে এঁদের তিনজনের অনুভূতিতেই শৈশব-চেতনার বিচিত্র বৈয়াচার চোখে পড়ে। অথচ এই অনুভবের চাকনা সাবান তুলে ধরলেই দেখা যায় কৈশোরের কণ্টকর অপরিচ্ছন্ন যৌনতা মাথা উঁচু করার চেষ্টা করছে। তবে যা কিছু রংগলবচেন, অধিকাংশ অডেনের ভাগেই জমা, তাই শিশুস্বপ্নের আকাশকে তিনি ঘুলিয়ে তুলেছেন অবচেতনের কুঁয়ো খুঁড়ে বের করা সব কিম্ভূত ও অলৌকিক উপমা ও চিত্রকল্পের কবন্ধ দিয়ে। আধুনিক কবিকুলের মধ্যে অডেন-ই প্রথম ইয়ুং ও ফ্রয়েডকে হাপাহাপি কাজে লাগালেন ও তাঁদের স্বপ্নদর্শনকে কবিতার প্রকরণে বন্ধ করলেন।

সিটোএলের কাব্যশরীরের অনুরূপ খুঁজে পাওয়া যায়

কিছুটা ডি লা মেয়ারের কবিতায়। ভিক্টোরিয় প্রতিভাসম্পন্ন যাকে বলেন 'পবিত্র' এঁদের বালকস্বভাবী কবিতাগুলিতে সেই সাদৃশ্য স্পষ্টত বিরাজ করছে। সিম্বিজো-দর্শনে বিশ্বাসী অডেন শৈশবের ভিতরেই যে নিহিত প্রাথমিক পাপবোধের আভাস পেয়েছেন, সিটোএলের কবিতায় তার প্রবেশ থাকলেও সর্বত্র ব্যাপ্তি নেই। ভিক্টোরিয়ের অপর দুজন মহিলা কবি এমিলি ব্রন্টে ও ক্যাথলিন রাইনে-র মত এডিথ-ও বরং ক্রিশ্চিনা রসেটির স্পষ্টতা ও দারল্যের সাধিকা হওয়ার প্রাণপণ চেষ্টা করেছিলেন। অন্ততঃ তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্য-সংকলন (১৯৩০-এ প্রকাশিত) পাঠে সেই ধারণা সুস্পষ্ট হয়।

এডিথের কলম এমনিই যথেষ্ট সরু ছিল, কখনো কখনো সেই সূক্ষ্মতা এবরুদ্ভারী-র বাড়াবাড়ি করে ফেলত। তবে প্রথম থেকেই তাঁর কাব্য-প্রকরণের দক্ষতা এলিয়টের কাছ থেকে বিশেষ প্রশংসা আদায় করেছিল এবং উন্নাসিক পাউণ্ড-ও তাঁর খুশীকে চেপে রাখতে পারেন নি। এই সংকলনের প্রায় কবিতাতেই ছোটবেলার স্মৃতির উচ্চ ও গহ্ব ও নার্শারী ধর্মের দোলা আছে। কল্পনা এত ঘরাট যে হঠাৎ মনে হতে পারে বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মাঝখানের পাঁচিল কোন অসতর্কতার সুযোগে উঠে গেছে ও দুয়ারা থেকে যথেচ্ছ লোক বিনিময় হওয়ায় নির্দিষ্ট রূপ ও চিত্রকল্প দেখে নেয়া যাচ্ছে না। রূপ-কথার রাজ্য যেন ছাড়া পেয়ে অসম্ভব বস্তুপুঞ্জের সম্ভার নিয়ে নিছক বাস্তবের দৈন্য ও দারিদ্র্যকে প্লাবিত করে ফেলেছে। সংঘাত থেকে কল্পনাকে টেনে একটু বেশী বাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, এলিয়ট যাকে বলেছেন 'কল্পনার প্রলাপ', সেই প্রচেষ্টার কাব্যরূপ সিটোএলের সংকলনে দেখে তিনি অত উল্লাস প্রকাশ করেছিলেন।

কেউ কেউ বলেছেন সিটোএলের কবিতা পড়া মানে টক আপেলের টুকটুকে রং দেখে রাগ মাখন বসিয়ে দেখে আফশোষ করা। এরকম ধারণা অসংগত হলেও এই ভ্রান্তির প্রধান কারণ বোধহয় সিটোএলের কবিতার বর্ণাঢ্যতা অথচ প্রবল অ-রোমান্টিকতা। তাঁর বহু কবিতার প্যাটার্ন বা আঙ্গিক নিয়ে এতো খুঁতখুঁতে, এতো ব্যস্তবাগীশ সে সময়ের অন্য কোন কবিকে দেখা যায় নি। স্বভাব-প্রেরণার সংগে যুদ্ধ করা আধুনিকতার প্রথম দিনগুলির অবশ্য বিষয় ছিল। চার্বিশায়ারের আঙ্গলিক ডাকাবুকো ও বেপরোয়া মেজাজ অথচ পাশাপাশি একান্ত সমর্পণের সংগে ঈশ্বর বিশ্বাস এই দুই সম্পূর্ণ বিরোধী চরিত্রের সার্থক সমন্বয় এডিথের কবি-চরিত্রে চিরকালই অব্যাহত থেকেছে। ভিক্টোরিয়ের কবিকুলের প্রায় সকলেই জনিয়ান কবিদের শুশ্রূষা সম্পর্কে পরম আগ্রহী ছিলেন, সিটোএলও তার ব্যতিক্রম নন। হ্যাথারলেল ও অলবার্ট সিটোএলের সংগে তাঁর সম্পাদিত 'ওয়েলস: এান এান্থলজি অব মডার্ন ভার্স'-এর এই বিরক্তির প্রচুর চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায়। আবার তারই পাশাপাশি সমকালের রাজনীতি থেকে সযত্নে প্রস্থানকারিণী এডিথের পিরার রেনিশ হলের নাইটদের রক্তের ও ঐতিহ্যের টান ছিল প্রবল। অতীতের কোন কিছুকেই প্রাণভরে স্বীকার করতে পারছেন না অথচ নির্দিষ্ট রাজনৈতিক ও সামাজিক নবা-দর্শন না থাকায় প্রাচীনকে ছেড়ে যেতে পারছেন না—দধ্য ভিক্টোরিয়ের এক ত্রিশঙ্কু-বিদ্যুতে তাঁর অসহায় অধিষ্ঠান একান্তই করুণ। ভালবাসিত সমস্ত কিছুরই পরিপতি নিয়ত রক্ষণোক্ষণে ও ক্রমাগত পচনে—এই বোধই সিটোএলকে ভাবিয়ে তুলেছিল। ফলে অনিবার্যভাবে বিষয় ও বক্তব্য ছেড়ে তিনি ঝুঁকে পড়লেন প্রকরণের দিকে—শান-পালিশে উজ্জ্বল সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম করে তুললেন সমস্ত আলংকারিক কলা-কে। এ যুগের প্রতি আবেগহীনা এডিথ অতীতাচারেও যখন শান্তি পেলেন না তখন তাঁর কল্পনাকে আহার যোগানোর জন্যে আপাতঃ অবিশ্বাস্য, অসম্ভব ও অলৌকিক দ্বিতীয় পৃথিবী বাক্তিত্বাকার মাটি দিয়ে তৈরী করলেন। স্বাধীনতার অপিতব্যবহারের

বরুণ তাঁকে কর্কশ সমালোচনার চাবুক খুব কম খেতে হয় নি। নারীসুলভ হৃদয়ের নির্বিচার ব্যবহার, বারোক-প্রতিমা সৃষ্টির ঝোঁক, অপ্রচলিত বিশেষ্য ও বিশেষণের পরিপক্ষ ঘটানো ইত্যাদি ব্যাপারে সিটোএলের প্রবণতা উত্তর-সূরীদের বিশেষ প্রভাবিত করেছিল। তাঁর কবিতার যদি প্রথম প্রথম অনেকেরই ভাল লাগে নি এবং তা নিয়ে খুব একটা হৈ চৈ হয় নি। বেশ বয়স হলেও নিশ্চিত পদক্ষেপে প্রবেশ করে তিরিশের কালের পাকাপাকি তা আলোচনার আসর জাঁকিয়ে বসল। এই দশকেরই শুরু থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হল এবং সিটোএলের কবিতাতেও অস্থির পরিবর্তনের দিক খুলে গেল। জনৈক সমালোচক নিপুণভাবে এই পালাবদলকে বিশ্লেষণ করেছেন—During the war years Edith Sitwell took a step forward which carried her into the forefront of English letters. Much that was playfully and wilfully decorative disappeared from her verse; keeping the richness of her technique she increased its somberness, and relaxed her strictness in order to put the decoration at the service of content. She became a prophetess instead of Harlequin.

সিটোএলের কবিতার শিল্পবস্তুগুলি বড় এলোমেলো ছড়িয়ে ছিল বলে যাঁরা আক্ষেপ করতেন সচকিত হয়ে তাঁরা দেখলেন আগেকার ভারী পোষাক খুলে ফেলে এডিথ কখন সরাসরি লক্ষ্যের দিকে ছুটে চলেছেন। একটিও অনাবশ্যক পংক্তি এখন কি শব্দ ব্যবহৃতও হচ্ছে না, কবিতার কারুকাজে কোথাও বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না—পরন্তু তাঁর অক্ষর-নৈপুণ্য ও প্রযৌক্তিক ক্ষমতা যুগপৎভাবে ইঙ্গিতময় বা বেদনাঘন সৃষ্টি করছে। নিরীক্ষার অবশ্য তিনি আদ্যন্ত অনলস, তবে তা আর উদ্দেশ্যহীন শব্দসন্ধান বলে হারবার্ট রিড্-ও মনে করতে পারছেন না।

সিটোএলের পারিবারিক আভিজাত্যের দেউলেপণাকে এ যুগ সমর্থন করে না। 'দি সিপিং বিউটি', 'ট্রয় পার্ক', 'দি প্রেজারস্ অব পোয়েট্রি' ইত্যাদি গ্রন্থে তিনি সেই প্রাক্তন সুষমার জন্যে হা-হুতাশ করেছেন। তাঁর 'দি উডেন পেগাসাস', 'বিউকলিক কমেডিস্' বা 'ক্যাসাড' গ্রন্থেও অনুরূপ রোমান্টিক আর্তনাদ অশ্রুত নয়, বরং বংশকৌলিন্যের পশ্চাদ্-ভূমিতে আরও প্রকট। তৃতীয় দশকের ব্যাপক অস্বাচ্ছন্দ্য, আর্থিক ও সামাজিক দ্বন্দ্ব এবং আধ্যাত্মিক বৈষম্যের মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃতির হিরণ্যপ্রভা যতই তার দ্যুতি হারাচ্ছিল, এডিথের শোক, ততই কাব্যময়তা লাভ করছিল। তবে তাঁর কবিসত্তার এক বজ্রকঠিন বন্ধনী ছিল, যা তাঁর কবিতার কোন বিপর্যয় বা অনিয়ন্ত্রাচার ঘটাতে দেয় নি। এই কারণেই হয়ত বিষয় নিয়ে বেশী চিন্তিত না হয়ে অক্ষরের শিল্পনৈপুণ্যের ওপর তিনি আজীবন এত জোর দিয়ে গেলেন।

চল্লিশের কাল থেকে এডিথের কবিতা পূর্বালোচিত নতুন পর্যায়ে রূপান্তর পেতে থাকে। তাঁর ক্ষীণ ও বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর ক্রমশঃ ভারী ও আবেগপ্রবণ হয়ে ওঠে। ১৯৩৯ থেকে পাশ্চাত্য কবিতায় যে ব্যাপক পালাবদল এল, তার প্রধান কারণ বোধহয় এই যে আমরা এই সময়েই প্রথম একান্ত স্পষ্টভাবে আমাদের কালের হৃৎস্পন্দন শুনতে পেলাম। কবিতার ক্ষেত্র কেবল আয়তই হল না, এত বিচিত্র বস্তুর আমদানী, ডিটেলস্ এর এত প্রয়োগ-চাতুর্য ও বিভিন্ন বিরোধী ভাবের একই সঙ্গে অনুপ্রবেশ আর কোন সময়ে দেখা যায় নি। আঠার শতকের অভিজাত-ঐতিহ্যের পৃষ্ঠপোষিকা সিটোএলের কবিতায় সাম্প্রতিক ভাব-প্রকাশের ভিক্ত ও কর্কশ রীতির যথেচ্ছ বিন্যাস চল্লিশের শুরু থেকে বিশেষ ভাবে চোখে পড়ে। প্রতীকবাদী কবিতার প্রতি তাঁর পূর্বকার আসক্তি অনেকখানি কমে আসে এবং প্রাচীন ও নতুনের

সম্বন্ধে তিনি যে বিচিত্র টোন-ইফেক্ট পাশ্চাত্য কবিতার আনলেন, তা তাঁকে প্রচুর খ্যাতি ও সিদ্ধির সাধীপ্যে এনে দিল। সিটোএল সমগ্র কবি-জীবনের ইতিহাস কবিতার ক্রম-পরিণতির নির্ভরযোগ্য ইতিহাস।

আরো দু দশকের ওপর তিনি কাব্য-চর্চা ও সমালোচনা করেছেন এবং এলিয়ট হপকিনস ও ইয়েট্‌স্ এর সঙ্গে তাঁর নাম উচ্চারিত হয়ে থাকে। রীতিবাদী রিড্ তো মনে করেন এজিথ অন্য সব কবি অপেক্ষা পরবর্তী কালকে অনেক গভীর ও ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করবেন। তিরিশের ঘরে যাঁর প্রবেশ তাঁর কবিতার স্থায়ীত্ব কোন স্থবির ভবিষ্যৎ শতক বিচার করবে। শুধু আন্তরিকতা ও অনলস পরিশ্রমে কতদূর হাঁটা যায়, তার আদর্শ হিসেবে সমালোচকেরা বহুকাল এজিথের দিকে আঙুল তুলে দেখাবেন।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

●

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

জোয়ার

উপন্যাস
পঞ্চাশের পর

বিজন কুমার ঘোষ

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল। তন্দ্রার ঘোরে স্বপ্নের ছায়া-পাত ঘটল নিঃশব্দে। যেন আবার সেই মধুবনপুর। বাড়ি বাগান ছাড়িয়ে বড় রাস্তার পাশে বটগাছের নিচে শান্ত দীঘি। বটগাছের ঝুরি নেমে গেছে চতুর্দিকে। দিনমানেই জায়গাটা অন্ধকার। দীঘির জলের রং তাই কালো। জলের ওপর ভোরের বাতাস। আলোক আদ্দির পাঞ্জাবী গায়ে হরিণের চটি জুতো পরে সেই দীঘির ধারে এসে দাঁড়িয়েছে। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। প্রায় ভোর। জলের রং পলাশ ফুলের মত লাল। কারখানার ফাঁক দিয়ে সূর্য উঠছে। আলোক সেইভাবেই আধ-শোয়া হয়ে রয়েছে ইজিচেয়ারে। বিছানা খালি। কেয়া এইমাত্র বাথরুম থেকে বেরুল।

—একটু আগে দেখলাম তুমি ঘুমোচ্ছ, তাই ডাকিনি।

আলোক তাকাল মুখের দিকে। ঘুমে চোখ ফোলা। গঙ্গার বাতাস সারারাত ঘুমপাড়ানি মাসিপিসির গান গেয়েছে।

পাশের চেয়ারটায় বসে পড়ল।

—সারারাত এখানেই ছিলে?

মাথা কাৎ করল আলোক।

—ধন্য ছেলে! তুমি এখনো ছেলেমানুষই আছ।

বেটেলের বয় চা নিয়ে এল গলা খাঁকারি দিয়ে। আলোক ইশারায় জল দিতে বলল এক গ্লাস। চা খেতে খেতে ঘড়ির দিকে তাকাল। ঘড়ি বন্ধ হয়ে গেছে। এখন ক'টা বাজে কে জানে। কলকাতার ট্রেন-ই বা ক'টায়? সোজা বাড়ির নেমে অফিস যাবে। শরীরে দারুণ বেদনা আর ক্লান্তি। এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছে না এখানে।

আলোকের স্বল্প ছটফটানি দেখে কেয়া বলল, অত ব্যস্ত হচ্ছ কেন? কলকাতায় ফেরার অনেক ট্রেন আছে। এক-সঙ্গেই যাব।

—ধন্যবাদ।

ঈষৎ চমকে উঠল কেয়া।

—তুমি আমার ওপর এখনো রাগ পুষে রাখছ!

—আগে রাগ ছিল। এখন নেই।

—বুঝতে পেরেছ তাহলে?

—আলবৎ।

—যাঁ, সেটাই ভাল—খুশি হল কেয়া: যত তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা বুঝতে পারবে ততই মঙ্গল—

উঠে দ্রুত পায়চারী করতে লাগল আলোক। বারান্দার পরিসর ছোট। চারদিকেই ফুলের টব। বারান্দা থেকে সিঁড়ি নেমে গেছে সোজা গঙ্গার ভিতরে। এখন জোয়ার। সিঁড়ির নাবখানটা ভয়ংকরভাবে তাজা। আলোক তরতর করে সেই জায়গাটাও পার হল। স্নিগ্ধ জলে হাত পাতল, পা' ডোবাল। ইচ্ছে হল ডুব দিয়ে একেবারে গহীনে তলিয়ে যায়। সমস্ত শরীর জুড়ে কি অদ্ভুত জ্বালা পোড়া। চোখ দুটো করকর করছে। ঠাণ্ডা জল চোখে দিল। কেয়া প্রচুর ঘুমিয়েছে। দেহে মনে কোন রকম উদ্বেগ নেই তাই ঘুমও

এসেছে। অথচ বোকার মত আলোক সারারাত শুধু কষ্টই পেল। মনস্তাত্ত্বিকদের অভিমত, মেয়েরা যদি নৃশংস হয় তাহলে নিষ্ঠুরতায় পুরুষদেরও হারিয়ে দিতে পারে। নিশ্চিত কেয়ার হাতে যদি রাজাপাট আর কামান বন্দুক থাকত তাহলে ও দ্বিতীয় হিটলার হতে পারত। লজ্জিত মুখার্জীর বাগদত্তা, তবু কি অজ্ঞানে আলোকের সঙ্গে মিশেছে। যেন প্রথম প্রেমিক। চোখ মেলে যেন আলোককেই প্রথম দেখেছে। খেলা ফুরিয়ে গেছে। তাই এতদিন পর বলছে, এবার চলনাথ। হাত ধরে খেলার ঘর থেকে আঙন নিয়ে খেলার ঘরে পৌঁছে গেল অপূর্ব বাচালতা নিয়ে, সার্কাসের মেয়েদের মত। মুখে একটুও বিকার নেই।

নিচু হয়ে হাত পা ছড়িয়ে একটু বাধার সৃষ্টি করতেই স্রোত কলকল করে ডেকে আপত্তি জানাল। সময় একদিন বয়ে যাবে। কাল একদিন সব হরণ করে নেবে। চুল পাকবে, চামড়া ঝুলে যাবে, গাঢ় কমলা রঙে কালচে ছোপ পড়বে। আলোকও রিটায়ার করবে। ছায়া ফিরি করা পসারী বিকেলে দোতলার বারান্দায় মৌজ করে বসে সিগারেটের বদলে গড়গড়ার নল তুলে নেবে। মনে পড়বে—একদিন যৌবন ছিল, কেয়া ছিল, কলকাতার পথে ঘাটে অচিন রহস্যময়তা ছড়িয়ে ছিল। বোটানিক্যাল গার্ডেন, রেড রোড, গড়ের মাঠ—কত কি! একদিন সন্ধ্যায় চন্দননগরে গিয়েছিলাম। মোরান সাহেবের বাগানের নতুন হোটেলে কি কান্নাই কেঁদেছিলাম ছেলেমানুষের মত। কেয়া চলে যাবে এই ভয়ে। ভাবতে ভাবতে গড়গড়ার নলটা হাত থেকে খসে পড়বে। অমনি ষোল বছরের তন্বী নাতনী এসে সস্নেহে ধমক দেবে, তুমি আজকাল বড্ড আনমাইণ্ডফুল দাদু! সত্যি, কি ছেলেমানুষ ছিলাম সেদিন—এই কথা মনে পড়ায় পলিত দাঁতের ফাঁক দিয়ে হেসে উঠবে বারবার। কেয়া এখন কোথায়, কার কাছে! হয়ত সজিত মুখার্জীর নাতি নাতনী পরিবৃতা হয়ে মুদিত নয়নে সুখে গীতাপাঠ করছে। সেদিনের কান্নাটা ছিল সত্যি। আজকের পড়ন্ত আলোয় সমস্ত ব্যাপারটা ছেলেমানুষী মনে হওয়াও সত্যি। মহাকাল একটা প্রবল ঢেউ দিয়ে উঁচু নিচু সব সমান করে দিয়েছে। আবার সূর্যটা যেখানে একটু আগে ডুবে গেল সেখান থেকে আরেকটা ঢেউ অন্তর মত জীবনের দিকে এগিয়ে আসছে। এর পর পৃথিবীতে পড়ে থাকবে কিছু ধুলো, কিছু ছাই। তবু এখনকার কান্নাটা মিথ্যে নয়। বড় নিষ্ঠুর আর নিরাকরণ। ভিতরটাকে ক্ষণে ক্ষণে রৌদ্রতপ্ত মাঠের মত শুষ্ক করে দেয়। আলোক অন্যমনস্ক হবার আড়িপাত চোখে মুখে বেশ করে জল দিল। তারপর সাবধানে ভাঙা জায়গাটা পার হয়ে বারান্দায় উঠে এল। কেয়া আগাগোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করছিল ব্যাপারটা। নিশ্চিন্ত হল।

—আমি ভাবছিলাম জলেই না ঝাঁপ দিয়ে বস—

—বোকারা জলে ঝাঁপ দেয়।

—এই তো চালাকের মত কথা।

ঘরে ঢুকে টেবিল থেকে ব্যাগটা তুলে নিল। তারপর দরজা খুলে বারান্দার ওপাশে ম্যানেজারের ঘরে গিয়ে উপস্থিত হল। ম্যানেজার চোখে আতস কাঁচ লাগিয়ে ঝুঁকে পড়ে কয়েকদিনের বাসি কাগজে চোখ বুলোচ্ছিল। কোন্ দেশী ঠিক বোঝা যায় না। টকটকে রং। চামড়া ঝুলে গেছে। আধ বয়সী পায়জামা। সোনী গায়ে। পরিষ্কার বাংলা বুলি মুখে। একদা নাকি রেইন গাছ সুদূর অস্ট্রেলিয়া থেকে এনে এদেশে লাগান হয়েছিল। এখন ডালে পাতায় ঝুলে আচ্ছন্ন আকাশ দেখে কে বলবে বিদেশী!

ম্যানেজার চমকে উঠে একগাল হেসে হাত বাড়িয়ে দিল। আলোক করমর্দন করলো।

—আমাদের দিক দিয়ে কোন অসুবিধে হচ্ছে না তো স্যার!

—না।—আলোক একশো টাকার নোটটা বাড়িয়ে দিল: কত বিল হয়েছে!

ম্যানেজার ভেবেছিল বহুদিন পর দুটি সার্থক কপোত-কপোতী এসেছে। পদ্মার হাওয়ায় শরীর জুড়িয়ে যাবে কিছুদিন। স্বাধীনতার পর হোটেলের দেওয়াল থেকে কেবলি আস্তর খসে পড়ছে। তাই বিস্মিত হয়ে বলল, সে কি স্যার, চলে যাবেন?

—হ্যাঁ, আমাদের কলকাতায় বিশেষ দরকার।

—দরকার থাকে তো কলকাতায় যান, আবার ফিরে আসুন।

—তা হয় না।

—আপনাদের নিজের অর্ডার চলে গেছে।

—বেশ তো, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পাঠিয়ে দিন।—একশো টাকার নোটখানা টেবিলেই ফেলে দিল।

—জানেন, আপনাদের পোয়েট ট্যাগোর এ জায়গা কত ভালবাসতেন। কত কেতাব লিখেছেন।

আলোক হেসে ফেলল।

—সত্যি ম্যানেজার। টাগোর পোয়েট বলেই ভাল লেগেছিল। সবার কি ভাল লাগে?

অগত্যা ম্যানেজার নোটটি তুলে নিল। এমনই হোটেল একশো টাকার ভাঙানিও পাওয়া যায় না। ম্যানেজার হোটেলের ছোকরাকে পার্শ্ববর্তী কোন গদীতে পাঠাল। আলোককে প্রায় দশ মিনিট বসে থাকতে হল।

যখন ঘরে এল কেয়ার স্নান ঘরে গেছে। ইযারজোলি কেশের জন্যে ওর ব্যাগে সর্বদা ছোট পাউডার থাকে। খোঁপায় একটি ফুল গুঁজে বারান্দায় গুনগুন সুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আলোক ঘরে ঢুকে জামা খুলে ফেলল। প্রচুর ক্লান্তি জমেছে শরীরে। ঘুমে ফেলতে হবে। অনেক টাকা দেওয়া হয়েছে হোটেলে। হোটেল একটু ব্যবহার না করলে টাকাটা সার্থক হবে কি করে। তোয়ালে-রুমালটা নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল। বাথরুমের বহু শীতল আবহাওয়ায় শীত করতে লাগল। টব ভর্তি জল। দেওয়ালের রং ফিকে সবুজ। মেঝে আর দেওয়ালের খানিকটা অংশ পুরোন আমলের রঙিন পাথর দিয়ে মোড়া। সুন্দর ছবি ফুটেছে। সামনে অদ্ভুতদর্শন মুখ করে কতকালের মযুর। কত মানুষের পায়ের চিহ্ন এখানে। সন্ধ্যকাল রাত্রি আটটায় কেয়া আলোকের পদধূলি পড়েছিল। আজ একটু পরেই চলে যাবে। খেলা ফুরিয়ে গেছে। এই ঘরে এই বাথরুমে এই বারান্দায় আবার পদ্মার বাতাস ঘা ঘা করে ঘুরে বেড়াবে। পুরোন ধরনের পাল্লার গোপন বাথার মত শব্দ শব্দ উঠবে। যেন আলোকের ব্যথাটাই প্রতিধ্বনিত করবে বিনিদ্র রজনীর সাক্ষী ঘুণধরা পাল্লা। দেওয়ালে গাঁথা কাঠের আলনা। মস্তবড় আয়না। কাঁচের গায়ে ফোঁটা ফোঁটা জল। কেয়া স্নান করতে গিয়ে লেগে গেছে। সেলফে ফেনামাখা পীয়ার্স সাবান। সমস্ত ঘর জুড়ে কেয়ার গায়ের গন্ধ।

আলোক এক টানে সব কিছু খুলে আয়নার সামনে দাঁড়াল। নিজেকেই কয়েক মুহূর্ত বিভোর হয়ে দেখল। রায়বংশের শেষতম ধারার রূপপতন সুরু হয়ে গেছে। উত্তেজনার পরপারে ফোটা সুখি ফুলে পচন ধরেছে। ওপরে কাঁচের ভিতর দিয়ে আসা নীল আলোয় ঘরখানার অদ্ভুত রূপ। টবের জল সমুদ্রের মত নীল। শীত। কোথা থেকে এত শীত উড়ে এল? চারধারে ভৌতিক নৈঃশব্দ। কেয়ার গন্ধ ঘরময়। হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠল। আস্তে আস্তে ভিজে মেঝের ওপরেই শুয়ে পড়ল। এই গাঢ় দুঃখ থেকে যেন কিছুতেই মুক্তি পাওয়া যাবে না। একদিন সব ছেলেমানুষী মনে হবে। অথচ আজই যদি মনে হত! ভিতরে দারুণ ব্যথা জমে ওঠায় ঠোঁট দুটো বেঁকে গেল। কিছুতেই সোজা রাখতে পারল না। সেই বাঁকা ঠোঁটের ভিতর দিয়ে অদ্ভুত সুরের কান্না বেরুতে লাগল। খানিকক্ষণ এইভাবে গেল। তারপর কান্নাটা নিজের কানেই মৃদু বিশ্রী শোনালে ধীরে ধীরে উঠে টবের নীল জলে ডুবে গেল। শুধু চোখ আর নাক জেগে থাকায় মুখটাকে একটা পুরোন ব্যথা-

ভয়া ঐতিহ্যওয়ালা মানুষের মত মনে হল। যেন আলোককে কোলে তুলে সন্তর্পণে দেখছে। আলোকের এবার তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করতে বাধল না। হঠাৎ অবরুদ্ধভাবে এই ধরধারা কেনে গেল একজন মানুষের গোপন কান্না। কিন্তু কেয়া কোনদিন জানবে না। হঠাৎ এই সময় অফিসের কথা মনে পড়ায় জল ছেড়ে উঠে পড়ল। তোয়ালে-রুমালে মুছে ফেলে জামা কাপড় পরে বেরিয়ে এল।

—বাব্বাঃ, এত দেরী হল? আমি ভাবলাম বুঝি ঘুমিয়েই পড়লে—

আলোক কিছু বলল না। আয়নার সামনে পকেট চিরুনী বের করে চুল আঁচড়ে নিল। গঙ্গার দিকে তাকাল। রোদের ঘোড় সওয়ার আকাশ ছুড়ে চড়ে বেড়াচ্ছে। নদীর জল ঝিকমিক্ করছে। এখনও জোয়ার। দেশী নৌকো একটাও নেই। ইঞ্জিনের বাচ্ছে পানাবোট নিয়ে। তারপর সুবিধে মত এক জায়গায় রেখে হালকা হয়ে চলে যাবে। ঠিক কেয়ার মত। আলোক পানাবোট ছাড়া আর কিছু নয়। ছিঃ ছিঃ!

বয় এই সময় দুটো টেবিল পাশাপাশি সাজিয়ে জল আর নুনের পাত্র রেখে গেল। কেয়া তাড়া দিল, এবার ওঠ, কাল সারারাত খাওনি—

ঘৃতাক্ত ভাতের থালার সামনে আলোকের ক্ষুধাবোধটা কিছুক্ষণের জন্যে চাপিয়ে উঠল। ভাতের মধ্যে আঙুল চালাতে চালাতে মনে হল কয়েক গ্রাস মুখে তুলতে পারবে। ভাবতে ভাবতেই ভাবনাটায় যেন আলস্যের বরফে ঘরে গেল। বয় অত্যন্ত বিনয় সহকারে জানাল, আজ্ঞে, এই গঙ্গার ইলিশ, খুব স্বাদের—

কেয়া বিরক্ত হয়ে তাকাল।

—ও কি করছ? খাও না—

এক গ্রাস মুখে দিয়ে বলল, ইচ্ছে করছে না।

—সবটারই একটা সীমা থাকা দরকার।

—দোহাই, উপদেশ দিও না।

—উপদেশ নয়। কিন্তু তুমি বড্ড বাড়াবাড়ি করছ।

—তুমি বাড়াবাড়ি করনি?

—না মোটেই বাড়াবাড়ি নয়। আমি আপাদোড়াই স্বাভাবিক।

—এতদিন চোরের মত প্রেম করেছ, এটা বাড়াবাড়ি নয়? আমার দেহ-মন ভেঙে দিয়েছ, এটা বাড়াবাড়ি নয়?

খোঁচা খেয়ে উঠল কেয়া।

—তুমি বাড়াবাড়ি বললেই বাড়াবাড়ি হয়ে যায় না—

—কিন্তু তুমি বললেই হয়।

—আমি কোন কিছু গোপন করতে পারি না, তাই আঘাত করতে তোমার সুবিধে হয়।

—কিন্তু এতদিন তো লজিত মুখার্জীর গল্পটা গোপন রেখেছিলে?

—আভাসে ইঙ্গিতে নিশ্চয়ই বলেছি। তুমি বুঝতে না পারলে আমার দোষ?

—সত্যি, তুমি যে লজিত মুখার্জির বাপদত্তও এ বুঝতে পারিনি। আর তুমি যে আমাকে বন্ধুর মত ভালবাস, মায়ের মত স্নেহ কর, এ তত্ত্বটাও যে কি কৌশলে এতদিন গোপন রেখেছিলে, তাও আমার অজানা—

—আমি তোমার সাথে তর্ক করতে চাই না—।

—চাইবে না, সে তো জানিই। কারণ তোমার কোন যুক্তি নেই, এক মানুষকে ঠকান ছাড়া—

—তুমি অত্যন্ত ইতর। তোমার ভাষা আজকাল কোন বাধাই মানছে না।

—মুখের ভাষা তোমার অসহ্য লাগছে কিন্তু কাজে করতে বাধে না।—আলোক এখন মরীয়া।

কেয়া বাতটা নাড়িয়ে রেখে নদীর দিকে তাকিয়ে একটু সময় কি যেন ভাবল। বলল, ঠিক আছে, তখন যদি

তোমাকে কিছু বলে থাকি তা ছিল সত্যি, এখন যা বলছি, এও সত্যি।

—চমৎকার!

—তুমি লিখেছিলে তোমার কাছে নাকি আমার দুয়ার খোলা, যাবার দুয়ারও খোলা। তা এখন যাবার দুয়ার খোলা নেই কেন? চিঠিটা রেখে দিলে প্রমাণ থাকত!

আলোক বিস্ময়ে কাঠ হয়ে তাকাল।

—সেই সরল কথাটার যে এত প্রচণ্ড মানে থাকতে পারে বুঝতে পারিনি কেয়া। ক্ষমা কোরো—

—ক্ষমার প্রশ্ন আসছে না আলোক।

—বিশ্বাস কর, তোমার গত কিছুকালের ব্যবহারে আমার কুড়ি বছর বয়েস বেড়ে গেছে।

—তোমার মনের বয়েস বাড়ছে শুনে খুশি হলাম।

—কিন্তু তোমার বয়েস কমে যাওয়াতে দুঃখ পেলাম।

—না কমেনি। তুমি যদি কুড়ি বছরের বাড়তি অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখতে তাহলে দেখতে পেতে বয়েস একই আছে।

—আমি ভেবেছিলাম আমাদের প্রেম চিরস্থায়ী—

—তুমি বোকার স্বর্গে বাস করছিলে তাই। জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয়। একদিকে ভাঙছে অন্যদিকে গড়ছে। যে এই ভাঙাগড়াটা সমানভাবে ধরতে পারে সেই প্রকৃত জ্ঞানী।

—হ্যাঁ, আমার দিকে যে ভাঙছে সেটা কিছুদিন হয়েই বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু কোলিয়ারী মালিকের দিকে গড়াটা ধরতে পারিনি।

—তুমি অত বিদ্রূপ মিশিয়ে কথা বল কেন? আমিও তো বলতে পারি তুমিও আমার দিকে ভেঙে মিনতির দিকে গড়ছ।

—বলতে পার, কিন্তু বলনি। কেননা তুমি জান, ওর মধ্যে খুব বেশী সত্যি নেই।

—কেন থাকবে না? আমি জানি আমরা কেউ-ই ওয়েল বালানসড্ নই। হয়ত আমি তোমার মনের একটা দিক পূরণ করি, মিনতি আরেকটা দিক—

হঠাৎ বিষণ্ণ হেসে উঠল আলোক। কেয়ার সামনে দীপ্তির মত মিনতির জন্য কেন ওকালতি করতে গেল? কেন বলে ফেলল ওর মধ্যে খুব বেশী সত্যি নেই? আলোক জানে এর পর কেয়া বলবে, তুমি আমার মনের একটা দিক পূরণ কর, সঞ্জিত মুখার্জী আরেকটা দিক—

আলোক হেরে গেল। যাকে বলে ক্লিন পরাজয়। কেষ্ট বিষ্টুদের মৃত্যু হলে মুখে মুখে তা ছড়িয়ে যায়। লোকজনের ভিড়, কাগজের রিপোর্টার, শোক প্রস্তাব, সমবেদনা—কত কি! কিন্তু পাড়ার পাঁচু দিকদারের মৃত্যু হলে কেউ জানতেই পারে না। বেচারা হয়ত ষোল বছর ধরে বাস করছিল, মরার পর মুখটাই কারো মনে পড়তে চায় না। শ্মশানে নিয়ে যাবার লোক জোটে না। শেষে হিন্দু সৎকার সমিতির গাড়ি এসে নিয়ে যায়। আলোক পাঁচু দিকদারের চাইতেও অধম। ছি! ছি! একদিন আলোক কেয়ার সামনে কেঁদেছিল। সে খবর হয়ত কোলিয়ারী মালিকের কানে পৌঁছে গেছে। হয়ত কেয়া স্বপরামর্শ চেয়েছে, আমি একজনকে বন্ধুর মত ভালবাসি, ভাই-এর মত স্নেহ করি, কিন্তু সে প্রেমিকের মত ভালবাসে। বিদ্রূপ করে কি উত্তর দিয়েছে কোলিয়ারী মালিক কে জানে। হয়ত ওদের সাংকেতিক ভাষায় বলেছে, আমি তোমার পাস্ট হিস্ট্রি জানতে চাই না—

আলোকের বন্ধু বান্ধবেরা বলে, তোকে যে পাবে সে ধন্য হবে। মেয়েরা বলে, আমরা লেভেল ক্রসিং পেরোতে চাইলেই বা কি, আলোকবাবু আমাদের নেবেন কেন? আলোকের আছে আর্থিক নিশ্চয়তা, সুকান্তি, বংশ মর্যাদা; উপরন্তু ছবির মত বাড়ি আর স্নেহময়ী মা। আলোকের তীব্র অনুভূতিপ্রবণ মনের ভালবাসা বুঝি কোথাও বাধা

পেতে জানে না। শুধু বাধা পায়। অপার খেলাধুলার পর হঠাৎ কারো কাছে একদিন মনে হয় :

অর্থ নয়, কীর্তি নয়, স্বচ্ছলতা নয়—
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;—

আলোক তাকিয়ে দেখল উজ্জ্বল সোনালি রোদে আকাশ বাতাস নদী ভরে গেছে। জলের সিঁড়ি কেটে হেলে দুলে জল চলেছে উজানে। স্টীমারের ভোঁ। বলে কারখানার সিরেন্টে দুই পায় আষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধানো। চিমনীর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মেঘের বিস্তার। "যে গঙ্গার দুই তীরের শোভা দেখে নাই সে বাংলার প্রকৃত রূপ দেখে নাই"—এই কথা কয়টিকে তীব্র ব্যঙ্গ করবার জন্যেই যেন কারখানার ভেপু বেজে উঠল আর অমনি পিঁপড়ের মত মানুষগুলি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে চলল। কেয়া ঠিক যেন এই মুহূর্তের সন্তান। তাই ক্লান্তি ওর শিরায় শিরায়। হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে আলোককে ভীষণ ভাল লেগেছিল। কিন্তু 'প্রেম - শিশু - গৃহ - নয় সবখানি' মনে হতেই কোথে কোথে ক্লান্তি ভর করে। এই ক্লান্তি কোন নতুন বোধের জন্মতে উত্তরণের জন্যে নয়। শুধু নতুনত্বের আশায় মুখ বদলানো। সাময়িক শান্তির জন্যে তেমনি ফন্দেরও প্রয়োজন। আলোক জানে এরা কারখানার সকাল আটটার ভেঁপুর ফসল। কারখানা কিছু সুখ, কিছু স্বাচ্ছন্দ্য, কিছু ধোঁয়া আকাশের বিনিময়ে কেয়াদের আয়ু কিনে নিয়েছে। তার বদলে দিয়েছে অবিরাম ক্লান্তি। বংশ পরম্পরায় তা সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। কেয়ারা একদিন নিঃশেষে ধ্বংস হয়ে যাবে। তার আগে শুধু নতুন নতুন মনে মুখ বদলাবার পালা। ক্লান্তির দিকে সামর্থিক পিঠ ফিরিয়ে বসা। আর যেন একটা অবান্তর আহিলা যায়। কেয়ার আলোক জানে, সাততলা বাড়ির চিলেকোঠা আকাশের কাছাকাছি থাকায় প্রচুর আলো হাওয়া যায়গা। কিন্তু যে কেউ কি একেবারে ওখানে পৌঁছুতে পারে? তাকে এক-তলার নোংরা অন্ধকার স্যাঁতসেতে ঘরখানার ভিতর দিয়েই যেতে হবে। তেমনি প্রেমেরও চিলেকোঠা আছে। সেখানে অফুরন্ত আলো বাতাস পান সৌন্দর্য। কিন্তু সেখানে পৌঁছুতে হলে দেহের আপাত নোংরা ঘরের ভিতর দিয়েই যেতে হবে। আলোকও একদিন ভেবেছিল, আমরা একদিন প্রেমের চিলেকোঠায় পৌঁছব। বৃদ্ধ বয়সেও আমাদের প্রেমের আলো বাতাস পান সৌন্দর্য অটুট থাকবে। হায়, পলকা সুতোর রঙিন ঘুড়ি উড়িয়েছিল আকাশে। সুতো ছিঁড়ে গেছে। রঙিন ঘুড়িটা কোথায় মুখ থুবড়ে পড়েছে কে জানে।

সব শুদ্ধ মোটা পাঁচেক চিঠি লিখেছে আলোক। কেয়ার নাকি সেগুলি পড়তে দারুণ ভাল লেগেছে। জমা করে রেখেও দিয়েছে গোপনে। যাক, আর শেষ একটি চিঠি লিখবে আলোক। আপন মনেই গুণগুণ করল কিছুক্ষণ। অবশেষে ভাষাটা যেন জালে ধরা পড়ল। সম্ভবত এই রকম তার রূপ হবে—আমি মুক্ত। নিজেকে হালকা একটা ছোট পাখির মতই ফুরফুরে লাগছে এখন। বিদায়! তোমার খাঁচে ঝুলে তোমার দেওয়া অনুগ্রহের ছাতু ছোলা আর খাব না। পালেই নীল আকাশ পড়ে আছে। উড়ে চললাম—

প্রতিবেশী নীল আকাশ আর উড়ে চলবার বাসনা আলোককে মাতি দিল। ঝড় থেমে গেছে যেন। ঝড়ের পর অবসাদ অবশিষ্ট আছে মাত্র। কিন্তু তা বিগতীর কেটে যাবে। অনুকূল বাতাস উজাছে চারধারে। আর পাঁচটা বিষয়ে নিয়ম মেনে চলে, সুতরাং এই ব্যাপারেও প্রকৃতির অনুশাসন মেনে চলবে। যা ঝরে যাবার তা ঝরে যাবেই।

জোর করে কাউকে ধরে রাখা যায় না। সুতরাং উড়ে যাওয়ায় দুঃখ নেই।

কেয়ার দিকে তাকাল। ওর খাওয়া হয়ে গেছে। হাত ধুতে বারান্দার বেসিনের দিকে চলে গেল। আলোক ইতিপূর্বে মুখ ধুয়ে এসেছে বাথরুম থেকে। জাজিম দেওয়া খাটের একপাশে এসে বসতেই আচমিতে কেয়া এসে হাতটা ধরল—

—আমি, বিশ্বাস কর, তোমার কাছে ছোট হতে চাই—

আলোকের ঠোঁটের কোনায় মৃদু কৌতুক খেলে গেল। নতুন নতুন নাটক। এতও জানে!

—আবার কি অপরাধ করলাম?—এবার সত্যিই বিরক্ত লাগছিল।

কেয়া কাঁপছে।

—প্লিজ, ঠাট্টা নয়। সিরিয়াসলি বলছি। তোমার কাছে অপরাধ করেছি অনেক। তার জন্যে ক্ষমা চাই না। তোমার ভালবাসার গভীরতা বুঝি। তাই তোমার চোখে চিরদিন ছোট থাকতেই চাই যাতে সহজে আমাকে ভুলতে পার—।

—কিভাবে ছোট হবে? বয়সে না উচ্চতায়?

—দোহাই ঠাট্টা কোরো না। আমি যা বলব পৃথিবীর কোন মেয়ে কোন পুরুষের সামনে তা উচ্চারণ করে না—

—তাই নাকি? তা কি নিষিদ্ধ বাক্য উচ্চারণ করতে চাও তুমি?

—তুমি আমাকে যতই আঘাত কর, আমি মনে করব এ আমার প্রাপ্য শাস্তি।

—নাটক বাদ দিয়ে আসল কথাটা বললে হয় না? কলকাতায় ফিরতে হবে।

কেয়ার বুকটা আবেগে ওঠানামা করছে। নদীর বাঁধখানে তাকাল, কারখানার দিকে, তারপর সোজাসুজি আলোকের চোখে—

—সঞ্জিত মুখার্জীর কাছেই আমার বেশী সিকিউরিটি। বিহারে ওদের পাঁচখানা কোল মাইন। তা বাদে কলকাতায় তিনখানা, রিচিয়ায়, বম্বে, লণ্ডনে বাড়ি আছে। আধুনিক যুগে স্বাচ্ছন্দ্যের জন্যে আমি অত্যন্ত প্রয়োজন মনে করি এসব—

—আহা, বেশ বেশ। সেলে থাকতে দেবে তো?

—হালদার ছবির মত বাড়িটা মাঝে মাঝে মনে পড়বে বৈ কি। ভালও লাগবে। কিন্তু চিরদিন পোষাবে না, এ জানি। তাছাড়া তোমরা তোমাদের নিরালা রাজ্যে আমাকে উৎপাত মনে করবে।

—বাজে কথা না বলে তোমার কম সিকিউরিটির কথাই বল। নিজের ইচ্ছেটা অপরের ঘাড়ে চাপাতে চাইছ কেন?

—ঠিক কথা। সিকিউরিটি কার্স্ট, সিকিউরিটি লাস্ট।

—ধন্যবাদ। এতদিনে রূপটা সরে স্বরূপটা বেরিয়ে পড়ল। ভেরি থ্যাঙ্কস!

—কেন বিদ্রূপ করছ? তুমি সিকিউরিটি চাও না? আগে যে কোম্পানিতে ছিলে সেখানে কম মাইনে বলে এখানে চলে আসনি? আরো ভাল চান্স পেলে অন্য কোথাও চলে যাবে না? তাহলে?

—তোমার চোখে রক্তমাংসের মানুষ আর কোম্পানি কারখানা তাহলে এক পর্যায়ের?

—আমি তোমার মত কবি নই, তাই এক পর্যায়ের দেখি।

—তুমি দেখছি মুক্ত পুরুষ। টাকা মাটি মাটি টাকার পেয়ানা সংস্করণ।

—তুমি যতই বিদ্রূপ কর আমার গায়ে কিছুই লাগবে না। আমি নিজে থেকেই অনেক নিচে চলে গেছি। তুমি আর কি ফেলে দেবে?

আলোক আর কিছু বলল না। দ্রুত বারান্দায় চলে এল। প্রবল বাতাসের মধ্যে সোটা চারেক কাঠি নষ্ট করে

সিগারেট জ্বালাল। মনের ভাবটা গোপন করবার জন্যে অথবা চিন্তার তীব্র প্রবাহে নিজে থেকেই পায়চারী করতে লাগল পা' দুটো। সামনে আয়না থাকলে দেখতে পেত মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। যতই স্মার্ট উত্তর দিয়ে ব্যাপার করতে চেষ্টা করুক, পরাজয় পরাজয়ই। অন্য কোন কিছুর প্রলেপ দিয়ে পরাজয়ের ক্ষত ঢাকা যায় না। একটি পুরুষ আরেকটি পুরুষের কাছে হেরে গেছে। এর চেয়ে মর্মান্তিক আর কিছু নেই। তবু আগের যুগের সামনাসামনি লড়াই-এর মধ্যে বলিষ্ঠতা ছিল, বীর্যবত্তা ছিল। এখনকার পরাজয় চোরাগোপ্তা আক্রমণের মুখে সহসা বিপর্যস্ত হয়ে যাওয়া। একটুও অবসর পাওয়া যায় না। আর চিরজীবন গোপন ক্ষতের চিহ্ন বয়ে বেড়াতে হয়।

সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলল অনেক দূরে। পুড়তে পুড়তে আঙুলের কাছে চলে এসেছিল, খেয়াল ছিল না। আরেকটা ধরাল অনেকগুলি কাঠির বিনিময়ে। এপাশে ওপাশে যতগুলি কারখানা ছিল, প্রত্যেকেই চিমনির নাকে প্রাণপণে কালো নিঃশ্বাস ফুঁসতে লেগেছে। নীল আকাশ আচ্ছন্ন করছে নকল মেঘে। আলোক জেগে উঠল। তোমার চোখে চিরদিন ছোট থাকতেই চাই যাতে সহজে আমাকে ভুলতে পার। কেমন সুন্দর মিনেকরা কথা। তুমি তো ছোট এমনিতেই আছ। তুমি তো সকালে আটটার কারখানার ভেপুর ফসল! তোমাদের সিকিউরিটির অন্ত নেই। উত্তেজক খেলায় মুহুর্মুহু ঠোঁট না ছোঁয়ালে জীবন বিস্বাদ হয়ে ওঠে মুহূর্তে। আর আমি? উত্তেজনার পরপারে আনন্দের, আরামের, স্নিগ্ধতার ফসল। তবে তোমাদের সংখ্যাই পৃথিবীতে প্রবল। আমাদের প্রতিনিয়ত গ্রাস করছ। তবু আমরা আছি মাথার ওপরে ধ্রুবতারার মতন। কোনদিন নিঃশেষে হারিয়ে যাব না। হারিয়ে গেলে বুঝতে হবে পৃথিবীর ঘোর দুর্দিন!

এবার ভাবতে ভাবতে আলোক ঘরে ঢুকল, অনেকটা সম্রাট আলেকজাণ্ডারের ভঙ্গীতে। কেয়া গালে হাত দিয়ে তখনো চিন্তাক্লিষ্ট। তাকিয়ে থাকতে থাকতে আলোকের ঠোঁটে গোপন হাসি খেলে গেল। শিকারী বিড়ালের খাবার ইঁদুরের মত আদিম ইচ্ছেটা চুপিচুপি উঠে এল। বলল, তুমি আমাকে যত বড় করলে নিজেকে ছোট করে। কিন্তু কি জান, আমার কেবলি পুরোন দিনের গল্পের কথা মনে পড়ছে—

—কি গল্প?—ঠিক বুঝতে না পেরে চোখ বড় বড় করল।

—ওই যখন ইউরোপে দুবেলা লড়াই হত তার গল্প। দুজনে সামনা সামনি রিভলবার নিয়ে দাঁড়িয়ে যেত—

—কিন্তু তা কি এখন চলে?—ম্লান হাসল: পুলিশে ধরবে যে—

—ঠিক বলেছ। সভ্য সমাজে চলে না। কিন্তু সুন্দরবনের বাঘেদের সমাজে এখনো চালু আছে।

—তাই নাকি?

—সেখানে একটি বাঘিনীর সামনে দুটো বাঘ প্রচণ্ড লড়াই শুরু করে দেয়। শেষে একটি আহত হয়ে পালিয়ে যায়। তখন বাঘিনী উঠে এসে বাঘটাকে আদর জানায়।

—ঠিক তাই। মানুষের মধ্যেও তা চালু আছে বৈ কি।—হাসল: প্রকৃতির নিয়ম মানতেই হবে।

—সামনা সামনি লড়াই-এর মধ্যে বলিষ্ঠতা থাকে। কিন্তু এটা পেছন থেকে চোরের মত আক্রমণ নয় কি?

—তা যুগভেদে রূপ বদলায় বৈ কি।—আবার হাসি।

একসঙ্গে হাসি দেখতে দেখতে আলোকও হেসে ফেলল। এখন যেন একটুও গ্লানি নেই।

—খুব হাসি পাচ্ছে।

—হ্যাঁ, খুব হাসি আমি। কেউ জানে না, হাসির ছিপি দিয়ে দুঃখটাকে বুকের বোতলে এঁটে রাখি—।

—আচ্ছা কথা দিলেছ দেখছি !

—তোমার সঙ্গে মিশে মিশে।—হাসির পারদ আরেক প্রস্থ চড়ল।

এর পর দু'জনের মনেই কলকাতার ট্রেন উঁকি দিল। দু'জনেই তৈরী। বয় পেটের কাছে একটিমাত্র রিকশা ঠিক করল। আলোকের ইচ্ছে ছিল আলাদা রিকশায় যায়। কিন্তু এক হোটেলে রাত কাটিয়ে ভোরবেলায় দুই রিকশায় চাপা ম্যানেজারের সামনে দৃষ্টিকটু। আলোক তাই চুপ করল। পিছন ফিরে তাকিয়ে দেখল একবার। সেই পদ্মা —পাখির ডাকে মুখরিত ছায়াচ্ছন্ন সেই স্টীমার। বিদায় হোটেল ডি প্যারিস। এক রাতের পান্থনিবাস। বিমিশ্র রজনীর সাক্ষী চন্দননগর। বিদায় ! বিদায়।

[ক্রমশঃ]

অনিল ব্লাকেন্সর
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩'৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতোগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১'২৫

"... নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

(রজনীকান্ত : কবি ও গীত সাধক—২৫২ পৃঃ পর)

মধ্যে। এই নীতির মধ্যেই তিনি আবিষ্কার করেছেন জীবনের অমৃতত্ব—তাই কাব্যগ্রন্থের নামকরণ হয়েছে 'অমৃত'। গদ্য রেখায় সেখানে জীবনের বোধ ও বোধিকে তিনি ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন—

নদী কভু পান নাহি করে নিজ জল,
তরুগণ নাহি খায় নিজ নিজ ফল।
গাভী কভু নাহি করে নিজ দুগ্ধ পান,
ধর্ম করে নিজ রূপে অপরে শোভিত,
বংশী করে নিজ স্বরে অপরে মোহিত।
শস্য জন্মাইয়া, নাহি খায় জলধরে
সাধুর ঐশ্বর্য তবু পরহিত তরে।

পরোপকার : অমৃত

কান্তকবির 'সদ্ভাবকুসুম' ও 'অমৃত' কাব্য রসনিষিক্ত জীবন বোধের অমৃতলোকেরই পন্থা নির্দেশ করছে। 'অমৃত' কাব্য প্রকাশিত হয়েছিল কবির জীবদ্দশায় এবং এ গ্রন্থটির সুষ্ঠু ও সার্থক প্রকাশনার জন্যে কবির উদ্বেগের ও আকাঙ্ক্ষার শেষ ছিল না।

৪

ব্যাধিগ্রস্ত রজনীকান্ত আত্মস্থ-মানসিকতায় কবি হলেও যুগ ও জীবনের নিয়ন্ত্রণে বাস্তব ভিত্তিক গঠনমূলক ভূমিকাও রচনা করেছিলেন তাঁর এক জাতীয় কাব্যধারায়। তাঁর সেই কাব্যবিভাগটি হল স্বদেশ প্রেমের কবিতা। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' চতুর্থ খণ্ডে বলেছেন : 'স্বদেশী আন্দোলনের সময় রজনীকান্তের গান দেশের সর্বত্র জনগণের চিত্তে যতটা আবেগ চঞ্চলতা জাগাইয়াছিল ততটা রবীন্দ্রনাথের গান ছাড়া আর কোন রচনার দ্বারা হয় নাই। কবিতা হিসাবে রজনীকান্তের রচনার বিশেষ দাম নাই, কিন্তু গান হিসাবে তাহার সাময়িক মূল্য ছিল। এই বিষয়ে রজনীকান্তকে কালী নজরুল ইসলামের অগ্রজ বলিতে পারি।' এ মূল্যায়ন একটু নির্মম—কিন্তু সত্য। দ্বিজেন্দ্রলালও স্বদেশী গান রচনা করে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। এ-গুলি বিশ্লেষণ করলে এর মধ্যে বক্তৃতামুখ্য তথা উদ্দেশ্যমূলক দিকটি অভিধাত্মার স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু রজনীকান্তের এ জাতীয় গানে রসসংগীতের প্রেরণা যেমন ছিল—তেমনি ছিল সাংগীতিক একটি দিক। স্বদেশী আন্দোলনের সেই ভাবপ্লাবনের দিনে সহজ সুরে সহজ বক্তব্যকে পৌঁছে দিয়েছিলেন রজনীকান্ত—যার প্রেরণা তুলনাতীত :

মায়ের দেওয়া মোটা কাপড়
মাথায় তুলে নেরে ভাই।

তাঁর স্বদেশ প্রেমের কবিতায় প্রবল ধ্যানের গৌরব ছিল না—ব্যাপকতর তত্ত্বের ব্যাখ্যা ছিল না। কিন্তু ছিল জনচিত্তজয়ী মজবুতার বিস্তৃতি। তাঁর এ জাতীয় কবিতায় স্বতন্ত্র রীতি আছে—নিরাভরণ সারল্যের প্রাচুর্য প্রতি ছত্রে উপস্থিত।

৫

রজনীকান্তের স্বদেশপ্রেমের সর্বোত্তম উৎস হল তাঁর হাসির গানের, ছত্রে ছত্রে নির্ঝর। হাসির গানে অবশ্য দ্বিজেন্দ্রলালের মতো সমকালীন জনচিত্তে সে চাঞ্চল্য আনতে পারেন নি। তাঁর হাসির গানে ব্যঙ্গের প্রদাহ ছিল না—ছিল স্নেহের প্রলেপ। সে উচ্চরোল হাসি ছিল নির্দোষ এবং আলাহীন। উদরবিলাসী ব্যক্তির প্রতি তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তব্য :

যদি কুমড়োর মত চালে ধ'রে রত,
পানতোয়া শত শত;
আর সরষের মত হত মিহিদানা
বুঁদিয়া বুটের মত!

ইতিহাস প্রসিদ্ধ চরিত্রগুলির মধ্যে বৈপরীত্য এনে কখনও কখনও তিনি হাস্যরস সৃষ্টি করেছেন :

'আকবর শাহ কাহা দিত কিনা,
মুমতাজমহলের কটা ছিল বীণা,
বসুধা ছিলেন বীণা কিংবা পীণা,
এ-সব করিয়া বাহির, বড় বিদ্যে করেছি জাহির।'

৬

কাব্যে রজনীকান্ত সংগীতের আদিক এনেছেন। তিনি সহজ সুরের কথাকার এবং সহজী স্রষ্টা। তাঁর গানের কারুণ্য, স্নিগ্ধতা এবং নিবিড় রসসৃষ্টির ক্ষমতায় সংগীত সাধক রজনীকান্ত অনন্য। তাঁর গীত সাধনায় পরীক্ষামূলকতার দ্বন্দ্ব বা নানামুখী বৈচিত্র্য অনুপস্থিত। যে জাতীয় গানে আবেগ, সুর কিংবা কথাসৃষ্টির স্বতঃস্ফূর্ততা থাকে—সে জাতীয় বিষয়-বস্তুকে তিনি গ্রহণ করেননি। প্রকৃতি ও প্রেম পর্যায়ের গান তাঁর নেই। কোন এক সমালোচকের এ প্রসঙ্গে একটি সুন্দর মন্তব্য চোখে পড়েছিল—'প্রকৃতি প্রসঙ্গে তাঁর নীরবতার কারণ সহজেই অনুধাবন করা চলে। তাঁর দৃষ্টিতে যদি পৃথিবীর সমস্ত সৌন্দর্যই ভ্রান্ত দেহাত্মিকাবুদ্ধিসংকুল, অতএব বর্জনীয়।' প্রকৃতির মধ্যে অন্তর্মুখী চেতনার সূক্ষ্ম-ব্যাপক ক্ষমতাও তাঁর ছিল না। প্রেমের গানও তিনি রচনা করেননি। প্রেমের রহস্যময় গভীর বেদনা ও আনন্দের অনুভব। সাধারণ দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবতা আনন্দের বাইরে প্রেমের সূক্ষ্ম গভীর ও রহস্য-নিবিড় বৈচিত্র্যের উজ্জ্বলতায় তাঁর কবি-আত্মার সাড়া ছিল না। দৈবী বিশ্বাসের আবরণে অন্ধ শান্ত অনুভবই ছিল তাঁর ধর্মের কথা। তাই অকৃত্রিম শান্ত রসই তাঁর কবিতা বা গানের প্রধান সুর। এই জাতীয় সুন্দর, সরল, স্বাভাবিকত্ব সৃষ্টির ব্যাপারটিও যে প্রচুর অনু-শীলন ও দক্ষতাসাপেক্ষ ব্যাপার এ কথা নিশ্চয়ই কেউ অস্বীকার করবেন না। ভক্তিগীতিতে তিনি টানার সুর আনেননি—হৃদয়ের অনবদ্য স্বতঃস্ফূর্ততাই এনেছেন। মাঝে মাঝে একঘেয়ে সুরের মধ্যেও বিস্ময়ের চমক এসেছে। ছন্দ আর সুর পার্বতী-পরমেশ্বরের মূর্তির মিলনে অদ্ভুত সাদৃশ্য পেয়েছে। সুর রচনায় চেষ্টাকৃত কারুপ্রয়াস উপস্থিত না থেকেও রাগসংগীতের মাধুর্যে তা মণ্ডিত হয়েছে। গীত সাধনায় তিনি রবীন্দ্রনাথের সম্পূর্ণ বিপরীত কোটী। দ্বৈত-বাদী দু'জনেই—কিন্তু সাধনার পন্থা বা রীতি ভিন্ন। জীবনেশ্বরের কাছে সুরের দীক্ষা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ সুরের স্বরচিত পুষ্পাঞ্জলি নিবেদন করেছেন তাঁরই পদপ্রান্তে—কিন্তু দেহাত্মিক বুদ্ধির ভ্রান্তিজনিত উপলব্ধির বেদনাই রজনী-কান্তের গানে ও সুরে প্রধান কথা হয়ে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল, অতুলপ্রসাদ—নজরুলের মতো বিচিত্র সুর বয়নের নানামুখী প্রয়াস রজনীকান্তে নেই। সমকালীন যাত্রা বা থিয়েটারের সুরের অভিযোজন তিনি অনুসরণ করেছেন—কিন্তু পাশ্চাত্য সংগীত বা রাগসংগীতের মৌলিকতায় তাঁর সহজ সাবলীল সাধনা। সংগীত ও সংস্কৃত ভাষার ব্যবহারে তিনি যে স্বাক্ষর রেখেছিলেন তার পশ্চাতে ব্যক্তিগত জীবনের প্রভাব হয়তো ছিল। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি তারকেশ্বর চক্রবর্তীর কাছেই যুগপৎ সংগীত ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেছিলেন। তাঁর গানের ভাষার নীতির অনুশাসন রসের ক্ষেত্রে অনুত্তীর্ণতার আর একটি কারণ। নৈতিক শাসন দিয়ে গানের দুয়ারে সুরের রাজাধিরাজকে স্পর্শ করা যায় না।

পরিশেষে আবার সেই কথাতেই ফেরে টানা যেতে পারে—কবি ও গীত সাধক রজনীকান্ত আত্মনিবেদনের কবি—শান্ত নিবেদ তাঁর কবি-আত্মার পরমতম পাঠ।

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধ লে শ্ব রী

প্র বো ধ ব ন্ধু অ ধি কা রী

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

না, কেউ জানত না ; জানতে পারে নি।

মধু কৈবিত্তির দুয়ারে ফুর্তির মেলা বসেছিল। ড্যাগ দুই ভাতের সরবৎ নিমেষের মধ্যে ফুরিয়ে গেল, আর সেই বিষ আকণ্ঠ গিলে মেউলী মাঝিপাড়ার মানুষেরা উন্মত্ত উদ্দাম। ঝুরঝুইয়া কানাইয়ের ঘুনুসি গগনা নাচন গাওনায় কাহিল হয় নি, অন্তর নেশা তার পা দুইখান ধরে টান মারছিল, চোখ ঢুলুঢুলু, ঘাড়খান দুমুল গাছের কচি ডগার তুল্য যেন বাতাসে নড়বড় করে—সোজা হয় না, হয় না—ঝুলে পড়ে, ছাতা খায় আর মহাজনে বাঙালী শিকারী বকের ঘেটির তুল্য ঢেউ মারতে থাকে। গগন তখনও গেয়ে যাচ্ছিল। অসংখ্য খেমে খেমে কড়ানো গলায় বলা অবিশ্রান্ত গানের কলি···নইলচার মইগে পানি কে রাখিল ডাব্বা···হুকারে পরাণের···

পরাণ গেদাশ দুই সরবৎ গলায় ঢেলে নেবে পড়েছিল আসরে, গগনা বেয়াইয়ের সঙ্গে খানিক নাচল, শেষে দরাসরি চলে এল পাকঘরের দিকে। তার চোখ লাল, পা টলছিল। কানচির কাছে দাঁড়ানো চারুর মুঠিখান গাঙের বুকে বহু দূরের কোনো ঘাঙ্গাদারী নাওয়ের বাদাবের নাহাল কাপসা কাপসা অস্পষ্ট ঠেকছিল। এগিয়ে আসতে সেই মূর্তি স্পষ্ট হয়ে ধরা দিল।

মজা দেখছিল চারু। পাকঘরে কুপি জ্বলছে, খানিক কপাটের ফাঁক দিয়ে নেশাড়ে মানুষের মূর্তি দেখেছে। কিন্তু ফাঁকটা এত ছোট যে চারু প্রায় কিছুই দেখতে পাচ্ছিল না। অবশেষে নেমে এসেছে চারু। কানচিতে। অল্প আড়াল আবডাল, ফলের ভারে আনত কামরাঙার গাছের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। পাকা কামরাঙার অম্বলী গন্ধ এখানে ম ম করে, ছায়াছায়া ভাব ঘরে আছে গোটা কানচিখানায়। চারুর খুব মজা লাগছিল। হালাক বাতিখান সাঁ সাঁ করে জ্বলছে, গোটা দুয়ারে যেন দুইজনের রোশনী। আঙনায় হুলস্থুল বন্ধে। মধ্যপাড়ার নন্দকিশোর, বৈকুণ্ঠ, বলাই, ঢেংঠা, উত্তরপাড়ার অনন্ত, ভোম্বল আর সাঁইদার কোকিলার সঙ্গে মিলল মুন্নারী নাচ নাচছে ঝুরঝুইয়া কানাইয়ের বড় কুটুম গগইন্তা বাবি। নাচ দেখে হাসি পাচ্ছিল চারুর। কারণ আসরের সবগুলো লোকই নেশার ঘোরে বেদামাল হয়ে পড়েছে।

'বউ ' পরাণ কাছে এসে ডাকল, অল্প জড়ানো গলায়।

চারু কিছু বলল না প্রথমে। কারণ আসরে মূর্তিবাজ তামাম মনিষ্যির চোখগুলো এতক্ষণ পরাণের ওপর ছিল, এখন তারা চারুকেও দেখতে পেয়েছে। চারু লাজ পেয়ে ঘোমটা টেনে দিয়েছিল। পরাণ কাছে আসতে সে অল্প সরে দাঁড়াল। জিভে কামড় দিয়ে ফেলেছিল।

'বউ···'

'ক্যা···' চারু চাপা কিনকিন গলায় জবাব দিল।

'বোকনাখান বাইর কর বউ, আর এট্‌ন খাই···'

'আর নাই', চারু মাথা নাড়ছিল, 'এক মুটাও নাইক্যা—সব বাটা গুলাইয়া ফ্যালাইচি···'

'তুই তুগা কথা কইবার নইচস বউ···' পরান অকারণে হেসে উঠল, হোঃ হোঃ করে হাসল খানিক। পরে সেই গমক কমে এলে অনুনয়ের গলায় বলল, 'তর দুইখান পা ধইরা কইতাচি বউ, দে, আর এট্‌ন খাইবার দে···'

চারু চায় নি, বেশি নেশা করে পরান বেসামাল হয়ে পড়ুক। তাই ভাতের শেষ বাটনা গোলা বোকনাখান পইঠার কাণ্ডিতে সাইয়া রেখে এসেছে। মুরারী এখন যতই খুশামদি করুক চারু কিছুতেই তার হদিস দেবে না, না। কারণ সে বুঝতে পেরেছে, আসরের পতিকখান সুবিধার লাগে না। 'অত খাইলে বাবায় গুসা করব।' ভিন্ন পথে বাধা দেবার চেষ্টা করল চারু। কিন্তু কার কথা কে শোনে! পরান পাট-আগ দেওয়া পচা জলের মইষ্যা জোঁকের তুল্য চারুকে ধরে ফেলেছে। 'অরে ছুঁইয়া কই বউ, বেশি খামু না আমি ···না—সাচাই কই তরে···আবার করকর করে হেসে উঠল পরান। 'গগইন্যা বিয়াইয়ের তামাসাখান নি দেখচস বউ? কেমুন নাচে দেখ···' আবার উন্নসিত হাসি ফেটে পড়ল এই কানচিতে। 'অরে না, আর দুই পালি খাওয়াইয়া দলাখান ···' কথাটা শেষ করতে পারল না পরান। চারুর আঁচলখান ধরে হাসতে হাসতে বসে পড়েছিল। অবস্থা এমন, যেন এখনই লুটিয়ে পড়বে পরান, কানচিতে গড়াগড়ি খাবে।

মুখখান পাকা করমচার তুল্য টকটকে হয়ে উঠল চারুর। কী লাজ! কী লাজ! চারুর মনে হ'ল, মুখখান মাটির মধ্যে গুইজ্যা দিবার পারলে সে বাঁচত।

যা ভাবা, তাই কাজ। চারু চোখ তুলে দেখল, দুয়ারের আসরের নাচ থেমে গেছে, মেশাড়ে মানুষগুলো ভাবভাব করে তাকিয়ে রয়েছে এ-দিকে। চারু পালাতে গিয়েছিল, কিন্তু পারল না। হেসে কুটিপাটি সেলেও শক্ত হাতে পরান বউয়ের আঁচলখান চেপে ধরে রেখেছে। সেই টানে চারু বসে পড়েছিল। আর অমনি সোটা আঙিনা জুড়ে হাসির হুল্লোড় উঠল। সেই সঙ্গে আবার উদ্দাম নাচ।

মা, বাধা দিতে পারে নি চারু, পইঠার কাণি থেকে বোকনাখান বের করে এনে দিয়েছিল।

এখেন ভাতের সরবৎ না, মদ্যের অমৃত। আসরের মানুষেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল এসে। আর চক্ষের নিমেষের সোটা পাত্রখান উজার হয়ে গেল।

ফুরফুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম গগন বোকনাখান ঘরে গলায় ঢালছিল, আর ঠিক তখনই কাণ্ডটা ঘটে গেল। সাইয়ার কোকিলা ছুটে এল সঙ্গে সঙ্গে। বোকনাখান ছোঁ মেরে কেড়ে নিয়ে তা টুপির মতন পরিয়ে দিল গগইনা বাজির মাথায়। সরষতে সরষতে গুটা মুখখাখা হুরলাপ। কী হাসি, কী হাসি। দুয়ারের আনাচে কানাচে ভিড় করা ঝি বৌয়েরা কলকল করে হেসে উঠল।

এতক্ষণে হুঁশ হ'ল গগনের। হ্যাঁ, এরই মধ্যে আসল গলাখানে সে চিনে নিতে পেরেছে। ঠিক চিনেছে, পাকু বৈষ্টিমির মাইয়্যা মাইয়া নিখিরে।

একটানে পারে নি, বার কয়েক টানাটানির পর মাথা থেকে বোকনা সরাতে পেরেছিল গগন। গামছায় মুখখান মুছে নিতে যতটুকু সময়, তারপরই ধাওয়ার ধাপটে গুড়ির ছেঁড়া লেজুরের মতন সাঁ করে ছুটে গেল গগন, গিয়ে দাঁড়িয়েছিল উত্তর কানচিতে।

এমনটা হবে ভাবতে পারে নি নিখি। গুরুপুলার আসর দেখতে এসেছিল সে। বেলাবেন সাধু ছড়া গাওনা গাইব, আসরে নাড়ুর লুট হইব, তাবে উবলা খাইয়া নাড়ু খাওনের কায়দা দেখব পুলাপানের। সেই সুবাদে আইন। কিন্তুক এহন দেহ বরাবাটায় নিশার ঘুরে বরে কি। উ—বা, ছি ছি··· নিখির সারা শরীরের রক্ত যেন আচমকা উঠে এল মুখে।

কী সরম, কী সরম! শুটা পাড়ার মাইনষেরা জানান পাইয়া গেল গা মনের কথাখানের। দুঃখে বেদনায় রাগে এবং লজ্জায় ঘরে যেতে ইচ্ছে করছিল; ভিতের সকল মেয়েরা তাকিয়ে আছে, মিটিমিটি হাসছে কেউ কেউ। নির্মলা ভিড় ঠেলে পালাতে চাইছিল, কিন্তু পারল না—আশপাশের বউঝিরা ততক্ষণে জাপটে ধরে ফেলেছে মিথিকে। সকলে মিলে ঠেলে দিচ্ছিল তাকে ঘুরঘুইরা কানাইয়ের বক্ষ ফুটুষ গগন মাঝির দিকে।

'উ মা গ, তলে তলে এত···'

'অ নিধি, চা চা, চক্ষু দুইখান মেইল্যা দুখাগের মানুষ-ডারে দেইখ্যা ল'

'পরানখান জুড়াইয়া লও দুখাগী ··'

'আমাগো সাইজা বউ তাইলে হাচা কথাই কইছিল গো···'

'তাই তো কই, মাইয়ার মনমন জান যায় গো বড়ই তলায়!'

'আশনাইয়ের ফুলখান যে ফুইট্যা গেছে···'

ঘরের মধ্যে যেতে চাইছিল পাকু কৈবিত্তির মাইজা। মাইয়া নির্মলা। অল্পক্ষণ ছটাপুটি ধস্তাধস্তি হ'ল, শেষে কায়ক্লেশে সকলের হাত ফসকে বেরিয়ে গেল নির্মলা। একছুটে মধু কৈবিত্তির বাড়ির সীমানার ওপারে একেবারে।

ঠিক দুইতান তলায় এসে দাঁড়াল নিধি। হিঃ হিঃ হিঃ ওর সমস্ত মনখান খোচড় মাইরা ওঠে। সব জানান পাইয়া গেল, আইজা ফেলাইল পাড়ার তাবাৎ মাইনষেরা। আহন আমি কী করি···কী···নিধির গলা বুক আলা করে কান্না এল। কাছে পেলে নিধি এখন গগনের পিরানখান ভীষণ আক্রোশে খামচে ধরত। 'মন লইয়া পারি ছা খালি, তাই তুমার হাতে তুইল্যা দিলাম তারে। তুমি যুকলা না, যুকের পিঞ্জরাখান আমার পুইড়্যা ছাব হইয়া যাইতাছে গা···' ক্ষুব্ধতার রাগে ক্ষিপ্ত অপমানে এবং আক্রোশে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল নির্মলা। 'যেই যুকের বাত্তারে তুমি বাদাতে ছড়াইয়া দিয়া হাল, তুমার মরণ নাইক্যা···?' সন্ধ্যারাতের নিশুতি প্রহরে নির্জন ছাইতান তলায় যৌবনবতী কুমারী কন্যা কাঁদে। ফুঁপাইয়া ফুপাইয়া কাঁদে, এই দিগরে তার মনের দুঃখু বুঝনের মানুষ নাই।

আকাশের কোথাও বুঝি ঝড়ঝর চলছিল। মেঘে আর বাতাসে চুশিসারে কথা লাগে, ফুঁসমন্তর দেয় বলেশ্বরীর কানে, আর ভেজী মেঘে ঘুমের উস্কানিতে গর্জে ওঠে। অজভেজী ঢেউয়েরা দিগুণ আক্রোশে ছুটে যায়; বলেশ্বরীর গহীন তলদেশে ঘুমনো দৈত্যটা বুঝি জেগে ওঠে আচমকা—আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা পাথের পানি গুলি-খাওয়া কানা গুণ্ডের মতো দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে গোঁ গোঁ করে ছুটে বেড়ায়। তারা শিকার চায়, শিকার।

নৈঋতের আকাশে ঝড়ঝর লড়ায় আয়োজন। আকাশের তামাম কালা মেঘেরা নিমন্ত্রণ পেয়ে ছুটে চলেছে। জিন্দুবনের কেউ জানে না, জানত না আজ, দ্যাঁ আজই দিগ্বিজয়ী ঝুমা নিয়ে তাণ্ডব নৃত্য নাচবে গাঙ বলেশ্বরী। তার নির্মম বীভৎস মুখব্যাদন এক এক করে গ্রাস করবে গাঙ পেরাম, অনেক পিরতথাত্তীর ঝকঝকে উঠানবাড়ি, ক্ষেতিখামার আর বিশাল বিশাল মাঠ ময়দানের দিগর।

আকাশে কাতা কাতা কালা মেঘের মেলা, মেঘ ফুরনো ধরলা ফেলাচিটে তোবক দিঁড়ে কেউ ছড়িয়ে দিয়েছে আকাশের আঙিনায়। থাবচা থাবচা নীলাভ অংশগুলো ঢেকে যাচ্ছিল এক এক করে। মাঝে মাঝে আকাশ চেরা আলো চিরিক দিচ্ছিল।

ঝিমুমি ধরেছিল ধানমাড়ুনির।

গাঙরার এক কোণে বসে আদরের ঘুড়ি দেখছিল। মধু

এর মধ্যে বার দুই এসে তাগিদ দিয়ে গেছে। 'অ মা, শুইবা না ?'

মানদা কথা বলে নি।

'পুলাপানেরা ঘুমি কইরা রাইত পুহাইয়া ফেলাইব নি। অত রাত জাইগ্যা তুমি বইয়া থাকবা নাহি ?'

'থাহুম' মানদা নিধা নাক জবাব দিয়েছে। 'বড়ছুরের একখান রাইত জাইগ্যা থাকলে মহাভারত অশুদ্ধ হইয়া যাইব না।'

আর কথা বলে নি বধূ। পাশে দাঁড়িয়ে খানিক হুকা টানল ঘুরুক ঘুরুক করে। আসরে নাচন কুঁদন দেখল, শেষে নিধা চলে গিয়েছিল তার পুব দুয়ারী ঘরখানে।

ঘরখান বড় ফাঁকা, কেউ নেই ও ঘরে··· মানদাসুন্দরী তাকিয়ে ছিল। দুইখান না, পাঁচখান না—একটা পুলা তার বইছা। এই পুলার নামে অজ্ঞান আছিল অর বাপে। কী আদর, কত সুহাগ ! পুলারে ফালাইয়া কিয়ারায় যাইবার মন নাই বাপের, ঘরের কানচি ছাড়বার চায় না। কিন্তুক প্যাট বইছা একখান বস্তু আছে তো মাইনষের। ওদিলদার নায়েবের ঘর না যে বইয়া বইয়া খাওন আইব। জাত ব্যাপার পুত, গাছের কেরপা, নাওয়ের দাতরি আর বাপার মেহনত লইয়া বাজিগাতের সংসার—তার নি বইয়া থাকলে চলে ?

···সেই আদুইরা পুলাখান বড় হইল, তাগদে জিনিসে বাজিগাচার গরব। বাপ কয় অরে মেহাপড়া শিখাইব··· উঁ মা, সে কি কথা গো। মাজির পুতে হাতের নসি বৈঠা ফেলাইয়া নি ধরব কলম। ছিঃ ছিঃ অধম্ম অধম্ম···। তাবে মানদার কথাই সাচা হইল। বইছা বাইঠ্যা ডুইল্যা নিল হাতে, বাপনদারী শিখ্যা ফেলাইল। আর যায় কুথায়। শরীলে গন্ধরে ভরাট পুলাডা পাকা বাপনদার বইয়া দুই হাতের মুইঠ্যা ভইরা ট্যাকাডা পয়সাডা আনবার লাগল ··।

···তারপর বিয়া। কত কুটুম আইল গালো, কত না সমধ্য। বাইয়া মেহনের সে কি ঘটা। উঁ মা তাবে কিনা লাল-পাওয়ের বাইয়ার খুলন বরাদ। বেতরাইলের পেরথুম মাজির রাঙা বাইয়া সেইধ্যা আইছিল পুলায়। কইকরার বাপরে বিয়া পেরস্তাব দিল। সেই বিয়া। কিন্তুক আবাগীর বেটির ঘরে মন বরল না। পেরথম পুলাখান বিয়াইছিল, আর এটা আইবার আগেই নিশুতি রাইতের বেলায় কুন দিগরে যে, পলাইয়া গেল কেউ কইবার পারল না।

···মাইনষে কয় ভাইগ্যা গেছে আকের লগে। উঁ মা। সেকি অলুক্ষের কথা গো। সমাজে মুখ থাকে না। তিন দিন পরে লাস পাওয়া গেল নাওখাটার কাছে। আবাগীর মনডায় যে কী আছিল কে কইব, গলায় কলস বাইয়া মুখপুড়ী গাঙের পানিতে ডুবাইয়া মারছে নিজেরে···

ঘুমে জখম ধরা ধরেছিল, হঠাৎ চেঁচামেচি হৈ হুল্লোড় আর কলকলানি হাসির শব্দে জেগে উঠল মানদা। আসরের নাচন থেমেছে, হুকার ঢপ গানখান আর গাইছে না কেউ ; হাসচে সবাই। হাসে ক্যান ? 'অ পরাইছা, অ চারু ওরা হাসছ ক্যান গো ? হইল কী ?' বুড়ি হাতিয়ে হাতিয়ে লাঠি-খান পেল। তারপর নেমে এল সিধা দুয়ারের ওপর। 'কই হাসনের কামখান কি হইল এহানে ?'

কেউ তাকাল না, কথা বলল না কেউ। মানদা বাতাসে যেন কিসের গন্ধ পেয়েছিল। আকাশে তাকাল সঙ্গে সঙ্গে। গোটা আকাশ ফাইজ্যার আগে বৈঠকে বসা সাঁইদার দুয়ানের মুখের তুলা। কান পাতল মানদা। শেষে সে শুনতে পেল রাক্ষুসী গাঙের বিশ্বগ্রাসী গর্জন। বাতাসের তেজও ততক্ষণে চড়ায় উঠেছে।

খুব বেশিক্ষণ না, গোটা কয়েক লহমা কাটতে না কাটতেই আচমকা বাতাসের ঝাপট আছড়ে পড়ল ছেউনী মাজিপাড়ার ওপর। তারপরই অঝোর ধারা বৃষ্টি। বধূ বৈবিত্তির দুয়ারে লাগা বন্যার আগর দেখতে দেখতে ভেঙে গেল। যে যেদিক পারল চোচা দৌড় মেরেছিল।

দিগন্ত জুড়ে নামা চড়া বৃষ্টির ছাট বাতাসে ভর করে

এসে আছড়ে পড়ছিল চালে বেড়ায় দরজায়। যেন বৃষ্টি না, বল্লমের খোঁচা। দেখতে দেখতে কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে সব একশা। মেউলী মাঝিপাড়ার ঘরে ঘরে কাপ পড়ল, খাওয়া খাড়ির পাট চুকিয়ে তামাম মনিষ্যিরা আশ্রয় নিয়েছিল উঁচু দাওয়ায়। কিন্তু তখন কি কেউ জানত যে, তাদের বৃষ্টি এবং শ্রবণের অগোচরে গাঙ হলেশ্বরী তার লেলিহান জিহ্বা প্রসারিত করে, তালগাছের মতন হা করে ছুটে আসবে গোটা গেরাম গ্রাস করতে? জানত না। তীব্র ঝড় আর অঝোর বৃষ্টির ছাট ওদের কানের মুখে যুক্তি ছিপি এঁটে দিয়েছিল। ওরা জানল না, শুনল না, কখন গাঙ হলেশ্বরীর উন্মত্ত জলরাশি পর্বতপ্রমাণ মুখব্যাদন করে হা হা করে ছুটে এসে একের পর একটি দিগর গেরামে পুরেছে। ঝুপ ঝাপ খসে পড়েছে পারের মাটি, ধপাস ধপাস করে জলের বুকে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে নদীপারের বিশাল বিশাল চওড়া চালার, ঘরবাড়ি গিয়েছে. সেদিন মানুষজন ক্ষেতখামার গাইবাছুর আর মাল্কি-মাল্লার একমাত্র সম্বল চড়নদার নাও। সব শেষ, সকল শেষ

রাত শেষের আগে বৃষ্টি থামল কিন্তু হলেশ্বরী শান্ত হ'ল না। রুদ্ররোষী গাঙ বিপুল উদ্যমে ধ্বংসলীলায় মেতে উঠল। আকাশে ঘন ঘন বিজলী চমকাচ্ছিল, নীচে মহাপ্রলয়ের জিগির। উন্মত্ত গাঙ উদ্দাম পাগলের মতন হা হা করে এগিয়ে আসছে। ভিন নদির তুল্য বিশাল ফণা তুলে সোঁ সোঁ করে ছুঁসে আসছে একের পর এক অগণন ফণাধারী শঙ্খচূড়। এসে তারা বিপুল আক্রোশে আছড়ে পড়ছে একমাত্র জেগে থাকা গাঙ মেউলী মাঝিপাড়ার ওপর। আছড়ে পড়ছে শতধা বিচ্ছিন্ন হয়ে ঘরের চালায়, দুয়ার, দরজার ওপরে। আর নেমে যাওয়ার কালে এক এক করে টেনে নিয়ে যাচ্ছে এক একটি আস্ত কি অংশত গেরস্তের সংসার।

ভোরের আলো ফুটতে পারল না, বৃষ্টি থামার পর রাত গোটা কয়েক মুহূর্ত বুঝি পার হয়েছিল, অমনি আকাশ পিথিমী কাঁপিয়ে কান্দন উঠল। তীব্র বাতাসের ঝাপটায় যতন গোটা গেরামের ওপর দিয়ে বয়ে গেল একটা যুক কাটা জিগির, হায় হায়, গেল গেল, সব তলাইয়া গেল গা···। অসংখ্য পরিবারের তীব্রতম অসহায় আহুল কান্নায় আকাশ বাতাস ছেয়ে গেল : গেল, সব আব হইয়া গেল গা···

গাঙ হলেশ্বরীর রুদ্ররোষী গর্জন আর অসংখ্য মানুষের বুককাটা গগন বিদারী চিৎকারে ঘুমের আমেজখান কালা কালা হ'য়ে গিয়েছিল। সহসায় ওড়াক করে উঠে পড়ল গগন। তীব্র নেশার ঘোরে সে বুইনের বাড়ির পথ চিনবার পারে নাই। খুইচা মালির বাইরবাড়ির আটচালার কুনায় খ্যাড়ের গাঁদায় সে পড়ে দিয়েছিল সেই ঘুমই কাল হইছিল। কিছু জানবার পারে নাই। হঠাৎ জেগে দেখে জিগির আর কান্দন, কান্দন আর জিগির। আর তার মধ্যে জননী গাঙের দিগর গেরালী গর্জন।

ছটাপুটি ছুটাছুটি। বেসামাল মানুষেরা অস্তিসন্ধি না কুল ছুটছে প্রাণভয়ে। ঝড়ের মতন বুককাটা চিৎকার করে কে যেন আচমকা ডেকে উঠল, 'স না ত ই ভা রে···'। টানা ডাক থামলে হাউ হাউ কান্নায় ভেঙে পড়ল সেই চড়া গলার তীব্র শব্দ। যুক্তি বুক চিরে শেষের অসহায় শোক বেরিয়ে এল, 'আমার সব গেল গা, সব···'

সব গেল! ঘুরঘুইরা কানাইয়ের বড় কুটুম গগইচার নেশাগ্রস্ত চেতনায় যেন কেউ চাবুক মারল সপাং করে। তিলমাত্র সময় না দিয়ে ছিলা ছেঁড়া তীরের তুল্য দৌড় মারল সে। কিন্তু কোথায় যাবে? সুবচনী বৈরাগিনীর আখড়ার প্রান্তে এসে থমকে দাঁড়াতে হল। না, মাটি নেই, গাছ-গাছালি ঘরবাড়ির চিহ্ন নেই, শুধু ঢেউ আর ঢেউ। কাল-নাগিনীর তুল্য পর্বতপ্রমাণ ফণা তুলে হড়মুড় করে ছুটে আসছে অসংখ্য কুড়ি কুড়ি উন্মত্ত ঢেউয়ের দল। নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেছে উত্তর মেউলীর গাঙঘেসা মাঝিপাড়ার অস্তিত্ব।

যেন বিশ্বাস হয় না, গগন নিজের চোখকে পর্যন্ত প্রথমে বিশ্বাস করতে পারছিল না। থক মেরে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। চোখে অসহায় শূন্য দৃষ্টি।

চোখের সামনে ঘটনাটা ঘটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে ছিটকে সরে এল গগন। নিমেষের মধ্যে তালগাছ তুল্য বিশালাকার কয়েকখান ঢেউ পর পর এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল হরচন্দী বৈরাগীনির আখড়ার ওপর, আর মুহূর্তের মধ্যে সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। সোটা আখড়াটা হুড়মুড় করে ধসে পড়ল গাঙের গর্ভে। আর একটু হলে গগনকে ধরেও টান দিয়েছিল আর কি।

এক মুহূর্তের হিসাবের গোলমালের জন্য গগনকে পেরালে পুরতে পারে নি গাঙে। ছিটকে, সাঁইদারী একখান কাল দিয়ে গগন এসে আছড়ে পড়ল অগভীর গাঙটার ওলায়। তারপরই চৌচা একখান দৌড়। হ্যাঁ, গাঙ এগিয়ে আসছে। চাঙাড় চাঙাড় মাটির জল মুখে পুরে তীব্র গতিতে এগিয়ে আসছে গাঙ ধলেশ্বরী, মা জননী।

দিগবিদিক জ্ঞান নাই জলধরের। তাড়া খাওয়া দলাকুর গতিতে ছুটে আসছিল সে। 'হুবালীরে··· হু-বা-দী···ই ই ই···' যেন বিদ্যুৎ গতিতে ছুটে আসছে সাঁই সাঁই তীব্র ঝড়ের ঝাপট। কাপা বাতাসের মতন গাঙের খাড়াই পার ধরে ছুটে আসছিল চন্দ্র কৈবিত্তের বাইজ্যা পুলা জলধরেরা। সে জানে না উত্তর দেউলীর পুব বাড়ির কিছুই আর ভেসে নেই। ঘরবাড়ি গোয়াল গরু গিলেছে, একটা মনিষ্যিও ভেসে উঠবার অবকাশ পায় নি। পুব নাই আর সেই সঙ্গে দুই দুইখান পুলাপান লইয়া গাঙের গর্ভে বেপাত্তা হয়েছে চন্দ্র কৈবিত্তির বড় সাইসের বাইয়া সুধাসী।

ঠিক পাড়ু বাড়ির দুয়ার বরাবর এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল জলধর। পথ নেই, গাছগাছালির চিহ্ন অবশিষ্ট নেই, খালদারী নাওয়ের মতন সেই পথটা বেপাত্তা বিলীন হয়ে মিলিয়ে গেছে অগাধ গাঙের জলগর্ভে। পথের এই শেষ, এই সমাপ্তি। আর দু'পা এগোলে জলধরকেও আর খুঁজে পাওয়া যেত না। কারণ পাড়ু কৈবিত্তির আধখান আঙিনা গাঙে টেনে নিয়েছে। দুয়ার ছুঁয়ে বয়ে যাচ্ছে উন্মত্ত উত্তাল নদী। জলধর দেখল, যার দু'পা সামনে জলের তোড়ে ভেঙে নেওয়া নরা খালের খাড়াই পার ভেঙে পড়েছে।

কোন পথে কেমন করে এখানে এসেছে হদিস করতে পারছিল না জলধর। তার জ্ঞান নেই, মন বলে যে বস্তুটি খানিক আগে জেগে ছিল তাও বুঝি থক মেরে গেছে। নাঃ কিছু নাই, কিছু না। পথ না, বাটি না, এখন দেখলে কে আর বিশ্বাস করবে যে, গাঙ ধলেশ্বরীর পার ঘেঁষে এই পথটা সোজা পাতা ছিল। ঢেউয়ার সীমানা ছুঁয়ে পথ গিয়ে থেমেছিল কোলের মুখে। বিশ্বাস করবে না। যেতড়িপর গাঙ পাতা পথখানারে দুই ভাগে ভাগ করে ফেলেছে। এক রাত্রির মধ্যে পারভাঙা গ্রাম খলাসনো নতুন খালের জলস্রোত সোয়ালে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়েছে ছিলের ওপর।

মাত্র এক কি দুই মুহূর্ত বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে, হতাশা এবং তীব্র অসহায়ত্বে থক মেরে থাকল জলধর। তারপর চড়া বাতাস শব্দের মতন ভাঙা রোরুদ্যমান গলায় প্রাণপণ শক্তিতে চিৎকার করল একটা 'হু-বা-দী-রে-এ-এ-এ' হা হা করে কেঁদে ফেলল জলধর; তবু তার গলায় মিরা জাগানিয়া প্রাণপণ আর্ত ডাক থামল না। লম্বা টানা আহাজে ভেঙে ফেলা কাঁসার বাসনের শব্দের তুল্য পরিত্রাহি গগন ফাটানিয়া সচিৎকার আহ্বান তীব্র হাওয়ায় ভর করে ছড়িয়ে পড়ল দিগন্তে 'হু-বা-দী-ই-ই-ই···'। সামনের অল্প কাৎ হয়ে পড়া বড়ই গাছের গুঁড়িখান ধরে সর সর করে বসে পড়ল জলধর। আর সঙ্গে সঙ্গে নিঃস্ব সর্বহারার মতন কেঁদে উঠল হাউ হাউ করে, মাটির ওপর লুটিয়ে পড়ে দু' হাতের মুঠির মুসি

চালাচ্ছিল জলধর নিজের বুকের ওপর—যেন বুকখানা সে গুঁড়িয়ে ফেলবে। আর সেই সঙ্গে কান্নাজড়ানো ভগ্ন গলায় বলছিল, 'আমারে ফ্যালাইয়া তুই কুথায় পলাইয়া গেলিরে পরানের বুইন ...'

শুধুই কান্না না, অবাই-করা পাঁঠার ধড়ের মতো পাশু কৈবিত্তের গোটা আঙিনায় গড়াগড়ি যাচ্ছিল। পটাপট ছিঁড়ছিল নিজের মাথার চুল, গায়ের কতুয়াখান কাতা কাতা করে ছিঁড়ে একটানা ডোক যাচ্ছিল জলধর 'হু-বা-সী-ই-ই-ই-ই...'

শুধু ডাক আর ডাক। কেউ জবাব দেয় নি, জবাব দিবার মানুষ নাই এ-দিগরে। পাশু কৈবিত্তির শূন্য উঠানে সবেধন নুতুনটা ছাড়া নাহাল ঘরে থাকানির আর আর্ত ডাকের উত্তরে শোনা যাচ্ছিল কেবল তীব্র অশান্ত উন্মত্ত জলস্রোতের দা সা অট্টহাসির রেশ। বুঝি নির্মম জলরাশি কলকল ছল ছল করে উপহাসের হাসি ছড়িয়ে বলছিল'—হু-বা-সী—ই-ই-ই ...'

অনেকক্ষণ, অনেক সময় পরে চোখ খুলে তাকাল জলধর। বেহুঁশ অচৈতন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল সে। তাকে জাগিয়ে তোলবার মানুষ নেই। সব শূন্য সব ফাঁকা। দু একবার পিটপিটে চোখে তাকিয়েছিল জলধর, পূর্ণ চেতনা ফিরে এলে রক্তজবার তুল্য টকটকে চোখ খুলে তাকাল সে। মাথার ওপরের গাছগাছালি বাতাসের ধাপুটে তখনও অল্প আকুলি বিকুলি করছিল। লোকপাখালির গলার রাও নাই। শুটা সন্ধ্যাখান গুঁগার পাওয়া মোল্লার মুখের মতন থমথমে, কালো। পাখনা-মেলা চিলের নাহাল ঘুচরা মাঘেরা ভাসছিল। আস্তর চেতনাটা আস্তে আস্তে ফিরে আসতে গাঙের ডাক কানে এল জলধরের। যেন রাক্ষসী ধলেশ্বরী তরঙ্গের হাতে, তরাবহ আক্রোশে মুখ থেকে শিকার ফসকে যাওয়া বাঘ-ভাঁগার তুল্য গো গো করে ফুঁসছে, ফুলছে। বিশাল রক্ত-ছপী ঢেউয়ের মাথাগুলো এক এক করে এসে বিপুল আক্রোশে ঝাপিয়ে পড়ছে সেই জেগে থাকা নদী কিনারের ওপর।

না, শুধুই নদী না; ক্লান্ত হতাশায় ভেঙে পড়া দেহ ভুলে বসেছে, আরও একটি শব্দ শুনতে পেল জলধর। হাঁ, মানুষের কান্দন। দক্ষিণের প্রান্ত থেকে অজস্র অগণ্য কাতারে কাতারে মানুষের আর্তকণ্ঠের পরিত্রাহি চিৎকার ভেসে আসছে।

দুর্বল কাঁপা শরীর তুলে কোনোরকমে দাঁড়াল জলধর। তার বুকের ভেতরে বুঝি পানি ফুটছে টগবগ টগবগ করে। পিঞ্জরাখান বুঝি ছাতু ছাতু হইয়া যাইব। নিস্তেজ শরীর ধীরে ধীরে ওপ্ত হচ্ছিল জলধরের, গলা শুকিয়ে এসেছে, নিশ্বাস থেমে থেমে বইছিল কানের ভেতরে যেন অগণ্য তোমরার দল টানাসুরে ডাকছিল। প্রথমে আস্তে আস্তে, ধীর পায়ে হাতের সামনে গাছগাছালি খুঁটোখাটি যা পেয়েছে তাই ধরে বেয়ার পথে পা বাড়িয়েছিল। কিন্তু ওইভাবে বেশিক্ষণ সে চলতে পারল না। নিমতলার সীমা পেরোবার আগেই জলধর দেখতে পেল, অল্পদূরে জনবিদ্বি প্রাণপণ চিৎকার আর আছাড়াকাড়ি দৌড়াদৌড়ি। চালাবেড়া খোলার ঘর লেপেছে উত্তর পাড়ার, লাটবন্দর মাথায় নিয়ে ছুটছে অনেক মানুষ। আর তার মধ্য থেকে সর্বহারা গলার তীব্র কান্দন আসছে, 'সব লইয়া গেল আমার, গাঙে আমার সব খাইয়া ফ্যালাইছে ...

খাইয়া ফ্যালাইছে। যেন কান্দন না, বুঝি এই কথাখান জলধর ধলেশ্বরীর বুকের ছিটকে এসে পড়ল ঠিক জলধর কৈবিত্তির বুকের পিঞ্জরার ওপর।...খাইয়া ফ্যালাইছে। আচ্ছন্ন চেতনা, সব বিরুৎসাহ এবং ভেঙে পড়া হতাশাকে সহসায় ঝেড়েমুছে কসরতের তুল্য ফেইলা দিল জলধর। নিস্তেজ শিরদাড়া টান টান করে সোজা হয়ে দাঁড়াল এক মুহূর্ত। তারপরই লম্বা কাইক মেরে ধনুক করে এগিয়ে চলল চক্র কৈবিত্তের ঘুঘান গুলাখান। তার পায়ের ধাপে মাটি কাঁপে, গলার শিরের

দিনের ঘুমের বাসন কালা কালা হইয়া যায়। গায়ের গন্ধে পইথপাথালি পলায়।

বেশিদূর যেতে হ'ল না, তার আগেই শইচা বালির লগে দেখা। পোটলা পুঁটলি নিয়ে যাত্রা করেছে শইচা। বাঁ কোলে দুই বছরের পুলা, মাথায় ভাঙা তোরঙ্গ। ডাইন বগলে একখান সাঁইবারী পুটলী। তার লগে লগে আসছে সাত বছরের বড় পুলা, আর পাঁচ বছরের মাইয়াখান। তাদের মাথাও খালি নেই।

কী মনে হ'ল পথ আগলে দাঁড়াল জলধর। মুখোমুখি পড়াতেও চোখ তুলে তাকাল না বইয়া বৈষ্ণবিত্তির ছোট পুলা শইচা বালি। ঘাড় বেঁকে করে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছিল, জলধর খপ তার হাতখান ধরে ফেলল। 'কুথায় যাইতাচ গা শইচা বা ?'

হিজার তুল্য কয়েকটা শব্দ তুলে চোখ তাকাল শচীন। শচীতুলের ফুলা চক্ষু দুইখান জলে। চোখে চোখ পড়তে ডুকরে করে কেঁদে ফেলল শচীন। কোলের পুলাডারে মাদিয়ে দিয়ে খপ করে ধরল জিকাগাছের একখান ডাল। 'আমারে যাইবার দে অলধইরা, যাইবার দে....'

'বৌঠানরে রাইখ্যা যাও কুথায় ?'

কথা নয় যেন ধারালো ছেনির একখান পোঁচ মারল জলধর শচীনের বুকে। আর অমনি হা হা করে পক্ষিমাদি কেঁদে উঠল শচীন। 'অর কথা কইস না আর, কইস না। জাবাগী'... কান্নার, দমক এত উচ্চগ্রামে চড়েছিল যে কথাটা শেষ করতে পারছিল না শচীন।

'ধারলা কান, কইয়া কালাও শইচা বা, কও—'

'আর অই, নইকা...'

'নাই।' শচীন যেন দু' পা হটকে গেল।

না নাই। কথা নয়, ঘাড় নেড়ে নেড়ে বলছিল শচীন। 'কাইলকা সানজের বেলায় কাইকা করচিলাম দুইজনে। রাইতে ঘরে আইল না, বিছানায় শুইলো না শুমাইল ঘরের কানচিতে বইয়া আছিল। আমি ভাবি ভো কত্তা কয় না। শুনা কইয়া চইল্যা আইয়া শুইয়া পড়ছিলাম। কী যে কাল ঘুমে আমারে পাইল রে-জলধইরা, ঘুম আর ভাঙল না। গাঙের ভাকে স্নান চাইতে উইঠ্যা দেহি সারি নাই। গাঙে আমার ঘুমারের আদখান লইয়া গেছে।' নিজের হাতে ঠাসঠাস করে কপালে করাঘাত করল শচীন। ঘরের ঘরে কাঁদছিল। 'কত ডাকলাম, ডাকলাম কিন্তুক ওরে আর পাইলাম না। জননী ভাবে কুল দিচে জলধইরা....'

আর কিছু বলল না জলধর। তার চক্ষু দুইখান জলা ঘরে বুক ঠেলে কান্না আসছিল।

অনেকক্ষণ কথা নেই। কথা বলতে পারছিল না জলধর। উচ্চগ্রাম থেকে নেমে আসা গলায় অনেকক্ষণ ক্ষীণ কান্না কাঁদল শচীন। কোলের পুলাডায় বাপের হাঁটু আঁচড়ে ধরে মুখপানে চেয়ে আছে হা মুখে। বাকী বাচ্চা দুটো হাপুস-চক্ষে নিঃশব্দ কান্না কেঁদে যাচ্ছিল।

খানিক পরে সম্বিৎ ফিরে পেল জলধর। তার চোখের কোল বেয়ে জল গড়িয়ে পড়েছে। বাঁ কাঁধে বাপের হাঁটুর তল থেকে শচীনের পুলাডারে তুলে নিল জলধর। আপটে ধরল বুকের ওপর। চুমা খেল কয়েকটা। তারপর স্থির চোখে তাকাল শচীনের দিকে। ধরা গলায় বলল, 'আবারে শুনা কইয়া কুন পথে যাইতাচ তুমি শইচাবো ?

'কইবার পারি না....'। শচীন মুক্তির খুটে চোখ মুছল। 'কার লেইগ্যা থাকুম আদি, কার মুখ চাইয়া বাঁচুম ?'

(ক্রমশঃ)

॥ পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষার প্রসার ॥

পশ্চিমবঙ্গে পরিকল্পনার প্রধান প্রধান লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শিক্ষাক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন তিনটি পরিকল্পনাতেই একটি প্রধান সামাজিক দায়িত্ব হিসাবে গৃহীত হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের বুনিয়াদী, মাধ্যমিক, কলেজীয়, চিকিৎসামূলক ও কারিগরী শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাপক অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

প্রাথমিক নিম্ন-বুনিয়াদী বিদ্যালয়

১৯৪৭-৪৮ ১০,৯৫০

১৯৬৩-৬৪ ... ৩২,৪১৩

মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৪৭-৪৮ ...১,৯১৩

১৯৬৩-৬৪ ... ৩,৬৮৮

উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়

১৯৫৭-৪৮ .... ১,১৪৭

১৯৬৩-৬৪ .... ১,২৯৬

কলেজ (সাধারণ শিক্ষা)

১৯৪৭-৪৮ ... ৫৫

১৯৬৩-৬৪ .... ১৪৫

বিশ্ববিদ্যালয়

১৯৪৭-৪৮ .... ১

১৯৬৩-৬৪ ... ৭

শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ ভারত গড়ে তুলতে পশ্চিমবাংলা এগিয়ে চলেছে

W B (I D P R) Ad. D 5225/65

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনাম সঙ্কটের আর এক ধাপ

হানয়ে প্রেরিত ব্রিটিশ সরকারের ডেভিস মিশন ব্যর্থ হয়ে ফিরে এসেছে। এমন কি পাঁচদিন হানয়ে অপেক্ষা করেও ডেভিস তার ব্যক্তিগত বন্ধু প্রেসিডেন্ট হো চি মিন কিম্বা প্রধানমন্ত্রী ফাম ভান ডং-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অকৃতকার্য হয়েছে। উত্তর ভিয়েৎনামের রাজনৈতিক দল কাদার-ল্যাণ্ড ড্রপ্টের সদস্যদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেই ডেভিসকে সন্তুষ্ট থাকতে হয়েছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বর্তমান অবস্থায় আদৌ বিরামের সম্ভাবনা উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারকে যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে আলোচনা বৈঠকে যোগদান থেকে বিরত করছে। ডেভিস এই ধারণাই নিয়ে ফিরে এসেছেন। উত্তর ভিয়েৎনাম সরকারের এই বদ্ধমূল ধারণার বিরুদ্ধে বমবর্ষণের শান্তি মিশনকে গ্রহণ করবার স্বপক্ষে ডেভিসের সকল যুক্তিই হানয় অগ্রাহ্য করেছে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ডেভিস মিশনের ব্যর্থতার অভিযোগের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী উইলসন অবশ্য উচ্চকণ্ঠেই গত ১৫ই জুলাই বলেছেন : "I would rather have rebuffs than let this war go on without making any efforts."

ডেভিস মিশনের ব্যর্থতার সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট জনসনের মুখ আরও গম্ভীর এবং দৃঢ়তর হয়ে উঠেছে। ১৫ই জুলাই তিনি বলেছেন "অদূর ভবিষ্যতে আরও নূতন এবং আরও গুরুতর সিদ্ধান্ত নেবার প্রয়োজন হতে পারে।" প্রায় একই সঙ্গে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে আমেরিকার সেনাবাহিনী ও সমর সম্ভার বৃদ্ধির সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছে। এই সংখ্যা পৌঁয়াত্তরকে তো অনায়াসেই পৌঁছাবে; আড়াই লক্ষের অনুমানও অগ্রাহ্য করা যায় না। এই বছরের শেষে আমেরিকান সৈন্যের সংখ্যা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ১৭০,০০০ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা সেখানে উপস্থিত মার্কিনী-সামরিক নেতাদেরই দাবী। তারা মনে করেন ভিয়েৎনাম যুদ্ধে ভিয়েৎকংদের শুধু প্রতিরোধ করে রাখবার সময় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, এবার তাদের পরাজিত করতে হবে। কিন্তু দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকংদের প্রভাব গুরুতররূপে বৃদ্ধি পেয়েছে। গোটা মধ্যাঞ্চল-দক্ষিণ ভিয়েৎনামে, ভিয়েৎকংদের আধিপত্যের পরিচয় পাওয়া যায় এই অঞ্চলে তাদের প্রভুত্ব সাব্যস্ত। কোয়াং নিন প্রদেশের দুই বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ১৫০ থেকে ২০০ মার্কিনী বিমানের আক্রমণ এই বছরের একটি ঘটনা। তানাং এর দুর্গকে উত্তর উপকূলের অন্যান্য এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, সেখানকার পেট্রোল ডিপোতে আগুন ধরিয়ে দিয়ে, বিয়েন হোয়া ঘাঁটি আক্রমণ করে, মধ্যাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি প্লিকুর পথে ডুক কো ঘাঁটি ঘিরে ফেলে এবং মার্কিনী যোদ্ধারু বিমান বিধ্বস্ত করে ভি ৎকংদের দুর্ধর্ষ অভিযান প্রায় চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছাবার উপক্রম হয়েছে।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধে উত্তর কোরিয়াও নীরব হয়ে নেই। দক্ষিণ কোরিয়ার পক্ষ থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের সহায়ক হস্তের প্রত্যুত্তরে উত্তর কোরিয়ার প্রথম উপ-প্রধানমন্ত্রী কিম দুই বলেছেন দক্ষিণ কোরিয়া যে পরিমাণে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সাহায্য পাঠাবে উত্তর কোরিয়াও সমপরিমাণ সাহায্য উত্তর ভিয়েৎনামকে দেবে। এদিকে চীনও মার্কিনী অভিযানের মোকাবেলা করবার আশ্বাস দিয়ে বলেছে যে চীনা বাহিনীও প্রস্তুত—"in full battle array"—এই বহুযুদ্ধে কোরীয় সংবাদে ৩৪ অক্ষরেখার উত্তরে মার্কিনী-

বিমানের অনাক্রমনীতির এবার আর পুনরাবৃত্তি যে হবে না, সে কথা মার্কিনীরাও বার বার স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলছে না। তাদের দিক থেকে আর একবার পররাষ্ট্র সচিব রাস্ক পাল্টাবার কথা বলেছেন: 'উত্তর ভিয়েৎনামের সমর্থকরা যেন মনে রাখেন ভিয়েৎনাম যুদ্ধে নিষিদ্ধ এলাকা বলে কিছু নেই'—'the idea of sanctuary is dead.''

ইতিমধ্যে ১৯৫৪ সালে ইন্দোচীন সংকটের জেনেভা-মীমাংসার এগার বৎসর পূর্তি উপলক্ষে উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পক্ষ থেকে নূতন প্রতিশ্রুতি শোনা গেছে। এই প্রতিশ্রুতির মূল্যায়ন আগামী কয়েকমাসের মধ্যেই যাচাই হয়ে যাবে নিঃসন্দেহ। কিন্তু আপাত-পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিশ্রুতি-গুলি আদৌ আকর্ষিত নয়। তার মধ্যে দুইটি সন্তর্পণ নিষিদ্ধ হয়েছে। জেনেভা মীমাংসার মার্কিনী উপদেষ্টা হো চি মিন বলেছেন: চূড়ান্ত জয় না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ চলবে, এজন্য যদি দশ বছর কিম্বা ততোধিক সময়ের প্রয়োজন হলেও। সায়গনে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধানও পিছিয়ে থাকেন নাই। তিনিও বলেছেন: উত্তর ভিয়েৎনামের কমুনিষ্ট সরকারের সঙ্গে কখনই কোনো মীমাংসার আলোচনা করা হবে না। ইতিমধ্যে ২৬শে জুলাই হ্যানয়ে সোভিয়েট রাশিয়া কর্তৃক স্থাপিত ও নিয়ন্ত্রিত ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে হ্যানয়ের ৪০ মাইল দূরে একটি মার্কিনী ফ্যান্টম জেট বিমান ভূপাতিত হওয়ার পর ২৭শে জুলাই ৪০টি মার্কিনী ফাইটার বম্বারের মিলিত আঘাতে উত্তর ভিয়েৎনামের একটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্রের ঘাঁটি বিলম্ব হয় আর একটিকে ক্ষতিগ্রস্ত করা হয়। ইতিপূর্বে মার্কিনী টহলদারী বিমান হ্যানয়ের নিকটে পাঁচটি রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ঘাঁটি লক্ষ্য করে থাকলেও এগুলি আক্রমণে তাদের দ্বিধা ছিল। কেননা, এই ঘাঁটিগুলির রুশ পরিচালকেরা নিহত বা আহত হতে পারে এই আশঙ্কায় এ-পর্যন্ত এই ঘাঁটিগুলি অক্ষত ছিল। ফ্যান্টম জেট ভূপাতিত হবার পর মার্কিনীদের এই দ্বিধা-সঙ্কোচ দূর হয়ে গেলো।

মার্কিনী প্রতিরক্ষা সচিব ম্যাকনামারার সাইগনে পাঁচদিন সফরের রিপোর্ট পত ২১শে জুলাই প্রেসিডেন্ট জনসন একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে ওয়াশিংটনে আলোচনা করেন। সেদিন ম্যাকনামারা সাংবাদিকদের বলেন বর্তমানে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ১৬৫,০০০ গেরিলার পাশাপাশি দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের ৫০০,০০০ সেনাবাহিনীর আনুপাতিক হার অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর। ম্যাকনামারা স্বীকার করেছেন গত পনের মাস যাবৎ ভিয়েৎনামের পরিস্থিতির ক্রমাবনতি হয়েছে এবং গেরিলাদের আক্রমণের গতিবেগ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই পরিস্থিতিতে গত ২৮শে জুলাই জনসন ঘোষণা করেন অতীতের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে পশ্চাদপসরণ নিরাপত্তা আনে না—'Retreat does not bring safety'। সুতরাং ভিয়েৎনামে মার্কিনী সেনাবহর অবিলম্বে ৭৫,০০০ থেকে ১২৫০০০ বৃদ্ধি করা হবে। ঐদিন মার্কিনী প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মচারীদের ঘোষণায় জানা যায় আগামী অক্টোবর গত নয় বছরের মধ্যে সর্বপ্রথম মার্কিনী নৌবাহিনীতে নূতন যুদ্ধার্থী তলব করা হবে। এদের সংখ্যা পূর্বেকার প্রতিমাসে ১৭,০০০-এর পরিবর্তে ৩৫,০০০-এ জনসন নির্ধারণ করেছেন।

ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী সহায়তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘে নবনিযুক্ত মার্কিনী প্রতিনিধি আর্থার গোল্ডবার্গের মাধ্যমে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী-জেনারেল উ থান্টকে ভিয়েৎনামে শান্তিপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বতোভাবে সক্রিয় হবার অনুরোধ জানিয়ে জনসন পত্র দিয়েছেন। এ-পর্যন্ত পনেরটি শান্তি প্রস্তাব পিকিং-হ্যানয় কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হলেও যে কোনো সময়ে আমেরিকার নিঃসর্ত আলোচনায় সম্মতি জানিয়ে জনসন লিখেছেন: "The U. S. A. would not surrender and will not retreat. When the Communists know that a violent solution is not possible in Vietnam, a peaceful settlement will be inevitable."

সংস্থার পক্ষে প্রেসিডেন্ট জনসন আপোষ আলোচনার প্রথম সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করে এই আলোচনায় ভিয়েৎকংদের অংশ গ্রহণের সুযোগও, আভাষ হলেও এই প্রথম, স্বীকার করেছেন।

ভিয়েৎনাম শান্তির জন্য মার্কিনী প্রচেষ্টার পাশাপাশি যুদ্ধপ্রস্তুতির পরিমাণগত প্রচেষ্টাও বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। রাইসনের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের প্রতি আর্থার গোল্ডবার্গের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট জনসনের শান্তির আবেদন নিরর্থক না হবার জন্য পর্দার অন্তরালবর্তী টাম-পোকেনের সংবাদ তারা আগষ্ট তীন রাজ ওয়াশিংটনে দিয়েছেন। এই সংবাদ অনুযায়ী উ থান্টকে দিয়ে সংস্থার সকল পক্ষের কাছে যুদ্ধবিরতির আবেদন পৌঁছবার পরিকল্পনা হয়েছে। হয়তো সেক্ষেত্রে উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণে মার্কিন বিরতিও সম্ভব হবে। উত্তর ভিয়েৎনামে বোমাবর্ষণের ফলে ভিয়েৎকংদের অগ্রগতি আদৌ ব্যাহত হয় নাই। বরং বোমাবর্ষণের পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সেরিলাদের অনুপ্রবেশও বৃদ্ধি পেয়েছে। শুধু এদের অনুপ্রবেশই যা কেন, উত্তর ভিয়েৎনামী সামরিক বাহিনীর কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান দক্ষিণ ভিয়েৎনামে উপস্থিত হয়ে ভিয়েৎকংদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে। এই অবস্থায় উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণে বিরতি দিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে শান্তি প্রচার অভিযানে শান্তিকামীর ভূমিকা গ্রহণের সুযোগ মার্কিনীদের প্রদান করাটা সম্ভব। কারণ এই ভূমিকা মার্কিনীদের ভিয়েৎনামী-নীতির স্বদেশে ও বিদেশে সমালোচকদের কিছুটা নিরস্ত করতে পারে।

কেনেডের শান্তী-টিটোর বোমাবর্ষণ বিরতির আবেদন, কিংবা নয়া দিল্লীতে শান্তী-ওয়োটোর অনুরূপ আবেদনের উপযুক্ত উত্তরও এই বিরতিতে নিহিত থাকবে। যার মার্কিন যুদ্ধক্ষেত্রে যারা জনসনের ভিয়েৎনাম-নীতির 'হকেনী, বোমাবর্ষণ-বিরতি তাদের বিক্ষোভেরও উপশম এনে দেবে।

বাকীর পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আর একবার শান্তি-প্রচেষ্টা হয়ে গেছে। নরওয়ের বিশেষ প্রতিনিধি হানেরে দিয়ে ফিরে এসেছে। অপর এক প্রতিনিধি, বাকীর পররাষ্ট্র মন্ত্রী, জনসনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে ফিরে গেছে। কোনো ফল হয় নাই। হানেরের দাবী মার্কিনী সেনাবাহিনী দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে অপসারিত হউক, তবেই শান্তি আসবে। জনসন বাকীর পররাষ্ট্র মন্ত্রীকে পত্রপাঠ বিদায় দিয়েছেন। উত্তর ভিয়েৎনামীদের প্রত্যুত্তরে জনসনের বক্তব্য : "We are going to stay।"

জনসনের বিশেষ প্রতিনিধি আভেরিল হ্যারিমান সোভিয়েত রুশ থেকে এই অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরে এসেছেন, যে ভিয়েৎনাম সংঘাতে সোভিয়েতের কোনো প্রভাব নেই। সুতরাং, তাদের করারও কিছু নেই। অবশ্য এই সংঘাত কেন্দ্র করে রুশ-চীন বন্ধুত্ব আবর্তিত হচ্ছে এবং সোভিয়েত রুশকে অপদস্থ করার সুযোগ গ্রহণে চীনা তৎপরতার ত্রুটি নেই। নাসেরও ভিয়েৎনামে শান্তির জন্য তৎপর হয়েছেন। পিকিং-এর মনোভাব যাচাইয়ে টিটো-শান্তী নাসেরের সহায়তা চেয়েছেন।

শান্তি প্রচেষ্টার পাশাপাশিও মার্কিনীদের বিপুল সামরিক প্রস্তুতির বিরতি নাই। গত ৪ঠা আগষ্ট জনসন কংগ্রেসকে আরও ১৭০ কোটি ডলার ভিয়েৎনামে যুদ্ধের জন্য বরাদ্দ করবার অনুরোধ জানিয়েছেন। তাছাড়া সেপ্টেম্বরের সৈন্য সংগ্রহের সংখ্যা ২৭,৪০০ তে এবং অক্টোবরের সংখ্যা ৩৩,৮০০তে বৃদ্ধি করে তারা আগষ্ট আমেরিকান সরকার হুকুম-জারী করেছে। কোরিয়া যুদ্ধের পর এতো বৃহৎ সমাবেশের আর নজীর নাই। এমন কি সেপ্টেম্বরের জন্য পূর্বে যে সংখ্যা নির্ধারিত ছিল, তার চাইতেও ১৭,০০০ বৃদ্ধি করা হয়েছে। মার্কিনী যুদ্ধপ্রচেষ্টার বিপুলায়তন বৃদ্ধির প্রতিক্রিয়াও দেখা দিয়েছে। চীনা সরকার এই যুদ্ধোৎসের তীব্র নিন্দা করে প্রয়োজন হলে চীনা ওলান্টিয়ার প্রেরণের প্রতিশ্রুতির পুনরাবৃত্তি করেছে। উত্তর কোরিয়াও অধিকতর সাহায্যের

প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দক্ষিণ ভিয়েৎনামের মুক্তি ফ্রন্ট অন্যান্য ইন্দো-চীন দেশের অধিবাসীদের সহযোগিতার আহ্বান জানিয়েছে। ১লা আগষ্ট থেকে তারা প্রত্যাঘাত করেছে এবং তখন থেকে আসল যুদ্ধ 'Real War'—শুরু হল।

দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রাষ্ট্রপ্রধানের মধ্যে আবার মতভেদের সংবাদ শোনা গেছে। তাছাড়া, দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের যুদ্ধ-বিরোধিতার সংবাদও ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। গত ৪ঠা আগষ্ট সায়গনের এক সামরিক আদালতে 'South Vietnam Peace Movement' নামক সংস্থার একুশজনকে যুদ্ধপ্রচেষ্টা-বিরোধিতা ও ধ্বংসাত্মক কাজের অভিযোগে শাস্তি দেওয়া হয়। তাদের নেতাকে ২০ বছরের কঠোর মেয়াদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং দক্ষিণ ভিয়েৎনামীদের মধ্যেও প্রবল যুদ্ধ-বিরোধী প্রতিক্রিয়া দানা বেঁধে উঠছে। যুদ্ধ ও শান্তির দ্বৈত-প্রচেষ্টার আপোষ-আলোচনার জন্য ভিয়েৎনাম থেকে মার্কিনী অপ-সারণের পূর্বশর্তে পিকিং-হানয় অবিচল রয়েছে। তাই শান্তি প্রচেষ্টা বার বার স্থানচ্যুত হতে বাধ্য। উত্তর ভিয়েৎনামের উপর মার্কিনী বোমাবর্ষণের আর একবার বিরতিতে—গত যে মাসে প্রথম বিরতি হয়েছিল—এই অবস্থার কোনো পরিবর্তনের সম্ভাবনা নাই। তবুও শান্তির খাতিরে আর একবার এ পরীক্ষার প্রয়োজন রয়েছে। আমেরিকা এ-পরীক্ষায় সুযোগ অনায়াসেই আপাতত দিতে পারে। কারণ, উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা বর্ষণ, দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকংদের অপ্রতিহত গতি প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে।

মালয়েশিয়ার ভাঙন

অকস্মাৎ গত ৯ই আগষ্ট মালয়েশিয়া থেকে সিঙ্গাপুর বিচ্ছিন্ন হয়ে পৃথক রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। অতঃপর মালয়, সাবা ও সারওয়াক নিয়ে মালয়েশিয়া পড়ে রইলো। মালয়েশিয়ার দুই বছরের বিপদসঙ্কুল জীবনে, সিঙ্গাপুরের বিচ্ছেদ, সারা-ওয়াক ও বোর্নিওকেও বিচ্ছিন্ন করে মালয়েশিয়ার অস্তিত্ব বিলোপ করবে কি না, সে-সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া এখনই সম্ভব নয়। মালয়েশিয়া গঠিত হয়েছিল এই অঞ্চলে মালয়ী, চীনা প্রভৃতি বিভিন্ন জাতির মধ্যে মোটামুটি সংখ্যাগত ভার-সাম্যের ভিত্তিতে, একটি ফেডারেশনরূপে। কিন্তু মালয়ী ও চীনাদের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বই মালয়ী-প্রধান মালয়েশিয়া ও চীনা-প্রধান সিঙ্গাপুরের বিচ্ছেদ টেনে নিয়ে এলো। সিঙ্গাপুরের চীনা প্রধানমন্ত্রী ও পিপলস্ এ্যাকশন পার্টির নেতা লি কুয়ান ইউর মালয়েশিয়ার ক্ষমতা দখলের প্রচেষ্টাকে মালয়ী-প্রধান ফেডারেশন অধিবাসীর চোখে দেখেছে। তাছাড়া গত এক বছর কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সিঙ্গাপুর সরকারের আর্থিক ও অন্যান্য বিরোধের পরিণতিতে এই বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। মালয়েশিয়ার প্রতিরক্ষায়ও সিঙ্গাপুর অর্থ সাহায্যে প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ করেছে। সিঙ্গাপুরের প্রতিরক্ষার জন্য যেটুকু প্রয়োজন সেটুকু ব্যয় করতেই সিঙ্গাপুর প্রস্তুত ছিল।

সিঙ্গাপুরের বিচ্ছেদে স্বভাবতই ইন্দোনেশিয়ার মালয়েশিয়া-বিরোধী আন্দোলনে শক্তি সঞ্চারিত হবে। যদি আকার্তা সরকারের সঙ্গে সিঙ্গাপুরের বন্ধুত্ব স্থাপন সম্ভব হয়—যে বিষয়ে এই নূতন রাষ্ট্র সচেষ্ট হবে বলে ঘোষণা করেছে—সেক্ষেত্রে মালয়েশিয়া আরও বিপন্ন হবে। অবশ্য মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর পারস্পরিক সহায়তার এবং প্রতিরক্ষার চুক্তি সম্পাদনে প্রতি-শ্রুত হয়েছে। তাছাড়া, সিঙ্গাপুরের প্রধানমন্ত্রী লি নূতন রাষ্ট্রকে অকমুনিষ্ট, কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত এবং আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের অন্তর্ভুক্ত একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের সত্তায় প্রতিষ্ঠিত করতেও প্রতিশ্রুত হয়েছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দ্রুত রাজনৈতিক চাঞ্চল্যকে এবং মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের বহুজাতিক দ্বন্দ্বে সকল প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও সিঙ্গাপুর আন্তর্জাতিক সংঘাতের আর একটি কেন্দ্র-বিন্দুতে পরিণত হবে কিনা, আগামী দিনে তা-ই লক্ষণীয়। এই পরিবর্তনের ফলে সিঙ্গাপুরের ব্রিটিশ ঘাঁটির ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে উঠলে এই সংঘাতের সম্ভাবনা ত্বরান্বিত হয়ে উঠবে। ১২।৮।৬৯

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এন্ডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

ভারতী

৩০ বর্ষ] ৫ম সংখ্যা [শারদীয়া ১৩৭২

ভারতের রাষ্ট্রনৈতিক পটভূমি

ভারত ইতিহাসের প্রকৃত ছবি, একেবারে সেই আদিকাল থেকে, তুলে ধরার প্রচেষ্টা মাত্র গত তিন দশক ধরে দেখা দিয়েছে। এর আগে পর্যন্ত প্রাক-বৃটিশ আমলের ভারতীয় ইতিহাস অগ্রাহ্য করাই বৃটিশ ঐতিহাসিকদের প্রথা ছিল। এবং যেহেতু তাঁরাই রাজনৈতিক ভারতের ছবি আধুনিক ইয়োরোপের সামনে প্রথম তুলে ধরেন, আধুনিক ইয়োরোপের পক্ষে এই ধারণা করা একান্তই স্বাভাবিক ছিল যে বৃটিশরা এসে এদেশ জয় করে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন করে গোটা দেশকে এক-রাষ্ট্রীয় শাসনের অধীনে এনে ফেলার আগে পর্যন্ত এ-দেশের স্বাধীন শাসকবর্গ কেবল নিজেদের মধ্যে চিরকাল যুদ্ধবিবাদ করেই কাটিয়েছে।

ভারতকে বুঝতে হলে অবশ্যই দুটি জরুরী জিনিষ প্রথমেই মনে রাখা দরকার। প্রথমটি এই যে ভারতের ইতিহাস দশ বা শত বছরের হিসাবে মাপা যায় না, তা হাজার-হাজার বছরের। দ্বিতীয়টি : এ কেবল বৃটিশ আমলেই যে এই দেশ এই প্রথম তার ইতিহাসে নিজেকে অধিকৃত রূপে অনুভব করতে শিখল। সুদীর্ঘ অতীত এবং বিশাল ভূ-আয়তনের ফলে, বহু উত্থান ও পতনের পথ ভারতকে পার হয়ে আসতে হয়েছে। ব্যক্তি বা দেশ, কারো জীবনেই একটানা ঊর্ধ্বগতি বা সমৃদ্ধি সম্ভব নয়। এবং ভারতের ইতিহাসে দেখা গেছে যে তার একটা অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির অধ্যায়কে একটা অবক্ষয় এমন কি অরাজকতার কাল সব সময় অনুসরণ করে চলে এবং অবক্ষয়ের পূর্ববর্তী যে সমৃদ্ধির কাল তা সর্বদাই অতি উন্নত স্তরের কৃষ্টি ও সভ্যতার দ্বারা চিহ্নিত। কেবল অজ্ঞ বা অন্ধের পক্ষেই এ-উক্তি সম্ভব যে ভারত বৃটিশ শাসন প্রবর্তনের পরেই এক-রাষ্ট্রীয়তার পরিচয় প্রথম পেয়েছে।

সুভাষচন্দ্র বসু

ইণ্ডিয়ান ষ্ট্রাগলের প্রস্তাবনা হইতে

সম্পাদকীয়

এতদিন পর ভারতবর্ষ মিথ্যা শান্তির মোহনিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে রূঢ় কঠিন বাস্তবের মুখোমুখি। যেমন ব্যক্তির জীবনে মূল্য দিতে হয় শ্রেয় ও প্রেয় লাভ করবার জন্য—তেমনি প্রতিটি দেশ ও জাতিকে প্রস্তুত থাকতে হয় উপযুক্ত মূল্য দেবার জন্য, তার অভীপ্সিত পথে চলবার স্বাধীনতা অর্জন ও রক্ষা করবার জন্য। তার জন্য সংগ্রাম, সংঘর্ষ জীবনদানের, অনিবার্যতা যারা স্বীকার করেনা বা এই পথকে এড়িয়ে মিথ্যার সঙ্গে আপোষ রফা করে সমস্যার সমাধান করতে প্রয়াসী হয় তারা—আর যাই হউক বৃহৎ বা মহৎ লক্ষ্যের অনুসারী নয়, সত্যের পূজারী তো নয়ই। সমস্যাকে গোঁজামিলের দ্বারা অথবা কথার মারপ্যাঁচে এড়িয়ে যাওয়া অসম্ভব, আর সে পথে যা লাভ হয় তা শান্তি 'নামে' অভিহিত হবারও যোগ্য নয়। সংগ্রাম সংঘর্ষ রক্তপাতকে এড়াবার জন্য পরাধীনতা পরবশ্যতা আত্মাবমাননা অমর্যাদাকে স্বীকার করে শুধু 'দিন যাপনের, প্রাণ ধারণের গ্লানি'কে যারা স্বীকার করে নেয়, তারা যা লাভ করে তাকে আমরা 'শান্তি' আখ্যায় আখ্যায়িত করি না—আর নয়তো তাদের সে শান্তিকে আমরা বুঝিও না, আমাদের তা একেবারেই কাম্য নয়; যে শান্তি মনুষ্যত্বলাভের পথ বা উপায় নয়—কেবলমাত্র বেঁচে থাকার দিনগুলিকে দীর্ঘতর করাই যার ফলশ্রুতি সে "শান্তিকে" আমরা আজীবন ঘৃণা করেছি।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতবর্ষে আমাদের বিবেচনায় যা সর্বাপেক্ষা শোচনীয় অভাব—তা হচ্ছে জাতির সামনে কোনো সুস্পষ্ট, সুনিশ্চিত জাতীয় লক্ষ্য নেই শুধু তাই নয়, নিরন্তর ভ্রান্ত অমর্যাদাকর লক্ষ্য উপস্থিত করার ফলে জাতি মাতৃল দিয়েছে চূড়ান্ত কিন্তু তার সঙ্গে বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নাগরিকদের সামনে থেকে দিগন্ত সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়েছে। হিংসা ও অহিংসা, শান্তি ও সংগ্রাম, ঐক্য ও অনৈক্য-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অবাস্তব, ভ্রান্ত ও অ-নৈতিক মূল্যমান জাতির সামনে রেখে তাকে আত্মপর, ক্ষুদ্রচেতা, গোষ্ঠী-চেতনাহীন, উদ্যমহীন এক ক্লীব মনুষ্যগোষ্ঠীতে পরিণত করা হয়েছে। এতদিন পর সেই কল্পনার জগতের অধিবাসীরা যদি বাস্তব সত্যের মুখোমুখি এসে নিজেদের আবিষ্কার করে থাকে ও জাতীয় লক্ষ্যের সন্ধান পেয়ে থাকে তবে আমরা তাকে পরম লাভ বলেই মনে করবো।

বিগত ৫ই আগষ্ট থেকে পাকিস্তানী হানাদাররা কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি রেখা অতিক্রম করে আসছে।

রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে শুরু করে ভারতের "মুরুব্বিরা" বিশেষ বৃটেনও আমেরিকা সামান্যতম মন্তব্য ও করেনি—তারপর ১লা সেপ্টেম্বর থেকে ভারতের সার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা লঙ্ঘনকারী পাকিস্তানী স্পর্দ্ধার যোগ্য মোকাবিলা করছে ভারতীয় সৈন্য ; অতুলনীয় দেশপ্রেম, প্রবল বীর্য ও দুর্লভ সামরিক কৌশল দেখিয়ে সমস্ত জাতিকে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট করেছে। আরো আনন্দের বিষয় ভারত সরকারের—বিশেষভাবে প্রধানমন্ত্রী শ্রীশাস্ত্রীর কাজে ও উক্তিতে আশাজনক পরিবর্তন লক্ষ্য করছি আমরা। আগামী দিনের নূতন নূতন জটিলতা ও কঠিনতর সমস্যার মধ্যে এই দৃঢ়তা ও সঙ্কল্প অটল অবিচল থাকবে এই প্রত্যাশায় জাতি অপেক্ষা করবে পূর্ণ সহযোগিতা ও সমর্থন নিয়ে।

গোড়া থেকেই যে আশঙ্কা ছিল এই সুযোগে ভারতকে লাঞ্ছিত ও পর্যুদস্ত করে, দক্ষিণ-পূর্ব-এশিয়াতেই শুধু নয় গোটা এশিয়াতে একচ্ছত্র ডিক্টেটার হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করবে চীন—তারই ইঙ্গিত দেখা গেছে ১৭ই সেপ্টেম্বর মিথ্যা ছুতো ধরে ভারতকে ৭২ ঘণ্টার চরম পত্র দেবার ধৃষ্টতায়। ভারতের যে সব শত্রুমিত্র এতদিন ধরে উচ্চাঙ্গের উপদেশ ও অনুযোগ দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করছিল—তারা এবার ঘমকে সুর পাল্টাতে শুরু করেছে। কিন্তু তার চাইতেও শুভ ইঙ্গিতবহ লোক-সভায় শ্রীশাস্ত্রী সমস্ত জাতির সঙ্কল্প সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করেছেন চীনের এই হুমকি আমাদের সার্বভৌমত্ব ও ন্যায্য অধিকার থেকে আমাদের বিচ্যুত করতে পারবে না। অন্যদিকে পাকিস্তানের সকল নষ্টামি এতদিন বেমালুম হজম করে উ থান্ট রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পক্ষ থেকে ভারত পাকিস্তানকে যুদ্ধ-বিরতির নির্দ্দেশ দেবার প্রস্তাব করেছেন, আজ ২০শে সেপ্টেম্বর উনোতে সিকিউরিটি কাউন্সিল ৪৮ ঘণ্টার চরমপত্র দিয়ে ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতির নির্দেশ দিয়েছে ; দু একদিনের মধ্যেই পাক ভারত সংঘর্ষের পরবর্তী অধ্যায়ের আকৃতি-প্রকৃতি অনেকাংশে পরিষ্কার হবে। এসব ঘটনার উপর বিশেষভাবে আন্তর্জাতিক শক্তিগুলির পায়তারা প্রভাবান্বিত ও নিয়ন্ত্রিত করবার ব্যাপারে আজকের ভারতের করবার বিশেষ কিছুই নেই। তার কারণ এই নয় যে আন্তর্জাতিক ঘটনা-প্রভাবিত করা তার সাধ্যাতীত ছিল কিন্তু এই দীর্ঘ ১৮ বছর ধরে স্বাধীন ভারতবর্ষ তার সুদীর্ঘ সুপ্রাচীন ইতিহাস, বিশিষ্ট বিচিত্র ভূগোল, বিপুল জনবল কোনো কিছুকেই কাজে লাগায় নি। নেতিবাচক, দুর্বল অবাস্তব আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করেছে, যার ফলে ভারতের লক্ষ্যহীন উদ্যমহীন জনতা শুধু ক্ষুধা, অশিক্ষা, স্বাস্থ্যহীনতা ও দুর্নীতির নিত্য শিকার হয়েছে। যার ফলে কম্যুনিষ্টরা তাদের বিশ্ব-উদ্ধারকারী কূটকৌশল প্রয়োগ করে এদেশের

জনতাকে মুক্তি দেবার চেষ্টায় নিত্যব্যস্ত, যাতে দেশের প্রতি আনুগত্য নস্যাৎ করে দিয়ে কম্যুনিষ্ট দেশগুলির স্বার্থ ও আন্তর্জাতিক উদ্দেশ্য রক্ষায় এরা স্বদেশ ও জীবন উৎসর্গ করে। ২য় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে তার জলন্ত দৃষ্টান্ত আমরা দেখেছি, দেখেছি কিভাবে সেদিন এই সর্বহারাদের ত্রাণকর্তারা বৃটিশের পদলেহন করে ইংরেজের বেতনভুক্ দেশ-উদ্ধারকারী হিসাবে দেশপ্রেমিকদের ধরিয়ে দেবার, তাদের বিরুদ্ধে সর্বপ্রকারে ইংরেজকে সাহায্য করবার এবং ভারত ও পৃথিবীকে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ মুক্ত করবার মহান ব্রত গ্রহণ করেছিল। এই বীরপুরুষরা সেদিন রুশ-মিত্রশক্তিগুলির মৈত্রীকে স্বাগত জানিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্রের আজাদ-হিন্দ-ফৌজকে ইম্ফল প্রান্তে রুখবার শুভ সঙ্কল্প নিয়ে দিকে দিকে 'জাপানকে রুখতে হবে' বলে ভারতের শশ্মানভূমিকে প্রকম্পিত করেছিল। সেদিন ভারতের সকল মত ও দলের দেশপ্রেমিকরা ইংরেজের স্বার্থের বলি হবার বিপক্ষে দেশ ও জাতিকে আহ্বান দিয়েছিল। তারপর দিনে দিনে কালে কালে কত ভোল এরা ফেরাল, কত রূপ এরা দেখাল কত ছলে। এবার এদের মুরুব্বি মহান চীন ও পিতা মাও সে তুং, তাঁর মুখনিঃসৃত অমৃতবাণীর নিত্যনূতন ভাষ্য শুনছে জাতি, হিমালয় সীমান্তে ১৯৬২ তে চীনের আক্রমণকে চোখে রঙ্গিন ঠুলি পরে এরা প্রচার করেছে চীন নয় ভারতবর্ষই আক্রমণকারী, এবারও কাশ্মীরের উপর পাকিস্তানী হামলাকে যতদূর সম্ভব ক্ষুদ্র ও ক্ষুণ্ণ করে দেখিয়ে এই যথার্থ দেশহিতৈষীরা কোমর বেঁধে প্রচারে নেমে পড়েছে—প্রধান বিরোধী দলের দেশপ্রেমিক দায়িত্ব নিয়ে—বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জাতিকে সতর্ক এবং পাক-ভারতের সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার ভূমিকায়।

আমাদের বক্তব্য সুস্পষ্ট :

(১) সংঘর্ষ, সংগ্রাম, যুদ্ধ মাত্রকেই আমরা অকল্যাণকর, অবাঞ্ছনীয় এবং যে কোনো মূল্যে এড়িয়ে যাবার বিরোধী। বর্তমান পাকিস্তানী আক্রমণ ভারতের স্বাধীনতার উপর আক্রমণ এবং সে আক্রমণকে জাতির সর্বশক্তি দিয়ে রুখবার কর্তব্য সর্বপ্রধান ও প্রাথমিক। এর জন্য কোন মূল্যদানই অতিরিক্ত নয়। এ সম্পর্কে আমরা দ্বিধাহীন ও সুস্পষ্ট। বর্তমান অবস্থায় প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সদ্ভাব রক্ষা, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের অনিবার্যতা, বিশেষভাবে বুর্জোয়াদের কায়দাজি সম্পর্কে সতর্ক থাকা ইত্যাদি প্রশ্ন উত্থাপন, জাতির প্রাথমিক এবং প্রথম কর্তব্য থেকে লক্ষ্য ও একাগ্র দৃঢ়তাকে অপসারিত করে জাতিকে বিভ্রান্ত ও তার প্রতিরোধকে দুর্বল করারই সামিল। এসব যুক্তি ও নীতি প্রচারের পেছনের উদ্দেশ্যও প্রচারকারীদের অন্তিম লক্ষ্য সম্পর্কে সচেতন ও সতর্ক থাকা ও করা প্রতিটী দেশব্রতীর ন্যূনতম কর্তব্য।

(২) এই সংঘর্ষে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি এবং সে লক্ষ্যে পৌঁছবার উপায় সম্বন্ধে অনুসরনীয় সুনির্দিষ্ট পথ ও করনীয়গুলি সম্বন্ধে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা অনতিক্রম্যভাবে প্রয়োজনীয়। সাম্প্রদায়িক ঐক্য, হিন্দু মুসলমানে সম্প্রীতি ইত্যাদি সম্পর্কে আবেগাপ্লুত হয়ে যাঁরা নিজেদের ঔদার্য, মহত্ব ও উচ্চাঙ্গের মনুষ্যত্ব সম্পর্কে আত্মতৃপ্তির মনোভাব নিয়ে সুউচ্চ ভূমি থেকে অন্যান্যদের উদ্দেশ্যে অনুকম্পা মিশ্রিত উপদেশামৃত বর্ষণ করে থাকেন এবং নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী হিন্দু বা মুসলমান-এর মধ্যে দোষাদোষ, দায়িত্ব ভাগাভাগি করে দেন, তাঁদেরকে জিজ্ঞাস্য এই সাম্প্রদায়িকতার উৎস সম্পর্কে তাঁদের বিশ্লেষণ কি? এবং বক্তৃতা বাদ দিয়ে মূলগত প্রতিকারের উপায়ই বা তাঁদের মতে কি? দেশকে সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে ভাগ করে এবং দু দেশে উভয় সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা বজায় রেখে সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত পরিবেশ দূর করবার উপায় এঁদের মতে কি? হিন্দু কিংবা মুসলমান মানুষের সকল দোষগুণ উভয়ের মধ্যেই আছে—ব্যক্তিগতভাবে কিছু হিন্দু ও কিছু মুসলমান সংকীর্ণতার উর্দ্ধে বৃহত্তর মনুষ্যত্বের আহ্বানে সর্বদাই সাড়া দিয়ে থাকেন ও থাকবেন—তার সংখ্যা ও হারাহারি নিয়ে যাঁরা বাক্ বিস্তার করেন—তাঁরা আর যাই করুন মানুষের বীর্যবান মহৎ প্রকাশের পরিবেশ রচনায় বিন্দুমাত্র সাহায্য করেন না। এ সম্পর্কে আমাদের মত সুস্পষ্ট। সাম্প্রদায়িক ভিত্তিতে দেশবিভাগের পাপকে সম্পূর্ণ উৎপাটিত করবার উপায় নিঃসন্দেহ দৃঢ়তার সহিত সেই পাপকে বর্জন করা—এবং তারজন্য প্রথম প্রয়োজন পূর্ণবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে ভারত পাকিস্তানে পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু করা এবং উভয় রাষ্ট্রের অধিবাসীদের মানসিক প্রস্তুতির পর উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে দেশবিভাগ বাতিল করা অন্ততঃ পক্ষে সর্বপ্রকার বাধাহীন আদান প্রদান ও যোগাযোগের স্বাধীনতা সম্ভব করা। যাতে অদূর ভবিষ্যতে অন্ততঃ দুই রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি কনফেডারেশন সম্ভব হয়। ভারত সরকার অথবা বিরোধী দলগুলি এই লক্ষ্য কেউই ঘোষণা করেননি। ভারত সরকার আন্তর্জাতিক জটিলতা সৃষ্টির আশঙ্কায় এবং নিজেদের দূরদৃষ্টির অভাবে আর এদেশের বিরোধী দলগুলি প্রধানতঃ নেতিবাচক ভূমিকাতেই সন্তুষ্ট। সম্পূর্ণ বিপরীত পরিবেশ চিন্তা বা সৃষ্টি করা তাদের পক্ষে দুঃসহ কঠিন। কয়েক হাজার বছরের ইতিহাসকে সাম্রাজ্যবাদীদের চক্রান্তে ও স্বার্থে মাত্র ১৮ বছর আগের সৃষ্ট অস্বাভাবিক অবস্থাকে অগ্রাহ্য ও নস্যাৎ করার কথা তারা কল্পনাও করতে পারে না। অথচ সমাধান আর কোন পথে সম্ভব তা আমাদের বুদ্ধি বিবেচনার অতীত। কাজেই এবিষয়ে জাতির লক্ষ্য স্থির হওয়া অবশ্য প্রয়োজনীয়।

(৩) ভারতের বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ নীতির আমূল পরিবর্তনের দাবী সোচ্চার হওয়া উচিত।—

আত্মরক্ষায় স্বয়ং-সম্পূর্ণতার নীতি যত বেশী সম্ভব অনুসরণ করার ব্যাপারে সুদৃঢ় পদক্ষেপ করা নিশ্চয়ই উচিত। এজন্য প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে সৈন্যদল গঠন ও সর্বপ্রকার হাতিয়ার প্রস্তুত করার কাজে অবিলম্বে নিযুক্ত হওয়া। আক্রমণ এসে পড়লে তোড়জোড় শুরু করা এবং ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে শত্রুমিত্র সকলের দ্বারে আবেদন করা যেমন অদূরদর্শিতা, তেমনি যথার্থ স্বাধীন নিরপেক্ষনীতি অনুসরণে অক্ষমতার কারণ। ৪র্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকে এই প্রয়োজনে পরিবর্তিত ও প্রয়োগ করার সুদৃঢ় দাবী উঠানো উচিত। ভারতের দূতাবাসগুলিকে লক্ষ্য, আচার আচরণ সম্পর্কে সুস্পষ্ট নির্দেশ দেয়া দরকার—যাতে ভারতের জাতীয় লক্ষ্য ও মর্যাদা সম্পর্কে কোনো ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি না হয় বিদেশে।

(৪) চীনের লক্ষ্য সম্পর্কে পরিষ্কারভাবে ভারতের বোঝা দরকার। আজ পাকিস্তানের সঙ্গে দোস্তির দোহাই, আগামীকাল সীমানা লঙ্ঘনের অজুহাত এরূপ নিত্য নূতন অজুহাত সৃষ্টি করে এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলির মধ্যে একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে চীন নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়—এবং এই ব্যাপারে ভারতকে তার সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে।—কাজেই পাক-ভারত সংঘর্ষের আপাত মীমাংসা হোলেও চীনের সঙ্গে ভারতের চূড়ান্ত মোকাবিলা রোধ করা যাবে তার কোনো সম্ভাবনা আমরা দেখছি না।

এজন্য ভারতকে দীর্ঘমেয়াদী লক্ষ্যনিয়ে প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে হবে। এই প্রস্তুতির কোনো সীমা পরিষ্কার নেই নিরবচ্ছিন্ন ভাবে এ চালিয়ে যেতে হবে। এবং এই প্রস্তুতির সম্পূর্ণতা ও ব্যাপকতাই একমাত্র ভারতের দৃঢ়তম প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। অহিংসা, শান্তি এই কথাগুলো স্থানে অ স্থানে ব্যবহার করে জাতিকে লক্ষ্যচ্যুত ও বিভ্রান্ত করা দৃঢ়ভাবে বন্ধ করতে হবে।

সর্বশেষ কথা

(৫) নিশ্চয়ই আভ্যন্তরীণ শান্তি রক্ষার জন্য জনসাধারণের বাঁচবার মত খাদ্যবস্ত্র, ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং একদিকে চূড়ান্ত ভোগ, দুর্নীতি ও অন্যপ্রান্তে নিম্নতম প্রয়োজনেরও অভাব এ অবস্থা কোনো মানুষের সমাজ সহ্য করবে না চিরদিন। দৃঢ় হাতে একে যদি বর্তমান শাসকেরা বন্ধ করতে না পারেন যদি নিজেদের গদীয়ান হয়ে থাকার আকর্ষণে পুঁজিবাদীর স্বার্থে, বঞ্চিত জনসাধারণের স্বার্থকে অগ্রাহ্য করেন তবে পরিণামকে রোধ করতে পারবে না সেবিষয়ে আমরা সুনিশ্চিত।

এই দুর্যোগপূর্ণ সময়ে ইতিহাসের রথচক্রের শব্দ যারা শুনতে জানে, শুনতে পায় তারা প্রস্তুত থাকুক—আর যারা বধির ও অন্ধ তাদের কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন ও অর্থহীন।

সর্বশেষে এবারকার শারদীয় জয়শ্রী গ্রাহক ও শুভার্থীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি নেতাজী সম্পর্কিত মূল্যবান দুটী দলিলের দিকে। এ দুইটি দলিল সংগ্রহ করে তাদের উৎসর্গ করবার জন্য জয়শ্রীর সম্পাদকীয় বিভাগের বেশ কিছু প্রয়াস করতে হয়েছে। এ দুইটি লেখা বিশেষ ভাবে 'ইণ্টারপ্রেস' নামক আন্তর্জাতিক জীবনী সংগ্রাহক সংস্থা থেকে সংগৃহীত লেখাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষতঃ অধুনা শ্রীসত্যনারায়ণ সিংহের প্রকাশিত প্রবন্ধাবলী ও তার পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভায় প্রশ্নের উত্তরে ভারত সরকারের মুখপাত্রের 'শানওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তকে ভারত সরকার সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছে,' এই ঘোষণা দেশে বিপুল বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। দেশবাসী যদি এই ধারণা ও সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে নেতাজী সম্পর্কে সুনিশ্চিত তথ্য সংগ্রহ ভারত সরকারের শুধু অনভিপ্রেতই নয়, তিনি জীবিত এই অকাট্য প্রমাণ উপস্থিত করে তাঁকে অনুসন্ধান করার দায়িত্ব গ্রহণেও তারা সম্পূর্ণ ভাবে উদাসীন ও অনিচ্ছুক—তবে নিশ্চয় তা অন্যায় বা ভুল হবে না।

নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে যে তথ্য শাহনওয়াজ কমিটি সংগ্রহ করেছে আমরা তাকে সম্পূর্ণভাবে অগ্রহণীয় ও বর্জনীয় বলে মনে করি দীর্ঘদিন থেকে, এবং বিমান দুর্ঘটনায় তাঁর মৃত্যুর কোনো বিশ্বাস-যোগ্য প্রমাণ না থাকাতে তাঁর মৃত্যু সংবাদকে স্বীকার করি না।—ইণ্টারপ্রেস-জার্মানীর একটী সুপরিচিত সংস্থা ১৯৪৯ সনে তারা যে জীবনী লিপিবদ্ধ করেছে নেতাজীর মৃত্যু সম্পর্কে শাহনওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তের উপর তা আলোকপাত করবে। ভারত সরকার সহজেই এর সত্যতা প্রমাণ করতে পারেন। এ সম্পর্কে তাঁদের বক্তব্য কি? ভারতবর্ষ নেতাজী সম্পর্কে কোনো দ্বিধাগ্রস্থ নীতি সহ্য করবে না। বিশেষতঃ জাতির এই দুর্যোগ পূর্ণ মুহূর্তে নেতাজীর জীবন বা মৃত্যু জাতির পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর জীবিত থাকার সম্ভাবনা এবং ভারতের স্বাধীনতা ও মর্যাদা রক্ষায় এই দুর্বার অতন্দ্র প্রহরীর সুদুর্লভ নেতৃত্বলাভে যদি জাতির পক্ষে কোনো সম্ভাবনা থাকে, তবে যে কোনো কারণেই হোক তা ব্যাহত হওয়া জাতি ক্ষমা করবে না। আশাকরি ভারতের বর্তমান নেতৃবর্গ তা অনুমান ও অনুধাবন করতে পারবেন।

২০।৯।৬৫

INTERPRESS

Ausgabe Politik
335/1949

INTERNATIONALER BIOGRAPHISCHER PRESSEDIENST

সুভাষচন্দ্র বসু

অধুনা ক্রমশঃ নানা ঘটনা পরম্পরায় এই তথ্য প্রতীয়মান হচ্ছে যে বিগত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিমান দুর্ঘটনায় নিহত বলে ঘোষিত ভারতীয় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু এশিয়ার রাজনৈতিক পটভূমিকে নিজের হাতের মুঠোয় আনার জন্য সুযোগের অপেক্ষায় আছেন।

শ্রীবসু দৃষ্টিপটের অন্তরালে অপেক্ষারত মানুষ

Babu Bose Mann hinter den Fronten

বিগত অক্টোবর মাসে ভারতবর্ষের প্রান্তে এক অতর্কিত আণবিক বিস্ফোরণ ঘটেছে। সে বিস্ফোরণ অবশ্য রাজনৈতিক প্রকৃতির এবং পরীক্ষামূলক মাত্র। কিন্তু এর অবশ্যম্ভাবী ফল সুনিশ্চিতভাবে ফলেছে। কয়েকদিনের মধ্যে বেতার ঘোষণায় জানা গেল, বিগত বিশ্বযুদ্ধে নিখোঁজ ভারতীয় বিপ্লবী সুভাষচন্দ্র বসু পিকিং-এর কমিউনিস্ট বেতার কেন্দ্র থেকে ভাষণ দিতে পারেন। অবশ্য এই রহস্যময় ঘোষণার পর আর কিছুই শোনা যায়নি, তবু এ কথা কেউই বলেননি, যে শ্রীবসু সত্যিই বেঁচে আছেন এ সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ আছে। আর এক কথা,—ঠিক যে মুহূর্তে হিমালয়ের উত্তর প্রান্তে এই ধরণের এক যুগান্তকারী রাজনৈতিক বিস্ফোরণ ঘটলো, সেই সময়েই শ্রীবসুর এককালের সহকর্মী, বর্তমানে তাঁর প্রচণ্ড বিরোধী, ভারতের বর্তমান সরকারের কর্ণধার, শ্রীনেহরু প্রেসিডেন্ট ট্রুমানের আতিথ্যে ওয়াশিংটনে অবস্থান করছেন, এ ঘটনা কি নিতান্তই কাক-

তালীয় ? বেশির ভাগ আমেরিকানেরই আশা ছিল, শ্রীনেহরু এ বিষয়ে মৌন অবলম্বন করবেন। শ্রীনেহরু তা করেছেন। অবশ্য তিনি এ কথা বলেছেন, আমন্ত্রণ পেলে তিনি মস্কোতেও যেতে পারেন। তিনি কি এই পরিবর্তনের সূচনাতেই বুঝতে পেরেছিলেন যে এই ঘটনা এক প্রচণ্ড আণবিক শক্তি-সম্পন্ন মানুষের আবির্ভাবের সূচনা করছে ? লেনিন যেমন ১৯১৭-র বৈপ্লবিক মুহূর্তে জার্মানীকে যাত্রাপথ হিসেবে বেছে নিয়ে রাশিয়ায় পৌঁচেছিলেন, শ্রীবসু আর একবার ভারতবর্ষের স্বার্থে সেই পন্থাই অবলম্বন করেছেন।

ইনিই সেই বসু যিনি ১৯৪২ সালের মে মাসে হিটলারের সঙ্গে সাক্ষাতের মাত্র একবছরের মধ্যেই অভাবনীয় পন্থায় সোজা টোকিওতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুদ্ধের অগ্নিদাহে পর্যুদস্ত, দগ্ধপ্রায় পৃথিবীর পূর্ব গোলার্ধে লেলিহান শিখার মধ্যে এই দুঃসাহসিক অভিযান কি করে সম্ভব হলো সে রহস্য আজও উদ্ঘাটিত হয়নি। তবে এ কথা নিশ্চিত যে হিটলার তাঁকে দূরপাল্লার বিমান, ইউ-বোট, এবং 'ব্রকেড্-ব্রেকার' ও অন্যান্য যুদ্ধ সরঞ্জাম দিয়ে সর্বতোভাবে সাহায্য করেছিলেন। সম্ভবতঃ শ্রীবসু ইউ-বোটকেই তাঁর যাত্রাপথে প্রশস্ত বলে মনে করেছিলেন। ১৯৪১ সালের জানুয়ারীতে ভারতবর্ষ থেকে গোপনে নিরুদ্দেশ হওয়ার যাত্রাপথও কম বিপজ্জনক ছিল না। মাত্র ষোলো বছর বয়সেই স্কুলের ছাত্র শ্রীবসু পিতৃগৃহ ত্যাগ করে পর্বতসঙ্কুল হিমালয়ের পথে নিঃসহায় যাত্রী হিসাবে পা বাড়িয়ে ছিলেন,—মন্দিরে মন্দিরে অনন্ত সত্যের সন্ধানে ফিরেছিলেন এই ধর্মপ্রাণ তরুণ। এই প্রচণ্ড ইংরেজ-বিদ্বেষী ব্যক্তিটি কেম্ব্রিজের কলেজে থাকাকালে ছদ্মবেশ ধারণের কলাকৌশল সুনিপুণভাবে আয়ত্ত করেছিলেন। ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যে ভিয়েনায় থাকাকালে তিনি এক প্রবাসী ভারতীয়ের কাছে মুখের মেক-আপ (শিক্ষা) আয়ত্ত করেছিলেন। এই সময় সেই ভারতীয় ব্যক্তিটির তত্ত্বাবধানে "ঈশানপুরের বাঘ" নামে এক চলচ্চিত্র জার্মানীতে তোলা হচ্ছিল। শ্রীবসুর এই শিক্ষা অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর কাজে লাগলো, যখন তিনি তাঁর নামে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা থাকা সত্ত্বেও ১৯৪১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ইঙ্গ-ভারতীয় শাসকগোষ্ঠীর চোখে ধূলো দিয়ে কাবুলে পৌঁছলেন আফগানিস্থানের জার্মান রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছায়। কিন্তু সেখানে তিনি তাঁর প্রয়োজনীয় জার্মানী যাওয়ার ছাড়পত্র পেলেন না। অবশেষে ইতালীয় দূতাবাস তাঁর ইতালীয় নামকরণ করে ইতালীয়বাসী হিসাবে এক মিথ্যা ছাড়পত্র দিলেন।

শ্রীবসু এই ঘটনার প্রায় দশ বছর আগে ভিয়েনার পথে রোমে মুসোলিনীর আতিথ্য স্বীকার

করেছিলেন। কিন্তু এবার তিনি যত দ্রুত সম্ভব হিটলার ও রিবেনট্রপের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র ছিলেন। তাঁর প্রথম লক্ষ্যস্থল ছিল বার্লিন। তিনি একজন জার্মান ইঞ্জিনীয়ারের সহকারী হিসাবে জার্মান সীমান্ত অতিক্রম করলেন এবং অতঃপর একজন নবাগত বিদেশী ভ্রমণকারীর ছদ্মবেশে মস্কো পরিদর্শনের ব্যবস্থা করলেন। ককেশাসের পথে মস্কোযাত্রা ভালই হোক, মন্দই হোক, তাঁকে যেতেই হবে। ভারতবাসী শ্রীবসু ইতালীয়ান ভাষা বিশেষ জানতেন না, রুশ ভাষা কিছু কিছু বুঝতে পারতেন। কিন্তু সোবিয়েৎ বাসীরা তাঁর হাবভাবে বেশ সমঝদার মনে করেছিল। তিনি ছাড়পত্র বিভাগে কোনো কথাবার্তা বলেননি। প্রায় একসপ্তাহ যাবৎ তিনি ট্রেণে একটি আরামদায়ক কামরায় বসে চা, দুধ, ডবকা আর প্রচুর গোমাংস খেয়ে ঘুরে বেড়ালেন। উচ্চশ্রেণীর বর্ণহিন্দুর পক্ষে এই নিষিদ্ধ খাদ্য গ্রহণ এক অসম সাহসিকতার পরিচয়। কিন্তু বিদ্রোহী সংস্কারমুক্ত শ্রীবসুর কাছে এই ধরণের প্রয়োজনীয় কোনো কিছুই অন্যায় ছিল না। রুশবাসীরা জানতেন যে শ্রীবসু ১৯৩৩ সাল থেকেই বলশেভিক ও ফ্যাসিস্ট নীতি খুব ভালভাবে শিক্ষা করেছেন এবং একাধারে মুসোলিনী ও স্তালিন দু'জনেই তাঁর আদর্শ ক্রেমলিনে তাই শ্রীবসু যথেষ্ট শুভতার সঙ্গে সমাদৃত হয়েছিলেন। এমন কি তিনি যখন হিটলার ও জাপানীদের পক্ষে যুদ্ধ সমর্থন করেছিলেন, তখনও মস্কো থেকে তাঁর বিরুদ্ধে একটি শব্দও উচ্চারিত হয় নি। ১৯৩৯ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি একদিন বলেছিলেন, কোনো এশিয়াবাসী নাৎসীবাদের নীতিকে সমর্থন করতে পারে না। অথচ ১৯৪২ সালে যখন তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য আবেদন স্বদেশবাসীর কাছে পেশ করলেন, তখন তিনি এই বিশ্বাসের অনুবর্তী হলেন যে ইংরাজের শত্রুপক্ষ জার্মানী ও জাপান "স্বাভাবিকভাবেই" মুক্তিকামী ভারতবাসীদের সমর্থন করবে।

কিন্তু বার্লিনে শ্রীবসুর সময় খুব ভালো কাটলো না। তিনি মাসের পর মাস এক হোটেলের নির্জন ঘরে অপেক্ষা করে রইলেন নিশ্চয়ই কোনো সাড়া পাবেন এই আশায়, অবশেষে নিদারুণ-ভাবে হতাশ হলেন যখন দেখলেন রণোন্মত্ত হিটলার মিত্র সোভিয়েৎ ইউনিয়নের উপরই ঝাঁপিয়ে পড়েছে। তিনি মন্তব্য করলেন, "এই বিশ্বযুদ্ধে, এই ঘটনা সবচেয়ে মারাত্মক ভুল"। শ্রীবসু এবার কেবলমাত্র জাপানের উপরেই কিছুটা ভরসা করলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের যোগদান বিদ্যুৎগতিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার পটভূমিতে রাতারাতি অভাবনীয় পরিবর্তন আনলো, শ্রীবসু বিশ্বরাজনীতির এই দ্বারবেলায় এক অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করলেন। তিনি সিঙ্গাপুর জয় করে সেখানে এক ভারতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করলেন। জাপানী অস্ত্রেশস্ত্রে সজ্জিত আজাদ হিন্দ ফৌজ

বাহিনী নিয়ে তিনি ব্রহ্মদেশের উপর দিয়ে ভারতবর্ষের পথে অগ্রসর হলেন, এ পথ শ্রীবসুর পূর্ব-পরিচিত মান্দালয়ের জেলে বন্দী হিসাবে যাতায়াতের পথ। ভারতবাসীদের কাছে এই বিদ্রোহী ভারতসীমান্ত অভিমুখী সৈন্যবাহিনী মোটেই বিশ্বাসঘাতক হিসাবে গৃহীত হয়নি, বরং বীর হিসাবে সাদরে সম্ভাষিত হয়েছিল আর তাদের "নেতাজী হলেন স্বয়ং শ্রীবসু।

ভারতবর্ষে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে, "মৃত্যুর পূর্বে যাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়, তার আয়ু আরও বৃদ্ধি পায়।" বিগত যুদ্ধের প্রথমভাগেই একবার শ্রীবসুর বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে বলে সংবাদ রটিত হয়েছিল। এই অসত্য সংবাদ সারা ভারতবর্ষ থেকে সেই মানুষটির পরিবারবর্গের প্রতি শোকবার্তা আর অজস্র ফুলমালার বন্যা এনে দিয়েছিল, যাকে ইতিমধ্যে সরকারীভাবে বিশ্বাসঘাতক বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তৎকালীন ভারতীয় নেতা নেহেরুর সঙ্গে এই আলোচনায় গান্ধী একমত হতে পারেননি। গান্ধী তাঁর সবচেয়ে বিপজ্জনক বিরোধী ব্যক্তিটি সম্পর্কে বলেছিলেন, "যাই হোক না কেন তিনি আমাদের মাতৃভূমির শত্রু নন, তিনি দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে অনেক অগ্রসর হতে সাহায্য করেছেন।" ১৯৪২ এর এপ্রিল মাসে এই দুঃসংবাদের পর, গান্ধী শ্রীবসুর মায়ের কাছে শোকবার্তায় বলেছিলেন, "তিনি ভারতবর্ষের মহান ও বীর সন্তান।" কিন্তু তার মাত্র অল্প কিছুদিন পরেই এই মৃত বলে ঘোষিত ব্যক্তিটির কণ্ঠস্বর দূরান্তর থেকে বেতারে প্রচারিত হলো।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পরই আবার শ্রীবসু মৃত বলে ঘোষিত হয়েছেন। এবারের ঘোষণাও সরকারী এবং সমগ্র মিত্রপক্ষের যুক্ত তদন্ত কমিশনের ঘোষিত ফলশ্রুতি। যদিও টোকিও থেকে প্রচারিত বেতারবার্তায় বলা হয়েছে, শ্রীবসু ১৯৪৫ সনের ১৮ই আগষ্ট তারিখে এক জাপানী বিমানে তাইহোকু বিমান বন্দর থেকে করমোজা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনায় আহত ও পরে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন, তবু সারা বিশ্ব এই ঘোষণায় বিশেষ আমল দেয়নি। ভারতবর্ষে ত কেউ এ কথা বিশ্বাসই করেনি। দুর্ঘটনার এক বছর পরে ১৯৪৬ সালের ২১শে অক্টোবর মিত্রপক্ষীয় তদন্ত কমিশন এই সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যে সত্যই শ্রীবসু ১৯৪৫ সালে ১৮ই আগষ্ট তারিখে করমোজার জাপানী মিলিটারী হাসপাতালে অন্তিম নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। কিন্তু গান্ধীর মত ব্যক্তিও অনেক পরে ঘোষণা করলেন, তাঁদের মতে শ্রীবসু এখনও জীবিত আছেন। ভারতসরকার জানালেন,

টোকিও শ্রীবসুকে মৃত বলে ঘোষণা করতে পারেন না। শ্রীবসুর বড় ভাই ভারতের জাতীয় সম্মেলনে বলেছেন, "কিছুই জানিনা" এমনকি আমেরিকান সৈন্যদের টোকিও প্রবেশের দিন পর্যন্ত যে সমস্ত জাপানী নাগরিক সেখানে ছিলেন তাঁদের কাছ থেকেও কোনো সংবাদ পাওয়া যায়নি। শ্রীবসুর দেহরক্ষী শেষ যাত্রার দিন তাঁর সঙ্গে এক বিরাট রহস্যময় পেটিকা দেখেছিলেন।

কেউ অগ্নিশিখা পরিবেষ্টিত মৃতদেহ দেখেনি। পূর্ব-এশিয়া সম্পর্কে বহু অভিজ্ঞ ব্যক্তিই অবশ্য জানেন যে আত্মসমর্পণের সময়ে ঘোষিত তালিকায় জাপানীরা বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিরই "বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর" কথা উল্লেখ করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসু পঞ্চাশ বছর বয়সেও একজন দৃঢ়দেহী অভাবনীয় মানসিক বলশালী এবং অসামান্য ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সম্পন্ন রাজনীতিক ছিলেন। জাপানের সঙ্গে যোগ দেবার অব্যবহিত পর থেকেই তিনি জাপানীদের সঙ্গে তাঁর বাহিনীর সম্মিলিত অভিযানের ফলাফল সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু এই দৃঢ়চেতা দূরদর্শী মানুষটি যে অদূর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কোনো পন্থা চিন্তা করে রাখেননি, এ কথা ভাবা যায় না। এখনই বা অদূর ভবিষ্যতে রাজনীতির বৃহত্তর খেলায় মস্কো এশিয়ার জাতীয়তাবাদের নবজাগরণকে কি ভাবে কাজে লাগাবে, তা কি তিনি জানতেন না?

১৯৪৫ সালে মিত্রপক্ষের যুদ্ধবিজয়ে সমগ্র চীনদেশে যে হট্টগোল সুরু হয়েছিল, তার মধ্য দিয়ে তাঁর কাছে রাখা অজস্র সোনার বিনিময়ে কোনোরকমে সোভিয়েৎ এলাকায় গিয়ে পৌছতে পারলেই তিনি নিশ্চয়ই বিশেষ বিমানে মস্কোয় বা অন্য কোনো নির্জন পল্লীতে গিয়ে আত্মগোপনের ব্যবস্থা সহজেই করতে পারতেন। তাহলে তাঁর বিশেষ ডীমারে আইরিশ ফ্রী-স্টেটে গোপন যাত্রা, যার খবর কোনো ব্রিটিশ বন্দর কর্তৃপক্ষই কোনোসূত্রে পায়নি অথচ ব্রিটিশ কম্যুনিস্ট পার্টির কর্মকর্তা গ্যালাহার এবং আইরিশ সরকার ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের কথাপ্রসঙ্গে এই সংবাদ উল্লেখ করেছেন, এর অর্থ কী?

ভারতবর্ষের কোটি কোটি মানুষ বিশ্বাস করে এক যুগের অবসানে এমন এক বিরাট পরিবর্তন আসবে যার সুদূরপ্রসারী ফল সে দেশকে স্বর্গরাজ্য করে তুলবে। বুদ্ধের মতো

মুখশ্রী-সম্পন্ন যোগ-সাধনায় পারদর্শী শ্রীবসু হয়তো একদিন ভারতবর্ষের শুধু নয় এশিয়ার মুক্তিদাতা হয়ে উঠবেন।.....

আর এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে তাঁর সুইজারল্যাণ্ড ভ্রমণ। সুইজারল্যাণ্ডেই একবার লেনিন অজ্ঞাতবাসী ছিলেন শ্রীবসুর রাজনীতি চিন্তার গতি আজ সারা পৃথিবীর মানুষই প্রায় জানে।.....

তাঁর প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বের প্রভাব সারা ভারতভূমিতে বিস্তার করেছে। শ্রীবসু যদি বেঁচে থাকেন,—এবং সেই সম্ভাবনাই সমধিক,—তবে পৃথিবী আবার তাঁর বাণী শুনতে পাবে, এ কথা নিশ্চিত।•

• মূল জার্মান হইতে অনূদিত

ইণ্টার প্রেস, আন্তর্জাতিক জীবনী সংগ্রাহক সংস্থা
রাজনৈতিক জীবনী প্রকাশন ১৩৫/১৯৪৯
২৮. ১০. ১৯৪৯

ভারতের স্বাধীনতা ও সুভাষচন্দ্র বসু

জেনারেল কাওয়াবে

[২য় বিশ্বযুদ্ধকালীন বার্মা ফ্রন্টের জাপ অধিনায়ক নিজের বাস্তব অভিজ্ঞতার পটভূমিতে নেতাজী সম্বন্ধে একটী গ্রন্থ রচনা করেছেন। শাহ নওয়াজ কমিটি কর্তৃক নেতাজী সম্বন্ধে অনুসন্ধানের সময় জাপ-সরকার এই বইটীর দ্বিতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করে কমিটির সদস্যদের মধ্যে বিলি করেন, কিন্তু এই বইটী এখনও ইংরেজী অথবা কোনো ভারতীয় ভাষায় মুদ্রিত হয়নি। অমৃতের সম্পাদকীয় বিভাগের অন্যতম সদস্য শ্রীনগর গুহ জাপান ভ্রমণকালে জেনারেল কাওয়াবের সঙ্গে নেতাজী প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় জেনারেল এই বইটীর একটি কপি শ্রীগুহকে দেন এবং ঐ বইটী অনুবাদের ব্যবস্থা করার জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। বইটী অনুবাদ করে যত বেশী অংশ সম্ভব অমৃতে প্রকাশ করার ইচ্ছা আছে। বইটীর একটি বিশেষ অধ্যায় গত নেতাজী জয়ন্তী উপলক্ষ্যে অমৃতে ছাপা হয়। এবার শারদীয়া অমৃতে বইটীর প্রারম্ভিক একটী অধ্যায় ইংরেজী থেকে বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা হোলো। মূল জাপানী ভাষা থেকে এই বইয়ের পূর্বের এবং বর্তমানের এই অধ্যায়গুলি ইংরেজীতে অনুবাদক করেছেন শ্রীবারীন বর্ধন। এই রচনায় অনেক স্থানে নেতাজীকে "চন্দ্র বোস" বলে বর্ণনা করা হয়েছে। জাপানে নেতাজী "চন্দ্র বোস" বলেই পরিচিত। অঃ সঃ]

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও সুভাষচন্দ্র বসু, জাপান ও সুভাষচন্দ্র বসু এবং ভারত ও জাপান.—যতই আমি এই সম্পর্কের কথা ভাবি ততই আমার মনে হয় সুভাষচন্দ্র বসু জাপানের ইতিহাসে এক গভীর রেখাপাত করে গেছেন। যদিও যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জাপ-ভারত সম্পর্ক এক দুঃখের অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত হয়েছে তবুও জাপানের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কের কাহিনী এক অভূতপূর্ব ও বিশেষ ঘটনা। তাঁর আপাতব্যর্থতার কথা বিস্মৃত হয়ে, বরং তাঁর অবদানের অনুসরণে আমরা ভারতকে বুঝবার চেষ্টা করবো এবং ভবিষ্যতেও সেই পথেই অগ্রসর হবো।

জাপানের ইতিহাস, বিশেষ করে ১৯০৪ সালের রুশ-জাপানের যুদ্ধের বীরত্বের কাহিনী সুভাষচন্দ্র বসুকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। ১৯০৪ সাল পর্য্যন্ত এশিয়ার এককোণে অবস্থিত জাপানের ন্যায় একটি দুর্বল ও পশ্চাদপর জাতি ইউরোপের তৎকালীন অন্যতম পরাক্রান্ত রুশ সাম্রাজ্যকে যেভাবে পর্যুদস্ত করে, সেই ইতিহাস তাঁর মনে এশিয়ার নবজাগৃতির জন্য নতুন আশা সৃষ্টি করে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামেও প্রেরণা জোগায়। এশিয়াবাসীর সাহায্যেই এশিয়ার বুক থেকে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যশক্তিকে বিতাড়িত করা সম্ভব হবে— ওঠে এবং তিনি পূর্ব-এশিয়ার যুদ্ধের মহান মহাযোগী হয়ে এই সুভাষচন্দ্র বসুর মনে চল্লিশ বছর পরেও এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে বিশ্বাসকে কার্যকরী করে তোলার প্রয়াসে অগ্রণী হন।

যেহেতু সুভাষচন্দ্র বসুর সারা জীবনের স্বপ্ন ছিল ভারতের স্বাধীনতা অর্জন করা,—তাই কেন তিনি জাপানের সঙ্গে সহযোগিতা করলেন তার পশ্চাদপট অনুধাবনের জন্য জাপানের বৃটিশ বিরোধিতা এবং ভারতীয় বিপ্লবীদের সাহায্যদানের পশ্চাদপটের মনোভাবের সংক্ষিপ্ত আলোচনা প্রয়োজন।

রুশ-জাপান যুদ্ধের পর থেকে বহু ভারতীয় ছাত্র জাপানে পড়াশুনা করার জন্য আসে এবং প্রথম মহাযুদ্ধের সময় ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিকেরা জাপানের বৃটিশ বিরোধিতার সুযোগ গ্রহণে অগ্রসর হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে জাপানের ভারতীয় মহলের সঙ্গে আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে অবস্থিত ভারতীয় স্বদেশ-প্রেমিকেরা যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং জাপানে এসে পরস্পরে মিলিত হন। বস্তুত, প্রথম মহাযুদ্ধের সময়েও টোকিও ভারতীয় বিপ্লবীদের স্বাধীনতা সংগ্রামের বৈপ্লবিক পরিকল্পনার মূল কেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৯১৫ সালে ভাইশেরা সম্রাটের সিংহাসন আরোহণের উৎসবের সময়ে লাজপত রায়, টোকিয়োতে হেরম্বলাল গুপ্ত ও অন্যান্য বিপ্লবীরা সমবেত হয়ে এই উৎসবে যোগ দেন। জাপ-ব্যবসায়ীদের সাহায্যে এই সময়ে অন্যতম বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানে এসে এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ভারতীয় স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক প্রয়াসে তৎপর হয়ে ওঠেন। ভারতীয় বিপ্লবীদের এই কার্যক্রমের কথা অবগত হয়ে বৃটিশ সরকার জাপান থেকে ভারতীয় বিপ্লবীদের বহিষ্কার করার জন্য জাপ সরকারের ওপর কূটনৈতিক চাপ দেয়। টোকিও থেকে ভারতীয় বিপ্লবীরা জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করার চেষ্টার ফলে তৎকালে জাপান ও রাশিয়ার যুদ্ধকালীন অবস্থা বর্তমান থাকায় জাপ সরকার বৃটিশ সরকারের অনুরোধ অনুমোদন করেন।

জাপ সরকার লাজপত রায়, হেরম্ব লাল গুপ্ত ও রাসবিহারী বোসের বিরুদ্ধে জাপান পরিত্যাগের নির্দেশ জারী করেন। এই আদেশের সঙ্গে সঙ্গে লাজপত রায় জাপান ত্যাগ করে আমেরিকা চলে যান কিন্তু বসু ও গুপ্তের অবস্থা জটিল হয়ে ওঠে। ভারত সরকার গভর্নর জেনারেল হার্ডিঞ্জের উপরে বোমা নিক্ষেপের ষড়যন্ত্রের অভিযোগে রাসবিহারী বসুর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করে ছিলেন এবং তাঁর গ্রেপ্তারের জন্য ১২ হাজার টাকা পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। তিনি বি, এন, ঠাকুর ছদ্মনামে পালিয়ে এসে জাপানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই সংবাদ জানাজানি হয়ে যাবার পরে জাপ সরকারের উপরে কঠোর কূটনৈতিক চাপ সৃষ্টি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপ সরকার রাসবিহারী বসুকে অবিলম্বে জাপান ত্যাগের নির্দেশ দেন। বিপ্লবীদের উপর থেকে এই আদেশ প্রত্যাহার করার জন্য ভারত-মিত্র মিঃ তোয়ামা জাপ সরকারকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানান। এই সময়ে উচিদা, ইয়োশোকাওয়া, কুজু ইয়োশোকাওয়া এবং আরও অনেকে এই সব বিপ্লবীদের আশ্রয় দিয়ে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেন এবং নাকামুরা বেকারীর কর্তৃপক্ষও এই কাজে সাহায্য দানে এগিয়ে আসেন। কিন্তু বহিষ্কারের আদেশের সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাপ পুলিস তাদের গ্রেপ্তার করতে এলে রাসবিহারী বসু ও গুপ্ত নাকামুরাইয়া পরিবারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সাড়ে চার মাস পরে বাইরে আসার সঙ্গে সঙ্গে বসুকে আবার গ্রেপ্তার করার চেষ্টা করা হলে নাকামুরাইয়া পরিবারের কন্যা কুমারী তোশিকো রাসবিহারী বসুকে স্বামীরূপে গ্রহণ করেন এবং তাঁকে জাপ-নাগরিক অর্জনের সুযোগ দিয়ে তাঁর বৈপ্লবিক কার্যক্রমের সুযোগ করে দেন। এই সময়ে হেরম্বলাল গুপ্ত তোয়ো জাহাজ কোম্পানীর সাহায্যে আমেরিকায় পালিয়ে যান।

পরবর্তী কালে জাপানে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন রাসবিহারী বসু এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় আজাদ হিন্দ ফৌজের বৈপ্লবিক অভিযানের পরিবেশ এবং সুভাষচন্দ্র বসুর জাপানে আগমন ও নেতৃত্ব গ্রহণে প্রাথমিক পটভূমিকাও তিনিই রচনা করেন। সুভাষচন্দ্র বসু সেই পটভূমিকার উপরে দাঁড়িয়েই গড়ে তোলেন তাঁর বৈপ্লবিক অভিযান।

শৈশবকাল থেকেই সুভাষচন্দ্র বসুর মধ্যে মাতৃভূমির মুক্তি কল্পে দেশপ্রেমের প্রবল প্রেরণা সৃষ্টি হয়। চব্বিশ বছর বয়সেই তিনি যুব সম্প্রদায়ের মুকুটহীন সম্রাটে পরিণত হন। নেহেরুর সঙ্গে যুক্ত হয়ে ২৭ বছর বয়সে তিনি কংগ্রেসের মধ্যে প্রগতি পন্থার প্রসার করেন। এবং বাংলাদেশ ; বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়ের সমর্থন লাভ করার ফলে কিছুকালের মধ্যেই সুভাষচন্দ্র বসুর প্রতিষ্ঠা নেহেরু ও গান্ধীর সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে তিনি প্রগতিবাদী ছিলেন কিন্তু তাঁর সংগ্রামী-দৃষ্টিভঙ্গী কংগ্রেসের প্রচলিত চিন্তাধারাকে বিচূর্ণ করে দেয়। গান্ধীনির্বাচিত সিতারামাইয়াকে পরাজিত করে এবং পরে কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করে ফরোয়ার্ড ব্লক গঠন করে তিনি এই পরিচয় দেন যে তাঁর পথ যুদ্ধের জন্য সংগ্রামের পথ। তাঁর বৈপ্লবিক সংকল্প এরূপ অদম্য ছিল যে যুদ্ধের সময়ে বৃটিশ কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে ও ভারত থেকে পালিয়ে প্রথমে রাশিয়ায় এবং পরে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় এসে অক্ষ শক্তির সাহায্যে স্বাধীনতা সংগ্রামের নতুন আহ্বান আনান।

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষচন্দ্র বসু নিজের বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। গান্ধীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও গান্ধীর আপোষবাদ ও অসহযোগিতার কর্মসূচীকে তিনি পূর্ণভাবে গ্রহণ করেন নি। বস্তুত সুভাষচন্দ্র বসুর রাজনীতি প্রভাবান্বিত হয় সি আর দাসের চিন্তাধারা ও ব্যক্তিত্ব দ্বারা। কংগ্রেসের মধ্যে নেহেরু ও বসু একযোগে প্রগতিশীল চিন্তাধারা ও সমাজবাদের আদর্শের ভিত্তিতে পরস্পরের সহযোগিতা করেন। নেহেরু শেষ পর্যন্ত গান্ধীর দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করেন বটে কিন্তু বসু তাঁর নিজের পথে অবিচলিত থাকেন। বসুর উপরে আরেকজন ব্যক্তির বিশেষ প্রভাব পড়েছিল—তিনি হলেন মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরই সিনকিন আন্দোলন সম্বন্ধে তাঁকে প্রভাবান্বিত করেন। ভারতীয় মুসলীমদের সহযোগিতা এবং তাদের প্রতি সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাব তিনি লাভ করেন সি আর দাসের ঐতিহ্য অনুসরণে।

সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক ভূমিকা অনুধাবনের জন্য উল্লিখিত মূল কথাগুলি জানা প্রয়োজন। সুভাষচন্দ্র বসু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত আপোষকামী সকল প্রচেষ্টার সুদৃঢ় প্রতিরোধ করেন। এক কথায় বলা যায় তিনি সব সময়ে প্রগতিপন্থী ছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রগতিবাদী চিন্তাধারার মধ্যে সর্বদাই একটি প্রবল যুক্তিবাদী মন কার্যকরী ছিল। এই যুক্তিবাদের উৎস থেকেই জন্মলাভ করেছিল তাঁর প্রগতিবাদ। কিন্তু তাঁর প্রগতিবাদ তাঁকে কখনও গোঁড়া বা বিবেচনাহীন করে তোলে নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে তাঁর কার্যক্রম, বৈপ্লবিক সংগ্রামের মাধ্যমে ভারত থেকে বৃটিশ শক্তিকে বিতাড়িত করার পরিকল্পনা, তাঁর গভীর চিন্তাশীলতা ও যুক্তিবাদী বিচারশীল মনের গভীরতা থেকেই উদ্ভূত ছিল। তাঁর কার্যক্রমের সাফল্য আপাতদৃষ্টিতে সাময়িক মনে হলেও,—এই কার্যক্রম কোন গোঁড়া দৃষ্টিভঙ্গী থেকে জন্মলাভ করে নি। তাঁর অন্তিম লক্ষ্য,—তথা ভারতের স্বাধীনতা-লাভে তাঁর পথ ও কার্যক্রম যুক্তিযুক্ত ছিল কিনা একথার ভবিষ্যতের ইতিহাসই সেকথা বলতে পারে।

ধারাবাহিক রচনা

তৃতীয় কিস্তি

সুভাষচন্দ্র

প্রবিত্র কুমার ঘোষ

চরিত্র ও আদর্শ

সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতায় এলেন কলেজের প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হতে জওহরলাল নেহেরু তখন তাঁর লেখাপড়া শেষ করে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে এসেছেন এবং পেশাতেও যোগ দিয়েছেন। কংগ্রেসের বাঁকিপুর অধিবেশনে (ডিসেম্বর, ১৯১২) তিনি যোগদান করেছিলেন। জাতীয়তাবাদ ও দেশের পরিস্থিতির প্রতি জওহরলালের কি মনোভাব ছিল? আত্মচরিতে তিনি এই সময়কার কথা লিখেছেন: "১৯১২ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন মন্দীভূত। তিলক কারাগারে—উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে চরমপন্থীরা (জাতীয়তাবাদী) হতোদ্যম। বঙ্গভঙ্গ রহিত হওয়ায় বাংলাদেশ অপেক্ষাকৃত শান্ত। মর্লি-মিণ্টো শাসন সংস্কার লইয়া মডারেটগণ বেশ জাঁকিয়া বসিয়াছেন। প্রবাসী ভারতীয়দের জন্য—বিশেষভাবে দক্ষিণ-আফ্রিকার ভারতীয়দের জন্য কিছু আন্দোলন ছিল। কংগ্রেস মডারেট দলের বার্ষিক মজলিসে পরিণত। সেখানে কতকগুলি দুর্বল প্রস্তাব গৃহীত হইত—উহা লইয়া কোন উৎসাহ দেখা যাইত না। ১৯১২-র বড়দিনে আমি প্রতিনিধি হইয়া বাঁকিপুর কংগ্রেসে যোগ দিয়াছিলাম। ইহা ইংরাজী শিক্ষিত উচ্চশ্রেণীর সম্মেলন, ইংরাজী কেতাদুরস্ত ফিটফাট পোষাকের ছড়াছড়ি। ইহা রাজনৈতিক উৎসাহ ও উদ্দীপনাহীন সামাজিক সম্মেলন মাত্র।" (সত্যেন্দ্রনাথ বসুমদার কর্তৃক অনূদিত জওহরলাল নেহরুর আত্মচরিত, পৃঃ ২২)। জওহরলাল তখনও রাজনৈতিক কর্মে বিশেষ লিপ্ত হননি। তাঁর এ বিষয়ে আগ্রহ তখনও কতকটা সৌখীন পর্যায়ের। তিনি নিজেই লিখছেন: "মহাযুদ্ধের প্রথমভাগে আমার ব্যক্তিগত রাজনৈতিক বা জনহিতকর কার্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। আমি সাধারণ সভায় বক্তৃতা করিতাম না। বক্তৃতা করিতে আমার ভয় ও সঙ্কোচ বোধ হইত।" (ঐ, পৃঃ ২৭) মনে রাখতে হবে জওহরলাল তখন পূর্ণ যুবক ও ব্যারিস্টার। তিনি ইংলণ্ড থেকেই রাজনৈতিক চেতনা, শিক্ষা ও আধুনিক ভাবধারায় সমৃদ্ধ হয়ে দেশে ফিরলেও কোনো বাস্তব কর্মপন্থার কথা তিনি আগে ভাবেননি। তাঁর নিজের বক্তব্য এ বিষয়ে এই: "বিলেত থেকে ফেরার পর আমার জীবন সম্পর্কে আমি অতৃপ্ত হয়ে উঠলাম। পেশায় আমি সম্পূর্ণ উৎসাহ পাইনি। রাজনীতি বলতে আমি বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে অন্ধ জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপই বুঝতাম—তাতেও যোগদান আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না।[১]

১ "I felt dissatisfied with life in those early years after my return from England [in 1912]. My profession did not fill me with a wholehearted enthusiasm. Politics, which to me meant aggressive nationalist activity against foreign rule, offered no scope for this. ("Towards Freedom, p. 41)

জওহরলাল নেহরুর প্রথম আলোচনা করে দেখি যে একই সময়ে, আট বছর বয়সের ব্যবধান ও শিক্ষা, অভিজ্ঞতা ও চেতনার বিকাশের বিপুল পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, একই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে যুবক জওহরলালের তুলনায় বিশেষ স্বভাবের প্রতিক্রিয়া অনেক সুনির্দিষ্ট, একমুখী এবং আত্মবিশ্বাসে ভরপুর। জওহরলালের চিত্ত দ্বিধাদীর্ণ—কী করবেন তিনি? আইন ব্যবসায়? রাজনীতি? কোনোটাই যেন পুরোপুরি আকৃষ্ট করছে না তাঁকে, অথচ তৃতীয় কোনো আকর্ষণও তাঁর নেই। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ও আদর্শ কী? সেবিষয়ে তখনও তাঁর সুস্পষ্ট কোনো বোধ নেই। দেশের তদানীন্তন পরিস্থিতির পটভূমিতে জওহরলাল নিজের কোনো ভূমিকার কথা ভেবেছিলেন এবং তার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করছিলেন কি? না, তেমন কোনোই প্রমাণ নেই। সেই অনির্দিষ্ট চিত্ত যুবক দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনগুলি পর্যবেক্ষণ করে কোন ধারার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করতে পারেন তা ভেবেও উদভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন মনে হয়। কারণ তাঁর বুদ্ধি তাঁকে বলছে দেশের সে সময়কার পরিস্থিতিতে নরমপন্থা কার্যকরী হবে না, বরং চরমপন্থাই উপযোগী। ইংলণ্ডে থাকতেই তিনি চরমপন্থার পক্ষপাতী হয়েছিলেন এবং সুরাটে (১৯০৭) কংগ্রেস দুই দলে ভাগ হবার আগেই পিতা মতিলাল নেহরুকে এক চিঠিতে (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯০৭) চরমপন্থীদের প্রতিই নিজের সমর্থন জানিয়েছিলেন। এবং সুরাটের ঘটনার সংবাদ পেয়ে জওহরলাল (২রা জানুয়ারি, ১৯০৮) স্পষ্ট করে পিতাকে লেখেন: 'সুরাটে প্রাণপূর্ণ কিছু একটা ঘটবে আমরা আশা করেছিলাম. কিন্তু প্রত্যাশার অধিক আমরা পেয়েছি। দল ভাগ হওয়াটা দুঃখের, কিন্তু এতো ঘটতোই, আর যত তাড়াতাড়ি ঘটেছে ততই শুভ। তুমি হয়তো সব দোষ চাপাবে তিলক ও চরমপন্থীদের ঘাড়ে। দোষ তাঁদের আছে হয়তো, কিন্তু নরমপন্থীরাও কম অপরাধী নয়।...নরমপন্থীরা হয়তো দেশের [illegible] প্রতিনিধিত্ব করেন কিন্তু তাঁদের ভাবখানা এই যে তাঁরাই গোটা দেশের স্বভাবসিদ্ধ নেতা ও প্রতিনিধি। যেভাবে তাঁরা তাঁদের বিরোধীদের অবহেলা করেন ও ছোট করে দেখান তাকে হাস্যকর যদি না বলি, তবে বলব উদ্বেগকর। আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই দেশে নরমপন্থীর দল বিলুপ্ত হবে। বর্তমানে যেসব পন্থা তাঁরা অনুসরণ করছেন তাতে তাঁদের দলের ধ্বংস ত্বরান্বিতই হচ্ছে।'[২]

নরমপন্থী বা মডারেটদের কর্মধারা সম্পর্কে অশ্রদ্ধা জওহরলাল কখনো গোপন করেননি। কিন্তু আশ্চর্য এই তিনি যে সকল নেতা ও প্রতিষ্ঠানকে ভ্রান্ত করতে পেরেছিলেন তাঁরা সকলেই মডারেট দলের লোক। তাঁর পিতা নিজে এই দলের

---

২ We expected lively things at Surat and our expectations were more than fulfilled. It is ofcourse a great pity that such a split should have occurred. But it was sure to come and the sooner we have it, the better. You will most probably throw all the blame on Tilak and the Extremists. They may have been to blame for it, but the Moderates had certainly a lot to do with it.... The Moderates may represent part of the country, but they seem to think, or at any rate try to make others believe, that they are the "natural leaders" and representatives of the whole country. The manner in which some of them try to ignore and belittle all those who differ from them would be annoying, if it was not ridiculous. I firmly believe that there will hardly be any so-called Moderate left in a very fewyears' time. By the methods they are following at present, they are simply hastening the doom of their party. (B. R. Nanda: The Nehrus, p. 91-92)

লোক। ইংলণ্ডে যে তিনজন ভারতীয় রাজনৈতিক নেতার বক্তৃতা শুনতে তিনি গিয়েছিলেন তাঁদের মধ্যে বিপিন পালকে তাঁর খুবই খারাপ লেগেছিল, গোপালকৃষ্ণ গোখলেকে ভালো লেগেছিল, কিন্তু লালপৎ রায়কেই সর্বোৎকৃষ্ট মনে হয়েছিল। বিপিন পালের জাতীয়তাবাদের মধ্যে তিনি শুধু হিন্দু সঙ্কীর্ণতারই পরিচয় পেয়েছিলেন। দেশে ফিরে এসে তিনি সবচেয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন গোখলের প্রতি। বাঁকিপুর কংগ্রেসে গোখলে উপস্থিত ছিলেন। জওহরলাল লিখছেন: "এই অধিবেশনে তিনিই ছিলেন সকলের শীর্ষস্থানীয়। যে দুটির ব্যক্তি রাজনীতি ও জনসাধারণের কাজ একান্তভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তেজস্বী ও মনস্বী গোখলে তাঁহাদের অন্যতম। তাঁহার মানসিক বল ও শক্তিমত্তা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম।' (আত্মচরিত, পৃঃ ২২)। গোখলের "সার্ভেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। "ঐ সমিতির সদস্যগণকে আমি শ্রদ্ধা করিতাম, কেননা তাঁহারা কেবল গ্রাসাচ্ছাদন লইয়া দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন।" (ঐ, ২৩)। কিন্তু বাংলার বিপ্লবী যুবক দলের প্রতি তাঁর মনে কোন আকর্ষণ জন্মায়নি, এমন কি তাদের আত্মত্যাগের দিকটাও তাঁর দৃষ্টিপথে পড়েনি হয়তো। এদের প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যও তাই খুব সংক্ষিপ্ত ও স্পষ্ট: "আমার ওপথে আকর্ষণ ছিল না।" (ঐ, পৃঃ ২৮)। আরও একটা বিস্ময়কর ব্যাপার এই যে নরমপন্থা ও চরমপন্থা নিয়ে বিস্তর চিন্তা করলেও চরমপন্থার স্বরূপ সম্বন্ধে তিনি অবহিত হয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। এ প্রসঙ্গে যতবার তিনি আলোচনা করেছেন ততবারই তিলকের কথাই তিনি উল্লেখ করেছেন, বিপিন পাল বা অরবিন্দের কথা নয়। তিনি লিখছেন: কংগ্রেসে দেখা দিল দুটি দল—তিলক ও বাংলার নেতাদের অধীনে চরমপন্থী এবং পুরাতন কংগ্রেস নেতাদের অধীনে নরমপন্থীগণ। যাই হোক, গোপালকৃষ্ণ গোখলেই ছিলেন নরমপন্থী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে প্রতিভ। সেবার আদর্শে তিনি নিজের জীবন গঠন দিয়েছিলেন। দুই বিরোধী দলের নায়ক রূপে তিলক ও গোখলে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছিলেন এবং ফলে ১৯০৭ সালে কংগ্রেস ভাগ হয়েছিল।[৩]

প্রকৃতপক্ষে অরবিন্দ ও বিপিন পাল প্রবর্তিত নব জাতীয়তাবাদের প্রতি জওহরলাল সম্ভবত বিরূপ ও বিরক্তই ছিলেন। তিনি লিখেছেন: "সামাজিক দিক হইতে দেখিলে ১৯০৭-এর ভারতীয় জাতীয়তাবাদ নিশ্চিতরূপেই প্রগতি-বিরোধী। ভারতে এবং প্রাচ্যের অন্যান্য দেশে নবজাতীয়তাবাদ ধর্মের ভিত্তির উপরই স্থাপিত হইয়াছিল। সামাজিক ব্যাপারে মডারেটগণ অনেক বেশী অগ্রসর ছিলেন।" (আত্মচরিত, পৃঃ ২০) জওহরলাল একমাত্র যে চরমপন্থী নেতার প্রতি লক্ষ্য ছিলেন সেই তিলকের সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়নি। ১৯১৬ সালের ডিসেম্বরে কংগ্রেসের লক্ষ্ণৌ সম্মেলনে তিলক উপস্থিত ছিলেন, জওহরলালও উপস্থিত ছিলেন। সেই সম্মেলনের সভাপতি ছিলেন অম্বিকাচরণ মজুমদার এবং সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন সুরেন্দ্রনাথ বাঁড়ুজ্জে, বিপিন চন্দ্র পাল, ভূপেন্দ্রনাথ বসু, অ্যানি বেশান্ত, জিন্না ইত্যাদি এবং তিলককে নিয়েই সবচেয়ে বেশি জাঁকজমক হয়েছিল। তিনি লক্ষ্ণৌ এলে তাঁকে দেখতে হাজার হাজার নরনারী ব্যাকুল

---

৩ "Two parties developed in the Congress—the extremists under Tilak and some Bengal leaders and the moderates under the older Congress leaders. The most prominent of the moderate leaders was, however, a young man, Gopal Krishna Gokhale, a very able man who had devoted his life to service···Tilak and he faced each other from their rival groups and, inevitably, the split came in 1907 (Glimpses of World History, p. 437)

হয়ে ওঠে, তাঁকে পুরোভাগে রেখে বিশাল শোভাযাত্রা বেরোয় এবং সম্মেলনে প্রথম থেকে শেষাবধি তিনিই নেতৃত্ব করেন। তাঁরই উদ্যোগে গান্ধীজী বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে স্থান পান, অসহযোগপন্থী গান্ধিজীর বিরোধে কোনো প্রস্তাব সে সম্মেলনে ছিলনা। কিন্তু জওহরলাল এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের কথা লিখতে গিয়ে একটিবারও তিলকের নাম করেননি, হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্যাপারে সে সময়ে তিলকের মহৎ মনোভাব সম্পর্কেও কিছু বলেননি, অথচ গান্ধিজী সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত হয়ে লিখছেন : "১৯১৬-র বড়দিনে লক্ষ্ণৌ-কংগ্রেসে গান্ধিজীর সহিত আমার প্রথম সাক্ষাৎকার।...আমরা বুঝিলাম, তিনি তাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার অবলম্বিত উপায় ভারতেও প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইয়াছেন এবং তাহাতে সাফল্যের সম্ভাবনাও রহিয়াছে।" (আত্মচরিত, পৃঃ ২৮-২৯) লক্ষ্ণৌ কংগ্রেস সম্পর্কে স্মৃতিচারণ করতে গেলে যে কোন ব্যক্তিরই প্রথম মনে পড়া উচিত তিলকের কথা, কিন্তু জওহরলাল তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব এবং নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবেই গান্ধিজীর পরবর্তী ভূমিকার কথা আগেই টেনে এনে লিখেছেন। ১৯২০ সালে তিলক মারা যান এবং তৎপূর্ব পর্যন্ত গান্ধিজীর সঙ্গে তাঁর মতভেদই ছিল। ভারতীয় রাজনীতিতে গান্ধীজীকে প্রবেশ ও প্রতিষ্ঠা দেন গোখলে, তিনি নরমপন্থী হওয়া সত্ত্বেও জওহরলালের অকুণ্ঠ প্রশংসার অধিকারী হয়েছেন। তিলক সম্পর্কে জওহরলাল উৎসাহিত হতে পারেননি, নিজে চরমপন্থায় আস্থাশীল হয়েও; অথচ পক্ষান্তরে গোখলে, মদনমোহন মালব্য, রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি নরমপন্থীদের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা প্রগাঢ় ও সোচ্চার। জওহরলালের বুদ্ধি, বিচারশক্তি একদিকে, আর তাঁর হৃদয়ের প্রবণতা সম্পূর্ণ ভিন্ন দিকে—সেই তখনই, যখন তিনি যুবক এবং যখন রাজনৈতিক দলাদলি ও চক্ররচনার কুটিল আবর্তে আদৌ এসে পড়েননি।

জওহরলালের এই দ্বিমুখ ভাবের পাশেই যেমি সুভাষচন্দ্র কলকাতায় এসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের প্রতি শ্রদ্ধা সত্ত্বেও আকৃষ্ট হচ্ছেন না, বিপিন পাল অসহযোগপন্থীতে পরিণত হওয়ায় তাঁর সম্পর্কে নীরব থাকছেন এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের কোন ধারার প্রতি অনুগত থাকবেন সে বিষয়ে মনস্থির করে ফেলেছেন।

সুভাষের বয়স ও শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার কথা স্মরণ করলে জওহরলালের তুলনায় তাঁর মনের এই পরিণতি ও সুদৃঢ় চিন্তাধারা আমাদের বিস্মিত করে। জওহরলাল যখন পথ হাতড়াচ্ছেন কী করবেন ভেবে, সুভাষ সেই সময়েই, অনেক কম বয়স সত্ত্বেও স্থির করে ফেলেছেন ভবিষ্যতে তিনি কী করবেন এবং তারই জন্য আত্মগঠনে তিনি রত। আদর্শ সম্পর্কে তিনি যেমন স্থিরনিশ্চয়, আদর্শের অনুসরণেও তাঁর তেমনি ছিল নিবিড় মনোভাব ও সক্রিয়। স্কুল জীবনের সময়কার বর্ণনা দিয়েই আত্মচরিতে তিনি লিখছেন : "বাবা যা বলেই আমাকে বাধা দিতে চেয়েছেন আমিও ততই বিদ্রোহী হয়ে উঠেছি। যখন অন্য কোনভাবে আমাকে বাগে আনতে পারলেন না, তখন কানাকাটি শুরু করে দিলেন। কিন্তু চোখের জলেও আমার মন ভিজল না। বরং বিরক্ত হয়ে আমি আরো বেশি অবাধ্য এবং বাধাবেপরোয়া হয়ে উঠলাম, কোনো রকম শাসনই আমার উপর খাটলনা। অবশ্য মনে মনে অত্যন্ত অশান্তি ভোগ করেছি। বাপমায়ের অবাধ্য হওয়া যে আমার পক্ষে কতখানি পীড়াদায়ক ছিল তা মুখে বোঝানো যাবেনা, কারণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। কিন্তু আমার কাছে সবার উপরে তখন আদর্শ—সেই আদর্শের কাছে আর সবই তুচ্ছ হয়ে গিয়েছিল।" কলেজে পড়তে কটক ছেড়ে কলকাতায় তিনি কেন এলেন তারও কারণ ছিল আদর্শ নিয়ে পিতামাতার সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব সংঘাত। তিনি লিখছেন : "আমার উপর বাবা-মায়ের অনেক আশা-ভরসা ছিল, কাজেই আমার এই পরিবর্তনে তাঁদের অবস্থা কী রকম দাঁড়িয়েছিল সেটা সহজেই অনুমেয়।

আমি এসব জিনিসকে মোটেই আমল দিতাম না, আমার কাছে আদর্শটাই তখন সবচেয়ে বড়। কোনোরকম বাধানিষেধই আমি মানতাম না। বাবা পেলে আমার জেদ আরো বেড়ে যেত। বাবা যা ভাবলেন স্থানপরিবর্তন করলে হয়তো আমার এইসব খামখেয়ালী কমে যাবে। অতএব আমাকে কলকাতায় পাঠানো স্থির হল।" সুভাষের বক্তব্যও পরিষ্কার, পথও সুস্থ এবং তার পরিণামও অমঙ্গল নয়। দেশের অবস্থার জন্য তীব্র বেদনাবোধ ও সেই স্বদেশেরই সেবার জন্য ভবিষ্যতে জীবনপাত করার স্থির সঙ্কল্প তখন তাঁর—ক্ষিতিপূর্ণ ভাষায় মায়ের কাছে সেই আবেদন উপস্থিত করে একখানি পত্রে তিনি লিখছেন: "মা যদি সন্তানকে বলেন—"তুই স্বার্থ লইয়া বসিয়া থাক"—তবে আর কি। তুমির সন্তানই হতভাগ্য! তাহা হইলে বুঝিতে হইবে এ কলিমূলে ভাল লোকের আর আবির্ভাব নাই। বুঝিতে হইবে ভারতের যাহা কিছু ছিল সবই নষ্ট হইয়াছে—আর কিছুই নাই। আর কিছু হবেনা! চারিদিকে নৈরাশ্য! যদি তাহাই হয়—যদি প্রকৃতই আর কোন উন্নতির আশা নাই—যদি বসিয়া বসিয়া কেবল অধঃপতন ও অবনতি দেখিতে হইবে—তবে এত কষ্ট কেন? যদি এ জীবনে আর কিছু করিতে পারিবনা—তবে এ জীবনে আর কাজ কি? আমি যেন চিরকালই সকলের সেবক হয়ে থাকিতে পারি।" (পত্রাবলী, পৃঃ ২৪) কিশোর সুভাষের এই মনোভাবের মধ্যে কোনো দ্বিধাদ্বন্দ্বের ছায়াপাত নেই—সম্মুখে প্রসারিত তাঁর কর্তব্য পথ স্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট।

জওহরলাল ও সুভাষ উভয়ের চরিত্রের গঠনের মধ্যে এই যে পার্থক্য, তা উভয়ের পরবর্তী জীবনকাহিনীর মধ্যেও অনুসৃত। কিন্তু দুই ব্যক্তির মানসভঙ্গী, চরিত্র ও জীবনবোধের এই পার্থক্যের মূলে ব্যক্তিপ্রকৃতির বিশিষ্ট গঠন যেমন দায়ী, তেমনি উভয়ের বাসনিক পরিমণ্ডল ও বিকাশের পটভূমিও অনেকাংশে দায়ী। জওহরলাল খুব অল্প বয়সে বিলাত গিয়েছিলেন, তাঁর শিক্ষাদীক্ষা সেখানেই লব্ধ—কৈশোর ও প্রথম যৌবন তাঁর ইংলণ্ডেই কেটেছে। ফলে স্বদেশের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ও যেমন নিবিড় হতে পারেনি, স্বদেশের জন্য বেদনার অনুভবও তাঁর জীবনে তেমন ভাবে আসেনি এবং সুস্পষ্ট কোনো বোধ গড়ে ওঠেনি। এই সকল দিক হতে সুভাষচন্দ্রের সুযোগ যেমন বেশি ছিল, তেমনি উনিশ শতকের শেষ দিকে বাঙালী জীবনের পটভূমিতে জন্ম ও বিকাশ লাভের সৌভাগ্যও তাঁর হয়েছিল। সেটাও খুব কম কথা নয়। একথা অনস্বীকার্য যে ভারতের আর কোনো জাতির মানসমুক্তিও সেদিন বাঙালীর মতো ঘটেনি, ভাব ও আদর্শের আন্দোলনও আর কোনো জাতির চিত্তকে এমন ভাবে প্লাবিত করেনি। আর সকলেরই প্রাচীন অতীতের গৌরব বাঙালীর চেয়ে বেশি ছিল; আর্যাবর্তের মানুষ জওহরলাল সুভাষচন্দ্রের তুলনায় অতীত ভারতের গৌরবের উত্তরাধিকারী অনেক বেশি পরিমাণে; কিন্তু নবযুগের নতুন ভাবধারা বাংলায় যতটা প্রচারিত হয়েছিল ভারতের আর কোনো প্রান্তেই তা হয়নি। সুভাষচন্দ্রের জীবন ও চরিত্রগঠনে বাংলার এই অগ্রবর্তিতা বিশেষ সহায়ক হয়ে উঠেছিল।

উনিশ শতকের বাংলায় যুক্তিবাদ ও বাস্তববাদের পাশাপাশি একটা প্রবল ও গভীর ধর্মচেতনাও ব্যাপ্ত হয়েছিল। পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এসে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রসার, বাস্তব ও বৈষয়িক জগতে অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রেরণা, শিক্ষা লাভের চেষ্টা ও নারীমুক্তির প্রয়াস দেখা দিয়েছিল; কিন্তু এরই সঙ্গে আরও একটা গভীরতর ভাব ও শক্তি বাংলার আবহাওয়ার মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে গিয়েছিল, বাঙালীর আত্মোৎসর্গ, নিঃস্বার্থ স্বদেশপ্রেম, সাহস, সঙ্কল্প ইত্যাদি সকলেরই মূলে আছে সেই ভাব ও শক্তি। মনে রাখতে হবে বাংলার নবজাগরণের আদি পুরোহিত রামমোহন বেদান্ত সূত্রের অনুবাদ প্রচারের মারফৎ প্রথম তাঁর আন্দোলন সুরু করেন,—এই বেদান্তের সাধনা ব্রাহ্মসমাজের মারফৎ বাংলায়

সঞ্চারিত হয় এবং রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের জীবনের ভিতর দিয়ে সেই ভাব ও সাধনা হয়ে ওঠে প্রত্যক্ষ, সত্য, জীবন্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের স্বদেশমন্ত্র এই ভাবভূমি হতে উৎসারিত এবং বিশ শতকের সূত্রপাতে যে নব জাতীয়তাবাদ বাংলা দেশকে আলোড়িত করেছিল তা সেই বঙ্কিমের উচ্চারিত স্বদেশমন্ত্রেরই সাধনা। তা রাজনীতি নয় একটা রাষ্ট্রনৈতিক প্রেরণালাভ আন্দোলনও নয়—রামমোহন থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলার নবীন বেদান্তসাধনার একটা অভিনব ফলশ্রুতি বাস্তবের ক্ষেত্রে। সুভাষচন্দ্রের জীবনবিকাশের সেই হচ্ছে পটভূমি—সুভাষ-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যের উৎসভূমিও বটে। (ক্রমশঃ)

Phone :
Factory : 55-3547
Office 22-6312
Residence 55-9028

SREE MA TYPE FOUNDRY

Quality Printing Mono Types Faces & Wooden Press
Furniture Manufacturer

259, RABINDRA SARANI
CALCUTTA-5

বাংলায় সুরেন্দ্র যুগ

সরোজেন্দ্রনাথ রায়

বাংলার সুরেন্দ্র যুগ বলতে গেলে সাধারণতঃ বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ বোঝায়—১৯০৫ থেকে ১৯১১ সাল পর্যন্ত। ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর বাংলা দেশ দ্বিখণ্ডিত হয় ও ১৯১১ সালের ১২ই ডিসেম্বর বঙ্গভঙ্গ রোহিত হয়। এই ছয়টি বৎসরের মধ্যেই সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এই সময়ের মধ্যে তিনি বাংলা তথা ভারতের মুকুটবিহীন রাজা বলে পরিচিত হন। এই সময়ের মধ্যে তাঁর অনন্যসাধারণ বাগ্মিতা অনুপ্রেরণা ও সংকল্প বাংলা তথা ভারতের জীবনে এক অভিনব উন্মাদনা আনয়ন করে। এই সময়ে বাঙ্গালী জাতি স্বাধীনতার জন্য সর্ব্বস্বত্যাগ ও সকল প্রকার ক্লেশ বরণ করার মন্ত্রে দীক্ষিত হয় ও কারাবরণ তো তুচ্ছ কথা মৃত্যুকেও হাসি মুখে বরণ করে। এই দীপনার মূলে ছিল প্রধানতঃ সুরেন্দ্রনাথের বাণী ও ত্যাগ।

আর এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে সুরেন্দ্রযুগের আরম্ভ হয় ১৮৮৩ সালে যখন আদালত অবমাননার দায়ে সুরেন্দ্রনাথের তিন মাসের কারাদণ্ড হয়। তখন থেকেই বাংলা দেশে রাজনৈতিক উন্মাদনার সূচনা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে ফতোয়ের পর হাই কোর্টের সম্মুখে অভূতপূর্ব্ব জন বিক্ষোভ হয়। সহস্র সহস্র যুবক ও ছাত্রমণ্ডলী বিক্ষোভ প্রদর্শন করে ও হাই কোর্টের দরজাজানালা লক্ষ্য করে ইট পাটকেল ছোড়ে। এখন শুনতে বিস্ময় লাগে যে এই বিশৃঙ্খল জনতার মধ্যে উনিশ বৎসর বয়স্ক আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও ছিলেন। সুরেন বাবু নিজে এই কথা লিখে গেছেন। এই সময় থেকেই বাংলা দেশে প্রকাশ্য রাজনৈতিক আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। এই আন্দোলন আর কখনও থামেনি। সুরেন্দ্রনাথের প্রতি বৃটিশরাজের এই যে কোপদৃষ্টি ও লাঞ্ছনা যার দরুণ তাঁর সিভিল সার্ভিসের চাকুরী যায় তা বরাবর তাঁর প্রতি তাঁর স্বদেশবাসীর শ্রদ্ধা আগিয়ে রেখেছিল। ১৯১৬ সালে ভারতের রাজপ্রতিনিধি এসে বেসান্টের উপর হত, তাঁর প্রতিষ্ঠিত হোমরুল লীগ নরমপন্থী কংগ্রেসী দলকে কোণঠাসা করে ও পরে সক্রিয় রাজনীতি থেকে ঘুরে সরে যেতে বাধ্য করে। এর পর হতেই সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ধীরে ধীরে বাংলা দেশ থেকে চলে যায়।

১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে লর্ড কার্জন ভারতের গভর্ণর জেনারেলের পদে নিযুক্ত হয়ে কলকাতায় আসেন। কার্জনের বহু গুণ ছিল কিন্তু হাস্যকরতা ও অবিমৃষ্যকারিতার ফলে তাঁর শাসন কালেই বৃটিশরাজের ভিত্তি মূল শিথিল হয়। সারা ভারতের জনগণের মধ্যে স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্খা বিশেষভাবে বর্দ্ধিত হয়। এদেশে আসবার প্রাক্কালে তিনি লণ্ডনে একটি বক্তৃতায় বলেন: "ভারতবর্ষ ও ভারতবাসীকে আমি খুব ভালবাসি। তাদের জীবনযাত্রা প্রণালী ও তাদের সভ্যতার বিচিত্রতা আমার খুব ভাল লাগে"। এই কথা শুনে এই দেশের লোকের মনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। কলকাতা পৌঁছিলে সুরেন্দ্রনাথ প্রমুখ ভারত সভার কয়েক জন সভ্য কার্জনকে অভিনন্দন জানাবার জন্য লাটভবনে গমন করেন। এই দলে সুরেন্দ্রনাথের জামাতা ব্যারিস্টার দে, চৌধুরী মশায়ও ছিলেন। তিনি স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহারের

একজন বিলিতি ব্রতী ছিলেন। তাই তিনি ও অপর একজন ভদ্রলোক বিলাতী-বুট জুতার পরিবর্তে দেশী নাগরা জুতা (দিল্লী ক্যাসনের) পরে গিয়েছিলেন। কার্জন দরবারে আসবার আগে তাঁর এক জন এডিকং ঐ ঘরে প্রবেশ করে ভদ্রলোকদের পোষাকপরিচ্ছদ পর্যবেক্ষণ করেন ও মিঃ চৌধুরী ও অপর ভদ্রলোকটিকে বাইরে জুতা ছেড়ে আসতে নির্দেশ দেন। এতে তাঁরা অপমানিত বোধ করেন ও ঐ কক্ষ পরিত্যাগ করে চলে যান। এই ঘটনায় বাংলাদেশের লোকেরা অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেন। এই হতেই কার্জনের প্রতি লোকের মনে বিরূপ ভাবের সঞ্চার হয় ও তাঁর প্রত্যেক কার্যের মধ্যে একটা দাম্ভিকতা ও দুরভিসন্ধির অভিপ্রায় দেখতে আরম্ভ করেন।

তখনকার দিনে বাংলা, বিহার ও ওড়িষ্যা নিয়ে বাংলা প্রদেশ গঠিত ছিল। কিছু দিন পূর্ব্বে বাংলাভাষা অধ্যুষিত সোয়ালপাড়া, কাছাড় ও সিলেট নিয়ে আসাম বিভাগ রচিত হয় ও একজন চিফ কমিশনারের শাসনাধীনে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহাতেই বাঙ্গালীদের মনে প্রবল অসন্তোষের সঞ্চার হয়। কিন্তু এই নব গঠিত প্রদেশদ্বারা সরকারের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। সরকার ঐ প্রদেশকে কার্য্যকরী করবার জন্য তাতে আরও কয়েকটি বাংলার জেলা জুড়ে দিতে বদ্ধপরিকর হন। এই সংবাদ প্রকাশ হওয়াতে দেশের লোকের মনে এক প্রবল অসন্তোষের বহ্নি ধূমায়িত হয়। অনেক প্রতিবাদ সভা হয়। কিন্তু কার্জন সরকার গোপনে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত বহাল করিয়ে নেন। ১৯০৪ সালের জুলাই মাসে দেশের লোক জানতে পারল যে উত্তর বাংলা, আসাম, ঢাকা ও চট্টগ্রাম ডিভিসন নিয়ে পূর্ব্ব বাঙ্গালা ও আসাম নামে একটি নূতন প্রদেশ গঠিত হবে। এই সংবাদ বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের ন্যায় বাঙ্গালীর মস্তকে পতিত হল।

বাঙ্গালীর মনের সেই অভূতপূর্ব্ব ভাব ভাষায় বর্ণন করা সহজ নয়। দেশ মাটি নয় যেন মাতা। বিদেশী শত্রু যেন তাকে দ্বিখণ্ডিত করল। সে অপমানের গ্লানি ও আত্মীয়-বিচ্ছেদের বেদনা বাঙ্গালীর চিত্তকে মথিত করে তুলল। এই অবস্থায় একমাত্র চিন্তা যা বাংলা দেশের মনকে অধিকার করে বসল তা হল প্রতিশোধ। প্রথম অবস্থায় কি যে করা যায় তা স্থির করা গেল না। শুধু একটা বাধা, শুধু একটা নিষ্ফল ক্রোধ। সারাদেশময় উঠল প্রতিবাদ—ভাবের উচ্ছলতা; ১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর (৩০শে আশ্বিন) বঙ্গবিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হল। বাংলা দেশ প্রশাসনিকভাবে দুই প্রদেশে বিভক্ত হল। সেই দিন হল শোকের দিন। সেদিন হল অরন্ধনের দিন, উপবাসের দিন। যারা উপবাস করতে পারল না তারা কাঁচা খাবার খেয়ে দিন কাটাল। কলকাতার লোকেরা ভোরে উঠে গঙ্গা স্নান করল—মফস্বলের লোকেরা নদী পুকুরে। পরস্পরের হাতে রাখিবন্ধন ও প্রতিজ্ঞা করল যে গভর্ণমেণ্ট যাই করুন না কেন, কোন শাসনবিধি বাঙ্গালীকে পৃথক করতে পারবে না। সে দিন শোকাচ্ছন্ন বাঙ্গালী জাতি শোকের চিহ্নস্বরূপ নগ্নপদ হন। বহু দোকান পাট বন্ধ হল। স্নানের পরে ঘরে ঘরে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর "বঙ্গলক্ষ্মীর ব্রত কথা পাঠ হল। আমার তখন শৈশবকাল, স্কুলের সর্বনিম্ন ক্লাসে পাঠ করি। কিন্তু সেদিনকার সে উন্মাদনা আজ এত দীর্ঘ দিনেও ভুলিনি। বেশ মনে আছে বাবা মা ও আমরা ভাই বোন ঘরের এক কোণে বসে পাঠ করলাম:

"বন্দে মাতরম্। বাংলা নামে দেশ, তার উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে সাগর। মা গঙ্গা মর্ত্তে নেমে নিজের মাটিতে সেই দেশ গড়লেন। প্রয়াগ, কাশী পার হয়ে মা, পূর্ব্ববাহিনী হয়ে সেই দেশে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করে মা শতমুখী হলেন। শতমুখী হয়ে মা সাগরে মিশলেন। তখন লক্ষ্মী এসে সেই শত মুখে অধিষ্ঠান করলেন; বাংলার লক্ষ্মী বাংলা দেশ জুড়ে বসলেন। মাঠে মাঠে ধানের ক্ষেতে লক্ষ্মী বিরাজ করতে লাগলেন। ফলে ফুলে দেশ আলো হল। সরোবরে

শতদল ফুটে উঠল। তাতে রাজহংস খেলা করতে লাগল। লোকের গোলাভরা ধান, গোয়াল ভরা গরু, গালভরা হাসি। লোক পরম সুখে বাস করতে লাগল।"

তারপর দুর্দিন এল, সেই দুর্দিনের মধ্যে বঙ্গদেশ বিধৃতিত হল। তারপর ব্রতকথা বলছে: "মা লক্ষ্মী কৃপা করে কাজল দিয়ে কাচ নেবোনা। ঘরের থাকতে পরের নেবোনা। শাঁখা থাকতে চুড়ি পরবো না। পরের দুয়ারে ভিক্ষা করবো না। মোটা অন্ন ভোজন করবো। মোটা বসন অঙ্গে নেবো। মোটা ভূষণ আভরণ করবো। পড়শীকে খাইয়ে নিজে খাব। মোটা অন্ন অক্ষয় হোক। ঘরের লক্ষ্মী ঘরে থাকুক; বাংলার লক্ষ্মী বাংলায় থাকুন।"

কথাগুলো খুবই সহজ ও সরল। কিন্তু এই সহজ ভাষার মধ্য দিয়ে মনে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা এল। আমাদের শিক্ষা চৈতন্যও আলোড়িত হল। সম্পূর্ণভাবে না হলেও এখনও সেই প্রতিজ্ঞা তখনকার বাঙ্গালীর চিত্ত অধিকার করে আছে। বাঙ্গালীর স্বদেশী সংকল্প সেদিন প্রকাশিত হল সন্ধ্যায় এক সভায়। এখন যেখানে ব্রাহ্মবালিকা শিক্ষালয়। সেই মাঠে এক বিরাট সভা হল। আনন্দ মোহন বসু শেষ শয্যা থেকে উঠে এসে সেই সভায় সভাপতি হলেন। রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত ছিলেন। কাতারে কাতারে লোক ভেঙ্গে পড়ল। বাঙ্গলা দেশের নেতৃস্থানীয় সকলেই সেই সভায় তাঁদের দৃঢ় সংকল্প প্রকাশ করলেন। স্থির হল ঐ মাঠে একটি হল নির্মিত হবে যার নাম হবে ফেডারেশন হল—বিভক্ত বাংলার ঐক্যের বন্ধন স্বরূপ সেখানে রচিত হবে উভয় বাংলার মিলন ভূমি। এই বিরাট জনতা মিছিল করে গেল বাগবাজারের পশুপতিনাথ বসুর বাড়িতে। সেখানে জমি ক্রয় ও গৃহনির্মাণের জন্য তাঁরা ভোলা হল। চারদিক থেকে থলির মধ্যে টাকা পড়তে লাগল। নগদ ৭০ হাজার টাকা পাওয়া গেল। সেদিনকার সে-উদ্দীপনার সমতুল্য উন্মাদ বাঙ্গালীর জীবনে কমই দেখা যায়। কিন্তু শীঘ্রই বোঝা গেল যে আর্তনাদ প্রতিবাদে কোন ফল হবে না। এমন একটা কিছু করতে হবে যাতে বিদেশী শাসকদের পকেটে হাত পড়ে। ইংরেজের জ্ঞান তাদের পকেটে। এই পকেট স্পর্শ না হওয়া পর্যন্ত তাদের চৈতন্যের উদয় হবে না। কি করে ইংরেজকে তাতে যায় এই চিন্তা সকলে করতে লাগলেন। এই থেকে 'বয়কট' বা বিদেশী বর্জন আন্দোলন আরম্ভ হল। তখনকার দিনে এই ব্যাপারটি সহজ ছিল না। তখন দেশের তৈরী বলে কিছুই ছিল না। সুতা ও কাপড় আসত ম্যাঞ্চেস্টার থেকে। ছুঁচ, ছুরি, কাঁচি সেলাই এর কল, লীড্স বা সেফিল্ড থেকে, চিনি জর্ম্মানী বা জাভা থেকে, নুন লিভারপুল থেকে। কাগজ পেন্সিল অষ্ট্রিয়া থেকে, কাচের বাসন বেলজিয়াম থেকে। আহাজ বোঝাই হয়ে এই সব মাল ভারতবর্ষের বাজার গ্রাস করে রেখেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধের পর জাপান এসে ইউরোপীয়দের কোণঠাসা করল। যাই হোক বিদেশী মাল বর্জন করে তার স্থান অধিকার করে এমন কোন শিল্প দেশে ছিল না। তাই আমাদের সংকল্প দেখে ইউরোপীয়েরা হাসাহাসি করতে লাগল।

তখন আমেদাবাদ কাপড়ের কল খোলা হয়েছে মাত্র। তার কাপড় ছিল চটের মত। এক ধোপেই পাড়ের রঙ, উঠে যেত। তাও আমার সব খায়গায় পাওয়া যেতনা। বাংলা দেশের ছাত্র যুবকেরা সেই কাপড় মাথায় করে বাড়ী বাড়ী নিয়ে যেতেন। আমার মনে আছে তখন আমাদের নওগাঁ শহরে (রাজসাহী জেলা) একটা এক দরজাওলা ছোট্ট দোকানে স্বদেশী কাপড় বিক্রী হত। তার পাশেই বড় বড় দোকানে বিলেতী কাপড়—যেমন সস্তা, তেমনি সুন্দর। রেলী ব্রাদার্স (Ralli Brothers) ও মাড়োয়ারী আমদানী কারকেরা বাজার বোঝাই করে রাখত। নিত্যনূতন পাড় সুতাও মিহি ও মসৃণ। সেই প্রলোভন সম্বরণ করে আমরা তখনকার দিনে দ্বিগুণ দামে আমেদাবাদের চট কিনতাম। পরিষ্কার ঝরঝরে বিলেতী সুন্দ বাদ দিয়ে কালো কালো

ব্যক্তিরা কয়কচ খুন ব্যবহার করতে আরম্ভ করলাম। তখন কোম্পানীর সুন্দর জুতা বাদ দিয়ে দেশী রুচির নাগরা জুতা ধরলাম। প্রথম দিনেই ফোস্কায় পা ভরে গেল। আমাদের পিতা বন্ধুদের পরামর্শে জুতাতে রেড়ী তেল লাগাতে লাগলেন। নওগাঁর রাস্তায় এক হাঁটু ধুলো ও রেড়ীর তেলে এক অপূর্ব সমন্বয় সৃষ্টি হ'ল। পরে পিঁপড়ের ঝাঁক এসে কয়েকদিনেই জুতার জুতিত্ব লোপ করে দিল। কাজেই হয় বরফ নয় খালি পা একমাত্র সম্বল রৈল।

যদিও আমি সুরেন্দ্রযুগের মানুষ তথাপি সুরেন্দ্র দর্শন বহু বিলম্বে ঘটে: আমি যখন নওগাঁ স্কুলের ৭ম শ্রেণীর (এখনকার ৩য় শ্রেণী) ছাত্র তখন নওগাঁতে স্বদেশী যুগ আরম্ভ হয়। আমাদের একজন যুবক মাষ্টার মশায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় আমাদের মত ছোট ছোট ছেলেদের নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করতেন। আমরা গাইতাম: "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্।" অথবা "স্বদেশের ধূলি স্বর্গেরও বলি' শেখো রেখো হৃদে এ ধ্রুব জ্ঞান", "মায়ের দেওয়া মোটা কাপড় মাথায় তুলে নেরে ভাই" প্রভৃতি গান। তখনও দ্বিজেন্দ্রলালের প্রাণ-মাতানো স্বদেশী সঙ্গীত প্রচলিত হয়নি। একবার আমরা শুনলাম যে সুরেন্দ্রনাথ নওগাঁ আসবেন। আমাদের মধ্যে দারুণ উদ্দীপনার সঞ্চার হ'ল। সুরেনবাবুকে আনবার জন্য নওগাঁ শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তিন মাইল দূর সান্তাহার স্টেশনে সমবেত হলেন। আমরা ছোটরা ছোট ছোট পতাকা হাতে করে রাস্তার দুইধারে সার বেঁধে "একবার তোরা মা বলিয়া ডাক, হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্", গাইতে গাইতে স্টেশনে উপস্থিত হলাম। স্কুলের উঁচু ক্লাসের ছেলেরা একটা গাড়ী টেনে নিয়ে গেল। সুরেনবাবু তাতে বসলে, তারাই গাড়ী টেনে নিয়ে আসবে। বন্ধুদের কাছে শুনেছিলাম সুরেনবাবুর দাড়ি আছে ও পরণে আচকান চাপকান। স্টেশনের বাইরে অনেকক্ষণ দাঁড়াবার [illegible] আমরা দূর থেকে দেখলাম একজন দাড়িওলা আচকান চাপকান পরিহিত ভদ্রলোক ট্রেন থেকে নামলেন। শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিরা তাঁকে ঘেরাও করে তাঁর গলায় মালা পরালেন। অবশেষে তিনি গাড়ীতে এসে বসলেন। গাড়ী টানা আরম্ভ হল। আমরাও প্রাণপণে 'হিমাদ্রি পাষাণ কেঁদে গলে যাক্' আরম্ভ করলাম। নওগাঁ এসে শুনলাম যে আমাদের নেতা সুরেনবাবু নন। বর্দ্ধমানের আবুল হোসেন সাহেব। বিকেল বেলা তিনি বক্তৃতা করতে করতে পাশের একজন ভদ্রলোককে দু গ্লাস জল আনতে বললেন। গ্লাস এলে তিনি তাঁর লম্বা পকেট থেকে ছুটি পুরিয়া বের করে দু গ্লাসের জলে মিশালেন। তারপর তিনি সকলকে আহ্বান করে বললেন: "ভাই সব, এবার এসে দেখুন। এক গ্লাস নুন আর এক গ্লাস চিনি। তার মধ্যে দেখতে পাবেন গরু ও পুরোহিত রক্তকণা ভাসবে।" দেখবার দরকার হ'লনা! আমরা তারপর থেকে বিলেতী চিনি ও নুন পরিত্যাগ করলাম। তখন আমরা ভাবের বন্যায় ভেসেছি। যা দেখি, যা শুনি, তাতেই সেই বন্যার তরঙ্গ তোলে। সমস্ত দেশটা যেন অভিভূত, আচ্ছন্ন। তারপর অসহযোগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, ভারত ছাড় আন্দোলনের ভিতর দিয়ে দিন কেটেছে কিন্তু সেই আচ্ছন্ন ভাবাবেগ আর ফিরে পাইনি। গান্ধীবাদ আমাদের আন্দোলিত করেছে সন্দেহ নাই, কিন্তু প্রাণের অন্তঃস্থলে নাড়া দেয়নি। তাই আমাদের মত প্রাণমাতানো গান, কবিতা ও সাহিত্য স্বদেশী যুগেই জন্মলাভ করেছে।' বাঙলার সাহিত্যে গান্ধীবাদের কোন চিহ্ন নাই। তাই বলে এ কথা বলতে চাই না যে মহাত্মা গান্ধী বা তাঁর অনুসৃত নীতির উপর আমাদের কিছু কম শ্রদ্ধা ছিল কিংবা বাঙালীর ত্যাগ ও দুঃখভোগ অন্য প্রদেশের চাইতে কিছু কম।

যাই হোক, এই কথাটা আমি বলতে চাই যে সেই যুগে বালক বৃদ্ধ যুবক সকলেই ভাবতরঙ্গে জীবন ভাসিয়ে দিলেন। ত্যাগ, দুঃখবরণ বা মৃত্যু তখন তুচ্ছ বলে বোধ হয়েছিল। এর কারণ স্বরূপ যেসব ঘটনা ঘটেছিল আবার তাতে ফিরে

যাই। ১৯০৫ সালে স্বদেশী আন্দোলন আরম্ভ হয়। বঙ্গভঙ্গ তার মুখ্য কারণ বটে কিন্তু কিছু দিন আগে থেকেই স্বাধীনতার আকাঙ্খা বাঙালী তথা ভারতবাসীর জীবনকে আন্দোলিত করেছিল। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র ও রঙ্গলাল প্রভৃতির কবিতায় সে ভাব প্রতিফলিত হতে দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের তো কথাই নাই। সুরেন্দ্রনাথ স্বদেশী যুগের প্রবক্তা হলেও রবীন্দ্রনাথ তার মন্ত্রদাতা। রাখিবন্ধন উৎসবের তিনিই স্রষ্টা। অন্যেরা যে রাষ্ট্রীয় বক্তৃতামঞ্চ থেকে প্রচারিত করছিলেন, রবীন্দ্রনাথ কাব্য, উপন্যাস ও নাটকের মধ্য দিয়ে, তাকে অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত করে প্রাণের দুয়ারে পৌঁছে দিলেন। মুখরঞ্জন তখন আনন্দে পরিণত হল। এই উন্মাদনার কারণ তখনকার ইতিহাসের মধ্যেই আমরা খুঁজে পাই। "ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে মোদের বাঁধন টুটবে" এই কথা শুধু কথার কথা ছিল না। তার পশ্চাতে যে অপমান ও লাঞ্ছনা ছিল তা ভুলে গেলে চলবেনা। ১৯০৬ সালের ১৪ই এপ্রিল বরিশালে প্রাদেশিক কনফারেন্সের সভা হবার আয়োজন হয়। বাংলা ভাগ হয়ে গেছে। বরিশাল পূর্ব বাঙ্গলায়। যে দুজন ইংরেজ শাসনকর্তা কার্জনকে বঙ্গভঙ্গে সহায়তা করেছিলেন তাঁরা তখন দুই বাংলার ছোট লাট। এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার পশ্চিম বাংলার, ব্যামফীল্ড ফুলার পূর্ব বাংলার ছোট লাট। দুজনেই অত্যাচারী ও নির্বোধ। ফুলার ফ্রেজার অপেক্ষা ঘৃণ্য। লাট হয়েই তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে লাগলেন। এর আগে স্বয়ং কার্জন ঢাকায় গিয়ে নবাব সলিমুল্লার কানে মন্ত্র দিয়ে এলেন যে বঙ্গভঙ্গ হলে পূর্ব বাংলায় মুসলমানদের চাকুরী ও অন্যান্য ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে। ঢাকাতেই মুসলীম লীগের জন্ম হল। তেমন সিংহ জেলার ধনবাড়ী গ্রামের একটা ছোট অশিক্ষিত জমিদার নবাব আলি চৌধুরী তাঁর সমর্থক হলেন। ফুলার ছোট লাট হয়েই রসিকতা করে প্রচার করলেন যে তাঁর দুই স্ত্রী. হিন্দু ও মুসলমান তিনি মুসলমান স্ত্রীকেই বেশী ভালবাসেন। তিনি যে শুধু রসিকতা করলেন তাই নয়। কাজ কর্মেও তাই দেখাতে লাগলেন। এই সময় শিক্ষাব্যাপারেও মুন্সীয়ানা প্রভাব দেখা যেতে লাগল। তৃতীয় শ্রেণীর মুসলমান অধ্যাপক ঐ বিষয়ে প্রথম শ্রেণীর হিন্দু অধ্যাপকের উপরে বসান আরম্ভ হল। অযোগ্য ও দুর্ব্যবহার মুসলমান কর্মচারী দ্বারা পুলিশ বিভাগ পূর্ব হতে আরম্ভ হোল। ঝিলুয়ার মেলায় জন একটা মোকদ্দমায় হিন্দুর সাক্ষী, হিন্দু জুরেই অগ্রাহ্য করলেন ও মুসলমানের সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে রায় দিলেন। হাই কোর্ট অবশ্য তাঁকে ভর্ৎসনা করলেন। তখনকার দিনের ইংরেজ সিভিলিয়ানদের মনোভাবের এটা একটা চিহ্ন মাত্র। কোন একটা স্বদেশী সভায় এক জন গায়ক (বোধহয় হেমচন্দ্র সেন) আনন্দমঠের বন্দেমাতরম্ গানটি উদাত্তকণ্ঠে গান করেন। শোনা যায় সুরেন্দ্রবাবু নাকি তখনও আনন্দমঠ পাঠ করেন নি। সভা আরম্ভ হবার একটু আগে কে এক জন তাঁর কাণে কাণে বন্দেমাতরমের কথা নাকি বলেন। সুরেন বাবু বন্দে শব্দটি ধরতে না পেরে জিজ্ঞাসা করেন "বন্দে মাতরম্" গানের অর্থ কি? যাই হোক পরে বন্দেমাতরম্ মন্ত্রের এমন ব্যাখ্যা করলেন যে সেদিন সেই মুহূর্ত থেকে বন্দেমাতরম্ জাতীয় সঙ্গীত ও ধ্বনিরূপে পরিগণিত হল। বন্দেমাতরম্ ধ্বনি হল স্বাধীনতার মন্ত্র। পূর্ববঙ্গে বন্দেমাতরম্ হল বিদ্রোহের ধ্বনি। বন্দেমাতরম্ গান গাওয়া, বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করা নিবারিত হল। বরিশাল কনফারেন্সে বন্দেমাতরম্ ধ্বনি একবারে নিষিদ্ধ হ'ল। কিন্তু কনফারেন্সের সদস্যেরা এ এ নিষেধ একবারে অগ্রাহ্য করলেন। এ্যাটিসার্কুলার সোসাইটির যুবক সভ্যেরা স্বৈরিক বসনে ভূষিত হয়ে গলায় বন্দেমাতরম্ ব্যাজ ঝুলিয়ে ও বন্দেমাতরম্ লাঞ্ছিত পতাকা হস্তে যখন সভাক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তখন তাঁদের উপর পুলিশ বেপরওয়া লাঠিচার্জ করল। বহু জন আহত হলেন। তাঁদের মধ্যে বানরী পাড়ার মনোরঞ্জন গুহ ঠাকুরতার

পুত্র চিত্তরঞ্জন শুধু ঠাকুরতা নির্দয় ভাবে প্রহৃত হন। যতবার তাঁর মাথায় লাঠি পড়ে ততবার তিনি বন্দেমাতরম্ ধ্বনি উচ্চারণ করতে থাকেন। অবশেষে তাঁকে মারতে মারতে অজ্ঞান অবস্থায় পুকুরের জলে ফেলে দেওয়া হয়। দয়াবশতঃ এক হিন্দু কনস্টেবল তাঁকে জলমাধি হতে রক্ষা করেন। সুরেন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে বলেছেন : 'আমরাই প্রথম সত্যাগ্রহী। যতবার মার খেয়েছি ততবার বন্দেমাতরম্ বলেছি। প্রতিহিংসা চাই নি।'

ইংরেজী একটি প্রবাদ বাক্য আছে Blood of the martyr is the cement of the church—রক্তের রক্তে মন্দিরের ভীতগুলি মজবুত হয়। বরিশালে সেদিন যে-রক্ত স্রোত প্রবাহিত হল তাতেই স্বাধীনতার ভিত্তিপ্রস্তর প্রতিষ্ঠিত হল। বন্দে মাতরম্ ভারতের রণতেরীর স্থান অধিকার করল। সেকালে ছাত্রদের বই খাতার শীর্ষদেশে ওঁ, শ্রীহরি, God is good প্রভৃতি লেখা প্রচলিত ছিল। সেগুলির পরিবর্তে বন্দেমাতরম্ লেখা চলতে লাগল। এমন কি হাতে বা বুকে উল্কি দিয়ে বন্দেমাতরম্ শব্দটি মুদ্রিত হল। কিন্তু পুলিশ যেখানেই বন্দেমাতরম্ দেখল, সেখানেই মারধোর ও গ্রেফ্‌তার করতে আরম্ভ করল।

এই প্রসঙ্গে হিতবাদী সম্পাদক কালী প্রসন্ন কাব্যবিশারদ একটি সঙ্গীত রচনা করলেন যার মাধ্যমে বাঙ্গালী জাতি তার প্রাণের জ্বালা প্রকাশ করতে লাগল।

'ফুলার করলে হুকুম জারি,
যা বলে যে ডাকবে তার শাস্তি হবে ভারি।
তবে কিরে ভাই বাংলা হতে উঠলো রে মা বলা,
মা বলে যে ডাকবে তার বন্দুকে টিপে গুলি। ইত্যাদি

বিশারদের অপর গান 'আগো, মার মুখে যেন জীবন চলে বন্দেমাতরম্ বলে'—সঙ্গীতটি গাইতে গাইতে লোকে উন্মত্ত হয়ে যেত।

সুরেন্দ্র বাবুর স্বদেশ প্রেম তাঁর প্রাণোন্মাদকারী বক্তৃতার মধ্য দিয়ে নরনারীর চিত্তকে জাগ্রত করল এবং সুরেন্দ্র বাবু হলেন বাংলাদেশের মুকুটহীন রাজা। কিন্তু সুরেন্দ্র নাথের আকাঙ্খা ও আদর্শ ছিল সীমিত। খণ্ডিত বাংলা এক করা ও আইনানুগ শাসন সংস্কার করা যার ফলে ভারতবাসীর হাতে দায়িত্বশীল শাসন কার্য্য এসে পড়ে এই ছিল তাঁর ও তাঁর সহকর্ম্মীদের আশা আকাঙ্খার চরম লক্ষ্য। ভারতবর্ষ কোন দিন পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করুক এ আশা তাঁরা কোন দিন করেন নি। এমন কি জাতীয়তাবাদীদের উগ্রপন্থীরাও কোন দিন স্বপ্নেও দেখেন নি। মহাত্মাগান্ধীও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব্বে বৃটিশ কর্তৃত্বের অধীন স্বায়ত্বশাসন পেলেই সন্তুষ্ট থাকতেন। কিন্তু জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে এক দল ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়ালেন যাঁরা অনুনয় বিনয়ে দ্বারা স্বরাজ পাওয়া অসম্ভব মনে করলেন। তাঁরা শক্তির সাধনা করতে আরম্ভ করলেন। এই দলের সর্ব প্রধান নেতা ছিলেন শ্রীঅরবিন্দ, পরে বিপিন পাল ও তিলক। এর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দ আবার আত্মিক উন্নতি ও ধর্ম্মজীবনের বিকাশের উপর বিশেষ ভাবে জোর দিতে লাগলেন। স্বামীবিবেকানন্দের রচনাবলী ও বক্তৃতাবালা দেশপ্রেম ও মানবকল্যাণের জন্য সর্ব প্রকার ত্যাগকে জীবনের চরম উদ্দেশ্য বলে তুলে ধরল। গীতাপাঠ ও অশ্বিনী কুমার দত্তের ভক্তিযোগের ব্যাখ্যা যুবক সমাজের প্রতি প্রভাতের নিত্যপাঠ্য হল। একটা পবিত্রতার হাওয়া দেশে প্রবাহিত হল ও দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া অতি সহজ কাজ বলে মনে হল। প্রফুল্ল চাকী নিজের হাতে নিজের প্রাণ নিয়েছিলেন। কানাই দত্ত ও সত্যেন বোস ফাঁসির মঞ্চে দাঁড়িয়ে মরণের অন্তর্ধান করেছিলেন। যতীন মুখার্জী বালেশ্বরের জঙ্গলে বিরাট পুলিশ বাহিনীর সঙ্গে লড়ে মরেছিলেন। এগুলো তখনকার দিনে কিছুই আশ্চর্য্য বোধ হয়নি। মৃত্যু অমৃতের সোপান—এই ধ্রুবজ্ঞান সকলের চিত্তকে অধিকার করেছিল। যে বীর সে পৃথিবীর অধিপতি হয়। ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দিলে স্বর্গবাস হয়—গীতার এই অমর বাণী

সকলের নিকট ধ্রুব সত্য বলে প্রতিভাত হয়েছিল। যেমন একদিকে আতঙ্ক তেমনি অপর দিকে বীরের মৃত্যু দেশের লোককে দুই দলে বিভক্ত করেছিল। আন্দামানে দ্বীপান্তর বাসের জন্য জীবন যাপন অপেক্ষা যে স্বেচ্ছামৃত্যু কত বাঞ্ছনীয় তার রোমাঞ্চকর বর্ণনা উপেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্রোহীর আত্মকাহিনীর মধ্যে বহু বহু পাওয়া যায়।

কিন্তু কথা প্রসঙ্গে আমরা এগিয়ে এসে পড়েছি। বলছিলাম যে সুরেন্দ্রনাথের প্রভাব ক্রমেই কমতে লাগল। বরিশালের পর সারা দেশব্যাপী আতঙ্কের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হল। প্রধান প্রধান গ্রামে বা শহরে যেখানে বিপ্লবীদের গন্ধ পাওয়া গেল সেখানে গুর্খা বা মিলিটারী পুলিশের চৌকী বসল। বানরীপাড়া গ্রামে গুর্খারা ভদ্রমহিলাদের উপর অত্যাচার শুরু করল, এমনকি সতীত্ব নাশ করতে আরম্ভ করল বলে শোনা গেল। সারা দেশে বিদ্রোহের বহ্নি ধূমায়িত হয়ে উঠলো। স্কুলে স্কুলে, শহরে শহরে নানা প্রকারের শরীর চর্চা, লাঠি ও ছোরা খেলা, ঘোড়ায় চড়া, নৌকা চালনা, রণপায় খেলা আরম্ভ হল। তখন মনে হয়েছিল সিপাহী বিদ্রোহের মত আর এক বিদ্রোহ দেশে আসন্নপ্রায়। আমার মনে আছে সে সময় বরিশাল-বাসী একটি যুবক নওগাঁর যুবকদের একটি সংঘ তৈরী করে তাদের নানা প্রকারের অস্ত্র চালনা শেখাতো। হঠাৎ একদিন সে নিরুদ্দেশ হল। এই সময় নওগাঁর যে মিলিটারী পুলিস কোতোয়ের ছিল তাদের একজন যুবক কর্মচারী আমাদের সিপাহী বিদ্রোহির নেতা কুমার সিংহের গল্প শোনাতো ও ও সে যে কুমার সিংহের বংশধর তা বলে খুব গৌরব বোধ করত। মোট কথা তারতে আবার সিপাহী বিদ্রোহের মত বিদ্রোহ যে হবে তার জন্য সকলে প্রস্তুত হতে লাগল। আমার পিতৃদেব তাঁর একটি 'পুরোন' বন্দুকে তেল লাগাতে লাগলেন ও আমার এক খুল্লতাত একদিন রাজসাহী থেকে পাটিতে জড়িয়ে তিনটি বন্দুক নিয়ে এসে উপস্থিত হলেন। অনেক পরিবারেই এইরূপ অস্ত্র সংগ্রহ ও অস্ত্র চর্চা আরম্ভ হল।

বরিশালের পর ১৯০৭ এ বেঙ্গলীপুরে প্রাদেশিক কনফারেন্স বসল। সুরেন্দ্রনাথ সভায় উপস্থিত হয়ে বুঝলেন তাঁর প্রতিপত্তি কমে গেছে। আগে হাজার হাজার লোক তাঁর কথা শোনবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে বসে থাকত। কিন্তু এ সভায় তাঁর উপস্থিতি সত্ত্বেও গোলমাল হ'ল। সঞ্জিবনী সম্পাদক কৃষ্ণ কুমার মিত্র মহাশয় তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন যে এগারজন সদস্য গোপনে গোপনে পরামর্শ করতে লাগলেন ও তাঁদের অর্থাৎ সুরেন্দ্রনাথের সহকর্মীদের দেখেই নীরব হয়ে যান। কিছু দিনের মধ্যেই এর কারণ বোঝা গেল।

দুই বাঙ্গালার জঘন্য অত্যাচারের ফলে একদিকে যেমন নিরাশা অপর দিকে তেমনি হিংসাবৃত্তি জাগ্রত হল। এ্যাণ্ড্রু ফ্রেজার ও ফুলার কে হত্যা করে তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি বিধান করার প্রতিজ্ঞা দেশের যুবক সমাজকে উন্মত্ত করে তুলল। তখন যাঁরা ছাত্র ছিলেন তাঁদের নিশ্চয়ই স্মরণে আছে যে তাঁদের জীবন কি রকম বিপন্ন হয়ে উঠেছিল। ঘরে বাইরে গুপ্তচর তাদের ঘিরে রেখেছিল। রাত্রিতে ঘুমিয়ে শান্তি ছিল না। কখন যে কার উপর পুলিশ চড়াও হবে তার ঠিক নাই। মেসে বোর্ডিংএ অতি নিরুপদ্রব ছাত্র হঠাৎ পুলিসী তৎপরতার কেন্দ্র হ'য়ে পড়ল। কে কবে কোন বন্ধুকে চিঠি লিখেছিল সেই চিঠি নিয়ে এসে তাকে পাকড়াও করা হল। সে জানতও না যে তার বন্ধু কোন রাজনীতিক ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। গরমের ছুটিতে বাড়ী গেলে গ্রামের চৌকিদার থানায় গিয়ে খবর দিয়ে আসত। বিদেশ থেকে আত্মীয়-স্বজন বাড়ী এলে সে তৎক্ষণাৎ পুলিসের নজরে পড়ত। অত্যাচারে অত্যাচারে লোক পাগল হ'য়ে উঠলো। এই পাগল লোকেরা যে নানা প্রকার পাগলামীর আশ্রয় নিবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি? একদিন দেখা গেল বেঙ্গলীপুরের নিকটবর্তী নারায়ণ গড় স্টেশনে ফ্রেজারের ট্রেনের তলায় বোমা ফাটাল। গাড়ীর ক্ষতি হ'ল কিন্তু ফ্রেজারের

কিছু হল না। কুলারকে হত্যা করার চেষ্টাও হতে লাগল। বাংলার লোক যখন রুদ্ধশ্বাসে কুলারের চরম শাস্তির জন্য অপেক্ষা করছিল, সেই সময় কুলার বিলেত চলে গিয়ে সকলকে নিরাশ করল। ঠিক এই সময়ই কিংসফোর্ড নামে একজন অত্যাচারী সিভিলিয়ান ছিল। সে ছিল কলকাতার প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট। তারপর বদলী হয়ে গেল মজফরপুরে ম্যাজিস্ট্রেট হয়ে। কলকাতা থাকা কালে তার কোর্টে স্বদেশী মামলায় অভিযুক্ত ছোকরাদের সে কঠোর শাস্তি দিত ও প্রকাশ্য বেত্রাঘাত দিত। বাংলার লোক তাকে শাস্তি দেবার জন্য ক্ষেপে উঠল। একদিন সন্ধ্যায় কিংসফোর্ডের গাড়ী সন্দেহে একটি গাড়ীতে বোমা পড়ল। দুই জন মহিলা মারা গেলেন। তাঁরা হলেন মিসেস কেনেডি ও মিস কেনেডি। কেনেডি ছিলেন একজন মজফরপুরের এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান উকিল। তিনি কিছুদিন কংগ্রেসের সভ্য ছিলেন। দুই জন যুবক বোমা ফেলেছিল—মেদিনীপুরের ক্ষুদিরাম বসু ও বরড়ার প্রফুল্ল চাকী। প্রফুল্ল ধরা পড়ার ভয়ে নিজের গুলিতে আত্মহত্যা করল। তার মৃতদেহের ফটো ঘরে ঘরে স্থান পেল। ছয়ফুট যুবকের দেহ ফাঁসির বুকে একটা গভীর গুলির দাগ। ক্ষুদিরাম ধরা পড়ে ফাঁসিতে ঝুলল।

এই সব বোমা এল কোত্থেকে? চারদিকে খোঁজ চলতে লাগল। তখনকার যুগান্তর পত্রিকার একটা আড্ডা ছিল। যুগান্তরের প্রথম সম্পাদক ছিলেন দেবব্রত বোস। পরে স্বামী প্রণবানন্দ নাম নিয়ে ইনি রামকৃষ্ণ মিশনে যোগদান করেন। পত্রিকার আফিস বলতে একটা কুঠরী, একখানা খবরকি, কিছু কাগজ পেন্সিল। যার খুসি এসে বসেছেন। গরম গরম লেখা বেরুত। সকলের আশা এই কুঠরী একদিন কেলভেডিয়ার প্যালেসে স্থানান্তরিত হবে। এখানে এসে জুটলো বারীন ঘোষ, উপেন বন্দ্যোপাধ্যায় ও উল্লাসকর দত্ত। বারীন অরবিন্দের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। দাদার অনেকই বিপরীত, আদর্শবাদী, বন্ধনহীন। উপেন চন্দননগরের এক ভবঘুরে যুবক। উল্লাসকর শিবপুর এঞ্জিনীয়ারিং কলেজের অধ্যাপক বিজয়দাস দত্তের পুত্র। হাসিখুশী বেপরোয়া যুবক। উল্লাসকর বোমা তৈরী করা শিখেছিল। সেই সময় অরবিন্দের পিতা ডাঃ কৃষ্ণধন ঘোষের মুরারীপুকুরে একটা পোড়ো বাগান বাড়ী ছিল। যত ভবঘুরে ছেলে এসে এখানে আড্ডা বসালো। জীবনে আসক্তি নাই—মৃত্যুতেও ভয় নাই। কথা নাই বার্তা নাই, কোথা থেকে কতকগুলি বাপ মায়ে খেদানো ছোকরা একটা খোচকা নিয়ে সেখানে জুটতে লাগলো। নারায়ণ গড়ে ও মজফরপুরের বোমা ফেলার পর পুলিস চারদিকে ছুটে বেড়াতে লাগল। যুগান্তর আফিসে খানাতল্লাসী হল। সেই সূত্রে একদিন রাত্রিবেলা মুরারীপুকুরে হানা দিয়ে পুলিস সবগুলোকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে গেল। অরবিন্দের বন্দেমাতারম্ পত্রিকা তখন লেখার মধ্য দিয়ে আগুন ছড়াচ্ছিল। অরবিন্দও ধরা পড়লেন। রাজনীতি ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় আরম্ভ হল। এরপর আরম্ভ হল আলিপুর বোমার মামলা। বোমার গগনভেদী গর্জনে সুরেন্দ্রনাথের উদাত্ত কণ্ঠ ডুবে গেল সত্যি সত্যিই যুগান্তর এল।

অবশ্য সুরেন্দ্রনাথের বাণী তখনও নীরব হয়নি। তাঁর ভক্তদের কাজকর্মও বন্ধ হয়নি। গ্রামে গ্রামে গিয়ে তাঁরা নানা প্রকার সংগঠনের কাজে নিযুক্ত হলেন। বিলেতী কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করা, স্বদেশী প্রচার করা বিদেশী দ্রব্য বর্জন প্রভৃতি কার্যে তাঁরা আত্মনিয়োগ করলেন। বাঙলা দেশে যাতে শিল্প প্রতিষ্ঠিত হয় তার জন্য তাঁদের চেষ্টায় বঙ্গলক্ষ্মী মিল, বেঙ্গল ষ্টাশনাল ব্যাঙ্ক, নীলরতন সরকারের ষ্টাশনাল ট্যানারি ও সোপ ওয়ার্কস হিন্দুস্থান কো-অপারেটিভ ইনসিওরেন্স কোম্পানী প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হল। দেশের লোক স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শেয়ার কিনল। গরীব মধ্যবিত্ত লোকেরাই কিনল। কিন্তু অভিজ্ঞতার অভাবে ও কোন কোন সভ্যের সততার অভাবে সবগুলিই মৃতপ্রায়

হল। চরকার সুতা কাটার অভিযানেও বহু টাকা লোকসান হ'ল।

১৯০৮ সালে সুরাটে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে সুরেন্দ্রনাথের দলের সম্পূর্ণ পরাজয় হ'ল ও সুরেন্দ্রনাথের জনপ্রিয়তা ক্রমেই কমতে লাগল। অবশেষে এল ১৯১১ সালের ১২ ডিসেম্বর যেদিন দিল্লীর দরবারে নৃপতি পঞ্চম জর্জ বঙ্গ বিভাগ রদ করে দিলেন। সুরেন্দ্রনাথের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ স্বপ্ন সফল হল। এর পর তাঁর আর বিশেষ কিছু করবার রৈল না। তিনি যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন।

সার্থকতার সাফল্যে উৎফুল্ল হয়ে জীবন সায়াহ্নে সুরেন্দ্রনাথ তাঁর আত্মজীবনী—A Nation in Making এ লিখেছেন: আধডজন শব্দে আমাদের জীবনের গোপন কথাটি বলা যেতে পারে। জয় সম্বন্ধে আমাদের কোন সন্দেহ ছিল না। আমরা ছিলাম নাছোড়বান্দা। আইনবিরুদ্ধ সব কাজ থেকে এবং সেই-উদ্দেশ্য যা থেকে এই সব কাজ বল পায় তা আমরা এড়িয়ে চলেছি। এমন কি যখন পুলিস আমাদের আঘাত করেছে, আমরা রুখে দাঁড়াইনি। পুলিসের লাঠির প্রত্যেক আঘাতের সঙ্গে আমরা বন্দেমাতরম্ বলেছি এবং তারপর আদালতের শরণাপন্ন হয়েছি। নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ আমরা পালন করেছি। আত্মার শক্তিতে আমরা বিশ্বাসী। কিন্তু আত্মিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা কোন রাজনৈতিক কাজ বা জাতীয় উদ্দেশ্য সিদ্ধি হতে পারে এবিষয়ে আমাদের বিন্দুমাত্র ভ্রান্তি ছিল না। জনসেবায় যাদের চিত্তবৃত্তি দমিত ও যারা আত্মসংযমপরায়ণ তাঁরাই শুধু এই কার্যে সফলতা লাভ করতে পারেন।

এই উক্তির মধ্যেই এঁদের বিফলতার বীজ নিহিত রয়েছে।

"The secret is told in less than half-a dozen words. We were praistent, we were confident of success. We religiously avoided unconstitutional methods and the wild hysterics that breed and stimulate them. Even when attacked by the police, we did not retaliate. We shouted Bandemataram at each stroke of the police lathi, and then appealed to the constituted courts of law for redress. Passive resistance we practised. Soul force we believed in; but we never were under the delusion that it could be employed to any useful or national purpose, except by men trained in the practice of selfrestraint and the discipline of public life.

পরিকল্পনার জন্যই স্বাধীনতা

স্বাধীনতা শুধু একমাত্র রাজনীতির লক্ষ্যই নয়, এর মানে হচ্ছে আমরা যেভাবে বাঁচতে চাই তার জন্য স্বাধীনতা, আমাদের দারিদ্রের উন্নতি সাধন করা এবং নিশ্চলতাকে সচল করা।

দেশকে উন্নত করার জন্য আমাদের শাসনতন্ত্রে বহুমূল্য আদর্শ আছে। এরই অনুধাবন করে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা লোকের দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞান প্রয়োগ করা ও সঞ্চয় করতে সক্ষম করায় সাহায্য করেছে।

শেষের তিনটি পরিকল্পনা আমাদের কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করেছে— খাদ্যশস্যের সঙ্গে সঙ্গে টাটকা সব্জীর ফলন বাড়িয়েছে, শিল্পের উৎপাদন তিন গুণ বর্দ্ধিত করেছে ; পাঁচ গুণ বিদ্যুৎ সরবরাহ বাড়ানো হয়েছে। সমস্ত পর্য্যায়ে শিক্ষা সংক্রান্ত সুবিধাদি বর্দ্ধিত হয়েছে। ১৯৫১ সালে যখন প্রাথমিক পর্য্যায়ে (৬ থেকে ১১ বছরের মধ্যে) ছেলেমেয়েরা স্কুলে যেত তাদের হার ছিল শতকরা ৪০% এখন তা শতকরা ৮০% তে পৌঁছেচে। উন্নততর চিকিৎসা বিধান এবং রোগের বিরুদ্ধে আক্রমনের ফলে দেশে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপ কমেছে এবং মানুষের আয়ু ৩২ বছর থেকে ৫০ বছর অবধি বেড়েছে।

পরিকল্পনা মানেই অগ্রগতি

এর জন্য কাজ করুন ও সঞ্চয় করুন

DA 65/219 Bengali

প ট ভূ মি কা

অন্নদাশঙ্কর রায়

পাকিস্তান-সৃষ্টির পর থেকে যে সমস্যা পাকিস্তানীদের কিছুতেই একমত হতে দিচ্ছে না সেটি হলো একটি গণতান্ত্রিক সংবিধান। যদি প্রত্যেক প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিককে একটি করে ভোটের অধিকারী করা হয় তা হলে বাঙালীদের ভোট অ-বাঙালীদের ভোটকে ছাড়িয়ে যায়। তার ফলে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারে বাঙালী সংখ্যাপরিষ্ঠতা হয়। সেইজন্যে পাকিস্তানী সৈন্যদলে, সিভিল সার্ভিসে, কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগে। যথার্থ হলেও অ-বাঙালীরা বাঙালীদের সংখ্যাপরিষ্ঠতা সহ্য করতে রাজী নয়। বছরের পর বছর গড়িয়ে যায়, মূলনীতি নির্ধারণ আর কিছুতেই হয় না। শেষে সাব্যস্ত হলো যে দেশটাকে পূর্ব ও পশ্চিম এই দুই ভাগে বিভক্ত করতে হবে ও লোকসংখ্যা কম বেশী হওয়া সত্ত্বেও উভয় প্রদেশকে প্যারিটি দেওয়া হবে।

এই "প্যারিটি" শব্দটি অবশেষে মুসলিম আমলের কাজ করে। ভোটার সংখ্যা যত বেশী আর যত কম হোক না কেন প্রতিনিধি সংখ্যা কিফটি কিফটি। সেকালের বি সি চ্যাটার্জির ফরমুলার নাম ছিল কিফটি কিফটি। তাঁর ভাগ্যদোষে দাঁড়িয়ে যায় কিফটি কিফটি চ্যাটার্জি। কিন্তু একালের এই প্যারিটিতে বাঙালীদের জনসংখ্যাকে তার উপযুক্ত ওজন দেওয়া হয় না। প্রকারান্তরে অবাঙালীরাই ওয়েটেজ পায়। তখন বাঙালীরা দাবী করে বসে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি। হ্যাঁ, বাঙালী মুসলমানরাই হঠাৎ মিশ্র নির্বাচনের ভক্ত হয়ে পড়ে। তারা হিসাব করে দেখে যে পশ্চিম পাকিস্তানের কিফটিতে একটিও অমুসলমান থাকবে না, অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কিফটিতে থাকবে স্বতন্ত্র নির্বাচন পদ্ধতির দৌলতে কয়েকজন অমুসলমান। ফলে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টে পশ্চিমা মুসলমান ও বাঙালী মুসলমান সমান সমান হবে না, বাঙালী মুসলমানরাই সংখ্যায় কম হবে। তা হলে প্যারিটিতে রাজী হয়ে তাদের লাভ কী হলো? সেইজন্যে তারা দাবী করে যে প্যারিটি যদি হয় তবে মিশ্র নির্বাচনও হবে, মিশ্র নির্বাচন যদি না হয় প্যারিটি হবে না। নানা ওজর আপত্তির পর পশ্চিমারাও এ দাবী মেনে নেয়, কিন্তু সকলে নয়। মুসলিম লীগ হয়কি ছাড়ে যে মিশ্র নির্বাচন পদ্ধতি সে প্রাণ থাকতে যানবে না। লীগের পক্ষে ওটা প্রাণদণ্ডের সামিল। ওই দই খেয়েই সে গাছে উঠেছে। দই ফেলে দিলে সে ফল পেড়ে খাবে কী করে? অন্নপন্ন জোগাড় করে আবার এক ডাইরেক্ট অ্যাকশনের দ্বারা সাধারণ নির্বাচন পণ্ড করতে উদ্যত হয় লীগ। এমন সময় ইস্কান্দর মির্জা ও আয়ুব খান্ মিলে "বিপ্লব" করেন।

এরপর আয়ুব খান্ দেশবাসীকে একটি সংবিধান উপহার দেন। অর্থাৎ উপর থেকে চাপিয়ে দেন। তাতে প্যারিটি রইল, মিশ্র নির্বাচন রইল, রইল না কিন্তু প্রত্যক্ষ নির্বাচন। পরোক্ষ নির্বাচনে যারা প্রতিনিধি নির্বাচিত হলেন তাঁদের হাতে ক্ষমতা রইল অতি সামান্য। প্রেসিডেন্ট অনেকটা সেকালের বড়লাটের মতো সর্বশক্তিমান হয়ে তাঁর মনের মতো মন্ত্রীদের, গভর্নরদের, গভর্নরদের মন্ত্রীদের নিয়ে দেশ শাসন করতে লাগলেন। পরে উপর থেকে একটা ফলও

চাপানো হয়। সরকারী মুসলিম লীগ। পাকিস্তান শাসনতান্ত্রিক অর্থে মন্ত্রি-মিন্টোর যুগে ফিরে যায়। এটা একটা প্রচ্ছন্ন বড়লাটতন্ত্র। অমীলাটতন্ত্র বললেও চলে। কারণ আয়ুব খান্ শুধু প্রেসিডেন্ট নন, তিনি ফীল্ড মার্শাল :

বহু শতাব্দীর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল মিলিটারীর উপর সিভিল কন্ট্রোল। দু'শো বছর ধরে ইংলণ্ডের কাছে শিক্ষা নিয়ে আমরাও তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলুম। কিন্তু পাকিস্তান সেটা হারিয়ে বসেছে। কবে কিরে পাবে খোদা জানেন। তেমনি বহু শতাব্দীর পরীক্ষানিরীক্ষার ফলে ইংলণ্ডে বিবর্তিত হয়েছিল গভর্নমেন্টের উপর পার্লামেন্টের কর্তৃত্ব। আমরাও তার উত্তরাধিকারী হয়েছিলুম। পাকিস্তান জন্ম দিয়ে যা বানিয়েছে তার স্বাদ অন্যরকম। এখন পাকিস্তানীরা উঠে পড়ে লেগেছে ভারতের মতো একটি সংবিধান পেতে। তারা চায় পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ও মিলিটারির উপর সিভিল কন্ট্রোল। পাকিস্তানের দুই [illegible] মানুষ এই দুটি ক্ষেত্রে একমত। তা ছাড়া আরো একটি ক্ষেত্রেও তারা একমত যে প্রদেশগুলি আগেকার মতো বহুসংখ্যক হবে ও আগেকার মতো ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। উপরন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অনেকের ইচ্ছা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে যে ক্ষমতা থাকবে সেটা যেন আরো সীমাবদ্ধ হয়, বাড়তি ক্ষমতা যেন বিকেন্দ্রীকৃত হয়। পূর্বপশ্চিম পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন না হলেও যথাসম্ভব স্বয়ংসম্পূর্ণ হয় এটাও তাঁদের ইচ্ছা। নতুন সংবিধানে এর জন্যে জায়গা থাকবে।

কিন্তু এখনো কয়েকটি দল আছে তারা মিশ্র নির্বাচনে নারাজ, সুতরাং নতুন সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন তাঁরা আবার একটা লড়াই বাধাতে যাবে। তাদের কথা জনে নিলে প্যারিটিতে পূর্বপাকিস্তানীদের লাভ হয় না, সুতরাং নতুন সংবিধান রচনার সময় যখন আসবে তখন এরাও আবার একটা অচল অবস্থার সৃষ্টি করবে। এরা বলবে এক একটি মানুষ এক একটি ভোট। বাঙালী যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় তবে বাঙালীই পার্লামেন্টে ও কেন্দ্রীয় সরকারে সংখ্যাগুরু হবে।

প্রথম দিকের ইসলামিক স্টেট আজকের দিনে খুব একটা অবরুদ্ধ আইডিয়া নয়। কিন্তু এখানো ওর যথেষ্ট শক্তি আছে। পূর্ব পশ্চিমকে একজোট করার বেলা ও যদি না থাকে আর কোনো সিমেন্ট থাকে না। তেমনি ওর দরকার পড়ে কাশ্মীরকে কব্জা করার জন্যে। ও যদি যায় তবে কাশ্মীরের উপর দাবী খাটে না। তেমনি ওর প্রয়োজন হয় পাঠানিস্তান অস্বীকার করার সময়। ও যদি যায় পাঠানদের ঘরে রাখা যায় হবে। সব চেয়ে বড়ো কথা মুসলিম লীগ প্রমুখ সাম্প্রদায়িক দলগুলির অস্তিত্ব রক্ষা করতে হলে ইসলামিক স্টেট বলে একটি আইডিয়া চাই। যদিও প্রত্যেকদিন মানুষের মন ওকে পিছনে ফেলে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী ও সিভিল কন্ট্রোলের অভিমুখে এগিয়ে চলেছে। অপরপক্ষে সোশিয়ালিজমের স্বপ্নও মানুষের মন অধিকার করছে। ভারতের মতো পাকিস্তানেও পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার যুগ পড়েছে।

পাকিস্তানের আত্মা এখন পুরোপুরি ইসলামের কৌটায় ভরা নয়। তার দুই হাত ধরে তাকে দুই দিকে টানছে আমেরিকা ও চীন। সে যদি আর পাঁচ দশ বছরের মধ্যে পার্লামেন্টারি ডেমোক্রাসী, প্রত্যক্ষ নির্বাচন, সিভিল কন্ট্রোল ইত্যাদি না পায় তবে হতাশ হয়ে চীন কিংবা বর্মার মার্গ ধরবে। সেরকম সময় যখন আসবে তখন পাকিস্তান দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে একভাগ সোশিয়ালিস্ট ও অপর ভাগ ক্যাপিটালিস্ট শিবিরে যেতে পারে। আয়ুব খান্ একটা ব্যালান্স রক্ষার চেষ্টা করছেন। যাতে পাকিস্তান দুই দিকে চলতে গিয়ে ছিন্নভিন্ন না হয়ে যায়। পাকিস্তানের প্রধান সমস্যা এখন পূর্ব পশ্চিম সমস্যা। পূর্ব বনাম পশ্চিম পাকিস্তান। আমেরিকা বনাম চীন। পূর্ব শিবির বনাম পশ্চিম শিবির।

পাকিস্তান তার নিজের সমস্যা নিয়ে এখন জর্জরিত যে

ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা তার নেই। ইচ্ছাও যে আছে তাই বা কেমন করে বলি? সরকার ও জনগণ তো এক নয়। বিশেষত পরোক্ষ নির্বাচন পদ্ধতি থাকতে। পাকিস্তান যুদ্ধ করে পারেই বা কী! আক্রমণ করে একদিন যেটা পাবে প্রতি-আক্রমণে আরেকদিন সেটা ছেড়ে দিতে বাধ্য হবে। ভারতীয় সেনাকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত না করলে কোনো দখলই পাকা হবে না। সামরিক দখল জাপানীরাও তো যুদ্ধকালে নানা দেশে করেছিল। দখল বজায় রাখতে পারল কি?

আমার মনে হয় পাকিস্তানের আসল অভিপ্রায় যুদ্ধ জিতে কাশ্মীরলাভ নয়, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে কাশ্মীরীদের মধ্যে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলে তাদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এমন এক বিপর্যয় সৃষ্টি করা যা দেখে দুনিয়ার লোক বলবে, ভারতকে কেউ চায় না, ভারত গায়ের জোরে চেপে বসেছে। বিদ্রোহ যদি সফল হয় তবে তো কেল্লা ফতে, বিফল হলেও চারদিকে সাড়া পড়ে যাবে যে কাশ্মীরীরা ভারতবিরোধী, তারা ভারতীয়ই নয়। ফলে ইউনাইটেড নেশনসের দুই তৃতীয়াংশ সভ্য পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেবে। সিকিউরিটি কাউন্সিলে রাশিয়া ভীটো প্রয়োগ করলেও জেনারেল অ্যাসেম্বলিতে পাকিস্তান ভোটে জিতবে। কত সহজ খেলা!

কিন্তু গোড়ায় গলদ কাশ্মীরীরা যদি বিদ্রোহ না করে? তা হলে কী উপায়! "যে পথ দিয়ে মোগল এসেছিল সে পথ দিয়ে ফিরল নাকো আর।" আর যদি ফেরেও তবে দ্বিতীয়বার অনুপ্রবেশ করা শক্ত হবে।

SAFE • STURDY • SIMPLE

Kum Kum
BLUE FLAME

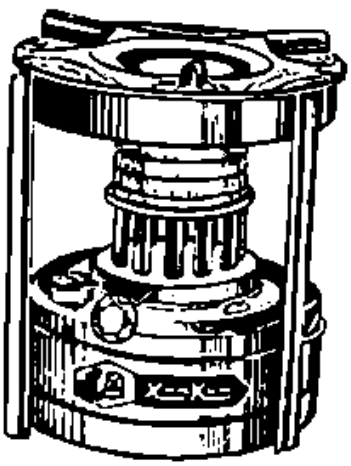

SAFETY STOVE

Seamless tank and riveted fittings to ensure durability.

Safe, easy and pleasant to use: No pump, no pin, no dust, no smoke.

An extra set of wicks and lighting wire free with each stove.

MANUFACTURERS: SUDHA INDUSTRIES, CALCUTTA-24
DISTRIBUTORS
KERAMIC AGENCIES
20, POLLOCK STREET, CALCUTTA-1

অভয় আশ্রম

পশ্চিম বাংলার সাতাত্তরটি ব্লকে অভয় আশ্রমের উৎপাদন কেন্দ্র রয়েছে। বিভিন্ন কেন্দ্রের নিজস্ব তিরিশটি ভাণ্ডারের মাধ্যমে ওই সব জিনিষপত্র—সূতি খাদি, রেশম খাদি, পশম খাদি, হাতে তৈরী কাগজ, তৈল, অভক্ষ্য তৈলবীজ থেকে তৈরী সাবান, মধু ইত্যাদি জনসাধারণ পাচ্ছেন।

খাদি ও গ্রামোদ্যোগের কাজ শুধু একটা মানসিক প্রবণতা নয়, দৃঢ় প্রতীতি যা ভারতীয় স্বাবলম্বী অর্থনীতি গড়ে তুলবে—এই কঠোর সংকল্প নিয়ে গান্ধীজীর আশীর্বাণীপূত অভয় আশ্রম গত ১৯২১ সাল হতে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে।

প্রধান করণ ঃ বিরাটী, কলিকাতা-৫১

৬ঠা সেপ্টেম্বর থেকে ৩রা অক্টোবর পর্যন্ত গান্ধী জয়ন্তী উপলক্ষে খাদিতে টাকা প্রতি পাঁচ পয়সা ও সিল্কে টাকা প্রতি কুড়ি পয়সা রিবেট দেওয়া হচ্ছে।

কাশ্মীর আক্রমণঃ ভারত-বিভাগের অন্তিম পরিচ্ছেদ

সুনীল দাস

কাশ্মীর আক্রমণ: ঘটনার সমাবেশ

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের পুনরাবৃত্তি করে অবশেষে ১৯৬৫ সালের ১লা সেপ্টেম্বর পাকিস্তান কাশ্মীর আক্রমণ করেছে। গত আঠার বছর ধরে যে সংঘাতের পটভূমিকা পাক-ভারত সম্পর্কে কখনও ধীর-মন্থর গতিতে, কখনও দ্রুত লয়ে বিস্তৃত হয়ে এসেছে, তারই অন্তিম পরিণতিতে মার্কিণী ট্যাঙ্ক, সাঁজোয়া-বাহিনী ও মার্কিণ সাহায্যপুষ্ট আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই সযত্ন-রচিত আক্রমণ। এই আক্রমণে কোনো আকস্মিকতার স্বাক্ষর নেই। সাম্প্রতিক সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অব্যর্থ সাক্ষ্য রয়েছে এই আক্রমণের পশ্চাতে এবং নিকট-অতীতও আকীর্ণ হয়ে আছে তারই পদচিহ্নে। যুদ্ধবিরতি সীমারেখার পুনঃপুনঃ লঙ্ঘনে, এই সীমারেখার সংলগ্ন এলাকাগুলিতে নিয়মিত গুলিবর্ষণে ত্রাসের সৃষ্টি করে ধারাবাহিক মানসিকতা অব্যাহত রাখতে পাকিস্তানী উদ্যোগে, কাশ্মীর আক্রমণের আদিপর্বের পৃষ্ঠভূমিকা রচিত হয়েছে। গত জানুয়ারী মাস থেকে এই উদ্যোগের দ্রুত বিস্তারের পরিমাপ পাওয়া যাবে এই বছরের গোড়া থেকে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘনে পাকিস্তানী তৎপরতায়। হিসেবে দেখা গেছে ১৯৪৯ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত ১৩৮১ বার যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘিত হয়েছে, আর ১৯৬৪-র জানুয়ারী থেকে যে মাসের মধ্যে এই লঙ্ঘনের সংখ্যা ১৩৪৭। অর্থাৎ চৌদ্দ বছরে যতবার কাশ্মীরে পাকিস্তান সীমানা লঙ্ঘন করেছে এ-বছর পাঁচ মাসেই প্রায় সমসংখ্যক ঘটনা যুদ্ধবিরতি সীমারেখায় চিহ্নিত হয়ে আছে। এছাড়া বিশেষ সামরিক শিক্ষালয়ে গেরিলা পদ্ধতিতে শিক্ষিত 'মুজাহিদ' নামে পরিচিত দশম বেসামরিক দলের বহুসংখ্যক সদস্যদের এবং সামরিক বাহিনীর দলে যুক্ত আধা সামরিক 'রাজাকার' বাহিনীর সদস্যদেরও পাকিস্তান কাশ্মীর সীমান্তে গত কয়েকমাস ধরে মোতায়েন করে এসেছে। জম্মু এবং কাশ্মীরে বিস্ফোরণের আনুপাতিক হারও গত কয়েকমাস বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে কাশ্মীর আক্রমণের সূচীমুখ রূপে গত পাঁচই আগষ্ট গেরিলাযুদ্ধে শিক্ষাপ্রাপ্ত, নিয়মিত সামরিক বাহিনীর, মুজাহিদ বাহিনীর এবং রাজাকার বাহিনীর নয়-দশ হাজার দশস্ত্র সদস্যের বেসামরিক বেশে পাকিস্তান কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করিয়ে দিয়ে এদের সাহায্যে ও স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ধ্বংসাত্মক ও নাশকতামূলক কাজ সংঘটন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের রূপ দেবার চেষ্টা করেছিল। পাকিস্তানের আশা ছিল ৯ই আগষ্ট যেদিন সমগ্র কাশ্মীরে শেখ আবদুল্লার সাম্প্রতিক কারাবাসের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শিত হবে, সেদিনই পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারীদের সহায়তায় চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়ে কাশ্মীরে পরিকল্পিত আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ পরিপূর্ণতা পাবে। কিন্তু হানাদারদের সামরিক নেতৃত্ব, কাশ্মীরে অনুপ্রবেশের প্রাক্কালে, রাওয়ালপিণ্ডিতে আয়ুব খাঁর বিদায় অভিনন্দন পেয়েও সেদিন ব্যাপক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিতে ব্যর্থ হয়।

কচ্ছ-পাকিস্তান সীমান্তে পাকিস্তানী আক্রমণের পর যে যুদ্ধ-বিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল, ভারত ও পাকিস্তানের

বিভিন্ন সীমান্তবর্তী সংঘাত প্রশমনের পথে প্রথম পদক্ষেপ রূপেই সে চুক্তি স্বীকৃত হবার মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই স্বয়ং-ক্রিয় রাইফেল, ট্যাঙ্ক-বিধ্বংসী কামান, ভারী মর্টার ইত্যাদি সহ হানাদারদের ব্যাপক অনুপ্রবেশের পর ভারত সরকারের পক্ষে যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে হানাদারদের ঘাঁটিগুলি দখল করা কিম্বা জবরদখল ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। এই সামরিক কৌশল গ্রহণ না করে অনুপ্রবেশকারী হানাদারদের, বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত অঞ্চলে, সেনাবাহিনীর সাহায্যে প্রতিহত করার কৌশল অবলম্বন করে নিশ্চিন্ত থাকলে ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিস্তীর্ণ এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে হতো এবং এইভাবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রতিরোধশক্তি দুর্বল করে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী প্রচণ্ড ও সংহত আক্রমণে কাশ্মীরকে বিপন্ন করে তুলতো। তাই ২৫শে আগষ্ট তারিখেই ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধবিরতি সীমারেখা অতিক্রমের পর পাক-অধিকৃত কাশ্মীর এলাকায় প্রবেশ করে হানাদারদের আগমন-নির্গমনের পথ ও প্রস্তুতির ঘাঁটিগুলির দিকে অগ্রসর হয়ে যেতে বাধ্য হল। ভারতীয় সেনাবাহিনীকে বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্ত হানাদার দলগুলির পশ্চাদ্ধাবনে বাধ্য করে তাদের সংহত শক্তিকে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে ছড়িয়ে দিয়ে প্রচণ্ড ও সংহত আক্রমণে কাশ্মীরের প্রতিরোধ বিধ্বস্ত করবার উদ্দেশ্যে পাকিস্তানী অভিযান কচ্ছর ও যেঁষে রাধ এলাকায় আন্তর্জাতিক সীমারেখা অতিক্রম করে ১লা সেপ্টেম্বর কাশ্মীরের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। সেই উদ্যত আক্রমণের পূর্বেই ভারতীয় সেনাবাহিনী যুদ্ধ-বিরতি সীমারেখা অতিক্রম করে প্রতিরক্ষার মহড়া নিতে বাধ্য হল। একই কারণে পূর্ব পাঞ্জাবে আসন্ন পাকিস্তানী আক্রমণ ব্যর্থ করার উদ্দেশ্যে ৬ই সেপ্টেম্বর পশ্চিম পাঞ্জাব সীমান্ত অতিক্রম করে ভারতীয় সেনাবাহিনী লাহোর অভিমুখে ত্রিমুখী অভিযান শুরু করতে বাধ্য হয়েছে। ৮ই সেপ্টেম্বর সিন্ধু সীমান্ত অতিক্রম করে হায়দারাবাদ অভিমুখী অভিযানের তাৎপর্যও রাজস্থানে সম্ভাব্য পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করবার লক্ষ্যে সীমিত। পূর্ব সীমান্তেও পাকিস্তানী সামরিক তৎপরতা পশ্চিম বঙ্গ, আসাম কিম্বা ত্রিপুরার দিকে প্রসারিত হবার সম্ভাবনা অগ্রাহ্য করবার নয়। এই সম্ভাবনার বাস্তব রূপায়ন আসন্ন হয়ে উঠলে, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত অতিক্রমের মধ্য দিয়ে এই সীমান্তেও ভারতীয়বাহিনীর অগ্রিম প্রতিরোধ অনিবার্য হয়ে উঠবে। সে-ক্ষেত্রে কাশ্মীর আক্রমণের প্রতিক্রিয়া সমগ্র উপ-মহাদেশে ছড়িয়ে পড়বে।

আক্রমণের পশ্চাৎপট : ভারতের ভ্রান্ত নেতৃত্ব

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে যেদিন পাকিস্তান বাহুবলে কাশ্মীর দখলে উদ্যোগী হল, সে-সময় কাশ্মীরের মহারাজা হরি সিং Instrument of Accession স্বাক্ষর করে না-ভারত, না-পাকিস্তান কোনো রাষ্ট্রেরই অন্তর্ভুক্ত না হয়ে কালক্ষেপণ করছিলেন। কিন্তু পাকিস্তানী আক্রমণের মুখে ২৬শে অক্টোবর ভারতভুক্ত হয়ে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সহায়তায় শত্রু আক্রমণ প্রতিরোধে কাশ্মীর সরকার সক্ষম হল। ইতিমধ্যে কাশ্মীর মহারাজার কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে শেখ আবদুল্লা কাশ্মীর সরকার গঠন করে পাকিস্তানী আক্রমণ প্রতিহত করতে সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। ভারতীয়বাহিনী অনতিকালেই সমগ্র কাশ্মীর এলাকা পাকিস্তানী আক্রমণ মুক্ত করতে সক্ষম হত, যদি না অকস্মাৎ নেহেরুর নেতৃত্বে ভারত সরকার কার্যত যুদ্ধবিরতি করে কাশ্মীর-বিরোধ শান্তির জন্য রাষ্ট্র সঙ্ঘে প্রেরণ করতেন। নেহেরুর দ্বিধাবিভক্ত মানসিকতা সেদিন চূড়ান্তভাবে কাশ্মীরের ভারতভুক্তির পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। এবং সেই থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে কাশ্মীর সমস্যা ঈদ-মার্কিন গোষ্ঠি অধীমাংসিত রেখে দিয়েছে। উপমহাদেশীয়রা কাশ্মীর আক্রমণ করেছে, এই অভিযো

গোড়ায় পাকিস্তান গ্রহণ করলেও শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিল তাদেরই নিয়ন্ত্রিত সেনাবাহিনী কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। এই স্বীকৃতির পর কাশ্মীর সমস্যা সৃষ্টিতে পাকিস্তানের দায়িত্ব চূড়ান্ত ভাবে নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাশ্মীর বিতর্কে নেহেরু সেদিন প্লেবিসাইট বা গণভোটের নীতি স্বীকার করে বসেন। ফলে রাষ্ট্র সঙ্ঘে পাকিস্তানের আক্রমণকারীর ভূমিকা গৌণ হয়ে গণভোটের প্রশ্নটি মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। অবশ্য গণভোট গ্রহণের পূর্বসর্ত ছিল, কাশ্মীর এলাকা থেকে সকল পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর স্বরিৎ অপসারণ, যে পূর্বসর্ত পাকিস্তান কোন দিনই আদৌ পরিপূরণ না করার ফলে নেহেরু-স্বীকৃত গণভোটের প্রতিশ্রুতিও অবান্তর হয়ে গেছে। কিন্তু, গণভোটের দাবিতার মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার উত্তাপ সৃষ্টিতে একদিকে যেমন প্রবলভাবে কাশ্মীরে সহায়ক হয়ে কাশ্মীরের রাজনীতিতে পাকিস্তানী পাপচক্রের স্থায়ী আবর্ত সৃষ্টি করেছে, তেমনি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে ভারতের স্নায়ুকেন্দ্রে বৈষম্যমূলক চাপ সৃষ্টির সুযোগ ঈজ-মার্কিণ গোষ্ঠির হাতে তুলে দিয়েছে। তাই, রাষ্ট্র সঙ্ঘে দেখা গেছে একমাত্র সোভিয়েট গোষ্ঠিই কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে বার বার স্বীকৃতি দিলেও, ঈজ-মার্কিণ প্রভাবে অন্যান্য প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্রই ভারতের বিরুদ্ধ শিবির অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্মীরে কয়েকটি সাধারণ নির্বাচন হয়ে গেছে এবং নির্বাচিত গণপরিষদ কাশ্মীরের ভারতভুক্তি চূড়ান্ত বলে ঘোষণা করেছে, তবুও ভারতীয় সংবিধানে ৩৭০ ধারা জুড়ে দিয়ে কোনো কোনো বিষয়ে কাশ্মীরকে পার্লামেন্টের এক্তিয়ার বহির্ভূত রেখে কাশ্মীরকে শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যে-ভাবে এই আঠার বছর বিশেষিত করে রাখা হয়েছিল, তার দরুণ দিল্লীও কাশ্মীর সম্বন্ধে ভারত সরকারের একটি অনিশ্চিত মানসিকতা প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে। সম্প্রতি সংবিধানের ৩৭০ ধারার বিলোপ করে কাশ্মীরের পরিপূর্ণ ভারতভুক্তির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে পাকিস্তানী প্রচারের প্রতিক্রিয়া আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও প্রসারিত হয়ে কাশ্মীর সমস্যার দ্বারা ভারতবর্ষের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন তাদেরও প্রভাবিত করেছে। পাকিস্তানের সাম্প্রতিক কাশ্মীর আক্রমণের পশ্চাতে এই মানসিকতা একদিকে যেমন পাকিস্তানীদের প্রবলভাবে উত্তেজিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে, অপরপক্ষে ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায়ও এই প্রচারের অনুকূলে সহৃদয় সমর্থন আকর্ষণ করেছে।

চীনা আক্রমণ : কাশ্মীর সঙ্কটের নবায়ন

চীনা আক্রমণের পর ভারতবর্ষকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের ব্যাপক সামরিক সাহায্যদান কাশ্মীর-সমস্যা মীমাংসা সাপেক্ষ, প্রচ্ছন্নভাবে তারা এই শর্ত আরোপ করে, ভারতের উপর কূটনৈতিক চাপ দেবার চেষ্টা করে। এই প্রসঙ্গে তৎকালীন বৃটিশ সরকারের কমনওয়েলথ সচিব ডানকান স্যান্ডিস ও যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী পররাষ্ট্র সচিব আভেরিল হ্যারিম্যান-এর নাম উল্লেখ্য। সেদিন পাকিস্তান তার সুহৃদ বৃটেন ও আমেরিকার কাছে আবার জানিয়েছিল যে চীনা-আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য পশ্চিমী সামরিক সাহায্য পুষ্ট ভারতবর্ষ পাকিস্তানের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে উঠবে। এই ওজরের প্রভাবেই এই দুই পশ্চিমী কূটনীতিবিদ নির্লজ্জভাবে ভারতবর্ষকে জানিয়েছিলেন যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, বিশেষত কাশ্মীর এলাকায়, ভারতীয় সেনাবাহিনীর ব্যাপক সমাবেশ ইংলণ্ড ও আমেরিকার জনসাধারণের পক্ষে ভারতবর্ষকে স্বাচ্ছন্দ্যে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতিদানের পক্ষে প্রতিবন্ধক হবে। অতএব, ভারতবর্ষের দায়িত্ব রয়েছে পাকিস্তানের সঙ্গে বৈরিতা ও বৈপরীত্য মেটাবার জন্য আর একবার উদ্যোগী হওয়া।

পাক-চীন চুক্তি : সঙ্কটের পরিপূর্ণতা

এই সমাবেশের যে সঙ্কটকালে কূটনৈতিক চাপ দিয়ে

পাকিস্তানের ভারত-বিদ্বেষ বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল, যে সময় কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্য 'ইউনাইটেড নেশনস কমিশন ফর ইণ্ডিয়া এণ্ড পাকিস্তানের' সর্তাবলীতে পাকিস্তানের দাবিদাওয়ার শেষ চেষ্টার অনিবার্যতা ছিল, ভারতবর্ষের সেই দুর্দিনে সামরিক সাহায্যের পূর্বসর্ত হিসাবে ভারতবর্ষের ওপরই চাপ দিতে পশ্চিমীরা কুণ্ঠা বোধ করলো না। এ-সময় কাশ্মীর বিভাগের প্রস্তাবের কাণাঘুষাও শোনা গেছে। এই চাপের ফলেই সর্দার স্বরণ সিং ও ভুট্টোর মধ্যে ১৯৬৩সালের জানুয়ারী থেকে যে মাসের মধ্যে ছয় দফা নিষ্ফল আলোচনা হল, দিল্লী, কলকাতা, করাচীতে। ইতিমধ্যে পাকিস্তান ও চীনের মিতালী ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠে এই পর্যায়ের শেষ আলোচনা চলাকালীনই চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তি সম্পাদনের কথা ঘোষিত হলে, স্বভাবতই এই আলোচনার ছেদ পড়ে। এই চুক্তি অনুযায়ী কাশ্মীরের ১৩,০০০ বর্গমাইল বে-দখল করা ভারতীয় জমি পাকিস্তান অনায়াসে চীনকে খয়রাত করে ভারতবর্ষের নিরাপত্তাকে বিপন্ন করে তুলল। এ-সময় লণ্ডন থেকে এমনও সংবাদ প্রচারিত হয়েছিল যে চীন-পাকিস্তান চুক্তির গোপন এক শর্তবলে পাকিস্তান ও চীন ঐ বছর যে মাসে একযোগে ভারত আক্রমণ করবে।

পাক-চীন চুক্তি সম্পাদনের পর পাকিস্তানের উত্তর অঞ্চলে চীনের বেসামরিক ও সামরিক তৎপরতা দ্রুতবেগে বৃদ্ধি পেয়েছে, পশ্চিমী রাইপোষ্টির সে-কথা অজানা নেই। এই আঁতাতের আশু সামরিক লক্ষ্য যে ভারতবর্ষ সে কথাও স্পষ্ট হয়ে গেছে। কাশ্মীরে আলজিরিয়ার অনুকরণে গেরিলা যুদ্ধের পাকিস্তানী হুমকি ও ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে Master Plan-এর পাকিস্তানী উদ্বেগের পশ্চাতে চীনা-হুতের সঙ্কেত পূর্বেই বোঝা গিয়েছিল। কাশ্মীর আক্রমণের সমসাময়িক-কালে চীনের পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন ঈর করাচীতে উপস্থিতি, চীন ও চীন-সুহৃদ ইন্দোনেশিয়ার ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি, পাক-চীনের সামরিক সহযোগিতার স্বার্থহীন পরিচালক। চীন-ভারত সংঘাতের সুযোগ নিয়ে সেখবারের মত পাকিস্তান কাশ্মীর দখলে উদ্যোগী হবে, না হয় চীনের সমর্থনে সরাসরি আক্রমণ করে কাশ্মীর ছিনিয়ে নেবে অথবা পাক-চীনের সমবেত আক্রমণের মুখে পাকিস্তান কাশ্মীর করায়ত্ত করবে, এই বিকল্প কৌশলগুলিকে সামনে রেখেই পাকিস্তানের চীনমুখীনতা। ভারত-বিরোধিতার জন্য এবং পশ্চিম শক্তিবর্গের আওতা থেকে পাকিস্তানকে সরিয়ে পাকিস্তানের ভৌগলিক-রাজনীতির সুযোগ নিয়ে নিজ সম্প্রসারণের জন্যও পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের মৈত্রী বন্ধনের প্রয়োজন ছিল। জন্মলগ্ন থেকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সাহায্যপুষ্ট ও অনুপ্রাণিত হয়েও ভারত-বিদ্বেষ এবং কাশ্মীর দখলের দুর্বার লোভে চীনের ফাঁদে পাকিস্তান ধরা দিয়েছে। পাকিস্তান সেদিন ভুলে গিয়েছিল যে চীনের রাজনীতি সামরিক নীতির দ্বারা পরিচালিত, তার সামরিক নীতি রাজনীতিদ্বারা পরিচালিত নয়। সুতরাং তার সামরিক নীতির প্রয়োগে যদি ভারতবর্ষ পর্যুদস্ত হয়, এই উপমহাদেশের পাকিস্তানী অংশও রক্ষা পাবে না। সেদিন রাজনৈতিক দূরদর্শিতার এই বিপরীতমুখী দিকটি পাকিস্তান আদৌ নেয়নি। চীনের ইশারায় কাশ্মীর আক্রমণ করে পাকিস্তানের জঙ্গীবাদী নেতৃত্ব রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অন্তিম পর্যায়ে পৌঁচেছে কি না ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণের মধ্য দিয়ে তার হিসাব-নিকাশ শুরু হয়ে গেছে।

কাশ্মীর আক্রমণে : আমেরিকা, বৃটেন, সোভিয়েট রুশ

অবশ্য কাশ্মীরের পশ্চিমী মুরুব্বীরা কি মনোভাব গ্রহণ করবেন চীন-পাকিস্তান সমঝোতার পটভূমিকায় কাশ্মীর আক্রমণ সম্পর্কে, তার ওপর পাকিস্তানী জঙ্গীবাদী নেতৃত্বের ভবিষ্যৎ পরিণতি অবশ্যই বহুলাংশে নির্ভর করবে। কম্যুনিষ্ট চীনের সম্প্রসারণ প্রতিরোধের জন্য ১৯৫৪ সাল থেকে মার্কিন

সরকার পাকিস্তানকে যে অকৃপণ সামরিক সাহায্য দিয়ে এসেছে, সেই সামরিক শস্ত্রসম্ভারই চীনের ইসারায় পাকিস্তান ভারতবর্ষের বিরুদ্ধে বেপরোয়া প্রয়োগ করে মার্কিণী মহলে বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। কচ্ছের রণে এ-বছর এপ্রিল মাসে পাকিস্তানের মার্কিণী শস্ত্র-ব্যবহারের তর্কাতীত প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও মার্কিণী মহল এ-বিষয়ে নীরব থেকে পাকিস্তানদেরই সহায়তা করেছিল। পাকিস্তানে মার্কিণী শস্ত্রসম্ভার সম্পর্কে তৎকালীন মার্কিণী প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার ভারতবর্ষকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এই অস্ত্রসম্ভার কোনো ক্রমেই ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে দেওয়া হবে না; কচ্ছ আক্রমণের সময় এই প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়ে দেওয়া সত্ত্বেও কোনো ফল হয় নাই। এবার মনে হয় মার্কিণীরা অপেক্ষাকৃত তৎপর। তাছাড়া, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে সীমাংসার প্রচেষ্টা ব্যতীত মধ্যস্থতার জন্য কোনো প্রচেষ্টা মার্কিণী পক্ষ থেকে নাই। আর একটি বিষয়েও কচ্ছ আক্রমণের সময়ের মার্কিণী নীতির ব্যতিক্রম দেখা যায়। সে-সময় ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষামূলক সামরিক ব্যবস্থা রূপে অন্তত রণাঙ্গন খোলার সম্ভাবনায় মার্কিণী কর্তৃপক্ষ ভারতবর্ষকে এই বলে শাসিয়েছিল যে সে-অবস্থায় মার্কিণী-শক্তি পাকিস্তানের সহায়তা করতে এগিয়ে আসবে। এবার ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানে একাধিক প্রতিরক্ষামূলক রণাঙ্গন খোলা সত্ত্বেও মার্কিণী-শক্তি নীরব। মৈনতা সন্ধতির লক্ষণ কি না ভাববার বিষয়। কারণ, গত কয়েকমাস যাবৎ পাকিস্তান, মার্কিণ-সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটেছে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে সমগ্র পাকিস্তানে প্রবল মার্কিণ-বিরোধী বিক্ষোভ উদ্বেল হয়ে উঠেছিল, পাকিস্তানকে মার্কিণী অধিক সাহায্য আলোচনা পিছিয়ে দেবার জন্য। ভিয়েৎনামে মার্কিণ নীতির কঠোর সমালোচনা করে, সিয়াটোর বৈঠক বর্জন করে এবং পিকিংমুখীন ঝোঁক দুর্বার করে পাকিস্তান মার্কিণ স্বার্থের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। সুতরাং, আমেরিকা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মাধ্যমে যুদ্ধবিরতির প্রচেষ্টার বাইরে এই বিরোধ-মীমাংসার অন্য কোনো পন্থা অবলম্বন করে নাই। এই বিরোধের সূচনাতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের সেক্রেটারী জেনারেল উ থান্টের সঙ্গে মার্কিণী সরকারও একমত যে পাকিস্তানী অনুপ্রবেশকারী হানাদারেরাই কাশ্মীর-সঙ্কটের জন্য দায়ী।

কিন্তু বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন, পাকিস্তান ও ভারতবর্ষের ভূমিকা তুলামূল্য জ্ঞান করে আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে একই পর্যায়ভুক্ত করে, কার্যতঃ পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাছাড়া, গত ৯ই সেপ্টেম্বরে লাহোর সীমান্তে ভারতীয় প্রতিরক্ষামূলক রণাঙ্গনকে পাকিস্তানের উপর আক্রমণরূপে চিহ্নিত করে ভারতবর্ষের বিপন্ন জাতীয়তা-বোধকে অবমানিত করেছেন। বৃটিশ সরকারের উৎকট পাকিস্তানপ্রীতির অন্যতম পরিচয় রয়ে গেলো উভয়পক্ষের নিকট উইলসনের যুদ্ধ বিরতি আবেদনের আড়ালে।

সোভিয়েট মনোভাব অবশ্য ভারতবর্ষের প্রতি সহানুভূতিশীল। কাশ্মীর ভারতবর্ষেরই অবিচ্ছিন্ন অংশ, সোভিয়েট এই প্রস্তাবে অবিচল থেকে যুদ্ধবিরতি কামনা করেছেন।

কাশ্মীরে ভারতের লক্ষ্য কি? পরিণতি কোথায়?

প্রশ্ন উঠেছে এই যুদ্ধের পরিণতি কোথায়? এই যুদ্ধে ভারতের লক্ষ্য কি? যুদ্ধবিরতির পূর্বশর্তগুলিই বা কি? কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এ-কথা বারবার ঘোষিত হয়েছে। সুতরাং পাক-অধিকৃত কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্ত হবে এই নিয়তম লক্ষ্যে পৌঁছানোর আবশ্যিকতার কোনো বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু এই নিয়তম লক্ষ্যে পৌঁছালেই কি কাশ্মীর সঙ্কটের স্থায়ী উত্তরণ হবে? আজ অস্ত্র-সংবাতের পরিপ্রেক্ষিতে সেই মূল্যায়নের প্রয়োজন রয়েছে। অন্যথায় চূড়ান্ত লক্ষ্য

নির্ধারণ আজকের বাইরে থেকে অদূর ভবিষ্যতেই নূতন সঙ্কট সৃষ্টি করবে।

দেশ বিভাগ : জাতীয় আদর্শের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা

কংগ্রেস ও মুসলীম লীগের সম্মতির উপর দেশ বিভাগের পরোয়ানা জারী করে সেদিন সাম্রাজ্যবাদী সরকার দ্বিজাতি তত্ত্বকেই কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছিল, আইনত না হলেও। কংগ্রেসও সাম্প্রদায়িকতার স্পর্শকাতরতা এড়িয়ে যাবার অছিলায় মূলত ভারত-বিভাগের বনিয়াদে সাম্প্রদায়িকতাকেই ঠাঁই দিয়ে জাতীয়তার আদর্শের প্রতি গুরুতর বিশ্বাসঘাতকতার দায়ে উত্তরকালের কাছে চিহ্নিত হয়ে রইলো। সেই অভিশাপের প্রথম অভিব্যক্তি হয়েছিল প্রায় দশ লক্ষ নরনারী শিশু হত্যাহতের মধ্য দিয়ে, অগণিত ধর্ষিতা নারীর আর্তনাদে, লক্ষ লক্ষ নারীর অপহরণ, অবরোধ ও বলপূর্বক ধর্মান্তরে। পশ্চিম পাকিস্তান প্রায় সংখ্যালঘুশূন্য হয়ে যাবার পর কিস্তিতে কিস্তিতে লাঞ্ছিত, অপমানিত, অত্যাচারিত পূর্ব পাকিস্তানের সংখ্যালঘুরা বাস্তুচ্যুত হয়ে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, ত্রিপুরা ও ভারতবর্ষের অন্যত্র উদ্বাস্তুর অভিশপ্ত জীবন নিয়ে দেশ বিভাগের অভিশাপের মাশুল দিয়ে চলেছে। সংখ্যালঘু উৎসাদনে এই কালান্তিক অভিযানে পাকিস্তানী কর্তৃপক্ষের হাতে কাশ্মীর সমস্যা উত্তাল সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টিতে একটি প্রয়োগিক হাতিয়ার হয়ে রয়েছে। গত আঠার বছর এই হাতিয়ারের পৌনঃপুনিক প্রয়োগে পাকিস্তানে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িক আবর্ত সীমান্তের অপর পারে ভারতবর্ষে সঞ্চারিত হয়ে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। সুতরাং কাশ্মীরের দুষ্টচক্রের অবলুপ্তিতেই ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদ, গণতন্ত্র ও সমাজতান্ত্রিক আদর্শের পূর্ণায়ন সম্ভব। অপরপক্ষে, কাশ্মীর সমস্যাকে অবলম্বন করেই ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যুদ্ধের সজ্জা, এবং আভ্যন্তরীণ সংখ্যালঘু নির্যাতন। ভারতবর্ষের পক্ষ থেকে ১৯৪৯ সালের পর থেকে 'no war' চুক্তি পুনঃপুনঃ উত্থাপন করে শ্রীনেহেরু হয়তো দেশ বিভাগের বিষেক-দংশনকে প্রশমিত করতে চেয়েছিলেন কিন্তু পাকিস্তান বার বারই এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সে সুযোগ থেকে তাঁকে বঞ্চিত করেছে। এছাড়া, সংখ্যালঘুদের সম্পর্কে ১৯৫০-এর নেহেরু-লিয়াকত চুক্তি, সীমান্ত বিরোধ সম্পর্কে ১৯৫৮ সালের নেহেরু-নুন চুক্তি, উদ্বাস্তু সম্পত্তির চুক্তি কিম্বা থালের জলের চুক্তি দেশ বিভাগজনিত অপরাধ বিষেককে দীর্ঘকালের জন্য শান্তি দিতে পারে নাই। বার বারই সংঘাতের পুনরাবির্ভাব হয়েছে। কারণ সংঘাতের প্রথম এবং অন্তিম সূচীমুখ কাশ্মীরসমস্যা অমীমাংসিতই রয়ে গেছে —যে সমস্যারও গভীরে দ্বিজাতিতত্ত্বের ও ধর্মীয় রাষ্ট্রাদর্শের মানসিকতা দৃঢ়মূল হয়ে প্রথিত রয়েছে।

শেখ আবদুল্লার রাজনীতি : সঙ্কটের সঙ্কোচন

নেহেরু ভেবেছিলেন শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে এ-সমস্যার সমাধান হবে। তাই ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত কাশ্মীরে আবদুল্লা নিরঙ্কুশ ক্ষমতায় আসীন ছিলেন। কিন্তু রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে বিদেশ থেকে ফিরে আসার পর আবদুল্লার রাজনৈতিক মানসিকতায় সার্বভৌম কাশ্মীরের উগ্র কল্পনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার পর, আবদুল্লার ভারতবর্ষের প্রতি আনুগত্য বৈরিতার বৈপরীত্যে দ্রুত চিহ্নিত হলে, আবদুল্লার স্থান কারাগারে নির্দিষ্ট করতে নেহেরু সরকার বাধ্য হলেন। কিন্তু এগার বছর রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধে অভিযুক্ত হয়ে, যখন নেহেরু সরকার সেই অভিযোগ প্রত্যাহার করে আবদুল্লাকে মুক্তি দিলেন, সেদিন আবদুল্লা অপ্রতিরোধ্য হয়ে উঠলো। আবদুল্লা এবার কাশ্মীরের পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্তি এবং সার্বভৌম কাশ্মীর—এই দুই সমাধানই সুযোগ-সুবিধাবাদ অস্বীকার করে নেহেরু-নীতির অনিশ্চিত ভারতভুক্তির দুর্বল অবস্থানে কাশ্মীরের ভিত্তিমূলকে আরও

দুর্বল করে তুললো। ফলে কাশ্মীর সঙ্কট আরও ঘনীভূত হল, গ্রেবিসিটের ঘাণী সরব হল, সাম্প্রদায়িকতাও দুর্বার হয়ে উঠলো। এই ঘনীভূত সঙ্কটের পশ্চাতে আয়ুব সরকারের বেপরোয়া ইশারা ও সহযোগিতার সন্ধান ভারত-সরকারের অজ্ঞাত রইলো না। আবদুল্লার পুনরায় কারাবাস ও নির্বাসন তাকে নিরস্ত করলো বটে কিন্তু সঙ্কটের যে গতিবেগ আবদুল্লা কাশ্মীরে সঞ্চারিত করে গেল তা রূপ পেল ছানাদারদের দীর্ঘকালব্যাপী অনুপ্রবেশের মধ্য দিয়ে। কারণ, একথা স্বীকৃত হয়েছে যে যে মাস থেকেই ছানাদারেরা কাশ্মীরে অনুপ্রবেশ করে অস্ত্রশস্ত্রের গোপন ঘাঁটি তৈরী করে রেখেছে।

হজরতবাল ঘটনা

১৯৬০এর শেষে কাশ্মীরে হজরতবাল ঘটনা কাশ্মীর-সঙ্কটকে ঘনীভূতীকরণে পাকিস্তান পরিপূর্ণরূপে ব্যবহার করেছে। ১৯৬৪ সালের জানুয়ারীতে পূর্ববঙ্গের সংখ্যালঘুদের আর একদফা বর্বরোচিত নির্যাতনের মধ্য দিয়ে কাশ্মীর সঙ্কটের দীর্ঘায়িত ছায়া আর একবার প্রতিফলিত হয়েছিল যার প্রতিক্রিয়া থেকে ভারতবর্ষও ফলমুক্ত থাকতে পারে নাই।

জঙ্গীবাদ এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের বা ধর্মীয় রাষ্ট্রাদর্শের বিলোপ : গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের বিকল্প অঙ্গীকার

সুতরাং চীন-পাকিস্তান চক্রের সবর বিস্তৃত কাশ্মীর আক্রমণের মধ্য দিয়ে পাক-ভারত সঙ্কটের সর্বোত্তম ও সর্বশেষ ফটক অপসারণে দেশ-বিভাগের এই অন্তিম পরিচ্ছেদটি রচিত হয়েছে। এই আক্রমণের জয়-পরাজয়ের উপর নির্ভর করবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্বের বা ধর্মীয় রাষ্ট্রাদর্শের মানসিকতার প্রসার ও স্থায়িত্ব কিম্বা গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। এই নিরিখেই ভারতীয় সেনাবাহিনীর পাকিস্তানের অভ্যন্তরে প্রতিরক্ষামূলক অভিযান বিচার করতে হবে। আঠার বছরের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বোঝা গেছে নিঃসর্ত যুদ্ধবিরতি, সঙ্কটের দিনগুলিকে দীর্ঘায়িত করে, সঙ্কটকে ঘনীভূত করে এবং সেই কারণে গণতন্ত্রের ও জাতীয়তাবাদের সুতরাং সমাজবাদের শ্মশান-শয্যা রচনার দিনগুলি এগিয়ে দেয়। তাছাড়া রাষ্ট্রশক্তিই হোক কিংবা অন্য যে কোনো রাষ্ট্রশক্তিই হোক না কেন, তাদের বুঝতে হবে, আক্রমণকারী ও আক্রান্তকে তুল্যমূল্য করে বিচারের দিন ভারতের নিকট অবসিত হয়েছে। যুদ্ধের জন্যও যেমন যুদ্ধ নয়, নিছক যুদ্ধবিরতির জন্যেই যুদ্ধবিরতিও অর্থহীন। যুদ্ধবিরতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্থহীন হতে হবে। কারণ বার বার যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘনে এই আঠার বছরে পাকিস্তানের বিরতি ছিল না, যদিও এবারকার যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘনের প্রকৃতি ও পরিমাণ স্বতন্ত্র। আয়ুব সরকারের জঙ্গীনীতি এবং দ্বিজাতিতত্ত্বের বা ধর্মীয় রাষ্ট্রাদর্শের মানসিকতার অবসানের মধ্যে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের জনমানসের গণতান্ত্রিক, জাতীয়তাবাদী ও সমাজতান্ত্রিক অভিব্যক্তির প্রতিশ্রুতি নিহিত রয়েছে। ভারতীয় প্রতিরক্ষা অভিযান সেই প্রতিশ্রুতির রূপায়ন ত্বরান্বিত করবে—এই নিশ্চিত বিশ্বাসে ভারতীয় জোয়ানদের প্রতি প্রতিটি ভারতবাসীর মরণপণ শুভকামনা প্রসারিত হয়ে আছে; হয়তো পাকিস্তানবাসী প্রতিটি গণতান্ত্রিক মানুষেরও সাম্প্রদায়িকতা এবং জঙ্গীবাদের প্রতি অকুণ্ঠ ধিক্কার ক্রমশ সোচ্চার হয়ে উঠছে। পূর্ব পাকিস্তানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় সংগ্রাম এবং পাথরুনদের বিদ্রোহ তারই ইঙ্গিত।

কাশ্মীরে পাকিস্তানী আক্রমণ শেষবারের মত যুদ্ধবিরতি সীমারেখা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিয়েছে, তাদের প্যাটন ট্যাঙ্কের তলায় গ্রেবিসিটের আর্তনাদও শেষবারের মত নিস্তব্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং, এই দুই প্রশ্নের পুনরুত্থানের আর কোনো অবকাশ নাই। ভারতবর্ষের সংগ্রাম যেমন পাকিস্তানের সাধারণ

মানুষের বিরুদ্ধে নয়, তেমনি নয় পাকিস্তানের দুঃখ ও দখলের জন্য। সুতরাং পররাজ্যলোলুপতার অভিযোগ যতই চীন কিম্বা পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ভারতবর্ষের উপর বর্ষিত হউক না কেন, সে-অভিযোগ ভারতবর্ষকে আদৌ স্পর্শ করবে না। শান্তিকামী ভারতবর্ষ, জাতীয় মর্যাদার বিনিময়ে মিথ্যা শান্তির যে ভ্রান্তিকে এতোদিন প্রশ্রয় দিয়ে জাতীয় কল্যাণের পথে কলুষ-কালিমা লেপন করে রেখেছিল, এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে সৌর্যে, বীর্যে, রক্তদানে ও আত্মদানে ভারতীয় জোয়ানেরা কাশ্মীরের ও পাকিস্তানের বিভিন্ন রণাঙ্গনে সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করে নিঃসন্দেহে আজ ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কের নবায়নের ভিত্তিভূমি রচনা করছে। পাকিস্তানের জঙ্গীবাদী ধর্মীয় রাষ্ট্রের ভিত্তিমূল ও সাম্প্রদায়িক আবেদনের কলুষ-কর্জর রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তে গণতান্ত্রিক, মানবিক ও জাতীয়তাবাদের আবেদনের উপর রাষ্ট্রীয় আদর্শ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে ভারতীয় জোয়ানদের জয় অনিবার্য হয়ে উঠলেই ভারতীয় উপমহাদেশে শান্তি ফিরে আসবে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্বতোৎসারিত হয়ে মানুষে-মানুষে সম্পর্কের মৈত্রীবন্ধন সহজ হবে, প্রতিবেশী রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে মৌলিক সম্পর্কের পরিবর্তন সাধিত হয়ে সংহতি ও উন্নয়নের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা উদ্বেলিত হয়ে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় নিঃসন্দেহে নূতন ভারসাম্য রচনা করবে। পাক-ভারত সংঘাতের সম্ভাবনাময় এই পরিণতি অপ্রতিরোধ্য হবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর জয়ে। শান্তির জন্য, সম্প্রীতির জন্য, গণতন্ত্রের জন্য, জাতীয়তার আদর্শকে অনির্বাণ রাখবার জন্য ভারতবর্ষের প্রতিটি মানুষ আজ সংহতশক্তি নিয়ে ও সর্বস্বপণ করে জোয়ানদের জয়কে সুনিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুত।

তবুও আর একটি প্রশ্ন থেকে যায়; এই যুদ্ধে পাক-চীন চুক্তির গোপন সূত্র অনুযায়ী চীনের সাহায্য পাকিস্তানের দিকে প্রসারিত হবে কিনা পাক-চীন সংঘাতে চীন ভারতবর্ষকে আক্রমণকারীরূপে চিহ্নিত করে পাকিস্তানকে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দুষ্ট এলাকায় চীনাভূমিতে ভারতীয় সেনাবাহিনীর অনুপ্রবেশের মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করে ইতিমধ্যে ভারত-সীমান্তে সামরিক উদ্যোগের ভূমিকাও চীন তৈরী করে রেখেছে। সুতরাং নিষ্ক্রিয় আস্ফালনেই চীনের সহায়তা সীমাবদ্ধ থাকবে এ-অনুমান ভুল হবে। সেক্ষেত্রে স্বতঃসিদ্ধভাবে বলা যায় আমেরিকা নীরব থাকবে না। সে সময় বৃটেন কি করবে? সোভিয়েট রুশ কি করবে? বর্তমানে এ-সবই তাত্ত্বিক প্রশ্নের ভূমিকায় বিন্যস্ত থাকলেও পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই আনুষঙ্গিক সমস্যাগুলির গুরুত্ব ক্ষিপ্র হবে, কাশ্মীর সমস্যা আন্তর্জাতিক সমস্যায় পরিণত হবে কিনা। এই প্রশ্নের নিঃসন্দেহ উত্তর ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত রয়েছে।

১ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫

জিও-পলিটিক্সের দৃষ্টিকোণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি

নীরেন সেন

জিওপলিটিক্স ও রাষ্ট্রনায়ক

কূটকৌশল রাষ্ট্রনায়কত্বের নামান্তর মাত্র। জার্মানদের প্রথম মহাযুদ্ধে পরাজয়ের কারণ কূটকৌশলে একটা সুষ্ঠু পরিকল্পনার অভাব। তারা এই যুদ্ধে তাদের সামরিক উৎপরতার সকল খুঁটিনাটি সম্বন্ধে ছকে রেখেছিলো। ফ্রান্সকে আক্রমণ করার জন্যে ছিলো তাদের Schlieffer Plan, আর রাশিয়ার সৈন্যকে কোথায় এবং কিরূপে পরাজিত করতে হবে তার পরিকল্পনা করেছিলেন সেনাপতি হিন্দেনবার্গ। কিন্তু বিশ্বরাজনীতির ক্ষেত্রে তাদের কোনও যথার্থ উদ্দেশ্যগত উপলব্ধি ছিলোনা। সেই জন্যে পরবর্তী যুদ্ধের আয়োজনের সময় জার্মানদের প্রথম চিন্তা হলো এক সুষ্ঠু কূটকৌশলের রূপায়ন। এই বিশ্বব্যাপী কূটকৌশলের পরিকল্পনাই হলো জিওপলিটিক্স্। পাঞ্জার বাহিনী, ডাইভ বোমারু, রণকৌশলে দীক্ষিত সৈন্যবল ও প্রচারযন্ত্র উত্তর যুগিয়েছিলো। "কি করে জিত্‌তে হবে?" এই প্রশ্নের। কিন্তু জিওপলিটিক্স্ হলো সেই বিশেষ পরিকল্পনা যা কোন্ কোন্ জায়গা জিত্‌তে হবে এবং কেন জিত্‌তে হবে তার সমাধান করে রণকৌশলীকে বিজয়ে সহজতম পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। হিট্‌লারের বিশ্বজয়ের চাবিকাঠি হলো জিওপলিটিক্স্।

জার্মানদের মতো কম্যুনিষ্ট চীন, আমেরিকা, রাশিয়া এবং যুক্তরাজ্য রাষ্ট্রনায়কের শিল্পকলাকে সুসংবদ্ধ করে তুলতে ও রাজনৈতিক কার্যকলাপের এক সুবিন্যস্তিত প্রণালী প্রণয়ন করতে চেষ্টা করছে। এই কারণে উপরোক্ত সব কটি দেশেরই জিওপলিটিক্স্ সম্বন্ধে নিজস্ব মতামত আছে। বলা যেতে পারে বৃহৎশক্তিগুলির পক্ষে জিওপলিটিক্স্ হলো বিশ্বজয়ের খসড়া।

প্রসারবাদ কেন?

জিওপলিটিক্স্ প্রসারবাদের মূলে যে সকল শক্তি (force) রয়েছে তাদের নিরূপন ও সংঘতি সাধনের এক বিশ্লেষাত্মক প্রচেষ্টা। উনিশ শতকে ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে বৈদেশিক নীতি আবর্তমান ছিলো শক্তিগুলির মধ্যে ঐক্য (concert of powers) ও শক্তিগুলির ভারসাম্য (balance of power) এই দুই ধারনাকে ঘিরে। ধারনাদ্বয়ের উৎসে ছিলো দুই বিশ্বাস যে আভ্যন্তরীণ নীতি ও আন্তর্জাতিক অবস্থার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান সম্ভব এবং সেইটাই হওয়া উচিত। বৃহৎশক্তিগুলো এখনও বিবাদবিসম্বাদ মেটাতে তাঁর আলোচনা ও আপোষের মাধ্যমে। আজও কূটনীতিকে দেখা হয় ন্যূনতম যুদ্ধের ঝুঁকিতে রাজনৈতিক সুবিধা পাওয়ার পন্থা হিসেবে। সত্যই উনিশ শতকে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিলো। কিন্তু শক্তিগুলোর ঐকাবদ্ধ প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়ভাবে এই যুদ্ধগুলোকে কয়েকটি এলাকায় সীমাবদ্ধ রেখেছিলো। এই সম্ভবেত সদ্ভাবতা মোটের ওপর ফলপ্রসূ হয়েছিলো তার কারণ, (১) শক্তিভিত্তিক রাজনীতিতে (power-politics) কোনও মতবাদের সমর্থন প্রয়োজন বলে বিবেচিত হতো না; (২) এই শক্তিগোষ্ঠীর ঐক্য সব সময়েই তাহাদের ঔপনিবেশিক অভিসন্ধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতো।

---

* কূটকৌশল—Political strategy

নবপর্যায়

এই প্রচলিত ব্যবস্থা থেকে একটা মৌলিক বিচ্যুতি ঘটালো জিও-পলিটিক্স্। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অস্থিরতাকে জিওপলিটিক্স্ মূলসূত্র হিসেবে ধরে। দেশগুলোকে এক একটি সমষ্টিগত (collective) জীব বলে মনে করা হয়—তারা হয় বর্ধিষ্ণু নয়তো ক্ষয়িষ্ণু হবে, হয় তাদের উত্থান নয় তো পতন হবে, কিন্তু কখনই তারা এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকবে না। সাধারণ ব্যাখ্যানুযায়ী জিওপলিটিক্স্ উনিশ শতকের শক্তিভিত্তিক রাজনীতি বা রিয়েল পলিটিকের (Real politik) ভগ্ন। কিন্তু যথার্থ ভাবে তা নয়।

জিওপলিটিক্স্ অনুযায়ী ইউরোপের বাইরের দেশগুলোর উত্থান, এশিয়ার মানুষের জাতীয়-জাগরণ, রাশিয়ার বিপ্লব ও প্রথম মহাযুদ্ধের সাথে সাথে পশ্চিম ইউরোপীয় সভ্যতার একাত্মক আধিপত্যের অবসান ঘটলো। বিশ্বজোড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার এক নতুন অধ্যায় সূচিত হলো। এই দ্বন্দ্বে দুর্বলের কোনও স্থান ছিলো না তাই শক্তিশালী দেশগুলোর নেতৃত্বে শক্তিগোষ্ঠীতে বিভক্ত এক নতুন জগতের উদয় হলো। ইউরোপের বিশ্বনেতৃত্বের যুগে মানুষ ধর্মীয়, সামাজিক ও অর্থনৈতিক যে সকল অতি-জাতীয় মূল্যবোধের আচ্ছাদনে বেঁচে ছিলো, পুরাতন বন্দোবস্ত ধূলিসাৎ হয়ে—আজও মানুষকে সেই আচ্ছাদন থেকে মুক্ত করতে ব্যাপৃত। জাতীয়তাবাদের আদর্শ তাই আমাদের শেষ আশ্রয়স্থল হলো এবং জাতিগত সার্বভৌমত্ব হলো বেঁচে থাকার একমাত্র সোনারকাঠি। জিওপলিটিক্সের চোখে এই জাতিগত বেঁচে থাকার দ্বন্দ্ব হলো জমির (space) পুনর্বণ্টনকে কেন্দ্র করে। কেন না বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে কেবলমাত্র অধিক জমির অধিকারী জাতিদেরই (আমেরিকা, রাশিয়া ও কানাডার মতো) বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা আছে। কোনও জাতি তার বৃদ্ধির সাথে সাথে আরো জমির প্রয়োজন অনুভব করে এবং ভবিষ্যত উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখে তাকে তার উত্তর-পুরুষের জন্যে—আরও জমি দখলের চেষ্টা করতে হবে। তাই জিওপলিটিক্সের মতে একটি রাষ্ট্রের ভূখণ্ড, সীমানা ও সীমান্ত প্রদেশ হলো শক্তির সাময়িক অবস্থার প্রকাশমাত্র। কোনও বিশেষ স্থিতাবস্থার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। অতএব একটিমাত্রই নিশ্চয়তা—সীমাহীন সংঘাত।

মানবসমাজের অর্থ ও প্রতিপত্তির দ্বন্দ্বে বিশ্বলোক নিতান্তই ভাগ্য, সাহস বা বুদ্ধিমত্তার জোরে একটু এগিয়ে থাকার সুবিধে পেয়ে আর সকলের চেয়ে অনেক উঁচুতে উঠেছে। তারা জনসংখ্যা বৃদ্ধি করে বা অন্য দেশে বসতি স্থাপন করে বৃহৎ শক্তি হয়ে উঠেছে। অতীতে সব সময়েই অবশেষে তারা সবাইকে গ্রাস করে নিজের নিজের এলাকায় সর্বোচ্চে উঠেছে।

শক্তি পিপাসা

যেখানেই একটু মৎস শিকারের সম্ভবনা আছে বৃহৎশক্তি ছিপ্ ফেলে ওৎপেতে বসেছে। একে তারা বলে নিজেদের স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখা। এইরকম বৃহৎশক্তি অনুপস্থিত এমন এক পৃথিবীর কথা কল্পনা করা খুবই সম্ভব এবং নিশ্চয়-ই সে পৃথিবী আমাদের কাম্য। যুদ্ধের শেষ আমরা কোনও দিনই দেখতে পাবো না যদি শক্তির ভারসাম্য রাখার পাগলামি না শেষ হয় কিংবা যদি না একটা রাষ্ট্র আর সকল রাষ্ট্রকে করায়ত্ত করে বিশ্বরাষ্ট্রের পত্তন করে। বিবর্তনের জিওপলিটিক্স্ তত্ত্বের নিঃসন্দেহে এই হলো যুক্তি সংগত শেষ পর্যায়।

দুর্বল রাষ্ট্রের ট্রাজেডি

দুর্বল রাষ্ট্রগুলোর আন্তর্জাতিক অবস্থার প্রধানসূত্র হলো যে তাদের প্রায় সকলেই দক্ষিণ ভূভাগে এবং তারা উত্তরের বৃহৎশক্তিগুলোর সাথে কোনও না কোনও উপায়ে সম্পর্ক রাখতে বাধ্য। হয় একটি দুর্বল রাষ্ট্র কোনও বৃহৎশক্তির

সাথে হাত মেলাবে নয়তো তাকে এক নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করতে হবে। দুর্বল রাষ্ট্র দুর্বলতর হয় যদি তারা তাদের বর্তমান ও ভবিষ্যত লড়াই করার ক্ষমতা (ভৌগলিক, অর্থনৈতিক জনতাত্ত্বিক তথ্যের বিশ্লেষণ করে) অনুমান করতে না পারে। এই ব্যর্থতাই আবার আন্তর্জাতিক অসমঞ্জস অবস্থা, ছোটোখাটো সীমাবদ্ধ যুদ্ধ, নিরপেক্ষ নীতি বর্জন ইত্যাদির কারণ। বর্তমানে নিরপেক্ষ দেশগুলোর কোনও একটি বিশ্বশক্তির শরণাপন্ন হওয়ার প্রবণতা বা অন্য কথায় বলতে গেলে নিজেদের লড়াই করবার ক্ষমতা বৃহৎশক্তির ক্ষমতার সাথে মিলিয়ে দেবার চেষ্টা উপরোক্ত কথারই প্রমাণ।

অনুন্নত দেশগুলোর সবচেয়ে পুরাতন ও সবচেয়ে নতুন সংস্কৃতি, নানারকমের পারিপার্শ্বিকতা ও বর্ণবৈষম্য তাদের ক্রমাগত জিনিসপত্র ও ভাবনার আদানপ্রদানে উৎসাহিত করবে। সুতরাং এই দেশগুলো ইউরোপীয় বা আমেরিকার কোনও দেশের মতো প্রভাবশালী না হলেও তাদের—আয়তন ও লোকবল ইউরোপের ও আমেরিকার নীতিতে—একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ নেবে।

ভারতের আশু প্রতিপত্তি

ভারতীয় শিক্ষার একটা প্রধান দুর্বলতা হলো অনুন্নত দেশগুলোর প্রয়োজনের দিকে নজরের অভাব। আমাদের ছাত্ররা সেক্সপীয়র পড়ে কিন্তু—কনফুসিয়স্ সম্বন্ধে কিছুই জানে না তারা ইউরোপের সম্বন্ধে যাও বা জানে (তাও নিতান্ত সীমিত), আফ্রিকা বা এশিয়া সম্বন্ধে সেটুকু জ্ঞানও তাদের নেই। যখন চীন আধুনিক পৃথিবীকে আবিষ্কার করলো তার পাঠ্যতালিকার ভীড়ের মধ্যেও সে নতুন, নতুন ভাষা ও নতুন ভূগোলশিক্ষার স্থান দিতে পেরেছিলো। পশ্চিমকেও এই ব্যবস্থা নিতে হয়েছে। অন্যদিকে আমরা ভারতে আমাদের বৈরী প্রতিবেশীর ভাষা ও ভূগোল শিক্ষা ছেড়ে দিয়েছি। ভারত কেন কোনও দেশই ভৌগলিক বাস্তবকে উপেক্ষা করে তার প্রতিপত্তির সীমা বাড়াতে পারেনি। এটা খুবই পরিষ্কার যে কূটনীতি ব্যর্থ হলে এবং যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হলে, একটা দেশ প্রয়োজন মতো লড়াই করতে প্রস্তুত থাকবে। কূটনীতির সাফল্যের জন্যে আমাদের একটা সামগ্রিক পরিকল্পনা ও গতিশীল নীতি প্রয়োজন এবং আবার তাদের প্রয়োজনেই আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে ভৌগলিক সূত্রের প্রয়োগ সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ পারদর্শী হতে হবে।

ভূগোল সম্বন্ধে অজ্ঞানতা যেমন ভীষণ মারাত্মক। আমাদের স্বাধীনতা পাওয়ার এক দশক পরেও আমরা ভারত বা তার প্রতিবেশী চীনা বা পাকিস্তানের যথাযথ সীমানা জানতাম না। সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের উপর সীমানার বিশেষত্বের প্রভাব আমরা অনুধাবন করিনি। যদিও আমরা দ্বিতীয় যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ যায়গার বিশেষ মহত্ব সম্বন্ধে সচেতন হয়েছিলাম তবুও আমরা সেগুলো জানবার জন্যে কোনও আগ্রহই দেখাইনি।

কি শান্তিতে কি যুদ্ধে গুরুত্বপূর্ণ যায়গা অন্তত: দশটি ভৌগলিক উপাদানের সম্ভাব্য সূচনা করে (এক) আয়তন, (দুই) আকার, (তিন) অভিগম্যতা accessiblity (চার) নিবেশ location (পাঁচ) সীমানা, (ছয়) মহাসমুদ্রের সাথে সংযোগ (সাত) স্থানের বিশেষত্ব (topography) (আট) খনিজ দ্রব্য (নয়) আবহাওয়া (দশ) লোক।

একটা বড় দেশ হিসেবে ভারতের প্রতিরক্ষার গভীরতার অভাব নেই। আমাদের যদিও "Heartland" বলতে ঠিক কিছু নেই তবুও গাঙ্গেয় সমতলভূমি এবং দাক্ষিণাত্যের ওপর দিয়ে কোনও বিজয়ী সৈন্যকে খুবই ধীরে ও অথেই অসুবিধার মধ্যে দিয়ে এগুতে হবে। আসাম, পূর্বপাকিস্তান বা কাশ্মীরের ওপর যুদ্ধ বিজয় মহীশূর বা মধ্যপ্রদেশের ওপর যুদ্ধবিজয়ের চেয়ে অনেক বেশী ফলপ্রসূ ও সম্পূর্ণ হতে পারে। এই জন্যেই

উত্তর বঙ্গের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিকে বিশেষ নজর রাখা উচিত। নেফা ও লাডাক ভারতীয়দের হাতে থাকা প্রয়োজন আসাম উপত্যকা ও কাশ্মীরকে সুরক্ষিত রাখতে।

ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানের সম্বন্ধে জ্ঞান এখনও সীমিত এবং যদি কোনও আক্রমণ হয় হবে তা আমাদের ভৌগলিক ও রাজনৈতিক উভয় দিক থেকেই অনাবিষ্কৃত জমির ওপর নিয়ে যাবে।

ভারতের সন্নিহিত নিবেশ (vicinal location) অর্থাৎ তার প্রতিবেশীর সংখ্যা ও প্রকারের পরিপ্রেক্ষিতে অবস্থিতি বোধ হয় বিশ্বে পূর্ব এশিয়ার সবচেয়ে জটিল। সুতরাং ভারত সর্বদাই সীমান্ত সমস্যার সম্মুখীন হবে। পাকিস্তান সৃষ্টি ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এতোই একটা অযৌক্তিক ব্যাপার যে পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে রাজনৈতিক সীমান্ত কখনই পাকাপাকি হবে না। চীনের সঙ্গে দীর্ঘ সীমান্ত কেবল মাত্র সুবিধারই সৃষ্টি করবে কেননা দুটো বৈরী রাষ্ট্রকে—যাদের অধিবাসীরা ভিন্ন রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আদর্শের এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর মানুষ – তাদের এ পৃথক করেছে।

আন্তর্জাতিক সংযোগ ব্যবস্থার দিক থেকে দেখতে গেলে (টেলিগ্রাফ, রাস্তা, রেল পথ এবং বিমান পথ) ভারত তার সকল প্রতিবেশীর চেয়ে এগিয়ে আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ এশিয়ার রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সংযোগব্যবস্থা নামমাত্র। এশিয়ার উত্তরের দিকে রাষ্ট্রগুলোর সাথে ভারতের কোনও যোগাযোগ নেই। একটামাত্র রাস্তা বার্মা ও ভারতকে এবং আরেকটি ভারত ও নেপালকে সংযুক্ত করেছে। একটি রেলপথ ও একটিমাত্র রাস্তা হলো ভারতের দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়ার সাথে যোগাযোগের উপায়। এখনকার সংযোগ ব্যবস্থা পশ্চিম বাংলায়, আসাম, রাজস্থান ও ছোটনাগপুরের খনিভূমি ব্যতিরিকে অন্যান্য স্থানে মোটামুটি যথেষ্ট। কোনও যুদ্ধের সময়ে, ছোটনাগপুরে প্রবেশ করার অসুবিধে আমাদের দীনতার মতোই ব্যয়বহুল বলে মনে হতে পারে।

Phone : 67-2108

K. P. Das & Co. Private Ltd.

GENERAL FOUNDERS, RLY & GOVT. CONTRACTORS

163, NETAJI SUBHAS ROAD, HOWRAH

STRUCTURAL & MECHANICAL ENGINEERS

IRON & NON-FERROUS FOUNDERS

Manufacturers of Special Iron Castings Up to Grade 17

FORGE MASTERS

MANUFACTURERS OF TEA & MILL MACHINE PARTS

RAILWAY MATERIALS A SPECIALITY

i e, Wagon Components, Carriage & Wagon Body Fittings, Locomotive Components, Signalling & Interlocking Materials, etc etc.

কলকাতা : নগর বিস্তারের সামাজিক দিক : প্রথম

অচিন্ত্যেশ ঘোষ

একটি সাময়িক পত্রিকায় কিছুদিন আগে দেখেছিলাম যে কোন এক বিদেশী সাংবাদিক এদেশ ঘুরে গিয়ে কলকাতাকে "a compressed tragedy of a city" বলে বর্ণনা করেছেন। শুনতে আমাদের খারাপ লাগলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে ওই ভদ্রলোকের কথা নিতান্ত খাঁটি। পৃথিবীর অন্য কোন মহানগরীর অবস্থা বোধহয় কলকাতার মত এত শোচনীয় নয়।

কলকাতার সমস্যা এতদিনে জাতীয় সমস্যা বলে স্বীকৃত হয়েছে। ৩২·৩২ বর্গমাইল একটি এলাকায় ২৯, ২৭, ২৮৯ জন মানুষের বিপুল চাপ যে ধারণাতীত সমস্যাবলির সৃষ্টি করবে তা ত সুনিশ্চিত। খাস কলকাতা শহরে অর্থাৎ কলকাতা কর্পোরেশন এলাকার প্রতি বর্গমাইল বাসজমিতে জনসংখ্যার ঘনত্ব ৭৩৪১০। অর্থাৎ প্রতিটি অধিবাসীর জন্য বসতি করার জমি মাত্র সাড়ে চার বর্গগজ। ১৯৫১ সালের সেন্সাস রিপোর্ট অনুসারে দেখা গেছে যে বিরাট গড়ের মাঠ, পার্ক, ময়দান ও রাস্তাঘাট বাদ দিয়ে জনবসতির জন্য নির্দিষ্ট স্থান মাত্র ২৮·৩৪ বর্গমাইল এবং প্রতি বর্গমাইলে ৮৯,৯৩২ জন লোক বাস করে। বৃহত্তর বোম্বাইতে ২১০৯ বর্গমাইল জায়গায় ২৮,৩৯,২৭০ জন লোক, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ১৩,৪৬৩ জন লোক বাস করে। দিল্লীতে ৩১·৪২ বর্গমাইল জায়গায় ১১,৯১,১০৪ জন, অর্থাৎ প্রতি বর্গমাইলে ৩৮,১৫৯ জন লোক বাস করে। সম্ভবতঃ একমাত্র রোম বাদে পৃথিবীর অন্য কোন মহানগরীতে এত ঘনবসতি নেই। রোমেও নগর ব্যবস্থাপনা অনেক উন্নততর। CMPO-র হিসাব মতে ১৯৮৬ সালের মধ্যে বৃহত্তর কলকাতার লোকসংখ্যা এক কোটির কাছাকাছি হবে। বর্তমানে বৃহত্তর কলকাতা এলাকায় ৬০ লক্ষেরও বেশী লোক বাস করে।

এই বিপুল জনসমষ্টি যে কি সুখে আছে তা এই নগরীর ভুক্তভোগী মাত্রেই প্রত্যক্ষ হাড়ে হাড়ে টের পান। তবু বিভিন্ন সমীক্ষা থেকে আমরা যে চিত্র পেয়েছি তার কিছুটা এখানে তুলে ধরা আবশ্যক।

কলকাতার অধিবাসীদের মধ্যে গড়ে

শতকরা ৩০ জন গৃহস্থের আবাস সংলগ্ন কোন জলের কল নেই,

১২ ,, পায়খানা নেই,

৬১ ,, স্নানের ঘর নেই,

৭৮ ,, রান্নাঘর নেই,

৪১ ,, ,, ঘরে বিজলিবাতি নেই।

আর্থিক সংগতি এবং স্থানসংকুলানের অভাবে মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ লোক একক জীবন যাপন করতে বাধ্য হয়। এরা মোট 'গৃহস্থদের' অর্ধেক। এদের মধ্যে আবার শতকরা ৮৭ জনের আয় মাসিক ১০০৲ টাকার নীচে। অধিকাংশই অবাঙালী; দেশে পরিবার পরিজনকে ফেলে এসে অতি কষ্টে জীবনযাপন করে আয়ের অধিকাংশ দেশে পাঠিয়ে পরিবার প্রতিপালন করে। নিয়মিত ভাবে দেশে যাতায়াত করে। ফলে, প্রথমতঃ কলকাতাকে এরা আপন জায়গা বলে

ছনে করে না, এবং দ্বিতীয়তঃ একক জীবন যাপন করার প্রতিক্রিয়ায় মহানগরীতে নানা নৈতিক এবং পৌর সমস্যার সৃষ্টি করে।

কলকাতার মোট গৃহস্থদের মধ্যে শতকরা ১৭ ভাগের কোন ঘর নেই, ৫০ ভাগ গৃহস্থ একটি ঘরের এক তৃতীয়াংশ ব্যবহার করতে পারে, ৪ ভাগ আধা ঘর পায়, ৩৩ ভাগের ভাগ্যে একটি পুরো ঘর জোটে এবং ১৬ ভাগের সৌভাগ্যে একাধিক ঘর জোটে (ঘরের মাপ ১২'×১২' ধিসেবে)। এখানে বলা দরকার যে রাস্তাঘাটে, ফুটপাথে, সেতুর নীচে বসবাসকারী অসংখ্য মানুষকে এই হিসেবের আওতায় আনা হয়নি। কলকাতা মুনিসিপাল গেজেটের ৩৩-তম বার্ষিক সংখ্যায় (২২-১১-১৯৫৮) প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী অনুমান তিন লক্ষের মত মানুষের মাথা গোঁজবার কোন ঠাঁই নেই। তারা জানোয়ারের মত রাস্তাঘাটে ঠাঁই খুঁজে নিতে বাধ্য হয়েছে। এরা ত হিসাব বহির্ভূত। কিন্তু হিসেবের মধ্যে যে সব গৃহস্থদের • ধরা হয়েছে তাদের মধ্যে শতকরা ৩২ ভাগ গৃহস্থের নিজস্ব বাড়ী বা বাসা-বাড়ী (ভাড়া দেওয়া বাড়ী) নেই, তারা হয় কোন পরিচিতের অতিথি হয়ে কিম্বা অফিসে বা দোকানঘরে দিন কাটায়। মাত্র ৭'২% গৃহস্থের নিজস্ব বাড়ী আছে। কলকাতার অধিবাসীদের এক বৃহৎ অংশ থাকে বস্তিতে ; আর এই বস্তিগুলির অধিকাংশকে সঙ্গতকারণেই বলা হয়েছে, "নরক সদৃশ", এবং সুস্থ বসবাসের সম্পূর্ণ অনুপযোগী।

শুধু 'বস্তি' কেন? সৌখীন পাড়া ক'একটিকে বাদ দিলে নগরের অধিকাংশ স্থানই নোংরা, অস্বাস্থ্যকর। উপরোক্ত দরিদ্র অবাঙালীরা ছাড়াও কলকাতার বর্তমান বাঙালী বাসিন্দাদেরও অনেকেই বহিরাগত, অর্থাৎ স্থানীয় বাসিন্দা নয়। প্রায় সকলেই জীবিকার সন্ধানেই এসেছেন, স্থায়ীভাবে এখানে বসবাসের উদ্দেশ্য অনেকেরই ছিলনা, পরে হয়ত পরিস্থিতি বশের ফলে এখানে স্থায়ী হয়ে গেছেন। ফলে এই নগরীর প্রতি যথার্থ মমত্ববোধ খুব কম লোকের মধ্যেই দেখা যায়। ১৯৫১ সালের সেন্সাসে যারা ১৯৩৯ সালের পরে কলকাতায় এসেছেন তাদের বহিরাগত বলে ধরা হয়েছে। এইরূপ বহিরাগতর সংখ্যা মোট জনসংখ্যার ৪০%। বস্তুত ১৯৩৯ সনের আগে ১৫/২০ বছরে যে বহিরাগত কলকাতায় এসেছেন, তাদের যদি গণনার মধ্যে ধরা হয় তবে বহিরাগতের সংখ্যা অনেক বেশী হয়ে যাবে। কলকাতার শতকরা প্রায় ৩১ জনের মাতৃভাষা বাঙলা নয়। বহিরাগতদের মধ্যে শতকরা ৮৫ জন এসেছে গ্রাম থেকে এবং নাগরিক রীতি নীতি, ও ভাবধারার সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারেনি। অধিকাংশই দরিদ্র এবং নিরক্ষর। এই গ্রাম্য বহিরাগতদের কাছে নাগরিক চেতনা বা civic sense প্রত্যাশা করা চলে না। কলকাতার বর্তমান শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য এই বহিরাগতগণ অনেক পরিমাণে দায়ী।

কলকাতায় সমস্যার† অন্ত নেই। নগরের প্রতি নাগরিকদের যেমন মমত্ববোধ নেই, তারা এই নগরীকে পায়ছন্দ, সুন্দর রাখার জন্য কোন দায়দায়িত্ববোধ করে না, তেমনি পৌরশাসন ব্যবস্থাও চূড়ান্তভাবে বিকল। এই শহরে সুস্থ থাকা প্রায় অসম্ভব, কিন্তু অসুস্থ হয়ে পড়লে মানুষ আরও নিরুপায়। হাসপাতালে বিনা সুপারিশে ঢোকা বোধহয় দেবতারও অসাধ্য, ঢুকতে পারলেও চিকিৎসার চেয়ে চিকিৎসা বিভ্রাট হয় বেশী। সাধারণ ডাক্তারেরা চড়া ফি এবং দুর্ব্যবহারের প্রতিযোগিতায় নিজেদের অসাধারণ প্রতিপন্ন করার নেশায় মত্ত। অবস্থাপন্ন এবং মধ্যবিত্তদের পক্ষেও সুচিকিৎসার

• সেন্সাসে একক গৃহস্থকেও গৃহস্থ-পরিবার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

† হিসাব অনুযায়ী বছরে কলকাতা থেকে ২৮ কোটি টাকা [illegible] ছুটি যদি অর্থের যাতায়াত বাইরে যায় (cf. A. Mitra, 'Calcutta's city', Cal 1963, P-20)

ব্যবস্থা করা দুরূহ ব্যাপার; সাধারণ দরিদ্র মানুষের পক্ষে পরিস্থিতি কি ভয়াবহ ব্যাপার তা কল্পনাও করা যায় না।

তেমনি, না দেখলে কল্পনা করা যায় না কি করে দিনের পর দিন মানুষ অবর্ণনীয় কষ্টে ট্রামে ও বাসে যাতায়াত করে। ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে সাধারণ দরিদ্র মানুষ যাথা গোঁজবার কোন ঠাঁই না পেয়ে জানোয়ারের মত রাস্তাঘাটে থাকবার ঠাঁই করে নিয়েছে। কলকাতার ট্রামে-বাসে ভদ্রলোকদেরও যেভাবে যাতায়াত করতে হয় তার চেয়ে জানোয়ারদেরও বোধহয় বেশী আরামে স্থানান্তরিত করা হয়।

এই মহানগরীর দুর্ঘশাভোগ শুরু হয় শৈশব থেকেই। পাঁচ বছরের ছোট বাচ্চাকে স্কুলে ভর্তি হবার জন্য কি হয়রান হতে হয়! যাদের সাধ্যে কুলায় তাদের বাচ্চারাও শুধু স্কুলে ঢোকে, দরিদ্র শিশুদের স্কুল ও রাস্তা, সহপাঠী কুকুর-বিড়াল। লেখাপড়াতেও কি সমস্যার অন্ত আছে? সমস্যাই বা ছেলেরা কতটুকু পায় মাছের লাইন, তেলের লাইন, রাশনের লাইন দিয়ে? সমস্যারাও আসে লাইন দিয়ে। আমাদের আগামীদিনের নাগরিকরা কিভাবে গড়ে উঠছে? আরও বড় হয়ে বেকারী, অথাদ্য, হতাশা, অন্ধকার ভবিষ্যৎ—।

অন্ধকার সর্বত্র। আলোবাতাসহীন, ঘুপচি অন্ধকার ঘর ছেড়ে অনেকে বাইরে এসে হাঁপ ছাড়তে চায়। কিন্তু এ নগরীতে কোথায় আরাম? ডিজ-ক্যাক্টরীর ধোঁয়া, বাস-ট্রাক-ট্যাক্সি-মোটর গাড়ী থেকে নিঃসৃত ডিজেলের ধোঁয়া, সকাল-সন্ধ্যায় উনুনের ধোঁয়া—ধোঁয়ায় কলকাতা অন্ধকার। তারপর চতুর্দিকের সর্ববিধ আওয়াজের বিচিত্র কোলাহল, রাস্তায় পদে পদে দুর্ঘটনার ভয়, সর্বত্র গাদাগাদি ভিড়, তিরিক্ষ মানুষের অসহিষ্ণু অভদ্র ব্যবহার -এই হল মহান কলকাতা, নরকের কাছাকাছি, ইহলোকের মহানগরী।

কলকাতার দুর্দশার অন্ত তথ্য সংগৃহীত হয়েছে। শুধু তাই দিয়ে প্রবন্ধ ভারাক্রান্ত করে লাভ নেই। আমাদের অনুসন্ধান করতে হবে উপায়।

কলকাতার উন্নয়নের জন্য ভাবছেন সকলেই। কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের মন্ত্রীগণ, বড় বড় পদস্থ কর্মচারীরা, পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞমণ্ডলী বছরের পর বছর ঘন ঘন ভাববিনিময় করছেন। ইতিমধ্যে কলকাতা মেট্রোপলিটন প্ল্যানিং অর্গানাইজেশন নামে এক বিরাট সংস্থা গঠিত হয়েছে। পরিকল্পনার জন্যই ইতিমধ্যে লক্ষ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে, আসল উন্নয়নের জন্য আরও কোটী কোটী টাকা নিশ্চয়ই খরচ করা হবে। ভাল কথা। তবে ইত্যবসরে একটি মূল প্রশ্ন বিবেচনা করা দরকার।

যত পরিকল্পনা হচ্ছে তার অধিকাংশেরই মোদ্দা কথা হচ্ছে 'আরও চাই'। কলকাতায় স্থানাভাব, কলকাতাকে বিস্তৃত করো; রাস্তা আরও চওড়া করো; যানবাহন বাড়াও। বিরাট কলকাতাকে বিশাল করে তোলা হবে। কিন্তু সত্যিই কি এইভাবে আমাদের সমস্যার সমাধান হবে? পৃথিবীর অন্য কোন মহানগরীতে এইভাবে সমস্যার সমাধান হয়নি। নগরের আয়তন যত বেড়েছে, ততই অধিক সংখ্যক মানুষ বাইরে থেকে এসে নগরের জনসংখ্যা আরও বৃদ্ধি করেছে, এবং ক'এক বছরের মধ্যেই সেই পুরনো স্থানাভাবের এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় সমস্যাকে আবার জাগিয়ে তুলেছে। আমাদের লক্ষ্য কি? কলকাতাকে আর একটি গ্রেটার নিউইয়র্ক, বা টোকিও করে গড়ে তোলা? কলকাতাকে অতিকায় নগরীরূপে গড়ে তুলে কার স্বার্থসিদ্ধি হবে? সাধারণ মানুষের?—তা ত কখনই হয় না। গ্রাম থেকে শহর, শহর থেকে নগর, নগর থেকে মহানগরী, মহানগরী থেকে অতিকায়নগরী (megapolis) —মানুষের বসতির এই যে স্ফীত রূপান্তর, এই রূপান্তর সাধারণ মানুষের স্বচ্ছন্দজীবনের উদ্দেশ্যে ঘটান হয়নি। ঘটেছে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, রাজশক্তি এবং বণিকশক্তির স্বার্থে। অবশ্য অনেক নগরের পত্তন ঘটেছিল স্বাস্থ্যকেন্দ্ররূপে, কিন্তু ক্রমশঃ এই

সব নগরও রাষ্ট্রশক্তি বা বণিকশক্তির বা ধর্মীয় কায়েমী স্বার্থের লাভের আকর হয়ে দেখা দিয়েছে ; সাধারণ মানুষের কোন কল্যাণ, দৈহিক বা আত্মিক, মানবিক কোন উন্নতি নগরের বিকাশের সঙ্গে জড়িত নয়।

মধ্যযুগ থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত নগরের প্রসার সাধারণত বনতন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সমান্তরালভাবে চলেছে। কলকারখানার জন্য মজুরের দরকার হয়েছে। দলে দলে তারা গ্রাম থেকে এসেছে। পশুর খোয়াড়ের মত তাদের জন্য বাসস্থান করে দেওয়া হয়েছে। প্রথম থেকেই মানবাভাবের সমস্যাটাকে অত্যন্ত লাভজনকভাবে জিইয়ে রাখা হয়েছে। বিখ্যাত সমাজ বিজ্ঞানী Lewis Mumford-এর উক্তি এখানে উল্লেখযোগ্য :

"The new commercial centers with their increasing populations set pace for intensified land uses, and the more limited the amount of land available,---the higher were the rents, and greater the possibilities of gain from degraded and anti-social uses" (The City in History, New York, 1961, p-477)

শুধু কলকাতাই নয়, পৃথিবীর প্রায় সমস্ত নগরীই নোংরা ঘিঞ্জি বস্তির মাঝখানে গড়ে উঠেছে এবং মনুষ্যবসবাসের অনুপযুক্ত এই নোংরা বস্তিগুলিকে ধনী মালিকের স্বার্থেই সৃষ্টি করা হয়েছে। এই সব বস্তিবাসীদের চরম দুর্দশার মধ্যে রেখেই আবার মালিকেরা তাদের শ্রমের মজুরির পর ইচ্ছামত কেঁদে মুনাফার পাহাড় গড়ে তুলতে পেরেছে। মার্কসের ভাষাতেই বলা চলে :

"Misery at the bottom was the foundation for luxury at the top. As much as a quarter of the urban population in the bigger cities, it has been estimated, consisted of casuals and beggars ; it was this surplus that made for what was considered by the classic capitalism to be a healthy labor market, in which capitalist hired labor on his own terms, or dismissed workers at will, without notice, without bothering as to what happened, either to the worker or to the city under such inhuman conditions" (ibid, p 432-33)

বনতন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গে গড়ে উঠেছে বণিক আবশ্যতন্ত্র। চিঠিপত্র, হিসাবনিকাশ ইত্যাদির জন্য দরকার একদল কেরানীর। এইভাবেই কেরানীর দলবৃদ্ধি, নগরের লোকসংখ্যার বৃদ্ধি, জমির উপর আরও চাপ, পরিবহন সমস্যা, যানবাহনের সংখ্যাবৃদ্ধি, সেইসঙ্গে নূতন কর্মসৃষ্টি, আরও লোকের চাহিদা, আরও লোকসংখ্যা বৃদ্ধি, ফলে নগরের চৌহদ্দির আরও প্রসার। এইভাবে নগরগুলি ক্রমেই স্ফীত হতে স্ফীততর হয়েছে। এইভাবে নগর বেড়েছে, আর সেই সঙ্গে বেড়েছে মুষ্টিমেয় কিছু লোকের মুনাফা আর রাজনৈতিক ক্ষমতা। এই মুষ্টিমেয় লোকের স্বার্থে কল্যাণ কিছু হোক বা না হোক, অপর সাধারণ মানুষের যে কোন কল্যাণ হয়নি সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। গ্রাম থেকে বনতন্ত্রের পীঠভূমি বিভিন্ন নগরে এসে মানুষ তার স্বাস্থ্য হারিয়েছে, শান্তিও হারিয়েছে। একটি সমীক্ষা অনুসারে জানা যায় যে অস্বাস্থ্যকর পৌরব্যবস্থার জন্য আমেরিকায় ১৮৯০ সালে একলক্ষ ষাটহাজার লোককে "অহেতুক মৃত্যু" (unnecessary death) বরণ করতে হয়েছে। কলকাতার ঘিঞ্জিময় প্রসারের জন্য কত লক্ষ লোকের অকাল মৃত্যু ঘটেছে তার হিসাব কি ?

আমাদের বক্তব্য এ নয় যে সব নগরকে তুলে দিতে হবে এবং আবার সেই পুরনো গ্রাম্য জীবনযাত্রার সঙ্গে ফিরে যাক। তা সম্ভবপর নয়। কিন্তু যখনই আমরা কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করব, তখন আমাদের সামগ্রিক লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিজেদের কাছে স্পষ্ট থাকা প্রয়োজন। আমরা নগর পরিকল্পনা করছি কার স্বার্থে ? যদি সাধারণ মানুষের স্বার্থ মুখ্য হয় তার মানবিক স্বার্থের কথা, তার সার্বিক উন্নয়নের কথা

চিন্তা করছি, না তার আংশিক আরামের কথা চিন্তা করছি, সে বিষয়ে নিজেদের ধারণাকে স্পষ্ট করে নিতে হবে। শ্রমিক ও সাধারণ মানুষের আংশিক স্বার্থ বা সাময়িক আরামের ব্যবস্থা ধনিকেরাও চিরকাল করে এসেছে। মদের চালাও ব্যবস্থা করেছে, অন্যান্য নানা ফুর্তির আয়োজন করে দিতেও কার্পণ্য করে নি, বস্তি মেরামত করে দিয়েছে এমনকি স্কুল-পাঠশালাও তৈরী করে দিয়েছে। কিন্তু তাতে কি শ্রমিকদের সামগ্রিক স্বার্থ রক্ষিত হয়েছে? মানুষ বন থেকে পশুপাখীকে ধরে এনে চিড়িয়াখানায় আটকে রাখে মানুষেরই স্বার্থে, পশু পাখীর স্বার্থে নয়,—তা তাদের থাকার যত সুব্যবস্থাই থাকুক বা যত আরামের ব্যবস্থাই হোক। মূল প্রশ্ন, ধনতন্ত্রের স্বার্থে যদি নগরের বিকাশ ঘটে থাকে, তবে নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার সূচনাতেও কি নাগরিক প্রশাসন অব্যাহত রাখা প্রয়োজন? সাধারণ মানুষের স্বার্থে যদি তা প্রয়োজনীয় না হয়, তবে নগর সমাজের বিকেন্দ্রীকরণের কথাই চিন্তা করতে হবে, সমগ্র দেশের মানুষকে ক্রমশঃ কয়েকটি মহানগরীতে কেন্দ্রীভূত করাকে রোধ করতে হবে।

বিকেন্দ্রীকরণের মানে এ নয় যে কলকাতার মত বড় বড় নগরকে ভেঙে দিতে হবে আমাদের ভাবতে হবে এই মহানগরীগুলিকে আরও অতিকায় করে না তুলে, বিভিন্ন স্থানে নূতন শিল্পকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র কলাকেন্দ্র এবং শাসনকেন্দ্র সৃষ্টি করে জনসংখ্যার চাপকে নানামুখীকরে তোলা যায় কি না। গ্রামের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে আরও দৃঢ় ভিত্তিক করে শুধু লেটের দায়ে গ্রামা মানুষের বহির্গমন রোধ করা যায় কি না। সরকার বা আমাদের পরিকল্পনাকারীগন যে এদিকে চিন্তা করছেন না তা বলা চলে না, কিন্তু সেই চিন্তাকে বাস্তবে পরিণত করার ব্যাপারে শোচনীয় ব্যর্থতা লক্ষিত হচ্ছে।

অসুবিধা অনেক আছে। থাকবেই। কিন্তু কোন বাধাই দুর্লঙ্ঘ্য নয়, যদি অগ্রসর হবার ইচ্ছা থাকে। বিকেন্দ্রীকরণ ধনিকশ্রেণী এবং আমলাতন্ত্রের মনঃপুত নাও হতে পারে। অর্থনৈতিক কারণ এবং ক্ষমতা হাতের মুঠোয় রাখার সুবিধা ছাড়াও মহানগরীর প্রতি এঁদের পক্ষপাতিত্ব বিলাসব্যসনের কথা ভেবেও। তাছাড়া, মহানগরীতে সাধারণ লোকের ছোঁয়া বাঁচিয়ে যে ভাবে "হাই সোসাইটির মধ্যে নিজেদের আলাদা করে রাখা যায়, ছোট শহরে তা চলবে না। ছোট শহরে নিজেদের ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া শেখার জন্য সাধারণ কেরাণীর ছেলেমেয়ের পাশে গিয়ে বসতে হবে। তাঁদের ছেলেমেয়েরা "অসভ্য" ছেলেমেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করবে, ইত্যাদি নানা বিভীষিকা আছে। আমলাতন্ত্রের যে খুব সহজে বাংলার রাজধানী কলকাতা থেকে অন্য কোন শহরে স্থানান্তরিত করতে দেবে তা মনে হয় না। অথচ তা সম্ভবপর হলে এই নগরীর জনসংখ্যার চাপ অনেক কমতে পারে। তেমনি কমতে পারে যদি রেল দপ্তর, ইত্যাদি বড় বড় দপ্তর স্থানান্তরিত হয়। অবশ্য সাধারণ মধ্যবিত্ত শ্রেণীও এতে প্রবল আপত্তি জানাবে। তার পেছনে সামগ্রিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অজ্ঞতা, অন্ধ ভাবালুতা, নতুন জায়গায় সংসার গুছিয়ে নেবার নানা অসুবিধার চিন্তা অর্থনৈতিক আশংকা,—এই সব মনোভাব কাজ করে। কিন্তু সুব্যবস্থা হলে নতুন জায়গায় বসতি স্থাপন করতে সাধারণ মানুষ কোন দিন আপত্তি করে না। তাছাড়া সামগ্রিক বিবেচনায় অনেকেই বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষেই সায় দেবে।

নাগরিকতার একটি বিশেষ লক্ষণ নৈর্ব্যক্তিকতা। গ্রামে প্রত্যেকে প্রত্যেকের হাঁড়ির খবর রাখে, একে অন্যের খোঁজ খবর নেওয়া অবশ্যকর্তব্য বলে বোধ করে। গোষ্ঠী চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আঞ্চলিক চেতনা এবং মমত্ব বোধ গড়ে ওঠে। নগরে আমরা পাশের ফ্ল্যাটের প্রতিবেশী সম্পর্কে কোন খোঁজ রাখিনা। নাগরিক জীবনধারাই এমন যে তার প্রয়োজনও ঘটে না। নগরে অধিকাংশ লোকই জীবিকার সন্ধানেই আসে এবং সেই নগরকে আপন "দেশ" বলে মনে করে না। বিশেষত, যে-সব নগরীতে বহিরাগতের সংখ্যা বেশী সেই সব নগরের

নাগরিকদের মনোভাবের প্রতি মনোযোগ দিতেই হবে। কলকাতার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে ইতিপূর্বেই আলোচনা করেছি। কলকাতার বর্তমান শোচনীয় অবস্থার একটি কারণ এই যে এই দেশে কলকাতার উন্নতির জন্য কোনরূপ দায়িত্বই বোধ করে না। যদি এই তীব্র ঘৃণা ভাব না থাকত, যদি সব দেশের সম্পত্তিবানেরা স্থায়ীভাবে এই নগরীতে বাস করতে পারত, তবে নিজ নগরী কলকাতা সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব অন্যরকম হত এবং বহু লোকের মনোভাব অন্যদের মধ্যেও সংক্রামিত হয়ে হয়ত কলকাতার রূপান্তর ঘটাত।

ও ডিরেক্টরদের বসবার ঘরে ঢুকে আমরা যদি নাগরিক কল্যাণের কথা চিন্তা করি তবে আমাদের গ্রাম ও নগর সম্পূর্ণ নতুন ভিত্তিতে গড়ে তুলতেই মনোযোগী হব। নিউইয়র্ক, লন্ডন, প্যারি, টোকিও – পৃথিবীর কোন নগরীই এখনো স্পষ্ট রূপে নাগরিক সমস্যার কোন স্থায়ী সমাধান দেখাতে পারে নি, মানুষের দার্শনিক কল্যাণের পথ উন্মুক্ত করতে পারে নি। কলকাতার উন্নয়নের জন্যও নিছক অনুকরণ অবশ্য বর্জনীয়।

আমাদের মূল সমস্যা রাজনৈতিক। আমরা মুখে সমাজতন্ত্রের কথা যতই বলি না কেন, আমাদের দেশ শাসিত হচ্ছে ধনতান্ত্রিক কাঠামোর মধ্যে, এবং ধনিকের স্বার্থেই। যতদিন নাগরিক বিকেন্দ্রীকরণ ধনতন্ত্রের স্বার্থসংগত না হয় ততদিনে এই রাষ্ট্রের অবস্থার আমূল পরিবর্তন আশা করা সম্ভবপর কিনা সন্দেহ। চুনকাম অবশ্য চলতে থাকবে।

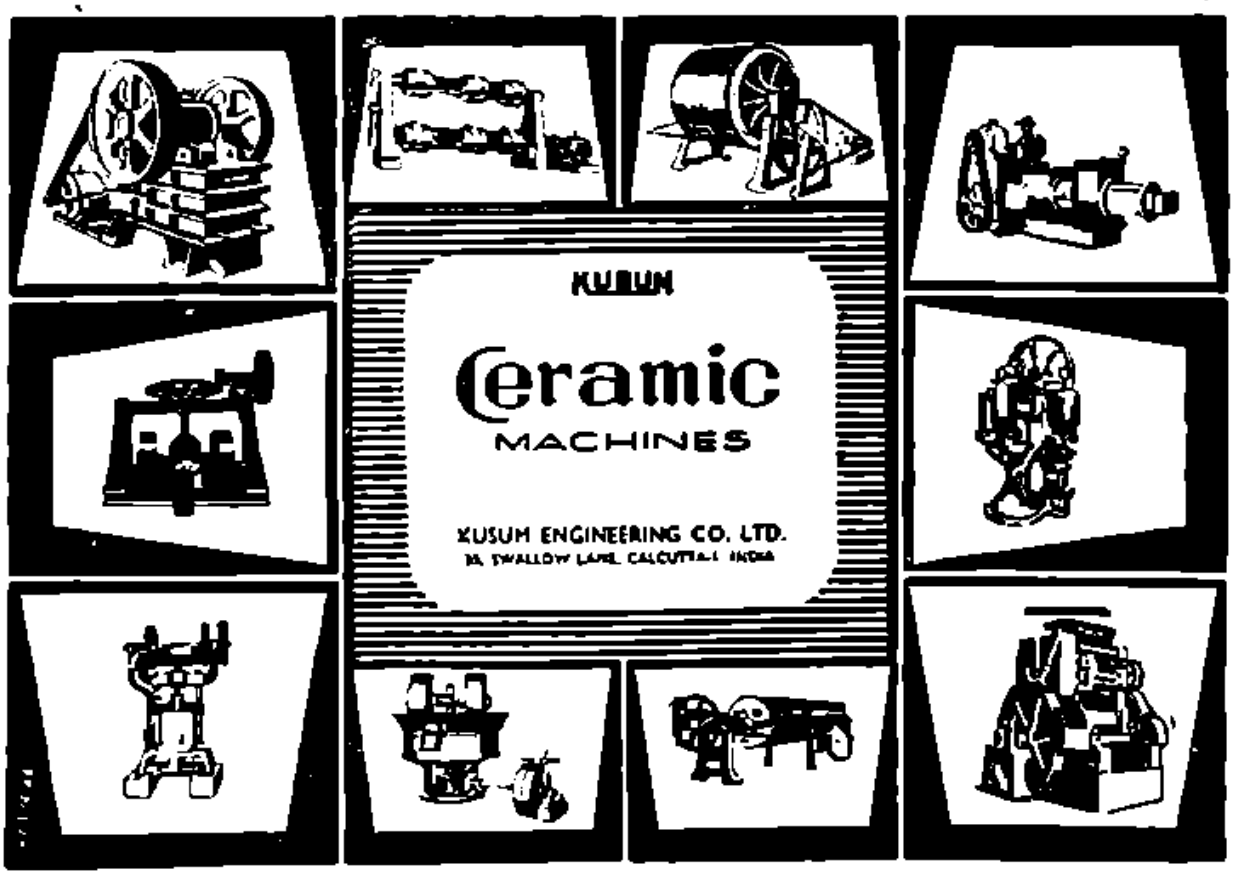

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

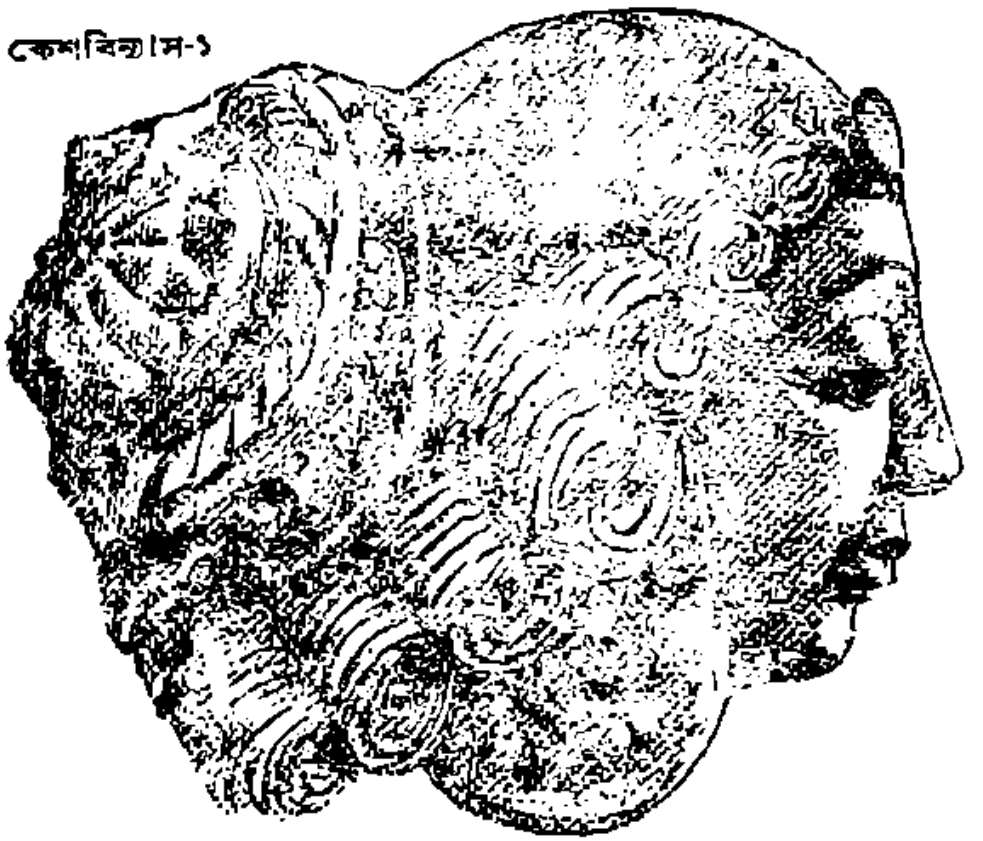

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

মনে রাখবেন

ছোট পরিবার মানেই সুখী পরিবার

ছেলেমেয়েদের জন্য চাই শিক্ষা, উপযুক্ত আহার ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ। সেজন্য অভিজ্ঞ বাবা-মায়েরা তাঁদের লালন পালন করার মত ক্ষমতা অনুযায়ী সন্তান জন্ম দিতে চান।

জন্ম নিয়ন্ত্রণের কয়েকটি উপায় আছে, কিন্তু এর মধ্যে সবচেয়ে নতুন ও উৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে 'লুপ'—যা বছরের পর বছর ধরে নিরাপদে, ও নিশ্চিন্তভাবে ব্যবহার করা যায়। এ বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়।

এই সম্পর্কে জানতে হ'লে আপনার নিকটতম **কল্যাণমূলক পরিকল্পনা কেন্দ্রে** গিয়ে অভিজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিন।

DA 65/218 Bengali

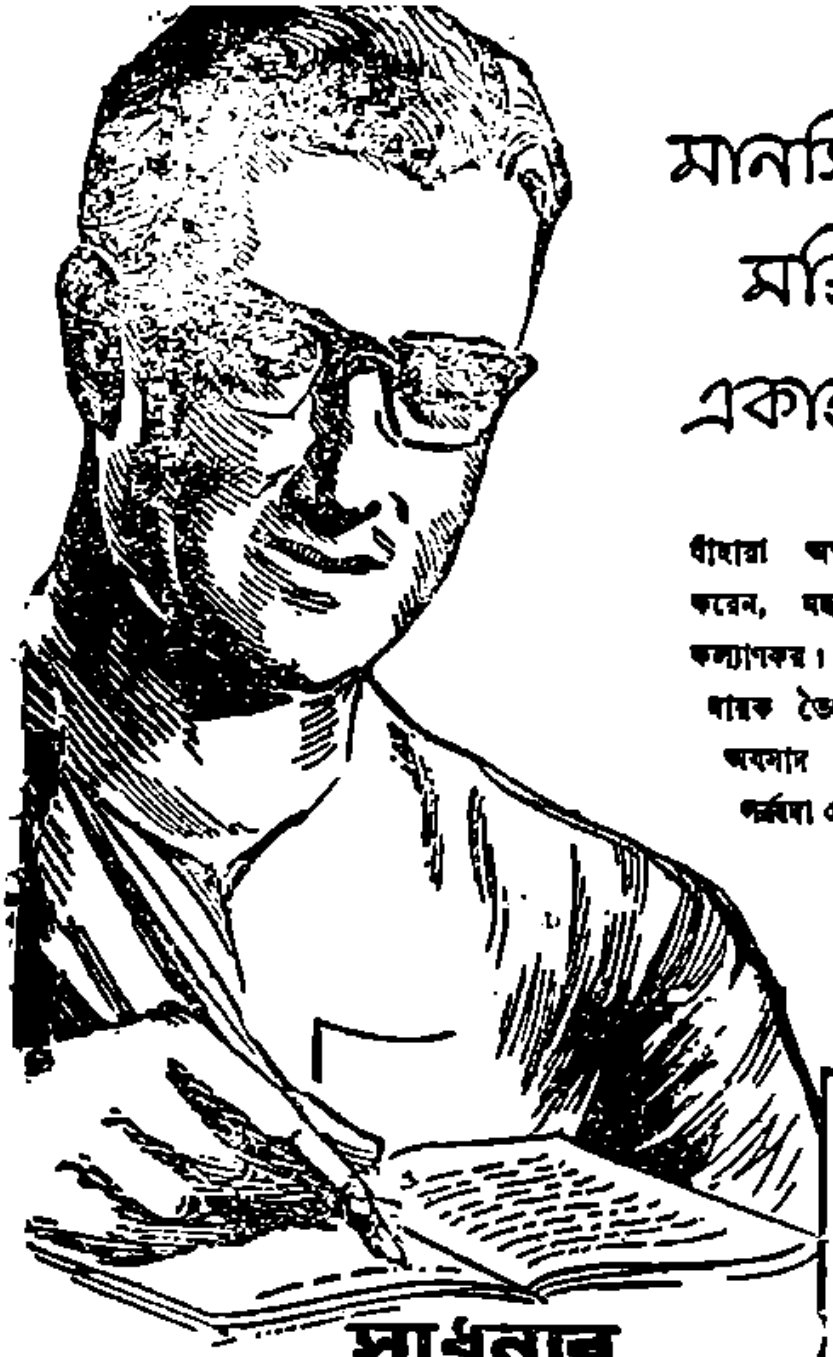

মানসিক পরিশ্রমে মস্তিষ্কের যত্ন একান্ত প্রয়োজন !

যাঁহারা অত্যধিক মানসিক পরিশ্রম করেন, মহাভৃঙ্গরাজ তাঁহাদের পরম কল্যাণকর। এই স্নিগ্ধকর ও আরাম-দায়ক তৈল সর্ব্বপ্রকার ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করে, দেহ ও মনকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল ও কর্ম্মক্ষম রাখে

সাধনার
মহা ভৃঙ্গরাজ
তৈল

সাধনা ঔষধালয়-কলিকাতা

কলিকাতা কেন্দ্র – ডাঃ নরেশচন্দ্র ঘোষ,
এম. বি, বি, এস, (কলিঃ) আয়ুর্ব্বেদাচার্য্য

অধ্যাপক শ্রীযোগেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ,
আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রী, এল, সি, এস, (লণ্ডন) এফ, সি, এস (আমেরিকা)
কলিকাতা আয়ুর্ব্বেদ মহাবিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক।

কয়েকটি নতুন কাব্যগ্রন্থ

শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

ধর্মে আছো জিরাফেও আছো

দাম : তিন টাকা

প্রমুখ্যৎ। ৬, বঙ্কিম চট্টোপাধ্যায় স্ট্রীট

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়ের

ঘর খুলে বারান্দায়

দাম : দু' টাকা

কাব্যকোশ। ৩২, কালিদাস পণ্ডিতমুণ্ডি লেন,

কলিকাতা-২৬

দীপ্তি জাগে ॥ মনোরঞ্জন দাশগুপ্ত

ঘুম শিশুদের জন্য টকি ॥ অমিতাভ দাশগুপ্ত

আমি অমল আঁধারে ॥ যদুজেশ মিত্র

সীতা কেঁদে গেলে ॥ বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

সমর্পিত শৈশবে ॥ অরুণ ভট্টাচার্য

স্ব-নির্বাচিত কবিতা ॥ গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

উজ্জয়িনী ॥ আনন্দগোপাল সেনগুপ্ত

নির্বাসিত কথামালা প্রিয়তমা ॥ শান্তি লাহিড়ী

ঈশ্বরের সঙ্গে দুঃখত ॥ অনেশরঞ্জন দত্ত

বকুলতলা ॥ সুনীল বসু

অন্তরিক্ষ ॥ শোভন সোম

নিজের বিপক্ষে ॥ সামসুল হক

কাল-নদী-রূপ ॥ শান্তি বসু

মন্ত্র বেলাভূমি ॥ মৃণাল বসুচৌধুরী

দু-পহরী ॥ আরতি দাস

বাংলা কবিতা ॥ শান্তি লাহিড়ী সম্পাদিত

সাহিত্য ॥ ১৮ পদ্মপুকুর রোড ॥ কলিকাতা-২০

"...প্রকৃতপক্ষে গ্রন্থের নাম-কবিতাটি আধুনিক বাংলা কাব্যে এজন্যেই স্মরণীয় যে এটি...যে অটল ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত তা হ'লো অমোঘ সত্তা। "দিনযাপন"-এ কবি ও শ্রেণীর যে মিলন হয়েছে তা বিরল এবং সমসাময়িক বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্বন্দ্ব ও জিজ্ঞাসা, চরিত্র ও স্বরূপ এই কবিতাটিতে পেয়েছে অসামান্য অভিব্যক্তি। কিরণশঙ্করের কবিতাগুলোকে যা বিশিষ্ট করেছে তা হলো মধ্যবিত্ত সমতল জগৎ থেকে উত্তরণের অস্পৃহা।...আধুনিক বাঙালী কবিদের মধ্যে যাঁরা ভবিষ্যতেও স্মৃত হবেন কিরণশঙ্কর তাঁদের মধ্যে অন্যতম। কারণ তাঁর কাব্যে সত্য আছে।...সত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বভাবগত কবিত্ব ও দীর্ঘকাল কাব্যচর্চা হতে অর্জিত দক্ষতা।..."

আনন্দবাজার পত্রিকা (১৮. ৮. ৬৩)

"...তিনি মুগ্ধ দৃষ্টি নিয়ে কবিতা লেখা শুরু করেছিলেন। ধীরে ধীরে গভীর অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে তিনি এসে পৌঁচেছেন তৃষ্ণার্ত তীরের এই প্রান্তে। কবিচিত্তের এই উত্তরণ বিস্ময়ে ও সাগ্রহে লক্ষ্য করবার মতো। দিনযাপনের কবিতাগুলি সে কারণেই দুই দশক পেরিয়ে আসা স্বগত সংলাপের স্বাদে অনুভূতিময়। এই কাব্যগ্রন্থ অনুভবী পাঠকের কাছে সমাদর পাবে।

যুগান্তর (২৪. ৩. ৬৩)

কিনুন আপনি

আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত একটি বহু-পরিচিত নাম। তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ দিনযাপন নিঃসন্দেহে তাঁর মর্যাদা ও প্রতিষ্ঠার পরিপোষক, মনন ও মেজাজে আধুনিক এবং সামগ্রিক শিল্পপ্রত্যয়ের সমীপবর্তী।

দাম : দু' টাকা ৫০ পয়সা

ইণ্ডিয়ানা

২।১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-১২

কলিকাতার সমস্যা

প্রবন্ধ

নিরঞ্জন হালদার

কলিকাতার বিরুদ্ধে যত বিরূপ মন্তব্যই করা হোক না কেন, কলিকাতাকে আজ আর অবহেলা করা সম্ভব নয়। এই শহরকে দুঃস্বপ্নের প্রতীক বা শোভাযাত্রা নগরী হিসেবে অভিহিত করার যাঁরা একদা মুক্ত হয়েছিলেন, তাঁরাও বর্তমান কলিকাতা সম্পর্কে এই বিশেষণগুলি আজ বাস্তব সত্য বলে মেনে নেবেন। কলিকাতা ও তার চারিপাশের শিল্পাঞ্চল সম্পর্কে এই এলাকার অধিবাসীদের নির্লিপ্ততা সমস্যা এত জটিল করে তুলেছিল যে, বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা ও বিশ্ব-ব্যাঙ্কের রিপোর্টের পর ভারত সরকারের পক্ষেও আর চোখ বুজে থাকা সম্ভব হয়নি। কলেরা রোগকে নির্মূল করবার জন্য বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা কলিকাতার পৌর এলাকা সমেত বৃহত্তর কলিকাতার পানীয় জল সরবরাহ এবং ময়লা জল নিকাশের ব্যবস্থা কার্যকর করবার জন্য একটি রিপোর্ট পেশ করেন। কলিকাতা ভারতের সবচেয়ে বড় শহরই নয়, সবচেয়ে বড় বন্দরও। হুগলি নদীতে পলি জমে নদীর নাব্যতা ক্রমেই হ্রাস পাচ্ছে এবং এই অবস্থা আরও কিছুকাল চললে কলিকাতা-বন্দরকে বাতিল করা ছাড়া উপায় থাকবে না। কাজেই দায় ভারতের আর্থিক উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে কলিকাতার উন্নয়নের সমস্যাকে বিচার না করে উপায় নেই। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় কলিকাতার সমস্যাকে উপেক্ষা করার বিশ্বব্যাঙ্ক ভারত সরকারের নীতির সমালোচনাও করেন। তারপর ১৯৬১ সালে কলিকাতা মেট্রোপলিটান প্ল্যানিং অর্গানিজেশান বা সি-এম-পি-ও গঠিত হয়েছে এবং বিশ্ব-স্বাস্থ্য-সংস্থা ও ফোর্ড ফাউণ্ডেশান ছাড়া রাষ্ট্রসংঘের বিশেষ উদ্যোগও বৃহত্তর কলিকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করছেন। আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থাও কলিকাতার উন্নয়নের ব্যাপারে আগ্রহী।

এতদিন আমরা কলিকাতার সমস্যা বলতে পৌর এলাকার সমস্যাই বুঝতাম। কিন্তু শিল্পাঞ্চল ও চারিপাশে নূতন গড়ে ওঠা উপনগরীগুলি বাদ দিয়ে কলিকাতার সমস্যা চিন্তা করাই অসম্ভব। হুগলি নদীর দুই তীরে তিন থেকে পাঁচ মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত শহর এলাকা নিয়েই বৃহত্তর কলিকাতা গঠিত। কলিকাতা এই গোটা এলাকার প্রাণকেন্দ্র। কলিকাতা পৌর এলাকায় পানীয় জলের সরবরাহ, ময়লা জল নিকাশ ও আবর্জনা অপসারণের যেটুকু ব্যবস্থা আছে, এইসব পৌর এলাকায় তাও নেই। কল্যাণী ছাড়া মাত্র তিনটি পৌর-এলাকায় ভূগর্ভস্থ পয়ঃ প্রণালীর চিহ্ন দেখা যাবে। বাসস্থানের সমস্যা শহরগুলিতে আরও বেশী জটিল। হাওড়াকে বস্তি-শহর বললে এমন কিছু বাড়িয়ে বলা হয় না। জনস্বাস্থ্য রক্ষার ব্যাপারেও পৌরসভাগুলি নজর দিতে পারে না। টাকার অভাবে কোন কাজই হয় না। অথচ এই একই কারণে ঠিকমত কর নির্ধারণ ও কর সংগ্রহের জন্য উপযুক্ত লোক নিয়োগ করা সম্ভব হচ্ছে না।

বর্তমানে দেশের লোকসংখ্যা যেখানে বছরে শতকরা প্রায় আড়াই ভাগ হারে বাড়ছে, সেখানে বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যাবৃদ্ধির হার শতকরা সাড়ে তিন। চতুর্থ দশকে বৃহত্তর কলিকাতার জনসংখ্যা শতকরা তিরিশ ভাগ বাড়লেও

কলিকাতা পৌর-এলাকায় এই বৃদ্ধির পরিমাণ ছিল শতকরা সাইত্রিশ ভাগ। গত দশকের কলিকাতার লোকসংখ্যা তিরিশ শতাংশ বাড়ে এবং বৃহত্তর কলিকাতার কোন কোন এলাকার জনসংখ্যা দ্বিগুণ হয়। জনসংখ্যাবৃদ্ধি সত্ত্বেও পৌরসভাগুলির আয় কিন্তু বাড়ে নি। জনস্বাস্থ্যমূলক কাজের জন্য ব্যয়ও তেমন বৃদ্ধি পায় নি। কাজেই কোন উন্নয়ন ও পরিকল্পনা কার্যকর করা তো দূরের কথা, কোন উন্নয়ন-কর্মসূচী রচনার জন্যও উপযুক্ত লোক নিয়োগের সামর্থ্য এই সব পৌরসভার নেই। এইসব কারণেই কলিকাতা ও আশেপাশের পঁয়ত্রিশটি পৌরসভা ও সাঁইত্রিশটি শহর এলাকা সমেত মোট প্রায় তিনশো বর্গমাইল এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনা রচনার জন্য সি-এম-পি-ও গঠিত হয়।

কলিকাতার লোক সংখ্যা প্রতিনিয়তই বেড়ে চলেছে, কিন্তু বাসগৃহের সংখ্যা বাড়ছে সামান্যই। ফলে শহরের এক তৃতীয়াংশ অধিবাসী বস্তি বা বস্তি-জাতীয় বাড়িতে থাকতে বাধ্য হয়। কলিকাতা শহরে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড বা ডিপথিরিয়া কিংবা আমাশয় রোগ যে মৌসুমী পাট্টা করে নিয়েছে, তার বড় কারণ এই বস্তি। ১৯৪৬ সনের এক সমীক্ষায় দেখা গেছে মহানগরীর দুই তৃতীয়াংশ কলেরা রোগী এই বস্তি এলাকা থেকেই আসে। অপর একটি সমীক্ষা অনুসারে শহরের শতকরা আটটি বাড়িতে কোন রান্নাঘর নেই (একটা বাড়ির মধ্যে অনেক সময় পাঁচটা পরিবারও বাস করে), খাদ্যদ্রব্য রাখার জায়গা নেই, বাসনপত্রও ভালভাবে পরিষ্কার করবার ব্যবস্থা নেই। শতকরা তিরিশ জন লোকের জন্য পানীয় জল সরবরাহের কোন ব্যবস্থা নেই। যাদের ভাগ্যে কিছু জোটে, পরিমাণে তাও খুব সামান্য। যে-সব বস্তি-বাড়িতে কূপ আছে, সে-গুলিও পায়খানার পাশে অবস্থিত। ফলে ওই সব কূপের জলও দূষিত হয়ে সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার ঘটিয়ে থাকে। বস্তিতে পায়খানা থাকলে তাও খাটা পায়খানা এবং এই ধরনের প্রতিটি পায়খানা কমপক্ষে পঞ্চাশ জন লোক ব্যবহার করে থাকে। বাড়ির ময়লা জল নিকাশেরও কোন ব্যবস্থা নেই। কাজেই এই শহরে মহামারী চিরস্থায়ী ব্যাপারে পরিণত হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। বস্তিগুলির বেশীরভাগ আবার কাজের জায়গার চারপাশে। কলিকাতা শহরের শতকরা ছেষট্টি পরিবারের আয় একশো টাকা বা তার কম হওয়ায় বস্তি ছেড়ে যে অন্য ভাল বাড়িতে যাবে তারও উপায় নেই।

কলিকাতায় নূতন বাড়ি যে হচ্ছে না, তা নয়। কলিকাতা উন্নয়ন সংস্থা অনেক বস্তি এলাকার উন্নয়ন করছে, কিন্তু সে-সব এলাকার জমি নীলামে বিক্রী হওয়ায়, স্থানীয় লোকদের পক্ষে ওইসব এলাকায় জমি কেনা সম্ভব হচ্ছে না। তাছাড়া কলিকাতায় জমির দাম পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী। জমির দাম বেশী হলে গগনচুম্বী বাড়ি করে পড়তা পোষাতে হয়, জমির মালিকানা অপেক্ষা ফ্ল্যাটের মালিকানা অর্জনকে জনপ্রিয় করে তুলতে হয়। জমির মূল্যবৃদ্ধি এবং সবশ-ছুতে নূতন উপনগরী সৃষ্টির পরিকল্পনা সত্ত্বেও বাসগৃহ নির্মাণ সম্পর্কে মান্ধাতা আমলের ধারণা আজও দূর হয়নি। কলিকাতা শহরের বস্তি-অপসারণ সম্পর্কে মাঝে মাঝে কথা শোনা যায়, নূতন বাড়িও ওঠে, কিন্তু তাতে বস্তিবাসীদের অবস্থার কোন উন্নতি হয় নি।

ঘরের সঙ্গেই পানীয় জলের সরবরাহ, ময়লা-জল নিকাশ ও আবর্জনা অপসারণের প্রশ্ন জড়িত। কলিকাতায় পরিষ্কৃত পানীয় জলের অভাবই সংক্রামক রোগ বিস্তারের অন্যতম কারণ। ১৮৬৪ সালে পলতায় পানীয় জল পরিশোধনের ব্যবস্থা ছিল। তখন গঙ্গার জল মিষ্টি ছিল, উপরের স্রোত আসত। কিন্তু তারপর কলিকাতার জনসংখ্যা ও আয়তন বেড়েছে অথচ পানীয় জলের সরবরাহ বাড়াবার তেমন চেষ্টা হয় নি। ফরাক্কা থেকে জলের স্রোত না এলে পলতায় নীচের গঙ্গার জলের লবণাক্ততা কমবে না, জলের সরবরাহও বাড়বে না। এসব সত্ত্বেও বর্তমানে পানীয় জল সরবরাহের

যে-ব্যবস্থা আছে, পৌরসভা ও রাজ্যসরকারের কল্যাণে তাও কাজে লাগানো যাচ্ছে না। পানীয় জলের সরবরাহের অভাবে লোকে কূপ, খাল ও পুকুরের জল ব্যবহার করে থাকে। কলিকাতার ময়লা-জল নিকাশের ভাল ব্যবস্থা না থাকায় বাড়ির ও মর্ষণার ময়লা জল খাল ও পুকুরের জলকে দূষিত করে থাকে। বর্তমানে কলিকাতার ৩৭ বর্গমাইল জল-নিকাশী ব্যবস্থার মধ্যে ১৭ বর্গমাইল অর্থাৎ শতকরা ৪৬ ভাগ খোলা মর্ষণা। ১৮৭৪ সালে কলিকাতায় যখন ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী নির্মাণের কাজ শেষ হলো, তখন শহরের ময়লা জল বিদ্যাধরী নদীতে ফেলা হোত। কিন্তু বিদ্যাধরী নদী বুজে যাওয়ায় ১৯৩৫ সাল থেকে কুলটি নদীতে ময়লা জল ফেলা হচ্ছে কিন্তু ঠিকমত সংস্কারের অভাবে ভূগর্ভস্থ পয়ঃপ্রণালী ও খোলা মর্ষণায় পলি জমে ভরাট হওয়া ছাড়া বানতলা কুলটি খালও ভরাট হতে চলেছে। ফলে সামান্য বৃষ্টিতেই কলিকাতার রাস্তাঘাট আজকাল জলে ডুবে যায়। কলিকাতার জল-নিকাশী ব্যবস্থা অক্ষুণ্ণ রাখবার ব্যাপারে রাজ্য সরকার ও পৌরসভার মধ্যে চুক্তিও কোন কাজে আসেনি। অবস্থা এই হারে চলতে থাকলে বৃষ্টি হলেই কলিকাতার রাস্তায় নৌকো চালাবার দরকার হবে।

আবর্জনা অপসারণের সমস্যা কম জটিল নয়। সি-এম-পি-ও কলিকাতা মহানগরীকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখবার জন্য প্রতি বাড়ি থেকে আবর্জনা তুলবার একটা পরিকল্পনা রচনা করেছেন। কিন্তু আবর্জনা পরিবহনের জন্য এখন যেখানে কমপক্ষে ৩২৫টি লরি দরকার, সেখানে এখন লরি আছে মাত্র ২৭৫টি এবং তারও শতকরা পঁচিশটি অকেজো। বস্তি এলাকা থেকে প্রতিদিন ময়লা অপসারণ করতে হলে আরও ৭২টি অর্থাৎ মোট ৩৯৭টি লরি দরকার। লরির সঙ্গে আবর্জনা ফেলবার আধারের সমস্যাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। খাপাতে আর বেশীদিন ময়লা ফেলা চলবে না এবং পরম দেশে এই ধরণের আবর্জনা ফেলা স্বাস্থ্যের পক্ষেও ক্ষতিকর।

কলিকাতায় জনস্বাস্থ্যরক্ষার যেটুকু ব্যবস্থা আছে, শহরতলির পৌরসভাগুলিতে তাও নেই। আবার শহরকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখার ব্যবস্থা থাকাই যথেষ্ট নয়, জন-সাধারণকে সে ব্যাপারে শিক্ষিত করা দরকার। বস্তির স্যাঁতসেঁতে, অস্বাস্থ্যকর, অন্ধকার পরিবেশে যারা বাস করতে অভ্যস্ত, তাদের পক্ষে রাস্তাঘাট পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখা রীতিমত কঠিন।

কলিকাতার চাপ কমাবার জন্য শহরের বাইরে লোক ছড়িয়ে দেওয়ার কথা উঠেছে। সরকারী পরিকল্পনা ছাড়াই হাওড়া ও শিয়ালদহ লাইনের শহরতলি রেলপথের দুই ধারে সমান ভাবে নূতন নূতন উপনগরী গড়ে উঠেছে। এইসব এলাকায় নাগরিক সুখ-সুবিধা তো নেই-ই, উপরন্তু প্রতিদিন কলিকাতা আসতে গিয়ে তাদের চরম দুর্ভোগের সম্মুখীন হতে হয়। হাওড়া ও শিয়ালদহ স্টেশন থেকে রেলপথে কর্মস্থলে পৌঁছাবার ব্যবস্থা করবার কথা ১৯১৪ সালে উঠেছিল, কিন্তু চক্রবেড় রেলপথ স্থাপন নিয়ে আজও সমানে ধামা-চাপা দেওয়া হচ্ছে। হাওড়া ব্রিজের উপর চাপ কমানো ছাড়া প্রতিরক্ষার প্রশ্নও গঙ্গার উপর অনেকগুলি সেতু নির্মাণ করা দরকার। দ্বিতীয় একটি সেতু নির্মাণের ব্যাপারে আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অর্থ সাহায্য করতে চাইলেও, সরকারী টাল-বাহানার ফলে শেষ পর্যন্ত কী ঘটবে, কিছুই বলা যায় না।

কলিকাতার উন্নয়ন নিয়ে আজকাল আলোচনা হচ্ছে, এটা খুবই আশার কথা। বিদেশী বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে সি-এম-পি-ও অনেক পরিকল্পনাও রচনা করেছেন। কিন্তু পরিকল্পনার অভাব এদেশে তো কখনও দেখা যায় নি। পরিকল্পনাকে কার্যকর করতে হলে নূতন ধরণের লোক দরকার, নেতৃত্বও নূতন হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন এই উন্নয়ন-প্রচেষ্টার সঙ্গে জনসাধারণের সক্রিয় সহযোগিতা। দুঃখের বিষয়, এ ব্যাপারে সরকার বা রাজনৈতিক দলগুলির এখনও তেমন নজর পড়েনি।

"KUMAR"

Sluice Valves, Large Diameter Pipes and Specials,
Reflux Valves, Air Valves, Pressure Relief
Valves are in service throughout India.
Kumar's Products Maintain the Highest
Standards Consistent with the
Company's Engineering
Experience

●

KUMAR ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED

P-52, BENARAS ROAD, HOWRAH
Phone : 66-2545

রজনীকান্ত সেন

অপ্রকাশিত কবিতা

ও ভাই চাষী, কি কসুরে আকাল হলো দেশ জুড়ে
ভাবছি বসে তাই
হলো চালের বাজার এমন কসা
কি খেয়ে আর বাঁচবি ভাই।
সবারই সমান দশা,
ঘরে আর ধানের গন্ধ নাই।

সত্যি কথা এই নাকি —
জোত আছে যার সাত পাখি
তার ছয় পাখি হয় পাট ;
সেই পাট বেচে ভাই ধান কিনে খাও,
মহাজনের সুদও চাই
সবাইকে দিয়ে থুয়ে
চলে না রাজার খাজনাই।

কথা যদি না শোনো,
ধান যদি আর না বোনো,
কর শুধুই পাটের চাষ।
ধান পাবি আর কোন দেশে
যেতে হবে পাট পাতাই—
বুদ্ধিটি শেখালে কে
আহারে, বলিহারি যাই।

ওই অভাগা পাটের জ্বালায়
ধানটা যদি মরে যায়
তো বুঝ্‌ছ কি হবে—
দশ টাকা মণ ধান বিকোবে
এতে কিছু সন্দ নাই,
তখন কি সোনা খাবে
বল্‌ব কি মাথামুণ্ডু ছাই।

দেখ পাটের জাগের এই তো ফল,
নষ্ট হলো দেশের জল,
তার গন্ধ কি দারুণ।
তাই ছেলে পিলের রোগ সারে না,
পিলে হয়ে পেট বোঝাই।
এ সব কি মিথ্যে কথা
কে শোনে, কাহারে শোনাই।

কান্ত বলে ভাই চাষি,
কর্‌ছ কি সর্ব্বনাশই,
এই পাটের আবাদে,
ধানটা ঘরে থাকলে মজুত
আর কিছুরই ভাবনা নাই
তুলে দাও পাটের আবাদ
তোমাদের গাঁচ পীরের দোহাই ॥০

[০ ১৯০৮০ সালে পাটক্ষেত থেকে ধানের একটি পরিকল্পনা হয়। সেই সময় এই কবিতাটি লেখা। কবিতাটি কাহকর্তার কন্যা শ্রীযুক্তা তৃপ্তি দেবীর সৌজন্যে ও শ্রীযুক্ত সুশীল রায়ের কল্যাণে প্রাপ্ত। কবরী চিত্রের বিষয়টি কৃতজ্ঞ। ঃ সঃ]

কাছে দূরে

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

মুখখানি যেন ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুনি
দু অধরে চেপে চাঁদ এক ফালি
নেমে গেল এক্ষুনি

তার দুটি আঁখি খঞ্জন পাখি
ঘুরে কাছে ঘুরে নাচে
এই আছে এই নেই আছে নেই
ঘুরে কাছে ঘুরে নাচে

নেমে গেল এক্ষুনি

হাওয়া বারে বারে আঁচল সরায়
হাত বারে বারে ঢাকে
হাত খালি হলে আঙুল জড়ায়
সবুজকে পাকে পাকে

ঝুঁকে প'ড়ে চোখে চূর্ণ অলক
যেন চায় প'ড়ে নিতে
শ্বেত পাথরের স্মৃতির ফলক
ধরণিকন্যা চারিভিতে

নেমে গেল এক্ষুণি

পথচারণায় ঘুরে নিয়ে যায়
তার কায়া তার ছায়া
দু চরণে বোনা যাব কি যাব না
ও বনে ও যৌবনে

থাকতে দেখি নি চেয়ে অকপটে
তার সে মুখচ্ছবি
দেখি আকাশের প্রসন্নপটে
ছাপা সে মুখচ্ছবি

নেমে গেল এক্ষুণি
ট্রেন খালি ক'রে ভোরের শেফালি
নেমে গেল এক্ষুণি

অঝোরে নেমেছে বৃষ্টি

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অঝোরে নেমেছে বৃষ্টি
বর্ষারাতে
জ্যোৎস্নার সর্বাঙ্গে ঘিরে
কালো মেঘ আর স্মৃতিগুলি
কান্নায় আলোয় অন্ধকারে
নিরাভরণ,

চারিদিক গভীর তমসা মনে হয়
অথচ আলোর নদী প্রবাহিত, অথচ পাষাণ
প'ড়েছে, বিধবা রাত্রি
অঙ্গের বসন ছুঁড়ে দিয়েছে দিঘির জলে

কিন্তু তার জল ভরবার কলস হারিয়ে গেছে।

পঞ্চাশে পা দিয়ে

গোপাল ভৌমিক

এক এক করে দেখি
পঞ্চাশ বছর
প্রায় অতিক্রান্ত আজ,
ভাবলে বিস্মিত হতে হয়।
কোথা দিয়ে কেটে গেছে সংগ্রামী সময়
প্রায় তার কিছুই বুঝি নি।
কয়েক হাজার দিন
কয়েক লক্ষ ঘণ্টা
এবং কয়েক কোটি মিনিট ও সেকেণ্ড
এই পৃথিবীর বুকে কাটিয়েছি :
অথচ বিস্ময় চোখে আছে
ভাবলে নিজের কাছে
নিজে বড় হই।
পৃথিবীকে ভালবাসি সত্য কি এতই ?

শুভার্থী বন্ধুরা ভাবে,
উপদেশ দেয় আরও বেশি :
সময়-চেতনাহীন আমি বলে
এ দেহের সব মাংসপেশী
চিরদিন রবে কি সবল ?
হাতে পাতে কিছু নেই
তবু যে এ বেলাজ ওজন
বুঝি সেটা মনঃপূত নয়।
অথচ উপায় নেই
হাহাকার করে না হৃদয়।

প্রতি ক্ষণ প্রতি পল
উপভোগ করে বেঁচে থাকা
মূল্য তার কম কিসে ?
নিঃশব্দে কখন ঘোরে সময়ের চাকা,
কখন মাথার চুল হয়ে গেল সাদা
তা নিয়ে দুশ্চিন্তা নেই
মনে নেই কণামাত্র ক্ষোভ ;
যেহেতু হৃদয় জানে বাঁচার বৈভব।

বিশ বছর পরে, গ্রামে

অরুণকুমার সরকার

খামারে ধান নেই, পুকুরে মাছ নেই,
বাগানে একটি বৃন্তচ্যুতও ফলে না।
পথঘাট শূন্য, মন্দিরে রুগ্ন কুকুর-ছানা।
স্ত্রীপুত্র পরিবার নিয়ে অনেকেই শহরে চলে গেছে,
কেউ কেউ যেতে যেতে মাঝপথে রক্তবমি করেছে।

যে-কয়েকজন এখনও বাস্তুভিটে আঁকড়ে পড়ে আছে
সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালাচ্ছে তুলসিতলায়
তারা ঠিক জীবন্ত মানুষ নয়
তাদের মধ্যে কোনো প্রতীক্ষা নেই
তারা অন্য এক যুগের প্রেতাত্মা।

এইখানে একদিন আমি অনেক মানুষ দেখেছিলাম
এইখানে একদিন আমি অনেক অনেক মানুষ দেখেছিলাম
ফাল্গুনের উৎসবে রক্তে ঢেউ জাগানো মাদল শুনেছিলাম
বীররসের আস্বাদ পেয়েছিলাম যাত্রাগানের আসরে।
যারা নতুন সেতুনির্মাণের স্বপ্ন দেখেছিল
কোথায় তারা আজ ? কোথায় ?

শুকনো পুকুরে কলমীলতার ঝোপে একটি কৃষ্ণবর্ণ সাপ
মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে।

পাখিরা আসে না আর

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

বহুকাল পাখিও দেখি না। কিছু শালিখ চড়ুই
কখনো কখনো। যদি বাহুল্যকে বলো কোনো পাখি,
তাহলে অবশ্য দেখি প্রতিদিন সকালে দুপুরে,
সুতীক্ষ্ণ কর্কশ ডাকে মগডালকে বিখণ্ডিত করে।

অথচ প্রকৃতপক্ষে কোথাও পাখির মেলা নেই,
কোথায় কখন তারা উড়ে গেল নিঃশেষ আড়ালে।
সবুজ ঘুঘুর টিয়া, কোকিলের চোখ, কাকাতুয়া
পিতাপিতামহদের গ্রামে তাঁরা দেখতেন কেন
সকালে বিকেলে। রোজ পাখিপাখালির ডাকে

উঠতেন খুব ভোরে, দূর মাঠে প্রভাতী ভ্রমণে
নিজেকে নিমগ্ন রেখে উদাসীন মুক্তরম্যতায়
মুগ্ধ হওয়া যেত কিছুক্ষণ। লাল নীল সবুজ কালোয়
অভিসিক্ত পাখিরাও সাড়া দিত প্রতিবেশী গাছে।

কোথা থেকে এসেছিল ঝাঁক বেঁধে মনেও পড়ে না।
সমুদ্রের দিক হতে অরণ্য আদিম থেকে এসে
গ্রামের নির্জনে তারা ছিল যে সান্নিধ্য ভালোবেসে
পিতাপিতামহদের দেশে। অকৃত্রিম মানুষের কাছে

হয়তো আদরণীয় ছিল তারা, হৃদয়ের অন্তরঙ্গতায়
তখন পাখিরা সব মানুষের আত্মার শরিক।
তারপর কেন তারা অরণ্যে সমুদ্রে গেল উড়ে,
অমৃত কখন হলো দুরন্ত নীলাভ গভীরে

সে খবর কেউই রাখি না। এই রক্তঝরা দিনে
পাখিরা আসে না আর এমন কি বলতে জানেন ॥

যখন ঘুমাতে পড়ি

মেধাময় ভট্টাচার্য

যখন ঘুমাতে পড়ি শিয়রে বিষাদ একা জাগে।
আমার তৃষ্ণার মত রাত্রি আর আকাঙ্ক্ষায় বিনষ্ট সকালে
কমল বিষাদ একা পাশে আছে—অবিকল আশার মতন।
সারাদিন মুখোমুখি, সারারাত তৃষ্ণা ও মৃত্যুর থেকে ডেকে
যখন নিজের ভাষা বলতে চাই অন্ধকারে অস্ফুট নির্গত
আমার সকল শব্দ চাপ-চাপ রক্ত হয়ে যায়।

নিজের ছায়ার হাড় মাংস চেটে মজার নুনের স্বাদ পাই,
কেবল পাই না হাতে বিষাদের মাসুদ শিকড়; যা আমার
লাকানো জঠরপিণ্ড থেকে প্রাণরস শুষে নেয় জোঁকের মতন
আমার শরীরে তার অন্ধকার তামস প্রণয়চিহ্ন রেখে
স্বর্গের সুবাস নিয়ে কিছুক্ষণ বিকশিত শেফালির মত
পার্শ্বিব রমণী এসে ফিরে গেছে—মৌন ঠোঁট বিষণ্ণ কম্পিত

তাহলে আমি কী কোনো অভিশপ্ত নির্বাসিত প্রেত?
চামড়ার বর্ম এঁটে মানুষের ভিড়ে এই কলকাতায় ঘুরছি
নয়
যে কেউ তোমার জন্যে বায়ু জল নক্ষত্র ও পৃথিবীর কাছে
থাকতো আকণ্ঠ ঋণী; তবে কেন আমার এ প্রস্তর-আঙুলে
বারংবার নষ্ট হয় রমণী তোমার
অশ্রুর জরায়ু থেকে নবজাত উজ্জ্বল নবীন ভালোবাসা!

হিমবহ্নি

অশোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

যেহেতু সমস্ত দিন বিনষ্ট দুর্দিন হয়ে গেল,
কোথাও পাবার কিছু নেই,
কোথাও দেবার কিছু নেই,
সব রাস্তা কর্দমাক্ত যুবকবৃন্দের আক্রমণে
অব্যবহারের উপযোগী ;
হাতের কাণিশে যদি ভয় করো সন্দেহ করবে
ভোগবতী ভাগীরথী ;
আর তুমি ? তুমিও কি আমাকে সন্দেহ করো ? তুমি
একযোগে ভ্রাতা বন্ধু ভগিনী আমার
হে অনন্তা, নগরের বাসীতে তোমার কৈশোর
কলস ভরতে গিয়ে কী পেয়েছো সত্য ক'রে বলো।
কী আর পেয়েছো তুমি ? কিছুই পাও নি, তাই বলে
চোরের মতন কেন সংগোপনে একাকী
উঠোনে দাঁড়িয়ে আছো, কাছে এসো, শৌখিন চলনা
খুলে ফেলো,
তোমার ভুরুর নিচে আমাকেও কিছু দিতে দাও।

মাধুর

মণিভূষণ ভট্টাচার্য

দিনগুলি পেকে উঠেছে শীর্ণ ফলে
ক্ষুণ্ণ তনুখানি মনে হয় বিবর্ণ
পরিখেয় নিয়ে রাত্রি গিয়েছে চ'লে
পাহাড়ে পাহাড়ে ভেঙেছে সোনার রথ।

এ যে দেহময় বিফল কুমারীব্রত,
বলো, কার বর ওপরে ওষ্ঠ চাপি,

ক্ষুধা তিথিতে তৃষ্ণার উপগত
চন্দ্রের দিকে বন্ধ করেছি ঝাঁপি,
খুলবো না আর পোড়া পূর্ণিমা রাতে,
বন্ধ বলবো খসে-পড়া তারাটিকে
এবং ভিজবো পৌষ অশ্রুজলে
নানা ঘটনায় রটে যাব সারাদিকে
শুধু একবার প্রখর নখরাঘাতে
জলকেলিহীন যমুনা উঠুক কাঁপি।

লোকমুখে শুনি কংস রয়েছে বধ,
আমাদের, বলো, তাতে কিবা যায় আসে
দিকে দিকে এলো চিবুকে বজানো মদ
কে যেন পবনে কিছু ব'লে চ'লে যায়
নিখিল বিরাগে চিত্ত কঠোর যেন
শাঁখ বেজে ওঠে ঘোরতর সন্ধ্যায়
ঘন হয়ে আসে বাহিরের ভালপালা
এত সব শোভে, মধুরা শোভে না কেন।

দু'দিকে শুভ্র রজনীর দুই তীরে
মধ্যে যমুনা কলহাস্যিক রতি
সঞ্চীয়া শুয়েছে স্থির যামিনী ঘিরে
কাননে কাননে জোৎস্নার ঝলমতি।
মনে পড়ে সখা, অলিত সে শিখীচূড়া
কুড়িয়ে এনেছি পীড়নের অবকাশে
ওষাল তিমিরে ফিরে যায় বন্ধুরা
সারা বুক জুড়ে দ্রুত বেলা প'ড়ে আসে।
এখন শোণিত শরীরের পীতাম্বরে
হলুদ অস্থি ছড়ানো দীর্ঘ পথ
কণিষনসার পাথরে ও কঙ্করে
ভেঙে পড়ে আছে তোমার সোনার রথ।

বিমূঢ় সাঁতার

প্রণবেশ দাশগুপ্ত

বিমূঢ় সাঁতার ছাড়া
আর কোনো খেলা নেই ব'লে
বিমূঢ় সাঁতার কেটে চলি।
ঝুঁকে বুক-পিঠ-হাতে
জল ঠেলবার শুধু কথা আছে,…
জল ঠেলে
ঘরে ওঠবার কোনো কথা জানা নেই।

মাঝে মাঝে, হঠাৎ প্রবলভাবে
ভাসি ব'লে, কিছু আর
বুঝতে পারি না।
তুমি নিস্ দিয়ে বুঝি
সব কিছু তোলপাড় করো!
তুমি বালকের বলে দিয়ে
আবার যাবার পথে কোলাহল করো।
নাকি প্রবল বিরহ হেনে
আমাকে বাঁধাও,
যাতে আমি চলতে না পারি!

শুধু যা ভীষণভাবে বাধা দেয়,
তাকে আমি
অবহেলা করি।
আমি পূতনার স্তন
দুইহাতে ছানি, শুধু
মরতে পারি না। শুধু
বিমূঢ় সাঁতার ছাড়া
আর কোনো খেলা নেই ব'লে
বিমূঢ় সাঁতার কেটে চলি।

স্মৃতির শব্দ

সুনীল বসু

বহুদিন পর এলরা পাউণ্ড
বহুদিন পর এলরা পাউণ্ড
স্মৃতির ভিতর, বুঝি রক্তের ভিতর
ডাকছে ব্লাড-হাউণ্ড
স্মৃতির ভিতর, বুঝি রক্তের ভিতর
ডাকছে ব্লাড-হাউণ্ড
মাথার ভিতর, বুঝি রক্তের ভিতর
ডাকছে ব্লাড-হাউণ্ড
মাথার ভিতর, বুঝি মাথার ভিতর
মাথার ভিতর, বুঝি মাথার ভিতর
গুলী চলল কয়েক রাউণ্ড
বহুদিন পর হায়
বহুদিন
বহুদিন পর হায়
এলরা পাউণ্ড
কেন কেন তুমি তুমি ভরোথি লামুর
কেন কেন তুমি তুমি ভরোথি লামুর
কেন কেন তুমি ছেলেবেলা
কেন কেন তুমি করো খেলা
কেন কেন ওঠে নয় ছুরি
ভরোথি লামুর করো খেলা
হেমিংওয়ে
রক্তের ওপর দিয়ে যান ঘরে
রক্তের ওপর দিয়ে
রক্তের
হঠাৎ গুলির শব্দ
হঠাৎ গুলির শব্দ
হঠাৎ শুদ্ধ
হঠাৎ হঠাৎ হঠাৎ।

অদ্ভুত খেলা

গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

জন্মতারুণ্যের খেলা বিষাদে সংহত হতে পারে।
তোমার তারুণ্য হয়তো প্রস্তাতীত ; হয়তো তুমি নিলে
বৈষয়িক সূত্রগুলি পরখ করেছ, আর পাওনি কোনো ভয় ;
শুধু সব সময় হাওয়ার চিৎকার শুনে অন্ধকারে
কিছুই তো দেখা যায় না ; গেলেও, মনটা ফেরে ভিজে
দেশলাই হয়ে ; কিন্তু তুমি জানো, অন্য হাওয়া বয়
দেশে, কালে ; তুমি জানো, দেবদারু-পালের সীমানায়
মৃত্তিকার ভাঁজে হাওয়া পাক খেয়ে আবর্ত এঁকে যায়।

সমুদ্রে উঠেছে ঝড়। জাহাজের খোলে, পাটাতনে,
মাস্তুলে ঝড়ের নক্সা ; দিগন্তের আকাশকে চিরে
যে-বিদ্যুৎ-কলা, তাতে শয়তানের ভয়, সর্বনাশ।
সামনে শোণাবহ ছবি - গ্রামে গ্রামে, নগরে, পত্তনে,—
অনাস্থা, উদ্বেগ, দৈন্য ; তুমি একটা চড়ুইকে ঘিরে
খেলা করছো ; ওপরে উঠছে মানুষের মনে অবিশ্বাস।

খালাসী ইব্রাহিম শেখের মৃত্যুর পর

দুর্গাদাস সরকার

অবশেষে গ্রামে এল ইব্রাহিম শেখের খবর।
দূরস্থ সাগর থেকে কোনো দিন এসে ইব্রাহিম
ঘরের চৌকাঠে আর দাঁড়াবে না মা—বলে।
সব শূন্য : জাহাজ, মেসিনঘর, বয়োপসাগর।
দেরালে হিসেব কষা সেই কবে—চাল, ডাল, নিন।
উঠনে মুঁ দিচ্ছিল বৌ টাকা এলে চাল ফুটবে জলে।

রক্তের নদীতে কা'রা জলপান করে শুধু আজ!
একটি জাহাজ এসে ছাড়া হয় আর এক জাহাজ।
আবার আহাজ এসে থামলো এই বন্দরের গায়ে
ঠেস দিয়ে। খালি পেটে কুলি সব জাহাজের খোলে
চালে চাল। প্রপেলারে কেউ দেয় দুই হাতে রঙ।
দুন মেখে খায় পোড়া রুটি। কাঁপে ওরঙ-হিলোলে।
তারপর সে ডুবায় সব কিছু সমুদ্রে বন্দর॥

অপেক্ষা

সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত

কেন এমন অকস্মাৎ ডেকে উঠলে পেছন থেকে ?
আলো সময় হয়নি যাতে এমন করে পেছন ডেকে
তুমি আমার গ্রীবা, কী তার কোনো সহজতর শাস্ত
স্বরবর্ণ বা ব্যঞ্জনবর্ণে স্থির করে যাক
করে তুলতে পারো। এখন আমার ঠিক সামনে গাঢ়
নীল বিশাল জলযাত্রা ; সে সময়হীন জলযাত্রাও
এক জাহাজ দেখিয়ে খুব গোপনে যেন আমাকে কিছু-
বলবে বলে কাছে টানছে। ঠিক তখনি, কেবল পিছু
থেকে আমার নামটি কেন ব্যবহারের ফলে সবল
প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করো। আমিতো জানি কোথাও জল
বা তার নীল, অঙ্ক থেকে গভীর হতে পারে না ; হায়
যৌবনের ছয় দিনগুলি ; বিদায়, কেন বিদায়
এই শব্দটী সঙ্গে ভালবাসার চতুর্দিকে
জমে উঠতে থাকে কুয়াশা। যখন আর কোন পাখিকে
বলা যায় না ফিরে এসো হে স্বাধীন, নীল শূন্য ঘিরে
ফিরে এসো। যে আঁধার আজ তারার মতো টুকরো হীরে
হয়ে উঠতে চাইছে, তুমি বাধা দিওনা তাকে

এইভাবেই জন্মতে হয় যৌবন ও অপেক্ষাকে।

অনুলিখন

মানস রায়চৌধুরী

কেন এত সাম্প্রতিক অন্ধকার আকাশবাতাস করে প্রতিক্ষণ জীবনে আমার
যেন চিরন্তন শ্রাবণের ছায়া নেমে আসে রুক্ষ, উদাসীন কান্নারে বিজনে পাথুরিয়া
সন্ধ্যার বিপুল আর্তি—শতাব্দীর গরুর গাড়ির একটানা পাঁচালীর
অপরিবর্তন আভা আনে মুখে শ্রাব্যমাণ শ্রাবণ মেঘের
চির আকুলতা চির অনগ্রসরের মুক্ত প্রতিচ্ছবি রুগ্ন আবেগের—

আমার সার্থক্য কোন মন্ত্রে স্পষ্ট হবে জানা নেই
মন্ত্রবারি পূর্ণ করে গোপন মদির পানীয়েই
অথচ নিসর্গ জুড়ে "দেদ দেদ আলু" এই ঘোর আর্তনাদ
মন্ত্রে কোন স্বাধীনতা ছিল ? ছিল কোন মৌল স্বাদ ?

মাঝে মাঝে এই সব ভুলে গিয়ে তোমাদের চুলবাঁধা দেখি একমনে
দেখি চিরুণী লাঙলে চলে ওই মেঘধননের পরিহাস
বিপুল আলস্যে লাগে এপারওপার করা বৃষ্টির উচ্ছ্বাসে
বানানো বস্তুতে হাত ছুঁয়ে রেখে মনে হয় এর-ও গহনে
উদ্বেগ অনেক ছিল, বাঁচবার সাম্প্রতিক ঘোড়ার লাগাম অভিমুখী
শিল্পের গূঢ়তাময় ইচ্ছা, লোভ, অভিপ্রায় প্রচণ্ড অসুখী।

ইচ্ছাহীন থাকা বেত্র পাথরে নিস্পৃহ রেখে সাধ অভিলাষ
সমস্ত দুপুর ওঠে রৌদ্রময় ধাপ বেয়ে দুঃখী সিসিফাস
যখনই গড়ায় সব সাফল্যের আয়োজন, সফল ইত্যাদি রাশি রাশি
তখনই নিজের কেন্দ্রে ধানভাঙা ঢেঁকি ওঠে বাঁশি
কিসে হবে অভিযান, কার কাছে আর্তনাদ, কোন সাম্প্রতিক অন্ধকারে
ফিরে আসতে হয় সেই অভিজ্ঞতা আয়ুতে শিরায় বারেবারে।

অরণ্য আমাকে জানে

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

অরণ্য আমাকে জানে—আমি তার অতিথি এখন
ছদ্মবেশ খুলে রেখে, খুলে রেখে ঘুরে ছদ্ম মন
আমি তার কাছে গেছি, তার বুকে, তার লোকালয়ে
সেখানে দেখেছি বৃদ্ধি, নাশ বীজ করে ও অক্ষয়ে।

তুমি কি দেখেছো কোনোদিন কোনো অরণ্যের ফাঁকে
থাকে তুমি চেয়েছিলে তার পদচ্ছাপ পড়ে থাকে—
সে নেই! কোথায় আছে? এই অরণ্যেই ঘুরে ঘুরে
নানা খোঁজ পাবে তার—সাহচর্য পাবে কাছে-দূরে।

আমি তো এভাবে পেয়েছিলাম তাহাকে সারাদিন
সন্ধ্যায় ফিরেছে ঘরে—পথ ভালো লাগেনি বেহেতু
আমি তো অরণ্যে বসে অরণ্যেরই লক্ষ্মীশ্রীর সেতু
উপভোগ করে গেছি—ভোর, গায় ঘুঙ্গো মুহূর্মুহু।

এবার আসে নি দিনে, বুঝি ব্যস্ত আরণ্য খামারে
সেখানেও শস্য আছে, অন্নমৃত্যু আছে একই দ্বারে!

প্রথাবদ্ধ

নচিকেতা ভরদ্বাজ

প্রথাবদ্ধ সময়ের দাস হতে চাইনি কখনো;
মুগ্ধ এই পলাতক অন্ধকার বুকে করে চৈতন্তে ধাওয়াল
জ্যোৎস্নার অভিসারী হতে গিয়ে শোনো
করুণ বিলাপী কণ্ঠ যৌবনের: ভেঙেছে দাঁড়াল;
হাল, পাল ছিঁড়ে গেছে—রশি।
হাওয়ার প্রদক্ষী বৃত্তে শুনি সেই অভিচারী ঘুণ
আকাঙ্খার অন্ধকার ধ্বনি না প্রাবণী।

সস্তা নিলামে শেষে ভাঙা নৌকা বিক্রী করেও
সংসার চালাতে হবে, টেনে রাখতে হবে জমিজমা।
চক্রবৃদ্ধি সুদ বাড়ে, দিনকাল বড় আহাম্মক—,
অতএব পথ চলতে অজস্র প্রশ্ন দংশেও
মেনে নিতে হবে সব; ক্ষুধা-তৃষ্ণা-ভয়ের তাড়না
জন্ম-মৃত্যু-অহংকার—সব কিছু আনন্দ-অশোক
হয়ে উঠতে পারে ভেবে কারবার চালিয়ে যেতে হবে।
অথচ জীবন যুদ্ধে অভিমন্যু সপ্তরথীর
ফুলত সংহার হবে; কীর্তনিয়া বানাবে বাদল।
মহাভারত পূর্ণ হবে অষ্টাদশ পর্বের গৌরবে।

হে কাল, হে মহাকাল, অনিরুদ্ধ সময়ের জল
ছুঁই তীর পরিপ্লাবি' অতএব বালাও গম্ভীর
তোমার বিবিক্ত তূর্য; সমস্ত সংঘাত উৎসবে
পরিণত হয়ে যাবে। তোমার আকাশ,
আশ্চর্য সম্রাস্ত আলো, মেঘ, বৃষ্টি, হাওয়ার চারণা,
নদীর নির্বাণ, নীড়,
ষাঠতরা স্নিগ্ধ ফসলের
আতিথ্য সংলাপী দিন প্রশ্ন, শান্তি, সন্ধির বিশ্বাস
ফিরে যেবে অন্ধকার প্রচলিত প্রসন্ন ধারণা,
স্বর্ণ-শিশু গৃহ নিয়ে তুমিও মুক্তির
অন্তর্গত হয়ে যাবে। আর কোনো প্রশ্ন, বাধা, অসুখ
থাকবে না।
মানুষ এমনি করে শোধ করে সময়ের দেনা।

রুপালি মানবী

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

রুপালি মানবী, সন্ধ্যায় আজ শ্রাবণ ধারায়
ভিজিওনা মুখ, রুপালি চক্ষু, বরং বারান্দায় উঠে এসো।
ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার, জানলা বন্ধ দরজা বন্ধ
রুপালি মানবী তালা খুলে নাও, দেয়াল বোতাম আলো জেলে নাও,
অথবা অন্ধকারেই বসবে, কাচের শার্সি থাকুক বন্ধ
দূর থেকে আজ বৃষ্টি দেখবে, ঘরের ভিতরে বেতের চেয়ার তালা খুলে নাও।

চাবি নেই, একি! ভালো করে ভাখো হাত ব্যাগ, মন
অথবা পায়ের নিচে কার্পেট, কোণ, উঁচু করে উঁকি মেরে নাও
চিঠির বাক্সে ভাখো একবার, রুপালি মানবী, এত দেরী কেন?
বাইরে বৃষ্টি, বিষম বৃষ্টি, ঝড়ের ঝাপ্‌টা তোমাকে জড়ায়
তোমার রুপালি চুল খুলে দেয়, চাবি খুঁজে নাও—
তোমার রুপালি অসহায় মুখ আমাকে করেছে আরও উৎসুক
থাকা যায়ো না! আপনি হয়তো দরজা খুলবে পলকা ও তালা
অমন উতলা রুপালি মানবী তোমাকে এমন হওয়া মানায় না
অথবা একলা হয়েছো বলেই বৃষ্টি তোমাকে কোনো ছলে বলে
ছুঁতে পারবে না, ফিরবে না তুমি বাইরে বিপুল লেলিহান ঝড়ে
তালা খুলে নাও।

রুপালি মানবী, আজ তুমি ঐ জানলার পাশে বেতের চেয়ারে
একলা বসবে আঁধারে অথবা দেয়ালে বোতাম আলো জেলে নাও
ঠাণ্ডা কাচের শার্সিতে রাখো ও রুপালি মুখ, দুই উৎসুক চোখ মেলে দাও

বাইরে বৃষ্টি বিষম বৃষ্টি, আজ তুমি ঐ রুপালি শরীরে
বৃষ্টি দেখবে প্রান্তরময়, আকাশ মুচড়ে বৃষ্টির ধারা··· ···
আমি দূরে এক বৃক্ষের নিচে দাঁড়িয়ে রয়েছি, একলা রয়েছি,
ভিজেছে আমার সব শরীর, লোহার শরীর, ভিজুক আজকে
বাজ বিদ্যুৎ একলা দাঁড়িয়ে কিছুই মানি না, সকাল বিকেল

খরচোখে আমি চেয়ে আছি ঐ আকাশের দিকে, কাচের এ পাশে
যতই বাতাস আঘাত করুক, তবুও তোমার রূপালি চমু—
আজ আমি একা বৃষ্টিতে ভিজে, রূপালি মানবী, দেখবো তোমার
বৃষ্টি না-ভেজা একা বসে থাকা।

●

অকৃত শৃঙ্খল

শান্তশীল দাশ

[illegible]াব চারিদিকে, এর ওর যার পানে চাই :
[illegible] হারিয়ে গেছে, ভবিষ্যৎ কারো চোখে নাই।
[illegible]তে বর্তমান টেনে টেনে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে
[illegible] কি চলছে না। অথচ কী আড়ম্বর নিয়ে
[illegible]শন চলে রোজ শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে—
আমরা এগিয়ে চলছি। বিক্ষোভ জমে থরে থরে।
যে-কোনো কারণ নিয়ে সে বিক্ষোভ ফেটে পড়ে, আর
চারদিকে ভয়াবহ মারামারির সৃষ্টি করে ; তার
[illegible]খে ভয় জাগে। পুঞ্জীভূত ঘন অসন্তোষ
[illegible]ছাড়া পায়। কী দুর্দম অনমনা সে রোষ!
নিজেকে নিঃশেষ করে দিতে চায় বুঝি সব কিছু :
আত্মপ্রেম, দেশপ্রেম—সসঙ্কোচে মাথা করে নীচু।
[illegible]ন চাইনিতো, কেন এই বীভৎস জীবন ?
[illegible]কি ? তা তো নয়। এ তোমার আমার সৃজন।

সোনার পুতুল তুমি

মঞ্জুলিকা দাশ

বোধের পুতুলে কিবা প্রমদে, ও ঘুমে
নবনীত যতো তুমি হও,—যাও ভুলে
সামান্য আঘাতে দ্রুত,—প্রস্তুতি নিয়েছি
হাতে তীব্র দুঃখ দিতে,—অস্থির দেখেছি
চোখে, তোর দু'চোখের তারা কেঁপে যায়
সূচী নয়, শেলবিদ্ধ সামান্য কথায়।
ভাবতে ভীষণ ভয়, সুতীব্র আঘাত দিলে কী যে হবে
তোর,—
ললাটে চিহ্নিত দেখি ভয়ঙ্কর যন্ত্রণার ঘোর
আমি দু'হাতের স্পর্শ দিয়ে মুছে দিতে
ভয় পাই পাছে, পাছে সমাদর লেগে তুমি গলে যাও
সোনার পুতুল তবে সেই ভালো বুকে এস,—
আনন্দের অদ্ভুত লগনে
তোমার দেবোনা দুঃখ, যত খুশী পারো তুমি খাও।

বুকের মধ্যে

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বুকের মধ্যে বুকের মধ্যে
চন্দ্রমা পিছিল
আলোকলতা,
বুকের মধ্যে অতন্দ্র নদিল।

বাইরে কোঠাবাড়ির টুকরো আকাশ জেগে
পরম নিরঞ্জন
শাদা-কালোর বহির্ভূত নীরব সত্যে
সন্ধ্যাবেলার আলোয় আগায় থেকে থেকে
আত্মসমর্পণ।

ধুলোর মধ্যে ধুলোর মধ্যে
চন্দ্রমা পিছিল
আলোকলতা—
ধুলোর মধ্যে অদাধারণ মিল—
ধুলোর মধ্যে আর্ত নির্বচন—
নিটোল নিস্পৃহতা।

সামুদ্রিক আলো জ্বলে

শান্তি লাহিড়ী

শোনোনি, কোথায় বাজে করুণ সানাই।

শেষ ট্রেন ছেড়ে চলে গেছে, জেগে একা হিসাব মেলায়
ইস্টিশনে মাস্টার মশাই।
—'জনের আপন জন কোন ঘরে নাই।'
ঘন্টার তুমুল শব্দ। পার্শ্ববর্তী খোলার চালায়
শিশু কাঁদে,
উকতায় পিতা তার হয়েছে শরীক।

পঙ্কর গাঙ্গীর নীচে মোল খায় শঙ্খনের কালি,
ঘর নাই, ঘর নাই—যত ভাবি একথা কেবলি,
জোনাকির ফসফরাস ডানা মেলে চোখের ওপর
মেলি সবদিক ফাঁকা, পড়ে আছে এক আকাশ ঘর।

এসব সত্ত্বেও মৃতদিন তাৎক্ষণিকের মাঝীদার
আলাতে জ্যোৎস্নার বাতি পুড়ে হয় কেবলি অন্ধকার।
কেবলি অদৃশ্য পোড়ে
শোধার ঘাটের কাছে, সামুদ্রিক জীর্ণ বাতি ঘরে।

দশ মাইল সফর

শংকরা নন্দ মুখোপাধ্যায়

দশ মাইল জুড়ে বৃষ্টি কত যে বিচিত্র পরিবেশে…
শাড়ির আঁচল কে বাঁচায়, পথে কাদা, কোনখানে
মাঠে বড় বড় গাছ সারাক্ষণ ভেজে ;
আমার ঘরবাড়ি নেই, দালাশ্রিত বৃষ্টির মতন
অনুভব সারা গালে চিঠির খামের মত বন্ধ করে কেউ
রাখে নি কৌটোয়—এই সব কথা বলি-বলি করে
অনেকক্ষণ জল্পনাকল্পনা যেন করে সেছি
ঠোঁটে হাত রেখে একা, যদিও ঠোঁটের অনুভব
কলসে গেছে ভীষণ আগুনে সারাদিন…
শিস হয় না গান হয় না বাঁশি তাও রাখি কোনখানে
কোথায় ফুৎকার দেব আজ,
দশ মাইল জুড়ে, বৃষ্টি…
অন্তহীন সোনা স্বাদ নিতে ঠোঁট ঘষি
কোথায় আবার।

পদ্মার জন্য মন কেমন করে

কৃষ্ণ ধর

পদ্মার জন্য মন কেমন করে আমার ?
এ কথা বলে পাশের লোকটা হঠাৎ চুপ করে গেল
একটা ট্রাম রাজহাঁসের মতো চলে গেল
ঘুলাৎ ঘুল শব্দ করতে করতে

শ্রাবণে প্রচুর বৃষ্টি হয়েছিল
ডালহৌসিবার রোডে এক বুক জল ভেঙে
চলে গেল বেহালার ট্রাম

কথাগুলি সেই জলভরা চাকার তলায় ডুবে গেল
লোকটা ভরা বর্ষার এক আশ্চর্য নদীর
কথা বলে বৃষ্টিটাকে ছোট করে দিল

জানেন, আমারও পদ্মার জন্য মন কেমন করে।

অবরুদ্ধ কান্না

অপরাজিতা গোপ্পী

অভিশপ্ত আত্মার অবরুদ্ধ কান্না
ধরাহীন পৃথিবীর
কঠিন মৃত্তিকা পরে,
ব্যর্থ আঘাতে বার বার
ভেঙে পড়ে।
ভেঙে পড়ে বিশ্বাসের চূড়তা
প্রেমহীন বৈশাখী দুর্যোগ অন্ধকারে।

তখানে আগুন জ্বলে।
তখানে শুধু হিংসার আগুন
রাত্রিদিন উন্মত্ত কোলাহলে
রক্তের পিপাসা জাগায়।

ঘৃণিত মানবের আদিম বন্যতায়
জেগে উঠে কামনার শোভ।

অত্যাচারী শাসকের
শাণিত তলোয়ার,
পৃথিবীর সৌন্দর্য হ'তে
বার বার নিচ্ছেছে ছিনায়ে
দেবতার আশীর্বাদ।

তবু লাঞ্ছিত আত্মার
মৃত্যু যজ্ঞ হ'তে,
মুক্তির আশ্বাস—
রাঙা রক্তে কলঙ্কিত কুরুক্ষেত্রে
ধ্বনিত হয়েছে বার বার।
ধরাহীন পৃথিবীর কঠিন মৃত্তিকা ঘিরে
অভিশপ্ত আত্মার অবরুদ্ধ কান্না
বার বার ফেলে যায় দীর্ঘশ্বাস
মুক্তির আর্ত হাহাকারে।

প্রত্যহ কেন যে এত রক্তপাত

অদেশরঞ্জন দত্ত

তাদের হাসিতে হাসি, কান্নায় নয়ন হয় ভারী,
প্রতিদিন কত আর পারি।
তাদের স্মৃতিকে নিয়ে অবসর বিনষ্ট মুখর,
প্রত্যহ কেন যে এত রক্তপাত, শিরায় শিরায় কেন ঝড়।

হায় হাসি, হায় কান্না, হায় ভালবাসা,
বেয়ালে বাঁধানো ফ্রেমে মূর্তিমতী প্রেমের তামাসা।

মহাপ্রস্থান

মোহিত চট্টোপাধ্যায়

একটি কবিতা শেষ হয়ে গেলে মনে হয় সবই ফুরালো
নক্ষত্র ও নীলিমার লক্ষারিত সূক্ষ্মতম অনন্ত শিরায়
যেখানে রক্তকণা হয়তবা আমি আর চোখে দেখব না
হয়তবা চেতনার মৃদু দোল খেয়ে
কাল্লা সব চলে যাবে।
ওষ্ঠের উত্তপ্ত লেস, চুলের উজ্জ্বল কাঁটা, উন্মুখ চিবুক
হঠাৎ কাঁটার মতো পায়ে ফুটে রক্তপাত হবে।
এসব রক্তের লাল নীল নাচ, উপদ্রুত উত্তাল বাজনা
আমি আর দেখবনা, শুনবনা কানে ;
ক্রমশ ধমির হব, ক্রমশ আঙুল থেকে চুপে
চলে যাবে স্পর্শ, বাথা, সোনার পেয়ালা।

কতদিন এইসব লেখা হবে দৈববাণী জানে।
জানে, স্বভাবের কেন্দ্রে বালক রাখাল…
জানিনা কখন গোষ্ঠ থেকে ফিরে যাবে সন্ধে ক্লান্ত কটি ধেনু।
বড় ভয় করে এই পর্যাপ্ত নিখিলে
যে কোন মুহূর্তে গাড়ি উল্টে যাবে ;
রূপা চাঁদ শিশু হয়ে দেখা দিতে পারে পার্কে প্যারাসুটেরে ;
প্রতিটি পাতার থেকে পরিচ্ছন্ন ঝরঝরে হাওয়া
বালিকা নার্সের মতো ঘিরে আসবে
রক্ত দিতে হবে কোন উদ্যানের ফুলে।

এরকম স্বপ্ন হয় ভয়ের ভিতর
এরকম ভয় হয় স্বপ্নের ভিতর
এরকম স্বপ্ন-ভয় বুকের ভিতর।
মনে হয় হয়তবা ঘুম ভেঙে সহসে পাণ্ডীব
আর তোলা যাবেনা কখনো,
মহাপ্রস্থানের কথা মনে পড়ে যাবে।

বকুলতলার ফুল

বিভূষ দাশগুপ্ত

আমার চিবুক তুলে নিয়ে করতলে
চার বছরের ছোট মেয়েটি বলে,—
"কোথায় যাচ্ছ সন্ধ্যেবেলায় কানু।"

আমি তো একাকী—এ ঘরে নেইতো কেহ
কত বিক্ষত বয়েছে আমার দেহ
রৌদ্র শাণিত নির্জনতার চাকু।

আমি বললাম—'নরকে যাচ্ছি খুকু'
সে তখনি বলে—'আমাকেও নিয়ে চলো',
কি ভালো লাগলো সন্ধ্যাবেলার উলু—
ছোট দুই চোখে বিশ্বাস টলোমলো
সে আবার বলে—'আমিও নরকে যাব
সোনা কানু তুমি আমাকেও নিয়ে চলো।'

হঠাৎ স্মৃতির দ্বার ঘুরে খুলে যায়
অন্ধকারে ছড় টেনে বেহালায়
কে যেন আমাকে বিগত ব্যাথায় ডাকে
কুয়াশা জড়ানো জ্যোৎস্নাছড়ানো শাখে—
তুমিতো পারোনি সাড়া দিতে কোনদিন
নরকের পথে চলে গেছি বকুল।

মুখ গুঁজে দিয়ে ছোট মেয়ের চুলে
আমি ভেসে গেছি বকুলতলার ফুলে।

তিন অনুভবগুলি

শোভন সোম

নিউক্লিয়াস

তোমাকে কতটা পাই রক্তের ভিতরে
হৃদয়ে আমার !
বুঝলে কি এক হওয়া যায় !
খণ্ডিত সত্তায় তুমি ছায়া ফেলে যাও, যেন প্রকাণ্ড আয়নার
বিশের সমস্ত ঘরে যতক্ষণ কাছাকাছি, কিন্তু তার বেশি
কিছু নয়। তোমারও হৃদয়
আমার মতন রক্তে মাংসে গড়া কলকব্জা তার কোনো
অতিমূর্ত অনুভূতি নেই
হৃদয়ে কিছুই নেই ; কিছুক্ষণ স্মৃতি থাকে মনের কোষে
আর কিছু নয়।
তোমাকে কতটা পাই রক্তের ভিতর।
যেমন অসহ্য পঙ্কে লেগে থাকতে পারো তুমি আমার শরীরে
তেমন ঘামের গায়ে লেগে থাকে অস্থির সবুজ !
অর্থহীন কথা বড়ো বলা যায়, সব কথা নয় সারবান
সব জেনে তবু কোনো বানানো সুখের স্বর্গে নিত্য বসবাস
প্রতি অঙ্গ লাগি তবু নিরবধি প্রতি অঙ্গ কাঁদে, জানি ;
খণ্ডিত সত্তায়
নীড়ে প্রথম পরে যাওয়া যায়, একক উৎসাহে
তোমার আমার মধ্যে যেখানে একমাত্র অখণ্ডতা !

মেঘের আড়ালে

শান্তি বসু

যখন করতলে সব শব্দগুলি এসে মাথা কোটে
যখন আদিগন্ত অন্ধকারে আবৃত আকাশ
সূর্যের বন্দনা বুকে পূর্বাচল স্থিরচিত্ত করে
জ্যোতির্ময়ী উষা আসে—
বিহগদেহলী তবু আকীর্ণ আঁধারে
ভয়ের দুয়ার খুঁলে ওরে।

আকণ্ঠ পিপাসা নিয়ে সমস্ত সত্তাগুলি বুকের ভিতরে
স্মৃতির বরোকা খুলে
স্বপ্নের সায়রে চোখ মেলে
স্বপ্নের সমস্ত জল মুছে যায় সূর্যের অনলে।

আলীন কেশের গুচ্ছ তমস্বিনী যেন মেঘভারে
স্বপ্নমুহূর্ত রাত্রি ভরে দেয়,
অন্তহীন নূপুরে নূপুরে সব যমুনাতমালকৃষ্ণঝঙ্কার
বেজে যায় বুকের অতলে।

অন্ধযজ্ঞকলিঙ্গের চতুর্দিকে খাণ্ডবের বনে অগ্নি জ্বলে
কথার আড়ালে তবু গোপন শিল্পের কথামালা
একটি কবিতা লেখে নীলিমার অপার আখরে ॥

প্রেমের মুরতি ধ্যানে পাথের আসন

হরেন্দ্রনাথ সিংহ

জীবনের সাঁঝে ঘরি বড় লাজে
ভুল পথে বুঝি গিয়েছি,
আশা নিরাশার মোহিনী মায়ায়
মরীচিকা শুধু পেয়েছি।
আকাশ কুসুম প্রণয়ে চয়নে—
তুমি এলে শেষে নয়নে নয়নে,
অতীতের দিন দিয়েছে স্বপনে,
স্মৃতি নিয়ে আলো বয়েছি।
জনমে জনমে প্রেম আকর্ষণে
আসিতে হবে না ফিরে।
মানসী আমার সাধনার জ্যোতি
অসীম সীমায় ঘিরে।
একি খেলা প্রিয়—"না পেয়ে পাওয়া।"
নয় দেহে শেষ হোয়ে গেছে চাওয়া।
স্বপনে তবুও ঘিরেছি।

আ চ ড়

বিমল কর

ঝিকেলের প্যাসেঞ্জার গাড়িটা এসে গেল।

রমা এখন সব বুঝতে পারে ; কোন গাড়ি কখন আসছে কখন যাচ্ছে শুধু কানে শব্দ শুনে শুনেই বলে দিতে পারে। কোনটা মালগাড়ি, কোনটা প্যাসেঞ্জার গাড়ি তা বলা তো খুবই সহজ, রমা তার চেয়েও কঠিন জিনিস—কোন মালগাড়ি ওরতি চলেছে কোন মালগাড়ি খালি চলেছে তাও ঠিক ঠিক বলে দেবে।

সেদিন সুশীলকে বোঝিয়ে দিয়েছে রেলগাড়ি লেট্ করে যাচ্ছে কেমন। সুশীল জিজ্ঞেস করেছিল, লেট্ রান করছে বুঝলে কি করে ?

'বা রে, যাওয়ার কথা সাতটায় যাচ্ছে আটটায়, বুঝব না ?'

'আহা, তা এখন সাতটাও তো বাজতে পারে।'

'তোমার যেমন মাথা, রাত হয়ে গেল, ঝিনলির বাস এসে গেল—, এখন বাজবে সাতটা। সাতটা বেজেছে কোন যুগে, যখন আমার রুটি বেলা শেষ তখন—'

সুশীল চমৎকৃত হবার মতন গলা করে বলেছিল, 'আরে বাস্ তুমি দেখছি অ্যাক্ত রেলঘড়ি হয়ে গেছ ক'দিনেই।'

কথাটা একরকম সত্যি ; রমার কান এখানে সজাগ এবং অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে এই মাসখানেকের মধ্যেই। প্রথম প্রথম জিজ্ঞেস করতে হত, এখন হয় না ; কোন এঞ্জিনটা ডিজেল কোনটা বা কয়লা ঠেলা তাও সে এঞ্জিনের শব্দ শুনে বলে দিবে।

ঝিকেলের প্যাসেঞ্জার যে এতক্ষণে প্লাটফর্মে ঢুকেছে, এবং চা ওলা, পান ওলা, ঝুলাওলারা হাঁকডাক করছে, যাত্রীরা মালপত্র নাবাচ্ছে ওঠাচ্ছে রমা বেশ বুঝতে পারল, দেখতেও পেল মনে মনে। প্লাটফর্মে গাড়ি থামলে কেমন একটা শব্দ ভেসে আসে, দু চারটে হাঁকডাকও স্পষ্ট কানে শোনা যায়।

রমা একটু দোনামোনা করল। তার বিছানা পাতা শেষ ; এখন কি উনুনটা ধরিয়ে দিয়ে এসে ঘরদোর একবার ঝাঁট দিয়ে নিয়ে তবে চুল বাঁধতে বসবে, নাকি চুলটাই আগে বেঁধে নেবে। অন্যদিন তার চুল বাঁধা হয়ে যায় এতোক্ষণে, আজ দুপুরে তিন চারটি বউ কি বেড়াতে এসেছিল, সবেই তো উঠে গেল।

রমা অন্যমনস্ক ভাবেই ঘর ঝাঁট দেবার বেঁটা খুঁজতে পাশের ঘরে চলে গেল। সুশীল এখন ওভারব্রিজের ওপার পথ আগলে দাঁড়িয়ে যাত্রীদের টিকিট নিচ্ছে। রমা অবশ্য সুশীলকে কোনোদিন ওই অবস্থায় দেখে নি, কিন্তু অন্যদের দেখেছে, এখানেই দেখেছে। সুশীল কি ভাবে দাঁড়িয়ে লোক করে তা দেখবার বাসনাও আছে বই কি রমার। কত দূর হলে তবে না এইসব টাকিবাজদের ধরা

যায়। সুশীলের সেই মূর্তাদি একটু দেখতে ইচ্ছে করে বই কি!

ঝেঁটা এনে রমা চটপট করে ঝাঁট দিতে লাগল। প্যাসেঞ্জার গাড়িটা এবার হাড়ি হাড়ি করছে। ব্রাটকর্ম ফাঁকা হয়ে আসায় চাপানের ধাঁক এবং এঞ্জিনের কোঁস কোঁস বেশ শোনা যাচ্ছে। সুশীল এখনও ব্রাটকর্মে। গাড়ি ছেড়ে গেলে টিকিটগুলো মুঠো করে নিজের অফিসে যাবে, তারপর হাতের কাজটুকু সেরে বেরিয়ে পড়বে। ছুটি।

বড় দেরী হয়ে গেল আজ। আর আধঘণ্টা খানেকের মধ্যেই সুশীল বাড়ি এসে পড়বে, অথচ এখনও উনুন ধরল না।

ছোট ছোট দু খানা ঘর তাড়াতাড়ি ঝাঁট দিয়ে ওঁার আগেই প্যাসেঞ্জার গাড়ি ছেড়ে গেল। রমা গাড়ি ছেড়ে যাবার শব্দ শুনতে পেল।

একটু দ্রুত হাতে রমা ঘর পরিষ্কার করে উনুন ধরাতে বসল। এত ঠাণ্ডা আর শীতে রান্না ঘরে একা একা আর বসে থাকা যায় না বলে, তোলা ছোট উনুনটা ধরিয়ে নিয়ে সে ঘরে চলে আসে। যাবের ঘরে উনুন ধেখেই যা রান্নাবান্না। রান্নাবান্না অবশ্য তেমন কিছু না, তবে ওই আঙনটুকুতে ঘর বেশ গরম হয়ে যায়, শোবার ঘরে সুশীল বসে থাকে, খোলা দরজা দিয়ে গল্প চলে দু জনে। কখনও বা সুশীলই কাছে এসে বসে বকবক করে হাজার রকমের। অফিসের গল্প, বাড়ির গল্প, এখানকার গল্প।

রমা উনুন ধরিয়ে উঠোনে নামিয়ে দিল। গলগল করে ধোঁয়া উঠতে শুরু করেছে; এখুনি ধরে যাবে।

হাত ধুয়ে এবার রমা চুল নিয়ে বসল। চিরুনি দিতে ঝাঁটা নিয়ে বেশী পারিপাটি করতে পারবে না আজ; কোনো রকমে একটা খোঁপা করে নেবে। শক্ত নিটুট খোঁপা সুশীলের অবশ্য বেশী পছন্দ। কিন্তু সবদিন তো সমান হয় না, সংসারের আর পাঁচটা দিকেও নজর রাখতে হয়, দাদাই: মনে মনে কথাটা সুশীলকে বলল রমা।

ঝোটা চিরুনি দিয়ে চুল আঁচড়ে বিনুনির জন্যে ফিতের দেরো বাঁধল রমা, দাঁতে ফিতে চেপে ধরে গোরাটা শক্ত করতে করতে জানলা দিয়ে দেখল। বাইরে অন্ধকার হয়ে এল বলে। স্টেশনে বাতি জ্বলেছে। সুশীল এতোক্ষণে তার হাতের কাজ সেরে উঠি উঠি করছে বোধ হয়।

অভ্যস্ত এবং নিখুঁত আঙুলে রমা তাড়াতাড়ি বিনুনি বাঁধছিল। বাঁধতে বাঁধতে হঠাৎ তার কি খেয়াল হওয়ায় নিজের মনে শব্দ করে হেসে উঠল। তারপর কোনো কৌতুককর কথা ও ঘটনা অনুধাবন করে সে আর খোঁপা বাঁধল না, মেঝেতে বসে পড়ে বাক্স খুলল, বাক্স হাতড়ে একটা লাল ফিতে এবং ছাপা একটা শাড়ি বের করে নিল। লাল ফিতেটা চুলের বিনুনির তলায় দুল করে বাঁধল।

লণ্ঠন জ্বালল রমা, লণ্ঠন জেলে দুই ঘরের মাঝখানে রাখল, দ্বিতীয় লণ্ঠনটা খুব অল্প করে জ্বালিয়ে দিল বারান্দায়। তারপর সাবান গামছা হাতে করে কল ঘরে চলে গেল।

সুশীল যে কোনো মুহূর্তেই চলে আসতে পারে। তা আসুক; রমার হাত মুখ ধুতে কত সময় আর লাগবে!

কলঘরে হাত মুখ ধুতে ধুতে রমা আপনমনে গুনগুন করে পুরোনো একটা গান গাইল: 'সেদিন সাঁঝেতে অভিমান করি, ভুলিয়া গেছিলে বাঁধিতে কবরী···' গাইল, খানিক, খানিকটা মনে করতে পারল, খানিকটা পারল না। কি ভেবে হাসল। সুশীল নিশ্চয় এই গানটা জানে না, জানলে সেই সেরে সেরে রমাকে শুনিয়ে দিত। কিন্তু শুনিয়ে দিলে কি হবে, রমা তো আর অভিমান করে চুল বাঁধেনি এখন নয়, বরং সুশীল এসে দেখবে স্বামীকে আজ অবাক করে দিয়েছে রমা।

কলঘর থেকে বেরিয়ে রমা ঘরে এল। ঘরে আসতে সন্ধ্যে দিয়ে নিল। একটা শাঁখ দরকার। ঘরে এসে বাক্স থেকে বার করা ছাপা শাড়িটা পরল ঘর বন্ধ করে। কতদিনের

শাড়ি, আইবুড়ো অবস্থায়। এত সুন্দর ছাপা যে শাড়িটা প্রায় একবার বেশী পরেনি রমা, তুলে তাকে রেখে দিয়েছে বিয়ের পরও নিজের বাক্সে তুলেছে, ছোট বোনকে দিয়ে দেয় নি।

শাড়ি পরা হলে আঁচল ঘুরিয়ে নিজেকে একটু দেখল রমা। মুখ মুছল। একটু পাউডার মাখল মুখে সিঁদুরে সিঁদুর দিল আয়না দেখে, হাতের লোহায় ছোঁয়াল, মাথায় মুছে নিল।

সুশীলের এতক্ষণ এসে যাওয়া উচিত কেন আসছে না?

সুশীলের বাড়ি আসবার এইটুকু বিলম্বে অবশ্য রমা খুশী ছাড়া অখুশী হল না। এখন সুশীল ফিরে এসে একেবারে চমকে যাবে। ভাববে, কাকে দেখছি রমাকে তো?

ঠোঁট টিপে হেসে রমা উঠোন থেকে তোলা উনুন আনতে গেল। বা চমৎকার আঁচ হয়েছে। জল খাঁটা ঠাণ্ডা হাত দুটো ক্ষণিকের জন্যে আগুনে তাতিয়ে নিয়ে রমা রান্নাঘর থেকে এবেলার রান্নার প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো আনছে, এমন সময় বাইরে কড়া নড়ল।

রমা সাড়া দিল না, সদর খুলতে এগিয়ে গেল।

সদর খুলতেই সুশীল বলল, 'তোমায় একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম।'

রমা অবাক। ডিউটি সেরে যার বাড়ি ফেরার কথা সে এসে বলছে—একটা কথা জিজ্ঞেস করতে এলাম। তবে কি এখনও ডিউটি শেষ হয় নি? কেউ কি আসে নি এ বেলা? রমা মুখ তুলে অবাক চোখে চেয়ে থাকল।

সুশীল বলল, 'স্টেশনে এক কাণ্ড হয়েছে ....গাড়ি থেকে এক বুড়ো নতুন ভদ্রলোক তাঁর মেয়ে নিয়ে নেমে পড়েছেন। পাসেঞ্জাররা বলিয়ে দিয়েছে, বলছে "পঙ্গু"...'

রমা খুব স্পষ্ট একটু শব্দ করল আতঙ্কের।

'মেয়েটির'

'ইস্....! মুখে হাতে বেরিয়েছে?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না। একটা আইবুড়ো জোয়ান বয়সী মেয়ের মুখের দিকে তো হাঁ করে চেয়ে দেখা যায় না। তবে মনে হল দু চারটে আছে—'

'সর্বনাশ!'

'কি করি বলো তো! বুড়ো ভদ্রলোক আবার আমাদেরই দেশের। চিনি না, কিন্তু নাম যাদ শুনে মনে হল—আমার তরফের কেউ হতেও পারে। আর বাপের বাড়ির গ্রাম: স্বজাতি।'

রমা কি বলবে বুঝতে পারল না। পথের হকমারি কি এই রকমই হয়।

সুশীল বলল, 'আমি কিছু বলি নি। কিন্তু সিংহীটা এমন মুখ্যু, কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই, হট করে ভদ্রলোকের সামনে আমার পরিচয় দিয়ে বলে দিল—আমিও বাঁকড়োর লোক...।'

সিংহীকে 'আমি বলেছি, এ সব ইয়ার্কির কোনো মানে হয় না।'

রমা আগে যেন অতটা তলিয়ে ভাবে নি, এখন বুঝতে পারল সুশীল কি বিপদে পড়ে ছুটে এসেছে। রমা শঙ্কিত ও বিচলিত বোধ করল। তারপর ছেলেমানুষের মতন বলল, 'তা হলে কি হবে?'

'তাই ভাবছি...। একটা বুদ্ধি দাও।' সুশীল তার অল্পবয়সী স্ত্রীর পরামর্শ পাবার আশায় ব্যগ্র হয়ে তাকিয়ে থাকল।

রমা কি পরামর্শ দেবে। সে নিজেই কেমন বিমূঢ় হয়ে গেছে। শুকনো গলায় বলল, 'আমি কি বলব—। আমার কিছু মাথায় ঢুকছে না।'

সুশীল স্ত্রীর চোখের দিকে তাকিয়ে দুশ্চিন্তার গলায় বলল, 'অন্য কিছু হলে না হয় আমাদের এখানেই নিয়ে আসতাম, দেশের লোক, স্বজাতি, দূর আত্মীয় হলেও হতে পারে। কিন্তু জেনে শুনে বাড়িতে বসন্ত রোগী ঢোকাই কি করে? তিনি আবার মেয়েছেলে।'

'আইবুড়ো মেয়ে বলছ! কত বড়।'

'তা তোমাদের বয়সী হবে—'

রমা, ভাবল, বলল, 'আমাদের এই তো ঘর সংসার। এখানে ছোঁয়াচে রোগী ঢোকাব কোথায়!'

'আমিও তো তাই ভাবছি। এখানে আনা যায় না, অথচ সিংহীর কথার পর ভদ্রলোক এমন ভাবে আমার ওপর ভরসা করে বসে আছেন—'

তুমি কিছু বলেছ?'

না, না। আমি কিছুই বলি নি। তবে, বিপদে পড়ে গেছে মানুষটা—নিজেদের দেশের লোক, একেবারে সাহায্য চাইবা করব না—কথাটা ভাবতেই কেমন লাগছে।

রমা এবার বিরক্ত হল। সুশীলের ওপর নয়, ভদ্রলোক এবং সেই অসুস্থ মেয়েটির ওপর। কেন রে, এত থাকতে এখানে কেন! যত অশান্তি। বলল, অসুখের আর জায়গা খুঁজে পেল না।...তোমারাই বা বাপু, এখানে নামাতে দিলে কেন!'

'আহা, তা আমরা কি নামিয়েছি! প্যাসেঞ্জারে যদি নামিয়ে দেয়। ছোঁয়াচে কোনো রোগ নিয়ে গাড়িতে যাবার নিয়ম নেই যে!'

'হাসপাতালে পাঠিয়ে দাও।'

'এখানে হাসপাতাল কই!' বলে সুশীল একটু থামল, তারপর বলল, 'মাষ্টার কথাই অবশ্য বলছেন, কোনো একটা ডাউন গাড়িতে—ছোট্ট মতন একটা কামরা খালি করিয়ে ওদের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেবেন।' বলে সুশীল কাছাকাছি কোথায় হাসপাতালের নামটা বলল।

'সেই তো ভাল।' রমা হঠাৎ নিশ্চিন্ত হল।

সুশীল বুঝিয়ে বলল, ডাউন প্যাসেঞ্জার গাড়ি পেতে এখন ঘণ্টা ছোদ্দ ঘণ্টার ব্যাপার। গাড়ি পেয়ে রোগী উঠিয়ে দিতে দিতে কাল সকাল, ততক্ষণে ওই মেয়েটা জ্বরে যন্ত্রণায় [illegible] হয়ে পড়বে।

রমা কিছু বলতে যাচ্ছিল, সুশীল তার আগেই বলল, 'ঘরে আজকের রাতটা এখানে এনে রেখে দিলাম; সবে তো গুটি উঠছে, এখন কোনো ভয়েরও কিছুই নেই শুনি। কাল ওদের ব্যবস্থা যেমন পাঠিয়ে দিলেই চলবে।'

রমা প্রায় আঁতকে উঠল, ওমা, 'তা এখানে থাকবে কোথায়!'

'ভেতরের ঘরটায়—'

'আর আমরা ওই ঘরের মধ্যে দিয়ে যাতায়াত করব।'

সুশীল মাথা চুলকোলো। বলল, 'সবই বুঝছি, কিন্তু অমন মেয়েটা···'

রমা স্বামীর গলায় স্বর লক্ষ করল মনোযোগ দিয়ে, 'অমন মেয়ে মানে কেমন মেয়ে?'

'বেশ যুবতী। দেখতেও ভাল।'

'ও।'

এতক্ষণ পরে সুশীল সবকা হেসে উঠল। হাসতে হাসতেই রমার দিকে পিছু ফিরে সদরটা বন্ধ করে দিচ্ছিল। রমা কিছু বলল না, রাগ করে উঠোন পেরিয়ে ঘরে ঢুকে গেল।

সুশীল সদর বন্ধ করে বারান্দায় এল, জুতো জোড়া খুলতে খুলতে রমাকে ডাকল মজার গলায়, তারপর কলঘর ঘুরে ঘরে এসে ঢুকল।

রমা উনুনের ওপর কেটলি চাপিয়ে দিয়েছে চায়ের। পিঁড়ির ওপর বসে আটা মাখছিল।

সুশীল ব্রেসের কোটটা খুলে কেদে রমার পাশে মাদুরে বসে পড়ল। বলল, 'কি রকম দিলাম একটা!'

রমা চুপ। যত না রেগেছে তার চেয়েও গম্ভীর মুখ করে বসে আছে।

'আসলে এ-রকম একটা কেস আসের স্টেশনে হয়েছে নাকি কাল, টি টি সাহেব গল্প করছিল, অবশ্য তাদের নামিয়ে পরের ট্রেনে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। তা আমার মনে হল তোমার একটু রাগিয়ে দেওয়া যাক—' বলে সুশীল হাত বাড়িয়ে রমার মুখ তুলতে চাইল।

রমা মুখ ফিরিয়ে নিল। 'আঃ—'

'আহা, শোনোই না—! অত চটে করে রেগে যাচ্ছ কেন!'

'ঠাট্টা তামাশার মাত্রা আছে।'

'আমি কি মাত্রার ওপরে দিয়েছি। তুমি যাইরি···,

'মানুষের আপদ বিপদ আসুখ নিয়ে তামশা। তার ওপর আবার কি কথার ছিরি আইবুড়ো মেয়ে, যুবতী মেয়ে—'

'ওটা তোমায় খেপাবার জন্যে। ভগবানের দিব্যি, বলছি আমি তোমায় একটু রাগিয়ে দিচ্ছিলাম।'

'আমার রাগের কি আছে।'

'তা আর নেই। সোনার মেয়ে ঘরে চুকলে তুমি কি রক্ষে রাখবে।' সুশীল রঙ্গ করে হাসতে হাসতে বলছিল।

রমা বলল, 'তুমি আনলে আমার সাধ্য আছে তাড়াই। তোমার বাড়ি তোমার ঘর—।'

সুশীল হাত বাড়িয়ে রমার থুতনি আবার ঘুরিয়ে নিল, মুখে চুকচুক শব্দ করল মজা করে, বলল, 'আমারই বাড়ি শুধু। বেশ তাহলে সত্যি, যদি কোনো আইবুড়ো সোনার মেয়ে টেনে এনে হাজির করি, তবে নিয়েই আসব বাড়িতে।'

'এনো।···এখন ছাড়।' রমা মুখ ছাড়িয়ে নিয়ে আটা-মাখা হাতেই চায়ের কেটলি নামাল।

'যাও, আমিই চা তৈরী করছি।' সুশীল হাত বাড়িয়ে চা-পাতার কৌটাটা টেনে নিল।

রমা বাধা দিল না। সুশীল চা তৈরী করতে লাগল।

সামান্য চুপচাপ। শেষে সুশীলই বলল, 'আমার আসতে কেন দেরী হল জান?'

রমা হাঁ হুঁ করল না, মুখও তুলল না।

সুশীল বলল, 'অফিসে জোর একটা তর্ক বেধে গিয়েছিল। তাদের ব্যাপার নিয়ে। ও তুমি বুঝবে না।·····অনেকটা দেরী হয়ে গেল দেখে ভাবলাম তোমায় একটু খবর দিতে হবে। তা যাইরি, তুমি ঠাট্টার ব্যাপারেও এত মুখ ভার করে থাকছ।···যাক গে, কান মলছি, আর তোমার সঙ্গে কে ঠাট্টা তামাশা করে।···কি, পা ধরে বলতে হবে নাকি মহারাণীকে—বলে সুশীল সত্যি সত্যি হাত বাড়িয়ে যেন রমার পা ধরতে যাচ্ছিল।

রমা ঘাবড়ে গিয়ে হাত বাড়িয়ে বাধা দিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল। সুশীল সেই সুযোগে একটা বিচ্ছিরী করে রমাকে জাপটে ফেলল। তারপর খানিকটা বিব্রত করল স্ত্রীকে।

ধীরে সুস্থে আবার পিঁড়িতে বসল যখন রমা তখন মুখের সেই গম্ভীর গম্ভীর ভাবটা আর নেই। সুশীল চা ঢালছিল।

রমা বলল, 'তোমার এত দুর্তামি বুদ্ধি জোটে কি করে?'

'আমি দুর্ত।'

'না তুমি নও, আমি—।'

'আমি তো দেখি তুমি আমার চেয়েও চালাক।' সুশীল নিজের চা নিল, রমাকে তার কাপ এগিয়ে দিল।

রমা বলল, 'আমি চালাক চতুর মেয়ে হলে তোমায় মাথা ঘুরিয়ে দিতাম।'

'ওরে বাদ্।' সুশীল হাতজোড় করে বলল, এবং মুখভঙ্গী করল।

রমা আটামাখা হাত পরিষ্কার করছিল। 'ওরে কাল-টাল নয়। তেমন তেমন মেয়ে হলে তোমার নাকে দড়ি দিয়ে ঘোরাত।'

'তেমন তেমন স্বামী হলে ঘুরত।'

'হ্যাঁ, তাই, ঘুরত।'

'বলছি তো ঘুরত। আমিও ঘুরছি।'

রমা বুঝতে পারল সুশীল তার সঙ্গে কি ধরণের তামাশা করছে। না, এসব লোকের সঙ্গে কথায় পারার ক্ষমতা তার নেই।

আজকের দুপুরের কথা তুলল রমা, বলল, 'পালবাবুর

বউর বড় মুখ আলগা। অতটা বলেন, এমন সব কথাবার্তা বলে।'

'পালদিদীর অতটা বয়স হল কি করে!'

'হল না। বা, আমার চেয়ে পাঁচ সাত বছরের বড় তো হবেই।'

'তাই বল। তুমি এমন করে বললে, যেন মনে হল পালবউদি বুড়ি হয়ে গেছে।'

'মোটেই না, আমি তা বলি নি।'

'যাকগে, কি বলল পালবউদি!'

'তোমার শুনে লাভ!'

'যা চুলোয়। তুমিই তো বললে—আমি কি জানতে গিয়েছিলাম কে এসেছিল, কে কি বলেছে—'

রমা চা খেতে লাগল। চা খেতে খেতে হয়ত সে অন্যমনস্ক ভাবে পাল গৃহিণীর কথা ভাবছিল।

সুশীল কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে থেকে বলল, 'কি, বলবে না!'

'তোমার শুনতে হবে না।'

'ও।···আচ্ছা। সুশীল আর আগ্রহ প্রকাশ করল না, চুমুকে চুমুকে চা খেতে খেতে পকেট থেকে কাঁচি সিগারেট বার করে ধরাল। তারপর আপন মনেই বলল, 'কত লোক কত কথাই বলে, সব কথায় কান দেওয়া উচিত না। আমাদের স্টাফের কেউ শুনেছি তোমার সম্পর্কে নানা কথা বলে···'

রমা চকল এবং কৌতূহলী হল। 'আমার কথা বলে—!'

'বলবে না কেন।'

'আমার কথা কেন বলবে!'

'কেন বলবে তার আমি কি জানি। তবে নতুন বউ এসেছে, লোকের একটু কৌতূহল থাকবেই।'

'নিন্দে করে তো!'

'প্রশংসাও করে।'

'তার মানে নিন্দেও করে।' রমা অসন্তুষ্ট হল। 'পুরুষ মানুষে বাড়ির বউ ঝি নিয়ে আলোচনা করে, কেমন লোক তারা। লজ্জা করে না।'

সুশীলের চা খাওয়া শেষ হয়েছিল, গম্ভীর মুখে সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বলল, পুরুষ মানুষের এটা অভ্যেস। মেয়েরাও কি কম আমাদের কথা নিয়ে আলোচনা করে।'

'মেয়েরা তোমাদের মতন ছিঁচকে নয়, ছ্যাংলা নয়।'

'আরে বাব্বা, বলতে! মেয়ে মানে তো দেবী।'

'পুরুষ বলতে তো চোর, নিন্দুক।'

'স্বার্থপর।'

'নিশ্চই। একশো বার। তোমরা যা স্বার্থপর···'

সুশীল হেসে বলল, 'আমরা স্বার্থপর পশু।'

রমা বুঝতে পারল সুশীল তাকে ক্রমশই খেপিয়ে যাচ্ছে। ইচ্ছে করে ঘুটুমি করে। রমা চট্ করে কিছু ধরতে পারে না বলে সুশীল প্রায়ই তাকে এই ভাবে খেপায়। কেন! রমা সাদাসিধে, সরল, ছেলেমানুষ বলে সুশীলকে কি সুযোগ পেলেই পেছনে লাগতে হবে! যার মুখে ঘোলো চায়ের কাপটা সরিয়ে রেখে হাত ধুয়ে আবার যে আটোসাটো শেষ করে রুটি বেলতে বসল।

সুশীল স্ত্রীকে দেখছিল। বলল, 'তোমার এই শাড়িটা তো বেশ! বড় সুন্দর দেখতে।'

রমা জবাব দিল না।

সুশীল সিগারেটটা ফেলে দিল বাইরে, ছুঁড়ে। বলল, 'বাই বলো এই শাড়িতে তোমায় মানিয়েছে। কে দিয়েছিল গো! বিয়েতে পেয়েছিলে!'

'না, এটা আমার আগের শাড়ি।'

'বিয়েরও আগের!'

'হ্যাঁ।'

'তাই তো বলি!' সুশীল যেন এতোক্ষণে বুঝতে পেরেছে এই রকম এক ভাব করল। 'তোমার আজ তাই আইঢুঢ়ো আইঢুঢ়ো লাগছে।

রমা একটু খুশী হল। কিছুই নয়, তবু আজ সে অনেক

দিন পরে তার কুমারী জীবনের একটা শাড়ি পরেছে. সেই ভাবে চুল বেঁধেছে বিনুনি করে। ইচ্ছে হল সুশীলকে মাথার বিনুনি এবং ফিতেটা দেখায়। ব্যাপারটা তো একটুও অঙ্ক নয়, তবু এখন পর্যন্ত চুলের কথা বলছে না কেন!

সুশীল অভীব চালাক। অনেক করে যেন লক্ষ করছে, দেখছে খুঁটিয়ে। শেষে বলল, 'বাঃ, চুলটাও তো খোঁপা চৌপা করো নি।···তা হঠাৎ বুঝি পুরোনো কথা মনে পড়ে গেল।

'পড়লেও বা। তোমার তো আইবুড়োই বেশী পছন্দ। রমা অভিমানের মত করে বলল, যদিও সে ঠাট্টা করছিল।

'জেনে ফেলেছ!'

'দেখলাম তো।···কাকে না এনে রাখতে চাইছিলে। যুবতী টুবতী কি সব!'

সুশীল হাসল। অথচ হাসির পরই তার আচমকা কি যেন মনে পড়ে যাওয়ায় হাসি থামলে মুখ আগে আগে কেমন গম্ভীর হয়ে গেল।

রমা কয়েকটা রুটি বেলে নিয়েছে। তাওয়া উনুনে বসালো। রুটি তাওয়ায় দিয়ে পুন্তি টেনে নিল।

সুশীল বেশ গম্ভীর। আচমকা সে যেন কোনো গুরুতর কাজে আটকে পড়েছে।

রমা রুটি সেঁকতে সেঁকতে বলল, 'মনিঅর্ডার ফর্ম আনিয়েছ!'

সুশীল কোনো সাড়া দিল না

রমা আপন মনেই বলল, 'কাল বাবাকে টাকা পাঠাতে হবে। সময় হয়ে গেছে।'

সুশীলের খেয়াল আছে, বাঁকুড়ায় বাবাকে টাকা পাঠাতে হবে। সে টাকা পাঠাবার কথা ভাবছিল না, অন্য কথা ভাবছিল।

আজ সে রমাকে যে মিথ্যে কথাটা বলে বিপদে ফেলেছিল, সেটা তো সত্যও হতে পারত। বাস্তবিক ওই রকম এক ভদ্রলোক তাঁর যুবতী অসুস্থ বন্ধু নিয়ে বিপদে পড়ে এখানের স্টেশনে নেমে যেতে পারতেন। প্রকৃতই এ-ঘটনা ঘটেছে, অবশ্য স্থান কাল অন্য ছিল। যদি এ-রকম ঘটনা আজ ঘটত, এখানে ঘটত তবে সুশীল বা রমা কি করত।

সুশীল ভেবে দেখল, সে ছুটোনাই পড়ত। নিজের যেন গ্রামের লোক হোক বা না হোক, সুশীল ছাড়া এখানে আর এমন কেউ নেই যে এ-সময় ওঁদের সাহায্য দিতে পারত। অন্য অন্য কোয়ার্টারে হয় বাচ্চাকাচ্চা নিয়ে কারও বড় সংসার, কারও বা সংসার নেই। বড় সংসারে রাখা যেত না ওঁদের, আবার স্ত্রীলোকহীন বাড়িতেও নয়। সুশীলকেই সবাই বলত তার কাছে রাখতে। কিন্তু সুশীল কি রাখতে রাজী হত?

সে রাজী হতে চাইত না মনে মনে। অসুখের ভয়ে কি? খানিকটা, তবে সবটা নয়। সুশীলকে রমার কথা ভাবতে হত। দাম্পত্য জীবনের সুখের মধ্যে অকারণ একটা বাইরের অস্বস্তি সে টেনে আনতে চাইত না: রমাও রাজী হত না। স্পষ্টই মনে তখন সে রাজী হয় নি।

সুশীলের সাড়াশব্দ পাচ্ছিল না বলে রমা মুখ ফিরিয়ে স্বামীকে দেখল। দেখে অবাক হল। মুখ গোমড়া করে অত কি ভাবছে সুশীল। বাবাকে টাকা পাঠাবার কথা!

রমা বলল, 'বাবাকে তুমি না পাঠাও বরাবর পাঠিয়ে যাও। আমার যা খাবারে আমি চালিয়ে দেব।···আজ কিছু পেয়েছ!'

সুশীলের হঠাৎ ইচ্ছে হল রমার মুখের ওপর চিৎকার করে বলে, 'না, সেংকার! কবিনেই বেশ উপরি রোজগারের স্বাদ পেয়ে গেছ!' সুশীল কিছু বলল না। কিন্তু নববিবাহিত এই বধূটিকে সে অদ্ভুত এক ঘৃণা করতে শুরু করল।

রমা অপেক্ষা করে থেকে আবার বলল, 'আমার তো মনে হচ্ছিল, আজ দশাইয়ের বখন এত হাসিখুশী ভাব তখন দু' পয়সা বেশীই হয়েছে।'

সুশীল আচমকা তিক্ত গলায় বলল, 'তাই বুঝি হাত পেতে বসে আছ।'

রমা ঠিক বুঝতে পারল না; স্বামীর গলার স্বরে বিস্মিত হল।

সুশীল বলল, 'তোমার ধারণাটা ভাল। দু পয়সা চুরি জচ্চুরি, ছেঁচড়ামি করে কেড়ে আনতে পারলেই আমার মেজাজ হাসিখুশী হবে, নয়ত হবে না।'

রমাকে আরও বিমূঢ় করে দিয়ে সুশীল উঠে পড়ল। স্ত্রীর কাছে থাকতে তার ইচ্ছে করছিল না, পাশের ঘরে চলে গেল।

পাশের ঘরে এসে সুশীল কেমন ছটফট করতে লাগল। আবার একটা সিগারেট ধরাল, সচরাচর যা সে করে না। দুম করে জানলা খুলে দিল। বাইরে অন্ধকার, ধোঁয়া, কুয়াশা, গুদামের বাতি, এবং খানিকটা তফাতে গ্লাটফর্মের লম্বা লম্বা বাতির আলো। একটা মালগাড়ি ঘুটি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে।

আশ্চর্য! এই রকমই আমাদের সংসার, আমরা সকলেই এই রকমের। সুশীল নিজেকে বাদ দিল না, বাদ দেবার যুক্তিও খুঁজে পেল না। সবাই নিজেকে বাঁচাচ্ছি, নিজের স্বার্থ দেখছি, নিজের সুবিধে অসুবিধে। যদি আজ ওই রকম একটি ঘটনা ঘটত, বিপন্ন কোনো মানুষ তাদের সামনে এসে দাঁড়াত তবে সুশীলরা তাকে কিছুতেই আশ্রয় দিত না। দিত না নিজেদের স্বার্থ ও সুবিধের জন্যে, নিজেদের আরামের জন্যে, ভয়ের জন্যে।

সুশীল অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে রমার আচরণের কথাও ভাবল। রমার সেই প্রশ্ন তার মনে পড়ল: 'কত বড় মেয়ে, বয়স কত?' যেন রোগটা কিছু না মেয়েটির বয়সটাই আসল। যুবতী মেয়ে, অবিবাহিত মেয়ে, কলঙ্ক রোগের চেয়ে বেশী বই কম না রমার কাছে, হবার কথা নয়।

এক মুখ ধোঁয়া যেন উত্তেজনার বশে গিলে ফেলল সুশীল, গলা জ্বালা করতে লাগল, কাশির ধমক এল।

এই সুশীল ছেলেবেলায় স্কুলে এবং তরুণ বয়সে স্কুল কলেজে (কলেজে অবশ্য মাত্র দু বছর) কত না বৃহৎ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে: বয় স্কাউট, বন্যা সমিতি, দরিদ্র সেবা, বিবেকানন্দ সমিতি···। প্রায় পাখিপড়া বুলির মতন সে এখনও শ' খানেক বাণী উগরে দিতে পারে। কিন্তু নিজের জীবনে সে কিছু করে নি। দু চারটে পয়সা ভিখিরীকে দেওয়া বা স্টেশনে একটা পাগলাকে ছেঁড়া জামা দেওয়া কিছু না। চোরও ও-রকম দেয়, খুনেও ও ধরণের অভ্যাস ধরা দেবার।

রমা অত্যন্ত ছোট, একেবারে 'দীন'। এই বয়সে সে সংসারের ছোট খোকরা জিনিসগুলো সব শিখে গেছে। সে আজ তার বাড়িতে বাইরের একটি লোককে ঢুকতে দিচ্ছে না, সামান্য সময়ের জন্যে হলেও না; কাল সে ননদ দেওর-কেও ঢুকতে দিতে কাপর্ণ্য করবে, পরশুদিন শ্বশুর শাশুড়ীকে গলগ্রহ মনে করবে। এখনও ঘরত করে, কিন্তু একেবারে নতুন এসেছে তো সংসারে নিজের কর্তৃত্ব গুছিয়ে নিয়ে ক্ষমতা হাতে তুলে নিতে পারে নি। রমা এ ক'দিনেই কেমন খুব আর উপরির পয়সা চিনে গেছে। যেন সুশীলের এ-সব প্রাপ্য, এবং রমারও তাতে অংশ আছে।

সুশীল তার স্ত্রী নিয়ে এ ক'দিন খুব খুশীতে এবং ফুর্তিতে ছিল, আজ হঠাৎ তার সুখের মধ্যে কাঁটার মতন একটি বেদনা ফুটল। রমা তার বউ, তারই মতন। রমা কোনোদিন সুশীলকে সংসারের ভাল কিছুতে সাহায্য করতে পারবে না, করার আগ্রহ পাবে না। রমার দুঃখ বলো, কষ্ট বলো, চিন্তা বলো—সব নিজেদের নিয়ে—।

কিছুই তো নয়। তবু তখন—যখন সুশীল এসে নিতান্তই

ইয়ার্কি করে স্টেশনের বিপদের কথাটা বলল, তখন যদি রমা মুখ ফুটে একবার বলত, 'ছি ছি—সে কী, আমাদের দেশের লোক, স্বজাতি ; তুমি আমাদের বাড়ি নিয়ে এস। অসুখ সবারই করে, সেরে যাবে ; তা বলে ওভাবে বিশেষ বিশ্বাসে বিপদে একটি বুড়ো ভদ্রলোক আর সোমত্ত মেয়েকে ফেলে দেওয়া যায়—' —তবে সুশীল হয়ত হো হো করে হাসত তখন, নিজের মিথ্যে গল্পের জন্য হাসত, কিন্তু রমাকে সে বড় বেশী কাছে পেত, অনুভব করতে পারত, তার স্ত্রী নীচ নয়, ইতর নয়, ছোট নয়।

রমাকে এত বেশী নীচ ও ছোট মনে হচ্ছে সুশীলের যে, সে যেন বুঝতে পারছে তারা দিনে দিনে আরও নীচতা ও ক্ষুদ্রতার মধ্যে ডুবে যাবে। কেউ কাউকে সাহায্য করতে পারবে না, তুলতে পারবে না।

রমা কখন যেন কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুশীলের গায়ে হাত দিয়ে আদর করে বলল, 'কি গো, তোমার কি হল ?'

সুশীল রমার হাত ঠেলে সরিয়ে দিল। তারপর বলল, 'আমি একটু সামন্তদের ওখানে যাচ্ছি, ঘণ্টাখানেক পরে ফিরব।'

'এখন ওখানে যা

'তাস খেলব।'

সুশীল গায়ের আলোয়ানটা টেনে নিয়ে প্যান্টপরা অবস্থাতেই ঘর ছেড়ে চলে গেল।

INDUSTRIES CORPORATION OF BENGAL LTD.

60/1, HAZRA ROAD

CALCUTTA-19

DYERS AND BLEACHERS

OF

KNITTED FABRICS

When
you settle
for comfort
Dunlopillo
comforts most.

ক্ষমা

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

বাস ষ্টপে যে মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে তাকে দেখে চেনা চেনা মনে হল অমলের। আরো ঘনিয়ে দেখল আর কেউ নয় তারই পুরোণ ছাত্রী শিখা। রাত আটটা। তখনো শহরতলীর বাস ট্রামে দারুণ ভিড়। বাস ষ্টপটায় আরো কয়েকজন যাত্রী দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কিন্তু তাহাদের আর কেউ পরিচিত বলে মনে হল না।

অমল মেয়েটির পাশে দাঁড়িয়ে বলল, 'শিখা যে এত রাত্রে।'

রাত অবশ্য বেশি হয়নি। সাড়ে আটটার মত। কিন্তু এইটুকু রাতও শিখা কি তার বোনেরা বাড়ির বাইরে থাকে না। ওর বাবার কড়া নির্দেশ আছে। এরই পাড়ার মেয়ে। গোটা পরিবারটিকেই চেনে অমল। ওর চালচলন আদব কায়দা সবই জানে।

তাই জিজ্ঞাসা করল 'তুমি যে এত রাত্রে।' শিখা একটু হেসে বলল 'টিউসানি করে এলাম অমলদা। পার্ক ষ্ট্রীটে একটি ছাত্রী আছে আমার' অমল হেসে বলল 'তাই নাকি? তোমারও ছাত্রী হয়েছে বুঝি আজকাল? এত দিন তুমিও ছাত্রী ছিলে এখন শিক্ষিকা' শিখা হেসে বলল 'সে তো সবাই অমলদা, আপনিও তো একদিন ছাত্র ছিলেন। অমল বলল 'এখনো তাই আছি।' শিখা বলল, 'কী বিনয় আপনার। আপনি অবশ্য এখনো খুবই পড়াশুনো করেন।'

অমল চুপ করে রইল। পড়াশুনো আর করতে পারে কই। ষ্টেট ট্রান্সপোর্ট অফিসে কেরাণীগিরির চাকরি করে অমল। সন্ধ্যার পর টুইশন করে। কখনো একটা কখনো দুটো। যখন যা জোটে। তাতেও সংসার সচ্ছলভাবে চলে না। বোন আছে তিনটি ভাই দুটি খুবই ছোট। বাবা রিটায়ার করেছেন। অবশ্য বসে থাকেন না। কিছু না কিছু করবার চেষ্টা করেন তাঁর পার্টটাইম কাজ কখন যে থাকে কখন থাকে না তার হিসাব রাখে না অমল। কলেজে সায়েন্স পড়েছিল চার বছর। বিজ্ঞানের সঙ্গে সম্পর্ক এখন ক্ষীণ। না কর্মক্ষেত্রে না সংসারক্ষেত্রে সেই অতীত বিদ্যা বড় একটা কাজে লাগে না। শুধু রাত্রে শোবার আগে বইপত্র একটু নাড়াচাড়া করে। কম দামে পুরোণ বই কেনার বাতিক আছে। সে সব বই দামে সস্তা হলেও ওজনে হালকা নয়। প্রকৃতিতে অমল নিজেও একটু ভারি। দেখতে ছোটখাটো মানুষটি। কিন্তু ভাইবোনরা তাকে খুব ভয় করে। এমন কি বাবা মাও তাকে একটু সম্ভ্রমের চোখে দেখেন। অমলের ছাত্রছাত্রীরাও তাকে খুব কড়া মাষ্টারমশাই বলেই জানে। এক সময় এই শিখাও তাকে বেশ ভয় করত। শুধু কি ভয়? শুধু কি শ্রদ্ধা? সেই সঙ্গে অতি প্রচ্ছন্ন একটু অনুরাগও কি ছিল না? কিন্তু নিজের চেয়ে বছর দশেক ছোট স্কুলের ছাত্রীকে তো আর প্রশ্রয় দিতে পারে না অমল। মর্যাদায় বাধে। তাছাড়া তাতে ওর পড়াশুনোর ক্ষতি হত।

শিখার ওপর যে একটু পক্ষপাত আছে অমলের তা সে অন্যভাবে প্রয়োগ করত। বেশি খেটে পড়াত ওকে ঘুরিয়ে, বেশিক্ষণ থাকত। শিখার তখনকার খাতাগুলিতে অমলের নিজের হাতের লেখা অনেক নোট পাওয়া যাবে। কিন্তু সে

খাওয়ার দিকে কি আর আছে। স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে দেড়-দুই বছর আগে। বি. এ. পাশ করে যাওয়ার কথা ছিল এতদিনে। কিন্তু একবারও পরীক্ষা দেয় নি। আর একবার রিপোর্ট করেছে। কলেজে ঢুকবার পর অমল আর ওকে পড়ায় নি। ওরা আর ডাকে নি। আস্তে আস্তে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গেছে। এক পাড়ায় থাকলেও এক রাস্তায় তো আর থাকে না। দেখা সাক্ষাৎ খুব কম হয়। এক পাড়ায় থেকেও মনে হয় ওরা যেন দুই আলাদা শহরে বাস করে।

পুরোণ ছাত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুরোণ দিনের কথা ভাবছিল অমল। মিনিট তিনেকের বেশি অবশ্য নয়। কিন্তু তিন মিনিটের স্মৃতিচারণ কি কম? তিন মিনিটে তিন যুগের অতীতকে মন্থন করা যায়।

একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল অমল হঠাৎ শিখার কথায় চমকে উঠল, 'অমলদা।'

ডাকটি ভারি মধুর লাগল অমলের। অনেকেই তাকে ওইভাবে ডাকে। তবু কারো কারো গলা কোন কোন মুহূর্তে ভারি মিষ্টি শোনায়।

অমল ঠিক জবাব না দিয়ে শিখার দিকে স্নিগ্ধ চোখে তাকাল।

শিখা বলল, 'এখান থেকে আমরা বাস ধরতে পারব না অমলদা। এখানে দারুণ ভিড় হবে। দেখছেন না, ক্রমশই লোক জমছে। তার চেয়ে চলুন একটু পিছিয়ে গিয়ে ওই মোড়ের স্টপটা থেকে উঠি।'

অমল সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে বলল, 'বেশ তো।'

শিখাকে নিয়ে অমল এগোতে লাগল। পাশাপাশি হাঁটবার উপায় নেই। রাস্তায় বেশ ভিড়। অমল হাঁটতে হাঁটতে ভাবল শিখা আর আগের মত ছোট নেই। আগেকার সেই আড়ষ্টতা চলে গেছে। শিখা এখন বেশ সপ্রতিভ। প্রায় সমবয়সী, বন্ধুর মতই ওর সঙ্গে এখন গল্প করা যায়। ফিরে যাবার সামান্য পথটুকু যে অমলকে একা যেতে হবে না, শিখার সঙ্গে গল্প করতে করতে যেতে পারবে একথা ভেবে ভালো লাগল অমলের। জীবনটা মাঝে মাঝে বড় একঘেয়ে লাগে। সেই একটানা কাজের পর কাজ। অফিসের চাকরি বাড়ি ফেরার পথে ছাত্র পড়ানো, বাড়িতে গিয়ে অভাব অনটনের কিরিস্তি শোনা—বড় বৈচিত্র্যহীন জীবন। পারিবারিক পুরোণ সম্পর্কগুলি কেমন যেন জীর্ণ হয়ে এসেছে। নতুন বন্ধুত্বের বন্ধনের মধ্যে মাঝে মাঝে মুক্তি চায় অমল। কিন্তু চাইলেই তো আর পাওয়া যায় না।

সামনেই একটি রেস্টুরেন্ট। একটি যুবক তার সঙ্গিনীকে নিয়ে বেরিয়ে এসে বাস ষ্টপের দিকে এগিয়ে গেল।

অমল হঠাৎ পিছন ফিরে বলল, 'শিখা, আমরাও এককাপ করে চা খেয়ে নেব নাকি? যে ছাতটি জুটেছে তার মাথা ভারি মোটা। কিছু চোকে না মাথায়। বকতে বকতে গলা শুকিয়ে যায়।'

কিন্তু কোথায় শিখা। কেউ তো নেই পিছনে। অমল ভালো করে তাকিয়ে দেখল অপরিচিত কয়েকজন ভদ্রলোক তার পিছনে পিছনে আসছেন। শিখা তাদের মধ্যে নেই। সামনে নেই, পাশে নেই, পিছনে নেই—শিখা যেন পৃথিবী থেকেই অন্তর্হিতা হয়ে গেল।

কোথায় গেল মেয়েটি। আশ্চর্য। পিছনে ফিরে অমল তাকে খুঁজতে লাগল।

এক ভদ্রলোকের সঙ্গে একটু ধাক্কা লাগল। তিনি বললেন, 'কী মশাই। আকাশের দিকে তাকিয়ে হাঁটেন নাকি?'

আর একজন সহানুভূতির সুরে বললেন, "কী হয়েছে? পকেট কাটা গেছে নাকি?"

অমল এবার বুঝতে পারল ব্যাপারটা। শিখা নিশ্চয়ই বাসষ্টপে অন্য কারো জন্য অপেক্ষা করছিল।

অমলকে বলতে পারেনি। কি বলতে চায়নি। তাই এই ছলনা।

দুঃখ নয়, নৈরাশ্য নয়, শুধু তীব্র একটা অপমানে ভিতরে ভিতরে জ্বলতে লাগল অমল। এই ইতরতা, অভদ্রতার কি মানে হয়? শিখা তো ওকে বলতে পারত 'আমার একটু কাজ আছে অমলদা। আমি পরে যাব।' কি কারো সঙ্গে যদি অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকেই সে কথাও বলতে পারত শিখা। তাতে অমল কিছু মনে করত না। কিন্তু এই ছলনা প্রতারণা কেন? এও কি সহ্য করতে হবে?

বাড়িতে এসে মা বললেন 'কী হয়েছেরে? তোর মুখখানা অত শুকনো দেখছি যে।' অমল রূঢ়কণ্ঠে বলল 'পরিশ্রমে।' মা তার মেজাজ দেখে আর কিছু বললেননা।

খাওয়াদাওয়ার পর পল্টু ছোট বোন চিত্রার কাছে অভিযোগটা জানাল। বোনের সঙ্গেও তার আট ন' বছর বয়সের ব্যবধান। কিন্তু একটু বড় হবার পর সেই ব্যবধান পার হয়ে বোনই এখন বন্ধু হয়ে উঠেছে অমলের। অনেক সুখদুঃখের কথাই এখন তার সঙ্গে হয়।

চিত্রা বলল 'শিখার কথা আর বোলোনা দাদা। ওর স্বভাবটভাব এখন অন্য রকম হয়ে গেছে। বাড়িতে ওদের যত কড়াকড়ি বাইরে তত ওদের লুকোচুরি বেশি। ও সবাইকে লুকোয়। একজনকে লুকিয়ে আর একজনের কাছে যায়। কতজনের সঙ্গে যে ওর বন্ধুত্ব হল আর ভাঙল তার ঠিক নেই।'

শিখার এই নিন্দায় খুশি হল অমল। কিন্তু সব জানা কি এতে মেটে।

তারপর থেকে রাস্তায় মোড়ে বাসে, বাসষ্টপে অনেকবার দেখা হল অমলের কিন্তু চোখে চোখ পড়তেই শিখা অন্যদিকে তাকায়। যেন অমলকে সে চেনেইনা। যেন তার সঙ্গে শিখার কোন দিনই কোন পরিচয় ছিলনা।

এই অবজ্ঞা অপমানে অপমানে অমল আরো জ্বলতে থাকে। মনে মনে ভাবে কী করে এর শোধ নেওয়া যায়। ওর এই ব্যবহারের অন্তত একটিবার প্রতিবাদ করতে হবে।

কিন্তু শিখা ভারি চতুর মেয়ে। সেই সুযোগ সে কিছুতেই অমলকে দেয় না। অমলকে দেখলে সে অতি কৌশলে সরে যায়। চোখ ফিরিয়ে নেয়। অপরিচয়ের ভান করে।

পৃথিবীটা অনেক বড় তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু একটি বড় রাস্তা আর তিনটি বাস গলি নিয়ে শহরতলীতে অমলদের এই যে ছোট একটু পাড়া এও কম বড় না। একটি ছেলের কাছ থেকে একটি মেয়ের লুকিয়ে থাকবার পক্ষে যথেষ্ট বৃহৎ।

কিন্তু সেদিন এক কাণ্ড ঘটল। বি. এ, পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। পাড়ার ছেলেমেয়েরা একটু চঞ্চল। এ বছর অমলের জানাশোনা কোন ছাত্র ছাত্রী পরীক্ষা দেয়নি। কোন কোন বার তারা রোলনাম্বার দিয়ে যায়। আগে থেকে পরীক্ষার ফল জেনে নেওয়ার জন্যে অনুরোধ করে। বন্ধুদের সমালোচনা হতে হয় অমলকে। এবারকার তেমন কিছু হয়নি।

পাড়ার বাসষ্টপে দাঁড়িয়ে নিজের ছাত্র জীবনের কথা ভাবছিল অমল। মাঝে মাঝে মনে হয় এই তো সেদিনের কথা। আবার কখনো মনে হয় যেন বহুযুগ সেই জীবনকে সে ফেলে রেখে এসেছে। সেই পরীক্ষা পরীক্ষার ফল নিয়ে উদ্বেগ, অকৃতকার্যতার গ্লানি, সাফল্যের আনন্দ কিছুই যেন আর এখন অমলকে স্পর্শ করে না। সে যেন আর এক জনম আর এক জীবন। এখনকার সুখদুঃখ ভিন্ন ধরণের আশা আকাংক্ষা আঘাত প্রত্যাঘাতের সঙ্গে আবর্তিত হয় না। এই মুহূর্তে এই বাস ষ্টপটিতে দাঁড়িয়ে ভাবতে পারা যায়না এই জীবনও একদিন বয়সান্তে আজকের সুখদুঃখও সেদিন এমনি ক্ষীণ আর অস্পষ্ট হয়ে আসবে।

হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে একদল মেয়ে যাচ্ছিল। অমল চোখ ফিরিয়ে নিল।

কিন্তু আশ্চর্য একটি মেয়ে সেই দল থেকে বেরিয়ে এসেছে। এসে অমলের পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'অমলদা এবার আমি পাশ করেছি।' শিখার মুখে হাসি। আজকের বিজয় গৌরব তাকে সব ভয় সংকোচ অপরাধের গ্লানি ভুলিয়ে দিয়েছে।

অমলও হাসল 'পাশ করেছো! বেশ বেশ। খুব খুশি হলাম।'

'আপনি নিশ্চয়ই আমার ওপর রাগ করে ছিলেন কি—'

ওরার শিখা কতকগুলি কথা বলবে।

হযোগ দিল না।

ছেলে বলল 'সে দিন কিন্তু হবনি। যাও, তোমার বন্ধুরা দাঁড়িয়ে আছে।'

শিখা অমলের মাথা ছাড়িয়ে গেছে। অন্তত তার চেয়ে ইঞ্চি দুয়েক লম্বা তো হবেই। ওর চোখ মুখ দেখলে বোঝা যায় জীবনের অভিজ্ঞতাও কিছু হয়েছে।

কিন্তু এই স্বাস্থ্যবতী পূর্ণযৌবনা নারীর মধ্যে অমল এই মুহূর্তে স্কুলের সেই ছোট্ট ছাত্রীটিকেই দেখতে পাচ্ছিল।

বিশেষ উৎসবে
বিশিষ্ট জিনিসটিই চাই

কেয়ো-কার্পিন
একটি বিশিষ্ট কেশ তৈল

দে'জ মেডিকেল ষ্টোর্স প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা, গৌহাটি, কটক, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, লেকেন্দ্রাবাদ, আম্বালা, ইন্দোর

PRO-KMP-11

বা ণি জ্য

দিব্যেন্দু পালিত

পঁচিশ বছরের চাকরিতে গগন মুখুজ্জে কোনদিন অফিস কামাই করেন নি। রয়াল এ্যাণ্ড কোম্পানীর ইতিহাসে এটা রেকর্ড।

কোম্পানী খুলেছিল তিনজনকে নিয়ে। বেয়ারা শশীশেখর শেষের দিকে ঘন ঘন আমাশায় ভুগত, চোখে কম দেখতে শুরু করেছিল আর মেজাজটাও হয়ে উঠেছিল খিটখিটে। জন সংযোগ ব্যবসায়ে এই ধরণের বদমেজাজী লোক অচল। সিকটে ওঠার মুখে প্রকাশ্যেই একদিন সে সিনিয়র পার্টনার বাহুকে ঘিস্তি করেছিল। শশীশেখর সম্পর্কে বাহু সাহেবের দুর্বলতা আছে। ফলে তাকে বরখাস্ত না ক'রে পেন্সন দেওয়া হল।

শশীশেখর এখন মাসে একবার অফিসে হাজিরা দেয় পেন্সনের দিনে। এবং ঐ একদিনেই বাহু সাহেবের পিতৃপুরুষ উদ্ধার করে ছাড়ে।

দ্বিতীয় ব্যক্তি বাহু সাহেব, রয়াল এ্যাণ্ড কো'র সিনিয়র পার্টনার। যতদিন প্রোপাইটরী ছিল ততদিন নাম লিখতেন ত্রিদিব চন্দ্র বসু। ঐ বছর পাঁচেক। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান গ'ড়ে উঠল, বর্ষার জলে গাছের পাশে আগাছার বেড়ে ওঠার মতো রয়াল এ্যাণ্ড কো'ও ফাঁপতে লাগল। বহু অগত্যা পরিণত হলেন বাহু-তে। একদিনে তিন সেট ষ্ট্যাটের অর্ডার দিতে হলো তাঁকে।

এ-সব ঘটনার সাক্ষী বেয়ারা শশীশেখর। নতুন ছেলে-ছোকরারা কোম্পানীর আগাগোড়া ইতিহাস জানার ব্যাপারে বিশেষ উৎসুক। শশীশেখর তাদের হতাশ করে নি।

তৃতীয় ব্যক্তি গগন মুখুজ্জে। তাঁর কোন ইতিহাস নেই অবশ্য বয়স ও প্রবীণতার যদি কোন ইতিহাস থেকে থাকে, সে-ইতিহাসে গগন মুখুজ্জেরও অধিকার আছে।

রয়াল এ্যাণ্ড কোম্পানীতে যখন ঢুকেছিলেন তখন তাঁর বয়স চল্লিশ। খালকোচা ধুতির ওপর হাফ শার্ট চড়িয়ে অফিসে আসতেন। মাথার চুল তখনই পাতলা হতে শুরু করেছিল। চোখে চশমা ছিল কি না শশীশেখর বলতে পারে না। অফিসের একটা চাবি সব সময় তাঁর কাছে থাকত। শশীশেখরের অনুপস্থিতিতে গগন মুখুজ্জে অফিসের দরজা খুলেছেন এমন নজিরও আছে। ছুটি নেননি, কামাই করেন নি, গগন মুখুজ্জে সত্যিই এক দৃষ্টান্ত।

বয়স বেড়েছে চুলে পাক ধরেছে, চেহারার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু গগনবাবুর নিয়মানুগ জীবনের কোন পরিবর্তন হয় নি। ছেলে ছোকরারা ঠাট্টা ক'রে বলত নেহরু এ্যালবামের মতো গগন মুখুজ্জের খাতিরেও একটা এ্যালবাম বেরনো দরকার। আসলে তারা সব সময়েই চাইত এ্যাণ্ড কো'র 'টু পার্টস' গজাক।

এ হেন গগন মুখুজ্জে অফিসে আসেন নি দেখে সকলেই আশ্চর্য হল। বেশ ভাজা ঝুরঝুরে দিন, আকাশে রোদও নেই মেঘও নেই, সবজ সুখী দিনের পরিবেশ সাজানো, এ-হেন দিনের মধ্যে গগন মুখুজ্জের অনুপস্থিতি বড় বেশি চোখে পড়ে। ডান দিকের সারির শেষের আসনটি ছিল তাঁর।

টেবিলে স্তূপীকৃত কাইল, সকালের ডাকের চিঠিপত্রও রয়েছে। শুধু গগনবাবু নেই।

অফিস বসল যথা সময়ে। গগনবাবুর অনুপস্থিতি কিছুক্ষণ সকলের আলোচনার বিষয় হ'য়ে দাঁড়াল।

পরিতোষ উঠে গগনবাবুর পাশের টেবিলে। কিছুক্ষণ এর কাছে ওর কাছে গজগজ ক'রে এসে বলল, 'আমার চাকরিটা আজ গেল।'

'কেন, চাকরি যাবার কি হল। আশিস বলল ওদিক থেকে 'বেশ তো আছ, বাপু।'

'হ্যাঁ, বেশই তো আছি।' পরিতোষ হতাশার ভাব করল। 'স্টেল ব্রাদার্সের বাজেট তৈরী করতে হবে। এদিকে গগনদা নেই। নিজের হাতে করেছি নাকি কোনদিন।'

'না পারলে কমল মুড়ি দিয়ে ব'সে থাক।' আশিস হাতের কাজে মন দিল।

'বেশছ না 'আর্জেন্ট' লেখা।' পরিতোষ গজগজ করতে লাগল। 'ঘুড়ো হাবড়াগুলিকে নিয়েই বিপত্তি। দু'দিন পরে কান্নাই করলেই পারতিস।'

এমন সময় বাসু সাহেবের প্রবেশ। চেম্বারে ঢুকে বোধহয় খটকা লাগল। সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এসে এদিক ওদিক তাকিয়ে দৃষ্টি স্থির হল গগন মুখুজ্জের শূন্য আসনের দিকে।

'গগনবাবু আসেন নি।'

পরিতোষ ঘাড় নাড়ল। মার অর্থ, না।

'টেল।' পাইপ কামড়ে ধরলেন বাসু সাহেব। 'ইট্স এ রেকর্ড। কিছু হয়েছিল নাকি।'

কি হয়েছিল কে খবর রাখে। উত্তর না পেয়ে গম্ভীর বাসু সাহেব আবার নিজের চেম্বারে গিয়ে ঢুকলেন।

২

বেলা দুটোর লাঞ্চ সেরে অফিসে ফিরছিলেন বাসু সাহেব। দুপুরে সাধারণত তিনি মদ্য পান করেন না। সহিত বলে নয়, কেমন বিমুনি আসে। আজ না খেয়ে উপায় ছিল না।

সেরটন কন্টার নতুন এজেন্সী খুঁজছে। উঠতি ব্যাসু-ক্যাকচারার, ইতিমধ্যেই বাজার ছেয়ে ফেলেছে। আপাতত দু'লক্ষ টাকার বাজেট। পাঁথতে পারলে ভালো মার্জিন থাকবে। বোম্বাই থেকে বদলি হয়ে এসেছে নতুন পি, আর ও. সি পি. চৌহান, মহারাষ্ট্রের লোক। আজ লাঞ্চে ডেকে-ছিলেন। বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে মনে হচ্ছে না। লোকটি ঘুঁদে, গ পাইনের সব খবরই রাখে। চল্লিশোর্ধ্ব ব্যাচিলরদের যা হয়—চৌহানের অনেক গুণই আছে। প্রায় দু' বোতল হুইস্কি গিলিয়েও কায়দা করতে পারলেন না। সামনের সপ্তাহে দেখা করতে বলল। বাসু সাহেবের সন্দেহ হয়তো অন্য এজেন্সীও ইতিমধ্যে পিছু নিয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে পাইপ ধরিয়ে লিফ্‌টে উঠলেন। লিফ্‌ট্‌ চলতে শুরু করবে এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে লোকটা লিফ্‌টে ঢুকে পড়ল। আগে কখনো দেখেছেন বলে মনে হল না। উস্কোখুস্কো চুল, ময়লা চেহারা, শরীরের সর্বত্র একটা দীনতার ছাপ।

বাসু সাহেবের মেজাজ বিগড়ে গেল। তিনি লিফ্‌টে উঠলে সাধারণত কর্মচারীরা আর কেউ ওঠে না, এ ব্যাপারে তাঁর অঘোষিত নির্দেশও আছে। লোকটি যেই হোক, এখনও আদব কায়দা শেখে নি।

প্রায় অর্ধ পথে লোকটি হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়ল। কেমন হকচকিয়ে গেছে। বাসুর কৌতূহল হল।

'কোথায় যাবেন আপনি?'

'গগনবাবুর অফিসে।'

লোকটি ধরেই নিল বাসু গগনের অফিসের কেউ। সময় না নিয়েই বলল, 'গগনবাবুর স্যার এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

'আপনি কে?'

পাইপটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে নিলেন বাসুসাহেব। লোকটিকে দেখলেন আপাদমস্তক।

লিফট তত্ক্ষণে চার তলায় পৌঁছে গেছে। বাসু বেরিয়ে এলেন, পিছনে পিছনে লোকটি। ভাবগতি দেখে মনে হচ্ছে জানাবে। এইসব পেটি স্টাফদের নিয়েই তাঁর যত বিপদ। এরা পদমর্যাদা বোঝে না, গুরুত্ব দিতে জানে না, সময়ের মূল্য সম্পর্কে কোন ধারণা নেই। বাসু সাহেবের চোখে মুখে বিরক্তি ফুটে উঠল।

'আমি স্যার ওর পাঁয়ের লোক।'

পবন মুখুজ্জের পাঁয়ের লোক নার্ভাস হয়ে ঢোঁক গিলল।

'পবনবাবু অফিসে আসছিলেন। বাস থেকে নামার সময় হঠাৎ—'

'আপনি ভিতরে গিয়ে বলুন।

বাস্ত না হ'য়ে পারলেন না বাসু সাহেব। এঁদের তিনি চেনেন। সংক্ষেপে মূল বক্তব্য পেশ করতে শেখেনি। যে-কোন ঘটনাই আদি-মধ্য-অন্ত বর্ণনা না ক'রে ছাড়ে না। দরজা ঠেলিয়ে দিয়ে দ্রুত স'রে পড়লেন তিনি।

স'রে পড়লেন, কিন্তু ভাবনা গেল না। পবন মুখুজ্জে লোকটিকে তিনি কত দিন দেখছেন না। এক সময় হুয়াল এ্যাড কোং'র উন্নতি বিহুরে লোকটির সঙ্গে সলা পরামর্শও করেছেন। কিন্তু, ক্রমশ তাঁর ধারণা হল পবন অত্যন্ত ইমসিপিড কারেক্টর, যারা কিনা খায় দায়, ঘুমোয় নিয়মিত অফিস করে যায় যায় আবার ঘুমোয়—অর্থাৎ, লাইফে কোন এ্যামবিশন নেই। অফিসের চেয়ার টেবিল আলমারী, দেয়ালের ক্যালেণ্ডারের মতো পবন মুখুজ্জেও তাঁর চোখে ক্রমশ একটা আসবাবপত্র অস্তিত্বে পরিণত হয়েছিল। দুর্ঘটনার কথাটাও একই কারণে তাঁর কাছে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল না।

চেম্বারে ঢুকে বাসু সাহেব একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন। অথচ সময় তাঁর খুবই অল্প। মাত্র সাতদিন। এর মধ্যে যা হোক কিছু একটা করে ফেলতে হয়। আজকের কথাবার্তায় চৌহানকে তিনি মোটামুটি খুশি করেছেন। টাকা পয়সার দিকে লোকটির তেমন নজর নেই। সুতরাং অন্য পথ খুঁজে বার করতে হবে।

ঘন্টি বাজিয়ে বাসু সাহেব বেয়ারাকে ডাকলেন। বললেন, 'চৌধুরী সাহেবকে বোলাও।'

চৌধুরী এল প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই। তাঁর পছন্দের লোক। ছ' শো টাকা মাইনে দিয়ে অন্য ফার্ম থেকে ভাঙিয়ে এনেছেন। বয়স বেশি নয়, দস্ত ডিগ্রিও পেরিয়েছে কি পেরোয় নি। কিন্তু, কাজে-কর্মে রীতিমতো পটু, আদব-কায়দা জানে, ব্যবহারে কেতাদুরস্ত আর ইংরিজীও বলে চমৎকার। ছোকরা উন্নতি করবে।

পাইপটা সরিয়ে রাখলেন বাসু সাহেব। সিগারেটের প্যাকেট বের ক'রে চৌধুরীর দিকে এগিয়ে দিলেন।

'হাতে ভালো মেয়ে আছে?'

ধোঁয়ার আড়ালে বাসু সাহেবের গোল মাংসল মুখ মুহূর্তের জন্য অদৃশ্য হল।

'খানে চাকরি দেব।' চৌধুরীর বিব্রত ভাব দূর করতে চাইলেন বাসু সাহেব।

চৌধুরী বিধায় পড়ল। সেন্টিমেণ্টে লাগল কথাটা। সে নিতান্ত কাঁচা নয়, বয়সও অত্যন্ত পরিষ্কার চৌহানের সঙ্গে এ্যাপয়েন্টমেন্টের কথাটা সে আগেই শুনেছিল। তার পরেই এই প্রস্তাব। বাসুর উদ্দেশ্য বুঝতে দেরি হল না।

'আই ডোন্ট কাইণ্ড এনি ওয়ান।' নাক দিয়ে গলগল ক'রে ধোঁয়া বের করল চৌধুরী। এই মুহূর্তে তো তেমন কাউকে দেখছি না।'

'থী পয়েন্টিড।'

বাসু সাহেব চৌধুরীর মনোভাব যাচাই করলেন।

'চৌহান স্ফূর্তিবাজ লোক। দি উড লাইক টু হ্যাভ

দায় কম্পানীর। সো, ডু দ্য নীডফুল। লোগাড় করতে হবে। দেরি করলে চলবে না।'

চৌধুরী মাথা নিচু করল। বাহ্ সাহেব দেশী লোক, একটি মেয়ের প্রয়োজন কতোখানি না বুঝলে এ হেন প্রস্তাব করতেন না। কিন্তু, মেয়ে সংগ্রহ করা তার কাজ নয়।

একটু চিন্তা করতেই মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। দুই আঙুলের ভাঁজে সিগারেটটা শক্ত ক'রে চেপে ধরল চৌধুরী।

'স্টেট্‌সম্যানে একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয়?'

'ওল রাইট। আজকেই কপিটা পাঠিয়ে দিন। ডিসগ্রেস এ্যাড। পার্সোনালি দেখা করতে বলুন। টিক টু আওয়ার নীড।'

মনে মনে বিজ্ঞাপনের একটা খসড়া ক'রে নিল চৌধুরী। টাইপ ক'রে পাঠাবে এখুনি, যাতে কালই ছাপা হয়।

বেরোবার আগে চৌধুরীর হঠাৎ বাইরের আলোচনার কথা মনে পড়ল। গগন মুখুজ্যের এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। আঘাত গুরুতর, হাসপাতালে গেছেন। কিন্তু একটা কথা দরকার।

'গগন বাবুর এ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে...'

দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে কথাটা শুধুই শুরু করেছিল চৌধুরী। বাহ্ সাহেব ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

'আমি শুনেছি।'

চৌধুরীর দ্বিতীয় কথা বলার ছিল না। আস্তে আস্তে বেরিয়ে এল বাইরে।

৩

বেলা চারটের খবর এল গগন মুখুজ্যের মৃত্যু হয়েছে। এ্যাক্সিডেন্টের খবর শুনে দু' তিনজন গিয়েছিল হাসপাতালে। খবরটা তারাই নিয়ে এল।

আদ্যোপান্ত ঘটনাটা প্রকাশ হয়ে পড়ল ক্রমশ। ডানকুনি থেকে ট্রেণে চেপে রোজ কলকাতায় চাকরি করতে আসতেন গগন মুখুজ্যে। হাওড়ায় নেমে আজও তিনি যথারীতি বাসে চেপেছিলেন। বয়স অবশ্য হলেও ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে ভ্রমণ তাঁর কাছে নতুন ছিল না। তবু, দুর্দৈব হ'লে যা হয়, আজই তাঁর হাতের থেকে হাত পিছলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে এ্যাক্সিডেন্ট।

গগনবাবুর অফিসে না আসার পিছনে যে এত বড় একটা ঘটনা অপেক্ষা ক'রে আছে সেটা কেউই অনুমান করেনি। মৃত্যুর সংবাদে সকলেই মুহ্যমান হয়ে পড়ল। গগন মুখুজ্যের পারিবারিক বৃত্তান্ত অনেকেরই অজানা ছিল না। গত পঁচিশ বছরে রয়াল এ্যাড কো'র সমৃদ্ধি হয়েছে প্রচুর; কিন্তু গগন মুখুজ্যে বেশিদূর এগোতে পারেন নি। স্বভাবে, আচরণে ও বিবেক বুদ্ধিতে তিনি ছিলেন নিতান্তই সেকেলে। ফলে তাঁর স্ত্রী, হেমবালা দেবী অনটন সত্ত্বেও প্রায় ত্রিশ বছরের বিবাহিত জীবনে গোটা সাতেক সন্তানের জন্ম দিয়ে স্বামীকে সন্ত্রস্ত করেছেন। কায়ক্লেশে পেটে খেত কোন রকমে। নিজের দুঃখ দারিদ্র্য নিয়ে কোন দিন হা-হুতাশ করেননি গগন বাবু। তাঁর আকস্মিক মৃত্যু সকলেরই সিমপ্যাথির কারণ হলো।

বাহ্ সাহেবের দুই বাঁচিয়ে অফিসের স্টাফদের মধ্যে একটা চাঞ্চল্য পড়ে গেল।

গগন মুখুজ্যের পরিবারকে সাহায্য করার জন্য মোটা-মুটি একটা খসড়া প্রস্তাব সেইখানেই রচিত হল। বাহ্ সাহেব তাঁর সংস্কারের জন্য পঞ্চাশ টাকা মঞ্জুর করে পাঠালেন। পঁচিশ বছর নিরলসভাবে যে-লোকটি কোম্পানীর সেবা করেছে, তাঁর জন্য কিছু করা দরকার। বিষয়টা হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর সময় লাগে নি। হৃদয়বান ব্যক্তি তিনি, ওঁকেও সংসার করতে হয়।

ছেলে ছোকরারা তাতেই সন্তুষ্ট হল না। গগন মুখুজ্যের বড় মেয়েটি গত বছর বি. এ পাশ ক'রে মাস্টারীতে ঢুকেছে।

(শেষাংশ ৪৯১ পৃষ্ঠায়)

রৌদ্ররেখা

প্রবোধবন্ধু অধিকারী

...দেখে বোঝবার উপায় নেই; কেই বা বলতে পারে, এখন, গোটা দিন কি রাত্রির কোন সময় এখানে স্থির হয়ে আছে। হ'তে পারে বরষার বিষণ্ণ কোনো বিকেল, যখন সারাটি আকাশ মেঘে মেঘে কানা, আদিগন্ত বাদলার সাজে সজ্জিত আকাশ বুঝি নিমেষের মধ্যে অজস্র বারিধারা ঢেলে দেবার ইশারার জন্যে অপেক্ষমান। মেঘাচ্ছন্ন নিস্তেজ হাওয়ার ঘন ইঙ্গিতে ঝাঁড়ির গাঢ় আস্তর পড়ে পড়ে ধূসর আবছা এবং ঘোলাটে করে তুলেছে গোটা জগৎকে। কিংবা শহর এলাকা হ'লে বলা যেত, বিকেল হয়েছিল খানিক আগে। সন্ধ্যার সন্ধিলগ্ন পেরিয়ে আলা শহরের এই গলি ঘুপচির বস্তী আর সাবেকী বোনেদ পাড়ার মিশি এলাকা এখন পাড়ার তাবৎ উনুন আঁচের ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় অন্ধ। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। গাছপালারা ডুব দিয়েছে জলের অতলে। কাছের মানুষটিকে পর্যন্ত ঠাহর করা এখন কঠিন।

না, এখন বর্ষা নয়, আসন্ন রাত্রির প্রাক্‌মুহূর্তের কোনো বস্তী এলাকাও এ-নয়; বাস্তবিক এখন সকাল। ভোর শেষ হয়েছে অনেকক্ষণ তবু বোঝবার উপায় নেই সময় কত। এত ঘন আর গাঢ়তা পেয়েছে যে পথঘাট নিশ্চিহ্ন, আশপাশের ঘরবাড়ি কি গাছপালার অস্তিত্ব ধরা যাচ্ছে না। নিথর নিস্তব্ধ হয়ে আছে সব। গোটা বিশ্ব বুঝি সমুদ্রের তলা থেকে সদ্য উদ্ধার করে আনা কোনো ভারী পুরনো পাথরের মতন শীতল এবং আর্দ্র। পক্ষী বলতেও এ জগতে কোনো প্রাণী বেঁচে নেই।

গত রাত্রির শেষ প্রহরে পলকা দুই বৃষ্টি হয়ে গেছে এখানে, এই উপকণ্ঠে। মাটি ভেজা। পথঘাটে জল না দাঁড়ালেও ভিজে ন্যাতার মতন কেমন সপসপ করছে সব। বৃষ্টি নেই তবু টুপটাপ শব্দ আসছিল। কুয়াশায় ডুব দেওয়া গাছের পাতা চুঁয়ে শিশিরের জল গড়িয়ে পড়ছে। অন্ধের মতন হাতড়াবার দরকার নেই, গন্ধ থেকেই ধরা যাচ্ছিল সারারাত ধরে শিউলি ঝরে ঝরে মাটির ওপর সৌরভের কারণ অনেক কুয়াশা বস্তুর বাতাসে ভাসছিল। এই কুয়াশা আস্তরণ পড়েছে। জন প্রাণী কোথাও নেই, কোথাও না। খানিকপরে এই এলাকার বড় রাস্তা থেকে এক জোড় পায়ের শব্দ নেমে এল। পীচের রাস্তা থেকে এগিয়ে এলে রবারের চোয়া ঢাকা এই পথে সেই পদশব্দ স্পষ্ট হ'ল। হাই হিল, জুতার পলকা চাপে পাথরের মসৃণ টুকরোগুলো কাঁদে, কবায়।

ঘন কুয়াশার পরদা সরিয়ে এখন যদি রোদ উঠত তবে নিশ্চয় ছোট এই পথটুকুর অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার মতন ছিল। দু'পাশে কেয়ারী, বেলফুলের টানা ঝাড়, রক্তগোলাপের দু' একটি ভারী শাখা পথের দিকে গলা বাড়িয়েছে। টগর ফুটেছে, গন্ধরাজের মিঠে সুবাসে বাতাস ভারী, কাঠমালতী আর গাঁদার ঝাড়ে ঝাড়ে, প্রজাপতি উড়ছে। কিন্তু রোদ নেই, ভয়চকিত আলো বুঝি ঘুরে কোথাও সংগোপন আশ্রয়ে নিজেকে আড়াল করে রেখেছে।

পথ ফুরাই, খানিক দূর পর্যন্ত এগিয়ে এসে এই পথ যেখানে থেমেছে, সুদৃশ্য একটি হালফ্যাশান বাড়ির বাইরের লন যেখানে। লন পেরোলে দরজা। দরজার একটি কপাটে নেম-প্লেট আছে খয়েরী বার্নিশের ওপর সাদা অক্ষর যেখানে লেখা রমনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। শুধু একটিমাত্র নাম। নামের ওপর কি নীচ কোথাও আর কিছু লেখা নেই।

হাই হিল জুতোর হালকা পায়ের শব্দ লন পেরিয়ে, দরজার এসে থামল। এই দরজায়। বুঝি একটিমাত্র মুহূর্তের জন্যে এখানে সে দাঁড়িয়েছিল। গলা বাড়িয়ে দেখবার আগেই ভেতর থেকে অত্যন্ত সংযত এবং দৃঢ় গলায় কেউ শুধোলো, 'কে'

'আমি—' হাই হিল জুতো পরা মহিলার গলায় সামান্য দ্বিধা। অল্প কুণ্ঠার ভাবটিও বুঝি আছে। জবাব দিয়েছিল, আবার চৌকাঠ ডিঙিয়ে ঘরে ঢুকল এই মহিলা। তার পরণে দামী সিল্কি শাড়ি, হালকা বেগনী রঙের। গায়ে কালো শিফনের ব্লাউজ। মহিলা প্রায় নিরাভরণা। নাম কণক।

'কখন এলে?' এ-ঘরের বয়স্ক পুরুষটি হাতের কাজ ফেলে অনেকটা অবাক চোখে দেখছিল। প্রশ্ন শেষ করে সে সামান্য এগিয়ে এল।

'খুব সকালে।' কণক তার হাতের ভারী ব্যাগটা মেঝের ওপর দিয়ে যেন স্বস্তি পেল। রুমাল দিয়ে মাথা ও মুখের সিঁদুর মুছছিল। 'মনটা বড় খারাপ লাগছিল মহিমদা···' কথার সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাসের শব্দও শোনাগেল।

'জানতাম, লাগবে···' মহিম আরও খানিক এগিয়ে এসে, অনেকটা কাছাকাছি দাঁড়াল। 'খোকন দেখলে খুব অবাক হবে। সিঁড়ি দাও।'

'ওরা কোথায়?'

'সকালে বেড়াতে বেরিয়েছে?'

'এই কুয়াশার মধ্যে···'

'খুব ভোরে কুয়াশা ছিল না। রাতে বৃষ্টি হয়েছিল···' মহিম আরও এগিয়ে এসে সোফা দেখিয়ে দিল, 'তুমি বসো তো। আমি একটা তোয়ালে নিয়ে আসি···'

'না-না-মহিমদা, তুমি অত ব্যস্ত হ'য়ো না।' কণক সোফায় বসলো। রুমালে গলা মুছছিল। 'সকালটা এত মিষ্টি···'

'খোকন তোমার একটা চিঠি পেয়েছে পরশুদিন। তার কি আনন্দ। চিঠিটা আমি পড়েছি।' মহিমের চোখেমুখে সামান্য প্রসন্নতা। 'পড়ে আমি বুঝেছিলাম তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে। মন খারাপ···ওখানে তুমি খুব হাঁপিয়ে উঠেছ···'

'না-না না', কণক অল্প বিচলিতভাবে কাশল। সামান্য পাংশু হয়ে এসেছে মুখ। রুমালে চোখ আর ওষ্ঠ মুছে নিয়ে তাকাল। 'লেখাপড়া ঠিক মতন করছে তো?'

মহিম হাসল, চিলেচালা মুখের হাসি। 'তোমায় যেমন কথা, পড়লে আর মাহুতদের পেছনে কে দৌড়াবে?' মহিম টিপয়ের ঢাকনা ঝেড়ে পাতছিল। 'ওখানে খুব শীত পড়েছে, না?'

'হ্যাঁ

'এখানে এই দু'দিন।' মহিম জানলার কাছের বুক শেলফের দিকে এগোলো। 'দিনের ভাব এমন হয়ে আছে না, মনে হ'চ্ছে মাথার ওপর বৃষ্টি···'

কণক কিছু বলল না, তাকাল না, শুনছিল কিনা তাও বলা মুস্কিল। যেন তন্ময় হ'য়ে কিছু ভাবছিল। সারামুখে শংকিত চিন্তার ভাসাভাসা রেখা। দু' ভুরুর সন্ধিতে একাধিক কালো রেখা খাড়াভাবে ফুটেছে। কণকের চোখ জানলার নীচে স্থির হয়ে আছে।

মহিম আরও কি সব বলল। জবাব না পেয়ে ফিরে তাকিয়ে কণককে দেখে অল্পক্ষণ নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে এগিয়ে এল। 'কণকদি···' নরম গলায় ডাকল মহিম।

ডাক শুনে সামান্য চমকে উঠলেও কণক সহসা নিজেকে সংযত করতে পারল। মুখ তুলল কণক। তার শুভ্র কপাল

ছুঁয়ে টানা ভুরু কেটে গুটিকয় চুল ঠোঁট ও গাল বেয়ে ঝুলে পড়েছে। 'তোমার দাদাবাবু ···' যেন দূর থেকে অনেক ইতস্তত্তের বাঁধ একটি একটি করে ভেঙে কণক কথা বলছে।

'উনি পড়ার ঘরে। লিখছেন। কাল প্রায় রাত দু'টো। নাগাদ লিখেছেন আমি জানি।' একেবারে পাশে এসে দাঁড়াল মহিম। 'খবর দেব?'

'নানা, না মহিমদা, ওঁকে এখন বিরক্ত করো না।' খুব দ্রুত গলায় কথাটা বলে ফেলে কণক নিজেই লজ্জিত কুণ্ঠিত হ'ল। 'খোকনরা ফিরে আসা অবধি তো আমি থাকছি···।'

'আমাকে একবার যেতেই হবে···' মহিম পাশের টেবিলের ওপর থেকে খবরের কাগজ তুলে নিল। 'সেই কখন কাগজ এসেছে···' ডানদিকের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল মহিম। কড়া নাড়তে হাত বাড়িয়েছিল, নাড়ল না। 'দাদাবাবু', অল্প চড়া গলায় ডাকল মহিম।···কাগজ।···তা ছাড়া দিদিমণি এসেছে খোকনকে পড়াতে।'

অল্প নীরবতা। মহিম দরজার কাছে অপেক্ষা করছে। কণক মাথা নীচু করে বসল। তার বুকের ভেতরটা কেমন করছিল, অন্তরে চাঞ্চল্য, ভয়ের ভিন্ন এক স্পন্দন যেন অনুভব করছিল কণক। এক ধরণের অন্তর্লীনের জন্যেও খুশী খুশী ভাব বুঝি মিশেছে তার মধ্যে।

বেশিক্ষণ না, দু' মুহূর্ত পরেই দরজা খোলার শব্দ হ'ল। রমণী। চৌকাঠ পেরিয়ে এসে এ-ঘরে দাঁড়িয়েছে রমণী। হাত বাড়িয়ে কাগজ নিল, চোখ দু'টি কণকের ওপর নিবদ্ধ। কারো মুখে কথা নেই। মাথা নীচু করে কণক এই শীতেও বুঝি ঘামতে শুরু করেছে।

দু' পা এগিয়ে এল রমণী। 'কখন এসে?'

'একটু আগে'। আস্তে আস্তে চোখ তুলল কণক, তাকাল। এক পলকের দৃষ্টি। 'ওই স্থির প্রশান্ত দৃষ্টির গায়ে বুঝি লাইতে থাকল না। মাথা আবার হেঁট করল কণক। আঙুলে আঁচল জড়াচ্ছিল। 'খুব ভোরে গাড়ি এসেছে···'

'আমায় ডাকলে পারতে ··' কথা বলতে বলতে এগিয়ে এল রমণী। টিপায়ের ওপাশের সোফায় বসল। তার পরনে চিলেঢালা শোবার পোশাক। 'আমি লিখতে বসেছিলাম ···'

'মহিমদাকে আমি বিরক্ত করতে মানা করেছিলাম ··' মুখ তুলল না কণক। আরও ব্যস্ততায় অত্যন্ত দ্রুত আঁচল মুড়ছিল, মোচড়াচ্ছিল এবং আঙুলে জড়াচ্ছিল।

'বিরক্ত!' হেসে উঠল রমণী। 'হায় ভগবান ···'

'কেন ···' ছুটতই কোনো জবাব না পেয়ে অর্থহীনভাবে কথাটা শুধালো কণক। চোখ তুলে তাকিয়েছে রমণীর দিকে।

'বললেই কি লেখা হয়?' অল্প কাৎ হ'য়ে বসল রমণী, হাতলে ভর করে। 'নতুন একটা কিছু লিখবার চেষ্টা করেছিলাম।' পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে কণকের দিকে তাকাল। তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ কথা বলল না।

এ যেন জোর করে, একের অনিচ্ছা এবং আপত্তি সত্ত্বেও চোখের ওপর টর্চ ফেলে রাখা। খুব অস্বস্তিকর। ঠিক তেমনি দৃষ্টিতে রমণী তাকিয়ে আছে বুঝতে পারল কণক। শরীরের সর্বত্র অদ্ভুত এক উত্তাপ অনুভব করছিল। শরীরও বুঝি কেঁপে উঠবে। মাথা হেঁট করে আর থাকতে না পেরে কণক চোখ তুলল। নীরব চোখে তাকাল।

'আমি ভেবেছিলাম, তুমি আর ফিরে আসবে না।' চোখ সরিয়ে এনে পাশে তাকাল রমণী। খবরের কাগজটা টেনে নিল, মেলল। 'আজ প্রায় আঠারো দিনের মতন হল বুঝি···'

'আমিও ভেবেছিলাম ফিরে আসব না। কিন্তু না এসে পারলাম না···' নরম, আদুরে অল্প কাঁপা গলায় বলল কণক। ডান হাতে আরেক কজির চুড়ি পড়ছিল আপন মনে।

কাগজ রেখা আছে কোলের ওপর, এক আধটি লাইনের ওপরও চোখ বুলোচ্ছিল রমণী কিন্তু পড়তে পারছে না। তার অল্প প্রসন্ন মুখ এখন ভার ভার। যেন কিছু ভাবছে রমণীমোহন। অন্য কোনো চিন্তায় মগ্ন কণকের কথা শেষ

হতে ঈষৎ গম্ভীর মুখ তুলল রমণী। 'তুমি কি আমাকে সেবা করছ, কণক?'

'না—'

'তুমি কি কণক ভেবেছ যে, আমি তোমার সঙ্গে অভিনয় করেছি, অথবা করছি আর কারও সঙ্গে···'

বিষণ্ণ মলিন হয়ে এসেছিল কণকের মুখ। বেদনার ছায়ায় থমথমে চোখে একবার পাশ দেখে নিয়ে কণক, রমণীকে দেখল। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকল। তার ওষ্ঠ কাঁপছে। অবসাদে বিভ্রান্তি। 'আমিও নিজেকে এই প্রশ্ন করেছিলাম···'

'করেছিলে?' রমণী কাগজটা ভাঁজ করছিল। করল। রাখল টিপয়ের ওপর। 'কিন্তু তোমার জবাব?'

'এর জবাব কি আমি জানি না।'

খুব জোরে, শব্দ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল রমণী। অল্প রক্তলো সোফায় সামান্য আলগাভাবে আরামে বসল। 'তোমার অনেক গোপন কথা, অদ্ভুত মানসিকতার কথা যদি আমি লিখে থাকি, তা দেখলে কি তুমি অবাক হবে? হবে না?' রমণী তাকাল।

'এর সঙ্গে ওর কোনো মিল নেই···'

'তা নেই।' রমণী অল্প খুশীর গলায় বলছিল, 'তুমি কি চিঠিটা দেখতে চাও?'

'কেন?'

'কারণ তার সবটাই তোমাকে নিয়ে···'

'সবটাই···?'

'হ্যাঁ।' রমণী পকেট হাতড়ে সিগারেট কেস বের করল। সিগারেট ধরাল। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল আবার। 'আমি লিখেছি, তোমার প্রতি অনেক আকর্ষণেই আমি নির্বোধ হয়েছি···'

'সেটাও তোমার মনেরই কথা···'

'ঠিক তাই।' আনমনা থেকে থাকল রমণী। তারপর সিগারেট টানছিল। 'হ্যাঁ, আমার মন। যেমন তোমাকে চেয়েছিল, আজও চাইছে···'

অনেক ইতস্তত করে কণক উঠল। তার সাদা চোখমুখ লাল রক্তিম হয়ে এসেছে। ওঠবার সময় এক পলক রমণীর চোখে তাকাল কণক। সরে গেল জানালার কাছে। বাইরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিয়ে চিত্তের চাঞ্চল্যকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। অল্পক্ষণ পরে কথা বলল কণক। 'তুমি কেন ভাবছ আমি সত্যিই চলে এসেছি···'

'কেন?' রমণীও উঠল। টিপয় থেকে খবরের কাগজগুলো তুলে নিয়ে টেবিলে রাখল। দেওয়ালে টাঙানো একটি ছবিতে চোখ রাখল খানিক। পরে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। 'অনেক কারণে। সেই ছোটবেলার কথা মনে করে দেখ কণক। তুমি আমি আর রমীন। বড় হয়েও ' রমণী থামল। সরে এল সোফার দিকে 'তোমার মন আমি বুঝেছিলাম অনেক পরে। যখন আমি সংসার ছেড়ে চলে যাই, যখন আমি পণ্ডিচেরিতে ছিলাম তখন আমার কাছে সবকিছু স্পষ্ট হয়েছিল। তোমার এক একটি চিঠি, কণক···'

'আমি যাই···' যেন আহত ক্ষুব্ধের গলায় প্রতিবাদ করল কণক। পাশ-তাকানোর মতন তাকিয়ে তীব্র যন্ত্রণা চেপে বলছিল, 'আমার চলে যাওয়াই ভালো।' কণক জানলার কাছ থেকে চলে এল, টিপয়ের ওপর থেকে ব্যাগটা তুলে নিয়েছে কষ্টে যন্ত্রণায় বিবর্ণ মুখে ব্যস্ততা। ''যৌবনরা কখন ফিরবে কে জানে···।' এই অবস্থিকর মুহূর্ত সহ্য করতে পারছিল না কণক। তার শরীরের কোথাও বুঝি আগুন লেগেছে। ঘরের আবহাওয়া বুঝি তার নৃশংস দুটি হাতের মুঠি বাড়িয়ে দিয়েছে কণকের কণ্ঠার দিকে।

সিগারেট টানছিল রমণী। অত্যন্ত ধ্রুতভাবে, রুক্ষ এবং অস্বাভাবিকজন। গমগম করে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছিল। মৃদু হাওয়ায় সেই ধোঁয়া অনেকটা ছড়িয়ে পড়ছে ঘরময়। ঘুরছিল, ছড়িয়ে পড়তে পড়তে মিলিয়ে যাচ্ছে। তেমনি

একখণ্ড ভাসমান মেঘের ওপার থেকে রমণী কণককে দেখল। 'চলে যাবে।···দু' পা এগিয়ে এল রমণী। দাঁড়াল। নিশ্বাস চেপে কষ্ট লাঘব করছিল। 'তুমি তো অনেকদিন আগেই আমার কাছ থেকে দূরে চলে গেছ কণক।···যাও নি?'

নিশ্বাস বন্ধ করল, চোখ বুজল। কণকের সারামুখে যন্ত্রণার হিজিবিজি রেখা। 'আমি জানি না···'

'জানো না···।'

কষ্ট করে বুঝি উদ্গত অশ্রুর মুখে বাঁধ দিয়ে চোখ খুলল কণক। মাত্র এক মুহূর্তের জন্য রমণীর চোখ দেখে নিয়ে, দৃষ্টি নামিয়ে আনল। 'জানলেও সে কথা আমি বলতে পারব না।' অল্প সময়ের নীরবতা। বুঝি এ ঘরের সময় আচমকা থেমে গেছে। কাঠের পুতুলের মতন দাঁড়িয়ে আছে দু'টি জড় প্রাণী। 'তুমি তোমার অন্তরকে শুধোও, আত্মাকে জিজ্ঞেস করো···' চাপা ধরা এবং প্রায় রোরুদ্যমান গলায় দ্রুত কথাটা বলে ফেলল কণক। বলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল।

'অন্তর!' রমণী এক পা দু পা পায়চারি করল। মুখ নীচু করে কিছু ভেবে নিচ্ছিল। 'সে কথা সত্যি আমি শুধিয়েছিলাম কণক।' রমণী থামল। অল্প দূর থেকে দেখল কণককে। 'এবং তার জবাব যা পেয়েছি, প্রতি চিঠিতে সে কথা তোমাকে আমি বলেছি।' জানলার দিকে ধীর পায়ে এগিয়ে যাচ্ছিল রমণী। 'তুমি না বললেও, তোমার অনেক কথাই আমার জানা।' রমণী জানলার গরাদে ধরে দাঁড়াল। দৃষ্টি ছড়িয়ে দিল বাইরে।

খানিক আগে গাঢ় ধোঁয়ার মতন যে কুয়াশা গোটা প্রকৃতি এবং আকাশকে আড়াল করে রেখেছিল, এখন তার চিহ্ন-পর্যন্ত কোথাও নেই। প্রভাতী রোদের মোলায়েম আভা ছড়িয়ে পড়েছে। এ-পাশের ঝোপে পাখি বাসায় ঝটপট করছিল। দূরের শিমুল গাছের পাতা চকচক করছিল রোদ ধরতে পেরে। আকাশ এখন নীল, পরিষ্কার এবং পাখিহীন নিঃসঙ্গ। কেবল দিগন্ত ছুঁয়ে একখণ্ড সাদা মেঘ ভাসছে।

এ ঘরে শব্দ নেই, শুধু যেন এক নীরব কান্না এখানে-ওখানে আছে। তার সুর শোনা যায় না, দেখা যায় না কিন্তু। অলক্ষ্যে বুঝি দু'টি আত্মার মর্মমূল কান্নার ভয়ানক তীব্রতা অনুভব করা যাচ্ছে। কোথায় যেন পাখি ডাকছিল। শিমুলের ডেঙ্গা চকচকে পাতার এইমাত্র এক ঝলক হাওয়া তার আলতো পরশ দিয়ে গেল।

'একটা কথা তোমাকে আজ আমি শুধোই কণক।' থামল রমণী। ঘাড় ঘুরিয়ে এক পলক দেখে নিল কণককে। 'জানি তুমি আঘাত পাবে। শুধু প্রশ্নটা না করে আমি পারছি না···' আবার তাকাতে চাইল রমণী, পারল না। নিচের ওষ্ঠ দাঁতে চাপছিল। 'কণক, তুমি কি তাকে ভালবাসো?'

'আমি···' কণকের ওষ্ঠ কাঁপছিল, চোখ কপালে কুঁচকানো। দ্রুত মাথা নেড়ে যাচ্ছে। 'আমি জানি না···'

'তোমার এই না-জানা আমাকে ব্যথা দিয়েছে, আমি জোর করে দাবত হয়েছি। অথচ কণক···' রমণী অজান্তে দাবাস্ত এগিয়ে এল। তার গলায় অধৈর্যতা, মুখেচোখে অসহিষ্ণু এক চাঞ্চল্যের ছায়া। '···অথচ তোমার জীবনে, মনে আমার জন্যে কত জায়গা নেই···'

'হ্যাঁ, ছিল···' কণকের মুখ পাংশু বিবর্ণ হয়ে এল। অল্প নীরবতার পর কথা বলল কণক 'কিন্তু তুমি কী করে জানলে সে কথা?

'ও আমায় বলেছিল। আমার মনে আছে, কখনও, কোনো সময়েই কেবল তোমার নাম উচ্চারণ করি নি। বলেছি, মধুবন, কণক

···টা কিছু আশ্চর্যের নয়। কারণ আমরা বাকা-ভাইবি সেই ছোটবেলা থেকে একসঙ্গে···'

'হ্যাঁ, রমণী, আমাকে তোমাদের সেই গোপন কথা

থেকেছিল।' রমণী আস্তে আস্তে এগিয়ে এল, সোফায় বসল, সিগারেট ধরালো 'তার আর আমার মধ্যে গোপন বলে কিছু ছিল না' একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রমণী কণকের দিকে তাকাল। 'সেকথা তুমিও ভাল করেই জানো'

কণকের মুখে তীব্র অস্বস্তি। যেন সে এই নোংরা আলোচনায় রাজি নয়। তার মন বিদ্রোহ করতে চাইছে। তবু খুব সংযত স্থির গলায় বলল, 'সেই কবে কি ঘটেছিল, আমরা এখন আর তা নিয়ে ...'

'নিয়ে!' রমণী চিবুক তুলে অবাকের চোখে তাকাল। 'তুমি কি ঠিক বলছ?' ছাইদানিতে সিগারেট রেখে সোফার ওপর আধশোয়াভাবে পা এলিয়ে দিল রমণী। দু হাতে মুখ করে মাথা ওপর রেখেছে। 'তোমাদের সেই বাগান বাড়িতে, সেই বাগান বাড়িতে...'

দু পা এগিয়ে এল কণক। তার গলায় অল্প ঘৃণার আভাস। 'তুমি কি তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছ না?'

'আমার মনে হয় সেকথা তুমি ভুলে যাও নি।' রমণী সোজা হয়ে বসল। ছাইদানি থেকে জলন্ত সিগারেটটা তুলে নিল। 'আমি ঠিক বুঝতে পারি না। পঞ্চাশেতেও থাকতানীনও সেকথা আমি বহুবার ভেবেছি।' মাথা নীচু করে পর পর কয়েকবার সিগারেট টানল রমণী, ধোঁয়া ছাড়ল। 'আমার অনুপস্থিতি কি তোমার মনে বেদনার সঞ্চার করেছিল...'

'না।' কণক থামল, চোক গিলল, 'আমি জানতাম তুমি বেশিদিন থাকতে পারবে না। তাছাড়া...

'তা ছাড়া...'

'তাছাড়া আমার মনকে আমি সংযত করে নিয়েছিলাম।'

'হ্যাঁ, আমি তা জানতাম। এক বছর পরে যখন তোমার প্রথম চিঠি পেলাম তখনও—এবং তোমার সেই ভীষণ অসুখের পরেও—সেকথা তুমি চিঠিতেও লিখেছিলে—'

'সে অসুখে মরতে পারলে আমি বাঁচতাম। কিন্তু তা হয় নি। সেরে ওঠবার পর আমার অনেক কিছুই পালটে গিয়েছিল।'

'সে সম্পর্কেও কি...'

'না।' কণক মাথা নীচু করে হাতের চুড়ি নিয়ে খেলছিল। তাকাল না কণক, তাকাতে পারছিল না। 'তার মধ্যে তোমাকে আমি বার বার দেখেছি...'

'তুমি কি এখনও তাই দেখে শান্তি পাও...'

'হ্যাঁ', কণকের গলা সামান্য আর্দ্র, ধরা। 'তাই আমি পেতে চাই।'

কথা বলল না রমণী। অসহ্য, তীব্র যন্ত্রণায় অস্ফুট কাতর আর্তনাদের মতন একবিন্দু শব্দ ফুটল তার গলায়। আহত পাখির মতন চোখ বুজল, কণ্ঠার নীচে চিবুক চেপে থাকল খানিক। অল্পক্ষণ পরে দু' হাত তুলে মাথাটাকে প্রাণপণে টেনে নামাতে চাইছিল নীচে।'...কণক', ওষ্ঠে যন্ত্রণার বুদ্বুদ তুলল রমণী। 'তুমি দেখতে পাচ্ছ না... পুড়ে পুড়ে আমি ছাই হয়ে যাবো। তা না হওয়া পর্যন্ত বীথি আমাকে কিছুতেই রেহাই দেবে না...'

থামতে দু' হাতের তালুতে মুখ ঢাকল কণক। 'না না, ও-কথা তুমি বলো না, বলো না...'

'না বলে আমি কিছুতেই পারছি না কণক কারণ সে-ই আমাকে বাড়ী ছাড়া করেছিল।' বলে থাকতে না পেরে রমণী উঠল। পিঠের নীচ অংশে দু' হাত মুঠি বেঁধে নিঃশব্দে পায়চারি করল অল্পক্ষণ। '—সেখানে অনাহারে অর্ধাহারে কেটেছে আমার। নির্বাসন আর দারিদ্র্যের যন্ত্রণা নিয়ে আমি অপেক্ষা করছিলাম।' দরজার কাছে এসে দাঁড়াল রমণী। সামান্য সময় তাকিয়ে থাকল। 'বীথির মৃত্যুকামনা আমার ছিল—মা কণক।' কী ভেবে ফিরে এল রমণী। ক্লান্ত বিধ্বস্ত পরাজিতের মতন হাঁটছিল। ধীর পায়ে। 'কারণ আমি জানি—সে, তার মন, তার সন্তানী সব কিছুই ছিল...

'কিন্তু খোকন···'

'খোকন!' অস্ফুট গলায় কথাটা উচ্চারণ করল রমণী। সঙ্গে সঙ্গে তার সারা মুখ কালো হয়ে এসেছিল। ঘৃণা, বিক্ষোভ উপচে পড়ছে 'তুমি ভাবছ, আমার ছেলে!' দ্রুত মাথা নাড়ছিল, যেন এই সম্পর্ক সে স্বীকার করছে না। 'সেকথা আমি বিশ্বাস করি না, করতে পারি না···' লোকার বসল রমণী। বসে দু' হাতের অন্ধকারে মুখ লুকালো।

'হিঃ হিঃ হিঃ' থরিতে দু' হাত তুলে কণক তার কান দু'টো চেপে ধরল।

'হাঁ···', লোকার হাতলের ওপর মুখ গুঁজলো রমণী, মুখে কোতে যন্ত্রণার মুখ থবছিল।

অল্প সময় এ-ঘর নিঃসাড় হয়ে থাকল। কণক মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছিল। রমণী ঠিক তেমনি লোকার হাতলে মুখ গুঁজে আছে। তার পিঠ কুঁজো, শরীর থেকে থেকে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। দু' মুহূর্তের নীরবতা নিস্তব্ধতার পর ধীর পায়ে এগিয়ে এল কণক। তার মুখচোখে সামান্য করুণা সহানুভূতির আলো। অল্প দূরে দাঁড়াল কণক। কি বলতে গিয়ে বলল না। সামান্য সময় তাকিয়ে থাকল রমণীর দিকে। 'মাত্র মাস দুয়েক তুমি ফিরেছ, কিন্তু এরই মধ্যে তোমার মন মানসিকতা এত অপবিত্র হয়েছে, আশ্চর্য···'

'হ্যাঁ, হয়েছে···', লোকার হাতলের ওপর থেকে চোখ মুখ তুলল রমণী। তার দু'চোখের কোল ভেজা, হাতলের খানিক অংশও জবজব করছিল। মুখ তুলে রমণী পাশের দেওয়ালের দিকে তাকালো।

দেওয়ালে বড় আকারের একটি ফোটো। অয়েল পেন্টিং। রমণী তার বসার জায়গা থেকে আস্তে আস্তে উঠে এসে সেই ফোটোর নীচে দাঁড়াল। তাকিয়ে থাকল অনেকক্ষণ। তার দু'চোখ ভরে এসেছে জলে। গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়ছিল অশ্রু। আঁচলে তা মুছে নিয়ে কণকের দিকে তাকাল রমণী। ইশারা করল।

কণক জানে ওখানে কে আছে, যার ছবির দিকে অপলক করে তাকিয়ে আছে রমণী। তবু সে এল। এসে পাশে দাঁড়াল। কারণ কণক জানে এই প্রৌঢ়প্রায় মানুষটির সকল দুর্বলতা ওখানে।

'বাবা···' ধরা, রোরুদ্যমান গলায় বলল রমণী। 'চির প্রণম্য সুপুরুষ আমার ওই বাবা সাক্ষী, কণক।' আস্তে হাত বাড়িয়ে দিল রমণী। হাত রাখল কণকের কাঁধের ওপর। মুখ নীচু করে ফেলেছে। 'আর কেউ না জানুক, আমার দেবতুল্য বাবা জানেন সব থেকেও, আমি কতদূর নিঃসঙ্গ একাকী·····'

কণকের মন বিখণ্ডিত এখন। এই স্পর্শ, এই নৈকট্য তার আজীবনের কাম্য। এই মুহূর্তে সেই আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গের গোলাপ সে বুকে তুলে নিতে পারলে ধন্য হত। কিন্তু পারল না, পারছিল না। তার আকাঙ্ক্ষা বাসনা যত তীব্র সঙ্গে সঙ্গে আর একটা মন বলে উঠছিল: ভুল করো না কণক, এই মেকি ভুলে সুবাস নেই, নেই, নেই···। কণক সরে যেতে চাইছে, প্রাণপণ শক্তি দিয়ে সে এই মুহূর্তের জন্য মুক্তি চাইছিল। কিন্তু পারছে না··· পারছিল না। কোন অদৃশ্য বাঁধনে সে যুক্তি বন্দী এখন।

অনেকক্ষণ কাছাকাছি, পাশাপাশি মন দাম্পত্যের মধ্যে বন্দীর মতন ওরা দাঁড়িয়ে থাকল। গোটা ঘরের সময় যেন মৃত, শীতল। বাইরে পাখি ডাকছিল ওরা শুনতে পায় নি। বেলা বেড়েছে, কখন যে আলসার পরাগ ছুঁয়ে এ ঘরে উঁকি দিয়েছে রোদ ওদের খেয়াল নেই। দু'টি মূর্তি, কণক আর রমণী এত কাছাকাছি মন তন্ময় হয়ে থাকা সত্ত্বেও যেন একে অন্যকে ধরতে পারছে না কিছুতে। কিছুতেই না।

কখন যে মহিম বাইরের দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল, কণক জানতে পারে নি, রমণীও না। অনেক পরে সেই বন্ধ দরজার বাইরের কড়া নড়ে উঠল। প্রথমে আস্তে, থেকে থেকে

(শেষাংশ ৬৮০ পৃষ্ঠায়)

উৎসবে উষা সেলাই কলই সেরা উপহার

উৎসব উপলক্ষে সর্বদেশেই প্রিয়জনদের উপহার দেওয়ার রীতি আছে। উপহার হিসেবে উষা সেলাই কলের একটা বিশেষত্ব আছে। উষার ৫টি মডেলের প্রতিটি কারুকার্যে ও উৎকর্ষে অনন্য। আধুনিক উষাকলে সেলাই করে আপনার অবসর আনন্দে ভরপুর করে তুলুন।

শ্রেষ্ঠ মেশিনে সেলাই করুন—

উষা

একটি JAY পণ্যশ্রী

বলে সেলাই করুন

উষা ভারত লিমিটেড, কলিকাতা-৩১

ছোটবিবির রয়ানি

গল্প

মিহির মুখোপাধ্যায়

দাদার মণ্ডল বলতো—সেই বঙ্গভঙ্গের কথা, মোর জুয়ান বয়সের কথা, মহারাণীর আমোল—মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। তখন জুয়ান বয়স। সেই বয়সের গল্প বলতো দাদার মণ্ডল। আমরা তিনভাইবোন গোল হয়ে বসে শুনতুম। বড়দি', মেজদি' আর আমি।

জুয়ান বয়সে দত্ত শিকারী ছিল দাদার মণ্ডল। অনেক হরিণ, চিতা, বুনো শুয়োর মেরেছে, আর মেরেছে সুন্দর বনের রাজা রয়েল বেঙ্গল টাইগার। দাদার বলতো—বড়দিঘা, সোঁদর বনের বড় দিঘা। অনেক বয়স হয়েছিল দাদারের। কত বয়স আমরা আন্দাজ করতে পারতুম না।

বড়দি বলেছিল—আদি-বিয়াশি হবে।

তার মানে পঞ্চাশ-ষাট বছর আগের গল্প বলতো দাদার। তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। দাদার আজ বেঁচে থাকলে একশো বছরের বেশি বয়স হ'তো।

শীতকাল। বড়দিনের ছুটিতে আমরা দাদাবাড়ির গাঁয়ে বেড়ুম। প্রকাণ্ড তিনমহলের বাড়ি।

বার-বাড়ির মহলে চণ্ডীমণ্ডপ, কাছারী, দালান। সোহার আটচালা। খুব সুন্দর চালাই লোহার লতাপাতার কারুকাজ করা আটচালা। এখানে গণেশপুজোর যাত্রাগানের আসর বসতো।

সেই আটচালার লোহার নক্সাকাটা রেলিঙের ধারে বারুর পেতে রোদ্দুরে পিঠ দিয়ে বসতো দাদার মণ্ডল। হুকোয় করে তামাক খেতো। লাল গামছায় বাঁধা পুটুলির ভেতর থেকে পাটালি গুড় বার করে আমাদের হাতে দিত। দু'তিন মাস অন্তর দাদাবাড়ির সেরেস্তা থেকে মাসোহারার টাকা নিতে আসত দাদার মণ্ডল। মুখে শাদা দাড়ি, মাথার চুল ভুরু সব শাদা, সেই শাদা চুলের ওপর, শাদা কাপড়ের গোল টুপি, চেক-কাটা লুঙ্গি, হাফ-হাতা ফতুয়া, গলায় স্ফটিকের মালা।

পাশে থাকত একটা লাঠি আর লাল গামছা বাঁধা পুটুলি। গুড়ুক গুড়ুক তামাক টেনে মুখের চারপাশে ধোঁয়া জমিয়ে তুলত। দেখে মনে হ'ত দাদার মণ্ডল যেন এক অলৌকিক যাদুকর। আরব্য উপন্যাসের ভেতর থেকে বেরিয়ে এসেছে। ধীরে ধীরে থেমে থেমে তামাক টানার ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু করে গল্প বলতো দাদার। কোন তাড়া নেই, কোন ব্যস্ততা নেই। বেশ আরাম করে শীতের রোদে পিঠ দিয়ে বসেছে, আয়েস করে তামাক টানছে।

আমি কিন্তু ব্যস্ত হতুম, তাড়া দিতুম—তারপর, তারপর কি হল—

বড়দি বলতো—আহা ওকে ভাবতে দে', কতকাল আগের কথা—

আমার ধৈর্য থাকত না। গল্পটাও যেন দাদারের মতোই আরাম করে এক আয়েসে বসে থাকতে চাইত, এগোত না। আমি অধির হয়ে বলতুম—তারপর, কি হলো?

দাদার বলতো—তারপর বুড়া কর্তার কইলেন, দাদার, গাবতলির জঙ্গলে বাঘ পড়ছে—

দাদারের বুড়ো কর্তা ছিলেন, আমার মায়ের ঠাকুর্দা, বিশ্বেশ্বর রায়মশাই। বাখরগঞ্জ জেলায় নাম-ডাকের জমিদার। তখন মহারাণী ভিক্টোরিয়ার আমল। জমিদারদের দাপট ছিল খুব। বুড়ো কর্তার হুকুম পেয়ে দাদার দলবল গিয়েছিল গাবতলির জঙ্গলে বাঘ মারতে।

সঙ্গে ছিল ভুবন শিকদার, আরসাদ মোল্লা, মঙ্গল মাঝি আর বুড়ো কর্তার নেপালী দারোয়ান নেত্রবাহাদুর। আরো অনেক শিকারের গল্প বলেছিল দাদার। কিন্তু গাবতলির জঙ্গলে বাঘশিকারের গল্পটাই আমাদের সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। গাবতলির জঙ্গলটা ছিল দাদাবাড়ির গাঁয়ের পশ্চিম সীমায়। আমাদের চেনাশোনা জায়গার মধ্যে। দাদার নিজেই গল্পটার নাম দিয়েছিল—ছোটবিবির রয়ানি। বাখরগঞ্জ জেলায় ননদার নামকে বলে "রয়ানি"। আমরা প্রতিবছর শীতকালে দাদারের মুখে সেই রয়ানি শুনতুম। ছোট-বিবির রয়ানি। কোন গালাগাল নয়। শাদামাটা গল্প। কিন্তু দাদার বলবার কথার মধ্যে, শ্বাস টেনে টেনে আস্তে আস্তে বলার মধ্যে, আশ্চর্য একটা ঝিমধরা সুর। যেন একটা সুরবাঁধা পালাগানের মতো শোনাত।

এই গল্পটা ভাল লাগার আরো একটা কারণ ছিল। আরসাদ মোল্লা নাকি বাঘ বশী করার মন্তর জানতো। আরসাদকে আমরা দেখিনি। আমাদের জন্মের আগেই সে মারা গিয়েছিল। তার মন্তরের নাকি এমন জোর ছিল যে বাঘ আর উঠতে পারতো না, শুয়ে শুয়ে শুধু লেজ নাড়তো। তারপর তাকে মারো, বাঁধো—যা খুশি তাই করো। শিকারে যাবার আগে হাতে তাগা বেঁধে নিত আরসাদ মোল্লা। বাঘ আর গায়ে আঁচড়টিও দিতে পারত না।

এই মন্তরের ব্যাপারটাই আমার কাছে রহস্যময় মনে হ'তো। আমার শরীর শিরশির করতো। বেজদি চোখ বড়ো বড়ো করে শুনতো। বড়দির কিন্তু উল বোনার বিরাম নেই। দুটো কাঁটা আর উলের সুতোর দিকে চোখ রেখে গল্প শুনতো বড়দি।

বাঘবন্দীর গুনিন আরসাদ মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে শিকারে গিয়েছিল চারজন। চারজনের হাতেই তাগা বেঁধে দিয়েছিল আরসাদ মোল্লা। ভুবন শিকদার আর মঙ্গলমাঝির হাতে বল্লম। দাদার দলও আর নেত্রবাহাদুরের হাতে দুটো দোনলা বন্দুক।

দাদার বলতো—মোরা পাঁচজন তো রওনা হইলাম—

ফলে চুপচাপ তামাক টানতো—পাঁচজনকে রওনা করিয়ে দিয়ে এটা কি তামাক টানার সময়।

আমি অস্থির হয়ে বলতুম—তারপর কি হল—

—আহা তুই বড় জ্বালাস্ তপু—বড়দি ধমক দিত—অমন করলে গল্প শুনতে আসিস না—

বেজদি ভুরু কুঁচকে তাকাল। আমি ওসব গ্রাহ্য না করে স্থির চোখে তাকিয়ে থাকতুম।

আমার নিশ্বাস বন্ধ। দাদারের চিবুকের নিচে দাদা রেশমের মতো দাড়ি, চোখের নিচে বয়সের রেখা। আলো চোখ বুজলে সেই রেশমের মতো দাড়ি, সেই বয়সের রেখাগুলি যেন স্পষ্ট দেখতে পাই।

আবার ভাঙা ভাঙা গলায় বিড়বিড় করে শুরু হত গল্প—

পাঁচজন শিকারী। গাবতলির জঙ্গলে ঢুকল, তখন দুপুর। জঙ্গলে অনেক গাবগাছ, শিমুল, শিরিষ আর বাদাবেরও অন্ত নেই। ছোট ছোট আগাছার ঝোপ, বাঁশবন।

জঙ্গলের মধ্যে বহুকালের পুরনো একটা মন্দির। মন্দিরটাকে জড়িয়ে রয়ে এক অশ্বত্থ গাছ।

সামনে একটা আশ্‌শেওড়া ঝোপের পাশ কাটিয়ে এসেই পাঁচজনের চক্ষুস্থির।

মন্দিরের ভাঙা রোয়াকের উপর বড়দিদা শুয়ে আছেন। শুয়ে শুয়ে রোদ পোয়াচ্ছেন।

বড়দিওলা নয়, বলতে হয় বড়বিবি। বিরাট বাঘিনী একটা। আর আশ্চর্য, পাশেই দুটো বাচ্চা। একবার দিঁড়িয়ে নিচে ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। তিরিশ-চল্লিশ হাতের তফাতে।

পলকে প্রলয় ঘটে গেল। কেউ কিছু ভাবার আগেই গুলি করে বসল নেত্রবাহাদুর।

দুপুরের নির্জন বন গুলির শব্দে চমকে উঠল। ধোঁয়া আর বারুদের গন্ধের মধ্যে আহত বাঘিনী গভীর গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়ল। একটা দুরন্ত হলুদ বিদ্যুৎ যেন রোদ্দুরে ঝলসে উঠল। সামনেই ছিল জুড়ন শিকদার। একলাফে রোয়াক থেকে সামনের খানজমিতে আরেক লাফে জুড়ন শিকদারের ঘাড়ে।

বাঘের সঙ্গে জড়াজড়ি করে শিকদার মাটিতে পড়ে গেল। ডান পাশেই ছিল মাদার মণ্ডল।

মুহূর্তে বন্দুকের নল ঘুরিয়ে বাঘের পাঁজরের সঙ্গে ঠেকিয়ে পরপর দুটো গুলি করেছিল।

বাঘিনী আর শিকদারের আর্তনাদ গুলির শব্দে ডুবে গেল। সমস্ত ব্যাপারটা ঘটল কয়েক লহমায়। মাদারের হিসেবে তিনবার দম ফেলতে যতটা সময় লাগে।

আরসাদ মোল্লা আর মঙ্গল বাবি কেমন হতভম্ব হয়ে গেছে। বাঘিনীর বিপুল দেহের নীচে তখনো গোঙাচ্ছিল জুড়ন শিকদার। সবাই মিলে তাকে উদ্ধার করেছিল। এক থাবায় ঘাড়ের নলী ভেঙে দিয়েছিল। কয়েকবার থাবি খেয়ে চোখ বুজেছিল জুড়ন শিকদার।

বেলদি বলতো—তা হলে আরসাদ মোল্লার বন্দুকে কোন কাজ হল না, হাতে তাবিজ বেঁধেও বাচল না জুড়ন শিকদার।

—তাগার বানুষন লিখা হইছিল, শিকদারের পো জানবারও পারে নাই কখন খুইলা গেছে গা—আস্তে আস্তে জবাব দিত মাদার।

প্রতিবছর একবার করে এই গল্পটা শুনতুম আমরা। আমরা বোধহয় তিনবার শুনেছিলুম।

প্রতিবারই বেলদি একই প্রশ্ন করতো, মাদারও একই জবাব দিত আর বড়দিও ঠিক এই সময় তালুতে জিভ ঠেকিয়ে চুকচুক শব্দ করতো।

আমি কিন্তু তাড়া দিতুম—তারপর, তারপর কি হল?

—আহা থামনা তপু—বড়দি বলতো—অমন একটা মানুষ বেঘোরে মারা গেল আর তুই কিনা—

কিন্তু মানুষ না মরলে শিকারের গল্পের আর মজা কি?

আমি ওদের কথায় কান দিতুম না, আরো সামনে ঝুঁকে জিজ্ঞেস করতুম—তারপর কি হল?

তারপর মঙ্গলমাঝি দৌড়ে গিয়ে গাঁয়ে খবর দিয়েছিল, খাটিয়া এনেছিল আরো লোক এসেছিল।

জুড়ন শিকদার কেখাটিয়ায় চড়ে সবাই যখন রওনা হবে, এমন সময় মন্দিরের ভেতর বন্দুকের শব্দ শুনে চমকে উঠেছিল সবাই। মাদার দৌড়ে গিয়েছিল মন্দিরের ভেতরে। নেত্রবাহাদুরের বন্দুকের নল থেকে তখনো ধোঁয়া বেরোচ্ছিল। সেই বাচ্চা দুটো লুকিয়েছিল মন্দিরের মধ্যে। খুঁজে খুঁজে বের করে একটাকে এক গুলিতে মেরেছে নেত্রবাহাদুর। অন্ধকার কোণে জড়োসড়ো হয়ে কাঁপছিল। আরেকটা গুলি করার জন্য বন্দুক তুলতেই মাদার হাত চেপে ধরেছিল।

—নাইরোনা বাহাদুর—চেঁচিয়ে উঠেছিল মাদার—নাইরোনা, বাইন্দা লমু, পুষবার লাগি—

বাচ্চাটাকে পোষবার জন্য বেঁধে এনেছিল মাদার। কি তেজ বাচ্চাটার। বেড়াল-ছানার মতো ফ্যাস্‌ফ্যাস্ করছিল। একটা চটের থলের মধ্যে আটকে আনতে হয়েছিল। দেখেশুনে বুঝেছিল মাদার, বাচ্চাটা মাদী। প্রথমদিন আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম—মাদী বাচ্চা কি?

বেলদি বলেছিল—মেয়ে বাচ্চাগুলোকে বলে মাদী আর ছেলেগুলোকে বলে মদ্দা।

হাসতে হাসতে বলছিল বাদার—বড়বিবির বাইগা ছোটবিবি, ছাওডার নাম রাইখলাম ছোটবিবি।

তারপর দলেদলে মানুষ এসেছিল। বিয়াট মিছিল হয়ে গেল। মিছিলের সামনে নেত্রবাহাদুর। বা'হাতে লেজ ধরে ঝুলিয়ে আনছে মরা বাঘের বাচ্চাটা, ডান হাতে বন্দুক। মুখে বিজয়ীর হাসী। পেছনে বাঁশের সঙ্গে বেঁধে বাঘটাকে নিয়ে আসছিল সাত-আটজন, তার পেছনে চারজনের কাঁধে খাটিয়ার ওপর জুড়ন শিকদার। তাদের পেছনে বাবা নীচু করে মঙ্গলমাঝি, আরশাদ মোল্লা, বাদার মণ্ডল। বাদারের হাতে চটের থলির মধ্যে মাদী বাচ্চাটা, যার নাম ছোট-বিবি। গ্রাম ভেঙে মানুষ আসছে, আরো আসছে। সকলের সামনে যেতে যেতে বিজয়ী বীরের মতো হাসছিল নেত্রবাহাদুর। বা' হাতটা উঁচুতে তুলে মরা বাঘের বাচ্চাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সবাইকে দেখাচ্ছিল। কিন্তু আচমকা একটা কান্না শুনে সব গোলমাল বোবা হয়ে গেল, সব উল্লাস পাথর হয়ে গেল। জুড়ন শিকদারের বুড়িমা সামনে এসে বুক চাপড়ে হাউহাউ করে উঠল। বুড়িমার পেছনে একগলা ঘোমটা টেনে জুড়ন শিকদারের বউ, আশেপাশে চারটি ছোট ছোট ছেলে মেয়ে।

নেত্রবাহাদুরের উজল হাসি নিভে গেল, কেমন বোকার মতো ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। এতক্ষণে বোধহয় ছ'শ হ'শ তার জুড়ন শিকদার মারা গেছে। বাঘিনীটা মারা পড়েছে ঠিক, কিন্তু সেজন্য আনন্দ করার মতো অবস্থা নেই। জুড়ন শিকদারের ঘরে বুড়িমা আছে, বউ আছে, চারটে ছোট ছোট ছেলেমেয়ে আছে। এদের এখন কি উপায় হবে। নিজের ভুলটাও বোধহয় বুঝতে পেরেছিল নেত্রবাহাদুর। সবাই সাবধান হবার আগেই আচমকা গুলিটা না করলে, বাঘিনীটা শুধুমাত্র জখম হয়ে অমন ভয়ঙ্কর হতো না আর জুড়ন শিকদারও বোধহয় অমন বেঘোরে মারা পড়ত না! মরা বাঘ, বাঘের বাচ্চা, জুড়ন শিকদার আর বুড়িমার হাহাকার সঙ্গে নিয়ে বোবা মিছিলটা বুড়োকর্তার কাছারী-বাড়ির সামনে এসে ভীড় করে দাঁড়াল। এই লোহার আটচালার পাশেই কাছারী দালানের সামনের উঠোনে বাঘটাকে শোয়ানো হল, পাশে জুড়ানের খাটিয়া। ভবানী ডাক্তার এসে দেখে শুনে রায় দিলেন প্রায় ঘণ্টা দুয়েক আগেই মারা গেছে জুড়ন শিকদার। বাদারের বুড়োকর্তা, বিশ্বেশ্বর রায়েবশাই সৎকারের খরচা দিলেন, জুড়নের মা-বউ এর জন্য মাসোহারার ব্যবস্থা করলেন। কয়েকদিন যাবে নেত্রবাহাদুরকেও মাইনে-পত্তর চুকিয়ে, কিছু বখশিস দিয়ে মানে মানে বিদেয় করলেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে গাঁয়ের মানুষরা সব ক্ষেপে উঠেছিল, বিশেষ করে জুড়নের আত্মীয়-স্বজন। বিদেশী মানুষ নেত্রবাহাদুর, কোথায় সবসময় ভোজালি রাখে। শেষে কি আবার একটা খুনোখুনি হবে।

দুই

সেই থেকে ছোটবিবি রয়ে গেল বাদারের কাছে। বাদার ওকে নিজের হাতে দাগলের দুধ খাওয়াত। খুব তেজ ছোটবিবির। কেউ কাছে গেলেই বেড়ালের ছানার মতো ফ্যাস্‌ফ্যাস্ করতো।

পাড়ার লোকেরা ভীড় করে আসত, পাড়ার কুহুরগুলো ঘণ্টাখেঁচে উঠোনের পাশে দাঁড়িয়ে ঘেউ ঘেউ করত। শনি-মঙ্গলবার হাট বসে। হাটবারের দু'দিন আশেপাশের দশখানা গাঁয়ের লোকএসে ভেঙে পড়ত। মোটকথা, অইপ্রহর যেন বাদার মণ্ডলের বাড়িতে গঙ্গাসাগরের মেলা লেগে গেল। দু'দিন যাবেই বাদারের বউ ফুলবনবিবি অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

—এ কোন আপদ আনলা, পোলাপান লইয়া ঘর করি, বাঘের ছাও পালন কি আমাগোর মতো মাইনষের কাম, কর্তাবাবুর জিনিষ তানারেই দিয়া আইসলা।

প্রথম দিকে তেমন কান দেয়নি বাদার। কিন্তু ছোট-

বিবি যেন খুব তাড়াতাড়ি বড় হয়ে উঠছিল। শেষে একদিন ভুলও হল। একবাটি মুরগীর রক্ত এনে খেতে দিয়েছিল মাদার।

চকচক করে সেই রক্ত চেটে খাওয়ার সময় কি আনন্দ ছোটবিবির।

ফুলজানবিবি চেঁচিয়ে উঠেছিল—দুর করো আপদ, অক্ষণই বিদায় করো, রক্ত চাইটা খাওয়া শিখছে, কোনদিন আমাদের ঘাড় মটকাইবো।

পাড়া-পড়শীরাও তাই বোঝাল। ছোটবিবিকে আর ঘরে রাখা ঠিক নয়। দিনকে দিন যেমন বেড়ে উঠছে, গায়ের রঙ, গলার আওয়াজ কেমন বদলে যাচ্ছে। তবু ওই লম্বা একটা শেকলের ভয়ঙ্কার বাঁশের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখাটা কোন কালের কথা নয়। ওকে এখন খাঁচায় রাখা দরকার। বেশ মজবুত খাঁচা, আবার ছোটখাটে হলেও চলবে না, বেশ বড় খাঁচা চাই। তারপর খোরাকি আছে। দিনদিন খাওয়ার বহর বাড়ছে, আরো বাড়বে। মাদারের মতন গরীব শ্রেণীর মানুষের কি বাঘ রাখা পোষায়। অগত্যা রাজী হল মাদার। ছোটবিবিকে কেউ পছন্দ করে না, বিশ্বাস করে না।

শুধু মাদার ওর কাছে যায়, নিজের হাতে খাওয়ায়, গা মুছিয়ে দেয়। দিনের মধ্যে চারপাঁচ বার পরিষ্কার শুকনো ন্যাকড়া দিয়ে গা মুছিয়ে দেয় মাদার, মুখে বলে—"বাঘের মা বাচ্চার গা চাইটা সাফ করে।" শুধু বাঘ কেন, হুনুর-বেড়াল সবাই তাই করে। ছোটবিবির মা চেটে দেবার মত কেউ নেই, তাই মাদার সে ভার নিয়েছে। মায়ের মতো স্নেহে, বাপের মতো যত্নে মাদার ওকে আগলে রাখতো।

কিন্তু কেউ খুশি নয়, পাড়া-পড়শিরা বিরক্ত হয়, ভয় পায়। অগত্যা গুরুর কথায় রাজি হতে হল।

একটা বড় কাঠের বাক্সে ছোটবিবিকে ভরে নিজেই মাথায় করে নেয়া পার হল। তারপর মাইলখানেক হেঁটে খুড়ো কর্তার সামনে এসে বাক্স নামাল।

সন্ধের এ জায়গায় মাদার হাত তুলে দেখাত—আটচালার ওই কোণায় সিকল দিয়া বাইন্ধা রাইখ্‌লাম, চাইর মাসের মত বয়স হইছে ছোটবিবির, কি রঙ, কি গড়ন, দেখলি পর আর চোখ ফিরান যায় না।

সব শুনে খুড়োকর্তা ছোট-বিবির থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। প্রথম দিকে কিছুদিন একটা বাঁশের খাঁচায় রাখা হল। তারপর কাছারীবাগানের পেছনে আমবাগানের মধ্যে ইটের গাঁথুনি আর লোহার গরাদ দিয়ে পাকা খাঁচা তৈরী হল।

সেই সঙ্গে মাদার নিজেও এখানে পাকাপাকি আস্তানা নিল। সারাদিন সেই খাঁচার পাশে বসে থাকত। দুষ্টু ছেলেরা সুযোগ পেলেই ছোটবিবিকে ঢিল মারে, লাঠি দিয়ে খোঁচায়। মাদারকে দেখলেই পালিয়ে যেত তারা। তাই সারা দিনমান খাঁচার কাছ থেকে নড়ত না মাদার।

একটা টুল পেতে বসে থাকত। নেহাৎ কোন দরকারে গেলে জীবন ভুঁইমালী কিম্বা অন্য কাউকে বসিয়ে রেখে যেত। মামাবাড়ির পাইক পেয়াদাদের সঙ্গে মাদার গুরুর খাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কোন কোনদিন সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরত মাদার। কিন্তু মন পড়ে থাকত ছোটবিবির কাছে।

কোনরকমে রাতটা কাটিয়ে ভোর না হতেই বেরিয়ে পড়ত আর রোদ না উঠতেই ছোটবিবির খাঁচার সামনে হাজির হত। ছোটবিবি খুশির গলায় গরগর করে উঠত, তার কটা চোখে যেন হাসির ঝিলিক ফুটত। ছোটবিবির সেই ভাষা, সেই হাসি শুধু মাদারই বুঝতে পারত। গরাদের ফাঁক দিয়ে থরথরে জিভ বার করে মাদারের হাত চেটে দিত ছোটবিবি। দুপুর বেলা নিজের হাতে বাংস এনে দিত। কোন কোন দিন আস্ত পাঠা কিম্বা হাঁস চুকিয়ে দিত খাঁচার মধ্যে। অনেক লোক আসত ছোটবিবির খাওয়া দেখতে।

মাদারের বুড়োকর্তা, আমার মায়ের ঠাকুর্দা বিশ্বেশ্বর রায়বর্মাই ছিলেন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। তাঁর হাবেলীর ত্রিসীমানায় মুরগী ঢুকতে পারতো না। তাই ইচ্ছে থাকলেও ছোটবিবিকে মুরগীর রক্ত খাওয়াবার কোন উপায় ছিল না। দিনের পর দিন গেল, মাস গেল, বছরও ঘুরে গেল। তারপর একসময় ছোটবিবির যৌবন এল। কি সুঠাম গড়ন, কাঁচা হলুদ রঙ, গভীর কালো কালো ভোরা, পেটের নিচে, গলার নিচে নরম সাদা পশম। মসৃণ ছন্দে খাঁচার মধ্যে পায়চারী করে। ডাকলে পরে ঘুমঘুম চোখে তাকায়। অন্ধকারে সেই চোখ জ্বলে।

মাদার বলতো—চক্ষু দুইটা আঙ্গারপানা জ্বইলতে থাকে।

রাত্রিবেলায় বড় অস্থির হয়ে ওঠে ছোটবিবি। এক এক সময় গমগম গলায় ডেকে ওঠে, অস্থির ভাবে খাঁচার মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। ছোটবিবির গা থেকে একটা তীব্র মধুর ঝাঁঝালো গন্ধ বেরোয়।

মাদার বলেছিল—সেই গন্ধ শুইকা বুঝলাম, ছাটা-চলা মেইয়্যা বুঝলাম ছোটবিবির যৈবন আইছে, বুড়াকর্তারে গিয়া কইলাম, কর্তা ছোটবিবি নাদি বসবার চায়—

বুড়োকর্তা নাকি হেসে হেসে বলেছিলেন—বিয়ে বসতে চায়, ভাল কথা, তুই একটা পাত্র খুঁজে আন্।

—মুই পামু কই কর্তা—হাতজোড় করে বলেছিল মাদার —মোর কথা যদি জ্ঞান্, তয় কই, ছোটবিবিরে হাইড়া জান, নিজের মরদ নিজেই খুইজা লউক্গা—

বুড়োকর্তা নাকি শোনেন নি, ধমক দিয়ে বলেছিলেন—তুই কেপলি নাকি মাদার, অতবড় বাঘটা আমি ছেড়ে দিই গাঁয়ের মানুষ খেয়ে শেষ করুক, ওকে বরং মেরে ফেলব—

—না, না কর্তা না, মোহাই আপনের—মাদার ছুটে চলে এসেছিল।

সেই বয়সে ভাল ভাবে বুঝতে পারিনি, আজ বুঝতে পারি। ছোটবিবির জন্য মাদার মণ্ডলের মনে একটা অদ্ভুত ভালবাসা ছিল, বড় অদ্ভুত ধরনের, আশ্চর্য একটা প্রেম।

খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে ডাকত মাদার—আ-আ।

ডাক শুনে মুখ তুলে তাকাত ছোটবিবি। খেলে-দুলে কাছে এসে গরাদের সঙ্গে মুখ লাগিয়ে দাঁড়াত। লম্বা জিভ বার করে হাত চেটে দিত। আপন মনেই ছোটবিবির সঙ্গে কথা বলত মাদার। গলা থেকে গরগর শব্দ করতো ছোটবিবি। সেই শব্দের ভাষা শুধু মাদারই বুঝতো।

জীবন তুইমালী বলতো—তুমি কি পাগল হইলা মণ্ডল, ঘরের বিবির থিকা ছোটবিবির লাইগা তোমার পরাণডা পোড়ে বেশি।

জীবন তুইমালীর কথা বলতে গিয়ে কোকলা মুখে একটু হাসত মাদার।

বড়দি তাড়াতাড়ি বলতো—থাক্ তুইমালীর কথা বাদ দাও, তোমার নিজের কথা বলো।

একটু সময় চুপ করে থেকে নিজের কথা শুরু করত মাদার।

সেদিন বুড়োকর্তার কাছ থেকে ছুটে এসে এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছিল মাদার। ছোটবিবির খাঁচার কাছে এসে ডেকেছিল আ-আ।

অলসভাবে শুয়েছিল ছোটবিবি। শুয়ে শুয়ে থাবা চাটছিল। মাদারের ডাক শুনে উঠে দাঁড়াল, গরগর করে সামনে এসে গরাদের সঙ্গে মাথা ঘষতে লাগল।

মাদার বলতো—তোরে বিশ্বাস করে না, তুই বোধে মানুষ খাবি, চিরে খাবি, মাইনষের রক্ত খাবি.—খাঁচার বাইরে একফালি বারান্দার মতো, যেখানে টুল পেতে বসে থাকত মাদার। তার কাছেই দেয়ালের গায়ে ঝুলুনিতে ছোটবিবির জন্য মাংস কাটার গোটা দু'তিন ছোট বড় ছুরি রাখা ছিল। তার থেকেই একটা ছুরি নিয়ে নিজের বাঁ'হাতের পিঠের খানিকটা চামড়া কেটে নিত মাদার।

গল গল করে রক্ত বেরোল। গরাদের ফাঁকে হাতটা দিয়ে বলেছিল মাদার—খা, খা, খাইয়া আখ ক্যামন লাগে।

রোজ যেমন হাত চাটে, তেমনি লম্বা জিভ দিয়ে হাতের রক্তটা চেটে নিয়েছিল ছোটবিবি।

তারপরেই মুখ তুলে কেমন অদ্ভুত ভাবে তাকিয়েছিল। সেই প্রথম মানুষের রক্তের স্বাদ পেয়ে গলার ভেতর থেকে কেমন অদ্ভুত একটা শব্দ করেছিল। তারপর মুখ ঘুরিয়ে ফোঁস ফোঁস করতে করতে খাঁচার মধ্যে পায়চারী শুরু করল। রোজ দু'বেলা ছোটবিবির খাঁচা সাফ করত জীবন দুইখালী। দু'হাতে দু'বালতি জল আর ঝাঁটা নিয়ে এসেছিল। মাদারের কাণ্ড দেখে হতভম্ব।

চেঁচিয়ে উঠেছিল—ইটা তুমি কি করতাছ মওল, নিজের রক্ত খাওয়াইতাছ—

মাদার হেসে বলেছিল—তুই চুপ কর, কইস্‌না কাউরে—

—মুই তো চুপ করলাম, কিন্তু বাঘের লাশায় বিষ থাকে জানো, শিগগির হাত ধুইয়া লও, ডাক্তারবাবুর বারে যাই—

তাড়াতাড়ি বালতির জলে হাত ধুয়ে ভবানী ডাক্তারের কাছ থেকে তুলো আর আয়োডিন দিয়ে হাতটা বেঁধে নিয়েছিল মাদার। জীবনই বেঁধে দিয়েছিল। হাত কাটার আসল কারণ জীবন ছাড়া আর কেউ জানতে পারেনি। জানলে পরে ভাবত, মাদারের মাথা খারাপ হয়েছে। জীবন নিজেও তাই ভেবেছিল—মওলের পো'র মাথাটা একবারে খারাপ হইয়া গ্যাছে।

কিন্তু দিনের পর দিন ছোটবিবির চাল চালন দেখে মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল মাদার। গভীর রাতে অদ্ভুত চাপা গর্জন করে ডাকত ছোটবিবি। পাইকদের ঘরের বারান্দার খাটিয়ার ওপর শুয়ে থাকত মাদার। ঘুম হত না। এক এক রাতে অন্ধকারে খাঁচার সামনে এসে দাঁড়াত। অন্ধকারে মাদারের মত ছোটবিবির চোখ জ্বলত। অস্থির ভাবে খাঁচার মধ্যে পায়চারী করত।

অন্ধকার আমবাগানে আম, জাম, জামরুল গাছের গায়ে মুঠো মুঠো জোনাকি জ্বলত।

সেই দিকে তাকিয়ে এক এক সময় চাপাগলায় গম্‌গম্‌ করে ডাকে যেন ডাকত ছোটবিবি।

শুধু মাদার জানত সেই ডাকের ভাষা ছোটবিবির মত মাদারও মনে মনে অস্থির হয়ে উঠেছিল।

চার পাঁচদিন অন্তর বাড়ি যেত। একটা রাতের বেশি থাকতে পারত না। বউ ছেলে-মেয়ে সংসার সব কিছু যেন ভুলেগিয়েছিল, ভুলে যাচ্ছিল মাদার মওল।

শেষ পর্যন্ত আর থাকতে না পেরে একদিন সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডটা করে বসল মাদার। যে কাণ্ডের কথা সে কাউকে বলেনি, বলতে পারেনি। অন্ততঃ মুক্তোকর্তা যতদিন বেঁচে-ছিলেন নিজের মুখে কখনো স্বীকার করেনি মাদার। প্রায় পঞ্চাশবছর পরে তিনটি ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে ছোট-বিবির বৃত্তান্ত বলতে বলতে সেই ভয়ঙ্কর কাণ্ডের কথাটা সে স্বীকার করেছিল।

সেদিন সন্ধ্যার কিছু পরেই বাড়ির দিকে রওনা হয়েছিল মাদার। মাইলখানেক পর খেয়াঘাট।

খেয়াঘাটের কাছে মঙ্গলমাঝির ঘর। ছোটবেলারবন্ধু মঙ্গল-মাঝি। এক সঙ্গে অনেকবার অনেক শিকারে গেছে তারা। যেতে-আসতে তার দাওয়ায় বসে একছিলিম তামাক টেনে যেত।

সেদিন সন্ধ্যার পর মঙ্গলমাঝির দাওয়ায় বসে তামাক টানতে টানতে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবছিল মাদার, একসময় হুকো রেখে উঠে বললো—মংলা আমি আসতাছি, বাবু আর আমু।

মঙ্গল বলেছিল—কি হইল আবার, চলনা কই?

—আর একটা জিনিস ফালাইয়া আইছি, লইয়া আই—যেতে যেতে জবাব দিয়েছিল মাদার।

মঙ্গল বলেছিল—জলদি আওন চাই, বেশি রাইত করবার পারুম না, খেয়া বন্ধ কইরা দিমু।

—না, না, মুই অখনই আইসতাছি—অন্ধকারের মধ্যে একটা ছায়ার মতো যেন হাওয়ায় উড়ে গিয়েছিল যাদার।

অন্ধকার আমবাগানে হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। গাছের ডালে দু'একটা বাদুড়ের ডানা ঝটপট।

চোরের মতো চুপি চুপি ছোটবিবির খাঁচার সামনে এসেছিল যাদার।

সেই পুরনো খাঁচাটা আমরা দেখেছি। বোধহয় এখনো সেই আমবাগানের মধ্যে সেই খাঁচাটা তেমনি পড়ে আছে। বুড়ো কর্তা নেই, আরসাদ মোল্লা নেই, মঙ্গল মাঝি নেই, যাদার শওকত নেই। বুড়ো কর্তার জমজমাটী ও স্বপ্নের মতো মিলিয়ে গেছে। এমনকি সেই দেশটাও আজ আমাদের কাছে বিদেশ হয়ে গেছে। কিন্তু এখনো হয়তো বুড়ো কর্তার ভিনমহলা ভাঙা হাবেলীর পাশে জঙ্গলভরা আমবাগানের মধ্যে ছোটবিবির সেই ভাঙা খাঁচাটা তেমনি পড়ে আছে। খাঁচাটার দুটো অংশ, তিনটে দরজা। পেছনে ইটের পাকা দেয়াল, সামনে মোটা মোটা গরাদ-বসানো। দু'পাশে একজন মানুষ যাবার মতো দুটো দরজায়ও লোহার গরাদ দেয়া। মাঝামাঝি আরেকটা দরজাও তেমনি, তবে চওড়া বেশি।

এই তিনটে দরজাই ছাদের উপর থেকে কপিকলের মত একটা যন্ত্র দিয়ে টেনে তোলা যেত আবার নামানো হত। রোজ দু'বেলা জল দিয়ে ফিনাইল দিয়ে খাঁচা ধুয়ে দিত জীবন ছুঁইবালী।

সে সময় পালা করে ছোটবিবিকে খাঁচার একদিকে রেখে বাকের দরজাটা আটকে দিয়ে আরেকদিক সাফ করা হত। রোজ দু'বেলা যাদার শওকত কিম্বা জীবন ছুঁইবালী কিম্বা চাকরদের মধ্যে অন্য কেউ এই খাঁচার দরজা ওঠানো-নামানোর কাজটা করত। খুব সাবধানে করতে হত। খাঁচার পেছন দিকে একটা বই লাগানো থাকত।

সেদিন সেই অন্ধকারে বই বেয়ে খাঁচার ছাদে উঠেছিল যাদার। কপিকলের চাকা ঘুরিয়ে একদিকের একটা দরজা আস্তে আস্তে কিছুটা তুলে দিয়েছিল। অতবড় শিকারী, অতবড় সাহসী যাদার শওকতের হাত-পা কাঁপছিল, বুকের মধ্যে যেন হাপর পেটাবার শব্দ হচ্ছিল।

একটু সময় অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তারপর যা ভেবেছিল, গুড়ি মেরে নিঃশব্দে খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল ছোটবিবি। মুখ তুলে যাদারের দিকে তাকাল একবার। তারপর সামনের আমগাছের গায়ে ঠিক বেড়ালের মতো বারকয়েক থাবা থাবড়াল।

আরেকবার মুখ তুলে যাদারকে দেখল। তারপর চাপা একটা ঘুনির গর্জন করে লাফাতে লাফাতে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। খাঁচার দরজাটা আবার বন্ধ করে চোরের মত পালিয়ে এসেছিল যাদার।

তিন

পরের দিন খুব হৈচৈ হয়েছিল। ছোটবিবিকে পাওয়া যাচ্ছে না। যেমন খাঁচা, তেমনি আছে। কোথাও একটু ভাঙা নেই একটু ফাঁক নেই। অথচ ছোটবিবি উধাও। কেমন করে হ'ল, কি করে পালালো ছোটবিবি। বুড়োকর্তা ক্ষেপে আগুন হয়ে ধমকাচ্ছেন সবাইকে।

যাদার শওকতেরও ডাক পড়ল। ডাকতে এসেছিল গঙ্গাচরণ। গঙ্গাচরণ বুণী। কর্তাসাহেবের হাবেলীর কাপড় কাচে। বেচারা দাতে-পাঁচে নেই। ঘোরের মধ্যে, আগের দিন বিকেলে,—যে সময় জীবন ছুঁইবালী খাঁচা সাফ করতে এসেছিল, তখন কাছাকাছি কাউকে না পেয়ে গঙ্গাচরণকে বলেছিল জীবন, খাঁচার দরজা তুলে দিতে। গঙ্গাচরণই পাঁচজনের সামনে সেবারের মতো খাঁচার দরজা তুলেছিল, আবার সাবধানে বন্ধ করেছিল। কর্তাসাহেব এখন তাকে জুতোপেটা করবেন। ভোজপুরী দারোয়ান,—রাধাবল্লভ, ঈশ্বরী প্রসাদ, প্রভুনাথ—এদের কাউকে দিয়ে মার খেওয়াবেন।

ভোজপুরী দারোয়ানেরা মেরে হাড় গুড়ো করে দেবে। মারের ভয়ে গঙ্গাচরণ হাউ মাউ করে কেঁদেছে।

কেঁদেকেটে কর্তামশাইর হাতে পায়ে ধরে একটু সময় চেয়েছে গঙ্গাচরণ। সময় নিয়ে মাদারকে ডাকতে এসেছে। যদি কোন সুরাহা করতে পারে ওস্তাদ শিকারী মাদার মণ্ডল। গঙ্গাচরণ একা আসেনি, একা আসতে তাকে দেয়া হয়নি। যদি পালিয়ে যায়, যদি গা-ঢাকা দেয়। তাই সঙ্গে এসেছে ঈশ্বরীপ্রসাদ। ওদিকে জীবন দুইখালীকেও দারোগাবাবুর হেফাজতে আটকে রাখা হয়েছিল। তখন সবে সকাল হয়েছিল। ভাল করে রোদ ওঠেনি। গঙ্গাচরণের ডাকাডাকি শুনে বেরিয়ে এসেছিল মাদার। খবরটা শুনে খুব যেন অবাক হয়ে বলেছিল—এ্যা কস্ কি, ছোটবিবি নাই—

গল্পের এই জায়গায় জীবন দুইখালী আর গঙ্গাচরণের ইনিয়ে বিনিয়ে কান্নাকাটির সুরটা নকল করে দেখাত মাদার। আমরা খুব হাসতুম।

ঘুড়োকর্তার হাতে-পায়ে ধরে তাকে একটু ঠাণ্ডা করে আশ্বাস দিয়েছিল মাদার, যেভাবেই হোক ছোটবিবিকে ঘরে আনবে, আজ হোক কাল হোক নিয়ে আসবে।

আরসাদ মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিল মাদার। পর পর দুটো দিন ধরে গাবতলির জঙ্গল থেকে শুরু করে আশে-পাশের সমস্ত বন-বাদাড় খুঁজে দেখল। ছোটবিবির পাত্তা নেই। ঘুড়োকর্তাকে এসে খবর দিয়েছিল—ছোটবিবি এই মরুকে নাই কর্তা, মনে লয় সোন্দরবনের দিকে পলাইয়া গ্যাছে গা—

বাখরগঞ্জ জেলার সমস্ত দক্ষিণদিক জুড়ে গভীর সুন্দরবন। এখান থেকে বেশি দূর নয়। পনের-বিশ মাইলের মধ্যেই সুন্দরবনের সীমানা শুরু হয়েছে। এক একবার শীতকালে নদীনালার জল কমলে পর যে বাঘের উৎপাত শুরু হ'ত, তার কারণও ওই সুন্দরবন।

ছোটবিবির বাপ্ত একদিন সেখান থেকেই এসেছিল। সেদিকে পালিয়ে যাওয়া ছোটবিবির পক্ষে অসম্ভব নয়। তবু কর্তামশাই নিশ্চিন্ত হতে পারেন নি, আশ-পাশের আট-দশটা গ্রামে ঢেঁড়া পিটিয়ে সবাইকে সাবধান করে দিলেন। সবাই সাবধান, বিশ্বেশ্বর রায় মশাইর হাবেলীর খাঁচা থেকে বাঘ পালিয়েছে। জ্যান্ত হোক, মরা হোক—কেউ ধরে আনতে পারলে নগদ একশো টাকা পুরস্কার।

কি করে পালালো ছোটবিবি, এই নিয়ে অনেক গুজব রটলো। নানা জনে, নানা কথা রটাল, নানা গল্প চালু হ'ল। ছোটবিবি নাকি বাঘ ছিল না, আসলে স্বর্গের অপ্সরী। পাপের ফলে বাঘ হয়েছিল। পাপের ভোগ শেষ হতেই স্বর্গে ফিরে গেছে।

কেউ বললো, সুন্দরবনের দেবী বনবিবির সখী ছিল ছোটবিবি, আবার তার কাছেই ফিরে গেছে। গাঁয়ের লোকেরা অনেক ছড়া বানাল, গান বাঁধল। একটা ছড়া মাদার মণ্ডল ঘুরে ঘুরে সুর করে শোনাত। লম্বা ছড়া। সবটা মনে নেই। আরম্ভটা এইরকম :

ছোটবিবির পরশ-কথা শুন মন দিয়া
আসমানে উড়িল বিবি অপ্সরী সাজিয়া—

তারপর দীর্ঘ বর্ণনা। ছোটবিবির রূপ, রঙ, চাল-চলন, যাওয়ার বহর। নানাভাবে ছোটবিবির অলৌকিক ক্ষমতার গুণকীর্তন করে ছড়াটা শেষ হ'ত এই বলে—

ছোটবিবির কাণ্ডখানা কিবা চমৎকার
ধরা দিলে একশো টাকা নগদ পুরস্কার।

অদ্ভুত সুরের এই ছড়াটা শুনে খুব হাসতুম আমরা। কিন্তু যে যাই বলুক, যাই মনে করুক, এ তল্লাটের শুধু দুজন লোক আসল ব্যাপারটা আঁচ করেছিল। ছোটবিবির পরশ-কথার অলৌকিক কাণ্ড-কারখানা কিছুই বিশ্বাস করেনি তারা। একজন মাদারের বউ জুলখনবিবি, আরেকজন মঙ্গল মাঝি। সেদিন অনেক রাতে খেয়া নৌকোয় মাদারকে নদী পার করে দিয়েছিল মঙ্গল মাঝি। আর দুপুর রাতে ঘরের দরজা খুলে দিয়েছিল জুলখনবিবি। সারারাত ঘুমুতে পারেনি মাদার। শুয়ে শুয়ে এপাশ-ওপাশ করেছে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় উঠে তামাক খেয়েছে।

দু'তিন দিন পরে চুপিচুপি বলেছিল বদলমাঝি—কামডা ভাল হয় নাই, মাদার—

চোখ পাকিয়ে জবাব দিয়েছিল মাদার—তুই তো আর জাখস্ নাই, চুপ মাইরা থাক্—

কিন্তু মাদারের বউ ফুলমনবিবি অত সহজে চুপ মেরে থাকেনি।

চেঁচিয়ে বলেছিল ফুলমনবিবি—ইয়া তুমরার কাম, মুই বুঝবার পারছি, কও, ঠিক কইছি কিনা, কও, সাঁচা কথা কইবা, আল্লার কিরা দিয়া কও, খোয়ে ছুইয়া কও, পোলার মাথায় হাত দিয়া কও—

মাদার শুনেছে আর হেসেছে। হেসেছে আর তামাক টেনেছে।

কিন্তু মাসখানেকের মধ্যেই প্রমাণ পাওয়া গেল ছোটবিবি অপ্সরীও নয়, বনবিবির সখীও নয়, জলজান্ত বাঘ। আর এই মুরুক ছেড়েও যায়নি, সেলেও ফিরে এসেছে।

মাসখানেকের মাথায় এক ঘুপ্পুর রাতে ভূষণ গোয়ালার গোয়াল ঘরের বেড়া ভেঙে ঢুকে একটা গরু নিয়ে গেল। গাঁয়ের শেষে গোয়ালপাড়ায় ভূষণের ঘর। তারপর মস্ত মাঠ, মাঠের শেষে গাবতলির জঙ্গল শুরু হয়েছে।

গর্জন শুনে, পায়ের দাগ দেখে, সবাই বুঝল, বাঘ এসেছে এবং ছোটবিবি হওয়াই সম্ভব, তবে অন্য বাঘও হতে পারে। কিন্তু অত রাতে কে আর যাবে সঠিক প্রমাণ আনতে।

পায়ের ছাপ, রক্তের দাগ চলে গেছে মাঠের দিকে, তারপর নিশ্চয়ই ঢুকেছে জঙ্গলে। কেউ আর এগোতে সাহস করল না। বাকি রাতটুকু ভূষণ পাড়া-পড়শীদের সঙ্গে বসে হায় হায় করে কাটাল। মাঝে মাঝে টিন পেটাল, কাঁসর ঘণ্টা বাজাল। ভোর না হতেই ছুটল কর্তাবাবাইকে খবর দিতে। সেখান থেকে গেল নদীর ওপারে মাদার মণ্ডলকে ডেকে আনতে।

পায়ের ছাপ দেখেই বুঝেছিল মাদার। ছোটবিবির প্রতিটি নিশ্বাস চেনে সে।

সোনদা বন্দুক আর আরশাদ মোল্লাকে সঙ্গে নিয়ে রওনা হয়েছিল মাদার।

ছোটবিবির পায়ের ছাপের পাশাপাশি কোঁটা কোঁটা রক্তের দাগ চলে গেছে মাঠের উপর দিয়ে। একটা ভারী জিনিষ টেনে নিয়ে যাবার চিহ্ন। মাঠের শেষে, জঙ্গলে ঢোকার মুখে এক জায়গায় চাপ চাপ রক্তের দাগ, পায়ের ছাপও অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। এখানে এসে গরুটাকে নামিয়ে রেখে বোধহয় একটু বিশ্রাম করেছে ছোটবিবি। স্বভাব মত খানিকটা ঘুরে ঘুরে পাহারাও করেছে। তারপর সোজা জঙ্গলে ঢুকে গেছে।

অনেক লোক জুটেছিল মাদারের পেছনে। এখান থেকে সবাইকে ধমক দিয়ে তাড়াতে হ'ল।

এত লোকের গোলমালে পালিয়ে যাবে ছোটবিবি। কোন কাজ হবে না। তাছাড়া আনাড়ি লোক জখম হতে পারে, মারাও যেতে পারে। এসব ঝুঁকি কে নেবে, কে দায়ী হবে।

কিন্তু কেউ চলে যেতে চায় না। সবাই সঙ্গে যাবে। আশ্চর্য ব্যাপার।

কারণটা প্রথম বুঝতে পারেনি মাদার। শেষে যখন বুঝতে পারল, অত বিপদের মধ্যেও হাসি পেয়েছিল। সবাই পুরস্কার চায়। সে-সব দিনে নগদ একশোটাকা পুরস্কার কম কথা নয়। সেই টাকাটা মাদার একা পাবে কিম্বা আরশাদ মোল্লার সঙ্গে ভাগ করে নেবে—এটা কারো মনে হচ্ছিল না। সেটাই মাদার গালাগালি দিয়েছিল—হালার পো হালারা, ভাবছো কি, ছোটবিবি কি পোলাপানের হাতের মোয়া যে গেলাম আর ধরলাম।

আরো অনেক গালাগালি দিয়েছিল, কিন্তু সেই সব গালাগালি আমাদের শুনতে দিত না বড়শি।

তাড়াতাড়ি বলতো—থামো, থামো, এসব গালাগাল বলতে হবে না, গল্পটা বলো—

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ তামাক টানার পর গল্পটা শুরু হত।
তারপর শুধু ভূষণকে সঙ্গে নিয়ে আরসাদ মোল্লা আর বাদার মণ্ডল জঙ্গলে ঢুকেছিল। কিছুদূরে সেই ভাঙা মন্দির। মন্দিরের পেছনে একটা পুকুর ছিল। পুকুরটা জঙ্গে প্রায় ডোবার মত হয়ে গেছে। সেই ডোবার কিনারায় জলের ধারে পড়েছিল ভূষণের গরুটা।
খানিকটা খাওয়া হয়েছে, একটা ভ্যাপসা গন্ধ। ভনভন করে মাছি উড়ছে।
সেই সকালেই কয়েকটা শকুন এসে জুটেছে। মাথার উপর ঘুরে ঘুরে উড়ছে।
ভূষণ আবার কিছুক্ষণ হায় হায় করল। অপঘাতে গরু মরার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।
তার আবার অনেক খরচা। কৃপণ স্বভাবের ভূষণ ইনিয়ে বিনিয়ে সে সব কথা আরম্ভ করেছিল। এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়েছিল বাদার। তারপর সব দেখে শুনে কাছাকাছি একটা বাদাম গাছে মাচা বাঁধার ব্যবস্থা করেছিল। ডোবাটার পশ্চিমে মন্দির, পুবে বাদাম গাছ, মাঝামাঝি জলের কিনারায় পড়েছিল গরুটা।
মাচা বাঁধার ব্যবস্থা করতেই বাকি দিনটুকু কেটে গেল। শীতশেষের বেলা তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে এল। সন্ধ্যার আগেই বন্দুক আর বল্লম নিয়ে বাদার মণ্ডল আর আরসাদ মোল্লা মাচায় উঠে বসল। ভূষণের ধনবল ফিরে গেল। তবে তাদের বলা হ'ল তৈরী থাকতে, বন্দুকের শব্দ শুনেই যেন আসতে পারে।
রাত গভীর হল। প্রহরে প্রহরে শেয়ালের ডাক, পেঁচার ডাক বাদুড়ের ডানা ঝটপটি শুনতে শুনতে একসময় মনে হ'ল রাত বুঝি ফর্সা হয়ে এল। শেষরাতে ছেটে ছেটে জ্যোৎস্না উঠেছে।
ছোটবিবির সাড়া নেই। হঠাৎ যেন কেউ ডাকল। হঠাৎ যেন সমস্ত বন নিস্তব্ধ হয়ে গেল।
একটু পরে আরসাদ মোল্লা আঙুলের খোঁচা দিল। মন্দিরের পাশ দিয়ে কি যেন একটা আসছে, আসছে। আরো এগিয়ে এল। শুকনো পাতার ওপর যেন অস্পষ্ট খস্ খস্ শব্দ শোনা গেল। হ্যাঁ, ছোটবিবি। তীক্ষ্ণ চোখে তাকিয়েছিল দু'জনে। ছোটবিবির প্রতিটি পায়ের চলন চেনে বাদার। মন্দিরের ছায়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে জ্যোৎস্নার মধ্যে এল।
একটু যেন রোগা হয়েছে ছোটবিবি। কেমন একটা বুনো ভাব হয়েছে।
ডোবার কিনারায় নেমে মাটি শুঁকে শুঁকে বারকয়েক চক্কর দিল। তারপর থাবা পেতে শিকারের পাশে বসল। এই সময় আরসাদ মোল্লা বিড়বিড় করে মন্তর পড়তে শুরু করল। বাঘবন্দীর মন্তর। বাঘ আর উঠতে পারবে না। মাটিতে আসাড় হয়ে পড়ে থাকবে।
বাদার মণ্ডল হঠাৎ তার মুখ চেপে ধরে বললে—এই চুপ—
আরসাদ হাতটা সরিয়ে অবাক গলায় বললো—ক্যান্ মন্তোর পড়ুব না ক্যান্ —
—না মন্তোর পড়বি না—চাপা গলায় ধমক দিয়েছিল বাদার।
হয় তো খুব অবাক হয়েছিল আরসাদ মোল্লা। কিন্তু প্রশ্ন না করে আবার বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছিল। বন্দুকটা মাচার উপর নামিয়ে রেখে দু'হাতে আরসাদের গলা টিপে ধরেছিল বাদার—না, না, মন্তোর পড়বি না, ঠ্যালা দিয়া ফালাইয়া দিমু কইলাম।
আরসাদও বেশ জোয়ান। জোর করে হাতটা ছাড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে বলেছিল আরসাদ—হালা, তোর বাঘের লগে পিরিত, অক্ষণ বুঝবার পারছি, খাঁচার বয়লা দুই পুইলা দিছিস, দুই কমু যাইয়া। কর্তাবাবুরে—
বাদারও ফুসতে ফুসতে বলেছিল—যা, অক্ষণই যাইয়া কইয়া দে—

দুই শিকারীর গতগোলে গুলিকে ছোটবিবি সরে গেছে। আকাশও ফর্সা হয়ে আসছে। বনের ঝোপে ঝোপে গাছ পালার নিচে আবছা অন্ধকার।

রাগের চোটে গজগজ করতে করতে মাচা থেকে নেমে সেই আবছা অন্ধকারেই হনহন করে রওনা দিয়েছিল আরসাদ মোল্লা। ভোরার পাড় ঘুরে ভাঙা মন্দিরের পাশ দিয়ে চোখের আড়াল হয়েছিল। পরক্ষণেই একটা বুকফাটা আর্তনাদ।

বন্দুক হাতে মাচা থেকে প্রায় লাফিয়ে নেমেছিল মাদার। ছুটেছিল আরসাদের যাবার পথের দিকে। তখনো চিৎকার শোনা যাচ্ছিল। শুকনো পাতা, ছোট ছোট আগাছার ঝোপের উপর দিয়ে একটা ভারী দেহ টেনে নিয়ে যাবার শব্দ হচ্ছিল।

মাদার ছুটলো সেই শব্দ, সেই চীৎকার লক্ষ্য করে। খানিকটা গিয়ে দেখল আরসাদের বন্দুকটা পড়ে আছে। সেই বন্দুকটার পাশে দাঁড়িয়ে আবছা অন্ধকারের মধ্যে আন্দাজে দু'বার গুলি ছুড়ল। বন্দুকে গুলি ভরে নিয়ে আবার ছুটল। গুলি ছোঁড়ার কাজ হ'ল। আরসাদকে ফেলে পালাল ছোটবিবি। চিত হয়ে পড়েছিল আরসাদ। হাত-পা ছড়ান, ঘাড় ভেঙে গেছে, কেমন বেয়াড়াভাবে বেঁকে আছে ঘাড়টা, গলগল করে রক্ত পড়ছে। আরসাদের চোখ দুটো বিস্ফারিত, হা করে নিশ্বাস নিচ্ছিল। দুই হাতের মুঠোয় কিছু ছেঁড়া পাতা। প্রচণ্ড শক্তিতে যখন টেনে নিয়ে যাচ্ছিল ছোটবিবি, হাতের কাছে যা পেয়েছে, তাই ধরে থামাতে চেয়েছিল, বাঁচতে চেয়েছিল আরসাদ মোল্লা। বাঘবন্দীর গুণিন আরসাদ মোল্লা।

সাদাচ্ছ ভুলের জন্য মারা পড়ল। রাগে, দুঃখে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়েছিল মাদারের। কি জবাব দেবে ভুতোকর্তার কাছে। আরসাদের বউ এর কাছে, ভুতো রাগের কাছে। কোন কাজ হবে না জেনেও রাগের মাথায় ছোটবিবির যাবার পথের দিকে লক্ষ্য করে আরো দুটো গুলি ছুঁড়েছিল। গুলির শব্দে সোয়ালপাড়ার সবাই ছুটে এসেছিল। তখন বেশ ফর্সা হয়ে গেছে। গাছের মাথায় পাখপাখালির ডাক।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই মারা গিয়েছিল আরসাদ মোল্লা।

চার

সন্ধ্যার আগেই আরসাদ মোল্লাকে কবর দেয়া হয়েছিল। আর বাড়ি ফেরেনি মাদার। নিজের হাতে আরসাদকে নতুন কাপড় দিয়ে ঢেকে, নিজের হাতে কবর কেটে মাটি চাপা দিয়েছিল। তারপর বন্দুক হাতে করে গোলা এসে মাচার উপর বসেছিল মাদার। একা। কাউকে সঙ্গে নেয়নি। পাপের প্রায়শ্চিত্ত সে একাই করবে। ভুলের খেসারত্, সে একাই দেবে।

রাত নিঝুম হল। গাছের ডালে বাদুড়ের ডানা ঝাপটানি এক সময় থেমে গেল।

ভাঙা মন্দিরের চুড়োয় অনেকক্ষণ বসে বসে একটা পেঁচা ডাকল। একটা দুটো শেয়াল এসে মরা গরুটার চারপাশে ঘুরে গেল। মাদার সতর্ক চোখে তাকিয়ে আছে। শেষরাতে বনের মাথায় আগের রাতের মতো ভাঙা চাঁদ উঠল। ফেটে ফেটে জ্যোৎস্না।

মাদারের মন বলছিল, ছোটবিবি আবার আসবে, আসতেই হবে। আগের দু'দিন ভাল খাওয়া হয়নি ছোটবিবির। রোজ দুপুরে খাসা মাংস খেয়ে বড় হয়েছে ছোটবিবি।

মাদার নিজের হাতে মেপে দিত। বুনো জন্তু ধরে খাবার অভ্যাস নেই। ধরার কায়দাও বোধহয় তেমন রপ্ত হয় নি। তবে বাঘের এই একটা বাস কোথায় ছিল, কি ভাবে ছিল সেটাই আন্দাজ করতে পারেনি মাদার।

কিন্তু যেখানেই থাক, যত দূরেই থাক, আবার এখানেই ফিরে আসতে হবে।

এই গাবতলির জঙ্গলে, যেখানে ছোটবিবির বা ঘরেছে, তাই ঘরেছে, জুতন শিকদার ঘরেছে, আরসাদ বোয়ারও ঘরল। এ ওঘাটের কাছে-পিঠে এতবড় জঙ্গল আর নেই।

নূতন কোন জঙ্গল বোধ হয় এখনো চেনে না ছোটবিবি। সুন্দরবনে যাবার রাস্তাও বোধহয় অচেনা। তাই ঘুরে ফিরে আবার এই জঙ্গলেই এসেছে। এই জঙ্গলেই বোধহয় জন্মেছিল আবার এখানেই মরতে হবে। হ্যাঁ মরতে হবে ছোটবিবিকে, আর কোন ক্ষমা নেই, কোন মমতা নেই।

শয়তান হয়ে গেছে ছোটবিবি। মানুষ থেকো শয়তান।

কিন্তু, কি শীত! মাঘমাসের শেষরাত্রি। হাত পা হিম হয়ে যাচ্ছে। আঙুলগুলো অসাড়। বন্দুকের নলটা ভীষণ ঠাণ্ডা। ঠাণ্ডা মাটির নিচে আরসাদ বোয়ার দেহটাও এমনি কঠিন শীতল হয়ে গেছে। শেষ পর্য্যন্ত কেমন বড় বড় চোখে তাকিয়েছিল আরসাদ। মৃত্যুর পরেও চোখের পাতা বন্ধ হয়নি। একটা ভয়, একটা নিষ্ফল চেষ্টার হাহাকার ছিল সেই ঠাণ্ডা নিষ্প্রাণ চোখের মধ্যে। কাল রাত্রেও পাশে বসেছিল। এমন সময়ও বেঁচেছিল।

চারপাশে একবার তাকাল মাদার। ঠাণ্ডা চোখের মতো হাজার হাজার জোনাকি জ্বলছে। গায়ের মধ্যে কেমন শির শির করছে। বন্দুকটা কোলের উপর রেখে হাতে হাত ঘসল।

আজ কি আসবে না ছোটবিবি। আজ না হোক্, কাল আসবে।

কাল না হোক পরশু, না হয় তার পরদিন। রোজ রাতে এখানে এসে অপেক্ষা করবে সে। একদিন না একদিন দেখা হবেই।

হঠাৎ ঘুরে যেন কেউ এর ডাক শোনা গেল। চারপাশ কেমন চুপচাপ মনে হ'ল।

পেঁচার ডাক নেই, বাদুড়ের সাড়া নেই বনের সমস্ত শব্দ যেন বন্ধ হয়ে গেল।

মাদারের গায়ে মোটা কাপড়ের কতুয়া, তারওপর খুড়ো কর্ত্তার দেয়া একটা পশম কোট, নিচে পায়জামা। মাথা মুখ ঢেকে একটা চাদর ঢাকা ছিল।

চাদরটা গুছিয়ে নেবে, এমন সময় লক্ষ্য হ'ল মন্দিরের ছায়ার আড়াল দিয়ে কি যেন একটা আসছে, আসছে। আরো এগিয়ে এল। চাদরটা খুলে আস্তে আস্তে পাশে রাখল। বন্দুকটা তুলে হাঁটু গেড়ে বসল। ছোটবিবি এসেছে।

ডোবার পাশে একটু চালুতে নেমে পঙ্কটার দেহ শুঁকল। শুঁকে শুঁকে চারপাশে ঘুরল। কিন্তু খেয়াল নেই মাদারের। কানের পাশটা ঝাঁঝাঁ করছে।

হঠাৎ পুরনো সুরে ডাক দিল—আ—আ—

পরিচিত ডাক শুনে ঘুরে দাঁড়াল ছোটবিবি। মুখ তুলে তাকাল।

তারপর কয়েক পা' এগিয়ে এসে থাবা পেতে বসল। একটা চাপা গর গর আওয়াজ। এই খুশির আওয়াজটা চেনে মাদার। মুখ তুলে তাকিয়ে আছে ছোট বিবি।

আঠারখানা চোখ জ্বলছিল। আর সময় নেই, আর দেরি করা ঠিক হবে না।

ছোটবিবির এই দুর্বল মুহূর্তেই শক্ত হতে হবে, সব শেষ করে দিতে হবে।

বন্দুক তুলে সেই জলজ্বলে দুই চোখের মাঝখানে ঠিক কপালের উপর একটি মাত্র গুলি করেছিল অব্যর্থলক্ষ্য পাকা শিকারী মাদার মণ্ডল।

ছোটবিবি চেঁচায় নি, নড়েনি। সামনের দুই থাবার মাঝখানে মুখটা শুধু নুঁকে নেমে এসেছিল মাটির ওপর। ছোটবিবি নিশ্চল, শান্ত।

এতক্ষণ পরে মাদারের চোখ থেকে টপ্ টপ্ করে জল পড়েছিল।

ছোটবিবির রয়ানি বলতে বলতে গল্পের এইখানে এসে এই পঞ্চাশ ব ৎ র পরেও তার চোখের পাতা ভিজে যেত।

একটু বাদেই চারদিক ফর্সা হয়েছিল। গ্রামের দিক থেকে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল বন্দুকের শব্দ শুনে আসছিল সব। মাদারের নাম ধরে ডাকছিল।

গাছ থেকে নেমে ছোটবিবির সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল মাদার।

তেমনি শান্তভাবে বসে আছে ছোটবিবি, যেন ঘুমিয়ে আছে।

আর আশ্চর্য, হিন্দু ঘরের বউদের মতো ছোটবিবির কপালে একটা লাল সিঁদুরের টিপ্।

শা ন্তি ল তা

ছোট গল্প

বিজনকুমার ঘোষ

মুকুল খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘরখানা দেখছিল। কড়কড়ে হলুদ আলো। অসুস্থ রুগীর মত নির্জীব। দেওয়ালগুলো কতকাল চুনকামবর্জিত কে জানে। আস্তরের বাড়ি ঠিঁড়ে ইটের দাঁত দেখা যাচ্ছে। যেন মুকুলের দিকে তাকিয়ে হেসে বলছে, নয়া নাগর। মুকুল চোখ ফেরাল। কতটুকু ঘর। একটি মাত্র বিছানা। বিবর্ণ বেড কভারে মোড়া। কত পুরুষের গায়ের গন্ধ লেপটে আছে কে জানে! মনে হল মুনিয়া চাকরটার বিছানাও এর চাইতে পরিষ্কার। মন বন্ধ হয়ে আসতে চাইল এক সময়। এখনো ফিরে যাবার সময় আছে। হয়ত যায়। কেননা টাকা তো দেওয়াই হয়েছে। ঘরে ঢুকতে ঢুকতেই মুকুলের হাতে ঘুলালদা গিঁজে দিয়েছে। ঘুলাল পাল। মুকুলের চাইতে বছর দশেকের বড়। এখনো ইস্কুলের গণ্ডিতেই ঘুরে গেছে। তবে এসব লাইনে মাস্টার। মুকুলের পরামর্শদাতাও বটে। বলেছিল, তোর মন খারাপ হয়েছে? তা এযুগে বাঁচতে গেলে মন এক সময় না এক সময় খারাপ হবেই। কিন্তু হাতের কাছে শুধু তো রয়েইছে। চল আমার সঙ্গে। খাসা জিনিস। সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে—ইত্যাদি।

কিন্তু একি খাসা জিনিসের ছিরি! ঘুলালদার মুখে অপ্সরা কিন্নরীর গল্প শুনেছিল। ওরা নাকি একবার কাছে দাঁড়ালেই যাবতীয় দুঃখ কষ্ট পাখির মত ফুরুৎ করে উড়ে পালায়। মুকুলের মনে হল যাবতীয় দুঃখ কষ্ট আরো জাঁকিয়ে বসে ওরা কাছে থাকলে। কেননা মুকুলদের বাড়িতে যে মেয়েছেলেটা বাসন মাজে সেও এর চাইতে সুন্দরী। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল মাত্র সাতটা বাজে। আর কতক্ষণ থাকতে হবে? এখনো ফিরে যাওয়া যায় এই নরককুণ্ড থেকে। এখনো এই মুহূর্তে রাস্তায় হাজার হাজার সুখি মানুষদের ভিড়ে হারিয়ে যাওয়া যায়। মুকুল প্রতিজ্ঞা করল ঘুলালদার সঙ্গে আর কখনো মিশবে না। ঘুলালদাকে শুধু বলেছিল, বেনা আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমার জীবনে নাকি সিকিউরিটি নেই। আমি এখনো ছাত্র। সঙ্গে সঙ্গে ঘুলালদা মুখের কথা লুফে নিয়ে বলেছিল, চল আমার সঙ্গে। খাসা জিনিস। সবে পাড়াগাঁ থেকে এসেছে—ইত্যাদি।

—বিছানায় আসবে না?

চমকে উঠল মুকুল। তাকাল। মেয়েটা করুণ চোখে চেয়ে আছে। সেই মেয়েটা যে বাসন মাজা ঝিয়ের মেয়ে। অবশ্য। শিউরে উঠল। এর সঙ্গে এক বিছানায় শুতে হবে! ভগবান! প্রাণপণে ইচ্ছে হল দরজার ছিটকিনি খুলে পালিয়ে বাইরে চলে যায়।

—কি গো, আসবে না?

—আমার শরীর ভাল নেই।

—তবে এলে কেন?

জবাব নেই।

—তোমরা ভদ্দরলোকরা মানুষকে বড় বেন্না কর।

—না না, ঘৃণা করিনি।—মুকুল যেন ধরা পড়ে গেল।

—তোমাদের আমি চিনি—

—সত্যি বলছি আবার—

—তোমরা বেশ্যা বাড়িতে আস আমাদের অপমান করতে। তোমরা চীজ ভাল নয় মোটে।

—আহা, ও কথা বলছ কেন?—মুকুল যেন একটা সূত্র পেয়ে গেল: টাকা তো পুরোপুরি দিয়েছি—

—কে চায় তোমার টাকা? এই নাও—

মেঝেতে ঝনাৎ করে শব্দ উঠল। কয়েকটা অসহ্য মুহূর্ত। বেরোবার পথ কি খোলা নেই? ওই দরজার খিলটা কি চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত? অথচ এই কুৎসিত মেয়েটার কাছে হেরে গেল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল হেনার ওপর। ওর জন্যেই তো দুলালদার খপ্পরে পড়া। ওর জন্যেই তো এই নরকযুণ্ডে আসা। অথচ ও কেমন হেসে খেলে ইঞ্জিনীয়ার স্বামীর ঘর করতে চলে গেল।

—নিয়ে যাও টাকা। আমরা ভিখিরী নাকি?

—রাগ করছ কেন?

—কেন রাগ করব না?

—আমার শরীরটা ভাল নেই। তাই—

—আমারও শরীর ভাল নেই। তুমি টাকা নিয়ে যাও।

দুলালদা বলেছিল, ওরা বড্ড অহঙ্কারী হয়। কখনো ওরা নিজেদের করুণার পাত্র মনে করে না। তুইও আবার ওদের সেখানে যাসনে। দোকানদার-খরিদ্দার সম্পর্ক মনে রাখবি। মুকুল মেঝে থেকে টাকা কয়টা কুড়িয়ে মেয়েটির হাতে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ও বিছানাটা পরিষ্কারের শোজ করে ইশারা করল উঠতে। মুকুল উঠল। যা থাকে কপালে। বিশুদ্ধ আর রক্ত কণ্ঠা দুষিত হয় কাল সকালে উঠে তা দেখা যাবে। দুলালদা উপদেশ দিয়েছিল, একবার ঢুকলে খুশি না করে বেরোবার চেষ্টা করবিনে। ওরা বিষ্ণু ভয়ংকর। ওদের পোষা গুণ্ডা থাকে।—কানের কাছে মুখটা এনে: আর ওদের খুশি করতে পারলে দেখবি হেনাকে ভুলতে বেশীক্ষণ লাগবে না। আমিও বড্ড ধাপ্পা খেয়ে এখানে এসেছিরে। আর ফিরে যেতে চাইনে—

রোগ জীবাণুর ওপর মুকুলের দারুণ ভয়। হয়ত খাই-জোলকোপ দিয়ে দেখলে দেখা যাবে সারা বিছানা জুড়ে লক্ষ লক্ষ সিফলিসের বীজাণু কিলবিল করছে। মুকুলের কান্না পেল। গলা শুকিয়ে আসছে। দুলালদা কোথায় তাকে ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেল। মেয়েটি যেন বুঝতে পেরেছে সব। হাসল। প্রথম প্রথম সবার-ই এরকম হয়। বিশেষত যারা ভেলেমানুষ। তারপর এরাই কেমন ওস্তাদ হয়ে যায়। পাকা খেলোয়াড়ের মত। টলতে টলতে ঘরের মধ্যে ঢোকে এরা। চোখ ভাটার মত জ্বলতে থাকে। কাপড়ে মোড়ান ঘরের যোতল বের করে দেয়। পাশের দোকানে চাটের অর্ডার দেয়। মেয়েটিও একপাল হেসে দুটো গেলাস আর সোডার বোতল নিয়ে বিছানায় উঠে বসে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যায়। উঠতেই চায় না লোকটা। যেন ওর বাড়ি ঘর, বৌ ছেলে মেয়ে কেউ নেই। এই ঘরখানা এই বিছানাটা ছাড়া আর কাউকে জানে না। মেয়েটির শেষকালে বিরক্ত লাগে। কেমন ধারা পুরুষ! তখন কিছু বাজা বাজা বাক্য-বাণ প্রয়োগ করতেই হয় হয়। উঠে দাঁড়ায়। কিন্তু পকেটে তখন ছুঁচো ডন মারে। কিছু না পেয়ে শেষে বিয়ের আংটিটাই ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে পালায়। মেয়েটি এ লাইনে নতুন। কিন্তু অভিজ্ঞতায় ঘুনো মারকেল। অথচ দেখেছে, সেই সব ছেলেগুলি, যাদের নাকের ডগায় সবে গোঁফ গজায়, তারা প্রথম প্রথম কি হাঁদা গঙ্গারাম-ই না থাকে। ভালো মাছটি উল্টে খেতে জানে না। শুধু ভাতের আলা চাই। আর কখনো একা আসে না। কৌতূহল যেন জলবিছুটি মারে। প্রত্যেকেরই একটি করে গুপনিধি সাথী থাকে। তারা ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে কৌশলে দরজা বন্ধ করে চলে যায়। একটু পরে ফুটো দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, হল? এরাই হল শয়তানের ছাও। আহা, আলাই বালাই ঘাট! ওদের

অতেই তো করে কম্মে খাচ্ছি। নাহলে কবে ব্যবসা ডুকে উঠত।

তাকিয়ে দেখল নতুন ছোকরাটি ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে আছে। একটু যেন মায়া হল। মায়া। হাসল নিজের মনেই। মায়া টায়া এখন আর নেই। ওসব লেকেলে ব্যাপার। সেদিন কোথায় ছিল মায়া? যেদিন ঘরের মধ্যে এক গুণ্ডাকে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে শেকল তুলে দিয়েছিল? লোকটার পায়ের ওপর পড়ে কত কান্নাকাটি করেছিল। সেদিন কোথায় ছিল মায়া? লোকটা সারা রাত ধরে চুষেছিল, যেমন লোকে আঙুর চোষে। সারা রাত ধরে আছড়েছিল বিছানার পাটে, যেমন ধোপা কাপড় আছড়ায়। কোথাও মায়া টায়া নেই। ওসব 'ভদ্দরলোকে'র ব্যাপার। লাইনে নতুন বলে কি হবে, অভিজ্ঞতায় সবাইকে ছাড়িয়ে গেছে। এই বয়সেই জেনে ফেলেছে, পুরুষেরা কুকুরের জাত। চেপে ধরলেই চিঁ চিঁ, আলগা ঢিলেই ঘেউ ঘেউ। সুতরাং ওই সব ডাকা ডাকা ষোল আনা ইজ্জতওয়ালা ভদ্দরলোকের বাচ্চাদের দেখলেই পিত্তি জ্বলে যায়। চোখা চোখা কথা বলে। হেঁহাই দেবার পাত্তর নয়।

কিন্তু এই ছেলেটাকে দেখে এতদিন পর কেমন যেন লাগছে। একটু যেন মায়া মতন। ভেবেছিল, মায়া টায়া বুঝি সব ঘুষে মুছে গেছে। আশ্চর্য, তাহলে এখনো রেশ যায়নি? কিন্তু জানে, মায়া টায়া ব্যবসা পত্তরকে বসিয়ে দেয়। তবু ছেলেটার প্রতি করুণা আসছে। এই ছেলেদের ধরনই আলাদা। এরা জীবনে একবারই আসে। কোন শত্তু থেকে, অথবা কৌমুদের নেশায় কিম্বা পাড়ার দাদাদের পাল্লায় পড়ে। শিকারী বিড়ালের গোঁফ দেখলেই চেনা যায়। ভয়ে কেমন সিঁটকে মেরে গেছে। একটু হেসে জিজ্ঞাসা করল, কি গো, ভয় পেলে নাকি বাছা!

—না-না—

—মেয়েছেলেকে এত ভয়? বৌ এলে না জানি কি করবে?

—না-না, ভয় পাইনি। শরীরটা খারাপ তাই।

—এই নতুন এলে বুঝি?

—হ্যাঁ।

—তা নতুন এলে শরীল সবারই খারাপ হয়ে যায়—একটু হেসে নিয়ে: কিন্তু পরে ওরে বাব্বা—মুকুল মাথা নিচু করল।

—তা সঙ্গের দাদাটিকে কুথায় জোটালে?

—ঘুলালদা। আমরা আগে এক পাড়ায় ছিলাম।

—বেশ বেশ। কত দিন ধরে সাকরেদী করা হচ্ছে?

মুকুল চুপ। কেমন যেন সব ওলট পালট হয়ে যাচ্ছে।

—বলি চুপ করলে কেন?.....এসব ভাল নয়। যদিও আমার ব্যবসা খারাপ হবে, তবু বলি এসব ছেড়ে দাও—

কান দুটো লাল হয়ে গেল মুকুলের। সবজান্তার ভঙ্গীতে ঘুলালদা যা যা বলেছিল তার সঙ্গে কিছুই মিলছে না। এরা নাকি ঘর থেকে বেরুতে না বেরুতেই কাছা চেপে ধরে, আবার কবে আসবে?

—কি, কথা বলছ না কেন? আর আসবে?

—না।—বাটির দিকে চোখ রেখেই মুকুল বলল।

—এই তো লক্ষ্মী ছেলের মত কথা। বলি কি করা হয়?

—পড়ি।

—ইস্কুলে?

—না, কলেজে।

—তা কলেজের ছাত্তররাও আমার কাছে আসে। মাষ্টাররাও। কেউ বাদ যায় না—হেঁ-হেঁ—

—তাই নাকি?—মুকুল অবাক হয়ে তাকাল।

—তা নয়ত কি।—মেয়েটি বাটা খুলে গম্ভীর চালে একটি পান মুখে দিল।

এ যেন নতুন জগত। নতুন কথা। মুকুলের বিস্ময় আর কাটতে চায় না।

—তুমি কিন্তু ভাই আর কক্ষনো আসবে না। আমার গা ছুঁয়ে বল। কিছু খাবে?

মুকুল কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত করল।

—না খাব না, খিদে নেই।

চোখ এড়াল না।

—আমি খাবে না। বেন্তার বাড়িতে খেতে বেন্না করে।

আহত এবং অনুতপ্ত হল।

—কি আছে খাবার বের কর।

—এই তো লক্ষ্মী ছেলে।

মেয়েটি তাক থেকে একটা মরচা টিন খুলে থিন এ্যারারুট বিস্কুট বের করল। একটা বয়াম থেকে আমের আচার।

—বিশ্বাস কর, আচার টাচার আমি বাড়িতেও খাই না। শুধু বিস্কুট খাচ্ছি—

—বেশ যা ইচ্ছে খাও। কিন্তু আমার একটা কথা রাখতে হবে ভাই। তুমি কলেজের পড়া শেষ করেই একটা টুকটুকে বৌ আনবে বল?

—বারে, চাকরী করতে হবে না বুঝি?

—চাকরী তো করবেই। পুরুষ মানুষ যখন। কিন্তু তারপর আনবে বল?

—হ্যাঁ।—সলজ্জ হয়ে মাথা নিচু করল। একটু পরে মাথা তুলল। ঘরে সেই আলোই জ্বলছে। তবে আলোর অত কড়কড়ে নয়। একটু যেন মৃদু কোমল রং। মেয়েটিকেও বেশ ভালই লাগছে এখন। ঘরের মধ্যে শুমোট ভাবটা আর নেই। একটু যেন হাওয়া খেলছে। মুকুলের ঘাম সব শুকিয়ে গেল। মৃদু স্বরে পালটা প্রশ্ন করতেও আর কোন সঙ্কোচ নেই বা দ্বিধা।

—তোমার নাম কি?

—শান্তি।

—তোমাদের দেশ কোথায়?

—উই আসানসোলের উদিকে।

—বাড়িতে কে কে আছে?

—মা আছে। বুড়ো বাবা আছে। ছোট ভাই বোন আছে।

—দেখতে ইচ্ছে করে না?

—হ্যাঁ করে।

—যাও না দেশে?

—গেলে মা-বাপ রাগ করে। আমি যে বেন্না। উদের খানে লাগে তবে কি মাসে টাকা পাঠাই।

—টাকা নেয় তারা?

—কেন নেবে না? উরা যে গরীব।

—মাসে তোমার ইনকাম কত?

—তার কি ঠিক আছে। যখন যেমন। দেড়শো দুশো। তবে পুজোর সময় বেশী। তখন বাবুরা বোনাস পায়।

—দিনে ক'জন করে বাবু আসে?

—আমি বেশী লোক নি' না। উতে শরীল খারাপ হয়। আমার একজন বাবু আছে। হেঁ-হেঁ—তোমায় ঠেনে বলতে লজ্জা করছে—

—আহা, বলই না।—মুকুলের খুব ভাল লাগছে। যেন নিজের হাতে একটু একটু করে কৌতূহলের পাপড়ি খুলে দেখছে। ফুলদানীর মাঝখানে যে জগৎ চির রহস্যময়, আজ সেই রহস্যের মাঝখানে গিয়ে বসেছে। ভালই লাগছে।

—আমার বাবু দোকানে কাজ করে। বেস্পতিবার বন্ধ থাকে। সেই দিন আমি কোন লোক নি' না। বাবু আমাকে পেয়ার করে। আমাকে নিয়ে ঘর বাঁধবে বলেছে।

—বাবু তোমাকে টাকা দেয়?

—হ্যাঁ, দেয়। অন্য লোক দিতে মানা করে। বলে অসুখ হবে উতে

—তোমাদের অসুখ হয় না?

—না। ডাক্তার বাবু কি ওষুধ দুই দিয়ে যায়। পাঁচ টাকা করে নেয়। আমি অসুখ-বাবুদের মোটে ঘরে ঢুকতে দিই নে।

—কি করে বোঝ অসুখ আছে? আমার যদি অসুখ থাকত?

—আমরা মুখ দেখেই বুঝতে পারি। আমরা ব্যবসা করে খাই।

এর পর মুকুলের একটি মোক্ষম প্রশ্ন।

—তুমি কেন এপথে এলে?

খানিকক্ষণ চুপচাপ। খোপাটা ভেঙে আবার ঠিক করে বাঁধল। কোঁচকানো বিছানার চাদরটা বেশ যত্নে করে করে গোছাল। তারপরেই মুকুলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল:

—এই পথে আসব না তবে কি ঘরে যাব? তোদের মত সখের বাবুদের মুখে ওই এক বুলি। বলি তোরা এপথে আসিস কেন? এটা কোথের নয়?……সেয়ানে এক ঘাসি দেল। গিয়ে বলল, চাকরী করবি? ভাড়া দিয়ে নিয়ে এল কলকাতায়। তারপর ঘরে গুণ্ডা ঢুকিয়ে নিকল তুলে দিল। খুব যে কুটুনি মারছিস, তোদের ঘরে গেলে থাকতে দিতিস? তোদের ঘরে বাসন মাজতাম, খেতে দিতিস?

এই পর্যন্ত বলে মেয়েটি হাঁফাতে লাগল। ঢক ঢক করে বুজোটা তুলে জল খেল। কাঁদছে নাকি? মুকুলের মনে হল, চোখের কোনাটা যেন চিক চিক করছে। খুব অন্যায় হয়ে গেছে। কথাটা না তুললেই ভাল ছিল। দুলালদার দোষ। দুলালদা বলেছিল, ওরা কখনো সত্যি কথা কয় না। একেক জনের কাছে একেক কথা বলে। প্রত্যেকেই দেখবি সতীলক্ষ্মী। হ্যাঁ, দুলালদা অনেক কিছু জানে; আবার অনেক কিছু জানে না। মুকুলের মনে হল, এর চাইতে সত্যি কথা পৃথিবীতে কোন মেয়ে কোনদিন বলেনি। শুধু দুলালদা নয়, মুকুলদের কলেজের প্রফেসরও একদিন ক্লাসে অটুহাসি করে উঠেছিলেন। শরৎচন্দ্র নাকি সার্থক পতিতার চরিত্র সৃষ্টি করতে পারেননি। বেশী বয়সের কলে সেও পর্যন্ত ওরা সতীলক্ষ্মী হয়ে গেছে। ওঁরা নাকি উচিত হয়নি। কিন্তু এই যে কড়কড়ে আলোর ভিতর যে দৃশ্য দেখল, যে কথা শুনল, তা কি সত্যি নয়? সত্যি বল দিয়ে দুলালদার মুকুনি, প্রফেসরের লেকচার?

হঠাৎ মুকুল চমকে উঠল। মেয়েটি একটি হাত ধরেছে।

—তোকে খুব মুখ করলাম। আমার পরে রাগ করেছিস, তাই না—একটু থেমে: তা কি করব বল। দিনের মধ্যে যদি পাঁচবার ওই কথা শুনি তাহলে মাথা ঠিক থাকে? নে, তোর পাঁচ টাকা দিয়ে যা—

মুকুল অভিভূত।

—তোমাকে আমি এমনি দিলাম। আমি খুশি হব—

—তোকে আর চংএর কথা বলতে হবে না। যা বলছি শোন। টাকা বেশী থাকে, কামাণী ভোজন করা। আর দুলালের সঙ্গে দিশকিনে। তোকে আমার খুব ভাল লেগেছেরে—

মুকুল এই সময় দুলালদার স্বর শুনতে পেল। যেন বরফার স্যুটের মুখ লাগিয়ে জিজ্ঞাসা করছে, বল? মুকুলের খুব খারাপ লাগছিল। এত তাড়াতাড়ি চলে যাবে? ইচ্ছে হচ্ছিল আরেকটু সময় বিছানায় বসে। মেয়েটির কথা শোনে। এখন আর রহস্যের ছিটে ফোটাও নেই। যাকে ভেবেছিল অতি কর্কশ ধরণের বাস্তব। তবু ভাল লাগছিল। মেয়ের দল গ্রাস করছিল। কিন্তু দরজার কড়াটা অধির হয়ে উঠল জোরে। দুলালদার চড়া গলা, মেয়ে শালা, খুব রস পেয়েছিস! তুই বাইরী ভিজে বেড়াল—

আচমকা মুকুলের গলাটা সজোরে ছড়িয়ে পড়ল।

—তোকে আমার খুব ভাল লেগেছেরে। কিন্তু তুই কখনো আর আসবিনে। আমার কপাল! তুই ওই খদ্দেরের

সঙ্গে ঘরদোর ঝিনঝিনে। আমার শাপ লাগবে। আমার পা ছুঁয়ে বল—কথা দে—

দরজাটা খুলে ফেলতেই এক ঝলক তীব্র গন্ধ ঘরে ঢুকল। সেই সঙ্গে ঘুলালদার অভিত ঘর, দুই শালা মাইরি লাইনের আছিস। তোকে আণ্ডারএস্টিমেট করে কি ভুলই যে করেছি। শালা ডিগে বেড়াল, চল—

বাড়ি ফিরতে ভীষণ দেরী হয়ে গেল। প্রায় বারটা। পার্কের বেঞ্চিতে খানিকক্ষণ শুয়ে ছিল। তারপর বাড়ি ফেরার কথা মনে পড়ে। ঘুম থেকে দেখতে পেল মা পিসিমা মেজদি ইতু দরজার সামনে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। প্রমাদ গুণল। কোনদিন এত রাত্রি হয়নি। এখুনি হাজারটা কৈফিয়তের উত্তর দিতে হবে। ঘুলালদা মাঝ রাস্তা থেকেই কেটে পড়েছে। শান্তি ঠিক বলেছে, ওর সঙ্গে মিশবে না। বাড়ির কাছাকাছি আসতেই ইতু দৌড়ে এসে হাত জড়িয়ে ধরল।—মা, দাদা এসেছে। মুহূর্তের মধ্যে সারা বাড়িটাতে হুলুস্থুল পড়ে গেল।—কোথায় ছিলি, এত দেরী হল কেন, শরীর খারাপ হয়েছে, ওমা টলছিস কেন, কথা বল না, আমার কি হবে গো—এক সঙ্গে এতগুলি প্রশ্নের ভিতর মুকুল কোন্‌টার জবাব দেবে? মুকুলের এবার সত্যিই পা টলতে লাগল। যেন এক্ষুণি মাথা ঘুরে পড়ে যাবে। ঘরদা সিঁড়ির কোণে বসে পড়ল।

মাবা বাড়িতেই ছিলেন। বললেন, থাক, ওকে কেউ ডিস্টার্ব কোরো না। ওকে বিছানায় শুইয়ে দাও—

একটু পরে মুকুল দেখতে পেল, যে ইতু ওর একটা কথাও শোনে না সে হুল হুল চোখে বাতাস করছে। মেজদি পায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। মা পাশে বসে রয়েছেন। দুই চোখে উদ্বেগ। পিসিমা এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে এলেন এই সময়। মুকুলের চকিতে মনে পড়ল, শান্তি কি এদেরই বলেছে নয়? তাহলে ঘুলালদা ওদের সম্পর্কে বাজে কথা বলে কেন? সেই বাংলার প্রফেসর ক্লাসের মধ্যে অট্টহাসি করে ওঠেন কেন? এই যে মুকুলকে জড়িয়ে ধরেছিল, কানে কানে বলেছিল, তোকে আমার ভাল লেগেছে রে, কিন্তু তুই আর কখনো আসবি নে—এ কি সত্যি নয়।

খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেল। যা মুকুলের জীবনে কোনদিন ঘটেনি। সিলেকোঠার ঘরে ঠাকুরদা গীতাপাঠ করছেন। সিঁড়ি দিয়ে গম গম করতে করতে স্পষ্ট ভারী সংস্কৃত উচ্চারণ ছুটে আসছে। বিছানায় আর থাকতে পারল না। খুব ভোরে ঘুম ভাঙা এই বাড়ির নিয়ম। ছাদের ঘরে ঠাকুরদা গীতাপাঠ করেন। আর সবাই তখন বসে শোনে। ব্যতিক্রম কেবল মুকুল। আগে আগে অবশ্য চেষ্টা চলত তারপরে। পরে সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছে। তাই আজ যখন গুটি গুটি মুকুল এসে বসল তখন সবাই বিস্মিত হল। সেই সঙ্গে খুশিও। যাক, শরীরটা তাহলে ভালই আছে।

মুকুল অবাক হয়ে দেখল সকালের প্রথম রোদ ঠাকুরদার কপালে এসে লুটোচ্ছে। কাঁচা সোনার মত গায়ে রং। ঝিনঝিনে যাতাসে কপালের ওপর কয়েকটা চুল উড়ছে। আবুল গা'। চোখে মুখে স্বর্গীয় দীপ্তি। অপরূপ ভঙ্গীতে শ্লোক ব্যাখ্যা করছিলেন। একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মুকুলের হঠাৎ মনে হল, সেও একদিন ঠাকুরদাদা হবে। সবার অলক্ষ্যে ছাদের ঘরখানা অধিকার করবে একদিন। সেদিনের নাতি নাতনী পরিবৃত হয়ে হয়ত তাকেও শ্লোক ব্যাখ্যা করতে হবে এমনি। কিন্তু ওরা সেদিন কেউই বিশ্বাস করতে চাইবে না ওদের স্বর্গীয় দীপ্তি ওরা ঠাকুরদাদা একদা কুৎসিত পল্লীতে গিয়েছিলেন। কিন্তু ঠাকুরদাদা যদি মাইকিয়াবী ভঙ্গীতে বলেই ফেলেন, শুধু সেদিনের ওরা কেউ বিশ্বাস করবে না সেই কুৎসিত পল্লীর খারাপ মেয়েটা গলা জড়িয়ে ধরে বলেছিল, তোকে আমার খুব ভাল লেগেছেরে, কিন্তু তুই কখনো আর আসবি না—

অপরাহ্ণের পর

ছোট গল্প

স্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়

এখন শিমুলতলার অপরাহ্ণ। শেষ গ্রীষ্মের উত্তাপ ও সূর্যরশ্মিগুলি আকাশে গাছেপালায় পাথর মাটিতে ছড়িয়ে দিয়েছে। রঙিন আলোরাশি বন জঙ্গলের শরীরে চড়াই উতরাই-এ আঘাত খেতে খেতে পড়েছে বাংলো বাড়ির ওপর। "নিরালা", "বাগানেজ", "আমহুদ", "সেতু", "দি রিট্রিট" প্রভৃতি বাংলো বাড়ির আশে পাশে কাশিশে, গাছেপালায় পড়ে আছে আলো। নিকটে, দূরে, সীমাহীন দূরে, গাছের পাতার ছিদ্রপথ দিয়ে, কাছে, আরো কাছে অপরাহ্ণের রঙিন দাগ পড়ে আছে।

শিমুলতলা এখন অপরাহ্ণের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। আর তার কাঁঠাল শাল সেগুন বকুল ইউকালিপ্‌টাস গাছের পিছনে ভাঙা প্রাচীর। অপরাহ্ণের আলোর ধ্বংসস্তূপের মত কয়েকটি বাগানবাড়ি দেখা যায়। এবং ধ্বংসস্তূপের ওপর ছিন্নভিন্ন করা আলো পড়েছে। ভাঙাচোরা পাথর বা মাটির পথ গাছপালা নদী খোয়াই সব যেন দীর্ণ করে দিয়েছে। যেন এই অপরাহ্ণের আলো শিমুলতলার নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করেছে পাখির ডাকের মধ্যে। সেইসব পাখিরা শিমুলতলার অপরাহ্ণে চেঁচাচ্ছে। যেন জানে হবে—শেষ গ্রীষ্মকালের একটি দিন মরে যাবে বলে—সেই বুড়ি দিনের মৃত্যুর আগে আকাশগত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পাখিরা কীর্তন করছে। সেই কারণে সূর্যের মরা আলোয় এখনকার পৃথিবী রঙিন, মৃত্যুর ছায়ায় কাতর। এবং পরক্ষণের অন্ধকারে সেই মৃত্যুদিনের শোক দিয়ে রাত্রিকাল অন্তরঙ্গতা হয়ে যাবে পরবর্তী একটি সকালের সূর্যের জন্য।

আলোকরশ্মি সমস্ত ভাঙাচোরা পথ ও বাড়ির ওপর নিঃশব্দ ছায়াকার করে ছুটতে ছুটতে এসে লেগেছে বহুরী বাংলো বাড়ির চারপাশে। বহুরী বাঙলো বাড়ির জলে চৌবাচ্চার কাঁচে থামের আড়ালে আয়নায় সর্বত্র লেগেছে এই অপরাহ্ণের আলো।

বহুরী, অর্থাৎ যে বাংলোবাড়িতে এখন সিউলি ও [illegible] থাকে। সেই বাংলোর গাছপালা ঘরের এপাশ আর তার কাঁঠাল শাল সেগুন বকুল ইউকালিপ্‌টাস গাছের পিছনে ভাঙা প্রাচীর। অপরাহ্ণের আলোর ধ্বংসস্তূপের মত কয়েকটি বাগানবাড়ি দেখা যায়। এবং ধ্বংসস্তূপের ওপর ছিন্নভিন্ন করা আলো পড়েছে। ভাঙাচোরা পাথর বা মাটির পথ গাছপালা নদী খোয়াই সব যেন দীর্ণ করে দিয়েছে। যেন এই অপরাহ্ণের আলো শিমুলতলার নিস্তব্ধতাকে চূর্ণ করেছে পাখির ডাকের মধ্যে। সেইসব পাখিরা শিমুলতলার অপরাহ্ণে চেঁচাচ্ছে। যেন জানে হবে—শেষ গ্রীষ্মকালের একটি দিন মরে যাবে বলে—সেই বুড়ি দিনের মৃত্যুর আগে আকাশগত সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে পাখিরা কীর্তন করছে। সেই কারণে সূর্যের মরা আলোয় এখনকার পৃথিবী রঙিন, মৃত্যুর ছায়ায় কাতর। এবং পরক্ষণের অন্ধকারে সেই মৃত্যুদিনের শোক দিয়ে রাত্রিকাল অন্তরঙ্গতা হয়ে যাবে পরবর্তী একটি সকালের সূর্যের জন্য।

আলোকরশ্মি সমস্ত ভাঙাচোরা পথ ও বাড়ির ওপর নিঃশব্দ ছায়াকার করে ছুটতে ছুটতে এসে লেগেছে বহুরী বাংলো বাড়ির চারপাশে। বহুরী বাঙলো বাড়ির জলে চৌবাচ্চার কাঁচে থামের আড়ালে আয়নায় সর্বত্র লেগেছে এই অপরাহ্ণের আলো।

বহুরী, অর্থাৎ যে বাংলোবাড়িতে এখন সিউলি ও [illegible] থাকে। সেই বাংলোর গাছপালা ঘরের এপাশ ওপাশে আলোর বিকিরণ লেগেছে। জানালা দরজা দিয়ে পশ্চিমের আলোখেলা বাড়ির সমস্ত জায়গায়—কাঁচে, পর্দায়, সার্সি, খড়খড়ি, জলের চৌবাচ্চায়, রান্নাঘরে, পার্টিশানে, অলিন্দে, সিঁড়ির ধারে, আয়নায় ছাবকা ছাবকা পড়ে রয়েছে। ভেতার পেটের তলাকার আবিল হলুদ রঙের মত আলো ছড়িয়ে আছে। ফুলদানিতেও পড়ে আছে বিকালের আলোর নীল রঙ। কিছুটা আলো পড়েছে শোবার ঘরের পাশে। বাথরুমের ঘষা সাদা কাঁচের ওপর একেবারে আফগানি রঙটা গাঢ় হচ্ছে ··। অর্থাৎ যে বাংলো বাড়ির মধ্যে লালবাবু ও আনন্দ বসে আছে—ঠিক শোবার ঘরের মধ্যে বসে আছে দুজন ; যার দুটো পুরনো মলিন কাউচের মুখ বাথরুমের দিকে ফেরান আছে। বাথরুমের কাঁচে আফগানি রঙ গাঢ় থেকে গাঢ়তর হচ্ছে। পাশেই বল্লিকার শোবার খাট,—সুন্দর বিছানা রয়েছে। টেবিল ঘড়িতে টি-পয়,

কারুকার্য করা গোল টেবিল—যেন একজন মানুষ শুয়ে পড়তে পারে অনায়াসে। ঘরের পাশে আয়না। কয়েকটা বড় বড় আয়নার পাশে পার্টিশান। আলনায় দামী শাড়ি ঝুলছে কয়েকখানা। ঘরের ভিতর বসে বাথরুমের কাঁচের ঘরজার জাফরানি রঙ দেখতে দেখতে, অপরাহ্নের নীল ছায়া কোথাও দেখতে দেখতে লালবাবু ও আনন্দ বসেছিল মল্লিকার অপেক্ষায়। মল্লিকা এখন বাথরুমে। মল্লিকা আসবে। যে মল্লিকাকে লালবাবু অনেককাল আগে থেকে চিনতো—সে মল্লিকা হয়ত এখন অনেকখানি পাল্টেছে; সেটাই দেখতে চায় লালবাবু। আনন্দ মল্লিকাকে কোনদিন দেখেনি। কিছুটা ইতিহাস শুনেছে, গল্প শুনেছে অনেকের মুখে। এই শিমুলতলায় আসার সঙ্গে সঙ্গে আনন্দ মল্লিকা সম্বন্ধে কিছু কিছু ইতিহাস শুনেছে! বড় নির্জন অসময় ও নিঃসঙ্গতা বোধ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল যখন আনন্দ, সমস্ত নিস্তব্ধ বাগানবাড়ির সালান অথচ শূন্য সংসার দেখতে দেখতে মনুষ্য শূন্য দেখে সে যখন হতাশ হ'য়ে পড়ছিল তখনই লাল-বাবু এ আয়গায় তাকে নিয়ে এল। এই মল্লিকার ঘর, দালান, গম্ভীর থাম, গোপন পার্টিশান, ছায়া ছায়া বারান্দা, অন্ধকার ফুলের গাছ এ সবের ওপর আনন্দ তার দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। "ধারা লজ" "নিরালা" প্রভৃতি বাগানবাড়ির চতুর্দিক দেখতে দেখতে সে যখন সুরভি খুঁজছিল দু-হাত বাড়িয়ে—এমন সময় মল্লিকার বাড়ি এসে তার মনে হল এমন একটা আয়গা নিরবচ্ছিন্ন নির্জনতার ভিতরেও দেহে মনে একটু স্পর্শ পাচ্ছে। মল্লিকার ঘর ঘোর বিছানা, মাত্র দুজনের সংসার হলেও, ঘরের অন্যান্য জিনিসপত্রগুলি কেমন মদির গন্ধযুক্ত। নির্জন রাত্রির বুকে সোহাগের প্রলেপ মাখান।

বিশেষ করে এই অপরাহ্নের আলোয় সবগুলি পড়ে আছে দেখে আনন্দর কেমন বিচিত্র কৌতূহল জাগল এ সবের ওপরে।

পশ্চিমের আলোর খেলা বাড়ির ওপর ছড়িয়ে দেওয়ায় ফলে পূব দিকের দাবা উঠানই যেন অনেকখানি গহ্বরের মত দেখায়। সেই গহ্বরের বুকে গাছের ঘনিষ্ঠ ও জটিল শীর্ষদেশে অবিরল বাড়ির ছায়া পড়ে আছে। বাড়িটা পূবদিক থেকে অনেকখানি উঁচুতে থাকার ফলেই ঘরের ভিতর থেকে এদিকের জানালায় ঘাড় তুললেই নিচু হয়ে যাওয়া জঙ্গলের রাশ ও দাবা পৃথিবী এবং জানালা বরাবর আকাশের অংশ দেখা যাবে।

বাথরুমের দাবা দাবা কাঁচের দরজার পাল্লা থেকে অপরাহ্নের আলো বেটে কেটে উল্টে পাল্টে যাচ্ছিল। মল্লিকা বাথরুমের ভিতর থেকে চাপা সুন্দর অথচ গম্ভীর গলায় ছোট ছোট কথাবার্তা বলছিল। মল্লিকা বলছিল—"যাচ্ছি গো—যাচ্ছি"। "কবে এসেছো গো—"। এসব কথায় ঘরের বাতাসে সেই নারীর আপাত বিচার করছিল আনন্দ। কোন অদৃশ্য নারীর স্বর শুনতে শুনতে কেমন মনে হয়। মানুষ না দেখা গেলেও অচেনা রমণীর অদৃশ্যলোক থেকে শুধুমাত্র গলার স্বর শুনতে শুনতে কেমন লাগে। কিন্তু তা ছাড়াও মল্লিকার ঘরের মধ্যে এমন একটা কিছু ছিল যা সবকিছুকে নতুন করে বুঝিয়ে দিতে পারে। আনন্দ স্বর শুনছিল। ঘরের এদিক ওদিক লক্ষ্য করছিল। মল্লিকার চেহারা বাথরুমে কাঁপছে লক্ষ্য করছিল। এই শিমুলতলায় তারা যে কজন এসেছে, যে কদিন এসেছে, তার মধ্যে প্রায় সকলেই যে নির্জনতার নিরাশায় ভুগছে একথা ভাবছিল আনন্দ। তার বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র অনিলই এখানে কিছুদিন যাতায়াত করছে। অনিল ছাড়া আর কেউ এই মল্লিকার বাড়ির খোঁজ পায়নি। লালবাবু যদিও অনিলকে এ বাড়ির কথা জানিয়েছিল আগে থেকে, কিন্তু নিজে আসে নি। আজ এই প্রথম লালবাবু এল তার অনেকদিনের চেনাজানা মল্লিকাকে দেখবে বলে। আনন্দ আজ সকলের চোখের আড়াল দিয়ে এখানে চলে এসেছে বলেই একবার তার বন্ধুদের কথা স্মরণ করল। তার বন্ধুরা এই শিমুলতলায় অপরাহ্নে কে কোথায় ছড়িয়ে

আছে ভেবে, আনন্দ এখানে আসতে পেরেছে বলে, একমাত্র অনিলকে বার দিয়ে—অন্যান্য বন্ধুর প্রতি তার রাগ ধারা পড়ল।

আনন্দ আগে সকলের চোখের আড়াল দিয়ে এখানে চলে এসেছিল বলেই তার বন্ধুদের স্মরণ করছিল, মাঝে মাঝে তার পা ছড়িয়ে গুটিয়ে নিয়ে সে অস্বস্তি প্রকাশ করছিল।

আলোর কয়েকটি লাফরানি রঙের রশ্মি বাথরুমের ঘষা কাঁচের জানালা ভেদ করে কাঁচের দরজায় লেগেছে। শোবার ঘরের ভিতর থেকেই বাথরুম যুক্ত থাকায় ঘরের মধ্যে বসে আলোর আধিক্যে বাথরুমের লোককে অস্পষ্ট চেনা যায়।

বাথরুমের দরজা ও সামনাসামনি কাঁচের লাগি দেওয়া জানালা। জানালার কাঁচের অংশ বন্ধ থাকায় বিপরীতে দরজার কাঁচে লাফরানি রঙ চেনা গেল। এবং এই জানালা ও দরজার মধ্যবর্তী জায়গায় লাফরানি আলোর দরদরেখার মাঝখানে সেই রমণীর শরীর আবছা চেনা গেল। আগন্তুক ঘরে এলে বাথরুমের কাছে পর্দা থাকে। আজকাল সে পর্দা নেই। কেউ হয়ত যেন ঘরে এসে বসে না। অসময়। শিমুলতলায় এটা সময় নয়। তাই মল্লিকার ঘরেও কেউ আসে না। আজকে লালবাবু আনন্দ সমস্যার যেমন করে অফিসের সকলের সঙ্গে শিমুলতলায় অসময়ে এসে পড়েছে তেমন করে এখানেও এই মল্লিকাদের বাড়ি এই 'মধুরী' নামক বাংলো বাড়িতে। অসময়ে পৌঁছাতে শিমুলতলা হয়ত প্রস্তুত হয়নি। এখানের লতাগুল্মপাখা ছায়া ছায়া নির্জনতা শিমুলতলার আবহাওয়া সবই যেন স্পষ্টতই আনিয়ে বুঝিয়ে দিয়ে যাচ্ছিল। মল্লিকার বাড়ি গিয়ে তেমনি মনে হল কিছুই যেন ঢাকা থাকতে না। এই অসময়ে হঠাৎ তারা এসে পড়তে কিছু কিছু লজ্জিয়ে আড়াল করছে না, বাধা দিচ্ছে না তাদের। মল্লিকার কথাগুলো আনন্দ কিছুক্ষণ আকাশ। [illegible] গালের গালেগুলি ঘুলে পা ছড়িয়ে দিল কার্পেটের ওপর।

মল্লিকার কথা শোনা যাচ্ছিল। বাথরুমে জলের শব্দ, ঝাঁজরি খোলা প্রভৃতির শব্দ শোনা যাচ্ছিল। মল্লিকার গলায় ঘর-এ পিয়ানোর সুরের ঝঙ্কার তুলছিল। মল্লিকার গলায়: "লাল, তুমি কতদিন পর একবার ভাবতে পারো—কতদিনে মনে পড়লো আমাকে! এর মধ্যে কত কি যে ঘটে গেল। উনি (প্রভাতবাবু মল্লিকার স্বামী) জীবনের মত চলে গেলেন। আমার বলতে আর কি রইল বল। নিজে চলে যাবেন বলেই কি শিউলিকে আমার সঙ্গী রেখে গেলেন। আমার সঙ্গে ওর ঝগড়াটাও যেমন এক হয়ে গেল। মা বাপ হারা শিউলীকে আমার কাছে রেখে গেলেন। যেন আমার এই নিঃসঙ্গতা দূর করতেই ও এল।"..... মল্লিকা আস্তে আস্তে কথাগুলো বলছিল। সুন্দর ঘর ছড়াচ্ছিল বাথরুমের ভিতর থেকে। প্রভাতবাবু যারা যাবার পর কি হল সেই জায়গায় একটু থেমে মল্লিকা বলল, "আমরাও রেলের কোয়ার্টার ছেড়ে এই মধুরীতে উঠে এলাম। আজ প্রায় চার কি পাঁচ, হ্যাঁ, পাঁচ বছর হয়ে গেল।"—লাল যেন দীর্ঘশ্বাস-কেলল 'মল্লিকা' বলে। মল্লিকা থামল, জলের শব্দ হল কিছুক্ষণ। এর মধ্যে কেউ কোন কথাও বলল না। আনন্দ ভিতর ও বাইরের সঙ্গে এই সম্পর্ক মিলিয়ে দেখছিল—অপরাহ্নের রঙ গোলাপের মত, কাঁচের দরজার ওপর দেখতে পাচ্ছিল। মল্লিকার ছায়া পড়ছে সেই কাঁচের মধ্যে। বাইরে অপরাহ্নের পাখির স্বর ভেসে আসছিল থাকে থাকে।

"অথচ এই পাঁচ বছরে যে কি করে বনজঙ্গলের আড়ালে আমি একবার ভাবতে পার লাল। ওই শিউলি আর আমি": মল্লিকার সুন্দর চাপা স্বর শোনা যাচ্ছিল—"দুজন মেয়েমানুষ দুজনের মুখের দিকে চেয়ে দিন কাটাচ্ছি। বানপ্রস্থ লাল—এ বানপ্রস্থ। রোগ শোক আর মৃত্যুতে আমার সংসারের বাসনা মরে গেল।" আবার একটু নিশ্বাস নিল মল্লিকা। আবার একটু জলের শব্দ করে সাবান ফেলের শব্দ করে বলল, "এই পাঁচবছর সময়টাও কিছুই নয় কিন্তু এর মধ্যে যা ঘটনা ঘটে গেছে তা যেন জীবনের অনেকখানি অটিল পথ বেয়ে আসার মত, অনেক যন্ত্রণার অনেক কষ্টে অনেক ইতিহাসের

ক্লান্ত হয়ে গেছি। ক্ষয়ে গেছি ক্ষয়ে গেছি লাল।' মল্লিকার ছায়া নড়ল কাঁচের দরজার পাল্লার ভিতর। সাবানের ফেনা ঘাড়ে মুখে লাগাতে লাগাতে মল্লিকা বলল, "এই বিদ্যুৎলতা, এই বায়ু পরিবর্তনের জায়গা, এই অনন্যস্থ জায়গায় কতকাল কাটল'···। কেটে কেটে থেমে জিরিয়ে নিশ্বাস নিয়ে মল্লিকা বলল, "এখানের রোদ অন্ধকার আলো বাতাস কত খাঁটলুম, এখানের বায়ুপরিবর্তনের কত মানুষ দেখলুম, কত চেনা হল, পরিচয় হল, পরিচয় কত গাঢ় হল, পরিচয়টা পুরনো হয়ে গেল, আবার নতুন করে সে মানুষ এল কতদিন পর··· কত মানুষ খাঁটলাম, চিনলাম দেখলাম সব ভেঙে গেল, সব—সব" টেনে টেনে কথাগুলো বলে মল্লিকা শেষ করল। মল্লিকা তার মানুষ সম্বন্ধে বাসনা কি তা এখন বন্ধ রাখল। গলায় বিষাদ ও জীবনের অনীহা ঢেলে বাথিত-কাতর গলায় যেন ঘোষণা করল কথাগুলো। "এক এক সময় ভাবি ঘর ছিটকে বেরিয়ে পড়ি যেদিকে দুচোখ যায়—সিউলিকে একা রেখে চলে যাই—এই বনজঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গিয়ে ট্রেনের বাঁশি শুনতে শুনতে ঝাঁপিয়ে পড়ি—।" বিকারের ঝোঁকে যেন বলছে কথাগুলো মল্লিকা।

লাল বলল, "এটা কি রকম কথা হল মল্লিকা। মৃত্যুকে প্রভাতদা ত ইচ্ছে করে গ্রহণ করেনি। কষ্টি স্যুসাইড ত করেনি প্রভাতদা। প্রভাতদার মৃত্যু ত নিয়তির খেলা। হঠাৎ মৃত্যু এসেছে প্রভাতদা তাকে ঘাড় পেতে দিয়েছে। কিন্তু এর মধ্যে তুমি কেন মরতে যাবে মল্লিকা। তোমার জীবনের এখনও অনেকখানি বাকি রয়েছে। সিউলি আছে।" লাল গলার স্বর পাল্টালো। একটু থেমে বলল, "সিউলির কাছ থেকে তুমি যেমন অনেক কিছু পেয়েছো তেমনি তোমারও সিউলির প্রতি একটা কর্তব্য রয়েছে। সেটা পালন কর।"

এপর্যন্ত বলে লাল যেন মল্লিকাকে শান্ত করতে চাইছিল। তাকে শান্ত করে রক্ষা করতে চাইছিল। লাল মল্লিকার উত্তরের প্রতীক্ষা করছিল।

"না লাল, আর আমার ভাল লাগে না। মল্লিকার গলার স্বর এ যেন আহুতি বিষাদ। বড় ক্লান্ত হয়ে গেছি, শেষ হয়ে গেছিলাম। বড় দুঃখ সয়েছি, আর নয়। ···একদিন অনেক আশা আর ভালবাসা নিয়েই ত স্বামীর ঘর করতে এলাম। বাবাকে একা ডিব্রীতে রেখে চলে এলাম। কেন এলাম—না, ভেবেছিলাম এটাই, এটাই ত হ'ল আসল সুখ। এখানেই যখন থাকতে হবে, বিয়ে যখন হয়েছে, তখন বাবার কষ্টে ভেবে আর মিথ্যে ওনাকে রাখিয়ে কি লাভ। বাবাও শেষে বলল।" মল্লিকা গলাটা অন্য রকম করল—"ওনার খুব কষ্ট হ'ত একা থাকতে।" মল্লিকা কথাটা পাল্টে বাবার মৃত্যুর সময়ের জায়গাটা ধরল—"আমত লাল বাবাকে শেষ অবস্থায় দেখতে যাওয়ার সময় আমার হয়নি।"

আনন্দ চুপচাপ বসে সব কথা শুনছিল। কাঁচের ভিতর আলোয় মল্লিকার ছায়া। অপরাহ্নের রঙ মিশে গাঢ়তর হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ মল্লিকার কথার মধ্যে 'ভালবাসা' কথাটা কেমন দোহারের সুর-এ শুনলো। সেটাই যেন ভাবছিল বসে বসে।

লাল মল্লিকার কথার জের টেনে সেই অতীত সম্পর্কের সাথে নিজেকে যুক্ত করল। উদ্দেশ্য যেন মল্লিকা সেই আগেকার সম্পর্ক জানতে পারে। সেই পুরানো সংসারে যেন লাল মল্লিকাকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছিল। লাল বলল, "তা জানি। বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হল না। শেষ জীবনটা বালবন্দির কাছে ডিব্রী অঞ্চলে এক দেহাতি হোসে কাটালেন। লাল জিজ্ঞেস করল তোমার বাবার কি যেন নাম ছিল ধনি। লাল নামটা স্মৃতিতে খুঁজল, মল্লিকা বলেছিল—বাবার নামটা "প্রিয়রঞ্জন"। "ওহো, প্রিয়রঞ্জন" বলে লাল কাউচে একবার নড়ে চড়ে বসল। প্রিয়রঞ্জন-বাবুর শরীরটা দিন দিন খারাপ হয়ে যাচ্ছিল। ওনার রোগ সারে না। তোমরা কেউই দেখতে যেতে সময়

পেলে না। প্রিয়রঞ্জনের লেপ্রসি হয়েছিল, দিনে দিনে শুকিয়ে যাচ্ছিলেন। যখন সংবাদ পেলে তখনও যেতে পারলে না। দেরী ক'রে গেলে। প্রিয়রঞ্জন তখন সে জায়গায় ছিলেন না—অন্যত্র। লাল কথাটা এভাবে থামাল যেন এই সংসারের পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে রাখার জন্যে মল্লিকার কাছে সমাধান পেতে চাইছে। তাকে সে ঘুরে রাখলেও যাবতীয় সংবাদ ও দুঃসংবাদের মধ্যে লাল বড় আপনার হয়ে উঠছিল মল্লিকার কাছে।

মল্লিকা তখনও বাথরুমে। অপরাহ্ণের জাফরানি রঙটা কাঁচের ওপর থেকে উঠে গেছে। এখন কয়েকটি ফেরুন রঙের রশ্মি—স্নানের ঘরের কাঁচের ওপর টলটল করছে। সেই ছায়ার মধ্যে মল্লিকার ছায়া প্রতিভাত হল। নগ্ন শরীরটা আবছাভাবে দেখা কাঁচের ওপর ধেনা করছে। বাইরে পাখির অনর্গল শব্দ, বনের নিবিড় গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে। কয়েকটি উন্নত বৃক্ষ শ্রেণীর ভিতর থেকে ভেঙেচুরে আসা এই ম্লান আলো কাঁচের গায়ে, ঘরের আশে পাশে লেগেছে। সবকিছুর ওপর দিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে লাল পা ছড়ানো কার্পেটে।

আনন্দ শুধু ফুলদানি দেখছিল। ফুল নেই—ঘরের মধ্যে যতটুকু সৌন্দর্য আছে তা যেন অনেককালের অনেকদিনের—যদিও এখানে কোন ফুল নেই তবু আনন্দ যেন আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে বসল মল্লিকার ছায়ার দিকে চেয়ে।

"লাল, সবই ত জান দেখছি। তাহলে আমাকে তোমরা এত অবহেলা নিয়ে রাখলে কেন! আমার যে কি হল এটা ত জানতে চাইলে না" বলার পর একটু থেমে জলের শব্দ শুনে একটু শ্বাসগ্রহণ করে বলল—,"লাল, তখন বয়সে এ ঘরে আছি—। বিশ্বাস করো!"

কিছুক্ষণ সময় কেউ কোন কথা বলল না। মল্লিকা বাথরুমে কোনরকম শব্দ না ক'রে, লাল আনন্দ স্থির থেকে কোন নিঃশব্দ একটি সময়ের দিকে ইঙ্গিত করল এবং সেই সময়ের মধ্যে যেন অপরাহ্ণকে আড়াল দিয়ে চলে যেতে নির্দেশ দিল দুজনে। নীরব নিস্তব্ধতার মধ্যে চারদিক ভেঙে-চুরে অপরাহ্ণ চলে যাচ্ছিল তাকে অবাধে চলে যেতে দিল।

একটু থেমে মল্লিকা সেই আগেকার কথার জের টানতে চাইল। মানুষের সঙ্গে সে অনেক মিশেছে, হয়ত অনেক আঘাত খেয়েছে, ভালবাসাও পেয়েছে। মল্লিকা বলল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি মানুষের অনেক বয়েস হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীটা ঠিক যেখানে থাকার ঠিক সেখানেই রয়েছে। পৃথিবীর বয়স হবার আগেই যেন এই মানুষগুলো তাড়াতাড়ি বৃদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। কেউ আর তেমন উৎসাহ নিয়ে এগিয়ে আসে না—। জানি না, এটা আমার মনের দুর্বলতা থেকে জানছি কি বলতে পারব না।" মল্লিকা এ কথায় পৃথিবী ও মানুষের সম্পর্ক নিয়ে নারী ও পুরুষের তুলনা করল। পৃথিবীর সঙ্গে নিজেকে তুলনা করে যেন সংযত করতে চাইল। লাল এ ব্যাপারে কোন কথা উল্লেখ করল না।

লালবাবু তাড়া দিল—"বাথরুম থেকে চলে এস তাড়াতাড়ি বলি—। সামনে এস, দেখি।" লালের গলায় অনুকম্পা। "কথা হবে পরে, আগে এস—দেখি।" লাল তাড়া দিল।

আনন্দ কোন কথা বলছিল না। সে চুপ করে গিয়েছিল। মল্লিকাকে এখনও সম্পূর্ণ দেখতে পাচ্ছে না। যেন তারা অসময়ে শিমুলতলায় এতদিন ঘোরাঘুরির পর জনশূন্য বাড়ি-ঘরের মধ্যে অনেক পরে একজন মহিলার সাক্ষাৎ পাচ্ছে। লালবাবুর সান্নিধ্যে এসে এখন যেন সেই রমণীর আবির্ভাব চলেছে।

কাঁচের জানালার ভিতর দিয়ে যে আলো পড়েছে সেই আলোয় সম্মুখের দরজা কাঁচের দরজা পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। কাঁচের ওপর এখন তুঁতে রঙের রোদ্দুর পড়ে আছে। ম্লান। দরজার ভিতরে মল্লিকার শরীরের ছায়া পড়ে আবার

যোঁয়াটে হল। আনন্দ লাল সেদিকে চেয়ে পরে নিশ্বাস ফেলল। আনন্দ পা ছড়ালো। বিস্তারিত করল নিজেকে। এবং দেয়ালের ওপর শূন্য ফুলদানির দিকে চেয়ে কাগজে লাল পেন্সিল দিয়ে কিছু আঁকতে চেষ্টা করল।

লাল বসেছিল। কোন কথাই ছিল না তার মুখে। মল্লিকাকে তাড়া দিয়ে সে যেন বসে আছে অপেক্ষায়।

বাথরুমে জল ফেলার শব্দ করে, ঝাঁজরি খোলার আওয়াজ করে মল্লিকা বলল, "যাই গো যাই—। বড় অসময়ে এসেছো যে, বড় অসময়।"

"তবুও ও এলাম" বলে লাল কাউচের ভিতর আধশোয়া হয়ে পড়লে লালের মুখটা কাউচের মধ্যে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আনন্দ দেখতে পেল না লালের মুখটা।

মল্লিকার গলার স্বরে একরকমের সুধা আছে। জানি না তার অন্যান্য সবকিছুতে কি আছে। তার রূপ চেহারা ব্যবহারে কি আছে—মনে মনে ভাবছিল আনন্দ। কিন্তু তার গলার স্বরটা যেন পাগল করে দেয়। আনন্দ যেন ভাবতেই পারে না এত সুন্দর গলার আওয়াজ—যা টানে, আকর্ষণ করে, সম্মোহিত করে দেয়। অনেকক্ষণ যেন কানের কাছে বাজে অবিকল গলার স্বর। বাথরুমের ভিতর থেকে আরো প্রকট ও আলাদা রকমের একটি সুর গম্ভীর আবরণ নিয়ে যেন কাঁচের ঝরনা দিয়ে ছিটকে ছিটকে আসছে।

লাল কিছু বলতে যাচ্ছিল এমন সময় দেখল রাধা এসে গেছে। রাধা হ'ল এ বাড়ির চাকরানি। কয়েকবছর হল আছে। রাধা এসেই ঘরের ভিতরটা দেখে টেবিল বিছানা পরিষ্কার করে বাইরে চলে যাবে তার আগে মল্লিকার ডাক শুনল। "হে, রাধা এসেছো—রাধা—। আমার কাপড় শায়াটা রাখ ত, ওপর দিয়ে বাথরুমে রাখ!"

আনন্দর এখনই যেন কেমন মনে হল—'অশ্লীল'। যেন মনে হল—কোন নারীর সৌন্দর্য দেখবে বলে নেশাখোরের মত তারা এখানে বসে আছে। আনন্দর চলে যেতে ইচ্ছে হল। এই শেষ গ্রীষ্মের আবহাওয়ার শিমুলতলা যেন সন্তর্পণে অপরাহ্ণ পার হচ্ছে। বৃষ্টিচুড়ার ওপরে অপরাহ্ণের রেশ ছুঁয়ে আছে। ক্রমে শিমুলতলা গভীর এক অন্ধকারে নামবে। রাধা পূর্বদিকের জানালা বাদে বাকি সব জানালা বন্ধ করে দিয়ে গেল। এঘরে কোন লোকজন এলেই রাধা ঘরের জানালা বন্ধ করে দিয়ে যায়। এ বাড়িতে যারা আসে তাদের রাধা হয়ত সব চেনে না কিংবা চেনে। রাধা ঠিক যেমন ঘরে এসেছিল আবার ঠিক তেমনি ঘাড় নিচু করে বেরিয়ে গেল। যাবার আগে ধুতুরপাড় শাড়ি, চিরুনির কাজ করা শায়া ব্লাউজ বডিজ সব রেখে গেল। পা ধোবার পর মল্লিকা ভিজে কাপড়ে এখান দিয়ে যাবে না।

পূর্বদিকের জানালাটা নাবো থাকায় বাড়িটা খুব উঁচে দাঁড়িয়ে আছে বলে মনে হবে। ফলতঃ এই ঘর থেকে জানালার প্রায় জুড়ে কেবল আকাশ দেখা যায়।

পূর্বদিকের জানালা খোলা থাকায় জানালার নীচে কিছু কিছু গাছের শীর্ষদেশ ছাড়া বাকি সমস্ত জানালা জুড়ে অপরাহ্ণের আকাশ। জানালাটা অনেকক্ষণ ধরে খোলা ছিল। অপরাহ্ণের শেষ রঙ পাতার মুহূর্তে মুহূর্তে ধূসর হয়ে যাচ্ছিল ক্রমশঃ।

হঠাৎ যেন অন্ধকার ঘিরে ফেলল বাড়িটাকে। ঝিঁঝিঁর ডাক উঠল, এদোমেলো পা ফেলে জোনাকি উঠল। আঁধার নেমেছে। শিমুলতলা ষ্টেশনে একটা ইঞ্জিনের শব্দ চলছে শুধু।

লাল বলল "কৈ শিউলিকে দেখছিনে—। কোথাও বেরিয়েছে না, কি ওপরে আছে?" এ বাড়ির ওপরে ছাদ সমেত একখানা টিনেকোঠা ঘর আছে। সে ঘর শিউলির। দালানের পাশ দিয়ে সিঁড়িটা যেখানে বেঁকে ওপরে উঠে গেছে আনন্দ সেদিকে তাকিয়ে একবার ওপরের ঘরটা কল্পনা করে নিল।

মল্লিকা বলল, "নাগো, একটু বেরিয়েছে। তোমাদের

অনিল ও সেই সকাল থেকে এসেছিল। ওরই সঙ্গে বেরুলো।" মল্লিকা একটু থেমে বাথরুম থেকে বলল, "কতদিন পর যে বেরিয়েছে!" বলতে বলতে মল্লিকা স্নান ঘরের দরজা খুলল।

আনন্দ তৈরী হয়েই ছিল এই প্রথম সে দেখবে মল্লিকাকে। এখানে আসার পর যার কথা সে অনেকবার শুনেছে। লালবাবুর কাছ থেকে সব সংবাদ শোনার পর মল্লিকার কণ্ঠস্বর শোনার পর এবার দৈহিক সাক্ষাৎ মিলবে। আনন্দ রুমাল বার করে মুখ পরিষ্কার ক'রে নিল।

অনিল শিউলির সঙ্গে এখানে সারাদিন কাটানোর পর বিকালের দিকে বেরিয়েছে শিউলিকে নিয়ে। লালবাবু জিজ্ঞেস করল আনন্দকে—"অনিল খাওয়া দাওয়া কোথায় করল?" আনন্দ জবাব দিল—"কালীধামেই গিয়ে একবার খেয়ে এসেছে।" এতখা বলার পর আনন্দ কেমন অন্যমনস্ক হয়ে যাচ্ছিল অনিল ও শিউলির কথা ভেবে। অনিল এতদিন যে এখানে আসছে তা কারো কাছে ও প্রকাশ করেনি। অনিল কি শিউলিকে ভালবাসে। ভালবাসলে কি ওরা বিয়ে করবে। শিউলি কি রকম মেয়ে। আনন্দ বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিল। শিউলিকে কি দেখতে পাব না। বোধ হয় দেখা হবে না। কিন্তু মল্লিকাকে—।

দরজা খুলে বেরিয়ে এসে দাঁড়াল মল্লিকা। ভিজে পায়ে জড়ানো। বহুবেষ্টিতের শাড়ি। বহুর পাড়। দেয়ালগিরির আলোয় তার গায়ের রঙ রোদ্দুরের প্রজাপতি বলে মনে হল। লালবাবু আনন্দ একসঙ্গে তাকাল। মল্লিকার চোখ টানা টানা দীপ্ত করুণায় মাখানো। হাতের সেটি নরম অথচ স্বাস্থ্যের উজ্জ্বল। হাতে ছগাছি বালাও রয়েছে। কোন আয়নায় বৈধব্যের চিহ্ন নেই। যেন আলাদা একটি আবেশে ভরা চোখ নাক মুখ চিবুক—। কানের লতিতে কোঁটার মত একটু মুক্তোর দুল দুলছে। কপালের সবটুকু এখন কর্সা। সিঁথির উজ্জ্বল। জলের ঈষৎ কোঁটাগুলো চুলের অগ্রভাগে রেণু রেণু হয়ে দুলছে। ঘাড়ের কাছেও কিছু জলের গুঁড়ো লেগে আছে। বিকালের কোন মুহূর্তে খোঁপা বেঁধেছে। তারও আগে ঘুমিয়েছিল যেন—সেই ঘুমানোর চিহ্ন স্বরূপ চোখের ভারি আলস্য করল লাল আনন্দ। চিবুকের তলায় হাসিটা এমনভাবে বিস্তৃত হয়ে আছে যেন অনেক সোহাগ অনেক কথা বলার জন্য ওই আয়নাটা সুন্দর; অপেক্ষাকৃত বেশী আগুনায় ঠোঁট ও চিবুক ছড়িয়ে আছে। যৌবনের আঘাত খাওয়া জীবন যেন বুকের কাছে আবার উৎসাহে উন্নত। শাড়ির ভাঁজ থেকে সাদা ব্লাউজের ভিতর থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল দেহটা বাঁক নিয়েছে কোমরের কাছ থেকে। আয়াসে আবেশে অতিরিক্ত হয়ে যাওয়া কোমর, নিম্নাংশ ভারি হয়ে গম্ভীর হয়েছে। বাথরুমের কাছ থেকে আঁচল ছড়িয়ে আছে। রাধা একবার এসেই মল্লিকার হাতে তোয়ালে দিয়ে চলে গেল। ক্রমশ ঝেঁকে-যাওয়া-আলোয় ঈষৎ কাঁপল। রাধাকে কিছু একটা বলবে যেন—ঘুরে দাঁড়াল মল্লিকা। পাতাকাটা চুল কোমর হাতের কব্জি পা, যেন সবকিছুর ওপর কেমন স্বাভাবিক স্নিগ্ধতা দিয়েছে। তলপেট ঈষৎ ভারি। বাইরে এলোমেলো হাওয়া চলছে। বাংলো বাড়ির বাইরে অন্ধকারে জোনাকি ঘুরছে। ঘরের আলোয় মল্লিকা লাল রাধা আনন্দ—আর কেউ নেই, কেউ নেই। অন্ধকারের বনভূমির মত যেন হাতড়াচ্ছিল আনন্দ। যেন আলোয় সব বাসনা নাশছে।

সামনে দাঁড়িয়ে খিলখিল করে হেসেই বলল—"লাল!" মুখব্যাদন করল মল্লিকা। কোন কথা বলার আগে একবার আয়নার সামনে দাঁড়াল তাড়াতাড়ি। গোল বড় কারুকার্য করা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ক্রীমের শিশিতে আঙুল ডুবিয়ে মুখে মাখতে মাখতে অন্যরকম গলায় পরিশানের ভিতর থেকে বলল, "যাই গো, এবার আমার হয়ে গেছে—তৈরী। আর এক মিনিট।"

এতক্ষণে যেন মল্লিকা তার নিজস্ব গলায় ঘর ও চেহারা

নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াল। অথচ কিছুক্ষণ আগেও আনন্দর মনে হয়েছিল অস্বাভাবিকভাবে মল্লিকার গলার স্বর কেউ চেপে চেপে ধরছে। এই নির্জন বনভূমির ভিতরে, কাঁচের মত গাঢ়পোতার শরীরে কোথা না কোথা মল্লিকার গলার স্বর কেটে কেটে মিশে যাচ্ছে।

বাথরুম থেকে এসে তোয়ালে দিয়ে বাকি জলটুকু মুছে ঘাড়ে পাউডার বুলালো। পাঞ্জাবীর ভিতর দিয়ে গোল নক্সাকাটা আয়নায় দাঁড়িয়ে চোখে সুর্মা এঁকে নিল। পাউডারের চাবনা মুড়তে মুড়তে বলল—"সিউলিকে না পেলে আমার জীবনটা যে কী হয়ে যেত লাল।—ভুল পেতাম না।"

"সেটা বিশ্বাস করি। ওই—ও তোমার সব" বলে লাল ঠিক হয়ে গুছিয়ে বসল।

"সব মানে। এই বাড়ি বল, টাকাকড়ি সবই ওর বাবার জিনিস—মৃত্যুর আগে দিয়ে গিয়েছিল—এসব না হলে!" মল্লিকা গলার অন্যরকম স্বর তুলে বলল, "এ ছাড়া দাঁড়াবার আয়গাই কোথায় ছিল বল না। এখন শুধু যাহোক দিন চলে যাচ্ছে।" আস্তে করে মল্লিকা বলল—"আমার কিছু টাকাকড়ি আর গয়না আছে।"

আনন্দ বাইরের অন্ধকারটাকে চিন্তা করছিল। শিমুলতলায় সেপ্টেম্বর মাসে তার অফিস বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক করতে এসেছিল বলে, এখনা মল্লিকাদের বাড়ি দোতলাটির আলোয় বসেছিল বলে একবার বন্ধুদের কথা চিন্তা করল। আনন্দর বন্ধু বনপতি—সেকি এখনও ছিলের ধারে মাছের আশায় ছিপ হইল নিয়ে বসে আছে। এখানের এই বিপুল অন্ধকারটা নিশ্চয়ই তাদের কালীধাম বাংলোটিকেও আচ্ছন্ন করে নিয়েছে। নির্জন এই অন্ধকারে এখন কোথায়। নিতাই দাদা কি অন্ধকারে সাপের ভয় পাচ্ছে। আর কট্টু-ভুষণের কি সেই শৃগালের ভয়। আর শৃগালকান্তি! আনন্দ ভাবল শৃগাল নিশ্চয়ই এখন পূর্ব পাকিস্তানের ঢাকা অঞ্চলের যেখানে তার বাড়ি ছিল—সেখানের অদ্ভুত রহস্যজনক অন্ধকারের সঙ্গে শিমুলতলার এই অন্ধকার তুলনা করছে। অনিল পিউলি কোথায় অন্ধকারে মিশে গেছে কে জানে।

বৈদ্যনাথ কি অন্ধকারে চেয়ে মনে-মনে অস্ত্রের গুণাগুণ পরীক্ষা করছে। এই সবকিছু অন্ধকারের পরিবর্তে থেকে আনন্দ ভাবছিল এখানকার মল্লিকাদের বাংলো বাড়িটাও অন্ধকারের আক্রমণ থেকে প্রতিরোধ করে যাচ্ছে। লাল সেজন লুকালিপ্টাসের গুঁড়িতে অন্ধকার ঠোকর দিয়ে যাচ্ছে। কান পাতলে এখনও অন্ধকারে ঝিঁঝিঁর ডাক শোনা যাবে। অন্ধকারে জোনাকির চলাও দেখতে পাওয়া যাবে। অন্ধকার যেন দেওয়ালে আঘাত করছে। আনন্দ ভাবছিল—সেই ঘোষালবাবুর গল্পের কথা—। আমরা সকলেই যেন স্বপ্নের ভিতর ঘুরিয়ে, অন্ধকারে নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।...আনন্দ আলোর মধ্যে বসে করে বসেছিল।

বাদচটি ঘরে তৎক্ষণে সামনে এসে বসে পড়েছে মল্লিকা। কার্পেটে তার চটি খোলা। কোন কিছু বলার আগেই যেন আনন্দকে দেখে জিজ্ঞেস করল মল্লিকা—"কত-জন এসেছেন আপনারা পিকনিক করতে।" আনন্দ বলল, "তা প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ জন হবে।"

লালবাবু পরিচয় করাল,—"এর নাম আনন্দ সমদ্দার, কলকাতা—আমারই অফিসের লোক। বিয়ে থা এখনও করেনি। করবে কিনা ভাবছে। ভারি কনসাস ছেলেটি—বুঝলে মল্লিকা—ভেরি কনসাস।" বলেই আনন্দকে বলল, "মল্লিকার পরিচয় ত তুমি আগেই পেয়েছো। দরকার হবে না।"

"নমস্কার।" মল্লিকা খাঁখের মত হুহাত জড়ো করল। আনন্দর মনে হ'ল যেন হাতে ফুল ছিল।

এই হল মল্লিকা। এমন করে একবার ঘুরে আনন্দকে দেখে নিল, চোখের গভীরতা দিয়ে, আবার এমন করে সমস্ত জগতকে অবিশ্বাস করল, এমন করে নিজের মধ্যে মিশে গেল

—অথচ আনন্দর মনে হ'ল সবটুকুই—মল্লিকার সবটুকুই যেন তাকে ঘেরিয়ে তুলিয়ে করা। সবই আনন্দর জন্যে। মল্লিকা সবই দেখছে, সবই খুঁটিয়ে দেখছে সামান্য দেখেই। আনন্দ ভাবল মল্লিকা যেন তাকে সামনে রেখে লালের সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। আনন্দ যেন অলক্ষ্যে উত্তরের হয়ে যাচ্ছে। আনন্দ মল্লিকার গলার স্বর রূপ স্বাস্থ্য পান করছিল, দেখে দেখে তৃপ্ত হচ্ছিল। এই আলোয় যে মল্লিকা এতখানি উজ্জ্বল অন্ধকারে তাকে কেমন দেখাবে। আনন্দর ইচ্ছা হচ্ছিল একদিন অন্ধকারে তার রূপ সে দেখে যাবে। এখানে।

একটু ঠিক হয়ে নিয়ে আনন্দ বলল, "আমরা বড় অসময়ে এসে পড়েছি নাকি। আপনার কি মনে হয়। এটা ঠিক শিষ্টাচারের সিজন নয়। অথচ আমাদের অফিসের পিকনিক হিসাবে আসতে হল।" আনন্দ টেনে টেনে বাকি কথাটা বলল, "কদিন কী ফাঁকা ফাঁকা নির্জন লাগছিল যে কি বলব।"

মল্লিকা যেন কেমন উজ্জ্বল হয়ে উঠল। চোখের চাউনী ঘুরিয়ে আনন্দকে দেখে একবার ভাবল—অসময় ও বটেই, কিন্তু আমি ত সময় অসময় মানি না। তোমরা হয়ত ভাবো যে এটা অসময় কিন্তু আমি ত সময় বলেই ভেবে নি। আসলে এসেছো—এই ত সময়। মল্লিকা কি ভাবতে ভাবতে বলল, —"না, না অসময় আর কি। সবটাই ত সময়। সময় না হলে কি আর এমনি করে আসতে পারতেন। এইত সময় হল সো লাল।" আনন্দর কাছ থেকে লালের দিকে পাশ ফেরালো মল্লিকা।

লাল যেন মল্লিকাকে দেখার পর কেমন নিস্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই মল্লিকা! সাত বছর পরের এই মল্লিকা! লাল মল্লিকাকে সাত বছর পরে দেখছে। যেন আরো অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। যেন সেই বিয়ের পর স্বামীর ভালবাসার আতরাগে লালের সম্পর্কটুকু কেমন করে ভুলতে পেরেছিল মল্লিকা দুজনের কেউই ভাবতে পারল না। কিন্তু লালের মনে হল প্রভাতবাবু মারা যাবার পর মল্লিকা যেন ম্লান হয়ে গেছে। মনের সিঁদি খুলতে ইচ্ছে হ'ল লালের। গান গাইতে ইচ্ছা হ'ল লালের। মল্লিকাকে সুখ্যাতি করতে ইচ্ছে হ'ল। কিন্তু আনন্দর দিকে তাকিয়ে আপাততঃ সে ইচ্ছা সম্বরণ করল লাল। আনন্দকে এনে সে কি খুব ভুল করল। না আনলেই হয়তো ভাল ছিল। লাল সামান্য হেসেই গম্ভীর হয়ে গেল।

এটাই হল লালের চরিত্র। মল্লিকাকে দেখার পর—তার সম্বন্ধে মনে মনে বিচার করে সে কখনও অনিন্দিত হয়ে উঠেছিল, কখনও বিষণ্ণ বোধ করছিল, কখনও আশ্চর্য হচ্ছিল। মল্লিকার সংস্পর্শে এসে পড়ায় লাল স্বাভাবিক-ভাবেই হতাশ গম্ভীর আশ্চর্য বিষণ্ণ সুখ অনুভব করছিল, এসবের মধ্যে ডুব খাচ্ছিল।

এর মধ্যে রাধা এসে টি পয়-এ কিছু কাজু বাদাম রেখে গেল। কয়েকটি ডিস এ বাদাম ও চায়ের সরঞ্জাম প্রভৃতি। রাধা চলে গিয়েছিল দরজা পর্যন্ত—মল্লিকা বলল, "চামচটা দিতে ভুলে গেছ রাধা—"।

কথা বলার পর আবার একটু দিক ওদিক হ'য়ে বসল চেয়ারে মল্লিকা। লাল টি পয়-এর কাছে ঘনিষ্ঠ হল।

"আপনি সরে আসুন আনন্দ বাবু" বলেই মল্লিকা আবার নিজেকে করল—"আপনি চিনি একটু বেশী খান না—।"

—"মাঝারি।"

—"মানে দুই তিন চামচ।" মল্লিকা চোখের দিকে তাকাল।

—"ওর মধ্যে একটা"।

"—তাহলে আড়াই—আড়াই চামচ দি।" মল্লিকা হাসল—"তারি ইন্টারেস্টিং করতে পারেন"।

লাল বলল, "মলি, তোমাকে এখানে এসে দেখতে পাব—আমি কল্পনাও করতে পারিনি। সেই ফুলবাগের চিঠি

পেয়েছিলাম। ব্যাস। তারপর আর মনে নেই।" অন্যদিকে একটু হেসে পড়ে লাল বলল, "তারপর শিমুলতলায় পৌঁছেই ডায়রি খুলতে খুলতে তোমার সেই চিঠি খানার ঠিকানাটা খুঁজে পেলাম।"

"লাল তোমার লজ্জা হওয়া উচিত। দেখতো, ছিঃ ছিঃ। আর যদি এখানে এসেও আমার সঙ্গে দেখা না করে চলে যেতে তাহলে আমি তোমার কি করতাম মনে আছে কি।"

"কি করতে বলি, কি করতে আমাকে" বলে যেন লাল উৎগ্রীব হয়ে উঠল। এতক্ষণ ধরে লাল এ ঘরের যাবতীয় জিনিস সুধার মত আকণ্ঠ পান করছিল। এবার মল্লিকার কথায় সে আরো ব্যাকুল হল—"কি করতে তুমি আমাকে বলি।"

"তোমাকে কঠোর শাস্তি দিতাম" বলেই মল্লিকা হেসে উঠল। মল্লিকার সঙ্গে লালও হাসল।

আনন্দ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। মল্লিকার হাসির শব্দে আনন্দ সম্বিৎ ফিরে পেল। আনন্দ হাসল না। এ ঘরের চারদিক চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল। কি একটু যেন মদির গন্ধ ছড়াচ্ছে মল্লিকার দেহ থেকে। ফুলের কথা কেউ ভাবেনি এখনও। এ ঘরে কোন ফুল নেই। আনন্দ মল্লিকাকে দেখে কত রকম করে ভাবতে লাগল আর মুহূর্তে মুহূর্তে অনেক রকম কল্পনা করল তাকে।

মল্লিকা একবার লালের দিক থেকে ঘাড় ফিরিয়ে আনন্দকে দেখল। মুখের হাসিটা কেমন মিলিয়ে গেল এক মুহূর্তে। আনন্দর দিকে তাকাতেই তার কেমন মনে পড়ে গেল—সেই 'অসময়' কথাটা। আনন্দকে দেখলেই যেন 'অসময়' কথাটা মনে পড়ে যায় আর হাসি পায় মল্লিকার। মল্লিকা মনে মনে উচ্চারণ করল অসময় ত বটেই যেহেতু ঘরে এখন কোন ফুল নেই। এখন আবির্ভাব হবে কি জানতাম। তাহলে অনেক আগে থেকেই ত সেজে গুজে থাকতাম। মল্লিকা কিছুক্ষণ যেন অর্থহীন চেয়েছিল আনন্দর দিকে। এবার বলল, "আপনি এখন মুখে তুলছেন না। খান, আরো অনেকটা বাদাম ভুনে।"

"নিচ্ছি—ঠিক আছে, কিন্তু আপনিও আমার ডিস থেকে গোটাকয়েক নিন" বলে আনন্দ যেন স্বস্তি পেল। তারপর ঠিক যেন বলা হয়েছে মল্লিকাকে। এই ত তার উচ্ছিষ্ট থেকে সে খাবার কথা বলতে পেরেছে। আনন্দ অনেক কিছু ভাবতে পারত—ভাবল না, সে কেবল মল্লিকার গলার স্বর ভাবছিল, মল্লিকার গলায় 'ভালবাসা' কথার সুরটা শুনতে পাচ্ছিল, ঘরে যে ফুল নেই অথচ বাগানের অন্ধকারে কোথাও ফুলের গাছ, আছে, এই ঘর দরজা জানালার ভিতর থেকেও সৌরভ ছড়াচ্ছে কেমন করে ভাবছিল। এবং সর্বশেষ ভাবছিল মল্লিকা তার কথায় কেমন করে গোটাকয়েক বাদামও নিয়ে নিয়েছে।

প্রভাতবাবু যাবা যাওয়ার পর লাল মল্লিকাকে এই নতুন পরিচয়ে জানত। তাই সে মাঝে মাঝে আশ্চর্য হল আনন্দিত হ'ল কখনও বিহ্বল হয়ে পড়ল সে মল্লিকাকে দেখে। লাল অনেককিছু কথা বলতে চেয়েছিল—এবার চায়ে চুমুক দিতে দিতে সে বলল, "অনেক কিছু বলার ছিল - এখন বলেনা বলি। পরে একবার আসবো।"

মল্লিকা জানালার দিকে পিছন ফিরে বসেছিল। ফুলের পাশে হাত দিয়ে জিজ্ঞেস করল—"কতদিন থাকছো তোমরা এখানে?"

—"তা বেশ কিছুদিন থাকবো"—।

—মল্লিকা বলল, "সকলেই নাকি।"

"নাহ্, সবাই চলে যাবে দুদিন থেকে, আমি বাকি কটা দিন এখানে—এই বাংলোয়—"

মল্লিকা লালের কথাটা সুন্দর করে ধরে ফেলল। "ওহো," বলে মল্লিকা বলল, "তাহলে ত খুব ভাল হয়, খুব মজা হবে—লাল থাকো না।"

লালের মুখে আর কোন কথা ছিল না। যেন বিস্মিত

হয়ে গিয়েছিল আজ এই মল্লিকাকে দেখে। তুমি এত সুন্দর হয়ে গেছো। তোমাকে এত লাভলি দেখবো বোধহয় ভাবতেও পারিনি। আর কোন কথা নেই লালের।

চায়ের পেয়ালায় টুং টাং শব্দ উঠছিল। পেয়ালা পিরীচের শব্দ করে মল্লিকা বলছিল শিউলির কথা। এতক্ষণ সে যেন এই শিউলির জন্যেই উৎকর্ণ হয়ে তাকাচ্ছিল বাইরে। জানালার খড়খড়ি খুলে বাইরেটা দেখছিল। জানালায় এখন ধূসর আকাশ ও অন্ধকার রাত্রির ছবি। জানালার কাছ থেকেই বন জঙ্গল উতরাই-এ অনেক দূর নেমে গেছে। মল্লিকা জানালার কাছ থেকে পিছন ফিরলে একরাশ জোনাকি জানালার অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে চলে গেল। আবার নিজের ভাবনায় বলতে বলতে মল্লিকা বলল, "আমি নিজের জন্য কিছু ভাবি না লাল। আমি ভাবি শিউলির জীবনটা যেন ভাল ভাবে কেটে যায়।"

—'শিউলির বিয়ে দেওয়া উচিত তোমার'। লাল যেন কাপের মধ্যে মুখ লাগিয়ে কথাটা বলল।

—'মানুষ জাতটার ওপর আমার বড় অবিশ্বাস হয়ে গেছে গো!"

"মানুষের ওপর অবিশ্বাস করে মানুষ থাকবে কি করে বলি। শিউলিকে যে বিয়ে করবে সে নিশ্চয়ই তা বুঝবে, তার দায়িত্ব বুঝবে।" লাল একটু থামল। একটু থেমে চায়ের পেয়ালা টি-পয়-এ নামিয়ে রেখে সিগারেট ধরালো। তারপর অন্যরকম হয়ে। ক্ষুব্ধ বিদ্রূপের ভঙ্গিতে বলল, "মানুষ জাতটার ওপর ভয় ও কোনদিন শুনি নি তোমার মুখে মল্লি। এ আবার নতুন কথা শোনালে কেন। আমি কি এতই কম চিনি তোমাকে।"

লালের কথার কোন রকম আমল না দিয়ে মল্লিকা শিউলির জন্য ব্যাকুল হল। মল্লিকা একবার হাত ঘোড়ার নাম করে উঠে পড়ল চেয়ার ছেড়ে। এবং সেই সঙ্গে-জানালার খড়খড়ি খুলিয়ে বাইরেটা দেখে নিয়ে মল্লিকা বলল, "ভয় হয় এই কারণে যে মানুষ ও ভালোর কাছে নিয়তির কাছে বন্দী দাস · তাই। নিয়তিকে ও দেখতে পাচ্ছি না চোখে। কখন কে কি করে বসে। এই শিউলি আজ এক আছে, কাল যদি আমাকে কিছু বলে বসে,—শিউলির স্বামী যদি আমাকে সহ্য করতে না পারে—আমার ও মনে কষ্ট হবেই। "মল্লিকার কথার মাঝে মাঝে কিছু কিছু শুকনো ঝরাপাতা ঝড়ে বাইরের বন জঙ্গল থেকে ঘরের মধ্যে এসে পড়ল। কিছু কিছু মল্লিকার শাড়িতে ও পড়িয়ে পড়ল। চেয়ারে বসতে বসতে মল্লিকা বলল—"যে শিউলিকে এতটা চিনি সেও ত আমাকে দু একটা কথা বলতে পারে"—আমার বাড়িতে থাকা হবে না—আমার টাকা—"।

লাল বলল, "শিউলিকে ও তাই বলে বাড়িতে আটকে রাখতেও পারবেনা তুমি বলি।"

"হ্যাঁ, তাত বটেই," বলেই মল্লিকা যেন শিউলির আসার শব্দ শোনার জন্যে উৎকর্ণ হয়ে রইল। এ ভাবে অন্যমনস্ক থেকেই বলল, "কিন্তু ওকে কে বিয়ে করবে। ওর যা ভাগ্য। যার বরাতে কিছুই সহ্য হয় না। বাপ মা কিছুই নয়—।"

"তা'বলে স্বামী সহ্য হবে না কেন, এটা ভাবা অন্যায়।'

মল্লিকা একটু অন্যরকম গলায় চিন্তিত হয়ে যেন ঘরের লোককে জিজ্ঞেস করল—"এত অন্ধকার হয়ে গেল, কখন ফিরবে বলতো,—এরা গেল কোথায়।"

লাল বলল, "এরা কাছাকাছি কোথাও গেছে—আসবেই। তাছাড়া এখানে হাঁটা ছাড়া অন্য কোন উপায় ত নেই। রাধাকে কিছু বলে গেছে নাকি।"

মল্লিকা বলল, "দেখছি"—। "রাধা" বলে ডাকল মল্লিকা। "রাধা, দিদিমনি কিছু বলে গেছে নাকি। যাবার সময় তোমাকে।"

রাধা বলল, "বলেছে, ফিরতে একটু দেরী হবে। কেউ যেন না ভাবে।"

মল্লিকা অন্ধকার বাগানের দিকে চেয়ে উৎকর্ণ হয়ে রইল।

তারপর সে জানালার কাছ থেকে পুব দিকের বড় জানালার কাছে আস্তে আস্তে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার সবটুকু জুড়ে অন্ধকার আকাশ। সেই আকাশের সৌরমণ্ডলের মাঝখানে মল্লিকার মাথা ও শরীরের অর্দ্ধেকটা পরিব্যাপ্ত। জানালার কাচ থেকে কালো ঝিক ঝিকে জঙ্গলের শীর্ষদেশ অনেকদূর উত্তরাই-এ নিচু হয়ে নেমে গেছে। হাওয়ার গাছের পাতার শব্দ হচ্ছিল আশে পাশের চারদিক থেকে। সেই দূরের চালু বন থেকে যদি কেউ এ বাড়ির দিকে তাকায়—যদি অনিল শিউলি ওই আঁকা বাঁকা রাস্তা দিয়ে ফিরে আসতে আসতে এ বাড়ির দিকে অন্ধকারে তাকায় তবে মল্লিকাকে ছায়ার মত এ বাড়ির জানালায় দাঁড়িয়ে আছে দেখতে পাবে। তার পিছনে আলোর ঘর। মল্লিকা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে চিন্তিত আকাশ বন ও সরু সরু আঁকা বাঁকা হাটে যাওয়ার রাস্তা দেখতে পেল। এবং দূরে লাটু পাহাড়কে অন্ধকারের ঠাঁইর মত মনে হল তার। মল্লিকা চিন্তিত হল। আরো চিন্তিত হয়ে উঠল। পরে বাগানের ধারের জানালা বন্ধ করে বিষণ্ণ চিন্তাক্লিষ্ট মুখে চেয়ারের কাছে ফিরে এল।

লাল বলল, "তোমার বড় চিন্তা হয়েছে আজকাল। এখনও ঠিক সেই ঘোর সংসারীর মতই আছ দেখছি। অথচ যা হওয়া উচিত নয়। লাল কথাটা একটু ঘুরিয়ে মল্লিকাকে কিছু নির্দ্দিষ্ট করে বোঝাতে গেল। তার নিজের অবস্থায় পরিচিত চিহ্নিত করে দিতে চাইল। লাল মল্লিকার দুর্বলতা লক্ষ্য করল।

মল্লিকা বলল, "না আজকাল ভাবি—ওর বড় শরীরটা অসুস্থ। রাস কেঁপেছে। একটুতেই যেন কেমন গম্ভীর হয়ে যায়, কাতর হয়ে পড়ে—বুঝি না, বুঝি না এসব।" অধৈর্য্যের মত মল্লিকা বলে পড়ল চেয়ারে।

"শিউলিকে আমি চিনি না, জানি না—কিন্তু তোমাকে ত চিনি মলি। তোমার পক্ষে এতখানি অধৈর্য হওয়া সাজে না। মানুষের প্রতি তোমার কেমন অবহেলা ও তাচ্ছিল্যের ভাব আসা উচিত ছিল। লাল ফ্রাঙ্ক ফ্রাঙ্ক শব্দ করে সাইটার জেলে সিগারেট ধরিয়ে আনন্দর সিগারেটে আগুন ছোঁয়ালো।

"তা হয়নি" বলে মল্লিকা একটু অপ্রস্তুত হয়েই বলল, "আপনার চা জুড়িয়ে গেল আনন্দবাবু! একটু গরম করে দি—, না হয় অন্য এক কাপ—।—ছাড়া।"

আনন্দ বলল, "দরকার হবে না। ঠিক আছে। কথাবার্ত্তা বলুন বরং—।"

"আপনি বড় কিন্তু কিন্তু করছেন।" মল্লিকা বলল, "লালের কথায় কিছু ভাববেন না। ওর সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তাও তেমনি। আপনি কিছু মনে করবেন না। মানে বিয়ের আগে থেকে ফ্রেণ্ড।" মল্লিকা গলা পাল্টে বলল, "যাক, এখানে কেমন লাগছে বলুন ত!"

"আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর ভাল।"

মল্লিকা হাসল, "কেন এ কথা বলছেন, কেন!"

—"তাছাড়া ভাবতেই পারছিলাম না এখানে মানুষ জন থাকে!"

—"তা সত্যি, স্বাভাবিক। সিজন টাইমে এসে বুঝতেন, কী লোকের ভীড়। আমার ঘরে ত দিন রাত হৈ হল্লোড় লেগেই থাকত।"

আনন্দর কাছে কথাটা যেন কেমন লাগলো। আনন্দ জিজ্ঞেস করল—"আপনার ঘরে কারা আসতেন, কোন আত্মীয় পরিচিত বুঝি।"

মল্লিকা খিলখিল করে হেসে উঠল। মনে মনে বলল, ভাকা ছোকরা—যেন বোঝে না আমার ঘরে কারা আসে! পরে বলল, "আনন্দ বাবু, আমার আত্মীয় কোথায়। যারা এখানে বেড়াতে আসে তারাই।"

আনন্দ মল্লিকার রূপে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। সুন্দরী বলে মনে হল তাকে, অপূর্ব সুন্দরী। প্রতিটি মুহূর্তে তাকে সুন্দরী বলে ডাকতে ইচ্ছা হল। আহারে রূপ, আহারে!

যেন একটি দেহের—কোমর নিতম্ব স্তনচূড়া সবটুকু

পাড়িতে অজানা একটি দীর্ঘ গম্ভীর সুন্দর তানপুরার ঘর। কথাগুলো প্রেম ভালবাসা যেন—সেই তানপুরার তারের মত সুন্দর সুরের ঝঙ্কার টানা টানা।

আনন্দের মনে হল পৃথিবীতে এমন সব সুন্দরী আছেন যাঁরা নির্জন অন্ধকার হতাশার এক এক সময় দেখা যেন বেরিয়ে আসেন। নির্জন অন্ধকার হতাশা থেকে বেরিয়ে এসে আবার তারই মাঝে বিলীন হয়ে যান। এ হল সেই সুন্দরী, সেই সুন্দরী মল্লিকা। তাঁদের সৌন্দর্যের ব্যাপকতা নির্জন অন্ধকার হতাশা থেকে শুরু হয়ে আবার সেখানেই শেষ হয়। মাঝে একবার সেই সব সুন্দরীর উৎসব আরম্ভ হয়। সেই উৎসব হল এখানের শীতের মাসগুলি। যখন ট্যুরিষ্টরা শিমুলতলার বাড়িঘরে অবতীর্ণ হন।

আনন্দ হঠাৎ বলে ফেলল-"আসব এখানে, আবার আসব।" সেই মল্লিকার মাথাটি তুলে নেওয়ার পর ও 'ভালবাসা' কথাটা শোনার পর থেকে আনন্দ যেন বিহ্বল হয়ে যাচ্ছিল। যেন সেই গন্ধটি খুঁজছিল—সেই বুকের গন্ধটি যার গন্ধে উতলা পুতলা ঘরের চারদিক। আনন্দ তাকাচ্ছিল বাইরের অন্ধকারটাকে। আনন্দ বাইরের অন্ধকারকে ঘরে ডাকছিল। সেই আদিম নগ্নতা চারিভিতে, সেই ঘন সন্নিবেশিত অন্ধকার যেন গোপনে ঘুমুচ্ছিল। আনন্দ ভাবছিল এই অন্ধকারটাই ত সব, আসল।

লালের সমস্ত কথাগুলো অসম্পূর্ণ ক্রমশঃ।

আনন্দ ভাবছিল অন্ধকারটা কখন ছড়াবে।

লাল কখনও আনন্দিত, বিষণ্ণ, আশ্চর্য হচ্ছিল কখনও।

লাল "মল্লিকা" বলে ডেকেই বলল, "আচ্ছা পরে বলব।"

আনন্দ যেন বিচার করছিল। করতে করতে হঠাৎ মল্লিকাকে জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা আপনি তাস খেলা জানেন?"

—"তা একটু আধটু জানি।"

—"কি টোয়েন্টি নাইন, না ব্রে—"।

—"ব্রীজ ও"

—"ব্রীজ, সত্যি!"

—"বিশ্বাস করছেন না।" মল্লিকার গলায় সোহাগ ভরকুটি।

—"বিশ্বাস করতে কষ্ট নেই, তবে যদি—"

আনন্দ দ্বিধাগ্রস্ত, কথায় অসম্পূর্ণ। লাল অনন্ত একটি সিগারেটের আগুন থেকে আর একটি সিগারেট ধরিয়ে ক্রমশঃ, কাউচে হেলান দিয়ে দিয়েছে লাল। এ্যাসট্রে থেকে পোড়া সিগারেটের ধোঁয়া উঠছে সামান্য। ঘরের দেয়ালগিরি আলোটা কেমন একটু গণ্ডগোল করল। মল্লিকা সিঁড়ির ভঙ্গিতে যেন একবার তাকাল দরজার দিকে। "না, এখনও এলনা," বলে কেমন নিশ্চিন্ত গলায় ভঙ্গি করে বলল, আনন্দকে—"কি হল, থামলেন কেন আনন্দবাবু পরীক্ষা করে নিন।"

কি পরীক্ষা করব। আনন্দ যেন মনে মনে বলল— মল্লিকা, তোমাকে কি পরীক্ষা করব। যতক্ষণ তোমার কাছে বসে আছি কেমন এক গন্ধ যেন আমাকে বিভোর করে তুলছে। তোমার তিরিশের চেহারা কেমন নতুন তরুণতায় গ্রাস করে নির্জনের মধ্যে কে ছুঁড়ে দিয়েছে। তোমার গলার স্বর আমাকে আশ্চর্য করেছে প্রথমেই। তোমার গলার স্বর এ ভালবাসা কথাটা কেমন হয়ে এল আমার শরীরে। আমি না থাকলে লাল হয়ত তোমাকে পূর্বেকার সেই ভালবাসার কথা (তোমার বিবাহের আগেকার ভালবাসা) নিয়ে কিছু একটা করতে পারত। হঠাৎ লালের মাথাটা ঠিক এই কারণেই যেন ধরে গিয়েছিল। আমি এখা থাকলে আমাকে তুমি কি করতে, আমি তোমাকে কি করতাম—। কিন্তু কি অসম্ভব ভাল লাগছে এখানে, এই নির্জন আয়নায়। যখন চারদিক থেকে অন্ধকারের পাহাড় এসে ধাক্কা খাচ্ছে, সেই আদিম নগ্ন অন্ধকার দেয়ালের চারপাশে বাগানে হাহাকার করে বয়ছে, সেখানে আমরা দুয়ার জানালা বন্ধ

করে একটুখানি আলো জ্বালিয়ে রেখেছি। যেন সবকিছুকে যথাসম্ভব এই আলোর প্রয়োজনে ঢেকে রেখেছি। তুমি আমাকে দেখে কি কতটুকু ভাবছ তা জানি না, আমি তোমাকে মুহূর্ত মুহূর্ত দেখে কতটুকু জেনে নিয়েছি তাও তুমি বুঝতে পারছ না। এখন তুমি হঠাৎ কেন বলে উঠলে —আনন্দবাবু আমাকে পরীক্ষা করে নিন—আমি উপযুক্ত কি না। কিসের উপযুক্ত তুমি মল্লিকা। আনন্দ ঘরের চারপাশে তাকিয়ে ওর মুখের দিকে চেয়ে, আলোয় ভরা উজ্জ্বল অঙ্গ, বুক কাঁধ ও গ্রীবার দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনি উপযুক্ত।"

"কি করে বুঝলেন যে আমি উপযুক্ত—।" যেন লোহাগের সুরে আনন্দকে ধাক্কা মারল মল্লিকা। "না না। আপনি বিচার করে নিন আমাকে। ধরুন আমি আপনার পার্টনার হব, তাহলে!"

আনন্দ পরীক্ষা করতে চাইল।—"শুনুন, স্পেডে ক' পয়েন্ট বলুন ত।"

মল্লিকা সামনে ঝুঁকে পড়ল। গালে হাত লাগিয়ে আনন্দের চোখে তাকিয়ে বলল-'নয়'।

"কি কি কার্ড থাকলে আপনি একটা ওপেনিং কল দিতে পারেন!"

মল্লিকা একটু চিন্তা করে বলল, "আড়াই ট্রিকস থাকলে, এবং এক কালারের পাঁচখানা তাস থাকলে," মল্লিকা গলাটা তরল করল—"ওপেনিং বা সেকেণ্ডারি কল দিতে পারেন।"

আনন্দ বলল, "এস, এস, সি, এল আর ও, টি জানেন ত!"

মল্লিকা বলল, "জানি-জানি—জানি।"

লাল সিগারেট খেতে খেতে আধশোয়া হয়ে বলল, "মলি, হার্টস-এ কত পয়েন্ট বলত।"

"কেন গো,"- বলেই বলল—"আই"। হাসল খিলখিল করে মল্লিকা।

"আর ডায়মণ্ড-এ।"

"নাও।"

"আচ্ছা ব্রীজের কোনটায় পয়েন্ট বেশী বলতো মলি—। লাল আবার বলল।

"নো ট্রাম্প-এ বল।"

"কারেক্ট কারেক্ট—। মলি জানে, মলি জানে।"

আনন্দ পরের প্রশ্ন করল। "আচ্ছা। পার্টনার পাঁচ স্পেড নিয়ে কল দিয়েছে। আপনি আপি অনার নিয়ে হার্টস করেছেন। এখন আপনি সেকেণ্ডারি কল দেবেন কি না, এবং তা কিসে—।"

মল্লিকা চুলের পাশে হাত দিয়ে একটু কাছে এগিয়ে এসে বলল "হার্টস এ কল দেব।"

"কাইন"—লাল চেঁচিয়ে উঠল। উঠেই সে যেন কেমন বিশ্রী বোধ করল। আসলে মল্লিকা যেন কেমন হয়ে যাচ্ছে। মল্লিকা যেন কোথায় তার কাছ থেকে আলাদা সম্পৃক্ত। লাল তবুও আরো প্রশ্ন করবে ভাবল।

আনন্দ যেন পাগল হয়ে যাচ্ছিল—একের পর এক প্রশ্ন করে। "টু-ডায়মণ্ড-এ কল করেছি, আমার বিরুদ্ধ পার্টি ওরা টু-ডায়মণ্ড ডবল দিল। ধরুন আর কোন কল হয়নি—এখন আপনি যি ডায়মণ্ড-এর খেলা করলে কত পয়েন্ট পাবেন।"

মল্লিকা বলল, "একটা ও, টি, আর একটা এক, সি,—ফিফ্টি পঞ্চাশ পাবো।"

লাল বলল—"বাঃ।"

আনন্দ বলল, "কিন্তু ওরা যদি রি-ডবল দিয়ে দেয় তখন—"।

মল্লিকা বলল, "তাহলে এক, সি, পঞ্চাশ,—ও, টি—একশো—।"

আনন্দ আবার বলল—"কত পয়েন্টে সেব হয়—।"

মল্লিকা ক্লান্ত হয়ে বলল—"ত্রিশটি।"

ততক্ষণে লাল যেন ঘাড় মুখড়ে দিয়েছে। সিগারেটের ধোঁয়া এ্যাস্ট্রের ওপর উড়ছিল। আনন্দ মল্লিকাকে একবার দেখে নিয়ে বাইরের অন্ধকারটা কল্পনা করল। যেন তার মনে হল—এই অন্ধকারটাই হ'ল সব. এই সূর্যরেখা আলো,' দেয়ালগিরির আলো এগুলো একরকমের সভ্যতা। না, এগুলো নয়। আসলে অন্ধকার—অন্ধকারটাই। ফুলের গন্ধ এসেন্সের গন্ধ আলো কিছু একটা চাপা দিচ্ছে. আসলটাকে আড়াল করছে।

মল্লিকা ভাবছিল—শিউলি কতক্ষণে আসবে—কতক্ষণে কতক্ষণে। এত অন্ধকার হয়ে গেল। কোথায় যে গেল। অনিলকে সে চেনে না। ছজনের বয়েস হয়েছে—সুতরাং বয়েসটাকে সে চেনে। অবিশ্বাসী বয়েস।···শিউলি মানুষের সঙ্গে বিশেষ মেশে না। কতদিন হ'ল মানুষ চোখে দেখেনি, মানুষের সঙ্গ পায় নি। বিভিন্ন কারণে শিউলি বড় গম্ভীর। কিন্তু কখন মানুষের কি হয়। একজন পুরুষ মানুষের সঙ্গে মিশে নিজেকে খারাপ হতে দেবে না ত! নিজে সামলে চলতে পারবে কি!

ঠিক এমন সময় বাইরে ছুলোড়া চটির শব্দ উঠল। স্যান্ডেলের শব্দ। "ওই বোধহয় শিউলি এল"—মল্লিকা যেন উদগ্রীব হ'য়ে পড়ল।

লাল বলল, "আলোটা নিভে যাচ্ছে বলি।" মল্লিকা শিউলির জন্যে তাকিয়ে ছিল। আলোটা আরো কমে আসছিল। দেয়ালের কাছে ছায়া—ছায়াটা বড় হয়ে গেল।

"রাধা, একবার আলোটা দেখতো—কি করছো।" মল্লিকা ডাক দিল।

আনন্দ দরজার দিকে চাইল—শিউলি অনিলকে দেখবে বলে—।

আলোটা আরো কমে আসছিল।

দরজার কাছে তখন পর্দা ধরে শিউলি দাঁড়িয়েছে। [illegible] চুল উস্কো খুস্কো। শিউলির মুখ আবছা আলোয় [illegible] পিছনে অনিল। অন্ধকার ঘাঁটতে ঘাঁটতে দুজনে ততক্ষণে এসে পড়ল।

আলো অন্ধকারের দরজায় যেন কোন নিষেধাজ্ঞা আছে। দরজায় হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের নিষ্প্রভ আলোয় কয়েকটি অচেনা লোককে দেখতে পেয়ে বিদ্যুতের মত চাইল শিউলি। শিউলি তাকাল মল্লিকার দিকে। তার চাউনীর মধ্যে সন্দেহ ছিল। মল্লিকাদি এতক্ষণ কি করছিল। এরা কারা।

ঘরের আলোটা নিস্তু নিস্তু হয়ে ক্রমে একেবারে নিভে গেল—অন্ধকার।

"রাধা এঘরে আলো দিয়ে যাও"—বলেই লাল অন্ধকারে দেয়ালাই জ্বালাল।

দেয়ালাই-এর আলোর কাঠির মধ্য দিয়ে শিউলি মল্লিকার দিকে চেয়ে—। মল্লিকা শিউলিকে সন্দেহ করে, এগিয়ে গিয়ে, আস্তে গলায় বলল,—"এত দেরী করলে কেন শিউলি—তুমি যে বড় অসুস্থ।"

দেয়ালাই-এর আলো আরো নিভে যাচ্ছিল। অন্ধকার। আনন্দর মনে হল সেই অন্ধকারটা দেয়াল ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে আনাচে দরজা টপকে এসে পড়েছে। এই অন্ধকারে ফুলদানি, ঘরের আলো, পর্দা, সাদি, খড়খড়ি, কাউচ, টি-পয় দামী জামাকাপড়, বিছানা, দৃশ্য সব মুছে গেছে—সব। এই বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র দেয়াল ছুয়ার করে অন্ধকারের বনভূমির মত নগ্ন গাছের মত—লাল মল্লিকা আনন্দ শিউলি অনিল চারিদিক হাতড়াচ্ছে: "মলি কোথায় মলি এখানে দাঁড়াও"—"শিউলি কোথায় রইলে", শিউলি ডাকল জিনিয়ার —"অনিল অনিল অনিল—।" মল্লিকা "আনন্দ" বলে ডাকল—"আনন্দ বড় অন্ধকার"। মল্লিকার গলায় সেই 'ভালবাসা' কথাটা শোনার পর এই "আনন্দ" ও "অন্ধকার" কথাগুলো বারুদগুণে অন্ধকারে ভেসে রইল। আনন্দর মনে হ'ল এটাই একবার, এই অন্ধকার যথার্থ—কেবল মাঝে মাঝে আলো দিয়ে কতটুকু ঢাকতে চাইছি।···অন্ধকার ঘাঁটতে

খাঁটতে আনন্দ মল্লিকাকে চিনতে পারছিল। শিউলিকে চিনতে পারছিল—শিউলির নিশ্বাস অনুভব করতে পারছিল, মল্লিকা নামে একজন সুন্দরীর গায়ের গন্ধ গরম দেহের স্পর্শ পাচ্ছিল—। শিউলি অন্ধকারের মাঝখানে স্থির পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে। লাল চেঁচিয়ে উঠল—"ভাল লাগছে অন্ধকার—বলি। এই অন্ধকারটাই যেন অভিপ্রেত ছিল।" লাল এই অন্ধকারকে ক্রমশঃ ঘোষণা করল।···অন্ধকারে যেন পাঁচজন এদিক ওদিক এলোমেলো পায়ে যাত্রা করছে। টাল খেতে খেতে অন্ধকার গর্তে নেমে যাচ্ছে। আনন্দর হাতে কার নরম হাত লাগল। মনে হল মল্লিকা কিংবা শিউলির। "লাল কোথায়"—। অন্ধকারে ঘাড় উঁচু করে কিছু দেখছে যেন। পাঁচজন অন্ধকারে জড়াজড়ি করে অন্ধকার-শুড়ঙ্গ দিয়ে কে কোথায় চলে যাচ্ছিল। চলে যেতে যেতে হিসাব ভাঙছিল গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল, সন্দেহ করছিল, অভিমান সুখ হাসি দুঃখ বিচ্ছিন্ন করে করে অন্ধকারে গুঁড়িয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকারে গুঁড়িয়ে যেতে যেতে আনন্দর মনে হল একবার ঘোষালবাবুর গল্পের কথা। আমরা সকলেই স্বপ্নের ভিতর ঘুমিয়ে সমাহিত চিত্তে নিজেদের অতীত সিদ্ধির জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।··· অন্ধকারে লাল ঘাড় উঁচু করে দাঁড়িয়ে। মল্লিকা আনন্দর কাঁধের পাশ দিয়ে শিউলির দিকে তাকিয়ে। অমিল শিউলি অন্ধকারের মাঝখানে ঘুমন্ত স্থির, গায়ে গা লাগিয়ে—নিস্তব্ধ—। অন্ধকারটা তাদের অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল। অন্ধকারে তাদের কোন ভয় ছিল না—অন্ধকারকে তারা পাতলা নরম সৌখিন ঠোঁট দিয়ে চাটছিল যেন। সেই অন্ধকারে মল্লিকা শিউলি পরস্পর সন্দেহের মন ভাঙছিল গুঁড়িয়ে ফেলছিল। একমাত্র রাধাই আলোর জন্যে অন্ধকারে ছোটাছুটি করছিল। এই আলোর জন্যে তার যত চেষ্টা ছোড়াছোড় আকিঞ্চন। আনন্দর সঙ্গে একবার হাত লেগে গেলে আবার সেই নরম সুন্দরীর হাতের জন্য সে চেঁচিয়ে উঠল—পাটনায়—পাটনায়—মল্লিকা।

শচীন্দ্রনাথ বসু রচিত

এই সালের রবীন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্ত বই

প্রাগিতিহাসের মানুষ

দাম : আট টাকা

কার্মা কে এল. মুখোপাধ্যায়

৬/১এ, বাঞ্ছারাম অক্রুর লেন

কলিকাতা-১২

ছুটি

: গোটগল্প

শচীন্দ্রনাথ বসু

পাহাড়ের বৃষ্টি হঠাৎ কখনকিয়ে এল, মেটে দিয়ে আশ্রয় নিলাম অদূরে এক বাড়ির বারান্দায়। বাড়ি সম্পূর্ণ অন্ধকার, ফরসা আনলা সব বন্ধ। কাঠের বারান্দায় আমার আগেই এসে দাঁড়িয়েছে ছুটি ছুটিয়া ছেলে মেয়ে, বোধ হয় ভাই বোন, দেয়ালে ঠেস দিয়ে নিজেদের মধ্যে আলাপ করছে।

কম কম বৃষ্টি, অল্প অল্প হাঁই, গায়ে শীতের শিহরণ। এখানে বেড়াতে আসবার আগে সবাই বৃষ্টির ভয় দেখিয়েছিল, বলেছিল ছুটি মাটি করে দেবে। এই চার দিন আকাশ পরিষ্কার থাকাতে আমিও বিছুটা আশ্বস্ত হয়েছিলাম—এখন কিন্তু মন্দ লাগছে না। অবশ্য অবিরাম বর্ষণ শেষে হয়তো বিরক্তি ধরিয়ে দেবে।

এই রকম ভাবতে ভাবতে চার দিকে তাকিয়ে জগৎজোড়া অন্ধকারের মধ্যে প্রকৃতির বিক্ষোভ উপভোগ করছি, এমন সময়ে হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকাল, চকিতে চোখে পড়ল বারান্দার ওপারে বর্ষাতি-ঢাকা এক স্ত্রী মূর্তি; এবং সেই ভয় মুহূর্তে মুখখানা যেন চেনা ঠেকল!···এ কি সম্ভব? কিন্তু কেন নয়?·····

বিদ্যুৎ আর খেলল না, বরং পাহাড়ী বৃষ্টি দেখতে দেখতে ঘরে এল। ছুটিয়া ছেলে মেয়ে মাথার উপর চাদর তুলে নেমে পড়ল। উনিও পাশের ছোট রাস্তা দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন। এ ক' দিন বৃথা বর্ষাতি বয়ে ঘরে আনি আজই তা বার দিয়েছি, সুতরাং আরও একটু অপেক্ষা করতে হল আমাকে। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছি: আমারই মত হয়তো বেড়াতে এসেছে—কিন্তু স্বামী কোথায়? ··কি যেন নাম ছিল···বারীন মিত্র, ব্যারিস্টার বারীন মিত্র···তখনও ছিল ব্যারিস্টার আই সি এস-এর যুগ, এখন যেমন এনজিনিয়ার অ্যাকাউন্ট্যান্টের···

পর দিন সকালে আবার আকাশ পরিষ্কার, এমন কি আমার হোটেল থেকে বেরিয়ে প্রথম মোড়টিতে দাঁড়িয়ে নীলের গায়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার সাদা মুকুট চকচকার দেখা গেল। সকালে বিকালে এই বেড়ানো নেশার মত ধরেছে আমাকে—[illegible]রের ভাল লাগে যে বেড়াবার অফুরন্ত আয়গা আর রাস্তায় বহিরাগত বাঙালীদের ঠেলাঠেলি নেই; এই শহর উচ্চতর শ্রেণীদের সম্পূর্ণ অনুমোদিত নয়। ভাল লাগে বাইলের পর বাইল আঁকাবাঁকা পিচ্‌মোড়া পথে হেঁটে বেড়াতে; পথের এক দিকে খাড়া পাহাড়ের দেয়াল, অন্য দিকে গভীর খাদ। সকালে রোদ বাড়লে গায়ের আলোয়ান খুলি, সন্ধ্যায় শীত বাড়লে পরি। কখনও টিবির উপর গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করি, পকেট থেকে নোট বই বার করে লিখি দু ছত্র। ঘরে যত ক্ষণ থাকি তত ক্ষণ হয় ঘুম নয় ইজিচেয়ারে বিশ্রাম। সঙ্গেই বই আছে সঙ্গে।

পর দিন সকালে হাঁটতে হাঁটতে ভাবছিলাম এমনি ভ্রমণের পথে আবার দেখা হয়ে যেতে পারে। কিন্তু দেখা হল বাজারে। হোটেলটা খুব ভাল নয়, হাটের দিন কল কিনব বলে বাজারে গিয়েছিলাম, সেখানে হঠাৎ মুখোমুখি। এ বার স্পষ্ট দিবালোকে আর কোনও সন্দেহ থাকল না, যদিও এই মুক্তিটা বছর যেন ছাপ রেখেছে ওর মুখে।

"নমস্কার। বেড়াতে এসেছেন বুঝি?"

"না, আমি এখানে থাকি।"

ইতিমধ্যে আমার সন্ধানী দৃষ্টি কোনও সঙ্গীর খোঁজ পেল না। আবার কানে এল, "লোয়ার রোডে আমার বাসা। আপনি কোথায় উঠেছেন?"

"হিল ভিউতে···বিশেষ সুবিধার নয়, যেমন মামুলি নাম তেমনি ব্যবস্থা।"

"এখানে এই রকমই সব। জায়গাটা ভাল লাগছে তো?"

"হ্যাঁ, চমৎকার।"

"সেটাই বড় কথা। আচ্ছা আসি।"

নমস্কার করে চলে গেল মরুবতী। আমিও চলা কেনা সেরে বেরিয়ে পড়লাম। একটু আশ্চর্য লাগল যে এত কাল পরেও মরুবতীর সঙ্গে আমি খুব সহজ ভাবে কথা বলতে পারি নি, ও যেন আমার এক ধাপ উপরে আজও তা অনুভব করেছি, যদিও আজ আমি সেই পঁচিশ বছর বয়স্ক অরুণ রায় মোটেই নই। সে কালে কত পুরুষই ওকে ঘিরে ঘুর ঘুর করেছে। দেখে জিতেছিল বারীন, কিন্তু তার পরেও মধু মক্ষিকার দল ক্ষান্ত বা শান্ত হয় নি শুনেছি।

ওর মায়া-পরিধির মধ্যে প্রায় জোর করে ঢুকতে গিয়ে যে ফল পেয়েছি তার তিক্ত স্মৃতি বহু দিন জাগিয়েছে আমাকে। আলাপটা গড়ে উঠেছিল ঘটনাচক্রে; আমি তিন বছর ধরে এক কলেজে ইংরেজি পড়াচ্ছি, মরুবতী সবে ভাল পাশ করে এক মেয়েদের কলেজে ঢুকেছে ঐ একই বিষয়ের শিক্ষয়িত্রী হয়ে। জন কয়েক উৎসাহী ছাত্র ও শিক্ষক মিলে একটা সাহিত্য সমিতির মত গড়ে তুলেছিল, সেখানে পরিচয় আমাদের। মরুবতী না এলে সভা জমত না। তার অনেক কারণ: সে যে শুধু প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হয়েছে তাই নয়, মুখশ্রী বিশ্লেষণ করে দেখলে খুব বেশী নম্বর হয়তো পাবে না, কিন্তু বহু দীর্ঘ তার দেহের গড়ন, সুন্দর তার গাঢ় লজ্জার ধরণ এবং সহজ স্বাভাবিক তার চলন বলন। সব মিলিয়ে বেশ প্রবল আকর্ষণ।

কিন্তু শিক্ষা বহন ছাড়াও তার জীবনে আর একটা বহন ছিল। তার কেন্দ্র ছিল তার ঘরে ও সমাজে, সেখানে আনাগোনা বারীন মিত্র ও ঐ বর্ণীয় লোকের। মরুবতীর অন্তঃপুর নামটাও বোধ হয় ছিল এক রকমের আকর্ষণ, শুনেছি সংস্কৃতের অধ্যাপক তার এক কাকা ওটা সংগ্রহ করেছিলেন বিষ্ণু পুরাণ থেকে। বলা বাহুল্য, বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় জন তাকে ডাকত মরু বলে।

সেই দিনই হোটেলের ম্যানেজারকে জিজ্ঞাসা করে জানা যে মরুকে এখানকার বাসিন্দারা সবাই চেনে। লোয়ার রোডে কিছুটা গিয়েই তার সুন্দর দোতলা বাংলো, নাম শুকতারা। সেখানে সে থাকে দশ বারো বছরের মেয়েকে নিয়ে। স্বামী সম্বন্ধে উনি কিছু বললেন না, আমিও জিজ্ঞাসা করলাম না।

পর দিন বিকালে লোয়ার রোডে ঢুকে পড়লাম, উদ্দেশ্য ছিল শুকতারার রূপটি দেখে চলে যাব। কিন্তু বাড়ি খুঁজে বার করেই দেখি মরু বারান্দায় বসে আছে, কি একটা বোনার কাজ হাতে নিয়ে। মুখোমুখি পড়ে গেলাম, তখন আর পলায়ন অসম্ভব। সব চেয়ে খারাপ লাগল এই ভেবে যে ও নিশ্চয় সন্দেহ করছে আমি ওর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি। সেই কারণেই কি চেহারার সাধারণ একটু ছায়া পড়তে দেখলাম—না কি তা আমার বিব্রত মনের ভুল।

ভিতরে আসবার আমন্ত্রণে কিন্তু কোনও জড়তা প্রকাশ পেল না।

বেতের চেয়ারে বসে ভাবলাম এক বার বলি, "আপনাকে হঠাৎ বিরক্ত করবার ইচ্ছা ছিল না, বেড়াবার পথে শুধু—", কিন্তু এই উক্তি এতই মামুলি ছুতোর মত শোনাবে যে অবিলম্বে তাকে গলা টিপে মারলাম।

পরিবর্তে কি বলা যায় ভাবছি, এমন সময়ে হাতের কাঁটা চালাতে চালাতে মক্কু বললে, "তার পর, বলুন আপনার খবর। এখনও কি সেই কলেজেই আছেন?"

"তাই আছি।"

"কি, প্রোফেসার?"

"হাঁ।"

"আচ্ছা, আপনাদের সেই সাহিত্য সমিতির কি হল?"

এক বার ভাবলাম বলি, "সমিতি আপনারও ছিল"; আসলে বললাম, "যা হয় তাই, নীরব মৃত্যু।"

চা এল, সঙ্গে কেক। এখানকার সবচেয়ে নামকরা দোকানে তৈরি কেক, তবু স্বাদ যথেষ্ট ভাল নয় বলে দুঃখ প্রকাশ করলে মক্কু।

"ক' দিন থাকবেন?"

"এই মাস খানেক।"

একটু দ্বিধার ভাবে জিজ্ঞাসা করলে সে, "আচ্ছা আপনি কি একলা এসেছেন—অর্থাৎ···?"

মনে মনে হাসি চেপে বললাম, "একাই এসেছি।"

"এটা কিন্তু অবিচার, আপনার স্ত্রী কিছু বললেন না?"

"আমি বৃত্তান্ত। এবং নিঃসন্তান।"

হঠাৎ মক্কুর মুখখানা কালো হয়ে গেল, অস্ফুটে দুঃখ জানালে—আমার দুর্ঘটনায়, না বেফাঁস কথা বলে ফেলে তা বোঝা গেল না।

ভাবলাম ওকেও জিজ্ঞাসা করি পরিবারের খবর, কিন্তু কথা চাপতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছি, এটাও চাপলাম। ইতিপূর্বে দেখেছি মেয়েরা আমাদের যা সহজে জিজ্ঞাসা করে ওদের কাছে তাই জানতে চাইলে ওরা ক্ষেপে যায়।

বললাম, "কত দিন আছেন এখানে?"

"তা বছর পাঁচেক হতে চলল। শীত কালে প্রায় বছরই ফিরে যাই, আপনারা যেমন সেখান থেকে আসেন গরমে।"

জলবায়ু, খাদ্যমূল্য ইত্যাদি নির্দোষ প্রসঙ্গে আরও কিছু ক্ষণ কথা বার্তা বলে উঠে দাঁড়ালাম। "আমি আসলে বেরিয়েছিলাম বেড়াতে, না বলে কয়ে আপনাকে বিব্রত করার ইচ্ছা ছিল না। এত কেক খাওয়ার পর হাঁটা আরও দরকার হয়ে পড়েছে।"

এর পরে কয়েক দিন আকাশ মোটামুটি পরিষ্কারই থাকল, আমারও ছুটি কেটে চলল ভাল। ঘরে বা বাইরে মক্কুর কথা মনে হত—ওর সঙ্গে আবার দেখা হওয়ার ইচ্ছা নয়, মনে হত অতীতের কথা।

কাঁচা বয়সের ভুল পরিণত জীবনে ভাবতে ভাল লাগে না, কিন্তু স্মৃতি ঠেলে সরিয়ে দিলেও ফিরে ফিরে আসছে। মক্কু যে আমাদের সঙ্গে সহজ ভাবে মিশত তার থেকেই বোধ হয় কোনও এক দিন আমার তরুণ মনের উর্বর মাটিতে উপ্ত হল এক আশার বীজ এবং ক্রমে সেই আশা ডালপালা ছড়াল। বলা বাহুল্য, ইচ্ছাটা বিবাহ—ও তবু ধরাই হবে না আমার, হবে সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহযাত্রিণী।

কিন্তু এই স্বপ্নের মধ্যে ছোট একটু দুঃস্বপ্নও ছিল—বাবা কোথায় যেন আমার বিয়ের কথা বলে রেখেছেন। আমার ইচ্ছাটা তাঁর কাছে নিতান্তই বেয়াড়া ঠেকবে একাধিক কারণে।

তবু মনে হয়েছিল মক্কুর মন পেলে এই বাধা এক লাফে পার হয়ে যাব। এবং একদা করে ফেললাম প্রস্তাবটা, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে।

মনে আছে সে মোটেই অপ্রতিভ হয় নি, হাসেও নি—যা আমি ভয় করেছিলাম। একটু ভেবে বললে, "আপনাকে ঠিক ঐ চোখে আমি কোনও দিন দেখি নি, বন্ধু ভাবেই ভেবেছি। আমার মনে হয় আমাদের মধ্যে ঐ সম্পর্কই সবচেয়ে pleasant হবে।" Pleasant শব্দটি সে যে ব্যবহার করেছিল তা এখনও মনে আছে, বোধ হয় "মধুর" কথাটা একটু শ্রুতিকটু হবে বলে।

শাস্ত্রে বলে মেয়েদের প্রথম প্রত্যাখ্যান এক মাত্র স্ত্রীর পাণিপ্রার্থীই মেনে নেয়. ওটা তাদের মনের কথা নাও হতে পারে, তা ছাড়া তাদের মন পদ্ম পাতায় শিশির বিন্দুর মত অস্থির. ইত্যাদি। আমিও আরও দু এক বার চেষ্টা করলাম, কিন্তু বন্ধুবের শুধ গানই শুনতে হল।

সুতরাং অনতিবিলম্বে সন্ধ্যা এসে আমার ঘর আলো করল, বাড়ির সবাইকে খুশী করে। দিন কতক পরে সে হঠাৎ এক দিন মরুর নাম করে আমাকে খোঁচা দিল, উপহারের ধরনটা দেখে তার রুচির তারিফ করতে পারি নি। মেয়েদের কানে সব খবরই পৌঁছায়—এবং বলা বাহুল্য খবরের দশ গুণ রটে নিশ্চয়। আমি নিশ্চয় আমি মরু কাউকে কিছু বলে নি। যাই হক, এই খোঁচা শুনতে হয়েছে সন্ধ্যা যত দিন বেঁচে ছিল। আমার কাব্যিক প্রেমের এইটুকুই ফল পেয়েছিলাম।

সকালে বেড়িয়ে ফিরে ঘরের সামনে বারান্দার রোদে পা দিয়ে বসি, পাশের ছোট টেবিলে থাকে পাঠ্য কিছু আর আমার নোট বই। একটু পরে এক পাত্র কফি আসে। সে দিন শ্রীলীর নাটকের এক মোটা সংকলন খুলে বসেছি, এমন সময়ে হোটেলের চাকরের হাতে কফির সঙ্গে এল এক টুকরো চিঠি।

"অরুণ বাবু—মনে পড়ছে বলেছিলেন আপনার হোটেলটা খুব সুবিধার না, স্থানীয় লোক হয়ে কিছুটা ক্ষতি পূরণ করতে চাই। আমার এখানে আজ দুপুরে খাবেন কি? আমার লোক এই সময়ে আপনাকে পাবে কি না জানি না—আমি কিন্তু অন্যথা না জানলে আপনাকে আশা করব।"

একটু অবাক হলাম বই কি। নিমন্ত্রণটা যদি বা হয় একান্তই সামাজিক, চিঠির ঐ সরলতা দূর বা নিকট অভিজ্ঞতায় থেকে ঠিক আসা করা যায় না। সে দিন বিদায়ের সময়ে এক বার বলেছিল বটে আবার আসতে, তবে সেটা ঘর ছিল নির্লিপ্ত। কিন্তু যেতে আপত্তি কি? দিনের পর দিন একলা একলা বেড়ানো, অথবা বই মুখে করে পড়ে থাকা একটু যেন একঘেয়ে হয়ে উঠছে। মরুর সুন্দর বাংলোতে বসে কিছু ক্ষণ আলাপ সালাপ মন্দ লাগবে না।

আলাপটা এ বারও প্রধানত হল বারান্দায় বসে, খাওয়ার পরে। ওর জিন-পরা চুল-ছাঁটা হাসিখুশী মেয়ে রুবিকে বেশ লাগল, এখানে ফনভেন্ট স্কুলে পড়ে।

বাংলা ইংরেজি মিশিয়ে খাওয়া মন্দ হল না। তা শেষ হতে হতে ঘর অন্ধকার হয়ে এল, আলো জ্বালতে হল। মরু বললে, "চলুন, বাইরে গিয়ে বসি।" রুবি মা'র কাছ থেকে ছুটি নিয়ে গেল বন্ধুর বাড়ি।

বাইরে এসে দেখা গেল আকাশ মুক্ত, মাঝে মাঝে কুয়াশা নেমে আসছে মাটির কাছে, মোট পাখিরা পড়িমরি চলেছে এ দিকে ও দিকে, অদূরের গাছ পালা ঘর বাড়ি ঢেকে দিচ্ছে কিছু ক্ষণের জন্য। ভিজে ঠাণ্ডায় গা কন কন করছে অল্প অল্প, ভারী কোট নিয়ে এসে ভালই করেছি। মরু পরেছে হলুদ রঙের এক জাকিগান, তার পাশে ওর ফরসা রং আরও ফুটে বেরিয়েছে।

বললাম, "আপনার বাড়িখানা চমৎকার। এইখানে বসে ঐ দূরের পাহাড়ের দিকে তাকিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা অনায়াসে কাটিয়ে দেওয়া যায়।"

একটু হেসে বললে সে, "পাহাড় এখানে প্রায় সব বাড়ি থেকেই দেখা যায়, আর স্থানী বসবাসীদের কিছুটা একঘেয়ে হয়ে ওঠে।"

"তাই বুঝি প্রতি বছরই কলকাতায় পালান?"

"হ্যাঁ, মাস দুয়েক কাটিয়ে আসি দাদার ওখানে। কিন্তু প্রতিবারই জানুআরির শেষে আবার এখানে পালিয়ে এসে বাঁচি।"

কিছু ক্ষণ কাটল চুপচাপ। কি বলব ভেবে পাচ্ছি না, যা ভাবছি তাই যেন ব্যক্তিগত হয়ে পড়ছে।

মরু হঠাৎ মেঘের দিকে তাকিয়ে বললে, "আপনার মনে নিশ্চয় আমার সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন আছে, কিন্তু লিষ্টতার খাতিরে কিছু বলছেন না। এত দিন কোথায় ছিলাম, কেমন কাটল···বারীনের কি হল? আপনি তার সম্বন্ধে এ যাবৎ একটি কথাও বলেন নি বলে মনে হচ্ছে হয়তো খবরটা জানেন না। বিয়ের তিন বছর পরে টেনিস খেলতে খেলতে এক দিন হঠাৎ সে মারা যায়।"

সচকিত হয়ে বললাম, 'সত্যিই আমি জানতাম না।"

মরু একটুখানি ম্লান হেসে বললে, "আপনি যখন তার পরে দেখা করতে এলেন না তখন আমিও ভেবেছিলাম খবর পান নি···অন্য কোনও কারণ নেই, যদিও আপনি তো অনেক দিন আগেই দূরে সরে গিয়েছিলেন।"

"সংসারে জড়িয়ে পড়েছিলাম," বললাম সংক্ষেপে। কিন্তু তখন আমি বড় বিস্ময়ে ভাবছি যে মরু কি সত্যিই তিন বছর পরেও আমাকে মনে রেখেছিল—শুধু তাই না, আমি কেন শোক জানাতে গেলাম না তার অর্থ খুঁজেছিল।

ওর দিকে তাকিয়ে কোনও হদিশ পেলাম না। এক ঝলক কুয়াশা তখন ঘিরেছে আমাদের। পাশের চেয়ার থেকে এক পা-চাদর তুলে নিয়ে সে কাঁধে পিঠে জড়াল।

"তার পরেও আর এক বার বিয়ে করেছি। দ্বিতীয় স্বামীর নাম জ্যোতির্ময় মজুমদার, ব্যারিস্টার কেরত। কবি তারই মেয়ে। আট বছর আগে আমাদের ডিভোর্স হয়েছে। এই বাড়িটা অবশ্য বারীনের।···এই হল সংক্ষেপে আমার জীবন কাহিনী।"

সহানুভূতির কথা সহসে আমার মুখে আসে না। শুধু সলজ্জকোচে বললাম, "আপনার কপালে এত দুর্ভাগ্য ছিল আমি ভাবতেই পারি নি।"

বাগানের ও পারে সরু রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে মরু বললে, "বোধ হয় নির্বুদ্ধিতার শাস্তি। কিন্তু কোনটা ভাল কোনটা দুর্ভাগ্য কে বলতে পারে।"

এই বক্তব্যের রহস্য ভেদ করতে চেষ্টা করছি, এমন সময়ে সে ঘাড় ফিরিয়ে বললে, "সহানুভূতির পাওনা আপনারই কি কম—আপনারও তো বৌ মারা গিয়েছে।"

তার এই ভঙ্গিটুকু ভাল লাগল, তবে কথাটা শুনে আমারও মনে হল ভাল মন্দ সম্বন্ধে সে এই মাত্র যা বলেছে সেই উক্তি।

"লেখার চর্চাটা রেখেছেন?" মরু জিজ্ঞাসা করলে। "মনে পড়ছে আমাদের সেই সাহিত্য সভায় আপনি নিজের রচনা মাঝে মাঝে পড়েছেন।"

"আপনাদের সভা এখন যে আমাদের সভা" বলেছে তা লক্ষ্য করে বললাম, "ছদ্মনামে মাঝে মাঝে লিখি, সেই নামটা খুব বেশী পাঠকে চেনে না। দু একটি পত্রিকার সঙ্গে পরিচয় আছে, তারা ছাপে—সম্ভবত অনেক সময়ে পাতা ভরাবার জন্য। আচ্ছা, কলেজের পত্রিকায় আপনিও তো ইংরেজি কবিতা টবিতা লিখতেন, তাই না?"

মরু হেসে বললে, "কবিতার খাতা খুঁজলে হয়তো এখনও পাওয়া যাবে। আচ্ছা আপনার লেখা বই যদি কিছু সঙ্গে থাকে তো পড়তে দিন না।"

'বই কিছু নেই, কেউ ছাপতে রাজী হয় নি—যাকে বলে পপুলার লেখক আমি তা নই। লেখার চেয়ে পড়াই বেশী ভাল লাগে। জীবন সংক্রিপ্ত পাঠ্য অনুবাদ।"

"এবং 'you can never be wise unless you love reading' বলেছেন ডঃ জনসন।" বলে সে হাসল।

এমনি করে কুয়াশাঘন অলস দ্বিপ্রহর গড়িয়ে চলল—পাঠ্য বস্তু সম্বন্ধে পরস্পরের রুচি, কার প্রিয় লেখক কে, আমি কি বিষয়ে লিখি এই সব আলোচনায়। অনেক সাধারণ আবিষ্কার হল। বাগানে টিপ টিপ জলের শব্দ—বৃষ্টি নয়, শিশির ঝরছে গাছের পাতা থেকে।

চা খেয়ে যেতে বলেছিল মরু, কিন্তু তার আগেই উঠে পড়লাম। বললে, "আরও কিছু দিন আছেন তো?"

"হ্যাঁ, সপ্তাহ দুই।"

"আবার আসবেন আশা করি।"

"নিশ্চয়", বলে ঢুকে পড়লাম কুয়াশার সমুদ্রে। ঠাণ্ডার আঙুলগুলি জামার ফাঁক দিয়ে ঢুকে গা কাঁপিয়ে দিল—বেশ লাগল তা।

সে দিন থেকে আকাশের মেজাজ ফিরল, দু দিন পর্যন্ত ভাল করে রোদ উঠল না, থেকে থেকে বৃষ্টি। সারা দিন ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগে না, বর্ষাতি চাপিয়ে বেড়াতে বার হই। তৃতীয় দিন সন্ধ্যায় চলার পথে বেশ চেপে জল এল, হোটেল প্রায় এক মাইল ঘুরে, গুরুতারা অনেকটা কাছে। সেখানে আশ্রয় নিলাম, যদিও এত তাড়াতাড়ি আবার হানা দেওয়ার ঠিক ইচ্ছা ছিল না।

মরু বোধ হয় রাস্তা ঘরে ছিল, বেরিয়ে এসে প্রসন্ন মুখে অভ্যর্থনা করলে। আজ বাইরে বসবার দিন নয়, কয়েক দিন বৃষ্টি হয়ে শীতও বেশ পড়েছে। খাওয়ার ঘর পেরিয়ে বসার ঘরের অন্তরঙ্গ আরামে ঢুকে মনে হল যেন বাইরের জগৎটাকে বহু দূরে ফেলে এসেছি। ঘর খুব বড় নয়, এক দিকে নিচু করে আগুন জ্বলছে, কাঁচের জানলার গায়ে-টানা ভারী পরদা মোটা মোটা ভাঁজে ঝুলছে, কার্পেটের উপর পুরু গদি-আঁটা সোফা, সোটা কয়েক আলমারিতে বই ও নানা রকম টুকিটাকি সাজানো, দেয়ালে আছে কিছু হাতে আঁকা ছবি, কিন্তু তার অধিকাংশেই ঝাঁকা।

ঘরের এক ধারে আলো মেজেতে রাখা এক লম্বা বাতি, তার নিচে বসে রুবি পড়াশুনায় রত। আমরা ঢুকতে মরু আর একটা মৃদু আলো জ্বেলে দিলে।

সে দিন চা পরিবেশন করলে রুবি, তার পর বই খাতা গুটিয়ে নিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল পড়তে। বাইরে বন বন বৃষ্টির একটানা সুর, জানলার কাছে গিয়ে পরদা সরিয়ে দেখি চরাচর নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত।

"কি বিপদে পড়া গেল, ঘরে ফিরব কি করে। তার চেয়েও খারাপ লাগছে আপনাকে ব্যস্ত করে।"

"কিছু বিপদ নয়, বৃষ্টি হঠাৎ এক সময়ে থেমে যাবে। আর এখানে কলকাতার মত জল দাঁড়ায় না, দেখতে দেখতে নেমে যায়। এখন তো সবে ছ'টা।"

ঘুরে ঘুরে ঘরের সাজ সজ্জা দেখতে দেখতে, আলমারি খুলে বই পত্রিকা ঘাঁটতে ঘাঁটতে আলাপ চলল। এত কাল আমাদের মধ্যে একটুখানি জড়তা থেকেছে, কখন যে তা একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল টেরও পেলাম না। আলাপের সূত্র সম্পূর্ণ অনুধাবন করবার দরকার নেই, ঘণ্টা দুয়েক বাদ দেওয়া চলে। আগুনের পাশে মুখোমুখি বসে আমরা, আর এক বার কফি এসেছে, তার খালি পাত্র পড়ে আছে পাশে, রুবি তার খাওয়া সেরে বিদায় নিয়ে শুতে চলে গিয়েছে। আকাশে মাঝে মাঝে গুম গুম আওয়াজ, তাতে অল্প অল্প ঝাঁপছে কাঁচের জানলা। বৃষ্টি কখনও কমছে, কখনও বাড়ছে।....

মরু বলছে তার ব্যর্থ বিবাহের কাহিনী। স্বামী হয়েই বারীন অন্য মূর্তি ধরেছিল, প্রত্যেক পুরুষের প্রতি তার অন্ধ সন্দেহের ফলে অশেষ যন্ত্রণা সইতে হয়েছে মরুর, বারীনও সুখী হয় নি এক দিনের জন্য। তার মৃত্যুর পর সে ঠিক করেছিল আর বিয়ে করবে না, পুরনো কলেজে আবার কাজও নিয়েছিল। কিছু দিন পরে জ্যোতির্ময়ের সঙ্গে আলাপ, তার স্বভাব বারীনের সম্পূর্ণ বিপরীত—সর্বদা হাসিখুশী, সব কিছুতে অফুরন্ত উৎসাহ। শুধু একটা দোষ, একই সঙ্গে একাধিক সহচরী তার চাই। বিয়ের পরেও। রাত্রে চোখের জল ফেলে ক্ষমা চাইত, আবার পর দিনই ছুটত তাদের পিছনে।

খানিকটা নীরবতার পর মরু বলছে কাঁপা গলায়, "আজ

ভেবে পাই না কেন এদের বিয়ে করেছিলাম, কি দেখেছিলাম এদের মধ্যে! দু দু বার একই ভুল কেন করলাম! বিয়ের প্রস্তাব তো অনেকেই করেছিল…আপনিও করেছিলেন। আমাদের দু জনেরই পড়াশুনার হাত, ক্লাসিকাল সাহিত্যের আমরা অনুরাগী, লেখারও ঝোঁক আছে…অথচ দেখুন আজ আমাদের একই অবস্থা—দুইই নিঃসঙ্গ…"

মরু থেমে গেল। বুঝতে পারছি একটা কিছু বলা দরকার, কিন্তু হঠাৎ আবার খানিকটা জড়তা এসে জমা হয়েছে।

বেশ কিছুটা পরে সে বললে, "মাপ করবেন, এ সব কথা আমার বলা উচিত হয় নি। আপনার স্ত্রীর স্মৃতি নিশ্চয়…"

"না না, তা নয়—যদি জানতে চান, বিবাহিত জীবনে আমিও সুখ হই নি।"

তার পর এক সময়ে খেয়াল হল বৃষ্টি থেমে গিয়েছে, ঘন নিঃসঙ্গতার মধ্যে শোনা যাচ্ছে এক চঞ্চল পাহাড়ী ঝরনার অস্পষ্ট গুঞ্জন। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখি ন'টা বাজে, তাড়াতাড়ি উঠে বললাম, "অনেক রাত হয়ে গেল, আজ চলি—আপনাকে অনেকটা বিব্রত করলাম।

মরু বললে, "খেয়ে যাবেন নাকি? আমার কোনও অসুবিধা নেই।"

"না, আজ থাক।"

আমার সঙ্গে সে বাইরে এসে দাঁড়াল। কেমন এক গাম্ভীর্যের ভাব ঘিরে আছে তাকে, শান্ত আকাশটার মতই। আমারও মন বিমর্ষ হয়ে এল। পকেট থেকে টর্চ বার করে রাস্তায় নেমে পড়লাম।

সে রাত্রে ভাল ঘুম হয় নি। পর দিন সকালে ঝর ঝর বৃষ্টি পড়ে যাচ্ছে। চা খেয়ে নিজের ঘরে ক্যানভাসের চেয়ারে বসে আছি বিছানায় পা তুলে জানালার দিকে মুখ করে। খোলা আকাশের পটে তিনটি লম্বা লম্বা চিনার গাছ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে।

আগের সন্ধ্যার মরুর কথাগুলিই মনে ঘোরা ফেরা করছে। বাঙালী মেয়ে এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর বিয়ের প্রস্তাব করতে পারে না। এও বুঝতে অসুবিধা হয় না যে বেশী বয়সে সে তার একলা জীবনের সঙ্গী খুঁজছে। যে একদা বন্ধু থাকতে চেয়েছিল এখন সেই স্ত্রী হতে চায়।…

কিন্তু এই কথা ভেবে মনে মনে খুব আত্মপ্রসাদ পেলাম না। আমিই বা কি তার স্বামী হতে চেয়েছিলাম? তার পিছনে কতখানি ছিল লোককে চমক দেওয়ার ইচ্ছা, দুর্লভ পুরস্কার হাত করবার অহংকার—এক কথায় মোহাবেশের ঘোর? এই প্রশ্ন বহু বছর আগেই মনে জেগেছে, এবং শান্ত হয়ে বসে নিজের মধ্যে তার জবাবও পেয়েছি, আজ যেমন পাচ্ছি। সুতরাং প্রতিশোধের ছল এই বয়সে আমি আর উপভোগ করতে পারব না।

এই বয়সে আর নিজের জীবনটাকে নিয়ে বড় রকমের কোনও পরীক্ষা করবারও ইচ্ছা (বা সাহস?) নেই। ছোট খাটো সুখ দুঃখ মিলিয়ে দিন যাপনের এই রীতিটা অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছে, এই নতুন উদ্যমে যতখানি ক্ষতির আশঙ্কা তার তুলনায় লাভের আশা কম। কিন্তু এ সব কথা তাকে বলি কি করে?

এ বার মরু আবার আসবার আমন্ত্রণ জানায় নি। কিন্তু পরের দিনই বৃষ্টিটা যখন ধরল আমি গিয়েছি, এবং তার পরে যত দিন ছিলাম দেখা করেছি দু তিন দিন পর পর। নীরবতার অবস্থি জমতে দিই নি দু জনের মধ্যে, সহজ ভাবে সব রকম আলাপই করেছি, অবশ্য সেই বর্ষাঘন সন্ধ্যার প্রসঙ্গ আলগোছে বাঁচিয়ে। আমার মনে হয় আমার এই ব্যবহারটা সে বুঝেছে আতিথেয়তায় কোনও ত্রুটি থাকে নি তার, যদিও আগের সেই সজীবতা, প্রফুল্লতা আর দেখি নি। শেষ পর্যন্ত এক প্রচ্ছন্ন গাম্ভীর্য তাকে ঘিরে ছিল।

এ ক টি ঠো ঙ্গা

: ছোট গল্প

নীলিমা দাশগুপ্ত

ছাখো, আমার শাস্ত হতে বলে
তুমি নিজেই ঘুরে মরছো ঘুরে
তুমি নিজেই ছড়িয়ে আছো এখানে ওখানে
ছড়ানো রোদ্দুরে।—

অধ্যাপক সমর চৌধুরির আধরোট খাওয়া বন্ধ হলো। ঠোঙার লেখায় চোখ আটকে গেছে।

দোকানীর কাছ থেকে একটি বাড়তি ঠোঙা চেয়ে নিয়ে হাতের ঠোঙার আধরোটগুলি তাতে ঢেলে সমর অতি সন্তর্পণে ঠোঙার জোড়াটা ছিঁড়লো।

দোকানের সামনের বেঞ্চিতে কতগুলি পাহাড়ী বসে এক এক গেলাস গরম দুধে জিলিপী মিলিয়ে খাচ্ছিলো। ওদের পাশে বসে পড়লো।

হালুয়াই হা-হা করে লাফিয়ে উঠলো। পাহাড়ীগুলিও।

"বসো হে, বসো ভোমরা—" সমর ঠোঙার ছিন্ন কাগজটি নিয়ে ব্যস্ত।

—না, ভেতর দিকের কিছু পড়া গেলো না। সব কাটাকুটি। পাহাড়ীদের খাওয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। ওরা চলে যেতেই দোকানীকে প্রশ্ন—"এসব ঠোঙা অথবা ঠোঙার কাগজ সে কার কাছ থেকে নেয়?"

"কিছু কসুর হয়েছে?"—হালুয়াই বৃদ্ধ রামদয়াল সবিনয়ে শুধোলো। বুড়ো থাবড়ে গেছে বেশ। সমর ভাবছিলো, কী বলা যায়?…পাকাও চিন্তার পর বললো যে ওর এক বাণ্ডিল খাতা খোয়া গেছে। খুব সম্ভব চাকরটা ঘর পরিষ্কার করতে ফেলে দিয়েছে খাতার দোহা কিম্বা বেচেও দিয়ে থাকতে পারে রদ্দি-কাগজওলার কাছে। অথচ খাতাগুলো ওর দরকার। সেই খাতারই একটা কাগজ দিয়ে বানানো এই ঠোঙা…তাই—যদি কিছু খাতা এখনো উদ্ধার করা যায়…।

বৃদ্ধ রামদয়াল বেশ ভাবাচাকা খেয়ে গেলো।—সাবের ভৃত্য বেশ গোলমেলে কাজ করে বসেছে তো অথচ সিমলার ভৃত্যরা ঠিক এ ধরণের তো নয়—না বলে জিনিষ-পত্র বিক্রী করবে…আর জানকী, যে ওর কাছে ঠোঙা বেচে তার ডেরাও তো ও চেনে না, সাবকে দেখেই মালুম বহৎ ভারি আদমী, বড়া আদমী…কী ফ্যাসাদেই না পড়লাম…বুড়ো রামদয়াল এখন কী করবে?

দোকানীকে চিন্তিত দেখে সমর হেসে হেসে সমঝিয়ে দিলো—দোকানীর ভাবনার কিছু নেই। যে লোক ওকে ঠোঙা বেচে সে কোথায় থাকে শুধু সেটুকু সমর জানতে চায়—।

রামদয়াল হাতজোড় করে জানালো ঠোঙাবালী-জানকীর

ছেরা সে চেনে না, শুধু এইটুকু জানে জানকী থাকে সোনার কাইখুতে—। ছোট চাকর ঝাড়ুরাম, যে দোকানীকে সব যোগান দেয়, সে কস্ করে বলে বসলো—আমি চিনি। রাঘবলাল ঝাড়ুরামকে খুশি মুখেই ছেড়ে দিলো।

জানকীর বাড়ি পর্যন্ত ঝড়ুরামকে আসতে দেয়নি সমর, ওপরের রাস্তা থেকে বাড়িটার হদিশ পাওয়া মাত্র ঝড়ুরামকে একটা টাকা বখ্‌শিস্ দিয়ে ছেড়ে দিলো।

সারা সিমলা তুষারের আবরণে ঢাকা। এখনো তুষার পড়ছে। এই তুষার দেখতেই সিমলায় আসা সমরের। গতকাল কী দেখে এসেছে কুফ্‌রি থেকে। সিমলায় থাকার মেয়াদ আর একদিন।

কার্ট রোড ছেড়ে এবার নিচে নামলো সমর। খাড়া রাস্তাটা হুভাগ হয়ে চলে গেছে উত্তরে-পুবে। উত্তর দিকের পথের দুধারে দিনের চাল ছাওয়া ছোট ছোট খুপরি। তারই একটার সামনে এসে দাঁড়ালো।

দরজায় শব্দ করতেই মোটা হেড়ে গলার আওয়াজ, "কৌন ?" সঙ্গে সঙ্গে কপাট খুলে মোটা বলবুত চেহারার একটি পাহাড়ী সামনে এসে দাঁড়ালো এবং অবাক হয়ে গেলো এমন ধানদানী চেহারার সাহেবকে ওদের বস্তী ঘরের সামনে দাঁড়ানো দেখে। অবশ্য জানকীর চেহারার জুড়ুস আছে এবং তার কদর দিতে অনেকেই আসে ওর খুপ্‌রিতে ...কিন্তু এখন—।

দেখেই বুঝেছে সমর, এ লোকটা নিশ্চয়ই জানকীর স্বামী।—হ্যাঁ ভাই। লোকটা বিনয় বিগলিত গলায় বললো, —সাহেব ধরছেন ঠিকই, ও জানকীর ঘরবালা সাবাহু। সমরের প্রশ্নের জবাবে সাবাহু বললো,—জানকীকে ঠোঙার কাগজ সাপ্লাই করে সাবাহুই, তবে এই ঠোঙার কাগজ কোন্ বাড়ি থেকে এনেছে তা বলতে পারা ওর পক্ষে অসম্ভব। ওরা সিমলা ঘুরে পুরোনো কাগজ সংগ্রহ করে সাবাহু, [illegible] বদলি, কাল ছোটো সিমলা, পরশু বেমলো তারপর দিন কাগ্‌লি. কোনো কোনো দিন আরো ঘুরে যায়—বালুগঞ্জ নয়তো সাধার দিল ...।

জানকী এসে দাঁড়িয়েছে ইতিমধ্যে। দেখাগেলো বুদ্ধি রাখে জানকী। ঠোঙার কাগজটা উল্টে-পাল্টে দেখে বললো, "ইতো হিন্দি ভি নেই, গুরমুখি ভি নেই, বাংগালি হরফ···জী সাব্, মেহেরবানী করকে এক মিন্ট বাইরে....। অল্প পরেই একটা লম্বাটে খাতার বলাট নিয়ে জানকী ফিরে এলো। একটা কলার খাতার বলাট। বলাটখানা সমরের দিকে এগিয়ে বললো. সাহেব, এ খাতার ওপরে যে লিখা আছে তাতে কিছু পাত্তা মেলে কি না দেখো—। তারপর জানকী আরো বললো, এই ঠোঙার কাগজ যে এই খাতা থেকে ছিঁড়েছিলো তা ওর পুরা বাদুম আছে।

সবই মিললো কলার খাতার বলাটে। খুব খুশি সমর। হারানো অমূল্য নিধি ফিরে পাওয়ার মতো। জানকীর হাতে দুটো টাকা দিয়ে খাতার বলাট নিয়ে ফিরলো। কার্ট রোডে এসে রিক্‌শা দেখলো সমর। আর সঙ্গে সঙ্গে মন বদলালো।—না কাল নয়, আজই যাই—। ছোটো সিমলার দূরত্ব অবশ্য বেশি নয়, বেশ অনেকখানি এবং ছ'টা প্রায় বাজে, তবু যাওয়া চলে এখন। রিক্‌শা সাতটার আগেই পৌঁছে দেবে ওকে।

রিক্‌শাআলারা নয়ামুখ দেখে দু'টাকা হাঁকলো। অনুহাত দিলো অবিরাম তুষার পতনের।—আচ্ছা ভাই দেবো। রিক্‌শায় চেপে বললো সমর। রিক্‌শা-চালকরা 'উইলো-ভিলা' চেনে। কাজেই ভাবনা নেই কোনো। একটা সিগ্রেট ধরিয়ে সমর পা এলিয়ে দিলো।

ঘুরে পাহাড়ের গাম্ভীর্য, কাছে পাইনের কানাকানি, সিগ্রেটের ধোঁয়া, তুষারের শুভ্রতা আর পাথুরে পথের তুষারের রিম্‌ঝিম্—একটানা অল-পয়ানো শব্দ সমরের মনের

চারধারে বুঝি একটা নেশার চাকে বাঁধলো। মনের সামনে এসে দাঁড়ালো একটি স্বরণীয় দুপুর।

—পাঁচ বছর আগে। দিনটা রবিবার। যাদবপুরের ভেতর দিকে, নেতাজী কলনীতে ছোট একটি একতলার সামনে দুপুরের নিঝুম স্তব্ধতা ছিঁড়ে একটি বিস্কুট রঙের ফিয়াট গাড়ি এসে থামলো। গাড়ি চালাচ্ছিল যে, সে দ্রুত চরণে নামলো গাড়ি থেকে। গাড়ির কাচ উইয়ে, চাবি বন্ধ করে সামনে এক চোখ তাকালো তারপর বাঁধারির বেড়া ঠেলে উঠোনটুকু পেরিয়ে টালি ছাওয়া বারান্দায় এসে উঠলো। ঠিকে ঝি কুসুম বাসন মাজছিলো, উঠোনের এক কোনে, নলকূপের কাছে, সসম্ভ্রমে উঠে এলো, "কাকে চান দিদিমণি?" মেয়েটি অকারণেই রুমাল দিয়ে গলাটা চাপলো, "মিঃ চৌধুরি আছেন? অধ্যাপক চৌধুরি?"

'আছেন'—বলেই দাঁ করে পাড়-জোড়া-বেনা পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেলো কুসুম।

সমর বেরিয়ে এসে ছাত্রীকে দেখে হতবাক। বিপন্ন ও বিরক্তি মেশানো মুখের চেহারা হলো সমরের। বিরক্ত আরো এইজন্য, সমরের অবচেতন মন কিছুকাল ধরে টের পাচ্ছিলো নীনার মনের ওপর ওর প্রভাবের কথা। সচেতন মনটা অবশ্য না বোঝার ভান করে মুখ ফিরিয়েই আছে।

যে কথা সবার প্রথম মনে হলো সমরের তা এই—যা কী ভাববেন? ছাত্রছাত্রীরা কেউ বাড়ি পর্যন্ত আসতে পারে, এমন নিয়ম তো নয় সমর চৌধুরী? তাছাড়া এটা কী বাড়ি?···এতো সমর আর তার মায়ের বাবা পৈতৃক আস্তানা। শুধু সমরের দুঃসময়ের প্রাণান্ত চেষ্টার ফলে এই আস্তানা। কাকার বাড়ির স্থায়ী রাঁধুনী-গিন্নি থেকে খারিজ করিয়ে যাকে যে সময় নিরঙ্কুশ স্বাধীনতা দিতে পেরেছে সেই আনন্দে বাসস্থানের সহস্র অসুবিধে সমরের কাছে তুচ্ছ। কিন্তু সেখানে ধনী নন্দিনী নীনার পদক্ষেপ একেবারেই বে-মানান।···এখানে আসার বুদ্ধি দিলো কে নীনাকে?··· ঠিকানা দিলো কে?···

নীনাই নীরবতা ভাঙলো। "স্যার, আমাদের বাড়িতে আপনাকে আধঘণ্টার জন্য নিয়ে যেতে এসেছি—" নীনার চোখে আলো, মুখে হাসি। "কেন?" বিষ্ঠভাষী সমর স্বভাব বিরুদ্ধ ভঙ্গিতে কণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ করলো এবং ভ্রূরেখা বঙ্কিম করলো, "তুমি বোধহয় জানোনা, আমি কারো বাড়ি যাইনে—" "জানি স্যার," আরেকবার গলায় রুমাল চাপালো নীনা, "কিন্তু" নীনার কণ্ঠস্বরে অস্ফুট মিনতি, "বিশেষ প্রয়োজন আপনি না করবেন না বাবা সম্প্রতি হার্টের রোগে ভুগে উঠলেন না হলে বাবাই আসতেন—" "কিন্তু প্রয়োজনটা কী?" একটা বিরক্তিকর বিরূপতায় মেজাজ বিগড়ালো সমরের। নীরস কাঠ কাঠ গলায় বললো, "আমি প্রাইভেট টুশানি করিনে—" "না, না, সেজন্য নয়—" সমরের শক্ত চিবুকের দিকে তাকিয়ে নীনা এদিক সেদিক অসহায় চোখ ফেললো।

সমর খুশি বা একটু লজ্জিত হলো।—বসতে বলা উচিৎ ছিলো। কুসুমকে ডেকে দুটো বেতের চেয়ার আনতে বললো। চেয়ার এলো। বসলো দুজনে। ব্যাপারটা কী—খোলাখুলি জানতে চাইলো সমর। সপ্রতিভ নীনা যেন কথা পাচ্ছেনা। বারকয়েক চোখ তুলে তাকালো, ওষ্ঠ স্ফুরিত হলো; আবার চোখ নামলো, ঠোঁট বন্ধ হলো। অনেকটা সময় নিলো নীনা। তারপর কুণ্ঠিত গলায় জড়িয়ে জড়িয়ে কোনোমতে জানালো যেন আবেদন জানানোর মতো।—এম. এ. টা নীনা পড়তে চায় ইউ. কে. তে গিয়ে। নীনার একলা যাবার সাহস নেই, সমরকে নিয়ে যাবে। সমর রিসার্চ করবে আর নীনা পড়বে এ ইচ্ছে শুধু নীনার নয়, নীনার বাবা বিমল প্রসাদেরও অনেকদিনের একান্ত ইচ্ছে।··

বিমূঢ় সমর স্তব্ধ বিস্ময়ে নীনার মুখের দিকে চেয়ে চুপ-চাপ কথাগুলো শুনলো। ক্রমশঃ মুখের রং পাল্টাচ্ছিলো

নীনার। সমর দৃষ্টি সরিয়ে সামনের বাথারির বেড়াটার গায়ে রাখলো। নিঃশব্দে পাঁচ মিনিট পেরুলো। "তোমার বাবা আমাকে চিনলেন কী করে?"

নিমেষে সমর রক্ত বুঝি মুখে উঠে এলো নীনার। কয়েক মুহূর্ত ইতস্তত:। তারপর, "আমার মনে হয় পেরেট থেকে—" কথার পেছনে যা অব্যক্ত, সেটুকু নীনার মুখের রংই বুঝিয়ে দিচ্ছে।

সমস্ত জিজ্ঞাসা স্তব্ধ সমরের। যেন বাধা ঝিম ঝিম করা আবহাওয়া।—কখনো যে এ সমস্যার সম্মুখীন হবে, কল্পনার বাইরে।

চেয়ারের ভেতরে নড়ে চড়ে সমর সোজা হয়ে বসলো। নীনার আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে কিভাবে এখন নীনার সঙ্গে কথাবার্তা বলা যায় বুঝতে পারছিলো না সে। অথচ এ ব্যাপারের শেষ এখুনি, আজই হওয়া চাই ··

"শোনো নীনা—" ধীর সুস্পষ্ট গলা সমরের, "তুমি তোমরা যা ভেবেছো তা নয়. ইউ. কে. বাবার স্কলারশিপ আমি স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিয়েছি অনিরুদ্ধকে, অর্থাভাবের জন্য নয়—প্যারেলমানি আমি যোগাড় করতে পারতাম ···" এক নিশ্বাস থেমে গেলো. "আমি আমার মাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না···আমার মায়ের কথা তোমাদের ঠিকমতো বোঝাতে পারবো না—" আবার একমুহূর্ত থমকালো সমর, "আমাকে মানুষ করার জন্য, ভয়াবহ দারিদ্র্যের সঙ্গে, আমার মা কী যে অমানুষিক প্রাণান্ত সংগ্রাম করেছেন, অনাদর আর অসম্মানের স্তূপের মধ্যে জীর্ণ হয়ে আমার মা—" সমর থেমে গেলো। ভাবলো, এসব কী বলছে সে নীনাকে। নীনার কথার আরো সহজ উত্তর ছিলো. আছে—। অসমর্থনের ভঙ্গিতে সমর বারে বারে মাথা নাড়লো।

"তুমি যে কল্পনা করতে পারো নীনা, যে আবহাওয়ায় মানুষ হয়েছো—তুমি এসব কিছুতেই বুঝবে না···ব্যাথা করে [illegible] না—"

নীনা স্বচ্ছমুখে হাসলো। দুটি আয়ত টলটলে চোখ তুলে সমরের মুখের ওপর রাখলো. "মাকেও আমরা নিয়ে যাবো ইউ. কে. তে—" সমর হাসবে না গম্ভীর হবে ভেবে পেলো না। বিস্ময়ের ধাক্কায় দৃষ্টি সরে এসেছে বাথারির বেড়া থেকে। নীনার সঙ্গে ছোট একটুখানি চোখাচোখি। —মেয়েদের চোখ কী আশ্চর্য হতে পারে—চকিতে চোখ সরিয়ে নিয়ে ভাবলো সমর।

লেখন দেবার খরটাকে আয়ত্তে আনতে সমরকে সামান্য অপেক্ষা করতে হলো। "শোনো নীনা, দুঃখ পেওনা কিন্তু—" হাসতে চেষ্টা করেও শেষে গম্ভীর হলো সমর, "আবেগে অন্যের উপকার করার ইচ্ছে ধনীদের প্রচণ্ড একটা বিলাস। আবেগের বন্যা যাকে মাঝে ভাসিয়ে নিয়ে যায় তাদের। আবেগ থামলে আফশোসের কিন্তু আর অন্ত থাকে না—সে এক বিড়ম্বনা। সে ভুল করো না তুমি···এ কী পাগলামী চেপেছে তোমার মাথায়! তাছাড়া তোমাদের এই দান গ্রহণ করার মাথা সমর চৌধুরির নেই · সত্যি বলতে কী—ধনীদের অতি সহানুভূতির ধাক্কা আমার খাওয়া হয় না···তাদের তুষি-সিক্ত দৃষ্টির আওতার বাইরে থাকতেই আমি চিরকাল ভাল-বাসি—" শেষের কথাটা যেন সমরের ইচ্ছার বিরুদ্ধে আপনিই বেরিয়ে গেলো মুখ দিয়ে, বলার ইচ্ছে ছিলো না। কয়েক মুহূর্ত অখণ্ড নীরবতা। "···আমাকে মাপ কর তুমি, তোমার বাবাকেও ক্ষমা করতে বলো আমাকে।"

মুখের উজ্জ্বল আলোটা নিভে গেছে নীনার। হাসিও। অশ্রুবিন্দুকে আড়াল করতে চোখ নামিয়ে নিলো। "দেখুন, আপনি—" শেষ পর্যন্ত কিছু আর বলতে পারলো না সে। মুখ ঘুরিয়ে উঠে দাঁড়ালো, এক মুহূর্তের দ্বিধা, তারপরই বারান্দা থেকে নেমে, উঠোনটুকু পেরিয়ে, বাথারির বেড়া ঠেলে বেরিয়ে এলো। পেছনে সমর নীরব, নিশ্চল হয়ে খানুর মতো বসে রইলো চেয়ারে। সাধারণ শিষ্টাচার বোধে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিতেও বিস্মৃত হলো। ওর মনে হতে

লাগলো, এখন যে কোনো মুহূর্তে ওর বেলাকটা বুঝি অঘটন ঘটাতে পারে। ঠিক একই জায়গায় একইভাবে একেবারে চুপ হয়ে অনেকক্ষণ বসে রইলো সমর। মিনিট পরেই অনেক তলায় কতগুলি ছোট উঠলো। ছোটো ছোটো, যা ওর নিজের কাছেও বুঝি অপরিচিত। তাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে, বসে বসে বড়মানুষি খেয়ালিপনা বিশ্লেষণ করতে করতে শেষে ভাবলো, মানুষের মন বড় অদ্ভুত, তার রহস্যের বুঝি কোনোখানে সীমা নেই।…

আর আশ্চর্য! মা মৃত্যুর সময় কিনা এই নীনার কথাই বারে বারে বললেন। "হ্যাঁরে সমু, সেই যে একটি মেয়ে পাড়ি চেপে এসেছিলো এখানে,—সে কোথায় রে?"

"কেন মা?"

"তিনবছর হয়ে গেলো আর একদিনও এলোনা তো?"

"তিনবছরের হিসেবও তুমি রেখেছো?"

"রেখেছি বাবা · রোজ তার আসার পথ চেয়ে থেকেছি আমি…আমাদের বারান্দা আলো করে বসেছিলো সে—" ছোট একটা শ্বাসফেললেন মা। মা'র মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে সমর বললো, "ওরা আলোর-জগতেরই মানুষ মা, আমাদের ওদের কথা—" ছেলের কথা মা শেষ করতে দেননি, "আর তুই কী অন্ধকার জগতের নাকি? তোর জগৎ যদি মাণিক্যের জগৎ—" কথা শেষ করে মা স্তিমিত চোখ দুটো টান করে চেয়েছিলেন তাঁর পরম রূপবান—ব্যক্তিত্বে ভরপুর পুত্রের দিকে। তারপর বলেছিলেন, "ঐ মেয়েটি আমার সমুর বউ হলে আমার বড় আহ্লাদ হতো।"—সেইকালে মা এই কথা বলছেন। মা কী সেদিন শুনেছেন নীনার কথা? "আচ্ছা মা, তাই হবে—" মা'র উত্তেজনা শান্ত করতে, সমর মা'র পিঠে-মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললো এবং ভাল করেই লক্ষ্য করলো সে মা'র পাংশু মুখের অপরিসীম খুশি।……

রিক্‌শাওয়ালাদের আস্তানায়, দিঘলায় চারজনে একটা রিক্‌শা টানে, সমর সচেতন হয়ে রিক্‌শা থেকে নামলো। ভাড়া চুকিয়ে দিলো।

সারাদিন যেমনি মতো বরফ পড়ছে। আর তার সঙ্গে ঝুর ঝুর করে বৃষ্টি। পথ নির্জন। রাস্তার আলোগুলো চারপাশে জমা বরফের ভেতরে যেন ঘুমুচ্ছে চোখ বার করে রয়েছে। আর শুধু বাতাসের শব্দ।

উইলো-ভিলার গেট পর্যন্ত ছোটো পথটা ঢালু হয়ে নেমেছে। পথের দুপাশে ফুলের বাগান। ইরিন-লিলি আর ক্যালেণ্ডুলা ছাড়া এখন আর কোনো ফুল নেই বাগানে। বরফের চাদর সরিয়ে উঁকি ঝুঁকি মারছে লিলি, ক্যালেণ্ডুলা আর নানারঙের কিছু হলদে-ছোপ ধরা পাতা।

ছোটো ঢালু পথ বেয়ে, গেট খুলে সমর ভেতরে ঢুকলো। কলিং বেলের বোতামে আঙুল রেখে এক মুহূর্ত থামলো, তারপরই বুড়ো আঙুলের চাপ পড়লো বোতামে।

প্রায় তখুনি দরজা খুলে ঠাকুমার বয়সী এক আয়া তোবড়ানো মুখটে মুখ বারকরলো। "সাহেব আছেন? মিঃ রায়?"

আয়া চোখ কুঁচকে মানুষটার আপাদ মস্তক দেখে নিলো একবার। তারপর সসম্ভ্রমে দেলাম জানিয়ে বললে, "সাব্, এখানে নেই, দিল্লীতে—" সমর জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলো—মিস রায় আছেন—। তার আগেই ভেতর থেকে নারী কণ্ঠ, "আয়া কৌন রে? ডাকদার সাব্…?" "নেহি মিনি বাবা, ইন্‌কো তো মাঙ্গ…" বলতে বলতে বুড়ি পিঠ-বেঁকিয়ে কসিডোর পেরিয়ে বাঁ দিকে বাঁক নিলো। আর সমর মনের বিচিত্র চাহিদায়, সমস্ত এটিকেট ভুলে নিঃশব্দে অনুসরণ করলো তাকে। যেতে যেতে সুসজ্জিত ড্রইংরুম চোখে পড়লো। মনেও এলোনা সেখানে বসে অপেক্ষা করার কথা। তখন কেবল মনে হতে লাগলো—নীনা যেখানে আছে, ও

সেখানে আছে এবং এখন এই মুহূর্তে ও—নীনার কাছাকাছি।

বুড়ি ভারি পর্দা ঠেলে ঘরে ঢুকে গেছে। পর্দার বাইরে সমর। বুড়ি পেশ করলো, এ সাহেবকে সে কখনো দেখেনি—কলকাতায় না, দিল্লীতে না, সিমলাতে না—।

"তা না দেখেছিস, নাই দেখলি, বলতে বলেছিস তো!" বুড়ি ঘাড় নাড়লো। "সে কী! যা শিগ্‌গির, ড্রইংরুমে নিয়ে গিয়ে বসা···আর জিজ্ঞেস করে আয় প্রয়োজনটা কী! কাকে চাই···আর নামটাও জেনে আসবি—" "নাম সমর চৌধুরি, আসতে পারি ভেতরে?···" জবাবের অপেক্ষা না করেই, নীনাকে একেবারে অবাক করে দিয়ে সমর পর্দা ঠেলে ভেতরে ঢুকলো। আকস্মিকতে এমন একটি আশ্চর্য ঘটনার জন্য প্রস্তুত ছিলোনা নীনা। আনন্দের আতিশয্যে এটিকেট ভুললো নীনাও। পেপ ও কম্বলের আবরণ সরিয়ে মস্ত একটা লাফ দিলো, "হাল্লো··" বলেই উচ্ছ্বাস সামলালো, "আপনি!···আমার কাছে যেন পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য বলে মনে হচ্ছে—আসুন···আসুন" চকিতে সমরের মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে নীনা বললো, "চলুন, ড্রইংরুমে গিয়ে বসি—" উল্লাসের চাঞ্চল্যে নীনা উদ্ভাসিত।

"যদি অপরাধ না নেন—" সমর নীনার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো একটা, "অবশ্য আপনার যদি অসুবিধে না হয়, তাহলে এ ঘরেই বসি না কেন, আর আপনি যদি দ্রুত লেপের আশ্রয়ে যান, তাহলে আমি অত্যন্ত খুশি হবো।"

"কী আশ্চর্য! অসুবিধে কেন হবে?—" দুটো চেয়ার টেনে চিমনীর আগুনের সামনে এনে নীনা বললো, "বসুন," সমর বসলো, নীনাও বসলো।

"আপনার অসুখ, বলাটা ঠিক হলোনা—"

"অসুখ না ছাই—" নীনা হেসে ফেললো, "মাসির সামনে একটি হাঁচি দিয়েছি কী হয়ে গেলো আমার, সঙ্গে সঙ্গে আমায় ঢুকতে হবে, ডাক্তারকে কল্ দিতে হবে। কিন্তু আমার ভারি মজা লাগছে—" নীনার দুই চোখে একটুকরো সকৌতুক লজ্জা, "আমাকে আপনি করে বলছেন কেন?" বুড়ির দিকে ঘাড় ফেরালো অনির্বচনীয় কোনো আনন্দের আভাসে—নীনার মিষ্টি মুখখানা যেন পদ্ম ফুলের মতো ফুটে উঠলো। নীনা, "মাসি, দাঁড়িয়ে দেখছিস কী হা করে" "খানাকামরায় গিয়ে বাহাদুর সিংকে বল, রাতের খানা আজ খুব অবশ্য হওয়া চাই—খুব বড় মেহমান এসেছে—আর এখন দুই কফি আর পাকোড়া দিতে বল··যা—" মাসির বুড়ো চোখও দেখতে জানে। এক বুক খুশি নিয়ে ঘর ছেড়ে চলে গেলো সে।

"তারপর বলুন আপনার সব খবর···সিমলায় কবে এলেন?" চাঞ্চল্য চেপে নীনার অটুট সহজ হবার চেষ্টা দেখে সমর হাসছে অল্প অল্প।

"তোমার খবর আগে বলো শুনি—সে অজই তো অসময়ে বন্ধকের ভেতরে সমর চৌধুরির এতদূর আসা—" দৃষ্টিটাকে নীনার মুখের ওপর ধরে রাখলো সমর।

"আমার খবর—" সমরের মুখের দিকে তাকিয়ে নীনা যেন অধিকার করতে চাইলো কিছু। কোলের ওপর দুহাত রেখে টান ধরে বললো, "তার পরেই তো বাবাকে নিয়ে বিদেশে চলে যাই আমেন বোধ হয়—" 'আমি"

"বাবার শরীরে অনেক গোলমাল শুরু হয়েছিলো, ডাক্তারকার চিকিৎসায় বাবা বেশ ভালই ছিলেন। আমিও নিশ্চিন্ত হয়ে এম. এ পড়ায় মন দিলুম। এম, এ-র পর বাবার ইচ্ছের রিসার্চ শুরু করতে হলো। আমার তখন আর পড়াশুনোতে মন ছিলো না, আদৌ ভাল লাগছিলো না—। বাবার তাগিদে লাগলুম রিসার্চের পেছনে। তারপর মনও বসলো। রিসার্চের কাজ প্রায় শেষ, থিসিসের একটা অংশে সাবমিট হয়েছে, ভাইবা হয়ে গেছে···হঠাৎ বাবার বুকে আবার ব্যথা হলো। পরদিনই বাবা এয়ার প্যাসেজ বুক করলেন। বন্ধুতে হলে যদেশেই বরবেন···তাছাড়া অনেক কাজ বাকি বাবা

আছে—" এক চুমকি সমরের মুখের চেহারা দেখে নিয়ে মুখে নিরীহ অভিব্যক্তি ফোটালো নীনা "এবার আর ধোকা খেকে নয় নিজেই যাবেন সমর চৌধুরীর মায়ের কাছে···বিদেশে গিয়েও কী মিঃ বাসুর শক্তি ছিলো জানি, যার ওপরে বিশেষ দৃষ্টি—সমানে তাঁর খোঁজ খবর রেখেছেন ~" নীনা মুখ নামিয়ে হাসি লুকোলো, "সেই মানুষটি নাকি সাধারণ নন, সাধারণ মানুষের সঙ্গে এত বেশী তফাৎ তাঁর - তাঁকে ভোলা কিছুতেই সম্ভব হয়নি বহুদর্শী মিঃ বাসুর" —মুখ তুলেই নীনা ভয়ানক চমকালো। যেন সমস্ত শক্তি দিয়ে উদগত অশ্রুকে ঠেকিয়ে রেখেছে সমর।

"কী···কী হয়েছে ?"

"মা নেই—দুবছরের ওপর —" সমর আর কথা শেষ করতে পারছে।

"মা নেই !···আমি যে—" নীনার মুখ, হঠাৎ আকাশে মেঘ করার মতো অন্ধকার হয়ে গেলো। ভারি কণ্ঠস্বর শোনা গেলো নীনার, "মায়ের আদর পাওয়া আমার ভাগ্যে নেই, আমি সেই ছেলেবেলায় " গলার স্বর ভেঙে বুজে গেলো।

বাহাদুর সিং এলো কফি আর পাকোড়া নিয়ে। দুজনের মাঝখানে ট্রে রেখে ট্রে নামিয়ে, নীনার দিকে চেয়ে মৃদু-স্বরে জিজ্ঞেস করলো, "রাত্রের খানা পুরো ইংলিশ হবে না মেমসাব ?"

"পুরোপুরি ইংলিশ ডিনই হোক···আপনি কী খাবেন ?" নিজে সহজ হয়ে নীনা সহজ করতে চাইলো সমরকে। নীনার কথার জবাবে সমর ঘাড় হেলালো। অর্থাৎ তাই হোক।

কফির পেয়ালা দাঁতে করে বসে আছে দুজনে। একেবারে চুপচাপ বসে আছে। নীরবতা যখন ক্রমশঃ ভারি হয়ে উঠলো, তখন সমর জোর করে হাসলো নীনার দিকে চেয়ে। হাসিটা আড়ষ্ট হাসি। তারপর সমর জানতে চাইলো, নীনা এখন শিমলায় একা এসেছে কেন ?

"—বাড়িটা ভাড়া খাবে দেবে, পাঞ্জাব গভর্নমেণ্ট ক্রিশ্চিয়ানের নোটিশ পাঠিয়েছে। ওদের নাকি বাড়ির অর্ধেক হয়ে পড়েছে, সব অফিসারদের বাড়ি দিতে পারছে না অতএব হয় ভাড়া দাও না হলে বিক্রী করো। সবে। দেড়মাস হলো এসেছি। দিল্লীতে থাকবো না কলকাতা থাকবো, এই নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে, এর মধ্যে এই চিঠি বাবার এখন পাহাড়ে আসা বারণ, তাই আমাকেই আসা হলো কয়সালা করতে—"

"হলো কয়সালা ?"

"হলো —" সমরকে সহজ দেখে নীনা হাসতে গিয়ে বিষণ্ণ হাসির বদলে দুচোখ ছাপিয়ে জল গড়ালো। সমর দেখলো, নীনা কফির কাপ তুললো, ঠোঁটে ছোঁয়ালো আবার নামিয়ে রাখলো। ঠোঁট কাঁপছে, হাত কাঁপছে। "মা শেষ সময়ে কী বলেছিলেন জানো—" সামান্য ঝুঁকে নীনার কম্পমান হাত সবল মুঠিতে তুলে নিলো, "বলেছিলেন গাড়ি করে সেই যে আলোকরা মেয়েটি আমাদের বাড়ি এ ছিলো, সে যদি আমার সমুর বউ হতো, আমার বড় আশা হতো—আমি রোজ তার আসার পথ চেয়ে থাকি—"

"মা তুলছেন এ কথা—" নীনা চোখ তুলতেই সমর চোখের ওপর এসে পড়লো।

নীনার চোখের ছবি সমরকে আবার স্মরণ করালো বছর আটেকের একটি মুখচোরা মেয়েকে। সমর বিস্ময়ে অ জানলো, সেই ছবির রাটি ওর মনের পর্দায় হুবহু তেমনি র —এতটুকু ফিকে হয়নি।

সমরের স্পর্শের উষ্ণতা নীনার সব কথার ঘুড়ি ছি দিলো। নীনা হাসিমুখে তাকালো, "আমাদের বাড়ি কী চিনলেন ? কী করে জানলেন আমি এখন শিমলাতে— ?

"একটি চোরা থেকে—" সমর মুখটিপে হাসলো। প থেকে ছিন্ন চোরাটা বার করে দেখালো, "তুমি আমাকে লিখে একখানা দীর্ঘপত্র দিয়েছিলে, মনে আছে ?"

"মনে আছে।"

"কিছু মনে করেনা নীনা, তোমার বাংলা-লেখার বাধাধরি আছে—"

খিল খিল করে নীনা হেসে উঠলো, "জানি, কাগের ঠ্যাঙ বকের ঠ্যাঙ তো—"

"অবিকল—, বিশেষ করে ই-কার আর উ-কার নিয়ে কী ভয়ানক মেহনত যে কর তুমি···, ঠোঙার ভ'রে আখরোট খেতে দিয়েছি, বরফে নাকি আখরোট খেলে শরীর গরম হয় —তা ঐ ই-কার আর উ-কার চোখে পড়তেই, চোখের মনি স্থির হয়ে দাঁড়ালো—।

পরের বৃত্তান্তটুকু সবিস্তারে বললো শঙ্কর। বাঁ হাত ঢুকিয়ে খাতার বলাটও পকেট থেকে বার করে দেখালো, যাতে নীনার নাম ও বাড়ির ঠিকানা আছে। হাসির তোড়ে আঁচল তুলে মুখ ঢেপেছে নীনা, "আজিকে ছোটা বখ্‌শিস করতে হবে— ঘর পরিষ্কার করতে, আমার পুরনো খাতাপত্তর বিক্রী করার জন্ত সেদিন কী কম বকুনি খেয়েছে আমার কাছে—"

বলাট রেখে, ছেঁড়া ঠোঙাটা উঁচু করে ধরলো শঙ্কর.

"এটিকে কী ভাবে রাখবো তাই ভাবছি—রূপোর ফ্রেম? না—"

ততক্ষণে ঠোঙাটা এসে গেছে নীনার বাঁ-হাতে। মুঠির চাপে কলা পাকিয়ে পুলকিত কৌতুকে নীনা বললো, "রূপোর ফ্রেম? ছিঃ···, রূপো তো সামান্ত ধাতু, বলো প্ল্যাটিনাম—"

"কিন্তু, নীনা বাসুর কবিতা লেখার ঝোঁক চাপলো কবে থেকে?"

"সেই যবে—" নীনা শঙ্করের চোখে চোখ রেখে ভুবন-মোহিনী হাসি হাসলো।

Acetic Acid Glacial 98/100% Purity

Zinc Dust 170 Mesh

Formaldehyde, Dibutyl Phthalate, Di-Oetyl Phthalate, Copper Sulphate, Sodium Bichromate, Pott Bichromate, Iso-Butyl Alcohol, Pthalic Anhydride, Ethyl Acetate, Methyl Salicylate & Other Chemicals And Solvents.

● **AVAILABLE READY STOCKS** ●

From

Western Commercial Corporation

3, BENTINCK STREET,

CALCUTTA-1.

23-3748
Office 23-5733
23-7540
Resi 47-2817
47-5429

Telegram : "VALLACO"

বৈরাগ্য

সুবোধ বসু

আশ্চর্যের কথা সন্দেহ নেই। টুলীদি গীতা পড়ছেন। এ কি বিশ্বেস করার মতো কথা! কিন্তু তিন মাস পরে কলকাতায় ফিরে যে চাঞ্চল্যকর সংবাদ প্রথম শুনতে হলো তা এই।

সুলতা বললে, 'আরে না, মোটেই বানিয়ে বলছি না। এ স্বয়ং টুলীদির নিজের বিনো-ঝির কাছ থেকে শোনা। সে এখন টুলীদির চাকরি ছেড়ে সবিতাদির দেওরের ফ্ল্যাটের পাশের ফ্ল্যাটের সেনসাহেবের বাড়ি কাজ করছে।

নিউ মার্কেটের ফুলের পলিতে এষাদির সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনি কুশলপ্রশ্ন সেরে সেকেণ্ডে সেরে বললেন, 'খবর শুনিস নি বুঝি, টুলী গীতাপাঠ শুরু করেছে। রোজ সকাল বেলায় পড়ে।'

'না, বিশ্বেস করি না। এ অসম্ভব।' খবরটা কতটা খাঁটি তা যাচাই করবার জন্ত বেশ জোর দিয়েই অবিশ্বাস জানালাম।

'বলিস কি তুই। এ যে সবাই জেনে গিয়েছে। সত্যি তিন মাস কলকাতায় ছিলিনে, তা স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে। রোজ সকালে চান করে', পজার জল ছিটিয়ে আসন পেতে নিয়মিত গীতা পাঠ করছে টুলী। পার্টিতে পিকনিকে তার দেখাই পাওয়া যাচ্ছে না।'

মনোরমাদিও তাই বললেন। "কি হলো বলতো তোদের টুলীদির। শুনছি সে নাকি আজকাল গীতা পাঠ করছে। স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া টগড়া হয়ে যায় নি তো?"

বলতে পারতাম, স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া হলে সমাজের মেয়েরা বাড়ীতে বসে গীতা পাঠ করে না, পণ্ডিচেরী আশ্রমে চলে যায়। কিন্তু তা বলা গেল না। মনোরমাদির এক বোন-ঝি মাত্র কয়েকদিন আগে পণ্ডিচেরীবাসী হয়েছেন একই কারণে।

'টুলীদির কথার ওপর কথা বলবার সাহস কার? ঝগড়া হবার উপায় কি?' আমি সবিনয়ে জানালাম।

'ধর্মে মতি আর যারই হোক, টুলীর হবার কথা নয়।' মনোরমাদি সবাজ্ঞে বললেন। 'বয়েস তো সেই তিরিশের পরে আর বাড়ছেই না। বরঞ্চ মুখে রং মেখে, চুলে বো কেঁদে, ক্লাবে গিয়ে ছোকরাদের সঙ্গে ফুর্তি মিলিয়ে নেচে তাও কমিয়ে ফেলবার চেষ্টায় আছে। তার আবার গীতা পাঠ। যা না একদিন। তোর সঙ্গে তো মাখামাখি। একদিন গিয়ে রহস্যটা জেনে আয়...'

টুলীদি সমাজের প্রাণ। আমুদে, কর্মঠ, সদাব্যস্ত মহিলা। পিকনিকের ব্যবস্থা করছেন। চ্যারিটি অভিনয়ের ব্যবস্থা করছেন, পার্টি দিচ্ছেন পার্টি আদায় করছেন। ক্লাবে গিয়ে বলনাচ নাচছেন, লাট প্রাসাদের বেবী-শোতে পাণ্ডাগিরি করছেন আবার ফলবল সংগ্রহ করে জোয়ানদের জন্ত স্থায়েটার বুনছেন। জীবনটাকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করছেন। হাসছেন, হাসাচ্ছেন, উপরপর করে বেড়াচ্ছেন। হঠাৎ বৈরাগ্য উদয় হওয়ার মতো এমন কিছু ঘটেছে বলে শুনিনি। তবে এ রকমের মানুষ যা করে বেশ জোর দিয়েই করে। ধর্ম করবার ইচ্ছে হলে ধর্মও বেশ জোরের সঙ্গেই করবে। এটা

G.E.C.

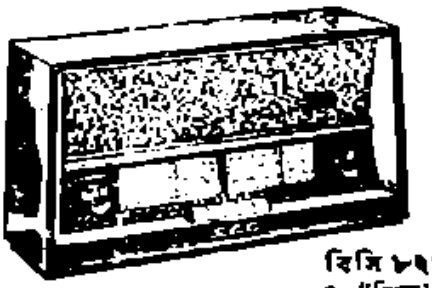

নতুন
টেব্‌ল
ট্রানজিস্টার

জি সি ৮৭১

● "ডিলুক্স" টেব্‌ল রিসিভার
● ১১ ট্রানজিস্টার এবং ডায়োড ● ৪ ব্যাণ্ড
● সমস্ত ব্যাণ্ডের ঐকান্তিক নিখুঁত ব্যবস্থা ● ডায়েল লাইট
● মেটেরোডাইন সেমাইট এরিয়েল ● ওয়েলনাট ফীনিয়ার কাভার
হ্যান্ডিমেট

মূল্য ৫২৫৲ (উৎপাদন শুল্ক সহ) স্থানীয় কর আলাদা।

GEC/GN/68

রেডিও ক্লাব প্রাইভেট লিমিটেড

সুরানা হাউস

৩, ম্যাঙ্গো লেন

কলিকাতা-১

ফোন : ২৩ : ২০১৪

২৩ : ১২৮২

ওটার জন্য নানা গণৎকার ও তান্ত্রিককে পয়সা খাইয়েছেন, চুপে চুপে লোক চক্ষুর আড়ালে কিছু ডাগ্তারিকেও ব্যবহার করেছেন। সেই তান্ত্রিকদের কেউ পীতা ধরিয়ে দেয় নি তো?

দুপুরে পাড়ী পেতে পাঁচ ছ' দিন দেরি হলো। অনেক সময় হাতে নিয়ে খাওয়া-দাওয়ার পর টুলীদির বাপীগঞ্জ সার্কুলার রোডের বাড়ীতে হাজির হলাম। খুড়ো দারোয়ান সেলাম করে পরিচিতের সহাস্যমুখে তাড়াতাড়ি পাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়াল।

'মেমসাহেব বাড়ী আছেন?'

'হাঁ জী। আপ তো বহুত রোজ আয়ে নহী?'

'বাইরে গিয়েছিলাম। ভালো আছ তো সব?' বলে সামনের সিঁড়ি দিয়ে ওপরতলায় উঠে গেলাম।

'ভেতরে আসব, টুলীদি।' এদিক ওদিক খুঁজে অবশেষে টুলীদির বেড-রুমের দরজায় হাজির হয়ে বললাম।

'কে, নীদি? আয় আয়, ভেতরে আয়। কবে ফিরলি?'

চুলের খুঁটি বাধার উপর তুলে, কোমরে কাপড় জড়িয়ে, বালতিতে ঝাড়ন ভিজিয়ে টুলীদি বেড-রুমের মার্বেলের মেঝে সাফ্ করছিলেন, আমাকে দেখে উঠে দাঁড়ালেন।

'এ কি ব্যাপার? আয়া কোথায় তোমার?'

'তাড়িয়ে দিয়েছি।' টুলীদি গম্ভীরস্বরে বললেন. 'তুই কবে ফিরলি বল? কেমন লাগল পাহাড়ে? বাবা, পুরো তিন মাস। কই, তেমন কিছু উন্নতি দেখছি নে তো?'

"কিন্তু তুমি এত রোগী হলে কি করে বলো তো? এবার কনভিনসড্ কামরার বাস করে কলকাতার শ্রীষ্মিকে দোষ দেওয়া চলবে না।' আমি টুলীদির জেগে-ওঠা কঠার হাত রেখে বললাম।

'সে অনেক কথা। আসে বস। ঠাণ্ডা কিছু খা।' বলে আমাকে তিনি খাটে নিয়ে বসালেন। 'যা ধকল গেছে গত তিনটে মাস। অন্যের হলে মুষড়ে পড়ত। একের পর এক আয়া, বাবুর্চি, বেয়ারা ড্রাইভার, মালী, সুইপার বিদায় করলাম। কি বদমাস বেয়াড়া হয়ে উঠেছে সব। এসব আর যেই হউক, আমি সইতে পারব না। মনে আছে তো তোর দিনোকে? বামন-মাজা কি হয়ে ঢুকেছিল আমার বাড়ীতে। নেপালী আয়া গয়না চুরি করে পালাবার পর আদিই দয়া করে ওকে আয়া বানাই। কায়দা করে শাড়ী পরতে শেখাই, ব্লাউজ পরতে শেখাই। সাফ্ জামাকাপড়ে ছোটখাটো মেমসাহেব বানিয়ে তুলি। নিজেদের খাওয়া থেকে পর্যন্ত ওকে এটা ওটা খাইয়েছি। এখন যেইখান হারামজাদা মেয়ে! পাশের বাড়ীর ফিসেস চ্যাটার্জির কাছে গিয়ে গল্প করে এসেছে—আমাদের মেমসাহেব কারি কারি খায়—সাহেবকে দেখে এতটুকুন তো নিজে খাবে এতটা। ফিসেস চ্যাটার্জি হেসে হেসে বলছেন, আর লজ্জায় আমি মরি। ভাবুন, অন্তত কিছুটা লজ্জা আছে। বল, এর পরেও ওটাকে রাখা চলে? পরদিনই ঘুর করে দিইচি —যাই, একটা ঠাণ্ডা কিছু এনে দিই। যা রোদ্দুরে পুড়ে এসেছিস। এই কাজ, এও এখন আমার নিজেকে করতে হয়। দুপুরে বেয়ারাকে ঘুমুতে ছুটি দিতে হবে। নইলে নাকি আজকাল কেউ থাকে না।'

'বসুন না আপনি। কিছু আনবার দরকার নেই।' প্রস্থানোদ্যত টুলীদিকে বাধা দিয়ে বললাম। 'কিন্তু কি হলো পুরানো বেয়ারার? তাকে তো দুপুরে ঘুমুতে দেখিনি। প্রায় সর্বক্ষণই তো তাকে হাজির দেখেছি।'

'ওপী? হ্যাঁ, ইদিকে সুবিধের ছিল।' টুলীদি প্রস্থান স্থগিত রেখে বললেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের যাবার সময় এসেছিল। যাই ধরে, ভেঙে টুকরো করে দেয়। পেয়ালা, পিরিচ বিকল্পই সুদার পট্, যাই ধরছে চৌচির হয়ে যাচ্ছে। প্রথম প্রথম লজ্জিত হতো। বাবা যেট করে চুপ করে' দাঁড়িয়ে থাকত। তারপর কি হলো, কৈফিয়ত দিতে শুরু

করল। ক্রমে জবাব দেওয়া আয়ত্ত হলো। পাবধানেই দুই, সাবধানেই চৌদ্দ পালাই। হাত থেকে ফসকে গেলে কি করব। ইচ্ছে করে ভাঙি না। পুরানো চাকর, এও সহ্য করেছি। কিন্তু যেদিন বিলিতি ডিনার সেটের তিন তিনটে পিস্ একই সঙ্গে ভেঙে তর্ক করতে এল, সেদিন আর সইতে পারিনি। বাড়ী থেকে দূর করে দিয়েছি।'

পুরানো বেয়ারাকে তাড়ানোর কথা বলতে গিয়েই হোক, বা শখের ডিনার সেট বিকলাঙ্গ হওয়ার শোকেই হোক টুলীদির কণ্ঠস্বর আর্দ্র হয়ে উঠল। এটা চাপা দেবার জন্যই কি না জানি না তিনি তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেলেন ঠাণ্ডা পানীয় আনতে। এবার আর তাকে আটকানো গেলনা।

ফিরে এসে ঠাণ্ডা পানীয়তে আমাকে এবং নিজেকে ঠাণ্ডা করে তিনি ঘণ্টা দেড়েক অনর্গল পুরানো ড্রাইভার, কাস্টমার, দাসী প্রভৃতির বিভাজনের ইতিহাস বিবৃত করে' আমাকে শোনালেন। এমন অধিচ্ছিন্ন টুলীদি কথা বলতে পারেন, যে অন্যের কিছু বলবার মত ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে না। এদিকে সময় হয়ে আসছে। চারটের মধ্যে বাড়ী ফিরে গাড়ী আফিসে পাঠাতে হবে। অথচ গীতা পাঠের কথা জিজ্ঞাসা করবার সুযোগ পর্য্যন্ত এখনও পাওয়া গেল না।

'এর পর অন্তত আধ ডজন আয়া, সাত আটটা বেয়ারা, তিনটে বাবুর্চি, দুটো ড্রাইভার বিদায় করেছি। একটাও উৎরোয় নি। একটা আয়া পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল ভাল। মিষ্টি করে কথা বলতে জানত। একদিন দেখলাম, রাস্তার মোড়ে পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে বিড়ি টানতে টানতে ঘিনো-ঝির সঙ্গে কথা বলছে। এ-বাড়ির দিকে আঙুল দেখিয়ে নানা ভঙ্গি করছে। মানে, এ-বাড়ীর ভেতরের খবর খুব রসিয়ে শোনাচ্ছে। যখন বাড়ী ফিরে এলো জিজ্ঞেস করলাম, ঘিনো-ঝিকে চেনো? বেমালুম বলে, না তো। বল, দুই বল, এর পর তাকে রাখতে পারি? আরও সব দোষই নাকি আমার। আমিই সবাইকে তাড়াচ্ছি। এমন করলে কেউ নাকি থাকে না। বাবুর্চি চুরি করবেই। বেয়ারা দরকারের সময় পা টাকা দেবে, তা মেনে নিতে হবে। বাসন-পত্র কিছু কিছু ভাঙবেই, নিয়মিত নতুন কিছু কিনে রাখা উচিত। বাজারের চুরি নীরবে মেনে নিতে হবে। মিষ্টি বা অন্য খাবার ফ্রিজ থেকে উধাও হলেও কাউকে দায়ি করা চলবে না। এ যদি না মেনে নাও, তবে তোমাকেই কথা শুনতে হবে, অপরাধী বনতে হবে—'

কে কথা শোনায়। স্ত্রীকে কথা শোনাবার মত সাহস মহিষদার আছে তা ভাবতেও পারি নে। না ভৃত্য-সমস্যায় প্রপীড়িত হয়ে তিনিও মরিয়া হয়ে উঠেছেন। জবাব জোগালেন টুলীদি নিজেই।

'কথা শোনাবার লোকের অভাব কি। বাড়ীর মানুষ তো আছেই। তাঁর ভাই আছে, ভাজ আছে, পিসী-মাসী আছে। আর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে নিজের বন্ধু বান্ধব হিতাকাঙ্খীরও তো অভাব নেই। মনোরমাদি আছেন, এরা আছে, রমা আছে, পাশের বাড়ীর কর্নেল গিন্নী আছেন। কত আর বলব। ঘেন্না ধরে গেছে সংসারের ওপর। করছে চুরি করুক। বাড়ীর নিয়মকানুন তচনচ করে' দিচ্ছে নতুন চাকর আর বেয়ারা। করতে দিচ্ছি। ড্রাইভার বদমায়ি করছে। চুপ করে' থাকছি। উপায় কি? একমাত্র উপায় যা এবার তাই আঁকড়ে ধরেছি। কুহুকে বৃহস্পতি জ্যোতির্বিদের চুলের সিরোমণি—অং বং কাগজে লিখে নবগ্রহ কবচ তৈরি করে' অনেক টাকা আমায় শুষেছে। কিন্তু একটা ভাল কথা বলত। অনেকবার বলেছে। "সংসারে আসক্তি কমাতে হবে মা। তবে প্রকৃত শান্তি পাবে। প্রত্যহ সকালে উঠে গীতা পাঠ করো। দেখো সংসারের সব তুচ্ছ সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।" সব সমস্যারই যদি সমাধান হয়, তবে চাকর নিয়ে যে যন্ত্রণা ভোগ করছি তারও কি শান্তি হবে না। তোকে বলব কি ভাই নীলি—কাউকে বলিস নি যেন রোজ সকালে উঠে গীতা পড়ছি। পুরো

পনেরো মিনিট ধরে পড়ি। এ ক'দিনেই আশ্চর্য্য উন্নতি বোধ করছি। ভাবছি....'

টুলীদি অকস্মাৎ থামেন, অন্তকে কথা বলবার সুযোগ দেন না। কিন্তু চুপ করে' থাকলে অন্তের প্রায় সকল প্রশ্নের জবাব আপনা থেকেই পাওয়া যায়। এবারও তাই হলো। প্রশ্ন করতে হলো না, আমার জিজ্ঞাস্য তিনিই জানিয়ে দিলেন।

'ভাবছি আরও কিছু দিন নিজে পরীক্ষা করে' দেখি, তারপর নিঃসন্দেহ হলে সমিতির স্কুলগুলিতেও গীতাপাঠ ধরিয়ে দেব। যেমন দিনকাল পড়েছে তাতে প্রথম থেকেই সবার, বিশেষ করে' মেয়েদের, নিরাসক্তি অভ্যাস—কিন্তু এ কি! ইতিমধ্যে সাড়ে তিনটে বেজে গেল নাকি? তোর সঙ্গে কথায় কথায় খেয়ালই হয় নি। অথচ হারাধনদা বেয়ারার একবার কাও দেখছিস? কোথায় চায়ের আয়না দেবে, সঙ্গে কি খাবার দেবে এখনও একবার জিজ্ঞেস পর্য্যন্ত করে' গেল না! বেয়ারপির একটা মাত্রা থাকা উচিত। এসব হচ্ছে কি দিনের দিন! এ আমি কখনও বরদাস্ত করতে পারব না। সাড়ে তিনটের পর চাকর-বাকর নাক ডাকিয়ে আরাম করবে, তা আমার বাড়ীতে কক্ষণো চলবে না—তা সে চাকর থাকুক আর চলে যাক...'

মুহূর্ত্তে টুলীদির চোখে আগুন ও ভ্রূযুগলে ভ্রূকুটি আত্ম-প্রকাশ করল। নাসারন্ধ্র উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগল। উত্তেজিতভাবে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। আসন্নপরায়ণ বেয়ারার বিশ্রাম হননের উদ্দেশ্যে ঝঞ্ঝাবৃষ্টিতে ছুটে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। তাঁর ক্রুদ্ধ পদাঘাতে কাঠের সিঁড়িগুলি একযোগে আর্ত্তনাদ করে' উঠল।

গীতাপাঠে টুলীদির কতটা উন্নতি হয়েছে, এরপর স্বভাবতই সে সম্বন্ধে সন্দেহ হ'তে পারত। টুলীদি নিজেই তার জবাব দিলেন। মিনিট দশেক পরে যখন ফিরে এলেন, তখন অনেকটা স্থির হয়েছেন। আমার দিকে একবার সস্মিত-দৃষ্টিতে চেয়ে দেখে বললেন, 'মনে মনে খুব হাসছিস। ভাবছিস, গীতাপাঠ সব মাঠে মারা গেছে...'

'সে কি! তা আমি ভাবতে যাব কেন।' তাড়াতাড়ি যথাযোগ্য প্রতিবাদ জানালাম। আশ্চর্য্য টুলীদির মন পড়ে নেবার ক্ষমতা!

'গীতা কি শুধু ত্যাগ আর বৈরাগ্য শিক্ষাই দিয়েছে রে!' টুলীদি তার স্বভাবসিদ্ধ তেজের সঙ্গে বললেন, 'অন্যায় বিনাশ করতে বলে নি? দুষ্কৃতকারী যদি আত্মীয়ও হয় তবু তাকে নিধনের পরামর্শ দেন নি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ? তৈরব নাম্ন গদ পার্থকে বলেছে?...চল, আর দেরি নয়। এবার চা খেয়ে নিই গে। কখন তোর গাড়ী এসে হাজির হবে ঠিক কি...'

গীতার শিক্ষা যে টুলীদির কাছে ব্যর্থ হয় নি, তা বলাই বাহুল্য।

• বিশিষ্ট মহিলা লেখিকাদের গ্রন্থ •

রবীন্দ্রসংগীতের ত্রিবেণীসংগম ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

চলিত কথায় যাকে গান ভাঙা বলা দৃষ্টান্ত-সহ তার আলোচনা।

রবীন্দ্রস্মৃতি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

সংগীত কাব্য নাট্য ও পারিবারিক স্মৃতির কাহিনী। ৩·৫০

নারীর উক্তি ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

বর্তমান স্ত্রীশিক্ষা-বিচার, সমর, আদর্শ, ভদ্রতা, প্যাটেল-বিল, বঙ্গনারী—কঃ পন্থা ; ইত্যাদি নিবন্ধ। লেখিকার সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণিত। ২·৫০

বাংলার স্ত্রী-আচার ॥ ইন্দিরা দেবী চৌধুরানী

পশ্চিম উত্তর পূর্ব বঙ্গের বিবাহ-পূর্ব বিবাহকালীন ও বিবাহ-উত্তর স্ত্রী-আচার-সমূহের মনোহারী বিবরণ। ১·৩০

নির্বাণ ॥ শ্রীপ্রতিমা দেবী

কবি জীবনের শেষ অধ্যায়টি এই গ্রন্থে অঙ্কিত হয়েছে। ১·০০

মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীঅমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতনের সঙ্গে সংযুক্ত প্রাচীন মহিলাদের বিচিত্র স্মৃতিকথা। ৩·৫০

দেহলি ॥ শ্রীহেমলতা ঠাকুর

এই গ্রন্থের ছোট গল্পগুলিতে মানবচরিত্রের, তার পারিপার্শ্বিকের চিত্র সুস্পষ্ট রূপে ফুটে উঠেছে।

কবিতাবলী ॥

নারী-কবিগণ রচিত ২৬ জন বৈদিক নারী-কবির ২৫টি সূক্ত, ৩২ জন নারী-কবির ১৪২টি সংস্কৃত কবিতা ও ৯ জন নারী-কবির ১৬টি প্রাকৃত কবিতার বঙ্গানুবাদ। শ্রীরমা চৌধুরী-অনূদিত। ২·০০

সেলাইয়ের নকশা ॥ শ্রীযমুনা সেন

কাশ্মীরী ও লক্ষ্ণৌ নকশার সূচের ফোঁড়ের আভাসে তৈয়ারী। এর বিশেষত্ব, শিল্পীর সুন্দর সরল ও বিচিত্র মৌলিক নকশার রচনায়। ২·৫০

আলাপচারী রবীন্দ্রনাথ ॥ শ্রীরানী চন্দ

জীবনের শেষ সাত বৎসর আলাপ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যেসব কথাবার্তা আলোচনাদি করেছেন তার আংশিক সংকলন। ৩·৫০

গুরুদেব ॥ শ্রীরানী চন্দ

রবীন্দ্র-জীবনের শেষ কয় বছরের কাহিনী। ৫·০০

পূর্ণকুম্ভ ॥ শ্রীরানী চন্দ

তীর্থভ্রমণের কাহিনী। অনেকটা ডায়েরির ভঙ্গিতে লেখা। ১৯৫৩ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রবীন্দ্র-পুরস্কার-প্রাপ্ত। ৫·০০

হিমাদ্রি ॥ শ্রীরানী চন্দ

কেদার-বদরী ভ্রমণ কাহিনী। লেখিকার 'পূর্ণকুম্ভ' গ্রন্থের ন্যায় সুখপাঠ্য। ৪·০০

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগরসংগমে

অম্বুজ বসু

আজকাল যে কোনো খ্যাতনামা পত্রিকার শারদীয়া সংখ্যার পাতা ওল্টালেই বাংলা প্রবন্ধের অতি দৈন্য চোখে পড়ে। দশ পনেরো কুড়ি বছর আগেও এমন ছিলনা। আমার অন্তত মনে আছে, বাড়িতে বড়রা যখন হরেকরকের আনা নানা শারদীয়া সংখ্যার মধ্যে দু একখানা বেছে নিতেন তখন গল্প উপন্যাসের চেয়েও প্রবন্ধের গুরুত্বের দিকে তাঁরা নজর রাখতেন এবং তাঁদের পছন্দ মত পত্রিকার অভাব হতো না। এখন, গল্প উপন্যাসের চাহিদার আতিশয্যে প্রবন্ধের সংখ্যা যদি শুধু কমে গিয়েছে জানতাম, তাহলে বিস্মিত হতাম না। কিন্তু যে প্রবন্ধগুলি এখনও তাতে স্থান পায় তাদের বৈষয়িক এবং গুণগত উৎকর্ষ, প্রশ্নের বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে—এবং সেইটাই ভাবনার কথা।

এই সব দেখে আমি নিজের মনে দীর্ঘকাল এত পোষণ করে এসেছি, যে মনন ধর্মী রচনার এখন অবক্ষয়ের যুগ চলেছে। সাম্প্রতিক সর্ববিধ সাহিত্যের অসারতা নিয়ে যাঁরা সর্ব সময়ে আক্ষেপ করে থাকেন নিজেকে প্রায় তাঁদের সমস্তরে এনে ফেলছি দেখে দুঃখ পেয়েছি, কিন্তু সান্ত্বনা পাইনি। আমার প্রক্ষিপ্ত পড়াশুনো নিয়ে একথাও বারবার ভেবেছি, উনিশ শতকে লেখক-সংখ্যা যখন আঙুলে গোনা যেত তখন যুক্তি শৃঙ্খলার গভীরে তাঁরা যে পারঙ্গমিতা দেখিয়েছিলেন সে তুলনায় এযুগের প্রাবন্ধিকদের রচনার পরিমান ও গুণগত হীনতা অভিনিবেশ ও আলোচনার বিষয় হওয়া উচিত।

ভাগ্যে তখনি সেটি আলোচনার বিষয় করে তুলিনি। কেননা আমার আরো কিছু অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল। গত এক বছরে প্রকাশিত বাংলা প্রবন্ধের বিষয় বিস্তার এবং উৎকর্ষ সম্পর্কে আলোচ্য প্রবন্ধ রচনার জন্যে আমি যখন অনুরুদ্ধ হলাম তখন মোটামুটি যে সব বই হাতের কাছে পাওয়া গেল সেগুলি নাড়াচাড়া করতে করতে এক দুর্বলতা অনুভব করলাম। নিজের রুচির পোষিত কোন ধারণা বা দৃঢ় মূল সংস্কার ভেঙে গেলে মানুষ যে অসহায় শূন্যতা বোধ করে, তেমন এক নিরবলম্ব অবস্থার অভিজ্ঞতা সেটি। তবু তার সঙ্গে একটা আনন্দও। যে আনন্দে কোনো আত্মবিস্মৃত বিজ্ঞানী 'ইউরেকা' বলে চেঁচিয়ে উঠতে পারতেন তেমন উজ্জ্বল তীক্ষ্ণ আনন্দ যদি নাও হয়, সমজাতের তো বটেই। আমাকে এবার বিশ্বাস করতে হলো অনিয়মিত মনঃসংযোগে সংগৃহীত তথ্য থেকে আমরা যে সব অভিমত পোষণ ও প্রচার করে থাকি তা কত অসার ও প্রমাদ পূর্ণ।

আমি সবিনয়ে স্বীকার করছি যে গত বছরে প্রকাশিত যাবতীয় বই-এর কথা ছেড়েই দিলাম, অনেক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থই আমি দেখিনি। সুতরাং আমার মতই যাঁরা বাংলা প্রবন্ধের দৈন্যের কথা ভাবতেন, বা ভাবছেন তাঁদের আক্ষেপোক্তি গুলির প্রতিবাদ বা অসারত্ব প্রতিপাদনের দায়িত্ব বা যোগ্যতা আমি দাবী করতে পারি না। তবু আমার পড়া বই গুলির ভিত্তিতে অন্ততঃ এটুকু বলা চলে যে বাংলা প্রবন্ধ বিভাগে গত এক বছরে যা সংযোজিত হয়েছে তাতে আক্ষেপের কিছু নেই বরং আশান্বিত হওয়ার কারণ আছে যে প্রতি বছর এমন ফসল পেলে এই আক্ষেপকে আর প্রতিপন্ন করতে পরেবর্তীকের প্রয়োজন হবে না

তবু উনিশ শতকের সঙ্গে বর্তমানের লেখকদের রচনা পদ্ধতির কোনো তফাৎ নেই এমন কথাও বলবো না। প্রবন্ধের যা প্রাণ লক্ষণ, তীক্ষ্ণ ও গভীর উপলব্ধি বস্তুর সরল স্বচ্ছ ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ—তা উনিশ শতকের রচনায় অব্যাহত। সেখানে দৃষ্টির সংকীর্ণতা থাকতে পারে কোথাও, কোথাও প্রাচীন জীবনের সংস্কারের আনুগত্যবন্ধন থাকতে পারে কিন্তু আজকের মতো অহেতুক বাক্ বিভূতি ছিল না। অকারণ বাক্ বিস্তারে চিন্তার কোনো ঐশ্বর্য প্রকাশ পায় না—একথা আমরা ভুলতে বসেছি। ফলে, আমাদের সাম্প্রতিক প্রবন্ধ হয় আবেগাশ্রয়ী বা স্মৃতিমূলক অথবা বিচারতন্ত্রিক এবং গবেষণাধর্মী। গত যুগের প্রবন্ধ প্রবহই, কিন্তু এযুগের প্রবন্ধ যতটা শিল্প ততটা গল্প, যতটা অনুভূতি বা যতটা পুনর্নিবিতি, ততটা উপলব্ধি কি না সন্দেহ। এখন প্রবন্ধ পড়তে মননের আজন্ম সহজ বিস্ময়ের মতো নতশিখায় প্রদীপ্ত হয়ে ওঠে না পাঠকের মনে। আলোর মতো তাকে উদ্দীপিত করে না। শুধু একটা তাপ অনুভব করা যায়। উনুনের নিচে অঙ্গারের ধরতাপের মতো, এই ধিকিধিকি জ্বলা, তিমুকের মতো, এতে কোনো মহিমা নেই। এই পুরানো শব্দকে পরিপাটি করে পরিবেশন, তাতে হয়তো ঐশ্বর্য বোঝা যায়, কিন্তু অর্জন কি না বোঝা যায় না। আবার ঐ আগের কথায় বলছি, বাংলা প্রবন্ধ মনোজীবীদের গান নয় আর, এখন তা রস-প্রস্রাতা এবং গবেষকদের দখলে গেছে।

তাই আমার সংগ্রহের জন্যে আমি সেই গ্রন্থটিকেই সবচেয়ে মর্যাদা দেবো যার জন্যে সেই অতীতের বহৎ প্রাবন্ধিকদের স্পর্শ পেয়েছি। আমি অন্নদাশঙ্কর রায়ের কথা বলছি। তাঁর প্রবন্ধ সংকলন "প্রবন্ধ।" এটি কোনো নব-সৃষ্টি নয়, পুরানো সৃষ্টি নবপ্রকাশ। এর-রচনা কাল ১৯২৩-১৯৫৫। তবু আমি এই গ্রন্থের কথাই সর্বাগ্রে বলবো, কেননা গ্রন্থকার এখনো এমনি প্রযুদ্ধ রচনায় বাংলা সাহিত্যকে ঋদ্ধ ক'রে চলেছেন। সে সব রচনা হয়তো পরবর্তী খণ্ডের জন্যে অপেক্ষা করে আছে। আমরাও সে জন্যে অপেক্ষা ক'রে থাকবো।

অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'প্রবন্ধ', বোধহয়, য়ুরোপের বহুতর মনোজীবী মানুষের আত্ম আবিষ্কারের সাধনার কাহিনী। এবং আত্ম উদ্ঘাটনের। এ সাধনায় তিনি নিষ্কাম। প্রবন্ধের বক্তব্য কি হওয়া উচিত, কিভাবে তা উত্থাপিত হবে যে সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর চিন্তাধারা ছিল বিশিষ্ট। তিনি মনে করতেন প্রবন্ধের বক্তব্য হবে একদেশদর্শী এবং পক্ষপাত-দুষ্ট। ফলে তা সর্বাধিক আক্রমণের লক্ষ্য হবে। এবং আলোড়নের। তাতে যে বিতর্ক সৃষ্টি হবে তার সাহায্যে সত্য প্রতিষ্ঠিত হবে। যে প্রবন্ধ বিতর্কের আবর্ত তুলতে পারে না তা যতই সুলিখিত এবং যুক্তিনিষ্ঠ হোক, নিরর্থক। অন্নদাশঙ্করকে অনেকে প্রমথ চৌধুরীর ভাবশিষ্য বলেন বটে, কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় প্রবন্ধের উত্থাপন রীতিতে তিনি বীরবলের অনুবর্তী নন্ অথচ রীতিতে অনুবর্তী না হয়েও তিনি একই লক্ষ্যে উপনীত হতে পেরেছেন। তাঁর রচনায় যুক্তির তারসাম্য এবং উপলব্ধির যথার্থতা সন্দেহাতীত। তবু তাঁর প্রায় প্রতিটি প্রবন্ধের পিছনে রয়েছে আলোড়িত প্রতিক্রিয়ার ইতিহাস। কেন না তাঁর প্রবন্ধ পাঠকের মনন উদ্বেলিত করে। তাঁর লেখা পড়তে পড়তে মনে হয় পাঠক হিসাবে আমার অভি-মতের অপেক্ষা করছেন লেখক। আমার সমর্থনের অথবা প্রতিবাদের। আর প্রতিবাদ আমরা প্রায়ক্ষেত্রে তখনই করি যখন নিজেরাই সাম্প্রদায়িক, প্রাদেশিক, রাজনৈতিক, বর্ণীয়, অথবা নৈতিক সংকীর্ণতা, উত্তেজনা অথবা যুক্তি বিমূঢ়তার শিকার। অন্নদাশঙ্করের এই মুক্ত মন, মনের এই প্রসারতা এবং সেই মনের এই অপরূপ অভিব্যক্তি তাই, আমার অন্তত, আকাঙ্ক্ষার ও ঈর্ষার বস্তু।

প্রবন্ধ রচনার সূচনায় সেই অন্নদাশঙ্করকে আমি শ্রদ্ধা করি যিনি যৌন নীতি এবং দাম্পত্য সম্পর্কের নব প্রতিষ্ঠার

আন্দোলনে দুঃসাহসী কলম ধরে ছিলেন ; বলাবাহুল্য তার জন্যে অভিনন্দন-ধন্য হন নি : আমি পরিণতির সেই অন্নদা-শঙ্করকে শ্রদ্ধা করি যিনি রাইভাষার উত্তপ্ত বিতর্কে স্থিতধী থাকতে পেরেছেন। এবং তাঁর সৃষ্টিকালের এই দুই প্রত্যন্ত সীমার মধ্যে অজস্র সাময়িক এবং চিরন্তন সমস্যায়, বৃদ্ধি সঙ্কটে অথবা সাহিত্যের সত্যসন্ধানে ও রসাবেদনে তাঁকে যে অসংখ্য ভূমিকায় এই গ্রন্থে দেখা যাবে তার সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে একমত হতে না পেরেও তার গুরুত্ব আমি অস্বীকার করতে পারি নে।

তার মানে, এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রতিটি রচনা আমার মতে উল্লেখের ও আলোচনার দাবী রাখে। তবু আমাদের খণ্ডিত নিবন্ধে তা অসম্ভব জেনে সব বাদ দিয়েও এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড 'বিদুর বই' এর স্বতন্ত্র সার্থকতার কথা উল্লেখ করবো। কেন না এটি আমার মতে আধুনিক বাঙালী লেখকের আত্মবোধ ও সাহিত্য জিজ্ঞাসার মহত্তম দলিল। সাহিত্যকে যাঁরা ভালবাসেন তাঁরা সবাই অন্নদাশঙ্করের 'প্রবন্ধ' বইখানা পড়বেন জানি, আমি তাঁদের এই বিশেষ খণ্ডটির প্রতি আরো একটু মনোযোগ দিতে অনুরোধ করবো।

রবীন্দ্র শতবার্ষিকীর কিছুদিন আগে থেকেই রবীন্দ্র-চর্চার যে নূতন প্রেরণা চিন্তাবিদের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, সুখের কথা, সেটা একটা সাময়িক হুজুগ-মাত্র ছিল না। রবীন্দ্র প্রসঙ্গে যেসব গ্রন্থ আজো প্রকাশ হচ্ছে তাতে তার প্রমাণ দেখা যাচ্ছে। রবীন্দ্র-স্মৃতি বিষয়ে দুখানি বিশিষ্ট গ্রন্থ আমাদের সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। প্রথমটি শ্রীযুক্তা অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'মহিলাদের স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ', দ্বিতীয়টি শ্রীযুক্তা সীতা দেবীর 'পুণ্যস্মৃতি'। বলাবাহুল্য দ্বিতীয় গ্রন্থখানি পুরানো রচনার নবতর সংস্করণ। দুখানি গ্রন্থেই একটি আকস্মিক বিষয়গত যোগ দেখা যাচ্ছে। উভয়েই মহিলাদের দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথের স্মৃতি-চিত্রণ। প্রথম গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রনাথের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার সুযোগ লাভ করেছিলেন এমন বত্রিশজন বিশিষ্ট মহিলা ঘরোয়া ভঙ্গিতে হারিয়ে যাওয়া অতীতের সেই বর্ণাঢ্য দিনগুলির চিত্র তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিগত পরিচয় এই গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে। স্নেহের সঙ্গে একটি স্নেহমধুর সম্পর্কের মধ্যে, হাস্য পরিহাসে, বাণীতে ও প্রার্থনা পূরণে রন্ধনে-ভোজনে, আন্তরিকতা ও সৌজন্যে, উদ্বেগে ও আশঙ্কায় বৃদ্ধ কবির যে কোমল হৃদয়ের অন্তরঙ্গরূপ এখানে ধরা পড়েছে অন্য কোনো প্রামাণিক জীবনী গ্রন্থে তেমনটি খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। এই গ্রন্থের সংকলনে সম্পাদিকা যে উদ্যম ও আয়াস স্বীকার করেছেন তার জন্য সকল রবীন্দ্রানুরাগীর তিনি ধন্যবাদের পাত্রী।

সীতাদেবীর "পুণ্যস্মৃতি" একটি সুপরিচিত এবং বহু প্রশংসিত গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম অন্তরঙ্গ ও সুহৃদ রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের কন্যা হিসাবে লেখিকা রবীন্দ্রনাথের অত্যন্ত স্নেহের পাত্রী ছিলেন। অত্যন্ত নিকট থেকে দেখা রবীন্দ্রনাথের নানা অপরিজ্ঞাত ও অপূর্বজ্ঞাত ঘটনার বিবরণ ও তার স্বভাব ও হৃদয়ের নানা দিক বর্ণনায় এই গ্রন্থ এক অশেষ মূল্যবান দলিল। তার চেয়েও বড়ো কথা এমন নৈপুণ্যে ও চিত্তাকর্ষক রীতিতে লেখিকা বর্ণনা করেছেন যে গ্রন্থটি উপন্যাসের চেয়েও খাদ্য হয়েছে।

রবীন্দ্র-শিক্ষাদর্শের উপর যাঁরা এদেশে গভীরাত্মক আলোচনা করেছেন বিশিষ্ট কবি ও শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্ত সুনীলচন্দ্র সরকার তাঁদের অন্যতম। রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন একটি অনতি-আলোচিত বিষয়। অবশ্য এবিষয়ে বাংলাভাষায় একাধিক গ্রন্থ রচিত হয়েছে আমরা জানি, কিন্তু সে সব আলোচনায় রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা বিষয়ক চিন্তাধারার বর্ণনাটি সবসময়ে যে ধরা পড়েছে এমন বলা চলেনা। শ্রীযুক্ত সরকারের আলোচনা এই অর্থে বিশিষ্ট যে রবীন্দ্রনাথের শুধু শিক্ষা সম্পর্কীয় রচনাগুলির উপর নির্ভর না ক'রে তাঁর সামগ্রিক জীবনদর্শনকে ভিত্তি ক'রে পর্যালোচনা করায়

রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার একটি সামগ্রিক রূপ এখানে পরিস্ফুট হয়েছে। এবং সেই আদর্শকে স্পষ্টতর ক'রে তোলার প্রয়োজনে লেখক দেশীবিদেশী বিশিষ্ট মনীষী ও দার্শনিকদের শিক্ষা বিষয়ক ভাবনা ধারণা বিশ্লেষণ ক'রে দেখিয়েছেন মনুষ্যত্বের উদ্বোধনের পথে কি জাতীয় শিক্ষার প্রয়োজন তাঁরা অনুভব করেছিলেন এবং তাঁদের সেই সব মতবাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের মৌল-সাদৃশ্য ও পার্থক্য কতখানি।

ইউরোপে শিক্ষাবিষয়ক চিন্তা ধারা এক এক সময়ে 'আদর্শবাদ' 'প্রকৃতিবাদ' 'প্রয়োগবাদ' এবং 'কলাবাদ' প্রভৃতি মতাদর্শ অবলম্বন করে বিকাশ ও পূর্ণতার পথে অগ্রসর হয়েছে। প্রাচ্যের মতবাদ সমূহের অপূর্ণতা ও একদেশদর্শিতার প্রতিক্রিয়ার বিশিষ্ট মনীষীদের চিন্তাধারা উদ্বেলিত হয়েছে। এইভাবে প্লেটো, অ্যারিষ্টটল, সেন্ট টমাস, অ্যাকুইনাস, রুশো, গ্রীনোজো, পেস্তালৎসি, মন্টেন, একহার্ট হেনেল, থোরো, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, উলপেনস্কি, ফ্রোয়েবেল এবং ডিউই প্রভৃতি শিক্ষা সম্পর্কে কি ভেবেছেন এবং শিক্ষাকে কি ভাবে নূতন ক'রে গড়তে চেয়েছেন প্রয়োজনে অতি সংক্ষেপে ও সহজে তা বোঝাতে পেরেছেন। এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারার তুলনাই শুধু যে তিনি করেছেন তা নয়, এবিষয়ে যে সব ভারতীয় চিন্তাবিদ কিছু চিন্তা করেছেন তাঁদের অর্থাৎ বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, গান্ধী ও রাধাকৃষ্ণন প্রভৃতির দৃষ্টি ভঙ্গি বিচার ক'রে ভারতীয় জীবনগঠনের আদর্শকেও স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে পেরেছেন। ফলে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি ভঙ্গির বিশেষত্ব এবং তার প্রয়োগ সাফল্য এখানে উজ্জ্বল হতে পেরেছে। সর্বোপরি, এই মূল্যবান বিষয়ের সংহত আলোচনা সত্ত্বেও বইটি তত্ত্বের ভারে পঙ্গু হয়নি। বস্তুত বাংলা সাহিত্যে এই গবেষণাধর্মী গ্রন্থখানি একটি বিশিষ্ট সংযোজন বলে গণ্য হবে।

রাধেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী বিগত শতাব্দীতে উদ্ভূত সেই সব বিরল বহুমুখী মেধার মানুষের অন্যতম, বাংলার সাহিত্য ও সমাজ তাঁদের অকৃপণ দানে সমৃদ্ধ হয়েছে। অথচ দু' একখানি খণ্ডিত জীবনী রচিত হলেও তাঁর সাহিত্যসাধনা এতদিন অনালোচিতই ছিল কেননা বিজ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য শিল্পতত্ত্ব, সৌন্দর্য-কলা, ভাষাতত্ত্ব জ্ঞান বিজ্ঞানের এবংবিধ সর্বস্তরে তিনি তাঁর স্বাক্ষর সমুজ্জ্বল করে রেখেছেন। এই বিপুল সৃষ্টির উপযুক্ত মূল্যায়নের জন্য অনুরূপ মেধার আবশ্যক। অথচ তেমন মানুষ সুলভ নয়। সম্প্রতি সাড়ম্বরে এই মহামনীষীর জন্মশতবার্ষিকী আমরা উদ্‌যাপন করলাম অথচ তাঁর সৃষ্টির সর্বপ্রধান দিকটি এইভাবে অনালোচিত ও উপেক্ষিত থাকলে তা আমাদের জাতীয় লজ্জার কারণ হতো। অধ্যাপক প্রদ্যোত সেনগুপ্ত সেই লজ্জা থেকে আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। তাঁর আলোচনা যত সংক্ষিপ্তই হোক, সমসাময়িক চিন্তাধারার পটভূমিতে রাধেন্দ্রসুন্দরের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব ও পাণ্ডিত্য তিনি যেভাবে তুলে ধরেছেন এবং যেমন নিষ্ঠার সঙ্গে প্রবন্ধগুলি পর্যালোচনা করা হয়েছে তাতে লেখকের শ্রম ও আন্তরিকতার পরিচয়ে সকলে তৃপ্তি বোধ করবেন। এই অবজ্ঞাত দিকটিতে এই প্রথম সৃষ্টি চিন্তাশীল ব্যক্তিদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট করবে এবং আরো সার্থকতর আলোচনার আবির্ভাব ঘটবে এই প্রত্যাশা করবো। সাহিত্য সংক্রান্ত প্রবন্ধ গ্রন্থগুলির অন্যে বিষয় গৌরবে চিন্তাব্যাপ্তিতে এবং অনন্যসাধারণ বৈদগ্ধ্যে শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত 'সাহিত্যের কথা' সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। সাহিত্য বিষয়ক চিরন্তন ও সাম্প্রতিক যেসব সমস্যায় একালের পাঠকচিত্ত স্পন্দিত, খ্যাতনামা প্রবন্ধকার এই গ্রন্থের প্রথম তেরোটি প্রবন্ধে তার আশ্চর্য বিশ্লেষণী আলোচনা করেছেন। বিশ্বসাহিত্যের প্রকৃতি এবং কালে কালে সাহিত্যের ধারা ও তার বিবর্তন ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর অভিমতগুলির পিছনে বহুদর্শিতা ও উচ্চ বোধশক্তির পরিচয় আছে। পরবর্তী বারোটি প্রবন্ধের কয়েকটিতে, যেমন ইউরোপীয় নানা ভাষার সাহিত্যে ভারতের

যে রূপটি উদ্ঘাটিত তাকে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে, তেমনি ভারতীয় মনীষী রবীন্দ্রনাথ ও গান্ধীর সঙ্গে ইউরোপীয় চিত্তের সংঘাতের কথা বলা হয়েছে। অন্য প্রবন্ধগুলির মধ্যে একদিকে যেমন মধুসূদনের ইউরোপীয় সাহিত্য হুইটিশ সাহিত্যের আধুনিকযুগ বা আফ্রিকার সাহিত্যের পরিচয় দেওয়া হয়েছে তেমনি আলবেয়ার কামু এবং টমাস মানের জীবনবোধের সঙ্গে পরিচয় সাধনের চেষ্টা করা হয়েছে। সব মিলিয়ে শ্রদ্ধাভাজন লেখকের এই আন্তরিক প্রয়াস সাংবাদিকতা ছাড়িয়ে বহু প্রবন্ধের দুরূহ গৌরবে সমুত্তীর্ণ হয়েছে।

শ্রীসুখময় মুখোপাধ্যায় রচিত 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের দ্বিপ্রহর' "একাডেমিক সমালোচনা" গ্রন্থ। সাময়িক পত্র-পত্রিকার সমালোচনা সম্পর্কে যেহেতু লেখকের অতিমাত্রায় স্পর্শকাতরতা আছে সেকারণে এই গ্রন্থ সম্পর্কে কিছু মন্তব্য করতে ভয় পাই। কেননা লেখকের নিজস্ব "সার্থক আলোচনা মাত্রই যে 'একাডেমিক' হবে, তার মধ্যে যে সমালোচকের বিদ্যা ও জ্ঞানের পরিচয় থাকবে, সেকথা বোঝবার মত বুদ্ধি এই নাবালকদের নেই।"

লেখকের মতে "ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ সুরু হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম ৪৪।৪৫ বছর তার প্রস্তুতি পর্ব। তার পরে দেখা দিয়েছে তার তাবৎ দ্বিপ্রহর। এই দ্বিপ্রহর-পর্বের আদিতে রয়েছেন বিদ্যাসাগর-তারাশঙ্কর (তর্করত্ন) আর অন্তে রয়েছেন বনফুল-তারাশঙ্কর (বন্দ্যোপাধ্যায়)।...এই পর্বটি প্রায় একশো বছর—দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল।"

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের কাল বিভাগে লেখক যতখানি নিশ্চিত আমরা ততখানি নই। মনে হয় অত ত্বরিত মন্তব্য করাও সঙ্গত নয়। আপাতদৃষ্টিতে যা মনে হয় তা যে সব সময়ে সত্য না হতে পারে আমাদের বর্তমান আলোচনার মূল বক্তব্যই তাই। লেখকের নিজের মতে তাঁর আলোচনা "বস্তুনিষ্ঠ ও বিশ্লেষণাত্মক" এবং আমরাও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি তাঁর প্রবন্ধ "পল্লবগ্রাহী সমালোচনা" নয়। কিন্তু এই প্রত্যক্ষ বিশ্লেষণে অভিমানে তিনি মাঝে মাঝে যেসব ছুট মন্তব্য করেছেন আমি তাকে 'ষ্টাটমেন্ট' বলতে চাই না, কিন্তু অযৌক্তিকমূলক না বলে গতি নেই। এবং তার ফলে তাঁর আত্মবিশ্বাসিত বস্তুনিষ্ঠা অনেক সময়ে (যেমন, 'বাসুদেব চরিত' প্রবন্ধে ডঃ সুকুমার সেন সম্পর্কিত মন্তব্যে) আবেগ অতিরেকে পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রীকিরণ শঙ্কর সেনগুপ্তের 'মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ ও উত্তর কাল' প্রায় সমজাতীয় সাহিত্য বিষয়ক আলোচনা গ্রন্থ। পার্থক্য এই যে শ্রীযুক্ত মুখোপাধ্যায় যেখানে একাডেমিক দৃষ্টি কোণ থেকে সবকিছু আলোচনা করেছেন সেখানে স্বয়ং একজন কবি হিসাবে শ্রীসেনগুপ্তের উপলব্ধি অনুভূতির অনেক গভীরতল থেকে উৎসারিত হয়েছে। তাই পড়তে পড়তে মনে হয় একজন সাহিত্যশিল্পী সাহিত্য সম্পর্কে আত্মজিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজছেন—এ কোনো সাহিত্য ব্যবসায়ীর নিষ্প্রাণ বুদ্ধি প্রয়োগ মাত্র নয়। এই জন্যেই এই গ্রন্থে এমন একটি অভিনব স্বাদ আছে যা পূর্বোক্ত গ্রন্থে দুর্লভ। অবশ্য উত্তর কাল পর্যায়ের শেষ দুটি প্রবন্ধে এবং আধুনিক কবিতা সম্পর্কিত আলোচনায় বক্তব্য যথাযথ ভাবে উপস্থাপনের প্রয়োজনেই আরো বিস্তারিত পরিধির দরকার ছিল।

ডাঃ হরপ্রসাদ মিত্রের 'বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ' বঙ্কিম প্রতিভা পরিচয়ে নবতর সংযোজন। সম্প্রতি বঙ্কিম সাহিত্য বিচার যে পর্যাপ্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শুরু হয়েছে অধুনা প্রকাশিত বঙ্কিম বিষয়ক আরো কিছু গ্রন্থে তার পরিচয় আছে। প্রসঙ্গ ক্রমে ডাঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল কুমার দাশগুপ্তের নাম আমরা স্মরণ করতে পারি। এ জাতীয় বিশিষ্ট আলোচনার আসরে ডাঃ মিত্রের গ্রন্থের আবির্ভাব যথেষ্ট কৌতূহলের উদ্রেক করবে। বঙ্কিম চন্দ্রের প্রবন্ধ সাহিত্যের পর্যালোচনায় এবং বঙ্কিম যাদবের বিশ্লেষণে লেখক যদিও যথেষ্ট

আলোচনা ও মূল্যায়নের পরিচয় দিয়েছেন কিন্তু বঙ্কিমের কথা সাহিত্যের পর্যালোচনায় লেখক তেমন গভীর মর্মদর্শিতার নিদর্শন সর্বত্র দিতে পারেন নি। বরং বঙ্কিমের অনেক বিশিষ্ট গ্রন্থের আলোচনাও এখানে বিক্ষিপ্ত বা খণ্ডিত মনে হয়। আমি প্রত্যাশা করবো পরবর্তী সংস্করণে এই দিকে গ্রন্থটির আমূল সংস্কার হবে।

ভারতের মুক্তি সংগ্রাম বিষয়ে দু'খানি বিশিষ্ট গ্রন্থ আমার সংগ্রহে রয়েছে। প্রবীণ সাহিত্যসেবী শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' বাংলা ভাষায় উক্ত বিষয়ে সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ ধারাবাহিক ইতিহাস। ১৩২৪ সালে প্রথম গ্রন্থটি প্রকাশ হয়। কিন্তু সাম্প্রতিক নূতন সংস্করণে গ্রন্থটিকে আমূল পরিমার্জন ও পরিবর্ধন ক'রে দেশ বিভাগ ও স্বাধীনতা প্রাপ্তি অবধি প্রসারিত করায় এর যে পরিবর্তন ঘটেছে তাতে একে একটি নূতন গ্রন্থ বলাই সঙ্গত। ভারতে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ জাতীয় আন্দোলনের প্রতিটি পর্যায় ও ধারা, অর্থাৎ কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্বেকার ও পরবর্তী আন্দোলনের রূপ প্রকৃতি, বঙ্গভঙ্গ, স্বদেশী, সত্যাগ্রহ, অসহযোগ, স্বরাজ্যদল, আইন অমান্য আন্দোলন, বিপ্লববাদ, ইসলামের জাগরণ এমনকি শ্রমিক আন্দোলন অবধি তাঁর আলোচনার বিস্তৃত পরিধিতে ধরা দিয়েছে। কিন্তু তার চেয়েও দুরূহ কাজ যেখানে যে কোনো ইতিহাসবিদের অগ্নি পরীক্ষা, এই সব আন্দোলনের ধারাকে সংক্ষেপে সত্যভাবে এবং তাদের আপেক্ষিক গুরুত্ব বজায় রেখে অপক্ষপাতে তুলে ধরা, আমি মনে করি, এবিষয়ে গ্রন্থকার অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছেন। এই ইতিহাস যেহেতু অত্যন্ত নিকট কালের তাই তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে নানা প্রশ্ন নানা জনে তুলবেন, কিন্তু যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা লেখক করেছেন তা নিয়ে কারো মনে কোনো দ্বিধা থাকার কথা নয়। পরবর্তী কালে হয়তো আরো পূর্ণাঙ্গ এবং বিস্তারিত ইতিহাস রচিত হবে তবু তখনও এই গ্রন্থ ঐ বিষয়ে পরবর্তী ইতিহাসকারের কাছে আদর্শের মতো প্রতিভাত হবে। এবং যতদিন তা না হয় ততদিন গ্রন্থখানি বাংলা ভাষার সর্বোত্তম ও সর্বাপেক্ষা প্রামাণিক ইতিহাস রূপে সমাদৃত হবে এতে কোনো সন্দেহ নেই।

এই গ্রন্থে জাতীয় আন্দোলন বিষয়ে একটি বিস্তারিত গ্রন্থপঞ্জী সংযুক্ত হওয়ায় এই পুস্তকের মূল্য বেড়েছে। যদিও এই গ্রন্থপঞ্জী আরো পূর্ণাঙ্গ এবং সুবিচারিত হওয়ার অপেক্ষা রাখে।

মুক্তি সংগ্রাম বিষয়ে দ্বিতীয় গ্রন্থ খানি হলো খ্যাতনামা বিপ্লবী গঙ্গানারায়ণ চন্দ্র রচিত 'অবিস্মরণীয় ভারত' (১ম খণ্ড)। যেহেতু ভারতবর্ষের বিপ্লব আন্দোলনের কোনো প্রামাণিক এবং ধারাবাহিক ইতিহাস নেই সেজন্য এই বিষয়ে গবেষণার প্রয়োজন অনস্বীকার্য। কিন্তু তার আগে পর্যাপ্ত তথ্যের সংকলন ও গ্রন্থনার জন্য যারা এই সব গোপন ঘটনাবলীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের স্মৃতি কাহিনী সংগ্রহের প্রয়োজন আছে। শ্রীযুক্ত চন্দ্র এই বিষয়ে যে একজন যোগ্য ব্যক্তি তাতে সন্দেহ নেই এবং তিনি যে শুধু আপন স্মৃতিই বিবৃত করেছেন তাই নয়, এই গ্রন্থে তিনি বিপ্লব আন্দোলনের সামগ্রিক কাঠামোটি তুলে ধরবার প্রয়োজনও বোধ করেছেন। গ্রন্থটি তথ্যগ্রাহী কিন্তু স্মৃতিপ্রধান হওয়ায় ত্রুটি হীন নয়। সে ত্রুটি তথ্যের নয়, অনেক ক্ষেত্রে বিন্যাস এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে ঘটনা সমূহের আপেক্ষিক গুরুত্ব বিচারে। কিন্তু যেহেতু তিনি ঐতিহাসিক নন সুতরাং তাঁর কাছে যা পাওয়া গেল তার জন্যেই আমরা কৃতজ্ঞ। শুধু কিছু পরিমাণে কালগত পারম্পর্য তিনি যদি পরবর্তী খণ্ডগুলি বিন্যাসের সময় মেনে চলেন তবে পাঠক হিসাবে আমরা কৃতার্থ হবো।

এই আলোচনাকে বাক্‌বিস্তারে দীর্ঘতর করার অভিলাষ

পরিশেষে কেবল একটি কথারই পুনরুক্তি করিয়া বাংলা প্রবন্ধ বিভাগে গত বছরের যে সংযোজিত হয়েছে তার পূর্বোক্ত নমুনা থেকে আমরা আক্ষেপ করবো না, বরং গৌরব অনুভব করবো।

গ্রন্থপঞ্জী

প্রবন্ধ। অনুরূপচন্দ্র রায়। ডি. এম. লাইব্রেরী। দাম ১৩·০০ টাকা

মহিলাদের দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ। অমিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্বভারতী। দাম ৩·০০

পুণ্যাহুতি। নীহারিকা দেবী। জিজ্ঞাসা। দাম ১০·০০

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শন ও সাধনা। শ্রীসুশীলচন্দ্র সরকার। দাম ৬·০০

রামেন্দ্রসুন্দর ও বাংলা সাহিত্য। প্রমোদ দেবগুপ্ত। সাহিত্যশ্রী। দাম ৪·০০

সাহিত্যের কথা। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়। রূপা অ্যাণ্ড কোম্পানী। ৬·০০

আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে। ইন্দুমতী মুখোপাধ্যায়। কেমারেল প্রিন্টার্স অ্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। দাম ৫·০০

অনুভব রবীন্দ্রনাথ ও উত্তরকাল—কিশোরের দেবতা। রূপ অ্যাণ্ড কোম্পানী। দাম ৬·০০

বঙ্কিম সাহিত্য পাঠ। দুর্গাদাস মিত্র। কোং। দাম ১০·০০

ভারতে জাতীয় আন্দোলন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। দাম ১১·০০

অবিস্মরণীয় (১ম খণ্ড)। শ্রীসত্যসাধন চক্র। মনীষা। দাম ৭·০০

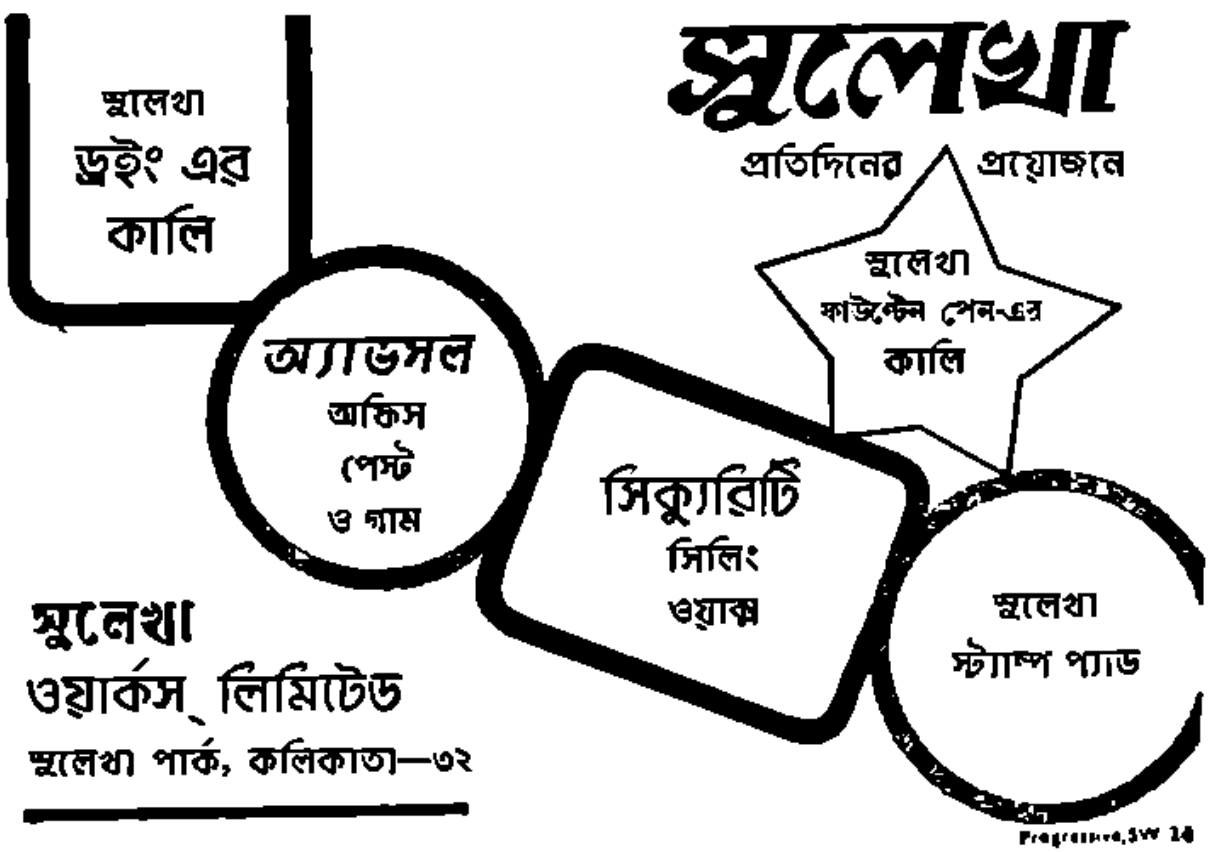

স্বাস্থ্য ও শক্তির উৎস...

এমন সময় আসে যখন আপনার দৈনন্দিন খাদ্যে দেহের সব প্রয়োজন পূরণ হয় না। তখন আপনাকে পুষ্টিকর টনিকের উপর নির্ভর করতে হয়। রোগাস্তিক দুর্বলতা, অতিরিক্ত পরিশ্রম, বা অন্য যে কোন কারণেই অবসন্ন বোধ করেন না কেন ভাইনো-মল্ট আপনার স্বাভাবিক শক্তি ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে। সুনির্বাচিত উপাদানে সমৃদ্ধ ভাইনো-মল্ট ক্ষুধাবৃদ্ধি করে, পরিপাকক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং দ্রুত স্বাস্থ্যের উন্নতি ও শক্তি বৃদ্ধি করে।

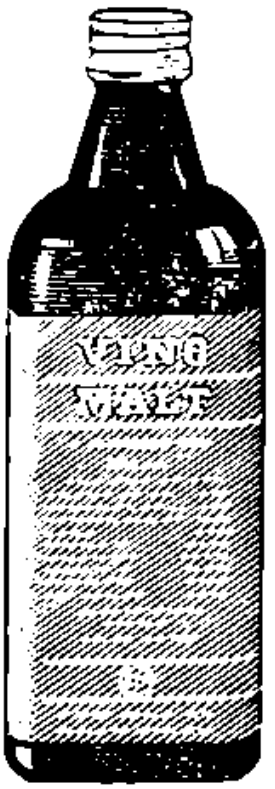

ভাইনো মল্ট

প্রাণোচ্ছল টনিক

বেঙ্গল ইমিউনিটির তৈরী

[গত বছর আমরা একটা পরিকল্পনা নিয়েছিলাম : যাঁরা শরৎচন্দ্র সম্পর্কে ব্যক্তিগতভাবে জানেন তাঁদের থেকে আলাপের সূত্রে তাঁর বিষয়ে জেনে নিয়ে রচনাকারে তা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা। এ বিষয়ে কয়েকজন বিশিষ্ট সাহিত্যিককে চিঠি দেওয়া হয়েছিল। আশ্চর্যের কথা, এবং দুঃখের, যে স্বর্গীয় সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, কবি কালিদাস রায় এবং ঐতিহাসিক ডাঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার ছাড়া এ বিষয়ে আর কেউ সাড়া দেননি। জয়শ্রীর তরফে আমাদের প্রতিনিধি সত্যব্রত বসু এই তিনজনের সঙ্গে দেখা করেন। সংক্ষিপ্ত সংবাদের ধরণে সেই সাক্ষাৎকারের বিবরণ প্রায় তখনই যা লিখে তিনি দপ্তরে পেশ করেছিলেন তার থেকে অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের অংশটুকু আপাতত প্রকাশ করা হল।

শরৎচন্দ্র স্বয়ং

স্বর্গীয় সাহিত্যিক অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়ের মুখ থেকে

ব্যক্তি-শরৎচন্দ্র সম্পর্কে রচনা বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। সেই কথা মনে রেখে যাঁরা এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন তাঁরা যদি এখনো অবহিত ও সচেষ্ট না হন তবে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে জানার কৌতূহল সুযোগ হবে; তখন সাহিত্যের এই শাখায় যে অপূরণীয় ফাঁক থেকে যাবে তার জন্য ভবিষ্যতের কাছে আমাদের কোনোই জবাবদিহি থাকবে না। — সম্পাদিকা : জয়শ্রী]

২৫ জুন, ১৯৬৪ : তাঁর সঙ্গে প্রথম দেখা ২০ জুন ৬৪-সন্ধ্যায়। আগে থেকে চিঠি দিয়ে গিয়েছিলাম।

অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কি জানি কেন মনে হয়েছিল যে তাঁর চেহারা কালোর উপর বেশ চওড়া হবে; মুখ ভারি ও আচ্ছন্ন, ভ্রূ এবং গোঁফ কর্কশ, কপাল ক্ষুব্ধ ও ছোটো; সব মিলিয়ে রীতিমত আচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন চেহারা।

আসলে কিন্তু একেবারেই উল্টো: পাতলা, শানানো চেহারার দীপ্তিমান মানুষ, উজ্জ্বল নূতন তামার মতো রং। ভারি ব্রাউন-শেলের চশমার পিছনে দীপ্ত চঞ্চল সজাগ কৌতুক-স্নিগ্ধ একজোড়া চোখ। সমস্ত শরীরে মার্জনার ও পরিচ্ছন্নতার একটি স্বাভাবিক দীপ্তি। ত্বক নিখুঁত, প্রায় পালিশ করা সিল্কের মতো। এমন উজ্জ্বল পরিমার্জিত মুখ সচরাচর দেখা যায় না। রীতিমত রূপবান বৃদ্ধ: যদিও বৃদ্ধ তা মনে হয়না; যদিও বয়স ৮৩ বললেন।

বললুম সেকথা। 'যেমন ডাঃ রায়কে দেখে বা নেহরুকে দেখে আমাদের বৃদ্ধ মনে হয়নি, তেমনি আপনাকে দেখেও না।' প্রকৃতপক্ষে তিনি যুবক,—শরীরে, মনে, বাক্যে ও ভঙ্গিতে।

তিনি হেসে বললেন, 'ডাঃ রায় আমাকে দাদা বলতেন। যদিও মাত্র ২৬ দিনের বড়ো আমি। আমার জন্ম ফোর্থ জুন, তাঁর ফার্স্ট জুলাই,—একদিন হিসেব করে তিনিই বলেছিলেন।"

আমি বললাম, 'ডাঃ রায়ের সঙ্গে আপনার রিসেম্ব্লেন্স কি দেখা হত!'

বললেন. 'না। দেখা হয়েছিল প্রায় বছর দশেক আগে,—হ্যাঁ, ফিপটিফোর বা ফিপটিফাইভ-এ,—তাঁর ওয়েলিংটনের বাড়িতে আমি নিজেই গিয়েছিলাম।'

আমি একটু থেমে বললুম, 'তিনি আপনাদের কাছে আসতেন না আগে। শরৎচন্দ্রের বাড়িতে।'

'না, সে শেষের দিকটায়, তাঁর [শরৎচন্দ্রের] অসুখের সময়ে।'

মুখোপাধ্যায়ের মধ্যে কোনো ক্লান্তি, বোরডম্, বেদনাবলি বা অবসন্নতা নেই। রাস্তার পরে কাঁকা খানিকটা জমি, কচুরিপানাভরা বেশ নীচু একটা ডোবা, তার উঁচু পারে নতুন দোতলা বাড়ি উঠছে, নীচে-তলার সমাপ্ত ফ্লাটে তিনি এখন উঠে এসেছেন। বাড়িটি সুন্দর। কলমলে মোজাইক মেঝে; দেখেই মনটা খুশি হয়ে উঠল। সাদা ছিমছাম দেওয়াল।

যখন এলাম তাঁর গায়ে একটি পাঞ্জাবী ছিল। একটু পরে, পরিচয় সহজ হতে, জামাটি খুলে সরিয়ে রাখলেন।

'জামা বেশিক্ষণ রাখতে পারি না গায়ে, ভালো লাগে না।'

বললুম, 'হ্যাঁ, খুলে ফেলুন। এই গরমে দরকারই বা কী।'

মাথার উপরে পাখা ছিল, তাও বন্ধ।

'ফ্যানের হাওয়াও বেশিক্ষণ সহ্য করতে পারিনা, মাথা ধরে যায়।'

আমি বললাম, 'তারই বা দরকার কি। দরজা দিয়ে সুন্দর বাইরের হাওয়া আসছে।'

তাঁর শরীরে, বিশেষত মুখাবয়বে স্বাস্থ্য ও বুদ্ধির দ্যুতিময় আভাটি আমাকে ভারি আকৃষ্ট করছিল। ঘরে ঢুকেই আমি লক্ষ্য করলুম মাথার গড়ন শরৎচন্দ্রের মতো, অমনিই সাদা চুল,—একটু পাতলা কেবল। লম্বা পরিষ্কার কামানো মুখ, তীক্ষ্ণ বাঁকানো নাক, গোঁফ আছে ঠিকই কিন্তু দানাদার, যেন না থাকলেই অমানান হত। তাঁর মুখের ত্বক একেবারে নিখুঁত, কোথাও একটি ভাঁজ কি দাগ নেই,—সারাদেহ কমনীয়-তায় মণ্ডিত। শরীর যদিও বেশ ক্ষীণ। হাতের ও পায়ের ছাঁদ টানাটানা, সুঠাম। শিল্পীর চেহারা তাতে সন্দেহ নেই।

স্বাস্থ্যের কথায় বললেন, 'এখনো আমি সকালে বিকেলে একটু পাক দিয়ে আসি। খুব নিয়মমতো চলি। রাত্রে ঠিক নটার মধ্যে খাই, সকালে সাড়ে পাঁচটায় উঠে পড়ি। তামাক খাইনা। চা খাইনা। আর ষোলো বছর বয়সেই, ঐ বয়সে আয়ুর্বেদীয় একটি শ্লোক আমার চোখে পড়েছিল, বুঝলে, সেইটি ফলো করে আসছি। শ্লোকটা ঠিক মনে নেই তবে খাওয়া সম্বন্ধে তাতে নির্দেশ ছিল এই রকম: পেটের দু'ভাগ ভরাবে অন্নে, এক ভাগ ভরবে জলে, আর—এক ভাগ থাকবে শূন্য, বায়ু যাতায়াতের জন্য। সেই নিয়ম মেনে আসছি। এখনো খেতেও পারি। একসের পাঁচপো দুধ আমি দৈনিক খাই। আম দুধেলা দুটি, বড় সাইজ অবশ্য। আরো পারি, তবে আমিই যদি সব খেয়ে নিই তবে ওরা খাবে কি।' বলে সুন্দরভাবে হাসলেন। মুখে কয়েকটি স্বাভাবিক দাঁত আছে এখনো। বললেন, 'হ্যাঁ, আমি চিবিয়ে খাই এখনো। কড়াইভাজা না তা বলে। এই যেমন বিস্কিট, মুড়ি, এই সব।'

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে কথা বলার আগে সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের আসা বিষয়ে বললেন।

'সাহিত্যে আমি বেশ দেরীতে আসি। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে। সেসময় ছুটে। এভিনিউ আমার সামনে খোলা ছিল।—সাহিত্য এবং অভিনয়। সিনির ভাদুড়ি তখন নতুন দল খুলছেন, আমায় লিখলেন, অসময়, তোমার এখানে আসতে হবে। আমার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু বাড়ির মেয়েরা আপত্তি করতে লাগলেন যে বাইরের মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা হবে তাতে খারাপ হবে, সেইজন্য আর হল না। এত আপত্তি করতে লাগল সব। আমি লিখে দিলাম, না ভাই হোলনা।'

আমি বললাম, 'অভিনয়েও আপনি নিশ্চয় নাইন করতেন।'

'হ্যাঁ, সে বিশ্বাস আমারও ছিল। উনিও [শরৎচন্দ্র]

অভিনয়ে বেশ পারদর্শী ছিলেন। অভিনয়, গান, ছবি, এসবে বেশ দখল ছিল ওঁর।

'সেই সময়েই উপেন গাঙুলীর "বিচিত্রা" বের হবার তোড়জোড় চলছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "পথের পাঁচালী" আর অন্নদাশঙ্কর রায় তখন লণ্ডনের পড়া শেষ করে কন্টিনেন্ট টুর করে বেড়াচ্ছেন আর ফাঁকে ফাঁকে "পথে প্রবাসে" লিখে পাঠাচ্ছেন, তাই নিয়ে "বিচিত্রা" বের হবে। আমার উপর ভার রইল ছোট গল্পের।'

একটু চুপ করলেন।

'সেইসময় কয়েকটি ছোট গল্প লিখি। গল্পগুলি বেশ ভাল হয়েছিল। অনেকে প্রশংসা করেছিলেন। পরে সেইগুলি একত্র করে একটি বই হল। বইখানি ওঁকে দেবার জন্য একদিন গেলাম। তখন রূপনারায়ণের ধারে থাকতেন। সেই প্রথম। সেইদিনই দেখে বললেন, "এঃ! এই এতদিন অপেক্ষা করে ছিলাম, এই দেখা হল।" '

আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, 'বলেন কী!'

'হ্যাঁ। বললেন, "আর জন্মে আমরা তিন ভাই ছিলাম, এ জন্মে আলাদা-আলাদা জন্মেছি,—এই আজ এতদিনে দেখা হল।" সেইদিনই সারাদিন রেখে খাইয়ে দাইয়ে তারপর বিকেলে ছাড়লেন।'

[আমি ওঠবার সময় বলেছিলাম, 'প্রথম দিনের এই সাক্ষাৎ ডেস্ক্রাইব করতে পারেন!' বললেন, 'আচ্ছা, এর পরদিন হবে।']

'উকীল ও দেশবন্ধুর অনুগত হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত মশাই আমাকে ছোটো-শরৎবাবু বলতো।' অমলদা বললেন। 'ওরা বলতো ওঁর সঙ্গে নাকি চেহারার মিল ছিলো।'

আমি এখানে উৎসাহিত হয়ে বললাম, 'দেখুন, আমারও এখানে প্রথম পা দিয়েই কিন্তু সেই কথা মনে হয়েছে। আমার মনে হল আমি যদি শরৎচন্দ্রকে আজ দেখতে আসতাম তবে তাঁকে ঠিক এই ভাবেই দেখতাম।'

উনি প্রসন্ন উজ্জ্বল হাসিহাসি চোখ তুলে একবার কেবল আমার মুখের দিকে চাইলেন।

'আড়ালে আমাকে একথা বলতো তাতে কিছু হয়নি,—একদিন সকালে হেমেনবাবুর বৈঠকখানায় গেছি, ঘর ভরা লোক, আমি এসে ঢুকতেই তিনি বললেন, "এই যে আসুন, ছোটো শরৎবাবু আসুন"। আমি বললুম, এটা কিরকম হল। কেন আপনি আমাকে এভাবে ডাকেন কেন! উনি সকলকে ডেকে বললেন, "কেন, অন্যায়টা কি বলেছি বলুন! দেখতে একরকম, স্বভাব চরিত্র রুচি একরকম, কথা একরকম, এমনকি লেখাও একরকম,—বলুন আপনারা, ছোটো শরৎবাবু বলে ওঁকে কি অপমান করা হলো!" '

'বয়সে আমার চেয়ে বেশি বড়ো ছিলেন না, বড় জোর বছর পাঁচ ছয়ের, কিন্তু নিজেকে বুড়ো বানাবার দারুণ শখ ছিল। চুলগুলো পর্যন্ত জোর করে, ইচ্ছা করে, পাকিয়ে ফেললে।'

'ইচ্ছা করে কিরকম!'

'এই বড় বড় চুল রাখতো, তা আবার রুখু, তেল নেই, চিরুনি নেই, এমনি করতে করতে পেকে গেল তারপরে!'

এইখানে শ্রীকান্তর বড় বড়, রুক্ষ, মাথাভর্তি এলোমেলো চুলের বর্ণনা আমার মনে পড়ে গেল। ওঁর নিজের ছবিও। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে একদিন ভারি সুন্দর বলছিলেন: 'আমরা সকলেই তখন শ্রীকান্ত হচ্ছি, আমি নজরুল অচিন্ত্য প্রেমেন, রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে শ্রীকান্তরা চলেছে…'

'তারপর চুল পেকে যেতে বেশির খুশি!'

'হ্যাঁ। দারুণ খুশি।'

ওঁর সঙ্গে আমিও হাসলাম। কিন্তু ওঁর চোখ ছিল আমার, বুঝলাম শরৎচন্দ্রকে পরিষ্কার দেখছেন।

'বসলিশে আমিয়ে গল্প বলতে পারতেন। শুধুই গল্প না,

তার মধ্যে বেশ বুঝতে পারতাম মিথ্যে বানিয়ে বলে যাচ্ছেন। শুনতে শুনতে লোকের আর হুঁশ থাকতো না। আমি বলতাম, আচ্ছা, এগুলো কেন করেন। বন্দুক দিয়ে ঐ যে সাপ মারার কথা বললেন, ওকি সত্যি। উনি হেসে বলতেন, "দেওয়ালের কার্টুনটাও সত্যি, লাশটাও সত্যি, বন্দুকটাই বানানো। তা গল্পে ওটা চাই, না হলে গল্প হয় না।"— আরো বলতেন, "যে-মিথ্যায় দুনিয়ার কারো কোনো ক্ষতি নেই, বরং লোকে যদি তাতে একটু খুশি হয়, তবে জেনো সে-মিথ্যায় কোনো অন্যায় হয় না।"

বিকেলের দিকে গাড়িতে প্রায় রোজই তাঁরা বেড়াতে বের হতেন : অসমঞ্জ এবং শরৎচন্দ্র। শুনে আমি পুলকিত। তাহলে নিশ্চয়ই বহু অন্তরঙ্গ আলাপের অবকাশ হয়েছে, শরৎচন্দ্রের নিভৃত মনের অনেক কথা, অনেক কাহিনীর সাক্ষী আছেন অসমঞ্জ। গাড়ি রেখে লেকের ধারে বা বরফঢাকা ঘাসের জমি ছেড়ে গাছের নীচে তাঁরা বসতেন।

'আর কেউ কখনো সঙ্গে থাকতো না!'

বললেন, 'হ্যাঁ, মাঝে মাঝে অমল, ওঁর ভাইপো, সে তখন খুব ছোট ছিল, সঙ্গে থাকতো।'

আমি জানতে চাইছিলাম 'স্ত্রী' থাকতেন কি না। পরিষ্কার করে সে প্রশ্নর আর দরকার হলনা।

'মাঝে মাঝে ভিক্ষুকরা এসে পয়সা চাইত। "বাবু, একটা পয়সা দিন," তিনি দেখতাম পকেট থেকে থলি বার করে, দেখা নেই, শোনা নেই, হাতে যা উঠল, কথা বলতে বলতে অন্যমনে একমুঠো খুচরো পয়সা তুলে দিয়ে দিলেন। দু'টাকা আড়াই টাকার খুচরো যা উঠল দিয়ে দিলেন। আমি বলতাম, এটা কি হল দাদা! এইভাবে কেউ পয়সা দেয়! বলতেন অসম্ভ ভরে, "যাক যাক, যেতে দাও।"

ডস্টয়েভ্স্কি সম্পর্কেও এমনি গল্প আছে, তাঁর স্ত্রী লিখেছেন। মনে হল এই ভাবে পয়সা দিয়ে ভিক্ষুকের অপ্রত্যাশিত প্রাপ্তির আনন্দের ছবিটা দেখতে চাইতেন। তার মধ্যে সেই চমকের কল্পনাও তাঁকে আনন্দ দিত। ভাণ নয়, অভিমান নয়, অহঙ্কার নয়, সুলভ বড়লোকি কৌতুকও নয়,

অসমঞ্জকে বলতেন, 'সারাজীবন অর্থের কষ্ট পেয়েছি, জানো। এখন মরবার সময় হাতে আসচে। ও যত দিয়ে দেওয়া যায় ততই ভালো।'

অসমঞ্জ এই সূত্রে বললেন,

'তিনি কখনো লেখার পার্ ব্যবহার করেননি, জানো!' পার্-কথাটা ঠোঁটের চাপ দিয়ে 'আর'-টা 'রোল' করে তারি সুন্দর উচ্চারণ করলেন।

'তখন পার্ ব্যবহার খুব ফ্যাশন হয়েছে। কিন্তু উনি ব্যবহার করতেন থলি, কাপড়ের, যাকে বলে বটুয়া,—এই ছবিটা আমি তাঁরই কাছ থেকে পেয়েছি, এখনো চলছে। এই যে দেখোনা, দাঁড়াও তোমাকে দেখাই।'

উঠে হাতবাক্সের তালা উল্টিয়ে ভিতর থেকে একটি কাপড়ের থলি বের করলেন। 'এটি আমাকে একটি মেয়ে দিয়েছিলো।' থলির ভিতরে কিছু খুচরো পয়সা ছিল, নয়াপয়সার নানা অঙ্কের মুদ্রা। থলিটা টান করে ধরতেই চৌকো চাপ্টা একখণ্ড দুভাঁজ কাপড় হয়ে গেল। মুখের ধারে ধারে একদিকে সুতুলি পরানো আছে, তাতে টান দিলেই মুখটি গুটিয়ে জড় হয়ে একটি ছোট থলি হয়ে গেল। ভঙ্গি করে দেখালেন, 'এমনি খুলে হাত ভরে পয়সা তুলতেন।' হাতে উঠে এল কিছু খুচরো নয় মুদ্রা। 'আমি আর অত কোথায় পাবো। তিনি মুঠো করে তুলতেন।'

বললেন, 'থলিতে পয়সা রাখার অনেক সুবিধা। কম জায়গায় রাখা চলে, সঙ্গে সঙ্গে রাখা যায়। ধরো কোনো বাড়িতে গেছ, কাউকে চেনোনা, ছেলেপিলেদের হয়তো কারো হাতটান আছে, এইভাবে গুটিয়ে ট্যাঁকে রেখে দিলে, —হয়ে গ্যালো।'

'ওঁর অবশ্য আরো সুন্দর কাল করা থাকতো। দিস্, ও হবে না। ও ত ছিঁড়ে যাবে। সাটিনের কাপড়, তাতে সুন্দর নক্সাকাটা।'

'পয়সা কড়ির ব্যাপারেই নয়, সব কিছুতেই খুব স্পষ্ট নিরাসক্তি ছিল।' অসমঞ্জ বললেন। 'খুব একস্ট্রাভাগাণ্ট ছিলেন। জিনিষ কিনতেন প্রচুর। দরকার নেই, তবু যেতে আসতে দোকানে ঢুকে পড়তেন। স্টেশনারী দোকানে সুন্দর করে জিনিষ সাজানো আছে, দেখতেন আর জিজ্ঞাসা করতেন, এটা কি, ওটা কি, কি হয়, কিভাবে ব্যবহার করতে হয়। "আচ্ছা দিয়ে দিন একটা।"

'আমি আপত্তি করতাম। এ্যাশ-ট্রে-টি যে কিনলেন দাদা, ওটি আপনার কোন কালে লাগবে! বাড়িতে ত বারো-চৌদ্দটা জমা হয়ে আছে!'

' "আহা, তুমি বোঝনা অসমঞ্জ, জিনিষ রেখে দিলেই একসময় না একসময় ঠিক কাজে লাগে। সবই দরকার।" '

একদিনের একটা ঘটনা বললেন। তিনি এবং শরৎচন্দ্র গাড়িতে বেশ একটু ঘুরে যাবেন। ড্রাইভার বললো, 'পেট্রল একটু বেশিই নেওয়া দরকার। কত নেব!'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'দু গ্যালন নিয়ে নাও।' তাকে একটি দশ টাকার নোট দিলেন।

'তখন ত পেট্রল শস্তা' অসমঞ্জ বললেন, 'দেড়টাকা করে গ্যালন। কিন্তু সন্ধ্যে পর্যন্ত দেখলাম সে বাকি পয়সাটা আর ফিরিয়ে দিল না। পরদিন দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, "দাদা ঐ যে নোটটা দিলেন পেট্রল কেনার জন্য, বাকিটা সে কি আর ফিরিয়ে দিয়েছিল!" '

'শরৎচন্দ্র হাত নেড়ে একটা অসহিষ্ণু ভাঙ্গিতে ওহি করলেন, অর্থাৎ, "যেতে দাও, যেতে দাও,—ও ঠিক আছে।" '

আর একটি কথা বললেন অসমঞ্জ : নূতন অপ্রকাশিত লেখকরা গল্প নিয়ে হাজির হতেন। শরৎচন্দ্রের কাছে অনেকে যেতে সাহস পেতেন না, তাঁরা অসমঞ্জকে ধরতেন। তাঁদের উদ্যমের সাহায্যে অনেকের রচনা ছাপা হয়েছে—অনেকে উঠেছেন, অনেকে হারিয়ে গেছেন। কিন্তু নূতন লেখকদের সাহায্য করার ব্যাপারে শরৎচন্দ্র আগ্রহী ছিলেন।

[কিন্তু তবুও একথা মনে হয়েই, অসমঞ্জর এই গল্প পড়ার পরও, যে এ বিষয়ে তাঁর যেন কিঞ্চিৎ ভীতি, এমনকি অসহিষ্ণুতাই ছিল। কারণ স্বাভাবিক।]

একবার একজন একটি লেখা দেন অসমঞ্জকে। গল্পটি তাঁর ভাল লাগে। লেখা এবং লেখককে নিয়ে পরদিন তিনি শরৎচন্দ্রের কাছে হাজির হলেন।

'দাদা এই ছেলেটি বেশ ভাল একটি গল্প লিখেছে। লেখাটি পড়ে আপনাকে কোনো সম্পাদকের কাছে একটি চিঠি লিখে দিতে হবে।'

শরৎচন্দ্র বললেন, 'তুমি পড়েছ ত! লেগেছে ওতেই হবে।'

'না, আপনাকেও পড়ে দেখতে হবে।'

'আচ্ছা রেখে যাও, পড়ব।'

'না, আজকেই রাত্রে পড়ে দেখতে হবে দাদা।'

'আচ্ছা আচ্ছা হবে।'

অসমঞ্জ তখন ছেলেটিকে ভরসা দিয়ে বললেন, 'যাও, ঠিক আছে। কাল এসে লেখা কোরো।'

পরদিন অসমঞ্জ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দাদা, গল্পটা পড়েছেন ত!'

'হ্যাঁ, ঠিকই বলেছ তুমি, দাদা লিখেছে।'

'উঁহুঁ, এ ত হলনা দাদা,' অসমঞ্জ বললেন, 'আমার যে মনে হচ্ছে আপনি পড়েন নি।'

'কে বললে পড়িনি।'

ক্লান্ত কৃষক ফসে যাওয়া মাটিতে চাষ করছে। এটা ভারতীয় কৃষকের একটা ছবি। প্রকৃতির খামখেয়ালীপনার জন্য তাদের প্রায়ই এমনটা ভাবতে হয়।

কৃষির পদ্ধতি বেশকে পরিবর্তনের জন্য একটি গুরু। কৃষকরা যেন নতুন পদ্ধতি নিয়ে ভাবি হয় আর, তেমন সুযোগের ব্যাপক উন্নত ফসলের বিনিময় দেখা পাওয়া যায়। প্রকৃতির খেয়ালখুশি এবং অসময়ে বৃষ্টিপাতের এমন তেও পরিবর্তনে হয়ে থাকে। এর জন্য অনেক নিখুঁত জমিতে নিশ্চিত ফসলের সম্ভাবনা খুবই কম।

আমাদের অর্থনীতির ভিত্তি হোল কৃষি

'আমিই বলছি। আচ্ছা কই বলুন দেখি, স্বামী ছেড়ে যাওয়ার পর তখন চারুলতার কি হল।'

শরৎচন্দ্র বিব্রত হয়ে বলতেন, 'আরে, অত ইয়ে করোনা, বুঝলে। অমন করে প্রশ্ন কোরোনা।'

অসমঞ্জ হেসে বললেন, 'তা চিঠি তিনি দিয়েছিলেন এবং সে লেখা ছাপাও হয়েছিল।'

সন্ধ্যা ৭ টার সময়ে এসেছিলাম, আটটা বাজে, এবার উঠতে হয়। মাঝে একবার তিনি চায়ের প্রস্তাব করেছিলেন। আমি বলেছিলাম, 'না, এই সময়ে তার দরকার নেই।'

'কেন, খাও না। আমি নিজে চা খাইনা বটে তবে সরঞ্জাম আমার তৈরী থাকে। ভালো চা, পট, পেয়ালা, কেটলি, দুধ'

আমি বললাম, 'না, তার দরকার নেই। দরকার হলে আমি বলব। আমি ত সাধারণ সামাজিকতা রক্ষা করতে আসিনি। আমি এসেছি সাহিত্যিকের বাড়ি। কিছু চিন্তা করবেন না, আমি কোনো সঙ্কোচ করব না।'

উনি চুপ করে গিয়েছিলেন কিন্তু একটু পরে একটি যুবক বাড়ির ভিতর থেকে এক পেয়ালা চা আর একটি ডিসে কয়েকখানি বিস্কিট নিয়ে ঘরে এলেন। বিস্কিট ফিরিয়ে দিয়ে আমি কেবল চা নিলাম।

আমি বললাম, 'উঠি আজ। আজ আপনার মুখ থেকে শুনলাম, এবারদিন আমার প্রশ্ন ধরে ধরে আপনার উত্তর শুনব।'

একটানা বেশিক্ষণ কথা বললে স্ট্রেন হয় বললেন।

আমি বললুম, 'বলুন, কোনো স্ট্রেন হল কী? বিরক্ত লাগল।'

'না, না, স্ট্রেন হলেও শরৎচন্দ্রের কথায় আনন্দ আছে ত, তাতে কমপেনসেটেড হয়ে যাবে।' হাসলেন, কিন্তু সে হাসি এবার ম্লান ছিল।

সেদিনের মত ঐ পর্যন্ত।

[এর পরে ২৮ জুন ৬৪-তে এই রিপোর্টটি ওঁকে পড়ে শোনানো হয়। শুনে নীচে লিখে দেন 'বহুদিনের পুরানো স্মৃতির থলি থেকে যে কথাগুলো বাইরে তুলে নিতে পেরেছি, তা ঐ উপরের কথাগুলি। অসমঞ্জ মুখোপাধ্যায়, ১৪ আষাঢ় ১৩৭১' : ২৮ জুন, ১৯৬৪]

২

২৯ জুন, ১৯৬৪ : কাল সন্ধ্যায় প্রথমত এই রিপোর্টটি ওঁকে শুনিয়ে আসার জন্যই যাই। খুব মন দিয়ে সমস্তটি শুনলেন। মাঝে মাঝে যা যোগ করলেন বা সংশোধন করলেন তা আমি সঙ্গে সঙ্গে টুকে নিলাম। রিপোর্টটি ওঁর ভাল লেগেছে। বললেন, 'হ্যাঁ, সব ঠিক লেখা হয়েছে। সব কথা তোমার ত বেশ মনে ছিল দেখছি।' বলে হাসলেন। আসবার সময় আবার বললেন, 'বেশ ভাল হয়েছে তোমার রিপোর্ট।' হেসে বললেন, 'একটু হাতে রেখে বলছি, পাছে আর না আসো।'

আমিও হাসলাম। বলে এলাম আর একদিন এসে নোটগুলি সব গুছিয়ে নিয়ে যাব। বললেন, 'এসো। যখন ইচ্ছা হবে চলে এসো।' [আর যাওয়া হয়নি ওঁর কাছে। তারপর ত তিনিই চলে গেলেন।]

শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এদিন আরো কিছু আলোচনা হল। আমি ওঁকে প্রথম দিন শরৎচন্দ্রের সঙ্গে ওঁর দেখা হওয়ার বিবরণ দিতে বলতে উনি যা বললেন তা হবহু "শরৎস্মরণী—১৩৬৬"-তে প্রকাশিত ওঁর লেখা "রূপনারায়ণের ধারে." যা কাল সকালেই আমি ফের পড়েছিলুম, লেখা আছে।

রচনাটিতে আছে, দেখেই বললেন "চা খাও"। উনি লিখেছেন সম্ভবত আগেই আসতে দেখেছিলেন।

কিন্তু বললেন, 'শরৎচন্দ্র বাবাকার বসে দাবা খেলছিলেন। আমি উঠে এলুম, কিছুক্ষণ দাঁড়ালুম, কোনোই হুঁশ নেই। শেষে একটি চেয়ার টেনে বসলুম, তখন মুখ তুলে তাকালেন।'

রূপনারায়ণের ধারে এই অঞ্চল "পানিত্রাস" বা "সাঁওতাবেড়ে", দুইই বলা হয়। নদীর ধারেই শরৎচন্দ্রের বাটির দোতলা এই বাড়ি। পিছনে খানিকটা ফাঁকা মাঠ। তারপর বাঁধ। বাঁধের ওপারে গ্রাম।

বাড়িটি শরৎচন্দ্র নিজের পছন্দ মত তৈরী করিয়েছিলেন। মাটির বাড়ি, কিন্তু মজবুত, ঠাণ্ডা, সুন্দর।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'হোয়াইটওয়াশ করা?'

'হ্যাঁ, বেশ ঝকঝকে তকতকে সুন্দর বাড়ি।'

'দেখলে বোঝা যেত বেশ স্বচ্ছল, রুচিসম্পন্ন, আধুনিক বাড়ি!'

'হ্যাঁ নিশ্চয়।'

'তখন ত তিনি রীতিমত কেমাস্ রাইটার। সোয়িং!'

'হ্যাঁ, তা ত বটেই।'

'আর দিব্যি দাবা খেলছেন বসে বাইরের একজন সাধারণ ভদ্রলোকের সঙ্গে!'

উনি হাসলেন। 'হ্যাঁ, স্থানীয় এক ভদ্রলোক। তবে শিক্ষিত নিশ্চয়ই।'

মনে হল না-হলেও কিছু এসে যেতনা। দাবা খেলার সঙ্গী হলেই হল। জিজ্ঞাসা করলাম, 'দেখতে বসে খেলছিলেন!'

'না, চেয়ারে। একটা টিপয়ের উপর দাবার ছক পাতা ছিল।'

'খালি গায়ে বসেছিলেন!'

একটু ভেবে বললেন, 'না। গায়ে একটা জামা ছিল। ঐ হাফ-হাতা যে-জামা পরতেন।'

দৃশ্যটি কল্পনা করে আমার ভাল লাগছিল। সামনে নদী, ফাঁকা অবারিত আকাশ, মাঠ, হু হু হাওয়া, নির্জন নদীর ধারে জলমুখী একটি মাত্র বাড়ি, বাড়িটি সুন্দর, ছিমছাম, আর বন্ধিত লেখক নিশ্চিন্ত নিরুদ্বেগ অবসরের গায়ে হেলান দিয়ে দাবা ঝুঁকিয়ে একমনে দাবা খেলছেন, হুঁশ নেই, অভ্যাগতের আগমনেও চমক ভাঙে না। তাঁর চেয়ারটিও চোখে পড়ল যেন। অগোছালো একঝাপা রুক্ষু এলোমেলো চুল, ঘুমন্ত, লম্বা সুন্দর দৃঢ় নিরীহ মুখ, ধবধবে পরিচ্ছন্নতা, কপালে চিরদিনের সঙ্গী সেই একাকীত্বের বিষণ্ণতা, মুখ, ঠোঁট, দৃঢ়বদ্ধ, যেন অভিমানী।

সেই সময় তাঁর কলকাতার বাড়িও তৈরী হচ্ছিল।

আমার কেমন ধারণা ছিল যে পানিত্রাস বা সাঁওতাবেড়ের এই বাড়ি দেখতে ভাল ছিল না। মাটির সাধারণ বাড়ি, কিরকম এবড়ো-খেবড়ো, দরিদ্র,—এবং কেন যে শরৎচন্দ্র তখন কলকাতা ছেড়ে ওখানে গিয়ে ছিলেন, আমি তার হেতু পেতাম না। আমার আরো ধারণা ছিল যে এ বাড়িতে কেবল শরৎচন্দ্র ও তাঁর স্ত্রী থাকতেন। তা নয়। তাঁর ভাই, ভাইয়ের স্ত্রী এবং তাঁদের ছেলেমেয়েরা সকলে মিলে থাকতেন। শরৎচন্দ্রের কোনো ছেলেমেয়ে ছিল না।

শরৎচন্দ্র ভরা পরিবারে সকলকে নিয়ে থাকতে ভালবাসতেন। বার্মা থেকে এদেশে এসে ছিলেনও তাই। তাঁর ভাইয়ের রোজকারপত্র কিছু ছিলনা। তার দরকারও খুব ছিল না। শরৎচন্দ্রের একার আয়েই তখন স্বচ্ছল পরিবার। শরৎচন্দ্রের স্ত্রী সুগৃহিনী ছিলেন। তাঁকে ছাড়া চলতো না। এই সুগৃহিনীর ছবি, যাঁকে ছাড়া পরিবারের একেবারেই চলেনা, শরৎসাহিত্যে অনেক আছে।

কিন্তু একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম যে তাঁর স্ত্রী সম্পর্কে আলোচনা করতে এঁদের সকলেরই কেমন দ্বিধা। কালিদাসেরও দেখলাম, অনঙ্গ মুখোপাধ্যায়েরও তাই। শুনলাম কালিদাসের মতো অনঙ্গও শরৎচন্দ্রের স্ত্রীকে কখনো দেখেননি।

আমি বললুম, 'এর আগের দিন যে বললেন বিকেলে

গাড়িতে আপনি এবং শরৎচন্দ্র বেড়াতে বের হতেন, কোনো কোনোদিন তাঁর ভাইপো শিশু-অমল থাকতো, তাঁর স্ত্রী কোনোদিন যেতেন না।'

অমলও সংক্ষিপ্ত এবং শুষ্ক কেবল একটি "না" বললেন। একটুক্ষণ চুপচাপ কাটল।

[কালিদাসের কথা এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছিল। রবীন্দ্রনাথ একদিন, একদিনই, শরৎচন্দ্রের বালিগঞ্জের বাড়িতে রবিবাসরে আসেন। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের মনোভাব আমরা সকলেই জানি, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কখনই যেন পরিষ্কার নয়। এই দুই গুরুশিষ্যের তুলনাও যেমন বিরল, তেমনি সম্পর্কের বিচিত্র বিষয় জটিলতাও। কিন্তু কালিদাস এদিনের বর্ণনা পুঙ্খানুপুঙ্খ বা মনঃপূতভাবে দিতে পারলেন না, কিম্বা দিলেন না।

আমাকেই প্রশ্ন করতে হল, 'খুব খুশি হয়েছিলেন নিশ্চয়ই!'

'হ্যাঁ! একেবারে ধন্য হয়ে গেলেন।'

পরেরদিন আবার আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'সেদিন শরৎচন্দ্রের স্ত্রীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়নি।'

কবি তাড়াতাড়ি বললেন, 'না। তিনি ভিক্টোরিয়া পর্দানশীন ছিলেন।' থেমে বললেন, 'আমরা কতদিন গেছি, নেমন্তন্ন করে খাওয়াতে ভালবাসতেন—আমি, বিশ্বপতি, সতীশ,—কিন্তু তিনি কোনোদিন সামনে আসেননি। পরিবেশন করত তাঁর [শরৎচন্দ্রের] ভাইঝি বা অন্যরা। তিনি [শরৎচন্দ্রের স্ত্রী] ভিতর থেকে আড়াল করতেন।'... 'তবে রাধেশ যেত, রাধেশের সঙ্গে দেখা হয়েছে। রাধেশের সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন।' রাধেশ কবির খুবই ভাই। তিনি শরৎচন্দ্রেরও খুব প্রিয় ছিলেন।]

আমি বললুম, 'আমার কিন্তু কিরকম মনে হয় স্ত্রী সম্পর্কে শরৎচন্দ্রের যেন একটু কুণ্ঠা ছিল।'

'হ্যাঁ, তিনি ত সাবেককালের ধরণের মানুষ ছিলেন, লেখা পড়া জানতেন না,'

আমি বললাম, 'সুতরাং সেদিক দিয়ে তাঁর জীবনেও বোধহয় একটা ফোক, একটা দূরত্ব ছিল।'

বললেন, 'না, তা নয়। বরং পারিবারিক জীবনে তিনি বেশ পরিতৃপ্ত ছিলেন। তাছাড়া তখনকার দিনে ত এতটা মেলামেশা করা বা বাইরে বেরনোর রেওয়াজ মেয়েদের ছিল না, সুতরাং ওদিক দিয়ে কোনো চিন্তা তাঁর [শরৎচন্দ্রের] মনে জাগেনি মনে হয়।'

আমি বললুম, 'তবুও, পুরুষ, বিশেষত সূক্ষ্ম বোধের ও উন্নত বুদ্ধির মানুষ চায় যে স্ত্রী বা সঙ্গিনী সবক্ষেত্রেই তার সহ-ধর্মিণী হোক। শরৎচন্দ্র সাহিত্যেও এই জিনিসটির উপর প্রচুর জোর দিয়েছেন। এবং দেখলে সাধারণত এইই মনে হয় যে কবি-সাহিত্যিকের জীবনে, এই জিনিসটি যেন ঠিক হয় না,—অথচ তাঁদেরই সবচেয়ে হওয়া দরকার,—চিন্তের ও চেতনার স্তরে ও অনুভূতির অভিজ্ঞতার দিক দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও দেখুন। মৃণালিনী তবু ও বেশ ভাল পরিবার থেকে এসেছেন কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সমকক্ষ কি তাঁকে বলা যায়।'

'না, তা ত নিশ্চয়ই বলা যায় না।'

আবহাওয়াটা তরল থেকে একটু গম্ভীর হয়ে উঠছিল। পরের প্রসঙ্গে তা অপেক্ষাকৃত হালকা হয়ে এল।

বললুম, 'সাহিত্যিক জীবনেও তাঁর এই দিকটায় যেন একটু ফাঁক ছিল মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কাছে যেমন সম্ভ্রান্ত শিক্ষিত পরিবার থেকে সুশ্রী গুণী বিদুষী মহিলারা সব এসেছেন, তেমনি কি শরৎচন্দ্রের কাছেও আসতেন। আমার মনে হয়, না। লেখাপড়া-জানা কালচার্ড মেয়েদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যিক জীবনেও যেন তেমন মেলামেশা বা অন্তরঙ্গতা

ছিল না। অবশ্য রাধারানী ছিলেন তা আমরা জানি। আচ্ছা, আপনি রাধারানী দেবীকে দেখেছেন?'

উনি একটু হেসে বললেন, 'না।'

আমি তাতে একটু অবাক হলুম।

নরেন দেবের সঙ্গে অবশ্য তাঁর আলাপ-পরিচয় ভালই। বললেন, 'এই বাড়িতেও মাসদুই আগে নরেন একদিন এসে হাজির, এই তোমার মতো। আমি বললুম, আরে, নরেন, তুমি! বললে, "এই এদিকে একটু কাজে এসেছিলুম ভাই দেখা করে গেলুম।" '

শরৎচন্দ্রের কাছে মেয়েদের আসা সম্পর্কে বললেন, 'হ্যাঁ, তাঁর কাছেও স্কুল কলেজের মেয়েরা আসতো, আমি প্রায়ই দেখেছি।'

'খুব খুশি হতেন না তাতে?'

'হ্যাঁ, খুশি ও হতেনই। একদিন সকালে গেছি, খানিক পরে একটি মেয়ে এলো,—বেশি বয়েস নয়, এই ১৫, ১৬, স্কুল কলেজে পড়ে। শরৎচন্দ্র বললেন, "কী চাই বলো?" কী আবার! সে বলল, "আপনার একটি অটোগ্রাফ নিতে এসেছি।" "অটোগ্রাফ!" শরৎচন্দ্র অবাক হবার ভাণ করে তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বললেন, "কী হবে অটোগ্রাফ। তারি তোমাদের লেখক শরৎ চাটুজ্যে তার আবার অটোগ্রাফ।" মেয়েটির সঙ্গে হাসিখুসি মুখে অনেক আলাপ করলেন। কোথায় থাকো, কি পড়ো, এই সব।—তাঁর কাছে একবার এসে-পড়তে পারলে আর ভাবনা ছিল না।—কোথায় থাকো বলতে, সে বললে, "এই কাছেই।" "কাছেই মানে!" "এই রসারোডে, ভবানীপুরের দিকে।" শরৎচন্দ্র সামান্য উদ্বিগ্ন হয়ে বললেন, "এটা বালিগঞ্জের অশ্বিনীদত্ত রোড, তুমি থাকো রসারোড, ভবানীপুরে, সেটা কাছে হল বুঝি। তাও ও একলা এসেছে।"

'মেয়েটি তাঁর অটোগ্রাফ নিয়ে খাতা বন্ধ করতে তিনি বললেন, "আমার অটোগ্রাফ নিলে, এঁর নেবে না। চেনো এঁকে?" মেয়েটি ইতস্তত করছে দেখে তিনিই বললেন, "সাহিত্যিক অসময় মুখোপাধ্যায়।" মেয়েটি লজ্জিত হয়ে তাড়াতাড়ি খাতা এগিয়ে দিতে আমি সই করলুম বটে কিন্তু পরে তাঁকে বলেছিলুম এটা ঠিক নয়। সে এসেছে তাঁর কাছে খুশি হয়ে, সেখানে জোর করে এইসব করা কেন। কিন্তু এই ছিল তাঁর ধরণ।

'মেয়েটি চলে যাচ্ছে, কি মনে করে হঠাৎ উঠে গিয়ে তাকে ডাকলেন। তাকে থামিয়ে গাড়ি বের করে গাড়িতে করে তাকে রাসবিহারী-রসারোডের মোড় পার করে এগিয়ে দিয়ে এলেন নিজে। আমাকেও যেতে হল।'

আমি একটু অবাক হয়ে বললুম, 'একটু বাড়াবাড়ি হল না!'

বললেন, 'আমিও তাই বলেছিলাম। তিনি বললেন, "তা হোক, তা হোক, ছোট মেয়ে, তাছাড়া আমার কাছে এসেছে, তাও আবার একা, আমার একটা দায়িত্ব নেই!" '

এই শরৎচন্দ্র।

আমি জিজ্ঞাসা করলাম, আসবাবে, জিনিষে, পোষাকে, জিনিষপত্রের ব্যবহারে বেশ গোছানো পরিষ্কার এবং রুচি-সম্পন্ন ছিলেন কিনা।

'হ্যাঁ, নিশ্চয়,' অসময় বললেন, 'খুব পরিষ্কার গোছানো পরিপাটি ছিলেন। কিন্তু সাধারণত প্রচলিত যা, সকলে যা করে, তা তিনি কখনো করতেন না। এই যে গেঞ্জি তোমাকে পার্সের বদলে থলি ব্যবহারের কথা বললুম, ও-ও ঠিক তাই। জামা তাঁর বিশেষ ধরণের ছিল; এই এখন হালে দেখা যাচ্ছে যা সকলে পরে, যাকে বলে বুশশার্ট। সামনেটা লম্বালম্বি সমস্তটা খোলা, কোটের মতো, বোতাম দেওয়া থাকতো। তিনটি পকেট, একটি বুকে, দুটি কোলের দিকে সামনে, লম্বা গোল, পাঞ্জাবীর মতো, হাতা হাফ।'

'এই জামা পরেই সর্বত্র যেতেন নাকি।'

'তা দেখেছি ও গেছেন ঐ জামা পরেই অনেক জায়গায়।'

আমি বললাম, 'জুতো কি পরতেন। পাম্প্‌শু। মানে নিউকাট।'

একটু ভেবে বললেন, 'হ্যাঁ।'

এদিনের আলাপে যেন শরৎচন্দ্রকে আরো কাছে পাওয়া গেল। মনে হল, তাঁর সাহিত্য যেমন অন্তরঙ্গতায় স্নিগ্ধ, মানুষটিও তাই ছিলেন : অমনিই পরিমার্জিত ও স্নিগ্ধ, অমনিই নির্দোষ, উদার স্নেহার্দ্র ও ভদ্র। কোনো সন্দেহ নেই।

সত্যব্রত বসু

সৌন্দর্যে ও সংরক্ষণে

ইষ্ট ইণ্ডিয়া পেইণ্ট এণ্ড কেমিক্যাল

ওয়ার্কস প্রাইভেট লিঃ

ক্যালকাটা, মাদ্রাজ

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভা

দেবীপ্রসাদ সেন

আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথের জন্মকাল হইতে একশত বৎসর অতীত হইয়াছে। এই একশত বৎসরের মধ্যে তাঁহার ন্যায় সর্বশাস্ত্র-বিশারদ পণ্ডিত পৃথিবীতে আর কেহ আবির্ভূত হইয়াছেন বলিয়া শুনা যায় নাই। তাঁহার প্রতিভা ছিল যেমন গভীর তেমনই ব্যাপক এবং বহুমুখী। সাহিত্য, কলা এবং বিজ্ঞানের বিবিধ শাখায় তিনি অতি স্বচ্ছন্দে বিচরণ করিতেন। তাঁহার জ্ঞানের পরিধি এমনই বিস্তৃত ছিল যে লোকে তাঁহাকে জীবন্ত জ্ঞানভাণ্ডার (Encyclopædia) বলিয়া অভিহিত করিত। একাধারে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও অসাধারণ স্মৃতিশক্তির সমাবেশে তাঁহার প্রতিভা এক বিস্ময়কর মহিমায় মণ্ডিত হইয়াছিল। তাঁহার দ্বি-সপ্ততিতম জন্ম-জয়ন্তী উৎসবে সমবেত মনীষীবৃন্দ একবাক্যে স্বীকার করেন যে তাঁহারা পৃথিবীর নানাদেশে পরিভ্রমণ করিয়া আচার্য শীলের ন্যায় দ্বিতীয় আর একজন সর্বশাস্ত্রবিৎ সুপণ্ডিতের সন্ধান লাভ করিতে পারেন নাই। আমরা এই প্রবন্ধে তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভা সম্বন্ধে কয়েকটী কাহিনীর উল্লেখ করিব। ইহার মধ্যে অধিকাংশ কাহিনীই আমরা তাঁহার ছাত্র, ভক্ত কিংবা সহকর্মীর নিকট হইতে সাক্ষাৎভাবে শুনিয়াছি।

আচার্য্য শীলকে আমরা সাধারণতঃ একজন প্রখ্যাত দার্শনিক বলিয়া জানি। তিনি যে এ যুগের একজন শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ছিলেন তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। দুর্ভাগ্যক্রমে তিনি তাঁহার দার্শনিক মতবাদ গ্রন্থাকারে প্রকাশ বা প্রচার করিবার সুযোগ পান নাই। তাঁহার অসুস্থতা এবং কয়েকটী দৈব দুর্ঘটনাই তাহার কারণ। আমরা নিশ্চিতভাবে বলিতে পারি যে বিধাতা যদি তাঁহাকে এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত না করিতেন তাহা হইলে দর্শন শাস্ত্রের ইতিহাসে তিনি একটী স্থায়ী আসন লাভ করিতেন। সর্বত্র দার্শনিক হিসাবে পরিচিত হইলেও ডক্টর শীল নিজেই বলিতেন যে তিনি যে দর্শন-শাস্ত্রে এম, এ, পাশ করেন এবং দর্শন শাস্ত্র চর্চা করেন তাহা একপ্রকার আকস্মিক ব্যাপার। জেনারেল এসেম্‌ব্লির কলেজ (বর্তমান স্কটিস চার্চ্চ কলেজ) হইতে বি, এ, পাশ করিবার পর, ব্রজেন্দ্রনাথ গণিত শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষা দিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছিলেন। পরীক্ষার প্রায় একমাস আগে তিনি কি জন্য দিতে যান। সেকালে কলেজের ছাত্র সংখ্যা ছিল খুবই কম। সুতরাং কলেজের অধ্যক্ষ এবং অধ্যাপকগণ সকল ছাত্রকে সাক্ষাৎভাবে জানিতেন। অধ্যক্ষ মহোদয় নিজেই অনেক সময়ে ছাত্রদের নিকট হইতে কি জন্য লইতেন। ব্রজেন্দ্রনাথ কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ হেষ্টি সাহেবের নিকট কি জন্য দিতে গেলে অধ্যক্ষ হেষ্টি লক্ষ্য করেন যে তিনি গণিত শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষা দিতে উদ্যত হইয়াছেন। কিন্তু অধ্যক্ষ মহোদয়ের ধারণা ছিল যে ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন শাস্ত্রে এম, এ, পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতেছেন। ব্রজেন্দ্রনাথ গণিত শাস্ত্রে উক্ত পরীক্ষায় অবতীর্ণ হন ইহা অধ্যক্ষ সাহেবের মনঃপূত না হওয়ায় তিনি তাঁহাকে পরীক্ষার আবেদন পত্রে গণিতের স্থলে দর্শন শব্দটী বসাইতে অনুরোধ করেন। অধ্যক্ষের অনুরোধে ব্রজেন্দ্রনাথ প্রমাদ গণিলেন। তিনি সবিনয়ে জানাইলেন যে মাত্র একমাস সময়ের মধ্যে তাঁহার পক্ষে দর্শন শাস্ত্রে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হওয়া অসম্ভব। তাঁহার কথা শুনিয়া অধ্যক্ষ

মহাশয় নিজ হাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সাধন করেন এবং সহাস্যে বলেন যে ব্রজেন্দ্রনাথের মত ছাত্রের সঙ্গে দর্শন শাস্ত্রে প্রশ্নোত্তর জন্য এতখানা সময়ই যথেষ্ট। যথাকালে ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন শাস্ত্রে এম. এ, পরীক্ষায় বসিলেন। প্রতি পত্রে তিনি মাত্র একটী করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিলেন। তাহার কারণ, সন্তোষজনকভাবে একটী করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিতেই তাঁহার সমস্ত সময় অতিবাহিত হইয়া যাইত। অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর লিখিবার সময় থাকিত না। পরীক্ষা দিয়া তিনি প্রায় নিশ্চিত ছিলেন যে তিনি উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। পাঁচ ছয়টী প্রশ্নের স্থলে মাত্র একটী করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিয়া কি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব? কিন্তু পরীক্ষার ফল বাহির হইলে দেখা গেল যে ব্রজেন্দ্রনাথ দর্শন বিষয়ে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। মাত্র একটী করিয়া প্রশ্নের উত্তর লিখিলেও সে উত্তরগুলি এতই উৎকৃষ্ট হইয়াছিল যে তাঁহার পরীক্ষকগণ মেধাক্রমে তাঁহাকেই প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থানের যোগ্য বলিয়া বিবেচনা করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ পরীক্ষকগণের এই সুপারিশ অনুমোদন করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এরূপ ঘটনা আর ঘটিয়াছে বলিয়া শুনি নাই।

দর্শন শাস্ত্রে এম এ পাশ করিবার পর আচার্য্য ব্রজেন্দ্রনাথ কলিকাতা সিটি কলেজে গণিতের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। এই সময়ে তিনি গণিত বিষয়ে মৌলিক গবেষণামূলক একখানি পুস্তক রচনা করেন। সিটি কলেজে দুই এক বৎসর অধ্যাপনা করিবার পর তিনি নাগপুর মরিস কলেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। শুনিয়াছি যে সেই সময়ে তিনি ইংরাজী সাহিত্য অনুশীলনের জন্য ব্রিটিশ মিউজিয়াম হইতে কোনও কোনও হস্তলিখিত ইংরাজী পুঁথির নকল আনাইয়া অধ্যয়ন করিতেন। অনতিকাল মধ্যে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত হন। কিন্তু দুই বৎসরের মধ্যেই আবার আচার্য্য শীল বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের অধ্যক্ষ পদ পাইয়া বঙ্গদেশে ফিরিয়া আসেন। সে সময়ে বহরমপুর সংস্কৃত চর্চ্চার একটী প্রধান কেন্দ্র ছিল। ব্রজেন্দ্রনাথ অবসর সময়ে স্থানীয় পণ্ডিতগণের নিকট ভারতীয় দর্শনের মূল গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করিতেন। এই সকল গ্রন্থের যে যে অংশগুলি সাধারণতঃ পণ্ডিতগণ বাদ দিয়া যাইতেন তিনি বিশেষ আগ্রহের সহিত সেই অংশগুলি পড়িতেন। এই অধ্যয়নের ফলে আচার্য্য শীল উপলব্ধি করেন যে ভারতীয় দর্শন এবং পাশ্চাত্য দর্শনের তুলনামূলক আলোচনার দ্বারা একটা নূতন দার্শনিক মত উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। সেই সময় হইতে তিনি এ বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকেন এবং নূতন "তুলনামূলক দর্শন", অথবা "সমন্বয়-দর্শনের" মূল উদ্ভাবনের জন্য সচেষ্ট হন। দর্শন চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সমানভাবে ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের অনুশীলন করিতে থাকেন এবং অনতিকাল মধ্যে এ বিষয়ে "New Essays in Criticism" নামে একখানি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালীন বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে একটী মনোজ্ঞ প্রবন্ধ আছে; প্রবন্ধটি ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইলেও ইহা বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে আচার্য্য শীলের গভীর আগ্রহ এবং মননশীলতার পরিচায়ক।

১৮৮৮ খ্রীষ্টাব্দে কুচবিহারের উদার প্রাণ প্রজাহিতৈষী মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ নিজ রাজ্যে কুচবিহার সহরে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার নামে একটি কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম কয়েক বৎসর ইংরাজী অধ্যক্ষের পরিচালনায় কলেজের কার্য্য পরিচালিত হয়। ইতিমধ্যে আচার্য্য শীলের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি দেশময় ছড়াইয়া পড়ে। কুচবিহারের মহারাজার অনুরোধে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন। তৎকালে ঐ কলেজে ইংরাজী এবং দর্শনশাস্ত্রে এম, এ পর্য্যন্ত পড়ান হইত। আচার্য্য শীল ঐ দুই বিষয় ছাড়াও ইতিহাস এবং অর্থনীতি পড়াইতেন। দীর্ঘ ষোল বৎসর যাবৎ তিনি এই কলেজের অধ্যক্ষপদ অলঙ্কৃত করেন। এখনও কুচবিহারের নাগরিকগণ এবং ঐ কলেজের শিক্ষক ও ছাত্রগণ

আচার্য্য শীলের নামে গৌরব অনুভব করিয়া থাকেন। কুচবিহার কলেজে তাঁহার নিকট অধ্যয়ন করিয়া যাহারা পরবর্ত্তীকালে বিভিন্ন বিভাগে কৃতিত্বের সহিত কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকে এখনও জীবিত আছেন। কুচবিহারের প্রবীণ নাগরিক এবং আচার্য্য শীলের প্রাক্তন ছাত্রবৃন্দের মুখে তাঁহার সম্বন্ধে অনেক বিস্ময়কর কাহিনী শুনিয়াছি। তাহারই দুই একটি এখানে উল্লেখ করিতেছি।

আচার্য্য শীল যখন কোনও পুস্তক পড়িতেন তখন এমন নিবিষ্টচিত্তে তাহা পড়িতেন যে নিজের পরিবেশ, এমন কি নিজের দেহসম্বন্ধেও সম্পূর্ণ জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িতেন। একবার কলেজের লাইব্রেরীর জন্য ক্যাম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত ভারতবর্ষের ইতিহাস ক্রয় করা হয়। পুস্তকগুলি কলেজে আসিয়া পৌঁছিলেই আচার্য্য শীল উহা লইয়া পড়িতে আরম্ভ করেন। পড়িতে পড়িতে তিনি এরূপ তন্ময় হইয়া যান যে কখন যে কলেজ ছুটি হইয়া গিয়াছে তাহাও বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহার আর্দালি তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেয় যে কলেজের ছুটি হইয়া গিয়াছে, এখন বাড়ী যাইতে হইবে। আর্দালির কথায় আচার্য্য শীল ঘোড়ার গাড়ী করিয়া বাড়ী ফিরিলেন। কিন্তু গাড়ীর মধ্যেও পাঠ চলিতে থাকে এবং বাড়ী আসিয়াও নিজ কক্ষে বসিয়া ঐ পুস্তক পড়িতে থাকেন। ইতিমধ্যে সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া যায়। ভৃত্য তাঁহার সম্মুখে বাতি রাখিয়া যায়। যথাসময়ে তাঁহার বৈকালীন আহার ও পরিবেশন করা হয়, তিনি অধ্যয়নে নিবিষ্ট থাকিয়া অন্যমনে ঐ আহার সমাপন করেন। এইভাবে পড়িতে পড়িতে একখণ্ড পুস্তক পড়িয়া ফেলেন। তখন বই বন্ধ করিয়া আচার্য্য শীল শিশুর ন্যায় চীৎকার করিয়া বলিতে থাকেন যে তিনি বহুক্ষণ হয় কলেজ হইতে আসিয়াছেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত তাঁহাকে বৈকালীন জলখাবার দেওয়া হইল না; ক্ষুধায় তাঁহার পেট জ্বলিয়া যাইতেছে ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে তাঁহার অন্যতম কৃতী ছাত্র মৈমনসিংহ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ শ্রীকুমুদবন্ধু চক্রবর্ত্তী মহাশয় আচার্য্য শীলের শত বার্ষিক-স্মারক গ্রন্থে একটি মনোরম ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন। কুমুদ বাবু তখন কুচবিহার কলেজের ছাত্র। একদিন প্রাতর্ভ্রমণে বাহির হইয়া তিনি আচার্য্য শীলের গৃহের সম্মুখস্থ রাস্তা দিয়া যাইতেছিলেন তখন সবে ভোর হইয়াছে। তিনি সবিস্ময়ে দেখিলেন যে অধ্যক্ষ শীল তাঁহার কলেজে যাইবার পোষাক পড়িয়া, বারান্দায় দাঁড়াইয়া আছেন। কৌতূহল বশতঃ কুমুদবাবু একটু অগ্রসর হইয়া ডক্টর শীলকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"এত ভোরে কোথায় যাচ্ছেন, স্যার?" অধ্যক্ষ শীল উত্তরে জানাইলেন যে তিনি কোথাও যাইতেছেন না,—কাল কলেজ হইতে একখানি বই পড়িতে পড়িতে বাড়ী আসিয়াছিলেন এবং বাড়ী আসিয়াও সেই বই পড়িতে পড়িতে কখন যে রাত্রি কাটিয়া গিয়াছে—তাহা বুঝিতে পারেন নাই; চারিদিক ফর্সা হইয়া গিয়াছে দেখিয়া একটু বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। অধ্যয়নের মধ্যে এরূপ ভাবে নিজেকে হারাইয়া ফেলার দৃষ্টান্ত বিরল।

কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষরূপে আচার্য্য শীলকে নানা প্রকার বৈষয়িক কার্য্য করিতে হইত বটে, কিন্তু তাঁহার মন সর্ব্বদা জ্ঞানরাজ্যে বিচরণ করিত। বৈষয়িক কার্য্যেও যাঝে মাঝে সুত্র পাইলেই তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া ফেলিতেন। কুচবিহারে তাঁহার প্রবীণ ছাত্রদের মুখে একটী কৌতুকজনক কাহিনী শুনিয়াছি। কাহিনীটির মধ্যে কতটুকু সত্য, কতটুকু গল্প তাহা জানি না। কিন্তু গল্প হইলেও আচার্য্য শীলের ন্যায় দার্শনিক পণ্ডিতের সম্বন্ধে এরূপ কাহিনী অলীক বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। একবার কুচবিহার কলেজের ছাত্রাবাসে একটী ছাত্রের বাক্স হইতে টাকা চুরি হয়। সংবাদ শুনিয়া অধ্যক্ষ শীল অত্যন্ত বিচলিত হইয়া পড়েন। বিদ্যামন্দিরের ন্যায় পবিত্র স্থানে চুরি হইবে—ইহা তাঁহার কল্পনায়ও স্থান পায় নাই। তিনি সংবাদ পাইবামাত্র থানায় খবর পাঠান এবং দারোগা বাবুকে ডাকিয়া

ইহার তদন্ত করিতে অনুরোধ করেন। তদন্ত শেষ করিয়া দারোগা বাবু পুনরায় অধ্যক্ষ শীলের সহিত দেখা করিয়া বলেন যে চোর ধরা পড়িয়াছে বটে, কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণের অভাবে তাহার বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতেছে না। দারোগাবাবুর মুখে "প্রমাণের অভাবে" এই কথাটী—শুনিয়াই আচার্য্য শীলের মন অন্য এক রাজ্যে চলিয়া গেল। তিনি উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন "কি ব'লেন, প্রমাণের অভাবে! কিন্তু প্রমাণ কি তা জানেন? তবে শুনুন।" এই বলিয়া ডক্টর শীল "প্রমাণ —" শব্দের দার্শনিক অর্থ সম্বন্ধে এক দীর্ঘ বক্তৃতা সুরু করেন।

কুচবিহারের অধিপতি মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ আচার্য্য শীলকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার যখনই যে পুস্তকের প্রয়োজন হইত তাহা ক্রয় করিবার জন্য রাজকোষ হইতে সমস্ত অর্থ মঞ্জুর করিতেন। ১৮৯১ সালে রোম নগরীতে যে প্রাচ্যবিৎ-সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় আচার্য্য শীল তাহাতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রিত হন। মহারাজার নির্দ্দেশে কুচবিহারের রাজসরকার তাঁহার ইউরোপ ভ্রমণের ব্যয়ভার বহন করে। ১৯১১ সালে আবার তিনি লণ্ডন সহরে অনুষ্ঠিত বিশ্ব নৃতত্ত্ব সম্মেলনের উদ্বোধন করিবার জন্য আমন্ত্রিত হন। এই সম্মেলনে তাঁহার উদ্বোধনী ভাষণ শুনিয়া উপস্থিত প্রতিনিধিগণ চমৎকৃত হন। আচার্য্য শীলের বহুমুখী প্রতিভা ও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা বিশ্বে ছড়াইয়া পড়ে। ১৯১২ সালে আচার্য্য শীল কুচবিহার কলেজের অধ্যক্ষপদ ত্যাগ করেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাধ্যক্ষ স্যার আশুতোষের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর বিভাগে দর্শন শাস্ত্রের প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত থাকিলেও আচার্য্য শীল সমস্ত বিভাগের তত্ত্বাবধান করিবার ভারপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার নির্দ্দেশ ও উপদেশ অনুসারেই বিভিন্ন বিষয়ের পাঠ্যসূচী স্থির হইত, এবং বিভিন্ন বিভাগের অধ্যাপকমণ্ডলী নির্ব্বাচিত হইতেন। বস্তুতঃ স্যার আশুতোষ পঠন-পাঠন বিভাগের দায়িত্ব প্রধানতঃ তাঁহার উপর ন্যস্ত করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠনের অন্যান্য দায়িত্ব নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শুনা যায় যে প্রথমে স্যার আশুতোষ চাহিয়াছিলেন যে আচার্য্য শীল বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতির প্রধান অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। কারণ সে সময়ে ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে অর্থনীতি নূতন গবেষণার রূপে গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। ভারতীয়দের মধ্যে এই বিষয় পড়াইবার উপযুক্ত লোক বেশী পাওয়া যাইত না। সুতরাং স্যার আশুতোষ আচার্য্য শীলকে এই বিষয়ের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিলেন। ব্রজেন্দ্রনাথ একটী সর্ত্তে আশুতোষের অনুরোধ রক্ষা করিতে সম্মত হন। সর্ত্তটী এই যে অর্থনীতির ক্লাসে ভারতে ইংরাজ সরকারের অর্থনীতির নিরঙ্কুশ সমালোচনার অধিকার তাঁহাকে দিতে হইবে। যে অর্থনীতি তিনি ভুল বলিয়া বুঝিয়াছেন নিজ বিবেক বুদ্ধির বিরুদ্ধে ছাত্রদের নিকট তিনি তাহা সমর্থন করিয়া বক্তৃতা করিতে পারিবেন না। কিন্তু সে সময়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল ভারত সরকারের পরিচালনাধীন এবং বিশেষভাবে নব প্রতিষ্ঠিত অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক পদের ব্যয়ভার ভারত সরকার বহন করিবেন। এ অবস্থায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আচার্য্য শীলের উপরোক্ত সর্ত্তে রাজী হইতে পারেন নাই। এই জন্য তাঁহাকে দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করিতে হয়।

এই স্থানে আমরা আচার্য্য শীলের অদ্ভুত স্মৃতিশক্তি সম্বন্ধে একটী কাহিনী উল্লেখ করিতেছি। এক সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ আচার্য্য শীলকে প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের বয়সের মান নির্ণয় করিবার ভার অর্পণ করেন। তাঁহাকে এই কার্য্যে সাহায্য করিবার জন্য অনোরিয়া বিভাগের অধ্যাপক অধুনা স্বর্গত গোপেশ্বর পাল সাময়িক ভাবে নিযুক্ত হন। গোপেশ্বর বাবু আমাদের বলিয়াছেন, একদিন আচার্য্য শীল তাঁহাকে

বলেন "ওহে তোমাদের মনোবিজ্ঞানের স্মৃতি শক্তির পরিমাপের কি সব নিয়ম আছে ; আমার স্মৃতি শক্তিটা একবার পরীক্ষা করে দেখ না।" মনোবিজ্ঞানের রীতি অনুসারে অর্থহীন তিন অক্ষরের শব্দ সমষ্টির দ্বারা লোকের স্মৃতি পরীক্ষা করা হয়। শব্দের অর্থ থাকিলে আমরা অনেক সময়ে ঐ অর্থের সাহায্যে শব্দগুলিকে মনে রাখিতে চেষ্টা করি। তাহাতে স্মরণ ক্রিয়ার জন্য বুদ্ধির প্রয়োগ ঘটে এবং বিশুদ্ধ স্মৃতিশক্তির পরীক্ষা হয় না। এজন্যই অর্থহীন শব্দের প্রয়োজন। সাধারণতঃ এই প্রকার দশ বারোটী শব্দের দ্বারা লোকের স্মৃতি পরীক্ষা করা হয়। কে কত শীঘ্র এ প্রকার দশ বা বারোটী শব্দ নির্ভুল ভাবে সঠিক ক্রম অনুসারে লিখিতে পারে তাহা দেখিবার জন্য শব্দগুলি নির্দিষ্ট সময় ধরিয়া পড়িতে দেওয়া হয়, কিংবা পড়িয়া শুনান হয়। কেহ নিজ চোখে দেখিয়া তাড়াতাড়ি লিখিতে পারেন, কেহ বা কেবল শুনিয়া তাড়াতাড়ি লিখিতে পারেন। সাধারণ লোকের ক্ষেত্রে দেখা যায় পাঁচবার বা ছয়বার দেখিবার কিংবা শুনিবার পর শব্দ গুলি নির্দিষ্ট ক্রমে স্মৃতিতে মুদ্রিত হয়। অর্থাৎ শিক্ষার্থী ব্যক্তি পাঁচ ছয় বারের চেষ্টায় শব্দগুলি নির্ভুলভাবে আবৃত্তি করিতে সমর্থ হন। শব্দের সংখ্যা বাড়াইলে পাঁচ ছয় বারের পরিবর্তে আরও বেশী সংখ্যক চেষ্টার প্রয়োজন হয়। অধ্যাপক পাল ডক্টর শীলের স্মৃতি শক্তির পরীক্ষার জন্য প্রথম বারোটী শব্দ উপস্থিত করিলেন। ডক্টর শীল একবার মাত্র দেখিয়া সেগুলি যথাক্রমে সঠিক আবৃত্তি করেন। তখন তাঁহাকে ঐ প্রকার আঠারোটী শব্দ দেওয়া হইল। আচার্য্য শীল তাহাও একবার মাত্র দেখিয়া আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। স্থির হইল যে আরও বেশী সংখ্যায় নূতন শব্দ সংগ্রহ করিয়া পরের দিন আবার পরীক্ষা করা হইবে। পরেরদিন অধ্যাপক পাল পঁচিশ বা ত্রিশটী অর্থহীন শব্দ গঠন করিয়া আনেন। আচার্য্য শীল তাহাও এক নজর দেখিয়া সঠিক ভাবে আবৃত্তি করিয়া শুনাইলেন। বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া গোপেশ্বর বাবু বলিলেন "স্যার আপনার স্মৃতি শক্তির পরীক্ষা নেওয়া আমার পক্ষে ধৃষ্টতা হয়েছে। আমাকে ক্ষমা করবেন।"

অধ্যয়নে আচার্য্য শীল কি ভাবে সম্পূর্ণ তন্ময় হইয়া যাইতেন সে সম্বন্ধে আমরা দুইটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াছি। তিনি যে কত দ্রুত গতিতে এক এক খানি বই পড়িয়া সমাপ্ত করিতে পারিতেন আর একটী ঘটনায় তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। এই ঘটনাটিও আমরা স্বর্গীয় গোপেশ্বর বাবুর মুখে শুনিয়াছি। একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য্য শীলের কক্ষে প্রবেশ করিয়া গোপেশ্বর বাবু দেখেন ঘরের একদিকে স্তূপীকৃত কয়েক শত বাংলা বই। আশ্চর্য্য হইয়া তিনি আচার্য্য শীলকে জিজ্ঞাসা করেন যে তাঁর ঘরে এক সঙ্গে এত বাংলা বই আনা হইয়াছে কেন। তাহাতে ডক্টর শীল বলেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের জন্য বই নির্বাচন করিতে হইবে। সে জন্য দোকান হইতে বই গুলি আনান হইয়াছে ; তিনি উহা পড়িয়া নির্বাচন করিবেন। বিস্ময়ের সঙ্গে গোপেশ্বর বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "এই সব বই আপনি প'ড়বেন ? কতদিন লাগবে ?" উত্তরে আচার্য্য শীল বলেন যে সাত আট দিনের বেশী লাগিবে না। এ কথায় গোপেশ্বর বাবুর বিস্ময় আরও বাড়িয়া গেল। ইহা বুঝিয়া ডক্টর শীল তাঁহাকে ঐ বই গুলির মধ্য হইতে যে কোনও একখানি বই আনিতে বলিলেন। গোপেশ্বর বাবু মধ্যম আকৃতির এক খানি বই আনিয়া ছিলেন। আচার্য্য শীল উহা খুলিয়া এক এক পৃষ্ঠায় চার পাঁচ সেকেণ্ড করিয়া চোখ বুলাইতে লাগিলেন এবং ১৫।২০ মিনিটের মধ্যে পড়া শেষ করিয়া গোপেশ্বর বাবুকে উহার যে কোনও অংশ হইতে কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে বলিলেন। বলা বাহুল্য বিস্মিত গোপেশ্বর বাবু ইহার পর আর কোনও প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই।

শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকণা

সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথ তাঁর ব্রহ্মচর্যাশ্রমে নিরামিষ আহার প্রচলন করেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নির্দেশেও মূল আশ্রমভূমিতে আমিষাহার নিষিদ্ধ ছিল।

পরে যখন আমিষাহার প্রবর্তন করা হয়, তখন মহর্ষি নির্দিষ্ট আশ্রমভূমির চৌহদ্দির বাইরে এক নূতন পাকশালা নির্মাণ করতে হয়েছিল।

আমিষাহার প্রবর্তন করেও পুনরায় তা বন্ধ করা হয়। ১৯১৭ সালে আমি যখন শান্তিনিকেতনে আসি, তখন সেই নবনির্মিত পাকশালাতেও নিরামিষ আহার চলেছে।

নিরামিষ আহারে পাছে ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানি হয়- সেই আশঙ্কায় রবীন্দ্রনাথ নানা পুষ্টিকর আহার্য সংগ্রহ করতেন। তাঁর জমিদারী হতে অনেক সময় গাড়ী গাড়ী নারিকেল এনে জমা করা হতো। ডালে, তরকারীতে এবং জলখাবারে প্রচুর পরিমাণ নারিকেল দেওয়া হতো।

একবার তো এত মধু সংগ্রহ করা হলো যে সপ্তাহ খানেক যাবৎ দুধের সঙ্গে মধু, দইয়ের সঙ্গে মধু, রুটি ও লুচির সঙ্গেও মধু বর্ষণ হয়।

ডাল খুবই ঘন হতো—এবং অপেক্ষাকৃত পরিমাণে দেওয়া হতো। তরকারীর মধ্যে আলুর প্রাচুর্য। কপির সময় কপি এবং পটলের সময় পটলও ইচ্ছামত পাওয়া যেতো। মাঝে মাঝে ছানার ডালনা এবং মোচার তরকারী হতো।

দুপুরে- ভাত, ভাতের সঙ্গে ঘি, ডাল, ডাল, দুটো তরকারী, চাটনি এবং দই দেওয়া হতো। রাত্রে ভাত, ডাল, দুটো তরকারী, এবং দুধ দেওয়া হতো। ডাল, তরকারী অপেক্ষা দিতো। রান্নাও ভালো হতো।

সকাল বিকেল, দু বেলা উৎকৃষ্ট জলখাবারের ব্যবস্থা ছিল। সকালের জলখাবার ছিল—লুচি-তরকারী, মোহন-ভোগ, বালুসাই, গজা, পেড়াকি। কখনো বা প্রচুর ঘি-সহ খিচুড়ি। লুচি, বালুসাই, গজা পেড়াকি সবই চারখানা করে পাওয়া যেতো। কখনো কখনো বোঁদে মুড়িও সকালের জল-খাবার হতো।

বিকেলে, চিঁড়ে বা মুড়ি ও দুধ-কলা, চিঁড়েভাজা বা মুড়ি এবং তার সঙ্গে ডাল ভাজা, চিনেবাদাম ভাজা প্রভৃতি জল খাবার থাকতো। জল খাবারের মধ্যে বেশ বৈচিত্র্য ছিল।

ছাত্রদের স্বাস্থ্য ভাল ছিল। কুস্তি ও "প্যারালাল বার" প্রভৃতি নানাপ্রকার ব্যায়ামের ব্যবস্থা ছিল। খেলাধুলাতে ছাত্রেরা অবশ্যই কৃতিত্ব দেখাতো। বীরভূম জেলার সব ক'টি "কাপ" এবং "শিল্ড" ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছেলেরাই অধিকার করতো। কলকাতা হতে আগত কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে "ফুটবল ম্যাচে" শান্তিনিকেতনের স্কুলের ছাত্রেরাই অধিকাংশ সময় জয়ী হতো।

মোহনবাগানের সঙ্গেও শান্তিনিকেতনের ছাত্রেরা

(প্রাক্তন ছাত্র সম্মেলনে) "ম্যাচ" খেলতো। হারলেও কখনো তারা গো-হারান হারতো না। মোহনবাগানের "টিমে" গোষ্ঠ পাল এবং বলাই চাটুজ্যেও আসতেন।

রবীন্দ্রনাথের কিন্তু মনে এক অশান্তি—তিনি বোধহয় ছাত্রদের যথেষ্ট পুষ্টিকর খাবার দিতে পারছেন না। দাল, মাংস ও ডিম বাদ দেওয়াতেই বোধহয় তাঁর এরূপ একটা দ্বিধা ছিল।

মনের এই খুঁতখুঁতুনির জন্য, রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে খাদ্য-বিশেষজ্ঞদের আহ্বান করতেন। রায়বাহাদুর চুনীলাল বসু মহাশয়কে তিনি এইজন্য কয়েকবার শান্তিনিকেতনে এনেছেন।

একবার মনে আছে—আম্রকুঞ্জে আমাদের সমবেত করা হয়েছে। চুনীবাবু খাদ্য সম্বন্ধে আলোচনা করবেন।

রবীন্দ্রনাথ ও চুনীবাবু একত্রে আসন গ্রহণ করেছেন। আমরা শিশুর দল ঠিক সামনে। চুনীলালবাবুর খাদ্য সম্বন্ধীয় গুরুগম্ভীর ভাষণে আমাদের নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে। অনেকেই ঘুমিয়ে পড়েছি। কেউ বা ঢুলছি।

এক জায়গায় চুনীলালবাবু বললেন—"নিরামিষ আহারে পুষ্টির অভাব নাই। ডাল যথেষ্ট পরিমাণে দিতে হবে। সপ্তাহে দুদিন খিচুড়ি দিলে ভাল হয়…।"

খিচুড়ির নাম শুনে আমাদের তন্দ্রা ছুটে গেল। আমরা কান খাড়া করে' বসলাম। রবীন্দ্রনাথের তা দৃষ্টি এড়ায় নি। তিনি মন্তব্য করলেন :—

"খিচুড়ির উপকারিতা সম্বন্ধে আমার সংশয় নাই। যার নাম শোনামাত্র ছেলেদের তন্দ্রা ছুটে যায়—তার শক্তিতে সন্দেহ আছে কি?"

শেষ পর্যন্ত কিন্তু আশ্রমে আমিষাহারই প্রচলিত হলো। সময়টা ঠিক মনে নাই। ১৯২১-২৪ সনের কোনো একসময়। বিশ্বভারতীর কাজ তখন শুরু হয়ে গেছে। রবীন্দ্রনাথ, তখনকার খাদ্য বিশেষজ্ঞ ডাক্তার অমূল্য উকিল মহাশয়কে আনিয়েছেন। সিংহসদনে তাঁর বক্তৃতা হবে। রবীন্দ্রনাথও উপস্থিত আছেন।

উকিল মহাশয় তাঁর বক্তৃতার উপসংহারে মন্তব্য করলেন :—

'যদি এই …পরিমাণ দুধ, এই…পরিমাণ ছানা, প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীকে দিতে পারেন—তাহলে নিরামিষ আহার চলতে পারে। নইলে আমিষ আহারই চালাতে হবে।"

অমূল্যবাবুর 'সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ' দুধ এবং ছানা দেওয়া কোনো রকমেই সম্ভবপর না হওয়ায়, সেই থেকে বিশ্ব-ভারতীতে স্থায়ীভাবে আমিষাহার প্রবর্তিত হলো।

নিরামিষাশীদের জন্য অবশ্য পৃথক পাকশালার ব্যবস্থা হলো। তার নাম হলো—"গুজরাটী কিচেন্।" অবাঙালীদের মধ্যে গুজরাটী ছাত্রদেরই তখন সংখ্যাপরিষ্ঠতা। নিরামিষ পাকশালায় তাদের পছন্দসইই আহার্য প্রস্তুত হতো। সেই-জন্যই নিরামিষ পাকশালার নাম হয়ে যায়—"গুজরাটী কিচেন্।"

আমরা আমিষাশীরাও কেউ কেউ "গুজরাটী কিচেনে" একবেলা আহার করতাম—তাতে কোনো বাধা ছিল না। দুধ পাল্টাবার জন্য আমাদের এটা বেশ ভাল ব্যবস্থা হয়েছিল।

গুজরাটীদের অবশ্য এরূপ দুধ পাল্টাবার কোনো উপায় ছিল না। তারা সকলেই কট্টর নিরামিষাশী ছিল।

ছাত্রদের পুষ্টিকর খাবার দেবার জন্য আমিষ রান্নাঘরেও রাত্রে রুটির ব্যবস্থা করা হলো। কিন্তু পূর্ববঙ্গের ছাত্রছাত্রী-দের তাতে ঘোর আপত্তি। একসময় তারাই আশ্রমে সংখ্যা-পরিষ্ঠ ছিল। সে-সময়েও তাদের সংখ্যা কম ছিল না। অন্তত সমান সমান। সুতরাং তাদের আপত্তি মেনে নিয়ে, রফা করা হলো—ভাত এবং রুটি দুই-ই হবে। কেউ ইচ্ছা করলে কেবল ভাত, অথবা কেবল রুটি, খেতে পারে।

টেবিলে সাজানো থালাতে প্রথমে ৩।৪ খানা রুটি দেওয়া

থাকতো। আমাদের বন্ধু ইন্দুর বাড়ি ছিল বরিশালে। সে রান্নাঘরে ঢুকেই প্রথমে তার থালা থেকে রুটিগুলো অন্য থালাতে তুলে দিয়ে তবে আসন গ্রহণ করতো। রুটির রূপবর্ণনেও তার আপত্তি ছিল।

একদিন তাকে জিজ্ঞেস করলাম—"রুটি খেতে তোমার কিসের আপত্তি?"

সে উত্তর দিল—"রুটি খেয়ে পেট ভরে না!"

আমি আশ্চর্য হয়ে বলি—"সে কি! রুটিতো যে-যত খেতে পারে, ততই দেওয়া হয়।"

সে বলে—"তাতো দেওয়া হয়! খেয়েও যাই। অনবরত খেয়ে খেয়েও বুঝতে পারি না—কখন পেট ভরবে!"

এরপরে আমি নির্বাক!

আ মাট বছর বয়সে, শৈশব ও যৌবনের এরূপ বহু টুকরো টুকরো ঘটনা,—আলোর শত শত মেয়ের মত, মানসপটে ভেসে আসছে।

বারান্তরে আরও কিছু স্মৃতিকথা প্রদান করবার ইচ্ছা রইলো।০

---

* থেকে ১৯১২ সাল হতে ১৯৪২ সাল পর্যন্ত, প্রত্যহ্যাত্রে ও বিশ্বভারতীর বিদ্যার্থী ছিলেন। ১৯৪২ এর অক্টোবর হতে ১৯৫৭ এর জুন পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে, পূর্ব ও উত্তরবঙ্গে এবং আসামে, তিনি অনুন্নত শ্রেণীর উন্নয়নমূলক কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সে-সময়ের তিনি বছরে অন্তত একবার শান্তিনিকেতনে এসে থাকতেন। ১৯৫৭ সালের জুলাই মাস হতে তিনি বিশ্বভারতীর চীনভবনে পূর্ণকাল অধ্যাপক। সুতরাং আজ অর্ধশতাব্দি ধরে শান্তিনিকেতনের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রায় বিচ্ছেদহীন।

ফোন : ৪৭-৫১৮৫

(রৌদ্র রেখা—৩৯৫ পৃষ্ঠার পর)

অনেকটা শব্দের ব্যবধান নিয়ে এই শব্দ বাজছিল, খুটখুট … খুটখুট…। যেন বাইরের মানুষটি জানান দিতে চাইছে, সে এসেছে। কিন্তু এখন, অনেকটা সময় পার হবার পরেও যখন সাড়া মেলে, তখন সেই অধৈর্য মানুষটি ব্যস্ততার সঙ্গে দরজায় কড়া নাড়ল। সেই চড়া শব্দ এঘরে শঙ্কিত হয়েছে সঙ্গে সঙ্গে।

আচমকা সরে গেল কণক, যেন এক ঝলকা বাঁধন এক টানে কেউ খুলে ফেলে দিয়েছে। সরে গিয়ে অনেকটা সন্ত্রস্ত ভীত চোখে কণক দরজার দিকে তাকাল।

ঘর এখন ফাঁকা। রবীন এইমাত্র তার পড়ার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে। কণক সরে গিয়ে একবার জানলার কাছে দাঁড়িয়েছিল। পরে এসে বসল সোফার কোণের দিক। ভেতর বাড়ি থেকে মহিম এল। দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

কণক জানে, বীথি ফিরেছে। সঙ্গে নিশ্চয় খোকন আছে। যেন অনেকক্ষণ কণক ওদের জন্যই অপেক্ষা করছে এমন ভাব করে বসে থাকল।

২. শূন্য ঘর, নির্জন; রবীন একলা বসে আছে। টিপয়ের ওপর খবর কাগজ ছিল, অল্পক্ষণ তা নিয়ে নাড়াচাড়া করল। ব্যানার হেডিং থেকে ছোট বড় অন্যান্য হেডিং আর খবরগুলোর ওপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে কাগজ রেখে দিয়েছিল রবীন। এখন, সোফায় সহজ এবং আলগাভাবে বসে চোখ বুজে বুঝি সময় গুণছে।

রমণীয় ঘরের দরজা বন্ধ—অনেক আগে থেকেই লক্ষ্য করেছে রবীন। মানুষটা নিশ্চয় লেখায় আত্মমগ্ন হয়ে আছে।

এমনি আসছে বলে বীথি সেই যে গেল আর ফিরছে না; রবীনের সকল প্রতীক্ষা কেবল তারই জন্যে। রবীন আজ প্রস্তুত, সম্পূর্ণভাবে তৈরি। মনের আকাঙ্ক্ষা আর বাসনাকে চেপে রাখলে তা শুধু মন জয় বুঝেই পোড়ায় না, মানুষের প্রধানতম কাম্য বস্তু যে শান্তি কোনো ক্রমেই তাকে পাওয়া যায় না। অতএব আজ রবীন তার সুযোগ-সম্বন্ধে কিছুতেই অবহেলা করবে না।

পাখি ডাকার মতন শব্দ আসছিল বাইরে থেকে, টানা ডাক। রবীন চোখ খুলল কান পাতল। বুঝতে পারল এই ডাক পাখির না। সুমন কবিতা পড়ছে। টানা গলার সেই আবৃত্তি দূর থেকে বাতাসে ভর করে আসতে আসতে অনেক ক্ষীণ, প্রায় পাখির ডাকের মতন মিষ্টি শোনাচ্ছে। আরও পরে রবীন কণকের গলা শুনতে পেল। থেকে থেকে থেমে যাচ্ছিল সুমন। আর তখন কণকের গলার স্বর সরব হচ্ছিল। কণক বাস্তবিক রবীনকে বাধা দিয়েছে। আঘাতও। স্টেশন থেকে সরাসরি এই সাত সকালে সে না এলেও পারত এখানে। কারণ রবীন জানে, বাইরে ভাল ব্যবহার করলেও বীথি কণকের এই সরাসরি আসার ব্যাপারটা খুব সহজভাবে নেবে না, নিতে পারবে না। ও একটা টেলিগ্রাম করতে পারত, মার ওখানে আজকের দিনটা বিশ্রাম নিয়ে কাল সকালে এখানে এলেও মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যেত না। কিন্তু রবীন জানে কণক কথা শোনবার মেয়ে নয়। সেই ছোটবেলা থেকে…

দরজার পায়ের শব্দ, তন্দ্রাচ্ছন্নতার ঘুম আচমকা কেটে গেল। চোখ খুলে তাকাল রবীন। বীথি।

'অনেক দেরি হয়ে গেল আমার…' এগিয়ে আসতে আসতে বলছিল বীথি। তার সারা দেহে সদ্য স্নানের স্নিগ্ধতা এবং পবিত্রতা। সমস্ত মুখময় আশ্চর্য এক প্রসন্নতা, প্রশান্তি।

মুগ্ধের মতন তাকিয়ে ছিল রবীন। 'ভেতরে স্নানের শব্দ হচ্ছিল শুনতে পেয়েছি…' সামান্য সরে বসল রবীন যে জায়গা করে দিল বীথিকে, বসতে।

বসল বীথি। সোফার কোণের দিকে। ব্যবধান অবশ্যই নয়।

অল্প সরে এসেই রবীন ওকে স্পর্শ করতে পারে। 'সকালটা এমন বিশ্রীভাবে…'

'আপনার সেই চিঠিটা—' হাত বাড়িয়ে এতক্ষণ কাগজ বাড়িয়ে দিল বীথি। রবীনের দিকে। চোখে চোখ রাখল। 'কাল রাত্রিতে এটা আপনি আমাকে দিয়েছিলেন।' সারাঙ্গ পাণ্ডুর্য ফুটল বীথির চোখেমুখে। 'আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না কথাগুলো।' চোখ বুলিয়ে বীথি আবার চিঠির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করল। 'এটা কি সত্যি আমাকে লেখা?'

'হ্যাঁ…'

'কিন্তু আপনি কী বলতে চাইছেন…'

'বোঝা যাচ্ছে না?' জিজ্ঞাসার চোখ তুলে তাকাল রবীন।

'না।' অল্পক্ষণের নীরবতা। বাইরের এবং ভেতরে দরজার দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করল বীথি। আঁচলে আঁচল খুঁটছিল 'এখানে এমন সব কথা আছে যা আমার…'

'হ্যাঁ, ভালবাসা…' সোজা হয়ে বসল রবীন। 'খুব স্পষ্টভাবে আমি তা বলেছি… । বলতে চেয়েছি।'

টিপয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল বীথি। চিঠিটা রাখল, তাকাল রবীনের দিকে। 'কাল রাত্রে আপনি সেকথা বলতে পারতেন…'

'আমি বলি নি।' অল্প সরে এল রবীন, বীথির দিকে। 'অনেক লোক ছিল কাল এ-বাড়িতে। মনে হয়েছে, তেমনি এখানে। তা ছাড়া আমি চাইছিলাম, সারারাত ভেবে নিয়ে আজ তুমি জবাব দেবে… ।'

'জবাব আমি না দিতেও পারি…'

'আমি খুব মুষ্ড হয়ে পড়েছিলাম কাল।' রবীন আরও অল্প সরে আসতে চাইছিল।' অল্প আলো ছিল মনে। অত লোকের উৎসবে, মনে হ'লো তুমি একটি রঙিন প্রজাপতি। এত সুন্দর, এত স্নিগ্ধ আর মনোরম…'

'শুধু কি কালকেই দেখলেন…'

'না।' রবীনের গলা অল্প আবেগে কাঁপছিল। 'বীথি …', মাথা নীচু করে খুব নরম মোলায়েম গলায় ডাকল রবীন। 'সোড়া থেকে…' রবীন কেমন হতাশ, উদাসভাবে আকাশের দিকে তাকাল। যেন দূর থেকে বলছে এমন গলা রবীনের। 'সে দিনের কথাগুলো আবার মনে পড়ছে। তোমার আর রবীনের সেই অন্তরঙ্গতা, প্রেম। সব সময় কাছে থাকলেও বরাবর আমি দূরে থাকতাম। যেন তোমাদের গোপন ব্যাপারটার আমি কেবল পাহারাদার ছিলাম।' অনেকগুলো কথা বলে চুপ করল রবীন। মুখ নীচু করে সিগ্রেট ধরাতে যেটুকু সময়। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রবীন আবার তাকালো বীথির দিকে 'সেই তখন থেকেই…'

'অনেকবারই কিন্তু সে কথা আমার মনে হয়েছে…'

'সত্যি—' রবীন আরও অল্প সরে এসে প্রায় গা ঘেঁষে বসল বীথির। 'আমি খুব ভুল করেছিলাম তখন।'

'হুঁ। তখন যদি বলতেন…' টেবিল থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল বীথি। হেঁটমুখে।

ভয়ঙ্কর আবেগ আর উত্তেজনা চাপতে চাইলেও রবীন ওকে এড়িয়ে যেতে পারছিল না। খুব দ্রুত নিশ্বাস নিচ্ছিল সে। নাক ফেঁপে উঠেছে। 'কিন্তু আজ!' রবীন পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকাল বীথির দিকে। 'আজ কি বীথি সেই উপহার তুমি গ্রহণ করতে পারো না?'

'না।' কেমন আনমনাভাবে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল বীথি। 'আমি বিবাহিত। আমার স্বামী…'

'তোমার স্বামী আমার পরম বন্ধু। তার চাইতে বেশী আপন আর অন্তরঙ্গ বলতে আমার কেউ নেই।' চোক গিলল রবীন। দু' চোখ বুজে থাকল অল্পক্ষণ। এখন তাকাল, তবু—তবু আমি না বলে পারছি না বীথি।' রবীনের সারা চোখমুখে যন্ত্রণার আঁকাবাঁকা রেখার হিজিবিজি। 'মাঝ-রাত্রের আগে আমার ঘুম ভেঙে যায় রোজ। অন্ধকার ঘরে

আমি তোমার গলা শুনতে পাই···চোখ দেখতে পাই, মুখও ···বীথি ··' প্রাণপণে দু'চোখ বুজে তীব্র যন্ত্রণায় গলায় ডাকল রবীন। 'ঈশ্বর তার সৌন্দর্যের ভাণ্ডার নিঃশেষ করে গড়েছিলেন তোমাকে। এত রূপ, ফুলের মতন স্নিগ্ধ মুখ, পাপড়ির মতন ওষ্ঠ···

কথা বলছিল রবীন, বীথি অন্যমনস্ক নিজেকে দেখল। তার মনে হচ্ছিল, রবীন যেন কথা বলছে না, খুব হালকা নরম হাতে সে সারা গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। এই অনুভব অদ্ভুত এক আবেশ সৃষ্টি করছিল। 'এ কথা, এমন কথা আমাকে কেউ বলে নি।' বীথি কেমন শূন্য শূন্য দৃষ্টিতে তাকাল রবীনের চোখে। 'আমার স্বামী···'

'আমি জানি তোমার স্বামী বলবে না।' রবীন অনেক সংকোচ আর ইতস্ততের বাঁধন ছিঁড়ে নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সে হাত এক কাঁধ পেরিয়ে আর এক কাঁধ ছুঁয়েছে। কাঁপা হাতে রবীন বীথির বাহুর ওপরকার মাংস ধরল। 'তাকে আমি চিনি। সে বলবে না; অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ ও। তা ছাড়া স্বামীরা? বীথি, কখনও স্ত্রীকে তার রূপ সম্বন্ধে সচেতন করে না···।'

'এতদিনে আমি বুঝছি··'

'তুমি আমায় নিরাশ করো না বীথি।' গলা কাঁপছে রবীনের। ডান হাত বাড়িয়ে বীথির একটি হাত তুলে নিল। 'বলো বলো বীথি, তুমি আমার, আমার··'

সকালের নিঃসঙ্গ এই ঘর অনেকক্ষণ ধরে যেন নীচু, চাপা গলায় ফিসফিস করে কথা বলল। আর কোনো শব্দ নেই। রবীন আর বীথির কাঁপা, গভীর কখনও আর্দ্র বা ভারী গলায় অনেক আবেশ ঝরে পড়ছিল।

রবীন। তোমার না পেলে আমি মরব, মরে যাবো।

বীথি। ও-কথা বলো না রবী···

রবীন। সব শেষ হয়ে যাবে সেদিন···

বীথি। গোবাই, তুমি চুপ করো।

রবীন। তোমাকে আমার অনেক কথা বলার আছে বীথি, অনেক অনেক কথা।

বীথি। আমারও··

রবীন। তুমি আসবে? সেখানে কেবল আমরা দু'জন থাকব—

বীথি। কোথায়?

রবীন। আমাদের···না না, আমার বাগানবাড়ি।

বীথি। কখন, কবে?

রবীন। আজ। হ্যাঁ, আজই রাত্রে। ঠিক আটটার সময়। তোমার জন্যে আমি অপেক্ষা করব—রোজ করব···

দরজায় শব্দ হচ্ছিল। রমণী দরজা খুলছে। বীথি সরে গেল আচমকা। 'ঠিকানাটা লিখে দিয়ে যেও···

'যান।' রবীন আস্তে গলায় ফিসফিস করে বলল।

দু' একটি শব্দ। তাও ক্ষণকালের। তারপর দরজা খুলে দিয়েছিল। পালকা খুলে দিয়ে দেখার টেবিল থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট তুলে নিল রবীন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিল, ঘুরে বসা রবীনকে। তারপর খুব ধীর এবং সংযত পায়ে এগিয়ে এল। তার মুখে অল্প গাম্ভীর্য।

টয় চেস্টের পাল্লা খুলে বীথি ভেতরের পুতুলগুলো অযথাই ঠিকঠাক করে বসাচ্ছিল। এ-দিকে পেছন দিয়ে। সোফায় বা এগিয়ে দিয়ে রবীন সিগ্রেট টানছিল। তার চোখ ছাদে—যেন ওখানে লক্ষ্য করবার মতন সে কিছু খুঁজে পেয়েছে।

যেন রবীন জানে না, জানতে পারে নি—এমন ভাব ও ভঙ্গি সে করে যাচ্ছে। রমণী এগিয়ে আসতে রবীন এমনভাবে তাকাল, যেন এইমাত্র পায়ের শব্দে তার অন্যমনস্কতা কি আনমনাভাব কেটেছে। সোজা হয়ে বসল রবীন; অল্প খুশীর হাসি হাসছিল। 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করছি। একটা খবর দেব···'

রমণী কথা বলল না সঙ্গে সঙ্গে। পাশের সোফায় এসে বসল। ভুরু তুলে তাকাল রথীনের দিকে। 'সুখবর···'

'হ্যাঁ।' রমণী টিপয়ের ওপর থেকে রথীনের সন্তরাখা সিগ্রেটের প্যাকেটটা টেনে নিল। সিগ্রেট নিয়ে ধরাল। 'তুমি শেষ পর্যন্ত দেখছি অন্য সিগ্রেট ধরলে ···'

'ধরকারে অনেক কিছুই আমার পাল্টায়···' রমণী সোজা-সুজি তাকাল রথীনের দিকে। তার সারা মুখ থমথম করছিল ভয়ানক গাম্ভীর্যে। যেন নিশ্বাস চেপে এতক্ষণ কথা বলছিল রমণী। এবার সেই চাপা নিশ্বাস আচমকা ছেড়ে সোফার পেছনে পিঠ রেখে অল্প এলানো ভঙ্গিতে বসল। 'শুনে খুব খুশী হলাম, এই সকালে তুমি আমার জন্যে একটি সুখবর এনেছ।' দু' বাহু তুলে রমণী নিজের মাথার দু'টি হাত রাখল। 'সুখবরটা নিশ্চয় লোভনীয়···'

'তোমার এই অদ্ভুত ধরণের স্বভাব, রমণী, খুবই যন্ত্রণা-দায়ক।' রথীন যেন বিরক্ত হয়েছে এমনভাবে বলল। সামান্য রুক্ষতার ভাব তার মুখে। 'তোমার সঙ্গে ফালতু কথা বলতে আসি নি। খুব সিরিয়াস কথা। শুনলে তোমার খুশী হওয়া উচিত···'

'তা হ'লে আমি নিশ্চয় খুশী হবো।' রমণী টিপয়ের ওপর থেকে সিগ্রেটের প্যাকেট নিয়ে নাড়াচাড়া করছিল। অল্প সময় অন্যমনস্কতার ছায়া ঘুটে থাকল তার মুখে। ক্ষণিক শুব্ধতার পর বীথির দিকে তাকাল। চোখ তুলে এনে আবার রথীনকে দেখছিল রমণী। 'আমার স্বভাবের সঙ্গে কি তুমি আজ পরিচিত হ'লে!'

'না।' রথীন গলার স্বরে আরও একটু আয়েশ করে বলল। 'আমার অভিযোগ ঠিক সেই কারণেই।' কপালের দিকের কয়েকটি চুল নিয়ে রমণী আঙুলে জড়াচ্ছিল। 'তোমাকে কি আর বোঝাতে পারি আমি···'। এক মুহূর্ত থেমে আর কোনো কথা বলল না রথীন। রমণীকে দেখছিল। 'এই স্বভাব তোমাকে অনেক দূরে সরিয়ে নিচ্ছে রমণী। তুমি অপ্রিয় হ'চ্ছো, আত্মস্থী হ'চ্ছো। এই জন্যে নিজের স্ত্রীর সঙ্গেও তোমার সম্পর্ক···'

'খুবই খারাপ সম্পর্ক সে-কথা আমি জানি বুঝি।' এইখানে থামল রমণী। তাকাল উচ্ছেচের দিকে, যেখানে বীথি এতক্ষণ ধরে অবধাই খেলনাগুলো নাড়াচাড়া করছিল। এখন বীথি নেই। না, কোথাও না। রমণী সারা ঘরে চোখ বুলিয়ে দেখল। পরে অল্প কাৎ হয়ে তাকাল রথীনের দিকে। 'রথীন···', রমণী খোলা জানলা দিয়ে বাইরে আকাশে চোখ রাখল। 'আমার বিয়েতে তোমার খুব আপত্তি ছিল না। শুধু আমার মনে পড়ে একদিন তুমি আমায় বলেছিলে, ইচ্ছে ক'রে আমি আমার গলায় কলসী বাঁধছি···। কথাটা খুব সত্যি···'

'সেদিন আমি ভুল বলেছিলাম। তুমি যখন চলে গেলে, তোমার পরিচিত বহুল কী বলেছে জানো?'

'কী।'

'বলেছে, তুমি এক কুমারী মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে গেছ। তোমার যারা প্রিয়জন, নিকট আত্মীয় তাদের কাছে এ বড় কম আঘাতের নয়। রমণী···,' রথীন অনেকটা সরে এল। উভয়ের মধ্যে ব্যবধান খুব অল্প তখন। 'শহরের বুদ্ধিজীবি মহলে তোমার যথেষ্ট সুখ্যাতি। ঔপন্যাসিক হিসেবে সারা দেশে তোমার অনেক নাম। এত সুনাম যশ তুমি হেলায় নষ্ট করছ না? স্ত্রীর প্রতি তোমার যে ব্যবহার তাই কি সাধুবাদ দেবার মতন?'

'আমার স্ত্রীর জন্যে এবং তার স্বার্থরক্ষার ব্যাপারে তোমার শুভাসক্তিকে আমি নিন্দা করছি না রথীন। আমি জানতে চাই এই কুৎসা রটনার পেছনে কে কে ছিল···'

'কার ওপর তোমার সন্দেহ?'

'তোমার। আমি জানি তুমি আর বীথি···'

'এ-তোমার অমূলক সন্দেহ।'

'শুনে খুশী হোলাম।'

'আমি তোমাকে সব কথাই খুলে বলব

মাথা নাড়ল রমণী, মুখে অল্প হাসির রেশ—যেন তার সন্দেহ সত্যি অমূলক নয়, রমণী তা ধরতে পেরেছে। 'বললে বুঝতে পার···রমণী প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে নিচ্ছিল। মুখে সিগ্রেট, দেশলাই ধরাবে এখন, 'তাঁর চেয়ে বোধ হয় সুখকর হবে তোমার সুখবরটা দিলে···।' সিগ্রেট ধরিয়ে ছাইদানিতে জলন্ত কাঠিটি গুঁজে দিল রমণী। একমুখ ধোঁয়া বাতাসে ছেড়ে দিয়ে চোখ তুলে তাকাল।

'হাঁ' অত্যন্ত উৎসাহ এবং আগ্রহে রবীন আরও খানিক এগিয়ে এল। 'আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টরকে বলেছিলাম তোমার কথা। তিনি তোমায় চেনেন, তোমার একজন ভক্ত পাঠকও তিনি। ব'লে কি জানো ' রবীন একেবারে তার সোফার শেষে প্রায় ছুঁয়ে বসল, শরীর টানটান, হাত নেড়ে সে কথা বলছে। 'সঙ্গে সঙ্গে উনি এডিটরকে ডেকে পাঠালেন। নামটা বলার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের এডিটর বললেন, নিশ্চয় নিশ্চয়। ওঁকে পাওয়া আমাদের সৌভাগ্যের। তোমাকে দেখা করতে হবে রমণী। উনি সন্ধ্যার পর আপিসে আসেন।'

'কটায়?'

'আটটায়' রমণী, আজ রাত্রি তোমার জীবনের এক বিরাট, এক বিরাট পরিবর্তন সূচিত করবে।'

রমণী তাকাল, অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকল রবীনের দিকে। তার দৃষ্টি উদাস এবং শূন্যশূন্য। রবীনের ওপর চোখ থাকলেও সে যেন এই ঘর, ঘরের মানুষ কি আসবাব কিছু দেখতে পাচ্ছে না ছ' মুহূর্তের এই ভাবমান অবস্থা থেকে ফিরে রমণী আত্মস্বরের মতন যেন নিজেকে কিছু বলছিল। 'কোনো কিছুর ওপরেই আমার ভরসা নেই। আমি দেখেছি, মানুষের জীবন কী ভয়ানক···'

'তোমার এই নিরাশাবাদের কোনো মানে নেই। জীবন সত্যিই নিঃসঙ্গ, একাকী নয়। রমণী, জীবন উপেক্ষার নয়, অবহেলার নয়। আমি বিশ্বাস করি জীবন উপভোগের, আনন্দের। তুমি এত গভীরে ভাবিও না, তাতে শান্তি পাবে···'

'শান্তি!' রমণীর মুখ জুড়ে অত্যন্ত ক্লান্তির একটি অধ্যায় ফুটল। 'আমার মনে হয় প্রকৃত জীবন আমি চিনেছি···'

'আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না।' রবীন এক টুকরো কাগজে কি লিখছিল, লেখা শেষ করে উঠল। 'শুধু আশ্চর্যের কি জানো?' রবীন রমণীর পাশে এসে দাঁড়াল। 'জীবন মূল্যহীন, শূন্য, অর্থহীন সব জেনেও মানুষ বাঁচতে চায়। তোমাকেও বাঁচতে হবে রমণী। কাজেই ' রবীন ঘুরে দাঁড়াল, দরজার দিকে মুখ করে। 'আমি আশা করব, রাত আটটায় তুমি নিশ্চয় যাবে।' মুখ ঘুরিয়ে রবীন লক্ষ করছিল। বীথি ওখানে আছে। গোলাপ ছিঁড়ছিল। এইমাত্র লেখা ঠিকানাটার কাগজটা মুঠো করে ধরল রবীন।

'তুমি কি চলে যাচ্ছ?'

'হাঁ যাবো।' রবীন ঘুরে দাঁড়াল আবার। তাকাল, রমণীর দিকে। স্থির চোখে। 'রমণী, মানুষ আদিও নিশ্চয়। জানিনা তোমার সংজ্ঞা কী হবে। তবু আমার কথাটাই তোমাকে বলছি। জীবন আমার কাছে নির্মল আনন্দের, অনেক পাওয়ার আর গভীর উপভোগের। কথাটা তুমি একবার ভেবে দেখো।

রবীন চলে গেল, এ-ঘরে রমণী একলা।

বাইরের লনে সকাল পেরোনো রৌদ্রের ঔজ্জ্বল্য। গাছে গাছে পাখি ডাকছে শুনতে পেল রমণী। গোটা এলাকাটা যেন অদ্ভুত আনন্দে উল্লাস করছে এমন কথা ভাবতে পারল সে। রমণী দেখল, রবীন আর বীথিকে। বীথি রবীনকে এগিয়ে দিচ্ছে।

রথীন চলে গেল বীথি কটকে দাঁড়িয়ে আছে রমণী দেখল। তার সারা মুখে মেঘ নেমে এসেছে। শরীরের কোথাও বুঝি তীব্র দহনের জ্বালা, বুকের অতলে ভয়ানক এক যন্ত্রণা গুমরে মরছিল। অতৃপ্ত, ক্ষুব্ধ এবং উত্তেজিত রমণী অত্যন্ত অধৈর্যের মতন পর পর কয়েকটি সিগ্রেট ধরিয়েছে, কোনোটি অল্প কোনোটি বেশি টেনে সে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে—যেন প্রতীক্ষার এই অল্প সময়টুকু সে পার হতে পারছিল না কিছুতে। বসে থাকতে না পেরে রমণী উঠল। জানলার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

সোটা বিশ্ব উজ্জ্বল আলোকে উদ্ভাসিত। গাঢ় নীল আকাশ মাথার ওপর চুপ হয়ে আছে। ঈশান কোণের আকাশে উড়ন্ত পায়রার ঝাঁক। দল বেঁধে চক্কর খাচ্ছিল ওরা। নৈঋত দিগন্তে স্থির হয়ে আছে কয়েকখণ্ড লাদা শুভ্র মেঘ। অল্প বাতাস দিচ্ছে। করবীঝোপের পাশে পুরু মাচিয়ে দাঁড়াচ্ছিল একটি গোলেন। কাঁঠাল গাছের ডাল থেকে একটি শালিকের নিঃসঙ্গ কূজন ভেসে আসছে। কোটা ফুল, উড়ন্ত প্রজাপতি ছুটের মরশুম দিনের কিছু ভালো লাগছিল না রমণীর, কিছু ভাল লাগছে না। বাস্ত চোখ বাস্ত মনকে ধরে রাখতে না পেরে রমণী পাশ ফিরলো, পেছন ফিরে ঘরলার দিকে এগোবে এমন সময় বীথি। বীথি ঘরে ঢুকেছে।

কিছু বলল না রমণী। চোখ তুলে তাকিয়েছিল একবার। সে চোখ নামিয়ে নিল। সরে এল আবার সোফার কাছে। সোফায় বসে রমণী মাথা গুঁজে দিয়েছে দু' হাতের গভীর অন্ধকারে।

দাঁড়িয়ে পড়েছিল বীথি। তার চোখমুখও গম্ভীর, থমথমে। অনেকক্ষণ তেমনি দাঁড়িয়ে থাকল সে। কিছু ভেবে নিচ্ছিল। 'কাণ্ডটা আমি ওকে কেন্দ্রে দিয়েছিলাম···' দু' পা এগিয়ে এল বীথি। থামল।

এতক্ষণে মুখ তুলল রমণী। 'দিয়েছিলে···'

'হ্যাঁ, দিয়েছিলাম···'

'ও কিছু বলেছে?'

'বলছিল, আমাকে ওর পছন্দ, আমাকে ও ভালোবাসে···'

'ও' সামনের টিপয়ের ওপর থেকে ঘরের কাগজ টেনে নিচ্ছিল রমণী। 'কখন থেকে···'

'মানে?'

'মানে কবে থেকে, কখন থেকে ও তোমাকে ভালবাসতে শুরু করেছে?'

'সব সময়েই। আমাদের বিয়ের আগে থেকেই মনে হয়' আরও দু' পা এগিয়ে এল বীথি, 'বলছিল আমি অসুখে অপারগ আমার সময়ে কি তুমি কিছু বলেছ ওকে?'

'না।'

'ও খুব অভিভূত হয়ে পড়েছিল তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেছি।' রমণী প্যাকেট থেকে সিগ্রেট বের করে ধরাল। খানিক ধোঁয়া ছেড়ে তাকাল বীথির দিকে। 'অনেক কিছুই আমি দেখেছি কিন্তু শুনতে পাইনি প্রায় কিছুই। অনেকক্ষণ ধরেই তো কথা হ'ল। আচ্ছা কী বলছিল রথীন? তাছাড়া···' রমণী আধ-তাকানোর মতন করে বীথিকে দেখল। 'খুব জড়াজড়িও হচ্ছিল দেখলাম।'

'তোমার হিংসে হচ্ছিল?'

'না।'

'সত্যি বলছ, একটুও হিংসে হয় নি?'

'হিংসে! কিসের?'

'ও আমাকে অমন করে জড়িয়ে ধরেছিল বলে?'

'শুধু কি ওইটুকুই সব?' রমণী সামান্য আগে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল বীথির দিকে। এবার অন্য সুরে এসে সিগ্রেট ধরাল। 'তুমি কি খানিক আগে এ-ঘরে ঘটে যাওয়া ঘটনাকে এখানেই সীমাবদ্ধ রাখতে চাও?'

'না।' যেন জোর করে নিশ্বাস টানল বীথি। অনেকটা।'

সাধারণ সোজা সরল হ'য়ে বসল। 'ব্যাপারটা আরও অনেক-দূর এগিয়েছিল। এবং তার সব কিছুই তুমি দেখেছ।' কাঁধের ওপর এলিয়ে পড়া চুলের গুচ্ছ সামলালো বীথি। কাছে সরে এল স্বামীর দিকে। 'ব্যাপারটা আরও গড়াবে। অনেকদূর। তোমার কথামতন এ পর্যন্ত আমি সহ্য করেছি। এগিয়ে এসেছি। আমি জানি না এই করে কী শাস্তি তুমি পাবে।'

'আমি ওকে পরীক্ষা করতে চাই···'

'এ কেমন পরীক্ষা আমি জানি না

'সেটা পরে বুঝবে।' রমণী বার বার কয়েক সিগ্রেটে টান দিয়ে তা ছুঁড়ে ফেলে দিল। 'কাগজে কি সব যেন লিখছিল·· কী?'

'ঠিকানা।'

'কিসের?'

'বাগানবাড়ির।'

'কেন?'

'আমাকে যেতে বলেছে।' অল্পক্ষণ কথা বলল না বীথি। হাতের চুড়ি নাড়ল আপন মনে। 'বাগানবাড়িতে তোমার প্রিয়বন্ধু একলাই নাকি থাকবেন। ওখানে আমাদের ভালবাসার কথা হবে।'

'তাই বুঝি

'হ্যাঁ', বীথি তার হাতের মুঠো খুলে কাগজের টুকরোটা প্রথমে দেখিয়েছিল। পরে সেই কাগজটা ফেলে ধরল। 'এই ঠিকানা। ও বলছিল, আমাকে ও রাজরাণী করে রাখবে···'

'মিথ্যেবাদী।' রমণী চাপা আক্রোশের গলায় কথাটা বলে ফেলল। 'একটা শয়তান, প্রবঞ্চক, চরিত্রহীন আর লম্পট ···'

'কে, আমি?'

'না।'

'তবে তোমার বন্ধু নিশ্চয়?'

'হ্যাঁ।'

'আর তুমি।' বীথির গলার আচমকা যেন উত্তেজনা ফেটে পড়ল। 'নিজের কথাটা একবার ভেবে দেখ। ভেবে দেখ, কী তুমি করছ

'আমি?'

'নিশ্চয়।'

'কেন আমি কী করলাম?'

'কী করেছ?' বীথি আচমকা প্রচণ্ড ক্রোধে আক্রোশে ঝরিয়া হয়ে উঠেছে। 'জীবনে একটি দিনের জন্যেও তুমি আমাকে ভালবেসেছ?'

রমণী হাসল। অত্যন্ত সরল সহজ হাসি। এক চোখের ভ্রূ অল্প কুঁচকে দেখছিল বীথিকে। 'অথচ আমরা ভাল বেসেই বিয়ে করেছিলাম বলে আমার মনে পড়ছে।'

'ভালবেসে?' বীথি উঠল। তার চোখে মুখে ভয়ঙ্কর রকমের বিশ্রীতা আর প্রচণ্ড রোষ ফুটে উঠেছে। 'ওই মিথ্যে দাম্পত্য দিয়ে অনেকদিন আমি মনকে ভুলিয়ে রেখে-ছিলাম। পরে বুঝেছি কথাটা কতবড় মিথ্যে···'

'মিথ্যে।'

'মিথ্যে না?' বীথি সহসা দু' পা এগিয়ে এল, রমণীর দিকে। জোরে জোরে নিশ্বাস নিচ্ছে। গা যেন দুলছিল। 'তুমি কি ভেবেছ কিছুই আমি জানি না?'

অত্যন্ত শান্ত, ধীর এবং শীতল চোখে তাকাল রমণী। মুখে হাসি নেই তবু প্রশান্তির শেষ রেখাটা মুছে যায় নি। 'আমি অন্তত: জানি না, আমার দোষ কোথায়?'

'তা তুমি জানবে না। চিরকাল নিজে ভালবাসাটুকু নেজে থাকতে চাও। তুমি কি মনে করেছ, তোমার গোপন প্রেমের কথা আমার অজানা?'

'প্রেম!' রমণী যেন আৎকে উঠল। ভয় না সম্ভবতঃ বিস্ময়ে।

'হ্যাঁ, প্রেম।' বীথির সারা মুখ সুখী কর্কশ হয়ে উঠেছে।

যেন ঘৃণা উগরে পড়ছিল। 'আমাকে তুমি স্বাধীনতা দিয়েছ, না? কিন্তু সে স্বাধীনতা কি ওই মেয়েটার সঙ্গে প্রেম করবার জন্যে?'

'কে?' সারা মুখ কুঁচকে এসেছে রমনীর। 'তুমি কি খোকনের দিদিমণির কথা···'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, দিদিমণি। কেন তখন অত দিদিমণি তোমার পছন্দ হয় নি মনে করেছ বুঝি তা আমার অজানা?'

'বীথি···' অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে সহসা প্রায় চিৎকার করতে গিয়ে থেমে গেল রমনী। চোখ বন্ধ করে রমনী অল্পক্ষণ থাকল। শেষে হাতের তালুতে কপাল রেখে কাঁপছিল। দু' মুহূর্ত ঘর নিঃসাড় হয়ে থাকল এই ঘর। অতি কষ্টে উত্তেজনা চেপে রমনী আস্তে আস্তে মাথা তুলল। বাষ্পিত, করুণ এবং মলিন চোখে তাকাল জানলার দিকে। 'জীবনের কোনো কথাই তোমার কাছে আমি লুকোই নি। লুকোবার ইচ্ছাও কোনোদিন হয় নি আমার।' রমনীর গলা ভারীভারী অথচ শান্ত এবং সংযমী। 'তবু এই অপবাদ তুমি দিচ্ছ। সেই ছোটবেলা থেকে আমাদের জানাজানি ঘনিষ্ঠতা। একে তুমি প্রেম বলতে পারো না বীথি···'

'তা পারি না, কারণ আমি জানি কথাটা কতবড় সত্যি। কতটা নিশ্চিন্ত···'

রমনী প্রাণপণ চেষ্টায় নিজেকে ধরে রাখতে চাইছিল কিন্তু পারল না। সোফা ছেড়ে উঠে এসে কী করবে ভেবে পাচ্ছিল না। শেষে স্ত্রীর মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। 'তুমি যদি মনে করে থাকো, জোর করে এই অপবাদ আমাকে দেবে, শাস্তি দেবে, তবে জেনে রাখো, তোমার এ অভি-যোগকে আমি পরোয়া করি না।'

'আমি করি···' বীথির তীব্র আক্রোশ আর চাপা উত্তেজনার গলা যেন প্রায় জোর করে রমনীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিল। অল্প হাঁপাচ্ছিল বীথি। তার চোখমুখ কঠিন এবং রুক্ষ। গলার শিরা ফুলে উঠেছে। চোখ বড় 'সংসার ছেড়ে দিয়ে কী কারণে তুমি পালিয়েছিলে বলো···'

'তোমার হাত থেকে বাঁচবার জন্যে···'

'জানি, না বাঁচলে আর একজনের সঙ্গে প্রেম হয় না, ভালবাসার বড় বড় চিঠি লেখা যায় না···'

'তোমার কথা আমি মেনে নিতে পারছি না'

'পারবেও না—' সারা মুখ ঘৃণার আক্রোশে বেঁকে এল বীথির। গাল গলা বেয়ে উঠেছে। আঁচল তুলে তা মুছে নিয়ে শক্ত হয়ে দাঁড়াল 'পারবে না, কারণ আমি সত্য কথা বলছি।' তীব্র রোষ অসম্ভব উত্তেজনা আর চরম আক্রোশ চাপতে না পেরে কেঁদে ফেলল বীথি। 'তোমার প্রতি অন্ধ বিশ্বাস আমার ছিল। কিন্তু আমি জানি, তোমার ওই বন্ধুর ভাইকি, সে তোমাকে ফিরিয়ে এনেছে। তার চিঠি না পেলে তুমি আদতে একথা আমি বিশ্বাস করি না।'

সোফায় বসল রমনী। তার মাথা বোঁটা ঝাচড়ানো ফলের মতন ঝুলে পড়েছে। হাঁটুতে কনুই রেখে, প্রসারিত হাতে কপালের দিককার চুল খামচে ধরে থাকল খানিকক্ষণ। নিশ্চুপে, চোখ বন্ধ রমনীর, সারা মুখে যন্ত্রনার হিজিবিজি রেখার জটিলতা। নীচের ওষ্ঠ যেন প্রাণপণে কামড়ে ধরে সংযম রক্ষা করছিল।

'আমি জানি, রোজ তুমি দরজা বন্ধ করে লেখার নামে প্রেমপত্র লেখ।' বীথি থামছিল না। নাকের ফুটো বিস্ফারিত হয়ে অল্প কেঁপে ওঠে এবং গাল কাঁপছিল। 'আমাকে বঞ্চিত করে এই প্রেমে তুমি শান্তি পাবে না। তুমি আরও বেশি পুড়বে। অনেক, আরও···'

'তুমি আমার কিছু কম পোড়াচ্ছ না—' রমনী মুখ তুলল। তাকাল স্ত্রীর দিকে। বীথিকে এত কদর্য এবং কুৎসিৎ লাগছিল যে, রমনী তার দৃষ্টিকে ধরে রাখতে পারল না তার ওপর। 'আমার সমস্ত মনকে তুমি বিষ করেছ···' মাথা নীচু করে অল্প হাঁপাচ্ছিল রমনী।

'আর তুমি ?' বীথি বিকারী বাজপাখীর ছোঁ-মারার মতন রমণীর মুখের কথা কেড়ে নিল। 'আমার ছেলেকে তুমি দিন দিন কুপরামর্শ দিয়ে আমার শত্রু করে তুলছ না ?'

'মিথ্যে কথা ?'

'সত্য মিথ্যে আমি জানি, আমি বুঝতে পারি। তোমার এত নোংরা মন যে, নিজের সন্তানের জন্ম নিয়ে পর্যন্ত তোমার সন্দেহ।'

'বীথি····' রমণী আচমকা লাফিয়ে উঠে পড়ছে।

এই কর্কশ, কুশ্রী এবং নোংরা ছোড়াছুড়ি আরও চলতো, চলতে পারত। কিন্তু ওরা দু'জনে হঠাৎ, হঠাৎই যেন কেমন শুরু যাদুমন্ত্রের বশে চুপ করে গেল। একসঙ্গে দু'জনে ভেতরের দরজার দিকে তাকিয়েছিল। এক পলকও তাকাতে পারল না। মুখ নীচু করে ওরা এসে বসল।

দরজায় সুমন। পরনে সেই নারীমূর্তি যে এ বাড়ির যৌবনকে স্থির করে সুদূরপ্রসারী চলে গিয়েছিল; গিয়ে বুঝেছিল এ যৌবন ছিঁড়বার নয়। অতএব আজ ভোর ভোর সকালে সে ফিরে এসেছে। নম্র, শান্ত, শ্লান্ত নারীমূর্তি।

সুমন ছুটে এসেছিল বাপের কোলে। এ বাড়ির বুড়ো চাকর সকালের চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে উপস্থিত।

খানিক সময় ঘরে বিষাদের উত্তেজনার এই ছায়াচ্ছন্ন ঘর সকালের রৌদ্রের মতন উজ্জ্বল হয়ে থাকল। সুমন বাপের কোলে মুখ গুঁজে মাথা রেখে কথা বলছিল। চিপয়ের ওপর চায়ের সাজানো হচ্ছে। ব্যক্তির দিকে নিশ্চুপ তাকিয়েছিল। ঘর ঘুরে। বীথি উঠে গিয়ে তাকে ধরে এনে সোফায় বসিয়েছিল। একটি দু'টি কথা থেকে শুরু করে মোটা দর এক লম্বা লম্বা কথার মুখর ঘরে উঠেছিল। যেই রৌদ্রোজ্জ্বল মুহূর্ত বর্ষা দিনের রৌদ্রমেঘের খেলার মতন অকস্মাৎ এই অনালোকিত ঘরকে আলোময় করেছিল। ওরা চলে যেতে আবার এ-ঘরে ঘনঘনে স্তব্ধতার ছায়া নামল।

ঘরে আর কেউ নেই এখন। বীথি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছেলের চলে যাওয়া দেখল। রমণী পা এলিয়ে দিয়ে সিগ্রেট টানছে। আসন্ন বাইরের প্রকৃতি এখন শান্ত। শীতের পাখিরা ডাকছিল। ফুলের বাগানে প্রজাপতি উড়ছে। বাতাস সৌরভ টেনে আনছিল। দিগন্তের সেই কটি মেঘখণ্ড সরে আসতে আসতে এখন জানালার পাল্লার রেখা ছুঁয়ে ওপর আকাশের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। রমণী অন্য কাৎ হ'ল। সামান্য ঝুঁকে পড়ে ঘন নীল আকাশ দেখছিল ওপর হয়ে।

দরজা থেকে সরে এল বীথি। তার চোখ রমণীর ওপর। এক পা দু'পা করে এগিয়ে এল বীথি। দাঁড়াল এসে স্বামীর পাশে। এক হাতে সে সোফার হাতল ধরেছে। ইচ্ছে থাকলেও সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না। চোখ বুঁজে কী ভাবল বীথি। শব্দ করে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে তাকাল স্বামীর দিকে। 'তুমি আমায় একটা কিছু বলো···'

'কি···' পাশ তাকাতে গিয়েছিল রমণী। তাকাল না।

'তোমার বন্ধু আমায় যেতে বলেছিল, রাত আটটায়···'

'যাও···'

'তুমি আমায় মানা করছ না !'

'না,' রমণী স্ত্রীর দিকে তাকাল, 'তোমার স্বাধীনতার ওপরে কোনোদিনই আমি হাত দিতে চাইনি···'

'কিন্তু তুমি ভেবে দেখ, নিরালা নির্জন আয়না, শুধু এক রাতজাগা বাড়ি, লোকটা একলা থাকবে। আমি···আমি···'

'সে রাস্তা সে পরিষ্কার করেই রেখেছে।' রমণী মুখ ফিরিয়ে নিল। আবার জানলার দিকে চোখ তুলেছে। 'তার মতলব খুব স্বচ্ছ। আমাকে ঠিক আটটার সময়েই যেতে হবে ম্যানেজিং এজেন্টের না কার সঙ্গে যেন দেখা করতে বলে গেল। আর তোমাকেও ঠিক আটটায়···'

'সব জেনেও তুমি আমায় বাধা দেবে না ?'

'না।'

'কিন্তু কেন? কেন তুমি সর্বনাশের দিকে আমায় ঠেলে দিচ্ছ?'

'সর্বনাশ!' রমণী ঘুরিতে মুখ ঘুরিয়ে বীথির দিকে তাকাল। অল্পক্ষণ কিছু বলল না। মুখ চোখ কুঁচকে এসেছিল। স্নেহের চোখ রাখল রমণী। 'আমরা কেউ কারও স্বাধীনতায় হাত দিই নি, দেব না। ওকে যদি তোমার ভালো লাগে সে ভালবাসার অধিকার তোমার আছে।'

'তুমি আমায় অপরাধ দেবে না, ঘৃণা করবে না?'

'না।'

'তবে জেনে রেখো, আমার দোষ কিছু নেই। তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা কখনও আমি করি নি। যা হয়েছে, ঘটেছে সব তোমাকে বলেছি। তোমার প্রতি আমার ভালবাসায় কোথাও ফাঁক নেই ...' বীথি থামল। ঠোঁক গিলল। ঝুলে পড়া আঁচল তুলে নিল হাতে। 'তাহ'লে আমি যেতে পারি সেখানে—'

'আমি তোমায় বাধা দিচ্ছি না—'

'না দিচ্ছ না—' আচমকা বীথি এগিয়ে এসে রমণীর হাঁটুর কাছে সোফা ধরে বসল। 'কিন্তু কেন দিচ্ছ না, কেন? তুমি কি কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছ না, তোমাকে আমি সব দিয়েছি। সব কিছু দিয়ে আমি নিঃস্ব সর্বহারা। তুমি আমায় ভালোবেসেছিলে— যখন চলে গেলে—'

'হ্যাঁ, যখন গেলাম—'

'চলে যাওয়ার পরেও একটা দিনের জন্যেও তোমাকে আমি ভুলতে পারি নি।' নীরব কান্না কাঁদছিল বীথি। কাঁপছিল। একটা হাত সে তুলে দিয়েছে স্বামীর কোলের ওপর। 'তুমি ফিরে দেখ, সব সন্দেহ, মনের সকল জটিলতা ফেড়ে ফেলে দিয়ে আমার পাশে ঠিক আগের মতন তুমি দাঁড়াও। দেখবে পৃথিবীতে এত বড় শান্তি নেই।'

'না না—' মুখ সরিয়ে নিল রমণী। মাথা নেড়ে যাচ্ছিল। 'তা আমি পারি না, পারছি না—'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, পারবে।' পাশে এসে বসল বীথি। অল্প ঝুঁকে স্বামীর হাত তুলে নিল হাতে। 'তুমি আমাকে বলো। মনের সব কথা খুলে বলো আমাকে। বলো, কী তুমি ভাবছ, কেন তোমার এত সন্দেহ, কেন তুমি মিথ্যেমিথ্যি এমন একটা ভয়ানক রোগে ভুগছ ...'

'আমি আহত, আমি বিক্ষত

'তুমি আমাকে খুলে বলো। বলো কীভাবে তুমি... বিকৃত হয়েছ, হচ্ছো...'

'আমার সমস্ত মনে সন্দেহ ভিড় পেতে বসেছে।' রমণী জোর করে স্ত্রীর মুঠো থেকে তার হাত ছাড়িয়ে নিল। পেছন ফিরে বসতে গিয়েছিল কিন্তু পারল না। বীথি তাকে ধরে ফেলেছে। সহসা বীথি তার মুখ গুঁজে দিল স্বামীর বুকে। কাঁদছিল।

'সন্দেহ, আমার প্রতি?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু আমি তোমার...' গাঢ় গভীর এবং ভারীভাঙা গলায় ফিসফিস করে বলল বীথি। 'আমি যদি এই মুহূর্তে মরি শুধু আমি তোমার...তোমারই...'

'আমি', ভয়ানক যন্ত্রণাপীড়িত গলায় কথা বলল রমণী। 'শুধু আমি পারব না, পারছি না বীথি। আমার সমস্ত মন অপবিত্র হয়েছে, আত্মা সন্দেহের বিষে বিষাক্ত। কিছুতেই আমি আর সেই বিশ্বাসের জগতে ফিরে যেতে পারছি না, না না না—' রমণী নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। হু' হাতে বীথিকে জড়িয়ে ধরল। কাঁদছিল।

ক থি কা

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

লিখছি বলেই কিন্তু মনে করবেন না যে এটা আজকের বিষয়। বহুদিন পূর্ব্বের এক গরল অনুভূতিকে আজ ভাষায় রূপ দিচ্ছি।

অনেক বছর আগের কথা ; রাত্রে খেয়ে দেয়ে এসে বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছি, মশারি ফেলিনি পরে ঘুমোবো বলে। শুয়ে শুয়ে আয়াস করছিলাম—কখন যে তন্দ্রা এল কিছুই বুঝতে পারলাম না।

হঠাৎ টের পেলাম কে যেন আমার গলা বড় করুণভাবে জড়িয়ে ধরেছে, এ আঁকড়ান যেন শিশুর অসহায়ভাবে গলা জড়িয়ে ধরবার মত, তার ছোট ছোট নিশ্বাসগুলো যে কাচের টুকরোর মতো টুক টুক করে গায়ে পড়তে লাগলো। তার বড় বড় ফোটা ফোটা চোখের জল আমার গালে পড়ে এপিঠ ওপিঠ গড়িয়ে যেতে লাগল।

আমি অলসভাবে হাতটুকু বাড়িয়ে তাকে একটু ধরবার প্রয়াস করে বললুম "তুমি কে ?"

'আগে কথা বল, এত জোরে কেন কথা বলছ—আমি যে তারা।'

'তারা ; সে আবার কে ?'

'আমি আকাশের তারা, আকাশ থেকে খসে এসেছি তোমার সাথে দেখা করতে,—তোমাকে আমাদের দুঃখ জানাতে—'

'দুঃখ ! কিসের দুঃখ ?'

'এবে আমাদের অনাদরের দুঃখ, অবহেলার দুঃখ। দুঃখ যে তোমরা আমাদের ভুলে গেছ। আমাদের দিকে আর ফিরে তাকাও না, শিশুকালে যে হাত বাড়িয়ে বাড়িয়ে ডাকতে, সেরূপভাবে তো আর ডাকো না, আর তো আমাদের দিকে চেয়ে তোমাদের চোখ আনন্দের স্পন্দনে দুলদুল করে ওঠে না। তুমি যে একটু বড় হয়েছ। কতকগুলো টুকরো টুকরো অলীক তারা বানিয়ে সত্যিকারের তারাদের ভুলে গেছ—যে তারা তোমাদের শিশুকালে অজ্ঞাত দেশে নিয়ে পৌঁছিয়ে দিত। তাদের ও আজ খোঁজ নেওনা। ছোট ছোট ভাইদের কোলে নিয়ে আঙুল তুলে যে দেখাতে—খোকন ঐ যে তারা দেখছ দেখায় তোমার মামাবাড়ী, ঐ যে তারা দেখছ এ ও মামাবাড়ীর তুলসী প্রদীপ। সব কথা ও আজ ভুলে গেছ। মেকী তারার পেছনে পেছনে ছুটেছ। এবে তারই দুঃখ জানাব বলে এসেছি।'

'কিসের তারা বানিয়েছি, আমি যে কিছুই বুঝতে পারি না।'

'বোঝনি, ভেবে দেখ দেখি আমাদের ছেড়ে বিজলি বাতির পেছনে ছুটেছ কিনা ? তাকে যে জোর করে জড়িয়ে আছ—স্নিগ্ধতা কি সেখানে পাও ? ওর মাঝে কি মধুরতা আছে ? ওর মাঝে কি শত সহস্র অসহায় নরনারীর চোখের তারকার প্রতিবিম্ব দেখছ না ? সে যে আগুনের ফুলকির মত গরম—সে যে অত্যাচারের মধ্যে জন্মলাভ করেছে তাও কি বোঝ না ? সে ও তারকা নয়। এবে ভুল করে দেখা

তারকা। দূর থেকে অনেক দূর থেকে যে তারকার মত দেখতে পাও—সে ও ফুল। মহাফুল, অজস্রভাবে ফুল। আমাদের দুঃখ কি বোঝ নি মাণিক? এখনও কি বোঝ নি?'

'তোমাকে ত আগে আর দুঃখ করতে দেখিনি।'

'তোমার কাছে এসে কতবার কেঁদেছি—তুমিও কথার জবাব দাওনি মাণিক।'

'আমি তো তোমায় দেখতে পাইনি বোন।'

'দেখতে পাওনি—কতবার যে মাটির বুকে আছাড় খেয়ে পড়েছি তাও দেখনি। আমার কথা শোনোনি—বৃষ্টি দেখনি—বৃষ্টি যে আমাদের কান্না। আকাশের গায়ে যে শত সহস্র সাদা সাদা ফুল দেখছ এযে তাদের চোখের জল।.....'

হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুম ভেঙে দেখি বাইরে ভয়ানকভাবে বৃষ্টি নেমেছে। তারই টুকরো টুকরো জলের ছিটে আমার চোখে মুখে বিঁধছে।

৪ঠা কার্ত্তিক, ৪১ বঙ্গাব্দ।

বন্ধা বন্দী নিবাস।

সরকার চুলা

বৈজ্ঞানিক কুকিং রেঞ্জ

২, লেক টেরেস

কলিকাতা-২৯

ফোন : ৪৬-২১৬১

বাণিজ্য

(৩১৮ পৃষ্ঠার পর)

দ্বিতীয়টি পুত্র, আই এস সি পড়ে। ছেলেটিকে যদি রয়াল এ্যাড কো'র একটা চাকরি দেওয়া যায়, মন্দ কি! দু'জনের যোগাযোগে যেমন চলত তেমনি কারুকেশে অন্তত চ'লে যাবে।

প্রস্তাব সকলেই সমর্থন করল। এখন বাসু সাহেবের কানে কথাটা তোলা প্রয়োজন।

কে তুলবে? জিজ্ঞাসার চিহ্নে সকলেরই মুখ ভোঁতা ও বিমর্ষ হয়ে পড়ল। সাহেবের মেজাজ কিছুদিন থেকে ভালো যাচ্ছে না, এটা কারও দৃষ্টি এড়ায় নি। সমস্যা সেইখানে।

অনেক চিন্তার পর স্থির হল চৌধুরীকে দিয়ে কথাটা বলানো যেতে পারে। সাহেবের সুনজরে আছে। দ্বিতীয়ত, চৌধুরী এখানে নিজে আসেনি, সাহেবই ওকে নিয়ে এসেছেন। ওর চাকরির ভয় নেই।

অগত্যা সেই রকমই সিদ্ধান্ত নেওয়া হল।

বিজ্ঞাপনের কপি ড্রাফ্‌ট ক'রে কাগজের অফিসে পাঠানোর ব্যবস্থা করছিল চৌধুরী। এরা ডেপুটেশনে গেল।

চৌধুরী তনয় মন দিয়ে, শুনে মাথা নাড়ল। অর্থাৎ, ব্যাপারটিতে ওরও পরিপূর্ণ সমর্থন আছে। গগনবাবুর ছেলেকে দিয়ে একটা দরখাস্ত পাঠালে ভাল হতো। যাই হোক, বাসু'র মন বুঝে সে প্রস্তাবটা উত্থাপনের প্রতিশ্রুতি দিল।

কাল থেকে পঞ্চাশ টাকা পাওয়া গিয়েছিল। স্টাফের মধ্যে চাঁদা তুলে আরো তিরিশ টাকা জোগাড় হল। গগনবাবুর স্ত্রী ও ছেলেরা খবর পেয়ে হাসপাতালে এসেছিল। হাসপাতাল থেকেই সবাইকে নিবতলায় নিয়ে যাওয়া হবে সৎকারের জন্য। পরিতোষ মালা কিনতে গেল নিউমার্কেটে। গগন মুখুজ্যের অনারে সেদিন আধ ঘণ্টা আগে রয়াল এ্যাড কো'র অফিস ছুটি হয়ে গেল। অর্ডারে সই করলেন বাসু সাহেব নিজে।

৪

বিকেল পাঁচটায় চৌধুরী বাসু সাহেবের চেম্বারে ঢুকল।

'আই ডোন্ট এক্সপেক্ট দিস ক্রুথ ইউ।' প্রস্তাব শুনে বাসু সাহেব জ্ব'লে উঠলেন। 'মিস্টার চৌধুরী, এটা অফিস, দানছত্র নয়। মানুষ মরে এটাই সত্যি। যে মরল সে যখন মরবে সেই জায়গায় আর একজনকে ঢোকাতে হবে, আই ডোন্ট থিংক ইন দ্যাট থিওরি।'

প্রস্তাবে কাজ হবে না, চৌধুরী অনুমান করেছিল আগেই। তবু এই ধরণের কথাবার্তা সে আশা করে নি। বলল, 'আমি স্টাকদের ইচ্ছের কথাই বললাম। কিছু করা না করা আপনার হাতে।'

বাসু সাহেব চোখ বুজলেন। ঈষৎ ক্রুদ্ধ। হয়তো কিছু বলতেন, তার আগেই চৌধুরী চ'লে গেলো। পাইপটা টেবিলে ঠুকে বেয়ারাকে ডাকলেন তিনি।

অফিস এখন ফাঁকা। ও-ঘরে বাসু সাহেব। এ ঘরে চৌধুরী। গগন মুখুজ্জের শবদেহ নিয়ে হয়তো এতক্ষণে ওরা শ্মশানের দিকে রওনা দিয়েছে। এখানে বসেই দৃশ্যটা কল্পনা করা যায়।

ফাইল গুছিয়ে চৌধুরী কেরার জন্ত তৈরী হতে লাগল। অন্তদিন সে এতক্ষণ অফিসে থাকে না। আজ ছিল, অবসর বুঝে গগনবাবুর পরিবারের সুরবস্থা সম্পর্কে বাসু সাহেবকে ওয়াকিবহাল করার জন্ত। কাজটা হল না। পরিবর্তে একপাশা গ্লানি জড়ো হলো মনে। গগন মুখুজ্জের সঙ্গে তার আলাপ ছিল ভাসা ভাসা, নিতান্ত প্রয়োজন না হ'লে কথাবার্তা হত না। কিন্তু, ভদ্রলোককে দেখে বহুদিনই তার মনে হয়েছে অভিমানী, গোপনতম কোন দুঃখ প্রকাশ করতে না পারার যন্ত্রণা তাঁকে মূক ক'রে দিয়েছিল। গগনের দুঃখে এই মুহূর্তে শোক অনুভব করল চৌধুরী।

বেয়ারার মুখে বাসু সাহেব আবার ডেকে পাঠালেন। চৌধুরী গেল, বিরক্তি ও অনিচ্ছা মেশানো একটা ভঙ্গী। না এলেই খুশি হত।

'আমাকে ডেকেছেন?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

বাসু সাহেব সময় নিয়ে খবরের কাগজের পাতা ওল্টালেন। ঘড়ি দেখলেন। চৌধুরী বসল না।

'বিজ্ঞাপনটা পাঠিয়ে দিয়েছেন?'

'দিয়েছি।'

বাসু তাকালেন স্পষ্ট চোখে। চৌধুরী চোখ নামিয়ে নিল।

'মিস্টার চৌধুরী, গগনবাবুর মেয়েকে আপনি দেখেছেন?'

'না।'

'উই মে বী ইন্টারেস্টেড ইন হার। ছেলেকে দিয়ে চলবে না। মেয়েটিকে ডেকে পাঠাতে পারেন। যদি ওকে দিয়েই আমাদের কাজ চলে, তা হলে···'

কথা নিয়ে বাসু সাহেব বললেন, 'আমি কি বলতে চাইছি আপনি নিশ্চয় বুঝতে পারছেন—'

With compliments from :

Eastern Industrial Corporation

Office : 142/1, Radha Bazar Street, CALCUTTA-1

Factory : Misrapara Road, Rajpur (24-PARGANAS)

GRAM : UNNAYAN : 22-5508

CALCUTTA UNIVERSITY

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ] ৬ষ্ঠ সংখ্যা [আশ্বিন ১৩৭২

সম্পাদকীয়

শারদীয়ার পরে

জয়শ্রীর গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের গভীর শুভেচ্ছা ও সম্ভাষণ জানাচ্ছি। পূজায় কলকাতায় না থাকাতে অনেকের শারদীয়া সম্ভাষণের ব্যক্তিগত স্বীকৃতি না দিতে পারায় অন্ত ত্রুটী স্বীকার করছি আশাকরি তাঁরা এ ত্রুটী ক্ষমা করবেন।

এই সঙ্কট ও সম্ভাবনাপূর্ণ মুহূর্তে, গত চৌত্রিশ বছর ধরে জাতির সেবা করার অধিকার জয়শ্রী যাতে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার জন্য জয়শ্রীর সমর্থক ও শুভানুধ্যায়ীদের সক্রিয় সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছি।

ইন্দোনেশিয়া ও রোডেশিয়ার বর্তমান দ্রুত পরিবর্তনশীল অধ্যায়ের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভব নয় বলে আগামী সংখ্যার জন্য তা স্থগিত রাখা গেলো।

ভারতের অমর-বীর্য ফোরাম

মেকং ও কঙ্গোর সমস্ত গ্লানি মুছে দিয়ে পাঞ্জাব ও কাশ্মীরের রণাঙ্গনে এক অমর ঐতিহ্য রচনা করেছে ভারতীয় জোয়ানেরা। তারা বিশ্বের দরবারে এক নতুন পরিচয় দিয়েছে আজ ভারতবর্ষের। ভারত আজ দুর্বল পঙ্গু, ক্লীব, পর্যুদস্ত সামরিক সংস্থার প্রতীক নয়,—সামরিক শক্তির দৃপ্ত ঐতিহ্যে ভারত আজ পূর্ব গৌরবের অধিকারী।

ভারত আজ লুপ্ত আত্ম-বিশ্বাসে বলীয়ান অন্যতম বিশ্বশক্তি। আধুনিকতম মার্কিনী অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত পাক বাহিনীকে ভারতীয় সামরিক নেতারা শ্রেষ্ঠতর ষ্ট্রাটিজী ও' ট্যাকটিস্ দ্বারা পরাভূত করেছেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সামরিক অধিনায়কদের রণনীতিকে কার্যকরী করেছেন ভারতীয় জোয়ান ও অফিসাররা। ভারতীয় বাহিনীর জোয়ান ও অফিসারেরা জীবন-মৃত্যুকে অগ্রাহ্য করে 'সুইসাইড স্কোয়াডের' ন্যায় দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হয়ে শত্রুর শ্রেষ্ঠতর সামরিক যন্ত্রকে বিপর্যস্ত করে দিয়ে জয়ের পতাকা উড়িয়েছেন পক্ষ নদীর তীরে। একদিন লাহোর জেলের ফাঁসীর মঞ্চে প্রাণের অঞ্জলী তুলে ধরেছিলেন ভগৎ সিং, রাজগুরু ও সুখদেব,—তাদের অমর ঐতিহ্যই ভারতীয় জোয়ানেরা জীবন্ত করে তুলেছেন আবার পক্ষ নদীর তীরে।

আজ দেশ, জাতি,—ভারতের প্রতিটি মানুষ সশ্রদ্ধ

কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মরণ করছে সেই জোয়ানদের যারা প্রাণের অঞ্জলী দিয়ে মান রক্ষা করেছেন দেশমাতৃকার। জাতি আজ সংকল্প গ্রহণ করেছে,—দেশের প্রতিটি মানুষ জোয়ানদের রক্তের ঋণ পরিশোধ করবে।

পাক-ভারত যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য

পাক-ভারত যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি? ভারতীয় নেতৃত্ব এখনও সে সম্বন্ধে নীরব। এই নীরবতার কারণ আংশিক কূটনৈতিক এবং আংশিক সংকীর্ণ দলগত স্বার্থবুদ্ধিপ্রসূত। পিণ্ডির লক্ষ্য কাশ্মীর দখল,—ভারতের আপাত লক্ষ্য পিণ্ডির অভিপ্রায়কে ব্যাহত করা। ভারত সরকার তাই বলছেন যে ভারতের সামরিক লক্ষ্য আত্মরক্ষামূলক এবং এজন্য পাক বাহিনীকে পর্যুদস্ত বা পরাজিত করা নয় (!)—আক্রমণাত্মক মনোভাব থেকে বিরত রাখার জন্য পিণ্ডি বাহিনীকে পঙ্গু করাই ভারতের লক্ষ্য। ভারতের পক্ষ থেকে তাই এই যুদ্ধের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—battle of attrition।

পাকিস্তানের রাজনৈতিক লক্ষ্য অতি সুস্পষ্ট, পাকিস্তান কাশ্মীর চায়। কিন্তু ভারত কোন ক্রমেই কাশ্মীর ত্যাগ করতে রাজী নয়। ভারতের বক্তব্য, কাশ্মীরে মুসলীম অধিবাসীর সংখ্যা বেশি এই অজুহাতে পাকিস্তানকে কাশ্মীর দান করতে দিলে ভারতের লৌকিক গণতন্ত্রের মূল ভূমিরাদ নড়ে যাবে। যদিও আমাদের মতে ভারত বিভাগে সম্মত হয়ে গণতন্ত্রের ভূমিরাদ বহু পূর্বেই কংগ্রেস নেতৃত্ব পরিত্যাগ করেছে। যদিও রাষ্ট্রপতি বলেছেন যে এই যুদ্ধ হলো ধর্মনিরপেক্ষ লৌকিক গণতন্ত্র বনাম বৈরতান্ত্রিক জঙ্গীবাদী ধর্মতন্ত্রের সংগ্রাম। ভারত কোন ক্রমেই কাশ্মীর ত্যাগ করতে পারে না,—এই যুক্তির সঙ্গে রাষ্ট্রপতির উক্তির তাৎপর্য সংযুক্ত করলে যে মূল দর্শনটি দাঁড়ায় তার তাৎপর্য হলো এই যে পাক-ভারত যুদ্ধ বস্তুতঃ ভিত্তিতে দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিপক্ষের এক আদর্শনৈতিক সংগ্রাম। অর্থাৎ পিণ্ডি মনে করে যে মুসলীম হলেই কাশ্মীরীরা পাকিস্তানী, ভারত মনে করে ধর্ম ও জাতীয়তা সমার্থক নয়।

বস্তুত, যে উদ্দেশ্য নিয়ে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়েছিল তার একটি উদ্দেশ্যও সফল হয়নি—বরং হত্যাকাণ্ড ও পাশবিক কলঙ্কের কুৎসিত কাহিনীতে ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাস আরও জটিল ও সংকটপূর্ণ হয়ে উঠেছে।

পাক-ভারতের সৈন্যবাহিনী যেভাবে সংঘর্ষের পরবর্তী অধ্যায়ে মুখোমুখী দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধ বিরতির দুই পারে তার সংকেত অতি সুস্পষ্ট। কাশ্মীর নিয়ে আপোষ করা দিল্লী বা পিণ্ডি কারো পক্ষেই আর সম্ভব নয়,—দুই পক্ষের সামরিক বাহিনীর এত রক্ত ঝরেছে যে তার প্লাবনে সেই সম্ভাবনা ভেসে গেছে এখন হয় পিণ্ডির বুকে রাজনৈতিক ভূ-কম্পন ঘটবে এবং ভারতের সঙ্গে নতুন রাজনৈতিক ক্ষেত্র রচনা হবে সেখানে, অথবা আসুর অনতি বিলম্বে শেষ মরণ-আঘাত হানবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে দ্বিতীয় পর্যায়ের যুদ্ধ সুরু হলে চরম নীমাংসায় না পৌঁছান পর্যন্ত সংঘর্ষ বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু দ্বিতীয় পর্যায়ে যদি পাক-বাহিনী পর্যুদস্ত হয় তাহলে ভারতের রাজনৈতিক লক্ষ্য কি হবে? এ সম্বন্ধে ভারতের চিন্তা ও লক্ষ্য অস্পষ্ট ও দ্বিধাগ্রস্ত। ভারত এখনও পিণ্ডি ও পাকিস্তানকে এক করে দেখছে। তাই, পাক জনতার ইচ্ছা-অনিচ্ছা পিণ্ডির দৃষ্টি দিয়ে দিল্লী বিচার করছে। এজন্যই পাক জনতার মধ্যে বিপ্লবের ইন্ধন জোগাতে এবং স্বাধীন পূর্ব-বঙ্গ রচনার ভূমিকা রচনায় সাহায্য দিতে দিল্লী এখনও দ্বিধাগ্রস্ত। দুই পাকিস্তানে যদিবিপ্লব ঘটে তা হলে এই উপ-মহাদেশের আঠার বছরের কলঙ্কিত সমস্যের পুনর্বিচার হবে এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিন্যাসের দ্বিতাবস্থায় অবশ্যম্ভাবী পরিবর্তন সৃষ্টি হবে। এই দ্বিতীয় আশঙ্কার জন্যই পাক-

ভারত যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণ এবং প্রচারে দিল্লী-নেতৃত্ব অনিচ্ছুক। পাক জনতা যদি স্বেচ্ছায় আবার এই উপমহাদেশের ঐক্য বন্ধন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে চায় তা হলেও দিল্লী সে প্রচেষ্টায় সাড়া দিতে রাজী নয়। দিল্লী সরকার শুধু পাক-ভারত মিলন প্রচেষ্টার কার্যক্রম অনুসরণেই পরাঙ্মুখ নয়—পাক ভারতের ঐক্যেরও তারা বিরোধী। কারণ এরূপ মিলনে তাদের ক্ষমতাচ্যুতি,—নয় পক্ষে ক্ষমতা বিস্তারের গণ্ডীতে আমূল পরিবর্তনের আশংকা রয়েছে। দিল্লী নেতৃত্বের মধ্যে বৈপ্লবিক আদর্শবাদের কোন প্রেরণা নেই—তাই বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গীও নেই। ভবিষ্যত সম্বন্ধে দিল্লী-নেতৃত্ব ভীত, সন্ত্রস্ত—তাই তাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীও অস্পষ্ট, দ্বিধাগ্রস্ত ও ভীতিসঙ্কুল।

কিন্তু পঞ্চনদীর তীরে মুখোমুখী পাক-ভারত বাহিনীর অবস্থিতির তাৎপর্য এখন অনেক মৌলিক ও সুদূর প্রসারী। আজ ইতিহাসের গতিপথ দিল্লী বা পিণ্ডির ইচ্ছার উপরে নির্ভর করছে না। এক চরম সমাধানের দিকে এগিয়ে চলেছে, পাক-ভারতের সম্পর্ক। ভারত যদি এই যুদ্ধের রাজনৈতিক লক্ষ্য সম্বন্ধে বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণে দৃঢ় সংকল্প হতো তা হলে পাকভূমীস্থান ও পূর্ব-বঙ্গ সম্বন্ধে ভারতের নীতি হতো অন্যরূপ। কিন্তু দিল্লীর ইচ্ছাতন্ত্রতা সত্ত্বেও ইতিহাসের নতুন গতিপথ নির্মাণ সুরু হয়েছে এবং এই ইতিহাসই দ্বি-জাতিত্বের চালের প্রহসন করে সৃষ্টি করবে এই উপমহাদেশে এক নতুন দেশ, জাতি ও রাষ্ট্র পরিকল্পনা। পঞ্চনদীর তীরে ইতিহাস আজ সেই যুগান্ত সন্ধ্যার ডাক দিয়েছে। এই ডাক অবোধ ও দুর্বার একে প্রতিরোধ করবার ক্ষমতা পিণ্ডি বা দিল্লীর হাতে আর নেই।

ভারত কমান কমনওয়েলথ

ভারতের প্রতি কোন রাষ্ট্র যদি পূর্বাপর সবচেয়ে বেশি শত্রুতার ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে সেই রাষ্ট্রটি হলো বৃটেন। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামকে পঙ্গু করার জন্য দানবীয় চাতিয়ার চালিয়েছে। ভারতীয় জাতীয়তাকে পঙ্গু করে দেওয়ার জন্য মুসলীম লীগ সৃষ্টি করেছে, ভারত ভাগের আগে ভারত বিভাগ করেছে, পাক-ভারতকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে এই উপমহাদেশে নিজেদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ বৃদ্ধি করেছে এবং কমনওয়েলথের কাঁধে বসে পঙ্গু সিংহের কেশর নাড়িয়ে আন্তর্জাতীক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠার ঠাট বজায় রাখছে। —এই বৃটেন যার বিরুদ্ধে দু'শ বছরের চরম লড়াই করে স্বাধীনতা অর্জন, সেই জাতিকেই আবার মাথায় তুলে নিয়ে বিশ্বকে সৌহার্দের আসনে বসাবার যত অকাল্পনীয় চরম অবদানকর কার্যটি সম্ভব হয়েছে ইটন কালচার পুষ্ট নেহেরুর জন্য। আজকের ভারতের সমস্ত সংকট নেহেরু নীতির পরিণাম। বৃটিশ কেন্দ্রিক কমনওয়েলথটিও তাঁরই বৃটিশ অনুরক্তির কীর্তি।

১৯৫০ সালের মাঝার সময়ে ভারতীয় বাহিনী যখন পূর্ব-বঙ্গের মুক্তির জন্য উদ্যত ঠিক সেই সময়ে বৃটেন এসে প্রতিরোধ করে ভারতকে। আজ এই উপমহাদেশের বিরাট সমস্যার সমাধান হয়ে যেত যদি সেদিনে পাক কুচক্রীদের কবল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হতো পূর্ববঙ্গকে। কচ্ছ-সংঘাতের সময়ে ভারত প্রস্তুত হয়েছিল পূর্বপ্রান্তে প্রত্যাঘাত হানতে। ঠিক সেই চরমক্ষণে আবার উইলসন এসে রক্ষা করে দিল পিণ্ডিকে। পাকিস্তানকে রক্ষা করে আফ্রো-এশিয়ায় ভারতীয় নেতৃত্বের অগ্রগমনকে ব্যাহত করে এই দুই মহাদেশে বৃটিশ নেতৃত্বকে শীর্ষস্থানে রাখা বৃটিশ কূটনীতির প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে অক্ষুণ্ন রাখার প্রধান বক্স হলো বৃটিশ নিয়ন্ত্রিত কমনওয়েলথ।

একই মৌলিক স্বার্থের তাগিদে এবারের পাক-ভারত সংঘর্ষে আবার বৃটেন নগ্ন ও নির্লজ্জভাবে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে। পররাষ্ট্র নীতিতে বৃটেনের প্রবিক ও রক্ষণশীল

স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গী প্রায় অভিন্ন। পিণ্ডি কর্তৃক কাশ্মীর ভূ-ভাগ আক্রমণে বৃটেন ছিল মৌন,—কিন্তু আত্মরক্ষার অনিবার্য প্রয়োজনে ভারতীয় বাহিনী প্রত্যাঘাত করা মাত্র সাম্রাজ্যতান্ত্রিক বৃটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলসন ভারতকে আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করতে দ্বিধা করেনি। রয়টার, বৃটিশ টেলিভিশন, বৃটেনের প্রতিক্রিয়াশীল দলের সংবাদপত্রগুলি একযোগে পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিরুদ্ধে প্রচার চালিয়েছে। করাচীস্থ ভারতীয় মিশনের চরম দুর্দিনে কমনওয়েলথের সহযোগী হওয়া সত্ত্বেও বৃটিশ হাই কমিশন একটি পত্র পর্যন্ত ভারতে পৌঁছে দিতে অস্বীকার করে ছিল।

পাক-ভারত যুদ্ধে বৃটেন সুপরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানের পক্ষে ও ভারতের বিপক্ষে। কমনওয়েলথ ত্যাগ করলে বৃটিশ বাজারের সুযোগ থেকে ভারত বঞ্চিত হবে,—এই যুক্তিও অসার। ভিয়েৎনামে মার্কিনী সামরিক কার্যক্রম সমর্থন করেও বৃটেন চীনের সঙ্গে ব্যবসা করতে কার্পণ্য করছে না।

ভারতের কমনওয়েলথ ত্যাগ করা আজ জাতীয় সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে অপরিহার্য।

২১শে অক্টোবরের শোণিত শপথ

জীবনভোর নেতাজী চেয়েছিলেন ভারতের একটি ছাপ্পান্ন আর্মী তৈরী করতে। তাই দেদিনে ২১শে অক্টোবরে আক্ষেপ করে বলেছিলেন যে ভারতের সবই আছে নেই শুধু একটি আর্মী অব লিবারেশন। জেনারেল চৌধুরী ক্ষমতা হাতে নিয়েই একটি ঘোষণায় বলেছেন যে আজ ভারতীয় বাহিনীর আমূল রূপান্তর ঘটেছে—কারণ ভারতীয় বাহিনী এখন একটি ছাপ্পান্ন আর্মী। ভারতীয় নৌবল যে এখন একটি ছাপ্পান্ন আর্মী তার যথার্থ শক্তির পরিচয় উঠেছে পাঞ্জাব-কাশ্মীর দুখণ্ডের রণাঙ্গনে। নেতাজীর আশা আজ আংশিক পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু ২১শে অক্টোবরে গৃহীত নেতাজীর সেই সমগ্র শপথ আজো পূর্ণ হয়নি। সমন্বয়বাদী ভারতীয় জাতীয়তাবাদের আদর্শের ভিত্তিতে অখণ্ড ভারত ভূমিতে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতীয় জাতি এখনও গড়ে ওঠেনি। ভারত ইতিহাসের স্থিতিত গতি সচল করে উঠেছে,—ভারতীয় জোয়ানদের শোণিত সিঞ্চিত পথে ইতিহাসের রথচক্র আবার চলতে সুরু করেছে। ইতিহাসের গতিনির্ণয়ের ক্ষমতা আজ আর দিল্লী বা পিণ্ডির হাতে নেই। নেতাজীর শপথ,—স্বাধীন ভারতের পূর্ণাঙ্গ দেহী রচনায় তাঁর স্বপ্ন আজ বাস্তবরূপ লাভের পথে। আজকের ১৯৬৫ সালের অক্টোবরে,—ভারতের সামরিক স্বাধীনতা দিবসের এই মহা-দিনটির কথা আজ জাতিকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমরা।

যুদ্ধ, পরিকল্পনা ও করভার

১৯৬২ সালের চীনের আক্রমণ, পাক-চীন আঁতাত, কচ্ছ আক্রমণ, পাক-ভারত যুদ্ধ এবং একই সঙ্গে জোটবদ্ধ পাক-চীনের ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধারম্ভের সম্ভাবনা অপরিহার্য-ভাবেই ভারতের অর্থনীতিকে প্রতিরক্ষা-কেন্দ্রিক করে গড়ে তুলতে বাধ্য করেছে। সকল যুদ্ধ পরিচালনার অপরিহার্য শর্ত সুস্থ ও সবল অর্থনৈতিক পটভূমি। এটা প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার প্রাথমিক শর্ত। তাই চতুর্থ পরিকল্পনাকে অনিবার্য-ভাবেই প্রতিরক্ষামুখী করে গড়ে তোলার যথার্থ কার্যক্রম গ্রহণ করেছে পরিকল্পনা কমিশন।

ভারতের পরিকল্পনা এতদিন অতিমাত্রায় বৈদেশিক সাহায্যের উপরে নির্ভরশীল ছিল,—খাদ্য সংগ্রহেও প্রতিবছর প্রায় ৩০০ কোটি টাকা ভারতকে ব্যয় করতে হয়েছে। কিন্তু পাক-ভারত সংঘর্ষের ফলে যে পশ্চিমাঞ্চল থেকে ভারত পরিকল্পনার মূলধন ও যন্ত্রপাতির একটি বড় অংশ সংগ্রহ করতো বর্তমান পাক-ভারত সংঘর্ষে ভারত এই পশ্চিমাঞ্চল

বিরোধী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তাই, আপাতত এই গোষ্ঠীর কাছ থেকে সাহায্য বন্ধ থাকবে এবং তার ভবিষ্যতও অনিশ্চিত হবে। বরং এই বৈদেশিক সাহায্যকে ভারতের বিরুদ্ধে কূটনৈতিক চাপ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ও হবে।

পরিকল্পনার মূলধন সংগ্রহে ও খাতে ভারতের স্বাবলম্বনের সংকল্প অপরিহার্য। অপরিহার্যতার অর্থ জনগণকে আরও বঞ্চিত করতার বহন করতে হবে। কিন্তু এরূপ প্রস্তাবের বিপদও আছে। এই যুদ্ধে সর্বশ্রেণীর জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও যুদ্ধ সমর্থনের স্বতস্ফূর্ত ও সামগ্রিক সংকল্প সৃষ্টি হয়েছে তা' ভঙ্গুরভাবে ব্যাহত হয়ে পড়তে পারে। পশ্চাতে ঐক্যহীন ও অসন্তুষ্ট জনসাধারণ নিয়ে যে রণক্ষেত্রে কোন দেশের পক্ষেই সাফল্য অর্জন করা সম্ভব নয় এটাও স্বতসিদ্ধ সত্য। কিন্তু করভার বৃদ্ধি করা ছাড়াও ভারতের পক্ষে উপায়ান্তর নেই।

নতুন কর নির্ধারণের আগে প্রথমত, দীর্ঘমেয়াদী প্রতিরক্ষা বণ্ড ও সার্টিফিকেটের ন্যায় অন্যান্য খাতের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত, এমনভাবে কর ধার্য করা প্রয়োজন যাতে ভারতে 'সাব-ষ্ট্যান্ডার্ড' বা 'অব-মান' গোষ্ঠির জনতার প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার উপরে এই করভারের বোঝা দুর্বহ না হয়ে পড়ে, তৃতীয়ত, বহু লক্ষের স্বেচ্ছামূলক অভিযানকে জনপ্রিয় করা প্রয়োজন। চতুর্থত, কৃচ্ছতা, মন্বন্তর, ও নৈতিকতারও লভ-বণ্টনের দর্শনকে সর্বস্তরে, সমভাবে এবং কঠোর পক্ষপাতিত্ব হীনভাবে প্রয়োগ করা প্রয়োজন। পঞ্চমত, উর্ধতন সরকারী আমলাতন্ত্রসহ উচ্চস্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে এই কৃচ্ছসাধনের মনোভাব বৃদ্ধি করা প্রয়োজন যে অর্থ সংগ্রহ ও ব্যয়-সংকোচের দায়িত্ব তাদেরই বেশি বহন করতে হবে এবং ষষ্ঠত, উদ্বিগ্নিত নীতি প্রবর্তনে কঠোর মনোভাব ও সতর্কতা প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রী শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের প্রশংসা করলেও অকাট্য তাত্ত্বিক প্রমাণ হচ্ছে যে এই দুইগোষ্ঠি, শ্রমিক ও জনসাধারণের দেশপ্রেমের সুযোগ নিয়ে বহুকোটি টাকার মোনাফা আত্মসাৎ করেছে, যার সামান্য অংশও তারা প্রতিরক্ষা তহবিলে জমা দেয় নি বরং জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়ে যে মুনাফা লুটে নেওয়া হচ্ছে তাও পুঁজিবাদী স্বার্থেই রক্ষিত ও রক্ষিত হচ্ছে। মুনাফাবৃদ্ধি, কালোবাজারী ও দুর্নীতিরোধের কর্তব্য পালনে সরকার যৌথি আবেদন ও মৃদু প্রয়োগের নীতি সমভাবে প্রয়োগ না করেন তা' হলে জনতার স্বদেশপ্রেম স্বাভাবিকভাবে অবক্ষয় ঘটতে বাধ্য। এ সম্বন্ধে অতি সতর্ক ও দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ না করলে জনতার স্বদেশপ্রেম ক্রমশঃ বিক্ষোভে পরিণত হয়ে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে বিপর্যস্ত করবে।

খাদ্য বৃদ্ধির অভিযান সময়োপযোগী এবং কৃষক ও বহুসংখ্যক শ্রমিকের উপরে এ কাজের দায়িত্ব অর্পণে প্রধান মন্ত্রীর উপদেশ সমর্থনযোগ্য। কিন্তু এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার প্রধান বিপদ ক্ষমতালোভী ও নির্বাচনমুখী কংগ্রেসীরা। এই গোষ্ঠীই খাদ্য উৎপাদন, সংগ্রহ ও বণ্টনের কাজকে সর্বত্র চাষীতে ব্যাহত করে।

কংগ্রেস সরকার যদি বর্তমান সংকটকালে জাতীয় স্বার্থ এবং কঠোর সততা ও নিরপেক্ষ মনোবৃত্তি নিয়ে আভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানে অগ্রসর না হয় তা'হলে ঐক্যবদ্ধ জাতীয় প্রতিরোধ ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। সামরিক বাহিনী যুদ্ধক্ষেত্রের পথে অগ্রসর হচ্ছে কিন্তু যদি যুদ্ধক্ষেত্রে কংগ্রেসী সরকার ও সরকারী আমলাতন্ত্র জাতীয় প্রতিরোধকে ব্যর্থ করে তা'হলে সীমান্তের জয় বিপর্যয়ে পরিণত হবে।

পূর্ববঙ্গ ও ভারতের সামরিক ষ্ট্র্যাটেজী

রাজনৈতিক সংকট কূটনীতি দ্বারা সমাধানে ব্যর্থ হলেই যুদ্ধ দ্বারা তার সমাধান অনিবার্য হয়ে ওঠে। কাশ্মীর আপাত দৃষ্টিতে পাক-ভারত সংঘর্ষের কারণ, কিন্তু পাক-ভারত সমস্যা

সন্ধানের চাবিকাঠি যে কাশ্মীর নয়,—বরং পূর্ববঙ্গে সেকথা দিল্লী নেতৃত্ব আজও অনুধাবন করে নি। খান আবদুল গফ্‌ফর খান অতি দূরদর্শী দৃষ্টিতে বলেছেন যে পাকিস্তানকে এক কাশ্মীর দিয়ে দিলেও পাক-ভারত সংঘর্ষ বাঁচিয়ে রাখার জন্য দিল্লি নেতৃত্ব আরও অনেক কাশ্মীর সৃষ্টি করবে। পাক-ভারত সম্পর্কের রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া বর্তমান সংকটের নিষ্পত্তি সম্ভব নয়। এই সমাধানের সূত্র রয়েছে স্বাধীন পূর্ববঙ্গের প্রবন্ধে। পূর্ববঙ্গ সিন্ধির বন্ধন ছিন্ন করে স্বাধীন হলে পাক কাঠামোতে যে প্রচণ্ড বিনাশন সুরু হবে তার ধ্বংসাবশেষের উপরেই রচিত হবে এই উপমহাদেশের সমস্যা সমাধানের নতুন পথ।

পাক-ভারতের ২২ দিনের প্রচণ্ড সংঘর্ষের সময়ে পূর্ব-পাকিস্তানকে মুক্ত করার চেষ্টা না করে ভারত সরকার রাজনৈতিক ভুল করেছেন। পুনরায় এই সুযোগ লাভের সম্ভাবনা অনিশ্চিত। এই ভুলের জন্য হয়তো ভারতকে ভবিষ্যতে চরম আপসোস করতে এবং অনেক দুর্ভোগ ভুগতে হতে পারে। যদি আবার গতানুগতিক স্থিতাবস্থা ফিরে আসে তা' হলে ভারতকে পূর্ববঙ্গের লক্ষ লক্ষ সংখ্যালঘুদের উদ্বাস্তু-রূপে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

সংকট আবার ঘনীভূত ও বিস্ফোরিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। স্বাধীন পূর্ববঙ্গ আন্দোলনকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা আজ ভারত ও ভারত সরকারের প্রধান কর্তব্য। বর্তমান পাক-ভারত সামরিক সংঘর্ষের সুযোগে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে যদি পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক বাসত্ব ছিন্ন করা সম্ভব না হয় তা' হলে নিকটবর্তী ভবিষ্যতে তা' আর সম্ভব হবে কি না একমাত্র এই উপমহাদেশের ভাগ্য দেবতা জানেন।

পাখতুনীস্তান ও খান আবদুল গফ্‌ফর খান

ভারতি গান্ধীজীর প্রাক্তন সেক্রেটারী প্যারেলালের কাছে ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম নেতা খান আবদুল গফ্‌ফর খান যে বিবৃতি দিয়েছেন তা রাজনৈতিক বিশ্বাস হননের এক মর্মান্তিক দলীল স্বরূপ। তিনি অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস যে দেশ ভাগের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল সেকথা তাঁকে ঘুণাক্ষরেও আগে জানতে দেওয়া হয়নি। তিনি মুক্ত কণ্ঠে বলেন যে পাখতুনরা শেষ পর্যন্ত কংগ্রেসের প্রতি এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত ও ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অনুগত ছিলেন। কিন্তু সেই কংগ্রেসই তাঁকে এবং পাখতুনদের নেকড়ে বাঘের হাতে তুলে দিয়েছে। পরবর্তী জীবনে তাঁর ও পাখতুনদের চরম দুঃখের জন্য দায়ী কংগ্রেস।

কী নৃশংসভাবে পাকিস্তানের প্রতিটি রাজনৈতিক পাখতুনদের হত্যা ও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছে, তিনি তার হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরেছেন। চরসাদ্দাতে খুদা-ই-খিদমদগারের কয়েক হাজার নরনারী যখন নমাজ পড়তে গিয়েছিল তখন তাদের 'হিন্দু কাফের' আখ্যা দিয়ে কীট-পতঙ্গের মত মেসিন-গান করে হত্যা করেছে। পাখতুন নরনারী তাঁকে পরম শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে বাদশাখান অর্থাৎ 'সম্রাট' আখ্যা দিয়েছেন। এই বাদশাখানের যথার্থই বৈষয়িক ও রাজনৈতিক বাদশাহী লাভের পথে কোন বাধা ছিল না। জিন্না, লিয়াকৎ আলী, মোসাদ্দেক, ইস্কান্দার মির্জা এবং আয়ুব খান পর্যন্ত পর পর সবাই তাঁকে জেলে ভরিয়ে রাখার জন্য চেষ্টা করেছেন এবং ব্যর্থ হয়ে তাঁর ও পাখতুনদের প্রতি প্রতিহিংসার বর্বরতম আচরণ করেছেন। পাক সরকারের কাছ থেকে তাঁর অপ্রাপ্য কিছুই ছিল না। কিন্তু তপঃপূতঃ এই মহান বিপ্লবী মান-সম্মান, পদমর্যাদা কোন প্রলোভনেই বিচলিত হয়নি। পাকিস্তানের আঠার বছরের মধ্যে পনের বছর কারাবাস, নির্জনবাস, অন্তরীণে জীবন কাটিয়েছেন তিনি। শেষ পর্যায়ে তিনি মৃত্যুর সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। এই ৭৪ বৎসর বয়সে এরূপ নিরবচ্ছিন্ন ১৫ বছরের নির্যাতন সহ্য করা আর কারো

(শেষাংশ ৫৫০ পৃষ্ঠায়)

জীবনসঙ্গীত : হুগো ফন হফমানস্টাল (১৮৭৪-১৯২৯)
অনুবাদ : শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

উত্তরাধিকারীটিকে যাও, তবে বিনষ্ট করুক
মৃত, বৃদ্ধ মহিলার হাত-থেকে-পাওয়া
অভিনিষেকের তৈল
ঈগল, ময়ূর আর ফেনের প্রতিই
মৃতেরা, অদৃশ্যপ্রায় যারা,
গানের শিখরগুলি ঘুরে—
তাদের সে নর্তকীর
পায়ের তালের তুল্যমূল্য মনে করে।

সে চলে এমনভাবে যাতে কোন শক্তি এসে তাকে
পিছন থেকেই আর আক্রমণ করতে পারে নাকো,
সে হাসে, যখন জীবনের খাঁজগুলি
ফিসফিস করে 'মৃত্যু' বলে
সমস্ত জায়গাই তাকে ডাকে। ছেড়ে দেয়
রহস্যজনকভাবে প্রবেশ-দুয়ার,
গৃহহারা লোক নিজেকেই যেন সমর্পণ করে
প্রত্যেক তরঙ্গে।
ঘুনো মৌমাছিদের ঝাঁক
তার মন বয়ে নিয়ে চলে ;
ডলফিনদের গান
তার পদক্ষেপে যেন পাখনা মেলে ধরে
সমস্ত দুঃখই তাকে
সন্তোষ ভরিতে বয়ে নিয়ে চলে যায়
অন্ধকার-হয়ে-আসা ঐ নদীগুলি
মেষপালকের দিন সীমাবদ্ধ করে।

মৃত, বৃদ্ধ মহিলার হাত থেকে পাওয়া
অভিনিষেকের তৈল
হাসি মুখ তাকে যাও, বিনষ্ট করুক
ঈগল, ময়ূর আর ফেনের প্রতিই।
সে হেসে ওঠে ঐ সঙ্গীতের প্রতি।
তালমানে তারহীন
জীবনের অন্ধকার গুহা ও-উত্থান
তাকে ধরে নিয়ে যায়।

জিনাস্তে
বিনোদ বেরা

ঘাটে খেয়া দেয় নাবি, বালক বালিকা নর নারী
প্রচুর ক্রীড়ার ক্লান্তি দিয়ে যায় নয়ন গগনে
গুরুভুক অস্তমুখে বেলা শেষে ; হঠাৎ হৃদয়ে
দোলা দিয়ে যায় আলো—আবেগে অস্থিরতা খানি
ঘুমের অরণ্যমুখে ইন্দ্রধনু তুলা জেগে রয়।
নদীর তরল ধাত্র, দিনান্তের পক্ষী যুথগুলি
কোথল সবলরব নীড়ের উদ্দেশে গতিশীল
থেকে শুধু চক্রাকার, তটিনীর নাভে ফেলে যায়
ক্লান্তি ; নভো বিহারের দীর্ঘ জ্যোতির্ময় অবসাদ—
কাকলী, উচ্ছল কিছু খেদ, কিছু সাফল্য রচিন।
পক্ষিদের অরিকাও নিভে গেলে ছাই রং আকাশ
বিশাল বিচিত্র ঘুনো গন্ধে কিছুক্ষণ শুব্ধ রয়
তারপর রূপ রচে মোহ ভরা রূপালী আলোর ;
সকল রকম জ্ঞান একটি সৌরভে দুরন্ত
পীতময় গড়ে তোলে প্রাসাদ উদ্যান, আনন্দের
বক্ষ হতে জেগে ওঠে বিশ্ব বিনাশন মনোযোগ॥

টোডোপাড়া জুড়ে হয়েছে মহোৎসব

অদ্রিজিত দাশগুপ্ত

খেলার সময় ডেকেছি তোমাকে কাছে
নীল ফুল ফুটে আছে
অচেনা লতায়—সেখানে দিয়েছি হানা
শুনিনি তোমার ফুলের কপট মানা
বলেছি—খোপার ফুল কেন থাকে গাছে ?

টোডোপাড়া জুড়ে হয়েছে মহোৎসব
বুঝিনি কোথায় শত বোলতার বাসে
আমরা গিয়েছি সরেজমীনের কাজে
আধীনেরা পৌঁতে ডাঙার তাবুর খুঁটি
উপদ্রবের মত কাঁধাপাশে উঠি

বাঁশের কেঁড়ের হাড়িয়া করেছে প্রীত
ভেবেছি সম্পিত
অলক্ষুণের মত রাতে আসো নি তো ?

ছেড়ে চলে আসি আরও উত্তরে, দূরে
হাওয়া উঠেছে কি হঠাৎ জনপুরে
ঘাসে ঘাসে কাঁপে প্রথম ভোরের অরি

ভয়ে ভয়ে যদি
আকাশে অমেছে মেঘ
স্মরনে তোমার কাঁপে নাকি উদ্বেগ

তুমি যদি ডাক, সকল ভয় ভুলি,
বাজাও হাতের ফুলি
মহাপ্রয়াণের দ্বার থেকে হাত তুলি।

দুপুর বেলায়

শিশির কুমার দাস

দুপুর বেলায় আজকে একটি হাওয়া
ঢুকে পড়েছিল হঠাৎ আমার ঘরে
চুলগুলি তার রুক্ষ, ক্লান্ত চাওয়া

ঢুকে পড়েছিল একা সে আমার ঘরে
সে ক্ষ্যাপা, পাগল, বুঝি কতদিন আগে
দেখা হয়েছিল কোনু সমুদ্রচরে

সে ক্ষ্যাপা পাগল, বুঝি কতদিন আগে
সাথী হয়েছিল একদা অন্ধরাতে
আজ তার চোখে সেই পরিচয় জাগে

সাথী হয়েছিল একদা অন্ধরাতে
আজ সে আবার দরোজার অবেলায়
শুষ্ক দুপের বল্লরী তার হাতে

আজ সে আবার দরোজার অবেলায়
অভিমানভর শিশুর চোখের মত
করুণ নীরব, ছেয়েছে সকল বেলায়।

অভিমানভর শিশুর চোখের মত
অনেক নীলিমা অনেক অজ পারের
গীত প্রথম বিরহ-সংকেত

অনেক নীলিমা অনেক অজপারের
নিয়ে ঢুকেছিল সেই পুরাতন হাওয়া
সমস্ত হারানো দুরাশ পাহাড়ের।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

আদর্শের সংঘাত

সুভাষচন্দ্র কলকাতায় কলেজে পড়তে আসার দুবছর আগেই বিপিনচন্দ্র পাল তাঁর দ্বিতীয়বারের বিলাতযাত্রা সমাপন করে ফিরে এসেছেন। স্বদেশী যুগের চরমপন্থী বিপ্লববাদী ততদিনে নরমপন্থী সংস্কারবাদী হয়ে গেছেন। ঘটনাটি আশ্চর্য মনে হতে পারে, কিন্তু দেশের সেসময়কার রাজনৈতিক পরিমণ্ডল বোঝার পক্ষে এ একটা অতিশয় গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। নিজের মত ও পথ স্থির করার কালে সুভাষচন্দ্রকে এই ঘটনার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল এবং অন্তত বিপিন পালের যুক্তিকে মেনেও নিতে হয়েছিল। সেই সময়েই বাংলার রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং স্বদেশ সাধনার ধারা একটা নতুন মোড় নিতে সুরু করেছিল এবং দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন এই নতুন ধারার নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন কয়েক বছর পর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধকালে ভারতের বাইরে চলে যাবার পূর্ব পর্যন্ত সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রবাস রাজনৈতিক কর্মপন্থাকে মোটামুটি এই ধারার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন। বিপিন পালের প্রসঙ্গটি তাই এই কারণেই আলোচনাযোগ্য যে বাংলার বামপন্থী রাজনীতির গতিপথ পরিবর্তনের ইতিহাস তাঁর নিজের চরমপন্থা থেকে নরমপন্থায় প্রত্যাবর্তনের মধ্যে নিহিত আছে।

য়ুরোপে যেসকল ভারতীয় বিপ্লবী ছিলেন শ্যামজী কৃষ্ণবর্মা ছিলেন তাঁদের অন্যতম নেতা। তিনি লণ্ডন থেকে Indian Sociologist নামে একখানি পত্রিকা সম্পাদনা ও প্রকাশ করতেন। দেশভক্তসভা নামে একটি ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে তিনি বিপিনচন্দ্র পালকে ইংলণ্ড যাবার জন্য আমন্ত্রণ জানান এবং চুক্তি হয় এই যে বিপিন পাল ইংলণ্ডে মোট ছয়য়ে পঁয়তাল্লিশটি বক্তৃতা দেবেন এবং তৎপরিবর্তে মাসিক ১০০০ টাকা করে পাবেন। এই টাকার কিছু অংশ অগ্রিম হিসাবে তাঁকে পাঠানো হয় এবং তৎসাহায্যে তিনি ইংলণ্ড যেতে সক্ষম হন। ১৯০৮ সালের ২০শে আগস্ট তারিখে তিনি ভারত হতে যাত্রা করেন। তিনি ইংলণ্ডে পৌঁছন সেপ্টেম্বর মাসে এবং ১৯১১ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুরো তিন বছর তিনি সেদেশেই থাকেন।

বিপিন পাল ইংলণ্ডে পদার্পণ করে তাঁর প্রথম বক্তৃতা দেন লণ্ডনের ইণ্ডিয়া হাউসে, ২৬শে সেপ্টেম্বর তারিখে। এই বক্তৃতার ফলেই কৃষ্ণবর্মার সঙ্গে বিপিনচন্দ্রের বিচ্ছেদ ঘটে যায়। কেননা তিনি সোজাসুজি বলেন বোমা পিস্তলের নীতির তিনি বিরোধী, সন্ত্রাসবাদের সাহায্যে দেশে স্বাধীনতা আসবে না। কৃষ্ণবর্মা তাঁর পত্রিকার অক্টোবর সংখ্যাতেই বিপিন পালের মতামতের তীব্র নিন্দা করেন। কিন্তু সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে বিপিনচন্দ্র বিভিন্ন ইংরেজি কাগজে পত্র লিখতে লাগলেন বিপ্লববাদের নিন্দা করে।

১৯১০ সালে ২২শে ডিসেম্বর ক্যাক্সটন হলে বক্তৃতাকালে বিপিনচন্দ্র বলেন, তিনি দেশে থাকতে চরমপন্থী ছিলেন বটে, কিন্তু বিপ্লববাদী ছিলেন না। বাহুবলের যুক্তির জন্য যেসকল

যুবক চরম আত্মত্যাগ বরণ করছেন তাঁদের দেশপ্রেমের তিনি প্রশংসা করেন, কিন্তু তাঁদের ব্যবহারি নীতি ভ্রান্ত ও অনর্থকরীর স্বলে তিনি ঘোষণা করেন।

যখনে থাকতেই বিপিনচন্দ্র পন্থাসম্বন্ধের প্রশ্নে (তখনকার দিনে তাকে বিপ্লববাদই বলা হত) তাঁর মতবিরোধিতা জানিয়েছিলেন। অরবিন্দ এবং হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ এ বিষয়ে তাঁদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার সাক্ষ্য রেখে গেছেন। ১৯০৮ সালের ২৯শে এপ্রিল অরবিন্দ তাঁর বন্দেমাতরম পত্রিকার সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লেখেন :

"পুরনো কংগ্রেস আজ যে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এতে এটুকুই সূচিত হচ্ছে যে আমাদের আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব শেষ হল। এখন আরম্ভ হবে বিরোধী শক্তিদের সংঘাত যার প্রথম ধাক্কায় বিশৃঙ্খল অরাজকতাই দেখা দেবে। আমাদের নবীন আন্দোলনের প্রথম শক্তিচাঞ্চল্যে এই আশা জেগেছিল যে সুশৃঙ্খল ও শান্তিপূর্ণ পথেই আমরা স্বায়ত্ত-শাসন লাভ করতে পারব, সে আশা চিরতরে অবলুপ্ত হয়েছে। বিপ্লব, তার নগ্ন ও কঠোর রূপ নিয়ে, আজ তার যুদ্ধক্ষেত্র প্রস্তুত করছে, শৃঙ্খলা ও পারিপার্শ্বের যে সকল কেন্দ্র একটা নতুন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল সে সবই আজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে এবং একটা বিশাল পতন ও ধ্বংসের এবং তারপর এক মহতী নতুন সৃষ্টির উপাদান সব তৈরী হচ্ছে। আমরা হয়তো চাইতে পারি যে ঘটনা এরকমভাবে না ঘটে অন্যভাবে ঘটুক, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভগবানের ইচ্ছাই সাধিত হবে।" ১

'বন্দে মাতরম' পত্রিকায় এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যেদিন বের হয় ঠিক তার পরদিনই মজঃফরপুরে সকতা মিশন কেনেডি নিহত হন ক্ষুদিরামের বোমায়। সে খবর কলকাতায় পৌঁছয় ১লা মে এবং মুরারিপুকুর বাগানের নায়করা সবাই গ্রেপ্তার হন, অরবিন্দও বাদ যান নি। 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার সম্পাদনার ভার গ্রহণ করতে বিপিন চন্দ্র পালকে তখন নিমন্ত্রণ করে আনেন হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ ও শ্যামসুন্দর চক্রবর্তী। তিনি প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখেন মজঃফরপুরের ঘটনার নিন্দা করে। ২১শে মের সম্পাদকীয় প্রবন্ধে তিনি লেখেন :

"বোমা ও হত্যার কথা আমরা কখনো প্রচার করিনি। আমাদের সহজাত বোধ ও জ্ঞান রাজনৈতিক সংগ্রামের এই সকল বিদেশীয় পন্থার সম্পূর্ণ বিরোধী।" ২

বস্তুতঃ 'বন্দে মাতরম' পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা হওয়া সত্ত্বেও এই পত্রিকার সঙ্গে বিপিন চন্দ্রকে যে মাত্র সম্পর্ক স্থির করতে হয়েছিল তার কারণ পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্য ব্যক্তিদের বৈপ্লবিক নীতি ও কর্মপন্থায় তিনি বিশ্বাসবান ছিলেন না। বৃটিশের দমননীতিকে তিনি যে ভয় পেতেন তা নয়, বৃটিশের সঙ্গে সশস্ত্র সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া ভারতের জন-

১ The disappearance of the old Congress announces the end of the preparatory stage of the movement, the beginning of a clash of forces whose first shock will produce chaos. The fair hopes of an orderly and peaceful evolution of self-government, which the first energies of the new movement had fostered, are gone for ever. Revolution, bare and grim, is preparing her battle-field, mowing down the centres of order which were evolving a new cosmos and building up the materials of a gigantic downfall and a mighty new creation. We could have wished it otherwise but God's will be done.

২ Bombs and assasinations have had, therefore, absolutely no place in our propaganda. Both our instinct and our wisdom equally rebel against these outlandish methods of political warfare.

সাধারণের পক্ষে তখন সম্ভব ছিল না, এটাই তাঁর আপত্তির কারণ। কয়েকজন মুষ্টিমেয় লোক নিজেদের বীরত্বে ও ত্যাগে দেশের মুক্তি আনবে এ নীতিতে তাঁর বিশ্বাস ছিল না। দেশের জনসাধারণ মুক্তি-আন্দোলনে যাতে অংশ নিতে পারে এবং যাতে তাদের আত্মশক্তির বিকাশ ঘটে সেটাই ছিল তাঁর কাম্য। পরবর্তীকালে "আমার রাষ্ট্রীয় মতবাদ" শীর্ষক একখানি গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: "যথাসাধ্য ইংরাজের সঙ্গে কোনও প্রকারে মারামারি বা লাঠালাঠি করিয়া এই স্বরাজ লাভ করিতে চাহি না। মারামারি করিয়া স্বরাজ পাইতে গেলেই সৈন্যসাহায্যের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইবে। এই মারামারির ফলে যদি ইংরাজ রাজত্বের ধ্বংসই হয় তাহাতে ভারতের শূন্য সিংহাসনে বিদেশী বিদ্রোহী সেনার অধিনায়কই যাইয়া বসিবেন। সেখানে গণদেবতার প্রতিষ্ঠা হইবে না। সে অবস্থায় আমরা একজন সেনাপতির রাজত্বেরই প্রতিষ্ঠা করিব, জনসাধারণের রাজত্ব আসিবে না। সেনা-নায়কত্ব সর্বদাই আজি পর্যন্ত স্বেচ্ছাতন্ত্র হইয়াছে।...বিদ্রোহের দ্বারা দেশের বর্তমান অবস্থায় আমাদের পক্ষে ইংরাজদের উচ্ছেদ সাধন সম্ভব হইলেও এপথে কিছুতেই সত্য গণতন্ত্র ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। সেজন্য আবার একদিন ভবিষ্যদংশীয়দিগকে নিজেদের মধ্যেই কাটাকাটি মারামারি করিতে হইবে। এই কারণে আমি সশস্ত্র বিদ্রোহের বিরোধী।" ১৯০৫ সালে যে স্বদেশী আন্দোলন শুরু হয় হিংসাত্মক সংগ্রামের পথে সে আন্দোলনকে পরিচালনার পরিকল্পনা ছিল না সেদিনের নেতৃবৃন্দের; সে ঘটনাই স্মরণ করে ১৯২১ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণে বিপিন চন্দ্র বলেন:

"বাংলা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে শত শত কণ্ঠ হতে সম্পূর্ণ জাতীয় স্বায়ত্ত শাসনের দাবী উচ্চারিত হয়েছিল; এবং ভাষাহীন ভাষায় বাংলা একথাও ঘোষণা করেছিল যে জাতীয় স্বায়ত্ত শাসন সম্পূর্ণ অহিংস পন্থাতেও লাভ করা সম্ভব। আমাদের আদর্শ ছিল জাতীয় স্বায়ত্ত শাসন, আমাদের পথ ছিল অহিংস অসহযোগ।[৩]

সুভাষচন্দ্র যখন কলকাতার কলেজে ভর্তি হতে এসেছিলেন সেই সময়ে আমাদের চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন সুস্পষ্ট দুটি ধারার মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। গণতান্ত্রিক উপায়ে পরিচালিত ব্যাপক গণ-আন্দোলনের পথ এবং মুষ্টিমেয় বিপ্লবী, ত্যাগী, দুঃসাহসী যুবকের সশস্ত্র অভিযান ও অভ্যুত্থানের পথ। এই দ্বিতীয় পথের নেতৃত্ব এসে পড়ে যতীন মুখার্জির ওপর—সে কাহিনী আমরা পরে বলব। প্রথম পথের নেতৃত্ব দেন গান্ধীজী এবং দেশবন্ধু,—যদিও সুভাষচন্দ্রের কলেজে ভর্তি হবার কয়েক বছর পরের ঘটনা এসব। কিন্তু সেই ১৯১৩ সাল, যখন সুভাষ কলকাতায় এসেছিলেন পড়তে, সে সময়টা যদিও ছিল ঘমঘমে, কোনো আন্দোলনেরই তখন বহিঃপ্রকাশ বড় একটা কিছু ছিল না, কিন্তু দেশের সামনে নতুন পথ বেছে নেবার একটা আহ্বান তখনই এসে গেছে। সুভাষচন্দ্র যুদ্ধে বিশ্বাস করতেন, সশস্ত্র সংগ্রামের দ্বারা স্বাধীনতা লাভ করতে চাইতেন, কিন্তু সন্ত্রাসবাদ বা বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু গোপন হত্যার অনুষ্ঠান করে দেশের স্বাধীনতা আসবে একথা বিশ্বাস করতেন না। বাংলার আত্মত্যাগপরায়ণ যুবকদের ব্যক্তিগত দুঃসাহস ও বীর্যবত্তার অভিযানের প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল, গোপন বৈপ্লবিক সমিতিগুলির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগও ছিল, এবং প্রকাশ্য রাজনীতির আসরে তিনি এঁদের

৩ From a hundred platforms in various parts of Bengal the cry for complete National Autonomy had rung out. And Bengal had proclaimed in unmistakable terms that this National Autonomy could be attained by us by absolutely non-violent means. Our ideal was National Autonomy. Our method was passive resistance."

সমর্থনও পেয়েছিলেন, কিন্তু তিনি নিজে এঁদের কার্যকর্মে বিশেষ জড়িত হননি। গণ-আন্দোলন ও গণ-সংগ্রামের পথই তিনি বেছে নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর সঙ্গে এবং কংগ্রেসের ভিতরে থেকে এই কারণেই দীর্ঘদিন তিনি রাজনীতি করতে পেরেছিলেন। গান্ধীজী ও গান্ধীবাদী কংগ্রেসের সঙ্গে যে বিরোধ তাঁর দেখা দেয় তার কারণ ভিন্ন এবং সেই কারণও বিপিন পালের চিন্তাধারার আলোচনার সাহায্যেই বোঝা সহজ হবে। আমরা সেকথায় পরে আসছি। আপাতত এটুকু আমরা জানি যে বোমাক্ষ সমিতিদের সঙ্গে সুভাষচন্দ্র কলেজ জীবনে যোগাযোগ স্থাপন করেন নি, এবং সামান্য যোগাযোগ যদি হয়েও থাকে তিনি তাদের পথ গ্রহণ করেন নি। আত্মচরিতে তিনি লিখছেন: "কলকাতার রাজনৈতিক আবহাওয়া সে সময়ে বেশ গরম ছিল, তার উপরে সন্ত্রাসবাদীরাও ভিতরে ভিতরে ছাত্রদের মধ্যে খুব প্রচারকার্য চালাচ্ছিল।...কলেজ ও হস্টেলে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের কয়েকজন নেতার সঙ্গে প্রায়ই দেখা হত—এরা যে সন্ত্রাসবাদী সে খবর অবশ্য আমি পরে পেয়েছিলাম। যাই হোক, এদের মতবাদ আমাকে কখনো আকৃষ্ট করেনি।" কলেজ জীবনে এসে কয়েকজন আদর্শবাদী যুবকের সঙ্গে একত্রে যে দলটি সুভাষচন্দ্র গড়ে তুলেছিলেন সেই দলটির রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা বলতে গিয়ে আত্মচরিতে স্পষ্ট ভাষায় তিনি লিখেছেন: "রাজনীতির দিক থেকে আমাদের দল সবরকম সন্ত্রাসবাদী বা ষড়যন্ত্রমূলক কার্যকলাপের বিপক্ষে ছিল। এজন্য ছাত্র মহলে আমরা তেমন জনপ্রিয় ছিলাম না, কারণ তখনকার দিনে বাংলাদেশের ছাত্রদের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের প্রতি অদ্ভুত একটা আকর্ষণ ছিল। এমন কি যেসব ছেলেরা এই ধরণের সন্ত্রাসবাদী দলের ছায়া মাড়াতে ভয় পেত তারাও মনে মনে সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে উঁচু ধারণা পোষণ করত। অনেক সময় নতুন সভ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে সন্ত্রাসবাদী দলের সঙ্গে আমাদের দলের সংঘর্ষ লাগত। একবার বেশ একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। আমাদের দলের কার্যকলাপ দেখে সি. আই. ডির কর্মকর্তাদের সন্দেহ হল ধর্মচর্চার ছদ্মবেশে আমরা হয়তো গোপনে অন্য কিছু করছি। এই সন্দেহে আমাদের দলের একটি সভাকে গ্রেপ্তার করার আয়োজন হল। সি. আই. ডির ধারণা ছিল এই সভাটিই দলের নেতা। এই সময়ে একটি সন্ত্রাসবাদী দলের দুজন সভ্যের চিঠিপত্র পুলিশের হাতে পড়ে—এই চিঠিগুলি থেকে পুলিশ জানতে পারে যে আমাদের দলের সেই সভাটিকে সন্ত্রাসবাদীরা পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলবার প্রস্তাব করছিল কারণ সে নাকি সন্ত্রাসবাদী দলের অনেক সভ্যকে আমাদের দলভুক্ত করে অহিংসা শিক্ষা দিচ্ছিল। এই চিঠি পড়ে আমাদের দলের প্রকৃত পরিচয় পেয়ে পুলিশ সেই সভাটিকে গ্রেপ্তারের হাত থেকে অব্যাহতি দেয়; আমাদেরও পুলিসের কোপদৃষ্টিতে পড়তে হয়নি।" বস্তুত একদিকে বাংলার যুবকদের সন্ত্রাসবাদ এবং ইংরেজদের চরম দমন নীতি দারা দেশে এমন একটা অদ্ভুত গুমোট অবস্থার আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে যে সাধারণ মানুষ তখন শান্তি ও সুস্থতার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। সরকারও বিপ্লবীদের দমাতে না পেরে ক্লান্ত, অবসন্ন, পরাজিত। বিপিন পাল এই সময়কার পরিস্থিতির বর্ণনায় বলেছিলেন:

"সরকারী সন্ত্রাসবাদ এবং তার প্রতিক্রিয়ায় বৈপ্লবিক প্রতি-সন্ত্রাসবাদ যখন পারস্পরিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে চলল তখন দেশের লোকের পক্ষে এক সহনাতীত পরিস্থিতি সৃষ্টি হল। সরকারের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল সে পরিস্থিতি। ১৯০৮ হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত এই তিন বছর লর্ড মর্লি এক সঙ্গে বাম হস্তে বদান্যতা এবং দক্ষিণ হস্তে নিপীড়ন—এই নীতি চালিয়েছিলেন, কিন্তু বৈপ্লবিক প্রচারকার্য বন্ধ করা দূরে থাকুক তাকে দুর্বল পর্যন্ত করা যায় নি এই নীতির দ্বারা। অবশেষে বাধ্য হয়ে সরকারকে পরাজয় মেনে নিতে হল।

লর্ড মর্লির নির্দেশানুসারে যে বঙ্গ বিভাগ ছিল একটি চূড়ান্ত ঘটনার সামিল তারও রদবদল হল।" ৪

বিপিন পালের কথাকে আক্ষরিক অর্থে ধরলে এই দাঁড়ায় যে বঙ্গ-বিভাগবিরোধী আন্দোলনের সাফল্যের মূলে সুরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির বাগ্মীতার চেয়ে বোমারুদের বোমার নীতিই বেশি কার্যকরী হয়েছে। এ সত্য স্বীকার করলে ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা অন্তত্রাবেই নিতে হয়। সে যাই হোক, ক্রমাগত নিপীড়ন ও সন্ত্রাসবাদ তখন মানুষের মনে একটা ক্লান্তি এনে দিয়েছে এবং অপেক্ষাকৃত শান্তির অবস্থা লোকে চাইছে। জনসাধারণের হৃদয়ের এই গভীর আকুতিই হয়তো সন্ত্রাসবাদের পরিবর্তে প্রকাশ্য গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক কর্মপন্থার প্রতি আস্থাবান হতে সুভাষচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছিল। বিপিনচন্দ্র পালের চিন্তাধারার এই অংশের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের মিল ঘটেছিল মনে হয়।

কিন্তু এই মিল আপাতঃ মিল, ভিতরে ভিতরে গভীর অসামঞ্জস্য ছিল। গান্ধীজীর সঙ্গে, আপোষকামী, নিয়ম-পন্থী রাজনৈতিক কর্মপন্থার সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যে বিরোধ পরবর্তীকালে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তা বৈপ্লবিক পন্থার প্রতি সুভাষচন্দ্রের পক্ষপাতেই কারণ। সন্ত্রাসবাদ এবং বৈপ্লবিক পন্থা যে সর্বদা সমার্থক নয় এটাই ছিল সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য এবং তথাকথিত সন্ত্রাসবাদও যে নিছক কয়েকটি গোঁয়ার লোকের হিংসাত্মক অপরাধ অনুষ্ঠান নয়, সম্ভবত এও তাঁর বক্তব্য ছিল। ১৯১৩ সালেই বিপিন পাল বৈপ্লবিক পন্থাকে অপরাধ অনুষ্ঠানের পথ বলে প্রশ্ন দিয়েছিলেন (Problem of Political crimes)। গান্ধীজীর ও বিপিন পালের দৃষ্টিভঙ্গী এ বিষয়ে প্রায় একই রকম ছিল। এবং বিপিন পালের মতে একটা ভুল আদর্শ হতেই কি সাহস কর্মপন্থার উদ্ভব।

"ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য স্থাপন করা যায় না, কোনোমতেই এ দুটির সহাবস্থান সম্ভব নয়—এই প্রত্যয়ই এদেশের সকল প্রকার বিপ্লবকামী দেশাত্মবোধের মানস পটভূমি।" ৫

"এই প্রত্যয়ের ফলেই পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের আদর্শ দেখা দিয়েছে—ভারতের বিপ্লবীগণ এই আদর্শকেই ধ্রুবলক্ষ্য মনে করে।" ৬

গান্ধীজীর মতোই বিপিন পাল উভয় পক্ষকে একটা আপোষের দফা দিয়ে বিরোধ-নিষ্পত্তির পরামর্শ দিয়েছিলেন। ভারতের পূর্ণ রাজনৈতিক স্বাধীনতার পরিবর্তে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকে স্বায়ত্তশাসনলাভই ভারতের আদর্শ ও

---

৪ And bureaucratic terrorism and revolutionary counter-terrorism, acting and reacting upon each other, created a situation that became almost unbearable to the people and uncontrollable by the Govt. Lord Morley's panacea of left-handed concessions and right-handed repressions were tried for three years from 1908 to 1911. But it absolutely failed to stop or even weaken the revolutionary propaganda. At last Govt. was forced to confess defeat Lord Morley's settled fact, the Partition of Bengal, had to be unsettled. (১৯২১ সালে বরিশালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।)

৫ The conviction that the conflict between Indian Nationalism and British Imperialism is unreconciled and absolutely irreconcible, is the intellectual cause of every form of revolutionary patriotism in the contry.

(Nationality and Empire, p 267)

৬ Out of this conviction has grown the ideal of absolute political Independence which is the avowed objective of the Indian revolutionary. (একই গ্রন্থ, পৃঃ ২৬৮)

লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে তিনি ঘোষণা করলেন। আমার "রাষ্ট্রীয় মতবাদ" নামক পুস্তিকার ছুটি অনুচ্ছেদে তিনি এ বিষয়ে তাঁর মত প্রাঞ্জল বাংলায় লিখেছেন :

[ছ] কোনও জাতি বা দেশন নিতান্ত নিঃসঙ্গভাবে থাকিলে তাহার আত্মরক্ষার জন্য যে পরিমাণে শক্তিসঞ্চয় করিতে হয়, দুপাঁচটা প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে মিলিয়া থাকিলে সে পরিমাণ শক্তিসঞ্চয় করিতে হয় না। যে জাতি নিজের স্বাধীনতাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া আর পাঁচটা স্বাধীন ও স্বপ্রতিষ্ঠ রাষ্ট্রের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারিবে, সেই পূর্ণতর স্বাধীনতা ভোগের অধিকারী হইবে। এই জন্য যদি আমার রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার ব্যাঘাত না করিয়া বর্তমানে ইংরেজের এবং ব্রিটিশ উপনিবেশের সকলের সঙ্গে আমাদের যে যোগ আছে সে যোগ রক্ষা করিতে পারি তাহার জন্য আমার জাতীয় স্বাধীনতার খাতিরেই যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে চাহি।

[জ] ইংরাজের সঙ্গে জোর করিয়া সকল সম্বন্ধ ছেদন করিলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সহজে এ আঘাত ভুলিবে না এবং বহুদিন পর্যন্ত ভারতের শত্রু হইয়া থাকিবে। ইহার ফলে স্বাধীন ভারতবর্ষকে সর্বদা সশস্ত্র হইয়া থাকিতে হইবে। সশস্ত্রের স্বাধীনতা কল্পনা মাত্র, সত্য বস্তু নহে। যে নিজেকে নিরাপদ ভাবিতে পারে না, তার স্বাধীনতা মুক্তির পর্যায়ে যায় না, বন্ধনেরই রূপান্তর হইয়া উঠে। এই সকল ভাবিয়া চিন্তিয়া যদি স্বাধীন ভারতের সঙ্গে বৃটিশ সাম্রাজ্যের একটা সন্ধি ও সাযুজ্য হইতে পারে আমি তাহাই সর্বোত্তভাবে কামনা করি।" (পৃঃ ৬)

সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের ভিতরে প্রথম বিদ্রোহের ধ্বজা তোলেন ঠিক এই আপোষকামী আদর্শেরই বিরুদ্ধে। দেশ-বন্ধুর মৃত্যুর পর সুভাষ যখন মান্দালয় জেল থেকে ছাড়া পেয়ে রাজনীতিতে ফিরে এলেন তখন বাংলায় বামপন্থী নেতৃত্বের ভার তাঁরই ওপর পড়ে। সেই ভার পালনের উপলক্ষ্যে তিনি যখন ভারতের রাজনৈতিক আদর্শ থেকে সুরু করে সংগ্রামের পদ্ধতি ও কর্মপন্থা পর্যন্ত সব বিষয় নিজেকে ভাবতে হল এবং পথ-নির্দেশের দায়িত্বও অস্বীকার করতে হল তখন গান্ধীজীর সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বিরোধ অনিবার্য হয়ে ওঠে—এবং ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ বনাম ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত স্বায়ত্ত শাসন লাভ—দুটি আদর্শ যখন উপস্থাপিত হয় সুভাষ তখন প্রথম আদর্শটির প্রবক্তা রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং গান্ধীজী হন দ্বিতীয় আদর্শের প্রস্তাবক।

অরবিন্দ যখন বাংলাদেশ ছেড়ে পণ্ডিচেরিতে চলে গেলেন রাজনীতির পরিবর্তে যোগসাধনার উদ্দেশ্যে, নিবেদিতা যারা গেলেন, বাংলার বোমারু বিপ্লবীরা হয় দ্বীপান্তরে, নয় ফাঁসিতে, নয় জেলে গেছে, এবং মহারাষ্ট্রের তিলকও যখন নেই তখন বিপিন চন্দ্র চরমপন্থা ও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শ পরিত্যাগ করে সরাসরি আপোষকামী, ঔপনিবেশিক স্বায়ত্ত শাসনে বিশ্বাসী, ইংরেজের শুভবুদ্ধিতে আস্থা-শীল মানুষে পরিণত হয়ে গেছেন। বাংলা বা ভারতে বিপ্লবের প্রচারক প্রকাশ্যে আর কেউ রইল না। পূর্ণ স্বাধীনতার দাবী করার লোকও আর কেউ তখন নেই। অরবিন্দ যেখানে তাঁর অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও পূর্ণ স্বাধীনতার আদর্শকে রেখে গিয়েছিলেন, বিপ্লবী যতীন মুখার্জির অভ্যুত্থান প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যাওয়ায় সে আদর্শ সেইখানেই মূল্যলুণ্ঠিত অবস্থায় পড়েছিল। সুভাষ সেই আদর্শকে ঠিক সেখান থেকেই তুলে নেন। বাংলার বিপ্লবীরা যখন অত্যাচারে, উৎপীড়নে ক্লান্ত ও বিধ্বস্ত, যখন বাস্তব পরিস্থিতি তাদের প্রতিকূল, যখন নতুন পথের সন্ধান না পেয়ে তারা দিশেহারা ও বিভ্রান্ত—তখন তাদের পুরাতন সন্ত্রাসবাদী কর্মপন্থাকে নয়, কিন্তু তাদের বৈপ্লবিক প্রেরণা, ত্যাগ, অধ্যবসায় ও সশস্ত্র সংগ্রামে অবিচল বিশ্বাসকে, মাতৃ-ভূমির স্বাধীনতার জন্য তাদের মূল প্রতিজ্ঞাকে—যে প্রতিজ্ঞার প্রথম মন্ত্র উচ্চারণ করেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর আনন্দমঠে—

সুভাষ সেনগুপ্তকেই গুরুরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সুভাষের সমস্ত প্রতিভার স্বাক্ষর এখানেই যে কোনো বাঁধা পথই তিনি নেন নি—পথ তাঁকে সৃষ্টি করে নিতে হয়েছে পদে পদে। অরবিন্দ-বিপিন পালের প্রথম যুগে যা চরমপন্থা নামে অভিহিত হত, যে চরমপন্থা ও নরমপন্থার সংঘর্ষে সুরাট কংগ্রেস ভেঙে গিয়েছিল—সুভাষের জীবনে সেই চরমপন্থার ঐতিহ্য বহনের ভার এসে পড়ে এবং ত্রিপুরী কংগ্রেসের বামপন্থা বনাম দক্ষিণপন্থার সংঘর্ষে কংগ্রেস ভেঙেও যায়। কিন্তু সুভাষ ১৯০৭ সালের রাজনীতির অনুসরণ করেননি। সশস্ত্র সংগ্রামের সাহায্যে মাতৃভূমির স্বাধীনতা লাভে তাঁর ভূমিকা তাঁকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবীর আসনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছে, কিন্তু তাঁর বিপ্লব প্রচেষ্টা ১৯০৮ সালের মুরারিপুকুর বাগানের বন্দীদের মতোও ছিল না, বাঘা যতীন বা সূর্য সেনের মতোও ছিল না। তিনি সশস্ত্র অভ্যুত্থান বাস্তবেই আস্থা রাখেন নি, বিশ্ব-পরিস্থিতির চক্রাবর্তন দৃষ্টি সহকারে পর্যবেক্ষণ ও তার আনুকূল্য লাভেও তৎপর ছিলেন। সুভাষ গণতান্ত্রিক রাজ-নীতি ও গোটা দেশের জনসাধারণের জাগরণের প্রয়োজন বুঝেছিলেন যা সন্ত্রাসবাদীরা বোঝেননি, কিন্তু আদর্শের ক্ষেত্রে যে আপোষ চলে না একথা সমস্ত সত্তা দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন—বৈপ্লবিক কর্মের ভয়াবহতা দেখে গান্ধীজী বা বিপিন পালের মতো আপোষকামী যারা আদর্শকে ম্লান করতে তিনি চান নি।

এসব প্রশ্নই আমরা পরে বিশদভাবে আলোচনার সুযোগ পাব। এখানে শুধু এইটুকুই জিজ্ঞাস্য যে কলেজে প্রথম প্রবেশের সেই কৈশোরকালে সুভাষচন্দ্র এই সকল রাজ-নৈতিক বিতর্কের দ্বারা কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং তখনই তিনি কোনো পক্ষ নিয়েছিলেন কি? সন্ত্রাসবাদ সম্পর্কে তাঁর সে সময়ের মনোভাব আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। তিনি যে বিপিন পালের আপোষকামী চিন্তাধারা দ্বারা আকৃষ্ট হন নি, তার প্রমাণ বিপিন পাল সম্পর্কে আত্ম-চরিতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ বা ঔৎসুক্য তিনি দেখান নি। সুভাষ যখন কলকাতায় এসেছিলেন পড়তে বিপিন পাল তার দু বছর আগেই বিলেত থেকে ফিরেছেন। বিলেতেই বিপিন পাল পুরোপুরি নরমপন্থী বনে যান। ১৯১০ সালেই 'মডার্ন রিভিউ' পত্রিকায় Nationalism and Imperialism নামে তিনি একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন, যাতে বৃটিশ সাম্রাজ্য-বাদকে স্বচ্ছন্দ চিত্তে মেনে নেবার উপদেশ ভারতীয় জাতীয়তা-বাদীদের তিনি দিয়েছিলেন। এই নতুন পরিচয়ে বিপিন পাল যখন উদ্ভাসিত হলেন, সুভাষ হয়তো তাঁর সমসাময়িক ছাত্রদের মতোই তখন বিপিন পালের প্রতি এক অপরিসীম বিরক্তিই অনুভব করে থাকবেন। নতুবা তিনি চিরকেলে নরমপন্থী সুরেন ব্যানার্জীর সভাতেও গেছেন, তাঁর সম্পর্কেও সপ্রশংস আলোচনা করেছেন, কিন্তু বিপিন পাল সম্পর্কে তিনি একেবারে নীরব। সুভাষ প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র-দের নিয়ে প্রায়ই বিতর্ক সভা অনুষ্ঠান করতেন ও আলোচনা-চক্র বসাতেন—দেশের পরিস্থিতি ও স্বাধীনতা-সংগ্রামের সকল দিকের আলোচনা চলত সেইসব সভা ও চক্রে। সেসব আলোচনার রেকর্ড নেই, ছাত্রসভার আলোচনার রেকর্ড থাকার কথাও নয়। কিন্তু পণ্ডিচেরির নিভৃত নিবাস হতে অরবিন্দের কোনো চিঠি কলকাতায় এলে সুভাষ তা সংগ্রহ করতেন, পড়তেন ও আলোচনা করতেন, অরবিন্দের 'আর্য' পত্রিকারও তিনি ছিলেন একজন নিয়মিত পাঠক; আর স্বদেশী যুগের অরবিন্দের শ্রেষ্ঠ সহচর বিপিন পাল সম্পর্কে আত্মচরিতে নীরব থাকলেও সেই কলেজের দিনগুলিতে তিনি যে অনবহিত ছিলেন তা নিশ্চয়ই নয়। বিপিন পালের সাবলীল ও চিন্তাপূর্ণ রচনা পড়তে সুভাষের আগ্রহের অভাব হবার কথা নয়। পত্র-পত্রিকা পড়তে তিনি অভিশয় ভাল বাসতেন এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের পত্রিকা তিনিই প্রথম উদ্যোগ করে প্রকাশ করেন। ছাত্র বয়স হতেই পত্রিকা প্রকাশ ও পরিচালনায় সুভাষ উৎসাহী ও কর্মদক্ষ। বিপিন

পালের মতো সুলেখক, চিন্তাশীল ব্যক্তির রচনা তখন নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হত অথচ সুভাষচন্দ্র পড়তেন না—এটা বোধ হয় সম্ভব নয়। বিপিন পালের মতামত নিয়ে সবিস্তারে এখানে এ কারণেই আমরা আলোচনা করেছি যে এই মতামতগুলি বিপিন পাল সুভাষের কলকাতায় পড়তে আসার কালেই প্রকাশ করে দিয়েছেন এবং মতামত প্রকাশে তিনি কোনোদিন ক্ষান্ত বা কুণ্ঠিতও হন নি। সুভাষও সেসব মতামত পড়েছেন, শুনেছেন, বিচার ও আলোচনা করেছেন এবং গ্রহণ অথবা বর্জনও করেছেন। ফলত যেসব কূট প্রশ্ন ও ভাবাদর্শের সংঘাতের মুখোমুখি তাঁকে উত্তরজীবনে হতে হয়েছিল সেসব প্রশ্ন ও ভাবাদর্শের পারস্পরিক বিরোধিতা বিষয়ে সুভাষ কৈশোরকালেই যথেষ্ট চিন্তার অবকাশ পেয়েছিলেন এবং সেদিক হতে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি সুঠাম হয়ে উঠতে পেরেছিল। এই কারণেই সুভাষ পরবর্তী জীবনে আর টলেন নি। জওহরলালের মতো যোগাচল মনোভাব ও দিংকর্তব্যবিমূঢ়তাও তাঁকে পেয়ে বসেনি। উত্তরকালে ভারতীয় রাজনীতির আসরে গান্ধীজীর আপোষপন্থার প্রতিবাদে আপোষহীন সংগ্রামী আদর্শ প্রচারে সুভাষচন্দ্রের যে অকম্পিত রূপ আমরা দেখেছি ছাত্র বয়সেই তার সূচনা হয়েছিল এবং সংগ্রামের লক্ষ্যবস্তু ও কর্মপন্থা সম্পর্কিত বিষয়ে মতস্থির করতে গিয়ে বিপিন পালের স্বচ্ছ চিন্তাধারার সম্মুখীন হয়ে নিশ্চয়ই তিনি উপকৃত হয়েছিলেন। সেদিনের বাংলাদেশের মানস আবহাওয়া যে বিভিন্ন মতাদর্শের সংঘাতে সমৃদ্ধ ছিল এটা তাঁর মতো স্পর্শকাতর কিশোরের বিকাশের পক্ষে ছিল বিশেষভাবে সহায়ক। (ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.	
বিদ্যাসাগর	২·৫০
মানুষের মত মানুষ	·৬২
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·২৫
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৩·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·০০
রবীন্দ্রনাথ	১·০০
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·২৫
আচার্য জগদীশচন্দ্র	১·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

ভারত-পাক সংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকা

ডঃ বিজেশ দত্ত মজুমদার

গত বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর শক্তিবিন্যাসে তিনটী ধারা ক্রমেই পরিস্ফুট হতে থাকে। পশ্চিমী গণতন্ত্র, কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্র, এবং এশিয়া ও আফ্রিকার সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত দেশসমূহ। স্নো সাহেবের (C. P. Snow) ভাষায় দুই সভ্যতা ও তৃতীয় জগৎ—The two civilizations and the third world. এই তৃতীয় জগতের মুরুব্বীয়ানা নিয়ে তথাকথিত দুই সভ্যতার মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। যুদ্ধোত্তরকালের ঠাণ্ডা লড়াই-এর অন্যতম উৎস হল এই তৃতীয় জগৎ—যার অন্তর্গত আমরাও।

সাম্রাজ্যবাদী বৃটেন ভারতীয় উপমহাদেশ ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়ে খণ্ডিত স্বাধীনতা দিয়ে গেল। বহুদিন আগে যে বিভেদের বীজ উপ্ত হয়েছিল তা মহীরুহে রূপান্তরিত হল। ভারতে প্রগতিশীল জাতীয় বিপ্লববাদ ব্যর্থ হল সেদিন। জাতীয়তাবাদী নেতৃত্ব ও হিন্দু বুর্জোয়া বনেদীয়ানা গোষ্ঠী খণ্ডিত ভারতবর্ষের ভিত্তিতে বোঝাপড়া করে ক্ষমতাসীন হলো। ভারতের পূর্বে ও পশ্চিমে দুই অংশ বৃটিশ সাম্রাজ্যপুষ্ট, জাতীয়তা বিদ্বেষী, সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুস্লিম লীগের হাতে গেল। নবগঠিত পাকিস্তানের মালিকানা পেয়ে সেখানকার নেতারা তাদের পূর্বতন হিন্দু বিদ্বেষী নীতিকে ভারত বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক নীতিতে রূপান্তরিত করলো। সেই সব নেতারা আজ আর নেতৃত্বে নেই। কিন্তু সেই ধনিক-গোষ্ঠী অনেক ফুলে ফেঁপে উঠেছে। ব্রিটিশ ও আমেরিকান বন্ধুত্বলাভও অনেক এগিয়েছে। এবং এই ধনিক গোষ্ঠীর স্বার্থে গণতন্ত্রের এক "যৌগিক" রূপ অর্থাৎ একনায়কতন্ত্র স্থাপিত হয়েছে। আর অন্যদিকে ভারত-পাক উপমহাদেশের সাধারণ মানুষ, কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত—তারা হিন্দু, মুসলমান, খ্রীস্টান যাই হোক এক অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ভোগ করছে।

ভারত-পাক বিরোধে পৃথিবীর দুই প্রবল পক্ষ কাশ্মীর নিয়ে। বৃটিশ পার্লামেন্টে গৃহীত ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গকে কোন একটী (Dominion এ) যোগ দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়। বিভক্ত স্বাধীনতার স্বরূপ নির্ণয়ের ব্যাপারে যেমন বৃটেনের অধিনায়কত্ব (Paramountacy) অর্থাৎ ইংলণ্ডের রাজা এবং পার্লামেন্টই সর্বেসর্বা—এই উপমহাদেশের জনসাধারণ নয়—তেমনি এই রাজ্যগুলোর ব্যাপারেও রাজাদের উপরেই, জনসাধারণের উপরে নয় সেই অধিকার বর্তায়। কিন্তু কাশ্মীরের ব্যাপারে ইংরেজ কূটনীতিকরা এক রহস্যময় ভূমিকা গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন হায়দ্রাবাদের নিজামকে ভারতীয় সৈন্য পাঠিয়ে Instrument of Accession এ সহি দিতে বাধ্য করানতে কোন আপত্তি ও তোলেনই নাই বরং সমর্থন করেছিলেন। অথচ কাশ্মীরের মহারাজা Instrument of Accession সহি করার পর ভারতীয় সৈন্য যখন হানাদারদের কবল থেকে প্রায় কাশ্মীর প্রায় মুক্ত করে আনছিলো তখন মাউন্টব্যাটেন এবং ইংরেজ কূটনীতিকদের পরামর্শে পাকিস্তানের স্বার্থে U. N. O. তে ব্যাপারটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। অথচ তখন পর্যন্ত পাকিস্তানের কোন আইনানুগ দাবীই ছিল না। কিন্তু বিশ্বের মাতব্বররা যুদ্ধবিরতি করিয়ে বিচার করতে বসলেন। যুদ্ধবিরতি রেখায়

অপরপার্শ্বে পাকিস্তান কর্তৃক অধিকৃত অঞ্চল বলে স্বীকৃত হল সেটা হয় যে-আইনীই হোকনা কেন। এই বিরোধের এক পক্ষ ভারতবর্ষ আর এক পক্ষ পাকিস্তান। বিভিন্ন রাষ্ট্র-দূতরা জল ঘোলা করতে লাগলেন। যারা কোন ব্যাপারেই জনমতের তোয়াক্কাই রাখে না তারা সব গণভোট ইত্যাদি কথা বলতে আরম্ভ করলো। পাকিস্তান বলে গেলে গণভোটে আপত্তি নেই তাতে সরকারও এ ধরণের কথা বলে ফেললেন। ভারতবর্ষে এক মহাজাতি গঠনের যে একটা Geo-political দিক আছে এসব তারা বুঝেন নি। ভারতের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি না করাই ভাল। ১৯৮৪ সালের মে মাস অবধি কম করেও তিন হাজার বার যুদ্ধবিরতি সীমারেখা লঙ্ঘন করেছে পাকিস্তান। তার মধ্যে '৮২ সালের প্রথম পাঁচ মাসে প্রায় দেড় হাজার বার।

স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসের ধারা অনুযায়ী ভারতবর্ষ তদানীন্তন বিশ্বে নিজেকে নিরপেক্ষ বলে ঘোষণা করল। কোন রকমের সামরিক জোট গঠনেরও ভারতবর্ষ বিরোধী। আর পাকিস্তান ঠিক তার উল্টো রাস্তা ধরে চলল। SEATO এবং CENTO র উৎসাহী সদস্য পাকিস্তানের NATO তে যোগ দিতেও আপত্তি নেই যদি সম্ভব হয়। পাকিস্তান নিজেকে কম্যুনিষ্ট বিরোধী সামরিক জোটের অন্তর্ভুক্ত করে দেড় বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য ও সাড়ে তিন বিলিয়ন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছে আমেরিকার কাছ থেকে। আমেরিকার রাষ্ট্রনায়কগণ পাকিস্তানের স্বাধীনতা বোঝেন নি। ব্রিটিশ উপনিবেশবাদের কবলমুক্ত হয়ে তাদের নিজেদের গঠনের ইতিহাসও তারা ভুলে গেছে। ১৯৬১ সালে প্রেসিডেন্ট আয়ুব খান আমেরিকান কংগ্রেসে ভাষণ প্রসঙ্গে বলেন: "The only people who will stand by you in Asia are the people of Pakistan…" কিন্তু ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ এবং আমেরিকার ভারতকে সামরিক সাহায্যদানে পাকিস্তানের ভারত বিরোধী স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যায়। ভারতের শক্তি বৃদ্ধিতে পাকিস্তান আতংকিত হওয়ার স্থান করতে থাকে। সমকালীন ইতিহাসে চীনের অন্ধীবাদী কম্যুনিষ্ট একনায়কতন্ত্রের অন্যায় সব চাইতে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। জাতীয় স্বার্থের সংঘাতে এবং অন্যান্য কারণে চীন এবং রাশিয়ার বিরোধে এশিয়ার শক্তি বিন্যাস পাল্টাতে আরম্ভ করে। ভারতের নীতি নির্ধারকগণ কূটনীতি realpolitik বিষয়ে অজ্ঞতার জন্য নিরপেক্ষতাকে অলঙ্কার দিয়ে চীনের শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করেন। অপরদিকে চীনের নেতারা তিব্বত গ্রাস করা অবধি ভারতকে পিঠ চাপড়ানি এবং তারপর বিরাট অঞ্চল দাবী করে আক্রমণ করে বসেন। পাকিস্তান দেখতে পায় চীনই সব চাইতে বড় ভারত-বিরোধী শক্তি। সুতরাং তার সাথে বন্ধুত্ব করতে হবে। আপাততঃ কাশ্মীর পাওয়া যেতে পারে পরে পূর্ব ভারতের অন্যান্য জায়গাও ভাগ-বাটোয়ারা করা যেতে পারে। সুতরাং আয়ুব খান এবং ভুট্টো সাহেব চীনের সাথে সহরহ মহরম শুরু করেন। সাদাখ অঞ্চলে, কাশ্মীরের বিতর্কিতভূমি চীন ও পাকিস্তান ভাগ-বাটোয়ারা করে সীমানা নির্ধারণ ও এক গোপন ভারত বিরোধী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। নিজে ভারত আক্রমণ করলে প্রত্যক্ষভাবে আমেরিকার সাথে এবং পরোক্ষভাবে রাশিয়ার সাথে সংঘর্ষের সম্ভাবনা, সুতরাং চীনের ধুরন্ধর নেতারা পাকিস্তানকে দিয়ে আক্রমণ করাল। এর দ্বিতীয় দিক হল ১৯৬২ সালের জাতীয় অবমাননার পর ভারতবর্ষ নিজেকে সামরিক শক্তিতে বলশালী করে তুলছিল। ভারতের দেশরক্ষা বাহিনী ও জনসাধারণ তাদের আহত দেশপ্রেমকে পুরস্কার করার কাজে শক্তি ও বুদ্ধিকে নিয়োজিত রেখেছে। অস্ত্রশস্ত্র জোগাড় এবং তৈরী করেছে। অপরদিকে পাকিস্তানকে আমেরিকা সমস্ত রকমের আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করেছে কম্যুনিষ্ট বিরোধী ঘাঁটি হিসাবে। এই

দুই-এর মধ্যে সংঘর্ষে উভয়েই দুর্বল হলে চীনেরই সব চাইতে বেশী লাভ।

কিন্তু ভারতবর্ষের জনসাধারণের চাপে আজকের ভারত সরকারকে দেশরক্ষা এবং আন্তর্জাতিক ব্যাপারে বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করতে হয়েছে। এবং বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে যে আন্তর্জাতিক শান্তি আসতে পারে না একথা বুঝেছেন। তার ফলে এই যুদ্ধে পাকিস্তান যতই তরপাক—বিপর্যস্ত হয়েছে। তদুপরি পূর্ব পাকিস্তানের প্রগতিশীল জনসাধারণ আমূলের হিন্দু বিরোধী ও ভারত বিরোধী জীপিয়ে ওঠে নি। তারা আজ পূর্ব পাকিস্তান গঠন করতে চাইছে। ভারতের প্রগতিশীল জনসাধারণ পূর্ব বাংলার এই আন্দোলনকে সমর্থন করে। স্বাধীন, গণতান্ত্রিক পূর্ব বাংলা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এই অঞ্চলে রাজনৈতিক স্থায়ীত্ব আনতে সাহায্য করবে। এশিয়ার অন্যান্য দেশসমূহ ও যারা ভারতের আস্থা রাখতে পারে নি এতদিনে—এইটুক অন্ততঃ বুঝতে পেরেছে যে ভারতবর্ষ এশিয়ার এবং পৃথিবীর অন্যতম শক্তিশালী স্থল শক্তি লাভ পাওয়ার। কিন্তু দেশের সমস্ত জনসাধারণকে ঐক্যবদ্ধ করার মত দেশরক্ষা, খাদ্য ও পররাষ্ট্র নীতি চাই। কেবলমাত্র তখনই ভারত তার নিজস্ব ভূমিকা নিতে পারবে বর্তমান বিশ্বে।

কোন সাময়িক উত্তেজনার বশে, কিংবা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা বা রাষ্ট্রনায়কেরা কোন পটভূমিতে কে কী বলল তার উপর নির্ভর করে পররাষ্ট্রনীতি স্থির করা উচিত নয়। রাশিয়া সর্বদাই কাশ্মীরের ব্যাপারে তার নিজের স্বার্থে এবং বিশ্ব শান্তির স্বার্থে ভারতকে সমর্থন জানাচ্ছিল—যদিও এবারে স্বভাবতঃই একটু নরমপন্থী মনোভাব নিয়েছিল। সংঘর্ষের একপক্ষকাল পরে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং আমেরিকার কোন কোন মাতব্বর মত পাল্টাচ্ছেন। Mr. Michael Stewart বলছেন "India has a case in Kashmir." আমেরিকার বিখ্যাত ভারত বিরোধী Time Magazine বলছেন "India has come to stay a power in Asia in her own right." Mr. Sherman Cooper বলছেন "Kashmir did accede to India and legally became part of it.···Pakistani troops were to withdraw from Kashmir and a plebiscite then held under a commission with authority from the India Govt." চীনের চরমপত্র এবং পাকিস্তানের সাথে সংঘর্ষের মুখে সারা ভারতের আপামর জনসাধারণ যে জাতীয় ঐক্য এবং দৃঢ়তা দেখিয়েছে তাতে সারা বিশ্বের জনসাধারণ ভারতে শুরু করেছে, ভারতবর্ষের শক্তির উৎস কোথায়। Facts speak better than speeches. এই অভূতপূর্ব ঐক্যের দিনে জাতির আশা, আকাংক্ষার ভিত্তিমূল সুদৃঢ় করে তোলাই প্রতিটী দেশপ্রেমিকের কর্তব্য।

পারম্পরিক প্রবন্ধ

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

(১) অবরোহী ন্যায় ডায়লেকটিক এবং বিরোধ তত্ত্ব (Formal Logic & contradiction)

পুরাণো লজিকের তিনটে নীতিকে হেগেল অবাস্তব ও ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দিতে চান। অ-বিরোধ (Identity বা non-contradiction) চিন্তা জগতের মৌলিক নীতি, একথা তিনি স্বীকার করেন না। তার মতে বিরোধই (contradiction) জীবনের, জগতের ও মনন ক্রিয়ার একমাত্র সত্যিকার নীতি এবং গোড়ার কথা। *

কিন্তু এই বিরোধ (contradiction) জিনিষটা কি? একটা বস্তুর অন্য একটা বস্তুর "বিরোধ" বা "বিপরীত" একথা বললে কি বোঝা যায়? বোঝা যায়, যে তাদের পরস্পরের মধ্যে পরিপূর্ণ অসামঞ্জস্য (Incompatibility) বর্তমান রয়েছে। তাদের মধ্যে একজন অপরজনকে খায়েল করে, সংহার করে এবং বিনষ্ট করে। যেমন সত্য ও মিথ্যা। এরা একই সময় একই আসরে উপস্থিত থাকতে পারেনা, এরা পরস্পরের অরাতি। প্রাকৃত-জনোচিত উপমায় বলা চলে যে এদের মধ্যে "আ-কুমড়ো সম্পর্ক" কিংবা সংস্কৃত ধরণে "অহি-নকুল" সম্পর্ক বর্তমান। এদের মধ্যে সহযোগিতা চলে না, কারণ তার জন্য পরস্পরের প্রতি যে উন্মুখতা প্রয়োজন তা' নেই; যা' আছে তা' হলো বিতৃষ্ণ বিমুখতা। আগুনের সঙ্গে তুলার যে সম্পর্ক তাকে সহযোগিতা বলা চলে; কিন্তু আগুনের সঙ্গে জলের যে সম্পর্ক তাকে অ-সহযোগিতা বা বিমুখতা বলতেই হবে। "opposition" বা 'বিরুদ্ধতা' বললেও আমরা এই একই জিনিষকে বুঝি। পক্ষের সঙ্গে বিপক্ষের এই বিরোধিতা চলে, স্বপক্ষের সঙ্গে নয়। এই যে সততই 'যুদ্ধং দেহি' ভাব, এ কেবল বিপক্ষের সঙ্গেই চলে, মিত্রের সঙ্গে নয়। যদি কোন তথ্য "সত্য" হয়, তবে একই স্থানে ও একই কালে সেই তথ্য "মিথ্যা" হতে পারে না। অন্য অর্থে, অন্য অবস্থায় হতে পারে। "এই ঘটনা সত্য" একথা বললে, তখনি একই স্থানে, কালে ও অর্থে "এই ঘটনা মিথ্যা" একথা অকল্পনীয়। কারণ "সত্য" ও "মিথ্যা" পরস্পর সতত যুযুধান প্রতিপক্ষ; এদের একই আসনে গলাগলি করে হাতে হাত ধরে বসবাস করা কিছুতেই চলবে না। বিরুদ্ধ বা বিপরীত ("Contradictory" বা "opposite") বলতে আমরা এই রকমই বুঝে থাকি। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর যখন contradiction বা বিরোধ সম্বন্ধ হয় তখন এই অহি-নকুল নীতি অনুসারেই তাকে বুঝতে হয়। চিন্তা জগতেও এই কথা খাটে। দু'টি চিন্তা যখন পরস্পরের "বিরোধী" (opposite) হয়, তখন একে অন্যকে খণ্ডন করে, সংহার করে; বিকর্ষিত বা বর্জিত করে

---

* "Contradiction is the moving principle of the world and it is ridiculous to say that contradiction is unthinkable." (p 205, Logic of Hegel)

না। একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বের সঙ্গে খাপ খায় না; একটি অপরটিকে বাতিল (cancel) করে, "reciprocally cancelling each other" (Hegel, p. 170, Logic)

কিন্তু "otherness" বলে আরেকটি জিনিষ আছে যার অর্থ ও ব্যঞ্জনা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। একে বলা যায় "ভেদ" বা "ভিন্নতা"। ভারতীয় ন্যায়শাস্ত্রের ভাষায় একে "অন্যোন্যাভাব" বা "ভেদসহিষ্ণু-অভেদ" বলাও চলতে পারে। একটি বস্তু অন্য একটি বস্তু থেকে "ভিন্ন" বা "other" একথার অর্থ কি? এর অর্থ এই যে, এদের পরস্পরের মধ্যে পরম শত্রুতা নেই, সাক্ষাৎ মাত্র একটি অন্যটিকে নস্যাৎ (cancel) করে না। এদের মধ্যে এতটুকু সহযোগিতা রয়েছে যে এরা একই স্থান ও কালে এক সঙ্গে আসর জমাতে পারে। এদের একত্র উপস্থিতিতে কোন বাধা নেই। একেবারে একাত্মভাব না থাকলেও এরা একে অন্যের হাত ধরাধরি করে উঠতে, বসতে, চলতে পারে। যেমন সত্য ও সৌন্দর্য। এরা একই সময়ে একই সভায় দিব্যি বন্ধুভাবে থাকতে পারে। যদি কোন বস্তু "সত্য" হয়, সে অধিকন্তু "সুন্দর"-ও হতে পারে। কিন্তু "সত্য" একই সঙ্গে "মিথ্যার" সঙ্গে কোন বস্তুর সম্বন্ধে প্রয়োগ করা যেতে পারে না। সত্য ও মিথ্যা, এই দুটো বস্তু একান্ত "বিরুদ্ধ" কিন্তু "সত্য" ও "সুন্দর" এ দুটো হচ্ছে "ভিন্ন"।

জগতে পূর্বোক্ত দু রকমের সম্পর্কই (relation) আমরা দেখতে পাই। জগতের বস্তুগুলোর মধ্যে সম্বন্ধ রয়েছে এবং সে সম্বন্ধ কোথাও "বিরুদ্ধতার" সম্পর্ক ও কোথাও বা "ভিন্নতার" সম্বন্ধ। এই পৃথিবীতে নিকটে দূরে হাজার লক্ষ কোটী কোটী ছোট বড়ো, ভালো মন্দ, বস্তুরাশি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে রয়েছে, এরা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর "ভিন্ন" (distinct) কিন্তু "নিঃসম্পর্ক" unrelated) নয়। প্রত্যেকটি বস্তুর স্বতন্ত্র সত্তা রয়েছে এবং প্রত্যেকেরই স্বতন্ত্র ইতিহাস রয়েছে। "কাঁঠাল" থেকে "আমগাছ" স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন (other)। কারণ, তাদের দুয়েরই আলাদা সত্তা ও ইতিহাস আছে. যে সত্তা ও ইতিহাস তাদের পৃথক পৃথক জন্ম-মরণ-বৃদ্ধির গণ্ডী দিয়ে ঘেরা রয়েছে। তেমনি "আমগাছ" আবার "অশ্বত্থগাছ" থেকে ভিন্ন। জগতে বস্তু ও জন্তু এবং শুধু তৃণ সবই পরস্পর থেকে আলাদা হয়ে জন্মেছে, বাড়ছে ও লয় পাচ্ছে; এরা সবাই পাশাপাশি বা ঘুরে ঘুরে দেশ কাল জুড়ে রয়েছে। এরা সবাই একে অন্য থেকে "ভিন্ন" কিন্তু কোথাও কোথাও এই বিভিন্নতার ওপরে আরো একটা সম্বন্ধ বর্তমান রয়েছে দেখা যায়। সেটি প্রখর বিরুদ্ধতা এবং Incompatible বা অ-সমঞ্জস সম্পর্ক। "কল্যাণের" সঙ্গে 'অ-কল্যাণের' যে সম্পর্ক; তাদের একটি যেখানে থাকবে সেখানে অপর থাকবেই না, এরা দুটি "ভিন্ন" তো বটেই এরা বিরুদ্ধও। শুধুমাত্র "ভিন্ন" বললে এদের সম্বন্ধের সবটুকু সত্যকে প্রকাশ করে বলা হয় না। তেমনি "পীত" এবং "অ-পীত", "অস্তি" এবং "নাস্তি", "চল" এবং "অ-চল", "সসীম" এবং "অসীম", "হ্যাঁ" এবং "না", ইত্যাদি সবগুলো স্থলেই কেবল ভিন্নতা নয়, এমন একটা পারস্পরিক অসঙ্গতি ও অমিল রয়েছে যাতে করে একটির সঙ্গে অপরটির সহবাস অসম্ভাব্য ও অচিন্তনীয়।

কাজেই একথা বললে ভুল হবে যে জগতে কেবল "ভিন্নতার সম্বন্ধই" (relation of distinctness) আছে কিংবা কেবলমাত্র "বিরুদ্ধতার" সম্বন্ধই (relation of opposition বা contradiction) দেখা যায়। কোথাও কেবলমাত্র 'ভিন্নতা' রয়েছে; কোথাও বা "বিরুদ্ধতা"-ও বাধা উঁচু করে রয়েছে। জগতে "ভিন্ন" ও "বিরুদ্ধ" দুরকম বস্তুই আছে।

তারপরে আর একটি শব্দ হেগেল ব্যবহার করেছেন—'negation"। হেগেলকে বুঝতে হলে এটা সম্বন্ধেও আমাদের পরিষ্কার ধারণা থাকা দরকার। "Negation"-এর মানে করা যেতে পারে 'বিনশন' বা নস্যাৎকরণ

একটি বস্তু আরেকটিকে negate করে, একথার অর্থ এই যে একটি অপরকে বিনাশ বা নস্যাৎ করছে। Negated হলো মানে, যে ছিল "অস্তি" সে হলো "নাস্তি"। একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে নির্মূল করে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করেছে, এমন হলেই negation ঘটলো। যেখানে একটির অস্তিত্বের পাশাপাশি অপরটিও নিজ নিজ বহাল তবিয়তে জাঁকিয়ে রয়েছে, সেখানে দুই-ই নিজ নিজ সত্তাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। এখানে এরা দুজনই স্বতন্ত্র সত্তা এবং পৃথক পদার্থ হিসেবে আছে। কেউ কাউকে নির্মূল করে নি। একজন যখন অপরজনকে negate করে রেখে থাকে, তখন সেখানে দুইয়ের মধ্যে একের অভাব ঘটে এবং তার শূন্য স্থানে অপর এসে বাসিন্দা হয়। দুটো বস্তুর পরস্পরকে limit করে থাকা এবং negate করে থাকা একই কথা নয়। দুটো বস্তু যদি পাশাপাশি থাকে, তবে একটির সত্তা অপরের সত্তাকে limit বা অবচ্ছেদ করছে, কিন্তু negate বা নস্যাৎ করছে না। জগতের সকল বস্তুই খণ্ড ও সসীম। কাজেই এখানে প্রত্যেকটি বস্তু অন্য সবারই সীমা নির্দেশ বা limit) করছে। একের দ্বারা অপর সীমিত বা অবচ্ছিন্ন হচ্ছে কিন্তু নস্যাৎ হচ্ছে না। দুটি বস্তুর অস্তিত্ব যেখানে পরস্পর বিরোধী, যেখানে এক থাকলে অপরের থাকা সম্ভব নয়, সেই স্থলেই কেবল একে অন্যকে negate বা নস্যাৎ করে বিদ্যমান থাকছে। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে যে স্থলে বিরুদ্ধতা (contradiction) রয়েছে সেই সেই স্থলেই কেবল negation (বিলয়ন বা নস্যাৎকরণ) সম্ভব। যেখানে কেবল ভিন্নতা (otherness) রয়েছে সেখানে নস্যাৎ-করণ (negation) নেই, আছে দুটি স্বাধীন সত্তার মধ্যে পার্থক্য (distinctness) জগতের সব বস্তুর মধ্যেই নস্যাৎ-করণ (negation) নামক বিশিষ্ট সম্বন্ধ (relation) দুটো সত্তার মধ্যে নেই; কোথাও কোথাও এই বিশেষ সম্বন্ধ ঘটছে বা আছে। কিন্তু সর্বত্র নয়।

"Negation, contradiction, opposition" বা নস্যাৎকরণ-বিরুদ্ধতা-বৈপরীত্য ইত্যাদি সম্বন্ধগুলোর মানে আলোচনা করা গেল এবং "otherness বা distinctness" (ভিন্নতা বা পার্থক্য) নামক সম্বন্ধ কি এবং তার সঙ্গে নস্যাৎকরণ (negation) ইত্যাদির প্রভেদ কোথায় তাও বোঝবার চেষ্টা করা হয়েছে। এখন দেখা যাক হেগেলীয় ডায়লেকটিকে এদের কী অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।

হেগেলের লজিক বইটির পাতায় পাতায় এই শব্দ কটির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, কিন্তু এদের সর্বত্র একই অর্থে তিনি ব্যবহার করেন নি। বিরুদ্ধতা-বৈপরীত্য-নস্যাৎকরণ (contradiction-opposition-negation)—এ তিনটি শব্দ দ্বারা তিনি একই মানে বুঝেছেন, কিন্তু এদের কোথাও তিনি "ভিন্নতা" অর্থে ব্যবহার করেছেন, আবার কোথাওবা এদের মানে করেছেন "বিরুদ্ধতা"। Negation-এর মানে কোথাও করেছেন "নস্যাৎকরণ" কোথাও বা শুধুমাত্র "অবচ্ছেদ" (limiting)। যেখানে হবে প্রকৃতপক্ষে ভিন্নতা বা পার্থক্য (otherness বা distinctness), সেখানে হেগেল বলেছেন বৈপরীত্য বা বিরুদ্ধতা (opposition বা contradiction); যেখানে হবে বৈপরীত্য (opposition) সেখানে ব্যবহার করেছেন ভিন্নতা (distinctness)। হেগেলের এই অর্থ বিভ্রাটের দরুণ তার ডায়লেকটিকের প্রয়োগও সর্বত্রই ভুল হয়েছে, যেমন তার Philosophy History-তে সভ্যতার বিকৃত ও অসঙ্গত ব্যাখ্যা তাঁকে করতে হয়েছে। অনেক স্থানেই তাঁকে জবরদস্তি করে সভ্যতার ইতিহাসকে তাঁর বাঁধা ছাঁচের গণ্ডীর মধ্যে আনতে হয়েছে। হেগেলের এই অর্থবিভ্রাটের কথা ইতালীয় দার্শনিক ক্রোচে (Croce) বিশদভাবে আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন যে তাঁর ডায়লেকটিক নীতির গোড়ার গলদ এইখানে।

আসল কথা, হেগেলীয় দর্শন সীমাতীত ও অখণ্ড অদ্বৈত

দর্শন। অসম্পূর্ণ বা খণ্ডিত যা, তা' পূর্ণ সত্তা নয়। খণ্ড-বস্তুগুলো পরস্পরের দ্বারা অবচ্ছিন্ন। কাজেই একটিকে বুঝতে হলে তাকে ডিঙিয়ে অন্যান্য সবগুলোকেই জানতে হবে, কারণ কোন সীমাবদ্ধ, ক্ষুদ্র গণ্ডীতে যে জ্ঞান সে জ্ঞানে মানব-মনের তৃপ্তি নেই। মানুষ যতক্ষণ না সকল 'বিশেষকে" এক ব্যাপক "সামান্যের' অন্তর্ভুক্ত করে দেখতে পাচ্ছে, ততক্ষণ তার বুদ্ধির নিবৃত্তি নেই। সাধারণ বা সামান্যকে (general) খোঁজা এবং বিশেষকে (particular) অতিক্রম করা মানুষের জ্ঞানাদেষণের মূল কথা। বিজ্ঞানেও দেখতে পাই, বহুকে কয়েকটি মূলসূত্রে পরিণত করে না জানতে পারলে "Law" গড়ে তোলা হয় না। Law-এর ধারণার পিছনে আছে Induction (আরোহ) এবং Induction (আরোহ) মানেই বিশেষকে ছড়িয়ে এমন ব্যাপক সামান্যের সন্ধান যা বিশ্বের অসংখ্যের খণ্ডিত ও অবচ্ছিন্ন সত্তাকে গেঁথে রেখেছে 'সূত্রে মণিগণা ইব'। তেমনি দার্শনিক জ্ঞানও বিশ্বরাজ্যের খণ্ডিত ও বিশিষ্ট সত্তাগুলোর পিছনে আছে যে ব্যাপক সামান্য ও নির্বিশেষ তাকে আবিষ্কার করতেই অভিযান করেছে যুগে যুগে। জড়বাদই হোক, আর চৈতন্যবাদই হোক, দ্বৈতবাদই হোক আর অদ্বৈতবাদই হোক, সকলেই এই বিভিন্ন ও বিচিত্র জগৎ-ব্যাপারকে অল্পসংখ্যক মৌলিক তত্ত্বের সাহায্যে বোঝবার ও বোঝাবার সাধনা করেছে। এই জগৎ তত্ত্বের পিছনে যে অখণ্ড ও ব্যাপক রয়েছে তার অনুসন্ধানের চূড়ান্ত ও বিধিবদ্ধ পরিণতিই রূপ পেয়েছে হেগেলীয় অদ্বৈতবাদে।

হেগেলীয় দর্শনের সৃষ্টি হচ্ছে পূর্ণতার দৃষ্টি। পূর্ণতার দিগন্তভূমি থেকে অপূর্ণকে দেখবার এবং অখণ্ডের দিগন্তভূমি থেকে খণ্ডকে জানবার যে দর্শন-ভঙ্গী তাকেই বলা যায় হেগেলীয় রীতি। মানুষের বিশ্লেষণী বুদ্ধি বা খণ্ডবুদ্ধি থেকে জাত হয় নানাত্ব জ্ঞান—যা' বিশ্বজগৎকে দেখে বিচ্ছিন্ন ও নানা সত্তার সমাবেশ রূপে। হেগেলীয় understanding (বিচার) তাকে দেখে আলাদা করে, টুকরো টুকরো করে। কিন্তু মানুষেরই মধ্যে আছে এক সংশ্লেষণী বুদ্ধি (speculative reason), হেগেলীয় ভাষায় যার তাগিদ সততই বিচ্ছিন্ন ও 'বিশেষকে' অতিক্রম করে' সর্বব্যাপক নির্বিশেষের দিকে উন্মুখ হয়ে রয়েছে। মানুষের এই তাগিদকে হেগেল বলেছেন উচ্চতর প্রেরণা ('higher craving')। এই প্রেরণার বশেই মানুষ খণ্ডে ও অ-পূর্ণতায় তৃপ্তি না পেয়ে কেবলি অপরোক্ষজ্ঞানের দিকে তীর্থযাত্রা করে। এই সংশ্লেষী বুদ্ধির কাছে প্রকট হয় এই তত্ত্ব যে জগতের কোন খণ্ড সত্তাই পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন নয়; তারা পরস্পরের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ ও সম্বন্ধের সূক্ষ্ম যোগে যুক্ত। বস্তুতঃ কেউই স্বতন্ত্র ও আত্মসম্পূর্ণ নয়; সবাই অপরের সঙ্গে সম্পর্কিত ও অপরের মুখাপেক্ষী। একে জানতে গেলে অপরকে জানতে হবেই। Hen's eggকে জানতে হলে, Not-Hen's egg কে জানতে হবেই। অর্থাৎ "মুর্গীর ডিম" ছাড়া পৃথিবীর আর সবরকম ডিমকেই জানা দরকার। কেবল তাই নয়; ডিম ব্যতীত অন্যান্য যে সব জিনিস জগতে আছে, সে সবকেই জানলে তবেই 'মুর্গীর ডিমকে' পূর্ণভাবে জানা হল। গাছকে জানতে পাতা, ফুল, ফল, বীজকে জানাও দরকার। কেবল তাই নয়, আলো, বাতাস, জল, মেঘ, সমুদ্র, ইত্যাদি করে বিশ্বের যাবতীয় বস্তু সম্বন্ধেই জ্ঞান দরকার। মূলতঃ বিশ্বের সব বস্তুর সঙ্গে সব বস্তু অচ্ছেদ্য সম্পর্কে জড়িত হয়ে আছে। সুদূর তারা ও নীহারিকামণ্ডলীর সঙ্গে বিশ্বের অণু-পরমাণু, ধূলিকণাটি পর্য্যন্ত সম্পর্কিত। অবশ্য সম্বন্ধেরও নানা রকম পর্যায় আছে। কোথাও সম্বন্ধ অতিমাত্র সূক্ষ্ম, সহসা ধরা দেয় না। কোথাও অতি স্থূল ও সহজেই চোখে পড়ে। কোথাও সোজাসুজি ও কাছাকাছি সম্বন্ধ রয়েছে, আবার কোথাও সম্পর্ক অতি পরোক্ষ (indirect) ও সুদূর। প্রবলই হোক আর নামমাত্রই হোক, স্পষ্টই হোক বা

গুই হোক, বিশ্বের সকল বস্তুই পরস্পরের সঙ্গে সম্বন্ধের ন জড়িয়ে আছে। এই রকম বিশ্বের সকল ঘটনাই পরের সঙ্গে যুক্ত ও সম্বদ্ধ। সাম্প্রতিক (contemporary) বা পারম্পর্যিক (successive), দেশকাল-কবলিত হলো ঘটনা বা বস্তু সম্বন্ধেই একথা খাটে। একই বস্তুর হাস সম্বন্ধেও এই তত্ত্ব প্রযোজ্য। কোন বস্তুর পরিবর্তন থাকলে পরপর যে সব স্তরের বা অবস্থার মধ্য দিয়ে বিবর্তন হতে থাকে সেই সবগুলো স্তরই (stage) একটার অন্যটি গভীরভাবে যুক্ত। একটি অবস্থাকে জানতে হলে ার ও পরের অবস্থাগুলোকে জানতে হবে। জড় জগতে, -জগতে ও মনন-জগতে—সর্বত্রই এই তত্ত্ব অব্যাহত , দেখা যাবে। একের সঙ্গে অপর সম্পর্কিত ও যুক্ত; কে জানলে, বুদ্ধি আপনিই আপনার তাগিদে পড়িয়ে 'অপরের' দিকে; সীমাকে উল্লঙ্ঘন করে বুদ্ধির এই ন স্বাভাবিক ও শাশ্বত। প্রত্যেক বস্তু বা সত্তার ইকে ছড়িয়ে আছে অপরিত 'অপর' (other) এবং এরা সত্তা থেকে ভিন্ন হলেও নিঃসম্পর্ক নয়। এই কথাই ও বলেছেন :

বীর সব সত্তাই একটি থেকে অপরটি ভিন্ন বা ন' কিন্তু এই বিভিন্ন সত্তাগুলির মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ য়েছে। দেশে কালে তারা পরস্পরের সঙ্গে পরস্পর । দেশকালাতীত সমগ্র দৃষ্টিতে দেখলে, তারা সবাই একই কের অন্তর্ভুক্ত হয়ে রয়েছে। হেগেলের দর্শনকে আমরা র্ণতার ও সমগ্র দর্শনের তত্ত্ব বলে বুঝে থাকি এবং এই সর্বগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গীই হেগেলের বিশিষ্ট দান, তাঁর অদ্ভুত ও অযৌক্তিক ডায়লেকটিক ছাঁচ নয়। ১৯শ শতকে হেগেলীয় প্রভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গী সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই ছড়িয়ে পড়ে এবং ইতিহাস, সমাজতত্ত্ব, অর্থনীতি ইত্যাদি সমস্ত বিজ্ঞানেই এই ব্যাপক ও সমগ্র দৃষ্টিতে জীবনকে ও জগৎকে দেখতে আরম্ভ করে। ধর্ম, ইতিহাস, সভ্যতা, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি সববিছুকেই ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখতে প্রকৃতপক্ষে হেগেলই পাশ্চাত্য জগৎকে শিখিয়ে গেছেন। আজও হেগেলীয় প্রভাব চিন্তাজগতে এই দিক দিয়ে প্রবল এবং আগামী কালেও এর প্রতিপত্তি লোপ পাবার কারণ নেই। বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনাকে বৃহৎ পটভূমিকায় দেখবার প্রয়োজন মানুষের চিরকালই আছে ও থাকবে। হেগেলের আগেও এই ব্যাপক দৃষ্টিতে বহুমানব জীবনকে দেখেছেন। কিন্তু হেগেল এই তত্ত্বকে একটা বিধিবদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত ক'রে একটা বিপুল পরিধিতে প্রয়োগ করেছেন। এইখানেই হেগেলের পরমবিশিষ্ট অবদান—দর্শন-ক্ষেত্রে। কিন্তু এই সর্বস্বীকার্য তত্ত্বটিকে হেগেল এমন পরিভাষায় ও এমন পরস্পর বিরোধী ভাব ও চিন্তাসহযোগে বিন্যাস করেছেন যে তাতে তাঁর সমস্ত ভাষ্যকারই বিকল হয়ে গেছে।

(ক্রমশঃ)

"Something becomes another : This other is itself somewhat, therefore it likewise becomes another and so on ad infinitum. (Art 93, p.174. Logic of Hegel).

সমকালীন বাংলা কবিতা

আলোচনা

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

এক

আধুনিক বাংলা কবিতার যুগ নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করা কঠিন। মঙ্গলকাব্যের আত্যন্তিক দৈবনির্ভরতার যুগে চৈতন্য প্রভাবিত বৈষ্ণব কাব্য এবং ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল তথা বিদ্যাসুন্দর যথেষ্ট 'আধুনিক' ছিল। আবার ভারত-চন্দ্রের চাইতে ঈশ্বরগুপ্ত অধিকতর আধুনিক। গুপ্তকবির যুগ পেরিয়ে মধুসূদনের কাব্যে আধুনিকতার বিজয়-দুন্দুভি নিনাদিত। আখ্যান-কাব্যের কাল পেরিয়ে মহাকাব্য এবং ব্যক্তিনিষ্ঠ গীতিকবিতার কাল এল। মধুসূদন এই যুগেরই ধারক। তাঁর মেঘনাদবধ কাব্য নতুন যুগের মহা-কাব্য; আর চতুর্দশপদী কবিতাবলী গীতিনির্ঝরণাও বারি-ধারা। রবীন্দ্রনাথ মধুসূদনের চাইতে আধুনিক। আবার যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল এবং নজরুল আরো আধুনিক। কল্লোলের কবিগোষ্ঠী, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং ইদানীন্তন কবিগণও আধুনিক। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'আধুনিক' শব্দটি যুগের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আরও স্পষ্ট করে বলতে গেলে, যুগ-পরিবর্তনের জ্ঞান-অভিজ্ঞানবহ এই শব্দটি। সেইজন্যে বর্তমান আলোচনায় যে-সব কবির কবিতা আমাদের আস্বাদনের বিষয়, তাঁদের আমরা শুধুই আধুনিক বলছি না। এঁরা যেহেতু বিশ শতকের এই কালসীমাকে স্পর্শ করেছেন, সেইহেতু 'সাম্প্রতিক' এবং আমাদেরই সমকালবাসী। তাই এঁদের কবিতাকে বলছি 'সমকালীন' এবং এই প্রবন্ধের শিরোনামা দিচ্ছি 'সমকালীন বাংলা কবিতা।'

এই কবিরা আমাদের নিজস্ব কালেরই অধিবাসী। একালের সুখ-দুঃখ, বেদনা-ব্যাকুলতা তাই এঁদের কবিতায় প্রধান স্থান গ্রহণ করবে, তাতে আর সন্দেহ কি! দু' একজন হয়তো বয়সে অপেক্ষাকৃত প্রবীণ, কিন্তু অধিকাংশই তরুণ। বয়স ত্রিশের কাছাকাছি, হয়তো বা কিঞ্চিৎ বেশি। এই তারুণ্যেরই স্পর্শে আলোচ্য কবিতাগুলি 'আধুনিক'। মধুসূদনের কবিতা আমাদের নবযুগের মানব-মহিমার কথা শুনিয়েছিল, শুনিয়েছিল ব্যক্তি-সচেতন আনন্দ-বেদনার সংগীত। সে যুগের আবহাওয়া তাঁকে এই সংগীত শোনাতে সহায়তা করেছিল। হিন্দু কলেজ এবং তার অধ্যাপক ডিরোজিও, ইংরেজী শিক্ষা এবং যুগ-সংঘাত। সেই সংঘাতের আলোড়ন থেকে জন্ম নিয়েছিল নতুন মূল্যবোধ, আকার গ্রহণ করেছিল নব-মানবতা। এবং সেকালের পক্ষে এই মূল্য-বোধে ছিল যুগাকাঙ্ক্ষারই প্রতিধ্বনি।

একালে আমরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রান্তর পেরিয়ে এসেছি। অতিক্রম করে এসেছি পঞ্চাশের মন্বন্তর; আর তার স্বভাবজাত কালোবাজার এখনো আমাদের গ্রাস করে আছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী দিনগুলির শেষ পর্বেও আমরা দেখেছি। প্রত্যক্ষ করেছি একদল মুক্তিযোদ্ধার অপ্রতিম আত্মত্যাগ। আবার দেখেছি একদল স্বার্থসন্ধানী 'দেশসেবকে'র অভিমান-দুষ্ট দুর্বলতা। চোখের সামনে আমাদের স্বপ্নের দেশ দু' ভাগে ভাগ হয়ে গেল। বাংলার দেহ হল বিখণ্ডিত। চোখের সামনে তিনটি বৃহৎ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার দংশন হতে দেখলাম। তার ওপর দেশব্যাপী বেকারত্ব, মুমূর্ষু মানুষের দীর্ঘশ্বাস, ব্যক্তিস্বার্থের গগনস্পর্শী মস্তক, দেশময় সংস্কৃতির

দুর্বল দেহ। সব কিছু মিলে আমাদের সমাজদেহে ঘুণ ধরার লক্ষণ সুস্পষ্ট। দেহ-মনে আমাদের এক অকাল বার্ধক্যের ছায়া ঘনিয়ে এসেছে। অথচ বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞান বৃদ্ধকে যুবক, মৃতকে জীবিত করার সাধনায় অগ্রসর। বিজ্ঞানের নিরঞ্জন নির্মোহ দৃষ্টিতে এবং মানব-সভ্যতার অগ্রগতির কর্ম-যজ্ঞে কত দেশ আজ গৌরবের শীর্ষাসনে সমাসীন। বিশ্বের সেই সাধনার সমাচার আমাদের কানে এসে পৌঁছেছে, মনে জাগিয়েছে ব্যাকুলতা। চেতনাকে বিশ্ববোধে এবং বিজ্ঞান-বোধিতে বিকশিত করার আকাঙ্ক্ষা জাগাচ্ছে। কিন্তু ওই পিছুটান, ওই অকাল বার্ধক্য সমস্ত উচ্চাশাকে ধূলিসাৎ করে দিয়ে চেতনায় বিছিয়ে দিচ্ছে অন্ধকারের আবরণ। অথচ এই তো সত্য নয়। চৈত্রশেষ-এর ঝরাই তো শেষ কথা নয়, সত্য হল রাজকুমার কার্ডিনালের আবির্ভাব, বিরাম্বার নিবিড় প্রেম, এরিয়েলের বন্ধন-মুক্তি। আমাদের এই বার্ধক্য, এই ধূলিধূসরতাও তো সর্বজয়ী হতে পারে না। মানবমহিমা যে মৃত্যুঞ্জয়। সে যে এগোতেই থাকে। আমরাও এগোতে চাই। এই আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রাণে মনে, শোণিত-ধারায় প্রবাহিত। এই অগ্রগতির আকাঙ্ক্ষা নামান্তরে আমাদের বাঁচবারই আকাঙ্ক্ষা। এই বাঁচবার মন্ত্র সমকালে, এই আমাদের কালে এবং সম্ভবত চিরকালই নিহিত আছে তারুণ্যের প্রাণ-বন্ধুরায়। তারুণ্যের বিজয়রথ কি বার্ধক্যের বালুচর অতিক্রম করে যাবেনা? তারুণ্যই তো স্বপ্ন দেখে, বিদ্রোহের বহ্নি জ্বালায়, শবের ওপর দাঁড়িয়ে শিবের ধ্যান করে। সেই 'শবসাধনাতে শক্তি যোগাবে এ যুগের কবিতা। এই তো আমাদের প্রত্যাশা। সে যুগের আধুনিকগণ সে-কালের প্রত্যাশাকে পূর্ণ করেছিলেন। একালের আধুনিকগণ কি তা পারবেননা? তাঁদের কণ্ঠে কি আমাদের বাঁচবার মন্ত্র ধ্বনিত হবেনা। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী' নাটকের বাউলের সেই গান তো এ যুগেরই সংগীত। এই সংগীত কি তাঁরা গাইবেননা।

এ আঁধার হবে ক্ষয়, হবে ক্ষয়রে,
ওহে বীর, হে নির্ভয়।
ছাড়ো ঘুম, দেখো চোখ,
অবসাদ দূর হোক,
আশার অরুণালোক
হোক অভ্যুদয় রে।

আমরা নির্ভয় হতে চাই, ঘুম থেকে জেগে চোখ মেলতে চাই। আমরা চাই অবসাদ থেকে মুক্তি। অবসাদজনিত বার্ধক্যে আমরা ক্ষিপ্তু। কিন্তু এঁরা, এই তরুণ কবিদল কি আমাদের প্রাণের তন্ত্রীতে জীবনের ঝঙ্কার তুলে বলবেন না, 'হবে জয়, হবে জয়, হবে জয়রে, ওহে বীর, ওহে নির্ভয়!'

দুই

১। প্রিয়তমা: শান্তি লাহিড়ী:
১৮ পদ্মপুকুর রোড: কলকাতা-২০

২। সমর্পিত শৈশবে: অরুণ ভট্টাচার্য: ঐ

৩। ঈশ্বরের সঙ্গে যুদ্ধরত: অমলরঞ্জন দত্ত: ঐ

৪। স্বয়ম্বর: শোভন সোম: ঐ

৫। বহুলতলা: সুশান্ত বসু: ঐ

৬। কবিতা ১৯৫৬-৬১: দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়: কবিপত্র প্রকাশ ভবন

(ক) There is enough evil in the crying of wind.—W. B. Yeats.

(খ) আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন—জীবনানন্দ দাশ

(গ) জীবনের চেয়ে সুস্থ মানুষের নির্ভুল মরণ।— ঐ

ইয়েট্‌সের এই অমঙ্গলবোধ, জীবনানন্দের এই ক্লান্তি এবং মরণাশ্রয়স্পৃহা আমাদের যুগের প্রতিমান। পূর্ববর্তী

পরিচ্ছেদে আমরা যে বিতৃষ্ণতার কথা বলেছি, যে বার্থকোর ক্লান্তির কথা বলেছি, সেই 'Ennui' বা 'আত্মিক অবসাদ' আমাদের চেতনাকে এ যুগে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। এই সীমাহীন নিরাশ্বাসের কবল থেকে কবিদেরও মুক্তি নেই। উপরের তালিকার বিধৃত কবিতাসংগ্রহের কবিদের চেতনাকেও এই অবসাদ তার কালোছায়ার যবনিকায় আবৃত করেছে। এঁরা আমাদেরই মর্মজ্বালাকে কবিতার পংক্তিতে, স্তবকে স্পন্দিত করেছেন। যুগযন্ত্রণার অবিসংবাদী প্রতিভূ এঁরা। যতদূর জানি, এঁরা প্রায় সবাই তরুণ। তরুণ প্রাণের এই অন্তহীন নির্বেদ আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে। বেদনার্ত অন্তরে বার বার এই বাসনা প্রতিধ্বনি তুলেছে—'রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবেনা দিন?' অরুণালোর স্বর্ণাঞ্চল, বলিষ্ঠ প্রত্যয়ের স্বপ্রতিষ্ঠ দিগন্ত এই কবিদের মধ্যে অন্বেষণ করলাম। কিন্তু আলো কোথায়? অরুণাভাস মুহূর্তে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যায় সীমাহীন তমসার অতলান্ত বারিধিতে। এ যুগ তাঁদের মনে এনে দিল মৃত্যু-প্রতীতি, বিষাদঘন ক্লান্তি। ছায়াধূসর অতীতে, সরল নির্মল শৈশবজীবনে, স্মৃতির আলোছায়ায়, রোমান্টিকতার কুহেলিকাময় স্বপ্নালোকে তাই আশ্রয় অনুসন্ধান। এই কবিদের কবিতায় প্রধানতঃ এই সমস্ত যুগাভিজ্ঞান বাঙ্ময়রূপ লাভ করেছে।

'প্রিয়তমা'র কবি শান্তি লাহিড়ীর বহু কবিতায় এই স্বপ্নপ্রয়াণ এবং অতীতে প্রত্যাবর্তনের আকুল বর্তমান।

(ক) বালির উপরে তাদের ঘর
অবিনশ্বর
সুখ দিয়ে রচনা করি
বালর শয্যা, খুলে দিই বাঁধা সোনার তরী। (৩নং)

(খ) নাও কিছু সম্বল হাতে পালিয়ে এসো
অনেকটা দূর বন্ধু কিংবা সাগরপারে,
যন্ত্রনাময়ী স্বপনাবাসন পাগলাঝোরা
আপনমনে অরণ্যে যাই অরণ্যে যাই। (৫৪নং)

কবি 'নীল আকাশে চন্দনাকে উড়িয়ে' দিতে চাইছেন, খুঁজছেন 'সোনার হরিণ'। কিন্তু খোঁজার শেষে সিদ্ধান্ত হল বিপুল বেদনার—'বরং থাকি অন্ধকারে'। কারণ—

একটুখানি চাঁদ, একটু আকাশ, দোকান থেকে
ফুলদানীতে সতেজ ফুলের মনোহরণ
আকাশকুসুম হঠাৎ যদি বন্ধু আসে
জানলা খুলে তাকিয়ে দেখি ট্রামের লাইন।
মানুষ চিনি মুখ চিনিনা ওরা সবাই
বন্ধু কারো নিকট প্রিয় বন্ধু কারো,
আমার চোখে ট্রামের তারের ওড়িৎ লাগে
চমকে ওঠে বুকের মাঝে অনাত্মীয়। (৫৬ নং)

বৈজ্ঞানিক সভ্যতার প্রতীক ট্রাম, দুর্বার গতিময় জীবনের প্রতীক ট্রাম লাইন। কিন্তু পথিকেরা কেউ পরিচিত নয়, অপরিচিত মানুষের দল। ব্যক্তির সচেতন কবিমনে তাই প্রবল বেদনা, 'মানুষ চিনি মুখ চিনিনা'। ব্যক্তিচেতনা যখন চলমান ঐ মানুষগুলির সঙ্গে সমন্বিত হতে পারবে তখনই তো তাদের মুখও চেনা যাবে। কিন্তু একালের আহত ব্যক্তিমন, স্পর্শাতুর কবিহৃদয় এই সমন্বয়ের পথ খুঁজে পাচ্ছে না কেন? ট্রামের লাইনের চেয়ে অন্ধকারের নিশ্চিত আশ্রয় অধিকতর কাম্য কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারলে এই তামস-তপস্যার সমাপ্তি সম্ভব। যুগের তমসায় সাম্প্রতিক কবিদের মন সমাচ্ছন্ন। বিভিন্ন প্রতীকে মুক্তির ইঙ্গিতও দুর্লভ নয়। কিন্তু যেদিন ওই সমন্বয় সম্ভব হবে, সেদিন সোনার হরিণ আর চন্দনা জীবনস্পন্দনের তালে তালে নিকটতর হতে থাকবে, 'সোনার তরী' পৌঁছে দেবে বন্ধুত্বের দেশে, আত্মীয়ের নগরে।

শান্তি লাহিড়ীর বাক্ ভঙ্গিতে মাঝে মাঝে প্রতি-রোমান্টিক-তার আভাস পাই। বাস্তব জীবনের প্রত্যক্ষ দিনযাত্রাকে

তিনি কবিতায় বিশ্বস্ত রূপ দেন। এই দিনযাত্রার তাগিদে অরণ্যাভিসারী কবিকেও স্বীকার করতেই হয়—

(ক) সময় হলে অফিস যেতে হবে
পিছন থেকে ঘড়ই টেনে রাখো। (২২ নং)

(খ) একপারে শস্যক্ষেত অন্যপারে কয়লার খিদিরে
শকুনি। (৩৫ নং)

সংশয়ান্বিত কবি কোন্ অভিষ্টের সন্ধানী? এই সংশয় প্রতীতির প্রবর্তনা ছাড়া দূর হতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাও আছে। মুক্তবায়ুর স্পর্শকামনা শুদ্ধ প্রত্যক্ষে বিশ্বস্ত, তবু কবি 'অদূরিত কোন আশা'র অপেক্ষায় রয়েছেন—

অদূরিত কোন আশা মাটির নিকটে কাছে ভিতে
আমি কোনোখানে নাই, তবু জানালা খুলে বসে থাকি।
(২৮ নং)

মুক্ত বাতায়নপথে কবির এই প্রতীক্ষাই তাঁর সম্ভাবনা, উত্তরণ সম্বন্ধে আমাদের আশ্বস্ত করেছে।

শান্তি লাহিড়ী যেতে চাইছেন অরণ্য-জীবনের সরলতায়, সহযোগী অরুণ ভট্টাচার্য চাইছেন শৈশবের নিশ্চয়ন স্বপ্নময় দিনগুলিতে ফিরে যেতে। তাঁর মন শৈশবের স্বপ্নে বিভোর, কবিতাগ্রন্থটিও তাই 'সমর্পিত শৈশবে'।

বর্তমান ক্লিন্ন, ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট। আশ্রয় তাই অনুষঙ্গ অতীতে, শৈশবের স্বপ্ননীল কল্পনায়। এরই আবেশে কবি বলেন—

(ক) আমি সুখী রাজপুত্র
বিশ্বজয়ী আমার বয়সী।
না আমি কোথাও যাব না।··· (ছিন্নপত্র)

(খ) বন্ধু তোমরা ঘুরে যাও। পা রাখবার মত
কোনোখানে মাটি নেই। আমিও বরং
গোপন শৈশবে ফিরে পৃথিবীর মুখ
নতুন করতে চেষ্টা করব অমল আশায়।
(কোনখানে মাটি নেই)

স্থানে স্থানে যুগযন্ত্রণার আন্তর্য প্রতিভাস—'একা, ভয়ঙ্কর একা আমরা সবে।···বস্তুত আমরা সবে ছিন্নমূল, একা' (ঐ)। এই অহং-এর সংকীর্ণ বৃত্তে বন্দী একালের অধিবাসী আমরা একাকী, নিঃসঙ্গ। কারোর সঙ্গে সাযুজ্যের পথ খুঁজে পাচ্ছি না বলেই তো 'আমরা সব ছিন্নমূল, একা'। কোন আদর্শের সঞ্জীবনী বিবেকে আমাদের কেউ উদ্বোধিত করছে না, স্বার্থত্যাগের ন্যূনতম দাবিকেও আমরা প্রশ্রয় দিতে চাই না। চরাচরব্যাপী 'মানুষের লোভ দীর্ঘ রাজনীতি দ্বন্দ্ব ও বিষাদ' (পোষ্টার)। কিন্তু এই দ্বন্দ্বজর্জর সমাজের প্রাণ-হীন অবয়ব থেকে মুক্তি বাস্তবিক অতীতে প্রত্যাবর্তনে নয়, প্রতীকের আলো-আঁধারিতেও নয়। আনন্দময় ভবিষ্যতের করোজ্জ্বল প্রভাতে সেই বন্ধনমুক্তি অনিবার্য। এ তত্ত্ব কবি আমাদের শোনাচ্ছেন না কেন? আর এতো তত্ত্বমাত্র নয়, এযে জীবন সত্য। এই জীবন-কাঠির স্পর্শেই তো ঘুমন্ত রাজবালার ঘুম কেটে যায়, রাক্ষসপুরীতে প্রাণের সাড়া জাগে। সেই বাণী, সেই উদ্বোধনীর প্রতীক্ষায় থাকবো। কবি বলছেন, 'আমার ভাবতে ভয় করে একটা অদ্ভুত ছায়া অবিরত আমাকে ঘিরছে' (ভাবতে ভয় করে)। সংশয়-তিমিরে কবির অবস্থান দীর্ঘস্থায়ী হবে না বলেই মনে হয়। কারণ প্রবল আত্মজিজ্ঞাসায় তিনি উন্মথিত। এ জিজ্ঞাসা যুগেরই প্রশ্ন—

···আমার মধ্যে সংগোপনে কাজ করছে,
বলতে পারো, কোন এক বিচিত্র অসুখ।
(ডায়েরী থেকে ২)

আত্মসমীক্ষার বাসনা যেখানে দুর্বার, উত্তরণের সম্ভাবনাও সেখানে অনিবার।

কবি অমেয়রঞ্জন গুপ্ত সমকালীন নৈরাজ্যের অভিত্বে বিশ্বচেতন। কিন্তু সতীর্থদের সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। তিনি মুখোমুখি বসে 'ঈশ্বরের সঙ্গে দু' দণ্ড' কথা বলছেন। সুনিপুণ বক্রোক্তিতে এই ঈশ্বরকে তিনি প্রশ্ন করছেন।

কোন্ মূল্যবোধ আমাদের উন্নতিকে গ্রাস করেছে এ সম্বন্ধে তিনি সজাগ। বর্তমানকালের মুখোশ-পরা সভ্যতা, ছদ্ম শালীনতা, প্রথাগত বিধিনিষেধের সহায়ে স্বার্থসিদ্ধি বিস্ময়কর ব্যঙ্গকুশলতায় উদ্ঘাটিত। সতীর্থ কবিদের সঙ্গে তুলনায় তাঁর বিশিষ্টতা এই ব্যঙ্গ নিপুণতায়। বক্রোক্তির কশাঘাতে বর্তমান যুগের ছিন্নমূল সভ্যতার বহিরাবরণকে তিনি খান খান করেছেন। এই শ্লেষ মর্মদাহন থেকেই উদ্ভূত। এই অন্তর-জ্বালা একটি কবিতায় বর্তমান কবন্ধ সভ্যতার রূপ প্রকাশে কবিকে সহায়তা করেছে। অনুপম শ্লেষের সঙ্গে তিনি বলেছেন –

প্রতিদিন দোকানের ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে
দুটো ঘোলাটে মৃত চোখ ছুঁয়ে হাঁটতে হাঁটতে
মনে হলো : আমি কখন ঝুলে পড়েছি ওখানে—
দোকানের শিকলে মালিকের অদৃষ্ট হয়ে উলঙ্গ শরীরে
বিশ শতাব্দীর সভ্যতা নিয়ে ঝুলে আছি—
(দোকানের ঝুলন্ত মাংসটাকে দেখে দেখে)

কিন্তু বৈতাত্ত্বিক সভ্যতার পেষণে কলাইখানার মৃত্যুকে সহজে স্বীকার করে নেওয়াতে মনুষ্যত্বের জয় নেই। কবি মর্মদাহনে দগ্ধ, যুগযন্ত্রণায় পরাভবচেতনা আসা তাই অস্বাভাবিক নয়। তাই বলেন—

চীৎকারের সাধ্য ছিল না আমার, ভেবেছিলাম,
বয়া ভেবে ওরা আর মারবে না,… (ঐ)

কিন্তু আশাহত কোন প্রত্যয়ের সুনিশ্চিত ঘোষণা আলোচ্য গোষ্ঠীর কবিরা কেউই প্রায় করতে চাইছেন না। হয়তো বা অতিমাত্রায় যুগসচেতন এবং বর্তমানকেন্দ্রিক বলেই এঁদের পক্ষে তা করা সম্ভব হচ্ছে না। মুক্তির তৃষ্ণা আছে, অতৃপ্তি আছে, কিন্তু জীবনের অন্ধকারে যেন আলোর প্রদীপ নিষ্প্রভ হয়ে যায়। তখন মানুষের অস্তিত্ব সম্বন্ধেই মনে সংশয় আসে। কী এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় অমলেন্দুরঞ্জন বলে চলেছেন—

মানুষের কোন চিহ্ন থাকবেনা পৃথিবীতে ;
পৃথিবী আবার ফিরে যাবে তার সমুদ্রের কোলে ;
ঝুলন্ত পাথরের কিংবা মৃত মানুষের ভারে
পৃথিবী কোথায় ডুবে অপসৃত হবে। (পৃথিবীতে)

কিন্তু আত্যন্তিক বিনাশের চেতনায় আবিষ্ট হলে মানবসভ্যতার জয়যাত্রায় আস্থা হারাতে হয়। পৃথিবী আবার সমুদ্রক্রোড়ে ফিরে যাবে কেন। এক অনাগত দিনে এই পৃথিবী যথার্থ মানুষের বাসোপযোগী হবে। কিন্তু কিভাবে? কবিও সেই আশা রাখেন। কিন্তু পথ অজানা।

পৃথিবী কখনো যদি জন্ম দিতে চায় মানুষের ;
পুনরায় আসে যদি ফিরে এই মানুষের মাঝে।
সেদিন আবার আমি যদি আসি, যদি দেখি
সে-পৃথিবী আনন্দে উজ্জ্বল,
তাহলে আমাকে তুমি মানুষের মত জন্ম দিও। (ঐ)

'যদি দেখি'র মত সংশয়ে নয়, নিশ্চিত বিশ্বাসে আনন্দোজ্জ্বল পৃথিবীর প্রতীক্ষা কি আমরা করবোনা?

আগেই বলা হয়েছে, নির্বান্ধব জীবন, প্রেমপরিশূন্য সমাজ, কপটাচারী জীবিকাদাতা, যৌনতাকাঙ্ক্ষী মানুষ মুখিক, ভ্রাতৃবিরোধ প্রভৃতি কতকগুলি কবিতায় বলিষ্ঠ বাণীরূপ লাভ করেছে। অমলেন্দুরঞ্জনের বর্ণনরীতি বাস্তবানুগ, জীবনচিত্রের অনুসৃত পর্যবেক্ষণে তাঁর অনেক কবিতা মূল্যবান। যেমন— ঈশ্বরের সঙ্গে সংলাপ ; আবিষ্কার ; বন্ধু কোনখানে নেই ; চার বন্ধুর ফটো দেখে ; অসুখে লোকটা ইত্যাদি।

মাঝেমাঝে প্রেমের শুচিস্নাত বিস্ময়ে তাঁর দৃষ্টি মগ্নতাবেষ্টন, সেই সময় একটি 'নিবিড় অন্বয়ে'র অস্তিত্বও তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি—

তোমার পূর্ণতা সাঙ্গ নয়,
আনত নয়ন তোলো, আখো আজো ফোটে ফুল ;
চরাচরে নিবিড় অন্বয়। (কোন প্রেমিকের উদ্দেশে)

প্রেম তাঁর কাছে স্বর্গপ্রতিম। তাই

এ স্বর্গের তাপে

বহুধার অনন্ত সন্তান

দীপ্র হয়। খুঁজে পায় আপন সন্তান। (ঐ)

প্রেমের এই দীপ্র অনুভবেই 'চরাচরে নিবিড় অমর' সম্ভব। সেই অনুভবে কবির জীবনচেতনার উত্তরণ আমাদের প্রতীক্ষার সীমায় রইলো। সেই উত্তরণের দিনে আমার তাঁর দ্বারা নিশ্চিত এই কথাই আরো স্পষ্টভাবণে উচ্চারিত হবে বলে ভরসা রাখি—'সে-পৃথিবী আনন্দে উজ্জ্বল'।

শোভন সোমের কাব্যের নাম থেকেই অনেক কিছু ব্যক্তিত হয়েছে। 'স্বয়ম্বর' নাম তো এই বিংশ শতাব্দীর মধ্যপর্বে আমাদের সবাইকেই দেওয়া চলে। দীর্ঘ শতাব্দী, জীর্ণতার তার অধিবাসী। আর এই আবহাওয়ার আমাদের জীবনপাত্রে যে পানীয়, তা গোষ্পদে বারিবিন্দুর সমান। তাই তৃষ্ণার্তও আমাদের শুধু 'কিছুক্ষণ বাঁচবার যন্ত্রণা'। আমরা সবাই 'স্বয়ম্বর'। এই পরিমণ্ডলে বেদনামেদুর কবিচিত্ত একটি পথই বেছে নিতে বাধ্য হয়। শোভন সোম একটি পংক্তির সংহত পরিসরে তাঁর ভাবনাকে ব্যক্ত করেছেন। সম্ভবতঃ এই তরুণ কবি গোষ্ঠির সবারই এই একই শিল্পভাবনা—'সমস্ত শিল্পই বুঝি পলায়ক সত্তার প্রতীক' (অন্বেষা)। পলায়নপর চেতনার আত্মদহনের অভীপ্সা, মৃত্যুকে তাই মনে হয় আশ্রয়ের ক্ষেত্র। শোভন সোম ও নিজেকে সম্ভাষণ করে বলছেন—'আত্মহা রে অভাজন, গোপদে কী ক্ষোভ বাসনা' (ঐ)। তৃষ্ণার্ত চিত্ত তৃপ্তির পথরেখায় পৌঁছাতে পারেনা বলেই কবি 'স্বয়ম্বর'। আহত মনে তাই তিনি বলেন, 'আলোর সমস্ত যাত্রা তিমিরের নিহিত উদ্দেশে' (ঐ)। তাই মৃত্যুর তিমির গর্ভকেই কাম্য বলে মনে হয়। মৃত্যু পায় সাদর নিমন্ত্রণ—'স্বাগত অনন্ত মৃত্যু (অন্তর্গলি করবনা)। স্বকালনিষ্ঠ কবি এলিয়টের মৃত্যুচেতনাতেও এ যুগেরই চিহ্ন দেখি। শুধু [illegible] যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর নানা দেশে শিল্পীমন যে যন্ত্রণায় আর্ত, আমাদের কবিমন সেই আর্তির সঙ্গে সমকণ্ঠ। তাঁরা এলিয়টের দেশ এবং বিশ্বত বিশ্ব উভয়তঃই চেতনাকে প্রসৃত করেছেন। এলিয়ট বলেন—

Those who sit in the stye of contentment, meaning Death

Those who suffer the ecstasy of the animals, meaning Death. (Marina)

এই মৃত্যুবন্দনা কিন্তু আসলে বিনাশবন্দনা নয়। ক্লিন্ন, বিক্ষত শতাব্দীর আহত হৃদয়ের আশ্রয় খোঁজার অপার আকুলতা। এই আকুলতার জন্যেই নিরাশার মধ্যেও আলোর বিন্দু দেখা দেয়। শোভন সোমও মনে করেন, অন্ধকার আপাতঃ সত্য, আলোই যথার্থ সত্য। পূর্বোল্লিখিত কবিতাতেই তিনি আমাদের শুনিয়েছেন, 'অন্ধকারের অন্ধকার শেষে হয় আলোময় হীরা'। এই 'আলোময় হীরা'র সন্ধানেই তো এ যুগের শ্মশানসাধনাও জীবনের দীপালিতে ঝলমল করে উঠবে।

শোভন সোমের ব্যক্তিত্ববোধ প্রবল। তীব্র আত্মচেতনার অনুভবে তাই তিনি বলে ওঠেন—

আমিই কালের নিত্য বহমান বর্তমান, অতীতে ও

ভবিষ্যতে ব্যাপ্ত চিরদিন

এ পৃথিবী আমাতে বিলীন

আমি তার বিলয় বৈজয়ন্তী, তার ভালে আমি

জয়টীকা। (ধ্রুব)

এই তীব্র অহং-বোধের সঙ্গে এ যুগে কল্যাণবোধের সম্মিলন ঘটতে পারছে না। আত্মগত অভীপ্সার বিশ্বগত হিতৈষণায় মিলিত হওয়াতেই তো উত্তরণ। কিন্তু এ উত্তরণ-মন্ত্রের উচ্চারণ অবসন্ন কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হবে কি করে। তাই তো বারবার মনে হয়—

বাঁচার মত বাঁচলাম না, জানলাম না বেঁচে থাকার মানে

মরার মত মরলাম না, ঘরে গেলাম চলন্ত শবদেহ

যেন কবির শিলালিপির অমরতার দাবি
বুকের ভিতর বলে বলেও শেষে কিছুই হলাম না।
(বাঁচার মত বাঁচলাম না)

চারদিকে পরিকীর্ণ পুতিগন্ধ। বর্তমানে নিবয়ঢ়ই কবি তাই উদ্ধৃত কবিতাতে অনুভব করেন, 'অস্তিত্বের যেন শূন্যতা।' এই শূন্যতার অচরিতার্থ প্রান্তরেই আমাদের যাত্রা থেমে থাকতে পারে না। আলোচ্য কবি সংশয়ের দহনে বিদ্ধ হলেও প্রত্যয়ের বেদীতে তাঁর প্রাণপ্রতিমাকে আবার প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন বলে আমাদের মনে হয়েছে। এ আশ্বাস তিনি নিজেই আমাদের দিয়েছেন। একটি কবিতায় বলেছেন, 'বিশ্বাসের পোড়ো ভিতে সংশয়ের নির্বিষ অঙ্কুর' (অন্তর্গলি করবনা)। কিন্তু তিনিই আবার অন্য কবিতায় বলছেন, '...নিশ্চিত এই জানি সমস্ত বৃক্ষের নাম বিশ্বাসের ধৈর্যের অলীক' (কেবল বুকতা)। 'সংশয়ের নির্মম অঙ্কুর' মাথা তোলে বিশ্বাসের 'পোড়ো ভিতে'। কিন্তু বিশ্বাস যেখানে দৃঢ়ভিত্তিক, সেখানে কবি অকম্পিত কণ্ঠে বলতে পারেন, 'মৃত্যুকে করিনা ভয়। মুহূর্তের মৃত্যুর সম্মুখে দাঁড়াইনা; নই কাপুরুষ'। শোভন সোম নিজেই তাঁর 'কবিতার উদ্দেশে' এই 'অস্তিত্ব ইচ্ছা' জ্ঞাপন করে আমাদের আশ্বস্ত করেছেন।

সতীর্থদের মত বিষাদক্লিষ্ট কবি হুশান্ত বসুর আশ্রয় স্মরণের আনন্দসম্ভব দুঃখে। 'বকুলতলা' তাই 'অনেক সুবাস, স্মৃতির 'অমল বেদনাতে' পরিপূর্ণ। সহযাত্রী অরুণ ভট্টাচার্য যেমন আশ্রয় খুঁজেছেন শৈশবে, শোভন সোম যেমন মৃত্যুকে স্বাগত জানান, হুশান্ত বসু তেমনি স্মৃতির বকুলতলায় তাঁর নিরপ্রতিমার পীঠস্থান স্থাপন করেন। বর্তমানের প্রাণ-শূন্য ধারাবাহিকতায় 'স্বরবিদ্ধের' কবির মত তাঁর চেতনাও শরবিদ্ধ—'অস্তিত্বে বন্দী আছি অন্ধকার ঘরে'(নির্বাসন ২৫নং)। তাই বারবার—

স্বপ্ন থেকে, স্মৃতি থেকে শৈশবের থেকে
নির্বাসনের দুঃখ বাকে বুকে...(নির্বাসন)

'প্রতীক' কবিতায় জীবন রঙ্গমঞ্চকে বিদ্রূপ মানুষের প্রতিরূপ, এখানে 'শিল্প মন্থিনী প্রতিভা যন্ত্রণায় মুখ ঢাকছে, শুদ্ধতা বিকৃত উচ্চারণ।' প্রতিধ্বনিত হচ্ছে 'আত্মহননের গান'। জীবনযাত্রা রঙ্গমঞ্চেরই উপমান। কিন্তু রঙ্গমঞ্চ আজ আলো-হীন। আর এই অন্ধকারে যেন নাটকের অভিনেতা আমাদের কী অবস্থা। 'আত্মহননের গান' গাইতে গাইতে 'মৃতকল্প তবু আমরা বেঁচে আছি'। জীবন যেখানে মৃতকল্প মানুষের অভিনয় মঞ্চের নায়ক, সেখানে আশ্বাস কোথায়? তাই 'প্রেম, স্বপ্ন, স্মৃতি', 'ওই তিনটি মরাল যারা ভিন্ন নীড়ে বেঁচে আছে বন্ধুদের ঘরে' (তিনটি মরাল), তাদের 'ফেলে আসা' খেলার 'সরোবরে' কবি স্নান করতে চান নিজেকে। স্মৃতিবেদনায় বিধুর হয়ে ভাবেন, 'নন্দনের পথ ছেয়া বিমুগ্ধ শৈশবে কবে ছিল পৃথিবীতে' (ঐ)। এই নন্দনের পথছেয়াই তাঁকে পৌঁছে দিল সেই বকুলতলায়, যেখানে 'স্মৃতির মুহূর্ত-গুলি সন্ধীপক বাণী হয়ে ঝরে' (স্মৃতির মুহূর্তগুলি)। এই কাব্যবিশ্বাসে সহযোগী অরুণ ভট্টাচার্যের মত তাঁর মনও 'সমর্পিত শৈশবে'।

এই স্মৃতিবেদনার মুহূর্তে কখনো কখনো প্রেমানুভূতির দুর্লভ লগ্ন উপস্থিত হয়। তখন বেদনাকে মনে হয় 'অমৃত বন্যা' (ষোড়শপদী), মনে হয় প্রেমের 'দুয়াতে মুক্তি ব্যাপ্ত,' তাকে মনে হয় যেন 'মগ্ন আকাশিনী' (ঐ)। আর এই অনুভবের মুহূর্তে প্রেম তাঁকে 'বীতশোক আশার বাণী শোনাল চিরন্তন' (তোমার প্রেম এলো)। বিমুগ্ধ চিত্তে কবি বলে ওঠেন, 'তোমার প্রেমে চেতনা আমার শুচিস্মরণ' এবং 'তোমার প্রেমে চেতনা আমার আষাঢ়ে প্রবীণ' (ঐ)।

কিন্তু এই চেতনাতো ধ্রুপদীমনী হতে পারে না। পরক্ষণেই বর্তমানের বিষবাষ্প দিকে দিকে পরিব্যাপ্ত হয়। তখন মনে হয়—

তীব্র বিষাদ যেন বা নিষাদ, দুঃখ
অপ্রতিরোধ্য সত্যের মতন চেতনায় সর্বত্র
রেখে যায় তার কী যে লঙ্কারী স্বাক্ষর। (অক্লান্তিকা)

এই বিষাদ আর নিষাদেরই মত আমাদের দিকে অনবরত শরসন্ধান করে চলেছে। কিন্তু কবি শুধু জীবনকে ভালোবাসেন, বিষাদগ্রস্ত হয়েও তিনি বিষাদবিজিত হননি। তাই তাঁর এ অনুভূতি প্রত্যয়দৃপ্তিত জীবনপ্রেমে উত্তরোত্তর বর্ধিত হবে বলেই আমাদের ধারণা—

তুমি তো জানো না জীবনের বনভূমি
কী অপার এক আলোক-নদে জ্বলে। (ঘরে ফিরে)

সহোদর কবিদের মত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মধ্যেও বিষাদনদীর ধারা বহমান। কিন্তু তাঁদের মত বেদনার বাঙ্ময়রূপদানে তিনি অত উচ্ছকিত নন। ভাষারও একটি কমনীয় মাধুর্য। একান্তভাবে রোমান্টিক তাঁর প্রসঙ্গ এবং প্রকরণ দুইই। গীতিমূর্ছনার আবেগস্পন্দনে কখনো মন তাঁর উচ্ছ্বসিত, কখনো বেদনায় বিনম্র। তবে দু'একস্থলে যুগচেতনা স্পষ্ট, সেখানে প্রকাশভঙ্গিতেও আলোচিত কবি-পক্ষকের সঙ্গে তাঁর সাদৃশ্য লক্ষণীয়। এই জায়গায় তিনিও বর্তমানের বুকে তাঁদের মতই 'খরবিদ্ধ'।

...ওরে কে জানালি—
দিগন্তরে যে সবুজ : সেও নদী নয়, মরীচিকা।
কোনদিকে দাঁড়াবো, এখনই যে
রুপোলি মশাল জেলে লক্ষ লক্ষ আলেয়া নাচাবে
অন্ধকার রাত্রি। আমি পালাচ্ছি, দু-হাত রক্তে ভিজে ;
আমার সামনের সব বার্থ সেই মৃতের বিলাপে। (যাযাবরী)

মুহূর্তে এমনকি অতীতকেও মনে হয় 'স্বপ্নের শরীরে [illegible] (ঐ)। এই ত্রাসগ্রস্ততা থেকে পলায়নের প্রবণতা জাগাই স্বাভাবিক। তাই কবির স্বীকারোক্তি, 'আমি পালাচ্ছি'। তবে পলায়নে যে মুক্তি নেই। 'যাযাবরী'র প্রাণময় সাড়াদানের জন্যে তাই আকুলতা। এই আকুলতা কি তাঁর পলায়নক মনকে পূর্ণসাধনার দিকে ফিরিয়ে দেবেনা? আমি দুঃখ আছে, বঞ্চনা আছে। কিন্তু স্বপ্নও তো আছে, প্রেমও তো আছে। এই প্রেমের অনাবিল স্পর্শে দুঃখকেও তো মহান বিত্ত বলে মনে হয়। দুঃখ হয় 'দুঃখরুচি,' বেদনা হয় 'শুচি মন্দাকিনী'।

...অমৃতবাহিনী
অন্ধকার কান্তি তার, কেননা নিজেকে ভালোবেসে
সে জানে দুঃখহীন প্রেমই তার শুচি মন্দাকিনী।
(দুঃখরুচি)

দেবীপ্রসাদের আলোচ্য কবিতাসংগ্রহে ১৯৫৬ থেকে ১৯৬১ অবধি রচিত কবিতা স্থানলাভ করেছে। ১৯৫৬ তে কবি 'নীলকণ্ঠ পাখি'র স্বপ্ন দেখেছেন। অনির্দেশ্য এক রোমান্টিক ব্যাকুলতায় আবিষ্ট হয়ে বলেছেন—

যতদূর দৃষ্টি যায় অনাবাদ কুহকে গেছে ছেয়ে—
তার মাঝে সে শুধু একাকী
ক্লান্ত ঘুমে আছে, আর স্বপ্ন যেন স্বপ্ন তার দেহে
তার চারিপাশে শুধু শত শত নীলকণ্ঠ পাখি।
(নীলকণ্ঠ পাখী)

দেখেছেন 'মধুবালা'র স্বপ্ন—

সুন্দরী সন্ধ্যার ছায়া গোধূলির স্বর্ণাভ গগনে :
সোনার পালঙ্কে মধুবালা। (মধুবালা)

১৯৬১ তেও দেখি তাঁর দুচোখে ক্লান্তি, 'সব রাস্তা কাঁটায় কাঁটায় ঢেকে গেছে' আর 'সব রাস্তা জঙ্গলে জঙ্গলে ছেয়ে গেছে' (যদিও দু চোখে আজ), আর এরই মধ্যে রূপকথার সেই 'অনাঘ্রাতপুষ্প' আর নিরবয়ব ভাবনাগুলি ফিরে আসে—

ছেনো ওগো তবু ছেনে রেখো
ছেনো আমাদের পাশে স্থির শৈশবের মতো
একটি অতল নদী ছিল। (যদিও দু'চোখে আজ)

এই কমনীয় স্বপ্নলীনতাই দেবীপ্রসাদের কবিমানসের অভিজ্ঞান। শব্দচয়নেও তাই ঘনোরম পেলবতা, একটি স্বপ্নময়ের স্পর্শ কাতরতা। অনাঘা কুসুম, স্বর্ণাভ গগন, রুপোলি ঘবাল, অতল নদী, জ্যোৎস্নার অলিন্দ, স্বর্ণিল পথ, ইন্দ্রমায়া, কীর্ণকুসুমের কোমলিমা ইত্যাদি শব্দগুচ্ছ নির্বাচনে এই অভিজ্ঞান স্পষ্ট। তবে জীবনের অতলতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন। জীবনের গভীরে অতলতা, ওপরে তরঙ্গান্দোলন, দুয়ের মাঝামাঝি নিত্যপ্রবাহিত স্রোত। এই অগ্রগতির কথা কি আধুনিক কবি শোনাবেন না? জীবনের গভীরতা সত্য, সত্য তার দ্বন্দ্বমুখরতাও। তাত্ত্বিক সত্য তার গতিশীলতা, তা কিন্তু 'স্থির শৈশবের মতো' নয়। সেই চলিষ্ণু জীবনের অনুগান শোনার অপেক্ষায় রইলাম।

ছন্দে তাঁর অনায়াস অধিকার, বিভিন্ন অনুষঙ্গ সংস্থাপনে অনিন্দ্য কুশলতা। আর এক 'অভিমানী বিষণ্ণ শরমা'র (মেঘে মেঘে নম্র হল) স্পর্শে তাঁর চেতনা অতি নম্র। এই চারুত্বের জগতে 'সহসা অকালবন্যা কালবৈশাখীর মূর্তি ধরে চিহ্নিত ঈশান ভরে সাজে' (সহসা অকালবন্যা)। কিন্তু এই কালবৈশাখীর আগমনের জন্যে পূর্বপ্রস্তুতিতেই তো বিবর্তনের লক্ষণ। একে 'সহসা' আসতে দেখে অভিভূত হওয়ার চাইতে এর আগমনের সম্ভাব্যতার কথা শোনানোই তো অধিকতর অনুভূত।

তিন

মানুষের নামে (সংকলন) : সম্পাদক বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সংহতি পরিষদ

"হিন্দু না ওরা মুসলিম?" ওই জিজ্ঞাসে কোন জন?
কাণ্ডারী! বলো ডুবিছে মানুষ, সন্তান মোর মায়।
—নজরুল

আমরা হিন্দু মুসলমানের তিনটি বৃহৎ দাঙ্গা প্রত্যক্ষ করেছি। ১৯৪৬, ১৯৫০ এবং ১৯৬৪তে। এই নির্মম নরমেধের পেছনে কোন ধর্মীয় হিংস্রতার স্থান নেই। ক্রুসেড বা ধর্মযুদ্ধও এগুলি নয়। ধর্মবিশ্বাসের মুখোশ পরে অন্তরের স্বার্থসিদ্ধির কুটচক্র এসব দাঙ্গার মধ্যে আত্মগোপন করে আছে।

মুসলমানবিজয়ের পর বিজিত হিন্দুজাতির সঙ্গে বিজয়ী মুসলমানের আত্মিক বন্ধন গড়ে উঠতে পারেনি রাজনৈতিক কারণে। এখানেও ধর্মগত বিভেদের প্রশ্ন গৌণ। ইংরেজ বিজয়ের পর হিন্দুজাতি প্রথম বিদেশী শিক্ষাকে সাদরে বরণ করে নবযুগের শিক্ষার আলোকস্নাত হয়ে ওঠে। বিজিত মুসলমানগণ আহত রাজগর্বে গ্রহণ করলেন শত্রুবৃত্তি; রক্ষণশীলতার সংকীর্ণ বাতাবরণে নিজেদের সংকুচিত করে রাখলেন। নবচেতনালোকিত হিন্দুসমাজ অন্যদিকে এদেশে বৃটিশপ্রভুত্বের স্থায়িত্বের পক্ষে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ালো। তখন ইংরেজ হঠাৎ হয়ে উঠলো মুসলমান প্রেমিক। মুসলমান সম্প্রদায় হয়ে উঠলো তাদের অনুগ্রহ-ভাজন। সুকৌশলে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে তারা বপন করে দিল বিদ্বেষের বীজ। এখানেও কারণ অর্থনৈতিক আর রাজনৈতিক। বিখণ্ডিত ভারতের দুই অঙ্গ এই চক্রান্তেরই পরিণতি।

দেশবিভাগের পর পাকিস্তানের অশিক্ষিত জনসাধারণকে তাদের পুঞ্জীভূত অসন্তোষের প্রতিক্রিয়া থেকে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা অনেক সময়ই প্রয়োজন হয়ে পড়ে। দারিদ্র্য আর নিপীড়নের বিরুদ্ধে যখনই তারা প্রতিবাদ করতে চায়, তখনই শাসকবর্গ তাদের সাম্প্রদায়িক স্বার্থাতুরতার আঘাত দেন। কাশ্মীর সমস্যা বা ভারতে মুসলমানগণের উপর নিপীড়নের এক কাল্পনিক কাহিনী তাদের কাছে ধরে দেন।

প্রাণ দিতে হয় অগণিত নিরীহ হিন্দু প্রজার, বিতাড়িত হয় লক্ষ লক্ষ হিন্দু। বিতাড়িত হিন্দু এসে আশ্রয় নেয় ভারতে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার ওপর প্রবল চাপ পড়ে। একদিকে বিক্ষুব্ধ বিতাড়িত হিন্দু উদ্বাস্তু, অন্যদিকে দুর্বল অর্থনীতির পেষণক্লান্ত ভারতবাসী। ভারতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার কারণও এইখানেই নিহিত। এর পেছনে কোন ধর্মীয় আবেগ আছে বলে মনে করা সম্পূর্ণ সত্য নয়। অথচ প্রাণ দিতে হচ্ছে নির্দোষ সাধারণ মানুষগুলির। রাজনীতির খেলা আর সমাজ ভিত্তির ক্ষীয়মানতার শিকার হবে কেন অগণিত জনসাধারণ? দাঙ্গার পেছনে এই রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক কারণ অনুসন্ধান এবং তার প্রতিকার চিন্তার সময় এসেছে। বলিষ্ঠ প্রতিবাদের সময় সমাগত। যুক্তি আর শুভবুদ্ধির অগ্রযাত্রা কতদিন ব্যাহত হবে মূঢ়তার কুহেলিকাচ্ছন্নতায়।

এই শুভবুদ্ধির মাঙ্গলিক গেয়েছেন কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সংকলিত 'মানুষের নামে' কাব্যগ্রন্থে। ঝড়ালী বুদ্ধিজীবী এবং শিল্পীর উদারতা আর মানববোধের দ্বার উন্মুক্ত করার এই প্রয়াস অভিনন্দনযোগ্য। ১৯৬৪-এর রক্ত কলঙ্কিত দাঙ্গার দিনগুলিতে এই বিবেক-বোধের উদ্বোধন-প্রয়াসের জন্যে সংকলয়িতা কবিকে সাধুবাদ জানাই দ্বিধাহীন কণ্ঠে।

রবীন্দ্রনাথ, নজরুলের দু'টি কবিতা সংকলনে স্থানলাভ করেছে। কবিতা দুটি বিস্তৃততর পটভূমিতে লেখা হলেও আলোচ্য সংকলনের উদ্দেশ্যকে মহত্তর করে তুলেছে। কবিতা দুটির নাম যথাক্রমে 'ধর্মমোহ' এবং 'কাণ্ডারী হুঁশিয়ার।' ১৯৪৬-৪৭ এর দাঙ্গার পটভূমিতে লিখিত জীবনানন্দ দাশ, প্রেমেন্দ্র মিত্র এবং মণীন্দ্র রায়ের তিনটি কবিতা সংকলিত হয়েছে—১৯৬৬-৬৭, প্রহসন এবং কপাল। বাকী কবিতাগুলি সাম্প্রতিক দাঙ্গা উপলক্ষে এ যুগের কবিকণ্ঠের বলিষ্ঠ প্রতিবাদকে ধ্বনিত করেছে। কজন মুসলমান কবির কবিতা সংকলনের গুরুত্ব বাড়িয়েছে -পরশ্রেষ্ঠ শাহিদী, শিকানদার আবু জাফর, শামসুর রহমান এবং দানাউল হক। মানুষের হিংস্র মুখে মানুষ-নিধনজনিত যে অট্টহাসি বিকশিত হয়, তার প্রেক্ষাপটে তরুণ কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের শ্লেষোক্তি তীব্র। এ শ্লেষের মধ্যে কী অন্তহীন বেদনার স্পর্শ—

রাস্তার কুকুরগুলি চের বেশি ভালবাসতে পারে
ওদের প্রেমিক নাম দিলে সৃষ্টি উচ্ছন্নে যাবেনা।

প্রবীণ কবি বিষ্ণু দে সাম্প্রদায়িক হত্যার পেছনে 'উত্তর' খুঁজেছেন। নিরীহ মানুষগুলির দুর্ভোগের জীবনে এই যে মানবসৃষ্ট দুর্গতি, এই যে অপঘাত এর দায় কার? মৃতেরা উত্তর দেবেনা, হত্যাকেরা 'গান্ধী' আর 'দক্ষিণ রায়ের' নামে 'শহুরে গ্রামে' 'কেউ' এর মত 'হুকুম দেয়', আর

তখন জিজ্ঞাসা করি; কে তুমি? কে তুমি? দুজনই
নিরুত্তর, চিরকালই নিরুত্তর এরা দুইজনে।

এই প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় অনেক তরুণ কবি যোগ দিয়েছেন। আমাদের সামনে একটি আশ্বাসের দিগন্ত উন্মুক্ত হয়েছে, মানববোধের জীবনবাণী ধ্বনিত হয়ে উঠেছে। মনে হয়েছে, এ দাঙ্গার সমাধান মানববোধের প্রতিষ্ঠায়, শুভবুদ্ধির অগ্রযাত্রায়, দুই সম্প্রদায়ের সংস্কৃতির সুসমন্বয়ে। মানবতার নামে এই সমন্বয় অপরিহার্য।

এ সংকলনের কবিতাগুলির শিল্পবিচার আমাদের লক্ষ্য নয়। তবে শিল্পের যা অন্তিম অবিষ্ট, সেই কল্যাণস্পৃহাকে অবারিত করে দিয়েই এ সংকলনটি আমাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে।

চার

সংকলিত কবিতা : মণীন্দ্র রায় : এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড।

এ দুঃখের অট খোলা যায়।
তবু বীজে শিকড়ে পল্লবে

মৃত্যু নেই অধিষ্ঠের ঘটে
অথবা অন্ধকূপে ; এদের যে
ব্যাপ্তি চলে জীবন্তের স্তরে। — বিষ্ণু দে (বলয় শঙ্খ দাশগুপ্ত ও সান্ত্বি সাহিড়ী সম্পাদিত 'বাংলা কবিতা', দ্বিতীয় সংকলন)

এ প্রবন্ধের সূচনাতে আমাদের প্রশ্ন ছিল—একালের আধুনিক-পন্থ কি আমাদের বাঁচবার মন্ত্র দেবেন না? কয়েকজন তরুণ কবির মধ্যে আমরা যুগযন্ত্রণাকে প্রত্যক্ষ করেছি। হৃদয় বিদীর্ণিত হয়েছে তাঁদের আত্মার ক্রন্দনে, আশাভঙ্গের বেদনায়, আশ্রয়চ্যুতির বঞ্চনায়। এই বঞ্চনা এবং বেদনা থেকে মুক্তি যে বলিষ্ঠ মানবপ্রত্যয়ে, বাণিজ্যমুক্ত প্রেমে, ইতিহাসধারার বিবর্তনের ওপর আস্থায়, বৈজ্ঞানিক সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিতে, দীপ্ত স্পষ্ট ভাষণের অকম্পিত কণ্ঠস্বরে—একথা বার বার মনে হয়েছে। এই আকাঙ্ক্ষা অনেকখানি পূরণ করেছেন কবি সুধীন্দ্র রায়। তিনি অবশ্য বয়সে তরুণ নন। কিন্তু মনের তারুণ্য বয়সের বলিরেখায় মুছে যায় না। প্রাণের জয়পত্র চিরসবুজ রাখার মধ্যেই তো শিল্পের সাধনা চরিতার্থ।

সকালমনস্ক কবি নিজের কালবৃত্তকে অস্বীকার করতে পারেননি। তাই প্রথম দিককার কাব্যগুলিতে যুগযন্ত্রণা প্রতিফলিত। সে যন্ত্রণা অনুসন্ধানের আগে তাঁর কাব্যধারার পরিচিতি দেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ত্রিশঙ্কু মনের' রচনাকাল ১৯৩১। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অশনি সংকেতের মধ্যে এ কাব্যের শুরু। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় কাব্য বিশ্বযুদ্ধের মধ্য এবং পরিণতি পর্বে রচিত—একচক্ষু (১৯৪২) এবং ছায়া সবচক্র (১৯৪৪)। চতুর্থ কাব্য 'সেতুবন্ধনের গান' স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। তারপর যথাক্রমে অন্তঃশীলা (১৯৫১); ক্রফচূড়া (১৯৫৪); অর্কিল থেকে দিল (১৯৫৮) মুখের বেদা (১৯৫৯); অভিমুখ আলোরেখা (১৯৬২) এবং অনুষ্টুভ 'নতুন কবিতা'। 'ত্রিশঙ্কু মনের' মধ্যে সমকালীন যন্ত্রণাবোধ কবিকে স্বপনচারী করে তুলেছে—

আমি তাই পলাতক স্বপনের পথে।
স্মিতিত ঘুমের ঢেউ-এ মিটে যায় সকল বিরোধ (মুক্তি)

কিন্তু এই কবিতাতেই আপাতঃ মুক্তির পরিবর্তে যথার্থ মুক্তির অস্পষ্ট নীহারিকা আভাসিত—

সুদূর দিগন্তপারে নতুন পৃথিবী এক হয়েছে উতল
আমার বিস্মৃতি স্মিত বুলনে
ভরে যেবে তার মনতল।

সমকালীন শূন্যতাবোধে কবিচিত্ত বিমর্ষ—

অসহ্য শূন্যতা আজ কাঁপে শ্রাবণের ঝিঁঝিঁর মতন
('স্বর্গ হতে বিদায়')

কিন্তু এই শূন্যতাবোধের মধ্যেও মুক্তিপিপাসা তীব্র, আশার স্পষ্ট অরুণচিহ্ন—

হে ত্রুটিবিধুর, সংশয় করো স্থির ;
হয়ত যুদ্ধই, তবু ত্রাণ তারি গর্ভে। (ত্রুটিবিধুরেষু)

দ্বিতীয় কাব্য 'একচক্ষু'তে সকালচেতনা আরো স্পষ্ট, কিন্তু সংগ্রামচেতনা তদ্ভোধিক পরিস্ফুট—

প্রাণের অমৃতভাণ্ডে শুধু চানাচুর
গলদ্ঘর্ম কপিথে সে পড়েছে ধুলায়। (নবচতুর্দশপদী ৫)

'গলদ্ঘর্ম কপিথে'র মত অন্তঃসারশূন্য সমাজ। এই অভিজ্ঞতাকে দুর্জয় কর্মশক্তিতে জয় করার সংকল্প এ পর্বে বিস্ময়কর। এই সংকল্পে কবি যুগাভিসারী, এখানে তিনি চিরন্তন মানবশক্তির গীতকার—

যাত্রবের নবযাত্রা উদ্যত হয়েছে যেইখানে
সেথায় আহ্বান মোর। দলিতের রক্তস্নাত সে হিংস্র বিষানে
আমার জগৎ যেন নবরূপে জাগিবারে চায় ;
এ পৃথিবী স্বাদহীন ; এ জগৎ কাঁদিছে বৃথাই।
কর্মঘন উদ্দীপনা উদ্বেলিত স্নায়ুতে শিরায়। (অক্রূর-সংবাদ)

এই পর্বের 'কালবৈশাখী' কবিতাটি ইতিহাসবোধের তীক্ষ্ণতায়, আশাবাদের কণ্ঠস্বর ঘোষণায়, সমবেদনা এবং সাধারণচেতনার কালোত্তর উত্তাপে একটি উৎকৃষ্ট সৃষ্টি। শেলীর Ode to the West Wind, রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ' এবং মোহিতলালের 'কালবৈশাখী' কবিতার প্রতিস্পর্ধী এই কবিতাটি। এর বাগ্‌ভঙ্গি বাস্তব অথচ বলিষ্ঠ, ছন্দে গতিস্পন্দন। সমস্ত কবিতাটি উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়। শুধু শেষ স্তবকটি তুলে দিলাম—

প্রভঞ্জন,
তীব্র, বৈদ্যুতিক,—যাক তপ্ত অন্ধকার
আষাঢ়ের বৃষ্টি, বীর্য, ধাতুবৃষ্টি হতে। হে পবন,
পরশ্রীবী দাপটের প্রাসাদ প্রাকার
হোক উৎখাটিত।
সৃষ্টির সূর্যেতে কর পুনঃ অঙ্কুরিত
মাটির সুবর্ণা, শস্য বৃষ্টির ছটায়।
জীবনের-দক্ষতায়—স্তব যেন জেগে ওঠে সুঠাম
শিরায়।
হে কালবৈশাখী
কত বাকী?

এই আস্তিকানিষ্ঠ জীবনদর্শন পরবর্তী কাব্যগ্রন্থেও উৎসারিত। অভিজ্ঞতার স্পর্শে পরের দিকের কাব্যধারায় এ বোধ হয়েছে মুক্তিত, সুপরিণত। মিশ্রিত হয়েছে তাতে অনাবিল মানবিক আবেদন, সম্প্রদায়চেতনাবিমুক্ত উদারতা। ১৯৫৯-এর 'সূর্যের মেলা' কাব্যের 'নীরজার ইতিকথা', 'ইয়াসিন মিয়া' আর 'বিক্রিওলা' কবিতা তিনটি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিক্রিওলা কবিতায় মানবিক আবেদন এবং সামাজিক সমবেদনাবোধ নিষ্কলুষ। বিক্রিওলার মত অনিশ্চিতও [illegible] দুঃখের দিনে সংসারের হত প্রত্যাহিত করে নেয়, তখন [illegible] হয়—'যে কাকে বাঁচায় যেন মুহূর্তে দেখেছি'। [illegible] যে নিশ্চিহ্নিত মানুষের অন্তরে নিহিত প্রাণ-শক্তিকে নিঃশেষ করতে পারেনি, তার প্রমাণ বিক্রিওলা। একদিনের যৌবনবিলসিত নীরজা আজ কেন উন্মাদিনী? সেদিনের বহুপ্রার্থনী প্রবর অরুণেশ, বন্ধু, রাজীব, কানাই' আজ কোথায়? ওই বহুস্তর বঞ্চিত 'প্রেমিকদের 'নির্বাধ লোভের দাহে' দগ্ধ হয়ে নীরজা আজ হারিয়ে গেছে 'আগুনের ঝড়ে'। অপার সহানুভূতিতে নীরজার বেদনার এই চিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন। নীরজা শুধু একটি বিশেষ নারী নয়, বহু সভ্যতায় নির্যাতিত নারীদের প্রতীক। নিরক্ষর চাষী ইয়াসিন মিয়া তেভাগা আন্দোলনের নেতা অবনীর দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাবার শক্তি পায় কি করে। এই অবনীই তো তার একমাত্র পুত্র রহিমকে ঠেলে দিয়েছিল আন্দোলনের পথে। আর তার বদলে দিয়েছিল কিশোর রহিম তার প্রাণ দিয়ে। দু' বছর জেলে কাটিয়ে অবনী ফিরে এল গ্রামে। প্রথমেই দেখা ইয়াসিনের সঙ্গে। কর্মরত ইয়াসিন তাকে জানাল—

'যখনি অস্থির মন, আলা ধরে বুকে,
কাজে ডুবে গেয়েছি আরাম।'

সঙ্গে সঙ্গে অবনীর মনে হল—'পৃথিবী চলেছে'।

১৯৬২-তে প্রকাশিত 'অতিদূর আলোরেখা' এবং অধুনাতন 'নতুন কবিতা'গুচ্ছের সুরবাহুল্য লক্ষণীয়। আগেকার কাব্যগুলির নিরলঙ্কার স্পষ্টভাষণ, মাংসিলহীন বাস্তববোধ এখানে যেন প্রতীক এবং অরূপের আলোছায়ায় আবৃত। চিত্রিত বধূর (আমার ঘরাল); অতিদূর আলোরেখা (অতিদূর আলোরেখা); জোয়ারের কলকলাস (গত-অনাগত); চিতল হরিণ (ঐ); ডাকিনী-চিৎকার (স্বতোৎসারে, নিজে); যকনার চিত্রিত পাগরী (ঐ) ইত্যাদি ইঙ্গিতরেখায় কবির বক্তব্য পূর্ণতম ব্যঞ্জনার রূপ ধরেছে। এ সমস্ত প্রতীকাভাসে কবি কোন্ লোকে যেতে চাইছেন? মনে হয়, অতিসাম্প্রত জীবনের শূন্যতা তাঁকে স্পর্শ করছে, জীবনজটিলতার এই ধূসর অরণ্যে তাই প্রতীকী তাৎপর্যের আবির্ভাব। তরুণ কবিদের 'আত্মিক অবসাদ' এই চিরতরুণ নীলকণ্ঠ কবিকেও

বিদ্ধ করতে উদ্যত হয়েছে দেখে আমরা বাধিত। তিনিও জীবনানন্দ এবং তরুণ শোভন সোমের মত আজ মৃত্যুতে আশ্রয় খুঁজছেন—'জন্মের চেয়ে মৃত্যুই মহীয়সী' (নিজের ধ্বনি)। যন্ত্রণাহত চিত্তের এই আক্ষেপে কি প্রবাহিত এই দিনের, এই আজকের শূন্যতারই প্রতিধ্বনি?

তখন, তখনি আমি বিদ্ধ ওই যন্ত্রণার ঘাতে;
সময়ের পরিবর্তে স্থির হয় সহসা জীবন—
সহসা ছড়ায় প্রাণ রেণু-রেণু নক্ষত্রের রাতে;
অথচ এ-সময়েই দেখি ঘুরে পৃথ্বী মতন।

(যতোৎসারে, নিজে)

প্রাণকেন্দ্রে ছড়িয়ে পড়ার বিশ্বাস যেমন আশাজনক, তেমনি মর্তপ্রেমিক এবং জীবনবাদী কবির কাছে এ দৃষ্টিও আশ্চর্যজনক—'এ-সময়েই দেখি ঘুরে পৃথ্বী মতন'। অথবা হয়তো অত্যন্ত স্বকালচেতন বলেই এ দৃষ্টিও অপ্রত্যাশিত নয়। আজকের দিনগুলিতে আমাদের সবারই তো এবোধই জেগেছে—'অদৃশ্য নৌকোর মতো রেখে যায় শূন্যের প্রকৃতি' (ঐ)। কিন্তু ভরসা এই, মৃত্যুকালীন শূন্যতার মধ্যেও কবি আমাদের আশার বাণী শুনিয়েছিলেন। বিংশ শতাব্দীর মধ্যলগ্নের এই শূন্যতা তাঁকে স্পর্শ করলেও 'পুণ্যের বেতনে'র মত কবিতাও তিনি উপহার দিয়েছেন—

পাপের বেতন মৃত্যু। কিন্তু পুণ্য, তারো যে মাথায়
কাঁটার মুকুট, তারো দুঃখদীন স্বপ্ন রাজধানী।
তবু সেই তিল তিল যন্ত্রণার দীর্ঘ প্রতীক্ষায়
যে আশা রূপকে গন্ধে জেগে থাকে নিত্য দুয়োরে
তারই মুখে শান্ত হাসি, বিষপাত্রে তবু তারই মন
অমৃতের অভিলাষী। আর তাই পুণ্যের বেতন।

এখনো তিনি পৃথিবীর ওপর আস্থা রেখেছেন—

বহুদূরে থেকে তবু পৃথিবী আমার
শুভ্রতার নীড় মেলে ইথারে ইথারে শব্দহীন
নিয়ত বাজাবে তেনো ভেরি।

(নিয়ত বাজাবে ভেরি)

চরাচরব্যাপ্ত হতাশার মধ্যে এই আশ্বাসের ভেরি-বাদন দ্বারা কি তিনি যন্ত্রণাক্লিষ্ট অসুস্থ কবিদের পথ দেখাবেন না? একথা কি তিনি তাঁদের বলবেননা যে, পঙ্কই পদ্মের অধিষ্ঠান নয়, রক্তকমল পাপড়ি মেলে ধরবে সূর্যবন্দনায়। পঙ্ক থেকে উত্তীর্ণ হয়ে আমাদের সবাইকেই 'আনন্দের সূর্যের চাকায়' (ঐ) নিজ জীবনের গতিকে মিলিয়ে দিতে হবে।

পাঁচ

সমকালীন কবিতার কিছু অংশের ভাবপরিক্রমার প্রয়াস করলাম। ভাবের শরীরী রূপ দানের জন্যে প্রযুক্ত বাগ্বিভঙ্গিও কবিতা আলোচনার সময় বাদ দেওয়া সঙ্গত নয়। কবিতার বিষয় বস্তু বা content এর সঙ্গে তার গঠন বা form এর আলোচনাতেই কবিতার আস্বাদন পূর্ণতালাভ করতে পারে। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতা এই রূপশিল্পে বিস্ময়কর অগ্রগতি লাভ করেছে দেখে আনন্দিত না হয়ে পারা যায় না। বিশেষতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর বাংলা কবিতার নাতিদীর্ঘ ইতিহাসে প্রযুক্তি বা ভঙ্গির যে প্রকর্ষ ঘটেছে, তার জন্যে আমাদের গর্ব করার কারণ আছে। আজকাল বহু বন্ধু এবং শিক্ষিত কাব্যরসিকের কাছ থেকেও অভিযোগ শুনি যে, আধুনিক বাংলা কবিতা বড় দুর্বোধ্য। তা নাকি বুদ্ধিবৃত্তির চাতুর্য এবং ভাষার ঘোরপেঁচ ছাড়া আর কিছু নয়। বলা বাহুল্য, ক্ষেত্রবিশেষে এ অভিযোগে কিছুটা সত্য থাকলেও একে পুরোপুরি মেনে নেবারও কোন কারণ দেখি না। কেন না ভাষার বিচিত্র কারুকৃতি, ভঙ্গির নানা পরীক্ষার মধ্যে একটি পরিশীলিত কবিস্বভাব কাজ করে। এই পরিশীলনে কাব্য-প্রযুক্তি দিন দিন উন্নতি লাভ করছে। আর অস্পষ্টতার জন্যে শুধু কবিরাই দায়ী নন। দায়ী এযুগের জীবনজটিলতা। বর্তমান বস্তুতান্ত্রিক সভ্যতা ব্যক্তিজনে যে দ্বন্দ্ব এবং জটিলতার সৃষ্টি করেছে, যে ঘনান্ধকারে জীবনপথ আজ আচ্ছন্ন, তারই প্রতিক্রিয়া হিসেবে শিল্পের প্রকাশরীতির মধ্যেও ইঙ্গিতময়তা,

ছায়াদূরতা এবং বক্রগতি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। অবক্ষয়ী সমাজমানস স্পষ্ট লক্ষ্যের অভাবে অস্পষ্টতার আড়ালে নিজেকে আবৃত রাখতে বাধ্য হয়। এর জন্য আক্ষেপ করার কারণ থাকলেও যুগনিবদ্ধ কবিরা কেন ক্ষমার্হ হবেন না? বরং এই জটিলতা তাঁদের তীক্ষ্ণ সমাজচেতনাকেই তুলে ধরে। বর্তমান আলোচনার পরিধিতে যে কবিগণ রয়েছেন, তাঁদের বাণীভঙ্গিতে এই বিচিত্র প্রয়াসের স্বাক্ষর লক্ষণীয়। এই প্রকরণকুশলতা বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমাদের আশান্বিত করেছে। বিভিন্ন অনুষঙ্গ প্রতীক এবং চিত্রকল্পের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় এঁদের কবিতায়। শব্দনির্বাচনে এবং ছন্দের ব্যবহারেও সচেতন শিল্পবোধের পরিচয় বিদ্যমান। সনেট বা চতুর্দশপদী রচনাতেও এই শিল্পবোধের প্রকাশ দেখা গেল। তরুণদের অন্বেষা এবং অনুশীলনের মধ্যে একটি প্রশংসনীয় প্রচেষ্টলতা বর্তমান। এঁরা শখের কবি এবং স্বভাব কবি নন, এঁরা সচেতন এবং স্বনির্ভর শিল্পী। আধুনিক কবিদের এই শিল্পকুশলতার সঙ্গে শিক্ষিতমনের পরিচয়বন্ধন ঘটেছে, সমাজসচেতনার সঙ্গে শিল্পপ্রবৃত্তির সম্মিলন ঘটছে। ভাব এবং ভাষার এই কর্ষণজাত হৃদ্যগৌরী সম্পর্ককে অস্বীকার করি কী করে? আধুনিক কবিতাকে যাঁরা দুর্বোধ্য বলে অপাংক্তেয় করে রাখতে চান, তাঁদের অনুরোধ করি একালের কবিসমাজের এই বিচিত্র প্রয়াসকে অনুসরণ করতে। একথাও বোধ হয় বলা দরকার, এ যুগের কবিতাপাঠকেরও কিছুটা অনুশীলনজনিত শ্রম স্বীকার করা অপরিহার্য। তা না হলে শুধু জটিলতার অভিযোগ দিয়ে বাংলা সাহিত্যের একটি ক্রমবিবর্তমান ধারা থেকে তাঁরা দূরেই সরে থাকবেন। আর এর ফলে শিল্পী এবং সামাজিক উভয়েই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কবিদেরও একথা মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, অস্পষ্টতার অর্থ যাতে বাঙালী পাঠককে বরাবর নিষিদ্ধ রাখা যেন তাঁদের অভিপ্রেত লক্ষ্য না হয়। কারণ ইঙ্গিতের অস্পষ্টতা থেকে ভাবের ধূসরতা, হতাশার চেয়ে প্রত্যয়সমুজ্জ্বল জীবনবাণীর রূপদান করার দিকে অগ্রসর হওয়াতেই তাঁদের পূর্ণ পরিণতি সম্ভব। আশাবাদী জীবন-দর্শনে উত্তীর্ণ হবার পর ভাষা এবং প্রকাশরীতিতেও তাঁরা স্পষ্টতার দিকে অগ্রসর হতে পারবেন বলেই আমাদের বিশ্বাস।

সমকালীন কবিদের কবিতার গঠন এবং রীতি নিয়ে পৃথক বিস্তৃত আলোচনা হওয়া সঙ্গত ছিল। কিন্তু সে এক অন্যতর প্রসঙ্গ। বারান্তরে সে চেষ্টা করার অভিলাষ রইলো। এখানে শুধু আলোচ্য কবিযুগের বাণীকুশলতা এবং তাঁদের কবিতার গঠনদক্ষতা সম্বন্ধে সাধারণ মন্তব্য করেই আমরা ক্ষান্ত হলাম।*

---

* (আলোচ্য কবিদের বিভিন্ন কবিতার ভাব অনুধাবনে সহকর্মী বন্ধু শ্রীগোপীনাথ রায় সঙ্গে যৌথিক আলোচনায় যে সহায়তা পেয়েছি, তা সবার স্বীকার্য। প্রবন্ধের খসড়াটি আলোচনার শোনার পর তিনি যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন, চূড়ান্ত প্রতিলিপি তৈরী করার সময় সেগুলি যথাসম্ভব গৃহীত হয়েছে।)

হৃদয়ের ঘরে

আর্যদেব

তিন বছর পরে সুমিতা আসছে আজ। লোকমুখে খবর পাঠিয়েছে সুমিতা। সব চাপা পড়ে গিয়েছিল—সব আশা, স্বপ্ন, স্মৃতি। আবার সে সব জেগে উঠলো এই বাড়িতে, এই সেই পুরনো বাড়িতে। মা-বাবা যেন তাকে কিছুক্ষণ সময় দেন—তার সামান্য কিছু প্রয়োজন আছে। কমলা দেবীর গা ঝি-ঝি করছিল শুনে, লোকটির মুখের ওপর ধমক বন্ধ করে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল. কিন্তু এক ঝলক পুরনো কথাগুলি মনে পড়ে যেতে পারলেন না, সে সব কিছুই করতে পারলেন না, ভয়ঙ্কর চুপ করে গেলেন। ভবতারণ কথাটা শুনে আরো গম্ভীর হয়ে দ্রুত পায়ে ঘরে চলে গেলেন। মণিকা আড়াল থেকে কথাগুলো শুনছিল। ভবতারণের সামনাসামনি হতেই সরে গেল।

পুরনো ঝি লক্ষ্মও শুনেছিল কথাটা। সেও আপনার মনে যেন বললো: সব ও চুকে-বুকে গেছে দাদাবাবু যারা যাওয়ার সঙ্গে. শুনেছি সুমিতা বৌদি বিয়েও করেছে আবার—পুরনো শ্বশুর শাশুড়ির সঙ্গে আর বিয়ের ধরকার যারা—ছি ছি, লজ্জা-ঘেন্নাও নেই।

প্রথম বিস্ফোরণ ঐ পর্যন্তই। তারপর আবার সব চুপ করে গেল। ক্রমে ক্রমে কৌতূহলের পালা সুরু হল। সমস্ত বাড়িময় জুড়ে প্রচণ্ড কৌতূহলের পালা। সকলেরই নিদারুণ কষ্টকর প্রতীক্ষা—কখন আসবে, কখন। কমলা দেবী কখন অজানতেই যেন ঘরদোর সাজাতে আরম্ভ করেছিলেন। ভুলে গোকান থেকে নিজেদের নাম করে কিছু খাবার আনিয়ে খানিকটা আলাদা করে রেখেও দিলেন। মণিকার মনে পড়লো—এই ত কদিন আগের সেই বৌদি তার কি অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিল। বৌদির পছন্দমত সেই পুরনো নীল পর্দাগুলি ঝেড়েমুছে টাঙিয়ে দিল জানলায় জানলায়। বৌদি কি আরো মোটা হয়েছে? নতুন বিয়ে করে নিশ্চয় খুব হাসি-খুশী। আর সত্যিই ত, আজকালকার দিনে বিধবার গোমড়া-মুখ নিয়ে বসে থাকার কী মানে হয়। দাদা-বৌদির ফোটোটার ওপর থেকে ধুলো ঝেড়ে টেবিলে রাখল মণিকা। বৌদির ট্রাঙ্ক-সুটকেসগুলিও ঝেড়েমুছে রাখলো। বৌদি যতই বদলে যাকুক. এসব দেখে পুরনো কথা নিশ্চয়ই মনে পড়বে তার, অন্তত কয়েক মুহূর্তের জন্যেও। বেচারা দাদা—এত তাড়া-তাড়ি কেন যে মারা গেল! সুটকেসের ভেতরে দু খাম ভর্তি চিঠিগুলি ঝরে পড়ে ফেলেছে মণিকা। দাদা যখন বাইরে ছিল তখন যে চিঠিগুলো দাদা লিখেছিল সেগুলো এক খামে, আর বৌদির চিঠিগুলো আর এক খামে রয়েছে। সেই চিঠির উত্তাপের মধ্যে যে বৌদির ছবি তার স্মৃতি এই ঘরের সর্বত্র—দাদা-বৌদির সেই ক' বছরের ছোট্ট ইতিহাস। মণিকা ভাবতে চেষ্টা করলো—বৌদি কেন আসছে, দাদার ছবি, চিঠিগুলো নিতে—সে ত অনেক আগেই নিয়ে যেতে পারতো। নাকি বাক্সটাগুলো নিয়ে যেতে এসেছে—কাপড় চোপড়, টুকিটাকি, এটাসেটা। নাকি দেখাতে আসছে নতুন বিয়ের পর সে কত সুখে আছে, কত আনন্দে আছে। বৌদি তখন ঐ জানলাটার ধারে দাঁড়িয়ে গান গাইতো। আর এক জানলায় দাঁড়িয়ে থাকতো দাদা। হাত বাড়িয়ে একটা হাস্নুহেনা গাছের নাগাল পাওয়া যেত। দাদা কতদিন মুঠো মুঠো ফুল ছিঁড়ে এনে টেবিলে রেখেছে। বৌদি গান গেয়েছে তখন। মাত্র ক' বছর আগের সব ঘটনা। মণিকা

হঠাৎ নিজের কথা ভাবলো। আর কদিন পরেই ও তার রঞ্জনের সঙ্গে বিয়ে—আচ্ছা, রঞ্জন যদি—তবে মণিকা কি—না, কখনোই না—মণিকা নিজের চিন্তার মুখে হাত চাপা দিল।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতেই সমস্ত বাড়িতে কেমন এক চাঞ্চল্য সুরু হয়ে গেল। সন্তু কি অন্যদিন তাড়াতাড়ি কাজ সেরে বাড়ি চলে যায়, আজ আর যাওয়ার তাড়া নেই ওর।

কমলা দেবী কি ভবতোষের মুখে কৌতূহলের কোন চিহ্ন নেই। হয়ত এসব বিষয়ে তাঁদের পক্ষে কৌতূহল অপরাধ কিংবা পাপের সামিল। মৃত পুত্রের নববিবাহিতা বিধবার কথা ভাবতেই তাঁদের মাথা ঝিমঝিম করছে। হয় ত পুরনো শোকটা আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো। মেয়েটা ত ভালই ছিল—শান্ত, সেবাপরায়ণা। বাপের বাড়ি গিয়েই হয় ত নতুন কথা ভাবতে শিখিয়েছে কেউ। প্রথমে শুনেছিলেন নার্সিং শিখছে, পরে শুনলেন বিয়ে করেছে। কথাগুলো শুনে একটু গ্লানিবোধ করেছিলেন তখন। আজ তার আসার সংবাদে বিহ্বল হয়ে পড়লেন এঁরা। পুরনো ক্ষতকে জাগাবার কি প্রয়োজন তার! সুধাময় নেই—তার শুধু একটি ফোটো ছাড়া স্মৃতি বলতে আর কী রইলো। প্রিয়তম শোক করার যে আধারটাও নষ্ট হয়ে গেল। হয় ত এই-ই হয়, আজকাল হয় ত এটাই নিয়ম। শ্বশুরবাড়ির গলগ্রহ না হয়ে স্বাধীন পথ বেছে নিয়ে বুঝি ভালই করেছে সুমিতা।

মণিকা ভাবছিল বৌদি এতটা বাড়াবাড়ি না করলেই পারতো। বিয়ে করেছে যখন, তখন আবার পুরনো বাড়িতে যাওয়ার কি দরকার। দাদার জন্যে বৌদির কি একটুও কষ্ট হয় না আর। মাত্র তিন বছরের মধ্যেই সব ভুলে গেল। ...বিকেলের দিকে সাজব না সাজব মনে ভেবেও কিন্তু মণিকা অন্য দিনের চেয়ে ভিন্নতর সাজগোজ করলো। মনটা সেই তিন বছর আগের মত। মনে হচ্ছে তাকেই বুঝি বা কোন গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে। একাজ-সেকালের মধ্যেও তার কান রইলো দরজায়।

ঠিক সন্ধ্যের সময় দরজায় শব্দ হল খুট খুট। দরজা খুলতেই মণিকা দেখলো—না, বৌদি নয়, রঞ্জন। রঞ্জনের আসার কথা ছিল না, কিন্তু তাকে দেখে খুশী হল মণিকা। চিন্তার বোঝাটা যেন খানিকটা হালকা হয়ে গেল ওর। বললো: এসো, বসো।

রঞ্জন অবাক হয়ে বললো: তোমাকে আজ একটু অন্যরকম লাগছে।

কৈ, না ত ও: হো, একটা কথা বলি তোমায়—আজ আমার ভূতপূর্ব বৌদি আসছেন।

: ভূতপূর্ব?

: হ্যাঁ, তিনি সম্প্রতি আবার বিয়ে করেছেন।

: বাঃরে, বেশ ত···

: মাত্র তিন বছরের মধ্যেই বৌদির সব প্রেম নিঃশেষ···

: যাক গে; তা সে মহিলা আসুন বা না আসুন, চলো আমরা বেড়াতে বেরোই···

: আমার একটু দেখতে ইচ্ছে করছে ওঁকে—কেন ওঁর আবির্ভাব তাও জানতে ইচ্ছে হচ্ছে—পরেই বেড়াতে বেরোব, কি বলো?

খানিক পরেই আবার শব্দ হল দরজায়। ওপাশের জানালার খড়খড়ি তুলেই নামিয়ে ফেললেন কমলাদেবী। সন্তু কি পর্দার ফাঁক দিয়ে সব দেখলো। মণিকা বলতে গিল সুমিতাকে: আপনার খবর পেয়েছি আমরা, বসুন। সুমিতার মাথায় আলতোভাবে সিঁদুর ছোঁয়ানো দেখলো মণিকা। চেহারাটায় আরো লেপা লেগেছে। সুমিতা মিষ্টি একটু হেসে বললো: মণি, আমার বাক্স-টাক্সগুলো কোথায়, ওপরে?

মণিকা একটু চমকে উঠলো। কোন জড়তা নেই বৌদির ভাষায়। এমন কি বাবা-মা সম্পর্কে বিন্দুমাত্র ঔৎসুক্যও নেই বৌদির কথায়।

মণিকা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল বাক্সগুলো। সুমিতা তাড়াতাড়ি সেগুলো খুলে জিনিসপত্রগুলি দেখতে লাগলো।

মণিকা বললো : অত ব্যস্ত কেন বৌদি, অনেকদূর থেকে এসেছেন, একটু বসুন, জল-টল খেয়ে যান।

হাসলো সুমিতা—না ভাই মণি, জল আর খাবার প্রয়োজন নেই—আমি আমার বাক্সটাক্সগুলোই নিতে এসেছি।

অবাক হল মণিকা—আর কিছু না···

না ভাই, আর কিছুর কী প্রয়োজন—

কেন বৌদি, আমরা কি এর মধ্যেই পর হয়ে গেছি?

সুমিতা এবার হাসলো : পর না হয়ে উপায় আর কী বলো ভাই, এক হৃদয়ে আর কতটুকু জায়গা খালি রাখা যায়, কত জিনিস ধরানো যায় সেই ছোট্ট হৃদয়ে?

রঞ্জনের দিকে চোখ পড়তেই সুমিতা বললো আবার : ইনি কে মণি?

ও রঞ্জন, ওঁকে আপনি আগে দেখেন নি—সাদনের দাদা আমাদের···সুমিতা বিস্মিতভাবে বললো : কিন্তু তোমার সেই—বলে রঞ্জনের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

মণিকা হাঁপ ছাড়লো। একটা বিপদ থেকে উদ্ধার পেল যেন। বৌদি নিশ্চয়ই অমলের কথা বলতে যাচ্ছিলেন।

সমস্ত জিনিস গুছিয়ে নেওয়ার পর সুমিতা বললো : এক হৃদয়ে একই সঙ্গে খুব বেশি লোকের স্থান হয় না—কি বলো মণি—

কথাটা শুনে মণিকার কান-মুখ লাল হয়ে উঠলো।

সুমিতা আর কারুর সঙ্গে দেখা না করেই তার বাক্স-টাক্সগুলো গুছিয়ে নিয়ে চলে গেল। দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে মণিকা একটু হাঁফাতে লাগলো। দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে দেখলো—না, দাদাবৌদির যুগ্ম ফোটোখানা নিয়ে যায় নি। সুটকেসের টুকিটাকির সঙ্গে চিঠির প্যাকেটগুলিও ফেলে রেখে গেছে।

তবে কি সত্যই হৃদয়ের জায়গা কম—এক হৃদয়ে একই সঙ্গে অনেক কিছুর স্থান সঙ্কুলান হয় না। কিন্তু বৌদি বোঝে, বোঝে বলেই অমলের সেই কাহিনী রঞ্জনের সামনে আর ভাঙলো না। সুমিতার আচরণে হঠাৎ কৃতজ্ঞতায় মন ভরে গেল মণিকার। সে সব পুরনো কথা কোথায় চাপা পড়ে গেছে—আজ প্রকাশ পেলে কী হত কে জানে!

মণিকা খানিক পরে সহজ হয়ে বললো : চলো রঞ্জন, বেড়াতে বেরোই।

মেঘের প্রহর

বিমলকুমার ঘোষ

এখন দার্জিলিঙ-এ বর্ষা নেমেছে।

সবে মে মাস শেষ হচ্ছে। মৌসুমিয়ম যদিও এখনও বর্ষাকাল সুরু হয়নি, তবুও দার্জিলিঙ-এ এমনি সময়েই বর্ষা নামে। এখন পাহাড়ের বাঁকে বাঁকে নানা অজানা ফুলের সমারোহ আর শাল সেগুনের আকাশমুখী উচ্ছ্বাস। মাঝখান দিয়ে এঁকে বেঁকে সর্পিল গতিতে উঠে গিয়েছে হিলকার্ট রোড। হিমালয়ান রেঞ্জের সুরু থেকেই ঘুমন্ত বনাঞ্চল। নিবিড় মেঘের আবরণে ঢাকা পড়ে থাকে ডাউ হিল আর ঘুম-পাহাড়। সমুদ্রতল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার ত্রিভুজে উদয় দিগন্তের নিশানাও মেঘে ঢাকা। পাহাড়ের গায়ে ঝরঝরার মত অসংখ্য ঝরণার বুকে নতুন বর্ষার মৃদু পদধ্বনি এখন থেকেই শোনা যাচ্ছে।

মে মাস শেষ হচ্ছে।

সৌরাংগের ঘরওলও শেষ। স্বাস্থ্যান্বেষী আর সিজনাররা ফিরে যাচ্ছে দার্জিলিঙ থেকে। পাইনের পাতায় পাতায় অবিরাম শির শির ধ্বনিতে গ্রীষ্ম বিদায়ের সংকেত। এখন দার্জিলিঙ শহর একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে। সৌরাংগের এখন বিরাম নেই। অসংখ্যবার যাতায়াত করছে সে শিলিগুড়ি-দার্জিলিঙ। এ রুটে কেউ বাঁধা ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সী নেয় না। যে যেমন আদায় করতে পারে প্যাসেঞ্জারদের কাছ থেকে। দার্জিলিঙ স্টেশনের পাশেই নেপালী যুবতী 'কানছি'র দোকানে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে টানছে সৌরাংগ। বর্ষা নেমেছে অথোর ধারায়। 'কানছির' চালের [illegible] থেকে স্টেশনের সীমানা ছাড়িয়ে উঁচু নীচু সহরটাকেই ঝাপসা দেখাচ্ছে। বর্ষার সংগে সংগে প্রথম মৌসুমী বাতাসে শীতের একটা হাড় কাঁপানো যন্ত্রণা যেন চেপে নেমে এসেছে। আর তার সংগে আকাশ চেরা বিদ্যুৎ চমক। 'কানছি' তার ছোট ছোট মোঙ্গলীয় চোখের তারায় এক দুর্বোধ্য আভাস এনে সৌরাংগকে জিজ্ঞাসা করল—চিয়া খানে দাহু? (চা খাবে)

সৌরাংগও বিচিত্রভাবে হাসে।

বলে—ঠাণ্ডি চিয়া দিহুস্। (ঠাণ্ডা চা দাও)

ঠাণ্ডা চা মানে দেশী মদ। দার্জিলিঙ-এর চায়ের দোকান-গুলির লাইসেন্সহীন কারবার। দার্জিলিঙ থেকে শিলিগুড়ি পর্যন্ত সমস্ত নেপালী মেয়েদের চায়ের দোকানে এই কারবার। 'কানছি' কাচের গ্লাসে মদ এনে দেয়।

এইভাবে সারাদিনে সৌরাংগ কতবার মদ খায়—তার হিসাব নেই। এমনি সময়ে সৌরাংগর ক্লীনার অমরা ভিজতে ভিজতে দোকানে এসে উঠল। প্যাসেঞ্জার সংগ্রহের চেষ্টায় সে এতক্ষণ বাইরে ছিল। সৌরাংগকে মদ খেতে দেখে বিমর্ষ মুখে দাঁড়িয়ে থাকে অমরা বলে—আবার ওই গুসান খাইতে লাইছ?

সৌরাংগ সে কথা কাণে তোলে না। এক নিঃশ্বাসে সে অবশিষ্ট মদটুকু খেয়ে ফেলে।

পূর্ব বাংলার মাটির মানুষ অমরা। দেশ বিভাগের অভিশাপ মাথায় করে ঘুরতে ঘুরতে এসে সৌরাংগর কাছে ঠাঁই পেয়েছে। একদা একই গ্রামে বাড়ী ছিল উভয়ের। অবশ্য সৌরাংগ দেশ ছেড়েছে বহুকাল আগে।

অম্বরা বলে—কি সুখ যে পাও ওই গুলান গিলিয়া—হে কইতে পারুম না। গৌরাংগ অম্বরার এই বন্ধুের অনুযোগ শুনে হাসে। বলে—মদ খেতে আবার সুখ দুঃখ কি। খাবি এক গ্লাস ?

—কাম নাই আমার তুমিই খাও ! জবাব দেয় অম্বরা।

বর্ষা থামবার লক্ষণ নেই। পায়ের নীচে আর মাথার উপরে গভীর মেঘের আস্তরণে ঢাকা পড়েছে শহর দার্জিলিঙ। এ বর্ষায় যাত্রী পাওয়া মুস্কিল। অম্বরা নড়বড়ে বেঞ্চির উপরে বসে এক কাপ চা নিয়ে গায়ের আর মাথার জল মুছতে মুছতে বলে,

— যেভাবে নামছে তাতে 'স্লিপ' অইব মনে লয়—'

পাহাড়ে 'স্লিপ' হলে রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে। সমতলের যোগসূত্র ছিন্ন হয়ে যাবে, যতক্ষণ না পি, ডব্লিউ, ডির লোক-জন এসে ধস্ না সরিয়ে দেয়। তবু যেতে হবে শিলিগুড়ি যাত্রী চাই অম্বরার। দুজন একজন যা পাওয়া যায়।

চায়ের কাপটা তাড়াতাড়ি শেষ করে বাইরে এসে দাঁড়াল অম্বরা। ভাঙা গলায় বিচিত্র সুর তুলে সে চীৎকার করল—শিলিগুড়ি—শিলিগুড়ি—

আর আশ্চর্য। আশ্চর্যই বলতে হবে, অম্বরার চীৎকারে আকৃষ্ট হয়ে দুজন যাত্রী এগিয়ে এল। বর্ষাতি ঢাকা দুজন যাত্রী। স্বামী-স্ত্রী। এই দুর্যোগের মধ্যেও শিলিগুড়ি যাবে ওরা। অম্বরা অবাক না হয়ে পারে না। আজ শিলিগুড়ি ফিরতে পারবে এ ভরসা ছিল না তার। যাত্রী না পেলে শুধু শুধু তেল পোড়ানোর চেয়ে হোটেলে খেয়ে ড্রাইভারস এসোসিয়েশনের ক্লাব ঘরে রাত কাটানো অনেক ভাল। অথচ যাত্রী পেয়ে গেল অম্বরা। খুশি হল সে মনে মনে। শিলিগুড়ির উপান্তে পল্লী ভাবগ্রাম কলোনীতে একটা ছোট টিনের ঘরে কুসুম তার জন্য রাতদুপুর অবধি জেগে বসে থাকবে। গৌরাংগের ওসব বালাই নেই। ঘর ফাঁকা। ফিরে গিয়ে ঘরের মেঝেতে বেহুঁস হয়ে পড়ে থাকবে। পাশের বাড়ীর বুড়ী যদি চারটি ভাত রেখে যায় আর গৌরাংগের যদি হুঁশ থাকে, তবে রাতে খাবে, নয়তো কানহির দোকানের পরোটা আর মাংসই আজকের মত শেষ খাওয়া।

বেলা ঠাহর করতে পারল না অম্বরা।

তবে বেশী বেলা নেই আর। যাত্রী দুটিকে গাড়ীতে বসিয়ে রেখে গৌরাংগকে ঠেলা দেয় সে সজোরে,

—ওঠো, এই অবেলায় ঘুমাইতে লইছ কান্ ? পিসিনলার বসছে গাড়ীতে।

গৌরাংগ কানহির দোকানের বেঞ্চির উপর একটা কম্বল পেতে শুয়ে পড়েছিল। চোখ জড়িয়ে এসেছিল বর্ষার ঠাণ্ডা আমেজে। অম্বরার চীৎকারে অপ্রসন্ন মুখে উঠে বসল,

—তুই একটা চীল অম্বরা। এই বর্ষাতেও প্যাসেঞ্জার ধরেছিস !

সেকথার জবাব দিল না অম্বরা। যাত্রার জন্য প্রস্তুত হতে থাকে সে। ভিজে জামা প্যান্ট খুলে পোটলা বাঁধে একটা। গাড়ীতে গিয়ে টায়ারের তেল মাপল। অগত্যা গৌরাংগকেও উঠতে হয়।

একটা বিবর্ণ রঙচটা বর্ষাতি গায়ে চাপিয়ে ড্রাইভিং সিটের দরজা খুলতে গিয়ে সে থমকে দাঁড়াল। ভাল করে চোখ মুছে ঘুম ঘুম ভাবটা কাটিয়ে সে ভাল করে তাকাল পিছনের সিটে বসা মহিলা যাত্রীটির দিকে। চোখ বন্ধ করল গৌরাংগ।

কানহির দোকানের মদটা নিশ্চয়ই আজ কড়া ছিল।

সশব্দে দরজা বন্ধ করে গাড়ীতে স্টার্ট দিল গৌরাংগ। একটা কর্কশ গর্জন তুলে একরাশ ধোঁয়া ছাড়ে পুরনো মডেলের টাক্সিখানা।

সামনের পথ ঝাপসা হয়ে রয়েছে অবিশ্রান্ত বর্ষণের ফলে।

পিছনের সিটের আরোহিণী এবং তার সঙ্গীর মুখ দেখতে পাচ্ছে না গৌরাংগ।

অবশ্য ড্রাইভিং সিটের সাইড গ্লাসটা নামিয়ে দিয়ে ওদের ভাল করে দেখতে পারে সে—কিন্তু উৎসাহ পাচ্ছে না গৌরাংগ।

কিন্তু ভুল দেখেনি তো গৌরাংগ?

ওস্তা লড়ানো চোখের বিভ্রম কিংবা কানছির দোকানের উগ্র দেশী মদের ক্রিয়া মস্তিষ্কের কোষে কোষে কাজ করে চলেছে এখনও? ঠিকমত ভাবতে চেষ্টা করে সে।

গ্লাস নামিয়ে তার গাড়ীর আরোহিণীর চেহারা না দেখেও, গৌরাংগ নির্ভুল বলে দিতে পারে—এখন ওই যাত্রিণীর কপালের দুপাশে দু গোছা ঘুংরো চুল খোঁপার বাঁধন থেকে আলগা হয়ে উড়ছে গাড়ীর গতিবেগের সংগে। ওই দু গোছা ঘুংরো চুল কোনদিনই খোঁপার বাঁধনে ধরা পড়ে না। দারুণ দুটো নিটোল টোল পড়ে গালে। আর চিবুকের পাশে যে কালো তিল—ওটা নিপুণ প্রসাধন কৌশল নয়, ওটা ওর সহজাত। গাড়ীর মধ্যে একটা রিমঝিম্ সুগন্ধি রেশ। দামী সেন্ট ব্যবহার করেছেন ভদ্রমহিলা। দামী সেন্টের উপরই প্রবল আসক্তি মহিলাটির। এ খবর বোধ হয় ওই ভদ্রলোকের চেয়ে গৌরাংগই বেশী জানে।

একটা মেয়ের স্বপ্ন ঘনাতে থাকে গৌরাংগের চোখে। কানছির দোকানের চোলাই মদের আবিলতা নয়—এ অনুভূতি অন্যরকম। এ যেন অনেক গরমের পর এক ঝলক ঠাণ্ডা বাতাসের স্পর্শ শিহরণ।

গাড়ী কার্সিয়ঙ ছাড়িয়ে গেল।

ঘরে ঘরে সাজানো মেঘের ফাঁক দিয়ে সন্ধ্যা নেমেছে অনেকক্ষণ। অথচ বর্ষণের বিরাম নেই। আঁকা বাঁকা পথ [illegible] গতিতে গাড়ী নামছে ডাইনে। বর্ষার জল পেয়ে [illegible] এসে ভীড় জমিয়েছে পথের আলোতে।

গৌরাংগ আর শিছন ফিরে তাকায়নি। একটা হিংস্র আক্রোশে স্টিয়ারিং হুইল চেপে ধরে একটানা গাড়ী চালাচ্ছে সে। সারাদিন স্নানাহার হয়নি। মাথার অগোছাল একরোখা কক্ষ চুলে মুখ ঢেকে গেছে গৌরাংগের।

অথচ এমন ছিল না।

গৌরাংগ নিজেই ভাবে আর অবাক হয়। এই যে পথের মারাত্মক 'সোনাই' গুলি পার হতে গিয়ে একটা আশ্চর্য উন্মাদনায় তার শরীর কাঁপছে থর থর করে, স্টিয়ারিং হুইল একটুখানি ঘুরিয়ে গাড়ীখানাকে গড়িয়ে দিতে ইচ্ছা করছে পাহাড়ের অতলগর্ভ খাদে, এমন আগে হত না কোনদিন।

একটা নরম হৃদয় ছিল গৌরাংগের। মধুর আসক্তি ছিল তার ঘরে ফেরার জন্য। অবশ্য সে সময়ও তাকে গাড়ী চালাতে হত দার্জিলিঙ লাইনে। অন্যদের মত সেও ব্যস্ত হয়ে উঠত শিলিগুড়ি ফেরার জন্য।

বাবা বেঁচে ছিলেন তখন। নিজে পছন্দ করে বিয়ে-দিয়েছিলেন গৌরাংগের। প্রথম যৌবনের সেই ভুলে যাওয়া দিনগুলি স্মরণ করল। সবখানি হৃদয় দিয়ে একান্ত আপন করেই সে কাছে পেতে চেয়েছিল বীথিকে। সারাদিনের শ্রমক্লান্ত শরীর নিয়ে ঘরে ফিরে আসত গৌরাংগ। বীথির কমনীয় মাধুর্য্য অকৃত্রিম কথার গুঞ্জনে ভরে তুলতে চাইত সেই অবসর মুহূর্তের সন্ধ্যাগুলি। ছাদের পাশের শিউলি গাছ থেকে চোখের জলের মত টুপ টুপ করে ঝরে পড়ত ফুলগুলি। হাসনুহেনার মদির গন্ধে ভারাক্রান্ত হত সান্ধ্যবাতাস।

—এমনি সময়ে ছাদের ওপর শুয়ে গৌরাংগ বলত,

—এমন চমৎকার সন্ধ্যা কিসের অভাবে মাটি হয়ে যাচ্ছে বলতো? বীথি জিজ্ঞাসা করতো—কিসের অভাবে?

—তোমার গুণ গুণ সুরের গানের অভাবে!

বীথি তাচ্ছিল্য ভরে বলতো—মোটর ড্রাইভার হলেও

তোমার রুচি আছে তা স্বীকার করি। তুমি লেখাপড়া শিখলে না কেন?

সংগে সংগে নিভে যেত গৌরাংগ। ঝুরিয়ে যেত এক নিমেষে। বিয়ের পর থেকেই এ এক নিদারুণ অভিযোগ বীথির। দাম্পত্য জীবনে এই ফাঁকটুকু আর ভরে দিতে পারেনি গৌরাংগ। বীথি বিদুষী। তার আধুনিকতা এবং অধ্যয়নস্পৃহাকে সম্ভ্রমের চোখে দেখে গৌরাংগ। শিক্ষার অভাব থাকলেও তার ভালবাসার তো কোন খাদ নেই। একটা পাশবিক উত্তেজনায় উঠে বসত গৌরাংগ। কপালের পাশের রগ দুটো দপ দপ করে উঠত। চলে যেতে যেতে ও কপাল চেপে ধরত প্রাণপণ শক্তিতে। বীথি বলে—কি হল গান শুনবে না?

বাজের মত শোনাতো বীথির কণ্ঠস্বর। গৌরাংগ না তাকিয়ে বলত—না।

যেতে যেতেই বলত গৌরাংগ - বিয়ের পর থেকেই তোমার এই অভিযোগের জবাব খুঁজছি আমি।

রূঢ় কণ্ঠে বীথি বলে এর কোন জবাব নেই বলে আজই দিতে পারনি।

—পারি গৌরাংগ বলত - তোমার মত শিক্ষিতাকে সে জবাব দিতে না পারার কারণও আমার অশিক্ষা।

আর কথা কাটাকাটি না করে দ্রুত পায়ে চলে যায় গৌরাংগ। উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায় ছোট শহরের পথে পথে। গভীর রাতে আবার যখন ঘরে ফিরে আসে—তখন দেশী মদের উগ্র নেশায় তার পা টলছে।

বীথি ঘুমিয়ে পড়েছে। বুকের উপর একখানা খোলা বই। এলোমেলো ভংগীতে রয়েছে বীথি। কপালের উপর খোলা চুলের একগোছা বাতাসে উড়ছে। লোভাতুর চোখে তাকিয়ে থাকে সে বীথির নিদ্রাবিবিশ শরীরের দিকে। একটা অবাধ্য আবেগে থরথর করে কাঁপে গৌরাংগ।

বীথির মাথার কাছে বসে ওর কপাল থেকে চুলের গোছা সরিয়ে দিতেই বীথি উঠে বসে।

বলে তুমি মদ খেয়েছ? ছি, ছি,—

গৌরাংগর দুই চোখ জ্বলে ওঠে একটা হিংস্র বন্য জন্তুর মত। কঠিন হাতে বীথির দুই কাঁধ ঘরে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে বলে—বীথি।

—ছাড়ো ছাড়ো, ড্রাইভারী করলে এত ছোটলোক হতে হয় তা জানতাম না।

—বীথি।

—মারবে নাকি? তোমাকে বিশ্বাস নেই। হয়তো তাও পারো তুমি। ছাড়াধাওয়া জানোয়ারের মত টলতে টলতে ফিরে আসে গৌরাংগ। কি ভেবে যেন ফিরে দাঁড়ায় এক মুহূর্ত। আর ঠিক সেই মুহূর্তে বীথি দুই হাত আড়াআড়ি করে গৌরাংগর যাওয়ার পথ বন্ধ করে বলে,

—কি জন্য এসেছিলে বলে যাও—।

দুর্বোধ্য লাগে গৌরাংগর। অবাক চোখে তাকায় সে বীথির দিকে। মাঝরাতে স্বামী কেন এসেছিল স্ত্রীর কাছে এর জবাব অন্ততঃ গৌরাংগর জানা নেই।

—পথ ছাড়ো বীথি। যেতে দাও—

দু হাতে পথ বন্ধ রেখে বীথি বলে—আগে আমার কথার জবাব দাও—

—জবাব? করুণ শোনায় গৌরাংগর কণ্ঠস্বর।—তুমি নিজেকেই এ প্রশ্ন করো, জবাব পাবে।

আকাশের কান্না থামবে না আজ। ধারাবর্ষণের বিরাম নেই। পাড়ী ভিনবাড়িয়া ছাড়িয়া গেছে। বৃষ্টিভেজা পাথর কাটা পথে পিছলে পড়ছে হেড লাইটের তীব্র আলো। যদি এখন গাড়ীখানাকে ফেলে দেওয়া যায়—পাহাড়ের খাদে? গৌরাংগ ভাবে মনে মনে।

তাহলে কেউ জানতে পারবে না—কেউ সনাক্ত করতে পারবে না কোনদিন। এই গভীর রাতে চিরতরে হারিয়ে

যাক্ গৌরাঙ্গ। ব্যর্থতার অভিশাপে সমাধি হোক একটা অপূরণীয় কামনার।

সহসা একটা আওয়াজ করে পথের মাঝখানেই থেমে গেল গাড়ী। প্রবল ঝাঁকুনীতে দুলে উঠল সকলে। গৌরাঙ্গ প্রাণপণে ব্রেক চেপে ধরেছে।

অরুণা বলে—কি অইছে, 'বিরিক' মারলা ক্যান্?

অরুণার মুখের দিকে বোকার মত তাকাল সে। তাই তো! ব্রেক কষল কেন! আরোহী ভদ্রলোকও উদ্বেগে ঝুঁকে পড়লেন সামনের দিকে—কি হল ড্রাইভার?

—ও কিছু না। আপনি বসুন স্যার!

সত্যি ও কিছু নয়। চোখের বিভ্রম। মনে মনে ভাবে গৌরাঙ্গ। এই যে দ্রুত ধাবমান গাড়ীর সামনে একটা ছায়ামূর্তি দু হাত মেলে তার পথরোধ করে দাঁড়াতে চাইছে—ও কিছু নয়। মনের ভাবনাই ছায়ায় প্রতিফলিত হচ্ছে। দু হাতে চোখ মুছে ভাল করে তাকাল সে সামনের প্রসারিত পথের দিকে—তারপর আবার গাড়ী ছেড়ে দিল।

বহুদিন আগে সেই রাতে দুই হাতে পথরোধ করে বীথিই বা কি জানবার জন্য অমন ব্যাকুল হয়েছিল—এ জিজ্ঞাসা গৌরাঙ্গেরও। কিন্তু সে প্রশ্ন তাকে আর করা হয়নি। এ জীবনে আর করাও হবে না। সেদিন সেই কম্পমের মধ্যেও কি বীথির মুষ্টিবদ্ধ মন একবারের জন্যও গৌরাঙ্গের দিকে মুখ তুলেছিল। কে জানে।

—অরুণা!

একটা ভয়ার্ত চীৎকার তুলে আবার ব্রেক চাপল গৌরাঙ্গ। বিপজ্জনকভাবে টাল খেল গাড়ীখানা। গৌরাঙ্গ কাঁপছে থর থর করে। যাত্রী ভদ্রলোক এবার নেমে ওঠেন—ইয়ারকি পেয়েছ? চলো সিলিগুড়ি। বলা দেখাচ্ছি!

অরুণা বলে—ইঞ্জিন একটু খারাপ আছে বাবু। আপনার [illegible]। কিছু অইব না।

[illegible] ঝাঁঝালো স্বরে বলে—ব্যাপারটা কি কও দেখি!

গৌরাঙ্গ বলে—সামনের দিকে তাকিয়ে ছাখতো কেউ দাঁড়িয়ে আছে নাকি?

—কয় পেগাস খাইছিলা কালছির দোকানে? অরুণা রসিকতা করে।

গৌরাঙ্গ বলে—যাদে বকিসনি অরুণা। আমি নতুন মদ খেয়ে গাড়ী চালাচ্ছি নাকি?

তা বটে। তবে আজ এমন হচ্ছে কেন?

শিলিগুড়ি স্টেশনে এসে যখন পৌঁছুলো—তখন রাত বারোটা বেজে গেছে। ভদ্রলোক নেমে কুলী ডাকতে গেলেন স্টেশনের ভিতর। গৌরাঙ্গ গাড়ীর বনেট খুলে কিছু একটা পরীক্ষা করতে সুরু করল। এই যান্ত্রিক গোলযোগটুকু এখনই ঠিক না করলেই নয়।

—আপনার ভাড়াটা নিন।

উগ্র সেন্টের গন্ধ। একটা উষ্ণ সান্নিধ্যের আভাষ। ভাড়া দেওয়ার তাগিদের চেয়েও কণ্ঠস্বরে ফুটে বের হল একটা সকাতর অনুনয়, মুখ তোল একবার। তাকাও আমার দিকে। সময় বয়ে যাচ্ছে।

—আপনার ভাড়াটা।

—ক্লীনারের কাছে দিন।

ইঞ্জিনের অন্ধকার গর্ভে মুখ রেখে জবাব দিল গৌরাঙ্গ। যেন অনিচ্ছার লজ্জায় মুখ লুকিয়ে রেখেছে সে। গৌরাঙ্গ ভাবে মনে মনে। তোমার সকল লজ্জা আমি ডেকে নিয়েছি। বিষামৃতধারী জীবনের গরলটুকুই গ্রহণ করলাম আমি। আমি নীলকণ্ঠ। তুমি শুধু অমৃতের স্বাদ গ্রহণ করো।

মনে মনে প্রার্থনার মত উচ্চারণ করে সে।

চলে গেছে ওরা।

সোজা হয়ে দাঁড়াতেই গৌরাঙ্গর নজর পড়ল হেড লাইটের উপর। গৌরাঙ্গ হেসে খুন। বলে—ছাখ অরুণা, এইটাই আলিয়েছে আমাকে সারা রাস্তা।

অরুণা সকৌতুকে দেখল। একটা লম্বা কড়িং ডানা মেলে বসে আছে হেড লাইটের উপর। দুইজনেই একসঙ্গে হাসে।

তারপর অরুণা বিজ্ঞের মত বলে—"আলো দেখলেই অগো ঝাঁপ দিয়া পড়তে অইব। আর মরণেও নিস্তার—"

জোয়ার

উপন্যাস
পরবর্তের পর

বিজন কুমার ঘোষ

॥ দশ ॥

হাওড়া ষ্টেশনে যখন পৌঁছুল তখনো ভেসী প্যাসেঞ্জারের স্রোত তত তীব্র হয়নি। ট্যাক্সি পেতে কোন অসুবিধা হল না। ভিতরে ঢুকে দরজা ফাঁক রেখে কেয়া বলল, এসো—

—আমি অন্য ট্যাক্সিতে যাব।—আলোক ট্যাক্সিওয়ালাকে গতিসম্পন্ন হতে ইঙ্গিত করল। হাওড়া পোলের মাঝামাঝি একবার দেখতে পেল কেয়াকে। এক পাশে চুপটি করে বসে আছে। তীব্র ইচ্ছে হল ট্যাক্সিওয়ালাকে বলে সামনের ট্যাক্সিটাকে ফলো করতে। কিন্তু পরক্ষণেই লজ্জা পেল। কি দরকার? ষ্ট্র্যাণ্ড রোডে পড়ে আর দেখতে পেল না। তবু অবাধ্য চোখ দুটো আলোককে না জানিয়ে এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করল। কিন্তু আর খুঁজে পাওয়া গেল না। গাড়ির অরেঞ্জ মিশে গেছে নিখুঁত ভাবে। ডালহৌসী স্কোয়ার। অফিসের সামনে গাড়িটাকে থামতে বলল। লিফটে চড়ে চারতলায় এল। অফিস ঘর তখন ঘনাঘোলা চলছে। দারোয়ান আর্দালী বাবুদের হঠাৎ চমকে উঠল রায়সাহেবকে দেখে। অফিস দশটায়। এখন বাজে সাড়ে আটটা। আলোক বারান্দার সামনে পায়চারী করল বার কয়েক। তারপর কি মনে হওয়ায় লম্বা করিডরে খটখট শব্দ তুলে নিজের চেম্বারে এল। দরজা খোলা। সাবান কেনা দিয়ে মেঝেটাকে পালিশ করা হচ্ছে। লোকটা আড়ষ্ট হয়ে উঠে দাঁড়াল সেলামের ভঙ্গীতে। আলোক শূন্যদৃষ্টিতে যোষা সেক্রেটারীয়েট টেবিলটার দিকে তাকাল। একবার ব্লিডলাইং চেয়ার, রঙিন পেপার ওয়েট, ইলেকট্রিক কলিং বেল, কাগজ-পত্র, ফাইলের দিকে এক লহমায় যতটা দেখা যায় দেখে নিল। সব ঠিক আছে, যেখানকার যা। শুধু এইগুলির মালিকই বেঠিক। অফিস করা এখন অসম্ভব। ছুটি নিতে হবে কিছুদিন। দরকার হয় বাইরে যাবে। এবার মধুপুর কিম্বা শিমুলতলায়। সমস্ত শক্তি দুয়ে নতুন মানুষের মত এই ঘর আলোকিত করবে। সিঁড়িতে শব্দের তরঙ্গ তুলে কের নিচে নেমে এল। একটা ট্যাক্সি ওর সামনেই বাঁক ঘুরবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল। আলোক ইশারায় গাড়িটাকে রুদ্ধ করে ভিতরে ঢুকে গেল।—চলো খিদিরপুর। লাটভবনের পাশ কাটিয়ে ট্রামের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ট্যাক্সিটা অবশেষে খিদিরপুর পোল পার হয়ে গতিবেগে জিজ্ঞাসা স্পষ্ট করে তুলল।—চলো যোধিনপুর। আলোক যেন কি বলতে চায় নিজের কাছেই অস্পষ্ট। যেন যোধিনপুর অনেক দূর। যেতে যেতে অফিস কামাই করা উচিত অথবা কিভাবে সময় কাটানো যায়, এ সম্পর্কে ভাববার প্রচুর অবসর পাওয়া যাবে। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে যোধিনপুর চলে এল। ট্যাক্সির চাকার ডাকার আবার অস্থিরতা। শেষে ঠিক করতে না পেরে বলেই ফেলল অনেক ডলাকার কথাটা, চলো বেহালা। এবার যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত। মন স্থির হয়ে গেছে। মাকেরহাট পোলের ওপর উঠতেই বিশাল

টাকশাল নজরে পড়ল। টাকশালের সামনে ব্রিফিউজি কলোনীতে আলোক আগে মাঝে মাঝে আসত। ওখানে আলোকের এক বন্ধু ছিল। সে তেলতেলে জীবনে ইতরতা দিয়ে অনেক দূরে চলে গেছে। ক্যানিং-এ। হঠাৎ কেন যেন তার কথা মনে পড়ল। কতদিন এখানে এসেছিল ভিসের নাড়ু খাওয়ার লোভে। আজ পার্শ্বকাটা বড্ড বেশী দাগা দিচ্ছে। আলোক কত রকমের ঘড়ির খেলার চিড়িয়াখানার জীব বনে গেছে। অথচ সে যাপনের মধ্যে ঘুরির মতন স্বচ্ছন্দ। বছরে ক'টা দিন ক্লাশ করত কর গুণে বলে দেওয়া যেত। শেষে বইএর ব্যবসা, বাড়ি ভাড়া না দিতে পারা, চোরের মত লুকিয়ে বেড়ানো—পরিশেষে উধাও। উধাও অবস্থায় চিরকুট এসেছিল—আলোক, অংশী বন্ধুকে ভুলে গেলে? সাক্ষে হয়েছে মৃণাল। ক্যানিংএর খালিপে আবের মত ছড়ান ছিটোন নদীগুলিতে মাছের মত সাঁতার দিয়ে বেড়ায় এখন। এসপ্লানেড থেকে অনেক দূরে সুন্দরবনের বাঘ নদীতে রাত্রি কাটায়। জোয়ারের জন্যে অপেক্ষা করে। হয়ত যখন জ্যোৎস্নায় দুই পারের বন পৃথিবীর আদিমতম রহস্য ফুটে ওঠে। পাতার ফাঁকে বিদ্যুতের মত ছোরা কাটা ঝলক দিয়েই উধাও হয়। দূরে কোথাও হরিণের গায়ের গন্ধ পাওয়া যায়। সুন্দর বাঁশী বাজায় মৃণাল। হয়ত আলো সারারাত না ঘুমিয়ে বাঘ হরিণ নদী জ্যোৎস্নার গন্ধে বাঁশী বাজায়। আলোক সেখানে কোনদিনও যেতে পারবে না। কোনও দিন না।

—এই রোকবে—

বন্দরালী নম্বর বোড এসে গেছে। বর্ষাতি ভাড়া মিটিয়ে এখানেই নেমে পড়ল। মন স্থির হয়ে গেছে। আর কোন দ্বিধাদ্বন্দ্ব নেই। ট্যাক্সিটা ছেড়ে না দিলেই হত। ঠিক আছে, আরেকটা খুঁজে নেওয়া যাবে। বাড়ি থাকবে কি এখন? প্রায় ন'টা বাজে। বিনতিদের হাড় জিরজিরে একটা মিষ্টির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আলোকের সমুদ্র বলে যেন কোন পদার্থ নেই। পারলে কুকুরকেই জিজ্ঞাসা করে ফেলে, বিনতি বাড়ি আছে? হাসি পেল দারুণ। যেন দারুণ দাগা পেয়ে সম্ভব অসম্ভবের সীমা হারিয়ে ফেলেছে। সত্যিই কি দারুণ? কেয়া হারিয়ে যাওয়া কি পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হয়ে যাওয়ার মত ভয়াবহ? না। মনটাকে চাঙা করে তোলবার জন্যেই আলোকের চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হল—না। পৃথিবীর গতি স্তব্ধ হওয়া নয়, অবশ্যে ঘড়িটা বন্ধ হয়ে যাবার মতই স্বাভাবিক। কেয়া বরং উপকার-ই করল। ঘড়িটাকে আবার দম দেওয়া যাবে। আলোকের এখন মৃণাল হতেও বাধা নেই। সুন্দরবনে জ্যোৎস্নায় বাঘের ডাক শোনা—যেন নিঃশ্বাসের মত অতি সহজ। আলোকের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমেছে। তাকিয়ে দেখল চারদিকে খুশির বাতাস। ভাল লাগছে। চারদিকটা আবার ভাল করে লক্ষ্য করল। যেন এই মাত্র আজনের বয়লার থেকে ভোরের সবুজ মাঠে ছিটকে পড়ল। কি দরকার অসম্ভবের পিছনে ঘুরে মরে? তার চেয়ে স্বস্তি অনেক ভাল। জীবনে শান্তি স্নিগ্ধতার প্রয়োজন অপরিমেয়। যেন আজনের বয়লার থেকে ভোরের সবুজ মাঠে ছিটকে আসায় আলোকের এই দিব্যজ্ঞান লাভ হল। তাহলে বিনতির কাছেই যাচ্ছি। ইস্ট আর ওয়েস্ট হোম ইজ দ্য বেস্ট—কথাটা মনে পড়ায় প্রবল সুখের সঞ্চার হল। বিনতি আমার হোম। সুতরাং বিনতির সঙ্গে আজই আমার বোঝাপড়া হয়ে যাক। কার সঙ্গে বোঝাপড়া? না বটগাছের নিচের কালো দীঘির মত—গলান কাচের মত জলের সঙ্গে আমার বোঝাপড়া। সেই কবিতাটির লাইন মনে পড়েছে—কোন্ ভুলে যায় হারিয়েছিল চাবি। চাবি এবার খুঁজে পেয়েছে। আর হারাবার মত দ্বিতীয়বার ভুল করবে না। মনটা গভীর হয়ে উঠেছে অজান্তে। অনেক দূরে চলে যাবে বিনতিকে নিয়ে। এই তো এসেই গেছে প্রায়। পানা পুকুরটা দেখা যাচ্ছে। কিন্তু হঠাৎ এত ছোট হয়ে গেল

কেন? লক্ষ্য করল লোটা তিনেক লম্বা পুকুরের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে। রাবিশ ফেলা হচ্ছে। কচুরিপানার রং কেমন ধসুর বিবর্ণ। ওদের গোপন ভাষা যেন আলোক এক লহমায় পড়ে ফেলল। আজকাল নতুন টাকাওয়ালারা এমন করছে। অল্প দামে পুরোন পুকুর কিনে রাবিশ ফেলে ভরাট করছে। তারপর আনকোরা ডিজাইনের তিনতলা চারতলা তুলছে। হঠাৎ চোখ মেলে একটা ভারী রোলার দেখতে পেয়ে আলোক সরে দাঁড়াল। ভারী রোলারটা গুড়গুড় ধ্বনি তুলতে তুলতে এগিয়ে আসছে। আলোক দেখতে পেল জমাটী নক্সর রোডের লাল খোয়া ওঠা পুরোন রাস্তার ওপর কালো রঙের মসৃণ পিচ পড়তে শুরু করেছে। মুচমুচ শব্দ হচ্ছে। পুরোন খোয়া ওঠা রাস্তাটা কি আলোকের কাছে সোপনে নালিশ করছে? আর একটু এগিয়েই দেখতে পেল সমুখ মাঠের মধ্যে টেলিগ্রাফের তার চলে গেছে—মাইলের পর মাইল।

আলোক দাঁড়িয়ে পড়ল। সমুখ মাঠের মধ্যে নিঃসঙ্গ টেলিগ্রাফের তারগুলিকে ভালই লাগছে। এই মুহূর্তে কি করবে বুঝতে পারল না। মিনতি একদিন বলেছিল, আমাদের এখানেও অমির দর বাড়ছে, সহর হচ্ছে। কলকাতা নাকি পা' বাড়া দিচ্ছে। নিজের মধ্যে আটছে না—ইত্যাদি। আলোক আরো লক্ষ্য করল অনেক দূরে সারি সারি তাঁবু, একটা টাওয়ার। কতগুলি ছোট ছোট এ্যারোপ্লেন এ্যানো-ফিলিস মশার কারখানা বাটিতে বসে আছে। আলোকের বিস্ময় বোধটা এতদিনে ভোঁতা হয়ে গেছে। আগের মত চোখ দুটো আর বিস্ফারিত হয় না। শুধু মনে হল হঠাৎও নিজের মধ্যে আটছে না? বেহালার আকাশে সাদা মেঘের ভেলার সঙ্গে এ্যানোফিলিস এ্যারোপ্লেনও উড়বে। মন্দ কি। কেউ রেসের পর্দায় ঘুষের আঁঠা কাড়বে। তবু ক্ষতি নেই। কেননা সহর বাড়ছে, সেই সঙ্গে অমির দাম। সবাই যা চায়। এই সবাইএর মধ্যে কে কে পড়ে? ভাবতে ভাবতে আলোক এগোল। পুকুরটা ছাড়িয়ে সরু পথ দিয়ে খা' আসতেই নিবারণবাবুর বাড়িটা দেখতে পেল। সেই নি বাবু, যিনি অভাব অনটনের মধ্যেও একটি কোমল সমস্ত পুষে রেখেছেন। দিনটা সুন্দর। স্টেনলেস ই ঝক্‌ঝকে রোদ। বেশ গরম। তবে বাস অবশ্য না শরীরে। হাওয়ার ঘুরন্ত বাসের ঝুলকালি মেখে ঘন ঘন। এই মুহূর্তে কেউ নাইরে নেই। আছে সব মধ্যে। আলোক চোরের মত পা' টিপে টিপে উঠো হল। বারান্দায় উঠে একপাশে মোড়ায় বসল। কয়েকটা মিনিট কেটে গেল। কেউ তার উপস্থিতি টে না। আলোকের বেশ মজা লাগছে। রান্নাঘরে অ খুন্তির আওয়াজ। এঘরে অসুস্থ বাবের কোঁকানি। মেয়েদের অবিরাম ঝগড়া। হ্যাঁ, এর মধ্যে মিনতির পাওয়া যাচ্ছে। স্থির আর সুরেলা। কেয়ার মত কেবে নয়। যুক্তিতে জেতে অভিমানে এই গলা পড়তে জানে না। থাক, আবার কেয়া কেন? অন্যায় ঘুচে গেছে। এবার মিনতির পালা। সি কয়েক ঘণ্টার জন্যে আলোক যেন দিশাহারা হয়ে গি কিন্তু তাবার জন্য খুঁড়ে বেদনা জাগানো কেন? নগরের গঙ্গার ঘাটে সেই মন যাহ করে ফিরে এ গাছের মাথাগুলি প্রবল বাতাসে আন্দোলিত হচ্ছে নীল আকাশ। এত রোদ আকাশ ছুড়ে যে চোখ যায়। বড় হালকা লাগছে এখন। কচুরিপানার পা মনটা রোদের মধ্যে, ঘন নীলের মধ্যে, হাওয়ার মধ্যে উড়ছে। ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। একেক সময় প্রচণ্ড। চাপে কচুরিপানার পাতাটা মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়তে। পরক্ষণেই উদ্বেল উর্দ্ধশ্বাসে আকাশে নীল। যেন। সঙ্গে ব্যাকুলতার প্রবল পাল্লা। কে ডাকে, কে ডেকে

—আরে আপনি?

চমকে উঠল আলোক।

—কখন এলেন?—শাড়িটা ঠিক করতে করতে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে মিনতি।

—অনেকক্ষণ।—আলোকের স্বরে অভিমান চাপা রইল না। এই সাত মিনিটের মধ্যে ঘর থেকে একজনও বাইরে না আসাতে ও নানান রকম অর্থ করছিল। অবশ্য কোন যুক্তি ছিল না শুধু ঘরপোড়া গরুর স্বভাব-ই এই।

—খুব ভাল হল। অনেকদিন আপনি আসেন না।—মিনতির শাড়ি ঠিক করা হয়ে গেছে। এবার চুল পরিচর্যা। চিরুনীটা অতি দ্রুত সঞ্চালন করায় বোঝা গেল ভিতরটা খুশি হয়েছে।

—তোমার ইস্কুল নেই?

—আছে তো।

—তাহলে চল একসাথে বেরোই—

ঠিক আছে। পরীক্ষা হয়ে গেছে, ইস্কুলে একটু দেরী করে গেলেও চলবে।

—না না, দেরী নয়। কাজ আছে।

রান্নাঘর থেকে সাড়া পেয়ে আরতিও বেরিয়ে এসেছে, এ কী—আপনি?

—কেন, আসতে নেই?

—তা কেন? আপনি-ই তো আসেন না—

হাসল আলোক।

—দেখেছি এলেই তুমি শুধু শুধু ঝগড়া কর। সেই জন্যে তো আসি না—

ঝগড়া না করার ফলও তো দেখেছি, তাই বলনাম।

—তোমার দিদিও তো ঝগড়া করতে পারত। কই সে তো চুপ করে আছে?

—দিদির কপালে অনেক দুঃখ—

হেসে উঠল সবাই।

মিনতি তাড়া দিল, চুপ কর ফালিস।

—আহা, দিদির দুঃখটা বলতেই দাও না।—আলোক সমর্থন করল।

—দিদির দুঃখ দিদি বুঝবে। রান্নাঘরে আয়তিটা।—মিনতির মন্তব্য।

—আহা যার জন্যে চুরি করি সেই বলে চোর!—গোছ করে পাশে একটি আসন রাখল আরতি।

গণ্ডগোল শুনে সব কটি ভাইবোন-ই বেরিয়ে এসেছে। আলোককে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে দেখছে। লজ্জা পেল। জিজ্ঞাসা করল, তোমার বাবা কোথায়। অফিসে গেছেন শুনে নিশ্চিন্ত হল। কেরানের বাড়িতে এই বয়সের ছাট্টা অতি নিরামিষ। রায় সাহেব কথার পিঠে অনেক সময় কথা জুগিয়ে দেন। কিন্তু এই বাড়ির পরিবেশ সম্পূর্ণ আলাদা। এখানে একটু বেফাস কথা বললেই সঙ্গে সঙ্গে মুখ লাল হয়ে যায়।

মিনতি কাজের কথাটা পাড়ল, আমাদের এখানে খেয়ে যান। আরতি মোচার ঘন্ট রেঁধেছে—

—আমার রান্না কি পছন্দ হবে?—আরতি আবার ফোড়ং কাটল।

—দেখলে?—আলোক মিনতির দিকে তাকাল।

—বলেছি না, রাম পাকা।

আলোক বলল, আগে কি ভালই ছিল। ভাল খাওয়া উপ্টে খেতে জানত না।

—ঘরে বসে বসে বাদু হয়ে গেছে—

দুঃখ নিল কথাটা সেই জন্যেই তো বলছি দিদি, আলোকদাকে বলে আমার একটা চাকরীর ব্যবস্থা করে দাও। ঘরে বসে আর কত থাকব?

—কেন চুপ করে বসে পড়বার সময় হয়েছে নাকি?

—বসে পড়লে আপনাদের-ই বিপদ। থানা-পুলিশ করে মরতে হবে—

—পাগল! তার চেয়ে আনন্দবাজারে বিজ্ঞাপন দেব—

একটি মেয়ে হারাইয়াছে। নাম আরতি। পরনে ডুরে শাড়ি। অতিরিক্ত অধিকৃত। যদি কোন সহৃদয় ভদ্রলোক পান, তাহা হইলে ইহাকে এবং ইহার সঙ্গের ছোকরাটিকে উত্তম-রূপে বাঁধিয়া নিকটস্থ থানায় জমা দিলে সবল পুরস্কার—

হাসির শব্দে কথাটা শেষ-ই করতে পারল না। চুল ছেড়ে দিয়ে দুই হাতে পেট চেপে বসে পড়ল মিনতি। আরতি এবার সত্যিই রেগে গেল, যান আপনার সাথে কথা বলব না—

—আহা, তুমি হারিয়ে গেলে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারি? তখন কে তরিবৎ করে মোচার ঘন্ট রাঁধবে?

ভেংচি কেটে চলে গেল আরতি, আমি আপনাকে কিছুতেই দেব না। ইচ্ছে হল দিদি দিক—

—তুমি না দিলে আমি খাবই না।

—ঠিক আছে, ঝগড়া বন্ধ করুন—মিনতি ঘটকের ভূমিকা নিল: আপনার অফিস নেই?

—ছুটি নিয়েছি।

—তা বুঝতে পেরেছি। ক' দিনের?

—অনেক দিনের। ভাবছি বাইরে যাব।

—স্নান-টান বুঝি হয়নি?

—হ্যাঁ, হয়েছে।

—না হলে করে নিতে পারেন। আপনি তো একবার আমাদের পানাপুকুরে নেয়েছিলেন—

—কেন, স্নান করার মত দেখাচ্ছে না?

—মোটেই না। মাথায় তেল নেই। উস্কো খুস্কো চুল। বলল আমা—

—আর?—হাসল আলোক।

—চোখের কোণে কালি। আপনার এই সাজ তো কোনদিন দেখিনি?

মাথা নিচু করল আলোক। এই সাজে কোনদিন আসি নি। এই ছিন্ন ভিন্ন মন নিয়েও কোনদিন না। এত হাসি ঠাট্টার মধ্যেও মিনতির বলয় এড়ায় নি। খুশি হল। আগের চেয়ে অনেক নিশ্চিন্তও বোধ করল।

ইতিমধ্যে আরতি মোড়ার সামনে একটা ছোট টেবিল বসিয়ে দিয়ে গেছে। এবার ওতে ভাতের থাল এনে রাখল। বহু বিচিত্র মোচার ঘন্টও আছে। এক বাটি ডাল। ডিমের অমলেট পাশে। খুব করিৎকর্মা মেয়ে যাই হোক। কথা বলতে বলতেই দোকান থেকে ডিম আনিয়েছে। অমলেট ভেজেছে। বুঝতে পারল, এ সেই অকাল পক্ক মেয়েটির কাজ। কিন্তু খেতে একদম ইচ্ছে নেই। খুব ভোরে হোটেল ডি প্যারিসে ইলিশ মাছের ঝোল দিয়ে কয়েকটি ভাত খেয়েছিল। তারপর অনেক সময় বয়ে গেছে। অনেক হাঁটাহাঁটি ছোটাছুটি হয়েছে তারপর। সুতরাং খিদে একটু লাগবার-ই কথা। কিন্তু আশ্চর্য, ক্ষুধা বোধটাই যেন বেমালুম উবে গেছে। তবে হ্যাঁ, পিপাসায় বুক ফেটে যাচ্ছে। সন্তর্পণে জলের গেলাসটা তুলে নিল আলোক। ইসারা করল আর সব নিয়ে যেতে।

—সে কি?

—বিশ্বাস কর, আমি খেয়ে এসেছি।

—তবু কিছু খান।—মিনতির চোখে অনুনয়।

—আচ্ছা মোচার ঘন্টটা খাচ্ছি।

—অমলেটটা তুলে নিন। আরতি করেছে—

—প্লিজ আমাকে আর অনুরোধ কোরো না। আমি আর পারব না।

—আপনার যেন কি হয়েছে?

—কিছু হয়নি। তোমার সঙ্গে কথা আছে।

—আমার সঙ্গে?—মিনতি অবাক হল।

—হ্যাঁ।

—এতদিন তো বলেন নি?—গলার স্বরটা যেন কেঁপে গেল ওর শেষে।

—এতদিন বলার সময় হয়নি।—আলোক যেন বুঝতে পারল ওর ভাবটা। বলল, খেয়ে নাও তাড়াতাড়ি—

আমার আবদারে মুখখানাকে জবাফুলের মত করে ঘরে ঢুকল মিনতি। একটু পরে বেরোল।—আগের সেই চপলতা আর নেই। ওকে দেখে আলোক উঠে দাঁড়াল। উঠোনে পায়চারি করতে করতে আবার পিছন ফিরল।

—আরতি, তোমার অমলেট আমি এসে খাব।

—বেশ।—সংক্ষিপ্ত উত্তর। (ক্রমশঃ)

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY Private Ltd.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

ধারাবাহিক উপন্যাস

ধ লে শ্ব রী

প্র বো ধ ব ন্ধু অ ধি কা রী

। পূর্ব প্রকাশিতের পর ।

লাভ

গাঙ ক্ষেপেছে ; ভাঁসার পাওয়া জননী ত্রেষাক্তির তুল্য ঝুটিখানে ঝাকুনি খেয়ে গোঁ গোঁ রবে এগিয়ে আসছে তো আসছেই—থামে না, ক্ষান্ত দেয় না, গুণা পড়ে না। তার চেউয়ের চূড়ায় চূড়ায় বুঝি পাঁও-দরা ভূতগুলা নৃত্য করে, শঙ্খচূড়ের নাহাল খোঁসায় ; গজরাতে গজরাতে সেই অদংখ্য চেউ বিশ্বগেরাসী ক্ষুধা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে দেউলী বাজি-পাড়ার ওপর। উত্তর দেউলীর বাজিপাড়া বাজির চাকলার নতুন হয়ে এসেছে, সবে একফালি জমিন খান। সবাই জানে আর মাত্র কিছু সময়—পরভাতের আর একটা পহর ঘুরিয়ে যাবার মধ্যে সোটা উত্তর পাড়াখানের চিহ্ন মুছে যাবে। সেখানে বৈ বৈ করবে জল। ঘোলা জলের বিশাল ঢেউ শুধু ঘুনিয়া কানা করে প্রলয় নাচন নাচবে। কাপা জননীর হাত ধিকা আইল রেহাই নাইক্যা জনমনিষ্যের।

গাঙ রাইতের গাঙ পহরে তামাম উত্তরপাড়ার জন-মনিষ্যির ঘুমের নিশান হইয়া গেচিল, উত্তর আকাশের এক-চইক্ষা তারামান চক্ষু বুজলে যব উঠল পলা, পলা, কাপা জননীর মেয়াল থনে মাটি মানুষের নিস্তার নাইক্যা।

যেমনি রব ওঠা অমনি কাজের শুরু। একদিকে সর্বহারা মানুষের তীব্র হাহাকার, গগন বিদারী আর্ত চিৎকার আর একদিকে কেবল জান লইয়া পলানের চেষ্টাই নয়, ভীত সন্ত্রস্ত তামাম মনিষ্যিরা প্রাণপণে লেগে পড়েছে কাজে। মালগুজারী সরানো হচ্ছে, ঘরের চালা খুলছে, বেড়া খুলছে—যে যেমন পারছিল বাঁচাবার চেষ্টা করছিল তার সম্পদের শেষ বিন্দু পর্যন্ত। খবর ছড়িয়ে পড়েছিল পুব আর দক্ষিণ পাড়ায়—অমনি, যে যেমন পেরেছে ছুটে এসেছে।

মধু কৈবিত্তির ওটা আঙিনা এখন ছত্রখান। গাব রাইতের আধু ঘুরাইলে মধু পরাণরে পাঠিয়েছিল বুচি পাড়ায়। ঘরামী চাই, সুতার মিস্ত্রি চাই—বাড়িঘানরে তুইল্যা লইয়া পলাইবার লাগব। পরাণ তার কর্তব্য করেছে। বৈষ্ণব বুচির কল আর টেউয়্যা সুতার পাড়াখানরে ধরে এনেছে যেন। আর সেই থেকে ধরাধর পড়ছে টিনের চালা, আদলা হচ্ছে নেবে আসছে বেড়া—সোটা আঙিনা জুড়ে তাই এখন নানান জিনিসে ছুপাকার। চৌকি খাটা বাক্স তোরঙ্গ নিয়ে কাদলারা ছুটছিল পুব পাড়ার দিকে, চারু তার আঁচলখানা কোমরে জড়িয়ে লেগে পড়েছে তাদের সঙ্গে। পরাণ হাত লাগিয়েছে কাজে, মধু তদারকী করছিল। কিন্তু ধানদা বুড়ি? না, সে কোথায় কেউ জানে না। এই ভীষণ ব্যস্ততার মধ্যে বুড়ির কথা ভুলে গেছে সবাই, খেয়াল নেই কারও। দেউলী বাজিপাড়ার উত্তর দিগন্ত সর্বহারা নিঃস্ব মানুষের গগন-ফাটানো কান্না আর ভীত শংকিত এবং সন্ত্রস্ত মানুষের চিৎকারে ভয়ঙ্কর এবং ভয়াবহ যদিও শুধু এই তীব্র আওয়াজ

চাপা পড়ছিল গাছের নিচিয়ে। কে কার খোঁজ রা খবর করে এ-সময়ে?

অনেক, অনেক পরে খোঁজ পড়ল। কী ঘটেছিল কে বলতে পারে, হঠাৎ আচমকাই ঠা-মা-আ-আ বলে এক দীর্ঘ আর্তনাদ করে উঠল চারু। আর সঙ্গে সঙ্গে উঠানের সেই ঘুপের মধ্যে ধড়াস করে পড়ে গেল চারুর অচৈতন্য দেহটা।

বিপদ একলা আসে না যদিও, তবু হড়িঘড়ি ব্যস্ততার মধ্যে কে আর ভাবতে পেরেছিল একসঙ্গে এতগুলো বাজ এসে পড়বে এখানে। কাছাকাছি ছিল না পরাণ। বাইরবাড়ি ছাড়িয়ে যে পথ, সেইখানে দাঁড়িয়ে সে ইয়াদিনের গরুর গাড়িতে তুলে দিচ্ছিল দক্ষিণহারী ঘরের বিশাল চালখান। এমন সময় সেই ভয়াবহ চিৎকার। যেন চিৎকার না, পরাণের মনে হ'ল কুন আঁধার কানচি থেকে কেউ ঘুরি তার বুকের চরাটের উপুরে প্রাণপণ তাগদ দিয়ে ঘাই মেরেছে ঘুত্তির জন্যে। আর সেই ঘাই খেয়ে সহসা লম্বা একখান ফাল দিয়েছিল পরাণ। এক, দুই, তিন—তিন ফালে ছুটে এসে দেখে চারু বেহুঁস। মধু পড়েছে তারে লইয়া। দুইখান কাবলার কলস বলস জল ঢালছে চারুর মাথায়।

ভর সইল না, বিন্দুমাত্র জ্ঞানও ছিল না পরাণের। থাকলে বাপের সুখে পুলার এমুন কাণ্ডখান করে না। কিন্তু বেদিশা পরাণ তাই করল। নিমেষে সে ঝাঁপিয়ে পড়ল চারুর ওপর। 'এ বউ, বউ···' পরাণ অচেতন চারুর বুকের ওপর ঝুঁকে পড়ছিল, মাথা ঘষছিল, ওরালে। যেন সেবারের মতন পরাণ তার সহায়ী বউয়ের পতরের বারাখান বুক ভইরা দিবার চায়। 'আমার বুকের পিঞ্জরাখান ভাইঙা দুই কুথায় পলাইবার নইচস বউ রে···'। হাউ হাউ করে কাঁদছিল পরাণ, দু হাতে প্রাণপণ ঘুরি মারছিল নিজের বুকে আর সেই সঙ্গে ভয়-ডরানী কান্দন। পাগলের তুল্য আচরণ। সত্য পরাণের কসুরের ঠ্যালা খেয়ে ছিটকে পড়েছিল একজন ভরা। আর একজন ভরা কলসখান নিয়ে ঘরকে দাঁড়িয়ে পড়েছে। কাপা মনিষ্যির মতন পরাণের বিশাল দেহটা যেন দিক-বিদিক মানছে না।

প্রথমটা বিশ্বাস করতে পারে নি মধু। বোঝবার পর প্রথমে শরম লেগে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কিছু বলল না। পাগল পুলার কাণ্ডখান দেইখ্যা খ বইনা থাকল কয়েকটা মুহূর্ত। ইতস্তত করছিল, ভেবে পাচ্ছিল না এখন তার কী করা কর্তব্য। শেষে হাত বাড়িয়ে দিল মধু। 'পরাণ, পরাণরে চুপ যার—ঘটমারে একটুক নিশ্বাস লইবার দে···।' কিন্তু কার কথা কে শোনে। ক্রমশ আরও বেশি উন্মত্ত হয়ে উঠল পরাণ। তার আদেখলা বিধান সইতে না পেরে প্রাণপণে সজোরে একখান ঝটকানি মারল মধু. 'সয় সইয়া যা কইলাম আগে—যাইয়ার নিশ্বাস লইবার পারে না, তারে তুই গুত্তাইয়া শাপ না কইরা ছাড়বি না মনে লয়···।' সেই সজোর ঝটকানে পরাণের দেহটা ছিটকে গিয়ে পড়ল ঘুপের একদিকে। মধুর নির্দেশমতন ততক্ষণ দু'জন কাবলা আপটে ধরে ফেলেছে পরাণকে।

খুব বেশিক্ষণ সময় নেয় নি। আজলা-ভরা জলের কয়েকটা ঝাপটানি মেরেছিল মধু চারুর চোখে। বার কয়েক মারতেই চোখ চাইল চারু। কেঁদে উঠল। যেন পুরা চিৎকারখান মুখ থেকে বেরোবার আগে সে ফিট হয়ে পড়েছিল, এখন জ্ঞান ফিরে আসতে সেই চিৎকারের শেষ রেশটুকু বেরিয়ে এল; '···ঠ-মা-গো···'। সঙ্গে সঙ্গে ফোঁপানি কান্না।

ঠাণ্ডা! যেন আচ্ছর চেতনাকে ওই একটা অবার সহসা ফালাফালা করে ছিঁড়েখুঁড়ে ফেলে দিল। জোর করে নোয়ানো ঘউরা বাঁশের বাধা ছেড়ে দেবার মতোন সহসায় ঝাঁ করে টানটান দাঁড়িয়ে পড়ল মধু কৈবিত্তি। তার ভাসাসী চক্ষু দুইখান বোঁ করে ঘুরে আসতে যতটুকু সময়, তারপরই উন্মাদ দিকবিদিক জ্ঞানহারার তুল্য দৌড়। ঘুপ মানল না, উঁচানীচা না, ঘর খন্দরের কথা মাথুর নাই মধুর। বোকো

বাতাসে ঘড়ি ছেঁড়া পক্ষিরের মতন সে ছুটছিল। তার দিগন্ত আগলিয়া গলার স্বর আছড়ে পড়ছিল উত্তর হেউলীর শেষ সীমান্তে—'হায় হায় আমার সাধ গেল না কুমার রে এ-এ-এ'—।

সঙ্গে সঙ্গে টনক নড়ল কাদলা আর ঘর সেঁচ নাবালো সুতারদের মধ্যে। ততক্ষণে বধূ কৈবিত্তির শরীলখান অন্ধকুমুর আর হিজলের বনে ঢুকে পড়েছে। মানুষটাকে দেখা যাচ্ছিল না, কিন্তু ঝোড়ো বাতাসের গর্জনের মতন তার গলার উন্মত্ত চিৎকার দিগন্ত ছাড়িয়ে ছুটে যাচ্ছে সেটা বালুর বল। ঝটপট হাতের কাজ ফেলে ওরা ছুটল কর্তা মাঝির পেছন পেছন।

ক্লান্ত পরাজিত নিষ্ফলের মতন ফিরছিল অনঘর। গায়ে তাগদ নাই, মনখান ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে তার। বুকের ভেতরটা খাঁ খাঁ করছিল, পাল গড়িয়ে অশ্রু পড়ছে। তার মনে হচ্ছিল এ পৃথিবীতে সে একা, তার কেউ নাই, কেউ নাইক্যা।

রাত কেটে সকাল হয়েছিল অনেক অনেক আগে। গোটা আকাশ মেঘে মেঘে কালা। ধবলা কাঁসার চুলার তুল্য ছিন্নভিন্ন মেঘেরা গোটা আকাশ তোলপাড় করে তুলেছে। আলো নেই, রোদ নেই। সাত সকাল থেকে যে সোনা রোদ আঁচল বিছায়ে সেই আয়োজন কোন অদৃশ্য হাতের ইসারায় আজ বন্ধ। রাত আর সকালের সন্ধিকালের মতন আবছা ধরা ভাব লেগে রয়েছে এ দিগন্তে, আকাশে। আশ-স্যাওড়া, বন কাপাসী, হিজল আর দীর্ঘ ছৈতান গাছের মাথায় মাথায় পুরান পাক-ঘরের চালের তুল্য কালো আন্ধার ঝুলছে। ঘুরঘুটির অন্ধকার ওৎ পেতে রয়েছে বুঝি ক্যাদার, জিকা, জলটে আর গাউছা পিপুলের ঝোপ ঝাড়ে। বাকি দিগন্ত কাপসা, আবছা অস্পষ্ট।

সাঁ সাঁ বইছে বাতাস। সুপারীর বনে যেন ঝড়ি নিয়ে হাজির হয়েছে এক না দেখা মানুষ। ঝড়ির কাঁস পরিয়ে সে যেন টান মারছে গাছগাছালির মাথা ধরে। খানিক আগে কয় ঝাঁক পাখিরা এলোমেলো উড়ে গেলো করুণ ডাক ডেকে ডেকে। এরই মধ্যে হঠাৎ নেমে আসছিল ইলশে গুঁড়ির মতন বৃষ্টির ভাব।

গাঙ ডাকছে, গাঙ ফুঁসছে, তার ঘুর্ণিতে ঘুর্ণিতে লৌহশ্রী সাপের বিষানী। অতল গর্ভ থেকে উঠে আসা বিশাল গুরুভুজ তুল্য ফণা তোলা ঢেউ ধারুণ আক্রোশে ছুটে এসে যেন প্রাণপণ ছোবল মারছে ডাঙার অমিতে। আর রাক্ষসীর ছোবলে ভেঙে পড়ছে এক একটা গোটা গেরস্ত বাড়ির ভাঙার আঙিনা, ভিটি নিরাত বন জঙ্গল পর্যন্ত।

ক্লান্ত পা, অনঘরের মন যেন কোথায় ভাসছিল। বুকের অন্দরে কে যেন হাহাশ্বাসে বারবার বলছে সুবাসী···সুবাসী ···সুবাসী। থেকে থেকে চাপা অদ্ভুট গলায় অজান্তে ওই নামটা কণ্ঠা পেরিয়ে উঠে আসছিল বতবার, ঠিক ততবার, ততবারই চক্ষের অতলে কমা জলের বাঁধ ভেঙে ছুটে আসছিল কান্না। সারা শরীর মুচড়ে উঠে আসছিল সেই কান্দন। '···সুবাসী' হাওয়ার গলায় নামটা উচ্চারণ করল চন্দ্র কৈবিত্তির বাইন্যা পুলা অনঘরিয়া। আর সঙ্গে সঙ্গে বালি-হাঁসের ঝাঁকের লগে তার মনখান পাখা মেইলা উড়াল দিল। ওড়ে···ওড়ে···ওড়ে—পুরানা হিলাবপুরের কোলের পাশ-ঘেষা আশ হেউলীর চড়ে এসে বাধন পাব। আহা, ছবির তুল্য গেরাম—কী রূপ সেই গেরামের, কী রূপ। চোখ বন্ধ করল অনঘর। পাতার ফাঁক বেয়ে টনটন করে পড়ল কয়েক ফোঁটা অশ্রু। দূরা চইখোর আন্ধারে আশ-হেউলীর নাও-ঘাটাখান ভেসে উঠল···

কারাক নাই, মুরুব্ব নাই—এলাসিনের জাহাজঘাটাখান যানে পাক্কার সীমার মধ্যে। এ-পাশে সুবনঘাটির খাল, ওপাশে চর হিলাবপুরের বিশাল কোলখান জুড়ে মহাজনী নাওয়ের সারি। কুড়ি কুড়ি পঞ্চর গাড়ি, শতেক শতেক

বাপ যওয়া ঘোড়া—কোলের পোটা চন্দর ছুকে যান পাট শুতের মালবাড়ী নাও থেকে নামানো পসরা। কোপ ছাড়িয়ে হিজলবাড়ীর বাথান, বইষের মিঠের তুলা ছোট একখান চর—ছোনে ছোনে ছয়লাপ। তারপরে গাঙের একখান ক'াড়ি। ক'াড়ি ছা'ড়িয়ে পুরান মেউলীর নাওঘাটা। বরষা আষনের আপখানে ঘাটার ডাঙার ঠাঁই নাই। নাওয়ের পর নাউ উপুর করা, চিৎ করা। পচা পাষের হলের গন্ধ—এক পোঁচ, দুই পোঁচ, তেসরা পোঁচ হলদ হইলে তবে নাও নামব জলে। যেন নয়া যৈবন পাওয়া নাও নয়া জলে পাতিহাঁসের তুল্য ছলবল করে।

সেবার নয়া জলের বান এসেছিল পেথম আষাঢ়ে। চারাবাড়ির ভাইঙ্গাঘাটার দিকে পাড়ি অন্দিরেছিল মেউলীর মাঝিরা। এক মাত্রা দুই মাত্রা আরও বেশি মাত্রা নাওয়ের বহর ভেসে পড়েছিল স্রোত উইজার গাঙের জলে। এমুন দিনে নয়া জলের বান আইয়া গেল ডাক ছাইড়্যা। আর সঙ্গে সঙ্গে নয়া পাঁওয়ের পত্তরে ঘান জান ফিরা আইল। বই-ঝিরা সাজন গোছন করল, অ'ক্কগাত মাইয়াগো হাতে হাতে তুইল্যা দিল বরণডালা, পুলারা দল বাইন্ধ্যা সঙ্গে মারল কুঁ। মেউলী মাঝিপাড়ার ঘাটায় মাইয়া পূজা শুরা দুই ফরে নয়া গাঙের চরে বসাইল একখান মেলা। মাঘন শুঁদাই নামাবলী পাইন্ধা উবুর মাইয়া শুইয়া পড়ল। ওয়োতিয়া ছুকার ধারল সঙ্গে সঙ্গে। কুড়ি-কুড়ি সঙ্গে পড়ল কুঁ। আর অমনি মাঘন শুঁদাই হাতখান বাড়াইয়া দিল, নয়া জলে ছুইয়্যা গেল হাতের পাতাখান। ঘুরঘুইরা কানাই জিগির ছাড়ল সেই সঙ্গে—

নয়া গাঙে নয়া জল
মাচে করে খলখল
নাওয়ের মুখে মিঠা হাসি
মা ধলেশ্বরী কর আসি আসি।

বরণডালা তুইল্যা ঘর
তাড়াতাড় যাত্রাসে জড় কর।
জড় কইরা পূজা সার
নাও ভাসাবে যে যাহার।
যৌ'ক্কি গো পূজা
তার পথ হইব সুজা
গাঙে আনব ধন
সোনার মনিক্কি জন,
ধলেশ্বরী তার পরাণের আপন জন।
জয় ধলেশ্বরী। জয় জননী ধলেশ্বরী।

মেয়েরা আবার জোকার ছাড়ল। ছেলেরা গাইল বরণ গাওনা। সব স্যাষে হইল গা পূজা। ভেষটিখান ডোঙার নাওয়ে সিদির আলাইয়া দিল মাঘন গোঁসাই। ফুল চন্দনে পূজা। বাটি বাটি পায়সান্ন পড়ল, মিঠাই কণ্ডা আর বাতাসার লুট হইয়া গেল। সব স্যাষে শান্তরখান কইলেন গা বসু কৈবর্ত্তির মাও মানদা ঠাকরেইন : তার শোনো বিত্তান্ত। এই যে দেখবার নীচ পাঠ, গাঙের পানি, শান্তরে কয়, মূলে গা উনি আছিলেন মনিক্কি। যমুনার কইন্যা গো, যমুনার একখান মাগুর মাইয়া। বড় সুখের সংসার আছিল। বাপে মায়া, মায় ঘরে বইয়া নকশী কাথা বানায়। চাঁদের মতন কইন্যা-খান লালে সুহাগে গা ডগমগ…। ফুলফুইরা চেহারাখান, মাথের তুলা চুল কুঁচর তুলা রঙ। জামাই মাইয়া পুলাপান কাল থিকাই বড় তেজী - উনার নাম হইল গা ধলেশ্বরী। অল্প তাইনার রূপ দিছিল, সূর্য দিছিল গাঙের রঙখান। সেই রূপের বাহারী মাইয়ার হইল গা আপনাই…। গাঙের ঘাটে আইছিল সদাগরী নাও। পুন্নিমার রাইতে, সদাগরের পুলাখান নাইয়া আইয়া বাজাইছিল বাঁশী। তাই না শুইন্যা তাইনের মন ঘরে রইল না। পাগলের তুলা ছুইট্যা আইলেন। মাথার চুলে বান্ধন নাইক্যা, বসনের নাইক্যা ঠিক উনি যান মাতালে

ওর কইরা আইয়া পড়লেন। চাঁদের রোশনীতে চক্ষে চইখ পড়ল—অমনি হইল সাঁ আপনাই ··সেই আপনাইখান হইল গ্যা উনার কাল

সাহস পাইলে অক্ষিদাত মাইয়ারা নাও ভাসাইল। নয়া জলের সোঁত সাঁ সাঁ করে টেনে নিল বাবটিখান খোলের নাও। কিন্তু সুবাসীর নাও চলে না। সোঁতে মারে মা টান —ঠাণ্ডা মারে তো ফিরা ফিরা আহে বারবার। হইল কি, হইল কী? রব উঠছিল সঙ্গে সঙ্গে। বানদা ঠাইকরেন কয়, আপনাই। মাইয়ার বেলাও বেবরীর রূপে পাপল হইচে।

যেন ওই একটা কথার জন্যে অপেক্ষা করছিল তামাম বেলার জনমনিস্যি। বানদার কথা হবার সঙ্গে সঙ্গে সকলে ঘিরে ধরল সুবাসীরে। 'শিগগীর ক, কইরা কালা নাবখান। ডুবল জলে নাইক্যা বাপ চা জননীর কাছে।' কিন্তু কার কথা কে শোনে। মাইয়া সেই যে থ মাইরা রইল তো রইলই। কথা কয় না, জিগাইলে রাও দেয় না। স্যাষে মার আইয়া ধরল মাইয়ারে। 'ক বাপো, কইরা কালাচ বাপ চা। মারার ধরের মাইয়া, গাঙ জননীর কুলে পাপ চাইল্যা দে।' কিন্তু তবু রাও কাটে না। কথা কয় না সুবাসী।

মাঝন গুনাই কয়, 'হাইড়্যা ভাও অরে। গাঙের মাইয়া গাঙেই করব গ্যা অর বিচার। ডুবুর কঙ্কলে হাচা কথাখান বাইরাইব না মুখ দিক্যা।'

কিন্তু গুনাইয়ের কথা শোনো না বানদা ঠাইকরেন। না' অর কথনই লাগব। এ জিগ্যায়, ও জিগ্যায়—সুবাসী খালি কান্দে কান্দে। ফৎ ফৎ কইরা কান্দে, মুখখান খুলে না কিছুতে।

মায় কয়, অ জলধইরা, কত্তা ল, কত্তা ল দুইনের কাছ খান।

মায়ের নির্দেশে ছোট দুইনেরে টেনে নিয়ে গিয়েছিল জলধর। বেলা ছাড়িয়ে দুরে। আদর দিয়েছিল, সোহাগ করেছিল। শেষে বলল, 'আমাগো মুহে চুনকালি মাখাইল না সুযু। আমারে ক।'

আদর খেয়ে আরও অনেকক্ষণে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল সুবাসী। কাঁধের গামছা টেনে নিয়ে চক্ষু মুছিয়ে দিয়েছিল জলধর। আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিয়েছিল বইনের মাথায়। 'হ কইয়া কালা, আমি আচি তর পাছে।'

'অরা ··' সুবাসী হিক্কা তোলার অতো কাঁদে, 'বাদাগো অরা মিছা কথা কয় ··'

'হাচাই কস?'

'হ।'

'তাইলে তর নাও যায় না ক্যান?'

সে কথার জবাব দেয় না সুবাসী। জলধর যত জিগায় তত কান্দে। এতবড় সাহস মাইয়ার, মুহে রাও কাটে না··· জলধর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল ক্রমে ক্রমে। শেষে রাগে ফেটে পড়ল। সুবাসীর কচি পালখানের উপুর বিরাশী সিক্কা ওজনের একটা চড় কসিয়ে দিয়ে গর্জে উঠল জলধর, 'ক, নাইলে তরে চরের বাড়িতে আইজ কবর দিয়া যামু কইলাম।'

প্রচণ্ড চড় খেয়ে কাৎ হয়ে পড়ে গিয়েছিল সুবাসী। দু' হাতে গাল চেপে ধরে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠল চৌদ্দ বছরের কিশোরী মেয়ে সুবাসী। 'অরা হগ্‌গলে মিছা কথা কয় গো দাদা। মিছা কথা। বারও হনে আমার আপনাই নাইক্যা··'

কি হ'ল, কথাটা বিশ্বাস করে নিয়েছিল জলধর। আর কিছু শুধোয় নি সে। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থাকল বোনের জবাব শুনে মন পুড়ছিল, বুকের কোথাও কষ্ট লাগছিল। জলধরের মনে হ'ল, বুঝাই সে এখন করে মারল মায়ের পেটের সোহাগী বোনটাকে। অনুশোচনায় কান্না আসছিল। জলধর তা সামলে নিল। আস্তে আস্তে উঠে এল বোনের পাশে। 'কান্দিস না দুইন কান্দিস না—আগে বুঝবার পারি মাইক্যা আমি···' জলধরের গলা ভারী হয়ে

এসেছিল, চক্ষু ছলছল। তবু সুবাসীকে টেনে তুলল। নিয়ে এলো মেলাতে। কিন্তু কেউ বিশ্বাস করল না। তা না করুক অন্তর বিশ্বাস করে নিয়েছিল। একাই সে রুখে দাঁড়িয়েছিল দেউলী মাঝিপাড়ার তাবাম জনমনিষ্যির সামনে।

সাধন গুণাই বলেছিল, 'অর কথাই যান সাচা হয়। কিন্তুক মাইয়ার যদি মিছা কথা কইয়া বাহে গাঙের হাত থিকা আর নিস্তার নাইকা।

গাঙের নয়া যৌবনের পূজার পাট সেরে মেলা ভেঙেছিল শেষ বিকেলে। দলবেঁধে ওরা ফিরে এসেছিল যে যার ঘরে। কিন্তু তখনও সুবাসী জানত না ধলেশ্বরী এর শোধ নিতে সত্যিই এগিয়ে আসবে। ঠিক তাই হ'ল। সোটা দিন গিয়েছিল। রাত্রির অবসরে, জনমনিষ্যির অজান্তে কখন যেন ক্ষেপে উঠেছিল ধলেশ্বরী। সাঁ সাঁ করে বেড়ে উঠেছিল জল। মাঝরাত্রির মধ্যে কানায় কানায় ভরপুর। রাইতের আঁধার পরত পড়বার আগেই উতাল ধলেশ্বরী আছড়ে পড়েছিল দেউলী মাঝিপাড়ার উপর।

কেউ জানত না, জানতেও পারত না বুঝি কিন্তু সুবাসী জানান পেয়েছিল সকলের আগে। মেলা শেষে ফিরে আসা স্তব্ধ মনমরা হয়ে চুপচাপ বসেছিল, রান্নে বেন না, চুল বাঁধল না, সেই যে খাটায় উঠেছিল আর নামল না কিছুতে। কিন্তু বিছানা নিলে কি হবে সোটা রাত নিশ্চিন্তে ঘুমোতে পারল না সুবাসী। বার কয়েক তন্দ্রার মতন এসেছিল, শেষে স্বপ্নে দেখল একখান মূর্তি। গাঙের পার থেকে দেবী মূর্তি উঠে এল সুবাসীদের আঙিনায়। শেষে ঘরে। 'আমারে তুই ভুলা বারচস ক্যান ক···' মূর্তিটা সোজাসুজি এসে দাঁড়াল সুবাসীর কাছে।

ভ্যাবড্যাব করে তাকিয়ে থাকল সুবাসী। এ খালি মূর্তি না, দেবী সিদ্ধিমে একখান। কী রূপ। কিন্তু সেই মূর্তির চোখ দুটো জলজল করে জ্বলছে।

'আমি আমি ···' সুবাসীর মুখে কথা আসছিল না, গলা বন্ধ—যান কেউ শক্ত মুঠিতে তার টুঁটিখান চাইপ্যা ধইরা রেখাইছে।

'হ তুই···' হাত বাড়িয়ে সেই মূর্তি সুবাসীকে দেখাল। 'আমারে ভুলা দিয়া তুই নিস্তার পাবি না সুবাসী···'

'লাজে শরমে আমি কইবার পারি নাইক্যা সই···'

'তুই পাপী

'আমারে ক্ষামা চাও···'

'ইপাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই···'

'আমারে তুমি বাচাও সই, জীবনে আর মিছা কথা কমুনা, দিব্যি কাটলাম তুমার কাছে···'

কথাটা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খা খা করে হেসে উঠল সেই অপরূপ মূর্তি। তার চক্ষু দুইখান ঠেলে উঠেছে কপালে, ধকধকিয়ে আগুন বাইরায় সেই চক্ষের বনে। মুখখান বিশাল হইয়া গেছে, নাক ফ্যাটা। খপ করে সেই মূর্তি সুবাসীর হাতখানা চাইপ্যা ধরল শক্ত মুঠিতে। 'আয়, আয় পাপী মাইয়া···' মূর্তিখান সুবাসীরে জোর কইরা টাইন্যা লইয়া যায়। সে বোঝে, সুবাসী যাবে না। কিন্তু সুবাসী গাঙের জোরে কিছুতে পারছিল না। শেষে সে চিৎকার করে উঠেছিল, প্রাণপণে, 'বাঁচাও বাঁচাও আমি যামুনা···

মেয়ের চিৎকারে ঘুম ভেঙে গিয়েছিল শতদলের আচমকা সে ধড়াক করে লাফিয়ে অন্ধকার ঘরে বলির পাঠার তুল্য ধরফর করে কাঁপছিল, 'আ সুবাসী, সুবাসী গো হইল কী তর, কী হইল ?' তড়িঘড়ি দেশলাই খুঁজছিল শতদল। কিন্তু শোওনের কালে সুধায় যে তুলে রেখেছে স্মরণ নাই। সুবাসী তখনও মুখুকাটা পাঁঠার মতন গোঁ গোঁ করে যাচ্ছে।

ঘর অন্ধকার। অল্প সময়ের মধ্যেই দেশলাই খুঁজে পেয়ে বাতি জ্বালালো শতদল। কেরসিনের কুপি। কুপিখান হাতে নিয়ে মেয়ের খাটার কাছে এসে দেখে, খাইয়ার খালি খাকরায় আর খাকরায়। শতদল জোরে

জোরে কয়খানি ঠ্যালা মারল বাইরাগে। তারপরই সব ঠাণ্ডা, সব চুপ চাপ। অল্প পরে চক্ষু মেইলা তাকাইল সুবাসী। নাটাকলের তুলা লাল দুইখান চইখ। শতদল ততক্ষণে বিছানায় উঠে পড়েছে। আপটে ধরেছে মেজেকে। 'কী অইল ম মা, লখন দেখচস ?'

সঙ্গে সঙ্গে না, চক্ষু মেলে প্রথমে সুবাসী গোটা ঘর, তার বিছানা, মায়ের মুখ দেখে নিল। পরে নিশ্চিন্ত হয়ে শান্ত গলায় বলল, 'হ।' আস্তে আস্তে ওঠে বসল। ঘরখানি দেখছিল শুধুও। 'আমারে এট্টুক জল ছাও মা, বড় পিয়াস লাগচে।'

জল দিয়েছিল শতদল। এক পানি জল খেয়ে জেরে ঢেঁকুর তুলল। সুস্থির হ'ল। তাকাল মায়ের দিকে। 'একটা বড় বিতিকিচ্ছা হপ্পন দেখলাম মাগো। যেমুন ভূতের নাহাল···'

'চুপ মার চুপ মার···' বাধা দিল শতদল। রাইতের সপন রাইতে কইলে মাইনষে কয় কইল্যা যায়। আর কওনের কাম নাই, ইবার ঘুমা।'

আবার ঘুমের আয়োজন। শতদল বাতি নিবিয়ে দিয়েছিল ফুঁ দিয়ে। আর সঙ্গে সঙ্গে গোটা ঘর আন্ধার হয়ে গিয়েছিল।

ঘরে আর কেউ নাই। চন্দ্র কৈবিত্তি নাও নিয়ে চাড়াবাড়ির আহাজঘাটায় গিয়েছিল। বাড়িতে পুরুষ বলতে কেবল জলধর। সেও এ ঘরে নেই। পশ্চিমধারী ঘরে ঘুমুচ্ছে জলধর। অন্ধকারে ওতপাত করছিল সুবাসীর। অনেকক্ষণ নিশ্চুপে আকাশ পাতাল ভাবল। আর ঠিক সেই সময়ে গাঙের পর্জানির শব্দ তার কানে এসে পৌঁছেছিল। সুবাসী আস্তে আস্তে নিঃশব্দে উঠল। উঠে বসল। মা জেগে আছে কিনা পরখ করার জন্য, নয়ন এবং নীচু গলায় বার কয়েক আনান দিল, ডেকেছিল মাকে। কিন্তু শতদল জবাব দেয় নি। এরই মধ্যে সে ঘুমে অচেতন হ'য়ে পড়েছে।

আরও খানিক সময় বসে থাকল সুবাসী। নিশ্চুপে, বিছানায়। শেষে নিঃশব্দে নেমে এল খাটা থেকে। পা টিপে টিপে এল ঘরের ঝাঁপ বরাবর। হাতড়ে হাতড়ে আড় দেওয়া বাঁশখান খুলে ঝাঁপ ফাঁক করে নিঃশব্দে নেমে এল উঠানে। আড়িনা ছাড়িয়ে তার দৃষ্টি অল্প এগোতেই ভয়ে শিউরে উঠল সুবাসী। অন্য সময় হলে চিৎকার করে উঠত। কিন্তু তা করল না। এক ছুটে দৌড়ে এল পশ্চিমধারী ঘরের পৈঠায়। পৈঠা ছাড়িয়ে বারান্দায়।

শুক্লপক্ষের শেষভাগের চাঁদ রয়েছে আকাশে। ঘরলা জোছনা। তবু দেখতে ভুল হয় নি সুবাসীর। গাছাই গাঙ এসে পড়েছে। সুবাসীদের সমুখ বাড়িতে তিনখান খেঁড়ুরগাছের ভরাজোড়ি, গাঙের পানি তার গোড়া ছুঁই ছুঁই করছিল। বাতাস দিয়েছিল কখন কে জানে সেই বাতাস এখন ঝাপালের মতন বইছে। ঢেউ উঠেছে গাঙে। রাক্ষুপী নদীর জলধারা ক্ষ্যাপা শুওরের নাহাল রাগে আক্রোশে গর্জে গর্জে বয়ে যাচ্ছিল।

প্রচণ্ড, ভয়ানক রকমের ভয় পেয়ে পেছাতে পেছাতে সরে এল সুবাসী। তার শরীরখান ঠেকল এসে পশ্চিমধারী ঘরের দরজায়। আর সঙ্গে সঙ্গে সম্বিৎ ফিরে পেল সে। প্রথমে আস্তে আস্তে কাকানি মারল দরজায়। শেষে চাপা নীচু গলায় ডাকছিল, 'দাদা, দাদা অ দাদা···'

খুব বেশিক্ষণ ডাকতে হয় নি। নীচু গলার স্বর হ'লেও ঘুম থেকে জেগে উঠে জলধর বুঝতে পেরেছিল এ গলা কার। সে নেমে এসে ঝাঁপ খুলে দাঁড়িয়েছিল বারান্দায়। দু' হাতের চেটোয় চোখ রগড়াচ্ছিল জলধর। 'হইল কী ?'

'ভাই, তাকাইয়া ভাই দেহি··'

সত্যি, তাকাবার সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু চড়কগাছ। 'গা-ও···' অস্ফুট আর্তনাদের মতন কথাটা কেবল বেরোলো জলধরের কণ্ঠা থেকে।

'হু' আরও কাছে সরে এল সুবাসী। 'আমার কেমুন ঘ্যান ভয় লাগে দাদা।'

কিন্তু বোনের কথা শুনে মনে সাহস জোগাল না জলধর। তাজ্জব তাজ্জব। সানকের কালে নদী জল বইছিল তির তির করিয়া। একখান রাইতের মধ্যে এ কী রূপ গাঙের। জলধরের চক্ষু দুইখান যেন আঠায় তুলা লেগে রয়েছে গাঙের পানির ওপর। সে চোখে পলক পড়ছে না। নড়ছে নাও জলধর। যেন সে কাঠ।

ব্যাপার বুঝে সুবাসী একটা কাকুনি মারল জলধরকে, 'দাদা···'

'অ···'

'কী অইব দাদা গো···' সুবাসী কেঁদে ফেলেছিল।

'ঘুমবার পারতাচি না আমি···' জলধর উঠানে নামতে গিয়েছিল। কিন্তু পারল না। সুবাসী তাকে শক্ত করে ধরে ফেলেছে। মুখে গুঁজে দিয়েছে মুখখান। 'দাদা গো গাঙেরে আমি সাচা কথাখান কই নাইকা·

'এঁ্যা···।' সবলা দু' হাত পেছনে ছিটকে সরে গেল জলধর। 'তুই বস কি সুবাসী, বস কী···' গলা কাঁপছিল জলধরের, চোখ দু'টো বিস্ফারিত হয়ে কপালে উঠেছে।

'তুমারে আমি সাচাই কই দাদা' সুবাসী নীরব কান্না কাঁদছিল। 'গাঙরে আমি তুলা দিছিলাম দাদা। আমার··· আমার—প্রবল কান্নায় গলা বুজে এসেছিল, কথাটা শেষ করতে পারল না সে।

খেয়াল ছিল না, শরীরে সাড় নেই ; মনটাও বালিহাঁসের মতন কোন সুদূরে উড়ছিল। ঠিক কাইল্যাদার নিরাপদর বাড়ির কাছাকাছি এসে সম্বিৎ ফিরে পেল জলধর। বোঁচট খেয়ে, জলধর হুমড়ি খেয়ে পড়ে গিয়েছিল একখান ছোট ন-য়ের [illegible]।

এ-দিকটা আন্ধার আন্ধার। ইতস্তত ছোট লাগা শরীর নিয়ে উঠে দাঁড়াল জলধর। চোখের সামনে সব কালসা অস্বচ্ছ। চারপাশে গাছগাছালির ঘন জটলা, ছোট বড় ঝোপঝাড় ডাইনে বাঁয়ে। তারই মধ্যে নিরাপদর আঙিনা-খান খাঁ খাঁ করছে। জনমনিষ্যি নেই, ঘরবাড়ির চিহ্ন পর্যন্ত মুছে গেছে, কেবল শূন্য তুলা আর ভিত পড়ে আছে। অথচ আশ্চর্য গতকালও সানকের বেলায় এ-বাড়িতে বৈঠক বসেছিল। গোপন সলা পরামর্শ। জনা সাতেক লোক ডেকেছিল নিরাপদ। জলধরকেও। পাড়ার হাল, গাঙের অবস্থা, বাল্লাগারদের সমস্যার কথা বলে আসল আসল জায়গায় চলে এল নিরাপদ। বলছিল, 'ইয়ার একখান বিহিত করন লাগে।'

'কিসের ?' সানকা তামুক খাচ্ছিল, জলধরের কথা শুনে চিলা থেকে মুখ সরিয়ে এনে তাকাল, 'কিসের কথা কইবার লইচ নিরাপদ ?'

'আংকর···' চাপা ফিসফিস গলায় বলল নিরাপদ। গলাখান বাড়িয়ে দিয়েছেন সিকারী বংশের তুল্য।' তুমারে কই লালনকা, আতরুরের ঘরের কিসসা তামাম পাড়ার হুকাইয়া পড়ছে···'

জলধর দেখল কাইল্যাদার নিরাপদর গোটা উঠান ফাঁকা। বিপদ বুঝে বাড়িঘর ভেঙে নিয়ে সে সরে পড়েছে অনেক আগেই।

দু' পা এগিয়ে আসতেই থমকে দাঁড়াতে হল। দাঁড়িয়ে পড়ল জলধর। রাক্ষসী গাঙ নিরাপদর আঙিনায় এসে উঠেছে। অনেকটা নেই উঠানের। খাড়াই পাড়ের নীচে উন্মত্ত জলরাশির পর্বতপ্রমাণ ঢেউ ঘুনিয়া কানা করে সজোরে আছড়ে পড়ছে।

বাঁয়ে বাঁক নিল জলধর। ডাইনে 'বায়ে সব শূন্য। কেবল আঙিনা পড়ে আছে, পড়ে আছে শূন্য উঠান। পারিজাইতা, তুলসী, চেংগা, কদাই, ভোমল, সারিসারি

সকলের আড়িনাই শূন্য। ধীর পায়ে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে আসছিল জলধর ক্লান্ত বিষণ্ণ পরাজিত। শূন্য উঠান ঘর। ঠিক বুড়া শিবতলার ঘাটে এসে থমকে দাঁড়াল চমক খেয়ে। 'কে··কে··কে··কে···?' ভয়পাওয়া গলায় অর্তস্বরে চিৎকার করে উঠল চন্দ্র কৈবির্ত্তির ঘাইজা পুলা জলধইরা।

কিন্তু জবাব এল না। আস্তার আস্তার বুড়ো শিব ঘাটের সেই মূর্তিখান জবাব দিল না। জলের ওপর তার মুখটা ভাসছে। কী যেন বলছিল মূর্তিটা ঠাহর করতে পারল না জলধর। তবে বিস্ময়ে হতবাক জলধর ঠকঠক করে কাঁপছিল। [ক্রমশঃ]

(সম্পাদকী—৪১৮ পাতার পর)

পক্ষেই সম্ভব হতো না। তাঁর বিপ্লবী মনের আগুন এখনও নিভেনি। তিনি পাখতুনীস্তান অর্জনের সংগ্রাম আবার নতুন পর্য্যায়ে পরিচালনা করতে কৃতসংকল্প।

বাদশাখান আরও জানান যে তিনি যখন গান্ধীজীকে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে অভিযোগ করে বলেন যে "you have thrown us to the wolves",—তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে পাকিস্তান দেশবিভাগের সময়ে পাখতুনদের প্রতি তাঁর বিচারের যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তা' যদি পালন না করে তা' হলে "ভারত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ করবে।" কিন্তু এজন্য যুদ্ধ ঘোষণা করা দূরে থাক গত সতের বছরের মধ্যে নেহেরু-নেতৃত্ব বা ভারতের কংগ্রেস সরকার পাখতুনদের বিরুদ্ধে পাক-নির্য্যাতনের সামান্যতম প্রতিবাদ বা প্রতিকারের চেষ্টাও করে নি। তবুও এই মহাপ্রাণ ব্যক্তির ভারতের প্রতি কোন ক্ষোভ বা বিদ্বেষ নেই। তিনি এখনও ভারতে আসতে প্রস্তুত,—কিন্তু তাঁর শর্ত হলো এই যে ভারতকে পাখতুনদের সংগ্রামে সাহায্য করার জন্য সুস্পষ্ট নীতি গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু কংগ্রেস সরকার এই প্রতিশ্রুতিদানে এখনও অক্ষম।

বর্তমান পাক-ভারত যুদ্ধাবস্থায় ভারতীয় মুসলীম সম্প্রদায়,—যাদের বৃহত্তর অংশ বিভাগ পূর্ব যুগে মুসলীম লীগের দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবল সমর্থক ও প্রবক্তা ছিল,—তারা আজ আঠার বছরের অভিজ্ঞতায় এক বর্তমান পাক-ভারত সংঘর্ষে

বিপত্তি ওয়েব অনারেটা উপলব্ধি করেছে তাই নয় হামিদ খানের হায় শহীদেরা রক্তের অঞ্জলী দিয়ে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠার নতুন সম্ভাবনা সৃষ্টি করেছে। ভারত সরকার যদি খান আবদুল গফুর খানকে ভারতে নিয়ে আসেন তা' হলে তাঁর নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পুনরুজ্জীবনের বিশেষ করে মুসলীম সমাজে এক অপূর্ব বিশ্বাস সৃষ্ট হবে এই দুঃখে। কিন্তু এসব চাই ভারতীয় নেতৃত্বের বৈপ্লবিক সংকল্প, দূরদৃষ্টি এবং নির্ভীকতা। কিন্তু দলীয় ক্ষমতা রক্ষায় প্রমুক্ত কংগ্রেস নেতৃত্ব কি সেই বৈপ্লবিক পদক্ষেপের পথে অগ্রসর হবে?

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ অধ্যায়ে চির-বিপ্লবীর জ্যোতির্ময় বিভায় ভারতের জাতীয় জীবনে যে তিনটি অবতার আত্মপ্রকাশ করেছিলেন,—তাঁরা হলেন মহাত্মা গান্ধী, নেতাজী সুভাষচন্দ্র এবং বাদশাখান আবদুল গফুর খাঁ। কিন্তু এই তিনজনই বিভাগোত্তর কংগ্রেস-নেতৃত্ব কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত ও পরিত্যক্ত।

যুদ্ধ, জাতীয় দৃষ্টি ও পশ্চিমবঙ্গ কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার

শাস্ত্রী সরকার দিল্লীতে বিরোধী দলের সঙ্গে সংযোগ ও সহযোগীতা রক্ষা করে যুদ্ধ সম্বন্ধে একটি জাতীয় দৃষ্টি ও নীতি রচনার চেষ্টা করেছেন। অন্যান্য রাজ্যেও এই নীতি অনেকাংশে অনুসৃত হচ্ছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও কংগ্রেস সংকীর্ণ স্বার্থপর দলীয় নীতি দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের যে কোন জাতীয়তাবাদী বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি আছে তাকে গ্রাহ্য করার প্রয়োজন বোধ করছে না। একচ্ছত্র দলীয় স্বার্থে কংগ্রেস ও কংগ্রেস সরকার জাতীয় সংহতির আওয়াজ তুলে সরকার ও দলের সংহতি ও ক্ষমতা বৃদ্ধির চেষ্টায় তৎপর হয়ে উঠেছেন। এমন কি সিভিল ডিফেন্সের সংগঠনটি পর্যন্ত দলের কুক্ষিগত রাখবার জন্য তারা ব্যস্ত। অন্য কোন দলের সহযোগীতা নেওয়ার কোন প্রয়োজনীয়তাও তারা বোধ করছেন না। পোস্ট অনেক ক্ষেত্রে সরাসরি বিরোধী কংগ্রেসের ব্যক্তিদের দ্বারা সিভিল ডিফেন্সকে [illegible] করবার কার্য্যক্রম গ্রহণ করা হচ্ছে। ২৪।১০।৬৫

অনিল রায়ের

সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩'৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থনৈতিক মতবাদ এবং সর্বগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১'২৫

"... নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নাস্ত পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, পাকুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

পুস্তকপরিচয়

কয়েকটি নূতন উপন্যাস

বন-উপবন—সুবোধ ঘোষ : চার টাকা

সেতুবন্ধন নরেন্দ্রনাথ মিত্র : পাঁচ টাকা

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ

আমাদের প্রিয় দুই কথাসাহিত্যিকের দুখানি নতুন উপন্যাসে তাঁদের মননের ভ্রান্তিহীন পর্যটন আমাদের মুগ্ধ করে। ছোটগল্প, একমাত্র ছোটগল্পেরই রাজা, সুবোধ ঘোষের সামান্য কটি উপন্যাসের মধ্যে 'বন-উপবন' একটি নতুন সংযোজন। যে-কালের কাহিনী তিনি বিবৃত করেছেন সেই কাল কবেই অপগত হয়েছে—সেই ইংরেজরাজত্বের শেষ পর্যায়, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কাল, হঠাৎ বড়লোক ব্যবসাদারের কাল। তবে আমাদের হাল আমলও যে সেই কালেরই অবশ্যম্ভাবী পরবর্তী কাল সেকথা এ উপন্যাস পাঠে একবারও ভুলি না। বনেদী মানবিক মূল্যবোধের দিনগুলি শেষ হয়ে গেছে, তার বদলে স্বার্থান্বেষী সুবিধাবাদী মানবিক মূল্যবোধহীন অর্থকৌলীন্যের দিন সুরু হয়ে গেছে—এই উপন্যাসে এই দুই দিকের দ্বন্দ্ব খুব সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এবং যা স্বাভাবিক অর্থাৎ মানবিক মূল্যের সামগ্রিক নিশ্চিহ্নে-পড়া—তাও বিবৃত হয়েছে শেষ পর্যন্ত। ভবিপাড়ার প্রতিভা সেই পুরনো মানবিক মর্যাদাশীল যুগের প্রতিনিধি। বিয়ের পর তার স্বামী অমূল্যের বাপবাজারের বাড়িতে প্রচুর সম্পদ জড়ো হয়েছে লোপন অন্ধকারময় সেই সম্পদের উৎস—এবং এই বাড়ির তথা এই নতুন কালা যুগের সঙ্গে তাল মেলাতে পারলো না প্রতিভা। প্রতিভার আত্মহত্যা এর নিশ্চিত পরিণতি। বস্তুত, আত্মহত্যার প্রতিভার তথা পুরনো সেই মহৎকালের পরাজয় ঘোষিত হয় না, নতুন এই অর্থবলমত্ত যুগের সব মূল্যের প্রতি প্রকৃত মানুষের তীব্র অবজ্ঞাই প্রকাশ পায়। উপন্যাসটির কথাবস্তুর মতই এর প্রচ্ছদও আকর্ষণীয়।

সেতুবন্ধন-এ নরেন্দ্রনাথ মিত্রকে তাঁর স্বক্ষেত্রে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে, স্বচ্ছন্দভাবে বিচরণ করতে দেখা যায়। দুই বিভিন্ন চিত্তের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, তাদের কার্ষি ও কার্বন পি কিংবা তার চেয়ে বেশি একটি তরুণীকে নিয়ে আপাতভাবে একটি ত্রিকোণ কাহিনীর অবতারণা করেছেন লেখক। কিতীশ বহির্মুখী কালের লোক, দুই বন্ধুর অংশীদারী ব্যবসায় একমাত্র কর্মঠ অংশীদার; আর সুকুমার অন্তর্মুখী, ভাবুক প্রকৃতির। ব্যাপক অর্থে কিতীশই তার সব সম্বন্ধের অতিভাবক। কিন্তু যখন তারা সেই চিরন্তন সমস্যা—একটি নারী শ্যামলীর মুখোমুখি হয় তখন তাদের মধ্যে থেকে সেই চিরকালের পুরুষ বেরিয়ে আসে—সেই হিংসুক, ক্রূর, সন্দিগ্ধমন দুই পুরুষ। যৌবাড়ি-বসোমির কার্বি, সেখানে যেমন রাই যৌবাড়ি আছে, তেমনি এই কার্বে রক্ষিতারী শ্যামলী। আর আছে বিস্ময়কর সেই পশুপক্ষিবিদ আনন্দবাবু। সুকুমার ভাবুক ব্যক্তি, এবং তার ভাবের আধার ও আকার খুব স্পষ্ট না হলেও, বাইরের জগতের সঙ্গে তার চরিত্রের দ্বন্দ্ব বেশ চোখে পড়ে। হয় ত ভাবুক লেখকের জন্যে এই পৃথিবী নয়। সুকুমারের প্রেয়সী ও ভাবী বধূর সলিলসমাধি থেকে আরম্ভ করে শ্যামলীর শালীন প্রত্যাখ্যান পর্যন্ত আয়গাতেই আমরা এই সংসারানভিজ্ঞ ব্যক্তিটির জন্যে

বাধা অনুভব করি। তার জীবনের ক্ষেত্রে সেই বিরোধটি উপন্যাসটিকে অর্থবহ করেছে – যার প্রতি তার সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ থাকে সে প্রেমের ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে সেই কিন্তীশই আবার শেষ পর্যন্ত তার একমাত্র বন্ধু থেকে যায়। নরেন্দ্রনাথ বাবুর এটি একটি সুন্দর ও সার্থক উপন্যাস। নানারকমের এত বিচিত্র ছোটখাট ঘটনা এতে আছে যাতে বারবার এই উপন্যাসটিকে জীবনের সত্য প্রতিফলন, জীবনের মতই উদার ও বিচিত্র বলে ভাবতে ভাল লাগে।

আর্য দেব

লঘু ত্রিপদী—আশাপূর্ণা দেবী :
রূপা এ্যাণ্ড্ কোম্পানী

শ্রীযুক্তা আশাপূর্ণা দেবী একটি গুরুতর বিষয়ের লঘুতর বিবরণী রচনা করতে চেয়েছেন বর্তমান গ্রন্থে। নামকরণেই তার প্রমাণ প্রচ্ছন্ন আছে। দুটি যুবক এবং একটি রমণীর বিচিত্র বন্ধুত্বের সূত্রে গড়ে ওঠা একটি অভাবিতপূর্ব পরিকল্পনাকে তিনি এই উপন্যাসের কেন্দ্রভূমিতে চিত্রিত করেও চেয়েছেন। ধনী যুবক সন্দীপ রায়, নিম্নবিত্ত যুবক অতীশ এবং সুরভি নামের একটি দুঃসাহসিক নারী বিবাহ সম্বন্ধের ঝুঁকি নিয়ে তাদের তিনজনের একটি মিলিত সংসার গড়তে চেয়েছে, এবং অবশেষে তা গড়েছেও। কিন্তু শেষ অবধি দেখা যায় সময়ের ক্লান্তি পীড়িত করেছে সন্দীপকে, যে বারবার তার পূর্বজীবনের বীতবন্ধন দিনগুলিকে অস্বীকার করেও মনে মনে ফিরে যেতে চেয়েছে সেই স্নেহ সুশোভন পরিবারজীবনের সন্ধানে, এবং তার একান্ত স্নেহপরায়ণ অগ্রজ প্রদীপ রায়ের দুর্ঘটনাসূত্রে আবার সেই পূর্বতন সংসার-সীমায় প্রত্যাবর্তন করেছে। অন্যদিকে অতীশ এবং সুরভির জীবনে একদিকে তাদের সীমাবদ্ধ বস্তুবিত্ত মানসিকতা এবং প্রবৃত্তিপীড়িত দিনযাপনের শেষে যে সম্পর্কে, তারা পৌঁছেছে, তার পরেই একটি বৈধ বিবাহের প্রতিশ্রুতিতে গ্রন্থ শেষ হয়েছে। আশাপূর্ণা দেবী বর্তমান সময়ের একটি উদ্ভটরূপাশ্রয়ী সমস্যার মুখোমুখি নিয়ে গিয়ে পাঠককে যে বিস্ময়ের মুখোমুখি করে তোলেন সে সমস্যার সমাধানে পাঠকের প্রত্যাশা চরিতার্থ হয় না। লেখিকার অন্যান্য উপন্যাসে বর্তমান সময়ের যে জলদ ভাস্য দেখতে পাওয়া যায় বর্তমান গ্রন্থে তা অত্যন্ত একরঙা বিবর্ণতায় ধূসর। চরিত্র তিনটির আচরণের চতুর্দিকে কৌতুকী সমাজের কোনও চিহ্ন নেই. এটুকু অসঙ্গতি চোখে লাগে। প্রবৃত্তির প্রতিরোধ যদি কাহিনীর অন্তঃসার হয়, তাহলেও চরিত্রের সূত্রে তার বিশ্লেষণ অত্যন্ত একপেশে বলে মনে হয়। তবে লেখিকার কাহিনীগ্রথনের মুন্সিয়ানার গল্পপ্রিয় পাঠকের কাছে উপন্যাসটির আপাতরম্য বাহুতা আকর্ষণীয়। ছাপা এবং বাঁধাই অত্যন্ত মনোরম ; তবে একশো পৃষ্ঠার বই-এর দাম চার টাকার কিছু কম হলে ভালো হতো।

শ্রীমন্ত সরকার

ক্রীতদাস যজ্ঞেশ্বর রায় : প্রান্তিক : পাঁচ টাকা

যজ্ঞেশ্বর রায় তথাকথিত খ্যাতিমান লেখকদের একজন নন। তবুও তাঁর উপন্যাসে আর পাঁচজন সাধারণ কথা-কারদের থেকে আলাদা কিছু বক্তব্য থাকে। এ বক্তব্য আমাদের প্রশ্নচিহ্নিত সময়ের কিছু কিছু আরক্ত জিজ্ঞাসাকে কেন্দ্র করে বলছিত। বর্তমান উপন্যাসটিও তার ব্যতিক্রম নয়। অনাদি নামক বর্তমান উপন্যাসের নায়কটির অস্তিত্বের রক্তমাত জিজ্ঞাসা সমস্ত উপন্যাসটির চতুর্দিকে ছড়ানো। উপন্যাস থেকে আমরা জানি, অন্যান্য অগ্রজদের অত্যন্ত স্নেহের পাত্র বর্তমান উপন্যাসের নায়ক এম. এ পাশ যুবক কয়েকটি ট্রাম্পনি-নির্ভর আপাত-বেকার জীবনের আবর্তনে নারীর দেহমন রহস্যের আকর্ষণকে কেন্দ্র করে যার

স্বপ্নচরিতার্থতার নানা প্রয়াস দেখতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিবাহে সে বিমুখ জীবনের 'ক্রীতদাসে' পরিণত হতে তার আগ্রহ অত্যন্ত পরাঙ্মুখ। অথচ ভিতরে ভিতরে ভালোবাসা নিজের একটি শুদ্ধসত্ত্ব বোধের জন্যও তার আগ্রহ অত্যন্ত প্রবল, এবং এরই প্রেরণায় সে তার বাল্যবন্ধু কণ্ঠরোগগ্রস্ত নাড়ুর অপরিণীতা সহধর্মিণী ললিতার ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসে, এবং নাড়ুর মৃত্যুর পর তাকেই তার পরিণীতা স্ত্রী-র মর্যাদায় গ্রহণ করতে উন্মুখ। অনাদির সন্তানকে গর্ভে ধারণ করা সত্ত্বেও ললিতা তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, এবং আত্মহত্যার চেষ্টায় ব্যর্থ হয়ে অনাদি আবার ফিরে গেছে তার পূর্ব-প্রণয়িনী বৌদির বোন অনিতার কাছে। জীবনের নিয়মকে অস্বীকার করে নয়, জীবনের নিয়মকে অঙ্গীকার করে নিয়েই অনাদি জীবনের ক্রীতদাসত্ব বরণ করে নিয়েছে। অনাদি এবং ললিতা যারা লেখকের জবানীতে: 'নিজস্ব সত্তার গভীরে তাদের স্ব স্ব ধারণা ও বিশ্বাসকে বারংবার অন্বেষণ করেছে।' কিন্তু যেহেতু 'এই পরম-সমর্থ-সম্ভাতা কিম্বা আমাদের সত্তার কোন অজ্ঞাত অংশ আমাদের অভিজ্ঞতাকে পুনঃপুনঃ নস্যাত করে, তাই ললিতা জীবনের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে প্রবৃত্তির মূল্যেও জীবনকে অস্বীকার করতে, জীবনের বিশ্বাস ধারাতে রাজি হয়নি, আর একটি পরাজিত যুবকের নিঃসঙ্গ বিবেক অন্যদিকে জীর্ণ প্রত্যাহিকতার হাতে পুনরায় সমর্পণ করেছে। লেখকের বিশ্লেষণ এবং চরিত্রভাবনা অধুনা-প্রচলিত একটি 'ক্লান্তির দর্শনের' অনুযোজন-চিহ্নিত, কিন্তু চরিত্রগুলির পাশাপাশি প্রতিবেশ অত্যন্ত নীরব, ফলে তাদের আত্মকথী জিজ্ঞাসা এবং দ্বন্দ্ব কোনও পরিপার্শ্ব-সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষে দীপ্যমান নয়। মুহূর্তের দেখায় নিতান্ত যৌন-প্রেরণায় দীপালী কিংবা অনিতার মত চরিত্র অনাদির কাছে আত্ম-সমর্পণ করে; আবার ললিতা ও অনাদির দ্রুতসঞ্চারিত ঘনিষ্ঠতার বিবরণও তাদের বিশিষ্টতা সত্ত্বেও জীবনের অনুযোজিত বলে বিশ্বাস জন্মায় না। এ সব ক্ষেত্রে পাঠকের বিশ্বাস লেখকের উপন্যাস এবং পূর্বনির্ধারিত 'ক্রীতদাসে' নামক এই একটি বিশ্বাসের বিশ্লেষণের কাছে পরাজিত হয়। তাছাড়া ভাষার ক্ষেত্রে লেখকের কিছু কিছু ত্রুটিও অত্যন্ত চোখে পড়ে। যেমন 'আবার করে (পুনরায় অর্থে); একটি কথে যাওয়া চটের পর্দার বর্ণনায় "অনেক বর্ষার ঝাপটা খেয়ে তলার দিকটা কয়ে কয়ে মুড়ির মতন হয়ে গেছে (পৃঃ ৪২)" কিম্বা "নিশোল খাঁটি পারা (পৃঃ ৬৩)", 'মোচ্ছা' 'সারা রাত ক্ষুধা তোমার পেটে বাটনা বেটেছে' (পৃঃ ৯১), 'চরম বাসনে ওকে বেষ্টন করতে চাইবে তখন (পৃঃ ৩৫)' ইত্যাদি আরও বাক্যবন্ধ লেখকের বিশ্লেষণী অন্তর্মুখিতার সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না। তৎসত্ত্বেও আমাদের সময়ের একটি ক্লান্তিবহ জিজ্ঞাসার অভিজ্ঞান হিসেবে অজেয়র রাত্রে বর্তমানে মনস্তত্ত্ব সম্মত উপন্যাস কটি মনে রাখার মত।

শ্রীমন্ত সরকার

পাখিরা পিঞ্জরে—বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশ ; সাড়ে তিন টাকা

আমাদের সাম্প্রতিক উপন্যাসে গ্রাম্যজীবন অনেকখানি উপেক্ষিত ; আর যাকে মাঝে তার উপস্থিতির আড়াল থেকে চরিত্রগুলির উপর শহুরেপনার আরোপ বড়ো বেশি করে চোখে পড়ে। আর নন্তো খামুলি একটা প্রেমের উপাখ্যান গ্রামজীবনের অনেকখানিকে ঢেকে দিয়ে শেষ অবধি অনেক টানাপোড়েনের পর যাহোক একটা সমাধানের তীরভূমিতে নিয়ে এসে পাঠককে ছেড়ে দেয়। আমার কথা এই নগর সর্বস্বতার যাদুখানে অন্তত দু একজন অনুদিবের ঔপন্যাসিকের মতো তরুণ কথাশিল্পী বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও গ্রামজীবনের একটি স্বতন্ত্র ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সাম্প্রতিক ছোটগল্পের জগতে তিনি একজন বিশিষ্ট গল্পকার, কিন্তু কাহিনীকে তিনি তত্ত্বের মূল্যে, অন্যান্য অনেক অনুসারীর

ছোটগল্পকারদের মত, নির্দিষ্ট করেন না, বরং কাহিনীর একটি বিশিষ্ট স্বাতন্ত্র্যমানতার সঙ্গে তাঁর জীবনপ্রসূত বক্তব্য অত্যন্ত নিপুণ প্রয়নে যুক্ত থাকে। বর্তমান উপন্যাসেও সঙ্কেতবহ প্রয়নামের মধ্য দিয়ে সম্ভবতঃ জীবনের একটি রূপক উন্মোচনই তাঁর অভিষ্ট। গীবলহাটি গ্রামের চৌকিদার অনন্ত, জীবনের একটি ইতিবাচক অর্থবহতার প্রতি যার আসক্তি, অথচ শঠ, প্রতারক এবং কুরুচরিত্র বদ আর মেয়েমানুষের ব্যবসাদার ভোলাবাবুর প্ররোচনায় জীবনের পাপপঙ্কে যার পদস্খলন ঘটেছে, গ্রামের সৎ এবং আদর্শবাদী বিশ্বেশ্বরের ঘরে আগুন লাগিয়ে তাকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন করে তার স্ত্রী যামিনী এবং পুত্র সত্যবানকে সে পথে নামিয়েছে, বিনিময়ে অনন্তের মনে বিধবা উমাশশীকে বেষ্টন করে একটি সুখী গার্হস্থ্যের স্বপ্নও যার প্রত্যাশিত হয়েছে, সে তারপর থেকে খুঁজে বেড়িয়েছে সত্যবান এবং যামিনীকে তার পাপাহত বিবেকের প্রণোদনায়। কোনও এক মুহূর্তে যামিনী তার হাতে সত্যবানকে সমর্পণ করে মুহূর্তে অদৃশ্য হবার পর গ্রামের সমস্ত রকম প্রলোভনের পরিমণ্ডল ছেড়ে পাখি ধরা আর পাখি বেচার কাজের মধ্য দিয়ে অনন্ত গন্ধে গন্ধে খুঁজে বেড়ায় যামিনীকে, তার হাতে সত্যবানকে সমর্পণ করার জন্যে। অবশেষে আর এক বন্দরে বৈরিণী সাবিত্রীর পঙ্কশয্যার মাঝখান থেকে যামিনীকে আবিষ্কার করে অনন্ত। নৌকো ভেসে যায়। চতুর্দিকে অন্তহীন জলরাশি। এবং অনন্তের নৌকোর সাবিত্রীর মাতৃস্নেহক্রোড়ে সত্যবানের নিশ্চিন্ত আশ্রয়। মোটামুটি এই কাহিনীটি চারদিকে এমন একটি সুন্দর আকর্ষণীয়তা সঞ্চারিত, যে কাহিনীর আকর্ষণ পাঠককে মুহূর্মুহু উপন্যাসের 'গল্প' (ফর্স্টার যাকে story বলেছেন) এবং অন্তর্লীন রূপকাশ্রিত বক্তব্যটি সম্বন্ধে সজাগ করে তোলে। অনন্তের একটা স্বপ্নসূত্রে সুরেনবাবুর বর্ণনা স্মরণ করা যাক, "অনন্তের চেহারাটাও অদ্ভুত দেখাচ্ছে। মাথায় পালক গোঁজা, পরণে বাঘছাল, হাতের ধনুকখানা লাঠির মত, তার এক হাতে খাঁচায় কয়েকটি ছোট ছোট পাখি ছটফট করে উড়বার চেষ্টা করছে। একটা ছোট পাখি আর এক পাখিকে তাদের ভাষা দিয়ে বললো, খাঁচার শিকগুলো কি শক্ত। অন্য পাখি উত্তর করল "আমাদের ঠোঁটগুলো কেন যে করাতের মত ধারাল নয়!" নিঃসন্দেহে এ বক্তব্য রূপক, এবং রূপকের আড়াল থেকে অনন্তের ভাবনা আমাদের সমগ্রের ভাবনার ভিন্নার্থবাহিত তাৎপর্যের মর্যাদা অর্জন করেছে। একটি শুভতৃষ্ণ জীবন, জলের প্রতীক এবং পাখির রূপকে পাখিরা শিল্পের সাম্প্রতিক বাঙলা কথাসাহিত্যে এক স্বতন্ত্রলাভের উপন্যাস।

শ্রীমন্ত সরকার

নীল চন্দ্রমল্লিকা—কারেল চাপেক

অনুবাদ, মোহন গঙ্গোপাধ্যায় ও দিলাতা গঙ্গোপাধ্যায়

রূপা এ্যাণ্ড কোম্পানী : চার টাকা

বাঙলা ছোটগল্পজিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে কারেল চাপেক নামটির সঙ্গে বাঙালী পাঠকের বোধহয় প্রথম পরিচয় ঘটে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'সাহিত্যে ছোটগল্প' নামক গ্রন্থটির মাধ্যমে। কিন্তু তাঁর গল্পের কোনও বিস্তৃত পরিচয় এতদিন পর্যন্ত বাঙলা সাহিত্যে অনুক্ত ছিল। প্রকাশক অনুবাদক এবং অনুবাদিকাকে ধন্যবাদ তাঁরা চেকোস্লোভাকিয়ার এই নাতীয় সাহিত্যিকের অসাধারণ গল্পগুলিকে বাঙালী পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। অনুবাদক দম্পতী উভয়েই চেক ভাষায় অত্যন্ত পারঙ্গম, ইতোপূর্বে চেকোস্লোভাকিয়ার কিছু রূপকথা 'বারো মাসের বারো রাজা' নামে তাঁরা বাঙালী পাঠকদের উপহার দিয়েছেন। বর্তমান গ্রন্থে তাঁদের সেই নৈপুণ্য পুনঃ প্রমাণিত হোলো। একটি সংক্ষিপ্ত পরিচিতিতে তাঁরা চাপেকের জীবন এবং সাহিত্যকর্মের একটি সুন্দর আলেখ্য চিত্রিত করেছেন। সমাজের দ্রাতা, অবহেলি

অন্তেবাসী সম্প্রদায়, 'আইনের চোখে যারা অপরাধী, এবং সমাজ যাঁদের বিচারকের আসনে বসিয়েছেন' তাদের প্রতি এক অপরূপ শ্রীতিস্নিগ্ধ মমতা চাপেকের প্রতিটি রচনায় ক্ষরিত। অকিঞ্চন মানুষের জীবনবৃত্ত রচনায় চাপেকের সহৃদয় নিরীলস্তা মানবিক ত্রুটি বিচ্যুতি কিম্বা সফলতা বিফলতাগুলির যে অনুপম জীবনধর্মগুলি তুলে ধরেছে, শোভন ভাষান্তরে তা বাঙলা ভাষার এক চিরস্থায়ী উত্তরাধিকার হিসেবে গণ্য হবে। 'ডাক টিকিট' নীল চন্দ্রবল্লিকা, 'কবি' 'ডাকঘরের ঘটনাটি' কাবিক চোর ইত্যাদি গল্পগুলি এই সংকলনের অন্যতম সম্পদ। চোর পুলিশ, এবং অত্যন্ত সাধারণ মানুষেরাও রহস্য রোমাঞ্চ সিহিরের বাইরে এমন করে মুহূর্তের আলোয় ছোট গল্পের দীপ্তিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে পারে, অনুবাদক দম্পতীকে পুনরায় কৃতজ্ঞতা জানাই, তাঁদের মাধ্যমে না জানলে, অনেকের পক্ষেই জানাটা এত সহজসাধ্য হত না।

শ্রীঅন্ত সরকার

কবিতা

নিজের বিপক্ষে—সামসুল হক। দু টাকা

কালনদীরূপ—শান্তি বসু। আড়াই টাকা

[সাহিত্য]

বছর আনি 'নিজের বিপক্ষে' সুপরিচিত তরুণ কবি সামসুল হকের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ। কবিতাগুলি পড়ে প্রথমেই আকর্ষণ অনুভব করি কবির সকীয়তায়। কোন বিষয়বিশিষ্ট আবহা অন্ধকার তাঁর স্বভাবে নেই, সেকারণে ভঙ্গি বক্র, বাচন স্পষ্ট। ছোট ছোট কবিতায় জীবনবৈচিত্র্যের সঙ্কেত আমাদের মধ্যেই ভাষায়। চিত্রে ও ভাবনায় কবি সেই মূলের মানুষ যার আসল এখনো হয়ত পাওয়া যায় লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন প্রকাশমাধ্যমে। স্বভাবতই গ্রামের কথা মনে পড়ে—গ্রামের সেই সরলতা, সেই নৈসর্গিক স্পষ্টতা ইত্যাদি ইত্যাদি। বাস্তবিকপক্ষে গ্রাম তাঁকে আচ্ছন্ন করে নি; বিমুক্ত মূলের একপাশে দাঁড়িয়ে লোকসংস্কৃতির জীবন্ত ভাবনাগুলিই যেন শুধু স্পষ্ট হয়ে উঠেছে—হয়ত সেইটাই তাঁর লক্ষ্য। না হলে অমিয়ভূষণ নীলকণ্ঠ' কেন বলবে: 'কারা যেন ডেকে মরছে: রক্তের শরীরে ওরে ঘরে ফিরে আয়/ততক্ষণে আহা শোন্—মোহন পিতল আলো—নীলকণ্ঠ গায়'। সমস্ত বইটিই যেন নীলকণ্ঠের গান। কবি এই তন্ময়তার মূলের নরকঙ্কালের সম্পর্কেও অবহিত: 'চৌদিকে বিষ ছড়ানো/ চৌদিকে বিষ ছড়ানো/নেইরে বুড়ো ওঝা মুখন কাঁপে কবির ঘরে লিখো ভয়ের খোঁজো' (ভয়ের ভয়ন)। কিন্তু কবি বিশ্বাস হারান না: 'শিখের ওখানে নয়, শিবেন, ওখানে নয়, শিবেন, ওখানে শিবেনের আয়ু কাল ফিরে গেছে মহত্তম আলোর সন্ধানে' (শিবেনের আয়ু); কিংবা, 'গোলাপ তুমি বলাল ফুলে সারা সহর আলো/পুনর্বার মল্লিকার বনে প্রবল কলি' (দিনলিপি)। কমল, শ্বেতপদ্ম, পদ্মনাভ, চঞ্চুবোড়া, আহত পাখি ইত্যাদি প্রসঙ্গ খুব স্বাভাবিক-ভাবেই কবির মনে পড়ে, কারণ ওগুলি তাঁর অভিজ্ঞতার বাসিন্দা। পরবর্তী কাব্যে আমরা সেই বিস্মৃতপ্রায় জীবনের আরো অনেক অনেক ছবি দেখার আশায় রইলাম।

কালনদীরূপ—কাব্য-গ্রন্থে কবি শান্তি বসুর একষট্টি সালের কবিতা সংকলিত হয়েছে যদিও গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে ১৯৬৫ সালে। এই দীর্ঘ ব্যবধানের কবিকর্মের সকল দিকটা চোখে পড়ে না। প্রেমই কবির প্রধান উপজীব্য। প্রেমের অন্তরেই তাঁর কণ্ঠ সোচ্চার। মাঝে মাঝে রবীন্দ্র সরলতার আভাসও যেন বেশ ভাল লাগে। প্রেমের শক্তিতে শক্তিমান কবির জীবনের প্রতি বিশ্বাস অটুট। তাই কবি বলতে পারেন: 'আমার সত্তোর আলো পাবে না তোমারে পৃথিবী তবাপি পাব প্রত্যহের বোঝা দুই কাঁধে / তোমার ভবন দুই কীর্তনে ভোরায়ে (ধনং)। 'সমস্ত প্রেমের রসে সিক্ত দুঁই মূল' (১৩ন)—কবি এই সত্যবোধ অবলম্বন করে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করেছেন। পরবর্তী গ্রন্থে আশা করবো আরো সাম্প্রতিককালের কবিতা।

সংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

লক্ষ লক্ষ প্রাণ একই সূত্রে গাঁথা।
ছোট ছোট অসংখ্য স্রোতস্বিনী যেন বিরাট এক নদীতে গিয়ে মিলিত হচ্ছে।

নানা ধর্ম্ম ও নানা মতের লোক এই দেশে স্বাধীনভাবে শান্তি ও সম্প্রীতিতে বাস করছেন। এই ঐক্যবদ্ধ সমাজ, এই শান্তি ও সম্প্রীতি সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা উচিত এবং তার জন্য সংগ্রাম করতে হলেও তা বরণীয়। মনে রাখবেন যে ভারতের এই ঐকাবদ্ধ সমাজে আপনার মতো, আপনার প্রতিবেশীও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ] ৭ম সংখ্যা [কার্তিক ১৩৭২

সম্পাদকীয়

যুদ্ধ ও ভারতের জাতীয় লক্ষ্য

কেন পাক-ভারত যুদ্ধ এবং চীন-ভারত সংঘর্ষ সে, সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকলে এবং এরূপ যুদ্ধের অন্তিম উদ্দেশ্য কি সে সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য না থাকলে ভারতের পক্ষে সাফল্যের সঙ্গে যুদ্ধ ও যুদ্ধাবস্থায় জাতীয় কর্তব্য নির্ণয় করা সম্ভব নয়। ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধের তিন সপ্তাহে ভারতের প্রায় ৪,০০০ সৈন্য নিহত হয়েছিল এবং প্রায় ৩,০০০ সৈন্য বন্দী হয়েছিল এবং আহত হয়েছিল প্রায় ৫,০০০ জোয়ান ও অফিসার। ১৯৬৫ সালের ২২ দিনের যুদ্ধে সরকারী বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী ১৬১ জন ভারতীয় অফিসার ও ২,২২৩ জন জোয়ান নিহত হয়েছে এবং ৭,৪৫৮ জন জোয়ান ও ৪১২ জন অফিসার আহত হয়েছে। জোয়ান ও অফিসারদের হতাহতের এরূপ বিরাট সংখ্যা শুধু চীন-ভারত ও পাক-ভারত যুদ্ধের গুরুত্ব নির্ণয়ই করে না, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে যে কোন সমর খণ্ডের অতি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের সঙ্গে যে এরূপ যুদ্ধ তুলনীয় সেকথাও নির্দেশ করে। এরূপ রক্তের মূল্যে যে পাক-ভারত ও চীন-ভারত যুদ্ধাবস্থার সূচনা হয়েছে তার স্বরূপ এবং লক্ষ্য কি?

পাক-ভারত যুদ্ধ এবং চীন-ভারত যুদ্ধের গতি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে বিভ্রান্তি অথবা এরূপ যুদ্ধের কারণ ও সমাধান সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণার অভাবেই আজও ভারতের পক্ষে কোন বলিষ্ঠ নীতি গ্রহণ করা এবং সেই নীতির ভিত্তিতে সমগ্র জাতীয় চেতনা ও শক্তিকে সুসংহত করা সম্ভব হয় নি। এরূপ নীতির অভাবেই একশ্রেণীর কংগ্রেস নেতা এই যুদ্ধাবস্থার সুযোগে অগ্রিম নির্বাচনের দাবী করার মত সংকীর্ণ স্বার্থবুদ্ধির পরিচয় দিয়েছিল এবং ১৯৬৬ সালের নির্বাচনের জন্য অত্যুগ্র আগ্রহে কংগ্রেসী দল প্রস্তুতি সুরু করে দিয়েছে। অন্যদিকে রাজাজী ও জয়প্রকাশের ন্যায় রাজনৈতিক দূরদর্শীরা কাশ্মীর ও আকসাই চীনকে যথাক্রমে পাকিস্তান ও চীনকে দান করে শান্তি ক্রয় করবার প্রস্তাব করবার প্রেরণা পাচ্ছেন এবং চীনপন্থী কম্যুনিষ্টদের পক্ষে কাশ্মীরকে অবীভাংসিত সমস্যার রাজ্য এবং চীন অধিকৃত

আবদাই চীনকে চীনের রাষ্ট্রাংশ বলে প্রকাশ্যে মত প্রকাশ করবার দুঃসাহস দেখানও সম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধের নীতি, গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে মারাত্মক বিভ্রান্তির জন্যই কংগ্রেসী নেতৃত্ব ও মন্ত্রীবর্গ জাতীয় স্বার্থ ও প্রয়োজনকে অগ্রাহ্য করে বর্তমান জরুরী অবস্থাকে দলীয় স্বার্থে ব্যবহারের জন্য অত্যুগ্র তৎপরতা দেখাচ্ছে এবং ১৯৬২ ও ১৯৬৫ সালে ভারতে বিপুল দেশপ্রেমের অভিব্যক্তি সত্ত্বেও এই দেশপ্রেমিক জনতাকে এক লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধ ও সংঘবদ্ধ করতে সক্ষম হয় নি।

নীতি ও লক্ষ্যের বিভ্রান্তির জন্যই পাক-চীনের আক্রমণাত্মক উদ্যোগে ভারতে প্রতি-ক্রিয়া ঘটেছে, ভারত কখনও 'ইনিসিয়েটিভ' গ্রহণ করে নি। শান্তিবাদী দর্শনের বৈপ্লবিক মোড়কের ফলে ভারতের রাষ্ট্রনীতিতে 'ডিফেন্সিভ অ্যাটিট্যুড' বা মনোবৃত্তি মজ্জাগত হয়ে গেছে। এই ডিফেন্সিভ অ্যাটিট্যুডে"র জন্যই সময় ও সুযোগ মত শত্রুকে ভারত আঘাত করে নি,—১৯৪৮ সালের কাশ্মীর আক্রমণের সুযোগে, ১৯৫০ সালের পূর্ব বাংলার দাঙ্গার ঘটনায় এবং ১৯৬৫ সালের কচ্ছের লড়াইয়ের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের বিহ্বাহ ভেঙে দিয়ে কংগ্রেস সরকার এই উপমহাদেশে স্থায়ী শান্তির ভিত্তি রচনার কখনো অগ্রসর হয়নি।

পাকিস্তানের লক্ষ্য শুধু কাশ্মীর দখল করা নয়,—ভারতকে পঙ্গু করা, বিপর্যস্ত করা এবং ভারতকে সর্বদা বিব্রত রাখা যাতে এই ভারত-বিদ্বেষ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে কৃত্রিম যোগসূত্র হয়ে পূর্ব পাকিস্তানের উপর পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন স্থায়ী করা যায়। পাক-ভারতের সংঘর্ষের পরিস্থিতি ছাড়া পাকিস্তানের ন্যায় অসম্বন্ধে উদ্ভূত একটি রাষ্ট্রের পক্ষে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হোত না। ভারতের পক্ষেও এই উপ-মহাদেশে স্থায়ী শান্তি ব্যতীত আর্থিক পরিকল্পনা বা কম্যুনিষ্ট চীনের আগ্রাসী অভিসন্ধিকে স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রিয় করার কার্যক্রমকে সফল করা যে সম্ভব নয় সেকথাও দিল্লী-নেতৃত্ব এখনও উপলব্ধি করেন নি।

চীনের অভিপ্রায় শুধু আবদাই চীনের উপরে দখলদারী কায়েম রেখে লাসা সিংকিয়াং পথকে সুরক্ষিত করা নয়; প্রথম পর্যায়ে তিব্বতকে একটি চীনা প্রদেশে রূপান্তর, দ্বিতীয় পর্যায়ে চীনা তাবেদার হিমালয় ফেডারেশন গঠন এবং তৃতীয় পর্যায়ে ভারত ও দক্ষিণ-পূর্ব এসিয়ায় চীনা কম্যুনিজম-এর সম্প্রসারণ,—চীনের মূল নীতি ও লক্ষ্য। কাজেই হিমালয় প্রান্তের যুদ্ধ যে শুধু সীমান্ত সংঘর্ষের লড়াই নয়,—সে সম্বন্ধেও এখনও ভারতের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত সুস্পষ্ট নয়।

ভারত ত্যাগ করে পাকিস্তান সৃষ্টি এবং তিব্বতের উপরে চীনের দখলদারীর স্বীকৃতির দ্বারা ভারতের সার্বভৌমত্ব স্থায়ীভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ভারতের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা ও তার গণতান্ত্রিক জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনাও বিপন্ন হয়েছে। ভারতের জাতীয় সত্তাকে রক্ষা করার জন্যই প্রথম পর্যায়ে ভারত ভাগের বিষাক্ত প্রতিক্রিয়াকে নিষ্ক্রিয় করে এই ভারতীয় উপমহাদেশে একটি পারস্পরিক ঐক্য ও শান্তিকামী নতুন রাষ্ট্রীয় কাঠামো রচনা করা এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে এই ঐক্যবদ্ধ উপমহাদেশকে কম্যুনিষ্ট চীনের আক্রমণাত্মক সামরিক রাজনীতির সম্মুখীন হবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বিশ্বের কোন সামরিক সংঘর্ষের ক্ষেত্রে রাশিয়া ও আমেরিকা বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছে,—এরূপ উদাহরণ নেই বললেই চলে। পাক-ভারত সংঘর্ষে আমেরিকা সামরিক দিক দিয়ে নিরপেক্ষ। রাশিয়া ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। চীনের আগ্রাসী রাজনীতির জন্যই এরূপ পররাষ্ট্রীয় ট্যাকটিক্যাল সুযোগ ভারতের পক্ষে এসেছে। চীনের সহায়তা ছাড়া পাকিস্তানের পক্ষে আর আক্রমণাত্মক কার্যক্রম গ্রহণ করা সম্ভব নয়। কিন্তু

আক্রমণাত্মক ট্যাকটিকস ছাড়া আয়ুবশাহীর পক্ষে পাক-রাজপাটের অস্তিত্ব রক্ষা করাও সম্ভব নয়। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানের পক্ষে চীনের প্রত্যক্ষ সাহায্যে দ্বিতীয় পর্যায়ের আক্রমণ করা সম্ভব না হলে আগামী মার্চ মাস পর্যন্ত পাকিস্তান 'ডিফেনসিভ ডিপ্লোম্যাসী'তে ভারতকে বিভ্রান্ত করে রাখার চেষ্টা করবে। কারণ, শীতের সময়ে চীনের প্রত্যক্ষ সাহায্যলাভ পাকিস্তানের পক্ষে সম্ভব নয়। আয়ুবের আমেরিকা ও রাশিয়া ভ্রমণের লক্ষ্যও এরূপ ডিফেনসিভ ডিপ্লোম্যাসী'র সংকেত। পক্ষান্তরে এই শীতকাল ভারতের পক্ষে আয়ুবশাহীকে পর্যুদস্ত করার বিশেষ সুযোগ।

প্রথম পর্বে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভক্ত ও বিপরীত-মুখী রাজনীতির অবসান ঘটান এবং দ্বিতীয় পর্বে হিমালয়ের উপরে চীনা কর্তৃত্বকে নিষ্ক্রিয়করণের ট্যাকটিকস গ্রহণ ভারতের জাতীয় সত্তার পক্ষে অপরিহার্য। প্রথম পর্বকে সফল পরিণতিতে নিয়ে যাওয়ার পক্ষে একান্ত ও আশু প্রয়োজন 'অফেনসিভ ট্যাকটিকস'র কর্মকৌশল। এই শীতকাল ভারতের এই 'অফেনসিভ ট্যাকটিকস'র পক্ষে অপূর্ব সুযোগ স্বরূপ। কিন্তু ভারতীয় নেতৃত্ব কি এই দূরদর্শী ও সাহসী ট্যাকটিকস গ্রহণ করবে?

পশ্চিমবঙ্গের নূতন খাদ্যনীতি

১৯৬৬ সালে খাদ্যে চরম দুর্যোগের সম্ভাবনা সরকারী স্বীকৃতি পাবার ফলে, সরকারী খাদ্যনীতির গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘোষিত হয়েছে। খাদ্যের এই সঙ্কট কোনো আকস্মিক ঘটনা নয়, কিছুকাল যাবৎই খাদ্যের পৌনঃপুনিক সঙ্কট সম্পর্কে সরকারী ঔদাসীন্য, অবিমৃষ্যকারিতা এবং কালোবাজারী ও মুনাফাখোরী সম্পর্কে সরকারী পরমসহিষ্ণুতা বর্তমান সঙ্কটকে পরিণতি দিয়েছে। বেশী দিনের কথা নয় ১৯৬৩র খাদ্যসঙ্কটে সরকারী আচরণ বিশেষভাবে অবস্থা নিয়ন্ত্রণে প্রশাসনিক ব্যর্থতার সরকারী অস্বীকৃতির মধ্যে বর্তমান সঙ্কটের গুরুতর সম্ভাবনা নিহিত ছিল। ১৯৬৪ সালেও ৫৭ লক্ষ টন উৎপাদিত চাউলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ লক্ষ টন গমের যোগান মিলিয়ে, পশ্চিমবঙ্গে এ বছর প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও খাদ্যের গুরুতর অভাবের কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৬৬ সালে ৪১ লক্ষ টন চাউলের অনুমান করা হয়েছে। এ-বছর কেন্দ্রীয় সরকারের গমের সরবরাহ একেবারে অনিশ্চিত, কারণ পি, এল ৪৮০ মার্কিনী গম কি পরিমাণ পৌঁছাবে, কখন পৌঁছাবে কিম্বা আদৌ পৌঁছাবে কিনা সে-সম্পর্কে কোনই নিশ্চয়তা নেই। সুতরাং সঙ্কটের পরিমাণ সহজেই অনুমেয়। এ-অবস্থায় সরকার দশ লক্ষ ও তদূর্ধ্ব জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে পূর্ণ রেশনিং-এর এবং অন্যান্য এলাকায় আংশিক রেশনিং-এর সাহায্যে খাদ্য সরবরাহ করবেন এবং সেই কারণে চাউলের বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত একচেটিয়াভাবে সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করবেন। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের পরিমাণ অনুমিত হয়েছে ১৫ লক্ষ টন। বলা বাহুল্য কেন্দ্রীয় সরবরাহের অনিশ্চিতি এবং উৎপাদন হ্রাস পাবার জন্য পূর্ণ রেশনিং এবং আংশিক রেশনিং দুই ক্ষেত্রেই খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেওয়া হবে। এই দুই ব্যবস্থায় রেশনিং-এর পরিমাণ কত হবে তা উল্লেখ করা হয় নাই।

যেখানে খাদ্যের ঘাটতি রয়েছে, ফলে খাদ্য মজুত করে মূল্যবৃদ্ধির অবাধ সুযোগ হয়েছে, সেখানে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত খাদ্য পুরোপুরি সরকারী করায়ত্ত না হলে বণ্টনের সমতা রক্ষা ও মজুতদারদের সায়েস্তা করে মূল্যস্থির রাখা অসম্ভব। সুতরাং মনোপলি প্রকিওরমেন্টের, অর্থাৎ একচেটিয়া ধান-চাউল সংগ্রহের নীতি অনিবার্য। কিন্তু প্রকিওরমেন্টে ধান-চাউলের মূল্যস্তর কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে

আনুপাতিক কিনা, লেভির হার কৃষকের পক্ষে বহনসাধ্য কিনা, অর্থাৎ লেভির যোগানের পরিমাণ উৎপাদনের এবং কৃষকের খোরাকের পরিমাণের আনুপাতিক কিনা এই প্রশ্নগুলির মুষ্ঠু প্রয়োগের উপর মনোপলি প্রকিওরমেন্টের সার্থকতা নির্ভর করে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিভিন্ন শ্রেণীর ধানের দর ১৩৲ ১৪৲ ও ১৬৲ টাকা নির্ধারিত করেছেন। উৎপাদন ব্যয় মিটিয়ে ধানের এই দর কৃষকের পক্ষে অত্যন্ত অভিলিৎকর এই মর্মে বক্তৃতার ঝাড়ী উঠেছে। মোটা ধানের উৎপাদন ব্যয়ই ন্যূন পক্ষে ১১ টাকা। সুতরাং ধানের দর বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। লেভির পরিমাণ সেচসিক্ত ও সেচমুক্ত জমিতে বিভিন্ন হারে ধার্য হলেও এই লেভির হার সম্পর্কেও প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে। দুই একর পরিমিত সেচমুক্ত জমি ও দেড় একর পরিমিত সেচমুক্ত জমির উৎপাদন লেভিমুক্ত হবে। জমির উপর লেভির হার ধার্য করার ফলে বিঘা প্রতি কিম্বা একর প্রতি সরকারের অনুমিত পরিমাণ ফসল যদি উৎপাদিত না হয়, সেক্ষেত্রে চাষীর খোরাকের ধানের অংশ দিয়েও লেভির অঙ্ক মেটাতে হবে। উৎপাদন যদি খুব কম হয়, সেক্ষেত্রে এমনও আশঙ্কা থেকে যায় যে সম্পূর্ণ উৎপাদন দিয়েও লেভির অঙ্ক মেটানো গেলো না। কিন্তু যদি উৎপাদনের পরিমাণ এবং পরিবারের লোকসংখ্যার ভিত্তিতে লেভির পরিমাণ ধার্য করা হয়, কৃষক সুবিচার পাবে। অন্যথায়, কৃষকের গুরুতর ও শোচনীয় দুর্দশার সম্মুখীন হবার সম্ভাবনা থাকবে এবং লেভির বিরুদ্ধে দুর্বার প্রতিরোধ দেখা দেবে।

চাউলকলগুলিকে সীমাবদ্ধ এলাকায় ধান সংগ্রহ করার অধিকার দিয়ে নূতন খাদ্যনীতিতে এই সুযোগ পথে কালো-বাজারীর সূচীমুখ তৈরী করে রাখা হয়েছে। চাউল কলগুলি এ-বছর চাউল মজুত ও চোরাকারবারের জন্য দায়ী, তা সত্ত্বেও এদের সম্বন্ধে এই দুর্বলতা সরকারী আন্তরিকতার সন্দেহের উদ্রেক করবে। তাদের উপর শতকরা ১০০ ভাগ লেভির সিদ্ধান্ত বহু পূর্বেই প্রয়োগ হওয়া উচিত ছিল।

পাইকারী ব্যবসা সম্বন্ধেও এই অভিযোগই প্রযোজ্য। পাইকারী ব্যবসাতে লোপ নিশ্চিত করেও নূতন নীতিতে প্রয়োজন বোধে জেলাশাসকদের সীমাবদ্ধ এলাকায় পাইকারী ব্যবসা চালু করবার অধিকার দিয়ে আর একটি কালো-বাজারীর সূচীমুখ তৈরী করে রেখেছেন। জেলা কর্তৃদের ব্যাপক প্রয়োগ অব্যাহত থাকবে। ভাগচাষী সম্পর্কে নূতন খাদ্যনীতি নীরব। ভাগচাষীদের বেলায়ও তাদের উৎপাদন এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে লেভি ধার্য না করলে গুরুতর অন্যায় হবে।

ধানের দাম, লেভির পরিমাণ, আংশিক রেশনের নিয়মিত যোগান, রেশনের পরিমাণ—এই সমস্যাগুলির মুষ্ঠু সমাধানের উপর নূতন খাদ্যনীতি সম্পর্কে জনসাধারণ আস্থাবান হবে। গত কয়েকবছর খাদ্যসমস্যার সমাধানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বিরোধী দলগুলির সহিত সরকারী অসহযোগ, মূল্যবৃদ্ধি, চোরাকারবার ও কালোবাজারের ক্রমবর্ধমান প্রভাব প্রশাসনিক কর্মকুশলতার উপর চূড়ান্ত অবিশ্বাস সৃষ্টি করেছে। সুতরাং মূলতত্ত্বাবে, মনোপলি প্রকিওরমেন্ট ও রেশনিং বর্তমান অবস্থায় অনিবার্য নীতি হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকের এবং ক্রেতাসাধারণের এই নীতি সম্পর্কে আস্থা সৃষ্টি না করতে পারলে নূতন নীতি গুরুতর দুর্যোগ ডেকে আনবে।

ভারতে সীমান্ত গান্ধীর আমন্ত্রণ

লোকসভায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং জানিয়েছেন যে ভারত সরকার সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গফ্‌ফর খানকে ভারতে আমন্ত্রণের সিদ্ধান্ত করেছেন। সংবাদে প্রকাশ যাদবপুর খান যে উদ্দেশ্যে আফগানীস্থানে গিয়েছিলেন ইঙ্গ-মার্কিণ চক্রান্তের চাপে সেই উদ্দেশ্যকে কার্যকরী করার পথে নানা বাধার সৃষ্টি

হয়েছে। সীমান্ত পরিভ্রমণ ও পার্বত্য এলাকার উপজাতিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে পাখতুনদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার সীমান্ত গান্ধীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দিতে আফগান সরকার দ্বিধাগ্রস্ত। তাই, তিনি ভারতে আসতে এবং ভারতকে কেন্দ্র করে পাখতুনী স্বাধীনতার সংগ্রাম চালিয়ে যেতে ইচ্ছুক। এই আজীবন বিপ্লবী ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শান্তির অভিলাষী নন। কিন্তু আপোষরফা করলেই এরূপ সুবিধা পাকিস্তানের কাছ থেকে তাঁর অপ্রাপ্য ছিল না। খান আবদুল গফ্‌ফর খান ভারতে আসতে চান স্বস্তিতে শেষ জীবনের অবসর বিনোদনের জন্য নয়,—তাঁর রাজনৈতিক লক্ষ্যকে কার্যকরী করার জন্য। আমরা আশাকরি যে খান আবদুল গফ্‌ফর খানকে আশ্রয় দেওয়ার জন্য নয়,—পাখতুনদের স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার এই বিপ্লবী নেতাকে সর্বভাবে সাহায্য ও সমর্থনদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেই তাঁকে ভারতে আমন্ত্রণ করা হয়েছে। সত্বর যাতে তিনি ভারতে আসতে পারেন, আশাকরি ভারত সরকার সে ব্যবস্থাও করবেন। আমরা এই মহান বিপ্লবী নেতাকে স্বাগত জানাবার অপেক্ষায় রয়েছি।

কাশী বিশ্ববিদ্যালয়

বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য বিশ্ববিদ্যালয়' রাখার প্রসঙ্গে একটি বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে। একশ্রেণীর ব্যক্তি এই বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'হিন্দু' শব্দটি বর্জনের বিরোধী। আলীগড় মুসলীম বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকে 'মুসলীম' শব্দটি বর্জনের বিরুদ্ধেও একটি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। কিন্তু আন্দোলনকারীদের আপত্তি সত্ত্বেও 'মুসলীম' শব্দটি বর্জন করে আলীগড়ের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের নামটি শুধু আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয় রাখা হয়েছে। একই যুক্তিতে কাশী বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম থেকেও 'হিন্দু' শব্দটি বর্জনের দাবী সমীচীন বলেই আমরা মনে করি।

আমরা আশাকরি, লোকসভার সুচিন্তিত সিদ্ধান্তেই কাশী বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত বিতর্কের চূড়ান্ত অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে।

খাদ্যাভাবে আত্মহত্যা

কলিকাতার সন্নিকটবর্তী হালতু এলাকায় সপরিবারে বীরেন্দ্র সেন খাদ্যাভাবে আত্মহত্যার শোচনীয় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। ক্ষুধার তাড়নায় একটি সমগ্র পরিবারের শোচনীয় পরিণতি, সমাজের অর্থনৈতিক দুর্যোগের ভয়াবহ স্বাক্ষর বহন করছে। যে সরকারী খাদ্যনীতি একটি পরিবারকে এই দুঃসহ মৃত্যু থেকে রক্ষা করতে অক্ষম হল, তার প্রতি ধিক্কারের ভাষা নেই। অনাগত আগামী দিনের সঙ্কট সমগ্র জাতির উপর দুঃস্বপ্নের মত চেপে থাকবে। সরকারী ব্যবস্থা তা থেকে পরিত্রাণের কোনো ভরসা দিতে পারবে না।

মিষ্টির পূর্ণ নির্বাসন

পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্প্রতি বহু আইন হাইকোর্টে বাতিল হওয়ার পরই গত ১৮ই নভেম্বর আর একটি নূতন আদেশ-জারী করে কলকাতা ও ৩৪টি সংলগ্ন মিউনিসিপ্যাল এলাকায় ছানা ও ক্ষীর উৎপাদন এবং এই দুই উপাদানের তৈরী মিষ্টি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করে ৮০০০ মিষ্টির দোকানের মালিক ও তাদের পঞ্চাশ হাজার কর্মচারীর অর্থনৈতিক জীবন বিপন্ন করে তুলেছে। দুধের নিয়মিত সরবরাহ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই এই সরকারী তুঘলকী আদেশ। দুধের সরবরাহ বৃদ্ধির বিষয় আয়োজন বহুপূর্ব থেকেই অনুসরণের যে সরকারী কর্তব্য তার অবহেলার খেসারৎ দেবার জন্য মিষ্টি বিক্রেতা ও তাদের কর্মচারীদের উপর এই খড়্গের আঘাত সরকারী উন্মত্ততার চরম নিদর্শন।

সংখ্যালঘু নির্যাতনের প্রতিরোধে পূর্ব বাংলার মুসলীম যুবসমাজ

বর্তমান পাক-ভারত যুদ্ধের রক্ত ও যন্ত্রণার ঘটনা এবং গত পঁচিশ বছরের বলতবর সাম্প্রদায়িক হানাহানির ইতিহাসের বিবর্তনে পূর্ব বাংলার যুব সমাজের আধুনিক অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গী ও কার্যক্রম বিগত যুগের চরম বিভীষিকার এক শোচনীয় অধ্যায়ের পরিসমাপ্তির ইংগিত বহন করে। ১৯৬৯ সালে আয়ুবশাহী কাশ্মীর দিবস উদ্‌যাপনের নামে পূর্ব বাংলায় সংখ্যালঘু নিধনের যে নারকীয় ঘটনা ঘটায় পূর্ব বাংলার বাঙালী মুসলীম যুবসমাজ সেই বর্বর ঘটনাকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং সেই মহান প্রচেষ্টায় কয়েকজন যুবক আত্মত্যাগও করে। গত পঁচিশ বছরের কালিমাময় কাহিনীতে এই আত্মদান এক পরম আশার আলোকপ্রদীপ জেগে রয়েছে আজ পূর্ব বাংলার বুকে।

পাক-ভারত যুদ্ধের পরিস্থিতিতে আয়ুবশাহী রণক্ষেত্রে বিপর্যস্ত হওয়ায় পূর্ব বাংলার নিরীহ ও অসহায় সংখ্যালঘুদের উপরে প্রতিশোধ নিয়ে একই সঙ্গে যুদ্ধ ও সাম্প্রদায়িক হত্যা-কাণ্ডের কুৎসিত বিষচক্রে ভারতীয় উপমহাদেশকে বিপর্যস্ত করার চক্রান্ত করেছিল আয়ুবশাহী। যুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব বাংলার রাস্তায় রাস্তায় হাজার হাজার বাঙালী মুসলমান ছাত্র ছাত্রী মিছিল করে আয়ুবশাহীর এই সাম্প্রদায়িক চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দেয়। আয়ুবশাহী আবার গত ২২শে অক্টোবর 'ভারত ধ্বংস কর' দিবস পালনের নামে পূর্ব বাংলার সাম্প্রদায়িক হত্যাকাণ্ডের বিষচক্র শুরু করার ষড়যন্ত্র করে। এই ষড়যন্ত্রকেও পূর্ব বাংলার বাঙালী মুসলমান যুব ও ছাত্র সমাজ ব্যর্থ করে দিতে সক্ষম হয়। পূর্ব বাংলায় আজ যে বাঙালী জাতীয়তাবোধ সৃষ্টি হয়েছে এবং যে বাঙালী জাতীয়তার আবেদনে সংখ্যালঘুদের রক্ষায় পূর্ব বাংলার নওজোয়ানেরা অগ্রসর হয়েছে আমরা সেজন্য তাদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং সর্বতোভাবে পূর্ব বাংলার বাঙালী জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্য কামনা করি। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামীদের হাত যাতে শক্তিশালী হয় পশ্চিম বাংলার আমরা সর্বতোভাবে তার চেষ্টা করবো।

অনিবার্য কারণে এ সংখ্যায় খবরাখবর দেওয়া সম্ভব হোলো না। সেজন্য আমরা দুঃখিত। — সঃ সঃ

কান্ত কবির স্মৃতি স্মরণে

গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী *

কান্তকবি আমার পিতার অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন, এজন্য মাঝে মাঝে তাঁকে আমাদের বাড়ীতে দেখেছি ছোটবেলায়।

বৈঠকখানাঘরে ফরাসের একপাশে রাখা হারমোনিয়াম সহযোগে কান্তকবি গান গাইছেন আর তাঁর পাশে বসে আমার পিতা তবলায় সংগত করছেন। আমরা দুই বোন গুটি গুটি ঘরে ঢুকলাম, আমাদের দেখে হেসে চোখের ইঙ্গিতে কাছে বসতে বললেন। গানের শেষে আমাদের মাথা নেড়ে দিয়ে আদর করে নাম জিজ্ঞেস করলেন।

আর একদিন তাঁর বাড়ীতে তাঁর ছোটছেলের অন্নপ্রাশন, আমার মার সঙ্গে আমরা ভাইবোন গিয়েছি নিমন্ত্রিত। উঠানে আলপনা দিয়ে আম্রপল্লবের ঘেরা জায়গায় পুরোহিতরা শাস্ত্রীয় আচারে রত, আমরা ছোটরা বারান্দায় বসে দেখছি। তখন দেখলাম গলায় মাফলার জড়ান কিন্তু খালি গা, আনন্দ-মূর্তি কান্তকবি সব দিকে দেখে শুনে বেড়াচ্ছেন। সেই সময়েই তাঁকে দুরন্ত ক্যানসার রোগ আক্রমণ করেছে, কিন্তু ধরা পড়েনি। গলাবাধা তাই মাফলারটা জড়ান। আমি কিন্তু খুব আশ্চর্য্য হয়েছিলাম খালি গায়ে মাফলার জড়ান দেখে। তখন সময়ের দিন কাজেই গায়ে একটা আবার জামা দিতে হবে সদানন্দ পুরুষের সে খেয়ালই হয়নি বোধহয়। তখনও তাঁর দেহ সেই আগের মতই নধরকান্তি।

তারপর বহু বছর তাঁর ঘরে যেদিন এলাম তখন তিনি ক্যানসার রোগে পীড়িত। রাজশাহী ছেড়ে কলকাতায় চিকিৎসা করিয়ে কাশী যান সেখান থেকে বেশী অসুস্থ হয়ে কলকাতায় এসেছেন এবং তখন তাঁর গলায় operation হয়ে বাকশক্তি রুদ্ধ হোয়েছে। এসে দেখলাম সেই নধরকান্তি জীর্ণ শীর্ণ হয়েছে। যার হাসি গানে সর্বত্র আনন্দ মুখরিত হতো সেই আনন্দময় মূক হয়ে গেছেন প্রথম দিকে ছোট ছোট করে কথা বলতে পারতেন কিন্তু ডাক্তারের নিষেধ ছিল। আমি গিয়ে কাছে বসে থাকতাম আমার চোখে জল আসতো তাঁরা মনে করতেন আমার বুঝি বাবা মার জন্যে কান্না পায়। তিনি আমার গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলতেন তোমার বাবাকে আসতে লিখবো এলেই তোমাকে পাঠিয়ে দেবো কেমন? আমার তখন বুঝিয়ে বলার মত বয়স নয় যে এ অশ্রু সেজন্য নয়। অথবা নিজেও সেটা ভালো উপলব্ধি করতে পারতাম না। বৌবাজারের একটা বড় বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল বিয়ের জন্য। আত্মীয় কুটুম অভ্যাগতে বাড়ী পরিপূর্ণ। তার উপরেও প্রতিদিন দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা আসতেন কান্তকবিকে দেখতে, কান্তকবি আবার তাঁদের নিয়ে আসতেন তাঁর নববধূকে দেখাতে। তখন ঘোমটার চলন ছিল কিন্তু কবি তাঁর বধূকে সবার সামনে নিয়ে বসাতেন মাথার কাপড় খুলে দিতেন, মুখ তুলে ধরে সবাইকে দেখাতেন, চুল খুলে দেখাতেন যেন একটা মস্ত দেখবার জিনিষ। ঐ রুগ্ন দেহ নিয়ে প্রসন্নমুখে এ ঘর ওঘর ঘুরে বেড়াতেন। সবার তত্ত্ব নিতেন। বৌভাতের পরদিন রং খেলার চলন ছিল তখন। বৌবাজারের বাসাতেও সকালে একদিন রং খেলা সুরু হলো। নিচের তলায় ছেলে মেয়ে ও আত্মীয়া ছোট বৌ

* কান্তকবির জ্যেষ্ঠপুত্রবধূ।

মেয়েরা সবাই রং নিয়ে মাতামাতি আরম্ভ করলো, আমার গায়েও সবাই রং দিতে লাগলো আমিও একটু আধটু সুরু করে দিলাম। হঠাৎ ওপর দিকে আমার নজর পড়তেই দেখি কবি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে হাসিমুখে এই উৎসব উপভোগ করছেন। আমার মামিমাগুরী একটু দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন। হঠাৎ এই সময় আমার পিতা এসে উপস্থিত হলেন। কবি ইসারা করলেন আমার পিতার গায়ে রং দেবার জন্য মামিমাকে। মামিমা তাড়াতাড়ি ছোট একবালতি রং নিয়ে বাবার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। বাবা রংখেলা দেখে খুসী হয়ে হাসতে হাসতে সিঁড়ি দিয়ে উঠছিলেন, গায়ে রং পড়াতে পেছন ফিরে দেখলেন, তিনিও হটবার পাত্র নন, চট্ করে মামিমার হাত থেকে বালতিটা কেড়ে নিয়ে বালতির সব রং মামিমার মাথায় ঢেলে দিয়েই ওপরে উঠে গেলেন। কবি তাই দেখে খুব জোরে জোরে হাততালি দিয়ে উঠলেন। আমিও বাবার পেছন পেছন ওপরে উঠে গেলাম। বাবা কবির সামনে যেতেই কবি তাঁর কাপড়ে হাত দিয়ে রঙ্গ আপশোসের ভঙ্গি করে উঠলেন। বাবা হেসে বললেন হাঁ এখন আপশোষ দেখান হচ্ছে, কিন্তু তুমি যে ইসারা করেছ তাকে আমি বুঝিনি? কবি হাসতে হাসতে বাবার হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন আমাকেও আর এক হাত দিয়ে টেনে নিলেন এবং আমার গায়ের রং দেখালেন বাবাকে।

পরদিন তাঁর ছেলের বন্ধুর একসঙ্গে ফটো তোলার জন্য ফটোগ্রাফার ডাকালেন। নিজেই ছেলেকে চেয়ারে বসালেন আমাকে পাশে দাঁড় করিয়ে দিলেন। আমার মাথার কাপড় খুলে কাঁধ অবধি নামিয়ে দিলেন এবং মিটিমিটি হুজনের দিকে চেয়ে হাসতে লাগলেন। তাঁর হাসি ও চারিদিকে লোকাভাবে আমি সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা একটু ঘুরিয়ে নিলাম। তাঁর ছেলেও বোধ হয় এই জন্যে মুখটা একটু ঘুরিয়ে থাকলেন। ফটো উঠলো এবং পরদিন প্রিন্ট হয়ে তাঁর হাতে এলো। ফটোতে দেখা গেল হুজনের মুখই হুপাশে ঘোরান। ফটো দেখে কবি-বেচারে অস্থির সবাইকে বলেন ওরা কি ঝগড়া করেছিল নাকি? এমনি তাঁর খুটিনাটি আনন্দ ও রসিকতা দেখেছি। তাঁকে দেখে তখন কে বলবে মুহূর্তে তাঁর সিমলে দাঁড়িয়ে আছে। দু চার দিন পর বাবার সঙ্গে রাজসাহি গেলাম। একমাস ছিলাম এই একমাসে আমার পিতারকাছে কবি দু তিন খানা চিঠি লিখেছিলেন নিজের হাতে। সে চিঠি আমি দেখেছিলাম। অতি সুন্দর সেইগুলি। দুই বন্ধুই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাওয়ায় অনেকদিন পর পিতার বাক্সে হঠাৎ দুখানি চিঠি পাই। অতি যত্নে রাখা। খুব ইচ্ছা সত্ত্বেও চিঠি দুখানি নিতে পারিনি, মনে হলো যার যত্নের জিনিষ তাঁর বাক্সেই থাক। কিন্তু দেশ বিভাগের গোলমালে সে চিঠির বাক্সই কোথায় হারিয়ে গিয়েছে। আমার মনে অত্যন্ত ক্ষোভ রয়ে গেছে কেন সেদিন চিঠি-দুখানি নিলাম না।

একমাস পর ফিরে এলাম কলকাতায়। এবার এসে উঠলাম মেডিক্যাল কলেজের কটেজ ওয়ার্ডে। এখানেই কবি সপরিবারে মাস কয়েক থেকে বাস করছিলেন চিকিৎসার জন্য। তাঁর পুত্রের বিয়ের জন্য শুধু কদিন বৌবাজারের বাড়ী ভাড়া করা হয়েছিল। আমাকে দেখে কি আনন্দ কিস্ কিস্ করে আমার কাছে রাজসাহীর খবরও দু একটী জিজ্ঞাসা করলেন।

জ্বরেই দুরন্ত রোগ বেড়ে চলেছে। এক একদিন কত কষ্ট পেতে দেখেছি। তবু সদা প্রসন্ন, কী ধৈর্য্য আর তাঁর ভগবানের উপর কি নির্ভর কী বিশ্বাস! যে না দেখেছে বুঝতে পারবে না। সকাল সন্ধ্যা তাঁর ঘরে দেশের কত বিশিষ্ট লোকের এবং আত্মীয় বন্ধুর সমাগম। সন্ধ্যাবেলায় মাঝে মাঝে তাঁর তৃতীয় পুত্র ক্ষিতীন্দ্রনাথ ও জ্যেষ্ঠ কন্যা শান্তিকে দিয়ে স্বরচিত গান গাওয়াতেন নিজে হারমনিয়াম বাজিয়ে। যেন উৎসবের বাড়ী। বড় বড় ডাক্তার আসছেন, তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন আবার ওখানে বসে গল্প করছেন গান

(শেষাংশ ৬১৭ পৃষ্ঠায়)

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

রবীন্দ্র প্রভাব

সুভাষচন্দ্রের সমগ্র জীবনটাই রবীন্দ্রবলয়ের ভিতরে কেটেছে একথা বললে অত্যুক্তি হয়না। সুভাষ যখন স্কুলের বালক রবীন্দ্রনাথের প্রভাব গোটা বাঙালী সংস্কৃতির ভিতরে হয়তো অগোচরে, কিন্তু সুনিশ্চিতভাবে, তখনই নানা পরিবর্তন এনে দিচ্ছে; আমাদের দৈনন্দিন কথাবার্তার ভাষা ও গড়ন, আমাদের রুচি ও সৌন্দর্যবোধ, এমনকি সাম্প্রতিক পরিস্থিতির প্রতি আমাদের প্রতিক্রিয়া—এসবই রবীন্দ্রনাথের দেওয়া আদলের মধ্যে চলে আসতে সুরু করেছে এই শতাব্দীর প্রথম দশক হতেই। রবীন্দ্রনাথ যখন নোবেল পুরস্কার পান তার অনেক আগেই তিনি আমাদের সাংস্কৃতিক জীবনে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রবর্তক হয়ে উঠেছেন এবং নিন্দা ও প্রশংসা উভয়ের তীব্র উচ্চারণের ভিতর দিয়েই তাঁর প্রভাব স্বীকৃত হয়ে গেছে। তাঁর নোবেল পুরস্কার পাওয়াও আমাদের জাতীয় জীবনের একটি বিশাল ঘটনা, বিশেষত বাঙালী সমাজে রবীন্দ্রনাথের স্থান তখন বিতর্কাতীত হয়ে গেল। যে বছর এই ঘটনাটি ঘটে ঠিক সেই বছরই সুভাষ কলকাতায় আসেন, স্কুলের পড়া সাঙ্গ করে, কলেজে প্রবেশ-লাভের আশায়। রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ষোলো বছর বয়সের কিশোর সুভাষের সেদিনকার উচ্ছ্বাস আদৌ অস্বাভাবিক নয়, বরং সঙ্গত ও আন্তরিক। আমরা ইতিপূর্বেই রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের পরিচয় পত্রাবলী ও আত্মচরিত হতে উদ্ধৃত করেছি। কলেজে পড়ার সময় শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা ও আলাপ করতেও সুভাষ গিয়েছিলেন। তারপর বয়স যত বেড়েছিল, সুভাষের পরিণত মন নিজস্ব বিবেক ও প্রত্যয়ে স্থির ও দৃঢ় থেকেও ভারতের এই মহাকবির প্রতি শ্রদ্ধায় ভরে উঠেছিল এবং কবিও বয়স, মর্যাদা ও আত্মম্ভরতার ব্যবধান অতিক্রম করে এসে সুভাষের নেতৃত্বকে বাংলা ও ভারতে প্রতিষ্ঠালাভের চেষ্টায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ কয়েকটি বছর ও সুভাষচন্দ্রেরও ভারতে অবস্থানের শেষ কয়েকটি বছর তাঁদের উভয়ের পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও স্নেহের উজ্জ্বল মাধুর্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল। পক্ষপাতিত্বের সকল অভিযোগ কাঁধে বয়েও, কংগ্রেস সভাপতি পদের জন্য সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয়বারের নির্বাচন-প্রতিযোগিতার পূর্বাহ্নে রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজী ও নেহরুকে সুভাষের পক্ষ সমর্থন করে ব্যক্তিগত চিঠি দিয়েছিলেন এবং তাতেও ফল না পেয়ে সুভাষের পক্ষে বাংলার জনমত গঠনের অনেকখানি দায়িত্ব নিজে নিয়েছিলেন। গান্ধীপন্থী সংবাদপত্রসমূহের মালিক-সম্পাদকদের ব্যক্তিগতভাবে আহ্বান করে রুদ্ধ কক্ষের নিভৃত আলোচনার দ্বারা সুভাষের বিরোধিতা করা হতে বিরত হবার প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ; এবং প্রকাশ্যে দেশনায়কের পদে বরণ করে বরমালা পরিয়ে দিয়েছিলেন সুভাষের গলে তিনি সেই সময়ে যখন কবির সেই আশীর্বাদ সুভাষচন্দ্রের প্রয়োজন ছিল একান্তভাবে। সুভাষ যখন দেশত্যাগ করে

গেলেন অজানার অভিসারে তাঁর সেই যাত্রার পরিকল্পনা কজন আগে জানত? প্রবাদ আছে, রবীন্দ্রনাথ জানতেন। এবং সুভাষের অন্তর্ধানের পর যতদিন জার্মানী হতে বেতারে তাঁর প্রথম কণ্ঠস্বর শোনা যায়নি ততদিন পর্যন্ত বৃদ্ধ কবি কী দারুণ উদ্বেগ বহন করেছিলেন ও কতখানি উৎকণ্ঠা নিয়ে সুভাষের শুভ সংবাদ শোনার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন আজ সেসবকথাই সর্বজনবিদিত ইতিহাস। একথা আজ বিতর্কাতীত সত্য যে রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষভাগে সুভাষ-চন্দ্রের নতুনতর পরিচয়ে উদ্ভাসিত দেখে বিমুগ্ধ ও পরিতৃপ্ত হয়েছিলেন এবং একদিন অন্তিম হতাশার ও ক্ষোভে তিনি যে বলেছিলেন এ দেশের ভবিষ্যতে তাঁর আর আস্থা নেই, সুভাষের নেতৃত্বের প্রতি নতুন করে দৃকপাত করে আবার তাঁর মনে আশা জেগেছিল, যেন অনেকখানি নিশ্চিন্ত হতে পেরেছিলেন এই দুঃখদীর্ণ দেশের ভবিষ্যৎ সম্পর্কেই।

আমাদের জাতীয় জীবনে, বিশেষ করে বাংলার ইতিহাসে সেই একটা অপরূপ সময় গেছে যখন সুভাষ এসে বলেছিলেন দেশের শ্রেষ্ঠ মনীষীর পদতলে এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্ব-ভারতীয় ও আন্তর্জাতিক বিশিষ্ট পরিচয় ও মর্যাদাকে উপেক্ষা করে রাজনৈতিক ক্ষুব্রুচিল পঙ্কিলেরও মাঝে এসে দাঁড়িয়েছিলেন তরুণ ইতিহাসস্রষ্টার যাত্রাপথে নিজের অকুণ্ঠ সমর্থনটুকু দেবার জন্য।

বৃদ্ধ কবি ও তরুণ রাজনীতিবিদের মধ্যে এই মিলন সম্ভব হতে পেরেছিল শুধু এই কারণেই যে উভয়ের চিন্তাধারার মূলে একটা গূঢ় গভীর মিলভূমি ছিল। ত্রিপুরিতে অনুষ্ঠিত যে কংগ্রেস অধিবেশনে সুভাষচন্দ্র তাঁর সভাপতির ভাষণ হতে পদত্যাগ পত্র যেন সেসময় তাঁর মর্যাদাপূর্ণ আচরণ দিয়ে বাংলার জনসাধারণকে রুচি ও শালীনতার গভীর মধ্যে আকৃষ্ট করে রেখে তাঁর পরিচালনা রবীন্দ্রনাথকে মুগ্ধ করেছিল এবং একখানি পত্রে একারণে সুভাষচন্দ্রকে তিনি অভিনন্দনও জানিয়েছিলেন। শালীন ব্যবহার, মর্যাদাপূর্ণ আচরণ, ক্ষুব্ধ বাধাবিপত্তিসঙ্কুল আলোড়নের মাঝে অক্ষুণ্ণ রুচিবোধ—বাঙালী জাতিকে সেই শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলছিলেন রবীন্দ্রনাথ বহুকাল ধরে; রবীন্দ্রপ্রভাবে দীক্ষিত বাঙালীদের মধ্যে সুভাষের স্থান সর্বাগ্রে দাঁড়ায় এই কারণে যে তাঁর বিরুদ্ধপক্ষীয় অতি প্রসিদ্ধ ও শক্তিশালী নেতৃকোটি যখন মতদ্বৈধ, অসহযোগ ও অন্যান্য আক্রমণ, এমনকি অশালীন ভাষা ও অস্ত্র ব্যবহারেরও মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিলেন, সুভাষ তখনও তাঁর পরিশীলিত রুচিবোধ, সৌজন্য ও শালীনতার বিন্দুমাত্র স্খলন ঘটতে দেননি। এবং আরও গভীরতর অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলে আমরা দেখি যে রবীন্দ্রনাথ যেমন কোনো-দিন কোনো ক্ষেত্রেই ইতর ভাবধারার প্রশ্রয় দিতে পারেননি এবং বিরুদ্ধপক্ষের বিচারে অপ্রিয় হতে গেলেও উদার ও মহৎ হয়ে উঠত তাঁর চিন্তাধারা, সুভাষের বেলাও ঠিক সেকথাই সত্য।

অন্তরঙ্গ এই দুই মিল ছিল উভয়ের চরিত্রে; রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষ জীবনের দুই ভিন্ন ক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে দেশের ভাবনার ও বেদনার সুরটাকে খুব উঁচু গ্রামে বাঁধতে চেয়েছিলেন। আমাদের জনজীবনের মধ্যে একটা প্রশস্ত উদার আলো এনে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ, এবং ঠিক সুর ইতর কর্মক্ষেত্রেও সেই একই চেতনাকে প্রবিষ্ট করাতে চেয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র। তাঁর আপোষহীনতার কথা, আদর্শের জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কথা, রক্তদানের বিনিময়ে স্বাধীনতা লাভের কথা এই সৌম প্রেরণা হতেই উৎসারিত এবং অবশ্যম্ভাবী আপ ও ঢিল চাওয়া-পাওয়ার বিরুদ্ধে তাঁর সংগ্রামঘোষণাই তাঁকে কংগ্রেসের কেতাদোরস্ত স্বীকারবাদী, মন্ত্রীত্বকামী, আপোষপন্থী কংগ্রেস নায়কদের পক্ষ করে তুলেছিল। তাঁর কংগ্রেস হতে বিতাড়নেরও সেটাই মূল কারণ। কিন্তু সেসব কথা আমরা পরে আলোচনা করতে পারব।

আপাতত সুভাষচন্দ্রের মানস বিকাশের ধারা অনুসরণ করতে গেলে আমাদের বিচার করা দরকার রবীন্দ্রনাথ তাঁকে

কতখানি প্রভাবিত বা সাহায্য করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট ও ব্যাপক রাজনৈতিক চিন্তাধারা ছিল এবং দেশপ্রেম দেশসেবা, জাতিগঠন, স্বাধীনতা সংগ্রাম ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে অকুণ্ঠভাবে তিনি তাঁর নিজস্ব বক্তব্য বারবার জনসাধারণের কাছে পেশ করেছেন। আমাদের স্বদেশী যুগের আদি পুরোহিতদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও অন্যতম এবং অন্তত বিশ শতকের প্রথম হতে বাঙালীর জাতীয় জীবনে রবীন্দ্রনাথই একক সর্ববৃহৎ শক্তি। যেসব বিষয় সুভাষ বাল্যবয়স হতে ভাবতেন, যেসব সমস্যা তাঁকে উদ্বিগ্ন করেছিল এবং যেগুলি তাঁর জীবনের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল সেসকল বিষয় সম্পর্কেই রবীন্দ্রনাথ প্রভূত চিন্তা করেছেন এবং অতি দৃঢ় চিত্তে তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন। নিজের পথ চিনে নিতে, নিজের মতাদর্শ গঠন করতে সুভাষচন্দ্র রবীন্দ্রদর্শনের নিকট কতখানি ঋণী? সুভাষচন্দ্রের জীবনীকারের পক্ষে এই প্রশ্ন অনিবার্য হয়েই ওঠে।

২

বিশ শতকের গোড়ায় আমাদের সর্বপ্রধান সমস্যা ছিল জাতীয়তাবোধের বিকাশ। 'ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন' ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উনিশ শতকেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং বিশেষত সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর চেষ্টায় সারা ভারতে একটা রাজনৈতিক ঐক্যবোধের চিন্তা শিক্ষিতমহলে দেখা দেয়। উনিশ শতকের প্রথম দিকে হেয়ার স্কুল, হিন্দু কলেজ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় কলকাতায় নতুন শিক্ষালাভের একটা আন্দোলন জেগে ওঠে এবং রামমোহন রায় আমাদের সমাজকে এক তীব্র আলোড়নের তরঙ্গের মধ্যে ফেলে দেন। লোকে চোখের সামনে দেখছিল ইংরেজের রাজত্ব জমেই বাড়ছে; নতুন চিন্তা ভাবনা ও বিদ্যাচর্চার দ্বারা যারা সেই শিক্ষিত শ্রেণী ইংরেজশাসনের ফলস্বরূপ নতুনভাবে গঠিত হচ্ছিল এবং তাদের স্বার্থ ও ইংরেজের স্বার্থ সেদিন অতি ঘনে বোধ হওয়ায় তারা সর্বতোভাবে ছিল ইংরেজের সপক্ষে; দেশের জনসাধারণ ইংরেজকে সম্ভ্রম, শ্রদ্ধা, ভয় ও ভক্তির দৃষ্টিতে দেখত। সেই সঙ্গে য়ুরোপীয় ধর্ম ও সভ্যতার শ্রেষ্ঠতা প্রচারে পাদ্রীরা ধর্মপরায়ণ হয়েছিল। ফলত অল্পসময়েই শিক্ষিত শ্রেণীর মধ্যে ভারতীয় ভাবধারার প্রতি একটা তীব্র বিমুখতা ও বিদ্বেষ দেখা দেয়—ইয়ংবেঙ্গল দলের আবির্ভাব তারই পটভূমিতে। ইয়ং বেঙ্গলদের কথাবার্তা, চালচলন, কাজকর্ম হিন্দু সমাজের অন্তরকে আঘাত করতে থাকল এবং ইংরেজ শাসক ও পাদ্রীদের কাছ থেকেও আমাদের নিয়ত অপমান জুটতে লাগল। সেই আবহাওয়ায় হিন্দু সমাজ আত্মরক্ষা ও আত্ম-আবিষ্কারের প্রেরণায় নিজেকে আপন করে পাবার চেষ্টা করল। 'হিন্দুমেলা' প্রতিষ্ঠিত হল, নানাবিধ দেশাত্মবোধক সঙ্গীত ও কবিতা রচিত হল, হিন্দুধর্মের নতুন ব্যাখ্যাতা ও প্রচারকদের আবির্ভাব ঘটল এবং নবীন সেন, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি সাহিত্য মারফৎ দেশের পরাধীনতার বেদনা ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে উদ্দীপ্ত করতে চাইলেন। উনিশ শতকের শেষভাগে বাঙালী মধ্যবিত্তের সঙ্গে ইংরেজের স্বার্থেরও সংঘাত বাধল। শিক্ষা দীক্ষা ও যোগ্যতায় ইংরেজের সমকক্ষতা লাভ করে বাঙালী যুবকরা চাইল উচ্চপদ এবং যোগ্য চাকরি, নিজদেশে ইংরেজদের সমান সুযোগ সুবিধা। সেজন্য সেদিনের ইংরেজ আদৌ প্রস্তুত ছিল না এবং সিভিল সার্ভিস হতে সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জীর অপসারণ ইংরেজের এই মনোবৃত্তির ফলেই ঘটেছিল। নবশিক্ষিত ও শক্তিশালী ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষা তখন অনেক বেড়ে গেছে, তারা খুশি নয় এবং আত্মমর্যাদাজ্ঞান ও স্বাধিকারবোধও তখন প্রখর। তারা চায় নিজদেশে উচ্চপদ ও মর্যাদা লাভের তাদের অধিকার স্বীকার—কিন্তু পরাক্রান্ত রাজশক্তির কাছ হতে সে অধিকার আদায় করে নিতে হবে আন্দোলনের সাহায্যে। দেশের জনসাধারণের অবস্থার যথেষ্ট অবনতি তখন একটা জীবন্ত

ভাব রূপে আবির্ভূত; হরেন্দ্রনাথ রানাজী প্রতিহত আত্ম-মর্যাদাবোধের প্রেরণায় তার সঙ্গে রাজনৈতিক অধিকার লাভের প্রশ্নও উত্থাপিত করলেন। বিশ শতকের গোড়ায় ভারতীয় ভাবধারার প্রতি আনুগত্য ও দেশপ্রেম প্রবল বন্যার আকারে দেখা দিল রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের ধর্মালোলনের ফলে এবং বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতির সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক প্রয়াসের ফলে।—পাশাপাশি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্যশাসনলাভ ও ভারতীয় জনসাধারণকে নিয়ে রাজনৈতিক ঐক্যের ভিত্তিতে এক অখণ্ড জাতি গঠনের দাবী এবং কল্পনাও দেখা দিল।

এই উত্তপ্ত পরিবেশে বাংলার মনীষীদের সামনে এই সমস্যা অতিশয় বৃহৎ আকার ও ব্যাপ্ত তাৎপর্য নিয়ে দেখা দিল। ব্রহ্মবান্ধব উপাধ্যায়, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী এবং রবীন্দ্রনাথ একটা দার্শনিক ভিত্তিতে এই সমস্যার আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন; "আমাদের প্রশ্ন এই, আমরা প্রধানত কোন দিকে মন দিব? ঐক্যের কোন আদর্শকে প্রাধান্য দিব। রাষ্ট্রনীতিক ঐক্যচেষ্টাকে উপেক্ষা করিতে পারি না।...কিন্তু এ কথা আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, আমাদের দেশে সমাজ সকলের বড়ো।" (আত্মশক্তি) 'আত্মশক্তি' গ্রন্থের আর একটি প্রবন্ধে এই কথাটাই বিশদ করে তিনি লিখেছেন: "য়ুরোপের যেখানে বল আমাদের সেখানে বল নহে। য়ুরোপ আত্মরক্ষার জন্য যেখানে উদ্যম প্রয়োগ করে আমাদের আত্মরক্ষার জন্য সেখানে উদ্যম-প্রয়োগ বৃথা। য়ুরোপের শক্তির ভাণ্ডার স্টেট অর্থাৎ সরকার। সেই স্টেট দেশের সমস্ত হিতকর কর্মের ভার গ্রহণ করিয়াছে—স্টেটাই ভিক্ষাদান করে, স্টেটাই বিদ্যাদান করে, ধর্মরক্ষার ভারও স্টেটের উপর। অতএব এই স্টেটের শাসনকে সর্বপ্রকারে সবল কর্মিষ্ঠ ও সচেতন করিয়া রাখা, ইহাকে আভ্যন্তরিক বিকলতা ও বাহিরের আক্রমণ হইতে বাঁচানোই, য়ুরোপীয় সভ্যতার প্রাণরক্ষার উপায়।"

আমাদের দেশে কল্যাণশক্তি সমাজের মধ্যে। তাহা ধর্মরূপে আমাদের সমাজের সর্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া আছে। সেইজন্যই এতকাল ধর্মকে সমাজকে বাঁচানোই ভারতবর্ষ একমাত্র আত্মরক্ষার উপায় বলিয়া জানিয়া আসিয়াছে। রাজত্বের দিকে তাকায় নাই। সমাজের দিকেই দৃষ্টি রাখিয়াছে। এইজন্য সমাজের স্বাধীনতাই যথার্থভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা।" ('স্বদেশী সমাজ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ট) এবং "আমাদের বাঁচিবার উপায় আমাদের নিজের শক্তিকে সর্বতোভাবে জাগ্রত করা। আমি বলিতেছি, আত্মরক্ষার জন্য সমাজকে জাগ্রত হইতে হইবে, কর্তৃত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। সমাজ যে কোনো উপায়ে সেই কর্তৃত্ব লাভ করিলেই আপনার সমস্ত সমস্যার মীমাংসা আপনি করিবে।" (ঐ) "আমরা অনেকে কল্পনা করি এবং বলিয়াও থাকি যে, আমরা যাহা-কিছু চাহিতেছি সরকার যদি তাহা সমস্ত পূরণ করিয়া দেন তাহা হইলে আমাদের প্রীতি ও সন্তোষের অন্ত থাকে না। এ কথা সম্পূর্ণ অমূলক। এক পক্ষে কেবলই চাওয়া। আর-এক পক্ষে কেবলই দেওয়া, ইহার অন্ত কোথায়। ঘৃত দিয়া আগুনকে কোনদিন নিবানো যায় না। সে তো শাস্ত্রেই বলে—এরূপ দাতা-ভিক্ষুকের সম্বন্ধ ঘটিয়া যতই পাওয়া যায় বদান্যতার উপরে দাবি ততই বাড়িতে থাকে এবং অসন্তোষের পরিমাণ ততই আকাশে চড়িয়া উঠে। যেখানে পাওয়া আমার শক্তির উপরে নির্ভর করে না, দাতার মহত্ত্বের উপরে নির্ভর করে, সেখানে আমার পক্ষেও যেমন অবমান দাতার পক্ষেও তেমনি অসুবিধা।" (সফলতার সদুপায়) ঐ প্রবন্ধেই রবীন্দ্রনাথ লিখছেন: "আমি পুনরায় বলিতেছি দেশের শিক্ষাদিক্ষার ভার আমাদিগকে গ্রহণ করিতে হইবে। সংসারী বলিবেন, শিক্ষার ভার যেন আমরা লইলাম, কিন্তু অর্থ দিবে কে? অর্থও আমাদিগকে দিতে হইবে। একটি বৃহৎ স্বদেশী কর্মক্ষেত্র আমাদের আয়ত্তগত না থাকিলে আমাদিগকে চিরদিনই দুর্বল থাকিতে হইবে, কোনো কৌশলে এই নির্জীব দুর্বলতা হইতে নিষ্কৃতি পাইব না। যে আমাদিগকে

কর্ম দিবে সেই আমাদের প্রতি কর্তৃত্ব করিবে, ইহার অন্যথা হইতেই পারে না—যে কর্তৃত্ব লাভ করিবে, সে আমাদিগকে চালনা করিবার কালে নিজের স্বার্থ বিস্মৃত হইবে না ইহাও স্বাভাবিক। আমরা আক্ষেপ করিয়া থাকি যে, আমরা কাজ শিখিবার ও কাজ দেখাইবার অবকাশ না পাইয়া মানুষ হইয়া উঠিতে পারি না। সে অবকাশ পরের দ্বারা কখনোই সন্তোষজনক রূপে হইতে পারে না, তাহার প্রমাণ পাইতে আমাদের বাকি নাই।

আমি জানি, অনেকেই বলিবেন কথাটা অত্যন্ত দুরূহ শোনাইতেছে। আমিও তাহা অস্বীকার করিতে পারিব না। ব্যাপারখানা সহজ নহে—সহজ যদি হইত, তবে অশ্রদ্ধেয় হইত। কেহ যদি কাগজের নৌকা বানাইয়া সাত-সমুদ্র পারে সাত রাজার ধন মাণিকের ব্যবসা চালাইবার প্রস্তাব করে, তবে কারও-কারও কাছে তাহা শুনিতে লোভনীয় হয়, কিন্তু সেই কাগজের নৌকার বাণিজ্যে কাহাকেও মূলধন খরচ করিতে পরামর্শ দিইনা। বাঁধ বাঁধা কঠিন, সে স্থলে জল বাঁধিয়া নদীকে দরিয়া বলিতে অনুরোধ করা কনস্টীটুশনাল আজিটেশন নামে গণ্য হইতে পারে। তাহা সহজ কাজ বটে, কিন্তু সহজ উপায় নহে। আমরা সস্তায় বড়ো কাজ করিবার চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকি কিন্তু সেই সস্তা উপায় বারংবার যখন ভাঙিয়া ছারখার হইয়া যায় তখন পরের নামে দোষারোপ করিয়া তৃপ্তিবোধ করি কিন্তু তৃপ্তি হয়, কিন্তু কাজ হয় না।" (ঐ)

রবীন্দ্রনাথ এই কথাটাই সেদিনের স্বদেশপ্রেমিকদের কাছে বার বার বলতে চেয়েছিলেন যে দেশের প্রকৃত শক্তি আছে দেশের ভিতরে এবং সকল স্বদেশসাধনার গোড়ার কথাই হবে সেই শক্তির পরিচয় লাভ করা ও তার ব্যবহার করা। এমন একটা দিন ছিল যখন ইংরেজের প্রতি একটা অন্ধ বিশ্বাস ও সম্ভ্রমবোধ আমাদের জেগেছিল। তখন দেশের প্রতিটি অভাব, সঙ্কট বা সমস্যার বিষয়ে আমরা প্রতিকারের জন্য ইংরেজের কাছে আবেদন নিবেদন করতাম। যখন দেখাগেল ইংরেজ সরকার তাতে কর্ণপাত করে না তখন এল তীব্র ক্ষোভ, এল ইংরেজকে সমুচিত শিক্ষা দেবার বাসনা—যেন আমাদের অস্তিত্বের গুরুত্ব তার মর্মে মর্মে উপলব্ধি হয়। কিন্তু এই ক্ষোভের বিস্ফোরণের ভিতরেও আমরা প্রকারান্তরে ইংরেজের শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকার এবং অভাব মোচনে তার সামর্থ্যকেই স্বীকার করে নিয়েছিলাম। রবীন্দ্রনাথ বলতে চাইলেন, সেখানেই আমাদের ভুল। বিবেকানন্দ বলেছিলেন দরিদ্র কৃষক, মজুর, জনসাধারণের ভিতর হতে নতুন ভারতবর্ষ আবির্ভূত হবে। মাদ্রাজ বক্তৃতামালায় বিপিন পাল বলেছিলেন দেশের সর্বসাধারণই দেশের শক্তির আধার। রবীন্দ্রনাথ শ্রেণী বিভাগের দিকে মন না দিয়ে সর্বাত্মক অর্থে 'সমাজ' শব্দটি ব্যবহার করে বলতে চাইলেন যে শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত ও সাধারণ, ধনী সমাজপতি ও জনগণ, নেতা ও জনতা সকলে সম্মিলিত ভাবে দেশের অন্তর্নিহিত শক্তিকে ধারণ করে আছে, সেই শক্তির উদ্বোধন ঘটানোর দায়িত্বও তাদের। বিদ্বান, সংযত, ত্যাগপরায়ণ ব্রাহ্মণ, বীর্যশালী, অটুট সঙ্কল্প ক্ষত্রিয় এবং সৎ, প্রাণবান জনসমাজ একত্রে একটা স্থানে এসে মিলতে হবে—সমাজের আঙিনাই সেই মিলনের প্রশস্ত ক্ষেত্র। মিলনের ও ঐক্যের ভিতর দিয়ে আমরা আমাদের জাতীয় শক্তির সন্ধান পাব। সেই জাতীয় শক্তিতে আত্মবান হয়ে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের একটা পাল্টা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। সরকার যেমন শক্তির কেন্দ্র, তেমনি আমাদের সমাজের ভিতর আর একটি পাল্টা শক্তিকেন্দ্র স্থাপন করা দরকার। এই নতুন শক্তিকেন্দ্র হতেই জাতির সকল কাজকর্ম চালিত হবে, ফলত ইংরেজ সরকারকে আমাদের জাতীয় প্রয়োজনের কোনোক্ষেত্রেই প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না এবং তার ফলে ইংরেজ সরকার এদেশে নিজেকে প্রতিপদে নিরর্থক করে তুলবে।

রবীন্দ্রনাথ অহিংস অসহযোগিতার কথা বা শুধু স্বদেশী পণ্য ব্যবহারের কথাই বলেননি, প্রকৃতপক্ষে এই শতাব্দীর একেবারে শুরুতে তিনি পাল্টা গণ-সরকার প্রতিষ্ঠার দাবীই করেছিলেন।

সুভাষচন্দ্র ত্রিশের দশকে দেশের সামনে এই পাল্টা সরকার প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবই রেখেছিলেন। ইংরেজের সঙ্গে অসহযোগ করে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিচালনার সামান্য সামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠনে তাঁর আপত্তি ছিল; তিনি বলেছিলেন এটা আপোষ পন্থা। কংগ্রেস সেদিন তাঁর আপত্তি গ্রাহ্য না করে প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল বিভিন্ন প্রদেশে। কার্যত সেই মন্ত্রীসভাগুলি ছিল সর্বতোভাবে ইংরেজ সরকারের অধীন। সুভাষচন্দ্র বললেন: ভারতবর্ষে একটি পাল্টা গণ-সরকার করতে হবে, ভারতবাসীদের একমাত্র আনুগত্য থাকবে সেই সরকারেরই প্রতি, সকল সমস্যার সমাধান ও বিচার পাবার আশায় মানুষ যাবে সেই সরকারেরই কাছে; ফলে ইংরেজ সরকার কার্যত অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়বে এবং তার আর কোনো ভিত্তি থাকবে না।

এই পাল্টা গণশক্তি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে প্রথম পদক্ষেপ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ প্রস্তাব করেছিলেন এমন একজন মানুষকে অধিনায়ক রূপে সমাজকে স্বীকার করে নিতে হবে, যাঁকে কেন্দ্রকরে সমাজের বিরোধী ও বিচ্ছিন্ন শক্তিগুলি একত্রিত ও ঐক্যবদ্ধ হতে পারে। তিনি লিখেছিলেন: "আমাদের প্রথম কাজ হইবে—যেমন করিয়া হউক, একটি লোক স্থির করা এবং তাঁহার নিকটে বাধ্যতা স্বীকার করিয়া ধীরে ধীরে ক্রমে ক্রমে তাঁহার চারিদিকে একটি ব্যবস্থাতন্ত্র গড়িয়া তোলা। '(স্বদেশী সমাজ)' আমাদের এখন অনেক উৎসাহী যুবক আছেন যাঁহারা দেশের জন্য কেবল বাক্যব্যয় নহে, ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। কিন্তু কী করিবেন, কোথায় যাইবেন, কী দিবেন, কাহাকে দিবেন, কাহারো কোনো ঠিকানা পান না। বিচ্ছিন্নভাবে ত্যাগ করিলে কেবল নষ্টই করা হয়। দেশকে চালনা করিবার একটা শক্তি যদি কোথাও প্রত্যক্ষ আকারে থাকিত তবে যাঁহারা ধনশালী তাঁহাদের ধন, যাহারা চেষ্টাশীল তাঁহাদের চেষ্টা, যাহারা জ্ঞানশীল তাঁহাদের জ্ঞান একটা বিপুল লক্ষ্য পাইত—আমাদের বিদ্যাশিক্ষা, সাহিত্যানুশীলন, আমাদের শিল্পচর্চা, আমাদের নানা মঙ্গলানুষ্ঠান স্বভাবতই তাহাকে আশ্রয় করিয়া সেই ঐক্যের চতুর্দিকে বেশ বলিয়া একটা ব্যাপারকে বিচিত্র করিয়া তুলিত।" (সফলতার সদুপায়)

রবীন্দ্রনাথ এই সকল কথা বলেছিলেন বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনেরও পূর্বে। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় তিনি তাঁর বক্তব্যকে দেশবাসীর সামনে আরও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত করেন। তিনি তখন লিখেছিলেন: স্বদেশের হিতসাধনের অধিকার কেহ আমাদের নিকট হইতে কাড়িয়া লয় নাই, তাহা ঈশ্বরদত্ত—স্বায়ত্তশাসন চিরদিনই আমাদের স্বায়ত্ত। ইংরেজ রাজা সৈন্য লইয়া পাহারা দিন, কৃষ্ণ বা রক্ত গাউন পরিয়া বিচার করুন, কখনো-বা অনুকূল কখনো-বা প্রতিকূল হউন, কিন্তু নিজের দেশের কল্যাণ নিজে করিবার যে স্বাভাবিক কর্তৃত্ব-অধিকার তাহা বিলুপ্ত করিবার শক্তি কাহারও নাই। সে অধিকার নষ্ট আমরা নিজেরাই করি। সে অধিকার গ্রহণ যদি না করি তবেই তাহা হারাই। নিজের সেই স্বাভাবিক অধিকার হারাইয়া যদি কর্তব্যশৈথিল্যের জন্য অপরের প্রতি দোষারোপ করি তবে তাহা লজ্জার উপরে লজ্জা। তাই আজি বলিতেছি, স্বদেশের মঙ্গল সাধনের কর্তৃত্বসিংহাসন আমাদের সম্মুখে শূন্য পড়িয়া আমাদিগকে প্রতি মুহূর্তে লজ্জা দিতেছে। হে স্বদেশসেবকগণ, এই পবিত্র সিংহাসনকে ব্যর্থ করিয়োনা, পূর্ণ করো। ……তবে প্রত্যেকে স্ব স্ব প্রধান হইয়া অসংযত হইয়া উঠিলে চলিবে না। একজনকে মানিয়া আমরা যথার্থভাবে আপনাকে মানিব। একজনের মতো আমাদের

মস্তকে স্বীকার করিব। একজনের রক্তিপতাকে আমাদের সকলের শক্তিতে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিব। আমাদের সকলের চিন্তা তাঁহার মহাপাপে মিলিত হইবে এবং তাঁহার আদেশ আমাদের সকলের আদেশরূপে বাংলাদেশের ঘরে ঘরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।" (দেশনায়ক)

৩

সুভাষচন্দ্র ১৯১৩ সালে কলকাতায় আসেন কলেজে পড়তে; তার আগে কটকে থাকাকালে স্কুলজীবনে রবীন্দ্রনাথের কোনো কোন কবিতা, গান বা রচনাংশ হয়তো পড়েছিলেন, কিন্তু তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক মতামত সম্পর্কে বিশদভাবে অবহিত ছিলেন না। কটকে তাঁর অবস্থানের শেষভাগে রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি তাঁকে মুগ্ধ করতে সুরু করে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কলকাতায় এসেই জাতীয়তার রাজনৈতিক বিতর্কগুলি অনুসরণ করার সুযোগ তাঁর ঘটে। কলকাতায় এসেই কিন্তু বাঙালী সমাজের সেদিনের সর্বৃহৎ আলোড়নের মাঝে তিনি পড়ে গেলেন: রবীন্দ্রনাথের নোবেল পুরস্কার লাভ। রবীন্দ্রনাথ সেদিন বাঙালী মাত্রেরই আলোচনার বিষয় হয়ে উঠলেন এবং তাঁকে নিয়ে গর্বের অন্ত রইলনা—বিশেষ করে সেই কলকাতায় যা রবীন্দ্রনাথের নিজেরই শহর। তরুণ দেশপ্রেমিক সুভাষ সেদিন রবীন্দ্রনাথের নামে উদ্বেলিত হয়েছিলেন। কিন্তু শুধুই কি রবীন্দ্রনাথের নামে? তাঁর মতো গম্ভীরাত্মা কিশোর শুধু হুজুগে হৈ চৈ বা নিছক উচ্ছ্বাসে বটপত্রের মতো ভেসেছিলেন একথা মনে করা যায়না। তাঁর মনোযোগ ও শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথ আকর্ষণ করেছিলেন; রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা সম্পর্কে তিনি যে আগ্রহী ও অনুসন্ধিৎসু হবেন এটুকু প্রত্যাশিত। দেশের মঙ্গলকর্ম ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা সুভাষ যে জানতে চাইবেন এটাই স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথের রচনা ও কর্ম তখন পত্র-পত্রিকাগুলির আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে; তাঁর বইগুলি দুষ্প্রাপ্য ছিল না, এমন কি মোহিত সেনের সম্পাদিতায় রবীন্দ্ররচনাবলীও তখন খণ্ডে খণ্ডে প্রথম প্রকাশের ব্যবস্থা কবি নিজেই করছেন। সেদিনের স্বদেশী আন্দোলনের প্রায় সব দিক নিয়েই রবীন্দ্রনাথ আলোচনা করেছিলেন, এবং এ কাজে তিনি কখনো ক্ষান্ত হননি। তাঁর এক একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিতর্ক ও সমালোচনার ঝড় উঠত, কাজেই কোনো নিষ্ঠাবান গভীরমনা স্বদেশপ্রেমিকের পক্ষেই রবীন্দ্রনাথের ভাবধারা সম্পর্কে অনবহিত থাকার উপায় ছিল না। কলকাতায় এসে সুভাষ রবীন্দ্রনাথের মতামতগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ যখন একদিকে সন্ত্রাসবাদ, অন্যদিকে গান্ধীবাদের প্রকাশ্য সমালোচনায় অবতীর্ণ হন তখন তাঁর রচনায় সুভাষ নিশ্চয়ই নিজের বহু চিন্তার সমর্থন পেয়েছিলেন। কিন্তু সে সব কথা পরে আলোচনা করতে পারব আমরা। এটুকু অন্তত আমরা এখন বলতে পারি যে সুভাষের কলকাতায় আসার সময় পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ-চিন্তার বৈশিষ্ট্যগুলি যতখানি প্রকাশিত হয়েছিল ততখানি কলকাতায় এসে তিনি অনুধাবন করেছিলেন মনে হয়, এবং সম্ভবত তিনি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রভাবিতও হয়েছিলেন। ইংরেজ সরকারের পাশাপাশি পাল্টা স্বশক্তিকেন্দ্র প্রতিষ্ঠার রবীন্দ্রভাবনা সুভাষের কিশোর মনকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং দেশকে সংগঠিত হতে হলে যে একজন অধিনায়কের প্রয়োজন, যিনি দেশের সকল শক্তি ও সাধনাকে এক কেন্দ্রাভিমুখী করে সারা দেশের হিতের জন্য পরিচালনা করবেন,—এ চিন্তা সুভাষকে আকৃষ্ট করেছিল। আশ্চর্যের বিষয় এই যে শেষ বয়সে রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকেই দেশের সেই অধিনায়কের ভার গ্রহণে আহ্বান জানিয়েছিলেন—এবং সুভাষ সে আহ্বানকে প্রত্যাখান না করে, তারই জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। সুভাষের এই প্রস্তুতি প্রকৃতপক্ষে সেই কৈশোরকাল হতেই

সুরু হয়েছিল। কেন হয়েছিল, কিসের প্রেরণায়? বিবেকানন্দের আদর্শের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথের অন্তোদয়ও কি তখনই সুভাষের হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করেনি?

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন এদেশে রাষ্ট্রের চেয়ে সমাজই বড়। রাজনীতির চেয়ে সমাজের আত্মশক্তি উদ্বোধনের কথাই তিনি বারবার বলতেন। আশ্চর্যের বিষয় এই, কলকাতার কলেজে প্রথম দু'তিনটি বছর পড়ার কালে সুভাষের দৃষ্টিভঙ্গীও অনুরূপ ছিল। রাজনীতির কোনো দলেই তিনি তখন নাম লেখাননি, সম্ভবত রাজনীতির প্রতি তাঁর শ্রদ্ধাও ছিল কম। তিনি সমাজসেবা করতেন, সেজন্য পাড়ায় পাড়ায় ভিক্ষুকের ঝুলি কাঁধেও তিনি বেরিয়েছিলেন। সুভাষ ও তাঁর সঙ্গীরা তখন দেশের জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপক পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁরা গঠনমূলক কর্মের জাল বিস্তৃত করতে চেয়েছিলেন। জাতিগঠন, সমাজ গঠন, নিজ নিজ জীবন ও চরিত্র গঠনই ছিল তাঁদের উদ্দেশ্য—তাঁদের কর্মপন্থাও ছিল তদনুরূপ। বিপিন পাল, সুরেন্দ্র বাঁড়ুজ্যে, মদনমোহন মালব্য, গোখলে, রাণাডে ইত্যাদি নেতৃবর্গ সুভাষচন্দ্রকে আকৃষ্ট করেননি; দেশের রাজনৈতিক কর্মপন্থা বক্তৃতা বা সংবাদপত্রে প্রচারিত প্রবন্ধে, আবেদন নিবেদনে শেষ হয়ে যায় সুভাষ তাতে বিরক্তিই বোধ করতেন। এবং সেদিনের বোমারুদের নীতির প্রতিও তিনি আকৃষ্ট হননি। তখনকার রাজনীতিতে ভিক্ষাবৃত্তি বা বাকসর্বস্ব কর্মপন্থা অথবা বোমা-পিস্তলের গোপন হত্যাপথ—এই দুই বিপরীত পন্থা ছাড়া আর কোনো তৃতীয় পন্থা ছিল না। সুভাষ এ দুটির কোনোটাকেই বেছে নেননি, তৃতীয় কোনো পথেরও হদিশ পাননি। তাঁর মন তখন রাজনীতির আবর্তের চেয়েও সমাজকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। রবীন্দ্রনাথের প্রভাব কি এ ব্যাপারে কার্যকরী হয়নি?

সুভাষচন্দ্রের জীবনীকারকে অতি সন্তর্পণে রবীন্দ্র-সুভাষ সম্পর্কের অন্তরালগুলিকে আলোচনা করতে হবে। কারণ শেষ দিকে এই সম্পর্ক যে অতি বিষাক্ত আকারে দেখা দিয়েছিল তাই নয়; বাংলার এই দুজন মহাপুরুষ একই সময়ে জীবিত ছিলেন, এবং বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়ায় সুভাষ রবীন্দ্রনাথের অপর্যাপ্ত অবদান হতে নিজের পাথেয় সংগ্রহের সুযোগ পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ছিল তাঁর প্রিয়—এই কারণে যে সেই সব গান তাঁকে প্রেরণা দিত। শুধু গান নয়, ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের বিশ্লেষণ ও ভবিষ্যদ্বাণীকে সুভাষ সর্বতোভাবে গ্রহণ করেছিলেন: Indian Struggle গ্রন্থের প্রারম্ভেই এবং তাঁর পরবর্তীকালীন কার্যাবলীতে তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশচিন্তা যে স্বদেশকে চিনতে ও কর্তব্য-নির্ধারণ করতে সুভাষকে বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকবে এ বিষয়ে সন্দেহ কী? (ক্রমশঃ)

মৈত্রীর পুনর্বিচার

সুনীল দাস

প্রশ্ন উঠেছে ভারতের বন্ধু কে, অথবা ভারত কার সঙ্গে বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হবে। মৈত্রীর সাধিক অনুবেদনের ভাষালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে, বিশ্ব নির্বাচন যে একটি অবাস্তব প্রচেষ্টা, নানা আন্তর্জাতিক স্বার্থসংঘাতের মধ্য দিয়ে, ভারতবর্ষ এই পরিণত সিদ্ধান্তে পৌঁচেছে। অবশ্য এই আবশ্যিক কর্তব্য-নির্ধারণে এতো দশবছরের প্রয়োজন ছিলনা। শুধু দশবছরই বা কেন, এজন্য ভারতবর্ষ যে মূল্য দিয়েছে, তারও প্রয়োজন ছিল না। এই অপচয়ের কারণ এই যে, যে ভিত্তিভূমির উপর দাঁড়িয়ে এ-যাবৎ ভারতবর্ষ মৈত্রীবন্ধনের দীর্ঘবাহু ইতস্তত প্রসারিত করে উদ্বেলিত-স্বরে অগ্রসর হয়ে এসেছিল, তার গোড়ায় গলদ ছিল। নিছক ভালোবাসুষী, শুভেচ্ছা কিম্বা উচ্চাঙ্গের বাক্‌জাল বুনে মৈত্রীর মোহ রচনা করে আদর্শবাদের ভ্রান্তিবিলাসে মুহ্যমান থেকেও মৈত্রীর নিশ্চিত-ভূমিতে পৌঁছানো সম্ভব নয়।

এর কারণও সুস্পষ্ট। ভৌগলিক অবস্থান, ইতিহাসের পারম্পর্য, ঐতিহ্যের ঐক্য, আদর্শগত স্বাজাত্য মৈত্রীর গ্রন্থিবন্ধনে যেমন প্রবলতা জোগাতে পারে, তেমনি এই উপকরণগুলির যে কোনো একটি বা সবগুলির প্রভাবও মৈত্রীর সহায়ক এবং পরিপূরক নাও হতে পারে। ভৌগলিক অবস্থিতির রাজনৈতিক প্রভাবকে (geo-political compulsion) অস্বীকার করে যেমন মৈত্রীর বন্ধন শিথিল হয়েছে, তাকে অস্বীকার করেও তেমনি প্রবল বৈপরীত্য বাধা ঠেলে দিয়ে উঠেছে—এ ধরণের ঘটনাও ইতিহাসে বিরল নয়। ঐতিহ্যগত একত্ব কিম্বা আদর্শগত স্বাজাত্যও বিরোধ ও সংঘাত প্রতিরোধে ব্যর্থ হয়েছে, এমন দৃষ্টান্তও বিরল নয়। শুধু অতীতের ইতিহাসই নয়, নিকট-অতীত এবং সাম্প্রতিককালের ইতিহাস তার প্রভূত সাক্ষ্য বহন করছে।

কিন্তু 'Real Politik', অর্থাৎ বাস্তব-কঠিন রাজনীতির ধারা ভিন্নমুখীন। সেখানে ভাষালুতার স্থান নেই। আদর্শ সেখানে বাস্তবানুগ। আদর্শের অন্তিম লক্ষ্যে অবিচল থেকে বাস্তবকে অবলম্বন করে অগ্রসর হওয়াই 'Real Politik' এর কৌশল। এই রাজনীতির 'ঘুরপথারোহ' পারদর্শিতায় নিখিলে মৈত্রীবন্ধনেরও যাচাই হবে। এই নিখিলের কেন্দ্র-বিন্দুতে নিহিত রয়েছে জাতীয় স্বার্থের আবেদন। জাতীয় স্বার্থ যেখানে নিশ্চিত, জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় অগ্রগতি, জাতীয় গৌরবও সেখানে নিহিত। জাতীয় স্বার্থকে অস্বীকার করে কিম্বা গৌণ স্থান দিয়ে যে মৈত্রী রচিত হয়' তা যত সুন্দর, যত মনোহারী, যতই সুখী সে তার ভিত্তিভূমি, কঠিন মূল্য দিয়ে যত বেশী যেমন সে-শিক্ষা গ্রহণ করেছে ইতিহাসে, ভারতবর্ষও তার ব্যতিক্রম নয়। সাম্প্রতিককালের অভিজ্ঞতায় সে-বেদনার্ত স্বাক্ষর ভারতীয় মনে মুদ্রিত হয়ে গেছে।

পাক-ভারত সংঘাতের মধ্য এই শিক্ষা গ্রহণ করে অতঃপর ভারতবর্ষ মৈত্রীবন্ধনের পথনির্দেশে বিভ্রান্ত হবে না, ভারতীয় রাষ্ট্রচিন্তায় তার আভাস দেখা গেছে। কিন্তু রাষ্ট্রচিন্তার গভীরে এই পরিবর্তনের সূচীমুখ প্রবেশ করেছে কি না, সে-সম্বন্ধে স্থিরপ্রত্যয়ে পৌঁছানো এখনই সম্ভব নয়। ভারতবর্ষ এ-যাবৎ ইতস্তত মৈত্রী বিতরণ করে এসেছে। ১৯৫০ সালে তিব্বতকে চীনের হাতে সমর্পণ করে চীনের প্রতি অকৃপণ মৈত্রী বিতরণ করেও হিমালয়ের নৈঃশব্দের মধ্যে ভারত-ভূভাগের অংশ গ্রাসে চীনকে বিরত করতে ব্যর্থ হল, ১৯৫৯

সালে ভারতীয় সেনাবাহিনী চীনের গুলিতে নিহত হল, চীনের হাতে বন্দী হবার লজ্জাকর বিফল করে পলাতক দালাই লামা যখন ভারতে নির্বাসিতের জীবন বরণ করে নিলো, তারপরও ভারতের চীনপ্রীতির মোহভঙ্গ হলোনা। ১৯৬২ সালের চীনা আক্রমণ ব্যতিরেকে এই মোহমুক্তি ঘটতো না। এই আক্রমণের আঘাতে আঘাতে ভারতীয় রাষ্ট্র-চৈতন্য মৈত্রীর স্বপ্ন থেকে জেগে উঠে দেখলো সঙ্কট-জর্জর মালয়েশিয়া ছাড়া আফ্রো-এশীয় এলাকায় ভারত সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ। ভারতবর্ষের মৈত্রীবন্ধনের রাজনীতি নিঃসংশয়ে অসার প্রতিপন্ন হল। শুধু তাই নয়, এই নীতির নিরঙ্কুশ অনুসরণে ভারতের জাতীয় স্বার্থ বিসর্জিত, জাতীয় নিরাপত্তা বিপন্ন, জাতীয় অগ্রগতি ব্যাহত ও জাতীয় গৌরব ক্ষুণ্ণ হয়ে, ভারতবর্ষ যে কি কঠিন মূল্য দিলো, আগামী দিনে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারত-বিরোধী প্রস্তাব বিস্তারের মধ্য দিয়ে তার পরিমাপ পাওয়া যেলো।

পাক-ভারত সংঘাতের পর তারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে, আরও গভীর, আরও ব্যাপকভাবে। সে-পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে শিক্ষা গ্রহণের সময় এসেছে। বাস্তবানুগ রাজনীতির নিরিখে তার বিচার বিশ্লেষণ চাই। কারণ, অতঃপর মৈত্রীবন্ধনের ভ্রান্তি সামগ্রিক সর্বনাশ ডেকে আনবে, সে-সময় সংশোধনের অবকাশ থাকবে না। তাছাড়া, ভারতীয় রাজনীতির আন্তর্জাতিক ও আভ্যন্তরীণ দৃষ্টিপট চূড়ান্ত সঙ্কটময় পর্যায়ে পৌঁছেছে : এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রনৈতিক ভারসাম্যের সামান্যতম বিচ্যুতিও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবার অপেক্ষা রাখে। তাই ধীর অথচ দৃঢ় ও নিশ্চিত পদক্ষেপের প্রয়োজন। পাক-ভারত সংঘাতের পর ভারতের বন্ধু কে তার আর একবার বিচার হয়ে গেছে। রাষ্ট্রসংঘে পাক-ভারত যুদ্ধ-বিরতি প্রস্তাবের আলোচনার মধ্য দিয়ে যে মানসিকতা পরিস্ফুট হয়েছে, সেখানে দ্বিধা-দ্বন্দ্বের অবকাশ নাই। এই আলোচনায় তেইশটি রাষ্ট্র নিরপেক্ষতা অবলম্বন করেছিল। ভারত-পাকিস্তান সংঘাতে তাদের ভূমিকা বর্শকের, উপদেষ্টার, নীতিবাগীশের, শালিসীর। কে আক্রমণকারী, কে আক্রান্ত, রাষ্ট্রসংঘের সনদ কে লঙ্ঘন করলো, এ-সম্পর্কে তাদের যেন কোনো বক্তব্য নেই। আক্রমণকারী এবং আক্রান্তকে তুল্যমূল্যজ্ঞান করে পাক ভারত সংঘাতে তারা নিরপেক্ষের ভূমিকায় যুদ্ধবিরতির জন্য সচেষ্ট হয়েছে। শস্ত্রসংঘাতে পর্যুদস্ত পাকিস্তান যুদ্ধবিরতির আড়ালে যদি রক্ষা না পায়, আরও গুরুতর বিপর্যয় তাকে স্বীকার করে নিতে হত। সুতরাং সে-সময় যুদ্ধবিরতি পাকিস্তানের সঙ্কটত্রাণের জন্য অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। নিরপেক্ষ এই রাষ্ট্রগুলি, কার্যত চূড়ান্ত পাকিস্তানী পরাজয়রোধেই সহায়তা করেছে। যদি ঘটনার পরিণতি বিপরীত হত অর্থাৎ ভারত সামরিক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলে এই তেইশটি রাষ্ট্রের নিরপেক্ষতা পর্যন্ত ভারতকে রক্ষা করতে উদ্যোগী হোতো কিনা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ রয়েছে। উনিশটি রাষ্ট্র সরাসরি ভারতবর্ষের বিরোধিতা করেছে, তার মধ্যে এগারটি আরব রাষ্ট্র। সোভিয়েট রুশ কাশ্মীর সমস্যার রাষ্ট্রসংঘে ভারতের অকৃত্রিম সহায়রূপে পরিচিত। এবারও সোভিয়েট রুশ সেই ভূমিকার অধিচল থেকেও রাষ্ট্রসংঘের যুদ্ধবিরতি সংক্রান্ত আলোচনায় সেন্টো-সিয়াটো সামরিক চুক্তির শরীক হওয়া সত্ত্বেও পাকিস্তানকে নন্-এলাইনড্ রূপে বর্ণনা করেছে। পাকিস্তান সম্পর্কে সোভিয়েট রুশের নবজাত সহমর্মতার একটি দৃষ্টান্তরূপে এই ঘটনাটি চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের ভারতের প্রতি সমর্থন সকল মৈত্রীবন্ধনের দৃষ্টান্তরূপে উল্লেখিত হয়েছে। তেমনি উল্লেখ্য যুগোস্লাভিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া ও ইথিওপিয়ার সমর্থন। সাইপ্রাসও ভারতবন্ধুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সাইপ্রাসের বন্ধুত্বের প্রয়োগিক মূল্য সামান্যই। এই স্বল্প সমর্থনের পটভূমিকায় কাসাব্লাঙ্কার আরব শীর্ষ সম্মেলনে ভারতের প্রতি সমর্থন প্রদারিত হয় নাই। সেখানে কাশ্মীর

সমস্যাকে ভারত ও পাকিস্তানের আভ্যন্তরীণ সমস্যারূপে চিহ্নিত করে দায়িত্ব স্বালন করা হয়েছে। অথচ, রাষ্ট্রসংঘে যুদ্ধ-বিরতির জন্য উত্থাপিত প্রস্তাবে কাসাব্লাঙ্কায় সম্মিলিত আরব রাষ্ট্রগুলি 'কাশ্মীর পাক-ভারতের আভ্যন্তরীণ বিষয়' এই অজুহাতে কাশ্মীর সমস্যার আলোচনায় বিরত থাকে নাই। অর্গানাইজেশন অফ আফ্রিকান ইউনিটি সম্মেলনেও কাশ্মীর সমস্যায় ভারতের স্বপক্ষে কোন অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। অবশ্য একথা সত্য এই দুই সম্মেলনেই ভারতের বিরুদ্ধে এবং পাকিস্তানের স্বপক্ষেও কোনো অভিমত প্রকাশিত হয় নাই। যদিও কাসাব্লাঙ্কা সম্মেলনে ভারত-বিরোধী রাষ্ট্রগুলিই সংখ্যা-গুরু ছিল।

রাষ্ট্রসংঘে পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি চুক্তি গ্রহণ সম্ভব হয়েছিল, কারণ, আমেরিকা ও রুশ, এই দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক স্বার্থের টানা-পোড়েন পাক-ভারত যুদ্ধের বিরতি অনিবার্য করে তুলেছিল। পাকিস্তানের চীনমুখীন রাষ্ট্রনৈতিক পর্যায়ের পূর্বে সিয়াটো ও সেন্টোয়ারে শক্তিশালী সামরিক ঘাঁটি গড়ে তুলে আমেরিকা রুশ ও চীনের উপর সামরিক আঘাতের সম্ভাবনা উন্মুক্ত রেখেছে। পাকিস্তানকে সেন্টো, সিয়াটো সামরিক চুক্তির অংশীদার করে কম্যুনিষ্ট-বিরোধী শিবিরে এই রাষ্ট্রটিকে যেমন সংযুক্ত রেখেছে, তেমনি ভারতের উপর কূটনৈতিক এবং প্রয়োজনবোধে সামরিক চাপ সৃষ্টি করে সোভিয়েট রুশের প্রভাবমুক্ত রাখবার জন্যও আমেরিকা উদ্যোগী হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানের চীনমুখীনতা এই সামরিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্যের পরিবর্তন ঘটায়। গত সেপ্টেম্বরে পাক-ভারত যুদ্ধে পাকিস্তানী সামরিক বিপর্যয়ের মুখে চীন ভারতকে চরমপত্র দিয়ে আক্রমণের জন্য উদ্যত হলে, যুদ্ধবিরতির জন্য মার্কিনী ব্যাকুলতা,—একদিকে যেমন চীনের সম্ভাব্য সামরিক আঘাতকে ব্যর্থ করার, অন্যদিকে তেমনি পাকিস্তানকে অধিকতর সামরিক সাহায্যের হাত রেখে রক্ষা করে পাকিস্তানের চীনমুখীনতার গতিবেগকে প্রতিহত করে মার্কিনী আওতায় তার প্রত্যাবর্তনের অনিবার্য প্রবণতা সৃষ্টির জন্য। ভারতের গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতি আকর্ষণ, উদ্বেগ কিম্বা ভারতের উন্নয়নের অপ্রতিহত গতিবেগ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যই যে নিছক মার্কিনী উদ্বেগ তা নয়। এই অঞ্চলে মার্কিনী শক্তির ভারসাম্য পুনঃপ্রতিষ্ঠার সুযোগ গ্রহণের দুর্বার তাগিদে পাক-ভারত যুদ্ধ বিরতির জন্য রাষ্ট্রসংঘে মার্কিনী তৎপরতা চিহ্নিত হয়ে থাকবে।

সোভিয়েট রুশের শান্তি উদ্যোগের পশ্চাতেও নন্-এলাইনড্ ভারতবর্ষকে সাহায্য করবার মধ্য দিয়ে আত্মস্বার্থ সংরক্ষণের সংশয়াতীত প্রেরণা কাজ করেছে। ভারতবর্ষের গণতন্ত্রের আদর্শের সঙ্গে সোভিয়েটের কম্যুনিষ্ট আদর্শের বিরোধ সত্ত্বেও ভারতবর্ষের শান্তিপূর্ণ অবস্থান নীতি, তার নন্-এলাইনমেন্ট, সোভিয়েট নীতির পরিপূরক। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েটের প্রতি ভারতবর্ষের অকুণ্ঠ সমর্থন এই অঞ্চলে শক্তি-সন্নিবেশের ভারসাম্যে সোভিয়েটের প্রবল সহায়ক। লাওস-কাম্বোডিয়া-ভিয়েৎনাম এলাকায় চীনের ক্রমবিস্তৃত প্রভাবের সামনে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় সোভিয়েটের মুখ প্রভাব সংরক্ষণের একমাত্র ভরসাস্থল ভারতবর্ষ। পাকি-স্তান এ যাবৎ সিয়াটো-সেন্টো জোটের অন্তর্ভুক্ত থেকে সোভিয়েটের সম্ভাব্য শত্রুর ভূমিকা গ্রহণ করেছে। কিন্তু পাকিস্তানের চীনমুখীনতা একদিকে যেমন সিয়াটো-সেন্টো জোটের পাকিস্তানী গ্রন্থিকে শিথিল করে দিয়েছে, তেমনি চীন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বে সোভিয়েট-বিরোধিতার নূতন ভূমিকায় পাকিস্তানের অবস্থানের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। এই সম্ভা-বনাকে প্রতিহত করবার জন্যই নন্-এলাইনড্ রূপে পাকি স্তানকে বর্জন করে সোভিয়েট প্রতিনিধি রাষ্ট্রসংঘে এই রাষ্ট্রের প্রতি প্রচ্ছন্ন সহানুভূতি দেখিয়ে তাকে পাক-ভারত সংঘাতের চূড়ান্ত বিপর্যয় থেকেও যেমন রক্ষা করতে চেয়েছে তেমনি চীনা চরমপত্রের কার্যকারিতাকে প্রতিহত করে পাক-চীন সম্পর্কের

অনিল রায়ের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কমু্যনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"
(ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, গাঙ্গুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী;
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

অনৈক্য সন্নিবেশের সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদ করতে চেয়েছে। কারণ, চীন যদি চরমপত্রের মেয়াদ অন্তে ভারত আক্রমণ করতো সেক্ষেত্রে ভারতবন্ধু সোভিয়েতের সরাসরি চীনা আক্রমণের বিরোধিতার উদ্যোগী হতে হতো, না হয় ভারত-রুশ মৈত্রীবন্ধনের প্রতি উদাসীন থেকে ভারতকে একান্তভাবে পশ্চিমীশক্তি নির্ভর হতে বাধ্য করতো। শেষোক্ত ক্ষেত্রে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শক্তির ভারসাম্যে সোভিয়েটের বিপাকও অনিবার্য হয়ে উঠতো। চীন সোভিয়েট দ্বন্দ্বেই হউক কিম্বা সোভিয়েট-মার্কিণ সম্পর্কের চীনা-পোড়েনেই হউক সেই ভয়ঙ্কর সম্ভাবনার সম্মুখীন হওয়া সোভিয়েট রুশের বৃহৎ শক্তির পর্যায় থেকে অবরোহণেরই সামিল হতো। সোভিয়েটের জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের খাতিরে এই আত্মহননের পথ গ্রহণ করা অসম্ভব ছিল। রাশিয়ায় পাক-ভারত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব উপলক্ষ্যে সোভিয়েট-মার্কিণ মৈত্রীর বিরল যোগাযোগের কারণও পাক-ভারত অঞ্চলে এই দুই বৃহৎ শক্তির পারস্পরিক জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থের যোগাযোগের মধ্যে নিহিত রয়েছে।

সুতরাং ঐক্যের ও মৈত্রীর ভাবাবেগে সঞ্চালিত ঊর্ধ্বাহু আন্দোলনের পূর্বে মৈত্রীর প্রতিটি বাস্তব ভিত্তিভূমির তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণ প্রয়োজন, যে বিশ্লেষণের পশ্চাতে জাতীয় স্বার্থের অন্তঃপ্রেরণা মৈত্রীর দিক নির্ণয় ও গতিবেগ নির্ধারণ করে থাকে। ভারতবর্ষের মৈত্রীবন্ধনে সেই পরিপক্কতার স্বাক্ষর আজও দেখা যায় নাই। পাক-ভারত সংঘাত সে-দিকে সহায়তা করবে, যদি শক্তির ভারসাম্যে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক অবস্থানের অনিবার্যতায় ভারতবর্ষের প্রতি প্রসারিত সম্পর্কের সূচীমুখগুলির প্রকৃত তাৎপর্য গ্রহণ করে ভারত আন্তর্রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের নবায়নে অগ্রণী হয়। সেই সুকঠিন দায়িত্ব ভারতকে অবশ্যই পালন করতে হবে। অন্যথা মৈত্রীর ভাবালুতার দিকভ্রান্ত ভারত, জাতীয় স্বার্থ বিসর্জন দিয়ে অন্তঃসারশূন্য আদর্শবাদের মোহগ্রস্ত হয়ে পরনির্ভরতার গ্লানি বহন করে চলবে। ভারতবর্ষকে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতেই হবে। নান্য পন্থাঃ।

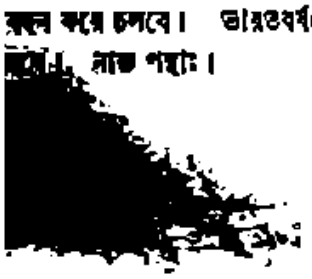

নিম টুথ পেস্ট

এর প্রচুর ফেনা দাঁত সাদা
ঝকঝকে করে আর মুখে আনে
মধুগন্ধময় স্নিগ্ধতা

NIM TOOTH PASTE

একমাত্র
ডেন্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
"ফ্লুয়োরাইড" প্রভৃতি
বহুবিধ আধুনিক
উপাদান

CNC.3A 8IN

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ

দান্তে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

[১২৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্লোরেন্স শহরে দান্তের জন্ম হয়। তিনি একাধারে চিত্রশিল্পী, সৈনিক রাজনীতিবিদ, কবি, দার্শনিক ও ধর্মতত্ত্বজ্ঞ। সৌভাগ্য ও দুর্ভাগ্যের আবর্তনে তাঁর জীবন বিচিত্র। The New Life, The Banquet, On Vernacular, On Monarchy প্রভৃতি কাব্য ও নিবন্ধ তাঁকে বিখ্যাত করেছে, কিন্তু তাঁকে অমরত্ব দিয়েছে The Divine Comedy —এটি মধ্যযুগীয় ইউরোপের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হলেও এর আবেদন সর্বকালীন ও সর্বজনীন। দান্তের ৭০০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে নিম্নলিখিত প্রবন্ধটি আমরা প্রকাশ করছি। ভঃ সঃ]

সপ্তদশ শতাব্দীতে বলরত বহুমুখের নেতৃত্বে আরব জগতের যে-জাগরণ হয় তার অন্যতম ফলশ্রুতি পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির দুর্ভাগ্যসাগরীয় অঞ্চল থেকে উৎসারণ ও আল্পসের অপর পারে পুনর্বাসন। এর পরবর্তী কয়েক শত বছরের পাশ্চাত্য ইতিহাস এবার এক পর্যায়ে প্রবেশ করে যার বৈশিষ্ট্য ওই আল্পসের মতো অচলতা ও ঊর্ধ্বমুখিতা। এই অচলতার অর্থ নৈতিক তথা রাজনৈতিক রূপ হলো সামন্ততন্ত্র আর ঊর্ধ্বমুখিতার আধ্যাত্মিক বা ধর্মীয় রূপ যাজকতন্ত্র।

পাশ্চাত্য সভ্যতা-সংস্কৃতির জন্ম ভূমধ্যসাগরের কোলে, তারই ঢেউয়ের দোলায় দোলায় কয়েক শত বছর ধরে তা লালিত-পালিত; ভূমধ্যসাগরের জলে জাহাজ ভাসিয়ে তারা প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য করত; আর যখন তখন ক্ষুধার্ত সিংহের থাবায় নিরস্ত্র মানুষের রক্তপাত ও মৃত্যু দেখে গগন বিদীর্ণ করত উল্লাসে। কিন্তু তারাই আবার নিষ্ক্রিয় দর্শক হয়ে রইল যখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ইসলামের অভ্যুত্থান হলো অনতিক্রম্য প্রাচীরের মতো। বৃহৎ বাণিজ্য বন্ধ হলে জমি চাষ করাই হয়ে ওঠে প্রধান জীবনকর্ম। দেশজে জমির মূল্য পরিবর্তিত হলো এবং সে-পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতে যেন এক জমিব্যবস্থা প্রবর্তিত হলো যার নাম সামন্ততন্ত্র।

বহির্বিশ্বের সঙ্গে নিঃসম্পর্ক হওয়ার পরে যারা জন্মাল যে পায়ের নিচের জমিটুকু নিয়েই গোটা পৃথিবী, এর উপরে স্বর্গ আর নিচে নরক। স্বর্গে বাস করেন সর্বশক্তিমান ঈশ্বর, ত্রিলোকের অধিপতি। একবার স্বর্গে উন্নীত হলে অন্তহীন সুখ ও শান্তি। কিন্তু ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত সেখানে প্রবেশলাভ অসম্ভব। ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হলে বা তাঁর কোপে পড়লে নরকে গিয়ে শয়তান ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের সঙ্গে তাদের যন্ত্রণার ভাগ নিতে হয়। ইহজগৎ তো একটা পান্থশালা, ইহলোকে দুটি দিন কাটিয়ে সবাইকেই যেতে হয় স্বর্গে অথবা নরকে। পরলোকই মানুষের গন্তব্যস্থল, তার চিরকালের আবাস। সাধারণত তারাই ঈশ্বরের করুণা থেকে বঞ্চিত হয় যারা পাপী, তবে সদাচারেও সর্বদা করুণা মেলে না। প্রকৃতপক্ষে কী ভাবে দৈনন্দিন জীবনযাপন করলে, কী কী আচার অনুষ্ঠান মানলে, কোন

পথে চললে ঈশ্বরের করুণা লাভ করা যায় তা যাতলে দিতে পারে ধর্মযাজকেরাই। অর্থাৎ তারাই সাধারণ মানুষের হয়ে ঈশ্বরের সঙ্গে মধ্যস্থতা করে। তাই গোটা মধ্যযুগ জুড়ে মধ্যস্থকারীর ভূমিকাই প্রধান।

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অর্থে মধ্যযুগের ইউরোপ বলতে যেমন সামন্ততন্ত্র তেমনই আধ্যাত্মিক ও ধর্মীয় অর্থে বোঝায় যাজকতন্ত্র—এমনভাবে দুটি পরস্পরের পরিপূরক যেন একটির গায়ে অপরটি হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা দুটি তাস। প্রকৃতপক্ষে অষ্টম শতাব্দীর শেষার্ধে লম্বার্ডদের পরাস্ত করে ইতালিতে যাজক-রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেন শার্লেমান, যিনি তখনকার ফ্রাঙ্কীদের প্রধান ছিলেন; এবং তাঁর রোম পরিদর্শনকালে ৮০০ খ্রীস্টাব্দের ২৪শে ডিসেম্বর প্রধান যাজক তৃতীয় লিয়ো শার্লেমানের মাথায় আকস্মিকভাবে সম্রাটের মুকুট পরিয়ে কৃতজ্ঞতা জানান যাজকদের তরফ থেকে। ছোট সামন্তের উপরে ন সামন্ত, তার উপরে সেজ সামন্ত, তার উপরে যেজ সামন্ত—এইভাবে সামন্ততন্ত্র যেন এক অন্তহীন সোপানশ্রেণী। ছোটর সঙ্গে সেজর সম্পর্ক নয়ের মাধ্যমে, নয়ের সঙ্গে যেজর সম্পর্ক সেজর মাধ্যমে অর্থাৎ পিঠোপিঠি ছাড়া কারও সঙ্গে কারও প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল না। আবার যাজকতন্ত্র সংগঠনের দিক থেকে ছিল সামন্ততন্ত্রের অনুরূপ।

উভয়ক্ষেত্রে প্রত্যেক মানুষের সঙ্গে প্রত্যেক মানুষের সম্পর্ক ছিল অটল, সুনির্দিষ্ট, স্তরে স্তরে সুবিন্যস্ত। সত্তা সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা, ভাগ্যবিপর্যয়ের আশঙ্কা কিংবা ভবিষ্যতের বিষয়ে উৎকণ্ঠা অজ্ঞাত ছিল, বংশানুক্রমে অনুসৃত চিন্তা ও কর্মের দ্বারা পরিক্রমণেই সেকালের মানবজনম সার্থক। সাধারণ মানুষ ছিল বহুলাংশে পরিতুষ্ট ও পরিতৃপ্ত। সেকালের পরিস্থিতি উচ্চাভিলাষীদের পক্ষেই বা এমন কী আসরোধী ছিল? সামাজিক স্তরক্রমে যাদের স্থান উচ্চে তারাই স্বভাবত উচ্চাভিলাষী। কিন্তু তারা নিশ্চয়ই বুঝত যে সমাজব্যবস্থার রূপান্তরে তাদের অবস্থান্তর অনিবার্য, সুতরাং স্থিতাবস্থাকে কায়েম করাতেই ছিল তাদের স্বত্ব স্বার্থ, তার সঙ্গে জড়িত ছিল তাদের বিশেষ সুযোগ-সুবিধে।

যাজকদের যেসব অতিরিক্ত অধিকার ছিল তার মধ্যে একটি মধ্যযুগীয় ধর্মপ্রতিষ্ঠানের আশ্রয়স্থাপন (asylum) অর্থাৎ গির্জা বা মঠকে ঘিরে অনেকখানি এলাকার পবিত্রতা রক্ষার নামে যাজকশাসন। সে সব স্থানে তীর্থযাত্রীরা, পায়ে হেঁটে দল বেঁধে যারা গাঁয়ে গাঁয়ে জিনিস বেচাকেনা করত সে সব ফিরিওলা স্তরের ব্যবসায়ীরা, কিংবা ভবঘুরেরা পেত আলো-বাতাসের পথে আশ্রয়। সেই সুবাদে এসব বসতিতে মধ্যে মধ্যে বাজার বসত, যা কালে কালে নেয় স্থায়ী বাজারের রূপ। আবার কোনও কোনও যাজক-মোহান্ত সরাসরি ব্যবসাতে লিপ্ত ছিল। কখনও বা ভূস্বামীরাও নিজেদের সুবিধের জন্য নিজের নিজের এলাকাতে বাজার বসাত, আগন্তুকদের জন্যে শিথিল করে দিত সামন্ততান্ত্রিক আইনের কঠিন বাঁধন, সেখানে অবরেসবরে বা দরকার পড়লে গিয়ে নিজেদের থাকবার ব্যবস্থাও রাখত, চারপাশে দেওয়ালও তুলত যাতে বিপদের দিনে প্রজাদের অন্তত কিছু অংশ সেখানে আশ্রয় পেতে পারে। বিশেষ করে সেকালের পদাতিক বণিকযূথের সাময়িক আড্ডা হিসেবে এসব জনপদ ক্রমে ক্রমে শহরে রূপান্তরিত হয়। অবশ্য সব শহর যাজক-মোহান্ত বা সামন্তপ্রভুদের উদ্যোগে গড়ে ওঠেনি, অনেক শহর গড়ে ওঠে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে: বিভিন্ন বণিকযূথের প্রতীক্ষার বা বিশ্রামের ঘাঁটি হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে।

একই সময় থেকে সেলজুক তুর্কীরা এশিয়ার দারুণ পরাক্রান্ত হয়ে ওঠে। জেরুজালেম তো বটেই, মূল ইউরোপ ভূখণ্ডেরও অনেকখানি তাদের দখলে। এরপরেই তারা থাবা বাড়াবে কনস্তান্তিনপলে। তারপরে পশ্চিম ইউরোপের কাঁধে চেপে বসতে কতক্ষণ। সেবারে শার্লেমান ছিলেন ইউরোপের পরিত্রাতা, এবারে তাঁর ভূমিকা নিলেন প্রধান যাজক দ্বিতীয় উরবান। পরস্পর বিবদমান পাশ্চাত্যের

সকল দুষ্কার্যকে তিনি ডাক দিলেন ঐশ্বর্যের নামে। ব্রহ্মদের হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে হবে পবিত্র শহর জেরুজালেম। ইতালির প্রজাতন্ত্রগুলো দেখল, প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্যের পথকে অবারিত করার এই তো মোক্ষম মওকা। ধর্মযুদ্ধের নামে তারা চলল বাণিজ্যসংগ্রামে। প্রথম তিনটিতে তাদের অভিসন্ধি প্রচ্ছন্ন থাকলেও চতুর্থ ধর্মযুদ্ধে তা এমন নির্লজ্জভাবে প্রকট হলো যা মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য ইতিহাসের সব চাইতে বড়ো কলঙ্ক। এদিকে যুদ্ধের খরচ তুলতে সামন্ত-প্রভুরা করের বোঝা চাপিয়ে দিল প্রজাদের মাথায় আর সে-কর আদায় করতে শুরু করল অত্যাচার। ফল হলো উলটো। প্রজাদের মধ্যে জমি ছেড়ে পালাবার হিড়িক পড়ে গেল, বণিকের দলে ভিড়ে তারাও নেমে পড়ল ব্যবসাতে। যার জমিজমা নেই তার পক্ষে ব্যবসাতে নামাই তো স্বাভাবিক। ব্যবসাদারদের ঘাঁটি হলো শহর। ওদিকে প্রাচীর সঙ্গে পশ্চিমের বাণিজ্যপথ খুলতে শুরু করেছে। ইতালি তার কেন্দ্রস্থল।

যারা তখনও চাষবাস নিয়ে আছে তাদেরও মন ছুটেছে বাণিজ্যে। শহরগুলোতে একসঙ্গে বাড়তে থাকল জনসংখ্যা ও বাণিজ্যিক তৎপরতা; এবং দেশান্তে কড়ি টাকার আমদানী। শহরে জীবন মানুষকে দিল স্বাধীনতা, বস্তুগত স্বাচ্ছন্দ্য, নতুন সুখের সন্ধান। পরের দিন মজুর পাওয়া যেতে পারে ভেবে কে-ই বা আজকে হাতের পাওনাটি উড়িয়ে দিতে চায়। সবার আগ্রহ পরলোকের অনিশ্চিত প্রাপ্তির চাইতে ইহলোকের নিশ্চিত প্রাপ্তির পানে ইউরোপের চিত্ত দিনে দিনে উন্মুখ হয়ে উঠতে থাকল। পরপর কতকগুলি ধর্মযুদ্ধের রক্তক্ষয়ে সামন্ততন্ত্র ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়ল। আর শহরে জীবনের আকর্ষণ-বৃদ্ধিতে যাজকতন্ত্র হারাল তার পূর্বতন প্রতাপ।

জমির স্বাধীন থেকে পুঁজির চাকলো, বাণিজ্যের পথে-পথে শহরের উদয়ে, শহরে মুক্ত আবহাওয়ায়, নতুন মূল্যবোধে ও জীবনধারার পরিবর্তনে, বৃত্তবদ্ধের দৃষ্টিকোণ ছেড়ে বৃহত্তর পৃথিবী সম্বন্ধে সচেতনায়, ঐহিক আগ্রহে, সঞ্চিত বিশ্বাসের বদলে আপন ব্যক্তিত্বের যাচাইতে সত্যের বিচারে, শাস্ত্রীয় ভাষার আধিপত্য অস্বীকার করে মাতৃভাষার সেবায়, আচার-সর্বস্ব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বেষ্টিত অনুশাসনের বাইরে আধ্যাত্মিক অন্বেষণে পাশ্চাত্য ইতিহাসে যখন সুস্পষ্টভাবে এক কালান্তরের সূচনা প্রস্তুত হচ্ছে তখন দান্তে অলিখিয়েরির আবির্ভাব। তাঁর পেছনে প্রায় ছ শ বছরের ইউরোপ: মধ্যযুগের ইউরোপ, আর সামনে বিপুল সম্ভাবনাতে অস্থির ইউরোপ: আধুনিক ইউরোপ। এই দুই ইউরোপের যথার্থ স্বরূপ আবিষ্কারের দুঃসহ ও দুর্ধর অভিযানে তাঁর জীবনকাহিনী রোমাঞ্চকর। অবশ্য সে-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বাস্তব-বিবরণ জানবার উপায় আজ না থাকলেও আমরা পেয়েছি তার রূপক-বিবরণ, মানুষের অনুভাবনা কত ব্যাপক, অনুভূতি কত গভীর, কল্পনা কত উচ্চ হতে পারে তার মহিমান্বিত সাক্ষ্য: "ডিভাইন কমেডি"।

দান্তের জন্ম ১২৬৫ খ্রীস্টাব্দের ৩০শে মে, ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে। তার অনেক আগে থেকেই সামন্ততন্ত্র আর যাজক তন্ত্রের মধ্যে যখনি তখন ঘুচে তলায় তলায় একটা রেষারেষি শুরু হয়ে যায়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই রেষারেষির জের ইতালিতে টানল ওই দুটি তন্ত্রের সমর্থকবৃন্দ: - প্রধান সাধুদের পক্ষভুক্তদের বলা হতো গিবেলুলিন আর প্রধান-যাজকের পক্ষভুক্তদের গুয়েল্ফ। গৃহযুদ্ধে জর্জরিত ইতালিতে ঐক্যের শেষ আশার শিখাটি নিবে গেল ১২৫০ খ্রীস্টাব্দে সিসিলির রাজা 'বিশ্বের বিস্ময়' দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের মৃত্যুতে। ফ্লোরেন্সে যখন গুয়েল্ফরা কর্তৃত্ব পেল তখন তাদের মধ্যেও আবার শ্বেত ও কৃষ্ণ নামে দুটি দলে ভাঙন ধরল। নাগরিক মেজাজের নবীন বণিকেরা হলো শ্বেতদল, ফ্লোরেন্সের অন্তে তারা দাবি করল প্রধানযাজক বা সম্রাটের প্রভাবমুক্ত এক শক্তিশালী প্রজাতন্ত্র কিন্তু ফলদল থাকতে রইল প্রধান

বালকের প্রতি আনুগত্যের ভিত্তিতে ওরেলুষদের আদিম আদর্শকে। দান্তের পরিবার ছিল ঘেলফদের অন্তর্ভুক্ত এবং এসূত্রে স্বদেশীয় রাজনীতির উত্তাপ প্রথম যৌবন থেকেই তাঁকে বহুবার স্পর্শ করেছিল। ঘোড়ার পিঠে চড়ে সামনের সারিতে যুদ্ধ করতেও হয়েছিল তাঁকে। ছোটবেলাতে ছবি আঁকার দিকেও নাকি তাঁর বিলক্ষণ প্রবণতা ছিল। কিন্তু কাব্য ছিল তাঁর অস্তিত্বের সারাৎসার আর সে-কাব্যের প্রেরণা নারীর প্রতি প্রেম। নারী বলতে আদর্শ নারীত্ব নয়, নারী সম্পর্কে কোনও নির্বস্তুক কল্পনা নয়, একেবারে রক্তমাংসের বিশেষ একজন নারী। অবশ্য বিয়াত্রিচেকে যখন দান্তে প্রথম দেখেন তখন তিনি আট ন বছরের বালিকা। দান্তের বয়সও তখন ন-দশের বেশি নয়।

বাবার সঙ্গে দান্তে গিয়েছিলেন ফ্লোরেন্সের একজন বিশিষ্ট নাগরিকের বাড়িতে নিমন্ত্রণ রাখতে। সেখানেই নিমন্ত্রণ-কর্তার মেয়ে বিয়াত্রিচেকে তিনি প্রথম দেখেন। প্রথম দর্শনের সেই ছবিখানি তাঁর মনে চিরকালের জন্যে ছাপা হয়ে গিয়েছিল। রক্তাভিরাম লাল পোশাকে বালিকা বিয়াত্রিচেকে দেখেই বালক দান্তের বুক কেঁপে উঠল, মনে হলো যে তাঁর চাইতে অনেক বেশী শক্তি ধরে এরকম কোনও দিব্য সত্তা যেন তাঁকে চালাবার জন্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। দান্তে নিজেই বলেছেন যে তাঁদের এ-প্রণয় বিবাহসাপেক্ষ ছিল না, বিয়াত্রিচেকে একান্ত নিজের করে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কখনও তাঁর আসেনি। বিয়াত্রিচের অন্যত্র বিয়ে হয়ে গেলেও একাধিকবার তাঁদের দেখা হয়। দান্তের যখন আঠারো বছর বয়স তখন একদিন পথে বিয়াত্রিচে তাঁকে দেখতে পেয়ে সম্ভাষণ জানান। সে-সম্ভাষণকে দান্তের মনে হলো স্বর্গীয় উন্মীলন। কদিন পরে আবার তাঁদের দেখা হলো এক বাড়ির ভোজসভায়। সেদিন বিয়াত্রিচেকে দেখে দান্তে এমন আবিষ্ট হন যে তাঁর বন্ধু ভেবেছিলেন, বুঝি-বা তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। কিন্তু বিয়াত্রিচে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীতা হলেন তখনই ১২৯০ খ্রীস্টাব্দে তাঁর মৃত্যু হলো।

দান্তের মনে হলো আকাশ থেকে সমস্ত আলো কেউ মুছে নিয়েছে, ফ্লোরেন্স যেন এক দারুণ শ্মশান। প্রিয়তমার অকাল মৃত্যু দান্তের মনে আঘাত কোন গুরুতর অভিঘাত। সেই তাঁর নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হলো। তিন চার বছরের মধ্যে প্রকাশ করলেন 'নিউ-লাইফ' নামে একত্রিশটি কবিতার সংকলন, সঙ্গে সঙ্গে লেখা কবিতাগুলি সম্পর্কে রচয়িতার মন্তব্য। আসলে সেগুলো শ্লোকে রূপান্তরিত বিয়াত্রিচের জন্যে তাঁর অনন্ত শোক, পঁচিশ বছরের বেশি যে নারীকে মানবসমাজ ধরে রাখতে পারেনি তাঁকে নিরবধি কাল ধরে রাখার প্রতিশ্রুতি। সেই একত্রিশটি রচনাতে দান্তের লৌকিক প্রেম পেল এক অলৌকিক রূপ: বিয়াত্রিচে সাধারণ নারী নন, তিনি দেবী, তাঁর মধ্যেই মূর্ত হয়েছে ঈশ্বরীয় উন্মীলন। প্রিয়তমার মৃত্যু দান্তেকে দিল নতুন জন্ম, নতুন জীবন, নতুন দৃষ্টি। মর্তের বিচ্ছেদের আড়ালে তিনি দর্শন করলেন স্বর্গীয় মিলন। কিন্তু সে মিলনের জন্যে যাত্রা করার আগে যে তাঁকে এই মর্তের ঋণ চুকিয়ে যেতে হবে।

অতঃপর দান্তে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়লেন স্বদেশের রাজনীতিতে। এক বছরের মধ্যে হলেন ঘেলফদের মুখ্য-নেতাদের অন্যতম। একই সময় পরিবারের নির্বন্ধে বিয়ে করলেন। পরিবারের কর্তা হিসেবে সামাজিক কর্তব্য অবহেলা করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। দান্তের দাম্পত্য জীবন সুখের ছিল কি না নিশ্চিত করে বলা কঠিন। তিনি স্বভাবতই আত্মমুখী ছিলেন। তাছাড়া স্বদেশের রাজনৈতিক নেতাদের অন্যতম হিসেবে তাঁকে নানা ধরনের চিন্তা ও কাজ নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হতো। ফলে সংসারের ব্যাপারে বিশেষ সময় দিতে পারতেন বলে মনে হয় না। রাজনৈতিক কাজ আরও বেড়ে যায় ১৩০০ খ্রীস্টাব্দে ছ জন সদস্য নিয়ে গঠিত ফ্লোরেন্সের তৎকালীন শাসক-সংস্থার একজন হিসেবে

নির্বাচিত হওয়ার পরে। ইতিমধ্যে শ্বেত ও কৃষ্ণ গুয়েলফদের মধ্যে নতুন করে এক বিরোধের সূত্রপাত হয়। তার মূলে ছিল শ্বেতদলের অন্তর্ভুক্ত এক পরিবারের কৃষ্ণদলের অন্তর্ভুক্ত এক পরিবারের মধ্যে একটি হত্যাকাণ্ড নিয়ে বিবাদ। অচিরেই সেই বিবাদ ফ্লোরেন্সের পথে পথে সশস্ত্র সংঘর্ষের রূপ নেয়। কৃষ্ণদল তলে তলে ব্যবস্থা করতে লাগল যাতে প্রধানযাজকের নির্দেশক্রমে ফ্রান্সের তৎকালীন রাজার ভাই ফ্লোরেন্সে শান্তি-প্রতিষ্ঠাতা রূপে হাজির হয়। শ্বেতদলের প্রতিনিধি করে দান্তেকে পাঠানো হলো প্রধানযাজক সপ্তম বোনিফেসের কাছে। সপ্তম বোনিফেস বরাবরই অসন্তুষ্ট ছিলেন ফ্লোরেন্সের শ্বেতদলের উপরে। তিনি নিজেও জানতেন যে কৃষ্ণদল যদি ক্ষমতাতে আসে তবে সেটা তাঁরই লাভ।

সেই যে সপ্তম বোনিফেসের সঙ্গে দেখা করে স্বদেশের সমস্যার একটা ফয়সালা করবেন বলে দান্তে ফ্লোরেন্সের মাটি থেকে পা তুললেন তারপরে আর কোনদিনই সেখানে পা ফেলতে পারেননি। সপ্তম বোনিফেস ছিলেন অসাধারণ উচ্চাভিলাষী, ধনলিপ্সু, পণ্ডিত ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং দান্তের বিবেচনায় খ্রীস্টীয় ধর্ম প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত যাবতীয় কুকীর্তির এক বিপুল বিগ্রহ। উভয়ের সাক্ষাতের কোনও যথার্থ বিবরণ পাওয়া যায় না। কিন্তু দান্তের অনুপস্থিতিকালে, ১৩০১-এর সর্ব-সন্ত-দিবসে ফ্রান্সের রাজভ্রাতা নিরপেক্ষ শান্তি-সংস্থাপক রূপে উপস্থিত হলেন ফ্লোরেন্সের দরজায় এবং শহরে ঢুকেই কৃষ্ণদলের পক্ষ নিলেন, তারপরে শ্বেতদলের সদর্থকদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে সাঙ্গপাঙ্গদের নিয়ে করলেন পাঁচ দিন ব্যাপী এক বন্ধুবে। দান্তে ও আরও চারজনকে জালিয়াতি, দুর্নীতি ও প্রধান-যাজক, ফ্রান্সের রাজা, গুয়েলফ দল ও ফ্লোরেন্সের শান্তির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জন্যে তলব করলেন। ১৩০২-এর ২৭শে জানুয়ারি অভিযুক্তদের উপর জরিমানা ও দু বছরের নির্বাসন এবং ১০ই মার্চ কঠোরতর হুকুমে দেওয়া হলো চির-নির্বাসনের দণ্ড। ফিরে এলে অগ্নিদগ্ধে জীবন্ত দাহ করা হবে। "ডিভাইন কমেডি"র জন্যে সারা ইউরোপে নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলে তাঁকে ফ্লোরেন্সে ফিরে আসার জন্যে ডাকা হয়, কিন্তু তার শর্তাদি ছিল অসম্মানজনক। নির্বাসনের উনিশটি বছর একেবারে কপর্দক শূন্য ভিখারীর দশাতে, এ-শহর থেকে ও শহরে বাউণ্ডুলের মতো ঘুরে ঘুরে, বক্তৃতা দিয়ে দিয়ে, গুণগ্রাহীদের সৌজন্যে কোনমতে খুদকুঁড়ো ও লজ্জানিবারণ করে কাটিয়ে দেন দান্তে। অপরের রুটির স্বাদ যে কটু আর অপরের সিঁড়ি বেয়ে ওঠা-নামা করাটা যে আদৌ অনায়াসসাধ্য নয় এই মর্মান্তিক সত্যের উপলব্ধিতে ১৩২১-এ তাঁর মৃত্যু হয় র‍্যাভেনাতে, সেখানেই তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়। অনেক শতাব্দী ধরে দান্তের দেহাবশেষ মাতৃভূমিতে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্যে ফ্লোরেন্সবাসীদের আন্তরিক বহু চেষ্টা সত্ত্বেও আজও তা র‍্যাভেনাতেই আছে।

নির্বাসনটা ছিল দান্তের কাছে শাপে বর। যদি জোর করে তাঁকে স্বদেশের রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে অপসারণ করা না হতো তবে কি স্বর্গীয় মিলনের জন্যে তাঁর পক্ষে যাত্রা করা সম্ভব হতো? পর্বতের শিখরে আরোহণের সময় যেমন বোঝা জালকা করে নিতে হয় তেমনই স্বর্গে গমনের সময় মর্তের দায়। যদি রাজনীতির সঙ্গে বিবাহার সম্বন্ধকে মেনাতে চাইতেন তাহলে হয়তো দু ক্ষেত্রেই ঘটত একাগ্রতার অভাব। তখন স্বর্গীয় মিলনের বদলে তিনি হয়তো লিখতেন ভৌতিক বিদ্বেষের কাহিনী। আর তা হতো খাঁচার পোষা পাখির বেসনার্ত গান। কমেডির বিপরীত ট্র্যাজেডি। কৃষ্ণদল তাঁকে নির্বাসন দিয়ে ডানার শিকল কেটে দিল। ছাড়া পেয়েই পাখি উড়ল আলোর ইশারা দেখে দেখে। খানিক দূর উড়ে পাখির খেয়াল, হলো, পায়ে এখনও শিকল পরানোর আংটাটা লেগে আছে। তাই দান্তে "অন মনার্কি" নামে একখানি বই লিখলেন।

এই ছোট বইখানিতে দান্তে দাবি তুললেন যে ঐহিক ও

পারত্রিক ক্ষেত্রের সম্পর্ক হবে সম্পূর্ণ স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের মতো, কেউ কারও বিষয়ে একেবারে হস্তক্ষেপ করবে না এবং আপন আপন ক্ষেত্রে সম্রাট ও প্রধানযাজক হবেন আরও শক্তিমান, জনসাধারণের উপরে তাদের কর্তৃত্ব হবে স্বতঃসিদ্ধ। সাধারণ মানুষও যথাযুগে মেনে নিয়েছিল যে চিরন্তন তথা পারত্রিক বিষয়ে ধর্মযাজকদের আর ঐহিক তথা ঐহিক বিষয়ে সামন্তপ্রভুদের অধিকার। যাজকশ্রেণীর সর্বোচ্চ স্তরে মহামান্য প্রধানযাজকের ও সামন্তদের সর্বোচ্চ স্তরে সম্রাটের অধিষ্ঠান। একজনের বিপক্ষে অপরজন সহায় এবং উভয়ের কর্তৃত্বের গতি তত্ত্বগতভাবে পৃথক; তবু প্রয়োগের ক্ষেত্রে একজনের সীমা অপরজনের পক্ষে দৃঢ় অর্থে মেনে চলা সম্ভব সর্বদা হতো না। পারত্রিক প্রসঙ্গে প্রধানযাজকের সর্বময় কতৃত্ব স্বীকারে সম্রাট অকুণ্ঠ, কিন্তু প্রধানযাজক ঐহিক প্রসঙ্গকে সর্বদা পারত্রিক প্রসঙ্গের অধীনে রাখতে উৎসুক। সেই যে তৃতীয় নিকো সম্রাটের মুকুট পরিয়ে দিয়েছিলেন শার্লেমানের মাথায় তার একটা ব্যাখ্যাও বের করলেন যাজক সম্প্রদায়: সম্রাটের শক্তির উৎস প্রধানযাজক কর্তৃক স্থাপিত পবিত্র কিরীট এবং প্রধান-যাজক কর্তৃক অভিষিক্ত না হলে কারও সম্রাটত্ব বৈধ হতে পারে না। এর থেকে এল দুটি কৃপাণের বিসংবাদ। ১০৭৭ খ্রীস্টাব্দে ক্যানোসাতে প্রধানযাজক সপ্তম গ্রেগরি যেভাবে লাঞ্ছিত করেন সম্রাট চতুর্থ হেনরিকে তা ঐহিক কৃপাণের উপরে পারত্রিক কৃপাণের প্রাধান্যের পরাকাষ্ঠা। তারপর থেকে নতুন নতুন অর্থনৈতিক ও সামাজিক শক্তির উত্থানে নির্ধারিত প্রতিপত্তিতে ভাঁটা পড়ে। কিন্তু দ্বি-কৃপাণের দ্বন্দ্বের দরুন ক্ষতি যা হওয়ার তা হয়ে গিয়েছিল আর নিজেকে ভেঙে ভেঙে তার সবচাইতে চড়া মাশুল দিতে হয়েছিল ইতালিকে। দান্তে ব্যক্তিগত ভাবেও কম যন্ত্রণা ভোগ করেননি—তাঁর নির্বাসনের মূলেও ওই দ্বন্দ্ব পরোক্ষে ছিল। সেজন্যে তিনি খুব জোরের সঙ্গে ঘোষণা করেন যে পৃথিবীর যাবতীয় অশুভ ঘটনার পেছনে অন্যায়কারীদের ঐহিক লালসা সবচাইতে বড়ো কারণ। মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ক্রিয়া হলো মননচর্চা আর স্বদেশের দুর্দশা দেখে তাঁর ধারণা হয়েছিল যে তার প্রকৃত বাধা হলো যুদ্ধবিগ্রহ। তাই রাজনীতির অবিতীয় লক্ষ্য শান্তিস্থাপনা। কিন্তু দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি কখনও পাশাপাশি থাকতে পারে না, অথবা দুটি শক্তি যদি একই কর্তৃত্বের জন্যে দোদুল হয়ে ওঠে তাহলেও অশান্তি অনিবার্য। একমাত্র সুরাহা হলো সমগ্র পৃথিবীতে একটি-মাত্র সরকার ও একটিমাত্র শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা এবং পার্থিব সকল বিষয়ের দায়িত্ব সেই সরকারের হাতে সমর্পণ করা, পক্ষান্তরে যাদের সাধ্য পরলোক তাদের সমস্ত অভিনিবেশ থাকবে মৃত্যুর পরেকার জীবনের প্রতি। স্বর্গের জীবন যে-ব্যবস্থার দ্বারা শাসিত হবে তার নাম সর্বজনীন রাজতন্ত্র, কেননা নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি দেখেছিলেন যে প্রজাতন্ত্রে এমন অনেকের হাতে প্রভুত্ব আসে যারা অযোগ্য, রাষ্ট্রশাসনের সুযোগে ব্যক্তিগত সৌভাগ্য ও স্বার্থের সন্ধানী, রাষ্ট্রশাসনের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত।

"অন মনার্কি" বইখানি লেখার অনেক আগেই দান্তে মহাকাব্যখানি লেখা শুরু করে দিয়েছিলেন। নিরয়লোক ও শোধনলোকের মধ্যে দিয়ে অত্যন্ত কঠিন অয়নে স্বর্গলোকের উদ্দেশে তাঁর যাত্রা। ঈশ্বরের সন্নিধানে উপনীত হওয়ার কোনও সুগম সহজ ও সংক্ষিপ্ত পথ নেই। নরকের পথ তো শুধুই উতরাই, তারপর থেকে স্বর্গের অন্তিম প্রান্ত পর্যন্ত সমস্তটাই চড়াই। "অন মনার্কি" লেখার পরে স্বর্গের ধার কাঁধ থেকে নামিয়ে চড়াইয়ের পথে দান্তের যাত্রা। হলো অপেক্ষাকৃত অনায়াসে সম্পন্ন। শোধনলোক পর্যন্ত যাঁকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলেন ভার্জিল, যিনি একাধারে দান্তের কাব্যগুরু ও তৎকালীন পার্থিব প্রজ্ঞার প্রতীক। তারপরে স্বর্গে উপনীত হওয়ার পরে পথ দেখালেন বিয়াত্রিচে।

কিন্তু যে-মিলন স্বর্গে হলো না তা যে স্বর্গে সম্ভব এ-প্রত্যয়

কোথা থেকে পেলেন থাকে? বার্থ প্রেমে স্বভাবতই মানুষ সান্ত্বনা খোঁজে পরলোকের সার্থকতাতে। অথচ দর্শীর বিদনের অন্তে পথের ও পথের বিভিন্ন অভিজ্ঞতাবলীর এমন বিশদ ও সুসমঞ্জস বর্ণনা তিনি দিয়েছেন যা কোনও নিতান্ত সান্ত্বনা-সন্ধানীর পক্ষে রচনা করা কঠিন। ছায়াচ্ছন্ন পাতালের পথে ঈনীসের কাছে ডিডোর আপমনের কথা রোমের আতীয় মহাকাব্য ঈনীডের ষষ্ঠ পর্বে ভার্জিল উল্লেখ করেছেন। হয়তো তার থেকেই দান্তেও বিশ্বাস করেছিলেন যে বিয়াত্রিচের সঙ্গে তাঁর দেখা হবে স্বর্গে, তাঁরই সহায়তায় জানতে পারবেন ঈশ্বরের রহস্যময় মহিমাকে। প্রাচীন পাশ্চাত্য ক্রপদী সংস্কৃতির যোগ্যতম উত্তরাধিকারী ছিলেন ভার্জিল এবং ঈনীসের পাতালে অবতরণের প্রয়োচনা তিনি পেয়েছিলেন আবার গ্রীক পুরাণের হেরাক্লেস, অডিসিউস ও প্রিয়তমাকে উদ্ধারের জন্যে অরফিউসের পাতালে অভিযানের কাহিনী থেকে। অর্থাৎ পারত্রিক প্রমাণের কল্পনার ব্যাপারে সুরোপে ক্রপদী গ্রীক চেতনারও উত্তরাধিকারী। তার উপরে মধ্যযুগের আলো-বাতাসেই ছিল পরলোকের প্রতি অটল প্রত্যয়: খ্রীষ্টধর্মা-বলম্বীদের মধ্যে প্রথম যুগে হেরমাসের ধর্মযাজক, ভবিষ্যৎ-দর্শী পিটার প্রভৃতির আর মধ্যযুগে মন্টে ক্যাসিনোর আলবেরিক, ইভলাবের যোহান প্রভৃতির অলৌকিক অভিজ্ঞতাগুলিও নিঃসন্দেহে দান্তের পারত্রিক কল্পনাকে পরিপুষ্ট করেছিল।

যীশুখ্রীস্ট কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের পাশ্চাত্য চেতনার সঙ্গে মহম্মদ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মের আরব্য চেতনার সংঘর্ষ দান্তের উপস্থিতিতে এক বিপুল যোগাযোগ সৃষ্টি করে থাকতে পারে। এ-ক্ষেত্রে যোগাযোগটা কতখানি আকস্মিক বা কতখানি স্বেচ্ছাকৃত তা বলা কঠিন, যেহেতু এই যোগাযোগের স্বরূপ সম্বন্ধীয় অনুসন্ধানে পাশ্চাত্য-মনীষা এতদিন পরে নতুন করে গবেষণার পথকে প্রায় প্রতিরুদ্ধ করে দিয়েছে। সুতরাং অনুবিদ্ধির শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া অন্যগতি নেই।

মুহম্মদ ও পরে দান্তে যেমন খ্রীস্টানদের, যেমন ইহুদীরা আক্রান্ত তেমনই মুসলমানরাও: পরলোকে মহম্মদের পবিত্র প্রয়াণের যে-কাহিনী দশম শতাব্দীতে আবুল-আলা অল্-মাআর্‌রি বিবৃত করেন তা প্রায় দু শতাব্দীর পরে পারস্যজ্ঞানী ও ধরণী ইব্‌ন্ আব্-অবি কর্তৃক দুটি পর্যায়ে পুনর্বর্ণিত হয়। প্রবন্ধেষাক চতুর্থ নিকোলাস যাঁর পাণ্ডিত্যে অভিভূত হয়েছিলেন সেই অর্ডার অব্ ব্রাদার্স সাধু ও লোর্ডার যাজক সন্ত পিটার প্যাসচলের রচনাতেও পাওয়া যায় মহম্মদের ওই যাত্রার বিস্তর উদ্ভিযোগে সম্প্রস্ত উল্লেখ: ১০০০ খ্রীস্টাব্দে দান্তের দেশত্যাগের সময়কালে তিনি যখন মুসলের হাতে শহীদ হন তখন স্পেনের ও সম্ভবত ইতালিকে নিয়ে সমগ্র পশ্চিমের সারস্বত সমাজে তাঁর বিবরণ বহুল প্রচারিত। সে-বিবরণে উল্লিখিত মিরাট আসলে স্বর্গ ও নরকের মধ্যে সংযোগকারী একটি ঘুরতিক্রম্য সেতু এবং তা পার হওয়ার সময় সকল আত্মাকেই সাবধানে টাল সামলে চলতে হয়। এই মিরাটের খ্রীস্টীয় সংস্করণ দান্তের শোধনলোক কিনা নিশ্চিত করে বলা মুশকিল। কিন্তু এ-বিষয়ে বিতর্কের অবকাশ নেই যে দান্তে প্রথম যৌবনে ছিলেন ব্রুনেত্তো লাতিনির অনুরাগক ও তাঁর পৃষ্ঠপোষকতাতে বহু তরুণ কবি, নরকে উত্তরের সাক্ষাৎ-কালে গুরু সিজের সম্পর্ক যে কত ওতপ্রোত ছিল তার পরিচয় স্বয়ং দান্তেই দিয়েছেন। যেকালে ব্রুনেত্তো স্পেনে গিয়েছিলেন কোবি অ্যালফনসর সভাতে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তখন সেখানে আরব্য সংস্কৃতির ব্যাপক চর্চা ছিল; যে-অলেফো ও যে-সেভিল কার্যত ছিল আরবের সাংস্কৃতিক উপনিবেশ সে-দুটি শহরেও তিনি অনেককাল কাটিয়েছিলেন; এবং সিজের মনে আরব্য সংস্কৃতি সম্বন্ধে ব্রুনেত্তো যে গভীর শ্রদ্ধা জাগিয়েছিলেন তার বহুতর সাক্ষ্য "ডিভাইন কমেডি"তে সুলভ। প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের এই সাংস্কৃতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল ধর্মযুদ্ধ-গুলোর ফলে। ঠিক কথা যে খ্রীস্টীয় ধর্মযোদ্ধারা প্রাচ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদগুলির সন্ধান পাননি, তাদের পরিচয় প্রধানত হয়েছিল মরুভূমির সন্তানদের সঙ্গে। তবু সেই সীমিত পরিচয়ের সূত্র

করে আরবদের চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, গণিত ও বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের অনুবাদ পশ্চিম ইউরোপে আগাম অভূতপূর্ব আলোড়ন। অর্থাৎ যাত্রার পক্ষে মহম্মদের দিব্য অভিযানের কাহিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ রূপে অবহিত হওয়ার অবকাশ ছিল প্রচুর।

যাত্রার এই অবয়বের প্রকৃতি বোঝা সহজ হবে যদি ইব্‌ন্ আর-অবির কাহিনীর সঙ্গে "ডিভাইন কমেডি"র সদৃশতা সম্বন্ধে কিছু মূর্ত নিদর্শন পাশাপাশি উদ্ধার করা যায়। প্রথমেই চোখে পড়ে: মহম্মদ ও দান্তের যে-অভিজ্ঞতা-গুলি বর্ণিত হয়েছে তার সমস্তই এই স্বর্গের পরপারে সংঘটিত। দুজনেরই যাত্রাশুরু নিশাকালে; মহম্মদের পথ আগলে থেকেছে একটা সিংহ ও একটা নেকড়ে আর দান্তের বেলাতে একটা চিতা বাঘ, একটা সিংহ ও একটি স্ত্রী-নেকড়ে। পথ প্রদর্শনে ছায়াবৃত্তিদের কিংবা জিনগোষ্ঠির প্রধান ঘষ্টুরের ভূমিকা "ডিভাইন কমেডি"তে পালন করেছেন অশরীরী ভার্জিল এবং তিনি ইতালির প্রপদী সংস্কৃতির প্রধানপুরুষ। প্রাথমিক সাদৃশ্যের পরে আরও অগ্রসর হলে দেখা যায় যে দুটি কাহিনীতেই নরকের নিকটবর্তী সপ্তগুলি হলো বিস্ফোরণকারী বিশৃঙ্খল ধ্বনিবহুল, অগ্ন্যুৎপাত ও বিস্ফোরণ এবং নরকের আকৃতি প্রতিক্রান্ত শঙ্কুর মতো ও পাতকীরা শ্রেণী-বিশেষে বিভিন্ন স্তরে বিন্যস্ত। নিম্নলোকের পরে শোধন-লোকের বর্ণনা আরব্যকাহিনীতে অস্পষ্ট হলেও স্বর্গের বিবরণ আবার দুটি কাহিনীতে পরস্পরের অনুরূপ: ঈশ্বরের নিকটবর্তী হলে মহম্মদের থেকে গ্যাব্রিয়েল ও দান্তের থেকে বিয়াত্রিচে পেছনে সরে গেছেন; আরব্য কাহিনীর অতিকায় রোরুদের ইতালীয় বিকল্প স্বর্গীয় ঈগল। জেরুজালেম থেকে মহম্মদ সোপান বেয়ে উচ্চতম স্বর্গে আর শনিগ্রহ থেকে দান্তে স্বর্ণ সোপান বেয়ে সর্বোচ্চ স্তরে উত্তীর্ণ হয়ে দেবত্ব লাভ করেছেন। উভয় কাহিনীতেই দিব্যবিভা বিস্ফুরক অগণিত দেবদূতের মণ্ডি সমকেন্দ্র মণ্ডল পরিবৃত অত্যুজ্জ্বল আলোকে ঈশ্বর-দর্শন বর্ণিত হয়েছে এবং তার ফলে মহম্মদ ও দান্তে উভয়েরই আত্ম-ও-বিলম্বিত-প্রতিক্রিয়া একাত্মক: ঘন্ধকারী আলোকে প্রথমে ভেবেছেন বুঝি-বা তাঁরা অন্ধ হয়ে গেছেন, ক্রমে সাহস সঞ্চয় করে সেই অলৌকিক দৃশ্যের প্রতি চক্ষু নিবদ্ধ করেছেন, তারপরেই তাঁদের সমাধিলাভ।

অবশ্য পাহাড়ের মাথায় সূর্যকে লক্ষ্য করে এগুনোর সোজা পথে চিতা বাঘ, সিংহ ও স্ত্রী-নেকড়ের রূপক প্রাচীন খ্রীষ্টীয় ধর্মগ্রন্থের অন্তর্গত ভবিষ্যদ্বক্তা জেরেমিয়ার অংশ থেকে আহরণ করা দান্তের পক্ষে সম্ভব এবং আরব্য কাহিনীর এ-প্রসঙ্গটি যে একই উৎস থেকে প্রবাহিত হয়নি তা বাজি রেখে বলা যায় না। তাছাড়া আরব্য কাহিনীর পক্ষে নরকে পাতকীদের নানা স্তরে সাজাবার জন্যে অ্যারিস্টটলের কাছ থেকে ঋণ করার কল্পনা কি একেবারেই বাতুলতা? আরব-বিশ্বে তো অ্যারিস্টটলের চর্চা নবম শতাব্দীতেই শুরু হয়ে যায় আবু ইয়ুসুফ ইয়াকুব ইব্‌ন্ ইশাক অল-কিন্দির ঘটকালীতে। রক্ষণশীল মুসলমানদের নির্বাসন ও বিরোধিতা সত্ত্বেও সে-চর্চা বিস্তার লাভ করতে থাকে আর দশম শতাব্দীর শেষে ও একাদশ শতাব্দীর শুরুতে তার চরম বিকাশ হয় আলেক্সোর বাদশাহ সয়েফ-অদ্-দৌলাহর সভাসদ আবু নসর্ মহম্মদ অল-ফরাবির অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ব্যাখ্যানে; এবং কারও কারও বিবেচনাতে তিনিই হলেন অ্যারিস্টলীয় অনুধ্যানের দ্বিতীয় গুরু। মনে হয় মহম্মদের বিস্তরণ শুধু অ্যারিস্টটলের কাছে ঋণই করেননি, যেকালে ইউরোপ অ্যারিস্টটলের নাম প্রায় মুছে ফেলেছিল তখন তাঁকে অক্ষত অবস্থাতে রক্ষা করে মধ্যযুগের শেষপাদে ইউরোপের হাতে সঁপে দিয়ে সে-ঋণ শোধও করেছেন। ঘনাস্টিসিজমের প্রবক্তাগণ-কৃত লাতিন অনুবাদে অ্যারিস্টটলের অন্তত্তম বিকৃতি হলো পাপের যাত্র দুটি পর্যায়ে বিভাগ: বাতিচার ও অহিতেচ্ছা। বাতিচার মানে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা, ভঙ্গুরিকতা, অর্থ-গৃধ্নুতা ও ক্রোধ আর অহিতেচ্ছা

যানে পাপের পীড়ন, সরল অহিতেচ্ছা, ও প্রবঞ্চনামূলক অহিতেচ্ছা। কিন্তু আরিস্টটল স্পষ্টভাবে ধর্ষণ বা পথাচারকে নির্দেশ করেছেন অহিতেচ্ছার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপে ও সেটাকে বলেছেন দ্বিতীয় পর্যায়ের পাপ।

দান্তে যদি আভিসেনা-কৃত আরিস্টটলের আরবী অনুবাদের বিপর্যস্ত লাতিন অনুবাদকেই অনুসরণ করে থাকবেন তাহলে কেমন করে তাঁর পক্ষে মূলক্রমে তিনটি পর্যায়ে পাপক বিভাগ করা সম্ভব হলো?

অবশ্য আরিস্টটল কর্তৃক নির্দিষ্ট তিন পর্যায়ে সাত প্রকার পাপের বিভাগ নিয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেননি, তার সঙ্গে যোগ করেছেন খ্রীষ্টান ধর্ম অবিশ্বাস ও ধর্মের বিরুদ্ধ ব্যাখ্যাকরণকে এবং এ-দুটি ছিল মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য চেতনার নিদান অনুসারী পাপ: কেননা যেখানে দৃঢ়নিবদ্ধ ধর্ম-সংহিতার ভিত্তিতে দেশীয় সংস্কৃতির উন্মেষ হয় সেখানে—যেমন মুসলমান আরবে বা খ্রীস্টীয় ইউরোপে—এ-রূপ পাপচিন্তা অনিবার্য। উল্লিখিত ন প্রকার পাপের সঙ্গে দান্তে আবার জুড়েছেন আদম অভিজ্ঞাতাত অতিরিক্ত এক প্রকার পাপ: স্থবিরাবাদ বা হদুপেপনা:। প্রথম সাত প্রকারকে আদিতন বা প্রাচীন যুগীয় আর পরের দু প্রকারকে মধ্যযুগীয় বলতে দান্তের নিজস্ব অবদানটিকে বলা যায় আধুনিক যুগীয় পাপ।

অতিরিক্ত দশম পাতকটিকে বাদ দিলে কারও কারও সন্দেহ জাগা স্বাভাবিক যে দান্তের কল্পনাতে মৌলিকতার কিলক্ষণ অনটন ছিল; একথা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো যে মৌলিকতা বলতে আজকাল যা বুঝি তার উদ্ভাস প্রকাশ "ডিভাইন কমেডি"তে আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য, এবং ওই কাব্য প্রকৃতপক্ষে কৃত্রিমকতার একটি উৎকৃষ্ট নিদর্শন, যেমন শেক্সপীয়র অথবা গেটে কিংবা রবীন্দ্রনাথের রচনাবলী। পরম্পরায় ঘটনার অবিরাম উদ্ভাবনে নয়, কোনও মহান স্বপ্নের প্রজননে ও প্রচারে নয়, স্বদেশের ও স্বকালের বিকীর্ণ [illegible] বিলম্ব লৌকিক চেতনাকে স্বগভীর স্থবিরত্ব হতবুদ্ধ অলৌকিক আধারে ধারণেই তাঁদের প্রতিভার অনন্যতা। পূর্বতীদের উত্তরাধিকার পরবর্তী প্রজন্মগুলিকে প্রদানেই তাঁদের দুর্ধর্ষ কল্পনার দুঃসাহসিক অভিযানের যাথার্থ্য, অনাগত কালের অজ্ঞেয় অন্ধকারে অতীতের আলোকদম্পাতেই তাঁদের কীর্তি সম্যক সর্বকালীন তাৎপর্যে বহুৎ।

মধ্যযুগের খোলস ফাটিয়ে ইউরোপের লৌকিক চেতনা যখন সবে আধুনিক যুগের পানে উন্মুখ সে সময় "ডিভাইন কমেডি" লেখা হয় অর্থাৎ তার রূপ প্রাচীন যুগের আর আলোবাতাস আধুনিক যুগের হলেও বাটি কিন্তু মধ্যযুগের। এবং মধ্যযুগীয় ইউরোপের সারাৎসার খ্রীস্টধর্মীয় সংবিত, যার মূল প্রত্যয় হলো পিতা পুত্র পরমাত্মা নিয়ে ত্রিতত্ত্ব ঈশ্বরের কল্পনা। এজন্যে তিন সংখ্যাটি দান্তের ধ্যানে প্রধান প্রতীক রূপে প্রতিষ্ঠিত: "ডিভাইন কমেডি" তিনি রচনা করেছেন এমন কৌশলে যাতে সর্বদা অখণ্ড অথচ খণ্ডখণ্ড রূপে নিম্নে তিনটি যাত্রা গ্রন্থটির থাকে এবং মূল অর্থে এই তিনটিকে বিধিতি বা গঠনরীতি সম্বন্ধীয়, আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শীর্ষলেখে বিচার করা যায়।

"ডিভাইন কমেডি"র জন্মে দান্তে যে-ছন্দ আবিষ্কার করেন তা তিনপদ বিশিষ্ট স্তবকের সুদৃঢ় অন্তর্গ্রথনে প্রবাহিত এবং তা তেরজা রিমা নামে বিখ্যাত; এ-কাব্য যাঁরা মূল ইতালী ভাষাতে পড়েছেন তাঁদের সাক্ষ্য থেকে জানা যায় যে এই বৃহৎ গ্রন্থের ছন্দস্পন্দন সর্বত্রই শুধু অক্ষুণ্ণরিত নয়, তার কোনখানে নাকি ছন্দের খাতিরে এমন একটিও শব্দ ব্যবহার করা হয়নি যাকে বাহুল্য বলে বাতিল বা শিথিল বলে বরদাস্ত করা চলে। প্রতিটি স্তবকের মতোই সমগ্র কাব্য আবার নিরয়লোক, শোধনলোক ও স্বর্গলোক অনুসারে তিনটি খণ্ডে বিভক্ত; প্রথম সর্গটিকে প্রস্তাবনা রূপে গণনা করলে প্রতি খণ্ডের সর্গসংখ্যা বীক্ষার পাশাপাশি দুটি-তিন-করানো তেত্রিশ অর্থাৎ তিন খণ্ডের সর্গসংখ্যা তিন তেত্রিশে নিরানব্বই ও সেসঙ্গে প্রস্তাবনা জুড়ে ঠিক একশ। মূল তিনটি পর্যায়-

শ্রেণী দাত প্রকার, সেলফে ধনবন্টনের দু প্রকার, অর্থাৎ ন প্রকার আর দান্তে নিজস্ব অতিরিক্ত এক প্রকার, অর্থাৎ দাকুলো দশ প্রকার পাতক অনুসারে নরকের যেমন স্তরভাগ করা হয়েছে তেমনই শোধনলোক ও স্বর্গও দশটি করে স্তরে বিভক্ত; এবং প্রতি খণ্ডের এই মোট স্তরসংখ্যা দ্বারা আবার সমগ্র কাব্যের মোট সর্গসংখ্যা বিভাজ্য।

দান্তের গঠনরীতি যে কতখানি সুপরিকল্পিত তা পশ্চাদ্যোদ্ধারনের প্রক্রিয়াতে অধিকতর অর্থপূর্ণ বিস্তার পেয়েছে, কেননা এ বই পড়তে পড়তে যতই এগুনো যায় ততই পেছনে-ফেলে-আসা বিভিন্ন উল্লেখের মর্ম স্পষ্টতর হয়: অ্যাকেরন নদী পার করে নরকে পৌঁছে দেয় কারোন এবং ফলিকের জন্যে সে পাঠকের অভিনিবেশে এতই হালকা একটা দাগ কাটে যা অচিরেই মুছে যায়, কিন্তু পরে যখন নরক থেকে দেবদূত-কর্ণধার যাত্রীদের পৌঁছে দেয় শোধনলোকে তখন ধরা পড়ে যে কারোনের দাগ সত্যি-সত্যি মুছে যায়নি, অন্তান্ত অভিজ্ঞতাতে চাপা পড়ে গিয়েছিল মাত্র ও দেবদূত-কর্ণধারের প্রসঙ্গে সেগুলো সরে গিয়ে স্পষ্ট করে দিয়েছে কারোনের দাগটিকে, এবং তখনই ধরা পড়ে যে কারোন বা দেবদূত কেউই স্বয়ংসাধিত নয়, বরং তারা একে যেন অপরের পরিপূরক, পারস্পরিক সম্পর্কেই তারা এমন এক তাৎপর্যের সমর্থন পায় যা পরিচ্ছিন্ন অস্তিত্বে তাদের বহন করে; তেমনই যে-প্রান্তে নরকের নিম্নতম-স্থলীতে অনন্ত ভিন্নিয়ের শটিত তুহিন পূতিপঙ্কে বীভৎস ত্রিরূপী শয়তানের স্থিতি তার সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ প্রান্তে বিরুদ্ধ পরিবেশে বিরুদ্ধ গুণান্বিত ঈশ্বরের বাস। প্রকৃতপক্ষে "ডিভাইন কমেডি"র রূপকল্প এমন সুদৃঢ় শৃঙ্খলায় সংগঠিত যে তার অঙ্গে কোথাও আকস্মিকতা অথবা অহেতুকতার অবকাশ নেই; প্রতিটি চিত্রকল্প, প্রতিটি উত্থাপিত প্রসঙ্গ একই সঙ্গে পরম অনিবার্য ও সুদরপ্রসর অন্তোক্তসম্বন্ধে অনেকান্ত অর্থে আলোকিত এবং সেসবের ক্রমাগত বিশ্লেষণে রস পাওয়া যায়।

অথচ আপাতচোখে দান্তের বিশ্ব নিপট সরল: এই বিশ্বের কেন্দ্রে পৃথিবী, তাকে ঘিরে চন্দ্র বুধ শুক্র সূর্য মঙ্গল বৃহস্পতি শনি স্থির নক্ষত্রপুঞ্জ ও আদিশক্তির সমকেন্দ্র ন টি গোলক ঘূর্ণিত হচ্ছে এবং এই ন টি গোলককে আবৃত করে রেখেছে যে-পবিত্র-আলোক সেখানেই ঈশ্বরের উপস্থিতি বা সেই আলোকই ঈশ্বর ফলে সমগ্র সৃষ্টির বিদ্যমানতা ঈশ্বরের দ্বারা বিধৃত; আবার পৃথিবী যেমন এই ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্র তেমনই তার কেন্দ্র হলো নরকের অন্তিম বিন্দু। স্বভাবতই পরিধির থেকে সেই চূড়ান্ত কেন্দ্রবিন্দুর দূরত্ব সর্বাধিক এবং সেই বিন্দুতেই শয়তানকে স্থাপন করেছেন দান্তে, অর্থাৎ এই বিশ্বের স্থাপত্যটাই যেন যথার্থ মূল্যবোধের মাপকাটি—পরিধির বা ঈশ্বরের থেকে কার কতখানি দূরত্বস্থান শুধু সেটুকু অনুসারে নরকেই নির্ধারণ করা যায় তার পাপের গুরুতা বা লঘুতা।

এই মাপকাটিকে দান্তে সদ্ব্যবহার করেছেন অসাধারণ বিশ্বস্ততা রক্ষার কাজে, কেননা যখনই তিনি ত্রিলোকের স্থানচিত্রের কোনখানে আঙুল রেখে সেখানের দৃশ্য বর্ণনা করেছেন তখনই স্বতঃক্রিয়াতে নির্ধারিত হয়েছে আলোচ্য প্রসঙ্গের মূল্যায়ন ও প্রকৃতি: নরকের মাপকাটিতে ইন্দ্রিয়-লোলুপীর স্থান সর্বোচ্চ আর তার শাস্তি অন্ধকার ঘূর্ণিবাত্যার অবিরাম আঘাত এবং এর সিদ্ধান্ত এই যে যেহেতু প্রেম পবিত্র মানসিক অবস্থা হলেও অতিরিক্ত দেহপ্রেম ঈশ্বরের অনুভূতিকে ভোঁতা ও প্রজ্ঞাকে প্রবৃত্তির বলি করে তাই পাতক হিসেবে লাম্পট্য সর্বাপেক্ষা লঘু আর তার প্রকৃতি হলো অসংযত সংরাগের রুদ্ধদ্বারাতে আবর্তন।

"ডিভাইন কমেডি" থেকে বিশ্বের প্রথম সম্বন্ধে যে-নক্‌শাটি কল্পনা করা যায় তা দ্বিতীয় শতাব্দীর মিশরীয় জ্যোতির্বিদ ক্লডিয়াস টোলেমেউস বিরচিত হলেও বহির্বিশ্ব সম্বন্ধে অচেতন ও মানুষে মানুষে অটল নিদিষ্ট যথাক্রম স্তরে স্তরে আনুপূর্ব সুরক্ষিত সম্পর্কে বিশিষ্ট মধ্যযুগীয় ইউরোপের প্রতিফলন,

যেখানে তার আচরণ জীবিকা সামাজিক-স্থিতি জীবনের লক্ষ্য পারলৌকিক গতি অর্থাৎ মানুষের সমস্ত কিছুই পূর্বনির্ধারিত এবং প্রতিটি বিভাগ প্রতিটির থেকে সুস্পষ্ট রেখায় স্বতন্ত্র অথচ প্রতিটির সঙ্গে প্রতিটির ধারাবাহিকতা অবিচ্ছিন্ন ও অপরাহত।

মধ্যযুগের মানুষ এই জগৎ ও সংসারের যে-রূপ অবধান করেছিল ও তার যে-স্বরূপ হৃদয়ঙ্গম করেছিল তাকে পরবর্তী-কালের বিজ্ঞান অলীক প্রতিপন্ন করেছে, কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই যে বিশ্বের প্রতিটি পৃথক পৃথক অংশের মধ্যে নিবিকল্প ও নিশ্চিত সম্পর্কের তথা সার্থকতার কল্পনায় তারা একটা প্রচণ্ড শক্তি সাহস ও একটা প্রচণ্ড সহায় বোধ করেছিল, তাদের কাছে জীবনটার একটা সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল, এবং সে-লক্ষ্যের মহিমা সম্বন্ধে তাদের মনে লেশমাত্র সংশয় ছিল না। সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় জীবনোপলব্ধির মধ্যেই "ডিভাইন কমেডি"র পরিকল্পনা করেছিলেন দান্তে অর্থাৎ তিনি শুরুতেই স্থির করে নেন যে মধ্যযুগীয় পাশ্চাত্য সার্বিক বিশ্বতত্ত্ব সম্বন্ধে কোথাও সন্দেহ লক্ষন করবেন না, বরং তাকে গ্রহণ করবেন মোল আনাতে। সুতরাং নিরয়লোকে অবতরণ করে স্বর্গের পথে তাঁকে শোধনলোকে আরোহণ করতে হলো; আর স্বয়ং ঈশ্বরের করুণা ও দর্শন লাভ করা ছাড়া তাঁর এই যাত্রার অন্য কোনও উৎকর্ষই থাকতে পারে না। অবশ্য এই ঈশ্বরও সর্বজনীন নন, তিনি একান্তভাবে খ্রীস্টীয় ঈশ্বর এবং তাঁর অনুভূতি সর্বতোরূপে অতীন্দ্রিয়।

ঈশ্বর সম্বন্ধে এই অনুভূতির স্বর্গীয় প্রান্তে যেমন পিতা পুত্র ও পরমাত্মার সম্মিলন তেমনই মর্তীয় প্রান্তে হয়েছে পরম-পিতার সঙ্গে তাঁর একমাত্র পুত্র যীশুখ্রীস্টের একাত্মীকরণ। ঈশ্বরের ত্রিত্বের কথা স্পষ্ট করে নরকের দরজার মাথায় উৎকীর্ণ করে দান্তে আর হয়নি, শেষ পর্যন্ত নানা উপলক্ষে কথাটি অসংখ্যবার স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন পাঠককে, এমন-কি কাব্যের আখ্যানটিতেও ওই ত্রিত্বের প্রত্যাভাস সুস্পষ্ট। আদিতে খ্রীস্টানদের বিশ্বাস ছিল যে প্রসবা (spiratio) এমনভাবে প্রসূতির (generatio) অন্তর্লীন অনুবর্তী অভিব্যক্তি যে উৎসের অস্বীকারেই স্রোতের যাথার্থ্য বা একটি অপরটির সনাতন স্বীকৃতি; নবীন খ্রীস্টান যুগজন্মের সময় থেকে প্রসূতি ও প্রসবার স্থান নেয় যথাক্রমে পিতা ও পুত্রের রূপ এবং এদের মধ্যে প্রবাহিত প্রেম পেল তৃতীয় একটি রূপ: আত্মাভিলাষ রূপান্তরিত হলো পবিত্র প্রাণবায়ুর (spiritus sanctus) কল্পনাতে, যা পিতা দিচ্ছে পুত্রকে আবার পুত্র দিচ্ছে পিতাকে এবং কালক্রমে প্রাণবায়ু পেল পবিত্র আত্মার বা পরমাত্মার রূপ। পক্ষান্তরে মর্তীয় প্রান্তে কুমারী মেরীর কাছে ২৫শে মার্চ ঘোষণা করা হয় যে তাঁর গর্ভে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্রের আবির্ভাব হবে: মানবীয় গর্ভে দেহ ধারণ করে ঈশা শান্ত করলেন মানবের জন্মাবলী অর্থাৎ তিনি এক অঙ্গে ঈশ-প্রকৃতি ও নর-প্রকৃতির সমন্বিত রূপ; এবং যীশু খ্রীস্টের সঙ্গে যেমন মনুষ্যত্বের তেমনই মেরীর সঙ্গে মনুষ্যদেহ সর্বপ্রথম স্বর্গে প্রবেশ পায়।

[আগামীবারে সমাপ্য]

মিনতি

সুনীল হাজরা

মিনতি : যেয়োনা তুমি নিভৃতে ওখানে—
ঘুমের আবেশে ম্লান সন্ধ্যার ছায়ায় ;
তার চেয়ে চলো নদী-সমুদ্র-সন্ধানে
স্বপ্ন-অধিরতা এনে চোখের মায়ায় ।

এঁকোনা শরীরে বৃথা চিত্রলিপি যতো ।
মাতালের কথকতা মেশার খেয়ালে,
প্রেম নিবেদন করে লম্পটের মতো ;
রাত্রি শেষে থাকবে বড় দিনের হেয়ালে ।

চারিদিকে ক্রুর ফণা : কালসর্প-ভয়,
মৃত্যুর শিয়রে রাখো রাত্রির প্রার্থনা ;
অলুক তোমার চোখে তারার বিস্ময় ;
কপট প্রেমের স্বর্গে অস্থির হয়োনা ।

শান্ত শীতলতা এনে দ্যুতিময় দেহে
লঘু হাও কাছে এসো মৃত্তিকার স্নেহে ।

হৃদয় আমার

শক্তি মুখোপাধ্যায়

আমার হাতে তোমার দেওয়া ফুল
শুকিয়ে গেছে । এখন স্মৃতিটুকু
অন্ধ অনুভূতির কারাগারে
বন্দী হয়ে আছে ।
আমার মনে তোমার ছায়া আজ
নিষ্ক্রিয় হয়ে আসে অন্ধকারে ।

কণ্ঠে তোমার পুরাতনের সুর
সেদিন ছিলো, আজও আছে জানি ;
কিন্তু আমি নতুন পরিবেশে
বদলে গেছি ছায়াছবির মতো ।

হৃদয় তোমার ছিলো পাখির ডানা,
আমার ডানা ভাঙা ;
এখন আমি অপরাধীর মতো
বন্ধ খাঁচার কোনে
মুখ লুকিয়ে আছি ।

হৃদয় আমার আজ ধীরে ধীরে
নিরাশ হয়ে গেছে ।

বুকে ক'রে রাখি

প্রীতিভূষণ চাকী

লক্ষ আলোর অন্ধকারে ডুবছি দিনরাত
ছিন্ন মুখোশ পাক না খুঁজে প্রাণের সাক্ষাত !

লগ্ন-প্রেমে অবিবেকী কাঁচ-রাঙানো সুখ
খণ্ড আকাশ ভাখে শুধু, পায় না গোটা মুখ ;

শিশুর সবল খেলাঘরে মত্ত জীবন পুরুষ
অন্ধকারের মুঁটি নাড়ায়, বোনে আলোর কুরুশ,

ছোট্ট ঘরেই আকাশ নাচায় ছোট্ট প্রাণের পাখি
ইচ্ছে করে তাকেই আমি বুকে ক'রে রাখি,

চাই না সাগর, পাই যদি এক সুর্য ছোঁয়া পুকুর
ভরিয়ে দেবো সুখ সুখে তোমার মনের মুকুর ।

মনে হচ্ছে প্রেম নেই

ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

মনে হচ্ছে কোনো ঘরে আলো নেই,—সমস্ত আঁধার।
এবং বাইরেও যেন ভোরাকাটা অন্ধকার শুয়ে।
মনে হচ্ছে জীবনের রূপ রঙ এবং ইচ্ছার
অমেয় আশ্চর্য শিল্প,—সব আছে অন্ধকার ছুঁয়ে।
নেশার বেহুঁশ যারা, যারা আত্ম-হননে নিরত
হয়তো এতেই সুখী তারা। কিম্বা অন্ধ উদ্দীপন
অবসানে যে-মিথুন উপস্থিত ক্লান্ত নিদ্রাগত
হয়তো তারাও। এবং হয়তো হয়তো বহুজন।

মনে হচ্ছে প্রেম নেই,—তাই চতুর্দিক অন্ধকার,
সম্মুখে পশ্চাতে শুধু ঘৃণা আর অশরীরী ভয়,
তাই সব কিছু ভ্রষ্ট, ব্যর্থ লক্ষ্য,—সব বরবার,—
জীবনের মননের শুধু অর্থহীন অপচয়।

মনে হচ্ছে প্রেম নেই,—তাই যেন সমস্তই তার,
সমস্তই আলোহীন আলোহীন অতল আঁধার।

সনেট

বিকাশ দাস

যদি চরিত্রেরা ঘোরে লাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে চতুর্দিকে,
অসল মুখোশ এঁটে—সাবলীল ভঙ্গি—চেনা যায়।
কেবল নিষ্ঠুর হাতে ছিঁড়ে ফেলে স্বপ্নের কোরক,
ধনিত কুসুম-গন্ধে অট্টহাসে কুটিল সন্ধ্যায়!
বলে, 'কারা ভালোবাসো, দেখেছ কে বুকের গোপনে—
রক্ত গোলাপের স্নিগ্ধ পরাগ! স্বর্গের প্রতিবেশী
হতে কে বাসনা-বদ্ধ? বর্ণময়, রক্তিম উল্লাস,
কে চাও ডুবন পেতে,—বুকে নারী স্নিগ্ধ এলোকেশী!'

বিদ্বেষে, সংঘাতে ক্লিষ্ট,—রক্তাপ্লুত বিপন্ন সময়,
নন্দিত মুহূর্ত, শান্তি,—ভগ্নপ্রায় অস্তিত্বের সাঁকো।
পার্কে-ময়দানে খুব হট্টগোল—নৈরাজ্য, আঁধারে,
কে জ্বালো মশাল, কারা অকালে নির্জীব পড়ে থাকো?

চতুর্দিকে হলাহল, চলুক খাওক, ঘোরে সাপ,—
কেউ অন্তরালে শুধু বুকে রোপে রক্তিম গোলাপ।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

আমরা দেখেছি যে সম্বন্ধের জগতে দুটো category আছে, একটি 'other', (অপর) অন্যটি 'opposite' (বিপরীত)। বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্পর্কে, চিন্তার সঙ্গে চিন্তার সম্বন্ধে, এই দুটো ভিন্নার্থক categoryই বর্তমান আছে। যেখানে বহু সত্তা ছড়িয়ে রয়েছে দেশে ও কালে, সেখানে সকলেই সকলের other বা অপর। অপরত্বের বা ভিন্নত্বের (otherness) সম্বন্ধ সর্বত্রই রয়েছে। কিন্তু এই সব "অপর" বা "ভিন্ন" সত্তার পরস্পরের মধ্যে কোথাও কোথাও বৈপরীত্যের (opposition) সম্বন্ধও বিদ্যমান। কোন কোন বস্তু একে অন্যের শুধু other নয়, বিপরীতও (opposite) বটে। অর্থাৎ কোনও কোনও বিশেষ বিশেষ সত্তার মধ্যে প্রকৃতই বৈপরীত্যের (opposition) সম্বন্ধও রয়েছে। তারা পরস্পরের 'other' বা অপর তো বটেই, বিপরীতও (opposite) বটে। এই বিশিষ্ট সম্বন্ধটি (opposition) সার্বত্রিক বা সর্বলৌকিক (universal) নয়, কয়েকটি বিশেষ বিশেষ স্থল ও সংকীর্ণ ক্ষেত্রে এই সম্বন্ধ (relation) বিদ্যমান আছে মাত্র। সকল বিপরীতই (opposite) অপর (other) বটে, কিন্তু সকল অপর (other) কখনো বিপরীত (opposite) নয়। কাজেই যদি বলি যে জগতের সব বস্তুই সব বস্তুর বিপরীত (opposite) তা হলে ভুল হবে। সব বস্তু অন্য সব বস্তু থেকে "other" বা ভিন্ন, একথা ঠিক। কিন্তু জগতের সকল সত্তার পরম শত্রুতা ও তীব্র বিরুদ্ধতা রয়েছে, একথা নিতান্ত কাল্পনিক।

জগতের বস্তু বা সত্তাগুলো পরস্পর থেকে ভিন্ন হলেও তারা সবাই এক অবিচ্ছেদ্য যোগে যুক্ত। তাদের বৈষম্য থাকলেও বিরুদ্ধতা নেই। তারা সবাই পরম সহযোগিতায় ও মৈত্রীতে জড়াজড়ি করে দেশের ও কালের ক্ষেত্রে বসবাস করছে। কোথাও কোথাও বিরুদ্ধতা নেই, এমন কথা বলছিনে। কারো কারো মধ্যে বৈরীভাব রয়েছে বৈ কি! যেখানে আছে, সেখানে তারা যুযুধান এবং কেউ কাউকে বিনাযুদ্ধে সূচ্যগ্র স্থানও দিতে রাজী হয় না। সেখানে একের সঙ্গে অপরের অস্তিত্বের সংঘর্ষ প্রবল। কিন্তু স্থানে স্থানে বিরুদ্ধতা থাকলেও অন্যত্র সর্বস্থানেই বিশ্বের বিভিন্ন সত্তাগুলি পরস্পরের বিভিন্নতার মধ্যেও গূঢ় সম্বন্ধে বাঁধা রয়েছে। উইলিয়ম জেম্‌স্ (William James) এই তত্ত্বটিকে তাঁর অনবদ্য ভাষায় ব্যাখ্যা করেছেন। *

* "The parts seem, as Hegel has said, to be shot out of pistol at us. Each asserts itself as a simple brute fact, uncalled for by the rest···Arbitrary, foreign, jolting, discontinuous are the adjectives by which we are tempted to describe it.···But notwithstand-

সবর বিশ্ব হচ্ছে 'paragon of unity'; 'বহু' এখানে 'একে' বিধৃত হয়ে রয়েছে, এবং "বহু"ও পরস্পর বিভিন্নতা সত্ত্বেও পরস্পরের সঙ্গে পরম মৈত্রীতে পাশাপাশি বাস করছে। বহুর সঙ্গে যেমন একের বৈরিভাব নেই, তেমনি বহুরও পরস্পরের মধ্যে বিরোধ বা বিরূপতা নেই। এই জন্যই উইলিয়ম জেম্‌স্ আমাদের এই বৈচিত্র্যময় বহু-সম্বলিত বিশ্বকে বলেছেন "মৈত্রী ও অ-বিরোধের অপূর্ব চিত্র" (very picture of peace and non-contradiction)। হেগেল নিজেও এক ও বহুর এই গূঢ় যোগের কথা বলেছেন :*

বিশ্বের সকল বস্তু ও সত্তার ব্যাপক ঐক্যের ভিতরেই বিচিত্র রকমের বিভিন্নতার স্থান রয়েছে। কিন্তু সব বস্তুর সঙ্গে সকল বস্তুর বিরুদ্ধতা নেই। যেখানে যেখানে বিরুদ্ধতা সত্যি সত্যি আছে সেখানেও হেগেলীয় রকমের বিরুদ্ধতা নেই। যেখানে সত্যি সত্যি 'বিরুদ্ধতা' বিদ্যমান রয়েছে সেখানে কী অর্থে এবং কোন্ সূত্রে কোন্ দিক থেকে 'বিরুদ্ধতা' রয়েছে, সে তত্ত্ব আমরা যথাস্থানে আলোচনা করব। এখানে আমরা এইটুকু শুধু স্বীকার করছি যে 'বিরোধিতা' নামক category বা সম্বন্ধও বিশ্বে কোথাও কোথাও আছে। কিন্তু এই সঙ্গে একথা স্বীকার করছি যে জগতের আলাদা আলাদা সত্তা বা বস্তুগুলোর পরস্পরের মধ্যে "ভিন্নতা" (otherness or distinctness) রয়েছে। অধিকন্তু এই "ভিন্নতা" নামক category সার্বত্রিক অর্থাৎ সকল খণ্ড সত্তা সম্বন্ধেই এই category সমানভাবে খাটবে।

এইখানেই হেগেলের সঙ্গে পার্থক্য সুরু হবে। কারণ, এই তত্ত্বের ব্যাপারেই হেগেল অর্থ ও যুক্তির সহজ সৃষ্টি করেছেন। এখানেই হেগেলের দার্শনিকের চরম অযৌক্তিকতা (Illogicality) আত্মপ্রকাশ করেছে। হেগেল বলছেন, বিরুদ্ধতাই (contradiction or opposition) বিশ্বের মূল তত্ত্ব এবং সার্বত্রিক ও সর্বলৌকিক তত্ত্ব (category)। বিশ্বগতির গোড়ায় সর্বত্র ও সর্বকালে এই একটিমাত্র তত্ত্বই চির-ক্রিয়াশীল ও চির-প্রভাবময় হয়ে রাজত্ব করছে। এই বিরুদ্ধতাই হল সর্বজনীন নিয়ম।*

বিশ্বের ক্রিয়াশক্তি ‡ তাঁর মতে বিশ্বের সকল সত্তারই মধ্যে "বিরুদ্ধতা" অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে; এমন কিছুই নেই যার অস্তিত্ব বিরুদ্ধতার দ্বারা জর্জরিত নয়।" সকল বস্তু বা চিন্তাই আত্মবিরোধী।** প্রত্যেকটি অণু-পরমাণু, প্রত্যেকটি ধূলিকণার মধ্যে জড়াজড়ি করে একই সঙ্গে বাসা বেঁধে রয়েছে দুটো বিরুদ্ধ শক্তি। সব কিছুতেই রয়েছে বিরুদ্ধ উপাদানের সহাবস্থান

---

log, it is this very paragon of unity. Space in its parts contains an infinite variety and the unity and variety do not contradict each other, for they obtain in different respects. The one is the whole, the many are the parts···and part lies beside part in absolute nearness, the very picture of peace and non-contradiction." (pp. 264-265, Some Hegelisms)

* "...the One forms the presupposition of the many and in the thought of One is implied that it explicitly makes itself Many." (p 181 : Logic of Hegel)

* "Universal law pervading the whole of nature" (p. 223, Logic of Hegel),

‡ "The very moving principle of the world" (p. 225, Logic of Hegel)

** Everything is opposite" (p. 423, Logic of Hegel)

(involves a coexistence of opposed elements, p. 100, Logic of Hegel)। কোনও বিষয়কে (object) জানা মানেই তাকে দুটো বিরুদ্ধ শক্তির লীলাস্থল বলে জানতে পারা। বিশ্বের পরিবর্তন ও অস্তিত্বের মূল সত্তাই হ'ল এই opposition বা বিরুদ্ধতা ; সব কিছুর বুকের মধ্যেই অহরহ চলছে দুটো বিপরীত সত্তার—যেন চিরসংগ্রামমান নিত্যকালের—দুরাসুরের যুদ্ধ (tug of war)। সব সত্তাই তাই বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের মূর্ত ঐক্য।* কাজেই দেখা যাচ্ছে আরোহী ন্যায় (Formal logic) যেখানে বলছে সকল মূল চিন্তার ও বিশ্ব-জগতের সকল গতি ও পরিবর্তনের মূল কথাই হলো অ-বিরোধ (Non-contradiction), সেখানে হেগেল বলছেন বিরোধই (contradiction) বিশ্বের সেরা ও আদি তত্ত্ব। আরোহী ন্যায় (Formal logic) যেখানে বলছে, নিজেকে নিজে খণ্ডন করলে বা বিরুদ্ধতা করলে তার ফল শূন্যতা ও নিষ্ফলতা, হেগেল সেখানে জোর করে ঘোষণা করছেন যে, বিশ্বের প্রত্যেক বস্তু বা চিন্তা অন্য প্রত্যেকটি বস্তু বা চিন্তাকে বিরুদ্ধতা করছে বা নিরসন করছে ; তথা প্রত্যেকটি বস্তু বা সত্তা আবার নিজেকেই নিজে নিরসন করছে—oppose contradict negate করছে। আরোহী ন্যায় যেখানে বলছে, স্ববিরোধ (self-contradiction) বা অসঙ্গতি সর্বথা বর্জনীয়। কারণ, ওটা অযৌক্তিক, সেখানে হেগেলের মত হচ্ছে, স্ববিরোধই জগতের ও জীবনের প্রগতির একতম ও অদ্বিতীয় কারণ। আরোহী ন্যায়ের (Formal logic) সঙ্গে ডায়লেকটিক লজিকের এই তত্ত্ব নিয়েই যুদ্ধ ঘোষণা এবং এর থেকেই হেগেলের মত ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপ বর্ষণ উচ্চ লজিকের উপরে। বিরোধ (contradiction) সম্বন্ধে উপরোক্ত আলোচনা থেকে দুটো কথা হেগেলের বেরিয়ে এসেছে : (ক) জগতের ভিন্ন ভিন্ন বস্তুগুলো পরস্পরকে বিরোধিতা করছে ; এবং (খ) জগতের প্রত্যেকটি বস্তু নিজেকেই নিজে বিরোধিতা করছে। আমাদের মতে হেগেলের এই দুই তত্ত্বই অলীক এবং যুক্তি ও বাস্তব—এই দুইয়েরই দ্বারা খণ্ডিত হয়।

(ক) জগতের প্রত্যেক সত্তাই অন্য প্রত্যেকটি সত্তাকে নস্যাৎ (contradict বা negate) করছে—হেগেলের এই মতের পিছনে যুক্তি বা বাস্তবতা, কোনোটারই সমর্থন নেই। আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি যে জগতের সবগুলো সত্তা পরস্পরের থেকে "ভিন্ন" কিন্তু "বিরুদ্ধ" নয়। 'গাছের' পাশাপাশি 'ভূমি' আছে, অন্য 'গাছ' আছে, 'পাহাড়' আছে, নদী' আছে, এরা সবাই দিব্যি পাশাপাশি নিজেদের অস্তিত্বকে নিয়ে বেঁচে রয়েছে, কিন্তু কৈ, কেউ তো কাউকে বিরুদ্ধতা বা নিরসন করছে না। তাদের একের প্রকৃতি, আকৃতি ও ইতিহাস অপরের আকৃতি-প্রকৃতি-ইতিহাস থেকে আলাদা ও স্বতন্ত্র ; কিন্তু তাই বলে একের ওপর অথবা এরা অপরে কেউ-ই যুদ্ধার্থী বা মারমুখো হয়ে উঠছে না। একের অস্তিত্বকে বিনষ্ট করে অপরের বাঁচতে হচ্ছে না এবং সততই অপরের সঙ্গে প্রত্যেকেরই যুদ্ধরত হয়ে থাকতে হচ্ছেনা। মানুষের সমাজে বহু মানুষের অস্তিত্ব একই সঙ্গে দেশে ও কালে সমভাবে বিদ্যমান রয়েছে। প্রত্যেকটি ব্যক্তি এক একটি খণ্ড সত্তা এবং প্রত্যেকের আকৃতি-প্রকৃতি-ইতিহাস আলাদা ধারা অনুসরণ করে স্বতন্ত্র খাতে বয়ে চলেছে। একের বাঁচতে হলে যে অপরের অস্তিত্বের বিলোপসাধন দরকার, এমন তো নয়। একজন 'সাধু' হয়ে যাবে, তবে অপর জনের 'চুরু' হবে—এমন রীতি সমাজে কোথাও চলবে না। প্রত্যেকটি ব্যক্তি প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে নিরসন করছে বিরুদ্ধতা করছে এবং বিনাশ করছে—এ কল্পজগতের কথা ও বাস্তব জগতের নয়। তারপর সম্বন্ধের ক্ষেত্রেও মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধ গড়ে

* 'Concrete unity of opposed determinations" (p. 110, Logic of Hegel)।

উঠে, তাতেও এ অবার্থ ও অমোঘ "বিরোধিতা" দেখতে পাইনে। 'পিতা' ও 'পুত্র'—এরা কেউ কারো অস্তিত্বের হানি সাধন করছে না। 'পিতাকে নিজে আত্মবলয় (বা self-inmolation) করে যদি পুত্রকে সংসারে স্থান দিতে হতো তবে হেগেলীয় নীতি খাটত বরং; কিন্তু একের সত্তার সঙ্গে অপরের সত্তার কোন অন্তর্নিহিত শাশ্বত বিরোধ বর্তমান নেই। জীবজন্তু বা প্রাণী বা মানুষের দেহ একটা স্বতন্ত্র সত্তা। কিন্তু এর বিভিন্ন অংশ বা অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি কি পরস্পরের বিরুদ্ধে নিত্যকালের বিদ্রোহী? হাত, পা, চক্ষু, কর্ণ, উদর, ফুসফুস, হৃৎপিণ্ড ইত্যাদি বহু অঙ্গ নিয়ে তবে প্রাণি-দেহ সম্পূর্ণ। এই বহু অঙ্গ প্রত্যেকে একে অন্য থেকে "ভিন্ন" সন্দেহ নেই. কিন্তু এদের মধ্যে বিরোধ নেই; এরা সবাই স্বতন্ত্রভাবে ও স্বতন্ত্ররীতিতে আপন আপন জীবন-ধারাকে অনুসরণ করছে। এরা "ভিন্ন" কিন্তু "বিরুদ্ধ" নয়। জগতের সর্বত্রই "বিরুদ্ধ" সত্তা রয়েছে একথা যথার্থ নয়।

হেগেল আসলে দুটো আলাদা ও ভিন্নার্থক category—অপরত্ব ও বিরুদ্ধতাকে (otherness & contradiction) নিয়ে গণ্ডগোল বাধিয়েছেন। বিরুদ্ধতাকে বিশ্বায়ত শাশ্বত নীতি (Universal Principle) বলা মানে সমস্ত বাস্তব ও যুক্তিকে এক কথায় উড়িয়ে দেওয়া। বরং অপরত্বই (otherness) হচ্ছে সত্যিকার বিশ্বায়ত নীতি (Universal Principle). কারণ বিশ্বের বহু বৈচিত্র্যে ও সত্তা-সম্ভারে বাস্তিকে নিয়েই সমষ্টি আর সর্বমেলে সর্বকালে ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্রতমেরও স্বতন্ত্র সত্তা উৎপন্ন, বিকশিত ও বিলুপ্ত হচ্ছে। এটাই হ'ল বিশ্বমানবের চিরন্তন অভিজ্ঞতা ও বাস্তব সত্য। এই "ভিন্ন" (distinct) সত্তাগুলোকে বোঝাতে গিয়ে যে কর্মূলা তিনি এদের বেলায় প্রয়োগ করেছেন, তার নাম দিয়েছেন 'Dialectic of Opposites.' এই সম্বন্ধে বর্তমান জগতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক ক্রোচে (B. Croce) যে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন তার কিছুটা এখানে উদ্ধৃত করলে বিষয়টা আরও পরিষ্কার হবে।

এ সম্বন্ধে ক্রোচে যে বই লিখেছেন তার নাম "What is Living & What is Dead of Hegel." বইখানার নামটাও অর্থপূর্ণ, কারণ এতে বলা হচ্ছে হেগেলের সবটাই বর্জনীয় নয় এবং হেগেলীয় দর্শনের আংশিক সত্যতা আজকার দিনেও স্বীকার্য। একথা আমরাও আগেই আলোচনা ও উল্লেখ করেছি। হেগেলের যে সব তত্ত্ব আজকের দিনে মৃত ও একান্ত অচল ক্রোচে সেই Dialectic of Opposites কে সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে হেগেলের মারাত্মক ভুলই হচ্ছে সেই যাকে কেমূল্ বলেছেন "Pertionaciously refusing to distinguish" এই ভুলের ফলে হেগেলের সমস্ত দার্শনিক ইমারতই গোড়া থেকে চূড়া পর্যন্ত নানা স্থানে বিকল হয়ে আছে।

অপরত্ব ও বিরুদ্ধতা (Otherness and Contradiction) সম্বন্ধে আমরা আগে যা বলেছি ক্রোচের কথায় তারই দায় পাওয়া যায়।*

---

* "The logical category of distiction is one thing and the category of opp sition is another....two distinct concepts unite with one another although' they use distinct; but two oppo-ite concepts seem to exclude one another. When one enters, the other totally disappears. A distinct concept is presupposed by and lives in its other which follows it in the sequence of ideas. An opposite concept is slain by its opposite" (Ch I) ক্রোচে আদর্শবাদী এবং তাঁর সদ্‌বস্তু (Reality) সম্বন্ধে ধারণা প্রকাশ পেয়েছে তার মাত্রাতত্ত্ব (Theory of Degrees) নামক মতবাদে। এ মাত্রাতত্ত্ব সম্বন্ধে আমাদের যে মনোভাবই থাক, এ

অদ্বৈতবাদের গোড়ায় যে সাধারণ তত্ত্বটি আছে সেটি সর্বজন-স্বীকার্য। তত্ত্বটি হচ্ছে এই যে, বিশ্বের সকল খণ্ড সত্তাই বিধৃত হয়ে আছে এক সর্বব্যাপক সম্বন্ধের (relation) জালে। সবাই অন্য সবার থেকে ভিন্ন থাকা সত্ত্বেও সবাই অন্য সবার সঙ্গে যুক্ত। সম্বন্ধের বিভিন্ন প্রকাশগুলো একটি অপরটির সঙ্গে সতত সম্পর্কিত এবং একটি অপরকে ইঙ্গিত করছে, সূচনা করছে ও প্রকট করছে। এই তত্ত্বই তাঁর 'Theory of Implication.' *

এই 'Distinctness'এর মানে হচ্ছে 'তফাতে'; একদিকে যেমন এতে সূচনা করে পার্থক্য, অন্যদিকে তেমনি বোঝায় ঐক্য। এই ঐক্য পার্থক্য সম্বলিত বিশেষ সম্বন্ধটিকেই ক্রোচে নাম দিয়েছেন 'Distinctness' বা 'ভিন্নতা' এই "ভিন্ন" সত্তাগুলোকে পৃথক করে বুঝতে গেলে সত্যের সন্ধান পাওয়া যাবে না। সম্বন্ধটিকে প্রভেদ ও ঐক্যের সম্বন্ধ বলে বসলেই এই ভুল ছাড়ানো যাবে।* বহু দৃষ্টান্ত নিয়ে ক্রোচে আলোচনা করেছেন—যেমন Art ও Philosophy, Poetry ও Prose, Language ও Logic, Intiuti n ও Thought, Fancy ও Intellect, Rights ও Morality.

এগুলো সবই ভিন্নতের (Distinctness) দৃষ্টান্ত। এগুলো মানুষের মনোজগতের এক একটা বিশেষ দিক এবং এক একটি বিশেষ মনকে এরা প্রকাশ করছে বা রূপ দিচ্ছে।

মানুষের বুদ্ধি (Intellect) ও "কল্পনা" (Fancy)—এরা প্রত্যেকেই মনঃক্রিয়ার (Spiritual activity) এক একটি প্রকাশ। এরা কেউই কিন্তু মনঃক্রিয়া থেকে বাইরের কোন আলাদা সত্তা নয়। এরা পরস্পর সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নও নয়; বরং একটি অপরের মধ্যে জড়িত ও মিশ্রিত হয়ে আছে।* কল্পনাকে (Fancy) বাদ দিয়ে একক বুদ্ধি (Intellect) চলতে পারে না।

তেমনি Art (শিল্প) ও Philosophy (দার্শনিক মনন)—এরাও পরস্পর থেকে "ভিন্ন" হলেও "বিচ্ছিন্ন" নয়। অথচ এদের মধ্যে "বিরুদ্ধতাও" নেই। কারণ শিল্পচিন্তা কারুর মধ্যে থাকলে যে দর্শন (Philosophy) থাকতে পারবে না, এমন হতে পারে না। শিল্পীর মধ্যে দার্শনিকতা থাকাও যেমন সম্ভব, দার্শনিক চিন্তায়ও তেমনি শিল্প মিশে থাকতে পারে, এমন কি হয়ত সর্বদাই থাকে।

তেমনি Prose (গদ্য) ও Poetry (কাব্য); এদের মধ্যে বিভিন্নতা থাকলেও এদের মধ্যে গূঢ় সম্বন্ধ রয়েছে। কিন্তু এদের পরস্পরের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই যাতে করে গদ্য সততই পদ্যকে দূরে রাখে বা পদ্য থাকলে গদ্য সেখানে বাসই করতে পারে না।

এমনি করে উপরের সবগুলো ক্ষেত্রেই ঘটে। বিশেষ সত্তার মধ্যে কোনোরকম বিরুদ্ধতা বা opposition নেই। অথচ এরা পরস্পর থেকে ভিন্ন (distinct)। যদি এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা থাকত তবে একটির অস্তিত্ব অপরের অস্তিত্বকে বিনাশ করত এবং একটি থাকতে অপরের সাম্রিধ্য অসম্ভব হ'ত। শিল্প, নৈতিকতা (morality), ইত্যাদি সবগুলো সত্তাই পরস্পর ভিন্ন, (Distinct) কিন্তু এদের মধ্যে বিরুদ্ধতা নেই। যেমন আমাদের আগেকার দৃষ্টান্তে দেখিয়েছি যে দেহের অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে "বিরোধ"

---

* "If distinct concepts cannot be posited in separation but must beautified in their distinction the logical theory of these distincts will...be that of 'Implication' (Ch IV)

* But the knot is unravelled, when we think of the relation as one of distinction and union together."

* "One passes into the other" (Croce).

নেই, কিন্তু তারা পরস্পর থেকে ভিন্ন (distinct)। ক্রোচে বলেছেন :

"The organism is the struggle of life against death, but the members of the organism are not therefore at strife with one another, hand against foot or eye against hand." (Ch IV ; Croce)

এখানে পরস্পরের মধ্যে যে সম্বন্ধ রয়েছে, তা' বিরুদ্ধতার নয়, এখানে রয়েছে সেই সম্বন্ধটি ক্রোচে যাকে বলেছেন ঐক্য ও প্রভেদ ('Union & distintion together')। 'বিভিন্নতার' (distinctness) মূল তত্ত্ব হ'ল বিবিধের মাঝে মিলন ('Unity in variety.')। এছাড়া হেগেলও আলোচনা করেছেন তাঁর 'Logic'এ ; তিনি বলেছেন তাদাত্ম্য ও ভেদ (Identity & difference) এরা একে অন্যের সঙ্গে সম্বন্ধ. একটিকে বাদ দিয়ে অপরের অস্তিত্ব নেই।*

হেগেল 'Diversity' (বৈচিত্র্য) সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন : বৈচিত্র্যে বিভিন্ন বস্তু পরস্পরের সম্বন্ধ দ্বারা আদৌ বিকৃত বা পরিবর্তিত হয় না। এই বাহ্য প্রভেদ একদিকে সাদৃশ্য অন্যদিকে অসাদৃশ্য।**

বিশ্বের সকল সত্তারই দুটো দিক আছে - এক, অপরের সঙ্গে সাদৃশ্য ; দুই, অপরের সঙ্গে অসাদৃশ্য। কতকগুলি ব্যাপারে যেমন সাদৃশ্য রয়েছে, আবার তেমনি কতকগুলি ব্যাপারে অসাদৃশ্যও রয়েছে। জগতের কোন বস্তুই অন্য কোন বস্তুর সঙ্গে একেবারে পুরোপুরিভাবে 'সদৃশ' হতে পারে না। আবার কোন বস্তুই পূর্ণভাবে 'অসদৃশ'ও হতে পারে না। কোন বস্তুর যদি জগতের অন্য কোন বস্তুরই সঙ্গে কোন রকমেরই সাদৃশ্য না থাকে, তবে আমরা সেই অদ্বিতীয় বস্তুকে বলে থাকি 'Unique'। কিন্তু যুক্তির খাতিরে এমন কোন সত্তাকে কল্পনা করে নিতে পারলেও, আমরা পৃথিবীতে এমন কোনও বস্তুর সাক্ষাৎ পাইনে যা একেবারে পুরোপুরি 'Unique' (অদ্বিতীয়)। একটা বস্তুর মধ্যে অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য (features or traits) আছে, যেগুলোকে ঐ বস্তুর স্বরূপ বলা হয়। যদি ঐ সব বৈশিষ্ট্যের মধ্যে থেকে কোন একটা বাহ্য বৈশিষ্ট্যও আমরা অন্য কোন বস্তুর মধ্যে পুনরাবৃত্ত (repeated বা reproduced) দেখ্‌তে পাই, তবে ঐ বস্তুকে আর পুরোপুরি অদ্বিতীয় (Unique) বলা চলে না, ঐ বস্তু তা হ'লে Sorokin-এর ভাষায় হয়ে দাঁড়াল আবৃত্ত ('Recurrent')। কার্যতঃ আমরা যদি বিশ্বের বস্তু বা ঘটনাগুলো নিয়ে তুলনা বা বিচার করি, তবে কী দেখি ? দেখ্‌তে পাই জগতে একেবারে Unique অদ্বিতীয় কিছুই নেই, সব বস্তুরই কতকগুলো বিষয়ে যেমন অদ্বিতীয়ত্ব (Uniqueness) রয়েছে, তেমনি আবার অন্য কতকগুলো বিষয়ে অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে নানারকমের সাদৃশ্য ও খানিকটা রয়েছে। সমস্ত বিষয়কে যদি একটিমাত্র কোটা কথায় বোঝাতে হয় তবে বলতে হয়, 'নানাত্বের মধ্যেই রয়েছে একত্ব' (Unity in Variety)।* (ক্রমশঃ)

---

* "....We must especially guard against taking it as ab tract Identity, to the exclusion of all Difference" (p. 214, Logic)

** "Difference is first of all immediate difference i. e., *Diversity or Variety*. In Diversity the different things are each individually what they are and unaffected by the relation in which they stand to each other. This relation is therefore external to them. ...This external difference, as an Identity of the objects related, is *Likeness* ; as a non-identity of them, is *Unlikeness*." (p. 218, Logic)

* If any phenomenon have their unique aspects, they also have their recurrent traits, characteristics which are common to other phenomena." (Sorokin : Social and Cultural Dynamics, p. 173, vol. I)

দে য়া ল

দে বী প্র সা দ ব ন্দ্যো পা ধ্যা য়

কত লিখলে, খুকু ?

খুকু।

কিন্তু খুকু যে হবে না বাবলু। ওখানে যে এক হবে। চারকে চার দিয়ে ভাগ করলে কি খুকু হয় ? ওই দেখ, মন্টু ! মন্টু তোর কত উত্তর হয়েছে। এক তো ? দীপু, সবি ? সবারের, ওই দেখ সবারের উত্তর হয়েছে এক। তুমি বড্ড হাবলা হয়েছ, বাবলু।

ছি ছি, বাবলুটা কী বোকা। কতটুকুনি সরল…

মন্টু ? আমি ধমক দিলাম।

ওমা, কাকামণি দেখ, মন্টু বাবলুকে ধরলো, ওমা বাবলু তুই কাঁদছিস।

কাঁদছে ! সে কি। কাঁদছো নাকি বাবলু ? ইস, তুমি বড্ড হাবলা ছেলে হয়েছ। যাও, খাতা রেখে দাও। ভুল গেছে তো হয়েছে কি, কালকে আবার, মন্টু, সবি, দীপু যাও তো বাবলুকে নিয়ে খেলে সে যাও।

বাবলু চোখদুটো মুছতে মুছতে গেল ওদের সঙ্গে। আস্তে আস্তে কোঁপাচ্ছে। বড্ড ছেলেমানুষ এখনও।

বউদি, তোমার ছেলের বয়েস হলো কত ?

কেন বাপু, হঠাৎ আবার তোমার আমার ছেলের বয়েসে কী দরকার পড়লো। বউদি বিকেলের চায়ের সরঞ্জাম গোছাচ্ছিল রান্নাঘরে।

বলোই না।

এই তো, কটকে সেবারে খুব শীত। কবে বলো তো ? তা বছর আটেক তো হল, তাই না ?

বউদি, মোছাই তোমার, আবার তোমার সেই কটকের গল্প শুরু করে দিওনা। তোমার তো

হ্যাঁ-বাবা-হ্যাঁ অন্যের জন্যে কষ্ট নিবারণের ঠ্যাঙ্গি বাসের রাস। হয়েছে তো ? বউদি হাসলো। হাসলে বউদিকে বেশ ভালো দেখায়। বললাম, বউদি, বাবলুর মুখখানা দেখলে মনে হয়—ছেলেবেলায় তুমি খুব সুন্দর ছিলে। তাই না ?

বউদি হাসলো। বাবলু যখন হলো, আমার কটকের মাসিমা বলেছিলেন, খুকু, তোর ছোটবেলার মুখখানা একেবারে বসানো। কী সুন্দর সোনারঙের চুল হয়েছে খোকার, তোর ছোটবেলায় অমনি একমাথা কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল ছিল।

বউদি তোমার কটকের মাসিমার আর চিঠিপত্তর পাও ? বউদি লজ্জা পেল বোধ হয়। না বাপু, এখন কোথায় কে, কারুর কি আর কিছুর ঠিক আছে। তুমি বসে না থেকে আমার চা-টা করো দিকিনি। তোমার দাদাকে তো আজ তাড়াতাড়ি ফিরতে বলেছি।

বউদি ? বউদি খুব ভারিক্কী হতে চেষ্টা করছে, বোঝা যায়। ভারিক্কী ভাব বউদির মুখে একেবারেই আসতে চায় না। মুখের আদলটা বড্ড ছেলেমানুষী এখনও।

গ্রীষ্মের ছুটি আর কতদিন, ঠাকুরপো ?

আমার হাওড়া কেঁপে চায়ের থেকে দুধ চলকে পড়লো। বাবলু পিছন থেকে গুটি গুটি ঢুকেছে এসে রান্নাঘরে। কী বাবলু, খেলা বুঝি আর জমলো না। বাবলু মার কোল

ঘেঁষে বসে পড়লো। হাসলো। খুব যে হাসি হচ্ছে এখন। হাসলে বাবলুকে ভারী সুন্দর দেখায়।

কী বাবলু ওদের ছেড়ে চলে এলি যে? মঞ্জু কোথায়? সবি?

মা!

দেখেছো ঠাকুরপো, কী স্বভাব হয়েছে ছেলের।

তা আর কী হবে! ওরা তো ওর চাইতে সব বড়ো।

কত আর বড়ো ঠাকুরপো। দীপু ওর চেয়ে এক বছরের বড়ো, মঞ্জু বছর তিনেকের। আর কদিনই বা বাবলু। ওরা তো সব আবার কলকাতায় চলে যাবে কাকাবাবুর সঙ্গে। আবার তুমি যে একা, সেই একা।

একা কেন বউদি।

একা ছাড়া কি বলো। ও-ও হয়েছে ঠিক আমারই মতো। ও মা হারা ছেলে, ওকি কারো সঙ্গে মিশবে? আর আমি আর কী বলবো বলো। আমিও—

বউদি একটু হাসলো। আমি বাপু একটু একলাসেঁড়ে। অবশ্য তোমার দাদাও যে মেলামেশা খুব একটা পছন্দ করেন

মাঝখান থেকে আবার দাদার দোষ দিচ্ছ কেন বৌদি। যেমন তুমি, তেমনি স্বভাব পেয়েছে ও। ঠিক তোমার মতোন। বাবলু? এই ধরো তোমার চা। বউদি

মা-মরা, একেবারে নাবালক ভাই। ও বাবলু, ওদের ডেকে নিয়ে যা বাবা, মঞ্জু—দীপু—সবি, ও মঞ্জু, যা বাবা শীগগিরি ডাক ওদের, সবাইকে—

এই যে দীপু, সবি, দেখেছ, এক-এক পা ধুলো সব, কোথায় গিয়েছিলি?

যা, যাও এইবার কাকাবাবুর বকুনি। দেখেছ, কাকাবাবু তৈরী করেছে। ও বাবলু, ওপাশের তাক থেকে ওই পাউরুটি নিবি, মঞ্জুর জন্যে, দেখিস ভাঙিস না যেন। এই দেখ মঞ্জু এলনা এখনও

বউদি তুমি বড্ড ব্যস্ত হচ্ছ। অথচ দেখ, আমার চা রেডি, তোমারই খাবার ভাগ করা হল না এখনও। নাঃ, তোমার দেরদাদী বাপু আমার

ভুরু কোঁচকালো বউদি, কপট রাগ। ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে বৌদির মুখখানা যেমে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি একহাতে প্লেটগুলো সাজাচ্ছে, একহাতে আঁচল সামলে নিল।

কী দেখছ ঠাকুরপো? সবাই তো আর তোমার মতন কাজের নয়। লেখাপড়াও শিখিনি, ঘরগেরস্থালীর কাজও শিখলাম না, ভাগ্যিস একটা আছি। কে, মঞ্জু, এলি। এদিকে এসে বোস, ওমা এ-যে তুমি, একি এত সকাল সকাল

চমকে পিছনে ফিরে তাকালাম, ওমা, দাদা এসে গেছে, এত সকাল সকাল যে।

কেন সকাল সকালই তো আসার কথা ছিল, অফিস্ থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে শ্যামবাজার, বাস পেলাম সঙ্গে সঙ্গেই

যাক ভালোই হল, আজ তোমের হাতের তৈরী চা পাবে। কই যাও তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস, ঘরে গিয়েই বসো নয়, এখানে আর কোথায় বসবে, তাড়াতাড়ি করো, চা জুড়িয়ে যাবে। এই যে মঞ্জু, তোমার কাকার চা-টা ঘরে রেখে এস না মা।

বউদি কী ভীষণ ভারিক্কীর মতন কথা বলতে শিখেছে। গতবার যা দেখেছি তার চেয়েও বেশি। আমার হাসি পেল। বাবলু? বাবলু কোথায় গেল আবার বউদি?

কোথায় আবার। গেছে তোমার পেছনে পেছনে। তুমি বাপু যেয়ে নাও, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

রাত ন-টা বাজলো।

ও মঞ্জু, শুনছিস?

আজ আর বলো না ছোটকাকা। বাবলু ঘুমিয়ে পড়েছে।

দীপু? সবি?

না ছোটকাকা, তুমি আজকেই শেষ করো। এই বাবলুর জন্যে অপেক্ষা করতে গেলে কোনোদিনই শেষ হবে না ওই গল্প।

দীপু!

না ছোটকাকা তুমি দিদির কথা শুনো না। ও না শোনে না শুনুক, ওর বাবলু সঙ্গে বেশী ভাব হয়েছে।

দীপু দাবি মঞ্জু। থাক্‌রে, আজ অনেক রাত্তির হয়েছে। খেয়ে উঠে বেশীক্ষণ রাত জাগতে নেই। যাও শুতে যাও। মঞ্জু তুই বাবলুকে নিয়ে শুতে পারবি? নাঃ, বাইরের হাওয়ায় আবার ঠাণ্ডা না লাগে। কী মুস্কিল। ওই তোদের কাকিমা আবার বকছে। মঞ্জু তোর গায়ে জোর আছে তো? মঞ্জু বড় হলে কিন্তু বেশ সুন্দর দেখতে হবে। ওর চুলের ভাবটা, ওর চোখ দুটো, রাত্তিরের আবছায়া পড়েছে ওর মুখে, নাঃ মঞ্জু সুন্দর হবে। মঞ্জু? দেখেছ ছেলেটা একেবারে নেতিয়ে পড়েছে ঘুমিয়ে নির্ঘাত। চল মঞ্জু, আমি দিয়াসি ওকে। মঞ্জুর চেহারাটা বোধ হয় একটু পুরুষালী হচ্ছে। আর ছেলেটা—ও একেবারে মেয়েলী, কী ভীষণ নরম…

বউদি। কী, তোমার রান্নাঘরে এখনও এতকী কাজ?

বউদি একটু কটাক্ষ করলো। ওরা ঘুমিয়ে পড়লো নাকি?

হ্যাঁ, ওদের তো শুইয়ে দিয়ে এলাম। দাদা ফিরবে কখন?

দেখলে তো সন্ধেবেলায় এসে ডেকে নিয়ে গেল।

আবার সেই তাসের আড্ডায়?

তা, এখন তো তবু ঘরে লক্ষ্মণ ভাইটি রয়েছে। অন্যসময় গেলে কিন্তু আমার বাপু বড্ড একলা লাগে। বড্ড ভয়ও করে।

বলো না কেন দাদাকে।

কী আর বলবো বাপু, দশটা পাঁচটার ডেলিপ্যাসেঞ্জার, ঘর থেকে আপিস, আপিস থেকে ঘর, খাবার মধ্যে একটু শুধু তাসখেলার দর। আর কী আছে বলো।

বউদি কী নিপুণ সংসারী হয়ে গেছে। বউদি—

কী?

একটু বাইরে গিয়ে বসবে?

তুমি যাও বাপু। আমার এখনও কাল সকালের কুটনো বাকী রয়েছে।

বউদি?

কী, রাগ করলে?

না, রাগ করবো কেন। বউদি বোধহয় আমাকে একটু এড়াতে চাইছে। আমার চোখ দুটো বড্ড জ্বালা করছে কেন যেন, হঠাৎ।

বেশ হাওয়া বাইরেটাতে। ছোট বাড়ি। সামনে আশেপাশে ঘুচকুটে গাছগাছালি। বেশীর ভাগ সবজী। কোণের হাসনুহানার ঝোপটার ওপর রাত্রি ঘন হয়ে জমে রয়েছে। বাহুরটার নীচে ঘাস। মাথার উপর তারা তারা তারা—মস্ত কালো একটা শূন্য, বাহুরের কাটিগুলো পিঠে ফুটছে। সাতদিন হলো এসেছি, বড় বউদির ছেলেমেয়ে তিনটেকে নিয়েছিলাম সঙ্গে করে। কিন্তু কেন? আর তিন দিন পরে ফিরে যাবো? কিন্তু কোথায়? ওদের বোধহয় ইস্কুল খুলবে। আমি কলেজ করবো। কলেজে কী সমস্ত যেন পড়ায়। কী সমস্ত যেন পড়াচ্ছে আবছা লাগে। খুব পাচ্ছে নাকি আমার? অনেক দিন ক্লাস করিনি ছুটির আগে। সামনে সম্ভবত আমার পরীক্ষায় বসতে হবে। বড়দা কী যেন ভাবে। বড়দা কী যেন ভাবে। বড়দা আমার সম্বন্ধে কী ভাবে। বড়বৌদি কী যেন ভাবে। মেজদা আমার সঙ্গে কথা বলে না। মেজবৌদি আমার দিকে কেমন করে যেন তাকায়। অদ্ভুত ভাবে তাকায়। মেজবৌদি আমাকে লুকিয়ে লুকিয়ে হাতখরচার টাকা যোগায়। কিন্তু

কেন? খুব হাওয়া এখানটায়। আমাদের ভবানীপুরের বাসায় যদি আর না ফিরি। যদি কোনোদিন আর না ফিরি। হৃদয়পুর ভবানীপুর-হৃদয়পুর-কলকাতা-হৃদয়পুর। দূরে বড়রাস্তায় বাসের হর্নের শব্দ। শেষ বাসও বোধহয় ফিরলো। এখানে বাড়ীগুলো বেশ ফাঁক ফাঁক, আমার বেশ ভালো লাগে। মাথার ওপরে তারাগুলো। আকাশটা যেন ক্রমশ নীচে নেমে আসছে, যেন মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে তারাগুলো। মাথার নীচে বারুইয়ের কাঠি ফুটছে। উঃ চমকে যেতে হয়, কত শেয়াল ডাকলো একসঙ্গে। আজ্ঞা আজ চাঁদ ওঠেনি? আকাশে তো বেশ আলো, এদিকে ওদিকে ওপরে নীচে—ওই-যে পাশের দিকে ওই দূরের নারকেল না তালগাছের ফাঁকে একচিলতে চাঁদ। পড়াশুনা কিছু হয় নি, পড়াশুনো একেবারে হয় না, কলেজে কারা যেন পড়ায়, কারা যেন পড়ে, অনেকগুলো মেয়ে বসে ওপাশের বেঞ্চে, অনেকেরই নাম জানি, বেশ হত যদি আলাপ হত কারো একজনের সঙ্গে, কিন্তু

কিগো ঠাকুরপো, ঘুমিয়েছ নাকি?

একটু চমক লাগলো বুকের ধুকধুকটায়।

বউদি? তোমার আর কোন কাজ নেই?

না ভাই, এই সব গুছিয়ে রেখে আসছি।

আমার চোখ দুটো কেন যেন জ্বালা করছে, হঠাৎ। আমি চোখের ওপর হাত রেখেছি। আমি পাশ ফিরে শোব, আমি উপুড় হয়ে শোব।

কী হলো ঠাকুরপো?

আমার চোখ দুটো বড্ড জ্বালা করছে। কলেজের সেই মেয়েটার নাম যেন কী। ও একদিন আমার পাশে এগিয়ে এল। আমি ওপাশে তাকিয়েছি। আমি সব টের পাচ্ছি। আমার চোখ দুটো কেমন জ্বালা করছে। আমার হাত [illegible] অনেক চেষ্টায় স্থির। ও হঠাৎ আমার হাতটা ধরে [illegible]। আমার চোখে জল এসে গেল। কিন্তু সত্যিসত্যিই ও আমার পাশে এগিয়ে আসেনি। আমার হাত ধরে নি। কিন্তু আমার চোখে জল এল।

বউদি, বলবে?

খাবার সময় তো হয়েছে তোমাদের। তোমার দাদার এবার ফেরা উচিত।

আমি সাহসে নিশ্বাস। বউদি তোমাদের এখানে কী সুন্দর হাওয়া। আমার এখান ছেড়ে আর যেতে ইচ্ছে করে না।

বউদি আমার মাথার কাছটায় বসলো একটু সরে হয়ে। তোমার পরীক্ষা কবে।

পরীক্ষা? আমি হাসলাম। বউদি কি টের পেল অন্ধকারে আমি হাসলাম। বউদি, আর তিনদিন আছে। আর তিনদিন আছি তোমাদের কাছে।

তোমার কলেজ খুলছে কবে ঠাকুরপো?

সোমবার।

পড়াশুনো ভালো করে করো ভাই।

হ্যাঁ করবো। আমি হাসলাম। কী করে বোঝাবো পড়াশুনো করা আমার পক্ষে কত কঠিন। বউদি?

বলো—

তোমাদের কদ্দিন হলো এখানে?

হঠাৎ?

না, এমনি মনে হলো।

তুমিই হিসেব করো। কদ্দিন হবে? তা

বউদি

রাত্রির আলোয় রুপোলি আর স্পষ্ট দেখাচ্ছে বউদির সর্বাঙ্গ। বউদির চোখে কোন কটাক্ষ নেই। সোজা তাকিয়ে রয়েছে। বউদি কি রঙের শাড়ী পরেছে? বুঝতে পারছি না। রাত্রি পড়ে ঘোর দেখাচ্ছে শাড়ীটার রঙ। আঁচলটা জড়িয়ে রেখেছে বউদি। বউদির গায়ে বোধহয় ব্লাউজ নেই। মেজবউদি একদিন আমাকে নিয়ে গিয়েছিল বোম্বাইয়ে।

ব্লাউজের ডিজাইন পছন্দ করতে বলেছিল। আমি যেটা পছন্দ করেছিলাম বড়বউদি সেটাই কিনলো। রাস্তায় বেরিয়ে বললো, তোমার কিছু পছন্দ নেই ঠাকুরপো, বাবা, আর কোনোদিন তোমায় নিয়ে কিছু কিনতে বেরুবো না। মেজদার বাসাটা খুব ছোট। মেজদা বেশ শৌখীন। কিন্তু মেজদা বোধহয় আমার সম্বন্ধে কিছু ভাবে। বড়বউদির ভবানীপুরের বাসাটা আমার ভালো লাগে না। কিন্তু রোজ সন্ধ্যায় সেখানে আমার ফিরে যেতে হয়। বড়দার রোজগার সকলের চেয়ে বেশী। কিন্তু বড়দা আমাকে কী যেন ভাবে। মঞ্জু, দীপু সবি, আমার ভালো লাগে না, আমার ভালো লাগে না, দীপু রাত্তিরে আমার কাছে শোয়, আমার ভালো লাগে না, মঞ্জু আমার কাছ থেকে গল্প শুনতে চায়, আমি মঞ্জুকে আদর করি, আমার ভালো লাগে না মঞ্জুকে, সবিকে আমি চকোলেট কিনে দিই, কিন্তু আমার ভালো লাগে না। আমি বড়বউদির মন ভুলিয়ে চলি, কিন্তু আমি পারি না, বড়বউদি আমাকে ভালো ভালো কথা বলে, সব সান্ত্বনো, সব সান্ত্বনো কথা...খুব ভারী করে ঘুরেছে, আমার চারিদিক ঘিরে ভয়ানক ভারী করে ঘুরেছে। ঘুরে কারা গল্প করতে করতে যাচ্ছে, চাষাদের কেউ? আকাশটা যেন ক্রমশ নীচে নেমে আসছে, যেন মুখের ওপর ঝুঁকে আসছে তারাগুলো, আমি তিনদিন পরে এখান থেকে চলে যাবো, ভয়ানক হাওয়া, ভয়ানক সুন্দর হাওয়া, কলেজের সেই মেয়েটার নাম যেন কি? সে একদিন আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। আমার হাত দুটো আঁকড়ে ধরলো। কিন্তু না। অনেকদিন আগে কবে যেন রাত্তিরে আমি শুয়েছিলাম আমার মাথার শিয়রের জানলা ছিল খোলা, কী যেন একটা গাছ ছিল জানলার বাইরে। তার পাতাগুলোর ছায়া জ্যোৎস্না মেখে আমার সমস্ত গায়ে ছড়িয়ে পড়েছিল, কেমন একটা হাওয়া ছিল, কেমন একটা গন্ধ। ফুলের? আমার চোখ ফেটে জল আসছিল। কে যেন ঝুঁকে পড়লো আমার মুখের ওপর, বুকটা ছুঁয়ে গেল আমার গালে, কে যেন আমার কপালে ছোট্ট একটি চুমু খেল। মা। আমার মা। আমার কান্না এল। আমি জোর করে কাঁদতে চাইলাম। আমি হু হু করে কেঁদে ফেললাম। আর আমি জড়িয়ে ধরলাম—কাউকে না। আমার—মা-কে।

ঠাকুরপো?

আমি চমকে উঠলাম।

ঠাকুরপো, ঘুমোচ্ছ নাকি?

কই, না।

ঠাকুরপো?

কী বলছো, বউদি?

তুমি খেয়ে নেবে ঠাকুরপো? তোমার দাদা তো ফেরবার নাম করছে না।

বউদির কথাগুলোর সঙ্গে বউদির গলার আওয়াজ মিলছে না। আমি বুঝতে পারছি, বউদি আর কিছু ভাবছে। আমি বুঝতে পারছি, বউদি যা ভাবছে তা কেউ জানে না, তা আমিও জানি না। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি বউদি যা ভাবছে তা এই কথাগুলো নয়। বউদি আমার জন্যে তোমার এত তাড়াতাড়ি কেন।

না ভাই, বড়দির বাড়ীতে তো জানি, সব তাড়াতাড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা।

বউদি, এটা তো বড়দির বাড়ী নয়, এটা তোমার।

আমার? বউদি বোধহয় একটু হাসলো?

বউদি? আমি পাশ ফিরে আরেকটু কাছ ঘেঁষতে চাইলাম। বউদি, তোমার ছেলের মুখখানা দেখলে মনে হয় ছোটবেলায় তুমি অমনি সুন্দর ছিলে।

বউদি উত্তর দিল না। আমি মুখ দেখতে পেলাম না বউদির।

তোমার ছোটবেলার গল্প বলো না বউদি।

বউদি উত্তর দিল না। আমি টের পেলাম বউদি বোধহয়

একটু হাসলো। আমি বউদির দুটো আঙুল ছুঁলাম আমার হাত দিয়ে। আমি নাড়াচাড়া করতে লাগলাম আঙুল দুটো। আমি বউদির হাতটা ধরলাম আমার মুঠোয়। ঠাণ্ডা। কিন্তু কী ভীষণ উত্তাপ। ঠাণ্ডা। কিন্তু কী···সেই কলেজের মেয়েটার নাম যেন কী। সে একদিন আমার হাতটা চেপে ধরেছিল তার মুঠোর মধ্যে। না না সে ধরেনি। কতদিন আগে রাস্তিরে যেন শুয়েছিলাম আমি শাদা পালকের মতন নরম বিছানায়। কে যেন ঝুঁকে পড়েছিল আমার মুখের ওপর। আমার গায়ের ওপর তার বুকটা ছুঁয়ে গেল। আমার কপালে ছোট্ট একটা চুমু। না না না। কী হাওয়া, কী ভীষণ হাওয়া।

বউদি, তোমাদের এখানে বড় সুন্দর হাওয়া, তাই না। আমার গলার আওয়াজ আমার নিজের কানেই ভারী জড়ানো মনে হল। বউদি কথা বললো না।

বউদি, তুমি কিন্তু শুধু শুধু পড়াশুনোয় ফাঁকি দিলে। পরীক্ষা দিলে তুমি ঠিক ভালোভাবে পাশ করতে।

না ঠাকুরপো।

কী না

আমি জানি না। বউদির গলার আওয়াজ ভীষণ আলগা শোনালো।

বউদি তুমি পড়াশুনো করলেনা কেন?

আমি? বউদি হাসলো।

হ্যাঁ তুমি। তুমি এখনো পড়োনা কেন।

সে কী। বউদি শব্দ করে হেসে উঠলো।

আমার কী দরকার পড়বার। আমি কেন পড়বো? বা-রে। আমি এখন ছেলের মা তা জানো না? পড়বে তোমরা। এখন হলো তোমাদের পড়াশুনো করার বয়েস। ভালো করে পড়াশুনো করার। বউদি যেন জোর করে খুব হালকা হয়ে গেল। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি বউদি আর কিছু ভাবছিল। আমি বুঝতে পারছি, বউদি যা ভাবছিলো তা কেউ জানে না। তা আমিও জানি না। আমি বললাম, বউদি তুমি বড় সংসারী হয়ে উঠেছ তো। কী ভারিক্কী হয়েছ।

কেন?

কেন নয়, বলো।

বাবলুটাকে নিয়েই ভাবনা। বউদি ঐখানে গিয়েই গেল না। তোমার দাদা তো ওকে নিয়ে একেবারেই বসবে না। যা করবার, সব আমি। কিন্তু আমার আর কতটুকুন বিদ্যে বলো।

আমি বললাম, যার কাছেই প্রথম বছরের পড়াটা হওয়া ভালো—

তাই নাকি। বউদি হাসলো।

আমিও হেসে ফেললাম।

তুমি তো বেশ বিজ্ঞ হয়ে উঠেছ, ঠাকুরপো।

তাই নাকি। তা বয়েস তো হল। আমি বউদির হাতটা নিয়ে খেলা করতে লাগলাম। আঙুলগুলো নিয়ে, হাতের পাতাটা নিয়ে এবং হাতের ভেতরকার সব শঙ্খ নিয়ে খেলা করতে লাগলাম।

তবু তুমি কবিন আছ। বাবলু সবরমতন বইপত্তরগুলো নিয়ে বসছে।

আমি কথা বললাম না। আমার শরীরের কোথাও কোনো সাড় নেই। সমস্ত স্নায়ু-শিরা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সব অঘোরে ঘুমন্ত। আমার চোখ দুটো শুধু জেগে রয়েছে সেই প্রকাণ্ড ঘুমের মাঝখানে। আর আমার চোখের সামনে, একেবারে সামনে ঝুঁকে পড়েছে তারা তারা তারা, ঝুঁকে পড়েছে বিরাট কালো একটা শূন্য। কী ভীষণ কালো। আর কী প্রকাণ্ড বিরাট শূন্য। আমি সাতদিন হলো এখানে এসেছি। এখানের দিনের-বেলাটা খুব অগোছালো একটা পল্লী—ঘুরের বাস-চলার আওয়াজ, পাশের মানুষের কণ্ঠস্বর। এখানের রাত্তিরবেলাটা

ভয়ানক নিবিড়, মনে হয় অনেক দূরে দূরে কেউ আছে, সবাই আছে, ঝিকমিক-করা তারায় ঢাকা রয়েছে, কিন্তু সবাই আছে। আলো জ্বলছে মাঝে মাঝে, আমি রয়েছি একলা, আমার সামনে সেই কলেজের মেয়েটা, যে একদিন আমার হাতটা চেপে ধরেছিল, তার মুখটা অবিকল মঞ্জুর মতন, তার হাতের স্পর্শ এখনও আমার মুঠোর মধ্যে বেঁধে রেখেছি।

ওঠ ঠাকুরপো, ওই উনি বোধহয় এলেন।

হঠ করে আমার হাতের বাঁধন খুলে গেল। যে আকাশটা ছিল আমার চোখের ওপরে, যে তারাগুলো আমার মুখের সামনে ঝুঁকে ছিল, তারা সবাই আমায় ভীষণ জোরে ধাক্কা দিল যেন আচমকিতে, আমি পড়তে লাগলাম। দ্রুত ভয়ানক কল্পনাতীত বেগে পড়ে যেতে লাগলাম—আকাশ থেকে অতলে ;

উঠে বসলাম। বউদি চলে গিয়েছে।

খাওয়ার পর বউদি বললো, ঠাকুরপো লক্ষ্মীটি ভাই, বাবলুকে একটু আমার ঘরে কোণে করে নিয়ে যেও না। মাস্তরাত্তিরে, দেখেছো তো ক-দিন ওরে, ও ঠিক আপনে সবাইকে। আমার রাত দুপুরে তোমাকে দিয়ে যেতে হবে আমার ঘরে। আর সারারাত ও ঘা পা ছোঁড়ে, ও কাউকে ঘুমোতে দেবে না।

দাদা আঁচিয়ে এসে একটা বিড়ি ধরাচ্ছিল। বললো, মঞ্জু তুই ওখানে কত রাত্তিরে শুস।

এগারোটা, সাড়ে এগারোটা দাদা।

পড়াশুনো হচ্ছে তো তোর ?

আমি কি বলে পালাই। আমি কোনোমতে ঘরে গিয়ে ঢুকলাম। কোণে হ্যারিকেনটা কমানো। ঘরটা আলো-আঁধারী। মশারীর ছায়া পড়েছে দেয়ালে। মশারীটা তুললাম। সবিটা একেবারে এককোণে পাশ ফিরে শুয়ে রয়েছে। দেখেছ, দীপুর সোয়ার রকম দেখেছ। পা-টা তুলে দিয়েছে বাবলুর গায়ের ওপর। ইস দেখ তো। বাবলু !···বাবলুর মুখে হ্যারিকেনের একটা মলিন আবছায়া পড়েছে। বাবলুর মুখটা ভারি সুন্দর। চুলগুলো সোনালী। বাবলুর চেহারাটা একেবারে মেয়েলী ধরণের। দেখেছ বাবলুটার সোয়ার ধরণ। একেবারে আঁকড়ে রয়েছে মঞ্জুকে। মঞ্জু ? মঞ্জুকে কিন্তু বড় হলে দেখতে সুন্দর হবে। ও মঞ্জু মঞ্জু···? একটু পাশ ফিরে শো-না। আমি বাবলুকে তুলে নেব। মঞ্জু ? মঞ্জুর কিন্তু বেশ টান হয়েছে বাবলুর ওপর। দুপুরবেলা বাবলু অত পায়েনি। বাবলুটা বোকা হয়েছে বড্ড ! দুপুরবেলা কেঁদে ফেললো শুধু শুধু। ওর বয়সে আমি ওর চাইতেও বোকা ছিলাম বোধহয়। ও মঞ্জু একটু সরে শুবি। মঞ্জু ?

আমি বাবলুকে তুলে নেব। বাবলুর হাতদুটো জড়ানো মঞ্জুর গলায়। বাবলুকে টেনে নিলাম। মঞ্জুর একটা হাত ছিল বাবলুর বুকের ওপর। সেটা গড়িয়ে পড়লো বিছানায়। আমি তুলে নিলাম বাবলুকে। মশারীটা ফেললাম আবার। হ্যারিকেনের কমানো পলতের ঘরের মধ্যে আলো-আঁধারী। দেখেছ বাবলুটা ঘুমে মেতিয়ে পড়েছে একেবারে। বাবলুর শরীরটা কী ভারী লাগছে হঠাৎ। হ্যারিকেনের আলো-আঁধারী বাবলুর মুখে লেগেছে। বাবলু, ও বাবলু। কি সুন্দর মুখখানা হয়েছে বাবলুর। কতদিন আগে রাত্তিরে শালা পালকের মতন বিছানায় যেন ঘুমিয়ে ছিল বাবলু। কে যেন ঝুঁকে পড়েছিল ওর মুখের ওপর। ওর গায়ের ওপর যেন কার বুকটা ছুঁয়ে গেল। আমি আর তিনদিন থাকবো। আমি সাতদিন এসেছি এই।

ভবরপুর—ভবরপুর—ভবরপুর—ভবরপুর—ঘন্টি নেড়ে বাস চলে গেল বিচ্ছিরি শব্দ করে।

আমার সেজদা, রোজ সে সকালে চলে যায়, সন্ধ্যেয় ফিরে আসে, তার চোখে কোনো দৃষ্টি নেই, তার মুখে কোন ভাষা নেই, সে তাস খেলতে বেরিয়ে যায় যেন কার বাড়ীতে,—

ভবানীপুরের বাসাটা বড় অন্ধকার. বন্ধুকে আমি আদর করি, সবিকে আমি চকোলেট কিনে দিই, বউদির হাতটা কী ঠাণ্ডা, অথচ কী ভীষণ উত্তাপ

বউদি।

আমার গলা দিয়ে বোধহয় আওয়াজ বেরুল না। বউদি কেমন করে যেন হাসে। বউদি কেমন করে যেন হাসলো। বউদি বাবলুকে নিল আলগোছে। বউদি বাবলুকে কেমন করে জড়িয়ে ধরলো দুহাত দিয়ে। বউদি কী যেন বললো, আমি শুনতে পেলাম না। আমি কী যেন বলতে চাইলাম, আমার গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুলো না। বউদি ঘরে ঢুকে গেল। দরোজা বন্ধ হয়ে গেল আমার সামনে! ভীষণ মলিন একটা অন্ধকার। বউদি, ও বউদি

বউদি, ও বউদি—

বাবলু যে ঘরের—

বাইরে রইল. বউদি, বাবলু যে

আমার মনে হলো হঠাৎ, বাবলু ঘরে ঢুকতে পারেনি। আমার মনে হলো ভীষণ ম্লান একটা অন্ধকারের মধ্যে একটা ছেলে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার সামনের দরজাটা কিছুতে খুলছে না। অনেক বড় হয়ে গেছে ও, কুচি কুচি ছালকা দাড়িতে ওর মুখখানা কালো হয়ে গেছে; কিন্তু আমার যে মনে হল ও বাবলু, ও ঠিক বাবলু. ওর সামনের দরজাটা বন্ধ, কিছুতে খুলছে না, আর সেই ধোঁয়া পাথুরে দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে মুখখানা ওর অন্ধকারে জ্বলছে।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

জোয়ার

উপন্যাস

বিজন কুমার ঘোষ

পুকুরের পাশ দিয়ে যেতে যেতে মিনতি জিজ্ঞাসা করল, আপনার কি হয়েছে বলুন তো? কোন উত্তর মিলল না দেখে আবার প্রশ্ন করল, কোথায় যেতে চান আপনি?

—যমালয়ে। কেন তোমার ভয় করছে?—ফিরে তাকাল।

—আপনি থাকলে আর ভয় করবে না অবশ্য।—হাসল।

—তাহলে চুপ করে থাক।

—তবু হেড মিস্ট্রেসকে একটু বলে এলে হত—

—দরকার নেই।

—মাইনে কাটা যেত না।

—মহৎ কাজে মাইনে কাটা গেলে কিছু হয় না।—আবার হেসে তাকাল।

মিনতি চব্বিতে মাথা নিচু করল। মুখটা লাল হয়ে গেল রোদ্দুরে। অসংখ্য ঘাম জমল রোমকূপের গোড়ায়। হাওয়া যেন হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেল এই সময়। রোদটা মালা কাঁসার বাটির মত আরো ঝকঝকে। একটা অসহনীয় অবস্থা। মিনতির মনে হল মাথার মধ্যে ঘোরতর বিপ্লব চলছে। পরিপূর্ণ নৈরাশ্য। আলোকের মুখের একটি কথার জন্যে এক সময় মিনতি দিবস-রজনী জেগে ছিল। ঘরে বাইরে মুকের মধ্যে এক তীব্র ইচ্ছার জ্বালা নিয়ে বাস করছিল। মিনতি যেন নিজেই একটি ধরণা। আলোক নামক এক বিলাসী ধনীপুত্র যে কোন সময় হঠাৎ খেয়ালে ঝড় বাধাতে পারে, একটু হাওয়া উঠলেই ছুটে দিয়ে দরজা খুলেছে। কেউ কোথাও নেই। মাঠ ভর্তি জ্যোস্না হা-হা করে হেসেছে শুধু দেখে। দিনের পর দিন একই খেলা। দরজা বন্ধ করে ক্লান্ত বিছানায় শুয়ে চোখের জল ফেলেছে। আবার আহত বাঘিনীর মত গর্জে উঠতে চেয়েছে একেক সময়। তবে হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বড়লোকের বিলাসী আর খেয়ালী ছেলেটা এসেছে বৈ কি। এলেই নিবারণবাবুর খোঁজ। যেন ভীষণ দরকার। না পেলে হতাশার ভঙ্গী করে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত বসে থাকা। এখানেই খেকে যেতে বললে নম্র নানা ভঙ্গী করে শেষে রাজি হয়ে গেছে। বিব্রত বোধ করত অনেক সময় মিনতিরা। কি খেতে দেওয়া যায়, কোথায় শুতে দেওয়া যায়—এই সব চিন্তায়। কিন্তু দেখা গেল এই বড়লোকের বিলাসী ছেলেটি সত্যিই খেয়ালী। চাক করে কাটা কাঁচকলা মিষ্টির সঙ্গে কলমী শাকের ঝোল নাকি অমৃত। ধনেপাতা দেওয়া মাছের ঝোল মাছ রান্না হলে খুশিতে আর এক চামচে ভাত চেয়ে খেয়েছে। অনেক সময় আবদ্ধি আহ্লাদী ভঙ্গীতে বলেছে, আলোকদা যাত্রা দেখতে যাবেন?

—কোথায় হচ্ছে শুনি?—যেতে যেতে জিজ্ঞাসা করেছে।

—জিজিয়া পোলের কাছে।

—কি বই?

—সিরাজ সম্রাট।

—বাঃ চমৎকার বই। চল—

—আপনার ভাল লাগবে না—মিনতি বাধা দিয়েছে: অনেক রাত জেগে থাকতে হবে—

—কি করে বুঝলে ভাল লাগবে না?

—আপনারা কলকাতায় ভাল ভাল কত ইংরেজী বই দেখেন।

—তুমি দেখছি আমার সব কিছু জেনে বসে আছ!

লজ্জিত হয়েছিল বিনতি।

—তা বলছি না। তবে পুরোনো বই কি আপনার ভাল লাগবে?

খুব জোরে হেসে উঠেছিল আলোক।

—আমার তো কাটলেট ভাল লাগে, তাই বলে কি কলমী শাক ভাল লাগে না?

মুখে আর কথা জোগায়নি বিনতির। আর কিছু বলতে গেলে হয়ত বলে বসবে, এই ভাল লাগাটা কি বেকী? চেয়ারের মত ভদ্রলোকের কথাগুলিও চমৎকার। ওতে এক সঙ্গে নাল সুন টক মিষ্টি মেশান থাকে। সুতরাং কথা না বাড়িয়ে যাবার জন্যে নিঃশব্দে শাড়িটা পরে নিয়েছে এরপর। আলোক বিনতি আর আরতি। রাত দশটায় খাওয়া আরম্ভ। বিনারণবাবুর খাওয়া দেখার কথাটা মনেই হয়নি একবারও। বরং খুশিই হয়েছেন বড়লোকের ছেলের এই সরলতা দেখে। জিজ্ঞিরা পোল হাটতে হাটতেই পৌঁছে গেছে। ট্যাক্সি ডাকতে ভুলে গিয়ে ভাল জায়গা দখল করবার জন্যে অন্ধকার মাঠের পথেই নেমে গেছে। কি অদ্ভুত অনুভূতি খেলে গিয়েছিল সেদিন সমস্ত শরীরে। অন্ধকারে পড়ে যাচ্ছিল বিনতি। আলোকদা হাত বাড়িয়ে ধরেছিল। তারপর ধরেই রইল অনেকক্ষণ যতক্ষণ না রাস্তার পাশের লাইট পোস্টের কাছে পৌঁছুল। চকিতে সরোবরে ঢিল পড়েছিল সেদিন। আলোকদা কি ভালোবাসে? কিন্তু কি আছে বিনতির মধ্যে? কি দেখেই বা আলোকদার মত ছেলে ভুলতে পারে? রোগা। কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়েছে। দেখতে ভাল নয় মোটে। গায়ের রং কালো। ইংরেজী বলতে পারে না। সাহেব সুবোর সঙ্গে মিশবারও ক্ষমতা নেই। অত্যন্ত গরীব। এক গাদা ভাইবোন। ওদের বাড়ির বাজার সরকার হবারও যোগ্যতা নেই এই পরিবারের। সুতরাং এ হতেই পারে না। কত বড় অফিসার আলোকদা। হালসুর ওদিকে ছবির মত বাড়ি। পূর্ববঙ্গের সেরা জমিদার ছিল ওরা। সেই রকম ওদের মন, মেজাজ। সব বাবার মুখে শোনা। আর চেহারা? সে তো নিজের চোখেই দেখেছে। গায়ে একটা আঁচড় দিলে মনে হবে বুঝি ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটবে। আর কি ভাল ব্যবহার। নাহলে কোম্পানী ছেড়ে দেবার পরও কলকাতা থেকে এত দূরে তেপান্তরের মাঠে কুঁড়ে ঘরে কেউ আসে? একেক বার মনে হয়েছিল বুঝি বড়লোকের ছেলের এ-ও একটা বিলাস। কিন্তু ঠিকটা জানতে বেশী দেরী হয়নি। না, বিলাস নয়। রক্তের মধ্যে এই অনুরাগ—বিনতির তা বুঝতে খুব একটা দেরী হয়নি। পুকুরের গভীর জলের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকত মানুষটা। মাঠের ওপাশে ঘন বাঁশের দিকে কি যেন খুঁজে বেড়াত। পাহাড়ীয়ার মাথার বিকেলের বাতাস যখন পাতাগুলিকে উল্টে দিত, লোকটা ছেলে মানুষের মতন ওদের লক্ষ্য করত। এই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কত হাসাহাসি করেছে। গোপনে কবি বলে বিদ্রূপ করতেও ছাড়েনি। কিন্তু ভদ্রলোক তা নিয়ে কোনদিন ভাবিত হয়েছেন বলে মনে হয়নি। তবে বিনতি যদি কখনো কলকাতার নিন্দে করত; হারিকেনের ম্লান আলোয় কিম্বা শহরের এত কাছে পাড়াগাঁয়ে থাকার জন্যে আক্ষেপ জানাত, লক্ষ্য করেছে, আলোকদা হঠাৎ নিস্তব্ধ হয়ে যেত। তারপর অন্ধকার মাঠে হাত ধরার ভিতর দিয়ে কিছুটা ঘনিষ্ঠ হলে সরাসরি বিরক্তি প্রকাশ করত। উপদেশ দিত, প্রকৃতি থেকে দূরে সরে থাকা নাকি পাপ। একদিন এর ফল বুঝতেই হবে। বিনতিও সাহস পেয়ে পাল্টা প্রশ্ন করত, আপনি কেন শহরে যান? হালসুর জঙ্গলে কেন বসবাস করেন না?

উত্তর দিয়েছে আলোক, যেতে হয় প্রয়োজনে। ক্লজি-রোজপারের জন্যে।

—তাহলে যেখানে ক্লসিরোজপারের প্রশ্ন তাকে কেন আট প্রহর নিন্দে করেন?

—কারণ সে আমার স্বাস্থ্যকে হত্যা করে।

—যাতে হত্যা না করে তার ব্যবস্থা নিলেই হয়!

—এখন আর উপায় নেই মিনতি।

—কেন, পাড়াগাঁয়ে কি হাজার হাজার লোক বাস করছে না?

—করছে। তারা চাষবাস জানে।

—আপনিও শিখে নিলে পারেন?

—শিখতে সময় লাগে।—একটু থেমে: তাছাড়া ওরা সন্দেহ করবে।

—কেন করবে? ওরা তো নিজেরা একে অপরকে সন্দেহ করে না?

—আমাকে নিজেদের লোক ভাবতে সময় লাগবে।

—আপনিও মানুষ ওরাও মানুষ, তাহলে?

—তবুও হয়ত পার্থক্য থাকে।

—আমি বলব? আপনি নিজেকে ঠিক চেনেন না।

চমকে উঠেছিল এ কথায়।

—তোমার কথা বুঝতে পারছি না মিনতি—

একটু থতমত খেয়ে গিয়েছিল। যেন কথার খেই হারিয়ে ফেলেছে। কিন্তু অনেকখানি এগিয়ে গেছে আন্দাজে। এখন ফিরে আসা যায় না। কি মনে হল, বলে ফেলল চটপট। আপনি নিজেকে ঠিক চেনেন না। এখন ওঁকে কি ভাবে ব্যাখ্যা করবে? আলোকদা তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। এক্ষুনি একটা কিছু উত্তর দেওয়া দরকার। হঠাৎ মনেও পড়ে গেল, বলেছিল, আপনি যখন শহরে থাকেন তখন মনটা পাড়াগাঁয়ে পড়ে থাকে, পাড়াগাঁয়ে থাকলে শহরে ছুটে যাবার জন্যে ছটফট করেন।

আলোকদা যেন বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়েছিল এ কথায়। কেননা, বহুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে বসেছিল অন্ধকারে। আঙুলের ফাঁকে জ্বলন্ত সিগারেটটাকে নিভে যেতে দিয়েছিল আনমনে।—কি করে বুঝলে—জিজ্ঞাসা করতেও যেন এবার কণ্ঠ দ্বিধা—ভয়।

কিন্তু এখন আর ভয় নেই মিনতির। যেন পৌঁছুবার স্পষ্ট সোজা রাস্তাটা পেয়ে গেছে। আলোকদার কথার জের টেনেই উত্তর দিয়েছিল, আপনি বলেছিলেন আমার কাটলেট ভাল লাগে তাই বলে কি কলমী শাক ভাল লাগে না?

হ্যাঁ, এরপর আলোকের বাড়ির কথা মনে পড়েছিল। অনেক রাত হয়েছে। এই অজুহাতে উঠে দাঁড়িয়েছিল। মিনতি তৎক্ষণাৎ ওর হাত দুটো জোরে চেপে ধরেছিল। আজ কিছুতেই যাওয়া হতে পারে না—

কোথা থেকে এত জোর পেল? মিনতি জানে না। কেমন করে যেন ভিতরে ভিতরে অনেক জোর জমে গিয়েছিল। স্বাস্থ্যের কারণেই প্রকাশ করতে বাধা হয়েছিল। নাহলে খুব অল্প দিনের মধ্যেই ভিতরটা ছিঁড়ে খুঁড়ে যাবার জো হত।

আজকাল আর 'থাকব' বলতে বিব্রত হতে হয় না। কোথায় একটা ছোট ঘর আছে। অন্য সময় মিনতি আরতি গোছ। আলোকদার জন্যে সেখানেই ব্যবস্থা করা হয়। তেলচিটে বালিশটা ঢাকবার জন্যে বাক্স থেকে পুরোন আমলের নক্সাকাটা সুজনি বের করা হয় আজকাল। সত্যি, আলোকদার তুলনা হয় না। কত অসুবিধা এখানে। তবু একটুও খুঁৎখুতি নেই। নাক সিঁটকানো ভাব নেই। কিন্তু সেই রাত্রে শুয়ে শুয়ে মিনতির কিছুতেই ঘুম আসছিল না। আলোকদা কি ওর কথায় দুঃখ পেয়েছে? কেন না, যখন আবছা অন্ধকারে মিনতি বলছিল আপনার পাড়াগাঁ প্রীতির জন্যে খারাপ লাগে—তখন আলোকদার মুখটা কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গিয়েছিল। না, কথাটা খুব ভেবেচিন্তে

বলেনি মিনতি। হঠাৎ-ই মুখে এসে গিয়েছিল। কলকাতার সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করে কোন নদীর ধারে ছিমছাম বাসা করার সাধ কবিতায় যত খুশি দেখা যায়। কিন্তু বাস্তবে অসম্ভব। ভাবা যায় কি আলোকদা কোট প্যান্ট টাই খুলে রেখে একটা লুঙ্গি আর ফতুয়া জড়িয়ে হালচাষ করছে? পাড়াগাঁ ভালবাসি বললেই যে হালচাষ করতে হবে, এর কি মানে আছে! সত্যি কথা, এ দেশের পাড়াগাঁয়ে শিক্ষিতদের রুজি রোজগারের কোন ব্যাবস্থাই নেই। সুতরাং বোকার মত ভালবেসে প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার কি লাভ? শহরে বসবাস করেও আকাশ বাতাস, গাছপালা, টুনটুনি পাখি, নদী, নদীর ওপর যাদের সাঁকোকেও দিব্যি ভালবাসা যায়। অনেকে তো এ টুকুও চায় না। তারা চায় সারা পৃথিবীটাকেই ইট কাঠ আর সিমেন্ট দিয়ে মুড়ে দেওয়া হোক। ছাই ফ্র্যাপারে আকাশ আড়াল হোক। তাতে তাদের আপত্তি নেই। আলোকদা হয়ত এই মনোভাবটাকেই অপছন্দ করে। শহর শহরের সীমা নিয়ে সন্তুষ্ট থাকুক, পাড়াগাঁ তার সীমানা নিয়ে। আলোকদা চায় না এই দুটোর মধ্যে বিবাদ বাধুক। তাহলে মিনতি কেন শুধু শুধু আলোকদাকে দুঃখ দিতে গেল? কেন হঠকারিতা করে উপদেশ দিল, চাষবাসটা শিখে পাড়াগাঁয়ে বাস করুন—।

মিনতির ঘুম আসেনি সেই রাতে। কোণার ঘরে শুয়ে আলোকেরও সেই অবস্থা। বুঝতে পারছিল মিনতি। আলোকদা দরজা খুলে একবার বাইরে গেল। ফিরে এসে জুঁজো উনুন করে জল খেল। খাটের পায়ার অবিরত খচ্‌খচ শব্দ। ঘুম আসছে না বেচারার। অনুশোচনায় পুড়ে যাচ্ছিল মিনতি। ওর বচনের জন্যই তো একটা মানুষ শুধু শুধু কষ্ট পাচ্ছে। হঠাৎ কি হল, উঠে বসেছিল বিছানার ওপর। আরতি অঘোরে ঘুমোচ্ছে। না, কেউ জেগে নেই। আবার মনে সেই রকম জোর উপস্থিত হল। সেই জোর, লোভের জয় সর্বত্র। ফলে মিনতি উঠে দাঁড়িয়েছিল। বাবা বা ভাই বোনগুলিকে সন্তর্পণে ডিঙিয়ে একেবারে সেই কোণার ঘরের সামনে—এই সময় জোরটা কমে গিয়ে ভয়টা চাগিয়ে উঠেছিল। যদি ধরা পড়ে যায়? ধরা পড়লে উত্তর দেবে কি? ধরা পড়লে উত্তর দেবার চাপর নিতে এসেছিল। শীত করছে তাই। কয়েক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। বেড়ার ফাঁক দিয়ে দিকে জ্যোৎস্নার রেশ এসে পড়েছে আলোকদার গায়ে। ঘুম আসেনি এখনো। মিনতি দুরন্ত সাহস এনে চকিতে কপালে হাতটা রাখল। আচমকিতে, সম্পূর্ণ অভাবিত ছিল মিনতির, সেই প্রবল মানুষটা চোখের পলকে একটা হালকা পালকের মত বুকে তুলে নিয়েছিল। একটা কথাও মুখ দিয়ে বেরুতে পারেনি। কি প্রচণ্ড শক্তি! ভেবেছিল ক্ষমা চাইবে। বলবে, আমারও পাড়াগাঁ নেহাৎ খারাপ লাগে না। ট্রামে বাসে ভিড়, যে কোন সময় বিপদ ঘটতে পারে। অত সতর্কতা ভাল লাগে না। তাছাড়া মেয়েমানুষ, চোর বদমাশ গুণ্ডার ভয় শহরে—। কিন্তু কিছুই বলা হল না। মনে হয়েছিল সমস্ত শরীরটা বুঝি ভেঙেচুরে পিণ্ড হয়ে যাবে। অনভ্যস্ত নতুন শরীরে এমনি ঘটঘট শব্দ হচ্ছিল। আর কি অপরূপ সুখ ছড়িয়ে পড়ছিল শিরায় শিরায়? তারপর আলো, অনেক দিন পর, ফুল ঝরে গেল রেশের নতুন শরীর রোমাঞ্চিত হয়!

রাস্তায় অনেকক্ষণ ওরা কেউ কথা বলেনি। গম্ভীরভাবে দু'দিকে জানালার কাছে বসে ছিল। যেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। একটু পরেই একটি সাধারণ প্রশ্নের কাছে দু'জনে মুখোমুখি হবে—এই নীরবতা যেন তারই প্রস্তুতি। অনেক ভাবছিল গতকালের কথা। সারা সকালটা দুপুরটা একটা অসহ্য দৌড়াতের মত কেটেছিল। বিবেকে পরিচিত রেস্টুরেন্টের নিচে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের ছেলের মত ঘন ঘন ঘড়ির দিকে তাকানো। তারপর ট্রামে চড়া, হাওড়া স্টেশন। ইলেকট্রিক ট্রেন। চন্দননগর। হোটেল ভি প্যারিস।

চোখের জল, গলা আর ভেসে আসা কত কালের বোরান সাহেবের বাগানের আচ্ছন্ন সুরভি। কেন অনর্থক কেয়ার সঙ্গে তর্ক করতে গেল? না করলেই ছিল ভাল। মাঝখান থেকে নিজের ইচ্ছেটাই শুধু প্রকাশ হয়ে পড়ল। শুধু আলোক অনেক দেরীতে হলেও এক ভুলের ফাঁদ থেকে মুক্তি পেয়েছে। এখন রয়েছে মিনতি। মিনতিকে সব জানাবে। মিনতি কেয়ার মত নয়। অন্য ধাতুতে তৈরী। সব চেয়ে বড় কথা, আলোক মিনতিকেও ভালবাসে। মিনতি নামের মেয়ে আর কিছু চায় না। আলোকের দেহ ঘিরে লতার মত জড়াতে ভালবাসে। আগে আগে চৈত্রের শুরুতে হঠাৎ কেন যেন বুকের মধ্যে অকারণে বিষাদ জমত। অথবা কোথাও গেলে দূরাগত ট্রেনের হুইসল, কি ঘুঘুপাখির করুণ ডাক মুহূর্তের মধ্যে মনটাকে বিষণ্ণ করে তুলত। কিন্তু পরক্ষণেই মনে পড়ত, আমি যেখানেই যাই না কেন, আমার কেয়া আছে। কেয়া যেন দ্রৌপদীর শ্রীকৃষ্ণের মত নিভাবনার প্রতীক। এই সামান্য কথা কয়টির উচ্চারণেই মনটা খুশী খোয়া আকাশের মত নীল হয়ে উঠত। লুকিয়ে লাভ নেই, আগে কেয়ার নামটাই ভাসত; তারপরে মিনতির। কখনো ভুল করেও মিনতির নাম আগে আসেনি। আলোক দুঃখিত, এখন আর তত দুঃখ নেই। কেয়া চলে গেছে, তাই তো মিনতি নামটা ভেসে উঠেছে। আলোকের যেন একটা সূক্ষ্ম বিশ্বাস আছে মিনতিই ওকে খুশি করতে পারবে। তার আগে ওর সঙ্গে একটা বোঝাপড়া দরকার। গত কাল কেয়া ওকে চন্দননগরে নিয়ে গিয়েছিল। হ্যাঁ, এখন আর কোন দ্বিধা নেই। কেয়ার সঙ্গে যত বোঝাপড়া হয়ে গেছে। এইবার মিনতির সঙ্গে, কলকাতা ছাড়িয়ে অনেক দূরে নিয়ে যাবে। কেয়া বলেছিল, কলকাতার হুইং রুমে আমরা নাকি সব কথা পরিষ্কার করে বলতে পারি না। ওখানে কৃত্রিমতা থাকে। তাই মনকে সঠিকভাবে জানতে প্রকৃতির উদার পরিবেশ দরকার। ঠিক আছে তাই হবে।

বাদবপুর স্টেশনে এসে গেল। ট্যাক্সিটাকে স্টেশনের গায়ে দাঁড় করাল। যেখানে যাবার উদ্বেগ তার জন্যে চারুরিয়া বালিগঞ্জ স্টেশনেও যাওয়া চলত। কিন্তু ওখানে পরিচিত কারও সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে। তাদের চোখের তারা কৌতূহলে নাচতেও পারে। আলোক অপছন্দ করে।

স্টেশন মাষ্টারের ঘর থেকে খোঁজ নিয়ে এল এখন কোন ট্রেন আছে কি না। আছে দশটা পাতে। এসে পড়ল বলে। গত কালের মতই দুখানা ফার্ষ্ট ক্লাসের টিকিট কাটল। কাটতে গিয়ে বিষণ্ণ বোধ করল। গতকালের মতই পরিশেষ বনাবে না তো?

ওভারব্রিজ দিয়ে বিপরীত দিকের প্ল্যাটফরমে এল। সিগন্যাল ডাউন। অনেক দূরে ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে। কলকাতার ট্রেনও প্ল্যাটফরম কাঁপিয়ে এসে পড়েছে। ডেলি-প্যাসেঞ্জারদের অফিসে যাবার তাড়া। ওদের দিকে তাকিয়ে নিজেকে বড় সুখি মনে করল আলোক। কেননা ও আজ অফিসে যাবে না। যাবে যাবে অফিস কামাই করার মত স্বাভাবিক দুর্বুদ্ধিও জাগে না। প্রতিজ্ঞা করল, এবার থেকে দুর্বুদ্ধিটাকে খুঁচিয়ে তুলবে। অফিসে ভাল ছেলের নাম কিনে কি লাভ? বিলেত যাওয়া নাইবা ঘটল। তবু এবার থেকে স্বাভাবিক মানুষ হবে। আর স্বাভাবিক মানুষরাই চিরকাল মিনতিদের মত মেয়েদের চোখে আদর্শ।

কলকাতার ট্রেনটা ভীষণ জোরে হুইসল দিয়ে ঘোষণা দিল। আলোকদের ট্রেনটাও এসে পড়ল বলে। প্রস্তুত হয়ে নিল। হঠাৎ লক্ষ্য করল মিনতির মুখে আতঙ্ক। এতক্ষণ যেন স্বাভাবিক ছিল। এই মাত্র ওভারব্রিজ দিয়ে এপারে আসায়, ডেলীপ্যাসেঞ্জারদের অকারণ চিৎকার, সর্বোপরি উদ্দিষ্ট ট্রেনটি প্ল্যাটফরম কাঁপাতে শুরু করায় আতঙ্কটাও যেন বিকাশ লাভ করতে বাধা পাচ্ছিল। শুকনো ঠোঁটের ওপর ঘাম এগিয়ে আসছিল।

মিনতি কি ওকে শেষ পর্যন্ত মেয়েধরা মনে করল? আর এই! স্বাভাবিকও। গতকাল হাওড়া স্টেশনে কেয়ার কাণ্ড কারখানা দেখে আলোকের মত ছেলেও ঘাবড়ে গিয়েছিল। কেয়াকেও সেইজন্য অভয় দিয়ে বলতে হয়েছিল, আমাকে এক দিনের সুলতান হতে দাও, প্লিজ—। আলোকও সেইভাবে সান্ত্বনা দেবে কি? না। ওতে বড় বেশী নাটুকেপনা।

—আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?—ক্ষুব্ধ জিজ্ঞাসা।

আলোক চমকে উঠল। যেন গত কালের ওর নিজেরই সপার কণ্ঠস্বর। ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টটা ওদের সামনেই।

—তোমার ভয় করছে?—আলোক সস্নেহে জিজ্ঞাসা করল।

—হ্যাঁ।

—তুমি একদিন যেখানে যেতে চেয়েছিলে সেখানে নিয়ে যাচ্ছি।

—কোথায়?—কেঁপে উঠল স্বরটা।

—গাড়িতে ওঠো, বলছি—

আলোকের ভয় ছিল বুঝি শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসবে। হঠাৎ বিনা নোটিশে যারা উধাও হয় তাদের নাম কয়েক দিন পর খবরে কাগজের আইন আদালতের পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হয়। বিশেষত মিনতির মত মেয়ের পক্ষে এ একটা অভিযান বৈ কি। কিন্তু না, ভয় পেলেও খুব শান্ত ভাবেই কামরায় উঠল। ওদের কম্পার্টমেন্টে আর দু'জন মাত্র যাত্রী সামনের সীটে। স্বামী-স্ত্রী। একটি বাচ্চাও আছে। আলোক ঘুরিয়ে দেখতে লাগল। বৌটি সুন্দরী। না কালো না ফরসা। কপাল জুড়ে সিঁদুরের ফোটা। আনমনা টেলি-গ্রামের তার দেখছে। চাহনীতে সরলতা মাখান। অনেকটা মিনতির মত। বয়স খাতায় নেই, হাওয়ার ঘোমটা পড়ে আছে, তবু তত দূরে নিজে বার বার। মিনতিও বড়ত তাই ভাবছে। যেন মিনতির ভবিষ্যৎ রূপ বউটির মধ্য দিয়ে দেখতে পাচ্ছে। স্বামীটি সেই তুলনায় বিশ্রস্ত। খবরের কাগজে মুখ অর্ধেক ঢাকা। শহরের সীমা শেষ করে ট্রেন এবার মাঠের মধ্যে নেমেছে। মাদারপুর ছাড়াবার পর লাইনের দু'পাশে অনেক ফসলী পড়েছিল। তারপর মাঠের মধ্যে একটি দুটি খোলার ঘর। লালার ঘরে একটি দুটি নিঃসঙ্গ মানুষ। এখানে তাও নেই। ধু-ধু মাঠ। লাইন থেকে অনেক নিচুতে জমি। সবুজ শীষের ওপর রোদের সোনালী ঢেউ। চোখে নেশা লাগে। ঝুরঝুরে বাতাস ট্রেনের ঝাকায় আছড়ে পড়ছে গায়ের ওপর। আলোক এখনো ইচ্ছে করলে কি আগের আলোকে ফিরে যেতে পারে না? মনে পড়ে ছুটির দিনগুলিতে হালদার বাগানে গাছের ছায়ার ছায়ায় কি ভাবে কাটিয়ে দিত। তাহলে বুকটা এখনো হু হু করে! ভুলেই যেত পরদিন নেকটাই বেঁধে লেডের অফিসে ডিজিয়ে কেয়াদের দেশে যেতে হবে। যাক, কেয়া আর কেয়াদের দেশ এবার ভাল করে চিনে নেওয়া হয়েছে। একবার চিনে নিলে মোহ ভাঙতে কতক্ষণ।

সোনারপুর জংশন। কম্পার্টমেন্ট মেয়ে গেল। মিনতি তাকাল। আলোক হাসল।

—কথা বলছ না যে!

—কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন বললেন না তো?

—তুমি কিন্তু একদিন বেড়াতে যেতে চেয়েছিলে। গাড়ির মধ্যে আমার বুকে মাথা রেখে বলেছিলে, আমি বড় ক্লান্ত, আমাকে আপনার বন্ধুর কাছে নিয়ে চলুন; মনে পড়ে?

মিনতি শুধু কিছু বুঝতে পারছে না। বড় বড় চোখে চেয়ে আছে।

আলোককে ব্যাপারটা সরল করতেই হয়।

—ক্যামিং-এর কথাটা এর মধ্যেই ভুলে গেলে?

—আমরা তবে ক্যামিং যাচ্ছি?—এখন একটু হাসির আভাস ফুটল মুখে।

—হঠাৎ এত ঘুরে নিয়ে যাচ্ছেন?

চিরদিনের স্থলাভিষিক্ত হবার কথাটা গোপন রেখে বলল, একটা কথা ছিল তাই—

মাথা নিচু করল মিনতি। জানলায় উড়ন্ত পাখি দেখা শেষ করে মিনমিন করে বলল, সেটা কি কলকাতায় বলা চলত না?

আলোক গত কালের শোনা ঘুনিটা তোতাপাখির মত আউড়ে গেল, না, কলকাতায় চলে না। ওখানে ডুইংরুমে বসে আমাদের মনটাকে ঠিক চিনতে পারিনে। তাই প্রকৃতির উদার পরিবেশে এলাম—

—আপনি বলতে চান উদার পরিবেশে যা বেরোবে তাই খাঁটি?

—নিশ্চয়ই। তোমার সন্দেহ আছে?

—আমার মনে হয় নিজের মনটাকে ঠিকভাবে জানলেই খাঁটি কথা বেরোয়।

—আমার বিশ্বাস, পরিবেশের ওপর খাঁটি কথা নির্ভর করে।

—পৌঁজামিল দিয়ে যারা চলে কোথাও গিয়ে তারা খাঁটি কথা খুঁজে পায় না।

দারুন ভাবে বিস্মিত হল আলোক। এ কি মিনতির কথা। ঠিক অবিকল কেয়ার গলাই যেন শুনতে পাচ্ছে মিনতির মধ্যে। বলশী শাকের মধ্যে কাটলেটের খোসবু বেমানান। প্রতি পলে কেবলি ভুল হয়ে যাচ্ছে। কেয়াকে চিনতে পারেনি দেখা গেল। তবে কি মিনতিকেও বুঝতে পারেনি? আলোক কি তবে এত কাল পৌজামিল দিয়ে চলেছে? আলোকের পহর ভালবাসা মেকী, প্রাণ ভালবাসার ভেজাল; কেয়াকে চিনতে পারেনি, মিনতিকেও বুঝতে পারছে না, ফিলজফি সব কি তেউলে হয়ে গেল এর মধ্যে? তাহলে লেভেল ক্রসিং ডিঙিয়ে কি হবে? ফিলজফি দিয়েই বা লাভ কি? যে কোন এক জায়গায় পড়ে থাকলেই হল মুখ থুবড়ে। আলোক বোধহয় একাল সেকাল, লেভেল ক্রসিংএর এপার ওপার—কোন দিকেরই উপযুক্ত না। দাড়িপাল্লার কাঁটার মত কখনো এদিকে কখনো সেদিকে হেলে পড়ে। কেননা, যে নিজেকেই জানে না। সে কি ভালবাসা সেটাই বা জানবে কেমন করে? হয়ত মিনতির কথাই ঠিক। তবু আশ্চর্য মুখের ওপর এমন স্পষ্ট অক্ষরে বলতে পারছে। অথচ মিনতিকে মনে করত বটগাছের নিচে পাড়াগাঁয়ে শান্ত দীঘির মতন। ঢেউ তুলতে জানে না। ছায়া আর স্নিগ্ধতাই জানে কেবল। একেই কি বলে হিমালয়ী ভুল? একটু আগে যে বাক্যালাপ হল তাতে স্নিগ্ধতা ঘুরে থাক, চামড়াটা কলসে যাবার জো হল। কেয়ার বেলায় তা হয় না। তখনই প্রস্তুতের চর্ব এঁটে থাকে। বরং দেখেছে, কথার পিঠে আঘাতটা খেলে ভাল। তাহলে আর ক্যানিং দিয়ে কি হবে? মৃণালের সাথের ক্যানিং একটু একটু করে নিতে যেতে লাগল চোখের সামনে; দিনগুলি ব্যর্থতার হাওয়ায় কি ভাবে যে উড়ে যাচ্ছে! মনে পড়ছে এখন হালদার কথা। মা খুবই চিন্তা করছে। গতকাল অফিস থেকে আর কেয়াই হয়নি ফিরে যেতে ইচ্ছে করছে এখন ঘরের ছেলে ঘরে। দোরগোড়ায় গেটে করুণ শব্দ উঠলেই ছুটে আসবে নিতাই। এক গাল হেসে পাগলা দাদাবাবুর জুতোর ফিতে খুলে দেবে। বা পুজোর ঘর থেকে সাড়া পেয়ে দেখতে আসবে রায়বাড়ির সেবায়েত ধীরা। একথা সে কথার পর নিপুণ টোপ ফেলবে হবে ঠোঁটের সামনে। রায়বাড়িতে বহুকাল শিশুর কলকণ্ঠ শোনা যায় না—ঘুরে ফিরে যায় এই এক আক্ষেপ।—ভাবতে ভাল লাগছে।

কালিকাপুর চলে গেল। চম্পাহাটিও যায় যায়। এবার শিয়ালী। নামটা ভারী সুন্দর। এক মিনিটিও গাড়ি দাঁড়াল না। ব্রিজের নিচেই ছোট শিয়ালী নদী। মজে গেছে। এখন ধান চাষ চলছে। জলার ধারে ছিপ ফেলে অবাক চোখে ট্রেন দেখছে একটি ছেলে। লাল রঙের লাগসই ফুল। একটা লোক আঁকশি দিয়ে সেগুলি তুলছে। ফুলটাকে

ঠিঁড়ে ভাইগুলিকে খাটি খেঁধে চালান দেবে ভরকারীর বাজারে। বিনে মূলধনের ব্যবসা। কিন্তু আর ভালতে ভাল লাগছে না। সমস্ত ব্যাপারটার ওপরেই যেন আলস্যেরী ধরে গেছে। প্রচণ্ড বোকামী মনে হচ্ছে। ভাগ্যিস এই বোকামীটা এক আলোকই জানতে পারছে। সাক্ষী থাকলে বড় সমস্যার ব্যাপার হত। এক জনের সঙ্গে চন্দননগরে যাওয়া, পুরুলীয় রাত্রি কাটিয়ে পরদিনই আরেকজনকে নিয়ে ক্যানিং চলে যাওয়া—ছেলেমানুষী ছাড়া আর কি। কাউকে কোন দিন বলাও যাবে না প্রাণ খুলে। মৃণালের সঙ্গে যদি দেখা হয়ে যায় তাহলে সে-ও হো-হো করে হেসে উঠবে। বলবে তুমি মন জানতে চেয়েই ভুল করেছ। মন জানাজানি হেসেলে ব্যাপার। কেউ অত ধৈর্য ধরে বসে থাকতে পারে

ভাল লাগলে সচীন তার সামনে গিয়ে হাতটি তুলে নেবে, বলে—

মুটিয়ারী শরীফ। মাঝখানে আর একটি স্টেশন তালদি। পরেই ক্যানিং। চাইল চৌহিলে নামগুলি মেখে নিয়েছিল। যদি জিজ্ঞাসা করে বসে, যা বলবার এখানেই বলুন কি উত্তর দেবে? বেশ ফাঁকা এখন। ফাঁকা ভিতর দিয়ে ট্রেন ছুটছে উদ্দাম গতিতে। বাতাস বার খড়ির আঁচলটা আলোকের গায়ে এনে ফেলছে। যদি করে বসে। এর চাইতেও উদার পরিবেশ চান?—দেবে? চেনাজানা মানুষের সঙ্গে তর্ক করার হ। মনে হয় কোথায় যেন কোন গোপনীয়তা ই উত্তরের জন্যে এমন হাতড়াতে হয় না। নিতি রের মানুষ। যেন কোন কালে পরিচয় ছিল না।

(ক্রমশঃ)

সূর্যমুখী জীবনের

হৈমন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়

যখন যেদিকে পড়বে প্রাণের উজ্জ্বল রোদ :
জীবন সেদিকে ঝুঁকে পড়,
অবিরল অন্ধকারে মৃতকল্প শরীরী চেতনা
বিবিক্ত আত্মার ব্যর্থ পাণ্ডুর স্মৃতির পাণ্ডুলিপি
মুছে ফেলে চেয়ে থাকো : উষ্ণোনের আবর্জনা ফুঁড়ে
নতুন ফুলের স্নিগ্ধ প্রস্তাবনা, প্রথম বৃষ্টির
স্পর্শের জলের আশীর্বাদ। অপব্যয়িত রাত্রির
দুচোখে নিমীলিত তারা। নিমীলিত প্রেমিক ভোরের
আলোর আয়ত লিপি : নতুন সূর্যের নাম্নী মুখ।

সবারি জীবনে থাকবে কিছু বৃষ্টি, কিছু ঝড়
ঝঞ্ঝা-বাত্যা-দুর্দিকল্প-আঁধি……
এবং আবারো মেঘে মেঘে স্বর্ণ বর্ণচ্ছটা
ফুলে ফুলে মাখবী শরদী,
ধূসর ক্রন্দসী পরা আলোর আরোগ্য স্নানে
লক্ষপাতী বহু সূর্যমুখী।

[৫৬৮ পৃষ্ঠার পর]

শুনছেন। একটা পেনসিল ও খাতা কবির পাশে থাকতো তিনি দ্রুত হস্তে লিখে লিখেই সবার সঙ্গে গল্প ও হাসি তামাসা করছেন। হঠাৎ ঘরে ঢুকে বুঝবার উপায় ছিল না —এটা একটা কঠিন রুগীর ঘর।

একদিন এলেন রবীন্দ্রনাথ, দুটী মহান মানব মুখোমুখি বসলেন। রবীন্দ্রনাথ আনন্দ বেদনাহত বিস্ময়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন এই মানবাত্মার উজ্জ্বল বিকাশের দিকে। রবীন্দ্রনাথ মৃদু মৃদু কথা বলতে লাগলেন আর কান্তকবির চললো লিখে লিখে ভাবের বিনিময়। তারপর নিজে বাজিয়ে ক্ষিতীন্দ্র ও শান্তিকে দিয়ে গান শোনালেন "বেলা যে ফুরায়ে যায় খেলা কি ভাঙে না হায়"…শান্তিনিকেতন ফিরে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠী দিয়েছিলেন কান্তকবিকে সে অমূল্য চিঠির কথা সবাই জানেন।

এই সময় কান্তকবির অমৃত বই ছাপা হলো। আমি ভেতরের ঘরে ছিলাম, একখানি বই হাতে করে ভেতরে এসে আমার হাতে দিলেন। তখন বয়স আমার অতি অল্প, এখন মনে হয় কতই কিছু আমার করবার ছিল কিন্তু করতে পারিনি। বইখানি হাতে নিয়ে মাথায় ঠেকালাম, তাতে তাঁর মুখে একটা আনন্দ খেলে গেল, আমার মাথায় আস্তে একটু হাত দিয়ে চলে গেলেন।

আর একদিন সন্ধ্যাবেলায় শান্তিদের নিয়ে ভেতরে বসে আছি। তিনি এসে ঢুকলেন একঠোঙ্গা খাবার নিয়ে, তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম আমার হাতে ঠোঙ্গাটা দিলেন, চেয়ে দেখি ঠোঙ্গাভর্তি লবঙ্গলতিকা। একটা নিয়ে তখনই তাঁর সামনে খাবার জন্যে ইসারা করলেন। আমি আনন্দে বিস্ময়ে যেন মূক হয়ে গেলাম। আবার ইসারা করলেন খাও। আমি তখন একটা নিয়ে মুখে দিতে হেসে চলে গেলেন।

খুব গরম পড়েছে, নিজে চুল আঁচড়াতে পারি না ভালোকরে মাথায়ও সব সময় কাপড় থাকেনা। ভিজে চুলের গরুর মাংসের ওপর ঘায়ের মত হয়েছে। একদিন দুপুরে খুব গরম। তাঁর ঘরে সে সময় বাহিরের লোক বা ডাক্তাররা কেউ নেই। মা কাজে ছিলেন তাঁকে দিয়ে আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমি কাছে যেতেই মাথার কাপড় খুলে দিয়ে তাঁর পাশে যেতে আমাকে শুতে বললেন। মাথায় বালিস দিয়ে দিলেন। সে ঘরে ইলেকট্রিক ফ্যান ছিল তাই। মাথার চুলগুলো হাত দিয়ে সরিয়ে দিতে গিয়ে ঘাড়ের দিকে নজর পড়লো। ইস্ করে শব্দ করে উঠলেন। মাকে হাত ধরে টেনে দেখালেন। লিখে বললেন কি হয়েছে দেখ না কেন? মা বললেন কি করি ওকে আর কখন দেখি। (তাঁর মাথার তখন ঘরুণ ঝুলছে এসব খুটিনাটি তাঁর দেখার সময় কোথায়) কিন্তু তিনি লিখলেন তবু দেখতে হয়। তারপর থেকে কদিনই দুপুরে তাঁর কাছে গিয়ে শুতে হয়েছিল।

একদিন দুপুরে আমাকে লিখে বললেন "মাগো, তোমাকে আমি লক্ষ্মী ঘরে এনেছি, তুমি বলতো আমি ভালো হবো কিনা? অন্ততঃ এই ভাদ্রমাসটা আমাকে যদি বাঁচিয়ে রাখ তবে তোমাদের জন্য আর একখানি বই দিয়ে যাবো। একখানা মোটা বই আমার মাথায় তৈরী হয়ে আছে"—দীর্ঘদিন রোগ ভোগের জন্য তখন একটু কানে কম শুনছিলেন সেজন্য আমিও তাঁর সঙ্গে লিখেই কথা বলতাম। আমি লিখলাম দেশের প্রত্যেক লোক আপনার জন্য প্রার্থনা করছে, আমরাও আপনার ভালো হবার জন্য ভগবানের চরণে সতত প্রার্থনা জানাচ্ছি, তিনি নিশ্চয়ই আমাদের প্রার্থনা শুনবেন, আপনাকে ভালো করে দেবেন। যদিও লিখলাম তবু সেই বালিকা বয়স মনেও সংশয় ছিল হায় এঁকে কি সুস্থ করে আর আমরা ফিরে পাবো? আমার লেখার পাশ দিয়ে তিনি লিখলেন "তুমি যখন বলছ তখন নিশ্চয়ই আমি ভালো হবো। আমার ভাবনা তোমাদের জন্য নইলে আমার কি ঘরাল ডাক দিয়েছেন তাঁর কাছে যাবো।" তারপর লিখে চললেন খাতার ৩।৪ পাতা ভরে গেল

তাতে শুধু তাঁর রুমালের কাছে আত্মনিবেদন, বোধ করি তখন আমার উপস্থিতি তো মুহূর্ত জগতই তাঁর কাছে ভুল হয়ে গিয়েছিল। আমি নীরবে পড়ে যাচ্ছি আর চোখে অকারণ জল আসছে। ইতিমধ্যে মা ঘরে এসে ঝুঁকে একটু পড়লেন, পড়ে বললেন "এমনি বেচারী কোন আনন্দ পায় না—ছেলেমানুষ, তুমি আমার এইসব লিখছ কিনা বুঝছে কষ্ট পাচ্ছে।" তখন যেন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এলো, একটু থেমে বাবার দিকে চেয়ে লিখলেন। "তোমরা ওকে যা ভাবো ও তা নয়, ওর কত বড় প্রাণ কত বুদ্ধি আমি বুঝি।"

এইধরণের কথা আমার বাবাকেও বলেছেন আরও অনেককে বলেছেন। আমি কুণ্ঠিত হয়ে ভাবতাম, আমি তো কিছুই জানি না শুধু উনি এ সব বলেন। খুব ভালোবাসেন তাই এসব বলেন আজও তাই ভাবি তিনি ঐ ক্ষুদ্র বালিকার কাছে কি পেলেন যা দেখলেন যে তাকে সবার কাছে এত বড় করে দেখার চেষ্টা করে গেলেন সে শুধু তাঁর অপরিসীম স্নেহ ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ ছটি মাস এই ছয়মাসের মধ্যে কত স্নেহ যে আমাকে ঢেলে দিয়ে গিয়েছেন তা অমূল্য সম্পদ হয়ে আছে আমার জীবনে। —অসময়ের ভালো আম, ভালো সন্দেশ তাঁর জন্যে খোঁজ করে করে আনা হতো। কিন্তু তাঁকে দেবার সময় আগে আমার হাতে না দিলে নিজে মুখে দিতেন না। আমার অল্পশক্তি কম। কিন্তু আমার প্রথম জীবনের এই অল্পটুকু উজাড় হয়ে আমার মনে গাঁথা আছে এবং সেদিন পর্যন্তও থাকবে।

কবির রোগ বড় বাড়াবাড়ি হয়ে উঠলো। রাজোচিত চিকিৎসা ও সেবা চলছে। তবু মানুষ যখন কূল পায় না তখন মনে পড়ে দৈবকে। তাই সবার পরামর্শে কবির বৃদ্ধা জননী গেলেন তারকেশ্বরে হত্যে দিয়ে তাঁর একমাত্র পুত্রের জীবন ভিক্ষে করতে। তিনদিন পরে বৃদ্ধা জননী প্রায় নিরাশ হয়েই ফিরে এলেন। স্বপ্নে তাঁকে তারকনাথ বলেছেন তোর ছেলে থাকবে না তুই কেন এসেছিস ফিরে যা। তিনি বলেছেন বাবা আমি ওষুধ না পেলে ফিরবো না। তখন একটা ওষুধ বলে দিয়েছেন শুনবিনা যখন এই খাইয়ে দিস।

কবি সব শুনলেন একটু ম্লান হাস্য করলেন। যাইহোক সেই ওষুধ খেয়ে তখনকার মত অবস্থাটা অনেক ভালো হ'লো।

এর মধ্যে একদিন আমাকে একা পেয়ে লিখে বললেন "খাসা তোমাকে বিয়ের সময় সোনার মুকুট দেবো বড় সাধ ছিল কিন্তু রোগের জন্য দিতে পারিনি সে আমার মনে দুঃখ হয়ে গিয়েছে। এখন তোমায় আমি একটা কিছু করে দেবো, তুমি বল সোনার মুকুট নেবে কি হীরের চুড়ি নেবে? —আমি লিখলাম যা আপনার ভালো লাগে তাই দেবেন। "তিনি বললেন না, তোমার যা ইচ্ছা তাই দেবো।" তখন আমি লিখলাম—এখন তো মুকুট পরলে ভালো লাগবে না, হীরের চুড়িই দেবেন। তিনি "বললেন—ঠিক বলেছিস্ হীরের চুড়িই বানাবো।" বলে আমার হাত দুখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখলেন আর হাসতে লাগলেন।

—হীরের চুড়ি দেবার সময় আর তিনি পান নি, কিন্তু সেদিন তাঁর স্নেহের নিদর্শন যা দেখলাম সেকি হীরের চুড়ির চেয়ে কম?

এই সময় আমার বাবা আমার এলেন কবিকে দেখতে। তিনি ফিরে যাবার সময় আমাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে বললেন, বললেন দেখো ওর বড় কষ্ট হচ্ছে, এই দেখনা চুলগুলো ভিজে থাকে বলে কি হয়েছে, ওকে নিয়ে যাও। বাবা বললেন—এখন নিয়ে যাবো সেকি। ছেলেমানুষ কিছু তো করতে জানে না শুধু তোমার কাছে এই সময় আছে এও তো ওর সৌভাগ্য। কষ্ট কি ও কষ্ট কি কষ্ট নাকি? কবি অত্যন্ত প্রীত হয়ে বললেন "তাইতো—এমন বাপ না হলে কি এমন মেয়ে হয়।" বাবা আমাকে আড়ালে ডেকে বললেন এই

ভাগ্যবান পার হবে বলে মনে হয় না। তোমাকে বড় আদর করে নিয়েছেন যেকটা দিন আছেন কাছে থাক যতটুকু পার সেবা কর। আজ তুমি ভাবছ বাবা বড় নিষ্ঠুর কিন্তু এর পরের জীবনে বুঝতে পারবে, বাবা আজ তোমার কি হিত করে গেল। পিতার সেই বাক্য অদ্যাপ সত্য তা - সারা জীবনে নিয়ত উপলব্ধি করেছি। সেদিন চলে গেলে জীবনের একটি অমূল্য সম্পদের অর্দ্ধেক হারিয়ে ফেলতাম।

ক্রমে সেই কঠিন দিন ঘনিয়ে আসছে, ক্রমে কবি দুর্বল হয়ে পড়ছেন। বাড়ীর মধ্যে চলাফেরাও সংক্ষিপ্ত হয়ে এসেছে। সে সময় সর্বদা তাঁর একটা আচ্ছন্ন ভাব। প্রতিদিনের মত তাঁর চিকিৎসক মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তার ফেজর বার্ড সাহেব সকাল বেলায় এলেন। এসে তাঁকে পরীক্ষা করে বললেন "আমার রুগী বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে এই তো চিন্তা কি করে সবল করব?" শুনে কবি চোখ মুখের ভঙ্গি করলেন কী আমি দুর্বল? সঙ্গে সঙ্গে ডা: বার্ডের হাত নিয়ে জোরে ঝাঁকি দিলেন। বার্ড সাহেব জোরে হেসে উঠে বললেন—"অলরাইট্। আর ভাববো না।" ডাক্তার চলে গেলে আমাদের কাছে বললেন —' দেখো আমি যতদিন খেতে পারছি ততদিন কিন্তু ভেবো না। যেদিন দেখবে খেতে পারছি না সেইদিন থেকে আর বেশীদিন থাকবো না।"

সত্যি তখনও কি সুন্দর খাওয়া ছিল—একখানি পাউরুটী ওপরের শক্তগুলো ফেলে দিয়ে আখনের দুধ দিয়ে, নরম ভাত সেই সঙ্গে চিকেনব্রথ, কিছু ফল সবশেষ সারা দিনের খাদ্যছিল! মাছ তরকারী ও অল্পবিস্তর সবজি খেতেন। কিন্তু তাঁর কথাই ঠিক হ'লো ক্রমে আহার কমে এলো। চলা ফেরা বন্ধ হলো। তখনও বিছানায় বসে থাকেন আচ্ছন্ন ভাব। বাড়ীতে একটা থমথমে ভাব। বাইরে থেকে সর্বদা সবাই আসছেন কিন্তু সবাই বিষাদ গম্ভীর।

এই সময় একদিন আমি ও তাঁর তিন মেয়ে ঐ ঘরে আর কেউ নাই দেখে ঢুকলাম। ছোট মেয়েটি তখন শিশু বলেই হয়। ছোট ছেলে তো অতি শিশু। আমাদের দেখে ডেকে কাছে বসালেন, গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন সবার। তারপর খাতা টেনে নিয়ে লিখলেন—"আমি তো চলে যাচ্ছি কিন্তু যাবার সময় তোমাদের মুখে হরিনাম শুনে যেতে চাই। আমি যখন যাবো। তোমরা তখন কেঁদোনা, আমার কানে হরিনাম দেবে। দেবেতো? আমরা সবাই ছোট আমরা ভয়ে ও দুঃখে বিহ্বল হয়ে গেলাম। আবার লিখলেন "হরিনাম শোনাবে তো?" তখন আমি মুখ তুলে অতি কষ্টে বললাম হাঁ। দেবো ওরা আমারও ছোট, ওদের আমি ইসারা করলাম বলবার জন্য। ওরাও তখন বললো বলবো। তখন আমাদের বললেন "আচ্ছা এখন তোমরা যাও।"

এর দু একদিন পরই খাওয়া একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। কোন আহারই গলা দিয়ে নামেনা। তবু কী অসীম ধৈর্য্য শান্ত সমাহিত ভাব। যখন খুব কষ্ট হচ্ছে, হাত জোড় করে তাঁর জগদীশকে স্মরণ করছেন ঠোঁট দুটী একটু একটু কম্পিত হচ্ছে। তাঁকে খাওয়াবার জন্য ডাক্তারগণ বৈজ্ঞানিক মতে নানা চেষ্টা করছেন। তবু হতাশ হচ্ছেন। মাঝে মাঝে তিনি হাত উঁচে ডাক্তারদের বলছেন আর কেন? তখনও মুখে মৃদু হাসি।

ভেতরে একটি ছোট ঘরে অর্দ্ধ অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে আছেন কবির অশীতি পর বৃদ্ধা জননী। তাঁর একমাত্র অতি আদরের অতি গৌরবের পুত্র আজ চলে যাচ্ছে তাঁকে ছেড়ে —তাঁর সেই সহনাতীত বেদনার অভিব্যক্তি যা দেখেছি সে কথা মনে হলে আজও অন্তরের মাঝে একটা আঘাত পাই। অবশ্য করুণাময় হরি একমাস পরই তাঁকে কোলে টেনে নিয়েছিলেন। জানিনা পুত্রহারা জননী তাঁর পুত্রকে পেয়েছিলেন কি না!

তারপর এলো সেই কঠিন দুর্দিন। সকাল থেকে সবাই আতঙ্কিত ও স্তব্ধ। সারাদিন কেটে গেল বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা হ'লো। রুগীর ঘরে ডাক্তারগণ তাঁর ছেলেরা এবং তাঁর

চির সহচরী সহধর্ম্মিণী তাঁর পাশে। বারান্দায় এবং রাস্তাতেও লোক। সন্ধ্যাথেকে আমি পাশের ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে আছি। ওখান থেকে সবই দেখা যাচ্ছে। অত লোক আর আমায় কেউ যেতে বলেন নি তাই যেতে পারিনি।

একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ডাক্তার হেমেন্দ্রনাথ বক্সী (তখন মেডিক্যাল কলেজের ষ্টুডেন্ট) প্রথমাবধি কবির সেবা ও যত্ন করেছেন আপ্রাণ চেষ্টায়। তাঁর অক্লান্ত সেবা —কবির পুত্রদের চেয়ে কম নয়। চলে যাবার দিন সকাল ১০টা কি ১১টার সময় হেমেন্দ্রবাবু ভেতরে এসে আমার হাত ধরে নিয়ে যেতে যেতে বললেন তোমাকে উনি ডাকছেন। আমি পাশে বসতেই হেমেন্দ্রবাবু বললেন এই বৌমা এসেছে। তখন আমার দিকে ফিরে কম্পিত হাত দিয়ে আমার মাথায় ও মুখে বুলিয়ে দিলেন কিছুক্ষণ আমার দিকে চেয়ে থেকে হেমেন্দ্রবাবুকে ইসারা করলেন উঠিয়ে নিয়ে যেতে কারণ আমার চোখে কেবলি জল আসছিল।

কবির জ্ঞানের একটুও বৈলক্ষণ্য নাই। সন্ধ্যার পর ছেলেদের ও নিজের স্ত্রীকে হাত দিয়ে ভেতরে যাবার জন্য ইসারা করতে লাগলেন ওরা ওঠেন না দেখে নিজের মুখে হাত দিয়ে খাবার ইসারা করলেন। তখন সবাই তাঁর ছেলেদের উঠিয়ে দিল—উনি শান্তি পাচ্ছেন না। তোমরা খেয়ে এসো। সবাই এক এক করে কোনমতে খেয়ে গেলেন। তখনও মা বসে। মাকে আবার ইসারা করছেন। হেমেন্দ্রবাবু মাকে ধরে আনলেন আমাকে বললেন একটু খাইয়ে দাও, তুমিও একটু খাও। আমি তৈরী ছিলাম। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই মার মুখে দুবার ভাত তুলে দিলাম। শুধু তাঁর শান্তির জন্য নইলে একি খাওয়ার সময়। মুখ মুছিয়ে দিলাম, একটা পান মুখে দিয়ে দিলাম (মা বড় পান ভালোবাসতেন) এক হাতে মাকে ধরে রেখেছিলাম তখন ছেড়ে দিলাম মা ছুটে ওঘরে চলে গেলেন আমিও সেই [illegible] কাছে গিয়ে আবার দাঁড়ালাম। মা যেতেই সবার [illegible] চেয়ে দেখলেন, সবাই খেয়েছে তাই যেন শান্তি পেলেন। আবার তখনি চঞ্চল চক্ষে এদিক ওদিক কি যেন খুঁজতে লাগলেন। হেমেন্দ্রবাবু সবার পায়ে হাত দিয়ে বলতে লাগলেন—এইতো বৌদিদি, এই তো ছেলেরা মেয়েরা। তখন নিজের কপালের ওপরে একটা হাত, আলগা করে রাখলেন। হেমেন্দ্রবাবু সে ইসারা বুঝে বললেন—"আচ্ছা বৌমাকে আনছি।" আমি নিজেই তখন অগ্রসর হয়েছি, একেবারে তাঁর পা ঘেঁসে পাশে বসলাম। হেমেন্দ্রবাবু আমার মুখের কাপড় সরিয়ে বললেন এই যে দেখুন বৌমা এসেছে। আমার দিকে চোখ ফেরালেন, দুতিন মিনিট একভাবে চেয়ে রইলেন, তারপর কম্পিত হাতটা তুলবার চেষ্টা করছেন দেখে হেমেন্দ্রবাবু তুলে ধরলেন। হাতদিয়ে আমার মাথাটা টেনে নিয়ে—নিজের বুকের ওপরে চেপে রাখলেন, তাঁর চোখের কয়েকফোঁটা জল আমার মাথায় এসে পড়লো, আমার চোখের জলও ঝরে পড়ছিল তাঁর বুকে। আস্তে মাথা ছেড়ে দিলেন, আমি মুখ তুলতেই নিজের বুকে হাত দিয়ে সেই হাত শূন্যে আন্দোলিত করলেন অতিধীরে। তারপরে হাতখানা ওপর দিকে একটু উঠিয়ে সেই হাত আমার মাথায় রাখলেন। সেই স্নেহময় জ্ঞানদয়ের শেষ ইঙ্গিত ও আশীর্ব্বাদ আমার সেই বালিকা বয়সেও বুঝতে ভুল হয়নি। প্রথমে বললেন আমি চললাম সেই অনন্তের পথে। ভগবানের পায়ে তোমাদের রেখে গেলাম তিনি রক্ষা করবেন।

তারপর মাত্র ৫।৬ মিনিট তারপরই সব শেষ। তাঁর চির আরাধিত দয়াল তাঁকে কোলে তুলে নিলেন। রোগ যন্ত্রণার শান্তি, জগতের কর্ম্ম কোলাহলের পরিসমাপ্তি।

—মনে পড়ে গেল তাঁর সেই আদেশ। সবাই তখন নাম করছে আমি কানের কাছে মুখদিয়ে নাম করলাম তাঁর প্রিয় হরিনাম। মেয়েদের টেনে এনে বললাম বাবার কথা রাখ আগে নাম শোনাও পরে কাঁদবে। ওরাও নাম শোনালো ওদের রুচি মুখে হরিনাম।

আর এরপর যা তা বলার কিছু নাই। দেশকে এই মহানকবি কি দিয়ে গেছেন সে কথা দেশ বুঝবে। দেশ যা পেয়েছে সে দেশের থাক, আমি যা পেয়েছি সে আমার নিজস্ব।

আজ তাঁর সেই মহাপ্রয়াণের দিনে আমার সযত্নে রাখা বক্ষপুটের স্মৃতির ডালা খুলে তাঁরই পায়ে নিবেদন করে বারম্বার তাঁকে প্রণাম জানাই।

বিশ্বাবর্ত

ইন্দোনেশিয়ার অন্তর্বিপ্লব

ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ বিপরীত শক্তিগুলির বিচিত্র সমবায়ে 'নাসাকম' নামক যে অস্থির ভারসাম্য স্থাপন করে প্রকৃতপক্ষে ইন্দোনেশিয় কম্যুনিষ্ট পার্টিকেই শক্তিশালী করেছিলেন, গত ১লা অক্টোবর প্রত্যূষে প্রেসিডেন্টের রক্ষীবাহিনীর অধিনায়ক উনটুং-এর নেতৃত্বে যে স্বল্পস্থায়ী বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল তার পরিণতিতে এই অস্থির ভারসাম্য গুরুতররূপে বিপর্যস্ত হয়েছে। সুকর্ণের 'নাসাকম'-এর শরীক জাতীয়তাবাদীরা,—সেনাবাহিনীর প্রধানাংশের নেতৃত্বে যারা ক্ষমতাসীন, ফৌজ প্রবল গোষ্ঠিগুলি,—মুসলীম দলগুলির মধ্যে যারা সংহত এবং কম্যুনিষ্টরা,—পিকিংপন্থী ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টি যাদের শক্তিশালী মুখপাত্র। এই বিদ্রোহে কার্যত নাসাকমের জাতীয়তাবাদী সেনাবাহিনীর নেতৃত্বকে স্থায়িত-আঘাতে উচ্ছেদ করে ক্ষমতাদখলের জন্য কম্যুনিষ্ট অংশের দুঃসাহসী উদ্যোগ। কারণ, উনটুং ও তার সহযাত্রী বিদ্রোহীরা সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত হলেও, কম্যুনিষ্ট পার্টির প্ররোচনায়ই তাদের এই উদ্যোগ এবং এই কারণে উনটুং-বিদ্রোহের প্রধান ও প্রথম লক্ষ্যস্থল সেনাবাহিনীর জাতীয়তাবাদী ক্ষমতাসীন নেতৃত্ব। সেই প্রত্যূষে সেনাবাহিনীর অধিনায়ক লেঃ জেনারেল ইয়ানী সহ ছয়জন সর্বোচ্চ জেনারেলকে নিহত করে বিদ্রোহীরা বহুলাংশে সফলও হয়েছিল। প্রতিরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল নসুশন গুরুতররূপে আহত হয়েও পলায়ন করতে যদি সমর্থ না হতেন, সেই অবস্থায় উনটুং-এর বিদ্রোহ বোধহয় এত দ্রুত পরাস্ত হোতো না। কারণ, নসুশনের প্রতি অনুগত দুর্ধর্ষ সিলিওয়াংগী ডিভিশন আকার্তার দ্রুত পৌঁছে উনটুং চক্রের অনুগত বিদ্রোহী সেনাবাহিনীদের দমন করে। 'নাসাকম' এর তৃতীয় অংশ, ফৌজ দলগুলি, এই বিদ্রোহে পরিপূর্ণভাবে জাতীয়তাবাদীসেনাবাহিনীর পক্ষে যোগ দিয়ে কম্যুনিষ্ট দমনে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে। সুতরাং, 'নাসাকম'-এর এই বিকল্প ভারসাম্য পুনঃস্থাপন অবাস্তব।

ইন্দোনেশিয়ার রাজনীতিতে পররাষ্ট্র মন্ত্রী ডঃ সুবন্দ্রিও কম্যুনিষ্ট সহযাত্রী। বিমানবাহিনীর অধিনায়ক ওমর দানি এবং নৌবাহিনীর অধিনায়ক মার্তাদিনাতাও যে তাই, এই বিদ্রোহের পর উনটুং ঘোষিত বিপ্লবী পরিষদে এই তিনজনের নামের অন্তর্ভুক্তিতে তা সপ্রমাণ হয়ে গেছে। ইতিমধ্যে ওমর দানি পদচ্যুতও হয়েছে। এই বিপ্লবী পরিষদে ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সভাপতি আইদিতের নাম অন্তর্ভুক্ত না হলেও, বারজন প্রখ্যাত কম্যুনিষ্টদের এই পরিষদে অন্তর্ভুক্তিতেই, বিদ্রোহের নেতৃত্বের রাজনৈতিক রূপ অতি সুস্পষ্ট। তাছাড়া "৩০শে সেপ্টেম্বর-এর আন্দোলন" (September 30 Movement) নামে চিহ্নিত এই বিদ্রোহকে ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির সরকারী মুখপাত্র সরাসরি সমর্থন জানাবার পর এই বিদ্রোহে শুরু থেকেই কম্যুনিষ্ট পার্টির উদ্যোগ সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ ছিল না। কম্যুনিষ্ট পার্টির চেয়ারম্যান ও সুকর্ণর একান্ত সমস্ত বিশিষ্ট মন্ত্রীসভার অন্যতম শক্তিশালী সদস্য আইদিত ১লা অক্টোবর থেকেই নিরুদ্দেশ। কখনও শোনা গেছে সাবেরেরিনে আইদিত পিকিং-এ পাড়ি দিয়েছে, কখনও শোনা গেছে বিমানবাহিনীর অধিনায়ক ওমর দানির সহযোগে মধ্য জাভার আত্মগোপন করে বিদ্রোহীদের নেতৃত্ব দানে আইদিত নিরত। এই অঞ্চলে তার গ্রেপ্তারের সংবাদও শোনা গেছে। কিন্তু আজও আইদিত

পলাতক। তাকে গ্রেপ্তার করার জন্য সমগ্র ঘটা আভার সেনাবাহিনী তোলপাড় করছে। সুতরাং উনটুং বিদ্রোহের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির অন্তরঙ্গতা কোনো প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না।

এই বিদ্রোহের পশ্চাতে চীনাদের ইঙ্গিতও খুবই স্পষ্ট। বিদ্রোহের নির্বাচিত দিন ১লা অক্টোবর চীনা কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতা দখলের স্মারক দিবসরূপে প্রতিবছর চীনে প্রতিপালিত হয়। সুতরাং সময় নির্বাচনেও চীনাপ্রভাবের স্বাক্ষর রয়েছে। বৈদেশিক রাজনীতিতে চীন-ইন্দোনেশিয়-পাকিস্তানচক্রে সুকর্ণের সম্মানিত স্থান থাকা সত্ত্বেও ইন্দোনেশিয়ার এই গুরুতর সঙ্কটে সুকর্ণ ও ইন্দোনেশিয়া সম্পর্কে চীনাদের প্রাথমিক নীরবতা এই বিদ্রোহের পশ্চাতে চীনাদের প্রত্যক্ষ সংযোগ গোড়া থেকেই সূচিত করেছে। ছয়জন নিহত জেনারেলের জন্য ইন্দোনেশিয়ার চীনা দূতাবাস পতাকা অবনমিত না করে ইন্দোনেশিয়ার জাতীয় সম্মানের প্রতি প্রকাশ্যে গভীর অশ্রদ্ধা এবং মৃত জাতীয় বীরদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় অনুপস্থিত থেকে মৃত জাতীয় বীরদের প্রতি অসম্মান জ্ঞাপন করেছে। সংবাদে জানা যায় চীনা রাষ্ট্রদূতকে ডেকে এনে গুরুতর কূটনৈতিক খবনের জন্য সুকর্ণের তিরস্কারের অবাবে এই রাষ্ট্রদূতটি শুধুমাত্র মুচকি হেসে ইন্দোনেশিয় রাষ্ট্রপতিকে অসম্মান ও অবজ্ঞা করতেও পশ্চাদপদ হয় নাই। পরবর্তীকালে কম্যুনিষ্টদলনের বিরুদ্ধে ইন্দোনেসিয়াকে তীব্র আক্রমণ করে বিদ্রোহীদের প্রতি চীনা-সমর্থনের মুখোস একেবারে খসে গেছে।

চীনাদের এবং চীনা-প্ররোচিত ইন্দোনেশীয় কম্যুনিষ্ট পার্টির এই স্পর্ধা ও দুঃসাহসের জন্য সুকর্ণের দায়িত্ব গত কয়েক বছরের ইন্দোনেশীয় ইতিহাসে নিহিত হয়ে আছে। এই পরিণতির জন্য সুকর্ণের দায়িত্ব সংশয়াতীত। পররাষ্ট্রনীতিতে কম্যুনিষ্ট চীনের একান্ত অনুসারী হয়ে, বাক্তি স্বেচ্ছায় [illegible] রাখবার উগ্র আকাঙ্খার প্রেরণায় ইন্দোনেশিয় আভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষমতাদ্বন্দ্বে কম্যুনিষ্ট পার্টির শক্তিবৃদ্ধিতে সুকর্ণ অন্যতম সহায়ক। সুকর্ণকে অবলম্বন করেই কম্যুনিষ্টদের ক্ষমতায় আরোহণ। মুসলীম ধর্মীয় গোষ্ঠির নাহদাতুল উলামা পার্টির এককোটি বিশলক্ষের, এবং সুকর্ণর নিজের জাশনালিষ্ট পার্টির চল্লিশ লক্ষের তুলনায় ইন্দোনেশিয় কম্যুনিষ্ট পার্টির (P. K. I) সদস্য সংখ্যা বিশলক্ষ হলেও, এদের প্রভাব প্রভূত। সেনাবাহিনীতে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের (Political Commiasior) আয়োজনও সুকর্ণর সাহায্যে আইদিত সম্পূর্ণ করে এনেছিল, সেনাবাহিনীর বিরোধিতার জন্য তার প্রয়োগ সম্ভব হয় নাই।

সুতরাং উনটুং-বিদ্রোহে সুকর্ণর ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহ থেকে যায়। ১লা অক্টোবর প্রত্যুষে যে-সময় সেনাধিনায়করা বিদ্রোহীদের হাতে নিহত হন, সে সময় সুকর্ণ আকার্তা. ত্যাগ করে হালিম বিমান ঘাঁটির নিকটবর্তী স্থানে চলে যান। এই হালিম বিমান ঘাঁটির সন্নিকটে উনটুং-এর অনুগত সেনাবাহিনীরা প্রস্তুত হয়েছিল এই মর্মে পরে সংবাদ জানা গেছে। এই স্থানান্তর কেন, তা স্পষ্ট। বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে সুকর্ণের কোনো ধিক্কার নেই, এদের সঙ্গে কম্যুনিষ্ট পার্টির সাংগঠনিক ষড়যন্ত্র থাকা সত্ত্বেও এই পার্টির বিরুদ্ধে সুকর্ণর কণ্ঠে কোনো নিন্দাবাদ নেই। অপরপক্ষে ইন্দোনেশিয়ার বিভিন্ন দ্বীপে যখন সাধারণ মানুষের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতি ধিক্কার গর্জে উঠেছে, যখন আকার্তায় শক্তিশালী কম্যুনিষ্ট পার্টির অফিস, চীনা বিশ্ববিদ্যালয় ভবন এবং পলাতক আইদিতের গৃহ জনতার উদ্বেলিত ক্রোধের লক্ষ্যস্থল হয়েছে, যখন বিদ্রোহীদের দমনে সেনাবাহিনী তৎপর, বিদ্রোহীদের সহায়ক, কম্যুনিষ্ট পার্টির সদস্যদের হালারে হালারে গ্রেপ্তারের যখন অভিযান চলেছে, সেই সময় বিদ্রোহীদের সম্বন্ধে নিস্পৃহ মনোভাব সন্দেহের উদ্রেক করবেই। তাছাড়া, আইদিত-বর্ণিত নূতন কম্যুনিষ্ট পার্টি গঠন করে 'নাসাকম' আদর্শের ভিত্তিতেই ইন্দোনেশিয়ার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির পরিক্রমার যে কর্মসূচী সুকর্ণ

তুলে ধরেছিলেন, তাতে বিদ্রোহের ভূত নগ্ন আপাতত চাপা পড়বে মাত্র এবং 'নাসাকম'-এর এই প্রস্তাবিত ব্যবস্থনের দ্বার থেকে ইন্দোনেশিয়ার অবস্থাবীরূপে পুনর্বিপ্লব আত্মপ্রকাশ করতো। কারণ, উনটুং বিদ্রোহের লক্ষ্য ছিল ইন্দোনেশিয়াকে কম্যুনিষ্টদের করায়ত্ত করা. সিকিং-এর সাহচর্যে। সুকর্ণ-এর পরিকল্পনা এই সম্ভাবনার মূলোচ্ছেদের বিরোধী। অবশ্য সেনাবাহিনীর ক্রমবর্ধমান চাপে এবং দেশব্যাপী কম্যুনিষ্ট দলনের পরিপ্রেক্ষিতে শেষ পর্যন্ত কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বেআইনী করবার কথা চিন্তা করতে সুকর্ণ সম্মত হয়েছেন। অবশ্য নিরঙ্কুশ কম্যুনিষ্ট দলনের জন্য অন্যান্য দলগুলিকে তীব্র ধিক্কার দিয়ে তাদেরও বেআইনী করবার হুমকি দিতে সুকর্ণ ভোলেন নাই।

সুবন্দিওর সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের অন্তরঙ্গতায় জনতার চোখে সে-ও সন্দেহভাজন হয়ে উঠেছে এবং তাকে বর্জনের দাবীও সোচ্চার হয়ে উঠেছিল। সুকর্ণ সে দাবী আপাতত অগ্রাহ্য করেছেন। কিন্তু দল ভারী কম্যুনিষ্টরা প্রতি আক্রমণের যে ঝুঁকি নিয়েছে, তার ফলে জাতীয়তাবাদী ও কম্যুনিষ্টদের দ্বন্দ্ব তীব্র আকার ধারণ করতে বাধ্য। সেই তীব্র দ্বন্দ্বের মুখে সুকর্ণ যদি জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে পরিপূর্ণভাবে নিজেকে একীভূত করতে অস্বীকার করে, সুকর্ণের বিদায়ের দিন আসন্ন হয়ে উঠবে।

রোডেশিয়ার সঙ্কট

রোডেশীয় স্বাধীনতা সংক্রান্ত বৈঠক গত ১১ই অক্টোবর লণ্ডনে ব্যর্থ হবার পরই গুরুতর সঙ্কট দেখা দেয়। রোডেশিয়ার শ্বেতসংখ্যালঘুদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর রোডেশিয় প্রধানমন্ত্রী তাদের অনিয়ন্ত্রণে একপাক্ষিক স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকীতে (unilateral declaration of Independence) অটল থাকাতেই এই সঙ্কট দেখা দিয়েছে। অতঃপর গত ১১ই নভেম্বর রোডেশিয়া অদ্য নিয়ন্ত্রণে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এই সঙ্কটের জন্য ব্রিটেন সর্বতোভাবে দায়ী। কারণ, গত কয়েক বছর যখনই রাষ্ট্রসংঘে রোডেশিয়ার সাংবিধানিক সমস্যার আলোচনা উত্থাপিত হয়েছে, এ-বিষয়ে ব্রিটেন তার দায়িত্ব এড়িয়ে গিয়ে এবং ৪০ লক্ষ আফ্রিকাবাসীর স্বার্থ ২ লক্ষ ৩০ হাজার শ্বেতকায় অধিবাসীদের নিকট বিসর্জন দিয়ে এসেছে এই যুক্তিতে, যে শ্বেতকায় অধিবাসীরা কার্যত স্বায়ত্বশাসন ভোগ করছে এবং তাদের এই অধিকারে হস্তক্ষেপ করে ব্রিটেনের পক্ষে সংখ্যালঘু শ্বেতকায় শাসনকে সংখ্যাগুরু আফ্রিকাবাসীর শাসনে পরিণত করা মুস্কিল। এবারকার লণ্ডন আলোচনায়ও পরিণামে আফ্রিকাবাসীদের শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক সম্মতি দিতে আমান সিথ সম্মত হলে রোডেশিয়ার স্বাধীনতার প্রস্তাবে বৃটিশ সরকার সম্মতি দিতে স্বীকৃত ছিল। এই স্বীকৃতি রোডেশিয়ায় কার্যত শ্বেতকায়দের সংখ্যালঘু শাসনে স্থায়িত্ব দিত। দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতশাসন তার নজীর।

ব্রিটিশ সরকার হুমকি দিয়েছে, রোডেশিয়া অনুনিয়ন্ত্রণে স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, তা বিদ্রোহের শামিল হবে। কিন্তু বিদ্রোহ দমনে কার্যকরী কি পন্থা গ্রহণ করবে তা অস্পষ্ট রেখে দিয়েছে। গত ১২ই অক্টোবর রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল এসেম্বলী ১০৭-২ ভোটে রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতকায় সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, এই সরকারকে দমন করবার জন্য সেনাবাহিনী নিয়োগ করতে বলেছে। ব্রিটিশ সরকারের এ-সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট সম্মতি চাই, অন্যথা আফ্রিকার স্বাধীন দেশগুলি নীরব থাকবে না। কারণ তারাও বলপ্রয়োগের জন্য তৈরী হচ্ছে। এবং অক্টোবরের শেষে অর্গানাইজেশন অফ্ আফ্রিকান ইউনিটির সম্মেলনে এ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে যে রোডেশিয়ার সংখ্যালঘু শ্বেতকায় শাসনকে প্রতিহত করতেই হবে।

রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে দমন ব্যবস্থা গ্রহণে ব্রিটেনের দৃঢ় অসম্মতির ফলে রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে রোডেশিয়া সংক্রান্ত আলোচনা অনির্দিষ্টকালের জন্য মুলতুবী হয়ে গেছে।

ব্রিটেন গত ১২ই নভেম্বর রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধনীতি গ্রহণ করেছে এবং এই নীতির ব্যাপক প্রয়োগে নিরাপত্তা পরিষদের কর্মতৎপরতা সীমিত থাকে, ব্রিটেনের তাই বাসনা। ব্রিটেন হয়তো অবিলম্বে তেল সরবরাহ বন্ধ করে দিয়ে রোডেশিয়া সরকারকে কাবু করবার চেষ্টা করবে।

কিন্তু আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলি নীরব থাকতে পারবে না। তাদের সঙ্গে রোডেশিয় সরকারের সংঘাত অনিবার্য। এই সংঘাতে চীন এবং রুশের সাহায্যও আফ্রিকানদের প্রতি প্রদানিত হতে পারে। এদিকে সে অবস্থায় দক্ষিণ আফ্রিকাও রোডেশিয়ার সহায়তায় অগ্রসর হবে। সেক্ষেত্রে সংঘাত অনিবার্য। এই অনিবার্য যুদ্ধপাতের জন্য ব্রিটেনের ভূমিকা সর্বাধিক। সুতরাং অর্থনৈতিক অবরোধেই অন্তিম ব্যবস্থা মনে করে ব্রিটেনের পক্ষে নিষ্ক্রিয় থাকা ঘোরতর অন্যায় হবে।

১২।১১।৬৫

মুদ্রক ২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

পুস্তকপরিচয়

জীবনালেখ্য

William Shakespeare—A Biography : A. L. Rowse ; Memillan and Co., 1963 ;

পৃষ্ঠা 435 ; মূল্য 45 শিলিং।

"কবিরে পাবে না কবির জীবনচরিতে," বলেছেন রবীন্দ্রনাথ। টি, এস, এলিয়টের মতও অনেকটা অনুরূপ। তিনি বলেছেন, কাব্যের মধ্যে কবির জীবনচরিতের দ্বারা অনুসন্ধান ভুল ; অর্থাৎ কাব্যের সঙ্গে কবির জীবনচরিতের সম্বন্ধ খুব প্রত্যক্ষ নয়। বর্তমান সংবাদপত্রের অতিপ্রভাবযুক্ত যুগে কাব্য ও কবির জীবন সমীকরণের যে প্রবণতা লক্ষ্যণীয় এবং কবির জীবনীদ্বারা তাঁর কাব্যের ভাষ্যরচনার যে-প্রচেষ্টা সমালোচনাক্ষেত্রে সতত উদ্যত, এই দুই মহৎ কবির উক্তি সেই বিপদের প্রতি আমাদের যথাযথরূপেই সতর্ক করে। কিন্তু তবু প্রশ্ন, কবির জীবন ও কাব্য কি সত্যই দুই পৃথক অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে? স্রষ্টা কি তাঁর প্রাকৃত জীবন থেকেই তাঁর সৃষ্টির রূপ রস গন্ধ, স্পর্শ, আনন্দ বেদনার উপাদান আহরণ করেন না? তাঁর কল্পনা কি এই পৃথিবীর সুখদুঃখ সৌন্দর্য মাধুর্য্য একেবারেই উদ্রিক্ত হয় না? কবির স্রষ্টা-স্বরূপ যতই কুটস্থ ও দুর্জ্ঞেয় হোন তার অধিষ্ঠান যে তাঁর প্রাকৃত স্বরূপকে অবলম্বন করেই তাতো অস্বীকার্য্য নয়। এই প্রসঙ্গে মহাকবি গোটের উক্তি যে তাঁর সকল সৃষ্টিই এক বিরাট স্বীকারোক্তির খণ্ডিতাংশ—'fragments of a great confession'—, এও স্মরণীয়। এখানে যে-স্বীকারোক্তির কথা বলা হয়েছে তা গোটের প্রাকৃতজীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিই অঙ্গুলি নির্দেশ করে। অবশ্য গোটের কাব্য ও রচনাকে তাঁর জীবনীর তর্জ্জমা মনে করলেও ভুল হবে। আসলে কবির অন্তর্জীবন নিগূঢ় ও রহস্যময়। তার গতিপ্রকৃতি, অভিজ্ঞতালব্ধ ও আত্মনির্ম্মানের হদিশ লোকচক্ষুর বাইরে। বাহিরের স্থূলগ্রাহ্য জীবনটার সাথে তার সম্বন্ধ কোথায় ও কতখানি তাও সঠিক আমাদের জানা নাই। কিন্তু সম্বন্ধ যে একেবারেই অনুপস্থিত তাও সম্ভব নয়। কবির স্থূলজীবন প্রতিনিয়ত তার অন্তর্লীন জীবনকে স্পর্শ করছে, রঞ্জিত করছে, সমৃদ্ধ করছে এবং পরোক্ষভাবে তাঁর সৃষ্টিকে স্বতঃই প্রভাবিত করছে। সে-প্রভাব কতো সুদূর প্রসারী হবে অথবা প্রবল হবে অথবা কী ভাবে তার প্রকাশ ঘটবে তা' বলা কঠিন। কিন্তু এদুয়ের সামুজ্য অনস্বীকার্য্য।

জীবনীবিমুখ সমালোচকরা অবশ্য বলবেন যে সামুজ্য অস্বীকার না করলেও সাহিত্যরসাস্বাদনে সাহিত্যিকের জীবনী যখন আমাদের কোনো সাহায্যই করতে পারে না, শুধু অবান্তর বিষয়ে আকৃষ্ট করে' চিত্তকে বিক্ষিপ্ত ও সমালোচনাকে পথভ্রান্ত করে মাত্র, তখন কাব্যচর্চ্চার ক্ষেত্রে জীবনীচর্চ্চা কোনোমতেই অনুমোদনযোগ্য নয়। শুধু জীবনী-আশ্রয়ী সমালোচন-পন্থী না হয়েও বলা চলে যে যে-কবির কাব্যে পাঠক আনন্দ লাভ করে তাঁকে সে জানতেও উৎসুক হয়, এবং জীবনচরিতের সূত্রে দেশে কালে দূরবর্ত্তী কবির সঙ্গে পরিচিত হবার মানবিক আগ্রহও এই কারণেই অস্বাভাবিক নয়। কাব্যকৃতি রূপনির্ম্মাণদক্ষতা ও সৃষ্টি-মহিমার ক্ষেত্রে যাঁর কৃতিত্ব আমাদের দৃষ্টিসীমার সুখদুঃখবিরহ-

মিলন ভালোবাসার হৃদয়ন এই সংসারে তিনি আমাদেরই সংগোত্র এটা জানলে আমাদের মন আপ্লুত হয়। কবি শিল্পী মনীষীর জীবনচরিতের প্রতি তাই মানুষের এই চিরন্তন আগ্রহ।

বিশ্বসাহিত্যে শেক্‌স্‌পিয়ার এমন একটি নাম যা মানুষের কৌতূহলকে চিরদিন প্রবলভাবে আকর্ষণ করবে তাঁর জীবনীর উদ্দেশে। দূরকালে বিস্তৃত, প্রায় দৃষ্টিচ্ছেদ সেই জগতে তাঁর যে অর্ধসংগোচর ব্যক্তিত্ব কাব্য নাটকের অন্তরাল থেকে ক্ষণে ক্ষণে আভাষিত হয় তা আমাদের ঔৎসুক্যকে বাগ্রতর করে মাত্র।

শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনের কয়টি মুখ্য ঘটনা আমরা নিশ্চিতরূপে জানি, এ-প্রশ্নের উত্তর দিতে অনেকেই ইতঃস্তত করবেন। কারণ তাঁর জন্মমৃত্যুর সঠিক তারিখও আমরা জানি না। ষ্ট্রাটফোর্ডের গির্জার খাতাতেও কবির জন্ম মৃত্যুর তারিখ নেই আছে ব্যাপ্‌টিস্‌ম্‌ ও কবরের। বিবাহ-সম্পর্ক হওয়ার কোনো উল্লেখ নেই যদিও উহাঁরের বিশপের নিকট উইলিয়াম শেক্‌স্‌পিয়ার ও অ্যান হ্যাথাওয়ের স্বাক্ষরিত বিবাহের অনুমতির জন্য একটি প্রার্থনা ও মুচলেকা পত্র পাওয়া গেছে। তাঁর কোন্ নাটক কখন লিখিত ও প্রথম অভিনীত হয় এ-তথ্যও সংগৃহীত। সর্বাধুনিকো শেক্‌স্‌পিয়ার ৩৬টি ৩৭টি ৩৮টি বা তদোধিক নাটক লিখে গেছেন সে সম্বন্ধেও এক, নিশ্চিত ও সর্বসম্মত কোনো সিদ্ধান্ত নেই। এ থেকেই বোঝা যাবে শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনী রচনা কতো দুরূহ। কতকগুলি বিক্ষিপ্ত ঘটনার অন্তবর্তী বিস্তীর্ণ শূন্যতা ভরাতে হয় অনেক কিংবদন্তি, অনুমান ও কল্পনা দিয়ে। বলা বাহুল্য এই অনুমান ও কল্পনার প্রয়োগ যুক্তিসহ ও বুদ্ধিগ্রাহ্য না হলে সব মাটি, এবং কিংবদন্তিগুলিকেও ঐ একই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ করা চাই। কিন্তু এই অনির্দিষ্টতার সুযোগও কম লোভনীয় নয়। যেখানে প্রায় সবই অনিশ্চিত সেখানে কল্পনা ও অনুমানের অবাধ সঞ্চরণের অবকাশ অনেক শেক্‌স্‌পিয়ার উৎসাহীকে তাঁর জীবনীরচনায় আকৃষ্ট করেছে। এই সব "আপন মনের মাধুরী মেশানো" জীবনালেখ্যগুলি বিচিত্র ও কৌতূহলকর হলেও কবি অপেক্ষা কবির জীবনীকারদেরই অধিক পরিচয় বহন করে। এদের মধ্যে উনিশ শতকের শেষ দশকে মুদ্রিত Sidney Lee'র শেক্‌স্‌পিয়ার জীবনীই মূলীয়ানার দিক থেকে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। কিন্তু এখানে তথ্য অপেক্ষা অনুমাননির্ভর যে শেক্‌স্‌পিয়ার চিত্র উদ্‌ঘাটিত তা' Lee'র আদর্শ শেক্‌স্‌পিয়ার হলেও ঐ জীবনচরিতে প্রতিভাসিত পাটোয়ারী বুদ্ধিসম্পন্ন, অর্থের সম্বন্ধে অতি-হিসেবী ব্যক্তিটিকে কবি শেক্‌স্‌পিয়ার বলে গ্রহণ করতে অনেকেই কুণ্ঠা বোধ করেন। এহেন পরিস্থিতিতে 1930 সালে E. K. Chambers তাঁর William Shakespeare, A Survey of Facts and Problems প্রকাশ করে কল্পনাশ্রয়ী জীবনীরচনার প্রায় পূর্ণচ্ছেদ ঘোষণা করলেন। তবু শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনীরচনার প্রয়াস এখনো বন্ধ হয়নি। Ivor Brown, Dover Wilson, Middleton Murry প্রভৃতির জীবনীচিত্রে শেক্‌স্‌পিয়ারের একটি বিশেষ ব্যক্তিরূপ ধরবার দিকে সেই পুরাতন অভিপ্রায়ই চোখে পড়ে। প্রাথমিক তথ্য ডিঙিয়ে যাবার উপায় আর নেই সত্য, তবু কিংবদন্তির ক্ষীণ সূত্র অবলম্বন করে, কিম্বা নাটকের চরিত্রচিত্রণ ও রূপকল্প অনুসরণ করে শেক্‌স্‌পিয়ারের কল্পনাশ্রিত ব্যক্তিরূপ সৃষ্টির আগ্রহ এখনো বন্ধীভূত হয়নি; হয়তো কখনোই হবে না।

শেক্‌স্‌পিয়ারের চতুর্থশতবার্ষিকীর প্রাক্কালে প্রকাশিত Rowseএর এই আলোচ্য জীবনীটির বৈশিষ্ট্য অনুমান প্রয়োগের অনন্যতায় নয়, তাঁর অনন্যসাধারণ approach-এ। Rowse নিজে ঐতিহাসিক, তাই উইলিয়াম শেক্‌স্‌পিয়ারের আবির্ভাব-ক্ষণ ইংলণ্ডের সাংস্কৃতিক ইতিহাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে তিনি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই বিচার করেছেন। শুধু তাই নয়, যে ভাবে ঐতিহাসিকগণ বিবরণটি

যন্ত্রোপকরণ যুগকে অশেষ নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নিপুণ প্রয়োগদ্বারা পুনর্গঠন করেন. তিনিও ঠিক সেই পদ্ধতি ও উপায় অবলম্বন করেছেন শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনী নির্মাণে। Taine-এর 'milieu-moment-man' সূত্রের প্রথম উৎপাদকদ্বয়কে অর্থাৎ শেক্‌স্‌পিয়ারের যুগ ও পরিবেশকে কলেবর দিয়ে সাকার ও মূর্ত করে তুলে বাকি শেক্‌স্‌পিয়ারের আলেখ্য তিনি বহুলাংশে পূর্ণাঙ্গ করতে সক্ষম হয়েছেন।

শেক্‌স্‌পিয়ারের দেশ ও কাল যদি তাদের বৃহত্তর ও ক্ষুদ্রতর প্রেক্ষিতে, তাদের ঘনিষ্ঠ ও বিস্তীর্ণ পরিধিতে স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হয় তা হলে ব্যক্তি শেক্‌স্‌পিয়ারও স্পষ্টতররূপে দৃষ্টিগোচর হবেন। কারণ পরিবেশ বাদ দিয়ে মানুষ নেই। বিশেষ বালা কৈশোরের পরিবেশের গঠনমূলক প্রভাব অপরিসীম। তাই পরিবেশের ইতিহাসই মানুষের প্রথম জীবনের সর্বাধিক মূল্যবান ইতিহাস। ঐতিহাসিক Rowse তাই অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে শেক্‌স্‌পিয়ারের দেশ-কালিক পরিবেশকে পুনরাবিষ্কার ও পুনঃসৃষ্টির চেষ্টা করেছেন। এই কারণেই তাঁর জীবনালেখ্যে ষ্ট্রাটফোর্ড অন্ অ্যাভন শহর তার তদানীন্তন ভৌগলিক, ঐতিহাসিক সামাজিক ও অর্থনৈতিক চেহারা, পঞ্চষাট-ঘর বাড়ী গির্জা বিদ্যালয়-দোকান-পাট-মিউনিসিপাল হল-কাউন্সিল, মুখ্য নাগরিকগণ ও তাদের কাজকর্ম. বৈষয়িক উন্নতি অবনতি ইত্যাদি সব কিছু নিয়ে এমন সরস সজীব ও পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে ফুটে উঠেছে।

পারিবারিক পরিবেশ মানুষের নিকটতম পরিবেশ। বালো এ-পরিবেশের অনেকখানিই পিতামাতা ও গৃহ। পিতা জন শেক্‌স্‌পিয়ারকে না জানলে তাই পুত্র উইলিয়ামকে যথার্থ বোঝা সম্ভব নয়। Rowse-এর জীবনীতে জন শেক্‌স্‌পিয়ারের একটি প্রায় পূর্ণাঙ্গ আলেখ্য তুলে ধরা হয়েছে এই কারণেই। কেমন করে তিনি অনুরবর্তী স্নিটারফিল্ড গ্রাম থেকে এসে ষ্ট্রাটফোর্ডে বসবাস শুরু করেন এবং উইলকোট গ্রামের মেরী আর্ডেনের সহিত বিবাহবন্ধনের সহায়তায় বৈষয়িক ও সামাজিক উভয় ক্ষেত্রেই সুপ্রতিষ্ঠিত হন, এবং 1557 থেকে 1577 পর্যন্ত দীর্ঘ সুদি বছর ধরে স্থানীয় বরো কাউন্সিলের সভ্য ও বিবিধ পদাধিকারীরূপে অপূর্ব জন-হিতৈষিতার পরিচয় দেন এবং পরে বৈষয়িক অবনতি ও দেনাগ্রস্ততায় সেই অর্জিত প্রতিষ্ঠা থেকে ক্রমে বিচ্যুত হন তার কাহিনী খুবই কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি তাঁর ঘরবাড়ী বিষয়কর্ম, মামলা-মোকদ্দমা, এবং পৌরপ্রতিষ্ঠানের বিবিধ কাজকর্মের মধ্য দিয়ে আমাদের কাছে অতি প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত হয়ে ওঠেন। শুধু জন শেক্‌স্‌পিয়ারই নয়, তাঁর প্রতিবেশী কুইনি পরিবার, হুমার্স, স্যাডলার, ওয়াকার, উলনার ইত্যাদি সব পরিবারদের নিয়ে, চারশো বছর আগের সেই ষ্ট্রাটফোর্ড শহর সব লোকজন, কোলাহল, উত্তেজনা, অপিচ সেই যুগের অপেক্ষাকৃত নিস্তরঙ্গ শান্তি সৌন্দর্যময় জীবনসহ আমাদের কল্পনালোকে মূর্ত হয়ে ওঠে। শহরের প্রান্তবাহী আভন নদী উহুরের আর্ডেন বনানী, দক্ষিণ-পশ্চিমের কটুগুড়ের তরঙ্গায়িত প্রান্তর, অক্সফোর্ড লণ্ডনের পথ, গ্রামীণ পরিবেশগুলির অতিঘনিষ্ঠতা, ওকলতা ফুলফল পশুপাখী সবই আমাদের আবিষ্ট করে। বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশরক্ষার আত্ম-রক্ষার প্রস্তুতি, রাণী এলিজাবেথের কেনিলওয়ার্থ পরিদর্শন, প্রটেস্ট্যান্ট ক্যাথলিকের দ্বন্দ্ব, প্লেগ মহামারীর পৌনঃপুনিক আক্রমণ, অগ্নিকাণ্ড ইত্যাদি সব ঘটনাই আমরা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করি। ষ্ট্রাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলের পাঠ্যক্রম, শিক্ষার স্থান, শিক্ষকদের ইতিবৃত্ত, এও যেমন আমাদের অজানা থাকে না, তেমনি ষ্ট্রাটফোর্ডের হোলি ট্রিনিটি গির্জা (যার চ্যান্সেলে তার টমাস লুসি প্রভৃতি প্রধান ব্যক্তিদের কবর) এবং গির্জার পুরোহিতবৃন্দের সঙ্গেও আমরা পরিচিত হই। রবিনহুডের স্মৃতিজড়িত আর্ডেনের আরণ্যক পরিবেশ, খরগোস ও হরিণ শিকার, খেলাধুলা আমোদপ্রমোদ, বনে বনে ফুলের শোভা ও পাখীর গান সব আমাদের ঘিরে ধরে। এই

জীবন্ত পরিবেশের যাদুস্পর্শে কাব্যমুকুর প্রতিভাসিত বাস্তব-শেক্‌স্‌পিয়ার আমাদের কাছে অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে ওঠেন।

শেক্‌স্‌পিয়ারের কাব্যে নাটকে এত যে পাখীর গান, মেঠো ফুল গাছপালা, প্রান্তর খেলাধূলা ও শিকার ইত্যাদির অজস্র উল্লেখ ছড়িয়ে আছে তা' যে ষ্ট্রাটফোর্ডের বৃহত্তর গ্রাম্য পরিবেশকেই বারে বারে স্মরণ করছে Rowse-রের জীবনীর পূর্ব্বে তেমন প্রবলভাবে কখনো তা' উপস্থাপিত হয়নি। একথা বললে চলবে না যে Rowse এখানে সুকৌশলে শেক্‌স্‌পিয়ারের কাব্য নাটক থেকে এক কাল্পনিক ষ্ট্রাটফোর্ড ও ওয়ারউইকশায়ার খাড়া করেছেন। বোড়শ ও সপ্তদশ শতকে যেসব ভৌগলিক, পর্য্যটক ও ঐতিহাসিক ষ্ট্রাটফোর্ড ও ওয়ারউইকশায়ার সম্বন্ধে যে যেখানে যা কিছু বলেছেন সেইসব প্রামাণ্য তথ্য থেকে Rowse শেক্‌স্‌পিয়ারের ষ্ট্রাটফোর্ড ও ওয়ারউইকশায়ারকে পুনরাবিষ্কার করেছেন। এ ছাড়া ষ্ট্রাটফোর্ডের মুনিসিপ্যাল কাউন্সিলের নথিপত্র, রাজকীয় মোহাফেজখানার নথিপত্র গির্জ্জার নথিপত্র ইত্যাদি আরো অজস্র প্রামাণিক দলিলও যে তিনি অনুসন্ধান করেছেন তারও পরিচয় অসংলগ্ন নয়।

এই প্রসঙ্গে দৃষ্টান্তক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে শেক্‌স্‌পিয়ার যে ষ্ট্রাটফোর্ডের গ্রামার স্কুলে পড়েছিলেন এটা আমরা প্রায় সকলেই বিশ্বাস করলেও সেই বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রম, অধীত বিষয় ও পুস্তকাবলী তাঁর রচনাকে কীভাবে এবং কতোখানি প্রভাবিত করেছিল তা চিন্তা করে দেখি না। কিন্তু Rowse-রের জীবনীতে শুধু যে গ্রামার স্কুলের ও পাঠ্যক্রমেরই বিবরণ পাই তা-ই নয় শেক্‌স্‌পিয়ারের রচনায় তাঁর সেই বিদ্যালয়ের পাঠ কতো বিচিত্রভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে তারও সবিস্তার আলোচনা দেখি। বিদ্যালয়ের পঠিত প্রথমেবারে প্রাথমিক পর্য্যায়ের বই,—যেমন ABC Book (ক্রস-ক্রস রো বুক) Lily'র ল্যাটিন গ্রামার ও ক্রেশ বুক থেকে সুরু করে ম্যানটুয়ানের Bucolica, প্যালিনজেনিয়াসের Zodiocus Vitae, অভিডের Heroides, Fasti, Metamorphoses, হোরেসের কাব্য, সুপারের ল্যাটিন অভিধান ও থেসউরাস লজিক ও রেটরিকের বই, স্যালাষ্ট ও সীজারের ইতিহাসগ্রন্থ প্রভৃতি সমস্ত পাঠ্য বই থেকে অজস্র উদ্ধৃতি, প্রতিধ্বনি, এবং প্রত্যক্ষ ও তির্য্যক প্রভাবের দৃষ্টান্ত উপস্থাপিত করে Rowse দেখিয়েছেন শেক্‌স্‌পিয়ারের মানস-বিকাশে বাল্যের এই প্রভাব কতো সুদূরপ্রসারী—হয়েছিল। অনুরূপভাবে, নিয়মিত গির্জ্জায় উপস্থিতি এলিজাবেথীয় যুগের সব বালকের পক্ষেই আবশ্যিক থাকা সত্ত্বেও শেক্‌স্‌পিয়ারের কাব্যে নাটকে তার স্বাভাবিক প্রভাব যে লক্ষিত হবে তাও আমরা স্বীকার করি। কিন্তু Rowse-রের জীবনীতে বিশপস্ বাইবেল, প্রেয়ারবুক, এ বুক অফ হোমিলিজ এবং শেক্‌স্‌পিয়ারের কাব্যে নাটক থেকে পাশাপাশি প্রতিফলন অজস্র উদ্ধৃতি ও দৃষ্টান্তে সেই প্রভাবের বিপুলতা ও গভীরতা যখন উদ্‌ঘাটিত দেখি তখন আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না।

Rowse-রের জীবনীর বৈশিষ্ট্য এই ঐতিহাসিক সন্ধানী আলোকের সর্ব্বত্র দীপ্তি। নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি যে কী অসাধ্যসাধন করতে পারে এই জীবনীখানা তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তবু আশ্চর্য্য ঠেকে যখন দেখি যে শেক্‌স্‌পিয়ারের জীবনীর দু একটি জটিল প্রশ্ন চিহ্নকে Rowse যেন এড়িয়ে গেছেন,—যেমন Anne Whateley'র রহস্য। তাই বলে Rowse-যে নীতিবাগীশ জীবনীকারের মতো অতিভক্তির একটি চরিত্রকে শেক্‌স্‌পিয়ারস্বরূপে খাড়া করতে চেয়েছেন তা-ও সত্য নয়। তা হলে শেক্‌স্‌পিয়ারের সনেট পর্ব্বকেই তিনি সযত্নে এড়িয়ে যেতেন। তা তিনি করেননি। বরং সনেটগুলি যে একান্তভাবে আত্ম-জীবনীমূলক এই কথাটি বিশেষ জোরের সঙ্গে বলেছেন। এবং 'ডার্ক লেডি

'ফেয়ার ফ্রেণ্ড', 'ডাইভাল লোয়েট' ইত্যাদি সব রহস্য সম্বন্ধেই যুক্তিসিদ্ধ অনুমান প্রয়োগ করেছেন।

এই জীবনীতে সাদাম্পটনের ভূমিকাটি যথাযথরূপেই বিস্তৃত ও গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছে। লণ্ডনের অন্যান্য জীবনাবর্তে সাদাম্পটনের বন্ধুত্ব ও তার অভিজাত পরিমণ্ডলের সাংস্কৃতিক আশ্রয় কবির আত্মনির্মাণ ও আত্মবিকাশে যে বিশেষ ফলপ্রসূ হয়েছিল তা সহজেই অনুমেয়। সাদাম্পটনের অস্থির, হঠকারী, গর্বোদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী চরিত্র কবিকে দুঃখ বেদনা আনন্দ তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে গভীরতর জীবনবোধ ও প্রজ্ঞার ভূমিতে নিয়ে যায়। তাই এই জীবনীতে শৈশব থেকে মধ্য যৌবন পর্যন্ত সাদাম্পটনের বিচিত্র, বন্ধুর জীবনের সুদীর্ঘ কাহিনী সন্নিবেশিত। তেমনি সাদাম্পটনের আত্মীয় উপদেষ্টা ও আদর্শকল্প এসেক্সের চিত্রও অনুরূপ বৈদগ্ধ্য প্রশ্নে পরিস্ফুটিত। এর কারণ আর কিছুই নয়। সেক্সপিয়ারের জীবন বন্ধুত্ব সূত্রে এই অভিজাত মণ্ডলীর সহিত নিবিড়ভাবে সংযুক্ত হয়ে পড়ে এবং এদের ভাগ্যের অভ্যুত্থান ও পতন তাঁকে স্বতঃই প্রভাবিত করে। ইংলণ্ডের তৎকালীন ইতিহাসের নায়কদের অদৃষ্টের সহিত কবির অদৃষ্টও পরোক্ষে কিছুটা জড়িত হয়ে পড়েছিল। তাই সমসাময়িক ইতিহাসও এই জীবনীগ্রন্থে এত বিস্তৃত স্থান অধিকার করে আছে।

কিন্তু শেক্সপিয়ারের জীবন তো শুধুমাত্র তাঁর প্রেম প্রণয় বন্ধুত্বের ইতিহাস নয় এবং হতে পারে না। কবি নাট্যকার শেক্সপিয়ার কী ভাবে তাঁর শিল্পকে আয়ত্ত করছিলেন মার্লো, লিলি, কীড, পীল, গ্রীন প্রভৃতি থেকে কেমন করে নীরব পরিত্যাগে করে স্বীয় সংগ্রহ করছিলেন এবং ধৈর্য ও নিষ্ঠার সঙ্গে ধীরে ধীরে শৈল্পিক উৎকর্ষের পথে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার বিচিত্র ইতিহাসও Rowse বিবৃত করেছেন একজন প্রবীণ শেক্সপিয়ার স্কলারের মতো। সেই সঙ্গে স্থানিক ও কালিক ঘটনার যা কিছু ছায়া বা স্পন্দন শেক্সপিয়ারের শিল্পের aeolian বীণাতে সুরঝঙ্কার তুলেছে তাও তিনি সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছেন। এর ফলে আমরা এমন একটি জীবনী লাভ করি যাতে সবগুলি সম্ভাব্য সূত্রের সমন্বয়িত বিন্যাস-প্রতিভাসে একটি পূর্ণাবয়ব চিত্র উদ্ঘাটিত হয়। এবং চিত্রটি নিরতিশয় জীবন্ত।

Rowse-এর এই অত্যন্ত চিত্তাকর্ষক জীবনীটি তাই এলিজাবেথীয় যুগের কয়েকটি দশকের অতি মূল্যবান ইতিহাসে সমৃদ্ধ। এবং সে-ইতিহাস শুধু রাজনৈতিক নয়,—একটি যুগের সর্বাবয়বের এমন সমাকলিত (integrated) আলেখ্য খুবই দুর্লভ। বিশেষ, সে-আলেখ্য একটি ব্যক্তির জীবনেতিহাসকে কেন্দ্র করে বিবৃত হওয়ায় যেমন উপন্যাসের মতো চিত্তাকর্ষক হয়েছে তেমনি জীবনীটির বস্তুগ্রথনেও (texture-এ) মহার্ঘতা সম্পাদন করেছে।

পরিশেষে আর একটি জিনিস বিশেষভাবে উল্লেখ করবো। তথ্য নির্বাচন ও বিশ্লেষণে ঐতিহাসিক যুক্তির অপূর্ব কুশলী প্রয়োগে শেক্সপিয়ারের জীবনের কয়েকটি অধ্যায়ে Rowse যে কিছু নূতন আলোক নিক্ষেপ করতে সমর্থ হয়েছেন তাতেও ভুল নেই। দুয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। শেক্সপিয়ার কখন কী ভাবে ষ্ট্রাটফোর্ড ছেড়ে লণ্ডনে চলে আসেন এবং তাঁর নটনাট্যকার জীবনের সূত্রপাত কীভাবে হয় সে সম্বন্ধে কাপসা অনুমান ছাড়া আর কোনো তথ্যনির্ভর সিদ্ধান্ত এযাবৎ উপস্থাপিত হয় নি। কিন্তু ষ্ট্রাটফোর্ড বরো কাউন্সিলের 1587 সালের নথিপত্র থেকে Rowse দেখিয়েছেন যে এযাবৎ অন্যূন পাঁচটি প্রামাণ্য নাটকের দল সেই সময়ে অভিনয় করতে এসেছিল। এর মধ্যে লর্ড লিসেস্টারের দলে এবং এ্যাডমিরালের দলে হঠাৎ নূতন অভিনেতার প্রয়োজন ঘটে। Rowse অনুমান করেন যে নাট্যোৎসাহী তরুণ শেক্সপিয়ার খুব সম্ভবতঃ এই সুযোগ গ্রহণ করেই এদেরই একটি দলে যোগদান করে লণ্ডনে চলে আসেন; এবং বুদ্ধি, দায়িত্ববোধ ও রচনা কুশলতার গুণে ধীরে ধীরে অভিনেতৃদলের

সঙ্গে নাট্যকারের খ্যাতি ও লাভ করেন। Rowse-এর এই অনুমানটি যে বিশেষ শ্রদ্ধার সহিত বিচার্য সে বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না।

অনুরূপ ভাবে, টমাস লোর্প কর্তৃক শেক্‌স্‌পিয়ারের সনেটগুচ্ছ প্রকাশ এবং সেই পুস্তকের উৎসর্গপত্রের যে-রহস্য ('W. H.' এবং onlie begetter' ইত্যাদি) এ যাবৎ শেক্‌স্‌পিয়ার বিশেষজ্ঞদের সব গবেষণা ও অনুমানকে পরাভূত করেছে সেই বিষয়েও Rowse-এর ঐতিহাসিক যুক্তি সার্থক আলোকপাতে সক্ষম হয়েছে বলতে হবে। Rowse বলেন যে সনেটগুলি সাদাম্পটনের কাছেই থাকা সম্ভব ছিল এবং সাদাম্পটনের গতিবিধির অনিশ্চয়তা হেতু তার কাছ থেকে তার মায়ের হেফাজতে চলে আসে। কাউন্টেস সাদাম্পটনের মৃত্যুর পর তাঁর সব কাগজপত্র তাঁর তৃতীয় তথা শেষ স্বামী উইলিয়ম হার্ভের হাতে পড়ে এবং তিনি এই সনেটগুলির সেই সূত্রে পান। শেক্‌স্‌পিয়ার তখন কবি ও নাট্যকার হিসেবে খুবই খ্যাতিমান লেখক। তাই তাঁর রচিত সনেটগুলি সাধারণে যথেষ্ট সমাদৃত হবে এই আশায় হার্ভে সেগুলি প্রকাশক টমাস লোর্পের হাতে দেন প্রকাশের উদ্দেশ্যে। লোর্প তাই ঐ সনেটগুচ্ছের উৎসর্গ পত্রে W. H. কে "onlie begetter" (মুখ্য সংগ্রহকারী এই অর্থে) আখ্যাত করেন। এই ব্যাসকূটের এটি যে একটি সন্তোষজনক ও যুক্তিগ্রাহ্য মীমাংসা তাতে ভুল নেই।

তেমনি সনেটে উল্লিখিত 'রাইভ্যাল পোয়েট' বা প্রতিদ্বন্দ্বী কবির হেঁয়ালিরও একটা ঘোটের উপর গ্রহণযোগ্য উত্তর দিয়েছেন Rowse। কিন্তু এইভাবে যুক্তি বাড়িয়ে লাভ নেই। বিচক্ষণ পাঠকের দৃষ্টিতে এরূপ উদাহরণ আরো ধরা পড়বে। যে ভাবে ঐতিহাসিক যুক্তি পারম্পর্য ও তথ্যবিন্যাসের সাহায্যে Rowse তাঁর এই অনুমান ও সিদ্ধান্তগুলি উপস্থাপিত করেছেন তার সারবত্তা ও গ্রহণযোগ্যতা যদি তর্কাতীত না ও হয় তা যে সম্রদ্ধ বিচার ও বিবেচনা আমন্ত্রণ করে তাতে সন্দেহ নেই। ফলকথা শেক্‌স্‌পিয়ারের বিপুল জীবনী সাহিত্যে Rowse-এর এই জীবনীটি একটি বিশেষ মূল্যবান সংযোজন। প্রত্যেক শেক্‌স্‌পিয়ার অনুরাগীর পক্ষে বইটি অবশ্য পঠনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঘোষাল

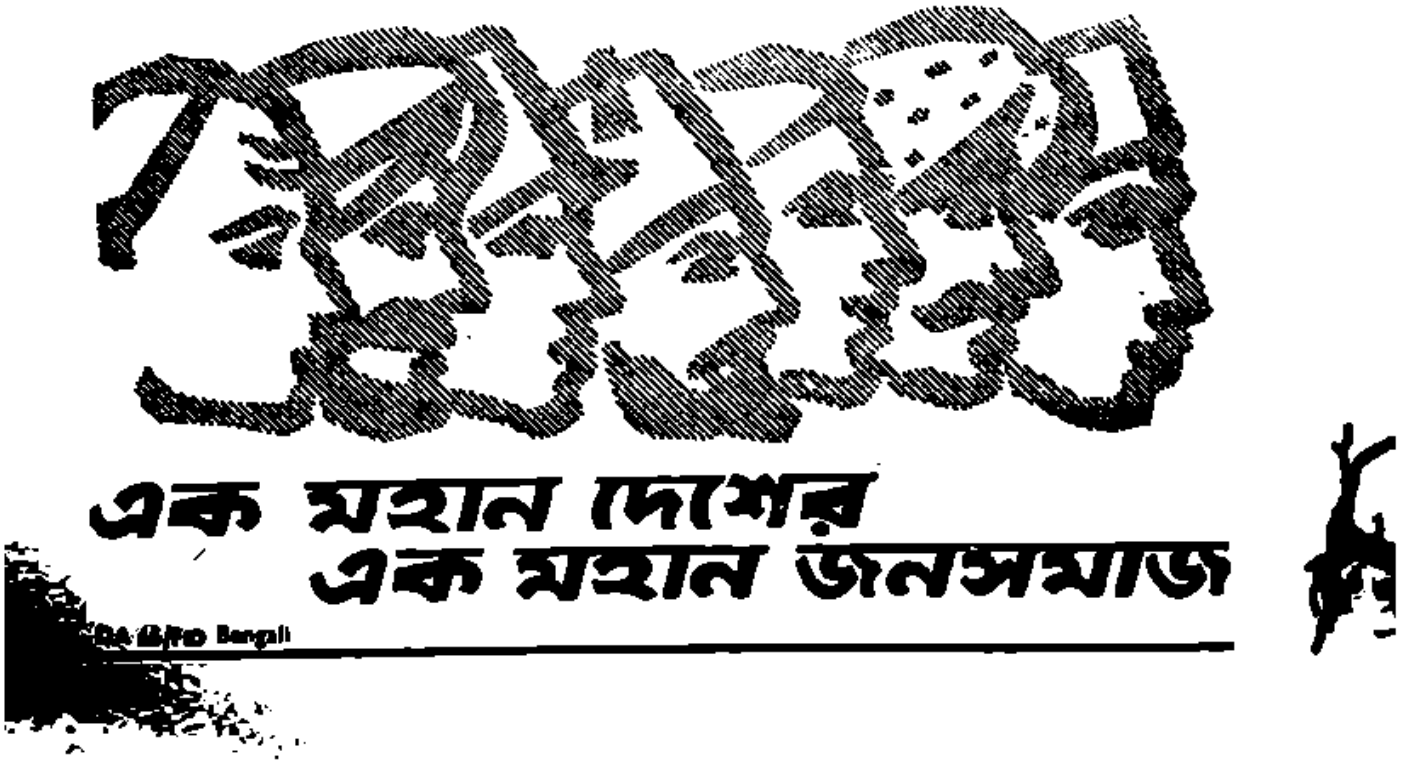

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY Private Ltd.

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY—1

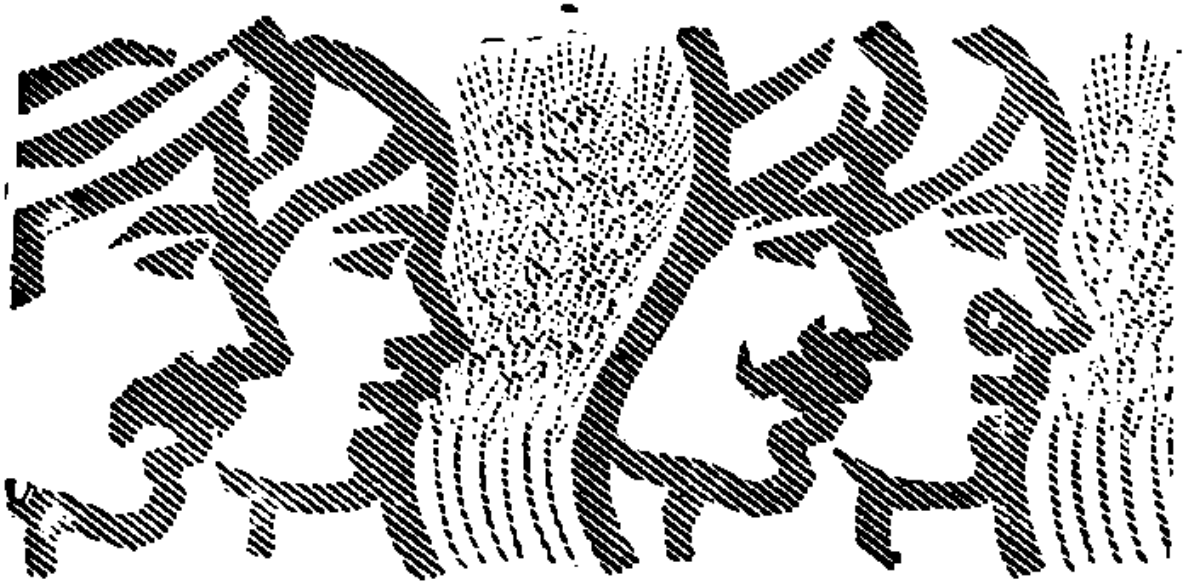

আমরা আমাদের কৃষকদের জন্য গর্ব বোধ করি। তাদেরই হাতের ছোঁয়ায় শস্য জন্মায়। খাদ্য চাই আমাদের সীমান্তরক্ষী জোয়ানদের জন্য, কারখানার শ্রমিকদের জন্য, আমাদের সকলের জন্য। উত্তরোত্তর আরো ফলন চাই। এই ভাবেই আমরা স্বাবলম্বী হতে পারব। আমাদের কৃষকরা জানে যে খাদ্য আমদানীতে আমরা যত কম খরচ করব, আমাদের উন্নয়ন ও প্রতিরক্ষার কাজে তত বেশী ব্যয় করতে পারব। কৃষকরা সমগ্র জাতির সেবায় রত। আপনিও তো তাই?

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ] ৮ম সংখ্যা [অগ্রহায়ণ ১৩৭২

সম্পাদকীয়

খাদ্য : লেভীর আতঙ্ক ও রেশন হ্রাস

ধান-চালের ঘনোপলি প্রকিওরমেণ্টের সরকারী নীতির প্রয়োগের বিরুদ্ধে যে প্রবল প্রতিবাদ উঠেছে, তাকে সরাসরি স্বীকৃতির দ্বিধাগ্রস্ত সরকারী নীতি বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের আয়োজনকে ব্যর্থ করে দিয়ে, ধারাত্মক বিপর্যয়ের মধ্যে আগামী বছর খাদ্য পরিস্থিতিকে ঠেলে দেবে, যদি না এখনও সরকার তৎপর হয়ে তাদের ভ্রান্ত নীতির পরিবর্তন করেন। আমরা ইতিপূর্বে বলেছি জমির পরিমাণের উপর লেভীর পরিমাণ নির্ধারণের পদ্ধতি অবৈজ্ঞানিক ও সামাজিক ন্যায় বিচারের দিক থেকে চূড়ান্তরূপে অযৌক্তিক। এই পদ্ধতির পরিবর্তে কৃষকের উৎপাদনের পরিমাণের উপর লেভির পরিমাণ নির্দিষ্ট হওয়া কর্তব্য। কারণ বিভিন্ন জমিতে উৎপাদনের হার বিভিন্ন। সরকার এই যুক্তিকে স্বীকার না করে গত ১৪ই ডিসেম্বর একটি অস্পষ্ট ঘোষণার দ্বারা জানিয়েছেন প্রয়োজনবোধে জেলা শাসকদের সেচসিক্ত এলাকার পাঁচ একরের এবং সেচমুক্ত এলাকার সাত একরের অধিক জমিসম্পন্ন কৃষকদের ওপর লেভির নোটিশ জারীর অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং এদের চাইতে অল্প জমিসম্পন্ন কৃষকদের-সেচসিক্ত ও সেচমুক্ত এলাকায় যথাক্রমে ১½ ও ২একরের উর্ধ্বে—পরিমিত লেভি স্বেচ্ছায় বিক্রয় করতে উৎসাহিত করতে হবে। অর্থাৎ লেভির পরিমাণ জমির সঙ্গেই সম্পর্কিত হয়ে রইলো এবং লেভির স্তরও অপরিবর্তিত রয়ে গেল, কেবলমাত্র আইনের কড়াকড়ি থেকে পাঁচ একরের ও সাত একরের নীচে জমির মালিকদের কাগজে-কলমে রেহাই দেওয়া হল যদিও বাস্তব ক্ষেত্রে লেভির বাধ্যবাধকতা থেকে তারা রেহাই পেল না। এ-ছাড়া কৃষকের পরিবারভুক্তদের খোরাকের ছাড় এবং বীজধানের সংস্থান রেখে লেভির পরিমাণ নির্ধারণের যে দাবী ছিল, তা সরকারী মহলে আমল পায় নাই। ধানের দর যথাক্রমে ১৮৲ ১৯৲ ২০৲ টাকা মণ ধার্য করার দাবীও সরকার গ্রহণ না করে কুইন্টল প্রতি দর দেড় টাকা মাত্র বৃদ্ধি করেছেন। তার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষক আগামীবারে ফসল উৎপাদনে অনাগ্রহী হবে। কিন্তু সম্পন্ন কৃষক ও জোতদারেরা লেভি দেবার ও খোরাকী রাখবার পর উদ্বৃত্ত ধান-চাল যে কোনো চড়া মূল্যে নূতন ব্যবস্থায় পরিমিত

খোলাবাজারে বিক্রয় করে মুনাফা লুটবে। কারণ কোনো নির্দিষ্ট দরে এই ধান-চাউল বিক্রয়ের বাধ্যবাধকতা এদের থাকবে না।

সরকারের হিসাব অনুযায়ী নূতন ধান ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই দরিদ্র কৃষকেরা যে ধান অল্প মূল্যে (distress sale) বিক্রয় করে, তাদের মূল্য দিয়ে তাদের কাছ থেকে অনায়াসে পাঁচ লক্ষ টন সংগৃহীত হতে পারে। তাই যদি হয়, অবশিষ্ট দশ লক্ষ টন সংগ্রহের জন্য ১৪ লক্ষ কৃষকের উপর লেভি ধার্য না করে দশ একর বা তদূর্ধ্ব জমির মালিকদের উপর লেভি ধার্য করলেই উপরোক্ত ধান সংগৃহীত হতে পারে। কৃষি পরিবারের শতকরা দুই ভাগ দশ একর বা তদূর্ধ্ব জমির মালিক এবং এদের হাতে কর্ষিত জমির এক তৃতীয়াংশেরও অধিক জমি ন্যস্ত হয়েছে। সুতরাং স্বল্প জমির চাষীদের ওপর লেভির খড়্গ প্রয়োগের কোনো প্রয়োজন ছিল না।

রেশনিং-এর সম্ভাব্য পরিণতিও ভয়াবহ। বিধিবদ্ধ রেশনিং-এর পরিমাণ সপ্তাহে ২'৪০০ কিলো থেকে ১'৯০০ কিলোতে কমিয়ে আনা হয়েছে। ২'৩০০ কিলোই যৎকিঞ্চিৎ। রেশনের পরিমাণ আরও কমিয়ে আনা হবে। তার মধ্যে চালের পরিমাণ অনেকটা কমে যাবে। বাকীটা গম দিয়ে পূরণের প্রতিশ্রুতি থাকলেও গমের যোগানই যেখানে অনিশ্চিত হয়ে গেছে এই প্রতিশ্রুতি সে অবস্থায় মূল্যহীন। কেন্দ্র এবার এক লক্ষ টন চাল দেবে, গতবারের তিন লক্ষ টনের জায়গায়। গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে রেশনের বৈষম্য দূর করতে নাকি পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী উদগ্রীব। অভাবের সমবণ্টনের নীতি গ্রহণ করে মডিফাইড রেশনিং-এর যে বিভীষিকা গ্রামাঞ্চলে সৃষ্টি হয়েছে তা শহরাঞ্চলে ছড়িয়ে দিতে তিনি উদ্যোগী হবেন। শহরের রেশনে কাঁচকলা আর আলু দিয়ে তার শুরু হবে।

লোকসভায় কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর খাদ্য বিতর্কে বক্তব্যের মধ্যে [illegible] ৪৮০ খাদ্যের উপর আকুল নির্ভরতা ও কম খাবার অনিবার্যতা প্রধান স্থান দখল করেছে। খাদ্যমন্ত্রী দুর্ভিক্ষের পদধ্বনির সম্ভাবনায় বলেছেন "Unless consumption of grain was drastically cut the country would not be able to tide over the crisis." ভয়াবহ অনাবৃষ্টির ফলে এবছর উৎপাদনে আনি লক্ষ টন ঘাটতির ওপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে সরকার রেহাই পাবেন না। প্রতিরক্ষা ও খাদ্যোৎপাদনকে সমান গুরুত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি, ১৯৭০-৭১-এর মধ্যে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার উদ্যোগ, কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রীর এই কাঁকাবুলিতে ক্ষুধার্ত মানুষের পেট ভরবে না। ১৯৭৬ সালে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কঠিন পরীক্ষা হবে। এই পরীক্ষায় উত্তরণের পর স্বয়ং-সম্পূর্ণতার স্তোকবাক্যের যাচাই হবে। কারণ ১৯৫১ সন থেকে এই স্তোকবাক্যের বন্যা বয়ে চলেছে।

সম্ভাব্য চীনা আক্রমণ : তাসখন্দ

ভারতের উত্তর সীমান্তে তের থেকে ষোল ডিভিসন চীনা সেনাবাহিনীর সমাবেশ, লাডাক অঞ্চলে 'line of actual control' লঙ্ঘন করে ৩০০০ হাজার চীনা সৈন্যের প্রবেশ, নিরস্ত্রীকৃত এলাকায় নূতন সামরিক আয়োজন, উত্তর সিকিমে বার বার সীমান্ত লঙ্ঘন ও সেদো লা এলাকায় ৩০০ চীনা বাহিনীর সহিত ভারতীয় টহলদারী বাহিনীর সংঘাত, নেফায় কামেং ও সিয়াং ডিভিসনে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ এবং সামরিক প্রস্তুতি গুরুতর পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছে। ১৯৬২তে চীনাদের একপাক্ষিক যুদ্ধবিরতি ঘোষণা, কলম্বো প্রস্তাব এবং এই অঞ্চলগুলিতে সামরিক ঘাঁটি ঘুরে থাকুক কোনো বেসামরিক ঘাঁটি তৈরী না করার ১৯৬৩এর মার্চে প্রদত্ত চীনা প্রতিশ্রুতি লঙ্ঘন করে চীনাদের এই নূতন সামরিক অভিযানের আশু লক্ষ্য ভারত সীমান্তে উত্তেজনা বৃদ্ধি করে আগামী ৪ঠা জানুয়ারী তাসখন্দে পাক-ভারত বৈঠকের পথে অন্তরায় সৃষ্টি হলেও অন্তিম লক্ষ্য সম্বন্ধে ভুল বোঝার কোনো অবকাশ

নাই। উত্তর সীমান্তে প্রচুর সেনা সমাবেশ ও লাদাক থেকে লাদাখ পর্যন্ত ব্যাপক সীমান্ত লঙ্ঘন শীতের পর ভারতের উপর চীনা আক্রমণের সুস্পষ্ট সামরিক নোটিশ। ভারতের আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রস্তুতি এই মূল ভিত্তিভূমির উপর নির্ধারণ করা ভারত সরকারের অনিবার্য কর্তব্য। পাকিস্তানও দ্বিতীয় আক্রমণের জন্য এই সুযোগের অপেক্ষায় থাকবে। গত ১৩ই ডিসেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘে আয়ুবের বক্তৃতায় তাসখন্দ আলোচনা ব্যর্থতার পূর্বাভাষই পাওয়া গেছে।

তাসখন্দ বৈঠকে ভারতের উপস্থিতি অনেকটা সোভিয়েত রুশের ধন ও মান রক্ষার জন্য। এশীয় মহাদেশে এই প্রথম রুশের উদ্যোগে একটি আন্তর্জাতিক বৈঠক আহ্বান করে সোভিয়েট রুশ এশীয় শক্তিরূপে যেমন স্বীকৃতি পেল,—চীনারা এ-যাবৎ যার বিরুদ্ধাচরণ করেছে,—তেমনি ভারত উপমহাদেশের এই অঞ্চলে একদিকে চীনের প্রভাব খর্ব করবার এবং অপরদিকে পশ্চিমী শক্তিবর্গের সমকক্ষতার দাবীর তাগিদও এই বৈঠক আহ্বানে কাজ করেছে। পূর্ব-প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাসখন্দে কাশ্মীর সম্পর্কিত আলোচনায় সম্মত হওয়া অসম্ভব এবং অন্যান্য ভারত-পাক সম্পর্কিত সমস্যাগুলি কাশ্মীর সমস্যার তুলনায় একেবারেই গৌণ। অপরপক্ষে পাকিস্তানী প্রেসিডেন্ট কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপনে প্রতিশ্রুত। তাসখন্দের বৈঠক পাকিস্তানকে সেই সুযোগ আর একবার এনে দিয়েছে, যদিও তার ব্যর্থতা অনিবার্য। ভারতবর্ষ আক্রমণ করে, যুদ্ধবিরতির সর্ত বার বার লঙ্ঘন করে এবং ভারতের বিরুদ্ধে নূতন উদ্যোগে সামরিক আঘাতের মহড়া নিয়েও যে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে সরাসরি বৈঠকের এবং সেই বৈঠকে কাশ্মীর সমস্যা সামরিক উত্থাপনেরও যে সুযোগ পাবে এটাই পাকিস্তানের পক্ষে কূটনৈতিক জয়। এই কূটনৈতিক জয়ের প্রচারে তথ্য অনোবল পাকিস্তানীদের মনে আক্রমণাত্মক ভারত-বিদ্বেষের উৎসাহ সঞ্চারের সুযোগে আয়ুবের তৎপরতা বৃদ্ধি পাবে। তাসখন্দ বৈঠকের আমন্ত্রণে গোড়ায় সাড়া না দিয়ে পাকিস্তান যে কূটনৈতিক ভুল করেছিল, বৈঠকে যোগদান করে তুলও যেমন শুধরে নিলো, সামরিক হলেও কূটনৈতিক জয়ও লুটে নিলো।

গণতন্ত্রের ব্যভিচার

গত ৩০শে নভেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নূতন খাদ্যনীতি সম্পর্কে বিধান সভায় বিতর্ক শুরু হলে, সেদিন প্রজা সোস্যালিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে বিধান সভায় একটি বিক্ষোভ মিছিল পরিচালিত হয় এবং এই সমাবেশের পক্ষ থেকে এই পার্টির পাঁচজন প্রতিনিধি খাদ্যনীতি সম্পর্কে পার্টির বক্তব্য সম্বলিত একটি স্মারক লিপি নিয়ে বিধান সভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। তাদের বক্তব্য শুনতে মুখ্যমন্ত্রীর অসম্মতি অগণতান্ত্রিক আচরণে পরিণত হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রতিনিধিদের তার ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে বলেন। এই প্রতিনিধি দলে দুইজন প্রজা সোস্যালিষ্ট সদস্য বিধান সভার সদস্য ছিলেন। এই ঘটনার পর বিধান সভার পর পর দু' দিন বিরোধীরা সমবেতভাবে মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের তীব্র নিন্দা করে বিধান সভায় উপস্থিত হয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে এ-ঘটনা সম্পর্কে তার বক্তব্য উপস্থাপনের দাবী জানানো সত্ত্বেও মুখ্যমন্ত্রী তাদের এই দাবী উপেক্ষা করে বিধান সভায় আদৌ উপস্থিত হন না। মুখ্যমন্ত্রীর এই অগণতান্ত্রিক আচরণে দুই দিন বিধান সভার কাজ অচল হয়ে দৈনিক প্রায় ৭০০০ টাকা অপচয় হয়। শেষে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিধান সভা বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর অবশ্য অনোপচারিভাবে মুখ্যমন্ত্রী বিরোধীদের সঙ্গে মিলিত হলে ঘটনাটির মীমাংসা হয় এবং মুখ্যমন্ত্রী বিধান সভায় বিরোধীদের সঙ্গে যোগাযোগ সম্পর্কের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এই ঘটনার উপর যবনিকা টানেন।

বিধান সভাকে অগ্রাহ্য করে অশোভন ঔদ্ধত্য দেখিয়ে মুখ্যমন্ত্রী গণতন্ত্রের সমাধি রচনার কাজেই অগ্রসর হয়েছেন। একটি গণতান্ত্রিক বিরোধীদলের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যে কোনো

কারণেই হোক অসদাচরণ করার পর যে কোনো গণতান্ত্রিক মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি ত্রুটি স্বীকার নিজের গৌরব যেমন বৃদ্ধি করতেন, গণতন্ত্রের প্রতিও মর্যাদা দিতেন। তাছাড়া, ঘটনাটা শুধু বিধান সভার সদস্যদের নিয়ে নয়, বিধান সভার সদস্য ছাড়াও প্রতিনিধিদের মধ্যে প্রজা সোস্যালিষ্ট দলের বিশিষ্ট কর্মকর্তারা ছিলেন। সুতরাং, ঘটনাটি বিধান সভার সদস্যদের প্রতি মুখ্যমন্ত্রীর আচরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে মুখ্যমন্ত্রী ও সরকার পক্ষ গণতান্ত্রিক মানদের পরিচয় না দিয়ে সঙ্কীর্ণতার পরিচয় দিয়েছেন। এই মনোভাবও গণতন্ত্রের পক্ষে শুভ নয়।

বিশ্ববিদ্যালয় বিল

সাম্প্রতিক কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ অগ্রাহ্য করে পশ্চিমবঙ্গ সরকার বেআইনিভাবে জোরে বিলটি বিধান সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছেন। বিশ্ববিদ্যালয় বিল নিয়ে বিতণ্ডা শুধু রাজ্য বিশেষে সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি অন্ধ্রেও এই ঘটনা ঘটেছে এবং অন্ধ্রের বিলকে উপলক্ষ্য করে পার্লামেন্টেও আলোচনা উঠেছিল। এই সব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় শিক্ষা মন্ত্রী প্রতিটি রাজ্যে অনুরোধপত্র দিয়েছিলেন, যেন বিশ্ববিদ্যালয় আইনের সংশোধনের পূর্বে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রালয়ের সঙ্গে আলোচনা করে নেওয়া হয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিলের আলোচনা স্থগিত রাখবার জন্য বিরোধীরা এই পত্রের উল্লেখ করেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রী এই অনুরোধপত্রকে উপেক্ষা করে বিলের আলোচনা মুলতুবী রাখার বিরোধিতা করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাদের সাত শত সংশোধনী প্রস্তাবের একটিও গ্রহণ না করে ভোটের জোরে বিলটি বিধান সভায় পাশ করিয়ে নিয়েছেন। গভর্নরের চ্যান্সেলার রূপে নিয়োগ, চ্যান্সেলার কর্তৃক ভাইস-চ্যান্সেলার নিয়োগ, দুইটি প্রো-চ্যান্সেলার নিয়োগ, সিনেটের ক্ষমতা হ্রাস, সিনেট, সিন্ডিকেট ও একাডেমিক কাউন্সিলে সরকারী মনোনীতের সংখ্যাবৃদ্ধি, সদস্য কলেজের ওপর বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব খর্ব করে সরকারী কর্তৃত্ব আরোপ, বিলের এই বিধানগুলির ফলে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর সরকারী কর্তৃত্ব বৃদ্ধি অনিবার্য। সদস্য কলেজগুলি সম্পর্কিত বিলের বিধানগুলির সম্পর্কে মতামত জ্ঞাপনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই কমিটির সুপারিশগুলি পর্যন্ত প্রকাশিত হবার অপেক্ষায় বিলের আলোচনা স্থগিত রাখতে সরকারী ধৈর্যের অভাব, বিলের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলিই সপ্রমাণ করে।

সোভিয়েট রুশে পটপরিবর্তন

গত ১৪ই নিসেম্বর সোভিয়েট রাষ্ট্রপতি মাইকোয়ান পদত্যাগ করেছেন এবং নিকোলাই পডগর্নি ও তার স্থলবর্তী মনোনীত হয়েছেন। এছাড়া আলেকজাণ্ডার সেলিপিন সরকারী দায়িত্ব থেকে অপসারিত হয়ে পার্টি চক্রে পডগর্নির স্থলবর্তী হয়ে ব্রেজনেভের সহকারী হবেন। ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কিছুদিন পূর্বে যখন সোভিয়েট রুশ সফরে গিয়েছিলেন, সে সময়ই মাইকোয়ানের পদত্যাগের সম্ভাবনা তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রীয় পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ রুশ বিপ্লব আন্দোলনের শেষ বলশেভিক নায়ক মাইকোয়ানের ভাগ্যেই সম্ভব হয়েছে। সেলিপিনের অপসারণ ও নিরোধ স্বেচ্ছায় হয়েছে বলে মনে হয় না। পার্টির তাগিদেই এই পরিবর্তন হয়েছে, এবং এই পরিবর্তনের ঘাত-প্রতিঘাত আগামী দিনে উন্মোচিত হবে। মাইকোয়ান ও পডগর্নি উভয়ে ১২-সদস্য বিশিষ্ট পার্টি প্রেসিডিয়ামে বহাল থাকলেও, আগামী দিনের পার্টি রাজনীতি ব্রেজনেভ-সেলেপিন-কোসিজিন চক্রের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ধারণ করবে। পডগর্নি পার্টির গুরুত্বপূর্ণ পদ থেকে আপাতত রাষ্ট্রীয় আলঙ্কারিক পদে উন্নীত হয়েছেন। সুতরাং পার্টির টানা-পোড়েনে পর্দার আড়ালে তার ভূমিকা নির্দিষ্ট হয়ে রইলো, প্রত্যক্ষ ভূমিকা রইলো ব্রেজনেভ-সেলেপিন-কোসিজিন—এই ত্রয়ীর।

১৭. ১২. ৬৫

স্বাধীন পূর্ববাংলা আন্দোলন

সমর গুহ

সতের বছরের পাক-শাসনে পূর্ববাংলার সামগ্রিক জীবনে আজ এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটেছে। স্থলপথে ২০০০ এবং জলপথে ৩০০০ মাইল ব্যবধানে অবস্থিত এবং ঐতিহাসিক, ভৌগলিক, নৃতাত্ত্বিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক সত্তার সম্পূর্ণরূপে বিপরীত প্রকৃতিতে সংগঠিত পূর্বাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চল পাক ভূখণ্ড দুইটির বাস্তব সম্পর্কের যে অভিজ্ঞতা পাকিস্তানী আমলের গত দেড়যুগ ধরে পূর্ববাংলা সঞ্চয় করেছে তার পরিণামে পূর্ববাংলার রাজনৈতিক এবং জাতীয় অনুভূতিতে এক সম্পূর্ণ নতুন চেতনা সৃষ্টি হয়েছে। এই চেতনার আলোকে পূর্ববাংলার অধিবাসীরা আজ একথা উপলব্ধি করেছে যে ইতিহাস, ভূগোল, ভাষা, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রক্ত ও বংশের ঐতিহ্যে এই দেশের অধিবাসীরা জাতি হিসাবে মূলত বাঙালী। এই জাতীয়তার অনুভূতির আবেষ্টনে পূর্ববাংলার অধিবাসীরা আজ একথা উপলব্ধি করেছে যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে স্বাভাবিক, স্বতঃস্ফূর্ত সহ-মর্মবাণী এবং সহ-স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নেই। বিভাগ-পূর্ব ভারতে হিন্দু আধিপত্যের যে ভীতির পটভূমিতে মুসলীম জাতীয়তার উদ্ভব হয়েছিল আজ সেই ভীতি বিলুপ্ত। হিন্দু-আধিপত্যের ভীতি পশ্চিম পাকিস্তানে নিশ্চিহ্ন এবং পূর্ববাংলার তা অতীতের বস্তু। পূর্ববাংলার জীবনে এই সতের বছরের বাস্তব পরিচয়ে বরং নতুন ভাবে এক পশ্চিম পাকিস্তানী বিভীষিকা সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তান জাতীয় জীবনে আজ উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতীক মাত্র এবং পাকিস্তানী ঐক্যের আদর্শও পূর্ববাংলার উপরে পশ্চিম পাকিস্তানী শাসন ও শোষণ অক্ষুণ্ণ রাখার এক সুকৌশল রাজনৈতিক চাতুর্য মাত্র। এই সতের বছরে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববাংলাকে এমন এক দুর্ভাগ্যের আবর্তের মধ্যে ঠেলে দিয়েছে যে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে নিজেদের ভাগ্যকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনা ছাড়া পূর্ববাংলার পক্ষে বাঁচবার অন্য কোন উপায় নেই। পূর্ববাংলার বাঙালীরা একটি জাতি এবং জাতীয়তার মৌলিক ভিত্তিতেই এদেশের অধিবাসীরা আজ একটি সম্পূর্ণ স্বাধীন পূর্ববঙ্গ রাষ্ট্র গঠন করতে চায়। আজ পূর্ববাংলার বাঙালীর এটাই জাতীয় আদর্শ এবং সংগ্রামের লক্ষ্য।

মুসলীম লীগের লাহোর প্রস্তাবের যে পাক-প্রকল্পের ভিত্তিতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে সে প্রস্তাবেই সুস্পষ্ট নির্দেশ ছিল যে ভারত ভাগের পরে পশ্চিমাঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চলে আরেকটি "স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন করতে হবে।" কিন্তু ভারত-ভাগের সময়ে বৃহৎ রাষ্ট্র গঠনের আগ্রহে এই নির্দেশকে অগ্রাহ্য করা হয়। কয়েকজন দূরদর্শী বাঙালী মুসলীম নেতা একটি পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু মুসলীম জাতীয়তাবাদ এবং পাকিস্তানী আবেগ তখন এত প্রবল ছিল যে সে সময়ে এই বিরোধিতাকে সক্রিয় রূপ দেওয়া সম্ভব হয় নি পূর্ববাংলার নেতাদের পক্ষে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে পাক গঠনতন্ত্র রচনার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাম্রাজ্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গী পূর্ববাংলার মনে স্বায়ত্ত-শাসনের মনোভাব জাগ্রত করে। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন এই মনোভাবকে তীব্রতর করে তোলে এবং পরবর্তী কালে পূর্ববাংলার উপরে একচ্ছত্র পশ্চিম পাকিস্তানী কর্তৃত্ব এবং অর্থনৈতিক শোষণ বাঙালীর আত্ম-

নিয়ন্ত্রণের দাবী আরও প্রবল আকারে সক্রিয় করে দেয়। অনেকদিন পর্যন্ত পূর্ববাংলার অনেক নেতার ধারণা ছিল যে অচিরেই পশ্চিম পাকিস্তানের শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং পূর্ববাংলা তার সম-মর্যাদা ও সম-অধিকার লাভ করবে। কিন্তু গোলাম মহম্মদের পাঞ্জাবী-শাসন এবং আয়ুবশাহীর অভ্যুদয় তাদের সেই আশাকে সম্পূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়েছে। পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভিত্তিতে একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠন আজ তাই পূর্ববাংলার অন্তিম লক্ষ্য।

স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন আজ পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক লক্ষ্য হলেও 'পূর্ণ স্বাধীনতা' শব্দটি প্রকাশ্যে ব্যবহার করা সম্ভব নয়। লিয়াকৎ আলী প্রবর্তিত এবং গোলাম মহম্মদ, মীর্জা, ইস্কান্দার ও পিণ্ডি-নেতা আয়ুবের অনুসৃত আইন অনুযায়ী এরূপ উক্তি রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই অপরাধের জন্য নিম্নে পাঁচ বছর ও উপরে মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত নির্দিষ্ট। তাই পূর্ববাংলার রাজনীতিকরা তাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের লক্ষ্যরূপে আইন বাঁচিয়ে যে শব্দগুলি ব্যবহার করে তা' হলো —'পূর্ণ স্বায়ত্বশাসন' 'পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার' 'complete and full autonomy', 'complete self-determination having slender link with the centre' ইত্যাদি। কয়েক বছর ধরে পূর্ণ স্বাধীনতার লক্ষ্যটি পরোক্ষভাবে তুলে ধরা হচ্ছে জনসাধারণের সামনে। প্রতি বছর ২৩শে মার্চ যে 'পাকিস্তান-দিবস' উদ্‌যাপিত হয় সে দিনে পূর্ববাংলার কাগজগুলিতে বড় বড় হরফে লাহোরের পাকিস্তান প্রস্তাবের সেই অংশটি প্রথম পৃষ্ঠায় বক্স করে ছাপান হয়,— যার মধ্যে সুনির্দিষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে "That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be so constituted with such territorial re-adjustments as may be necessary that the areas in which the Muslims are numerically in a majority as in the *North Western and Eastern zones of India should be grouped to constitute "Independent States,"* in *which the constituent units shall be autonomous and sovereign.*"

পিণ্ডি-নেতা আয়ুব পূর্ববাংলার বিদ্রোহী মনোভাবের গুরুত্ব উপলব্ধি করেছেন এবং সেইজন্য ১৯৬৫ সালের নির্বাচনী প্রচারের সময়ে তিনি স্পষ্টভাষায় বলেছেন যে "পূর্ববাংলার বিরোধী দলগুলি বাঙালী জাতীয়তার ভিত্তিতে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন করতে চায়।" কিন্তু এরূপ মনোভাবকে তিনি 'বিশ্বাসঘাতকতা'র সমতুল্য বলে আখ্যা দিয়েছেন এবং এই বলে পূর্ববাংলার অধিবাসীদের ভীতি প্রদর্শন করেছেন যে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ববাংলার পক্ষে স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা সম্ভব নয় (not viable) এবং এরূপ স্বাধীন সত্তা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে এক করে পূর্ববাংলার উপর 'হিন্দু গোলামী' পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে পূর্ববাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করা। তাই, এই পাঞ্জাবী ডিক্টেটর স্বাধীন পূর্ববঙ্গ গঠনের আন্দোলনকে 'ভারতীয় চর'দের এক 'চক্রান্ত' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

আয়ুবশাহীর এই ভীতি-প্রদর্শনের ভিত্তি একটু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে যে কৌশলী প্রেসিডেন্টের এই অভিযোগ সম্পূর্ণ অমূলক। আয়ুবশাহীর প্রাথমিক যুগ পর্যন্ত একটি সময় ছিল যখন পূর্ববাংলার প্রতিটি স্বায়ত্ব-শাসনকামী বাঙালী নেতাকে করাচী ও পিণ্ডির শাসকেরা 'দেশদ্রোহী' ও 'ভারতের চর' বলে আখ্যা দিয়েছেন। জননেতা হুসেন শহীদ সুরাবর্দীকে ১৯৫৩ সালের নির্বাচনের পরে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী "আত্মস্বীকৃত বিশ্বাসঘাতক" ("Self-confessed traitor") বলে অভিহিত করেছেন। জনাব শহীদ সুরাবর্দীকে 'বরহক' লিয়াকৎ আলী "ভারতীয় পাগলা কুকুর" ("the mad dog let loose by India") বলে বলেছিলেন। মৌলানা ভাসানীকে বহুবার "ভারতের

দালাল' বলা হয়েছে। মুজিবুর রহমান, আতাউর রহমান, আবুহোসেন সরকার এবং অন্যান্য নেতারা প্রত্যেকেই পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের কাছ থেকে 'ভারতের দালাল' আখ্যা লাভ করেছেন। কিন্তু এই 'ভারতীয় দালাল'দেরকে ডেকে নিয়ে আবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, গভর্নর প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ইত্যাদি পদে করাচী ও দিল্লির নেতারা বারবার বসিয়েছিলেন। পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুব 'ভারতের দালাল' মৌলানা ভাসানীকেই কয়েকবার চীন-যাত্রী পাক-ডেলিগেশনের নেতা করে পাঠিয়েছেন। তাই, করাচী ও দিল্লির এই অভিযোগগুলি যে নিতান্তই পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে খর্ব করবার উদ্দেশ্যে প্রযুক্ত রাজনৈতিক গালিগালাজের সামিল একথা বুঝতে পূর্ববাংলার মানুষের মনে অসুবিধা হয়নি এবং এরূপ কটূক্তি সত্ত্বেও এই নেতাদের তারা বাঙালী জাতির নেতা বলে গ্রহণ করেছে এবং অজস্রবার লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় পূর্ববাংলার মানুষ এই নেতাদের আহ্বানে পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলনকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করেছে। তাই, আজ স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা গঠনের দাবী শুধু মুষ্টিমেয় নেতাদের দাবী নয়,- সমগ্র পূর্ববাংলার গোটা বাঙালী সমাজের আন্তরিক ও সার্বিক দাবী।

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে পূর্ববাংলার পক্ষে কি নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা যথার্থই অসম্ভব? মিশর, সুদান, টিউনিসিয়া, আলজেরিয়া, মরক্কোর পক্ষে স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে টিকে থাকা সম্ভব হচ্ছে কি করে? ঘানার কি করে আজ একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র? পূর্ববাংলার যে পাট সম্পদ আছে তার ভিত্তিতেই পূর্ববাংলার পক্ষে আর্থিক সম্পদে শুধু টিঁকে থাকা নয়,—প্রগতি সাধন করাও সম্ভব। জাতি হিসাবে বাঙালীর প্রতিভা এত তীক্ষ্ণ যে যথার্থ পরিবেশ ও সুযোগ পাওয়া সম্ভব হলে স্বাধীন পূর্ববাংলাকে একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্রে পরিণত করার পূর্ণ সম্ভাবনা রয়েছে।

পূর্ব বাংলা স্বাধীন হলে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষে আর্থিক দিক থেকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে নিজের অস্তিত্ব রক্ষা করা কঠকর হবে। পূর্ববাংলার প্রায় একচেটিয়া পাট সম্পদ আছে, পশ্চিম পাকিস্তানের আছে কিছু তুলা। পশ্চিম পাকিস্তানে বিশেষ কোন খনিজ সম্পদও নেই। সমগ্র পাকিস্তানের প্রায় ৬৫ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা সঞ্চিত হয় পূর্ববাংলা থেকে। পূর্ববাংলার অনগ্রসর দেখিয়েই পাকিস্তান বৈদেশিক সাহায্য লাভে সক্ষম হয়। যে সামরিক সাহায্যের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শক্তি গঠন করা সম্ভব হয়েছে তা'ও পূর্ববাংলার বৃহত্তর জনসংখ্যা দেখিয়ে। পূর্ব বাংলার আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য, শিল্প-সম্পদ এবং ব্যাঙ্কারের একচেটিয়া কর্তৃত্ব রয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে। পূর্ববাংলার রাজস্বের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের ৯০ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানী আমলাতন্ত্র পোষণের ভার বৃহদাংশে নির্ভর করে। সুতরাং পূর্ববাংলা বিচ্ছিন্ন হলে বরং পশ্চিম পাকিস্তান আর্থিক সংকটের সম্মুখীন হবে। তাই, স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে পাকিস্তানের অস্তিত্ব পূর্ববাংলার উপরে নির্ভরশীল বলেই স্বাধীন পূর্ববাংলার অস্তিত্ব ও স্থায়ীত্ব সম্বন্ধে অমূলক প্রচার করা হচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের পক্ষ থেকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কোন উপনিবেশের স্বাধীনতার দাবী প্রতিরোধ করার জন্য যে সমস্ত যুক্তি উত্থাপন করা হতো এবং এখনও করা হয়,—পশ্চিম পাকিস্তান স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের সম্ভাবনা সম্বন্ধে সেই একইরূপ সাম্রাজ্যবাদী যুক্তি ও বিভীষিকা সৃষ্টি করার প্রচেষ্টায় উগ্র তৎপরতা প্রদর্শন করছে নিজেদের স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে।

বিভাগ-পূর্ব ভারতীয় জাতীয়তাবাদ এবং রাজনৈতিক মানসিকতার দৃষ্টিভঙ্গীতে পূর্ববাংলার ভবিষ্যতের কথা বিচার করলে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে ভারতীয় ইউনিয়ন প্রথম সুযোগেই স্বাধীন পূর্ববাংলাকে পশ্চিম বাংলার সঙ্গে এক করে দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করবে। কিন্তু গত সতের বছরে পশ্চিম বাংলার এবং

ভারতীয় নেতৃত্বের মানসিকতার যে আমূল রূপান্তর ঘটেছে এবং যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, স্বার্থবোধ ও ক্ষমতা-চক্রের সৃষ্টি হয়েছে তার তাৎপর্য উপলব্ধি করলে নিঃসংশয়ে এই সিদ্ধান্ত করা যায় যে পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতীয় নেতৃত্ব পূর্ববাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করতে এখন আর আগ্রহী বা উন্মুখ নয়, —বরং এরূপ ঐক্য ও অন্তর্ভুক্তির বিরোধী মনোভাবই সৃষ্টি হয়েছে আজ ভারতীয় রাজনীতিতে।

পূর্ববাংলায় আজ যে বাঙালী জাতীয়তাবোধের সৃষ্টি হয়েছে তার প্রগতির কথা চিন্তা করেও দুইবাংলার ঐক্য স্থাপনের কোন প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়া উচিত নয়। ভারত ভাগের জন্য প্রধান দায়িত্ব যে বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের সেকথা ঠিক, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক স্বার্থ সংঘাতের পটভূমিতে সাম্প্রদায়িকতার যে বিষ বাঙালীর জাতীয়তাবোধকে পঙ্গু করে দিয়েছিল তার মূল তাৎপর্যের কথাও বিস্মৃত হওয়া অনুচিত। সুপ্রতিষ্ঠিত এবং স্থিতস্বার্থ বাঙালী হিন্দু প্রধান মধ্যবিত্তের সঙ্গে ক্রমবর্দ্ধমান মুসলীম মধ্যবিত্ত সমাজের নবজাগ্রত স্বার্থ-বোধের যে সংঘাত বিভাগ-পূর্ব সংযুক্ত বাংলার সৃষ্টি হয়েছিল এবং সেই সংঘাতের প্রতিক্রিয়াই যে পাকিস্তানী আন্দোলনের সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র রচনা করেছিল সেকথাও ঐতিহাসিক সত্য। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলাকে এক করে সংযুক্ত বাংলা গঠন করা হলে পশ্চিম বাংলার হিন্দু-প্রধান মধ্যবিত্তের সঙ্গে পূর্ববাংলার নব জাগ্রত মুসলীম-প্রধান মধ্যবিত্তের স্বার্থে এক নতুন সংঘর্ষ ও নতুন প্রতিদ্বন্দ্বিতা সৃষ্টি হবে এবং এরূপ সম্ভাব্য ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে আবার লাভ করবে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি। কিন্তু পশ্চিম বাংলা ও পূর্ববাংলা যদি পৃথক থাকে তা'হলে এই দুই ভূখণ্ডের সংখ্যাগরিষ্ঠ জন-গোষ্ঠির স্বার্থের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দূরীভূত হবে। পূর্ববাংলার নতুন বাঙালী জাতীয়তাবোধের রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে পূর্ণ বিকাশের সুযোগ লাভের জন্য পূর্ববাংলার স্বাধীন সত্তার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিশেষভাবে প্রয়োজন। কিন্তু সেই সঙ্গে প্রয়োজন দুই বাংলার মধ্যে শান্তি, মৈত্রী, সদ্ভাব ও সহযোগিতার পারস্পরিক নীতি।

শুধু পশ্চিম বাংলার শাসক গোষ্ঠিই নয়, দিল্লীর কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও পূর্ববাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী। স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র বসু ও শহীদ সুরাহ্‌বর্দ্দীর স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা তথা 'সোভারীণ বেঙ্গলে'র (Sovorign Bengal) সেই বিভাগ-পূর্ব প্রকল্পের বিষয়টি আজও দিল্লী-নেতৃত্বকে চিন্তিত করে তোলে। পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সংযুক্ত হলে অথবা একটি পৃথক অঙ্গ রাজ্যরূপে পূর্ববাংলা ভারতের অন্তর্ভুক্ত হলে আবার সেই সার্বভৌম বাংলা গঠনের দাবী সৃষ্টি হতে পারে—এরূপ সম্ভাবনা সম্বন্ধে দিল্লী এখনও সচেতন। তাই এরূপ সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রকল্প যাতে ভবিষ্যতে সক্রিয় হয়ে উঠতে না পারে সেজন্যও দিল্লী-নেতৃত্ব দুই বাংলাকে এক করার অথবা পূর্ববাংলাকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার বিরোধী। স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলা গঠনের প্রকল্প সম্বন্ধে দিল্লীর একশ্রেণীর নেতৃত্বের উষ্মা এত প্রবল যে এরূপ প্রকল্প যাতে নতুনভাবে সক্রিয় হওয়ার সুযোগ লাভ না করে সেজন্য তারা স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলা গঠনে পূর্ববাংলার জনসাধারণের দাবীকে নৈতিক সমর্থন জানাতেও রাজী নয়।

স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা গঠনের দাবী সম্বন্ধে সম্প্রতি ভারতে এবং পশ্চিমবঙ্গে যে আগ্রহ ও সহানুভূতি সৃষ্টি হয়েছে তার কারণ ভিন্ন। পূর্ববাংলা থেকে আগত উদ্বাস্তুর সমস্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিব্রত। আজ ভারতে এরূপ একটি বিশ্বাস সৃষ্টি হয়েছে যে যদি স্বাধীন পূর্ববঙ্গ গঠন সম্ভব হয় তা'হলে সংখ্যালঘুদের পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করার প্রয়োজন হবে না এবং বাঙালী জাতীয়তার নতুন পরিবেশে পূর্ববাংলার মুসলীম সমাজের সঙ্গে সেখানকার সংখ্যালঘুরা সম-স্বার্থ, সম-মর্যাদা এবং বাঙালী জাতীয়তাবোধের সম-আবেদনের আবেদনে শান্তি ও সদ্ভাবে বসবাস করবার একটি বাস্তব ভিত্তি খুঁজে পাবে।

[শেষাংশ ৬৯৯ পৃষ্ঠায়]

নিম
টুথ পেস্ট

এর প্রচুর ফেনা দাঁত সাদা
ঝকঝকে করে আর মুখে আনে
মধুগন্ধময় স্নিগ্ধতা

NIM TOOTH PASTE

একমাত্র
ডেন্টাল ক্রীম
যাতে নিমের
হিতকর গুণাবলীর
সঙ্গে যুক্ত হয়েছে
"ফ্লুরোরাইড" প্রভৃতি
বহুবিধ আধুনিক
ভেষজ

CNC.3A 88N

দি ক্যালকাটা কেমিকেল কোং লিঃ

ইয়েট্‌স্‌ : সেই নিঃসঙ্গ দুর্গ

বিজয় দেব

ইয়েট্‌সের প্রতিভাকে যাচাই করার প্রসঙ্গ যখন এসে পড়ে তখন স্বাভাবিকভাবে দুটো কবিতা মনে আসে—"The two trees" ও "The Circus Animals' Desertion."

'The two trees' প্রথম যুগের রচনা, সেখানে তিনি বলেছেন :

"হে হরিত, তোমার হৃদয়কে অবিচল দৃঢ় সীমায় রেখো
সেখানেই সেই পবিত্র বৃক্ষ ;
শাখাগুলো ভেসে এলো যেন আনন্দলোক থেকে
তার সাথে জেগে উঠছে তীব্র তীব্র পুষ্প স্তবক।"

দীর্ঘ পঞ্চাশ বছর পর 'The Circus Animals' Desertion-এ

"আমার বিশ্রামসুখ সিঁড়ির তলায়,
যেখানে হৃদয়ের জীর্ণ পোষাক, টুকরো অস্থি গচ্ছিত,
পলস্তরা সারানো সেই অপবিত্র অস্তিত্বে।"

বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দিক হলো আত্মসন্ধানবোধ ও আত্মবয়াননার বিশ্লেষণ। ইয়েটসের নাটকীয় পার্থক্য প্রথম যুগের রচনা ও পরবর্তী যুগের কাব্যের সাথে গভীর। যার জন্যে তাঁকে পরবর্তী কাব্য সম্বন্ধে একটা অনীহা পোষণ করতে দেখা যায়। কারণ পূর্ববর্তী কাব্যকে অস্বীকার করা। এ জন্যই "Countess Cathleen"-এ পবিত্র বৃক্ষটির অবস্থান হৃদয়ে। এখানে আনন্দের ধ্বনি নয়, মাত্র একটা প্রতিবাদ বিমূর্ত।

Kermode বলেছেন : "এই প্রতিকৃতি ঐতিহ্যবাহী রোমান্টিক সমালোচনার সাথে সাদৃশ্য যা' শিল্পের যান্ত্রিক গঠন তা'কে সংকীর্ণ করেছে।" দুটো বৃক্ষের ধসড়া রেখের বিরোধাভাসে : "শিল্পই জীবনের বৃক্ষ, বিজ্ঞান মৃত্যুর।" এই প্রতিকৃতি সহজভাবে শৈল্পিক প্রক্রিয়ার রূপগ্রাহ্য। "বাদাম বৃক্ষ, বহৎ ভিত্তি"র উপর বলিষ্ঠ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। রাজনৈতিক আন্দোলনের সংস্পর্শে যেখানে "তুমি কি সেই পত্রগুচ্ছ? পুষ্প মুকুল? বৃক্ষ?" যা শক্তি ও ভিত্তির উৎস এবং বহির্বিশ্বের তাৎক্ষণিক পরিস্থিতি ও ঐতিহ্যবাহী প্রতীকে উর্বর। এখানে হিম্পুথর্বের চরম জিজ্ঞাসা বাস্তবের ভিত্তি ও সৃষ্টিশক্তিকে গুরুত্ব ও গতিকে অন্তরে প্রবাহিত করেছে।

ইয়েট্‌স্‌ কদাচিৎ কোন বিষয়কে ত্যাগ করতেন। কেননা এদের মধ্যে বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রতীক আহরণ করে রূপ বদল করতেন মাত্র। "মুকুরের আঘাতে তোমার ভাবনাকে অখণ্ডতায় মিশিয়ে ফেলো।" এই চিন্তাটা অনিচ্ছাকৃতভাবে তাঁকে আবর্তে করেছিলো।

ইয়েটসের প্রথম দিক ও শেষের দিকের কাব্যের বিভাগ তীব্রভাবে লক্ষ্যণীয়, যেন দুজন কবিকে এক নামের মধ্যে দেখছি। প্রথম দিকের রচনা লক্ষ্যণীয়, সেখানে সমালোচকরা আঘাত করে তাঁর ভাবনাকে একঘরে দেখতে ব্যস্ত ছিলেন, যার ফলে উনিশ ও বিশশতকের মধ্যে তিনি কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেন। সতর্কভাবে বিচার করলে দেখা যায় ইয়েটসই প্রথম ও শেষ প্রতীকী কবি। তাই তাকে বলতে

শুনি : "আমার কোন বক্তৃতা নেই, আছে শুধু প্রতীকী ভাবনা।"

প্রত্যক্ষভাবে আভ্যন্তরিক, সংশ্লিষ্ট জীবনকে সহজভাবে দেখানোর সুযোগ এসেছে : "আমরা যারা বিশ্বাসী তারা বাস্তবকে দেখতে পাইনা। আত্মাকে অনুভব করতে পারি এবং তখন আমাদের বোধশক্তি দিয়ে আনন্দলোকে উত্তীর্ণ হওয়া ছাড়া কোন পথ নেই। সে বিভিন্ন প্রক্রিয়া যারা হোক এক সময় আত্মার প্রতিকৃতি বেরিয়ে আসবেই।"

১৯৩৭ সালে "General introduction"-এর "The first Principles" এ লিখেছেন : "কবি সর্বদা ব্যক্তিগত জীবনকে ট্র্যাজেডি ছাড়াও তার রচনায় লিপিবদ্ধ করেন সে হলো ব্যর্থ প্রেম, ও নিঃসঙ্গতা। এখানে ইয়েট্স্‌কে তারতীয় দর্শনে অবগাহন করতে দেখা যায়।

১৯২৪ সালে ইয়েটসের রচনায় নৈতিক ধারিত্ব স্পষ্ট প্রথম উৎকীর্ণ হয়। তখন ইয়েট্স্‌কে ক্যাথারিন টেনানকে লিখতে দেখি "সেই বন অরণ্যানী আমার ভাবনায় এনে দেয় দীর্ঘ কবিতার রূপ, আমি তখন তাকে একটা চিন্তার রাজ্য হিসেবে ধরে সেখানে বিচরণ করছি জীবনের জন্য। চরিত্রগুলো বাস্তবগ্রাহ্য না হয়ে অরণ্যে মানুষের ছায়াতেই বাঁধা পড়ে আছে। তাদের জীবনের উদ্বেগ হলো শান্তি নষ্ট না করে নিঃসঙ্গতাকে সুদীর্ঘকরা।"

"Mosada" এবং "Island of stalnes" দুটো কবিতা রচনা করা হয় অরণ্যে, প্রথম কবিতা নাটকীয় ও অনুসন্ধানমূলক। বিষধারা মৃত্যু এবং বুদ্ধিভ্রংশ পুরোহিত সেখানে মুক্তির প্রতিকৃতিকে স্থাপন করা, "Island of stalnes"এ এক মেষপালক ও মেষপালিকা একটি দ্বীপের জাদুকরীকে পরাজিত করে ফুল খুঁজে বেড়াচ্ছে যা দ্বারা পাষাণ মূর্তিগুলোতে প্রাণ সঞ্জীবিত করবে। এককালে জাদুকরীর মায়ার প্রভাবে প্রাণ পাষাণমূর্তি হয়ে যায়। তাদের মুক্তি দিয়ে জিজ্ঞাসা করা হয় : "তোমরা পৃথিবী ও আকৃতির মধ্যে কোন স্থানে বাস করতে চাও?" তারা জানায় : আমরা শান্তিময় আর্কেডিতেই থাকব। নাটকের শেষে স্টাটায়ার সামুদ্রিক সজ্জা হাতে নিয়ে আমাদের অতীত চেতনাকে জাগিয়ে দিয়েছেন।

"Oisin" কবিতা সম্বন্ধে ইয়েটস বলেছেন : "অন্যকোন কবিতা আমার এত যন্ত্রণার কারণ হয়নি। দীর্ঘ কবিতা রচনা করা যেন অন্ধে বেহদ হওয়া।"

Oisin যখন তার সাথী কেনিয়ানুসের সাথে শিকার করে ফিরছিলো তখন মুক্তোর মত অশ্রুফল নিয়াম (শেষ মানুষরা নিয়াম) দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং তিনটি দ্বীপে একশত বছর করে কাটায়। সেই তিনটি দ্বীপ হলো যা মানুষের কাম্য অসীম অনুভূতি, অনন্তকালব্যাপী যুদ্ধ এবং অন্তহীন বিশ্রাম। সেই দ্বীপগুলোকে বর্ণনা করা হয়েছে প্রাণবন্ত দ্বীপ, বিজয়দ্বীপ এবং শেষ বিস্মৃতি ঘেরা দ্বীপ।

কোন দ্বীপই স্থায়ী আশ্রয় দিতে সক্ষম নয়। সৈনিকের বন্ধন যুদ্ধ আহ্বান করে প্রথম দ্বীপের মায়াকে ভেঙ্গে দেয় এবং স্বপ্নে ও বিস্মৃতিতে ডুবে থাকতে দ্বিতীয় দ্বীপে তেমনি আঘাত হানে তারপর নির্ভেজাল সত্য যে মানুষ তৃতীয় দ্বীপের আদুকে ও নিষ্ফল করে দেয় : "সে বিরক্তিতে ভেঙ্গে পড়ে, উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণকারী Oisin তোমার ঘন্টাধ্বনির শক্তি (শূন্য) কিছুই নয়, তোমার আঙুলে আঙুলে চকল হয়ে জীবন পৃথিবীর বিষাদ ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

Oisin এখন বৃদ্ধ। আজ আয়ারল্যাণ্ডের মাটি স্পর্শ করলেন। সময় তার মূল্য দাবী করলো যা পরিহার করার কোন উপায় নেই। Oisin জিজ্ঞেস করলেন : এই তিনটি দ্বীপের কোনটা তরুণ দ্বীপ' ? নিয়াম্ এর সাড়া উল্লেখযোগ্য।

"কেউ জানে না" সে বললো,
এখন আমার স্তনের উপর শায়িত তার কাল্লাময় মস্তক।"

তারপর Oisin খুঁজে বেড়াচ্ছেন "যৌবন দ্বীপ" নয় "সত্তোষ দ্বীপকে" এখানে মানুষ কোন একটা পছন্দে স্থিতি-

শীল নয়। স্বপ্ন পৃথিবীর বারবার ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইয়েটস্ কাব্যের প্রথম দিকের 'উন্মেষ' 'একাগ্র শক্তি' অবস্থা ক্রম-বিকাশের স্বাক্ষর। Oisin কবিতাটি অস্থিরভাবে রচিত পরীক্ষামূলক। এখানে বহু কণ্ঠস্বর ভেসে আসে। কিন্তু তারা পূর্ণ হতে পারবে না। ইয়েটস্ কবিতা রচনা করে তৃপ্ত হননি যা' প্রতিশ্রুতিবান কবির পক্ষে অস্বাভাবিক ছিলো।

ইয়েটসের কাছে মানুষের মন ছিলো বিরুদ্ধ সত্তাগুলোর মধ্যে একটা অস্থিত্ব। যদি সেই মনকে বেঁচে থাকতে হয় তবে তাকে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য তৈরী থাকতে হবে।

'Countess Cathleen' 'The Wandering of Oisin' এর পরিপূরক। 'Cathleen'-এ দেখতে পাই ইয়েটসের দীর্ঘ পথযাত্রা। আংশিক ভাবে পথ দিয়ে অতীতকে আবিষ্কার করেছেন এবং নিজেকে খণ্ড খণ্ড করে দেখেছেন।

ইয়েটস্ সেই জাতের কবি ছিলেন যাঁরা সাধারণ শ্রেণী মুক্তিকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। তিনি যেসব কবিতা লিখতেন তা' সাধারণের মেজাজে এক করা ছিলো বিপজ্জনক। 'The Rose' কবিতাটি ক্রমবিকাশের একটা শ্রেণী যা' 'The Wind Among the Reeds' কবিতায় পরিণতির চরম নিদর্শন বহন করছে। তখন ইয়েটস্ "The Land of Heart's Desire" নাটকটি লিখছিলেন। সেই নাটকে তাঁর ব্যক্তিগত অতীতকে তীব্রভাবে নিন্দা করেছেন: "আমি বড় হয়েছি অপছন্দ করতে। কিন্তু জানি না কেন এই অপছন্দ করা।"

ইয়েটসের সার্থক কবিতার জন্ম দুটি বিরুদ্ধ সত্তার উত্তেজনায়, অস্বীকারে নয়।

অপূর্ণতাকে আবিষ্কার করতে গিয়ে ইয়েটস্ তাঁর মনকে প্রস্তুত করেছেন নতুন ভাবে শক্তি স্থাপন করে কবিতাকে [illegible] মানুষের জন্য সৃষ্টি করেছেন।

"The Wild Swan at Coole" কবিতাটির সুরু হয় একটা অনুচ্ছারিত বিষাদ নিয়ে এবং সমাপ্তিতে বিপরীত শক্তির যুগপৎ উপস্থিতিকে সহজেই অনাবৃত করে।

'Tower' কবিতা রচনা বলিষ্ঠতার চরম পর্যায়ভুক্ত। ইয়েটস্ কোন দুর্বল কবিতা লিখতে পারেননি। কারণ ভেতরে ছিলো দোষগুণের বিচারশক্তি। তাঁর সার্থক কবিতার মহানুভবতার চিত্র লক্ষণীয়। সেই লক্ষণ যদিও স্বাধীনভাবে ছলনাকারী তথাপি মহানুভবতার রীতি, সমালোচক দৃষ্টিভঙ্গীকে উৎসাহিত করেছিলো। তাঁর কাব্যকে নির্ভর-যোগ্যভাবে বলা যায় 'প্রধান স্রোতের' কাব্য। 'Sailing to Byzantium' লিখে সুরু করেছেন—'Tower' কবিতা সেখানে পূর্বকল্পিত ছিলো। কাব্যের শুদ্ধ চৈতন্যকে এখানে ঢেলে দিয়েছেন যা' শেষে আত্মপ্রত্যয়ে স্বকীয় রূপ গ্রহণ করেছে। "Sailing to Byzantium" কবিতাটি চারটে স্তবকে সম্পূর্ণ হয়েছে। প্রথম স্তবক শুরু হয়েছে কবির আদর্শ নগরে পৌঁছানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে। সেই দেশ বার্ধক্যের অনুপযুক্ত। এখানে তরুণরা প্রত্যেকেই মনিষ্ঠ। পাখীরা গাছের আশ্রয়ে প্রাণময় (Keats এর ode to the nightingale'কে মনে করিয়ে দেয়) যেখানে কবিকে বলতে শুনি: "no bungry generation tread thee down." দ্বিতীয় স্তবকে কবির দৃঢ় বিশ্বাস বার্ধক্য ঘৃণাই হয়ে উঠতো যদি আত্মা উজ্জীবিত না হয়ে উঠতো। বৃদ্ধ শারীরিক দিক থেকে যতই দুর্বল হোক না কেন ততই উচ্চস্বরে গান গাইবার শক্তি বহন করে। তৃতীয় স্তবকে ঈশ্বরকে প্রার্থনা নয়। এখানে ভক্তদের স্তব (এখানে স্মরণীয় মন লক্ষণীয়)। সেই ভক্তবৃন্দ ঈশ্বরের আলোকে নিজেদের রক্ষা করে আছেন। তাঁরা যেন কাছে আসেন। কবির স্তবের কামনায় অন্তর্নিহিত। যে কামনা পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই কারণ শারীরিক অক্ষমতা; ভক্তবৃন্দ যেন সেই অক্ষমতা দূর করেন ও অতীত চিন্তাকে সরিয়ে দিয়ে "পারলৌকিক

সংভাবনায়" আলোকে তাঁকে সচেতন করেন। শেষ শুরুকে প্রকাশ পেয়েছে কবির কামনা। যখন পার্থিব সংজ্ঞার বৃত্ত তখন তিনি পুনরায় আর জীবদেহ ধারণ করবেন না। তখন তিনি শিল্পাধারে উত্তীর্ণ হতে চান (Keats-এর Grecian Urn)। এই কবিতায় ইয়েট্‌স্ জৈব ও আত্মার মধ্যে এবং সেই সঙ্গে আরও বহিরঙ্গ ও উদ্দীপনাময় শক্তির মধ্যে ভাষা ও আঙ্গিকের ধারাবাহিকতাকে সার্থকভাবে আরোপ করেছেন।

'The Tower' কবিতাটিকে একটা যুগের যুযোপকে রেখার নক্সায় আঁকে রাখা হয়েছে। এই কবিতায় কবি অনুভব করেছেন যে তিনি দৈহিক দিক থেকে দুর্বল হলেও দিনে দিনে তাঁর ভাবাবেগ, রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত ভাবনা যেন বলিষ্ঠ হচ্ছিলো। পুরোনো দুর্গে বসে তিনি নিজকে কেন্দ্র করে দৃশ্যগুলোকে ভাবছেন। কবিতাটি তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। প্রথমতঃ তিনি বার্ধক্যজনিত একটা তীব্র অনুযোগে বিব্রত। দ্বিতীয় পর্যায় একটু খুশি বা চিত্তাকর্ষক ও দীর্ঘতর। এখানে দুর্গের আত্মরক্ষার স্থান থেকে আইরিশ ইতিহাস ও আভিজাত্যের ক্ষয়কে পরিদর্শন করছেন। প্রাচীরের ছিদ্র দিয়ে দেখছেন আশেপাশের বৃক্ষরাজি, ঘন-সবুজ বন আর উঁচুনীচু অবস্থান। তৃতীয় অঙ্কে কবির মানসিকদ্বন্দ্বের সমাপ্তি। একটা গভীর শান্ত সমাহিত ভাব তাঁকে আচ্ছন্ন করেছে। তিনি তখন রাজনৈতিক দর্শন লিখছেন। এখানে কবি আত্মাকে অনুভব করেছেন গভীরভাবে। এই কবিতাটি একটা বৃত্তে আবদ্ধ হয়ে আছে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে মানুষের উন্নত দাবীর জন্য তাকে বিরুদ্ধ পরিবেশে বাস্তব দাবী এবং পাশবদাবীকে অবদমন করতে হয়। পর্বত-প্রমাণ ভুল করে যেখানে পৌঁছানো সেখানে দেহ তখন বয়স-ভারে ধূর্ণচূর্ণ করে বসে আছে। এতে মনে হয় মানুষের মধ্যে দুটো সত্তার উপস্থিতি, জটিলতার সংমিশ্রণ এবং রোচিত সাহস।

বিশ্বাস ও অহংকারই জীবনের পূর্ণতা এনে দেয়। ইয়েট্‌স্ ("I like to think of that building") 'Tower' কে বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেছেন: "আমার রচনার প্রতীক দীর্ঘস্থায়ীভাবে পরিবর্তের দৃষ্টিগোচর হয়।" এই প্রতীক অন্ধকার যুগকে লক্ষ্য করে। ইয়েট্‌স্ তাঁর বার্ধক্য তাকে লক্ষ্য করে ভাবছেন তাঁর বাড়ীকে: "আমার এই বাড়ীকে যেন সেই উদার ভাস্কর্যের স্থান এখনো অবশিষ্ট।"

সর্বগ্রাসী ধ্বংসের মধ্যে মানুষ অন্ধকারে আলোর দীপ জ্বালাবার দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার চিতা ও আলোর সংকেত একই মানুষের হৃদয়ে বিরোধ ব্যথা ও সফলতাকে নিশ্চিহ্ন করে তোলে। সেই প্রতিকৃতি বিশ্বাসে প্রত্যাবর্তন করে দুর্গে ঘন্টাধ্বনি করছে।

: "সে জানে মৃত্যুর উপলব্ধি অস্তির মজ্জায়।
সেখানে মানুষই লোকান্তরের স্রষ্টা॥

১৯২৮ সালে 'The Tower' কবিতা পুনরায় পাঠ করে ইয়েট্‌স্ নিজকে 'তিক্ততায় নিমজ্জিত' দেখে আশ্চর্য হলেন। তিনি স্বীকার করেছেন যদি তিনি ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী হতেন তবে "তিক্ততা এত তীব্র হতোনা।"

১৮৯৯ সালে ইয়েট্‌স্ লিখেছেন: "আমার অতিকথা ও প্রতিকৃতি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এবং বাধ্য করে চলেছে — যতই সময় বয়ে যায় ততই পরস্পরের সাহায্যে কবিতাগুলো আলোকিত হয়ে উঠবে।" এই বক্তব্য তাঁর দুটো প্রধান দিককে স্পষ্ট করে তুলেছে: তার সার্থকতা এবং উৎসাহ অখণ্ডতার বিশিষ্টতা। তাঁর কবিতাগুলো স্বাতন্ত্র্যবোধে একক যেমন আকাশের নক্ষত্র আপন আলোকে উজ্জ্বল। কিন্তু তাদের পশ্চাৎপটে রয়েছে অসীম আকাশ। ইয়েট্‌স্ সেখানে ব্যক্তি উৎসাহ খণ্ড খণ্ড জীবন ও অখণ্ডতার মধ্যে যোগসূত্র গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন।

ইয়েট্‌স্ কাব্যের অনিত্যবস্তু শুধু নয়। রীতি খুঁজতে

দিয়ে তাঁকে পরিবর্তনও করতে হয়েছে। স্বপ্নময় জগৎ থেকে প্রস্থানের পরিবর্তে পর্বত আরোহণ আর হয়ে উঠেনি। সৌন্দর্যতত্ত্ববিদের নিঃসঙ্গতার বদলে এসেছে মানুষের একাত্মবোধ।

ইয়েটসের কেত্রে দাঁড়িয়ে আছে মানুষ। ঐতিহ্যে তাঁর স্থান এলিয়টের চেয়ে বেশী। এলিয়টের কাব্যের তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলো বিশ্বাসের অন্বেষণ ও অন্তর্নিহিত অর্থের প্রতি স্পৃহা। সেখানে অখণ্ডতা ও সংকীর্ণতার যথার্থ সংজ্ঞা নিরূপণ করা হয়েছে। এলিয়ট অন্তর্দৃষ্টিকে অনাবৃত করেছেন এবং অনুসন্ধানের শেষে ইঙ্গিত ও অনুধ্যানকে ধরে রেখেছেন। ইয়েটস্ বিশ্বাসকে প্রাধান্য হিসেবে মূল্য দিয়ে কাব্যের গহন অরণ্যে এগিয়ে গেছেন। জ্ঞানের প্রতি তীব্র আকর্ষণের চেয়ে কি করে মানুষ জ্ঞানকে উজ্জ্বল করে সেদিকে তাঁর প্রখর দৃষ্টি ছিলো: "Man can embody truth but he cannot know it." ইয়েটসের মানুষের প্রতিকৃতি হলো যৌলিক এবং সম্ভবতার প্রতি একটা অন্তর বোধ।

এলিয়ট ক্যাথলের তীর থেকে খণ্ড খণ্ড অস্তিত্ব কুড়িয়ে ঐতিহ্যের সমবায় তৈরী করেছেন। যদি অতিকথা (myth) শ্রেষ্ঠ কাহিনী হিসেবে মানুষের ব্যক্তিত্বকে উপস্থিত করে তবে ইয়েটসের অতিকথার পদ্ধতি হলো ব্যাপক ও ঘনিষ্ঠ। মানুষের অনেক প্রশ্নের জবাব সেখানে পাওয়া যায়।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

DA 65/FID Bengali

ডাবলু বি ইয়েটস্ স্মরণে

[মৃত্যু : জানুয়ারী, ১৯৩৯]

ডাবলু এইচ অডেন

অনুবাদ : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

তিনি অন্তর্হিত হলেন শীতের গভীরতার মধ্যে :
ঝোট নদীগুলো জমাট, বিমান বন্দরগুলো প্রায় পরিত্যক্ত,
এবং বরফে রাস্তার মূর্তিগুলো ছিল বিকৃত ;
মুমূর্ষু দিনের মুখে পারদ ধীরে ধীরে নেমে গিয়েছিল ।
আর৮ সমস্ত লক্ষণগুলোই বলে দিয়েছিল
তাঁর মৃত্যুদিনটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা দিন ।

তাঁর অসুখ থেকে অনেক দূরে
নেকড়েরা চিরসবুজ অরণ্যের মধ্য দিয়ে দৌড়ে গিয়েছিল,
প্রমত্ত নদী রুচিসম্মত পাথর বাঁধানো ঘাটের প্রলোভনে
সাড়া দেয় নি ;
বিলাপসিক্ত কণ্ঠস্বরগুলো
কবির মৃত্যু সংবাদ তাঁর কবিতাগুলোর কাছ থেকে
দূরে রেখেছিল ।

কিন্তু তাঁর জন্যে এটাই ছিল শেষ বিকেল, যেমন তিনি নিজেও,
শত্রুতাকারিণীদের এবং নানা গুজবের বিকেল ;
তাঁর শরীরের বিভিন্ন প্রদেশ বিদ্রোহ করেছিল,

তাঁর মনের চতুষ্কোণগুলো শূন্য,
নিঃশব্দতা অনুপ্রবেশ করেছিল শহরতলীতে,
তার অনুভবের বিদ্যুৎপ্রবাহ হয়ে পড়েছিল ক্রিয়াহীন :
তিনি নিজেও সে-রকম হলেন তাঁর জনমুহূর্তের মতো।

এখন তিনি শত শত শহরে ছড়িয়ে রইলেন,
এবং সম্পূর্ণরূপে সঞ্চারিত হলেন অপরিচিত ভালোবাসায় ;
যেন জানতে চাইলেন তাঁর সুখ চিরতরে কোনো অরণ্যে,
এবং অনুশাসিত হতে চাইলেন
বিদেশী বিবেকের সংহিতায়।
একজন মৃত ব্যক্তির কথাগুলো
রূপান্তরিত হতে থাকে জীবিতদের অন্নের ভিতরে।

কিন্তু আগামীকালের মর্যাদা ও কোলাহলের মধ্যে
যখন দালালেরা পশুর মতো গর্জন করছে 'বোর্স'-এর মেঝের ওপর,
এবং গণীবরা পাচ্ছে সেই যন্ত্রণা যাতে তারা প্রায় অভ্যস্ত,
এবং প্রত্যেকেই নিজ নিজ কুটুরীতে যখন
নিজের স্বাধীনতা সম্পর্কে একেবারে নিঃসন্দেহ :
অন্তত কয়েক হাজার লোক স্মরণ করবে এই দিনটির কথা,
যেমন কেউ কেউ মনে ক'রে থাকে সেই দিনটিকে
যেদিন ব্যতিক্রমযোগ্য কিছু করা হয়েছিল।
আহা, সমস্ত লক্ষণগুলোই বলে দিয়েছিল
তাঁর মৃত্যুদিনটি ছিল অন্ধকারাচ্ছন্ন ঠাণ্ডা দিন।

রেটস্-এর কয়েকটি কবিতা

ভালবাসার দুঃখ

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

ঘরের ছায়ায় সব চড়ুই পাখির কলরব,
পূর্ণ গোলাকার চাঁদ, নক্ষত্র-খচিত মহাকাশ ;
আর চির পীতিমর পাতাদের সঙ্গীত সরব,
ঢেকেছিল পৃথিবীর পুরাতন ক্লান্তি-হতাশ্বাস।

তুমি এলে শোকাবহ বিবর্ণ অধরে তারপর,
সাথে সাথে নেমে এলো অশ্রুধারা সারা পৃথিবীর ;
আর তার ভ্রমকারী জাহাজের পরিপূর্ণ দুঃখের বহর,
আর তার হাজার বছরে জমা কষ্ট সুগভীর।

এবং এখন সব চড়ুই পাখির ধ্বস্ত ঘরের ছাঁচায়,
দুখের দরের মতো ম্লান চাঁদ, আর শাদা তারারা আকাশে,
আর উচ্চ কোলাহল শান্তিহীন গাছের পাতায়,
পৃথিবীর পুরাতন ক্লান্তির কান্নায় কাঁপে ত্রাসে।

দ্বিতীয় ট্রয় নয়

অনুবাদ : গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

কেন তাকে দোষ দিই, সে মেয়ে জন্মেছে দুঃখ নিয়ে
আমার দিবস বলে, অথবা সে অতি সাম্প্রতিক
শিখিয়েছে অজ্ঞদের ভীষণ পন্থায় টেনে নিয়ে
অথবা ছুঁড়েছে ছোট রাস্তাগুলি রাজপথে ঠিক।

ইচ্ছার সমান যদি বীরত্বও থাকতো তাদের ?
কী তাকে পারতো দিতে শান্তি এনে তার সেই মনে
বহন করেছে যাকে আগুনের মতো সহজের,
সৌন্দর্যে সটান একটা ধনু যেন এমনই বরণে

যা কেবল স্বাভাবিক হয়তো এই বয়স সময়ে,
উচ্চ মন, নির্মলতা প্রিয়, আর একান্ত নির্ভয় ?
কেন কী করেছে দোষ তবে বলো, সে-যা তা-ই হয়ে ?
তার গড় করার তরে কি তবে ছিল অন্য ট্রয় ?

জলের মধ্যে একটি দ্বীপ

অনুবাদ : নচিকেতা ভরদ্বাজ

আচ্ছা থাকুক, থাকুক একজন,
আমার বুকের আদর মেখা থাকুক তারাটি,
আগুন আলোর দারখানে সে বিদ্যুতের মত
ঘুরে বেড়ায়—স্বতন্ত্রতা—দানের সমর্পণ।
পূর্ণ থালা যত্ন করে আনে
সাজিয়ে রাখে এবং সযতনে।
অথৈ জলে একটি সবুজ দ্বীপ
তাকে নিয়ে যাবই যে সেখানে।
হাতে যে তার মোমের মৃদু শিখা,
সকল দীপ জ্বালিয়ে দেবে পর্দা-কাঁপা ঘরে,
এবং ভীরু লজ্জা নিয়ে মোরে পাশে একা
লজ্জাবতী মিলিয়ে রবে অন্ধকার ঘরে :
একা ভীরু রাত যেন থাকবে না বন্ধু,
সহায়তার সখী এবং আমাতে তারী থাকুক।
সবুজ নীল জলের মধ্যে সবুজ দ্বীপের ঘরে
তাকে নিয়ে উড়ে যেতে মনে উৎসুক।

বোকার গান

অনুবাদ : সংকর্ষণানন্দ মুখোপাধ্যায়

আগুনের ধারে ছেঁড়া টুলটায় আমি ঘুমোচ্ছিলাম
আমার হাঁটুর ওপর ঘুমোচ্ছিল বাদামরঙের বেড়ালটা,
আমরা ভাবিনি খোঁজ করি
বাদামী বস্ত্রগোশটা কোথায় থাকতে পারে
অথবা লম্বাটা বন্ধ আছে কি না।
বাছুরে দাঁড়িয়ে দু পা তুলে
কে জানে ও কেমন করে খাওয়া খেয়েছিল
গোড়ালি ঢুকে দাঁড়িয়ে পড়ার আগে—
যদি আবার ঘুম ভাঙতো
আর আমি ওর নাম করে ডাকতাম তাহলে
হয়ত ও শুনতো কিন্তু বেরিয়ে যেত না,
যা বাকি এখন সে পেয়ে গেছে
ঘাঁসির দলিত পদ্ম আর শিকারী কুকুরের দাঁত।

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

বঙ্গ সংস্কৃতির ধারায়

এ পর্যন্ত আলোচনায় আমরা নিশ্চিত হয়েছি যে সুভাষচন্দ্র তাঁর সমকালীন বাংলার ভাব-পরিমণ্ডল হতে আত্ম-বিকাশের পক্ষে প্রয়োজনীয় সকল সাহায্য করেছিলেন: কিন্তু আরও গভীরতর অনুসন্ধানে আমরা দেখব যে বাংলার সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত কয়েকটি ধারা সুভাষের চরিত্রের মাঝে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক নেতৃত্ব ও কীর্তি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ও আচ্ছন্ন করে; কিন্তু আসল মানুষটি রাজনৈতিক ভূমিকার দ্বারাই বিচার্য নয়। গান্ধীজী সম্পর্কে অনেক লেখক লিখেছেন: পশ্চিমী লোকরা মনে করে যে গান্ধীজী গভীর ধর্মবিশ্বাস সম্পন্ন একজন রাজনৈতিক নেতা; এবং এই কথা সত্য বলেই কখনো কখনো মনে হয়; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীকে দেখা উচিত গভীর রাজনৈতিক বিশ্বাস সম্পন্ন ধর্মীয় নেতারূপে, কেননা সততই তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারা তাঁর গভীর ধর্মীয় প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতা হতেই উৎসারিত হত।[১] সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে এই একই মন্তব্য কি নিঃসংশয়ে করা চলে না?

১। Westerners are inclined to think of Gandhi as a political leader with deep religious convictions, and sometimes he seemed to qualify for such a description; but he should rather be looked on as a religious leader with deep political convictions, for at all times his political activities were a mere by-product of his intense religious faith and experience. —A. L. Basham: Hinduism, (The Concise Encyclopaedia of Living Faiths, ed. by R. C. Zaehner)

বস্তুতঃ গান্ধী-সুভাষের বিরোধ রাজনৈতিক ক্ষমতা ও নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব নয়, রাজনৈতিক মতবাদ ও কর্মপন্থার বিরোধও নয়, তা ধর্মীয় প্রত্যয় ও অভিজ্ঞতার দুই বিশিষ্ট ধারার বিরোধ; এবং সে কারণেই আধুনিক ভারতের ইতিহাসে গান্ধী-সুভাষের দ্বন্দ্ব একটা ফলজনক অধ্যায় না হয়ে মহত্ত্বের গৌরবে দীপ্ত হতে পেরেছে এবং এই দুইজন মহৎ পুরুষ পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা না হারিয়ে অন্তরের গভীর অনুভূতির ক্ষেত্রে সাহচর্যই অনুভব করেছেন।

গান্ধীজী সরাসরি তাঁর ধর্মবিশ্বাস ও সাধনার কথা বলেছেন; সত্য তথা ঈশ্বরলাভই যে তাঁর জীবনের ব্রত একথাও তিনি স্পষ্টভাবে বলেছেন। ব্রহ্মচর্য, অহিংসা, নিষ্কাম কর্ম, জনসেবা, এসব তাঁর ঈশ্বরলাভের সাধনায় এবং তাঁর সকল কর্মধারার মধ্যে এই সাধনপথকেই তিনি অনুসরণ করেছেন। ধর্মের সংস্কারকার্যেও তিনি ব্রতী। হরিজন ও অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ আন্দোলন এবং গীতার ব্যাখ্যা রচনা তাঁর প্রধান প্রধান কাজের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর রাজনৈ-

বেশ, নিষ্কাম নিষ্কিঞ্চন পরহিতব্রত দেশের চিত্ত জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। পূর্বোক্ত লেখক তাই লিখছেন: সাধারণ ভারতবাসীদের মধ্যে গান্ধীজীর জনপ্রিয়তার বড় কারণ এই যে তিনি তাঁদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলেন সন্ন্যাসীর বেশে, তাঁর নতুন ভাবধারাকে তাদের চাহিদা ও চরিত্রের সঙ্গে খাপ খাইয়ে এমনভাবে তিনি উপস্থিত করলেন যে তাদের কাছে তাঁর ভাবধারা খুব স্বাভাবিক বলে প্রতীয়মান হয়। সাধারণ লোকের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন ঈশ্বরসান্নিধ্যপ্রাপ্ত একজন মহাপুরুষ, আর তাই তাঁর কথাকে লোকে দৈবীপ্রেরণাসঞ্জাত বলে মনে করত। তাঁর তপশ্চীসুলভ দারিদ্র্য,— এই দারিদ্র্য বরণে তাঁর বহু শিষ্য তাঁকে অনুসরণ করেছিল—তাঁর গভীর আন্তরিকতারই প্রমাণ।২

সুভাষচন্দ্র দেশেবাসে ছিলেন সম্পূর্ণ আধুনিক মানুষ; মহাত্মাজী যে রাজনীতির সঙ্গে আধ্যাত্মিকতাকে গুলিয়ে ফেলেন এ ছিল তাঁর অন্যতম অভিযোগ; inner voice বা ভগবানের প্রত্যাদেশ অনুসারে তিনি চলেননি—অন্ততঃ গান্ধীজীর মতো প্রকাশ্যে সেকথা বলেননি; ধর্মসংস্কারের কোনো কর্মপন্থা তাঁর ছিল না এবং ভারতের লক্ষ্য রূপে তিনি সমাজতন্ত্র, বিপ্লবের ইত্যাদি আধুনিক ভাবধারাগুলিকেই পেতে চেয়েছিলেন: শ্রীঅরবিন্দের অধ্যাত্ম উপদেশগুলিকে তিনি প্রকাশ্যে কঠোর সমালোচনা করেছিলেন। এসব কিছু হতে এই কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সুভাষ চরিত্রের আলেখ্য অঙ্কনে ধর্মপ্রসঙ্গ না আনাই উচিত। কিন্তু আমরা ইতিপূর্বে তাঁর পত্রাবলী, আত্মজীবনী ও কিশোরকালের বন্ধুদের সাক্ষ্য হতে উদ্ধৃতি মারফৎ দেখেছি যে অধ্যাত্মচেতনার বিকাশই সুভাষের অন্তর্জীবনের আসল ইতিহাস। দিলীপ কুমার রায় লিখেছেন: ভারতের মন ভগবদাঞ্জির নিশার জন্য তাঁর গভীর বেদনাবোধের কথা এই কারণে আমি উল্লেখ করতে চাই যে তাঁর সেই অতলান্ত বেদনার উৎস মূল ছিল তাঁর আত্মার প্রেম —যা একজন মিস্টিকের পক্ষেই সম্ভব, দেশসেবকের পক্ষে নয়। দু বছর আগে সুভাষের লেখা (যার তারিখ ডিসেম্বর ২৩-২-৩৮, বিঠলনগর) একটি অটোগ্রাফ আমার নজরে আসে—সে লেখাতেই প্রকাশিত হয় যে দেশভক্তের সত্তা ছাপিয়েও তাঁর মাঝে উন্মীলিত হয়েছিল এক মিস্টিকের সত্তা। সুভাষ লিখেছিল: "বাঁধা পথের বাইরে এবং অজানার অভিসারে চলবার ডাক যতটা আমার হাতছানি দেয়, ততটা আর কিছুতেই নয়। এই জীবনে হয়তো জোটে দুঃখভোগ, কিন্তু আনন্দ তো কম মেলে না; হয়তো আসে তন্দ্রিহা-রজনী, কিন্তু সুপ্রভাতও তো আসে। এই পথেই আমি আমার দেশবাসীকে আহ্বান জানাই।"৩

২। Gandhi's success with the ordinary Indians was largely due to the fact that he came before them as a sannyasi, adapting his new ideas to their needs and character so that they seemed perfectly natural. He was, for the simple folk, a great saint who had achieved close contact with God, and hence his utterances were thought to be divinely inspired. His voluntary ascetic poverty, in which he was followed by many disciples, was an earnest of his sincerity.—Ibid.

৩। I refer to his deep feeling for the tragic night of India because here one could feel the response of a mystic more vividly than that of a patriot. And I maintain it was this mystic and not the patriot that made him write an autograph (dated 23-2-38 Vithalnagar) I chanced upon two years ago: "There is nothing that lures me more than a life of adventure away from the beaten track and in search of the unknown. In this life there may

দিলীপ রায় আরও লিখছেন : সুভাষের স্মৃতিকথা লিখতে আমি বসতুম না যদি না আমি তাঁর ভিতর অনুভব করতুম একটি মিস্টিক সত্তাকে—জীবনের মধ্য দিয়ে যার আত্মার অভিসার ছিল যাকে সে বলত "অজানা" তার অভিমুখে। এই মিস্টিক সত্তাকে সে কখনো জীবনের উপরিভাগে প্রকট হতে দেয়নি, কিন্তু দেশসেবার ভিতর দিয়ে একদিন সে পরম সত্য লাভ করবে এই বিশ্বাস যদি তার না থাকত তাহলে দেশসেবার জন্য—পরম সত্যের জন্য অভিসারের তুলনায় যার মূল্য ক্ষুদ্রতর বলেই ধার্য করতে হয়—সে কি তার যথাসর্বস্ব বিসর্জন করতে পারত? সে ভারতের কথা ভেবে রোমাঞ্চিত হত শুধু তখনই যখন সে দেশকে মৃত্তিকাখণ্ড রূপে না দেখে দেখত দিব্যজননী রূপে। রক্তমাংসের মায়ের জন্য যেমন তার পুত্রহৃদয়ের জন্য স্পন্দিত হয়—ভারতজননীর হৃদয়ও তাঁর সন্তানদের জন্য তেমনই জীবন্তভাবে স্পন্দিত হয় বলে সুভাষ মনে করত—আর ভারতমাতার ভিতর দিয়ে তার কাছে এসে পৌঁছেছিল পরমেশ্বরের অলঙ্ঘ্য আদেশ। যারা আসত তার ব্যক্তিত্বের সান্নিধ্যে তাদের মনে হত যেন তারা এক অদৃশ্য সূর্যকরজালির ধারায় স্নাত হচ্ছে; যদি সে একজন আসল মিস্টিক না হত তাহলে এটা সম্ভব হত কি?৪

সুভাষচন্দ্রের চরিত্র-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আরও অগ্রসর হয়ে দিলীপ রায় বলেছেন: আমি এখানে সুভাষ সম্পর্কে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জোর দিয়ে উল্লেখ করতে চাই—সুভাষের গোটা সত্তা সম্পর্কে বিচার করতে গিয়ে এই তথ্যটা আমরা প্রায়ই অবহেলা করি—যে তার ছিল একজন যোগী হবার সম্ভাবনা, মরমী সাধকও হতে পারত সে।... তার বাইরের বিনিদ্র কর্মধারাবহুল রূপটার আড়ালে এই যে অন্তরতর পুরুষটি ছিল লুকিয়ে কেউ কেউ তা অনুভব করেছিল (কখনো কখনো তার চারপাশে এক অতীন্দ্রিয় জ্যোতির্বলয় যেন উদ্ভাসিত হত)।৫

---

be suffering, but there is joy as well; there may be hours of darkness but there are also hours of dawn. To this path I call my countrymen." (The Subhas I knew, p. 79)

৪। I would not have taken the trouble to write all I still remember about him had I not felt in him the mystic whose soul's Quest through life was what he calls, "the Unknown." And I believe that albeit he never gave this mystic in him chance he might have, he could not possibly have staked his all for a lesser light—since all quests are lesser than the Supreme Quest—had he not been persuaded somehow that the lesser would eventually lead him to the Highest. That is why he could only thrill to India when the peninsula ceased to be a thing of clay and became invested with Divinity. And it was this Godhead that called him imperiously through the Motherland whose heart throbbed for her children as vividly as did that of a mother in flesh and blood. I will even go farther and say that if he had not been the authentic mystic he *was* one would not have felt as though one was basking in some invisible sunshine of his personality. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৭৮)

৫। I want here to stress a highly significant fact about Subhas—a fact we are too prone to ignore in our appraisement of the total man—that he had been potentially a Yogi, a contemplative,—some indeed had inferred this inner potentiality in the outer man of sleepless action (from an aura of other worldliness that on occasion hovered roundabout him)—p. 101,

সুভাষচন্দ্রের জন্ম উনিশ শতকের একেবারে শেষভাগে এবং তাঁর বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বিশ শতকের গোড়ায়। বাংলা দেশে গোটা উনিশ শতকের ইতিহাসটাই স্বর্গোজ্জ্বল এবং সুভাষ তার উত্তরাধিকারী। বিশ শতকের গোড়ায় বাংলা দেশে নবীন, সংগ্রামব্রত জাতীয়তাবাদ ও ভারতের স্বাধীনতার যুদ্ধের বিকাশ ঘটে – সুভাষ তারও উত্তরাধিকারী। উনিশ শতকে আর সব আন্দোলনকে ছাপিয়ে ধর্ম আন্দোলনই মুখ্য হয়ে দেখা দেয়—বিশ শতকে রাজনৈতিক সংগ্রামই জাতীয় জীবনের প্রধান সাধনীয় বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুভাষের চরিত্রে ধর্ম সাধনা ও অন্যান্য চেতনার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দেশের পরাধীনতা মুক্তির ব্রত গ্রহণ দুটি বিরোধী বা অসমঞ্জস ঘটনা নয় – আমাদের জাতীয় চেতনার রূপান্তরের স্বাভাবিক ফলশ্রুতিই তাতে বরং লক্ষ্য করা যায়।

বাংলার নবজাগরণের মন্ত্র রামমোহন উচ্চারণ করেন তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থ' প্রকাশের ভিতর দিয়েই। নবযুগের নতুন নগর কলকাতায় এসে রামমোহন প্রথম এই গ্রন্থখানিই প্রকাশ করেন। তাঁর সতীদাহ আন্দোলন বা ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের আন্দোলনের চেয়েও আমাদের জাতীয় জীবনের পক্ষে সম্ভবত এইটিই তাঁর গভীরতর প্রদান। ভারতবর্ষে সমাজ সংস্কার বা শিক্ষা সংস্কারের আগে যা প্রয়োজন তা হল ধর্ম সংস্কার—কেননা ভারতের সমাজ, সংস্কৃতি এবং গোটা ভারতীয় মানসিকতাই একান্তরূপে ধর্মভিত্তিক। রামমোহন বাংলায় লোকের প্রচার করেন এবং তাতে যে শুধু আমাদের ধর্মীয় কুসংস্কার ও জীবনেই আঘাত পড়ে তা নয়, এক নতুন বলিষ্ঠ ধর্ম চেতনারও বিকাশ ঘটে। হিন্দু কলেজ স্থাপন ও ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনে রামমোহনের সহযোগিতার কথা সুবিদিত ; বাংলার ইংরেজি শিক্ষার ফল রূপে যখন ইয়ং বেঙ্গল দলের এবং পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত নাস্তিকতা-[illegible] প্রাবল্য দেখা দিল তখন তাকে শোধন ও জাতীয় [illegible] উদ্বোধনের দায়িত্ব নিয়ে আবির্ভূত হল ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলন—যা রামমোহন কর্তৃক কল্পিত ও প্রতিষ্ঠিত। উনিশ শতকের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত ব্রাহ্ম ধর্মান্দোলনই দেশের বৃহত্তম জাতীয় আন্দোলন রূপে বর্তমান ছিল।

কিন্তু ক্রমশ: ব্রাহ্ম ধর্ম ও ব্রাহ্ম সমাজের অন্তরের বিকটাও বড় হয়ে দেখা দিল। জাতির গভীরতর আকুতিকে ব্রাহ্ম আন্দোলন তৃপ্ত করতে পারেনি। উনিশ শতকের শেষার্ধে তাই দেখি সমাজ সংস্কারের আন্দোলন ব্রাহ্ম সমাজ-বহির্ভূত বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বাধীনে চলে গেছে। শিক্ষা-বিস্তার, বিশেষত নারীশিক্ষা বিস্তারেও তিনিই নেতৃত্ব দিচ্ছেন ; সাহিত্যের নেতৃত্ব এসেছে অব্রাহ্ম বঙ্কিমচন্দ্রাদির হাতে ; এবং ধর্ম বিষয়েও ব্রাহ্ম নেতাগণ শ্রীরামকৃষ্ণের নিকট শিক্ষা গ্রহণ করছেন। জাতির আগরণের সঙ্গে তাল রাখতে না পারায় ব্রাহ্ম সমাজের প্রাণশক্তি নষ্ট হয়ে ক্রমশ: তাতে দলাদলির মনোভাব প্রবেশ লাভ করল, এবং ব্রাহ্ম সমাজ তিন ভাগে ভাগও হয়ে গেল। অবশেষে একদিন ব্রাহ্ম সমাজের কার্যকারিতা নিঃশেষিত হয়ে গেল।

ব্রাহ্মসমাজের প্রাণ চাঞ্চল্যের শেষ দিকে বাংলা দেশে দুজন ব্যক্তি দুটি আদর্শ প্রচার করেন—বাংলা ও ভারতের পরবর্তী জাতীয় জীবনে এই দুটি আদর্শই বহুৎ প্রভাব রেখে গেছে। সমসাময়িক এই দুজন ব্যক্তি, রামকৃষ্ণ (জন্ম ১৮৩৬) ও বঙ্কিমচন্দ্র (জন্ম ১৮৩৮) দুটি আদর্শ প্রচার করলেও, সেই দুই আদর্শের ভিতর গভীর মিলও ছিল। রামকৃষ্ণ বললেন মানব জীবনের শ্রেষ্ঠ আদর্শ ঈশ্বরলাভ এবং ঈশ্বরের মাতৃরূপের কল্পনাই তিনি বিশেষভাবে উপস্থিত করলেন দেশের সামনে। বঙ্কিম রামকৃষ্ণের মাতৃমন্ত্র গ্রহণ ও প্রচার করলেন, কিন্তু তিনি বললেন সেই মা দুর্গা বা অন্য কোনো দেবী নন,দেশই সেই জননী ; দেশমাতৃকার আহ্বানই জীবনের শ্রেষ্ঠ আহ্বান। বঙ্কিম একথা আলঙ্কারিক অর্থে বলেননি, যেন হৃদয়ের মধ্যে চৈতন্যস্বরূপা ভগবতীকে দেশের মূর্তিতে প্রকাশমানা হতে তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন—তাই

তাঁর কল্পনা জীবন্ত রূপ নিয়ে গণচিত্তের সামনে দাঁড়াল, এবং তাঁর বন্দেমাতরম যেন মাতৃবন্দনার মন্ত্রোচ্চারণের মতো শোনাল। আমরা যদি বলি যে রামকৃষ্ণের ভাব বঙ্কিমের কল্পনার ভিতর দিয়ে খুঁজি বা আবেগগ্রাহ্য রূপ নিয়ে উনিশ শতকের বাঙালীর চিত্ততলকে আঘাত করেছিল তবে হয়তো ভুল বলা হয় না। বঙ্কিম বাঙালীকে মাতৃমন্ত্রে দীক্ষা দিলেন। সে মন্ত্র সর্বত্যাগের মন্ত্র। 'আনন্দমঠে'র বর্ণনা এই :

> মহেন্দ্র বলিল, "এ ত দেশ, এ ত মা নয়—
>
> ভবানন্দ বলিলেন, "আমরা অন্য মা জানি না—জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী। আমরা বলি, জন্মভূমিই জননী, আমাদের মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বন্ধু নাই, স্ত্রী নাই, পুত্র নাই, ঘর নাই, বাড়ী নাই, আমাদের আছে কেবল সেই সুজলা, সুফলা, মলয়জসমীরণশীতলা শস্যশ্যামলা—"

এই নবীন দেশাত্মবোধ ও মাতৃপ্রেমের একটা বাস্তব আকৃতি তিনি দিয়েছিলেন, তিনি একজন বিদেশিনী—নিবেদিতা। নিবেদিতা ভারতবর্ষকে নিজের জননী রূপে দেখার দীক্ষা পান তাঁর গুরুর কাছে। স্বামীজী সকল ভারতবাসীকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন যে যেন তারা ভুলে না যায় যে তারা জন্ম হতেই মায়ের জন্য বলিপ্রদত্ত – ভারতের কল্যাণ যেন হয় তাদের একমাত্র আরাধ্য বিষয়। শত শতাব্দীর শেষ সময়ে নিবেদিতা এদেশে আসেন, কিন্তু স্বামীজীর দেহত্যাগের পূর্ব পর্যন্ত নিজের স্কুলের কাজ এবং জনসেবা ছাড়া আর বিশেষ কোনো কিছু করতে তাঁকে আমরা দেখিনি। কিন্তু ১৯০২ সালে স্বামীজীর দেহত্যাগের প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিবেদিতা ভারত ভ্রমণে বহির্গত হন এবং সারা দেশে একটা অখণ্ড জাতীয়তাবোধ সৃষ্টির কাজে নিজেকে নিয়োজিত করেন। এর আগে সুরেন ব্যানার্জীও ভারতের নানা স্থানে ঘুরে একটা ঐক্যবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ার কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন, ভারতীয় কংগ্রেসও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু সুরেন ব্যানার্জী বা কংগ্রেস কেউই অখণ্ড ভারতীয় জাতির প্রাণমন্ত্রের সন্ধান পাননি যা নিবেদিতা পেয়েছিলেন এবং প্রচার করেছিলেন। ক্রমে তিনি ভারতের বিজ্ঞান, ভারতীয় শিল্প, ইতিহাস ও সাহিত্য, লোকসংস্কৃতি ও আচারপ্রথা—ইত্যাদির বিকাশের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রমই করেছিলেন তাই নয়, এসবের ভিতর দিয়ে তিনি একটা খাঁটি ভারতবর্ষের একটা বাস্তব রূপ আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরলেন—এবং পাঞ্জাবী, মারাঠী, দ্রাবিড়, ওড়িশা, বাঙালী ইত্যাদি সবস্ত মিলে একটি অখণ্ড ভারতীয় জাতি যে বর্তমান এ সত্যও তিনি নতুন করে তুলে ধরলেন। বঙ্কিম যে মায়ের বন্দনাগান লিখেছিলেন তিনি দশকোটি বাংলাভাষীর জননী,—কিন্তু নিবেদিতা স্বামীজীর শিক্ষা অনুসারে সকল সম্প্রদায়, বর্ণ ও ভাষাভাষীর এক সম্মিলিত ভারত জননীর জীবন্ত মূর্তি আমাদের দেখালেন—এবং সেই ভারতের বন্ধন মুক্তির উদ্দেশ্যে বৈপ্লবিক কর্মপন্থা হাতে কলমে রূপায়িতও করেছেন।

স্বামীজীর প্রতি সুভাষচন্দ্রের গভীর ভক্তির কথা সর্বজনবিদিত ; কিন্তু নিবেদিতার প্রতি তাঁর কী মনোভাব ছিল ? সেকথা বিশদভাবে তিনি বলেননি, বলা সম্ভবও হত না। কেননা নিবেদিতার প্রতি সুভাষের একটা অতি কোমল ও নিবিড় অনুভূতি থাকাই স্বাভাবিক। সুভাষ কলকাতায় আসার মাত্র দু বছর আগে নিবেদিতা মারা গেছেন—সুভাষের পক্ষে এটা ব্যক্তিগত ক্ষতি বলে মনে হওয়া আশ্চর্য নয়। কারণ নিবেদিতা ও সুভাষ উভয়েরই অন্তরের গভীরতম শ্রদ্ধা ও অনুরাগের পাত্র—বিবেকানন্দ ; নিবেদিতা জাতীয়তাবাদী, সুভাষ জাতীয়তাবাদের সাধক ; নিবেদিতা বিপ্লবী, সুভাষের বিপ্লব-প্রয়াস তার চেয়েও ব্যাপক ও দূরপ্রসারী। কিন্তু বিবেকানন্দের ভক্ত হয়েও সুভাষ রাজনীতি ও দেশের পরাধীনতামুক্তিব্রতকেই সার করেছিলেন

কেন, নিবেদিতার দিকে তাকালেই লেকথা আমরা বুঝতে পারি।

বস্তুতঃ রামমোহন হতে নিবেদিতা পর্যন্ত বাংলার এক শতাব্দীর সাধনা সুভাষচন্দ্রের মধ্যে মূর্ত হয়ে উঠেছিল—একথা বললে কি ভুল বলা হয়? রামমোহনের মুক্ত বুদ্ধির আন্দোলন, পশ্চিমী নব সভ্যতাকে স্বাগত জানানো, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতার চিন্তা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মবোধ—সুভাষ এ সবেরই উত্তরাধিকারী। এরই সঙ্গে তাঁর চরিত্রে ছিল এমন একটা তন্ময় গভীরতা যাকে মিস্টিকতা বলা যায়, এবং যার ফলে রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ আন্দোলনের অন্তর্লীন ভাবধারাগুলিকে আত্মসাৎ করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। রাজনৈতিক নেতা হলেও সুভাষ যে আমাদের জাতীয় জীবনে একটা অকস্মাৎ অভ্যুদিত মানুষ নয়, একজন hero মাত্রও নয় শুধু—বরং একটা জাতির দীর্ঘকালের সাধনার ক্রমাভিব্যক্তির অনিবার্য পরিণাম রূপেই তিনি এসেছেন; যুদ্ধক্ষেত্রে বা রাজনীতিতে বীরত্ব দেখানো ছাড়াও একটা দেশের অন্তরাত্মার আকুতিকে প্রমূর্ত করে ধরেছিলেন তিনি নিজ জীবনে—সুভাষ চরিত্র বিচারে সেটাই কি সবচেয়ে বড় কথা নয়?

(ক্রমশঃ)

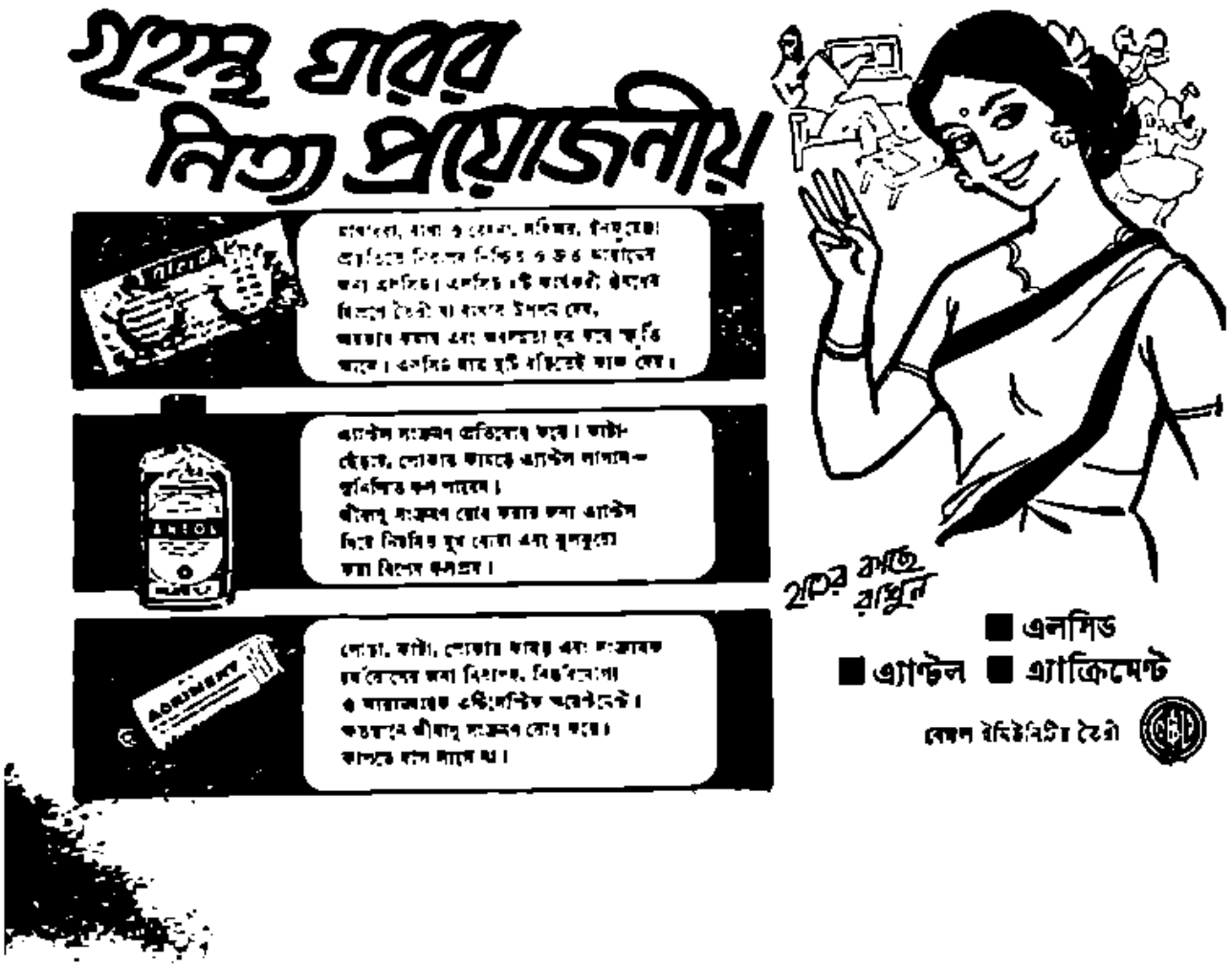

দান্তে

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

পরলোককে কেন্দ্র করে মধ্যযুগীয় ইউরোপে যে-মানব-জীবন আবর্তিত হতো তার পরম আকাঙ্ক্ষা ছিল স্বর্গে প্রবেশ-লাভ। কিন্তু স্বর্গে প্রবেশের পরে দান্তের কাব্যও নিঃশেষ হয়নি। তখন বিয়াত্রিচে তাঁকে নিয়ে গেলেন ঈশ্বরের সন্নিধানে। প্রেমের কাছে মানুষের অন্তহীন দাবি। এত দূর এসে ঈশ্বরের দর্শন থেকে কি বঞ্চিত থাকা যায়? তিনিই তো প্রেমস্বরূপ। ঈশ্বর-দর্শনের জন্যে দান্তের মনোবাঞ্ছাও পূরণ করা হলো। কিন্তু ঈশ্বরের—ত্রিভুবন-রূপ-বর্ণনের কোনও বর্ণনা কবি দেননি, বলা উচিত, দিতে পারেননি যেহেতু মর-ভাষাতে তা অবর্ণনীয়: সমস্তটা যেন দৃষ্টির সম্মুখে দ্রবমান তুষারের মতো, মর্মরিত শিহরিত পত্রগুচ্ছের উপরে উদ্ভীন সিবিলের ভবিষ্যদ্বাণীর মতো বিলীন হয়ে গেল, রইল শুধু কোনও দিব্যস্বপ্নের অমল আনন্দপূর্ণ স্মৃতি। সেজন্যে তিনি অনুভব করেছেন বিশ্ব-সংসারের অর্থগুতা ও পরিপূর্ণতা আর তার মধ্যে অন্তর্নিহিত এক অমোঘ ছন্দ-শৃঙ্খলা।

ঈশ্বরের রূপ না হয় অবর্ণনীয়, কিন্তু তাঁর অনুভূতি কী রূপ? তিনি কি আলোকময় মঙ্গলময় সর্বগুণসম্পন্ন সর্বশক্তিমান? না, দান্তের ব্যক্তিগত উপলব্ধিতে ঈশ্বরই স্বয়ং আলোক ও মঙ্গল, সর্বজ্ঞ ও সর্বশক্তি। পৃথিবীর অন্য সমস্ত আলোক মঙ্গল গুণ শক্তি ঈশ্বরের থেকে উৎসারিত, তাঁকে কেন্দ্র করে ধৃত। এর মধ্যে আলোক সবচাইতে সহজে গ্রহণীয়, তাই পাহাড়ের মাথায় আলোর ইশারা দেখে অন্ধকার অরণ্যে উদ্‌ভ্রান্ত দান্তের যাত্রা শুরু। এই আলোক হলো ঈশ্বরের প্রেম। কিন্তু প্রেমের পথ কঠিন। সেজন্যে অভিযাত্রীর প্রজ্ঞা থাকা চাই। দান্তের প্রজ্ঞা তাঁর গুরু ভার্জিল। তিনি স্বর্গ পর্যন্ত শিষ্যকে এগিয়ে দিয়েই খালাস। স্বর্গ যে প্রেমের রাজ্য। তাই সে-রাজ্যে দান্তেকে পথ দেখালেন তাঁর স্বর্গের প্রেমনীয়া বিয়াত্রিচে। ঈশ্বরের এই প্রেমের হেতু কী? দুধ কেন ধোল না হয়ে দুধই হলো এ-প্রশ্নের যেমন জবাব নেই তেমনই ঈশ্বরের প্রেমের হেতুসন্ধানও অনর্থক। প্রেমের জন্যেই প্রেম। স্রষ্টার প্রেম প্রতীক্ষা করে থাকে সৃষ্টির মধ্যে তার প্রতিফলনের জন্যে। স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির আকর্ষণের মূলেও প্রেম। ঈশ্বরের প্রেমকে দান্তের যখন আর-কিছু চাইবার থাকল না তখনই সমাপ্ত হলো "ডিভাইন কমেডি।"

দান্তেকে যাঁরা ঈশ্বরের সকাশে পথ দেখিয়েছেন তাঁরা কেউ যাজক-সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নন: একজন ভার্জিল, একজন বিয়াত্রিচে এবং মাতা মেরীর কাছে দান্তের হয়ে যিনি প্রার্থনা করেছেন তিনি সন্ত বের্নহার্ড। অথচ সে-যুগে খ্রীস্টীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠান দাবি করেছিল যে ঈশ্বরের সঙ্গে মানুষের মধ্যস্থতা করার আমমোক্তারনামা নাকি শুধু যাজকদেরই আছে, আর আমীর থেকে ফকির অবধি কারও উপরে সে-অধিকার খাটাতে তাঁরা কসুরও করেননি। এটা ভাবা ভুল যে ওই প্রতিষ্ঠান কর্তৃক উৎপীড়িত হওয়ার দরুণ দান্তে পাল্টা-হাত নিয়েছেন অধিকাংশ যাজক ও ধর্মযাজককে নরকের শাস্তি দিয়ে; আসলে

আনুষ্ঠানিক বাহ্য ধর্মাচরণের প্রতি তিনি সম্পূর্ণ আস্থাহীন ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, যে ঈশ্বরের মধ্যে স্থিতি তাঁর করুণা পাওয়ার উপায় হলো বাইরের সাধনা ভুলে নিয়ে ভিতরের সাধনা অর্থাৎ নিজের অন্তরের মধ্যে প্রসারিত অন্বেষণে যাত্রা করা; সেজন্যে সহজেই ম্যাগডেবুর্গের মেখ্‌টিল্ড বা "এটার্নাল গোসপেল" প্রণেতা জোয়াকিম প্রমুখ ধর্মীয় সাধিকা-সাধকের স্বর্গীয় সন্ধান কল্পনা করেছেন; এবং সেজন্যে নিজেও বাইরের সোজা-পথে পাহাড়ের মাথায় উঠতে গিয়ে চিতাবাঘ, সিংহ ও স্ত্রী-নেকড়ের তাড়া অবশেষে ভার্জিলের সঙ্গে পাহাড়ের ভিতর দিয়ে ঘুর-পথে এগিয়েছেন একই লক্ষ্যের পানে।

স্বর্গের সরলা পর্যন্ত দান্তেকে এগিয়ে দিয়ে ভার্জিল আর যেতে পারলেন না, তাঁর পরে বিয়াত্রিচে পবিত্র-আলোক পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে স্বর্গকান্তিতেই যিনি ঈশ্বরদর্শন পেয়েছিলেন সেই সন্ত বের্নহার্ডকে অনুরোধ করলেন দান্তের অভিলাষ পূর্ণ করে দেওয়ার জন্যে। বিয়াত্রিচে যেন সব অবস্থাতে তাঁকে ত্রাণ করেন এবং বিয়াত্রিচের প্রেমের যোগ্য যেন তিনি হতে পারেন এই প্রার্থনা করে দান্তে নিলেন বের্নহার্ডের সঙ্গ। কিন্তু দান্তের সম্মুখে দর্শন দেওয়ার জন্যে ঈশ্বরকে অনুরোধ করার অধিকার বের্নহার্ডেরও নেই, তা আছে একমাত্র মাতা মেরীর, যিনি মানবের জন্যে একদা ঈশ্বরকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন। যেহেতু ঈশ্বরের দর্শনলাভের মতো অলৌকিক প্রত্যাশা প্রকাশের ভাষা নশ্বর মানুষের নেই তাই দান্তের হয়ে প্রার্থনা করলেন সন্ত বের্নহার্ড।

কুমারী জননী, আপন পুত্রের কন্যা,
বিনীতা: বহুতী তাবৎ জীবের থেকে,
চিরপূর্ণতার ধ্রুবলক্ষ্য তুমি ধন্যা।

প্রথম পংক্তির মাত্র ছটি শব্দে মেরীতত্ত্ব বর্ণিত: মেরী যদিও কুমারী তবু জননী, যে-ঈশ্বর রক্তমাংসে তাঁকে সৃষ্টি করেছেন সেই ঈশ্বরকেই তিনি জন্ম দিয়েছেন রক্তমাংসে, তাই তিনি তাঁর কন্যা তিনিই তাঁর পুত্র। দ্বিতীয় পংক্তির ছটি শব্দে মেরীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে: সাপের চাতুরীতে আদিমারী যে-ভুল করেছিল তারই ফলে মানুষ স্বর্গ হারায় ও সেই পতিত মানববংশের সন্তান বলে মেরী বিনীতা, কিন্তু সে সঙ্গে মহতীও বটে, কেননা মনুষ্যদেহে তিনিই এলেন স্বর্গে। তৃতীয় পংক্তির চারটি শব্দে মুক্তির পূর্ণতত্ত্ব বিকশিত: ঈশ্বর স্থির করেছিলেন মানবকে তার মূল আবাসে ফিরিয়ে আনবেন স্বয়ং এবং মেরীর মধ্যে দিয়ে যেমন ঈশ্বর হলেন মানবতার সাথিল তেমনই মেরীর মধ্যে দিয়েই মানবের ঐশিকতা লাভ সম্ভব এবং সমগ্র মানবের ঐশিকতা লাভের জন্যে মেরীই একমাত্র মাধ্যম।

এসব কাহিনী একালে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মতো তো বটেই, অনেক খ্রীস্টানদের মনেও বিশ্বাস উৎপাদন করতে পারে না; প্রকৃতপক্ষে "ডিভাইন কমেডি"কে আক্ষরিক অর্থে নেওয়া একান্তই অপলাপী: মনে রাখা দরকার যে ওই কাব্যের অনেকাংশ তাৎপর্যের উপরে দান্তে স্বয়ং গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং ওটি রূপকের প্রচ্ছদে সত্যের জন্যে মানবের চিরন্তন অভিসারের কাহিনী। হিন্দুরা যেমন শুম্ভনিশুম্ভের দ্বন্দ্বকে চণ্ডী কর্তৃক মহিষাসুর বধের মধ্যে কল্পনা করেছেন এখানে রূপক বলতে তেমন কোনও বিমূর্ত প্রসঙ্গ মূলে ফুল করা হবে, কেননা দান্তের রূপক-কল্পনার অন্তরতম ভাব বহুবিধ প্রতীকে সমৃদ্ধ, তা বিশুদ্ধ স্বতঃসিদ্ধ রূপের মূর্তিমান। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাহিনীতে ঔদ্ধত্য স্বৈরাচারের সবচেয়ে রূপ হিটলার—সে-কাহিনীতে অন্তর্ভক্তিকে বোধগম্য করার জন্যে কোনও ভয়ংকর-দর্শন দানবীয় রূপ কল্পনার অর্থহীনতার মতো দান্তে বিভিন্ন গুণ বা পাপ ও পুণ্যকে বোঝাবার জন্যে বাস্তবের থেকে নিঃসম্পর্ক কতকগুলি চরিত্র ও তাদের রূপ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়াকে মূলত পরিহার করেছেন, এবং তার পরিবর্তে প্রাসঙ্গিক পাপের অথবা পুণ্যের আধার হিসেবে বিভিন্ন ব্যক্তিকে নির্বাচন করেছেন ইতিহাস বা ইতিহাসের সাথিল

ইতিকথা পুরাণ ইত্যাদির থেকে : নিম্নলোক ও শোধনলোকে পথ প্রদর্শনের জন্যে মানবিক প্রজ্ঞার কোনও অভিনব রূপ কল্পনা না করে সে-ভার দিয়েছেন ভার্জিলকে, কেননা মানবিক প্রজ্ঞা যে ভার্জিলের মধ্যে বিশেষ রূপে প্রকাশ পেয়েছিল তা দান্তে কর্তৃক প্রবাদপ্রতিম থাকেনি, এবং ভার্জিলের মতো 'ডিভাইন কমেডি'র অধিকাংশ চরিত্রেরই স্বভাব স্বতঃস্ফীকৃত।

চণ্ডী কর্তৃক অসুর হননের কাহিনী যতখানি ভাবমূলক রুদ্রের ভ্রূলীলা ততখানি নয়, বরং তা বহুলাংশে বস্তুমূলক ; ভিন্নধর্মাবলম্বীর কাছে নিত্যত্রাণের কল্পনা দুঃসাধ্য হলেও একজন খ্রীস্টানের কাছে মেরী ও ঈশার কাহিনী ততটাই বাস্তব, এবং দুটি কাহিনীই ইতিহাস ইতিকথা পুরাণের সংমিশ্রণ। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় ইউরোপের সন্তান দান্তের কাছে ঈশা ছিলেন প্রকৃতই ঈশ্বরের পুত্র বা ঐশীসত্তার জীবন্ত মূর্তি এবং মেরী ঈশ্বর কর্তৃক পরম গর্বের একজন নারী, কিন্তু এমন একজন নারী যাঁকে নির্দিষ্ট করে ঐশীসত্তা ধারণ করেছিল রক্তমাংসের মানবিক রূপ। এখানে বিশেষ বিবেচ্য এই যে মধ্যযুগের চিন্তাধারাকে অনুসরণ করেও দান্তে অলক্ষ্যে তার থেকে সরে গেছেন : মেরীর মধ্যস্থতা করার অধিকারে এমন এক গুরুত্ব আরোপ করেছেন যা সামন্ততন্ত্র ও যাজকতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে ছিল, ওই দুটি তন্ত্র বিলুপ্ত হওয়ার পরেও আছে, কিন্তু ঐতিহাসিক অর্থে মধ্যযুগের ইউরোপে অদ্ভুত।

যেকালে জ্ঞানচর্চার একমাত্র ভাষা ছিল লাতিন এবং ভারতবর্ষে সংস্কৃতর মতো যা ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজনের নিকট বোধগম্য শাস্ত্রীয় ভাষা তখন দান্তে ভাষার শুচিতা সম্পর্কিত মধ্যযুগীয় সংস্কারকে "অন ভার্নাকুলার" নিবন্ধে শুধু যে আক্রমণ করলেন তাই নয়, যে-ভাষায় ইতালির আপামর জনসাধারণের স্বত্ব স্বীকৃত, যে-ভাষা প্রবণতায় স্ত্রী-পুরুষ শিক্ষিত-অশিক্ষিত নির্বিশেষের বোধগম্য সেই ইতালীতে স্বয়ং দেশবাসীকে তথা বিশ্ববাসীকে পরিবেশন করলেন তাঁর পাণ্ডিত্য প্রজ্ঞা মুক্তির পরমোপলব্ধি এবং সে সঙ্গে তাবৎ শাস্ত্রীয় ভাষার সঙ্গে এক কোটিতে প্রতিষ্ঠা করলেন মাতৃভাষার মর্যাদাকে।

'ডিভাইন কমেডি' রচিত হওয়ার এক শ বছরের মধ্যে ইতালীতে যে-নবজাগরণের সূচনা হয়, মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার মতো তার অপর একটি লক্ষণ নব্যরাজতন্ত্রের সহায়তায় সামন্ততান্ত্রিক অরাজকতা ও যাজকতান্ত্রিক কপট অধ্যাত্মসাধনার অবসান : পাশ্চাত্য রাজনৈতিক চিন্তার ইতিহাসে মেকিয়াভেলিকে গণ্য করা হয় আধুনিক রাজনীতির গুরু হিসেবে, কিন্তু পর্ববিভাগের সীমানাকে শিথিল করে পঞ্চদশ শতাব্দীর বদলে ত্রয়োদশ শতাব্দীকে আধুনিকতার শুরু ধরলে সে-আসন দান্তের প্রাপ্য ; অবশ্য মেকিয়াভেলি রাজাকে সিংহের মতো বলীয়ান ও শৃগালের মতো ধূর্ত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন এবং রাজনীতি ব্যাপারটাকে এঁকেছেন যথাসাধ্য কলঙ্কিত কূটব্যবসায় করে, এবং, আমরা সবাই জানি যে, তাঁর বক্তব্য যতই অপ্রিয় হোক-না কেন তা অকাট্য। পক্ষান্তরে দান্তে রাজনৈতিক জীবনের সম্বন্ধে যে-ধারণা পোষণ করতেন তা একান্তই আদর্শগত এবং সেখানে টমাস মোরের "ইউটোপিয়া"র সঙ্গে তার সাদৃশ্য সবিশেষ আন্তরিক : সরকারের শাসনাধিকার দৈহিক শক্তিতে অথবা জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বতে জন্মায় না, তা জন্মায় আইনের প্রতি শাসকের সর্বাত্মক আনুগত্যে ; ঠিক কথা যে ধরিত্রীর অধিষ্ঠাতৃ কর্তা বা রাজাকে হতে হবে সিংহের মতো বলীয়ান, কেননা আইন প্রয়োগের শক্তিও থাকা তাঁর পক্ষে আবশ্যিক ; কিন্তু পাছে সর্বজনীন রাজতন্ত্র শক্তির অপব্যবহারে সর্বজনীন স্বেচ্ছাচারিতায় পরিণত হয় তাই তাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে থাকবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা গির্জা যার কাজ হবে সরাসরি রাজনীতিতে হস্তক্ষেপ না করে রাজা ও রাজকর্মচারীদের পরম প্রজ্ঞাবান ও সত্যকাম করে তোলা যাতে তাঁরা আপনা থেকে সকল দুষ্কর্মে, শৈথিল্যে ও স্বেচ্ছাচারে নিবৃত্ত হয় এবং তাদের কর্তব্য হবে বিশ্বরাষ্ট্রের প্রতিজনের জন্যে সুখ ও শান্তির বিধান

করা আর ওই বর্তমানবোধে তারা হবে জনসাধারণের বিশ্বস্ত সেবক।

রাষ্ট্রতান্ত্রার মর্যাদা সম্বন্ধে মধ্যযুগের ইউরোপকে যিনি সচেতন করে তুলেছিলেন, যিনি বলেছিলেন রাজতন্ত্রের তুলনাতে যাজকতন্ত্র অর্বাচীন, সন্ত পল পর্যন্ত ছিলেন রাজার সাহায্যপ্রার্থী এবং রাজা ঐহিক ক্ষেত্রে ও যাজক পারত্রিক ক্ষেত্রে সর্বেসর্বা তাঁর স্থান স্বতঃক্রিয়াতে ও সুস্পষ্টরূপে নব্য রাজতন্ত্রের পৃষ্ঠপোষকতাতে পরিপুষ্ট পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীর পাশ্চাত্য নবজাগরণের অন্যতম পরিচয় রূপে সুনির্দীত হয়ে যায়। কিন্তু যে-মানবিকতা ওই মহান জাগরণের মূলাধার তার আলোকে ঈশ্বরের স্বরূপ ও দেবীর মানবীয় রূপের অনন্ত নিবাড়ার বিষয়েও দান্তের উপলব্ধি অশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং বোধকরি সে-তাৎপর্য আরও গভীর; আবার ওই তাৎপর্যের পশ্চাদ্বোদ্ভাসনে যখন স্বর্গলোক খণ্ডের একাদশ সর্গ বোঝার চেষ্টা করি—যেখানে বীনতাকে দেখা হয়েছে প্রথম পতি খ্রীস্টীয় ধর্ম-প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রবর্তিতা মাননীয়া মহিলা রূপে এবং যেখানে দান্তে গুরুত্ব আরোপ করেছেন সূর্যের মতো আবির্ভূত আসিসি-নিবাসী সন্ত ফ্রান্সিসের সঙ্গে সহস্র বৎসরেরও অধিক অনাদৃতা ও উপেক্ষিতা ওই নারীর পুনর্বিবাহের উপরে—তখন দান্তেকে দেখি কঠোর ধর্মসংস্কারক-রূপে। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মধ্যে ধর্মশাস্ত্রজ্ঞান ও মানবিকতাবাদ, আভিজাত্য ও সহজিয়া-সাধনা, খ্রীস্টীয় প্রত্যয় ও ধর্মসংস্কার-বোধ বা প্রাতিষ্বিক-ধর্মবোধ নিপট জটিলতায় সমন্বিত হয়েছিল।

আদি-নারী ঈভের ভুলে মানুষ যে স্বর্গীয় উদ্যানের অধিকার হারিয়েছিল সে-কথা মনে রেখে মধ্যযুগের যাজকগণ খ্রীস্টান জগতে প্রচার করেছিলেন তীব্র নারী-দ্বেষ; কিন্তু দান্তে দুর্জনের প্রতি সজ্জনের তথা মানুষের প্রতি ঈশ্বরের দয়া, (misericordia) সন্তানের প্রতি পিতামাতার স্নেহ (pietate) [illegible] বা মহত্ত্ব (magnificenza) দ্বারা দেবীকে ভূষিতা করেও ক্ষান্ত হলেন না, তিনি বিয়াত্রিচেকেও এই কাব্যে উপস্থাপন করেছেন পরম উন্মীলন রূপে। অথচ কে এই বিয়াত্রিচে? সে তো মর্তের একজন সাধারণ নারী মাত্র। তার অলোকসাধারণতার মূলে কী? প্রেম। প্রত্যেক সাধারণ প্রেমিকের চোখে তার প্রিয়তমা এক অনন্যা স্বর্গীয় সুষমা, সেটুকুর ভিত্তিতেই মরলোকের নারী বিয়াত্রিচের অমরত্ব। পার্থক্য শুধু এই যে তিনি ছিলেন দান্তের মতো অলোক-সামান্য কবির প্রিয়তমা। যে-কালে নারীকে বর্ণনা করা হতো নরকের দ্বার রূপে তখন দান্তের দৃষ্টিভঙ্গি বৈপ্লবিক এবং তাঁর নারী-বন্দনা গূঢ়তর অর্থে নতুন যুগের আবাহন।

এ-কথা ঠিক যে মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে নারী সম্পর্কিত সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন শুরু হয়েছিল: রাজা আর্থার ও গোলাপের উপকথাগুলিতে দেখা যায় রুগ্ন সেনাদের শিভালরস সমস্ত কীর্তির পেছনে নারীর বিচিত্র প্রেরণা, অসাধ্য সাধন করার মূলে নারীর হৃদয় জয় করার বাসনা; কিন্তু মেনে নেওয়াই ভালো যে ওসব উপাখ্যানে ত্রিয়ংসার একটা বড়ো রকমের ভূমিকা ছিল, এবং সার্ভেন্টিস সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই পাচিকা ডুলসিনীয়ার উদ্দেশ্যে ডন কুইকসোটের অভিধানে দেখেছেন কারুণ্য ও কৌতুক। একদিকে মধ্যযুগীয় ও অন্যদিকে সার্ভেন্টিস প্রমুখ কাহিনী-গুলির মধ্যে নারীর মূল্য যে-দোলাচলে অনিশ্চিত তাকে দান্তে এমন অমল মহিমাতে উন্নীত করেছেন যা সর্বেশ্বরবাদী সুফী সাধকদের, কিংবা আমাদের আরও কাছের রাধা-সাধক বাউলদের সহজিয়া কল্পনাসাধ্য এবং যা একই সঙ্গে সামুজ্য পেয়েছে গেটে ও রবীন্দ্রনাথের প্রেমোপলব্ধিতে। আদর্শ রাজতন্ত্র, আদর্শ ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, আদর্শ সৌন্দর্য, আদর্শ করুণা, আদর্শ স্নেহ, আদর্শ মহত্ত্ব—দান্তের চেতনাতে যা কিছু আদর্শ ছিল সমস্তই বিয়াত্রিচেকে অবলম্বন করে বিকশিত: অর্থাৎ বিয়াত্রিচেই পরম জ্ঞান বা অমরতাতে উপনীত হওয়ার একমাত্র সূত্র। উপনীত হওয়ার অর্থ আয়ত্ত করা নয়, দর্শন

করা, পরম জ্ঞানের স্বাদ গ্রহণ করা, অনন্ত সমুদ্রে গিয়ে অবগাহনের মতো রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা।

বাস্তব জীবনে দান্তের প্রেমে কতখানি সাড়া বিয়াত্রিচে দিয়েছিলেন তা সঠিকভাবে বলা মুশকিল। "নতুন জীবন" পর্যায়ের কাব্যমালাতে তাঁদের প্রেমের যেটুকু কাহিনী পাওয়া যায় সেটুকুই আমাদের প্রধান সম্বল। কাহিনীর বাদবাকি অংশ কিংবদন্তীর সামিল। দান্তের জবানবন্দী থেকে জানতে পাই যে বিয়াত্রিচেকে চোখে দেখেই দান্তের হৃদয় দিব্য আহ্লাদে ভরে যেত, মনে হতো কেউ যেন তাঁকে স্বর্গে টেনে তুলছেন। কিন্তু নিশ্চিত করে বলা যায় না এর কতটা বাস্তব ও কতটা কাব্যিক সত্য। "ডিভাইন কমেডি"তে গহন অরণ্যের থেকে উদ্‌ভ্রান্ত দান্তেকে উদ্ধার করে নরকের পথে যাওয়ার সময় ভার্জিল বলেছেন যে বিয়াত্রিচে কর্তৃক তিনি নিযুক্ত হয়েছেন নন্দনবাসিনীর প্রেমিককে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যে। অর্থাৎ বিয়াত্রিচের কামনাতেই দান্তের স্বর্গে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। তারপর দান্তেকে পরম জ্ঞান বা ঈশ্বরের সন্নিধানে পৌঁছে দিয়েছেন স্বয়ং বিয়াত্রিচে।

মর্তের পাতকী দান্তের পক্ষে স্বর্গে পৌঁছনো কেমন করে সম্ভব হলো? শুধুই প্রেমের জোরে? প্রেম কি ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে উল্টে দিয়ে পাতকীকে স্বর্গে উত্তীর্ণ করে? প্রেম নরকের ভয়াবহ পথে যাওয়ার সময় দান্তেকে শক্তি জুগিয়েছে, স্বর্গের পানে ক্রমাগত আকর্ষণ করেছে, কিন্তু ঈশ্বরের ব্যবস্থাকেও পদে পদে মেনে নিয়েছে।

কী সেই ব্যবস্থা? মানুষের পক্ষে স্বর্গে যাওয়ার মূল শর্ত হলো আত্মজ্ঞান। আগে আত্মজ্ঞান, পরে পরম জ্ঞান। কিন্তু আত্মজ্ঞান আসবে কেমন করে? পাতকের জ্ঞানে। মরমানুষ স্বভাবতই পাপপ্রবণ, যেমন তার দেহ তেমন প্রবল। তাই অস্বাস্থ্যের প্রতিকার প্রথমেই ব্যাধির নির্ণয়ে আর মরতার প্রতিকার প্রথমেই পাপের নির্ণয়ে। যেমন ব্যাধির আবাস দেহে তেমনই পাপের আবাস মনে। ভার্জিল বা মানবিক প্রজ্ঞার পরিচালনার ধাপে প্রবেশ করেছেন নিজেরই অন্তরে। সেখানে যাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে তারা আসলে বিভিন্ন পাতকের প্রতীক। পাতক মাত্রেই কোন-না-কোন নরক দেহ-সাপেক্ষ, সেগুলি কোনও বিমূর্ত কল্পনা মাত্র নয়, চৈতন্যের স্তরে সেগুলির পরাক্রান্ত শক্তি, মানবিক স্তরে সক্রিয়তর ক্রিয়া, ও সামাজিক স্তরে সেগুলির সবল রূপ আছে। ওই সব পাপের অধিষ্ঠানে প্রত্যেক মানুষের জীবন নিদারুণ বিরোধাত্মক উপলব্ধির দ্বারা উৎকণ্ঠিত ও উৎপীড়িত। আরিস্টটল যখন বলেছিলেন আপনাকে জানবার কথা তখন তাঁর ইঙ্গিত সাধারণভাবে মানব চরিত্র সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রতি; সন্ত অগাস্টিন যখন প্রশ্ন তুললেন: আমি কী? তখন মানব জিজ্ঞাসার থেকে আরও এগিয়ে প্রাতিস্বিক জিজ্ঞাসাকে বিদ্ধ করলেন। গ্রীকদের চেতনাতে মানব জীবন নিয়তির দ্বারা সীমাবদ্ধ; পাশ্চাত্য নবজাগরণের চেতনাতে মানুষ সীমাবদ্ধ নিজেরই বিশেষ দুর্বলতা দিয়ে। "ডিভাইন কমেডি" একই সঙ্গে মানবিক ও প্রাতিস্বিক জিজ্ঞাসাতে আক্রান্ত। সেজন্যে অস্তিত্বের বিরোধাত্মক স্বরূপ দান্তের চেতনাতে সম্পূর্ণ।

রিমিনির বিকলাঙ্গ লাবণ্য লিয়ানচিয়োত্তর সঙ্গে ফ্রানচেসকার বিয়ে দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে: সেখানে দুর্ভাগ্যের উপরে ফ্রানচেসকার নিজের কোনও হাত ছিল না, কিন্তু স্বভাবের দুরন্ত সংবাদে প্রণয়ী হিসেবে সে নির্বাচন করল দেবর পাওলোকে এবং লিয়ানচিয়োত্তর ছুরিকাঘাতে পরস্পরের আলিঙ্গনে দুজনের মৃত্যুর পরেও প্রেমিককে ছেড়ে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হলো না, নরলোকের পাপাচরণ থেকে পরলোকে গিয়েও সে নিবৃত্ত হতে পারল না। এক দিকে যেমন অগাধ প্রেমবোধ তেমনই অপরদিকে অতল পাপবোধে ফ্রানচেসকার পরজীবন নরকের সবচাইতে নিচু স্তরেও অর্গলিত। নীতি ও প্রীতির আলোছায়াতে হৃদয়ের যেটা রহস্য সেটাই আবার পরস্পর-বিরোধিতাতে জীবনকে ভরে তোলে অনতিক্রম্য বিয়োগান্তবোধে। ফ্রানচেসকার ক্ষেত্রে

যে-বোধ প্রচ্ছন্ন ছিল তা প্রকট হয়ে উঠেছে প্রথম খণ্ডের পঞ্চদশ সর্গে ব্রুনেত্তো লাতিনির সঙ্গে তাঁর একালীন অনুসারী দান্তের সাক্ষাতে। প্রদীপ্ত মনীষার জন্যে ইহলোকে যিনি পূজিত ছিলেন নিরয়লোকে দারুণ নেশাখোর বেলেল্লা সোডোমাইটদের মধ্যে তাঁকে দেখতে পেয়ে বিমূঢ় দান্তের মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে, "শ্রদ্ধেয় ব্রুনেত্তো, এ কি! আপনি এখানে!" দান্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও এ-প্রশ্ন প্রিয়জনের দর্শনে ব্রুনেত্তোর প্রথম উল্লাসকে আহত ও অস্বস্তির দুর্গতি সম্বন্ধে সেই অসাধারণ মনীষীকে শোচনীয়ভাবে সচেতন করে, তার-পরে দান্তে যখন বিদায় নিলেন তখন তাঁদের পারস্পরিক সম্পর্কের ঐকান্তিকতাকে এবং সেই বিশেষ পর্বকালের বাইরে সে-সম্পর্কের জের টানার অসাধ্যতাকে স্বীকার করার বেদনা দুজনেরই হৃদয় বিষাদে ভারাক্রান্ত: বিশেষ করে একালে যখন অতীতের কোনও অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাতের একটু পরে কথা ফুরিয়ে যায় ও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের নিঃস্পন্দিত বন্ধুতা তখন বোঝা যায় ব্যক্তিত্বে ব্যক্তিত্বে যে-শক্তি বিচ্ছেদ ঘটায় বিষাদ ছড়ায় তার পরাক্রমের সামনে আমরা কত অসহায়। ব্যক্তির এই সীমাবদ্ধতা বোধকরি অধিকতর বিষণ্ণ-রূপে অভিব্যক্ত হয়েছে সর্গের পরে যখন কুণ্ডলিনকদের প্রসঙ্গে, যেখানে অনুভব করি তাঁরা আমাদেরও ব্যক্তিগত বৈফল্যকে স্পর্শ করছেন, যেখানে এই মর্মান্তিক সত্যকে স্বীকারে বাধ্য হই যে প্রত্যেক মানুষের ব্যক্তিত্ব একাধারে অবোধ্য ও সর্বজনীন কতকগুলি নৈতিক সত্যের সঙ্গে এমন নিগূঢ় ভাবে জড়িত যার জট মোচন করা শিবেরও অসাধ্য; এবং এই স্বীকৃতিতেই ঘটে আমাদের চিত্তশুদ্ধি।

মনে রাখা দরকার যে কাহিনীর চরিত্রগুলির নয়, চিত্ত-শুদ্ধিটা ঘটে আমাদের, লেখকের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের। দান্তে এমনভাবে এই মহাকাব্য রচনা করেছেন, এমনভাবে [illegible] বর্ণনা করেছেন যাতে আমাদের প্রায় অজ্ঞাতেই [illegible] সঙ্গে সংযুক্ত, কখনও বা তাঁদের থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ি আমরা, কখনও তাঁদের যন্ত্রণাভোগে আমরা আর্ত, কখনও-বা তাঁদের রূপান্তরে আমরা চিত্তশুদ্ধ হয়ে যাই। প্রেম দিয়েছে দান্তেকে এমন এক অশ্রুতপূর্ব সুযোগ যার ফলে নরকের মধ্যে দিয়ে, শোধনলোকের মধ্যে দিয়ে, স্বর্গে ঈশ্বরের সন্নিধানে তিনি উপনীত হলেন। এই অপার্থিব সৌভাগ্য একা দান্তেকেই দেওয়া হলেও তিনি একাকী তা ভোগ করেননি, তাঁর আন্তরিক অভিজ্ঞতার বিপুল বর্ণনা লিপিবদ্ধ করে আমাদেরকেও তার ভাগ দিয়েছেন; কিন্তু পাঠক হিসেবে আমরা যা লাভ করেছি তার থেকে "ডিভাইন কমেডি"র চরিত্রগুলি, বিশেষ করে নরকের চরিত্রগুলি, বঞ্চিত থেকেছে, কেননা তাদের ভাগ্য আগেই নির্ধারিত হয়ে গেছে স্ব-স্ব নির্ধারিত কর্মের দ্বারা এবং একবার যাদের স্থান নরকে নির্দিষ্ট হয়ে গেছে তাঁদের আর উদ্ধার নেই, ঈশ্বরীয় বিচারে প্রদত্ত শাস্তির থেকে একমাত্র তাঁদেরই নিস্তার আছে যাদের ইহজীবনের মেয়াদ ফুরিয়ে যায়নি, যাঁদের স্থান শোধনলোকে; আর যারা এ-কাব্যের পাঠক, যাদের সামনে এখনও আপন কর্ম নির্বাচনের বা অনুতাপের অবকাশ অব্যাহত তাদের পক্ষে এ-গ্রন্থের অন্তরতম তাৎপর্যকে অনুধাবন করে নরকের অনন্তবাস অতিক্রম করা সম্ভব।

বিয়াত্রিচে কর্তৃক নিযুক্ত ভার্জিলের সঙ্গে সঙ্গে যেমন দান্তে তেমনই দান্তের সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও যাত্রা ত্রিলোকের বাইরে সরীসৃপে। দান্তের বর্ণনার সূত্র অবলম্বন করে আমরা পাতকের শেষ সীমা পর্যন্ত চলে যাই, তাঁর বর্ণিত চরিত্রগুলির সঙ্গে আমরাও তাঁদের পাতকের অংশীদার হয়ে পড়ি এবং সেসব পাতকের রকম বয়সকে স্তরে স্তরে অর্জন করি নিজেদের সংবিতে। তারপরে শুরু হয় আমাদের অনুতাপের অর্থাৎ শোধনের পালা। আমাদের পাপজ্ঞান যত যথার্থ অনুতাপও ততই গভীর। এ-গ্রন্থের পাঠকের বেলাতে শোধনের প্রক্রিয়া হলো স্তরে স্তরে পাপজ্ঞান বর্জন তথা আত্মজ্ঞান অর্জন এবং তা আসলে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক অর্থে

পাঠকের চিত্তশুদ্ধি : শোধনলোকের সীমান্তে পৌঁছে বিয়াত্রিচের কাছে দান্তের অশ্রুসজল বিনীত স্বীকারোক্তিতে তাঁর অতীত অপূর্ণতা অনন্ত দুর্বলতা অপার দীনতা অতলস্পর্শতা প্রকাশ পেয়েছে, আত্মনের প্রকৃত স্বরূপকে অনুধাবনেই সম্পূর্ণ হয়েছে তাঁর অনুতাপ। নেতি নেতি করে আপনার নাস্তির সম্বন্ধে নিটোল নিশ্চয়তা ও সম্যক সচেতনার পরে শুদ্ধচিত্ত দান্তের সামনে খুলে গেছে স্বর্গের দুয়ার, শুরু হয়েছে প্রতি পদে বিয়াত্রিচের একান্ত অনুসরণ, পরমজ্ঞানের পথে ক্রমাগত উত্তরণ, অবশেষে লক্ষ্যে উপনয়ন : অজ্ঞানের কাঁটাকে জ্ঞানের কাঁটা দিয়ে উৎপাটনের পরে বিজ্ঞানলাভ।

স্বভাবতই অজ্ঞানের জগৎ প্রাণজিক খণ্ডটির তুলনাতে জ্ঞানের জগৎ প্রাণজিক খণ্ডটি নানারূপ তত্ত্বালোচনাতে পরিপূর্ণ এবং কোন কোন পাঠকের মনে হতে পারে যে সে-আলোচনা কাব্যের বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করেছে ; কিন্তু গদ্য ও পদ্যের বিশুদ্ধতা সম্পর্কিত উনবিংশ শতকীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এলিয়টের বক্তব্য এখানে প্রণিধানযোগ্য : মানুষের হৃদয় ও মস্তিষ্ক জলাচল কোটরে কোটরে বিভক্ত নয় এবং মহৎ রচনা ব্যক্তির ভাবৎ অভিজ্ঞতাকে বিভিন্ন মাত্রা-বর্ণ-রূপ-জটিলতাসহ ধারণ করে সমৃদ্ধ ও সম্পূর্ণ। নিরয়লোকের যথাযথ বিপরীত করে শোধনলোকের বর্ণনা দান্তে যেমনি করুন, তার ফলে প্রথম খণ্ডের রুদ্ধশ্বাস আবহাওয়ার আকর্ষণ পরবর্তী দুটি খণ্ডেই যে অনুপস্থিত তা-ও সত্য, এবং এর কারণ দান্তে যেন্দ্রায় সর্বতোভাবে দনত্র কাব্যের এমন স্থাপত্য পরিকল্পনা করেছিলেন যাতে তিনটি খণ্ডের মধ্যে আপাত সাদৃশ্য ও অন্তর্লীন ক্রিয়া সত্ত্বেও মৌল প্রতিমানের পুনরাবৃত্তি না ঘটে, যাতে স্বাধী-দান্তের উত্তরণের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পী দান্তে বারবার নিজেকে উত্তীর্ণ হয়ে যেতে পারেন এবং যাতে প্রতিমানের সে-তারতম্য অর্থাৎ শিল্পসিদ্ধ উত্তরণ প্রতি খণ্ডের কেন্দ্রনিহিত তাৎপর্যের ইতর-বিশেষকে স্পষ্ট করে তোলে। সেজন্যে নিরয়লোকের সঙ্গে শোধনলোকের প্রকৃত পার্থক্য খণ্ডপ্রমাণে নয়, খণ্ডপ্রাপ্ত চরিত্রগুলির মনোভঙ্গিতে : মানুষ যখন পাপ করে ও তার ফলস্বরূপ গ্লানি থেকে মুক্ত ও পাপের কুহকেই থাকতে থাকা পছন্দ করে তখন লঘুতম শাস্তিকেও সে স্বীকারে অক্ষম, সেটাকে মনে করে অন্যায় অত্যাচার, অজ্ঞানবশে বুঝতে পারেনা যে যে-দিব্যবিভাকে সে প্রত্যাখ্যান করেছে তা-ই আগুন হয়ে জ্বলছে নরকে ; পক্ষান্তরে সে যখন জ্ঞানের চৌহদ্দিতে স্বকৃত পাতক সম্বন্ধে যথার্থই অবহিত তখন তার জন্যে মাথা পেতে নেয় শাস্তিকে আর আপনা থেকে তার অন্তরে সে-শাস্তি জাগায় শোধনক্রিয়া। পাতকের সম্মোহনকে অতিক্রম করার আগ্রহ যাদের নেই তাদের জন্যেই অনন্ত নরকজীবন, আর ওই আগ্রহেই অনেক পাতকীর স্থান শোধনলোকে এবং শোধিত হয়ে একদিন তাঁরা পাবেন অনন্ত স্বর্গজীবন ; শোধন লোক তাঁদের একটা সাময়িক আবাসমাত্র, কিংবা আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, রোগ সারাবার একটা হাসপাতাল। মানুষ তখনই তো হাসপাতালে যায় যখন তার এই জ্ঞান হয় যে সে রোগের কবলে পড়েছে।

কিন্তু দান্তে যেটাকে অজ্ঞান বিবেচনা করেছেন তা আপন অস্তিত্ব সম্বন্ধে অচেতন জীবের অজ্ঞানতা নয়, তা অবোধ শিশুর বা আদিম মানুষের অজ্ঞানতাও নয়, তা এক হিসেবে বিশেষ পরিস্থিতি ও স্বকীয় কামনার মধ্যে উদ্ভূত সমস্যার প্রবৃত্তি বা প্রযুক্তি দিয়ে সাধিত সমাধান, তা ভালোমন্দ সত্যা-সত্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও মিথ্যার নির্বাচন, অর্থাৎ ব্যক্তি যখন পরমজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে প্রবৃত্তির তাড়নাতে বা প্রযুক্তির পরামর্শে নিজেকে চলতে দেয় তখনই সে অজ্ঞানে পর্যুদস্ত হয়, আর আপন পাতকের পশ্চাতে যে যত বেশী প্রযুক্তি সহবরাবে পটু তার অজ্ঞান তত বেশী ঘন। আসলে প্রযুক্তি ও বিচারের পার্থক্য দুস্তর বলেই হয় না, বলা উচিত দুটির সম্পর্ক সম্পূর্ণ বিপরীত, কেননা প্রযুক্তির উৎস যেখানে অজ্ঞান সেখানে বিচারের উৎস পরমজ্ঞান এবং দুটির মধ্যে কোনটির দ্বারা ব্যক্তি নিজেকে চালিত হতে দেবে সে-প্রশ্নেই

উত্থাপিত হয় তার আপন কর্ম তথা পারলৌকিক অবস্থিতি নির্বাচনের অধিকার। যে-মধ্যযুগ সাধারণভাবে বিশ্বাস করত যে মানুষের ইহজীবন ও পরজীবন দিবা স্পৃহার দ্বারা পূর্ব-নির্ধারিত তার থেকে দান্তে এক্ষণ নিঃশব্দে অপসরণ করলেন নির্বাচনের বা মুক্ত স্পৃহার তত্ত্বে যে সম্বন্ধে তা চোখেই পড়ে না; কেননা ঈশ্বরের করুণা ব্যতীত স্বর্গে প্রবেশলাভ অসম্ভব এ-বিশ্বাসকে তিনি স্পর্শমাত্র করেননি, মধ্যযুগীয় ভাবসত্তার মূল কাঠামোকে তিনি সর্বত্র স্বীকার করেছেন, কিন্তু সে সঙ্গে ঈশ্বরের করুণার জন্যে মানবদের ধারস্থ হওয়ার আবশ্যক-তাকে তিনি উড়িয়ে দিয়েছেন, তার জায়গায় ঢুকিয়েছেন সেই ব্যক্তিস্বরূপকে যা নির্ধারিত হয় ব্যক্তির সামগ্রিক বিবেচনা ও নির্বাচন করার শক্তির দ্বারা। এবং এখানেই এসে পড়েছে প্রাতিস্বিক দায়িত্বের প্রশ্ন। প্রকাশ থাকে যে ওই প্রশ্ন উত্থাপনে দান্তের পক্ষে সর্বৈব অভিনবত্ব দাবি করা যায় না, কেননা মধ্যযুগের উষাকালেই সন্ত অগাস্টিন একই প্রশ্ন তুলে-ছিলেন "কনফেশনসে", কিন্তু সে-প্রশ্নকে তিনি নিজেই চাপা দিয়েছিলেন "এনকিরিডিয়নে"।

লৌকিক অস্তিত্বে অটল বিশ্বাস থেকে ব্যক্তির ভাবরূপকে প্রত্যাখ্যান করেছেন দান্তে, তাঁর ব্যক্তি ছিল সেই মূর্ত অস্তিত্ব যার থেকে হয় ভাবের উদ্ভব, যেমন বোনিফেস থেকে এসেছে স্বর্গ প্রতিষ্ঠানগত পাপচিন্তা বা সন্ত টমাস অ্যাকুইনস থেকে তত্ত্বচিন্তা, এবং এই ব্যক্তি অনন্ত হয়েও ইতিহাসের অধীনস্থ, মুক্ত স্পৃহার অধিকারী হয়েও ইতিহাসের কাছে দায়িত্ববদ্ধ: ইতিহাস তথা মানব জীবনের অবিচ্ছিন্ন প্রবাহের প্রতি কর্তব্যগুলির মধ্যে কোনটি নির্বাচন করছে ও কোনটি সম্পর্কে সে সক্ষম হচ্ছে তা দিয়ে ঈশ্বর নির্ধারণ করেন মৃত্যুর পরে ত্রিলোকে তার স্থান। মজা এই যে মরজীবন একবারই মানুষ পায়, আর সে-জীবনের স্থায়িত্ব মহাকালের পলকমাত্র, এর মধ্যেই তাকে অলঙ্ঘ্য দেশকালের পরিপ্রেক্ষিতে সেই অপরি-বর্তনীয় সিদ্ধান্ত নিতে হয় যা দিয়ে তার সমগ্র পরকাল স্থির হয়ে যায় এবং এখানেই প্রকৃতি প্রবৃত্তি ও প্রযুক্তির নাগপাশে আবদ্ধ ব্যক্তির যৌল অস্তিত্ব গভীর বিয়োগান্তক তাৎপর্যে বিশিষ্ট।

এবং এই তাৎপর্য আমাদের সমকালে আরও গভীর হয়ে উঠেছে। মানুষ যেদিন থেকে নিসর্গের সঙ্গে পাল্লা দিতে শুরু করে সেদিনই বোঝে যে বাইরের প্রকৃতির চাইতে ভিতরের প্রকৃতি বা প্রবৃত্তির প্রাধান্য কিছু কম নয়, বরং বেশি; কিন্তু একথা যেমন প্রবৃত্তির পক্ষে তেমনই মধ্যযুগে প্রযুক্তির হাতে মানবজীবন মুখ্যত সমর্পিত: মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে মানুষের পরিচিন্ন ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকে প্রযুক্তির পথে এরূপ চিন্তার আত্মতুষ্টির অবকাশ প্রচুর হলেও সত্যের ভাগ সামান্য, আসলে উল্টোটাই সত্য এবং মধ্যযুগীয় দর্শন হোয়াইটহেডের উক্তিতে—"সীমাহীন যুক্তিবাদ"। এই সত্য ত্রয়োদশ শতাব্দীর সন্ত আকুইনস ও অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে কান্টের অবস্থান তুলনা করলেই স্পষ্ট হয়, কেননা আলোকময় যুগের চরমে এসে কান্ট অনুধাবন করলেন যে প্রযুক্তির সীমানা কতদূর সংকুচিত, তাই তিনি বাধ্য হলেন প্রযুক্তির অর্থটাকেই পালটে দিতে, অথচ ঈশ্বরকে একবার সৃষ্টির মূল হেতু বলে কল্পনা করার পরে আকুইনসের মনে হয়েছিল যে মানুষের প্রযুক্তির কাছে সমস্তই যন্ত্র এবং তা দিয়ে সমস্ত কিছুকেই বিদ্ধ করা সম্ভব অর্থাৎ প্রযুক্তির অতীত এক রহস্যকে জগতের উৎস বলে মেনে নেওয়ার পরে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মধ্যবর্তীকালে প্রযুক্তিরই একচ্ছত্র আধিপত্য এবং সে-আধিপত্যের পরমগতি আবার সেই রহস্যেই প্রত্যাবর্তন। কিন্তু মধ্যযুগে মানুষের জীবদ্দশা ছিল যে-প্রযুক্তির আশ্রয়ে নবজাগরণের সময় থেকে তা শিথিল হতে শুরু করে; অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারের আন্দোলন এল বন্যার মতো, মধ্যযুগীয় মানবিক অনুভূতি আবেগ ও প্রকোষ্ঠ থেকে উদ্ভূত যে সব অলংকার চিত্রকল্প ও প্রতীকের সম্ভারে মানুষ সাজিয়েছিল নিসর্গকে একে

একে সে সব ক্ষেত্রে নিয়ে এমন এক রকম দিল নিসর্গের বা সভ্যতার শত্রু, যাকে পরাস্ত করতে হয় কঠিন আঘাতে, এবং এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সমান্তরালে একই উদ্দেশ্য সাধনের মন্ত্র নিয়ে উদ্ভোধিত হলো পাশ্চাত্য যন্ত্রতন্ত্র। প্রযুক্তি তার পুরাতন কর্তৃত্ব হারাল যন্ত্রতন্ত্রের বিকাশে, কেননা সে-কর্তৃত্ব অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপাদ থেকে হস্তগত করতে থাকে যন্ত্রতন্ত্র, আর যন্ত্রতন্ত্রও প্রকৃতপক্ষে প্রবৃত্তি ও প্রযুক্তির মতোই মানুষের আপন কামনার একপ্রকার প্রকাশ। তবে প্রবৃত্তির সঙ্গে প্রযুক্তি ও যন্ত্রতন্ত্রের পার্থক্য এই যে প্রথমটি যেখানে মানুষের স্বভাবগত সেখানে শেষের দুটি মানুষের দ্বারাই সংঘটিত, তাই সেখানে ব্যক্তির নির্বাচন-ক্রিয়া সহজেই আগে এবং বিশেষ করে যন্ত্রতন্ত্রের ক্ষেত্রে তো তা স্বতঃপ্রতিষ্ঠ ; কিন্তু যে-যন্ত্রকে নিজের ইচ্ছে মতো গড়েছে ও নিজের দাস বানাতে পেরেছে মনে করে মানুষ অহংকারে মাটিতে পা ফেলতে চায়নি আজ সেই যন্ত্রই চেপে বসেছে মানুষের বুকের উপরে —নিজের কামনার জালেই মানুষ আজ বন্দী।

ধনতান্ত্রিক সমাজে তত্ত্বগতভাবে ব্যক্তির মূল্য এক-একটি সম্পূর্ণ একক হিসেবে, কিন্তু তলিয়ে দেখলেই সে-মূল্য নিতান্ত বিমূর্ত : আমাদের ভোটে যে-দল ক্ষমতার অধিকারী হয়ে রাষ্ট্র শাসন করছে তার কাছে কোনও একজন সাধারণ মানুষের অভাব-অভিযোগ অরণ্যে রোদন ; বর্তমান সমাজ ব্যবস্থার প্রবণতা বড়ো বড়ো দরবানগরীতে জনতা সমাবেশ করার দিকে, কিন্তু সে-জনতার মধ্যে আলাদা আলাদা ভাবে প্রতিজন অসহায় ও নিষ্ফলঙ্ক এবং সে-জনতার চাপে ব্যক্তির কর্ম-নির্বাচন যেন মূক পদক্ষেপ, যেমন আমরা বলতে পারিনে যাদবপুর থেকে কাশীপুর যেতে ঠিক কতক্ষণ সময় মোটর গাড়িতে লাগবে, কেননা কোন সময়ই সময়ে পৌঁছতে গাড়ি চালানোর কল্পনা অবাস্তব, কোথায় কতক্ষণ আস্তে বা জোরে গাড়ি চালানো যাবে বা দাঁড়াতে হবে তা সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অর্থাৎ সাধারণ চলাফেরার ব্যাপারটাও আমাদের নিয়ন্ত্রণ-শক্তি বা মুক্ত স্পৃহার অতীত ; ব্যক্তি-স্বাধীনতার উগ্র প্রচারক অস্তিকরা হলেও সেরকম ছাঁটকাটের পোশাক পরেন বা হালচালের অনুগামী এবং হালচালের দাবিতে বড়ো বড়ো দুঁড়িখানাতে নিতান্ত ভূতের মতো আচরণ করেন ; বড়ো বড়ো কল-কারখানা বড়ো বড়ো হাসপাতাল বড়ো বড়ো রেলস্টেশনে ঢুকে মনে হয় না যে এসব মানুষ হিসেবে আমার সৃষ্টি, বরং নিজেকে একা ও নগণ্য মনে হয়, নিজেকে অভিভাবকহীন অনাথ মনে হয়, এয়ারকণ্ডিশনার, রেফ্রিজেরেটর, রেডিয়োগ্রাম প্রভৃতির উচ্চকিত উজ্জ্বল বিজ্ঞাপন নিরন্তর আমাদের মনে একটার পর একটা চাহিদাবোধ জাগাচ্ছে, তাকে প্রতিক্ষণে উসকে দিচ্ছে, আমাদের মনে এই প্রতীতির জন্ম দিচ্ছে যে এসব উপকরণ ব্যতীত মানব জনম অচল ও বিফল ; আজকের মানুষের বিচারশক্তি বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে সংবাদপত্রের দ্বারা, অধিকাংশ ব্যক্তির সঙ্গে দুদণ্ড রাজনীতি নিয়ে আলোচনা করলে প্রায়ই সঠিকভাবে বলা যায় যে সে কোন সংবাদপত্রের নিয়মিত পাঠক, উপরন্তু আজকের শিক্ষিত মানুষ যদিও নানা বিষয়ে পণ্ডিত, তবু তাঁর পাণ্ডিত্য সংবাদপত্রে পরিবেশিত পল্লবগ্রাহী জ্ঞানেই সীমাবদ্ধ আর যেহেতু দৈনিক পত্রিকা একটি দিনের সেবক হিসেবে দিনে দিনে সব বিষয়েই জ্ঞান বিতরণ করে তাই এই সব শিক্ষিতরাও সর্বদাই যন্ত্রমেধাবী আনকোরা জ্ঞানের ক্ষুদ্র বিশ্ব-কোষ বগলে নিয়ে ঘোরেন এবং সে সঙ্গে স্বাধীনচিন্তা ও সর্বজ্ঞতার বড়াই করেন।

আজকের মানুষ তার স্বাতন্ত্র্যী ব্যক্তিস্বরূপকে অস্বীকার করে, তার প্রাতিস্বিক চেতনাকে বিস্মৃত হয়ে ব্যক্তির অতীত কতকগুলি প্রতিষ্ঠানের সামনে নতজানু প্রণতি জানাচ্ছে, জড়োপকরণের সন্ধানে দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটে চলেছে, নিজের অজ্ঞাতে ব্যক্তিস্ববিলাসী শক্তিগুলোর হাতে অকাতরে আত্ম-সমর্পণ করছে : নবজাগরণের সময় থেকে ভৌতিক জগতের

উপরে যে-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে আধুনিক মানুষ জয়যাত্রা করেছিল, যে-যাত্রার সাফল্যের স্বপ্নে উনবিংশ শতাব্দী উদ্বেলিত, তা সহসা বিপরীত সত্যে পরিণত হলো প্রথম মহাযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, আতঙ্কিত বিস্ময়ে মানুষ আবিষ্কার করল যে অভিমন্যুর মতো নির্গমনের কৌশল না জেনে ঢুকে পড়েছে মৃত্যুব্যূহে : মুহূর্মুহু মানুষের অব্যক্ত ও বাধাতীত উৎকণ্ঠা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে এবং পরমাণু শক্তির উপরে কর্তৃত্ব তার মনে আশ্বাসের পরিবর্তে আশঙ্কাকেই তীব্র করেছে। অর্থাৎ মানুষ যে আজ শুধু নিজের কামনার ফাঁদে বন্দী তাই নয়, তার স্বাশ্রয়ী ব্যক্তিস্বরূপ তথা ব্যক্তির খুঁইয়ে নয় আন্তরতায় সে টিকে আছে মাত্র।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষাশেষি মানুষ ভৌতিক বিজ্ঞানে ও কারিগরি শিল্পের সাফল্যে এত বেশি মজেছিল যে তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলার অবসর পায়নি ; এই পর্বে যদি-বা কিয়ের্কেগার্ড, নীৎশে, মার্কস, থোরো, টলস্টয় প্রমুখ কোনও কোনও মনীষী মানুষের নেশা ভাঙাবার চেষ্টা করেছিলেন তবু আত্মসমালোচনাতে প্রবৃত্ত হওয়া চোরের ধর্ম নয় ; এবং প্রথম মহাযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকা নিপট অজ্ঞানে নিমজ্জিত থেকে নিশ্চিত ছিল যে মানুষের পক্ষে স্বর্গ-রাজ্য জয় করা আর সুদূরপরাহত নয়। কিন্তু সমষ্টিগত ভাবে মানুষ গত তিন-চার শ বছর ধরে যে-পাপ করেছে তার খেসারৎ শুধু এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশগুলোর উপর দিয়েই যাবে একথা আজ কোনও বাতুল পাশ্চাত্য সাম্রাজ্য-বাদীর পক্ষেও কল্পনা করা অসম্ভব ; এই পাপের স্বরূপ স্বীকৃতি এখনও পশ্চিমে সমষ্টিগতভাবে শুরু হয়নি, যা হয়েছে তা নিতান্তই ব্যষ্টিগত ও বিক্ষিপ্তভাবে, অথচ যতদিন না আমরা সার্বিক ভাবে সে-গ্লানি বোধ করছি ততদিন এই শতাব্দীর নিরয়লোক থেকে আমাদের উদ্ধার নেই এবং সে-উদ্ধারের অর্থ মৃত্যুর পরে শোধনলোকে নয়, ইহলোকেই নতুন সমাজ-ব্যবস্থাতে উত্তরণ, যে-সমাজব্যবস্থাতে প্রতি ব্যক্তি খুঁজে পাবে তার হারিয়ে-যাওয়া স্বকীয় সত্তাকে। কেননা কোনও নতুন সমাজব্যবস্থাই প্রবর্তিত হতে পারে না যদি ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির সম্পর্ক পরিবর্তিত না হয়, যদি ব্যক্তি তার অসীম দায়িত্ব সম্বন্ধে অবহিত না হয় ; এবং দায়িত্বের স্বীকৃতি হলো জীবিকা ও জীবনে প্রতিটি পদক্ষেপকে নির্বাচন করা আর সে-নির্বাচনের অধিকারটাই ঐহিক শোধনলোকে যাওয়ার জন্যে আমাদের ছাড়পত্র : প্রশ্ন হচ্ছে এই ছাড়পত্রের মর্যাদা আমরা ব্যক্তিগত ভাবে প্রাত্যহিক আচরণে কতখানি রক্ষা করতে পারছি—আমরা বিমূর্ত জনতার চাপে নিজেকে চলতে দিচ্ছি কি দিচ্ছি না, বিমূর্ত প্রচারে আমরা বিভিন্ন বস্তুর অভাব বোধ করছি কি করছি না, বিমূর্ত হালচালের অনুগামী হচ্ছি কি হচ্ছি না।

আধুনিক সভ্যতা মানুষের মনকে আকৃষ্ট করেছে বাইরের অজস্র উপকরণে, জীবনযাত্রার প্রচণ্ড বাহুল্যে ; নবজাগরণ মানুষের মনে অন্তহীন যে-অন্বেষণস্পৃহা জাগিয়েছিল তা আজ সাধারণ মানুষের কাছে দাঁড়িয়েছে সেই উপকরণ ও বাহুল্যের অন্তহীন অন্বেষণে, এবং সে-অন্বেষণের পথে কোনটা ভালো কোনটা মন্দ তা নিয়ে চিন্তা করার সময় আমাদের নেই। ধাতের মতোই আজ আমরা এক অন্ধকার গহন অরণ্যে পথ হারিয়ে ছুটোছুটি করছি, সুখের সংক্ষিপ্ততম পথ ধরে চলতে গিয়ে বহুমূত্রে ভুগছি, অত্যধিক রক্তচাপে, হৃৎপিণ্ডের নানা ব্যাধিতে, ঘুমের ঔষধ খেয়ে প্রাণ হারাচ্ছি, কখনও ধীরে ধীরে কখনও চকিতে আত্মহত্যা করছি, সমাজজীবন থেকে মুছে ফেলছি শান্তির সমস্ত নিশানা। আধুনিক মানুষকে ধাতে কোনও পারলৌকিক শান্তির অধিকার দিতে পারেন না সেকথা সত্যি, কিন্তু তাঁর কাব্য আমাদের প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারে, এবং প্রেমই একমাত্র সেই জিনিস যা মানুষকে অন্তর্মুখী করে, প্রয়োচিত করে আত্মসমালোচনাতে : আত্মমূল্যায়নে ; আর একমাত্র তখনই আমাদের অস্তিত্বের যথার্থ স্বরূপ নির্ধারণে আমরা সক্ষম হব। এক হিসেবে সেই স্বরূপ-নির্ধারণই হলো

ব্যাধি-নির্ধারণ। প্রেম শুধু আমাদের অন্তর্মুখী করে না, আপার জিজীবিষাকে। যার জিজীবিষা আছে চিকিৎসাকে সে মেনে নেয় সহজে। তার অকাট্য দাবি শোধনলোকে। শোধনলোক মানে শুধু হাসপাতাল নয়, তা নতুন সমাজ-ব্যবস্থাও বটে। তারপরে আছে সর্বোচ্চ সমাজব্যবস্থার স্বর্গলোক: অদ্বিতীয় রাষ্ট্রের অধীন বিশ্বজনীন সমাজ বা রাষ্ট্রহীন সমাজও সারাৎসারে তাই। তার মানে এই নয় যে সকলেই সে-সমাজে ব্রহ্মর লাভ করবে, যেমন উপনিষদে প্রোক্ত আছে যে পরমাত্মা ও জীবাত্মা একই ব্রহ্মের ধারা; পক্ষান্তরে মানুষের উপলব্ধ ঈশ্বর সর্বপূর্ণ: তাঁর পূর্ণতাকে কোনদিনই মানুষ আয়ত্ত করতে পারে না, শুধু পেতে পারে সেই পূর্ণতার স্বাদ, তাঁর পূর্ণতার মধ্যে কোনদিনই বিলীন হতে পারে না মানুষ, শুধু সেই পূর্ণতার আস্বাদনে মহৎ থেকে মহত্তর হতে পারে।

সমাপ্ত

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

এক টুকরো সাবান

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার

দেশ ভাগ হল, কলকাতায় চলে এলাম। কত আশা, কত চঞ্চলতা সব যেন স্তব্ধ হয়ে গেল। যে পূর্ববাঙলার জেলায় জেলায়, সহরে, বন্দরে গ্রামে দল বেঁধে স্বদেশী করে বেড়িয়েছি, বিপ্লবীর আড্ডায় আড্ডায় তীব্র আবেগে ঘোরাফেরা করেছি; সব যেন নিঃশেষে ফুরিয়ে গেল। সে বিস্তৃত যুগের আদর্শবাদ, ভাবাবেগ আজকের টেরিলিন ও সিনথেটিক যুগে দেখছি অচল ও অনাদৃত।

জেল থেকে বেরুতে না বেরুতেই দেখা দিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, আর বাংলায় মানুষের পক্ষে অবর্ণনীয় মন্বন্তর এবং পাকে পাকে এল ভ্রাতৃহত্যার নির্মম পর্ব।

কলকাতায় এসে কিছু করব ভাবছি এসময়ে হঠাৎ আলাপ হল ঠাকুর পরিবারের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে। তাঁর ঘরেও আমারই কাছাকাছি। আলাপ জমে উঠল শ্রীঅরবিন্দের একটি ফটো নিয়ে, আমারই অফিস ঘরে। ফটো দেখিয়ে তিনি শুধু বললেন "আশ্চর্য বিদগ্ধ পণ্ডিত," আমি জবাবে বললুম "তার চেয়েও কিছু বেশী—যদি বলি বার্ণার্ডশ অদ্ভুত পণ্ডিত, কথাটা যেন সেখানেই থেমে যায় কিন্তু শ্রীঅরবিন্দের বেলায় আমরা যেন আরো কিছু খুঁজে বেড়াই।" কথার অন্য তিনি কি খুঁজে পেলেন জানিনে কিন্তু সেই এক কথায়ই তিনি আমাকে ভালবেসে ফেললেন। আরম্ভ হলো আমাদের নিয়মিত দেখাশুনা, আলাপ, আলোচনা, আত্মীয়তা শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে ও ঘিরে। এ যে নেহাৎ আড্ডা নয় বুঝতে দেরী হলো না। বন্ধু আমেলে বিশেষ করে দেউলী জেলে শ্রীঅরবিন্দের কিছু বই পড়বার সুযোগ হয়েছিল কিন্তু সে-পড়া আর এ-পড়ার তফাৎ বুঝতে পারলাম। মনের মধ্যে যেন এক অভাবনীয় সাড়া পেলাম। দুজনেই তৈরী হতে লাগলাম। পিঠাপুর এরই মধ্যে বার তিনেক পণ্ডিচেরী ঘুরে এলেন। আলাপ ও আলোচনায় এবং আত্মীয়তায় আমি যেন নতুন দিগদর্শনের আভাষ পেলাম।

তারপর এল শ্রীঅরবিন্দের তিরোভাবের ক্ষণ। কি যেন অচিন্তনীয় ঘটে গেল। আমরা এর জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিলামনা।

পণ্ডিচেরী যাওয়ার সাধ আমার অনেককালের পুরনো কিন্তু দরিদ্রের চিরাচরিত বাসনা মনের মধ্যেই চেপে ফুলেই আবার থেমে যায়।

আমার অভাব গেল বেড়ে, বন্ধু বান্ধবের কাছ থেকে ছিটকে পড়লাম। অভাবে, অনটনে, দেবার আশায় উৎকণ্ঠায় দিনগুলো কাটতে লাগলো। সে যে কী অসহনীয় জ্বালা কি তার তীব্র বেদনা তা প্রকাশ করা যায় না। সংগ্রামের শেষ ধাপটিতে পৌঁছে যেন মাঝে মাঝে মৃত্যুর মুখোমুখি এসে দাঁড়াতাম, পাল্লা কষতাম, তারও আছে এক অনন্ত সুর, সে সুর জীবনে নতুন পথের দিশা দেবার, নতুন আশার পাথেয় যোগায়। সত্তা সেখানে জন্ম নেবার চেষ্টা করে।

দশটা বছর অভাবের সঙ্গে লড়েও যখন কিছু করে উঠতে পারলাম না, যখন জীবন যুদ্ধে ক্লান্ত ও পরাজিত তখন এক সহৃদয় পরিচিত বাঙালী ইঞ্জিনিয়ার ছোট একটা কাজ দিয়ে আমাকে তুলে ধরবার চেষ্টা করলেন। সেই অছিলায় ভারতবর্ষময় ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। ভারতের সুন্দর ও

চিরন্তন রূপ, তার সহর, গ্রাম, নদনদী পাহাড়, বনজঙ্গল আমাকে আচ্ছন্ন করলো। কাজের ফাঁকে ফাঁকে সাধু, সন্ত পীর, ফকীর, আচকন, পাগড়ি, কেরিওয়ালা, মেথে, বেদেনী, চাষী, মজুর সবার পিছনে ঘুরে দেখতে লাগলাম। উত্তর থেকে দক্ষিণ ভারতবর্ষ ঘুরে ফিরে দেখবার এক অবাধ সুযোগ পেলাম। পুরানো বিপ্লবীর চোখে নয়, শুধু দেখলাম এক নতুন জীবনের সূচনা। চোখের সামনে ভেসে যেতে লাগলো ছবির মতো বাল্মিকী আর বেদব্যাস, বুদ্ধ অশোক কালিদাস ও ভর্তৃহরি, চৈতন্য আর রামকৃষ্ণ, শ্রীঅরবিন্দ ও সুভাষ। মনে তেমন দাগ কাটতো কি না জানিনা কিন্তু আনন্দ পেতাম প্রচুর। নতুন উৎসাহ আর উদ্দীপনায় উত্তর ভারতের সাধু-সন্তের লীলা নিকেতন থেকে মন্দিরময় দক্ষিণের মাদুরা, রামেশ্বরম, ধনুষ্কোটী কন্যাকুমারীর কিছুই বাদ দিলুমনা। সে এক অজানা নেশার ঘোর। নতুন বন্ধু জুটে গেল এখানে ওখানে, ঘুরে ফিরে, বার বার দেখা হতে লাগলো তাঁদেরই সঙ্গে। তাঁদের অনিন্দ্য আপ্যায়ন ও আন্তরিকতায় আমি যেন পেছনের দুঃখ কষ্ট সব ভুলে গেলুম। সাধারণের মধ্যেই এক অনন্ত রূপ দেখে উৎসাহে ভেসে পড়তে লাগলাম। রাজপুতানার এক ভাঙ্গী পল্লীতে তের চৌদ্দ বছরের একটি বালিকার অপূর্ব রূপশ্রীতে মুগ্ধ হলাম। সে সৌন্দর্যের মধ্যেও কি এক প্রেরণার উৎস। কৃতকিছু দু জন বিশিষ্ট ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে জোর করে তা দেখাবার জন্য একেবারে ভাঙ্গিয়ে নিয়ে গেলাম। দেখে তারা আমার মতো অবাক হলনি, কিন্তু আমাকে ভালবাসতেও তাঁরা কসুর করেননি। কাজ করে যাচ্ছি, পথের যেন শেষ নেই। চলার পথে কত যে দেখার কত যে বলার আছে তার গোণা-গুণতিও নেই। ১৯৬২-র মাঝামাঝি উদয়পুরে কাজ সেরে রাস্তায় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এক বাঙালী মহিলা শিল্পীকে পেয়ে একটি রবীন্দ্র সঙ্গীতের আব্দার এমন ভাবে করে ফেললুম যে তিনি হচকচিয়ে গেলেন। একটু থেমে সহজভাবে সঙ্গে তিনি আমার গান শোনাবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। গান আমার শোনা হয়নি; পরের দিনই আবার বেড়িয়ে পড়তে হলো। দুঃখ রয়ে গেল যে আজও তাঁর সঙ্গে আর দেখা করে উঠতে পারিনি, ত্রুটি-কৃতজ্ঞ।

১৯৬৪-র অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহে দিল্লী হয়ে বোম্বাই এসেছি, হাতে তেমন কাজ নেই। ঝোঁক চাপলো পণ্ডিচেরী যাওয়ার। বিগত আঠারো বছরের অদম্য ইচ্ছা আমার সফল হল। আশ্রমে একখানা চিঠি দিয়ে মনের বাসনা জানিয়ে রওনা হলুম। আশ্রমে পৌঁছে দেখি চিঠি পৌঁছায়নি। ছুটে গেলুম আশ্রম প্রাঙ্গনে অধিকর্তার খোঁজে, প্রথমেই নজরে পড়লো শ্রীঅরবিন্দের সমাধি, নিজেকে ধন্য মনে করলুম। কৌমুদে গভীর শ্রদ্ধায় মাথা নোয়ালুম। অনেকদিনের জমানো দুঃখের মেঘ নিমেষেই উবে গেল। সমাধিতে কান পেতে গভীর স্পর্শ অনুভব করলুম। শুনলুম সেই মৌন বাণী: আমি আছি। মনে এলো ডঃ নীরদবরণের লেখা বই, I am here.

সময় নেই, অধিকর্তাকে পেতেই হবে। আশ্রম থেকে তাঁর আবাসে যেতে হলো। তিনি এক অতিথিশালায় খুশী মনে থাকার নির্দেশ করে দিলেন। রিক্সা করে সমুদ্রের ধার ঘেঁসে ছুটলাম। পণ্ডিচেরী সম্বন্ধে এত শুনেছি, পড়েছি, আলাপ করেছি, ছবি দেখেছি যে আমার কাছে কিছুই যেন নতুন মনে হলনা। সবই যেন জানা, চেনা, আগে দেখা। সমাধির ওপরে যে সুন্দর গাছটি ছায়া দিয়ে সমাধিকে সাজিয়ে রাখিয়ে ঢেকে রেখেছে তাকেই মনে হল আশ্রমের "Service Tree" খুব ভাল লাগলো। গাছটির উদ্দেশ্যে প্রণাম জানাতেও দ্বিধা বোধ করিনি।

অতিথিশালায় পৌঁছলাম। সমুদ্রের ওপর পরিচ্ছন্ন আবাস দেখে আনন্দ হলো। দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই লোক-জন এসে বিছানা পত্তর খাটিয়ে গেল। দেখলুম চমৎকার-

পাঁচশ বছরের একটি তামিল মেয়ে কুঁজোয় জল নিয়ে এসে আমার দিকে উৎসুক নয়নে চেয়ে আছে। মুখ তুলে চাইতেই সে যেন আরো সপ্রতিভ হল। মেয়েটি আমার হাল চাল দেখেই যেন বুঝতে পেরেছে যে এ একটি উড়নচণ্ডি খাপছাড়া মানুষ আশ্রমে এসে পড়েছে।

সময় বেশী নেই সাড়ে বারটার মধ্যেই খাবার ঘর বন্ধ হয়ে যাবে। কোনরকমে চান সেরে দৌড়লাম খাবার ঘরের দিকে। জিনিষ পত্তর কোথায় কি রইলো দেখবারও সময় হলনা। খেয়ে এসে দেখি আমার জিনিষপত্তর এমনভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছে কৃষ্ণা, যে আশ্চর্য হয়ে গেলাম। কি রুচিবোধ আশ্রম সবার মধ্যেই গড়ে তুলেছে। দেখলাম আমার একগাদা ময়লা জামাকাপড় ধোয়ালে বেড-কভার সব ইতিমধ্যেই সে সাবান দিয়ে কেচে রৌদ্রে মেলে দিয়েছে ময়লা রুমাল ও অন্তর্বাস কেচে রেখেছে দেখে সঙ্কোচ বোধ করলাম, কেমন লাগাও হলো। কৃষ্ণা স্কুল থেকে ফিরতে যা কিছু খাবার, কলা, বিস্কুট ছিল সব দিয়ে দিলাম। সে আমার সেবার মধ্যে আত্মীয়তার ভাব দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। হাত বাড়িয়ে যখন কৃষ্ণা আমার দামী ঘড়িটি দিল কেমন যেন একটু অপ্রতিভ ও আশ্চর্য হলাম। তাড়াহুড়োর মধ্যে ঘড়িটি ফেলে রেখেই খেতে গিয়েছিলাম। ঘড়িটি দিয়েই দুর্বোধ ভাষায় আমার অন্যমনস্কতার জন্য সে অনেক কথা শোনাতে লাগলো। ভাষা না বুঝলেও তার বয়ন বুঝতে ভুল হলনা। তাকে বড় ভাল লাগতে লাগল।

খুব ভালভেই জিজ্ঞেস করে অল্পটা বুঝে নিয়ে চা খাবার ইচ্ছে আমার নেই সেটা যেন কৃষ্ণা আগেই বুঝে নিয়েছে। খুব ভালভেই কি খেতে চাই জানতে চাইলো। আমাদের কথাবার্তা হাত মুখ নেড়ে যুক অভিনয়ে হতে লাগলো। তার একটি কথাও আমার বোঝবার জো নেই, সেও আমার ভাষা বোঝে না। ভাঙা দু চারটে ইংরেজী শব্দ তার চেয়েও [redacted] হিন্দি বুলিই তার সম্বল এবং চোখের ভাষার আর আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে কাজ চালিয়ে নিতে লাগলাম। দোকান থেকে সে বিস্কুট, কলা, সন্দেশ ও চা নিয়ে এল। আনা খাবার থেকে তাকে কিছু তুলে দিতে সে যেন আরো অবাক হয়ে গেল। এমন যেন সে দেখেনি বা পায়নিও। পয়সাও দু চারটে করে প্রতি কাই-করমাসের সঙ্গে তাকে দিতে লাগলাম।

জিজ্ঞেস চায়টা বলতেই আবার আশ্রমে গেলাম। শ্রীঅরবিন্দ যে ঘরে চল্লিশ বছর সাধনা করে গেছেন সে ঘর-খানা দর্শনার্থীদের জন্য সেদিন আশ্রম কর্তৃপক্ষ খুলে রেখে-ছিলেন। খবর পেয়েই ছুটে গেলাম সেই ভারত যুগন্ধরের সাধনাপূত কক্ষে। মন ভরে দেখলাম। আবার সমাধিতে প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই দেখি আমার পরিচিত ধরণী বন্ধু শ্রীঠাকুর দাঁড়িয়ে। আমাকে তিনি এখানে দেখবেন আশা করেননি—প্রায় পাঁচ বছর পরে দেখা হলো। তিনি আমাকে জড়িয়ে ধরলেন অনেক কথা হলো, অনেক খুশি হলুম। সেই খুশির টুকরো যেন দুই ফুল হয়ে আশ্রম প্রাঙ্গনে ছুটে উঠল। আমি যেন দূর থেকে দেখছি আশ্রমের সাধক-সাধিকারা ছোট ছোট পা ফেলে গুন গুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আমার আনন্দ কণিকা মাড়িয়ে চলছেন। আমার সকল দুঃখ বেদনা আজ যেন সার্থক হল।

ওদিকে কৃষ্ণা আমাকে যেন পেয়ে বসেছে। আমার কিসে সুবিধা, কখন কি খেলে ভালো লাগে সব যেন তার মুখস্থ। কখন কোন জামা কাপড় পরা উচিত তাও হুকুম চালিয়ে যেতে লাগলো। জুতো পালিশ থেকে পছন্দসই চায়ের চিনি বের করে দেওয়া পর্যন্ত দেখে আমি অবাক হয়ে গেলাম। তার পরিপূর্ণতার মুখখানি দেখে সুখী বোধ করলাম। দু চারদিন যাতে বেশী থেকে যাই সে বাহানা করে যেতে লাগলো। আমি যে ইংরেজী জানি বা আশ্রমে আমার কেউ চেনা-জানা থাকতে পারে সে তা মনেই আনতে চায় না। আমাকে অনবরত ওরদন সমঝিয়ে দিতে লাগলো কখন

কোথায় যেতে হবে, কি দেখতে হবে ও আমার করণীয় সব।

একদিন বৃষ্টিতে ভিজে সর্দি ধরে গেল। জ্বর-জ্বর বোধ করার আগেই কৃষ্ণা বুঝে নিল। সরষের তেল গরম করে সে যখন জোর করেই আমার পায়ের তলা ঘষতে লাগল আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম কিন্তু আবার কৃষ্ণার মধ্যেই যেন দেখলাম আমার মৃতা মায়ের মুখ। এই সাত বছর কলকাতা ছেড়ে ভারতের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত ঘুরে বেড়িয়েছি, কত অজানা থেকে এসেছি জানার তবুও এমন ধরণ পেয়েছি বলে মনে মনে পড়ে না।

এবার বাছরা—কেরার পালা। আমার কাছে টুকি-টাকি যা ছিল সব কৃষ্ণাকে উজাড় করে দিলাম। এক শিশি ভর্তি অবাক্ষুষ্ব তেল ধরে দিলাম। যাবার সময় যখন রিক্সা করে বালষ্টাতে রওনা হলুম কৃষ্ণা উদাস নয়নে রিক্সার দিকে যতদূর দেখা যায় তাকিয়ে রইলো। কলকাতায় এলাম অনেক দিনের পর।

পণ্ডিচেরীতে প্রথম যাত্রার মায়ের দর্শন না পেয়ে মন খারাপ করেই এলাম। শুনলুম আগামী নভেম্বরে ওঁর দর্শন দেবার দিন। মনের বাসনা মনেই চেপে রাখতে হলো।

ফিরে এসে কলকাতার দাহাকাছি আসানসোলপুর, কটক, ভুবনেশ্বর কুচকেল্লা আরো কতক ছোটখাট জায়গায় কাজ গুছিয়ে নভেম্বরের মাঝামাঝি কলকাতায় ফিরলাম। মনকে তৈরী করে এলাম পণ্ডিচেরী যাবার জন্যে। মায়ের দর্শনের দিন আগত, অনেকেই যাবার তোড়জোড় করছেন কাউকে কিছু বললুম না বা বুঝতেও দিলুম না। শুধু স্বর্গত শ্রীঠাকুরকে মনের কথা বলায় তিনি আনন্দে লাফিয়ে উঠলেন। যাবার আগেই বম্বাইয়ে বন্ধু বধূবাবুকে পণ্ডিচেরীতে আসবার অনুরোধ করে চিঠি লিখলুম। হাওড়া স্টেশনে অনেকে জড়ো হলেন। প্রায় সম্পূর্ণ একখানা কামরা পণ্ডিচেরীযাত্রীদের নিয়ে ভর্তি। অনেক পুরানো বন্ধুরা আমাকে হাওড়া স্টেশনে দেখে একটু অবাক হলেন। দু একজন কিজ্ঞেসও করলেন—তুলে দিতে এসেছেন বুঝি? অন্য কারোকে বুঝতেই দিলুম না যে আমিও চলেছি। গাড়ী ছাড়ার পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত যেন লুকিয়েই গাড়ীতে উঠে বসলুম।

মাদ্রাজ স্টেশনে দেখি বন্ধুবর বধূবাবু গাড়ীর সামনে আমাকে অভ্যর্থনা করবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। আনন্দে মন ভরে গেল। এবার পণ্ডিচেরীতে আশ্রম হলো "গোলকুণ্ডা" অতিথি-নিবাসে। মনে আর আনন্দ ধরে না। বধূ আমাকে অত্যন্ত ভালবাসেন, শ্রদ্ধা করেন, আমার সম্বন্ধে অনেক আশাও রাখেন। তাই তাকে কৃষ্ণার কথা আগাম বলে রাখলাম তার সঙ্গে যে কাল দেখা করতে যাব তাও। এসব ব্যাপারে তিনি বড়ো উৎসাহী, সাহিত্যিকের মন তাঁর।

পরদিন আমি ও বধূ গিয়ে কৃষ্ণাকে না পেয়ে মন খারাপ করে ঘুরে এলাম। দ্বিতীয় দিন কৃষ্ণাকে দেখে নাম ধরে ডাকতেই সে যে ভাবে তীরের মতো আমার কাছে ছুটে এল, তার মধ্যে সে যে কি শ্রদ্ধা, ভালবাসা, ধরণ আমি ও বধূ দেখেই বুঝতে পারলাম। শুধু নারী বলেই সে আমাকে সঙ্কোচে জড়িয়ে ধরতে পারেনি। আমি সাগরে তার খোঁজ খবর নিতে লাগলুম। গোলকুণ্ডাতে উঠেছি শুনে আমাকে অনেক অনুযোগ করলো—বড়লোক হয়ে গেছি, নতুন নতুন লোক নতুন নতুন দেশ বেড়াচ্ছি—তাকে মনে রাখবার কি আছে? সব কথাই যেন স্পষ্ট বুঝতে পারলাম। মনে হলো কৃষ্ণাকে একটা কিছু দিতে পারলে ভাল হতো। তেমন তৈরী ছিলাম না। মানিব্যাগ খুলে একটা টাকা দিতেই তার প্রফুল্ল মুখের হাসি হঠাৎ যেন মলিন হয়ে গেল। বোকার মত আর একটা টাকা বের করে দিলাম। সে হাত পেতে নিল বটে কিন্তু আমি যে ভুল করেছি বুঝতে আমার একটুকুও দেরী হলো না। বড়ো অস্বস্তি বোধ করলুম, নিজেকে ছোট মনে হল। সম্বিৎ ফিরে আসতেই

কেন রুশ লেখক ইভান তুর্গেনিয়েফের জীবনের এক বিচিত্র ঘটনা মনে এল। কৈশোরে তাঁর একবার কঠিন অসুখ হয়। ডাক্তারের উপদেশে নেভানদীর পারে কোন যায়গায় কিছুদিন চেঞ্জে যান। নদীর পারে এক জেলেদের গ্রাম। ইভান পরিবারের জমিদারী ছিল সেই গ্রামে। তুর্গেনিয়েফ ষড়োদরের ছেলে, ওরকম মুখচোরা, লাজুক সুপুরুষও নাকি তখন খুব কম ছিলো। ছেলে গ্রামে সারগোল পড়ে গেল, গ্রামে স্বর্গেরদূত নেমে এসেছে। সবাই মনে করে নিলো এ বৃথা আশা। গ্রামীন দীবর বন্ধাদের কাছে এ কিশোর কবিকে নাগালে পাওয়া কঠিন। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই দেখা গেল তুর্গেনিয়েফ মনে ভিড়ে গেছেন—অতি উৎসাহে। আরো অবাক করে দিলেন তিনি সবাইকে যখন তিনি বেছে নিলেন এক স্বাস্থ্যবতী কোমল স্বভাবা সাধারণ সুন্দরী মেয়েকে। তাঁর ভদ্রতার ব্যবহারে রুচিবোধে সবাইকেই তিনি আকৃষ্ট করে ফেললেন। তুর্গেনিয়েফ তাঁর প্রেম, ভালবাসা রূপ ও সৌন্দর্য্য দিয়ে প্রেয়সীকে রূপায়িত করে তুললেন। স্বর্গের তারারাও যেন সেদিন এদের নির্মল প্রেমের সৌরভকে ঈর্ষা করতে ছুটে এলো। ভারবার তরঙ্গায়িত আলোর প্লাবনে নেভার দুকূল হাসিয়ে উঠল কিন্তু কেউ সে রাতে সাড়া দেয়নি। কেউ সে কাঁদে ধরা দিতে এলোনা। গ্রাম ঘুমিয়ে আছে, স্বপ্নে তারা বিভোর। তুর্গেনিয়েফের প্রেমের মূলমুরির আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে নেচে চলেছে তারা—ফিরে দেখার সময় কোথায়?

ছয়মাস পর ইভান পরিবারের চিঠি এল প্যারিস থাকার বার্তা নিয়ে। নেভানদীর দুকূল কলকণ্ঠের অন্ধকারে ঢেকে দিল। তুর্গেনিয়েফ বীরপদে সবার কাছে ঘুরে ঘুরে বিদায় নিলেন। কার কি ফরমায়েস প্যারিস থেকে আনবার তাও টুকে নিলেন। প্রেয়সীর বাড়ীতে এসে দেখলেন সে অঝোরে কাঁদছে।

জিজ্ঞেস করলেন তুমি এমন কাঁদছো কেন? আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি এবং আসবোই। কিন্তু কিছুতেই যেন তার কান্না থামে না। অনেক আদর করে বুঝিয়ে বলতে চেষ্টা করলেন, যে তিনি আবার ফিরে আসবেন। বার বার জিজ্ঞাসা করলেন প্যারিস থেকে তার জন্য কি নিয়ে আসবেন। পাড়ার মেয়েরা যে কি আনবার আব্দার জানিয়েছে সে তালিকাও তিনি তার কাছে তুলে ধরলেন। কিছুতেই কিছু হল না। শুধু সে কেঁদেই আকুল—আমি কিছুই চাইনে শুধু তুমি ফিরে এসো।

অনেক অনুরোধ, উপরোধের পর প্রেয়সী শেষে বলে "তবে আমার জন্য সুগন্ধি সাবান এনো।" ইভান চমকে উঠলেন, এ আবার কি ধারা চাওয়া? অনেক জেরার পরে সে বললো—"তুমি আমার হাতে চুমু খেতে ভালবাসো, সে আমার জানা। আমার হাতে লেগে থাকে সব সময়েই মাছের আঁশটে গন্ধ। প্যারিসের সুগন্ধি সাবানে শুনেছি গন্ধ লাগবেনা।"

তুর্গেনিয়েফের জীবনে বড় দুঃখ ছিল তিনি সে গ্রামে আর যেতে পারেননি। বৃদ্ধবয়সেও তিনি তা নিয়ে আক্ষেপ করতেন। মনের কোথায় যেন একটা বেদনা গুমরে উঠত। সে দুঃখ আমি গভীর ভাবে কৃষ্ণার পাশে দাঁড়িয়ে অনুভব করলাম। নিজেকে কেমন যেন মনে হল। নেভানদীর পারের সেদিনকার সে তরুণ প্রেমের সুরভী আমাকে আচ্ছন্ন করলো। সে বর্ণাঢ্য প্রেমের বর্ণালি যেন আশ্রমের সুবর্ণ সৈকতে মিশে মিশে আমাকে একাকার করে দিল। মুখ না তুলেই সমুদ্র সৈকত হয়ে আশ্রমে ফিরে এলাম।

আমার বন্ধু-বান্ধব, জানা ও অজানা কে কি ভাববেন তা আমার ভাববার কথা নয়। কি ভাবলাম, কি বুঝলাম কিছুই ঠিক করে বলতে পারবো না। পরদিন সকালে বাস্তাল ফেরার পথে রিক্সা করে গিয়ে কৃষ্ণাকে ডেকে এক বাক্স সুগন্ধি সাবান দিয়ে এসেছিলাম।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

জগতের সব বস্তুই তাহলে সাদৃশ্য-অসাদৃশ্যে পরম বিচিত্র, ঐক্য-অনৈক্যের বিভিন্ন রঙে এরা সবাই রাঙিয়ে রয়েছে এবং এই কারণেই বিশ্বের সকল বস্তু সম্বন্ধেই বলা যায় যে এরা "ভিন্ন" ("other' or di-tinct")

এখন কথা হ'ল এই যে, যদি বিশ্বের কোন বস্তুই অন্য কোন বস্তু থেকে একেবারে "অসদৃশ" (dissimilar) না হয়, তবে "বিরুদ্ধতা" বলে কোন বস্তু কি জগতে নেই? তাহলে বিরুদ্ধতা কাকে বলতে হবে, যদি সর্বত্রই ভিন্নতাই ('distinction) রাজত্ব করতে থাকে? সত্যি সত্যি opposition বা বিরুদ্ধতা বলে কি কোন সম্বন্ধ নেই?

একথার উত্তরে আগেই বলে রাখছি যে বিরুদ্ধতা (opposition) বলে একটা বিশেষ সম্বন্ধ জগতে আছে এবং বিপরীত (opposite) বিরুদ্ধ সত্তাও অবাস্তব নিশ্চিহ্ন নয়। তবে এখানে বিরুদ্ধতা বলতে কি বোঝায়, তার সত্যিকার মানে কী সেটা খুব ভালো করে ধারণা করে নিতে হবে।

আমরা জগতে দেখতে পাচ্ছি হাজার, লক্ষ খণ্ডিত বস্তু ছড়িয়ে রয়েছে দিগ্-দিগন্তে। নানা রকম তাদের রূপ, নানা রকম তাদের গুণ। আমরা তাদের যখন ইন্দ্রিয় দিয়ে দেখি, বুঝি, অনুভব করি। তখন তাদের নানা রকমই দেখি, বুঝি, ও অনুভব করি। এদের প্রত্যেকটি বস্তুর আলাদা আলাদা নাম আমরা দিয়েছি, কারণ এরা আলাদা আলাদা রূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হচ্ছে। এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপের সমষ্টিই হচ্ছে আমাদের অনুভূতির জগৎ। এই জগৎ সম্বন্ধে আমাদের যে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান তা কখনো একেবারে নির্ভুল ও নিখুঁত জ্ঞান হতে পারছে না, কারণ এই জ্ঞান আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোর-দ্বারা সীমাবদ্ধ ও অবচ্ছিন্ন (limited)। ইন্দ্রিয়-জ্ঞান কখনো ইন্দ্রিয়ের গণ্ডীর বাইরে পা দিতে পারছে না। এই জন্যে আমাদের যে জ্ঞানই হোক না কেন, তার ভিতরে সর্বদাই ভুলশেষ (margin of error) একটা থেকেই যাচ্ছে; যত সাচ্চা জ্ঞান হোক না কেন, তার মধ্যে ভুলের খাদ মিশে থাকবেই থাকবে। কাজেই আমরা যখনই কোন বস্তুর সঙ্গে অন্য কোন বস্তুকে তুলনা করি, তখন নিখুঁতভাবে তুলনা করা, অসাদৃশ্য সাদৃশ্যের পরিমাণ করা আমাদের পক্ষে কখনো সম্ভব হয় না। ধরা যাক, আমরা দুটো বস্তুর পরস্পরের সাদৃশ্য বের করে নির্ধারণ করেছি যে ওরা পরস্পর পুরোপুরিভাবে "সদৃশ", কোন দিক দিয়েই ওদের মধ্যে কোন রকম অসাদৃশ্য নেই। কিন্তু আসল ব্যাপার হল এই যে এ কথা জোর করে বলার জো নেই। কারণ,

আমাদের যন্ত্রপাতির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যখন আরো সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও পরীক্ষণ সম্ভব হবে, তখন হয়তো দেখা যাবে যে অতি সূক্ষ্ম পার্থক্য তাদের মধ্যে বিদ্যমান রয়েছে,—যে পার্থক্য আগে ধরা পড়েনি। কাজেই সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য সম্পূর্ণ কি না সে কথা জোর করে বলা চলে না। আমাদের এই অনুভূতির জগৎ বা empirical reality সম্বন্ধে এজন্যে আমাদের কারবার শুধু "বেশী বা কম" (greater or lesser) সাদৃশ্য-অসাদৃশ্য নিয়ে।

কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে আমরা যে জগতে এখন আছি সে হচ্ছে লক্ষিকের জগৎ। আমাদের বাহ্য ইন্দ্রিয়ানুভূতির জগতে যে তত্ত্বের সাক্ষাৎ আমরা পাইনে সে তত্ত্ব লক্ষিকের জগতে পাওয়া যায়। বাইরের ইন্দ্রিয় আমাদের যা এনে দিতে পারে না, আমাদের ন্যায়ানুসারী চিন্তা (Logical Thinking) তা স্বচ্ছন্দে আহরণ করে এনে দিতে পারে; বাইরের জগতে আমাদের ইন্দ্রিয় কোন নিখুঁত (perfect) বস্তু বা নিখুঁত category অনুভূতিতে পেতে না-ও পারে। কিন্তু যুক্তির রাজ্যে, ন্যায়শাস্ত্রের জগতে যে সব category নিয়ে আমাদের কারবার, সে গুলো সবই নিখুঁত ও সুস্পষ্ট চিন্তায় আমরা নিখুঁত আকার গড়তে পারি, ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তার সাক্ষাৎ বহির্জগতে না পেলেও লক্ষিক চুলচেরা বিশ্লেষণ ও শান দেওয়া ধারালো বিচারের সাহায্যে যে সব category স্বজন করে, গঠন করে, সে গুলো আদর্শ রচনা (ideal construction)। এক অর্থে পূর্ণ সাদৃশ্য বা পূর্ণ অসাদৃশ্য জগতে আমারা খুঁজে বের করতে পারি বা না পারি, কিন্তু পূর্ণ সাদৃশ্য (complete similarity) ও পূর্ণ অসাদৃশ্যের (complete dissimilarity) সংজ্ঞার ভাষা কী হবে ও আসল রূপ কী হওয়া উচিত যুক্তির দিক থেকে, সে তত্ত্বটি লক্ষিক নির্ধারণ ও নির্দেশ করে দিতে পারে। এই কারণে বস্তু জগতে নিখুঁত ও পূর্ণ আমার 'সাদৃশ্য' কি 'অসাদৃশ্য' না পাওয়া গেলেও যুক্তি-লব্ধ নিখুঁত ও 'পূর্ণ সাদৃশ্য' বা অসাদৃশ্য বস্তুটি কি, সে সমাধান মানুষের ন্যায়ানুসারী বুদ্ধি (Logical Thinking) করতে পারে।

এই জন্যেই Sorokin বলছেন: পূর্ণ সাদৃশ্য বা পূর্ণ অসাদৃশ্য বাস্তবে নেই, ওরা আদর্শ সীমা।*

এই পূর্ণ অসাদৃশ্যের (complete dissimilarity) মানে হচ্ছে সব দিকের ও সকল feature এ অসাদৃশ্য। এই রকম তীক্ষ্ণ ও সর্বব্যাপী পার্থক্যকেই বলা যেতে পারে বিরুদ্ধতা ("opposition")। দুটো বস্তুর কোন প্রকৃতির সঙ্গেই যখন কোন প্রকৃতির মিল নেই, যখন সব দিক থেকে দেখলেই তাদের বিপরীত ও বিভিন্ন বলে দেখা যায়, তখনই বলা যাবে যে তারা একে অন্যের বিরুদ্ধ (opposite)। এখানে একটা কথা বলে রাখছি যে এই সব দিক দিয়ে যে অসাদৃশ্য তার মানের একটু বিশেষত্ব আছে। আগেই বলা হয়েছে যে এই জগতের সকল বস্তু বা ঘটনার পটভূমিকায় (back-ground) রয়েছে দেশ ও কাল, দেশের ও কালের ক্ষেত্রেই বিশ্বের যত পরিবর্তন, যত ঘটনা ঘটছে এবং যত বস্তু রয়েছে। কাজেই দেশে ও কালে সব বস্তুই সত্তাবান এবং সেই 'সত্তা' (Being) সকল বস্তুরই আদি বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি। "অস্তিত্ব"—এই কথাটি বললে যে গুণ বা বৈশিষ্ট্য (feature) বোঝা যায়, তা সব বস্তুরই মধ্যে রয়েছে। "অস্তিত্ব"—গুণ সকল বস্তুরই সাধারণ গুণ, একটা সার্বভৌমিক ও সর্বকালিক গুণ। কাজেই যতো বিভিন্ন, যতো অসদৃশ

* "We rarely deal in empirical reality with complete identity or complete dissimilarity. These 'Poles are rather ideal limits—Between these limits there is considerable room for varying degrees of similarity and dissimilarity.
(p. 166, Ibid, Sorokin, Vol.I)

বস্তুই হোক না কেন, এই এক গুণ সবার মধ্যেই আছে। সুতরাং এই একটি গুণে অন্ততঃ বিশ্বের সকল বস্তু ও ঘটনা সদৃশ। "আছে"—একথা সকল বস্তু সম্বন্ধেই বলা চলে। অবশ্য এই "আছে" ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এই তিন-কালেরই অস্তিত্ব হতে পারে। এই অস্তিত্ব বা (Being) বিশ্বের সকল বস্তুর সাধারণ ও অচ্ছেদ্য গুণ। ম্যাক টাগার্ট (Mc. Taggart) বলেছেন যে এই অস্তিত্ব (Being) হচ্ছে হেগেলীয় ডায়লেকটিকের একমাত্র স্বীকার্য (postulate or assumption), কারণ আমাদের সকল অভিজ্ঞতার মধ্যেই এই 'সত্তা' ('Being') বিদ্যমান রয়েছে *

কাজেই হাজার অসাদৃশ্য থাকলেও সব বস্তুর পরস্পরের মধ্যে একটা সাদৃশ্য চিরকালই রয়েছে যে এদের সবারই 'অস্তিত্ব' নামক গুণটি আছে। অন্য সব বিষয়ে বৈষম্য থাকলেও এই এক বিষয়ে সবাই এক রাজ্যের ভাগিদার ও একই গুণের শরীক। উইলিয়ম জেম্‌স্-ও তাই বলেছেন যে বস্তুগুলো পরস্পরের কাছে যতই "arbitrary, foreign, jolting, discontinuous" হোক না কেন, সব অবচ্ছিন্নতার (discontinuity) পেছনে এক শাশ্বত ও সর্বলৌকিক নিরবচ্ছিন্নতা (continuity) রয়েছে সে হচ্ছে দেশ ও কালের অবিচ্ছেদ্য ও অবিভাজ্য পটভূমিকা।**

এইখানেই জেম্‌স্ বলছেন যে বিশ্বের "অসদৃশ" যে সব বস্তু রয়েছে যাদের মধ্যে আর কোনই মিল নেই, তাদের দেশকালই হচ্ছে একমাত্র মিলনভূমি,— The only ground of union they possess."

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে এই "দেশকালে-অস্তিত্ব" বিষয়ে সকল বস্তুরই সাদৃশ্য রয়েছে। এই অর্থে পূর্ণ অসাদৃশ্য (complete dissimilarity) জগতে অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু তুলনামূলক বিচারে প্রাথমিক নিয়মই হ'ল এই যে, যা' সকল বস্তুতে সাধারণভাবে আছে তাকে বাদ দিয়ে তবে তুলনা করতে হয়। সমস্ত বিশ্বজগতের যা সাধারণ গুণ (common factor) তাকে বাদ দিয়েই আমাদের সকল বস্তুকে বিচার ও তুলনা করতে হবে। এই কারণে যখন আমরা সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্য (similarity or dissimilarity) বলি তখন এ সর্বাধিগত, সনাতন ও নিত্যগুণটিকে বাদ দিয়ে তবে সাদৃশ্য বা অসাদৃশ্যকে (similarity or dissimilarity) বুঝতে হবে। সুতরাং পূর্ণ অসাদৃশ্য (complete dissimilarity) বললে বুঝতে হবে এই সর্বলৌকিক সাদৃশ্যকে বাদ দিয়ে অপরাপর আর সকল বিষয়ে অসাদৃশ্য। এই রকমের গভীর ও ব্যাপক অসাদৃশ্যকেই আমরা বিরুদ্ধতা (opposition) বলে আখ্যাত করছি। যাদের পরস্পরের মধ্যে এই সবধিকের উচ্চ অসাদৃশ্য রয়েছে তাদের বলা যায় বিরুদ্ধ বস্তু (opposite)।

---

* "The only logical postulate which the dialectic requires is the admission that experience really exists—we must be assured of the existence of some experience—in other words, that something is. (Art 17)

We are justified in assuming this postulate because it is involved in every action of every thought……" (Art 18. Studies in Hegelic Dialectic. Mc. Taggart).

** "……We find continuity ruptured on every side.…The atoms themselves are so many independent facts, the existence of any one of which in no wise seems to involve the existence of the rest. We have not banished discontinuity, we have only made it finer-grained—. The continuities of which they partake in Plato's phrase, the ego, space and time are, for most of them, the only grounds of union they possess." [p. 266, Will to Believe].

'opposite' সংজ্ঞাকে আগেই বোঝানো হয়েছে। যে দুটো বস্তুর এককালীন অস্তিত্ব একই জায়গায় সম্ভব নয়, যাদের মধ্যে এক থাকলে অপরের থাকা অসম্ভব, তাদেরকে 'opposite' বা 'বিরুদ্ধ' বস্তু বলা হয়ে থাকে। যেমন 'সত্য' ও 'অসত্য'। কোন বস্তু সত্য হলে, সেই অর্থেই 'অসত্য' হতে পারে না। এ-দুয়ের মধ্যে চিরন্তন বৈরিভাব আশ্রিত হয়ে রয়েছে। এরা একে অন্যকে নস্যাৎ (negate) করে, বাতিল করে (nullify) এবং contradict বা বিরুদ্ধতা করে। এমনি ধরণের opposition বা বিরুদ্ধতা বিশ্বের কোনো কোনো বস্তুর মধ্যে আছে এবং একথা সবাই স্বীকার করে। এই কারণে ক্রোচেও (Croce) বলেছেন :

"our thought, however, in investigating reality, finds itself face to face, not only with 'distinct' but also with 'opposed' concept" (Ch I. Ibid).

বাস্তব জগতে দুরকমই সম্বন্ধ এবং দুরকম শ্রেণীর বস্তুই পাওয়া যায়। কেবল "Distinction" এর সাহায্যে সব কিছুকে বুঝতে চেষ্টা করলে ভুল হবে। কারণ জগতে 'opposites'ও রয়েছে। যেমন সত্য ও অসত্য (True & False), ভালো ও মন্দ (Good & Evil), সুন্দর ও কুৎসিত (Beautiful ও Ugly), Positive & Negative, আনন্দ ও বেদনা (Joy & sorrow), জীবন ও মৃত্যু (Life and Death) সৎ এবং অসৎ (Being ও Not-Being) ইত্যাদি। এই দুন্দ্বভাবগুলোর এক পক্ষ অপর পক্ষের একেবারে "বিরুদ্ধ," যাতে করে প্রত্যেকেই তার বিরুদ্ধভাব দ্বারা নিহত হচ্ছে ('slain by its (opposite). হেগেলীয় পরিভাষায় বলা যায়, একটী দ্বারা অপরটী negated বা বিনষ্ট হয়। সত্যের সঙ্গে অসত্যের [illegible] সম্বন্ধ, সত্যের সঙ্গে ভালোর (goodness) সেই সম্বন্ধ নয়। সত্য ও অসত্য বললে, তৎক্ষণাৎ বোঝা যায় যে এ দুটী একত্র থাকতে পারে না কখনো কোথাও। যে স্থানে সত্য থাকবে সেখানে অসত্যের স্থান নেই। যেখানে অসত্য থাকবে সেখানে সত্যের থাকা অসম্ভব। এদের মধ্যে অহি-নকুলের সম্পর্ক চির-বিদ্যমান। কিন্তু সত্য ও ভালো (Goodness) বললে অন্য রকমের সম্পর্ক বোঝা যায়। সত্য যেখানে আছে সেখানে ভালোরও (goodness) একত্র থাকবার কোনই বাধা নেই। দুই-ই দিব্যি সহযোগী হিসেবে থাকতে পারে। একই মানুষ বা বস্তু একই কালে True ও Good হতে পারে। একথা বলবার বেলায় আমাদের বাধে না। কিন্তু একই বস্তু একই কালে সত্য ও অসত্য দুই-ই হতে পারে, এ কেবল আলঙ্কারিক উপকথার রাজ্যে সম্ভব হলেও হতে পারে। কিন্তু যুক্তি, বুদ্ধি বা বাস্তবের রাজ্যে এ একেবারে অসম্ভব।

কাজেই দেখা গেল যে অপরত্ব (otherness) ও বৈপরীত্য (opposition) দুটো আলাদা ও ভিন্নার্থক সংজ্ঞা বা category। এদের অর্থের পার্থক্য আসমান-জমীন এবং এরা একটি অপরটীর পরিবর্তে কখনও ব্যবহৃত হতে পারে না। Croce তাই বলছেন :

"These are profound differences which do not permit that both modes of connection should be treated in the same manner.

The 'true' is not in the same relation to the 'false' as it is to the 'good,' nor is the 'beautiful to the 'ugly' in the same relation as it is to the 'philosophic truth'... But truth without goodness and goodness without truth are not two falsities."

জগৎকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে হলে এই দুরকম সম্পর্কের পার্থক্যকে সর্বদা মনে রাখতে হবে। এদের অর্থের তফাৎ

যদি চোখের সামনে না থাকে তবে বিশ্ব-গতির অর্থ-নির্ণয় নির্ঘাৎ ভুল হবেই হবে। কারণ এই otherness ও opposition-এর মানের পার্থক্য দার্শনিক বিচারের গোড়ার কথা। ক্রোচে (Croce) বলেন "This is an essential point" অথচ এই "essential point"-এই হেগেল ভুল করে বসেছেন। তাঁর লজিকের সর্বপ্রধান কথা বিরোধ বা বৈপরীত্য (contradiction বা opposition) এবং তাঁর Logic কে Logic of contradiction বা বিরোধাত্মক ন্যায় বলে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। অথচ এই বিরোধতত্ত্বের মানে তিনি যা করেছেন, তাতে যুক্তি ও বাস্তবতা নেই, আছে কেবল কষ্টকল্পিত অর্থের বিকৃতির সাহায্যে কথামূলাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা। তিনি Formal Logic বা অবরোহী ন্যায়ের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের নিশান তুলতে গিয়ে বিরোধ ও বৈপরীত্যকেই (contradiction & opposition) স্থূল বসলেন বিশ্বজগতের সার্বভৌমিক ও চিরন্তন নীতি এবং নির্দেশ করলেন যে বিশ্বের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে oppose করছে, বিরুদ্ধতা করছে। বিশ্বের সকল বস্তুর পারস্পরিক সম্বন্ধ কেবল একটিমাত্র এবং সেটি হচ্ছে বৈপরীত্য (opposition)। উইলিয়ম জেম্‌স্ (William James) এজন্যেই বিদ্রূপ করে তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে বলছেন :

"He [Hegel] will not call contradiction the glue in one place and identity in another ; that is too half-hearted. Contradiction must be a glue universal and must derive its credit from being shown to be latently involved in cases that we hitherto supposed to embody pure continuity." (On Some Hegelisms p. 275-75)

সূত্র যেমন করে মালার সকল ফুলকে একত্রে গেঁথে রাখে হেগেলের মতে এই বিরোধ (Contradiction) তেমনি বিশ্বের সকল বস্তু এবং ঘটনাকে ধারণ করে আছে। যা কিছু আছে, যা কিছু ছিল, এবং যা কিছু থাকবে—সবই বিধৃত হয়ে রয়েছে এই contradiction-এর মধ্যে। যেখানে সব খণ্ড বস্তুগুলোই পরস্পর contradiction বা অবিচ্ছেদ্য সহযোগিতার বন্ধে আছে, সেখানেও বিরোধের (contradiction) হাত এড়াবার উপায় নেই। যদি প্রত্যক্ষভাবে না থাকে তবে অন্ততঃ পরোক্ষ ও অনুক্তভাবে থাকবেই। আমরা যেখানে বিরোধের (contradiction) নামগন্ধও খুঁজে পাইনে, সেখানে হেগেল উদগ্র বিরোধকে (contradiction) খুঁজে পেয়েছেন।*

যেখানে মৈত্রী সেখানে হেগেল দেখতে পেয়েছেন বৈরিতা ; যেখানে আছে সহযোগিতা, সেখানে তিনি কল্পনা করেছেন প্রতিযোগিতা ; বস্তুর সঙ্গে বস্তুর সম্বন্ধে যে বৈচিত্র্য রয়েছে তাকে তিনি চোখ বুজে উড়িয়ে দিয়েছেন, অর্থাৎ দেখেও দেখতে চাননি। ফলে বিপুল ব্রহ্মাণ্ডকে একটিমাত্র ছাঁচে ঢালতে গিয়ে তিনি বিরোধকে (contradiction) পূজাবেদীতে বসিয়ে অন্ধ ভক্তির কাছে যুক্তিকে বলি দিয়েছেন, এবং নিজেও নিতান্ত হাস্যকর ভাবে বিরোধের (contradiction) জালে জড়িয়ে গিয়েছেন। জেম্‌স্ নির্দোষ রসিকতা করে বলেছেন.

"Hegel will show that their [of things] very

* "Thus the relations of an ego with its objects, of one time with another time, of one place with another place, of a cause with its effect, of a thing with its properties and especially of parts with whole, must be shown to involve contradiction. Contradiction, shown to lurk in the very heart of coherence and continuity, cannot after that be held to defeat them, and must be taken as the universal solvent, or rather, there is no longer any need of a solvent…" (Ibid—p 275-76)

difference is their identity and that in the act of detachment, the detachment is undone and they fall into each other's arms.

...it seems rather odd that a philosopher who pretends that the world is absolutely rational...should fall back on a principle (identity of contradiction) which utterly defies understanding." (Ibid—p. 275-76)

উপরের দ-কিত আলোচনায় দেখা গেছে যে হেগেলের প্রথম মূলতত্ত্ব যুক্তি ও বাস্তবের বিরোধী। অর্থাৎ জগতের সকল বস্তুই সকল বস্তুকে contradict বা বিরোধিতা করছে একথা মিথ্যা। হেগেলের এই ভুলের কারণ তাঁর কর্মূলা-প্রীতি। অর্থাৎ জগতের সব কিছুতেই এই একটিমাত্র সম্বন্ধকে দেখাতে চেয়েছেন তিনি এবং এজন্য "Otherness" বা অপরত্ব নামক আরেকটি সম্বন্ধকে হিসাবে আনেননি। এখন তাঁর দ্বিতীয় তত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা যাবে। এই দ্বিতীয় তত্ত্ব আলাদা কিছু তত্ত্ব নয়, প্রথম তত্ত্বেরই ভাষান্তর ও রূপান্তর মাত্র।

(খ) জগতের প্রত্যেকটি বস্তু আত্মবিরোধী (contradictory) :

বিরোধ (Contradiction) জগতের বস্তু ও সত্তার বুকে লুকিয়ে আছে। যে কোন বস্তুর প্রকৃতিকে বিশ্লেষণ করলেই দেখা যাবে, সেই বস্তু নিজেই নিজেকে খণ্ডন বা বিরোধিতা করছে। আমরা আগেই এ-তত্ত্বের বিস্তৃত বর্ণনা করেছি। দেখেছি যে কান্টের Antinomy তত্ত্বকে বিকশিত ও প্রসারিত করে নিয়ে হেগেল একে বিশ্বের সকল বস্তু বা সত্তার উপরে প্রয়োগ করেছেন। প্রত্যেকটি বস্তুই হচ্ছে "a coexistence of opposite elements" এবং "a concrete unity of opposed determinations." (p. 100, Logic of Hegel)।

এই কথাটিকে হেগেল কয়েকটা concrete বা মূর্ত দৃষ্টান্ত দিয়ে বোঝাতে চেয়েছেন। এই তত্ত্বকে বলা হয়ে থাকে "Interpenetration of opposites"। এই দৃষ্টিতে, কোনো বস্তু সেই বস্তুও বটে এবং সেই বস্তু নাও বটে। এবং এই তত্ত্ব Law of Identity ও non contradiction-এর খাড়া অস্বীকৃতি এবং তার বিরুদ্ধে উচ্চারিত যুদ্ধ ঘোষণা। কারণ, উইলিয়ম জেমসের ভাষায় :

"The principle of the contradictoriness of identity and the identity of contradictories is the essence of the Hegelian system." (p. 277, Logic of Hegel)

এ-সম্বন্ধে একমাত্র উত্তর এই যে এ তত্ত্ব মানুষের সাধারণ বুদ্ধি ও দার্শনিক বুদ্ধি এই দু'য়েরই বিরোধী। যুক্তি ও লজিককে এ-তত্ত্ব সমূলে উৎপাটন করেছে এবং মানুষ উন্নত কল্পনার সাহায্যেও এতে ধারণায় আনতে পারে না কারণ জেম্‌স্‌-এর ভাষায় বুদ্ধি ও যুক্তি সবই এর কাছে হার মানে, 'defies understanding." এই জন্যই ক্রোচের মত পণ্ডিত হেগেলীয়ানও বলতে বাধ্য হয়েছেন :

"He who takes up the 'Logic' of Hegel with the intention of understanding its development and above all the reason of the commencement, will be obliged ere long to put down the book in despair of understanding it or persuaded that he finds himself face to face with a mass of meaningless abstractions." (p. 118, Croce)

তাঁর এই আত্মবিরোধ (Self-contradiction) তত্ত্ব বাস্তব জগতে কোথাও নেই, তাকে সৃজন করেছেন হেগেল নিজের কল্পকল্পনার গর্ভ থেকে। রাম এবং 'not-রাম', এ দুটো বিরোধী (Contradictory বা Opposite) সত্তা বা সংজ্ঞা। এই দুটো সংজ্ঞাকে

একই স্থানে ও একই কালে একই ব্যক্তির সম্বন্ধে আরোপ করা যায় না। কারণ জেম্‌স্-এর ভাষায় এরা "in conflict" বা "mutually exclusive" এবং কোচের ভাষায় একটি অপরটির দ্বারা নিহত ('Slain') হবে যদি এরা কাছাকাছি আসে। অবশ্য এরা যদি দূরে দূরে থাকে এবং কারুর সঙ্গে একই আসন গ্রহণ করে থাকতে না চায়, তবে এদের সম্প্রতি কোন লড়াই হবে না। অর্থাৎ যখন 'রাম' বলা হচ্ছে ঠিক তখনি 'not-রাম' যদি বলা না হয়, তবে কোনো দ্বন্দ্ব ("Strife") এদের মধ্যে তৎক্ষণাৎ (immediately) হচ্ছে না। কিন্তু একই কালে ও একই স্থানে দুজনই আসতে চাইলে তা চলবে না। যখন 'রাম' আসবেন, তখুনি 'not-রাম' আসতে পারবেন না। এলে একজনই স্থান পাবেন, অন্য নিগৃহীত হবেন। দেশ ও কাল বিরাট বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে রয়েছে, জায়গার অভাব নেই, কাজেই এই অফুরন্ত বিস্তৃতির মধ্যে আলাদা আলাদা জায়গা বেছে নিয়ে দুজনেই ঘুরে ঘুরে থাকলে শান্তিতে থাকতে পারেন। এই কথাই জেম্‌স্ বলছেন :

They conflict only when, as mutually exclusive possibilities, they strive to possess themselves of the same parts of space, time and ego (James, Ibid, last page of the chapter)

আসল কথা একই অর্থে, এই দুটি সংজ্ঞাকে প্রয়োগ বা ব্যবহার করা চলবে না। যে অর্থে "রাম" বলা হবে, "রাম" শব্দের ঠিক সেই অর্থেই 'not-রাম' তখুনি বলা চলবে না। অবশ্য একবার 'রাম' এক অর্থে ব্যবহার করে, আবার অন্য অর্থে 'not-রাম' তখনি বলা চলতে পারে।

তেমনি ভাল ('Good') ও মন্দ ('Evil') সম্বন্ধেও। এরা বিরুদ্ধ (opposite) সংজ্ঞা। কাজেই যদি কোন লোককে 'good' বলি, তবে ঠিক সেই স্থানে ও কালে তাকে 'Evil' বলা অসম্ভব; অর্থাৎ একই অর্থে বলা চলবে না। বিভিন্ন অর্থে বললে দোষ হবে না। যে অর্থে ও যে ব্যাপারে 'good' বলা হয়েছে, অন্য ব্যাপারে ও অন্য বিষয়-বোধক অর্থে ঐ লোককে 'Evil' বলতে পারা যায়। দুটো সংজ্ঞাকে দুটো আলাদা আলাদা ভিত্তিভূমি থেকে বোঝা, বলা ও ব্যবহার করা হচ্ছে। এখানে একই স্থানে, কালে ও অর্থে না বলায় এদের বাস্তব বিরোধ বাধলো না। কাজেই কোনো বস্তু সম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞা একই কালে ও স্থানে প্রয়োগ করা যেতে পারে, হেগেলের এ মতের বাস্তবতা ও যৌক্তিকতা নেই। কী করে যে এমন অসঙ্গত প্রয়োগ সঙ্গত হতে পারে, তা হেগেল প্রমাণ করে দেখান নি। দুটো বিরোধী (contradictory) সংজ্ঞা প্রয়োগ করা যেতে পারে দুটো ভিন্ন অর্থে ও দুটো আলাদা ভিত্তিভূমিতে। একই বস্তুর মধ্যে বাস করছে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা, হেগেলের একথা অর্থহীন। রামের মধ্যে রামত্বও আছে, আবার একই সঙ্গে 'না-রামত্বও আছে, এবং ভালত্বও আছে আবার মন্দত্বও আছে, একথা একই অর্থে খাটে না। যেটুকু খাটে সে হচ্ছে ভিন্ন অর্থে। জেম্‌স্ এর ভাষায় : তারা বিভিন্ন অর্থে রয়েছে (They obtain in different respects)।

(ক্রমশঃ)

রবীন্দ্র স্মৃতিকণা

সুজিত কুমার মুখোপাধ্যায়

১৯০৪-০৬ সালের কোনো এক সময়। আমি তখন আসামে—শ্রীহট্টে। বহুদিন পর শান্তিনিকেতনে আসছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করবো। তিনি তখন "শ্যামলী"তে।

উত্তরায়ণের সিংহদ্বার পার হয়ে, 'উদয়নে'র আঙিনা থেকে দেখি—রবীন্দ্রনাথ বাইরে বসে আছেন। কিন্তু একি! তাঁর যে সন্ন্যাসীর বেশ! সর্ব অঙ্গে গেরুয়ার আচ্ছাদন। অল্পদিনে তাঁর এমনই পরিবর্তন!

স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ি। প্রথম চমকটা কাটিয়ে ধীর-পদে অগ্রসর হতে লাগলাম। খানিক এগিয়েই বুঝলাম—গেরুয়াধারী রবীন্দ্রনাথ নন—"গাঙ্গুলী মশায়"।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর মুখমণ্ডলের অদ্ভুত সাদৃশ্য। রং যদিও শ্যামবর্ণ। দূর থেকে রং বড় নজরে পড়ে নি। কাছে এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

প্রণামান্তে রবীন্দ্রনাথকে আমার ঐ চমক লাগার কথা বললাম। তিনি হাসলেন। বল্লেন—"ও এখন আমার কাছেই থাকে। কোথায় আর যাবে!"

গাঙ্গুলী মশায়ের ধনীর ঘরে জন্ম—হঠাৎ দরিদ্র হয়ে গেছেন। শান্তিনিকেতনে তাঁকে একটি চাকরি দেওয়া হয়েছিল। চাকরি করার অভ্যাস নেই—তাই বেশি দিন সে-কাজ করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথই এখন তাঁকে নিজ কুটীরে আশ্রয় দিয়েছেন।

গাঙ্গুলী মশায় অতি উচ্চস্বরে কথা বলেন। নিম্নস্বরে কথা বলা তাঁর ধাতে নেই। রবীন্দ্রনাথ যখন তাঁর ঘরে আমার সঙ্গে কথা বলছিলেন—তখন পাশের ঘরে, গাঙ্গুলী মশায়ের উচ্চ কণ্ঠস্বরে কয়েকবার তাঁর কথায় ব্যাঘাত হয়।

অবশেষে পাশের ঘরে এমনই জোর আওয়াজ হতে লাগলো যে রবীন্দ্রনাথকে বাক্যালাপ বন্ধ করতে হলো।

সমস্ত মুখ তাঁর লাল হয়ে উঠলো। বুঝলাম তাঁর ধৈর্যের সীমা অতিক্রম করেছে।

কিন্তু তখনই তিনি নিজেকে সংযত করে—মন্তব্য করলেন—"এত সরল মানুষ!" তারপর পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে এলেন।

এরকম একজন মানুষের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ, শ্যামলীর মত একটি ছোট্ট কুটীরে কিছুদিন কাটিয়েছিলেন।

একেই বলে—"মহাবদান্য"।

শঙ্খমালা

মিহির মুখোপাধ্যায়

কেমন যেন চেনা চেনা মনে হচ্ছিল। খুব পরিচিত হাঁটার ভঙ্গি। একটু আগে আগে যাচ্ছিল মেয়েটি। ট্রাঙ্করোড পার হ'ল। হ্যারিসন রোডের মুখ। নতুন নাম মহাত্মা গান্ধী রোড। সামনে শেয়ালদা ষ্টেশন। গায়ে গায়ে মানুষ, মানুষের স্রোত। পাশাপাশি দুটো স্রোত। একটা যাচ্ছে, একটা আসছে। এশিয়ার সবচেয়ে ব্যস্ত ষ্টেশন নাকি এই শেয়ালদা। ব্যস্ত মানুষের ধারার মাঝের মত সাবলীল-ভাবে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে মেয়েটি। অত তাড়াতাড়ি যেতে পারছে না সুবিনয়। তার হাতে চামড়ার মস্ত ভারি ব্যাগ। তবু চোখে চোখে রাখল। টিকিট ঘরের সামনে এসে একটু ঘুরে যাবার সময় মুখের পাশটা দেখতে পেল এবং পুরোপুরি চিনতে পারলো। কল্যাণী, যার ডাকনাম—কলি।

সেই ছোটবেলার ছোট্ট শহরতলী শহরের নগেনবাবু উকিলের মেয়ে। সরু সুড়কির রাস্তার দু'ধারে মুখোমুখি বাড়ি ছিল তাদের। ওপাশে রাস্তার ওপর নগেনবাবুর বৈঠকখানা আর এপাশে তার বাবার ডিসপেনসারি। সব টিনের ঘর। তাদের ছোটবেলার সেই শহরতলী শহরে টিনের ঘরই বেশি। পাকা দালান বড় একটা চোখে পড়ত না। কল্যাণী ততক্ষণে ষ্টেশনের ভেতর ঢুকে গেছে। ভিড়ের মধ্যে চোখের আড়াল হয়েছে। এক নম্বর আর দু'নম্বর প্লাটফর্মে দুটো গাড়ি। একটা বনগাঁ, আরেকটা নৈহাটি লোকাল। রাত আটটা বাজার কয়েক মিনিট বাকি। একটু আগে-পিছে এখুনি ছাড়বে গাড়ি দুটো। যদি ওদের একটায় উঠে পড়ে কল্যাণী। তা'হলে আর কথা বলার সুযোগ হ'ল না। কিন্তু সুযোগ পেলেই বা কি হত? এতদিন পরে কি কথা আর জিজ্ঞেস করত। সেই মামুলি প্রশ্ন, কেমন আছো, কোথায় আছো, কি লাভ তা'তে? টিকিট কাটতে কয়েক মিনিট দেরি হ'ল। নৈহাটির গাড়িটা তীব্রস্বরে বাঁশি বাজাল। আস্তে আস্তে প্লাটফর্ম ছেড়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ষ্টেশনের ভেতর এল সুবিনয়। তার রাণাঘাট লোকাল আসবে চার নম্বর প্লাটফর্মে। ছাড়বে আটটা পঁচিশে। চার নম্বর প্লাটফর্মে একটি বেঞ্চিতে ক্লান্ত ভঙ্গিতে বসেছিল কল্যাণী। সুবিনয়কে দেখেই খুব অবাক হয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে চোখ রেখে এক পা এগিয়ে এল। স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে আছে সুবিনয়, মুখে এক ফোটা হাসি।

—একি, বিনুদা, তুমি—কাছাকাছি এসে দাঁড়াল কল্যাণী।

—যাঃ, চিনতে পেরেছ তাহলে—

—যাঃ, পারব না যেন,—একটু হাসল কল্যাণী। আগের মতই বাঁদিকে একটু ঘাড় কাত করে কথা বলার অভ্যাস। খুব বদল হয়নি, আগের মতই দোহারা দীঘল গড়ন। তবে রঙটা যেন একটু ময়লা হয়েছে। নিয়নের নীলাভ আলোয় কেমন ক্লান্ত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল। সেই কথাই বললো সুবিনয়—তোমাকে খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে, একটু যেন ময়লাও হয়ে গেছ।

ছোট রুমালে মুখের ঘাম মুছল কল্যাণী, একটু লজ্জা হাসি মুখে বললো—সারাদিন যা ছুটোছুটি করতে হয়, তুমি কিন্তু বেশ মোটা হয়েছ বিনুদা, চোখে আবার চশমা নিয়েছ,

তুমি যদি সামনে এসে অমন করে না তাকাতে, তা'হলে চেনা যুক্তিল হতো—

—কেমন আছো, কোথায় যাচ্ছো এখন—

—যাব কাঁচরাপাড়া, সেখানে দাদা-বৌদির সঙ্গে থাকি—কল্যাণীর কথা শুনে সুবিনয় আবার জিজ্ঞেস করল—সত্যেন কেমন আছে, কি করে আজকাল?

—ওখানে রেলের কারখানায় কাজ করে—

—তুমি কি করছ?

আবার বেঞ্চে বসতে বসতে জবাব দিল কল্যাণী—এখানে একটা স্কুলে পড়াই, সন্ধ্যার সময় টিউশনি সেরে এখন বাড়ি ফিরছি—

—রোজই কলকাতা আস তা' হলে—

—রোজই আসতে হয়, কিন্তু তোমার খবর কিছু বললে না তো—

—আমার আর কি খবর, রানাঘাটে ডাক্তারী করি, বাবার ডিসপেনসারীতে বসতে হয়, বাবার শরীর খুব ভাল নয়, মা আছেন একরকম—

—তুমি বিয়ে করোনি?

—কি মনে হয় তোমার—

—আমার কি মনে হবে, ছেলেদের কিছু বোঝা যায় নাকি—

—বোঝা যায় না আবার, বিবাহিতদের কেমন সুখী-সুখী ভাব চেহারা হয়।

—তাই নাকি, তুমি তো খুব জানো দেখছি—মুখ টিপে একটু হাসল কল্যাণী—আর মেয়েদের কি হয়—

—তাদের তো কপালেই চিহ্ন থাকে, সিঁথির রঙই সঠিক সংবাদ দেয়—

—আগের মতোই তোমার শব্দ মিলিয়ে কথা বলার অভ্যেস আছে দেখছি, এখনো কবিতা লেখ নাকি—

—না, কবিতা লেখা ভুলে গেছি, এখন রোগ আর রোগী নিয়ে সারাদিন কাটে, সত্যেন কি আগের মতোই আছে, এখনো কি ফুটবল খেলা নিয়ে হৈ হৈ করে বেড়ায়—

—হ্যাঁ এখন পাড়ার ক্লাবের টিম নিয়ে মাতামাতি করে, এই তো কলকাতার ফুটবল খেলা শুরু হয়েছে, এখন সপ্তাহে দু' তিনদিন খেলা দেখতে আসবে—

—কতকাল দেখা হয় না ওর সঙ্গে—আস্তে আস্তে বললো সুবিনয়—তোমার মা-বাবা কেমন আছেন—

—মা আছেন ওখানে, ওহো তুমি বোধহয় জানো না, বাবা আজ তিন বছর—কল্যাণীর কথা শুনে কিছুটা বিস্মিত, ব্যথিত সুবিনয় জিজ্ঞেস করলো—সেকি, হঠাৎ কি হয়েছিল—

—সেরিব্রাল থ্রম্বসিস, এলোনা একদিন আমাদের ওখানে, এমন তো কিছু দূর নয়, মা দেখলে খুব খুশি হবেন—মুখ তুলে তাকিয়ে আছে কল্যাণী।

সুবিনয় কিন্তু মন থেকে খুব একটা উৎসাহ পেল না, তেমন কিছু আগ্রহ যেন বোধ করছে না, তবু বললো—আচ্ছা যাব একদিন—

অথচ এই সতুর সঙ্গে একসময়ে প্রায় সারাদিন কাটত। দিনের মধ্যে অন্ততঃ আট-দশ ঘণ্টা একসঙ্গে থাকত দু'জনে। তখনো কল্যাণীর সঙ্গে আলাপ হয় নি।

কল্যাণী থাকত মামার বাড়ি, দিদিমার কাছে। একটু বড় হয়ে শহরের স্কুলে পড়ার জন্য মা-বাবার কাছে এসেছিল।

খুব সকালে উঠে পড়তে বসত সুবিনয়। বরাবরের অভ্যাস। পরীক্ষার আগে অন্ধকার থাকতে উঠে পঠন জেলে বসত। বাবার ডিসপেন্সারীর পাশে লম্বা চওড়া বারান্দার ছিল পড়ার টেবিল-চেয়ার। আরেক পাশে কেশব-কম্পাউণ্ডার নড়বড়ে একটা তক্তাপোষের উপর ঘুমুত। ময়লা বিছানায়, তালিমারা মশারী। সেদিনও খুব ভোরে পড়তে বসেছিল সুবিনয়। ক্লাশ টেনের ছাত্র, সামনে প্রি-টেস্ট পরীক্ষা। বাইরে অল্প-অল্প করসা হয়েছে। একটা-দুটো

কাক ডাকছে। ঘরের ভেতর অন্ধকার। জানালা দিয়ে আলো আসছে বটে, কিন্তু বই পড়া চলে না। সঠনের আলো উস্‌কে গুন গুন করে পড়ছিল সুবিনয়। একটু পরে খোলা জানালা দিয়ে চোখ পড়ল, জানালার পাশে টগর ফুলের গাছের নিচে কে যেন ঘুরে বেড়াচ্ছে। গাছটা শাদা ফুলে ঢেকে গেছে। ফুল তুলছে কেউ। আলোটা নিবিয়ে বাইরে এলো সুবিনয়। বেশ কর্সা হয়ে গেছে। টগর গাছটার নিচে একটি মেয়ে। বারো-তের বয়স। সবুজ রঙের ফ্রক পরা, হাতে আঁকশি আর ফুলের ডালা।

—কোন বাড়ির মেয়ে তুমি—জিজ্ঞেস করেছিল সুবিনয়—নাম কি তোমার?

—আমি কল্যাণী, ওই বাড়ি আমাদের—হাত তুলে নগেনবাবুর বাড়িটা দেখাল।

—ও, নতুন বোন তুমি, ঘরে এসেছ?

—কাল সন্ধেবেলা।

সেই প্রথম আলাপ। কাল রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। আকাশে তখনো ভাঙা-ভাঙা মেঘ। তেজী রোদ্দুরের সকালটা ভারি লেগেছিল।

তারপর বেলা হয়েছে, রোদ বেড়েছে। অনেক দুপুর, অনেক সন্ধ্যা।

মহকুমা শহরের স্কুলে ভর্তি হ'ল কল্যাণী। নতুন জ্যামিতি-আঁকার বাক্স কিনে জ্যামিতি বুঝতে আসতো। একদিন কম্পাসের পেন্সিল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা বৃত্ত জুড়ে জুড়ে কল্যাণীর খাতায় একটা পদ্মফুল এঁকেছিল সুবিনয়।

আঁকার কৌশলটা দেখতে পায়নি কল্যাণী। কেন যেন একটু সময়ের জন্য বাইরে গিয়েছিল। ফিরে এসে অবাক হয়ে বলেছিল—বাঃ বেশ হয়েছে তো কি করে আঁকলে?

—বলবো না—মাথা নেড়ে হেসেছিল সুবিনয়।

—বলো না, বিনুদা লক্ষ্মী বলো না, তাহলে তোমার সঙ্গে আড়ি—ঠোঁট ফুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছিল কল্যাণী, বইখাতা গুছিয়ে বলেছিল—আমি যাই, আর আসবো না।

আরে বসো বসো—হাত দুটো ধরেছিল সুবিনয়। নরম কর্সা, নিটোল হাতের গড়ন। জোর করে চেয়ারে বসিয়েছিল।

—এই ছাড়, ভারী অসভ্য তুমি—হাত ছাড়িয়ে সরে বসেছিল কল্যাণী।

একটু অপ্রতিভের মতো হেসেছিল সুবিনয়। সামান্য ছুতোনাতা করে কতদিন যে এরকম ঝগড়া হ'ত। মনে করে আপন মনেই অল্প অল্প হাসল সুবিনয়।

কল্যাণী বললো—কি ভেবে হাসছ বিনুদা।

—তুমি কেমন রাগ করতে—জবাব দিল সুবিনয়—তোমার সেই জ্যামিতির বাক্সটা হারিয়ে ফেলেছিলাম মনে আছে—

কল্যাণী হেসে বললো—কতকাল আগের কথা এখনো মনে করে রেখেছ—তারপর একটু এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললো—এক কাপ চা পেলে ভাল হ'ত—

—ব'সো তুমি, আমি দেখছি—চায়ের ষ্টলের দিকে এগিয়ে গেল সুবিনয়। মাটির ভাঁড়ে চা আনল।

সেদিন সুবিনয় বলেছিল—পদ্মফুল আঁকা শিখিয়ে দেব, যদি আমসত্ত্ব এনে দাও—দিদিমার দেয়া জিনিস। বিপন্ন-মুখে কি যেন ভেবেছিল কল্যাণী।

মামাবাড়ি থেকে আমসত্ত্ব, আমচুর, আচার, কাসুন্দি—এসব পাঠিয়ে দিতেন দিদিমা। সেগুলি ঘর করে তাঁরাও ঘরে আটকে রাখতেন না। সহজে কাউকে দিতেন না।

সেই ভাঁড়ার ঘরে কারো চোকার হুকুম ছিল না।

তবু কি করে যেন অনেকটা আমসত্ত্ব এনেছিল কল্যাণী।

সন্ধ্যার পর লণ্ঠন জেলে পড়তে বসেছিল সুবিনয়। পেছন থেকে চোখ টিপে ধরেছিল। হাতের বালা ছুঁয়েই বলেছিল সুবিনয়—এই কলি ছেড়ে যাও, আমি বুঝতে পেরেছি।

টেবিলের পাশে সরে এসেছিল কল্যাণী। গোলাপী রঙের একটা ফ্রক পরেছে। কপালে লাল টিপ। লম্বা বেণীটা কাঁধের পাশ দিয়ে সামনে এনেছে। লণ্ঠনের হলুদ আলোয় আশ্চর্য ভালো দেখাচ্ছিল। একটুকাল তাকিয়েছিল সুবিনয়।

হা করে দেখছো কি, এই নাও—একটু হেসে কাগজে মোড়া আমলত্বর প্যাকেটটা টেবিলের ওপর রেখেছিল কল্যাণী।

কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে একটার পর একটা বৃত্ত জুড়ে জুড়ে পদ্মফুল আঁকার কৌশলটা সেদিন শিখিয়েছিল সুবিনয়। সামনে ঝুঁকে দেখেছে কল্যাণী, মুখের কাছে মুখ এনেছে। গরম নিশ্বাস লেগেছে গালে, কপালে। কিশোর সুবিনয়ের সমস্ত শরীর শির শির করেছিল। গলা শুকিয়ে আসছিল। কোনদিন এমন হয় নি।

চা খেয়ে ভাঁড় ছুটো লাইনের ওপর ফেলে দিল। কল্যাণীর দিকে একবার তাকাল সুবিনয়। সেই আগের লাবণ্য আর নেই। দেহে ভরা যৌবন, স্বাস্থ্যও ভাল। কিন্তু মুখে-চোখে কেমন ক্লান্তি আর বিষণ্ণতার ছাপ।

একটা সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখছিল কল্যাণী। প্ল্যাটফর্মের এদিকটায় লোকের ভীড় বাড়ছিল। গাড়ি আসার সময় হয়ে গেছে। একবার হাতঘড়ি দেখল সুবিনয়। বাঁশীর শব্দ করে, কপালের ওপর আলো জ্বালিয়ে, বিদ্যুতের রেল-গাড়ি মন্থর গতিতে প্ল্যাটফর্মের ভেতর এসে পড়ল। কল্যাণী প্রথমে ভাবল, বরাবর যেমন যায়, তেমনি মেয়েদের জন্য আলাদা গাড়িতে যাবে, তারপর কি ভেবে বললো—চলো বিনুদা, তোমার সঙ্গে উঠি।

—তা'হলে এসো তাড়াতাড়ি—সুবিনয় ওর হাত ধরে ভিড়ের মধ্যে পথ করে সামনের কামরাটায় উঠে পড়ল আর কি ভাগ্যি, জানালার পাশে বসবার জায়গা পেল দুজনেই।

সুবিনয়ের কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকতে হ'ল।

—তুমি একটু কষ্ট করে বসতে পারো—কল্যাণী জানালার দিকে সরে জায়গা দিল।

মাথার ওপর জিনিসপত্র রাখার জায়গায় ভারী ব্যাগটা তুলে দিয়ে বললো সুবিনয়—আমার দাঁড়িয়ে যাবার অভ্যেস আছে, তুমি ভাল হয়ে ব'সো, আমি মোটা মানুষ, ওইটুকুর মধ্যে বসতে পারব না।

কল্যাণী হাসল। নিঃশব্দ হাসি। আগের মতো যৌবনের জোরে জোরে আর হাসতে পারে না কল্যাণী। ছোট-বেলায় যেমন সামান্য কথায়, অল্প রসিকতায় খিল্ খিল্ করে হেসে উঠতো।

কেশব কম্পাউণ্ডার বলতো—পড়ার মধ্যে অত হাসি কিসের, হাসির কথাটা কি, অ্যাঁ।

সন্ধ্যাবেলা বাবা যেতেন ক্লাবে তাস খেলতে। রোগী দেখার সময় ছিল সকাল থেকে বেলা বারোটা। সন্ধ্যার পর তেমন কোন খবর এলে কেশবদা গিয়ে ডেকে আনত বাবাকে। ডাক্তারখানার ভেতর একটা হ্যারিকেন-বাতি জ্বলত। বাইরে ঢাকা-বারান্দার একপাশে একরত্তি আফিম খেয়ে একা-একা বেঞ্চিতে বসে ঝিমোত কেশবদা। আরেকপাশে লণ্ঠন জ্বালিয়ে পড়তে বসতো সুবিনয়। এক একদিন কল্যাণী আসতো জ্যামিতি বুঝতে। পড়া কি আর হত। নানা গল্প আর কখনো দমকা হাওয়ার মত হাসির উচ্ছ্বাস। সমস্ত শরীর ভেঙে হাসত কল্যাণী। আর আফিমের নেশায় ঝিমুতে ঝিমুতে বিড়বিড় করে বকতো কেশবদা।

গাড়ি ছাড়ল। আটটা-পঁচিশ। একবার হাতঘড়ি দেখল সুবিনয়, মুখ নিচু করে জিজ্ঞেস করলো—আচ্ছা কণি, কেশবদার কথা তোমার মনে আছে, সেই যে মুখে বসন্তের দাগ, বাবার কম্পাউণ্ডার ছিল।

একটু হাসল কল্যাণী—খুব মনে আছে, কেশবদা এখন আছে কোথায়?

—যাদবপুর কোন্ এক কলোনীতে, বুড়ো হয়ে গেছে, চোখে ভাল দেখতে পায় না।

অনেকগুলি লাইনের জটিলতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে যেতে যেতে গাড়িটা এতক্ষণে একটা সোজা লাইন পেল। গতি বাড়ল। পাশাপাশি আরো কয়েক জোড়া লাইন। একটা মালগাড়ি যাচ্ছিল। আস্তে আস্তে পেছনে পড়ে গেল। এখন এঞ্জিনটা ওদের কামরার পাশাপাশি। ড্রিসেল এঞ্জিন। কেমন ভাঙা গলায় বাঁশি বাজাল। বাইরে অন্ধকার। শহরগুলির আলো। মাঠ, কারখানার চিমনি, লম্বা পুকুর, খোপাদের বস্তি, ছোট ছোট বাড়ি। তারপরেই উল্টাডাঙা। একজন উঠে যেতেই কল্যাণীর মুখোমুখি বসার জায়গা পেল সুবিনয়। বাইরের অন্ধকারে তাকিয়ে আছে কল্যাণী। হাওয়ায় ওর চুলের গুচ্ছ উড়ছে। দেখতে দেখতে নয়নম। রাত্রির ষ্টেশনগুলি বড় অদ্ভুত লাগে সুবিনয়ের। কত লোক নামল, কিছু উঠল।

একটা ছোট ছেলের কাছ থেকে চিনেবাদাম কিনল কল্যাণী। তাড়াতাড়ি ব্লাউজ বার করে দামটা দিল সুবিনয়। কল্যাণী একবার আপত্তি করেছিল। তারপর বললো—তোমার রুমালটা দাও তো বিনুদা। কোলের ওপর রুমাল বিছিয়ে বাদাম ঢেলে নিল।

একটা ঠোঙা ছাড়িয়ে সুবিনয়ের হাতে দিচ্ছে, কখনো নিজের মুখে।

দু' একটি ছোট ছোট কথা। যেমন—ওই আলোটা কিসের বিনুদা?

আবার হয়তো আস্তে আস্তে—তোমার পৌঁছুতে অনেক রাত হয়ে যাবে, তাই না?

গাড়ি ছুটছে। একজোড়া লাইন ডাইনে রেখে আলাদা হয়ে গেল।

সুবিনয় হাত তুলে দেখালো—ওই তাখো খুলনার লাইন—একটু থেমে আবার বললো—জানো কলি, মনটা ভারী খারাপ হয়ে যায়, আর কোনদিন হয়তো ও লাইনে যাব না, কতকাল যে টিমারে উঠি না, পদ্মার নৌকোয় চড়ি না।

কল্যাণী একটু হেসে বললো—মনে আছে বিনুদা, একবার আমরা বাবার এক বন্ধুর বজরায় চেপে চড়ুইভাতি করতে গিয়েছিলুম।

একটু সামনে ঝুঁকে কথা বলতে হচ্ছে। গাড়ির শব্দ, হাওয়ায় কথা উড়ে যাচ্ছে।

—মনে নেই আবার—জবাব দিল সুবিনয়—ফেরার পথে সন্ধ্যেবেলা, নতুন পোষা কুকুরছানাটা জলে পড়ে গিয়েছিল, সবু জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে জল কাদা মেখে সেটাকে তুলে আনল।

আবার চুপচাপ দু'জনে। কতকাল দেখা হয় না, আর হয়তো হবেও না কোনদিন। সেই পরিচিত নদী, নৌকো, নানা রঙের বজরা, পদ্মার নৌকো, টাবুরে নৌকো।

এক বৈঠার ছই-ঢাকা নৌকোগুলিকে বলে, খুলনায় বলে, টাবুরে নৌকো।

একবার বাবা-মা'র সঙ্গে লক্ষ্মীপাশার কালিবাড়ি পুজো দিতে যাবার সময় টাবুরে নৌকোয় চেপেছিল সুবিনয়। আর পদ্মার নৌকো। ভাবলেই মনটা কেমন হয়ে যায়। মস্ত নদী বিশখালি। ওপারে গাছ-গাছালির ভীড়, সবুজ বনরেখা আর এপারে ধানক্ষেত। সেই ধানক্ষেতের পাশ দিয়ে নানা গাঁয়ের যাত্রী নিয়ে পদ্মার নৌকো চলেছে।

রেলগাড়ির শব্দ শুনতে শুনতে নদী, টিমার, নদীর পারের গ্রাম আর পদ্মার নৌকোর কথা ভাবছিল সুবিনয়।

কল্যাণী কথা বলছে—সারাদিনের পর এই ভিড়ে এক এক সময় এত ক্লান্ত লাগে—

কিছু বললো না সুবিনয়, শুধু কল্যাণীর বিষণ্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। চোখ নিচু করে বাদামের খোসা ছাড়াচ্ছিল কল্যাণী। সরু সরু আঙুল। অনাধিকার একটি প্রবাসের আঁটি।

অনেকদিন আগে, একবার কে সন্ধ্যেবেলা কল্যাণীর হাতখানি হঠাৎ ধরে ফেলেছিল সুবিনয়—তোমার কেমন সুন্দর সরু সরু আঙুল কলি, তুমি ছবি আঁকো দেখ—

—হাত ছাড়ো কেশবদা কি ভাববে ছিঃ নতুন শাড়ি পরেছিল কল্যাণী। চোখে কাজল কপালে লাল টিপ। ভালবাসার কথা মুখে বলে নি তারা। বলার কোন প্রয়োজন ছিল না। দু'জনেই দুজনকে মনে মনে জানত, বুঝত।

ম্যাট্রিক পাশের পর কেশব শহরের কলেজে পড়তে এল সুবিনয়, বোর্ডিং-এ থাকত। মাঝে মাঝে চিঠি দিত কল্যাণীকে, সন্তুকে।

তারপর কলকাতায় ডাক্তারি পড়ার সময় আলাদাভাবে কল্যাণীর কাছে দীর্ঘ একখানি চিঠি দিয়েছিল সুবিনয়। মনের সমস্ত ইচ্ছের কথা, সমস্ত স্বপ্নের কথা লিখে অপেক্ষায় থাকতে অনুরোধ করেছিল কল্যাণীকে। সেই চিঠির কোন জবাব আসে নি। তখন দেশভাগ হয়ে গেছে। আত্মীয়-বান্ধব, পাড়া-প্রতিবেশী কারা যে কোন দিকে ছিটকে পড়ল, কোন হদিশ নেই। সেই চিঠিটা কি পেয়েছিল কল্যাণী?

জবাব দিল না কেন? হয়তো পেয়েছিল, হয়তো পায় নি। কিন্তু এতকাল পরে এসব কথা জিজ্ঞেস করেই বা লাভ কি?

সেই অ্যাপিটিচ্যুর বাক্সটা হারিয়ে যাবার মত দিনগুলি হারিয়ে গেছে। ভাবল সুবিনয়। ম্যাট্রিক পরীক্ষার হলে অ্যাপিটিচ্যুর বাক্সটা ফেলে এসেছিল। বাড়ি এসে যখন মনে পড়ল, তখন আর ফিরে পাবার কোন উপায় ছিল না। কোন উপায় নেই। দিনগুলি হারিয়ে গেছে, হারিয়ে যাচ্ছে। আমরা নিরুপায়। সেই কল্যাণীকে আর কোনদিন খুঁজে পাওয়া যাবে না, সুবিনয়কেও না। আজ হঠাৎ এই হাজার মানুষের ভীড়ে এমনভাবে দেখা না হলেই বোধহয় ভালো হত।

বেলঘরিয়া, আগরপাড়া, সোদপুর। একটার পর একটা ষ্টেশন আসছে, চলে যাচ্ছে। অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে। মানুষ, মানুষের ভীড়, ষ্টেশনের আলো, কেরীওয়ালা। আবার অন্ধকার। মাঠ, জলা-জঙ্গল, ছোট ছোট বসতি, মুদ্রক-ঘরের আলো। অন্ধকার আকাশে তারা।

কল্যাণী বলল—আমাদের ঠিকানাটা লিখে রাখবে, বিনয়দা—

সুবিনয় পকেট থেকে নোটবই বার করে দিল। কল্যাণী নিজেই লিখল। গাড়ির দুলুনির জন্য একটু থেমে থেমে নোটবইয়ের শেষ পাতায় পেন্সিল দিয়ে লিখল। নোটবইটা আবার পকেটে রাখল সুবিনয়। কল্যাণীকে কেমন খুশি-খুশি মনে হ'ল। হয়তো এই হঠাৎ দেখা হওয়ার জন্য মনে মনে খুশি হয়েছে কল্যাণী। কেমন তৃপ্ত চোখে তাকিয়ে, একটু হাসল। সুবিনয়ও হাসল।

কিন্তু মন থেকে খুব একটা সাড়া পেল না। এখন শুধু স্মৃতি, স্মৃতি। অকারণ জঞ্জাল খুঁড়ে স্মৃতির বেদনা। আরো কয়েকটি ষ্টেশন চলে গেল।

তারপর কাঁকিনাড়া, নৈহাটি, হালিসহর এবং অবশেষে কল্যাণীর ষ্টেশন এল।

প্লাটফর্মে নেমে জানালার পাশে এসে দাঁড়ালো কল্যাণী—আমাদের বাড়ি এলো বিনয়দা—

তারপর একটু থেমে, হয়তো ভুল সুবিনয়ের কেন জন্যায় সঙ্গে বললো—চিঠি দিও, কেমন।

জানালা দিয়ে হাসিমুখে হাত বাড়াল সুবিনয়, ইচ্ছে ছিল কল্যাণীর হাতখানি একটু ধরে, কিন্তু ততক্ষণে গাড়ি চলতে শুরু করেছে। বৈদ্যুতিক গাড়ির গতি সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে যায়। হাত নেড়ে শুধু বলতে পারলো সুবিনয়—সন্তুকে বলো, আমার কথা—

আবছা আলোর প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে কল্যাণী। দেখতে দেখতে চোখের আড়াল হয়ে গেল। সুবিনয়ের মনে পড়ল, নিজের ঠিকানাটা সে দেয় নি।

কল্যাণীও খেয়াল করে চেয়ে নেয় নি। নোটবইটা খুলে দেখল, শেষ পাতায় কল্যাণীর নাম-ঠিকানা। দীপালী যদি কখনো দেখে, হয়তো হাঙ্গামা করবে। কল্যাণীর নামটা শুনেছে দীপালী। তাদের ঘনিষ্ঠতার খবরও কিছু কিছু শুনতে পেয়েছে ভাইবোনদের কাছ থেকে। কি দরকার অশান্তি ডেকে, নোটবই-এর শেষ পাতাটা ছিঁড়ে ফেলতে-ফেলতে ভাবল সুবিনয়। দীপালীর খবরটা ইচ্ছে করেই বলা হয় নি। আলাপের প্রথম দিকেই বিয়ের খবর জিজ্ঞেস করেছিল কল্যাণী। সোজাসুজি কোন জবাব না দিয়ে কথার কৌশলে এড়িয়ে গেছে সুবিনয়। যে মন নিয়ে একদিন সে কল্যাণীকে অপেক্ষা করার জন্ত লিখেছিল, সেই মন হারিয়ে গেছে, সে নিজে কিন্তু অপেক্ষা করতে পারে নি। আবার যদি কখনো চলতি পথে এমনি হঠাৎ দেখা হয়, ভুলটা শুধরে নেবে, হয়তো কল্যাণীও ততদিনে নিজের ভুল বুঝতে পারবে।

কিছুই কারো জন্ত অপেক্ষা করে না, কেউ কারো জন্ত অপেক্ষায় থাকে না, থাকতে পারে না। নোটবই-এর শেষ পাতাটা দলা করে বাইরে ফেলে দিল সুবিনয়। একটার পর একটা আবছা আলোর ষ্টেশন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে।

অনিল ব্লাকের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।"
(ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :—
৩১২, পাঞ্জুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)
জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,
২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

জোয়ার

উপন্যাস
গল্পাকারে পঠ

বিজন কুমার ঘোষ

মৃণালের ক্যানিং।

অব চার্ণকের কলকাতা, সিরাজের মুর্শিদাবাদের মতই মৃণাল বিশ্বাসের ক্যানিং। মৃণালকে ছাড়া যেন ক্যানিং ভাবা যায় না; আলোকের কাছে মৃণালের ভিতর দিয়েই ক্যানিং-এর অস্তিত্ব। যেন ক্যানিং এর পথে ঘাটে, আকাশে বাতাসে মৃণালের সুবাস ছড়িয়ে আছে। আলোক অনুভব করতে চেষ্টা করল, কলেজ জীবনের বন্ধু-বান্ধবের মধ্যে মৃণালের নামটাই কেন আজো বেঁচে আছে? মৃণাল ছাড়া তো আরো অনেক উজ্জ্বল বন্ধু ছিল। তাদের অনেকেই জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত। রাস্তার পিচ আর বন্টরের টায়ার সহযোগে উৎপন্ন মসৃণতাকেও হার মানায়। বলতে গেলে তাদের ঘরজার পর্দা কাঁপিয়ে রোজ হাসনুহেনা থেকে ডালহৌসী ছোঁয়ারে যায়। তবু কেন ও এত জীবন্ত? এখন এই মুহূর্তে একটা কারণ-ই আলোকের মনে এল; তা হচ্ছে, বন্ধন। শত পাকে জড়ানো আলোক। আর মৃণাল স্বয়ং উদ্বাস্তা, উড়ে যাওয়া পাখির প্রতীক। আলোক চিরকাল সেই পাখির রহস্যময় পাখার শব্দ শুনে-এসেছে। তাই এর পরিচিতের জন্যেও একটা নাম্বই বার বার তেসে ওঠে। মৃণালের কর্মক্ষেত্র ক্যানিং। তাই স্বাভাবিক কারণেই ক্যানিং এর নামটাও।

এই ক্যানিং, মৃণাল আর সমুদ্রের গল্প শুনিয়েছিল আলোক একদিন। ইস্কুল, টিউশিনি আর সেলাই এর দোকানের মধ্যে হাঁফিয়ে উঠেছিল দিনগুলি। মুখচোরা, নিজের কথা স্পষ্ট ভাষায় বলতে না পারা মেয়েটার যেন কি হয়েছিল সেদিন। খুব সোপনে ক্লান্তির কথা জানিয়েছিল। যেন ক্যানিং-এ এসে দাঁড়ালেই বুক ভরে সমুদ্রের বাতাস নিতে পারবে। ক্লান্তি পরাজিত সৈনিকের মত পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। তাই এতদিন পর আলোক কথা রেখেছে। সুতরাং ক্যানিং-এ আসা সার্থক হল, কি ব্যর্থ হল, সেটাই বড় কথা নয়। কথা দিয়েছিল, বন্ধুর দেশে নিয়ে আসবে। সমুদ্রের হাওয়া গায়ের ওপর দিয়ে ঝ্যাপলা জালের মত উড়িয়ে দেবে। আলোক তার কথা রেখেছে, এই মাত্র। এখন মনস্কামনা পূর্ণ না হলেও কিছু যায় আসে না। হলে সেটা উপরি পাওনা।

জলের ওপরের চঞ্চলতা অনেক থিতিয়ে এসেছে। আলোক এখন আগের চেয়ে অনেক স্বাভাবিক। উত্তেজনার মাত্রাধানে বেশীক্ষণ বাস করা যায় না। স্বাভাবিক তাঁকে হতেই হয়। যেন ইচ্ছে অনিচ্ছে সব একাকার হয়ে গেছে ওর কাছে। সার্থকতার সঙ্গে ব্যর্থতার ফারাক খুব বেশী আর নেই যেন। আলোক অত্যন্ত খুশি খুশি ভঙ্গীতে সীট ছেড়ে দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। ট্রেনের গতিবেগ অনেক কমে এসেছে। ধানক্ষেতের সীমানা শেষ হচ্ছে। উঁচু লাল টালির বাড়ি। মাথার উপর ক্রুশ চিহ্ন। গীর্জা। গুদাম ঘরের গায়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন। আসিতেছে, আসিতেছে !! আগামী আকর্ষণ—ইত্যাদি। পুকুর, পুকুরের সবুজ রং। টেলিগ্রাফের তারে এবার-পাতিকাক। কোলাহল। ট্রেনের গতি আরো মন্দ। চিনেবাদাম ওয়ালা। জুতো পালিশ। লাল রঙের ঝুলি। প্ল্যাটফরমের বুড়ি ছুঁয়ে ফেলা।

অবশেষে ব-দ-ম-স—। অনেক পরিশ্রম হয়েছে। ঘোমার জিভ বের করে ইঞ্জিনটা হাঁফাচ্ছে। ক্যানিং এর মাটি ছোঁবার জন্যে জুতোর তলাগুলা আকুল। শেষ ঝাঁকুনি দিতেই অনেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল। মিনতি এখনো বসে আছে। কোলাহলের ভিন্নতা শুনে, কি সাইন বোর্ড পড়ে, বা ইঞ্জিনের অস্তিম হুইসল শুনে নিশ্চয়ই বুঝতে পারা উচিত এখানেই আমাদের নামতে হবে। শুধু যেন আলোকের ডাকের অপেক্ষায় বসে আছে। ওর ক্লান্তির চমকানো দেখে আলোকের মুগ্ধ মুহূর্তটি ছিঁড়ে গেল। তবে কি জোর করে ওষুধ গেলানোর প্রয়াস? কেন, একদিন কি মিনতি নিজে থেকেই আসতে চায়নি? সেদিন বুকের ওপর পড়ে কে বলেছিল, আমি ক্লান্ত? যেন গরল আলোকের একারই, যেন অনিচ্ছুক ঘোড়া দিয়ে চাষ করানো। আলোক মন্থর গতি ট্রেনের দরজায় যখন দাঁড়াল তখন বিস্ফারিত চোখ নিয়ে মিনতি পাশে দাঁড়াতে পারত না? কি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে প্রচুর হেলেদুলে কয়েই বা বাধা কোথায়? সকাল দেখেই বোঝা যাচ্ছে দিনটা কেমন যাবে। চন্দননগরের সঙ্গে ক্যানিং এর খুব বেশী অমিল হবে না। শুধু কেয়া ছিল কাছের মানুষ। চিনতে অসুবিধে হয়নি কখনো। কিন্তু মিনতিকে এতদিন যা ভেবেছিল, আসলে তা নয়। এখন সত্যিই মনে হচ্ছে একটা অবলা নারীকে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে। মুখে কথা নেই, চোখে বিস্ময়, কি শরীরে শিহরণ—কিছুই নেই? যেন আলোকের হুকুম তামিল করছে।

আলোক বাইরে এসে টাইম টেবিল দেখে নিল। কলকাতার ট্রেন তিনটে পঁচিশে। তাছাড়া খুব বাস সার্ভিস আছে গড়িয়া পর্যন্ত। সুতরাং কেয়ার ভাবনা নেই। শুধু ট্রেনেই কিরবে ঠিক করল।

—তোমার ভাল লাগছে না বোধ হয়।—জিজ্ঞাসা করল।

—কেন লাগবে না?—একটু হাসি।

—না লাগলে স্পষ্ট করে বল, এই ট্রেনেই কলকাতায় যাওয়া যায়—

—এসেছি যখন একটু বেড়িয়েই যাই। ফিরব তো বটেই।

—ঠিক আছে।

সন্দেহ করল, বেড়ানোটাই যেন ওর একমাত্র উদ্দেশ্য। বেড়িয়ে কলকাতায় যথাসময়ে ফিরতে পারলেই হল। যে বিশেষ কথাটি বলার জন্যে এত ঘুরে এসেছে, প্রকৃতির উদার পরিবেশে, সেই প্রসঙ্গটা ইচ্ছে করেই চেপে গেল। ঠিক আছে। গতকাল কেয়ার জন্যে চন্দননগর, গঙ্গা, পুরোনো দিনের বাগানের গন্ধ উবে গিয়েছিল। আজ কিছুতেই মিনতির জন্যে ক্যানিং ভ্রমণ বাতিল করতে পারে না। ক্যানিং এর পথে ঘাটে যদি ব্যর্থ প্রেমিকের পাঠ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তাহলে আর কেউ নয়, স্বয়ং মৃণালের আত্মাই কষ্ট পাবে। সুতরাং দুই চোখ ভরে ক্যানিং, ক্যানিং এর নদী, নদীর ওপারে সবুজ চর, বালি হাঁসের উড়ন্ত সারি দেখা যাক। হৃদয়কে অকারণে ভারাক্রান্ত করা ভাল নয়।

প্রথমেই মৃণালের খোঁজটা নেওয়া দরকার। ও থাকলে বেড়াতে সুবিধে হবে। নিশ্চয়ই খুব অবাক হয়ে যাবে পুরোনো বন্ধুকে দেখে। আলোকের খুব বেশী বন্ধু নেই। কেন তা কে জানে। ক্লান্তিরা সহ্য করতে পারে না। পালিশ দিয়ে কথাগুলিকে চকচকে করে তুলতে ভালবাসে না। কিন্তু অনেক সময় নিজে তাই করলেও অপরকে করতে দেখলে বিরক্ত লাগে। সন্ধী বলতে এতদিন দু'জন ছিল। মনে মনে ছক কেটে নিয়েছিল। ক্লান্তির সন্ধী কেয়া, স্নিগ্ধতার সন্ধী মিনতি। সুপ্রিয়র বিয়েতে আলাপ হয়েছিল; এখন কোথায় বা সুপ্রিয়। মৃণাল কি করে যেন টিকে রয়েছে। হয়ত সেই রহস্যময় পাখার শব্দে এই নামে লুকিয়ে আছে, এক আলোকই তা শুনতে পায়।

ক্যানিং কে শহর বলবে, না গ্রাম বলবে, না গঞ্জ বলবে—

ভেবেই পেল না। শহর, গ্রাম, গঞ্জ মিলিয়ে হালদারকর মত কিছু বলাই ঠিক। তবে এটা নিশ্চিত, গ্রামের হাতে শহর যেন নাজেহাল হয়েছে। যতই সিনেমা হল থাকুক, দোকান পশার চলুক, রিকশাওয়ালারা যাত্রী ছেঁকে ধরুক, তবু গ্রাম অজেয়। তবে আর কতদিন শহর আলেকজাণ্ডারের দিকে তাকিয়ে পুরুর মত গ্রাম তার স্বাধীকার বজায় রাখবে সেটাই ভাববার কথা,। আলোক খুশি হল। এখানে এসেও যেন কেয়াকেই দেখতে পাচ্ছে। কেয়া থাকলে বলত, দেখ দেখ, তোমার গ্রামের কি অবস্থা! কলকাতা থেকে এত দূরেও পিষে মারছে। তোমাদের গ্রাম এবার সুন্দরবনে গিয়ে আশ্রয় নেবে।

কেয়ার কথা কানে ভাসছে। শহরেই থাকুক আর গ্রামেই থাক, কেয়ার একটা উপভোগ করবার মেজাজ আছে। অপরকে ভালিয়ে নিয়ে যাবারও ক্ষমতা আছে। কিন্তু যারা নিজেরা উপভোগ করে না, অপরকে ভালায় না তারা কি চীজ!

ছোট অপরিসর রাস্তা। মাঝে মাঝে ইটের হাড়গোর বেরিয়ে পড়েছে। ছোট ছোট দোকান দুই পাশে। মুদিখানা, বাসনপাতির দোকান। রঙিন কিতে, কাচের চুরি, বৌ ভোলানো আলতা, রূপোর মল। এর পাশেই উৎকট তেলের গন্ধ। ফুলুরি, আলুর চপ, বেগুনী ভাজছে। কিনবে নাকি কয়েক আনার? নদীর পারে বসে খাওয়া যাবে।

—ও গো মেয়ে, পেঁয়াজের বড়া গরম হবে?

—হবে বাবা। ক' আনার?—খাননীয় খদ্দের দেখে বুড়ি গলে যায়।

এদিকে তেলের ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। বেশীর ভাগই বালক শ্রেণীর। বয়স্করাও কম কৌতূহলী নয়। সাধারণত কলকাতার ট্রেন ক্যানিং স্টেশনে পৌঁছুলে দুধ ডিম মাছ ওরকারির ব্যাপারীরা নামে। চাকরীজীবী খুবই কম। কিছু স্টেশনের, কিছু স্কুল কলেজের বাবু। সুতরাং সাত সকালে কলকাতা থেকে 'ভদ্দরলোক' এসেছেন, সঙ্গে মেয়েছেলে; মাথায় সিঁদুর নেইকো। অতএব অভাবনীয় ঘটনা; আলোকের মজাই লাগছে। এর মধ্যে একটা যেন গেঁয়ো গেঁয়ো গন্ধ পাচ্ছে। কিন্তু বিরক্তিতে মিনতির স্বর কর্কশ হয়ে উঠল, কি করছেন? গুচ্ছের তেলেভাজা কিনছেন কেন?

—খুব ভাল জিনিস এগুলো।—আলোক নির্লিপ্ত।

খদ্দের ভালিয়ে নেয় দেখে বুড়ি ঠোঙাটা রেখেই গুণাগুণ বর্ণনা করতে সুরু করে দিল। খুব ভাল জিনিস বা, বাবু ঠিকই ধরেছে। দেখো বা, একটু পরে ওপার থেকে মানুষারারা আসবে। এটা ফুলুরিও পাওয়া যাবে না—হু, আমার নাম—

কিন্তু বুড়ির এরকম বর্ণনা মাঠে মারা গেল। ঝাঁঝিয়ে উঠল, বাজে তেলের গন্ধ, এখন কলেরার টাইম—

বলা গেল আলোক।

—তুমি খেও না—

বুড়ি পেঁয়াজী ভাজতে ভাজতে আবার বাঁকা চোখে তাকাল। আজ্ঞা আলাভন!

—হ্যাগা বা, এত লোক হীরু পিসির তেলেভাজা খাচ্ছে, কারও কলেরা হচ্ছে না, আর হবে গিয়ে পিরতিমের মার আর কাত্তিকের মত ধামাধারীর!

অকাট্য যুক্তি। মিনতি চুপ। সামনের টুলটার ওপর বসে পড়ল আলোক। একটা গরম আলুর চপ তুলে মুখে দিল, আঃ, চমৎকার। খাবে নাকি একটা?

—আপনি খান।—গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

আলোকের কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। আলুর চপ, বেগুনীর রস গ্রহণে অধিক ব্যস্ত দেখা গেল। মিনতির মনে পড়ল বাড়িতে আরতি সাত তাড়াতাড়ি ভাল মোচার ঘন্ট অমলেট করে দিয়েছিল। কিন্তু সৌমিনবাবুর তাতে রুচল না। খিদে নেই বলে পালিয়ে এল। আর এখানে নোংরা

অবশ্য জায়গায় বসে চোখ উল্টে তেলেভাজা খাচ্ছে, যেন অমৃত।

—হ্যাঁ গা, হীরু পিসি—

—আর ছুটি দেব বাবা?

—তা দাও। বেগুনীটা বড্ড ভাল—

হীরু পিসি এবার সোনার পিরিতির দিকে ফিরেও তাকাচ্ছে না। হু, যে হীরু পিসির তেলেভাজার নিন্দে করে হীরু পিসি তার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। পিসির বড় এক বোখা গোঁ। কথা শুনিয়ে দিতে পারত খানকতা দিয়ে। নেহাৎ বাবু অতি সৎচরিত্তির মানুষ তাই রক্ষে।

খাওয়া শেষ হয়ে গেছে। পাতা দিয়ে বেশ করে মুখটা পুছে ফেলে দিল।

—হ্যাঁগা পিসি?

—কি বলছ বাবা?—আধবুড়ো পিসির চোখটা খুজে আসে। দেখে যা হতভাগারা, কলকাতার কত বড়লোক মানুষ পিসির দোকানের তেলেভাজা খেয়ে মুখে রা নেই। নচ্ছার ব্যাটারা খালি কলেরার ভয় দেখায়। তেলের মধ্যে গন্ধ পায়। অমন নাক পুড়িয়ে কেল গে না—

—বুঝলে বিশ্বাসকে চেন পিসি?

—নামটা কি বললে বাবা?

—বুঝলে বিশ্বাস। ক্যানিং-এ বাড়ি।—আলোক প্রাঞ্জল করে।

—বুঝতে পারলাম না বাবা। কত খদ্দের আসে যায়, সব নাম কি আমি চিনি—

—শুকের সারেং।

—ও—বুড়ি এবার হদিশ পায়: তাহলে তুমি বাবা সক্ষ কোম্পানির আপিসে জিগেস কর। ওরা বলতে পারবে।

আলোক উঠল।

সামনেই চোখে পড়ল কাচের চুড়ির দোকান। সূর্যের আলো পড়ে ঝিকমিক্ করছে একসঙ্গে। নানান বাহারের রং। দোকানদার এতক্ষণ উসখুস করছিল। চোখাচোখি হতেই হেসে ফেলল যেন বহুদিনের পরিচিত, আসুন বা আসুন, কি চুড়ি চাই? হাল ফ্যাসানের সব মাল আছে—

আলোকের চোখ চিকচিক করে উঠল। ফিসফিস করে বলল, কিনবে নাকি?

—না না—

—খুব ভাল জিনিস। তোমাকে মানাবে।

—একটুও মানাবে না। ও সব কেউ পরে আজকাল?

—পরলেই বা—

—আর কারো জন্যে কিনবার মন থাকলে কিনুন।—সাফ জবাব।

এবারও দোকানদারের জন্যে দুঃখ হল। বেচারা তখনো চেঁচাচ্ছিল—নানান ডিজাইনের কাচের চুড়ি আছে মা, পরলে মা দুর্গার মত দেখাবে, হাল ফ্যাসানের মা চান—

আলোকের ইচ্ছে হল দোকানসুদ্ধ জিনিসপত্র কিনে ওর সামনে ফুটবলের মত লট করে। বড় অহঙ্কার, কেউ পরে না। পূর্ণিমাদিদির কথা মনে পড়ল। স্নানযাত্রার মেলায় দিদি নিজে দোকানে যেত। সঙ্গে অবশ্য বয়কল্যাণ থাকত। কত রকমের যে কাচের চুড়ি কিনে আনত! লক্ষ্য করেছে, সবুজ রংটার ওপরেই দিদির ঝোঁক ছিল বেশী। ফরসা হাতে সবুজ চুড়ির ছায়া পড়ে কি রকম যেন মায়াময় করে তুলত জায়গাটা। একবার দিদির সঙ্গে মারামারি করতে গিয়ে চুড়িতে হাত কেটে রক্তারক্তি। বেয়ারও এই ব্যাপারে সখ ছিল। ওর সঙ্গে কোন এগজিবিশনে গেলে হঠাৎ চুড়ির দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ত। ওরা শহুরে, তাই সব সময় শহুরেয়ানা প্রকট করে তুলতে ভালবাসে না। আর মিনতির মত মেয়েরা, যারা প্রকৃতই গেঁয়ো, তাদেরই ভয় এই বুঝি সবার সামনে ধরা পড়ে যায়। ওরা মনে করে বাইরের চাল চলনটাই বুঝি আসল। কাচের চুড়ি পরলে

পাছে ধরা পড়ে যায় তাই আলোকের সামনে নাক সিঁটকোনো। যেন আলোক কিছু বুঝতে পারে না। এদের চাইতে কেয়ার মত মেয়েরা শতগুণে ভাল। এদের সহরেয়ানায় কোন বিকার নেই। কিন্তু মিনতির মত মেয়েদের অবস্থাই সব চাইতে করুণ: কখনো কখনো হাস্যকর। বাড়িতে মা ছাড়া দ্বিতীয় কোন মেয়ে নেই। কেয়াও নেই; নাহলে সত্যি সত্যি ওদের জন্যে চুড়ি কিনে সখ মেটাত বই কি।

নিচু থেকে বাঁধের রাস্তায় উঠতেই নদী দেখতে পেল। সুন্দর কাকের চোখের মত। ইতস্তত ছেলে নৌকো কতগুলি। একটা নৌকোকে উল্টো করে আলকাতরা মাখানো হচ্ছে। পার থেকে কাঠের সাঁকো নদীর মধ্যে অনেকখানি পর্যন্ত চলে গেছে। বোধ হয় জেটির ঘাট। কেননা, একটা লঞ্চ বাঁধা আছে। আরেকটা লঞ্চ দক্ষিণ থেকে তীর বেগে আসছে। বেশ বড় লঞ্চ। ডেকের ওপর গুটিগুটি মানুষ দেখা যাচ্ছে। হয়ত মৃণালই ওটার সারেং। দেখা হলে কি মজাই হবে। হয়ত তক্ষুণি ওই লঞ্চটার মুখ ঘুরিয়ে সোজা সুন্দরবনে নিয়ে যাবে। তারপর অনেক রকম গাছ চিনিয়ে দেবে, লতাপাতা—। জিজ্ঞাসা করবে, এটা কি পাখি বল তো? এই বনে বাঘ থাকে। ছায়ায় ছায়ায় থাকে কালনাগিনী, শঙ্খচূড়। গা' ছমছম করবে। আর জোরে হো হো করে হেসে উঠবে বন্ধু। বলবে, তোমার তুমি শহরে বাস করতে করতে একেবারে সহরে হয়ে গেছ। আগে তো দুরু দুরু করে খুন হতে। সত্যি ভারী লজ্জা পাবে তখন। মিনতিকে দেখিয়ে বলবে, কি করব ভাই, পরের মেয়ে এনেছি। না হলে তোমার সঙ্গেই থেকে যেতাম।

একজনকে লঞ্চ কোম্পানির অফিসঘর জিজ্ঞাসা করল। রাস্তায় মিনতিকে দাঁড়াতে বলে আলোক ভিতরে ঢুকে গেল। ঘরের মধ্যে এতক্ষণ বোধহয় ঘুষঘুষ চলছিল। আলোককে দেখে থেমে গেল সব। একজন উঠে চেয়ার ছেড়ে দিল। একটি টেবিল, খান কয়েক চেয়ার ও বেঞ্চি। খাতাপত্তর। বিল বই। ক্যালেণ্ডারের পাতাগুলি উড়ে গেছে। কেবল সুন্দরী বহিমার স্নানের ছবিটি রয়ে গেছে। এসব জায়গায়, অর্থাৎ না গ্রাম না সহর অঞ্চলে এখনো ক্যালেণ্ডারে স্নানের দৃশ্য আর টিনের বাক্সে গোপাপ ফুল আঁকা ছবি দেখা যায়। আলোকের সামনে একটি অল্পবয়েসী ছোকরা বসে: ভাড়া নিয়ে বোধহয় গণ্ডগোল চলছিল। ফলে যথেষ্ট উত্তেজিত। লোকগুলিকে ইসারায় বেরিয়ে যেতে বলে আলোককে জিজ্ঞাসা করল, কি চাই আপনার?

আলোক বলল, আমার এক বন্ধুর খোঁজে এখানে এসেছিলাম—

—নাম কি বলুন তো?

—মৃণাল, মৃণাল বিশ্বাস।

—ও, হাঁ হাঁ, আপনি মৃণালদার বন্ধু। কলকাতায় থাকেন তো? আচ্ছা আপনার কথা অনেক শুনেছি—ছেলেটির চোখে মুখে আলো, একটু পরে আলো নিভে গেল: কিন্তু এখন তো ওঁকে পাবেন না—

—বাড়িতে গেলে?

—বাড়িতেও না। আজ খুব ভোরে লঞ্চ নিয়ে বেরিয়ে গেল হাসনাবাদের ওদিকে। কাল বিকেলে আসবে।

—তা বলে তো মুশকিল।—আলোক চিন্তিত হল।

—এক কাজ করুন—ছেলেটি খুব উৎসাহী হয়ে উঠেছে: আপনি থেকেই যান—

—সঙ্গে মেয়েছেলে আছে যে!

ছেলেটি মোটে ঘাবড়াবার পাত্র নয়।

—দেখেছ কাণ্ড? কোথায় তিনি?

—রাস্তায়। আরে না না, ব্যস্ত হবার কিছু নেই।—আলোক হাসল কাণ্ড দেখে।

একটু পরেই প্রায় পাঁজা কোলা করে ঘরে নিয়ে এল মিনতিকে। ইতিপূর্বে কে পা তুলে বসেছিল, সেইজন্যে নিজেই রুমাল বের করে মুছে দিল চেয়ারটা। কিন্তু ছেলেটির

সরলতা দেখে একটুও খুশির আভাস দেখা গেল না ওর মুখে। হাসলে পাছে সকল সহরেখাগুলি বেরিয়ে পড়ে! সত্যি, না আসলেই ভাল ছিল। থেকেই যেত রাতটা যেখানে হোক।

ছেলেটির বক্তৃতা ততক্ষণে শুরু হয়ে গেছে।

—মৃণালদাকে আমি ঠিক দাদার মত দেখি। আমি তার পাশের ঘরেই থাকি। এই দেখুন দাদার ঘরের চাবি। আমাকে দারুণ বিশ্বাস করেন—

—কোথায় বাড়ি মৃণালের?

—এক নম্বর দীঘির পার।

—বড় দীঘি আছে বুঝি সেখানে?—আলোক কৌতূহলী হয়ে উঠল। এতকাল দিব্যে দীঘির উপমা দিয়েই কাটিয়ে দিল।

—না না, দীঘি নেই। বর্ষাকালে জল হলে অবিশ্যি দীঘির মত দেখায়। চলুন আপনাদের ঘর দেখিয়ে দিচ্ছি, কাছেই—

—আরে, আমরা থাকব না। এমনিই বলছিলাম—

—আপনাদের কিছু অসুবিধে হবে না স্যার, বিছানাপত্র সব আছে। আপনারা চলে গেছেন শুনলে মৃণালদা রাগ করবে—

—আপনি বুঝি এই সব কোম্পানিতেই কাজ করেন?

ছেলেটি জিভ কাটল।

—আমাকে আপনি বলবেন না। হ্যাঁ, এই কোম্পানিতেই। তা মৃণাল কতদিন আছে—

—কেন মৃণালদা কি থাকতে চায় না?

—সত্যি বলব?—ছেলেটি সভয়ে এদিক ওদিক তাকাল: ওনার মাথায় একটু পোকা আছে। মাইরী বলছি, কিছু মনে করবেন না। রাতদিনই হুমকি দিচ্ছেন চাকরী ছেড়ে দেবেন। বলুন দেখি কি করি ওনাকে নিয়ে?

তার চিন্তিত কপালের রেখা দেখে হেসে ফেলল আলোক।

—কেন চাকরী ছেড়ে কোথায় যেতে চায়?

—তা কি জানি! চাকরী ওনার ধাতে নেই। কেবল ঘুরে ঘুরে বেড়াতে চান।

—যা কোথায়?

—তিনি—বলতে গিয়ে একটু বাধা পেল: তিনি যারা গেছেন অনেক দিন। সেই থেকে পিছটান একদম নেই। বলুন, আমি কি বলতে পারি বিয়ের কথা? আপনি যদি—

আলোক বিয়ের কথা ভাবছিল না। কিন্তু মা যারা গেলে কি কারো পিছটান থাকে না? কেউ কি চাকরী ছেড়ে দিয়ে বেরিয়ে পড়তে চায়? হয়ত এক একটা মানুষের ধাতই আলাদা থাকে। মনে পড়ল থান কাপড় পরা শুচিবাইগ্রস্তা বিধবা মহিলাকে। অমন তিলের নাড়ু আলোক কোথাও খায়নি। দাঁত ভেঙে যাবার মত অবস্থা হত। দুঃখ হল। সেই সব পরিচিত মানুষরা কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে।

আলোক নিজে চাকরী ছেড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়াবার সাধ কল্পনা করতে পারে। কিন্তু সত্যি সত্যি চাকরী ছাড়তে পারে কি? সেদিন তর্ক করেছিল; কিন্তু সত্যিই নদীর পারে মাথার টোকা লাগল কাঁধে গরুর লেজ মুচড়ে হৈ-হৈ করে উঠতে পারে কি? তবে হ্যাঁ, চোখে সানগ্লাস, মাথায় হাট, ট্র্যাক্টর নিয়ে মাইলের পর মাইল জমি চাষ করছে—এ দৃশ্য দিব্যি কল্পনা করা যায়। সবই পরিবর্তিত হয়ে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। আলোক যদি এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে না চলতে পারে তাহলে ও পিছনের মানুষ হয়ে যাবে। সবাই এগিয়ে যাবে তখন। ভাল লাগা এক জিনিস, আর কালের স্রোত রোধ করা অন্য। রায়বাড়ির কর্তামশায়রা বেঁচে থাকলেও এই পরিবর্তিত ধারার সঙ্গে সঙ্গতি খুঁজে নিতেন। কেন না, পশ্চাদপদ মানুষেরা করুণা ছাড়া আর কি আশা করতে পারে? কর্তামশায়রা করুণ মুড়োবার মানুষ ছিলেন না। আলোকও কি এই বংশের বিগত ধারা নয়? মৃণাল চাকরী ছাড়তে চায়। চাকরী ছেড়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াতে চায়। মৃণালের মা নেই। পিছটান

নেই। আলোক নিজেকে কি ওর সঙ্গে মেলাতে পারে? আলোকের যা আছে। বাড়ি আছে। আছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। একজনকে আর একজনের ভাল লাগতে পারে। তার কারণ নিজের অপূর্ণতা অন্যের ভিতর দেখতে পায় বলে। একজন আর একজনের সঙ্গে কিছুতে মিলতে পারে না। এখন জোর করে মেলাতে গেলে মূর্খামির পরিচয় দেওয়া হয় না কি? মৃণালের জামা মৃণালের গায়েই মানায়, আলোকের গায়ে সম্পূর্ণ বেমানান। তবু কৌতূহল জাগে সুন্দরবন ছেড়ে আবার কোন বনে গিয়ে বাসা বাঁধবে। যাযাবর পাখিদের মত এবার কোন্ সুদূর থেকে চিঠি লিখবে, অচেনা বন্ধুকে ভুলে গেলে? ছেলেটি খুবই অনুগত বোঝা গেল। তবে ও যা চরিত্রের, তাতে অনুরাগীর শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে বিশেষ দেরী হয় না। কিন্তু অনুরাগ দীর্ঘস্থায়ী করতে গেলেই আশাভঙ্গ হবার সম্ভাবনা।

উঠে দাঁড়াল আলোক। জানালা দিয়ে একবার নদীর দিকে চাইল। নদীর জল ঘরের খুব নিচে এসে ছলাৎ ছলাৎ করে ডাকছিল। জোয়ার এখন। জিজ্ঞাসা করল, আচ্ছা, কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কোন রকম—

ছেলেটি জিভে কামড় দিল।

—সে কথা বললে চলবে না স্যার। কর্তৃপক্ষ ওনার কাছে হাত জোড় করে থাকেন। কাজকর্ম ভাল জানেন যে দাদা। বড় তুফানের মধ্যে অন্য নায়েরা ঘরে শিকল এঁটে শুয়ে থাকে, কিন্তু দাদা ঠিক বেরিয়ে যাবেন। দাদার বাইনেই সব চাইতে বেশী।

—তাহলে?

—ওই যে বললাম, মাথায় পোকা আছে।

ছেলেটি খিস্তির হাসি হাসল। আলোক আর কথা বাড়াল না। যাক্ গে, দেখা না হয়ে ভালই হয়েছে। পরে এক সময় একদা আসবে। তবে এসেছে যখন একটু বেড়িয়ে যাওয়া ভাল। জিজ্ঞাসা করল, ধারে কাছে কোথায় বেড়াতে যাওয়া যায় বল তো?

—বাগন্তি। খুব ভাল জায়গা। লঞ্চ ছাড়বে—দাঁড়ান বলছি—

—ফিরে এসে কলকাতার ট্রেন ধরতে পারব তো, তিনটে পঁচিশের?

—সে কি। আজকেই ফিরতে চান নাকি?

—হ্যাঁ ভাই, আজকেই ফিরতে চাই। তুমি দাদাকে বোলো আমি আরেকবার আসব। কিন্তু এবার নয়।

—তাহলে এক কাজ করুন—ছেলেটি পেন্সিল দিয়ে কপালে ঠোকা মারতে লাগল: বরং কুঁড়েখালি যান—

—তিনটে পঁচিশের ট্রেন ধরতে পারব তো?—আলোক উৎসাহিত হল।

—নিশ্চয়। তার আগেই পৌঁছে দেবে। কুঁড়েখালি চমৎকার জায়গা। আপনার ভাল লাগবে—

আলোক গুণগুণ করল মনে মনে। কুঁড়েখালি চমৎকার জায়গা। ভাল লাগবে।

—লঞ্চ কটায় ভাই?

—বারোটায়। কিন্তু লঞ্চের ঘাটটা একটু আগে। পোলকুমির সামনে।

—আচ্ছা ভাই চলি—

মিনতিকে নিয়ে রাস্তায় চলে এল।

(ক্রমশঃ)

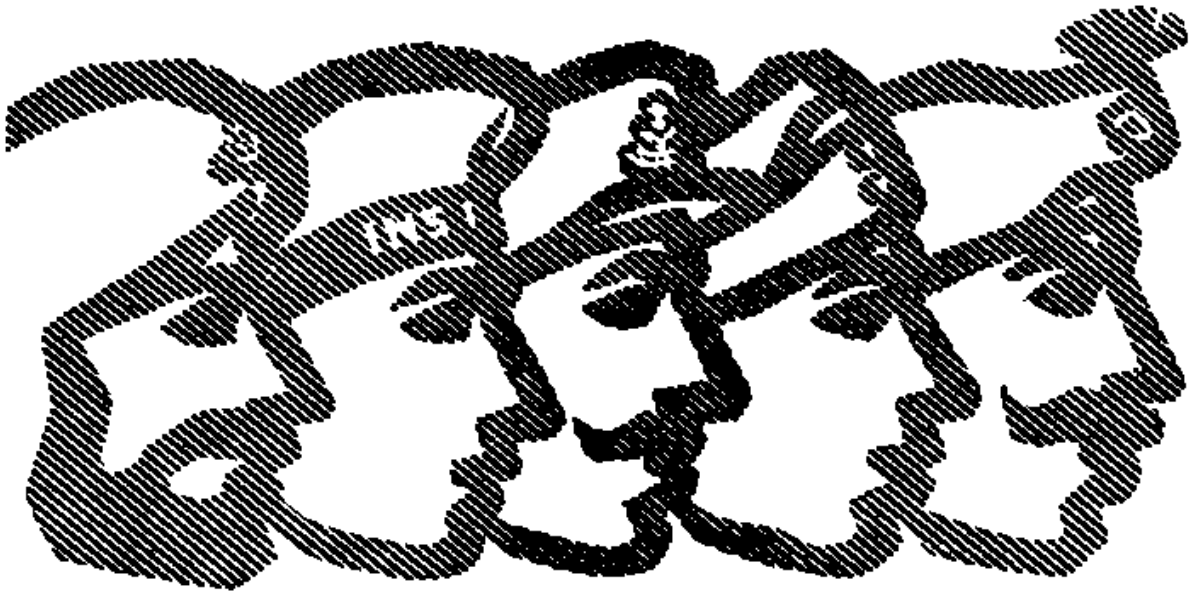

আমরা আমাদের জোয়ানদের জন্য একান্তভাবে গর্বিত। তারা আমাদের স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করেছে। তারা শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করেছে। এই কাজে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছে, আর আহত হয়েছে আরো বেশী। আমাদের জোয়ানরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে। আসুন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে আমরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করি।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

DA 65/F6 Bengali

ধ লে শ্ব রী

প্র বো ধ ব ন্ধু অ ধি কা রী

আট

চাপা অসন্তোষ গুমরে মরছিল তাদের বাস্তিপাড়ায়। বিচার চাই, পেত্তিবিধান চাই; সোটা পাড়ার বেবাক মানুষের কপালে মেখে এসেছে ভয়ঙ্কর পাপ, দেবতার প্রচণ্ড রোষ। গাঙ জননী ক্ষেপে উঠেছে অচেনকা। বেজন্তির তেজ নিয়ে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছে গাঁও দেউলীর বাস্তিপাড়ার ওপর। শূন্যে, স্বর্গের আসনে বসা ঠাকুর ভগবান পোঁসার কালা-করা মুখখান ফিরিয়ে নিয়েছে; নিদান নাই, নিস্তার নাইক্যা।

চাপা অসন্তোষ পুঞ্জীভূত হচ্ছিল অনেকদিন থেকেই। গোপন শলা বারবার বসেছে পাড়ার এখানে ওখানে। তীব্র উত্তেজনাকে পাথর চাপা দিয়ে বেবাক জোয়ানের দল একই কথা বলছিল; মাতব্বরের ঘরে শনি লাগছে। পয়লা নজরে পড়েছিল ক্ষেত্র কৈবিত্তির। বাপ ছাওয়ালে নাও বায়। বরফুন্দী কিরায়ার কালে সওয়ারী পেয়েছিল জামুরকির। গোটা রাত তারা নাও বেয়েছে, পরদিন পৌঁছেছিল পোদ্দার বাড়ির ঘাটে। বেলা দুই কর ছুঁই ছুঁই করে। কিরায়াগণ্ডা বুঝে নিয়ে বাজারে এসে নাও ভিড়াল বাপ ছাওয়ালে। গোটা রাত্তিরে দানা পড়েনি পেটে, সকালে তেলিগুড় দিয়ে মুঠ কয়েক চিড়া চিবিয়েছিল। এখন পাক চলবার পাঠাতন খুলে ভাত বসিয়েছে ক্ষেত্র। বলাই বাজার থেকে তাজা কাউইত্যা মাছ এনেছিল। তারই ব্যঞ্জন দিয়ে খাওয়াখান হইল জব্বর গোছের। ভরাপেটে নেশায় ধরেছিল, ক্ষেত্রর ইচ্ছা আছেল মতন একটু গড়িয়ে নেয়। আউইত্যা ভাতের মৌজে ঘুমখান হইতে মানাচ্ছি মতন। কিন্তু শোবার আগে বাপ সেধে বসল বলাই। 'সাঝের আগে যাইবার পারলে পাদিন্দর ধরন যাইব জাহাজের।' লগির বান্ধন খুলতে খুলতে কথা বলছিল বলাই, 'ই-বারের মরশুমখান বড় জব্বর জইমা আইছে বাবা। টাহা জমাইয়া একখান পানসী করনের মন লয় আমার।'

'কইরো···' হুঙ্কার শেষ কটা মুখটাম বেয়ে কড়ি নামিয়ে রাখল ক্ষেত্র। নলচের বাঁধা আংঠা অন্দর হাতের বাতাস ও'ঁজেছে। 'পানসী একখান কইরবার পারলে লাচাই কামের কাম হইব'। ক্ষেত্র উঠে দাঁড়াল, নেশার আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলল, 'কিন্তুক ওর বাপের ইচ্ছাখান

'ইচ্ছা'···, আপনাও ছেড়ে কাদি বরাবর পোদ্দনের দিকে যাচ্ছিল বলাই। যদিও কথাখান সে জানে, তবু বাপের মুখ থেকে আবার তা শুনতে চাইছিল। শুধু কথাই নয়, বলাই জানতে চায়, এ-ব্যাপারে তার বাপের মতখান কী। 'যায় আবার কয় কি?'

'ওর বিয়্যার কথা কইবার নইচে।' গাঙ্গি পেতেছে ক্ষেত্র,

এখন বাদামের কলিকল বাঁধছিল, 'তর ধারের ইচ্ছা সামনের আষনেই···'

'যার কথা খুইয়া ভাও তুমি।' ততক্ষণে হালের বাঁট চেপে ধরেছে বলাই, না দেখার ভান করে বাপে মুখের ভাবখান দেখে নিচ্ছিল। 'আগে একখান পানসী করনই লাগব। চন্দ্রপুড়ার পুলায় গেল সালে চৌদ্দ কুড়ি ট্যাহা লাকা কয়চে। কয়, ই সালে নাকি মধু গোঁসাইয়ের মাইজ্যা বজরাখান কিনব···।'

'মরব, মরনে ধরচে অলখইয়ারে।' আড় বাপাসের পালালা তুলল ফের। 'চন্দ্র কাহার ভাগ্যক হইচিল, ঠাহুরের খল্লিতে সব চইলা গেল গা···। মাইয়া আপনাই করল, পুলায় বিভায় পন দিচিল দশ কুড়ি ট্যাহা। কিন্তুক ভগমানখান আচে না? যাইব কুথায়? যে নাও লইয়া মরব, সেই নাওয়েই তারে লইয়া গেল। পুড়াবাড়ির খাওরে ছুইব্যা মরল না হি বছরে?'

আসল কথা অন্য পথে মোড় নিচ্ছে। বলাই চায় নি, এমনটি হোক। সে শুধু জানতে চেয়েছিল বাপের মতখান। কিন্তু কথায় কথায় প্রসঙ্গটা আরেক পথে পা বাড়িয়েছে; সুতরাং চুপ করে গেল বলাই। সুযোগ মতন আবার কথাখান তাকে পাড়তে হবে।

যমুনার মুখখান বারবার উঁকি মারছিল বলাইয়ের মনে। ছিপাস কৈবিত্তির রাঙা মাইয়া যমুনা। সহসা চোখ দুটো তাজা পুটির চুচার তুল্য ঝকঝক করে উঠল, অদ্ভুত মদির এক স্বপ্ন। বলাই কথা দিয়েছে যমুনাকে, কৈবিত্তির অবান। আর সেই আশাতেই বসে আছ অক্তে সেনা-জাপানিয়া সেই আশ্চার্য নামের সৌদর মূর্তিখান। ভীরু খোয়াবের মতন একটু আবেশ মন আচ্ছন্ন করেছিল। আর অমনি স্মৃতির পটে ভেসে উঠল ছিপাসপরের সুখের খেলার একখান ছবি।

জাতিরাইলের নিতাই বংশীর বাড়ি গিয়েছিল বলাই। পাঁচের দিন। নয়া জলের বান ডেকেছে তার হপ্তা তিনেক আগে। আর এরই মধ্যে কানায় কানায় ভার গেছে বিল বাওর। কুল ছাপিয়ে জলের ঝাপা সোঁত ধওয়া করেছিল ক্ষেত খামারের দিকে। এখন দিনে, কথা মতন দেখা করার পালা। বাড়িতে মায়ের অসুখ, বাপের মনও তারতার সুতরাং সুযোগ বুঝে ফিরারা ক'াকি দিয়ে রওনা ধরেছিল বলাই। দুইকর পড়লে এসেছিল নিতাইয়ের বাড়ি। বিকাল পড়লে ভুগা বারল সে নিতাইকে। বাড়ি ফেরার নাম করে, ফুলচান্দ গোসাইয়ের একখান্নাই কোষনাওখান ভাসিয়েছিল এলংজানিতে। দুরত্ব সামান্য। মাত্র কয়েকটা পলকের মধ্যে স্রোতের তীব্রটান আর বৈঠার বাওনে এসে পৌঁছিল গুলাম বাড়ীর চত্বরে। ভাজা পলাশের তুল্য সূর্যখান ততক্ষণে ঘুর এলাংজানির বাঁক ছাড়িয়ে নেমে এসেছে জলের প্রান্তে।

সামান্য পথ। জোর কাইকে গেলে একদম, নয় তো দুই দমের ধাক্কায় এসে পৌঁছানো যায়। পাদ্দিবেতের ঘন ক্ষেতির আড়ার এপাশ ওপাশে, তা ছাড়িয়ে গোঁসাই বাড়ীর আধবাসান; তারপরই সেই লক্ষ্যস্থল। বলাই জানে, ছিপাস বাড়ি ফিরারা ক'াকিবাজ নয়। শায়ের তুল্য মান ছিপাসের, পরপারে বড় চিনে। অতএব এই সুযোগ। দ্রুত কাইকে চলা মানুষটা ঠিক কাঁঠাল তলায় এসে দাঁড়াল একবার। তাকাল এদিক ওদিক। তারপর মনে ভরসা নিয়ে ধীর পায়ে এগিয়ে এল। গলা খাঁকারী দিচ্ছিল ঘনঘন।

বলাই জানে, ছিপাস বাড়ি ওরে না থাকলেও বাড়িখান তার শূন্য নাই। শকুনের তুল্য চোখ মেলে সজাগ পাহারায় ওখানে বসে থাকবে আর একটা মনিষ্যি; যমুনার আলা মা —চোরা পায়ের শব্দখানও তার জানানের ক'াক দিয়ে গলবে না। যেন বাতাসে মানুষটা গন্ধ পায় মাইনষের। আর সঙ্গে সঙ্গে কুতুর কুতুর চইখ্যে ওদিক এদিক তাকাবে ঘুড়ি। হাঁক ছাড়বে, কারা রে, ক্যারা?

খুব ভয়ে ভয়ে ছিল বলাই, খেজুর গাছখান যখন

পেরিয়েছে তখনও সাড়া পায়নি বুড়ির। তা হ'লে কি ঘুমি নেই? বলাই জোর গলায় আরও বার দুয়েক গলা খাঁকারি দিল। কিন্তু বুথাই।...'কারা রে, পথে যায় কারা?' সেই পরিচিত খেকানির গলার স্বর সে শুনতে পেল না তবু। মনে ভরসা নিয়ে আরও দুই কাইক এগিয়ে এসে ভড়কে গেল। না, কাউকেই দেখা যাচ্ছে না। কানচির বেড়ার ফাঁক গলা পথে অন্দরের অল্প অংশ চোখে পড়ে সেখানটা একেবারে শূন্য। তবে কি গোটা বাড়ীটাই খালি? কেউ নাই নাকি বাড়ীতে? বলাইয়ের বুকের রক্ত ধড়াস ধড়াস আছাড় খায়। তা হ'লে কি ময়নাও ··

আর তর সইল না ছোট পলটুকু পলকের মধ্যে পেরিয়ে এসে বেড়া দেওয়া উঠানের প্রান্ত ঘেঁসে দাঁড়াল বলাই। দু. তিনটা ঢোক গিলল পর পর। তারপর সংশয়ের গলায় কোনো রকমে হাঁক দিল। 'ছিদাম খুড়ায় আছেন নি?'

সঙ্গে সঙ্গে না, বার দুই খাস টানার পর জবাব এল ভেতর থেকে। চিকন গলা নরম স্বর, 'আছেন কারা?'

'আমি···', এতক্ষণে স্বস্তি পেল বলাই। সে বুঝতে পেরেছে এ গলাখান তার বড় আপন চিনিস্থির। 'আমি বলাই বেউলীর···।'

ঝনঝন করে একটা শব্দ হ'ল; কোনো জবাব নেই। বলাইয়ের মনে হ'ল, পাঞ্জা করা বাসনের মধ্যে কেউ বুঝি পা পিছলে পড়ে গিয়েছে সহসাই। আচম্বিতে সে ধরে নিতে পারল, আর কেউ না, ময়না; হাঁ ময়নাই বুঝি পড়ল। কি আশ্চর্য, মনে যেন পড়া অমনি একখানা সাঁইত্রাশী কাল জিভে গিয়ে থমকে দাঁড়াতে হ'ল। অবাক চোখে সামনে দাঁড়ানো মৃত্তিখানের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল বলাই। সে বিশ্বাস করতে পারছিল না, এমনভাবে এমন সময়ে, এমন করে কোনোদিন সে কাছে পাবে তার ময়নাকে।

অল্পক্ষণের নীরবতা। সম্বিৎ ফিরে পাওয়ার আগেই ফিক ক'রে হেসে ফেলল ময়না. বলাইয়ের বুকের পিঞ্জরায় পাখী, 'কী মাগী বিষম খাইলা মনে লয়?'

'হয়।' ছুৎ করে ততক্ষণে দাঁড়িয়েছে বলাই। এগিয়েও এসেছে আর কাইক, 'চাওনের আগে দেখী দর্শন হইয়া গেল গা, বিষম খামু না?'

'সবুর সবুর···,' সারা অঙ্গ দুলিয়ে হেসে উঠল ময়না। যেন নদ্যা বনের গাছে পেয়ারা ঢেউ উঠেছে। 'আঁতারে দেখী বানাইলা আমারে, ভক্তখানরে আখবার চাও।'

'ভক্তখান গ্যা চুলার ছিচরণে।' আরও দু'পা এগিয়ে এল বলাই, হাত বাড়িয়ে নরম একখান হাত ধরল ময়নার। মুখও বাড়িয়ে দিয়েছে 'পরাণ ভইরা আবা করণের আইজ্ঞা চাই।'

'ই-স···,' চরম আবেগের আদর পেতে পারত ময়না। কিন্তু তা উপেক্ষা করেছে সে। শেষ বিকেলের মরা আলোয় মনের মানুষের চোখের সামনে ধরা মুখখান সরিয়ে নিয়েছে সে। 'পত্তিক দেইখ্যা সব্দ হইবার নইচে। বিটলা ভক্ত মনে লয়··'

তারপর কখন যেন দিনের আলোটুকু মুছে গেল। কথায় আর খুশীতে আনন্দের ক-টি রমণীয় মুহূর্ত কেটে গিয়েছিল ওরা জানে না। বলাইয়ের প্রশস্ত রোমশ বুকে অনেকক্ষণ মাথা রেখে স্থির হয়ে থাকল ময়না। অনেকগুলো আবেগ ধর্মর মুহূর্ত ততক্ষণে কেটে গিয়েছে।

হাঁ, বলাই যা অনুমান করেছিল, তাই সত্য। ছিদাম বাগির গুটা বাড়িখানে বলতে গেলে আর কেউ নাই। শূন্য উঠান ফাঁকা ঘর। কেবল পূর্ব দুয়ারী ঘর থেকে বাতে কাহিল সন্ধ্যাশরী ময়নার মার কঁকানির স্বর শোনা যাচ্ছিল। ছিদাম নেই। না, কেরায়ায় নয়, শঙ্কুনের তুল্য মাও নিয়ে সে গত কাল রওনা দিয়েছে নাগী মটরায়। সেখানে বড় খাইয়ার জন্যর ব্যাপো। মরণ-বাঁচনের সন্ধিকাল এখন তার।

বেলা শেষের আলো মুছে ঘোলা জলের তুল্য ছায়া

নেমেছিল ততক্ষণে। দূরের বাঁধারে এরই মধ্যে পোড়া পাজিদের তলার লাখান অন্ধকার নেমেছে। পইথ-পাখালির শেষ ডাক ওরা শুনতে পেয়েছিল অনেক আগে। আরও খানিক পরে চোখ খুলল ময়না, চাপা ফিসফিসে গলায় বলছিল : 'ই-বার ছাইড়্যা দাও আমারে।'

'না।' বুকের পিঞ্জরার মধ্যে ধরা পক্ষীর মতন আরও জোরে, নিবিড় করে ময়নাকে মিশিয়ে দিতে চাইছিল বলাই। 'যাইবার মন লয় না আমার।'

'লয় না!' কোনো রকমে নিজেকে মুক্ত করতে পারল ময়না, তাকাল মনের মানুষটার চোখে সোজাসুজি 'তুমার মতলবখান ব্যান ভাল ঠ্যাকে না মাজি··· বেজবান থাকনের ইচ্ছা মনে হইতেছে···'

'না, তার লিগ্যা আহি নাইক্যা ময়না।' বলাইয়ের গলাখান তখনও কাঁপছে, শুষ্ক খাঁচা লইয়া কাইন্যা ধরি, বুকের পিঞ্জরা আমার ভরে না।'

'ভরব ভরব।' হাত বাড়িয়ে ময়না বলাইয়ের কাঁধ ছোঁয় 'ডালাখান খুইল্যা রাইখো, তুমার মনের পক্ষীরে তুমি পাইয়া যাইবা।'

'কবে?'

'যেদিন তুমি লইয়া যাইবা আমারে।'

আর বেশী কথা নয়। ভরা বুক তৃপ্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছিল বলাই। কথা নিয়ে এসেছে, কাল সুখের বেলায় দেখা হবে। অনেক মানুষের ভিড় থেকে ময়নাকে তুলে নেবে ডিঙি নাওয়ে। তারপর এলাহোনির বাঁক পেরিয়ে সোজা ধলেশ্বরীর প্রশস্ত বুকে।

কথামতন হয়েছিল কালও। পরদিনের নাও ফেরৎ দিবার কালে প্রস্তাবটি পেড়ে রেখেছিল বলাই, ফুলচান্দ গোসাইয়ের কাছে। ঠিক সময় বুঝে কথা। বলাই গোসাইয়ের মনের অভিসন্ধি জানে। এমনিতে পরাজ দিলের মানুষ হলেও সন্ধ্যার পর যত ঘন হয়ে আসবে রাত ততই দিল খুলবে ফুলচান্দ গোসাইয়ের এখন সে সম্রাট, বাদশা। ···দাওখানা পাইত্যা থাকাও, সানকের মুলতানী দিল তাথাম উপুর কইরা দিব। যা কইব তাই সই নেশার ফুলে পড়া বাধাখান ওল্প ঝাঁকাবে কেবল। জড়ানো কথা হলেও বলবে, 'সব নিয়া যা গা আমার সব, খালতক একখান পাখী আমারে ধইরা দিস।

জবাব দিতে হয়, হবে। বলতে হবে ছোট্ট একখান কথা, 'দিমু কর্তা।' ব্যাস, অমনি আরম্ভি মজুর। নেশার ঘোর কাটলে, স্বাভাবিক অবস্থায় যখন দেখা হবে, ফুলচান্দ গোসাই আর বলবে না সে কথা। এ পরগণার কোন মানষ্যি না জানে যে, নেশার ঘরি পাচে পড়লেই গোসাইয়ের শিকারী-মনখান চাঙ্গা মেরে ওঠে।

সুযোগ বুঝে পেরস্তাব রাখতেই মঞ্জুর করে দিয়েছিল গোসাই। হা, সারা দিনমানের নামে ডিঙি নাওটার মালিকানা বলাইয়ের।

রাতভর প্রায় জেগেই থাকল বলাই। তন্দ্রার ঘোরে বারবার সে ময়নার মুখখান দেখতে পেয়ে চমকে উঠেছিল। সারা ঘরখানে যেন তার গায়ের গন্ধ লেগে রয়েছে। অন্ধকারে সারারাত ধরে বহুবার তাকাল, চোখ বন্ধ করে সেই আরীতনুর স্বপ্ন দেখল। এবং আসন্ন দিনের সম্ভাব্য কয়েকটি মুহূর্তের কথা ও কল্পনার ছবি যতবার তার মনে পড়ছিল ততবার অমাবাসিত এক মাদকতা আচ্ছন্ন করে ফেলছিল বলাইয়ের মন। থেকে থেকে সে অনুভব করতে পারছিল তার শরীরের রক্ত কথা কইবার চায়। ময়না···ময়না···ময়না অস্ফুট গলায় আপন মনে সারারাত ধরে ঐ একটা নামের জপকরল বলাই।

(ক্রমশঃ)

শুধু তাই নয়,— পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হলে ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদও নির্বিঘ্ন প্রগতির সুযোগ পাবে। পশ্চিম পাকিস্তানে অনুরূপ সংখ্যালঘু নেই এবং পূর্ববঙ্গে যদি সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হয়ে যায় তা' হলে রাজনৈতিক কারণে পূর্ববাংলা ও ভারতে যেসব সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিষচক্র সৃষ্টি হয় তার অপঘাত থেকে পূর্বাঞ্চল ভারত ও পূর্ববাংলা মুক্তি লাভ করবে। এক কথায় বলা যায় যে স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববাংলা গঠিত হলে ভারত ও পূর্ববাংলার সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধান হবে এবং এই দুই দেশের মধ্যে সাম্প্রদায়িক শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং প্রগতির পথও কণ্টকমুক্ত হবে।

স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ববঙ্গ গঠিত হলে এই উপমহাদেশের সামগ্রিক জন-জীবনেও শান্তি ও মৈত্রীর এক নতুন পরিবেশ সৃষ্টি হবে। সংখ্যালঘু সমস্যার উদ্বেগেই ভারত ভাগ করা হয়েছিল। কিন্তু বিভাগোত্তর উপমহাদেশে এই সমস্যার সমাধান হয়নি, বরং আরও অনেক রক্তক্ষয়ী ও সর্বনাশা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। মানব সভ্যতার বর্বর যুগেও যা' ঘটেনি দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে তার চেয়েও নারকীয় ঘটনা ঘটেছে এই উপমহাদেশে। সেদিনের নৃশংস কাহিনীর উপসংহারে বৃটিশ সাংবাদিক লিওনার্ড মোস্‌লে বলেছেন যে ভারতভাগের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান ও উত্তর পশ্চিম ভারতে "৬০০,০০০ লোক নিহত হয়েছে, ২৪,০০০,০০০ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছে এবং ১০০,০০০ তরুণী অপহৃত হয়েছে এবং হয় তারা বলপ্রয়োগে ধর্মান্তরিত হয়েছে অথবা নীলামে বিক্রি হয়েছে। এই ঘটনা ঘটেছে দুই পক্ষেই।" কিন্তু গত সতের বছরে পূর্ববাংলা ও পূর্বভারতে সংখ্যালঘু হত্যাকাণ্ডের যে বীভৎস ঘটনা ঘটেছে এবং যার ফলে হাজার হাজার অসহায় সংখ্যালঘু নিহত হয়েছে, শত শত মা-বোনের মর্যাদা লাঞ্ছিত হয়েছে এবং প্রায় এক কোটি নিরপরাধ মানুষ যে বাস্তুভিটা হারিয়েছে সেই মর্মন্তুদ কাহিনী মোস্‌লের লেখার স্থান পায়নি। যে ভ্রাতৃ রক্তস্রোতের মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছে সেই রক্তক্ষয় আজও বন্ধ হয়নি। এই সংঘাত আজ এক চরম পর্বে উপস্থিত হয়েছে এবং সুরু হয়েছে পাক-ভারত যুদ্ধ। উভয় পক্ষের হাজার হাজার তাজা-নওজোয়ানের রক্তস্নানের শিউরে উঠছে এই উপ-মহাদেশের প্রাণ। আজ রক্ত, মৃত্যু ও ক্রন্দনের এক চরম বিষাক্ত আবর্তে নিমজ্জিত এই উপমহাদেশ। আজ শান্তি ও প্রগতিকামী মানবতাবাদী মানুষের বেদনার্ত মনে প্রশ্ন উঠছে এই সর্বনাশা জিঘাংসার হাত থেকে এই উপ-মহাদেশের মানুষের বাঁচবার উপায় কি?

আয়ুবশাহী বলছে কাশ্মীর পেলেই পাক-ভারতের সংঘর্ষের সমাধান হবে, পক্ষান্তরে ভারত বলছে কাশ্মীর যদি ধর্মের নামে পাকিস্তানে যায় তা' হলে ভারতের ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙ্গে পড়বে এবং ভারতের পাঁচ কোটি সংখ্যালঘুর জীবন বিপন্ন হবে। বস্তুত, কাশ্মীর মূল ব্যাধি নয়, ব্যাধির উপসর্গ মাত্র। আয়ুবশাহীর কাশ্মীর চাই পশ্চিম পাকিস্তানের জল-সরবরাহের উৎস দখল করে প্রতিরক্ষার ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করবার এবং সেই সঙ্গে পূর্ববাংলার উপরে ঔপনিবেশিক ও সাম্রাজ্যবাদী কর্তৃত্ব কায়েম রাখার জন্য। কাশ্মীর পশ্চিম পাকিস্তানের চাই পূর্ববাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে খর্ব করার উদ্দেশ্যে। পূর্ববাংলার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তান সংখ্যাগরিষ্ঠ হলে, সিভি-নেতৃত্বের পক্ষে পূর্ববাংলার উপরে পশ্চিম পাকিস্তানের গোলামী চিরস্থায়ী করা সম্ভব হবে। পূর্ববাংলা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারে বঞ্চিত, পশ্চিম পাকিস্তানের সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিরও একই অবস্থা। সিভি নেতাদের কাশ্মীর চাই কাশ্মীরিদের জন্য নয়,—আয়ুবশাহীর রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধিকে কার্যকরী করার জন্য। এক কাশ্মীর পেলেও আরও 'কাশ্মীর সমস্যা' সৃষ্টি করবে আয়ুবশাহী,—পাক-ভারতের মধ্যে বিদ্বেষ ও সংঘর্ষের পরিবেশ ছাড়া সিভি-নেতাদের পক্ষে

পূর্ববঙ্গের উপরে ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণ চালান ও কায়েম রাখা সম্ভব নয়।

বস্তুত, পাক-ভারত দ্বন্দ্ব নিরসনের চাবিকাঠি কাশ্মীর উপত্যকায় নয়,—পূর্ববাংলার হাতে। পূর্ববাংলায় যদি একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় তা' হলে পশ্চিম পাকিস্তানেও আয়ুবশাহীর পতন ঘটবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মানুষ স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের অধিকার ফিরে পাবে। এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে এই উপমহাদেশের মানসিকতায় এক বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটবে এবং স্বাধীন পূর্ব-বাংলা, স্বাধীন পশ্চিম পাকিস্তান, ভারত পারস্পরিক স্বার্থ, সম্মতি ও সহযোগিতার ভিত্তিতে এই উপ-মহাদেশের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগের নতুন ঘুনিয়াদে একটি নতুন রাজনৈতিক কাঠামো বা কনফিডারেশন গড়ে তুলতে সক্ষম হবে এবং এই রাজনৈতিক কাঠামোর কাশ্মীরী সংঘাতের স্বাভাবিক পরিসমাপ্তি ঘটবে।

আজকের এই ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত উপমহাদেশকে রক্ষা করতে পারে স্বাধীন পূর্ববাংলা। স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠন যদি সম্ভব হয় তা' হলে এই ভারতীয় উপ-মহাদেশের রাজনৈতিক সম্বন্ধে এক বৈপ্লবিক রূপান্তরের উৎসমুখ উন্মুক্ত হবে এবং তার ফলে সৃষ্টি হবে শান্তি, মৈত্রী ও সহযোগিতা স্থাপনের এক বাস্তব ও সারগ্রাহী পটভূমি। স্বাধীন ও সার্বভৌম পূর্ব-বাংলা গঠিত হলে ভারতীয় উপ-মহাদেশ সর্বনাশা রক্তক্ষয় ও অংসের হাত থেকে রক্ষা পাবে এবং সাম্রাজ্য লোলুপ চীনও এই উপ-মহাদেশের উপরে থাবা বসাতে সাহস পাবে না।

নিয়মতান্ত্রিক পথে পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণ লাভের উপায় পশ্চিম পাকিস্তানীদের সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত অনেক আগেই বন্ধ্যা ও মূল্যহীন করে দিয়েছে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে নিয়মতান্ত্রিক বিপ্লবের যে অপূর্ব নিদর্শন স্থাপন করেছিল পূর্ববাংলা, তার নজীর পৃথিবীর নিয়মতান্ত্রিক ইতিহাসে খুব কমই পাওয়া যায়। পাকিস্তান সৃষ্টিকারী মুসলীম লীগকে চরমভাবে পরাজিত করে পূর্ববাংলার বুক থেকে মুসলীম লীগের সাম্প্রদায়িক রাজনীতি নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল পূর্ব-বাংলার নবজাগ্রত তরুণ মুসলীম সমাজ। পূর্ববাংলা আশা করেছিল যে এই ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী তাৎপর্য পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন এবং স্বীকার করে নেবেন পূর্ববাংলার আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার। কিন্তু এই নির্বাচনী নির্দেশের উল্টোপথ বেছে নিয়ে পূর্ববাংলার নিয়ম-তান্ত্রিক বিপ্লবকে দমন করার জন্য তারা নিয়োগ করলেন সাম্রাজ্যবাদী ভেদ-নীতি। পূর্ববাংলার গণতান্ত্রিক ভাগ্য নিয়ে জুয়া খেলা সুরু করলেন পশ্চিম পাকিস্তানী নেতারা। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত চার বছরে সাতবার পূর্ববাংলার মন্ত্রীসভা গড়লেন এবং সাতবার এই মন্ত্রীসভাকে বরখাস্ত করে দিলেন। কেন্দ্রেও ঘটলো সেই একই অবস্থা। এই চার বছরে পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে আটবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভার অদল-বদলের পুতুল নাচের খেলা হলো। বগুড়ার মহম্মদ আলী, চৌধুরী মহম্মদ আলী, সহীদ সুরাহবর্দী, ফুস্রীগড় এবং ফিরোজ খানকে এবং এই সব নেতা ও নেতাদের দলকে এক একবার গদীতে বসালেন পশ্চিম-পাক নেতারা এবং এক একজন করে তাদের চরণ বিক্ষেপের পাকে পরিণত করে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন মন্ত্রীত্বের গদী থেকে। বস্তুত, এই চার বছরে গোলাম মহম্মদ এবং মীর্জা ইস্কান্দার নিয়মতান্ত্রিক রাজনীতির এন্তেকাল ঘটালেন পাকিস্তান এবং এই দুই নেতার স্বৈরাচারী কীর্তিই পাক-রাজনীতির ভস্তুর ক্ষেত্র তৈরী করে সহজসাধ্য করে দেয় কৌজী নেতা আয়ুবের সামরিক অভ্যুত্থানের পথকে।

চার বছর সামরিক আইনের ষ্টীম রোলার চালিয়ে এবং দুই বছর 'মৌলিক গণতন্ত্রের' প্রহসনের স্বৈরতান্ত্রিক ডিক্টেটরশীপ পরিচালনা করে ১৯৬৪ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের নামে একটি নিয়মতান্ত্রিক ভণিতা করার যে কৌশল

করেছিলেন পিণ্ডি-নেতা আয়ুবের সেই সামান্য সুযোগটুকু গ্রহণ করেও বিদ্রোহী পূর্ববাংলা চ্যালেঞ্জ করেছিল আয়ুবশাহীকে। ১৯৬৫ সালের নির্বাচনী অভিযানের সুযোগে পূর্ববাংলায় যে গণ সমুদ্রের গর্জন শোনা যায় তাতে আতঙ্কিত হয়ে নিয়মতান্ত্রিক নির্বাচনের তথাকথিত সুযোগটিও শেষ মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দেন আয়ুব। তিনি স্পষ্টাক্ষরে জানিয়ে দেন যে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে ক্ষমতা পরিবর্তনের কোন অবকাশ নেই পূর্ববাংলায়। পূর্ববাংলায় আয়ুবশাহী-বিরোধী গণবিক্ষোভের প্রচণ্ডতম নিয়মতান্ত্রিক অভিব্যক্তি দেখে তিনি স্পষ্টাক্ষরে ঘোষণা করেন যে নির্বাচনে যদি এই ডিক্টেটরের পরাজয় হয় তাহলে পাকিস্তানে 'দ্বিতীয় বিপ্লব' ঘটবে অর্থাৎ মার্শাল আয়ুব আবার মার্শাল ল জারী করে নিজের ডিক্টেটরী শাসন বাহাল রাখবেন।

পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের পথে আজ যদি পূর্ববাংলার মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ থাকতো তাহলে নিঃসন্দেহে পূর্ব পাক ভূখণ্ডের বাঙালী জনতা ৯৯ শতাংশে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের স্বপক্ষে সুস্পষ্ট মত প্রকাশ করতো। কিন্তু পূর্ববাংলার আজ ব্যক্তি স্বাধীনতা, প্রাপ্ত বয়স্কের ভোটাধিকার প্রত্যক্ষ নির্বাচন এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ক্ষমতা পরিবর্তনের একটী সর্তও অবশিষ্ট নেই। তাই নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে স্বাধীন পূর্ববাংলা গঠনের কোন পথই আজ খোলা নেই পূর্ব বাংলার সামনে।

পূর্ববাংলার সামনে আজ খোলা আছে শুধু একটি পথ,—সেই পথের সংকেত স্পষ্ট হয়ে উঠেছে বিপ্লবের অমোঘ আহ্বানে। নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পাশাপাশি সেই বৈপ্লবিক পথের নিশানাও তৈরী করেছে পূর্ববাংলার ছাত্র ও যুব সমাজ। ১৯৫২ সালে ২১শে অক্টোবর, ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯ সালে সেই ১৭ই সেপ্টেম্বরের বিদ্রোহী পদক্ষেপের পুনরাবৃত্তি এবং এই একই বছরে মাত্র বার দিনের ব্যবধানে ২৯শে সেপ্টেম্বরের শোণিত-দীপ্ত শপথগুলি 'পাকিস্তানী' পূর্ববাংলার জীবনে বৈপ্লবিক সংকল্পের এক অপূর্ব আমন্ত্রণরূপে আজো জেগে আছে পূর্ববাংলার মানুষের বুকে। ১৯৫২ সালের ২১শে অক্টোবর চল্লিশটি তাজা-প্রাণ নওজোয়ানের শহীদী আত্মাহুতির আহ্বান পূর্ববাংলার বুকে বপন করেছে বিপ্লবের বীজমন্ত্র। সেই বহ্নি-বীজেই অংকুরিত হয়েছে ১৯৬২ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর। এই দিনে পূর্ববাংলার বিদ্রোহী ছাত্র সমাজ প্রকাশ্য রাস্তায় পাক প্রেসিডেন্ট আয়ুবের কুশপুত্তলিকা দাহ করে পশ্চিম পাকিস্তানকে অগ্নির অক্ষরে জানিয়ে দিয়েছে যে পূর্ববাংলা কি চায়। ১৯৬৯ সালের সেই ১৭ই সেপ্টেম্বরকে স্মরণ করার প্রচেষ্টায় পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজের সঙ্গে পিণ্ডি-ফৌজের তিনদিন ব্যাপী চলে রক্তাক্ত খণ্ডযুদ্ধ। পূর্ববাংলার স্বাধী-স্বাধীনতা সংগ্রাম কোন্ পথ নেবে তারই রূপ-রেখা স্পষ্ট হয়েছে এই খণ্ড যুদ্ধের মাধ্যমে। এই বছরেরই ২১শে সেপ্টেম্বর পূর্ববাংলার আয়ুবশাহী দমননীতির বিরুদ্ধে যে অভূতপূর্ব ধর্মঘট হয় তার মাধ্যমে পূর্ববাংলার সংগ্রামীরা আরম্ভ করেছে গণ-বিপ্লবের চূড়ান্ত ট্যাকটিস। কি করে যানবাহনের চাকা অচল করে দিতে হয়, কলকারখানা বন্ধ করতে হয়, সরকারী দপ্তরগুলি শুরু করে দিতে হয় এবং সরকারী আমলাতন্ত্র ও ফৌজী চলাচলের সমস্ত ব্যবস্থা পঙ্গু করে দিয়ে কিভাবে গণ-বিপ্লবের মাধ্যমে প্রতি-সরকার গঠন করে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উড়াতে হয় তার প্রাথমিক মহড়া হয়ে গেছে ১৯৬৯ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর। পূর্ববাংলার ছাত্র ও যুব সমাজ, বাঙালী শ্রমিক-শ্রেণী, পাট-চাষী কৃষক সমাজ এবং সরকারী আমলাতন্ত্রের বাঙালী অফিসার ও কর্মচারীরা আজ পিণ্ডি-বিরোধী বিদ্রোহের সংকল্পে প্রস্তুত। বাকী শুধু এখন বিপ্লবের চূড়ান্ত ট্যাকটিস এবং বিস্ফোরণক্ষণের চয়ন ও চূড়ান্ত মুহূর্তটির নির্ধারণ।

পূর্ববাংলা আজ উপলব্ধি করেছে যে আয়ুবশাহীর কাশ্মীর-যুদ্ধ পূর্ববাংলার যুদ্ধ নয়। ওথাকথিত ও কল্পিত

পাকিস্থানী স্বদেশপ্রেম যে পূর্ববাংলার মানুষকে বিভ্রান্ত করে স্বাধীনতা সংগ্রামের লক্ষ্য থেকে তাদের বিচ্যুত করার এক কূটনৈতিক প্রতারণা মাত্র সেকথাটি বুঝতেও বিদ্রোহী পূর্ববাংলা ভুল করে নি। পূর্ববাংলার সঙ্গে পরামর্শ করে আয়ুবশাহী কাশ্মীর-যুদ্ধ সুরু করে নি বা পূর্ববাংলার মতামতের কোন পরোয়া না করে যুদ্ধ বিরতি গ্রহণ করতেও পিণ্ডি-নেতারা দ্বিধাগ্রস্ত হয়নি। পূর্ববাংলার মানুষের মনে আজ তাই পাকিস্থানী স্বদেশপ্রেমের কপট আবেদন কোন সাড়াই জাগাতে পারছে না।

পূর্ববাংলার আয়ুবশাহী আবেদনের এই ব্যর্থতা দেখে পিণ্ডি-নেতারা প্রচার কৌশলের ধারা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করেছেন। কাশ্মীর যুদ্ধকে এখন তারা হিন্দুর বিরুদ্ধে মুসলীমদের ধর্মীয় যুদ্ধ বলে বিকৃত করার চেষ্টা করছেন। 'ইসলাম' ও 'জেহাদের' নামে পূর্ববাংলার মুসলীম সমাজের মনকে উত্তপ্ত করার জন্য শেষ চেষ্টা করছে আয়ুবশাহী। ঢাকা রেডিও থেকে প্রতিদিন উন্মাদের মত প্রচার শুরু হয়েছে ধর্ম-প্রাণ সরলমন মুসলীম সমাজকে বিভ্রান্ত করার জন্য। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু করে এই জেহাদী মনোভাবকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্যও আয়ুবশাহীর ক্রীড়নকদের তৎপরতার ত্রুটি নেই। কিন্তু পূর্ববাংলার বাঙালী আত্মনিয়ন্ত্রণবাদের আবেদন ও বাঙালীর নবজাগ্রত সংকল্প আয়ুবশাহীর এই চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিতে আজ দৃঢ় সংকল্প। রাস্তায় রাস্তায় মিছিল করে বাঙালী ছাত্র ও যুবকেরা এই সাম্প্রদায়িক চক্রান্তের প্রতিরোধ করছে। ২২শে অক্টোবরের 'ভারত ধ্বংস কর' দিবসের ষড়যন্ত্রকেও তারা ব্যর্থ করে দিয়েছে। আয়ুবশাহী জানে যে আজ যদি পশ্চিম পাকিস্তানের অবাঙালী ক্রীড়নকেরা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা সুরু করে তা' হলে পূর্ব-বাংলার আজ বাঙালী বনাম অবাঙালীর রক্তাক্ত সংঘর্ষের দাবানল জ্বলে উঠবে। পূর্ববাংলার সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সুরু করতে আয়ুবশাহী আজ তাই সন্ত্রস্ত ও সংযত। পিণ্ডি-নেতারা একথা বুঝেছে যে আয়ুবশাহীর পূর্ববঙ্গ সাম্রাজ্য আজ এক ভগ্নপ্রায় বালুর ঢিবির উপরে বেসামাল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

পূর্ববাংলার উপরে পিণ্ডি চক্রের কর্তৃত্ব আজ রেডিয়ো-গ্রামের হুকুমনামার শেষ অবলম্বনে এসে দাঁড়িয়েছে। পশ্চিম সীমান্তে ২২ দিন ব্যাপী যে রক্তাক্ত যুদ্ধ চলে তখন পূর্ববাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্থানের কোন যোগাযোগ ছিল না। এই বাইশ দিন পশ্চিম পাকিস্থান থেকে পূর্ববাংলায় একটি বিমান বা একটি জাহাজও আসতে পারে নি। পিণ্ডির নাভিকেন্দ্র থেকে পূর্ববাংলা ছিল সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন। যুদ্ধ বিরতির পরেও চলছে প্রায় একই অবস্থা। কদাচিৎ হয়তো দু' একটি বিমান পিণ্ডির বার্তা নিয়ে হয়তো পৌঁছতে পারে পূর্ববাংলায় কিন্তু এই বিমানে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন মন্ত্রী বা সামরিক নেতার পূর্ববাংলায় আসার সাহস নেই। গুজরাটের প্রধান-মন্ত্রীর বিমানকে গুলিবিদ্ধ করে ধ্বংস করেছিল আয়ুবের অনুচরেরা। সেই ভাগ্য আজ পশ্চিম পাকিস্তানী নেতাদের ভাগ্যেও ঘটতে পারে,—প্রাণভয়ে ভীত আজ পশ্চিম পাক-নেতারা তাই পূর্ববাংলার পথে পা' বাড়াতে আর ভরসা পাচ্ছে না। আজ প্রকৃতপক্ষে শুধু বেতারে বার্তা বিনিময় করা ছাড়া পূর্ববাংলার সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের কোন যোগাযোগ নেই। পূর্ববাংলা আজ বাস্তব ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েই গিয়েছে,—এখন বাকী শুধু পূর্ববঙ্গে আয়ুবশাহীর সাম্রাজ্যবাদী তাসের ঘরটিকে শেষ আঘাতে ভেঙে দেওয়া। আয়ুবশাহীর এক ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ পূর্ববাংলায় আয়ুবস্তানের এই তাসের ঘরটি রক্ষা করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। কিন্তু এই শেষ চেষ্টাও ব্যর্থ-প্রায়।

পূর্ববাংলায় আয়ুবশাহী সোনারীর শেষ প্রহরী হলো এক ডিভিশন পাঞ্জাবী ফৌজ। কিন্তু এই ফৌজের মনোবলও দিন দিন ভেঙে যাচ্ছে। একদিকে দেখছে তারা অসহায়

সামরিক অবস্থা, অন্যদিকে দেখছে বিদ্রোহী পূর্ববাংলার রক্ত-চক্ষু। চারদিকে তাদের অসহযোগিতা ও গণবিক্ষোভের প্রেতচ্ছায়া। তারা আজ সীমান্ত রক্ষা করবে, না গণবিক্ষোভ দমন করবে। পূর্ব-পাক রাইফেল বাহিনীর বাঙালী পুলিসের উপরে অথবা আনসার বাহিনীর উপরেও তাদের বিশ্বাস নেই। এই দুই বাহিনীর অবাঙালী অফিসারদের বিরুদ্ধে বাঙালী পুলিস ও আনসারেরা বিক্ষুব্ধ। গণবিক্ষোভ দমন করবে না সীমান্ত রক্ষা করবে,—আজ সেটাই এই দ্বিধাগ্রস্ত পাঞ্জাবী কৌজের প্রধান সমস্যা। তারা জানে যে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে কোনভাবেই কোন রি-ইনফোর্সমেন্ট আসার সুযোগ নেই। গোলাবারুদ ক্ষয় হয়ে গেলে নতুন অস্ত্র-শস্ত্র পাওয়ারও কোন ভরসা নেই। পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব-বাংলায় কৌজ বা অস্ত্র-শস্ত্র পাঠাবার জল-পথ এবং বিমান-পথ,—দুই-ই বন্ধ। পূর্ববাংলায় একটি অভিনেল ফ্যাক্টরীও নেই,—এমনকি সামরিক সাজ-সরঞ্জাম মেরামতের একটি বড় কারখানাও নেই। কৌজী বিমান আছে মাত্র তিরিশ কি চল্লিশটি। এই বিমান তাদের কোন সাহায্যই দিতে পারবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের মূল ঘাঁটি থেকে এবং সমস্ত প্রকার যোগাযোগ ও সরবরাহ ব্যবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই এক ডিভিশন পাঞ্জাবী কৌজের পক্ষে লড়াই করে সীমান্ত রক্ষা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এরূপ একটি শোচনীয় পরি-স্থিতির মধ্যে কোন সামরিক বাহিনীর মনোবল রক্ষা করা সম্ভব নয় এবং মনোবল না থাকলে কোন সামরিক বাহিনীর পক্ষেই লড়াই করাও সম্ভব নয়। আজ তাই পূর্ববাংলায় আয়ুবশাহীর সাম্রাজ্য-প্রহরীরা বন্দী শিবিরের অপেক্ষায় আতঙ্কিত হয়ে আসন্ন মৃত্যুর বিভীষিকা দেখছে।

উদ্গীর্ণ-প্রায় আগ্নেয়গিরির মুখে বসে আছে আজ পূর্ববাংলা। ওদিকে সিন্ধির রাজপটে আয়ুবশাহীর অবস্থাও টলমল। চীনের দিওয়ালী আজ আয়ুবশাহীর কাল হয়েছে। হয় আয়ুবশাহীকে চীনের চক্রান্তে আবার কাশ্মীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে, অথবা পশ্চিম পাকিস্তানে দেখা দেবে নতুন সামরিক বিদ্রোহ। আয়ুবশাহীর আজ ত্রিশঙ্কু অবস্থা।

পূর্ববাংলায় স্বাধীনতা অর্জনের বৈপ্লবিক সুযোগ আজ সমাগত। শেষ লড়াইয়ের বিস্ফোরণ মুহূর্তও প্রত্যাসন্ন। বিদ্রোহী পূর্ববাংলা আজ তৈরী হয়ে আছে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের শেষ ও সার্থক অধ্যায়ের চূড়ান্ত পরিণতির অপেক্ষায়।

এই পরিণতির মধ্যেই নিহিত রয়েছে আয়ুবশাহীর বিলুপ্তি। সিন্ধি-চক্রের অবসানে এই উপমহাদেশে যে পটপরিবর্তন ঘটবে তার পরিপ্রেক্ষিতে সৃষ্টি হবে এক বৈপ্লবিক মানসিকতা,—যার আবহণে বিভাগোত্তর রক্ত, মৃত্যু ও ধ্বংসের বিষাক্ত পরিবেশের পরিবর্তনে জন্মলাভ করবে কালান্তরের নতুন আশা, শান্তি ও প্রগতির এক নতুন দিগন্ত।

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনাম

ভিয়েৎনামের অঘোষিত যুদ্ধ ইতিমধ্যে তীব্রতর হয়ে উঠেছে। বিগত বর্ষায় ভিয়েৎকং-এর এই যুদ্ধ চূড়ান্ত জয়ের যে সম্ভাবনা ছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে। মার্কিনী জয়ের সম্ভাবনা যেমন সুদূর-পরাহত, তেমনি মার্কিনী সেনাবাহিনীকে সমুদ্রের জলে ঠেলে দিয়ে, তাদের নিরস্ত্র করবার লগ্নও অতিক্রান্ত হয়ে গেছে। ভিয়েৎনাম যুদ্ধে আরও মার্কিনী সেনা, আরও অস্ত্র, আরও অর্থ নিয়োগে মার্কিনী সরকার প্রস্তুত। সমগ্র আমেরিকার বুদ্ধিজীবিদের মধ্যে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে মার্কিনী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রবল প্রতিবাদ গর্জে উঠেছে। এমন কি নূতন দিল্লীর মার্কিনী দূতাবাসের সম্মুখে প্রবাসী মার্কিনী ছাত্ররা কয়েকজন মার্কিনী সেনেটরের সেখানে উপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে। খাস আমেরিকার দক্ষিণ ভিয়েৎনামী যুদ্ধবিরোধীদের অনুকরণে দুইটি মার্কিনী যুবক ভিয়েৎনাম যুদ্ধের প্রতিবাদে আগুনে আত্মাহুতি করেছে। কিন্তু জনসন সরকার কম্যুনিষ্ট কবল থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামকে রক্ষা করতে কৃতসঙ্কল্প—সে জন্য যে মূল্য-ক্ষতির সম্মুখীনই তাকে হতে হোক না কেন। নভেম্বর মাসে কাম্বোডিয়া সীমান্তে ভয়ঙ্কর যুদ্ধে প্রচুর সংখ্যক উত্তর ভিয়েৎনামী, ভিয়েৎকং এবং মার্কিনী সেনা নিহত হয়েছে। যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে একজন মার্কিনী এয়ার ক্যাভালরীর মুখপাত্র বলেন "They are using human wave tactics but we are pounding them from air."

কাম্বোডিয়া সীমান্তে এই ভয়াবহ সংঘাতের মুখে উ থাণ্ট গত ১৬ই নভেম্বর এক বিবৃতি দিয়ে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে সংশ্লিষ্ট শক্তিবর্গের নিকট 'major concessions'-এর ভিত্তিতে আপোষ-আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টির আবেদন জানান। উ থাণ্ট ১৯৫৪ সালের জেনেভা সিদ্ধান্তের প্রতি গভীর আস্থা জ্ঞাপন করে বলেন: "Even at this late hour, perhaps 10 years too late, I still hold the view that the Geneva agreement of 1954 can be implemented." গত বছর মে মাসে মার্কিনী বোমা-বর্ষণের বিরতির কাল উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে আলোচনার প্রস্তাব এসেছিল, কিন্তু এই আলোচনার পূর্বশর্তগুলিতে মার্কিনী সরকার সম্মত হতে না পারায়, আলোচনা হতে পারে নাই। এ সংবাদ মার্কিনী দপ্তর থেকে গত ১৭ই নভেম্বর জানা গেল। সুতরাং, দক্ষিণ ভিয়েৎনামের পার্বত্য মধ্যাঞ্চলে উত্তর ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনীর সঙ্গে মার্কিনী ও দক্ষিণ ভিয়েৎনামী সেনাবাহিনী জীবন মরণ যুদ্ধের মুখে উ থাণ্টের আবেদন কোনো শক্তির কাণেই পৌঁছাবে না।

তা সত্ত্বেও যুদ্ধ বিরতির আর একদফা প্রচেষ্টার সংবাদ জানা যায়। গত জুনের মাসের পর রুমানিয়ার সঙ্গে অন্তত দুইবার আমেরিকার ভিয়েৎনাম যুদ্ধবিরতি আলোচনা হয়েছে। এবারকার উদ্যোগ উত্তর ভিয়েৎনামের। রুমানিয়ার মধ্যস্থতায় আমেরিকার তাদের পক্ষ থেকে শান্তি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। এই প্রস্তাবের পরিণতি জানা না গেলেও বোঝা যায় আলাপ আলোচনা কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। হানোইয়ের কম্যুনিষ্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটিও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়াতে শান্তি স্থাপন

উদ্যোগী হয়েছে। ব্রিটেন বারটি রাষ্ট্রের শান্তি আবেদন, উত্তর ভিয়েৎনামে প্রেরণের সিদ্ধান্ত করেছে। ব্রিটেন সোভিয়েটকেও এই আবেদনের শরীক হতে অনুরোধ জানিয়েছে।

ইতিমধ্যে সোভিয়েট রুশ, চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের যুদ্ধে কম্যুনিষ্ট শস্ত্র-সাহায্যের জন্য আলোচনার প্রস্তাব করেছিল। চীন সে আলোচনায় স্বীকৃত হয় নাই। উত্তর ভিয়েৎনামে ও উত্তর কোরিয়া অঞ্চলে সোভিয়েট প্রভাব বিস্তারের বিরুদ্ধে চীনা মনোভাব সর্বজনবিদিত। এবছর ফেব্রুয়ারীতে হ্যানয় থেকে ফেরার পথে কোসিগিন পিকিং-এ গেলে এ বিষয়ে চীনা আপত্তি তাকে জানিয়ে দেওয়া হয়। বস্তুতপক্ষে উত্তর ভিয়েৎনামের উদ্দেশে সোভিয়েত শস্ত্র সরবরাহ কিছু সময়ের জন্য চীন আটকও করে রেখেছিল। সাম্প্রতিক বিশ্ব শান্তি সম্মেলনে এবং বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়ন সম্মেলনে উত্তর ভিয়েৎনাম চীনের চাইতে সোভিয়েট রুশের নিকটতর থাকায় চীনা মনোভাব উত্তর ভিয়েৎনামে রুশ শস্ত্র সরবরাহে আবার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের পত্রিকায় সাম্প্রতিক মন্তব্যে এই আশঙ্কা বাস্তবরূপ নেবে বলে অনুমিত হয়েছে।

সুতরাং, শান্তি আলোচনায়, পিকিংকে উপেক্ষা করে, হ্যানয় আদৌ উদ্যোগী হতে পারবে কিনা সেটাই প্রশ্ন। তাছাড়া সাম্প্রতিক যুদ্ধে ভিয়েৎকং-এর ক্ষয়-ক্ষতির মুখে হ্যানয়ের পক্ষে শান্তি প্রস্তাব উত্থাপন সম্ভব কিনা সে-সমস্যাও রয়েছে। অবশ্য, হ্যানয় ভিয়েৎকং-এর কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে মার্কিনী আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য নিজস্ব সেনাবাহিনীর কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান দক্ষিণ ভিয়েৎনামের রণাঙ্গনে পাঠিয়েছে। সুতরাং বিভিন্ন রাষ্ট্রের রাজধানীতে ভিয়েৎনাম যুদ্ধে শান্তি স্থাপনের সাম্প্রতিক প্রচেষ্টা শুভে আন্দোলিত হলেও এখনও বাস্তবে কোনো দানা বাঁধে নাই।

এদিকে সোভিয়েট রুশ ১৯৬৬ সালে প্রতিরক্ষার খাতে ১৯৬৫-এর চাইতে শতকরা পাঁচ ভাগ ব্যয়বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। দুই বছর পূর্বে সোভিয়েট রুশ এই খাতে তাদের ব্যয় বরাদ্দ হ্রাস করেছিল। জাতীয় আয়ের শতকরা ১২·৮ ভাগ ১৯৬৬ সালে প্রতিরক্ষায় ব্যয়িত হবে। ১৯৬১ সাল থেকেই সোভিয়েট রুশ এই ব্যয় হ্রাস করছে। সে বছর প্রতিরক্ষা ব্যয় ছিল জাতীয় আয়ের শতকরা ১৭·১ ভাগ। সুপ্রীম সোভিয়েটের সভায় প্রতিরক্ষার ব্যয়বৃদ্ধির কারণ নির্দেশ করে সোভিয়েট অর্থমন্ত্রী ভ্যাসিলি গারবুজক বলেছেন: "The international situation is becoming aggravated and the menace of war is growing"। পশ্চিমী পর্যবেক্ষকদের মতে তীব্রতর ভিয়েৎনাম সংঘাতের ফলে বর্ধিত বিশ্বসঙ্কটের এবং গত বছর উত্তর ভিয়েৎনামের বর্ধিত সামরিক সাহায্যের পরিপোষক। গারবুজক আরও বলেন: "The latest events testify to the growing activity of the aggressive forces of the imperialist states, to the desire to create ever new seats of war, and to arrest the process of social and national liberation by military means."

কঙ্গোর রক্তপাতহীন বিপ্লব

কঙ্গোর সেনানায়ক জেনারেল মোবুতু প্রেসিডেন্ট কাসাবুভুকে বিতাড়ন করে গত ২৪শে নভেম্বর কঙ্গোর রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেছে। ১৯৬০ সালেও আর একবার প্রেসিডেন্ট কাসাবুভুকে ক্ষমতাচ্যুত করে নয় মাস যাবৎ কলেজ অফ কমিশনার্স গঠন করে শাসন চালাবার পর পাশ্চাত্য শক্তিবর্গের চাপে কাসাবুভুকে ক্ষমতা প্রত্যর্পণ করে। এবার মোবুতু কারেমী-স্বত্ব নিয়ে বলেছে, কারণ এবার জনসাধারণকে অরাজকতার থেকে বাঁচাবার জন্যই—'to protect the people from anarchy and chaos'—তার এই অভিযান। তাছাড়া মোবুতু এবার নিজেই রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব নিয়ে যুদ্ধে কর্ণেল লুনুলাকে প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করেছে।

মাত্র গত ১৩ই অক্টোবর মোবুতু লুমুম্বাকে প্রধান মন্ত্রীর পদ থেকে অপসারিত করে কাসাবুভু ই কিষাঙ্গে

প্রধান মন্ত্রী মনোনীত করেছিল। এর পর সোবের সমর্থকদের সঙ্গে কিম্বার বিরোধ বেধে উঠেছিল। লুমুম্বার হত্যায় মোবুতুর ভূমিকা সংশয়ের ঊর্ধ্বে ছিল না এবং বেলজিয়ানরা কঙ্গো ত্যাগের পর সোবের নেতৃত্বে কাটাঙ্গার বিদ্রোহ দমনে মোবুতু রাষ্ট্রসঙ্ঘের কঙ্গোস্থিত সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করে এসেছে। সুতরাং মোবুতুর পশ্চিমী আনুগত্যের স্বাক্ষর কঙ্গোর রাজনীতিতে ইতিপূর্বে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। কিন্তু ক্ষমতা দখলের পরই লুমুম্বার সহকর্মী, ১ জন-ভাইস-প্রেসিডেন্ট এবং বামপন্থী গিজেঙ্গাকে মুক্ত করে মোবুতু বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। সুতরাং, এই ঘটনা মোবুতুর নীতি সম্বন্ধে সামান্য কিছু অস্পষ্টতা এনে দিলেও যুক্তরাষ্ট্রের স্বীকৃতি মোবুতুর পশ্চিমী আনুগত্য সপ্রমাণ করেছে। ইতিমধ্যে কাসাবুবু ও সোবের সমর্থকদের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে প্রধান মন্ত্রী কর্ণেল মুলুবা ২২ সদস্যবিশিষ্ট ক্যাবিনেট গঠন করেছে।

রোডেশিয়া

গত ১১ই নভেম্বর আমান স্মিথের অকস্মিকপেক্ষ স্বাধীনতা ঘোষণার পর রোডেশিয়া পরিস্থিতিতে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। বৃটিশ পার্লামেন্ট রোডেশিয়াকে কমনওয়েলথের ব্যবসায়িক সুযোগ থেকে বঞ্চিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেও রোডেশিয়াতে তেল রপ্তানী নিষেধে তৎপর হওয়া দূরে থাকুক গত ৫ই ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকারের সম্মতিক্রমে ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম কোম্পানীর ১২,০০০ টন তেল ভর্তি ট্যাঙ্কার পারসিয়ান উপসাগর থেকে রোডেশিয়ায় রওয়ানা হয়ে গেছে। অথচ গত ২০শে নভেম্বর রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবে ব্রিটেনকে তেল বন্ধের নির্দেশ সহ রোডেশিয়ার বিদ্রোহ দমন করতে বলা হয়। সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির মুখপাত্র সঙ্গতভাবেই বলেছে যে পশ্চিমী মনোপলীগুলি স্মিথ সরকারকে সাহায্য করছে: "Several dozens of big companies of the West have interest in Southern Rhodesia. It has been estimated that before 1955 they extracted from Rhodesia riches to the tune of one million dollars."

কঠোর হস্তে রোডেশিয়ার বিদ্রোহী সরকার দমনে ব্রিটেনের অনিচ্ছা সারা পৃথিবীতে বিশেষ করে আফ্রিকায় নানা প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। প্রায়ন উত্তর রোডেশিয়া ও বর্তমান জাম্বিয়া এবং রোডেশিয়ার সীমান্তবর্তী জাম্বেসী নদীতে তৈরী কারিবা ড্যামের নিরাপত্তার উপর জাম্বিয়ার খনিজ শিল্প পরিপূর্ণরূপে নির্ভরশীল। রোডেশিয়ার বিদ্রোহের পর এই ড্যামটি বিপন্ন হওয়ায় এটি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জাম্বিয়ার রাষ্ট্রপতি কেনেথ কাউণ্ডা ইংরেজের সাহায্য চেয়েছিলেন। ইংরেজ সেনাবাহিনী কারিবা ড্যামটি ঘিরে থেকে তার নিরাপত্তা বিধান করুক, কাউণ্ডার এই ছিল প্রস্তাব। ইংরেজ সরকার জাম্বেসী অতিক্রম করে রোডেশিয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ-কাজ করতে অসম্মত হওয়ায় কাউণ্ডা অপর একটি রাষ্ট্রের সাহায্যে কারিবার নিরাপত্তা বিধানের হুমকি দিয়েছিলেন। আপাতত ব্রিটিশ বিমান বহরের অংশবিশেষ জাম্বিয়ায় স্থানান্তরিত হয়েছে। ইংরেজের স্থল সৈন্য আমদানীতে কাউণ্ডা অস্বীকার করেছে।

স্মিথ সরকারের প্রতি এই প্রশ্রয়দুলভ মনোভাবের বিরুদ্ধে আদিস আবাবায় গত ৩০া ডিসেম্বর ৩৮টি রাষ্ট্রবিশিষ্ট Organisation of African Unityর বৈঠক হয়ে গেছে। এই বৈঠকে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সামরিক উপদেষ্টারাও উপস্থিত ছিলেন। ১৫ই ডিসেম্বরের মধ্যে স্মিথ সরকার উচ্ছেদে ব্রিটেন অপারগ হলে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে সকল কূটনৈতিক সম্পর্ক ছেদনের এই বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে। একটি যৌথ সামরিক বাহিনী গঠন ও সামরিক কর্মসূচী গ্রহণের সিদ্ধান্তও এই বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। রোডেশিয়ার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধের প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছে।

ব্রিটিশ সরকার তৎপর না হোলে আফ্রিকার দেশগুলি স্মিথের খেতাঙ্গ সরকারের বিরুদ্ধে অনিবার্যভাবে অস্ত্রধারণ করবে। সেই ভয়াবহ সংঘাতে বর্ণবিদ্বেষের বিভীষিকা সমস্ত পৃথিবীকে দাবানল ছড়িয়ে যেবে। সুতরাং, রোডেশিয়ার প্রশ্নে উইলসন সরকারের দায়িত্বও সর্বাধিক। ৯.১২.৬৫

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীবিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ | ৯ম সংখ্যা | পৌষ ১৩৭২

"... ...তোমার বিধান
কেমনে কী ইন্দ্রজাল করে যে নির্মাণ
সংগোপনে সবার নয়ন অন্তরালে
কেহ নাহি জানে। তোমার নির্দ্দিষ্ট কালে
মুহূর্তেই অসম্ভব আসে কোথা হতে
আপনারে ব্যক্ত করি আপন আলোতে।" রবীন্দ্রনাথ

কখনো কখনো ইতিহাস যেন ছুটে চলে, আর কয়েকটি মাত্র দিনের ভেতরে অবিশ্বাস্য ভাবে কয়ে দশক জমাট বেঁধে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি ক'রে বিস্ফোরণ ঘটায় আর মুহূর্তেই কয়েক দশক মূর্ত হ উপস্থিত হয়, স্বাভাবিক গতিতে ঘটতে যা লেগে যেত ঐ পরিমাণ সময়। ১৯৬৫র আগষ্ট থে ১৯৬৬র জানুয়ারীর আজ পর্যন্ত এমনি একটি সময়। বাইশ দিনের পাক-ভারত সংঘর্ষের বিধি স্তর এই বিপুলায়তন দেশের কয়েক কোটি মানুষকে প্রচণ্ড ভাবে নাড়া দিয়ে গিয়েছে এবং যা বিঘোষিত নীতিসমূহ জীর্ণ বস্ত্রের মতই পরিত্যক্ত হয়েছে রূঢ় বাস্তবের মুখোমুখি। তবু আজও কে বিপর্য্যস্ত নীতির মিথ্যা জয়গান শুনে যেতে হচ্ছে!

অনেক টানা-পোড়েন, অনেক বিভিন্ন, বিচিত্র ভাষ্য অতিক্রম করে শাস্ত্রীজীকে শেষ পর্য তাসখন্দে পাক-প্রেসিডেন্ট আয়ুবের সঙ্গে এক বৈঠকে মিলিত হবার সোভিয়েট আমন্ত্রণ গ্রহণ করা হয়েছিল গত ৭ই জানুয়ারী। বৈঠকটি নিষ্ফলা হবার মুখে ১১ই জানুয়ারীর সন্ধ্যায় পাক-ভারত এ যুক্ত ইস্তাহারে তাসখন্দ-ঘোষণা নামীয় দলিলটির জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই অতি বেদনাদায় পরিবেশে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর সোভিয়েট ভূমিতে জীবনাবসান ঘটে।

মৃত্যু। নাটকীয় আকস্মিকতায় এই মৃত্যু ভড়িতাহত করে দিয়েছে ভারত ও বিশ্বকে। ফ তাসখন্দ ঘোষণার লাভালাভ খতিয়ে দেখবার মনোভাব ও অবসর হয়নি অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে হতে দেওয়া হয়নি এখনও। কোনো কোনো পক্ষ ও ব্যক্তি একে ঐতিহাসিক আখ্যা দিয়েছে

যদিও আমাদের নিকট য়ুনোর অন্তর্ভুক্ত দেশগুলির পক্ষে স্বীকৃত শর্তাবলীর পুনর্বিন্যাসের অতিরিক্ত কোনও গুরুত্ব অথবা অভিনব মূল্য এর আছে বলে মনে হয়নি। বরং আমাদের বিচারে 'শান্তি' 'শান্তি'র মন্ত্রপূত পরিবেশ সৃষ্টির ভাবালুতাকে বাদ দিলে ভারতের ক্ষতি ও অমর্যাদাই হয়েছে এতে। পাক-ভারত সংঘর্ষে পাকিস্তান শুধু আক্রমণকারীই নয়, ভারতের অন্তর্ভুক্ত কাশ্মীর অঞ্চলে বহুদিন ধরে ভারতীয় নিষ্ক্রিয়তার সুযোগে অনুপ্রবেশকারী। তবু পশ্চিমী শক্তিগুলি বিশেষ-ব্রিটেন যদিও আশ্চর্য কূটনৈতিক শঠতার সহিত ভারতকেই আক্রমণকারী বলে ঘোষণা করেছে করছে বার বার। এইবারই প্রথম স্বাধীন ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর নিকট পর্যুদস্ত ও হতমান হয়েছে পাকিস্তান। তার পশ্চিমী মুরুব্বীদের ওকালতি ও কূটনীতির আশ্রয়পুষ্ট হয়ে যুদ্ধ বিরতির অন্তরালে মুখ ও মান বাঁচাতে সমর্থ হয়েছে। শুধু তাই নয় সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর আমন্ত্রণে তাসখন্দে ভারতের সহিত পূর্ণ সমতায় এক বৈঠকে মিলিত হয়ে পাকিস্তান ভারতের সহিত কেবলমাত্র রাজনৈতিক সমপর্যায়তা ও সমকক্ষতাই লাভ করেনি, নিজের বিপক্ষে সোভিয়েট প্রতিকূলতার দেয়ালও চূর্ণ করে দিতে সক্ষম হয়েছে। নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের পক্ষে এ সুদূর-প্রসারী কূটনৈতিক জয়। তাসখন্দের পর ভারতের অনুকূলে ও পাকিস্তানের প্রতিকূলে সোভিয়েটের পক্ষে কোনো পক্ষাবলম্বন আর সম্ভব হবে না বরং পাক-ভারত পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার নীতি অনুসরণ করবে। এই একটি কূটনৈতিক চালের দ্বারা সে একই সঙ্গে পাকিস্তানকে বহুলাংশে চীনের প্রভাব-মুক্ত করতে ও নিজের শক্তি কক্ষের আওতায় আনতে সক্ষম হয়েছে। এতে সোভিয়েট, এশিয়া ভূখণ্ডে অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রধানতম শক্তি ও ভাগ্যনিয়ন্তা হিসাবে দেখা দিল—এবং এতদিন ধরে যে সম্ভাবনাকে ব্যাহত করবার জন্য প্রাণপণ করছিল, চীনের সেই প্রয়াস অপাততঃ বহুল পরিমাণে বিফল হোল আর জয় হয়েছে পাকিস্তানের কূটনীতির। এতদিন পশ্চিমী গোষ্ঠী-বিশেষ ভাবে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনকে পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলিয়ে দু'তরফেরই তোয়াজ ও সহায়তা আদায় করেছে সে। এবার সেই দ্বিপক্ষীয় ক্ষেত্রে সোভিয়েটও যুক্ত হয়ে একদিকে ত্রিপক্ষীয় শক্তি সমাবেশ বনাম ভারত পাকিস্তান সমপর্যায়ে স্থাপিত হোলো। তাসখন্দ ঘোষণার ফলে এরপর থেকে এই ছকের ভেতরেই আন্তর্জাতিক রাজনীতির দাবা খেলার নূতন নূতন জটিলতা ও গ্রন্থিমোচন হয়তো দেখা যাবে। অপরপক্ষে তাসখন্দ-ঘোষণা ভারতের ভাগ্যে কেবল 'শূন্য'ই এনে দেয়নি শান্তির নামাবলী অঙ্গে আবেগোচ্ছল বাষ্প-জালের অন্তরালে নৈতিক মর্যাদাহানি ও বিপুল কূটনৈতিক পরাজয় ঘটিয়েছে আর ঠিক সেই পরিমাণেই লাভ হয়েছে পাকিস্তানের। এর পূর্ণ ফলশ্রুতি অদূর ভবিষ্যতে আত্মপ্রকাশ করবে।

এই পরিবেশে শাস্ত্রীজীর দেশের বাইরে আকস্মিক মৃত্যু ভারতের পক্ষে এক শোকাবহ ঘটনা, বিশেষতঃ শাস্ত্রীজীর আমলেই এই সর্বপ্রথম ভারতের মর্যাদা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার প্রশ্নে শাস্ত্রীজীকে দেশের দাবীকে রূপায়িত করতে দেখা গেল। এই একটি কাজের জন্য তিনি দেশবাসীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা লাভ করবেন।

তাসখন্দে যাবার পূর্বে সুদীর্ঘ প্রতীক্ষার পর ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিগত ২৩শে ডিসেম্বর—২৩শে জানুয়ারী নয়—নেতাজীর ব্রোঞ্জমূর্তির আবরণোন্মোচন করেন। যদিও ভারতের অন্যান্য স্থানে ইতিপূর্বেই নেতাজীর মূর্তি স্থাপিত হয়েছে কিন্তু বাংলায় এই প্রথম। এই মূর্তি প্রতিষ্ঠা সম্পর্কে নানা দিক দিয়ে আমাদের প্রচুর বিক্ষোভ রয়েছে। প্রধানতঃ **২৩শে জানুয়ারীর পরিবর্তে যে কোনো অজুহাতেই হোক্ ২৩শে ডিসেম্বর নির্বাচন করা আমাদের নিকট গভীর অমর্যাদাকর ও অশোভন মনে হয়েছে।** দ্বিতীয়তঃ মূর্তিটির শিল্পগত নানা ত্রুটি আমরা অমার্জনীয় বিচ্যুতি বলে মনে করি। এই কথা বলার পরে আমাদের প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন এই আবরণোন্মোচনের যথার্থ সিগনিফিক্যান্স ও ইম্প্লিকেশন অর্থাৎ মর্ম ও অর্থ কি? শাস্ত্রিজীর বক্তৃতা হিন্দিতে ছিল ইংরাজী ও বাংলা কাগজে তার পূর্ণ ভাষ্য প্রকাশিত হয়েছে কিনা তা বলা শক্ত। হিন্দি বক্তৃতার পূর্ণ ভাষ্যের জন্য এই পত্রিকার পক্ষ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে আকাশবাণীকে; আজও তা আমাদের হস্তগত হয়নি। সে পাওয়া গেলে শাস্ত্রিজীর বক্তৃতার বিশ্লেষণে এই অনন্যব্রতী, পূর্ণ আত্মোৎসর্গকারী, মহত্তম মুক্তি-সংগ্রামীর প্রতি বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্টের বাচনিক নয়, যথার্থ মনোভাব কিছুটা বোঝা যাবে। তবে সে মনোভাব কি বাস্তবিকই বোঝা কঠিন? এই প্রসঙ্গে বর্তমান ভারতের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সংখ্যায়ই একটী মূল্যবান আলোচনা করেছেন, তার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার প্রমুখ বাংলার কয়েকজন বিশিষ্ট প্রতিনিধি সরকার ঘোষিত নেতাজীর মৃত্যুর পূর্বতদন্তের যৌক্তিকতার দাবী উত্থাপন করবার জন্য প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন কিন্তু পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী সময় করে উঠতে পারেননি বা করা প্রয়োজন মনে করেননি। এর উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।

এরপর যদি আমরা এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হই যে নেতাজীর "জীবন" নয়, "পুনরাগমন" নয়, বিঘোষিত মৃত্যুর সত্যতাই বর্তমান শাসকদের পক্ষে 'অধিকতর' নিরুপদ্রব অর্থাৎ তাঁদের পক্ষে "শান্তিবহ" তবে কি ভুল করা হবে? ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু শ্রদ্ধেয় সুরেশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রশ্নের উত্তরে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার আলোকচিত্রের প্রতিলিপি এই সংখ্যায় প্রকাশিত হোলো। এ থেকে কি কারো মনে হবে যে লেখক নেতাজীর পুনরাবির্ভাবের

অন্ত আগ্রহান্বিত এবং প্রস্তুত মঙ্গলপ্রসূ বলে মনে করেন ? ভারতের দ্বিতীয় প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর নীতির বিশ্বস্ত অনুসরণকারী বলে আখ্যাত সম্প্রতি লোকান্তরিত লাল বাহাদুর শাস্ত্রী নেতাজীকে ভারতের 'অন্যতম প্রধান নেতা' বলে আখ্যাত করার মর্মার্থ কি বোঝা অত্যন্ত কঠিন। স্বাধীন ভারতের প্রথম ও দ্বিতীয় প্রধান মন্ত্রী যে নীতি অনুসরণ করে এই ১৮ বৎসর ভারতকে পরিচালিত করেছেন তার সঙ্গে সেই 'অন্যতম প্রধান নেতার' নীতি, আদর্শ ও চরিত্রগত পার্থক্য কোথায় ছিল, কেন তিনি দ্বিতীয় যুদ্ধের মধ্যে ঘনায়মান দুর্যোগ ও অনিশ্চয়তার মধ্যে ভারত ত্যাগ করে বাইরে যাবার সংকল্প নিয়েছিলেন সে সম্পর্কে ভারতের অন্য কোনো মহৎ নেতা কি বিন্দুমাত্র আলোকপাত করেছেন এই 'স্বাধীন' 'গণতান্ত্রিক' 'সমাজতান্ত্রিক' ভারতবর্ষে ? ভারতের স্বাধীনতা লাভের উপর সেই অভিযানের ফলশ্রুতিই বা কি হয়েছে সে সম্পর্কে এঁরা সম্পূর্ণভাবে নীরব থেকেই কি ঋণ পরিশোধ করেছেন। এ থেকেই কি বর্তমান ভারতের নেতাদের এই 'অন্যতম' মহৎ নেতা সম্পর্কে মনোভাব বোঝা যায়না ? ভারতের জনগণকে ইতিহাস ব্যাখ্যার কোন পথনির্দ্দেশ দিচ্ছেন এঁরা ? স্বাধীনতাত্তোর ভারত এযাবৎ যাঁদের নীতি ও আদর্শ অনুসরণ করে চলছে সেই পথানুসরণের ফলশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে অন্য কোনো ভিন্ন আদর্শ অথবা নীতি অনুসরণের প্রশ্নই উঠে না, কারণ "মহত্তম" বিপ্লবী নেতার নীতি অনুসরণ করে ভারতের ঐতিহ্য, মর্যাদা ও এই উপমহাদেশের ৬০কোটি জনতার যথার্থ মঙ্গল ও কল্যাণকে সামনে রেখে তথাকথিত "শান্তি"র আড়ালে মিথ্যার সহিত আপোষ করা যাবেনা তাতে। কাজেই বর্তমান ভারতের অনুসৃত নীতি অনুযায়ী ভারতের তৃতীয় প্রধানমন্ত্রী কে হবেন সে বিষয় আমাদের আগ্রহ ও আশা করবার কিছু নেই। আমরা অপেক্ষা করবো ভারতের নূতন নেতৃত্বের, নূতন দিকদর্শনের এবং নূতন ভাস্কর উদয়ের ; বিঘোষিত "মৃত্যুর হল"-ভারতকে সেবা করবার অধিকার থেকে যাকে বঞ্চিত করেছে এই সুদীর্ঘকাল।

১৭ জানুয়ারী, ১৯৬৬

নেতাজী সুভাষচন্দ্র
ঘোষিত মৃত্যুর সত্যাসত্য বিচার

ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার

গতকাল (২৩শে ডিসেম্বর, ১৯৪৫) ময়দানে আমাদের জাতীয় প্রধান মন্ত্রী নেতাজীর মূর্তি উন্মোচন করিয়াছেন। নানা কারণেই এটি একটি বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা। স্বাধীনতার সমরে যাঁহারা আত্ম বলিদান করিয়াছেন তাঁহাদের অনেকের মূর্তি নানাস্থানে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বাংলার বাহিরে হরিদ্বারে ও বিলাসপুরে নেতাজীর মূর্তি দেখিয়াছি কিন্তু তাঁহার জন্মভূমি বাংলাদেশে নানা জল্পনা কল্পনা বহুদিন ধরিয়া চলিয়াছে—কিন্তু এই তাঁহার মূর্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইল। এতদিনে বাঙ্গালীর একটি কলঙ্ক মোচন হইল। কেহ কেহ মনে করেন আমাদের সরকারের ঔদাসীন্য ইহার প্রধান কারণ। ইহা কতদূর সত্য বলিতে পারি না। তবে এরূপ অনুমানের কারণ আছে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের ১৫ই আগষ্ট মধ্যরাত্রে ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির উপলক্ষে দিল্লীতে প্রায় সারারাত্রি ধরিয়া মহোৎসব হয়। অনেক বক্তৃতা হয়, বহু দেশনায়ক ও স্বাধীনতা সমরের অগ্রদূতদের সম্বন্ধে অনেক ভাবাবেগপূর্ণ উচ্ছ্বসিত স্তুতি পাঠ হয়—ইহা খুবই স্বাভাবিক। বক্তৃতাগুলি রেডিওতে সকল ষ্টেশনেই শোনার ব্যবস্থা ছিল। আমি আগাগোড়া শুনিয়াছিলাম—কিন্তু নেতাজীর নাম এই উপলক্ষে কেহই উল্লেখ করেন নাই। ইহা এতই অস্বাভাবিক মনে হইয়াছিল যে ভাবিলাম বোধ হয় আমি শুনিতে ভুল করিয়াছি। সুতরাং দু একজন বন্ধুবান্ধবকে জিজ্ঞাসা করিলাম—যাঁহারা আমার মত আগাগোড়া শুনিয়াছিলেন তাঁহারাও নেতাজীর নাম উচ্চারিত হইতে শোনেন নাই এইরূপ বলিলেন। সংবাদ পত্রে এই উৎসবের যে বিবরণ বাহির হইয়াছিল তাহাতেও নেতাজীর কোন উল্লেখ ছিল না। আমি কোন রাজনীতিক দলভুক্ত ছিলাম না এখনও নাই। কিন্তু ইতিহাসের ছাত্র হিসাবে আমার দৃঢ় ধারণা হইয়াছিল যে কেবলমাত্র মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহের ফলেই ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দেয় নাই, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ গঠনও ইহার একটি মুখ্য কারণ। সুতরাং স্বাধীনতা উৎসবে নেতাজীর নাম উল্লেখ না হওয়ায় বিশেষ ক্ষুব্ধ হইয়াছিলাম। ভাবিলাম অন্যান্য অনেক সময় ভাবের আবেগে পরিচালিত হয়—সব দিক দিয়া বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করে না—এই জন্যই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে খুব অবহিত নহে। সুতরাং নিছক ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এ বিষয়টি আলোচনা করিয়া ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৫৪) একটি ছোট প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম—তাহাতে নানা ঘটনার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার আলোচনার দ্বারা আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম যে মহাত্মা গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন, নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ, ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ এই তিনটির ফলেই ইংরেজ ভারতকে স্বাধীনতা দিয়াছিল। ইহার যে কোনটির অভাব হইলে আমরা ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা লাভ করিতে পারিতাম না। এই প্রবন্ধ প্রকাশের পরে কেহ কেহ ইহার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন মহাত্মাকে আমি অত্যন্ত খাটো করিয়াছি—কারণ তাঁহার আন্দোলনের ফলেই আমরা

স্বাধীনতা পাইয়াছি। অবশ্য অনেকে মুখে এবং কেহ কেহ সংবাদপত্রের মারফৎ প্রকাশ্যে ইহার সমর্থন করিয়াছিলেন। কোন বিশ্বস্ত সূত্রে শুনিয়াছিলাম—এখানকার কর্তৃপক্ষ অসন্তুষ্ট হইয়া আমার প্রবন্ধের ইংরাজী অনুবাদ করিয়া দিল্লী দপ্তরে পাঠাইয়াছিলেন; দিল্লীর কর্তৃপক্ষও নাকি ইহাতে আমার প্রতি অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন! ইহা কতদূর সত্য জানি না। কিন্তু আমি নানা প্রবন্ধে, গ্রন্থে ও বক্তৃতায় বহুবার আমার পূর্বোক্ত মত ব্যক্ত করিয়াছি—এবং যে কারণেই হউক এ-বিষয়ে জনমত ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হইয়াছে। মহাত্মার সত্যাগ্রহই যে স্বাধীনতার একমাত্র কারণ নহে এখন একথা প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায় এবং অনেকে এই মতের সপক্ষে লিখিয়াছেন। প্রধান মন্ত্রী কর্তৃক নেতাজীর মূর্তি উদ্ঘাটন যে মত পরিবর্তনের অপরোক্ষ ফল এরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। কিন্তু নেতাজীর অবদান সম্বন্ধে যে কর্তৃপক্ষ খুব অবহিত ছিলেন না—এবং এখনও নাই—ইহার আর একটি প্রমাণ তাঁহার জীবনের পরিণতি সম্বন্ধে সঠিক তথ্য নিরূপণ বিষয়ে কর্তৃপক্ষের যথোচিত আগ্রহের অভাব ও ঔদাসীন্য। ১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু ঘটিয়াছিল—এ কথা যে অনেকেই বিশ্বাস করেন নাই, এবং এই অবিশ্বাসের যে যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে কর্তৃপক্ষ নিঃসন্দেহে তাহা জানিতেন। তথাপি এ বিষয়ে উপযুক্তরূপে তত্ত্ব অনুসন্ধান করার জন্য পুনঃপুনঃ আবেদন সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ তাহা করেন নাই। অনেক বিলম্বে তাঁহারা শাহ্‌নাওয়াজের সভাপতিত্বে যে কমিটি বসাইলেন—তাহার অনুসন্ধান পদ্ধতির প্রতি যে লোকের বিশেষ কোন আস্থা ছিল না, এবং তাহার সিদ্ধান্তকে যে অনেকেই বিশেষ কোন মূল্য দেয় নাই ইহাও সকলেই জানে। এমন কি স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলালও প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার করিয়াছেন। এই কমিশনের রিপোর্ট বাহির হইবার ৩।৪ বছর পরে ১৯৬২ সনের ১০ মে তারিখে পণ্ডিতজী একখানি চিঠিতে লিখিয়াছেন "নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ ও স্পষ্ট কোন প্রমাণ নাই।" * সাত বৎসর পূর্বে এক সাধু সৌলমারীতে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন। ক্রমে এই ক্ষুদ্র আশ্রম খুব বড় হইয়া ওঠে এবং চারিদিকে জনরব শোনা যায় যে এই সাধুই নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু। আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানি যে সরকারের তরফ হইতে একজন প্রবীণ বাঙালী কংগ্রেস সেবককে সৌলমারী পাঠান হয় সপ্তাহদিনে তদন্ত করিয়া দেখিতে যে বাস্তবিকই এই সাধু নেতাজী কিনা। যদি শাহনাওয়াজ কমিটির সিদ্ধান্তে কর্তৃপক্ষ বিশ্বাস করিতেন—এবং নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইতেন তবে এই রকম লোক পাঠাইবার প্রশ্নই ওঠে না। পণ্ডিতজীর একাধিক চিঠি ও বক্তৃতাও এই মতের সমর্থন করে।

সৌলমারীর সাধুই যে নেতাজী অনেকে একথা জোর করিয়া বলিয়াছেন। উত্তমচাঁদ এ সম্বন্ধে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা ছাপাইয়াছেন। "শারদীয়া সৌলমারী" নামক দুই সংখ্যা পত্রিকায় নেতাজীর সঙ্গে এককালে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কয়েকজন নিঃসন্দেহে সাধুই যে নেতাজী এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু সম্প্রতি সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে সৌলমারীর সাধু প্রকাশ্য ভাবে নানা স্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন এবং তিনি যে নেতাজী নহেন তাহা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন। সুতরাং সৌলমারীপর্বের যবনিকা পতন আসন্ন।

অধুনা মৃত, আমার ও নেতাজীর বিশেষ পরিচিত একজন ভূতপূর্ব অধ্যাপক ও দেশসেবক আমাকে বলিয়াছিলেন যে তিনি নেতাজীর সঙ্গে দ্বারের আড়াল হইতে কথাবার্তা বলিয়াছেন। যদিও নেতাজী তাঁহাকে দর্শন দেন নাই তথাপি তিনি পুরানো এমন অনেক কথা বলিয়াছিলেন যাহা অপরের পক্ষে জানা সম্ভব নয়—এবং এই উচ্চশিক্ষিত পরম ভদ্রলোক সত্য সত্যই বিশ্বাস করিতেন যে তিনি যাঁহার সহিত (দুই তিন বৎসর আগে) কথা বলিয়াছিলেন তিনিই নেতাজী।

* চিঠির প্রতিলিপি অন্যত্র শেষ পৃষ্ঠায়।

১৯৪৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীযুত গৌরেন্দ্রমোহন গোস্বামী 'NeLaji Mystery Revealed' নামে একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় নেতাজীর মৃত্যু কাহিনীর প্রতিবাদ করিয়াছেন এবং একখানি গ্রুপ ফটো ছাপাইয়াছেন; ইহার মধ্যে একজনকে তিনি নেতাজী বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তিনি এখনও নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করেন যে নেতাজী জীবিত আছেন এবং শীঘ্রই আত্ম-প্রকাশ করিবেন।

এইরূপ আরও অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে। এগুলি হইতে নিঃসন্দেহে কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছান সম্ভব নহে।

এই সকল ব্যক্তিগত কাহিনী বাদ দিয়া নেতাজীর মৃত্যু রহস্য সম্বন্ধে আর কোন অধিকতর নির্ভরযোগ্য প্রমাণ আছে কিনা অতঃপর তাহাই আলোচনা করিব।

'১৮ই অগষ্ট, ১৯৪৫, বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হইয়াছে' এই সংবাদ সর্বপ্রথম প্রচারিত হয় ২০শে অগষ্ট। দোমেই নামক জাপানের একটি সংবাদ-প্রচারক প্রতিষ্ঠানের মারফৎ এই খবর পাইয়া রয়টার ঐ তারিখে সগুন হইতে এই সংবাদ চারিদিকে তারযোগে পাঠান। এখানে প্রশ্ন ওঠে যে এরূপ একটি গুরুতর সংবাদ পাঁচ দিন গোপন রাখা হইয়াছিল কেন?

আরও একটু রহস্য আছে। নেতাজীর আজাদ হিন্দ গভর্ণমেণ্টে প্রকাশন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী আয়ার লিখিয়াছেন: "আমি তাদের বলেছি - যে 'তোমরা চারিটি মূল্যবান দিন নষ্ট করেছ—এবং আরও বেশী করে লোকে ওতই এ সংবাদে বিশ্বাস করে না। সুতরাং যত শীঘ্র এ খবর বাহির হয় ততই ভাল।' আমি খবরের একটা খসড়া তৈরী করিলাম (২২ অগষ্ট)··· জাপানের বৈদেশিক দপ্তরের তিনজন কর্মচারী কতক্ষণ পরে আসিয়া আমাকে প্রচারিত সংবাদের খসড়া দেখাইলেন—আমি তাহা অনুমোদন করিলাম।"

এই কথা কয়টি যদি সত্য হয় তবে ব্যাপারটা আরও রহস্যময় হইয়া ওঠে। মনে হয় নেতাজীর মৃত্যু-সংবাদ অনেকটা পূর্ব পরিকল্পনা অনুসারে সাজান ঘটনা।

২৯শে অগষ্ট নয়া দিল্লী হইতে প্রচারিত সংবাদে বলা হয় যে আমেরিকার একজন সংবাদপত্রের প্রতিনিধি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুকে বলেন যে নেতাজী সুভাষচন্দ্র মরেন নাই —তিনি জীবিত আছেন এবং সম্ভবতঃ সাইগনেই আছেন।

দোসরা সেপ্টেম্বর রয়টার লণ্ডন হইতে নিম্নলিখিত সংবাদ ঘোষণা করেন: "সানডে অবজার্ভার (Sunday Observer) —এর নয়া দিল্লীস্থ সংবাদদাতা বলেন যে ব্রিটিশ ও আমেরিকান যুদ্ধ-সমিতি (War Council) কেহই নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ বিশ্বাস করে না। জাপানী রেডিও হইতে শ্রীবসুর মৃত্যুসংবাদ ঘোষিত হওয়ার কয়দিন পরেও যে তিনি সাইগনে ছিলেন এবিষয়ে যথেষ্ট প্রমাণ (enough evidence) আছে।"

সিংহলস্থিত কাঁদী নগর হইতে ওরা সেপ্টেম্বর এই সংবাদ প্রচারিত হয়: "শ্যামদেশীয় একজন উচ্চপদস্থ সেনানায়ক (Deputy Chief of the Siamese Army) এখানে আসিয়াছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন—জাপান হইতে প্রচারিত নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ বিশ্বাস করা কঠিন। জাপানী রেডিও বলিয়াছিল যে নেতাজীর একজন সহযাত্রী, কিমুরাও মারা গিয়াছেন। কিন্তু কয়দিন পরেই জানা গেল যে কিমুরা জীবিত আছেন।

আমাদের স্মরণ রাখিতে হইবে যে এই সময় ইঙ্গ-মার্কিন কর্তৃপক্ষ নেতাজীর সংবাদের জন্য খুব ব্যগ্র ছিলো। নিউ ইয়র্কের গভর্নর ডিউই এক ভোজ সভায় বলিয়াছিলেন যে "সুভাষচন্দ্রকে আমরা ফাঁসি দিব কারণ তাঁর জন্য অনেক আমেরিকান সৈন্য মারা গেছে।" এই ছিল তখন ইঙ্গ-মার্কিনের মনোভাব—এবং তারা নেতাজীর মৃত্যুসংবাদ মোটেই বিশ্বাস করেনি। সুতরাং আমেরিকান সংবাদের উপর গুরুত্ব আরোপ না করা সঙ্গত নহে।

আর এক শ্রেণীর প্রমাণ হচ্ছে নেতাজীর বেতার-ঘোষণা।

১। ১৯৪৪ সালের ১৯শে ডিসেম্বর নেতাজী বাঙ্কক হইতে বেতারে ভারতীয়দের উদ্দেশ করে একটি ভাষণ দেন। ১৯৫৪ সালের ২৩শে জানুয়ারী শ্রীযুক্ত চিন্তামণি কর অমৃতবাজার পত্রিকায় ইহার এক অংশ উদ্ধৃত করেন এবং বলেন যে এর সত্যতা সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে তিনি নেহরুর সাথে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে প্রস্তুত। পরে জানা যায় যে বাংলার লাট ভবনের রেডিও মনিটার যন্ত্রে এই ভাষণ শুনে তার প্রচার করেন। (১৯৫৬-৭ সালে তিনি নিজেই এক প্রবন্ধে ইহা প্রকাশ করেন)।

২-৩। ১৯৪৬ সালের ১৯শে জানুয়ারী ও ১৯শে ফেব্রুয়ারী মাসে নেতাজী আরও দুইটি ভাষণ দেন। বাংলা ১৩৬৭ সনে ভারতবর্ষ মাসিক পত্রিকায় মাঘ সংখ্যায় প্রথম ভাষণটির অংশ এবং দ্বিতীয়টি পুরাপুরি উদ্ধৃত হয়।

এই তিনটি ভাষণের কথা প্রকাশিত হওয়ার পরেও আমাদের গভর্ণমেণ্ট এ বিষয়ে কোন উচ্চবাচ্য করেন নাই। প্রথম ভাষণটি লাট ভবনের কর্মচারী শুনিয়াছিলেন সুতরাং গভর্ণমেণ্ট অনায়াসেই এর সত্যাসত্য নির্ণয় করিতে পারিতেন—কিন্তু তা করেন নাই। শাহনাবাজ কমিটি আমেরিকা হইতে প্রকাশিত পূর্বোক্ত সংবাদগুলি এবং অন্ততঃ নেতাজীর প্রথম বেতার ভাষণের সংবাদ জানিতেন এই অনুমান করা অসঙ্গত নহে কিন্তু তারা এদিক দিয়া অনুসন্ধানের কোন চেষ্টাই করেন নাই। এগুলির সঙ্গে যখন যোগ করা যায় যে শাহনাবাজ কমিটি তথাকথিত বিমান-দুর্ঘটনা যেখানে ঘটিয়াছিল সেখানে সরেজমিনে তদন্ত করিবার কোন আবশ্যকতাই মনে করেন নাই—তখন এই কমিটির রিপোর্টে জনসাধারণ যে কোন আস্থা স্থাপন করে নাই তাহাতে আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। এই কমিটির তদন্ত সম্বন্ধে ইহার অন্যতম সভ্য নেতাজীর অগ্রজ শ্রীসুরেশচন্দ্র বসু যে আলাদা রিপোর্ট দিয়াছেন তাহা পড়িয়া এই কমিটির রিপোর্টের উপর কোন আস্থা রাখা কঠিন।

গত ফেব্রুয়ারী মাসের সাতই তারিখে এবং তার পরবর্তী কয়েক সংখ্যা 'হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড' পত্রিকায় ডাক্তার সত্যনারায়ণ সিংহ নেতাজীর অন্তর্ধানের পর হইতে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করেন। এতে তিনি নেতাজীর পরবর্তী জীবনের বহু ঘটনার কথা উল্লেখ করিয়াছেন—কিন্তু সে সকল আলোচনা কালে পাঠকের মনে বিভ্রমের সৃষ্টি হইবে। এর মতো বর্তমানে কেবল তাঁর একটি উক্তি আলোচনাই যথেষ্ট মনে হয়। কারণ এটির সত্যাসত্যের নির্ধারণ হলেই নেতাজী রহস্যের যবনিকা উত্তোলন করা যাইবে।

যে বিমান বন্দরে ১৮ই আগষ্ট, ১৯৪৫ সালে নেতাজীর বিমান-দুর্ঘটনা হয় সেটী ফর্মোসা দ্বীপের টাইহোকু (অথবা টাইপেই একটি জাপানী আর একটি চীনা নাম) নামক স্থানের সন্নিকটে অবস্থিত। সত্যনারায়ণ সিংহ লিখিয়াছেন যে তিনি সেই বন্দরে গিয়াছিলেন। প্রতি বিমান বন্দরেই প্রতিদিনকার বিমানপোতের গতায়াত সম্বন্ধে খুঁটিনাটি বিবরণ রোজনামচার মত লেখা থাকে। তিনি সেই রোজনামচা পরীক্ষা করিয়া এবং সেখানকার কর্মচারীদের নিকট অনুসন্ধান করিয়া নিশ্চিত খবর জানিয়াছেন যে ঐ বছর আগষ্ট (বা অন্য কোন) মাসে ঐ বন্দরে কোনরূপ বিমান দুর্ঘটনাই ঘটে নাই। এইরূপ একটা সাংঘাতিক দুর্ঘটনা বিমান বন্দরের প্রায় সীমানার মধ্যে ঘটিয়া থাকিলে যে রোজনামচায় তার উল্লেখ থাকিবে না এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অথচ এ ব্যাপারটির সত্যাসত্য গভর্ণমেণ্ট সহজেই নিরূপণ করিতে পারেন। কারণ ২।৩ জন বিশ্বস্ত লোক লইয়া একটি সমিতি করিয়া তাহাদের উক্ত বিমানবন্দরে পাঠাইয়া দিলেই ও অনায়াসে চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিতে পারে।

ডাক্তার সিংহের উক্তি সত্য প্রমাণিত হয় তবে বুঝিতে হইবে নেতাজীর মৃত্যু সংবাদ সর্বৈব মিথ্যা এবং শাহনাবাজ কমিটির রিপোর্টের কোন মূল্যই নাই। ডাক্তার সিংহ নেতাজীর

পরবর্তী জীবন সম্পর্কে যা বলিয়াছেন তখন তাহার সত্যতা সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইবে। আর ডাক্তার সিংহের উক্তি যদি মিথ্যা প্রমাণিত হয় এবং রোলাঁবাচার সত্য সত্যই বিমান দুর্ঘটনার উল্লেখ থাকে তবে নেতাজীর মৃত্যু সম্বন্ধে সংশয় দূর হইবে।

No.704-PMH/62

প্রধান মন্ত্রী ভবন
Prime Minister's House
New Delhi

May 13, 1962.

Dear Shri Suresh Bose,

I have your letter of the 12th May. You ask me to send you proof of the death of Netaji Subhas Chandra Bose. I cannot send you any precise and direct proof. But all the circumstantial evidence that has been produced and which has been referred to in the Enquiry Committee's report has convinced us of the fact that Netaji has died. In addition to this, the lapse of time now and the extreme probability of his being alive secretly somewhere when he would be welcomed in India with great joy and affection, adds to that circumstantial evidence.

Yours sincerely,

Jawaharlal Nehru

Shri Suresh C. Bose,
[illegible],
P.O. Garia,
Distt. 24 Parganas.
West Bengal.

এই যুক্তি দেখাইয়া কলিকাতার একটি জনসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয় যে ভারতের প্রধান মন্ত্রীকে অনুরোধ করা যাইতেছে তিনি যেন এই বিষয়ে স্থানীয় অনুসন্ধানের জন্য ভারতের চীফ জাষ্টিসের নেতৃত্বে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন যে শাহনাওয়াজ কমিটির রিপোর্টের পরে আর কোন তদন্তের প্রয়োজন নাই। এই রিপোর্টের উপর জনসাধারণ তো দূরের কথা স্বয়ং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুও যে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নি সেকথা পূর্বেই লিখিয়াছি। অথচ এই রিপোর্টের দোহাই দিয়া আমাদের প্রধানমন্ত্রী নেতাজীর পরিণাম সম্বন্ধে একটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে পৌঁছার এই সুবর্ণ সুযোগ স্বচ্ছন্দে ত্যাগ করিলেন। হয়ত এ রকম সুযোগ আর আসিবে না কারণ তাইহোকু বিমান বন্দরের দলিল-পত্র নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। গত কাল নেতাজীর মূর্তি উন্মোচন উপলক্ষে আমাদের প্রধানমন্ত্রী সুভাষচন্দ্রের সম্বন্ধে যে প্রশংসা-সূচক বাক্য বলিয়াছেন সেটা যদি তাঁর অন্তরের কথা হয় তবে এই 'মহাপ্রাণ ত্যাগী বীর ও ভারতের মুক্তি সংগ্রামের একজন শ্রেষ্ঠ নায়কের জীবন মৃত্যু সম্বন্ধে অনিশ্চিততা ও সন্দেহ নিরসনের জন্য তিনি এই অনায়াস-সাধ্য কার্যটি করিতে কুণ্ঠিত হইবেন ইহা বিশ্বাস করা কঠিন। আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ যে তাঁহার এই ত্রুটী কখনও মার্জনা করিবে না এ বিষয়ে আমার মনে কোন সন্দেহ নাই।

তুমি আছো

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

কোথাও তোমার নামে মূর্তি গড়া হয়,
কোথাও বা শোভে রাজপথ,
কোথাও তোমার নামে দারুণ প্রলয়,
মোহ আর মুক্তির ভৈরব।

পেশাদার জ্যোতিষীরা ও নাম ভাঙিয়ে হেসে-হেসে
জিতে নেয় ট্রফি,
আয়কর বাঁচাতে গিয়ে বণিকেরা নর্তকী উদ্দেশে
ছুঁড়ে দেয় মলিন আশরফি।

প্রহসন আরো আছে : এঁকে রাখে শৌখিন পটুয়া
তোমার কার্টুন ক্যালেণ্ডারে,
যেমন ধর্মের নামে অলিতে-গলিতে চলে জুয়া,
সেই মতো তোমার সংস্কারে।

কী করে যে এর মধ্যে তুমি আছো, ভ্রান্ত ধারণার
অন্তরালে এ অজ্ঞাতবাস
আর কবে খুলে দেবে উদয়সূর্যের সিংহদ্বার,
নেতাজী সুভাষ !

২৩শে জানুয়ারী

শান্তশীল দাশ

তবুও তোমার কথা বার বার মনে পড়ে, আর
'তুমি নেই' এ কথায় কিছুতেই মন মানে নাকো।
তোমার প্রখর দীপ্তি, সেই তো কভু হারাবার নয় ;
তুমি আছ, আছ তুমি কোন এক দুর্গম নিভৃতে।

সেখানে কঠোরতর ব্রত নিয়ে, সে-ব্রত সাধনে
মগ্ন তুমি ; দেখা দেবে তোমার অভীষ্ট যজ্ঞ শেষে।
তারপর চারিদিকে কী উল্লাস ! সে-কথা ভাবতে
আজো শিহরণ জাগে, মনে মনে জয়মালা রচি

অসংখ্য হৃদয়ে আজ ওই মূর্তি উজ্জ্বল, সুন্দর ;
সুদৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে আজো পথ চেয়ে আছে তারা।
মাঝে মাঝে মৃত্যু আসে, পরাজয় মানে সসংকোচে ;
মৃত্যুঞ্জয় মহাপ্রাণ, মৃত্যু চির নত তার কাছে।

তোমার অজ্ঞাতবাস শেষ হবে কবে যে জানি না ;
তোমার আসন খানি শূন্য আজো, নহেক মলিন ;
নিত্য সেথা পূজারতি অন্তরের শ্রদ্ধা-অর্ঘ্য দিয়ে,
অম্লান মূর্তিটি সেথা কী ভাস্বর সবার হৃদয়ে।

এখানে অনেক কালো জমা হয়ে আছে চারি ধারে,
সে-কালো মোছাবে তুমি, তোমার জীবনদীপ দিয়ে ;
তারই প্রতীক্ষায় দিন কেটে যায় ; এস, এস তুমি,
তোমার আসার লগ্ন আজো কি হল না, হে মহান।

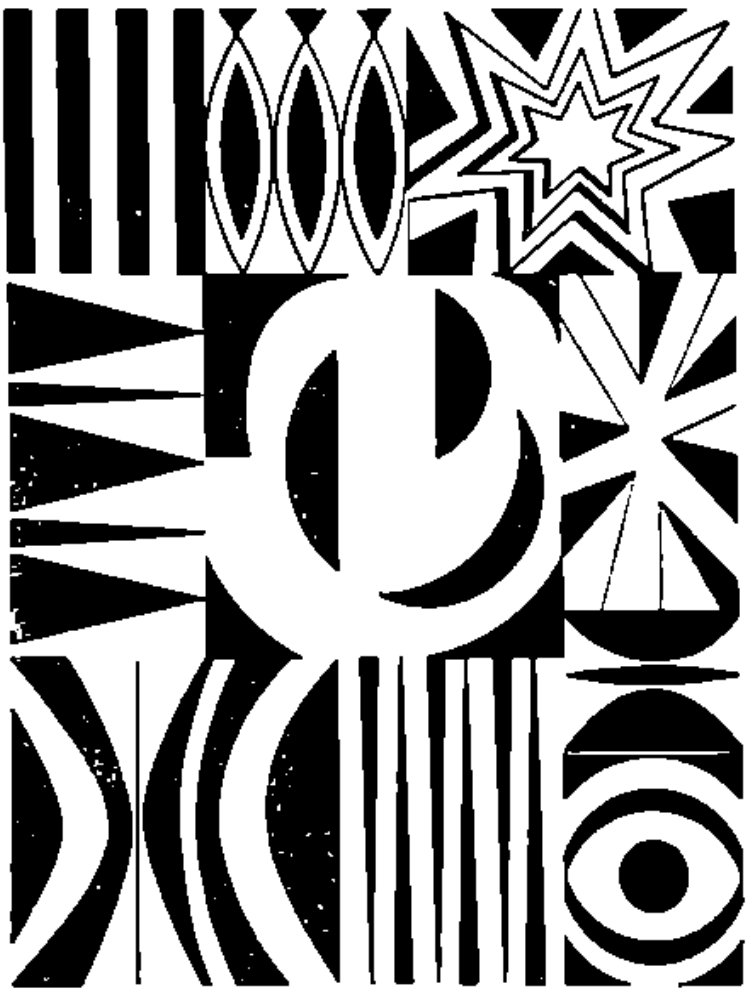

বেলজিয়াম ১৯৬৫ সালে
ভারতীয় বাটা প্রতিষ্ঠান থেকে
মোট ৯২,২৫০ জোড়া
জুতো কিনেছেন

Bata

আপনি কি---

আপনার ছেলেমেয়েদের সত্যিই ভালোবাসেন

ছেলেমেয়ের প্রতি মা বাবার ভালোবাসা শুধুমাত্র ভাবাবেগ নয়। চিন্তায়, কাজে এবং কথাবার্তায় ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়। ছেলেমেয়েদের ভালো খাওয়ানো পরানোর জন্য, তাদের সুস্থ রাখার জন্য, তাদের উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার জন্য মা বাবা অবিরামভাবে চেষ্টা করেন।

সুখের জন্য পরিকল্পনা করুন

সকলেই পারিবারিক সুখ ও আনন্দ চান। কাজেই উপযুক্ত আদর যত্নে যদি সন্তানকে বড় করে তুলতে পারেন তাহলেই শুধু সন্তান কামনা করা উচিত।

ভালো থাকার জন্য পরিকল্পনা করুন

সন্তান সংখ্যা যদি কম থাকে তাহ'লে যে আয়ই হোকনা কেন তাতে পরিবারের সকলেই অপেক্ষাকৃত ভালো খেতে পারে, পরতে পারে, শিক্ষা পেতে পারে। আপনার নিজের পক্ষে, আপনার দেশের পক্ষে এটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

আপনার স্থানীয় পরিবার পরিকল্পনা কেন্দ্রে গিয়ে পরামর্শ নিন

এখানকার চিকিৎসক আপনার বন্ধু ও পরামর্শদাতা ; সংখ্যা সীমিত রাখতে তিনি আপনাকে সাহায্য করবেন।

আপনার পরিবার যদি সুখ পরিবার হয় তাহলে দেশ আরও শক্তিশালী হয়ে উঠবে।

DA 6/81 (Bengali)

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১

১৯৫৪ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবার্ষিকী উপলক্ষে একখানি স্মারকগ্রন্থ উক্ত কলেজ হতে প্রকাশিত হয়, যাকে প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসও বলা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের বৃহত্তম ও প্রামাণ্য ইতিহাস রূপে এই বইখানি অদ্বিতীয়। প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবন সম্পর্কে আলোচনা করতে যেয়ে যে বিষয়টি সর্বপ্রথম আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা এই যে উক্ত গ্রন্থে সত্য গোপনের চেষ্টা আছে এবং আমার কাছে সমস্ত ব্যাপারটাই অশোভন মনে হয়। ছাত্র হিসেবে সুভাষ এই কলেজে যোগ দেন ১৯১৩ সালে এবং বিতাড়িত হন ১৯১৬ সালে। যখন তিনি প্রথম কলেজে ভর্তি হন তখন তিনি ছিলেন স্নেহ ও প্রশংসার পাত্র—আর তাঁর বিদায় নেবার পরই তাঁর সম্পর্কে কলেজ ম্যাগাজিনে অধ্যক্ষ ডব্লিউ. সি. ওয়ার্ড-মোরার্থ সম্পাদকীয় স্তম্ভে অত্যন্ত অপমানকর কয়েকটি মন্তব্য করেন - ওরসা তাঁর ছিল শুধু এই যে প্রত্যুত্তর দেবার কোন অধিকার তখন সুভাষের নেই। তখন অনেকের ধারণা হয়েছিল যে সুভাষের ভবিষ্যৎ জীবন অন্ধকারাচ্ছন্ন—কোনোদিন আর তাঁর মাথা তুলে দাঁড়াবার সামর্থ্য হবে না। কেননা তিনি শুধু কলেজ হতেই বহিষ্কৃত হননি, বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে নির্বাসন দেয় এবং তাঁর শিক্ষালাভের সকল দরজা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু সেই ঘটনার পর অর্ধশতাব্দী কেটে গেছে এবং আজ যখন প্রতিপন্ন হয়েছে যে প্রেসিডেন্সি কলেজের গত একশত দশ বছরের মধ্যে যত ছাত্র সেখানে ভর্তি হয়েছে তাদের মধ্যে একমাত্র বঙ্কিমচন্দ্রের কথা বাদ দিলে সুভাষ সকলের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং শুধু ঐ কলেজের ইতিহাসে নয়, ভারতীয় জাতির ইতিহাসেই তাঁর জন্য কয়েকটি অধ্যায় লিখতে হবে ঐতিহাসিকদের, তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের মাথায় সুভাষভীতি চেপে বসে আছে কেন জানিনা। যে অধ্যক্ষের আমলে সুভাষের ছাত্রজীবন প্রেসিডেন্সি কলেজে কেটেছে ১৯১৬ সালের দুঃখজনক ঘটনা ও তার পরিণামের জন্য তিনি নিজে কিছু কম দায়ী ছিলেন না; লোকটি কী ধরণের ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি অসহিষ্ণু ও কলেজে রাজভক্তি প্রচারের বাহন ছিলেন তা আমরা পরে উল্লেখ করছি। তাঁর নাম হেনরি রোশার জেম্‌স, কলেজে ইংরেজি পড়াতেন, ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১৬ সাল এই নয় বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এই সময়টাই বাংলা দেশে স্বদেশী ভাবের কাল এবং বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ও বোমা পিস্তলের যুগের কালও বলা চলে। বাংলা দেশে এই সময়ে ইংরেজ সরকারের প্রশাসনিক অত্যাচার চরমে ওঠে। অধ্যক্ষ জেম্‌স সাহেব এই সময়ে কলেজে ছাত্রদের

কাছে জাতীয়তাবাদীদের নিন্দা ও বৃটিশ সাম্রাজ্যের মাহাত্ম্য প্রচার করতেন। ফলে প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে ওঠে এবং একটা বিষাক্ত আবহাওয়া কলেজে গড়ে ওঠে। তারই পরিণতি ওটেনকেন্দ্রিক সংঘাত—যার ফলে অধ্যক্ষ জেমসকেও কলেজ হতে বিদায় নিতে হয়। আলোচ্য স্মারক গ্রন্থখানিতে কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত একটি ছবি দেওয়া হচ্ছে। প্রেসিডেন্সি কলেজে আজ পর্যন্ত যতজন অধ্যক্ষ হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বেছে বেছে এই অধ্যক্ষ জেমস সাহেবকেই সর্বোচ্চ সম্মানের সিংহাসন দিয়ে বলা হয়েছে যে তিনি একজন প্রথম শ্রেণীর অধ্যাপক, স্বপ্নদ্রষ্টা, বাস্তববাদী প্রশাসক এবং অতি সাধারণ অবস্থা থেকে তিনিই কলেজটিকে বর্তমান বৃহৎ আকারে দাঁড় করিয়ে দিয়ে যান :—তাঁর মৃত্যুর পর আর কোনো উন্নতিই কলেজের হয়নি।১

তথ্যবিচারে লেখকের এই মন্তব্য সত্য বলে মনে হয়না, কিন্তু সে কথায় আমরা পরে আসছি। লেখক সুভাষচন্দ্রের কথাও উল্লেখ করেছেন; কিন্তু একটি পুরো বাক্য (sentence) তাঁর জন্য ব্যয় করা যোগ্য মনে করেননি। এই কালের ছাত্রী ছাত্রদের মধ্যে তিনজন রাজেন্দ্রপ্রসাদ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ও সুভাষচন্দ্র বসুর উল্লেখ করে লিখেছেন 'Subhas Chandra Bose to whose untiring efforts the freedom achieved in 1947 was largely due' এই ছত্রটি। শরৎচন্দ্র বসুর নামোল্লেখও যা কেন নেই তা আমরা জানিনা।

তিন বৎসরের ছাত্রজীবনে সুভাষচন্দ্র প্রেসিডেন্সি কলেজে অনেকখানি অবদান রেখে গেছেন। প্রথম বর্ষে প্রবেশ করেই তিনি একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন, যা ঐ কলেজের পক্ষে অভিনব। সুভাষ কলেজে ঢুকতে না ঢুকতেই ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্মিলিত দৃষ্টি কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁর সহপাঠী শ্রীদিলীপ কুমার রায় লিখেছেন যে ছাত্রেরা তাঁর গমন পথের দিকে চেয়ে থাকত এবং তিনি চলে গেলে একে অন্যকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলাবলি করত : ঐ ঐ সুভাষ. দিলীপ রায় লিখছেন : "সুভাষের নাম তখনই ছাত্রমহলে ছড়িয়ে পড়েছিল। মস্ত বাপের ছেলে, অধ্যাপকের প্রিয়, সহপাঠীদের হিরো সর্বোপরি দেশের শ্রেষ্ঠ কিশোর জনসেবকদের অন্যতম।" (স্মৃতিচারণ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৯৪)। "অধ্যাপকের প্রিয়" শব্দদ্বয় লক্ষ্য করার মতো। কেন সেকথা আমরা পরে আলোচনা করেছি। বস্তুত প্রেসিডেন্সি কলেজের বারান্দায় মাঠে, ক্লাসে সুভাষ তখন আলোচনার বিষয়। "প্রেসিডেন্সি কলেজে তার অপরূপ মুখকান্তি, উদার ললাটে প্রতিভার ছাপ ও ঋজুদেহে বীর্যের সহজ দীপ্তি" (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ৩১০) কার না দৃষ্টি আকর্ষণ করত? তারপর প্রকাশ পেল তাঁর বাগ্মিতার শক্তি। দিলীপ রায়ের সাক্ষ্য এই : "প্রেসিডেন্সি কলেজে আসতে না আসতে সুভাষ ডিবেটিং ক্লাবের দিকপাল হয়ে উঠল। শুনলাম সে নাকি চমৎকার ডিবেট করে। তার সুগৌর ব্রহ্মচর্যপুত উজ্জ্বল মুখকান্তি যখন বক্তৃতা দিতে

১ A special tribute should be paid to the Principal who came and left during this period (1907-1917) after about ten years of distinguished service—Henry Hosher James. It would be hyperbolic to claim that he found the College brick and left it marble, but it may be said without hesitation that much of the development of the College was due to its having as Principal a man who was not merely a first rate scholar and a visionary but also a practical administrator, and it is doubtful if the College has made any progress of a fundamental character since James left. (S. C. Sengupta, History of the College, P. C. Centenary Volume p. 26)

উঠতে ঈষৎ রক্তিম হয়ে উঠত তখন আমার চোখ নিচুয়ে উঠত আনন্দ বিস্ময়ে।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৫) প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিবেটিং-এ সুভাষের সমকক্ষ আর কেউ তখন ছিলনা এবং তাঁর খ্যাতি সে বিষয়ে অল্প দিনেই ছড়িয়ে পড়েছিল। দিলীপকুমার রায়ের সাক্ষ্য হতে আরও উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। তিনি লিখছেন: "কিন্তু কী আশ্চর্য, যেই সুভাষ ওঠে অমনি মনে হয় তার প্রতিপক্ষ পথ্যা নিয়েছে সুভাষের তর্কবানে ছিন্নভিন্ন হয়ে। সত্যিই যেমন চমৎকার ছিল তার ভাষণভঙ্গি তেমনি নিপুন তার ওকালতি।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২৯৮)। তিনি অন্যত্র লিখেছেন: "সুভাষ ডিবেটিং ক্লাবের পাওা বলতে পাওা—কর্তা বলতে কর্তা—নেবক বলতে নেবক—উদ্যোক্তা বলতে উদ্যোক্তা। ও ছিল বাগ্মিতা আন্দোলনের প্রাণ-শক্তি।" (ভূবর্ণ চকন, পৃঃ ৩২) প্রেসিডেন্সি কলেজের শতবর্ষপূর্তি স্মারক গ্রন্থে অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখেছেন যে ১৮৮৯-৯১ সালে প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম ডিবেটিং ইউনিয়ন হয়েছিল কিন্তু তা সে সময়ই ভেঙে যায়। ১৯১৩-১৪ সালে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে নতুন করে ডিবেটিং-এর পত্তন হয়।২

ডিবেটিং-এর পত্তন করেই সুভাষ ছাত্রদের ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টা করেন। ইতিপূর্বে ১৯০৫ সালে অধ্যক্ষ ডঃ পি, কে, রায়ের উদ্যোগে একটি ছাত্র-ইউনিয়ন গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছিল। তার নিয়মাবলীও প্রস্তুত হয়ে গিয়েছিল এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদকে সেক্রেটারি নির্বাচিতও করা হয়েছিল কিন্তু সে ইউনিয়ন কোন কাজও করেনি, টেঁকেওনি। এরপর ১৯১৪ সালে Students' Consultative Committee নাম নিয়ে একটি ছাত্র-ইউনিয়ন গড়ে ওঠে। অধ্যাপক সুশোভন সরকার লিখছেন যে অধ্যক্ষ জেমস সাহেবই এই কমিটিটি গড়েন।৩ তাঁর কথা আক্ষরিক অর্থে মিথ্যা নয়। কিন্তু এই প্রথম ছাত্র ইউনিয়নের প্রস্তাবনা কার ছিল? কার নেতৃত্বে মিলিত হয়ে ছাত্ররা এর দাবী জানিয়েছিল? অধ্যক্ষ জেমসকেই বা কে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ছাত্র-ইউনিয়নের প্রস্তাবে রাজি করিয়েছিল? অধ্যাপক সরকারের লেখা পড়ে মনে হয় পরিকল্পনাটি যেন জেমস্ সাহেবের নিজস্ব, তিনিই উদ্যোগ-আয়োজন করে ব্যাপারটি গড়ে তুলেছেন। সে কথা সত্য নয়। কেননা এই ইউনিয়নের প্রাণ ছিলেন সুভাষচন্দ্র এবং তাঁর নেতৃত্বাধীনেই ছাত্ররা চলত। এই ইউনিয়নের সংগ্রিষ্ট ছাত্ররা প্রেসিডেন্সি কলেজের তিক্ত ও বিষাক্ত আবহাওয়ার প্রতিকার করতে চেয়েছিল, তারা অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্পর্ককে একটা নতুন ভিত্তিতে স্থাপন করতে চেয়েছিল এবং ছাত্রদের কাজ যে শুধু অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকদের বক্তৃতা শোনা নয় তাও বোঝাতে চেয়েছিল। সে কারণেই শেষ পর্যন্ত কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষ বাধিয়ে ওঠে। সেই সংঘর্ষের পরিণামস্বরূপ সুভাষ হন বিতাড়িত এবং ছাত্র-ইউনিয়নটিকেও কর্তৃপক্ষ ভেঙে দেন। যদি সুভাষ ইউনিয়নের প্রাণ না হতেন এবং ছাত্ররা তাঁর অনুবর্তী না হত এবং ওটেন সাহেবের ঘটনায় এই ইউনিয়ন জড়িত না থাকত তবে কি সুভাষকে বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়নটিকেও ভেঙে দেওয়া হত? জেমস সাহেবের পর যিনি অধ্যক্ষ হয়ে এলেন সেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ সাহেব কলেজ ম্যাগাজিনে তাঁর

২। In 1913-14 there was a First Year Debating Union of which Subhas Chandra Basu seems to have been the leader. Next year the same batch of students ran a Second Year Union (P. C. Centenary Volume, p 166)

৩। In 1914, Principal James set up the Consultative Committee of students representatives to which Pramthanath Bandyopadhyay was the secretary for 1914-15 (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ১৭৯)

প্রথম সম্পাদকীয় নিবন্ধে শুধু সুভাষকেই নয়, তাঁর দলীদের এবং ছাত্র ইউনিয়নটিকেও তীব্র আক্রমণ করেন ও ঐ ইউনিয়ন যে আর চলতে পারে না সেকথা বলেন। ইউনিয়নের প্রতি এই আক্রোশ কেন? অধ্যাপক সরকারও স্বীকার করেছেন যে ওটেন ঘটিত গোলযোগের ফলেই ইউনিয়নটিকে বাতিল করে দেওয়া হয়।৪ আমাদের জিজ্ঞাস্য এই যে যার অনক অধ্যক্ষ জেমস তা কী ভাবে বিদ্রোহী ছাত্রদের দলে পরিণত হয়? রাজভক্ত বিচক্ষণ বিদগ্ধ মিঃ জেমস কি এত বোকা ছিলেন যে বৃটিশদ্রোহিতার আদর কলেজে বসাবেন তিনি নিজের উদ্যোগে? এবং এ প্রশ্নও আমরা করতে পারি যে জেমস সাহেব ১৯০৭ সাল থেকে অধ্যক্ষ থাকা সত্ত্বেও ১৯১৪ সালের আগে এই ইউনিয়ন গড়ার কথা ভাবেননি কেন? পরিকল্পনাটি কি তাঁর মাথার এক কোণে চাপা পড়েছিল? সেক্রেটারি প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ও যদি ইউনিয়ন গঠন বা পরিচালনায় প্রকৃত কর্তৃত্ব করতেন তাহলে সুভাষ বিতাড়নের সঙ্গে সঙ্গে ইউনিয়ন ভেঙে দেওয়া হত না। বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ভাল ছাত্র ও নিরীহ প্রকৃতির মানুষ ছিলেন, লেখা-পড়ার বাইরে নিজের ভবিষ্যৎ ছাড়া অন্য কিছু ভাবতেন না এবং ছাত্রদের সংঘবদ্ধ করা বা তাদের একটা নিজস্ব শক্তির স্বাদ দেবার কথা তাঁর মাথায় আসেনি। যাই হোক এপ্রসঙ্গে আমরা পরে আলোচনা করছি।

অধ্যাপক মুখোপাধ্যায় সরকারের রচনার অধিকতর ত্রুটি ঘটেছে কলেজ ম্যাগাজিন সম্পর্কিত প্রবন্ধে। তিনি এই পত্রিকা প্রকাশের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব দিয়েছেন অধ্যক্ষ জেমস, প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও যোগেশচন্দ্র চক্রবর্তীকে। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার এই যে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালে, তার আগে নয়। তার আগে হাতে লেখা ম্যাগাজিনের চল ছিল, প্রমথনাথ সেই হাতে লেখা কাগজ নিয়েই সন্তুষ্টচিত্তে চালাচ্ছিলেন। জেমস সাহেবও এ বিষয়ে বাধা দামাননি। সুভাষ এবং তাঁর দল বললেন, মুদ্রিত পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে এবং জেমস সাহেবকে বুঝিয়ে এ ব্যাপারে তাঁরা রাজিও করালেন। অধ্যাপক সরকার এ বিষয়ে উল্লেখ করে বলেছেন যে ছাত্রদের অধিকাংশ এক সম্মিলিত আবেদনপত্র দেয় ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য এবং অধ্যক্ষ জেমস সাহেব persuaded হলেন।৫ ম্যাগাজিন প্রকাশের জন্য ছাত্রদের তরফ হতে যে দরখাস্তখানি দেওয়া হয়েছিল সেটিই ম্যাগাজিন প্রকাশের আসল রহস্য বা কারণ। ঐ দরখাস্তে সুভাষের নাম স্বাক্ষরিত আছে বলে আমাদের বিশ্বাস. এবং প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ যদি সেখানি বের করতে পারেন তবে আমাদের সংশয়-ভঞ্জনের অবকাশ ঘটে। প্রথম ম্যাগাজিন কমিটিতে সুভাষচন্দ্র সদস্য ছিলেন। সম্পাদক অধ্যক্ষ জেমস সাহেব ম্যাগাজিনটির যে তিনটি উদ্দেশ্য নির্ণয় করেন তার মধ্যে দ্বিতীয়টি অর্থাৎ 'To give the news from other Colleges and the University'—এটি নির্ণয়ে বিশেষভাবে সুভাষের বক্তব্য তাঁকে সাহায্য করেছিল মনে হয়। কেননা সুভাষের অধিকাংশ কালকর্ম তখন পরিচালিত হত প্রেসিডেন্সি কলেজের বাইরে,

৪ In its second year, the Consultative Committe was suspended on account of the College disturbances in 1916.

৫ The College Magazine apparently existed for some time in a manuscript form under the editorship of Pramathnath Bandopadyay and Jogeshchandra Chakrabarti (who were appointed appropriately the first Editor and the first Secretary), suported by a "Chartist petition signed by the vast majority of the students." This pursuaded Principal James to sanction the introduction of a compulsory Magazine subscription for all students which has continued ever since. (উক্তগ্রন্থ, পৃঃ ১৬১)

বিভিন্ন কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ এবং মাঝে মাঝে তিনি কলকাতার বাইরেও যেতেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করার জন্য ইউনিয়নের প্রয়োজনীয়তা তিনি অনুভব করেছিলেন, কিন্তু তার চেয়েও গভীরভাবে তিনি অনুভব করেছিলেন গোটা বাংলা দেশের ছাত্রসমাজের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তা, এবং সম্ভব হলে তাদের ঐক্যবদ্ধ করারও প্রয়োজনীয়তা। এ বিষয়ে বাস্তব কর্মপন্থা তাঁর ছিল এবং অকাতরভাবে সে কর্ম-পন্থা তিনি কাজেও প্রয়োগ করতেন। ভারতের ছাত্র আন্দোলনে তাঁর অবদান অপরিসীম এবং ছাত্র ফেডারেশন একসময় তাঁরই নেতৃত্বাধীনে পরিচালিত হত। ছাত্রদের কর্তব্য ও ভূমিকা সম্পর্কে তিনি বহু ভেবেছেন, তার প্রমাণ তাঁর 'তরুণের স্বপ্ন' বা 'নূতনের সন্ধানে' গ্রন্থে প্রচুরভাবে পাওয়া যায়। ছাত্রদের নিয়ে তাঁর এই ভাবনা ও কাজ শুরু হয়েছিল তাঁর কলকাতায় আসারও আগে, কটকে থাকতেই। কলকাতায় এসে সেই চিন্তা ও কর্মধারা আরও খরতর বেগে প্রবাহিত হতে শুরু করে। শুধু তাঁর সমশ্রেণী বা নিচু শ্রেণীর ছাত্রদের সঙ্গেই তাঁর যোগাযোগ ছিল না, উচ্চতর ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গেও তাঁর অবাধে যোগ ছিল। সে সময় ছাত্রদের তিনি দেশের সমস্যা ও তাদের কর্তব্য সম্পর্কে বিশেষ-ভাবে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই ডিবেটিং ক্লাবের প্রবর্তন করেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ডিবেটিং-এর আয়োজন করার পিছনে তাঁর কী মানসিকতা ছিল দিলীপকুমার রায়ের সাক্ষ্য হতে তা বিশেষ ভাবে জানা যায়। তিনি লিখছেন :

"সুভাষের সঙ্গে প্রথম আলাপ হয় আমার এই ডিবেটিং ক্লাব নিয়েই।" (স্মৃতিচারণ, পৃঃ ২৯৫)

"সে বললে,—আমাদের মধ্যে তর্কবিতর্কের অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। কারণ এদেশে বড় বড় বক্তা, বাক-বোদ্ধার বিশেষ প্রয়োজন—মানে, স্বাধীনতার জন্যে যুধ্যমান··" (আমার বন্ধু সুভাষ, পৃঃ ৫)

"তারপর সে বললে দৃপ্ত কণ্ঠে—হ্যাঁ, দেশের জন্যে জীবন দিয়ে আগুন জ্বালিয়ে রাখব। কিন্তু শুধু ভাবপ্রবণতায়ও ইজ্জত মোটে না। তাই আমাদের অস্ত্র-বর্ম সংগ্রহ করতে হবে, আধুনিক জগতের যোগ্য করে তুলতে হবে নিজেদের।" (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৬)

"আমি চাই যে ছেলেরা স্বতন্ত্র চিন্তা করতে শিখুক। চিন্তাশক্তির উন্নতির সঙ্গে সঙ্গেই আত্মপ্রত্যয় আসবে—সেটাই ত বড় লাভ। আমরা ভারতবাসীরা পরের মুখ চেয়ে চলতেই বড় বেশি অভ্যস্ত—কাজে, কর্মে, মতামতে. কোনো কিছুর উদ্দীপনার সবটাতেই আমরা আর-একজনের অপেক্ষায় বসে থাকি। তাই আমি এই বিতর্কসভার মধ্যে দিয়ে আমাদের নিজের পায়ে দাঁড়াবার ক্ষমতা অর্জন করে নিতে চাই।" (পৃঃ ৯)

সুভাষচন্দ্রের বাল্য ও কৈশোর জীবন সম্পর্কে অবহিত হলে আমরা দেখি যে তাঁর প্রতিটি কর্মের পিছনে একটা মানসিক চেতনা ও চিন্তাধারা ছিল, কোনো বিশেষ কাজের খাতিরেই তিনি কাজ করতেন না, সব কাজই ছিল একটা ব্যাপক দৃষ্টি ও পরিকল্পনার অঙ্গীভূত। পরবর্তী জীবনেও এটাই দেখা গেছে। কলেজে ঢুকে ডিবেটিং ক্লাব যে শুধু বিতর্কে নাম করা বা আনন্দ পাবার জন্য তিনি করেননি তা উপরোক্ত সাক্ষ্য হতেই বোঝা যায়। তিনি সেসময় কী চাইছিলেন এবং ছাত্রদের কাছে কী আশা করছিলেন তাও সুস্পষ্ট। প্রেসিডেন্সি কলেজের বাইরে অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংবাদ সংগ্রহ ও আদানপ্রদানে প্রকাশ করার মাধ্যমে তিনি যে বৃহত্তর ছাত্রসমাজের সঙ্গে একটা সেতুবন্ধ গড়তে চাইছিলেন এ বিষয়ে সন্দেহ করা চলে না। অন্যান্য সেসময় বা আর কোনো অধ্যাপক বা ছাত্রের মাথায় যে এধরণের চিন্তা ভিড় করে আসেনি সেকথাও বলা বাহুল্য। তাঁদের জীবনের প্রেরণা ছিল সীমিত। যে সময় বাংলার ছাত্রসমাজে জাতীয়তাবাদের উত্তপ্ত হাওয়া প্রবল বেগে বইছে সেসময়

জেমস সাহেব যে তাঁর কলেজকে একান্তে সক্রিয় বৃটিশরাজ অনুরক্তির নিবিড় ও মনোরম স্থান করে রাখতে চেয়েছিলেন সেকথা অধ্যাপক সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত স্বীকার করেছেন।৬ ছাত্ররা যে কর্তৃপক্ষের চিন্তাধারা অনুসারে চলত না তাও অধ্যাপক সেনগুপ্ত উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে জেমস সাহেব স্বকীয় উদ্যোগে অন্যান্য কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের নিবিড় যোগবন্ধন ঘটাবার ব্যবস্থা করবেন, একথা বিশ্বাস করা শক্ত। সুভাষই তাঁর এ বিষয়ক পরিকল্পনাটি বেশ মধুর করে পেশ করে থাকবেন এবং অধ্যক্ষকে সম্মত করানো তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল এই কারণে যে তিনি কর্তৃপক্ষের সুনজরে ছিলেন এবং লোককে নিজের প্রস্তাবে রাজি করাবার একটা অদ্ভুত জন্মগত প্রতিভাও তাঁর ছিল। পরবর্তী কালে এই প্রতিভার বিকাশ ঘটে, এবং ফলে হিটলার, মুসোলিনী, তোজো প্রভৃতিকেও তিনি বশতে আনতে পেরেছিলেন।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের প্রথম যে উদ্দেশ্যটির কথা লিখেছিলেন অধ্যক্ষ জেমস প্রথম সংখ্যাতেই, সেটির নির্দেশেও সুভাষের বক্তব্য কার্যকর হয়েছিল মনে হয়। সুভাষই প্রথম এই কথাটির গুরুত্ব সকলকে বোঝান যে ছাত্র ও অধ্যাপকদের সম্পর্ক ভালো হওয়া চাই, কলেজে একটা আত্মীয়তার আবহাওয়া চাই। এই উদ্দেশ্যেই ছাত্র-ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠা হয় এবং কলেজ ম্যাগাজিনেরও যে সেটিই প্রথম উদ্দেশ্য বলে ঘোষিত হল সে যোগাযোগটি লক্ষণীয়। এ বিষয়ে আমরা পরে বিশদ আলোচনা করছি। আমরা যদি মনে রাখি যে কলেজ ম্যাগাজিন প্রকাশের পরিকল্পনা ও দাবী আসে ছাত্রদের তরফ হতে, অধ্যক্ষের পক্ষ হতে নয়, তাহলে সব কৃতিত্বের ভাগী অধ্যক্ষকে করতে হয়না। সম্পাদক ও সেক্রেটারি বলে যে দুজন ছাত্রের নামোল্লেখ হয়েছে তাঁরা খুব দূরপ্রসারী ভাবনা, সংগঠনমূলক কর্ম বা ছাত্রদের নিয়ে এধরণে আন্দোলন করার মতো মানসিক বলের অধিকারী ছিলেন না—যদি থাকতেন তবে অনেক আগেই ম্যাগাজিন প্রকাশ হয়ে যেত, সুভাষের আগমন ও কলেজ জীবনে আত্ম-প্রতিষ্ঠা লাভ পর্যন্ত তাঁদের বসে থাকতে হত না। হাতে লেখা ম্যাগাজিন নিয়েই তাঁরা মোটামুটি তৃপ্ত ছিলেন—ছাত্রদের সম্মিলিত দাবীসনদ কর্তৃপক্ষের কাছে না গেলে, ঐ নিয়েই তাঁরা তৃপ্ত থাকতেনও। পত্রিকা প্রকাশ, সম্পাদনা ও পরিচালনার ব্যাপারে সুভাষ পরবর্তী জীবনে বারবার নিজেকে নিযুক্ত করেছেন; শ্রীযুক্ত জেমস, বন্দ্যোপাধ্যায় বা চক্রবর্তী মহাশয়কে এ বিষয়ে আর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে কখনো দেখা যায়নি। কাজেই পত্রিকা প্রকাশের মৌল প্রেরণা সেদিনকার ছিল তা পরবর্তী ইতিহাসের সাক্ষ্যেই প্রমাণিত হয়ে গেছে বলে আমাদের মনে হয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের রিলিফ ফাণ্ড গঠন ও পরিচালনার ইতিহাস লিখতে যেয়েও অধ্যাপক সরকার সুভাষচন্দ্রের কথা উল্লেখ করেন নি এবং সেটা কতখানি ভ্রমাত্মক আমরা তা পরে আলোচনা করব।

২

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিন প্রথম মুদ্রিত আকারে

৬। The Presidency College.....was obviously not a proper nursery for *Swadeshi* education; but although the College carried on it normal duties, heedless of the storm blowing outside, the agitation deeply stirred the student community, and many pupils of the Presidency College played a leading part in propagating *Swadeshi* and in founding the National Council of Education (P. C. C. Volume, p. 21)

প্রকাশিত হয় ১৯১৪ সালের নভেম্বর মাসে। কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ এইচ. আর. জেমস এম. এ এই সংখ্যার ম্যাগাজিনটির আদর্শ ও উদ্দেশ্য বর্ণনা করে একটি ভূমিকা লেখেন। তাতে তিনি লেখেন: কলেজের সামগ্রিক জীবনের মুখপত্র এই ম্যাগাজিন। আমাদের জীবনধারা যেমন এতে প্রতিবিম্বিত হবে, তেমনি সেই জীবনধারার গতিবেগ সঞ্চারও করবে এই পত্রিকা। কলেজের বাস্তব দৈনন্দিন কাজকর্মের সঙ্গে যত ঘনিষ্ঠ যোগ এর থাকবে ততই এই উদ্দেশ্য সফল হবে। এই পত্রিকায় ঘটনার বিবরণ থাকবে, থাকবে মতামত বিনিময়ের সুযোগ, কলেজের প্রাসঙ্গিক সব বিষয় ও গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলি সম্পর্কে খোলাখুলি আলোচনার অবাধ সুবিধা এতে দেওয়া হবে। এইগুলিই হবে এর প্রধান ও প্রথম কর্তব্য; এই কর্তব্য পালনে ত্রুটি হলে একে আর কলেজ ম্যাগাজিন আখ্যা দেওয়া চলবে না।[১] অধ্যক্ষ লিখছেন যে এছাড়া আরও দুটি উদ্দেশ্য পত্রিকার আছে; তা হল অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সংবাদাদি পরিবেশন করা এবং সাহিত্য ও বিজ্ঞানবিষয়ক প্রবন্ধ প্রকাশ করা। কিন্তু তিনি বলছেন শেষোক্ত উদ্দেশ্য দুটিকে বরং গৌণ উদ্দেশ্য বলা চলে যতই তাদের গুরুত্ব থাকুক না কেন। সর্বাগ্রে স্থান দিতে হবে প্রধান উদ্দেশ্যটিকেই, অর্থাৎ 'current events and interests and the interests of the college' সম্পর্কে আলোচনা করাই এর প্রধান কাজ।

অধ্যক্ষের এই আশা পূর্ণ হয়নি—সম্ভবত বাস্তব ঘটনার ও সমস্যার মুখোমুখি হবার পর তিনি বুঝেছিলেন তাঁর লেখাটা একটু রঙ-চড়ানো গোছের হয়ে গেছে। কলেজ ম্যাগাজিন যখন প্রথম বেরোল তখন সুভাষচন্দ্র দ্বিতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র, পূজার ছুটির পর কলেজ খুলেছে কিন্তু টেস্ট পরীক্ষা সামনেই, তারপর কাইভাল। অতএব তখন জেমস সাহেব বুঝতেই পারেননি যে কোনো বিপদ ঘটতে পারে। তৃতীয় বর্ষে পদার্পণ করে সুভাষ ও তাঁর সহপাঠীর দল যখন অধ্যাপকদের অপমানকর ব্যবহার নিয়ে উত্তেজিত হতে লাগলেন তখন তাঁদের সেই মনোভাবের কথা তাঁরা কলেজ ম্যাগাজিন মারফৎ প্রকাশ করতে পারেননি। বহুদিন ধরে এই কলেজে অধ্যাপক ও ছাত্রদের সম্পর্ক বিষাক্ত হয়ে উঠছিল; অধ্যাপকদের ভারতবিদ্বেষ ও ইংরেজ শাসনপ্রেম ছাত্রদের মনকে অশান্তিতে ভরে দিত এবং পুলিশের দৃষ্টিতে তখনকার প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা ছিল রীতিমতো সন্দেহভাজন। কিন্তু এই সকল গুরুতর বিষয় সম্পর্কে প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের কোনো পাতায় কোনো কোণেও এতটুকু আলোচনা বেরোয়নি। এবং আরও আশ্চর্য এই যে ওটেন সাহেবের ব্যাপার নিয়ে যে সংঘর্ষ কলেজে ঘটে, যার সংবাদ সেদিন সারা কলকাতাকে উত্তেজিত করেছিল এবং যার ফলে সুভাষ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় হতে বহিষ্কৃত ও নির্বাসিত হন এবং অধ্যক্ষ জেমস সাহেবও কলেজ ছাড়তে বাধ্য হন সেই সংঘর্ষ বা তৎ-সংক্রান্ত কোনো আলোচনা কলেজ ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়নি। শুধু সম্পাদকীয় স্তম্ভে পরবর্তী অধ্যক্ষ ওয়ার্ডসওয়ার্থ সাহেব অনুপস্থিত ও বহিষ্কৃত ছাত্র সুভাষচন্দ্রের প্রতি, তাঁর

১। Rightly understood, a college magazine is an organ of the corporate life of the college. It is at once an expression of the common life and a quickener of its activities. It fulfils these functions better in proportion as it keeps as closely in touch with the actual work-a-day life of the college. It should chronicle events; it should communicate views; it should afford opportunities for the free discussion of college affairs and interests. These things it should do first and foremost; and if it fails to do these things, it is no College magazine. (Presidency College Magazine Vol 1, No 1, p. 2)

কোনো নামোল্লেখ না করেই, তীব্র ও অতি অপমানকর কটূক্তি বর্ষণ করেন। এটি একতরফা বিচার। সুভাষ বা তাঁর পক্ষ নিয়ে আর কাউকে সেই কটূক্তির জবাব দিতে বা এ বিষয়ে কোনোরকম আলোচনা করতেই দেওয়া হয়নি। জেমস সাহেবের উদ্বেগের ঘোষণা অতএব পুঁথির পাতাতেই আবদ্ধ রইল বলা যায়, বরং তাঁর লেখার কালি শুকোতে না শুকোতেই তা একটা হাস্যকর প্রহসনে পর্যবসিত হল। এমন-কি জেমস সাহেব কথিত ম্যাগাজিন প্রকাশের দ্বিতীয় উদ্যোগটিও আর বজায় থাকেনি—অন্যান্য কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সংবাদ প্রকাশও এতে বন্ধ হয়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর এই তিনমাসে তিনবার এবং নভেম্বর থেকে মার্চ এই তিন মাসে তিন বার—কী মাসের প্রথম সোমবারে ম্যাগাজিনটি বেরোবে। শেষ পর্যন্ত সে ধারাও আর রাখা যায়নি। অর্থাৎ বলা যায় জেমস সাহেবের কথা সবই প্রায় বিফল হয়েছে।

এই সময়ে কলেজে একটি ম্যাগাজিন কমিটি ও একটি Students' Consultative Committee গঠিত হয়। সুভাষচন্দ্র বসু ম্যাগাজিন কমিটিতে ছিলেন এবং পরের বৎসর কনসালটেটিভ কমিটিরও সদস্য হন। ম্যাগাজিন কমিটিতে দ্বিতীয় বর্ষের আর দুজন ছাত্র শ্রীরমাপ্রসাদ মুখার্জি এবং নিবারণ মুখার্জিও ছিলেন। প্রাক্তন ছাত্রদের সঙ্গে যোগা-যোগ ও তাঁদের সংবাদ বা লেখা সংগ্রহের ভার সুভাষচন্দ্র ও রমাপ্রসাদের উপর যৌথভাবে ন্যস্ত হয়।

এই সময়ে য়ুরোপে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে। পৃথিবীর ইতিহাসে সে যুদ্ধের তুলনা পাওয়া যায়নি। সর্বত্র গভীর উত্তেজনা। প্রেসিডেন্সি কলেজ সরকারী কলেজ, তার অধ্যক্ষ ইংরেজ, অধ্যাপকদের মধ্যে আছেন আর, এন, সিনক্লাইস্ট, ই, এফ, ওটেন, ই, পি, হ্যারিসন প্রভৃতি ব্রিটিশ সাহেব এবং অনেক বাঙালী অধ্যাপকও যে কর্তাভজার দলে নাম লেখাননি তা নয়। অতএব যুদ্ধ ব্যাপারে ইংরেজ সরকারকে সাহায্য দান করা কর্তব্য বলে স্থির হল। College Notes শীর্ষক বিভাগে সাড়ম্বরে লেখা হল: জগতের ইতিহাসে বৃহত্তম যুদ্ধের প্রতিধ্বনি ভেসে আসছে রণাঙ্গন হতে বহু দূরে অবস্থিত আমাদের কাণে—জীবন-মরণের বিশাল সমস্যা নিয়ে আজ চলছে কারবার। কিন্তু দ্বন্দ্বের ভিতর হতেই ভালোর উদ্ভব হয়। এই যুদ্ধের সবচেয়ে ভালো ফল হচ্ছে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য জুড়ে স্বার্থের সমসূত্রতা ও ভাবাবেগের ঐক্যের অভূতপূর্ব প্রকাশ। সম্রাটের বিশেষত্ব সাম্রাজ্যের প্রতি তটে আজ আহ্বানে পড়ছে আনুগত্যের ওরঙ্গ।৮

ভারতীয় সৈন্যরা ইংরেজের হয়ে লড়তে যাচ্ছে য়ুরোপে, তাদের খরচপত্র দেওয়া হবে ভারতের এক্সচেকার হতে—এর চেয়ে শুভ ও গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ যে আর হতেই পারে না, সেকথাও লেখা হয়েছে। 'ইয়ং বেঙ্গল' নাকি যুদ্ধে ইংরেজের প্রতি সহানুভূতি জানাতে এগিয়ে এসেছে। এবং অতিশয় গর্বের কথা এই যে বাংলা দেশের তাবৎ স্কুল, কলেজ ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজই সর্বাগ্রে সরকারকে সহানুভূতি জানিয়েছে ও বাস্তব সাহায্যও দান করেছে।৯

৮। Far away from the scene of strife we hear only the echoes of what is likely to prove the greatest war in the world's history. Tremendous issues hang in the balance; but 'out of evil commeth good' and the most cheering outcome of the present war is the manifestation of the solidarity of interest and the unity of sentiment which prevail throughout the British Empire. A wave of loyalty has touched the shores of the Overseas Dominions of the Emperor. p. 3

৯। "Young Bengal" has not been slow to make known its sentiments. We believe

এই উপলক্ষে কলেজে দুটি সভা হয়—প্রথমটি ১২ই আগষ্ট ইডেন হিন্দু হোস্টেলে এবং দ্বিতীয়টি ফিজিক্স থিয়েটারে ২রা সেপ্টেম্বর। সুভাষচন্দ্র কি এই দুটি সভায় যোগ দিয়েছিলেন? আজ আর তা বলার উপায় নেই। প্রথম সভাটি যখন অনুষ্ঠিত হয় তখন সম্ভবত তিনি রোগ-শয্যাশায়ী, টাইফয়েডে ভুগছেন বা অসুখ সেরে গেলেও শরীর দুর্বল। কিন্তু দ্বিতীয় সভাটিতে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল। দ্বিতীয় সভাটিতে দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। ২নং প্রস্তাবের সঙ্গে তাঁর অন্তরের যোগ ছিল সম্ভবত এবং সেই প্রস্তাব অনুসারে তিনি কাজও করেছিলেন। যুদ্ধের ফলে দেশের স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য বিপর্যস্ত হওয়ায় যারা ক্ষতিগ্রস্ত বা দুস্থ হয়ে পড়ে তাদের সাহায্যার্থে চাঁদা তোলা এবং অ্যাম্বুলান্স বাহিনীর কাজকর্ম শেখার প্রস্তাবের কথাই আমরা বলছি।[১০]

এই যে একটা সাহায্য তহবিল খোলা হল এতে অধ্যাপকরা তাঁদের বেতনের পরিমাণ অনুসারে কেউ বেতনের শতকরা এক ভাগ, কেউ দুই ভাগ এবং কেউ তিন ভাগ প্রতি মাসে দিতে রাজি হলেন যুদ্ধ না থামা পর্যন্ত। কলেজের অফিস ও লাইব্রেরির কর্মচারিগণকেও তাঁদের বেতন হতে দান করতে সম্মত করানো হল। এবং ছাত্রদের কাছ থেকেও টাকা তোলার আদেশ জারি হল। ছাত্রদের কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্যদের ওপর নিজ নিজ ক্লাশের ছাত্রদের নিকট হতে চাঁদা আদায়ের ভার দেওয়া হল। এই কমিটিতে সে বছর সুভাষচন্দ্র ছিলেন না—কিন্তু পরের বছর তিনি সদস্য হয়েছিলেন। ১৯১৪ সালে এই কমিটিতে দ্বিতীয় বর্ষের বিজ্ঞান বিভাগ হতে প্রফুল্লকুমার বসু এবং কলা বিভাগ হতে পশুপতি ঘোষ সদস্য ছিলেন। এবং উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে প্রথম বর্ষের কলা বিভাগের ছাত্র শ্রীশ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিও এই কমিটির সদস্য ছিলেন।

সুভাষচন্দ্র কনসাল্টেটিভ কমিটির সদস্য না হলেও তিনি ছিলেন ছাত্রদের অবিসম্বাদী নেতা—অন্ততঃ তাঁর নিজের শ্রেণীতে তো বটেই। আর্তত্রাণ বিষয়ে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তাঁর দ্বিমত হবার কারণ ছিল না। যুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর যে মতই থাকুক, ইংরেজকে সাহায্য করা বা না করা বিষয়ে যে মতই তিনি পোষণ করুন, কিন্তু যুদ্ধের ফলে দুর্দশাগ্রস্ত দেশবাসীকে সাহায্য দানের কাজে তিনি এগিয়ে এলেন। ছাত্রদের মধ্যে টাকা তুললেন তিনিই সবচেয়ে বেশি। তাঁর ক্লাশ হতে মাসে পঞ্চাশ টাকা তোলা হবে ও রিলিফ তহবিলে দেওয়া হবে এ প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন এবং কার্যত তা করলেনও। প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম বর্ষ হতে ষষ্ঠ বর্ষ পর্যন্ত কলা বিভাগ ও বিজ্ঞান বিভাগ মিলিয়ে ছজনাধিক ক্লাশ আছে, কিন্তু টাকা উঠল সবচেয়ে বেশি দ্বিতীয় বর্ষ কলা বিভাগের ক্লাশ হতে। কর্তৃপক্ষ এতে গর্ববোধ করেছেন এবং প্রশংসাও করেছেন এই ক্লাশের ছাত্রদের।[১১]

দ্বিতীয় বর্ষের কলা বিভাগের ক্লাশে ছাত্রসংখ্যা ছিল ষাট

that among educational institutions our college may claim to have been the first which expressed its sympathy with Government and offered such practical help as is in our power to give. p. 3.

১০। We have opened a subscription list for the relief of distress consequent on the disorganization of commerce, and we expect to start ambulance lectures very soon.

১১ It is gratifying to learn that one of our junior classes has promised to raise monthly subscriptions amounting to Rs. 50 per month. The class which has thus distinguished itself is the second year Arts class. This is a promising beginning and we hope that none of the classes will fail to follow suit. (College Notes p. 4.)

জনের মতো—কাজেই তাদের কাছ থেকে মাসে পঞ্চাশ টাকা তোলা সেদিনের পক্ষে অনেকখানি কাজ বলতে হবে। এটা সম্ভব হয়েছিল স্বভাষচন্দ্রের নেতৃত্ব গুণে। রিসিকের কাজে তাঁর ছিল গভীর আগ্রহ।

'কলেজ নোটসের' পাতায় আরও বিচিত্র সব তথ্য লুকিয়ে আছে। যে ওটেন সাহেবকে নিয়ে পরে এত কাণ্ড হয়েছিল তিনি যুদ্ধের বাজারে বিলেতে গিয়েছিলেন বিয়ে ও মধুচন্দ্রিকা যাপন করতে। তিনি গিয়েছিলেন এপ্রিলে, বিয়ে করেছেন ১৫ই জুন এবং নভেম্বর মাসাদ সপত্নী তিনি ফিরে এসেছেন মনে হয়।

কিন্তু সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সংবাদ য়ুরোপে আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসুর জয়যাত্রা। তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যাপক। নিবেদিতার মৃত্যুতে ব্যক্তিগত ভাবে অপূরণীয় ক্ষতির সম্মুখীন হলেও জগদীশচন্দ্র শোক খানিকটা সামলে উঠে য়ুরোপে গেছেন।১২ যেখানেই তিনি যাচ্ছেন সর্বত্র তাঁর সম্মান অব্যাহত। এপ্রিলের গোড়ায় কলকাতা হতে রওনা হয়ে সেই মাসেরই শেষ দিকে তিনি বিলেত পৌঁছেছেন, অক্সফোর্ডে ২০শে যে বিশিষ্ট বিজ্ঞানসভায় Irritability of Plants সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন, ২রা জুন বক্তৃতা করেছেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে, ভিয়েনায় দিয়েছেন তৃতীয় বক্তৃতা শরৎকালে লণ্ডনের Psychological Societyতে বক্তৃতার জন্য তিনি আমন্ত্রিত হয়েছেন, আমেরিকার ওয়াশিংটনে Scientific Academy-তে বক্তৃতা করতে তিনি যাবেন এবং ফলাদিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, নিউ ইয়র্কের বিজ্ঞান একাডেমি, শিকাগো, উইসকন্সিন, ইলিনয় ও মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়-গুলিতেও তাঁকে বক্তৃতা দিতে হবে।

ভারতের একজন বৈজ্ঞানিক এইভাবে বিদেশে সর্বত্র অপর্যাপ্ত সম্মান পাচ্ছেন তাতে প্রত্যেক ভারতীয় সেদিন গৌরব বোধ করেছেন। স্বামী বিবেকানন্দ অনন্ত ভাষায় বহুদিন আগে জগদীশ চন্দ্রের বৈজ্ঞানিক সাফল্যের গৌরব বর্ণনা করেছিলেন, নিবেদিতা শ্রম দিয়ে, পরামর্শ দিয়ে, সাহচর্য দিয়ে জগদীশচন্দ্রকে করেছেন সাহায্য, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্য ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে বেরিয়েছেন—কলকাতার সকল সংবাদপত্র জগদীশচন্দ্রের জয়গান গাইছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষও জগদীশচন্দ্রের জন্য গৌরবান্বিত—কিন্তু কী কারণে? না তিনি এই কলেজের অধ্যাপক, এখানকার গবেষণাগারে তিনি গবেষণা করেছেন। ব্যস। আর জগদীশচন্দ্রের সবচেয়ে বড় গৌরব কিসে হয়েছে? না, বড়লাট তাঁকে অভিনন্দন জানিয়ে চিঠি লিখেছেন। এই কলেজের কর্ণধাররা এরকম মানসিকতাতেই ভুগতেন সেদিন, ভারত প্রেমের কোনো বালাই তাঁদের ছিল বলে শত্রুরাও অপবাদ দিতে পারেনি। সুভাষ ছাত্র হিসেবে এই কলেজেই পড়াশুনা করতে এসেছিলেন, কিন্তু কলেজের আবহাওয়া তাঁকে আদৌ আকৃষ্ট করেনি। এই কলেজকে তিনি ভালোবাসতে পারেননি। তাই ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা

১২ We have noticed with great pleasure the recognition which Dr. Bose is receiving wherever he goes in Europe....His reception on each occasion was cordial and even enthusiastic ...All this is very gratifying to us, and the most gratifying of all is the congratulatory letter which has been written to Dr. Bose by the Viceroy. This has already appeared in all the Calcutta papers and we need not reproduce it here. But seeing how intimately Dr. Bose belongs to us and how closely he is associated with this College we take a natural and proper pride in all this new harvest of distinctions for one whose great work was begun and perfected in our midst and in the very laboratories in which our work is carried on (College Notes p. 9)

পাশের পর তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্সি কলেজে বি, এ, পড়তে ভর্তি না হয়ে কটকে চলে যাবেন ও সেখানেই পড়াশুনা করবেন ভেবেছিলেন। একটি চিঠিতে তিনি বন্ধু হেমন্ত সরকারকে লিখেছিলেন সে সময়: "সরকার হইলে কটকে বা হাজারিবাগে পড়িতে পারি। হাজারিবাগে prospectus এর জন্য লিখেছি, Kurseong থেকে ফিরিয়া আসিয়া যদি সরকার মনে করি তাহা হইলে কলিকাতায় পড়া বন্ধ করিতে পারি।" (২৭-৩-১৫ তারিখের চিঠি, পত্রাবলী, পৃঃ ৫০)

প্রেসিডেন্সি কলেজের একটা মোহ ছাত্রমহলে সে সময় প্রবলভাবে বিদ্যমান ছিল, আজও কিছুটা আছে। সুভাষ সেই কলেজ ছেড়ে দেবার কথা ভেবেছিলেন তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হবার আগে। কারণ হিসাবে তিনি শরীরের কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু তার চেয়েও বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন এই যুক্তির ওপর যে তাঁর দেশসেবামূলক কাজকর্মের সুবিধা এই কলেজে হবে না, সেপক্ষে কটকেই তাঁর সুবিধা হবে। এক বৎসর যেতে না যেতেই তাঁর এ অনুমান সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছিল।

১৯১৬ সালের আগস্ট-সেপ্টেম্বর মাসে অধ্যাপক হেমন্ত সাহেব ছাত্রদের কাছে কয়েকটি বক্তৃতা দেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধোদ্যমে সহায়তা দানে ছাত্রদের উদ্বুদ্ধ করা। ২৪শে আগস্ট তারিখে প্রদত্ত ভাষণে তিনি স্বদেশপ্রেমের প্রশংসাচ্ছলে বাঙালীদের স্বদেশপ্রেমের প্রতি তীব্র আক্রমণ করেন। তিনি বললেন বাংলা দেশে বাঙালী ছাত্রদের সভায় বক্তৃতা করতে হলে স্বদেশপ্রেমের বিষয়টাই সবচেয়ে প্রথমে মনে পড়ে। কিন্তু ১৫, ১৬, ১৭ বা ১৮শ শতাব্দীতে বা এমন কি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে স্বদেশপ্রেম নামক বস্তুটি বাংলা দেশে ছিল কী? আসলে ওটা ইংরেজি শিক্ষার ফল, ব্রিটিশের দান। আর সেই কারণে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে কোনরকম বিরোধী মনোভাব পোষণ করা স্বদেশ-প্রেমিকদের আদৌ উচিত নয়।[১৩]

স্বদেশ প্রেমিক ভারতীয়দের এখনকার স্বদেশপ্রেমের কাজ হচ্ছে যুদ্ধে ইংরেজ সরকারকে সর্বতোভাবে সাহায্য করা, কেননা ইংলণ্ড বাঁচলে মানবসভ্যতা বাঁচবে। ভারতের বিশেষ লাভ কী হবে? সে প্রশ্নে হেমন্ত সাহেব নীরব। কিন্তু এত করে বোঝালেও ভয় যায় না। বাংলা দেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী বারবার স্মরণপথে এই ধ্রুব সত্যটিই এনে দেয় যে, বাংলা ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে—বাংলার বহু সন্তান তখন জেলে, দ্বীপান্তরে, ফাঁসিতে গেছে।[১৪] হেমন্ত সাহেব বারবার বলেছেন যে হে ছাত্রগণ, ওপথে তোমরা যেওনা। কিন্তু ছাত্রগণ যে বৃটিশরাজের অনুগত নয়, বিশেষ করে কোনো কোনো ছাত্র যে

১৩। It is something which has come along with modern education, with English education as we sometimes call it. I do not think it would be misleading to say that patriotism in Bengal was a product of British rule. That is surely a fact of importance. It is specially important that those who have been born within the last twenty or twenty-five years should realize and recognize this. For *if you do*, you will surely agree with me that one thing patriotism in Bengal should not do, is to direct the national spirit into an attitude of hostility to British rule. (Principal's Address, p. 32)

১৪। But it is well that we should not altogether *forget, at least that you should not altogether forget* that it has not always been so well with us during recent years. (Ibid)

ভারতের স্বাধীনতা চায় জেমস সেকথা ভুলতে পারে না।[১৫] প্রেসিডেন্সি কলেজে কারা ছিলেন এই বিদ্রোহী ছাত্র? সুভাষচন্দ্র লিখেছেন ছাত্রদের একটা দল বিদ্রোহী ছিল তো বটেই: "একটি গুপ্ত বিপ্লবী দল ছিল।..... সরকারী কলেজ হলেও প্রেসিডেন্সির ছাত্ররা মোটেই সরকারভক্ত ছিল না। এর কারণ, লেখাপড়ায় ভালো হলেই যে কোন ছেলে প্রেসিডেন্সিতে ঢুকতে পারত। সি, আই, ডি, মহলে প্রেসিডেন্সির ছাত্রদের অত্যন্ত বদনাম ছিল শোনা যায়। ইডেন হিন্দু হস্টেলকে তো বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা বলে ধরা হত। এজন্য পুলিশ প্রায়ই এসে হস্টেল খানাতল্লাসী করে যেত।" (ভারত পথিক, পৃ: ৭১)

জেমস একথাও বলেছিলেন যে স্বদেশপ্রেম ভালো, কিন্তু অন্ধ স্বদেশপ্রেম ভালো নয় এবং আঞ্চলিক স্বদেশপ্রেমও খারাপ। অতএব বাঙালীরা যেন না বলে যে তাদের দেশ খুব ভালো—কেননা সেটা অন্ধ স্বদেশপ্রেমের নিদর্শন। তারা যেন একথাও না বলে যে ইংরেজ সাম্রাজ্য হতে ভারতবর্ষের বেরিয়ে আসা উচিত—কেননা সেটা হবে আঞ্চলিক স্বদেশ-প্রেমের নিদর্শন। তাঁর মতে বিশ্বজোড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র সকলকে এখন ব্রিটেনকে সাহায্য করতেই হবে।[১৬]

এত সব উপদেশ দেবার পরও জেমস সাহেব নিজের আঞ্চলিক ও অন্ধ স্বদেশপ্রেম—অর্থাৎ তাঁর প্রগাঢ় ইংলণ্ড প্রীতি আর গোপন রাখতে পারলেন না। তিনি গোচ্ছারে গানের সুরে আবৃত্তি করতে লাগলেন:

What have I done for you,
England, my England!
What is there I would not do,
England my own?
With your glorious eyes austere
As the lord were walking near
Whispering terrible things and dear
As the song on your bugles blown,
England,
Round the world on your bugles
blown! ইত্যাদি।

সুভাষ কি শুনেছিলেন এই বক্তৃতা বসে থেকে? আজ আর তা জানবার উপায় নেই। কিন্তু এই বক্তৃতা কলেজ ম্যাগাজিনে ছাপা হয়ে বেরিয়েছিল। তখন তা তাঁকে পড়তেই হয়েছে। এবং বক্তৃতাগুলি দেবার পর ছাত্রদের মধ্যে তা নিয়ে বিস্তর আলোচনাও হয়েছিল একথা অনুমান করা যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজে বিতর্ক সভায় যিনি ছিলেন প্রধান পাণ্ডা সেই সুভাষচন্দ্র সামনেই পরীক্ষার দোহাই দিয়ে এই বক্তৃতাগুলি সম্পর্কে আলোচনার দায় হতে পুরোপুরি অব্যাহতি নিয়েছিলেন একথা সত্য হতে পারে না। প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রশস্ত বারান্দায়, সবুজ তৃণাচ্ছাদিত মাঠে নভেম্বরের নরম রোদে বেড়াতে বেড়াতেও কি তিনি কারও সঙ্গে কোনো আলোচনা করেননি এ বিষয়ে? আমরা অনুমান করতে পারি কয়েক মাস পরে অটেন সাহেবকে কেন্দ্র করে যে ঘটনা ঘটেছিল তার সূচনা এই সময়েই বা তার অনেক আগেই হয়তো হয়ে গিয়েছিল। বাংলার বিপ্লবীদের তাপ ও

১৫। So I say to you that you have not always been blameless in this matter. Therefore in your ardour of loyalty now, do not forget that there is some tarnish of disloyalty to be brushed away. (Ibid)

১৬ Patriotism has its special dangers. One of these is what is called *blind patriotism*, typified by the saying, "my country right or wrong."— and there is *local* patriotism, when a part is put for the whole, as when Bengal... is put in the place of the British Empire..... The British Empire needs the support of all its members in every quarter of the globe. (উক্ত গ্রন্থ)

যাবনা, সেদিনের নবজাগ্রত জাতীয়তাবাদ ও স্বদেশপ্রেমকে এইভাবে নিন্দিত করে তৎস্থলে ইংলণ্ডপ্রেমের বন্যা বহানোকে সুভাষ কোন চোখে দেখেছিলেন তা অনুমান করতে কষ্ট হয় না। যখন রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত গান "ও আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি" বাংলার আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে এবং সুভাষ আকণ্ঠ বাংলা দেশের প্রতি ভালোবাসায় নিমজ্জিত তখন জেমস দাহেবের কণ্ঠোৎসারিত :

Ever the faith endures
England, my England :—
Take and break us : we are yours,
England, my own !

তাঁর প্রাণে যে প্রেমের ভাব সঞ্চার করেনি একথা বুঝতে কষ্ট হয় না।

কিন্তু সুভাষ প্রকাশ্যে এসব কোন কিছুর বিরুদ্ধেই হয়তো প্রতিবাদ করেননি। তার একটা কারণ এই হতে পারে যে কলেজের রাজনীতি করা ছাত্রদের সঙ্গে তিনি সেসময় নিজের একটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে চলতেন। যেসব ছাত্ররা তখন রাজনীতিতে লিপ্ত বা সংশ্লিষ্ট ছিল বা রাজনৈতিক ভাবনা ভাবত তারা সন্ত্রাসবাদের পথেই চলত বা সে পথেই চলা উচিত মনে করত। সুভাষ সে পথ পছন্দ করেননি। তিনি রাজনীতির চেয়ে সমাজসেবা, জনসেবা, দেশের জাতীয় শিক্ষার পুনর্গঠন, সংগঠনাত্মক কর্ম এ সবকেই শ্রেয় জ্ঞান করতেন। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন যে স্বামী বিবেকানন্দের যে আদর্শ রামকৃষ্ণ মিশন গ্রহণ করতে পারেনি ঠিকমতো, তাকেই সঠিকভাবে গ্রহণ ও কার্যকর করার ইচ্ছাই তাঁর তখন ছিল। তিনি লিখছেন : "কলেজে প্রথম দুবছর রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ ভক্তদের প্রভাব আমার উপর খুব বেশী ছিল। দলের অধিকাংশই ছিল ছাত্র এবং এদের নেতা ছিল মেডিকেল কলেজের দুজন ছাত্র—সুরেশ চন্দ্র মজুমদার ও সুবল মিত্রের আতা। এরা রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দের আদর্শকে জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করেছিল। তবে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য এরা জনসেবার উপরই বেশি জোর দিত। জনসেবা বলতে এদের বিবেকানন্দের শিষ্যদের মতো হাসপাতাল বা দাতব্য চিকিৎসালয় ইত্যাদি স্থাপন করার উপর বিশেষ আস্থা ছিল না—এদের উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষার প্রসারের মধ্য দিয়ে দেশের উন্নতি করা। এ ব্যাপারে এদের উপর খৃষ্টান মিশনারিদের প্রভাব পড়া বিচিত্র নয়। বিবেকানন্দের শিষ্যেরা অর্থাৎ রামকৃষ্ণ মিশনের কর্মীরা বিবেকানন্দের আদর্শ পুরোপুরি অনুসরণ করেননি। আমরা এই ত্রুটি সংশোধন করতে এগিয়ে গেলাম। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলও ধর্ম ও জাতীয়তার সমন্বয় ঘটানো—শুধু চিন্তায় নয়, কাজেও।" (ভারত পথিক, পৃ ৭১-২)

এই কারণেই রাজনৈতিক প্রশ্নে কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে প্রকাশ্য বাদানুবাদে সেসময় তিনি যাননি। উপরন্তু তাঁর কর্মের ক্ষেত্র ও দৃষ্টি ছিল বাইরে অনেকখানি প্রসারিত—একটা আলাদা সংগঠনের সঙ্গে সেসময় যুক্ত থাকতে তাকে দেখতে পাই। বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত ঐ সংগঠনের প্রতিই ছিল তাঁর অধিকতর মনোযোগ আকৃষ্ট। এবং হয়তো সে কারণেই কলেজ কর্তৃপক্ষের সুনজরেই তিনি ছিলেন। প্রথমত তিনি কলেজে এসেছেন ম্যাট্রিকে ভালো ফল করে—দ্বিতীয় স্থানে। তদুপরি তাঁর প্রতি অধ্যাপকদের স্নেহ সহজেই আকৃষ্ট হত তাঁর চালচলন ও ব্যবহারে। উপরন্তু তিনি ধনীর পুত্র। এইসব কারণে তখন পর্যন্ত সুভাষের প্রশংসায় কর্তৃপক্ষ ছিলেন পঞ্চমুখ। তাঁর ক্লাসের প্রশংসার কথা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। ১৯১৩ সালে প্রথম বর্ষ কলা বিভাগের ক্লাসে ভর্তি হয়েই সুভাষ যে বিতর্ক সভার প্রতিষ্ঠা করেন, কলেজের ইতিহাসে সে একটা অভিনব ঘটনা। বিতর্ক সভাটির তখন তিনি নাম দেন

First Year Union. প্রথম বর্ষের কলা ও বিজ্ঞান উভয় বিভাগের ছাত্রদের নিয়েই এটি গঠিত হয়েছিল। সুভাষকে ছাত্ররা এই বিতর্ক সভার সেক্রেটারি নির্বাচিত করে এবং অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হন শ্রীসুবোধপ্রসাদ মুখার্জি (কলা) এবং শ্রীনলিনীকান্ত বসু (বিজ্ঞান)। যে কটি বিষয় নিয়ে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়েছিল তন্মধ্যে এগুলিই প্রধান বিষয়।

১। The Press and the Platform

২। The Good and Bad Aspects of the Present System of Education

Why we read History.

The Possibility of a Common Dialect and a Common Script for the whole of India.

দ্বিতীয় বর্ষে উন্নীত হবার পর ১৯১৪ সালে সুভাষচন্দ্র প্রথম বর্ষের অনুকরণ একটি বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। এই সভার উদ্যোগেও কয়েকটি ভালো বিতর্ক হয়েছিল।[১৭]

সুভাষচন্দ্রের প্রতি কলেজ কর্তৃপক্ষের স্নেহদৃষ্টি তখনো অক্ষুণ্ণ ছিল, কেননা তা নাহলে তাঁর হাতে গড়া জিনিসের এমন সমাধির মুদ্রিত রূপকে প্রকাশ করা হত না। পরবর্তী কালে এ ধরণের মোহনা পত্রিকাটির আর কোন সংখ্যায় দেখিনি। ফলে আগে এই ধারণাই দৃঢ় হয় যে সুভাষ কলেজ কর্তৃপক্ষের চোখে তখনো অপাপবিদ্ধ এবং বিশেষ স্নেহের পাত্র। তৎসত্ত্বেও মূল ব্যাপারে কিঞ্চিৎ ফিরে যাওয়া সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সভায় পূর্বোক্ত প্রস্তাব দুটি যখন গৃহীত হয় তখন ছাত্রদের মধ্য হতে প্রথম প্রস্তাবটির বিরুদ্ধে আপত্তি উঠেছিল। সে আপত্তি তোলায় সুভাষ অগ্রণী হয়েছিলেন কি না জানি না, ঐ সভায় তিনি উপস্থিত ছিলেন কি না তাও নিশ্চিত ভাবে জানা যায় না; কিন্তু প্রস্তাবটি পাশ হয়েছিল ভোটের জোরে, সর্বসম্মতিক্রমে নয়। প্রথম প্রস্তাবটিতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রতি কলেজের ছাত্রদের আনুগত্য প্রকাশ করা হয় এবং কর্তৃপক্ষ যেভাবে বলবেন সেইভাবেই তারা সরকারের সেবা করবেন এ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রস্তাবে দুঃস্থ জনসাধারণকে সাহায্য দান করার সঙ্কল্প গৃহীত হয়। অ্যাম্বুল্যান্স ক্লাসে শিক্ষাদান সুরু করার কথাও স্থির করা হয়।[১৮]

সুভাষ প্রথম ১৯১৩ সালে কলেজে প্রবেশ করেই, বিতর্ক সভা প্রতিষ্ঠা করেন। তারপর কলেজ ম্যাগাজিন

১৭। One of the Debating Societies in this College is the First Year Union. It is made up of the students of both the Arts and Science sections of the First Year. The Union was revived Last Year by some students of the First Year Class and ended a year's useful work for the session 1913-14. The Union is managed by a Secretary and two Assistant Secretaries, one from each section. Sirjut Subhas Chandra Bose occupied the office of Secretary during the last session ....The Students of the Second Year (Arts and Science) have started a Debating Union on Similar lines as the Fist Year Union. We hope this will also end with a record of useful work for another session. (উক্ত গ্রন্থ)

১৮। Two resolutions were passed.

(1) That this meeting of the students of the Presidency College desire to express their deep sympathy with the Goverment on the occasion of the present war involving the British Empire. They further beg to assure the Goverment that as dutiful citizens of the British Empire they are ready to serve under the Government in any capacity that the authorities may think fit.

প্রবন্ধে উদ্যোগী হন, ছাত্রদের সঙ্ঘবদ্ধ করে একটি Students' Consultative Committee গঠনে অগ্রণীর ভূমিকা নেন, এবং যুদ্ধ বাধলে যে রিলিফ কমিটি গঠিত হয় তাতে চাঁদা তুলে দেবার ভারও নেন। তাঁর কলেজ জীবনের প্রথম দু'বছরের মোটামুটি এই হচ্ছে কাজ —কিন্তু এ ছাড়া তাঁর আসল কাজগুলি হত কলেজের বাইরে, সেখানে তাঁর নিজস্ব দল ছিল, এবং ঈশ্বর লাভের জন্য সন্ন্যাসী হয়ে তিনি একবার ঘর ছেড়ে বেরিয়েও যান দ্বিতীয় বর্ষে পড়ার সময়। বাড়ি ফিরে এসে তাঁর হয় টাইফয়েড রোগ। যখন তিনি টাইফয়েডে ভুগছেন, য়ুরোপে যুদ্ধ বাঁধে সেসময়ে। এই যুদ্ধ বাধার আগে পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মপন্থার সঙ্গে নিজেকে তিনি জড়িত করেননি, এমনকি ইংরেজ সাম্রাজ্যের অধীনে ভারতের স্বায়ত্তশাসন লাভের কথাও তিনি ভাবতেন। কিন্তু যুদ্ধ যখন বাধল, রোগশয্যার শুয়ে শুয়েই তিনি স্থির করলেন যে ভারতের যা দরকার তা হচ্ছে পূর্ণ স্বাধীনতা, এবং ইংলণ্ডের উপর কোনো বিষয়েই নির্ভর করা ভারতের উচিত নয়। আত্মচরিতে তিনি লিখেছেন।

"১৯১৪ সালের জুলাই মাসে অসুখে শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি। আর য়োরোপীয়দের সম্বন্ধে আমরা নবলব্ধ অভিজ্ঞতার কথা ভাবি। এ অবস্থায় আমার নিজের এতদিনের সব ধারণা এবং প্রচলিত মত-বাদগুলি ভালো করে যাচিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম—দেশের শাসনভার দু'ভাগে ভাগ করে, এক ভাগ বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, আর এক ভাগ নিজেদের হাতে রাখা—এ কি সম্ভব? না, আমাদের কর্তব্য শাসনভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রাখা, কিংবা সম্পূর্ণ অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া? এ-প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে বিশেষ ভাবতে হয়নি। ভারতবর্ষকে যদি অন্য সব সভ্যদেশের সমকক্ষ হতে হয় তবে তাকে তার মূল্যও বহন করতে হবে, দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবেনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যাঁরা সংগ্রাম করছেন, সামরিক অসামরিক দু রকম শাসনভারের জন্যই তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতাকে কখনো ভাগ করা চলে না। স্বাধীনতার অর্থই হল বিদেশী শাসনের হাত থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি। মহাযুদ্ধে আমরা দেখেছি সামরিক শক্তি না থাকলে যে কোন দেশের পক্ষেই স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন।" (ভারতপথিক, পৃঃ ১৪-১৫)

এই যন্ত্র দুটির বিশ্লেষণ ও সুস্পষ্ট মত গঠনের পর সুভাষ সুস্থ হয়ে কলেজে যোগদান করেই দেখেন সেখানে বৃটিশ-রাজের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের বন্যা চলছে। অধ্যক্ষ বলছেন বাংলার আভ্যন্তরীণ শান্তি খুব খারাপ জিনিস, ইংরেজের প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করা খারাপ জিনিস, ইংলণ্ডকে সাহায্য করাই ভারতীয়দের একমাত্র কর্তব্য। সুভাষ প্রতিবাদে রুচ় ও মুখর হননি সেসময়, কিন্তু অন্তরে তাঁর সেসময়ই আগুন জ্বলে উঠেছে। তিনি ভাবালু প্রকৃতির ছিলেননা, উচ্ছ্বাসপ্রবণ নয়, ধীর, সংযত ও গম্ভীর প্রকৃতির সেই ছাত্র সেদিন সহসা অন্তরের ভাবকে বাইরে প্রকাশ করে একটা কারণঘট বাধিয়ে তোলেননি; কিন্তু ধীরে ধীরে

---

(2) That the students of Presidency College are ready to join the movement that has been set on foot for the relief of the people who are likely to be thrown out of employment in consequence of the stagnation of business during the present crisis

.....It was further resolved by the show of hands that ambulance classes should be started and that students should supplement the offer made by the staff to contribute monthly to the Relief Fund (College Meeting পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃষ্ঠা ৩৯)

চারদিকে তিনি দৃষ্টিপাত করছিলেন, পরখ করছিলেন কার কী মনোভাব, এবং এও হয়তো চিন্তা করছিলেন যে এই কলেজেই একটা অগ্নিময় বোমাপড়া তাঁকে করতে হবে। ঘটনাকে নিয়ে যে ঘটনা পরে ঘটে, তার মূল অনেক দূর প্রসারিত; অধ্যক্ষ জেমসের ভাষণ ও কার্যকলাপ দেখেই প্রেসিডেন্সি কলেজে ভারতীয় জাতীয়বাদের চূড়ান্ত অবমাননা বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় হয়েছিলেন এবং এর প্রতিবাদ ও প্রতিকার কোন রাস্তায় করতে হবে তা স্থির করতে বেশ কয়েকমাস সময় লেগেছিল তাঁর। চূড়ান্ত প্রতিবাদ যেদিন জানানো হল, সুভাষের আর কোন স্থান রইল না সেদিন কলেজে। তিনি বহিষ্কৃত হলেন। কিন্তু অধ্যক্ষ জেমসও রেহাই পাননি। তাঁকেও বিদায় নিতে হয়েছিল কলেজ থেকে।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

অবোধ জীবন-পথ-যাত্রী

প্রথম প্রয়াস

সিপাহী যুদ্ধের অবসানে ভারতে শাসন-যন্ত্র নিরুপদ্রবে নিরুদ্বেগে চলবে বলে ইংলণ্ডে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস উঠেছিল। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ফরাসী বা অন্য বিদেশীর শক্তির উপদ্রব তখন লোপ পেয়েছে। ভারতের মধ্যে হায়দার-টিপু সুলতান, পেশোয়ারা আর ভয়ের কারণ নয়। "স্বাধীন" নরপতিরা করদ রাজ্যের নাম মাত্র বশংবদ অধীশ্বর হয়ে বিলাতী রেসিডেণ্টের হুকুম তামিল করে নিজেদের ধন্য মনে করছেন।

এদিকে কিন্তু সামান্য বেসুরো গান আরম্ভ হয়ে গেছে। রাম মোহন রায়, জাতির জীবনে আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠা দিতে চাইলেন। রমলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, প্রভৃতি পরাধীনতার যন্ত্রণাকে কবিত্বের মাধ্যমে রূপ দিতে লাগলেন। রাজনারায়ণ বসু, শিবনাথ শাস্ত্রী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, নবগোপাল মিত্র, শিশির কুমার ঘোষ প্রভৃতি মনীষীরা নানাভাবে জাতির মর্মবেদনা সাধারণের সম্মুখে ধরে দিতে লাগলেন। একটা গুপ্ত সমিতিও হ'ল যার লক্ষ্য হ'ল ভারতের স্বার্থের পরীপন্থী ইংরাজি ব্যবস্থাগুলোর প্রতিবাদ করা, প্রথমে গুপ্ত আলোচনায়। পরে তাকে সাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়ে আন্দোলন সৃষ্টি করা। এ সবের প্রকাশ্য ফল হ'ল ১৮৮৫ সালে কংগ্রেসের জন্ম। মনে রাখা ভাল ১৮৮২ সালে "বন্দে মাতরম" সঙ্গীতটি রচিত হয়েছিল, যদিও "আনন্দ মঠ" আরও পরের লেখা।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে মহারাষ্ট্রীয়রা মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। সর্বত্রই অশান্তির গুঞ্জন ধ্বনিত হচ্ছিল, বিদেশীর শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে প্রবল বিক্ষোভ আকার ধারণ করবার জন্য যেন সুযোগের সন্ধানে চঞ্চল হয়ে উঠছে। কালপূর্ণ হলে এই রকমই হয়ে থাকে। কোথা হতে ডাক এসে যায়, আর সব যেন ওলট পালট হতে থাকে।

প্রকাশ্য প্রতিবাদ ও চর্মচক্ষুর, ভারতের স্বার্থবিরোধী কার্যকলাপের প্রতি তীব্র বিদ্বেষ রূপ পরিগ্রহ করছিল। বক্তৃতা ও পত্র-পত্রিকার লেখার ভাষা ক্রমে গরম হয়ে উঠছে। যদি কোনো উপায়ে সম্ভব হয়, তাহলে শ্বেতাঙ্গদের ভারত ভূমি হতে বিতাড়ন করার পন্থার চিন্তা দেশপ্রেমিক ভাবুকদের মন দখল করা সুরু হল।

কংগ্রেস জন্মেরও অনেক আগে ১৮৭৪ সালে বরোদা রাজ্যের রেসিডেণ্ট, কর্ণেল ফেয়ারকে বিষপ্রয়োগে হত্যার চেষ্টা হয়। তখন বাঙলার এক দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ্য ভাবেই গাইকোয়াড় মুলহর ওরফে মাধব রাওয়ের এই কার্য্য সমর্থন করে। বক্তব্য ছিল, যেভাবে ফেয়ার গাইকোয়াড়ের প্রত্যেক কাজে বাধা দিত, প্রজাদের শাস্তি মূলক ভাবে দ্বারা গাইকোয়াড়ের শক্তি খর্ব এবং পদে পদে অপদস্থ করবার চেষ্টা করত, গোপনে তাঁর বিরুদ্ধে বিলেতেও বড়যন্ত্র নালিশ জানিয়ে পত্রের পুতুল বানাবার চেষ্টা করা হত, তাতে গাইকোয়াড় বা তাঁর লোকে যদি ফেয়ার হত্যার চেষ্টা করেই থাকে, তাতে এমন দোষের

কিছুই হয়নি। এর চেয়ে ঢের বেশ অত্যাচার অবিচার ইংলণ্ডে ভিন্ন দেশীয় শাসন যদি করবার চেষ্টা করত, তাহলে এত বিলম্ব হত না, অনেক আগেই সেই দুর্বৃত্তকে ইহ জগৎ থেকে সরিয়ে ফেলবার কথা। নিতান্ত শান্তি-প্রিয় দেশ এই ভারত, তাই এ রকম খুনখারাপি কাজে লোক সহজে হস্তক্ষেপ করে না।

ইংরাজ রাজ, তাহতে একটা নব চিন্তাধারার লক্ষণ বুঝে একটু চিন্তান্বিত হল। বাঁধনের রশি টেনে বাঁধবার জন্যে একবার গা ঝুলিয়ে উঠ্‌ল। এ ব্যাপার ঐখানেই চাপা পড়ে গেল। তবে সাইকোয়াড়কে পদচ্যুত করা হয়েছিল। তিনি মাদ্রাজে প্রবাসকালেই ইহধাম ত্যাগ করেন।

বাড়তে লাগল দেশের মধ্যে জাতীয়তার ভাব। তিলক মহারাজ আরম্ভ করেছিলেন গণপতি উৎসব আর শিবাজী উৎসব। তাঁর মনোগত ইচ্ছা লোক একসঙ্গে এক উৎসবে এসে মেলামেশা করুক, পরস্পরকে এক কাজের মধ্যে দিয়ে চিনে নিক; ভালবাসতে থাকুক। পুরাতন দেবদেবীর প্রতি যেমন আস্থা ফিরে আসবে, অতীত গৌরবে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করবে। আর শিবাজী মহারাজের মত দেশকে ভালবাসবে, বীর হবে, শত্রুর সঙ্গে লড়াই করতে শিখবে। স্বাধীনতা ফিরিয়ে আনার জন্য বদ্ধপরিকর হবে। জীবন যদি উৎসর্গ করতে হয়, তাতে পিছপাও হবে না।

হাওয়া বদল উঠলই, তখন সেটা একদল লোকের মনকে নাড়া দিতে ছাড়েনি। গণেশ দামোদর সাভারকর ও বিনায়ক সাভারকর যেমন একদিকে, অপর দিকে দামোদর ও বালকৃষ্ণ চাপেকার ও সঙ্গীরা প্রতিষ্ঠান গড়তে লেগে গেলেন নাম হল 'অভিনব ভারত সমিতি.' মিত্র মেলা প্রভৃতি।

চাপেকররা পশ্চিমাঞ্চলের চিৎপাবন ব্রাহ্মণ। হরি চাপেকার মহাশয় দামোদর হরি, বালকৃষ্ণ হরি আর বাসুদেও হরির পিতা। শান্ত শিষ্ট ধর্মপরায়ণ ব্রাহ্মণ। ঠাকুর দেবতার নাম করে দিনের বেশীর ভাগ অতিবাহিত করেন।

জ্যেষ্ঠ দামোদর পিতার সদ্‌গুণের অধিকারী। তার ওপর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব একটা লক্ষণীয় বস্তু। উৎকট দেশ প্রেম তাঁকে অপর সাধারণ থেকে বৈশিষ্ট্য এনে দিলে। স্বাধীন চিন্তাধারা তখন সকল কথায়, সকল কাজে স্বপ্রকাশ হল। স্বাস্থ্য চর্চা, চরিত্রের নির্ম্মলতা, দুর্বলতা পরিহার কেবল নিজে যে করতেন তা নয়, সঙ্গীদের ওপর তাঁর সে প্রভাব বিস্তার করতেন।

বড় বড় সভায় তিনি বলতেন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত…" দেহ মনে শক্তি সঞ্চয় করতে হবে। বলহীনের দ্বারা দেশের উদ্ধার সম্ভব নয়। এদের শত্রু অতি দুর্দ্ধর্ষ, অতি ধনিবান; অত্যন্ত পরাক্রমশালী। এদের সঙ্গে লড়তে হলে শত সহস্র-গুণ শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। সে যুদ্ধে হাতিয়ার হবে বন্দুক, কামান, গোলাগুলি।"

আরও বলেন। মনকে তৈরী করতে হবে রণ ঝঙ্কারের সুরে। কবির কথায় বলি,—

যাও সিন্ধুনীরে দুর্গম শিখরে,
গগনের গ্রহ তন্ন তন্ন করে,
বায়ু উল্কাপাত বজ্রশিখা ধ'রে
স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হও।

দুর্ব্বলতা ছেড়ে "রণরঙ্গ রসে হওরে উন্মাদ"। নিজ প্রাণ তুচ্ছ করে, ভারত মাতার চরণে বলি দিতে হবে।

সভায় যেন বিদ্যুৎ খেলে যেত। যাদের হৃদয় স্পর্শ করেছে দামোদরের বাণী, তাঁরা বুঝলেন ভারতের দুর্দ্দশা অবসানের প্রাতঃসূর্য্যরশ্মি দেখা দিয়েছে।"

জ্যেষ্ঠ দামোদর হরির মনে অসীম সাহস। ছোরা লাঠি তলোয়ার সঞ্চালনে তিনি দক্ষ। তাঁর মনের বাসনা ছেলেরা যেন ভাল করে যুদ্ধবিদ্যা শেখে এবং লজ্জা ভেঙে অবার্দ্ধ হয়। তিনি বার দুই সেনাদলে ভর্ত্তি হবার চেষ্টা করে বিফল হয়েছিলেন। সঙ্গীদের বলতেন, "ভাই ফুটবল ক্রিকেট ছাড়, ঘোড়ায় চড়, অস্ত্রের আঘাত দিতে এবং সে রকম

আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে শেখ। অভাব পক্ষে সেনাদের মত সুচবাওয়াজ কর; রাস্তায় পা মিলিয়ে চলবে, এলোমেলো ভাবে চলা ছেড়ে দেবে।"

সৎ সঙ্গেরও একটা সংক্রামক শক্তি আছে: তার ওপর এরা আত-মারাঠী। ছেলেরা দামোদর হরিকে গুরুর মতন মানতে শিখলে এবং তাঁর হুকুমে নিজেদের সংযত করে ফেললে। দামোদরের সঙ্গীদের মধ্যে যৌবনসুলভ চপলতা, চরিত্রের দুর্বলতা দূর হল। সব যেন এক গোষ্ঠীর ছেলে, এক ছাঁচে ঢালা, এক মতে চলা, একসঙ্গে দেশ মন নিয়োগ করে দেশ উদ্ধার করা। চারিদিকে তাদের নাম ছেয়ে উঠল। আপদে বিপদে সকলের আগে দামোদরের দল "অভিনব ভারত সমিতি"র কথা মনে আসে।

সংগঠন চলছে। ইংরেজ বিতাড়নের উপায় আবিষ্কার করা নিয়ে সকলেই আপন আপন মনের মতন করে ভাবছেন। এমন সময় এক বড় আপদ এসে পুনায়—তথা বোম্বাইয়ের মাটিতে আবির্ভূত হল। ১৮৯৬ সাল। মহামারী রূপে প্লেগ এসে পুনাবাসীকে বিব্রত বিপর্যস্ত করে ফেলল। বাড়িঘর ছেড়ে লোক পালের মত ছুটে বেড়াতে লাগল। মুখে ত্রাসের চিহ্ন, প্রাণের ভয়। মরণোন্মুখ রোগী ফেলে আত্মীয়স্বজন পালাতে আরম্ভ করে দিল। লোকে মনে করে, কালের বিষাণ; দেবতার অভিশাপ।

সমিতির সভ্যদের মধ্যে আলোচনা চলছে সদাসর্বদা। দেশ ত স্বাধীন হবে পরে, এখন এই বিপদের মধ্যে সেবা ও ত্রাণ কার্যের পথ খুঁজে বার করা দরকার। কে কার কথা শোনে? এই রকম অবস্থা। লোক যত আত্মরক্ষার জন্যে ছুটে অপর স্থানে যাচ্ছে, রোগের প্রসার তত বেড়ে যাচ্ছে।

রোগ বিস্তার নিবারণ করবার জন্যে গভর্মেণ্ট ৪ঠা ফেব্রুয়ারী ১৮৯৭ প্লেগ নিরোধ আইন চালু করে তার বিধানগুলি প্রয়োগ করবার উদ্দেশ্যে বসিয়ে দিলে র‍্যাণ্ড নামে এক পাষণ্ডকে প্লেগ কমিশনার করে।

অত্যাচারী জেলা শাসক বলে র‍্যাণ্ডের অত্যন্ত দুর্নাম ছিল। এর পূর্বে সাতারা জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট থাকাকালীন ১৮৯১ সালে ২৭শে সেপ্টেম্বর ওয়াই অঞ্চলে তাঁর হুকুম অমান্য করে বাজনা বাজাবার অপরাধে কয়েকজন সম্ভ্রান্ত লোককে জরিমানার বদলে তিনি জেল দিয়েছিলেন। যুক্তি দেখানো হয়েছিল, যখন তাঁরা স্থানীয় মাননীয় ব্যক্তি আর বেশী সাজা দেওয়া যখন উদ্দেশ্য তখন জেল দিলে সাজার সঙ্গে অপমানটা অতিরিক্ত যোগ হয়ে যাবে। র‍্যাণ্ডের অভিসন্ধি, এক ঢিলে দু'পাখী মরবে। সেই র‍্যাণ্ড হলেন সর্বময় কর্তা। লোক প্রমাদ গণলে।

র‍্যাণ্ডের অত্যাচারে মুক্ত হয়ে গেল সরকারী প্লেগ হাসপাতাল—নরককুণ্ড আর শ্মশানের সমান। সেখানে কেবল রোগ সন্দেহে নয়, নীরোগ লোককেও টেনে নিয়ে—যাওয়া আরম্ভ হল। গলা, বগল, কুঁচকি পরীক্ষা যে ভাবে সদর পুলিস দিয়ে আরম্ভ হল, তাতে সকলের প্রাণ ওষ্ঠাগত। মনে হল, এর চেয়ে রোগের কবলে মৃত্যু অনেক ভাল।

হিন্দুঘরণীর ঘরের মধ্যে আলোর অভাব এই অজুহাতে র‍্যাণ্ডের হুকুমে নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রকাশ্য পথের ওপর এসে দাঁড়াতে হল। নগ্ন অবস্থায় পুরুষ দাঁড়াবে। স্ত্রী লোকেরা চৌলি বা কাঁচুলি খুলে ফেলবে, আর নিয়বাস ঘুরাতে উঁচু করে ধরে থাকবে কুঁচকি বগল পরীক্ষার অথবা সময় নষ্ট যাতে না হয়। মুসলমান নাগরিকদের এসকল যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া হল। তাদের ঘরের মধ্যে না কি প্রচুর আলো আছে। বাড়ীর তল্লাসীতে জিনিষপত্র তছনছ হয়ে গেল। সন্দেহ মাত্রে বিছানাপত্র টেনে ফেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেওয়া হতে লাগল। যেখানেই পুলিশের পদার্পণ হয়, সেইখানেই যেন চেঙ্গিস খাঁ তৈমুরলঙ্গ নগর আক্রমণ সুসম্পন্ন করে সর্বেসর্বা বিনাশ নিয়েছে। সম্ভ্রান্ত লোকের সামনে যেন মূর্তিমান বিভীষিকা এসে আবির্ভূত হয়েছে।

কোনো অঞ্চলে সন্দেহ মাত্রেই সদল সৈনিক এসে

হাজির। বুধোয়ারপেট অঞ্চলে ২০০ সশস্ত্র অশ্বারোহী আর এক শত পদাতিক সেনার সম্মিলিত আবির্ভাব আর সঙ্গে সঙ্গে নিদারুণ ধানাতল্লাসী। কোনো লোক কোনো বাড়ী বাদ পড়বার উপায় নেই। কাতারে কাতারে লোক যেন হাসপাতালের বন্দীশালায় চলেছে। সেখানে দারুণ স্থানাভাব: তা না হবেই বা কেন? তারপর ঔষধ থেকে ইচ্ছাকৃত: লোক আবদ্ধ রাখা এক কাজ। গরু ছাগলের খোয়াড় এই শুশ্রূষাগারের চেয়ে অনেক ভাল। পৌচাগারের যে ব্যবস্থা না থাকায় হাসপাতাল নরককুণ্ডে পরিণত হল। চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই, আছে ভীতি প্রদর্শন আর কারণে অকারণে জুলুম, কঠোর থেকে কঠোরতর নিয়ম।

সরকারী দপ্তরে বহু আবেদন নিবেদন করা হল। সভাসমিতিতে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করা হল। বড় দপ্তরে সেদে লোকদের র‍্যাণ্ডের সঙ্গে দেখা করতে বলে তারা কর্তব্য শেষ করলেন। র‍্যাণ্ড রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠে, অত্যাচার চরমে উঠ্‌তে থাকে।

বাল গঙ্গাধর তিলক মহারাজ সবলকে অভয় দিতে লাগলেন—প্লেগের বিস্তার নিরোধের উপায় প্রচারিত হল। তিনি একদিকে যেমন সতর্কসেবককে সতর্ক করতে লাগলেন। তেমনি দেশবাসী বিশেষতঃ নেতৃস্থানীয় যারা নিষ্ক্রিয় সন্ত্রাসবাদকে সার্বভৌম করে এগিয়ে আসতে নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন যে রোগ এবং রোগের অত্যাচারের প্রতিরোধ করবার জন্যে দেশের বেঁচে উঠতে হবে। এখনি বিপন্ন আর্ত লোকদের রক্ষা করা কর্তব্য। এ সকল অবহেলা করে যারা পালিয়ে বাঁচতে চেষ্টা করছে, তারা ভীরু কাপুরুষ; তারা মৃত্যু থেকে তাদেরও টেনেছে—এর চেয়ে লজ্জা ও ক্ষোভের বিষয় আর নেই। নিরাপদ স্থান থেকে তারা পুনরায় লোকদের সাহস দিচ্ছে আর সোয়ার অত্যাচারের প্রতিরোধ করতে বলছে।

ফল বিপরীত হল না। মৃত্যুর চেয়ে শরণ নিরোধের দিভীষিকা মানুষকে পাগল করে তুলল। লোকে বলাবলি করে, হাসপাতালে যাওয়ার চেয়ে সমুদ্রে ডুবে মরা ঢের বেশী শ্রেয়, অনেক সহজ।

স্ত্রীলোকের আর্তনাদ—"রক্ষা করো", আকাশ বাতাস ভরিয়ে উঠতে লাগল। সুধার পত্র পত্রিকা ক্ষিপ্ত হয়ে সাধারণ লোককে প্রতিবাদ জানাতে এবং মেস নিবারণ ব্যবস্থার প্রতিরোধ করবার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। লোকের মুখে এক কথা—এই অসহায় অবস্থার মধ্যে থেকে উপায় খুঁজে বার করতেই হবে।

সাড়া পড়ে গেল "অভিনব ভারত সমিতি"র সভ্যদের মধ্যে। নিজেরা বলাবলি করে, একটা সাহেব বাচ্চার অত্যাচার নিবারণ করা যদি সম্ভব না হয় ত গোটা ইংরেজ জাতের উচ্ছেদ সম্ভব হবে কি করে? দেশকে শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করতে হবেই, সেটা তাদের প্রতিজ্ঞা. কিন্তু তার আগে সাধারণ মানুষকে যমযন্ত্রণার হাত থেকে বাঁচাতে হবে। র‍্যাণ্ডকে সাজা দিতে পারলে লোকের মনে বিশ্বাস আসবে যে আমাদের দ্বারা বড় কাজ করা সম্ভব। তাদের সহানুভূতি সহযোগিতা পেলে কাজ খুব এগিয়ে যাবে।

গুপ্ত সমিতির সভা বসে গেল। মুখে মুখে আলোচনার ফলের ধারায় যে আভাষ পাওয়া যাচ্ছিল, সকলে মিলে তার মধ্য থেকে একটা নির্দিষ্ট কর্মপন্থা স্থির করতে হবে। দামোদর চাপেকার বললেন, "আমরা সবাই মারাঠি কিন্তু যে-বয়সে অস্ত্র গ্রহণ করেছিলেন সেই বয়সের সন্তানও মুসলমান সাম্রাজ্যের বুকে বসে যিনি স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলেছিলেন, সেই বয়সে অস্ত্রগ্রহণ করে একটা সাধারণ ইংরেজকে অন্ধ করতে পারা যাবে না, এর চেয়ে লজ্জার বিষয় আর কিছুই হতে পারে না।

বাকরা আগেই বইছিল কানুভি দিনভি হাত জোড় করে প্রস্তাব করে অত্যাচার নিবারণ করা যাবে না। মানুষের মত ছাতি ফুলিয়ে দাঁড়িয়ে অন্যায়ের প্রতিবাদ,

প্রতিরোধ এবং প্রয়োজন হলে শক্তিপ্রয়োগ করে প্রতিক্রিয়ান করতে হবে।

সিপাহী যুদ্ধের পর এই হল ভারত মুক্তির জন্য প্রথম সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

সময় সংক্ষেপ। ব্র্যাণ্ডের অত্যাচার প্রতিদিন বিকট মূর্তি ধারণ করছে। ঘর দোর শ্মশান হয়ে যাচ্ছে। "জান মাল জরু গরু" সব আহারমে যায় বুঝি। তিলক মহারাজের "কেশরী" (পত্রিকা) গর্জন করে চলেছে। ব্র্যাণ্ড বা গভর্নমেন্টের কাছে সে সতর্কবাণী উপেক্ষিত। "খ্যাকশিয়ালের চীৎকারে চাঁদের গতি ব্যাহত হয় না" বলে তারা আপন আনন্দে আত্মহারা।

ধারাটি জোয়ানরা নিশ্চেষ্ট বসে নেই। প্রবল প্রতাপান্বিত শত্রুর সঙ্গে পাল্লা লড়তে হবে। লাঠি ছোরার কাজ নয়। গুলি বারুদ পিস্তল চাই। দামোদর কোথা থেকে বারুদের খবর সংগ্রহ করে তার সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত। উত্তোলী পুরুষ কল্পিত কাজে এগিয়ে যেতে চাইলে সিদ্ধিদাতা গণেশ তার সহায় হন, পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে আসে চলেন।

নাইকবিপুলের মহাদেবীর মন্দিরের পূজারী কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে গেল। মায়ের পূজা বন্ধ থাকবে না। দামোদরের কাছে সেই সুযোগ উপস্থিত হল। স্বচ্ছন্দচিত্তে দামোদর কাজের ভার নিয়ে নেগে গেল। সান্ধ্যপ্রার্থিক পূজা সেরেই আছে। মন্দির বিগ্রহ রক্ষার জন্য বোম্বাই তারতীয় চতুর্দশ পদাতিক বাহিনীর কয়েকজন সৈন্য মন্দির রক্ষা করে। দামোদর এখন পূজারী; সতীর মনোনিবেশ। কিন্তু নজর আছে শান্ত্রীদের হাতিয়ারের উপর। "চোরের মন বোচকার টানে।" একদিন হালচাল দেখে দামোদর মনে করলেন কোথায় যেন যাবে তারা, অন্ততঃ তাদের কয়েকজন।

অন্যদিনের ন্যায় পূজা চলছে। আর বাইরের দিকে নজর রেখেই সতর্ক হয়ে উঠছে। তার মধ্যে মন্ত্রোচ্চারণ শোনা যাচ্ছে—

নমস্তে শরণ্যে শিবে সানুকম্পে
নমস্তে জগদ্ব্যাপিকে বিশ্বরূপে।
নমস্তে জগদ্বন্দ্য পাদারবিন্দে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।
নমস্তে জগচ্চিন্ত্যমান স্বরূপে
নমস্তে মহাযোগিনি জ্ঞানরূপে
নমস্তে সদানন্দরূপ স্বরূপে
নমস্তে জগত্তারিণী ত্রাহি দুর্গে।

[হে শরণাগত বৎসলে, মঙ্গলময়ী দয়াশীলে, তোমাকে প্রণাম; হে বিশ্বব্যাপিকে, বিশ্বরূপে, তোমাকে প্রণাম। তোমার পাদপদ্ম সকলে বন্দনা করে, তোমাকে প্রণাম। হে জগত্তারিণী, তোমাকে প্রণাম। হে দুর্গে রক্ষা কর।

তোমার তত্ত্ব জগতের সকলেই চিন্তা করে, তোমাকে প্রণাম। হে মহাযোগিনি, হে জ্ঞানরূপে, তোমাকে প্রণাম। হে সদানন্দময়ি হে জগত্তারিণী, তোমাকে প্রণাম। হে দুর্গে, রক্ষা কর।]

মুখে মন্ত্রোচ্চারণ চলছে। দৃষ্টি রয়েছে সিপাহীদের গতি-বিধির ওপর। মনে হল একজন তার ঘাঁটি ছেড়ে যাচ্ছে। মন্দিরের পরিচারককে ডেকে দামোদর খবর আনলেন যে সিপাহীদের অধিকাংশই চলে গেছে। তখন ছোকরাকে এক কাজের ফরমায়েশ করলেন যাতে ফিরতে তার বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগে যায়। অপর সংবাদ হচ্ছে, সিপাহীরা যাচ্ছে এক নদীর সংকার করতে, তাদের ফিরতে লেগে যাবে অনেক সময়।

সব পরিবেশ যখন অনুকূল তখন দামোদর এক সুযোগে দুর পাল্লার দুই হেনরী-মার্টিনি বন্দুক সরিয়ে নিয়ে তাল করে লুকিয়ে রেখে দিলে। খোঁজ পড়ে গেল, বন্দুকের সন্ধান আর পাওয়া গেল না। সিপাহীরা যথাস্থানে হাতিয়ার-হরণ সংবাদ জানিয়ে দিলে। পাকা খাতায় লেখা হইল।

এদিকে ব্র্যাণ্ড-হত্যা-যজ্ঞের আয়োজন সমাপ্তিমুখেই

চলতে লাগল। বারে বারে সুযোগ আসবে না, লোক ভুল বলে চলবে না। এটাই তখন প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়াল।

মানুষ সম্বন্ধে যাতে ভুল না হয়, তাই নানা ভাবে, নানা স্থানে র‍্যাণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করছে দলের একজন, না হয় আর একজন। কোথায় কখন যায়; দিনের মধ্যে কোন্ কাজটা কখন করে, এই চৌকি দেওয়া হল বড় কাজ। এ কাজে ছোট ভাই বাসুদেও হরি পাকাপোক্ত হয়ে উঠলো।

ঘটনার তিন চার সপ্তাহ আগে র‍্যাণ্ডের বাসায় এক অপরিচিত ভদ্রলোক এসে হাজির। তার একটা কাজকর্মের দরকার; বড় দুঃস্থ। বেয়ারা নাম-লেখা চিরকুট নিয়ে সাহেবের ঘর থেকে ফিরে আসে; সাহেব বড় ব্যস্ত, সাক্ষাৎ হবে না; আর চাকরি চাইলেই চাকরি খালি আছে না কি?—এটা বেয়ারাজীর মন্তব্য।

যামোদর এসে দলের মধ্যে তার দিনের প্রচেষ্টার কথা বলে; ছেলেরা শোনে আর হাসে। কিন্তু যামোদর বুঝছে শিকার সম্বন্ধে ভুল হবার সম্ভাবনা নিতান্ত কম। আরও পাকা করবার জন্যে যামোদর আর তিনেক এই চেষ্টা করল। বিফল হওয়ায় ও তার কোনো দুঃখ নেই। লোক সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া তার কাজ, তাতেই সে পাকা হ'য়ে উঠছে।

আরও নিঃসন্দেহ হবার জন্য এরা পিয়নকে জিজ্ঞাসা করলে র‍্যাণ্ডের নামের চিঠি কোন্ বাড়ীতে বিলি হয়। ডাকপিয়ন ও ভেতরের খবর জানে না ব'লে সন্দেহও কিছু হয় নি, সে র‍্যাণ্ডের বাড়ী দেখিয়ে দিয়েছিল।

সুযোগ খোঁজা চলছে; একটা দিন কেটে যায়, আর সব ছটফট করে। বুকের ওপর জগদ্দল পাথরের বোঝা যেন বেড়েই উঠছে। উপায় আবিষ্কারে সব ব্যস্ত। কোথাও একটু আশার আলো পেলে ক'জনে বসে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে বসে যায়।

অবশেষে শুভদিনের উদয় হ'ল। ভারতেশ্বরী মহারাণীর ষাট বৎসর অবিচ্ছিন্ন রাজ্যশাসন পূর্ণ হ'য়েছে; সারা ইংরেজ সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে; বাইরে থেকে মনে হচ্ছে ভারতবাসীও সেই শাসন মহা আনন্দে মাথা পেতে নিয়েছে। মহারাণীর জয়গান করছে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। জুবিলী উৎসব সারা ভারতবর্ষে মহা ধুমধামের সঙ্গে পালিত হচ্ছে। সংবাদপত্রে, বিশেষতঃ ইংরেজ পরিচালিত কাগজগুলোতে ফলাও ক'রে তার বিস্তৃত বিবরণ দিচ্ছে।

বিধাতা পুরুষ একটু মুচকি হাসলেন। ২২শে জুন ১৮৯৭ সালের দিনটায় যা লেখা রয়েছে একবার চোখ বুলিয়ে নেখে নিলেন। এদিকে ষোকরাদের উত্তেজনার সীমা নেই। পূর্ব্বরাত্রে সমস্ত কার্য্যক্রম স্থির করা হ'য়ে গেল।

জুবিলীর দিন সকালের দিকে র‍্যাণ্ডের হাতে একখানা চিঠি আসে। তাতে লেখা রয়েছে "তোমাকে আজ হত্যা করা হবে।" হেসে উঠলো র‍্যাণ্ড। বিড়বিড় করে বললে "পাগল আর কি! আমার ধারে এখন লোক ত দেখি না।" চিঠিখানা একেবারে W. P. B. তে (বাজে-কাগজ ফেলার আধার) না দিয়ে রেখে দিল টেবিলের ওপর। সকালের কাজ, কাগজপত্র সহি সব নিয়মিতভাবেই সমাপ্ত হ'ল।

সংবাদপত্র জুবিলী উৎসবের কার্য্যসূচী নিয়ে অপর দিনের ন্যায় ২২শে জুনও সকালে আত্মপ্রকাশ ক'রল। প্রবল উৎসুক্যের সঙ্গে কাগজ পড়া শেষ ক'রে প্রত্যেকের নির্দ্দিষ্ট কাজ সম্বন্ধে আলোচনা হ'ল। বলা বাহুল্য, তৎপূর্ব্বদিন র‍্যাণ্ডের গতিবিধি লক্ষ্য করা হয়েছে। শিকার যেন ফস্কে না যায়।

বিরাট চাঞ্চল্য মনের মধ্যে। কাউন্সিল হাউসে বিকালের দিকে যত গাড়ী জড় হ'য়েছে, র‍্যাণ্ডের গাড়ী তার মধ্যে নেই। সকলের মুখে এক কথা "তবে গেল কোথায়?" র‍্যাণ্ড তখন সেক্রেটেরী সির্জ্জার; সেখানে একজন তাকে দেখতে পেয়ে সকলে উৎফুল্ল। কিন্তু সেখানে লোকের ভিড়ের দরুণ হামলা করা সমীচীন বোধ হ'ল না।

র‍্যাণ্ডের ওপর কড়া নজর রইল। পর্তুগেজ হাউসে সাড়ে সাতটায় তার আবির্ভাব। গাড়ীরও আলো ঝড় জোরালো। অন্যান্য গাড়ীর আলো জ্বলছে। সে সময় আক্রমণ করা সম্ভব নয়।

ক্ষুধিত বাঘের মত তারা বাইরে চৌকী দিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল। এক একখানা গাড়ী লাটের বাড়ীর চৌহদ্দীর মধ্যে প্রবেশ করে আর কয়েকটা জোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টি তার ওপর পড়ে।

সময় আর কাটে না। রাত্রি সাড়ে এগারোটায় গাড়ী বেরুতে আরম্ভ করলে তারা সতর্ক হ'য়ে উঠে। বাঘোদর বড় সদর দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়াল; বন্যান ব্রাণ্ডা বালরুক খানিকটা রাস্তা ছেড়ে আরও একটু আগে। হাতে আছে বাঘোদর সংগৃহীত তলোয়ার আর পিস্তলটা। পরিহিত আখার নীচে লুকানো রয়েছে। তলোয়ারখানা পুরানো পাগড়ীর টুকরো দিয়ে ঢাকা।

র‍্যাণ্ড গাড়ী চড়ে বেরিয়ে খানিকটা অগ্রসর হ'ল। 'শ' দুই গজ পিছনেই চলেছেন সেকনাণ্ট আয়ার্ট আর তাঁর পত্নী একটা গাড়ীতে। বাঘোদরকে ফেলে হাত দুয়েক যেতে-না-যেতে বাঘোদর গাড়ীর পিছনে ছুটতে সুরু করে দিল। সে ছিল গাড়ীর ডান দিকে। গাড়ীখানা যখন সার জেমসেটজী জীজীভয়ের বাড়ীর সামনে তখন গাড়ীর বাঁ দিক থেকে বালরুক সঙ্কেত ধ্বনি করলে "নরায়া। নরায়া।" বাঘোদর সঙ্গে সঙ্গে খুব জোর দৌড় দিয়ে র‍্যাণ্ডের গাড়ীর পিছনে উঠে দাঁড়াল। গাড়ীর পিছনের পর্দা বোতাম দিয়ে ভেতর দিকে আঁটা ছিল। ভিতরে হাত দিয়ে পর্দা আল্গা করার সঙ্গে সঙ্গে পিস্তল র‍্যাণ্ডের গায়ে ছুঁইয়ে ধরে জোড়া টিপলো। শব্দ হ'ল, "দুদুম।"

আয়ার্টের গাড়ী কিছু পিছনেই ছিল। আয়ার্ট-পত্নী শব্দ শুনে মনে করলেন উৎসবের একটা পটকা ফেটেছে। ঠিক সেই সময় মহাদেব বিনায়ক রানাডের বন্দুকের গুলি ছুটে এসে আয়ার্টকে বিদ্ধ করলো; তার রক্তাক্ত দেহ পত্নীর কোলে লুটিয়ে পড়ল।

এখন ঘটনাস্থল থেকে সরে পড়ার পালা। প্রথমেই তলোয়ার দুখানা নিকটস্থ রাস্তার জল নিকাশের এক পুলের মধ্যে লুকিয়ে রাখা হ'ল। সকলের অলক্ষ্যে তারা সরাসরি ষাঁড় পার হ'য়ে সহরে এসে ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল। হাতিয়ারগুলো এক কুয়ার মধ্যে ফেলে দিল।

র‍্যাণ্ড বহুদের সঙ্গে লড়াইতে পরাস্ত হ'ল। শেষ নিঃশ্বাস পড়ল ১৮৯৭ সালের ৩রা জুলাই ভোর সোয়া চারটায়।

বাঘোদরকে সন্দেহক্রমে ধরা হল ৯ই আগষ্ট। তার কাছে সত্য ঘটনা আবিষ্কার করতে পুলিশকে মোটেই বেগ পেতে হল না। দেশানুরাগের যে কাহিনী বাঘোদর প্রকাশ করলো, তা সত্যই বিস্ময়কর। তিনি তিলক মহারাজের বিপক্ষ দলকে মোটেই বরদাস্ত করতে পারেন নি। গাডগিলের উৎসাহ যখন করেছিলেন। 'সুধাকর' পত্রিকার সম্পাদক ও অপর এক পত্রিকার সহিত সংশ্লিষ্ট কুলকারণিকে তিনি সায়েস্তা করেছিলেন কারণ তিনি তিলকের বিপক্ষতাচরণ করতেন লেখার দ্বারা দিয়ে। মহারাষ্ট্রীয় যুক্তিতে আলকাতরা প্রলেপ এবং গলায় জুতার মালা পরিয়ে দেওয়া তারই কাজ। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার জন্য এবং সরকারী কাজে বড় সরকারী কর্মচারীদের আপ্যায়নের জন্য নির্দ্মিত দুই বড় তাঁবু তিনি নিজেই আগুন দিয়ে পুড়িয়েছিলেন। মুক্তকণ্ঠে তিনি সকল কথা প্রকাশ করলেন। বহুদিন ধরে পুলিশ যে সকল "লীলায়" নায়কের সন্ধান করতে গিয়ে গলদঘর্ম হয়ে পড়েছিল, আজ তাই সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হল। সব যাচাই করে দেখা গেল এর সবকটাই সত্যি।

আরও দুই ব্যক্তি ঐ ৯ই আগষ্ট ধরা পড়েছিল। প্রাথমিক তদন্তের পর ১৪ই অক্টোবর আসামীদের বিচার আরম্ভ হ'ল। এজাহার ফলে পাগড়ী-জড়ানো তলোয়ার বন্দুক, পিস্তল ছোরা সবই আবিষ্কার হয়েছিল। সে সকল

বন্ধ আদালতে দাখিল করা হল। ম্যাজিস্ট্রেটের তাঁরু ঘুরোয়ে মামলা শোনতে গেল, ১৮৯৮ সালের ১৬ই জানুয়ারী বিচার আরম্ভ হল বাঘোদর আর সঙ্গীদের।

এই সময় বাঘোদর ভিলক মহারাজের আশীর্বাদ ভিক্ষা করলেন, পেলেন একখানি শ্রীমদ্ভাগবত গীতা। বইখানি তাঁর সর্ব্বদাসঙ্গের সাথী। বিচার চলছে, তিনি অন্য সব কাজ ছেড়ে, গীতা তত্ত্ব নিয়ে মজে আছেন। পড়েন

"দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তর প্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

[দেহাভিমানী জীবের যেমন এই দেহে, কৌমার, যৌবন ও বার্দ্ধক্য (ঘটে) মৃত্যুও সেইরূপে অবস্থান্তর মাত্র; জ্ঞানী তাতে বিচলিত হন না।]

• •

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী।"

[যেমন মানুষ জীর্ণ বাস ত্যাগ করে অপর নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মা সেইরূপে জীর্ণ বাস পরিত্যাগ করে অন্য নতুন দেহ ধারণ করে।]

• • •

"কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্ম্মণি॥"

[নিষ্কাম কর্ম্মেই তোমার অধিকার হক, কর্ম্ম ফলে যেন কদাচ না হয়। কর্ম্মফলে লোভী হয়ো না, অকর্ম্মে কর্ম্ম যেন তোমার প্রবৃত্তি না হয়।]

• •

ইত্যাদি—

এই রকম রাজনৈতিক বিচারের ফল অবধারিত। কিন্তু এর জন্যে একটু বাস্তবের অবতারণা ঘটে গেল। তাহলে ইংরাজের বিচারালয়ের একটা স্বনাম হয়েছিল,—যেখানে কালায় কালায় বিবাদ। কালা ধলা বিবাদের ফল সকল সময়েই পক্ষপাতদুষ্ট হত। আর ছিল সরকার বিরুদ্ধ মামলায়। এখানে তারা লজ্জা সরম বিসর্জ্জন দিতে কুণ্ঠিত হয় নি।

ফেব্রুয়ারী ৩ (১৮৯৮) তারিখে জজসাহেব সাক্ষীর জবানবন্দী, ঘটনা পরম্পরা, আইনের কূটবিচার ও তার প্রয়োগ জুরীকে বিশ্লেষণ করে দিলেন। সর্ব্বনাশ! মুখপাত্র বলে বসেন, "আসামী দোষী। খুনের অপরাধে নয়, খুনের উৎসাহ দেওয়ার অপরাধে মাত্র।"

এই অপরাধে তখন দণ্ডবিধি আইন (পেনাল কোডে) ফাঁসী দেওয়া চলত না। কিন্তু ফাঁসী দেওয়া ত চাই। জজ-সাহেব জুরীকে জেরা আরম্ভ করে দিলেন। থতমত খেয়ে মুখপাত্র বলেন, সম্ভবতঃ হত্যাকাণ্ডের জেরে এবং সময় আসামী বাঘোদর উপস্থিত ছিল।

-বস্ কৌরা। এতেও ত ফাঁসীর নাগালের বাইরে ছইল মুখ্য আসামী। আবার জেরা, সঙ্গে সঙ্গে তর্জ্জনা—ভদ্রলোকেরা বিচার বোধশক্তির ওপর কটাক্ষপাতও হয়ে থাকবে। তখন মতামত যাচাই করে বলে, আসামী বাঘোদর হত্যার অপরাধে দোষী।" আর যায় কোথায়! ঈপ্সিত মত পেয়ে জজ সাহেব মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা দিলেন। বিচার প্রহসন আর কাকে বলে!

আসামীকে ফাঁসীর হুকুম শুনিয়ে দেওয়া হল। লোকটা জানে কি! "হুজুর এর চেয়ে বড় সাজা আর নেই!"

ফাঁসীর আগের সময়টা বাঘোদর কাটিয়ে দিচ্ছে গীতা-পাঠে। ক্রমে ফাঁসীর দিন এসে উপস্থিত; সেটা ১৬ই এপ্রিল। কিছু বলবার আছে কি না? জিজ্ঞাসা করায় বলে, "কিছু না।"

ফাঁসীর মঞ্চের দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, আসামী বলে চলেছেন, "জয় নারায়ণ, জয় হরি! জয় গোপাল!

'অনাদিদেবঃ পুরুষ পুরাণ
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ॥

[হে অনন্তরূপ, তুমি দেবগণের আদি, যেহেতু অনাদি পুরুষ তুমি এই বিশ্বের পর স্থান। এবং জ্ঞাতব্য ও পরমধাম, তুমি এই বিশ্ব ব্যাপিয়া আছ।]

"জয় নারায়ণ! জয় হরি! জয় গোপাল!"

সময় উত্তীর্ণ হয়ে কয়েক মিনিট কাল গেছে; ম্যাজিষ্ট্রেট এসে হাজির হন নি; বিলম্ব হচ্ছে। দামোদর হেসে বল্লেন, 'জানতাম ইংরেজ জাত সময় সম্পর্কে খুব সজাগ; মিনিট ধরে তারা না কি কাজ করে। তা ছাড়া সময় পালন করার জন্যে সরকার তাদের মজুরি দিয়ে থাকে।'

ফাঁসির মঞ্চে বীর অবিচলিত পদক্ষেপে উঠলেন দামোদর। হাতে সেই গীতা যদিও শিকলে বাঁধা করে হাত বাঁধা। ফাঁসিতে লটকে দেওয়া হ'ল। এরপর সবারই অঙ্গ নিথর হ'য়ে পড়ে। দামোদরের হাতের গীতা খ'সে পড়ল না—বজ্রমুষ্টি তেমনিই ভাবেই বইখানা ধরে আছে। যেমন ছিল যখন দামোদরের জীবন প্রদীপ নির্ব্বাপিত হয় নি। গীতা সমেত দামোদরের অন্ত্যেষ্টি সম্পন্ন হ'ল, জেলেরা জেলের মধ্যে।

বালকৃষ্ণহরি চাপেকার, মহাদেব বিনায়ক রাণাডে আর খাণ্ডু বিষ্ণু সাখেকে ধরে দিতে বা ধরা পড়ার উপযুক্ত সন্ধান দিতে পারলে ২০,০০০ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হ'ল, সরকার পক্ষ থেকে।

বালকৃষ্ণ সরে পড়েছিলেন নিজাম রাজ্য হায়দরাবাদে। সেখানে তিনি পুলিশের হাতে ধরা পড়েন। সমস্যা হল, নিজাম সরকার দাবী ক'রে বসলেন, সেখানেই আসামীর বিচার হবে। একজন স্বীকারোক্তি করে যাকে দোষী বলেছে কেবলমাত্র তার অভিযোগের ওপর নির্ভর করে তাঁকে হত্যা অপরাধে ইংরাজ আদালতে বিচার করতে দিতে নিজাম সরকার রাজি হ'ল না।

ঘুটঘুটিতে ইংরেজের জোড়া মেলা ভার। অনুনয় বিনয়ে যখন হ'ল না, তখন মোক্ষম অস্ত্র প্রয়োগ করাই সমীচীন। মহামহিম রেসিডেন্ট বাহাদুর, যিনি প্রতি কল্প রাজ্যের সর্ব্বেসর্ব্বা, এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলেন ভারত সরকারের নির্দ্দেশে। নির্বিষ ফণাহীন ফুলঝ হলেন নিজাম; সঙ্গে সঙ্গে বালকৃষ্ণকে পুণায় এনে হাজির করা হ'ল।

হায়দরাবাদের পুলিশ বালকৃষ্ণর ধরা পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করেছে বলে তারা ঘোষিত পুরস্কারের অর্দ্ধেক দাবী করল এবং সঙ্গে সঙ্গে দশ হাজার টাকা পেয়ে গেল। এ ঘটনা উল্লেখ করার অর্থ আছে, কারণটা পরে বলা হচ্ছে।

বালকৃষ্ণ, সহচর রাণাডে ও আর দুজনের বিচার আরম্ভ হ'ল ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৮৯৯—অভিযোগ রাণ্ড ও আয়ার্স্ট হত্যা, ষড়যন্ত্র ও বে-আইনী অস্ত্র গোপন করা, ইত্যাদি।

মনে অতুল সাহস। নিজের জীবনের প্রতি মমতাহীন; শত্রুর প্রতি নির্ম্মম বীর হ'লেও বালকৃষ্ণ মানুষ ও খাঁটি। আদালত কক্ষে ২২শে ফেব্রুয়ারী ছোট ভাই বাসুদেওকে দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে তাকে আলিঙ্গন করতে চাইলেন। বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে খেলে গেল স্নেহের ভাইটি আর কতক্ষণ বাইরে থাকতে পারে? তাঁকে পুলিশ এসে বাধা দিল; তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে নিষ্ফল দাঁড়িয়ে গেলেন।

ঘটনা জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে। পুলিশ কৌশল করলে বাসুদেও ও রাণাডেকে বালকৃষ্ণর সঙ্গে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাবে। ইতিমধ্যে তাঁরা চেয়েছিল, বাসুদেও ছেলেমানুষ, ভজিয়ে ভাজিয়ে বালকৃষ্ণর বিপক্ষে সাক্ষ্যটা দিইয়ে নেবে।

বাসুদেও আর রাণাডের সঙ্গে বালকৃষ্ণর ঘোগসাজস প্রমাণ করতে পুলিশকে বেগ পেতে হ'চ্ছে। বাসুদেওকে পুলিশ বারে বারে থানায় হাজির হতে বলে যায়, সুতরাং প্রায়ই

সেখানে যেতে হয়। পুলিশের কাজ হ'চ্ছে একই কথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে জিজ্ঞাসা করা যদি অন্তর্কিতে মুখ থেকে কিছু বেরিয়ে পড়ে। ক্রমে বাসুদেও বেশ বুঝতে পারলে যে তাকে নেজ বাবার বিপক্ষে সাক্ষী দিতে হবে। তার কাছে এ বিষয়টা মর্মান্তিক পরীক্ষা হ'য়ে দাঁড়াল। বোধহয় সরাসরি দিয়ে কথাগুলো বলা তার পক্ষে কষ্টসাধ্য ব্যাপার বলে মনে হ'য়েছিল। তার কাছে বাবাজীর বালকৃষ্ণ কেবল জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নয়,—একাধারে সহকর্মী, বন্ধু ও গুরু।

যখন সে জানতেই পারলে যে সাক্ষ্য তাকে দিতেই হবে তখন তার মাথায় এক গুরুতর কন্সি খেলে গেল। সে পরম্পরায় খবর পেয়েছিল অদালতুমাও দেশদ্রোহী দুটো ভাই অর্থলোভে তার জেলদারের সন্ধান দিয়ে ধরিয়ে দিয়েছে। তখন বাসুদেও ঠিক করলে মরতেই যখন হবে তখন পৃথিবী থেকে এই দুটো মহাপাতককে নিকেশ করে যেতে হবে। তখন সে প্রকাশ্যভাবেই এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা পালনের জন্য তার মন প্রস্তুত করলে; কোনো বাধা বিপত্তি মানতে চায় না —একটা দারুণ বে-পরোয়া ভাব। মন একেবারে উচ্চগ্রামে বাঁধা।

তাকে পুলিশের ফাঁদে ফেলবার জন্যে রামজী পাণ্ডু নামে এক হেড্ কনেষ্টবল একেবারে আদা-জল খেয়ে লেগে পড়েছে। বালকৃষ্ণর প্রতিজ্ঞা এই আপদটাকে আগে সরাতে হবে, তাহলে বালকৃষ্ণর ধরা পড়ার জন্যে প্রধানতঃ যে দায়ী তার ওপর প্রতিশোধ নেওয়া সার্থক হবে। বাসুদেওকে তখন পুলিশ নজরে নজরে রেখেছে তার পক্ষে সাবধান হয়ে চলা একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু যার প্রাণ দেশের জন্য উৎসর্গীকৃত, তার কাছে সতর্কতার প্রশ্ন ওঠে না —তখন লক্ষ্যের প্রতি স্থির দৃষ্টি রেখে সে অগ্রসর হয়ে চলেছে।

প্রথম প্রচেষ্টা হল যখন ১৮৯৯ ফেব্রুয়ারী ৩ তারিখে রামজী সারাদিনের কাজের পর রাতে বাড়ী ফিরছে, তখন বাসুদেব তাকে লক্ষ্য করে পিস্তল ছুড়ল। এ কি! আওয়াজ পর্যন্ত হল না, শিকারটা অক্ষতদেহে সামনে থেকে চলে গেল। কারণ খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল যে উত্তেজনার বশে বন্দুকে টোটা ভরবার সময় সেটা বাইরে পড়ে গেছে, লক্ষ্য করা হয় নি।

তখন সে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। প্রকাশ্যে তার এক কাকাকে বলে যে সে রামজীকে খুন না করে শান্তি পাচ্ছে না। সে রাত্রেই পুলিশ পক্ষের একটা না একটাকে হত্যা করবেই। আবার রামজীর সন্ধানে বেড়িয়ে পড়ল রাণাডেকে সঙ্গে করে।

পুলিশের অনুসন্ধান চলছে। দ্রাবিড় ভ্রাতৃদ্বয় গণেশ আর রামচন্দ্র—এদের দুজনের গুপ্ত তথ্যের ওপর পুলিশ কমিটির সকল সভ্যের নাম টের পেয়ে গেছে। এক একজনকে ধরে এনে কেবল জেরার ওপর জেরা চলছে।

অদ্ভুতকর্মা অসমসাহসী বাসুদেব ইতিমধ্যে আর এক কাণ্ড করে বসল। সে আর রাণাডে যেমন রামজীর ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে, তেমনি দ্রাবিড় দুটোর ওপরও তাদের লক্ষ্যেই ঘোরে চলেছে।

এই ভাই দুটির মধ্যে একটির সামান্য পরিচয় দেওয়া দরকার। আন্দাজ বিশ বৎসর বয়সে গণেশ দ্রাবিড় পুনার যত্র পুলিশ অফিসে চাকরি পায়। পুলিশি আমব কায়দায় বাড়িভাড়া করায় তার মাইনে থেকে মাসিক ১০ টাকা কেটে নেওয়ার হুকুম হয়। কিন্তু যে জানে সে একটা উপায় বার করে নেবেই নেবে। সে তার মাইনের বিল ঠিকঠাক লিখে উর্দ্ধতন অফিসারের সহি আদায় করে, এ্যাকাউন্টেন্ট জেনারেলের অফিস থেকে মঞ্জুরীপত্র পাশ করিয়ে নিয়ে প্রতিমাসে পুরো মাইনে নিয়ে যেত।

এ চাতুরী খুব বেশী দিন চলেনি; ধরা পড়ে তার দণ্ড হল, তিন বৎসর সশ্রম কারাবাস। পিছপাও হবার ছেলে নয় শ্রীমান গণেশ। সে জেলখানায় কয়েদীর নম্বর

দেওয়ার কাজ সংগ্রহ করে নিয়েছিল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েদীদের মুক্তি সংক্রান্ত কাগজপত্র তৈরী করার কাজের ভার তার ওপর পড়ে। সে এই সুযোগে নিজের মুক্তির কাগজ লিখে নিয়ে জেল-কর্তার সই করিয়ে বেরিয়ে পড়ে।

এই সময় সে চাপেকরদের খবরাখবর কেবল সংগ্রহ করা নয় তা পুলিশকে সরবরাহ করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত পুলিশ তার জেল-পলায়নের অপরাধে ধরে ফেলে। হাইকোর্টে সেদিন জজ বলেছিলেন যে "সাবাস, সাহস! লোকটা মোটে মরে না।" তখন আবার দু বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হয়।

জেলে বসে বসেই সে চাপেকর গুপ্ত সমিতির অমূল্য তথ্য পুলিশকে দিতে আরম্ভ করেছিল যার ফলে রামকৃষ্ণ ধরা পড়ে, সে কারণে ১৮৯৯ সালের ২৪ জুলাই তার অবশিষ্ট দণ্ড মকুব করে মুক্তি দেওয়া হয়। আর রামকৃষ্ণ ধরা পড়লে যে নগদ টাকা পুরস্কার দেবার কথা ছিল তার অর্দ্ধেক দশ হাজার টাকা দেওয়া হয়। সে তাতে সন্তুষ্ট হ'তে পারে নি।

ধর্ম্মের কল বাতাসে নড়ে। ১৯৮৯ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী টাইম্‌স অফ্ ইণ্ডিয়া পত্রিকায় এক দীর্ঘ পত্র প্রকাশিত হ'ল। তাতে গণেশ শঙ্কর দ্রাবিড় লিখছে যে "আমাকে হয়ত অনেকে লোভী ব'লে মনে করবে কারণ ঘোষিত পুরস্কারের বিশ হাজার টাকার মধ্যে মাত্র দশ হাজার টাকা ও আমি পেয়েছি। তাই ও সত্যের খাতিরে আমার লিখতে হচ্ছে সব কথা। রামকৃষ্ণ চাপেকার ভাই সাহায্যে ধরা পড়েছে আজ আর নতুন ক'রে কাকেও বলে দিতে হবে না। গভর্ণমেণ্ট সে কথা অস্বীকার করেনি। কিন্তু টাকা দেবার বেলায় মাত্র অর্দ্ধেক দিয়েছে; তারও অর্দ্ধেক আমার ভাইকে দেওয়া হয়েছে। আমার সম্পূর্ণ বিশ হাজার টাকা পুরস্কার কেন দেওয়া হবে না, আজ পর্য্যন্ত এর যোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

"পাকা খবর আমি দিয়েছি, সেটা যে নির্ভুল তার প্রমাণের অভাব নেই। পুলিশ ধরতে পারে নি, তার অযোগ্যতার জন্য আমাকে শাস্তি ভোগ করতে হবে,—এ যুক্তি বন্ধ নয়। এখন রামকৃষ্ণও ত ধরা পড়েছে। জনমতের বিরুদ্ধে আমি অসম সাহসে গভর্ণমেণ্টকে সাহায্য করতে বিপদকে তুচ্ছ জ্ঞান করেছি, লোকে আমাকে দেশদ্রোহী শত্রুরূপে প্রচার করেছে। প্রবল প্রতাপান্বিত সরকার বাহাদুরের সঙ্গে আমার মত ক্ষুদ্র নগণ্য লোকের কোনো সংগ্রাম সম্ভব নয়। কিন্তু তার চোখে আঙুল দিয়ে ভুল দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করা এবং পত্রিকার পাঠকদের মধ্যে যদি আইনজ্ঞ কেউ আমার সাহায্য করেন, সেই কারণে এই পত্রটি প্রকাশ করলাম।"

পাইতাবার সরকারের কপটতা আর পুলিশের অযোগ্যতা গণেশ প্রচার করে দিলে। আর যাই হ'ক, কথার প্যাঁচে সে ঘুরিয়ে দিল, যে তার বুদ্ধির জোরে আসামী ধরা পড়েছে।

সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেল গণেশ শঙ্কর পুলিশের সিদ্ধিলাভে সহায়তা করেছে। তখন বাসুদেব ক্রোধে ক্ষোভে একবার হুঙ্কার দিয়ে উঠল। কর্ম্মিকর্ম্মা পুরুষ, বসে বসে চিন্তা করে, একবার উপায় ঠিক হ'লে আবার বদলে অন্য পথ ধরা বাসুদেবের চরিত্রে দেখা নেই। সঙ্গে সঙ্গে স্থির করলে, "খুন, খুন, নির্দ্দয়ভাবে খুনজখমারা করতে না পারলে, এর প্রতিশোধ নেওয়া হ'ল না।"

৮ই ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা পার হ'য়ে রাত্রির অন্ধকার পৃথিবীর বুকের ওপর ধীরে ধীরে নেমে এসে জমাট বেঁধে উঠছে। গণেশের বিবৃতি প্রকাশিত হবার পর থেকে প্রতি রাত্রে বাসুদেব আর বাপাডে দ্রাবিড়দের বাড়ীর চারপাশে ক্ষুধার্ত্ত বাঘের মত ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। ভয় আছে, পাছে কারও নজরে পড়ে যায়। কিন্তু তারা কর্ত্তব্যে অটল; কোনো বিপদ আপদে তাদের ভ্রূক্ষেপ নেই। জীবন পণ করে তারা বেরিয়ে পড়েছে।

সাধনায় সিদ্ধি মেলে। ৮ই ফেব্রুয়ারী রাত্রে তারা স্থির

করে ফেল্‌লে, 'আর নয়; এস্পার ওস্পার যা হয় আজ ক'রে ফেলা চাই।' তখন মাথায় খুন চেপেছে। মনে হ'ল এক সঙ্গে সব শেষ করতে হবে। একবারের বেশী দুবার ও মারতে হবে না, কিন্তু উপযোগী পুরুষ সম্বন্ধে দৃঢ় হ'য়ে থাকলে একাধিক শিকার লাভে সমর্থ হওয়া সম্ভব। তারা সন্ধ্যার মুখটায় রামজীর যাওয়া-আসার পথটা আগলে রইল, আগে সেটাকে সাবাড় ক'রে, পরে গণেশ-রামচন্দ্র নিধন পর্ব্ব সুরু করতে হবে।

রামজীর পরমায়ুকাল তখনও শেষ হয় নি; সে রাত্রে শিকার সে-পথ দিয়েই গেল না। বড় দুঃখে—যাত্রাটা সুরু হ'ল, বিফলতা দিয়ে। যাই হ'ক, মনোভঙ্গ নিরুৎসাহ হ'য়ে পড়বার ছেলে তারা নয়। সেখান থেকে তারা ব্রাবিড়দের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত। ইতিমধ্যে বেশ পরিবর্ত্তন হ'য়ে গিয়েছে। যেন পুলিশ অফিসের লোক।

বেশ জমিয়ে তাস খেলা চলছে ব্রাবিড়দের বাড়ীতে; হারজিতের মধ্যে তারা ডুবে রয়েছে। রাত্রি তখন ৯টা বেজে গেছে; হয় ত ১০টার কাছাকাছি। খেলার আড্ডায় এক পাঞ্জাবী মূর্ত্তির অকস্মাৎ আবির্ভাব। অপরিচিত পুরুষ হিন্দীতে বলে যে থানার বড় কর্ত্তা গণেশ-রামচন্দ্র ভাই দুজনকে ডেকেছেন বড় জরুরি কথা আছে। খেলায় মত্ত; সকলে ভাল করে লোকটার দিকে চেয়ে দেখার মত মন ছিল না। গণেশ বল্লে, 'এগিয়ে যাও; এই হাতটা খেলে আমরা যাচ্ছি।' আগন্তুক একটু তাগিদ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল।

মায়ের প্রাণ সকল জায়গায় এক, শয়তানের মা হ'লেও তিনি 'মা'। গণেশের মা কথাটা শুনে যেন অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে আতঙ্কিত হ'য়ে উঠলেন। কেবল বল্লেন, 'আজ আর নয়; রাত্তিরে ভিত্তিরে, কিসে কি ঘটবে, বলা যায় না।' ছেলে উত্তর দিলে, 'কোনো ভয় নেই, দুজনে একসঙ্গে যাবো, যাবো আর চলে আসবো, বেশী কাজ থাকতে পারে না।'

মা কেবল বল্লেন, 'কাল সকালে যাবি, এ কথাটা লোক-টাকে বলে দিলি না কেন?' নিজেই বলে দেবেন বলে সন্ধান করে দেখলেন আগন্তুক চলে গেছে।

এদিকে এক কুয়ার কাছে গাছের অন্ধকারে দুই বন্ধু বাসুদেব আর রাগাডে চঞ্চলপদে শিকার লাভের আশায় পায়চারি করছে, আর ব্রাবিড়ের বাড়ীর দিকে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টিতে চেয়ে দেখছে, ফস্‌কে না যায়। ধীরে ধীরে দুটি মূর্ত্তি ব্রাবিড় বাড়ীর দরজার চৌকাট অতিক্রম করে বাইরে বেরিয়ে এল। ব্রাবিড়-জননী ইষ্টনাম জপ করতে করতে দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেলে দরজা বন্ধ করেছেন মাত্র। 'দুড়ুম, দুড়ুম', গোটাকতক শব্দ পর পর বাতাসে মিলিয়ে গেল, আর্ত্তকণ্ঠে অস্ফুট স্বরও বোধ হয় বেরিয়ে এল। কিন্তু যেটা আকাশ বাতাস প্রকম্পিত করে উঠল, সেটা ব্রাবিড়-জননীর মর্ম্মভেদী কণ্ঠস্বর।

'মেরে ফেলেছে রে। কে কোথায় আছ ছুটে এস, আমার গণেশ রামকে খুন করেছে!'

তাস খেলার সঙ্গীরা আর আক্রান্ত দুজনের ছোট ভাইরা ছুটে এসে দেখলে যে রক্তাপ্লুত হ'য়ে দুই ভাই প্রায় মরণোন্মুখ। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই গণেশের প্রাণবায়ু অনন্তে মিলিয়ে গেল। তারা রামচন্দ্র দাদাকে অনুসরণ করলে পরের দিন ভোরে।

বাসুদেব ও রাগাডেকে কেউ দেখেনি, সুতরাং এই খুনের সঙ্গে তাদের জড়াতে পারা গেল না। কিন্তু পুলিশের সন্দেহ এড়াতে তারা পারে নি। আগে থেকেই ও তাদের ডাকা-ডাকি সুরু হ'য়ে গিয়েছে।

দুই বন্ধু বুঝলে আর নিস্তার নেই। তখন যে কর্ম্মী খাঁটলে তা আরও বিস্ময়কর। কাজ সেই দিনই হ'য়েছিল। কিন্তু রামজী পাণ্ডু কনেষ্টেবল্-এর অখণ্ড পরমায়ু, আবার দারোগার বিফলতা এসে সব ওলট পালট করে দিলে।

ডাক এলো বলে। যাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে নিচ্ছে: রাগাডেকে বাসুদেব একটা টোটা ভরা পিস্তল সঙ্গে নিতে

বলে ; নিজের সঙ্গে একটা রেখে দিলে। কোর্টার নীচে পলার খোলানো এক থলির মধ্যে এগুলো ভরা রইল, বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই।

একটা দিন বাদ দিয়ে ১০ই ফেব্রুয়ারী থানার লোক আমন্ত্রণ জানিয়ে গেল। সকালেই যেতে হবে। সেখানে পুলিশের লোক ভীষণ ব্যস্ত নানা রকম জিজ্ঞাসাবাদ আর তথ্যানুসন্ধানের কাজে। ছোকরা তিন জন বসেই আছে। সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল, তখন তাদের—ডাক পড়লো আলাদা আলাদা জাঁদরেলের কাছে। সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট স্বয়ং আলাদা বাসুদেবকে নিয়ে পড়লেন। আর প্রস্তাবনে জর্জরিত করলেন, আগের দু'রাত্রি সে কোথায় ছিল, কি করেছিল।

বলা নেই কওয়া নেই, বাসুদেব হঠাৎ পুলিশ সাহেবকে গুলি করবার জন্যে পিস্তল বার করেছে। সাহেব, মিঃ ক্রুইস, চক্ষের নিমেষে বাসুদেবকে আক্রমণ করে মাটিতে ফেলে দিলেন। হাত থেকে পিস্তল ছিনিয়ে নিয়ে তাকে আর সঙ্গী মহাদেব বিনায়ক রাণাডেকে আটক করে ফেললেন।

তারপর আর বেশী কথা নয়। বাসুদেব হরি চাপেকার, মহাদেব বিনায়ক রাণাডে আর বাপুবিষ্ণু সাথের বিচার আরম্ভ হল। বালকৃষ্ণর মামলার পূর্ণ সমাপ্তি হয় নি। তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এদেরও আসামী তালিকাভুক্ত করা হল।

রাণাডে ছিল সরকারী বিজ্ঞান কলেজের এক কারখানার শিক্ষানবীশ। তার কাজের জন্য সীসার পাত দেওয়া হত। প্রস্তাবিত হল, সেই সীসা থেকে সে মুলেট তৈরী করেছিল এবং তারই একটা আয়ার্স্টের দেহ থেকে পাওয়া যায়।

বাসুদেও আর রাণাডে গর্বভরে কেবল দোষ স্বীকার নয়, বুক ফুলিয়ে বলেছিল,। "বেশ করেছি, অত্যাচারী রাজপুরুষ আর দেশদ্রোহী ভাই দুটোকে যে সাবাড় করতে পেরেছি, তাতে আমরা দেশের মঙ্গলের সঙ্কীর্ণ পথ কিছু প্রশস্ত করতে পেরেছি।"

এবারে বালকৃষ্ণহরির মামলার রায় বেরুবার অন্তত দিন ধার্য্য হয়ে গেল। ১৮৯৯ সালের ৮ই মার্চ্চ সেসন্ জজ্ বালকৃষ্ণর ফাঁসীর হুকুম দিলেন।

বালকৃষ্ণ বলে উঠলেন, "আঃ! বাঁচা গেল।"

এদিকে বাসুদেও, রাণাডে আর সাথের বিচারের বাকীটুকু শেষ করবার দিন এগিয়ে এল। বালকৃষ্ণ তখনও তৃতীয় মামলার আসামীর কাঠগড়ায়। নতুন অপরাধ, অর্থাৎ প্রাবিড় মিলন, চাপানো হ'ল তিন তরুণ বন্ধুর ঘাড়ে। সেসন বিচার আরম্ভ হল ২রা মার্চ্চ (১৮৯৯)।

বলা বাহুল্য, বাসুদেও হরি চাপেকর, মহাদেব বিনায়ক রাণাডে এ দুজনের ফাঁসির হুকুম হল। বাপু বিষ্ণু সাথের প্রতি দশ বৎসর সশ্রম কারাবাসের হুকুম হল।

বিচারালয়ে যখন হাজির হল নতুন তিন আসামী তখন মনে হল যেন তিন বন্ধু বিয়ের বর, "মিত" বর, আর এক বরযাত্রী। পরিধানে জরির পাড়ের ধপ ধপে সাদা ধুতি, সোনার জরির পাড় তাদের মিহি চাদরে। হাসি হাসি মুখ। যাঁরা বিচার দেখতে এবং রায় শুনতে এসেছিলেন, তাঁরা হাসবেন, কি কাঁদবেন ভেবেই ঠিক করতে পারলেন না। কবির ভাষায় বলে এক চক্ষে হাসি, আর এক চক্ষে আনন্দের অশ্রু গাল বেয়ে ঝরে পড়তে লাগল।

রায় শুনে হাসতে হাসতে বাসুদেও বলে, "হুজুর! ন্যাও, আয়ার্স্ট হত্যার একটা ফাঁসি ত ঝুলছে। আবার একটা দিলেন। এর কোনটা আগে হবে, পরেরটা বিফল হয়ে ফোতে আছড়ে পড়ে যারা যাবে যে!"

৩১শে মার্চ্চ (১৮৯৯) হাই কোর্টের আপীলে বাসুদেও আর রাণাডের ফাঁসির হুকুম বহাল রইল। সাথের কারাদণ্ড দশ থেকে সাত বছরে কমিয়ে দেওয়া হল মাত্র।

এখন চিরবিদায়ের দিন ঘনিয়ে এল। কে কবে ছোকরারা মৃত্যুর সামনে দাঁড়িয়ে হাসি মস্করা চালাচ্ছে, যেন নরক গুলজার হয়ে উঠেছে। জেলকর্তৃপক্ষ ও অবাক। মনে মনে প্রশ্ন, এরা কি সাধারণ মানুষ, না,—"অমৃতস্য পুত্রাঃ"।

চলছেন বাসুদেও ফাঁসির মঞ্চের দিকে। সব আলাদা আলাদা কুঠরীতে আবদ্ধ। যাবার সময় বালকৃষ্ণর কুঠরীর সামনে এসেই বলে, "দাদা, চল্লুম; আশীর্ব্বাদ কর, আবার যেন তোমাদের মত দাদা পাই।"

বালকৃষ্ণ বলে, "এসো ভাই, তুমি বয়সে ছোটো হলে কি হয়, আমি তোমাকে অনুসরণ করছি।" বাকী কথাগুলো মনে মনেই হল। "যে সাহস, যে বুদ্ধি, আর অকপট ভ্রাতৃপ্রেমের পরিচয় দিয়েছ ভাই, তাতে তুমিই আমাদের দাদা হবার যোগ্য। তোমার বিদায়ক্ষণে আমি তোমার আমার অন্তরের শ্রদ্ধা নিবেদন করি।"

ফাঁসির দড়ি দুলছে ৮ই মে (১৮৯৯) তারিখে।

ফাঁস পড়ে গেল গলায় মুখের আবরণ খুলে ডাক্তার পরীক্ষার সময় দেখলেন মুখখানি যেন প্রস্ফুটিত পদ্মফুল স্বর্গীয় সুষমায় ভরে আছে।

মহাদেব বিনায়ক আরও দুদিন কাটালেন আনন্দের মধ্যে জেলখানার চৌকীদার, প্রকৃতির সহিত হাসি তামাসার সঙ্গে, আর বাকী সময় উপবাসের সঙ্গে স্বয়ংবোর আউড়ে। একদিন বাদে ১০ই মে (১৮৯৯) রাণাডে দেশমাতৃকার চরণে অকাতরে প্রাণবলি দিলেন ফাঁসি কাষ্ঠে।

এইবার বয়োজ্যেষ্ঠ বালকৃষ্ণহরি চাপেকারের পালা। তিনি গম্ভীর প্রকৃতির লোক। বিরাট সিন্ধু যেন স্থির, অচঞ্চল। যেটুকু জীবনের লক্ষণ পাওয়া যায়, সেটা যেন মৃদু বায়ু সঞ্চালনে সমুদ্রবক্ষে তরঙ্গের লীলা। অবিশ্রান্ত দেব-দেবতার নাম উচ্চারিত হচ্ছে। জেলের কুঠুরী যেন ঠাকুর ঘর। দেশমাতৃকা সেখানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। "বাহুতে তুমি মা শক্তি, হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি"। জীবন প্রদীপে তৈল নিঃশেষ হয়ে আসতে লাগল। শুভদিন এল ১২ই মে (১৮৯৯)। দামোদর আর বাসুদেও ভ্রাতৃদ্বয়ের মত বালকৃষ্ণ ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের গান গাইতে গাইতে চিরবিদায় গ্রহণ করলেন। ইহজগৎ থেকে। কিন্তু তাঁরা মৃত্যুর মধ্যে চির জীবন লাভ করেছেন। নশ্বর দেহ ত যেতেই হবে; চিরদিন কবে স্থির ধারণে, জীবন নদে?" কিন্তু "কীর্ত্তির্যস্য সঃ জীবতি," একথা চিরসত্য, "সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভুলে, মনের মন্দিরে নিত্য সেবে সর্ব্বজন।" এরাই সার্থক বলেছেন, "যার যাবে জীবন চলে, জগৎ যাবে তোমার কাজে 'বন্দে মাতরম্' বলে।"

একবার কি মনে প্রশ্ন জাগবে, "এক বংশে এই বীর ভ্রাতৃত্রয়ের আবির্ভাব সম্ভব হ'ল কি ক'রে?" তার উত্তর পাওয়া গেছে। নেপোলিয়ান বলেছিলেন, "তাঁর সমস্ত গৌরব, তাঁর জননীদেবীর প্রাপ্য।" মহাপুরুষদের জীবনী আলোচনা করতে গেলে সৃষ্টিকর্ত্তার এই বিরাট আশীর্ব্বাদ মনে এসে দেখা দেয়। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মাতৃদেবীর কথা আর বাঙ্গালী পাঠকের কাছে নতুন ক'রে বলবার কিছু নেই।

আমরা চাপেকর পরিবারের মধ্যে দামোদর-বালকৃষ্ণ-বাসুদেও-জননীর চরণে প্রণাম জানাই। যখন তিন ছেলের ফাঁসী হ'ল ১৮৯৮ সালের ১৮ই এপ্রিল থেকে ১৮৯৯ সালের ১২ই মে তারিখের মধ্যে অর্থাৎ তেরো মাসের মধ্যে, এবং জননী ক্রোড় একেবারে শূন্য হয়ে গিয়েছে, তখন পরদুঃখে বিগলিতপ্রাণা ভারতের মুক্তি যুদ্ধের অন্যতমা বিদুষিনী ভগিনী নিবেদিতা (মিস্ মার্গারেট নোবল্) দামোদর-জননীকে সান্ত্বনা দিতে, শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করতে বোম্বাই গিয়েছিলেন।

ভারতের সকল বীর সন্তানের মাতার প্রতীক দামোদর-বালকৃষ্ণ-বাসুদেও জননী তখন পূজায় নিরত। তিনি ভগবানের শ্রীচরণে সন্তানদের আত্মোৎসর্গ করেছেন, ভারতের মুক্তির জন্য অন্তরের প্রার্থনা জানাচ্ছেন; নিজের অবশিষ্ট জীবনের জন্য শান্তি কামনা করছেন।

'দিদিমা' শুনলেন 'মা' ঠাকুর ঘরে। তিনি অপেক্ষা করতে লাগলেন। ওদিকে সংবাদ গেল এক বিদেশিনী মহিলা সাক্ষাৎ করতে চান। তিনি অর্দ্ধ সমাপ্ত পূজা-আহ্নিক ফেলে

রেখে ধীরে ধীরে বাহিরের ঘরের দিকে আসছেন। নিবেদিতা দেখলেন "জীবন্ত প্রতিমা; মুখে শোকের চিহ্ন মাত্র নাই। শান্ত সমাহিত মুখচ্ছবি। তিনি পাদস্পর্শ ক'রে প্রণাম করতে গেলেন। বীর জননী একটু পিছনে সরে দাঁড়ালেন। পাদস্পর্শ করতে দেওয়া যায় না। আপত্তিক কোনো প্রকারেই হীন নয়; সমপর্যায়ে পদধূলি দান ও গ্রহণ বিধেয় নয়।

নিবেদিতা অতি কোমল করুণ কণ্ঠে সহানুভূতি প্রকাশ করতে গেলেন। মা বলেন, "আপনার সমবেদনার আমি অভিভূত হ'য়ে পড়েছি। কেবল এই কথাই ভাবি প্রিয় সন্তানদের যিনি দিয়েছিলেন, তিনিই উঠিয়ে নিয়েছেন; আমার এক্তিয়ারের মধ্যে ও নয়। গৌরববোধ করি যে তাদের জীবনদানে দেশবাসী মহা অত্যাচারের হাত থেকে রক্ষা পেয়েছিল। দেশপ্রেমের যে আগুন তারা ছড়িয়ে গেল ভারতবর্ষকে সেই স্ফুলিঙ্গ অগ্নিময় ক'রে তুলে ধরবে। আশীর্বাদ করুন যেন তাদের আত্মা চিরশান্তি লাভ করে। তাদের জীবন উৎসর্গ করার আদর্শ দেশের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে।"

নিবেদিতা বিদায় নিলেন নমস্কারে। কেবল বল্লেন, "মা! দেশের মধ্যে যতদূর জাতীয়তার ভাব প্রসারলাভ করেছে কল্পনা করেছিলাম, তার থেকে আরও গভীরে সে ভাব ছড়িয়েছে।

যে দেশের জননী এইভাবে তিন সন্তানকে ভারতমাতার চরণে উৎসর্গ করে মনকে এই উঁচু সুরে বেঁধে রেখেছেন, সে দেশ পরাধীনতার যন্ত্রণা থেকে মুক্ত হবার খুব বেশী দেরী হবে না।"

উদ্বোধন আবার প্রণাম জানিয়ে নিবেদিতা চলে এলেন।

মহারাষ্ট্রের এই দেশপ্রেম, সাহস, শৌর্য্য, ত্যাগ ক্রমে ভারতকে লাঞ্ছিত করেছে। যখন বাল গঙ্গাধর তিলক, আর মহাদেব পারাঞ্জপে 'কেশরী' আর 'কাল' পত্রিকায় অগ্নি-বর্ষণ করে দেশবাসীর কালনিদ্রার অবসান ঘটাতে চেষ্টা করছিলেন, তখন ভারতের অন্যত্র সে জাগরণ ঘটে নি। বাঙালী মন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। জাতীয়তাবোধ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে দেখা দিয়েছে। মহারাষ্ট্র গুরুর মন্ত্রে অরবিন্দ তখন বারুদ গুল ক'রে আগ্নেয়াস্ত্রে ভরবার ব্যবস্থা করছেন।

তাহার পর গোলা ফাটার শব্দে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল মুখরিত হ'য়ে উঠেছে। প্রথম দিকে বাঙলা সময়ে অবতীর্ণ হ'লে, উত্তর ভারত ক্রমে পাশে এসে শক্তিযোজনা করেছে।

তিলক মহারাজের গণপতি ও শিবাজী উৎসব ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে নতুন ধারা এনে দিয়েছে। শিবাজীর নামে ভারতের বীরধর্ম্মের রক্ত উত্তাল হ'য়ে ওঠে। কবি বলছেন,

"শুধু তব নাম আজি পিতৃলোক হ'তে এল নামি"
কহিল আহ্বান,
মুহূর্ত্তে হৃদয়াসনে তোমারেই বরিল হে স্বামি,
বাঙালীর প্রাণ।"

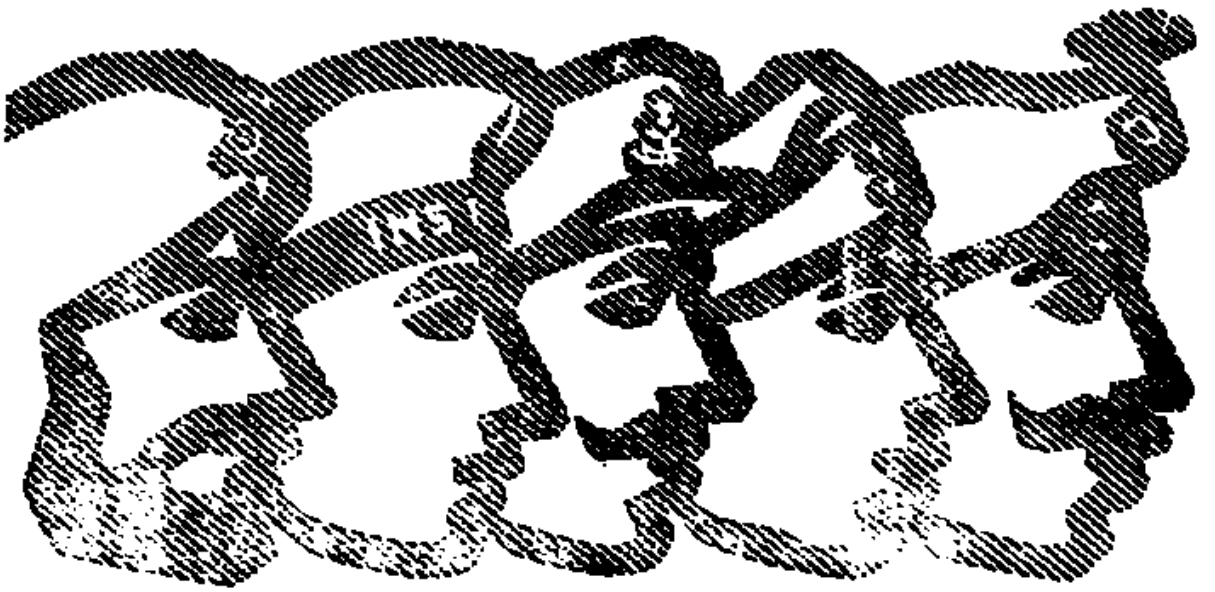

আমরা আমাদের জোয়ানদের জন্য একান্তভাবে গর্বিত। তারা আমাদের স্বাধীনতা, সম্মান, সম্পদ ও জীবন রক্ষা করেছে। তারা শক্তিশালী শত্রুকে প্রতিহত ও বিতাড়িত করেছে। এই কাজে অনেকে জীবন বিসর্জন দিয়েছে, আর আহত হয়েছে আরো বেশী। আমাদের জোয়ানরা নিষ্ঠার সঙ্গে তাদের কর্তব্য পালন করে চলেছে। আসুন, সর্বশক্তি দিয়ে কাজ করে আমরা তাদের শক্তিবৃদ্ধি করি।

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

আশীর্বাদ

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটী
অপ্রকাশিত কবিতা

পিছে রাখি বহুদূর শৈশবের স্মৃতি
জীবনে অতীত নিশা আজি অবসান।
নব উষালোকে আজি নব আশা ভরে
নবীনার কর ধরি বিস্ময়ে পুলকে
নবীন উৎসাহে তুমি হলে উপনীত
জীবনের কর্ম্মক্ষেত্র সংসার মাঝারে।
মনের ভাষা আজি মুখে না ফুরায়,
কেমনে জানাব বল, হৃদয়ের প্রীতি?
লহ মোর প্রাণভরা স্নেহ আশীর্ব্বাদ,
আর লহ পাতি শির তাঁর স্নেহাশীষ
নীরব ভাষায় যাহা— পীযূষ পূরিত—
ঝরিছে অমর হতে সদা নিরন্তর—
জাহ্নবীর পূত ধারা সম নিরমল—
দম্পতি জীবন হক চির সুখময়।
কঠিন কর্ত্তব্য ভরা কর্ম্মক্ষেত্র মাঝে
নির্ভরে বিপুলে ধরি' হও অগ্রসর।
কৃপাসিন্ধু (ও) কভু তব বিঁধিবে না পায়।—
(আর) ধরি জনম-দুখিনী দেবী জন্মভূমি তব,
দেশহিতে মনপ্রাণ কর সমর্পণ
সুখের বসন্তে যাদা ফুলে সত ফলে,
সার্থক জীবন হক, ধন্য হক দেশ।—

২২শে অগ্রহায়ণ, ১৩১৮।

[রায় বাহাদুর ডাঃ কুমারনাথ বাগচির বিবাহ উপলক্ষে]

বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জীবনদর্শন

পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

[বঙ্গ ভঙ্গের যুগে যে জাগরণের সূত্রপাত হয় আসমুদ্র হিমাচলে, সেই লক্ষণ দেখেই দূরদর্শী ইংরেজ বুঝে নিয়েছিল যে ও-তরফ রোধ ক'রে খুব দীর্ঘকাল আর এদেশে তাদের শাসন করতে হবে না। এবং ইংরেজ রাজত্বের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই স্বাধীন দেশ যে ফিরে তাকাবে জাতির জাগরণের অন্যতম প্রধান হোতাদের দিকে, তাদের অধিষ্ঠিত করতে চাইবে শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের সর্বোচ্চ আসনে, এ কথাও জানত তারা। তাই, সেই শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের অর্ঘ্য যাতে সত্যকার হোতাদের চরণে গিয়ে না পৌঁছায়, সেই অপচেষ্টায় তারা জাতীয় নেতাদের কারো কারো মহানতম অবদানের অত্যুজ্জ্বল স্বর্ণালীকে কুয়াসাচ্ছন্ন করে দিয়ে যথেষ্ট কুশল রীতির সাহায্যেই দেশবাসীর সামনে অত্যধিক প্রস্ফুট ক'রে ধরেছিল সেই সব তাদের বিকৃত চিত্র অথবা অপেক্ষাকৃত গৌণ কৃতিত্বের দিক গুলো। এই প্রক্রিয়ার অন্যতম শোচনীয় এক ক্রীড়নকরূপে আমরা বিপ্লব-নেতা যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে ডাকতে শিখেছি 'বাঘা' যতীন নামে, মুগ্ধ বিস্মিত হতে শিখেছি তাঁর শারীরিক বল ও সৌর্যের কাহিনীতে। অথচ যতীন্দ্রনাথ যে নিছক বাহুবলের প্রতীক ছিলেন না, যতীন্দ্রনাথ যে নিছক 'শহীদ' ছিলেন না, যতীন্দ্রনাথ যে ভারতীয় বিপ্লবের সার্থকতম কর্মসূচীর উদ্ভাবন মুহূর্ত থেকেই তার সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন, সেই কর্মসূচী উদ্ভাবনের মূলে তাঁর অবদান যে অসামান্য ছিল, এবং সেই উদ্ভাবনের মুহূর্ত থেকে—১৯০৩ সাল থেকে—তার প্রথম সফলতম অভিব্যক্তির তরঙ্গশীর্ষে দাঁড়িয়েই যে ১৯১৫ সালের ১ই সেপ্টেম্বরে তিনি মাত্র ছত্রিশ বছরের জীবনটি হাসতে হাসতে উৎসর্গ ক'রে দিয়ে গেলেন দেশ-জননীর চরণতলে, দীর্ঘ প্রায় বারো বছরের অক্লান্ত নেতৃত্ব দিয়ে ধন্য ক'রে গেলেন অগ্নিযুগের সকল বৈপ্লবিক কর্মসূচীকেই সে-ইতিহাস আজো আমাদের অজ্ঞাত। সে-ইতিহাস যদি আজ বিস্মরণের তমসাকোণ ছেড়ে দিবালোকে আবির্ভূত হয় আমাদের দৃষ্টির সামনে, তাকেই কি আমরা বরণ ক'রে নিতে পারব শ্রদ্ধা ভক্তি প্রেমের অর্ঘ্য দিয়ে? নাকি, বার্থ নমস্কারেই তাকে ফিরে যেতে হবে আজও?

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে চেষ্টা করা হয়েছে যতীন্দ্রনাথের সত্যকার চরিত্রের একটি দিক উদ্ঘাটনের।]

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, আমাদের ধর্ম সনাতন ধর্ম, যে-ধর্ম ত্রিবিধ, ত্রিমার্গগামী, ত্রিকর্মরত। অন্তরাত্মার মানসিক জগতে এবং স্থূল জগতে তাঁকে খুঁজে পাওয়া তাঁর সঙ্গে যুক্ত হ'তে চেষ্টা করা হচ্ছে সনাতন ধর্মের ত্রিবিধ স্বরূপ। জ্ঞান, ভক্তি ও কর্মের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির চূড়ান্ত পর্যায়ে ভগবানের সঙ্গে যোগ—এই হচ্ছে সনাতন ধর্মের ত্রিমার্গের স্বরূপ। আর, সত্ত্ব, প্রেম ও শক্তির বিকাশের সাহায্যে মানুষ উত্তরোত্তর উন্নত করে তোলে নিজেকে—এই সনাতন ধর্মের ত্রিকর্ম। কিন্তু, অরবিন্দ বলেছেন, সনাতন ধর্মকে অবলম্বন করে ছোট বড় বহু ধর্মই গড়ে ওঠে, সেগুলি যতই অনিত্য পরিবর্তনশীল হোক না কেন, তারাই সাহায্য করে সনাতন ধর্মের বিকাশে ও অনুষ্ঠানে। যখন গৌণ এই ধর্মগুলি—যেমন, যুগধর্ম, জাতিধর্ম, বর্ণাশ্রিত ধর্ম—অবহেলিত পরিত্যক্ত হয়ে ওঠে কোনও দেশে কোনও যুগে, সনাতন ধর্মের পুষ্টি তখন অসম্ভব, তখন অধর্মই

মানুষের ভিতরে বাইরে একচ্ছত্র আধিপত্য লাভে তৎপর হয়ে ওঠে। তখনই ভারার্ত পৃথিবীর দুঃখ লাঘব করতে ভগবানের অবতার কিংবা বিভূতি মানবদেহে প্রকাশ হন, ধর্মপথ নিষ্কণ্টক করে তোলেন; শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, ব্যক্তিগত ধর্ম যদি জাতিধর্মের অবহেলা করে জাতিধর্মে ভাঙন ধরে এবং সেক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ধর্মের ক্ষেত্র ও সুযোগও নষ্ট হয়ে যায়। **জাতিকেই আগে রক্ষা করা প্রয়োজন, এবং জাতি যদি রক্ষা পায় তবেই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, নৈতিক ও আর্থিক উন্নতি নিরাপদ করা যায়।**

১৭৫৭ সালে পলাশী যুদ্ধের ঠিক পরেই যে চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা দেখা দিল আমাদের জাতির জীবনে, সেই সঙ্কট থেকে দেশকে জাতিকে উদ্ধার করতেই আবির্ভূত হলেন রাজা রামমোহন রায়। পলাশীর তোপধ্বনিতেও যে জাতির চেতনা ফিরল না, দিল্লীর বাদশাহী সনদ নিয়ে বণিক ইংরেজ রাজস্ব আদায়ের নামে যে জাতির বুক চিরে রক্ত পানে মত্ত হল, ফলে মন্বন্তরে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল সোনার বাংলারই এককোটি সন্তান —সেই জাতিকেই জাগাতে এলেন অগ্নিতেজসম্পন্ন বিভূতি, রাজা রামমোহন রায়, ভারতের নবজন্মের প্রথম পথিকৃৎ। বিরাট আলোকস্তম্ভ তুললেন তিনি সমাজের সকল পর্যায়ে, নবজাগরণের প্রথম সাড়া যেন দেখা দিল। রাজা রামমোহনের পাশে দাঁড়ালেন পর্তুগীজ দুই ভিভিয়ান ডিরোজিও আর স্কটল্যাণ্ডের ডেভিড হেয়ার। জাতির সুপ্ত বুদ্ধি ও যুক্তিকে জাগিয়ে দিলেন তাঁরা ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন ক'রে। জাতির জীবনকে নতুন মর্যাদা দিয়ে নতুন সৃজনী প্রতিভার স্ফুরণে উৎসাহও এনে দিলেন তাঁরা। নতুন পরিবেশে, নতুন নতুন আদর্শে ঘরানাতে বান ডাকল, সেই পরিবেশ, সেই আদর্শগুলি রূপায়িত করতে, সফল করতে, অধিগত করতে পথেই হ'ল নব্য তরুণেরা। রাজা রামমোহনের অঙ্গুলী-সঙ্কেতে জাতি ফিরে তাকাল তার ঐশ্বর্য-সমৃদ্ধ অতীত সংস্কৃতির দিকে, সেই সংস্কৃতির সমাদর করতে শিখল, শিখল নতুন যুগের পটভূমিকায় তার মূল্য যাচাই করতে। এই হল রামমোহনের অবদান।

কিন্তু দেশ রইল পরাধীন। জাতিধর্ম পেল না তার পূর্ণ মর্যাদা, কাজেই ব্যক্তিগত ধর্ম রইল ধর্ব ক্ষুণ্ণ অপুষ্ট হয়েই: জনসাধারণের পরাধীন মনোভাবই নিয়ন্ত্রণ করতে লাগল জাতীয় চরিত্র। এ-দেশীয়দের দায়িত্বজ্ঞানহীন স্বার্থান্বেষী ব্যবহারে উত্যক্ত হয়ে বিদেশী শাসকেরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল যে এ-দেশের লোকের উপর কোনও কাজেই নির্ভর করা অসম্ভব। ক্লাইবের নায়েব গোবিন্দরাম, হেস্টিংসের নায়েব নন্দাগোবিন্দ সিংহ এই যুগের দেশী চরিত্রের নিকৃষ্টতম উদাহরণ। রামমোহনের দেহত্যাগের বছর ১৮৩৩ সাল নাগাদই দেখা গেল ক্ষুদ্রাশয়তা, ক্ষুদ্র লক্ষ্য, দলাদলি, তামসিক জীবন যাত্রার সর্বপ্রকার অন্ধকারে দেশের মানুষ ডুবে গিয়েছে নতুন ক'রে, মনুষ্যত্ব বহুল বিলুপ্ত হয়েছে একেবারে।

রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন, রামগোপাল ঘোষ, রসিক মল্লিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারীচাঁদ মিত্র, রাধানাথ শিকদার, রামতনু লাহিড়ী, দক্ষিণা মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ডিরোজিও-শিষ্যেরা রামমোহনের শিক্ষার দীপ অনির্বাণ রেখে চললেন কতকাংশে; তাঁদের প্রেরণাস্বরূপ রইলেন শিক্ষিত সমাজের অগ্রণণ্য দ্বারকানাথ ঠাকুর ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। এঁদেরই আলোকবর্তিকা অনুসরণ ক'রে এলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, পুরুষসিংহ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র, দ্বারকা বিদ্যাভূষণ, কেশবচন্দ্র সেন, ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ প্রমুখ অবিস্মরণীয় মহাপুরুষেরা। একদিকে যেমন চেতনার শিখা দেদীপ্যমান হয়ে উঠল শ্রীরামকৃষ্ণকে কেন্দ্র করে, অন্যদিকে তেমনি প্রগাঢ় হ'য়ে উঠল অন্ধকার।

১৮৫৭ সালে জাতিধর্মের মুখ চেয়েই যে ক্ষণিক গ্রহণ দেখা দিল সিপাহী অভ্যুত্থানের প্রচেষ্টায়, সেই পটভূমিকাতেই এবারে আবির্ভূত হলেন—রাজা রামমোহনের ঠিক এক

শতাব্দী পরে (১৮৭২ সালে) শ্রীঅরবিন্দ, রোমাঁ রোলাঁ-র ভাষায় সর্বশেষ ঋষি। তাঁরই কয়েকবছর আগে জন্মগ্রহণ করেছেন বিরাট বিভূতি বিবেকানন্দ, যাঁর বুকে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ জেলে দিয়ে গেলেন আপন সিদ্ধির পাবক শিখা; সেই সঙ্গে জন্মেছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, বালগঙ্গাধর তিলক, অশ্বিনীকুমার দত্ত, আচার্য জগদীশচন্দ্র, উপাধ্যায় ব্রহ্মবান্ধব, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, মদনমোহন মালব্য, স্বামী ব্রহ্মানন্দ, দ্বিজেন্দ্রলাল রায়, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, লালা লাজপৎ রায়, ভগিনী নিবেদিতা, মোহনদাস গান্ধী, চিত্তরঞ্জন দাস, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমুখ দিকপাল প্রতিভা। এবং এই অলোকসামান্য নৈবেদ্যের চূড়ায় এলেন এঁদের মধ্যে কনিষ্ঠতম—শ্রীঅরবিন্দ। রাজা রামমোহনের জন্মের ঠিক এক শতাব্দী পরে অবহেলিত আর্য-ধর্মের সংস্থাপনার্থে এই যে বিপুল আয়োজন করলেন ভগবান, তার ওপর তাঁরই বিশেষ মনন্দের মোহর অঙ্কিত দেখা গেল নব-আগরণের এই পর্যায়ে।

এবং শ্রীঅরবিন্দকে কেন্দ্র ক'রে যে চূড়ান্ত অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা দেখা দিল তাতে যেসব জ্যোতিষ্কের সমাবেশ ঘটল, তাঁদেরই অন্যতম হলেন যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—শ্রীঅরবিন্দের ভাষায় "my right hand man" : শ্রীঅরবিন্দের সাত বছর পরে, ১৮৭৯ সালের ৬ই ডিসেম্বর তাঁর জন্ম।

অবিশ্বাস্য বিপরীত গুণের সমন্বয়ে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্বিতীয়: প্রচণ্ড প্রাণশক্তির প্রাচুর্য ছিলো তাঁর মধ্যে সহজাত এক ধ্যানস্থীর স্থিতির সঙ্গে, বিরাট ঔদ্ধত্য আকর্ষণী শক্তি তাঁর মধ্যে ছিলো যার্থবিহীন প্রেমের ভাগীরথী-স্রোতে, উগ্র রাজসিকতার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশেছিল বিনীত জ্ঞানদীপ্ত সাত্ত্বিক ভক্তি, শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে সৌন্দর্য ও শক্তির এমন সমন্বয় আর দেখেননি তিনি। "যতীন্দ্রনাথের জীবন ও মৃত্যু একটা যুগের শ্রেষ্ঠতম প্রতীক—" লিখেছেন ভগিনী শ্রীদুর্গেশ্বরী, "যে যুগটা রামমোহন থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত বাংলার যে রেনেসাঁসের শতদলটি ফুটে উঠেছিল, তারই সুষমার মত ইতিহাসে চিরদিন আনন্দ বিতরণ করবে।.....রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ পর্যন্ত যে sages and saints-এর একটা race এক শতাব্দী ধরে আমাদের দেশে জন্মগ্রহণ করলেন, তাঁদের বাণী—The glorious but emerging New World, still in the throes of its birth to be brought into real life by the spiritul content absorbed from the ever effulgent Ancient India—এই বাণীরই প্রথম পরিপূর্ণ আভাস ফুটে উঠেছিল, ফুটে উঠতে চেয়েছিল যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ে। ফুটে উঠতে চেয়েছিল তাঁর দিনের, তাঁর দেশের পারিপার্শ্বিকে।...তাঁরই জীবনের অ্যাক্টেন ভূজীথা-র মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছিল কয়েকটি generations of martyrs। অ্যাক্টেন—মানে নিজেকে—ফুরিয়ে ফেলা—ধাউইয়ের মত জ্বলে উঠে নিজেকে মুহূর্তে নিঃস্ব করে দিয়েই হোক বা তিলে তিলে প্রতি মুহূর্তের মরণকে বরণ করেই হোক। আর ভূজীথা—মানে সত্যি সত্যি উপভোগ করা—সংসারে যেমন স্ত্রী পুত্র নিয়ে মানুষ যে আনন্দ উপভোগ করে, তার চেয়ে গভীর আনন্দ পেয়ে যাওয়া।...."

যতীন্দ্রনাথের প্রথম অধ্যাত্ম-গুরু বোধ করি তাঁরই গর্ভধারিণী শরৎশশী দেবী। নিজে অভুক্ত থেকে শিশু যতীন্দ্রের হাতে তিনি অন্ন-ব্যঞ্জন পাঠিয়ে দিয়েছেন দুয়ারে অপেক্ষমাণ ভিখারীর সেবার্থে দিনের পর দিন। শিশুর যেদিন জ্ঞান হয়েছে, জানতে চেয়েছে, "মা তুমি খাবে না।" জবাবে শুনেছে, "বাবা, দরিদ্রের তৃপ্তিতেই আমার নারায়ণের তৃপ্তি যে।" যতীন্দ্র-চরিত্রের অনেকখানি জুড়ে এই তেজস্বতী অথচ স্নেহকোমল কবি-হৃদয়ের প্রভাব প্রস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

কৈশোরেই গীতাপাঠে অভ্যস্ত হয়েছিলেন যতীন্দ্রনাথ। এবং কলেজ-জীবনে তিনি পেলেন স্বামী বিবেকানন্দের সান্নিধ্য। বিবেকানন্দ যতীন্দ্রনাথকে বললেন, রাজনৈতিক

স্বাধীনতা ব্যতিরেকে ভারতের আধ্যাত্মিক উন্নতি সম্ভব হচ্ছে না, ব্যাহত থাকছে, আগে চাই জাতির রাজনৈতিক স্বাধীনতা।

ওদিকে অবশ্য অরবিন্দের আখড়ায় ঘনিষ্ঠতা হল যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের পুত্র শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথকে শচীন নিয়ে গেলেন প্রাতঃস্মরণীয় পিতার কাছে। যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন বিশেষ বন্ধু, এবং তাঁদের সঙ্কল্প ছিল লেখনীর সাহায্যে জাতিকে উদ্বুদ্ধ করবেন তাঁরা। জগতের অন্যান্য দেশে, ইতালিতে, ফ্রান্সে, রাশিয়ায় – বিপ্লবের পদচিহ্ন কী ভাবে পড়ল, তারই প্রাণ-মাতানো কাহিনী অগ্নিস্রাবী ভাষায় যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ লিখতেন; এবং তাঁর প্রভাবও যতীন্দ্রনাথের মানসিক গঠনের প্রচুর সহায় হয়েছিল।

কৈশোরেই কুষ্টিয়ার বন্ধুত্ব হয়েছিল মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বংশধর সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গে; সেই সূত্রে সরলা দেবীর সঙ্গে; এবং রবীন্দ্রনাথেরও সঙ্গে। যতীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে জেলায় জেলায় ছোট ছোট তরুণ দল গড়ে উঠেছিল যখন, যতীন্দ্রনাথ সেই তরুণদের হাতে গীতা তুলে দিয়েছেন, দিয়েছেন যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণ আর বঙ্কিমচন্দ্রের বই, স্বামী বিবেকানন্দের আদর্শ - আর তাঁদের পাঠিয়ে দিয়েছেন সুরেন ঠাকুরের কাছে ইতিহাসের নতুন ব্যাখ্যা শুনতে: জাপানী মনীষী কাউন্ট ওকাকুরার প্রভাবে সুরেন ঠাকুর এদের বলতেন —আমাদের দেশ, বাংলা নয়, ভারতবর্ষ নয়, সমগ্র এশিয়া আমাদের দেশ, সমগ্র এশিয়ারই অভ্যুত্থান চাই। সুরেন ঠাকুরের মাধ্যমে ওকাকুরা ও যতীন্দ্রনাথের কয়েকবার সাক্ষাৎও হয়।

১৮৯০ সাল থেকেই বরোদায় ঘুনী জালিয়ে বসেছেন শ্রীঅরবিন্দ। লেখনী তাঁর একটি মাত্র দাবী জানিয়ে চলেছে— প্রথম তিনিই মুক্তকণ্ঠে জানালেন এই দাবী—পূর্ণ স্বাধীনতাই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য। লোকমান্য তিলকের সঙ্গে মিলে পশ্চিম ভারতের গুপ্ত সমিতির কার্যপ্রণালী সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে বাংলা দেশে তিনি দূত পাঠালেন যে, এন্. ব্যানার্জীকে। নিজেও বাংলা দেশে এসে ১৯০৩ সালে উঠলেন যোগেন্দ্র বিদ্যাভূষণের বাড়িতে এবং বিদ্যাভূষণ মশাই মণিকাঞ্চন যোগ সাধন করলেন শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় করিয়ে দিয়ে।

শ্রীঅরবিন্দের সেদিনের মনোভাবই কি আরও পাঁচ-ছয় বছর বাদে তিনি প্রকাশ করলেন তাঁর লেখনীতে? "আমাদের উদ্দেশ্য সনাতন ধর্ম প্রচার ও সনাতন-ধর্মাশ্রিত জাতিধর্ম ও যুগধর্ম অনুষ্ঠান," শ্রীঅরবিন্দ লিখলেন। "আমরা ভারতবাসী, আর্য জাতির বংশধর, আর্যশিক্ষা ও আর্যনীতির অধিকারী। এই আর্যভাবই আমাদের যুগধর্ম ও জাতিধর্ম। জ্ঞান, ভক্তি ও নিষ্কাম কর্ম আর্যশিক্ষার মূল; জ্ঞান, উদারতা, প্রেম, সাহস, শক্তি, বিনয় আর্যচরিত্রের লক্ষণ। মানব জাতিকে জ্ঞান বিতরণ করা, জগতে উন্নত উদার চরিত্রের নিষ্কলঙ্ক আদর্শ দেওয়া, দুর্বলকে রক্ষা করা, প্রবল অত্যাচারীকে শাসন করা, আর্যজাতির জীবনের উদ্দেশ্য, সেই উদ্দেশ্য সাধনে তাহার ধর্মের চরিতার্থতা। আমরা ধর্মভ্রষ্ট, লক্ষ্যভ্রষ্ট, ধর্মসঙ্কর ও ভ্রান্তিসম্ভূত তামসিক মোহে পড়িয়া আর্য-শিক্ষা ও নীতি-হারা। আমরা আর্যজাতি হইয়া শূদ্রত্ব ও শূদ্র-দুর্বলতা দাসত্ব অঙ্গীকার করিয়া জগতে হেয়, প্রবল-পদদলিত ও দুঃখ-পরম্পরা-প্রপীড়িত হইয়াছি। অতএব যদি বাঁচিতে হয়, যদি অনন্ত নরক হইতে মুক্ত হইবার লেশমাত্র অভিলাষ থাকে, জাতির রক্ষা আমাদের প্রথম কর্তব্য। যাহাতে জননী জন্মভূমির ভাবী সন্তান জ্ঞানী, সত্যনিষ্ঠ, মানব-প্রেমপূর্ণ, ভ্রাতৃভাবের ভাবুক, সাহসী, শক্তিমান, বিনীত হয়, সমস্ত জাতিকে, বিশেষতঃ যুবক-সম্প্রদায়কে সেইরূপ উপযুক্ত শিক্ষা, উচ্চ আদর্শ আর্যভাব উদ্দীপক কর্মপ্রণালী দেওয়া আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য। এই কার্যে কৃতার্থ না হওয়া পর্যন্ত সনাতন ধর্মপ্রচার উহার ক্ষেত্রে বীজবপন মাত্র।

"...শক্তি স্ফুরণের লক্ষণ কঠিন তপস্যা, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্ম। যখন এই জাতি তপস্বী, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও মহৎ কর্মপ্রয়াসী হইবে, তখন বুঝিতে হইবে, জগতের উন্নতি আরম্ভ হইয়াছে, ধর্মবিরোধিনী আসুরিক শক্তির সঙ্কোচ ও দেবশক্তির পুনরুত্থান অবশ্যম্ভাবী। অতএব এইরূপ শিক্ষাও বর্তমান সময়ে প্রয়োজনীয়।"

যাঁরা যতীন্দ্রনাথকে জানেন, যাঁরা যতীন্দ্রনাথের জীবনের কিছু ঘটনার সঙ্গেও অন্তত পরিচিত, তাঁদের দৃষ্টিতে শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তির একমাত্র জীবন্ত দৃষ্টান্ত রূপে সে-যুগে যতীন্দ্রনাথের মূর্তিই সর্বপ্রথম প্রতিভাত হ'বে। এবং শ্রীঅরবিন্দও প্রথম সাক্ষাতেই তাঁকে চিনে নেন অন্যতম বন্ধু ও বিশ্বস্ততম সহকারীরূপে।: He was one of my intimate friends and most trusted lieutenants."

শ্রীঅরবিন্দের সহযোগিতার্থে ১৯০৩ সালেই যতীন্দ্রনাথ যে কর্মসূচী অনুযায়ী প্রস্তুতিতে হাত দিলেন, সেই কর্মসূচীই বিপ্লবী বাংলার প্রধান কর্মসূচী হয়ে উঠল যখন ১৯০৮ সালে শ্রীঅরবিন্দের অপর লেফটেনান্ট বারীন ঘোষের কর্মসূচীর খেই হারিয়ে গেল বীপান্তরে। সে প্রসঙ্গ এখানে অবান্তর।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন যে সমতা, অনাসক্তি, কর্ম ফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম, স্বধর্মসেবাই গীতার মূল তত্ত্ব। এই সূত্রগুলির অনুসরণ করে যদি যতীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী যাচাই করা যায়, যদি যতীন্দ্রনাথের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করা যায়, সহজেই আমরা বিপ্লবী যাদুগোপাল মুখার্জীর সঙ্গে একমত হয়ে বলতে পারি যে যতীন্দ্রনাথ ছিলেন রূপমূর্ত গীতা। "গীতার সাধা ছিল তাঁর জীবন।" যাদুগোপালবাবু লিখেছেন, "সুখ-দুঃখ, বাঁচা-মরা, লাভ-অলাভ, জয়-পরাজয়, নিন্দা-স্তুতি তাঁর কাছে ছিল তুল্য।...যতীন্দ্রনাথ কথা কইলে শ্রোতার দেহ মনে তড়িৎ-প্রবাহ বয়ে যেত, অদ্ভুতপূর্ব বল সঞ্চার হত। তাঁর সামনে অসম্ভব কিছু মনে হত না।...শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক শক্তিতে তিনি এত বলীয়ান ও উচ্চস্তরে বিচরণ করতেন যে তাঁর সঙ্গে তুলনা করতে পারি, এমন দ্বিতীয় ব্যক্তি চোখে দেখেনি।"

সমতা, অনাসক্তি, কর্মফলত্যাগ, শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ, নিষ্কাম কর্ম, স্বধর্ম সেবা—এগুলি যতীন্দ্রনাথের চরিত্রে জল হাওয়া রোদের মতোই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত দেখা দিয়েছে। দিদি বিনোদবালা দেবীর আগ্রহে উত্তর কৈশোরেই যতীন্দ্রনাথ সংসারী হয়েছিলেন। সরকারী চাকরীর সুবাদে তাঁর উপার্জন যথেষ্ট ছিল—তার অধিকাংশই কিন্তু দেশের কাজে ব্যয়িত হ'ত। দিদি বিনোদবালা জানতেন সহোদরের জীবনের ব্রতের সব কথাই, তবু সংসার যখন অর্থাভাবে অচল হয়ে পড়ত, ভ্রাতৃজায়া ইন্দুবালার কষ্ট যখন অসহ্য হয়ে উঠত তাঁর চোখে, তখন বিনোদবালা হয়তো যতীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণ করছেন সংসারের দিকে। তার উত্তরে যতীন্দ্রনাথ অম্লান বদনে বলেছেন,

"ভগবানই ওদের জন্য ভাবছেন। এই ক্ষুদ্র পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই কেবল আমার সংসার নয়, অর্থাৎ জগত সংসারই আমার সংসার। সংসারে পুরুষ হয়ে জন্মেছি পুরুষের কাজ করতে হবে। জীবনে ভয় করলে কখনও কোন কাজ করা যায় না। এই মুহূর্তে যদি কলেরা হয়ে তোমাদের কোলের ওপরে মরে যাই, তোমরা কি আমায় ধরে রাখতে পারবে?" (বিনোদবালা দেবীর খাতা থেকে)

অথচ এমন প্রেমময় স্বামী, এমন স্নেহপরায়ণ পিতা কমই দেখা যায়। আলিপুর জেলের ক্ষুদ্র ৮কোষ্ঠে বিচারাধীন বন্দী যতীন্দ্রনাথ ১৯১০ সালে ২০শে আগষ্ট দিদি বিনোদবালাকে চিঠিতে লিখছেন,

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু

দিদি, আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আপনার স্নেহাশীর্বাদী পত্রে সমস্ত অবগত হইলাম এবং সকলেই শারীরিক কুশলে আছেন জানিয়া সুখী হইলাম। খোকাদের

লইয়া সর্ব্বদা সাবধানে থাকিবেন। আমি আর সে বিষয়ে আপনাকে কি লিখিব? আর আমার জন্ত বিশেষ কোন চিন্তা করিবেন না, আমি শারীরিক ভাল আছি। মেজদাদাকে মধ্যে মধ্যে পত্র লিখিব; তিনিই আপনাদিগকে আমার সংবাদ লিখিবেন। কতদিনে মোকদ্দমা উঠিবে এখনও জানিতে পারি নাই। যাহা হউক সেই সর্বমঙ্গলময় পরম পিতার চরণের দিকে চাহিয়া আছি। তিনি যে বিধান করেন তাহাই তাঁহার আশীষ বলিয়া গ্রহণ করিব। তিনি আমাদের অমঙ্গলের জন্ত কখনই কিছু করেন না। আপাতদৃষ্টিতে যাহাকে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয় তাহারও পশ্চাতে কোন মহদুদ্দেশ্য নিহিত থাকে যাহা ভ্রান্ত আমরা বুঝিতে পারি না। তাঁহার উপরে সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করিয়া প্রাণে বল ধরিয়া সময় প্রতীক্ষা করুন, অবশ্য নির্দোষীকে তিনি বিপমুক্ত করিবেন। যথাযোগ্য স্থানে আমার প্রণাম ও আশীষ দিবেন। ইতি—

প্রণত: সেবক জ্যোতি।"

এই নিষ্কাম কর্মের মনোভাব, এতখানি আত্ম-সমর্পণ সহজলভ্য নয়। যতীন্দ্রনাথের প্রতিটি পত্রেই এই আন্তরিক নিবেদনের ভাব কত যে স্পষ্ট, তা' অনেকেই জানেন। এই বিনীত সমর্পিত শক্তিসাধক প্রসঙ্গে তাই বিপ্লবী শ্রীভূপেন বসুকে লিখতে দেখি, "শ্রীঅরবিন্দের লেখায় পড়েছি, তাঁর সাথে আলাপ করে বুঝেছি,...রক্তমাংসের মানুষ পশু, কিন্তু রক্ত মাংস ছাড়া সে আর যেটুকু, সেটুকুতে সে দেবত্বে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়, মানুষের সমাজকে পশু সমাজের স্তর থেকে দেব সমাজের স্তরে তুলতে চায়। যতীনদার স্বাধীনতার সাধনা ছিল এই সাধনারই অঙ্গ।...এই আত্মসমর্পণের সঙ্গে শক্তির সাধনায় সাধকের এক হয়তো যতীন্দ্রনাথের মত বিরাট ব্যক্তিত্বের পক্ষেই সম্ভব।"

যতীন্দ্রনাথ ছিলেন প্রথম সাধক, এবং সাধক বলেই বিপ্লবের পথ বেছে নিয়েছিলেন সাধনার অঙ্গরূপে। তাই তো দেখি নারায়ীপুরের জমিদার বাড়ীর ছেলে, সিদ্ধ এক তান্ত্রিক সাধকের বংশধর চিত্তপ্রিয় রায় চৌধুরী যখন প্রথম সাক্ষাতেই আকুল কণ্ঠে মহানায়ক যতীন্দ্রনাথকে প্রশ্ন করলেন, "এ-পথে কি ভগবানকে পাওয়া যাবে?"—দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে যতীন্দ্রনাথ অটল গভীর কণ্ঠে জবাব দিলেন,..."তা যদি না পাওয়া যেত, তবে আমার অন্তত এ-পথে দেখতিস্ না।" এই ছিল যতীন্দ্রনাথের স্বধর্ম সেবার ব্রত। আত্ম অর্ঘের মুখ চেয়েই যে তিনি বিপ্লবের পথে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, তার আরো নিশ্চিত ইঙ্গিত আমরা পাই যখন তিনি হরিদ্বারের সাধকশ্রেষ্ঠদের অন্যতম স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা গ্রহণ করলেন এবং গিরিমহারাজও শিষ্যকে বললেন, "তোর মধ্যে দিয়ে ভগবান অনেক কাজ করতে চান, দেশ তোকে চায়, আমিও তোর জন্তই দিন গুণছিলাম।" এবং সাতাশ বছর বয়সে যখন একটি রোমাঞ্চী দিয়ে বাঘ মেরে নিজেও যথেষ্ট আহত হ'ন, যখন তাঁর জীবনের আশা কেউ কেউ ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন ঈশ্বরের সমর্পিত এই দেশ নায়ক অপূর্ব মনোবলের সাহায্যে তাঁর স্বাভাবিক জীবন-যাত্রা নতুন ক'রে শুরু ক'রে দিলেন, দেশের কাজে আরো নিবিড়ভাবে আত্মনিয়োগ করলেন। কেউ সংসারের দিকে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে তাঁর স্বাভাবিক সুন্দর হাসিমুখেই বলতেন,

"সমষ্টির হিতকামনায় ব্যক্তিগত স্বার্থ উপেক্ষা করতে হবে। বাঘের মুখ থেকে ভগবান যে আমাকে বাঁচিয়ে তুলছেন তা' বোধহয় এই ক্ষুদ্র সংসারের জন্ত নয়; নিশ্চয়ই তাঁর কোন মহদুদ্দেশ্য তিনি আমার দিয়ে সাধিত করে নেবেন —এই তাঁর ইচ্ছা। ক্ষুদ্র থেকে মহতের উৎপত্তি হয়। ক্ষুদ্র শক্তি ক্রমশঃ মহৎ শক্তি লাভে বিরাট মূর্তি ধারণ করে। সেই সর্বশক্তিমান বিরাট পুরুষের ইচ্ছাতেই মানুষ পরিচালিত হচ্ছে এবং হবে।" (বিনোদবালা দেবীর খাতা থেকে)

যতীন্দ্রনাথের সাধনার জীবনও তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে এগিয়ে চলেছিল দ্রুত পরিণতির

দিকে, অথবা বলতে পারি নিষ্কাম কর্মী যতীন্দ্রনাথ তাঁর ঐহিক জীবনে যতই নিজেকে নিঃশেষ করে ঢেলে দিতে চেয়েছেন জাতীয় আন্দোলনের তপস্যা-বহ্নিতে আহুতির মতো, ততই তিনি পূর্ণ হয়ে উঠেছেন অন্তরে অন্তরে, ততই তিনি তাঁর সাধনার জীবনের যে ঈপ্সিত সিদ্ধির সন্নিকটবর্তী হয়ে চলেছেন। তিনি যে ছিলেন সাধক বিপ্লবী।

প্রথম মহাযুদ্ধের ডঙ্কা বেজে গিয়েছে ইউরোপে, সমস্ত ভারতে অস্ত্রাগারের প্রচেষ্টা চলেছে, বিদেশ থেকে অস্ত্র, অর্থ ও অন্যান্য সাহায্য আসছে তখন, কাশীতে যতীন্দ্রনাথের কর্মচঞ্চল দিনগুলির পর ক্রমতর হয়ে উঠেছে উত্তরোত্তর—এমনি মুহূর্তেই যতীন্দ্রনাথকে হরিসুধার চক্রবর্তী পরিবারে খোলা জানালার ধারে বসে কাটাতে দেখেছেন—ধ্যানমগ্ন, দুই গণ্ডে অবিরাম ঝরে চলেছে আনন্দের অশ্রু। বাংলা দেশ ছেড়ে যাবার মাত্র কয়মাস আগের এই ঘটনা।

এবং এই সিদ্ধির পূর্ণতার রূপ প্রত্যক্ষ করেছেন উড়িষ্যার কপিলধারা জঙ্গলে যতীন্দ্রনাথের বন্ধু শ্রীনরেন্দ্র চক্রবর্তী। বালেশ্বর যুদ্ধে যতীন্দ্রনাথের আত্মদানের অল্পকাল আগের কথা। নরেন্দ্র চক্রবর্তীর খাতা থেকে তুলে দিই এই বর্ণনা:

"যতীন্দ্রবাবু যে একজন ভগবান-ভক্ত তাহা আমি জানিতাম না। বৈকালে বাড়ীর নিকটে ঘাসের উপর বসিয়া আছি, অনেকক্ষণ একথা সেকথার পর উভয়েই নীরব হইয়া কিছুক্ষণ বসিয়া রহিলাম। সম্মুখে জঙ্গল, শাল, আসন্ প্রভৃতি গাছগুলি মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে, দিন প্রায় অবসান হইয়া আসিয়াছে। গাছের মাথায় একফালি রৌদ্র তির্যক রশ্মি বিকীরণ করিতেছে। যতীন একদৃষ্টে সম্মুখস্থ একটি শাল গাছের দিকে তাকাইয়া আছেন।

"আমি উঠি উঠি করিতেছি। যতীনের দিকে নজর পড়িতেই দেখিলাম যতীন প্রস্তর মূর্তিবৎ অচল, দৃষ্টি কিন্তু ঐ সম্মুখস্থ শাল গাছের দিকে। তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আমি আর উঠিবার ইচ্ছা করিলাম না।

"এইরূপে আরও কিছুক্ষণ কাটিয়া গেল, যতীন আমার হাত ধরিয়া বলিলেন—'দাদা, দেখো, দেখো, ঐ যে আমার কৃষ্ণ ঐ শালগাছের ডালে বসিয়া আমার দিকে তাকাইয়া রহিয়াছেন।' আমি গাছের দিকে তাকাইলাম, কই—আমি ত কিছু দেখিতে পাইতেছি না।...

"দেখিতে পাইতেছ না ঐ যে কৃষ্ণ। দেখো, দেখো।' বলিয়া উত্তেজনার বশেই যেন আমার হাত ধরিয়া উঠাইলেন। আমি উঠিলাম, কিন্তু আমার সে চোখ কই?...আনন্দে অধীর যতীন যেন আত্মহারা হইয়া পড়িলেন।

"তাঁহার কাজের কত চিন্তা, কত গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা সম্মুখে রহিয়াছে, যতীন যেন সবই ভুলিয়া গিয়াছেন।...মনে কি এক আশ্চর্য ভাব লইয়া দুজনে অন্ধকার হওয়া পর্যন্ত বসিয়া ছিলাম।.. যতীন ধন্য তুমি, তোমার জন্ম ধন্য।"

এই সময়েই দিদি বিনোদবালাকে যতীন্দ্রনাথ লিখেছেন,

"শ্রীশ্রীচরণকমলেষু,

"দিদি আমার অসংখ্য প্রণাম জানিবেন। আমি বেশ ভাল স্থানে সর্বাঙ্গীন কুশলে আছি। আমার জন্য কোন চিন্তা করিবেন না।—কর্মের নিমিত্ত বাহির হইয়াছি, ভবিষ্যতে সাফল্যাদি কর্মের উপরই নির্ভর করিতেছে। শীঘ্রও হইতে পারে, কিছু বিলম্ব হইতে পারে। তবে নিরাশ হইবার বা ভয়ের কোন কারণ দেখি না। সর্বদা স্মরণ রাখিবেন "নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিৎ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি।" মা'র আশীর্বাদে সমস্ত বিপদ হইতে উদ্ধার হইয়াছি—তিনি সমস্ত কর্মে সর্বদা যেমন সাহায্য করিয়াছেন, এ বর্তমান অবস্থায়ও তেমনি সাহায্য করিবেন সন্দেহ নাই—তাঁহারই প্রেরণায় এ কর্ম সমুদ্রে ঝাঁপাইয়াছি তিনিই কূলে লইবেন। আপনি যে মা'র সন্তান তাঁহার চরণের কথা স্মরণ করিয়া আপন হৃদয়ে বল রাখিয়া যে সকল পঙ্ক্তিত নরগুলি[১] আপনার

১ কন্যা আশালতা ও দুই পুত্র জ্যোতিন্দ্রনাথ এবং বীরেন্দ্রনাথের উল্লেখ করেছেন এখানে যতীন্দ্রনাথ। বিনোদবালাই তাঁদের মানুষ করেন।

নিকট আছে তাহাদের যাহাতে উদ্দেশ্যানুযায়ী কর্মের উপযোগী করিয়া ভবিষ্যতে দেশের পূজায় অর্পণ করিতে পারেন, সেই চেষ্টা করিবেন। আপনি ব্যস্ত হইলে ইন্দুর[২] নিকট কি আশা করেন? আপনি ব্যস্ত হইবেন না। সমস্তই বুঝেন। সংসারে সমস্তই যে কত অস্থায়ী তাহা আপনি অনেক প্রকারে দেখিয়াছেন এবং বুঝিয়াছেন। এই অস্থায়ী সংসারে অস্থায়ী জীবন যে ধর্মার্থে বিসর্জন করিতে অবকাশ পায় সেও ভাগ্যবান এবং তাহার সমস্ত শুভাকাঙ্ক্ষী আত্মীয়-স্বজন বিশেষতঃ তাহার মাতৃস্থানীয়া সহোদরা যদি একটু স্থিরভাবে চিন্তা করিয়া দেখেন তাহা হইলে নিজের এবং বংশের সৌভাগ্যের কথা বেশ উপলব্ধি করিতে পারেন এবং ধর্মার্থে বহির্গত ব্যক্তির সাধনার সিদ্ধির পূর্বে তাহার গৃহে প্রত্যাবর্তন কখনই বাঞ্ছনীয় মনে করেন না, বরং তাহার মন্ত্রের সাধন পথের সহায়তার নিমিত্ত তাহার অবর্তমানে গৃহে থুক যাবিয়া ভগবানে নির্ভরতা সহকারে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ ও শান্তি-দান করাই তাঁহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হয় এবং এই শ্রেণীর ব্যক্তিরাই জগতে ধন্য এবং সার্থক মাতৃস্তন্য পান করিয়াছেন।—হা হুতাশ ও সকলেই করিয়া থাকে, আপনি আমিও যদি তাহাই করি তবে আমরা আমাদের স্বর্গীয়া মাতৃদেবী শরৎশশীর গর্ভে জন্মিয়াছিলাম কেন। আমরা ত সাধারণের ন্যায় দুর্বলহৃদয় অবিশ্বাসী সাধারণ মায়ের সন্তান নই—আমাদের মা জীবন ভরিয়া কী সকল ব্যাপার হাসিতে হাসিতে সহ্য করিয়া গিয়াছেন একবার ভাবিয়া দেখুন ত আর আজ তিনি জীবিত থাকিলে তিনি স্বয়ং আমাকে আমার কর্মে বরণ করিয়া লইতেন সন্দেহ নাই। তাঁহার অবর্তমানে যাহার হাতে আমাকে তিনি রাখিয়া গিয়াছিলেন, আমার সেই মাতৃস্বরূপিনী সহোদরা ও গুরু ভগ্নী কি করা কর্তব্য একটু ভাবিয়া দেখিবেন। আপনি ইতিপূর্বে এক সময়ে কোন বিপদের সময় আমাকে লিখিয়াছিলেন, 'আমাদের অপেক্ষা যিনি তোমাকে বেশী ভালবাসেন তিনিই সর্বদা তোমার কথা ভাবিতেছেন, আমরা তোমার নিমিত্ত চিন্তা করিয়া কি করিব।'—আপনার অবস্থা এতদিনে আরও উন্নত হওয়ার কথা। হৃদয়ের বল এখন আরও অধিক হইয়াছে আশা করা যায়। আপনি অনুগ্রহ করিয়া মন শান্ত করিয়া সসন্তান ইন্দুকে[২] রক্ষা করিবেন। সন্তান-গুলি যাহাতে মানুষ হয় তাহার চেষ্টার যেন ত্রুটী না হয়। কখন কোন বিষয়ের প্রয়োজন হইলে ভাইদের[৩] কাহাকেও স্মরণ করিবেন এবং আমার মত জ্ঞান করিয়া প্রয়োজন জানাইবেন, অভাব থাকিবে না। কোথায় আছি জানিয়া প্রয়োজন নাই—পত্র পাইলেন তাহাও কাহাকে বলিবার প্রয়োজন নাই। প্রেরিত লোকের নিকট বক্তব্য যদি কিছু থাকে জানাইবেন। সমস্ত গুরুজনদিগকে প্রণাম ও আশীর্বাদ-ভাজনগণকে স্নেহাশীষ দিবেন। স্মরণ রাখিবেন বিপদের সময় ধৈর্য্য সহকারে বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করাই বিধেয়। পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেবের[৪] চরণে সদা মতি রাখিবেন। তাঁহাকে পত্রাদি লিখিবেন।

শ্রীচরণে নিবেদন ইতি—

প্রণতঃ সেবক"

সহধর্মিণী ইন্দুবালাকেও এই পত্রের শেষে যতীন্দ্রনাথ লিখলেন,

"পরমকল্যাণবরাসু

ইন্দু, আমার স্নেহাশীষ লও। তোমাকে আর পৃথক কি লিখিব, দিদিকে যে পত্র আমি লিখিলাম উহা পড় ও মর্ম অবগত হও। ভগবদিচ্ছায় আজ ১৫।১৬ বৎসর আমার সহিত মিলিত হইয়াছ। এই দীর্ঘকাল যখন সময় পাইয়াছি তখনই বহু প্রকারে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছি প্রকৃত

---

২ যতীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী শ্রীইন্দুবালা দেবী।

৩ অনুগামী বিপ্লবী শিষ্যগণ।

৪ স্বামী ভোলানন্দ গিরি মহারাজ।

অনুভব কোথায়। অত যে অবস্থা আসিয়াছে এ অবস্থা যে এক সময় আসবেই এসম্বন্ধে নানা প্রকারে তোমাকে বুঝাইয়াছি এবং প্রস্তুত থাকিতেও বলিয়াছি। আশা করি তোমার মত ক্ষেত্রে আমার সে সকল শিক্ষার বীজ আশানুরূপ ফল প্রসব করিয়াছে। বহু বহু সহস্রের মধ্যে একজনের নিকট যেরূপ শক্তি, ধৈর্য্য ও কর্ত্তব্যজ্ঞানের বিশেষ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় তোমার নিকট প্রকৃতই তাহা আশা করি। সন্তানগুলি যাহাতে ভবিষ্যতে মানুষের সন্তান বলিয়া পরিচিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখিতে ভুলিও না। ক্ষণিক দুর্বলতা সকলেরই আসিতে পারে; সেরূপ অবস্থায় নিজিকে সাহায্য করিও ও তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিও। সর্বদা মনে রাখিও যে প্রকৃতি লইয়াই পুরুষ পূর্ণ—যত দূরেই থাকি না কেন, তোমার প্রসন্নতা ও শুভেচ্ছারূপ শক্তির সাহায্য যেন সর্বদা পাই। সর্বদাই শ্রীগুরুদেব ও ভগবৎচরণে তোমার স্বামীর সাধনার সিদ্ধির নিমিত্ত প্রার্থনা করিও এবং হৃদয়ে বল রাখিও।

ইতি—"

শ্রীঅরবিন্দের গীতার ব্যাখ্যায় আমরা ভগবানকে বলতে শুনি—গহনা কর্মণো গতিঃ; কি কর্তব্য, কি অকর্তব্য, কি কর্ম, কি অকর্ম কি বিকর্ম তা নির্ণয় করতে জ্ঞানীও বিব্রত হয়ে পড়েন, কিন্তু ভগবানই ভক্তকে এমন জ্ঞান দেবেন যে ভক্তের গন্তব্য পথ নির্ধারণে বেগ পেতে হবে না, কর্মজীবনের লক্ষ্য ও সর্বদা অনুষ্ঠেয় নিয়ম এককথায় বিশদ ব্যাখ্যাত হবে।

"এই জ্ঞানটা কি, এই দশ কথার এক কথা কোথায় পাইব!" শ্রীঅরবিন্দ লিখেছেন, "আমাদের বিশ্বাস গীতার শেষ অধ্যায়ে ভগবান যেখানে তাঁহার সর্বগুহ্যতম পরম বক্তব্য অর্জুনের নিকট বলিতে প্রতিশ্রুত হন, সেইখানেই এই দুর্লভ অমূল্য বস্তু অন্বেষণ করিলে পাওয়া যায়। সেই সর্বগুহ্যতম পরম কথা কি?

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে।
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ।

"এই দুইটি শ্লোকের অর্থ এক কথাই ব্যক্ত হয়, আত্ম সমর্পণ। যিনি যত পরিমাণে শ্রীগুরুর নিকট আত্মসমর্পণ করিতে পারেন তাঁহার শরীরে তত পরিমাণে ভগবদ্দত্ত শক্তি আসিয়া পরম মঙ্গলময়ের প্রসাদে পাপমুক্ত ও দেবভাবপ্রাপ্ত করে। সেই আত্মসমর্পণের বর্ণনা প্রথম শ্লোকার্ধে করা হইয়াছে। তাহারা ভক্ত মদ্‌যাজী হইতে হয়।....."

তাহারা বলতে শ্রীঅরবিন্দ বুঝিয়েছেন সর্বভূতে ভগবানকে দর্শন করা, সব সময়ে তাঁকে স্মরণ করা, সব কাজে সব ঘটনায় তাঁরই শক্তি জ্ঞান ও প্রেমের খেলা বুঝে পরমানন্দে থাকা। ভক্ত অর্থাৎ ভগবানের ওপর সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা ও প্রীতি স্থাপন করে তাঁর সঙ্গে যুক্ত থাকা। আর মদ্‌যাজী হল ক্ষুদ্র মহৎ সব কাজই শ্রীগুরুর উদ্দেশে যজ্ঞের মতো অর্পণ করা আর স্বার্থ ও কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ করে ভগবানেরই জন্যে কর্তব্যকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া।

যতীন্দ্রনাথের সম্যক চরিত্র, যতীন্দ্রনাথের জীবনের ঘটনাবলী, যতীন্দ্রনাথের মনোভাব—সবই দিবালোকের মতো স্পষ্ট সার্থক সহজ হয়ে যায় আমাদের কাছে, শ্রীগুরুর এই উক্তির আলোকে যদি আমরা দেখি যতীন্দ্রনাথকে। এত বড় consistency, এতখানি ব্রতনিষ্ঠা খুব কমই চোখে পড়ে: জীবনের সবখানি তিনি নিঃশেষে তুলে ধরেছিলেন ভগবানের নৈবেদ্যের মতো; সুষমামণ্ডিত, নিখুঁত, দুর্লভ এই অর্ঘ্য। বিন্দুমাত্র অসঙ্গতি নেই সেখানে, নেই ফাঁকি নেই বিচ্যুতি। ধনু তীরের মতো ছুটে গিয়েছে গোটা জীবনটাই অভীষ্ট লক্ষ্যের অভিমুখে।

শ্রীঅরবিন্দ বলেছেন, সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ মানুষের পক্ষে কঠিন, কিন্তু আন্তরিক চেষ্টা করলে স্বয়ং ভগবান অন্তরালে

গুরু, রক্ষক ও সুহৃদ হয়ে যোগপথে অগ্রসর করিয়ে দেন—এই উক্তিও যে যতীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে কতখানি সত্য প্রমাণিত হয়েছে তা অনেকেই জানেন। শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন এই ধর্ম আচরণ করা সহজ ও সুখপ্রদ : যতীনাথের জীবনে যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছিলেন, অনেকেরই এই উপলব্ধি হয়েছে। তাঁরা দেখেছেন কী আনন্দ, কী পবিত্রতা, কী শক্তি বিকীর্ণ করত যতীন্দ্রনাথের সান্নিধ্য যা।

উক্ত শ্লোকের 'মামেবৈষ্যসি' প্রতিশ্রুতির অর্থ শ্রীঅরবিন্দ করেছেন, "আমাকে প্রাপ্ত হইবে, আমার সহিত বাস করিবে, আমার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইবে। এই কথায় সাযুজ্য, সালোক্য ও সাযুজ্য ফলপ্রাপ্তি ব্যক্ত হইয়াছে। যিনি গুণাতীত তিনিই ভগবানের সাযুজ্য প্রাপ্ত। তাঁহার কোনও আসক্তি নাই, অথচ তিনি কর্ম করেন, পাপমুক্ত হইয়া মহাশক্তির আধার হন ও সেই শক্তির সর্বকার্যে আনন্দিত হন। সালোক্য ও কেবল দেহপতনান্তর ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তি নয়, এই শরীরেও সালোক্য হয়। দেহযুক্ত জীবন যখন তাঁহার অন্তরে পরমেশ্বরের সহিত ক্রীড়া করেন, মন তাঁহার সত্য জ্ঞানে পুলকিত হয়, হৃদয় তাঁহার প্রেমস্পর্শে আনন্দমগ্ন হয়, বুদ্ধি মুহুর্মুহুঃ তাঁহার বাণী শ্রবণ করে ও প্রত্যেক চিন্তায় তাঁহারই প্রেরণা জ্ঞাত হয়, ইহাই মানব শরীরে ভগবানের সহিত সালোক্য। সাযুজ্যও এই শরীরে ঘটে। গীতায় তাঁহার মধ্যে নিবাস করার কথা পাওয়া যায়। যখন সর্বজীবে তিনি, এই উপলব্ধি স্থায়ীভাবে থাকে, ইন্দ্রিয় সকল তাঁহাকেই দর্শন করে- স্মরণ করে, আঘ্রাণ করে, আস্বাদন করে, স্পর্শ করে, জীব সর্বদা তাঁহার মধ্যে অংশভাবে থাকিতে অভ্যাস হয়, তখন এই শরীরেও সাযুজ্য হয়। এই পরমগতি সম্পূর্ণ অনুশীলনের ফল…"

যতীন্দ্রনাথ আজীবন পূর্ণতারই সাধনা করেছিলেন, সম্পূর্ণ অনুশীলনই ছিল তাঁর ব্রত। সম্পূর্ণ অনুশীলনেরই পরামর্শ তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর অপর অনুগামীদের। তাই তো শুনি ডাঃ যাদুগোপালের উক্তি, "মানুষ হয়তো পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু পূর্ণতার কাছাকাছি যারা পৌঁছেছেন, তাঁদের মধ্যে যতীন্দ্রনাথের স্থান সুনিশ্চিত। যতীন্দ্রনাথ ছিলেন আলাদা ধাতের মানুষ। আমাদের মত সাধারণ ব্যক্তির বহু উর্ধ্বে এবং আমাদের সকলকে ছাপিয়ে। তাঁর প্রাণের শিখা যেন কোনও উচ্চলোক থেকে জ্বালিয়ে নিচে নামতেন।"

গীতার পুরুষ যতীন্দ্রনাথের জীবনের সব খানিই যদি এই আলোকে না দেখি, আমাদের যতীন্দ্রনাথ-দর্শন কি অপূর্ণ থেকে যায় না?

[১৩৭২ শারদীয়া সংখ্যা 'ত্রিপুরা' হইতে লেখক কর্তৃক পুনর্মুদ্রিত]

স্মৃতির পটভূমিকায় নেতাজী

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

দ্বিতীয় বঙ্গীয়ান। ১৯৩১-এর সেপ্টেম্বর মাস। ইংরেজ চালাল কারাগারে হত্যাকাণ্ড। সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন মারা গেলেন তাদের গুলিতে। আহত হল অনেক। সারা বাঙলা দেশটা তখন ধুমধুম্ করছে। সবাই মনমরা। তারকেশ্বরের বাড়ী ছিল বরিশালের পৈলা গ্রামে। তাঁর চিতাভস্ম সেই গ্রামে আনা হল। সমাধিস্তম্ভও উঠল। নেতাজী এলেন তার উন্মোচন। সেই সময় তিনি আরও দু একটি গ্রাম দেখবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। সেই সূত্রেই এলেন তিনি আমাদের গ্রাম উজিরপুরে। সারারাত নৌকায় বসে। ঘুমুলেন ঘুমুলবারায় বৃষ্টি শুরু হল। কিন্তু ভ্রুক্ষেপ নেই তাঁর। রাসলীলা নিয়েই মেতে রইলেন সারাটা রাত। সেদিনের কথা ভোলবার নয়। সারা উজিরপুর ও তার আশেপাশের গ্রামগুলি সেদিন ভোরে ঘর ছেড়ে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে নৌকাঘাটে তাদের প্রিয় নেতাকে বরণ ক'রে নিয়ে যাবার জন্য। গ্রামের পথঘাট সেদিন মুখরিত হল 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনিতে। শোভাযাত্রা ক'রে নিয়ে এল গ্রামবাসীরা তাদের বীর নেতাকে আমাদের বাড়ীতে। বাড়ীর দরজায় আমার ঠাকুরমা করলেন ধানদূর্বায় নেতাজীকে অভ্যর্থনা। আমার জ্যেঠামশাই বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শ্রীপ্যারীলাল রায়, ঠাকুরমার পরিচয় দিলেন নেতাজীকে। অমনি পায়ে হাত দিয়ে নেতাজী ঠাকুরমাকে প্রণাম করলেন। প্রাণ বৃদ্ধা তিনি—কেঁদে উঠলেন নেতাজীকে বুকে চেপে। নেতাজীর সঙ্গে সেদিন এসেছিলেন বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির সম্পাদক সুধাংশুবিমল পাকুলী ও বরিশাল কংগ্রেসের নেতৃস্থানীয় সর্বশ্রী রজনী চট্টোপাধ্যায়, নরসকুমার বসু, সুরেশ গুপ্ত, নগেন্দ্রবিজয় ভট্টাচার্য, জিতেন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি কর্মীরা। পতাকা উত্তোলনের সঙ্গে শুরু হল সেদিনের কাজ। কবিগুরু বসল। দেশ কী করবে, কী হবে তার কর্মপন্থা, দেশের লোক কোন্ পথ ধরবে ইত্যাদি। কত বিষয়েই আলোচনা হল। এইভাবে সকাল বেলার কাজ শেষ হল। নেতাজীর যাতে কোন অসুবিধা না হয় সেজন্য আমরা সবাই উঠে পড়ে লাগলাম। নেতাজী কিন্তু এতে বিব্রত হয়ে পড়লেন। হেসে বললেন—আপনারা আমাকে আপন করে নিতে পারছেন না, তাই এত ব্যস্ত হ'য়ে পড়েছেন। গ্রামের লোকেরা সেদিন পাগলের মত ছুটে এসেছিল তাদের নেতাকে দেখতে, শ্রদ্ধা জানাতে। নেতাজীও হাসিমুখে তাদের সঙ্গে গল্পগুজব করলেন। কখনও কখনও ছোট ছেলে-মেয়েদের ডেকে তাদের নাম জিজ্ঞাসা করলেন, কাউকে বা কোলে তুলে নিয়ে আদরও করলেন। এইভাবে স্নানের সময় হ'য়ে এল। খোলা গা। তেল মাখবেন তিনি। এই সময় আমাদের গ্রামের ছবেন চক্রবর্তী এলেন তাঁর ক্যামেরা নিয়ে—উদ্দেশ্য নেতাজীর একটি ছবি তোলা। তাঁর মনোবাসনা নেতাজী পূরণ করলেন। খোলা গায়েই এই ছবিটি তখন তোলা হল। নেতাজীর জন্য বিশেষ-ভাবে স্নানের ঘর করা হয়েছে। পুকুরে স্নান করার অভ্যাস ও তাঁর নেই। নেতাজী কিন্তু সে ব্যবস্থা দেখেই প্রতিবাদ করলেন। বললেন—"আপনারা কোথায় স্নান করেন, পুকুরে নিশ্চয়? আমিও তাই করব।" সবাই বাধা দিলেন, তা হয় না। আপনার অভ্যাস নেই। নেতাজী বলে উঠলেন—

সুভাষচন্দ্রের একখানি অপ্রকাশিত চিত্র

[১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে বরিশালের শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়ের উলিরপুরস্থ গ্রামের বাড়ীতে গৃহীত]

"Don't forgot I am the President of a Swimming Association." এ কথা বলেই তিনি পুকুরের জলে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। ডুব সাঁতারে গেলেন অনেক দূর। গভীর পুকুরের তলা থেকে মাটি হাতে নিয়ে উঠলেন জলের উপর। সবাইকে দেখালেনও সে মাটি।

স্নান করে উঠেও তিনি আবার বাধা পেলেন। খাবার আয়োজন চেয়ার টেবিলে করা হয়েছে। দেখেই বুঝতে পারলেন এ বিশেষ ব্যবস্থা তাঁরই জন্যে। এবার তিনি অসহায়ের হাসি হেসে বললেন—"আপনারা দেখছি আমাকে তাড়িয়েই ছাড়বেন।" তাঁর কথাতেই চেয়ার টেবিল সরে গেল। মাটিতে আসনের উপর সবাইকে নিয়ে বসলেন। পরিজনদের সঙ্গে সঙ্গে চলল খাওয়া। বারবার রান্নার প্রশংসা করতে লাগলেন। বাড়ীর মেয়েরা নিজেদের হাতেই সব তৈরী করেছেন শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করে বললেন—"আজকের এই খাওয়ার কথা আমি ভুলব না। ঠাকুর চাকরের রান্না খাওয়া ছাড়া বাড়ীর মেয়েদের হাতে পুরোপুরি তৈরী রান্না খাওয়া আমরা ভাগ্যে খুব কমই জোটে। আঃ! বাংলের চপটা খাসা হয়েছে কি বলেন নগেনবাবু!" নগেনবাবু ও অপ্রস্তুত। তিনি নিরামিষাশী। মাছমাংস স্পর্শও করেন না। কোন উত্তর না দিয়ে তাই তিনি চুপ ক'রে রইলেন। নেতাজীও অপ্রস্তুত। কিন্তু প্রিয় নেতার তৃপ্তির জন্য নগেনবাবু একটি বাংলের চপ নিলেন ও পরম আনন্দে খেলেন। নেতার জন্য কর্মীরা কি না করতে পারে এই ছিল হয়ত নগেনবাবুর মনের ভাব। মুহূর্তের জন্য নেতাজী তখন যেন কোথায় হারিয়ে গেলেন। তাঁর এই মৌন উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল সারা ঘরে। সহসা তিনি বলে উঠলেন—"নগেনবাবু, আমার জন্য নয়, বলুন দেশের জন্য। ব্যক্তির চাইতে দেশ অনেক অনেক বড়।"

পাঁচটার জনসভা। সভার আগে তোলা হল উপস্থিত কর্মীদের সঙ্গে নেতাজীর গ্রুপ ফটোখানা। বাড়ীর পূর্বদিকের সামনের বিরাট খোলা জায়গা ছুড়ে বসল এলাকার সব লোকেরা। অনেক দূরগ্রাম থেকেও সেদিন এসেছিল অনেকে নেতাজীর মুখের কিছু কথা শুনতে। তিনিও একটানা দুঘণ্টা বক্তৃতা করলেন সেই সভায়। কিন্তু তবু যেন আরও শুনতে চায় জনতা। তিনি বললেন, "ভারতের এই শোচনীয় অবস্থায় নিজের স্বার্থে জলাঞ্জলি দিয়ে দুঃখিনী ভারতমাতার জন্য কর্মসাগরে সবাইকে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। পরের জন্য জীবনই প্রকৃত জীবন।" ছাত্রদের বললেন—"চরিত্র গঠনই ছাত্রের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। চাই চরিত্র, জ্ঞান ও কার্য।"

একটা দিন অবিরাম কাজের মধ্যে ডুবে রইলেন নেতাজী। সন্ধ্যাশেষে বিশ্রামের ফাঁকে তিনি কয়েকটি স্বদেশসংগীত শুনলেন স্থানীয় শিল্পীদের কণ্ঠে। রাত্রের আহার শেষ হলে বিদায়ব্যথার বেহাগ সুর বেজে উঠল বাড়ীর ঘরে ঘরে। সমস্ত নেতাজীর দৃপ্ত ব্যক্তিত্ব ঘুচে গিয়ে সেদিন সারা বাড়ীটা। রাত তখন একটা। বাড়ী আবার লোকজনে ভরে গেল। তাঁরা তাঁদের চোখের জলে নেতাজীকে বিদায় দিতে এসেছেন। 'বন্দেমাতরম্' ধ্বনির সঙ্গে নেতাজীর মোটরগাড়ি চলল ঘাট ছেড়ে আমাদের অন্তরটিকে নিয়ে। আমাদের দেহটাই যেন শুধু তাঁকে ঘাট থেকে বিদায় দিল।

দীর্ঘ তেত্রিশ বছর পরে ঐ দিনটার কথাই আজ বারবার করে মনে পড়েছে। নেতাজী। অনাথ, দীন, দুঃস্থাতুর, দুঃখিত, ভীত ও দুঃস্থ জনের তুমিই প্রিয় নেতা। তোমায় নমস্কার।*

* রামকৃষ্ণ মিশন শিক্ষণ-মন্দির বেলুড়মঠ হইতে প্রকাশিত 'লক্ষ্মীপদ' নামক পত্রিকা হইতে প্রকাশকের সৌজন্যে ও অনুমতি ক্রমে ধন্যবাদের সহিত পুনর্মুদ্রিত। ঃ সঃ

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য ক'রে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

ম্যম্ :

মহাবলী লেখক

সত্যব্রত বসু

গল্পটির নাম মনে নেই। বৈরীপক্ষের এক ফুর্তিবাজ সৈনিক বিজিত দেশের এক কৃষককুমারীর গর্ভে তার সন্তানের জন্ম দিল ; মেয়ের বৃদ্ধ অসহায় দুর্ভাগা বাপ এই ঘটনা দুনিয়ার নিয়ম, যুদ্ধের সময় আক্রান্ত দেশের উদ্ভট নিয়ম মেনে নিয়ে মলিন বিমর্ষ মুখে চুপ করে রইল। সৈনিকটি তারপর ক্রমে তার ভাবী সন্তানের মায়ের প্রতি আকৃষ্ট, পরে আসক্ত হতে লাগল। মেয়েটি ভিতরে ছিল অত্যন্ত কঠিন, বাইরে মৌন, নির্ভীক, আর শত্রুকে প্রবল, প্রায় অমানুষিক ঘৃণা করার শক্তি ছিল তার। সন্তান দুর্ধিষ্ট হবার দিনটি ঘনিয়ে আসতে লাগল ক্রমে। ইতিমধ্যে সৈনিকটি বহুবার এসেছে, তার অবিবাহিত স্ত্রীর মন নরম করার জন্য যতপ্রকার সাধ্য-সাধনা অনুনয় বিনয় সম্ভব কিছুরই ত্রুটি ছিল না বেচারীর, উত্তরে তার ভাবীসন্তানের কুমারী মার কঠিন অবজ্ঞা, উপেক্ষা, দুর্ব্যবহার, ঘৃণা, ঔদাসীন্য, সে শক্তিমান পুরুষের মতই প্রসন্ন কৌতুকের সঙ্গে গ্রহণ ও সহ্য করে তার সন্তানের জন্মের দিনটির অপেক্ষা করে রইল। সেদিনও মোটরবাইক হাঁকিয়ে সে এল, সঙ্গে যথারীতি খাবারের টিন, বুড়ো শ্বশুরের জন্য সিগারেট, অপেক্ষা করে রইল, কিন্তু গর্ভযন্ত্রণাকাতর ভাবী বা কোথায়? শেষে তার বাপও চিন্তিত মুখে উঠে খুঁজতে গেল। তারপর মা তার সন্তানের পায়ে ধরে ঝুলিয়ে এনে দাদনের উনিশের উপর শুইয়ে রাখল। জন্মের পরই পুতুলে নিয়ে খিয়ে তাকে ডুবিয়ে ধরেছিল, যতক্ষণ না মৃত্যু হয়। ধরা সন্তানকে তার বাপের সামনে ফেলে দিয়ে কুমারী মা এইবার মুরগীটা কাটার আবেগে ভেঙে যেন গুঁড়িয়ে যেতে লাগল। আর বাপ্! সে কপাল চাপড়ে হাঁকিয়ে উঠে যাবার লাথি খাওয়া কুকুর যত বিকট অদ্ভুত গোঙানির মত একটা আওয়াজ করে উঠল।

অদ্ভুত গল্প।

তাঁর কালের আর কোনো সাহিত্যিকের কলমে এই জাতীয় সবল, স্পষ্ট, নির্ভীক, জৈবিক গল্পের জন্ম হয়েছে বলে জানি না। বরং ম্যম্ নিজেই এরকম গল্প আরো কিছু লিখেছেন।

দি মুন এ্যাণ্ড সিক্স পেন্স্-এর দুর্বল আর্টিস্ট যখন দূর দ্বীপে দুরারোগ্য কুষ্ঠরোগে অচল, প্রায়ান্ধ, হাতড়ে হাতড়ে তখনো ফুটিয়ের প্রায়ান্ধকার দেওয়ালে অন্ধের মতো, পাগলের মতো, ব্যাকুল আগ্রহে, প্রবল আকাঙ্ক্ষায়, ছবি ফুটিয়ে চলেছেন। অদ্ভুত, উজ্জ্বল, জীবন্ত, তুলনাবিহ বর্ণনা সে সব ছবির,—সাহিত্যে তারও তুলনা অতি কম। জীবনের একটা প্রবল স্পন্দন, একটা দুর্দম আবেগ, একটা গভীর অনুভূত সত্যকে সেখানে ধরে রেখেছেন লেখক, এবং অনায়াসে।

এক ভদ্রলোক বেশ সুন্দর বলেছিলেন। মনের একটা গল্প : 'পড়ছি, পড়তে পড়তে দেখি, হাঁ, ঠিক আমার চোয়ালের হাড় শক্ত হয়ে এল, দাড়ির গোড়ায় কাঁটা দিয়ে উঠল,—দারুন লেখা আমি এই দিয়েই বুঝি এবং বুঝলাম ম্যম্ দারুন লেখেন।' নিশ্চয়। সাহিত্যেরও ইম্প্যাক্ট হবে জীবনের যে কোনো প্রকৃত অভিজ্ঞতার মতো। এবং লেখকেরও

শক্তির যাচাই তাতেই : যখন মনস্তত্ত্বের এই সহজ পরিচয় অক্ষরে অক্ষরে অনায়াসে তিনি ফুটিয়ে তুলবেন।

'অব্ হিউম্যান বনডেজ' প্রকাশের প্রায় কুড়ি বছর পরে যদি কোনো আমেরিকান ভদ্রলোককে এই বই সম্পর্কে বৃটিশ ক্রিটিকদের আবারো অবহিত করতে হয়ে থাকে তবে ম'র কথাই যথার্থ মনে হয় : সূক্ষ্ম বিষয় এরা বোঝে না তা নয়, একটু দেরীতে। হাসেও, কিন্তু তাও বেশ পরে, সকলের হয়ে গেলে।

মাম যারা গেলেন, এইবার তাঁর রচনার বিরল অদ্ভুতপূর্ব, বিবিধ গুণাবলীর বিস্তৃত পুঙ্খানুপুঙ্খ নিবিষ্ট গবেষণা দেখা যাবে। অব হিউম্যান বনডেজ, রেজার্স এজ, দি মুন এ্যাণ্ড্ সিক্স পেন্স, ক্যাটালিনা, সাদিং আপ প্রভৃতি তাঁর বই : প্রোজ্জ্বল, প্রাণবন্ত, প্রাঞ্জল। আর উত্তমপুরুষে লেখা তাঁর অসংখ্য বিচিত্র, সজীব গল্প। এদের পাঠক? সারা পৃথিবীর লোক : যারাই ইংরেজী বোঝেন, সাহিত্য ভালোবাসেন। অথচ মাম্ বেঁচে থাকতে দেখে গেলেন গত কয়েক দশকে তাঁর সমসত্ত্বের ও পরের অনেক অনেক নিষ্প্রভ লেখক একে একে সাহিত্যের সেই শ্রেষ্ঠ পুরস্কারটা পেয়ে গেলেন। দুঃখ ছিল তাঁর? গ্লানি? ক্ষোভ? তাঁর বৃদ্ধবয়সের ছবি দেখে তা মনে হয় না। মুখ ক্লান্ত, করুণ, নিঃসঙ্গ,—দৃষ্টি আশাহত, [ডিস্‌ইলিউশন্‌ড্] কিন্তু স্থির, আত্মস্থ,—সে চোখে মানুষের জন্য সহিষ্ণুতা, করুণা এবং হয়ত,—অন্তত আশা করা যায় যে,—মার্জনাও আছে।

২

অব্ হিউম্যান বনডেজ্" অনেকে বলেন, মামের জীবন। এই বইর নায়ক ফিলিপের একটা পা খারাপ, খুঁড়িয়ে হাঁটত। মাম্? না; তিনি একটু খর্ব ছিলেন। কোথায় লিখেছেন, আর ক ইঞ্চি লম্বা হলে তাঁর চোখে জগতের চেহারা আরেক-রকম হত। ফিলিপ লেখে এক স্নিগ্ধ স্বাস্থ্যবতী নারীর পাণিপ্রার্থী। মাম্! প্রায় অকৃতদার। তাঁর লেখবয়সের মুখ অচরিতার্থ হৃদয়ের বেদনায় ভারে যেন অবনত, ক্লান্ত। যেন বড় নিঃসঙ্গ তিনি, দুঃখী, নিজেতে নিজের জীবনে পরাজয়ই যেন সে মুখে গভীরভাবে লেখা আছে।

বনডেজ্'-এর মধ্যপর্বে মাইল্ডরোজের সঙ্গে ফিলিপের অনার্থক অপমানজনক প্রণয়ের যে কাহিনী মাম লিখেছেন, সমকালীন সাহিত্যে তারও দ্বিতীয় উদাহরণ বিরল। অপমানিত, ব্যর্থ, প্রত্যাখ্যাত পুরুষের রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের এ এক নিদারুণ যন্ত্রণার ছবি : নিখুঁত, পুঙ্খানুপুঙ্খ, ভয়াবহ; এবং এ কাহিনীর জন্য ব্যক্তিগত জীবনের লজ্জাকর, মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা ছাড়া হতে পারে না। এ একটা অন্ধ আবেগ, প্রচণ্ড ও দুর্নিবার; অতি ভয়াবহ একটা নৈরিক আসক্তি,—এ থেকে মুক্তির প্রশ্ন যখন আসে, যদি আসেই, তবে দ্বিতীয় কোনো নারী, নতুবা মৃত্যু; কারণ এর বাইরে যে পথ তা সকলের জন্য নয়। বইতে ফিলিপের সেই দ্বিতীয় নারী এসেছে, কিন্তু কাহিনী সত্য হয়ে থাকলে, মাম্? যদি বনডেজ্ সত্যই তাঁর স্বকাহিনী হয়ে থাকে তবে মনে হয় এই লজ্জা, কলঙ্ক, অপমান এবং পরাজয়ের গ্লানি সারাজীবনে তাঁর মন থেকে মোছেনি; এবং এই অভিজ্ঞতা যদি মানুষের প্রেম বা যৌবনজীবন সম্পর্কে তাঁর কেতাবপুষ্ট পোষাকি দৃষ্টিভঙ্গিটাই আমূল বদলে দিয়ে থাকে তবে তা একান্তই সঙ্গত।

সাহিত্যে অটিস বা বিচিত্র নারীচরিত্র কম নেই কিন্তু তাদের সঙ্গে মাইল্ডরোজের তফাৎ মূলতই মূলে : সে আপাতিক, সেই অর্থে ভয়াবহভাবে স্বাভাবিক। মেয়েটি সাধারণ, নিতান্তই আটপৌরে, সকলে; আর ফিলিপ ডাক্তার, মার্জিতরুচি, বুদ্ধিমান, মাইল্ডরোজের প্রতি তার আবেগ প্রবল ও অন্ধ, আকর্ষণ দুর্নিবার; আর মাইল্ডরোজ নিস্পৃহ, বিমুখ, তাকে নিষ্ঠুর মনে হয়, নির্লজ্জ, অনুদার, হীন, কখনো কখনো ইতর। কিন্তু ফিলিপ দোষ দিয়েছে কখনো। তার এই হৃদয়হীন মানবেতর ব্যবহারের জন্য! না। মাম্! মনে হয় না। বরং

(শেষাংশ ৭৭৯ পৃঃ)

সুভাষচন্দ্র ও ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং

শঙ্করীপ্রসাদ বসু

॥ এক ॥

প্রধানমন্ত্রী শ্রীলালবাহাদুর শাস্ত্রী কলকাতায় নেতাজীর মূর্তির আবরণ মোচনের কালে নেতাজীকে ভারতের 'সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী' বলে অভিহিত করেছেন। আমার স্মরণ হয়, পরলোকগত প্রধানমন্ত্রী জহরলাল নেহরুও নেতাজীর চিত্রের আবরণ মোচন করতে গিয়ে (ঠিক কোথায় মনে পড়ছে না, সম্ভবত পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভাকক্ষে) বলেছিলেন, নেতাজীর জন্যই আমরা স্বাধীনতা পেয়েছি। ভারতের বর্তমান রাষ্ট্রপতি ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন সবরমতী নদীর উপর নেতাজীর নামে একটি সেতুর ভিত্তিস্থাপন করতে গিয়ে শ্রোতাদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন, দেশের জন্য নেতাজী গান্ধীজীর মতই সর্বোচ্চ ত্যাগ ও দুঃখবরণ করেছিলেন।

সংবাদপত্রে ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের বক্তৃতার যেটুকু রিপোর্ট বেরিয়েছে উদ্ধৃত করছি। এর মধ্যে নেতাজীর সঙ্গে রাধাকৃষ্ণানের যোগাযোগের বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আছে। জাপানে যাবার পরেও নেতাজীর সঙ্গে ডাঃ রাধাকৃষ্ণানের সংযোগ ছিল বলে তিনি জানিয়েছেন যদিও স্টেটসম্যান দুর্বোধ্য কারণে (কিংবা সহজেই বোধগম্য কারণে) সেই অংশটি বাদ দিয়েছে।*

এই সমস্ত কথা আমাদের কাছে খুবই তৃপ্তিদায়ক ঠেকে, কেননা যাঁরা এই কথাগুলি বলেছেন, তাঁরা ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান এবং তাঁরা বিবেচনা করে কথা বলবেন, তাই প্রত্যাশিত। সেই তৃপ্তির সঙ্গে কিন্তু বিস্ময় থাকে, যখন দেখি, ভারতের রাষ্ট্রকর্তাদের মতে যিনি স্বাধীনতা এনেছেন, কিংবা ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ বিপ্লবী,—তাঁর বিষয়ে রাষ্ট্রীয় প্রচারযন্ত্র যথাসম্ভব নীরব। মনে হয়, এই যন্ত্রের পরিচালকরা নেতাজীর কীর্তির মত সুমহান ব্যাপারে 'পরিণামে সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী' এই মহাবাক্যের উপর নির্ভর করেছেন।

পরিণামে সত্যের জয়ের সঙ্গে বর্তমানেও সত্যের জয়ে

---

* AHMEDABAD, Dec 25 (1962)—Dr. Radhakrishnan to-day hailed Netaji Subhas Chandra Bose as a great man who like Gandhiji, gladly went through the greatest and bitterest suffering for the country. 'Subhas was something of a non-conformist, and the world is converted by those who do not conform to its ways' said the President, according to P.T.I.

Speaking after laying the foundation stone here for a bridge to be named after Netaji Subhas accross the Sabarmati, the President recalled that Netaji had once declared that he completely dissociated himself "from the Sabarmati School of economics and the Pondicherry School of politics."

Netaji Bose was, Dr. Radhakrishnan said "an incarnation of the spirit of self-lessness and complete dedication to the cause

যারা কিছু আগ্রহী তাঁরা চান নেতাজীর স্মারক মূল্য স্বীকৃত হোক সরকারীভাবে। একটি বিষয় আমাদের মনে পড়ছে, যে বিষয়টিকে আমরা বর্তমান প্রবন্ধে আলোচনাবস্তু করেছি —তা হল, 'ভারতীয় জাতীয় পরিকল্পনা'—ব্যাপারটির উদ্যোক্তা সুভাষচন্দ্রই, কিন্তু পরিকল্পনা বিষয়ক রচনাদিতে তাঁর নাম দেখা যায় না। এখানে আবার আমাদের বলতে হচ্ছে, যদি নাম না দেখা যায় তার তাৎপর্যও সুগভীর ভিত্তির উপরই গৃহ দাঁড়িয়ে থাকে, কিন্তু বাড়ি তৈরী হয়ে গেলে ভিত্তি চোখের আড়ালে চলে যায়।

॥ দুই ॥

ডাগডাল প্ল্যানিং-এর ইতিহাসে চলে যাওয়া যাক। প্রবন্ধেই ডাঃ মেঘনাদ সাহার রচনাংশে উদ্ধৃত করেছি :

"১৯৩৮ সালে যুক্তপ্রদেশে প্রথম কংগ্রেসী মন্ত্রী-সভার শিল্পমন্ত্রী থাকাকালে ডাঃ কৈলাসনাথ কাটজুকে যুক্তপ্রদেশের কোনো এক স্থানে একটি দেশলাই কারখানা উদ্বোধন করতে আমন্ত্রণ করা হয়। সেখানে তিনি এক অতীব উদ্দীপ্ত ভাষণে বলেন, এই দেশলাইকারখানা উদ্বোধনের দ্বারা দেশে বৃহৎ শিল্পের প্রবর্তনের পথে একটি পদক্ষেপ করা হল।

"বক্তৃতাটি কঠোরভাবে আঘাত করল আমাকে। কারণ, এর দ্বারা বোঝা গেল যে, একজন উচ্চপদস্থ কংগ্রেস নেতা, যাঁর উপর নিজ প্রদেশের শিল্পের পুনর্গঠন, উন্নয়ন, এবং প্রবর্তনের গুরু দায়িত্ব ন্যস্ত, তিনি জানেন না, বৃহৎ শিল্প কাকে বলে॥ আমি দেখলাম, অধিকাংশ কংগ্রেসীর অবস্থা একই প্রকার। এঁরাই ভাবী মন্ত্রী বা বর্তমান মন্ত্রী। আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম, এঁরা ক্ষমতা পেলে, জীবনে বড় আকারে জল দেখেনি অথচ সমুদ্রে জাহাজ চালাতে অনুরুদ্ধ হয়েছে এমন মাটির মানুষের মত হয়ে পড়বেন। এই সকল ভাবনা এই সমস্যার সমাধানে মনোনিবেশ করতে আমাকে বাধ্য করল।

"এইকালে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হলেন। তাঁর নির্বাচনের সংবাদ ঘোষিত হওয়ার সময়ে আমি কলকাতায় ছিলাম; তাঁকে অভিনন্দন জানাতে তাঁর বাসভবনে গেলাম। নেতাজীকে আমি প্রশ্ন করলাম : কংগ্রেস এখন ক্রমে ক্ষমতাসীন হচ্ছে; ক্ষমতা পাবার পরে আপনারা কিভাবে দারিদ্র্য, বেকার সমস্যা, এবং কারিগরিবিদ্যা দূর করবেন?' নেতাজী বললেন, স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্যস্ত থাকার জন্য কংগ্রেস নেতারা অন্য বিষয়ে সময় দিতে পারেন নি; কিন্তু তিনি জানতে চান, এবিষয়ে আমার মত কি? আমি তাঁর কাছে কাটজুর বক্তৃতা-সংবলিত খবরের কাগজের অংশ তুলে ধরলাম এবং বললাম, ডাঃ কাটজু এই বক্তৃতার দ্বারা নিজেকে যেভাবে তুলে ধরেছেন, অন্যান্য কংগ্রেস নেতারা যদি সেই

---

of the nation. He achieved greatness from suffering and sacrifice."

Dr. Radhakrishnan said, he had met Netaji ten days before he left India. Subhas Bose's activities abroad, the President said, showed that he was "a sanyasin at heart." He also noted that several of the patriotic songs now sung over All India Radio and on public occasions were composed for the I.N.A., and the greeting Jai Hind was first given to the I.N.A. by Netaji.

(Statesman, 27. 12. 62)

জাতীয় হন, যদি তাঁদের ধারণায় দেশলাই বা চরকা তৈরীর কারখানা বৃহৎ যন্ত্রশিল্পের পথে অগ্রগতির নিদর্শন হয়, তাহলে ক্ষমতা পাবার পরে কংগ্রেস দেশের সর্বনাশ ঘটাবে। আমার বক্তব্যের গুরুত্ব নেতাজী স্বীকার করে প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি করা যায়? আমি তাঁকে জাতীয় পুনর্গঠন ও শিল্পায়নের সমস্যার সমাধানের জন্য একটি জাতীয় পরিকল্পনা-সমিতি গঠনের পরামর্শ দিলাম। নেতাজী তৎক্ষণাৎ সায় দিলেন; এবং তিনি ১৯৩৮ সালের অক্টোবর মাসে দিল্লীতে বিভিন্ন প্রদেশের শিল্পমন্ত্রীদের ও ভারতের কিছু অন্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের যে-সভা ডাকলেন, তাতে আমাকে নিমন্ত্রণ করলেন। আমি সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনেই মাত্র যোগ দিতে পেরেছিলাম। দেখলাম, সেখানে ডাঃ কাটজু, ডাঃ সৈয়দ মামুদ সহ প্রদেশসমূহের প্রায় সকল শিল্পমন্ত্রীই উপস্থিত আছেন। ভারতীয় প্ল্যানিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব আগেই গৃহীত হয়ে গিয়েছিল, এবং তার এম বিশ্বেশ্বরায়াকে অনুরোধ করা হয়েছিল কমিটির সভাপতিত্ব স্বীকার করার জন্য। আমি তার এম বিশ্বেশ্বরায়ার সঙ্গে কথা বলে সভাপতিত্বের পদগ্রহণে তাঁকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হলাম; তাঁকে বুঝিয়েছিলাম, একজন প্রবীণ সাহিব কংগ্রেস নেতাকে সভাপতি না করলে ভারতীয় প্ল্যানিং কমিটির সিদ্ধান্তগুলি বিতর্ক তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তরূপে থেকে যাবে, কংগ্রেসের কাছে তার কোনো মূল্যই থাকবে না। সেই মহান প্রবীণ ব্যক্তিটি আমার কথায় সারবত্তা খুঁজে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়ে গেলেন। আমার পরামর্শমতই পণ্ডিত জহরলাল নেহেরুকে (তখন ইউরোপে) ভারতীয় প্ল্যানিং কমিটির

সভাপতিত্ব করতে আমন্ত্রণ জানানো হল।"

(অনূদিত)

(ডাঃ মেঘনাদ সাহা রচিত 'Rethinking our future' গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত)

ভারতীয় প্ল্যানিং কমিশনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত একজন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের মুখে ভিতরের কিছু ইতিহাস শুনলাম। এই ইতিহাসকে 'সংশোধন প্রস্তাব সহ' স্বীকার করতে আপত্তি হওয়া উচিত নয়। গান্ধীবাদের আওতায় বর্ধিত কংগ্রেস নেতাদের অধিকাংশে যে চরকা এবং কুটীর শিল্পের বাইরে ভবিষ্যৎ দেখতে পারেন নি বা দেখতে চাননি, তা নিশ্চয়। চরকাকে মুক্ত করার ফলে দেশে বৃহৎ শিল্পের প্রয়োজনীয়তার পক্ষে জনমত গড়ে উঠবার সুযোগ ঘটেনি। এই পরিস্থিতি যে মেঘনাদ সাহার মত বৈজ্ঞানিককে বিচলিত করবে তাতে সন্দেহ নেই। তিনি নিজে স্বীকার করেছেন, ডঃ কাটজুর ১৯৩৮ সালের উদ্দীপ্ত ভাষণটি তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল। বৃহৎ শিল্প মানে শেষ পর্যন্ত দেশলাইয়ের কারখানা! ডঃ সাহা অতঃপর সক্রিয় হয়েছিলেন;— তিনি জানিয়েছেন,—তিনি কিভাবে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রকেও সক্রিয় করে তোলেন এবং তার এম বিশ্বেশ্বরায়াকে রাজনৈতিক কারণে সভাপতিত্ব থেকে নিবৃত্ত করতে সমর্থ হন।

এখানে পরিস্থিতির যথাযোগ্য উপস্থাপনার জন্য একটি বিষয় পরিষ্কার করে নেওয়া দরকার; ডঃ সাহা নিশ্চয় তাঁর রচনাগত সুভাষচন্দ্রকে পরিকল্পনা কমিশন গঠনে অনুরোধ করেছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র তাতে তৎক্ষণাৎ রাজীও হয়েছিলেন, কিন্তু ভারতীয় প্ল্যানিং-এর পরিকল্পনাটা সুভাষচন্দ্রের কাছে নতুন কিছু নয়। সুভাষচন্দ্র অহিংসাপন্থী নন, স্বাধীন ভারতকে তিনি বিশ্বের অন্যান্য স্বাধীন রাষ্ট্রের অনুরূপ চেহারায় কল্পনা করতে অভ্যস্ত, যে স্বাধীন ভারতের প্রতিরক্ষা-ব্যবস্থা সশস্ত্র পন্থায় হবে। ভারতের দারিদ্র্য

ত্বরান্বিতকরণ, সম্পদ বর্ধন এবং সমাজতন্ত্রের প্রবর্তনের জন্য বড় শিল্পায়নের প্রয়োজনীয়তার কথা বহুপূর্ব থেকে তাঁর চিন্তায় স্থান পেয়ে আসছে। এখানে স্মরণ করিয়ে দিই, ১৯৩০ সালের ১০ই জুন লণ্ডনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের "The struggle & after" নামক বক্তৃতার কথা। ঐ বক্তৃতায় তিনি সাম্যবাদী সংঘের পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিলেন, যে-সাম্যবাদী দল স্বাধীনতা-উত্তর কালে রাশিয়ার অনুরূপ জাতীয় পুনর্গঠনের সর্বনৈতিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে। ঐ বক্তৃতায় তিনি ভারতে সম্ভাব্য শ্রেণী সংগ্রামের কথাও তুলেছিলেন। সুভাষচন্দ্র স্বাধীনতার পূর্বে শিল্পায়নকে সম্ভব বলে মনে করেননি, কিন্তু তিনি ভারতের পুনর্গঠন যে, শিল্পায়নের পথে ঘটবে এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় ছিলেন। এই বক্তৃতার দেড়বৎসর পরে লিখিত 'দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল' গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র কংগ্রেসের অভ্যন্তরের সম্ভাব্য বামপন্থী দলের পরিকল্পনা ও কর্মপদ্ধতির উপস্থাপনা করতে গিয়ে পরিষ্কার বলেছেন,—

> "এই দল দেশের কৃষি এবং শিল্পের পুনর্গঠনের জন্য সুনির্দিষ্ট রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনায় বিশ্বাস করে।"

সুতরাং একথা না বললেও, চলে, ডঃ সাহার কথায় সুভাষচন্দ্র যে তৎক্ষণাৎ রাজী হয়েছিলেন,— এই রাজী হওয়াটা তাঁর নিজের তাগিদেই হয়েছিল। এখানে এইটেই বলা উচিত, সুভাষচন্দ্র তাঁর রাষ্ট্রগঠনের পরিকল্পনায় ডঃ সাহার জন্য প্রতিভার সহযোগে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন। এই ভেবে খুশী হয়েছিলেন—তাহলে এতদিনে বিজ্ঞান এসে রাজনীতির হাত ধরল।

বিশ্বেশ্বরায়াকে সভাপতিত্ব থেকে নিবৃত্ত করার ব্যাপারে নিজ ভূমিকা সম্বন্ধে ডঃ সাহা যা বলেছেন তার প্রতিবাদ না করেও বলা যায়,—শ্রীযুক্ত সত্যরঞ্জন বক্সীর উক্তিসূত্রে আমি বলছি,—সুভাষচন্দ্র বুঝেছিলেন, এই পরিকল্পনা কমিটির ব্যাপারে তাঁকে গান্ধীবাদীদের কাছ থেকে কী পরিমাণে বিরোধিতা সহ্য করতে হবে। তাঁর পরিকল্পনার অঙ্কুরে বিনাশ নিবারণ করতে হলে বর্ষীয়সী জহরলালকে এর সঙ্গে যুক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন বলিয়া সুভাষচন্দ্রের আশঙ্কা ছিল,—শ্রীযুক্ত বক্সী বলেন।—সে ক্ষেত্রে পরিকল্পনা কমিটির অধিবেশন ভাষণবহুল হয়ে পড়বে।

সুভাষচন্দ্রকে যে কত সন্তর্পণে অগ্রসর হতে হচ্ছিল, তার নমুনা পাওয়া যাবে পরিকল্পনা কমিটি সম্বন্ধে তাঁর সংযত সতর্ক উক্তিসমূহে। এই ব্যাপারে তিনি গান্ধীবাদের সঙ্গে আপোষের আঘ্রাণ চেষ্টা করেছেন। হরিপুরা ভাষণে সমাজতান্ত্রিক পন্থায় কৃষি ও শিল্পের রাষ্ট্রায়ত্ত পুনর্গঠনের কথা যদিও বলেছিলেন, যদিও বলেছিলেন, যে যন্ত্র যুগের পাপের কথা যতই বলা যাক না কেন, যন্ত্রপূর্ব-যুগে ফিরে যাওয়ার কোনো উপায় নেই, তবু ঐ ভাষণে সুভাষচন্দ্রকে এই অনিবার্য সত্যকে প্রকাশ করতে হয়েছে বিনয়ের ভাষায় আবৃত করে।

ভারতীয় রাজনীতির বিচিত্র চরিত্রের জন্য এই সাবধানতা সুভাষচন্দ্রকে দেখাতে হয়েছিল, নিখিল ভারত প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী ভাষণে পর্যন্ত। প্ল্যানিং কমিটির ঐ প্রথম সভা হয়েছিল ১৯৩৮ সনের ১৭ই ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে। উক্ত উদ্বোধনী ভাষণে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন :

> "গত কয়েক সপ্তাহ ধরে আমি কোনো কোনো মহলে একটি আশঙ্কা লক্ষ্য করছি : ১৯২১ সাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত নিখিল ভারত কাটুনী সংঘ ও নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের উদ্যোগে খাদি উৎপাদন ও কুটীর শিল্পের উন্নয়নের জন্য যে চেষ্টা চলে আসছে তার উপর আমাদের বর্তমান শিল্পবিষয়ক পরিকল্পনার সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়া কি জাতীয় হবে? দিল্লীতে উদ্বোধনী ভাষণে আমি যা বলেছিলাম তা এখানে স্মরণ করতে অনুরোধ করছি। আমি সেখানে পরিষ্কারভাবে বলেছিলাম, কুটীর শিল্প এবং বৃহৎ শিল্পের মধ্যে কোনো

অন্তর্নিহিত বিরোধ নেই। বস্তুত আমি শিল্পকে তিনভাগে বিভক্ত করেছিলাম: কুটীর শিল্প, মাঝারি শিল্প, বৃহৎ শিল্প। এবং আমি এই তিন শ্রেণীরই শিল্পের বিকাশের উপযোগী পরিকল্পনার পক্ষে বলেছিলাম। শুধু তাই নয়, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনে আমরা নিখিল ভারত গ্রামোদ্যোগ সংঘের জন্য একটি আসন সংরক্ষিত রেখেছি এবং ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটিতেও অনুরূপ একটি আসনের ব্যবস্থা করা যায়। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের উদ্যোক্তারা কুটীর শিল্পের পুনরুজ্জীবনের আন্দোলনকে ফাঁসিয়ে দিতে চান, এই কথা বললে, কিংবা এমন আশঙ্কা বোধ করলেও, আমাদের প্রতি গভীর অবিচার করা হবে।

"সকলেই জানেন, কিংবা তাঁদের জানা উচিত যে, ইউরোপ বা এশিয়ার সবচেয়ে শিল্পসমৃদ্ধ দেশ, যেমন জার্মানী বা জাপানে, যথেষ্ট সংখ্যক কুটীর শিল্প আছে এবং তারা বৃদ্ধির পথে। সে ক্ষেত্রে আমাদের মত দেশের ক্ষেত্রে আমরা আশঙ্কা বোধ করি কেন?"

সুভাষচন্দ্র আরও বুঝিয়েছিলেন। কুটীরশিল্প এবং যন্ত্রশিল্পের মধ্যে সমন্বয় কিভাবে সম্পন্ন হতে পারে তা সহজভাবে বিশ্লেষণ করবার প্রচুর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফল হয়নি। অপর দিকে তাঁর কলভোগ তাঁকে করতে হয়েছিল।

ফল না হবার দুটি কারণ ছিল। প্রথম কারণ, কুটীর শিল্পের গোঁড়া ভক্তেরা সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নন। তাঁরা স্বপ্ন দেখেছেন, এবং তদনুযায়ী সাধনাও করেছেন, ভারতের মূল শিল্প হবে কুটীর শিল্প। সুভাষচন্দ্রের বক্তব্য, মূল শিল্প হবে যন্ত্রশিল্প, কুটীরশিল্প তার সহযোগিতা করবে।

সুভাষচন্দ্রের দ্বারা গঠিত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর বিরোধিতার দ্বিতীয় কারণ রাজনৈতিক। এটা গ্রহণযোগ্য নয়, কেননা এর পিছনে আছেন সুভাষচন্দ্র ও তাঁর সভাবলম্বীরা। দেশকে যন্ত্রশিল্পের মানসিকতা দেওয়ার অর্থ জাতীয় নেতৃত্বের বদলের পথ খুলে দেওয়া। গান্ধীবাদীরা খাদি বা কুটীর শিল্পের প্রচারের উপর নেতৃত্ব গড়ে তুলেছেন; তাঁরা গান্ধীবাদে পুরোপুরি বিশ্বাস করুন বা না করুন, তাঁদের নেতৃত্বের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে কুটীর শিল্পের প্রচার জড়িত হয়ে আছে। সে নেতৃত্বের ভিত্তি দুর্বল হবে যদি তাঁরা কুটীর শিল্পের প্রতি অনুরাগকে ত্যাগ করেন।

কিন্তু যদি যন্ত্রশিল্প প্রবর্তনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন সমকক্ষীয় কেউ? সেক্ষেত্রে যন্ত্রশিল্পে আপত্তি নেই। সুভাষচন্দ্র তা বুঝেছিলেন বলেই জহরলালকে পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতিত্বে ডাক দিয়েছিলেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, জহরলাল যখন স্বাধীনতা-উত্তরকালে যন্ত্রশিল্পায়নের জন্য প্রয়াসী হলেন, তখন কোনো বড় প্রতিবাদ গান্ধীবাদের পক্ষ থেকে আসেনি, কারণ পণ্ডিত জওহরলাল গান্ধীজীর উত্তরাধিকারী।

॥ তিন ॥

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের সূত্র সংকলন করা চলে এইবার। Cross Roads নামক গ্রন্থে জাতীয় পুনর্গঠন বিষয়ে সুভাষচন্দ্রের মত-সংবলিত তিনটি রচনা রয়েছে। 'Science & Politics' রচনাটিতে সুভাষচন্দ্র ও ডঃ মেঘনাদ সাহার কথাবার্তা সংকলিত। ইণ্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ অ্যাসোসিয়েশনের তৃতীয় সাধারণ সভায় রাষ্ট্রপতি সুভাষচন্দ্র সভাপতিত্ব করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। ঐ সভা হয় ২১শে আগষ্ট, ১৯৩৮। বিজ্ঞান ও শিল্পের ব্যাপারে কংগ্রেসের মনোভাব সম্বন্ধে অধ্যাপক সাহা

সুভাষচন্দ্রকে কিছু প্রশ্ন করলে তিনি তার উত্তর দেন। পূর্বোক্ত রচনায় সেই প্রশ্নোত্তরগুলি রয়েছে।

'The Industrial Problems of India' রচনাটি ২রা অক্টোবর, ১৯৩৮-এ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে প্রদত্ত সুভাষচন্দ্রের ভাষণ।

'The National Planning Committee' রচনাটি নিখিল ভারত ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী ভাষণ। সভা ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৩৮ বোম্বাইয়ে অনুষ্ঠিত হয়।

এই তিনটি রচনার ভিতর থেকে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের ধারণার পূর্ণরূপ পাওয়া সম্ভব। বিবেচনার জন্য প্রথমেই ডঃ সাহার সঙ্গে কথোপকথন-মূলক রচনাটিকে গ্রহণ করা যায়, কারণ এখানে তিনি বিজ্ঞানীদের সঙ্গে কথা বলছেন, বিচিত্র সব মনোদুষ্টির ধারণাকে পরিদুষ্ট করবার ক্লান্তিকর দায়িত্ব থেকে এখানে তিনি মুক্ত।

ডঃ সাহা প্রশ্ন করলেন, ভারত কি গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যাবে গ্রামজীবনের আদর্শকে বরণ করে, নাকি সে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত শিল্পের পথ গ্রহণ করে দারিদ্র্য, অশিক্ষার সঙ্গে লড়াই করবে—আধুনিক অস্ত্রে আত্মরক্ষার সচেষ্ট হবে?

ডঃ সাহা যোগ করলেন, কংগ্রেস যদি শিল্পায়নের নীতি গ্রহণ করে, তাহলে সে কি ন্যাশন্যাল রিসার্চ কাউন্সিল প্রভৃতির শিল্পায়নের যুক্তিসম্মত পরিকল্পনা ইত্যাদি গ্রহণ করবে?

সুভাষচন্দ্র উত্তরে জানালেন, স্বাধীনতা সংগ্রামের সংগঠন কংগ্রেসই, স্বাধীনতা-উত্তরকালে জাতীয় পুনর্গঠনের দায়িত্ব নেবে এবং সে ব্যাপারে সে বিজ্ঞানের কাছ থেকে সর্বাধিক সাহায্যপ্রার্থী। হরিপুরা-ভাষণে তিনি এই মনোভাব প্রকাশ করেছেন ইতিপূর্বে।

কংগ্রেস গোরুর গাড়ীর যুগে ফিরে যাবে কি না, এটা সুভাষচন্দ্রের কাছে বাতিল প্রশ্ন। দশবছর আগে ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে ৩১ বছরের সুভাষচন্দ্র সে কথা বলেছিলেন। বলার জন্য নিন্দা সহ্য করতে হয়েছিল যথেষ্ট।

শিল্পায়ন বলতে ঠিকভাবে তিনি কি বুঝেছেন তা স্পষ্ট-ভাবে জানালেন। তখন দেশে নষ্ট শিল্পের পুনরুদ্ধারের পক্ষে ভাবাবেগমূলক প্রচার চলছিল। সে প্রচারে পাখার বাতাস করছিল ইংরেজ সরকার। সুভাষচন্দ্র পরিষ্কার ভাষায় জানালেন, ভারতের সামনে কয়েকটি মধ্যযুগীয় শিল্পের পুনরুদ্ধার কোনো সমস্যার বিষয় নয় (যে পুনরুদ্ধার-চেষ্টার সঙ্গে ন্যাশনালিস্ট-মার্কেন্টাইলের বিবাদ নেই), তার মূল চেষ্টা হবে আধুনিক শিল্পায়ন। শিল্পবিপ্লব ঘটাতেই হবে ভারতবর্ষে, নইলে ভারত উঠবে না; ভারত রয়েছে যন্ত্রশিল্প-পূর্বযুগে; বর্তমান যুগ শিল্পের যুগ; ভাল লাগুক আর মন্দ লাগুক, শিল্পায়ন ভারতের বাঁচবার পক্ষে অত্যাবশ্যক।

সুভাষচন্দ্র একটি রূঢ় বাস্তব সত্য তুলে ধরলেন। শিল্পায়ন গ্রেট ব্রিটেনের মত ক্রম-বিবর্তনের পথে আসতে পারে, কিংবা রাশিয়ার মত বাধ্যতার দ্রুত পথে। সুভাষচন্দ্র বললেন, ভারতের জন্য প্রয়োজন রাশিয়ার তুল্য বাধ্যতার পথ।

> "We can at best determine whether this revolution, that is industrialisation, will be a comparatively gradual one, as in Great Britain, or a forced march as in Soviet Russia. I am afraid it has to be a forced march in this country."

আরও কিছু মন খুললেন তিনি। কুটীর শিল্পকে সম্ভব ক্ষেত্রে রক্ষা করবার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও তিনি বললেন:

> "ভারতের ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা বলতে যন্ত্রশিল্পায়নের পরিকল্পনাকেই বোঝাবে। আর যন্ত্র শিল্পায়ন বলতে ছাতার বাঁট বা bell metal

Plate তৈরী বোঝায় না, যেমন যেমন স্যার জন অ্যানডারসন সব বোঝাতে চেয়েছেন।"

সুভাষচন্দ্রের মনোভাব বোঝা গেল। এই মনোভাব যে সকল কংগ্রেসীর নয়, একথা তাঁকে স্বীকার করতে হয়েছিল। তবে এটা কংগ্রেসের উঠতি-দলের মত, তাতে সন্দেহ নেই। সুভাষচন্দ্রাদি শিল্পায়নকে প্রয়োজন মনে করেন নিম্নলিখিত কারণে,—

(১) বেকারী দূর করার জন্য। যান্ত্রিক কৃষি, উৎপাদন বাড়াবে, কিন্তু বেকারীও বাড়াবে; সুতরাং কর্ম-সংস্থানের জন্য চাই শিল্প।

(২) সমাজতন্ত্র, যা ভাবী ভারতের আদর্শ, সেই সমাজ-তন্ত্রের সঙ্গে শিল্পায়ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

(৩) বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য;

(৪) জীবন যাত্রার মানোন্নয়নের জন্য।

ভাশন্যাল প্ল্যানিং-এর কয়েকটি নিয়ন্ত্রক নীতির কথাও বললেন—

(১) শিল্পের দৃষ্টিতে সমস্ত পৃথিবী একটি ক্ষেত্ররূপে গৃহীত হলেও জাতীয় আত্মসম্পূর্ণতার প্রয়োজন আছে, বিশেষত অত্যাবশ্যক দ্রব্যের ব্যাপারে।

(২) মূল শিল্পগুলির বিকাশের চেষ্টা করতে হবে, যথা, বিদ্যুৎসরবরাহ, ধাতু উৎপাদন, যন্ত্রপাতি নির্মাণ, রাসায়নিক দ্রব্য উৎপাদন, যানবাহন ও যোগাযোগের বস্তু নির্মাণ ইত্যাদি।

(৩) শিল্পবিষয়ক শিক্ষা ও গবেষণার ব্যবস্থা। 'নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য' নিয়ে শিক্ষার্থীদের অন্যান্য দেশে পাঠাতে হবে যাতে তারা ফিরেই নতুন শিল্প সুরু করতে পারে। আর শিল্পের গবেষণার ব্যাপারে সরকারের অযথা হস্তক্ষেপ নিবারণ করতে হবে।

(৪) স্থায়ী গবেষণা সংস্থা থাকবে।

(৫) জাতীয় পুনর্গঠন পরিকল্পনার পূর্ব-প্রস্তুতিরূপে অর্থনৈতিক অবস্থার ব্যাপক সন্ধান ও পর্যবেক্ষণ চালাতে হবে।

সুভাষচন্দ্র নিজের ধারণা পরিষ্কার করার কালে ডঃ মেঘনাদ সাহাকে বিশেষভাবে প্রশংসা করলেন তাঁর এই বিষয়ক প্রচেষ্টার জন্য; ভারতের রাজনীতি ও বিজ্ঞানকে হাত ধরে চলতে হবে; বিজ্ঞান দেশের প্রয়োজন নিবারণের পথ দেখাবে গবেষণার দ্বারা, রাজনীতিকরা সেই গবেষণালব্ধ বিজ্ঞানসিদ্ধিকে প্রয়োগ করবেন জনকল্যাণে ইত্যাদি।

মেঘনাদ সাহার সঙ্গে আলোচনাকালে শিল্পায়ন সম্বন্ধে নিজ চিন্তার যে কাঠামো সুভাষচন্দ্র উপস্থিত করেছিলেন, তার কয়েকটিকে অধিকতর ব্যাখ্যা ও দৃষ্টান্তযুক্ত করেছিলেন শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলনে এবং ভাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির উদ্বোধনী সভায়। এই দুটি ভাষণের বক্তব্যকে আমরা এক-সঙ্গে উপস্থিত করব।

ভাষণ দুটিতে সুভাষচন্দ্রকে দুটি জিনিস বিশেষভাবে বোঝাতে হয়েছিল—কৃষি ও শিল্পের সম্পর্ক এবং কুটীরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের সম্পর্ক। মনে রাখতে হবে, এই দুটি ভাষণ মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান-প্রতিষ্ঠানে দেওয়া হয়নি, দেওয়া হয়েছিল কংগ্রেসী সভায়, যাঁদের অধিকাংশই বৃহৎ শিল্প বলতে বুঝতেন লেদশাই কারখানা। কংগ্রেসের নো-চেঞ্জার মহলে সুভাষচন্দ্রের যান্ত্রিক মনোভাবে আশঙ্কার গুঞ্জন উঠেছিল। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষে কৃষির উন্নতিতেই তো উন্নতি, সেখানে আবার যন্ত্রশিল্প নিয়ে বাড়াবাড়ি কেন? আর যদি কিছু শিল্পের প্রয়োজন হয় তার জন্য আছে কুটীর শিল্প। সুভাষ-চন্দ্রকে তাই প্রাথমিক কতকগুলো কথা বোঝাতে হয়েছিল—কথাগুলো সত্যই প্রাথমিক, আধুনিক যে-কোনো দেশের পক্ষে।

কৃষির উন্নতিতে দেশের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি নেই। আগেই বলা হয়েছে, যান্ত্রিক কৃষি উৎপাদন বাড়ালেও বেকার বাড়বে। সেই উদ্বৃত্ত কৃষককে নিয়োগ করতে হবে শিল্পে। কৃষক

। হলে বেকারী ঘুচবে, উৎপাদন বাড়বে, তার ফলে উন্নত
জীবনযাত্রার যান।

কুটীরশিল্প ও যন্ত্রশিল্পের সহযোগ সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্রের
কথা আগেই উপস্থিত করেছি। শিল্পোন্নত দেশেও
কুটীরশিল্প ক্ষেত্র বিশেষে উন্নতির পথে যায়, ভারতে তার
। কোনো কারণই নেই। সুচিন্তিত পরিকল্পনার দ্বারা
শিল্পের মধ্যে প্রতিযোগিতা নিবারণ করতে হবে।

যন্ত্রশিল্পের উন্নতি কুটীর শিল্পকে সর্বক্ষেত্রে সংহার তো
ই না, উপরন্তু ক্ষেত্রবিশেষে কিভাবে উন্নতির পথে নিয়ে
যায় দৃষ্টান্ত দিয়েছেন তিনি। যথা, বেনারসের যন্ত্র-
। যদি উন্নততর যন্ত্র দেওয়া যায় এবং সস্তায় বিদ্যুৎ
হ করা যায়, তাহলে সেখানে উৎপাদনের উৎকর্ষ ও
া দুই-ই বৃদ্ধি পেতে পারবে।

শের তাই তিনটি বিভাগ করলেন তিনি—কুটীর শিল্প,
। শিল্প ও মূল শিল্প। সুভাষচন্দ্র জোর দিলেন মূল
ব্যাপারে। কারণ তিনি জানতেন, যদি দেশে মূল
উন্নতি ঘটানো যায় তাহলে বাকি শিল্প স্বাভাবিক-
বৃদ্ধিলাভ করবে। মূল শিল্প বলতে কি বুঝেছেন, তা
ই জানিয়েছি। তিনি আরও ব্যাখ্যা করেও বললেন,

"মূল শিল্প হল সেই সব শিল্প অপরাপর শিল্পগুলিকে
সাফল্যের সঙ্গে চালিত রাখবার জন্য যাদের
প্রয়োজন, যথা, বিদ্যুৎ শিল্প, ধাতুনির্যাস শিল্প, ভারী
রসায়ন শিল্প, যন্ত্রপাতি নির্মাণের শিল্প, রেল
টেলিগ্রাফ, রেডিও প্রভৃতি যোগাযোগ ও যানবাহন
শিল্প।"

সুভাষচন্দ্র দ্বার্থহীন ভাষায় বললেন, এই শিল্পায়ন
াপ হয়, তবে তা ভারতের বাঁচার পক্ষে
ীয় পাপ। তিনি আবার বললেন, এ ব্যাপারে
। আদর্শ রাশিয়া—তার দ্রুত বাধ্যতামূলক শিল্পায়ন

"ইউনাইটেড স্টেটস অব আমেরিকার মতই
খনিজ সম্পদপূর্ণ দেশ ভারতবর্ষ। ভারতের খনিজ
সম্পদ এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যের সীমা নেই।
এখন প্রয়োজন, জাতির সর্বাধিক স্বার্থের
দিকে দৃষ্টি রেখে ঐ সম্পদের প্রণালীবদ্ধ ও
সুসংগঠিত ব্যবহার। পৃথিবীতে যে-সকল দেশ
অর্থ ও সম্পদশালী হয়েছে তাদের সকলেই শিল্পের
পরিপূর্ণ বিকাশের দ্বারা তা হতে পেরেছে। এখানে
আমি একটি মাত্র দেশের দৃষ্টান্ত দেব। (প্রবন্ধ)
মহাযুদ্ধের আগে রাশিয়ার অবস্থা ভারতের চেয়ে
কিছু ভাল ছিল না। রাশিয়া তখন প্রধানত
কৃষিনির্ভর দেশ ছিল। তার জনসংখ্যার শতকরা
প্রায় ৭০ ভাগ ছিল কৃষক, এবং তাদের অবস্থা
আমাদের এখনকার কৃষকদের মতই ছিল শোচনীয়।
রাশিয়া তখন শিল্পে পশ্চাৎপদ অবস্থায়; বিদ্যুৎ
শক্তির উৎপাদন ও একই অবস্থায়; বিদ্যুতের
ব্যবহার বিলাসিতা রূপে গণ্য। সে তখন নিজের
বিদ্যুৎ-সম্পদের কথা জানে না। বিশেষজ্ঞ বা
বা যন্ত্রবিৎ নেই দেশে। কিন্তু গত ১৬ বছরের
মধ্যে সে মূলত অর্ধাহারী কৃষকের দেশ থেকে
উপযুক্ত আহার্যে পুষ্ট ও পোষাকে আচ্ছাদিত শিল্প-
শ্রমিকের দেশে পরিণত হয়েছে। বিপ্লবের পূর্বে
কৃষিজীবী জনসাধারণ অবিরত সেখানে দারিদ্র্য,
ব্যাধি এবং দুর্ভিক্ষে পীড়িত হোত। সেই কঠিন
সমস্যার উল্লেখযোগ্য সমাধান সে করতে পেরেছে।
সমগ্র দেশের সুপরিকল্পিত শিল্পায়নের দ্বারাই এটা
ঘটাতে পেরেছে এবং সেই শিল্পায়নের পিছনে
আছে সুপরিকল্পিত বিদ্যুৎ-উৎপাদন। অত্যন্ত
অল্প সময়ের মধ্যে রাশিয়ার এই অপূর্ব অগ্রগতিকে
যত্নের সঙ্গে অনুধাবন করা উচিত—সোভিয়েট রাষ্ট্র

যে রাজনৈতিক আদর্শের উপরই নির্ভর করুক না কেন। আমি রাশিয়ার দৃষ্টান্ত দিয়েছি এই কারণে যে, যুদ্ধপূর্ব রাশিয়ার অবস্থার সঙ্গে আমাদের বর্তমান অবস্থার সাদৃশ্য আছে এবং আমি এই দৃষ্টান্তের দ্বারা দেখাতে চাই, কিভাবে পরিকল্পিত শিল্পায়ন দেশের সর্বাঙ্গীণ সমৃদ্ধি আনতে পারে।"

উদ্ধৃত অংশ সম্বন্ধে একটি কথা বলা যায়—রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার বিষয়ে বক্তব্যের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের বক্তব্যের পূর্ণ ঐক্য আছে। রাশিয়ার ভূতাত্ত্বিক সন্ধান কার্য থেকে শুরু করে সর্বদিকের অগ্রগতি রবীন্দ্রনাথকে এমনভাবে মুগ্ধ করেছিল যে, রাশিয়া-দর্শনের পরে যখনই সুযোগ হয়েছে তার বিষয়ে তিনি উল্লেখ করেছেন। মৃত্যুর কিছু পূর্বে মিস্ রাথবোনের উদ্দেশ্যে লিখিত পত্রেও তিনি অল্পদিনের মধ্যে রাশিয়ার উন্নতির কথা বলেছিলেন, অবশ্য সে উন্নতির মধ্যে সাধারণের শিক্ষার দিকটাই তাঁর চোখের সামনে বড় হয়ে ধরা দিয়েছিল।

॥ চার ॥

এবার সংক্ষেপে দেখে নেওয়া যাক স্থানীয় প্ল্যানিং কমিশন ও স্থানীয় প্ল্যানিং কমিটির প্রতিষ্ঠার পিছনের ইতিহাস। সে ইতিহাসের কিছু অংশ দেখেছি মেঘনাদ সাহার রচনায়। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের অভ্যন্তরে ব্যাপারটার অগ্রগতি কিভাবে হয়েছিল?

সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রীত্ব নেয় ১৯৩৭ সালের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী। মন্ত্রীত্ব নেবার পরে বিভিন্ন কংগ্রেসী প্রদেশে একই ধরনের শিল্পনীতি প্রবর্তনের কথা ওঠে। তাছাড়া প্রদেশগুলির পরস্পর নির্ভরতার জন্য অর্থনৈতিক পরিকল্পনাকে সফল করতে হলে সহযোগিতা ও সমনীতির প্রয়োজন ছিল। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৯৩৮-এর আগস্ট মাসে নিম্নের প্রস্তাবটি গ্রহণ করে—

"কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেসী মন্ত্রীসভাসমূহের নিকটে একটি বিশেষজ্ঞদের কমিটি গঠনের সুপারিশ করছে; ঐ কমিটি জাতীয় পুনর্গঠন ও সামাজিক কোনো পরিবর্তনের সমাধান করার পক্ষে আশু ও গুরুতর সমস্যা সমূহের সম্পর্কে বিচার বিবেচনা করবে। সমস্যা সমূহের সমাধানের জন্য ব্যাপক অনুসন্ধান, তথ্য সংগ্রহ এবং সামাজিক উদ্দেশ্যের সুস্পষ্ট নির্ধারণ প্রয়োজন। এই সকল সমস্যার অনেক গুলির কার্যকরী সমাধান প্রাদেশিক ভিত্তিতে করা সম্ভব নয়,—সংলগ্নপ্রদেশ সমূহের স্বার্থ সেখানে পরস্পর জড়িত হয়ে আছে। সর্বনাশা বন্যার নিবারণ, সেচের কাজে জলের ব্যবহার, ভূমিক্ষয় সমস্যার বিবেচনা, ম্যালেরিয়ার বিতাড়ন, এবং জলবিদ্যুৎ উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ক নীতি নির্ধারণের জন্য নদী বিষয়ক ব্যাপক অনুসন্ধান কার্যের প্রয়োজন। এই উদ্দেশ্যে সমগ্র নদী উপত্যকা সমূহের বিষয়ে সন্ধান ও তদন্ত চালাতে হবে, যাতে করে বৃহৎ আকারের রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা গৃহীত হতে পারে। শিল্পসমূহের বিকাশ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য কিছু কিছু প্রদেশের যৌথ ও সমন্বিত প্রয়াসের প্রয়োজন আছে। ওয়ার্কিং কমিটি তাই প্রারম্ভিকভাবে একটি আন্তঃ প্রাদেশিক বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের পরামর্শ দান করছে, যে কমিটি সমস্যাসমূহের সাধারণ রূপ নির্ণয় করবে এবং পরামর্শ দেবে—কি ভাবে, কোন্ পথে সেগুলিকে আয়ত্ত করা যাবে। এই বিশেষজ্ঞ কমিটি পৃথক পৃথক সমস্যার বিবেচনার জন্য পৃথক পৃথক কমিটি বা বোর্ড গঠনের সুপারিশ করতে পারবে এবং প্রাদেশিক

সরকারগুলিকে যৌথ প্রথায় কিভাবে অবলম্বন করা যাবে সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে পারবে।"

প্রয়োজনীয় অস্পষ্টতা সবেও সব কিছু আছে প্রস্তাবটির মধ্যে। এতে বিশেষজ্ঞ কমিটি, শিল্পোন্নয়ন, জল-বিদ্যুৎ, রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা—পাওয়া যাবে না এমন জিনিস নেই; কিন্তু মূল প্রশ্নটি সযত্নে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে—সে প্রশ্ন হল—ভারতবর্ষ জাতীয় পুনর্গঠনের ব্যাপারে বৃহৎশিল্প না কুটীর শিল্প কোনটিকে ভিত্তিরূপে গ্রহণ করবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল পণ্ডিত জহরলালের সভাপতিত্বকালে: দক্ষিণপন্থী সহযোগীদের দ্বারা এমন একটি প্রস্তাবকে তিনি পাশ করিয়ে নিতে পেরেছিলেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিত্বের প্রমাণ, কিন্তু তা করতে গিয়ে দেশের সামনে স্পষ্ট নীতি তুলে ধরবার ইচ্ছাও তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

অতঃপর সুভাষচন্দ্র সভাপতি হলেন ১৯৩৮ সালে। সুভাষচন্দ্রের কাছে শিল্পায়নের ব্যাপারটি নীতি হিসাবে মূলগত; সুতরাং তার সুস্পষ্ট রূপদান করতে তিনি কৃতসংকল্প হলেন। তিনি ১৯৩৮ সালের ফেব্রুয়ারীর হরিপুরা ভাষণে পরিষ্কার ভাবে যন্ত্রশিল্পায়নের পক্ষে বললেন এবং পরবর্তী যে মাসে বোম্বাইয়ে সাতটি প্রদেশের প্রধানমন্ত্রীদের সম্মেলনে ডাকলেন। ঐ সম্মেলনে ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন সদস্য এবং অন্য কয়েকজন মন্ত্রীও যোগ দিলেন। সভায় শিল্প পুনর্গঠন, বিদ্যুৎ-উৎপাদন, প্রদেশসমূহের মধ্যে সহযোগ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা হল। সম্মেলনে সমাগত ব্যক্তিরা বিশেষজ্ঞ কমিটি গঠনের কথা তুললেন।

ওয়ার্কিং কমিটি জুলাই মাসে (১৯৩৮) একটি প্রস্তাব গ্রহণ করল—

> "ওয়ার্ধায় ১৯৩৭ সালের ১৪-১৭ আগস্টের সভায় ওয়ার্কিং কমিটি সর্বভারতীয় শিল্প বিষয়ক পরিকল্পনা গ্রহণ করবার জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটি নিয়োগের যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, তদনুযায়ী ঐ বিষয়ক প্রাথমিক কার্যক্রমে ওয়ার্কিং কমিটি কংগ্রেস সভাপতিকে শিল্প-মন্ত্রীদের একটি সম্মেলন যথাশীঘ্র আহ্বান করার দায়িত্ব দিচ্ছে এবং তাঁকে অনুরোধ জানাচ্ছে, তিনি যেন প্রদেশসমূহের শিল্পের বর্তমান অবস্থা, তার অভাবের রূপ এবং সেখানের নূতন শিল্প-সম্ভাবনা সম্বন্ধে বিবরণ পেশ করেন।"

একটি বৃহৎ পরিবর্তন ঘটে গিয়েছে,—১৯৩৭ আগস্টের এবং ১৯৩৮ জুলাইয়ের প্রস্তাব দুটিকে পাশাপাশি লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে। ১৯৩৭ এর প্রস্তাবে উক্ত পরিকল্পনা কমিটি যে শিল্পকেন্দ্রিক হবে তা স্পষ্টভাবে বলা ছিল না; ১৯৩৮ এর প্রস্তাবে খোলাখুলি বলা হল—ঐ কমিটি গঠিত হবে সর্বভারতীয় শিল্প পরিকল্পনার জন্য।

এই বৃহৎ পরিবর্তনের দায়িত্ব সুভাষচন্দ্রের।

সুভাষচন্দ্র অতঃপর নানা স্থানে নানাভাবে ভারতের যন্ত্র-শিল্পায়ন সম্বন্ধে তাঁর ধারণা প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৯৩৮-এর আগষ্ট মাসে বিজ্ঞানীদের সম্মেলনে তাঁর ভাষণের রূপ আগেই দেখেছি; মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর ঐ বিষয়ে আলোচনার প্রকৃতিকেও বিশ্লেষণ করেছি। ২রা অক্টোবর দিল্লীতে শিল্পমন্ত্রীদের সম্মেলন হল—সভাপতিরূপে সুভাষচন্দ্র তাঁর চিন্তাকে উন্মোচন করলেন এবং ১৯৩৮ সালের ১৭ ডিসেম্বর বোম্বাইয়ে ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটির প্রথম সভায় উদ্বোধনী ভাষণ দিলেন।

এই সকলের দ্বারা যন্ত্রশিল্পের পক্ষপাতী ও বিপক্ষ উভয় দলের মধ্যেই বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি করলেন তিনি।

রবীন্দ্রনাথের কিছু প্রসঙ্গ এই প্রসঙ্গে এইখানে আসছে সেই সঙ্গে কিছু জহরলালের কথাও। ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে ভারতের এই তিন ধারা খুব কাছাকাছি এসেছিল।

সুভাষচন্দ্র ১৯৩৮এর ১৯শে অক্টোবর ট্রেন থেকে ইউরোপ প্রবাসী জহরলালকে যে চিঠি লিখেছিলেন, তার শেষে আছে

—"আশাকরি তুমি পরিকল্পনা কমিটির সভাপতিত্ব গ্রহণ করবে। যদি এটাকে সফল করতে হয় তো তার তোমাকে নিতেই হবে।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতে সদ্য-প্রত্যাবৃত্ত জহরলালকে শান্তিনিকেতন থেকে লিখলেন ১৯শে নভেম্বর, ১৯৩৮—

> "এই সেদিন ভারতীয় শ্রমশিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা নিয়ে ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে দীর্ঘ এবং চমৎকার এক আলোচনা হল। আমি এর গুরুত্ব সম্বন্ধে স্থির নিশ্চয়। তুমি সুভাষ-পরিচালিত কমিটির সভাপতি হতে রাজী হয়েছ বলে এ সম্পর্কে তোমার অভিমত জানতে চাই।"

দেখা গেল রবীন্দ্রনাথ সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্টভাবে শিল্পের বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনার সমর্থক। ডঃ মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তিনি এ বিষয়ে সুদীর্ঘ আলোচনা করেছেন, সুভাষচন্দ্রের সঙ্গেও করেছেন, এবং তিনি এই বিষয়ে জহরলালের সাহায্য চান। সুভাষচন্দ্র জানতেন, রবীন্দ্রনাথ জানতেন, মেঘনাদ সাহা জানতেন, বুদ্ধিমান সকলেই জানতেন,—এই জাতীয় পরিকল্পনা সম্বন্ধে গান্ধীপন্থীদের মনোভাব কি ধরনের হবে। মধ্যস্থতা করতে পারেন একমাত্র জহরলাল—যাঁর ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহ সংশয় আছে দক্ষিণপন্থী মহলে কিন্তু মানুষটা সম্পর্কে কোনই অবিশ্বাস নেই সেখানে।

বিষয়টি সম্পর্কে জহরলালের নিজের আগ্রহও ছিল। তা তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর ডিস্কভারি অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে। তাছাড়া এ বিষয়ে সুস্পষ্ট ও সুবিন্যস্ত ধারণাতেও পূর্ণ ছিল তাঁর মস্তিষ্ক। সুভাষচন্দ্রের ভাষায়—'সুন্দরতর ভাবরাজিতে পূর্ণ জহরের মাথা।' জহরলাল ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতিত্ব স্বীকার করেছিলেন, যদিও অন্তত্ব উদ্যোক্তা ডঃ মেঘনাদ সাহার কথাবার্তা তিনি পছন্দ করেননি। ডঃ সাহা কংগ্রেসী দক্ষিণপন্থীদের প্রগতিবিরোধী ধারণা সম্বন্ধে সন্দেহমুক্ত হতে পারেন নি কখনো। কংগ্রেস গান্ধীবাদের সুতোয় কালে ধরা পড়ে আছে, শিল্পায়নকে মনে প্রাণে সমর্থন করতে অনিচ্ছুক, এই ছিল তাঁর বক্তব্য। শান্তিনিকেতনবাসী কৃষ্ণ কৃপালনীকে লিখিত একটি পত্রে জহরলাল ডঃ সাহার মত ও মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ঐ পত্রে শিল্প সম্বন্ধে তাঁর মূল ধারণাগুলিকে প্রকাশ করেছেন। তাতে আছে—

(১) তিনি বৃহৎশিল্পকে দেশের অগ্রগতির পক্ষে অপরিহার্য মনে করেন। 'আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে।' 'কোনো দেশ বা জাতি বৃহৎ শিল্পের সহায়তা বাদ দিয়ে প্রগতির পথে চলতে পারে—এ আমি ভাবতেই পারি না।' বৃহৎ শিল্প না থাকলে সাধারণ জীবনযাত্রার মান উঁচু হবে না, রাষ্ট্রিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা অবলুপ্তির সম্ভাবনা থেকে যাবে। প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বৃহৎ শিল্প অত্যাবশ্যক। তাছাড়া বিস্তৃতভাবে কুটীর শিল্প গড়ে তোলার জন্য যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তির প্রয়োজন তাকে বৃহৎ শিল্পের দিকে না গেলে লাভ করা সম্ভবপর হবে না।

(২) কিন্তু বৃহৎ শিল্প থেকে অনেক দোষ এসেছে। শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পার মতে, একালে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্তর্গত বৃহৎ শিল্পসমূহ হিংসার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এবং তাতে বণ্টনের সমস্যাটি সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষিত। সুতরাং শ্রীযুক্ত কুমারাপ্পা বলেন, কুটীর শিল্পের বৃদ্ধির সঙ্গে বণ্টনের ব্যাপারটি সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে এবং তাতে হিংসার ভাব কম থাকবে। জহরলাল কথাগুলিকে অত্যধিক পরিমাণে স্বীকার করেন। তাঁর মূল বক্তব্য, হিংসা ও অবিচারের জন্য বৃহৎ শিল্প দায়ী নয়, দায়ী উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা। সেই ব্যক্তিগত মালিকানা সমাজতন্ত্র প্রবর্তনের দ্বারা লুপ্ত করতে

পারলে বৃহৎ শিল্পের কুফল রোধ ও সুফল ভোগ করা সম্ভব।

(৩) জহরলাল ভারতের ক্ষেত্রে বৃহৎশিল্প ও কুটীর শিল্পের সহযোগিতা চান। বৃহৎ যন্ত্র ও শিল্পের প্রবর্তন ও প্রসারে উৎসাহ দিয়ে শিল্পায়নের দিকে ভারতের এগিয়ে যাওয়া কাম্য, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে কুটীর শিল্প গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যাবে না।

কিন্তু জহরলাল জানিয়েছেন, তিনি কুটীর শিল্প-বাদীদের দলে নন। তাদের সঙ্গে তিনি সহযোগিতা করতে পারেন, কিন্তু তাদের দৃষ্টিভঙ্গি মেনে নিতে অক্ষম।

পণ্ডিত জহরলালের এই সকল মতের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে প্রশ্নাতিপন্থী কারো কোনো সন্দেহ থাকার কথা নয়, এবং আমরা এবিষয়ে সুভাষচন্দ্রের যে সকল ধারণার কথা জানিয়েছি তাদের সঙ্গে জহরলালের ধারণার হুবহু ঐক্য আছে।

কেবল তাঁর একটি বক্তব্য বিতর্কযোগ্য। তিনি বলেছেন :—

"কংগ্রেস কখনই বৃহৎশিল্পের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করেনি; কিন্তু একাধিক কারণে, (আমি নিজে সেগুলির যৌক্তিকতা স্বীকার করি,) কুটিরশিল্পের উপর অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে বৃহৎ শিল্পের পক্ষে, কিন্তু তবুও রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে আমি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন করে এসেছি। আমার মনে এই দুইয়ের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল না কখনই, যদিও কুটিরই থেকে ওঠার সম্বন্ধে দিক নিয়ে চিন্তাগত দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে বইকি মাঝে মাঝে। এ ব্যাপারে গান্ধীজীর মতের প্রতিনিধিত্ব হয়ত খুব বেশী দূর করতে পারব না আমি, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই দুইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংকট এতাবৎকাল ঘটেনি।"

ব্যাপারটিকে জহরলাল আরও ব্যাখ্যা করেছেন—

"একথা সত্য যে, কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল যে বৃহৎ শিল্পগুলি স্বাধীনভাবে কোনরকম সাহায্য ছাড়াই নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারে, কাজেই কুটীরশিল্পের দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত। এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই বিষয়টির বিচার করতে হবে। আমাদের সংগঠন ছিল একটি বেসরকারী প্রতিষ্ঠান মাত্র, এবং রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কাঠামো ছিল আমাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। এ অবস্থায় বৃহৎ শিল্পকে উৎসাহদানের অর্থ ছিল ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠিগত কায়েমী স্বার্থকেই উৎসাহ দেওয়া। এর মধ্যে বিদেশী কায়েমী স্বার্থও আছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল শুধু নিষ্ক্রিয় ও বেকার মানুষদের কাজ যুগিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধিই নয়, অলসধা মানুষের অবসরকেও কাজে লাগানো। ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাসের ভাব জাগিয়ে তোলা। কংগ্রেস এ ব্যাপারে অনেকটা সাফল্য অর্জন করেছে।"

কতকগুলি সুন্দর, যুক্তিযুক্ত, স্থান বিশেষে অখণ্ডনীয় কথা এখানে আছে; কিন্তু যেমন অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয়ে থাকে এখানেও পণ্ডিতজী নিজেরই প্রতিনিধিত্ব করেছেন। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস কখনই বৃহৎশিল্পের বিপক্ষে মত প্রকাশ করেনি। সম্ভবত লিখিতভাবে করেনি। কিন্তু সত্যই কি করেনি? চরকার দ্বারা মুক্তি—এই তত্ত্ব কি বৃহৎ শিল্পের মানসিকতার বিরোধিতা করেনি? গান্ধীজী কি ১৯২২ সালে অসহযোগ আন্দোলন থামিয়ে দিয়ে খাদি ও অস্পৃশ্যতা নিবারণকেই কংগ্রেসের তৎকালীন আদর্শ বলে ঘোষণা করেন নি, এবং কংগ্রেস বলতে কি গান্ধীজীকে বোঝাতো না? জহরলাল বলেছেন, তিনি খাদি গ্রামোদ্যোগ আন্দোলন সমর্থন

করেছেন এবং এর সঙ্গে বৃহৎ শিল্পের মৌলিক পার্থক্য অনুভব করেননি। যদি না করে থাকেন, সে তাঁর মনের ভুল, এবং তিনি যে বলেছেন, কার্যক্ষেত্রে কুটীরশিল্প ও বৃহৎ শিল্পের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংঘর্ষ এতাবৎকাল ঘটেনি, তার কারণ, না বললেও চলে, সে সংঘর্ষ ঘটাবার মত শক্তি 'এতাবৎকালে' গান্ধীজীর অনুগত কংগ্রেসে দেখা যায় নি। অথচ পণ্ডিতজী যখন পত্র লিখেছেন—সেই ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে—সেই সংঘর্ষ শুধু শুরু হয়নি, তার হতভাগ্য শিকার হতে হয়েছিল সুভাষচন্দ্রকে।

জহরলালের আর একটি বক্তব্য সম্বন্ধে প্রশ্ন তোলা যায়। তিনি বলেছেন, কংগ্রেস ধরে নিয়েছিল বৃহৎ শিল্পগুলি নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে, তাই কুটীর শিল্পে কংগ্রেস উৎসাহ দিয়েছে। এখানে বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করা যায়, এমত কী পণ্ডিতজীর ব্যক্তিগত মত নয়? বৃহৎ শিল্পগুলি যদি নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাসম্পন্ন, তাহলে স্বাধীনতার পূর্বে কটি বৃহৎ শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছিল? এবং স্বাধীনতার পরে বৃহৎ শিল্পকে পায়ে দাঁড়াবার জন্য এত রাশেদার প্রয়োজনই বা কি? তাছাড়া যদি কুটীর শিল্প নিজের পায়ে দাঁড়াবার যোগ্যতাসম্পন্ন না হয়, সে ক্ষেত্রে কুটীর শিল্পকে অপরের পা ধার দেবার দরকারই বা কি?

না, এক্ষেত্রে পণ্ডিতজী কংগ্রেসকে বাঁচাতে গিয়ে নিজের ঘাড়ে কংগ্রেসের অনেক অবৈজ্ঞানিক ধারণার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেসী আন্দোলন এবং কংগ্রেসী প্রচার স্পষ্টত বৃহৎ শিল্পের বিরোধিতা করেছে।

কিন্তু দায়ি আন্দোলনের পক্ষে তাঁর একটি যুক্তি সত্যই শ্রদ্ধাযোগ্য। কংগ্রেস বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, তার হাতে নেই রাষ্ট্রের অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের ভার, সে ক্ষেত্রে বৃহৎ শিল্পে উৎসাহদান কায়েমী স্বার্থকে জোরদার করা। তার পরিবর্তে ভারতীয় জনসমাজে আত্মনির্ভরতা জাগিয়ে তোলার জন্য খাদির প্রবর্তন।

পণ্ডিতজীর যুক্তির সারবত্তা কিছু পরিমাণে স্বীকার করেও বলা চলে, কংগ্রেস কি পণ্ডিতজীর দৃষ্টিতে চরকাকে গ্রহণ করেছিল—না কি সে আরও এগিয়ে গিয়ে চরকাকে ধর্ম করে তুলেছিল? গান্ধীজী বলেছিলেন, চরকাই আমার একমাত্র উত্তর। পণ্ডিতজীর কাছে চরকা মাত্র একটি উত্তর, একটি সমাধানের জন্য। বলা বাহুল্য স্বাধীনতা-পূর্বকালে কংগ্রেস বলতে পণ্ডিতজী অপেক্ষা গান্ধীজীকে বেশী বোঝাত।

পণ্ডিতজী বলেছেন, ক্ষমতাপ্রাপ্তির পূর্বে বৃহৎশিল্পে উৎসাহদানের অর্থ কায়েমী স্বার্থকে উৎসাহ দেওয়া। কথাটা কি ঠিক? ভারতবর্ষের উন্নতির জন্য বৃহৎশিল্প প্রয়োজন, এই কথা বললেই যদি কায়েমীস্বার্থ জোরদার হয়ে ওঠে, তাহলে বোধহয় কথা বন্ধ করে দিতে হবে।

যাই হোক, পণ্ডিতজীর মূল যুক্তিভঙ্গির যৌক্তিকতা সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ নেই। তিনি যে শিল্পায়নের যথার্থই পক্ষপাতী, সুভাষচন্দ্রের অনুরোধে পরিকল্পনা কমিশনের সভাপতিত্বে স্বীকৃত হয়ে তা দেখিয়ে দিলেন। তার জন্য রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ধন্যবাদও জানালেন।

কিন্তু পরিকল্পনা কমিশনের পথ নির্বিঘ্ন হল না। গান্ধীজী ও গান্ধীবাদীরা এতে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। যন্ত্রশিল্পের পক্ষে আন্দোলন সৃষ্টি সুভাষচন্দ্রের অন্যতম অপরাধের পর্যায়ে উঠল। দ্বিতীয়বার তাঁর সভাপতি হওয়ার বিরুদ্ধে যে সব কারণ দাঁড় করানো হয়েছিল—তার মধ্যে এটিও ছিল। সুভাষচন্দ্র লিখেছেন—

> "১৯৩৮-এর অক্টোবরে দিল্লীতে কংগ্রেসী শিল্প-মন্ত্রীদের সম্মেলনে (যাতে আমি সভাপতিত্ব করেছিলাম) ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি নিয়োগের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। সাধারণ সম্পাদকসহ ওয়ার্কিং কমিটির কয়েকজন মুখ্য সদস্য সেখানে উপস্থিত থাকলেও, এবং কেউ বেফুরো আওয়াজ না তুললেও, মহাত্মা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ মহল

এই সিদ্ধান্তকে অনুমোদন করেননি। এবং ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটিকে মহাত্মাগান্ধীর দ্বারা সৃষ্ট Village industries association-এর উদ্দেশ্য ও কর্মের পথে কণ্টকস্বরূপ গণ্য করেছিলেন। কেউ কেউ আরও এগিয়ে গিয়ে মন্তব্য করলেন, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং কমিটি মহাত্মার সাত্ত্বিক জীবনের সাধনাকে নষ্ট করে দেবে। আমার বিরুদ্ধে অভিযোগনামায় এই আর একটি বিষয় যুক্ত হল।

[Cross Road-209, এই কথাগুলি Indian Struggle ১ 35-42 এর মধ্যে (P-15) এবং Forward Bloc—its justification (P-81) এর মধ্যেও রয়েছে।]

সুভাষচন্দ্রের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা গান্ধীজী পছন্দ করতে পারেননি, তা স্বয়ং গান্ধীজীই জানিয়েছেন পত্রযোগে। ত্রিপুরীর পরে গান্ধী-সুভাষ পত্রালাপে বিষয়টির উল্লেখ আছে। ১৯৩৯ সালের ১০ই এপ্রিলের পত্রে গান্ধীজী সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক মতভেদের কথা জানাবার পরে বললেন—সে মতভেদ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও। কারণ "আমরা ঐ ক্ষেত্রটিতেও পার্থক্য আবিষ্কার করেছি।"

১৩ই এপ্রিলের পত্রোত্তরে সুভাষচন্দ্র বিষয়টিকে স্পষ্ট করে নিলেন—

"আপনি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আমাদের মধ্যে সহযোগিতার কোনো প্রকার সম্ভাবনাকে বাতিল করে দিয়েছেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রের সঙ্গে আপনি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রকে যুক্ত করেছেন, তার কারণ সম্ভবত আপনি ভারতের জন্য আমাদের শিল্প-বিষয়ক পরিকল্পনাকে সমর্থন করেন না, যদিও আমরা শিল্পবিস্তারের সঙ্গে উপযুক্ত কুটীর শিল্পের প্রবর্তনের পক্ষে মত প্রকাশ করেছি।"

ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে গান্ধীজীর বিরক্তির চেহারা দেখা যাবে জহরলালকে লেখা তাঁর ১২শে আগষ্ট ১৯৩৯ তারিখের পত্রে—

প্রিয় জহরলাল,

ভাবছিলাম, অল্প সময়ের অভাবে ওয়ার্কিং কমিটির সমক্ষেই প্ল্যানিং কমিটি সম্পর্কে কিছু বলব কি না তোমায়। আজ সকালে তোমার সঙ্গে কথাবার্তার পর শঙ্করলাল এসেছিলেন এখানে। সঙ্গে এনেছিলেন তাঁকে এই বিষয়ে লেখা কৃপালনির একটি চিঠির প্রতিলিপি। কৃপালনি এ ব্যাপারে যে সব আপত্তির কথা তুলেছেন তাতে আমার সায় আছে। সত্যি বলতে, কমিটির কার্যকলাপের উপযোগিতা আমি বুঝে উঠতে পারিনি কোনোদিন। আর এর কাজকর্মের বিবরণ ওয়ার্কিং কমিটিকে ঠিকমত জানানো হয় কি না তাও জানি না। এর অসংখ্য সাবকমিটিগুলির অস্তিত্বের সার্থকতা বুঝতে আমি অক্ষম। আমার মনে হচ্ছে প্রভূত অর্থ এবং মূল্যবান সময় এমন একটি কর্মে ব্যয়িত হচ্ছে, যার ফল একেবারেই কিছু হবে না, কিংবা খুব সামান্য কিছু হবে। এই হল আমার সন্দেহ।"

গান্ধীজীর এই পত্র থেকেই বোঝা যায়, ন্যাশন্যাল প্ল্যানিং সম্বন্ধে প্রচেষ্টাকে তিনি কোন্ চোখে দেখেছিলেন। গান্ধীজীর এ বিষয়ক মনোভাবে সুভাষচন্দ্র বিস্মিত হননি; শ্রীযুক্ত কৃপালনি প্রমুখ গান্ধীবাদীদের কুটীর শিল্প-ভিত্তিক তাত্ত্বিক ধারণাও তাঁকে বিস্মিত করবার কথা নয়; তিনি বিস্মিত হয়েছিলেন একটি ব্যাপারে,—কৃপালনি প্রমুখ গান্ধীবাদীদের বহুমুখ আচরণে। সুভাষচন্দ্রের যে রচনাংশে পূর্বে উদ্ধৃত করেছি, তাতে দেখা গেছে, শিল্পমন্ত্রীদের ১৯৩৮ অক্টোবরের দিল্লী সম্মেলনে, কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক

কলকাতায় প্রমুখ কয়েকজনের ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যের উপস্থিতিতে প্ল্যানিং কমিটি গঠনের প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়; সেই সভায় বেসুরো কোনো বক্তব্য ওঠেনি। এই পটভূমিকায় সুভাষচন্দ্রের কাছে কলকাতা-নিবন্ধের পরবর্তী মনোভাব বিস্ময়কর বোধ হয়ে ছিল।

॥ পাঁচ ॥

প্ল্যানিং কমিশনের প্রারম্ভিক ইতিহাসকে এইভাবে ভুলে ধরবার কারণ, এই প্ল্যানিং ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ—গান্ধীজী—সুভাষচন্দ্র—জহরলাল—মেঘনাদ সাহা এবং আরও অনেকে জড়িত হয়ে পড়েছিলেন। এঁদের মধ্যে একমাত্র গান্ধীজী সুস্পষ্টভাবে প্ল্যানিং কমিটির বিরোধী। মেঘনাদ সাহা উগ্র রকমের সমর্থক সুভাষচন্দ্রও তাই। কিন্তু বৈজ্ঞানিক মেঘনাদ সাহা যতখানি নির্বিকার হয়ে মত প্রকাশ করতে পারেন, রাজনৈতিক সুভাষচন্দ্র তা পারেন না এবং রাজনৈতিক সহযোগের প্রত্যাশায় অনেক সময়ে এ বিষয়ে তাঁকে নরম সুরে কথা বলতে হয়েছে। জহরলাল সুভাষচন্দ্রের অনুরূপ মতবাদী, এবং তিনি সুভাষচন্দ্রের অনুরোধ-মত প্ল্যানিং কমিশনের সভাপতিত্ব গ্রহণ করতে রাজী হয়ে ছিলেন। রবীন্দ্রনাথও দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। তিনি পরিকল্পনার যতটুকু অংশ সমর্থন যদি নাও করেন, এই পরিকল্পনার দ্বারা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি এবং বৈজ্ঞানিক চিন্তার প্রসার সম্ভব হবে বলে মনে করেছিলেন। প্ল্যানিং সম্বন্ধে সুভাষচন্দ্র ও মেঘনাদ সাহার সঙ্গে তাঁর আলোচনা হয়েছিল এবং তিনি সুভাষ-গঠিত প্ল্যানিং কমিটিতে সভাপতি হতে রাজী হওয়ায় জহরলালকে অভিনন্দিত করেছিলেন। তাছাড়া সকলের বড় কথা, সুভাষচন্দ্রের দ্বিতীয় সভাপতিত্ব সমর্থন করার কালে এই বিষয়টির উল্লেখ করেছিলেন।

প্ল্যানিং-এর ব্যাপারে সুভাষচন্দ্রের উৎসাহ তাঁর যোগাভার প্রমাণরূপে পরিগণিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে।

এই একই বিষয় তাঁর নেতৃত্বকে কতিপয়রূপে প্রমাণ করেছিল গান্ধীবাদীদের নিকট।

প্ল্যানিং কমিটির গঠনের পিছনে সুভাষচন্দ্রের আগ্রহ ও প্রেরণার কিছু রূপ আমরা দেখেছি ইতিমধ্যে। এই ব্যাপারে কতখানি মূলদান করতে হয়েছিল, তাও বলা হয়েছে।

প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারে আর একজন উৎসাহী, তার সুযোগ্য প্রথম সভাপতি পণ্ডিত জহরলালকে সাগ্রহে সাদরে আহ্বান করেছিলেন সুভাষচন্দ্র সহযোগিতায়। সুভাষচন্দ্রের উদ্ধৃত পত্রাংশে তার চিহ্ন আছে।

পণ্ডিতজী বলেছেন, এ ব্যাপারটি তাঁর মনোমত বস্তু। তিনি সত্যই উৎসাহভরে এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

পণ্ডিতজী প্ল্যানিং কমিশনের উদ্দেশ্য ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর ডিসকভারি অব ইণ্ডিয়া গ্রন্থে। কিন্তু ঐ অংশে সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ নেই।

পণ্ডিতজী যখন স্বাধীন ভারতের নায়ক, তখনো পরিকল্পনা বিষয়ক নানা পুস্তিকা বেরিয়েছে। তাতেও সুভাষচন্দ্র অনুল্লিখিত। *

ইতিহাসের বিচিত্র বিধান। প্ল্যানিং কমিটির ব্যাপারে যাঁকে প্রচুরতম কৃতি স্বীকার করতে হল, প্ল্যানিং কমিটির ইতিবৃত্ত তাঁকেই ভুলে গেল। সুভাষচন্দ্র এতে কিছু মনে করেন না, কারণ তিনি তাঁর একটি আদর্শের মধ্যে সান্ত্বনার অফুরন্ত উৎস আবিষ্কার করেছেন—"ব্যক্তিকে মরতে হবে, যাতে করে জাতি বাঁচে; আজ আমাকে মরতে হবে, যাতে ভারত বাঁচতে পারে, স্বাধীন হতে পারে, অর্জন করতে পারে মহা গৌরব।"

আমরা যারা সুভাষচন্দ্র নই, সুভাষচন্দ্র থেকে বহুদূরে আছি,—সেই আমরা ঐ মহাবাক্যে সান্ত্বনা পাই না।

শুনেছি ইতিহাস সত্য কথা বলে, তবে সে সত্যকে দেখে যাবার সৌভাগ্য অধিকাংশ মানুষের ঘটে না।

* এই প্রবন্ধটি লেখকের একটি পরিবর্ধিত গ্রন্থের অংশ বিশেষ।

সংযোজন

'জনশ্রী'র সম্পাদকীয় বিভাগ প্ল্যানিং কমিশনের ব্যাপারে ইংরাজী 'জনতা' পত্রিকায়, ১১১৫ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীবিশ্বনাথ কাশ্যপের একটি লেখার দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। শ্রীকাশ্যপ প্রথম দিকে পরিকল্পনা কমিশনের সেক্রেটারী ছিলেন। কিছুদিন পরে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, জহরলালের সঙ্গে মতভেদের জন্য। কোন্ পটভূমিকায় কেন, তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়, ঐ রচনায় শ্রীকাশ্যপ তার উল্লেখ করেছেন। আমরা প্রয়োজনীয় কিছু অংশ অনুবাদ করে দিচ্ছি। শ্রীকাশ্যপ এই লেখায় বলেছেন, 'আমার বিশ্বাস, কংগ্রেস সভাপতিদের মধ্যে সুভাষচন্দ্রই প্রথম প্ল্যানিং এর সুস্পষ্ট নীতি নির্দেশ করেন।'

শ্রীকাশ্যপের রচনার অংশ :

> ভাসনগাল প্ল্যানিং কমিটির কর্মকর্তাদের নাম ঘোষিত হল। কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র ইউরোপে অবস্থিত জহরলাল নেহরুকে চেয়ারম্যান হবার জন্য আমন্ত্রণ জানালেন। সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণ করলেন তিনি। কয়েক মাসের জন্য আমি এই কমিটির সেক্রেটারীর কাজ করেছিলাম, কিন্তু রাজনৈতিক কারণে আমাকে পদত্যাগে বাধ্য করা হল, কংগ্রেসের ত্রিপুরী অধিবেশনের পরেই। এই সূত্রে সুভাষচন্দ্র ১৯৩৯-এর ১ই জুলাই এক পত্র লেখেন নেহরুকে। কংগ্রেস সভাপতিত্ব থেকে পদত্যাগের পরেই সুভাষ ঐ চিঠি লেখেন। তার কিছু অংশ তুলে দিচ্ছি।
>
> "শ্রীকাশ্যপকে যখন সেক্রেটারীর পদ গ্রহণে আহ্বান জানানো হয়, তখন তাঁর উপর কোনো বিধি-নিষেধ আরোপ করা হয়নি। তার অর্থ, যে-পর্যন্ত না তিনি কর্মসচিবের দায়িত্বে অবহেলা দেখান, সে পর্যন্ত রাজনৈতিক বিষয়ে মতপ্রকাশের স্বাধীনতা তাঁর আছে।
>
> "কিছু সংখ্যক লোক কাশ্যপের রাজনৈতিক উক্তিতে আপত্তি জানিয়েছে, একথা আপনি বলেছেন। ঐ সকল লোকের কথায় আপনার সায় না থাকলে আপনি সহজেই জানাতে পারতেন, আপনি কাশ্যপকে বাক্-স্বাধীনতা দিয়েছেন। কিন্তু তাতে গতিকে মনে হচ্ছে, আপনি তাঁর স্বাধীনতা সংকুচিত করতে চান, এবং আমার বিবেচনায় এই ব্যাপারটাই গণ্ডগোলের মূল। কাশ্যপের বিরুদ্ধে কারা অভিযোগ করেছেন? তাঁরা কি কংগ্রেসী, না অকংগ্রেসী? যদি অকংগ্রেসী হন তাহলে কোনো কংগ্রেসী কোনো একটি বিশেষ বিষয়ে কি মত প্রকাশ করেছেন সে সম্বন্ধে তাঁদের আপত্তি করা উচিত নয়। প্ল্যানিং কমিটির কয়েকজন সদস্য আপনার অতীতের সমাজতান্ত্রিক কথাবার্তা নিয়ে আপত্তি জানিয়ে সভাপতিপদে আপনার নাম প্রস্তাবে আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু আমরা চেয়েছিলাম আপনি সভাপতি হোন, তদনুযায়ী আমাদের মত তাঁদের বুঝিয়ে স্বীকার করিয়ে নিয়েছিলাম। এক্ষেত্রে আপনিও যদি চাইতেন শ্রীকাশ্যপ সেক্রেটারী থাকুন, আপনিও সহজেই ব্যাপারটাকে সরল করে তুলতে পারতেন।
>
> "আর যদি কংগ্রেসীরা শ্রীকাশ্যপের উক্তির বিরুদ্ধে আপত্তি জানিয়ে থাকেন, তাঁরা কারা? তাঁরা প্ল্যানিং কমিটির সদস্য, কি সদস্য নন? যদি সদস্য না হন, সেক্ষেত্রে আমি বলতে বাধ্য, তাঁদের কথায় আপনার কান দেওয়া উচিত হয়নি। প্রকাশিত পত্রগুলি পড়ে এবং সমস্ত ব্যাপারটি বিবেচনা করে,

(শেষাংশ ১৮১ পৃঃ)

(৭৮২ পৃষ্ঠার পর)

কিলিপের ভিতর দিয়ে কোনো একটি নারীকে কেন্দ্র করে পুরুষজনমের এই ক্ষুধা, সীমাহীন দুর্বলতা ও অন্ধ আসক্তির নগ্ন চেহারা তাঁকে বিব্রত, বিস্মিত, এমনকি ত্রাসে যেন নির্বাক করে দিয়েছে মনে হয়।

ম্যমের রচনার সবচেয়ে স্পষ্ট বৈশিষ্ট্য : জীবন বা, বা তিনি অভিজ্ঞতায় জেনেছেন, নির্জলা, নির্ভেজাল, তা-ই,—রচনাকে গল্প বা উপন্যাসের আকার দিতে যতটুকু ন্যূনতম ভানটুকু দরকার তা ছাড়া,—স্পষ্ট তুলে ধরতে চেয়েছেন তাঁর পাঠকের সামনে। ফিটাচয়েন্ট শিল্পীর প্রথম মহৎ গুণ না। ফিটাচয়েন্ট যদি অজস্রকটিচিটি হয়,—তা দিয়ে সন্ন্যাসীর ট্রান্সফরমেশন না, যদি শিল্পীর এ্যাড্‌আর্টমেন্ট বোঝায়। বাল্পীয় আবেগ, বিচারের প্রবণতা, সিদ্ধান্ত, উপদেশ, যে-গুলির ঝোঁক প্রায়-লেখকের পক্ষেই এড়িয়ে চলা কঠিন হয়, তাঁর নেই। মানুষকে অযথা বড়ো, জটিল, বা বিচিত্র করেননি, মানুষ নিতান্তই একটা জীব,—তাঁর মতে,—প্রাণী : জৈববার্থ-প্রণোদিত, ক্ষুদ্র, গণ্ডীবদ্ধ, সঙ্কীর্ণ, ক্ষুব্ধ, সতর্ক,—এবং কখনই, একমাত্র বইতে ছাড়া, উচ্চ বা মহৎ নয়। তার মাপ্ তাঁর রচনায় ঠিক আছে, চেহারা এবং চরিত্রও।

কল্পনার একটা মায়াবের, মিথ্যা, মোহময় জগৎ রচনার স্বাভাবিক সাহিত্যিক প্রবণতা, আশ্চর্যের কথা, প্রথম থেকেই তাঁর ছিল না। এবং এটাই তাঁর চ্যালেঞ্জ, প্রতিবাদ,—সাহিত্যের চিরাচরিত প্রথা বা রীতির বিরুদ্ধে। কিন্তিয়ান এবিকস্-এর একটু কোড়ণ ব্যবহার করলে,—তাঁর পক্ষে কিছুই কঠিন ছিলনা,—তাঁর চরিত্ররা মহৎ হতে পারত, তাঁর বিমুগ্ধ ক্রিটিকরা খুশি হতেন, তাঁকেও 'মহৎ' বা 'স্মরণীয়' বলায় বাধা খুব হত। কিন্তু।

৩

অরবিন্দ মরেল সম্পর্কে একবার-চিঠিতে লেখেন, যোগী। শ, রাসেল, ওয়েলস্, ওয়াইল্ড, আরো অনেকের সম্পর্কে তাঁর অভিমত আছে। চমৎকার। ম্যম্ এঁদের সমকালীন। ম্যমের কোনো লেখা তাঁকে পড়ানো হয়েছিল। কিন্তু বলেছিলেন। এক মহিলার ইচ্ছায় মরেল ও রাসেল দুই প্রতিভাধর পরস্পরের বন্ধু হন। বন্ধুত্ব একবছরের বেশি সয়নি কারণ রাসেল বিব্রত, বিপন্ন, এমনকি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। এসব কথা রাসেল-ই পরে বুড়ো বয়সে লিখেছেন। মরেলের সঙ্গে একবার ম্যমের দেখা হয়। ম্যম্ তখন বিশ্ববিশ্রুত, ধনী, মরেল তুলনায় অনেকটা অবজ্ঞাত বইকি। ম্যম্ নাকি ঠাণ্ডা ছিলেন। কেন। অন্তর্নিহিত চেতনার আয়াসলব্ধ উপলব্ধি সম্পর্কে তাঁর স্বভাবগত অসহিষ্ণুতা। অথচ শ মরেলের প্রতি সহানুভূতিশীল। মনে হয় মানুষের সঙ্গে মানুষের স্বার্থবোধসঞ্জাত সম্পর্ক সম্পর্কে ম্যম্ নিস্পৃহ, উদাসীন, যেন হৃদয়হীনই।

আমেরিকার 'টাইম' সাপ্তাহিকে একবার একটি ছবি ছিল পাশাপাশি ম্যম্ ও চার্চিলের : দুই সার্থকনামা দিগ্বলয়ী বৃদ্ধ বন্ধুভাবে, শান্তভাবে, মনে হয় ম্যমেরই ভিলায়, আরাম্চেয়ারে বসে আছেন। চার্চিলের সিগার, ম্যমের সিগারেট, চুড়ির মুখে পরানো। পরস্পরের সম্পর্কে এঁদের মনে কোনো উদ্বেগ, উত্তেজনা বা সখীহ দেখা গেল না। এটি ভারতীয়ের চোখে একটা অভিজ্ঞতা।

ম্যম্ প্রচুর অর্থের অধিকারী, পৃথিবী একাধিকবার ঘুরেছেন। চার্চিলের বন্ধু ম্যম্ ইংরেজ আমলে একবার ভারতেও আসেন। প্রবাসে ইংরেজ ব্যবসায়ী বা রাজকর্মচারী সম্পর্কে তাঁর সংক্ষিপ্ত তির্যক অবজ্ঞাপ্রসূত ভ্রূভঙ্গী সুবিদিত। ভারতে কোথায় তিনি ছিলেন। কোথায় উঠেছিলেন। রাজঅতিথি। হায়্! তাঁর এই ভারত ভ্রমণের কোনো বিস্তৃত বিবরণ পাইনি। লিখেছেন, ভারত দেখলাম। ভারতের কথা ভাবলেই দেখি, কৃষ্ণ, কৃশকায় মুণ্ডিত কৃষক, বক্রাকার, মাথায় শাদা পাগড়ি, কটিতে অল্প একটু কাপড়, তার দুটি শীর্ণ পঙ্ক তাড়িয়ে তাড়িয়ে

শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারতের মাটিতে শাশ্বত চাঁদিয়ে চলেছে : এই হল ভারতের রূপ,—সনাতন, শাশ্বত।

তখন রবীন্দ্রনাথের যুগ, তখন গান্ধী, তখন পণ্ডিচেরীতে শ্রীঅরবিন্দ : এঁদের কার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়েছিল ! দেখা চেয়েছিলেন !

বৃদ্ধ ন পর্যন্ত জহরলাল সম্পর্কে কি আশ্চর্যভাবে দুর্বল, মোহগ্রস্ত ; অবাক লাগে সত্যিই। কিন্তু ম্যান্। এই সেদিনও, বছর তিন কি পাঁচ আগে, আবার যান জাহাজে ভূদর্শনে বেরিয়েছিলেন। ভারত তাঁর তালিকার মধ্যে ছিল না। বম্বে পোর্টে জাহাজ ভিড়লে "ইলাস্ট্রেটেড উইকলি"র একজন সাংবাদিক তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। ম্যান্ সমুদ্রের দিকে ডেকে চেয়ার পেতে বসেছিলেন। দেখা, কথাবার্তা, গল্প, সমুদ্র সামনে রেখে সেখানেই হল। এদিকে এলে ভারতের ভূমি একবার দেখলেন না পর্যন্ত। শেষে উঠে ক্যাবিনে গেলেন। এই বিরাগ, নিস্পৃহা কেন। অভিমান। আমাদের থেকে তাঁর কি কোনো বিশেষ প্রত্যাশা ছিল]

প্রচণ্ড আয়না নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভিলায় একাকী বাস করতেন,—প্রায় রাজর্ষির মতো। বাইরের লোকের তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়া কঠিন ছিল। কোন প্রথমে এক মহিলা পেতেন। 'কী বলুন।' 'মানের সঙ্গে দেখা হবে কি।' 'দাঁড়ান দেখি।' কোন আরো ভিতরে যেত, অন্দরের সেক্রেটারীর কাছে। তারপর : 'পরশু বেলা এগারটায়, ঠিক এগারটায়, কিন্তু যদি আবহাওয়া পরিষ্কার ও উজ্জ্বল থাকে,—বুঝলেন ত। আবহাওয়া উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার।'

ম্যান্ প্রাচীন ভারতীয় দর্শন এবং যোগশাস্ত্র বিষয়ে অবহিত ছিলেন ; তাঁর নানা রচনায় তার পরিচয় আছে। নিজে ঈশ্বর অবিশ্বাসী। তাঁর কোনো সংস্কার বা আভিজাত্য ছিল না। মৃত্যু সম্পর্কে এই সেদিনও বলেছেন, "অযত্ন, বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা, আরো, যখন সে মৃত্যু স্বাভাবিক নিয়মে।" গত জানুয়ারীতে [১৯৬৪] এক দর্শনার্থীকে বলেন : "আমার অন্ত্যেষ্টিতে নিমন্ত্রণ আশা করবেন না ; অন্ত্যেষ্টিই হবে না। শোক না, সভা না, মালা না, স্তোত্র না, কিছুই না. ও সব আমার ঠিক করা আছে, এবং আমার শরীর দাহ করা হবে।"

তাই হল, সমাধি না, দাহ।

আশ্চর্য বইকি, বেশ আশ্চর্যই লাগে।

তাঁর মুখও যেন ভারতীয়,—বরং স্পষ্টভাবেই বাঙালী ; বিদগ্ধ দূরদর্শী প্রবীন বাঙালির মুখ। কৃষ্ণ চুল. কৃষ্ণ চক্ষুতারকা, চিবুক, উন্নত নাসা, মধ্যখণ্ডের ভঙ্গিমা, লাবণ্য, —তাঁকে স্বর্গত প্রথম চৌধুরীর অনুজ অনুমানে কোথাও বাধা নেই।

সাহিত্যের সেই তথাকথিত শ্রেষ্ঠ প্রাইজটা তাঁকে দেওয়া হয়নি, ঠিকই, কিন্তু সেটা তাঁর ক্ষেত্রে আর জরুরী ছিল না. বাপেও বেশ ছোট হয়ে গিয়েছিল। তাঁর পক্ষে এবং বিশ্বময় ছড়ানো তাঁর অগণিত অনুরাগী পাঠকের কাছে সর্বাপেক্ষা আনন্দ ও গৌরবের বিষয় যে শেষ দিনটি পর্যন্ত জগতের সামনে সার্থকনামা পুরুষের মতো, বিজয়ী সম্রাটের মতো মাথা উঁচু করে তিনি বেঁচে গেলেন। তাঁকে হাত পেতে কখনো নিতে হয়নি, যতদিন পেয়েছেন বরং হাত ভুলে দিয়ে গেছেন জগতকে। এটি সংসারে ক জনের ভাগ্যে হয়।

মৃত্যুর পূর্বেও তিনি বললেন, "আমি এখনো ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী ; বিশ্বাস করিনা যে আত্মা অমর।"

তথাপি তাঁর অনুরাগী অসংখ্য প্রাচ্যের পাঠক, যারা আত্মার বিনাশ সম্পর্কে তাঁর মতো নিঃসংশয় নয়,—হয়ত প্রথাগত বা সংস্কার বশেই,— কামনা করবে যে তাঁর অতৃপ্ত অশান্ত আত্মা যেন স্বর্গ ও শান্তি লাভ করে।

(১১৮ পৃষ্ঠার পর)

আমার মনে হচ্ছে, আপনি কামাথকে তাড়াতে চান, যেহেতু তিনি তাঁর নিজস্ব বিশেষ মত প্রকাশ করেছেন। যদি তিনি কংগ্রেসের সরকারী মতে সায় দিতেন, কিংবা আপনার অবলম্বিত পথের সমর্থন জানাতেন, তাহলে কি আপনি তাঁর সঙ্গে যে ব্যবহার করেছেন, সেই একই ব্যবহার করতেন? অকংগ্রেসীদের সম্বন্ধে বলা যায়, কংগ্রেসের অভ্যন্তরের বিশেষ কোনো মতের ব্যাপারে তাঁদের মাথাব্যথা নেই। কংগ্রেসীরাই এ ব্যাপারে মাথা ঘামিয়েছেন, এবং সম্ভবত তাঁরা প্ল্যানিং কমিটির সঙ্গে যুক্ত নন। আমি আপনাকে এ বিষয়ে কিছু লিখতাম না, যদি না আপনি আগে লিখতেন, আর যদি না শ্রীকামাথ আমার মতের সমর্থন করার জন্যই বর্তমান অবস্থায় পড়তেন।.....এতাবৎকাল আপনি প্ল্যানিং কমিটির গঠন ব্যাপারে আমার সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজন বোধ করেন নি, যদিও এই কমিটির সংগঠনের জন্যই আদিই বহুলাংশে দায়ী এবং তার জন্য গান্ধীবাদীদের কোন দৃষ্টিতে পড়েছি।"

আমি যতদূর জানি সুভাষচন্দ্রের পত্রের উত্তর দেওয়া হয়নি। উপরের পত্রে উল্লিখিত আমার উক্তি সমূহ আর কিছু নয়, ত্রিপুরী কংগ্রেসের অব্যবহিত পূর্বে সুভাষচন্দ্রের সমর্থনে সংবাদপত্রে আমার কয়েকটি বিবৃতি। প্ল্যানিং কমিটির চেয়ারম্যান নেহরুর তাগিদ এগুলি হল "রাজনীতিতে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ"। তিনি চাইলেন, এ ধরনের কার্যকলাপ আমাকে বন্ধ করতে হবে। সে কথা প্রত্যাখ্যান করে আমি লিখলাম, "এক কারাগার থেকে আর এক ঢুকবার ইচ্ছায় আমি আই, সি. এস, থেকে পদত্যাগ করিনি" ("I have not resigned the Indian Civil Service just to exchange one prison house for another.") নেহরু অনমনীয় রইলেন সুতরাং আমাকে যেতে হল। স্বর্গতঃ অধ্যাপক কে. টি, সাহ্ অতঃপর প্ল্যানিং কমিটির অবৈতনিক সেক্রেটারী হলেন, এবং ৬।৭ বৎসর ধরে পরিশ্রম করে বৃহৎ আকারের ২০।৩০ খণ্ডে তিনি অবিভক্ত ভারতের জাতীয় অর্থনীতি সম্বন্ধে যে বিরাট বিবরণ প্রস্তুত করেন, তার বিষয়ে সকলেরই জানা আছে।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

রোল অফ্ অনার মূল্যায়ন

The Roll of Honour : Kali Charan Ghose : Vidya Bharati : Calcutta : Price : Rupees Thirty only.

যে মৃত্যুঞ্জয় বীরের দল ভারতবর্ষের বিপ্লবপ্রচেষ্টায় আত্মদান করে শহীদ হয়ে গেছেন, 'The Roll of Honour' মূলতঃ তাঁদেরই স্মৃতি-তর্পণ। লেখক গ্রন্থটির উপশিরোনামা দিয়েছেন—'Anecdotes of Indian Martyrs'—এবং বইটি উৎসর্গ করেছেন ভারতীয় স্বাধীনতার 'অজ্ঞাত ও বিস্মৃত সংগ্রামীদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে, যাঁরা নীরবে যাতনা ও মৃত্যু বরণ করে নিয়েছেন।' ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশব্যাপী বিপ্লব-প্রচেষ্টার মুক্তির অধ্যায়ের অনির্বাণ দীপশিখাটিকে এই গ্রন্থরচনা করে লেখক স্বাস্তির দিয়ে গেলেন. তাঁর অনুকরণীয় অধ্যবসায়, সুগভীর বেদনার্ত মমত্ববোধ এবং ইতিহাস-নিষ্ঠার মানসিকতা দিয়ে। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিপ্লব-প্রচেষ্টার মূল্যায়নে সরকারী স্তরে অবহেলা. সঙ্কীর্ণতা ও বিকৃতদৃষ্টিভঙ্গি, এই মহৎ প্রয়াসের ঐতিহাসিক ভূমিকাকে খর্ব ও গৌণ করে পরিবেশনের পরিকল্পনার বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ প্রতিবাদে খাড়ানো। ঐতিহাসিক ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার তিন খণ্ডে স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস রচনা করে যে জাতীয় দায়িত্ব সম্পাদন করেছেন, বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্যতম শহীদরূপে পরিণত বয়সে লেখক তাঁর এই শহীদ-তর্পণের মধ্য দিয়ে বিপ্লব-প্রচেষ্টার ঐতিহাসিক মূল্যায়নের অক্ষয় পদচিহ্নগুলি সংগ্রামের পটভূমিকার সবস্ব পারম্পর্যে বিন্যস্ত করে, তেমনি আর একটি জাতীয় কর্তব্য সম্পাদনের স্বাক্ষর রেখে গেলেন।

আট শতাধিক পৃষ্ঠায়, তেরটি অধ্যায়ে এই বইটি সমাপ্ত হয়েছে এবং শহীদদের শতাধিক অমূল্য ছবি গ্রন্থটিতে সংযোজিত হয়েছে। লেখক ভূমিকায় নিজেই বলেছেন ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিপ্লবের ধারাবাহিক ইতিহাস রচনার অনিবার্য প্রয়োজনীয়তা থাকলেও আলোচ্য গ্রন্থখানি তা নয়। গ্রন্থটির বিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লেখক বলেছেন : (১) বিপ্লব-কর্ম সম্পাদনের ফলে যাঁরা জীবন দান করেছেন (২) কোথাও না কোথাও বন্দী থাকাকালীন যাঁদের প্রাণ বিয়োগ হয়েছে (৩) যাঁরা সরকারী ব্যবস্থার ফলে নির্বাসনে প্রাণ দিয়েছেন (৪) যাঁরা কোনো মূল্যবান সূত্র না রেখে বিপ্লবের কর্মক্ষেত্র থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছেন, তাঁদের ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থটিতে বিধৃত করা হয়েছে। লেখক এই বিন্যাসের ত্রুটি সম্পর্কে যে সম্পূর্ণ সচেতন তাঁর ভূমিকাতেই সে কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি সেখানে বলছেন : "There is a large number of fighters whose contributions are in no way less but at times more valuable than of those who have strewn the dreary path of freedom with their fallen corpses." এই নিরিখে আরও ইতিবৃত্ত এই গ্রন্থে হয়তো সংযোজিত হতে পারতো. কিন্তু তার সীমারেখা কোথায়? অসম্পূর্ণ হলেও লেখক তার সমাধান খুঁজে পেয়েছেন : "Though not quite easy, the dividing line had had to be drawn with the greatest hesitation and a feeling bordering on consternation. Only the title of the book itself has

helped me a good deal in moving within a specified circle." বাস্তবিকই এই সীমারেখা টানতে গিয়ে বিষয়-বিন্যাসে লেখককে কিছুটা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। সুতরাং, স্বভাবতই আলোচ্য গ্রন্থে তার স্বাক্ষর রয়ে গেছে। ছয় বৎসরেরও অধিককাল নিরলস পরিশ্রমের পরও যে তথ্যের অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে, লেখক সে সম্বন্ধে সম্যকরূপে অবহিত আছেন। তিনি যে আত্মতৃপ্ত নন, তা তাঁর ইতিহাস-সচেতনতা সপ্রমাণ করছে।

১৭৫৭-এর পলাশীর প্রান্তর থেকে ১৯৪৪-এ ইম্ফল প্রান্তরে আজাদ হিন্দ বাহিনীর অভিযান পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামের সশস্ত্র আয়োজনের পটভূমিকায় ১৮৯৭ সালে বিপ্লব আন্দোলনের প্রথম শহীদ পুণার চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়ের কাহিনী থেকে শুরু করে ১৯১৯-এর পাঞ্জাবের অত্যাচারী গভর্ণর মাইকেল ও' ডায়ারকে ১৯৪০ সালে লণ্ডনে রিভলবারের গুলিতে হত্যা করে উধম সিংএর আত্মদানের গৌরবগাথা যেমন আলোচ্য গ্রন্থে গ্রথিত হয়েছে, তেমনি চিন্তার জগতে বিপ্লবের ক্ষেত্রপ্রস্তুতির সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তও এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। গুপ্ত সমিতি গঠনে এবং বিপ্লব-চিন্তায় বাংলাদেশ ও মহারাষ্ট্রের অগ্রণীর ভূমিকা ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছে। এই বিপ্লব-ভাবনার পশ্চাতে স্বামী বিবেকানন্দের মননা গুটি কয়েক কথায় লেখক উপস্থাপিত করেছেন: "...and getting the soil nurtured for Tilak and Aurobindo and others to sow the seeds of Revolution. (P3?)

জাতীয় সংগ্রামের বিপ্লবাত্মক পরিণতিতে বিবেকানন্দের প্রভাবের পরিমাপ পাওয়া যাবে মনস্বী রমা রঁলাঁর একটি উদ্ধৃতিতে, যেটি এই গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে "nationalist movement smouldered for a long time until Vivekananda's breath blow the ashes into flame and erupted violently three years after his death."

স্বামীজীর মানসকন্যা ভগ্নী নিবেদিতা চাপেকার শহীদদের মাতার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য পুণায় গিয়েছিলেন। এই সাক্ষাতের বিবরণে নিবেদিতার সকারিত (P 51-52) স্বামীজীর বিপ্লব-ভাবনার প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যাবে। অবশ্য ভগ্নী নিবেদিতার সঙ্গে বাংলার বিপ্লবী আন্দোলনের নিগূঢ় সম্পর্ক আজ আর কারো অবিদিত নাই। মহারাষ্ট্রে তিলকের নেতৃত্বে গণপতি ও শিবাজী উৎসবের পুনরুজ্জীবনের মধ্যে শত্রুকে হত্যা করে মৃত্যুবরণের আবেদন মহারাষ্ট্রের বিপ্লব প্রচেষ্টায় কি ভাবে শক্তি সঞ্চার করেছে গ্রন্থে উদ্ধৃত গণপতি ও শিবাজী শ্লোকগুলি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ "... Die but, kill the English" (P 34) " we shall die after killing only...."

বিপ্লব চিন্তার উন্মেষে এবং চরম আত্মদানের উদ্বোধনে বিপ্লবীদের মনে গীতা ও 'আনন্দমঠের' প্রভাব সম্পর্কে খুবই উপযোগী আলোচনা গ্রন্থটিতে স্থান পেয়েছে। শ্রীঅরবিন্দের ভবানী মন্দিরের উল্লেখও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এই অধ্যায়টির The Printed lines of Flame' (P127) নামকরণ বিপ্লবের যবনিকায় যেন একটি মূর্তিমান অভিব্যক্তি। রাণ্ড হত্যাকারী প্রথম ভারতের শহীদ দামোদর চাপেকার গীতা হাতে নিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করেছিলেন ফাঁসীর পরও তা দামোদরের হস্তচ্যুত হয় নাই: 'He held the book fast in his grip which was carried with his body to the burning ghat. (P47) বাংলার প্রথম শহীদ ক্ষুদিরাম প্রশ্নের উত্তরে আদালতে বলেন তাঁর কোনো ভয় নেই। কারণ তিনি গীতা পড়েছেন। (P166) গীতা' বিপ্লবীদের অন্তরে দীক্ষিত করেছিল।

বিপ্লব প্রচেষ্টা উদ্বোধনে, সহিংস আঘাতে বিদেশী শাসন উচ্ছেদে, দেশে এবং বিদেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকার ভূমিকায়

সময় পরিবেশে শুধু যে গ্রন্থটিই সমৃদ্ধ হয়েছে তা নয়, বাংলার তথা ভারতের বিপ্লব প্রচেষ্টার অন্তরঙ্গ দর্পনটিকেও লেখক তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। লণ্ডনে স্বাধীন কৃষ্ণবর্মার 'The Indian Sociologist', মহারাষ্ট্রের 'কাল' ও 'কেশরী' বাংলার 'যুগান্তর', 'সন্ধ্যা' এবং অন্যান্য প্রদেশের বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা দেশে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে অকুণ্ঠ আত্মদানের প্রবল উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিল, নানা উদ্ধৃতি দিয়ে লেখক সে সময়কার দুঃসাহসী চিন্তার আলোড়নকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। 'কাল' পত্রিকার 'Educative value of Murder' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় প্রবন্ধে (P 6.) রাজনৈতিক হত্যার সার্থকতা আলোচ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে "There is nothing connected with these murders that needs secrecy and concealment They are perpetrated for the good of the world." যুগান্তর-এর একটি উদ্ধৃতিতে (P 103) এই প্রসঙ্গই অনুরণিত হয়েছে :

"...Begin yielding of a life after taking a life.. Dedicate your life as an offering in the temple of Liberty. Withoutblood shed the worship of the goddess will not be accomplished" প্রাণ নিয়ে প্রাণ দেবার উদাত্ত আহ্বান সেদিন বাংলার আকাশ-বাতাস মথিত করেছিল, তারই মাঝে পূর্ণ স্বাধীনতার অভ্রান্ত লক্ষ্যের দিকে অবিচলিত পদক্ষেপে বিপ্লবীরা এগিয়ে গেছেন।

কিন্তু বিপ্লব দর্শনের সমগ্র রূপটি আলোচ্য গ্রন্থে বিধৃত না হওয়ায় গ্রন্থটির একটি অসম্পূর্ণতা রয়ে গেছে। লেখক এটিকে তুলে ধরতে চেষ্টা করলেও ভারতবর্ষের তথা বাংলার বিপ্লব-প্রচেষ্টাকে 'সন্ত্রাসবাদে'র সরকারী কালিমা-মুক্ত করে বিপ্লবের সামগ্রিক পটভূমিকায় এই প্রয়াসকে উপস্থাপনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। স্বাধীনতা সংগ্রামের এই প্রয়াসকে সন্ত্রাসবাদ, এনার্কিজম্, কখনও নিহিলিজম প্রভৃতি নানা ভাবে আখ্যায়িত করে, এই অধ্যায়ের ইতিহাসকে বিকৃতির চেষ্টা আজও অব্যাহত রয়েছে। নির্বিবেক হত্যা ও নির্বিচার নাশকতাতেই বিপ্লব-প্রচেষ্টা যে সীমাবদ্ধ নয়, বিপ্লবেরও রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তা ছিল, সন্ত্রাসবাদের কালিমা দিয়ে বিপ্লবীদের এই বহুমুখ আদর্শবোধ ক্ষুণ্ণ ও বিকৃত করা হয়েছে। গ্রন্থের একটি অধ্যায়ে বিপ্লবীদের প্রচেষ্টার এই আলোচনা খুবই উপযোগী হোতো। অবশ্য গ্রন্থের কোথাও কোথাও এ-সম্বন্ধে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকলেও গ্রন্থটির দৃঢ়তা নিয়ে সর্বতোমুখী আলোচনার অবকাশ ছিল এই গ্রন্থে। স্থানে স্থানে প্রাসঙ্গিক উল্লেখগুলির কয়েকটির প্রতি পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

বিপ্লবী নেতা রাসবিহারী বসুর একটি উদ্ধৃতিতে রয়েছে : (p 265) to awaken the masses by the commission of outrages to the fact that they are living under a foreign rule. Then a strong desire will burst among them for open revolution." কারণ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা চাই এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ব্যতিরেকে সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হবে না। ১৯০৯ সালে লণ্ডনে স্যার কার্জন ওয়াইলীকে গুলি করার পর মদন লাল ধিংড়া বলেছিলেন (p 210) : "I am a 'patriot' working for the emancipation of the motherland from the foreign yoke."

১৯২৯ সালে কেন্দ্রীয় লেজিসলেটিভ এসেম্বলীতে বোমা নিক্ষেপের পর ভগৎ সিং আদালতে বিপ্লবের ব্যাখ্যা করেছিলেন : "Revolution does not necessarily involve sanguinary strife nor is there any place in it for an individual vendetta. It is not the cult of the bomb and the pistol. By

"Revolution" we mean that the present order of things, which is based on manifest injustice, must change." (p395) ভগৎ সিং-এর বিপ্লব-ভাবনার অন্তিম লক্ষ্য ছিল "world federation (which) should redeem humanity from the bondage of capitalism and imperialist wars." (p 399) তাঁর বিবৃতির উপান্তে ভগৎ সিং বলেছিলেন : This is our ideal and with this ideology for our inspiration we have given a fair and loud enough warning. .....To the altar of this revolution we have brought our youth as incese, for no sacrifice is too great for so magnificient a cause" (p 399)

বিভিন্ন সময়ে বিপ্লবীদের ইস্তাহার পুলিশের হস্তগত হয়েছে। অনেক ইস্তাহারই পুলিশের নাগালের বাইরে রয়ে যায়। এই প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত ইস্তাহারগুলি থেকেই বিপ্লবীদের রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার আভাস পাওয়া গেছে। শুধু যে সন্ত্রাসবাদেই তাদের লক্ষ্য সীমিত ছিলনা, তাদের লক্ষ্য ছিল আরও দূরে কখনও বিশ্ব ফেডারেশন, কখনও মানবতার সেবা, কখনও ভারতীয় প্রজাতন্ত্র, কখনও বা সমাজবাদী রিপাবলিক তা সংশয়াতীতরূপে স্বীকৃত হয়ে গেছে। দক্ষিণেশ্বরের বোমার মামলায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সময় 'Formation of young India' (p 380) শীর্ষক ইংরাজীতে লেখা একটি পাণ্ডুলিপি থেকে জানা যায় যে "তাঁদের অন্তিম লক্ষ্য ছিল" "... the service to the country and humanity" তাঁদের আশু লক্ষ্য "Independence of the country" তাঁদের উপায় "Means : all possible means including armed Revolution." How to rise." (p380) শীর্ষক আর একটি পাণ্ডুলিপিতে ভারতবর্ষে বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায় আলোচনা করা হয়েছে : "revolution in India would come in the following way : (i) Individual demonstration, i, e murder of high officials, capturing government money, arms, ammunition, etc : destroying govt Institutions and bridges, jail outbreaks, wrecking of trams etc (ii) simultaneous demonstration, (iii) Insurrection including guerilla warfare (iv) Revolution."

এছাড়া বিপ্লবী দলের নামাকরণের মধ্য দিয়েও তাদের আদর্শগত লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া গেছে। সান্যালের 'Revolutionary Socialist Republican Party', 'Hindusthan socialist Republican Army' চট্টগ্রাম বিপ্লবীদের 'Indian Republican Army' এদের অন্যতম। ফাঁসীর মঞ্চে চূড়ান্ত আত্মদানের মুহূর্তে ভাবনাহীন চিত্তের তেজোদৃপ্ত সৌরভ বিকীর্ণ করে গেছেন শহীদেরা। সেই অপূর্ব মুহূর্তগুলিকে পাঠকের মনকে উদাস করে দিয়ে আর এক জগতে নিয়ে যাবে, তাদের উদ্বুদ্ধ করবে আত্ম-নিবেদনের জন্য। মৃত্যুপথযাত্রী যতীনের চাপেকার অধৈর্য হয়ে উঠেছেন, সময় উত্তীর্ণ হয়ে যাচ্ছে ম্যাজিস্ট্রেট কেন আসছে না। তারপরই নিশ্চিন্তমনে গীতা হাতে নিয়ে ফাঁসীর মঞ্চে আরোহণ করলেন। (p16-47) তাঁর দুই ভাই বালকৃষ্ণ এবং বাসুদেবও মৃত্যুর মুহূর্তে অবিচলিত ধৈর্যের প্রতিমূর্তি। বালকৃষ্ণের ফেলের পাশ দিয়ে ফাঁসির মঞ্চে যাবার সময় বাসুদেব বলছেন "Good bye brother, I am going" বালকৃষ্ণ উত্তরে বলেন : "Go, I will follow you day after tomorrow." (p 51) কুদিরামের শেষ মুহূর্তের হাসি, কানাইলালের বোল পাউণ্ড ওজন বৃদ্ধি, মনে অপার্থিব আনন্দ, সতেজের ধর্মীয় রীতিতে শেষ কৃত্য সম্পন্ন হবার ইচ্ছা প্রকাশ, পরম মনের সেবা সিং-এর মৃত্যুবরণ : "I shall

gladly have the rope put around my neck thinking it to be a rosary of God's name (p 201), ১৯১৫-র Lahore conspiracy Trial (p 267)-এর মৃত্যুপথযাত্রী কার্তার সিংকে আপীল করতে বলা হলে উত্তরে বলছেন : "Why should I ? If I had more lives than one, it would have been a great honour to me to sacrifice each of them for my country." অমূল্য চয়ন বটে ! বেনারসের সুশীল লাহিড়ী, গোপীনাথ সাহার অনুভবাণী "May every drop of my blood sow the seeds of freedom in every home of India," দক্ষিণেশ্বর বোমার মামলার অনন্তহরি মিত্র, প্রমোদরঞ্জনের আত্মোৎসর্গ, কাকোরী ষড়যন্ত্রের রাজেন লাহিড়ী, আশফাকউল্লা, রামপ্রসাদ বিসমিল রওশন সিং, লাহোর ষড়যন্ত্রের ভগত সিং, রাজগুরু, সুখদেব, রাইটার্স বিল্ডিং অভিযানের অন্যতম শহীদ দীনেশ গুপ্ত এবং সর্বোপরি মাষ্টারদা সূর্য সেন ও চট্টগ্রাম বিদ্রোহের অন্যান্য মৃত্যুপথযাত্রী বীরদের গৌরবগাথা গ্রন্থে আকীর্ণ হয়ে আছে। সকল শহীদরাই অমর হয়ে রইলেন এই গ্রন্থে।

বিপ্লবী নেতা যতীন মুখার্জি ও তাঁর সহযাত্রীদের প্রথম সশস্ত্র যুদ্ধে আত্মদানের প্রাণবন্ত কাহিনী শ্রদ্ধাবনতচিত্তে করে দেবে পাঠকদের বিপ্লবের এই পথপ্রদর্শক ও তাঁর সতীর্থদের প্রতি।

সেনাবাহিনীর মধ্যে বিদ্রোহের বহ্নিশিখা জ্বালিয়ে যারা প্রাণ দিয়ে গেছেন, তাদের অমর কাহিনীও সযত্নে বিধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে। ১৯১৫এ (p289) 2 rd Cavalry Regiment-এর ১২ জন চরম মূল্য দেন। সেই বছরই সিঙ্গাপুরে অবস্থিত 5th Native Light Infantry-র (p 359-372) কয়েকজনের মৃত্যুদণ্ড, এবং ১৯৪৩-এ 4th Madras Coastal Defence Batteryর মানকুমার বসু ঠাকুরের নেতৃত্বে নয়জনের মৃত্যুবরণ (p 581) ইংরেজ আমলে স্বাধীনতার সংগ্রামে সেনাবাহিনীর বিদ্রোহের ইতিহাসে চি হয়ে আছে।

বিদেশে বিভা ও উষার সিং-এর মৃত্যুবরণও বিশিষ্ট মর্যাদায় সিক্ত। (p 211, p 554)

আজাদ হিন্দ ফৌজের ষোলশতাধিক শহীদদের নাম সংযোজিত করে লেখক আর একটি কৃতিত্বের প দিয়েছেন। এছাড়া, বর্মা বিদ্রোহের ইতিহাসও আরও উল্লেখ্য সংযোজনা।

'A Lion too big for any cage' (p 585-5 বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর বিপ্লব-কর্মের সংক্ষিপ্ত ইতি রয়েছে। বিচিত্রাকর্ষী এই পুরুষের বিপ্লবপ্রচেষ্টার ইতি না থাকলে গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে যেতো। বিপ্লবী বসুর শ্রদ্ধার্তর্পণ করে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সভাপ আজাদ হিন্দ সরকার ১৯৪৩-এর ২৪শে জানুয়ারীতে সিঙ্গ বিশেষ সভায় যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল, সেই মূল দলিলটিও গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে। অনেকেরই ধ স্মরণ নেই যে আজাদ হিন্দ সরকার রাসবিহারীর মৃত্যু Order of the Tamgha-E Azad Hind নামক মর্যাদার আসন সৃষ্টি করে এই মহান বিপ্লবীকে সেই আ প্রথম মহান অধিকারী পদে বরণ করে নেন। এথার মহান বিপ্লবীর প্রতি নেতাজীর মনোভাব চিহ্নিত হয়ে আ

'Pilgrim destined for the Battlef (p 593-60?) অধ্যায়টি আর একটি অনিবার্য সংযো নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর বৈপ্লবিক প্রতিভার প অভিব্যক্তি আজও অব্যক্ত রয়েছে। লেখক এই অ তাঁরই সামান্য পরিচ্ছাত অংশ বিধৃত করেছেন, তার কিছু এ যাবৎ অজ্ঞাত তথ্যও রয়েছে। বৈদেশিক স নিয়ে স্বাধীনতা অর্জনের প্রচেষ্টা সম্পর্কে নেতাজী প্রত্যয় উদ্ধৃত হয়েছে এই গ্রন্থে :

"But I have yet to find one single inst

in modern history where an enslaved nation has achieved its liberation without foreign help of some sort. And for enslaved India, it is much more honourable to join hands with enemies of the British Empire than to carry favour with British leaders of political parties." (p 600)

নেতাজীর দ্বিতীয়বার অন্তর্ধান সম্পর্কে লেখক বলছেন: "The rest of the story of his life was as given by the Govt has not been universally accepted" (p 601) এই কথা বলে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মৃত্যুর সরকারী বিবরণের পাশাপাশি এই মতের বিরোধী মত উল্লেখ করে বলছেন: "He is still in hiding, and for reasons known only to himself." তাঁর তৃতীয় অনুমান হিমালয়ের ডাক শুনে নেতাজি সংসারত্যাগীও বা হতে পারেন। দ্বিতীয় ও তৃতীয় অনুমান সম্পর্কে লেখকের হাতে কোনো তথ্য নেই। কিন্তু প্রথম মতের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে অনেক তথ্য উদ্ঘাটিত হয়েছে এবং এই মতটি প্রত্যাখ্যাতও হয়েছে। এটিতে এই আলোচনার সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত থাকলে সেটা ইতিহাস-সম্মত হোতো বলে মনে হয়।

এত বৃহৎ গ্রন্থে, যার অধিকাংশ তথ্য উদ্ধার করতে হয়েছে অতীতস্মৃতি থেকে, কিছু কিছু ভুল থাকা স্বাভাবিক। লেখক নিজেই পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধন করে নেবেন। কিন্তু দুই একটি তারিখের ভুল চোখে পড়েছে, যা লেখকের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে ছাপা হয়ে গেছে। ৩১৯ পৃষ্ঠায় February 27, 1926 ফাঁসীর তারিখটা ভুল মনে হচ্ছে, যেখানে হাইকোর্টের আপীলই ১লা জুলাই ১৯২৬-এ নাকচ হয়েছে। ৪০০ পৃষ্ঠায় সাহোর ষড়যন্ত্র মামলার শুরুর তারিখ দেওয়া আছে July 10, 930। এটাও বোধহয় ভুল, ১৯২৯ হবে। এই আলোচনার গোড়ায়ই বলা হয়েছে বিষয় বিন্যাসে লেখককে কিছুটা কৃত্রিমতার আশ্রয় নিতে হয়েছে। এই ধরণের কৃত্রিমতার চূড়ান্ত উদাহরণ কুষ্টিয়ার ম্যাজিস্ট্রেট ষ্টিভেন্স হত্যার বিবরণে (৫০৯-৫১১) দেখা যায়। লেখক ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েও যে দুই কিশোরী সেদিন এই অসম সাহসিকতা দেখিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছিলেন, তাদের নাম উল্লেখ করতে পারেন নাই। ১৯৩২-এ বাংলার গভর্ণর ষ্টানলী জ্যাকসনকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কনভোকেশনে গুলি করেছিলেন আর এক তরুণী। সে ঘটনার অনুল্লেখও আর একটি দৃষ্টান্ত। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম কয়লেও লেখককে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ স্পর্শ করতো না। অন্তত ইতিহাস-দৃষ্টির বিচারে। এটা অবশ্যি একজন পাঠকের মত, চূড়ান্ত বিচারের ভার লেখকের, যিনি শহীদ-তর্পণের গুরু দায়িত্ব একাকী বহন করেছেন, শারীরিক, মানসিক ও আত্মিক স্তরে।

গ্রন্থের প্রচ্ছদটিও শহীদ-তর্পণের পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। আশা করি অতীতের প্রতি দায়িত্ববোধ এই শহীদ-তর্পণ পাঠে শিক্ষিত ভারতবাসীকেই উদ্বুদ্ধ করবে। অতীতের গৌরবময় পথই ভবিষ্যতের পাথেয়, জাতীয় জীবনে এটি একটি অনস্বীকার্য অনস্বীকার।

সুনীল দাস

সম্পাদকীয়

কৃষ্ণমাচারীর পদত্যাগ : নূতন অর্থমন্ত্রী নিয়োগ

শ্রীকৃষ্ণমাচারীর বিরুদ্ধে লোকসভার সদস্যের দুর্নীতির অভিযোগ সম্পর্কে সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতির প্রাথমিক মতামত গ্রহণে পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর সূচনাকে শ্রীকৃষ্ণমাচারী তার উপর অনাস্থাসূচক মনে করে পদত্যাগ করেছেন। শ্রীশাস্ত্রীও অনন্যোপায় হয়ে তার পদত্যাগ গ্রহণ করে তাসখন্দ যাত্রার পূর্বেই শ্রীশচীন চৌধুরীকে নূতন অর্থমন্ত্রী রূপে নিযুক্ত করে যান। শ্রীচৌধুরীর নিয়োগ বিস্ময়ের সঞ্চার করেছে। ষ্টেট ব্যাঙ্কের আকস্মিক বোর্ডের সদস্যপদ ছাড়া অর্থনীতি সম্পর্কে তার কোনো অভিজ্ঞতার কথা জানা যায় নাই। বিশিষ্ট আইনজ্ঞরূপে কোম্পানী আইন ও ট্যাক্স সংক্রান্ত আইনে তার পারদর্শিতা এযাবৎ বড় বড় ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদেরই সহায়ক হয়েছে, আইনের ফাঁক দিয়ে, তাদের কায়েমী স্বার্থকে পাকা-পোক্ত করবার জন্য। ফলে, সাধারণের চোখে শ্রীশচীন চৌধুরী এই গোষ্ঠির একজন প্রতিভূ হয়ে আছেন। প্রধান মন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পরই যে আসন গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ ভাবে দেশের অর্থনীতির এই সঙ্কটপূর্ণ সময়ে অকস্মাৎ শ্রীচৌধুরীর মত একজন পেছনের সারির অখ্যাত কায়েমী স্বার্থের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে অর্থমন্ত্রীরূপে নিয়োগ বিস্ময়ের সঞ্চার করবেই।

শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

প্রবীণ কংগ্রেসী নেতা শ্রীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় গত ২রা জানুয়ারী রিষড়ায় ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করেছেন। বাংলার রাজনীতিতে অসহযোগ আন্দোলনের সময় শ্রীচট্টোপাধ্যায়ের প্রথম পরিচিতি, স্বরাজ্য দলে দেশবন্ধুর সহকর্মীরূপে তার পূর্ব পরিণতি। অতঃপর তার দুর্জয় সাহস ডাকাত বিপ্লবীদের আইন-আদালতে সহায়ক হয়েছে, যার ফলে তিনি 'Standing Counsel for Revolutionaries রূপে অভিহিত হন। দেশবিভাগের পর শ্রীচট্টোপাধ্যায় পূর্ববাংলায় এবং পরে পাকিস্থানের কেন্দ্রীয় আইন সভায় কংগ্রেস দলের নেতারূপে পাকিস্থানকে ইসলাম রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রবল বিরোধিতা করেন। তিনি কয়েকবার পাকিস্থানের পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের নেতারূপে কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারী এসোসিয়েশনের সভায় যোগ দেন। ১৯৬২ সাল পর্যন্ত শ্রীচট্টোপাধ্যায় পূর্বপাকিস্থানে বাস করে চিকিৎসার জন্য কলকাতায় আসেন। সেই অবধি তিনি পশ্চিম বঙ্গেই বসবাস করছিলেন। এই নির্ভীক প্রবীণ নেতার স্মৃতির প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

ডঃ এস ভি গ্যাডগিল

মহারাষ্ট্রের প্রবীণ কংগ্রেস নেতা ডঃ এস ভি গ্যাডগিল ৭১ বৎসর বয়সে গত ২ জানুয়ারী পুণায় লোকান্তরিত হন। পুণার লক্ষাধিক নাগরিক তাঁর অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় উপস্থিত হয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন। পুণার রাজনীতি থেকে ধীরে ধীরে গ্যাডগিল সর্বভারতীয় রাজনীতিতে উন্নীত হয়ে কেন্দ্রীয় ক্যাবিনেটের মন্ত্রী ও পরে রাজ্যপাল নিযুক্ত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের নেতৃত্ব-স্থানীয় এবং শীর্ষস্থানীয় পদ বরণ করেও প্রয়োজনবোধে কংগ্রেস নেতৃত্বের কঠোর সমালোচনা করতেও গ্যাডগিল কুণ্ঠিত হন নাই। লোকান্তরিতের স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

খাদ্য পরিস্থিতি

আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ১৫ লক্ষ টন চাউল সংগ্রহের

হাজনের মধ্যে এ-যাবৎ মাত্র এক লক্ষ আশী হাজার টন হীত হয়েছে। খাদ্য শস্য গ্রহের এই শোচনীয় গতিতে ারী বৃদ্ধির টনক নড়েছে, ফলে ধান সংগ্রহের দর মূল্য বর্ধিত হয়েছে। এই বৃদ্ধির দাবীরহ আগেই ছিল। সে সময় দর বৃদ্ধি করলে ইতিমধ্যে আরও অনেক াণ ধান গোপনে বর্ধিত মূল্যে হস্তান্তরিত না হয়ে সরকারী ারে আসতো এবং চাষীরাও নিশ্চিত হোতো। এদিকে ইরড রেশনিং-এ বহু এলাকায় চাল নেই। খোলা-রেও নেই। যেটুকু আলো-আঁধারিতে রয়েছে, তার দরও অত্যধিক। পূর্ব রেশনিং এলাকাতেও চাউলের টানাটানি, দর ধরও পুনরায় বৃদ্ধির দিকে। সুতরাং, আগামী দিনের আতং এখনই পরিব্যাপ্ত। পি. এল ৪৮০-র গম আমদানী নিশ্চিত হলেও, সে গম জাহাজ থেকে বন্দর এবং বন্দর থেকে মফঃস্বলের ঘরে যাবার পথে বিঘ্ন অনেক। সময় মত গম পৌঁছাবার নিশ্চয়তা কে দেবে? সে গম আবার খাদ্যের উপ-যোগী হবে কিনা সে প্রশ্নেরও বা সুনিশ্চিত উত্তর কোথায়? সুতরাং, সঙ্কটের গহ্বর দীর্ঘতর হচ্ছে।

১৭ ১.৬৬

স্বাধীন পূর্ব বাংলা

'আজাদ পূর্ব পাকিস্তান' আজ সকলের মুখে মুখে। এই কয়টী শব্দ ঘিরে বিস্ময় সন্দেহ অবিশ্বাসের জাল বোনা চলেছে। এই কয়টী শব্দের পেছনের সুদূর প্রসারী তাৎপর্য বিস্ময়কর দক্ষতার সহিত অধ্যাপক সমর গুহ বিপুল পরিমাণ তথ্য ও নিপুণ বিশ্লেষণ দ্বারা উত্থাপিত করেছেন আপনার সামনে। আপনি কি ভাবছেন কি সিদ্ধান্ত করবেন? এ বইটী পড়ে স্থির করুন।

দাম : ২·০০ পৃষ্ঠা : ১২৮

প্রাপ্তিস্থান

৬০এ, রাজা সুবোধ মল্লিক রোড
কলিকাতা-৩২

২। প্রজা সোশ্যালিষ্ট পার্টি অফিস
৮৬এ, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪

২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CENTRAL LIBRARY CALCUTTA UNIVERSITY

জয়ন্তী

৩০ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা | মাঘ ১৩৭২

সম্পাদকীয়

ডঃ ভাবা

পারমাণবিক যুগে ভারতকে যে বিজ্ঞানী পারমাণবিক মানসিকতায় অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছিলেন এবং পারমাণবিক বিজ্ঞানের আন্তর্জাতিক উচ্চ সারিতে যিনি ভারতের প্রতিনিধিরূপে বিশেষ মর্যাদা অর্জন করেছিলেন সেই পরমাণুবিদ হোমি ভাবার শোচনীয় মৃত্যুতে সমস্ত ভারত বিশেষ মর্মাহত হয়েছে। পারমাণবিক বৈজ্ঞানিকদের এক বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য তিনি ইয়োরোপে যাচ্ছিলেন এবং যে বিমানে যাচ্ছিলেন তার সমস্ত যাত্রীসহ আল্পস পর্বতের কুয়াসায় পথ হারিয়ে সেই যাত্রী-বিমান ধ্বংস হয়ে যায়। কোনো যাত্রীই রক্ষা পাননি। বিজ্ঞানী ভাবা নিজের প্রতিভের জন্য অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতকে এশিয়ার দ্বিতীয় বৃহত্তম পারমাণবিক শক্তিরূপে উন্নীত করতে সক্ষম হন। চীন পরমাণুবোমা বিস্ফোরণে সক্ষম হলেও, এশিয়ার পারমাণবিক প্রতিযোগিতায় জাপানের পরেই ভারতের স্থান। বিজ্ঞানী ভাবা অল্প সময়ের মধ্যেই একটি বৃহৎ পারমাণবিক গবেষণাগার নির্মাণেই শুধু সক্ষম হন নি। তিনি কয়েকটি রিয়েকটার স্থাপন করেও ভারতকে রেডিও আইসোটোপ উৎপাদনে প্রায় স্বাবলম্বী করে তুলতে সক্ষম হয়েছিলেন। ডঃ ভাবাই ভারতকে সর্ব প্রথম সচেতন করে জানিয়ে দেন যে চীনা পারমাণবিক হুমকির জবাবে ভারতেরও পারমাণবিক বোমা নির্মাণ করা উচিত এবং প্রয়োজনে ভারত এক বছরেই পরমাণু বোমা নির্মাণে সক্ষম। তিনি ভারতকে আরও স্মরণ করিয়ে দেন যে সাধারণ বারুদের চেয়ে পারমাণবিক বিস্ফোরণ উৎপাদন ব্যয় কম। বিজ্ঞানী ভাবার অসময় জীবনাবসানে ভারতের পারমাণবিক বিজ্ঞানের গবেষণায় অপূরণীয় ক্ষতি হলো।

সত্য গুপ্ত

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়দশকের ধাকাধাকি, গুণ্ডা ও নানা দুষ্কৃতিকারীদের পীঠস্থান, সেদিনের পূর্ববাংলার রাজধানী ঢাকা শহরে, তরুণ ও যুবছাত্র মহলে যে কয়েকটী নাম শৌর্য-বীর্যের গোত্রনায় বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল তাঁদেরই একজন বিপ্লবী বাংলার অন্যতম নেতা, দুর্ধর্ষ তারুণ্য শক্তির প্রতীক, নেতাজীর অন্যতম একনিষ্ঠ অনুগামী শ্রীসত্য গুপ্ত অকস্মাৎ গত ১৯ শে জানুয়ারী বেরিলীতে

৬৪ বছর বয়সে লোকান্তরিত হয়েছেন। শ্রীসত্য গুপ্তের অগণিত সহকর্মী বন্ধু, গুণগ্রাহী, ও আত্মীয়বর্গ ভগ্নস্বাস্থ্য সত্ত্বেও তাঁর কর্মচঞ্চল জীবনের এত শীঘ্র অবসান আশঙ্কা করেন নাই। তাই তাঁর লোকান্তরের সংবাদ সকলকেই মুহ্যমান করে দিয়েছিলো।

ঢাকায় সত্য গুপ্তের কর্মজীবন শুরু। সেখান থেকেই তিনি এম্ এ পাশ করেন। কিন্তু কৈশোর থেকেই সত্য গুপ্ত বিপ্লবীদলের সহিত যুক্ত হয়েছেন এবং ঢাকায় ধীরে ধীরে তরুণসমাজের মধ্যে বিপ্লবভাবনার উন্মেষে ও বৈপ্লবিক সংগঠনে এগিয়ে গেছেন তাঁর দলের অগ্রগতির সহিত। সেই সময় থেকেই তাঁর নিরলসানুবর্তিতা, সাধারিক সুখদাবোধ, দৈহিক শৌর্য এবং নেতৃত্বসুলভ মানসিক গঠন, যুবসমাজে আকর্ষণের বিষয় ছিল। ফলে তাঁর প্রেরণায় বহু তরুণ ঢাকার এই বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত হয়। পরবর্তীকালে এই বিপ্লবীদলের প্রভাব সারা বাংলাদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৯২৮ সালে কলকাতা কংগ্রেসে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর সর্বাধিনায়কত্বে গঠিত ভলান্টিয়ার বাহিনীতে যোগ দিয়ে সত্য গুপ্ত 'মেজর' পদে বৃত হন এবং অতঃপর আমৃত্যু তিনি 'মেজর সত্য গুপ্ত' রূপেই পরিচিত ছিলেন।

১৯৩০ সাল থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত রাজবন্দী থাকার পর নেতাজী সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে সত্য গুপ্ত কংগ্রেসের কাজে আত্মনিয়োগ করেন এবং ১৯৩৯ সালে নেতাজী প্রতিষ্ঠিত ফরোয়ার্ড ব্লকে যোগ দেন। অতঃপর ১৯৪০ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত তিনি ভারতীয় নিরাপত্তা আইনে বন্দী ছিলেন। দেশবিভাগের আপোষহীন বিরোধী ছিলেন তিনি। ক্ষমতা হস্তান্তরের পরও নানা রাজনৈতিক সংগ্রামে যোগ দিয়ে একাধিকবার কারাবরণ করেছেন।

এই লোকান্তরিত বিপ্লবী দেশব্রতীর স্মৃতির প্রতি আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করার কালে বেদনার্ত হৃদয়ে বার বার এই কথাই উঁকি দিচ্ছে—মৃত্যুর পূর্বে তাঁর আজীবন আকাঙ্ক্ষিত নেতার সাক্ষাৎ লাভ এ-পৃথিবীতে আর ঘটল না।

অবলা বসু জন্মশতবার্ষিকী

গত ৮ই ফেব্রুয়ারী লেডী অবলা বসুর জন্মশতবার্ষিকী অনুষ্ঠিত হয়েছে। বাংলাদেশের, বিশেষ নারীদের শিক্ষা ও সামাজিক বাধা-বিঘ্ন অপসারণের ইতিহাসে পরম শ্রদ্ধেয়া অবলা বসুর নাম চিরদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় থাকবে। নারী শিক্ষা প্রসারে, বিধবা নারীদের সামাজিক ও আর্থিক পুনর্বাসনে অবলা বসুর সংগ্রাম পথিকৃতের গৌরবে উদ্ভাসিত হয়ে আছে। নারীশিক্ষা সমিতি ও বিদ্যাসাগর বাণীভবন এবং সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলি সমাজে নারীর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর অন্তর্বেদনার স্বাক্ষর বহন করে রয়েছে। এ-ছাড়া আচার্য জগদীশচন্দ্রের জীবনসঙ্গিনীরূপে তাঁর প্রতিটি বৈজ্ঞানিক কৃতিত্বের পশ্চাতে অবলা বসুর অন্তঃসলিলা প্রেরণা বাঙ্ময় হয়ে রয়েছে। ভগিনী নিবেদিতার অকৃত্রিম সুহৃদরূপে বসু-দম্পতির অমূল্য সাহচর্য্য বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটি দুর্লভ ঘটনা যা পরবর্তীকালে স্বপ্রকাশ হয়ে লেডী অবলা বসু ও আচার্য জগদীশচন্দ্রের বিচিত্র কর্মময় জীবনকে আরও মহিমান্বিত করেছে।

এদেশে, বিশেষ বাংলার নারীর বন্ধনমুক্তির আন্দোলনের এই পথিকৃৎকে তাঁর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আমাদের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করছি।

প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন

গত ১৯শে জানুয়ারী কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের নির্বাচনে ৩২৫-১৬৯ ভোটে শ্রীমোরারজী দেশাইকে পরাজিত করে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দলনেতা নির্বাচিত হয়ে প্রধান মন্ত্রীত্ব গ্রহণ করেছেন। শ্রীনেহেরুর মৃত্যুর পর 'কনসেনসাস' এর দোহাই দিয়ে শ্রীশাস্ত্রীবাহাদুর শাস্ত্রীর নির্বাচন সর্বসম্মত

হয়েছিল, এবার কনসেনসাস-এর ম্যাজিক কাজে লাগলো না এবং অন্য যে কোনো দলীয় নির্বাচনের মতই, নূতন দলনেতা তথা প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তবে একথা সত্য অন্যান্য টানা-পোড়েনের মধ্যে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রতি কামরাজের সমর্থনই তাঁর নির্বাচনের নিয়ামক হয়েছিল। দলীয় প্রার্থীদের মধ্যে কে ভাল, কে মন্দ, দলের বাইরে সর্বসাধারণের নিকট এ-প্রশ্ন প্রায় অবান্তর। কেননা, নির্বাচিত দলনেতা দলীয় নীতির মুখপাত্র হবেন মাত্র। প্রতিদ্বন্দ্বীদের ব্যক্তিগত নীতির উপস্থাপনার অবকাশ থাকলে সেই নিরিখে ভাল-মন্দের বিচারের প্রশ্ন থেকে যেতো। সে অবকাশ কংগ্রেস নেতৃত্বের পুরোধার ক্ষেত্রে খুবই সঙ্কীর্ণ, নাই বললেই চলে। তবে মুখপাত্রের ভূমিকার সঙ্গে ব্যক্তিত্বের প্রখরতা যুক্ত হবার অবকাশ এ-ক্ষেত্রেও রয়েছে। সে-প্রশ্নের মীমাংসাও কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ বিষয়, সর্বসাধারণের দিক থেকে তার আবেদন সামান্যই। কারণ প্রখর ব্যক্তিত্বও যদি দেশের সর্বসাধারণের কিম্বা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী নীতির পোষ্টার ব্যাখ্যাতা হন, জনসাধারণের দিক থেকে সে-ব্যক্তিত্বের প্রতি মোহগ্রস্ত হবার কারণ নেই। বরং সর্বনাশা নীতির নেতৃত্বের সর্বস্বপণ প্রতিরোধ তাদের অনিবার্য কর্তব্য হয়ে দাঁড়াবে। সুতরাং, নূতন নেতা নির্বাচনে দেশে উৎসাহের বা নিরুৎসাহের কোনো কারণ ঘটে নাই, দলীয় মামুলী ঘটনার চাইতে এই নির্বাচনের কোনো গুরুত্ব নেই জনসাধারণের জীবনে। অতঃপর কংগ্রেসী সরকারের নীতি কি হবে? অর্থনৈতিক দুর্যোগ, খাদ্যসঙ্কট, জাতীয় নিরাপত্তা ও আন্তর্জাতিক জীবন-মরণের প্রশ্নে ক্রত নবায়ন হবে কিনা, এই নিরিখেই নূতন প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রীসভার বিচার হবে। দলীয় চক্রের পতন-অভ্যুত্থানের বেশী গুরুত্ব নূতন প্রধানমন্ত্রী নির্বাচন ও মন্ত্রীসভা গঠনে অভিব্যক্ত হয় নাই।

জয়পুর কংগ্রেস

জাতির এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে গত ১০ই ফেব্রুয়ারী থেকে জয়পুরে কংগ্রেসের সপ্তত্রিংশ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে। লালবাহাদুর শাস্ত্রীর বিয়োগের পর এবং নূতন প্রধান মন্ত্রী নির্বাচনের অব্যবহিত পরেই জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন শাসনক্ষমতায় আসীন দলের পক্ষে দেশের সর্বসাধারণের নিকট নূতন দিক্‌দর্শনের যে সুযোগ এবে দিয়েছিল তা সত্যানুগতিক প্রস্তাব গ্রহণ, সমস্যার অস্পষ্ট রেখাঙ্কন, সমাধানের দুর্বল ও অস্পষ্টতর ইশারা এবং কোনো অব্যবহিত প্রয়োজিক ব্যবস্থা গ্রহণে শোচনীয় অক্ষমতা ধামাচাপা দেবার অপচেষ্টায় অবসিত হয়েছে। তিনটি মূল বিষয়ে এবারকার অধিবেশনের আলোচনা সীমিত ছিল: তাসখন্দ ঘোষণা, খাদ্য, বর্তমান আর্থিক অবস্থা। এর মধ্যে তাসখন্দ প্রস্তাবের আলোচনা নিরুত্তাপ না হলেও, 'কাশ্মীর ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ'—ভারত সরকারের বহু-ঘোষিত এই নীতি সামরিক বাহিনীর অপসারণে জাতীয় মানসিকতায় ও মর্যাদায় অনভিপ্রেত লক্ষ্যে পরিণত হওয়া সত্ত্বেও, তাসখন্দ ঘোষণায় এই পবিত্র লক্ষ্য যে ভাবে অবনমিত ও বিশ্বাসহননে চিহ্নিত হয়েছে, তার প্রবল প্রতিক্রিয়া জয়পুরে প্রতিধ্বনিত হল না, এটা বিস্ময়ের। বিহারের বিভূতি মিশ্রের তীব্র প্রতিবাদ তার ব্যতিক্রম মাত্র। কংগ্রেস পার্লামেন্টারী দলের কার্যনির্বাহক সমিতির নিকট পরলোকগত প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি—"Whole of India might perish, but there would be no withdrawals"—তাসখন্দ ঘোষণার উপহাসে পরিণত হলেও, কংগ্রেস অধিবেশনে উত্তাপের দহন দেখা গেল না, এই ঘোষণার আলোচনাকালে।

অবশ্যি, খাদ্য পরিস্থিতি সংক্রান্ত প্রস্তাবে তীব্র উত্তাপ সঞ্চারিত হয়েছিল। খাদ্য পরিস্থিতি বিপর্যয়ের মুখোমুখী পৌঁছানো সত্ত্বেও কংগ্রেসের খাদ্য-প্রস্তাবে সঙ্কটের উদ্বেগ নাই, তেমনি নাই সমাধানের পরিবেশ। চিলেঢালা মামুলী কয়েকটি অস্পষ্ট নীতি-নিবেদনেই দায়সারা ভাবে কাজ সারা

(শেষাংশ ৮৯০ পৃষ্ঠায়)

তাসখন্দ ঘোষণা ঃ শান্তির মরীচিকা

সমর গুহ

ভূয়া বিভ্রান্ত শান্তিবাদে আকণ্ঠ নিমজ্জিত কংগ্রেসী নেতৃত্বের দুর্বলতা ও আপোষপন্থার আরেক শোচনীয় নিদর্শন তাসখন্দ ঘোষণা। যে জোহানেরা নিজেদের জীবনের বিনিময়ে বিশ্বকীর মর্যাদা এনে দিয়েছিল ভারতের জাতীয় জীবনে, কংগ্রেসী নেতৃত্বের বন্ধ্যা কূটনীতির ফলে তা' শেষ পর্যন্ত পরাজয়ের ফলশ্রুতিতে পরিণত হলো তাসখন্দের চুক্তিতে। তাসখণ্ড চুক্তি শান্তির সনদ নয় – আরেক আপস বিপর্যয়ের দলিল ও ভারতীয় কূটনীতির শোচনীয় পরাজয়ের এক লজ্জাকর স্বাক্ষর।

তাসখন্দ চুক্তিতে জয়ী হয়েছে রাশিয়ার স্ট্রাটেজী এবং স্ট্র্যাটেজিক ও রাজনৈতিক সুবিধা হয়েছে পাকিস্তানের। পক্ষান্তরে সর্বাত্মক কূটনৈতিক পরাজয় ঘটেছে ভারতের পক্ষে। ভারত ও পাকিস্তানকে দিয়ে তাসখণ্ড ঘোষণায় স্বাক্ষর করিয়ে এবং রাশিয়ার এশিয় ভূখণ্ডে তাসখন্দ বৈঠকের ব্যবস্থা করে রাশিয়া এশিয়ার প্রধান অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিরূপে গুরুত্ব অর্জনে সক্ষম হলো। চীন রাশিয়াকে এশিয় শক্তিরূপে গণ্য করতে চায়নি, রাশিয়া তার যোগ্য প্রত্যুত্তর দিল তাসখন্দে দুইটি অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিবাদে সালিসী করে। পাক-ভারত বৈঠকে এবং সোভিয়েট ভূমিতে দুইটি অ-কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রের বিবাদে সালিসী করে আন্তর্জাতীয় রাজনৈতিক ভূমিকায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্রে রাশিয়া এক ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠা লাভ করলো তাসখন্দ বৈঠকে। রাশিয়া প্রমাণ করে দিল যে আন্তর্জাতীয় মুরুব্বীয়ানায় কম্যুনিষ্ট রাষ্ট্র রাশিয়াও এখন ইঙ্গ-আমেরিকান গোষ্ঠির সম-প্রতিদ্বন্দ্বী।

তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে পাকিস্তান এক ধারাত্মক সামরিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বেঁচে গেল। শীতকালে যদি আবার পাক-ভারত সংঘর্ষ সুরু হোতো তা' হলে হাজীপীর গিরিবর্ত্ম, ভিখোয়াল ও কারগিল এবং শাহোর-সিয়ালকোট খণ্ডে অবস্থিত ভারতীয় ফৌজের হাতে সুনিশ্চিত পতন ঘটতো আসুরশাহীর। শীতকালে সংঘর্ষ সুরু হলে ভারত অনায়াসেই হিমালয় সীমান্ত থেকে কয়েক ডিভিশন কৌজ সরিয়ে এনে সমাবেশ করতে পারতো পাঞ্জাব সীমান্তে। কারণ এই শীতকালে আবহাওয়ার কারণে চীনের পক্ষে পাকিস্তানকে কোনরূপ কার্যকরী সামরিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব হতো না। মার্শাল আয়ুব এই সামরিক ষ্ট্র্যাটেজীর গুরুত্ব উপলব্ধি করেই সৈন্য অপসারণে রাজী হয়েছেন।

কূটনীতির দিক থেকেও এক বিশেষ লাভ হয়েছে পাকিস্তানের। তাসখন্দ চুক্তিতে কাশ্মীর সমস্যা সম্বন্ধে উল্লেখ করতে ভারতকে বাধ্য করে আন্তর্জাতীয় ক্ষেত্রে পাকিস্তান একথা প্রমাণ করে দিল যে কাশ্মীর এখনও অমীমাংসিত সমস্যা। শুধু তাই নয়, তথা কথিত 'আজাদ কাশ্মীর' থেকে ভারতীয় কৌজ প্রত্যাহারে ভারতকে রাজী করিয়ে পাকিস্তান পরোক্ষে এই স্বীকৃতিও আদায় করে নিল যে অধিকৃত কাশ্মীর যথার্থই পাকিস্তানের এলাকা,—ভারতের

নয়। রাষ্ট্রপুঞ্জ পরিষদ একথা স্বীকার করে নিয়েছিল যে, আইনত অধিকৃত কাশ্মীরের শাসিক ভারতবর্ষ। কিন্তু নিজের এলাকা থেকে নিজের ফৌজ সরিয়ে এনে ভারত কার্যত সেখানে পাকিস্তানের স্থায়ী কর্তৃত্ব মেনে নিল। তাসখন্দ চুক্তিতে যথার্থই আয়ুবশাহী কূটনীতির এক সাফল্যের সংকেত সূচিত হলো।

তাসখন্দ ঘোষণায় ষোল আনা পরাজয় ঘটেছে ভারতের। পরলোকগত শাস্ত্রীজী জাতির কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, কাশ্মীর ভারতের স্থায়ী ভূখণ্ড এবং কাশ্মীর কোনো ক্রমেই পাক-ভারত আলোচ্য বিষয় হ'তে পারে না; রাজনীতির ভাষায় কাশ্মীর 'নিগোসিয়েবল' নয়। তিনি আরোও প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, হাজপীর পিরিবর্ত্ম, কারগিল ও টিথোয়াল, তথা যে-আইনীভাবে অধিকৃত পাক কবল থেকে পুনর্দখল-করা ভারতীয় এলাকা কোন ক্রমেই ভারত পাকিস্তানকে আর ছেড়ে দেবে না। কিন্তু এই দুইটি প্রতিশ্রুতিই শাস্ত্রীজী ভঙ্গ করেছেন তাসখন্দে। দেশের চরম স্বার্থ ত্যাগের বিনিময়ে পাকিস্তানের কাছ থেকে শান্তি ক্রয়ের যে আশ্বাস আদায় করেছেন বলে কংগ্রেসী নেতৃত্ব উৎফুল্ল হয়ে উঠেছেন তাও শান্তির মরীচিকা ছাড়া কিছুই নয়। এমন কি ফৌজ অপসারণের ব্যাপারেও পাকিস্তানের স্বার্থে এক তরফা সর্ত হয়েছে। পাকিস্তান হানাদার অপসারণে রাজী হয়নি, এবং স্বাধীন আয়ুব জানিয়ে দিয়েছেন কাশ্মীর হানাদারদের দেশ এবং নিজের দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের সরিয়ে আনার প্রশ্নই উঠে না। এই হানাদাররা যাতে অনায়াসে কাশ্মীরীরূপে কাশ্মীরে প্রবেশ করতে পারে তার জন্যও ভারত সরকার কাশ্মীরে প্রবেশের গিরিবর্ত্মগুলি পাকিস্তানকে ছেড়ে দিতে রাজী হ'য়েছে। কংগ্রেসী নেতৃত্ব অতি সহজ ও স্বভাবিকভাবে বিস্মৃত হয়ে গেছে যে, হানাদারদের অনুপ্রবেশের জন্যেই সেপ্টেম্বরের যুদ্ধ সুরু হয়েছিল।

তাসখন্দ চুক্তির স্বাক্ষরের কালি শুকোতে না শুকোতেই এই চুক্তি পত্রের ভিন্ন ব্যাখ্যা সুরু হয়ে গেছে। রাশিয়ার স্বার্থ অনেকাংশে পূর্ণ হয়েছে। তাই চুক্তির ব্যাখ্যায় রাশিয়া এখন নীরব। কংগ্রেস সরকার বলছে—কাশ্মীর তাসখন্দের আলোচ্য বিষয় ছিল না; ভবিষ্যতেও আলোচ্য বিষয় হবে না। প্রত্যুত্তরে আয়ুব, ভুট্টো, আজিজ আহমেদ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন যে, তাসখন্দে কাশ্মীরই প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল, এবং ভবিষ্যতেও কাশ্মীরই হ'বে পাক-ভারত বার্তালাপের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কারণ, পাক প্রবক্তাদের মতে, কাশ্মীরই হলো পাক-ভারত সংঘর্ষের মূল সমস্যা। কংগ্রেসী নেতৃত্ব বলছেন যে পাক-ভারত সমস্যা সমাধানে অস্ত্র প্রয়োগ করা হ'বে না বলে পাকিস্তান যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে তাই হলো ভারতের প্রধান লাভ। বর্তমান প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তানের এই স্বীকৃতিকে পরোক্ষ যুদ্ধ-বর্জন চুক্তি বলে আখ্যা দিয়ে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। কিন্তু আয়ুবসহ সমস্ত পাক নেতারা জানিয়ে দিয়েছেন যে অস্ত্র পরিহারের সর্তটি কোন নতুন কথা নয়, কারণ রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের অন্তর্ভুক্ত স্বাক্ষরকারীরূপে পাকিস্তান আগেই এই নীতির সমর্থন করেছে। পাক নেতারা আরও বলেছেন যে শান্তিপূর্ণ উপায় ব্যর্থ হলে অস্ত্র প্রয়োগের ব্যাপারে রাষ্ট্রপুঞ্জ সনদের স্বাক্ষরে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। সম্প্রতি ভুট্টো বলেছেন যে, এক নতুন ফ্রেমে কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের জন্যই তাসখন্দ চুক্তি করা হয়েছে। আয়ুবও বলেছেন যে, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলে যুদ্ধ প্রস্তুতি চলতেই থাকবে।' পাকিস্তান কাশ্মীর দাবী পরিত্যাগ করে নি, যুদ্ধও বর্জন করেনি, তবুও কংগ্রেসী নেতৃত্ব তার উল্টা কথা বলে তাসখন্দ চুক্তির লাফাই গেয়ে 'শান্তি শান্তি' করে উল্লাসে আত্মহারা হচ্ছেন।

কোন্ কূটনৈতিক দৃষ্টিতে পাকিস্তান তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে সাম্প্রতিক পাক নোটে তা' স্পষ্ট। কংগ্রেসী সরকার পাক-ভারত আশু আলোচনায় ব্যগ্র; কিন্তু পাকিস্তান

জানিয়েছে যে আলোচনা হবে ২৫শে ফেব্রুয়ারীর পরে এবং একেবারে হবে পাক-ভারত সম্পর্কের 'নরমেলাইজেশন', তথা, স্বাভাবিকরণ নয়—প্রধান আলোচ্য বিষয় হবে 'কাশ্মীর, ভারত প্রত্যাগত মুসলিম লীগারের, জল, কারাদ্ধ বাঁধ এবং কাশ্মীর সমস্যা সমাধানের পর পাক-ভারত ফৌজের সংখ্যা হ্রাস' করার প্রস্তাব। অর্থাৎ কাশ্মীরের ঘাঁটিগুলি এবং লাহোর শিয়ালকোটের স্ট্র্যাটেজিক এলাকা থেকে ভারতীয় ফৌজের অপসারণের পরে পাকিস্তান যখন বিপদমুক্ত হবে, একমাত্র তখনই পাক-ভারত মন্ত্রী পর্যায়ের আলোচনায় বসতে পাকিস্তান রাজী, তার আগে নয়।

পাকিস্তানী উক্তি, বক্তব্য, ভাষ্য এবং পাক-ভারত বৈঠকের একেবারে ও বৈঠকের সময় নির্ধারণের ঘটনা থেকে একথা স্পষ্ট যে পাক ভারত সমস্যা সম্বন্ধে পাকিস্তানী নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গির সামান্যতম পরিবর্তনও হয় নি, শুধু সাময়িক ভাবে স্ট্র্যাটেজিক ও ডিপ্লোম্যাটিক কারণে আয়ুবশাহীর জঙ্গী কিস্তির স্থগিত রয়েছে। কিন্তু বাস্তবতা-বিমুখ কংগ্রেস নেতৃত্ব এমনই ভেগে ঘুমান যে, অতি স্পষ্ট ঘটনাকে পর্যন্ত তারা নিজেদের প্রয়োজন মত ব্যাখ্যা করতে দ্বিধা বোধ করছেন না। কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছেন যে আসলে আয়ুব শান্তিকামী কিন্তু ভুট্টো-চক্রের বিরোধিতার জন্যই এখনও খোলাখুলি শান্তি নীতি গ্রহণ করতে পারছেন না। সুতরাং ভারতকে ধৈর্য ও সহনশীলতার সঙ্গে আয়ুবের শান্তিকামী হাতকে শক্তিশালী করতে হবে। কংগ্রেসী নেতৃত্ব এ কথা স্মরণ করবার প্রয়োজন বোধ করছে না যে, পাকিস্তানের ফৌজী একনায়কত্বে আয়ুবই সর্বময়,—কি ফৌজে, কি পাক সরকারে আয়ুব-বিরোধী সমস্ত সম্ভাব্য শক্তি সিভিল মার্শাল অনেক আগেই নিষ্ক্রিয় করে দিয়েছেন। ভুট্টো কিম্বা জেনারেল মুসা সিভিলিয়ান আয়ুবের বিরুদ্ধে কাঁটাস্বরূপ মাত্র। অন্যদিকে পাক ডিক্টেটরী শাসনে বিরোধী-পক্ষের ভিপিরের মূল্যও নগণ্য মাত্র। আয়ুব-ভুট্টোর বাক-বৈষম্য আসলে প্রতিধ্বনির কূটনৈতিক আবরণ মাত্র। একথা ভেবে আশ্চর্য হতে হয় যে, আঠার বছরের অভিজ্ঞতার পরেও পাক রাজনীতি অনুধাবনে কংগ্রেসী নেতৃত্বে কেতাবী চিন্তার বিভ্রান্তি ঘুচে গেলো না।

তাসখন্দের শাকাইয়ে কংগ্রেস নেতৃত্ব বলছে যে, ভারতের অর্থনৈতিক প্রগতির জন্যই শান্তির প্রয়োজন। আবার সেই সঙ্গেই সমস্বরে এই নেতৃত্বই ঘোষণা করছে যে, ভারতের সামরিক প্রস্তুতির প্রয়াস কোনো ভাবেই সামান্যতম হ্রাস করা হবে না। তারা আরও বলেছেন যে, সেপ্টেম্বরের 'শিক্ষা' যদি পাকিস্তান গ্রহণ না করে তা' হলে ভারত আবার পাকিস্তানকে সমুচিত জবাব দেবে। গত আঠার বছরে পাকিস্তানকে অজস্র 'চান্স' দিয়েও কংগ্রেসী নেতৃত্ব চান্স দানের মনোভাব থেকে নিবৃত্ত হয় নি। সমস্ত স্ট্র্যাটেজিক ঘাঁটি ছেড়ে দিয়ে পাকিস্তানকে আবার সুযোগদানে উদ্যত হয়েছে কংগ্রেসী নেতৃত্ব।

তাসখন্দ চুক্তির ফলে স্বতঃ, সর্বোদয়ী চিন্তা চীন ও রুশপন্থী কম্যুনিষ্ট এবং এক শ্রেণীর কংগ্রেসীরাও উদ্যোগী হয়ে উঠেছেন আয়ুবের সঙ্গে কাশ্মীর সমস্যাটার একটা মীমাংসা করে ফেলে পাক-ভারত শান্তির বুনিয়াদ পাকা করে ফেলবার জন্য। অর্থাৎ আয়ুবের ন্যায় এই গোষ্ঠিও পাক-ভারত আলোচ্য বিষয় রূপে কাশ্মীরকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষপাতি। অন্যদিকে তাসখন্দের শান্তির অনুকরণে 'চীন-ভারত সীমান্ত সমস্যা' সমাধানের জন্য চীন পন্থীরা অত্যুৎসাহী হয়ে উঠেছে। এদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন মস্কোপন্থী কম্যুনিষ্টরা এবং শান্তি ধর্মের আশ্রিত প্রবক্তা সর্বোদয়ীরা। ভারতের তিন সীমান্তে পাক-চীনের যুক্ত ফ্রন্ট যখন ব্যাপকতর ভাবে উদ্যত হয়ে রয়েছে সেই সময়ে জাতীয় মনকে বিভ্রান্ত করার এবং জাতীয় প্রতিরোধ সংকল্পকে দুর্বল করার সমস্ত পথ খুলে দিয়েছে তাসখন্দ ঘোষণা। ভুয়া শান্তির প্রবচনে আজ মুখর হয়ে উঠেছে ভারতের রাজনীতি।

রাশিয়ার সমর্থন লাভের অনতিক্রম্য প্রয়োজনেই নাকি ভারত তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু তাসখন্দ বৈঠকে যোগ দিয়ে এবং তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর করে ভারত রাশিয়াকে অনেক দূরেই বরং ঠেলে দিয়েছে। রাশিয়া এখন ভারত ও পাকিস্তানের সম-দূরত্বে বা সম-নৈকট্যে অবস্থিত। রাশিয়া নাকি গোপন আশ্বাস দিয়েছে শাস্ত্রীজীকে —কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্বন্ধে গোপন ও মৌখিক আশ্বাসের মূল্য মরীচিকার মতই অবাস্তব। রুশ-চীন দ্বন্দ্বের পরিপ্রেক্ষিতে সিয়াটো ও সিন্টো চুক্তিবদ্ধ পাকিস্তানের অপেক্ষা নিরপেক্ষ ভারতের বন্ধুত্বের প্রয়োজনীয়তাও যে রাশিয়ার পক্ষে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়—আত্ম-সংশয়ী দুর্বল-চিত্ত কংগ্রেসী নেতৃত্ব সেকথা অনুধাবন করার মত কূটনৈতিক অন্তর্দৃষ্টি দেখাতে পারে নি।

তাসখন্দ আলোচনায় পাকিস্তান নিরুদ্বেগে ভারতের অঙ্গরাজ্য কাশ্মীর নিয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হয়েছে; কিন্তু ক্ষ শ্রেণী নেতৃত্ব পূর্ববাংলা ও পাকতুনীস্তানের স্বাধীনতার প্রশ্নটি পাল্টা জবাবে তুলে ধরতে পারেনি আয়ুবের সামনে এবং বিশ্বকে জানাতে পারে নি যে, পূর্ববঙ্গে ও পাকতুনীস্তানে প্রবল স্বাধীনতাকামী আন্দোলন চালু রয়েছে।

তাসখন্দ চুক্তি শুধু ভারতের জনতাকেই বিভ্রান্তির পথে টেনে আনেনি, বীর্যবান ভারতীয় জোয়ানদের জীবনদান ও মনোবলকেও নিষ্ফল করে দিয়েছে। একথা ভেবে তারা বিস্মিত হয়ে আছে যে, যে রক্ত ও প্রাণের মূল্যে তারা জাতির জন্য অমূল্য স্ট্র্যাটেজিক সুবিধা অর্জন করেছিল তথাকথিত শান্তির বেদীতিতে তাকে বিসর্জন দিতে কংগ্রেসী নেতৃত্বের বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই। আমাদের আশঙ্কা ভারতের সামনে আরও চরম সামরিক সংকট এগিয়ে আসছে, আরও অনেক হাজার জোয়ানের জীবন দিয়ে তাসখন্দের কূটনৈতিক পরাজয়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে ভারতকে। সেই আশঙ্কার উদ্বেগেই হয়তো বিবেক সংশয়াহত শাস্ত্রীজীর হৃদযন্ত্র চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে। কি গোপন কারণে যে শাস্ত্রীজী তাসখন্দে আত্মসমর্পণ করলেন সে কথা বোধ হয় গোপনই থেকে যাবে চিরদিন। ভিতরে বাইরে সবদিক দিয়েই ভারত আজ এক চরম বিস্ফোরণের সম্মুখীন. ভারতের নেতৃবৃন্দ ও একথা জনতা মনে রাখলে দূরদৃষ্টি ও বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেবে।

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

সুভাষ যখন প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র সে সময়ে কলেজের ছাত্রদের মনোভাব ইংরেজ রাজত্বের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ছিল না, কিন্তু সুশীল ও সুবোধ ছাত্রদের যে অভাব ছিল তাও নয়। প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার প্রথম সম্পাদক হন শ্রীপ্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, এবং জেনারেল সেক্রেটারি ও সহ-সম্পাদক হন শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এঁরা উভয়েই ষষ্ঠ শ্রেণীর ছাত্র—এবং কৃতী ছাত্রই ছিলেন। কলেজ পত্রিকায় এঁদের দুজনেরই ফটো ছাপা হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস রচনা করতে যেয়ে কলেজ পত্রিকা প্রকাশে এঁদের দুজনের উদয় ও কৃতিত্বের কথাই সাড়ম্বরে ঘোষণা করা হয়েছে। সেটা স্বাভাবিক। প্রেসিডেন্সি কলেজের খাতায় এঁদের নাম জলন্ত অক্ষরে লিখে রাখাটাই ঐ কলেজের পক্ষে ঐতিহ্যসম্মত—অর্ধশতাব্দীরও পর প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষ, তথা শিক্ষকমণ্ডলীর দৃষ্টিভঙ্গী ও ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্য যে আজও অপরিবর্তনীয় হয়ে আছে সেটুকু জানতে পারা আমাদের পক্ষে ভালো; কেননা আত্মমর্যাদাসচেতন, প্রতিভাবান ও আত্মবিশ্বাসী কোনো বালক যে নিজের আদর্শ অটুট রেখে উক্ত কলেজে ছাত্রজীবন কাটাতে পদে পদে বাধা পেতে পারে সেটুকু আমাদের বোঝা দরকার এবং অর্ধশতাব্দী আগে একজন কিশোর ঐ কলেজের আবহাওয়ার পাঠ নিতে যেয়ে কেন যে রুদ্ধশ্বাস ও বিপন্ন বোধ করেছিল নিজেকে তা অনুমান করা ক্রমশই সহজ হয়ে আসে। না, সুভাষ একাই সেদিন কলেজের গোটা আবহাওয়াটার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেননি, বহু ছাত্রই সেই প্রতিবাদের অংশীদার ছিল—সুভাষ ছিলেন এঁদের স্বাভাবিক নেতা। সে কাহিনী আলোচনায় আমরা পরে আসছি।

প্রেসিডেন্সি কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে শ্রীপ্রমথনাথ ও যোগেশচন্দ্র দুজনেই ছিলেন নিষ্পাপ তরুণ; তাই সকল প্রশংসা তাঁদের দুজনের বন্দিকেই বর্ষিত হওয়াটাই প্রত্যাশিত। এঁরা দুজনে ছিলেন ইডেন হিন্দু হস্টেলের আবাসিক। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার পর ইংলণ্ড যখন সে যুদ্ধে সর্বাত্মক-ভাবে যোগ দেয় তখন প্রেসিডেন্সি কলেজের রাজভক্ত কর্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ এবং ছাত্রগণ কীভাবে যুদ্ধ ব্যাপারে ইংরেজকে সাহায্যের জন্য সরকারের কাছে বাসখৎ লিখেছে সেকথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। ঐ সালে ১২ আগস্ট হিন্দু হস্টেলে একটি "War Meeting" হয়—কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেব সেই সভায় সভাপতিত্ব করেন। তিনি ছাত্রদের রাজভক্তি প্রদর্শনে উদ্বুদ্ধ করে ভাষণ দেন।[১] উক্ত সভায় দুটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রথম প্রস্তাব

১। Mr. James in a stirring speech explained the situation and pointed out how we could help the Government. (P. C. Magazine, Vol 1, No 1 p. 47)

যতে হোস্টেলের ছাত্রগণ নিজেদের সরকারের কাছে সঁপে দিচ্ছেন এই বলে যে সরকার যুদ্ধব্যাপারে তাঁদের যা করতে বলবেন তাঁরা তাই করবেন। এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন শ্রীপ্রবধনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সমর্থন করেন শ্রীযোগেশচন্দ্র চক্রবর্তী। এই প্রস্তাব হাতে নিয়ে অধ্যক্ষ জেমস নিজে যান হোটলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করতে এবং কলেজের ছাত্রদের ও অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের এই রাজভক্তির প্রগাঢ় প্রলাপ পেয়ে কারমাইকেল সাহেব অতিশয় তৃপ্ত হন।২ হিন্দু হোস্টেলের সেসময় মোট আবাসিক ছিলেন ২৫৮ জন ছাত্র। তাঁরা সকলেই উক্ত প্রস্তাবের সমর্থক ছিলেন তা নয়, কেননা প্রস্তাব সর্ববাদীসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়নি এবং সভায় ঠিক কতজন উপস্থিত ছিলেন তাও জানা যায় না। সুভাষচন্দ্র সেসময়কার হিন্দু হোস্টেলে। ছাত্রদের সম্পর্কে বর্ণনা দিয়েছেন এই বলে: "ইডেন হিন্দু হোস্টেলকে তো বিপ্লবীদের প্রধান আড্ডা বলে ধরা হত। এজন্য পুলিশ প্রায়ই এসে হোস্টেল খানাতল্লাসী করে যেত।" (ভারতপথিক, পৃ: ৭১)

হোস্টেলের ছাত্রদের এই মানসিকতার পৃষ্ঠপটে শ্রীপ্রবধনাথ ও শ্রীযোগেশচন্দ্রের রাজভক্তি সত্যই অভূতপূর্ব বলতে হয়। আরও মনে রাখতে হবে এই যে এঁরা দুজন ছিলেন ছাত্রদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ, প্রখর বুদ্ধিশালী ও বিদ্বান। ষষ্ঠ বর্ষের ছাত্র ছিলেন তাঁরা এবং তাও ইতিহাসের ছাত্র। যোগেশবাবু সেবার ইতিহাস সেমিনারে The Present European War এবং English Statesmanship in the Nineteenth Century নামে স্বরচিত প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন। প্রবধবাবুও প্রবন্ধ পাঠ করেছিলেন, তদুপরি তিনি ছিলেন ইতিহাস সেমিনারের সেক্রেটারি। ইতিহাস সেমিনারের প্রেসিডেন্ট ছিলেন ই. এফ. ওটেন, যাঁর প্রসঙ্গ পরে আমাদের বিশদভাবে আলোচনা করতে হবে। ওটেন সাহেবের রাজভক্তির বাড়াবাড়ি ছিল এবং তৎসঙ্গে ছিল ভারতীয়দের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা। প্রবধবাবু বা যোগেশবাবু কোনোদিন তার প্রতিবাদে কিছু বলেছেন বলে জানা যায়নি। বরং রাজভক্তি প্রদর্শনে তাঁরাও ছাত্রদের মধ্যে অগ্রণী হয়েছিলেন—এবং পরিণত জ্ঞান, চিন্তা ও বিবেচনার সাহায্যেই এই মত ও পথ তাঁরা নির্বাচন করেছিলেন। তাঁরা যখন যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নিজেদের সামিল করে সরকারের কাছে দাসখৎ লিখে দিলেন, সুভাষ সেসময় সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তিনি তখন মাত্র দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র; পাণ্ডিত্যে, মননশীলতায় ও কৃতিত্বে শ্রীপ্রবধনাথ ও শ্রীযোগেশ চন্দ্রের চেয়ে তিনি অনেক পিছনে পড়ে আছেন; তাঁর বয়স ও বুদ্ধি তখন যথেষ্ট পরিণত হয়নি। তবু ইয়োরোপের যুদ্ধের স্বরূপ তিনি প্রায় অভ্রান্তভাবে বুঝেছিলেন। যুদ্ধ যখন বাধে তখন তিনি রোগশয্যায়—টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত। কিন্তু সেটাই ছিল যুদ্ধের গতি প্রকৃতি বোঝার পক্ষে সবচেয়ে ভালো অবকাশ—কেননা, হাতে কোনো কাজ ছিল না। সব দিক চিন্তা করে এই সিদ্ধান্তে এসে তিনি পৌঁছলেন যে ইংরেজের যুদ্ধে ভারতের কোনো স্বার্থ নেই, অতএব ভারতের তাতে করণীয়ও কিছু নেই। ভারতের একমাত্র উদ্দেশ্য হবে স্বাধীনতা লাভ। যুদ্ধ তাঁকে এ শিক্ষাও দেয় যে স্বাধীনতা লাভ ও রক্ষা করতে হলে ভারতের নিজস্ব সামরিক বাহিনী চাই।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ বাধার সময়ে রোগশয্যাশায়ী, দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র সুভাষ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে সেই সিদ্ধান্তই বাস্তবে তিনি প্রয়োগ করেছিলেন। একে শুধু দৃষ্টি বলব না। এই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। দেশের প্রতি তাঁর ভালবাসা ও আনুগত্য জ্ঞান ও গভীর ছিল বলেই সহজ

২। The resolutions were placed by our Principal personally in the hands of His Excellency Lord Carmichael, who, we hear, was very pleased with them. (Ibid)

সত্য, তাঁর চোখে সহজভাবেই ধরা পড়ত—আর তারই অভাবে প্রবীণ বিজ্ঞ বিচক্ষণদের চিন্তাধারা রাজভক্তির ভরা-পাকে নিমজ্জমান হয়ে যেত। ইংরেজ সরকারের কলেজে সুভাষের ঠাঁই বেশিদিন হওয়া সম্ভব ছিল না—কিন্তু সেই কলেজের খাতায় বিরাট বিরাট প্রশংসাবাণী যাঁদের নামের পাশে লিপিবদ্ধ আছে এবং আজও থাকে, রাজভক্তির চড়া মূল্যেই তাঁদের তা কিনতে হয়েছে, একথা যেন উল্লেখ থাকে। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস লেখকগণ ১৯৫০ সালের স্বাধীন দেশে বসেও অতি কৃপণ হস্তে সুভাষের নামে দু'এক ছত্র লিখেছেন এবং যে কৃতিত্ব তাঁর প্রাপ্য তা সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত করেছেন অন্য স্কন্ধে—একে অবিচার না বলে প্রেসিডেন্সি কলেজের ঐতিহ্যের স্বাভাবিক পরিণাম বলেই বলতে ইচ্ছা হয়।

দুই

প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষচন্দ্রের ছাত্র থাকাকালীন নানাবিধ ঘটনার কথা নানা সূত্র হতে জানা যায়। এ বিষয়ে তাঁর সমসাময়িকদের সাক্ষ্য রয়েছে। কিন্তু কলেজের ম্যাগাজিনটি এ বিষয়ে একটি রত্নখনির মতো। আজও সেই ম্যাগাজিনটি প্রকাশিত হয় এবং তার মান যথেষ্ট ভালো। কিন্তু কখনো কোনো উপলক্ষেই সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে কোনো রচনা তাতে প্রকাশিত হয় না। অথচ এই কলেজের প্রাক্তন ছাত্রদের সম্পর্কে রচনা প্রকাশিত হবে, এই ছিল ম্যাগাজিন প্রতিষ্ঠাতাদের অভিমত। এবং প্রথম যখন পত্রিকাটি বের হয় তখন কলেজের লোকপ্রসিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্রদের সম্পর্কে আলোচনার দায়িত্ব নেন সুভাষচন্দ্র এবং রমাপ্রসাদ মুখার্জি। সুভাষ ছাত্র থাকা কালে এই সিরিজের বেশ কয়েকটি লেখা বেরিয়েছিল। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত হয় তাঁর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে—লেখক রমা প্রসাদ মুখার্জি। দ্বিতীয় সংখ্যায় তাঁর আশুতোষ মুখার্জি সম্পর্কে লেখেন যোগেশ চক্রবর্তী ও শিবদাস মুখার্জি। তৃতীয় সংখ্যায় পুনরায় তাঁর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে এবং স্যার তারকনাথ পালিত সম্পর্কে প্রবন্ধ বের হয়। দ্বিতীয় বর্ষ প্রথম সংখ্যায় তাঁর রাসবিহারী ঘোষ সম্পর্কে লেখেন রমা প্রসাদ। এ ছাড়াও কলেজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিশিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির কর্মধারা সম্পর্কে বিশেষ আলোচনা প্রকাশিত হয়েছিল। সুভাষ নিজে কোনো লেখা লিখেছেন বা লিখতে সাহায্য করেছেন কিনা জানিনা, কিন্তু তাঁর উদ্যোগ এ সকল বিষয়ে নিশ্চয়ই কার্যকরী হয়েছিল—কেননা দায়িত্ব নিয়ে তা পালন করাই তাঁর চরিত্রের বৈশিষ্ট্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজের আবহে দেশাত্মবোধসম্পন্ন ভারতীয় ছাত্ররা সেদিন পদে পদে যদি ক্ষুব্ধ হয়ে থাকে তবে তাতে অবাক হবার কিছু নেই। শুধু অধ্যক্ষ দেবল সাহেব বা মিঃ ওটেনের মতো ইংরেজরা নন, বাঙালী অধ্যাপকদের মতামত ও দাসসুলভ মনোবৃত্তিও ছাত্রদের ক্ষুব্ধ না করে পারেনি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপক ছিলেন মিঃ ই, এফ, ওটেন এবং তাঁর সহকারী অধ্যাপক ছিলেন মিঃ জে, এন, দাসগুপ্ত, অক্সফোর্ডের বি, এ, বার এট-ল। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগেরও অধ্যাপক হয়েছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে এঁর কিছু কাজও আছে। ভারতীয় ইতিহাসের যথাযথ পাঠ ও গবেষণার গুরুত্ব বর্ণনা করে ইনি একটি ভাষণ দেন, প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকার প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যাতেই ভাষণটি মুদ্রিত হয়েছিল। তিনি বলছেন যে প্রাকবৃটিশ যুগের ভারত তমসাচ্ছন্ন এবং সে সময়ের ইতিহাস লেখা অসম্ভব ও অপ্রয়োজনীয়। ভারতের ইতিহাসে গৌরবোজ্জ্বল ঘটনা হচ্ছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবিজয়—নেপোলিয়নের ইয়োরোপ বিজয়ের সঙ্গেই একমাত্র সে ঘটনার তুলনা চলে। তারপর থেকে, বিশেষত মহারাণী ভিক্টোরিয়া ভারতশাসন ভার গ্রহণ

করার পর থেকে এই দেশে যে বিপুল নৈতিক ও বৈষয়িক প্রগতি এসেছে তার যথাযথ ইতিহাস রচনাই ভারতীয় ঐতিহাসিকদের সর্বপ্রধান কর্তব্য ও দায়িত্ব।১

যতদিন আগে প্রেসিডেন্সি কলেজেরই একজন পুরাতন ছাত্র, বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের ও স্বজাতির ইতিহাস রচনার ও অতীত ঐতিহ্যের সমস্ত নিদর্শন ও প্রমাণ সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন বাংলার স্বদেশী যুগে ভারতের প্রাচীন সভ্যতার গৌরবগাথা রচনায় বহুজন ব্যস্ত হয়েছেন এবং বিদেশেও ভারতীয় সভ্যতা সম্পর্কে নব কৌতূহল ও অনুসন্ধিৎসা জাগ্রত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজের আবহে সেসব ঘটনা কোনো আলোড়ন তুলতে পারেনি। স্যার উইলিয়াম হাণ্টার ভারতের একখানি সমগ্র ইতিহাস রচনার উদ্দেশ্যে পঁচিশ বছর ধরে বহু তথ্য ও দলিলাদি সংগ্রহ করেছিলেন, নেপাল নামে একটি জাহাজে সেইসব জিনিস বাহিত হবার কালে জাহাজ ডুবির ফলে সেসবই খোয়া যায়। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক হাণ্টার সাহেবকে সান্ত্বনা দিয়ে লিখছেন যে ঐ ক্ষতির বদলে বরং তাঁর লাভই হয়েছে, কেননা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের চর্চা না করে শুধু বৃটিশ যুগের চর্চা করলে সুফল অনেক বেশি পাওয়া যাবে। ইতিহাস-চেতনার এই বৈত্ত দেখে আজ আমরা বিস্মিত হতে পারি; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের তৎকালীন কর্তৃপক্ষের ও অধ্যাপকদের মানসিকতা ছাত্রদের কেন বিমুক্ত করত তারও হদিশ এতে মিলবে।

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের নজীরে তৎকালীন কলেজের মানস পরিমণ্ডল সম্পর্কে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ করা যায় না। অধ্যাপকদের যেসব রচনা এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল তাদের মান সাধারণ নয়। সে সময়ের অধ্যাপকদের মধ্যে আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় এবং আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু ভিন্ন ভাতীয় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই আর কেউ কোনো অবদান রেখে যাননি। এই পত্রিকার প্রথম দুবছরের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের যোগাযোগ ছিল, তৃতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় তিনি কলেজ হতে বিতাড়িত হবার পর। এই দুবছরে পত্রিকায় প্রকাশিত উল্লেখযোগ্য রচনা গুলির মধ্যে বিভিন্ন ছাত্র কর্তৃক লিখিত Old Presidency College Men Seriesএর কয়েকটি পরিচিতি মূলক লেখা তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র সুধাময়রঞ্জন দাশগুপ্ত লিখিত Henry Louis Vivian Derozio, ষষ্ঠ বর্ষ ফিসিক্স ক্লাসের ছাত্র যতীন্দ্রমোহন দত্ত লিখিত Aviation, চতুর্থ বর্ষে পদার্পণ করার পর সুকুমার রঞ্জনের দ্বিতীয় রচনা Captain David Lester Richardson, সুধীন্দ্র বসুর লেখা Dr. Jagadis Chandra Bose in America, অধ্যাপক জে. সি, করাজি লিখিত চারটি কিস্তিতে সমাপ্ত War and Finance, অধ্যাপক জি, আর, রাও লিখিত দুই কিস্তিতে সমাপ্ত Aspects of Idealism in Life and Literature, অধ্যাপক ই, সি হ্যারিসন লিখিত The Storms of Bengal প্রভৃতির নাম করা যেতে পারে। কিন্তু এই দুবছরে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সম্পর্কে আলোচনাই ম্যাগাজিনে বেশি স্থান ও গুরুত্ব পায়—কিন্তু কোন আলোচনাই নিরপেক্ষ বা বস্তুতান্ত্রিক হয়নি; শুধু পক্ষে ইংরেজ প্রগতি গাওয়াই যেন পত্রিকা প্রকাশের মূল লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়, এবং ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি

১। The present British Indian Empire of which we all are proud to be citizens has been built up in no inconsiderable measure by the labours of public servants of this stamp May the School of History in this University teach our young historians justly to estimate the value of the services, alike to England and to India, rendered by these empire-builders। (P. C. May, Vol, No 1)

অশোভন ও রূঢ় আক্রমণও ছিল পত্রিকাটির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জনৈক জি, এস, দত্ত, আই, সি, এস লিখিত The Story of Bharatmata নামে একটি রচনা পত্রিকার প্রথম বর্ষ তৃতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। শ্রীযুক্ত দত্ত তৎকালে এই কলেজের ছাত্র বা অধ্যাপক কিছুই ছিলেন না, ফরিদপুর থেকে তিনি লেখাটি পাঠান। যুগ যুগ ধরে বহু দুঃখ দুর্দশা ও গ্লানির ভিতর অতিবাহিত করে অবশেষে ভারতমাতা কী ভাবে ব্রিটানিয়া নামক এক নবীনা পরমহিতৈষিণী[১] নারীর দেখা পেলেন এবং ব্রিটানিয়া ও তাঁর সন্তানদের প্রতি ভারতবাসীদের মনোভাব কীরকম শান্ত, কৃতজ্ঞতাপূর্ণ ও শান্তপরায়ণ হওয়া উচিত শ্রীযুক্ত দত্তের প্রতিপাদ্য বিষয় তাই।

১৯১৪ সালে বাংলার স্বদেশী আন্দোলন যখন দ্বিতীয় পর্যায়ে পৌঁছেছে, যতীন্দ্রনাথ মুখার্জির নায়কত্বে সারা ভারতব্যাপী সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি যখন প্রায় বাস্তবের সম্ভাবনার সীমায় উপস্থিত, এমনকি জার্মানীর সঙ্গে যোগাযোগ করার পরিকল্পনা নিয়ে নরেন ভট্টাচার্য প্রমুখ কয়েকজন বিপ্লবীও চলে গেছেন তখন প্রেসিডেন্সি কলেজ পত্রিকা মারফৎ এই উপদেশামৃত বর্ষণ চলেছে যে ভারতমাতার কাতর আবেদনে তাঁর দুঃখের সমাপ্তি ঘটাবার সুমহান উদ্দেশ্যে গুরুর ভূমিকা নিয়ে ইংরেজরা এদেশে এসেছে। প্রথম প্রথম এই গুরুদেবের দল বাধ্য হয়েই একটু কঠোর শাসনের আশ্রয় নিয়েছেন, উদ্ধত ও অপদার্থ ভারতবাসীদের মঙ্গলার্থে তাঁদের বিধান আপাতকঠোর মনে হলেও তাঁদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা অনমীচীন এবং তা ব্যর্থ হতে বাধ্য।২

যুগে যুগে ভারতীয়রা ইংরেজ গুরুর পদতলে বসে যে শিক্ষা লাভ করেছে তার ফলে তারা সুখ, শান্তি, সমৃদ্ধি, সংস্কৃতি ও সভ্যতার দ্বার উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছে। যেদিন ইন্দ্রপ্রস্থে ইংরেজরাজের দরবার বসেছিল সেদিন হতে ভারতের আর সুখের সীমা নেই। ভারতমাতার জীবনের সাধ পূর্ণ হয়েছে তিনি এখন পূর্ণ সৌন্দর্যে উদ্ভাসিতা ও আনন্দিতা। আজ ইংরেজ যখন দুষ্কালে বিপদে পড়েছে তখন কৃতজ্ঞ চিত্তে ভারতমাতা যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের হয়ে লড়ার জন্য নিজের সন্তানদের পাঠাচ্ছেন। হাজার হাজার

১ In utter despair Bharatmata appealed to her friend and sought her aid in reducing her own unruly children to peace and order ; and Britannia, ever ready to assist those who were in need of help, sent some of her best and wisest sons to act as "guru" (teacher) to the quarrelsome children of Bharatmata—and she called the guru the "Governor General." p 206

২ | And at first the Guru had to be very very strict, and when need arose, to chastise them—cruelly as the children thought—to bring the unruly once into submission, for like naughty children they knew not that it was all done for their own good and at their mother's wish. And one day the naughty ones rose in rebellion and wellnigh killed the well-meaning guru and his assistants, but they failed in their foolish adventure, for Providence had willed that the beneficient mission of Britannia should not fail and that the cherished hope of Bharatmata should not be foiled. And inspite of these occasional foolish acts of violence on the part of the children the wise guru was true to his duties and was not vindictive ; and Britannia, who knew well how to correct unruly children, did not lose hope in ultimate success in delivering Bharatmata from her age-old distress. (p. 207)

ভারতীয় যুদ্ধক্ষেত্রে ইংলণ্ডের জন্য প্রাণ বলিদিচ্ছে—এর চেয়ে হর্ষের দৃশ্য আর কী কল্পনা করা যায়? প্রাচীন কালে ভীষ্ম, অর্জুন, দ্রোণ, ভীম প্রভৃতি নামে পরিচিত যে মহাবীরগণ ভারতে বর্তমান ছিলেন, আবার তাঁরা নবদেহে নবজন্ম নিয়েছেন এবং তাঁরাই এখন গঙ্গা সিং, নায়েক দারোয়ান, খোদাদাদ প্রভৃতি নাম নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বলি দিচ্ছেন। তাই ভারতমাতার দুচোখ দিয়ে আনন্দাশ্রু ঝরে পড়ছে, তিনি উল্লসিতা ও গর্বিতা। ব্রটিশ সম্রাটের জন্য জীবনদানের ভিতর দিয়ে যাতে ভবিষ্যতের জন্য ভারতবাসী ইংরেজের সঙ্গে চির প্রেম, কৃতজ্ঞতা ও পারস্পরিক সহানুভূতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছে।৩

এই অতি নিম্ন মানের রচনাটি সম্পর্কে সবিস্তারে আমরা আলোচনা করলাম এই কারণে প্রেসিডেন্সি কলেজের অধ্যক্ষ জেমস সাহেবের মনোভাব এতে বোঝা যাবে। কলেজ ম্যাগাজিনের সম্পাদকের মনোভাব সম্পর্কেও আর ভুল বোঝার অবকাশ থাকে না। তাঁদের রুচির প্রশংসা করা যায় না, কিন্তু প্রশ্ন শুধু রুচি নিয়ে নয়। তাঁদের উদ্দেশ্য কী ছিল? ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতি নিজেদের আক্রোশ গোপন রাখাও তাঁরা দরকার মনে করেননি। আর অতি উচ্চকণ্ঠে রাজভক্তি প্রচার করার জন্য আসরে নামাটাই ছিল অধ্যক্ষ সাহেবের পত্রিকা প্রকাশের একমাত্র উদ্দেশ্য। এ পরিস্থিতিতে ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের একটা প্রচণ্ড সংঘাত ঘনিয়ে ওঠাই ছিল স্বাভাবিক।

(ক্রমশঃ)

৩। And so atlast Bharatmata had the cherished hope of her life fulfilled, and a great and mighty flow of happiness rejuvenated her own life and brought the strength and activity of youth, no less than its beauty and grace, back to her again. ...And forever after, the children of Britannia and Bharatmata became bound together, in the cause of justiice and humanity, of truth and learning, in an indissoluble bond of mutual sympathy, gratitude and love. (p. 203)

রমাঁ্যা রলাঁ

১৮৬৬-১৯৪৪

ডঃ কালিদাস নাগ

রমাঁ্যা রলাঁর জন্ম ফ্রান্সের অন্তর্গত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ বারগাণ্ডি প্রদেশের ক্লামসি নামক গ্রামে এক ধনবিত্ত পরিবারে। পুত্রের শিক্ষার ক্ষেত্রে এ্যাডভোকেট্ পিতার যথাশক্তি চেষ্টা সাধারণ গ্রামের বিদ্যাতেই ক্ষান্ত থাকেনি, ছেলেকে তিনি দেশের শ্রেষ্ঠ স্কুল একল নর্মেল (Ecole Normal) এ দিয়েছিলেন। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রোম নগরীর ফরাসী ইন্সটিট্যুট স্কুলে তিনি যোগ দেন। রোমেতেই ইয়োরোপের শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক ও শিল্পীদের সংস্পর্শে আসেন। এঁদের মধ্যে জার্মানীর মালভিডা ভন মিসেনবুগ-এর নাম করা যায়,—ইনি বিখ্যাত জার্মান সঙ্গীতবিদ বিঠোফেন, ওয়াগনার প্রভৃতির বন্ধু,—যাঁদের উপর পরে রমাঁ্যা রলাঁ অনেকগুলি উৎকৃষ্ট সঙ্গীত রচনা লিখেছেন।।

তরুণ রলাঁ মালভিডা ভন্ মিসেনবুগের কাছে সঙ্গীতে তাঁর বিশেষজ্ঞ হবার ব্যগ্র বাসনার কথা ব্যক্ত করেন, এবং ইটালিতে যখন এঁর উদার ও মহা সাহচর্যে রলাঁ ছিলেন তখনই জাঁ ক্রিস্তফ্ নভেলের কল্পনা তাঁর মনে আসে। নভেলের পরিকল্পনা হয় ইটালিতে এবং ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ, বিশেষভাবে জার্মানী, ফ্রান্স, স্পেন এবং আরো কতকগুলি দেশ ভ্রমণ এবং সেই অভিজ্ঞতায় তিনি বইটি সমৃদ্ধ করেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে রমাঁ্যা রলাঁ ইটালী এবং ফরাসী বিপ্লবের যুগ সম্পর্কে তাঁর চিন্তাধারা নাটকের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার প্রচেষ্টায় রত আছেন দেখা যায়। তখন য়ুরোপে যুদ্ধ সুরু হয়েছে (১৮৯৯); যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিজোট আফ্রিকা বিভক্ত করে উপনিবেশ স্থাপনে দৃঢ়সঙ্কল্প এই যুদ্ধ ভিত্তি করে তাদের বিরুদ্ধে একটি নাটক লিখে তিনি এই শতাব্দী সমাপ্ত করলেন।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯২০ সালে ফ্রান্সে থাকার অমিত সৌভাগ্য আমার হয়। রমাঁ্যা রলাঁ এবং তাঁর ভগ্নী রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন এবং কবিগুরু অনুরোধপূর্বক এই পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেন। প্যারীতে তাঁর ফ্ল্যাটে আমাকে আদরের জন্য রলাঁর ভগ্নী যা বলেন রলাঁর নাম আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। এখানে তাঁর ভ্রাতা মসিয়ে রলাঁর সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ আলাপের সুযোগ তিনি করে দিয়েছিলেন।

যতদিন রলাঁ জীবিত ও কর্মক্ষম ছিলেন, সকল ভারতীয় লেখক ও নেতা, লালা লাজপত রায়, ডঃ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, সুভাষ বসু এবং পণ্ডিত নেহরু, তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ আলোচনা করেন। ম্যাডেলিন রলাঁ একবার আমার অধ্যাপক স্যুল লুফের ধারক্ৎ,—তিনি প্যারীতে ইনস্টিটিউট অব্ লিভিং ওরিয়েন্টাল ল্যাংগুয়েজের সঙ্গে যুক্ত,—একজন ভারতীয়ের সন্ধান করেন যিনি মসিয়ে রমাঁ্যা রলাঁকে তাঁর প্রয়োজনীয় তথ্যাদি সরবরাহ করতে পারবেন। এই কাজের জন্য নির্বাচিত করা হয় আমাকে, এবং প্রায় দশবছর কাল (১৯২০-৩০) কঠিন পরিশ্রম সহকারে আমি রমাঁ্যা রলাঁকে তাঁর অনবদ্য জীবনীগ্রন্থ গুলির জন্য,—যথা (১) মহাত্মা গান্ধী-১৯২২, (২) শ্রীরামকৃষ্ণ এবং

(৩) স্বামী বিবেকানন্দ-১৯২৯-৩০,—যেগুলি তাঁর "লিভিং থট্ অব্ হিন্দুইজম্ লাইভ্‌স্"(১) বিটোফেন ১৯০৩, (২) মাইকেল এঞ্জেলো-১৯০৮ এবং (৩) লিও টলস্টয়-১৯১০-এর অনুসারী-তথ্যাদি সরবরাহ করি। এই সুখের দিনগুলির কথা আমি আবার ১৯৫০'এ আমার বই টলস্টয় ও গান্ধী' রচনার সময় স্মরণ করেছিলাম।

জীবনীগুলি লেখারপর রলাঁ তাঁর '['রিভার'-] বন্ডেল" জাঁ ক্রিস্তফ্ রচনায় মন দেন। তাঁর বন্ধু পেগুঁর (Peguy) দ্বিসাপ্তাহিক ফরাসী পত্রিকায় এই রচনা ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়। পেগুঁ প্রথম মহাযুদ্ধের সময় মারা যান। এঁর উপর রলাঁ তাঁর শেষ 'স্মৃতি' রচনা করেন, ইতিহাস প্রসিদ্ধ ভার্সেলির টেম্পল ক্যাথিড্রেল-এর নিকটবর্তী তাঁর স্বগ্রামে অন্তরীণ থাকাকালে (১৯৪৩-৪৪,)। এখানেই ফরাসী আক্রমণকারী 'নাজি'দের (১৯৩৯-৪৪) হাতে প্রায় বন্দী অবস্থায় তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, যদিও তাঁর প্রতি আর্থানদের ব্যবহার ভদ্র ছিল।

ভারত এবং ভারতের মাধ্যমে এশিয়ার অন্যান্য দেশগুলির সঙ্গে রমাঁ রলাঁর সম্পর্ক একটি গবেষণাগ্রন্থের বিষয় হওয়া উচিত। ব্যক্তিগতভাবে আমি আমি এবং তাঁর জীবনীগ্রন্থ 'মহাত্মা গান্ধী'—১৯২১-২৩, 'শ্রীরামকৃষ্ণ'-১৯২৯-২৮ এবং 'স্বামী বিবেকানন্দ—১৯৩০-৩১ প্রভৃতিতে যে দুটুর পরিধান উদাহরণ তিনি রেখেছেন, তা থেকে জানা যায় যে তাঁর মন ইয়োরোপীয় সভ্যতাই যে শ্রেষ্ঠ এই ধারণা থেকে মুক্ত ছিল ; এবং এশিয়ার প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা এবং এশিয় সভ্যতা ভারতের চিন্তানায়ক রবীন্দ্রনাথ এবং গান্ধীর মধ্য দিয়ে যেভাবে প্রতিফলিত হয়েছে, সেই ভাবধারাই তিনি চিরদিন অনুসরণ করে এসেছেন। এই দুই মহান ভারতীয়ের প্রভাব তাঁর মনে চিরদিন ছিল। রবীন্দ্রনাথই সম্ভবত প্রথম ভারতীয় লেখক, যিনি তাঁর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জাঁ ক্রিস্তফ্-এর ইংরেজি অনুবাদ (মিলবার্ন কানান কৃত) ক্রয় করেন। এই বই বাঙলায় অনুবাদ কতকাংশ আমি এবং মাসোলের প্রতিষ্ঠাতা-সম্পাদক আমার স্বর্গত ভাই গোকুলচন্দ্র নাগ, করেছিলাম।

ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের প্রতি রলাঁর প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সমর্থনের কথা তাঁর "চিঠি" "ডায়েরী" (Inde) থেকে জানা যায়। "Amis de R. Rolland" বিশ্বপ্রদর্শনী ব্যবস্থাপনায়, — এটি এখন প্যারি ইউনিভার্সিটিতে স্থিত,— আমি আমার রলাঁকে মূল্যবান মূল চিঠি এবং দলিলপত্র সরবরাহ করি। রবীন্দ্রনাথের মত রলাঁ বিশ্বশান্তির ক্ষেত্রে একমাত্র বিশিষ্ট হোতা এবং আমাদের এই সমস্যাজর্জরিত যুগে সমাধানের পথ তাঁদের রচনা থেকেই সন্ধান করতে হবে। রামমোহন রায়ের মৃত্যু শতবার্ষিকীতে রলাঁ আমাদের সঙ্গে যোগ দেন। তিনি সোভিয়েট রিপাব্লিকেরও একজন মহান মিত্র ছিলেন। সোভিয়েট রাশিয়া সম্পর্কে তাঁর অসংখ্য চিঠি এবং লেখা এবং ষ্টেফি প্রমুখ সোভিয়েট লেখকবৃন্দের,— যাঁরা তাঁর প্রতি গভীর ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন,— রচনা থেকে জানা যায়।

রবীন্দ্রনাথের মত জীবনের শেষ দিকে রলাঁ রাশিয়া ভ্রমণ করেন। তাঁর রাশিয়া ভ্রমণ সম্পর্কে মূল্যবান রচনাদি আমার রলাঁ আশা করি প্রকাশ করবেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই দুই ঋষি রবীন্দ্রনাথ ও রলাঁ—এবং এঁদের সঙ্গে বিশ্বের শান্তিপ্রয়াসী শক্তিগুলি মিলিত হয়ে বিশ্বে আশা করি শান্তি আনবে।

রলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের প্রেরণাতেই আমি ১৯২০ সালে

"অর্থশাস্ত্র" বা হিন্দুবিজ্ঞান শাসনতন্ত্র সম্পর্কে আমার গবেষণাপত্র প্যারি ইউনিভার্সিটিতে পেশ করি। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' ফরাসীতে তর্জমা করার সময় আমি রমাঁ। রলাঁ এবং ম্যাডেলিন রলাঁর প্রভূত উৎসাহ পাই এবং তাঁদেরই জন্য শক্তিমান করাসী কবি জে. পি. জুভ্ (Jouve) -এর আন্তরিক সহায়তা লাভ করি।

রলাঁর পরবর্তী ধারাবাহিক উপন্যাস "দি এনচ্যান্টেড সোল"; ইংরেজিতে তার অনুবাদ হয়, এবং তাঁর প্রবন্ধ "আই শ্যাল্ নট্ রেস্ট্" এর কথা তা স্মরণ করায়, কারণ রবীন্দ্রনাথের মতো রলাঁরও জীবন শেষদিন পর্যন্ত দেশ ও মানবের সেবায় নিয়োজিত ছিল। মাদাম রমাঁ্যা, রলাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর যে রচনাবলী প্রকাশ করার দায়িত্ব নিয়েছেন সেগুলি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁর সম্পূর্ণ গ্রন্থবিবরণী সম্পর্কে আমাদের অপেক্ষা করতে হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে তাঁর অনুরাগীদের সঙ্গে রলাঁর যে বিস্তৃত পত্রালাপ আছে সেগুলি একত্র করে একটি আলাদা বই হওয়া উচিত। তাঁর প্রিয়তমা জননী এবং ভগ্নি ম্যাডেলিন রলাঁর সঙ্গে তাঁর যে পত্রালাপ এবং আর যে পত্রগুলি মাদাম রলাঁকে আমি দিয়েছি সেগুলি ইতিমধ্যে পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয়েছে। মহাত্মা গান্ধীর কাছে তাঁর পত্রগুলি আশা করি গান্ধী-জন্মশতবর্ষপূর্তির আগে (১৯৬৯) প্রকাশিত হবে। তাঁর সাম্প্রতিক জীবনীকার শ্রীসিল্ভারেলাল এই পত্রগুলির অসামান্য মূল্য সম্পর্কে অবহিত আছেন এবং আমার বিশ্বাস সহকর্মী, যাঁরা ভারত ও এশিয়ায় রবীন্দ্রনাথের যুগ এবং ফ্রান্স ও ইয়োরোপে রলাঁর যুগ প্রত্যক্ষ করেছেন, তাঁদের সম্পর্কেও আমি এই আশা পোষণ করি। চিন্তা ও ভাবধারার এই মূর্ত দুর্লভ সমন্বয় পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে অন্যান্য সেতুবন্ধস্বরূপ, যে-সেতু রলাঁ ও রবীন্দ্রনাথের নির্মাণ। বিশ্বশান্তিব্রতের পূজারী ও সুহৃদ রলাঁকে নমস্কার। তিনি দীর্ঘজীবি হোন। তাঁর রচনা চিরস্থায়ী হোক।*

---

* ইন্দুভূষণ রলাঁর সত্তরতম জন্মদিবসে নিখিল ভারত রমাঁ রলাঁ জন্মশতবার্ষিকী কমিটির উদ্যোগে আহূত সভায় প্রদত্ত। (কমিটির সম্পাদক হিরণ্ময় রায় চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত) ইংরেজি বক্তৃতার শ্রীসত্যেন বসু কর্তৃক বঙ্গানুবাদ।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

Manufacturers of :

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

আমার ভারতবর্ষ — বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

আমার ভারতবর্ষ
চল্লিশ কোটি নগ্ন মানুষের
যারা সারাদিন রৌদ্রে খাটে, সারা রাত ঘুমাতে পারে না
ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে ;

কত রাজা আসে যায় ইতিহাসে, ঈর্ষা আর দ্বেষ
আকাশ বিষাক্ত করে
জল কালো করে, বাতাস ধোঁয়ায় কুয়াসায়
ক্রমে অন্ধকার হয়
চারদিকে ষড়যন্ত্র, চারদিকে লোভীর প্রলাপ
যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ আসে পরস্পরের মুখে চুমু খেতে খেতে
মাটি কাঁপে সাপের ছোবলে, বাঘের থাবায় ;

আমার ভারতবর্ষ চেনেনা তাদের
মানেনা তাদের পরোয়ানা ;
তার সন্তানেরা ক্ষুধার জ্বালায়, শীতে, চারদিকের
প্রচণ্ড মারের মধ্যে
আজো ঈশ্বরের শিশু, পরস্পরের সহোদর ॥

ক্রমেই বয়স বাড়ে কিরণ শঙ্কর সেনগুপ্ত

ক্রমেই বয়স বাড়ে, চলে' যাই সূর্যের পশ্চিমে।
একটি গহ্বর যেন কোথাও সমুখে
অন্ধকার বুকে নিয়ে সারাক্ষণ
আলো চাওয়া রৌদ্র থেকে দূরে সরে গিয়ে
তপস্বীর মতো কোনো সংকল্পে নিরম
ধ্যানস্থ, অটল। এই গহ্বরের দিকে

সবাই এগিয়ে যাবে সারিবদ্ধ বয়সানুক্রম
স্থিরতায়, রৌদ্র যদি বুকে লেগে থাকে,
যদি আলো আকাঙ্ক্ষার চেউয়ে সঞ্চারিত,
একটি মেধাবী কোনো শেষ অন্বেষণে
সব ঝরে হেমন্ত হাওয়ায়।

ক্রমেই বয়স বাড়ে, প্রাচীরের কোণে
শাদা কালো হিজিবিজি, বাঁকানো রেখায়
দেয়ালে অনেক ছবি, স্মৃতির দেয়াল
ক্রমশ অস্পষ্টতর, নারীর শরীর, শিশুমুখ
অতি অন্তরঙ্গ কিন্তু কেমন সুদূর।

ক্রমেই বয়স বাড়ে, চলে যাই সূর্যের পশ্চিমে,
গহ্বরের কাছাকাছি এখন কোথাও
সূর্যকেও ক্ষুদ্র মনে হয়॥

আয়নাবতী : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

কারা যেন দুয়ারে দাঁড়িয়ে।
তাহলে কপাটে খিল দিয়ে
আয়নায় আঙুল বাড়িয়ে
কাকে তুমি চাও?

কাকে, বলো কাকে, বলো কাকে।
নিজেকে? কে যেন দূরে ডাকে।
তাহলে স্মৃতির ভূতটাকে
দূর করে দাও।

যে এই প্রাসাদে প্রতিধ্বনি,
গড়িয়ে গড়িয়ে নীচে নামে,
কেন তাকে খিলানে ও থামে
আবার হারাও?

বয়সের হাওয়া যাকে মারে,
আয়না কী তাকে দিতে পারে?
তবে আর কাচের পাহাড়ে
কাকে তুমি চাও?

কাকে, বলো কাকে, বলো কাকে।
নিজেকে? কে যেন দূরে ডাকে।
তাহলে স্মৃতির ভূতটাকে
দূর করে দাও।

'আমরা ক'জন সৌরলোকের বামন'

অশ্রুকুমার সিকদার

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী সমবয়সী কবি—তিনজনের মধ্যে সব চেয়ে বেশী বয়সের ব্যবধান চার বছরের। এঁদের মত সমকালীন কবিদের নিয়ে আলোচনা করতে বসলে সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রধান সূত্র ›বৈধ মিথ্যা মনে হয়। একই যুগপরিবেশ সকলকে একভাবে আচ্ছন্ন করে রাখে। বরং এই কথাই সত্য মনে হয় কবিতার ইতিহাস, কবিতা কেবল শুধু সাহিত্যের ইতিহাস নয়, বস্তুত তার টেকনিকের ইতিহাস। বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় অন্তর্বিক্ষুব্ধ শতাব্দীর রক্ত চাপ বেঁধে থাকে, তার রং যত না লাল তার চেয়ে বেশী কালোর নিকটবর্তী। জমাট-বাঁধা রক্ত সম্বন্ধে এই কবির একটি বিকারগ্রস্ত আকর্ষণ আছে, অসুস্থ উল্লাসে তিনি তার কাছে বার বার ফিরে ফিরে আসেন—(১) রবীন্দ্রনাথের ছবি ইঁদুরের রক্তের ভিতরে···(২) চৌকাঠে রক্তের দাগ, ঘর ভর্তি মানুষের হাড়···(৩) অপরের রক্তে মেজে ভাসলে আমার বুক হিম/হয়ে উঠত···(৪) সকলই অমৃত হত যদি/মানুষের হৃদয়ে ইঁদুর/আর রক্ত করত না বসি (৫) মুখ দেখতে দেখতে দেখতে দেখতে চোখ ফেরালে মনে হবে রক্ত, মনে হবে ঘর ময় রক্ত···(৬) এখন পৃথিবী লাল করবচার বৃষ্টি নিয়ে শরীরের রক্ত আর পুঁজ/করুণের বন্ধনায় অর্ধেক উন্মাদ। (৭) সারাটা দিন রক্ত বমি করে/মৃতের মত একলা জেগেছিলাম···(৮) সব দৃশ্য বদলে গেছে, সব মুখ এখন লোণিত/ডুবে গেছে, চাপ চাপ রক্ত আজ ছেঁকে বাদে ট্রামে···রাত্রির নির্জনে/কোঁটা কোঁটা রক্ত ঝরে পাপের বেরে অন্ধ নর্দমায়। (৯) তোমাকেও সহোদর বলে ডাকতে ভয় নাই/পাছে রক্ত ওঠে, পাছে ঝিনঝি দিয়ে ফের রক্ত ওঠে।

অন্যদিকে অরুণকুমার সরকারের কবিতায় ক্রমাগত হাওয়া বয়, অমল উল্লসিত যৌবনের স্মৃতিবাহী বাতাস। (১) আকাশের মাঠ থেকে হাওয়ার রাখাল/তাড়া করে নিয়ে আসে···(২) ও হাওয়া, ব্যাকুল হাওয়া, কেন তোর বকুনি অযথা। (৩) হাওয়ায় শিউরে উঠছে দেখছে নিজেরই বিম্বিত মুখ (৪) যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে···(৫) যৌবন তার এক মুঠো ধুলো আকাশে ব্রাউন রঙের রোদে বিকেলের ধর্মতলায় ঘূর্ণি হাওয়ার প্রত্যাশী। (৬) সখী, মুখরিত দক্ষিণ হাওয়া চলে গেছে উত্তরে। (৭) ও হাওয়া, পাগল হাওয়া, কল্পনা উধাও (৮) এসো গো অপ্সরী হাওয়া, নাচো, গাও, স্ফূর্তির ফোয়ারা (৯) উত্তরের হাওয়া/ধুলোয় বিভ্রান্ত করে ঘুমতে দেয় না। 'রক্ত' এবং 'হাওয়া' এই দুইটি ইমেজ ব্যবহারের ধাওয়া থেকে দুইজন কবির জগতের বিভিন্নতার পরিচয় স্পষ্ট হয়ে ওঠে—একই বিষে একই সময়খণ্ডে বাস করা সত্ত্বেও দুইজনের প্রতিক্রিয়া এতই পৃথক যে তা দুই জগতের সমতুল্য। তাই পরিবেশ নয়, কবিতার আলোচনায় কবিতার টেকনিকই প্রধান আলোচ্য। তিন জন কবির তিনটি কাব্যগ্রন্থ • আলোচনা করতে গেয়ে

• দয়া থেকে গেলে—বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়। সাহিত্য। ৩.০০ টাকা
নীরক্তকলসী—নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। দ্যুতি প্রকাশন। ৩.০০ টাকা
যাও, উত্তরের হাওয়া—অরুণকুমার সরকার। ত্রিবেণী প্রকাশন। ৩.০০ টাকা।

এই কথা নতুন করে মনে হল। তাঁর কবিতায় কারুকলা সপ্রাণ সঞ্জীবিত, টেকনিক ব্যবহারের অনুপ্রবেশ-শক্তিতে দেশকালকে উদ্ভাসিত শব্দের শায়কে যিনি বিদ্ধ করতে পারেন, কবিতায় টেকনিকের ইতিহাসে যিনি পুরনো অভ্যাসের রোমন্থন করেন না, ক্রমাগত মার্জনায় শিল্পের কলস মোচন করে শব্দকে যিনি শাণিত উজ্জ্বল রাখেন শেষ পর্যন্ত তাঁকেই বোধহয় 'খ্যাতির বুড়ি' পালা খেলায় জিতিয়ে দেয়। এই চালই শুধু অব্যর্থ। অবশ্য একথাও স্বীকার্য যে শূন্যকে আশ্রয় করে টেকনিকের অগ্রগতি সম্ভব নয়।

॥ ২ ॥

এঁদের মধ্যে কোই বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতায় একটি বিকারগ্রস্ত দুঃস্বপ্নের পরিবেশ ('দেয়াল জুড়ে টিকটিকিটা বিরাট ভয়ের মত') এবং সেই সঙ্গে এই দুঃস্বপ্নময় পরিবেশের মধ্যে একটি মর্মান্তিক মরিয়াভাব বর্তমান। এই অনির্দেশ্য ভয়াবহতার স্তম্ভিত ভার বর্তমান বলে কাক্‌কার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক মনে হয় না—'মন বলে যে রাস্তায় কাক্‌কা হাঁটতে যেতে হবে।'

(১) শতেক মত অসুন্দর গর্জন করে
সমস্ত শরীর ছিঁড়ে ছিঁড়ে কারা যেন পাগলাঘোর
গান বানায়।
(ভাঙা আয়নার কাচে-)

(২) এখন আকাশ নদী গাছ পাখী ফুল ভয়ঙ্কর
নরকের মুখোমুখি অসহায় শতাব্দীর মতো হৃৎপিণ্ডের
পিপাসা
জুড়াতে গলায় ফাঁস দিতে চায়, মৃত্যুর চাকার নিচে
পিষে যেতে চায়।
(মানুষের মুখ)

এই পরিবেশচেতন সংবেদনশীল কবিচিত্ত অতিশয় ক্ষুব্ধ — সঙ্গত কারণেই ক্ষুব্ধ। কেন না, 'ভীষণ সব সর্বনাশগুলি' তিনি স্বচক্ষে দেখেছেন,

…ছেচল্লিশের মন্বন্তর আর এবং মহামারীর
ভীষণ রোগ রক্তে নিয়ে
দেশ যখন সন্তানের হিংসাদ্বেষ, মায়ের দেহের
মাংস নিয়ে
কাড়াকাড়ির নরক। (মৃত্যুর পর, কৃত্তি বছর)

'পঞ্চাশিতে দুর্ভিক্ষের চেয়ে ইতর ভারত জুড়ে দেশভাগের উত্তেজনা,' 'মন্ত্রী করে চোরের সর্দারি,' ডাক্তার ওষুধ বলে নর্দমার জল বিক্রি করে—'দেশে দেশে নন্দনকাননে/ রাজ্যপাল, ধাত্রীমন্ত্রী, বণ আর সওদাগরেরা' তীব্র ভালোবাসা বা অনুপযুক্তে আরোপিত হয়ে ঘৃণা ও ক্রোধে রূপান্তর নেয়, অনুরূপ সংবেদনশীলতায় মনে হয়েছে—'মায়ের কুড়ি বছর যেন নর্দমার স্রোতের ইতিহাস/পিপাসা, স্নান, জীবনধারণ সকলই অমানুষিক।' এই সংক্ষোভ ক্রোধ এবং ঘৃণাগুলো যখন অবচেতনে প্রবেশ করে তখন দুঃস্বপ্নময় এক নায়কীয় জগৎ শব্দে রূপায়িত হয়ে মূর্ত হয়ে ওঠে। যুক্তির পারম্পর্য নষ্ট হয়ে যায়, কার্যকারণশৃঙ্খলা হয়ে যায় উন্মার্গগামী, সত্য ও মায়াজালের দৃষ্টি তখন হয়ে যায় একাকার—যেমন হয়েছে অনেক পরিমাণে 'টাইফয়েড' কবিতায়। কিন্তু যেখানে ক্রোধ অবচেতনে মিলিয়ে যাবার সুযোগ পায় না, কবিতার শব্দ যেখানে ব্যক্তিগত ক্রোধকে কবিতায় পূরণ দেয় না, সেখানে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় কবিতার শিখর থেকে সহজেই ভাবসমুদ্রের পঙ্কে অবঃপতিত হন।

এখনো আফ্রিকা, আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া, সাইবেরিয়া
জাতি ধর্ম বর্ণ নিরপেক্ষ মানুষের
স্বদেশ যদি না হয়;
সামনে ভীষণ বন চতুর্দিকে যুদ্ধের বাসনা।
বাসাবেই। কেউ রুখতে পারবে না তাকে।
(মানুষের মাতৃভূমি)

এবং এটি কোনো নিঃসঙ্গ নিদর্শন নয়।

এই দুঃস্বপ্নের জগৎ থেকে মুক্তির পথ দুটি—একটি খাওলাদির মেকি মুক্তি। রম হুইস্কি বিয়ার নেশা দেয়, দুশ্চিন্তাকে ভোলাতে পারে, কিন্তু নেশা যখন কাটে তখন পূর্বের তুলনায় জগৎকে আরো বেশি কুৎসিত এবং কটুবাদ লাগে। ঘৃণায় ঘৃণায় লজ্জায় খাওলাদিতে প্রয়াণ করলেও দুঃস্বপ্ন পিছু ছাড়ে না—মদের গেলাসে ভূতের ভয় নাচে। (১) সেখানে এখনো রম বিয়ার হুইস্কি জীন পাওয়া যাবে,/ এখনো মরলা বন্ধ হতে চের দেরি আছে···। (২) বের করো তেমন সুরা, মুক্তাভস্ম, গোলাপী আভায়/যাতে নেশা লাগে, আমরা নেশা করতে এসেছি এখানে। 'নষ্টচাঁদ' কবিতার পঞ্চম অংশে মদের মাত্রাবৃদ্ধিতে মুক্তি নেই জেনে খাওলাদির করুণ হাহাকার। দ্বিতীয় মুক্তির পথ, ঈশ্বরের দিকে। ধর্ম যদি আফিঙের বড়ি হয় তাহলে ঈশ্বরের পথে প্রয়াণ খাওলাদিতে মুক্তির চেয়ে কিছু কম মেকি ব্যাপার নয়। কিন্তু কবিতা-পাঠক হিসাবে এই জিজ্ঞাসা অবান্তর—কবি যদি তাঁর প্রত্যয়কে কবিতার অবয়বময় দান করতে সমর্থ হয়ে থাকেন, কবিতার মন্ত্রোচ্চারণে তার মধ্যে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে থাকতে পারেন, তাহলে উক্ত প্রত্যয়ে অবিশ্বাসী পাঠকও বিনা প্রতিবাদে তাকে মেনে নিতে পারে, ব্যক্তিজীবনে না হোক অন্তত ঐ কবিতাগুচ্ছ পাঠকালে। দীর্ঘকাল দুঃস্বপ্নের জগৎবাসী এখন যন্ত্রণাকে মন্থ করতে উদ্যত, পাপকে প্রেম দিয়ে কী উপায়ে কেনা যায় সেই চিন্তায় এখন কবি চিন্তিত।

পৃথিবীর গভীর অসুখ জেনে আমি
কালিঘাটে শুয়োর মোষের শবপচা গন্ধজলে
হাঁটু অব্দি কাদায়
দাঁড়িয়ে, আমার জ্যেষ্ঠ ভাই আলো জননীর নিচে অবল
আছে জেনে ঈশ্বরকে নিরাময় প্রার্থনা জানাব।
(মানুষের মুখ)

অন্ধকারে বন্ধমূল এই মানুষের আলোয় উত্তরণের ইতিহাস আছে আরো একটি উল্লেখযোগ্য কবিতায়—

একদিন যৌবনে
যখন আমি ধানে বসন্তের কাশফুলদল নিয়ে
মনে হত চোখের সামনে ভয়ঙ্কর এক ভূত
অনন্তকাল নৃত্য করছে।
সেদিন আমার কবিতাকে, অলোক, তুমি করতে
পরিহাস—
ডাকঘরের অমলের মতো, বুকের রক্তে ঘর ভাসলে, তুমি
রাজার চিঠি দেখতে পেয়ে হেসে উঠতে। আমার
ভূতের ভয় তোমার কাছে মনে হত অভিশপ্ত নির্বোধ
পশুমনের প্রলাপ! আমি ডাকঘরের অমলের মতো নই
বরং অপরের রক্তে মেখে ভাসলে আমার বুক হিম
হয়ে উঠত; ঈশ্বরে বিশ্বাস আমার ছিল না, অলোক।—
তোমার কাছে ছিলাম তাই অপরাধী।···
অলোক, আমি হেরে গেলাম। (ভূতের ভয়)

লক্ষ করার বিষয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস আলোকে পরাজয়ের নামান্তর মনে করা হয়েছে। অন্ধকারের সমস্ত দিগন্তকে কবি নিরতিশয় সাহসে পর্যবেক্ষণ করতে চেয়েছেন, তাই প্রথমে আলোর আবির্ভাব তাঁর কাছে হার মানার ইশারা আনে। কিন্তু ক্রমেই পৃথিবীর ললাটের অন্ধের চেয়ে আলোকের আলো কবির কাছে বেশী অভিপ্রেত হয়ে উঠেছে।

বুকের গভীরে যাও
প্রেম স্বপ্ন মৃত্যুর নিশ্বাস,···
বুকের গভীরে যাও
যন্ত্রণার তিমির ভাবনা
আমাকে একবার শুধু এক মুহূর্তের
অমৃতের স্বপ্ন দাও, পিতা!

আমি অবিশ্বাসে পুড়ে প্রত্যহ অঙ্গার
হওয়ার অসহ্য গ্লানি আর সইতে পারি না, আমার
বিশ্বাস ফিরিয়ে দাও। (অনেক রবীন্দ্রনাথ)

অন্ধকার থেকে আলোরেখার উত্তরণের জন্য কবিতার অনলসকর্মী বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাগুলি সম্বন্ধে আকর্ষণ বোধ করি তা নয়, আকর্ষণ বোধ করি তাঁর অধিকাংশ অনুভূতির জন্য—সব চেয়ে বড়ো কথা তাঁর কবিতায় অন্ধকারের দুঃস্বপ্নের ভয়াবহতা এবং আলোকোজ্জ্বল আলো বা নিরাময় প্রার্থনা পৃথক কিছু নয়—এই দুই অনুভূতি সংলগ্ন সহোদর সহবাসী। প্রেম স্বপ্ন এবং মৃত্যু এখানে একাকার, যন্ত্রণার তিমির ভাবনা এবং অমৃতের স্বপ্ন এক ঐক্যানুভূতির অঙ্গ। ফলে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা এমন একটি একনিষ্ঠ সততা এবং অখণ্ড অনুভূতির প্রমাণ রাখে যা বিরল। 'চোখের যন্ত্রণা নিয়ে/আর তুমি গভীরে যেও না' এবং 'পাতা ঝরছে, গাছের পাতা ঝরছে, এখন হাত পাতলে চোখের জল, শুধু চোখের জল'—এই অতল যন্ত্রণায় তিনি যেমন প্রবেশ করেন তেমনি বলেন—

ঈশ্বরের ঘরা কাঁপছে···
সারা অঙ্গ যন্ত্র হচ্ছে···
চন্দন নিমের গন্ধে ছেয়ে যাচ্ছে সমস্ত বাতাস।
(ভোর বুকের দরজাখানে)

দুইয়ের মধ্যে ভেদ নেই, অই চন্দন ও নিমের গন্ধ একাকার—যাদুকর শুভের সন্ধান তিক্ততা বর্জন করে হয় না। এই বিনীত উপলব্ধি-গভীর কবিকণ্ঠ তাই পাঠককে কৃতজ্ঞ করে।

॥ তিন ॥

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় আলো-অন্ধকারের এই সহোদরত্বের, এই অন্যোন্য-সাপেক্ষতার অভাব অনুভূত হয়। এই সচেতন অন্ধকারের কবি যদিও আলো প্রত্যাশী, কিন্তু আলো সম্বন্ধে নিরতিশয় সন্দিহান। আলোর প্রতি অন্তর্লীন অনুরাগকে পাছে কেউ সহজ সমাধান বলে মনে করে তাই কি কবি নিজেই সন্দিহান। পূর্বপুরুষের প্রাক্তন বিশ্বাসগুলি বিরুদ্ধ মতবাদ বিরুদ্ধ অভিজ্ঞতার দাপাদাপি নিয়ত। 'বর্তমান শতাব্দীর অজীর্ণ রোদ্দুর' তাই 'উদরে অন্ন, রক্তে যৌবনের ইচ্ছা নিয়ে তবুও সহান্ত হাটে সুবেশ যুবক'—এর উপমা। আজ যদিও 'ঘরের বাহিরে জলে দৈব জলধারা' তথাপি অজীর্ণ রোদ্দুর দেখে, মিথ্যা দেখে অভ্যস্ত মানুষের সন্দেহ ঘোচে না।

রৌদ্রের বাগানে রক্তকরবীনিচয়
ফুটেছে, ফুটুক।
আমি রক্তকরবীর লক্ষ্যহীন প্রণয়ে যাব না।
এখন যাব না।
রৌদ্র যে মুখোশ নয়, ঈশ্বরের মুখ,
আগে তা নিশ্চিত জেনে নেব।
না-জেনে এখনই আমি বাহির-দুয়ারে দাঁড়াব না।
(নীরক্তকরবী)

'অন্ধকার ভালো নয়,' অথচ আলো সম্বন্ধে সন্দেহসঙ্কুল এই কবি চারিদিকে আতঙ্কের ইশারা দেখেন। 'আমি তোমাদের সামান্য সংসারের দিকে তাকাই/আর শিউরে শিউরে উঠি।' তিনি দেখেন 'উত্থানের গভীর ভিতরে—ভীষণ চক্রান্ত চলে' এবং 'উত্থানের গভীর ভিতরে/মৃত্ত না সৌন্দর্য, তার দশগুণ বিভীষিকা।' নিম্নোদ্ধৃত কবিতার সমস্ত কিছুর অতিশয় ও চরমতার মধ্য দিয়ে তিনি সার্থকভাবে এক নিদারুণ আতঙ্কের ভাব ফুটিয়ে তুলেছেন—

রজনীগন্ধার সাদা যেন আজ দ্বিগুণ প্রকট।
গোলাপ দ্বিগুণ লাল। সন্ধ্যার আকাশ
অধিক নিবিড়।···
নক্ষত্র নিথর হয় ভীষণ অবধিকর শব্দহীনতায়।....

আজ চতুর্দিকে চোখ ঘুরিয়ে স্পষ্ট মনে হয়,
নানাবিধ অন্ধকার, প্রলয়, প্রকৃতি,
চরিত্রলক্ষণ তার শেষ পরিণতির ভিতরে
এসে দাঁড়িয়েছে।
তা না হলে সূর্য এত বিশাল প্রভায়
প্রত্যহ সকালে কেন দেখা দেয় ঈশানীতে? কেন
নিশীথ ক্রমেই আরো ঘোর অন্ধকার হয়ে আসে?
হয়ত প্রত্যেকে আজ আপন সত্তার শেষ পরিণতি
চায়।...
যেন আর
গোপন রহে না কিছু। মনে হয়,
সর্বশেষ ঘোষণার মুহূর্ত ক্রমেই কাছে আসে
বি-বি-সির থেকে আরো শক্তিশালী কোনো এক
সংবাদদাতার। (গোপন রহে না)

অন্য একটি কবিতা পড়ে অনুমান করি এই সর্বশেষ ঘোষণা 'লাস্ট টাইম লাস্ট টাইম' - বুকের ভিতরে এই প্রলয়-রোল শোনা যায়।

সন্দিগ্ধ মন তখন চিরন্তন ঘরের মৃত্তিকের মৌলিক বিশ্বে ফিরে যেতে চায়। 'অথচ বাহিরে আমি কোনোখানে রৌদ্র দেখি না।/মেঘ না, ফুল না, আমি কিছুই দেখি নি।/চলো, আমি ঘরে ফিরে যাব।' 'না গো, আমি অন্ধকারে রৌদ্র বানাই/যে-অমল গল্প দিয়ে, তুমি সেই গল্প দিয়ে যাও।/চারিদিকে অন্ধকার। না, আমি তোমার কাছে যাব।' নিজেকে পরাজয় দিয়ে তিনি লেখেন 'বরং বিমত হও, আস্থা রাখো দ্বিতীয় বিভায়।/বরং বিক্ষত হও প্রশ্নের পাথরে।/বরং বৃষ্টির নখে শান দাও, প্রতিবাদ করো।' তাই রৌদ্র বানাতে ইচ্ছুক কবি সরল আলোর পথ সন্ধান না করে সচেতন অন্ধকারের সমস্ত দিগন্ত অনুসন্ধান করেন। 'বরং বিমত হও' ইত্যাদি চরণগুলি পড়লে পূর্বাপর সন্দেহ সমন্বিত হয়—তাত্ত্বিক প্রত্যয়ের সূত্র থেকে তিনি আলোর প্রতিবাদে অন্ধকারের প্রশ্ন উত্থাপন করেন। রৌদ্রময় প্রবণতা প্রত্যাঘাত হয় এবং রৌদ্র ও রাত্রি যে একই ঐক্যময় উপলব্ধির দুইরূপ তাও প্রতিষ্ঠা পায় না অথচ দুই বিভা যে সহোদর, একই বিভার দুই পিঠ এই উপলব্ধি যে কোথাওও নেই তাও নয়। 'ভিতর-বাড়িতে রাত্রি' নামক আশ্চর্য কবিতায় যখন পড়ি 'আমি সারারাত্রি দেখি—/ঘরস্রোত অন্ধকার বয়ে যায় ভিতর-বাড়িতে' এবং নিম্নোদ্ধৃত ক্ষুদ্র কবিতাটি পড়ি—

যাও পাখি, তাকে বোলো যে, আমার ঘর
এখনও অন্ধকারে
মূর্ছিত হয়ে আছে, শুধু সেই পারে
শোনাতে আলোর স্বর।
বলো, আমি তার জন্যে আলোর ঘর
বানাব অন্ধকারে। (যাও পাখি)

তখন বুঝি নীরেন্দ্রনাথ উদ্ভাসিত অন্ধকারের সঙ্গে একেবারে অপরিচিত নন।

কিন্তু এই খরচিত ওদিস্যা থেকে কবির মুক্তি মা-র কাছে ফেরায়, ঘরে ফেরায়, মৃদ্বাভিমুখী মনের নস্টালজিয়ায়। নীরেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বর এই নস্টালজিয়ায়, তার মধ্যে এমন একটি স্বভাবসঙ্গত কোমল নম্রতা আছে যা আমাদের উদ্যত প্রশ্নাবলীকে মৌন করিয়ে দেয়।

(১) ঈশান আকাশে
মেঘের ঘটনা চলে, তবুও নামে না ঝড়, ধারুণ কোটাল
ফিরে ফিরে আসে।
নৌকার মিছিল যায়, চিরকাল যায়। (নৌকার
মিছিল যায়)

(২) নদী বড় স্থির। তার জল
যেন খুব স্পষ্ট করে সব খানি শরীর দেখায়।
আকাশ, নির্মল জল, ভুবনমোহিনী জ্যোৎস্না, যাবতীয়
লক্ষণ মিলিয়ে

নৌকার মাঝির মনে হয়
এখন আশ্বিন মাস।

এখন আশ্বিন মাস। তাহলে কি পদ্মই ফিরাব?
ফিরে যাব সনাতন আঙিনায়?
আশ্বিনে বাড়ির কথা মনে পড়ে নৌকার মাঝির···
(আশ্বিন রজনী)

(৩) সব কিছু ছাড়তে পারি, তোমাকে পারি না, ধ্রুবতারা।
তুমি থেকো।
বৃক্ষ, নদী, নৌকা যদি ঘোর অন্ধকারে ভেসে যায়,
তাহলে, তখনও
তুমি থেকো, রাত্রির আকাশে জেগে থেকো।
(বৃক্ষ, নদী, নৌকা, তারা)

কিন্তু সেই মুহূর্তের মৌলিক শাশ্বতে ফিরতে গেলে দেখেন সেখানেও রক্তের দাগ লেগেছে, তাতেও লেগেছে অন্ধকারের গ্রহণ—

যেন দূর দেশে কোন্ প্রত্যূষবেলায়
যেতে গিয়ে আবার ফিরেছি
আলস্য নদীর ধারে, পরিচিত বৃক্ষের ভিতর।···
বৃষ্টির ভিতরে সব দেখা যায়, সব
নিজের মুখের মত পরিচিত। আমি
এই পরিচিত মুখ কতবার দেখব আমি আয়নায়?···
আমি
পুরনো আয়নার কাঁচ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে
নিজের রক্তাক্ত মুখ কতবার দেখব আয়নায়?
(বৃষ্টিতে নিজের মুখ)

রক্তাক্ত অন্ধকারের প্রচ্ছায়া সত্ত্বেও নীরেন্দ্রনাথের গভীর প্রার্থনা—'চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পাই তোকে/সন্ধ্যাবেলার নদী।···চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পাই তোকে/সকালবেলার টগর।'

যীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সাফল্যের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেন, 'নীলনির্জনের' কবি নীরেন্দ্রনাথ অনলস চর্চার বিনীত পরিশ্রমে 'নীরক্তকরবীর' বহু কবিতার সাফল্যের অতিরিক্ত সার্থকতা অর্জন করেছেন। যদিও শক্তির স্বরূপ নয়, তার প্রকাশই বিচার্য, তবু নিরতিশয় যত্ন কতদূর নিয়ে যেতে পারে নীরেন্দ্রনাথের কবিতাবলী তার উল্লেখযোগ্য প্রমাণ। তাঁর সার্থক কবিতাগুলি থেকে অনেক চরণ উদ্ধার করেছি—সেগুলি ছাড়াও সার্থক কবিতা এই সংগ্রহে বিরল নয়। যেমন 'অন্ধের সমাজে একা', যেখন নিম্নোদ্ধৃত পদাবলী.

তীব্রণ প্রাণায় জ্বলে, যেন চিরকাল জ্বলে সায়াহ্ন বেলায়।
অলিন্দ, বরোকা, শ্বেতমর্মরের সমস্ত নির্মাণে
জ্বলে ওঠে। আগুনের সুন্দর খেলায়
যাউ যাউ জ্বলে হর্ম্য, প্রমোদনিকুঞ্জ। কিংবা সাধের তরণী
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেন অন্য পথে ধীরে আগুন
হতে গিয়ে অগ্নিবলয়ের দিকে ঘুরে যায়।
মুহূর্তে থাকলে পাশে পাটাতনে প্রচণ্ড হলুদ
জ্বলে ওঠে।
সাধের তরণী জ্বলে যেন চিরকাল জ্বলে সায়াহ্নবেলায়।
(উপাসনার অপরাহ্ণ)

কিন্তু যিনি শক্তিধর, শ্রমে যাঁর কুণ্ঠা নেই, তিনি কখনো কখনো কেন তুচ্ছ পদ্য লেখেন, অকিঞ্চিৎকর চরণকে প্রশ্রয় দেন বোঝা যায় না। 'গ্রাম শ্যাম যদু ও মধুকে/একই সঙ্গে ভালোবাসা, একই সঙ্গে আলিঙ্গন করা অসম্ভব।'—বারুণ দুঃসাহসী একটি উপলব্ধির মত কবি এই কথা উচ্চারণ করেন, অথচ বক্তব্যে বা বাগ্‌বিন্যাসে এর মধ্যে কিঞ্চিৎমাত্র নূতনত্বও কি আছে। কলকাতা সম্বন্ধে এই কথাও কি খুব নূতন.

এখন কলকাতা···
···শিখিয়ে দিয়েছে,
এ ওর একমাত্র পাড়ে নিশ্বাস ফেলেও তবু
কী করে উদাস ঘুরে থাকা যায়। (কলকাতা শেখায়)

"এমন নিষ্ঠুর মাঠ জীবনে দেখি নি"—/অন্ধকারে অরুণের কণ্ঠস্বর যেন খুব বিপন্ন শোনালো।' অরুণ কি এমন কোনো প্রত্যয় অর্জন করেছে বা প্রচার করেছে যা লিখে রাখার যোগ্য বা যাতে পাঠকের কোনো আগ্রহের কারণ থাকতে পারে? না বলে উপায় নেই, নীরেন্দ্রনাথের কবিতার ফুলোল অসমান, তিনি শিখর যেমন জয় করেন, তেমনি অবলীলাতে কম পতিত হন না। 'রাণী রাস্তা', 'ঘুঘুরে লণ্ঠন,' 'ওর্জনী,' 'হঠাৎ শূন্যের দিকে', 'কবিতা, বর্ষাদিবসে,' 'রক্তোলির চূড়া,' 'বয়ঃসন্ধি' 'শঙ্খের পাথরে', 'সন্ধ্যায় সিঁড়ির দিকে'—এই সব কবিতার ক্ষেত্রে কবির পরিশ্রমী মন শেষ পর্যন্ত হয় ক্লান্ত, নতুবা অপারগ হয়েছে; রূপকারী বিবেককে ঘুষ পাড়িয়ে সংকলনে তাদের প্রভ্রয় দিয়েছে মনস্তত্ত্বিক। এই ব্যর্থ কবিতাগুলি তাৎপর্যবিহীন, যদি কোনো অভীষ্ট লক্ষ্য থেকেও থাকে তবে সে লক্ষ্য বিদ্ধ হয় নি, উদ্দেশ্য রূপ নেয় নি কবিতাশরীরে। 'নিয়নমণ্ডলে, অন্ধকারে' কবিতাটি যান্ত্রিক কৌশলে পাঠককে বিমূঢ় করে, তাকে অন্তর্নিহিত কোনো তাৎপর্যের সন্ধানে তৎপর করে তোলে—কিন্তু বাস্তবিক তার কোনো তাৎপর্য বা ব্যঞ্জনা নেই। গদ্যকবিতার সার্থকতা লাভ করতে গেলে যেমন, অ্যাবসার্ড পরিবেশ তৈরি করতে গেলে তেমনি উপাদানসমূহের উপর যে শাসন প্রয়োজন, যে নির্মম সংযম প্রয়োজন এখানে তারও অভাব। 'পরিচিত রাস্তাগুলি' অপরিচিত হয়ে যায় এবং নিজের নিজের বৈশবে ফেরাও অসম্ভব। কিন্তু এখানেও উদ্দেশ্য কবিতায় প্রাপ্তি স্বরূপ পায় নি। 'যান্ত্রিক পরিভাষার সুন্দর যবনিকা' আজ ছিন্নপ্রায়, তাই 'যবনিকা কম্পমান' কিন্তু তার সঙ্গে বিশেষ করে বার্ট্রাণ্ড রাসেলের সম্পর্ক কি বোঝা কঠিন। যদি তাও জোর করে বুঝে নেওয়া যায়, তবু শেষ পর্যন্ত হার মানতে হয় নিম্নোদ্ধৃত চমৎকার অংশটির সর্বশেষ চরণে এসে—পূর্ব চরণগুলির সঙ্গে তার যোগ কোথায় তার সন্ধানে বেরুব হতে হয়—

অন্ত-কিছু না থাক, তোমার
স্মৃতি ছিল; স্মৃতির ভিতরে
ভুবন-ভাসানো একটি নদী ছিল; তুমি
নদীর ভিতরে কের ডুবে গিয়ে কয়েকটা বছর
অনায়াসে কাটাতে পারতে। কিন্তু কাটালে না;
এমনি হঠাৎ তুমি জ্বলে উঠলে ব্লাউজের হলুদে।
(একটাই ঘোষবাতি)

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কতকগুলি কারুকৌশল উল্লেখযোগ্য—তার মধ্যে সর্বপ্রধান একই চরণ বা বাক্যাংশের পৌনঃপুন্য। যেখানে পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও ভাবের অগ্রগতি হয়, বা একই চরণ অন্ত তাৎপর্যে বা অর্থে ডুবিত হয়ে যেন মূলত অন্ত চরণ হয়ে ওঠে সেখানে পুনরাবৃত্তি সঙ্গত শুধু নয়, অনিবার্যও হয়ে ওঠে। এই কবির পুনরুক্তিপরায়ণ রচনার সর্বত্রই যে সেই অনিবার্যতা আছে এমন দাবী করা চলে না। এক-এক সময় এই পুনরাবৃত্তি প্রবণতা কত দূর পর্যন্ত যায় তার প্রমাণ 'আগস্ট ১৯৬০' কবিতাটি। সতেরো লাইনের এই কবিতায় 'চোখ মেললেই এবার যেন দেখতে পাই তোকে' চারবার ব্যবহৃত: 'মানুষ আমি অনেক দেখলাম, অনেক রকম মানুষ। / ঘরের মানুষ, পরের মানুষ, হরেক রকম মানুষ। / আর না, মানুষ আর না।' এই লাইন তিনটি দ্বিতীয়বার ফিরে এসেছে; 'সন্ধ্যাবেলার নদী' এবং 'সকালবেলার উপর' বাক্যাংশ দুবার করে স্থান পেয়েছে। বস্তুত প্রথম স্তবকের প্রতিধ্বনি তৃতীয় স্তবক, দ্বিতীয় স্তবক শুধু নিঃসঙ্গ স্বাতন্ত্র্যে বিরাজমান। আর একটি কৌশল, কবিতার মূল শরীরে কবি যে আবেগ স্ফীত করে তোলেন তাকেই শেষ চরণে চমৎকারভাবে ছিন্ন করে অপ্রস্তুতের এক শেষ করেন। 'বাঘ' কবিতাটিতে 'বনের আতঙ্ক হেঁটে যায়' 'অন্ধকার বনের নিয়তি' 'চিত্রিত আগুনখানি যেন ধীরে ধীরে হেঁটে যায়' এই সবের পর শেষ পর্যন্ত জানা গেল 'আমরা নিশ্চিন্তে বসে বাঘ দেখি ডিসনির ছবিতে।' তাছাড়া প্রধানত পয়ারে নির্ভরশীল এই কবির

কবিতার সূত্রপাত প্রায় পর্বের নাটকীয়ভাবে। অবশ্য এ ব্যাপারে নীরেন্দ্রনাথ একক নন—এই নাটকীয় প্রবণতা সমকালের অন্য কবিদের মধ্যেও বিরল নয়।

॥ চার ॥

অরুণকুমার সরকারের কবিতার যে দুর্বলতা সেগুলির জন্য দায়ী, সন্দেহ হয়, তাঁর অসতর্ক খেয়ালিপনা। মনে হয়, ছন্দে তাঁর যে কারুকৌশল আছে তাঁকে তিনি তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতেই অভ্যস্ত। অমিত্রাক্ষর অনেকটা অপচয় তিনি করেন, কিন্তু তাতে যেন তাঁর মনঃক্ষোভ নেই। 'হাওয়ার' এই কবিতাগুলিকে তিনি হাওয়ায় উড়িয়ে দিয়েছেন। স্বীকার করতেই হবে এই ভঙ্গির মধ্যে একটি পরোক্ষ বিনয় আছে। এই সংগ্রহের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য দেখতে গেলে প্রথমেই চোখে পড়ে বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মত তাঁরও অধিকাংশ কবিতা পয়ারাশ্রিত। অক্ষরের তুলনায় অবশ্য ছন্দমাত্রার পর্বের ছন্দ তিনি বেশি ব্যবহার করেন। কিন্তু তাঁর পয়ারের মাত্রাগণনা রীতি সম্বন্ধে কিছু মন্তব্য করা আবশ্যক মনে হয়। 'দৈত্য দুটো ধাঁকে ডাকে খানদানি বলেই মনে হলো'—এই চরণে খানদানি তিনমাত্রার মূল্য পেয়েছে বলে 'বলে-ই' এই কৃত্রিম অকারণ ঝোঁক ব্যবহার করতে কবি বাধ্য হয়েছেন, অথচ শব্দটিকে চারমাত্রার মূল্য দিলে এই কৃত্রিমতাকে প্রশ্রয় দিতে হত না। মাত্রার হিসাবে এই জাতীয় স্থিতিস্থাপকতা ছন্দের স্বাস্থ্যের পক্ষে প্রয়োজন এবং এই স্থিতিস্থাপকতা তিনি মানেন না তাও নয়। 'চশমার কাঁচ ঘষে নন্দলাল বসু বললেন'—এক্ষেত্রে 'চশমার' এবং 'বললেন' দুটি শব্দকেই চারমাত্রার মূল্য দেওয়া হয়েছে। কখনো কখনো বরং স্থিতিস্থাপকতার সুযোগ এতদূর পর্যন্ত নেন যে পয়ারের প্রথাগত শোভনতাও তাকে গ্রাহ্য করতে অপারগ হয়—'দৈত্য দুটো গদা ঘুরিয়ে', 'সব মিলিয়ে খাসেশী সঠিক'—'ঘুরিয়ে' এবং 'মিলিয়ে'-কে দুই মাত্রার ওজন দেওয়া হয়েছে। কিন্তু তা হয় না'—চোখ অস্বীকার করে তা নয়, কানও স্বীকার করে না।

অরুণকুমার সরকার রীতিবদ্ধ শব্দগুলি, ব্যবহারে ব্যবহারে 'হেজেমজে' যাওয়া শব্দগুলি যখন ব্যবহার করেন তখন তাঁর অসতর্কতার আর এক প্রমাণ পাই—'উজ্জ্বল সকাল' 'সমুদ্র সফেন', 'বেদনার নীল' এবং একই অপরাধে অপরাধী 'ইচ্ছাগুলি,' 'ভাবনারা,' এই জাতীয় বহুবচন। চরণের পূর্বে 'এবং' ব্যবহার করে মাত্রা পূরণের যে বহু-অভ্যাস সাম্প্রতিক কবিতার দুর্লক্ষণ তাও অরুণকুমারের কবিতায় অবারীতি প্রশ্রয় পায়—(১) এবং কুয়াশা ঘনায়ি চতুর্দিকে, (২) এবং অন্যথা গ্রামে উজ্জ্বল সকালে, (৩) এবং যদিও চামড়া ঢেকে রাখি নৌথিন পোষাকে, (৪) এবং বুকের মাংস যেন স্রষ্টা বালিকা ঠুকরেছে। এই রকম আরো। 'খা সাহেব অতএব,' 'কক্ষে কক্ষে,কেউ কি নেই যে'—এই রকম মিল যেমন নূতনত্বে চমৎকারিত্বে মুগ্ধ করে, তেমনি 'আছে,কাছে', 'কেউ,ঢেউ' - শ্রেণীর মিল আমাদের আবার মাটিতে ফিরিয়ে আনে।

তাঁর কারুরীতির উল্লেখযোগ্য দুর্বলতা নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে উল্লেখযোগ্য সার্থকতাও লক্ষণীয়। তাঁর কবিতা প্রতিধ্বনিতে মুখর। বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায় বা সমর সেনের মত ব্যঙ্গের উদ্দেশে তত নয়, অত্যন্ত সহজভাবে তিনি পূর্বসূরীর প্রতিধ্বনি কবিতায় ব্যবহার করেন। এই প্রতিধ্বনি কখনো পূর্বসূরীর অবিকৃত বা ঈষৎ পরিবর্তিত বাক্যাংশের, কখনো শুধু ছন্দঃস্পন্দের। তাঁর মতে, 'সব কবিতাই পুনর্লিখিত কবিতা'—কবিতার বিষয় একই থাকে শুধু টেকনিক্ পরিবর্তিত হয়; সবই পুনর্লিখিত কবিতা বলে তিনি হয় তো প্রতিধ্বনি ব্যবহার করেন এত। 'প্রতিদিন তুমি নব নব রূপে এসো' চরণটি যেমন রবীন্দ্রনাথের গানের প্রতিধ্বনি, তেমনি অজস্র পাই অন্য নানাজনের প্রতিধ্বনি—

'আবার আবার সেই কামান গর্জন,' নারকেলতরুজঙ্গে সমুদ্র-বিশাল / দেয় করতালি।' সমস্ত 'অন্ধে আবার' কবিতাটি তো সচেতন প্রতিধ্বনিতে মুখরিত—

নিজ গুহ্য আধা গুপবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী।···
সোনার পাথর বাটি।···
কোনখানে যাও বারেক দাঁড়াও···
সহ সখী সহ হয়েছে অসহ
এ-বেশভূষণ কুসুমমালা।···
চলে নীল শাড়ি নিঙাড়ি নিঙাড়ি···
গোরোচনা গোরি নবীনা কিশোরী···
পথে হল দেরি করে সেল চেরি
দিন বৃথা সেল বৃথাই প্রিয়া।

বৈষ্ণব পদাবলী থেকে বুদ্ধদেব বসু এই কবিতার অঙ্গে একাকার হয়ে গেছে—প্রমাণিত হয়েছে, সব কবিই এক অর্থে সমসাময়িক কবি।

'বুদ্ধদেব বসু কে' নামক কবিতায় অরুণকুমার সরকার লিখেছেন—'যেহেতু আপনার কাব্য আমার চিন্তার সমর্থন/ যেখানে প্রজ্ঞার প্রেমে নেই বর্ণদ্বেষী ব্যবধান/তাই আনন্দিত চিত্তে সেই রাজ্যে করেছি প্রবেশ।' এই আনন্দিত প্রবেশের একটি প্রমাণ বুদ্ধদেব বসুর কবিতার ছন্দঃস্পন্দের অবিকল প্রতিধ্বনি মেলে এই কবির কোনো কোনো কবিতায়। বাক্যাংশে শুধু নয়, রীতিম্, ছন্দের বিশিষ্ট দোলাটি। যখন পড়ি—'চেনা মুখ আর দেখায় না কফিখানা :/নূতন শহর পথ ঘাট নয় আমার/বন্ধুরা মৃত, অপরিচিত গোলানি' অথবা 'যৌবনঘটা দুর্যোগে নেব চিনে/বহুদিনকার হারানো অন্ধ গলি...' তখন স্বভাবতই বুদ্ধদেব বসুর নিম্নোদ্ধৃত চরণগুলির আন্দোলন মনে পড়ে—'বললেন রাধারাধব উপাধ্যায়/উনসত্তরে শেষ শহরটায় শুয়ে...' অথবা মনে পড়ে—'অবাধ, আগাধ, বিশাল শ্রাবণ ঝরে কদম্ববনে বিকাশে অন্তপলি।' যখন পড়ি—

আমার অপরাজের অযোনিজ বীর সন্তানেরা
সমুদ্রে খাটায় তাঁবু, মরুঝড়ে বাঁধে স্থির ডেরা
সভাকে সাজিয়ে করে সুন্দরের নতুন অলীক।
(যাও, উত্তরের হাওয়া)

তখন কান বলে, এই চরণগুলির ছন্দঃস্পন্দ 'যে আঁধার আলোর অধিকের,' বুদ্ধদেব বসুর কোনো কোনো কবিতার ছন্দঃস্পন্দ থেকে খুব দূরবর্তী নয়।

অরুণকুমার সরকার কবিতার শব্দনির্বাচনে যতদূর সম্ভব উদার, কোনো শুচিবায়ুগ্রস্ততা তাঁকে বিচলিত করে না। রবীন্দ্রনাথের আভিজাত্যের প্রতিবাদে সুধীন্দ্রনাথ 'মুরগী' নিয়ে নয় 'কুকুট' নিয়ে কবিতা লিখেছিলেন, অরুণকুমারের তেমন কোনো বালাই নেই। প্রাকৃত চলিত শব্দ শুধু নয়, কলকাত্তাই অপভাষাও তিনি জায়গা মত অবলীলায় এবং সার্থকভাবে ব্যবহার করেন। বর্তমান সংগ্রহের প্রথম দিকের কবিতায় অবশ্য তৎসম শব্দেরই প্রাধান্য, কিন্তু শেষ পর্যায়ে ক্রমেই প্রাকৃত লৌকিক শব্দাবলী কবির হাতে ছাড়পত্র পেয়েছে। (১) বসন্তে গদগদঘর্ম পাঁজরার খাঁজে ও গর্মানে --(২) গোঁত মেরে নিজেরই মাথা ভেঙে ফেলবো এক ঘা মুখপোড়া···(৩) পালিয়ে আয়। কামড়ে দেবে। দাঁত-মুখ-খিঁচোনো বলভারী খেঁকি কবরছা ঝড়ো সাংঘাতিক, বিষাক্ত, একলোট। তৎসম শব্দ বহুল কবিতা এবং প্রাকৃত শব্দবহুল কবিতা—এমন কোনো স্বাতন্ত্র্যের সেরাল কবি তোলেন নি। একই কবিতায় একজাতীয় শব্দ থেকে অন্য জাতীয় শব্দে কবি অবলীলায় চলে যান, দুই জাতীয় শব্দ একই সঙ্গে ব্যবহৃত হয়ে অর্ধনারীশ্বর চারিত্রার্থতা অর্জন করে।

এখানেও হানা দিলি ওরে নোংরা অসভ্য কুকুর।
আমার ছালচামড়া ছিঁড়ে বুঝি তুই ছুচছুদি বানাবি?

পালিয়ে যা, ঢিলিয়ে, তার ঠ্যাং খোঁড়া করবো এক্ষুণি,
পালিয়ে যা প্রকাণ্ড ঘরে, আধো অন্ধকারে ঠাণ্ডায়
নরম কোলের মধ্যে মুহূর্তে ডুবে যা বন্ধুর,
ফুটে উঠবে চোখে তোর অনিবার্য স্বর্গীয় গোলাপ।

(অনিবার্য)

সমকালের বা অব্যবহিত পূর্বকালের অধিকাংশ শব্দ ব্যবহারে দ্যুতি হারায়, ক্লিষ্ট ক্লিশেতে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু পুরোনো অব্যবহৃত শব্দ নূতন অপ্রত্যাশিত ব্যবহারে, বাক্যের নবীন বিন্যাসে এক চমকে সহসা সঞ্জীবিত হয়। তাই যদিও কবি প্রতিশ্রুতি দেন,

কেন না, আমার পরিচিত শব্দগুলো
ব্যবহারে ব্যবহারে হেজেমজে গেছে।
ঘষেমেজে, বেনারসী শাড়ি পরিয়ে
প্রৌঢ়াদের টেনে আনব না
উজ্জ্বল আলোর নিচে, বাসরঘরে
কিশোরী যুবতীদের জটলায়। (হাওয়ার হাসি)

কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে কবি সেই প্রতিশ্রুতি পুরোপুরি পালন করেন নি, তাই এক একটি পুরনো শব্দ কবির হাতে নূতন ব্যবহারে নবীনাদের হার মানিয়েছে—(১) তুমি যে সেখানে অপেক্ষমান/দালতীলতার কুঞ্জে যাব না, যাব না, যাব না অন্ধকারে। (২) কলস-জলস চরণে এসো সাবধানে··· (৩) তুমি যা ডাকুক কেন? ডেকে ওঠো পলাশে ঠুংরিতে/ কুহু কুহু কুহু কুহু চিত্তচোরা, হে বসন্তসখা।

তাঁর কবিতায় বর্তমান গ্লানিকর পরিবেশের কথা পাই। 'নেপথ্যে অনেকেই খুব মাতা দিচ্ছে' পরিস্থিতি কাউকে 'শান্তিতে দেবে না থাকতে'। কিন্তু বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরুদ্ধ পরিবেশের দুঃস্বপ্নময়তাকে যেমন কবিতায় মূর্ত করে তোলেন, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী যেমন অনেক ক্ষেত্রে পারেন, সেই প্রকাশের মূর্ততা অরুণকুমারের কবিতায় নেই। তিনি প্রত্যক্ষভাষণে গ্লানির বিবরণ দেন, তার স্বরূপকে প্রকাশ করেন না। পরিবেশ প্রতিকূল, তার মধ্যে কবির প্রতিটি কবিতা দুঃসাহসী প্রতিবাদের বীরত্বময় প্রমাণ। 'ভাঙ্গাঘরে বাজছে দামামা, নাকড়া, জয়ঢাক, শিঙা সমস্ত ঘোর বৈরাচারী তথাপি সে গান ধরলো।' অথচ যে পাখী গান গায়, কবির হৃদয় চুরি করে নিয়ে যায় যে পাখি, পরিবেশ দোষে সে চারিত্র্য হারায়, শেষ পর্যন্ত সে 'শূকরমর্ত গ্র্যাস্টিকের পাখি'। মাস্টারি সমালোচনার বিরুদ্ধে যখন তিনি বিদ্রূপে প্রখর হন ও ন তিনি আসলে প্রতিকূল পরিবেশকেই আঘাত করেন।

ব্যানার্জিষ্ট চোখ। যদি পেটে তার পেন্সিল গুঁজে দি
ঢেকুর তুলবে বটে এলোমেলো নানা উদ্ধৃতির।
বিস্তর টকগন্ধ, কিছু ঘেঁাটা ছেড়ে, কেলে,
কী এক কিম্ভূত বস্তু কাগজের উপর পোয়াবে। (গুরুশিষ্য)

কিন্তু অধিকাংশ কবিতার বিষয় কবিতা, কবিতা ও যৌবন বা শুধু অপদস্থমান যৌবনের কথা। সমর সেনের যৌবনবিষয়ের কবিতাগুলিতে যে কটুস্বাদ আছে, অরুণকুমারের কবিতাগুলিতে তা অনুপস্থিত—এখানে অনবদ্য যৌবনের কাছে শুধু চরিতার্থ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ। (১) যৌবন যায়। যৌবন-বেদনা বোঝায় না। সহসা ব্যাকুল ঝিকেলে বাজে/স্নায়ুতে স্নায়ুতে সাতসাগরের দোলানি। (২) যাও, উত্তরের হাওয়া, তাকে গিয়ে বলে এসো, আছে/যৌবনের ধনুর্বান লুকানো ইচ্ছার শরীরে। (৩) আধো যৌবন প্রৌঢ় এখন/শেষ ঘরে এল খেলা/তোমাকেই দিই তোমারই এ-দিনগুলি।

(৪) বইতে পারি না আমি এই গুরুভার
এত প্রেম কেন দিলে এতটুকু প্রাণে।
প্রেম জাগে দু'নয়নে, প্রেম জাগে ঘ্রাণে
প্রেম জাগে ভুবাতুর হৃদয়ে আমার। (রিমিঝিম)

কখনো যৌবনের কথা ও কবিতার কথা একাকার হয়ে যায়—অন্তরের যৌবন অন্তর্হিত হয়ে যাওয়ার অর্থ কবিতারও অনিবার্য পলায়ন। তাই 'যদিও লোকালয় স্বপ্নহীন/স্বপ্ন ছাড়া

সবই অর্থহীন/আমাকে দাও কিছু স্বপ্ন দাও।' আর আছে কবিতার কথা। কখনো সবিনয়ে কবি বলেন—

যদি ক্ষীণ ধ্বনি ওঠে আবর্তের মূর্ছিত দেতারে,
কথার গুরুত্বে কিম্বা নিক্ষেপের নিপুণ কৌশলে
নয় তা ; আত্মবিদ্যা অনায়ত্ত এখনো আমার।

(কথা)

কখনো কবি সমস্তভম শব্দের জন্য অতন্দ্র অপেক্ষার কথা লিপিবদ্ধ করে রাখেন—'যার আসে, সহজেই আসে। আমার কেবল/কান পেতে অপেক্ষায় থাকা।'

কয়েকটি মৌলিক উপলব্ধির কথা অরুণকুমার সরকার বারবার বলেন। দুঃখের বিষয় এই মৌলিক কথাগুলি যখন কবি উচ্চারণ করেন তখন কী উপলব্ধিতে কী বাচনভঙ্গিতে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কণ্ঠস্বরের সঙ্গে তাঁর কোনো স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার করা যায় না। (১) এই ক্লান্তি এই শূন্যতাই নাকি ঈশ্বরচেতনা...(২) শুধু প্রেম নয়, কিছু ঘৃণা রেখো মনে,/ যেমন অনেক বৃক্ষ কোমলাঙ্গে কাঁটা দিয়ে ঢাকে। (৩) শেষ খুঁটিগুলো খুব শক্ত করে ধরে রাখতে চাই।

(৪) যতই বয়স বাড়ে ঈশ্বরের কাছাকাছি যাই
চন্দনধূপের গন্ধ, ঘণ্টাধ্বনি অদূর মন্দির
শ্বেতপাথরের সিঁড়ি, নিচু বরণা, আদি অন্ধকার
সকল ভালোর ভালো সচকিত পুনর্দৃষ্টি লাভ
আবাদে ও মরুদেশে শুধুমাত্র রক্তের শুকাত।

(সমতল)

(শেষ উদ্ধৃতিটির শেষ চরণে অবশ্য যুক্তিবোধ বক্তব্য বাচনভঙ্গিমা সুস্পষ্ট।) এই নিদর্শনগুলি পড়লে কার স্বর কোনটি বুঝে ওঠা কঠিন হয়। এ ক্ষেত্রে কে কার সুরে সুর মেলান সেটা বড় কথা নয়। শুধু এই কথা না বলে পারা যায় না যে, নীরেন্দ্রনাথ ও অরুণকুমারের কণ্ঠস্বর এই সব ক্ষেত্রে অভিন্ন মনে হয়। সম্প্রতিকালের কবিদের পারস্পরিক প্রভাবাচ্ছন্নতার এই একটি প্রমাণ।

স্বাভাবিক ক্ষমতায় বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বা নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর চেয়ে অরুণকুমার সরকার কিছু বঞ্চিত নন। কিন্তু তাঁর প্রতিভা অপচয়ী, শ্রমবিমুখ ; অনেক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে অনেক কম সার্থকতা তিনি অর্জন করেন। তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে হাইনের একটি বাক্য মনে এল—"He who does not go as far as his heart urges, and reason permits, is a paltroon.' তিনি পরিচিত দিগন্ত ছেড়ে অপরিচিত অন্ধকারে ঝাঁপ দেন নি, তাঁর শক্তির আভাস তিনি জেনেও অপ্রমাণ করির মৌলতাই তিনি যেন মেনে নিতে প্রস্তুত। পাঠকের পক্ষে কবির এই সিদ্ধান্ত দুঃখজনক—

অন্ধচেতনার বুকে অনেক পুষ্প
কিন্তু আমি তো যাব না অন্ধকারে। (যাবনা)

অন্ধকারে তিনি গেলেন না, সর্বোত্তম পুষ্পগুলি তিনি চয়ন করলেন না।

হেগেলীয় দর্শন

অনিল রায়

হেগেল বলবেন, একই বস্তুর দুটো কার্য (function)—মানে, বিরুদ্ধ ক্রিয়া (function)—সর্বদাই তো দেখা যাচ্ছে। যেমন, বচন বা Proposition-এর মধ্যে subject ও objectকে অন্বিত করে, সংযুক্ত ক'রে বর্তমান রয়েছে সংযোজকটি (Copula)। সংযোজকটিই, দেখা যাচ্ছে, দুটো বিরুদ্ধ ক্রিয়া সম্পাদন করছে একই কালে। অর্থাৎ সংযোজক যেমন সংযোগ সাধন করেছে, তেমনি বিয়োগও সাধন করছে। যুক্তও করছে, বিযুক্তও করছে।

এর জবাবে এইটুকু নির্দেশ করলেই হবে যে হেগেল এখানেও তাই করেছেন। যাকে বলা হয়েছে "refusing to distinguish" (প্রভেদকরণে অস্বীকার)। কারণ, যে অর্থে সংযোজক সংযোজন করছে, তার বিয়োজন নামক কাজটি ঠিক সেই অর্থে নয়। এই রকমের আরেকটি দৃষ্টান্ত দিয়েছেন, যেমন "Dumb bell", ডাম্বেলের মধ্যকার ডাণ্ডাটি (bar) দুদিকের দুটো বলকে সংযুক্তও করছে, আবার বিযুক্তও করছে। কাজেই আপাতদৃষ্টিতে মনে হবে যে ডাণ্ডাটি এখানে সত্যি সত্যি দুটো বিরুদ্ধ কার্য (Contradictory function) সাধন করছে একই সঙ্গে। সুতরাং হেগেলের 'বিরুদ্ধের পারস্পরিক অনুপ্রবেশ' (Interpenetration of opposites) বা আত্মবিরুদ্ধতার অনন্ত দৃষ্টান্ত হয়ে ডাম্বেলের অন্তবর্তী ডাণ্ডাটি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু তলিয়ে দেখলেই বেড়িয়ে পড়বে যে বস্তুতঃ ব্যাপার তেমনটি মোটেই নয়। ডাণ্ডাটি বলদুটোকে "সংযোজন" করছে এই অর্থে যে বল দুটোকে সে বাইরের সমস্ত দেশ বা space থেকে বাইরে রাখছে ; কিন্তু যখন বলি ডাণ্ডা দুটোকে "বল বিযুক্ত" করছে, তখন অন্য অর্থে বলি। অর্থাৎ তখন বলি যে দুটো বলের অন্তবর্তী দেশটুকু (space) থেকে বল দুটোকে বাইরে রাখছে। উইলিয়ম জেম্‌স্ একে প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন এবং তাঁর ভাষা তুলে দিলে বিষয়টি আরো স্পষ্ট হবে :

'It is true that the space between the two points both unites and divides them, just as the bar of a dumb-bell both unites and divides the two balls.

But the union and the division are not Secundum idem ; it divides them by keeping them out of the space between, it unites them by keeping them out of the space beyond. So the double function presents no inconsistency.

Self-contradiction in space could only ensue if one part tried to oust another from its position.' (pp. 264-265 : Ibid. James)

দেখা গেলো, একই স্থানে ও কালে দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একত্র ব্যবহার করা যেতে পারে না। যদি কেউ কখনো পেয়ে থাকেন কিংবা পাওয়া যাবে বলে মনে করেন, যেমন

হেগেল করেছেন, তবে নিতান্ত abstraction-এর জোরে এবং একতোরো দৃষ্টির আনুকূল্যে। যে abstractionকে হেগেল লজিকের পাতায় পাতায় গালাগাল দিয়েছেন, তিনি নিজেই সেই abstraction-এর পাকে আকণ্ঠ ডুবে গেছেন। এই মনোভাবের ফলেই তিনি ধারণা করেছেন যে, দুটো বিরুদ্ধ সংজ্ঞা একত্র রয়েছে সকল বস্তুতে এবং এই পৃথিবী আপাদমস্তক সকল অংশেই কেবল বিরুদ্ধতায় জর্জরিত হয়েছে। সব বস্তুই দ্বিমুখো এবং একমুখ যদি অস্তিবাচক, তবে অপরমুখ নাস্তিবাচক। "অস্তি" কী করে যে "নাস্তি" হতে পারে, অর্থাৎ অস্তি স্বরূপতঃ "নাস্তি" বৈ আর কিছু নয়, এ অপরূপ তত্ত্ব কোন্ ব্যক্তিকে যে সম্ভব হতে পারে তা' হেগেল কোথাও উদ্‌ঘাটন করেন নি। এ কেবল সদসদ্‌রূপ অনির্বচনীয় মায়ার অলকাপুরীতে সম্ভব হতে পারে কিংবা হেগেলীয় স্বপ্নপুরে; কিন্তু আমাদের এই ইটকাঠের নেহাৎ সাধারণ, বাস্তব জগৎ পৃষ্ঠে এমন অঘটন ঘটতে দেখা যাচ্ছে না। যাকে "বন্ধু" বলছি, তাকে সেই স্থানে-কালে ও সেই অর্থে তখনই "শত্রু"-ও বলব, এ কী করে হবে। কূটনীতির (Diplomacy) জগতে চলতেও বা পারে কিন্তু সঙ্গতির (Consistency) জগতে বা ন্যায়ের (logic) জগতে কী করে এ চলবে? হেগেলীয়ান-রা হয়তো গীতার বচনীয় দেবেন 'আত্মৈব বন্ধুরাত্মনঃ আত্মৈব রিপুরাত্মনঃ' ইত্যাদি। আত্মাকে একই সঙ্গে 'বন্ধু' ও 'রিপু' বলা হচ্ছে। কিন্তু এখানে যে অর্থে "বন্ধু" সে অর্থে "রিপু" নয়। কোন শাস্ত্রেই এ বিরুদ্ধ-সমন্বয় চলতে পারে না, কারণ এ নিতান্ত আজগবী ও অবাস্তব। বর্ণ্‌স্টাইন-এর (Bernstein) ভাষায় বলতে "Yes is no" এবং "no is yes" "হাঁ" এবং "না" একই অর্থে বলা যেতে পারবে এ কেবল প্রলাপ-লোকে সম্ভব, যুক্তি-লোকে নয়। জেম্‌স্ তাই বিদ্রূপ করে বলেছেন :

"But hark! What wondrous music is this that steals upon his ear? Incoherence itself, may it not be the very sort of coherence I require? Muddle! Is it anything but a peculiar sort of transparency? Is it not jolt passage! Is friction other than a kind of lubrication? Is not chasm a filling?—why seek for a glue to hold together when their very falling apart is the only glue you need? Let all that negation which seems to disintegrate the universe be the mortar that combines it and the problem stands solved."

(James, pp. 273-74)

যে কারণে হেগেলী বিরোধ-বাদকে জোডে বলেছেন অর্থহীন পিণ্ড (meaningless mass), যে কারণে ফিকটে-(Fichte) হেগেল দর্শনকে বলেছেন, "masterpiece of erroneous consistency" সেই কারণেই জেম্‌স্ বলেছেন যে এই অসম্ভব বাগ্‌জাল বিস্তারের উৎস হচ্ছে হেগেলের মানসিক আতিশয্য "(mental excess)"। তাঁর মতে —

"The paradoxical character of the notion could not fail to please a mind monstrous even in its native Germany, where mental excess is endemic" (James, pp. 273-74)

উইলিয়ম জেম্‌স্ বিদ্রূপ করে যা বলেছেন তার মধ্যে সত্য আছে। হেগেলের অবিরোধ তত্ত্বের precise অর্থ ঐরকমই দাঁড়ায় একথা ঠিক। স্বাভাবিক বুদ্ধিতে হেগেলীয় ধরণের বিরোধ-তত্ত্ব "monstrous" ঠেকে, এতে অত্যুক্তি কিছু নেই। প্রত্যেকটি বস্তুই যদি নিজের বিরুদ্ধ বস্তুও হতে পারে তবে অসঙ্গতিকে (Incoherence) সঙ্গতি (Coherence) বলতে হবে; এবং "দ্বন্দ্বাত্মকতার" অর্থ হবে "সহজবোধ্যতা"। তথা, শূন্যতা ও পূর্ণতা, Jolt ও Passage, Muddle ও Transparency, Friction ও Lubrication, এই জোড়া জোড়া শব্দগুলো একার্থক হয়ে দাঁড়ায়। অথচ হেগেল এ তত্ত্বকে কোথাও প্রলাপ করেছেন বলে আমাদের জানা নেই।

কেবলমাত্র কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়েই কাজ সেরেছেন লজিকে। এখন হেগেলের দৃষ্টান্তগুলোকে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক, সত্যি সত্যি ঐ দৃষ্টান্তগুলো 'স্ববিরোধকে' (self-opposition) সমর্থন করে কিনা। আমরা সর্বপ্রথম তাঁর প্রথম ত্রিনীতিকে (triad) নিয়ে আলোচনা করব।

হেগেলের প্রথম ত্রিনীতির তিনটি ধাপ : Being, Nothing ও Becoming. Being মানে সত্তা, কিন্তু এ সত্তা মানে কোন বিশেষ বস্তু বা পদার্থের সত্তা নয়, এ হচ্ছে সকল বিশেষ বস্তুর সত্তার আড়ালে যে রূপহীন, নামহীন ও নির্বিশেষ "সত্তা" বিদ্যমান সেই অমিশ্র, বিশুদ্ধ 'সত্তা'। এর অস্তিত্ব, ওর অস্তিত্ব, রামের অস্তিত্ব, শ্যামের অস্তিত্ব নয়—কোনই অস্তিত্বমান পদার্থের অস্তিত্ব নয়—কেবলই শুদ্ধ সত্তা নিছক ও নির্গুণ "অস্তিত্ব" মাত্র।* এই বিশুদ্ধ ও নির্গুণ "অস্তিত্ব" বিশ্বজগতে হুমড়ুমিতে পাওয়া যাবে না, কারণ এর empirical অস্তিত্ব নেই। এ হচ্ছে আমাদের বিমূর্ত রূপ (abstraction) মাত্র—সব বস্তু থেকে শুদ্ধমাত্র তাদের "অস্তিত্ব"টুকুকে ছিনিয়ে নিয়ে তার আলাদা সত্তার কল্পনা করে নেওয়া হয়েছে। তেমনি "Nothing" মানে 'নাস্তিত্ব' বা "অনস্তিত্ব"। আমরা অস্তিত্বকে ছেড়ে অনস্তিত্বের ধারণা করতে পারিনে। কোন বস্তু থাকলেই তবে না-থাকার কথা আসতে পারে অথচ এ মানে 'nothing' বলতে কোনো বিশেষ বস্তুর "না থাকা"-কে বুঝাতে হবে না। রামের অনস্তিত্ব, শ্যামের অনস্তিত্ব, এর অনস্তিত্ব, তার অনস্তিত্ব—এসব বিশিষ্ট 'অনস্তিত্ব' নয়; সকল নাস্তি-বস্তুর আড়ালে তাদের যে সার নাস্তিত্বটুকু রয়েছে অর্থাৎ যে নামহীন, রূপহীন, গুণহীন, নির্বিশেষ "অনস্তিত্ব" বা 'না-থাকা' রয়েছে, তাকেই নাম nothing বা অনস্তিত্ব। এও একটা অবাস্তব বিমূর্তরূপ (abstraction) মাত্র—সকল নাস্তিত্ব থেকে জোর করে ছিঁড়ে নিয়ে একে জিশুর মতো নিরালম্ব শূন্যতায় ঝুলিয়ে রেখে বলা হচ্ছে, এ হচ্ছে নির্বিশেষ, বিশুদ্ধ "অনস্তিত্ব"।**

অস্তিত্ব (Being) হ'ল স্থিতি (Thesis) এবং তাকে নস্যাৎ বা negate করে তার বিরুদ্ধ পক্ষ অনস্তিত্ব (Nothing) হ'ল প্রতিস্থিতি (Anithesis.) হেগেল বলছেন, এই নিরালম্ব অস্তিত্ব ও নিরালম্ব নাস্তিত্ব এরা উভয়েই আসলে একই বস্তু, কারণ যে স্বরূপ Being এর বর্ণনা করা হয়েছে তাতে বিশুদ্ধ nothing ছাড়া এ আর কিছু নয়. দুইয়ের চেহারাই গোড়ায় একই রকম দাঁড়াচ্ছে। ক্রোচের ভাষায় "... the two terms taken abstractly pass into one another and change sides" হেগেলের নিজের ভাষায় "...it (being) yields to dialectic and sinks into its opposite, which, also taken immediately, is Nothing." (Logic of Hegel, p. 161) Being মানে যেমন নির্বিশেষ গুণহীনতা তেমনি Nothing-ও সেই নির্বিশেষ গুণহীনতা। কাজেই একের সঙ্গে অপরের কোনই তফাৎ নেই। কাজেই, একার সত্তা বিমূর্ত অর্থেই একান্ত নঞর্থক বা নাস্তিবাচক আর তা-ই অনুরূপভাবে 'কিছুই না' (Nothing)।***

* Pure, indeterminate, unqualified, indistinguishable, ineffable being i.e. being in general, not this or that particular being. (Croce)

** 'Nothing conceived in itself, without determination or qualification, nothing in general, not the nothing of this or that particular being." (Croce)

*** 'But this mere Being, as it is mere abstraction is therefore the absolutely negative ; which, in a similarly immediate aspect, is just Nothing.'

[Logic of Hegel, p. 161, Art. 87]

এদের দুয়ের কোনোটাই পুরোপুরি সত্য নয়—Being ও নয় Nothing-ও নয়। এদের দুটিকেই খণ্ডন বা negate করে ওদের ওপরে হয়েছে 'Becoming' (হয়ে-ওঠা) বা বিবর্তন, যাতে সত্তার ভিতরে এদের দুয়েরই সত্তা বিধৃত হয়ে রয়েছে। Being ও Nothing কে অতিক্রম করে করেই তবে বিবর্ত বা Becoming সম্ভব। এজন্য বিবর্তকে (Becoming) বলা হয়েছে উভয়ের সমন্বয় বা সংশ্লিতি (synthesis) অর্থাৎ Being ও Nothing নামক দুটো পরস্পর-বিরোধী পদার্থের বৃহত্তর সমন্বয়।

এখন আগেকার প্রসঙ্গে আসা যাক্। এখানে Being বা Nothing এরা দুইই পারস্পরিক অনুস্যূতি (Interpenetration of opposites) নীতির দৃষ্টান্ত। কারণ হেগেলের মতে Being এর মধ্যেই Nothing লুকিয়ে রয়েছে ; যেহেতু অস্তিত্বই (Being) অনস্তিত্ব (Nothing.) কাজেই Being এর মধ্যেই স্ববিরোধী একটা সত্তা বিদ্যমান রয়েছে। যেমন Nothing নিজেকে নিজেই খণ্ডন (Contradict) করছে—কারণ Nothing-এর নিজের সত্তা মানেই Being. Nothingও স্ববিরোধের দৃষ্টান্ত। সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে অস্তি এবং নাস্তি আসলে একই হয়ে দাঁড়াল। যা অস্তি, তাই নাস্তি। বিশ্বে যে দ্রুত বিবর্তন হয়ে চলেছে প্রতিমুহূর্তে, প্রত্যেক অনুপরমাণু যে ছন্দে অনন্ত রূপান্তরের মধ্য দিয়ে নিত্যনূতন হয়ে চলেছে, সেই বিশ্বনীতির চকল ছন্দটি এই Being-Nothing-Becoming-এর ত্রিতালেই আবর্তিত হচ্ছে। জগতের সকল বিবর্তই (Becoming) বিকশিত হচ্চে অস্তি-নাস্তি দ্বন্দ্বের ফলে। অস্তির মধ্যেই নাস্তি বাসা বেঁধে রয়েছে বলে জগদ্ব্যাপারের এই নিত্য চাঞ্চল্য। অস্তি যদি স্ব-বিরোধিতা না করত, তবে বিবর্তন হ'ত না ; জগৎ হয়ে দাঁড়াত স্থানু কঙ্কালমাত্র। উইলিয়ম জেম্‌স্ এই হেগেলীয় তত্ত্বকে অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বুঝিয়েছেন :

এই ত্রিনীতি দেখাচ্ছে, বাস্তব জগতের পরিবর্তনশীলতার কারণ এই যে Being বা সত্তা নিয়ত নিজেকে খণ্ডন করে চলেছে। যা কিছু আছে, তা আছে বলেই নেই। Being-এর এই ধারণা, যা নিজের পায়েই চিরদিন উচোট খেয়ে পড়ে এবং অস্তিত্ব রক্ষার দায়েই পরিবর্তন স্বীকার করে তা সত্যবস্তুর (Reality) অতি অপরূপ প্রতীক ; এবং এটাই একটি কারণ যার জন্য তরুণ পাঠক অনুভব করে যে এই পদ্ধতিতে যেন এক গভীর সত্য নিহিত রয়েছে।*

এই Being-কে যেভাবে স্ব-বিরুদ্ধতার দৃষ্টান্ত করা হয়েছে তাতে এখানেও হেগেলের সেই একই মারাত্মক confusionএর দেখা পাওয়া যাচ্ছে এবং সেই একই কৌশল বা ভুল, যাই বলা যাক না কেন, সেই প্রভেদ-বিচারে অস্বীকৃতি ('refusing to distinguish)। এই ত্রিনীতিতে "অস্তি"-কে যেরকম সংজ্ঞাহীন ও নির্বিশেষরূপে কল্পনা করা হয়েছে, তাতে "অস্তির" চেহারা অবিকল 'নাস্তির" চেহারা হয়ে পড়েছে ; কারণ "নাস্তি" অবিকল অমনি সংজ্ঞাহীন ও নির্বিশেষ। এখানে অস্তি ও

---

* "This trial shows that the mutability of the real world is due to the fact that being constantly negates itself ; that whatever is, by the same act 'is not', and gets undone and that this the irremediable torrent of life about which so much rhetoric has been written, has its roots in an ineluctable necessity which lies revealed to our logical reason. This notion of a being which for ever stumbles over its own feet, and has to change in order to exist at all, is a very picturesque symbol of the reality and is probably one of the points that make young readers feel as if a deep core of truth lay in the system."

(Ibid. W. James)

নাস্তি যদি একই বস্তু হয়, তবে 'অস্তিকে' নস্যাৎ করে নাস্তির জন্ম হয়, এ নস্যাৎ-করণের কর্মূলা এক্ষেত্রে খাটছে না। কারণ একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু বিনাশ করছে বলতে তাদের স্বতন্ত্র সত্তা ধরে নেওয়া হয়। নাস্তির কোন স্বতন্ত্র সত্তা এখানে নেই, কারণ অস্তি এখানে অস্তি-ই।

তারপরে অস্তি-নাস্তিকে negate বা নস্যাৎ করে আবার যে Becoming এর নতুন synthesis, তাও এক্ষেত্রে অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। Becoming বলতে এই দৃশ্যমান নাম-রূপের জগতের বিকাশকেই বোঝা যায়; নামহীন, নির্বিশেষের তলগত পরিবর্তন বা বিবর্তন হতে পারে না। যারা আছে, তারা পূর্ব স্বরূপকে নস্যাৎ বা negate করে, নতুন স্বরূপকে গ্রহণ করলে, তবেই Becoming নামক প্রক্রিয়াটি (process) ঘটতে পারে। কাজেই এখানে 'Being' বা অস্তিত্ব বলতে সংজ্ঞাহীন নির্বিশেষ 'অস্তিত্ব' বোঝাচ্ছে না। এখানে 'অস্তি' মানে বিশিষ্টতা-সম্পন্ন (determinate) নামরূপ-সম্বলিত 'অস্তি'। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে হেগেল তাঁর ত্রিনীতির প্রথম উপাত্তে (premise) যে অর্থে অস্তিত্ব বা Being কে ব্যবহার করেছেন, বিবর্তন (Becoming) অর্থ করতে গিয়ে আবার এখানে "অস্তিত্ব" শব্দের ভার থেকে অন্য মানে ধরে নিয়েছেন। আগে 'অস্তি'কে ধরলেন নির্বিশেষ 'অস্তি' হিসেবে, পরে 'অস্তি' মানে ধরে নিলেন 'বিশিষ্ট অস্তিত্ববান বস্তু' হিসেবে। কাজেই Being-কে দুটো বিভিন্ন অর্থে দু'বারগায় কাজে লাগানো হয়েছে। অর্থের যে সূক্ষ্ম পার্থক্য এখানে রয়েছে তাকে উড়িয়ে দিয়ে নিতান্ত অযৌক্তিক ভাবে তাঁর negation বা খণ্ডনের কর্মূলাকে প্রতিষ্ঠা করবার চেষ্টা হেগেল করেছেন। কেন্দ্ এই ত্রিনীতির হেগেলীয় ব্যাখ্যান-রীতিকে তীব্রভাষায় সমালোচনা করে বলছেন :

"He takes what is true of a term—*secundum quid*, treats it as true of the same term '*simpliciter*, and then of course, applies it to the term *secundum aliud*. A good example of this is found in the first triad····—But how is the reasoning done? Pure being is assumed, without determinations, being secundum quid. In this respect, it agrees with nothing. Therefore simpliciter it is nothing; wherever we find it, it is nothing, crowned with complete determinations then; in secundum aliud, it is nothing still, and bebt sich auf." (James, ibid pp.280-282)

(ক্রমশঃ)

কমিউন

অমিয়ভূষণ মজুমদার

সুরথ ও সুমথ দুই ভাই। সুমথ বয়সে সাত-আট বছরের ছোট। এই ভাড়াটে বাসাতে তারা অনেকদিন থেকেই বাস করছে। আগে এই বাসাতে ওদের পরিবার ছাড়াও অন্য একটি পরিবার থাকতো। বছর চারেক হ'লো সেই পরিবার উঠে যাবার পর গোটা বাসাটাই সুরথরা ভাড়া নিয়েছে। বাড়িটা পুরনো, বাড়ির সামনের রাস্তাটা তেমন আধুনিক নয়। কিন্তু সম্পূর্ণ বাড়িটা ভাড়া নিতে পেরে তারা সুখী হয়েছে মনে হয়। অন্য আর একটি পরিবারের উপস্থিতির ফলে আগে যেমন অহরহই ভাড়াটে বাড়ি ব'লে মনে হ'তো এখন তেমন হয় না।

দুই ভাই-ই বিবাহিত; সুরথের স্ত্রী অনিমা, সুমথর স্ত্রী চারুশীলা। সুরথের চারটি সন্তান, সুমথর একটি। এই নিয়েই তাদের সংসার।

কিছুদিন আগেও দুই-ভাইকেই ক্লিষ্ট ও ক্লান্ত দেখাতো। এখন যেন অনেকটা পরিবর্তন হয়েছে। সুরথকে তেমন যেন হতাশার সংকীর্ণ আর দেখায় না। সুমথর পরিবর্তনটা বিশেষ চোখে পড়ে। তার চেহারা ও পোশাক, এবং চালচলনে একটা স্বচ্ছন্দ জীবনের অনুমান করা যায়। সুরথ কিন্তু একটা নিশ্চয়ই করে, তার প্রমাণ চার পাঁচ বছর আগে পর্যন্ত সংসারটাকে সেই চালাতো; কিন্তু ঠিক কি করে তা বোঝা যায় না এ জন্য যে যে সব কাজের ওকথা থাকে তেমন কিছু সে করে না। অন্যদিকে ইদানীং অন্তত সুমথ যে কোন মার্চেন্ট অফিসের ছোট ধরনের অফিসার তা বোঝা যায় যখন কোন কোন দিন অন্তত তাকে অফিসে নেবার জন্য তাদের গাড়ি আসে।

সুরথের স্ত্রী অনিমা স্বভাবতই এদের পরিবারে আগে এসেছিলো। তখন শাশুড়ি ছিলেন। সেকালের প্রথায় শাশুড়ির হাত থেকে সংসারের কর্তৃত্ব ধীরে ধীরে তার হাতে এসে যাচ্ছিলো। অবশ্য ছোট একটা ভাড়াটে বাড়িতে যে সংসার তার কর্তৃত্বের মূল্যই বা কতটুকু। কিন্তু যাবনের বাক্সর চাবিটা অনিমার হাতে দিয়ে শাশুড়ি যখন শেষবারের মতো চোখ বুজলেন, দেখা গেলো অনিমার মনে অভিভাবক-সুলভ একটা ভঙ্গি অনেকটা প্রধান হয়ে উঠেছে। এটা পরিবারের প্রায় সকলেই অনুভব করে তারও প্রমাণ পাওয়া যায়।

কোনদিন হয়তো সুমথ বললো, "বৌদা টাকার তাগাদা দিচ্ছিলো।"

উনুনে ডাল চড়াতে চড়াতে অনিমা বললো, "আচ্ছা, বলবো তোমার দাদাকে।"

অথবা কোনদিন চারুশীলা বললো, "দিদি, দুধটা কি পয়লা আজকাল তোমার সামনে দিচ্ছে।"

তরকারি কুটতে কুটতে অনিমা বললো, "সামনেই তো দেয়, কেন?"

"মাপে কম দিচ্ছে।"

"কম দিচ্ছে? তা কি ক'রে হবে? কাল রাত্রিতেও সকলেরই কুলিয়ে গেলো।"

চারুশীলার মুখটা গম্ভীর দেখালো। কোঁকড়ানো সুন্দর চুলে ঢাকা তার কপালটা কিছু কুঁচকে গেলো।

সে বললো, "কাল সোনার দুধে কম পড়েছিলো রাত্রিতে খাওয়াতে দিয়ে।"

"বলিস কি? আচ্ছা দেখবো।"

চারুশীলা চ'লে গেলে ব্যাপারটাকে নিয়ে মনে মনে আলোচনা করলো অনিমা। যতবার তার মনে হ'লো শিশু সোনার দুধে কম পড়েছে ততবার তার রাগ হ'তে লাগলো। কখনোও দিব্যবাবুর গয়লাদের উপরে, কখনও নিজের উপরে, কখনও বা চারুশীলার উপরে। কারণ এক বছরের শিশু সোনা আধসেটা খেয়েছিলো এটা তার অভিভাবকত্বকেই চূড়ান্ত অপমান করেছে।

সোনা চারুশীলার একমাত্র সন্তান হ'তে পারে কিন্তু তারই কি কেউ নয়। সোনাকে কষ্ট দিয়ে কি লাভ হয়েছে কার?

খেতে ব'সে অনিমা বললো, "দুধ যখন ঘরে নিয়ে গেলে, তখনই তো কম দেখেছিলে। পরিবেশন করতে করতে এমন এক আধটু কম বেশী হয়ে যায়। আগে দেখলেই পারতে।"

চারু বললো, "সেটা তো আদর্শ ব্যবস্থা নয়। আর আগে দেখলেই বা কি হতো?"

অনিমা বললো, "চাবলু নয় কম ক'রে খেতো দু বিস্কুক। সে তো সন্ধ্যাবেলায় যা হ'ক দুটো ভাত খায়।"

চারু বললো, "অন্য কারো ভাগের দুধ সোনা খেতে গেলো কেন?"

ভাতের গ্রাস নিয়ে যে হাতখানা অনিমার মুখের কাছে উঠেছিলো সেটা অবশ হয়ে থালের উপরে নেমে পড়লো।

সোনার খাওয়া হয় নি এটাই যথেষ্ট পরিতাপ ও রাগের কারণ হয়ে আছে, তার উপরে ছোট বউএর এই গা জ্বালানো কথা। রাগে অনিমার সারা দেহ জ্বলতে লাগলো।

সে বললো, "কি জানি চারু, তোমার বাপের বাড়িতে কি হয়। আমাদের এই পরিবারে ভাগের ভাগ বলে কিছু নেই। দুধের গায়ে কারো নাম লেখাও থাকে না।"

চারু বললো, তার সুন্দর মুখ লাল হ'য়ে উঠলো, "আমার বাপের বাড়ি এমন হা ঘরে নয় যে হিসাব করে চলতে হবে।"

"আর আমরাই বুঝি হা ঘরে? আমরাই হা ঘরে?"

অসমাপ্ত আহার রেখে অনিমা উঠে গেলো।

সমস্তটা দিন অনিমা কি করবে ভেবে না পেয়ে নিজের রাগ আর অনুশোচনায় আকুল হয়ে বেড়ালো। সে একবার ভাবলো সে নিজে ছোট বউএর বাপের বাড়ির কথা তুলেই অন্যায় করেছে। বাপের বাড়ির দিকে কটাক্ষ কোন মেয়েমানুষই সহ্য করতে পারে না। অন্য সময়ে সে ভাবলো ভাগের ভাগ কথাটা তুলে চারুশীলাই তাকে এবং তার এই শ্বশুর বাড়ির সব ব্যবস্থাকে অপমান করেছে। কিন্তু এখন কিছু করা চাই যাতে এ ধরণের কথা আর কখনও না ওঠে।

পরদিন সকালে গয়লা দুধ দিয়ে গেলে অনিমা একটা কাজ করে বললো। দুধ আল দিয়ে দুই বাটিতে পৃথক করে ফেললো। মনে মনে একটা বাটির গায়ে নাম লিখে দিলো চারুশীলার ঘরের দুধ। না, সে আর কখনও তার অভিভাবকত্বের, তার সুবিচারের খুঁত ধরতে দেবে না কাউকে।

কিন্তু মাছ নিয়ে যেদিন কথা উঠলো সেদিন প্রমাণ হয়ে গেলো অনিমার অভিভাবকত্বে এ বাড়ির সকলে আর সুখী নয়।

ইস্কুল যাওয়ার আগে অনিমার ছ বছরের বড় ছেলে খেতে বসেছিলো। সে বললো, "বাজারে খুব ভালো ইলিশ মাছ উঠছে। মাছ ভাজা খুব ভালো লাগে। সেদিন কেমন সুন্দর আস্ত মাছ এনেছিলো কাকা।"

দুপুরে খেতে বসেই আবার কথা হলো।

অনিমা বললো, "চারু, কালকে ঠাকুরপোর অফিস

বেরুনোর সময়ে মনে করিয়ে দিও তো। শেয়ালদা বাজার থেকে মাছ আনতে বলে দেবো।"

চারু কিছু না বলে খেতে লাগলো।

অনিমা আবার বললো। "তুমু বলছিল মাছের কথা। আহা, কি যে হলো দেশের, বাঙালীর ছেলে হয়েও মাছের কাঙাল হলো ওরা।"

চারু ফস্ করে বলে বসলো, "তোমার ঠাকুরপো বলছিলেন আজ বড় মাছ এনেই বা লাভ কি?"

"ঠিক বুঝলাম না তোর কথা।"

চারুশীলা বললো, "তোমার ঠাকুরপো বলছিলেন আজকাল ইলিশ মাছের কোল তৈরি হয় না।"

সামান্য কথাটা। কিন্তু বলতে গিয়ে চারুশীলার সুন্দর মুখ খানিকটা উত্তাপে লাল হয়ে উঠলো।

সামান্য কথাটার উত্তর সামান্যই হতে পারে। অনিমা বললো হাসিমুখে। "রসিকতা। সেদিন কেমন বড় বড় কটা —কেন ঠাকুরপোর বাড়িতে —।"

কথাটা অসমাপ্ত রেখে অনিমা ভাবলো। ভাবতে গিয়ে চারুশীলার লাল হয়ে ওঠা মুখ তার চোখে পড়লো।

অনিমা বলতে গেলো, "সেদিন বাইরের স্বজন ছিলো। হয়তো সে জন্যই সেদিন ঠাকুরপোর পাতে মাছের কোল পড়েনি।"

কিন্তু হঠাৎ অনিমার মনে জ্বালা ধরলো। সে বললো, "ঠাকুরপো বলেছে এই কথা? আচ্ছা আসুক, আজই জিজ্ঞাসা করবো। ছি-ছি, চারু, তুমি না বি এ পাশ? তুমি না অক্সেনরি ট্রেনিং প্রাপ্তা? তুমি না বড় ঘরের মেয়ে?"

চারুশীলা বললো, 'পরিবেশন করার সময়ে একটু দেখে দিলেই পারো!"

"তুমিই তা করো এখন থেকে। আমি তোমার কি বা রাঁধুনে বামনি নয় যে তোমার উপদেশ মত কাজ করবো।"

অনিমা মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো সুরথকে এসবই সে বলবে আজ। এমন করে সংসার করা তার সহ্য হয় না। নির্লিপ্ত ভালোমানুষের মতো সংসারের উপর মহলে বসে সুরথ এ সব জ্বালা যন্ত্রণার কথা কিছুই বুঝতে পারে না। ভাবো তো ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত মাছ চুরির দুর্নাম! বাইরের স্বজন ভদ্রলোক খেয়েছিল আর তাদের সঙ্গে বসেছিল সুরথ। এ সব ক্ষেত্রে সকলকেই সমান করে সাজিয়ে দিতে হয়। সুরথকেও তাই কোলের মাছ দিতে হয়েছিলো। আর তার পরে খেতে বসে ছোটরা বায়না ধরেছিলো। চারুর ছেলে সোনা বড় হলেও তা ধরতো। আর কোলের মাছ থাকলে তাকে না দিয়েও পারা যেতো না। এ জন্য হয়তো সুরথের বাটিতে কোলের মাছ ছিলো না। কিন্তু তাই মুখস্থ করে রেখেছে চারু আর তাই নিয়ে খোঁটা দিচ্ছে! ছি-ছি।

সেদিন রাত্রিতে অনিমা একটু কথা বলার সুযোগ পেয়েছিল সুরথের সঙ্গে। সুরথ নিজে থেকেই বললো, "আজ খবর পেলেম সুরথর আমার আর একটু উন্নতি হয়েছে চাকরিতে। মাইনেও প্রায় এক'শ টাকা বাড়বে। বউমার আমার লক্ষ্মীশ্রী আছে। সে আসবার পর থেকেই সংসারে উন্নতি হচ্ছে।"

অনিমার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বললো, "তাই, এর চাইতে সুখবর আর কি হ'তে পারে। ঠাকুরপোর যোগ্যতা সম্বন্ধে তো সন্দেহ করার আর কিছু নেই। তা ছাড়া সত্যি এক একজনের শ্রীভাগ্য থাকে। লোকে বলে শ্রীভাগ্যে ধন।"

অনিমা টুল কাঁটা নিয়ে বুনতে লাগলো। অনিমার ইচ্ছে হলো তখনই গিয়ে সুরথকে অভিনন্দন জানিয়ে আসে। এক সময়ে এরকম করতো বটে সে। তখন এদের সুখ দুঃখের একমাত্র সঙ্গিনী ছিলো সে। কিন্তু এখন তাকে খানিকটা দূরত্ব রেখে চলতে হবে। এখন বরং চারুর অভিনন্দন দেবার সময়।

কিন্তু কথাটা হঠাৎ যেন ধরা পড়ে গেলো অনিমার কাছে। সে হাসিমুখেই সমুস্বরে বললো, "খবর পেলে বললে, কার কাছে জানলে? খবরটা ঠিক তো?"

সুরথ বললো, "তুমি যে আমাকে কি ভাবো অনিমা। ভুল খবর, ঠিক খবরও কি বুঝি না? নারায়ণদা নিজেই ফোন করেছিলেন। এর পরে বলবে কোন নারায়ণদা? যে সুমথর চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলো?"

"তা হ'লেই, দেখো, ঠাকুরপো তোমাকে বলে নি।"

কয়েক পলক সুরথ অনিমার মুখের দিকে চেয়ে রইলো। তার স্নান কিন্তু বিষাদমগ্ন মুখে হঠাৎ যেন পরিবর্তন দেখা দিলো।

সে বললো, "ছি-ছি, মেয়ে মানুষের মন বড় সংকীর্ণ। সে আমার কাছে গোপন করবে কেন? সময় হ'লেই বলবে। অনিমা প্রকৃতি তোমাদের মনকে সংকীর্ণ করেছে, তার উপরে কারো হাত নেই; কিন্তু প্রতিশোধও যোগান দিচ্ছে। সে দিকে দেখো। ভালোবাসতে শেখো।"

ধমক খেয়ে অনিমার মুখটা ম্লান দেখালো। কিন্তু তারও কিছু বলার ছিলো। সেও অনেক সহ্য করেছে। বললো, "আমি আসার পর থেকেই না হয় তোমাদের লক্ষ্মী ছেড়ে গিয়েছে, কিন্তু আমি কি কাউকেই ভালোবাসি না?"

সুরথ বললো, "তোমাকে কথায় হারাতে সরস্বতীও পারবে না।"

এই বলেই সে দাঁড়ি টেনে দিলো আলোচনাটার উপরে। আর তার সঙ্গে সঙ্গেই যেন সে তার মনের শান্তিকে ফিরে পেলো।

কিছুক্ষণ অনিমা উল বুনলো, আর তাতেই তার মনটাও শান্ত হওয়ার সুযোগ পেলো। সে ভাবলো, বলো এই মানুষকে কি সুখের বাটিতে দু বিন্দুক দুধ কম পড়ার কথা, কার পাতে একটা বোলের মাছ পড়ে নি—এমন সব কথা বলা যায়। সন্ধ্যায় ঘরে যেতে হবে না যদি সে বলে এসব কোন ভাষার কথা?

শুয়ে পড়ার আগে অনিমা ভাবলো, আর এটাই যেন স্বাভাবিক রাতের চিন্তা, সুমথ খবরটা দাদাকে এখনই দিতে চায় না। হয়তো প্রথম মাসের বাড়তি মাইনেটা হাতে নিয়ে দাদার সামনে দাঁড়াতে চায়। অন্য রকম ভেবেছিলো বলেই নিজেকে বরং সে শাসন করলো। এর আগে চারুশীলা এ বাড়িতে আসবার অনেক আগে, শাশুড়ি থাকতেই, দুই ভাইএ ভুল বোঝাবুঝি হয় নি এমন নয়,—আর তখন সে নিজেই সে সব ভুল বোঝাবুঝি দূর ক'রে দিয়েছে।

ঘুমিয়ে পড়ার ঠিক আগে অনিমার মনে শান্তির সঙ্গে সঙ্গে আশ্বাসও দেখা দিলো। সে ভাবলো বাড়তি টাকার পঞ্চাশটাও যদি সে হাতে পায় সংসারে সে আর একটু সুখ সোয়াস্তির ব্যবস্থা করতে পারে। তখন আর বাহু দুধ নিয়ে কেউ কটাক্ষ করার সুযোগ পাবে না।

সংসারে রোজই ঘটনা ঘটছে। সে ক্ষেত্রে পুরনো একটা ঘটনার জের টেনে চলা যায় না। সমুদ্রের ঢেউ অবিরাম ওঠা পড়া করছে। তার হিসাবই বা কে রাখে? তা সত্ত্বেও মাস কাবারের পর দশটা দিন অনিমা যেন কিসের একটা প্রতীক্ষায় কাটালো। কি যেন একটা সুখের আভাস তার সংসারের চারিদিকে অথচ ঠিক সংসারের মধ্যে আসছে না। তার পরে তার মনে পড়লো আবার সুমথর মাইনে বাড়ার কথা। মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে একটা অস্বিরতা বোধ করলো সে। কিন্তু এবথা কি আর উত্থাপন করা যায়। আশ্চর্য! সুমথ বলছে না? তাকে না হয় নাই বলেছে, এখন তো সুখের কথা বলার লোক আছেই। কিন্তু তার দাদাকেও সুখের সংবাদটা বলছে না। না, না। এ কথা আর এবাড়ীতে যেন না ওঠে। তাতে শুধু টাকার উপরে তার লোভই প্রমাণ হবে।

কিন্তু সংসারের ঢেউগুলোকে সমুদ্রের ঢেউএর সঙ্গে তুলনা

করে, খুন করেছিলো অনিমা। এবং নদীর ঢেউ। একই রকমের ঢেউ বলে মনে হলেও তাদের চিরস্থায়ীত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ করা যায়। নদীর পথ বদলায়। প্রতিটা ঢেউই নতুন করে পথ কাটে, পুরনো পথে চরা তৈরী করে যদিও তা অদৃশ্যভাবে।

চার পাঁচ মাস পরে একদিন খেতে বসে চারুশীলা বললো, "তোমাকে একটা কথা বলি, দিদি ওঁদের কোম্পানী থেকে প্রস্তাব দিয়েছে।"

"কি? তোকেও চাকরি দেবে?"

"না। কোয়ার্টারের কথা বলছি। বেশ ঝকঝকে নতুন সব কোয়ার্টার। ইলেকট্রিক ফ্যান হিটার সবেরই ব্যবস্থা আছে।"

"শুনতে তো ভালোই লাগে। কিন্তু সে সব জায়গায় শুনেছি দু তিন খানা মাত্র ঘর থাকে খুব বড় অফিসার না হলে। খোঁজ নিয়েছ কখানা ঘর?"

"শোবার মত ঘর দুখানা, আর বসবার জন্য একখানা।"

অনিমা বললো, "তবে? এ বাজার চারখানা বড় বড় ঘরেও কুলায় না।"

চারু বললো, "তুমি একটু বলবে বড় ঠাকুরকে।"

হঠাৎ যেন অনিমা প্রস্তাবটার গোড়ার কথা ধরতে পারলো। সে ব্যস্ত হয়ে বললো, "না, চারু, না; এ কথা আমি তোমার বড় ঠাকুরকে বলতে পারবো না।"

চারুর সুন্দর মুখে বিরক্তি দেখা দিলো; এ রকম সময়ে তার ঠোঁটটা উল্টে যায়, তেমনি করেই সে বললো, "কিন্তু এটাই তো স্বাভাবিক। আধুনিক কালে এটাই চলে।"

অনিমার ভঙ্গি দেখে মনে হলো চারুর বক্তব্যটাকে সে অবহেলার অন্ধকারে গোপন করতে চায়। আর সংসারে তা করতেও হয়।

কিন্তু সেদিন রাত্রিতে আবার সে সুরথকে সংসারের কথা বলতে সুরু করলো।

অনিমা বললো, "ঠাকুরপো যে কার্মে চাকরি করে সেখানে কি কোয়ার্টার দেবার ব্যবস্থা আছে।"

সুরথ খবরের কাগজের পাতা উল্টে বললো, "তা দেয় বোধ হয়, সুধন্যর কাছে জেনে নিও।"

অনিমা বললো, "ঠাকুরপোর এখন উন্নতি হয়েছে চাকরিতে ভালো কোয়ার্টার বোধ হয় দেবে। ঝকঝকে নতুন বাড়ি। আর এই ছোট বাড়িটাতে অসুবিধাই হচ্ছে।"

"তাতো হয়ই।"

"তা হলে তোমার মত আছে।"

"কিসের মত? সব দিকে ভেবে দেখেছো? আমার ছাত্রগুলো অবশ্য এখান থেকেই কাছাকাছিই হয়। তা যা হয় সুধন্যর সঙ্গে পরামর্শ করে নিও।"

অনিমা বললো, "তুমি কি আমার কথা শুনছো?"

সুরথ কাগজটাকে ভাঁজ করে সরিয়ে রাখলো। বললো, "বলো তুমি কি বলছিলে?"

অনিমা হঠাৎ যেন সাহস হারিয়ে ফেললো। কিন্তু তা সত্ত্বেও বললো, "তোমাকে যেতে হবে কেন?"

"তা হলে আর আলোচনা কেন?"

"ঠাকুরপোরা—"

"ঠাকুরপোরা? মানে? অর্থাৎ? তুমি কি জানো, অনিমা, স্ত্রীলোককে ধার বলে কেন?" কঠোর শুনালো সুরথের স্বর।

অনিমা মিনমিন করে বললো, "চারু বলছিলো।"

দপ্ করে জ্বলে উঠলো সুরথ। "কি? কে বলে? কার কথা বলছো।" সুরথের গলা চড়তে লাগলো। সে যেন এখনই ঘর থেকে ছুটে বেরুবে। বললো প্রায় চীৎকার করে, "কে আমার বাড়ি ভাগে দেখতে চাই। কার এত বড় বুকের পাটা। আমার ভাইকে আমার কাছ থেকে নিয়ে যাবে, কার এত শক্তি?" "যাবো, যাবো, মোহা' তোমার যাবো, তোমার পায়ে পড়ি যাবো" বলে অনিমা চেয়ার থেকে ছুটে

উঠে এলো। সত্যি সত্যি দু পা চেপে ধরলো সুরথের দু হাত দিয়ে।

"ছি-ছি, আমি, আমিই ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি ভাসুর হয়ে ভাই বউকে গাল দেবে নাকি? একি শরৎবাবুর উপন্যাস।"

সুরথ কষ্ট কঠিন মুখে বললো, 'সরো।"

এই আধুনিক জীবন কি শরৎবাবুর উপন্যাস হ'তে পারে? দু-তিনদিন পরে নিজের বলা এই কথাটাই হঠাৎ আবার মনে পড়লো অনিমার। শরৎবাবুর উপন্যাসে এরকম দুই ভাইএর যৌথ সংসার আছে। আর সে সংসারের সঙ্গে কোন কোন দিক দিয়ে অনিমার সংসারেরও মিল আছে। গত দশ বারো বছরের ইতিহাস অনিমার চোখের সামনে এসে গেলো।

বিলেতি মার্চেন্ট অফিসের আপার ডিভিসন ক্লার্ক সুরথের সঙ্গে অনিমার বিবাহের পরের এই দশ বারো বৎসর। বনমুষ্টাইর শ্বশুরের মৃত্যুর পরে অনুভব করা গেলো যৌতুকের বিশের টাকা যা আদায় হ'তে পারে, আর দোকানদার যা পাবে তার অঙ্ক কষলে দোকানদারের পাওনা কয়েক হাজার টাকা বেশী থেকে যাবে। কলকাতার বাড়ি বিক্রি করে পিতৃঋণ শোধ করেছিলো সুরথ, এই ভাড়াটে বাড়ির একটা অংশে মা, ভাই ও বোনকে নিয়ে উঠে এসেছিলো। সুরথ তখন সবে মাত্র কলেজে উঠেছে। তার পর শুরু হলো সুরথের সংসার। শরৎবাবুর উপন্যাসের বড় ভাইদের হাতের কাছে কিছু পৈতৃক সম্পত্তি থাকে। যার সাহায্যে কায়ক্লেশে গ্রাসাচ্ছাদন চলে, অদ্ভুত উপায়ে সেই দারিদ্র্যের মধ্যেও ছোট ভাইকে লেখাপড়া শেখানোর দায়িত্বে অবিচল থাকা যায়। সুরথের হাতের কাছে একমাত্র অবলম্বন ছিলো দু'শ টাকার একটা চাকরি। তখন এখন দিনও গিয়েছে যে দুই ভাই মিলে চারখানা আস্ত ধুতিও ছিলো না। পেন্সি, জামা, জুতোও দুই ভাইকে অনেক সময়ে ভাগ করে পড়তে হতো। এর উপরে নলদের বিয়ের ব্যাপারটা এসে পড়লো। আজকালকার দিনে অনেক মেয়েই বিয়ে করে না, চাকরি করে। কিন্তু শাশুড়ির তা ইচ্ছা ছিলো না। একবার নলদ বলেছিল সুরথকে নিরস্ত করতে। সুরথের চোখ দুটি ছলছল করে এলো। সে ম্লান মুখে বলেছিলো, বোনকে ডেকে; "বাবা থাকলে তোর কত ভালো বিয়ে হতো তা আমিই জানি। তেমন বিয়ে দিতে পারছিনে এ জন্য আমি তোদের সকলের কাছেই অপরাধী। চাকরি করতে হয় শ্বশুর বাড়িতে গিয়ে ভেবে দেখিস।"

উৎসবটা মিটে গেলে হিসাব নিয়ে বসতে হয়। সুরথও বসেছিলো, আর তখন দেখা গেলো তার মতো লোকের পক্ষে ধার না করে বিয়ের ব্যবস্থা করা যায় না।

একদিন যখন সুরথ হিসাবের খাতায় ধারের ছোট বড় অঙ্কগুলোকে যোগ দিয়ে তার সঠিক পরিমাণটাকে খতিয়ে দেখার চেষ্টা করছে, সুরথ গিয়ে দাঁড়িয়েছিলো। খাতাটাকে চোখের সম্মুখ থেকে সরিয়ে ফেললো সুরথ।

সুরথ বললো, "দাদা, একটা কথা বলতে এলাম।"

"বলো।"

"আমি ভাবছি, মানে, আমি আর পড়তে চাচ্ছি না।"

"কী! কী বললে!"

"ভাবছি, মানে একা তোমার পক্ষে সংসার চালানোটা শক্ত হয়ে পড়ছে না?"

সুরথ কঠোর স্বরে বললো, "যাও পড়তে বলো গে। বাবা বেঁচে থাকলে বলতে পারতে একথা।"

"কিন্তু, এটা একটা অদ্ভুত অবস্থা যে তুমি অফিসের খাটনি খেটেও দু বেলা টিউশনি করে বেড়াবে। আমি আর পড়বো না।"

"পড়বো না, পড়বো না! দূর হয়ে যা আমার সামনে থেকে।"

টিউশনি সেরে ফিরে রান্নাঘরে খেতে বসে সুরথ বললো, "তুমি খেয়েছে। ওর ঘর অন্ধকার দেখছি যে বড়ো?"

অনিমা বললো, "খাবে না, বলেছে মাথা ধরেছে।"

"ও, মাথা ধরেছে বাবুর, ভারি মাথাওয়ালা লোক দেখছি।" তরাক করে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো সুরথ। ঘটঘট করে সুমথর ঘরে গিয়ে দাঁড়ালো। আলো জ্বালালো সুইচ টিপে।

সুমথ টেবলের সামনে গোঁজ হয়ে বসেছিলো। অন্ধকারে। সুরথ তাকে হাত ধরে টেনে তুললো, "ওঠ বলছি। বাবুর আবার রাগ আছে দেখছি।"

সুমথ বললো, "না, না, আমাকে ছেড়ে দাও। মাথা ধরেছে আমার।"

সুরথ বললো, "ভালো কথায় যাবি না, তোকে কোলে করে নিয়ে যেতে হবে। ভাবছিস খুব বড় হয়েছিস।

সুমথর সে একটা অদ্ভুত হাসি-কান্নি অবস্থা। বলছে "ছাড়ো ছাড়ো।" কিন্তু সুরথের আলিঙ্গন থেকে নিজেকে মুক্ত করতেও পারছে না। অবশেষে পাশাপাশি খেতে বসলো দু ভাই।

সেখানেই কি শেষ।

মাছের বাটিটার হাত দিতে গিয়েই সুরথ বললো, "আরে করেছো কি বড়বউ, কতদিন না বলেছি আমি মাছ খেতে ভালোবাসিনা, তবু ওগুলো কেন আবার চাপিয়েছো।" এই বলে সে নিজের মাছের বাটিটা সুমথর বাটিতে উপুড় করে দিলো।

কিন্তু অনিমার অনুরোধ ঠেলতে পারে নি সুরথ।

সেই রাত্রিতে অনিমা জিজ্ঞাসা করলো, "আর কাউকে না বলো আমাকেও বলতে পারো না? ধারের অঙ্কটা কোথায় গিয়ে ঠেকেছে?"

সুরথ বললো, "ঘুমাও এখন।"

কিন্তু ঘুম কি আসে? অনিমা অন্ধকারে বসারির ছাদের দিকে চেয়ে শুয়ে রইলো। বলো এই মানুষটিকে কি বলা যায় ঘরে চালও বাড়ন্ত।

দু তিনদিন নিঃশব্দে কাটিয়ে অনিমা বললো আর একদিন, "একটা কথা বলবো যদি রাগ না করো।"

"আমাকে খুব বদরাগী বলে তোমাদের ধারণা হয়েছে দেখছি।"

"আমাকে একটা কাজ জুটিয়ে দিতে পারো?"

"একটা তো দিয়েছি। এতে হচ্ছে না?"

"সংসার কাটা কি আবার কাজ হলো?"

"তবে কি, চাকরি?" সুরথ হোহো করে হেসে উঠলো। "চাকরি ছেড়ে বিয়ে করেছিলে, এবার কি বিয়ে ছেড়ে চাকরিতে ফিরে যাবে?"

"ক্ষতি কি? তোমার ধার শোধ হলে আমারই স্বার্থসিদ্ধি হবে। তা ছাড়া ঠাকুরপোর পড়াটাও নিরাপদ হবে।"

সুরথ চুপ করে রইলো।

মাস দু এক পরে সুরথ একদিন হালি ঠাট্টার মতো করে বললো, "চাকরি করবে?"

"সত্যি পাওয়া যায়?"

"আমাদের ছোটসাহেবের জন্য একজন স্টেনো টাইপিস্ট মঞ্জুর হয়েছে। অস্থায়ী চাকরি। তবে কালে স্থায়ী হতে পারে।

"করবে? তুমি তো এর আগে টাইপিস্ট ছিলে।" সুরথ হাসতে লাগলো।

"ঠাট্টা করো না। সত্যি, লক্ষ্মীটি, দেখো না চাকরিটা যদি হয়।"

"হতে পারে না এমন নয়। ওরা আমাকে এখন খুশী করতেই চায়। কিন্তু ছোটসাহেবের বদনাম আছে।"

"তার বদনাম তারই থাকবে। তুমি দেখো চেষ্টা করে, লক্ষ্মী।"

চাকরিটা নিয়েছিলো অনিমা। স্বামীস্ত্রীর যৌথ চেষ্টায় ধারটাকে কাটিয়ে উঠেছিলো তারা। খবরটা কিছুদিন গোপনই ছিলো। এক ছুটিতে জানতে পেরে সুমথ বলছিলো,

"প্রতিবীরারিং পড়ে কি স্বর্গে যাতি দেবো। এসব কি হচ্ছে কিছু বুঝি না।"

"কিছুই হচ্ছে না।" হাসতে হাসতে বলেছিলো।

"না, বউদি, তোমার এই সংসার ঠেলার পরে চাকরিতে যাওয়া ভালো লাগছে না। শরীর শুকিয়ে পোড়ো কাঠ হচ্ছে।"

"পাশ করো, চাকরি করো, ঘরে আমার ছোট জা আসুক। তখন পায়ের উপরে পা তুলে বসে খেয়ে মিত্তির বাড়ির বড় বউ হ'য়ে যাবো।"

মিত্তির বাড়ির বড় বউ গুলতায় বিখ্যাত। সুরথ আর অনিমা একসঙ্গে হেসে উঠেছিলো।

সাত বৎসর হ'লো চাকরি গিয়েছে সুরথের আর তার সঙ্গে সঙ্গে অনিমারও। আর চাকরি যখন গেলো তখন সুরথের পড়া শেষ হ'তে একবছর বাকি। দিনটার কথা অথবা সেই দিনের বিকেলের কথা অনিমার স্পষ্ট মনে আছে। মানুষ এমন নির্বোধও হয় যেমন সেদিন হয়েছিলো অনিমাদের অফিসের ছোটসাহেব। পাশের ঘরে তখন সুরথের বরখাস্তের চিঠি বিলি হ'য়ে গিয়েছে। অফিসের অন্য বয়স্ক কর্মচারীরা সুরথের টেবলের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। উত্তেজিত তারা। অনিমার ছোট সাহেব অবশ্যই আন্দাজ করেছিলো সুরথের চাকরি ছেড়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিঃশব্দ হবে না। সে বলেছিলো আমার গাড়িটায় বরং তুমি আজ বাড়ি যাও অনিমা। আর তোমাকে একমাসের ছুটি দিচ্ছি। একমাস পরে আমি আবার গাড়ি পাঠাবো।

অনিমা বলেছিলো, "কেন, হঠাৎ, এখন ছুটি?"

ছোটসাহেব বললো, "তা জিজ্ঞাসা করো না। তবে জেনে রেখো যখনই যে অসুবিধে হবে আমাকে জানিও। আমি তার প্রতিকার করতে পারবো। শোফারকে গাড়ি আনতে বলেছি। চলো বরং তোমাকে একটু এগিয়ে দিই।"

অনিমা বলেছিলো, "আমি নিজেই যেতে পারবো।"

"বেশ যাও। অফিসে থেকো না, আর তুমি মনে রাখবে তোমার ছুটি শেষ হবে আজ থেকে ত্রিশ দিন পরে। সেদিনই জয়েন করো।"

বলা বাহুল্য সুরথ সেদিন অফিস থেকে বেরিয়ে গেলে শুধু অনিমা নয় অফিসের অধিকাংশ কর্মচারীই বেরিয়ে এসেছিলো। সুরথ ছাড়া অন্যান্য কর্মচারীরা পনেরো দিন ধর্মঘটের পরে চাকরিতে ফিরে গিয়েছিলো। কারু সুরথকে চাকরিতে বহাল রাখা ছাড়া অন্যান্য সব দাবিই তাদের কর্তৃপক্ষ মেনে নিয়েছিলো। অনিমা অবশ্য ফিরতে পারতো। কিন্তু সেটা আলোচনার বিষয় নয়।

ছোট সাহেবের বিশেষ দুর্বলতাই কি সেটা সেই ছুটি দেবার প্রস্তাব? ধর্মঘটী কর্মচারীদের তালিকায় অনিমার নাম ওঠে নি। কৌশল, না দুর্বলতা। পরে নিশ্চয়ই ছোট সাহেবের অজানা ছিল না যে অনিমা সুরথের স্ত্রী, কিন্তু তখন কি সে জানতো না? অথবা জেনেও মনে করেছিলো-টাকার আগুনের দিকেও সব মেয়েরই পতঙ্গের মতো টান আছে?

স্বপ্রোথিতার মতো সংসারের কাজে মন দিলো অনিমা। অতীতের ইতিহাস চোখের সামনে এনে কি লাভ আর? শরৎবাবু, তোমার সেই যুগ থেকে আমরা সরে এসেছি, তা অনেকটা দূরই হবে। তোমার উপন্যাসের কোন বড় বউ স্টেনোর চাকরি করতে যায়নি, আর তোমার কল্পিত কোন বড় ভাই ট্রেড ইউনিয়ন করতে গিয়ে চাকরি খোয়ায় নি। এখানেই আমরা আধুনিক।

কিন্তু তাই বলে ছোট বউ আধুনিক একটা বাড়িতে উঠে যেতে চাইলেই তাতে রাজি হওয়া যায় না।

পরে ভাবলো অনিমা, আর তারই বা অপরাধ কোথায়। সে তো বলেনি চলে যাবো। মানুষের মনে এমন কত ইচ্ছাই

হয়। সে প্রকাশ করেছে বইতো নয়। বয়সে সে ছোট। ওটাকে অতটা গুরুত্ব না দিলেও হয়। আর সংসার এমন করেই চলে।

তার প্রমাণ সম্বন্ধে এই বলা যায় চারুর সেই কথার পরে আরও ছ মাস চলে গিয়েছে। আর সেই ছ মাসে সংসারে কেউ আগুনে পুড়ে মরেনি। বরং ছেলেপুলেরা বড় হয়েছে। সোনা হাঁটতে শিখেছে। টাবলু স্কুলে ভর্তি হয়েছে। চারুশীলা বাপের বাড়ি গিয়েছিলো। সেখান থেকে হাসি-মুখে ফিরেছে। দুধের বাটির কৌশলে অনিমা জয়ী হয়েছে। দুধ নিয়ে আর গোলমাল হয় না, কারণ এখন টাবলুকে এক আধ দিন দুধ না দিলেই চলে। মাছ অনেকদিন সুরথকে দেয় না অনিমা। সে ধীরে ধীরে বাড়ির প্রায় সকলকেই জানিয়ে দিয়েছে সুরথ মাছের আঁসটে গন্ধ সহ্য করতে পারে না।

আর এই নীতিটা যে সংসার সম্বন্ধে ভালো নীতি তার আর একটা প্রমাণ দেখা দিচ্ছে। সুরথ বলুক আর নাই বলুক তার চাকরির উন্নতির কথা, তার আর্থিক সচ্ছলতার কিছু কিছু সুফল সংসারও ভোগ করছে তো বটে। যেমন এ বাড়িতে রেডিও ছিলো না, সেলাইএর কল ছিল না, ইলেকট্রিক ফ্যান ছিলো না। এখন সে সবই হয়েছে। হতে পারে যে সেলাই-এর কলে অনিমার নিজের কিছু সুখ সুবিধা বাড়ে নি। সে সেলাই করেই বা কি, সেলাই করার সময়ই বা তার কখন। ইলেকট্রিক ফ্যান তিনটি শোবার ঘরের একটিতে মাত্র হয়েছে। কিন্তু তাও ভালো। এর আগে প্রতিবেশীর বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে টাবলু ফ্যান ঘোরার দিকে কেমন বোকার মতো অবাক হয়ে চেয়েছিলো নিজেদের বাসায় ফ্যান থাকলে তা হতো না। রেডিও, সেলাইয়ের কল, ইলেকট্রিক ফ্যান ইত্যাদি বর্তমান জীবনের সঙ্গে এমনভাবে জড়িত যে এগুলোর প্রত্যক্ষজ্ঞান ছেলেপুলেদের থাকা উচিত। আর রেডিও সম্বন্ধে অন্ততঃ সকলেরই প্রত্যক্ষলাভ হয়েছে। কাজ করতে করতেই অনিমা শুনতে পায়, নিজের ঘরে বসে

ভার ক্ষণিক বিশ্রামের অবকাশেও। মোটকথা যাকে আজ-কাল জীবন যাত্রার মান বাড়া বলে তা বেড়েছে এ পরিবারের, যতই বলা হক সুরথ বাড়তি যাইনার কোন অংশ অনিমার হাতে পৌঁছায় নি সংসার খরচের জন্যে। উপরন্তু আরও বলা যায়: সামাজিকতা লৌকিকতার কথাই বলো। সমাজে বাস করতে হলে ওটা করতেই হয়। অথচ কি পরিমাণ মর্মপীড়ার কারণই না হতো। সংসার খরচ থেকে এতদিন বড়জোর একটা পাঁচ টাকার নোট সে লৌকিকতার জন্য ব্যয় করতে পেরেছে, কিন্তু বিবাহ বলো, উপনয়ন বলো সামাজিকতার খাতিরে সে সব উৎসব ক্ষেত্রে এ বাড়ির দু বউকেই যেতে হয়েছে। এখন আর তেমন হবে না, তার প্রমাণ কিছুদিন আগে মোড়ের মাথার মিত্তির বাড়ির মেয়ের বিয়েতেই পাওয়া গিয়েছে। দুই বউই গিয়েছিলো, কিন্তু এবার সঙ্কোচে কণ্টকিত হতে হয়নি। কারণ এসব ক্ষেত্রে যেমনটা দিলে ভালো দেখায় তেমন করেই ব্যবস্থা করা গিয়েছিলো, করেছিলো সুরথ। অনিমাদের সংসারের পক্ষ থেকে শাড়ি, আর মিষ্টি দিয়ে লৌকিকতা করা সম্ভব হয়েছে।

আর এ সবেরই ফলে অনিমার সাংসারিক সাহস বেড়েছে। তার প্রত্যক্ষ প্রমাণও পাওয়া গেলো।

চারুর এক দিদি পশ্চিমে থাকে। দু তিন বছরে একবার তিনি কলকাতায় আসেন। তাঁর এখানকার এক আত্মীয়ের বাড়িতে এসে থাকেন। আর চারুকে ডেকে পাঠান। চারু তাঁর কাছে কোন বার এক মাস কোন বার দিন পনরো কাটিয়ে আসে।

খবর পাওয়া গেল চারুর দিদি দিন পনরোর মধ্যেই কলকাতায় আসছেন।

একদিন চারু বললো, "আমাকে কয়েকদিনের জন্যে দিদির কাছে যেতে দেবে তো?"

অনিমা চিন্তা করলো কথা বলার আগে। বললো, "প্রতিবারই তুমি গিয়ে তাঁর কাছে থেকে আসছো, এবার

তাঁকেই তোমার কাছে থাকতে বলো না কেন?"

চারু অবাক হয়ে গেলো। এতদিন ধরে এমন কোন প্রস্তাব করেনি অনিমা।

সে বললো, "বাইরের লোক এসে থাকলে অসুবিধা হবে না?"

"বাইরের লোক কি রে? তোর নিজের দিদি, এত বড় কুটুম আমাদের আর কে আছে।"

"তুমি তা হলে বড় ঠাকুরের মত নিয়ে দেখো।"

অনিমা হেসে বললো, "আত্মীয় স্বজন, কুটুমের তত্ত্বতল্লাস করতে কর্তাদের মত নিতে হয় না। সেটা গিন্নীদেরই অধিকার।"

সেদিনই বিকেলের দিকে চারু বললো, "কিন্তু দিদি, আমাদের বাসাটা তো তেমন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন নয়।"

"তুলনা করলে হতে পারে, কিন্তু তুই যেখানে তিনশ' পঁয়ষট্টি দিন থাকতে পারিস, সেখানে তোর দিদি পনরো সুড়িদিন থাকতে কষ্ট পাবে তা ভাবিস কেন?" এই ব'লে অনিমা হেসে আবার বললো, "ঠাকুরপোকে বরং বলবো পারে যদি এক কলি চুণ ফিরিয়ে দেবে। আর জমাদারণিকে বলে দেবো তোর দিদি যে কদিন থাকবে রোজ একবার করে ঝাঁট দিয়ে যাবে।"

কিন্তু সংসারে সাধারণ ঘটনার মধ্যে থেকেও এমন অসাধারণ ঘটনার উদ্ভব হয় যে অতিবিচক্ষণ ব্যক্তির সম্বন্ধেও তা অপ্রত্যাশিত হতে পারে।

তিন চারদিন পরে এক সন্ধ্যায় ভাড়ার থেকে রান্নার চাল আনতে গিয়ে থমকে দাঁড়ালো অনিমা। কারো কথা কান পেতে শোনা অভ্যাস নয় তার। কিন্তু কোন কোন সময়ে সাধারণ কথাও এমন তীক্ষ্ণ হতে পারে যে দু হাতে কান চেপে ধরলেও তার হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায় না।

চারুশীলা আর সুমথ কথা বলছিলো। স্বামী-স্ত্রীর আলাপ শোনা উচিত নয় বলে অনিমা তাড়াতাড়ি সরে যাওয়ার চেষ্টা করলো, কিন্তু কথাগুলোই যেন তার অন্তর ভেদ করে তাকে মাটিতে গেঁথে দিয়েছে।

চারু বললো, "শুধু চুণের কলি ফিরানোই নয়। বিছানা বালিশ, আধা কাপড়।"

সুমথ বললো, "আমরা যে বড়লোক নই একথা তোমার দিদি জানেন। আর তা ছাড়া তোমার বিছানা ইত্যাদি এমন কিছু পুরনো বা কুটুম নয়। সোনার কয়েকটা গয়না বানাতে চাও এই তো? তা বানিয়ে নিও।"

চারু বললো, "আহা, তা যেন? তোমার বউদির ঘরের বিছানাপত্তরের কথা ভাবো। ওগুলো কি লোককে দেখানোর মতো? তা ছাড়া তোমার ভাইপোরা ওই রংওঠা ছুট ফ্র্যানেল পরে বেড়াবে তো?"

সুমথ বললো, "বেশ তো খান কয়েক সুজনি চাদর না হয় কিনে দেয়া যাবে বউদিকে। আর ওই শিশু তিনটিকে না হয় তিনটে উলের জামা কিনেই দেয়া গেলো।"

"কিন্তু তাতে খরচটা কত হবে ভেবে দেখেছো। শুধু সুজনি চাদর নয়, দেশ বালিশের ওয়ার। ঘরলা জানালার পর্দা, তার চাইতে আমার যাওয়াই কি ভালো নয়?"

যেন লম্বিত পেয়ে ছুটে পালালো অনিমা। রান্না ঘরে গিয়েও যেন তার হাত পায়ের কাঁপুনি থামতে চায় না। রান্না করতে বসেও সে কড়ার দিকে চাইতে পারলো না। একবার সাহস করে সে নিজের ঘরে গেলো আর তখনই যেন সে চোখের জলে ভেঙে পড়বে মনে হলো। তার বিছানা কোনদিনই মূল্যবান নয়, ব্যবহার-জীর্ণও বটে, কিন্তু আর কোনদিনই তাকে এমন ভিখারীর কাঁথা বলে মনে হয়নি। তার ছেলেরা সত্যি বিবর্ণ ছুট ফ্র্যানেলের জামা পরে বসে আছে। কিন্তু আর কোনদিন তাদের এমন অবহেলায় অপমানে লাঞ্ছিত মনে হয় নি।

অনিমা তার ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। না, না, না।

তার শূন্য মনে এই শব্দটাই হতে লাগলো। কখনই সে শয্যাত্রয় কিনবে না, কখনই এই শর্তে সে তার ছেলেদের উলের জামা পরতে দেবে না। বরং একটা পর্দা কিনবে সে। তার শোবার ঘরদুটোকে সেই পর্দা দিয়ে একেবারে পৃথক করে দেবে।

অন্য উপায়ই বা কি আছে আর। এখন কি আবার বলা যাবে চারু তোমার দিদির এসে আর কাজ নেই? তা হলে কি এই প্রমাণ হবে না যে সে স্বামী-স্ত্রীর গোপন আলাপ কান পেতে শুনেছে? ছি-ছি। কিছুই স্থির করতে না পেরে সে শুধু স্থির হয়ে বসে রইলো।

শুধু রাত্রিতে শুতে গিয়ে চোখের জল যখন আবার উদ্বেল হয়ে উঠছিলো, অনিমা স্বামীকে বললো, "আর কিছু টাকা পয়সা না হলে চলে না।"

সুরথ চুপ করে রইলো।

অনিমা বললো "আমি বুঝি এখন কথা বলার অযোগ্য হয়ে যাচ্ছি।"

সুরথ হেসে বললো, "চাকরি করবে? তোমার পুরনো বস্ তোমাকে বিশেষ শ্রদ্ধা করেন এমন খবর পেয়েছি। আমার সঙ্গে দেখা হয়েছিলো কিছুদিন আগে। তোমার খোঁজ নিলেন। আর দেখো কি বলা, চাকরি যাওয়ার আগে এই ছোট সাহেবই আমাকে এক নম্বর শত্রু মনে করতেন। নমস্কার করলেও প্রতিনমস্কার করতেন না। সেদিন নিজে থেকেই এগিয়ে এসে নমস্কার জানিয়ে আলাপ করলেন। বদনাম থাকলেও ঠিক অভদ্র বলা যায় না, তাই নয়।"

অনিমা বললো, "বিজনকে তুমি বলে দেখো। যদি তেমন সুবিধা হয় কয়েক ঘণ্টার পার্টটাইম টাইপিস্টের কাজও যদি পাওয়া যায়। বলবে?" সুরথ বললো, "ভেবে দেখি।"

চারুশীলার দিদি চারুশীলার চাইতে বেশ কয়েক বছরের বড়। কিন্তু এখনও তাকে সুন্দরী না ব'লে পারা যায় না। তার আর্থিক স্বচ্ছলতা যে এ বিষয়ে তাকে অনেকটা সাহায্য করেছে তাতে সন্দেহ নেই। বেশ বড়লোকের একজন অফিসারের স্ত্রী। খুব চিন্তা ভাবনা না ক'রেই ব'লে দেয়া যায় সমাজের উচ্চ চূড়ায় যে অতি সংকীর্ণ নন্দন কাননের মতো সজ্জিত উপত্যকা আছে সেখানেই তার বাড়ি। কালচার ব'লে একটা কথা আছে। চারুশীলার দিদি মনীষাকে দেখে মনে হয় তিনি কালচারের প্রতিমা। অবশ্য কালচারের ক্ষেত্রে, যেমন চিত্রপ্রদর্শনীর উদ্বোধন, চ্যারিটি বাজার, অথবা কোন মন্ত্রীমহাশয়ের অভ্যর্থনায় যখন তিনি নেতৃত্ব করেন তখন তাঁকে কেউ মনীষা বলে না, দিলেন বোনার্জি বলতে তাঁকেই বুঝতে পারা যায়।

সৌন্দর্যের উপরে কারো কারো জন্মগত অকারণ আকর্ষণ থাকে। অনিমারও যে এমন ছিলো তা ইতিপূর্বে বোঝা যায় নি। ট্যাক্সিটা এসে থামতেই সে অভ্যর্থনা করার জন্য এগিয়ে গেলো। তার কর্মঘলিন দুখানা হাতে চারুশীলার ম্যানিকিউর করা সুদৃশ্য বড় বড় নখ সমেত দুখানা হাত তুলে নিয়ে যখন সে অভ্যর্থনা জানালো তখন তার হৃদয় এতটা পূর্ণ হ'য়ে উঠেছিলো যে বলবার মতো কিছুই সে খুঁজে পেলো না।

মনীষা বললো, "এই বুঝি তোমার বড় জা, চারু।"

কথাটায় কি কিছু ছিলো, অথবা বলার ভঙ্গিতে? কিম্বা এটা হয়তো অনিমার মতো একজন সাধারণ গৃহিণীর পক্ষে স্বাভাবিকই হয়েছিলো—তার ভয় ক'রে উঠলো।

চারুর সঙ্গে প্রথম দেখা হওয়ার সুযোগে সে যা বললো তাতে দেখা গেলো নিজের গৃহিনীপনার যোগ্যতাতেই তার সন্দেহ এসে গিয়েছে।

অনিমা বললো, "কি, কি, ব্যবস্থা হবে বলতো? চা না হয় ঘরেই দিলাম, কিন্তু দুপুর রাত্রির ভাত? সেও কি ঘরেই দেবো, না বাবুদের খাওয়া হ'য়ে গেলে তোর আমার সঙ্গেই খাবেন? সত্যি বলছি, আমি যাবড়ে যাচ্ছি।"

চারু বললো, "ওখানে তো আমরা এক সঙ্গেই খেয়ে থাকি।"

অনিমা কাজে মন দিলো। কাজ করতে করতে সে ভাবলো, মানুষগুলোকে নিজের বশে না আনতে পারলে রান্নাও যে ছাই হয়ে যাবে। আর সত্যি যদি চারুর দিদিকে সে নিজের কুটুম বলে ভালোবাসতে পারে তবে এসব সঙ্কোচই বা কেন! তা ছাড়া অমন চেহারা, অমন ঐশ্বর্যময়ী চেহারা যাঁর তিনি কখনও সামান্য সামান্য ব্যাপারে ত্রুটি ধরতে পারেন!

ঘণ্টাগুলো যেন অনিমের ঢেউএর উপর দিয়ে খেলা করে করে চলে গেলো।

বিকেলে রান্না করতে করতে একটু অসুবিধা বোধ করেছিলো অনিমা। তার মনে হলো তার ঘরের দরজার টাঙানো পর্দাটা বড্ড বেশী নড়ছে। ডালটা নামিয়ে দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলো। তারপর তার সে ঘরে ছুটে এলো।

সাত বছরের টাবলু তার পাঁচ বছরের ও তিন বছরের দুটি ভাইকে সামলে রাখছে। ঘরের এখানে ওখানে ছড়ানো, খেলনা, বই, পুতি, প্রভৃতি দেখে বুঝতে পারা যায় কাজটা তার পক্ষে খুব সহজ হচ্ছে না। মা ঘরে আসতেই নিজের মুখের উপরে আঙুল রেখে ভাইদের চুপ করে থাকতে ইশারা করে মাকে কানে কানে কিছু বলার জন্য ইসারায় ডাকলো।

এ যেন এক খেলা এমন ভাবেই মাথা নোয়ালো অনিমা টাবলুর মুখের কাছে।

টাবলু মায়ের কানের কাছে মুখ নিয়ে বললো, "তোমার ছেলে দুটোকে আমি আর সামলাতে পারছি না, মা। ওই দেখো বাবলু আমার বই খাতাগুলো ছিঁড়ে ফেলেছে। আর ছোটন বাবার বিছানায় কালি ঢেলেছে। আমি আর পারছি না মা, সত্যি পারছি না।" টাবলুর চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো।

এক মুহূর্তের একটা আবেগে অনিমার চোখও ছলছল করে উঠলো। ভাববার জন্যই একটু দাঁড়ালো সে। বললো, "সোনার ছেলে টাবলু। আজ তুমি আমার কোলে শোবে। কাল তোমার বিজন কাকাকে ইস্কুল থেকে আসবার সময়ে ডেকে এনো। কাল থেকে রোজ বিকেলে তোমরা বেড়াতে যাবে।"

"অনেকক্ষণ বেড়াবো মা"। প্রায় সমস্বরে বললো শিশু তিনটি।

"হ্যাঁ। অনেকক্ষণ। বিজন কাকাই নিয়ে যাবে। সন্ধ্যে পর্যন্ত তোমরা পার্কে থেকো। এখন আর একটু লক্ষ্মী হয়ে থাকো তোমরা।"

টাবলু নিচু গলায় ভাইদের ডেকে নিয়ে খেলতে বললো আবার। আর অনিমা পর্দাটাকে টেনে দিয়ে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে।

কিন্তু রান্না ঘরে যেতে যেতে উঠোনের দাওয়ায় থমকে দাঁড়ালো অনিমার পা দুখানা। হঠাৎ কুয়াশার মতো, বাষ্পের মতো কিছু একটা অনিমার মনকে একেবারে ছেয়ে ফেললো। আর সেই ঝোঁয়াটে অস্পষ্ট মন যেন যুক্তি হারিয়ে উপায়ান্তর না দেখে প্রোপান দিতে সুরু করলো—এমনি করেই ভালোবাসাকে বিস্তার করতে হয়। কুটুমকে ভালোবাসাই ভালোবাসার প্রথম বিস্তার।

বিজন এসেছিলো। টাবলু তাকে ঠিকই ধরে এনেছে, বিকেলের আগেই।

বিজন বললো, "বউদি, টাবলুদের বেড়াতে নিয়ে যেতে হবে!"

"বলেছে বুঝি! কিন্তু তোমার অত কাজ ফেলে—।"

"বিলক্ষণ। সুরধুনী বলেন অকেজো, কুঁড়ে, আর আপনি বলছেন অত কাজ। দাদাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন। তাতে একটু উপকার হবে আমার। আর কি কি হুকুম তাই বলুন।"

"তুমি হুকুম মনে করলে কি করে বলি ভাই।"

"বিলক্ষণ না হয় আদেশ বা নির্দেশ হলো।"

কথাটা অনিমার মুখের কাছে এসে গিয়েছিলো, বারে বারে কেউ যেন কথাটা বলতে তাকে খোঁচাচ্ছে। ছেলে তিনটিকে উলের জামা কিনে দেয়া দরকার। অনিমা বলতে গেলো "কয়েকটা টাকার দরকার ছিলো, বিজন।" কিন্তু কথাগুলো চাপতে গিয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেলো তার মুখ।

বিজন বললো, "মুখ দেখে বুঝতে পারছি। বাবাও কাল হাসতে হাসতে বলেছিলেন। চাকরি করবেন আবার? আজ সোমবার। শনিবার সন্ধ্যায় জানাবো। আপাতত টাবলু, রেডি। বলো কি চড়বে ট্যাক্সি না, রেলগাড়ি, না স্টিমার?"

ছোটন বললো, "রেল গাড়ি।"

ছোটনকে কোলে তুলে ভদ্ ভদ্, পু, কিক্ কিক্ শব্দ করে প্রবল বেগে হাত ঘুরাতে ঘুরাতে বিজন প্রশস্ত রাজপথে টাবলু আর বাবলুকে রেলগাড়ি রূপে টানতে টানতে রওনা হয়ে গেলো।

সদর দরজার পাশ থেকে সরে এলো অনিমা। এ বুদ্ধিটা আগে করলেই হতো, এই ভাবলো সে। এই ভালো হবে। দিন পনরো থাকবে বনীথা। তার মধ্যে চার পাঁচ বারও যদি টাবলুদের বেড়াতে নিয়ে যায় বিজন ছেলেদের মনে আর খেদ থাকবে না পর্দার আড়ালে থাকতে হলো বলে।

অনিমা বনীথার সঙ্গে আলাপ করবে। চারুশীলা সব সময়েই তার সঙ্গে আছে। তা হলেও তারও আলাপ করা দরকার, গল্পগাছা করা দরকার। এই দুদিন সামান্যই করেছে তা। আর আলাপই কুটুম্বিতা। নতুবা বনীথা কি তার বাড়িতে খেতে এসেছে?

কিন্তু এখন রান্না চড়ানোর সময় নয়। এসময়টা তার হাতে অবসরের মতো হয়েই এলো। সকাল থেকে এতক্ষণ সে কাজ করেছে। এখন কি একটু বিশ্রাম করে নেবে?

একটু ভেবে অনিমা স্থির করলো এখন বরং আর খানিকটা কাজ করে নেবে সে। অবসরটাকেই বরং সন্ধ্যার কাছে সরিয়ে নিয়ে যাবে। বনীথারা এখন বেড়াতে গিয়েছে। তারা ফিরে এলে খানিকটা সময় তার সে বনীথার সঙ্গে গল্পগাছা করবে। আর তা দরকারও। আলাপই কুটুম্বিতা।

তাড়াতাড়ি হাত চালিয়ে কাজ করে নিলো অনিমা।

ট্যাক্সিটা থামলো শব্দ করে দরজায়। উনুনে চায়ের জল চাপিয়ে দিলো অনিমা। তারপর কুটুম্বিনীর তত্ত্বতল্লাস করতে এগিয়ে গেলো।

আগে যে ঘরটাকে ভাড়ার করে রাখা হয়েছিলো, সেটাকেই সাজিয়ে গুছিয়ে বসবার ঘরে পরিণত করেছে চারু। এর আগে এদিকে অনিমার আসবার ফুরসুৎ হয়নি। বেশ লাগলো তার। ঘর সাজাতে গিয়ে মাকারি দামের অনেক জিনিষ কিনতে হয়েছে। তা ভালোই করেছে। এ না হলো বাড়িটার সম্মান থাকতো না। লৌকিকতার ব্যাপারে যেমন এতেও অনিমা খুশী হয়ে উঠলো।

ঘরে তখন বনীথা, চারুশীলা আর সুমথ তিনজনই ছিলো। অনিমা যেতেই বনীথা বললো, "এসো, সারাদিন কাজই করছো। এত কাজই করতে পারো।"

অনিমার গালের পাশ দুটো লাল হ'য়ে উঠলো। বললো সে, "খুবই অন্যায় হয়েছে আমার, দিদি, আপনার সঙ্গে সে-জন্যেই এখন কথা বলতে এলাম। কোন দিকে গিয়েছিলেন আজ।"

কৈফিয়ৎ দেয়ার পর্বটাকে কাটিয়ে উঠতে পেরে অনিমা হাসলো।

বনীথা বললো, "সুমথর কোআর্টার্স দেখে এলাম। তুমি দেখেছো নাকি?"

হঠাৎ যেন বুকের নিচেটা ফাঁকা হয়ে যাবে মনে হ'লো অনিমার। সে বললো, ও, না দেখিনি এখনও।"

"বেশ ভালোই। কোআর্টার্স হিসাবে ভালোই। সে তো আর নিজের বাড়ির মতো নয়। তা হ'লেও ভালোই।"

অনিমা বললো, "তা হ'লে ভালো নিশ্চয়ই। চারুরও পছন্দ হয়েছে নিশ্চয়।"

চারুর মুখটা ফ্যাকাসে হয়ে গেলো।

মনীষা বললো, "পছন্দ হলে আর কি হবে। তোমরা নাকি চারুকে কোআর্টাসে যেতে দিতে চাওনা?"

এটা যেন একটা হাসির কথা। কথাটা বলে হাসি চাপতে পারলো না মনীষা। তবু হাসিটা যেন আলগা কিছু হিসাবে বসিয়ে দিলো সে কথাটার শেষে।

অনিমা বললো, "কেউ কি কারো যাওয়া বন্ধ করতে পারে? ওরা দুভাই,, পরস্পরকে কাছে রাখতে চান বলেই চারু যায় নি।"

কথাটা এত সহজে বলতে পেরে অনিমা একটু জোর পেলো। সে হেসে বললো, এখানে হয়তো কিছু কিছু অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু এটা মানে আমাদের এই যৌথ পরিবারটা একটা কমিটমেন্ট। ঠাকুরপো নিজেই পার্টি মেম্বার। কি বলো, ঠাকুরপো? এটাকে একটা আদর্শ কমিটমেন্ট বলতে চাও না?"

সুরথ কিছুই বললো না। কিন্তু অনিমা হাসতে পেরে আর ঝকঝকে কথাটা বলতে পেরেই যেন দুর্দিনীর সহজ সাহস ফিরে পেলো। সে খিলখিল করে হাসলো, বললো, আবার, "এমন কি, জানেন, আমাদের চারুও ঠাকুরপোকে ভালোবাসতে সুরু করে পার্টির কাজে নেমেই। কি, চারু, তাই নয়?"

মনীষা বললো, "কি জানি। ঠিক বুঝতে পারি না তোমাদের কথা।"

একটা স্তব্ধতাকে যেন ডেকে আনলো মনীষার এই কথা কয়েকটি। অথচ খুব গম্ভীর স্বরে সে বলেছিলো এমন নয়। সুরথ যেন একটা প্রকাণ্ড প্যাঁচালো সমস্যার সম্মুখে বোকা হয়ে চেয়ে রইলো। একটা প্রবল আবেগ কোথা থেকে সংগ্রহ করে চারু মুখ চোখ লাল করে টেবল ক্লথের একটা সুতোর দিকে মাথা নুইয়ে বসে আছে।

মনীষাই আবার কথা বললো, "অবশ্য এতে তোমাদের সুবিধাই হয়। সুরথ বাবু তো কোন চাকরিই করে না।"

অনিমা উঠে দাঁড়ালো। হাসলো। এমন কি তার গালে হাসির টোলটিও দেখা গেলো। সে বললো, "কিন্তু, মনীষাদি চায়ের জল বসিয়ে এসেছে। চা ভিজিয়ে আনি।"

বিকেল থেকে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা থেকে রাত্রি। ইতিমধ্যে একবার রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে অনিমা চারুশীলাকে ডেকে এনেছিলো। গোপন পরামর্শ করার সুরে বলেছিলো মাছ আজ ভালো পাওয়া যায় নি। তরকারির চপ বানাবো, একটু গড়িয়ে নে। দুই জাতে রান্না ঘরের কাজ শুরু করেছিলো। চারুর হাতে মুহূর্তের জন্য হেঁসেলের ভার দিয়ে অনিমা নিজের শিশু কয়েকটিকে ভালভাত খাইয়ে ঘুমানোর ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে এসেছিলো।

রাত্রিতে খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকিয়ে অনিমা যখন ঘরে গেলো তখন নিজেকে ক্লান্ত মনে হলো। সে নিজে দেখতে পাচ্ছে না যদিও, তার ক্লান্ত মুখের ঠোঁট দুটিতে একটা হাসি জড়িয়ে আছে। আর তার ফলে যে তাকে দেখবে তারই মনে হবে ম্লান একটা আত্মপ্রসাদের কথা।

কাগজ থেকে মুখ তুললো সুরথ।

অনিমার আর একটু কাজ বাকি আছে। ছোটন এই সময়ে একটু দুধ খায়। মেঝেতে আসন পেতে ঘুমন্ত ছেলেকে কোলে ক'রে তাকে দুধ খাওয়ালো অনিমা। কাজটা বরাবরই নিঃশব্দে হয়। ছোটনের ঘুম ভাঙে কিনা সন্দেহ।

ছেলেকে শুইয়ে দিয়ে অনিমা বললো, "দেরি আছে?"

সুরথ একটা সিগারেট ধরালো। কোন কোনদিন এমন হয়। নিছক অকারণের সিগারেট। ক্লান্তির সঙ্গে যার কোন সম্পর্ক নয়। অথবা এটাকেই নেশা বলা হবে। এরকম সময়ে কোন কোন দিন সুরথ পাশের চেয়ারটায় অনিমাকে

বলতে বলে। একটা যেন আমিরী ভঙ্গি ফুটে ওঠে সুরথের মধ্যে তখন। যেন পৃথিবীতে কোন সমস্যাই আর নেই।

অনিমা সুরথের টেবলের ধারে দাঁড়ালো।

"আজ একটা ভারি মজার ব্যাপার হয়েছে।" সে বললো।

"পৃথিবীতে রোজই তা ঘটা উচিত, কিন্তু ঘটে না। বলো শুনি।" সুরথ মৃদু মৃদু টান দিলো সিগারেটে।

"মনীষাদিরা আজ ঠাকুরপোর কোয়ার্টার্স দেখে এসেছেন।"

"আচ্ছা।"

"মনীষাদি কিন্তু ঠাকুরপোর কোয়ার্টার্সে চ'লে যাওয়ার পক্ষে।"

"খুব ভালো কথা।"

"আমি কিন্তু তা বলতে পারি নি। আমি বলেছি ঠাকুরপো কমিউনিস্ট, আর এটা আমাদের একটা কমিটন।"

সুরথ হো হো ক'রে হেসে উঠলো। "চমৎকার বলেছো। এমন ভালো বক্তৃতা তুমি কোন ট্রেডইউনিয়ন মিটিঙে দিতে পারো নি। ঠিক বলেছো। কমিউনকে তো এমনই হ'তে হবে। এত ভালোবাসাতেই তা গড়ে উঠবে।"

"কিন্তু—"

"এর মধ্যে আর কোন কিন্তুই থাকতে পারে না।"

অনিমা সুরথের মুখের দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

কিন্তু সে বললো, 'আচ্ছা তুমি অনেকের চাকরি যোগাড় ক'রে দিয়েছো, আর একটা পারো!"

"চাকরি? তা পারি। করবে তুমি? কিন্তু তোমার সংসার কি সুরথের আয়ে চলছে না।"

"তুমি কি সংসারের কোন খবরই রাখবে না?"

"বড় বউ তোমার উপরে আমার সম্পূর্ণ আস্থা আছে।"

এক মুহূর্তে পুরনো কথাটাই মনে পড়ে গেলো অনিমার। ঠিক যেন শরৎবাবুর উপন্যাস। যেন তেমন কোন বড় ভাইয়ের প্রতিচ্ছবি ছোট ভাইয়ের আয়ে সংসার চলছে; গড়গড়ার নল হাতে জীবনের সান্ধ্যসুখ অনুভব করছে যেন সে নিজে। কিন্তু, কিন্তু তারা তো—তাদের তো আফিমের নেশা ছিলো। এ কথাটা এর আগেও মনে এসেছে বটে, বোধ হয় এমন তীব্রভাবে কোনদিন আসে নি। আজ যেন সেজন্যই সে লুকানো সত্যটাকে ধরতে পারছে। হাঁ, সুরথেরও নেশা আছে। নেশা বই কি। আফিমের নেশার চাইতে তা কম নয়। তাকে রাজনীতি অথবা আর যাই বলো।

নেশা বৈ কি, নেশায় বিবশ সুরথ। আর সে যে কি ভয়ংকর নেশা তা কথা দিয়ে বোঝানো যায় না। নেশা মানুষের আর্থিক ও দৈহিক সর্বনাশ করে সুরথেরও তা হয়েছে।

অনিমা মনে মনে বললো, কাল কত বদলে যায় তা দেখো, সেই সব গল্পের বড় বউ সংসারে আঘাত সহ্য করে প'ড়ে থাকা ছাড়া আর কিই বা করতে পেরেছে। শেষে একদিন অবশ্য সে স্বামীর নেশাতুর শান্তিকে খান্‌খান্‌ করে দিয়ে চোখ মুখ লাল করে কেঁদে কেটে গল্পের শেষে ছোট বউকে হার মানিয়ে দেয়। কিন্তু শরৎ বাবু, সে তোমার সহানুভূতির ফলে। চোখের জলের কাছে কেউ হার মানে।

অনিমা বললো, "মনীষাদি, কালচার্ড, শিক্ষিতা, সুন্দরী।"

সুরথ বললো, "ঠিক বলেছো। আমাদের ছোটবউ আর কিছুদিন পরে অমনি হবে, দেখো।"

"কিন্তু—"

সুরথ বললো, "তিনি তো দিন কয়েকের অতিথি, স্থায়ী নন।"

অনিমা নিজেই অনুভব করলো তার নিচের ঠোঁটটা কাঁপছে। সে বললো, "এটা তোমার নিজের সুবিধার জন্যই

যে তুমি বোধ ব্যবস্থা বহাল রাখতে চাইছো—এমন কথা যদি কেউ বলে।"

এক মুহূর্তের জন্য মনে হ'লো সুরথের কপালের শিরাটা বিস্ফারিত হয়ে উঠছে। মুহূর্তে ক্রোধই বোধ হয় রক্তের মতো আত্মপ্রকাশ করবে। হো হো করে হেসে উঠলো সে। বললো, "অনিমা, কথাটা পুরনো। বোধ হয় মনস্তাত্ত্বিকদের। সন্তানকে মা নিজের স্বার্থে ভালোবাসেন, স্ত্রী স্বামীকে ভালোবাসে, নিজের স্বার্থে!"

হাসির আড়ালে কান্না এসে অনিমার মুখটায় তোলপাড় করতে লাগলো। কি যেন হয়েছে আজকাল চোখের জল আসে না। আকাশে মেঘ নেই, চোখে কাজল দেয়া হয় না। বর্ষণহীন দিন সব।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.	
শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৪·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

●

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.	
বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.	
বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

জোয়ার

উপন্যাস

বিজন কুমার ঘোষ

একটু এগোতেই তপ্ত রুমাল চাপা দিতে হল। একটা বাজার করে নিয়ে আসে দা'র কাছ থেকে টাকা নিয়ে। বিশ্রী গন্ধের ঝাপটা এসে লাগল নাকে। অনেকটা বালিগঞ্জ থেকে ট্রেনে করে যেতে এই রকম একটা জায়গা পড়ে, চ্যাংরার চামড়ার কারখানা। সারি সারি মাচার ওপর গরুর ছাল ঝুলতে থাকে। কুকুর আর অদ্ভুত রঙের মানুষদের দেখা যায়। না, এখানে সেরকম কোন ব্যাপার নেই। সাহেব বাজার। হ্যাঁ বটে, খবরের কাগজে পড়েছিল, কলকাতার বাবুদের পাতে মাছ সরবরাহের দায়িত্ব ক্যানিং-এর ওপর। এখানে মাতলা নদীতে মাছমারী করবার জন্য মাঝে মাঝে সাগর থেকে ইলিশের ঝাঁক আসে। ওদের শিরদাঁড়ার ঘায়ে নাকি অনেক সময় ডিঙি নৌকো উল্টে যায়। আর তখনি কলকাতার অলিতে গলিতে খুশির মিঠে বোল ওঠে। বাতাস মদির হয়। নদীর পারে অনেকখানি জায়গা জুড়ে সাহেব বাজার। এখন ফাঁকা। ভোর বেলার ট্রেনে কলকাতার পথে চালান হয়ে গেছে। এখন কিছু কুচো চিংড়ি আর পচা মাছ স্থানীয়দের জন্যে পড়ে আছে। ভালোকের বাজারটা ঘুরে দেখবার ইচ্ছে হল। ওই যে বুড়িটা ঝুড়িতে কতগুলি ল্যাটামাছ (মহুবতপুরে বলত চাকি) নিয়ে বসে আছে, তার সঙ্গে দরাদরি করতে সাধ হল। থলে নিয়ে সারা বাজার চক্কর দিয়ে কেনাকাটা করা অনেক দিনের বাসনা। কিন্তু লক্ষ্য করেছে অনেক ইচ্ছের মত এই সাধারণ ইচ্ছেটাও অপূর্বই থাকছে। অথচ এর চাইতে সহজ কাজ আর কি আছে। বাড়িতে যখন খুব ভালো তার আগেই মিতাই গ্রাজলাদের বাজার, মাত্র দু' পা হাঁটলেই। কিন্তু ছুটির দিনে ভিড় ভাল লাগে না। পুকুরের ধারে, বাগানে, গাছের ছায়ায় ছায়ায় ঘুরতে ভাল লাগে। আদুওয়ালা-পটলওয়ালার সঙ্গে দর কষাকষির চাইতে টুনটুনির বাসা, হেনা ফুলের বেড়ার প্রজাপতির উড়ন্ত ঝাঁক, কিম্বা সিঁড়ির ঘাটে রূপোলি মাছের ভীরু আনাগোনা দেখতে অনেক বেশী লোভনীয়। তবে মহুবতপুরের স্মৃতি বেশ মনোরম। সেখানে সপ্তাহে দু' দিন হাট বসত ডাক্তারখানার মাঠে। রবিবার আর বুধবার। নদীর পারে রঙিন বিদেশী নৌকো এসে লাগত। হ্যাঁ, রায়-বাড়িতে শাসনের নামে সৌহ্য ব্যবস্থা ছিল না। ছেলে-বেলায় কখনো মানেনি, ওদের সাথে মিশবে না খোকা, ওরা ছোটলোক! বরং আলোক পুলকদাদার আঙুল ধরে ওদের বাড়ি গেছে অনেক দিন। দাওয়ায় সিঁড়ি পেতে বসে নতুন গুড় দিয়ে মুড়ি খেয়ে এসেছে। রায়বাড়ির ছেলেদের দেখবার জন্যে ভিড় জমে যেত উঠোনে। ইস্, কি কথা, কি সুন্দর ঝোকড়া চুল—ওরা ফিসফিস করে সভয়ে বলাবলি করত। যেন কথাটা কানে গেলেই পর্যান যাবে। খুব মজা লাগত। হ্যাঁ, যেমন অনায়াসে ওদের বাড়ি গেছে, তেমনি অনায়াসে কি হাটবারে দুই ভাই মিলে হাটে গেছে। খুব অবজ্ঞাত হাট। গিরীশ পালের রসগোল্লার বেশ নাম ডাক ছিল তখন। এক রকম মিঠাই পাওয়া যেত—ডিমের মটকা। এ দিকে সে সব দেখতে পাওয়া যায় না। রাঙ্গ-

বাড়ির ছেলেদের দেখতে পেলেই ছেঁকে ধরত দোকানদারেরা। হাতে এটা সেটা গুঁজে দেবার চেষ্টা করত। অধিকাংশ সময় দাম নিতে ভয়ানক আপত্তি জানাত ওরা। কিন্তু রায়বাবুদের কড়া হুকুম ছিল কিনা পয়সায় যেন একটা কাঁচকলাও না ঢোকে রায়বাড়িতে। সন্ধ্যা ঘোর হলে রায়বাড়ির সরকার মশাই কাঁচা টাকার একটা ভারী থলে নিয়ে হাটে আসতেন। তারপর রায়বাড়িতে কি কি সওদা গেছে হিসেব মিলিয়ে গুণে দাম মিটিয়ে দিতেন। আলোকের যেন এখনো বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেনি। বাবার কথা মনে এইরকম একটা দৃশ্যই কেবল ভেসে ওঠে। সেইজন্যে যদিও মাঝে মাঝে মা'কে বলে থাকে, কাল আমি বাজারে যাব; কিন্তু পরদিন সকালে উঠিয়ে দিলে আড়মোড়া ভাঙতে ভাঙতে বলে, নিতাইকেই পাঠিয়ে দাও বরং। আলোকের ভয় পাছে দৃশ্যের রূপান্তর ঘটে। আশ্চর্য, কলকাতায় ধানকাশারের দোকান ছাপিয়ে মনের মধ্যে কবেকার শিরীষ গাছের মিটমিটে দোকান এখনো টিকে আছে!

ছোট রাস্তা। সুস্থিরভাবে পাশাপাশি হাঁটা যায় না। মিনতি অতএব পিছনে। আলোকের আবারো মনে হল, মিনতি যেন নিজেকে এড়াতে চাইছে। একটা কথাও ওর বলবার নেই। যেন জোর করে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছু করতে চলেছে। আলোক এখন এসব ব্যাপার নিয়ে ভাবতে মোটেই রাজি নয়। বহুদিন পর মনটা বাতাসের মত হালকা হয়ে উঠেছে আবার। মনের মধ্যে ভিড় করে মহব্বতপুর আসছে তার রাজকীয় ঐশ্বর্য নিয়ে। কিছুতেই ফেরাতে পারে না আলোক। আলোকের বুকে যখন মহব্বতপুরের স্মৃতি দুলতে শুরু করে ওঠে, বুঝতে হবে, মনের পালটা খুব ভাল চলছে। কিশ্রী মাছের বাজারটা দেখেই নদীর ধারের ডাক্তার খানার মাঠ মনে পড়ল। আরো আছে; হাট ফুরিয়ে গেলে, পাল উড়িয়ে নৌকোগুলি চলে গেলে, ডেউলার ছাদ থেকে দেখতে পেত ডাক্তারখানার মাঠে একটু বড় সাইজের অসংখ্য জোনাকি ঘুরে বেড়াচ্ছে। সরকার মশাইকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিয়েছিল, ওগুলো আলো। গ্রামের ছেলেরা পয়সা খুঁজতে আসে। অনেকের কতদিন ইচ্ছে হয়েছিল আলো নিয়ে অন্ধকার হাটে পয়সা খুঁজতে যায়। যাক সে কথা। কিন্তু এখন বর্তমানকে উপেক্ষা করে কি ভাবে! এই তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবে না, ওর কথা ভেবে মন খারাপ করবে না—একথা যেমন করেই বা ভাবে! মূর্তিশ্রী পাশাপাশি রয়েছে, তাই ঘুরে ফিরে চোখ পড়ছেই। কেয়া হলে খিলখিল করে হেসে সব কিছু উড়িয়ে দিত। সে মনের জোর ওর ছিল। প্রতিকূল স্রোতকে চেউ দিয়ে নিজের দিকে ফেরাতে ওর মত ওস্তাদ কেউ নেই। এখন অনেক দূরে চলে গেছে, শুধু জানে, প্রতিটি দিনের কোন সময় না কোন সময় আলোক হাজির হবেই। একটুও দুঃখ বলেনি কেয়া। হয়ত সঞ্জিতের কাছে চলে গেছে অধিক সুখের আশায় অথবা অন্য কোন গভীরতর কারণে, কিন্তু এটুকু জানে, সেখানে যত সামান্য পরিমানেই হোক না কেন, আলোকের একটা স্থান আছেই। থাকবেও। কোন অস্পষ্টতা নেই, গোপনীয়তা নেই, এখের আকাশ ভরা রৌদ্রের মত কেয়া স্বপ্রকাশ। প্রত্যেক ক্লাসেই এক রকমের ছাত্র থাকে ওরা লাস্ট বেঞ্চে বসে, পড়া জিজ্ঞাসা করলে ভুলেও হ্যাঁ-না কিছুই বলে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে। মিনতি সেই জাতের মেয়ে। এরা কোন দিন ভুলেও মুখ দিয়ে কিছু বের করে ফেলে না। পাছে লোকে জানতে পারে। মেয়েদের সম্পর্কে সেই পুরোন প্রবাদ বাক্যটা শাসন করতেই ভালবাসে।

ছেলেটি বলেছিল, নদীর পার দিয়ে হেঁটে যান, গোলকুঠির সামনে আমাদের ঘাট। সুতরাং গোলকুঠিটা কোথায় কাউকে জিজ্ঞাসা করবে ভেবেছিল। কিন্তু তা হল না। একটু পরেই দেখতে পেল নদীর ঠিক পাশেই পুরোন সেকেলে দোতলা বাড়ি। আকৃতিটা গোল। হলুদ রং। এখানে

ওখানে চুন বালি খসে গেছে। জানলার নীল কাচ কত কাল আগে ভেঙে গিয়ে শূন্য হয়ে আছে। অনেকটা খুলির চোখের মত শীতল শূন্যতা। কোন মানুষ বাস করে কি ওখানে? দূর থেকে কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু না দেখেও কোন প্রাণের সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না। তবু সবার থেকে দূরে সবার মাথা ছাড়িয়ে একলা দাঁড়িয়ে আছে। যেন পুরোনোকে সবাই ভুলে যাচ্ছে, সবাই অবজ্ঞা করছে, সেইজন্যে গোলকুঠির সর্বাঙ্গে একটা উদ্ধত দুঃখী। যেন সামান্য একটু সংস্কারের খোঁচড়ও সে সহ্য করবে না। যদি কচিৎ গোলকুঠির গায়ে রঙ লাগিয়ে চুনকাম করার চেষ্টা হয়, কি কার্নিশ থেকে বটগাছের চারাটিকে তুলে ফেলা যায় অথবা জানালায় যদি নতুন কাচ বসানো হয়, তাহলে গোলকুঠি যেন প্রচণ্ড ভাবে দুলে উঠবে। প্রতিটি ইট আন্তর ছিঁড়ে আর্তনাদ করে উঠবে -না-না-না -। নদীর ওপারে প্রবল প্রতিধ্বনি জানাবে—না-না-না—। লেভেল ক্রসিং-এর এপারের সঙ্গে ওপারের তফাত। পৃথিবীর কোথাও গিয়ে এক মুহূর্ত স্বস্তি নেই। সবখানেই লেভেল ক্রসিংএর আস্ফালন। আর দূরাগত কোয়ারের ধ্বনির মত অবিরাম শব্দ। লেভেল ক্রসিংএর মাথা আকাশে উঠে গেছে। নিচ দিয়ে অবিরাম স্রোত। পৃথিবী ক্রমশ ছেলেবেলার কাগজের নৌকার মত জোয়ারে ভেসে যাচ্ছে। ডুবেই যাবে কোন সময় বা। আর জোয়ারের গগনবিদারী প্রচণ্ড শব্দের কাছে গোলকুঠির পুরোনো ইটের না-না আর্তনাদ কি করুণ। কতদিন পর, চিরন্তরে মহবতপুর ছেড়ে আসার পর এই একটা নিঃসঙ্গ বাড়ি দেখে আলোকের ভীষণ ভাল লাগল, ভীষণ দুঃখ পেল। আবার বুঝি নতুন করে স্মৃতির কুসুম চয়ন করবার পালা এল। কেননা মহবতপুরের কথা মনে পড়ছে। নিজেদের সেই আশ্চর্য বাড়িটার কথা। পুরোনো দিনের রূপকথা। নিজের শৈশব লুকিয়ে নদীর পারে এমনি দাঁড়িয়েছিল। হয়ত তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেও আশ্চর্য লেভেল ক্রসিং দেখা যেত। এবং সেই সঙ্গে কূল ভাসানো জোয়ারের কলগান। হ্যাঁ, আর কিলবিলে লবণের দীর্ঘশ্বাসও। যেন ওদের বাড়িটাও আধুনিক অত্যাচারে ভীষণ দুলতে থাকবে। তীব্র অভিমানে এক সময় পদ্মার জলে ডুবেও যাবে বা। শহর পৃথিবীর প্রথম পাঠে এই ধরনের কয়েকটা বাড়ি থেকে আলো নেওয়া যায়। যেমন এই গোলকুঠিটা। কিন্তু নিজেদের বাড়িটা নেই। সেই মর্মরিত বাগান, শিশুগাছের গোলাপগুলি, শীত গ্রীষ্ম বর্ষার মাঝখানে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকা বারান্দা যেরা বাড়িটা হিংসার আগুনে ছাই হয়ে গেছে। এ হয়ত এক পক্ষে ভালই। নদীতে ডুবে মরার হাত থেকে রক্ষা পেয়েছে। সাক্ষী আছে আলোক। তবে পৃথিবীতে আলোকদের সংখ্যা বেশী নেই। একদিন আলোকের ছেলে শহরে হয়েই জন্মাবে। প্রথম চোখ মেলে রেডিওগ্রাম, টেলিভিশন দেখবে। কানের ভিতর দিয়ে প্রথম মরমে পশবে জেট প্লেনের তীব্র গর্জন, তারপর শহরে হয়েই শ্মশানে যাবে একদিন। সুতরাং আলোকরাই শেষ প্রতিনিধি। আলোক যেদিন জন্মেছিল, শুনেছে, বাবা সেদিন ঘরে ঘরে ফুল পাঠিয়েছিলেন, মিষ্টি পাঠিয়েছিলেন। আলোক যেদিন চোখ বুজবে সেদিনও খোঁজ পড়বে একটা সাদাসাটা বাড়িয়ার। রামবাগানের বাজার থেকে ঘরে নিয়ে যাবার লোক খোঁজ করতে হবে। খাট খাট আসন শুধু আলোকের বেহুঁশ পোড়াবারই দায়িত্ব নেবে। ছেলের বেলায় শুধু একটা ফোন করতে হবে, হ্যালো—। অমনি এ্যাম্বুলেন্সের মত শ্মশানের গাড়ি এসে হাজির হবে। ইলেকট্রিক চুল্লিতে এক দণ্ডে বিশটা লাসের সঙ্গে আলোকের ছেলেও নিঃশেষ হয়ে যাবে। এতে সময়ও বেশ বাঁচবে, তেমন খরচও কম হবে। তাই ওদের লেভেল ক্রসিং সম্পর্কে কোন রকম চেতনা থাকবে না। জোয়ারের ধ্বনি শুনে প্রবল অনুভবের বিশে বেহদন জর্জরিত হবে না। আলোকরাই শেষ লেভেল ক্রসিংএর বিয়োগে, শেষ জোয়ারের ধ্বনি শুনে হৃদয়ে অপরিসীম দুঃখ নিয়ে বিদায় নেবে।

হঠাৎ চিন্তায় ছেদ পড়ল। একটা পরিচিত কণ্ঠস্বর কানে যেতেই ঘুরে তাকাল আলোক। বাঁধের ওপর দিয়ে অফিস ঘরের সেই ছেলেটি ছুটতে ছুটতে আসছে।

—কি ব্যাপার?—আলোক জিজ্ঞাসা করল।

ছেলেটি তখনো হাঁফাচ্ছে।

—আপনাকে তুলে নিতে এলাম।

আলোক মুগ্ধ।

—কি দরকার ছিল! এই তো লঞ্চ দাঁড়িয়ে আছে, তাই না?—আঙুল তুলে দেখাল।

—তা কি হয়?—ছেলেটি জিভে কামড় দিল: আপনারা আমাদের অতিথি। মৃণালদা কি বলবে বলুন তো!

হাসল।

—একবার মৃণালদার সঙ্গে দেখা হোক, তোমার এমন প্রশংসা করব।

লজ্জা পেল। মাথা নিচু করল।

—কি যে বলেন! আসুন আমার সঙ্গে—

ছেলেটি বাঁধানো চালু পার দিয়ে খানিকটা নিচে নেমে এল। ছোট্ট লঞ্চটা দিব্য জলে দাঁড়িয়ে আছে। একটা মাত্র কাঠ ফেলে সিঁড়ি তৈরী করা হয়েছে। ছেলেটি হাত ছাড়িয়ে দিতেই একজন খালাসী বেরিয়ে এল। সিঁড়ির পাশে একটা বাঁশ ধরে দাঁড়িয়ে হুড্রিল রেলিং তৈরী করল। ছেলেটি আগে আগে উঠে এল। ফিরে তাকাল।

—আসুন আপনারা—

আগে আলোক, পিছনে মিনতি সন্তর্পণে পা' ফেলে ফেলে লঞ্চে উঠল। আলোক এই সময়ও ঠোঁটের কোণে একটু হাসি আশা করেছিল। কিন্তু সত্যিই হাসি এসেছিল কি না, হাসি গোপন করল কি না—ভাবলেশহীন মুখ দেখে কিছুই বোঝা গেল না। তবে বলা বাহুল্য সঙ্গে সঙ্গে পালন করা দেখে এটা বোঝা যায়, ওরও এতে সায় আছে। আলোক কোন মতেই জোর খাটাচ্ছে না। এটা ভেবে নিশ্চিন্ত হল।

যাক, এক সময় না এক সময় তিনটে পঁচিশ বাজবেই। কাঁকা মাঠের ভিতর দিয়ে ট্রেন ওদের পাশে রেখে ঢাকুরিয়া অথবা বালিগঞ্জে। বনমালী নস্কর রোডে গিয়ে নামতে চাইবে। অবশ্য করলে আর বেশী অনুরোধ করবে না। তারপর হাঁটা লোহার সেতুর কঙ্কাল শব্দ উঠবে এক সময়। সেই কঙ্কাল শব্দ জানিয়ে দেবে উত্তেজনার পরপারে আরেক জীবনের কথা। সেই কঙ্কাল ট্রেন কানে কানে বলে যাবে, রক্তের ধারা কখনো ভুলতে নেই। আহা, কতকাল মা'র মুখ দেখে না। নিতাইএর মুখটা যেন ঠিক মনে পড়ে না।

কিন্তু এসব কথা ভাবতে আর ভাল লাগছিল না। মন হুহু উঠেছে সিঁড়ি বেয়ে ডেকে ওপরে উঠতেই। যেন পাসপোর্ট ভিসা চেকপোস্ট কাস্টমস ইত্যাদি চোখে ধুলো দিয়ে একেবারে মহাভারতপুরেই ফিরে এসেছে। ঠিক সেই রকম আকাশ। নদীর জল। পাল তোলা নৌকো। ঠিক সেই রকম নদীর ওপারটা! দু-দু বাবুল চর। মাঝে মাঝে ঘন সবুজ ছোপ। জেলে ডিঙি। মনে পড়ল, মৃণাল এই সবের মধ্যে বাস করে। ওকে লেভেল ক্রসিং ডিঙোতে হয় না। সহরে যায় না। বিলেত যাবার জন্যে ছটফট করে না। ওর কেরা-বিনতির দ্বন্দ্ব নেই। ভেসে ভেসেই জীবনটা কাটে। আলোকও একদিন ওর কাছে ভাসমান জীবন কামনা করত। তাই একদা আহ্বান জানিয়েছিল চিঠিতে। মাত্র কয়েক দিনের জন্যে ছুটি নিয়ে ওর সঙ্গে ভাসতে বলেছিল মাত্র। কিন্তু ওই কয়েক দিনের মুক্তিও কি আলোকের পক্ষে সম্ভব? মৃণাল তা জানে না। মৃণাল চিরদিন লেভেল ক্রসিংএর এক দিকেই পড়ে থাকবে। সত্যি, ওর মত সুখি কে? জোয়ারের মুখে পিঠ ফিরিয়ে নদীতে নদীতে আমরণ নৌকো বেয়ে যাবে। কিন্তু..? চমকে উঠল আলোক, বুকের মধ্যে ভয়ানক ঘাবড়ানির ঘা পড়ছে - আপনি নিজেকেই ঠিক চেনেন না—। এবার রুৎপিণ্ডের ওপর—আপনি যখন সহরে থাকেন তখন পাড়াগাঁয়ে আসতে চান, পাড়াগাঁয়ে থাকলে সহরে যাবার

অন্তে ছটফট করেন—।—আলোকের পাটা হঠাৎ ভয়ানক কাঁপতে শুরু করে দিল আলোককে না জানিয়েই। মাথা ঘুরছে। যেন এক্ষুনি মাতলা নদীতে পড়ে যাবে। তাড়াতাড়ি ডেকের চেয়ারে এসে বসল। কিন্তু মনে পড়ছে, আলোক যেন উত্তর দিয়েছিল, কাইলেই ভাল লাগে বলে কি কলমী শাক ভাল লাগে না?

—আপনার শরীর খারাপ লাগছে? - ছেলেটির নজর এড়ায়নি।

আলোক লজ্জিত।

—না না, ও কিছু নয়—

—হঠাৎ যেন কেঁপে উঠলেন—

—মহা মুস্কিল! – আলোক হেসে উঠল: কেউই কাঁপা যাবে না দেখছি, সব সময় এ্যাটেনশন হয়ে থাকতে হবে।

—বলছিলাম কি, রোদই তো নেই আজ, তাই আর না গেলেন।

—না, আজই যাব। খুব ভাল আছি। কণ্ডাক্টর ছাড়বে বলতে পার?

—এক্ষুনি।

লঞ্চের সারেং তার কামরায় এসে বসল। বুড়ো মত লোকটা। আবার কানেও কম শোনে। কারণ, ছেলেটি যেন আস্তে করে কি বলতে গেল, বুড়োটা চেঁচিয়ে উঠল, জোরে বল শঙ্কর বাবু। অতএব শঙ্করবাবুকে এবার জোরে কানের কাছে মুখ এনে বলতেই হল: খুব ভাল করে চাদাবে। মুনাদেবার বন্ধু। কলকাতা থেকে বেড়াতে এসেছেন। ভিনটের মধ্যেই পৌঁছে দেবে। পঁচিশের ট্রেন ধরে ওরা আজই কলকাতায় যাবেন। খেয়াল থাকে যেন বুড়ো—

আলোকের মূঢ়তাবোধ যেন সীমা খুঁজে পাচ্ছিল না। সত্যি, কলকাতার এত কাছে এমন একটি হীরক-হ্রদয় থাকতে পারে—তাহলেই পারেনি। কোন দিন আলোককে দেখেনি। বৃদ্ধের মুখে হয়ত দু' একবার নামটা শুনে থাকবে। অথচ কি আন্তরিকতা! যেন কতকালের পরিচয়! এরা যে প্রকৃতিরই সন্তান। তাই প্রকৃতির মত উদার হৃদয় এদের। এই প্রকৃতির বোঁটা থেকে একবার খসে পড়লেই বিপদ। তখন ক্ষুধার্ত সিভিলিটির জন্যে মাথা খুঁড়বে। নিওন আলোর নিচে বিলিতি বাজনার তালে ঠিক তালে পা' ফেলতে না পারার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করবে। হায়রে!

কাঠখানাকে তুলে নেওয়া হল। হঠাৎ বাকেশ শব্দ করে লকখানা ঘরঘর করে কাঁপতে লাগল। জলটা পর পর কতগুলি পাক খেয়ে উঠল। ঘোর ঘুরে সরে যাচ্ছে সব কিছু। ছেলেটি বাঁধের ওপর এখনো দাঁড়িয়ে আছে। আলোক রুমাল নাড়ল। লকের বেগ বাড়ছে। ক্যাবিনকে খুব নিরীহ দেখাচ্ছে এখন। নিভে যাচ্ছে সব কোলাহল। শুধু গোলকুঠিটা রয়েছে এখনো মাথা তুলে। কিন্তু কতক্ষণ থাকবে? বুড়ো কানে কম শুনলেও চালায় ভাল। কলকাতার বাবুদের কাছে প্রমাণ না দিয়ে ছাড়বে না। হাঁ, গোলকুঠি এখন দৃষ্টির মধ্যে সমাধি লাভ করল। শুধের মহবতপুরের রায় বাড়ির সঙ্গে আর কোন তফাৎ রইল না। শেষ পর্যন্ত তাই হয়। কেন না লকের জোর বেশী। লক থেকে স্টিমারের টানার থেকে জাহাজের। এখন কত লক অশ্বশক্তি নিয়ে পরমাণু চালিত জাহাজ মহাসাগরে নেমেছে। তাহলে সব কিছু ছেড়ে ছুড়ে দিয়ে আবার সেই স্টিমটিমে জেলে ডিঙি? আলোক কাকে ভোট দেবে? লেভেল ক্রসিং এর কোন্ দিকে গিয়ে দাঁড়াবে শেষ পর্যন্ত? কিন্তু এই যে আকাশ বাতাস নিঙড়ে লকটা ছুটে চলেছে, এই যে মুহূর্তে মুহূর্তে দৃশ্যপট পালটে যাচ্ছে, পরম সুখে এই যে ডেক চেয়ারে চোখ বুজে আছে, এতে কি একটুও অস্বস্তি হচ্ছে? তার বদলে মাঝির মুখের গান নিয়ে জল ছেঁচতে ছেঁচতে উজান ঠেলে যাওয়াটাই কি চরম সুখের? কোন দিকে যাবে? আবার কাটলেই কলমী শাকের প্রশ্ন আসছে।

কিন্তু এড়াতে চায় না আলোক। এড়িয়ে গেলে প্রশ্নটা পাগলের মত তাড়া করে আসে। তার চেয়ে দাঁড়িয়ে পড়লে প্রশ্নটাও সামনে এসে থমকে দাঁড়ায়। আলোককে আক্রমণ করতে আর সাহস পায় না। এবং এই অবসরণেই প্রশ্নটা মীমাংসা করতে চায় ও। দীর্ঘদিন ঝুলিয়ে রেখে দিলে প্রশ্নটাও দীর্ঘতর হয়ে যায়। আলোক প্রথমে নিজেকেই জানতে চেষ্টা করবে। তারপর কি ভালবাসে সেটা খুঁজে নেবে। কেননা, নিজেকে না জানলে আর কি ভালবাসে সেটাও বোঝা যায় না। দিনভির উক্তি। দিনভি যখন যা বলে তখন সেটাই যেন একমাত্র সত্যি, দ্বিতীয় কোন কথা থাকতে পারে না। বেরাও বাকি অভ্রান্ত। জীবন সম্পর্কে ওদের যেন প্রচুর অভিজ্ঞতা। আলোককে ওই অভিজ্ঞতার চাঁদনি দিয়ে ঢেকে দিয়েছে। তাই একেক জন একেক রকম ভাবে আলোককে আবিষ্কার করেছে। কারো চোখে নীল রঙটাই ফুটছে কেবল। কারো চোখে হলুদ। সে সেই ভাবেই ব্যাখ্যা করছে। কিন্তু নীল রঙ বা হলুদ রঙ ছাপিয়ে আরো অনেক রকম রঙও যে থাকতে পারে সেটা ওদের খেয়ালে থাকছে না। একটা মানুষের পোর্ট্রেট কি একটা মাত্র রঙ দিয়ে আঁকা যায়? মহাকাল কি এতই কাঁচা শিল্পী? ওরা জানে না কত রকমের রঙ দিয়ে একটা আস্ত মানুষ সৃষ্টি হয়। কত রকমের রঙের নাম জানা আছে, তার চাইতেও কতগুণ অজানা অচেনা রঙ আছে মহাকালের তুলিতে। তার সেই অচেনা রঙের কত বিচিত্র বর্ণের একেকটি সৃষ্টি হয় তার খবর কি করেই বা জানবে? আলোক নিজেও কি ওর ভিতরের, আরো ভিতরের সেই সব অচেনা রঙের খবর রাখে? আর আলোকের মনের মধ্যে দিয়ে, চোখের মণির মধ্যে দিয়ে সেই অজানা রঙের কত সূক্ষ্ম একেকটি কেমন ভাবে বেরোয় তার মহত্ত বোঝে এত বড় শোরেন্দা অন্তত আজো হয়নি। তবে আলোক নিজের সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞান থাকত যদি না ওদের সঙ্গে মিশত। ওরা যেন ফটিপাথর। কেবার সঙ্গে মিশে নিজের নীল রঙটা বুঝল, দিনভির সংস্পর্শে হলুদ রঙ। এই দুটো রঙ হয়ত ওর মধ্যে ছিল, কিন্তু সচেতন ছিল না সে বিষয়ে। ওরা এই দুটো রঙের মহিমা বুঝতে সাহায্য করেছে। বরং উপকারই করল বলা যায়। এটা খুব আশ্চর্য লাগে, আমি আমাকে ঠিক মতন বুঝতে পারব না, অপরের চোখ দিয়েই নিজেকে বুঝতে হবে। আবার বিপদও আছে। অপরের চোখ সব সময় যে বিশ্বাসযোগ্য হবে তার কোন মানে নেই। আর ওর হঠাৎ যে রঙটা প্রথম চোখে ধাধায়, সেটাকেই সার কেনে বসে থাকে। এখানেই বিপদ। পরে আরো রঙ আবিষ্কার করলেও প্রথম রঙটাকেই রঙিন করবার জন্যে তা ব্যবহার করে। তবে প্রথম বা প্রধান রঙ বলে কিছু নেই এই আলোক জানতে পারল এই সব দাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে। একেকটা পরিবেশ বা মানুষের কষ্টিপাথরে একেকটা রঙই হঠাৎ জ্বলে ওঠে। পরে সেই পরিবেশ বা মানুষটা সরিয়ে নিলেই অন্য রঙ বেরিয়ে পড়ে। সুতরাং এককালের প্রধান রঙ এক সময় তিমিত হয়ে যায়। আর যা ছিল অজানা অচেনা সেই গহীন রঙটাই ঝিলিক দিয়ে ওঠে।

ঠিক আছে, আলোক যতগুলি রঙ সম্ভব, বুঝে নেবে। আচ্ছা, নিজের রঙ বুঝে নিলে কি হয়? আর না বুঝলেই বা কি ক্ষতি? একটা টিকটিকি একটা বিড়াল কি ওদের রঙ সম্পর্কে সচেতন? না। ওরা নিয়তরের প্রাণী। বোঝাবুঝির পালা ওদের নেই। জন্মের পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত প্রকৃতির নিয়ম বিধৃত ভাবে পালন করে যায়। মানুষ প্রথমে নিজেকে বুঝতে চেষ্টা করে, তার পরে অপরকে। তারপর বিশ্ব প্রকৃতিকে। শেষে সবাইকে নিজের কাজে লাগায়। ভুল ভ্রান্তি কম হয়। আলোকও যদি নিজের সম্পর্কে সচেতন থাকত তাহলে গতকাল চন্দননগরে গিয়ে গঙ্গার জলবৃদ্ধি করত না। কিম্বা আজ সকালে দুধকে দুধ বলে উদ্ধার করে টেনে আনত না বাতলা নদীর বুকে। নিজেকে চেনে না, নিজের

—

সম্পর্কে অজ্ঞ, তাই কোনটা ঠিক পথ সেটা বাছতেই কারো কারো জীবন কাবার হয়ে যায়। আলোকেরও অনেক সময় নষ্ট হয়ে গেল। এবার হিসেব মিলিয়ে নেবে আসলে কি চায়। শহর না গ্রাম? কাকে বেশী ভালবাসে? জেলা না মিনতি? পৃথিবীর রূপান্তর চায় কি? না প্রকৃতির সন্তান হয়ে আদুল গায়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াবে, কণ্ঠে গান নিয়ে নদীতে নদীতে ভেসে বেড়াবে।

সকটা এক জায়গায় দাঁড়াল। সুতরাং, ভাবনায় ছেদ পড়ল। নীল বর্ণের খালাসী একটা কাঠ পেতে দিতেই একদল নেমে গেল বোঝাই পোটলা নিয়ে। আরেক দল সঙ্গে সঙ্গে খুলতাল পূরণ করল। কতগুলি বস্তা সরুটে ভোগা ছেলে ভাবভেবে চোখ বের করে অপরূপ দৃশ্য দেখছে। আলোকও একটি দৃশ্য দেখতে পেল। একটি মেয়ে, বড় জোর দশ এগারো বছর বয়েস, পরনে লাল শাড়ি, সিঁদুরে সিঁদুরে কপাল বোঝাই, কাঁদছে হাউমাউ। সেই শ্বশুর বাড়ি যাওয়ার মত কোন মামুলি ব্যাপার। কয়েকজন বয়স্কা মহিলা হাত নেড়ে বোঝাবার চেষ্টা করছে। মেয়েটি অটুট। খালাসীটা তাকালী দেখে রেগে গিয়ে ধমক দিল। বেচারা কতক্ষণ সিঁড়ি ধরে দাঁড়িয়ে থাকবে। হঠাৎ ওপর থেকে চেঁচিয়ে উঠল বুড়ো সারেং, ধ-হু যতক্ষণ লাগে লাগবে, তুর কিরে হারামজাদা! পরে আলোকের দিকে তাকিয়ে বলল, ভাবলেন তো কর্তা বাড়ীর কান্ডটা। আরে তুই কি বুঝবি কাল্লনের মর্ম। বলি তুই কি মায়ের বাপ হইছস?

কোচার খুঁটে বুড়ো সারেং চোখ মুছল। হঠাৎ কোথায় ধাক্কা লেগে বুড়োর চোখের ভিতর দিয়ে অতি কোমল রসটা বেরিয়ে পড়ল। আলোক তা দেখে নিল। হঠাৎ মনে হল কোথাও কি, যখন সত্যিই মুখার্জীর কাছে যাওয়ার সময় হবে, কাঁদবে? সকটা আবার চলতে শুরু করেছে। দুই পাশে ধানের ক্ষেত। মনে হল, ওদের হাসি ওদের কান্না ওদের কাছেই থাকুক। নদীর লোনা জল যাতে ধানের ক্ষেতে না ঢুকতে পারে সেইজন্যে দুই পারে উঁচু বাঁধ। বড় কষ্ট করে এই জমি তৈরী করা। সুন্দরবনের সীমা দিন দিন কমছে। মানুষ বেড়ে যাচ্ছে। অন্ন জমিতে আঁটছে না। সামলা মোকর্দমা। উকিলদের টু পাইস। দেশে দেশে যুদ্ধ। যারা জনবলে অস্ত্রবলে বলীয়ান, তাদেরই সওকা। যাবতীয় যুক্তি তাদের পক্ষে।

সকের একটানা ভটভট আওয়াজ। আলোক গদা খাকারি দিল। আত্মগোড়া ভাজন মিনতি। একটু যেন হাসির আভাস ফুটল ঠোঁটে। আলোকের হঠাৎ খেয়াল হল, তাহলে এতক্ষণ মিনতির পাশে বসে ছিল। কেন যেন, সকে ওঠার পর থেকে ওর অস্তিত্ব একদম মনে পড়েনি। মেয়েটি কাঁদছিল, তাই দেখে জেলার কথাই মনে এল। কিন্তু একবারও মিনতির কথা মনে হয়নি। যেন কাঠের পুতুল বসে আছে।

আশ্চর্য, শুধু হাসির আভাস নয়। এবার কথাও বলে কেবল কাঠের পুতুলটা।

—মনে হচ্ছে আপনি যেন আমাকে নিয়ে খুব বিব্রত বোধ করছেন—

—আমিও এই কথাটাই জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম।

—আমি যদি বিব্রত বোধ করতাম তাহলে এক কথায় চলে আসতাম না।

—হুঁ, এসেছিলে। তারপর থেকে পরিবর্তনটা লক্ষ্য করছি।

—আমিও আপনার পরিবর্তন লক্ষ্য করছি—

—কি পরিবর্তন দেখলে?

—আপনিও বা আমার কি পরিবর্তন দেখলেন? উত্তর দিতে যাচ্ছিল, থেমে গেল। খালাসিটা ইতিমধ্যে দুই পেয়ালা গরম দুধ এনে হাজির করেছে ওদের সামনে।

—কি ব্যাপার, ওদের অধ্যে দুধ এল কোথা থেকে?—আলোক অবাক।

বুড়ো দারোগা আবার ঘুরে তাকাল, খাটি দুধ কর্তা। কলকাত্তাক। আপনারা আমাগো অতিথ,

—কিন্তু এখানে খাঁটি দুধ? লোকের মধ্যে গরুও আছে নাকি?

বুড়োটা অপ্রস্তুত হেসে উঠল।

—কি যে কন কর্তা। গরু থাইব কেমতে? তাহেন না থাক দুধ ভিন তরফ দি আইতে লাগছে? যাওনের কালে আমাগো খাইবার দিয়া যায়।

—তোমাগো খাইবার দেয়, তা আমাদের দিচ্ছ কেন?

—বুঝছি গা অয় য তাসে আপনাগের খিদা পাইছে। অয় মনে কইরেন না কর্তা আমরা না খাইয়া দিতাছি—

—তাই নাকি? কাল্পনের মর্ম বুঝতে পারা গাছের বাতাসে খিদা লাগছে সেটা বুঝতে পার। তোমার তো দেখি অনেক গুণ দারোগ সাহেব!

এবার বিনয়াবনত হল বুড়ো।

—আইজ্ঞা আমারে দারোগ সাহেব ডাইকেন না কর্তা। আমার নাম বিলাস বওল—

আলোক অবাক হল। ভেবেছিল সাহেব টাহেব ডাকলে এরা খুশি হয়। কিন্তু তা তো নয়। শুধু মনে মনে বুড়োর আরেকটা রূপ দেখার জন্যে কৌতূহলী হয়ে উঠল। বলল, কেন, তুমি তো ভাল লক চালাও। আর লক যারা চালায় তাদের তো দারোগ বলেই ডাকে।

—না কর্তা আমি লক চালাই কিন্তু আমার চৌদ্দপুরুষে কেউ চালাইছে, হেই কথা কেউ কইতে পারব না।

—তবে তোমার চোদ্দ পুরুষ কি ছিল?

—আমরা চাষী আছিলাম কর্তা। আমাগো ভাল আছিল মূলীগঞ্জে। গাঙে চল আইলে আমরা পাট ক্ষ্যাতের মইধ্য দিয়া—

—বেশ বেশ—আলোকের ভিতরে হুইচ টেপার লক হল, ক্লিক। একটু এগিয়ে গেল: কিন্তু চাষবাস ছেড়ে দিলে কেন?

—প্যাটের দায়ে। হুজুর, পোড়ার প্যাট।—পেটটাকে বাজিয়ে নিল ঢাকের মত।

—অ। তা শুধু চাষবাসে বুঝি পেট ভরল না?

—তা কেমুন কইরা ভরে ক'ন। ভাগে চাষ করতাম, তাও গেল জলের তলে ডুইবা। আইল পাকিস্তান। লাগল রাইয়ট। এক বস্তরে আইরা পড়লাম—

তারপর?

লকটা আবার পারের কাছে এসে ঠেকল। নেমে গেল অনেক। উঠল হুজ্জত করতে। সিঁড়িটা তুলে নিতেই লক খালখানে চলে এল। নদী এবার খুব ছোট। বোধহয় ডেকের ওপর থেকে একটা ঢিল ছুঁড়লেই পারে এসে লাগে। বেগটা কিকিৎ বাড়িয়ে দিয়েই আবার ফিরে তাকাল বুড়ো, শিয়ালদায় ওঠলাম। পুলিশ আইল। পড়লাম গিয়া কলোনীতে। হ্যারে একজন বাবু দয়া কইরা আমারে লকের কাম শিখাইল। সেই থনে জলে জলে ঘোরতে লাগছি। তয় কর্তা অখনো চক্ষু বোজলে ভাখতে পাই গাঙে চল আইছে, আর পাট ক্ষ্যাতের মইধ্য দিয়া ভিজা বাইয়া চলছি খলখলইয়া—

আলোক চমকিত। বহুদিন পরে এমন একটি মানুষের সন্ধান পেল যে গোপনে জোয়ারের ধ্বনি শোনে। শুনতে শুনতে ক্লান্ত—বিদীর্ণ। চোখ বুজলে দেখতে পায় নদীতে চল নেমেছে, আর পাট গাছের মাথা ছুঁয়ে খলখলিয়ে ভিজা ঝেরে চলে। আলোকের মহাভারতপুরের মতই এখন কল্পনা হয়ে গেছে যে সব। মানুষের গড়া কৃত্রিম আইন অস্বীকার করে একদিন প্রকৃতির সন্তান চলে এসেছিল শিয়ালদহে। সেখান থেকে কলোনীতে। তারপর এক সদাশয় বাবুর চেষ্টায় সারেং-এর কাজ শিখে নিয়ে মাতলা নদীতে ছিটকিলাভ। ক্যানিং এর নদীতে পদ্মা মেঘনার মত চল নামে না। দুই

পায় ছত্রিশ ভাবে বাঁধানো লোনা জলের স্তর। অত ঔষু পাটকেতই বা কই। হরিণের মত ডিঙি নৌকার বদলে লঞ্চের টিয়ারিং ধরে সাবধানে চলাফেরা। তবু মাঝে মাঝে লোহারের অস্পষ্ট শব্দ শুনে উৎকর্ণ হওয়া, মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখা, মেঘের ঢেউ আকাশে। নিচে মেঘনা। কিনারার কথা মনে হলে বুকে কেঁপে ওঠে বুক। সম্বল মাত্র হরিণের মত ডিঙি আর এক চিলতে বৈঠা। কিন্তু পেটের জ্বালা বড় জ্বালা। সব ছেড়ে ছুঁড়ে আসতেই হল একদিন। এখন লোহার টিয়ারিং বিলাস বওলের জীবনে প্রচুর সিকিউরিটি এনে দিয়েছে। শুধু ফেলে আসা জীবনের জন্যে আক্ষেপ। যে জীবন মানুষের তৈরী কোন আইন মানুষের পরোয়া করে না। লেভেল ক্রসিংএর ওপাশে যে জীবন কোন রকমে ঘুঁকছে।

(ক্রমশঃ)

ধলেশ্বরী

'ধলেশ্বরী' দুই খণ্ডে বিভক্ত উপন্যাস। প্রথম খণ্ড "বর্ষা থেকে হেমন্ত"। দ্বিতীয় খণ্ড 'শীত থেকে গ্রীষ্ম'। বর্তমান গ্রন্থটি এর প্রথম খণ্ড হিসাবে প্রকাশিত হল। স্বতন্ত্রভাবেও এটি স্বয়ং-সম্পূর্ণ।

এ-উপন্যাস "জয়শ্রী" পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। পাঠক-পাঠিকাদের কাছে কলার এই যে, এর ভাষা চলতি ভাষা নয়। পূর্ব-বাঙলার পরিপূর্ণ চিত্র ও চরিত্রকে প্রাণমূর্ত করবার জন্য এ-ক্ষেত্রে আমাকে ভিন্নপথ নিতে হয়েছে। গ্রন্থকার

• • • •

জয়শ্রীতে 'ধলেশ্বরী' ১৩৭১ কার্তিক থেকে ১৩৭২-এর অগ্রহায়ণ মাস অবধি ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে ২৮৬ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এই উপন্যাসের প্রথম খণ্ড পুস্তকাকারে ছাপা হবার খবর জানতে পেরে এই উপন্যাসের ১৮৭ পৃঃ পর্যন্ত প্রকাশিত হবার পর বাকী অংশ জয়শ্রীতে আর প্রকাশিত না করার সিদ্ধান্ত করতে হয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত অসুবিধার জন্য জয়শ্রীর পাঠক-পাঠিকাদের নিকট আমরা ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

জ. স.

অমৃত-কুম্ভ

রমা দাস

এলাহাবাদ কোটের ওপর থেকে দৃষ্টিকে প্রসারিত করেছি সাদনের দিকে। সোনার রোদে মাখা শীতল মাঘের প্রভাত। বহুতোয়া যমুনার নীল জলে ঝকঝকিয়ে উঠছে হীরের দ্যুতি। বহুবিস্তৃত বালির চরে অসংখ্য তাঁবু আর লক্ষ লক্ষ মানুষের সমাবেশ। এই বিশাল জনসমুদ্র কুম্ভ-মেলার সমাগত।

ভারতের দূর-দূরান্ত থেকে এসেছেন সাধুসমাজ; এসেছেন ধর্মপিপাসু পুণ্যার্থী নরনারীর বিরাট প্রবাহ। ধনী দরিদ্র, বিদ্বান, মূর্খ, জ্ঞানী, অজ্ঞান এসেছে ভীড় করে—সাধু-সমাজকে দর্শন করে ধন্য হতে, কুম্ভযোগে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে। রাজনীতি সমাজনীতি আজও সাধারণ মানুষের মনে সাড়া জাগায় না। ধর্মের নামে উদ্বুদ্ধ সনাতন ভারতবর্ষের 'একটি বিরাট হিয়ার' রূপকেই যেন প্রত্যক্ষ করলাম এই পরম তীর্থ ক্ষেত্রে। উত্থান-পতনের বন্ধুর পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে যে ভারতবর্ষ তার চলার চিরন্তন রাগিনীই যে ধর্ম।

প্রতি বার বছর অন্তর প্রয়াগে কুম্ভমেলার আয়োজন হয়। পুরাণ কাহিনীর মধ্যে কুম্ভযোগ মাহাত্ম্য লিখিত আছে। দেব-দৈত্যের মিলিত প্রচেষ্টায় সমুদ্র মন্থনে অমৃত উঠেছিল। দৈত্যদের অমৃতের ভাগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্য ইন্দ্রপুত্র জয়ন্ত অমৃত-কলস নিয়ে পলায়ন করলেন। দৈত্যগুরুর ইঙ্গিতে দানবরা ছুটলেন জয়ন্তের পশ্চাতে। জয়ন্ত বারদিন সর্বত্রক্ষণ দৌড়াতে লাগলেন। তারতে চারবার আর অন্যান্য স্থানে আটবার কুম্ভকে রক্ষা করেন। দেবগণের বারদিন, মানুষের বার বছর। সেইজন্য বার বছর অন্তর ঐ যোগে কুম্ভমেলা হয়। সপত্নী কদ্রুর সন্তান সর্পদের জন্য অমৃত আনবার জন্য বিনতা পুত্র গরুড়কে আদেশ করেন। গরুড় যে চার জায়গায় বিশ্রাম করেছিলেন ও অমৃতকুম্ভ রক্ষা করেছিলেন—সেই সেই স্থানে কুম্ভমেলার অধিবেশন হয়, এরূপ কাহিনীও লিখিত আছে।

হরিদ্বার, প্রয়াগ, নাসিক ও উজ্জয়িনী এই চার স্থানে কুম্ভযোগ দেখা যায়। প্রয়াগের কুম্ভযোগই শ্রেষ্ঠ। মাঘমাসে বৃষরাশিতে বৃহস্পতি এবং মকর রাশিতে চন্দ্র-সূর্য একত্রিত হলে অমাবস্যা তিথিতে প্রয়াগে কুম্ভযোগ হয়। এবারে প্রয়াগে কুম্ভযোগ ছিল ২১শে জানুয়ারী এই মাঘ।

বিশ্বের প্রাচীনতম মেলা এই কুম্ভমেলা। কোন সুদূর অতীতে পর্বতে অরণ্যে তপস্যারত সাধু-সন্ন্যাসীরা লোক-চক্ষুর সামনে নেমে আসতেন। বাস করতেন এই বালির চরে, কুম্ভমেলায় সাধারণ মানুষকে ধর্মোপদেশ দিয়ে আধ্যাত্মিক জীবনের দিকে এগিয়ে দিতেন। সপ্তারিথর রাজা মহারাজারা আসতেন ধর্মস্নানে 'বিষয় বিকার ধিয়' চিত্তকে সঞ্জীবিত করে তুলতে। প্রচুর দান করতেন বিত্তশালীরা। কথিত আছে সম্রাট হর্ষবর্ধন পরিধেয় বস্ত্রখানি ছাড়া যথাসর্বস্ব দান করতেন এই মেলায়।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্য বিজড়িত কুম্ভমেলায় যাবার ইচ্ছা ছিল বহুদিন ধরেই কিন্তু সুযোগ ও সুবিধা হয়ে উঠেনি। হিমালয়-বাসিনী এক দাদুমার গল্প ধরে আমাদের পরিবারের প্রায়

অন্য দলের রওনা হলাম ১২ই জানুয়ারী রাত্রে দিল্লী-কালকা মেলে। ১৪ই জানুয়ারী মকর-সংক্রান্তির স্নানটা করবার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এত আগে যাত্রা।

১৩ই জানুয়ারী পৌঁছলাম বেলা ন'টায়। স্টেশনে সাইকেল রিক্সার ভাড়া গগনচুম্বী। যাত্রীদের পকেটের ভার লাঘবের জন্য কুলী ও রিক্সাওয়ালারা সদা প্রস্তুত। যাইহোক অনেক হাঁকাহাঁকির পর যাত্রা শুরু হল মেলা ক্ষেত্রের দিকে।

কিছুদূর গিয়ে সহরের প্রান্তে রিক্সার পথ শেষ হ'ল। তখনদাম এবার পদব্রজে যাত্রা। বালির চড়ার ওপর দিয়ে হাঁটা শুরু হল। কড়া রোদে চলতে চলতে বাঁধাকপির পাতা ছাড়ানর মত একটার পর একটা গরম জামা খুলতে খুলতে প্রচুর পোষাকের সদ্ব্যবহার করতে লাগলাম।

অনেকগুলি অস্থায়ী পুল গঙ্গার উপর তৈরী হয়েছে। পুলের এধারে সহরের সীমানাতেও প্রচুর শিবির পড়েছে সাধু সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষের। আমাদের গন্তব্য ঝুঁসি রামকৃষ্ণমিশনে, পুলের ওপারে। এক নং সেতু দিয়ে পার হ'লাম যমুনা। প্রচুর পুলিশ মোতায়েন হয়েছে সাত আট মাইল ব্যাপী মেলা ক্ষেত্রের জন্য।—বিস্তৃত বালির চর যার অনেকাংশই বর্ষাকালে থাকে গঙ্গাগর্ভে।

পথের নির্দেশ পুলিশেরা কেউই প্রায় ঠিকমত দিতে পারে না। কারুর ভুল নির্দেশ দিয়ে অনেক বারই বিভ্রান্ত করেছে। বেলা প্রায় এগারটায় ঘর্মাক্ত কলেবরে গন্তব্যস্থলে পৌঁছলাম। আমাদের দলের তিনজন মহিলা দিক্‌ভ্রান্ত হয়ে অন্যদিকে চলে গিয়েছিলেন। দিগন্ত বিস্তৃত বালুর চরে সব পথভোলাকেই এক রঙে মনে হত।

একটা বড় তাঁবু আমাদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছিল। প্রায় পঞ্চাশ ষাটজন একসঙ্গে বসে খাওয়া হ'ল। তারপর কম্বল বিছিয়ে বসলাম সকলে তাঁবুর ভিতরে।

বিকেল বেলা চা খেয়ে আমরা একটু বেড়াতে বেরুলাম। রাস্তায় প্রচুর আলোর ব্যবস্থা। সাধুদের শিবিরেও আলোর প্রাচুর্য্য এবং মাইক প্রভৃতির ঢালাও বন্দোবস্ত। যত নামকরা আখড়া, তত তার জাঁকজমক। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের বিরাট সভামণ্ডপ তৈরী হয়েছে, তারই চারিদিক ঘিরে ছোট ছোট তাঁবুতে বিভিন্ন মতাবলম্বীদের থাকার ব্যবস্থা। নিরঞ্জনী, নির্বাণী প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের নানান আখড়ায় পাঠ ভজন কীর্ত্তন চলেছে। কয়েকটি আখড়ার অঙ্গনে দেখলাম সোনারূপার কারুকার্য্যখচিত দোলা পরিষ্কার করা হচ্ছে। পরদিন মকর সংক্রান্তিতে স্নানে বেরুবেন শোভাযাত্রা করে মঠাধীশরা।

জ্যোতির্ব্বঠের জগদ্‌গুরু শঙ্করাচার্য্যের সভামণ্ডপ তৈরী হয়েছে—তিনি এসে গেছেন পৌঁছনির প্রয়াগে। এসেছেন আনন্দময়ী মা। এসেছেন গীতা ভারতী। শিশুকাল থেকে গীতা কণ্ঠস্থ। গীতার অতি সুন্দর পাঠ ও ব্যাখ্যা করেন। বয়সে প্রবীণা নন্—পোষাকেও আছে একটু লৌকুদ। গীতা-রূপ প্রবণপিপাসুদের মেলা বসেছে তাঁর বিরাট সভামণ্ডপে।

আখড়ার পর আখড়া পার হয়ে যাচ্ছিলাম। একটা আসরের সামনে থামলাম গানের সুরে আকৃষ্ট হয়ে; রাসলীলা চলেছে। শ্রীকৃষ্ণ রাধারাণীর হাত বেঁধেছেন; যখন রাধারাণী বলছেন, 'খুলে দাও'—তখন কৃষ্ণ বলছেন—'বাঁধতে জানি, খুলতে তো জানিনা।' ভগবান যাকে প্রেমে বাঁধেন তাকে তো আর ছাড়েন না, একেবারে আপন করে নেন।

ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে সদলবলে ঢুকলাম চায়ের দোকানে। বাঁশের খুটির ওপর টিনের চালা। প্রকাণ্ড উনুনে ওদিকে প্রকাণ্ড কড়াই-এ খাবার তৈরী হচ্ছে। খাবার অফুরন্ত। দোকানী বললে, "আপনে এইটুকু জায়গায় ছাপ্পা দিয়েছি সাড়ে সাতহাজার টাকা, পাঁচ হজ্জার জিনিসের।"

রাত আটটার নৈশ আহারের ঘণ্টার তাগিদ মনে রেখে ফিরতে হল বড়ুলে।

ভোর তিনটায় ঘুম ভাঙল। সারারাত্রি অখণ্ড নাম গান, রামায়ণ পাঠ হতে থাকে আখড়াগুলিতে। বড় ভাল লাগল—

'তোমার সুর শুনাবে যে ঘুম ভাঙাও
সে ঘুম আমার স্বপ্নময়।'

সারা চারুটের রওনা হলাম প্রায় জন পনেরোর একটি বিরাট দল। সাধুদার আজ উপবাস ও মৌনতা পালন। পাথরচড়া লঘু পায়ে তিনি সর্ব্বাগ্রে যাচ্ছিলেন দ্রুত গতিতে — সেরকম চাদরের ওপর নীল র‍্যাপটা পিঠে ফেলে। দল-পতিরূপে যাচ্ছিলেন আমার বড় নজরেই। অহস্ত কোটের ওপর তিনি গলায় জড়িয়ে ছিলেন লাল উলের ডোরাকাটা এক বেডকভার। পোষাকটি খুব নয়নাভিরাম না হলেও তাঁর পৃষ্ঠে বিলম্বিত কড়া রঙের বদন প্রান্তটি বাতাসে যত আমাদের চোখের সামনে দুলছিল। চোখ রেখেছিলাম তার ওপরেই।

সমর ও পরিশ্রম বাঁচাবার জন্য পথ ছেড়ে নামা হল বালির প্রান্তরে। হায়রে—মাটিগুলো তবু শক্ত, হাঁটা যায়। বালির মাঠে পা ডুবে যেতে লাগল—পুলিশের ভুল নির্দ্দেশেও ঘুরপাক অনেকখানি। প্রভাতের আলো তখনও দেখা দেয়নি। স্বল্পালোকে কে যে কোথায় ছিটকে পড়ল জানি না। দ্রুতগতি পুণ্যলোভাতুর দলের অনেক পিছনে দিদি ও আমি পড়ে রইলাম। তার থেকেও অনেক ঘুরে পড়ে রইলেন আমার ছোট ননদ ও নন্দাই। ছোট নন্দাই তার দেহভার নিয়ে বালির ওপর দিয়ে চলতে অনভ্যস্ত।

চলার গতিকে তীব্রতাবে বাড়িয়ে দিয়ে ভবে আমি আর দিদি দলের সাক্ষাৎ পেলাম।

অত সকালেই স্নান করে ফিরে আসছে বহু যাত্রী। ভিড়ের অন্ত নেই। ভজন করতে করতে চলেছে সামান্য বস্ত্র পরিহিতে শীতার্ত্ত নরনারী। হাজার হাজার নরনারী এই প্রচণ্ড শীত উপেক্ষা করে রজনীর শেষ যামে কোন দুর্ব্বার আকর্ষণে চলেছে আমি শুধু তাই ভাবতে লাগলাম।

বিশেষ তিথিতে স্নানে পুণ্য হবে? পুণ্য কি? পুণ্যের সংজ্ঞা কি—আমরা কি জানি কেউ?

এখন আলোর চেতনাটি জেগে উঠেছে আকাশ জুড়ে। নৌকায় করে ত্রিবেণী সঙ্গমে পৌঁছলাম, সমস্ত প্রিয়জন আত্মীয় বন্ধুর কল্যাণ কামনা করে অনেকগুলো ডুব দিলাম গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর মিলিত প্রবাহে। লক্ষ লক্ষ নরনারী ডুব দিচ্ছে সাধু সঙ্কল্প নিয়ে, সকলের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা নিয়ে। যখনই অপরের জন্য কল্যাণ প্রার্থনা করি তখনই তো চিত্তশুদ্ধি হয়, কণিকের জন্য হলেও। এই জলে অবগাহন করেছেন সাধুসন্তরা, তাঁদের অঙ্গ স্পর্শ ও আশীর্ব্বাদ মিশে আছে এই প্রবাহে। একাত্ম হয়ে গেলাম সকলের সঙ্গে।

স্নান কি শুধু সঙ্গমের জলপ্রবাহে। অন্তরে ভাবের ত্রিবেণী সঙ্গমে অবগাহন করতে হবে যে! যমুনা প্রেম স্বরূপা। প্রেমের সঙ্গে মিলেছেন বৈরাগ্য বিগ্রহ গঙ্গা। জ্ঞান-রূপিণী সরস্বতী আত্মগোপন করে অন্তঃ সলিলা হয়েছেন। জ্ঞানে জানা যায়, বৈরাগ্যে প্রস্তুতি আসে, প্রেমে পাওয়া যায়। বৈরাগ্যপুত প্রেমই তো ভারতের সাধ্য এবং সাধনা! এই যে মনটা গভীর সুরে বেজে উঠল এই তো পরম পাওয়া। তীর্থ স্নানের এই তো সার্থকতা!

স্নান পূজা সেরে সাধুরা পূর্ব্বদিগন্তে উদীয়মান সূর্য্যের দিকে প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলেন। সেই জ্যোতিউদ্ভাসিত মুখে হৃদয়ের কোন পরম প্রাপ্তির আনন্দ প্রতিফলিত হয়েছিল—আমরা তার সংবাদ জানিনে।

এর পর পথের ধারে বসা গেল সাধু মহারাজদের শোভাযাত্রা দেখবার জন্য। বাঁশ কাঠ দিয়ে বেড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল যেন জনসাধারণ শোভাযাত্রার খুব নিকটে না আসতে পারে। যে সব সন্ন্যাসী সম্প্রদায় রেজিস্টার্ড নয় তাঁরা শোভাযাত্রায় যোগ দিতে পারেন না। সোনারূপার মোটা চক্রে মাথায় সোনার ছাতা দিয়ে মঠাধীশরা বেরিয়েছেন—হাজার হাজার সাধু চলেছেন। দৃশ্যটি বড় সুন্দর। মনোমুগ্ধকর। কিন্তু প্রশ্ন আসে মনে, পরমার্থ যাঁরা লাভ করেছেন তাঁদের এই বাহ্যাড়ম্বরের কোন্ প্রয়োজন।

একদিন সেলাম 'শঙ্করাচার্য্য নগরে'—আমাদের শিবিরের খুব নিকটেই এঁদের বিরাট শিবির। ঋষিকেশে এঁদের যোগশিক্ষার প্রতিষ্ঠান আছে। শ্রীমহেশ যোগী এর প্রতিষ্ঠাতা। বিদেশী অর্থে এঁদের চুয়াশীটে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ভজন-কুটির তৈরী হয়েছে। য়ুরোপীয় নরনারীরা এই স্থানে যোগ শিক্ষা করেন। পাশ্চাত্য দেশীয় নরনারীর ভিড় দেখলাম এই শঙ্করাচার্য্য নগরে। শ্রীমহেশযোগীর বক্তৃতায় শুনলাম—মাত্র তিন দিনে তাঁরা যোগ শিক্ষা দিতে পারেন। সাধুরা বললেন, 'কত বড় অহঙ্কারের কথা। তিনদিনে যোগ শিক্ষা!' কয়েকজন য়ুরোপীয় ভদ্রলোক ও মহিলা বললেন যে তাঁরা অল্পেই মানসিক শান্তি পেয়েছেন এই যোগের সাধনে।

'শঙ্করাচার্য্য নগরে'র উপকরণবহুল বৈভবের পাশাপাশিই দর্শন করলাম সন্ন্যাসী করপাত্রজীর স্নিগ্ধ সৌম্য মূর্ত্তি। অসাধারণ পাণ্ডিত্যেও নিরভিমান—সাধনার অন্তর্দাহকে প্রবেশ করেও বাইরে অতি সাধারণ তিনি। একখানি শীতাতপনিয়ন্ত্রিত গাড়ী করে বিভিন্ন স্থানে বক্তৃতা করে বেড়ান। ঐ গাড়ীর মধ্যেই তাঁর খাওয়া শোয়া বসা। দুখানি অঞ্জলিবদ্ধ করকেই তিনি আধার ও পানের পাত্র হিসাবে ব্যবহার করতেন বলেই তাঁর নাম হয় 'করপাত্রজী'। তাঁর সম্বন্ধে একটি কাহিনী শুনলাম। তাঁর একটি বিরাট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন হয়েছিল। একজন শ্রেষ্ঠী কোটী টাকা নিয়ে এসে অনুরোধ করে যে প্রতিষ্ঠানটি তার জননীর নামে করা হোক। শ্রেষ্ঠীর অর্থ প্রত্যাখ্যাত হল। করপাত্রজীর শিষ্য তাঁকে বিশেষ অনুনয় করে বললেন যে অর্থটা গ্রহণ করলে যে প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বড় সুবিধা হ'ত। করপাত্রজী হেসে বললেন—'কোটি টাকা নিতে দেখেছ কেহও দিতে দেখেছ কখনও?'

গঙ্গা-যমুনার পুণ্য শীতল বায়ু সেবিত রাত্রির সন্ধ্যার মুক্ত আকাশের নীচে বালির ওপর বসে করপাত্রজীর মধুর প্রাঞ্জল ভাষণের মধ্যে ডুবে গেলাম। 'আমরা তাঁরই ছায়া—ছায়া অনুগামিনী হোক কায়ার। প্রেম আসুক প্রাণে।" 'তাঁকে ভালবাস আর সকলকে ভালবাস' এই তো ভারতের শাশ্বত বাণী।

এতক্ষণ ভাষণে শুনেছি—'ভাগবত উপকরণের প্রতি আসক্তি ঘোচাও।'—শিবিরে ফিরেই যে মোহমুক্তির পাঠাভ্যাস হাতে কলমে করতে হবে তা বুঝিনি। আমাদের তিন পরিবারের তিনটি ট্রাঙ্ক চোরে নিয়ে গেছে। তবে বাইরে যা ছিল আর কয়খণ্ডটি ফেলে রেখে গেছে নইলে তাও নিশ্চয় কলকাতা ফেরা হ'তে হ'ত।

প্রতিদিনই সঙ্গমে স্নান করি আর বেলা চড়ায় ঘুরে বেড়াই। দোকান পাট বসেছে মন্দ নয়। খোলা আকাশের তলায় একত্র হয়েছেন কত সাধু সন্ত, কত দরিদ্র জন সাধারণ—যাদের আশ্রয়ই ঠাণ্ডা নিবারণের একমাত্র উপায়। উত্তর প্রদেশের হাজার হাজার নরসুন্দর এসে উপস্থিত হয়েছে প্রয়াগে - প্রচণ্ড বিক্রমে ব্যবসায়ের মরশুম পুরোদমে চলেছে।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের শিবিরে হিন্দু সংস্কৃতি সম্মেলনে একদিন। জ্যোতিষপীঠের জগদ্গুরু শঙ্করাচার্য্য শ্রীমৎ সাম্বারাজ মহারাজ, শ্রীআনন্দময়ী মা ও আরো অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য ভারতের চার প্রান্তে চারটি মঠ নির্দ্ধারণ করে তাঁর বিভিন্ন সন্ন্যাসী সম্প্রদায়কে এই চারটি মঠের অন্তর্ভুক্ত করেন। ধর্ম্ম জগতে এই চারজন জগদ্গুরুর সমান ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি।

হিন্দু সম্মেলনে প্রায় সকল সাধুরাই প্রতিপাদ্য বিষয় দেখলাম 'জনতা জনার্দ্দনের' সঙ্গে সাধু সমাজের যোগসূত্র স্থাপন। তাঁরা বললেন শুধু সাধুদের হাতে ধর্ম্মের ভার ফেলে রাখলে চলবে না—গৃহস্থদেরও এই ভার নিতে হবে। আত্মশুদ্ধির উপদেশ দিলেন। জগদ্গুরু বললেন, যুক্তির চঞ্চলতা যত বাড়ছে মানুষ তত দুর্ব্বল হচ্ছে—শক্তি আর ভক্তি একত্র মেলাতে হবে—কর্ম্মের মধ্য দিয়েই হবে ঈশ্বরের পূজা।

দলের কেউ কেউ জ্বরে পড়েছিলেন, সাধুরাও। তিনদিন প্রচণ্ড জ্বর ভোগ করে ঠিক গিয়ে ডুব দিলেন কুম্ভযোগের প্রভাতে। দেহের গ্লানি দূরে গেল, আত্মার আনন্দে উদ্ভাসিত হ'ল মুখ।

কুম্ভযোগের প্রভাতে লক্ষ লক্ষ সাধু-সন্ত ও সাধারণ নরনারী অবগাহন করছেন সঙ্গমের সেই শীতল সলিলে। নামগানে আকাশ-বাতাস পরিপূরিত। ডুব দিয়ে উঠলাম। পরম প্রশান্তি মনে।

কুম্ভযোগে স্নান করে ছদয়কুম্ভ ভরে উঠল কোন অমৃতে।

পূর্ব্ব দিগন্ত রাঙা হয়ে উঠেছে সূর্য্যের আসন আবির্ভাবে। হে আলোর আলো তোমাকে নমস্কার।

ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণ মেবাবশিষ্যতে।
ওঁ শান্তি শান্তি শান্তি।

পুস্তক পরিচয়

বিক্রয়—লেখক সমবেশ বসু (আনন্দ পাবলিশার্স, ৪ টাকা)।

কতগুলি অবস্থা বিশ্লেষক ও রচনা কৌশল বিদেশী সাহিত্যে প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। যথা, উদ্দেশ্যহীন খুন বা motiveless murder ; কাল্পনিত খুন বা actual murder—এতে উপভোগের সময়ে পুরুষের মনে সত্যিসত্যি খুন করবার অদম্য ইচ্ছা জাগে (অপরাধতত্ত্বে এর অনেক নজির আছে) ; আকর্ষণ বিকর্ষণ সম্পর্ক বা love-hate relationship (কেউ কেউ বলেন প্রতি প্রেমে ঘৃণাও আছে) ; চেতনা প্রবাহ বা stream of consciousness বা চেতন প্রবাহ প্রবর্তন করেন—এতে মনে যা কিছু আসে তা সঙ্গতি অসঙ্গতি বা কথা ফুলস্টপের বাধা পেরিয়ে সহজে প্রবাহিত : খুনীকে নিয়ে পুলিশ কর্মচারীর খেলানো ইঁদুর নিয়ে বিড়াল যেমন খেলে, যাকে বলে cat and mouse game এবং যার সবচেয়ে প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত আছে "Crime and Punishment" বইতে ; এবং কি এক অপ্রতিরোধ্য সর্বনাশের আকর্ষণে খুনীর অপরাধ-স্থলে ফিরে আসা (a criminal returns to the scene of his crime)।

এর সবই বর্তমান এই ক্ষুদ্র-পরিসর বইখানিতে। উপন্যাস নায়ক সেই দলের লোক যাকে কলিন উইলসন এক কথায় বলেছেন outsider ; জীবন যাপনের ভারে ভারাক্রান্ত, নীতিবহির্ভূত এই অবিশ্বাসী ছন্নছাড়াদের এ যুগে প্রসিদ্ধ করেছেন সার্ত্র, কাম্যু প্রমুখ লেখকরা। তা ছাড়া, স্বাধীন ইচ্ছার ও সিদ্ধান্তের দুঃসহ ভার সম্বন্ধে স্বৈরতন্ত্রবাদী (existentialist) দর্শন এ বইয়ের প্রধান অংশ, এমন কি ভিত্তি বলা যেতে পারে ; আমরা সদলে আরামের ব্যবস্থাটা মেনে নিয়ে (তা যত ফাঁকিই হক) নিজের নিজের বিবরে বাস করি, গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সত্য (লেখকের ভাষায় "স্বাধীনতা"—এখানেও শব্দটির প্রতিধ্বনি !) আহরণ করতে ভয় পাই, কারণ তা হলেই সর্বনাশের আশঙ্কা—যেমন ঘটল নায়কের। আশ্চর্য নয় যে এমন বই বাঙালী পাঠকের কাছে খুবই নতুন ঠেকেছে এবং একে ঘিরে ভীষণ বাদানুবাদের ঝড় উঠেছে। অবশ্য এত ঝড়ের একটা বড় কারণ এই যে চতুর লেখক গল্প শুরু করেছেন শোবার ঘরে 'অবৈধ' প্রেমের দৃশ্য দিয়ে. যার বর্ণনা এত প্রগতির পরেও এ দেশের পক্ষে নিশ্চয় 'দুঃসাহসিক', যদিও মিলার, বারোজ, এমন কি ম্যাক্সি ম্যাকাবির তুলনায় এই আদিরস নিতান্তই পানসে।

সাহিত্যে অশ্লীলতার বিচার অতি দুরূহ, অধিকাংশে বিচারকের মতে শিল্পের প্রয়োজনে হলে অশ্লীলতার দোষ ঘুচে যায়, সেখানে তা গুণ। এ ক্ষেত্রে যে নায়কের অবাধ স্বগতোক্তি আমরা শুনছি সে হল যাকে বলে 'বকাটে ছোঁড়া' (তার নিজের বর্ণনায় 'রক্তমাংস খচ্চর'), সুতরাং কিছুটা তথাকথিত অশ্লীলতা স্বাভাবিক, তবে সব ক্ষেত্রে তার প্রবর্তন ও মাত্রা শিল্পের তাগিদ অনুযায়ী কি না তা নিজ নিজ বিচার অনুসারে পাঠকের বিবেচ্য। দু এক জায়গায় ভাষার রস বীভৎস রসে পরিণত হয়েছে, যেমন চুম্বনের সুদীর্ঘ আলোচনায়। যাই হক, কোনও বইয়ের প্রধান উৎকর্ষ বিচারে অশ্লীলতার অভিযোগ বড় কথা হতে পারে না।

এই বইয়ের প্রধান উদ্দেশ্য যদি হয় আমাদের জীবন ও সমাজে যা কিছু মেকী ও ভণ্ড তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ

জানানো তবে লেখক এই প্রতিবাদ খুব তীব্র সুরেই জানিয়েছেন এবং সে কাজে অনেকখানি সাহসের পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর প্রথম অস্ত্র বিদ্রূপ—তাও আবার 'রকবাজী' ভাষায়। প্রেম পরিবার ধর্ম চাকরি দেশপ্রেম সব কিছুর ভান ও ভণ্ডামির উদ্‌ঘাটনে তৎপর আমাদের নায়ক, যা কিছু নিয়ে আমরা গর্ব করি তার অন্তরালে নগ্ন নির্মমভাবে খুঁড়ে বার করে আলোয় ধরেছে সে। বস্তুত এই নায়ক কিছুতেই বিশ্বাস করে না, এমন কি খবরের কাগজও পড়ে না, ঘুষের টাকার নিজের বিবরে পান আহারে মৈথুনের জগতে বেশ আরামে তার বাস (একে নায়ক না বলে আমরা বিপরীত নায়ক বা anti-hero বলতে পারি)। যে আকর্ষণ বিকর্ষণের ফোটানোর ফলে সে তার প্রেমিকাকে প্রেমের আসরে খুন করল তাতে তার চাকরিও গেল—অসাধু ব্যবসায়ীর সরকারের টাকা আত্মসাৎ করেছে, উপরওয়ালার আস্থা অর্জন করে তার বিরুদ্ধে রিপোর্ট দিয়ে। এই ঘটনাই কাহিনীর কেন্দ্রস্থল; এ সম্বন্ধে কেউ যদি বলেন যে এ সব দুর্নীতির খবর এত জোরে প্রকাশ করার মধ্যে কোনও নতুনত্ব নেই, আজ আর তা কারও অজানা নয়, তবে বলব কোনও কোনও কথা যত বার বলা যায়, যত জোরে বলা যায় ততই ভাল।

কিন্তু আর একটি প্রশ্নের জবাব অত সহজে খুঁজে পাওয়া যায় না। অসাধু ব্যবসায়ীর বিরুদ্ধে রিপোর্টের পর যখন সংবাদপত্রের মালিক 'ভিতরের খবর' সব প্রকাশ করতে চাইল, তখন নায়ক তাকে "রামখচ্চর" বলে গালি দিয়ে বিদায় করল, তার কারণ সে এসেছিল নিজে ঘুষ পয়সা করে নেওয়ার মতলবে। কিন্তু যদি ধরে নেওয়া যায় যে এই বইয়ের বিক্রিলব্ধ টাকা লেখক দান করে দিচ্ছেন না, তা হলে কি ঐ ধরনের প্রশ্ন এখানেও ওঠে না? লেখকেরই মত ব্র্যাকেটের মধ্যে 'বিক্রি' বাক্য ব্যবহার করে এই বইয়ের আন্তরিকতা সম্বন্ধেও সন্দেহ প্রকাশ করা চলে, বিশেষত যেখানে পাতায় পর পাতা এগুলানি আদিরসে সিক্ত। বিক্রির দিক থেকে এ বই নিশ্চয় সাফল্য অর্জন করেছে। উপরোক্ত কারণেই তা সর্বতোভাবে তার গুণের নির্ণায়ক বলে ধরা যায় না।

বিশ্ব সাহিত্যের সঙ্গে যারা অল্প বিস্তর পরিচিত এতটুকু ব্যঞ্জনের মধ্যে এত রকম বিদেশী মশলা তাদের পক্ষে কিছুটা গুরুপাক হবে ধরতো। কিন্তু বিশ্বের পটেই যে বাংলা সাহিত্যের বিচার করতে হবে এমন কোনও বাধ্যকতা নেই, বাংলার সংকীর্ণ পরিধির মধ্যে এ বই নিঃসন্দেহে অভিনব—সেই বিস্ময়ের চোখের পাতে তা যে কতটুকু ঘুমেছে তা তাদেরই বলতে হবে। অন্তত পাঠকের মনোযোগ টেনে ধরবার যে বিশেষ আগ্রহ নেই তা বিনা বাক্য ব্যয়ে যেটুকু বলা হল তার থেকেই প্রতীয়মান।

বইখানির ছাপার ভুল নেই, কিন্তু "ইট ইজ রিগ্রেট ফাট", "স্লিটেল রিপোর্ট" ইত্যাদি ইংরেজি বাক্য পরবর্তী মুদ্রণের সময়ে পুনর্বিবেচ্য।

ইন্দ্রনাথ

প্রেম—সৈয়দ মুজতবা আলী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা-৯। চার টাকা।

নিকোলাই লেসকভের 'লেডি ম্যাকবেথ' নামক ছোট উপন্যাসের সৈয়দ মুজতবা আলী কৃত অনুবাদ 'প্রেম'। অনুবাদ হিসেবে অনবদ্য—আগাগোড়া প্রাঞ্জল ও সাবলীল, এত বেশি সহজ যে প্রায়ই অনুবাদ বলে মনে হয় না। এখানে সার্থকতা এইখানে।

অবশ্য মূল বা ইংরাজি তর্জমার সঙ্গে বর্তমান সমালোচকের পরিচয় না থাকায় তারতম্যে 'প্রেম' কতোখানি উৎকর্ষের দাবী করতে পারে বলা সহজ নয়। ব্যাপক বিচারের প্রয়োজনই বা কি।

নাম 'প্রেম', প্রেমেরই গল্প। শেষাংশ বাদ দিলে কাব্যভাষিত এক রমণীয় প্রেমাভিলাষের দারোঘাটা কাহিনী বলেই ধরে নেওয়া যেত। শেষাংশের নিষ্ঠুর ব্যঞ্জনার জন্য তা বলতে বাধে। একই কারণে মূল লেখকের 'লেডি ম্যাকবেথ' নামকরণের তাৎপর্য স্পষ্ট। প্রায় অনুরূপ 'নিয়তি' নির্দেশ করেছে এই গ্রন্থের নায়িকা কাতেরীনার উপর, তার শেষের সঙ্গে ভিন্নভাবে শেক্সপীয়রের চরিত্রটির অন্তর্জ্বালা তুলনীয়। মুলতবা আলী সাহেব মপাসাঁর 'বেল্ আমি' গ্রন্থের উপর এই গ্রন্থের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন—অন্য দিকে, মনে হয়, লিস্কভ বেশি মাত্রায় শেক্সপীয়র প্রভাবিত। কাতেরীনা ও তার অবৈধ প্রণয়ী সেরগেই যে-ভাবে বালক ফেদিয়ার মৃত্যু ঘটিয়েছে, তার সঙ্গে চিচার্ড দি থার্ড-এর একটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সাদৃশ্য লক্ষণীয়।

'প্রেম', বস্তুত এক সদ্যান্ধ মহিলা, কাতেরীনার অবদমিত যৌনক্ষুধা যথেচ্ছভাবে পরিতৃপ্ত করার কাহিনী;—স্ত্রৈণীয় সাহিত্যে এই ধরণের বেহদ নিঃসঙ্গ মহিলাদের হাতে প্রায়ই গল্পের বই বা ছবি আঁকার তুলি তুলে দেওয়া হত। কাতেরীনা সে পথে না গিয়ে তার স্বামীর 'মৃত্যু' সেরগেইয়ের প্রচণ্ড শরীরের কাছে আত্মসমর্পণ করেছে এবং অবৈধ সংসর্গ কায়েমী করার জন্য পর পর তিনটি নৃশংস হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত হতেও তার বিবেকে বাধেনি। তাদের পাপ প্রকাশিত হয়ে পড়ে, তারা নির্বাসিত হয় সাইবেরিয়ায়। এতদসত্ত্বেও কাতেরীনা সেরগেইয়ের প্রতি তার প্রেমে (বা কামনায়) একনিষ্ঠ; সেরগেই তা নয়। এক রমণীতে সে তৃপ্ত নয়। পরিণতি কাতেরীনার আত্মহত্যায়। শেষের এই দৃশ্যে কাতেরীনার প্রতিহিংসা অপেক্ষা তার অন্তর্দাহ ও মৃত্যুই বড় হয়ে দেখা দেয়।

লেস্কভের বইটি বহুদিন আগেকার লেখা। বলা উচিত, এখনো এ বইয়ের আকর্ষণ সমান।

বিষয়বস্তু ও অনুবাদের গুণ ছাড়াও বইটির আর একটি আকর্ষণ এর অলঙ্করণ। শিল্পী অশোক বসুর রুচিত্ব সর্বজনের প্রশংসা দাবি করে।

বিবেকানন্দ পালিত।

আইনের বিচার। শ্রীপশুপতি সাহা। প্রকাশক-ভি লাইট বুক কোং। ক্রি-ডা। মূল্য দুই টাকা।

ন্যায় বিচারের আশা নিয়ে সভ্যমানুষ একদিন আইন সৃষ্টি করেছিল। জীবনের সভ্যতার জটিলতা যত বৃদ্ধি পেয়েছে আইনের জটিলতাও বেড়েছে ততখানি। তবু একথা ঠিক, আইনের বিচার বারে বারে নতুন জিজ্ঞাসা নিয়ে উপস্থিত হয় যার উত্তর মেলে না সহজে। এই একটি বিশেষ দিকে লক্ষ্য রেখে লেখক তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্প গ্রন্থে মোট বারটি গল্প সন্নিবেশিত করেছেন। লেখক স্বয়ং আইনজীবি —সুতরাং আইনের জগতের যে অনেক আনন্দ, অনেক অশ্রু, অনেক সুখ, অনেক বেদনা চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে, সহজে তিনি সেগুলি আহরণ করেছেন—দরদ দিয়ে লালন করেছেন। বিশেষ করে বেদনার ভাষায় তিনি উজ্জ্বল। এক কথায় গল্পগুলি সুখপাঠ্য। তবে বর্তমান কালের পাঠকরুচির দিকে লক্ষ্য রেখে ভাষার পরিবর্তন, পরিমার্জন ও গল্পাংশের সংক্ষেপন ও পরিবর্তন বিষয়ে মনোযোগী হলে সর্বাঙ্গে সুন্দর হতে পারত। গল্পের চরিত্রগুলি আপনার আমার অতি পরিচিত একান্ত ঘনিষ্ঠ। কোন দ্বন্দ্ব নেই—নিতান্ত সহজ সরল ভাবেই এরা উপস্থিত হতে পেরেছে। প্রচ্ছদপট মনোরম। প্রচ্ছদ শিল্পীর নাম না থাকাটা অশোভন বলে মনে হয়েছে। বইটির বহুল প্রচার সম্ভব।

অনিতাভ চক্রবর্তী

সমুদ্র সবুজ আকাশ নীল, আলোক ঘোষ
অরুণাবহ প্রকাশনী : কলকাতা-২৬
পৃষ্ঠা ৩৪, দাম, একটাকা

একেবারে নূতন লেখক, তাঁর ছোট্ট বই।

ঠিক গল্প নয়, নকশাও নয়, কয়েকটা ছাড়া ছাড়া আঁচড়, তা দিয়ে ছবি কেমন হবে বোঝা যায় না, তবে টান যাকে যাকে জোরালো, রঙ স্পষ্ট এবং এদের নির্ভর করে যদিও লেখকের ভিতরে পৌঁছনো যায় না তবু অন্বেষণ হয় একদিন, আশা করা যায় শীঘ্রই, লেখকের হাত সবল হবে, দৃষ্টি সূক্ষ্ম এবং নিজস্ব দৃষ্টি ও বোধে পৌঁছে তিনি ভাল লেখা সহজে লিখবেন।

জীবন বা অস্তিত্ব প্রথমে মনে হতে পারে শূন্য, নিরর্থক, নিঃসঙ্গ, কিন্তু এ একটা স্তর, প্রথম দিকের, এটা যায়, এবং তাড়াতাড়ি এটা পেরিয়ে আসাই ভাল। তরুণ যৌবনের অমূর্ত রঙে আকাশ এখন ছাওয়া তাই তার খোঁয়াটে ধূসর রঙ রচনায় সর্বত্রই একটু বেশি লেগে আছে : ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য অন্য রঙ নেই তা নয়, যেমন :

"মস্ত মাঠটা পেরিয়ে অনেক দূরে কাদের বাড়ি তৈরী হচ্ছে। দুপুরের ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুরের রঙে সাদা বাড়ি, রুপালী বেষ, বিরাগণ সূতোর গায় বৈরাগ্যের বেদনায় মুক আকাশ, নিঃসঙ্গ ছিল।" পৃঃ ৮।

দৃষ্টি আছন্ন, কিন্তু মুখ তুলতেই বিস্তৃত ব্যাপ্ত অসৎ চোখে পড়ছে, যদিও নূতন বা প্রথম বলে রঙ বা আলো একটু প্রখর, কিন্তু তা হোক।

"শীতের কুয়াশা মাখা অন্ধকার রাত।" ১৪। এও মন্দ না।

একটা কথা : ভঙ্গি নিজস্ব করার দিকে ঝোঁক থাকাই ভালো। যদিও ভঙ্গি আসে,—তাকে আনতে হলে বিকৃত বা বিসদৃশ দেখাতে পারে।

৮টি কবিতার বইয়ের মত চটি গল্পের বই কম দামে বেরলে সাহিত্যানুরাগীরা তরুণ লেখকদের অনুপ্রাণিত করার সুযোগ পেতে পারেন। এদিকে সংশ্লিষ্ট মহলের নজর পড়লে ভাল হয়।

সত্যব্রত বসু

বিশ্বাবর্ত

ভিয়েৎনাম : শান্তি না যুদ্ধের বাণ্ডি

সাইগ্রিশ দিন বোমাবর্ষণ বিরতির পর গত ৩১শে জানুয়ারী থেকে মার্কিনী বিমান বহর আবার উত্তর ভিয়েৎনামে বোমা-বর্ষণ শুরু করেছে। ইতিপূর্বে মার্কিনীরা ১৯৬৪-র মে মাসে পাঁচদিন বোমা বর্ষণে আর একবার বিরতি দিয়েছিল। উত্তর ভিয়েৎনামে অবিরাম বোমাবর্ষণের ফলেই হো-চি-মিন সরকারের পক্ষে ভিয়েৎনাম সঙ্কট মীমাংসার জন্য কোনো আলোচনা-বৈঠকে যোগদান সম্ভব নয়, দেশে এবং বিদেশে মার্কিনী ভিয়েৎনাম-নীতির এই ধরণের সমালোচকদের দিকে চেয়েই প্রেসিডেন্ট জনসন বোমাবর্ষণে বিরতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হো-চি-মিনের পক্ষ থেকে এই সময়ের মধ্যে উল্লেখ্য কোনো সাড়া কিম্বা সাড়া আসে নাই। উত্তর ভিয়েৎনাম এবং আমেরিকা পূর্বের ন্যায়ই আলাপ-আলোচনার জন্য বিপরীত পূর্বসর্তেই স্থির হয়ে আছে। উত্তর ভিয়েৎনামের দাবী, আলোচনার পূর্বে মার্কিনীবাহিনীর দক্ষিণ ভিয়েৎনাম থেকে অপসারণ চাই এবং ভিয়েৎকং পরিষদের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টের আলোচনা বৈঠকের একমাত্র না হলেও অন্যতম দক্ষিণ ভিয়েৎনামী প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতি চাই। মার্কিনীদের বক্তব্য নিঃসর্ত আলোচনা চাই এবং তারা ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামের অন্যতম প্রতিনিধিরূপে স্বীকৃতির ঘোরতর বিরোধী। ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট যদি আলোচনা-বৈঠকে হাজির থাকতে চায়, উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদের সঙ্গে ওরা আসন গ্রহণ করবে এর বেশী নয়।

বোমা বর্ষণ হবার সঙ্গে সঙ্গেই ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ কামনা করে মার্কিণ প্রতিনিধি গোল্ডবার্গ প্রস্তাব উত্থাপন করলে, সোভিয়েট রুশ এবং ফ্রান্সের পক্ষ থেকে প্রবল বাধা আসে ও উত্তর ভিয়েৎনাম এবং চীন ঘোষণা করে যে রাষ্ট্রসঙ্ঘে ভিয়েৎনাম সম্পর্কে কোনো প্রস্তাব গৃহীত হলে, এই দুই রাষ্ট্র সে প্রস্তাব অগ্রাহ্য করবে। সোভিয়েটের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভিয়েৎনাম সম্পর্কিত প্রস্তাব আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। এই প্রস্তাবের মূল বক্তব্যগুলি এইরূপ:

1. Calls for immediate discussions without pre-condition among the appropriate interested Governments to arrange a conference looking towards the application of the Geneva accord of 1954 and 1962 and the establishment of a durable peace in S. E. Asia.
2. Recommends that the first order of business of such a conference be arrangements for a cessation of hostilities under effective supervision.
3. Offers to assist in achieving the purpose of this resolution by an appropriate means including the provision of arbitrators or mediators.
4. Calls on all concerned to cooperate fully in the implementation of this Resolution.

সোভিয়েট রুশ, চীন এবং উত্তর ভিয়েৎনামের চোখে এই প্রস্তাব বোমাবর্ষণকে আড়াল করবার জন্যই উত্থাপিত হয়েছে। গত ৩রা ফেব্রুয়ারী উত্তর ভিয়েৎনামের বৈদেশিক দপ্তর থেকে বিবৃতি দিয়ে জানানো হয় ভিয়েৎনামে রাষ্ট্রসঙ্ঘের হস্তক্ষেপ

'inappropriate' বলে কারণ তা ১৯৫৪ র ভিয়েৎনাম চুক্তির বিরোধী ব্যবস্থা। কিন্তু আমেরিকা ১৯৫৪ ও ১৯৬২ সালের মত জেনেভা-সম্মেলন আহ্বানে দাবিতিস্থাপনের পরও সোভিয়েট রুশের পক্ষ থেকে এ-পর্যন্ত কোনো সমর্থন আসে নাই। এই সম্মেলন আহ্বানের এক্তিয়ার বৃটেন ও সোভিয়েটের—যারা জেনেভা সম্মেলনের Co-chairman ছিলেন। ব্রিটেন এ বিষয়ে তার সম্মতি জানিয়েছে।

চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের পূর্বসম্মতি ব্যতিরেকে সোভিয়েটের সাড়া দেবার উপায়ও নেই। জানুয়ারীর দ্বিতীয় সপ্তাহে সোভিয়েট নেতা শেলেপিনের নেতৃত্বে হানয়ে যে প্রতিনিধিদল গিয়েছিল, তারা উত্তর ভিয়েৎনাম তথা চীনকে আপোষ-আলোচনায় সম্মত করাতে ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসে। ১১ই জানুয়ারীতে People's Daily-র এক সাম্প্রতিক যা বলেছেন পিকিং-হানয়ের মনোভাব তা থেকেই বোঝা যাবে: —"The key to a settlemnt of the Vietnamese question is not the so-called scaling down of the fighting but withdrawal of all U S aggressor troops from South Vietnam If the Americans do not get out, the Vietnamese people will drive them out by force." আলজিয়ার্সের ভিয়েৎকং সূত্রে জানা গেছে যে এই সর্তও মিটিয়ে হতে পারে যদি আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েৎনামে ভিয়েৎকং-এর রাজনৈতিক মুখপাত্র ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে সরকারীভাবে স্বীকৃতি দেয়। আমেরিকা এই সর্তে সম্মত হলে দক্ষিণ ভিয়েৎনাম সরকারকে বর্জন করতে হয়, যা তার পক্ষে বর্তমানে অসম্ভব। এদিকে জনসন ও নিক্সন নেই। আডেলিয়ে স্টিভেনসন সম্প্রতি ওয়াশিংটনে বলেছেন যে ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্টকে ভিয়েৎনাম শান্তি বৈঠকে উত্তর ভিয়েৎনামের প্রতিনিধিদলের অংশরূপে অথবা একটি 'Independent Group' রূপে যোগ দেয়া যেতে পারে। কিন্তু একটি পৃথক সরকাররূপে নয়, 'Such participation'...could not be on the basis of recognition of NLF as a "Government." ঘোষা-বর্ষণ বিরতির অবকাশে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে ভিয়েৎনামে শান্তির জন্য মার্কিনী প্রচেষ্টা চলেছে। সেনেটর ম্যানফিল্ড ও অপর চারজনের একটি প্রতিনিধিদল ইউরোপ ও এশিয়ার ১৬টি রাজধানী ঘুরে এসে জনসনকে একটি উদ্বেগপূর্ণ রিপোর্ট দিয়েছেন। ম্যানফিল্ড বলেছেন কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার দ্বার খুলে যুদ্ধবিরতির পৌঁছানোর সম্ভাবনা একেবারেই ক্ষীণ এবং শান্তির চেষ্টা ব্যর্থ হলে ভিয়েৎনাম সংলগ্ন এশিয়া ভূখণ্ডে বৃহৎ যুদ্ধের ক্ষেত্র রচনা করবে:

the Vietnam conflict would move towards a general war on the Asian mainland if peace efforts failed." শেলেপিন মিশনের ব্যর্থতাও তারই সূচনা।

জনসনের বিশ্বব্যাপী শান্তি অভিযানের পাশাপাশি ভিয়েৎনামে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের আয়োজন প্রস্তুতি চলেছে। গত ১২ই জানুয়ারী জনসন আমেরিকান কংগ্রেসে উপস্থিত হয়ে আর একবার ভিয়েৎনাম ও এশিয়া সম্পর্কে দফায় দফায় ঘোষণা করে বলেন: "We donot intend to abandon Asia to conquest." এই যুদ্ধে ভিয়েৎনামে এ-পর্যন্ত ৪ লক্ষ মার্কিনী সৈন্যের সমাবেশ ঘটেছে এবং ১৯৬৬ সালের জন্যে এই সংখ্যা চার লক্ষে পৌঁছবে। প্রধানতঃ ভিয়েৎনাম যুদ্ধ পরিচালনার জন্য জনসন কংগ্রেসের নিকট অতিরিক্ত ১২,৭৩০,১১৯,০০০ ডলারের মঞ্জুরী চেয়েছেন। আমেরিকার প্রতিরক্ষা বাজেটও ৫৪,৪০০ মিলিয়ন ডলার থেকে আগামী জুলাই-এ ৫৮,৩০০ ডলারে পৌঁছাবে। গত ১২ই জানুয়ারী ১১২,৮০০ মিলিয়ন ডলারের রেকর্ড বাজেট উত্থাপন করে মার্কিনী শান্তি প্রচেষ্টার বিবরণ দিয়ে জনসন বলেন ১৯৬৫ সালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ৩০০ বার ওয়াশা

আলোচনায় আমেরিকার পক্ষ থেকে শান্তির প্রচেষ্টা হয়: ৪০টি দেশে দূত ও অভিজ্ঞ প্রতিনিধিদের প্রেরণ করা হয় এবং একশতাধিক গভর্নমেন্টের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হয়। এই ব্যাপক শান্তি প্রচেষ্টা ফলপ্রসূ না হওয়ার ফলে উত্তর ভিয়েৎনাম থেকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে সামরিক সাহায্যের গতিবেগ ত্বরিত করবার উদ্দেশ্যে আবার বোমাবর্ষণ শুরু হয়েছে। মার্কিনীরা দাবী করে বোমাবর্ষণ করে গত বারমাসে উত্তর থেকে দক্ষিণে অনুপ্রবেশকারীদের সংখ্যা প্রতিমাসে ১০০০ থেকে ৩৫০০-এ হ্রাস হয়েছে।

গত ৬ই ও ৭ই ফেব্রুয়ারী প্রেসিডেন্ট জনসন দক্ষিণ ভিয়েৎনামের নেতাদের সঙ্গে হনলুলুতে বৈঠক করে যুদ্ধের গতিবেগ ও ভিয়েৎকং প্রভাবিত অঞ্চলে আর্থিক উন্নতির পরিকল্পনা সম্পর্কিত কিছু আলোচনা করেন। উত্তর ভিয়েৎনামে দীর্ঘদিন বোমাবর্ষণ নিয়ে এবং জনসনের ব্যাপক শান্তি অভিযানের প্রতিক্রিয়াস্বরূপে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী শাসনে যে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছিল, তা দূর করার জন্যও মার্কিনী দিক থেকে হনলুলু বৈঠকের প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই বৈঠকে দক্ষিণ ভিয়েৎনামী শাসন চক্রের এয়ার ভাইস-মার্শাল এই প্রথম স্বীকার করে যে শুধুমাত্র অস্ত্র প্রয়োগে দক্ষিণ ভিয়েৎনামে কম্যুনিজম রোধ করা যাবেনা: "……That Communism could not be completely defeated in North Vietnam until a start was made at eliminating what be termed of political and Social defects that encourage the spread of communism."

কিন্তু হো-চি-মিন বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট ভিয়েৎনামে শান্তি স্থাপনের জন্য হস্তক্ষেপের আবেদন জানিয়েছেন। ভারতবর্ষের নিকট এই আবেদন এসে পৌঁছেছে। পোপ পলও আবেদন করেছেন নিরপেক্ষ শক্তিবর্গের কাছে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়ে শান্তিস্থাপনের উদ্যোগী হবার জন্য।

কিন্তু শান্তি কই? একদিকে বোমা-বর্ষণ বিরতি দীর্ঘতর করে বিপদের ঝুঁকি নিতে মার্কিনী অনীহা অপর দিকে নিঃসর্ত বোমাবিরতি আলোচনায় চীন ও উত্তর ভিয়েৎনামের অসম্মতি, শান্তির সম্ভাবনাকে শুধু অনিশ্চিত নয়, অবাস্তব করে তুলেছে। এরই মাঝখানে উত্তর ভিয়েৎনামের বন্ধুর ভূমিকায় চীন-রুশ দ্বন্দ্ব ও উত্তর ভিয়েৎনামে সোভিয়েট সমরাস্ত্র অবাধ সরবরাহে চীনা প্রতিরক্ষক দলপতির রুশ অভিযোগের বিরুদ্ধে চীনা চ্যালেঞ্জ, এই দ্বন্দ্বকে আরও জটিল করে তুলেছে। গত ১০ই ফেব্রুয়ারী তারিখে হ্যানয়ের নিকটবর্তী ঘাঁটি থেকে উৎক্ষিপ্ত ক্ষেপণাস্ত্রের আঘাতে মার্কিনী বোমারু বাহিনী হারাবার মার্কিনী আক্রমণের উদ্বেগও বৃদ্ধি পাবার সম্ভাবনা! ভিয়েৎকং-এর আক্রমণের গতিবেগও তীব্রতর হয়েছে। সুতরাং এই অবস্থায় চীন যদি উত্তর ভিয়েৎনামের নিঃসর্ত আলোচনায় যোগ দানে সম্মত হত, ভিয়েৎনাম যুদ্ধের ব্যাপ্তি অনিবার্য হয়ে উঠবে। শান্তি সম্পর্কে চীনের ঘুরন্ত অনাগ্রহ এই সম্ভাবনার ইঙ্গিত বহন করছে।

চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি ও চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টির মধ্যে ক্রমবর্ধমান দ্বন্দ্বের সাম্প্রতিক সংবাদও ভিয়েৎনাম যুদ্ধ সম্পর্কে চীনা নীতির সম্ভাব্য পরিবর্তন ঘোষণা করছে। এই সংবাদ গত ২৭শে জানুয়ারী পিকিং-এর সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে। এই দ্বন্দ্বের প্রকৃতি বর্ণনায় সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান মিঃ Hsiao Hua বলেছেন এটা জানা দরকার; "…Whether the gun will direct the party or the party will direct the gun" পার্টিকে নিশ্চিত হতে হবে যে: "the guns are in the hands of the most reliable people" সেনাবাহিনীর দিকে লক্ষ্য রেখেই এবার পিকিং সতর্কনীতি নিয়ে চলেছে। এই নূতন নীতির প্রয়োগে কোন্ সতর্কতার অবসান হবে।

১৪.২.৬৬

(৭৯৩ পৃষ্ঠার পর)

হয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রস্তাবে একটি নীতিকথা পরিবেশন করে বলা হয়েছে খাদ্য সঙ্কটকে জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হবে—'national view of the crisis' যেন এটি একটি নূতন অভিজ্ঞতার সন্ধান ; এ-যাবৎ যার প্রয়োজন ছিলনা। প্রস্তাবে রেশনিং ও 'প্রকিওরমেন্ট'-এর প্রয়োজনীয়তা মাত্র উল্লেখ করা হয়েছে. এই দুই ব্যবস্থার অনিবার্যতা, বিশেষ করে compulsory প্রকিওরমেন্টের অনিবার্যতা সম্পর্কে দৃঢ় প্রত্যয় নাই এবং প্রয়োগের কোনো নির্দেশও নাই। 'উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ', এই মানসিকতার বশবর্তী হয়ে প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'The committee calls upon all States surplus in rice to procure as much as possible and to spare adequate quantities for the deficit States.' অভিজ্ঞতাপন্ন বাক্যজালে সঙ্কটের সমাধান হলে, সে কাজে দীর্ঘকাল পূর্বেই সম্পন্ন হতো, সেজন্য অমৃতসরের প্রস্তাবের প্রয়োজন ছিল না। বন্টনের ক্ষেত্রে প্রস্তাবের পরস্পরবিরোধী বিবৃতি প্রস্তাবটিকে উপহাসাস্পদ করে তুলেছে। ব্যক্তির সঙ্গে ব্যক্তির এবং অঞ্চলের সঙ্গে অঞ্চলের বন্টনে বৈষম্যের বিরুদ্ধে মত প্রকাশের পরক্ষণেই প্রস্তাবে বলা হয়েছে : "The committee recognises that it is not possible to lay down an equal per capita availability of foodgrains all over the country." উৎপাদন বৃদ্ধির উল্লেখ করে এবং সার আমদানীর জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অগ্রাধিকার দাবী করে প্রস্তাব শেষ হয়েছে।

মন্ত্রিসভা সংস্কার যোগাযোগে মাদ্রাজে নির্মীয়মাণ সারের কারখানার উৎপাদিত সার সম্পর্কে এই বৈদেশিক সংস্থাটিকে সারের মূল্য নির্ধারণের যে ঢালাও সুযোগ দেওয়া হয়েছে তার ফলে সস্তা দরে কৃষকদের নিকট সার পৌঁছাবে কিনা সে-সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছে। শোনা যায় কাবরাল এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করে খাদ্যমন্ত্রীকে আক্রমণ করেছিলেন।

এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে বিষয় নির্বাচনী-সভায় প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। দাবী ওঠে যন্ত্রনার সংঘবদ্ধন হউক। কেরলায় দাবাপিছু ১৪০ গ্রাম চাউল, মাদ্রাজে ২৪০ গ্রাম—এই অসম ব্যবস্থা চলতে পারে না। খাদ্য-অঞ্চল বিলোপের দাবী এবারই দুর্বার হয়ে উঠেছিল যে কংগ্রেস সভাপতি এবং প্রধান মন্ত্রীর আবেদন উপেক্ষা করে সরকারী প্রস্তাবের সংশোধন অপরিহার্য হয়ে ওঠে এবং খাদ্যাঞ্চল বিলোপের প্রশ্নটি অবিলম্বে বিচার করার জন্য সম্মত হয়ে নেতৃত্ব রেহাই পায়। সমগ্র দেশে গম-চালের পরিমাণের সমতা, মূল্যের সমতা ও খাদ্যাঞ্চল বিলোপ, খাদ্যের মজুত তহবিল নির্মাণ, ভূমি সংস্কার, পর্যাপ্ত কৃষি ঋণের ব্যবস্থা এবং এবং উৎপাদন বৃদ্ধি-এই কয়টি লক্ষ্য পূরণে পরিবেশ সৃষ্টির ব্যর্থ হলে খাদ্য সঙ্কট জটিলতর আকার ধারণ করবে। জয়পুরে প্রতিনিধিদের প্রায় বিদ্রোহে কংগ্রেসের কর্তৃস্থানীয়রা প্রবল ভাবে নাড়া খেলেও সঙ্কটের সমাধানে কোনো দৃঢ় পদক্ষেপে অক্ষম হয়েছে।

এই অক্ষমতার আর একটি সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে জয়পুরের অর্থনৈতিক প্রস্তাবে ; আর্থিক সঙ্কটের প্রকৃতি বিচারে কোনো আভাস নেই, কোনো বিশ্লেষণ নাই : কেবল মাত্র মামুলী হা হুতাশ, পরিকল্পনায় কি হতে পারতো আর কি হয়েছে তার আর একবার উদ্দেশ্যহীন বর্ণনে আর্থিক সমস্যা করে গোটা বিষয়টি ধামাচাপা দেবার জন্য কংগ্রেস সভাপতির মনোনীত একটি কমিটির ওপর এ-বিষয়ে রিপোর্ট রচনার ভার দেওয়া হয়েছে। আশ্চর্যের কথা, ধামাচাপার এই কৌশলের বিরুদ্ধে বিষয় নির্বাচনী কমিটিতে কোন সরব প্রতিবাদ শোনা গেল না।

সভাপতির ভাষণে কাবরাল আক্ষেপ করেছেন : ১৯৪৭ সালে আবাদী কংগ্রেসে সমাজতান্ত্রিকধাঁচের লক্ষ্য স্বীকৃত হবার পর দশ বছর অতিক্রান্ত হলেও ধন বৈষম্য হ্রাস পায় নাই। তারপর ১৯৫৩ তে ভুবনেশ্বরে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছে, ভুবনেশ্বর প্রস্তাব প্রয়োগের জন্য গঠিত কমিটির

রিপোর্টও পাওয়া গেছে। কিন্তু তা কার্যকরী করার পথে অন্তরায় কি, সেই আত্মবিশ্লেষণের পথে পা বাড়াতে কারুরই সাহস পান নাই, সমাধানের কয়েকটি সদ্য সূত্রের উল্লেখ করেই কর্তব্য সমাধা করেছেন।

জয়পুরে বিভ্রান্ত নেতৃত্ব নূতন পথের দিশা দিতে যেমন ব্যর্থ হয়েছে, তেমনি সাধারণ সদস্যদের মনে নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মনোভাবও এই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। নেতৃত্বের সাধ আছে, সাধ্য নাই, সাধারণ সদস্যদের সঙ্গেও তাদের যোগসূত্র দুর্বল—জয়পুরের এই শিক্ষা।

জেনারেল জয়ন্তনাথ চৌধুরী

যদিও সামরিক প্রশাসন বিধির সাধারণ নীতি অনুযায়ী জেনারেল চৌধুরীর অবসর গ্রহণের সময় এবছরের ১০ই জুন কিন্তু ভারতের বর্তমান সামরিক পরিস্থিতিতে এই সাধারণ নীতি বর্তমান ক্ষেত্রে প্রযোগ করা উচিত কিনা সে সম্বন্ধে ভারতের সর্বত্র একটি সরব প্রশ্ন উঠেছে। বর্তমান বছরে ভারতের চরম সামরিক পরিস্থিতির সম্মুখীন হবার আশঙ্কা রয়েছে এবং সেই পরিস্থিতির মোকাবিলা করবার দক্ষতা অন্যান্য জেনারেলদের নেই, সে ইঙ্গিত আমাদের নয়। কিন্তু ১৯৬২ সালের সামরিক আঘাত ও যেমন-চক্রের রাজনীতির ফলে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর দক্ষতা ও মনোবল সম্বন্ধে যে হতাশাব্যঞ্জক ও ধর্বিত প্রতিচ্ছবি ভারতীয় জনমনে ও বিশ্বের দৃষ্টিভঙ্গীতে প্রতিফলিত হয়েছিল জেনারেল চৌধুরীর নায়কত্বে ভারতীয় সামরিক মান সম্বন্ধে সেই সংশয়ই যে দূর হয়েছে শুধু তাই নয়—ভারতীয় সামরিক বাহিনী বিশ্বের কাছে এক নতুন মর্যাদার আসন দাবি করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতীয় সামরিক বাহিনী সম্বন্ধে ভারতীয় জনমনের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং ভারতীয় বাহিনীর মনোবল এক সুদৃঢ় সংকল্পে উজ্জীবিত হয়ে উঠেছে। মাত্র তিন বছরের মধ্যে জেনারেল চৌধুরী ভারতীয় বাহিনীর মধ্যে আত্মবিশ্বাস পুনঃস্থাপন করে ভারতীয় জোয়ান ও অফিসারদের এক গৌরবময় সামরিক ঐতিহ্যের অধিকারী করে তুলতে সক্ষম হয়েছেন। বর্তমান সামরিক সংকটের অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে নেতৃত্বের প্রতি সামরিকবাহিনী ও জনসাধারণের পূর্ণ আস্থা জাতীয় প্রতিরোধ গড়ে তোলবার পক্ষে অনিবার্য। এই গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে, বিশেষ পরিস্থিতির বিশেষ কারণে, জেনারেল চৌধুরীর কার্যকালের মেয়াদ বৃদ্ধি করা উচিত হবে বলেই আমরা মনে করি। জেনারেল চৌধুরীর কার্যকাল বৃদ্ধি হলে ভারতীয় জোয়ান ও জনতা যে বিশেষ ভাবে খুশি হবে সে বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি

বার মাসের মধ্যে জীবনমানের সূচক দশ পয়েন্ট বৃদ্ধি পেলে দাস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভাতা গত ডিসেম্বর মাস থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে। এ ভাতা বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার কারণ, বিভিন্ন রাজ্যসরকারের কাছ থেকে প্রবল প্রতিবাদ। কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধি হলে অনিবার্যভাবেই রাজ্য কর্মচারীদের ভাতা বৃদ্ধির দাবী উঠবে এবং অনেক রাজ্যেরই এই বর্ধিত ভাতা মেটাবার সঙ্গতি নেই। তাই কেন্দ্রীয় ভাতা বৃদ্ধিতে রাজ্যসরকারের প্রতিবাদ। অথচ কেন্দ্রীয় প্রতিশ্রুতি পালনে বিলম্বও গুরুতর অন্যায়। এই ভাতা বৃদ্ধি ৫১, ৮১, ১১১, ১২১, হারে করা হয়েছে এবং এই বৃদ্ধি নিম্নস্তরের কর্মচারীদের পক্ষে মূল্যবৃদ্ধির ক্ষয় মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পূরণ করবে, অথচ দাস কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শতকরা ৯০ ভাগ ক্ষয়পূরণের দায়িত্ব সরকারের উপর বর্তেছিল। এই ভাতা বৃদ্ধির দায়িত্ব মেটাতে কেন্দ্রীয় সংকারের বছরে ২৫ কোটি টাকা ব্যয় হবে।

পশ্চিম বাংলা সরকারের কর্মচারীদের ৫৲ ও ১০৲ এবং প্রাথমিক শিক্ষক, মাধ্যমিক শিক্ষক, স্কুল কলেজের অ-শিক্ষক কর্মচারী এবং স্পনসর্ড কলেজ ও পলিটেকনিকের শিক্ষকদেরও ভাতা বৃদ্ধির প্রশ্ন উঠেছে; প্রথম তিন স্তরের ৫৲ টাকা ও চতুর্থ স্তরের ১০৲ টাকা। সর্বসাকুল্যে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের এই বৃদ্ধি বাবদ ব্যয় দাঁড়াবে কোটি টাকা, অর্থাৎ তখন ভাতার পরিমাণ দাঁড়াবে ৯·৫০ কোটি টাকা। এর চাইতেও বড় প্রশ্ন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য স্তরের কর্মচারীদের ভাতার বৈষম্য দূর করে ন্যায় বিচার ও সমতা স্থাপন। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের মধ্যে সর্বনিম্ন স্তরের বেতন যাদের মাসিক ৭০ টাকা থেকে ১০৯ টাকা, বর্তমান ৫৲ টাকা ভাতা বৃদ্ধির ফলে তাঁদের ভাতার পরিমাণ দাঁড়াবে ৩৮ টাকা। আর রাজ্যস্তরের যাদের বেতন ১৫০ টাকা পর্যন্ত তাদের ভাতা পাঁচ টাকা বৃদ্ধি পেয়ে ১৫ টাকা হবে। অবশ্য রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের ভাতা ১৯৬০ সালে বেতনের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার পর, আবার ৬৪ সাল থেকে এই ভাতা চালু করা হয়েছে। এই দুই সরকারের কর্মচারীদের বেতনও ভাতার বৈষম্য দূর করার সময় এসেছে।

চন্দ্রে জয়

রাশিয়া যেদিন স্পুটনিক পাঠিয়ে আকাশচারণের স্বপ্নকে সফল করে তুলেছিল সেদিনে যেমন বিস্ময় ও নূতন দিগন্ত উন্মোচনের আশায় বিশ্বজন উৎফুল্ল হয়ে উঠেছিল, চন্দ্রপৃষ্ঠে সুনার স্বদেশমন্ত্র অবতরণেও আজ সারা বিশ্বে পুলক শিহরণই সৃষ্টি হয়েছে। মানুষের পক্ষে যে চন্দ্রযাত্রা হয়তো এক বছরের মধ্যেই সম্ভব হবে চন্দ্র পৃষ্ঠে সুনার এই মন্ত্র অবতরণ সেই প্রতিশ্রুতিই ঘোষণা করলো উৎসুক মানব-সমাজের কাছে। এর পরে ৫ম্রে যাবে রবটচারী সুনার সঙ্গী জীবন্ত জন্তুজানোয়ার। তারপরে হয়তো যাবে দুই সাইড বাহিনী' এবং সর্বশেষে প্রত্যাবর্তনকারী বিজ্ঞানীরা। তারপরের অধ্যায়ে শুরু হবে চন্দ্রে যাতায়াতের স্বাভাবিক নভোচারী চলাচল। লুনা ছবি পাঠিয়ে যে বার্তা জানিয়েছে পৃথিবীকে তা' হে যে চন্দ্র জয়ের পথই অনেকখানি পরিষ্কার হয়েছে তাই নয়,—চন্দ্রের জন্ম তথা 'পৃথিবী ও সৌর' মণ্ডলের জন্ম সম্বন্ধে বিশ্বের এতদিনের প্রচলিত ধারণায়ও অনেক নতুন চিন্তার রশ্মিপাত ঘটেছে। চন্দ্রের প্রকৃতি ও পরিচয় নিয়েও শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা-কল্পনা। চন্দ্র এত কাল ছিল ভাববিলাসীদের কল্পরঞ্জিত চন্দ্রিকা। এবারে চন্দ্র বিজ্ঞানীদের শুধু গবেষণা ক্ষেত্রেই পরিণত হলো তাই নয়, মানুষের এহান্তর যাত্রার প্রথম স্বপ্ন সম্ভবও হয়ে উঠলো ষোল কলার ছলনাময়ী সুবর্ণ শশী। বিশ্বশান্তির পক্ষে চন্দ্রযাত্রার অভিজ্ঞতার হয়তো দুঃসাহসী মানব মনকে অনেকখানি পথান্তরিত করতে সক্ষম হবে। রাশিয়ার অমর বিজ্ঞানীদের আমরা সানন্দ অভিনন্দন জানাই।

১৬.২.৬৬

২০১, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এন্ডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY
CENTRAL LIBRARY

জয়শ্রী

৩০ বর্ষ | ১১শ সংখ্যা | ফাল্গুন ১৩৭২

সম্পাদকীয়

বীণাপাণি রায়

আমাদের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, ত্রিশবছরের দুর্যোগের দিন-গুলিতে যাঁরা পর পর 'জয়শ্রী'র সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করে সরকারী নিপীড়নের মধ্যেও 'জয়শ্রী'কে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন তাঁদেরই অন্যতম, শ্রীমতী বীণাপাণি রায় গত ১৭ই ফেব্রুয়ারী অকস্মাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোকগমন করেছেন। ছাত্রাবস্থায়ই বীণাপাণি রায় বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টার আওতার মধ্যে বর্ধিত হয়ে ছাত্রী আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকায় ও সে-দিনের বিপ্লবী মহিলা প্রতিষ্ঠান 'বীণাপাণি সংঘে'র সদস্যরূপে দেশ ও সমাজের সেবায় পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ করে-ছিলেন।

রাজনৈতিক নানা আন্দোলন, সভাসমিতি, সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে কখনো তিনি বিরাগগ্রস্ত হন নাই। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে, যে-বছর নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু ওয়েলিংটন স্কোয়ারের এ, আই, সি, সি-র সভায় ত্রিপুরী কংগ্রেসের পর রাষ্ট্রপতির পদ ত্যাগ করলেন, সেই সম্মেলনে শ্রীমতী বীণাপাণি নারী স্বেচ্ছাসেবিকাবাহিনীর ভারপ্রাপ্তা ছিলেন। এ-ছাড়া কংগ্রেসের অধিবেশন, নানা মহিলা সম্মেলনে তিনি উপস্থিত থেকে অংশগ্রহণ করেছেন। তিনি সুবক্তাও ছিলেন।

শ্রীমতী বীণাপাণি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কৃতী ছাত্রীরূপে এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন এবং শিক্ষাব্রতীরূপেই পরবর্তীকালে নিজের কর্মপ্রয়াসকে সীমিত রেখে দীর্ঘকাল সুপরিচিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান নারীশিক্ষামন্দিরের সহিত যুক্ত ছিলেন।

আমাদের এই ঘনিষ্ঠ সহযোগীর অকালমৃত্যুতে বেদনার্ত হৃদয়ে তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে আমাদের সমবেদনা জানাচ্ছি। ৺বীণাপাণি রায় ৺অনিলচন্দ্র রায়ের জ্যেষ্ঠতাত-কন্যা এবং আমাদের অন্যতম সহকর্মী ডঃ শৈলেশচন্দ্র রায়ের জীবন-সঙ্গিনী ছিলেন।

বীর সাভারকর

যে বিপ্লবী ভারতের বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে অবিচ্ছিন্নভাবে প্রাণ সঞ্চার করেছেন, যার কার্যক্রম এক কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিল, ইংরেজের জাহাজ থেকে যার পালাবার ঘটনাবলী বৈপ্লবিক দুঃসাহসের প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, সেই মহান বিপ্লবী বীর সাভারকার পরিণত বয়সে দেহান্তরিত হয়েছেন। আমরা তাঁর স্মৃতির প্রতি একান্ত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি। তিনি যে অন্তরের অন্তঃস্থলে কিরূপ মৌল-বিপ্লবী ছিলেন নিজের শেষকৃত্য সম্বন্ধে তাঁর অন্তিম ইচ্ছায়, যার মধ্যে তিনি গতানুগতিক শ্রাদ্ধাদির রীতি বর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন, —তার ভিতর দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। এই বীর বিপ্লবীর প্রতি লোকসভার শ্রদ্ধা প্রকাশে কংগ্রেসদল অসম্মতি জ্ঞাপন করে এক নিন্দনীয় আচরণ করেছে। গান্ধীমার্গের প্রাধান্যে বিভোর এই নেতৃত্ব যে বিপ্লব মার্গের অনুসারীদের প্রতি স্বীকৃতি ও মর্যাদা দানে এখনও কুণ্ঠিত এই ঘটনাটি সে সম্বন্ধে আরেকটি লজ্জাকর দৃষ্টান্ত। আমরা বীর সাভারকারের আত্মার শান্তি কামনা করি।

পশ্চিমবঙ্গের বাজেট

১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে রাজস্ব খাতে ১৮০ কোটি ৯৮ লক্ষ টাকা আয় ও ১৮৮ কোটি ৬০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে বলে অনুমান করা হয়েছে। সুতরাং ১৯৬৬-৬৭ সালে রাজস্বের ঘাটতি ৭ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা এবং রাজস্ব খাতের বাইরে মূলধনী খাতে ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়াবে ১০ কোটি ৪৯ লক্ষ টাকা। সুতরাং আগামী বছর আনুমানিক মোট ঘাটতি ১৮ কোটি ১১ লক্ষ টাকা। প্রারম্ভিক তহবিলের ২২ লক্ষ টাকা মিলিয়ে হিসাব করলে ঘাটতি হবে ১৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা। ৬ কোটি ৪০ লক্ষ টাকার মতো অতিরিক্ত কর আদায় করে রাজস্ব খাতে ঘাটতি ১ কোটি ২২ লক্ষ টাকায় নামিয়ে আনা হবে বলে অর্থময়ী আভাষ দিয়েছেন। চলতি বছরে অতিরিক্ত কতকগুলি কর ধার্য করে তা থেকে ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেটে ২·৬ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অর্থময়ী ভারত সরকার ও পরিকল্পনা কমিশনের নিকট অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার বরাদ্দ চেয়েছেন। তার আশা এই টাকাটা মঞ্জুর হলে সামগ্রিক ঘাটতি ১৭ কোটি ৮৯ লক্ষ টাকা থেকে ১·৪৯ কোটি টাকায় নামিয়ে আনা হবে।

পশ্চিমবঙ্গের রাজস্ব খাতে আয় বেড়েও ব্যয় তদোধিক বেড়ে যাচ্ছে। অথচ জনহিতকর কাজের ব্যয় বৃদ্ধি পাওয়া দূরের কথা হ্রাস পাচ্ছে এবং তদুপরি চলতি বাজেটে জনহিতকর কাজের জন্য যে ব্যয় ধরা হয়েছিল তার চাইতে কম ব্যয় হয়েছে। অথচ প্রশাসন, জেল, পুলিশে ব্যয় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে।

ঋণের সুদেও সরকারের ব্যয় বেড়েছে। চলতি বছরে ৮ কোটি ৫১ লক্ষ ৮৭ হাজার টাকা সুদ বাবদ বরাদ্দ ছিল, কিন্তু সংশোধিত বাজেটে ব্যয় হয়েছে ৯ কোটি ৩১ লক্ষ ৩৭ হাজার টাকা। আগামী বছরে এই খাতে ব্যয়ের পরিমাণ ১১ কোটি ২৯ লক্ষ ১ হাজার টাকা। বর্তমান ঋণের পরিমাণও ক্রমশ বৃদ্ধি পেয়ে ৫২৬ কোটি ৭৭ লক্ষ টাকায় দাঁড়িয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৬-৬৭ সালে পরিকল্পনার ব্যয়-বরাদ্দ নিয়ে ভারত সরকারের সঙ্গে টানা পোড়েন চলেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ৬৭ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা ব্যয় করতে চান এবং এ-বাবদ অতিরিক্ত ১০ কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে প্রার্থনা করেছেন। কেন্দ্রীয় সরকার এ-বছরের বরাদ্দ আরও নীচে নামিয়ে আনতে চান এই কারণে যে, পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গতি দিয়ে পরিকল্পনার ব্যয়ের এই স্তরে পৌঁছানো যাবে না। পশ্চিমবঙ্গে রাজস্বের

অপব্যয় প্রবাদের মত দাঁড়িয়ে গেছে এবং অডিটর জেনারেলের রিপোর্টে এর ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। তা ছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যবসায়ে লোকসানের চল আজও অব্যাহত রয়েছে।

সুতরাং মূলধন থেকে আয় বৃদ্ধি করে ট্যাক্স-বহির্ভূত রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধিই পশ্চিমবঙ্গের আর্থিক সঙ্কটের একমাত্র পরিত্রাণের পথ, সরকার সে পথে ব্যর্থ হয়েছেন এবং রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ওভারড্রাফ্‌ট সম্বল করে পাওনা মেটাচ্ছেন। ভারত সরকার ধার মেটানোর এই সহজ পন্থা বন্ধ করবার বিষয় চিন্তা করেছেন। এদিকে কড়া নজর না দিলে রাজ্যসরকার সমূহের আর্থিক কাঠামোর স্থিতি-স্থাপনের গুরুত্বাদির সম্পর্কে টনক নড়বে না।

খাদ্যের দাবীতে গণ-সংগ্রাম

মার্চ মাসের প্রথম দু সপ্তাহে বাংলা দেশে যে অভাবনীয় ঘটনা ঘটেছে তাকে আন্দোলন বা সংগ্রামের আখ্যা দেওয়া যায় না। বাংলা দেশের সমগ্র জনসাধারণ কংগ্রেস সরকারের খাদ্যনীতি এবং এই সরকারের দর্পিত ও ক্ষমতা-প্রমত্ত ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে স্বতঃস্ফূর্তভাবে গণ জাগরণ ঘটায়। ক্ষুধার জ্বালায় জর্জরিত হয়ে এবং কেরোসিনের অভাবে বিপর্যস্ত হয়ে এই আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্তভাবে সুরু করে স্কুলের ছাত্র ও অল্প বয়সের যুবকেরা। এই কিশোরদের খাদ্য আন্দোলন দমনে পুলিশ চণ্ডনীতি প্রয়োগ করার পরে বাংলা দেশের বিরাট জনসমাজ এই সংগ্রামী কিশোরদের সঙ্গে এসে যোগ দেয়।

খাদ্যের দাবীতে গণ জাগরণের ঘটনাবলীর নিম্নলিখিত তাৎপর্যগুলি বিশেষ ভাবে অনুধাবনীয়।

প্রথমত, এবারের খাদ্য সংগ্রাম সুরু করে কিশোর ও তরুণ ছাত্র সম্প্রদায়, চরম পুলিশী দমনের প্রতিক্রিয়ায় পরবর্তী অধ্যায়ে বৃহত্তর জনতা এই খাদ্য আন্দোলনে যোগ দেয়। এই গণ অভ্যুত্থানে নিহত, আহত ও ধৃতের মধ্যে প্রায় আশি শতাংশের বয়স বিশ বছরের নিচে।

দ্বিতীয়ত, এই গণ অভ্যুত্থানে প্রথম বা পরের পর্যায়ে কোথাও ছাত্র বা জনতার হাতে কোন রাজনৈতিক দলের পতাকা দেখা যায়নি। নেতৃত্বে ও পরিচালনায়ও কোন রাজনৈতিক নেতাদের দেখা যায় নি। মৃত ও আহতদের অধিকাংশই কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত নয়। যারা গ্রেপ্তার হয়েছেন তারাও অধিকাংশ কোন রাজনৈতিক দলের সভ্য নয়।

তৃতীয়ত, গণ অভ্যুত্থান ঘটে প্রধানত, খাদ্য ঘাটতি অঞ্চলে এবং ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমও এই অঞ্চলগুলিতেই প্রধানত সীমাবদ্ধ ছিল।

চতুর্থত, এই গণ-সংগ্রাম দমন করার জন্য বাইরের রাজ্য থেকে কয়েক হাজার সশস্ত্র পুলিস আনা হয়েছিল। এবং শেষ পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গের শাসন ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ায় কোন কোন অঞ্চলে আইন-শৃঙ্খলার ভার তুলে দেওয়া হয়েছিল সামরিক বাহিনীর হাতে।

পঞ্চমত, গণ-প্রতিরোধের অবস্থা এমন পর্যায়ে এসেছিল যে পুলিশও সরকারী দমন নীতির বিরুদ্ধে প্রায় বিদ্রোহের মনোভাব প্রকাশে প্রস্তুতি হতে পারতো এবং সেনা বাহিনীর মধ্যেও এই দমন নীতির প্রতিক্রিয়া দেখা দিত।

ষষ্ঠত, এই গণ-প্রতিরোধের সামনে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল এবং মন্ত্রীর পর্যায় থেকে আরম্ভ করে উঁচু নিচু সমস্ত স্তরের কংগ্রেস নেতারা স্বগৃহ ত্যাগ করে সশস্ত্র পুলিশ বেষ্টিত হয়ে সুরক্ষিত স্থানে আশ্রয় গোপন করে আত্মরক্ষা করতে বাধ্য হয়।

সপ্তমত, এই গণ-প্রতিরোধের সময়ে যারা নিহত ও আহত হয় তাদের প্রায় অধিকাংশই ধ্বংসাত্মক ঘটনা-

বলীয় সঙ্গে বা প্রত্যক্ষভাবে গণ প্রতিরোধের সঙ্গে জড়িত ছিল না।

অষ্টমতঃ, প্রথম পর্য্যায়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার চরম হিংস্র ও প্রতিশোধক মূলক আচরণ গ্রহণ করে কিন্তু পরের পর্য্যায় শাসন যন্ত্র ভেঙ্গে পড়লে সরকার পুলিশ বাহিনী ও মিলিটারীর হাতে আত্ম সমর্পণ করে।

নবমতঃ, এই গণ-প্রতিরোধের মধ্যে ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম প্রধানতঃ যান বাহন ও চলাচল ব্যবস্থা তথা কমুনিকেশন ধ্বংস করার দিকে ঝুঁকে পড়ে রেল ষ্টেশন, রেল লাইন, রেল ফিসপ্লেট, পোষ্ট অফিস, তার ও তার ঘর রেল কোচ ইত্যাদি জনতার ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমের মধ্যে পরিণত হয়।

দশমতঃ, জনতার বিক্ষোভ স্বতঃস্ফূর্ত হওয়া সত্ত্বেও আণ্ডার গ্রাউণ্ড টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের তার কাটা, ফিসপ্লেট তোলা, সিগনাল নষ্ট করা ইত্যাদি কার্যক্রম এবং বিশেষ ধরণের বোমা তৈরীর ঘটনা গুলি যে ইতস্তত নয় এবং তার পশ্চাতে বিশেষজ্ঞের হাত রয়েছে এবং মনে করার কারণ ঘটেছে।

বাংলা দেশে আরও অগণিত হরতাল ঘটেছে। কিন্তু কোন হরতালই এরূপ নাশকতামূলক পথে বিচ্যুত হয়নি। এরূপ হিংসা ও ধ্বংসের ঘটনাবলী নিঃসংশয়ে শোচনীয় ও অনভিপ্রেত কিন্তু জনতার অভিযোগ, প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ প্রকাশের সমস্ত গণতান্ত্রিক উপায় বন্ধ করে দিয়ে এবং সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা হরতাল বন্ধ করার হিংস্র ও উদ্ধত চ্যালেঞ্জ তুলে ধরে যিনি জনতাকে এই হিংসাত্মক পথে ঠেলে দেওয়ার জন্য দায়ী তিনি হলেন পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন।

ধ্বংস, বিনাশ ও হরতালের অনেক মর্মান্তিক ঘটনা এবারের গণ অভ্যুত্থানে ঘটেছে কিন্তু এবারের ঘটনার যে মূল বিষয়টি চরম ভাবে বিপর্য্যস্ত হয়েছে তা হলো গণ-তন্ত্রের আদর্শ, নীতি, ঐতিহ্য ও আচরণ। গত ১৮ বছরে পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্র এমন ভাবে আর কখনও বিপর্যস্ত হয় নি। গণতন্ত্রের এরূপ চরম বিপর্য্যয় ঘটাবার জন্য যে ব্যক্তিটির ঔদ্ধত্য; গর্ব, ক্ষমতান্ধতা, অবিবেচনা ও বুদ্ধি বিভ্রান্তি মূখ্যতঃ দায়ী পশ্চিম বাংলার সেই মুখ্যমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগ করা প্রয়োজন। এই মুখ্যমন্ত্রী অপসারিত না হলে পশ্চিমবঙ্গে গণতন্ত্রের অবসান ঘটবে সে সম্বন্ধে দিল্লীকে আমরা সতর্ক করে দিতে চাই।

পশ্চিম বাংলায় সাম্প্রতিক গণ অভ্যুত্থানের প্রকৃতি কারণ, পশ্চাদপট, সরকারের ভূমিকা পুলিশের যথেচ্ছাচার এবং দমননীতি ইত্যাদি সম্বন্ধে ব্যাপক ও মৌলিক তথ্যসহ আমরা একটি বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করছি। এবারে পশ্চিম বাংলায় যে ঘটনা ঘটেছে তার রূপ ও স্বরূপ এবং সরকার ও জনতার দায়িত্ব সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধান এবং এই অভ্যুত্থানের প্রকৃতি নির্ণয় করা বাংলা দেশের স্বাধীনতা, জাতীয়তা ও গণতন্ত্রের মূল নীতি ও ভবিষ্যত সম্বন্ধে আমরা অপরিহার্য বলে মনে করি।

পুনরায় আয়ুবশাহীর রূপ-প্রস্তুতি

কেউ যদি নিজের চোখ নিজে বেঁধে আর্তনাদ করে উঠে বলতে আরম্ভ করে 'আমি কেন অন্ধ হয়ে গেলাম' তাহলে সেই ব্যক্তিটি যেমন বিদ্রূপের পাত্রে পরিণত হয় আজ আয়ুবশাহীর পাকিস্তান সম্বন্ধে ভারত সরকারের অবস্থাটি হয়েছে অনেকটা সেরকম। ভারত সরকার সজ্ঞানে চোখবুজে স্বেচ্ছাচারের ন্যায় তাসখন্দ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। আজ সেই চুক্তির কালির আঁচড় শুকাতে না শুকাতেই পাকিস্তান আবার ভারতের প্রতি হিংস্র হস্ত দেখাতে সুরু করেছে। কচ্ছ চুক্তি স্বাক্ষর করতে না করতেই আয়ুবশাহীর হানাদাররা কাশ্মীরের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল—এখন তাসখন্দ চুক্তির প্রথম

পদক্ষেপ অর্থাৎ অধিকৃত কাশ্মীর ও লাহোর শিয়ালকোট খণ্ড থেকে ভারতীয় বাহিনী অপসারিত করতে না করতেই পাকিস্তান ভারত বিরোধী কার্যক্রম-এর বগ-হুংকার শুরু করেছে। পাক-ভারত সম্পর্ক স্বাভাবিক হতে না হতেই, পাসপোর্টের মাধ্যমে দুই দেশে যাতায়াত শুরু না হতেই এবং যুদ্ধকালীন অধিকৃত ভারতীয় সম্পদ প্রত্যর্পণ না করেই—পাকিস্তান ভারত-বিরোধী পদক্ষেপে অগ্রসর হতে আরম্ভ করেছে।

আত্মম্ভর কংগ্রেসী সরকার ভারতবাসীকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন যে আমুর লোকটি ভাল কিন্তু মুস্টোই হচ্ছে সমস্ত নষ্টামীর গোড়া এবং তাসখন্দ চুক্তি বিরোধী জনমতের জন্যই পিণ্ডি নেতা আমুর কিছু কিছু কড়া কথা বলতে বাধ্য হয়েছেন। কিন্তু ভারত সরকার বোধহয় এখন একথা উপলব্ধি করেছেন যে আমুর ও মুস্টো একই পাক রাজমুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ মাত্র। নিজেকে নির্বোধের ভূমিকায় ঠেলে দিয়ে দিল্লী সরকার এখন আহত অভিমানে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের কাছে একটি পত্র পাঠিয়ে অভিযোগ করেছেন যে আয়ুবশাহীর মতিগতি ভাল নয় এবং পিণ্ডি সরকার তাসখন্দ চুক্তির সর্তগুলি পালন না করে এরই মধ্যে আবার ভারত-বিরোধী কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছে।

ভারতবিরোধী প্রচার শুরু করার চেয়েও আরও গুরুতর সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। যুদ্ধ বিরতি এবং তাসখন্দ চুক্তির পর্দার আড়ালে পাকিস্তান এর মধ্যেই কম্যুনিষ্ট চীনের অস্ত্রশস্ত্রে দুইটি নতুন ডিভিশন সৈন্য গঠন করেছে এবং বহু ট্যাংকসহ কমপক্ষে দুই স্কোয়াড্রন মিগ-১৯ শ্রেণীর সামরিক বিমান লাভ করেছে। চীনের কাছ থেকে যে পাকিস্তান অস্ত্র লাভ করছে সে বিষয়টি গোপন করার প্রয়োজনও বোধ করেনি আয়ুবশাহী। পাক বিপাকিক দিবসে রাওয়ালপিণ্ডিতে পাঁচটি চীনা ট্যাংক এবং চারটি মিগ বিমান বিশ্বের কাছে আয়ুবশাহী গর্বিতভাবে প্রদর্শন করে দিয়েছে। ঐরূপ সংবাদের সঙ্গে আরও জানা যাচ্ছে যে রাওয়ালপিণ্ডির গাড়োয়া এবং পাঞ্জাবের কেমকরণ এলাকায় পাকিস্তান সৈন্যও সমাবেশ করেছে।

সম্প্রতি চীনের প্রেসিডেন্ট লিউ-সাউ চি এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রী চেন-ই পাকিস্তান পরিদর্শনে এসেছেন। রাওয়ালপিণ্ডি এবং ঢাকা দুই কেন্দ্রই চীন প্রেসিডেন্টের সফর সূচীর অন্তর্ভুক্ত। চীনের অবদান এবং ভারত সম্বন্ধে চীনের মনোভাবের পুনরুত্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে চীন-নায়কদের পাকিস্তান ভ্রমণ শুভ-সংকেতের সূচক যে নয় সেকথা সুস্পষ্ট।

শান্তির মরীচিকায় বিভ্রান্ত হয়ে ভারত পাকিস্তানকে সামরিক দিক দিয়ে সমস্ত ট্যাক্টিকিক ঘাটিগুলি ছেড়ে দিয়েছে। এখন শুরু হয়েছে দিল্লী সরকারের আর্তনাদ। দিল্লী নেতৃত্বের এই বন্ধ্যা রাজনীতির হাত থেকে ভারতীয় জনতা কবে মুক্তিলাভ করবে আমরা সেকথাই ভাবছি। এই নেতৃত্ব যে ভারতকে আরও কোন দুর্ভাগ্যের গহ্বরে ঠেলে দিবে আজ তাই ভারতীয় জনতার উদ্বেগপূর্ণ প্রশ্ন।

নাগা ও মিজো বিদ্রোহ

একই দিকে শান্তি ও সংঘাতের ঘটনাবলীতে নাগা ও মিজো অঞ্চলে এক সংকটজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে বিদ্রোহী নাগাদের একাংশের সঙ্গে আলোচনার বার্তালাপ চলছে! অন্যদিকে মণিপুরে একশ্রেণীর নাগারা ধ্বংসাত্মক কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। আরেক দিকে নাগাদের একাংশের নেত্রী রাণী গুইদালো একটি বিশেষ শ্রেণীর নাগাদের জন্য স্বায়ত্বশাসন চাইছে এবং অন্যদিকে বিদ্রোহী নাগাদের দৃষ্টান্তে অপেক্ষাকৃত শান্তিপ্রিয় মিজোরা

বিদ্রোহ করেছে। এই বিদ্রোহ দমিত হওয়ায় তারা পাকিস্থানে আশ্রয় নিচ্ছে।

নাগা ও মিজো সমস্যা সম্বন্ধে কয়েকটি মূল বিষয়ের তথ্যানুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

প্রথমতঃ শান্তিবার্তার নামে নাগারা নতুন বিদ্রোহের ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে কিনা, দ্বিতীয়তঃ মিজোরা বিদ্রোহী নাগাদের দ্বারা প্ররোচিত, পরিচালিত ও অনুপ্রেরিত হয়েছে কিনা, তৃতীয়তঃ পাকিস্তান এই বিদ্রোহের পশ্চাতে কতখানি সাহায্য দিচ্ছে এবং কিভাবে কিরূপ ভাবে এই বিদ্রোহীদের শিক্ষা ও সাহায্য দিচ্ছে, চতুর্থতঃ পলাতক বিদ্রোহীরা কি প্রধানতঃ পাকিস্তানে আশ্রয় নিচ্ছে, পঞ্চমতঃ নাগা ও মিজোদের মধ্যে কোন কোন শ্রেণী বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন এবং কোন শান্তি ও সহযোগিতাকামী, ষষ্ঠতঃ বিদ্রোহী নাগাদের মূল লক্ষ কি, নবমতঃ পাকিস্তান ছাড়া নাগা ও মিজো বিদ্রোহের পশ্চাতে অন্য কোন শক্তি, ব্যক্তি, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বা চীনের হাত আছে কিনা এবং দশমতঃ আসাম ও অসমীয়া ভাষা সম্বন্ধে এদের মনোভাব কি।

নাগা ও মিজো সমস্যা সমাধানে এই তথ্যের সন্ধান এবং সেই তথ্যের ভিত্তিতে নীতি সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া কর্তব্য।

কেন্দ্রীয় বাজেট

নূতন অর্থমন্ত্রী শ্রীশচীন চৌধুরী তাঁর ১৯৬৬-৬৭ সালের বাজেট গত ২৮শে ফেব্রুয়ারী পেশ করেছেন। বাজেটে রাজস্ব খাতে আয় ধরা হয়েছে ২৬১৭·১২ কোটি টাকা এবং ব্যয় ধরা হয়েছে ২৪০৭·৪১ কোটি টাকা। রাজস্ব খাতে চলতি বছরে ২৮২ কোটি টাকা উদ্বৃত্ত হবে বলে অনুমান করা হয়েছে এবং আগামী বছর রাজস্ব খাতে উদ্বৃত্তের অনুমান ২১০ কোটি টাকা কিন্তু এই দুই বছরই মূলধনী খাত সমেত সামগ্রিক ঘাটতি দাঁড়াবে। চলতি বছরে রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত ১০০ কোটি টাকা ঋণের সাহায্য এবং বৈদেশিক সাহায্যে ৪৩ কোটি টাকা ঘাটতিতে এই বছরের সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ১৬৫ কোটি টাকা অনুমান করা হয়েছে। আগামী বছর এই সামগ্রিক ঘাটতির পরিমাণ ১১৭ কোটি টাকা অনুমিত হয়েছে। এবং এই ঘাটতি কাগজী নোট না ছাপিয়ে পূরণ না করে অতিরিক্ত কর আদায় করে পূরণের ব্যবস্থা অর্থমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন। এই বছর অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় রাজস্ব খাতে অতিরিক্ত ১০১·৪০ কোটি টাকা আদায় করবেন। এর অর্ধেকটাই চিনি, সিগারেট, ডিজেল তেল, সুতী বস্ত্র এবং অন্যান্য উপকরণের উপর আবগারী শুল্ক বৃদ্ধি করে আদায় করা হবে। এই আবগারী শুল্কের আদায় থেকে রাজ্যগুলির পাওনা হবে ১০·০৭ কোটি টাকা। এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় সত্ত্বেও মূলধনী খাতে এদুটিটি বাবদ ৯·৩৯ কোটি টাকা কম আদায় হওয়াতে ১১৭ কোটি টাকার ঘাটতি ২৪ কোটি টাকায় নেমে আসবে। অবশিষ্ট ফাঁক অর্থমন্ত্রী পূরণ করেন নাই কারণ আরও অতিরিক্ত সম্পদ আহরণ করলে 'buoyancy of production and revival of confidence' প্রতিহত হবে।

চলতি করের হারের ভিত্তিতে অতিরিক্ত ১২১ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের সম্ভাবনা সত্ত্বেও অর্থমন্ত্রী করের বোঝা বৃদ্ধির এবং আর্থিক কাঠামোর ওপর বোঝা চাপাবার প্রবণতা কেন সম্বরণ করতে পারলেন না, তা বোঝা গেল না। অথচ মূলধনী বাজার চাঙ্গা করবার জন্য এবং কর্পোরেট সেক্টরের বোঝা লাঘব করবার জন্য অর্থমন্ত্রী খুবই তৎপর। অর্থমন্ত্রী বোনাস ইস্যু ট্যাক্স এবং বোনাস শেয়ারের উপর মূলধনী মুনাফা কর বর্জন করে বিনিয়োগকারীদের স্বস্তি দিয়েছেন। ইদুইটি ভিত্তিতেই ট্যাক্স ও কোম্পানী মুনাফার উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স

সংশোধন করেও কর্পোরেট সেক্টরকে সাহায্য করেছেন।

অর্থমন্ত্রী ব্যয়-কর বর্জন করেছেন। দান-কর সংশোধন করেছেন এবং এছাড়াও ডিপসিট খাতের সীমানা ১৫০০০ টাকা থেকে ২৫০০০ টাকায় উঁচু করেছেন। আয়-ঘাট্য বিক্রয়ের উপর কেন্দ্রীয় বিক্রয়-করের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে। আয়করের ক্ষেত্রে বছরে ১,৪০০ টাকার কম যাদের আয় তাদের ক্ষেত্রে সুবিধা দেওয়া হলেও এই সীমানার উর্ধে আয়সম্পন্নদের আয়কর বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিরক্ষা ব্যয় আগামী বছর ২৯ কোটি টাকা বৃদ্ধি পাবে এবং আণবিক শক্তি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে মূলধনী খাতে প্রায় শতকরা ৫০ভাগ ব্যয় বৃদ্ধি হবে। চা শিল্পেও উন্নয়ন মূলক সম্পত্তির হার বৃদ্ধি করে বাজেটে এই শিল্পের আভ্যন্তরীণ সম্পদ বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে।

লোকসভায় বাজেট বিতর্কে দেখা গেছে বাজেটের সমর্থকেরা ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনে আস্থা সৃষ্টির নিরিখে বাজেটটিকে উপযোগী বলে বিচার করেছেন। আসলে বাজেটটি কর্পোরেট সেক্টরের সুযোগ সৃষ্টির দিকে লক্ষ্য রেখেই রচনা করা হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক লক্ষ্য, ধনবৈষম্য হ্রাসের উদ্দেশ্য এবং দারিদ্র্যের বোঝা লাঘবের কোনো প্রচেষ্টাই বাজেটে স্থান পায় নাই। বরং ক্রেতাসাধারণের ঘাড়ে বোঝা চাপিয়ে অর্থবানদের স্বস্তি দিতেই অর্থমন্ত্রী ব্যস্ত। অর্থমন্ত্রী সমাজবাদের উল্লেখ বাজেট থেকে বর্জন করেছেন। এইখানেই শ্রীচীন চৌধুরীর বাজেটের প্রবণতা নিহিত রয়েছে।

২৮. ৩. ৬৬

জয়শ্রীর নিয়মাবলী

গ্রাহকদের জন্য

জয়শ্রী প্রতি বাংলা মাসের শেষ ও ইংরেজী মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রকাশিত হয়। বার্ষিক চাঁদা ৯·৫০। ষাণ্মাসিক ৪·৭৫। যে কোনো মাস থেকে গ্রাহক হওয়া যায়। বিশেষ সংখ্যাগুলির জন্য স্থায়ী গ্রাহকদের অতিরিক্ত কিছু দিতে হয় না।

লেখকদের জন্য

১. শক্তিশালী নূতন লেখকদের রচনা প্রকাশের সুযোগ সর্বাগ্রে দেওয়া হয়।

২. লেখা পরিষ্কার হরফে মূলস্যাম্পের একপৃষ্ঠায় লিখে পাঠান চাই। নকল রেখে পাঠানোই উচিত। কারণ হারিয়ে গেলে পত্রিকার দায়িত্ব নেই।

৩. কবিতা সম্বন্ধেও তাই নিয়ম।

৪. উপযুক্ত ডাকটিকিট থাকলে রচনা ফেরৎ পাঠানো হয়।

শক্তিশালী নূতন কবি, সাহিত্যিক এবং প্রাবন্ধিকদের সহযোগিতার জন্য আমরা আন্তরিক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

কলকাতার সব স্টলে জয়শ্রী পাওয়া যায়।

প্রচার অফিস, জয়শ্রী
৩১২, গাঙ্গুলিবাগান
কলিকাতা-৪৭
ফোন ৪৬-৪১১৬

লোকশিক্ষা গ্রন্থমালা

ইতিহাস ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতবর্ষের ইতিহাস প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় রচনা এই গ্রন্থে সংকলিত ; অধিকাংশ রচনাই ইতিপূর্বে কোনো গ্রন্থে প্রকাশিত হয়নি। মূল্য ২·৫০ টাকা।

বিশ্বপরিচয় ॥ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছোটদের উপযোগী করে লেখা বিশ্বের ও সৌরজগতের কাহিনী। মূল্য ১·৮০ টাকা।

পূজাপার্বণ ॥ যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

কতকগুলি প্রসিদ্ধ পূজাপার্বণের উৎপত্তি ও প্রকৃতির সচিত্র আলোচনা। মূল্য ৩·০০ টাকা।

ভারতের ভাষা ও ভাষাসমস্যা ॥ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ভাষা বিষয়ে তথ্যবহুল আলোচনা, চিন্তাশীল ব্যক্তিমাত্রের পড়া উচিত। মূল্য ২·৩০ টাকা।

ব্যাধির পরাজয় ॥ চারুচন্দ্র ভট্টাচার্য

ব্যাধির বিরুদ্ধে মানুষের সংগ্রাম ও বিজয়ের কাহিনী। মূল্য ১·৫০ টাকা।

ভারতদর্শনসার ॥ উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য

প্রাঞ্জল ভাষায় দর্শনশাস্ত্রের তত্ত্বের ব্যাখ্যা। মূল্য ৩·৩০ টাকা।

বাংলা উপন্যাস ॥ শ্রীশ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

উপন্যাসের প্রকৃতি ও গঠন সম্পর্কে মনোজ্ঞ আলোচনা। মূল্য ২·০০ টাকা।

প্রাণতত্ত্ব ॥ রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

জীববিদ্যার মূলতত্ত্বের সরল সংক্ষিপ্ত আলোচনা। মূল্য ২·৩০ টাকা।

বিশ্বমানবের লক্ষ্মীলাভ ॥ সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র সম্বন্ধে যাঁদের কৌতূহল আছে, এই বই তাঁদের পরিতৃপ্ত করবে। মূল্য ২·৩০ টাকা।

বাংলা সাহিত্যের কথা ॥ শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী

অল্পের মধ্যে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস এবং প্রাচীন ও আধুনিক সাহিত্যিকদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়। রচনার বৈচিত্র্যে সাহিত্যের মতোই সরস ও সুপাঠ্য। মূল্য ২·০০ টাকা।

বাংলার নব্যসংস্কৃতি ॥ শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

উনিশ শতকের বাংলা দেশে যে নবচিন্তা ও নবনির্বিত্তির সূচনা ও প্রসার হয়েছিল তার সুপ্রথিত চিত্র। মূল্য ১·৪০ টাকা।

আহার ও আহার্য ॥ শ্রীপশুপতি ভট্টাচার্য

শরীররক্ষা ও পুষ্টির জন্যে কী ধরনের আহার আবশ্যক তার বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা। মূল্য ১·৫০ টাকা।

হিন্দু সমাজের গড়ন ॥ শ্রীনির্মলকুমার বসু

প্রাচীন ভারতীয় বর্ণব্যবস্থা এবং ভারতীয় সমাজ ও অর্থনৈতিক সংগঠন বিষয়ে তথ্যপূর্ণ আলোচনা। বহু চিত্র-সংবলিত। মূল্য ২·৫০ টাকা।

হিউএনচাঙ ॥ শ্রীসত্যেন্দ্রকুমার বসু

চীনা পরিব্রাজক হিউএনচাঙের ভারত ভ্রমণকথা ; তথ্যবহুল, অথচ উপন্যাসের ন্যায় চিত্তাকর্ষক। মূল্য ৩·০০ টাকা।

বিশ্বভারতী

৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

১৯৮৪ সালে প্রকাশিত The Oxford History of Modern India (1740-1947) নামক গ্রন্থে সুভাষচন্দ্রের নাম তিনবার উল্লিখিত হয়েছে (পৃ:৩৪২, ৩৭৩)। উল্লেখের ভঙ্গীটুকু বিস্ময়কর। প্রথমবারের উল্লেখে একটি অসম্পূর্ণ ছত্রে সুভাষচন্দ্রের কথা বলা হয়েছে শুধু এইটুকু: while a conflict began between the Sen Gupta and Subash Chandra Bose factions which permanently weakened the Congress in Bengal. কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনের কালে কিভাবে সারা ভারতে কংগ্রেসের ভিতর দলাদলি দেখা দেয় সেই প্রসঙ্গে সুভাষচন্দ্রের নামোল্লেখ ঘটেছে—যদিও বিখ্যাত অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদক্ষ ও সুপণ্ডিত ঐতিহাসিকগণ সুভাষচন্দ্রের নামের শুদ্ধ বানানও রক্ষা করতে পারেননি। দ্বিতীয়বারের উল্লেখ ঘটেছে এইভাবে: The more conservative wing of the Congress was represented by the able but unspectacular Rajendra Prasad, western Indian big business and militancy by Sardar Vallabhai Patel, the extreme left wing by the rising Bengali, Subash Chandra Bose. এই বানান ভুলের রহস্যটুকু আমরা বুঝতে পারিনি, কেননা সুভাষচন্দ্রের নাম ইংলণ্ডের সমাজজীবনে পরিচিত, তাঁর আই সি এস ত্যাগের সময় হতে। ইংলণ্ডের পার্লামেন্টে, সংবাদপত্রে, সভার বক্তৃতায় সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত আলোচনা ১৯৩১ সাল পর্যন্ত অব্যাহত ছিল; তিনি ইংলণ্ডে অনুষ্ঠিত কোন কোন সভায় ভাষণ দিয়েছেন এবং তাঁর লেখা বা বিবৃতিও ইংলণ্ডের সংবাদপত্রে প্রকাশিত হত;—তাঁর ইংরেজি বইগুলি ইংলণ্ডের প্রকাশকদের তালিকে লেখা হয় এবং তাঁরাই সে বইগুলি প্রকাশ করেন। এ ছাড়াও সুভাষচন্দ্রের জীবনী ইংলণ্ড থেকে কয়েক বছর আগেও প্রকাশিত হয়েছে। —তাছাড়া রয়েছে ইংরেজিভাষায় রচিত তাঁর অনেকগুলি জীবনী, তাঁর গ্রন্থাবলী; এবং কংগ্রেসের ও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের যাবতীয় ইতিহাসে তাঁর নাম পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস-বিভাগ ও বিশেষত ঐতিহাসিকপ্রবর Percival Spear (যিনি গ্রন্থের লেখক) সুভাষচন্দ্রের নামের এই ভুল বানান কিভাবে বরদাস্ত করলেন তা জানি না; তবে এই দুই কাজটি তাঁর ইচ্ছাকৃত বলেই মনে হয়।

উক্ত গ্রন্থে জওহরলাল নেহেরুর নাম আছে ১৫ বার, গান্ধীজীর নাম ২৫ বার, দেশবন্ধুর নাম একবার। আমাদের মনে রাখতে হবে প্রাক-স্বাধীনতা যুগের ভারতের ইতিহাসই এই গ্রন্থের বিষয়বস্তু, স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতের প্রধানমন্ত্রী রূপে জওহরলালের নামোল্লেখ এতে থাকার কথা নয়; নেইও। আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে সুভাষের চেয়ে জওহরলালের ভূমিকা যে অনেক বড় উক্ত ইতিহাস-গ্রন্থে

লেখক তা স্বতঃসিদ্ধভাবে ধরে নিয়েছেন—কোনো যুক্তি দেননি তিনি এবিষয়ে—তাই সুভাষের প্রতি তাঁর এই বিদ্রূপাত্মক মনোভাব। সুভাষচন্দ্রের প্রতি যে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবিধানে ঐতিহাসিকগণ সত্যই বিদ্রূপাত্মক মনোভাব পোষণ করেছে তার প্রমাণ রয়েছে এই গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত তৃতীয়বারের উল্লেখে (পৃঃ ৩৭৩)। মধ্যপ্রদেশের কংগ্রেস নেতা ডাঃ খারে কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের সঙ্গে কোনো কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করায় তাঁকে নেতৃত্বের আসন হতে সরিয়ে দেওয়া হয়। সুভাষচন্দ্রকেও একই পন্থায় ধূলিসাৎ করে দেওয়া হয় (Mr. Subas Bose was allowed to succeed Pandit Nehru as president at the end of 1937. But when he stood for re-election a year later against the wishes of the Mahatma he was disciplined as sternly as Dr. Khare). উদ্ধৃত বাক্যদুটির প্রথম বাক্যটি মিথ্যা এই অর্থে যে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস সভাপতির পদে ১৯৩৭ সালে সর্বসম্মতিক্রমে বরণ করা হয়—বিপক্ষ হলেও মহাত্মাজী তাঁকে এই সম্মান দেন এই আশায় যে ইতিপূর্বে জওহরলাল নেহরুকে যেমন ঠিক সম্মান দান করে তিনি তাঁকে নিজ শিবিরে পরিণত করতে পেরেছিলেন, সুভাষকেও তেমনি সম্মানের মোহে নিজের বশবদ অনুগামীতে পরিণত করতে পারবেন। মহাত্মা নিজেই কলকাতায় সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কংগ্রেসের সভাপতিত্ববার জন্য আহ্বান জানান। পরে অসুস্থতার কারণে সুভাষচন্দ্র ঘুরোপ থাকাকালে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁকে সভাপতি পদে বরণ করে। এক্ষেত্রে 'allowed' শব্দটি অপ্রযোজ্য এবং ঐতিহাসিক সত্যের দিক হতে বিভ্রান্তিকর। দ্বিতীয় বাক্যটি আরও আপত্তিকর এই কারণে যে উক্ত ইতিবৃত্ত গ্রন্থে সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অতঃপর আর কোথাও উল্লেখ নেই, ফলে পাঠককে ধরে নিতে হবে সুভাষচন্দ্রের রাজনৈতিক জীবন ও কর্মধারাও ঐখানেই শেষ হয়ে গেল—এবং স্বাধীনতা-আন্দোলনে আর তাঁর করণীয় কিছু রইল না। দ্বিতীয়ত, ১৯৩৮ সালে দ্বিতীয় বারের জন্য কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হতে চেয়ে সুভাষ মহাত্মা ও কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ডের প্রবল ক্রোধাগ্নিকে প্রজ্বলিত করেছিলেন সত্য, কিন্তু তিনি কি সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিলেন, না হননি? অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের মুরুব্বি ঐতিহাসিক সে তথ্যটি একেবারে কৌশলে লুকিয়ে ফেলেছেন। পূর্ব বৎসরে যিনি সভাপতি হতে মহাত্মা ও তাঁর দলবল কর্তৃক allowed হয়েছিলেন, পরের বৎসর সরাসরি নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি মহাত্মা ও তাঁর চক্রের সাম্রাজ্য তীব্র বিরোধিতা সত্ত্বেও জয়লাভ করলেন ও সভাপতি হলেন—কি ভাবে? তৃতীয়ত, ব্যক্তিগত ঔদার্য, শালীনতা ও ভদ্রতার প্রতি নিস্পৃহতাবশত সুভাষচন্দ্র স্বেচ্ছায় কংগ্রেস-সভাপতি পদ হতে পদত্যাগ করেছিলেন; মহাত্মা বা কংগ্রেস হাইকম্যাণ্ড সে পদ হতে তাঁকে সরাতে পারতেন না। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্কটসন্ধিতে নিজের কর্ম-পন্থাকে দৃঢ় ও সুনিশ্চিতভাবে অনুসরণ করার উদ্দেশ্যে সুভাষ নিজের মতাবলম্বীদের সংগঠিত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন এবং দেশকে মহাত্মার নেতৃত্ব হতে ভিন্ন বিকল্প নেতৃত্ব দিতে চেয়েছিলেন—ফরোয়ার্ড ব্লক সংগঠনের সামান্য কয়েকমাসের ইতিহাসে তিনি তাতে সফলও হয়েছিলেন। চতুর্থত, কংগ্রেসের ইতিহাসে কিংবা ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে ডাঃ খারের ভূমিকা ও সুভাষচন্দ্রের ভূমিকা কোনমতেই তুলনীয় নয়—কিন্তু অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ঐতিহাসিক উভয়ের ভূমিকাকে তুল্যমূল্য জ্ঞান করেছেন। বস্তুতঃ সুভাষের নাম যে তিনবার তিনি উল্লেখ করেছেন সে তিনবারই তিনি যাঁদের নামের পাশাপাশি তিনি সুভাষের নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করেছেন তাঁদের কারোর ভূমিকার সঙ্গেই সুভাষচন্দ্রের ভূমিকার কোনো তুলনা হতে পারে না। পঞ্চমত, এই গ্রন্থের যে অধ্যায়টিতে

(India and the War, 1939-45) যুদ্ধের সময়ে কংগ্রেস, মুসলিম লীগ, ইত্যাদি দলগুলির কথা পুনঃ পুনঃ আছে, নেই শুধু একজনের কোনো উল্লেখ—সুভাষচন্দ্র ও তাঁর I. N. A.। এই যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর ভূমিকা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রবন্ধলেখক লিখেছেন : ভারতীয় সৈন্যরা হঠাৎ দেখল তারা ঘটনাবলীর একেবারে কেন্দ্রস্থলে এসে দাঁড়িয়েছে ; সাহসে ও দক্ষতায় তারা পশ্চাৎপদ হলনা। ১৯৪০-১ সালে বিখ্যাত মরু অভিযানে ভারতীয় সৈন্যরা বিশিষ্ট অংশ নিয়েছিল। চতুর্থ ও সপ্তম বাহিনী ভারতীয় সৈন্যদলের গৌরব বৃদ্ধি করেছিল এবং মরুযুদ্ধের কঠোরতা ও জটিলতার মধ্যেও নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছিল। আধুনিক যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত বলে পৃথিবীর অন্য কোনো দেশের সৈন্যদলের চেয়ে তারা কম যায় না। ওয়াভেল ও অচিনলেকের অধীনে এবং পরে মন্টোগোমারির অধীনে ভারতীয় সৈন্যরা যুদ্ধে অংশ নিয়েছিল ; ইরাক, সিরিয়া ও পারস্য যুদ্ধেও তারা ছিল। ইরাকের যুদ্ধে ভারতীয় সৈন্যদের মোতায়েনের ফলেই জয়লাভ ঘটেছিল। (পৃঃ ৩৭৭)

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার রণাঙ্গনে ভারতীয় সৈন্যদলের ভূমিকা সম্পর্কে গ্রন্থকার লিখেছেন : দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার জাপানীদের দৌরাত্ম্য ১৯৪১ সালের গোড়া হতেই বেড়ে ওঠে। বৃটিশ এবং অষ্ট্রেলিয় সৈন্যদলের সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় সৈন্যদেরও নিয়োগ করা হয় মালয় রক্ষার্থে। ১৯৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে জাপানী আক্রমণের ফলে ব্রিটিশকীয় সৈন্যগণ দক্ষিণে হটে যায় এবং সিঙ্গাপুরের পতন ঘটে। ভারত-ব্রহ্মের সীমান্তে পার্বত্য-অঞ্চলে ও জঙ্গলে সম্পূর্ণ উপযোগী, আরাকানের বর্ষাপ্লাবিত এলাকায় ভারতীয় সৈন্যদের নিয়োগ করা হয় জাপানীদের রুখবার জন্য। কিন্তু এসব অঞ্চলের যুদ্ধে জাপানীরা ছিল দক্ষতর। ১৯৪৩ সালে হতে মাউন্টব্যাটেনের দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া কমাণ্ডের (S. E. A. C) অধীনে ভারতীয় সৈন্যদের আনা হয় এবং স্যার উইলিয়াম স্লিমের Fourteenth Army-র অংশ রূপেও তারা গণ্য হয়।

১৯৪২ সালের বসন্তকালে জাপানীরা আসাম আক্রমণ করে। ভারতীয় সৈন্যদের সেটা ছিল একটা সঙ্কট ও বিজয়ের কাল। কোহিমার যুদ্ধে তারা জাপানীদের অগ্রগতি রোধ করে এবং জাপানীদের অনিবার্য ভাগ্য-বিপর্যয় সুরু হয়। অবশেষে রেঙ্গুনও ইংরেজের পুনরায় দখলে আসে।

জাপানে কোহিমার আই এন এ যুদ্ধ করেছিল দেশকে স্বাধীন করার উদ্দেশ্যে—জাপানী আক্রমণ নেটা নয়। অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে আই. এন. এ-র নাম নেই, সে সম্পর্কে কোনো পরোক্ষ ইঙ্গিতও নেই ; ভারতীয় সৈন্যদলের একটা বিরাট অংশ যে ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়েছিল সে-কথা ঘুণাক্ষরেও লেখক প্রকাশ করেননি এবং নৌবিদ্রোহের কথাও কিছু উক্ত ইতিহাসগ্রন্থে নেই। একজন ঐতিহাসিক কিভাবে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বাস্তব ইতিহাস সম্পর্কে বিভ্রান্তিকর মৌনাবলম্বন করেন তা বোঝা দুষ্কর ; যুদ্ধের সময় প্রোপাগাণ্ডার স্বার্থে অনেক মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা বলতে হয়,—কিন্তু যুদ্ধ শেষ হবার বিশ বৎসর পর, ১৯৬৫ সালের শান্ত পরিবেশে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণাগারে বসে ধীমান ও বিশেষজ্ঞ ঐতিহাসিক ইতিহাস রচনার নামে মিথ্যা কাহিনীকে লালিত্যে লিখে যান কোন প্রেরণায় তা আমাদের অনুসন্ধানের বিষয় বই কি।

সেই প্রেরণাটুকু যে কী তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন দেখি সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য ও অটল বীরত্বের পাশাপাশি জহরলাল সম্পর্কে উচ্ছ্বসিত প্রশংসোবাক্য গ্রন্থের পাতায় পাতায় উৎকীর্ণ। যুদ্ধের সময় সকল ভারতীয় নেতাদের মধ্যে একমাত্র জহরলালই পূরবর্তী নেতৃত্বপ্রতিভার পরিচয় দিয়েছিলেন বলে উক্ত গ্রন্থের লেখকের ধারণা। তাঁর মন্তব্যটি এই ; Amongst the Congress leaders, Jawharlal Nehru was the only one to be fully aware of the import of international events

for India and to seek to interest the public in these issues. (p. 377) এবং Mahatma Gandhi over-more the more generous insiucte of Nehru and Rajagopalachari (p. 364)

ইংরেজের স্বার্থকে ব্যাহত করে কোনো ইংরেজই হয়তো তাদের ক্ষমা করেনা—নিরপেক্ষ ইতিহাস লিখতে ব্রতী হবেও না। সেই কথাহীন ইংরেজ যখন নেহরু বা রাজাগোপালাচারির চরিত্রচিত্রণ রচনা করে এবং সুদূরপ্রসারী মহাত্মা গান্ধীকেও হেয় করে দেখাতে তখন বুঝতে অসুবিধা হয় না যে ভারতে ইংরেজরাজের সহায়তা শেষ পর্যন্ত কারা করেছে এবং কারাই বা করে নি। অসহযোগ নেহরুর প্রতি ইংরেজের যেমন চিরন্তন দুর্বলতা, সুভাষচন্দ্রের প্রতি তেমনি তার চিরন্তন বিদ্বেষ। কেন এই বিদ্বেষ তা সবাই জানে, কিন্তু এই বিদ্বেষের সূত্রপাত কবে হয়ে ?

সুভাষচন্দ্রের নাম সংবাদপত্রে প্রথম মুদ্রিত হয়কে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হলে—পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থানাধিকারী হয়ে বলে দ্বিতীয়বার তাঁর নাম প্রকাশিত হয় ইংরেজ অধ্যাপক এ. এফ. ওটেনের সঙ্গে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের সংঘর্ষের পর। বস্তুতঃ সেই ঘটনার ফলে কলকাতার সমস্ত মহলে সুভাষচন্দ্র অকস্মাৎ বিখ্যাত হয়ে যান—এবং ভারতে বসবাসরত ইংরেজরা সেই সময়ই তাঁর পরিচয় জানতে পারে। বিলেতে বসে আই. সি. এস পরীক্ষায় সাফল্যের পর তিনি যখন চাকরি নিতে অস্বীকার করলেন এবং পদত্যাগ পত্র দাখিল করলেন তখন সারা ইংলণ্ডে সুভাষচন্দ্র বিখ্যাত হয়ে পড়েন একজন তীব্র ইংরেজসাম্রাজ্যবিরোধী তরুণরূপে। বস্তুতঃ সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে ইংরেজ জাতির এই যে পরিচয় ঘটে তাঁর কৈশোর ও যৌবনের সন্ধিলগ্নে সেই পরিচয় ক্রমবর্দ্ধমান সঙ্কটের ভিতর দিয়ে ইংরেজের কাছে একটা অনন্ত প্রবাহের রূপ নেয়—এবং সুভাষচন্দ্রের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদবিরোধিতা যেমন প্রখর ও বাস্তব আকার নিতে থাকে, ইংরেজের সুভাষবিদ্বেষও ততই বাড়তে থাকে। তাঁদের অন্তরের এই বিদ্বেষের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ভারতের ইতিহাস গ্রন্থখানি হতেই বোঝা যায়। আমাদের আশ্চর্য লাগে যখন স্বদেশীয় বিদ্বানগণকে ইতিহাস-রচনার ক্ষেত্রে ইংরেজ ঐতিহাসিকদের অনুসৃত রীতিকেই অবলম্বন করতে দেখি। প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস গ্রন্থখানি তাই আমাদের বিস্ময় ও বেদনার কারণ হয়ে উঠেছে।

দুই

প্রেসিডেন্সি কলেজে অধ্যাপক ই, এফ, ওটেন (Edward Farley Oaten) সাহেবকে নিয়ে যে সঙ্কট ঘটে তার ফলে কলেজ হতে অধ্যক্ষ জেমস ও ছাত্র সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে সঙ্গে. ওটেন সাহেবকেও বিদায় নিতে হয়। ১৯১০ সালে ওটেন প্রেসিডেন্সি কলেজে যোগদান করেছিলেন এবং ইতিহাস বিভাগের প্রধান অধ্যাপকরূপেই তিনি কলেজে ছিলেন। ছাত্রদের দ্বারা প্রহৃত হবার পর কলেজ থেকে তাঁকে কর্তৃপক্ষ সরিয়ে দেন। পরে ১৯১৯ সালে তিনি আবার এই কলেজে এসেছিলেন, কিন্তু সে মাত্র কয়েক মাসের জন্য।

প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস লেখকগণকে ধন্যবাদ যে তাঁরা ওটেন সাহেবকেও একজন মহামানবে পরিণত করেননি। অধ্যক্ষ জেমস সম্পর্কে তাঁদের বারংবার অহেতুক উচ্ছ্বাস দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে ছাত্রদের বিচারে অভিযুক্ত হয়েছিলেন বলেই অধ্যক্ষ জেমস প্রেসিডেন্সি কলেজের মাননীয় ঐতিহাসিকদের চোখে মহনীয় হয়ে উঠেছেন ; সেই একই দাপকাঠিতে বিচার করে শ্রীযুক্ত ওটেন সম্পর্কেও প্রশংসাবহুল বাক্য রচনা তাঁদের পক্ষে সম্ভব ছিল। কলেজের ম্যাগাজিনে ওটেন সাহেবের যেসকল লেখা প্রকাশিত হয়েছিল তা হতে ইতিহাস বিভাগের সেই প্রধান অধ্যাপক সম্পর্কে খুব উঁচু ধারণা পোষণ করা চলে না। প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যার

(জানুয়ারী, ১৯১৪) গুটেন সাহেবের প্রথম প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় : My day on the Yarra Bank, প্রবন্ধটি তিনি লেখেন 'for the benefit of the readers of the Presidency College Magazine. অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ণ শহরের পাশে ইয়ারা নদী ; নদীর ওপর একটি সেতু আছে, সেই সেতুর পাশের স্থানটিকেই বলে ইয়ারা ব্যাঙ্ক। ১৯১০ সালের ১লা মে রবিবার লেখক সেখানে গিয়েছিলেন। তিনি দেখলেন যে লিলেতের হাইড পার্কের মতোই এই স্থানটি ব্যবহৃত হয় বিভিন্ন বক্তাদের বক্তৃতার জন্য। সেদিন সেখানে নৈরাজ্যবাদী, সোশালিস্ট, সংরক্ষণপন্থী, ধর্মযাজক —ইত্যাদি সকলেই বক্তৃতা করছিলেন। লেখকের বর্ণনা থেকেই জানা যায় যে অতি সাধারণ বক্তারা সাধারণ স্তরের বক্তৃতাই দিয়েছিল—সেটাই সেখানকার পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু এই সব দেখে লেখক অবিশ্বাস্য এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে অ্যাংলো-স্যাক্সন জাতির যুক্তি ও যুক্তির বিন্যাস ঘটনাটি অতুলনীয়—বিস্ময়করভাবে (I came away marvelling at the argumentative powers of the Anglo-Saxon race under the southern sky)। আমি বছর আগে এই ইয়ারা নদীর তীরে ঝোপে-জঙ্গলে-ঘুরে বেড়ানো কুৎসিত আদিবাসিগণ—আর আজ সেখানে স্বর্গ-মর্ত্য-পাতালের সর্ববিধ সমস্যা অতি নিপুণ ও গভীরভাবে আলোচিত হচ্ছে। কি আশ্চর্যজনক উন্নতি ইংরেজি সভ্যতা এনে দিয়েছে!

প্রেসিডেন্সি কলেজ ম্যাগাজিনের পাঠকদের উপকারার্থে রচিত এই নিবন্ধটির বাণী ও আদল উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংশয়ের কোনো অবকাশ নেই। ইংরেজি সভ্যতার প্রগতিশীলতা ও মহত্ত্ব সম্পর্কে প্রচার করাই লেখকের একমাত্র উদ্দেশ্য। কিন্তু এই বিষয়ের মধ্যে না আছে ইতিহাস, না তথ্য ও যুক্তি—এমন কি এটি ভ্রমণকাহিনীও হতে পারেনি। এই নিম্ন মানের রচনাটি নিয়েই গুটেন সাহেব কলেজ ম্যাগাজিনের পৃষ্ঠায় প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেন; এবং আমাদের মনে হয় প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্ররা এজন্য আড়ালে তাঁকে বিদ্রূপ-বাণে বিদ্ধ করতে ছাড়েনি। ১৯১৫ সালে, বাংলার স্বদেশী আন্দোলন শুরু হবার দশ বছর পরে, প্রধানতঃ ছাত্রদের উদ্যোগে প্রেসিডেন্সি কলেজে যে পত্রিকা প্রকাশিত হল তা শেষপর্যন্ত প্রধানত হয়ে দাঁড়াল বৃটিশসাম্রাজ্যমহিমা প্রচারের বাহন ;১

অন্যান্য যেসব পত্রিকাটির এই পরিণতি ঘটাবার বিষয়ে ছিলেন প্রধান উদ্যোগী, তাঁর সাহচর্যে এসেছিলেন চাটুয্যে অধ্যাপকের দল। শ্রীযুক্ত গুটেন এঁদেরই মধ্যে একজন প্রধান ব্যক্তি। কলেজের তৃতীয় বর্ষের শ্রেণীতে উঠে তাঁর যখন পত্রিকাটির পরিচালনা ব্যাপারে অগ্রসর হলেন—যে পত্রিকা প্রধানত তাঁরই আগ্রহে ও উদ্যোগে প্রথম প্রকাশিত হয় সেই পত্রিকাকে অধঃপতন হতে উদ্ধার করে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে এগিয়ে আসাটাই তাঁর পক্ষে স্বাভাবিক —তখনই সঙ্কট মোচনে ঢিল। সঙ্কটটি ঠিক কী ভাবে ঘনিয়ে উঠেছিল, সেকথায় আমরা পরে আসছি।

১৯১৪ সালে যুরোপে যে যুদ্ধ শুরু হয়েছিল ইংলণ্ড সে যুদ্ধে অন্যতম পক্ষ থাকায় অধ্যক্ষ রেমসের মতোই গুটেন সাহেবও ইংলণ্ডের হয়ে কলমের লড়াইতে যোগ দেন। এই উপলক্ষে রচিত তাঁর প্রবন্ধগুলি পড়লে বোঝা যায় যে শ্রীযুক্ত

I looked back on the curve of the Yarra; and as I did so, I recalled with a sort of mild surprise and wonder the fact that little over eighty years had passed since this stream on whose banks is now thrashed out—every problem in earth or heaven, was a river winding through uncleared bush, in the midst of which the degraded aboriginal wandered and sought for edible worms in rotted bank.
(Vol I, No 2, p. 141).

ওটেন ছিলেন বদ্ধ যুক্তির মানুষ; তাঁর বক্তব্য তিনি বেশ পরিষ্কার করে ও গুছিয়ে বলতে পারেন; কিন্তু প্রেসিডেন্সি কলেজের ইতিহাস বিভাগের এই প্রধান অধ্যাপকের ইতিহাসচেতনা ছিল আশ্চর্যরকম দিক্‌চিহ্নিত। সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদের তিনি ছিলেন সমর্থক যতক্ষণ পর্যন্ত ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থ অক্ষুণ্ণ থাকে ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি অন্যান্য দেশের সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের প্রয়াসকে অকুণ্ঠচিত্তে মেনে নিতে রাজি। কিন্তু ইংলণ্ডের স্বার্থ বিন্দুমাত্র যদি আহত হয় তাহলে অধ্যাপক ওটেন অতিশয় ক্ষুব্ধ হয়ে পড়েন - কেননা জগতে তাঁর জাতীয় স্বার্থ একটুই থাক এই যেমন তাঁর একমাত্র কামনা, তেমনি অন্যান্য সকল জাতির তুলনায় তাঁর ইংরেজ জাতিই যে শ্রেষ্ঠ সে বিষয়েও তাঁর বিশ্বাস গভীর।

The Calcutta Review পত্রিকার ২১৯ নং সংখ্যায় (জানুয়ারী, ১৯১৫) অধ্যাপক ওটেনের একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়: German theories and English Facts প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয় হচ্ছে এই যে য়ুরোপীয় যুদ্ধের জন্য একমাত্র দায়ী জর্মানী, ইংলণ্ড বা মিত্রপক্ষীয়দের কোন দোষ নেই। দ্বিতীয়তঃ জর্মানী যদি ইংলণ্ডের সাম্রাজ্যিক স্বার্থে আঁচড় না কাটার প্রতিশ্রুতি দেয় তাহলে নিজ সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য সে যা খুশি তাই করুক, ইংলণ্ড তা সহানুভূতির সঙ্গে মেনে নেবে। এবং বিশ্বশান্তি ও বিশ্বসভ্যতার প্রগতির পক্ষে সেটাই হবে সবচেয়ে সুব্যবস্থা।১ জর্মানী যদি হেলিগো-

১। England has had in the past, and has now, no essential hostility to Germany's desire to expand, provided she does not injure England in the process. (Calcutta Review, January 1915, p. 51)

—...In 1870 England...left Prussia to expand at the expense of France if she could .. during the closing decades of the Nineteenth Century Germany created for herself a splendid colonial empire, not one inch of which she could have acquired had England desired to prevent her.....When Germany turned her eyes eastward and south-westward. England placed no absolute veto on her expansion (উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫১-৫২)

২। But when Germany turned her eyes westward and began to contemplate an empire which included not only the shores opposite to England but an overseas dominion needing for its creation and maintenance a fleet rivalling or even superior to our own, the question was different. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৩)

ল্যাণ্ডের মতো ক্ষুদ্র একটি দ্বীপের দিকে নজর না দিয়ে বিশাল পূর্ব আফ্রিকাকে পদানত করতে চাইত তবে ইংলণ্ড তাতে বাধা দিত না। জর্মানী যদি ফ্রান্স বা রাশিয়ার নিকট হতে বিরাট বিরাট অঞ্চল ছিনিয়ে নিত তাহলেও ইংলণ্ড কোনো আপত্তি করত না। যুদ্ধটা যদি রুশ-জর্মান যুদ্ধ হত তাহলে ইংলণ্ড, এখনোই সে যুদ্ধে নিজেকে জড়িত করত না। কিন্তু জর্মানী যখন পশ্চিম দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল এবং ইংলণ্ডের সমকক্ষ বা তার চেয়েও শক্তির নৌবাহিনী গড়ে তুলতে চাইল তখনই মানবসভ্যতার বিশ্বাসের দিক দিয়ে সমস্ত গলদটিই গেল বলে।২ জর্মানী যখন তার নৌবহর বাড়াতে সুরু করে তখন ইংরেজরা বুঝে নেয় যে তার উদ্দেশ্য কী। তখনই যদি ইংলণ্ড প্রবল শক্তির উদ্যোগে জর্মানীকে আঘাত করত তাহলেই হত সবচেয়ে ভালো, এমনকি সেই আক্রমণ নাকি আন্তর্জাতিক আইন ও বিবেকসম্মত কাজও হত। অধ্যাপক ওটেনের মতে বিশ শতকে মানবসভ্যতার সবচেয়ে প্রধান সঙ্কট হচ্ছে য়ুরোপীয় শ্রমিকদের বেতনবৃদ্ধির আন্দোলন —সেই আন্দোলনের সুষীমাংসা না হলে সভ্যতা বিপন্ন হবে। জর্মানীর প্রধান অপরাধ এই যে উপনিবেশ বিস্তার ও

উপনিবেশ শোষণ দ্বারা য়ুরোপীয় ধনতন্ত্রের মধ্যে সঙ্কট সৃষ্টি করে বৃথা অর্থক্ষয়ের ব্যবস্থা সে করেছে।[৩] এবং মানব-সভ্যতার নেতৃত্বপদের অধিকারী ইংলণ্ড (true leader of the world's culture—p-50) তাই মানবসভ্যতাকে রক্ষা করার মহৎ ব্রত উদ্‌যাপনের জন্য জার্মানীর সঙ্গে লড়াই করছে।

এই হচ্ছে অধ্যাপক গুটেনের দৃষ্টিকোণ হতে প্রথম মহাযুদ্ধের বিশ্লেষণ। তিনি খোলাখুলি বলছেন যে উপনিবেশ শোষণ করা বহুৎ কাজ, জার্মানী যদি ইংলণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বী হবার চেষ্টা না করে উপনিবেশ শোষণের সোজা রাস্তায় নামত তাহলে যুদ্ধ আদৌ বাধত না। কিন্তু জার্মানীর নৌবাহিনীর কলেবৃদ্ধি দেখেই ইংলণ্ড বুঝে নিয়েছে যে তাকে চ্যালেঞ্জ করাই জার্মানীর উদ্দেশ্য।[৪] এবং সভ্যতার প্রকৃত সঙ্কট হচ্ছে য়ুরোপীয় শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধির দাবী—যে দাবী মেটাবার একমাত্র উপায় ঔপনিবেশিক শোষণ, এবং জার্মানী সেই শোষণজাত টাকা যুদ্ধের জন্য খরচ করতে বাধ্য করেছে বলে সে সভ্যতার শত্রু।

অধ্যাপক গুটেন এই প্রবন্ধ লিখছেন কলকাতায় বসে; —ভারতবর্ষে তিনি এসেছেন রাজা শাসন নয়, অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে; কাজেই তাঁর কাছ হতে সভ্যতার যে সংজ্ঞা সেদিন পাওয়া গেল তাতে যখন গোটা এশিয়া-আফ্রিকার কোন নামোল্লেখই রইলনা যখন তা বিস্ময়ের কারণই ঘটে। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ সে দিনের ধীমান ইংরেজদের চরিত্রেরও ছিল প্রধান নিয়ামক; আশ্চর্য এই যে ভারত ও এশিয়া-আফ্রিকার অন্যান্য দেশের স্বাধীনতার কোনো মূল্যই যাদের কাছে ছিল না সেই অধ্যাপক গুটেন, অধ্যক্ষ মেসন—এঁরাও যুদ্ধব্যাপারে ভারতবাসীর সাহায্য ও সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজের কিছু ছাত্র সেই আবেদনে সাড়া দিয়ে নিজেদের লেখাপড়ার পাঠ্যক্রমের পরিপ্রেক্ষিতে এই বলে উৎসর্গ করেছিলেন যে যুদ্ধে সাহায্যের জন্য যে কাজই তাঁদের করতে দেওয়া হোক তাঁরা তা করে ধন্য হবেন।

এই নিষ্পাপদের দলে সুভাষচন্দ্র যোগ দিতে পারেননি। যুদ্ধ তাঁর কাছে নিয়ে এসেছিল অন্যরকম শিক্ষা। যুদ্ধ যখন বাধে সে সময়ে তিনি টাইফয়েড রোগে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী। তাঁর নিজেরই বর্ণনা অনুসারে:

"১৯১৪ সালের জুলাই মাসে সহসা শয্যাশায়ী হয়ে পড়ে আছি। কাগজে যুদ্ধের খবর পড়ি।.....এ অবস্থায় আমার নিজের এতদিনের সব ধারণা এবং প্রচলিত মতবাদগুলি ভালো করে খতিয়ে দেখবার সুযোগ পেলাম। নিজের মনকে প্রশ্ন করলাম—দেশের শাসনভার দুভাগে ভাগ করে, এক ভাগ বিদেশীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে আর এক ভাগ নিজেদের হাতে রাখা—এ কি সম্ভব? না, আমাদের কর্তব্য শাসনভার সম্পূর্ণ নিজেদের হাতে রাখা, কিংবা সম্পূর্ণ অন্যের হাতে ছেড়ে দেওয়া? এ প্রশ্নের জবাবের জন্য আমাকে বিশেষ ভাবতে হয়নি। ভারতবর্ষকে যদি অন্য সব সভ্যদেশের সমকক্ষ হতে হয় তবে তাকে তার মূল্যও বহন করতে হবে, দেশরক্ষার গুরুদায়িত্ব এড়িয়ে গেলে চলবেনা। দেশের স্বাধীনতার জন্য যারা সংগ্রাম করছেন, সামরিক অসামরিক দু রকম শাসন-

---

৩। that civilization must solve the problem of industrial poverty; or industrial poverty will destroy civilization; and the full measure of Germany's crime against civilization in compelling money and energy which should have been devoted to the tackling of that problem, to be dissipated in unproductive expenditure upon armaments, becomes evident. (পূর্বোক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ৫৭)

৪। When she began to increase her fleet in obvious rivalry with our own, we had to ask ourselves for what purpose it was created. (পৃঃ ৫৩)

ভারের জন্যই তাঁদের প্রস্তুত থাকতে হবে। স্বাধীনতাকে কখনো ভাগ করা চলে না, স্বাধীনতার অর্থই হল বিদেশী শাসনের হাত থেকে সর্বাঙ্গীন মুক্তি। মহাযুদ্ধে আমরা দেখেছি সামরিক শক্তি না থাকলে যে কোনো দেশের পক্ষেই স্বাধীনতা বজায় রাখা কঠিন।"

(ভারত পথিক, পৃঃ ১৪-১৫)

প্রথম মহাযুদ্ধ হতে অধ্যাপক ওটেন প্রমুখেরা যে শিক্ষা নিয়েছিলেন এবং সুভাষচন্দ্র যে সিদ্ধান্ত করেছিলেন তা এতই পৃথক যে উভয় দৃষ্টিভঙ্গীর ভিতর কোনপ্রকার সাযুজ্যই সম্ভব নয়। মহাযুদ্ধ হতে সুভাষচন্দ্র নিলেন এই শিক্ষা যে ব্রিটিশ শাসন হতে ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা চাই এবং সেই স্বাধীনতা রক্ষা করতে হলে চাই দেশরক্ষার উপযুক্ত প্রস্তুতি ও আয়োজন। অধ্যাপক ওটেন এশিয়া বা আফ্রিকার কোনো দেশের স্বাধীনতালাভের কথা ভাবতেই পারতেন না।

মহাযুদ্ধ চলাকালেই সুভাষ ও তাঁর অনুবর্তী ছাত্রদের সঙ্গে অধ্যাপক ওটেনের সঙ্ঘর্ষ বেধে উঠেছিল কেন তা বোঝা শক্ত নয়।

(ক্রমশঃ)

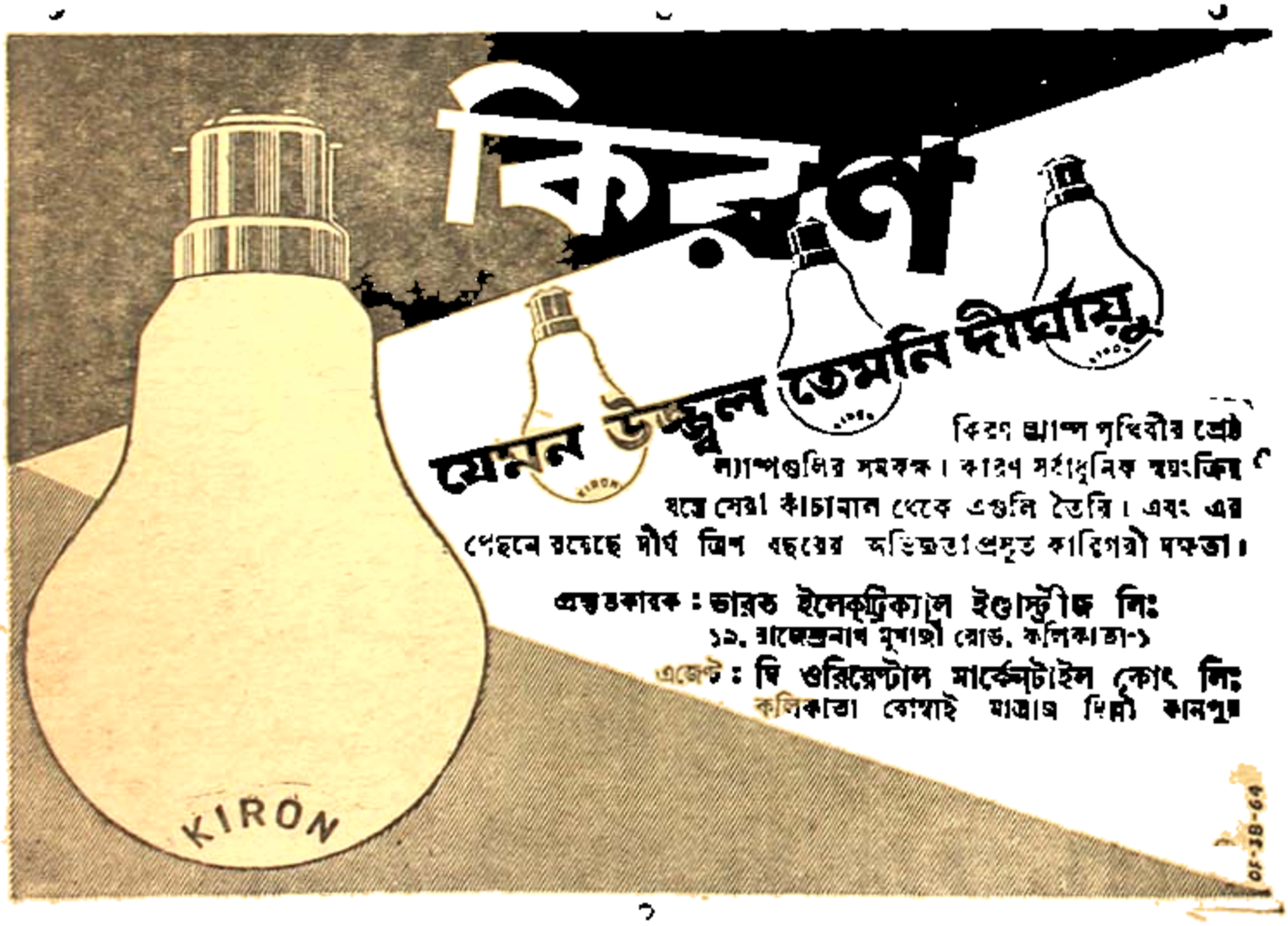

খাদ্য সঙ্কট ও আন্দোলন

সুনীল দাস

খাদ্যসঙ্কট প্রতিরোধে আন্দোলন, পশ্চিম বাংলার দীর্ঘ-দিনের ঘটনা। ক্ষমতা হস্তান্তরের পর প্রথম খাদ্য আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল ১৯৫২ সালে। সেটা ছিল সেপ্টেম্বর মাস। সেদিনকার দীর্ঘিত আন্দোলনও ছিল স্বল্পস্থায়ী। আন্দোলনের দাবী কিছুটা মেনে নিয়ে সেদিন সরকার একটা আপোষ-রফা করে নিয়েছিল। তারপর অবশ্যি ১৯৫৩-৫৪ সালে প্রচুর ফসল হলে ১৯৫৪ সালের জুন-জুলাই মাসে খাদ্যে রেশনিং তুলে নেওয়া হ'ল। এ-কাজে সেদিন উদ্যোগী হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী রফি আহমদ কিদোয়াই। তারপর এ-সময়টা ধান-চালের দর কমতে সুরু করে। কিন্তু ১৯৫৫ সালের জুন মাস থেকেই চালের দাম ঊর্ধ্বগতি হয়ে একটানা দরবৃদ্ধি পেতে থাকে। চালের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য নিত্য-ব্যবহার্য জিনিসেরও দর বাড়তির দিকে পা বাড়ায়।

অতঃপর খাদ্য আন্দোলন প্রতিবছরই দেখা দিয়েছে—কমবেশী। কিন্তু সঙ্কটের দিনগুলি প্রতি বছরই বছরের গোড়ার দিকে এগিয়ে গেলো। সেপ্টেম্বরের সঙ্কট মার্চ-এ এসিয়ে এলো। ১৯৬৩ সালে তা-ই ঘটলো। অবশ্যি সে-বছর মার্চে শুরু হলেও সঙ্কটের চূড়ান্ত পর্যায় উঠেছিল অক্টোবরে। খোলাবাজারে তখন আদৌ চাল নেই। কালো বাজারের দর ৪০-৬০ টাকা মণ। ১৯৬৬ সালে ফসল উঠবার প্রায় অব্যবহিত পর থেকেই সঙ্কটের সূচনা এবং ফেব্রুয়ারীর মাঝামাঝি খাদ্যের দাবীর অবাবে গুলি গর্জে ওঠে। তারপর থেকে গুলির দমাদ্রোহ চলে পশ্চিম বাংলা জুড়ে আর হত্যোৎসব। এ ঘটনাগুলি ঘটে ৪ঠা-৫ই মার্চ রুকনপুর ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাগুলিতে। আর ১০ই মার্চ হরতালের দিন কলকাতা, হুগলী, ব্যারাকপুর, আসানসোলে। ১২ই মার্চ পর্যন্ত পুলিশী তাণ্ডব চলে ব্যাপকভাবে। আগুনে পুড়ে ছাই হল ট্রেন, ষ্টেশন, পোষ্টঅফিস, অফিসবাড়ী, খাদ্যগুদাম, টেলিফোন এক্সচেঞ্জ, টেলিফোন লাইন, দমকল, থানাবাড়ী ইত্যাদি। ১৮ই ফেব্রুয়ারী থেকে সুরু করে পর পর বসিরহাট, রুকনপুর, বাউড়িয়ার গুলিতে কিশোরেরা আহত ও নিহত হয়েছে। এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের সমবেত দাবী সরকার অগ্রাহ্য করে নিঃসন্দেহে দুর্যোগ ঘনিয়ে আনে। সাহিত্য সানবাল্লার আর্ত-আবেদন সরকারী দপ্তরে প্রতিহত হয়ে শান্ত-নিরীহ মানুষকে প্রতিরোধের সংগ্রামে দুর্জয় করে তুললো। একটি নিছক অর্থনৈতিক সমস্যা সরকারী জেদের ফলে আইন ও শৃঙ্খলার সমস্যায় পর্যবসিত হল।

১৯৫১ সালের পর ভারতবর্ষ খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণ হবে এবং বিদেশ থেকে আর খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন হবে না, ভারত সরকারের সেদিনকার এই আশ্বাস প্রহসনে পরিণত হয়েছে বহুদিন পূর্বে। এ যাবৎ আড়াই হাজার কোটি টাকার আনুমানিক খাদ্য আমদানী করেও, খাদ্যের আমদানী হ্রাসের কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। এ-যাবৎ গড়ে প্রতি বছরে পঞ্চাশ-ষাট লক্ষ টন খাদ্য আমদানীর প্রয়োজন হয়েছে। বর্তমান বছরে খাদ্যসঙ্কুলানের জন্য এক কোটিরও অধিক খাদ্য আমদানীর আয়োজন চলছে। একথাও সরকারী সূত্রে বিভিন্ন সময়ে প্রচারিত হয়েছে যে এই পরিমাণ খাদ্য

সমরূপ ভারতবর্ষে না পৌঁছালে খাদ্যসঙ্কট দূরীকরণ আকার গ্রহণ করবে। প্রধান মন্ত্রী তো স্পষ্টই বলেছেন আগামী দুবছর খাদ্য পরিস্থিতি অত্যন্ত সঙ্কটজনক হবে। বছরেকমাস পূর্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘের মিঃ রেমণ্ড ইওরেল (Raymond Ewell U. N. Consultant) তাঁর রিপোর্টে বলেছেন এবছর ভারতবর্ষে এককোটি থেকে এক কোটি বিশ লক্ষ লোকের অনাহারে মৃত্যু হবার সম্ভাবনা রয়েছে। রেমণ্ড-এর রিপোর্টের পর সম্পন্ন দেশগুলিতে আতঙ্কের আলোড়ন দেখা দিলে, বিভিন্ন দেশ থেকে সাহায্যের প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে। খাদ্যের জন্য পরনির্ভরতার পরিমাণ পাওয়া গেছে গত ভারত-পাক সঙ্ঘাতের পর মাসিক ভিত্তিতে আমেরিকার খাদ্য যোগানে এবং ভবিষ্যৎ খাদ্য যোগান সম্পর্কে মার্কিনী অনিশ্চয়তায়। অতীতের প্রতিমাসে গড়পড়তা দশলক্ষ টন এবং সাম্প্রতিক এককোটির ঊর্ধ্বে, খাদ্যশস্য যোগানের মার্কিনী প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেলেও এ-যাবৎ সে তুলনায় সামান্য মাত্রই খাদ্য আমদানী হয়েছে। এই বছরগুলিতে ভারতবর্ষে খাদ্যশস্যের উৎপাদন যে বৃদ্ধি পায় নাই, তা নয়। কিন্তু সে উৎপাদন প্রয়োজনানুপাতিক নয়। একই সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে, এবং অপ্রতিহত গতিতে মূল্যস্তরও ঊর্ধ্বগামী হয়েছে। এই পরিস্থিতির মধ্যে মজুতের অভাব সুযোগ অব্যাহত থেকে কটনের ক্ষেত্রে দারুণ বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। ফলে অপেক্ষাকৃত দুস্থ মানুষ, বঞ্চনার পীড়নে জর্জরিত হয়ে অনাহার ও অর্ধাহারে দাহিত জীবন যাপন করছে। গড়ায় অনাহার ও অর্ধাহারের দাহনার দিনগুলি খাদ্যের অনটনের—lean months—মাস দুইয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলেও গত কয়েক বছর যাবৎ এই ঘটনা প্রায় কলন উঠবার সদসাবয়বিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। কয়েক বছর পূর্বে ফোর্ড ফাউণ্ডেশনের একটি তথ্যানুসন্ধানী দল অভিমত প্রকাশ করেছিলেন যে তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার আমলে যদি ভারতবর্ষে খাদ্যের উৎপাদন এগার কোটি টনে না পৌঁছে দেওয়া যায় তবে অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না। অন্ধ্রপ্রদেশ তৃতীয় পরিকল্পনার পরও ঘাটতির পরিমাণ প্রায় শতকরা বিশ ভাগে এসে দাঁড়াবে। এই লক্ষ্য এখনও বহু দূরের পথ। সর্বভারতীয় ভিত্তিতে এবার গতবারের চাইতে প্রায় আশীলক্ষ টন কম ফসল উৎপাদিত হয়েছে।

সর্বভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম বঙ্গের অবস্থা আরও শোচনীয়। পূর্বেই বলা হয়েছে ১৯৫৩-৫৪ সালে পশ্চিম বঙ্গে প্রচুর উৎপাদন হয়েছিল। ১৯৪৭-৪৮-এর প্রায় চৌত্রিশ লক্ষ টন, ১৯৫৫ সালে তেরোর লক্ষে পৌঁছায়। বর্ষা ভাল হওয়ার ফলে এবার ভাগ্য সুপ্রসন্ন হয়েছিল। তার পরের বছরই অর্থাৎ ১৯৫৬ সালে ফলনের পরিমাণ ছিল চুয়াল্লিশ লক্ষ টন। তারপর থেকে প্রতিবছরই ফলন হ্রাস পেয়েছে। ১৯৫৭-৫৮ সালে আমন ধানের ফলন হয়েছিল পঁয়ত্রিশ লক্ষ টন। তারপরের বছর ফলন আরও হ্রাস পায়। অবশ্যি ১৯৬০-৬১ সালে ফলন ভাল হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬১-৬২ সালে চালের ঘাটতি ছিল। এরপর আর এক বছর ফলন ভাল হয়েছিল ১৯৬৫ সালে। ১৯৬৫-৬৬ সালে অনাবৃষ্টির দরুণ ধানের ফলন আতঙ্কজনকভাবে কমে গেছে বলে প্রকাশ।

পশ্চিম বঙ্গে ঘাটতির ওঠানামা বিচিত্র, রহস্যাবৃতও বলা চলে। পশ্চিমবঙ্গের ঘাটতিরও এক বিচিত্র হিসাব ধরা হয়। সাধারণত সব ও চালে মিলিয়ে যে কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রতি বছর পশ্চিম বঙ্গে পৌঁছায়, তাকেই সে-বছরকার ঘাটতি বলে অনুমান করা হয়। কিন্তু এই ঘাটতিরও কারচুপি হয়ে গেছে। কেন্দ্রীয় সাহায্যের জন্য দফায় দফায় বর্ধিত বরাদ্দ রাজ্যসরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রের নিকট চাওয়া হয়ে থাকে। এই ক্রমবর্ধমান ঘাটতির হিসাবের ফলে কেন্দ্রের ও রাজ্যের মধ্যে মন কষাকষি ও পরস্পর দোষারোপ চলে, যার ফলে কেন্দ্রীয় সাহায্য পৌঁছাতে বিলম্ব হয়ে এখানে সঙ্কটের সৃষ্টি করে। ঘাটতির কারচুপির দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায় ১৯৬২র

এপ্রিলে খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেন আট লক্ষ টন ঘাটতির হিসাব দিয়ে আগষ্ট মাসেই তাকে দশ লক্ষ টনে পৌঁছে দিলেন। অথচ সেবছর জুলাই মাসে কেন্দ্রীয় খাদ্য উপমন্ত্রী শ্রীচ্যবন পশ্চিম বঙ্গের ঘাটতির হিসাব দিয়েছিলেন ৬ লক্ষ টন। ঘাটতির কারচুপি ১৯৬৫সালে প্রহসনে পরিণত হয়। সে-বছর বাজেট বক্তৃতায় ঘাটতির পরিমাণ বলা হয় চার লক্ষ টন। তারপর ক্রমান্বয়ে ঘাটতির পরিমাণ সাত লক্ষ, এগার লক্ষ, সতের লক্ষ ও বাইশ লক্ষ টন পর্যন্ত ফাঁপিয়ে বলতে খাদ্যমন্ত্রী কোনো সঙ্কোচই বোধ করলেন না। সে বছরই আগষ্ট মাসে শ্রীচ্যবন লোকসভায় বলেন পশ্চিম বঙ্গে তিন থেকে চার লক্ষ টন চাউলের ঘাটতি রয়েছে। ঘাটতি নির্ণয়ের কোনো স্থির বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি নেই। কখনও মাথা পিছু ১২ আউন্স, কখনও ১৫ আউন্স, ১৬·৫ আউন্স চাউলের বরাদ্দ অনুমান করে মোট প্রয়োজনের হিসাবের অঙ্ক কষে ঘাটতির তেবি দেখান হয়ে আসছে।

প্রতি বছরই জনসংখ্যাবৃদ্ধি পাচ্ছে এবং বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্যের চাহিদাও আনুপাতিক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্যের বর্ধিত চাহিদা মেটাতে হলে খাদ্যের উৎপাদন বছরে শতকরা অন্তত তিন ভাগ বৃদ্ধি করা চাই। তৃতীয় পরিকল্পনার আমলে প্রথম দুই বছরে খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজনের তুলনায় খুবই কম হয়েছে, এবং সে কারণে ভারতবর্ষে আর্থিক উন্নয়নের সামগ্রিক হার হ্রাস পেয়েছে। অর্থাৎ, জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে খাদ্যের বর্ধিত চাহিদা, আনুপাতিক হারে পূরণে ব্যর্থতার জন্য জীবনযান উন্নয়নের উদ্দেশ্যে আর্থিক ব্যবস্থার উদ্বৃত্ত কোনো সম্পত্তি রইলো না। খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি না পেলে জীবনযানও নিম্নগামী হতে বাধ্য।

খাদ্যসঙ্কটের দীর্ঘমেয়াদী সমাধান, উৎপাদন বৃদ্ধির উপর নির্ভর করলেও, সেদিকে আমরা এখনও অনেক পিছিয়ে আছি। প্রচুর মার্কিনী গম ও চাল আমদানী করে জোড়া-তালি দেবার দিনও ফুরিয়ে আসছে। কারণ, চতুর্থ পরি-কল্পনার পর খাদ্য আমদানীর এই অবারিত সুযোগ যে থাকবে না, সে-সম্বন্ধে মার্কিনীরা ইতিমধ্যেই ভারত সরকারকে সাবধান করে দিয়েছে। তাই এখন রুদ্ধশ্বাস চেষ্টা চলছে এই সময়ের মধ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হবার। মার্কিনী খাদ্য দিয়ে ভারত-বর্ষে বন্ধুত্ব খাদ্য তহবিল গড়বার কথা ছিল। সেটি গঠন করলেও অনটনের বাজারে আতঙ্কের কারণ থাকতো না।

পশ্চিম বাংলায় চাষের জমির পরিমাণ জনসংখ্যার তুলনায় এতো কম এবং নূতন জমি চাষে আনবার সুযোগও এতো কম যে বিঘা প্রতি ফলন বৃদ্ধি করতে না পারলে খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি সম্ভব নয়। যে-ফসলী জমির পরিমাণ বৃদ্ধিও বিঘা প্রতি ফলন বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। এই ব্যবস্থা বহুলাংশে সেচ-ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে। সেচ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে বৃহৎ-পরিকল্পনাগুলির চাইতে এ-বিষয়ে ক্ষুদ্র-সেচ পরিকল্পনাগুলির সার্থকতা অনেক বেশী। কিন্তু পশ্চিম বঙ্গে এ-গুলি দীর্ঘকাল অবহেলিত। সার, বীজ, কৃষিঋণ ও কৃষির অন্যান্য আনুষঙ্গিক ব্যবস্থার অপূর্ণতাও জমির ফলন বৃদ্ধি না হবার জন্য দায়ী। এ-ছাড়া ভূমি স্বত্বের পরিবর্তনের প্রশ্নও রয়ে গেছে।

উৎপাদনের ক্ষেত্রে দীর্ঘমেয়াদী সমাধানের অপ্রয়োগ খাদ্যসঙ্কটের যেমন, খাদ্য আন্দোলনেরও পৃষ্ঠভূমিকা রচনা করে আছে। কিন্তু বন্টনের ক্ষেত্রে যে পৌনঃপুনিক সঙ্কট, আন্দোলনের আপোড়ন সেখান থেকেই উৎসারিত। রাজ্যের ঘাটতি অঞ্চলে খাদ্য সরবরাহ, সর্বত্র সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার সীমানার মধ্যে মূল্যস্তরের নিয়ন্ত্রণ এবং খাদ্যাভাবের দরুণ দুর্গত অঞ্চলে খয়রাতি সাহায্য ও অন্যান্য সাহায্যের ব্যবস্থা, ক্রয়বিক্রয় ও শিল্পজাতপণ্যের মধ্যে সমতাযুক্ত সংহত মূল্যনীতির প্রয়োগ—এই ব্যবস্থাগুলি গ্রহণে ব্যর্থতাই সঙ্কটের তীব্রতা বৃদ্ধি করে আন্দোলনে গতিবেগ সঞ্চারিত করে আসছে।

বণ্টনের ক্ষেত্রে ঘাটতি মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় সাহায্য সত্ত্বেও চাউলের মূল্যও যেমন প্রতি বছর বৃদ্ধি পেয়েছে, খোলা বাজারেও চাউল দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। চাউলের বাজারে দেখা গেছে মূল্যবৃদ্ধি ও দুষ্প্রাপ্যতা পরস্পরের অন্তরঙ্গ সহচর। সুতরাং, মূল্যস্তর বেঁধে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি-রোধের প্রচেষ্টার পাশাপাশি খোলাবাজারে শস্যের যোগান সুনিশ্চিত না করলে, নির্ধারিত মূল্যস্তরকে এক পাশে রেখে বাজারে চাউলের মূল্য ক্রমশই ঊর্ধ্বগতি হয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই খোলাবাজার কালোবাজারে পরিণত হয়।

দৃষ্টান্ত স্বরূপ ১৯৫৮ সালের ডিসেম্বর মাসে পশ্চিম বঙ্গ সরকারের ঘোষিত খাদ্যনীতির উল্লেখ করা যেতে পারে। এই নীতি অনুযায়ী ১৯৫৯ সালের ১লা জানুয়ারী থেকে পশ্চিম বঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় অত্যাবশ্যক আইন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরণের ধান ও চাউলের উচ্চতম দর বেঁধে দেওয়া হল। উৎপাদক, পাইকার, মিলওয়ালা, খুচরা দোকানদার, সকল-শ্রেণীর বিক্রেতার জন্যই দর বাঁধা হল এবং ধান-চাউলের উচ্চতম ও নিম্নতম দরের মধ্যে কোনো ব্যবধান রাখা হোলো না। তাছাড়া, মিলের উৎপাদনের শতকরা ২০ ভাগ লেভিতে সংগ্রহের এবং প্রয়োজনমত অত্যাবশ্যক দ্রব্য আইনের প্রয়োগে ব্যবসায়ী ও উৎপাদকদের মজুত সংগ্রহের প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়। সেই সঙ্গে মুনাফা-বিরোধী আইনও পাশ করে সরকার সংকল্পের দৃঢ়তা দেখান। মূলত নীতি ঘোষণার সময় খাদ্যমন্ত্রী বলেন যে কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী সরকারের এই নূতন নীতি বানচাল করার চেষ্টা করলেও সরকার সংকল্পে অটুট এবং আগামী একবছরের মধ্যে এই খাদ্যনীতির কোনই পরিবর্তন হবে না। কিন্তু সরকার সে বছর অল্প সময়ের মধ্যেই জোতদার-মজুতদার-বিপণনিক চক্রের কাছে পরাজয় স্বীকার করেন এবং মূল্যবিনিয়ন্ত্রণ করে পশ্চাদপসরণ করেন। এই পরাজয়ের পর খাদ্যমন্ত্রীর কিম্বা মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দূরে থাকুক এই আত্মসম্পর্ণের কৈফিয়তরূপে মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন: অতীতে কোনো ঘাটতিরাজ্যেই মূল্যনিয়ন্ত্রণ সফল হয় নাই।

প্রকৃত ঘটনা এই যে পশ্চিমবঙ্গ সরকার মূল্য নিয়ন্ত্রণ সফলের অপরিহার্য সর্তগুলি পালনের কোনো দায়িত্ব বোধ না করেই মূল্যস্তর বেঁধে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন, মুনাফা লুটির জন্য। মূল্যনিয়ন্ত্রণের প্রথম সর্ত: ধান চাউলের পর্যাপ্ত সরকারী মজুত গুদাম। দ্বিতীয় সর্ত: খাদ্যস্তরের প্রশাসনিক সততা ও দক্ষতা। তৃতীয় সর্ত: মূল্যস্তর নির্ধারণে ছোট ও দরিদ্র চাষীর স্বার্থ সংরক্ষণ। মজুতদার-কালোবাজারীকে পর্যুদস্ত করে মূল্যস্তর স্থির রাখার জন্য প্রয়োজনমত মজুত ধান ও চাউল বণ্টন ও বিক্রয়ের অবাধ ক্ষমতা সরকারের হাতে থাকা চাই এবং দুর্নীতিমুক্ত প্রশাসনিক কাঠামো ছাড়া এই বৃহৎ প্রয়াস অনায়াসেই বানচাল হতে বাধ্য। জনসাধারণের প্রতিনিধিস্থানীয়দের সর্বস্তরে সহযোগিতা নিয়ে প্রশাসনিক দুর্নীতি দমন করে খাদ্যনীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল। আর মূল্যস্তর যদি এমন ভাবে নির্ধারিত হয় যে দরিদ্র চাষীর উৎপাদন ব্যয়ও তাতে সঙ্কুলান হয় না, সেক্ষেত্রে ফসল উঠবার পরই গ্রাম-দোকানে ধান ছেড়ে দিয়ে সেই চাষীকেই আকার সময় মণ প্রতি দশ পনের টাকা বেশী দরে চাউল কিনে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। এ-ছাড়া দেশের সরকার কিছু পরিমাণ ধান-চাউল বিনা অনুমতিতে মজুত রাখার অবাধ অধিকার দিয়েছিলেন। গ্রিণার্ড ব্যাঙ্কের পদ্ধ থেকে খাদ্যশস্য ব্যবসায়ে অর্থ বিনিয়োগের জন্য ঋণদানের ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কগুলির উপর কোনো নিষেধাজ্ঞা কিম্বা নিয়ন্ত্রণাদেশ জারী করে মজুত নিয়োধের কোনো ব্যবস্থা না রাখার ফলে মূল্যস্তর নিয়ন্ত্রণ সত্ত্বেও অবাধ মজুতের কোনো অন্তরায় রইলো না। বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত (marketable surplus) চাউলের একটা বড় অংশ সরকার ক্রয় করে মজুত করতে পারতেন, সঙ্কট বর্তমান পর্যায়ে পৌঁছবার বহু পূর্বে। ১৯৫৮–১৯৫৯ সালের

কথাই উল্লেখ করা যেতে পারে। সে-সময় এ-ভাবে সংগৃহীত পাঁচ লক্ষ টন চাউলের মজুত তহবিল সরকারের হাতে থাকলে মূল্যবৃদ্ধির পাশে পাশে নিয়ন্ত্রিত দরে বাজারে চাউল ছেড়ে দিয়ে মূল্যবৃদ্ধি প্রতিরোধ সম্ভব ছিল। এভাবে মজুতদারেরা পরাস্ত হোতো, কালোবাজার অন্তর্হিত হোতো। চাউলের এই মজুত তহবিল গড়বার প্রয়োজনীয় অর্থ ব্যাঙ্ক থেকে অনায়াসেই পাওয়া যেত। প্রশ্ন উঠতে পারে ঘাটতি এলাকায় চাউল কিনে সরকার যদি সে চাউল সহরে চালান দেয় তাহলে ঘাটতি এলাকার খাদ্য-সঙ্কট তীব্রতর হবে। ঘাটতি এলাকার চাউল সে এলাকার বাইরে যাওয়া নিষিদ্ধ করে এই সমস্যার সমাধান করা যেতে পারতো। ১৯৫৯ সালে মূল্য নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে পশ্চিম বঙ্গ সরকার মজুতদার-আড়তদার-মিলওয়ালাদের অবাধ লুণ্ঠনের পথ সুগম করে দিলেন।

নূতন ফসল উঠবার পর অন্তত দুই-তিনমাস বাজার দর নিম্নগামী হবে, বাজারের এই নিয়ম। '৬২ সালের মে মাসে চাউলের দর বৃদ্ধি পেয়ে প্রায় নভেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও '৬৩ সালে ফসল উঠবার তিনমাসের মধ্যেই অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি হয়। সে-বছর যদিও কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা ব্যবসায়ীদের বিরুদ্ধে প্রান্তিক ঘাটতির সুযোগ নিয়ে ধানের মূল্যবৃদ্ধির অভিযোগ করে ফসলের নিকট থেকে সরাসরি ধান সংগ্রহের প্রস্তাব করেন, পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়: ১৯২৯ সালের অভিজ্ঞতার পর মজুতের যাঁরা যাবেন না এবং ঘাটতি অঞ্চলে প্রকিওরমেন্ট অবাস্তব। চাউলের প্রচুর ঘাটতি, সরকারের পক্ষ থেকে প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মূল্যরোধ করা সম্ভব নয়, চাউলের দর যাঁরা সম্ভব নয়, প্রকিওরমেন্ট সম্ভব নয়—মুখ্যমন্ত্রীর এই একটানা প্রচারে চাউলের পাইকারী দর সেপ্টেম্বর মাসে প্রায় চল্লিশ টাকায় পৌঁছায়। অক্টোবর শুরু হতেই চাউলের পাইকারী দর চল্লিশের সীমা অতিক্রম করে গেলো। আর সে বছর ৩রা অক্টোবর মুখ্যমন্ত্রী যেই না বললেন: যেখানে দেবার মত চাল নেই—৮৫ লক্ষ লোকের আংশিক রেশন—চালের দর একদিনেই মণ প্রতি ৪২ টাকা থেকে ৪৮ টাকায় চড়ে গেল এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই পঞ্চাশের সীমা অতিক্রম করে গেল। এই চূড়ান্ত পর্যায়েও সেদিন মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণে অক্ষমতা জ্ঞাপন করে বিস্তীর্ণ দর্শক হয়ে রইলেন। তারপরই জনতার হস্তক্ষেপে সুদৃঢ়ভাবে মজুত চাউল ধরা শুরু হয়। অবশ্য সরকারেরও চৈতন্য হয়ে। আগষ্ট মাসে মুনাফার প্রান্তিক নির্দেশক আইন জারীর সংবাদ বিজ্ঞাপিত করে সেপ্টেম্বরে সে আদেশ সরকার জারী করলেন। অক্টোবরের মাঝামাঝি সে আদেশ সংশোধন করে তার প্রয়োগের ভার পুলিশের হাতে দিলেন। প্রশ্ন থেকে যায় এই আইন প্রয়োগের নির্দেশ কেন্দ্র থেকে ২০শে জুলাই এলেও তার প্রয়োগে এত বিলম্ব কেন? সে কি মজুতদার মুনাফাখোরদের আরও লুটের সুযোগ দেবার জন্য? আর গোড়াতেই বা পুলিসের সাহায্য কেন নেওয়া হয় নাই। অক্টোবরের মাঝামাঝি পর্যন্ত কেন অপেক্ষা করা হয়েছিল? ডিলার কিম্বা উৎপাদক ব্যতিরেকে পারমিট না নিয়ে তিনশত মণ ধান-চাউল মজুদের সীমা, তিনশত মণ থেকে পঞ্চাশ মণে নামিয়ে আনবার জন্য পশ্চিম বঙ্গ ধান চাউল নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ অক্টোবরের মাঝামাঝি সংশোধন করা হয়। আর অনেক পূর্বেই এই নির্দেশ সংশোধন করে মজুত রেখে সরকারী উদ্যোগের জন্য দাবী ছিল। সেবছর পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী ঘাটতির একটানা বিবৃতি দিয়ে এবং প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ করতে অস্বীকার করে যে ভাবে মুনাফাখোর ও মজুতদারের সহায়কের ভূমিকা নিয়েছিলেন, সরকারের দায়িত্ব থেকে অপসারণই তার যোগ্য প্রত্যুত্তর ছিল। চাউলের দুষ্প্রাপ্যতা ও মূল্যবৃদ্ধি, ধান-চাউল ব্যবসার রাষ্ট্রীয়করণ দীর্ঘকাল যাবৎই অপরিহার্য করে তুলেছে। মূল্যবৃদ্ধির পরিমাপক পাইকারী মূল্যসূচী। কি হারে এই মূল্যসূচী

বৃদ্ধি পেয়েছে, বিভিন্ন সময়ে পাইকারী মূল্যসূচীর অঙ্ক লক্ষ্য করলেই তা বোঝা যাবে। ১৯৬৪ সনের ২৮শে মার্চে যে সপ্তাহ শেষ হল সেই সপ্তাহের সূচীর অঙ্ক ১১৯·২ (১৯৫৩ সালের মার্চের সূচী ১০০-এর ভিত্তিতে)। ১৯৬৫র ৩১া জুলাই-এ এই সূচী দাঁড়ায় ১৪৯·০-এ। আর তার প্রায় একবছর পূর্বে ১৯৬৩-র জুনে মূল্যসূচী ছিল ১৩৪·৮। আর ১৯৬৯-র জানুয়ারীতে এই নিরিখ ১৬১·১ এ পৌঁছে যায়। ১৯৬৩-র জুন থেকে ১৯৬৪ র জুনের মধ্যে চাউলের দর শতকরা ১৪·৩ ভাগ বৃদ্ধি পায় অথচ এই সময়ের মধ্যে সর্বভারতীয় ভিত্তিতে চাউলের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই বছর চাউলের উৎপাদন বেশী হওয়া সত্ত্বেও কম পরিমাণ বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত চাউল বাজারে পৌঁছায়।

বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত সংগ্রহের সিদ্ধান্ত '৬৩ র বিপর্যয়ের পরই অনিবার্য হলেও, '৬৩ র মূল্যবৃদ্ধির মুখেও সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলো না। ১৯৬৪-র এপ্রিল-মে পর্যন্ত সঙ্কটের আবর্তের সামনেও পশ্চিম বঙ্গ সরকার নিষ্ক্রিয়। এ-বছর ৭ই মে তারিখে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হল ছয়টি উদ্বৃত্ত জেলার উৎপাদকদের মজুত ধান-চাউল আটকের। অথচ, সে-সময়ের মধ্যে বহু উৎপাদকের ধান-চাউল পাইকারী-ব্যবসায়ী-মিলমালিক-কালোবাজারীর চক্রের হস্তগত হয়ে গেলেও এদের মজুত করণের সিদ্ধান্ত ক্যাবিনেট গ্রহণ করলো না। তাছাড়া বৃহৎ উৎপাদকদের মজুতকরণের চেষ্টারও সরকারের কোনো আন্তরিকতা ছিল না। আন্তরিকতা যে ছিল না তার প্রমাণ ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত কার্যত করে সংবাদপত্র ছাপিয়ে বৃহৎ উৎপাদকদের তাদের মজুত নির্দিষ্ট পরিমাণের চাইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মজুতে রূপান্তরে অবকাশ দেওয়া হল। সুতরাং বৃহৎ উৎপাদকদের পক্ষে মজুত করণ অভিযান এড়িয়ে নিজ নিজ মজুত বহাল রাখা অনায়াসসাধ্য হয়ে গেলো। সুতরাং এই রাজ্যে বিক্রয়-যোগ্য উদ্বৃত্তের একটা বড় অংশ মজুতের ফলেই খোলাবাজারে চাউল দুষ্প্রাপ্য এবং কালোবাজারে দুরন্ত মূল্যবৃদ্ধি হল। সেদিন সরকার পশ্চিম বাংলায় ৬০০ চাউল কলে প্রায় ৭ লক্ষ টন চাউল উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ লেভির সূত্রে আদায়ে প্রতিশ্রুত। কিন্তু চাউল-কলের উৎপাদন থেকে এই লক্ষ্যের অনেক কম লেভি আদায় হয়েছিল। ফলে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্তের বৃহদংশই সরকারী আয়ত্তের বাইরে থেকে বহুতলার-মুনাফাবাজ-কালোটাকার চক্রের কবলিত হয়ে মূল্যবৃদ্ধির যোগান দিয়েছে।

মূল্যবৃদ্ধি সম্পর্কে পলায়নপর মনোবৃত্তি, দুটি যুক্তির আড়ালে আত্মরক্ষার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট। এই পলায়নপরদের প্রথম যুক্তি হল; উন্নয়নমূলক অর্থনীতিতে মূল্যবৃদ্ধি অনিবার্য এবং দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো আরও দীর্ঘকাল মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে জর্জরিত হবে। কিন্তু মূল্যস্তর না বাড়লে মূল্যবৃদ্ধির আঘাতে গোটা পরিবর্তনাই যে বানচাল হয়ে যাবে, এই সর্বনাশা পরিণতি সম্পর্কে তারা অবোধ। বছরে শতকরা দুই বা তিন ভাগ মূল্যবৃদ্ধিতে উদ্বেগের কারণ নাই। কিন্তু যেখানে মূল্যবৃদ্ধির পরিমাণ বছরে শতকরা প্রায় দশ তার পরিণতি যে ভয়াবহ হতে বাধ্য। এদের আর একটি যুক্তি জনসংখ্যা বৃদ্ধি। জনসংখ্যা বৃদ্ধির হারের সঙ্গে খাদ্যের যোগানের হারের অবশ্যই সম্পর্ক আছে প্রতি বছর বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা মেটাবার জন্য বছরে অন্তত শতকরা তিনভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির অনিবার্যতা রয়েছে। কিন্তু সাম্প্রতিক মূল্যবৃদ্ধির হারের সঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধির আনুপাতিক সঙ্গতি কোথায়? ১৯৬৩ সালে পাঁচ-মাসের মধ্যে চাউলের মূল্য শতকরা নব্বই-এক'শ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সে-সময় জনসংখ্যা বড়জোর শতকরা দেড়ভাগ বৃদ্ধি পেয়ে থাকবে।

১৯৬৪র জুন থেকে কয়েকবারই মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন হয়ে গেছে। এই সম্মেলনগুলিতে খাদ্যসঙ্কটের কোনো মৌলিক সমাধানের দিকে অগ্রসর হওয়া দূরে থাকুক, নিজ নিজ

রাজ্যের চাহিদার অতিরিক্ত খাদ্যশস্য আদায়ের চেষ্টায় মুখ্য-মন্ত্রীরা তৎপর রয়েছেন। কিন্তু জাতীয় খাদ্যনীতি উদ্ভাবনে মুখ্যমন্ত্রীদের কোনো হাত নেই। নিজ নিজ সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর মধ্যেই তাঁদের মানসিকতা সীমাবদ্ধ। জাতীয় সংহতির শ্লোগান প্রচারের পাশাপাশি এক রাজ্যে অনাহার, অর্ধাহার ও ক্রয়ক্ষমতার অতিরিক্ত মূল্য অপর রাজ্যে খাদ্যে স্বাচ্ছন্দ্য,—সংহতির সংহারের ভূমিকাই রচনা করছে। কেন্দ্রীয় সরকারের একান্ত নির্ভর পল, পি, এস'৮০ আইন অনুযায়ী মার্কিনী খাদ্য সাহায্য। কেন্দ্রীয় সরকারের এই সাহায্যের উপর একান্ত নির্ভরতা এবং রাজ্য সরকারগুলির কেন্দ্রের উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা উৎপাদন বৃদ্ধির মানসিকতা বহুলাংশে বিনষ্ট করেছে। খাদ্য-সমস্যার মৌলিক সমাধানে উপেক্ষার দায়িত্ব যেমন রাজ্য সরকারের, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বও তাতোধিক।

দশলক্ষের অধিক জনসংখ্যা-বিশিষ্ট শহরে পূর্ণ রেশনিং-এর সিদ্ধান্ত সত্ত্বেও কলকাতা ছাড়া আর কোথাও ১৯৬৫ সালে রেশনিং চালু হয় নাই। অবশ্য কলকাতার পূর্ণাঙ্গ রেশনিং-এ খাদ্যের পরিমাণগত স্বল্পতা রেশনিং এলাকার অধিবাসীদের কালোবাজারমুখীন করে রেখেছে। আংশিক রেশনিং প্রায় কাগজী ব্যবস্থাই হয়ে রইলো। এর কারণও অস্পষ্ট। কেন না ১৯৬৫ সালে ৪৭ লক্ষ টন উৎপাদিত চাউলের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের ১০ লক্ষ টন গমের যোগান মিলিয়ে, প্রয়োজনের অতিরিক্ত খাদ্যের যোগান থাকা সত্ত্বেও সে-বছর খাদ্যের তীব্রতর অভাবের কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

১৯৬৬ সালের উৎপাদন ৪৪ লক্ষ টন চাউল, সরকারী মতে। এবছর কেন্দ্রীয় সরকারের গমের সরবরাহও অনিশ্চিত ছিল, যদিও মার্চ মাস থেকে প্রতি মাসে এক লক্ষ বিশ হাজার টন গম কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। এবছর পূর্বো বছরের মত কেন্দ্রীয় চাউলের বরাদ্দ এক লক্ষ টন। কিন্তু মার্কিনী গমের নিয়মিত সরবরাহ এখনও অনিশ্চিত। এবার সরকার দশ লক্ষ ও তদূর্ধ জনসংখ্যা বিশিষ্ট শহরে পূর্ণ রেশনের এবং অন্যান্য ঘাটতি এলাকায় আংশিক রেশন-এর তরদা দিয়েছিলেন। পূর্ণ রেশন ও আংশিক রেশন উভয় ক্ষেত্রেই চাউল-গমের বরাদ্দ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং রেশনের চাউলের মূল্যও উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা হয়েছে। গমের ক্ষেত্রেও তাই। বণ্টনের সমতা রক্ষায় এবং মূল্যবৃদ্ধিরোধের জন্য পশ্চিম বঙ্গ সরকার ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর থেকে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত একচেটিয়া ভাবে সংগ্রহের নীতি গ্রহণ করেছেন, যে নীতি '৬০ সাল থেকেই গ্রহণের অনিবার্যতা ছিল। আর সেদিন 'প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ অসম্ভব'—এই অজুহাতে মুখ্যমন্ত্রী সকলপ্রকার নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে গেছেন। এবারও প্রয়োগের ক্ষেত্রে সরকারের নূতন নীতির অবাস্তব এবং ক্ষতিকর বর্জনগুলির পরিবর্তন ব্যতিরেকে সঙ্কট ঘনীভূত হবে—এই সতর্কবাণী উচ্চারিত হওয়া সত্ত্বেও সরকারের অনমনীয়তা পশ্চিমবাংলায় বর্তমান বিস্ফোরক পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে।

ধান-চাউল প্রকিওরমেন্টের মূল্যস্তর কৃষকের উৎপাদন ব্যয়ের সঙ্গে আনুপাতিক কিনা, লেভির হার কৃষকের পক্ষে বহনসাধ্য কিনা, অর্থাৎ লেভির যোগানের পরিমাণ উৎপাদনের এবং কৃষকের খোরাকের আনুপাতিক কিনা এই প্রশ্নগুলির সুষ্ঠু প্রয়োগের উপর মনোপলি প্রকিওরমেন্টের সার্থকতা নির্ভর করে। পশ্চিম বঙ্গ সরকার এই আশঙ্কা-গুলিকে অগ্রাহ্য করে পশ্চিম বাংলার আইন শৃঙ্খলার বর্তমান পরিস্থিতি ডেকে এনেছেন। ফলে ৩১শে মার্চের ১৪ লক্ষ টন লেভির লক্ষ্যকে ১১ লক্ষ টনে নামিয়ে এনেও এই সময়ের মধ্যে অর্ধেকের সামান্য বেশী আদায় করেছেন। চাউলকল গুলিকে সীমাবদ্ধ এলাকায় ধান সংগ্রহ করার অধিকার দিয়ে, তাদের উপর শতকরা ১০০ ভাগ লেভি না করে, পাইকারদের সীমাবদ্ধ এলাকায় প্রয়োজনবোধে ব্যবসায়ের অধিকারে কালো-

বাজারের মুখোমুখি এই নীতিতে নিহিত রাখা হয়েছে। এর উপর জেলা কর্তন, ধারা কর্তন প্রভৃতি উদ্বৃত্ত এলাকা থেকে ঘাটতি এলাকায় যোগানের পথগুলি অবরুদ্ধ করে চাউল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য করে পশ্চিম বঙ্গ সরকার বর্তমানে সঙ্কট ডাকিয়া করেছেন। ধানের দাম, লেভির পরিমাণ, আংশিক রেশনের বিধিমিত যোগান,—আংশিক ও পূর্ণাঙ্গ রেশনের পরিমাণ—এই সমস্যাগুলির দুই সমাধানের উপর নূতন খাদ্যনীতির সার্থকতা নির্ভরশীল ছিল।

গত কয়েক বছরের খাদ্যসঙ্কট সমাধানে প্রশাসনিক ব্যর্থতা, বিরোধী দলগুলির সহিত অসহযোগিতা, মূল্যবৃদ্ধি, মুনাফাখোরী এবং চোরাকারবার—প্রশাসনিক দুর্বলতার উপর সাধারণ মানুষের চূড়ান্ত অনাস্থা এনেছে। সুতরাং মূলগতভাবে মনোপলি প্রতিষ্ঠানেই ও রেশনিং বর্তমান অবস্থায় অনিবার্য নীতি হলেও, প্রয়োগের ক্ষেত্রে কৃষকের ও ক্রেতাসাধারণের এই নীতি সম্পর্কে গভীর অনাস্থা। সরকারী দম্ভ ও কর্তৃত্বের উদ্ধত্য বাংলা দেশে শুরুতর দুর্যোগ ডেকে এনেছে। বিরোধীদের সহযোগিতায় খাদ্যনীতির পরিবর্তনের দাবীর পশ্চাদ্ভূমিতে সাধারণ আলোচনার মধ্য দিয়ে যে সমস্যার সমাধানে পৌঁছান সম্ভব ছিল, উপেক্ষাভরে তাকে অগ্রাহ্য করে সরকার মুনাফা ও দুর্নীতির ক্ষেত্রে রাজত্ব সম্প্রসারিত করেছে সমগ্র পশ্চিম বাংলায়। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিম বাংলায় গণতন্ত্রের মানসিকতার পুনরুদ্ধার সম্ভব একমাত্র যুক্তফ্রন্টের অপসারণে। জনসাধারণ ও সরকারের পারস্পরিক সহযোগিতায়, সেই অবস্থাতেই খাদ্যসঙ্কট সমাধানের সূত্র-সন্ধান সম্ভব। ঘটনে বন্যা সঙ্কটকে ঘনীভূত করবেই। বন্যার দ্রুত নিষ্কাশনই সে-অবস্থার প্রতিকারের একমাত্র পথ। এ-পথের প্রথম এবং প্রধান শর্ত জনসাধারণ ও সরকারের মধ্যে গণতান্ত্রিক পারস্পরিকতার কাঠামো এবং সরকারের প্রতি জনসাধারণের সুগভীর আস্থা। পশ্চিম বঙ্গে এই পরিবেশ দীর্ঘকাল যাবৎ অন্তর্হিত। যুক্তফ্রন্টের পতনোত্তর এই পরিস্থিতির নবায়নের পূর্বগর্ভ।

২৪. ৩. ৬৬

জয়শ্রীর আসামী উপন্যাস

সাহিত্যে নবাগত **মহীতোষ বিশ্বাস**

লিখিত,

জল, মাটি, মন

আগামী ১৯৭৩ বৈশাখ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে। কৃষিকেন্দ্রিক কৃষিজীবন বাঙলা উপন্যাসে কোনো নূতন উপাদান নয়, কিন্তু এই রচনার স্বাদ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য অন্য কারণে: রচনার বিষয়ের যথাযথ বিন্যাসে, স্বাভাবিকতায়, অকপট অকৃত্রিমতায়। লেখকের ক্ষেত্রে, যেহেতু তিনি নূতন, এইটিই প্রথম কথা।

সাধারণ সুবিধার মানুষের নিস্তরঙ্গ অপরিসর এই জীবন: এরই মধ্যে স্বাভাবিক গতিতে জন্ম, মৃত্যু, প্রেম, পরিণয়, মৃত্যু; কিছুই না, আবার সবই,—কারণ হৃদয়ের সরোবরে এগুলিই ঘটনার ছোট ছোট ঘূর্ণী, এরাই স্পর্শ দিয়ে হৃদয়কে উপ্ত করে, মানুষকে জ্ঞানের দিকে ঠেলে নেয়, তাকে জীবনের মর্মমূলে প্রীত প্রসন্ন প্রত্যয়ে, জীবনের কৃতজ্ঞ অঙ্গীকারে আবার ফিরিয়ে আনবে, স্থিত করবে বলে।

এই রচনা আমাদের পাঠকবর্গের প্রিয় হবে আশা করি।

জঃ সঃ

হেগেলীয় দর্শন

অমিল রায়

এই প্রথম ত্রিনীতিকে (triad) ন্যায়বাক্যীয় (syllogism) আকারে লিখলে দাঁড়াবে এমনি একটা রূপ :

(১) নির্গুণ বা নির্বিশেষ সত্তা অসৎ (Being, without, determinations, is Nothing)

(২) অতএব, সকল সত্তাই অসৎ (So, all Being is Nothing.)

(৩) অতএব, সগুণ সত্তা অসৎ (Being, with determinations, is Nothing.)

(৪) অতএব, সব কিছুই নিজেকে অস্বীকার বা খণ্ডন করে। (Everything negates itself.)

এখানে প্রথম উপান্তে (Promise) Beingকে নির্বিশেষ করে দ্বিতীয় উপান্তে এবং তৃতীয় সিদ্ধান্তে Beingকে সবিশেষ করে নিয়ে হেগেল তাঁর অবিরোধ-নীতিকে প্রমাণ করেছেন। এ কী শ্রেণীর হেত্বাভাস (fallacy) তা সবাই জানেন। জেম্‌স্ ঠিক এই ত্রিনীতিকে এবং এর পেছনের হেত্বাভাসকে (fallacy) একটি সহজ ও উপযোগী দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন। তাঁর দৃষ্টান্তটি ন্যায়বাক্যীয় (syllogism) আকারে বললে এমনি ধরণের হবে :

(১) "বস্ত্রবিবর্জিত" মানুষকে 'উলঙ্গ' বলা যায়।

(২) সুতরাং "মানুষ"কে 'উলঙ্গ' বলা যায়।

(৩) সুতরাং বস্ত্র-পরিহিত "মানুষ"কেও 'উলঙ্গ' বলা যায়।

এখানে ১নং উপান্তে (premise) মানুষকে একটা বিশেষণে ভূষিত করে তার সম্বন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে যে "উলঙ্গ"। কিন্তু ২নং সিদ্ধান্তে সকল রকমের মানুষের ওপরই সেই মন্তব্য করা হয়েছে, যে মন্তব্য কেবল বিশেষ একরকমের মানুষের সম্বন্ধে খাটে। এর পরেই ৩নং সিদ্ধান্তে একেবারে পরিষ্কারভাবে ১নং উপান্তের উল্টো অর্থ ধরে নিয়ে সেই সম্বন্ধেই পূর্বোক্ত মন্তব্য করা হয়েছে। ফলে কী রকম গুরুতর অবস্থার উদ্ভব হয়েছে, সবাই হয়তো লক্ষ্য করে থাকবেন। কারণ কাপড়কাচা এবং হাইকোর্ট পর্যন্তও যদি অশালীনতার নিন্দা থেকে রেহাই না পাওয়া যায়, তবে মানুষের বিপদের সীমা কোথায়।

অবশ্য জেম্‌স্ বলছেন, হেগেলীয়গণ হয়তো এতে ঘাবড়াবেন না। তাঁরা বলবেন, "কেন, বস্ত্রের নীচে দর্জিতার কৃত্রিম আবরণের আড়ালে সত্যিকারের মানুষটি কি আসলে 'উলঙ্গ' নয়? যতোই কাপড়-চোপড়ের বোঝা চাপানো হোক না কেন, শাশ্বত ও সনাতন মানুষটি,—অকৃত্রিম ও আসল মানুষটি তো উলঙ্গই। গভীর দৃষ্টিতে দেখলে এ তত্ত্ব তো অতি সহজেই চোখে পড়বে। জেম্‌স্ বলছেন, এ কথায়

ব্যারপাচে যদি বাস্তব মন খুসী হয় তো হোক। কিন্তু এই খুসভীর যুক্তিতে যদি হ্যাটকোট-পরা অতিথিকে বৈঠকখানায় ঢুকতে না দেওয়া হয় তবে তো সবারই সমূহ বিপদ দাঁড়াবে। তাছাড়া যে যতই খুসী হোক, বৈঠকখানার মালিকরা ওক্ষেত্রে হেগেলীয় নীতিকে বনবাসে দেবেই দেবে। জেম্‌স্‌-এর অনুপম ভাষা তুলে দেওয়াই এখানে স্থির হবে :

Of course we may in this instance or any other repeat that the conclusion is strictly true however comical it seems. Man within the clothes is naked, just as he is without them. Man would never have invented the clothes had he not been naked. The fact of his being clad at all does prove his essential nudity.....

But we must notice this. The judgement has now created a new subject, the naked clad and all propositions regarding this must be judged on their own merits, for these, true of the old subject, 'the naked', are no longer true of this one. For instance, we cannot say because the naked pure and simple must not enter the drawing room or in danger of taking cold, that the naked with his clothes on will also take cold or must stay in his bedroom.

Hold to it eternally that the cladman is still naked if it amuse you,—it is designated in the bond; but the so-called contradiction is a sterile boon. Like Shylock's pound of flesh, it leads to no consequences. It does not entitle you to one drop of his Christian blood either in the way of Catarrh, Social exclusion, or what further results pure nakedness may involve." (Pp. 280-82, James ibid)

এখানে বলা যেতে পারে যে Being ও Nothing যদি একই বস্তু হয়, তবে তারা একই স্থানে ও কালে এবং একই অর্থে বিপরীত বা বিরোধী (opposite) পদার্থ হতে পারে না। একই সঙ্গে তারা অভিন্ন (identical) ও বিরোধী (opposite) হওয়া সম্ভব নয়। যদি কেউ সম্ভব বলে দাঁড় করাতে চায়, তবে উপরোক্ত ফল দাঁড়াবে। যদি তাদের একই পদার্থ (identical) ধরা যায় তবে তাদের সমবায়ে Becoming নামক প্রগতি সম্ভব হতে পারে না।*

আসলে Being ও Nothing পরস্পরবিরোধী। Being এর সঙ্গে Nothing এর কোন দিকেই মিল নেই, একের একটি থাকলে অপরটি থাকতে পারে না। এদের মধ্যে বিরোধ (contradiction) রয়েছে, এবং এরা একটি অন্যটির বিরোধী (opposite) এবং একটি অপরকে negate বা খণ্ডন করে।†

একই সঙ্গে Being ও Nothing সমধর্মী ও বিপরীতধর্মী হ'তে পারে না। এরা সমধর্মী বস্তুত নয়, এরা বিপরীতধর্মী কাজেই Being-এর মধ্যে তার নিজের বিপরীত সত্তা অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে, একথা অসত্য ও অযৌক্তিক। এই দৃষ্টান্তে হেগেলীয় নীতি খাটছে না।

সত্তাকে (Being) স্ববিরোধী (Self-contradictory)

---

* "Of being and nothing are identical, how can they constitute becoming f—a—a remains 'a' and does not become 'b'. But being is identical with nothing only when being and nothing are thought badly or are not thought truly. Only then does it happen that the one equals the other, not as a=a, but rather as o=o. (Croce. First Ch)

† "For the thought which thinks them truly, being and nothing are not identical but precisely opposite and in conflict with one another....." (Croce First Ch)

প্রমাণ করতে একজন হেগেলীয়ানে অন্ত এক যুক্তির অবতারণা করেছেন। তিনি বলেছেন যে, Pure Being-এর কোন বিশেষণ (determination) নেই। কাজেই এতেই দেখা যাচ্ছে যে সত্তা (Being) একই সঙ্গে সবিশেষ ও নির্বিশেষ। তার মানে সে নিজেকে নিজেই contradict করছে। ন্যায়বয়ীর (Syllogism) আকারে এই যুক্তি হবে এই রকম, যথা :

বিশুদ্ধ সত্তার গুণ বা বিশেষণ নেই : কিন্তু নেই বলে সে নিজেই একটা গুণ বা বিশেষণ, অতএব বিশুদ্ধ সত্তা স্ব-বিরোধী ইত্যাদি।*

কিন্তু এখানেও সেই একই হেগেলীয় গলদ লুকিয়ে রয়েছে, অর্থাৎ মানের পার্থক্যকে চোখ বুজে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। বিশুদ্ধ সত্তার (Pure Being) আগে কোনো স্ববিরোধ নেই। যখন বিশুদ্ধ সত্তার কোনই বিশেষণ নেই বলা হচ্ছে, তখন তার মানে হচ্ছে এই যে উল্লিখিত বিশেষণটিকে (অর্থাৎ "কোন বিশেষণ নেই"—এও একটি বিশেষণ") বাদ দিয়ে এতদ্ব্যতিরিক্ত "অন্য কোনো বিশেষণ" নেই। এখানে "No determination" কথাটার মানে নিয়ে গোলমাল। জেম্‌স্ এই যুক্তির গলদ আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলেছেন :

"Is by not take heed to the meaning of what is said ? When we make the prediction concerning pure being, our meaning is merely the denial of all other determinations than the particular one we make." (James, Ibid, Pp. 282-83)

এখানে কেবল কথার মারপ্যাঁচ ছাড়া আর কিছু নেই।

* "Pure being has no determinations. But having none is itself a determination. Therefore, Pure Being contradicts its own self and so on. (James)

ভ্রান্তির কথার ছটায় হেত্বাভাসকে (fallacy) ঢেকে রাখা যায় প্রাকৃত লোকের হাটবোরে বৈঠকী কথাবার্তায় অনিয়ে। কিন্তু নাস্তিকের রাজ্যে যেখানে চুলচেরা যুক্তি ও শাণিত-বিচার অষ্টপ্রহরই উচ্চকিত হয়ে আছে, সেখানে কথার গলদ ঢাকা যায় না। "No determination" কথাটার মানে এখানে যাই "No determination" নয়। কারণ determination যে নেই, এও তো একটা determination।* কাজেই ন্যায়সঙ্গত (logical) আকারে যুক্তিটা প্রয়োগ করলেই স্ববিরোধ কর্পূরের মত মিলিয়ে যাবে। জেম্‌স্ এখানে একটি রসাল উপমা দিয়ে একে নিরসন করেছেন। উপমাটা এই : একদা কোন হস্তি বিক্রেতা বিজ্ঞাপন দিয়েছিল— "নিজে ছাড়া জগতের অন্যসকল হস্তি থেকে বৃহত্তর হাতী।" এখানে নিজে ছাড়া কথাটা নিতান্ত নিষ্প্রয়োজন বোধ করলো কেন ও? জেম্‌স্ বলেছেন যে লোকটা নিশ্চয় কোন হেগেলীয় দেশে গিয়েছিলো এবং কাজেই হেগেলীয়দের থেকে আত্মরক্ষা করবার জন্যই অমন অপ্রয়োজনীয় জানা কথাটাও নিরর্থক যোগ করে দিতে হয়েছিল। কারণ, এ ভয় ছিল যে হেগেলীয়রা এসে হয়ত তাকে বলবে : "সব হাতী থেকে বৃহত্তর - এতে স্ব-বিরোধ (self contradiction) রয়েছে, হাতী একই সঙ্গে একই কালে নিজের থেকে বড়ো এবং নিজের থেকে ছোট, কারণ এই হাতী নিজেও তো জগতেই রয়েছে। কাজেই অতঃপর এ হাতীর এই স্ব-বিরোধকে (self-contradiction) বৃহত্তর সমন্বয়ে (synthesis) সমাধান করা ছাড়া আর উপায় নেই। কাজেই নিয়ে এল সেই উচ্চতর সমন্বয় বা সংশ্লিষ্টি (higher synthesis)। আমরা এরকম বিমূর্ত (abstract) হাতী চাইনে।" জেম্‌স্ —এর নিজের ভাষা ও ভঙ্গীতে এবার আরো উপভোগ্য :

"The showman who advertised his elephant as "larger than any elephant in the world except himself," must have been in an

Hegelian country where he was afraid that if it were less explicit the audience would dialectically proceed to say : This elephant, larger than any in the world, involves a contradiction, for he himself is in the world and therefore endowed with the virtue of being both larger and smaller than himself,—a perfect Hegelian elephant, whose immanent self-contradictoriness can only be removed in a higher synthesis ! We don't want to be such a mere abstract creature as your elephant..." But in the case of this elephant the scrupulous showman nipped such philosophising and all its inconvenient consequences in the bud, by explicitly intimating that larger than any 'other' elephant was all he meant." (Pp. 262—63)

উপরের আলোচনায় দেখা গেছে যে, সত্যি সত্যি হেগেলের অভিনব ডায়ালেকটিক নীতি বাস্তবে যুক্তিলোকে কোথাও সত্য নয়। একই স্থানে ও কালে কোন বস্তু একই সঙ্গে হাঁ বা না (yes or no) ইত্যাদি পরস্পর-বিরোধী সংজ্ঞার বিষয় হতে পারে না। ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, কালে ও অর্থে হতে পারে। এই তত্ত্বই আরোহী ভায় বা Formal logic-এর অভেদ-নীতির (Law of Identity ও Non-contradiction) সার কথা। কিন্তু হেগেল এই নীতিকে অস্বীকার করে বলেছেন বিরোধ (contradiction) জগতের সর্বত্র সকল বস্তুতে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে আছে এবং একই স্থানে কালে হাঁ ও না দুই-ই যে কোনো বস্তু সম্বন্ধে বলা যেতে পারে। হেগেল অভেদ-নীতি ও বিরোধ-নীতির (Law of Identity ও Law of Contradiction) বিরুদ্ধে যে সব যুক্তি দিয়েছেন সেগুলিকে আমরা এখন বিশ্লেষণ ও পরীক্ষা করে দেখব তাতে যুক্তিযুক্ততা বা সত্য কতখানি আছে। তিনি যে সব দৃষ্টান্ত দিয়েছেন সেগুলিও তাঁর নীতিকে কতটুকু সমর্থন ও প্রমাণ করছে তাও এই সঙ্গে দেখবে।

হেগেল বলছেন, অভেদ-নীতি Law of Identity) নিতান্ত অর্থহীন, কারণ রাম হয় রাম ('Ram is Ram)' একথার কোনো মানে হয় না এবং একটা বচনের (proposition) মূলনীতিই হল এই যে উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় predicate) দুটোই ভিন্ন ভিন্ন হওয়া চাই ; এখানে উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় (predicate) একই বস্তু ও term। এ যুক্তি হেগেলের একেবারে সামুলী 'রাম হয় রাম'-এর কথা। প্রকৃতপক্ষে গভীর মানে রয়েছে। মানুষের বা প্রত্যেক ব্যক্তির অভিন্নতা (identity) যদি গণ্ডগোল হয় তবে সংসারই অচল হবে, একথা হেগেল খেয়াল করেন নি। মানুষের জ্ঞান ও জ্ঞানের সত্যতা নির্ভর করে পারিপার্শ্বিক বা স্থিতিভূমির উপরে। এক পারিপার্শ্বিকে 'রাম হয় রাম' অপ্রয়োজনীয় কথা মনে হলেও অবস্থান্তরে এই সাধারণ উক্তিটারই অলঙ্ঘনীয় প্রয়োজনীয়তা তীব্র হয়ে ওঠে। 'রাম হয় রাম'—এ-কথা বলার মানে আছে এই জন্যে যে 'রাম' যে 'রাম' নয়, এ ভুলও কোনো কোনো ক্ষেত্রে হবার সম্ভাবনা আছে। যেমন হেগেল নিজেই ভুল করেছেন। মিথ্যা জ্ঞানের সম্ভাবনা আছে বলেই অভেদ-নীতির (Law of Identity) দরকার আছে। এই জন্যে হেগেল স্বীকার না করলেও পোষ্ট অফিস থেকে শুরু করে আদালত পর্যন্ত সর্বত্রই অভিন্নতা (identity) নির্ধারণের দরকার এত প্রবল। জগতে অভিন্নতা নির্ধারণ এত প্রয়োজন সবাই বোধ করেছে যে, এই জন্যই জগৎটা পাগলা গারদ হয়ে যায় নি। চিন্তার ও মননের মূল নীতিই হচ্ছে এই অভিন্নতা নির্ধারণ। ব্যবহারিক ক্ষেত্রে যদি এর এত প্রয়োজন রয়েছে, তবে দার্শনিকের সূক্ষ্ম-বিচারের ক্ষেত্রে, মননের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ও বিচারের ক্ষেত্রে তো এর প্রয়োজন আরো অনেক গুরুতর হবেই। আপাতোদৃষ্টিতে যাকে comical মনে হয়,

পৃথিবীতে তেমন অনেক কিছুরই গভীরতর অর্থ থাকে। বচন (Proposition) হলেই তাতে নতুন কিছু (novelty) বা আনকোরা নতুন জ্ঞান থাকে একথা প্রত্যক্ষ হয়ে ধরা দেবে এমন কথা অযৌক্তিক। যে জ্ঞান বা যে তথ্য অন্তর্নিহিত (Implicit) ছিল, তাকে প্রকট (explicit) করলেই যে কোনো বচনের (proposition) সার্থকতা সিদ্ধ হয়। সকলেই জানে এমনই ধরণের নতুনত্বের দাবী করে মিল (Mill) সমালোচনা করেছিলেন ত্রাবয়বীকে (syllogism)। আজও কেউ কেউ সেই সব পুরানো যুক্তির পুনরাবৃত্তি করলেও, একথাও সবাই জানে যে মিল্-এর ওসব যুক্তি একদেশদর্শী। ভুলের সম্ভাবনাকে প্রতিরোধ করে—বিশেষতঃ যে ভুল সকল জ্ঞানের ও ব্যবহারের জগতে গলা-পালট এনে দেবার ক্ষমতা রাখে—এমন ভুলকে প্রতিরোধ করে যে বচন (proposition) তার সার্থকতা অপরাজেয়। এবং অভেদনীতি (Law of Identity) অপ্রতিদ্বন্দ্বী ও অমর থাকবে চিরকাল—হেগেলের আক্রমণ সত্ত্বেও। হেগেল যখন বলেন যে টেবিল চেয়ার নয় (Table is not the chair), তখন একথাও একটা নিতান্ত মামুলী ও অর্থহীন ('silly') উক্তি বলে মনে হয় বই কি। একথা বলার দরকারটা কি? দরকার হলো এই যে টেবিলই চেয়ার (Table is the chair) এই ভুলের সম্ভাবনা কারো কারো বেলায় থাকতেও পারে। কেউ বা ভুলেও বলতে পারেন যে টেবিলই চেয়ার। অথচ এই ভুল ও মিথ্যা ধারণার প্রতিরোধী হিসাবেই টেবিল চেয়ার নয়'-এর (Table is not the chair) সার্থকতা।*

এই কারণে 'রাম হয় রাম' (Ram is Ram) এই আপাত নিরর্থক উক্তিটিরও সময়ান্তরে সার্থকতা আছে, যখন অভেদ-জ্ঞান ভুল ও মিথ্যা জ্ঞানের গর্ভে লীন হয়ে যায় এবং আমাদের চোখের সামনে থাকে না, সেই সময়ে অভিন্নতাকে (identity) স্মরণ করানোই তখনকার নতুন জ্ঞান—মানে, যে-জ্ঞান অপ্রকট ছিলো তাকে প্রকট (explicit) করা হল। তারপর উদ্দেশ্য (subject) ও বিধেয় (predicate) হল দুটো term মাত্র; এগুলি নিরর্থবাচক term হবে, একথারও কোনো মানে নেই। বাচনিক আকার (propositional form) বলতে এরা হেগেল যদি বুঝে থাকেন, তবে একে নিতান্ত commonplace মানে বলতে হবে। যে কোনো termকে উদ্দেশ্য-বিধেয় (subject-predicate) হিসাবে যুক্ত করার দোষ নেই যদি উদ্দেশ্য-বিধেয় সংযোজকের (subject-predicate 'copula) এই সমস্যার অর্থযুক্ত ও প্রয়োজনীয় হয়। আমরা দেখেছি অভেদ-বাচক প্রস্তাবের সার্থকতা আছে, কাজেই হেগেলের এই technical যুক্তি ভিত্তিহীন। (Logic, pp. 213-24)

তারপর হেগেল বলেছেন, 'universal experience' ও "practical common sense" জগতের সকল বস্তুতে আত্মবিরোধ অহরহই দেখতে পাচ্ছে। (p. 214, Logic) কিন্তু কোথায়? তিনি বলেন, অভেদ (Identity) বলে জগতে কোনো বস্তু নেই, যা আছে সে হচ্ছে সভেদ অভিন্নতা (identity with difference)

কিন্তু এতে কি অভেদ-নীতি (Law of Identity) ভুল প্রমাণ হল? একথা সবাই জানে যে, জগতে পুরোপুরি অভিন্নতা (identity) বলে কিছু নেই। জগতের বস্তুগুলো সবাই পরস্পরের সদৃশ ও অসদৃশ। একথা সর্বস্বীকৃত এবং এতত্ত্ব হেগেলের নতুন আবিষ্কারও নয়। তবে হেগেল কি বলতে চান? জগতের প্রত্যেক বস্তু অন্যান্য বস্তুর সঙ্গে সদৃশ ও অসদৃশ, এতে হেগেলীয় স্ব-বিরোধ (self-contradiction) নীতি প্রমাণ হচ্ছে না। বস্তুগুলো

---

*"The table is not the chair' supposes the speaker to have been playing with the false notion that it may have been the chair." (Ibid. W. James 290-91)

'সদৃশ' ও 'অসদৃশ' ভিন্নার্থে ও বিভিন্ন ভিত্তিভূমি থেকে। একই অর্থে সদৃশ ও অসদৃশ যদি বস্তুগুলো হত, তবে হেগেলীয় নীতি খাটত। কিন্তু এখানে প্রকৃত ব্যাপার অন্যরকম। বস্তুগুলোকে তুলনা করলে দেখা যায়, তাদের কতকগুলো দিক বা বৈশিষ্ট্য (feature) অপরের সঙ্গে সদৃশ আছে কিন্তু অন্য কতকগুলো দিকে (feature) আবার এদের অসাদৃশ্য রয়েছে। কাজেই সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য ভিন্ন ভিন্ন দিক থেকে ও ভিন্ন ভিন্ন অর্থে। একই অর্থে এবং একই বৈশিষ্ট্য (feature) সংক্রান্ত সাদৃশ্য ও অসাদৃশ্য যদি থাকতো তবে স্ব-বিরোধ (self-contradiction) দেখা দিত। ভিন্ন অর্থে তারা সদৃশ ও অসদৃশ,—("obtain in different respects"—James) হেগেল নিজেও অন্যকথা বোঝাতে গিয়ে, এ তত্ত্ব স্বীকার করেছেন: যেখানে তিনি বলছেন, কিন্তু সদৃশতা নয়, অস্তিত্বের আন্তর ঐক্য নির্ণয়ের কথা* কিংবা যেখানে বলছেন প্রভেদ আছে ধরে নিলেই তুলনায় আসে হয়; আর সেই প্রভেদ নির্ণয় করা যেতে পারে যদি মিল আছে ধরে নেওয়া হয়।‡

এখানে যে বস্তুটির কথা বলা হয়েছে তা বিরোধ (opposition) নয়, তার নাম স্বতন্ত্রতা (distinctness) বা অপরত্ব (otherness)। অথচ একে বিরোধ (opposition) বলে চালানো যায় কোন্ যুক্তিতে তা বোঝা দুষ্কর।

(ক্রমশঃ)

---

* 'not to rest at mere diversity but to ascertain the inner unity of all existence,' (p 219 Hegel)

‡Comparison has a meaning only upon the hypothesis of an existing difference, and that on the other hand, we can distinguish only on the hypothesis of existing similarity." (p. 218, Logic)

অনিল ব্লাকের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতোগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন

নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে; নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩১২, গান্ধুলী বাগান, কলি:-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

হিরোসিমা

পথচারী

একটি পুরানো দিনের কথা। এই ফোনে ডাকাডাকি, 'শো'-র ঘরভরা লোকের আনাগোনা—সব দিনিয়ে আমার অফিসটা সেদিন ছিল 'অলসেন' ও 'জনসন' গীতিনাট্যোৎসবের পঞ্চাশঘরের মতো।

ব্যবস্থা-মত প্রশান্ত সাগর ফেরতা এক ভূতপূর্ব সৈনিকের সঙ্গে মোলাকাৎ করতে হল আমায়। আরো হাজার ছোকরার মত তারও ছিল 'শো' ব্যবসাতে নামবার আগ্রহ। সুযোগ যদি হঠাৎ করে এসে পড়ে, আমিই যোগাযোগ করে নেব—বলেছিল তাকে। আর আমার তাড়া আছে জানিয়ে মুমিনিটের সাক্ষাতের জন্য ক্ষমা চেয়ে নিলাম তার কাছে। সেও একটু হেসে দরজার দিকে পা বাড়াল।

'—অত দরাজ হাসি কেন?' জিজ্ঞেস করলাম তাকে।

'ও কিছু নয়—অমনি,' বলল সে। আরেকটি বাস্তবাগীশ লোকের কথা মনে পড়ে গেল—তাই।

এমন চটে কথাটা বলল যে উৎসুক না হয়ে পারলাম না।

'বল না সে লোকটার কথা,' বললাম তাকে।

'না, তেমন গণ্যমান্য কেউ নয়,' বলল ভূতপূর্ব সৈনিকটি।

'সে আর তার বাবা ছোট একখণ্ড জমিতে একটু খেতি করেছিল। কিন্তু তাদের নাম আর ঐ জমিটুকু ছাড়া আর কোথাও তাদের মিল ছিল না বললেই চলে। যুড়োর ছিল সব ব্যাপারেই সহজ স্বচ্ছন্দ ভাব, আর ছেলে ছিল 'ধরি-মার-কৈরি' ধরণের।

একদিন সকালবেলা গাড়িতে সব্জি বোঝাই করে বলদ ছুটে চলল তারা শহরের দিকে। ছোকরা হিসেব করল দিন রাত সমানে পথ চললে শহরে পৌঁছে যাবে পরদিন সকালে। তাই লাঠি দিয়ে বলদটাকে কেবলি ঠেলা দেয়ে চলল সে।

'আস্তে সুস্থে চলো। দিন কয়েক বেশী টিকে যাবে,' বললে যুড়ো।

'আর সবার আগে হাটে পৌঁছলে ভালো দাম পেতে পারি,' বললে ছেলেটি।

যুড়ো টুপিটা চোখের ওপর টেনে দিয়ে সীটে বসেই ঘুম লাগাল। চার মাইল আর চার ঘণ্টা পথ চলে তারা দাঁড়াল এসে একটা ছোট্ট বাড়ির কাছে। 'এই যে তোর যুড়ো বাপের বাড়ি, আর একটু দাঁড়িয়ে দেখা করে বলে যাই ভালতো।'

দুই যুড়োতে গল্প করে পুরো এক ঘণ্টা কাটিয়ে দিল, আর ছোকরা ছেলেটি সারাক্ষণ উসখুস করতে থাকল।

'আবার চলা সুরু হল, এবার বলদ তাড়াবার পালা যুড়ো বাপের। রাস্তা যেখানে ভাগ হয়ে গেছে সেখানে এসে যুড়ো বলদটাকে চালিয়ে দিল ডানদিকে। ছেলেটি অমনি বলল' 'বাঁয়ের পথটা সোজা।'

'জানি, কিন্তু এ পথটা বেশী সুন্দর,' জবাব দিল যুড়ো।

'সময়ের কোনো দর্বাদাই নেই তোমার কাছে?' জিজ্ঞেস করল ছেলেটি।

'খুব আছে,' বলল যুড়ো। 'তাইতো ফুলের দিকে তাকিয়ে তার সদ্ব্যবহার করতে চাই।'

সন্ধ্যায়-সন্ধ্যায় তারা পৌঁছে গেল এমন এক যায়গায়

যা দেখতে বন্ত একটা বাগানের মতো। 'এখানেই ঘুমিয়ে নেওয়া যাক,' বললে বুড়ো।

'তোমার সঙ্গে এই আমার শেষ পথ চলা। টাকাকড়ি রোজগারের চেয়ে ফুলের ওপরেই তোমার টান বেশী,' হেসে বলল তাকে।

সূর্য ওঠবার আগেই ছেলে বাপকে ঝাঁকানি দিয়ে জাগিয়ে দিল; তারপর আবার ওরা চলতে শুরু করল। মাইল খানেক এগোতেই দেখা হল এক চাষী গোরুর সঙ্গে। সে বাপ থেকে তার গাড়িটাকে টেনে তুলবার চেষ্টা করছে। বাপ বললে, 'এস, একটু হাত লাগিয়ে সাহায্য করি।'

'অর্থাৎ আরো খানিক সময় নষ্ট করি!' বললে ছেলেটি।

'অত কড়া নাই-বা হলে। তুমি নিজেও তো একদিন বাপে পড়তে পার,' বললে বুড়ো।

গাড়িখানা আবার যখন রাস্তায় তোলা হয়েছে তখন বেলা আটটা। হঠাৎ আকাশটাকে চিরে দিয়ে বিজলী চমকে গেলো তারপরই বজ্রগর্জন। পাহাড়ের ওধারে আকাশ তখন কালো হয়ে এসেছে।

'শহরে জোর বর্ষা নেমেছে, মনে হয়,' বললে বুড়ো।

সময় মতো যেতে পারলে সবমাল বেচে দিয়ে খালাস হতে পারতাম আমরা,' গজ গজ করতে লাগল ছেলেটা।

'একটু ধীরে সুস্থে চলো। দুদিন বেশী টিকে যাবে,' বললে বুড়ো।

"বেলা গড়িয়ে গেল, বিকেল হল—তার আগে ওরা পাহাড়ের ওপরে উঠতে পারল না। পাহাড়টা দাঁড়িয়ে আছে শহরের গা ঘেঁষে। ওপর থেকে ওরা বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল নীচে ঐ শহরটার। দিকে যোয়ান ছেলেটির তো তাড়াহুড়োর অবধি ছিল না, এবার সে বললে, 'এতক্ষণে বুঝলুম, বাবা, তুমি কী বলতে চাইছ।'

"তারপর গাড়িখানা ঘুরিয়ে ফিরে চলল ওরা সেখান থেকে—যেখানে একদিন ছিল শহর হিরোশিমা।" •

(• মিশি রোচ-এর লেখা একটি গল্পের তর্জমা)

জয়শ্রী মাসিক পত্রিকার স্বত্ব ও অন্যান্য বিষয়ে বিবৃতি

[সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন রুলের ৪নং ফরম অনুযায়ী]

(৮নং রুল দ্রষ্টব্য)

১। যে স্থান হইতে প্রকাশিত হয় তাহার	ঠিকানা :	২০৯, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
২। প্রকাশের কাল :		মাসিক
৩। মুদ্রাকরের নাম, জাতি,		কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
	ঠিকানা :	১০।৬৯এ, বেলগাছিয়া শালদহ রোড, কলিকাতা-৩৩
প্রকাশকের নাম, জাতি,		কিরণচন্দ্র মিত্র, ভারতীয়,
	ঠিকানা :	১০।৬৯এ বেলগাছিয়া শালদহ রোড, কলিকাতা-৩৩
সম্পাদকের নাম, জাতি,		লীলা রায়, ভারতীয়,
	ঠিকানা :	৩১২, পাঞ্জুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭
৬। স্বত্বাধিকারীর নাম, জাতি,		লীলা রায়, ভারতীয়,
	ঠিকানা :	৩১২, পাঞ্জুলী বাগান, কলিকাতা-৪৭

আমি কিরণচন্দ্র মিত্র, ঘোষণা করিতেছি যে, উপরোক্ত বিবরণ সমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য। স্বাঃ

কিরণচন্দ্র মিত্র

প্রকাশক

১৬।৩।৬৬

মঞ্জুলিকা দাশ

[অরুশ্রীর দপ্তরে মঞ্জুলিকা দাশের এটি সর্বশেষ কবিতা। স্থান কালের প্রতি কবি মঞ্জুলিকা বরাবরই উদাসীন, কোন চিঠিতেই এসবের উল্লেখ থাকতো না। এ নিয়ে তাঁকে এক আধবার লিখেছি, কিন্তু আজ তিনি স্থান কালের বাইরে।

২৪শে ফেব্রুয়ারী ব্রাড-ক্যান্সার রোগে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সংবাদ আমাদের বিমূঢ় ও ব্যথিত করেছে। ব্যথিত করেছে প্রায় সকল সাহিত্য প্রেমীকে। তার প্রকাশ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় পেয়েছি। অরুশ্রীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় বিগত মাঘে (১৩৭১) ; এ পর্যন্ত তাঁর দুটি কবিতা অরুশ্রীতে প্রকাশ হয়েছে ; ১, 'সুখ এবং আমি' (মাঘ ১৩৭১), ২, সোনার —পুতুল তুমি (শারদীয় সংখ্যা ১৩৭২) অঃ সঃ]

মঞ্জুলিকা দাশের অপ্রকাশিত কবিতা

আমরা নিজের দুঃখ নিজে গড়ি নাকি ?
কিম্বা দুঃখ কিছু নয়,
অমল ধূপের মতো শুধু বেদনার গন্ধময়
জীবনের এই পরিচয়, সবই মেনে নিতে হয়,
সবই জেনে নিতে হয়। সব অন্তরায়
শুধু অবসর বিনোদন ছলে ভাবে, আকাশ পাতাল ভাবা
ছাড়া আর কিছু নয়,

দু'হাত কালের মধ্যে বন্দী সারাদিন
তার ফাঁকে খুলে আরক্তিম সূর্য দেখে
আকাশে আলপনার দিকে কিম্বা
ভিন্ন সুরে বুক চিরে ভাবা কোন আকাশকুসুম।
তার চেয়ে অবসর কাটানো মধুর যুক্তি
ভিক্ততার পরিবেশ, রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের সাথে বোঝাপুড়ি
ভিন্নচোখ, ভিন্ন মুখ, ভিন্ন সব মানুষের পরিচয়
স্বার্থের সংঘাতে,

বিচারের মঞ্চে বসে কারা অন্ধের পুতুলি মতো,
দু'নয়নে দেখেও না দেখে চলে।
বিনাদোষে বজ্রপাত, আকস্মিক এই অশ্রুপাত,
মেঘ শূন্য, তাখো দূর, আকাশ নির্দোষ।
নীপ বেলা বেলে যায়, আমার ভিতরে
শুধু দিন নেই, রাত নেই, নেই কোন আলোর
রোশ্‌নাই তারা।

অন্ধকার হয়ে থাকা বুক কিম্বা
বুকের জমাট দুঃখ, এত সূক্ষ্ম,
কিম্বা এত স্থূল দুঃখ পেতে পেতে
বাঁধানো কংক্রিট, মনে হোক অশ্রুপাতে।
শোনো, দর্পণের প্রতিবিম্বে যায় না দেখানো আর,
এ বুকের চারধার, অন্ধকার, গাঢ় অন্ধকার।
দু'চোখের কালছিট ছাড়া যায় না দেখানো কিছু ?

দুঃখ বা অপমানের কোনও রং নেই ?
বিবর্ণ মুখের চিহ্নে প্রতিভাস, তাকে দেখা যায়।
মানুষ এখন তাখো কী সহজ ভাণ ভনিতায়,
সুন্দর লুকোতে পারে নির্লজ্জ অভদ্রতাকে লজ্জাযুক্ত
মুখের মুখোসে।
তাই আজকাল মানুষের মুখ দেখে মনোভাব বোঝা যায়।
কঠিন জীবনে শয়তানের মহড়ায়,
কুটিল চক্রান্ত বর্মে ঢাকা আবরণ
ছিঁড়ে নিলে, আমি সেই সব মানুষের···।

সাঁওতাল অরবিন্দ ভট্টাচার্য

শালের পাতার ফাঁকে বাতাসের ঝিরঝিরি সুর
চিবুকে উলাড় করে মৃদু হেসে শুধালো আমাকে,
'বাবু তুই কুথা যাবি ?' 'রাজবাড়ী।' আবার মধুর
পাখির কাকলি শুনি—'রাজাবেটা উই হোথা থাকে।'
রাজার বেটার সুখ তাহা 'পড়ে' সমান জিজ্ঞেস :
হেসায় করেছে দখ—আমি বলি এসে,
'তুই কোথা যাবি ?' দেহে ঢেউ তুলে নিয়ে
বলল, 'আমার ঘর উই নদী বেঁধে।'

সুবর্ণরেখার হাত ওর চোখে মণি হয়ে ভাসে,
চরণে আহুতি নাচে : 'বেলা হ'ল, মুই যাবো ঘর।'
'চল্ তোর সাথে যা'ব।' অবুঝ ওরাসে
শিহরণ জাগে দেহে—'তুই রাজা, তোর
হোথা কি যাবার আছে ?' আষাঢ়ে-বাদল
জমাট নিটোল রূপে, স্তন-ভাঁজে নাচে
বহুরা ফুলের নেশা—বললাম, 'চল্ যাবো, চল্।
যা' কোন রাজার নেই তাই তোর আছে :
আছে সুখ, আছে শান্তি, তৃপ্তি, হাসি, আলো।'
আবার দেখালো মুক্তো সার-বাঁধা হাঁসের মতন—
সে হেসে বলল, 'মুই নাচ জানি ভালো।'
বাঁধা নেড়ে সায় দিল মদমত্ত ঘন শালবন।

রাজা নয়, রানী নয়, বাঁচবার অপার জিজ্ঞাসা
বুকে নিয়ে বেঁচে আছে নিষ্পাপ শিশুর মতন :
মাদলের ধ্বনি আর মনে রাঙা বহুয়ার নেশা
লাল মাটি পায়ে রেখে, শিরে রেখে নীল আবরণ।
রাণী নয়, পত্নী নয়, দেহ-ভাঁজে বে-আবরু ঢেউ
তুলে পথ চলে মেয়ে, গান গায়, নাচে, কথা বলে—
সভ্যতার পদশব্দ শালবনে শোনে না'ক কেউ,
পৃথিবীর খোঁজ নেই ক্লান্তিহীন নীলমুখী জলে।

মিল চিত্র ভানু

সন্ধ্যায় ফিরেছে ঘরে একে একে গৃহস্থের গরু
দূরান্তর পরিধির প্রান্ত হতে গৃহের মতন
মাঠে, ঘর কোণে কোণে। কতো যে বিচিত্র পন্থা ধরি
সরল কুটিল আলো অন্ধকারময়, পড়ি-মরি
ছুটেছিল ঊর্ধ্বশ্বাসে কুলি ও মোজুরি অন্বেষণে ;
এখন শিথিলতর, গুটানো-উদ্যম গৃহকোণে,
সংবৃত বলয়ে এসে, স্থির হয়ে হোল অধিষ্ঠান।
মজুরির তলপাদী ঘুমন্ত শিশুর অনুমান
স্নেহের প্রবল দাবী বিধাতার আদেশের মতো,
অনায়াসে ইচ্ছার সহস্রধারা করেছে সংহত।
ঘরে ঘরে দারিদ্র্য ও সম্পদের বিচিত্র বিন্যাস ;
ভিন্ন মন, ভিন্ন রুচি, ভিন্ন মত, বিভিন্ন প্রয়াস
বিকাশের লক্ষ পথ খোঁজে। পরিধিতে মিল নাই,
অমিলের সাদা কালো ব্যবধান রচিছে সদাই।
তবু কী নিবিড় মিল স্বভাবের গভীর গহনে,
প্রাণের সম্বল ভাষা প্রাণের আশ্রয় বিরচনে।

সৃষ্টি কবিতা ॥ পার্কে ॥ শঙ্করানন্দ মুখোপাধ্যায়

কেন যাও সবাই এখন, বৃদ্ধ থাবা পেতে আছে,
হিংস্রক গুহার চারিপাশে ফুল ফোটে,
কর্পোরেশনের পার্কে ঘুঘো মালি গাছে জল ঢালে—
পাতা ছাঁটে লাল পাতা, মাঝে মাঝে সাবধান করে
বেপাড়ার ছেলেকে মেয়েকে……
জেট বিমানের সাদা প্রলেপ যেমন ঐ সমস্ত আকাশে
পাকা চুল অভিজ্ঞতা তার তাহা দাঁত সাবধান করেছিল ;
সমস্ত নীলিমা শ্যাম সবুজ পাখির
উজ্জ্বল শাড়ির সমারোহে
ভীষণ চাবুক এক ছুঁড়ে দিয়েছিল কোন শীতের সার্কাস।
এইসব কথা ভেবে সকালবেলায়
মনে হল যাই
রীণুকে হয়ত শেষ কিছুকাল আজো দেখা যাবে
যতক্ষণ আমি আছি আমার ভিতরে।

কলিকাতার বিপদ — বিশ্বনাথ রায়

কলকাতাতে পথে চলার বিপদ যে ভাই কত,
প্রাণটী নিয়ে ফিরেও যে হয় সর্ব্বহারার মত।
ট্যাক্সি, লরি, টেম্পোগাড়ী চাপাই দেয় বা বুঝি,
প্রাণ বাঁচাতে নিরাপদের ঠাঁই যে শুধু খুঁজি।
ফুটপাতেতে দোকান পসার সাজিয়ে রাখে যেলা,
তাও বাঁচিয়ে উঠতে যে হয় বিপদ আসার বেলা।
তাতেও যে ভাই রক্ষা নাহি, কারেন ওরে ভর',
চলতে গিয়ে পদে পদে ঠোকর খেয়ে মরা।
সদর ছেড়ে গলির পথে যদি বা কেউ যায়,
উপর থেকে মাথায় পড়ে সেওত বিষম দায়;
কি যে পড়ে কাপড় ছোড়া খুলে গেলেই হ'ল।
দেখতে নাহি পাবে কারেও কাথায় থেকে এল।
কখনও বা ছাড়িয়ে দিল ময়লা কাপড় জামা,
রাগের বশে তাকিয়ে দেখা একটুখানি থামা,
দেখ যে তখন জিভটী কেটে সুন্দরী কেউ এসে
দাঁড়িয়ে আছেন পরাক্ষেতে একটু খানি হেসে,
বেকুব হয়ে তাকিয়ে থাকেন হাতটী করে জোড়,
তখন তুমি হ'বে বেকুব চোখে কিসের ঘোর।
রাগটী কোথায় যাবে চলে চাইবে এমন করে,
মানে যে তার কিছুই এ নয় আরও ফেল এর পরে।
বাসে ট্রামে উঠতে গেলেই চরণ রাখা দায়,
ব্লেড পাইপের ভাঙ্গটী ভেঙ্গে নাকের দাওয়াই লয়।
মনিব্যাগ ও কলম নিয়ে পকেট থাকুলে ভারী,
কিছু ক্ষণেই হাত সাফাইয়ের কেরামতিটা জারী।
ভেতরে গিয়ে বসার আগেই হেঁচকা টানের পালা,
টাল সামলাতে না পেরে ভাই সেওত বিষম জ্বালা;
হয়ত কোন সুন্দরীরই কোলে পড়লেন বসে,
সাথের স্বামীর সঙ্গে তখন ঝগড়া বাধুক কসে।
তখন তিনি থামেন না যে পাড়েন শুধু গালি,
অবাক হয়ে সকল মানুষ যোগান তারে খালি।
বলতে হ'বে বারেক মশায় আমার বাড়ী গেলে,
গিন্নি আমার বলবে তখন তোমায় নিয়ে কোলে।
তার সঙ্গে এক এক পেয়ালা চাও মিলিতে পারে,
তবেই যদি রাগটী কমে চাইবে অন্য ধারে।
এই ভাবেতে এসে যখন নামবে তুমি শেষে,
দাঁড়িয়ে নয় শুয়ে আছে ধুলায় ধূসর বেশে।
উঠে শেষে ঝেড়েঝুড়ে ফুটপাতেতে যাও,
রিক্সা ডেকে তাতেই চড়ে বাড়ীর পানে ধাও।
বাড়ীর লোকে বলবে তখন এমন কিসে হাল,
এমন করে বল দেখি কাটবে কত কাল?
ঘটল কেন নতুবা যে এই ভোগান্তি আছে,
শুনবে নাত ভাল কথা খরচ হয় যে পাছে।
ব্যাঙ্কগ্যারান্টির দরখাস্তটা দিলে যা হোক্ করে,
মিলবে তখন নূতন গাড়ী ছয়টী বছর পরে।
ছয় বছরে মিলল যাহা ছয় মাসেতেই তার,
পিস্তার অচল ব্রেক ধরে না ঠেলেই হ'বে পার।
কিছুক্ষণের বৃষ্টিপাতেই রাস্তা ভাসে জলে,
ছুতা হাতে কাপড় মাথে চলবে দলে দলে।
ট্রাম বাস যে চলতে নারে আটকে গাড়ী থাকে
চারি আনার রিক্সা তখন দুইটী টাকা হাঁকে।
এই ভাবেতেই কলকাতাতে বছর কাটে হায়।
বয়স বাড়ে বিপদ বাড়েই জীবন চলে যায়।
শেষ কালেতে ঠিক হ'ল এই বাড়ীর বাইরে আর
বের হবে না রইবে ঘরে বন্ধ করে দ্বার।

শরৎচন্দ্র

প্রথম খণ্ড : জীবনী

গোপালচন্দ্র রায়

সাহিত্যসদন, এ ১২৪ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা-১২। প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৪। পৃষ্ঠা ৪০০। দাম, ষোল টাকা।

সাহিত্যপ্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দের অল্প কয়েকটি কথা কিন্তু মনে হয় শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ রায় : 'হি হ্যাড্ প্রোফাউণ্ড্ ইমপ্রেশন্ পাওয়ার'—'উই হ্যাড্ বঙ্কিম, উই হ্যাড্ টেগোর এ্যাণ্ড্ শরৎ চ্যাটার্জি —দ্যাট্ ইজ্ এ্যাচিভ্‌মেণ্ট এনাফ্ ইন্ এ সিঙ্গল্ সেঞ্চুরি'।

তাঁর সম্পর্কে এদিকে বহু অপপ্রচার : ভণ্ডামি, ওণ্ডামি ভ্রষ্টাচার, বহু কটূক্তি, বহু অবমাননাকর রচনা,—এ সব সত্ত্বেও বাঙালি কেন শরৎচন্দ্রকে ভালবেসেছে, শ্রীঅরবিন্দের এই উক্তিতেই সে রহস্য পরিষ্কার হয়। কিন্তু তাঁর সম্পর্কে পণ্ডিতসমাজের এখনো স্পষ্ট দ্বিধা ; তাঁদের ভয় ও সংশয় যায়নি। অনেকের মত, তিনি কেবলমাত্র গল্পকার। এরকম মত কেবলমাত্র এদেশে তাঁর সম্পর্কেই নয়, কিন্তু প্রশ্ন, গল্প কী! গল্প কি এতই সোজা! তবে তাঁরা পারেননি কেন, যার জন্য জীবিতকালেই লেখক হিসাবে তাঁরা মৃত, বিস্মৃত, স্মৃতিচ্যুত হয়ে রইলেন।

এত বাধা সত্ত্বেও শ্রীগোপালচন্দ্র রায় যে শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বহুদিন থেকে নিবিষ্ট গবেষণায় রত, অনুরাগী পাঠকমাত্রেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকার ভিতর দিয়ে তা জানেন এবং আনন্দ ও কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করেন। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে এই পর্বত প্রমাণ তথ্য-ইতিহাস-কাহিনী-কথা তিনি সংগ্রহ করেছেন : এর পিছনে কি পরিশ্রম সহিষ্ণুতা, শ্রম, ধৈর্য, সন্ধান এবং নিষ্ঠা,—ভাবলে অবাক লাগে। বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ তাঁর কাছে ঋণী,—বলতে হয়, আমাদেরও অপরাধের মাত্রা এই সঙ্গে অনেক পরিমাণে লঘু হয়ে রইল।

তাঁর এই বই প্রথম খণ্ড : 'শরৎচন্দ্রের জীবনী'। '২য় খণ্ডে শরৎচন্দ্রের মৌখিক আলাপ-আলোচনা, বৈঠকী গল্প, হাস্য-পরিহাস ও মৌখিক অভিভাষণ, ৩য় খণ্ডে শরৎচন্দ্রের চিঠিপত্র এবং ৪র্থ খণ্ডে শরৎসাহিত্যের আলোচনা থাকবে।'

এই বই তিনি 'জীবনী' বলেছেন। লম্বা ছাঁদের, বিরাট, ৪০০ পৃষ্ঠার বই। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে বই, সুতরাং সে কোনো সমস্যা নয়। সমস্যা বরং বই শেষ হতে থাকলে, বই শেষ হয়ে গেলে। এই বইতে শরৎচন্দ্রের 'জন্ম ও বংশপরিচয়,' থেকে আরম্ভ করে তাঁর মৃত্যুদিন পর্যন্ত এত ঘটনা, এত কথা, ইতিহাস, কাহিনী ভীড় করে আছে এবং সর্বত্র জুড়ে যে সেগুলি সম্পর্কে গুছিয়ে কোনো আলোচনা, এমন কি সংক্ষেপে মোটামুটি একটা পরিচয় পর্যন্ত দিতে মুস্কিল লাগে। শরৎচন্দ্র সম্পর্কে অনেক কথা আছে নূতন, অনেক কথা চমকপ্রদ,— যেমন একাদিক্রমে একবার একমাস 'পতিতালয়ে' বাস : আমরা জানি কি। রেঙ্গুন থেকে একমাসের ছুটিতে দেশে এসে হাওড়ার এক পতিতালয়ে উঠেছিলেন, উপেন গঙ্গোপাধ্যায়ের আবিষ্কার : উপরের একটা ঘরে বসে তখন 'চরিত্রহীন' লিখছিলেন। ৮৭

সাপুড়েদের থাকতে দেখা যায় শীতকালে দুপুরে বাগানে বসে সাপ পাহারা দিচ্ছেন। বাগানের মাঠে বড় বড় সাপ রোদ পোয়াতে আসত, তিনি পাহারা দিতেন, পাছে বাচ্চারা এদিকে এসে পড়লে ওরা পালিয়ে যায় : 'আহা! ওরা

একটু রোদ পোয়াচ্ছে, তোরা গেলে যে পালিয়ে যাবে।' ৩৯৪। আমার প্রয়োজনে এই মানুষই গুলি করে মাপ মেরেছেন। ২৩৭

তাঁর ভেদুর কথা ও সকলেই জানে; ভেদু মুকুল, 'ভেদু বেঁচে নেই। শেষদিন বড় যন্ত্রণা পেয়েই সে গেছে।··· পেট করে কড়া ওষুধ খাওয়াবার চেষ্টা করি, কিন্তু রাগের ওপর আমাকে কামড়ালে। সেদিন সমস্ত রাত আমার গলার কাছে মুখ রেখে কি তার কান্না। ভোর বেলায় সে কান্না তার থামলো।' ২২৩

একটি খালি ছাগল ছিল, তার নাম দিয়েছিলেন 'স্বামীজী'। ২৮৬

তখন দেশজোড়া তাঁর খ্যাতি, তখনকারদিনে মাসে ৮।৭ শ টাকা আয়, অথচ অভিমান নেই, গ্রামে গ্রামের মানুষ হয়ে মিলে মিশে আছেন। ছেলেদের খেলার মাঠে আছেন, বিপদের দিনে বড়দের সঙ্গে রাত্রিতে হাসান আলিয়ে বন্যার বাঁধ দিতে কোদাল হাতে মাঠে নেমে এসেছেন। এখানে একটি করুণ ঘটনা আছে: কবরস্থ একটি শিশুর দলিত দেহ মাটির চাবড়ার সঙ্গে তাঁর হাতে এসে পড়ল। তাঁর শান্ত প্রতিক্রিয়ার বিবরণটুকু সুন্দর,—যেন অন্ধকারে আচমকা জোরালো টর্চের আলোয় আর এক মুখ: তিনি নয়. —শ্রীকান্ত। ২৩৬

তাঁর হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা এবং গরীবের সেবা শুশ্রূষার কথা জানি কিন্তু রাগ করে একশ' টাকার খড় কেনার গল্প। ভাগ্নের উপনয়নের দিনে এইটিই তাঁর বিচিত্র উপহার: ভগ্নিপতির একটি পাদুই একশ টাকায় কিনে তক্ষুণি 'কাহার'-দের মধ্যে বিলি করে দিলেন: 'তোদের···চালে তো খড় নেই। মুখুজ্জে মশায়ের একটা খড়ের গাদা···তোরা ভাগ করে নে।' ৪০৪

গ্রামে মেয়েদের স্কুল নেই, একটা স্কুল করে দিলেন, সে-স্কুল এখন অনেক বড়। ২২৮। একবার দারুণ গোলার উপদ্রব হলে, তিনি ম্যাজিস্ট্রেটকে ধরে পুলিশ আনিয়ে রক্তারক্তি ঠেকালেন। ২৬৮-৭০। এর ফলও অবশ্য হাতে হাতে হয়েছে: প্রথমে সমাজে 'ব্রাহ্মণদের দ্বারা পতিত.—তাতে সুবিধা না হলে নিধ্যে মামলা। ঠিকই হয়েছে কারণ তাঁর মত মানুষের জানা উচিত যে লাগরের তিনি-র পুহুরে চলে না। উপদ্রব বৈকি। অহেতুক উৎপাত। শেষদিকে দেখা যায় তিনিও বেশ তিক্তবিরক্ত: 'ভাবছি এটা [ঘামলাটা] কোনমতে শেষ হলেই পালাব। শরীরই মোটের উপর সুসহ।' ২৭২

ভুলে যেতেন। একদিন অসময়কে খেতে বলে ভুলে গেছেন। ও, 'তোমার নিমন্ত্রণ ছিল' নাকি? আচ্ছা 'তাহলে ·· অল্প করে দুটি খাও'। কারণ মোটামিকালে একটা পার্টি. তাঁকে নিয়ে সেখানে যাবেন। পিয়ে জানা গেল, পার্টিটা রবিবারে ঠিকই কিন্তু পরের রবিবারে। ৪০৮-১১। চিঠির উত্তর দিতে ভুলে যেতেন, দিয়ে ভুলে যেতেন, না ·· দিয়ে ভাবতেন দিয়েছেন। বাসারাদিকে লিখছেন, 'আগের চিঠির জবাব দিইনি—হবেও না।·· দিই দিই করেই মাসখানেক কেটে যায়, তারপর সমস্ত ভুলে যাই।·· দিন তিনেক আগে তোমাকে একখানি মস্ত বড় চিঠি লিখেছিলুম পাঠিয়েছি না ছিঁড়ে ফেলেছি,·· মনে পড়ছে না।' ৪০৬-৭। বার্মায় একবার উল্টো ট্রেনে উঠে পড়েন। একবার প্রুফে, 'যেমনি ভুল ছিল তেমনি ছাপা হয়ে গেল,' নিজে লিখছেন,' সে বড় দুঃখের।···এই ইচ্ছাকৃত ভুলের জন্য যিনি দায়ী, অন্তত দায়িত্ব যার পরে তাঁর দণ্ড হওয়া উচিত।' কিন্তু দণ্ড তাহলে তাঁরই নিতে হয়, কারণ, 'দেখা গেল ভুলটা কাটিয়া দিতে আমিই ভুলিয়াছি।' ৪০৭-৮।

বেশভূষা, কলমের শখ, এসবের বিস্তৃত বিবরণ লেখক দিয়েছেন। কুড়ি বাইশটা দামি কলম ছিল। লেখার সময় দশ বারোটা কলম নিয়ে বসতেন। তার একেকটায় একেক-রকম কালি। নিব সূক্ষ্ম, অতি সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম। 'পথের

দাবী' লেখার সময় রমাপ্রসাদবাবু ওঁকে একটি কলম দিয়েছিলেন, সেই কলমের নিব যখেষ্ট সরু নয় অতএব সরু নিব গুঁজে আমার জন্য তাকে রওনা করিয়ে দেওয়া হল আমেরিকা, কারণ এখানে অত সরু আর ছিল না। প্রিয়জনকে প্রেম উপহার দিতে কলম 'তাকে আমার হাতের কলম দিয়েছি কেন না এর চেয়ে ভাল জিনিস আর আমার দেবার নাই।...আমার কলমের যেন অপমান না হয়।' ৪১৪।

লোয়াকে আমাকে কখনো আদীর, কখনো ফকির: 'আমা, ধুতি, চাদর সবই নিজের ...।...জপার খালা, গেলাস বাটিও ব্যবহার করতেন বাইরে বেরোবার সময় একটা উড়ুনি, না হয় একটা চাদর সব সময়েই তাঁর কাঁধে থাকত। হাতে ছড়ি · অনেক রকমের ছড়ি ছিল··· সব ছড়িই ···খুব দামী ···রকমারি চশমা....রীমলেশ সোনার চশমাও··· পরতেন। জুতো হরেক রকমের....তালতলার গুঁড়তোলা চটি ওঁর প্রিয় ছিল।' আবার উল্টো বর্ণনা কেদার বন্দ্যো-র রচনায়: 'নানা কথা চলতে লাগল।—আমার লক্ষ্য কিন্তু মানুষটির উপর। খুব সাদাসিধে চাল— ক্যাম্বিসের জুতো— তাও পুরো নয়—গোড়ালি নই! টুইল শার্ট— তাও পুরো নয়—দু-একটা বোতাম নেই। দাড়ি—তাও পুরো নয়— বাদসাদ দেওয়া। এই ভাব। বলপুর— আপনাকে বড় কাহিল দেখছি।— না আমি বরাবরই এইরকম।' 'শরৎচন্দ্র গায়ে বা মাথায় তেল মাখতেন না।... ফলে চুল সবসময়েই উস্কো-খুস্কো থাকতো'। শ্রীকান্তও তাই। 'বাড়ীতে প্রায় সকল সময়ই খালি পায়ে থাকতেন...কখনো কখনো কাপড়কে দু ভাঁজ করে লুঙ্গির মতন....পরতেন গৈতাকে মালার মত করে গলায় ঝুলিয়ে রাখতেন।' ৩৯৫-৯৯

অনেক খবর: গ্রামে পাশের বাড়ির নিবারণ ঘোষাল ওঁর 'খুড়ো', যে সে ব্যক্তি নয়, 'দফাদার', এরকম শরৎচন্দ্রের অনেক,—চিরকাল। দফাদার খুড়ো রোজ সকালে সন্ধ্যায় ওঁর বাড়িতে চা খেতেন। এ হেন ব্যক্তির কাছে একদিন এস. ডি. ও. শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসে পা ধোওয়ার জল চেয়ে বসলেন। যে-যাল ব্রাহ্মণ, প্রবীন,—এস ডি. ও. কোনটাই না। 'জলটা বেকাল, মনে হয় নার্ভাসনেস, কিন্তু মুখ থেকে বেরিয়ে গেছে উপায় কী। তারপর এস. ডি. ও-র পিছন পিছন বাড়িভর্তি, বাড়ির বাইরে দাঁড়ানো, সারা গ্রামের লোক। শরৎচন্দ্র নিবারণকে বললেন, 'খুড়ো ধান।' এস. ডি. ওকে বললেন, আপনি সরকারের বড় চাকর, ও ছোট চাকর, কিন্তু আমার বাড়িতে ও আপনাকে পা ধোবার জল দেবে কেন মশাই! 'যান···যা পারেন করুন গিয়ে।' ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ নিয়ে শরৎচন্দ্রের বন্ধু হাওড়ার ম্যাজিস্ট্রেটের একখানি ব্যক্তিগত চিঠি খেজুর বয়ং বহন করে এনেছিলেন, এখন কাঁচুমাচু, জড়সড়, একবাড়ি লোকের সামনে অপ্রস্তুতের একশেষ। শরৎচন্দ্র কিন্তু আর কথাই বললেন না, চিঠির কথা শুনে হাত বাড়িয়ে চিঠিটি নিয়ে উপরে উঠে গেলেন। ৩৭২

পাবলিক প্রসিকিউটার সার তারকনাথ সাধুর কথা কি আমরা জানি? শরৎচন্দ্রের পরম ভক্ত, প্রকৃত অনুরাগী ছিলেন এই মানুষটি। পথের দাবী কেন্দ্র করে প্রচুর কৌতূহল এবং উত্তেজনা দেখে। পুলিশ কমিশনার স্বয়ং কলসন্ সাহেবের পরিষ্কার স্বীকারোক্তি শরৎচন্দ্রের কাছে: 'আমরা যেখানেই বিপ্লবীদের ধরছি···দেখছি,···সকলের কাছেই একটা করে গীতা ও·· পথের দাবী'। ১৯৭। সার সাধু শরৎচন্দ্রকে আড়াল করে শুধু বইখানি বাজেয়াপ্তের ব্যবস্থা করেন। রবীন্দ্রনাথ যে বলেন, "তোমাকে কিছু না বলে তোমার বইকে চাপা দেওয়া প্রায় ক্ষমা," ২০৮, সেটা ঠিক না। প্রকাশকেরও ক্ষতি হয়নি। জ্ঞানাঞ্জন নিয়োগীর 'বিপ্লব' মামলার সাক্ষী শরৎচন্দ্রকে আবারও তিনিই কাঠগড়ায় উঠতে দিলেন না: 'তাঁকে কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে প্রশ্ন করাটাকেই তারকবাবু যেন নিজের পক্ষে লজ্জাকর ও অপমান-জনক বোধ করতে লাগলেন।' ৩৬৯

ছোট ছোট সুন্দর এই কাহিনীগুলি ; চমৎকার লাগে।

তাঁর কাছ থেকে লেখা আদায়ের একটি কাহিনী বলেছেন লেখক ১৩৪-৩৫ পৃষ্ঠায় সাহিত্যিক নলিনীকান্ত সরকারের জবানীতে,—এখন শান্তিনিকেতনে,—কিন্তু ঘটনাটা আনুপূর্বিক দিলে ভাল হত। নলিনীকান্তকে দুটি বছর যে ঘুরিয়েছিলেন তাও একটা আর্ট,—অনুকরণীয় শরৎচন্দ্রীয় আর্ট – সেটি বাদ দিয়ে পাঠককে বেশ বঞ্চিত করেছেন লেখক।

৩০৬ পৃষ্ঠায় আর একটি অপ্রকাশ্য সংবাদ : শরৎসম্বর্ধনার সেদিন বাঙলার মহিলারা 'পৃথকভাবে তাঁকে মানপত্র দিয়েছিলেন'। বেশ ভাল লাগে ভাবতে।

…'নিখিল নারীচিত্তের… প্রকৃতিজাত বৈশিষ্ট্যগুলি তাহার অকৃত্রিম রূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছ, হে অন্তর্যামি,… নারীর পরম শ্রদ্ধেয় বন্ধু হে নারীহৃদয়ের মরমী কবি, আমাদের পরম প্রিয় তুমি, পরম আত্মীয় তুমি,…তোমাকে আমরা ভালবাসি · আমরা আমাদের হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতে আসিয়াছি।'

লেখক ঠিকই বলেছেন যে 'শুধু আমাদের দেশেই নয়, পৃথিবীর অন্য দেশেও কোন লেখককে তাঁর দেশের নারীরা এই-ভাবে অভিনন্দন জানিয়েছেন বলে কই শোনা যায় না।' ৩০৫

শরৎচন্দ্রের মৃত্যু সম্পর্কে সাধারণ বিশ্বাস যে তাঁর অন্ত্রে অস্ত্রোপচার সফল হয়নি। দেখা যায় তা নয়, তারপরেও বেশ সুস্থ ছিলেন, ভাল হয়ে উঠছিলেন। কীরকম ভ্রম, মুখ দিয়ে আফিমের জলটুকু নিয়েই নিজের এবং দেশের সর্বনাশ ডেকে আনলেন,– সত্যি, এত বড় দায়িত্বহীনতা যেন ক্ষমা করা যায় না। ৩০৮

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা মনে হয় : তাঁর স্বাস্থ্য, অন্তর্শরীর, বহুদিন যাবৎ ভাল ছিল না' চিঠিতে এই নিয়ে কতদিন থেকে তাঁর ক্লান্তি ও হতাশার সুর। ভাল থাকলে সাহিত্যকে তিনি কোথায় তুলে দিয়ে যেতেন ও বা যায় না।

বইয়ের মোটামুটি একটা বিবরণ আশা করি দেওয়া গেল।

এই বইয়ের দুটি প্রসঙ্গ · জন্য লেখককে ধন্যবাদ : শরৎচন্দ্রের জীবনে নিরুপমা ও রবীন্দ্রনাথ,—প্রেম ও ভক্তি। প্রথমটি দুরূহ, জটিল, কারণ এ এমন একটি বিষয়, এত ডেলিকেট, যে ত্রুটির সম্ভাবনা প্রতি পদে। তাছাড়া প্রতিভার প্রেম ও প্রণয় নিয়ে ঠিক এই ভাবে চর্চার বেওয়াজ বাঙলাদেশে কম, নেইই। এখানে আরো বাধা কারণ সময়ের ব্যবধান যে স্বাভাবিক ভাব রচনা করে তা নেই, এখনো হয়নি,—ঘটনার পাত্র-পাত্রী যদিও আর আমাদের মধ্যে নেই : নিরপেক্ষচিত্ততা এবং দক্ষতা দুয়েরই পরিচয় রাখলেন লেখক।

রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের মধ্যে যে ভাবসম্পর্ক, সেটির প্রকাশ বাইরে খুব হয়নি, কারণ সুযোগ ছিল না, কিন্তু পরস্পরের কাছে উভয়ের চিঠির ভিতর দিয়ে তার পরিচয় আছে সুন্দর :

'বোড়শী' প্রসঙ্গে শরৎচন্দ্র : সাধারণের কাছে সমাদর লাভ করা গেল প্রচুর, কিন্তু আপনার কাছে দাম আদায় হলো না। এ আমার বাইরের পাওয়া সমস্ত প্রশংসাই নিষ্ফল করে দিলে।' ২১৬

অভিমানে যেন জল এসে গেল চোখে : কি হবে বই-লিখে যদি রবীন্দ্রনাথই পছন্দ না করেন! রবীন্দ্রনাথও বিচলিত, বিব্রত, যেন ভিতরের আবেগ প্রকাশ হয়ে পড়ল সহসা, গলা কেঁপে গেল :

'আমি তোমার যে সব গল্প পড়েচি, তাতে তুমি অনায়াসে চিরকালের সভাকে মুক্তি দিয়েচ—…তোমার এখনকার লেখা পড়তে ভয় হয়, পাছে চোখে পড়ে যে, তোমার কলমের উপরে তোমার জ্ঞাত বা অজ্ঞাতসারে বিদ্বের লোকের মনটা ভর করেছে। সে এত বড় লোকসান যে সে আমি চোখে দেখতে পারব না।' ২৫০

এই প্রসঙ্গে তাঁর সঙ্গে বিহারীলালের ব্যবহার মনে পড়ে। বিহারীলালের স্ত্রী মাঝে মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে স্বামীকে বলতেন, 'আহা, ছেলেটা আসে কত আশা নিয়ে, তুমি এমন নিরুৎসাহ

করে দাও কেন?' বিহারীলাল জবাব দিতেন না, হাতে উঠে দিয়ে অন্ধকারে একা একা অনেকক্ষণ কাটিয়ে আসতেন।

শরৎচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে লেখা যার জীবনে মাত্র একবার একটি ভুল করেছিলেন, 'তাঁর "ষোড়শী" নাটকের জন্য গান লিখে দিতে অনুরোধ করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ,' স্বভাবতই, 'পারেননি।' ২৪৪। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর যুক্ত অভিভূত শ্রদ্ধা, হৃদয়ের অবিমিশ্র অনুরাগ, তার কি তুলনা আছে দ্বিতীয়? তা যেমন সর্বজনীন অর্চনায়, তেমনি ব্যক্তিগত নিবেদনে:

'তোমার প্রতি চাহিয়া আমাদের বিস্ময়ের সীমা নাই। হাত পাতিয়া জগতের কাছে আমরা নিয়াছি অনেক, কিন্তু তোমার হাত দিয়া দিয়াছিও অনেক। হে সার্বভৌম কবি, এই শুভদিনে তোমাকে শান্ত মনে নমস্কার করি। তোমার মধ্যে সুন্দরের পরম প্রকাশকে আজি নতশিরে বারম্বার নমস্কার করি।' ২৯৬

নিজের জন্মদিনে, '৬২ তম জন্ম দিবসে' বেতারভাষণে কলকাতা থেকে বললেন: 'বাষট্টি বৎসর বয়সে পা দিয়ে আজ আমার জন্মতিথি উপলক্ষে সকলের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে নেবার পূর্বে আমার গুরুদেব বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ, যিনি আজ রৌদ্রপথযাত্রী, তাঁকে প্রণাম করি।' ৩১০। শান্ত সমাহিত কণ্ঠে সর্বসমক্ষে তাঁর গুরুপ্রণাম সম্ভবত এই প্রথম এবং এইই শেষ।

শরৎচন্দ্র হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন শুনে রবীন্দ্রনাথের ছোট উদ্বেগভরা একটি চিঠি,

'শরৎ রুগ্ন দেহ নিয়ে তোমাকে হাসপাতালের আশ্রয় নিতে হয়েছে শুনে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হলুম। তোমার আরোগ্য-লাভের প্রত্যাশায় বাংলাদেশ উৎকণ্ঠিত হয়ে থাকবে।' ৩৩৪

শরৎচন্দ্রের আকস্মিক বিয়োগে বাংলাদেশ সেদিন যে সর্বজনীন শোকের বিষাদরূপ প্রত্যক্ষ করেছিল ইতিহাসে তা প্রতিদিনের ঘটনা নয়।

বড় বই, ভাল বই, সুন্দর বই: অনেকদিন পর সত্যি আনন্দ পাওয়ার মত একটি বই। কেবল একটি অভাবে কথা শেষে উল্লেখ করতে হয়।

রচনার মধ্যে ধারাবাহিকতা, যোগসূত্রতা এবং সংহতি যেন শিথিল। যেন টুকরো টুকরো ছড়ানো অনেক কাহিনী একসঙ্গে জড় করে এই বই। এইভাবে না হয়ে, এগুলি উপাদান হিসাবে ব্যবহার করে আনুপূর্বিক বইটি আবার লিখলে সুন্দর হত। শরৎচন্দ্রের সম্পূর্ণ একটি মূর্তিরচনা উদ্দেশ্য হলে এই প্রণালীই সঙ্গত মনে হয়। এই বই, 'জীবনী'। কিন্তু শরৎচন্দ্র কেমন, রোগা না মোটা, লম্বা না খাটো, ফরসা না কর্সা, এই বই থেকে এই সহজ কথাটিও জানা যায় না। জানা যায় না তাঁর দিন, জীবন কীভাবে কাদের সঙ্গে কোন কথায় কেটেছে, বা তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত বা অভিজ্ঞতাগুলি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া কি। খ্যাতি সম্পর্কে তাঁর প্রতিক্রিয়া, নিঃসন্দেহে নিদিগু,—যেন জানা কথাই,—চিঠির একটি ছত্রে তা সুন্দর ব্যক্ত হয়েছে: 'ওকি আমার লেখা? আমার তো একটুও মনে পড়ে না। যদি উপীনকে চিঠি লেখেন, এই অনুরোধটা জানাবেন যেন আমার অমতে আর কিছুই না প্রকাশ হয়।' ১২৯। রবীন্দ্রদর্শন, রবীন্দ্রপ্রেম, রবীন্দ্রস্নেহ, নিঃসন্দেহে তাঁর জীবনের সর্বোত্তম কামনা, শ্রেষ্ঠ অভিজ্ঞতা: এগুলি সম্পর্কে কোনো ছবি নেই,—বলতে, কবে কোথায় তাঁদের প্রথম দেখা, এ সম্পর্কে প্রচলিত কোন তথ্য ভুল, কেন ভুল, এই গবেষণায়,—শুধু এখানেই নয়, আরো কয়েক-জায়গায়, যেমন পরীক্ষার কী, বিয়ে,—অনেক পৃষ্ঠা লেখক শুধু বৃথা ব্যয় করেছেন। অবশ্য অনেক জায়গায় আবার ভুল মত, ভুল প্রচার এই তথ্যেরই উক্তি ও যুক্তিতে তিনি প্রশংসনীয় ভাবে খণ্ডন করেছেন, তার দরকারও ছিল, এবং এই প্রসঙ্গে শরৎচরিত্রের বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণও তাঁর সুচারু, অবশ্যই।

মৌখিক আলোচনা, চিঠি, এগুলি নিয়ে আলাদা বই পরে হবে। সেগুলি মনপার মত শরৎমূর্তি বা শরৎচরিত্র

(শেষাংশ ৯২৭ পৃঃ)

জোয়ার

উপন্যাস
পরশুরামের পর

বিজন কুমার ঘোষ

বুড়ো আনাস কুঁড়েখানি আর বেশী দূরে নয়। আর সামান্য কয়েকটা বাঁক পেরোলেই। এখন তাই কোথাও থামবে না। লক্ষ সমানে গর্জন করে চলেছে। লঞ্চের পেছনে দু' পাশ থেকে দুটো ঢেউ এর সারি প্রসারিত হতে হতে পারে এসে আছড়ে পড়ছে। মাটির রং পাথুরে কালো। সমুদ্রের ঢেউ-এর দাগ রয়েছে এখনো। আকাশের কোলে এসে ধানক্ষেতের সীমা শেষ হয়েছে। গাছপালার সংখ্যা কম-ই। আলের ধারে অশ্বত্থের তলীতে দুই চারটে বাবলা গাছ। ব্যস। দৃষ্টিকে বাধা দিতে পারে এমন কিছুই নেই। চোখ দুটোকে বহুক্ষণ বিশ্রাম দিতে দিতে কেমন অলসতা এসে গিয়েছিল মিনতির। সত্যি, এখন যেন আর বনমালী নস্কর রোডের সেই মিনতি নেই। সেলাইএর দোকানের মিস দত্ত কিম্বা ইস্কুলের দিদিমণিও নেই যেন আর। সবই পালটে গেছে। এক কথায় বিস্মিত, অভিভূত। অনেক দিন আগে পুরোন ক্যালেণ্ডারে একটা আশ্চর্য ছবি দেখেছিল মিনতি। ছবিটা কাঁচা সবুজ রঙে ছোপান। তারিখগুলি একে একে ফুরিয়ে গেলেও সযত্নে ঘরে টাঙিয়ে রেখেছিল। সত্যি, টিউশনির পর ইস্কুল করে সন্ধ্যায় সেলাই দোকান সেরে যখন ঘরে ফিরত, বলতে কি, ছবিটা এক মুহূর্তে ক্লান্তি অবসাদ বিষাদ শুষে নিত। কাঁচা সবুজ রং। মাঝখান চিরে দুধের সরের মত আঁকাবাঁকা নদী। ছবিতেই নদীটা শেষ, কিন্তু তাকালেই মনের মধ্যে নদীটা সুদূর হয়ে যেত। ভারী রহস্যময় মনে হত নিজেকে। সেই নদীতে একটি মাত্র নৌকো। ছই নেই, পাল নেই। একটি মাত্র মানুষ লগি ঠেলে নিয়ে চলেছে। এক পারে দুইচালার মত কুঁড়ে ঘর, আঙিনার পাশে কলা গাছ। অন্য পারে কাঁটা ঝোপ, ধানের শীষ নুয়ে পড়েছে, তার ওপর উড়ন্ত চড়াই পাখি। বছর উড়ে গেলেও ছবিটা ফেলে দিতে পারেনি মনের মধ্যে সুদূরতা অনুভব করবার জন্যে। একেক বার মনেও হত জীবনের কোন এক সময় এই রকম একটি জায়গায় গিয়ে পড়তে। ছবিটা ভীষণ ভাল লাগে, তাই বলে কুঁড়ে ঘরে বাস করবার কথা একবারও মনে হয়নি। বরং ঐ নৌকোটার মাঝি হতে সাধ হয়েছে। আঁকাবাঁকা নদীর স্রোতে ভেসে যেতে মন চেয়েছে। এতদিন পর বড়লোকের ওই খেয়ালী ছেলেটার জন্যেই তা সম্ভব হল। একবার অলক্ষ্যে কৃতজ্ঞতার সুরেও পড়ল যেন। মনটা ঘন বর্ষার গাছের পাতার মতন ক্রমাগত ভিজে যাচ্ছে। এক সময় ছিঁড়েই পড়বে বা। কিন্তু কিছুতেই ছিঁড়তে দেবে না মিনতি। শক্ত হাতে সামলে নেবে নিজেকে। বাস্তবের বোঁটার সঙ্গে প্রাণপণে নিজেকে গেঁথে রাখবে। মিনতির চরমতম পরীক্ষা আরম্ভ হল ঠিক যখন বড়লোকের খেয়ালী ছেলেটা আচমকিতে বাড়িতে গিয়ে হাজির হল, তখন থেকেই। খুশি হয়েছিল মিনতি একথা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, ঘাবড়ি বোধ করেনি। চোখে মুখে একটা উদ্বেগের ছাপ নিয়ে হাজির। চুল উসকো খুসকো। স্নান হয়নি। সমস্ত রাত নির্ঘুম কেটেছে মুখ দেখলেই বোঝা যায়। ঠিক যেন একটা

ঝড়,—কিন্তু কোন রকমে নিজেকে সংযত রেখে বারান্দায় চুলের ওপর বসেছিল। বলতে কি, চমকে উঠেছিল ওকে দেখে। আমাদের মনের মধ্যে আরেকটা মন থাকে, যে নাকি ভাল মন্দ, ভুল ভ্রান্তি সম্পর্কে আগে থেকেই আঁচ করতে পারে। মিনতির মনের মধ্যের সেই মনটাও খানিকটা আঁচ করতে পেরেছিল বৈ কি। আঁচ করার সঙ্গে সঙ্গে মুখের কতগুলি অতি সূক্ষ্ম রেখাকে সচকিত করে দিয়েছিল। কিন্তু মিনতির ওই সাদাসিধা মনটাই সব ভণ্ডুল করে দিয়ে খুশি হয়ে বলল। আলোক যখন বলল, তোমার সঙ্গে কথা আছে, বাইরে চল ; অমনি এক কথায় রাজি হয়ে গেল। ভিতরের মন বলল, খবরদার যেও না, বলা নেই কওয়া নেই, এত দিন পর হঠাৎ এসে নিয়ে বেরিয়ে যাওয়া মোটেই ভাল লক্ষণ নয়। কিন্তু বাইরের মনটা যেই দেখল ম্লান হয়নি, উসকো-খুসকো চুল, চোখের কোণে কালি ; যখন বলল, কথা আছে ; অমনি সঙ্গে যাবার জন্যে নাচতে লাগল। মহা মুশকিল। শুধু বাইরের মনটাই নিতে গেল। কিন্তু ভিতরের মনটা খুঁৎখুঁৎ করতে লাগল ক্রমাগত, যাচ্ছ যাও, কিন্তু সাবধানে থেকো। বেফাঁস কথা বোলো না। ওরা বড়লোকের ছেলে। ওদের খেয়ালের নেই অন্ত। ওদের কাছে ভালবাসা একটা বিলাস ছাড়া কিছু নয়। তোমার সঙ্গে একটু প্রেমের খেলা খেলতে চায় এই মাত্র। দেখো শেষ কালে এলগিন রোডের ওই ব্যারিস্টারের মেয়েটার সামনে গিয়েই টোপর মাথায় দেবে। তোমায় ঠিক বলে রাখলাম। তুমি মাটির মেয়ে। তাই মাটির খুব বেশী ওপরে উঠতে যেও না। তাহলেই পতনের সম্ভাবনা। বেড়াবার সাধ তোমার আছে জানি। সারা দিনই কাজ করে যাও মেশিনের মত। একটা টাকাও প্রাণে ধরে খরচ কর না সংসারের কাজে লাগার ভয়ে। তাই তোমাকে খুব একটা বাধা দিতে পারলাম না। কিন্তু ওই খেয়ালী ছেলেটার দিকে কয়া কথা-গুলিকেই যত ভয়। দেখো, রঙিন কথার ফুলঝুরিতে ভেবে যেও না। তুমি মাটির মেয়ে, মাটির কাছাকাছি থেকো। আর কি বলব ? তোমার ভালমন্দ তোমার হাতে। টাকা পয়সা প্রচুর থাকলেই মানুষ সুখি হয় না। তাই যদি হত তাহলে তোমার বন্ধু রেণুকার এই দশা কেন ? কত বড় ঘরে বিয়ে হয়েছিল ওর। আজ কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছে। কেন ? যে ফেয়ার রোডে বাড়ি, গাড়ি আছে, বিলেত ফেরত ইঞ্জিনীয়ার স্বামী, এত সব থাকতেও কেন রেণুকার কপাল পুড়ল ? ওই যে বললাম, ওদের টাকাই আছে, অনুভব নেই। টাকার গরমে স্বাভাবিক অনুভূতিগুলি জলে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। একটা মানুষের চোখের জল, কি সুখের ছোঁয়া ওদের মনে কোন আঁচড়ই কাটে না। খেলা করতে করতে একটা মেয়ের কাছে আসে, শেষে হয়ত বিয়ে করে, তারপর হতভাগীর রং একটু ফিকে হয়ে এলেই বাসি ফুলের মালার মত ছুঁড়ে ফেলে। আসল কথা হল, ভালবাসা। যার প্রভাবে বস্তিও স্বর্গ হয়ে উঠতে পারে, আবার যে ফেয়ার রোডের মত জায়গাও নরক হয়ে উঠতে কতক্ষণ। অবশ্য আলোক সে টাইপের ছেলে নয়। কিন্তু এখনও তো দেখা গেছে বিয়ের আগে এক রকম, বিয়ের পর অন্যরকম। কে বলতে পারে আলোকও একদিন বাসি ফুলের মালার মত ছুঁড়ে ফেলবে না ? বিয়ের আগে যে তাজা মাছটি উল্টে খেতে জানে না, পরে তারই সিংহ গর্জনের ঠ্যালায় অস্থির হতে হয়। সুতরাং সম্ভেহবাতিক মনটি সজাগ রাখা ভাল। হয়ত তোমার ভাল মানুষ মনটি একটু খুঁৎখুঁৎ করবে, কিন্তু এর জন্যে তোমাকে একদিন পস্তাতে নাও হতে পারে। তার চেয়ে ভাল কথা শোন, তুমি মাটির মেয়ে, তাই মাটির কাছাকাছি কোন ছেলেকে বেছে নাও। এতে কোন লজ্জা নেই। বাছাবাছির পালা সব জায়গাতে আছে। এরকম ঘটনা আকছার ঘটছে আজকাল। হ্যাঁ, তোমাদের ইস্কুলের পরিমলের কথা বলছিলাম। চমৎকার ছেলেটি। নিজের হাতে আঁকা কেচে ইস্তিরি করে ইস্কুলে আসে। তোমাকে

পরিমল নিশ্চয়ই বলেছে, খুব অল্প বয়সেই বাপ মারা গিয়েছিল ওর। পরের বাড়িতে থেকে মানুষ। বাংলা দেশে পরের বাড়ির স্মৃতি সাধারণত মধুর হয় না। এ ক্ষেত্রে তুমি কেষ্টর কথা স্মরণ করতে পার। তবু তার মেজদিদি ছিল। অনেকের তাও থাকে না। পরিমলেরও ছিল না। সে যাই হোক, দুঃখের ধাপ বয়ে বেড়াবার মত ছেলে পরিমল নয়। আই. এ. পাশ করে ইস্কুলের প্রাইমারী সেকশনে ঢুকেছিল। তারপর প্রাইভেটে বি. এ. পাশ। শেষে অনার্স। শুনছি নাকি এখন এম. এ-ও দেবে। তোমাকে বলে রাখলাম, সে উন্নতি করবেই। যারা ছোট থেকে বড় হয়, তারাই অধিক নির্ভরযোগ্য, একথা জেনো। তোমাকে উচিত মূল্য দেবে। কখনো তোমাকে কল্পনার বেলুনে ফুঁ দিয়ে আকাশে ঠেলে তুলবে না। আবার মাটিতেও ফেলে দেবে না। তার কাছে গিয়ে তুমি যা তাই থাকবে। তোমাকে গ্রাম শহরের পার্থক্য বোঝাতে বলবে না। রাত দুপুরে যাত্রা দেখাতে নিয়ে যাবে না জিঞ্জিরা পোলোর গাছে, কিম্বা কলমী শাকের ঝোল নিয়ে কবিতা লিখতে বলবে না। বরং সে অনেক বই জোগাড় করে দিয়েছে। তোমাকে পরীক্ষাটা দিতে বলছে। এত কাজের মাঝখানেও পরিমল খোঁজ করবে বলেছে। এই তো চাই। মাটির মানুষ, মাটির গন্ধ ভরা সহানুভূতা। তার মানে অটল নির্ভরতা। কোন দ্বিধা নেই, কাকে ভালবাসি; কোন দ্বন্দ্ব নেই, কেন ভালবাসি। মানসিক রোগের চিকিৎসকের পাল্লায় ওরা কখনো পড়েনি, পড়বেও না। চির সুস্থ ওরা। তোমার ভালমানুষ মনটা হয়ত দুঃখ পাবে এর জন্যে, কিন্তু কি করবে বল। সবই অদৃষ্ট। ঝড়ের মতন আসে যারা, ঝড়ের মতনই চলে যায়। চিহ্নও রাখে না। যদি তোমার জন্যেই তোমাকে মনে পড়ে কি? এই বড়লোকের মেয়েটার কাছে যখন যায় তখনই তোমাকে মনে পড়ে। তাহলে এরকম অস্থির মানুষ নিয়ে ঘর বাঁধা তাদের দিনার তৈরী করার সামিল নয় কি?. ঠিক একই রকম, শহরে থেকে কয়েক ঘণ্টার জন্য তোমাদের বাড়ি এসে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করা। আহা, কি সুন্দর মাঠ, কি সুন্দর তোমরা, কি সুন্দর রাঙা মাটির পথ। বর্ষাকালে রাঙা মাটির পথের কি দুরবস্থা হয় খেয়ালীবাবু তা বুঝবেন কেমন করে? ওই পচা তোমরা যে আসলে মরার কারখানা তা মানুষ হবে কি করে কারণ বাবুকে তো আর মোটা সুচ দিয়ে ইঞ্জেকশন করে না। বাকী থাকল সুন্দর মাঠ। ওই সুন্দর মাঠ দু' দিন যাবে জলে ভরে যাবে। কচুরি পানা উঠে আসবে ঘরের দুয়ারে আর সাপে কাটার সংবাদ আসতে থাকবে যখন তখন। তবু কি এই, আরো হাজার অসুবিধে। অথচ বিলাসবাবু কিন্তু বারো আনা সময়ই ভালহৌসী তোমারের মত জায়গায় কাটান, যাকে বলা যেতে পারে শহরের হৃৎপিণ্ড। চার আনা সময়ের জন্যে যে হালসুতে যান সেখানেও কিন্তু শহরের উপকরণ এক চুলও কমতি নেই। তাহলে? সুতরাং তাদেরই মানায় শহরের সব সুবিধে কাটায় কাটায় আদায় করে নিয়ে গ্রামের প্রশস্তি গাওয়া। কিন্তু তোমার চলে কি? সেবার মনে নেই, অন্ধকার হয়ে গেছে, সেলাই মেশিন থেকে ফিরতে ফিরতে কি হয়েছিল? এদিকে বৃষ্টি বাদলের রাত্তু, রাস্তায় আঠার মত কাদা, তুমি দড়াম করে আছাড় খেলে। মনে হল যেন মেরুদণ্ডের হাড়টা দু' ইঞ্চি সরে গেল। কিন্তু রাসবিহারী এ্যাভিনিউতে অইটুকু রাত্রিতে নিওন আলোর তলায় কেউ আছাড় খায় কি! খেলে সেটা খবরের কাগজের নিউজ হয়ে যায়। কতদিন এমন হয়েছে, সারা দিন খাটা-খাটনির পর বাড়িতে এসে দেখো হারিকেনে তেল নেই। সারা বাড়ি অন্ধকারে ছেয়ে আছে। তখন কি ইচ্ছে হয় বল তো? ইচ্ছে হয় না কি হারিকেনটা তোমার জলে ছুঁড়ে ফেলতে? কিন্তু তার বদলে তোমাকেই তো বোতল হাতে বনমালী নস্কর রোড পেরিয়ে সদর রাস্তায় আসতে হয়। সত্যি করে বল তো, তখন সাধ হয় না কি সইচের একটা মৃদু মধুর ক্লিক আওয়াজ শুনতে। এই রকম অসুবিধের দিতে ক্রমশ

বেড়েই চলে, এর কোন শেষ নেই জেনো। খেয়ালীবাবুটি কল কারখানার নামে রেগেই আগুন, কিন্তু জিজ্ঞাসা করি তিনি যে কোম্পানিতে কাজ করেন তাদের কল কারখানা নেই? সে বেলায় বুঝি দোষ হয় না? বরং তোমাদের এদিকটায় কলকারখানা অফিস আদালত বসলে জায়গাটার চেহারাই বদলে যেত। চাই কি আরতিরও একটা কাজ জুটত। তোমারও কোন ভাল সুযোগ এসে যেত। দেশের সরকারও এটা ভাল করেই জানে। তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে দেশের নানা প্রান্তে কলকারখানা বসাচ্ছে। প্রথমে যেখানে মানের মাঠ, কি পোড়ো জমি থাকে। তারপর রাস্তা তৈরি হয়, রেললাইন পাতা হয়, ওই রেল লাইন দিয়ে ইট কাঠ করলা মানুষ আসতে থাকে। শেষে আকাশ ফুঁড়ে ঘরে চিমনী উঠে যায়, সকাল সন্ধ্যায় ভোঁ বাজে। কত লোকের অন্ন সংস্থান হয়। দেশের প্রয়োজন মেটায়। বিদেশে রপ্তানী করেও অর্থ আসে। সুতরাং এক কথায় কলকারখানার গুণাগুণ কি বলে শেষ করা যায়? অথচ তোমার আলোচনার আদেশ শিরোধার্য করতে হলে কৌপীন পরে বনবাসে যেতে হয়। হাঁ, এক কালে তা সম্ভব ছিল। কারণ তখন লোকসংখ্যা ছিল কম। জমির ওপর এরকম অমানুষিক চাপ পড়েনি। কিন্তু তাই বলে আজকের দিনে চলে কি? যাক সে কথা, এখন প্রশ্ন হল বিদ্যালীবাবুকে তুমি ভালবাস কি না। না না, লুকিয়ে লাভ নেই। মাথা নিচু করারও দরকার নেই। ব্যাপারটা তোমাতে আমাতে ঘরোয়া হয়ে থাক না। আমরা তো আর পাঁচ কান করছি না। শোন, কোন ব্যাপারই বেশীদিন ঝুলিয়ে রেখো না। শেষ কালে চিকিৎসার বাইরে চলে যায়। তোমাদের মা'র ব্যাপারটাই ধর না কেন। প্রথম প্রথম যখন হাটের দোষ হল, ঘন ঘন হাত পা' ঝিঁচুনি আর সেই সঙ্গে ভুল বকা, তোমরা হেসেই উড়িয়ে দিলে। তোমার বাবা অন্য কাজ সারবার জন্যে কোথা থেকে সাড়ে পাঁচ আনার বাদ্যী এনে পরিয়ে দিল। তাতে কোন ফল হল কি? এখন এক গাদা পয়সা খরচ করেও এক রত্তি উপকার মিলবার আশা নেই। সব ডাক্তারই জবাব দিয়েছে। অথচ প্রথম থেকেই যদি তোমরা উদাসীন না হতে। এটাও ঠিক তাই। এটাও জীবন মরণের প্রশ্ন। সুতরাং আর এক মুহূর্তও দেরী করা উচিত নয়। তুমি হয়ত বলবে। বলবে খাকুল চমকে উঠবে! কিন্তু আমি তো তোমাকে চিনি, আমার চেয়ে হাড়ে হাড়ে আর কে চেনে বল। সেই আমি বলছি তোমার ভালমানুষ মনটি একটু লোভীও। তার ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই যত গণ্ডগোল। অবশ্য তাকে পুরোপুরি দোষও দিতে পারি না। এটা খুবই স্বাভাবিক। বরং নির্লোভ হলেই আশ্চর্য হতাম। জন্মের পর থেকেই তুমি দারিদ্র্য বুঝতে শিখেছ। তারপর যত বয়েস বেড়েছে দারিদ্র্য ধারালো ব্লেডের মত তোমার নরম শরীরে কেটে বসেছে। তোমার বয়সের মেয়েরা আজো বেণী দুলিয়ে কলেজে যায়। শীতের দুপুরে বোটানিক্যাল গার্ডেনে পিকনিক করতে যায় দল বেঁধে। যখন যা যা ভাল ছবি আসে শহরে, সব দেখা চাই। তাদের আঠারো বছরেও আঙুরেপনা যায় না। ঘর ভর্তি লোক তাদের। সেজকাকা কাশ্মীরে বেড়াতে গেলে তাদের জন্যে দামী শাল নিয়ে আসেন। ছোট মামা বিলেত থেকে পার্শেলে জমকালো শাড়ি পাঠান। দাদার বন্ধু আপিসে গেলে বার বার ঝুলে ফেরত হয়, ফিরবার পথে ক্যামেরা নিয়ে এসো। আর বোম্বাই প্রবাসী জ্যেঠতুতো ভাই দিন কয়েকের জন্যে এলে গ্রেট ইস্টার্ন নেই। নিউ মার্কেট করতে করতেই দিন ফুরিয়ে যায়। এদের পাশাপাশি নিজেকে তুলনা কর। মনে হবে নাকি ওরা মানুষের চাইতেও শ্রেষ্ঠতর জীব আর তোমরা মানুষের চেয়ে নিকৃষ্ট কোন প্রাণী। চেহারা দেখেও পার্থক্যটা বেশ বোঝা যায় বৈ কি। কেয়াকে দেখবার সৌভাগ্য অবশ্য তোমার হয়নি। কিন্তু রাসবিহারী এ্যাভেনিউতে হঠাৎ গাড়ি থামিয়ে যে সব মেয়ে শাড়ি পরবার দোকানে ঢোকে তাদের কাউকে দেখেই তুমি আচ করে নিতে

পার। ভুল কোরো না। তোমার মতও অনেকে যায় অবশ্য কিন্তু তা একবারেই। ঘটিবাটি বেচে ছিপের পয়না পড়াতে যায়। চেয়ারা দেখলেই বুঝে নিতে পারবে তোমারই ভিন্ন সংস্করণ। যেন এমন হবে না? তুমি কি পড়ন্ত বিকেলে বারান্দায় পা ছড়িয়ে একটা আস্ত বনলালেবু কেবারে খেয়েছ। যার মধ্যে প্রচুর দি ভিটামিন আছে; দুইশক্তি ভাল রাখে, রক্তের উজ্জ্বলতা বাড়ায়? কোন দিনও কি তোমাদের পাতে একটা আস্ত ডিম পড়েছে, যে প্রোটিন শরীরের পক্ষে একান্ত প্রয়োজন? খুব সস্তার দিনেও ছুটি মাত্র ডিমের বড়ার ঝোল এতগুলি মানুষের মধ্যে ভাগ বাটোয়ারা হয়েছে। বলতে কি সেদিন যেন তাতে একটু টানই পড়েছে। তাই তো বলি, কলমী শাকের ঝোল আর হেলেঞ্চা পাতা দিয়ে কাবিা করা চলে। কিন্তু রোজ রোজ পাতে পড়লে কেমন লাগবে খেয়ানীবাবুর? এদিকে বি এ টাও পাশ করতে পারলে না পয়সার অভাবে তোমার বাবা 'চরকাল পরিষার পরিকল্পনাকে কাঁচকলা দেখিয়ে এসেছে। ফলে তার যাবতীয় দায় দায়িত্ব এখন তোমার ঘাড়ে। মনে পড়ে, সামান্য প্রাইমারী সেক্সনের একটা টীচারি জোগাড় করতে গিয়ে তোমাকে চরম অপমান সহ্য করতে হয়েছিল? ভুঁড়িওয়ালা মাতালের মত দেখতে লোকটাই নাকি স্কুলের সেক্রেটারী। তবু আশায় আশায় সকাল দুপুর সন্ধ্যে দিয়ে কড়া নেড়েছ। একেকবার একেক রকম উত্তর। বাবু ঘুমোচ্ছেন, কি বাত আছেন, অথবা তাস খেলছেন—এমনি কত কি। শেষে সত্যিই যেদিন চার চোখের মিলন হল, সেদিন এ কথা সে কথার পর আদ্যিকালের মত লোকটা ঘটরে হাওয়া খাবার বাসনা জানিয়েছিল। তুমি থরথর করে কাঁপছিলে। মুখটা লাল হয়ে গিয়েছিল। অসভ্য ইতর। পয়সার জোরে সেক্রেটারী হয়ে কি সাহস? উঠে এসেছিলে সেই মুহূর্তে। কিন্তু দু'দিন বাদে যখন ইস্কুলের পিওন এসে চিরকুট দিল তখুনি দেখা করতে, কই পারলে প্রতিজ্ঞা রাখতে? হুঃ, তোমরা আমার মানুষ। তোমাদের আবার প্রতিজ্ঞা! আরো আছে। তোমার যা বয়েস, সাধারণত এই সময় বাড়িতে ঘটকের আনাগোনা বৃদ্ধি পায়। বাবা মা পছন্দসই ছেলের খোঁজ করে। তোমার বার কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু নিবারণ বাবু কি স্বপ্নেও সুপাত্রের কথা ভাবতে পারেন? ফলে ক্লান্ত গরুর গাড়ির চাকার মত সকালে টিউশিনি, দুপুরে ইস্কুল, সন্ধ্যায় সেলাই দোকান—এই ঘূর্ণিপাকের যেন শেষ নেই। হ্যাঁ, ঠিক এই সময়ই এসেছিল আলোক তার অপরূপ দিব্যকান্তি নিয়ে, হালদার বাগান থেকে একরাশ সুগন্ধ নিয়ে। যেন শ্রীষ্মের প্রথম ঝিরঝিরে বৃষ্টি। তোমাকে নেশার মত জড়িয়ে ধরেছিল যেন। সত্যি তোমার মধ্যে আমি ভয়ানক আলোড়িত হয়েছিলাম। সাধারণত লোকে বলে, এমন কি তোমার ভাল মানুষ মনটি পর্যন্ত বলে, আমি নাকি একটু সন্দেহ বাতিক। তা বলুক সে। সন্দেহ বাতিক একটু থাকা ভাল। কারণ পৃথিবীটা খুব সরল সহজ জায়গা নয়। এখানে খুব ভালদের প্রথম যা চোখে পড়ে তা হচ্ছে প্রাণপণে সবাই বাঁচার জন্যে লড়াই করছে। প্রত্যেকে ঠেলেঠুলে আগে বেরিয়ে যেতে চাইছে। সুখে ও দুঃখে যেমন কোন অন্তর নেই, তেমনি বাঁচার লড়াইতেও নেই—এমনি একটা ধারণা মানুষের মনে বদ্ধমূল হচ্ছে। এটা খুবই খারাপ লক্ষণ। কিন্তু কি করবে বল, আমি একা ভাল হয়ে তো কোন লাভ নেই। তাহলে চার দিক থেকে মার খেতে হবে। তার চাইতে একটু সন্দেহ বাতিক হওয়া ভাল। সন্দেহটা হল হাকিমি বিশেষ। ভাল যে সে সন্দেহ করলেও ভালই থাকবে। আর এতে তোমার বিপদ হয়েছে কি? বরং অনেক ব্যাপারে সাবধান করে দিয়ে ভালই করেছি, সে তুমি নিজেও জান। যাক গে সে সব। হ্যাঁ, যা বলছিলাম। হালদার ছেলেটাকে দেখে একটু বিষম খেয়েছিলাম বৈ কি। খুব ভাল লেগেছিল। নতুন আশায় খুব গোপনে বুক বাঁধতেও শুরু করেছিলাম। ষোল কথা আমি একটু যুক্তি

পালাতে চেয়েছিলাম এই দারিদ্র থেকে, এই সংসার থেকে। তারপর যদি কেউ বলে বসুক। যেন মুক্তি পেতে চাইব না! পৃথিবীতে আসবার আগে কার কাছে এমন ধনুর্ভঙ্গ পণ করে এসেছি যে কেবলই খেটে মরতে হবে? একটুও আনন্দ থাকবে না, হাসি থাকবে না, গান থাকবে না। শুধু কেরোসিন তেলের নোংরা বোতল, বিবর্ণ রেশন কার্ড আর বাজার মুদির খিস্তি কর্ণ নিয়ে জীবন কাটবে? হ্যাঁ, তোমার বাইরের মনটির সঙ্গে সঙ্গে আমিও হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। একটা বিশাল বটবৃক্ষের ডালের মত এগিয়ে আসতে দেখেছিলাম হালকা আলোক রাজ্যকে। সেই বটবৃক্ষে কোকিলের ডাক শুনতে পেয়েছিলাম। নিচে অফুরন্ত ছায়া আর ডালে ডালে পাতায় পাতায় মধুর বাতাস উড়ে যেতে দেখেছিলাম। সুতরাং এই ছায়ার পানে হাত বাড়ানোকে যদি কেউ কদর্য করে বলে স্বার্থপর, তাহলেও কিছু যায় আসে না। কেন না, সমাজে এমন অনেক লোক দেখতে পাওয়া যায়, নিজেরা না পেলেই তাদের গাত্রদাহ উপস্থিত হয়। তখন তারা সাধারণ একটা সুস্থ কামনার মধ্যেও দোষ দেখে। সত্যি বলতে কি, ভীষণ ভাবে জড়িয়ে গেলাম। আমাতে আর তোমাতে এক চুলও তফাৎ রইল না। কেমন যেন বেহুশের মত ঘোর লাগল। সন্দেহ বাতিক মনটিও ভোতা হয়ে গেল। তার ওপর নিজের চোখে দেখতে পেলাম ভিজে মাটির সোঁদা গন্ধ কিম্বা ময়লা কাপড়-চোপড়ের দুর্গন্ধে যখন ঘরের মানুষগুলি অতিষ্ঠ, তখন হালকা মহানুভব যুবকটি ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে রয়েছে। মুখে একটুও বিকার নেই। শরীর বলে কোন রকম তুচ্ছ জিনিসও নেই। যেন আপন মানুষের চাইতেও আপন। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর তোমার বাবা এই ছেলেটি সম্পর্কে কত গল্প করেন। তুমি ঘুমোবার ছলে কান খাড়া করে তা শুনে গেছ। এক খণ্ড হীরকের মত নাকি ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পূর্ববঙ্গের বেশ জমিদার ছিল ওরা। যুদ্ধের বাজারে হঠাৎ ফেঁপে ওঠা ধনী নয়। প্রকৃত অভিজাত মনের অধিকারী। নাহলে কোম্পানি ছেড়ে দেবার পরও এত দূরে এক নগণ্য টাইপিষ্ট কেরানীর বাড়িতে কে আসে? তারপর যেদিন রাত্রিতে থাকতে বলা হয়, মানুষটা এক কথায় রাজী হয়ে গেল। কিন্তু দেখা গেল তোমরাই সব চেয়ে বেশী উদ্বিগ্ন হলে এতে। অবশ্য মেঘ কেটে যেতে বেশী দেরী হল না যখন দেখতে পেলে পুঁই চচ্চড়ি ডাল আর পেপের ডালনা দিয়ে পরিতৃপ্তি সহকারে খেয়ে উঠল। ময়লা বালিশের ওপর সুরুনি ঢাকা দিলে কি গন্ধ আটকায়? তবু ভদ্রলোকের এমন কুম্ভকর্ণ ঘুম হল যে পরদিন ঠেলে তুলতে হল। ধড়মড় করে ঘুম ভাঙার এমন লজ্জিত ভঙ্গী আমি হলপ করে বলতে পারি, তুমি কোন কালে দেখনি। যেন মহা অন্যায় করে ফেলেছে একটু বেশী বেলা অব্দি ঘুমিয়ে। বারান্দায় টুলের ওপর (ঘরে একটা চেয়ারও নেই।) বসবার শান্ত ভঙ্গীটি কি সুন্দর। একটি দুটি কথা বলেন মাঝে মাঝে। যেন নিঃশব্দে শীতের পাতা ঝরে একটি দুটি করে। স্বীকার করতেই হয় চরিত্রে মন প্রাণ কেড়ে নেবার দুর্লভ ক্ষমতা আছে ভদ্রলোকের।

বেশ দিনগুলি কেটে যাচ্ছিল আশায় আশায়। কিন্তু এর মধ্যে হঠাৎ একদিন ঠোঁট কামড়ে উঠলাম। আমার চোখের পর্দা সরে গেল। রোদের সঙ্গে কুয়াশা মিলতে হতেই আমার সন্দেহ বাতিক মনটা চাগিয়ে উঠল। স্পষ্ট মনে আছে সে দিনটা। ইস্কুল থেকে বাড়ি ফিরেছ। হাত মুখ বেশ করে ধুয়ে বসতেই আরতি তোমাকে খাবার দিল। খাবার বলতে দু'খানা আটার রুটি আর একটু আলুর তরকারি। বেলার পরদ। সূর্য ডুবে গেলেও গ্রীষ্মের বিকেলে সহজে আলো ফুরোতে চায় না। পেছনের মাঠ থেকে পাতলা ফিনফিনে বাতাস উড়ে এসে তোমার মুখে ঘাড়ে গলায় লাগছিল। তোমাদের পোষা কুকুরটা উঠোনের এক পাশে ঘুমে লাগা ঝরাচ্ছিল। ঘরের ভিতর ঘরকন্নার মায়ের গোছানি। তোমার এক পাল ভাই ভাই বোন কিছুক্ষণের জন্যে খাবারের

বারনা স্কুলে গরম মুড়ি খেলার ব্যস্ত ছিল। এমন সময় পুকুরের পার দিয়ে তাঁকে আসতে দেখলে, যার কথা তুমি কেবলি ভাবছ ঘুরে ফিরে। এতই ভাবনার প্রকোপ যে তার ফলে তোমার বুকের ব্যথাখানটা বাথা বাথা করছিল। ইস্কুলেও একটা অপ্রীতিকর ঘটনার জন্যে মনটা বিশেষ ভাল নয়। আর কিছুই নয়, হেড মিস্ট্রেস মুখের ওপর বলে দিয়েছেন আপনি ক্লাস ম্যানেজ করতে জানেন না। এটা স্বাভাবিকও। তুমি নতুন, তার ওপর বয়স অল্প, আর মেয়েগুলি বাঁদর। তবে সবার সামনে ওভাবে না বললেও পারতেন। আরো লজ্জার কথা কয়েকজন ছাত্রীও দাঁড়িয়ে ছিল সেখানে। ভাবছিলে যদি এই রকম একটা রিপোর্ট পেয়ে সেক্রেটারী বরখাস্ত করে তাহলে উপায়! তোমার ওপর একটু রাগও আছে। ঘটরে চড়ে বেড়াবার মত একটা নির্মল সাধ তুমি আজও পূরণ করনি। নিবারণবাবু হয়ত এ খবর শুনে আত্মহত্যাই করে বসবেন। দারিদ্র্যে তাঁর মাথা খারাপ হবার জোগাড় হয়েছে। কারো কাছে পাঁচ মিনিট বসলে এক সময় না এক সময় আত্মহত্যার প্রসঙ্গ তুলে আনবেনই। যেন দারিদ্র্য থেকে মুক্তি পাবার একটা শর্টকাট রাস্তা পেয়ে গেছেন। যাক, যা হবার হবে। তুমি ভেবেছিলে অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। কিন্তু তোমার ভিতরের খুশি ভাব'া কিছুতেই গোপন থাকল না। হেসে ফেললে। আলোক তোমার কাছে বেড়াবার প্রস্তাব করল। তুমি তো এক পায়ে খাড়া। ভেবেছিলে শহরে নিয়ে যাবে, এসপ্লানেড বা এই রকমই অন্য কোথাও। কিন্তু তোমাকে নিয়ে ও মাঠের দিকেই রওনা দিল। এখন তোমার আলোকদা সঙ্গে আছে তাই এই অতি পরিচিত জায়গাটাও ভাল লাগবে বৈ কি। কিছুক্ষণ কথাবার্তা নেই। আলো নিভে গিয়ে এখন পাতলা ছায়া নেমেছে মাঠে। বাতাস আরো উদ্দাম। ঠেলে ফেলে দিতে চায় কাঁটা ঝোপের ভিতরে। পায়ে চলা সরু পথ। জনহীনতায় মাঠটাকে আরো বিশাল বিশাল দেখায়। আলোক হঠাৎ একটা সরু পাতাওয়ালা গাছের নিচে বসে পড়ল। তুমিও ঘন্ন চালিতের মত পাশে পাশেই রয়েছ। অনেক কথা বলার ইচ্ছে। কিন্তু ভরসা পাচ্ছ না ব্যাপার দেখে। আমিও কিছু আন্দাজ করতে পারছি না। কি ব্যাপার? এত গম্ভীর কেন? অবশেষে বাধু মুখ খুলল। কিছু দিন আসতে পারেনি, কারণ অফিসে কাজ ছিল। পরশু গেছে কেয়ার জন্মদিন। (আমি চমকে উঠলাম। সরু পাতাওয়ালা গাছের শিরড়ে যেন দুলে উঠল।) বাধুই প্রস্তাব করে দিল অবশেষে। এলগিন রোডে বাড়ি। এবার কনভেন্টে পড়া মেয়ে কেয়া মিত্তির। বাপ প্রখ্যাত ব্যারিষ্টার রাঘবেন্দ্র নাথ মিত্র। রাঘবনের মত নরম শরীর, জোয়ার মত নাকি রং। (হায় ঈশ্বর!) শহরের হৃৎপিণ্ডে বসবাস করে। তাই একেবারে খাটি শহুরে। আরো গুণ আছে কেয়া মিত্তিরের, তার পরিচয় পাওয়া গেছে জন্মদিনের রাত্তিরেই। সেদিন নিজে গাড়ি ড্রাইভ করে চলে গিয়েছিল লেভেল ক্রসিং ডিঙিয়ে হালতুর অনেক ভিতরে। দিনের মত জোৎস্না রুপোলি জল, ঢেউ খেলানো ধানক্ষেত আর যুঁই ফুলের মত তারার আকাশ দেখে ওর শহুরে চোখ বিস্ময় মেনেছিল। শুধু তাই নয়, এক কথায় এলগিন রোডের মসৃণ জীবন ফেলে পাখি ডাকা গাছপালায় ছাওয়া নিরালা জীবনে ফিরে যাবার বাসনাও জানিয়েছিল। তোমার আলোকদার ভাষায় এই বাসনা নাকি অত্যন্ত খাটি। কেননা, শহরের ভাল মন্দ সব কিছু হৃদয়ঙ্গম করেই তবে গাছ পালা পাখি নিরালা জীবনের প্রতি ধাবিত হওয়া। আমি তোমাকে তখুনি স্মরণ করিয়ে দিলাম কিছুদিন আগে একই বিষয় নিয়ে জোর তর্ক করেছিলে। আলোকদা মন্তব্য করেছিল, পাড়াগাঁয়ে বাস করলেও নাকি তোমার মন শহরের সুবিধে আবহাওয়ায় শান্তি পায়। অর্থাৎ প্রকারান্তরে এটা কলুষ ইচ্ছে। অথচ ভিন্ন পরিবেশে আরেক জনের বাসনা নাকি সততার সোনা দিয়ে মোড়া। হায় অদৃষ্ট! তুমি তর্ক করেছিলে, শহরের কি কি

সুবিধে, পাড়াগাঁয়ের অসুবিধেই বা কি, তুলনামূলক আলোচনা তুলে। কিন্তু তার কি কোন দরকার ছিল? জেগে ঘুমুলে তার ঘুম কি কখনো ভাঙে? কেয়ার বেলায় যেটা যুক্তি, তোমার বেলায় সেটা কুযুক্তি হয়ে গেল। তখনি আমি অসহিষ্ণু হয়ে উঠলাম। সেই থেকে তোমাকে অনেক বোঝাবারও চেষ্টা করেছি। তুমি মাটির মেয়ে, সমাজের কোন স্তর থেকে এসেছ—ইত্যাদি। খেয়ালীবাবুর খেয়াল স্রোতে ভেসে যেতে প্রথমে খুব আরামই লাগে। কিন্তু তারপর যখন খেয়ালের ভাটা পড়ে যায়? কেন তুমি চিৎকার করে বল না আমি পাড়াগাঁকে হাড়েহাড়ে চিনি। আমরা খেটে খাওয়া মানুষ। আমাদের জন্যে ঘাসের মিনার নয়। পাড়াগাঁর ফুল পাখি লতা কি দিয়েছে আমাদের? মুখের গ্রাস জোগাতেও সে অক্ষম। এ যুগের প্রাণতোষরাই রয়েছে শহরের মধ্যে। অন্ন বস্ত্র বাসস্থান শিক্ষা সমাজ—কি না জোগাবার দায়িত্ব শহরের? তুমি কিন্তু কিছুই বুঝতে চাইছিলে না। কিম্বা বুঝেও না বোঝার ভান করছিলে। অথবা মিথ্যার মনোরম প্রাসাদটিকে এত তাড়াতাড়ি খান খান হয়ে যেতে দিতে তোমার ভয় করছিল। এবং সেই জন্যে কান্নার রেশ মিশিয়ে দিয়েছিলে ঘাটের বাতাসে। কিন্তু আমি হাল ছাড়িনি। সেই দিন থেকে তোমার যাতে ভাল হয় সেই চেষ্টাই করে আসছি। চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছি আলোকের পাশে কেয়া যতটা সহজ ও স্বাভাবিক, ঠিক ততটাই বিসদৃশ এবং বেমানান মিনতির পাশে। আমি দেখেছি তোমার প্রতি সে রকম টানই ওর নেই। শহরে বন্দরে ঘুরে কিম্বা কেয়ার কাছে পালিশ করা কথা বলে যাকে যাবে হাফিয়ে ওঠে। তাই কিছুক্ষণের জন্যে তোমার পাশে এসে বসে মুখ বদলাতে। আর তখনি আকাশ বাতাস পাখির গান সবুজ ধানের উল্লাস পড়ে যায়। কই, থাকুক দেখি এখানে এসে দুটি মাস? হ্যাঁ, ঠিক এই কথাটিই তোমার মুখে গুঁজিয়ে দিয়েছিলাম একদিন। সত্যি, তোমার সাহস দেখে খুশিও হয়েছিলাম। কিন্তু রাত্রিতে তোমার ভাল মানুষ মনটির সে কি অনুশোচনা! শান্তিতে ঘুমোতেই দিল না তোমাকে। এত পই পই করে বারণ করলাম, শেষ পর্যন্ত উঠিয়ে তবে ছাড়ল। সকলকে ডিঙিয়ে হাজির হলে আলোকদার ঘরে। তারও ঘুম আসছিল না। কারণ সত্যি কথাটা মুখের ওপর বলতে নিজেকেও যেন কিছুটা বুঝতে পেরেছিল। তোমাকে অনেকক্ষণ ধরে আদর করল। তুমি যথারীতি গলে গেলে। কিন্তু বলতে কি, আমার গাটা রী রী করছিল। বুঝতে পারছিলাম তোমার কপালে আরো অনেক দুঃখ আছে। মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছিল, বেহায়া—

হ্যাঁ, এরপর স্বাভাবিক ভাবেই পরিমলের কথা এসে পড়ে। ওর কথা না এলে যেন প্রসঙ্গটা সম্পূর্ণ হয় না। বনমালী নস্কর রোডে শ্রীযুক্ত আলোক রায়ের আগমনকে আবির্ভাব বলা চলে। কিন্তু লক্ষ্য কোরো, পরিমলের বেলায় আমি সামান্যটা 'আসা' শব্দটি ব্যবহার করেছি। একটু আগে আলোককে বিশাল বটবৃক্ষের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। কিন্তু পরিমলের বেলায় তুলনা চলে বুঝি একমাত্র মাটির প্রদীপের। তুলনাটা হয়ত একটু সেকেলে। তা হোক গে। কিন্তু বোঝাবার পক্ষে ওইটেই সব চেয়ে সুবিধেজনক। চাঁদের আলো যতই মনোহারী হোক না কেন, তা সব সময় বিশ্বাসযোগ্য নয়। কৃষ্ণপক্ষ থাকতে পারে অথবা মেঘে ঢাকা পড়ে অন্ধকার করে ফেলতে পারে এক মুহূর্তে। মাটির প্রদীপের সে যৌবন নেই। কিন্তু নির্ভরযোগ্যতা আছে। হাত বাড়িয়ে সলতেটাকে শুধু উসকে দাও। পরিমল এসেছিল এক রাশ ভীরুতা নিয়ে। প্রতি পদে ছিল সঙ্কোচ আর কুণ্ঠা। আলোকের মত ছিল না ওর অপরূপ দিবাকান্তি। কিম্বা কোন নিবিড় বাগান থেকে একরাশ সুগন্ধ ও ঝরে আনেনি। গ্রীষ্মের প্রথম বেলাকী বৃষ্টি যদি হয় আলোক, তবে পরিমল শ্রাবণের অঝোর ধারা। চাষীরা যার জন্যে আকাশের মুখ চেয়ে বসে থাকে। আলোক ছিল ঝড়, ভেঙে চুরে সব

কিন্তু তছনছ করে চলে যাওয়াই যার ধর্ম। পরিমল দক্ষিণ হাওয়া, যার মৃদু উপস্থিতি প্রায় নজরেই আসে না। কিন্তু শরীর জুড়িয়ে যায়। তাহলে বুঝতে পারলে দু'জনের মধ্যে পার্থক্যটা কোথায়? বলতে কি, আলোককে দেখে আমার বিচারশক্তি লোপ পেয়েছিল। সেই জন্যে ওর মোহন ফাঁদে অত তাড়াতাড়ি পা দিয়ে ফেলেছিলাম। কিন্তু পরিমলের বেলায় জ্ঞান ছিল টনটনে। প্রথম দিকে পাত্তাই দিইনি। লম্ব আঘাত খাওয়া মনে সমগ্র পুরুষ জাতটার ওপরেই ঘেন্না ধরে গিয়েছিল। পরে ভেবে দেখলাম, একজনের জন্যে সকলকে দোষী সাব্যস্ত করা অসুস্থতার লক্ষণ। অনেকেই কিন্তু এই ভুলটা করে থাকে। অবশ্য এই মনোভাব পরিবর্তনে পরিমলই সব চেয়ে বেশী সাহায্য করেছে। পরিমলের মত ছেলেরা প্রতারণা করতে জানে না, তা ওর সরল ভীরু চোখ দুটির দিকে তাকালেই বোঝা যায়। তাছাড়া ওদের কারবারোপ নেই। সেই জন্যে স্বভাবতই কল্পনার বেলুনে ফুঁ দিতে এরা অক্ষম। ওরা জানে কেবল কাজ। অন্তর্জগতের সূক্ষ্ম কারুকাজ নিয়ে মাথা ঘামায় না। বহির্জগতের মোটা বাস্তবতা নিয়েই এরা ব্যস্ত। শক্ত হাতে কি করে পথের বাধা ছিঁড়ে ফেলতে হয় তা পরিমল ভাল করেই জানে। কেননা, অতি শৈশব থেকে প্রতি পদে লড়াই করে এত বড়টি হয়েছে। একদা ছেলেবেলায় ছেঁড়া গামছা পরে গ্রাম থেকে শহরে এসেছিল। দেখো, একদিন শহর জয় করবে। পরের বাড়িতে থেকে যারা মানুষ, তাদের শাপে বরের মত অজান্তে কতগুলি গুণও এসে জমিয় হয়। তারা আত্মপ্রত্যয়ী ও দৃঢ় হয়। এরা নিজেরা যে সান্ত্বনা ভোগ করে তার প্রতিদান দেয় সমাজে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে। যতদিন না হয় ততদিন মরমে মরে থাকে। লক্ষ্য কোরো, পরের বাড়িতে থাকার ফলে এরা যেমন নিজেদের অস্তিত্ব সম্পর্কে সচেতন হয় তেমনি আত্মমর্যাদা সম্পর্কেও। তবু এদের কঠিন দিকটাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয়। কোমলতার ছোঁয়ায় মনটাও তেমনি নরম। তোমার সঙ্গে ব্যবহারেই যে এর প্রমাণ মেলে তা নয়। অন্য যে কোন লোকের সঙ্গেও তার পরিচয় পাওয়া গেছে। একবার এক বাচ্চা পকেটমারকে চড় মেরে সে কি মর্মতাপ। পরিমলের মনে হয়েছে বিরূপ সমাজ ব্যবস্থার জন্যেই ওই বাচ্চা ছেলেটা পাঠশালায় না গিয়ে ওস্তাদের কাছে তালিম নিচ্ছে। একজনের অপরাধে আরেকজনকে শাস্তি দেওয়া ঠিক নয়। পরিমল আজ ইচ্ছাশক্তির জোরেই বড় হয়েছে। নাহলে সেও অমনি একটি পকেটমার হতে পারত। সামান্য বি, এ, পাশ আর স্কুলের একটা সাধারণ মাষ্টারী, একে কি স্কুলেও কেউ বড় হওয়া বলে? মানি, আজকের দিনে কেউ বলে না। কিন্তু পরিমলের ছেলেবেলার অবস্থাটা একবার কল্পনা কর। সুদূর এক পাড়াগ্রামে অতি দীন পরিবারে জন্মেছিল। বাপের মুখ মনেই পড়ে না। শুধু বেড়ার গায়ে একটি ছবি টাঙান ছিল। ইস্কুলের পথে যেতে যেতে বাপেরা গাল টিপে পয়সাটি করে দিবি কেটে দিচ্ছে। তারপর খাওয়া হয়ে গেলে স্কুলের মধ্যে বই শ্লেট গুছিয়ে রাখছে। পরিমল এই সব কেমন যেন অসহায় চোখে তাকিয়ে দেখত। তারপর কত দিন এমন হয়েছে, দুপুর বেলা চুপি চুপি ফটোটা নিয়ে চলে গেছে পুকুর পারে। একটু পরে দুই চোখ ঝাপসা হয়ে আসত। উইপোকায় কেটে ফেলেছে ছবিখানা। যার মুখ দেখাই যায় না। শাড়ির কিছু অংশ, ডান হাত আর পা দু'খানা। পরিমল বার বার মাথায় ঠেকাত। তারপর কাপড়ে লুকিয়ে ছবিখানা আবার ঠিক জায়গায় টাঙিয়ে রাখত। তারপর বিকেল বেলায় যখন কদম গাছের তলায় চোর চোর খেলত, এত সঙ্গী সাথীর মধ্যেও হঠাৎ পরিমলের মন বিষণ্ণ হয়ে উঠত। ওই শাড়ির অংশ, ডান হাত আর পা দু'খানা মিলিয়ে কল্পনা করত যার মুখ কেমন ছিল। কিন্তু কোন হদীশই পেত না। পাছে ছেলেরা পরিমলের চোখে জল দেখে ফেলে সেই ভয়ে ছুটে চলে যেত পুকুর পারে। বাবা ছিলেন পোস্টমাস্টার।

এক বেলা পোস্ট অফিস বসত। মাইনে চোদ্দ টাকা। এত কমে কি করে যে চলত তা আজো বুঝে উঠতে পারে না। তবে সেই শৈশবকালেই দেখতে পেত শোভাযাত্রা করে পাওনাদার আসছে। বাবার মুখ রক্তশূন্য হয়ে যেত। ওরা গালাগালি দিত, অপমান করত। এত দুঃখের মধ্যেও বাবা ছিলেন প্রখর সত্যবাদী। ধার করেছেন, শোধ দিতে পারেননি সময়মত, তবু ফাঁকি দেবার কথা কল্পনায়ও আনেনি। পরিমলকেও বার বার এই একটা উপদেশই দিয়ে এসেছেন, সত্য পথ থেকে বিচ্যুত হয়ো না। সত্যকে ধ্রুবতারা কর। কিন্তু পরিমল একদিন একটা দুঃসাহসিক কাজ করে ফেলেছিল। বাজারের অভয়বাবু আসতেই বলেছিল, বাবা বেরিয়ে গেছে। কিন্তু তিনি ঘরের মধ্যেই ছিলেন। কথাটা তাঁর কানেও যায়। তারপর আরম্ভ হল পিতাপুত্রে চোর চোর খেলা যেমন পরিমলরা কদম গাছের তলায় খেলত। সাত দিন ধরে কেউ কারো মুখের দিকে তাকাতে পারেনি। সে একটা দিন গেছে। রান্না করে পরিমলের জন্যে ভাত ঢাকা দিয়ে রাখতেন। আঁচাতে গিয়ে দৈবাৎ চোখাচোখি হলে দুজনেই আড়ষ্ট হয়ে যেত। তারপরে সেই চির দুঃখী বাবাও একদিন ওদের ছেড়ে চলে গেলেন। পরিমল কলকাতায় ওর দূর সম্পর্কের এক কাকার বাড়িতে চলে এল। ছোট ভাই নির্মলকে গ্রামেরই এক ভদ্রলোক দয়া করে রাখলেন। পরিমল কাকাকাকীমাকে কোনদিন দেখেনি। আত্মীয়তার চেয়ে বাবার সঙ্গে বন্ধুত্বই ছিল বেশী। গল্পে গল্পে একবার নাকি বলেছিলেন, তোর একটি ছেলেকে আমি রাখব। সেই গল্পের সূত্র ধরেই ওর শহরে আসা। কলকাতা থেকে গ্রামে এক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন। তিনিই পরিমলকে পৌঁছে দেন বিডিরপুরে ওর কাকার বাড়িতে। মনে আছে সন্ধ্যা তখনো শুরু হয়নি। শীতের বেলা। সব বাড়িতে এক সঙ্গে উনুন ধরানো হয়েছে। ছোট গলিটা ঠিক চেনাই যাচ্ছে না। ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন চারদিক। পরিমল একটা পুঁটুলি হাতে ভয়ে সঙ্কোচে আধমরা হয়ে ঢুকেছিল। প্রণাম করে উঠে দাঁড়াতেই শুরুতে স্পষ্ট বিরক্তির ছাপ লক্ষ্য করেছিল। কাকার মনে পরোপকারের কোন রকম স্পৃহাই ছিল না। নেহাৎ কথার কথা হিসেবে ওটি বলেছিলেন। এখন ব্যাপার দেখে চক্ষু চড়কগাছ। তবু বাইরে উপকারী সাজার একটা ক্ষীণ সাধ হয়ত ছিল। যার জন্যে চুপ করে গেলেন তখনকার মত। কিন্তু হুঁষে আসলে শোধ তুলতে লাগলেন অবাঞ্ছিত ছেলেটার ওপর। চুড়োয় পৌঁছতে পারলে যে কেউ পথের কষ্ট ভুলে যায়। পরিমল কিছুতেই ভুলতে পারে না সেখানে সে চোর অপবাদ পেয়েছিল। দু'মাস আগের কোন তুচ্ছ ঘটনার জন্যেও সকলের সামনে অপদস্ত হতে হত। ভুলে গেলে একজন আরেক জনকে মনে করিয়ে দিত। সেখানে পরিমল আনগ্রেটফুল কথাটার নতুন তাৎপর্য পেয়েছিল। কাকা বলতেন, একটা কুকুরকেও ভাত দিলে পায়ের কাছে বসে লেজ নাড়ায়। পরিমল মনে করত, সেইজন্যেই ও কুকুর। মানুষ তা পারে না। প্রথমত মানুষের লেজ নেই, দ্বিতীয়ত মানুষের আত্মমর্যাদা আছে। মানুষ চায় ভাতের চাইতেও বড় মানুষের মতন সম্পর্ক। সত্যি কথা বলতে কি, পরিমল অনেকবার গ্রেটফুল হবার চেষ্টা করেও পারেনি। তার জন্যে সে যে কোন শাস্তি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। হয়ত এ এক পক্ষে ভালই। পরিমলের সেই থেকে মানুষ চেনার পালা শুরু হল। মনের বয়েস হু-হু করে বেড়ে গেল। দাঁতে দাঁত প্রতিজ্ঞা করল, বড় হতেই হবে। কাকা বলতেন, তোদের বংশে তো লেখাপড়ার চর্চা নেই; কোন দিন কলকাতা দেখেছিলি? এখানে বাস করার কথা ভাবতে পেরেছিল? হাঁা, পরিমল আজ শহরে প্রবেশের ছাড়পত্র পেয়েছে বৈ কি। কাকার বাড়ি ছাড়ার পর অতি কষ্টে টিউশনি করে চালিয়েছে। আই. এ. পাশ করার পর ইস্কুলের মাস্টারীটা পেয়ে বেহালায় একটা ঘরও ভাড়া করেছে অল্প টাকায়। ইতিমধ্যে দেশ থেকে নির্মলকে এনে ইস্কুলে ভর্তি করে

দিয়েছে। এখন ও অনার্স গ্রাজুয়েটের ছেলে যাইনে পায়। কিন্তু ওখানেই মেয়ে থাকবার ছেলে পরিমল নয়। ইংরেজী খবরের কাগজ দেখে এপ্লিকেশন ছাড়ছে। এম. এ. দেবার সঙ্গে সঙ্গে কম্পিটিটিভ পরীক্ষা দেবার জন্যেও প্রস্তুত হচ্ছে। দেখো, ও ঠিক বেরিয়ে যাবেই। ইংরেজী লিখতে পারে, যে কোন বিষয়ে ক্লিয়ার কনসেপশন আছে। তদুপরি আছে একাগ্রতা। কেননা, ওকে যে শহর জয় করতেই হবে। পরিমলের আরো একটা গুণ এই যে, নিজে থেকে কোনদিন এসব কথা শোনাতে যায়নি। অনেক ঘনিষ্ঠতা হবার পরও যখন তোমাদের বাড়ি নিয়ে গিয়ে লজ্জায় পড়েছিলে তখনি বলেছে। তাও একেবারে নয়। একটু একটু করে, তোমার লজ্জা ভাঙবার জন্যেই। বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিল তোমার আর ওর লেভার এক সূত্রে বাঁধা। তাই বেহয়ো বাজবার সম্ভাবনা কম। মনে আছে, তুমি পরিমলের কথা অবাক চোখে শুনে গিয়েছিলে। এর মধ্যে কোন অপরিচিত শব্দ ছিল না। শুধু প্রত্যেকটি শব্দই যেন আলাদা ভাবে চোখে ঝলসে উঠেছিল। পরিমল যেন খুব কাছের মানুষ, আবার একই সঙ্গে খুব দূরের। তোমার মধ্যে আমি খুব খুশি হয়েছিলাম সেদিন। তুমি কি কখনো বাঁচবার, লড়াই করবার, বড় হবার ভাষা ওই বিলাসীবাবুর মুখ থেকে শুনেছ? তিনি আসতেন, নিঃশব্দে টুলের ওপর বসতেন, তারপর পাছপালায় মাখা, ঘুরের মাঠ, আকাশের দিকে বাচ্চা ছেলের মত তাকিয়ে থাকতেন। যেন পাছপালার মাথায় হাজার টাকার গেড়া বাঁধা রয়েছে। আর একটু নিন্দে করলে বাপুর সে কি রাগ! আর যে সব কথা উনি বলতেন তা কি তোমার বিন্দুমাত্র কাজে লেগেছে? যেমন কুরুচি ফুল কোন্ সময় ফোটে, রজন নামটা কার দেওয়া, সংস্কৃত সাহিত্যে কিংশুকের এত প্রাধান্য কেন; কিম্বা কোকিল কেন পরের বাসায় ডিম পাড়ে, মেয়ে কোকিলের গায়ে ছিটছিট দাগ থাকে, পৃথিবীতে একটি মাত্র তোড়ো পাখি আছে লণ্ডনের চিড়িয়াখানায়—তুমিই বল, এ সব শুনে কি লাভ? তাছাড়া আলোক কখনো তোমার ইচ্ছে অনিচ্ছের মর্যাদা দিয়েছে? তুমি যে মানুষ, তোমার যে ব্যক্তিত্ব আছে তা খেয়ালীবাবুর কাছে অতি তুচ্ছ। হঠাৎ ঘুনকেচুর মত উদয় হয়ে বলেছে, বাইরে চল। যেন তুমি ওর হুকুমের চাকর। অথচ এত মেলামেশার পরেও পরিমল তোমাকে সিনেমা যাবার মত সাধারণ প্রস্তাবটাও হঠাৎ করতে পারেনি। আগে জেনে নিয়েছে তোমার সময় আছে কি না, তারপর অমুকে অমুকে অভিনয় করেছে, গল্পটাও ভাল, অতএব দেখার ইচ্ছে আছে কি না ইত্যাদি। কত সঙ্কোচ ওর!

এখন একটাই প্রশ্ন থাকে, পরিমল তোমাকে ভালবাসে কি না। দেখ, এটা তোমার তর্কের খাতিরে বলা। ভালবাসে গো বাসে। একটা কুকুরও বুঝতে পারে কে তাকে ভালবাসে। বিড়ালও গলায় ঘরঘর আওয়াজ দিয়ে প্রতিদান জানায়। আর তুমি বুঝতে পার না? ন্যাকা মেয়ে।

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য)

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.

(FORMERLY THE COTTOT AGENT PRIVATE LTD.)

INDUSTRY HOUSE,

159, Churchgate Reclamation,

BOMBAY—1

কাব্যরূপকল্প ঃ মাইকেল মধুসূদন

কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে পর্যন্তও বাংলাকাব্যের করণকৌশল কাব্যদেহের নির্মাণকার্যের রহস্য নিয়ে বস্তুকেন্দ্রিক আলোচনার তেমন রেওয়াজ লক্ষ্য করা যেত না। রবীন্দ্রনাথও তাঁর সাহিত্যসমালোচনায় কাব্যের আত্মার তাৎপর্য নিয়ে ব্যাপৃত থেকেছেন। তাঁর দৃষ্টি ভোক্তার বিশ্লেষকের নয়। রূপ-শিল্পগত আলোচনাক্ষেত্রে তিনি ছন্দোবিজ্ঞানে যে পরিমাণ মনোনিবেশ করেছেন, বিশেষভাবে কবিভাষা, : বা-অলঙ্কার বা কাব্যরূপকল্প (Poetic image) সম্পর্কে সে তুলনায় অনেক কম কথাই তাঁর সাহিত্যসমীক্ষায় স্থান পেয়েছে। বরং বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কাব্যবিচারে ভারতপন্থী। প্রাচীন সৌন্দর্য দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিষ্ঠা দিয়েছেন তাঁর সাহিত্য-বিধানকে। তথাপি জয়দেব কালিদাস চণ্ডীদাস বিদ্যাপতি ও কোনো কোনো আধুনিক (দেশ-বিদেশের) কবির আলো-চনায় তিনি কাব্যের গঠন ও রূপের বহিরাবরণ ও আত্মা সম্পর্কের মনোজ্ঞ সমীক্ষা নির্দেশ দিয়েছেন।

আচার্য রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' গ্রন্থটিতে কবি সত্যেন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে কাব্যের চিত্রাত্মিকা দোষের কথা বলেছেন। ইদানীং রবীন্দ্রকাব্য রূপকল্প, রবীন্দ্রকাব্য-ভাষা ও রবীন্দ্রনাথের কবিতার ইন্দ্রিয়-চেতনার বৈচিত্র্যবিষয়ক কিছু কিছু অভিনব রচনা আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।[১] ডঃ শিবচন্দ্র লাহিড়ী মহাশয়ের বিরাট পরিকল্পনা বহন করে এনেছে 'বাংলা কাব্যে উপমালোক।'

অবশ্য প্রাচীন অলঙ্কারশাস্ত্রীগণ আমাদের দেশে কাব্য-করণ কৌশলের যে কৌতূহলোদ্দীপক আলোচনা করেছেন তা সর্বকালেই অভিনন্দিত হবে। পঞ্চম শতকেরও আগে অগ্নিপুরাণ বলেছিলেন, 'অর্থালঙ্কার রহিতাবিধবের সরস্বতী' অর্থাৎ সরস্বতী (কাব্য) অলঙ্কাররহিতা হলে বিধবার মতন। অলঙ্কার শাস্ত্র লেখা হবারও বহু আগে মহাকবি বাল্মীকি লিখেছিলেন 'নিঃশ্বাসইব সীতায়া বাদূর্বাতি মনোহর :— সীতার নিঃশ্বাসের মত মনোহর বাতাস বইছে। অলঙ্কার প্রয়োগে কবির রচনা বস্তু স্বরূপের অভিনবত্বের সন্ধান দেয়। এই অভিনবত্বের প্রেরণা কোনো বিশেষ যুগকালের নয়। একালের পাশ্চাত্য সমালোচকগণও আরিস্তটলের শিল্প-সমালোচনার রূপকত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করছেন।

বলাবাহুল্য অর্থালঙ্কার পর্বে সাদৃশ্যধর্মী অলঙ্কার অর্থাৎ মূলত উপমা রূপকই বিশেষ প্রভাবশীল। কারণ কবিকল্পনার রহস্য লোকের চাবি হল বস্তুর সঙ্গে বস্তুর তুলনায় বা সাদৃশ্য নির্ণয়ে। অথবা বলা যায় বস্তুজগতের সঙ্গে কবিকল্পনার বা বস্তুসৌন্দর্যচেতনার সংঘর্ষে এক আশ্চর্য রংমশাল জ্বলে উঠে অভাবিত পৃথিবীকে আলোকিত করে আমাদের সম্মুখে।

কালিদাস বলেছেন রঘুবংশের প্রথম সর্গে, মহারাজ দিলীপের মুখে সংবাদ শুনে ত্রিকালজ্ঞ মহর্ষি বশিষ্ঠ নিদ্রিত-সংজ্ঞ-সমর্থিত তপোধনের ন্যায় ক্ষণকাল স্তিমিত ভাব অবলম্বন করলেন। "ধ্যানস্তিমিতলোচনঃ ক্ষণমাত্রমুষি স্তব্ধো সুপ্ত মীন

১। রবীন্দ্রকাব্যে বাক্ প্রতিমা—ডঃ অমলেন্দু বসু। রবীন্দ্রনাথ—পুলিনবিহারী সেন সম্পাদিত।

২। রবীন্দ্রকাব্যে ইন্দ্রিয়চেতনার বিকাশ ও রূপায়ণ—শ্রীঅশোক বিজয় রাহা—বিশ্বভারতী পত্রিকা।

ইব ব্রহ্মঃ।" ধ্যানমগ্নতাকে কালিদাস এইভাবে দেখেছেন। তুলনায় এই নবপরিকল্পিত অধিতীয় আধারে না ধরলে কিছুতেই আমরা কবি বশিষ্ঠের ঐ বিশেষ অবস্থাটিকে দৃষ্টি গোচর করতে পারতুম না।

সংস্কৃত তথা প্রাকৃত রূপশিল্পলোক প্রাচীন কাল থেকে অদ্যাবধি, রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ও বটেই, বাংলাকাব্যরূপকের মূলভিত্তি রচনা করে রেখেছে। 'বিম্বাধরা' 'পদ্মাক্ষি' 'কমললোচনা' 'বাহুলতা' 'মৃণালভুজ' 'বঙ্কোচূড়'—এমনতর ভূরি ভূরি উপমা বা সাদৃশ্য সূত্রের টোটকাবিশেষ কতকাল থেকে যে ভারতীয় কাব্যলক্ষ্মীর বরাভরণ হয়ে আছে তার সৌন্দর্যনির্ণয়ের দুরূহ সাধনায় তথ্যে অবকাশ রয়েছে। লোকসাহিত্য থেকেও বিদগ্ধ কবিসমাজ অনেক রূপ-উপকরণ সংগ্রহ করেছেন তারও নজির আছে।

মধুসূদন প্রসঙ্গে আসবার আগে আমি আরও একটু কাল-হরণের লোভ-সংবরণ করতে পারছি না বলে পাঠক আমায় ক্ষমা করবেন।

মেদিনীপুরের ঝেলপাহাড়ী অঞ্চলের একটি সাঁওতাল গীতির উল্লেখ করছি। প্রবাসী প্রিয়তমের উদ্দেশে বিরহিণী বলেছে : [১] "আসবে না সে যদি জানতেম তবে খোঁপার ফুলের মত নয়নে অঞ্জনপ্রায় আঙুলে আংটির মত রাখিতাম তারে।"

এই গীতি কবিতাটিতে যে উপমা চয়ন করেছেন লোককবি তার সঙ্গে অনেকটা মিল রয়েছে বিদ্যাপতির নিম্নলিখিত পদটিতে :

হাসক ধরণক আধক মুদ।
নয়নক অঞ্জন মুখক তাম্বুল॥
হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার।
দেহক সরবস গেহক সার॥

প্রেয়সীর নিত্যব্যবহারের বস্তুগুলি রূপকারের উপাদানগুলি উপমা হয়ে শোভা পেয়েছে কবিতায়।

মধুসূদনের কবিতায় রূপক উপমার অজস্রবিস্তার। এটা কোনো নতুন কথা নয়, আবার নতুনও বটে। কবিতা-অলঙ্কারের ভেতর যেগুলো সাদৃশ্যধর্মী, যাদের মধ্যে কবির ব্যক্তি-চেতনা বস্তুবিশ্বে বিবিধ নানাবর্ণিল উপাদানে সক্রিয় হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে তাদের নিয়ে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য কাব্যে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। বিশ শতকের কাব্য সমালোচনায় রূপক উপমা কবিতায় যে চিত্রযোজনা করছে কবির ব্যক্তিত্ব ও ইন্দ্রিয়চেতনার যে নবনব রূপরাশির প্রকাশ করে চলেছে তাকে কেন্দ্র করে রূপকল্প, চিত্রকল্প, বা Imagery'র কথাটা বড় হয়ে প্রকাশ পেয়েছে। প্রাচীন ও নবীনের চিন্তাধারা ঠিক এক জাতের নয়। একালের রূপকল্প সমালোচক বলছেন রূপক উপমার সংহতি বা বিশ্লেষণে সর্বদাই কোনো ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য চিত্র উপস্থিত হয় না। তাঁরা বলবেন, "মহাসত্ত্ব যথা নম্রশিরঃ ফণী উত্তরিলা রাবণ-অনুজ লক্ষ্মি রাবণ-আত্মজে" এই প্রকাশটিতে কোনো বিশেষ চিত্র আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিভাত হয় না। বিকৃত নিন্দিত বিভীষণের গভীর আত্মগ্লানিকর লজ্জাকে মত্ত-অধমত্ত-শির সর্পের সঙ্গে উপমিত করে দেখানো হয়েছে। মহাকাব্যসুলভ বিস্তৃতিতে মধুসূদন ইহাপেক্ষা বিস্তারধর্মী উপমার ব্যবহার করেছেন। রূপক সংহত সংবৃত। বিরোধধর্মী নিতান্ত অবাস্তবকেও সে পাশাপাশি রেখে নবত্ব সৃষ্টি করতে সক্ষম। পাঠকচিত্তের কল্পনা দীপটিকে উস্কে দিতে সাহায্য করে রূপকই বেশি করে, উপমা নয়। যেমন পূর্বোক্ত পংক্তিতে দেশদ্রোহী কাপুরুষ চরিত্রটি মধুসূদন ঐ

১। অধ্যাপক বন্ধু অমিল সেনগুপ্ত তাঁর ছাত্র তারাপদ মুর্মুর কাছ থেকে এটি সংগ্রহ করেন। ছাত্রটি ঝেলপাহাড়ী অঞ্চলের সাঁওতাল অধিবাসী।

কৌতূহলী পাঠকের জন্য মূল গানটি উদ্ধৃত করছি :

হাং এ হিজু: গাড়ায় গাদি ক। তং রেমাঃ বাহালেক।
সেং রেমাঃ আরদম কাট রেমুঁদাম্ লেকাএত বংকো

উপমার আলোয় উদ্ভাসিত করেছেন। পরন্তু সেখানে ধরাবশীভূত সর্পের কোনো অভিজ্ঞতা কোনো দৃশ্যমানতা আমাদের কল্পনায় সঞ্চারিত হয় না। অথচ "এবে অজপর গরজে সাগর ঘুঁসিছে—"—এখানে কবি-অভিপ্রেত বিভিন্ন রকমের হলেও শ্রুত-ধ্বনিমোহে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্রে সাপের গর্জন শুনতে পাচ্ছি। আমি এমন বলি না যে মধুসূদন শুধু গতানুগতিক অলঙ্কার প্রয়োগের কবি। এও বলি না যে তাঁর কল্পনায় তুলনায় বৈচিত্র্য নেই। বরং একথাই বলব তিনি সংস্কৃত কাব্যের পথাঙ্ক অনুসরণ করেও তাঁর বলিষ্ঠ কল্পনার স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন।

আমি মধুসূদনের কবিতা থেকে তাঁর রূপকল্প চেতনার অভিপন্নীর নিদর্শনটি উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছি। রূপক উপমা রূপকল্প ইত্যাদির ভেদবিভেদের বিতর্ক নিরসন করে মিড্‌লটন মারে বলেছেন, 'প্রকৃতপক্ষে উপাদানের দিক থেকে উপমা ও রূপকে কোনো পার্থক্য নেই। রূপক হল উপমারই সংহত (compressed) প্রকাশ। 'ইমেজ' শব্দটির মধ্যে উপমার বিষয়বস্তুর দিকটা অনেকটা সীমাবদ্ধ তবে দৃশ্যচেতনাগত প্রসঙ্গ উঠে পড়লে 'Imago' শব্দটি অনেকটা সুপ্রযোজ্য মনে হয়।...যদিও 'ইমেজ' শব্দ প্রয়োগে কাব্যসমালোচনার নানা অসুবিধে দেখা দিতে পারে তবু শব্দটির প্রয়োজনীয়তা আছে। 'ইমেজ' শব্দটি উপমা ও রূপকের মুখ্য আলোচনা প্রসঙ্গেই তাদের স্বরূপ নির্ণয়ে প্রযুক্ত হতে পারে। রূপকল্প (Imago) শুধু দৃশ্যচেতনারই প্রাধান্য এমন সিদ্ধান্ত আমরা যদি নাই করি, তাতে সুবিধা আছে। কারণ রূপকল্প শব্দটি তার জনকশব্দ কল্পনার সঙ্গে খানিকটা যুক্ত। কল্পনার সামগ্রিকতা ও আন্তরিকতার ধর্ম রূপকল্পের মধ্যে নিহিত।...উপমা রূপকের আধুনিকতর বিকল্প সংজ্ঞা হিসাবে রূপকল্প শব্দটি অপেক্ষাকৃত মূল্যবান বলেই মনে হয়।'[১]

মধুসূদন ছিলেন বহুভাষাবিদ। বাংলা কাব্যে, উনিশ শতকের তীব্র আত্মসচেতনতায় তিনিই বোধকরি সব প্রথম সচেতনভাবে শব্দশিল্পের ও বাক্‌প্রতিমাগঠনের সৌন্দর্যরক্ষায় তৎপর হয়েছিলেন। শব্দ ও ধ্বনি সম্বন্ধে, বর্ণাতিরেকের ঘনঘটায় বহুক্ষেত্রেই হয়ত প্রতিমাগঠনের সুচারু বিন্যাসটি ব্যাহত হয়েছে, কিন্তু তৎসত্ত্বেও তিনি মহাকাব্য-সরস্বতীর দীপ্ত মুখমণ্ডলে যে কঠিন বলিষ্ঠ ভাস্কর্যের চিহ্ন রেখে গেছেন তা তুলনারহিত অদ্বিতীয়। রূপকল্প বিচারে তা কাব্য-অলঙ্কারের কোনো না কোনো পর্যায়ে পড়লেও সমগ্রভাবে মাইকেলের শব্দ ও ধ্বনিসমবায়ের দুরন্ত আততি (tension) যে রূপকল্প নির্মাণের সাক্ষ্য বহন করছে তা একদিকে যেমন নিখুঁত কারু-কার্যখচিত অন্যদিকে তেমনি নাটকীয় গতিবেগে দুরন্ত, মহা-কাব্যিক চরিত্রদৃঢ়তায় অপরিহার্য। শত্রুবেষ্টিত ইন্দ্রজিত প্রবল পৌরুষে গর্জন করে বলেছে, 'ছাড় দ্বার যাব অস্ত্রাগারে' আর দেববলে বলী লক্ষ্মণের নাটকীয় প্রত্যুত্তর লিপিবদ্ধ করেছেন মহাকবি সুকৌশলে একটি অব্যর্থ রূপকল্প যোজনায় 'আনায় যাকারে বাধে পাইলে কি কভু ছাড়ে রে কিরাত তারে।'

গতানুগতিক ধারার বিলাসবর্ণনা মাইকেলের কাব্যে অপ্রতুল নয়। কিন্তু মধুসূদনের স্বকীয়তা সেইখানেই থেমে যায় নি। একদিকে সংস্কৃত অন্যদিকে ইংরেজি লাতিন গ্রীক হিব্রু প্রভৃতি ভাষার শব্দ সংস্কৃতি মন্থন করে সেইসব সুবিপুল করণকৌশলের কবিতারীতির কোনখান থেকে কতটুকু পরোক্ষ-ভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে মধুসূদন গ্রহণ করেছেন অর্থাৎ আত্মস্থ করে নিয়েছেন তা বিশ্লেষণ করে দেখান বেশ কঠিন কাজ। কিন্তু বর্ণন কৌশলে যদি তিনি মূলত ভারতের কবিগুরুর কাছে পাঠ না নিতেন তবে বাংলা কাব্যের মহাকবিও তিনি হতে পারতেন না। আবার একথাও সত্যি তাঁর উপমা রূপক শৈলী তাঁর মহাকাব্যিক রূপকল্পনা আবার চিরন্তন বাঙালী-

১ Middleton Murry's 'Selected Criticism' গ্রন্থের 'Metaphor' শীর্ষক প্রবন্ধের মূল বক্তব্য-আশ্রয়ানুসরণে প্রায় অনুবাদের মত করে উপস্থিত করা হল।

চিত্রকল্পরীতিতে তিনি অনায়াসেই অনন্য স্বতন্ত্রতা অর্জন করেন। যা হেমচন্দ্র নবীনচন্দ্র বা রঙ্গলাল প্রভৃতির পক্ষে কল্পনা করা যায় না। উনিশ শতকের গোড়াতেও বাংলা কাব্যের পল্লবে কোনো সৌন্দর্যের সঞ্চার হয় নি। ললিত লতায় কোমলতার ঘুম এসেছিল। বঙ্গের কলমলানিতে আর পাঁচ স্বাপত্যকর্মে মাইকেল মহাসমারোহের বান ডেকে দিলেন। 'কুসুমদামসজ্জিত দীপাবলীতেজে উজ্জ্বলিত দালান' মত তাঁর কাব্য আমাদের শত সহস্র রূপে আর ও অবাক করে দিল। সমুদ্রের এই ছবি কি আগে ছিলাম :

"মেঘশ্রেণী যেন
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল বাঁধা
দৃঢ় বাঁধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়,
ফেনাময়, কণাময় যথা ফণিবর
উগরিছে নিরন্তর গম্ভীর নির্ঘোষে।"

র মুক্তবেণীতে তিনি নবছন্দের সূচনা করলেন তার রূপে তাড়িত হতে হতে শব্দচিত্রগুলি চলেছে, আসছে একের পর এক। শিলাময় সাগর সেতু মেঘের মত। ফুল পর্বমান সমুদ্র বিস্তৃত কণা সর্পের মত। বঙ্গের —বিশ্লেষিত হয়েছে, কোনো নতুন দীপ্তি নেই। অথচ পনার সংহত ও পরিমিত। অপরদিকে লঙ্কার বৈভব ন মধুসূদন অপরিমিতির উচ্ছ্বাসে বন্ধনহীন—

শত শত হেম-হর্ম্য, দেউল, বিপণি,
উদ্যান, সরসী, উৎস ; অশ্ব অশ্বালয়ে
গজালয়ে গজবৃন্দ ; স্যন্দন অগণ্য
অগ্নিবর্ণ, অস্ত্রশালা চারু নাট্যশালা
মণ্ডিত রতনে, মরি।

ন্তর বিবৃতি, ঐশ্বর্যের ভীড়। কেবল কবির ব্যক্তিচেতনার শ ঘটেছে দুটি শব্দে যেখানে তিনি বলেছেন "স্যন্দন অগণ্য র্শ" অর্থাৎ আগুনরঙা অসংখ্য রথ আর নীরব কবির মত মুগ্ধ হয়ে সংক্ষেপে বলেছেন, 'মরি'। এই 'মরি' বলার ধরণটি নিতান্ত বাঙালীসুলভ। মধুসূদন যাদৃশী সৌধ্য ভারতের আদর্শের কবি নন, ব্রাহ্মণের তপোবনে অনায়াস স্বচ্ছন্দাসনে অন্তরে ঐশ্বর্যবান বিভবে নিঃস্ব যে ভারতবর্ষ মধুসূদনের কাব্য সংগীত সেখান থেকে উত্থিত হয়নি. 'মরকতীত ফুর্ত ক্ষত্রিয় পরিমার যে ভারত স্বপ্ন যেমবান ও রূপোজ্জ্বল মধুসূদনের কাব্যলক্ষ্মী সেখানেই অধিষ্ঠিতা।

মধুসূদনের মেঘনাদবধকাব্যে নিবিড় রূপবিলাসের ছড়াছড়ি। সঙ্গিনীদের নিয়ে বরাঙ্গনা প্রমীলা বীরবেশে লঙ্কায় প্রবেশ করছেন, "সুবর্ণকুন্তল বিভা উঠিছে আকাশে।" ক্ষত্রিয় রমণীর রূপযৌবনের এমন স্পষ্ট উত্তুঙ্গ রেখাঙ্কণে মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু মাইকেলের মহাকাব্যে বিষণ্ণ গোধূলি ছেয়ে আছে একমাত্র অশোক কাননে। সেখানকার বাক্‌কল্পনা বা রূপকল্পগুলি চলছলে অশ্রুজলভার মেঘের মত। স্মৃতিভারাতুর (Nostalgic) বেদনার্ত।

কোটা খুলি, রাক্ষসবধূ ধরে দিলা কোটা
সীমন্তে ; সিন্দুরবিন্দু শোভিল ললাটে,
গোধূলি-ললাটে, আহা! তারারত্ন যথা।

শেক্সপীয়রের সৃষ্টির মূলে ছিল টিউডর যুগের অবিশ্বাস্য স্বপ্না ভয় আর আন্তব প্রবৃত্তির আত্মক্ষয়ী লড়াই। মধুসূদনের মেঘনাদবধের কাব্যপট ছলনা লাঞ্ছনা ও অযথ ষড়যন্ত্রের পাশবৃত্তিতে কলঙ্কিত। আত্মধ্বংসী ভাবনার আন্তব রূপকল্পে শেক্সপীয়রের নায়ক বলেছে,"My thoughts like hounds pursue me to my death."[১] অবশ্য কাব্য প্রেরণার এই বিশেষ দিকটি মধুসূদন প্রত্যক্ষ ভাবে তাঁর পরিপার্শ্ব বা যুগ থেকে লাভ করেন নি, এমন কি তাঁর কাব্যে উত্তুঙ্গ পুরুষকার বা আদিম সুপ্ত জীবনধর্মের পদচিহ্ন অনুসরণে আমরা পাশ্চাত্য মহাকবিকুলের রাজ্যেও পদার্পণ করবার

১ Geoffrey Bullough লিখিত Mirror of Minds গ্রন্থে শেক্সপীয়রের Animal Imagery র দীর্ঘ আলোচনা আছে।

প্রয়োজন দেখি না। মেঘনাদবধকাব্যরচনার প্রারম্ভে মধুসূদন যে আদিকবির বন্দনা করেছেন তিনিই রামায়ণ মহাকাব্যে এমন একটি স্বচ্ছন্দ প্রাগৈতিহাসিক কাঠামো গড়ে রেখেছেন, সেখানেই এমন এক আরণ্যবিচিত্রতার দ্বারা বিরাজমান যার দুরায়ত প্রভাব উনবিংশ শতাব্দীর এই মহাকবিতে সঞ্চারিত হওয়া মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

মাইকেলের 'মেঘনাদবধ' থেকে আমি কতগুলি জান্তব আদিমচেতনার চিত্রকল্প উপস্থিত করছি:

"ত্বরন্ত চেড়ী সতীরে ছাড়িয়া
ফেরে দূরে ত্রস্ত সবে উৎসব কৌতুকে—
হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী
নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে।"

(মেঘনাদবধ : চতুর্থ সর্গ)

একদিকে অসহায়তা অপরদিকে হিংস্রতা দুইই দুর্বল ও শ্বাপদ অন্তর রূপকল্পে উদ্ভাসিত। সাধুভাষাচেতনার স্বাদু না হয়ে মধুসূদন নাট্যগতিতে সক্রিয়:

"বাহিরিলা আশুগতি দোঁহে
শার্দূলী অরণ্যানে, নাশি শিশু যথা
নিষাদ, পবন বেগে যায় ঊর্ধ্বশ্বাসে
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আক্রমে সহসা,
হেরি গতজীব শিশু বিবশা বিষাদে।"

(মেঘনাদবধ : ষষ্ঠ সর্গ)

"যথা পথে সহসা হেরিলা
ঊর্ধ্বফণা ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি
পথিক, চাহিলা বলী লক্ষ্মণের পানে।"

(মেঘনাদবধ ষষ্ঠ সর্গ)

"বীরবাহু শোকে
বিবশা রাজমহিষী বিহঙ্গিনী যথা,
সবে প্রাণে কালফণী ফুলায়ে পশিয়া
শাবকে।"

কৃতান্ত আদিছেতোর দুরন্তরাবণি।
কাটি কাটি বংশেদর্প আমূহীন জনে।

(মেঘনাদবধ : ষষ্ঠ সর্গ)

হিংস্র ও অনির্দেশ্য নিয়তির আকস্মিক আক্রমণরূপায়ণে মধুসূদন ব্যাঘ্র বাঘ্রী সর্প ইত্যাদির রূপকল্পে অসাধারণ নাটকীয় ও মহাকাব্যিক তীব্রতা সৃষ্টিতে সক্ষম হয়েছেন। কালিদাসের ন্যায় মধুসূদনও উপমা প্রয়োগে অদ্বিতীয়। এছাড়া ঝড় অরণ্য সমুদ্র যুদ্ধ প্রভৃতির রূপও মহাকাব্য-সুলভ ব্যঞ্জনায় গম্ভীর। সামুদ্রিক ঝড়ের এমন রূপকল্প প্রাচীন মধ্যযুগের বাংলাকাব্যে কোথায় আছে?

হুহুঙ্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে
যথা অম্বুরাশি; সবে ভাঙে আচম্বিতে
আস্ফালে; কাঁপিল মহী; গর্জিল জলধি।
তুঙ্গ-শৃঙ্গ ধরাকারে তরঙ্গ-আবলী
কল্লোলিল। বায়ু সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি।
ধাইল চৌদিকে মত্তে জীমূত; হাসিল
ক্ষণপ্রভা।

এখানে 'আস্ফালে' শব্দটি লক্ষ্য করবার মত। চিত্রের পরিপূর্ণতায় বলিষ্ঠ। আমার মনে হয় মধুসূদন শুধু বস্তুর শান বাঁধানো রাজপথে তাঁর শব্দসম্ভারোদ্বহনক্ষম কাব্যতুরঙ্গকে বেগবান করে তোলেননি, যদিও ইদানীং সমালোচকমহলে এরূপ মনোভাবের এক ফ্যাশন গড়ে উঠেছে, বস্তুত তাঁর রূপকল্পে, শব্দচয়নে, উপমা ও রূপকে এক নিপুণ শিল্পীর বিদগ্ধতা ও সংযমসাধন পারিপাট্যই প্রকাশ পেয়েছে। নিম্নের শান্ত বিস্তৃত চিত্রপটটির দিকে লক্ষ্য করুন, দেখবেন তাকে onomatopoeic image ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না—

বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িলা আকাশে
পক্ষিরাজ, মহাছায়া পড়িল ভূতলে,
আঁধারি অযুত বন, গিরি নদ নদী।

স্বরধ্বনি বিস্তারের দীর্ঘায়ত প্রলম্বিত টান আকাশ পৃথিবী বন পর্বত ও নদনদীর বিপুলায়তন চিত্রের সার্থক উপাদান। মধুসূদনের যে মহাকাব্যিক ব্যাপ্তনা ঘটনাপ্রবাহে, বিবরণধর্মে, আখ্যান সংস্থানে ও পুরাবৃত্ত আলোচনায় ফুটে উঠেছে প্রকারান্তরে তা রবীন্দ্রনাথের মহান উচ্চ গম্ভীর গভীরস্পর্শী কল্পনায় সমুদ্ভাসিত। রবীন্দ্রনাথের গীতি কবিতার সহস্র-তন্ত্রীতে একটি গম্ভীর তার ঝঙ্কৃত। তা মূলত মহাভারতের আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। ভারতইতিহাসের গরিমাদীপ্তিও তাতে অনুরণিত। সে সকল কবিতায় উপমা-রূপকের সংহত ব্যাপ্তনার চিত্রকল্প যোজনার করণ কৌশলে কতটা তিনি মধুসূদন-পন্থী ও কতটা স্বাধীন তা দেখাবার একটা প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র আছে বলে আমি মনে করি।

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

প্রাচীন কেশবিন্যাস-১

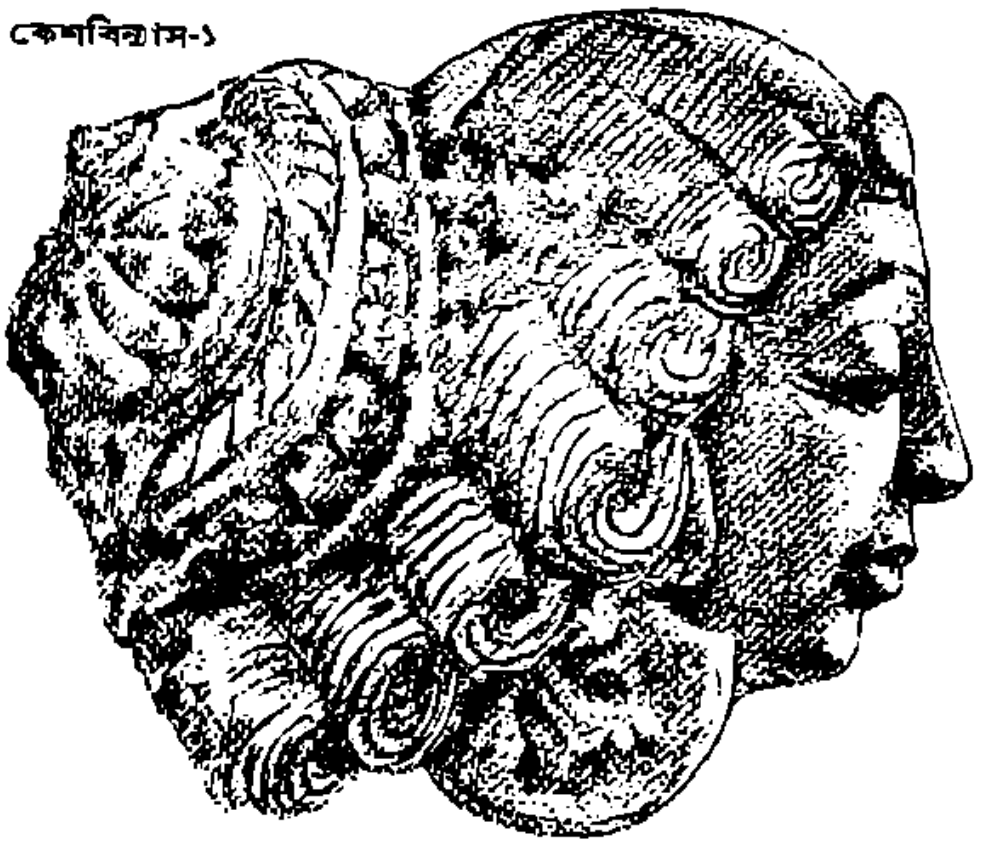

কেশবিন্যাসে আমাদের ঐতিহ্য

উত্তরপ্রদেশে অহীচ্ছত্রের অনুপম ভাস্কর্যে প্রাচীন ভারতীয় নারীর অপূর্ব কেশ-বিন্যাসের দৃষ্টান্ত বর্তমান। এরূপ কেশবিন্যাসের জন্য প্রয়োজন কেশ প্রাচুর্যের। আজকের দিনের আধুনিকতম মহিলার কেশচর্চার বেলাতেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। কিন্তু কেশবৃদ্ধির সহায়ক একটি মাথার তেল বাছাই ক'রে নেওয়া এক সমস্যা।

অলিভ অয়েল দিয়ে তৈরী ক্যালকেমিকোর **ক্যান্থারল** চুলের গোড়া শক্ত করে এবং কেশ বৃদ্ধিতে সাহায্য করে এই সমস্যার সমাধান করতে পারে।

ক্যান্থারল

সুরভিসম্পৃক্ত ক্যান্থারাইডিন কেশতৈল

দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ কলিকাতা-২৯

একজন সুদর্শন যুবকের একটি যন্ত্রের মতো হওয়ার একটি মানুষী

সুদর্শন যন্ত্রমানব নয়। কিন্তু তাঁর কাজের জন্য ঐ রকম নৈপুণ্যের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ অতিদ্রুত গতিতে প্রতি ঘণ্টায় ৬০০ চিঠি বাছাই করে সেগুলি সঠিক খোপে রাখতে হয়। প্রতিদিন সুদর্শনকে হয়তো ৪০০০ চিঠি বাছাই করতে হয়। এটা একটা অত্যন্ত দায়িত্বপূর্ণ কাজ এবং তিনি তা যথাসম্ভব দ্রুততা ও যোগ্যতার সঙ্গে পালন করেন। ৪০০ কোটি চিঠিপত্র, টেলিগ্রাম, মানিঅর্ডার ইত্যাদি যাতে যথাসম্ভব দ্রুতগতিতে এবং যোগ্যতার সঙ্গে বিলি করা যায় সেজন্য ডাক ও তার বিভাগে সুদর্শনের মতো ১৫০০০ কর্মী আছেন।

ডাক ও তার বিভাগ

পুস্তক পরিচয়

জ্যোতির জ্যোতি

ঠাকুর পরিবারের দান বাংলা সংস্কৃতির ইতিহাসে কতখানি তার খবর উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সম্বন্ধে অনুসন্ধানী যে কোন পাঠকই লক্ষ্য করবেন। সাহিত্য, সংগীত, চিত্র, স্বাদেশিকতা, ধর্মবোধ, সমাজসংস্কার এবং মানবচেতনা—সমস্ত দিকেই এই পরিবার তার সাধনার আলোক প্রক্ষেপ করেছে। বিশেষতঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর পুত্র-কন্যাদের দান এ প্রসঙ্গে সীমাতিক্রমী। রবীন্দ্রনাথের সর্বব্যাপী প্রতিভার দ্যুতিতে কিন্তু পরিবারের অন্যদের পরিচয় অনেকখানি ম্লান। কিন্তু তাঁরা যে প্রতিভার দিক থেকে নেহাৎ নগণ্য ছিলেন না, একথা নিরপেক্ষ ঐতিহাসিক-মাত্রেই স্বীকার করবেন। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং তাঁর 'জীবনস্মৃতি' এবং 'ছেলেবেলায়' একথা স্বীকার করেছেন।

মহর্ষির পঞ্চম পুত্র জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের (জন্ম ১৮৪৯ সনের ৪ঠা মে, লোকান্তরগমন ১৯২৫ সালের ৪ঠা মার্চ) প্রতিভা যেমন বিচিত্র, তেমনি বলিষ্ঠ। বাংলাদেশ এই বিস্ময়কর প্রতিভাকে প্রায় ভুলে যেতে বসেছিল। খুবই আনন্দের কথা, লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিক সুশীল রায় মহাশয় প্রভূত শ্রম স্বীকার করে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের একটি পূর্ণাঙ্গ পরিচয় আমাদের উপহার দিয়েছেন। বাঙালী এজন্যে তাঁর কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

সুশীলবাবুর ভাষাতেই অনুভকর্মা জ্যোতিরিন্দ্রনাথের পরিচয় লিপিবদ্ধ করা যাক :

"তিনি জাতীয় সংগীত রচনা করেছেন, তিনি গীতকাব্য রচনা করেছেন, ব্রহ্মসংগীত রচনা করেছেন, চিত্র অঙ্কন করেছেন, দেশাত্মবোধক নাটক রচনা করেছেন, ফরাসি ইংরেজী মারাঠী সংস্কৃত প্রভৃতি ভাষা থেকে বিবিধ গ্রন্থ অনুবাদ করে বঙ্গ সাহিত্যের পুষ্টিসাধন করেছেন, চিন্তা-গবেষণা-মৌলিকতা এক একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্বরূপ তিনি অজস্র প্রবন্ধ রচনা করেছেন। তাঁর দীর্ঘজীবনের একটি মহমাত্র তিনি অপব্যয় করেছেন বলে মনে হয় না। আরও এক কাজ তিনি করেছেন, তিনি রবীন্দ্রনাথকে সৃষ্টি করেছেন।...জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাই একটি ইন্‌স্টিটিউশন (জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, পৃঃ ১৬৫)

গ্রন্থটির অধ্যায় সন্নিবেশ থেকেই বিষয়বস্তুর আলোচনাপদ্ধতি চোখে পড়বে—

১. জীবনী বা ব্যক্তিজীবন ২. সমসাময়িক সমাজ কাল ৩. পারিবারিক পরিবেশ ৪. জাতীয়-চেতনা ৫. আত্মগঠন ৬. নাট্যশালা স্থাপন ও নাট্যাভিনয় ৭. রবীন্দ্র-মানস-গঠনে ৮. সামাজিক বিবর্তন ও তার প্রভাব ৯. স্বদেশ চর্চা ১০. সাহিত্য সাধনা ১১. বঙ্গ সাহিত্যে স্থান ১২. সংগীত সাধনা ১৩. চিত্র সাধনা ১৪. বিবিধ কর্মোদ্যম।

এ ছাড়া পরিশিষ্টে আছে—(১) অশ্রুমতী-প্রসঙ্গ (জ্যোতিরিন্দ্র রচিত নাটক 'অশ্রুমতী'); (২) শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতা-প্রসঙ্গ (বালগঙ্গাধর তিলকের মরাঠি গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

(৩) জ্যোতিরিন্দ্রনাথের রচনাপঞ্জী ; (৪) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-রচিত সংগীত ; (৫) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র।

বিভিন্ন অধ্যায়ের মাধ্যমে নানা ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের প্রতিভা ও কর্মোদ্যমের প্রকাশ সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। এই কাজের জন্য গ্রন্থকারকে দীর্ঘকাল তথ্যানুসন্ধান করতে হয়েছে, তারপর সেই সমস্ত তথ্যকে কার্য-কারণসূত্রে গ্রথিত করতে হয়েছে। সুশীলবাবু গল্প উপন্যাস জীবনী রম্যরচনার ক্ষেত্রে যে দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন, শ্রমনির্ভর গবেষণার উপল বন্ধুর পথেও তেমনি কর্মশক্তির স্বাক্ষর রেখেছেন। সৃষ্টিধর্মী সাহিত্য-স্রষ্টাকে গবেষণাভিত্তিক আলোচনা-প্রয়াস করতে গিয়ে যে বাধার সম্মুখীন হতে হয়, লেখক প্রশংসনীয়ভাবে সে বাধা অতিক্রম করেছেন। সে অন্তরায়টি হল আবেগাতিশয্য। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কয়েকজন সৃষ্টিকুশল সাহিত্যসাধকের মধ্যে কল্পনা এবং মননের অপূর্ব সমন্বয় সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে বাংলাসাহিত্য একই সঙ্গে ব্যাপ্তি এবং গভীরতালাভ করেছে। সুশীলবাবু সেই ধারাতেই আরেকটি সুচিহ্নিত তরঙ্গনিক্ষেপ করলেন।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ একাধারে ভাবুক এবং কর্মী ছিলেন। এ দুয়ের বহুধা প্রকাশে তাঁর ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট। আজ বঙ্গবাসী তাঁকে প্রায় চেনেইনা। নাট্যকার হিসেবেই সামান্য খ্যাতি তাঁর এখন পর্যন্ত স্বীকার করা হয়। কিন্তু তিনি যে দেশকালের গতিধারার ইঙ্গিতগ্রহণে সক্ষম সপ্রতিভ শিল্পী এবং কর্মী ছিলেন, একথা অনেকেরই জানা নেই। তিনি প্রথম শ্রেণীর প্রতিকৃতি অঙ্কনে পারদর্শী ছিলেন। বিখ্যাত শিল্পী রোদেনস্টাইন তাঁর চিত্রকে Durer এবং Helbein প্রমুখ শিল্পীর চিত্রের সঙ্গে তুলনা করেছেন। সংগীতরচনা, স্বরলিপিপ্রকাশ, সংগীতের আলোচনা ইত্যাদি কাজে তাঁর নিপুণতার পরিচয় কে'জন রাখে? একনিষ্ঠ স্বদেশপ্রেমের প্রকাশ তাঁর সমস্ত সাহিত্যপ্রয়াস এবং কর্মোদ্যমের মধ্যে। আর রবীন্দ্রপ্রতিভার বিকাশের পথ মুক্ত করে দেওয়াতে তাঁর অবদান অসামান্য। মৌলিক রচনা এবং বিভিন্ন ভাষা থেকে অনুবাদের ক্ষেত্রেও তাঁর দান বিপুল। তিনি দেশবাসীকে ব্যবসায়-বুদ্ধিতে উদ্বুদ্ধ করার জন্যে স্বদেশী স্টীমার কোম্পানি চালনা করেছেন, নীলের ব্যবসা করেছেন। সাহিত্য ও সংগীত বিষয়ক পত্রিকা, বিদ্বজ্জন-সমাগম ইত্যাদি করে সে যুগের বাংলাদেশে একটি সাংস্কৃতিক আলোড়ন এনেছিলেন। প্রথম জীবনে স্ত্রী স্বাধীনতার বিপক্ষে প্রহসন (কিঞ্চিৎ জলযোগ) রচনা করলেও পরে তিনি স্ত্রীস্বাধীনতার অন্যতম প্রবক্তা হয়ে দাঁড়ান। শেষজীবনে বালকবালিকাদের আনন্দনির্ভর শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্বন্ধেও তাঁকে চিন্তা করতে দেখি।

এই বহুমুখী প্রতিভার অধিকারীকে আজ আমরা ভুলতে বসেছি তাঁর প্রতিভার বিচিত্রগামিতার জন্যেই। গ্রন্থকারের মতে, কোন বিশেষ দিকে তাঁর প্রতিভার প্রকাশ সীমাবদ্ধ থাকলে হয়তো সীমাবদ্ধ রসগ্রহণক্ষমতার অধিকারী আমরা তাঁকে আরও বেশি চিনতে পারতাম। কিন্তু বাঙালীর এই অকৃতজ্ঞতার অপরাধ অনেকখানি দূর হয়েছে সুশীলবাবুর নিষ্ঠা ও শ্রমের ফলে। জ্যোতি-সন্ধানের সার্থক প্রয়াসের জন্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডক্টরেট ডিগ্রি দিয়ে তাঁর শ্রমের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

দু'একটি তথ্যের যাথার্থ্য সম্বন্ধে মনে কিঞ্চিৎ সংশয় জাগলেও এখানে আর উল্লেখ করলাম না। কারণ বইটি সামগ্রিকভাবে আমাদের মন আকর্ষণ করেছে। রচনারীতি সাবলীল, উচ্ছ্বাসবর্জিত এবং পরিমিত। *

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

---

* জ্যোতিরিন্দ্রনাথ : সুশীল রায় ; জিজ্ঞাসা ; দশ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস। ৫৭ ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা-৩৭। মূল্য দশ টাকা।

উনবিংশ শতাব্দী বাঙালোদেশের ইতিহাসে সবচেয়ে কীর্তিমান শতাব্দী। আর ঐতিহাসিকগণের দাক্ষ্যপ্রমাণমতে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা ভারত-ইতিহাসেরও স্মরণীয়তম প্রসঙ্গ। যে দীর্ঘ ও বিলম্বিত সময়ক্ষুণ শেষ পর্যন্ত অবসিত হয়েছিল এই শতাব্দীর উন্মেষকাল থেকে আর আধুনিক ইতিহাসের আবির্ভাব ঘটেছিল এই ভূখণ্ডে, তার সূত্রপাত ভারতের পূর্বপ্রান্তস্থ এই বাঙলাদেশে। আধুনিক চেতনা নামক বস্তুটি এখানকার মাটিতেই সর্বপ্রথম উদ্ভিন্ন হয়েছিল, এখানকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্বিন্যাসেই সর্বপ্রথম তা বিকাশলাভ করেছিল, এবং বহুবার শোনা ঐতিহাসিকদের সেই পুরোনো কথাই আরেকবার পুনরুদ্ধার করা যাক :

> In this new Bengal originated every good and great thing of the modern world that passed on to the other provinces of India—যদুনাথ সরকার : History of Bengal, Vol II
>
> It would be hardly any exaggeration to say that the evolution in Bengal formed a basic pattern for the rest of India, so that a study of Bengal in the nineteenth century would not only facilitate a similar study of other regions of India, but seem to be a necessary precursor to it—রমেশচন্দ্র মজুমদার : Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century.

আধুনিক ভারতবর্ষের ইতিহাস লিখতে গেলে অতএব অনিবার্যভাবে উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা থেকেই শুরু করতে হয়, যুগান্তরের প্রথম চিহ্নগুলি তারই শরীর চুঁড়ে খুঁজে বের করতে হয়। আর সেই নবজাগরণ যেহেতু বাতুলের করে ঘটেনি, যে-ব্যক্তি আধুনিকতার প্রথম নবজাতক সচেতন ও সচেষ্ট সেই ব্যক্তির নির্বন্ধাতিশয্যে সম্ভব হয়েছে, শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের যুক্তিকোণটিও সেই কারণে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ।

শ্রীযুক্ত বাগলের প্রস্তাবনাটি নিঃসন্দেহে প্রত্যয়ক। তিনি উনবিংশ শতাব্দীর বাঙলা-দেশের ধারাবাহিক ইতিহাস লেখেননি, কয়েকটি বিশিষ্ট চরিত্রের প্রস্তাবনা করেছেন মাত্র। কিন্তু 'ব্যক্তি থেকে পরিপার্শ্ব'—তাঁর এই পদ্ধতিটি তাৎপর্যবহ। তিনি ঐ সময়ের যুগন্ধর ব্যক্তিদের জীবন পর্যালোচনা করে তারই দ্বারা দিয়ে তৎসাময়িক দেশ ও কালের হাওয়া নিরূপণ করার পক্ষপাতী। ঐ ব্যক্তিরা তাঁর কাছে লক্ষ্য নন, মাধ্যম-মাত্র, সময়টিকে খুঁটিয়ে জানবার কাজে নিরতিশয় সহায়ক। সেই কারণে যে কতিপয় জীবনী এই বইয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন তার সবগুলি স্বনামধন্য নয়, অনেকগুলিই স্বল্পজ্ঞাত। তাঁর প্রণীত জীবনকাহিনীগুলি কোনোমতেই hero-worship নয়, সবজায়গাতেই অতীব নৈর্ব্যক্তিক। এবং সর্বতোভাবে তথ্যপ্রাণ। তিনি যে লিখেছেন

> এই সকল জীবনের মধ্যে শুধু ব্যক্তিবিশেষের খুঁটিনাটি তথ্য পরিবেশন করিয়াই ক্ষান্ত হই নাই, ইহাদিগকে কেন্দ্র করিয়া সমাজের বিভিন্ন বিভাগে যে নবরূপায়ণের কার্য আরম্ভ হইয়াছিল তাহাও এই সকল রচনায় বিবৃত করি।

তাতে বোঝা যায় ব্যক্তি তাঁর সূচনাবিন্দু হলেও তৎসাময়িক দেশ ও সমাজের ইতিহাসই তাঁর প্রতিপাদ্য। এবং সেই ইতিহাস সমকালের বহির্বিবরণী নয়, ব্যক্তির কার্যকলাপে নির্ধারিত অন্তরঙ্গ ইতিহাস

১৯৪১ সালে এই বইয়ের সংক্ষিপ্তর প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। তারপর দীর্ঘদিন পরে মুদ্রিত এই দ্বিতীয় সংস্করণে অনেকগুলি পৃষ্ঠা ও কয়েকটি চরিত্র নতুন করে সংযোজিত হয়েছে। তা সত্ত্বেও এই বই যে সুসংবদ্ধ ইতিহাস হয়ে উঠেছে এমন বলা চলে না। এমন কি লেখক যে

বলেছেন, "এখন উনবিংশ শতাব্দীর একটি পূর্ণ রূপরেখা ইহা হইতে স্পষ্ট হইতে পারিবে." পূর্ববর্তী সংস্করণ অনেকখানি পরিবর্ধিত হলেও সত্যিই অতখানি বলতে পার যায় কি না সন্দেহ। আসলে সেই ধরণের কোনো বৈষয়িক পরিকল্পনা নেই বলে, এবং সর্বোপরি কোনো ধারাবাহিকতা নেই বলে এই বই পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের প্রতীতি কোনোদিক থেকেই দেয় না। অবশ্য তার ফলে এর কোনো মর্যাদাহানি হয় না। এটি নিতান্তই ভিন্ন চরিত্র। আর ইতিহাস রচনা করবার মতো উপকরণ—প্রভূত পুঙ্খানুপুঙ্খ ও যাচাই করে নেওয়া উপকরণ, অসাধারণ পরিশ্রম ও নিষ্ঠাসহ তিনি এখানে সঙ্কলন করে দিয়েছেন।

শ্রীযুক্ত বাগল অনেকদিনকার নিষ্ঠিত গবেষক। গবেষণার ক্ষেত্রে স্বভাবত তিনি সহজলভ্যতার থেকে objectivity কে বেশী মান্য করেন। তাঁর প্রমাণ-পত্রও অত্যন্ত বাস্তবানুসারী। সরকারী নথিপত্র, দলিল-দস্তাবেজ, বিভিন্ন বিভাগীয় সরকারী রিপোর্ট, সরকারী আনুকূল্যে প্রকাশিত পুস্তক-পুস্তিকা, সমসাময়িক সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্র, বড় বড় জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের মুদ্রিত ও অমুদ্রিত কার্যবিবরণ, বর্ণীয়ীদের লেখা চিঠিপত্র, দিনলিপি, আত্মজীবনী ইত্যাদি—যেখানেই তাঁর বর্ণীয় বিষয় বা ব্যক্তির সত্যসন্ধানের অন্বেষণার ছড়িয়ে রয়েছে, বহুশ্রমে সেই তথ্যাদি তিনি আহরণ করে আনেন এবং যাচাই করে তাকে প্রতিষ্ঠা করেন। এই ধারা গবেষণার আধুনিক ধারা, এতে ব্যক্তিপূজা প্রশ্রয় পায় না, অনুমান ও রচনামূল সংস্কারের নিরসন হয়, এবং যথার্থ সত্য প্রকাশ লাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে লেখা কোনো জীবনচরিতের পাশে এই ধারার কোনো রচনা স্থাপন করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ধারার ইতিপূর্বে কাজ করে গেছেন, সম্ভবত পুরোধাদের অন্যতম। তিনি যেভাবে তাঁর তথ্যগুলিকে সংযোজিত করে তুলেছেন তা অনেকেই জানেন। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল প্রথমত ব্রজেন্দ্রনাথেরই সহকারী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। অন্তত সাহিত্য-সাধক চরিতমালা'র দু-জনের একত্র উপস্থিতি আছে। আর 'সাহিত্য-সাধক চরিত মালা'কে যদি উনিশ শতকীয় কীর্তিমান-জনের চরিত্রগ্রন্থমালা বলে আখ্যাত করা যায়, তাহলে আলোচ্য 'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা' অত্যন্ত নিরাপদে ও স্বস্তির সঙ্গে তার পরবর্তী বা অন্তত্তম খণ্ড বলে বিবেচিত হতে পারে।

কিন্তু এই বইয়ে শুধুমাত্র যেসাক্ত তথ্যাকর্ষণই নেই, তার বেশি আছে। একটি প্রচ্ছন্ন যোজনাসূত্রও লেখক এখানে সক্রিয় রেখেছেন। এবং সেই সূত্রটিও সামান্য নয়, উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের অন্যতম প্রেরণা : পাশ্চাত্যশিক্ষা। যে পাশ্চাত্যশিক্ষা দেশের বণিকবৃত্তি শাসনযন্ত্র সত্ত্বে ও কতিপয় বিদেশী ও দেশী ব্যক্তির স্ব-কীয় উৎসাহে এখানে প্রবর্তিত হয়েছিল। যে শিক্ষাবাহনে নব্য জ্ঞানও সংস্কৃতি সারা দেশ আর গোটা জাতিকে অচিরকালমধ্যে মধ্যে থেকে নব্য-যুগতরঙ্গে টেনে এনেছিল, তার অভূতপূর্ব পুনর্বিন্যাসে হাত লাগিয়েছিল। এবং যে শিক্ষার সমস্ত প্রকট ও নিহিত তাৎপর্য এতদ্দেশীয় বিদগ্ধজনেরাই মুহূর্ত মধ্যে অবহিত হয়ে তদনুসারে কর্মপ্রণালী প্রণয়ন করে নিয়েছিলেন।

মনে রাখা দরকার, বিষয়টি পাশ্চাত্যশিক্ষা; এবং উনবিংশ শতাব্দীরও আগে কোম্পানিরই সংশ্লিষ্টজনেরা ওয়ারেন হেস্টিংস, জোনাথান ডানকান বা উইলিয়ম জোন্স যদিও কলিকাতা মাদ্রাসা, বারাণসী সংস্কৃত মহাবিদ্যালয় ও এশিয়াটিক সোসাইটি স্থাপন করেছিলেন, সেই বিদ্যোৎসাহ এদেশের নবজাগরণের প্রত্যক্ষ সহায়ক হতে পারেনি। অপরদিকে একটি সাধারণতম ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠাতেও তখনকার এদেশী সংবাদপত্রগুলির যে রকম উন্মাদনা লক্ষ্য করা গেছে, তাতে পাশ্চাত্যশিক্ষার জন্যে এদেশীয়দের প্রখর সচেতনতা আরো স্পষ্ট করে টের পাওয়া যায়। একজন

ডেভিড হেয়ার, হাইড ইস্ট বা আলেকজাণ্ডার ডাফ তাঁদেরই উৎসাহে ইস্কুল খুলিয়েছেন মাত্র।

অবশ্য শ্রীযুক্ত বাসল বাঙলাদেশে পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রবর্তনা-বিষয়ে কোনো স্বয়ংবাক্ ভূমিকাও লেখেননি, উৎসাহী পাঠক ভক্টর সুশীলকুমার দে প্রণীত সেই পুরাতন ও অদ্যাপি-অপরিহার্য বইটিতে তার উজ্জ্বল ও বিশদ বিবরণ পাবেন, কিন্তু শিক্ষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট একটি দ্বিতীয় ও অব্যবহিত বিষয়ের উপরে তিনি অবশ্যভাবে জোর দিয়েছেন। লিখেছেন

> শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে সে যুগের শিল্প বিপ্লবকে স্বাগত করিয়া অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নেও কেহ কেহ বিশেষভাবে তৎপর হন। জাহাজ শিল্প, রেশম, শর্করা, কয়লা শিল্পাদি, জীবন বীমা, সাধারণ বীমা ব্যাঙ্ক প্রভৃতি হইতে চা শিল্প পর্যন্ত বহু বিস্তৃত ক্ষেত্রে ঐ সময় ভারতসন্তানেরা কেহ কেহ স্বাধীনভাবে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাইতে অগ্রণী হন। এক একটি জীবনকে কেন্দ্র করিয়াই আমি এই সকল বিষয় আলোচনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছি।

বস্তুত শিক্ষাকে তখনীন্তনেরা দেশের ঐহিক উন্নতির বিধায়ক হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন, এবং শিক্ষা বলতে সর্বতোভাবে কার্যকরী শিক্ষাকেই বুঝেছিলেন। এমন কি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এবং তাঁর বাঙলা বর্ণমালা মুদ্রণ পরিকল্পনার পিছনেও 'প্রয়োজনীয় বহুবিধ তথ্য জ্ঞান' বিস্তারের আগ্রহ নিহিত ছিল বলে জানা যায়। কিন্তু সে আলাদা প্রসঙ্গ। আরেক দিক থেকে, দেশের নবরূপায়ণে দেশের আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি সাধনের প্রসঙ্গও থাকে, আর সে ক্ষেত্রে সংগোপনে শিল্পব্যবসায়ীদের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এবং তখনকার মনীষীদের মধ্যে ব্যবসায়েও কৃতার্থ এমন মানুষের সংখ্যাও তো একেবারে নগণ্য নয়। দ্বারকানাথ ঠাকুর, যাঁর জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বদেশের উন্নতিসাধন, বাণিজ্যেও বিশেষ কৃতকার্য। এমন কি তাঁর বিলাতযাত্রারও অন্যতম কারণ তিনি জানিয়েছেন, সেখানকার জাতীয় প্রতিষ্ঠান বা কারিগরী শিল্পের পদ্ধতি খতিয়ে দেখা। কারিগরী শিল্পেই আধুনিক সভ্যতা প্রত্যক্ষভাবে রেখায়িত তিনি বুঝেছিলেন। আর সেই কথা তাঁর সমসাময়িকেরা আরো অনেকেই বুঝেছিলেন পাশাপাশি। এবং বুঝেছিলেন ঐহিক উন্নতিতে যে আত্ম-নির্ভরতা আসে, জাতীয় সচেতনতার জন্য তা কতখানি প্রয়োজন। প্যারীচাঁদ মিত্র ও তারাচাঁদ চক্রবর্তী শুধু সংস্কৃতিবিদই ছিলেন না, ব্যবসায়েও তাঁদের বিশেষ খ্যাতি ছিল। আর এই বইয়ে রূপসজ্জী কাওয়াসজী নামে যে পার্শি ব্যবসায়ীর চরিতকথা লেখা হয়েছে তিনি অশোকর জাহাজের ব্যবসায়ের পাশে সমান ভাবে বা সমধিক ভাবে কৃষিতত্ত্বের প্রচারে কিংবা শহর কলকাতার উন্নয়নে যত্নবান ছিলেন।

আবার যাঁরা বিশুদ্ধ জ্ঞানের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যজাতির সমকক্ষতা অর্জনে স্পৃহা ও সফল হয়েছিলেন, নবরূপায়ণের তাঁরাও স্মরণীয়কর্মা। তাঁরা আমাদের অনেকখানি দুর্গত আত্ম-বিশ্বাস অর্জন করে এনে দিয়েছিলেন। রাধানাথ শিকদার, পৃথিবীর উচ্চতম পর্বতশৃঙ্গ আবিষ্কারের কৃতিত্বটি যাঁর উপরিতন কর্মচারীর নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে, তিনি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গাণিতিক বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। সূর্যকুমার চক্রবর্তী, এক দরিদ্র গ্রামীণ ব্রাহ্মণবালক—পিতৃ-মাতৃহীন—শুধু ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা ও প্রতিভা নির্ভর করে পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ্যায় নিষ্ণাত হয়ে ফিরেছিলেন। আনন্দমোহন বসু, কেম্ব্রিজের সর্বোচ্চ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যিনি ভারতবাসীদের মধ্যে প্রথম র‍্যাংগলার, দেশে ফিরে এলেন উচ্চতর চাকুরির বদলে উদগ্র স্বদেশপ্রীতি নিয়ে, এবং প্রথম ভারতীয় বিপ্লবী যুব-ছাত্রদলের মধ্যমণি হয়ে বিরাজিত হলেন। এইরকম আরো অনেকে। এঁরা সবাই নিজের নিজের ক্ষুদ্র অংশে অধিষ্ঠিত হয়ে নবরূপায়ণের কাজ এগিয়ে দিলেন।

এঁদের মধ্যে কতিপয় পরদেশীরও অনিবার্য ভূমিকা রয়ে গেছেন। কাওয়াসজী বাঙালি ছিলেন না, কিন্তু তিনি ভারতীয়, আর বাঙলাদেশের সঙ্গেই তাঁর ভাগ্য এমনভাবে জড়িয়ে

গিয়েছিল যে তাঁকে বাঙালি না বলারও কারণ নেই। আমরা বলতে চাই পাশ্চাত্যজাতীয় কারো কারো কথা, এদেশের জাতীয় জাগরণে যাঁরা অবিস্মরণীয় চরিত্র। যেমন, ডিরোজিও: যিনি নব্য-বঙ্গের আচার্য-পদে বৃত হয়েছিলেন; হেয়ার: যাঁর এদেশ-হিতৈষণা তাঁকে প্রবাদপুরুষের বেদিকায় আর আপনতম-জনের আসনে তুলে ধরেছিল; যেখুন: যাঁর বিদ্যোৎসাহের তুলনা ছিলনা; কিংবা লঙ্: বাঙলাভাষায় উৎসাহী হয়ে যিনি আকস্মিকভাবে নীলদর্পণ-জনিত উনবিংশ শতাব্দীর উজ্জ্বলতম ইতিহাসসংঘটনে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

'উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা'য় মোট ষোলোটি চরিতকথা আলোচিত হয়েছে: দ্বারকানাথ ঠাকুর, রামলোচন ঘোষ, কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেভিড হেয়ার, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, হেনরি লুই, ভিভিয়ান ডিরোজিও, তারাচাঁদ চক্রবর্তী, রসিককৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, ডেভিড লেস্টার রিচার্ডসন, সূর্যকুমার চক্রবর্তী, ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন, ভগবানচন্দ্র বসু, জেম্‌স্ লঙ্, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার ও আনন্দমোহন বসু। পরিশেষে 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা'র একটি অনুষ্ঠানপত্রের মূল পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। দু-একটি চরিত্রের বিবরণ ইতিপূর্বেই বিশদভাবে জানা গিয়েছিল। ডিরোজিওর একটি উপন্যাসোপম জীবনকথা শ্রীযুক্ত বিনয় ঘোষ লিখেছিলেন, সেটি সাধারণ পাঠকেরও খুব পরিচিত। দ্বারকানাথ ঠাকুর ও ডেভিড হেয়ার সম্বন্ধে কিশোরীচাঁদ মিত্র প্যারীচাঁদ মিত্র দুই ভাই বহুদিন আগেই যে তথ্য লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন, আলোচ্য গ্রন্থকার তার অবহিত সহযোগ গ্রহণ করেছেন। অন্য অধিকাংশ রচনাতেই গ্রন্থকারের স্ব-প্রম সম্বলিত হয়েছে। এই সব ব্যক্তিদের বিষয় আমাদের নানাধিক ও উপরিজলচারী ধারণা ছিল, তাঁদের পূর্ণ ব্যক্তিত্ব ও অন্তঃশীল চরিত্র শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র বাগল এই বইয়ের মধ্যে উপস্থাপিত করেছেন। বাঙলা-দেশের ঐ সময়কার ইতিহাসের অন্তত বিস্তৃতপরিমাণ এই বইয়ে অতি-নির্ভরযোগ্যভাবে বিবৃত হয়েছে, সন্দেহ নেই।

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচেতনা। ডঃ বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। সদ্বোধি পাবলিকেশানস প্রাইভেট লিমিটেড। দাম সাত টাকা।

রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রজ্ঞা ও মননের সংবাদ সকলেই জানেন কিন্তু তাঁর প্রতিটি বিষয়ে তাঁর চিন্তাভাবনার সম্যক পরিচয় সাধারণ মানুষের গোচরে আছে মনে হয় না। কেন না রবীন্দ্রনাথের মৌলিক সাহিত্যসৃষ্টি নিয়ে যেমন পর্যাপ্ত পর্যালোচনা হয়েছে, জ্ঞান-বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ে তাঁর ভূমিকা নিয়ে তেমন কিছুই প্রায় হয়নি। সহজপাঠ্য বাঙ্ময় আলোচনার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্বের এই সব কঠিন ও আয়াসগম্য দিকগুলির সঙ্গে জনমানসের পরিচয় সাধনের প্রয়োজন যে কতখানি তা অনুভব করা যায় যখন এখন কোনো দিকে কোনো সার্থক সৃষ্টি প্রয়াস নজরে আসে। বলা বাহুল্য, বর্তমান আলোচ্য গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথের এমনই এক অনতি-আলোচিত দিক উদ্ঘাটিত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন না। কিন্তু যে কোনো সময়-সচেতন বুদ্ধিজীবী মানুষের মতোই বিজ্ঞানের এক কুতূহলী পাঠক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথ কবি ছিলেন বটে, কিন্তু আধুনিক কালের কবিমন আদিম পৃথিবীর মানুষের মতো মতোআয়ত্ত জ্ঞান অভিজ্ঞতা বা যুগান্তরীণ সংস্কারের উপর ভিত্তি ক'রে আর যে স্থায়ী কিছু সৃষ্টি করতে পারে না, অথবা অতীতের রসবাদী আলঙ্কারিকদের অনুগত হয়ে রসবস্তুকেই কাব্য সৃষ্টির অমল উপকরণ বলে গণ্য করতে পারে না তা তিনি

পুকতেন। তরুণ পঙ্কজের মতো কবিচিত্তের মহাভুখার আহার জগৎ ও জীবনের সর্বস্তর থেকে সুখ হাতে সংগ্রহ করতে তিনি ইতস্তত করেন নি। তাই বিজ্ঞান, যা জীবনকে অজস্রবিধ ঐশ্বর্য সম্ভারে ভরে তুলেছে তাকেও তিনি পরিহার্য মনে করেন নি। অথচ করলে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কেননা সকলেই জানেন বিজ্ঞান কাব্যের সহযোগী নয় যেহেতু সে কল্পনার শত্রু। প্রাচীন পুরাণ ও উপকথা তার প্রদীপ্ত শিখায় ভস্মসাৎ হয়ে যায় সহজেই। অথচ কবিচিত্ত যুগযুগান্তর এই সব পুরাণ প্রবচনের সমৃদ্ধ ভাবনা কল্পনার রসেই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জানতেন, আজকের কবিকে আজকের জগতের রূঢ় বস্তু সত্যের উপরে দাঁড়াতেই হবে। নইলে সত্যের অগ্নি পরীক্ষায় কবিত-কাঞ্চনের মতো সে টিকে থাকতে পারবে না।

কিন্তু বিজ্ঞানের ছাত্ররা যে বস্তুগত প্রয়োজনের দৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে চিনতে প্রয়াসী রবীন্দ্রনাথ তেমন ভাবে বিজ্ঞানকে দেখেন নি। বিজ্ঞানের অপর্যাপ্ত ভাণ্ডারের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের উৎসুক্য মাত্র কয়েককটি বিষয়েই ব্যাপৃত যা কাব্যনিষ্ঠ কল্পনাকে আশ্চর্যভাবে রঙ্গ করে তুলতে পারে। সুতরাং এই অর্থে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-সাধনা কাব্যসাধনারই পরিপূরক। হাঁস যেমন ক্ষীরটুক ছেঁকে নিতে পারে জল থেকে, তিনি তেমন বিজ্ঞানের বিপুল আয়োজন থেকে নিজ কবিমনের খোরাকটুকই তুলে নিয়েছিলেন। অথবা সেই প্রথাসিদ্ধ উপমা নিলে আরো যথার্থ বলা হয় যে যেমন ফুলের থেকে বোলতা নেয় বিষ, মৌমাছি নেয় মধু, প্রজাপতি কিছুই সঞ্চয় করে না, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তেমনি নিজের স্বভাবধর্মে রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই মৌমাছি কেন না সৌন্দর্যলোকের অনন্তকালের তৃপ্তির জন্য তাঁকেও মধুচক্রই নির্মাণ করতে হবে—ছাত্রপাঠ্য কেতাব রচনা করতে হবে না। এই কথাটি ভুললে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান চেতনার সত্য তাৎপর্য আমাদের অনায়ত্ত থেকে যাবে।

বর্তমান গ্রন্থের প্রথমেই লেখকও বলেছেন "রবীন্দ্রনাথ বিজ্ঞানী ছিলেন একথা প্রমাণ করা এ গ্রন্থ রচনার উদ্দেশ্য নয়, রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবন ও সাহিত্যে আধুনিক যুগের বিজ্ঞান-চিন্তার গভীর ও ব্যাপক প্রভাব পড়েছে, এ সত্যটি প্রতিপন্ন করাই এ গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য।" সর্বব্যাপী কৌতূহল ও সত্যানুসন্ধিৎসা যদি রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার প্রেরণা হয় ব্যবহারিক জীবনকে সেই বিজ্ঞানের দানে সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ও উদ্যমের যে পরিচয় এ গ্রন্থে উদ্ঘাটিত হয়েছে তার মূলেও দেখা যাচ্ছে বিজ্ঞানের প্রতি নৈর্ব্যক্তিক আসক্তি নয় বরং গভীর লোকপ্রেম ও হিতৈষণা। এই সব কথার উল্লেখ যে রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞানচর্চার গুরুত্ব হ্রাস করার উদ্দেশ্যে অবশ্যই নয় একথা বিচক্ষণ পাঠকের কাছে বলা নিষ্প্রয়োজন। যে নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে তিনি প্রায় আমৃত্যু বিজ্ঞান চর্চা করেছিলেন তা বিজ্ঞানের অনেক উচ্চিষ্ট সেবকের মধ্যেও দুর্লভ। আমরা শুধু এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর বিজ্ঞান চর্চার যোগসূত্রটিকে তুলে ধরতে চাইছি। বলা বাহুল্য এসব কথাই এ গ্রন্থে আভাসিত রয়েছে, স্পষ্ট ভাবে আলোচিত হওয়া প্রয়োজন ছিল।

বইটিতে যে সব তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে সাধারণ পাঠকের কাছে তার মধ্যে এত বিস্ময়ের উপকরণ নিহিত যে বইটি পড়তে গিয়ে এমন কোনো অভাবই কিন্তু অনুভূত হবে না। তাঁরা বিস্মিত হয়ে দেখবেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ জীবনের সাহিত্য সৃষ্টিতে কি ভাবে বিজ্ঞানের উপকরণকে কাজে লাগিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে পংক্তি তুলে তুলে তাঁর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, ধর্মসংক্রান্ত আলোচনার প্রতিটি প্রাসঙ্গিক উপমা-উদাহরণ উদ্ধৃত ক'রে লেখক এ সত্য প্রতিষ্ঠিত

ছেন এ বিষয়ে লেখকের শ্রম ও নিষ্ঠা প্রভূত প্রশংসার
। রাখে।

যারা ইতিপূর্বে খবর রাখতেন না তাঁদের কাছে আরো
প্রচার কবির বিজ্ঞান বিষয়ে সাংবাদিকতার বিবরণ।
জ্ঞানিক সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' প্রবন্ধে লেখক এমন তথ্য
বগোচর করেছেন যা এই গ্রন্থের প্রয়োজন ও সার্থকতা
পাদন করবে। রবীন্দ্রনাথের বিজ্ঞান-বিষয়ক রচনা
ত সাধারণে একমাত্র 'বিশ্ব পরিচয়' বইটিকেই বোঝেন।
বালক এবং সাধনা পত্রিকায় তিনি বিজ্ঞান বিষয়ক যে
গুলি প্রকাশ করেছেন সেগুলি সংগৃহীত হয়ে গ্রন্থাকারে
াশ হলে এমন ধারণা অবশ্যই দূরীভূত হতে পারতো।
ভারতী সম্প্রতিকালে রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস, পল্লীপ্রকৃতি
ত বিভিন্ন বিষয়ক রচনাগুলিকে প্রকাশ করেছেন দেখতে
। তাঁরা এবিষয়ে অনুরূপ ব্রত নেবেন এটা আমরা
াশা করি।

ব ভূমিকায় ডঃ বিমলবিহারী ভট্টাচার্য মহাশয় যথার্থই
ছেন—'গ্রন্থকার বিজ্ঞান শব্দটাকে নিতান্ত সংকীর্ণ অর্থে
ছেন বলিয়া মনে হয় না। অতিপ্রাকৃত গল্পের প্রসঙ্গে
মনস্তত্ত্বকেও বর্জন করেন নাই।' কৃষি ও পল্লী সংস্কারে
নাথ বিজ্ঞানবুদ্ধিকে কি ভাবে প্রয়োগ করার কথা
ছেন এবং বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগে কতখানি সাফল্য লাভ
ছেন গ্রন্থকার তারও পর্যালোচনা করেছেন। বিজ্ঞানী
াশচন্দ্র বসু ও আলবার্ট আইনষ্টাইনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের
াযোগ বিষয়কেও গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করে তিনি বিষয়কে
চমুখী ক'রে তুলেছেন। পরিকল্পনার এই ব্যাপকতার
তিনি অবশ্যই বিশেষ অভিনন্দনযোগ্য।

না গ্রন্থের সমালোচনায় তার ত্রুটি বিচ্যুতি নির্দেশ করার
ই রীতি আছে। সেই রীতিকে আন্তরিক ভাবে অনুসরণ
বা বলে নয় বরং এমন একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ পূর্ণতর হয়ে
উঠুক এই ইচ্ছার জন্যেই আমরা এর দু-একটি দুর্বলতার কথা
উল্লেখ করবো। এ গ্রন্থে তথ্যের সমাবেশ হয়েছে প্রচুর
কিন্তু তার বিশ্লেষণে আরও একটু প্রয়াসী হওয়া যেত। যেমন
'রবীন্দ্র কাব্যে বিজ্ঞান', 'বিজ্ঞান, কথাসাহিত্য ও রবীন্দ্রনাথ,'
এবং 'রবীন্দ্রনাথ, ধর্ম ও বিজ্ঞান' প্রভৃতি পরিচ্ছেদে কোন
রচনায় রবীন্দ্রনাথ কি বিজ্ঞান-প্রসঙ্গ ব্যবহার করেছেন তারই
পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাই—এর গবেষণা মূল্য যাই থাক এই
পুঞ্জীভূত তথ্যের ধাক্কা দিয়ে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে রবীন্দ্র-
মানসের কোনো বিশিষ্ট পরিচয় ব্যক্ত হয়নি। অন্তপক্ষে
'বৈজ্ঞানিক সাংবাদিক রবীন্দ্রনাথ' পরিচ্ছেদে আরো অধিকতর
তথ্য সন্নিবেশ কাম্য ছিল। তাহলে প্রাণীতত্ত্ব, উদ্ভিদবিজ্ঞান
পদার্থ বিদ্যা জ্যোতির্বিদ্যা, রসায়ন গণিত প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন
বিষয়ের কোনটিতে তাঁর কি কৌতূহল প্রকাশ পেয়েছে তার
বিশ্লেষণ করা চলতো। কেননা রবীন্দ্রনাথ যে বিজ্ঞান বিষয়ে
সাংবাদিক মাত্র ছিলেন এই উদ্ঘাটনই আমাদের প্রবন্ধকারের
কাছে একমাত্র দাবী নয়, বরং রবীন্দ্রনাথের কৌতূহল
কতদিকে প্রসারিত বিষয়ের স্তরবিন্যাস বিশ্লেষণ ও
পর্যালোচনার মাধ্যমে তাকে পরিস্ফুট ক'রে তোলাতেই এ
জাতীয় প্রবন্ধের সার্থকতা। আমরা আশা করবো পরবর্তী
সংস্করণে লেখক এ বিষয়ে পুনর্বিবেচনা করবেন।

কিন্তু আপাততঃ যা পাওয়া গেছে তার জন্যেই আমরা
গ্রন্থকারের কাছে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। 'বঙ্গ-
সাহিত্যে বিজ্ঞান' পর্যায়ে তিনি যে গবেষণা শুরু করেছেন
তাতে নিত্য নূতন লেখক সম্পর্কে এখন বিস্তারিত আলোচনা
আরো কিছু গ্রন্থের মাধ্যমে করবেন আমরা এই প্রত্যাশা
করবো।

এই সুলভ পরিচ্ছন্ন গ্রন্থটি আবিজ্ঞ সাধারণের কাছে
সমাদৃত হবে এই আমাদের বিশ্বাস।

অম্বুজ বসু

(৯০২ পৃষ্ঠার শেষাংশ)

নির্মাণে ব্যবহার করা যেত, এবং বিষয়ভেদে বই ভাগ না হয়ে এক বই পরে পরে প্রকাশ হবার বাধা ছিল না, বরং সেইটিই সুন্দর হত।

বইতে শরৎচন্দ্রকে দেখা এবং দেখানো হয়েছে বাইরে থেকে, ভিতর থেকে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টাটি চোখে পড়ল না। শরৎচন্দ্রের শিল্পসত্তার একটি ধারাবাহিক বিবর্তন আছে, —বাইরের ঘটনা তাকে প্রভাবিত নিয়ন্ত্রিত এবং পরিচালিত করেছে,—সেটি বাকি রইল। এই জগৎ জটিল সূক্ষ্ম ও সুবিস্তৃত, এ বিষয়ে লেখাও অবশ্যই বহুমুখী অতএব সুদূর হতে বাধ্য।

তাঁর পরবর্তী বইগুলিতে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখলে লেখক সকলশ্রেণীর পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হবেন।

সত্যব্রত বসু

বিশ্বাবর্ত

নক্রুমা বিদায়

গত ২৪শে ফেব্রুয়ারী যে সময় ঘানার রাষ্ট্রপতি নক্রুমা পিকিং-এর রাজপথে উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনার উত্তেজনাময়ে অগ্রসর হয়ে চলেছেন, তার মাত্র অল্পকাল পূর্বেই রাজধানী আক্রাতে সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সমবেত অভ্যুত্থানে নক্রুমা পদচ্যুত হয়ে গেছেন, প্রায় বিনাবাধায়। নক্রুমার এই ভাগ্যবিপর্যয় জানা যায় ২৪শের অতিপ্রত্যুষে ঘানা রেডিও থেকে কর্ণেল কোটেকা নামক একটি সামরিক অফিসারের ঘোষণায়। একটি সংক্ষিপ্ত ঘোষণায় বলা হল: "The myths of Nkrumah have been broken." নক্রুমার দেহরক্ষী বাহিনীকেও অবিলম্বে অস্ত্রসমর্পণ করিতে বলা হয় এবং নক্রুমার রাজনৈতিক দল Convention Peoples' Partyর সদস্যদের গ্রেপ্তারের জন্য জনসাধারণের নিকট আহ্বান জানানো হয়। বিদ্রোহের নেতারা সর্বপ্রথমেই নক্রুমার বিশেষ সঙ্কটকালে তার স্থলবর্তী তিন-সদস্যবিশিষ্ট প্রেসিডেন্সিয়াল কমিশনও বাতিল করে দিয়ে সাত-সদস্য-বিশিষ্ট ন্যাশনাল লিবারেশন কাউন্সিলের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়েছে। নক্রুমা কর্তৃক অপসারিত কিন্তু বিদ্রোহীদের দ্বারা পুনর্নিযুক্ত ঘানা সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক লে. জে. জে. এ. আনক্রা লিবারেশন কাউন্সিলের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। কাউন্সিল, প্রেসিডেন্ট ও মন্ত্রীদের শুধু অপসারণ করে নাই, তারা একদলীয় পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়েছে, সংবিধান বাতিল করেছে এবং নক্রুমার দলকে বে-আইনী ঘোষণা করেছেন।

আক্রায় নক্রুমা আইডিওলজিক্যাল ইন্সটিটিউটও বন্ধ করে

দেওয়া হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠানটিতে মার্ক্সীজম্, বিপ্লব ও প্রতিবেশী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মহড়া দেওয়া হত।

নক্রুমার পতনে আক্রার অধিবাসীদের সানন্দ স্বস্তির অভিব্যক্তি শোনা গেছে: "The tyranny is over—no more nepotism." পার্লামেন্ট ভবনের সম্মুখে উত্তোলিত-হস্ত নক্রুমার বিরাট প্রতিমূর্তিটিকে ভেঙে ফেলা হয়েছে। চীন ও রুশ কারিগরদের এবং গেরিলাযুদ্ধবিদদের ঘানা থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে। লিবারেশন কমিশন একটি সংবিধান কমিশন গঠন করে এমন একটি সংবিধান রচনা করবেন যেখানে কোনো ব্যক্তির হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হবার সুযোগ থাকবে না এবং আইন সভা, প্রশাসন এবং বিচার বিভাগের মধ্যে ক্ষমতার শুধু বণ্টন হয়। তাছাড়া অবাধ ও ন্যায়সঙ্গত নির্বাচনের সুযোগেরও সাংবিধানিক ব্যবস্থা থাকবে।

নক্রুমার ভবিষ্যৎ অস্পষ্ট যদিও গিনির প্রেসিডেন্ট তাকে সম্মানিত অতিথিরূপে এবং ঘানার রাষ্ট্রপতিরূপেই আশ্রয় দিয়েছে। নাসেরেরও নক্রুমার প্রতি অনুকম্পা দেখা গেছে এবং নক্রুমাকে কেন্দ্র করে আফ্রিকান রাষ্ট্রগুলিতে দুইটি জোটের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। নক্রুমার বিপর্যয়ে আফ্রিকায় চীনের প্রভাব আরও বিপর্যস্ত হয়েছে। হয়তো রাশিয়ার প্রভাবও। রোডেশিয়ায় স্মিথ সরকারের বিরুদ্ধে আফ্রিকার রাষ্ট্রগুলির প্রত্যক্ষ অভিযানের তোড়জোড় নক্রুমা-বিদায়ের সঙ্গে স্তিমিত হয়ে যাবে। এই পদচ্যুতির পশ্চাতে মার্কিনী সি, আই এর হাত আছে বলে নক্রুমা যে অভিযোগ করেছেন, তার সত্যতা যাচাই করা এখনই সম্ভব নয়। কিন্তু তার বিরুদ্ধে বিক্ষোভের পরিমাপ করা যায় ১৯৬০, ৬২ ও ৬৩ সালে তাকে হত্যার জন্য ষড়যন্ত্রের মধ্য দিয়ে। সতর্ক-প্রস্তুতির স্বাক্ষর রয়েছে এই পদচ্যুতির পশ্চাতে, তা অনুমান করা কঠিন নয় এবং নির্বাসিত ঘানাবাসীদের সূত্রে জানা যায় সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর মধ্যে Ghana all force Inner Council নামক একটি গোপন সংগঠন পাঁচ বছর যাবৎ নক্রুমার নীতির বিরুদ্ধে ঘানায় গণতন্ত্রের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য কাজ করে আসছে। আফ্রিকার সম্প্রতি অনেকগুলি রাষ্ট্রে সটপরিবর্তন হলেও, গত জানুয়ারীতে নাইজেরিয়ার রোডেশিয়া সমস্যা মীমাংসার জন্য কমনওয়েলথ সম্মেলন আহ্বানের অব্যবহিত পরেই সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতাচ্যুতি ও শোচনীয় মৃত্যু এবং নক্রুমার অপসারণে নিছক নাটকীয়তার উপাদান রয়েছে। পিকিং-এর সক্রিয় সাহায্যে নক্রুমার ক্ষমতা পুনর্দখলের সম্ভাব্য প্রচেষ্টার মধ্যে হয়তো আফ্রিকার রাষ্ট্রনীতির আরও নাটকীয় উপাদান নিহিত আছে। আগামী ভবিষ্যৎ তার ইশারা দেবে। গত ১লা মার্চ আদিস আবাবায় অনুষ্ঠিত অরগ্যানাইজেশন অব আফ্রিকান ইউনিটির মন্ত্রী পরিষদের সভায় বিপুল ভোটাধিক্যে ঘানার নূতন সরকারকে সমর্থিত হয়েছে। ঘানার নূতন সরকারকে সমর্থন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাবার জন্য এই মন্ত্রীপরিষদের সভা থেকে গিনির প্রতিনিধি গত ৩রা মার্চ সভা ত্যাগ করে। ঐ দিনেই অপর এক সংবাদে জানা যায় গিনির প্রেসিডেন্ট তৌরে পদ-ত্যাগ করে নক্রুমাকে ঘানা ও গিনির যুগ্ম রাষ্ট্রপতি পদে বরণ করেন।

সিরিয়ায় পরিবর্তন

গত ২৩শে ফেব্রুয়ারী সিরিয়াতে রক্তাক্ত নাটকীয় পরি-বর্তন ঘটেছে। একদল চরমপন্থী সামরিক অফিসার রাষ্ট্রপতি আমিন হাফেজ ও প্রধানমন্ত্রী সালা বিটারকে ক্ষমতাচ্যুত করে সিরিয়ার রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছে। ক্ষমতাচ্যুত এবং নূতন ক্ষমতায় আসীন উভয় গোষ্ঠীই বাথ সোসিয়ালিষ্ট পার্টির অন্তর্ভুক্ত হলেও যারা ক্ষমতা দখল করলেন তাদের বাথ দলের জাতীয় নেতৃত্বরূপে (Ba'athist National Leader-ship) চিহ্নিত করা হয়ে থাকে এবং ক্ষমতাচ্যুতদের বাথ দলে আন্তর্জাতিক নেতৃত্বের অধিকারীরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে (Ba'athist International Command)। শেষোক্ত দল প্রথম দলকে গত ডিসেম্বর মাসে ভেঙে

দিয়েছিল। সে সময় প্রাক্তন সেনানায়ক মেজর-জেনারেল সালা অদিদ 'জাতীয় নেতৃত্ব' গোষ্ঠির পুরোভাগে ছিলেন। জেনারেল অদিদের সমর্থকদের এবং বিতাড়িত নেতৃত্বের স্থানে দীর্ঘকাল সংঘাতের পরিণতিতে সিরিয়ার এই বর্তমান পরিবর্তন ঘটলো। ডঃ হুরোদ্দিন আটাসি এবং ডঃ মুহম্মদ জাইনের যথাক্রমে নূতন রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রী মনোনীত হলেও নূতন সামরিক নেতৃত্বের হাতে এদের পদচ্যুতির ক্ষমতা রয়েছে। সিরিয়ার বিপ্লবের সম্পর্কের যে উন্নতি হয়েছিল নূতন নেতৃত্ব তার অবসান ঘটাবে। এরা নাসের-বিরোধী এবং চীনা সমর্থক। বাথ সোসিয়ালিষ্ট পার্টির অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সিরিয়ার ক্ষমতার পরিবর্তন আরব ঐক্যের পথে প্রবল অন্তরায় হবে।

সুকর্ণ বিদায়

ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল নসুসিয়নকে বাদ দিয়ে গত ২১শে ফেব্রুয়ারী মন্ত্রীসভা পুনর্গঠন করে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণ সেনাবাহিনীর হাত থেকে ক্ষমতার সূত্র পুনর্গ্রহণের শেষ চেষ্টা করেছেন। কারণ এই ঘটনার পরই জাকার্তার ছাত্রদের প্রবল বিক্ষোভের মুখে সুকর্ণ কার্যী নায়ক শক্তিশালী ছাত্র-প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনী ঘোষণা করেন। ছাত্রদের এই বিক্ষোভ একদিকে জেনারেল নসুসিয়নের অপসারণের ও অপরদিকে সুবান্দ্রিও সহ যতিশজন কম্যুনিষ্ট কিংবা কম্যুনিষ্ট সমর্থকদের অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে। ছাত্রদের এই আন্দোলন কম্যুনিষ্টপন্থী মন্ত্রীদের বিভিন্ন স্তরের সম্মুখে প্রবল বিক্ষোভের আকার ধারণ করা সত্ত্বেও সেনাবাহিনীর নিষ্ক্রিয়তায় সুকর্ণ কর্তৃক সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল সুহার্তোকে রক্তপাতের উদ্যোগের অব্যবহিত পূর্বে সুহার্তো জাকার্তায় সেনাবাহিনী আমদানী করে প্রেসিডেন্টকে চরমপত্র দেয়। সেই চরমপত্রের মুখে নিরুপায় সুকর্ণ বাধ্য সকল ক্ষমতা গত ১৩ই মার্চ জেনারেল সুহার্তোর হাতে তুলে দিয়ে নামেমাত্র প্রেসিডেন্ট পদে বহাল থাকে। সুহার্তোও প্রথম সুযোগেই কম্যু নষ্ট পার্টি, গোটা ইন্দোনেশিয়াতে বেআইনী ঘোষণা করে সেনাবাহিনীর মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট কম্যুনিষ্টদের উৎসাদনে অগ্রসর হয়। সুব্রান্দ্রিও সহ অন্যান্য ১৫জন কম্যুনিষ্ট মন্ত্রীদের গত ১৮ই মার্চ গ্রেপ্তার ও পদচ্যুত করে দেওয়া হয়। সুকর্ণর একশত সদস্য-বিশিষ্ট মন্ত্রী-সভার পরিবর্তে সুহার্তো পঁচিশ সদস্য-বিশিষ্ট মন্ত্রী-সভা গঠনে উদ্যোগী হওয়ার সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। সুহার্তোর এই পদক্ষেপ সুকর্ণর নামমাত্র ক্ষমতাটুকুরও বিলোপ সাধন করবে যদিও সুকর্ণ গত ২৫শে মার্চও রেডিওতে ঘোষণা করেছেন তিনি এখনও রাষ্ট্রপ্রধান। বারবার রেডিওতে আপন অস্তিত্ব জাহির করে সুকর্ণ প্রমাণিত করেছেন যে তার অস্তিত্ব বিপন্ন। সে দিন খুব বেশী দূর নয়।

২৩. ৩. ৬৬

২০১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র মিত্র এডভোকেট কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পূর্ণ ঠিকানা থাকলে তাড়াতাড়ি ডাকবিলি করা যায়

ঠিকানা অসম্পূর্ণ থাকলে ডাকবিলি করতে দেরী হয়

ভারতীয় ডাক ও তার বিভাগ

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

ভারতী

৩০ বর্ষ | ১২শ সংখ্যা | চৈত্র ১৩৭২

সম্পাদকীয়

আচার্য নন্দলাল প্রয়াণে

পূর্ণ মনুষ্যত্ব ও একনিষ্ঠ সাধনার ক্ষেত্র থেকে আর একটি ভাস্বর জ্যোতিষ্ক অর্ধ-শতাব্দীর উপর ভারত বিশেষ বাংলাকে নিজ সাধনালব্ধ অমূল্যরত্নরাজী উপহার দিয়ে অস্তর্ধান করলেন। তাঁর জীবন-সাধনা শাশ্বত প্রেরণার উৎস হয়ে ভারত বিশেষ বাংলাকে চির-উদ্দীপিত করুক এই কামনা করি।

'ভারতী' নামটি যেমন কবিগুরুর দেয়া তেমনি ভারতীর প্রথম (১৩০৬) ও দ্বিতীয় (১৩০৭) বছরের নন্দলালের অঙ্কিত অপূর্ব সুন্দর প্রচ্ছদপটে সজ্জিত হবার সৌভাগ্য হয়েছিল তার।

আর মানুষ নন্দলালের মধুর ব্যক্তিত্বের পরিচয় পেয়েছিলাম ১৯৩২ সনে হিজলী বন্দী নিবাসে সুদীর্ঘ দিনগুলিকে সার্থক করবার প্রয়াসে। সেদিন ছবি আঁকা চর্চার আকাঙ্ক্ষা জানিয়ে নন্দলালকে চিঠি লিখে পেয়েছিলাম তার স্নেহস্নিগ্ধ অমূল্য উপদেশ এবং বন্দীর পক্ষে সংগ্রহ করা কঠিন হবে অনুমান করে ওঁর নিজের ব্যবহৃত বড় বড় কয়েকটি তুলি ও এক বাক্স সুন্দর রং। আজ তাঁর তিরোধান-মুহূর্তে তাঁর স্নেহলাভের সেই দুর্লভ সৌভাগ্যকে স্মরণ করে গভীর শ্রদ্ধায় তাঁর বিদেহী সত্তাকে প্রণাম করছি।

৬ই এপ্রিল

৬ই এপ্রিলের হরতাল শান্তিপূর্ণভাবে অনুষ্ঠিত হয়ে গেছে। সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে ১০ই মার্চের রুদ্র বিক্ষোভের পর একদিনের শান্তিপূর্ণ কর্মবিরতি প্রমাণ করে দিল সরকারী বলপ্রয়োগের শাসানি এবং উস্কানি না থাকলে জনসাধারণও মারমুখী না হয়ে শান্তি বজায় রাখে। সরকারী ঔদ্ধত্য, উন্মত্ততা ও পুলিশী সন্ত্রাস ঘটবার পথবিক্ষোভের যে বড় পটভূমিকা রচনা করেছিল, ৬ই এপ্রিলের সামান্যমাত্র স্ফুলিঙ্গ সংযোগে তাতে আগুন জ্বলে উঠতো। কংগ্রেস ও সরকারী স্তরে 'প্রতিরক্ষাবাহিনী'র প্রচার ও প্রয়োগে সে-সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত শুভবুদ্ধির উন্মেষে প্রয়োচনার উপলক্ষ অপসারিত হওয়ায় নিছক হরতাল অনুষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী খাদ্যনীতির বিরুদ্ধে ৬ই এপ্রিলই শেষ কথা নয়। সরকারী খাদ্যনীতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে দ্বার্থিক প্রতিরোধেই জনসাধারণের পুঞ্জীভূত বিক্ষোভের পরিসমাপ্তি হবে। ৬ই এপ্রিলের সার্থক অনুষ্ঠান এই দায়িত্বের আহ্বান জানিয়ে গেছে।

মিহির সেন

পঁচিশ ঘণ্টা চুয়াল্লিশ মিনিট অবিরাম সাঁতারের পর

ইংলিশ চ্যানেল বিজয়ী শ্রীমিহির সেন পদ্ধতি অতিক্রম করে এক নূতন রেকর্ড স্থাপন করেছেন। ৫ই এপ্রিল ভোর ৫-৫০ মিনিটে সিংহলের তালাইমান্নার থেকে রওয়ানা হয়ে বাইশ ঘাইলের পদ্ধতি অতিক্রম করে ৬ই এপ্রিল সকাল ৭টা ২৪ মিনিটে ধনুকোটিতে পৌছান। অন্তঃ দলিলা প্রবল ভোত, হাঙর, সাপ প্রভৃতি প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এই অভিযানের আয়োজন ভারতীয় নৌবাহিনীর লেঃ ইন্দ্রজিৎ শর্মার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হয় এবং বিমান বাহিনীর স্কোয়াড্রন লীডার ডুবুরী লেঃ মার্টিন বিশ ঘণ্টা শ্রীসেনের সঙ্গে জলে থেকে তাকে উৎসাহিত করেন। এই সাফল্যের কৃতিত্বে তাই এঁরাও সমভাগী। আমরা শ্রীমিহির সেনকে এই দুর্জয় অভিযানের সাফল্যে সানন্দ অভিনন্দন জানাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে লেঃ ইন্দ্রজিৎ শর্মা ও লেঃ মার্টিনকেও এই সাফল্য সম্ভব করে তোলার জন্য অভিনন্দিত করছি।

নাগা বিদ্রোহ-পাকিস্তান চক্র

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে বিদ্রোহী নাগাপ্রতিনিধিদের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আর একদফা আলোচনা হলেও অবস্থা শুধু যে অনিশ্চিত রয়ে গেছে তাই নয়, এই আলোচনার আড়ালে বিদ্রোহী নাগাদের সন্ত্রাসমূলক কার্যক্রম যে অব্যাহত রয়ে গেছে তা প্রমাণ হয়েছে গত ২০শে ও ২৩শে এপ্রিল যথাক্রমে দাদড়িং ও ডিমুতে নিউ জলপাইগুড়ি-তিনসুকিয়া ট্রেণের উপর বোমা বিস্ফোরণে। এই বিস্ফোরণের ফলে দাদড়িং-এ ৫৫ জন ও ডিমুতে ৪০ জন নিহত হয়েছেন, আহতের সংখ্যাও অনেক। ভারতীয় ইউনিয়নের মধ্যেই নাগাদের ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে, সুস্পষ্টভাবে এই অভিমত জ্ঞাপনে এবং তার রূপায়নে ভারত সরকার যত বিলম্ব করবেন আমাদের সমগ্র পার্বত্য এলাকায় অনিশ্চয়তা তত বৃদ্ধি পাবে এবং বিদ্রোহী নাগাদের সন্ত্রাসক্ষেত্র তত দ্রুত বিস্তৃত হবে। বিদ্রোহী নাগারা ইতিমধ্যে ফেডারেল নাগা সরকারের প্রতিনিধিরূপে নিজেদের জাহির করে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকগুলিকে দুইটি স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়ের মধ্যে বৈঠকরূপে ভারতবর্ষেই প্রচারের অবাধ সুযোগ পাচ্ছেন। অথচ এদের সঙ্গে প্রধান মন্ত্রীর ১৬ই ফেব্রুয়ারীর বৈঠক-কালীন লাখডিংএর নিকটবর্তী ট্রেণনে প্রথম বোমা বিস্ফোরণে বিদ্রোহীরা ট্রেন ধ্বংস করে বহুযাত্রীর প্রাণনাশ করে এবং এপ্রিলের বৈঠকের পর, দুইটি বিস্ফোরণ ঘটলো। এছাড়া গত ১১ই এপ্রিল শ্রীমীনেশ সিং লোকসভায় অক্টোবর থেকে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত বিদ্রোহী নাগাদের ৩০টি হিংসাত্মক কাজের যে তালিকা দিয়েছেন তাতে সঙ্কটের গভীরতা সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। ভারত সরকারের এই বিলম্বিত আলোচনার মারাত্মক পরিণতিতে বিদ্রোহীদের এই ধ্বংসাত্মক কার্য-কলাপ ছাড়াও শান্তি মিশনের মাইকেল স্কটের নাগাসমস্যাকে আন্তর্জাতিক সমস্যায় রূপায়ণের গোপন প্রচেষ্টা, ভারত সরকারকে সঙ্কটের গুরুত্ব সম্পর্কে আদৌ উদ্বুদ্ধ করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তা যদি হতো, ভারত সরকার বিদ্রোহীদের সঙ্গে আলোচনা বন্ধ করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে ছেদ টেনে দিয়ে মাইকেল স্কটকে নাগাভূমি ও ভারতবর্ষ থেকে বহিষ্কার করে দিতো।

নাগাদের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক সুবিদিত এবং বর্মার মধ্য দিয়ে পাকিস্তানে তাদের যাতায়াতও সরকারের অজানা নয়। বর্মার সঙ্গে আজও আলোচনা করে এ-পথে নাগাদের পাকিস্তানে যাতায়াত বন্ধ করা ভারত সরকারের পক্ষে সম্ভব হল না। এদিকে নাগাসমস্যার সঙ্কট ঘনীভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিজো পাহাড়ের সঙ্কটও গাঢ়তর হয়ে এসেছে। পাকিস্তান ও বর্মা থেকে মিজোরা বর্মার যুদ্ধের জন্য তৈরী হচ্ছে এবং মাঝে মাঝে, কাছাড়ে এবং মণিপুরে উপদ্রব শুরু করেছে। মিজো বিদ্রোহী নেতা লালডেঙ্গা মাইকেল স্কটের অনুসরণে মিজো স্বাধীনতা সংগ্রামকে শক্তিশালী করবার জন্য মিজো-সমস্যার

আন্তর্জাতীয়করণের প্রচেষ্টার তার পরিচয় পাওয়া গেছে স্বকর্ণের কাছে লেখা লালডেঙ্গার পত্রে। মিজোরা যে তিন চার বছর যাবৎ পাকিস্তানের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত সে সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে। লালডেঙ্গার চিঠির বক্তব্য মিজোরা ভারতীয়দের চেয়ে চীনাদের কাছাকাছি এবং মিজো এলাকা ভারতের অংশ নয়, স্বয়ংশাসী যাবৎ স্বতন্ত্র সত্তা নিয়ে অবস্থান করছে। সব চাইতে তাজ্জবের কথা লালডেঙ্গা জহরলাল নেহেরুর ১৯৫৬ সালের ৯ই আগষ্টের একটি বক্তৃতা উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে নেহেরুও বলেছেন সীমান্তের কতকগুলি এলাকা ভারতের নয়। নেহেরু অবশ্য সে-সময় প্রধানমন্ত্রী হন নাই, যদি তিনি একথা বলে থাকেন তবে খুবই বিস্ময়ের।

আসামের প্রশাসনে অবহেলিত পার্বত্য এলাকার অসমীয়া ভাষাকে আসামের একমাত্র সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃতির আন্দোলন যে ক্ষতচিহ্ন রেখে গেছে নাগা এলাকা ছাড়া অন্যান্য পার্বত্য এলাকাগুলিতে তারই পরিণতিতে আঞ্চলিকতাবাদের ও আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী বহুমুখ হয়েছে। এই অঞ্চলের সঙ্কটের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমাধানের জন্য যদি দৃঢ়পদক্ষেপে ভারত সরকার অগ্রসর হতে যদি কাল বিলম্ব করেন নাগা-মিজো-পাকিস্তান চক্রের আবর্তে আসামের সমস্ত পার্বত্য এলাকা টলমল করে উঠবে। সম্প্রতি পটাশকার রিপোর্টে মিজো এলাকাকে আসাম থেকে বিচ্ছিন্ন করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে আসাম কংগ্রেস প্রতিবাদ করেছে। বর্তমান পরিস্থিতির বিচারে পটাশকার রিপোর্টই আসাম পার্বত্য এলাকার সমস্যার সমাধানরূপে গ্রহণীয় হলে আসাম কংগ্রেসের দ্বিধা প্রতিবাদ অন্তরায় হয়ে যেন না দাঁড়ায়। বর্তমান সঙ্কটের দায়িত্ব বহনাংশে আসাম কংগ্রেসের ও আসাম সরকারের।

পাকিস্তানকে ভূমি দান

পাকিস্তান যে সময় সর্বতোভাবে তাসখন্দ চুক্তি লঙ্ঘন করে চলেছে এবং এই মর্মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সারা বিশ্বে অভিযোগ তুলেছেন, সে-সময় তাসখন্দ চুক্তি অনুসরণে ভারত সরকার পাকিস্তানকে ভারতের ৩৬ একর জমি দান করেছে। শিয়ালকোট ও জম্মু-কাশ্মীর সীমান্তে রাজস্ব রেকর্ড অনুযায়ী ভারতের ৩৬ একর জমি দীর্ঘকাল পাকিস্তানের দখলে ছিল। তাসখন্দ ঘোষণা অনুযায়ী এই আগষ্ট তারিখের অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহারের সর্ত অনুযায়ী সৈন্য অপসারণের প্রশ্ন দেখা দিলে এই তথ্যটি আবিষ্কৃত হয় এবং ভারতীয় এলাকায় অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও এই এলাকাটি পাকিস্তানের হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী ছেড়ে দিয়েছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর এই আগষ্ট তারিখের অবস্থায় ফিরে আসার পর ভারত সরকার এবং রাষ্ট্রসংঘের জেনারেল সেক্রেটারী ঘোষণা করেছিলেন তাসখন্দ চুক্তি অনুযায়ী সৈন্য অপসারণ সম্পূর্ণ হয়ে গেছে। তারপর ঘুরো ঘাবী করে শিয়ালকোট অঞ্চলের ৩৬ একর জমি থেকে ভারতীয় সৈন্য অপসারিত না হবার ফলে তাসখন্দ চুক্তি কার্যকর হয় নাই। অতঃপর, শোনা যায় পাকিস্তানের পক্ষ থেকে সোভিয়েট রুশের নিকট অভিযোগ উত্থাপিত হলে তাদের চাপে ভারত সরকার এই এলাকা পাকিস্তানের হাতে তুলে দিয়ে আসে। কাশ্মীর যুদ্ধের পর ভারতের এক ইঞ্চি জমিও পাকিস্তানের হাতে ছেড়ে না দেবার ঘোষিত সঙ্কল্পই শুধু এভাবে সরকার ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন তা নয়, পাকিস্তানের তাসখন্দ চুক্তি-বিরোধী কার্যকলাপ সত্ত্বেও ভারতীয় জমি উপহার দিয়ে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করেছেন। তাসখন্দকে যারা স্বাগত জানিয়েছে তাদের তোষণের নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করে বিগত পাক-ভারত যুদ্ধে যারা আত্মদান করেছে তাদের আদর্শকে অক্ষুণ্ণ রাখা জাতীয় কর্তব্য।

শিক্ষক আন্দোলন

চলতি বছরের ১লা এপ্রিল থেকে যথিত হারে বেতন

চালু করার আশ্বাস পেয়ে পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি ১৯৬৫ সালে পরীক্ষা বর্জন সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করেছিলেন। অধ্যাপকগণের এই দাবী ১৯৮০ সালে শুরু। এই বছরও এবিষয়ে সরকারী অনুযোগে শিক্ষক সমিতি বাধ্য হয়ে পরীক্ষা-বর্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সরকারী অনুযোগের কারণ ছিল অর্থের অভাবের অজুহাত। অতঃপর গত ৪ঠা এপ্রিল কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী শ্রীচাগলা বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী এ-বছরের ১লা এপ্রিল থেকে বেতন বৃদ্ধির সরকারী সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন। সরকারের এই ঘোষণায় পশ্চিম বঙ্গ কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপক সমিতি বৈষম্যমূলক বেতনহারের পরিবর্তে এক রকমের বেতন হার প্রবর্তনের জন্য ও অন্যান্য দাবী পূরণের জন্য ৩১শে জুলাই পর্যন্ত সরকারকে সময় দিয়ে পরীক্ষা বর্জনের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করে নিয়েছেন। অধ্যাপক সমিতি এই সুবিবেচনার জন্য সকলেরই ধন্যবাদার্হ হবেন এবং ৩১শে জুলাই-এর মধ্যে যে প্রশ্ন সমিতি উত্থাপন করেছেন তার সদুত্তর দিয়ে সরকার সুবুদ্ধির পরিচয় দেবেন আশা করি। গতবছরে শিক্ষকদের নিকট প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ৪ঠা এপ্রিল পর্যন্ত অপেক্ষার ফলে সঙ্কট ঘনীভূত না করে বহুপূর্বেই সরকারের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব ছিল। সরকারের এই বিলম্বিত ও দ্বিধাগ্রস্ত নীতি শিক্ষাক্ষেত্রে চূড়ান্ত অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করে শিক্ষা সংহারের আয়োজন সম্পূর্ণ করছে।

প্রাথমিক শিক্ষকদের বেলায়ও তাই ঘটছে। গত ১৮শে এপ্রিল থেকে প্রাথমিক শিক্ষকরা তিনদিনের জন্য কলকাতা রাজভবনের নিকট অবস্থান ধর্মঘট শুরু করে ২২শে ধরনা আইন অমান্য করেছেন। এই ভয়ঙ্কর মূল্যবৃদ্ধির দিনে বেঁচে থাকার মত বেতনের দাবীতে তাদের এই আন্দোলনের মুখে প্রাথমিক শিক্ষকদের মাসিক একশত টাকা বেতন দেবার কথা নাকি রাজ্য সরকার ভাবছেন। রাজ্যের ১৪১৫৩ জন প্রাথমিক শিক্ষকদের মধ্যে ১৩,০০০ হাজারের বেতন ১০০ টাকার কম। ৬৫,৫১২ জন 'খ' শ্রেণীর শিক্ষকদের বেতন হার ৭৫-১-৮০ টাকা এবং ১৩৩৭ জন 'গ' শ্রেণীর শিক্ষকের বরাদ্দ ৬৫-১-৭০ টাকা। বর্তমান অবস্থায় একশত টাকার সম্মতি নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ করা আদৌ যে সম্ভব নয় শিক্ষা কমিশন কর্তৃক অনুষ্ঠিত একটি আলোচনা চক্রে প্রাথমিক শিক্ষকদের ১৫০ টাকা বেতন সুপারিশ করে তার জবাব দিয়েছেন। প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দাবী অন্তত মাসিক ১৮০ টাকা এবং দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সূচক অনুযায়ী-মহার্ঘভাতা। এছাড়া রয়েছে শিক্ষকদের জন্য বাড়ি ভাড়া ও বদলীকালীন রাহা খরচ।

৬ থেকে ১৪ বছরের সকল ছাত্রছাত্রীর আবশ্যিক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সংবিধানসম্মত দাবীও প্রাথমিক শিক্ষকরা করেছেন। অথচ, অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার ব্যবস্থা মাত্র তিনটি সহরে—আসানসোল, জঙ্গীপুর ও খড়্গপুর—চালু আছে আরও দশটি শহরে নাকি রাজ্যসরকারের এই পরিকল্পনা চালুর প্রস্তাব রয়েছে। এ-বিষয়ে রাজ্য সরকার ৮৫টি পৌর সভাকে পরিকল্পনা দাখিলের অনুরোধ জানালেও মাত্র ২২টি পৌরসভা সাড়া দিয়েছেন।

প্রাথমিক শিক্ষকদের এই সঙ্গত দাবীকে গ্রহণ না করলে এবং অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষার দিকে দ্রুত অগ্রসর না হলে গণতন্ত্রের বনিয়াদে ধসে নামবে। প্রাথমিক শিক্ষকদের বেতনের ক্ষেত্রে অন্তত শিক্ষা কমিশন আলোচনা-চক্র নির্দিষ্ট মাসিক ১৫০ টাকা অবিলম্বে চালু হওয়া উচিত।

খাদ্য

খাদ্য নিয়ে ঘন ঘন মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন ডেকেও এ-যাবৎ কোনো আশুর খাদ্যনীতি উদ্ভাবনে কেন্দ্রীয় সরকার ব্যর্থ

হয়েছেন। এ যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকারের সকল আয়োজন-উদ্যোগ সংগ্রহ ও বণ্টনে সীমাবদ্ধ ছিল, উৎপাদনের জন্য সংহত চেষ্টার কোনো আয়োজন দেখা যায় নাই। গত ৯ই ও ১০ই এপ্রিলের মুখ্যমন্ত্রী সম্মেলন তার ব্যতিক্রম বলা যায়। এই সম্মেলনে ১৯৬৭ সালের জন্য নয় কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টন থেকে নয় কোটি সত্তরলক্ষ টন খাদ্য উৎপাদনের লক্ষ্য ধার্য করে কয়েকগুলি বেশী উৎপাদনক্ষম বীজের ব্যবহারের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৫০ লক্ষ একর জমিতে এই পর্যায়ে উৎপাদনক্ষম বীজ ব্যবহার করে ধান, গম, ভুট্টা, বাজরা ও জোয়ারের চাষ হবে। ধান চাষ হবে ১৯ লক্ষ একর জমিতে। এ বীজে পরীক্ষা করে দুই ফসলের ভিত্তিতে একর প্রতি ১০০ থেকে ১২০ মণ ফসল পাওয়া গেছে। সেই সঙ্গে কৃষি ঋণের, সারের ও প্রশাসনেরও উপযোগী ব্যবস্থার প্রস্তাব হয়েছে। এ-ছাড়া এই ধরণের বীজ উৎপাদনের জন্য প্রতি রাজ্যে ৫০০ একর পরিমিত বীজ খামারের ও ক্ষেত্রের উদ্যোগে প্রতি রাজ্যে ১০,০০০ একর পরিমিত বীজ খামারের প্রস্তাবও হয়েছে।

এই সম্মেলনের সব চাইতে উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত সারদ্রব্যের সুনির্দিষ্ট বণ্টন। এই উদ্যোগে কেন্দ্রের ও রাজ্য সরকারের দায়িত্বের সীমানা যেমন সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত থাকবে, তেমনি রাজ্যের স্তরে কোন কর্মচারী উৎপাদনের জন্য কতটা দায়ী সে-সীমানাও নির্ধারিত থাকবে। কেবল যাদের অঙ্ক দিয়ে এ-যাবৎ খাদ্য উৎপাদন প্রচেষ্টা নিরীক্ষিত হয়ে, উৎপাদনের দায়িত্ব সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে রেখেছিল। অতঃপর, বিগত যুধ্যা সম্মেলনের পর তা দূর হয়ে খাদ্যোৎপাদন একটি কাগজী সদিচ্ছার অবরুদ্ধ থাকবে না, আশা করা যেতে পারে।

কিন্তু খাদ্যাঞ্চলের বেড়া তুলে সমগ্র দেশকে নিয়ে একটি মাত্র খাদ্যাঞ্চল গঠনে সরকারী অনিচ্ছা বা অক্ষমতা বণ্টনের ও মূল্যের ক্ষেত্রে বৈষম্য বজায় রেখে দিলো। সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে উদ্বৃত্ত অঞ্চলগুলিতে গত বছরের ধান চাল এ-বছরে যা উপচে পড়েছে তার পরিমাণ কম নয়। তা সম্ভব হয়েছে রাজ্যবিভিন্ন খাদ্যাঞ্চলের জন্য। অবশ্য অনেক গবেষণার পর পাঞ্জাবের গম-চাষীদের সুবিধার জন্যই নাকি পাঞ্জাব, উত্তর প্রদেশ ও দিল্লীর গমাঞ্চল নিয়ে বৃহত্তর গম এলাকা গত ১৯শে এপ্রিল খাদ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন। পাঞ্জাবের কৃষকদের আনুকূল্যে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও, পাঞ্জাবের গম দিল্লীর গমাঞ্চল থেকে যদি করডনিং-এর বেড়া ডিঙিয়ে দিল্লীর ক্লাউটারী রেশনিং এলাকায় একবার প্রবেশ করতে পারে, তবে মুনাফাখোর মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা পাঞ্জাবের চাষীকেও যেমন লুঠ করবে গমভোজীদেরও মূল্যবৃদ্ধি করে তেমনি লুঠন করবে।

সরকারের নূতন সার-নীতিও চাষীদের লুণ্ঠনের সিংহদ্বার খুলে দিয়েছে – নূতন নীতি অনুযায়ী বেসরকারী কারখানার শতকরা ৭০ ভাগ উৎপাদনের বণ্টন ও মূল্যনির্ধারণের অবাধ অধিকার দেওয়া হয়েছে বেসরকারী মালিকানাদের। এমনিতেই সারের দাম অত্যন্ত চড়া, টন প্রতি ৬১৫ টাকা। সুতরাং মূল্য নির্দ্ধারণের অবাধ অধিকার সারের মূল্য যে আরও বাড়িয়ে দেবেনা, তার নিশ্চয়তা কোথায়? প্রকৃতপক্ষে পশ্চিম বাংলার খাদ্য আন্দোলন চলাকালীনই ভারত সরকার রাসায়নিক সারের দাম বাড়িয়ে দিয়েছে। এক টন ইউরিয়ার দাম ৬১৫ টাকা থেকে ৬৮০ টাকা একটন ক্যালসিয়ামের দাম ৩১০ টাকা থেকে ৩৬১ টাকা, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট ৪০৪ টাকা থেকে ৪৫০ টাকা, একটন সুপার ফসফেট ২৮৮ টাকা থেকে ২৯১ টাকায় উঠেছে, সুতরাং নূতন সার-নীতির ফলে সারের দাম আকাশচুম্বী হবে এই অনুমানই স্বাভাবিক।

এ-বছরের জন্য কেন্দ্রীয় খাদ্যমন্ত্রী সম্পূর্ণ নির্ভয় হতে পারেন নি। এখনও ভগবান ভরসা যদি বৃষ্টি হয়। কিন্তু

পশ্চিম বঙ্গের এখনও বিস্তর সমন। লেভী ব্যর্থ হয়েছে, বন্ডিকারেড রেশনিং-এর চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে, অথচ চাউল নেই। তাই ইতি মধ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে বন্ডিকারেড রেশনিং-এর পরিমাণ ৭৫০ গ্রাম থেকে ৫০০ গ্রামে নেমে এসেছে। আরও নামবার সম্ভাবনা রয়েছে। টেষ্ট রিলিফ শুরু হয়েছে ঘাটতি জেলাগুলিতে। আর এদিকে সরকার বন্যার প্রথমের হুমকি দিচ্ছেন। এখন সবেমাত্র এপ্রিলের শেষ। সুতরাং পশ্চিম বাংলার আগামী ছ'টির মাসগুলি কি ভয়ঙ্কর হতে পারে, তার পূর্বাভাস নিহিত রয়েছে. এই ঘটনাগুলির মধ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর আত্মপ্রসাদ সত্ত্বেও।

পাঞ্জাবী সুবা

পাঞ্জাবী সুবা গঠনের দিন ধার্য হয়ে গেছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীগুলজারীলাল নন্দ গত ১৮ই এপ্রিল সংসদে ঘোষণা করেছেন যে বর্তমান পাঞ্জাব রাজ্য ভেঙে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা নামে যে দুটি রাজ্য গঠন করা হবে, আগামী ১লা অক্টোবর থেকে তাদের শাসন চালু হবে। ইতিমধ্যে দুই রাজ্যের সীমানা নির্ধারণ এবং ঋণ ও সম্পত্তির হিসাব-নিকাশ করবার জন্য একটি সীমানা কমিশনও গঠিত হয়েছে। এই কমিশন যে মাসের শেষের দিকে তাদের রিপোর্ট দাখিল করবেন। বর্তমান পাঞ্জাবের হিন্দিভাষী পাহাড়ী-অঞ্চলগুলি হিমাচল প্রদেশের সঙ্গে যুক্ত হবে। হিমাচল প্রদেশ বর্তমানের মত কেন্দ্র শাসিতই থাকবে। দিল্লী প্রদেশও অক্ষুণ্ণ থাকবে। সংসদীয় কমিটি নয়া দিল্লী বাদে দিল্লী প্রদেশটিকে হরিয়ানা রাজ্যের সহিত যুক্ত করার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সরকার তা গ্রহণ করেন নাই। দিল্লী ও নয়াদিল্লী একটি প্রশাসনিক ইউনিট এবং রাজধানী। কেন্দ্রীয় সরকার এদের বিভক্ত করা অসম্ভব এবং অবাঞ্ছনীয় মনে করে অন্যান্য সুবিবেচনার পরিচয় দিয়েছেন। পাঞ্জাবী সুবা সম্পর্কিত নির্দিষ্ট ঘোষণার অতঃপর সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটবে।

পূর্ববঙ্গের মুক্তি

পশ্চিম পাকিস্তানের অধীনতার বন্ধন থেকে মুক্ত হবার দাবী পূর্ববঙ্গে আবার সোচ্চার হয়ে উঠেছে। পূর্ববঙ্গের এই গভীর রাজনৈতিক সঙ্কটের ইতিবৃত্ত আমুবের কঠোর শাসন উপেক্ষা করে আন্তর্জাতিক প্রচারের স্তরে হাজির হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমসে ঢাকা থেকে প্রেরিত জ্যাকেস নেভার্ড-এর সংবাদে অতঃপর সমগ্র পৃথিবীই উচ্চকিত হবে এবং ভারত-বর্ষের স্বার্থসন্ধিৎসু প্রচারযন্ত্রও এই বিদ্রোহকে চিহ্নিত করে লঘু করবার সুযোগও আমুবের হাতছাড়া হয়ে গেলো। পূর্ব-পাকিস্তানের মুক্তির দাবী গত ভারত-পাক সংঘাতের সময় কিছুদিনের জন্য মাত্র চাপা পড়ে বর্তমানে আবার প্রবলভাবে আত্ম-প্রকাশের প্রমাণ পাওয়া গেছে স্বাতন্ত্র্যকামী আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবর রহমানের সাম্প্রতিক খোঁহর ও সিলেটে যাওয়ায়ে। শেখ মুজিবর রহমান ছয় দফা দাবী তুলেছেন :

(১) জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সর্বময় কর্তৃত্বসম্পন্ন ফেডারেল পার্লামেন্টারী শাসন।

(২) ফেডারেল সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক ব্যাপার থাকবে অন্যান্য সকল ক্ষমতা ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির হাতে থাকবে।

(৩) পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে মূলধনের প্রবাহ রোধে এই দুই অঞ্চলে হয় স্বতন্ত্র মুদ্রা না হয় স্বতন্ত্র আর্থিক নীতি চালু করতে হবে।

(৪) ফেডারেল সরকারের কর ধার্যের এক্তিয়ার থাকবে না, নিজ ব্যয় নির্বাহের জন্য রাজ্যগুলির করে অংশ থাকবে মাত্র।

(৪) ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলির নিজের দায়িত্বে বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালনার এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রার উপর অধিকার থাকবে।

(৫) পূর্ব পাকিস্তানে সেনাবাহিনী কিম্বা আধা-সামরিক বাহিনী গঠন করতে হবে।

এই ছয়দফা দাবীর ভিত্তিতে আত্মনিয়ন্ত্রণের যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে আমুব সরকার তাকে বিদ্রোহের সামিল বলেই মনে করে। আমুব সরকারের পক্ষে এই দাবীকে স্বীকার করাও যেমন বিপজ্জনক, অস্বীকার করাতেও বিপদ রয়েছে। এই আন্দোলনকে স্বীকার করলে আমুব সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে দুর্বল বলে নিন্দিত হবে, যেমন হয়েছিল কাশ্মীর-সমস্যার মীমাংসা না করে যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা ও তাসখন্দ চুক্তি স্বাক্ষরে। এই আন্দোলনকে স্বীকৃতি না দিলে পূর্ব স্বাধীনতার দাবী দুর্বার হয়ে উঠবার আতঙ্কেও আমুবশাহী অর্জরিত। সামরিক শাসনে এই আন্দোলনকে স্তব্ধ করা সম্ভব নয় আমুব সরকার তা হাড়ে হাড়ে জানে। গত যুদ্ধের সময় এক ডিভিসন সেনাবাহিনীর আশ্রয়ে পূর্বপাকিস্তানের জনসাধারণকে ফেলে রাখার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে ভেদের নিরাপত্তাবোধ ঘুচে গেছে। চীনের ভয়ে ভারত পূর্বপাকিস্তান আক্রমণে সাহসী হয় নাই, এই যুক্তির উত্তরে পূর্ব পাকিস্তানের নেতাদের বক্তব্য চীনের উপর যদি নিরাপত্তার জন্য নির্ভর করতে হয়, তবে পশ্চিম পাকিস্তানের আশ্রয়ে তারা থাকবে কেন?

গত আঠার বছর পূর্ব পাকিস্তানের উপর উপনিবেশিক অত্যাচার ও শোষণের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানকে এবার বিদায় দিতে পূর্ব পাকিস্তানের গণমানস উদ্যত হয়েছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস-এর সংবাদ তারই প্রচারনামা। পূর্ববঙ্গের আত্মনিয়ন্ত্রণের আন্দোলন বিদ্রোহের অব্যবহিত বিপরীত।

জয়শ্রী

বৈশাখ : ১৩৭৩

দীনেশচন্দ্র সেন শতবর্ষ
ও
নন্দলাল বসু স্মৃতি সংখ্যা

আমরা আমাদের দেশের নারী সমাজের জন্য গর্ব্ব অনুভব করি। পরিবারের অতি প্রিয়জন কেউ হয়তো বাড়ীতে নেই, তিনি আমাদের সীমান্ত রক্ষা করছেন। দেশ যে একটা সঙ্কটের মধ্য দিয়ে চলেছে তা জেনে আমাদের নারীগণ হাসিমুখে সব দুঃখ সহ্য করছেন। তাঁরা জানেন যে সব রকম অপচয় বন্ধ করে সঞ্চয় করা প্রয়োজন। যুদ্ধে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছেন তাঁদের সেবা শুশ্রূষায় সাহায্য করার জন্য তাঁরা হাসপাতালে, রক্তব্যাঙ্ক এবং স্বয়ংসেবী প্রতিষ্ঠানগুলিতে কাজ করছেন। হ্যাঁ, আমাদের দেশের নারীগণ দেশের সেবা করছেন! আপনি?

এক মহান দেশের এক মহান জনসমাজ

OA 65/19 (Beng)

ধারাবাহিক রচনা

সুভাষচন্দ্র

পবিত্রকুমার ঘোষ

প্রেসিডেন্সি কলেজ

কলেজ প্রাঙ্গণের বাইরে

প্রেসিডেন্সি কলেজের চতুঃসীমানার বাইরে বাংলা দেশের আবহাওয়া তখন অতিশয় থমথমে—ঘুপসিঝিকপই হয়তো তাকে বলা চলে। ১৯১৩ সালে সুভাষ যখন কলকাতায় এসে কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে ভর্তি হলেন তখন বঙ্গ-ভঙ্গ আন্দোলন সম্পর্কিত সমস্ত ব্যাপারটি মিটমাট হয়ে গেছে বা যাবার অবস্থায় এসেছে। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে আমাদের জাতীয়তাবাদের উদ্বোধন ও দেশপ্রেমের মন্ত্রোচ্চারণ ঘটেছে—উক্ত শতাব্দী যত সমাপ্তির মুখে এগিয়েছে ততই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ পাঢ় হতে পাঢ়তর হয়েছে এবং স্বদেশপ্রেম যেন বাস্তব মূর্তি ধারণ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত দেশজননীর একনিষ্ঠ পূজারীর দল ছিল মুষ্টিমেয় পাতায় নিবদ্ধ—কিন্তু শতাব্দীর শেষ প্রান্তে, বঙ্কিমচন্দ্রের মহত্তম কল্পনাকেও পরাভূত করে, আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের সুবৃহৎ প্রেক্ষাপটে বৃহৎ, মহৎ, সুবিশাল দেশপ্রেম এক মূর্ত, তেজবীর্যকান্তি, সর্বত্রগামী তরুণ সন্ন্যাসীর মূর্তি ধরে দাঁড়াল—আবেদন-নিবেদন নয়, বিনীত করুণাভিক্ষা নয়, সে আপন সৌর্যে অগস্ত্যের অনলগম্ভীর ঘোষণা আমাদের কানে এনে দিল। যে ইংলণ্ড, যে পাশ্চাত্য জগৎ তোমাকে জয় করেছে, এবার আপনার অনন্ত বীর্যে সেই ইংলণ্ড, সেই পাশ্চাত্য জগৎকে তুমি জয় করো—ভারতের কাছে এই হল সেই তরুণের আহ্বান। conquer! conquer!—এই নতুন রণমন্ত্র বিবেকানন্দ আমাদের সেদিন দান করেছিলেন।

ভারতবর্ষে উনিশ শতক যখন শেষ হল তখন চতুর্দিকে নতুন জাগরণ, নতুন আশাবাদ, নতুন সংগ্রামচেতনা সৃষ্টি হয়েছে। বাণী ও ভাব যেন এইবার বাস্তবমূর্তি ধরবে—মন্ত্র যেন concrete বস্তু-রূপ নেবে। বিবেকানন্দ আত্ম পরিচয় দিয়েছিলেন এইভাবে—I am a voice without a form. কিন্তু বাণীর সার্থকতা আসেনা যদি তা স্থূল রূপের মাঝে নবজন্ম লাভ না করে, রূপায়িত হওয়াই মহৎ মন্ত্রের অন্তর্নিহিত প্রতিশ্রুতি। বিবেকানন্দ তাই অতি অল্প বয়সে তাঁর ত্যাগোজ্জ্বল জীবনকে সংবৃত করে নিলেন, যেন নতুন কর্মকঠোর বাস্তব অস্তিত্বের মাঝে নিজেকে রূপায়িত করারই উদ্দেশ্যে—যেন উনিশ শতকের ভারতের সমস্ত সাধনার বাণীরূপ বিশ শতকের রক্ত ও ক্লেশলব্ধ, আঘাত ও সংঘাতময় বাস্তব স্থূল মূর্তি পরিগ্রহের আশায় আপাতত আত্মবিসর্জন দিলেন এবং নিজেকে সংক্রামিত করলেন, বিগলিত করলেন বিশ শতকের প্রাণস্পন্দনের মাঝে। একটা অধ্যায় শেষ হয়ে গেল—সেই ১৯০২ সালে। বিবেকানন্দের জীবনীগ্রন্থ হতে জানা যায় যে জীবনের শেষ কয়েকটি বছর তিনি আত্মসংবৃত অবস্থায় কাটিয়েছেন—বাহিরের উদ্যম ও চাঞ্চল্য প্রত্যাহৃত করে আত্মস্থ, স্তব্ধ, সংহত, গম্ভীর হয়ে কী যেন

ভাবছিলেন তিনি শেষ কয়েকটি বছর, কিসের অনুসন্ধান চলছিল তাঁর সমাধিমগ্নতার অন্তরালে। উনিশ শতকের সমাপ্তিরেখার দাঁড়িয়ে নতুন দৃষ্টি নিয়ে বিবেকানন্দ তাকিয়ে ছিলেন সমাগত নব শতাব্দীর দিকে, একটা বৃহৎ সঙ্কল্পের বীর্যে পুনরায় স্পন্দিত হয়েছিলেন তিনি, এবং তারই বশে নিজের অভ্যস্ত, পরিচিত জীবনের অধ্যায়চিহ্নে একটা দ্রুত সমাপ্তি টেনে দিলেন। বিশ শতককে স্পর্শ করেই প্রাক্তন জনের কৌতূহলী দৃষ্টির অন্তরালে অপসারিত করলেন তিনি নিজেকে।

একটা অধ্যায়ের শেষ হল বটে, কিন্তু নতুন অধ্যায় নবতর রূপে সুরু হতে বেশিদিন লাগেনি। ১৯০২ হতে ১৯০৫ সাল—ব্যবধান মাত্র তিন বৎসরের। ১৯০৫ সনের বাংলায় ও ভারতে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হয়ে উঠল একটা নতুন শক্তির জাগরণ—তখন সে আর একটা ভাব মাত্র নয়, বাণীও শুধু নয়,—সে একটা মূল শক্তির প্রকাশ। ঘটনা ঘটার পূর্বদিনও কেউ ভাবেনি যে এমনটি ঘটবে, সুক্ষ্মতম কল্পনাতেও ধরা পড়েনি, অনিবার্যের আভাস :—কিন্তু নিতান্ত অকস্মাৎই দেশের জনচিত্তের ভিতর হতে মহাশক্তি জাগ্রত হল, সংগ্রামের প্রকাশ্য ময়দানে ইংরেজরাজকে রক্তাক্ত মোকাবিলার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে বসল—আমাদের অভিপ্রেত মূল বাস্তব স্বাধীনতা সংগ্রাম সুরু হয়ে গেল। একটা অনাস্বাদিতপূর্ব শক্তির জাগরণ রূপে সাধারণ বাঙালীও সেদিন অসাধ্যসাধন অভীপ্সা হৃদয়ে ধারণ করল। নেতৃবৃন্দই বা সাহস, শক্তি, বীর্য, সংকল্প পেলেন কোথা হতে? সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বা বিপিন পাল আগেও ছিলেন, পরেও বহু বৎসর বেঁচেছিলেন—কিন্তু ১৯০৫ সালে ও তৎপর যে তাঁদের কণ্ঠস্বরে দৈববাণীসম সঞ্চয় বার্তা ঘোষিত হতে লাগল—তা একেবারেই অভাবিত ও নতুন। হঠাৎই ঘটল অরবিন্দের মতো যুগপৎ সমুদ্ভূত মানুষের আবির্ভাব—এবং প্রায় ব্যাখ্যাতীতভাবে জোট বাঁধল অগ্নিপ্রভ নবযৌবনের নতুন বার্তাবহের দল। এর কোনো নজির নেই বাংলা বা ভারতের সমাজন ইতিহাসে—এ একেবারে নতুন। ১৯০৫ সাল ও তৎসময়ের বাংলা যেন এক বিস্ময়কর দেশ। ১৯০২ সালে যে voice আমাদের শ্রুতি ও দৃষ্টির অগোচরে চলে গিয়েছিল ১৯০৫ সালেই সে যেন নতুন form নিয়ে দিকপ্রান্তে আভাসিত হয়ে উঠল। বোঝা গেল উনিশ শতকে যা ছিল মাত্র বাণী, বিশ শতকে তা প্রত্যক্ষ রূপের মাঝে আকারিত হতে চলেছে।

সেই নতুন কালের নতুন প্রকাশের আয়োজনের সঙ্গে বিবেকানন্দের একটা প্রত্যক্ষ জীবন্ত যোগসূত্রও বর্তমান ছিল—সেই সূত্রটি নিবেদিতা। নিবেদিতাই এদেশে 'জাতীয়তাবাদ' এই শব্দটির স্রষ্টা ও প্রবক্তা। ১৯০২ সাল হতে ১৯১১ সাল পর্যন্ত আমাদের জাতীয় আন্দোলন, বৈপ্লবিক সংগ্রাম, শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, ইতিহাস, ধর্ম প্রভৃতি ক্ষেত্রে জাতীয় ভাব ধারার বিকাশ—ইত্যাদি সকল ব্যাপারের কেন্দ্রস্থলে ছিলেন নিবেদিতা উপবিষ্ট। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সমাপ্তিতে জাতীয় সংগ্রামের একটা অধ্যায় শেষ হয়ে যায়—নিবেদিতারও মৃত্যু হয় তখন। যখন সুভাষ কলকাতার আদেন কলেজে পড়তে তখনও নতুন অধ্যায় সুরু হয়নি। কলকাতা ও বাংলা দেশের আবহাওয়া তখন থমথমে। বিপ্লব-আন্দোলন তখন গোপন পথ ধরেছে - প্রকাশ্য কোনো গণ-আন্দোলন তখন নেই। বিপ্লবীদের গুপ্ত সমিতিতে সুভাষ জড়িয়ে পড়েননি, গণ-আন্দোলনে অংশ নেবার প্রশ্নও তখন ওঠেনা। অথচ প্রেসিডেন্সি কলেজে ছাত্রদের নিয়ে যত কাজই তিনি করুন—বিতর্ক সভা গঠন, ম্যাগাজিন প্রকাশ, কিংবা দরিদ্র সাহায্য ভাণ্ডারে চাঁদা তোলা -তাঁর বিপুল কর্মশক্তি ও আদর্শবাদ এতেই নিঃশেষিত হয়নি। কলেজের সীমানায় তাঁর মন বাঁধা পড়েনি—বরং কলেজের বাইরেই তাঁর মনোযোগ, উদ্যম ও সময়ের অধিকাংশ ব্যয়িত হয়েছে। প্রেসিডেন্সি কলেজ তাঁকে ছাড়তে হয় যে সঙ্ঘর্ষের ফলে সেই সঙ্ঘর্ষের এক পক্ষ অধ্যাপক ওটেন ও অন্যপক্ষ ছাত্রসমাজ—তাঁদের

পরিচয় আমরা ইতিপূর্বে বিশদ ভাবে উদ্ধৃত করেছি। কিন্তু আর এক পক্ষ সুভাষ—তাঁর সত্যিকার পরিচয় তখন কী? তাঁর প্রকৃত কর্মধারাই বা কী?

২

কলকাতায় সুভাষের ছাত্রজীবনের কর্মধারার সূত্রপাত ঘটে কটকে স্কুলে পড়া কালে। তাঁর নিজের বর্ণনা এই: "প্রথম রাজনৈতিক প্রেরণা পেয়েছিলাম ১৯১২ সালে আমারই বয়সী একটি ছাত্রের (হেমন্তকুমার সরকারের) কাছ থেকে। ছেলেটি কটক ও পুরীতে বেড়াতে এসেছিল। প্রধান শিক্ষকমহাশয়ই বেণীমাধব দাস তার সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দেন। ছেলেটি কলকাতার একটি রাজনৈতিক দলের সভ্য ছিল—এই দলের আদর্শ ছিল আধ্যাত্মিক উন্নতি ও দেশসেবা। ·····সমাজ ও দেশের নানা সমস্যা নিয়ে মাত্র মাথা ঘামাতে সুরু করেছি এমনি সময়ে ছেলেটির আবির্ভাব।···আগন্তুক ছেলেটি একদিন সুযোগ বুঝে দেশের প্রতি আমাদের কী কর্তব্য সে সম্বন্ধে আবেগের সঙ্গে বহু উপদেশ দিল। তাদের কলকাতার দলের বিচিত্র কার্যকলাপ সম্বন্ধে অনেক খবরও তার কাছে পাওয়া গেল। সব শুনে আমি তো মুগ্ধ হয়ে গেলাম। কলকাতার মতো বড় শহরের একটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত হওয়ার মধ্যে যে গৌরব আছে তার লোভে আমরা সকলেই, ছেলেটির আবির্ভাবকে ভগবানের আশীর্বাদ বলেই মনে করলাম। কলকাতায় ফিরে গিয়ে ছেলেটি তার দলের কাছে আমাদের সম্বন্ধে একটি বিবৃতি পেশ করেছিল। কিছুদিনের মধ্যেই সেই দলের প্রধানের কাছ থেকে সেই সূত্রে আমরা চিঠি পেলাম। এইভাবে দলটির সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ ঘটল বেশ কয়েক বছর তা টিঁকে ছিল।"

(ভারত-পথিক, পৃ: ৪৫-৪৬)

কলকাতার প্রথম যে দেশপ্রেমিক দলের সঙ্গে সুভাষের যোগাযোগ এইভাবে ঘটে প্রকৃত প্রস্তাবে সেই দলটির সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাবার জন্য দায়ী প্রধানশিক্ষক বেণীমাধব দাস মহাশয়। কটকের র‍্যাভেনশা কলেজিয়েট স্কুলে প্রধান শিক্ষক থাকাকালে সুভাষকে তিনিই প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন বলা যায়; এবং কৃষ্ণনগর কলেজিয়েট স্কুলে বদলি হয়ে আসার পর হেমন্ত কুমার সরকারকেও সুভাষের বন্ধু হবার উপযুক্ত বালক বলেও তিনিই চিনতে পারেন। হেমন্ত কুমারের নিজের প্রদত্ত বর্ণনা এইরকম: "আমার বয়েস তখন বছর পনেরো। সুভাষেরও তাই। কৃষ্ণনগরে এসে বেণীবাবুর স্নেহ দৃষ্টি আমার উপর পড়লো। আমার শরীর ভাল না থাকায় তিনি পুরীতে চেঞ্জে যাওয়ার জন্যে আমার হাতে সুভাষকে একখানা পত্র দিয়ে কটকে পাঠালেন। আমার সম্বন্ধে পত্রখানিতে লেখা ছিল—A minute's talk will reveal to you his character. পুরীতে সমুদ্রের ধারে আমার থাকার ব্যবস্থা করতে তিনি সুভাষকে অনুরোধ করেছিলেন।

কিন্তু এটা একটা উপলক্ষ্য মাত্র। তিনি চেয়েছিলেন সুভাষের সঙ্গে আমার অন্তরঙ্গ মেলামেশা। এবং সেই মেলামেশার মধ্য দিয়ে একটি যুগ্ম জীবনধারার সৃষ্টি।"

(সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃ: ৪)

হেমন্তকুমার উক্ত গ্রন্থে কটকে সুভাষের সঙ্গে তাঁর প্রথম সাক্ষাৎ ও তৎপরবর্তীকালের বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন: "শারদীয়া সপ্তমীর সুপ্রভাত। ইংরেজি ১৯১২ সালের একটি সকালে নীল আকাশে খণ্ড খণ্ড সাদা মেঘগুলি অলসভাবে ভেসে বেড়াচ্ছে। কটক সহরের উড়িয়া বাজার পল্লীতে অধ্যাপক গোপালচন্দ্র নন্দুলি মশায়ের বৈঠকখানায় বসে আছি। এমন সময়ে একটি গৌরবর্ণ কৃশকান্তি তরুণ কিশোর এসে তার ছোট্ট করদুটি জোড় করে আমায় নমস্কার করল। আমি অবাক হয়ে তার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করে চিত্রার্পিতের মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রভাতের স্নিগ্ধ

মাত কুসুমের মত তার পবিত্র মুখখানি, চোখে সোনার ফ্রেম-দেওয়া চশমা, গায়ে ফিকে নীল রঙের বরফি-কাটা ছিটের লম্বা কোট, তার উপর একখানি পাট করা সাদা চাদর, পরণে ধুতি এবং পায়ে কালো-রঙের ফিতে-আঁটা বুট। এই মূর্তি দেখে আমি মনে করলাম যে মানুষ খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম —এই সে। ভাবের আবেগে আমি তাকে প্রতি-নমস্কারটি পর্যন্ত করিনি।

অনেকক্ষণ পরে সুভাষ বললো, 'মাস্টার মশায় লিখেছেন — তুমি আমাদের বাড়িতে উঠবে—তা ওঠনি কেন?

আমি বললাম—'ভাই, তোমরা এত বড়লোক যে আমার মত গরীবের সেখানে উঠতে ভয় করে।'

তার চোখ ভিজে উঠলো—'বড়লোকের ঘরে জন্মেছি বলে তুমি আমায় খোঁটা দিলে, আমার কি অপরাধ বলতো ভাই!'

তারপরে দুজনে বসলাম কথা কইতে। "(উক্ত গ্রন্থ, পৃঃ ২০)। অতঃপর: "সে দুপুর পর্যন্ত আমার সঙ্গে কথায় বিভোর হয়ে থাকলো। স্নেহময়ী মা তার জন্য খাবার নিয়ে বসে আছেন স্মরণ হওয়ায় সে দুপুরে বাড়ি ফিরে যাওয়া শের করেই আমার কাছে এলো। ...'অন্নতোঃ অক্রবেণ" গল্প করতে করতে অধিক রাত হয়ে গেল— আমরা হাঁটতে হাঁটতে জোৎস্না ভাবিত কাটজুড়ি নদীর বাঁধের উপর বেড়াচ্ছিলাম। চারদিন কটকে থেকে ৺বিজয়া দশমীর সন্ধ্যায় সুভাষের নিকট বিদায় নিয়ে পুরী গেলাম।")

"কটকে আমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সুভাষ স্থির করলো ব্রহ্মচর্য্যব্রত গ্রহণ করে দেশের ও দশের সেবায় জীবন উৎসর্গ করবে। এই সঙ্কল্প গ্রহণের মূলে একটু ইতিহাস আছে।"

ইংরেজি ১৯১৩ সালে আমি স্বাস্থ্যলাভের জন্য পূজার ছুটিতে অক্টোবর মাসে দেওঘরে বেড়াতে যাই। দেওঘর হাইস্কুলের বোর্ডিং তখন পূজাবকাশে খালি ছিল। সেখানে উঠি। শ্রীযুত হরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও যুগলকিশোর আঢ্য নামে মেডিকেল কলেজের দুইজন ছাত্র তখন ওখানে ছিলেন ....হরেশচন্দ্রের যক্ষ্মারোগ হয়েছিল। তখন তিনি মেডিক্যাল কলেজের চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়তেন—যুগলকিশোর পঞ্চম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র ছিলেন। তখনকার দিনে যুগল কিশোরের মত মেধাবী ছাত্র মেডিক্যাল কলেজে আর কেহ ছিলেন না; তিনি প্রায় সকল পরীক্ষাতেই প্রথম হতেন এবং অনেক গোল্ড মেডাল পেয়েছিলেন ও বার্ষিক ৮০৲ বৃত্তিলাভ করেছিলেন।

হরেশচন্দ্রের সঙ্কল্প ছিল আজীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করে দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করা। যুগলকিশোর ছিলেন এই সঙ্কল্পের সহায়ক। দেশের যুবকদের নিয়ে একটা দল বেঁধে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করতে হবে, এই ছিল তাঁর পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্যে আমিই তাঁর প্রথম শিষ্য হই।

কলিকাতা শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে ৫৩নং বাড়িতে প্রথম আড্ডা বসে। সেখানে হরেশদা ও যুগলদা ছাড়াও শ্রীযুত আশুতোষ দাস নামে মেডিক্যাল কলেজের একজন ছাত্র ছিলেন।...৫৩নং শ্রীগোপাল মল্লিক লেন থেকে ৩নং বিডনপুর স্ট্রীটের একটা মেডিক্যাল মেসে পরে হরেশদারা আসেন। কটক থেকে ফিরে এসে সুভাষের সমস্ত কথা হরেশদাকে বলি। সুভাষের সঙ্গে হরেশদার চিঠিপত্র চলতে থাকে আমিই সুভাষকে দলে ভিড়াই।" (উক্ত গ্রন্থ পৃঃ৭-৯)

সুখের কথা এই সময়কার বিবরণ শ্রীহরেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে বিশদ ভাবেই দিয়েছেন। তাঁর বর্ণনা হতে সুভাষচন্দ্রের ছাত্রজীবনের [illegible] সংগঠনের পরিচয় অনেকখানি জানা যায়। তিনি লিখেছেন: "পূজার ছুটিতে যাওয়া পরিবর্তনের জন্য যুগল আমায় লইয়া গেলো দেওঘর। আমরা দেওঘর স্কুল-বোর্ডিং থাকিতাম। [illegible] ...তার সাথে ভাবও খুব তাড়াতাড়ি জমিয়া উঠিলো। যেন

সেবার কথাও তার সাথে কখনো কখনো হইতো। একসাথে মিলিয়া রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দের বই পড়াও আরম্ভ হইলো। ... দেশসেবক তৈরীর জন্য একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠার সঙ্কল্প আমার মনে জাগিলো। সাথে সাথে মনে হইলো—এ-আশ্রমের প্রথম পরিচালক ও শিক্ষকমণ্ডলী সংগ্রহের জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগাই হইবে এখন হইতে আমার প্রধান সাধনা।...হেমন্তকে আমরা ঐ-কথা বলিলাম। দু-একটি কথা বলাতেই সে মুস্কিল ফেলিলো। আমাদের অন্তরের যতোকিছু ভাব—এমনি এক সুরে বাঁধা হইয়াছিল কয়েকদিনের প্রাণখোলা মিষ্টি-সংস্রবে বেলা বেলার আমাদের হৃদয়-বীণার তন্ত্রীগুলি। সে এর পর থেকে আরো জোরের সাথে আমাদের সকল সঙ্কল্পের যোগ দিতে লাগিলো। কলিকাতায় আসিয়া আমি ও যুগল বন্ধুদের কাছে আমাদের প্রাণের কথা খুলিয়া কহিলাম। আরো বলিলাম—আধা-আধি কাজ করে কোন-ই লাভ হবে না, বাড়ী ঘর ছেড়ে পুরোপুরি কাজে নেমে পড়তে হবে, প্রায় সন্ন্যাসীর মতো, বিয়ে করা তো দূরের কথা। আমাদের এ প্রস্তাবে মিথ্যা অভিত কণ্ঠে হাঁ না কহিলো অনেকেই কিন্তু বুক টান করিয়া হাঁ কহিলনা কেহই। হেমন্তও কৃষ্ণনগর গিয়া ছেলেদের মাঝে এ ভাব প্রচার করিতে লাগিলো। সে কলেজিয়েট স্কুলের দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতো, ক্লাসের প্রথম ছেলে ছিলো, ছাত্রদের উপর প্রতিপত্তিও তার ছিলো যথেষ্ট কাজেই একটি ছোট খাট দল সেখানে সহজেই গড়িয়া উঠিলো। দলের উদ্দেশ্য ছিলো অতি সহজ। সারাজীবন বিবাহ না করিয়া যথাসম্ভব পবিত্র জীবন যাপন করিয়া, স্বাধীনতা লাভের [illegible] মিলিয়া চেষ্টা করা। জগদ্ধাত্রী পূজার সময় হেমন্ত আমাদের কৃষ্ণনগর যাওয়ার নিমন্ত্রণ করিলো। আমরাও সেখানে গেলাম। অনেক ছেলের সাথে আলাপ হইলো।... কোর্থ ইয়ারের শেষে গ্রীষ্মের ছুটিতে আমি ও যুগল বাই বসুপুর। সেখানে প্রায় একমাস থাকি। সেখান হইতে ফিরিয়া আসিয়াই ৩নং বিশ্বাপুর ষ্ট্রীটে একটি নূতন মেস খুলি। শ্রীগোপাল মল্লিক লেনের বাড়িটি ছিলো একতলা চারিদিকে দুর্গন্ধ নর্দমাদ্বারা বেষ্টিত, কতকটা অন্ধকারও স্যাঁৎ স্যাতে। সেই বাড়িতে স্বাস্থ্য মোটেই টিকিতেছিলো না। তাই এই পরিবর্তন। ৩নং বিশ্বাপুর ষ্ট্রীটের বাড়িটি তেতলা—ইহার উত্তরে কলেজ স্কোয়ার, দক্ষিণে অনেকটা ফাঁকা। গত পূজার ছেওয়ুরে থাকার সময় নীলরতন ধর ও তার দাদা জীবনরতন ধর, জ্ঞান ঘোষ, জ্ঞান মুখার্জি প্রভৃতির সাথে দেখা হয়। তারা সবলেই বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী সন্তান—পি. সি. রায়ের ছাত্র এবং তাঁরই মতো অনেকটা সাদা সিধে ভাবে জীবন যাপনে অভ্যস্ত। দেশসেবার ভাবও তাদের মধ্যে ছিলো যথেষ্ট। তাদের সাথে আমাদের কতকটা ভাব হয়। সেই ভাবের ফলেই জীবন রতন ধরের সাথে মিলিয়া ৩নং এর এই মেসের প্রতিষ্ঠা। জীবন ধর তখন মেডিক্যাল কলেজে পড়িতো।...পরের ছুটিতে হেমন্ত বেড়াইতে গেল কটকে, আমি ও যুগল সম্বলপুরে।.. বলে লোক ভিড়ানোর জন্য হেমন্তের রক্ত তখন উতলা। তাই সে ব্যস্ত হইয়া গেলো কটকে। এখন থেকে নানা জায়গায় নানারকম ছেলের সাথে আলাপ হইতে লাগিলো। ফলে নানাস্থানে ছোট ছোট দলও গড়িয়া উঠিলো।..... সিরিশ ব্যানার্জি তখন কটক কলেজের সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতো। খুব ঘুড়িয়াল হইলেও রোগীর সেবা করিতে করিতে ও ছেলেদের পিছনে ঘুরিতে ঘুরিতেই তার দিনের প্রায় সবগুলি ঘণ্টা কাটিতো। তাই বছরের পর বছর তার সেকেণ্ড ইয়ারের অভিজ্ঞতাই বাড়িলো কিন্তু পরীক্ষা পাশের সিঁড়ি বাহিয়া থার্ড ইয়ারে ওঠার সৌভাগ্য আর ঘটিলো না। সারা জীবনে অনেক লোক দেখিয়াছি কিন্তু গিরীশের মতো আর একটি প্রাণ দেখিব কিনা সন্দেহ। হাঁপানির ব্যামো তার প্রায় বারো মাসই লাগিয়া থাকিতো। কিন্তু প্রাণে যার আগুন, ব্যামো টামো কি তার পথ আগলাইতে পারে। তাকে

কেন্দ্র করিয়া কটকে যে কর্মীদল গড়িয়া উঠিয়াছিলো সুভাষ বসু, নৃপেন বসু, অমলা চৌধুরী প্রভৃতি তাদের মধ্যে প্রধান। হেমন্ত আমাদের বাড়ি বহিয়া লইয়া গেলো কটকে এই ছেলেদের মাঝে। আজ কালকের ছেলেদের কাছে এ-বাড়ি হয়তো নিতান্তই সেকেলে ঠেকিবে কিন্তু তখন ছিলো এ দুয়ই নূতন। সারা জীবন অবিবাহিত থাকিয়া দেশ স্বাধীন করার সঙ্কল্প দেশের কথা তখন শুনা যাইতো খুব কম ছেলেরই মুখে। তাই তাদের প্রাণে নূতন আগুন জ্বলিলো।...

কটক হইতে এফ্‌এ পরীক্ষার পর কলিকাতা পৌঁছিয়াই সুভাষ এবং বিরাপুর স্ট্রিটের মেসে আসিলো। হেমন্তের সাথে তার আলাপ হওয়ার পর হইতেই আমার সাথে তার রীতিমতো পত্র লেখালেখি চলিতেছিলো। তাই কয়েকদিনের উৎসুক প্রতীক্ষার পর হঠাৎ তাকে দেখিয়া প্রাণ আনন্দে ভরিলো। সে যে কালে বড় হইবে, এ-কথা প্রথম দেখার সময় হইতেই আমার মনে লাগিয়াছিলো। এ-কথা আমি অন্যান্য সকলকে বহুবার বলিয়াছি ও। তাকে এবং-এ আমার ঘরে আসিতে দেখিলে পাশে-বসা সাথীদের অনেক সময় বলিতাম—Look the lion comes—এমনি তেজালো তখন তার চোখ মুখের ভাব ছিলো। এবং-এ আসার পর হইতেই বাড়ির কথা সুভাষ ভুলিতে লাগিলো। (শ্রীসুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : জীবন প্রবাহ, পৃঃ ১৩০-৭০)

সুভাষচন্দ্রের একজন নতুন জীবনীকার প্রখ্যাত লেখক অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত কটক হতে কলকাতায় এসে প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হবার সময়ে সুভাষচন্দ্রের জীবনের একটি দিকের উপর নতুন আলোকপাত করেছেন। তিনি লিখেছেন: "ছোট মফস্বল শহর ছেড়ে বিরাট রাজধানীতে এসে পড়েছে সুভাষ, প্রকাণ্ড জনজাগরণের হাওয়া তার গায়ে লেগেছে। সে নিদারুণ চঞ্চল হয়ে উঠল। কলেজের প্রথম ছুটি হতেই ছুটল সে কৃষ্ণনগর, বন্ধু হেমন্ত সরকারের উদ্দেশে।

'আমি এলাম।' হেমন্তের বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল সুভাষ।

'ভালো করেছ। আমাদের গুপ্ত সমিতির সুরেশদা যুগলদাও আছেন।'

সুরেশদা অর্থ সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় আর যুগলদা অর্থ ডাক্তার যুগলকিশোর আঢ্য।

'আর কে আছেন?'

অমূল্য আছে গুরুদাসও আছেন।

'সবাই যাবেন তো একসঙ্গে?'

'সবাই যাবেন।'

'প্রথমেই কিন্তু পলাশী। তারপরে মুর্শিদাবাদ।'

'তাই তো সুবিধে।' হেমন্ত বলল: 'যদি সুবিধে হয় পলাশীতে আমরা বন্দুক ছোঁড়া প্র্যাকটিস করব।'

হ্যাঁ, চলো সেই যুদ্ধক্ষেত্র দেখব। সুভাষ বললে, 'সেই আম্রবন।'

হেমন্ত বললে, 'সেই আম্রবন আর নেই। এখন সেখানে আখের খেত।'

'তবু সেই যুদ্ধক্ষেত্রই আমাদের তীর্থ। সেখানেই তো মোহনলাল আর মিরমদনের সৈন্যেরা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে লড়েছিল—'

আর আছে ইংরেজের তৈরি বিদ্যাসাগরমহাশয়ের মূর্তিস্তম্ভ।'

'চলো।'

সবাই মিলে পায়ে হেঁটে এল সেই পলাশীর মাঠে। "(উত্তর খণ্ড, পৃঃ ১২৬) অচিন্ত্যকুমার এই মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ কাহিনীর একটি সুদীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছেন ও ভ্রমণে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের রোমান্টিক ও সুললিত সংলাপ সমূহ উদ্ধৃত করেছেন। তাঁর বর্ণনা এবং সংলাপাবলির ভিত্তি আমি অনুসন্ধান করেও জানতে পারিনি। বলা বাহুল্য, উক্ত ভ্রমণকালে অচিন্ত্যকুমার উপস্থিত ছিলেন না। ভ্রমণে অংশ-গ্রহণকারী ব্যক্তিদের নিকট হতে তিনি বিবরণ সংগ্রহ

করেছেন একথাও মনে করা শক্ত, কেননা উক্ত ব্যক্তিরা আমাদের ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গেছেন। অচিন্ত্যকুমার যে বইগুলি হতে তথ্য সংগ্রহ করেছেন সে বইগুলির একটি তালিকা দিয়েছেন—সেই বইগুলির কোনোটিতেই উক্ত বিবরণী নেই। এ অবস্থায় তাঁর প্রদত্ত বর্ণনা স্বকপোলকল্পনা-প্রসূত বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক।

সুভাষ কলকাতায় এসে মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণে গিয়েছিলেন একথা সত্য, এবং এই ভ্রমণ নিছক ভ্রমণের আনন্দলাভের জন্যই অনুষ্ঠিত হয়নি। এর একটা বিশেষ তাৎপর্য ছিল এবং সেকারণেই তাঁর ছাত্রজীবনের কার্যকলাপের মধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। তিনি নিজেই সেকারণে তাঁর অতিসংক্ষিপ্ত আত্মচরিতে এই ঘটনাটির কথা লিখেছেন এবং তার তাৎপর্যের কথাও লিখতে ভোলেননি। তিনি, লিখেছেন: "কলকাতায় আমি ভরতি হলাম প্রেসিডেন্সি কলেজে··· গ্রীষ্মের বন্ধের পর কলেজ খোলবার তখনো তিনমাস বাকি। এই তিনমাস আমি বসে ছিলাম না। এক বছর আগে কটকে যে ছেলেটির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হয়েছিল, তার দলটিকে খুঁজে বের করলাম। সাধারণত ষোলো বছরের একটি ছেলে যদি একা কলকাতার মতো বড় সহরে আসে তবে প্রথম প্রথম সে দিশা হারিয়ে ফেলে। কিন্তু আমার বেলা তা ঘটেনি—কলেজ খোলবার আগেই আমি কলকাতার বেশ ভড়িয়ে বসলাম, পছন্দমত অনেক বন্ধুও জুটিয়ে ফেললাম।·····আমাদের দলের একটা খুব বড় গুণ ছিল—দলের ছেলেরা সকলেই ছিল অত্যন্ত চটপটে এবং কর্মঠ এবং এদের মধ্যে অনেকে ভালো ছাত্র হিসেবেও খুব নাম করেছিল। এই দলের কার্যকলাপ তিনটি ধারায় বিভক্ত ছিল। প্রথমত, নতুন নতুন ভাবধারার সন্ধানে দর্শন, ইতিহাস এবং আন্তর্জাতিক বিষয়ের উপরে নতুন নতুন বই পড়া এবং এইভাবে যে জ্ঞান লাভ হত সেটা সকলের মধ্যে সঞ্চারিত করে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ, স্থানীয় এবং বাইরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে নতুন মতা সংগ্রহ করাও আমাদের অন্যতম কাজ ছিল, ফলে অল্পদিনের মধ্যেই বহুলোকের সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ ঘটেছিল। আমাদের তৃতীয় কাজ ছিল নামকরা লোকদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করা। যদি কোনো সাধু সন্ন্যাসীর কাছে সত্যের সন্ধান মেলে সেই আশায় বারাণসী, হরিদ্বার ইত্যাদি তীর্থস্থান পরিদর্শন করে ছুটির দিনগুলি কাটানো হত। অনেকে আবার দেশের প্রকৃত ইতিহাসের সন্ধানে ঐতিহাসিক জায়গাগুলিতে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করত। আমি একবার এমনি একটি দলের সঙ্গে মুর্শিদাবাদ গিয়েছিলাম। সাতদিন ঘুরে পরিভ্রমণ করার ফলে প্রাক্-বৃটিশ যুগের বাঙলার রাজধানী মুর্শিদাবাদ সম্বন্ধে বহু মূল্যবান তথ্য আমরা আবিষ্কার করেছিলাম—স্কুল-কলেজে মাসের পর মাস পড়লেও যা কখনোই সম্ভব হত না।" (ভারত-পথিক, পৃঃ ১৯-২৩) এই বর্ণনা হতে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সুভাষ ও তাঁর দলের মুর্শিদাবাদ ভ্রমণ কোনো আকস্মিক ঘটনা ছিল না—তাঁদের উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থার একটি আবশ্যকীয় অঙ্গরূপেই এই ভ্রমণের ব্যবস্থা হয়েছিল। স্বদেশ ও তার ইতিহাসকে প্রকৃতভাবে জানার আগ্রহ হতেই এই ভ্রমণের আয়োজন—এবং একটি বিশেষ স্থানে সাতদিন ধরে অনুসন্ধান চালানোয় সেই আগ্রহের গভীরতাই প্রমাণিত হয়।

কিন্তু ভ্রমণটি ঘটেছিল কখন? অচিন্ত্যকুমারের মতে কলেজের প্রথম বারের ছুটিতে। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "কলেজে প্রথম বছর ছুটিতে বাবা-মার কাছে কটকে ফিরে গেলাম।" (ভারত-পথিক, পৃঃ ৮২) হেমন্তকুমার সরকার লিখেছেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজে সুভাষের ক্লাস সুরু হবার আগেই এই মুর্শিদাবাদ যাত্রা ঘটে। কলেজের প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর সেশন সুরু হয় জুলাই মাসে, অর্থাৎ গ্রীষ্মের বন্ধের পর। সেশন সুরু হবার তিন মাস আগে সুভাষ কলকাতায় এসেছিলেন এবং সেই তিন মাস তিনি বসে না কাটিয়ে হেমন্তকুমার সরকারের সঙ্গে

যোগাযোগ স্থাপন করে তাঁর দলের সঙ্গে একত্রিত হন বলে তিনি নিজেই জানিয়েছেন। মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণ ঘটে এই সময়ে। হেমন্তকুমার সরকার লিখেছেন: পরীক্ষার পর সুভাষ কৃষ্ণনগরে আমার কাছে এসে কিছুদিন থাকবে, কটক থেকেই স্থির করে এসেছিলাম। ১৯১৩ সালের মে মাসে সুভাষ কৃষ্ণনগরে এল। আমাদের বাড়িতে উঠল। সুরেনদা ঠিক করেছিলেন, সদলবলে কৃষ্ণনগর থেকে গিয়ে পলাশী মুর্শিদাবাদ প্রভৃতি ঐতিহাসিক স্থানগুলি দেখতে যাবেন। কৃষ্ণনগর থেকে ট্রেণে আমরা পলাশী গেলাম। স্টেশন থেকে পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্র মাইল তিনেক হবে। পলাশীর সে আম্রকানন আর নাই। দর্শকদের জন্য একটি ডাক বাংলো ও যুদ্ধের বিজয়-স্মৃতিস্তম্ভ মাঠের মাঝখানে লর্ড কার্জনের আদেশে তৈরি হয়েছে।" (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ১০০-১১) অচিন্ত্যকুমার লিখেছেন: "সবাই মিলে পায়ে হেঁটে এল সেই পলাশীর মাঠে।" মনে হয় তাঁর বক্তব্য এই যে কৃষ্ণনগর থেকে হাঁটতে হাঁটতে সবাই পলাশী গেছিলেন। হেমন্তকুমারের লেখায় আমরা পাই যে কৃষ্ণনগর ট্রেণে করে পলাশী স্টেশন পর্যন্ত যাওয়া হয়েছিল—সেখান থেকে পলাশীর মাঠ মাত্র তিন মাইলের হাঁটা পথ।

এই মুর্শিদাবাদ-ভ্রমণের বিশদ ও প্রাঞ্জল বর্ণনা হেমন্ত সরকার ও সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উভয়ের গ্রন্থ হতেই পাওয়া যায়। দুজনেই ভ্রমণে অংশ গ্রহণকারী বিশিষ্ট ব্যক্তি—অতএব তাঁদের বর্ণনাই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য। অতএব সেই বর্ণনা উদ্ধৃত করেই এই পর্বের কথা আমরা শেষ করব। হেমন্তবাবু লিখেছেন: "যুদ্ধক্ষেত্রে ভ্রমণ করতে করতে আমি কবি নবীন সেনের "পলাশীর যুদ্ধ" পুস্তক থেকে আবৃত্তি করেছিলাম মনে আছে। সেনাপতি মোহনলালের মুখে যে শেষ কথাগুলি কবি শুনিয়েছেন, তার আবৃত্তি শুনে সুভাষচন্দ্র চোখের জল ফেলেছিল।

পলাশীর স্মৃতিস্তম্ভের মার্বেল ফলকের গায়ে সুরেনদা খড়ি মাটি দিয়ে লিখে দিলেন—'Monument of glaring treachery.' চৌকিদার এসে ধমক দিয়ে তৎক্ষণাৎ সেটা সযত্নে মুছে দিল।

পলাশী দেখে আমরা চললাম মুর্শিদাবাদ ভ্রমণে। বহরমপুরে গিয়ে উঠলাম আমার সম্পর্কীয় এক মামার বাড়িতে। শ্রীযুত অমূল্য উকিল, অধ্যাপক গুরুদাস গুপ্ত, সুশীলদা প্রভৃতি আমরা ছয় জন ছিলাম। মামীমা অতি আদর করে আমাদের খাওয়ালেন। বহরমপুর থেকে মুর্শিদাবাদ মাইল ছয়েক হবে। আমরা হেঁটে যাত্রা সুরু করলাম। সঙ্গে ছিল নিখিলনাথ রায়ের "মুর্শিদাবাদ কাহিনী।" মধ্যে মধ্যে পড়া হতে লাগলো। মুর্শিদাবাদ সহরে গিয়ে আমরা উঠলাম ডাঃ নবিরুদ্দিন আমেদের বাসায়। সুরেনদা ও সুশীলদার এঁর সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ থেকেই পূর্ব হতে আলাপ ছিল। অসময়ে উপস্থিত হই—তখন গৃহস্থের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে। তবুও ডাঃ আমেদ ছাড়লেন না—আলুভাতে ভাত ঘি দিয়ে খাওয়া হল। ওই ডাঃ আমেদই পরবর্তীকালে মেডিক্যাল কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হয়েছিলেন। তাঁর সাহায্যে নবাবের প্রাসাদ, মোতিঝিল, হাজার দুয়ারি, নবাব সিরাজউদ্দৌলার কবর প্রভৃতি দেখার সুবিধা হল। বড় নগরে রাণী ভবানীর মন্দির পর্যন্ত দেখে আমরা ফিরলাম। তখন জ্যৈষ্ঠ মাস—রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত মিষ্টি আম খেতে খেতে গিয়েছিলাম।

খোসবাগে সিরাজউদ্দৌলার কবরের অনাদরের দশা দেখে আমাদের প্রাণ খুবই ব্যথিত হয়েছিল। সন্ধ্যায় একটি মাত্র রেড়ির তেলের প্রদীপ দেওয়া হত।

এই ভ্রমণ কাহিনী লিখতে গিয়ে আজ একটি ব্যথাময় স্মৃতির কথা মনে পড়ছে। আমরা হেঁটে চলেছি—মাঠের ধারে অঙ্কুরের ক্ষেত। সুভাষের জীবনে পল্লীর সঙ্গে এই প্রথম পরিচয়। অত বড় সবুজ ক্ষেত দেখে সে আনন্দে আত্মহারা হয়ে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—এটা কিসের বন?

আমি উত্তর করলাম অশ্বত্থ গাছের বন। খানিক দূর এগিয়ে আর একটি অভ্রভেদী গাছ দেখে সুভাষ বললো, কত বড় আর একটি অশ্বত্থ বন, দেখ। সঙ্গীরা সকলে হেসে উঠলেন। সুভাষ হাসির কারণ বুঝতে না পেরে ছলছল চোখে আমায় জিজ্ঞাসা করলো—ওরা হাসলো কেন? আমি বললাম—ওগুলো অশ্বত্থ গাছ নয়, অভ্রভেদী গাছ। সুভাষ আমায় ক্ষমা করলে কেন? বলতে বলতে তার চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগলো। এই নিষ্ঠুর পরিহাসের ব্যথা আজও যেন আমার বুকে কাঁটা হয়ে আছে। সেই থেকে আর কোনও দিন আমি তার সঙ্গে পরিহাস করিনি।

সুভাষ সব সময়ে ঠাট্টা বুঝতো না। তার সরল কোমল প্রাণে এই আঘাত দেওয়ার কথা আমি ভুলতে পারিনি। সুভাষ কথা কইতো কম—তার মনটা যে কত নরম ছিল, তার পরিচয় আমরা কতই না পেয়েছি এবং তার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে আমি ভবিষ্যতে অত্যন্ত সাবধান ছিলাম। ছেলেবেলায় খিদে পেলে সে মুখ ফুটে কখনো কথা বলতো না—হাতের মুঠো আঙুলটি মুখে দিয়ে দেওয়ালে হেলান দিয়ে চুষতে থাকতো। তার এক বুড়ী ঝি ছিল, সে বুঝতে পেরে তখনি দুধ খাবার এনে খাওয়াতো।

মুর্শিদাবাদ থেকে আমরা একখানি নৌকো ভাড়া করে ফিরলাম বহরমপুরে। বর্ষার গঙ্গা—জ্যোৎস্না রাত, দাঁড়িরা তালে তালে দাঁড়ের শব্দ ও তার প্রতিধ্বনি তুলে চলেছে। আমরা নৌকোর ছাদে বসে। সুভাষকে অনেক কাকুতি-মিনতি করে বললাম একখানি গান করতে, সে আমার কথার রাখি হলো—গাইলো,

'ঘুরে ফের চক্র বিরহে উদ্ভাসিত গঙ্গা
যায় যত দূরেতে, লাগায় পদ পদ পরশে
কূলে কূলে করি পরিবেশন ধবলতরী বরষা
শ্যামবরণী সরসা—'

..... সন্ধ্যার পর নৌকায় কৃষ্ণনগর ফিরবার পথে উজান স্রোতে আমাদের বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। মাঝিটি আনাড়ি হওয়ায় সুরেশদা হাল ধরলেন, আর যুগলদা, সুভাষ ও আমি গুণ টানতে লাগলাম। আগের অভ্যাস থাকায় সুরেশদার হাল ধরতে কোনও কষ্ট হয়নি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি কষ্ট হয়েছিল সুভাষের। ...সুভাষকে নিবৃত্ত হতে বললেও সে কথা শোনেনি।" (সুভাষের সঙ্গে বারো বছর, পৃঃ ১০-১৫)

সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বর্ণনা হেমন্তকুমারের বর্ণনাকেই সর্বাংশে সমর্থন করে। সুতরাং তাঁর বর্ণনার বিস্তৃত উদ্ধৃতি হতে বিরত হওয়া যায়। অচিন্ত্য সেনগুপ্ত লিখেছেন যে সুভাষ কলকাতা হতে কৃষ্ণনগর হেমন্ত সরকারের বাড়ি যেয়ে সেখানে সুরেশচন্দ্র, যুগল আঢ্য অমূল্য ও গুরুদাসকে দেখতে পান ও তাঁদের সবাইকে নিয়ে পলাশী যাবার উদ্যোগ তিনিই করেন। সুরেশচন্দ্রের বর্ণনা হতে প্রীসেনগুপ্তের এই উক্তি যথার্থ নয় বলে মনে হয়। সুরেশচন্দ্র লিখেছেন: "বাংলার অতীত কীর্তি দেখার জন্য আমাদের কয়েকটি সাথীর মুর্শিদাবাদ যাওয়া ঠিক হইলো। আমি, যুগল, গুরুদাস ও সুভাষ কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া কৃষ্ণনগর গেলাম। (জীবন-প্রবাহ, পৃঃ ৭১)। হেমন্ত সরকার নৌকা ভ্রমণের যে বর্ণনা দিয়েছেন সেটি ঘটে নবদ্বীপ হতে কৃষ্ণনগর আসার পথে—এবং এটি মুর্শিদাবাদ যাত্রার অব্যবহিত পূর্বের ঘটনা। এবিষয়ে সুরেশচন্দ্র লিখেছেন: সন্ধ্যার পর নৌকায় খড়ে নদী বাহিয়া কৃষ্ণনগর ফিরিতে আমাদের বেশ বেগ পাইতে হইয়াছিলো। মাঝিটি একটু আনাড়ি হওয়ায় আমাকেই শেষে ধরিতে হইলো হাল আর যুগল, সুভাষ ও হেমন্তের টানিতে হইলো গুণ। আগের অভ্যাস থাকায় আমার কোনো কষ্টই হয় নাই। গলদ-ঘর্ম হইতে হইয়াছিলো সুভাষকেই সবচেয়ে বেশি। বড়লোকের ছেলে। সোনার চাঁদের মতো চেহারা, ছোটকাল অবধি আদর আহ্লাদের মাঝে লালিত-পালিত,

দুঃখের আঁচড় গায়ে লাগে নাই যে কখনো।"
প্রবাহ, পৃঃ ১৭২)

প্রেসিডেন্সি কলেজে যে বিশোর ভর্তি হয়েছিল ১৯১৩ সালে সেরা ছাত্রদের একজন রূপে তার কলেজজীবনের গোড়াপত্তন ঘটে এইভাবে। শুধু পুঁথি পড়তে কলকাতায় সুভাষ আসেননি, রাজনৈতিক কাজকর্ম করতেও না। তাঁর তখন সবচেয়ে বড় আগ্রহ নিজেকে জানা, দেশকে জানা, নিজের জীবনাদর্শ স্থির করা ও সেই আদর্শের জন্য নিজেকে সর্বতোভাবে প্রস্তুত করা। কটক হতে কলকাতার মতো বড় শহরে এসে এবং অপেক্ষাকৃত স্বাধীনতার মধ্যে বাস করেও কলকাতার বহু উচ্ছল কেন্দ্রে ফুর্তির সুযোগ তাঁর মন টানেনি —এবং মনোমত সঙ্গীদের নিয়ে দলগঠন ও মহৎ উদ্দেশ্যমূলক কর্মপন্থা ধীর ও সংযত চিত্তে দৃঢ়ভাবে অনুসরণ করতেই তাঁর তখন আনন্দ। অন্যান্য ছেলেদের পক্ষে হয়তো এরকম ছাত্রকে বুঝতে পারা সম্ভব হয়নি, ফলে আদর্শগত সংঘর্ষের প্রথম পর্যায়েই সুভাষকে তাঁর অবাঞ্ছিত ছাত্র বলে মনে হয়েছিল এবং তাঁর বিবেচনায় সেই অবাঞ্ছিত ছাত্রের জন্য কলেজ হতে বহিষ্কারই ছিল একমাত্র যোগ্য শাস্তি।

(ক্রমশঃ)

খানকয়েক শ্রেষ্ঠ বই

গীতাশাস্ত্রী জগদীশচন্দ্র ঘোষ বি. এ.

শ্রীগীতা	৬·০০
শ্রীকৃষ্ণ ও ভাগবত ধর্ম	৫·০০
ভারত-আত্মার বাণী	৫·০০
শিক্ষার্থীর ধর্মশিক্ষা	১·৫০
কর্মবাণী	১·২৫
Soul of India Speaks	5·00

শ্রীনীলিমা ঘোষ এম.এ. বি.টি.

বিদ্যাসাগর	২·২৫
মানুষের মত মানুষ	·৭৫
শিশু রামায়ণ	·৬২
শিশু মহাভারত	·৭৫

শ্রীঅনিলচন্দ্র ঘোষ এম. এ.

বাংলার ঋষি	৩·০০
বাংলার মনীষী	১·৩০
বাংলার বিদুষী	২·০০
বীরত্বে বাঙালী	১·৫০
ব্যায়ামে বাঙালী	২·০০
বিজ্ঞানে বাঙালী	৪·০০
রাজর্ষি রামমোহন	১·৫০
রবীন্দ্রনাথ	১·২৫
যুগাচার্য বিবেকানন্দ	১·৫০
আচার্য জগদীশচন্দ্র	২·৫০
আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র	১·৫০

॥ প্রতিটি বই বহুচিত্র শোভিত ॥

প্রেসিডেন্সী লাইব্রেরী : ১৫ কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা—১২

সফরের খতিয়ান

সুনীল দাস

প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দশ দিনের মধ্যে চারটি রাষ্ট্রের প্রধানদের সঙ্গে নিবিড় আলোচনা করে গত ২রা এপ্রিল দেশে ফিরেছেন। প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রীর মুখ্য আলোচনা ছিল ওয়াশিংটনে মার্কিনী প্রেসিডেন্ট জনসনের সঙ্গে। যাতায়াতের পথে তু গল, হ্যারল্ড উইলসন ও আলেক্সি কসিজিনের সঙ্গে যথাক্রমে প্যারিস, লণ্ডন ও মস্কো বিমান ঘাটিতে সৌজন্য ও শুভেচ্ছামূলক সাক্ষাৎ করেছেন।

প্রধান মন্ত্রীর এই ঝটিকা সফরের বিপুল সাফল্য দেশে ও বিদেশে প্রচারের পক্ষিবেগে প্রশংসার ঝড় তুলেছে। কোনো কোনো মহলে কূটনীতির খেলায় শ্রীমতী গান্ধীকে অসাধারণ কুশলীরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমন কি কারো ধারণা নেহেরু-কেনেডী ব্যর্থ সাক্ষাৎকারের এবং গত বছর শাস্ত্রীর মার্কিনী সফর অকস্মাৎ বাতিল হবার পর এবং বিশেষ করে গত সেপ্টেম্বরে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় থেকে ভারত-বর্ষকে দেয় মার্কিনী আর্থিক সাহায্য বন্ধ হবার পর ধীরে ধীরে ভারত-মার্কিন সম্পর্কে যে ভাঙন ধরেছিল, শ্রীমতী গান্ধীর সফর সেই অধ্যায়ে ছেদ টেনে এই দুই রাষ্ট্রের সম্পর্কের নবায়নের ভিত্তিভূমি রচনা করেছে।

আমেরিকা যাত্রার পূর্বে শ্রীমতী গান্ধী বলেছিলেন যে কোনো সাহায্যপ্রার্থীর ভূমিকা নিয়ে তিনি মার্কিনী সফরে যাচ্ছেন না—কোনো 'aid-seeking mission' নয়; কেবলমাত্র পরস্পরের সহিত ঘনিষ্ঠতর সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্যেই এই সফর সীমাবদ্ধ; এমন কি পরামর্শ দেওয়া কিম্বা গ্রহণ করার মন নিয়েও এই সফর নয়: primarily to establish rapport and understanding and not to exchange advice or favours.

এই সফরের ফলে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি ও আর্থিক নীতির অধিকতর সমাদর হয়েছে, অন্তত শ্রীমতী গান্ধী তাই মনে করেন। শ্রীমতী গান্ধীর এই অভিমত সত্ত্বেও কার্যত, ভারতবর্ষের পররাষ্ট্র কিম্বা আর্থিক নীতি সম্পর্কে আমেরিকার গ্রহীষ্ণুতা কতটা বৃদ্ধি পেয়েছে সে সম্পর্কে সংশয়ের অবকাশ রয়ে গেছে এবং শ্রীমতী গান্ধীর আমেরিকা সফরকালীন কিম্বা ভারতবর্ষে প্রত্যাবর্তনের পর প্রচারের মহিমায় আসল সত্য অন্তরালবর্তী রয়ে গেছে।

আসল সত্য হল, মার্কিনী আর্থিক সাহায্যের পশ্চাতে কোনো সর্ত আরোপিত আছে কি না এবং যদি কোনো সর্ত থেকে থাকে তার প্রকৃতি কি? শ্রীমতী গান্ধীর সফরের পর ভারতবর্ষের অনুকূলে অবস্থার পরিবর্তন তাঁর সফরের সাফল্যের সূচক। অন্যথা নয়।

বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে ভারতবর্ষের আর্থিক উন্নয়নের পথে মার্কিনী চাপ বেশ কিছুদিনের ঘটনা। নেহেরুর আমলেই এই চাপ আত্মপ্রকাশ করলেও সে-সময় প্রয়োগের সুযোগ হয় নাই। শাস্ত্রীর আমলেই এই চাপের প্রকোপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে চতুর্থ পরিকল্পনার প্রথম বছরে তিনটি পরিকল্পনার মুকুল সংহত করে দ্বিতীয় বছর থেকে চতুর্থ পরিকল্পনার রূপায়ন শুরু করবার প্রস্তাবে। চতুর্থ পরিকল্পনার শস্যীর পরিমাণ আলোচিত আনুষাঙ্গিক

২১,০০০ কোটি টাকার চাইতে কমিয়ে আনবার চাপও ছিল। এক সময় শ্রীশাস্ত্রী এই প্রস্তাবের প্রবক্তাও হয়ে উঠেছিলেন। বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রস্তাব ভারত সরকার একেবারে অগ্রাহ্য করতে পারে নাই, যার ফলে চতুর্থ পরিকল্পনার আসল গত ১লা এপ্রিল থেকে সুরু হয়ে গেলেও মাত্র প্রথম বছরের বিনিয়োগের পরিমাণ নির্ধারিত হয়েছে। অবশিষ্ট চার বছরের সম্ভাব্য পরিমাণ এবং পরিকল্পনার অন্যান্য বিস্তৃত বিন্যাস বৈদেশিক সাহায্যের, বিশেষরূপে মার্কিনী সাহায্যের, নিশ্চিত পরিমাণের অপেক্ষায় রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট জনসন এবার সরাসরি বলে দিয়েছেন যে আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক (bilateral) সাহায্যের পরিবর্তে বিশ্বব্যাঙ্কের মাধ্যমে আর্থিক সাহায্য দেবে। সাহায্য দেবার পদ্ধতির এই পরিবর্তনের বিরুদ্ধে ভারতবর্ষে আপত্তি করবার না থাকলেও এ কথা সহজেই অনুমেয় যে রাষ্ট্রগত স্তরে সরাসরি চাপ দেওয়া কিম্বা সর্ত আরোপ করার চাইতে বিশ্বব্যাঙ্কের মত একটি অর্থনৈতিক সংস্থার মারফৎ সে কাজ সূক্ষ্মভাবে সম্পন্ন করা আমেরিকার পক্ষে সহজতর। বিশ্ব-ব্যাঙ্কের চাপ ভারতবর্ষের অর্থনীতির আভ্যন্তরীণ কাঠামোতে ইতিমধ্যেই কতটা প্রসারিত হয়েছে, সে-সম্পর্কেও শ্রীশাস্ত্রীর সফরের পূর্বে ও পরে নানা নজীর পাওয়া গেছে। সে-আলোচনায় আসার পূর্বে আর্থিক সাহায্যের পূর্বসর্তের অদৃশ্য সঙ্কেত পাওয়া যাবে প্রেসিডেন্ট জনসনের কংগ্রেসে প্রেরিত বাণীতে, কংগ্রেসে প্রেরিত এজেন্সী ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্টের রিপোর্টে এবং এমন কি শ্রীমতী গান্ধীর সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে।

মার্কিনী আর্থিক সাহায্যের সর্তগুলি কখনই কঠোর হচ্ছে কি না এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীমতী গান্ধী গত ১৯শে এপ্রিল নয়াদিল্লীতে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন: একথা সত্য কোনো দেশই একাদিক্রমে সাহায্যদান পছন্দ করে না এবং আমেরিকায়-ও এ-মনোভাব প্রবল যে ভারতবর্ষকেও স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার জন্য প্রবলভাবে সচেষ্ট হতে হবে, যাতে বৈদেশিক সাহায্য কালক্রমে নিষ্প্রয়োজন হয়ে পড়ে কিম্বা সামান্যমাত্র প্রান্তিক সাহায্যেই কাজ চলে যেতে পারে। এই মনোভাবই গত ৩০শে মার্চ কংগ্রেসে জনসন যে বাণী পাঠিয়েছেন তাতে আরও সুস্পষ্ট। জনসন ভূমিকা করে বলেছেন যে আমেরিকা অপর রাষ্ট্রের রাজনীতি কিম্বা অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপ করে না। কিন্তু তারপরেই বলছেন গত পনের বছরের রেকর্ড দেখলেই বোঝা যাবে যে তারা সাহায্যের পরিণতিতে কি ফল দাঁড়ালো তারই জন্য উদ্বুদ্ধ: "We are naturally concerned with results—with ensuring that our aid be used in the context of strong and energetic policies calculated to produce the most rapid possible economic development." সুতরাং তাদের সাহায্য নিস্পৃহ নয় 'strong and energetic policies'-এর নিরিখে সাহায্যের ভবিষ্যত নির্ভরশীল যে 'policy' রাজনীতি-নিরপেক্ষ কখনই হবে না। সুতরাং সাহায্য ও রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক যে অন্তরঙ্গ জনসন তা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

আর্থিক সাহায্য রাষ্ট্রনীতি-নিরপেক্ষ যে নয়, তা সেপ্টেম্বরের ভারত-পাক সংঘাতের সময় থেকে ভারতবর্ষ হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছে। সেদিনকার অবরুদ্ধ আর্থিক সাহায্য শ্রীশাস্ত্রীর যাদুস্পর্শেও অবারিত হয় নি। হবেও না। গত ৩০শে মার্চ স্টেটসম্যানের ওয়াশিংটন প্রতিনিধির প্রেরিত সংবাদে সে কথা স্পষ্ট করেই লেখা আছে। থাসহোয়ার বলছেন: "It is also clear that President Jhonson wants to look at India's current and long-term needs afresh and does not particularly care to reopen previous commitments which have remained unfulfilled because of the pause in aid at time of September war between India

and Pakistan." এ-সম্পর্কে পার্লী-অনসনের যুগ্ম-বিবৃতিতে অমুরোধ মালহোত্রের কথাতেই সায় দেয়। শ্রীমতী গান্ধীর গত ১৯শে এপ্রিলের সাংবাদিক বৈঠকে এই প্রসঙ্গের উল্লেখে "It is not a correct report" বলেই তার রায় দেবে সত্য ঘটনা সম্পর্কে নীরব থাকাই শ্রীমতী গান্ধী শ্রেয় মনে করেছেন। আর্থিক সাহায্যের অন্যতম সর্তরূপে পাক্-ভারত উপমহাদেশে শান্তিরক্ষার দায়িত্ব আভাসে-ইঙ্গিতে ভারতের উপর মার্কিন মুখপাত্রগণ আরোপ করতে ভুল করেন নাই। অর্থাৎ পাকিস্তান শান্তিভঙ্গ করলেও ভারতকে তার ফলভোগ করতে হবে এই অদ্ভুত পরোয়ানা মার্কিনী মুখপাত্রেরা ভারতবর্ষের উপর জারী করে দিয়েছেন। এজেন্সী ফর ইনটারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট-এর পক্ষ থেকে গত ১৪ই এপ্রিল মার্কিণ কংগ্রেসে আর্থিক সাহায্যের যে প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়েছে, তার মুখবন্ধে উপরোক্ত সংস্থাটি স্বার্থহীন ভাষায় বলেছে: "Future loans to India will be contingent to the continuation of effort to improve stability and peaceful relations in the sub-continent and to improved policies designed to accelarate economic and social growth." এ, আই, ডি ভারতবর্ষকে কবুল জবাব দিয়ে বলছে: 'আর্থিক সাহায্য চাও তো পাকিস্তানের সঙ্গে মিলেমিশে এই উপমহাদেশে শান্তি বজায় রাখো।' সোজা কথায় বলতে গেলে আমেরিকা পরোক্ষে পাকিস্তানী আব্দার মেনে নিয়েই শান্তি বজায় রাখবার জন্য ভারতবর্ষের উপর চাপ দিচ্ছে।

আসল কথা হোলো, ভারতীয় অর্থনৈতিক কাঠামোর অভ্যন্তরে অনুপ্রবেশের সুচীমুখ অনুসন্ধানে মার্কিনী উৎপলতা এ-যাবৎ প্রতিহত হলেও অতঃপর সার্থক হয়েছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিউ ইয়র্কের ব্যবসায়ীদের এ-সম্পর্কে ঢালাও আশ্বাস জানিয়ে আশ্বস্ত করে বলেছেন মূলধন ও মুনাফা সাগর পাড়ি দিয়ে দেশে ফিরিয়ে আনবার পথে ভারতে মার্কিনী লগ্নীকারকদের কোনো অন্তরায়ের সম্মুখীন হতে হবে না। কিন্তু মার্কিনী মূলধনের বিনিয়োগের জন্য আরও অধিকার আদায়ের উদ্যোগ চলেছে। ভারতীয় আর্থিক নীতির আরও মসনীয়তা (liberalisation) এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে শিথিলতার দাবী আমেরিকা তথা বিশ্বব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে মুখর হয়ে উঠেছে। ভারতবর্ষের খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতার প্রচেষ্টার পূর্বসর্তের উপরই যে মার্কিনী খাদ্য সাহায্য একান্ত ভাবে নির্ভরশীল এই রূঢ় বাস্তব সত্যকে ভারতবর্ষ স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে। আমেরিকার কৃষি সচিব ওরভিল ফ্রিম্যানের ভাষায় "U. S A. was tying its food assistance programme to self-sufficiency." এই স্বয়ংসম্পূর্ণতার সূত্র ধরেই কৃষিতে সারের বহুল প্রয়োগের প্রয়োজন দেখা দিয়েছে। ভারতের তিন কোটি বিঘা পরিমাণ জমিতে নিবিড় চাষের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ভারত সরকার মার্কিনী খাদ্যসাহায্যের যোগ্যতা অর্জন করেছে। এই নিবিড় চাষের—agricultural inputs-এর মধ্যে সার অন্যতম। ভারতবর্ষে সারের ঘাটতি রয়েছে প্রচুর। অল্প সময়ের মধ্যে সার উৎপাদনের জন্য মার্কিনী মূলধনকে প্রাধান্য দিয়ে ভারতবর্ষে বেসরকারী ক্ষেত্রে সার কারখানা স্থাপনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রস্তাবও ভারত সরকার গ্রহণ করে ভারতের শিল্পনীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। বিশ্বব্যাঙ্কের এই প্রস্তাবের ফলে মার্কিনী মূলধনের সংখ্যাপরিষ্ঠতার সঙ্গে ভারতীয় বেসরকারী সংখ্যা-লঘিষ্ঠ মূলধনের সমবায়ে সারের কারখানা স্থাপনের পথ প্রশস্ত, যা ইতিপূর্বে অসম্ভব ছিল। শুধু তাই নয়। তাতেও বিশ্বব্যাঙ্ক সন্তুষ্ট নয়। খোলাবাজারে বেসরকারী সূত্রে ভারতীয় অংশীদারদের পক্ষে শতকরা ৬৯ ভাগ ভারতীয় টাকার মূলধন (Rupee finance) সংগ্রহের সম্ভাবনা সম্পর্কে বিশ্বব্যাঙ্কের সন্দেহ নিরসনের জন্য ভারত সরকার স্থির করেছেন যে ভারতীয় বেসরকারী লগ্নীকারকদের পক্ষে প্রয়োজনীয় মূলধন

(শেষাংশ ১৮৯ পৃষ্ঠায়)

আমেরিকার নিগ্রো বিদ্রোহ

অনাথবন্ধু দত্ত

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট এব্রাহাম লিঙ্কন তাঁহার ঘোষণা দ্বারা নিগ্রোদাসের মুক্তিদান সত্ত্বেও গত একশত বৎসরে তাহার দুঃখ দুর্দশা দূর হয় নাই। একশত বৎসরেও যখন নিগ্রো, সমগ্র জাতির এক দশমাংশ হইয়াও, সমতা ও মর্য্যাদা এবং মানবিক অধিকারে বঞ্চিত রহিল তখন তাহার পক্ষে বিদ্রোহ করা ব্যতীত অন্য উপায় রহিল না। ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকানরা ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়াছে, আজ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সেই দেশের নিগ্রো নাগরিক তাহার মৌলিক অধিকার ও স্বাধীনতা যাহা সে দেশের সংবিধান তাহাকে দিয়াছে, তাহা অর্জন করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছে। জগতের বিভিন্ন দেশে আজ মুক্তিসংগ্রাম চলিয়াছে—মূল আফ্রিকা মহাদেশেও বহু স্বাধীন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। বর্তমান জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাকালে যে উচ্চাদর্শের কথা ঘোষিত হইয়াছিল এবং আজও যুক্তরাষ্ট্র যে স্বাধীনতার বাণী প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে, আজ স্বদেশে শ্বেত-আমেরিকানকে তাহার নিগ্রো স্বদেশবাসীর প্রতি ব্যবহার দ্বারা তাহা বাস্তবে রূপায়িত করিতে হইবে। ইহাতে সফলকাম না হইলে তাহার দেশের ও রাষ্ট্রের এই দুইস্তর সন্দেহ বিষাক্ত করিয়া ভবিষ্যতে জাতির ধ্বংসের পথ সরল করিয়া দিবে। মার্কিনের দূরদর্শী রাষ্ট্রনায়কগণ ইহা বুঝিতে পারিয়াছেন এইজন্যই আইন ছাড়াও কার্যকরী ব্যবস্থাদ্বারা নিগ্রো যাহাতে তাহার নাগরিক অধিকারে সুদৃঢ় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় সেজন্য চেষ্টা করিতেছেন। এই বহুৎ প্রচেষ্টায় দুইজন মার্কিণ প্রেসিডেন্টকে—এব্রাহাম লিঙ্কন (১৮৬৫) এবং জন কেনেডিকে (১৯৬৩) আততায়ির হাতে প্রাণ দিতে হইয়াছে।

আমেরিকার দাসপ্রথার আরম্ভ প্রায় ৪৫০ বৎসর পূর্বে। কলম্বাস (১৪৪৭-১৫০৬) যে জাহাজে চড়িয়া নূতন জগৎ আবিষ্কার করিয়াছিলেন তাহাতেও একজন নিগ্রো সঙ্গী ছিল। তাহার পরবর্তী আবিষ্কারক বেলবোয়া (পানামার আবিষ্কারক) এবং কর্টেস-এর (১৪৮৫-১৫৪৭ ইনি মেক্সিকো বিজয়ী) দলের সঙ্গেও নিগ্রো ছিল। পীজারোর (১৪৭১-১৫৪১ ইনি পেরু বিজয়ী,) অভিযানেও নিগ্রোর সন্ধান মেলে। অন্যান্য ভাগ্যান্বেষী অভিযানকারীগণের সঙ্গেও নিগ্রো ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকগণ বলেন আমেরিকার ইংরেজ উপনিবেশে নিগ্রো সর্বপ্রথম ক্রীতদাস-রূপে আমদানী হয় ১৬১৯ খৃষ্টাব্দে যখন একখানি ওলন্দাজ (ডাচ) যুদ্ধ জাহাজ ভার্জিনিয়ার জেমস টাউন বন্দরে নঙ্গর করিয়া কুড়িজন নিগ্রোদাসের একটি চালান নামাইয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গেই তাহা বিক্রয় হইয়া যায়। ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায়ের ইহাই সূচনা।

আমেরিকা আবিষ্কৃত হইবার পূর্বেও নানাদেশে—এশিয়া ও আফ্রিকার এবং ইউরোপে দাসপ্রথা ছিল। প্রাচীন গ্রীসেও ইহা ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু আধুনিক কালের দাসব্যবসায়ের পত্তন হয় ১৪৪৪ খৃষ্টাব্দে যখন পর্তুগালের রাজপুত্র যিনি হেনরি দি নেভিগেটর নামে বিখ্যাত হইয়াছেন, তিনি তাঁহার অধিনস্থ কাপ্তান আন্তাম গনসালভেসের অধীনে

একদল হানাদার পাঠাইয়া আফ্রিকায় দাস সংগ্রহ শুরু করেন।

রোমানক্যাথলিক ও প্রোটেস্টান্ট এই উভয় শ্রেণীর দাস ব্যবসায়ীই এই ব্যবসায়ের সমর্থক ছিল ইহাই আশ্চর্য্য। ক্যাথলিকের যুক্তি এই ছিল যে আফ্রিকার কালো হিদেনকে (অখৃষ্টান) এই উপায়ে খৃষ্টধর্ম্মের আলোকে আনা এবং পরিণামে উহার স্বর্গের রাস্তা পরিষ্কার করা খুবই পুণ্যকার্য্য সুতরাং অবশ্য কর্ত্তব্য। আর প্রোটেস্টান্ট খৃষ্টান কালো মানুষকে মানুষ বলিয়া জ্ঞান করিতনা সুতরাং তাহার উপরে অমানুষিক কোন ব্যবহার হইতেছে একথাই প্রযোজ্য নয়।

দাস ব্যবসায়ের পত্তন হইতে আজ ৪০০ বৎসরের বেশী উত্তীর্ণ হইয়াছে, এই দীর্ঘ সময়ের মধ্যে আফ্রিকা মহাদেশ হইতে চার কোটী দাস সংগৃহীত হইয়াছে এরূপ অনুমান করা হয়। এই ঘৃণিত ও অমানুষিক ব্যবসায়ে ইউরোপের প্রায় সব জাতিই লিপ্ত ছিল। এক বৎসরের হিসাবে দেখা গিয়াছে যে মোট ৭৪০০০ হাজার দাস-আমদানির মধ্যে ইংলণ্ড ৩৮,০০০, ফ্রান্স ২০,০০০, পর্তুগীজ ১০,০০০, ডাচ্ ৪,০০০ এবং ডেনমার্ক ২,০০০ যোগান দিয়াছে অর্থাৎ ইংলণ্ডের সরবরাহ সর্ব্বাধিক।

নিগ্রোর গায়ের কালো রং তাহার কাল হইয়াছিল। আমেরিকার ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক প্রথমে আমেরিকার ইণ্ডিয়ানদের দাসে পরিণত করিয়া কাজে লাগাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু দেখা গেল কেত খামারের কাজ করিয়া ইহারা রোগগ্রস্ত হয় এবং অল্পেই মারা যায়। ইউরোপ হইতে মুক্তিবদ্ধ (indentured) সাদাশ্রমিক আনিয়া তাহাদিগকেও বেশী দিন আটকাইয়া রাখা সম্ভব হইত না। তাহারা কাজ ছাড়িয়া পালাইত এবং স্বাধীন খেত ঔপনিবেশিক দলে সহজেই বেমালুম মিশিয়া যাইত, ধরিবার কোন উপায় ছিল না। একমাত্র নিগ্রোই অমানুষিক পরিশ্রম করিতে সক্ষম ছিল এবং তাহার গায়ের রং কালো হওয়ায় সকল 'দাস' বলিয়া তাহাকে চিনিয়া বাহির করিতে কোন অসুবিধা হইত না।

পশ্চিম আফ্রিকার সমগ্র উপকূল প্রদেশে হানা দিয়া দাস ব্যবসায়ী তাহাদের শিকার সংগ্রহ করিত। নগ্ন দেহ পায়ে শিকল বাঁধা নিগ্রোকে পশুর মত সমুদ্রকূলে আনিয়া তাহার শরীরের ক্রটীবিচ্যুতি পরীক্ষা করা হইত। বুকে তপ্ত লোহার দ্বারা ছেঁকা দিয়া এই সকল হতভাগ্যকে অপেক্ষমান দাস চালানী জাহাজে তুলিয়া দেওয়া হইত। সিয়েরা লেওনে সিথিয়াছেন যে অনধিক ১৮ ইঞ্চির জাহাজের তাকে (Sholves) ইহাদের গলায় এবং পায়ে শিকল দিয়া বাঁধিয়া রাখা হইত। আফ্রিকা হইতে আমেরিকায় পৌঁছিতে সেকালে দুই তিন মাস কাটিত। হতভাগ্যদের অনেকে পাগল হইয়া যাইত, পথেই অনেকে মারা পড়িত। মৃতদেহ সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দেওয়া হইত। হাঙ্গরের দল এই সকল দাস-বাহী জাহাজ চিনিয়া রাখিয়াছিল এবং সমস্ত আত্লান্টিক মহাসাগরের পথে শবের লোভে এই সকল জাহাজের অনুসরণ করিত।

প্রথম নিগ্রোদাস আমদানীর দুই শত বৎসর পরেও তাহার ভাগ্যের, দুঃখ দুর্দ্দশার কোন পরিবর্ত্তন দেখা গেল না। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে আমেরিকার নিগ্রোর সংখ্যা দাঁড়াইয়াছিল চল্লিশ লক্ষ। ইহার মধ্যে 'স্বাধীন' (free) নিগ্রোর সংখ্যা পাঁচ লক্ষের বেশী ছিল না। (যে সকল নিগ্রোকে মনিব স্বাধীন করিয়া দিত অথবা যে সকল দাস-নিগ্রো মনিবের নিকট হইতে মজুরী পাইয়া উহার বিনিময়ে 'মুক্তি' ক্রয় করিত তাহারাই ছিল স্বাধীন নিগ্রো)। দক্ষিণ স্টেটগুলির তুলার খামারে ইহাদের উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার হইত। প্রভাত হইবার পূর্বেই চাবুক মারিয়া তাহাদের ঘুম ভাঙ্গান হইত এবং কাজের জন্য মাঠে ছাড়িয়া দেওয়া হইত। পারিবারিক জীবন বলিয়া ইহাদের কিছু ছিল না। ছেলে-মেয়েকে পিতামাতা হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইত। স্বামী

স্ত্রীকে বিভিন্ন স্থানে বিক্রয় করিয়া দেওয়া হইত। দাস-ব্যবসায়ীর বা দাস মালিকের একমাত্র দৃষ্টি ছিল মুনাফার দিকে। নিগ্রোর পারিবারিক জীবন কাহেদ না হউক, জাতি হিসাবে, সমাজ হিসাবে যাহাতে সে সংঘবদ্ধ না হয় এবিষয়ে অবশ্য দাস মালিকের খুব চেষ্টা ছিল।

অল্প আলোহারের মত বিবাহিত জীবন ব্যতীতই নিগ্রোর বংশ বৃদ্ধি হউক মালিকেরা ইহাই চাহিত কারণ দাসের সংখ্যা বাড়িলেই বেশী অর্থ লাভ। নির্লজ্জ দাস মালিক বিজ্ঞাপন দিয়া সবল ও সুস্থ নিগ্রো কেবল প্রজননের জন্য সংগ্রহ করিত। শ্বেতাঙ্গ দাস-মালিক এবং অবিবাহিত যুবকেরা নিগ্রোনারীর সহিত অবাধে সহবাস করিত এবং এরূপ ঘৃণ্য উপায়ে ফলে বর্তমান সময়ে বহু নিগ্রোর ধমনীতে মিশ্ররক্ত প্রবাহিত হইতে দেখা যায়। মেলভিল জে হার্সকোভিট্স্ ১৯৩০ সালে এক অনুসন্ধানের ফলে দেখিয়াছেন যে শতকরা ৭১'৭ জন নিগ্রোর পূর্বপুরুষ কোন শ্বেতাঙ্গ। দুই দোআঁশ খুব সত্যকথাই বলিয়াছেন—আমেরিকান নিগ্রো মানুষের সৃষ্ট—ভগবানের সৃষ্ট জীব নহে। খুব লজ্জার কথা দাস ব্যবসায় ছিল আইন সম্মত এবং দেশের প্রধান প্রধান ব্যক্তি-গণ ছিলেন দাসের মালিক (slave-owners)। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় জর্জ ওয়াশিংটন (১৭৩২-১৭৯৯) টমাস জেফারসন (১৭৪৩-১৮২৬) এবং প্রেসিডেন্ট হেনরি (১৭৩৬-১৭৯৯) স্বাধীনতার পুরোধাগণ ছিলেন দাস-মালিক।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (১৮৬১-৬৫) প্রকৃতই দাস-মুক্তির কিম্বা দাস ব্যবসায়ের বিস্তার প্রতিরোধ করিবার জন্য কিম্বা উত্তর এবং দক্ষিণ স্টেটগুলির মধ্যে নানা অর্থনৈতিক অসাম্য এবং বিরোধের জন্য কিম্বা অন্যান্য জটিল রাজনৈতিক কারণে হইয়াছিল তদ্বিষয়ে পণ্ডিতগণের মধ্যে নানা মত বর্তমান। এব্রাহাম লিঙ্কন নিজেই মুক্তকণ্ঠে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে আমেরিকার অর্থাৎ উত্তর ও দক্ষিণ স্টেটগুলির একত্ব রক্ষার জন্যই গৃহযুদ্ধ. ক্রীতদাসের মুক্তি গৌণ। কিন্তু গৃহযুদ্ধের কারণ যাহাই হউক এই যুদ্ধের ফলস্বরূপ নিগ্রোদাসের মুক্তি ঘোষিত হইয়াছিল (Emancipation Proclamation 1863)। সংবিধানের ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ১৪শ সংশোধনও নিগ্রোদাসের অনুকূলেই হইয়াছিল কারণ ইহাদ্বারা সে আইনের চোখে পূর্ণ বা সমান নাগরিকত্ব অর্জন করে এবং সমান বিচার পাইবার অধিকারী হয়। সংবিধানের ১৫শ সংশোধন হয় ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে—ইহাদ্বারা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলে, এবং কেহ পূর্বে ক্রীতদাস থাকা সত্ত্বেও ভোট দিবার অধিকার লাভ করে। ১৮৭৫ খৃষ্টাব্দের নাগরিক অধিকার আইন (Civil Rights Bill) হোটেলে, সরাইখানায়, সাধারণের স্থল ও জল যানবাহনে, অভিনয় গৃহে এবং সকল প্রকার রঙ্গগৃহে সকল নাগরিককে সমান অধিকার দেয়।

কিন্তু গৃহযুদ্ধ শেষ হইবার কুড়ি বৎসর পরেও যে গণ্ডগোল চলিতে থাকে তাহাতে পরিষ্কার বুঝা গেল যে নিগ্রো মোটেই কোন স্বাধীনতা পায়নাই এবং পাইবারও কোন সম্ভাবনা নাই। দীর্ঘকালের দাসত্ব, নিষ্করুণতা, ভূমি মালিকানায় বঞ্চিত নিগ্রোকে এত পঙ্গু করিয়া ফেলিয়াছিল যে সে স্বাধীন সমাজে চলাফেরার অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছিল। তাহার কোন ভিৎ ছিল না যাহাকে আশ্রয় করিয়া সে দাঁড়াইবে এবং নূতন সমাজ গড়িবে। নিরাশ্রয় নিগ্রো ব্যাধি এবং অভাবে হাজারে হাজারে মরিতে লাগিল। দাস নিগ্রোকে মালিক অন্ততঃ গৃহপালিত পশুর প্রতি যেটুকু দরদ দেখান হয় সেটুকু দরদ দেখাইত কিন্তু স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রো লাভ করিল ঘৃণা এবং ঈর্ষা। আইনতঃ স্বাধীনতা দিলেও অধিকাংশ শ্বেতাঙ্গের তাহার প্রতি কোন সহানুভূতি ছিল না। উত্তরের স্টেটগুলি আর্থিক স্বার্থের জন্য এবং অন্যান্য কারণে দক্ষিণ স্টেটগুলির উপর "ক্রীতদাসের মুক্তি"

* The Anthropometry of the American Negro—Columbia University Press, 1930

চালাইয়া দিয়াছিল। সুতরাং দক্ষিণ দেশগুলি আক্রোশের সহিত উহার প্রতিরোধ আরম্ভ করিয়াছিল।

কু-ক্লাক্স-ক্লান (Ku Klux Klan) ও অন্যান্য অবৈধ শ্বেতাঙ্গ দলগুলি অকথ্য এবং নিষ্ঠুর অত্যাচার আরম্ভ করিল। নিগ্রো বিরোধী স্টেটগুলি নিম্নতম শিক্ষা এবং সম্পত্তির মালিকানা কিম্বা ব্যক্তিকর (poll tax) নির্দ্ধারণ করিয়া নিগ্রোর সংবিধান-নির্দ্দিষ্ট নাগরিক ভোটের অধিকার বাতিল করিয়া দিল। একটী অদ্ভুত আইন হইল যে যাহার পূর্ব্ব পুরুষ (পিতামহ) ভোটাধিকারী ছিল সেই একমাত্র ভোটাধিকারী অর্থাৎ সে নিরক্ষর এবং অন্যান্য অযোগ্যতা থাকিলেও ভোট দিতে পারিবে। এইরূপ অদ্ভুত উপায়ে নিঃস্ব শ্বেতাঙ্গ ভোটের অধিকারী হইল আর অন্যান্য যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নিগ্রো বাদ পড়িল। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে টেনাসি স্টেটে রেলগাড়ীতে নিগ্রোর পৃথক চলার ব্যবস্থা হইল (segregation)। ১৯০০ সালের স্কুলে, হাসপাতালে জেলখানায়, শবগৃহে, কবরস্থানেও নিগ্রোর জন্য পৃথক ব্যবস্থা হইল। গীর্জ্জা এবং স্কুল, কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়েও বটেই। বার্মিংহাম, আলাবামা প্রভৃতি স্থানে আইন করিয়া নিগ্রোর সহিত দাবাখেলা পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। সর্ব্বাপেক্ষা আশ্চর্য্য ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সর্ব্বোচ্চ ধর্ম্মাধিকরণ সুপ্রীম কোর্ট এক বিচারে রায় দিল যে ১৮৭৫ সালের সিভিল রাইট্‌স্ বিল সংবিধান বিরুদ্ধ সুতরাং বে-আইনি। ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দের বিখ্যাত (কুখ্যাত?) এক বিচারে—প্লেসি বনাম ফার্গুসন (Plessy vs Ferguson) দক্ষিণ স্টেটগুলি যে নিগ্রো পৃথকীকরণ আইনগুলি প্রণয়ন করিয়াছিল উহার সমর্থনে সুপ্রীমকোর্ট বলিল "পৃথক কিন্তু সমান" (separate but equal) ব্যবস্থা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সম্মত। এই বিচারের রায়ই হইল পরবর্ত্তী ৫০ বৎসরের জন্য আমেরিকার স্বীকৃত বিধান. কেহ ইহার প্রতিরোধের কিম্বা বৈধতার প্রশ্ন তুলিল না।

আশ্চর্য্য এত দুঃখ, দৈন্য এবং অপমানেও নিগ্রো যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য হারায় নাই। আমেরিকার প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে ১৭৭০ খৃষ্টাব্দের হত্যাকাণ্ডে (Boston Massacre বলিয়া বিখ্যাত) ক্রিস্পাস্ আটুক্‌স্ নামক পলাতক ক্রীতদাস নিগ্রো (mulatto) বৃটিশ সৈনিকের গুলিতে আত্মবলি দেয়। এই সংঘর্ষে হয় জনতার সহিত। সৈনিকগণ বন্দুকে বেয়নেট চড়াইয়া রাস্তায় অগ্রসর হইলে লাঠি ও পাথর লইয়া জনতা তাহাদের আক্রমণ করে। আটুক্‌স্ ছিল একজন পলাতক দাস, সে তখন বন্দরের এক তিমি ধরিবার জাহাজে চাকুরী করিতেছিল। জনতার পুরোভাগে থাকিয়া আটুক্‌স্ সৈন্যদের বাধা দেয় এবং সর্ব্বপ্রথমে গুলির আঘাতে মারা যায়। জনতার পক্ষে এই সংঘর্ষে মোট মৃত্যু সংখ্যা ৪, আটুক্‌স্ ব্যতীত সকলেই শ্বেতাঙ্গ। নিগ্রো হইলেও সহরবাসী আটুক্‌স্‌কে শহীদের সম্মান দিয়াছিল।

আমেরিকার স্বাধীনতার যুদ্ধে (১৭৭৫-৮১), গৃহযুদ্ধে (১৮৬১-৬৫), দুইটি বিশ্বযুদ্ধে (১৯১৪-১৮ এবং ১৯৩৯-৪৫) কোরিয়ার যুদ্ধে (১৯৫১-৫২) নিগ্রো আমেরিকার পক্ষে রক্তের সহিত যুদ্ধ করিয়াছে নিগ্রোর দাসত্ব ও পৃথকীকরণের সহিত তাহার দেশভক্তির সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। সে আদিবাসভূমি আফ্রিকা মহাদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া আমেরিকার সংস্কৃতি ও সভ্যতার অঙ্গীভূত হইয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও সে ছিল মার্কিন সমাজের এক বিচ্ছিন্ন অংশ নিতান্ত অবাঞ্ছিত এবং অবজ্ঞাত। এই নূতন দেশে পৃথিবীর নানাদেশ হইতে নানা জাতি ও বর্ণের লোক আসিয়া বসবাস দিশিয়া গিয়াছে এবং নূতন আমেরিকান জাতির সৃষ্টি হইয়াছে। সকলেই হইয়াছে উন্নতি ও অগ্রগতির সহায়ক এবং সম্পদ ও ভোগ্য সামগ্রীর অধিকারী। একমাত্র নিগ্রোই হইয়াছে বঞ্চিত যদিও এদেশের উন্নতিতে তাহার পরিশ্রম ও দানের তুলনা হয় না, বিশেষতঃ উপ-

নিষেধের প্রথম এবং কৃষি যুগে। দুর্ভাগ্য ও হতাশার মধ্যেও নিগ্রো শ্বেতাঙ্গকে অনুকরণ এবং অনুসরণ করিয়া চলিয়াছে। সমাজ বিজ্ঞানীরা বলেন যে আমেরিকার নিগ্রোর গায়ের কালো রং ব্যতীত আফ্রিকার পূর্ব্বপুরুষের সহিত তাহার আর কোন সম্পর্ক নাই। আমেরিকান নিগ্রো নিজেও আফ্রিকার সহিত কোন সম্পর্ক স্বীকার করিতে চায়না। তাহার ভাষা ইংরেজী, ধর্ম্মে সে খৃষ্টান, একই ভগবানের উপাসক এবং একই গণতন্ত্রী রাষ্ট্রের অনুরাগী। শ্বেতাঙ্গের সমাজ ব্যবস্থার সে প্রশংসা করে এবং উহাই তাহার আদর্শ। নিগ্রোর শ্বেতাঙ্গের গীর্জায় প্রবেশ অধিকার নাই এজন্য সে এরূপ শক্তিশালী চার্চ স্থাপন করিয়াছে যে আজ তাহা শ্বেত আমেরিকানের ঈর্ষার বস্তু। এত করিয়াও সে শ্বেতাঙ্গের মন জয় করিতে পারে নাই। আমেরিকার বিরাট মিলনভূমিতে বহু জাতি বহু সংস্কৃতি মিশিয়া গিয়াছে একমাত্র নিগ্রোই এখানে একক ও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়া আছে।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধের পর হইতেই দেখা যায় যে দক্ষিণ স্টেটের লোকেরা নিগ্রোদের মানুষ জ্ঞান করিতে একেবারে নারাজ তাহাদের সহিত মেলামেশা করা ত দূরের কথা। তাহারা নিগ্রোর সঙ্গে বসিয়া এক টেবিলে আহার করিতে চায় না। অথচ গৃহে নিগ্রো চাকর রাখিবে, নিগ্রো পাচক রাঁধিয়া দিলে কিম্বা পরিবেশন করিলে খাইবে। ছেলেমেয়ে নিগ্রো ভৃত্যের কোলেপিঠে মানুষ হইবে ইহাতেও আপত্তি নাই। নিগ্রো, শ্বেতাঙ্গ নারীর সঙ্গে মেলামেশা করিবে কিম্বা নিগ্রো শ্বেতাঙ্গ নারীকে বিবাহ করিবে ইহা অসহনীয়—ধারণার অতীত। নিগ্রোরও শ্বেতের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের জন্য আগ্রহ দেখা যায় না। সে চায় কাজ, চাকুরী, রুটী। সে দরিদ্র খাসই তাহার বিশেষ দরকার। সে বাঁচিতে চায় শ্বেতাঙ্গদের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের চিন্তা তাহার মনে আসে না। কিন্তু পরস্পরের দৃষ্টিভঙ্গি ও আগ্রহের পার্থক্য সত্ত্বেও বর্ত্তমানে ইহা খুবই স্পষ্ট যে নিগ্রোর দাবী শ্বেতাঙ্গ-নাগরিকের সহিত সকল বিষয়ে সমান অধিকারের ভিত্তিতে।

খুবই আশ্চর্য্য দীর্ঘকালের এত অবিচার এবং অত্যাচার সত্ত্বেও সমগ্র নিগ্রোজাতি এতদিন বিপ্লব বা বিদ্রোহ করে নাই। বিপ্লবী না হইয়াও সে গোড়া হইতেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছে। দাসত্বের যুগেও শত শত বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্র হইয়াছে এবং উহাতে শত শত নিগ্রো ও শ্বেতাঙ্গ প্রাণ হারাইয়াছে।

দাসপ্রথা রোধ হইবার পরেও ক্রীতদাসের মতই স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নিগ্রো প্রহারের ভয়ে, দক্ষিণ স্টেটগুলিতে রাস্তায় শ্বেতাঙ্গদের সহিত দেখা হইলে টুপি খুলিয়া সম্মান দেখাইত এবং 'স্যার' 'স্যার' বা (হুজুর হুজুর) বলিয়া সম্বোধন করিত। অথচ মনে মনে সে ছিল এতই বিরূপ যে সাদা মানুষকে ঠকাইতে তাহার বিবেকে বাধিত না এবং রাত্রে শ্বেতাঙ্গের ঘরণী চুরি করিতে খুবই উৎসাহী ছিল। অনেকের মতে সাদার প্রতি ঘৃণা বশতঃই নিগ্রো পরিশ্রমে অক্ষমতা এবং কার্য্যে অবহেলা দেখায়।

অত্যাচার অসহ্য হইলে নিগ্রো তাহার শ্বেত সমর্থনকারীদের সহায়তায় কাজ ছাড়িয়া পলায়িত। স্বীকার করিতেই হইবে নিগ্রোকে প্রকৃত স্বাধীনতা দানের পক্ষেও একদল শ্বেতাঙ্গ ছিল যাহারা নানা বৈধ ও অবৈধ উপায়ে ইহাদের সাহায্য করিত। ইহারাই নিগ্রোদের ঘুরদেশে পলায়নের সুবিধার জন্য বিভিন্ন সহরে ও স্থানে গোপন ঘাঁটি স্থাপন করিয়াছিলেন যাহাকে বলা হইত ভূমির রেল স্টেশন বা রেলপথ (underground railways)। এই পথে অতি গোপনে নিগ্রোদাস মুক্তি পাইত। ইহা রেলপথও নহে, ভূমির ও নহেই বলা বাহুল্য। তবে গোপন পথ এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। ধরা পড়িবার ভয়ে নানা সাঙ্কেতিক শব্দের ব্যবহার হইত এবং বহু ঘাঁটি পার হইলে তবে গন্তব্যস্থানে পৌঁছিতে পারিত। এই সকল

পলাতক নিগ্রো যাহাতে উত্তর স্টেটগুলিতে আশ্রয় না পায় এজন্য 'পলাতক প্রেত্তার আইন' পাশ করা হইয়াছিল। অতঃপর বহু নিগ্রোকে আইন এড়াইবার জন্য নানাভাবে সরাইয়া দেওয়া হইত। লিঞ্চিং বা ফাঁসী দিয়া জনতা কর্তৃক নিগ্রো হত্যা দক্ষিণ স্টেটগুলির দৈনন্দিন ঘটনা হওয়ায় বহু নিগ্রো প্রাণভয়ে শ্বেতাঙ্গ মনীবের সহায়তায় পলায়ন করিত।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে ফিলেডেলফিয়ার নিগ্রো জাতির প্রথম জাতীয় সম্মেলন (First National Negro Convention) "স্বাধীনতা ও সর্ব্ব মানবের সমতা" (all men are born free and equal) এই নীতির ঘোষণার জন্য আহূত হয়। ১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ওহিও, ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস্, নিউ অর্লিয়ান্স এবং সিকাগোতে এরূপ সম্মেলন হয়। কিন্তু ১৯০৫ হইতেই নিগ্রোর প্রকৃত বিপ্লবী আন্দোলন শুরু হয় বলা চলে। এই বৎসর চরমপন্থী প্রতিভাবান নিগ্রো নেতা ডব্লিউ ই বি ডুবয়েস্ (W. E. B. Dubois) তাঁহার কয়েক জন শিক্ষিত ও চিন্তাশীল সহকর্ম্মী লইয়া আন্দোলন আরম্ভ করেন। ইহাই "নায়েগারা আন্দোলন" (Niagara Movement) নামে বিখ্যাত, কারণ নায়গারা জলপ্রপাতের নিকটেই এক সম্মেলনে ইহার সূত্রপাত হয়। ডুবয়েস্ ছিলেন ফিস্ক, হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষিত এবং জার্ম্মানীর বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট, এক দীর্ঘদেহ বিরাট পুরুষ। তিনি নিগ্রো জাতির কর্ম্মবীর বুকার টি ওয়াশিংটনের প্রতিদ্বন্দ্বী নিগ্রো নেতা ছিলেন। ওয়াশিংটন ১৮৮১ সনে টাস্কিজি ইন্‌স্টিটিউট স্থাপন করেন। উনবিংশ শতাব্দীর তিনিই ছিলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিগ্রো নেতা।—১৮৯৫ সনে ওয়াশিংটন এক বক্তৃতায় বলিয়া ছিলেন যে সকল ব্যাপার মূলতঃ সামাজিক তাহাতে আমরা পৃথক হইলেও অন্যান্য বিষয়ে হাতের পাঁচটি পৃথক আঙুলের মত পরস্পরের উন্নতিতে সামগ্রিক উন্নতি সম্ভব। এই বক্তৃতায় ওয়াশিংটন পৃথকীকরণের সমর্থন করিতেছেন বলিয়া ডুবয়েস্ তাঁহার বিরোধীতা করিয়াছিলেন। ওয়াশিংটনের মত নরমপন্থী নিগ্রো নেতাগণের চেষ্টাতেও উগ্র শ্বেতাঙ্গদের নিগ্রোবিদ্বেষ হ্রাস পায় নাই। বরং লিঞ্চিং প্রভৃতি বাড়িতেছিল। নায়গারা আন্দোলন আরম্ভ করা হয় পূর্ণ নাগরিক অধিকারের দাবীতে সমগ্র নিগ্রো জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। এব্রাহাম লিঙ্কনের নিজের নির্ব্বাচনী সহর স্প্রীংফিল্ডে (ইলিনোয়া স্টেট) এক রক্তক্ষয়ী সাদা-কালোর খুনোখুনীর পর, একদল শ্বেত-আমেরিকান নিগ্রো আন্দোলনের সমর্থকরূপে ১৯০৯ সনের, ১২ই ফেব্রুয়ারী National Association for Advancement of Colored People (সংক্ষেপে NAACP) স্থাপন করে। ঐ দিনটি ছিল লিঙ্কনের ১০০তম জন্ম বার্ষিকী। যাহারা এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের পুরোভাগে ছিলেন তাহাদের মধ্যে আধুনিক অগ্রগামী শিক্ষার জনক জন ডিউই এবং প্রসিদ্ধ সাংবাদিক লিংকন ষ্টিফেন্সের নাম উল্লেখযোগ্য। ডুবয়েস ছিলেন এই সমিতির গবেষণা এবং প্রচারের অধিকর্ত্তা। কার্য্য নির্ব্বাহকগণের মধ্যে তিনিই একমাত্র নিগ্রো ছিলেন, অপর সকলেই শ্বেতাঙ্গ। ইহার তের বৎসর পরে ডুবয়েস্ কম্যুনিষ্ট পার্টিতে যোগ দেন এবং ঘানায় যান ও ঐ দেশের নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬৩ সনের ২৩শে আগষ্ট ৯১ বৎসর বয়সে ঘানায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

NAACP প্রথম হইতেই ভয়াবহ এবং নিষ্ঠুর লিঞ্চিং যাহাতে থামিয়া যায় সেজন্য চেষ্টা করে। কিন্তু তাহাতে বিশেষ ফল হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কথিত আছে ১৮৯০ সনের ঘোর দুর্দ্দিনে দক্ষিণ স্টেট গুলিতে প্রতি দুইদিনে একজন নিগ্রোকে লিঞ্চ করা হইত। ১৯৫০ সালে লিঞ্চ করা নিম্ন হইতেই প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু এই কয়েক বৎসরেই ৪৭৩৩ জনকে লিঞ্চ করা হইয়াছিল বলিয়া জানা যায়। অনেকের ধারণা শ্বেতাঙ্গ নারীর উপর নিগ্রোরা পাশবিক অত্যাচার করিত বলিয়াই লিঞ্চ করা হইত। কিন্তু

এ ধারণা ভুল। বহু নিগ্রো নারী এবং শিশুকে লিঞ্চ করা হইয়াছিল দেখা গিয়াছে। এক্ষণও দেখা গিয়াছে যে সাদা জনতা, চাকুরী ছাড়িবার জন্য, সাদাকে সম্মান না দেখাবার জন্য বা ভোট দিতে চেষ্টা করার জন্য নিগ্রোকে ধরিয়া লিঞ্চ করিয়াছে। সকল নিগ্রোকেই লিঞ্চ করিয়া বা ফাঁসী দিয়া প্রকাশ্যে হত্যা করা হইত না—আরও পৈশাচিক ব্যবস্থা ছিল। ১৯১৬ সনে টেক্সাস স্টেটের ওয়াকো নামক স্থানে এক উন্মাদ নিগ্রো যুবককে ছুরী মারিয়া জখম করা হয় এবং ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ জীবিত অবস্থায়ই সহরের এক উদ্যান বা পার্কে সমবেত ১০,০০০ উৎসুক জনতার সামনে পোড়ান হয়। NAACP রিপোর্টে প্রকাশ এই অঙ্গচ্ছিন্ন শব দড়ি বাঁধিয়া সহরের বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরানো হইয়াছিল এবং উহার এক একটি দাঁত স্মারকরূপে পাঁচ ডলার মূল্যে বিক্রয় হইয়াছিল। এই সকল ভয়াবহ অত্যাচার সত্ত্বেও নিগ্রো নেতাগণ কংগ্রেস কর্তৃক লিঞ্চিং-বিরোধী আইন পাশ করাইতে সমর্থ হন নাই। হয়ত সাদা লোকদের বিবেক-বুদ্ধি জাগ্রত হওয়ায় লিঞ্চিং নিজে নিজেই করিয়া গিয়াছিল। কিন্তু লিঞ্চিং-এর স্থানে আর এক উৎপাত দেখা দিল—নিগ্রোর বাড়ীতে বন্দুকের গুলি ছোড়া বা বোমা ফেলা। আলবামা স্টেটের বার্মিংহাম সহরের নিগ্রো মহল্লায় এত বোমা ফেলা হইয়াছিল ইহার নাম হইয়াছিল 'ডিনেমাইট হিল'।

বিদ্যালয়ে যাহাতে সাদার সঙ্গে নিগ্রো ছাত্র পড়িতে পারে NAACP উহার জন্য আদালতের শরণাপন্ন হইল। ১৯৩৫ সনে নর্থ ক্যারোলিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির মামলায় কোন রুটীর জন্য তাহাদের হার হয়। কিন্তু ১৯৩৫ সনের মেরীল্যাণ্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশের অধিকারের মোকদ্দমায় তাহাদের জয় হইল। ১৯৫০ সনে যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রীম কোর্ট দুইটী রায়ে নিগ্রোকে শিক্ষাক্ষেত্রে পৃথকীকরণ বেআইনী, ইহা স্পষ্টভাবে বলেন। নিগ্রো নেতারা দেখিল যে আদালতে জিতিলেও প্রাথমিক বিদ্যালয়ের লক্ষ লক্ষ নিগ্রো ছাত্রের ইহাতে কোনই সুবিধা হইবে না। কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং সরকারী বিভাগে শিক্ষা সমান অধিকারই যথেষ্ট নহে। ১৯৪৪ সনে সুপ্রীম কোর্টের এক বিচারে প্রধান বিচারপতি আর্ল ওয়ারেন কোর্টের পূর্ববর্তী ১৮৯৬ সনের বিচারের নজীর 'পৃথক অথচ সমান' বাতিল করিয়া দিলেন। এতদিন পরে অন্ততঃ আইনের দিক দিয়া নিগ্রো সমান অধিকারের পথে পা দিল।

ইতিমধ্যেই নিগ্রো নানাদিকে নিজের উন্নতি করিয়া চলিয়াছে এবং নাগরিকের অধিকারও ক্রমে ক্রমে লাভ করিতেছিল। শিক্ষা ক্ষেত্র ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রেও আদালতের বিচার তাহার সহায়ক হইয়াছে। ১৯১৫ সনে সুপ্রীম কোর্ট "পিতামহের ভোট থাকিলেই ভোটাধিকার" দক্ষিণ স্টেট সমূহের এই আইন বাতিল করিয়া দেয়। গৃহ নির্মাণে যানবাহনে (বাস-ট্রেনে) পৃথকীকরণও বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। নিগ্রোর একটি জয়লাভ হয় ১৯৪১ সনের জুন মাসে যখন Brotherhood of Sleeping Car Porters-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং সভাপতি এ. ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্ফ্, প্রতিরক্ষা শিল্পের বর্ণগত পক্ষপাতিত্বের অবসান না করিলে এক অভিযান করা হইবে হুমকী দিলে, প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট তাঁহার Executive Order 8802 সহি করিয়া নিগ্রোর বিরুদ্ধে বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা বাতিল করেন। ইহার কিছু পরেই রুজভেল্ট Fair Employment Practices Commission (FEPC) নিযুক্ত করেন, ফলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়ে (১৯৪৩-৪৫) নিগ্রোর কিছুটা উন্নতির পথ সুগম হয়। নিগ্রোর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য র‍্যাণ্ডল্ফ্-এর বাইশ বৎসর অভিযান করিতে হয় নাই কিন্তু ১৯৬৩ সনের আগষ্ট মাসে তাহাকে রাজধানী ওয়াশিংটনে ঐতিহাসিক অভিযান করিতে হইয়াছিল।

১৯৪৬ সনে (বিশ্বযুদ্ধ শেষ হইবার পর) কংগ্রেস FEPC তুলিয়া দিল এবং বিভিন্ন স্টেট বা রাজ্যগুলি নিজেদের

এলাকার পৃথক পৃথক আইন করিয়া নিয়োগ নিয়ন্ত্রণ করিতে লাগিল। নিউইয়র্ক এবং নিউ জার্সি FEPC-র অনুরূপ আইন প্রণয়ন করিয়াছিল ১৯৪৫ সনে। ১৯৫০ সনের মধ্যে ২১টি স্টেটে ৪৫টি সহরে ঐরূপ আইন বিধিবদ্ধ হইল। ১৯৬৩ এপ্রিল মাস পর্যন্ত ১৬টি স্টেটে এবং মোট ৫৭টি সহরে নিগ্রোর গৃহ নির্মাণ বা বসবাসের পৃথকীকরণের অনুকূলে বা প্রতিকূলে আইন পাশ হইল। আইনগুলি পৃথকীকরণের বিরুদ্ধে হইলেও শ্বেতাঙ্গের দিক হইতে বেশী প্রতিরোধ আসে নাই যেহেতু আইনগুলি ছিল সরকারী বাসগৃহ (public house) সম্পর্কীত। মোট দশটি স্টেটে এবং দুইটি সহরে —নিউইয়র্ক এবং পিটাস্‌বার্গে, প্রাইভেট গৃহ সম্পর্কীয় পক্ষপাত বিরোধী আইন করিতে গিয়া কাঠোর প্রতিরোধের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল।

নিগ্রো ছিল অদৃশ্য মানুষ (Invisible man), কোথাও তাহার অস্তিত্ব অনুভব করা যাইত না বলিলেই হয়। ক্রমে ক্রমে আমোদ আহ্লাদ এবং খেলা-ধূলার ক্ষেত্রে নিগ্রো গৃহীত হইতে লাগিল। প্রথম নিগ্রো কর্তৃক Revue-Dixie to Broadway ১৯২৯ সনে নিউ ইয়র্কে প্রথম প্রদর্শিত হয়। (Revue হইতেছে বিগত বৎসরের ঘটনা সম্পর্কীত অভিনয় গান ইত্যাদি কতকটা কলিকাতার জেসোপাড়ার নং-এর সহিত তুলনীয়।) ১৯২৭ সনে Revue ঐ সহরেই কটন ক্লাবের সাধারণের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ডিউক ওয়েলিংটন নামক একজন নিগ্রো দ্বারা। জো লুই (Joe Louis) বিখ্যাত নিগ্রো খেলোয়াড়, শুরুতার উত্তোলনের শ্রেষ্ঠত্ব দান (Heavy Weight championship of the World) ১৯৩৭ সনে এবং ১৯৪১ পর্যন্ত উক্ত সম্মান বজায় রাখিতে সমর্থ হন। জেকি রবিন্‌সন্ (Jackie Robinson) বেস্‌বল্ খেলায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেন ১৯৪৭ সনে জেসি ওয়েন্স (Jesse Owens) ১৯৩৬ সনে বার্লিনের অলিম্পিকের দৌড়ে ৪টি পদক পান।

১৯৪৮ সনে যখন প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস্ ট্রুমেন Executive Order 9981 দ্বারা সামরিক বিভাগে বর্ণ বৈষম্য বাতিল করেন তখন নিগ্রো আর এক ধাপ উপরে উঠিল। অবশ্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক আইন অমান্যের (civil disobedience হুমকীর জন্য এরূপ করা হইয়াছিল সন্দেহ নাই। ধীরে ধীরে নিগ্রো তাহা ন্যায্য অধিকারে প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল।

বহু নিগ্রো বিংশ শতাব্দীর আরম্ভেই দক্ষিণ স্টেটগুলি ত্যাগ করিয়া উত্তরের স্টেটগুলিতে বসবাস আরম্ভ করিয়াছিল। গ্রাম অঞ্চল হইতে তাহাদের গতি সহরের দিকেও চলিতেছিল বিরামহীন বেগে, নিম্নলিখিত পরিসংখ্যান * হইতে তাহা দেখা যাইবে—

	সহরে	গ্রামে
১৯১০—	২৭ লক্ষ	৭১ লক্ষ
১৯২০—	৩৫ "	৬৯ "
১৯৩০—	৪২ "	৬৭ "
১৯৪০—	৬২ "	৬৮ "
১৯৫০—	৯১ "	৫৬ "
১৯৬০—	১,৩৮ "	৫১ "

নিগ্রো সহরে গিয়াও নূতন এক সমস্যায় পড়িল। তাহার বাসস্থান হইল সহরের বিশ্রি বস্তিতে (ghetto; অদক্ষ (unskilled) বলিয়া নিচের দিকের চাকুরী তাহার মিলিত এবং অদক্ষ শ্রমিকের কাজে উত্তর স্টেটগুলিতে বর্ণবৈষম্যের অসুবিধাও বিশেষ ছিলনা। কিন্তু নূতন নূতন শ্রমলাঘবকারী কলকব্জার উদ্ভাবনে নিচের লোকের চাকুরী যাইতে লাগিল। কারণ "শেষে নিযুক্ত, আগে ছাঁটাই" (last hired, first fired) ছিল চাকুরীতে রাখার নীতি। সহরে আসিয়া নিগ্রোর দুঃখ আরও বাড়িল।

* Statistical Abstract of United States 1950, 1545, 1562.

১৯৫৪ সালে সুপ্রীম কোর্টে অনুকূল রায়ের পরেও নিগ্রোর উন্নতির পথ সুগম হয় নাই। স্টেটগুলি আবার স্থানীয় আইন পাশ করিয়া নিগ্রোকে পৃথক রাখিতে (Segregate) করিয়া হইয়া লাগিল। NAACP নিম্ন আদালতে মোকদ্দমা চালাইয়া যাইতে লাগিল। বিচারে জিতিলেও নিগ্রোছাত্রেরা যাহাতে স্কুলে ঢুকিতে না পারে সাদাচামড়ারা সেজন্য হাঙ্গামা সুরু করিল। টেক্সাস্, ফ্লোরিডা, টেনেসী, কেন্টাকী প্রভৃতি স্থানের হাঙ্গামার কেন্দ্রীয় রক্ষী-বাহিনী ডাকিতে হইল। পুলিশ পাহারায় নিগ্রো ছেলে-মেয়েকে স্কুলে যাইতে হইত। নানা স্কুল কর্তৃপক্ষ আইন অগ্রাহ্য করিয়া নিগ্রোছাত্র-ছাত্রীকে বিতাড়িত করিল। সাদাচামড়ারা কয়েকটি স্কুল পুড়াইয়া বোমাবিয়া ভাঙ্গিয়া দিয়াছিল। ১৯৫৭ সনের Little Rock এর নিগ্রোর স্কুল প্রবেশের সংগ্রাম ইতিহাস প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এখানে কেন্দ্রীয় সৈনিক আমদানী করিতে হইয়াছিল এবং উহার প্রতিরোধে দাঁড়াইয়াছিল স্টেটের গভর্ণর স্বয়ং। ১৯৬২ সনের ৩০শে সেপ্টেম্বর এবং ১লা অক্টোবর ২৫০০ শ্বেত জনতার সহিত কেন্দ্রীয় সৈনিকের যে সংঘর্ষ হয় তাহাতে বেশকিছু হতাহত হয়। এরূপ রক্তপাতের পরে নিগ্রো শিক্ষার্থী জেম্‌স্ মেরেডিথ্ অক্সফোর্ডের মিসি-সিপি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ লাভ করে এবং ১৯৬৩ সালে স্নাতক হয়।

কিন্তু ইহাতেও নিগ্রোর বেশী কিছু লাভ হইতেছিল না। প্রত্যেক স্থানে সৈনিকের পাহারায় স্কুলে যাওয়া চলে না। সাদারা নিগ্রোর সহিত নিজেদের ছেলেকে পড়ান অপেক্ষা স্কুল বন্ধ করিয়া দেওয়া সমীচীন বোধ করিল। সুতরাং সাদা-কালোর একত্রীকরণ খুব মন্থর গতিতে হইতেছিল। ১৯৬৩-৬৪ স্কুল বৎসরে দেখা গেল দক্ষিণের সাদা-কালোর (মিশ্র) স্কুলে নিগ্রোর সংখ্যা শতকরা ১.৮ মাত্র। এত চেষ্টা করিয়াও দেখা গেল তথাকথিত বৈষম্যযুক্ত মিশ্র এবং উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ৭৭০০ ছাত্রের মধ্যে নিগ্রোর সংখ্যা মাত্র ৬১ জন মাত্র।

অতঃপর নিগ্রোর আর প্রকাশ্য বিদ্রোহ ছাড়া অন্য উপায় রহিল না। কিন্তু সে সংখ্যালঘু, দরিদ্র, অসহায় তাহার পক্ষে সহিংস বিদ্রোহ সম্ভব ছিল না। আর কিছুটা সম্ভাবনা থাকিলেও সফলতার কোন আশা ছিল না। এই সময় মার্টিন লুথার কিং (জুনিয়ার) যিনি ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর অহিংস অসহযোগ মন্ত্রে খুবই বিশ্বাসী, জাতির নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। অহিংস জন-অসহযোগই ছিল তাঁহার অস্ত্র।

নর্থ ক্যারোলিনার এক কৃষি কলেজের দুইজন নিগ্রো ছাত্র সাদাছেলেদের জন্য ভোজনাগারে খাদ্যের দাবী করিয়া ১৯৬০ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী এক নতুন আন্দোলনের সূচনা করিল। তাহাদের দাবী অগ্রাহ্য করায় তাহারা সত্যাগ্রহ করিয়া সমস্ত দিন খাদ্যের কাউন্টারে বসিয়া রহিল। প্রতিদিন এরূপ চলিতে লাগিল। সত্যাগ্রহীর সংখ্যা বাড়িতে লাগিল। এরূপ সত্যাগ্রহ ১৫টি সহরে ছড়াইয়া পড়িল। ইহাতে শ্বেতাঙ্গ সমাজ বিচলিত হইল। এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ আর একটি প্রবল নিগ্রো প্রতিষ্ঠান—Congress of Racial Equality (সংক্ষেপে CORE এই আন্দোলনে যোগ দিল ১৯৪২ সনে জেম্‌স্ ফার্মারের নেতৃত্বে শিকাগো সহরে Core স্থাপিত হয়। ফার্মার প্রসিদ্ধ ভারতীয় সাংবাদিক কৃষ্ণলাল শ্রীধরণীর War without Violence পুস্তক পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন। ফার্মার ঘোষণা করিলেন যে আইন এবং নীতি কার্যকরী করাই তাহাদের উদ্দেশ্য, ইহাতে যে বিপদই আসুক তাহারা উহার সম্মুখীন হইবেন। এই সময় আর একটি সমিতি গঠিত হয় Students' Non-violent Coordinating Committee (সংক্ষেপে) SNCC। ইহার সভাপতি ছিলেন জন লুই। এই সমিতির শত শত লোক কারাগারে গিয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝাযায় মহাত্মা-গান্ধী প্রদর্শিত সত্যাগ্রহ আন্দোলন ও সংগ্রাম নির্বাচিত

মার্কিন নিগ্রোজাতির উপরে কিরূপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

নিগ্রোজাতির মধ্যেও নেতার, মতের এবং দলের অভাব ছিল না। এজন্য আন্দোলন যতটা প্রবল হওয়া দরকার ততটা হইতে দিলনা। কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় দল ছিল NAACP যেমন ভারতের ছিল জাতীয় কংগ্রেস। মার্টিন লুথার কিং-এর নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন বাড়িয়া চলিল। সহানুভূতিশীল শ্বেতাঙ্গদের মধ্য হইতেও অনেকে প্রকাশ্যে নিগ্রো আন্দোলনে যোগ দিল। শ্বেতশুণ্ডার অত্যাচারে পক্ষিদের নানা সংঘের রাস্তা নিগ্রোরক্তে লাল হইল। কিন্তু নিগ্রো থামিবার নয়। অনেকে বলিল নিগ্রো কি উন্মাদ হইয়াছে। ইহার উত্তরে কেহ বলিয়াছিল—নিগ্রো উন্মাদ হয় নাই। আত্মস্থ হইয়াছে। মার্টিন লুথার ধমিবার পাত্র ছিলেন না। নিগ্রোদের অত্যন্ত হইতে বলিলেন। নিগ্রোদের উপর কুকুর লেলাইয়া এবং অগ্নি নির্বাপক জলের পাইপ চালাইয়াও তাহাদের থামান গেল না। "কুকুরের কামড়ে একজন নিগ্রোর রক্তপাত পৃথিবীর সকল নিগ্রোর রক্তপাত" ধ্বনি সাদা মানুষের হৃদয় স্পর্শ করিল। দারমুখী নিগ্রোর আর ফিরিবার পথ নাই, সাদাকেও এই সমস্যার সমাধান না করিয়া অন্য উপায় নাই।

আলবামা স্টেটের গভর্নর চার্জ ওয়ালেস দুইজন নিগ্রোকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করিতে অস্বীকার করিয়া যুক্তরাষ্ট্রের বিধানের প্রতি অশ্রদ্ধা দেখাইলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে ৫০০ দাঙ্গাপটু (riot-trained) সৈন্য প্রেরিত হইলে ওয়ালেস রণে ভঙ্গ দিলেন এবং বলপ্রয়োগ ব্যতীতই ছাত্রেরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইতে পারিয়াছিল।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্ণধারগণ সজাগ হইলেন। এ সমস্যা আর বিচ্ছিন্নভাবে ফেলিয়া রাখা চলে না। প্রেসিডেন্ট জন কেনেডি টেলিভিশনে ঘোষণা করিলেন—

"It can not be met by repressive police action. It cannot be left to increased demonstrations in streets. It cannot be quieted by token moves or talk. It is time to act in the Congress, in your state and legislative body, and, above all, in our daily lives."

যে সর্বাত্মক চেষ্টার কথা পরলোকগত কেনেডি বলিয়া ছিলেন তাহা খুবই সত্য, তার কথা হইতেছে প্রতিদিনের ব্যবহারিক জীবনে মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলামেশার সম্প্রীতির উন্নতি।

নিগ্রোরা কি চায়? সাদা-কালোর চাকুরীতে মজুরীতে কোন বৈষম্য থাকিবে না। যোগ্যতা অনুযায়ী চাকুরী, কাজ-অনুযায়ী একই মাহিনা। নিগ্রো কালো হইলেও মানুষ। যোগ্যতা অনুযায়ী সে কাজ চায়। দাদার উপর প্রভুত্ব চায় না, সমতা চায়। অবশ্য নিগ্রোদের মধ্যে খুবই সংখ্যালঘু একদল যাহারা কালো মুস্লিম বা Black Muslim বলিয়া খ্যাত তাহারা সাদাকে ঘৃণার চোখে দেখে এবং হিংসাত্মক উপায়ে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়। ইহারা যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে মুস্লিম স্টেট দাবী করে। ইহাদের নেতা এলিজা মুহম্মদ এবং ম্যালকলম্ এক্স (Malcolm X)। ম্যালকলম্ এক্স ২১শে ফেব্রুয়ারী ১৯৬৫ নিউইয়র্কে আততায়ীর গুলিতে নিহত হইয়াছেন।

এক কথায় নিগ্রো চায় সকল প্রকার শিক্ষায় সাদার সহিত সমান অধিকার, সকল কাজে সমান সুযোগ এবং সকল বিষয়ে ন্যায় বিচার, নিজ দেশে দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হইয়া সে থাকিতে চায় না। বসবাসে গৃহনির্মাণে কোন পৃথকীকরণ চলিবেনা। তাহার বাসের জন্য পৃথক পল্লী, তাহাকে বাড়ীভাড়া না দেওয়া, ভোজনাগারে প্রবেশ নিষেধ বা পৃথক ব্যবস্থা প্রভৃতি ব্যবস্থা চলিবে না।

তাহার এই সকল মৌলিক এবং নাগরিক অধিকার অর্জন করিবার উপায় হইল সমস্ত দেশব্যাপী আন্দোলন,

প্রচার, সত্যাগ্রহ, বয়কট প্রভৃতি। ৭০,০০০ নিগ্রো ভোকনাসরে খাদ্যের দাবীতে ১০০টি সহরে সত্যাগ্রহ করিয়াছিল। অবশ্য এই সত্যাগ্রহীদের মধ্যে সাদা আমেরিকানও কিছু ছিল। কোন কোন সহরের বাস চলা বয়কট করিয়া নিগ্রোরা সাদা মালিকদের খালি বাস চালাইতে বাধ্য করিয়াছে এবং ইহার ফলে লোকসান হইয়াছে। সাদা-গুণ্ডার হাতে তাহারা লাঞ্ছনা অনেক হইয়াছে, অনেক মার খাইয়াছে কিন্তু নিগ্রো দমেনাই। আন্দোলন মোটামুটি অহিংসই ছিল। নিগ্রো জাতির হিংসার পথে জয় সম্ভব নহে, সংখ্যাগরিষ্ঠের হৃদয় জয় করাও অসম্ভব। নিগ্রোর এই নূতন 'ধর্মযুদ্ধের' প্রেরণা সে পাইয়াছিল—কনফিউসিয়াস্, বুদ্ধ, ঈশা, গান্ধী এবং বাকিপে সত্যাগ্রহী খুরোর বাণী হইতে। ১৯৬১ সনের মে মাসের রক্তাক্ত সপ্তাহে নিগ্রো সত্যাগ্রহী 'ধর্মযুদ্ধের' পরীক্ষায় যে শক্তির পরিচয় দিয়াছিল তাহা বিস্ময়কর। এই আন্দোলনে নিগ্রো চার্চ বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল এবং নেতাগণের অনেকেই ছিলেন ধর্ম যাজক। সকলের কণ্ঠেই ছিল একই উৎসাহের বাণী "ঈশ্বর আমাদের সহায়, আমরা জয়ী হইব" (God is on our side, we shall win) এই গভীর বিশ্বাস পতিত নিগ্রোজাতির মনে এক নূতন আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

রাজনীতিক্ষেত্রে নিগ্রোরা ছিল বিভিন্ন দলের। কিন্তু প্রেসিডেন্ট কেনেডির (মৃত্যু ২২শে নভেম্বর ১৯৬৩) সময়ে ইহাদের প্রতিপত্তি খুব বাড়ে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনসনের সময়েও প্রতিপত্তি বাড়িয়াই চলিয়াছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে এই বৎসর (১৯৬৬) জানুয়ারী মাসে ডাঃ রবার্ট সি উইভার—একজন নিগ্রো, সর্বপ্রথম ক্যাবিনেট মন্ত্রী হইলেন। জনসনের এই নিয়োগ কংগ্রেস সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করিয়াছে।

নানা অসুবিধা, নানাবিধ মতদ্বৈধতা সত্ত্বেও অহিংস বিপ্লবের পথে নিগ্রো প্রতিদিন জয়ের পথে অগ্রসর হইতেছে। ১৯৬৩ সালের গ্রীষ্মের তিন মাসে নিগ্রো বিদ্রোহ চরমে উঠিয়াছিল। এই সময় ১,৪১২টী নিগ্রো বিক্ষোভ হয়। সকলের কণ্ঠেই 'হবে জয়' ধ্বনি। ১৯৬৩ ২৮শে আগষ্ট ওয়াশিংটনে সমস্ত যুক্তরাষ্ট্রের নানাদিক হইতে আগত এক অভিযান ইতিহাসের এক অভূতপূর্ব্ব ঘটনা। অভিযানকারীরা পায়ে হাঁটিয়া, রেলে, বাসে, এরোপ্লেনে ও অন্যান্য উপায়ে সমবেত হইয়াছিল। বৃদ্ধ ফিলিপ র‍্যাণ্ডল্ফ্ এবং বেয়ার্ড রাষ্টিন্ ছিলেন তাহাদের নেতা। আমেরিকার অমর সন্তান এব্রাহাম লিঙ্কনের মূর্ত্তির পদতলে তাহারা সমবেত হইয়া অতি দৃঢ় এবং ভদ্রভাষায় তাহাদের দাবী ঘোষণা করিয়াছিল। সমবেত বিরাট জনতার সম্মুখে মার্টিন লুথার কিং যে ভাষণ দেন তাহা "I have a dream" নামে বিখ্যাত হইয়াছে।

Civil Rights Bill দ্বারা আমেরিকা সমতা আনিবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু কেবল আইন দ্বারা সব কিছু সম্ভব নয়—গত ১০০ বৎসরে তাহা সম্ভব হয় নাই। চাই শ্বেতাঙ্গ আমেরিকাবাসীর মানসিক পরিবর্তন। বর্তমান পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম শক্তি, জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠ আমেরিকান জাতি আজ নিজের ঘর সামলাইতে না পারিলে সমস্ত পৃথিবীতে বড় গলায় তাহার সাম্য, মৈত্রী ভ্রাতৃত্ব ও স্বাধীনতার প্রচার অর্থহীন।

মৃতপথে দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

বসে রই ওই মৃতপথে সারাদিন
মৃতপথে সারাদিন

যেন বসে রই মৃতপথে সারাদিন
ধুলো উড়ে যায় আলো হয়ে রয় ক্ষীণ।

নীল মরুভূমি চাঁদোয়ার মতো শিরে
ঝুলে থাকে উদাসীন।

একেক সময়ে সাঁতাল পাড়ার মতো
আবীর মাখানো সাঁঝবেলা আসে ফিরে।

একেক সময় দেহাতী দুপুরবেলা
ঘু-ঘু করে ওঠে আলসে ওতপ্রোত।

একেক সময় বালুচর ওটিনীরে
ফিসফিস করে : আমায় মাথায় ফিরে—

আমায় মাথায় ফিরে—
ঘুরে ঘুরে কাঁদে বাতিউলাদের বেলা।

আর বসে রই মৃতপথে সারাদিন
মৃতপথে সারাদিন

বসে রই ওই মৃতপথে সারাদিন—
ধুলো উড়ে যায় আলো হয়ে রয় ক্ষীণ।

চের ঘুরে চলে গেছে যে—আমার হাতে
তারই প্রতি অবহেলা

হা-হা করে ওঠে। রাঙা মৃগলিপালাতে
ভরে ওঠে নিরাসক্ত দিবসের।

আর মাঝে মাঝে বহুরাদাতাল রাতে
কীটে-খাওয়া হৃদয়েরে মেয় বরাভয়।

কাদিনীর নেশা জড়ায় সে পায়ে পায়ে,
অথচ পরক্ষণে

শুকনো পাতার বিলাপ শুধু সে শোনে।
কাদিনীর নেশা জড়ায় সে পায়ে পায়ে,

অথচ পরক্ষণে
সেই চোখ দুটি জড়ায় মোহাঞ্জনে।

কে জানে কীসের আতুর অভিপ্রায়ে
অস্ত্যযামের চাঁদ সে নামায় ছাদে।

অথচ পরক্ষণে
আমার পায়ে সে আপাদ পক্ষাঘাতে।

শর্বরীকে — বহ্নি গাঙ্গুলি

কত সুন্দর তোমাকে দেখিয়েছিল
জানতে না তুমি জানতে না শর্বরী—
আঁধার আকাশে আঁধার চতুর্দিকে
তুমি নেমে এলে আলোকের সহচরী।

আমার দৃষ্টি ক্রমশঃ স্বচ্ছ হোলো
আমার নয়নে তোমার নয়ন তোলো
সলজ্জ হোলো পার্বতী প্রিয়তমা—
ভরে গেল তার কনক কপলে কোলও।

আমি উড়ে যাই আকাশে পক্ষীরাজে
আমি ভেসে যাই সুদূরে ভেলাভরে—
সহসা কোথায় ঝর্ণাধারার মাঝে
বেজে বেজে উঠি কার বেহালার ছন্দে।

জানতে না তুমি জানতে না শর্বরী
আমরা আঁধারে আলোক সৃষ্টি করি।

অদৃষ্ট — বিনয় কুমার দত্ত

কোথায় দেখেছি তাকে ? স্বপ্নে, কিংবা রাত্রিজাগরণে
রূপসী নিন্দিত যার মুখশ্রীর দুরন্ত আহ্বান
বসন্ত ফুলের মতো সুবাসিত। অথচ আবার
দৃষ্টির সীমানা ছুঁড়ে শ্রাবণের বিষন্ন সজল
স্মৃতির প্রতিমা ভাসে, কোন যে এমন !
মুখবন্ধে, কেন যে শেষের কথা রক্ত অক্ষরের
জ্বালা হ'য়ে কেঁপে ওঠে জীবনে এখন ?

কেন, সান্ধ্য প্রত্যাবর্তনের ব্যগ্র, কাতর নিঃশ্বাস অনি আজো
ভোরবেলা কানে আসে। যখন যাত্রার
আনন্দসঙ্গীত বাজে জলে স্থলে নভোনীলিমায়
এই সব অনিবার্য আঁধারের কারুকার্যে অভিমানী রঙে
দেখেছি পুলিত তার গমনভঙ্গীও স্নিগ্ধ রূপবতী আলো,
অথচ আশ্চর্য সেই ওষ্ঠের সরল রেখা চোখের কাজল
কোথায় দেখেছি, কোন হৃদয়ের প্রাসাদ শিখরে ?
যেখানে ঘোরানো সিঁড়ি পার হয়ে মুগ্ধ প্রবেশের
পরিণতি জেগে থাকে অনাবৃত গোলাপ বাঁধায়।

আজ

ধীরেন্দ্রনাথ পাত্রই

শিরীষ ফুলের গন্ধ ভ'রে থাকা আমাদের প্রসন্ন উঠানে
দু'পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নিপুণ গাঁয়ের কবিরা
গান গায়।
তাহাদের গান গাওয়া শেষ হ'লে অনুভববেদ্য হয়ে ওঠে
আমাদের বুকের আগুন।

গোপীযন্ত্রে সুর সাধি জীবনের—অথও প্রাণের
চিরদিন;
তন্দ্রিলা উপেক্ষা ক'রে দুপায়ে মাড়িয়ে লাভ ক্ষতি
যন্ত্রনার মধ্যে আমরা উৎসবের স্নিগ্ধ গান গাই—
চেয়ে দেখি দুপুরের রাঙা শঙ্খচিল
আমাদের মত
আলোর সমুদ্রে ভাসে
নিজস্ব বেদনাবোধ ডানার আড়ালে ঢেকে রেখে।

অবিস্মরণীয় এক আদার স্মৃতির নৌকায়
আমি আজ পা রেখেছি পরম বিশ্বাসে :
ভালোবাসবার এক সংবৃত পিপাসা বুকে নেখে
চেয়ে দেখি শালবন নদী ঘেঁষ নিভৃত কুটীর
পুড়ে যাচ্ছে দুঃসহ আগুনে :
প্রেমের চিরন্তন দাহে ॥

জয়তু ছাত্রদল

জয়তু ছাত্রদল,
শত শহীদের শোনিতে রাঙিয়া
পথ আজি উজ্জ্বল।
বাংলা মায়ের ভাঙা বুকে
গর্জে কঠিন কাল,
"অত্যাচারী তোর স্পর্ধা সামাল।"

ঘুমেটের মুখে বক্ষ পাতিয়া
মরণ পাগল নাচিছে,
মায়ের আশীষ ললাটে তাহার
দীপ্ত শিখায় জ্বলিছে।

বহু সমবোধ একটী রাত্রীর অনুভূতির একাশ হিসেবে এ কবিতাটি ছাপা হোল। ঃঃ সঃ

ললি-রোড

পথচারী

অথ বাচাল উবাচ :

বাসস্তিতে যে পৌরসমিতি আছে বহু বছর ধরে লোকের সে চেতনাই ছিল না। তাই বলে শহরের অবস্থা যে কিছু খারাপ হয়েছিল তা নয়। রোদ দেখা দিত, কিছুকাল চলত, আবার আপনা থেকেই তা অদৃশ্য হত; ধুলো জঞ্জাল জমত, হাওয়ায় উড়ে উধাও হত; নালা-নর্দমায় উজোন-ভাটা খেলত, নিজেরাই নিজেদের সামলে নিত। পৌরসমিতি যে আড়ালে ছিল সেই আড়ালেই থেকে গেল যতদিন না ১৯৪৭-এর ১৫ই আগস্ট দেশ স্বাধীন হল। সেদিন হিমালয় থেকে কুমারিকা পর্যন্ত কী আনন্দোৎসবের ঢেউ খেলে গেল ইতিহাসে তার জুড়ি নেই বললেই চলে। আমাদের পৌরসমিতিতেও সে উদ্দীপনা সংক্রামিত হল। তারা রাস্তা ঝাড়ু দিল, ড্রেন সাফ করল, বাড়ি বাড়ি নিশান উড়ানো। রাস্তায় রাস্তায় নিশান উড়িয়ে গান গেয়ে মিছিলের পর মিছিল চলল সেদিন—পৌরপিতাদের মন চাঙা হয়ে উঠল।

পৌরসভার সভাপতি ব্যালকনি থেকে নিচে তাকিয়ে আপন মনে বললেন : "এই মহোৎসব উপলক্ষে আমাদের যে সামান্য করণীয় তা আমরা করেছি।" সভার যে দু'একজন সদস্য তাঁর পাশে ছিলেন, তাঁরা সভাপতির চোখে একটু জলও মোমহর দেখেছিলেন সেদিন—অন্তত আমার তাই বিশ্বাস। যুদ্ধের সময় ফৌজের কখল যোগান দিয়ে নিজের ইষ্ট সাধন করেছিলেন তিনি, পরে সেই লাভের অনেকটাই খরচ করে ঐ সভাপতি-পদ অর্জন করেন। সে এক মহাকাব্য, কিন্তু সে কথার এখন প্রয়োজন নেই আমাদের। আমার এবারের কাহিনীটা আলাদা। সভাপতি এইমাত্র যে আত্মতৃপ্তি লাভ করেছিলেন তা স্থায়ী হল না। যে রঙীন নিশান উড়িয়ে-ছিলেন এক সপ্তাহের মধ্যেই তা ছিঁড়ে উড়ে গেল, তিনিও কেমন মন-মরা হয়ে পড়লেন। আমি প্রায় রোজই তাঁর কাছে যেতাম সংবাদ সংগ্রহের চেষ্টায়। উত্তর ভারতের একটা কাগজে সংবাদ সরবরাহ করাই ছিল আমার জীবিকা। ছাপানো প্রতি ইঞ্চি খবরের জন্য ওরা আমাকে ছটাকা করে দিত। প্রতি মাসে ঐ কাগজে দশ ইঞ্চির মতো খবর দিতে পারতাম—সে পৌরসমিতির নিখুঁত কাজকর্মের খবর। এতে তখনে বেশ খাতির পেতাম। হামেশা সভাপতির আফিসে আমি আসা যাওয়া করতাম। কিন্তু সেদিন তাঁকে বড়ই অন্যমনস্ক দেখলাম, তাই শেষ পর্যন্ত জিজ্ঞেস করতেই হল :

'অলোয়াত্তিটা কিসের বলুন তো—'

জবাব পেলাম, "মনে হচ্ছে যতটা করা উচিত ছিল তা করিনি।"

"কিসের যতটা?"

"এই ঐতিহাসিক ঘটনাকে চিহ্নিত করে রাখবার জন্য কিছুই করিনি।"

একটু কী ভাবলেন, তারপর ঘোষণা করলেন, "যাই হোক, বিরাট কিছু একটা করবই।" তারপর পৌরসভার জরুরি সভা ডাকলেন, বক্তৃতা করে সবাইকে বোঝালেন : সঙ্গে সঙ্গে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল স্বাধীনতার জন্যের মর্যাদা রক্ষার্থে সকল পথ ও পার্কের নামের জাতীয়করণ হবে।

মার্কেট ক্রোয়ারের পার্ক নিয়েই কাজ শুরু হল। ওটার নাম ছিল কর্পোরেশন পার্ক—কার কর্পোরেশন যে তা স্বয়ং ভগবানই জানেন। হতে পারে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার, নয়তো সম্রাট অশোকের। এ নিয়ে অবশ্য কারো মাথা ব্যথা ছিল না। কিন্তু এবার তার নামের পুরানো বোর্ড তুলে ফেলা হল, তার যায়গায় নতুন নামের নতুন বোর্ড খাড়া হল—পার্কের নাম আজ থেকে "হামারা হিন্দুস্তান পার্ক।"

অন্যান্য রদ-বদলগুলো অত সহজে চট করে সম্ভব হল না। 'মহারাণী গান্ধী রোড' নামটা প্রায় সবারই লাগি। আটজন ওয়ার্ড সদস্য ঐ একটা নামের জন্য উঠে পড়ে লাগলেন। আর দু'জন চাইলেন তাঁদের বাড়ির সামনের রাস্তার নাম হোক নেহরু রোড বা নেতাজী সুভাষ বসু রোড। দাবি নিয়ে মেজাজ চড়তে লাগল। তর্ক হল শেষ পর্যন্ত বা হাতাহাতিই হয়। একটা সমঝোতায় শেষটি হল তা নিয়ে পৌরসমিতির যেন মাথা খারাপ হয়ে গেল। ওঁরা সিদ্ধান্ত করলেন চারটি রাস্তার একই নাম হবে। দেখুন, অতিমাত্র গণতন্ত্রী ও দেশভক্ত শহরেও দুটো রাস্তার একই নাম হওয়া সম্ভব নয়। এক পক্ষকালের মধ্যেই এই ক্যাপাসিটির ফল দেখা দিল। নতুন নামের মালা-পরা শহরটাকে যেন আর চেনাই যায় না। মার্কেট রোড, নর্থ রোড, চিত্রা রোড, বিনায়ক মুদালি রোড এবং এরকম কত রোড যে উধাও হল। তাদের বদলে দেখা দিল নতুন নাম—মন্ত্রী, উপমন্ত্রী, কংগ্রেস কার্য-নির্বাহক সমিতির সদস্যদের নাম, তাও আবার চার যায়গায় একই নাম। বলা বাহুল্য, এতে ঝকমারি ও গোলযোগের এক শেষ হল—এক যায়গার চিঠি চলল আরেক যায়গায়, কার বাড়িতে কোথায় কেউ ঠাহরকরে উঠতে পারল না, অপরকে ঠিকমতো বলতেও পারল না। সব নিশানা ও চিহ্ন ঘুরিয়ে শহরখানা হল যেন তেপান্তরের মাঠ!

সভাপতি কিন্তু তাঁর এই প্রেরণা-সিদ্ধ কাজে পরম পরিতোষ লাভ করলেন। এবার তিনি অধীর হয়ে উঠলেন—সন্ধান করতে লাগলেন নতুন কর্মক্ষেত্র।

নদি এক্সটেনশন ও মার্কেটের কোণে ছিল একটি মূর্তি। মূর্তিটা যে কার সে খোঁজও লোকেরা করত না, মুখ তুলে ওটার দিকে তাকাতও না।—ওটা ছিল পাখিদের বসবার ঠাঁই। সভাপতির হঠাৎ খেয়াল হল মূর্তিটা তাঁর 'গ্রেট্রিক নদি'র আর তাঁর নামেই এক্সটেনশনেরও নামকরণ হয়েছিল। এখন ওটার নাম পালটে 'গান্ধী নগর' করা হয়েছে; কাজেই নদির মূর্তিটা ওখানে আর রাখা চলে না। পৌরসমিতির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হল—ওটা সরিয়ে ফেলতে হবে। পরদিন সদস্যদের নিয়ে সভাপতি বিজয় গর্বে সভা থেকে বেরিয়ে এসে মূর্তিটাকে প্রদক্ষিণ করলেন। এবার তাঁরা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলেন। মূর্তিটা মাথায় ছিল ছুঁচ এবং দাঁড়িয়ে আছে অমানো দাঁতের পাদপীঠের ওপরে। ওঁরা কল্পনা করেছিলেন একটা কড়া রকমের প্রস্তাব পাশ করেই এই কদাকার মূর্তিটিকে উপড়িয়ে ফেলা যাবে; কিন্তু এখন দেখতে পেলেন ওটা পাহাড়ের মতো শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ওঁরা উপলব্ধি করলেন বৃটিশ এখানে এসে নিজেকে কোনো খেলো বনেদের ওপর দাঁড় করাতে চায় নি। কিন্তু এই বোধ থেকে তাঁদের সংকল্প আরো দৃঢ় হল। মূর্তিটা সরাবার জন্য শহরের ঐ অংশটা যদি উড়িয়ে দিতে হয় তাতেও তাঁরা পিছ-পা নন। কারণ, ইতিহাস থেকে স্যার নদি সম্বন্ধে ইতিমধ্যে অনেক তথ্য তাঁরা আবিষ্কার করে ফেলেছেন। নদি ছিলেন য়ুরোপের অভিশাপ অ্যাটিলা এবং ম্যাকিয়াভেলির মতো কূটচক্রী নাদির শাহের এক সাংঘাতিক সম্মিলন! তিনি তরবারির মুখে ভারতকে পদানত করেছেন এবং প্রতিবাদের গুঞ্জন উঠতেই সে গ্রাম ধূলিসাৎ করে দিয়েছেন। নতজানু হয়ে তাঁর সামনে না উপস্থিত হলে তিনি কোনো ভারতীয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত মাত্র করতেন না।

লোকেরা তাদের প্রচলিত নিত্যকার কালকর্ম ছেড়ে

মূর্তিটার চারদিকে ঘুরে বেড়াতে লাগল, আর অবাক হয়ে ভাবতে শুরু করল কী করে এতকাল ঐ মূর্তিটাকে তারা সহ্য করেছে। তাদের মনে হতে লাগল ভদ্রলোক যেন সমস্ত জাতির প্রতি তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার হাসি হাসছেন, আর তাঁর হাতদুটি রয়েছে পেছনে এবং তলোয়ার ঝুলছে কোমরবন্ধ থেকে। কারো আজ দংশনমাত্র নেই যে কল্পনীয় অত্যাচারীদের মধ্যে ইনি হচ্ছেন নিকৃষ্টতম: ভারত-ইতিহাসের বৃটিশ যুগে নিতান্ত ঘৃণিত অতি পরিচিত যা কিছু তারই খাঁটি ছবি—পরণে ব্রীচেস, মাথায় পরচুলা, শাদা আঙরাখা আর ঐ কঠোর-সংকল্পের ছাপ মুখে। তারা যেন শিউরে উঠল, যখন এই লোকটার অত্যাচার যারা সহ্য করেছে সেই তাদের পূর্বপুরুষদের কথা তাদের মনে হল।

এরপর পৌরসমিতি টেণ্ডার ডেকে পাঠাল। একজন ঠিকেদার এষ্টিমেট পেশ করল—মূর্তিটা তুলে নিয়ে গাড়িতে করে পৌরসমিতির অফিসে পৌঁছে দেবার। ওখানে সবাই ভেবে সারা হচ্ছিল কোথায় ওটাকে রাখা হবে। সবচেয়ে কম এষ্টিমেট দাঁড়াল ৫০ হাজার টাকায়। সভাপতি ভেবেচিন্তে আমাকে বললেন: "তুমিই কাজটা নেও না কেন? মূর্তিটা তোমায় অমনি দেব—যদি ওটা সরিয়ে নেবার খরচ বাবদ আমাদের কাছে কিছু না চাও।" এ পর্যন্ত ভেবে এসেছিলাম আমার পৌরসমিতির বন্ধুরাই পাগল, এবার দেখছি আমিও তথৈবচ। নিছক লাভের দিক থেকে সমস্ত ব্যাপারটা এবার হিসেব করে দেখতে লাগলাম। ধরা যাক মূর্তিটা তুলে সরিয়ে নিতে আমার পাঁচ হাজার খরচ হল (আমি জানতাম ঠিকেদারেরা খরচটা কাঁপিয়ে বাড়িয়ে দেখায়), আর সব সীসেটা বিক্রি হল দু' হাজার টাকায়।.... তিনটনের মতো ধাতু বিক্রি করে অনেক টাকাই তো হতে পারে। অথবা মূর্তিটাকে বৃটিশ মিউজিয়াম বা ওয়েস্টমিনস্টার এ্যাবিতে বিক্রি করতে পারি। অমনি চোখের ওপরে দেখলাম যে উত্তরভারতের সংবাদপত্রের কাজটা ছেড়ে দিয়েছি।

মূর্তিটাকে সরিয়ে নেবার অনুমতি আমাকে দিয়ে প্রস্তাব পাশ করতে পৌরসমিতির একটু বেগ পেতে হল না। কাজটা ঠিকমতো তুলবার জন্য আমি বিশদ ব্যবস্থা করলাম।...খড়ের দোকানের কাছ থেকে টাকা ধার করলাম কথা দিলাম সুদ দেব এমন হারে যে সবার তাক্ লেগে যাবে। পাদপীঠ-টাকে খুঁড়ে তুলবার জন্য পঞ্চাশ জন কুলি লাগালাম। গোলাম-তাড়ুয়ার মতো তাদের ঘাড়ের ওপর খাড়া থেকে চাবুক চালিয়ে যেতে লাগলাম। তারা সন্ধ্যা ছ'টার হাজিরাপত্র জমা দিত আবার পরদিন সকালে এসে সেগুলো নিয়ে তাদের কাজে লাগত। তাদের যোগাড় করা হয়েছিল বিশেষ করে কোপাল থেকে—সেখানে মেমপি-বনে পুরুষানুক্রমে লেগুন গাছ কেটে লোকেদের দেহ হয়ে উঠেছিল যেন পিটিয়ে গড়া।

* * *

দশদিন ধরে চলল আমাদের কাটা-পেটা। পাদপীঠের এখান-ওখান থেকে চিপ্‌তে কালি কেটে বার করা হ'ল বটে, কিন্তু মূর্তিটার নড়বার কোনো লক্ষণই দেখা গেল না। এই হারে কাজ চললে ঝুলন্তারোহের বাজেই দেউলে হতে হবে, এই আশঙ্কা মনে উঁকি দিতে লাগল। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের অনুমতি নিয়ে কিছু ডিনামাইট যোগাড় করলাম, তারপর ঐ অঞ্চলটা ঘেরাও করে দিলাম বারুদের পলতের আগুন ধরিয়ে। অনাহারি না করে শেষ পর্যন্ত বীরপুলবকে পাদপীঠ সমেত নামানো হল। তারপর ঐ মহাসম্পদ নিয়ে বাড়ি পৌঁছতে লাগল তিন দিন। গুটিকয়েক বলদে টানা বিশেষ গাড়ি তৈরী করে তার ওপরে ওটাকে শোয়ানো হল। মার্কেট রোড দিয়ে যাবার পথে হৈহল্লা, জনতার ঠাট্টাবিদ্রূপ, আমার নির্দেশ-সূচক হাঁকাহাঁকি, দিনের তীব্রতাপ, অসুবিধাজনক স্থানে ও কোণে তার এক-এর গাড়ি হঠাৎ থেমে যাওয়া, না এগোনো না-পেছোনো, সকলদিকের যান-বাহন আটকে দেওয়া, আর বাড়ির ধারেকাছে না যেতেই হঠাৎ করে আবার থমিয়ে

আশা—সব মিলিয়ে সে যে কী এক দুঃস্বপ্ন তার বর্ণনা না-ই বা করলাম। রাত্রে পথের ধারে তাঁর পাহারায় রইলাম। তিনি আকাশের তারার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে চিৎ হয়ে পড়ে রইলেন। দেখে আবার কষ্ট বোধ হল, বললাম,—

"এরকম উদ্ধত সাম্রাজ্যবাদী হয়ে এই তো পেলে। সাম্রাজ্যবাদী হয়ে লাভ হয়না কোনোকালে।" যথাকালে আমার ছোট ঘরটিতেই ঠাঁই হল তার—নিরাপদ আশ্রয়। তাঁর মাথা ও কাঁধ রইল আমার দাদনের হলঘরে, আর বাকী অংশটা দরজা পেরিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে গেল। কবীর সেনের লোকেরা কিন্তু এতে কিছুই মনে করল না।

•

আমার এই সেবাকাজের জন্য আমাকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্তাব পাশ করল পৌর সমিতি। এখবর তারযোগে আমার পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলাম, সঙ্গে জুড়ে দিলাম মূর্তি সম্বন্ধে ফল-ইঙ্কি কাহিনী এক সপ্তাহ পর সভাপতি এলেন আমার বাড়িতে—অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ তিনি। আমি তাঁকে সেই অত্যাচারীর বুকের ওপরে বসালাম। তিনি বললেন, "তোমাকে মন্দ খবর দিতে হল। মূর্তিটি সম্বন্ধে ঐ সংবাদ পত্রিকায় না দিলেই ভাল হত। দেখ এ গুলো··· ··। এই বলে, একতাড়া টেলিগ্রাম আমার সামনে এগিয়ে দিলেন। সেগুলো এসেছিল ভারতের নানা সোসাইটি থেকে—সকলেই মূর্তি অপসারণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে। তার এক সম্বন্ধে আমরা সবাই ভুল করেছি। আমাদের বর্তমান কাহিনী সবই হল ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলের অন্য এক 'লর্ড' সম্বন্ধে। এই যে ফ্রেডরিক লর্ড—যাঁর মূর্তি সরানো হয়েছে—ইনি হলেন একজন সামরিক লাট: সিপাহী বিদ্রোহের পর তিনি এখানে ভারতবর্ষে বাস করছিলেন। জঙ্গল সাফ করিয়ে বালতড়ি শহর বহুলাংশে তিনিই নির্মাণ করেছিলেন। তিনি সারা ভারতের জন্য সর্বপ্রথম লবণের সমিতি এখানেই স্থাপন করেন, খাল কাটাবার ব্যবস্থা করেন। এতে করে লবণের জল এনে হাজার হাজার একর জমিতে সেচের ব্যবস্থা হয়। অথচ এতকাল এই লবণের জলের অপচয় হচ্ছিল। তিনি এ রকম অনেক ভালো-কাজ করেছিলেন, অবশেষে লবণের মহামারীর তীব্রতায় গ্রাম-বাসীদের জীবন রক্ষা করতে গিয়ে নিজে মৃত্যুমুখে পতিত হন।" ভারতীয় শাসন ব্যাপারে ক্রমশ অধিক সংখ্যক ভারতীয়কে যুক্ত করবার পরামর্শ ইংরেজদের মধ্যে সর্বপ্রথম ইনিই বৃটিশ পার্লামেন্টকে দিয়েছিলেন। শোনা যায় তাঁর কোনো ডেসপাচে তিনি নাকি একথা বলেছিলেন যে, "নিজেদের মঙ্গলের জন্যই ইংলণ্ডকে একদিন ভারতবর্ষ ছাড়তে হবে।"

সভাপতি বললেন, "সরকার আমাদের মূর্তিটি পুনঃ-স্থাপনের আদেশ দিয়েছে।"

"অসম্ভব!" চেঁচিয়ে উঠলাম আমি। এটা আমার মূর্তি, আমিই এটা রাখব। জাতীয় বীরপুরুষদের মূর্তি সংগ্রহ করতেই আমার ভালো লাগে। কিন্তু এই বীরত্বের আবেগে কারো মনই সাড়া দিল না। এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের সমস্ত কাগজ ভর্তি কেবল ফ্রেডরিক লর্ড। জনসাধারণের মধ্যে এই উৎসাহের আবেগ কিন্তু সংক্রামিত হল। আওয়াজ তুলে তারা আমার বাড়ির সামনে কুচকাওয়াজ করতে লাগল। তাদের দাবী—মূর্তি ফেরত দেওয়া হোক। মূর্তিটি এখানে তুলে আনতে আমার যে অর্থ ব্যয় হয়েছে অন্তত সেই টাকাটা পৌরপ্রতিষ্ঠান আমাকে দিলে তবেই আমি মূর্তিটা ছেড়ে দিতে রাজী হলাম। জনসাধারণ আমাকে তাদের শত্রু বলে মনে করতে লাগল। লোকটা মূর্তিকে নিয়েও কালোবাজার চালাবার চেষ্টা করছে, মন্তব্য করল ওরা। বাধ্য হয়ে একটা প্ল্যাকার্ড আমার বারান্দায় টাঙিয়ে দিলাম। তাতে লিখলাম,

"মূর্তি বিক্রয়—আড়াই টন উৎকৃষ্ট ধাতু—দেশপ্রেমিক

বন্ধুর জন্ম আদর্শ উপহার—দশহাজার টাকার অধিক মূল্যের প্রস্তাব দিয়েছে।"

এতে ওরা ক্ষেপে গেল, আমি সাধি মারতে চাইলাম। কিন্তু অহিংসার ঐতিহ্যে লালিত ওরা, তাই আমার বাড়ির সামনে পিকেটিং শুরু করল। পতাকা তুলে ও স্লোগান হেঁকে পর পর আমার দরজায় শুয়ে পড়ে থাকল। মূর্তিটার জন্ম যন্ত্রণা করতে হবে বলে স্ত্রী ও পুত্রকন্যাদের আগেই আমি গ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছিলাম। কাজেই পিকেটিং-এ আমার কোনো অসুবিধা হল না—কেবল পেছন দিকের দরজাটার ঘন ঘন ব্যবহার করতে হল। 'প্রাচীন স্মৃতি-স্তম্ভ আইনে' (Ancient Monuments Act) আমাকে ফ্রেডারিকের পুরোনো পাঠাল পৌরপ্রতিষ্ঠান। সে পুরোনো আমি উচিত কথায় উড়িয়ে দিলাম। শুরু হল আইনের কচ্‌কচি—চলল আমার ও পৌর সমিতির উকিলের মধ্যে বুদ্ধির লড়াই। তিন মাসের যন্ত্রণা নেই যে-বাড়িতে সেখানে জমতে লাগল চিঠিপত্রের পাহাড়—এটাই হল জঘন্য ব্যাপার।

আমি রইলাম আমার মূর্তি আঁকড়ে. মনে মনে ভেবে হতাশ হতে লাগলাম—এর শেষ কোথায়। নিজের বাড়িতে হাত পা ছড়িয়ে একটু আরামে থাকবার জন্ম মনটা ব্যাকুল হয়ে উঠল।

• • •

যেদিন পেলাম ঠিক ছ'মাস পর। মূর্তিটির ব্যাপারে পৌরসমিতির কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠাল সরকার। এর সঙ্গে পৌরসমিতির ত্রুটি বিচ্যুতির বিষয় জড়িয়ে সরকার জানতে চাইলেন—কেন বর্তমান প্রতিষ্ঠান ভেঙে দিয়ে পুনর্নির্বাচনের আদেশ দেওয়া হবে না। আমি সভাপতির সঙ্গে দেখা করে বললাম, এবার আপনাকে বড় ও বিরাট কিছু করতে হবে। জাতীয় ট্রাস্ট হিসেবে আমার বাড়িটা দখল করে নিন।"

"কেন করব?" জিজ্ঞেস করলেন তিনি।

"কারণ তার এক আমারই বাড়িতে আছেন," বললাম আমি। "তাড়িতে করে আমার ওঁকে সেই আগের যায়গায় কখনো নিয়ে যেতে পারবেন না আপনারা। এতে জনসাধারণের অর্থের নিতান্তই অপচয় হবে। যেখানে উনি আছেন ওখানেই ওঁকে দাঁড় করিয়ে দিন না কেন? অন্য যায়গায় তো অনেক কালই উনি ছিলেন। তাছাড়া দামে আমার বাড়িটা ছেড়ে দিতে আমি রাজী।

"কিন্তু আমাদের পুঁজিতে কুলোবে না তো," হতাশ হয়ে বললেন তিনি।

"কিন্তু আপনার নিজের তো ঢের টাকা আছে। পৌরসমিতির টাকার উপর কেন নির্ভর করছেন? আপনার দিক থেকে এ একটা প্রকাণ্ড কাণ্ড হবে—ভারতে একেবারে অনন্য—" কথনের ব্যবসায় বিরাট লাভের কিছুটা ছেড়ে দিয়ে হাল্‌কা হতেও পারবেন, ইঙ্গিত করলাম আমি। আর কিছু না হোক্‌……আরেকটা নির্বাচনে লড়তে হলে আরো কত টাকাই তো আপনাকে খরচ করতে হবে। কথাটা তাঁর মনে ধরল। হিসেব করে টাকার অঙ্ক একটা ধার্য করলাম আমরা। দিন কয়েক পরে কাগজে খবরটা দেখে তিনি অত্যন্ত খুশী হলেন:

"মালগুড়ি পৌরসমিতির সভাপতি মহাশয় স্যার ফ্রেডরিক লসির মূর্তিটিকে আজিকে উপহার দেবার জন্ম কিনে নিয়েছেন। তিনি প্রস্তাব করেছেন নতুন যে-জমি সংগ্রহ করা হয়েছে সেখানেই ঐ মূর্তিটি স্থাপন করবেন এবং সেখানে একটি পার্ক রচনা করবেন। পৌর সভায়ও এই প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে যে, কবীর লেনের নাম পাল্টে 'লসি রোড' রাখা হবে।"*

---

*[—শ্রীনারায়ণের লেখা 'লসি রোড' নামক গল্পের তর্জমা]

জোয়ার

উপন্যাস
পরবর্তীর পর

বিজন কুমার ঘোষ

কুঁড়ে খালি। এখানেই লঞ্চের গতি বেঁধে দেওয়া হয়েছে। লঞ্চটা পারের কাছে এসে খুব লক্ষ্মী ছেলের মত দাঁড়াল। বুড়ো মি হাত খুবই ভাল বলতে হবে। একটুও কাঁপল না, বা ধাক্কা খেয়ে আবার জলের দিকে সরে গেল না। কাঠ পেতে দেওয়া হল। কিন্তু আলোক গুণে দেখল সাকুল্যে দশ বারোটি মেয়ে-পুরুষ নেমে গেল। এতক্ষণ ক্রমাগত লোক নামাতে নামাতে লঞ্চটা প্রচুর হালকা হয়ে এসেছে। আবার জলের মধ্যে অনেকখানি বসে যাবে যখন ক্যানিং-এ গোলকুঠির ঘাটে পৌঁছবে।

বিশ্বাস মশাই বলল, আপনের কিছু নাই। ওর নতুন আয়গা। এট্টু ঘুইরা আহেন। লঞ্চ চল্লিশ মিনিট খাড়াইব।

অতএব আলোক উঠে দাঁড়াল।

বুড়োটার নজর এড়ায় না। মিনতির দিকে তাকিয়ে বলল, আপনেও লগে যান। বিল আছে, বিলের মইধ্যে অনেক পাখি বসে। ভালই লাগব। পহরে থাইক্যা আপনের চক্ষু খোয়াইছেন—

বড় বাজে বকে বুড়োটা। তবে মানুষ ভাল। কুঁড়ে খালিতে একটু একা একা ঘুরতে চেয়েছিল। নিজের সঙ্গে একা একা কথা বলার ইচ্ছে ছিল। সিঁড়ি দিয়ে নেমে বাঁধের ওপর পৌঁছুতেই দেখতে পেল মিনতি অতি ধীরে পা টিপে টিপে আসছে। যাক ভালই। মিনতির বুদ্ধি আছে। ও যদি লঞ্চেই বসে থাকত তাহলে বুড়োটার মনে নানা রকম সন্দেহ উঁকি দিত। এক্ষেই দু'জনের মধ্যে বাক্যালাপ নেই। ইতি মধ্যেই বুড়োটা কি ভেবে বসে আছে সে জানে। কিন্তু চুলোয় যাক ওসব। আলোক একটি মারাত্মক ভুল করে বসে আছে। ভুলের মাশুল হিসেবে ক্রমাগত নাচতে হচ্ছে। কি পরম মাটি। পায়ের তলাটা পুড়ে যাচ্ছে। কোথাও ঘাস নেই। বাঁধের মাটি এত তেতে যায় বুঝতে পারেনি। ওর রকম দেখে মিনতি হেসে ফেলল।

—জুতো আনেননি বুঝি!

তাকিয়ে দেখল মিনতির পায়ে স্যাণ্ডেল। ওর দুরবস্থা দেখে কিক কিক করে হাসছে। ডিঙিং করে একটা লাফ দিয়ে বিরক্ত হয়ে আলোক বলল, না আনিনি।

—আমি এনেছি।

—তা তো দেখতেই পাচ্ছি।—আবার লাফ।

—আপনি পাড়াগাঁ ভালবাসলে কি হবে, পাড়াগাঁ আপনাকে ভিটতে দেবে না।

—কি বলতে চাও?

—জুতো জোড়াটা নিয়ে আসুন না। বেশী দূরে তো আসিনি।

—দরকার নেই।—যা ভাবা গিয়েছিল আদলে তা নয়। এ মেয়েটা কথায় ওস্তাদ। তবু হার স্বীকার করে চলবে না কিছুতেই। এপ্রিলের দুপুর। আকাশ থেকে আগুনের গোলা নামছে মাটিতে। উঃ—। পা' রাখা যাচ্ছে না। শেষে বিপদই উপায় বাতলে দিল। বাঁধের ওপর থেকে ছুটতে ছুটতে নিচে নেমে এল। বিলের শুরু এইখান থেকে।

আঃ—কি ঠাণ্ডা জল! জলের অনেকখানি ভিতরে পা' ডুবিয়ে দিল। কি শান্তি! ফুরফুর করে বিলের ওপর দিয়ে হাওয়া উড়ে আসছে। অনেক দূর থেকেই একটা ধ্যানমৌনী বক দেখতে পেয়েছিল, ঠিক এই সময় রঙীন ডানা আর তীক্ষ্ণ ঠোঁট নিয়ে মাছরাঙাটা জলের মধ্যে ডুবে গেল। ঘাড় ফিরিয়ে দেখল মিনতিও নেমে আসছে জলের দিকে। ওর পায়ে জুতো আছে। না এলেও চলত। আলোক ঘাড়ে চোখে মুখে জলের ঝাপটা দিল। শিরশির করছে দেহটা। ইচ্ছে হচ্ছিল একটা গামছা থাকলেই জলে নেমে যেত। কড়কড়ে রোদের মধ্যে ঝিকমিক করে কাঁপছিল পারাটা বিল। মরুভূমির মধ্যে বোধহয় এই রকমই মরীচিকা দেখায়। মাইলের পর মাইল জুড়ে নকল বিল এমনিই ঝিকমিক করে হাসে। নকল মানুষও আছে আমাদের চার ধারে। নিজেরা জুতো পায়ে দিয়ে অপরের দিকে তাকিয়ে হাসে। আলোক চলতে আরম্ভ করল জলের মধ্যে পা রেখেই। আকাশ থেকে আগুন ঝরানোর কামাই নেই। কতগুলি ভীরু মেঘ সূর্যের অতি ঘুরে দিয়ে চলছে।

—ওপরে আসুন না, শামুকে পা কেটে যেতে পারে।—মিনতি আবার সাবধান করে দিল।

—পা' পুড়ে যাবে।

—তাহলে লঞ্চে ফিরে চলুন। চল্লিশ মিনিট কতই বা—

আলোক কিছু না বলে করল না। মেয়েটি আচ্ছা তো! হালকা বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে জানিয়ে দিতে চায় পাড়াগাঁর জল এবং মাটি দুই-ই আপনার পক্ষে অচল। যাক, আবার ওসব কেন? বিলটা বিশাল। অন্তত আলোক এত বড় বিল জীবনে দেখেনি। মহবতপুরেও না। এমন কি একটা নৌকো পর্যন্ত বাঁধা রয়েছে বাঁশের সঙ্গে। অনেক দূরে, তাই নৌকোটাকে আধ হাতের সমান ছোট দেখাচ্ছে। মানুষের সাড়া পেয়ে বকটার ধ্যান ভঙ্গ হল। কক্ কক্ করে ডাকতে ডাকতে বিলের এ মাথা থেকে ও মাথা উড়ে গেল। আলোক ওর চোখের পাতার পাখার বেগটাও অনুভব করতে পারল। হ্যাঁ, এ মাঠা বুনের দেশ। জল থেকে সৈনে তোলা, বন কেটে সাফ করা রাঙা। খবরের কাগজে প্রায়ই দেখে সুন্দরবন নাকি বাঙালীকে একদিন ভাতের আর মাছের শোক ভুলিয়ে দিতে পারে। আপাতত ওই কৃষ্ণবর্ণ লোকটি বাঙালীর অপর কোন শোক ভোলাবার চেষ্টায় আছে। জিজ্ঞাসা করল, কি খুঁজছো?

কোমর সমান জলে দাঁড়িয়ে একটা লম্বা বাঁশ দিয়ে আপন মনে কি যেন খুঁচিয়ে চলেছে। ফিরে তাকাল আলোকের দিকে। উত্তর দেবার প্রয়োজন মনে করল না।

উত্তর দিল মিনতি।

—কি খুঁজছে বলুন তো?

চমকে উঠল আলোক।

—মাছ চাচ হবে হয়ত।

বিলের বাতাস কাঁপিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠল।

—ওই লম্বা বাঁশ দিয়ে কখনো মাছ ধরা যায়? আপনি কিছু জানেন না। কচ্ছপ ধরছে—

—সবাইকে সব কিছুই কি জানতে হবে?

বিলের বাতাস সহসা গম্ভীর হয়ে উঠল।

মিনতি চুপ করে গেল।

অপরাধ! একটা মেয়ের সঙ্গ কতদূর বিষাক্ত হতে পারে আলোক এই প্রথম টের পেল। দিব্যি একা একা ঘুরে বেড়াত চল্লিশ মিনিট ধরে। নিজের মনের সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে কয়েকটি কথা বলত। সবজান্তা বুড়োটার জ্বালায় তা হল না।

—আপনি আসুন।

দেখতে পেল মিনতি ফিরে যাচ্ছে। ফিরে যাওয়ার মধ্যে, প্রতিটি পা' ফেলার আহত বাঘিনীর ভঙ্গী।

আলোক একটা অনুতাপের ছোট্ট শ্বাস ছেড়ে ওর যাওয়া দেখতে লাগল। ফিরে যাবে কি এখন লঞ্চে? ওর পাশে

বলে ছুটো একটা কথার মোচড়ে পরিবেশটাকে ঘুরিয়ে দেবে কি? থাক, ওতে বরং দুর্বলতাটাই প্রকাশ হয়ে পড়ার সম্ভাবনা। কি আর করবে, তীর ছুটে গেছে। সত্যি এক টুকরো আগুন নিয়ে খেলা করতে করতে সমস্ত বাড়িটা-তেই ধরে গেল। এখন বলকল ডাকলে আগুন আরো ঘুঁসে উঠবে। অস্বস্তিতে হয়ে পোষ মানাতে পারছে না। পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। বেশ ছিল বাড়িতে। আলোকই উসকো খুসকো চুল নিয়ে টেনে আনল কুঁড়ে খানিতে। সম্পূর্ণ অজানা অচেনা পরিবেশে। কি দরকার ছিল এত নাটক সৃষ্টি করবার? মিনতি না হয় সারাটা পথ নিঃশব্দ ছিল। কিন্তু আলোকও কি খুব ভদ্রোচিত ব্যবহার করেছে? আলোক দেখতে পেল মিনতি বাঁধের ওপারে চলে গেল। এইবার পা' টিপে টিপে কাঠের সিঁড়িতে উঠবে। ওর ওঠা দেখে এবং পাশে কাউকে না দেখে বুড়োটার চোখ ঝিলিক মেরে উঠবে।

নাঃ দুর্বলতা ধরা পড়ার মত লজ্জা আর নেই। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ঘড়িশ মিনিট ঘুরোতে এখনো বাইশ মিনিট বাকী। দূরে একটা দোকান দেখা যাচ্ছে। ওখানে কি চা পাওয়া যায়? জল পিপাসা পেয়েছে। সেই যে চোখে মুখে জল দিয়েছিল, শুকিয়ে গেছে। আবার উবুড় হয়ে কাপটা দিল। ভাল লাগছে না। সত্যি, কাদার মধ্যে ভাঙা শামুকে খোঁচা খেল। মিনতি ঠিক বলেছিল। পাটা জলের ওপর তুলে দেখল দরদর করে রক্তপড়ছে। সেপটিক হতে পারে। লকে যোধবর ডেটল পাওয়া যায়। ভাবতেই ঈষৎ সন্তুচিত হল। পাড়াগাঁয়ের লোকেরা এ সবের ডেটলের খোঁজ করে না। খানিকটা গাঁদাপাতা বেটলে রস করে লাগিয়ে রাখে। সেপটিকের ভয় কললে ওদের চলে না। কিন্তু আর এগোন যাবে না। বিলটা এইখানে এসে ঘুরে গেছে। দোকানে যেতে হলে খাটিতে পা' রাখতেই হয়।

অতএব ফিরল। বেজায় খানার মত টলমল করছে বিল। ভারী পিপাসা পেয়েছে। এক আঞ্জলা তুলে মুখে দেবে কি? এখানে নিশ্চয়ই ঘরে ঘরে টিউবওয়েল নেই। আলোকের বই পড়া জ্ঞান বলে বিল টলমল করলেও এই জলে লক্ষ লক্ষ জীবাণু। কুঁড়ে খানির সরল অধিবাসীরা সেই বইএর পাতা আলো ওল্টায়নি। তাই পসারী কিংবা ছায়া কিরি করতে এলে দেখা যাবে বৌ-ঝিরা কলসী কাঁখে এই বিলের দিকেই আসছে। আর তখন হয়ত দূরের কোন রসিক রাখালের বাঁশরী কথা কয়ে উঠবে, জলের ছায়াতে কি মায়া গো—

—বিল ভাবলেন?

বুড়োটা দোতলার সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে।

—হ্যাঁ, দেখলাম।

—কেমন?

—ভালই।

—তবু কইছিলাম না কর্তা—বুড়োর চোখ পিট পিট করল: শহরে থাইক্যা আপনের চক্ষু—

বিরক্তি লাগল। সারে পড়া খাজুরি আলাপ। কথাটা অন্য কাউকে বললেও মানাত। দেখবার চোখ কে হারিয়েছে, আলোক না মিনতি? আশ্চর্য! বুড়োর রং পর্যবেক্ষণ করবার আর সময় নেই। আপাতত বাচাল বৃদ্ধের প্রলেপটাই বেশী দরকার। মিনতিকে বলল, তুমি হঠাৎ চলে এলে?

—এমনি।

—তুমি থাকলে দোকানে গিয়ে একটু চা খাওয়া যেত।

—পেলেই পারতেন।

—তুমি ছিলে না।

হাসল মিনতি।

—আমার জন্যে, না পায়ে জুতো ছিল না সেইজন্যে?

আর কথা বাড়াল না। কি দরকার? গতকাল কেয়ার কাছে যে আঘাত পেয়েছিল তার তুলনায় এতো কুসুমদল। তবে সারাটা পথ যথাসাধ্য ভদ্র ব্যবহারই করে যাবে। একবার কোন রকমে বনবাসী নগর রোডে পৌঁছে দিতে পারলেই

হয়। তারপর 'চিরস্থায়ী মুক্তি। দু'জনের সঙ্গেই মিশে মেখেছে। আলোকের কাছে ওরা রঙিন কাচ ছাড়া আর কিছুই নয়। আসল হীরকের সন্ধান করে যাবে জীবনভোর। যদি না পায়, দুঃখ নেই। শুধু রঙিন কাচ দিয়ে শূন্যস্থান পূরণ করবে না।

ইঞ্জিনঘরের শব্দ পুনরায় প্রখর হল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল চল্লিশ মিনিট কখন নিঃশেষ হয়ে ঝরে গেছে। দিঁড়ি ও নোঙর এক সঙ্গে তুলে নেওয়া হল। বুড়োটা ষ্টিয়ারিং ধরবার আগে প্রণাম করল। নীলবর্ণ খালাসী ওদের জন্যে দু' গেলাস জল বয়ে নিয়ে এল। সেই সঙ্গে চাও। শঙ্কর বাবুর কল্যাণ হস্ত এত দূরেও প্রসারিত। টাদার জল টালি গন্ধে এসে সরু সুতো হয়ে যায়। যদিও সমুচ্চশীলতাই জলের ধর্ম। যন্ত্রের ব্যাপারে তা সব সময় খাটে না। মানুষের বেলায় যত ঘুরে যাওয়া যায় ততো বেড়ে যায়। এই যে কাল থেকে ঘোড়ো হাওয়ার মত কেবলি উদ্দেশ্যহীন ঘুরে মরছে, তাতে যে কোন সময় একটা বিপদ ঘটতে পারত। ঘটেনি তার কারণ ওই ঘোড়ো হাওয়ার মধ্যে মায়ের আশিস অলক্ষ্যে অনুসরণ করছে।

পিরা ওঠা বুড়োর হাত ষ্টিয়ারিং-এর ওপর আড়াআড়ি চেপে আছে। শঙ্খ এখন জোরে ছুটছে। দৃশ্যাবলী দ্রুত অপসৃয়মান। ভাল লাগছে। আকাশে হেলান দিয়ে চায়ের কাপে কল্যাণ হস্ত অনুভব করা। জীবন কত দূর পর্যন্ত প্রসারিত, কত বিচিত্রগামী। আমরা গণ্ডীবদ্ধ জীব, কতটুকুই বা খবর রাখি। আলোকের ক্যালেণ্ডারে এই দিনটি, এই মুহূর্তটি আর কখনো খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমনি করেই শিপরের প্রাচীন ঘড়ির বালির মত কোটার কোটায় জীবন ঝরে যায়। মুহূর্ত গুলি নৈশ আকাশের আত্মহত্যাকারী তারকার মত দ্রুত খসে পড়ে। এই ভাবেই দিন যায়। মাস আসে। বছর ঘুরে যায়। একটি ক্যালেণ্ডার টাঙানো থাকলে সেখানে নতুন ডিজাইনের ক্যালেণ্ডার ওঠে। তারিখ গুলোতে ধুলো জমে আস্তে আস্তে। একটি নতুন শিশুর কান্নাও পাখির গানের মত সুরেলা হতে পারে। কাকের মত কর্কশও হয় ওই শিশুর-ই। তারপর সময় ঘনিয়ে আসে। কোন কোন মানুষ শেষ বেলাকার ঘন্টা ধ্বনি অনেক আগে থেকেই শুনতে পায়। যেমন আলোক। অতি ছেলেবেলায় কাকার মৃত্যু দেখেছিল। কলেরায়। মুখের চেহারা কি করুণ হয়ে গিয়েছিল। কাছে আসতে পারেনি। আলোক দাদার হাত ধরে ঘোরানো বারান্দা থেকে সভয়ে উঁকি দিয়েছিল। জল জল করে শেষ দিকে কি চিৎকার! সেই ঘরে যেতে পারতেন বাবা মা ডাক্তারবাবু আর কম্পাউণ্ডারবাবু। আলোক ঢুকবার আগেই জ্যেঠামশায় বিদায় নিয়ে চলে যান। বাবার মৃত্যু তো চোখের ওপর দেখল সেদিন। শান্ত নিরুদ্বিগ্ন বাবার জীবন রেখায় কতকগুলি চিড় খেয়ে গিয়েছিল। দোতলায় আলোকের ঘরেই বাবা শেষ কটা দিন ছিলেন। মাথার কাছে মা, পায়ের কাছে আলোক—সমস্ত ক্ষণ এই ভাবেই কেটেছে। কলকাতা থেকে দু'জন সেরা ডাক্তার এসেছিলেন। আলমারীর মাথার সারি সারি ওষুধের শিশি। আপেল কমলালেবু যোগানো। শেষ দিকে বাবা কিছুই ছুঁতে চাইতেন না। হয়ত বুঝতে পেরেছিলেন আর বেশী দেরী নেই। শিয়রের দিকের জানালাটা খোলা রাখতে বলেছিলেন, যেন ওই পথ দিয়ে উনি চলে যাবেন। সেই যে কদম গাছটা, যাকে বাবা কন্টাকটরের করাত থেকে বাঁচিয়ে ছিলেন, কৃতজ্ঞতায় বিগলিত হয়ে এক রাশ ফুল পাতা আর সুগন্ধ দিয়ে ঘরের ভিতর অনেক খানি চলে এসেছিল। বাবার দুই চোখের পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছিল। আলোক জানে বাবার কষ্টের সঙ্গে পুলকদাদা পূর্ণিমাদিদির বেদনা মিশে গিয়েছিল। তাই অত জল ঝরেছিল দুই চোখে।

পুলকদাদার মৃত্যু চোখে দেখতে হয়নি। বহরমপুরে

থাকতেই মাত্তি পিওন টেলিগ্রাম এনে দিয়েছিল। সেদিনটা আলোকের মনে কতগুলি শব্দ অদ্ভুত ভাবে দাগা দিয়েছিল। ইংল্যাণ্ড, ডেভনশায়ার, দুমার রক্ত। দুর্গোলের জ্ঞান তখনো পরিপক্ক হয়নি। সবকিছুই তখন রহস্যময়। বন্ধুর বাড়ি থেকে দুমার ঝড়ের মধ্যে দিয়ে পড়লই বা কেন? গলায় একটা সতীর নীল দাগ। কেন? পুলিশ তুফুর শুকতে শুকতে কত দূর পর্যন্ত গিয়েছিল? শেষে কি দুমার ঝড়ের ভিতর আততায়ীর সব চিহ্ন মুছে গেল?

পুলিমাদিদির কথা ভাবলে আলো গায়ে কাঁটা দেয়। জীবন যৌবন ধনমানের সঙ্গে পদ্মপত্রে নীরের উপমাটা বিশেষ করে মনে পড়ে। চোখের পলকে একটা জীবন্ত ফুল হাওয়ায় মিলিয়ে গেল। ট্রেনের চাকায় থেৎলে যাওয়া, ছিন্ন বের হওয়া বিভৎস দেহটাও আলোককে দেখতে হল। সেদিন হালদার চাকুরিয়ার যেন আর মানুষ ছিল না। সব এসে জড়ো হয়েছিল ওদের পুলক-পুলিমা ভিলার সামনে। সেদিন ওরা অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছিল। যেন কিছুতেই বিশ্বাস হতে চাইছিল না আগাগোড়া ফুল দিয়ে সাজানো ছবির মত বাড়িটার অন্তরে কোন দুঃখ থাকতে পারে।

হ্যাঁ, এই কটি মৃত্যু আলোক খুব কাছ থেকে দেখেছে। আরো অনেক রকম মৃত্যু আছে, যেমন হরিপদর মা, পরেশের দিদিমা, ওপাচার সুবল বোষ্টম ইত্যাদি। কিন্তু ও গুলি নিছক সংবাদ হয়েই এসেছিল। কাছের হোক আর দূরের হোক - মৃত্যু মৃত্যুই। তবু আমার শরিকের মৃত্যুর রূপ আলাদা হয়। খবরের কাগজে তো প্রায়ই দেখে অমুক জায়গায় বোমাবর্ষণে পাঁচ শো নিরীহ লোকের মৃত্যু। কিম্বা কয়দিন আগে অস্ট্রেলিয়ার কাছে একটা সুদ্র দ্বীপ পাঁচ হাজার অধিবাসীসমেত সমুদ্রে তলিয়ে গেল। রেডিওতে গান শুনতে শুনতে কানে পাখির পালকে সুড়সুড়ি দিতে দিতে আলোক খবরগুলির ওপর চোখ বুলিয়েছিল মাত্র। নিতাই যখন চোখ বড় বড় করে বর্ণনা করছিল, জানো দাদাবাবু, সুবল বোষ্টম উই কদমবার হোথা থেকে কি রোববারে এসে থাকে গান শোনায়, তেরাসের তলায় পড়ে মইরে গিয়েছে; আলোক তখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে টাই বাঁধছিল। নিতাই বোধহয় কিছু একটা উত্তর পেতে চায়, সেইজন্যে ওকে খুশি করবার জন্যেই বলেছিল, শহরে গিয়ে ট্রামে চাপা পড়বার কি দরকার ছিল? তুই কিন্তু খবরদার শহরে যাবিনে বুঝলি?

নিতাই অনেকটা অবাক হয়েও ঘাড় কাৎ করেছিল। যে মরল তার সম্পর্কে একটিও কথা নেই, আরেক জনকে উপদেশ। হরিপদর মা রোজ সকালে ওদের বাড়িতে দুধের যোগানি দিত। একদিন হঠাৎ খেয়াল হল বুড়িটা আসে না কেন মা?—ও মা তুই আজ বলিস, বুড়ি তো মাস চারেক আগেই মারা গেছে!—সুতরাং এ হল এক ধরণের মৃত্যু, যার সঙ্গে কিছুতেই একাত্মতা অনুভব করা যায় না। দাঁত মাজার ব্রাশটা হঠাৎ কাকে দিয়ে যাবার মত অথবা ধরার দিনে কিউের পর দু পয়সা বাড়ার মতই অনিবার্য কিন্তু বিশেষত্বহীন খবর। তার জন্যে এক মিনিটও চিন্তা করা মানে সময়ের অপব্যবহার। কিন্তু আলোক যে চোখ মেলেই যাদের কাকাকে দেখতে পেয়েছে, পুলকদাদা পুলিমা দিদির সঙ্গে খেলতে খেলতে এত বড়টি হয়েছে। প্রিয়জনের মৃত্যু, যাঁরা বেঁচে থাকে তাদের ভিত্তি ভূমিকেই টলিয়ে দিয়ে যায়। ভাবতে শেখায়, তোমার দিনও ফুরিয়ে এল হে। মানুষ এই বোধটাকেই ভয় করে সব চাইতে বেশী। জন্মের পর মুহূর্ত থেকে একটিমাত্র আকাঙ্খাই অধিক যন্ত্রণা দেয়, তা হল বেঁচে থাকার ইচ্ছে। গাছের পাতা কি হলুদ হবার আগেই ঝরে পড়ে কখনো?

পর পর অতি কাছ থেকে এতগুলি মৃত্যু দেখার ফলে আলোকের মনে ইতিমধ্যেই জীবন সম্পর্কে কেমন একটা মনোরম উদাসীনতা জন্মে গেছে। প্রত্যেক মানুষের মনেই হয়ত এই ভাবটা পালে বছর বাটেক পেরিয়ে, কিন্তু আলোকের বেলায় অনেক আগেই এসে গেছে। আলোক তাকে শ্রদ্ধা

করে। বলে না, এখন বিদেয় হও, এসো যখন চশমার সামনে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে শ্রীশ্রীগীতা পড়তে পারব তখন। আলোক লক্ষ্য করেছে বিদায়কালীন এক রকম হাসিখুশী আছে, যা অন্য কোন সুখের সঙ্গেই তুলনা চলতে পারে না। সকালের সঙ্গে বিকেলের যা তফাৎ, প্রথম কান্নার সঙ্গে কিছু বলতে গিয়ে ঠোঁট থেকে যাওয়ার মত পার্থক্য কেন্দ্র করে ওই হাসিখুশী বেজে ওঠে। আর মহাকাল তার সঙ্গে সঙ্গত করেন। আলোক পড়ন্ত আলোয় এই নদীর বুকে চোখ বুজে সেই সুর শুনে যাচ্ছে। হাসিকান্না যেমনা পাওয়া না-পাওয়ার সব বোঝা এই সুরের স্রোতে ভেসে অনন্তে চলে যাচ্ছে। বড় মধুর! মধুর!! পৃথিবীতে বেঁচে থাকার মত শাস্তি আর নেই। মৃত্যু আছে তাই বেঁচে থাকার এত আনন্দ। মৃত্যুহীন বেঁচে থাকাটা কেমধানার মত এক ঘেয়ে। বেরোবার পথ নেই। শুধু প্রাচীরের গায়ে অনন্তকাল মাথা কুটে যাও। ভাবা যায় না। অতএব চলে যাওয়াটা যাতে সুস্থ স্বাভাবিক হয় সেই জন্য বিদায়-সঙ্গীত এত মধুর। সেই সঙ্গীত অতি ধীরে একদিন বেজে ওঠে হৃদয় গহনে। কান পেতে থাক, শোন আর রোমাঞ্চিত হও মধুর মধুর শব্দের অবিরাম আঘাতে। তোমার ভিতরের সুরের সঙ্গে অনন্তের সুর এক হয়ে লীন হয়ে যাক। দেখো এ সময় অনর্থক চেঁচামেচি কান্নাকাটি করে মহাকালের অমোঘ সঙ্গীত তাল কেটে দিও না। বাকী রয়ে গেল বলে দুঃখ? তা আমি বলছেও যদি বাকী থাকে তাহলে হাজার বছরেও পূর্ণ হবার নয়। তাই চটপট বুঝে নাও, শুনে নাও, দেখে নাও। কেননা, জীবন দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায়। যদি সময় কারো আরো কম থাকে, তাহলে আন্দাজে ইঙ্গিতে রহস্যে বুঝে নাও। শুধু কি শেষ হবার? কিছু বাকী থেকে যাবেই। পূর্ণতা মৃত্যুর চাইতেও ভয়াবহ।

আলোক চায় পাশটা তাকিয়ে দেখল শেষ বারের মত। দুপুরের রোদে বিকেলী রং লেগে গেছে। ছায়া দীর্ঘ হতে শুরু করেছে। আকাশে বাতাসে নদীর জলে যেন সেই উচ্ছ্বাস আর নেই। অপরিচিত বিষণ্ণতা আস্তে আস্তে গ্রাস করে নিচ্ছে সব কিছু। সেই বিষণ্ণতার বিশাল পক্ষপুটে আলোক ও ঢুকে যাচ্ছে ক্রমে ক্রমে। মুক্তি। যেন দৌড়ে পালাবার মত ইচ্ছেও নেই। আলোক অলস ভঙ্গে ডেকের চেয়ারে আধ শোওয়া। ওই যে গোল কুঠি দেখা যাচ্ছে। লোকজন এখন আর বেশী নামছে না। উঠছেই কেবল। কলকাতার বাবুদের জন্য দুধ ছানা মাছের বাঁক একতলা পূর্ণ হয়ে দোতলাও উঠে এসেছে। ক্যানিং প্রথার একটা বিদ্যুতে অবয়ব পেল। জানালা দিয়ে কে ওলার শোর গোল ক্রমশই পাকিয়ে উঠছে। জল ভ্রমনের পালা আর কিছুক্ষণের মধ্যেই শেষ হবে। কিন্তু এর স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে কত মাস কত বছর লাগবে? প্রকৃতির পরিবেশে একটা বিশেষ কথা বলতে ট্যাক্সি ট্রেন লক্ষ যোগে এত দূরে এসেছিল। বলতে গেলে কোন বাধাই ছিল না কুঁড়ে খালির সেই নির্জন বিলের ধারে। তবু বলা হল না। বরং দু'জনেই মৌন থেকে দু'জনের মনের কথা আরো তীব্র আরো তীক্ষ্ণ করে বলে নিয়েছে। মিনতি যদি হঠাৎ বলে বসত, এই তো প্রকৃতির পরিবেশ, এর চাইতেও নির্জনতা চান? তখন কিছুই বলার ছিল না। কেন না, বলতে গিয়ে দেখতে পেত দীর্ঘস্থায়ী মৌনব্রত অবলম্বনের ফলে এবং দু' চারটে দুর ছিটোন কথার ধাক্কা দিয়ে সব বলা হয়ে গেছে। এই ভাল। না-বলা বাণীর মধ্যেই অনেক বেশী বলা যায় এটা আবিষ্কার করতে পেরে আলোক খুশি হল। তার চাইতেও বড় আবিষ্কার, মিনতিকে এত দিন যা ভেবেছিল আসলে তা নয়। শান্ত স্নিগ্ধ ইত্যাদি পাড়াগেঁয়ে দীঘির উপমাগুলির সব মিথ্যে আর কিছু হতে পারে না। বরং অপুষ্টিতে ভরে যাওয়া একটি কালো মেয়ের চোখে আত্মমর্যাদার দৃপ্ত আগুন দেখতে পেয়ে চমকিত হল। ভাবতে পারেনি আলোক। যেন বনমালী নস্কর রোদের জোয়ান অব

আর্ক। লড়াই করতেই জানে কেবল। আলোক এতদিন বিনতিকে নিজের মত করে ভেবে নিশ্চিন্ত ছিল। তাই যখন তখন ওর কাছে গিয়ে যা খুশি বলার সাহস সহজ হয়ে গিয়েছিল। আজ যাত্রা দেখব, কাল থিয়েটার, পরশু বেড়াতে যাব—যা ইচ্ছে হচ্ছে অমনি জানিয়েছে ভাবনাচিন্তা না করেই। ঠিক কথা, ওর সুবিধে অসুবিধের দিকে ততটা নজর দেয়নি। দেয়নি কেননা প্রয়োজন বোধ করেনি, কিন্তু কেয়ার বেলায় অত সহজে বলতে পারত কি? ওর ইচ্ছে অনিচ্ছে ছিল। ভাল না লাগলে বলে বলত, বোগাস। আর একবার না করলে হাঁ করাতে মুশকিল ছিল। তবু আলোক কি মিনিটের পর মিনিট ধরে যুক্তির জাল ছড়ায়নি ওর কাছে? শেষে কেয়া যাড় কাৎ করলে আলোক কি খুশিতে গান গেয়ে ওঠেনি? যাক, যা হবার হয়ে গেছে। জয় মুক্ত তীর। এখন বাস্তবকে সযত্নে অনুধাবন করাই বুদ্ধিমানের কাজ। না না, অনুধাবন করারও প্রয়োজন দেখতে পাচ্ছে না। ভুল চিরকাল মধুর ভুল হয়েই থাকুক। ভুল সংশোধনের জন্যে সময় নষ্ট না করে বরং আরেকটা ভুল করা ভাল। ভুলের পর ভুল করতে করতে এবং সেটা বুঝতে বুঝতে পেরিয়ে যাওয়ার নামই জীবন। আমার সামনে উনিশটা ভুল পথ, একটা মাত্র ঠিক পথ। উনিশটা পথ দিয়ে ঘুরে ঘুরপাক খেতে খেতে তবেই না ওই ঠিক পথে আসব। এর মধ্যে কত বৈচিত্র্য, ভয়, সংশয় ক্লান্তি দীর্ঘশ্বাস জড়াজড়ি করে আছে। আর এগুলি না থাকলে জীবন কত দরিদ্র হয়ে পড়ত। অনেক সময় ঠিক পথে আসাও হয়নি। ঘুরতে ঘুরতেই সময় ফুরিয়ে যায়। আমরা বৈচিত্র্য, ভয় সংশয়, ক্লান্তি দীর্ঘশ্বাসকে অত্যন্ত ভয় করি। এগুলিকে সর্বদা পাশ কাটিয়ে যেতে চাই। কিন্তু ওগুলি মনের সঙ্গে জোকের মত আটকে থাকে। ভয় তাড়ালে সংশয় আসে ক্লান্তি দূর করলে হতাশা ভর করে। এ এক জ্বালা! মুক্তি পেতে চাইলেও এর হাত থেকে নিস্তার নেই। রাবনের মায়ার মত একটা জোঁক সরালে আরেকটা জোঁক হাজির হবে। আমরা চাই আর না চাই। তবু এগুলি মেঘের মধ্যে বিদ্যুতের চমক নয় কি? সাপের মাথার মণির মত ভয়ংকার সুন্দর নয় কি, যে মানুষ খাটে শুয়ে থাকে তা মাংসপিণ্ড মাত্র। আর যে বৈচিত্র্য, ভয় সংশয় ক্লান্তি দীর্ঘশ্বাসের দোলায় দুলতে থাকে সে ই প্রকৃত জীবনের অধিকারী। ভুল ভুলই। নির্বোধেরাই তা সংশোধনের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আপশোস করে মরে ভুলের জন্যে। সুতরাং আলোক ও পথে যাবে না। কেয়া এসেছিল চলে গেছে। বিনতির যাবার ঘণ্টা বেজে গেছে। পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিস থাকে যা মেলাই করা যায় না। তা তোড়াতাড়ি যায়। দু'দিন পরেই ফেলে যায়। অতএব আলোক লক্ষ্মী ছেলের মত হালদুতে ফিরে গিয়ে আরেকটি ভুলের জন্যে অপেক্ষা করবে। সেই ভুলটা কোন্ দিক দিয়ে কি ভাবে আসবে জানে না। কিন্তু আসবেই এটুকু জানে। অতএব ভুলের জয় হোক! আলোক চমকিত হল। চিরকাল নিন্দিত ভুলের কে এমন ব্যাখ্যা করতে পারে জানা ছিল না। পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখ মুছে ভাল করে তাকাল। মনে হল সব কিছুই যেন ভুলের ফসল। ওই আকাশ বাতাস নদী পাহাড় সমুদ্র—যার গোটা পৃথিবীটাই কি এক প্রকাণ্ড ভুলের গোয়ালে তৈরী। হঠাৎ একদিন অন্য একটা গ্রহের আকর্ষণে সূর্যের শরীর থেকে খানিকটা ঘাসে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে সূর্যের চারদিকেই ঘুরতে থাকে। শেষে ঘুরন্ত ছেলে ঠাণ্ডা হয় এক সময়। বাতাস বয়, বাষ্প ওঠে, মেঘ জমে। নদী বয়ে যায় সাগরে। নবুজ গাওলা জমে ঘাটের কিনারে। তার পর ব্যাঙাচির মত দেখতে এ্যাদিবা—পৃথিবীর প্রথম প্রাণকণা—কোন মন্ত্রী এসে জিভে কেটেছিলেন কি সেদিন? যেমন জাহাজ ভাসাবার সময়, কি তুলসী গাছ রোপনেও যাদের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মোট কথা পরিবর্তনাহীন একটি বিরাট ভুলের মহান ফসল আমাদের এই পৃথিবীটা। তেমনি ছোট পরিসরে

আলোককেও কেন পরিকল্পনাহীন ভুলের ফসল বলা যাবে না? অতএব পিতা পিতামহ প্রপিতামহ হয়ে যে ভুলের প্রবাহ চলছে, তার মধ্যে আলোকের এই তুচ্ছ অতি সাধারণ ভুলের জন্যে শোক প্রকাশ করার মত বোকামী আর নেই। আর সব ভুলই তো ঠিক মনে হয় প্রথমে। সুতরাং বুঝবেই বা কি করে। ভুল করেই ভুল চিনবে। সকাল বেলার শালিখ প্রচুর ভুল বকে। তবু কি সুন্দর। পৃথিবীটাও সুন্দর। কিন্তু সবার চাইতে সুন্দর আলোক নিজেই। কেননা, সৌন্দর্য উপলব্ধি করবার মত চোখের পেছনে ওর বোধ কাজ করেছে। মুহূর্তের ভুলের জন্য এতগুলি আশ্চর্য জিনিষের সৃষ্টি হয়ে গেল। তাহলে একথা বলা যায় না কি, ভুলই আসলে ঠিক, ঠিকগুলি আসলে ভুল?

জলে জলে ঘই ঘই করছে যাওলা নদী। জোয়ার। নিঃসঙ্গ গোল কুঠিটা ছাড়িয়ে গেল। এখন গোলকুঠির ঘাটে লঞ্চ দাঁড়াবে না। প্রচুর জল আছে তাই বাজারের ঘাটে ভিড়তে কোনই অসুবিধে হবে না। শেষ বারের মত দেখে নিল গোলকুঠি গোল কুঠিও আলোকের দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত রুমাল নাড়ল। যেন বহু দিন বহু বছর অপেক্ষা করার পর একজন সত্যিকারের আপনজনকে বিদায় জানাল। আলোক মনে মনে বলল, আসব আবার আসব।

ক্যানিং এখন সরগরম। বিকেলের বাজার বসেছে। লোকজনের চিৎকার কানের পরদায় চোকা দিচ্ছে। আখের রস অনেকক্ষণ ধরে জাল দিলে যেমন ঘন বাদামী রং ধারণ করে। তেমনি রোদের রং হয়েছে। জল অতি পরিষ্কার। ঢেউ নেই। তবে ওপরের দিকে তির তির করে কাঁপছে। লঞ্চের বেগ কমে এসেছে। গাঙচিলের ঝাঁক উড়ে গেল মাথার ওপর। আলোক দেখতে পেল একটি পালক আকাশ থেকে ধীরে ধীরে নামছে। সোজা ভাবে নয়, মাঝে মাঝে হাওয়ার বেগে খানিকটা এগিয়ে যাচ্ছে। এবার জলের সীস ছুঁয়ে ফেলল। ভেসে চলল। গাঙশালিকের শরীরের কোন কিছুই অপচয় হয় না। সমুদ্রে যাবার জন্যেই যেন ওর জন্ম।

আলোক ঘাটে এসে একবার শঙ্করের খোঁজ নিতে গেল। যাবার আগে ওর সঙ্গে একবার দেখা করে যাওয়া ভাল। চমৎকার ছেলে। যখন শুনবে মৃণালদার বন্ধু দেখা না করে কলকাতায় চলে গেছে, দুঃখ পাবে। অফিস ঘরের সামনে সেই বুড়ো সারেং-এর সঙ্গে আবার দেখা।

—শঙ্কর বাবুরে বিচরাণ? হারে অখন পাইবেন না।

—কেন কোথায় গেছে?

কইলকাতায়। হাস্তিরে কলেজে পড়ে শঙ্করবাবু। বড় ভাল পোলা—

আলোকের চট করে মনে হল, ভাল পোলারা কি বেশী দিন এখানে পড়ে থাকতে চায়? অভিজ্ঞতায় দেখেছে এরা মুক্ত প্রকৃতির লবণাক্ত গায় ততদিন যতদিন না এদের কিছু জোটে। পাখা গজানো পর্যন্ত এরা অপেক্ষা করে। পাখা গজালেই বিরাট আকাশ ফেলে উড়ে চলে যাবে ছোট ডানহোলী জোয়ারে। ঠোঁটে থাকে ভুল ইংরেজীর অ্যাপ্লিকেশন। আলোকের হাড়ে হাড়ে চেনা আছে। এরা বর্ণচোরা। মিনতিদের জাত।

মিনতি অবশ্য মুগ্ধ হল বুড়োর মুখে এই কথা শুনে। যেন পরিমলেরই ছোট ভাই। একলা বিদেশ বিভুঁই-এ লড়াই করে চলেছে। হয়ত কেউ নেই। কিম্বা ওর ছোট ভাই আছে। দীঘির পারে লম্বায় একটি ঘর ভাড়া নিয়েছে। সকালে লঞ্চ কোম্পানির অফিস ঘরে এসে বসে। দুপুরে ফিরে নিজেই রান্না চাপায়। তার পর বিকেলের ট্রেনে কলকাতায় যায় পড়তে আহা, এবার পরিমলের সঙ্গে দেখা হলে বলবে ক্যানিং-এ গিয়ে তোমার ছোট ভাইকে দেখে এলাম। পরিমল খুসি হবে। কোথাও যদি শোনে কেউ প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে লড়াই করছে, বড় হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করছে, পরিমলের মন শ্রদ্ধায় নুয়ে আসে।

কিন্তু—বিষম খেল মিনতি। পরিমল যখন জিজ্ঞাসা করবে তুমি ওর সঙ্গে কি আলাপ করলে। তখন কি উত্তর দেবে? সত্যি বড্ড অন্যায় হয়ে গেছে। আলোকের জন্যেই। আলাপ করিতে দেয়নি। প্রথম থেকেই কি রকম যেন তাচ্ছিল্যের ভাব দেখিয়ে এসেছে। যেন ভেবেছে, মিনতি ওর পা' জড়িয়ে ধরে বলবে, ওগো আমাকে উদ্ধার করো। সে কথা যদি ভেবে থাকে তাহলে চরম ভুল করেছে। মিনতি সে মেয়েই নয়।

স্টেশনে এসে চক্ষু চড়ক গাছ। ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ছে। আর মাত্র মিনিট পাঁচেক বাকী। এদিকে লম্বা লাইন। ফার্স্ট ক্লাশ থার্ড ক্লাশের জন্য একটাই মোটে কাউন্টার। লোকগুলি করছিল কি এতক্ষণ? আলোক এসব লাইন টাইনকে অতি ভয় করে। লাইনে দাঁড়ানোর চেয়ে টাকের ওপর ঝাঁপ দেওয়া ভাল। কিন্তু মিনতিই জট ছাড়িয়ে দিল, দাঁড়ান আমি কাটছি। সেকেণ্ড ক্লাস্। টাকা দিতে দেল। বলল, থাক আমার কাছে আছে। একটু পরেই দু'খানা টিকিট নিয়ে বেরিয়ে আসতে দেখে হালকা লাগল। লাইনটা তখনো কচ্ছপের মত ঈষৎ নড়াচড়া করছে। এদিকে হুইসল বেজে উঠল। গার্ড সাহেবের সবুজ নিশান। আলোক শেষ বারের মত জানালা দিয়ে তাকাল। ট্রেনের চাকায় চাকায় উত্তেজনা। অনেক স্মৃতি ছড়িয়ে রইল এখানে। শেষ বেলাকার রোদে কেমন করুণ হয়ে উঠেছে সব কিছু। বিদায় মাতলা নদী, ক্যানিং টাউন। বিদায় গোলকুঠি। বিদায়!!

বাড়ী থাকল লোহার গেটে করুণ শব্দ।

এই শব্দটাকে আলোকের দারুণ ভয়। তাই রিকশা থেকে নেবে লোহার গেটে হাত রাখতে গিয়ে ভিতরে ভিতরে একবার চমকে উঠল। কেননা এই শব্দ বড় অদ্ভুত ধরণের। একেবারে হৃৎপিণ্ডের ওপর আছড়ে পড়ে। আর সেই সঙ্গে অনেক আলোছায়াঘেরা কথা নদীর মত কলকল করে ওঠে। ভেবেছে, একদিন মিস্ত্রিকে ডেকে এই শব্দটাকে থামিয়ে দেবে। পারেনি। কারণ শব্দটা আলোকের বিবেক। তাই এবারও সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে হাতটা বাড়াতেই বেহালার ছড় টানার মত দীর্ঘ করুণ শব্দ উঠল। দোতলার জানালাটা সঙ্গে সঙ্গে খুলে গেল, ও মা খোকা—

নিতাই তিন লাফে ছুটে এল, দাদাবাবু দাদাবাবু—

আলোকের যেন ফেরার কোন প্রকার সম্ভাবনাই ছিল না। বারান্দায় উঠে দাঁড়াতেই পূর্ণশশী দেবী এগিয়ে এসে কপালে হাত রাখলেন। মুখে দারুণ উদ্বেগের ছাপ।

— এ কি খোকা, কি হয়েছে বল তো?

— কিছু হয়নি মা।

— আমার কাছে লুকোস নে খোকা।—ছেলের এক খানা হাত তুলে নিলেন। আহা, সদ্যবয়সী কেউ নেই বাড়িতে যে প্রাণের সুখে কথা বলবে। তাই অনেক কথা চাপতে চাপতে কথা কম বলা যাহার স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে। কিন্তু খোকার মুখ চেয়ে পরিষ্কার করে সব কিছু জানতেই হবে। কি কষ্টে যে দুটো দিন একটা রাত কেটেছে এক অন্তর্যামীই জানেন। কোন দিন তো এমন হয়নি। এমন কি অফিসে যাবার সময়ও ফুল থাকে, মা চললাম।

আলোক বারান্দার একপো পাওয়ারের বালবের নিচে চুপ দাঁড়িয়ে। কি উত্তর দেবে বুঝতে পারছে না। মা জানেন সবই, শুধু কি করে বলে কাল চন্দননগরে গিয়েছিলাম আজ ক্যানিং টাউনে প্রকৃতির পরিবেশ খুঁজতে। যদি সফল হয়ে ফিরে আসত তবে না হয় চোক গিলে মুখটা লাল করে বলেই ফেলত। তার উপায় নেই। মা এক দৃষ্টে সন্ধানী আলো নিয়ে তাকিয়ে আছেন। এড়িয়ে যাওয়া চলবে না এটা বুঝতে পারল। এমন কি নিতাইও এমন অবাক চোখে চেয়ে আছে যেন ওর সাথের দাদাবাবু এই মাত্র মঙ্গল গ্রহ থেকে ফিরে এল। ওর ভেজা হাত দুটোর দিকে তাকাতেই জল

পিপাসার কথা মনে পড়ল। ইসারায় জল চাইল। নিতাই এই রকমই একটা কিছু হুকুম চাইছিল। সুতরাং মুহূর্তে ও রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। পূর্ণশশী দেবী হাতটা ধরেই রইলেন। আহা ঠোঁট দুটি শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে বাছার। জল খেয়ে নিক। পরে না হয় সেবা করবেন। সত্যি, এত বছরের জীবনে এ রকম অঘটন কখনো ঘটেনি। ওকি জানে না, আলোক ছাড়া এই বিশাল পৃথিবীতে আপন বলতে কেউ নেই? কি পিপাসাই পেয়েছিল আহা মুখের দুই পাশ দিয়ে জল গড়িয়ে আমা ভিজে গেল।

—খোকা আমার কথার জবাব দিলি নে?—হাতে একটা মৃদু ঝাঁকুনি দিলেন।

—মা, আমি বড় ক্লান্ত। গেলাসটা বাড়িয়ে দিল নিতাই-এর দিকে: আমাকে কিছুক্ষণ একলা থাকতে দাও—

হাতটা অবশ হয়ে গেল ছেলের কথা শুনে। ছেড়ে দিলেন ওর হাত। পৃথিবীতে মা হওয়ার মত নিরন্তর দুঃখের আর কিছু নেই। একটা কঠিন দীর্ঘশ্বাস ফেলে এই কথা কয়টি হৃদয়ঙ্গম করলেন পূর্ণশশী দেবী। অথচ নিতাই, একটা বাইরের ছেলেও জানে এই দুটো দিন একটা রাত চোখের পাতা এক করতে পারেননি। অষ্ট প্রহর ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা করেছেন। সবই কপাল! দেখতে পেলেন ঘোরানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে। তুমি কেমন আছ, একবার জিজ্ঞাসাও করল না নিজে থেকে।

যাক, প্রাথমিক পর্ব মিটে গেল সহজে। এত তাড়াতাড়ি নিষ্কৃতি পাবে ভাবতে পারেনি। মা কি দুঃখ পেলেন ওর কথায়? ভাবল একটু বিশ্রাম করে মাকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গিয়ে সব বলবে। কিছুই গোপন রাখবে না। তাছাড়া মা তো সবই জানেন। কেয়াকেও জানেন, মিনতিকেও জানেন। তাহলেই মা ঠাণ্ডা হয়ে যাবেন। ছেলেদের ওই এক সুবিধে। মা বলে ডাকলে আর কথা নেই। মাত্র দুই দিন, এক রাত্রি। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বহুদিন বাড়ি ছাড়া, ঘর ছাড়া। ঘরের প্রতিটি জিনিসই মায়ের মত চোখ দিয়ে দেখছে আলোককে। যেন এক্ষুনি সবাই চিৎকার করে উঠবে। খোকা, কোথায় ছিলি? কোথায় ছিলি? বাইরে হাওয়ার শব্দ পেয়ে জানালাগুলি খুলে দিল। লক্ষ্য করল। একটা জিনিসও সামান্য স্থানচ্যুত হয়নি। যেন এই ঘরে এসে ঘরের প্রত্যেকটি জিনিসের ভিতর দিয়ে ছেলেকে খুঁজতে চেয়েছেন। একে একে সবাই ফাঁকি দিয়ে চলে গেছে। সেই জন্যেই এই অতিরিক্ত সতর্কতা। একেক সময় আলোকের বাড়াবাড়ি মনে হয়। কিন্তু সূর্যের আলো কি বাড়াবাড়ি রকমের বেশী? একটু কম পড়লে কি প্রাণী জগত চোখে সরষে ফুল দেখত না? যখন সেবা মিনতি দু'জনেই মুখ ফিরিয়ে চলে গেল তখন এই মায়ের কথা ভেবেই কি বুকে বল পায়নি? হাওয়ায়া বড্ড দাপাদাপি আরম্ভ করে দিয়েছে। জামা কাপড় সব খুলে ফেলল এক টানে। ভীষণ ক্লান্তি, ভীষণ অবসাদ, ভীষণ ঘুম। তিন দিক থেকে ভালুকের মত আক্রমণ করছে। শুয়ে পড়ল বিছানায় তিন জনকেই এক সঙ্গে শান্ত করতে পারলে মন্দ হয় না। বেড কভারটা পাল্টানো হয়েছে। যাওয়ার সময় দেখে গিয়েছিল মনিপুরী। এখন মোরাদাবাদী। টেবিলে কবিতার বই গুলি সুন্দর করে সাজানো। প্রথমে বিভাপতি, তারপর বয়েস অনুপাতে একেবারে হাল আমলের। এ নিতাই-এর কম্ম নয়। আরো কি কাজ কাজ আছে, আমার ইচ্ছে প্রবল হওয়ায় উঠে নীল আলো নিভিয়ে দিওন আলোটা জ্বালল। গ্লাস টেবিলে এক বিন্দু ছাই নেই। ফুলদানীতে তাজা টাটকা ফুল। ফুলের গায়ে এখনো জল লেগে রয়েছে। আলোক আজ কিসাতে পারে ভেবে মা হয়ত নিতাইকে দিয়ে তুলিয়ে রেখেছেন। ঘরে যে কয়টা অয়েল পেন্টিং-এর কাজ ছিল, ঝকঝকে করে মোছা হয়েছে। কোথাও এতটুকু ধুলো নেই, না মেঝেতে, না পড়ার টেবিলে। কলম পেন্সিল লেখার প্যাড্ পেপার ওয়েট—যেখানে যা থাকবার কথা ঠিক সেখানে। কিন্তু

নাকের সামনে ক্ষৌরকর্ম করা রুমাল ধরা হয়েছে। চারদিক আচ্ছন্ন করে ঘুম আসছে। চিন্তার ছুঁচলো মুখ ভোঁতা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু এই সময় গুলে আর রক্ষা নেই। তাহলে সকাল আটটায় উঠতে হবে। মা আরো রেগে যাবেন। নিতাই এসে দাঁড়াল।

—কি ব্যাপার?

—মা খেয়ে নিতে বলেছে।

—দাঁড়া স্নানটা করে নি। কি রান্না হয়েছে?

—মাছের ঝোল, ডাল, পোস্তর বড়া, পটলের—

—খুব হয়েছে। তুই তোয়ালে সাবানটা নিয়ে পুকুর ঘাটে যা দেখি। আমি যাচ্ছি।

পুকুর ঘাট! ভাবতেই পায়ের ওপর দিয়ে পুকুরের সমস্ত জলটা ঢেউ কেটে কেটে চলে গেল। শিরশির করে উঠল গাটা। আহা, কত দিন পর রুপোলি মাছের মত একেবারে মাটির কাছে গুলিয়ে যাবে। আহা, কত দিনই বা ভুলে থাকতে পারে লোহার পেটে করুণ শব্দ!

পুকুর ঘাটে এসে বসল। সাবান তোয়ালে রেখে দিয়ে গেছে নিতাই। ঝিঁঝি ডাকছে কত দিন পর। যেন বিলায়েত হোসেন খানের শেষ রাতের আলাপ। জ্যোৎস্না। গতকাল গঙ্গার ঘাটে ছিল পূর্ণিমা। আজ একটুও তাতে ছায়া পড়েনি। সমান জোরালো আর দিনের মত ফুটফুটে। ঘাটের দু'পাশে সেবার দুটো পদ্মরাজ এনে লাগিয়ে দিয়েছিল। কি মিষ্টি আর সুরেলা গন্ধ এখন তাদের। তাকিয়ে দেখল জ্যোৎস্নার মধ্যে অষাঢ় দুধের মত ফুলগুলি খুশিতে উথলে উঠেছে। 'অল্প নিয়েছি বুলিতে, নাই ধূলি মোর অঞ্চরে।' ওরা ধরার প্রণাম। ইস্কুলের দুপেলে পড়েছিল এপ্রিলের রাত্রিতে দক্ষিণ সমুদ্র থেকে হাওয়া আসে। হালদার বাগানের গাছ গুলিকে যেন সুটের বাস পেয়েছে। ইচ্ছে মত ঝাঁকুনি দিচ্ছে, পাতাগুলিকে জোর করে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করছে। জলে নামল। সোজা খানিকটা সাঁতার দিয়ে এগিয়ে এল। মাথা করে ডুবে গেল। জলে একটুও শব্দ বা ঢেউ হল না। অনেক ক্ষণ থাকল ওই ভাবে। দম বন্ধ হয়ে আসছে। তবুও। আর না। বুকটা ফেটে যাবে এই বার। বাতাস জ্যোৎস্না ফুল আর বিলায়েত হোসেন খানের সেতারের মধ্যে ফিরে এল আবার। দক্ষিণ দিকে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করল। পুকুরের পার ঘেঁষে রজনীগন্ধার সারি। সমুদ্র হাঁটা বাতাসে দোলাদুলি করছে সুখে। ছোটবেলার সেঠের পাশে শিউ গাছের দোলাদুলি মনে করিয়ে দেয়। আবার পুকুরের মাঝখানে আসবার জন্যে ডুব দিল। ডুব দেবার কিছুক্ষণ পরেই হাত পা' অবশ হয়ে গেল। চকিতে মনে হল আর কখনো জলের ওপর ভেসে উঠতে পারবে না। বুকের ভিতর কি প্রচণ্ড ব্যথা। গঙ্গার ঘাটে ঠিক এই রকম ব্যথা পেয়েছিল। আলোক মরে যাবে। এই পুকুরের তলায় শুয়ে থাকবে। মাছ গুলি ঠুকরে খাবে। ব্যথাটা ক্রমশ বেড়েই যাচ্ছে। হাত পা' আরো অবশ। সমস্ত শরীরটাই অবশ হবার ফলে জলের ওপর হালকা হয়ে উঠে এল। অত্যন্ত কষ্টদায়ক ভাবে আটকে যাওয়া নিঃশ্বাসটা বেরিয়ে এল। ঘাটের দিকে এগোতে চেষ্টা করল। কারণ আলোক এখন যে কোন মুহূর্তে মরে যেতে পারে। তা ঘাটে গিয়ে মরাই ভাল। মরতে গিয়েও কেমন করে যেন এই কথা গুলি মনে পড়ল। ঘাটের সিঁড়িতে পাওলার মুখ গুজে নিঃসঙ্গে খানিকটা কাঁদল আলোক। কেয়া থাকলে মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, একেবারে ছেলেমানুষ! শিয়ালের ডাক। কেউ নেই। সারাদিন ঘাওলা নদীতে হৈ-চৈ-এর মধ্যে ছিল। ঘিনতির সঙ্গে অবিরাম ঠাণ্ডাযুদ্ধের ফলে একটা গোপন ক্ষত ভুলে ছিল। এখন ঘিনতি নেই। নির্জন জ্যোৎস্নায়। ঝিঁঝি পোকার সুরের মধ্যে সেই ক্ষত দপদপে ব্যথা নিয়ে বেরিয়ে এসেছে। কেয়া থাকলে গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলত, তোমাকে ভালবাসি তাই ঘুরে থাকতে চাই। কি অবোধ যুক্তি। জানে না ভালবাসা গভীরতায় পৌঁছুলে

কাছে না টেনে উপায় থাকে না। আর ভালবাসার ঘাদ থাকলেই বহৎ ভালবাসার নামে ঘুরে ঠেলে দেয়। কি দোষ করেছিল আলোক? কোথায় কি পরিমাণ খুঁৎ ছিল যে এমন করে চলে যেতে পারল? এই তো আরেকটু হলেই ঘাটে সাবান তোয়ালে রেখে মা ডুকরে কেঁদে উঠতেন। বুঝতেও পারতেন না কি দুঃখে সোনার ছেলে জলে গেল। আলোক গলাটা শুধু বের করে দিঁড়িতে বসেই রইল। ওঠবার শক্তি নেই। আর সহ্য হয় না। যাকে সব বলবে। এত ভালবাসত কেয়াকে? এত প্রচণ্ড শক্তি থাকে এই ভালবাসার? জলের মধ্যে থেকেই নতুন রক্তের জল এল। শুধু হৃৎপিণ্ডে আর সব রক্ত শুধু হৃৎপিণ্ডটাই জলে পুড়ে যাচ্ছে।

—দাদাবাবু?

—কেন্তে, নিতাই—

—মা তোমাকে তাড়াতাড়ি আসতে বলল।

—যাচ্ছি।— নিতাইকে দেখে যেন নিজের ভিতরে একটু জোর পেল। জল থেকে উঠে এসে ওর কাঁধে হাতটা রাখল।

— আমাকে নিয়ে যেতে পারবি?

জড়িয়ে ধরল নিতাই দুই হাতে।

—দাদাবাবু কি হয়েছে বল তো?

—কিছু হয়নিরে পাগল।

—জানো দাদাবাবু মা ভাত খায়নি। কত কেঁদেছে।

—তাই নাকি। আলোক অন্যমনস্ক হয়ে পড়ল।

—কত বুঝিয়েছি মাকে, দাদাবাবু আইসবেই। তার পর ই নৌয়ার সেটে শব্দ হইল, দুই ছুটে গেলাম। তাই না দাদাবু?

দুজনে ধরাধরি করে দোতলায় এল। ভিজে সপসপ করছে। নিতাই দাদাবাবুর গাটা বেশ করে মুছিয়ে দিল।

—তোমার জ্বর এসেছে দাদাবাবু?

—নারে।

—গাটা কেমন করছে—

—ও এমনি। মাকে যেন বলিস নে আবার।

—বারান্দায় তোমার ভাত ঢাকা দেওয়া আছে। মা তাড়াতাড়ি খেয়ে নিতে বলেছে।

সিল্কের শুমিটা পড়ল। মাথা আঁচড়াতে গিয়ে দেখল চুলের গোড়ায় দারুণ ব্যথা। খেতে ইচ্ছে করছে না। নিতাই সামনে না থাকলে ভিতরের অস্থিরতাকে একটুও চাপা দিতে পারত না। মন হালকা করার জন্য যা সুবিধে হত তাই করত। কত দিন মন বিষণ্ণ হয়ে থাকবে? ভুলে যাওয়াই নাকি মনের ধর্ম। অন্তকথা চৌবাচ্চার মত মানুষের মন। এক দিক দিয়ে ক্রমাগত গ্রহণ করে, অন্যদিকে বিস্মরণের নালা দিয়ে বের করে দেয়। কবে বিস্মরণের নালায় উপনীত হবে আলোক? খেতে বসল। কেননা, একটু পরেই মা দোতলায় উঠে আসবেন। নিতাই পাশে দাঁড়িয়ে। ইসারা করল চলে যেতে। নিজেকে একলা পাওয়াও একটা ভাগ্যের ব্যাপার। আশ্চর্য। মিনতিকে নিয়ে এত যে কল্পনার জাল বুনেছে, আসলে আলোকের ওপর ওর কোন প্রভাবই নেই। সেই যে মেয়েটা, শহরের প্রতীক বলে আলোকের অপরিসীম বিরক্তির কারণ, চোরাবালির মত আলোককে সর্বক্ষণ টানছে। যতই রাগ প্রকাশ করুক, তবু কেয়াকেই ভালবাসে। কেয়ার কোন বিকল্প থাকতে পারে না। আবার গলার কাছে অসহ্য যন্ত্রনা। এক গেলাস ভাত নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগল। চোখের পাতা ভিজে যাচ্ছে বার বার। জল চেলে উঠে পড়ল। দিঁড়ি দিয়ে নামতে যাবে, সামনে মা।

—কিছুই তো খেলি নে বাবা?

—আমার পেট আগেই ভরা ছিল মা।

—খোকা, তুই কিন্তু আমার সামনে কোন দিন মিথ্যে বলিস নি।

আলোকের পা কাঁপতে লাগল। মাথা নিচু করে রেলিংটা শক্ত করে চেপে ধরল কোন রকমে। ছেলে কোনটা সত্যি

বলছে কোনটা মিথ্যে বলছে, মার চোখ এড়ায় না কিছুই অপরাধীর মত মুখ করে বলল, আমার শরীরটা ভাল লাগছে না মা —

—সে আমি ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পেরেছি। তুই কি আমার কথা একবারও ভাবিস নে ?

—মা আমি কাল চন্দননগরে গিয়েছিলাম—

—আমাকে বলে যেতিস

—আমার বন্ধু অফিস থেকে জোর করে নিয়ে যায়। ওখান থেকে ক্যানিং-এর মৃনালের বাড়িতে।

—বেহালার সেই মৃনাল ?

—হ্যাঁ, মা।

—তুই এখন চলিলি কোথায় ?

—একটু পুকুর ঘাটে গিয়ে বসব। ও খানটায় খুব বাতাস।

পূর্ণশশী দেবী ছেলের মুখের দিকে তাকালেন। ছেলের মন এখন কতকটা বুঝতে পারেন। গাছপালা ছায়া জোৎস্না বাতাসের সঙ্গে ওর নাড়ীর যোগ। তাই আর ভাবতেও পারেন না এই বাড়িটা বিক্রী করে মাস কলকাতার মধ্যে ঢুকে যেতে। একটা মাত্র ছেলে। ওর সাধ আহ্লাদের দিকে নজর রাখতে হবে বৈ কি। বিশেষ করে এরা রায়বাড়ির ছেলে যখন। আর এও যুবলেন, ছেলের এখন উড়ে বেড়াবার বয়েস হয়েছে। সুতরাং এ ডালে সে ডালে একটু উড়ে বেড়াবেই। তাই খুব আস্তে আস্তে আবার গায়ের ওপর হাতটা রাখলেন।

—একটা কথা বলব খোকা, রাগ অমত করবি না ?

হাতটা সরে গিয়েছিল। আবার দু'জনের মাঝখানে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

—বল।— আলোক মুখের দিকে তাকাল।

—এই বেলা একটা বিয়ে কর খোকা, আমি দেখে যেতে চাই—

পুকুরের জল জোৎস্নায় মধ্যে ঝিলমিল করছে। কতই বা রাত। হালসুর এদিকটায় এর মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছে। রাত পাখির ডাক শুনে মনে হচ্ছে গভীর রাত। আর লুকোচুরি খেলতে ভাল লাগছে না। বলেই ফেলল তোমার যা ইচ্ছে —

পূর্ণশশী দেবীর সারা মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মুহূর্তে। এত বড় একটা কঠিন প্রশ্নের এমন সহজ সমাধান যেন স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। আটচল্লিশ বছর রায় বাড়িতে বাস করে এই প্রথম জয়ের আস্বাদ পেলেন। এই প্রথম তাঁর একটা বিশেষ ইচ্ছাকে রায়বাড়ির ছেলে মূল্য দিল। হাতটা ছেড়ে দিয়ে তিনি ওর পিঠেই হাত রাখলেন।

—আমার আপত্তি নেই বাবা, তুই যেয়াকেই—

—না মা, তা হয় না —

বিষম খেলেন। এর মধ্যে আবার কি হল ? বেশ মেয়েটি। কি এমন আপত্তি থাকতে পারে।

—তাহলে বেহালার বিনতিকেই বরং —

—অসম্ভব।

চমকে উঠলেন পূর্ণশশী দেবী। যা সহজ মনে করা যায় তা হয়ত আসলে সহজ নয়। যদিও বিনতিকে চোখে দেখেননি কিন্তু অনেক গল্প শুনেছেন ছেলের মুখে। অতি শান্ত আর স্নিগ্ধ নাকি ওর মন। গরীব। তা গরীবে আপত্তি নেই পূর্ণশশী দেবীর। কেননা, নিজেও তিনি গরীব ঘর থেকেই এসেছেন। সত্যি, আজ কালকার ছেলেদের মনের ভাষা পড়াই যায়।

—তোর ইচ্ছে নেই খোকা, আমি বেশ বুঝতে পারছি। — ঘরে ক্ষোভটা চাপা থাকল না।

—কেন মা কেয়া বিনতি ছাড়া বাংলাদেশে আর মেয়ে নেই নাকি ?

—তাহলে আমি দেখি ?

—দেখ।

ভগবান। শেষ বেলায় এত সুখও কি পূর্ণশশী দেবীর কপালে লেখা ছিল॥ বাড়িটা যেন কাঁপছে। প্রবল ভূমিকম্পে রাতবাড়ির ধারা ওলট পালট হয়ে গেল নিমেষে। দক্ষিণ থেকে জানালার পাল্লার শব্দ তুলে হু-হু বাতাস আসছে। আনমনে কয়েক মুহূর্ত সেই দিকেই তাকিয়ে রইলেন।

—দেখেছিস খোকা ঘরেই কত বাতাস। আর পুকুর ঘাটে গিয়ে কাজ নেই। এই বেলা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়—

মা চলে গেলেন। আলোক রেলিং ধরে তেমনি দাঁড়িয়ে রইল। জোরালো আলোটা চোখে লাগছে। বাড়িতে টেলিফোনের লাইন পাতা একান্তই দরকার। অমুক জায়গায় আছি, এই বলে যদি একটা ফোন করত জটুলে এই বয়সে মাকে এত দুশ্চিন্তা পোহাতে হত না। ঘন ঘন জল পিপাসা পাচ্ছে। বেসিনের জলে হাত ধোওয়া যায় না। গরম। নিতাই কাচের গেলাস ঢাকা দিয়ে রেখে গেছে। গলায় ঢালতে গিয়ে মনে হল জলটা যে দিক দিয়ে যাচ্ছে সে দিকটা পুড়িয়ে দিয়ে চলে যাচ্ছে। ঠিক করল, সামনের মাসেই একটা রেফ্রিজারেটার কিনে ফেলবে। এটা খুবই দরকার।

যার কথা মত আলোটা নিভিয়ে দিতেই অন্ধকার ভরে গেল। মনে পড়ল, 'ঐ ভরা বাদর মাহ ভাদর শূন্য মন্দির মোরা—। ঘরের ভিতর ফিনফিনে জোনাকি নীল আলো জেলে উড়ে বেড়াচ্ছে। এতক্ষণ হয়ত ঘরেই ছিল, কিন্তু আলোর জন্যে টের পাওয়া যায়নি। জানালার ঠাণ্ডা দিকে গাল ঠেকিয়ে দাঁড়াল। চাঁদ ঢাকা পড়ায় বাইরেও আবছা অন্ধকার। এপ্রিলের এলোমেলো হাওয়া এই ঘরখানাকে দিব্যি এড়িয়ে ওই বনের মধ্যে ঢুকে হুটোহুটি করছে। — শূন্য মন্দির মোর। অনেক তলাকার বিত্তাপত্তি উঠে এসে অন্ধকারকে আরো বিষাদময় করে তুলল। এই মুহূর্তে মরে যাবে। খাসপ্রশ্বাসী বাতাস এই ঘর শূন্য করে চলে গেছে। নিঃশ্বাসের জন্যও অবশিষ্ট রাখেনি। একবার মনে হল জলের মধ্যেই রয়ে গেছে। এখন বুকটা কাটবার সময় হয়েছে। আলোক উত্তেজনায় অধীর হয়ে পায়চারী করতে লাগল। শূন্য মন্দিরের ভার কি সারা রাত ধরেই চলবে? এত নিষ্ঠুর শূন্য মন্দির! এখন একটাই মাত্র উপায় ঘুমের ভিতর দিয়ে বিস্মরণের জানালায় পৌঁছে যাওয়া। কিন্তু একটা ভয়, ঘুমুলে সেই পুরোন স্বপ্নটা না উঠে আসে! দুর্বল ঔপন্যাসিকরা এই রকম একটা প্রত্যাশিতধর্মী স্বপ্ন দিয়ে গল্পের শেষটা মিলিয়ে দেয় দেখেছে। যেমন যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে আলোক পথে বের হয়ে যাবে এক সময়। তার পর বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে গিয়ে সেই পুরাতন এ্যাকসিডেন্ট। লেভেল ক্রসিং উঠে যাবে আকাশে। ট্রেনের চাকায় দু' টুকরো হয়ে ছিঁড়ে যাবে দেহটা। মাথাটা ছিটকে পড়বে শহরের দিকে। ধড়টা এপাশে হালতুর দিকেই পড়ে থাকবে। ইহাই উপন্যাস বিষয়। যাক, কাজ নেই অমন স্বপ্ন দেখে। স্বপ্নান্ত যবনিকা দিয়ে আর যে সমস্যাই মিটুক, বেঁচে থাকার সমস্যা মেটে না। যন্ত্রনারই অন্য নাম জীবন। অতএব আলোক পায়চারী করতে করতে ফের জানালার দিকে গাল ঠেকাল। রাস্তার ওদিকের সব কটা প্লট বিক্রী হয়ে গেছে। সামনেই যন্ত্রপাতি তৈরীর বিরাট কারখানা বসছে। ইতিমধ্যে গুদাম ঘর তৈরী হয়ে গেছে। নেপালী দারোয়ান টকাস টকাস শব্দ তুলে পাহারা দিচ্ছে। টেলিফোনের লাইন পাতা দরকার। হঠাৎ উধাও হবার আগে মাকে অন্তত নিজের গলাটা শুনিয়ে দিতে পারবে। সামনের মাসে একটা রেফ্রি জারেটার না কিনলে নয়। হোক, সব কিছুই হোক। কেয়াদের সাম্রাজ্য ঝেড়ে যাক। তাকিয়ে দেখল, আবার দিনের মত জোৎস্না নেমেছে। সারা আকাশটা অসংখ্য ছোট ছোট জুঁই ফুলে ভরে গেছে। এমন তারাও আছে যার আলো আজো পৃথিবীতে এসে পৌঁছয়নি। হালতুর বাগান জুড়ে ঝড় চলছে। বৈজ্ঞানিকদের অভিমত চাঁদের দিন নাকি শেষ হয়ে এল। আর মাত্র আট

দশ বছরের মধ্যেই দূর পাল্লার রকেটে মানুষ চাঁদে পৌঁছে যাবে। ইতিমধ্যেই চাঁদের ভীতিজনক ফটোগ্রাফ আসছে নানারকম। তবু যে মানুষ দূর পাল্লার রকেটে যাবে, সে কি কোন সময় ক্লান্ত হয়েও হালদার মত নিরাশা কোণ থেকে দেখে না? তাহলে পাখির গান, জ্যোৎস্নার রং, মনের ছায়া, কাশফুলের ঢেউ কি কবিতার মধ্যেই কসিল হয়ে থাকবে অথবা দু' চারটে মানুষের মনে হাবুডুবু খাবে?

এবার ঘুম আসছে। দূর থেকে কাউ গাছের শো শো আওয়াজের মত শরীরের ক্লান্ত কোষে ঘুম নামছে। টলতে টলতে নিজেকে বিছানায় ডুবিয়ে দিল কোন রকমে। চাঁদের দেশের চরকা কাটা বুড়িটা ইতিমধ্যেই ঘুমের গান শুরু করে দিয়েছে। সব শব্দ থেমে গেছে। নিঝুম। শুধু যে তারাদের আলো আজো পৃথিবীতে পৌঁছয়নি, তাদের গা' বেয়ে নীল বাতাসের স্রোত আলোকের ঘরখানা ভাসিয়ে নেবার জন্য চৈত্রের আকাশ বেয়ে ছুটে আসছে।

সমাপ্ত

বিজ্ঞপ্তি

১৩৭২ চৈত্রে যাদের চাঁদা শেষ হবে তাঁরা অনুগ্রহ করে ১০ই মের মধ্যে জয়শ্রী কার্যালয়ে চাঁদা পাঠিয়ে সহযোগিতা করবেন। অন্যথায় বৈশাখে ১৩৭৩ এর জয়শ্রী ভি পি করা হবে।

কার্যাধ্যক্ষ জয়শ্রী

জয়শ্রী

আগামী দুটি উপন্যাস

বৈশাখ ১৩৭৩ থেকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে

মিহির মুখোপাধ্যায়ের ঐ তি হা সি ক

উপন্যাস

কণ্ঠ-তরা বিষ

মিহির মুখোপাধ্যায় জয়শ্রীর পাঠকবর্গের নিকট সুপরিচিত। ইতিপূর্বে জয়শ্রীতে তাঁর উপন্যাস 'কালপুরুষ' প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমান উপন্যাসের সময় আঠারো শতকের প্রথমার্ধ। বাংলা দেশের নাট্যমঞ্চে তখন অনেক চরিত্রের ভীড়। অনেক গোপন রহস্য, অনেক চক্রান্ত, অন্ধকার লোভ আর বিদ্বেষের অন্ধকার। সমাজ ও জীবনের এই বিক্ষুব্ধ জটিল পরিবেশে ধীরে ধীরে উন্মেষ ঘটেছে এক মহৎ কবি চেতনার। অন্ধকার সময়ফুলের শেষ সন্ধাকবি ভারতচন্দ্র এই উপন্যাসের নায়ক।

সাহিত্যে নবাগত মহীতোষ বিশ্বাস লিখিত,

জল, মাটি, মন

ভূমিকেন্দ্রিক গ্রামজীবন বাংলা উপন্যাসে কোনো নূতন উপাদান নয়, কিন্তু এই রচনার স্বাদ ও প্রকৃতির স্বাতন্ত্র্য অন্য কারণে: রচনার বিষয়ের যথাযথ বিন্যাসে, স্বাভাবিকতায়, অকপট অকৃত্রিমতায়। লেখকের ক্ষেত্রে, যেহেতু তিনি নূতন, এইটিই প্রথম কথা।

সাধারণ ভূমিলগ্ন মানুষের নিস্তরঙ্গ অপরিসর এই জীবন: এরই মধ্যে স্বাভাবিক গতিতে জন্ম, কর্ম, প্রেম, পরিণয়, মৃত্যু; কিছুই না, আবার সবই,—কারণ হৃদয়ের সরোবরে এগুলিই ঘটনার ছোট ছোট ঘূর্ণী, এরাই স্পর্শ দিয়ে হৃদয়কে উপ্ত করে, মানুষকে জ্ঞানের দিকে ঠেলে নেয়, তাকে জীবনের মর্মমূলে প্রীত প্রণয় প্রত্যয়ে, জীবনের কৃতজ্ঞ অঙ্গীকারে আবার ফিরিয়ে আনবে, স্থিত করবে বলে।

এই রচনা দুটি আমাদের পাঠকবর্গের প্রিয় হবে আশা করি।

UPPER GANGES SUGAR MILLS Ltd.
THE OUDH SUGAR MILLS Ltd.
NEW INDIA SUGAR MILLS Ltd.
THE NEW SWADESHI SUGAR MILLS Ltd.
BHARAT SUGAR MILLS Ltd.
GOBIND SUGAR MILLS Ltd.

PURE CRYSTAL CANE SUGAR

Managing Agents :

BIRLA BOMBAY PRIVATE LTD.
(FORMERLY THE COTTON AGENT PRIVATE LTD.)
INDUSTRY HOUSE,
159, Churchgate Reclamation,
BOMBAY—1

সংস্কৃতির বিনিময়!

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

আন্তর্রাজ্য সাংস্কৃতিক বিনিময়ের প্রকল্পে গত ৫ই ফেব্রুয়ারি আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে রাজস্থানী লোক সংস্কৃতির এক অনুষ্ঠান হয়। অবশ্য সরকারী তথ্য ও প্রচার বিভাগের বিচিত্র কর্ম-তৎপরতার দরুন খবরটা বিশেষ কেউই জানতে পারেননি, ফলে দু একজন সংস্কৃতমনা ব্যক্তি ছাড়া দর্শক-শ্রোতা হিসেবে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁরা উচ্চতম সরকারী কর্মচারীদের আত্মীয়-পরিজন বা বিনিপয়সার তামাশার দর্শক-শ্রোতা। অবশ্য রুশ ব্যালের অনুষ্ঠানে উদয়শঙ্কর প্রবেশাধিকার পর্যন্ত পাননি, সেখানে অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেন মাননীয় জনৈক মন্ত্রী মহোদয় যিনি নাকি সংগীতজ্ঞ। রাজস্থানী সংস্কৃতির অনুষ্ঠান উদ্বোধন করতে যে উদয়শঙ্করের ডাক পড়েছিল এটাই তাঁর অনেক ভাগ্য তা বলে ওই অনুষ্ঠানের পুনর্প্রদর্শনের প্রস্তাব যদি তিনি করেন তবে সেটাও রাখা হবে নাকি? গণতান্ত্রিক দেশে মুড়ি-মিছরির এক দর হয়েই থাকে। উদয়শঙ্করের চাইতে যে কোনও সরকারী কর্মচারী কোনও অংশেই কম নয়। ফলে রাজস্থানের সাংস্কৃতির যে-অনুষ্ঠান কলকাতায় একটিবার প্রদর্শিত হয় তা ঝাঁকুড়াতে একই রজনীতে দুবার প্রদর্শিত হয়। সত্য সেলুকাস, কী বিচিত্র এই দেশ!

যেসব সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান দেখবার জন্যে কলকাতা ভেঙে পড়ে টিকিট ঘরের সামনে, সেসবের চাইতে রাজস্থানী লোক-সংস্কৃতির অনুষ্ঠান এতটুকু হীন নয়, বরং অনেকগুলোর চাইতে বহুগুণে উৎকৃষ্ট। লোক নৃত্য-বাদ্য-গীতে রাজস্থান যতখানি সমৃদ্ধ, খুব সম্ভব, ভারতের অন্য কোনও রাজ্য ততখানি নয়। বহু বার করে বহু ক্রোশ দূরে আবার যে-রাজস্থান দেখতে যাই তার অনেকখানি মৃত, অনেক খানি অগৌরবের এবং অনেক খানি অলীক; আর আমাদেরই আঙিনায় এসে রাজস্থানের যা শ্রেষ্ঠ সম্পদ তার পসার নামিয়ে রাজস্থানীরা হেঁকে হেঁকে চলে গেল, আমরা জানতেই পারলাম না।

রাজস্থানী লোকসংস্কৃতি ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোক-সংস্কৃতি থেকে স্বভাবতই কিঞ্চিৎ স্বতন্ত্র, কেননা লোকসংস্কৃতি মাত্রেই লোকজীবনের প্রতিবিম্ব এবং ভৌগোলিক পরিবেশের দরুন রাজস্থানের লোকজীবন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের লোকজীবন থেকে স্বতন্ত্র। সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে প্রকৃতি অত্যন্ত কঠোর ও নিষ্ঠুর ব্যবহার করে, সে কখনও কাছে টানে না, বরং দূরে ঠেলে, কখনও মুখ করে না, উলটে রুক্ষ করে। প্রকৃতির থেকে রাজস্থানীরা যা পায়নি সে-ঘাটতি তারা পূরণ করতে চেয়েছে নিজেদেরই সৃষ্টি দিয়ে, জীবনকে বর্ণাঢ্য, গীত-বাদ্য-মুখর, নৃত্য চকল করে।

অনুষ্ঠান শেষ হয়েছিল 'আবড়াখাবড়া' সংগীত দিয়ে। সংগীত অর্থাৎ নৃত্য-গীত-বাদ্যের সমন্বয়। এই সংগীতটি রাজস্থানের কৃষক জীবনের একটি সম্পূর্ণ আলেখ্য তুলে ধরে। সেখানের উষর জমিতে চাষ করা কঠিন, যতক্ষণ-না আকাশে মেঘ দেখা দেয় ততক্ষণ রাজস্থানী কৃষকের শান্তিমুক্তি হয় না, আকাশের মেঘ দেখে যেমন ময়ূর নাচে তেমনই কিষাণীরা নাচে—আর সেখানের গাঁয়ের প্রধান পাখি হলো ময়ূর, আমাদের যেমন কাক। ফসলে ক্ষেত ভরে যায়, গর্বে মাটিতে পা ফেলতে চায় না কিষাণী, সে তখন ঘুরের কুয়ো থেকে জল

আনতে যাবে না—তাতে তার মানে বাধে। এই আনন্দোৎসবের উপরে পড়ে মেঘের ছায়া। অসময়ে মেঘ ঘনাল কেন? দিনের আলো নিবে গেল কেন? আকাশ কালো করে আসছে পঙ্গপাল। চোখের সামনে ক্ষেতের ফসল উজাড় হয়ে গেল। ঘরে ঘরে হাহাকার আর কান্নার রোল।

বলা দরকার যে রাজস্থানের লোকনৃত্য আমাদের কাছে ক্রপদী নৃত্যের শামিল। কথক নৃত্য সেখানে লোকনৃত্যের অঙ্গীভূত। অনেকেই জানেন না যে কথক নৃত্যের উৎস হলো রাজস্থান। পরে জয়পুরে এই লোকনৃত্য নাগরিকতায় রঞ্জিত হয়। এবং আস্তে আস্তে সমগ্র উত্তর ভারতের উচ্চাঙ্গ নৃত্য হিসেবে গণ্য হয়। সুশীলা ও চরণ যে-নৃত্যটি পরিবেশন করেন তাতে যেমন লোকনৃত্যের ভালো ভাব ও সরলতা তেমনই উচ্চাঙ্গ নৃত্যের কলাকুশলতা ফুটে ওঠে। অবশ্য 'গোরবন্ধ' নৃত্যটি একান্তরূপেই গ্রাম্য মাধুর্যে ও সৌন্দর্যে পরিপূর্ণ। এটিও সংগীত এবং এই সংগীতে নৃত্যের সঙ্গে গীত সমান গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ নৃত্য ও গীতের মধ্যে কোনটি কোনটির চাইতে গৌণ নয়। মরুভূমির দেশে উটের চাইতে বড়ো সম্পত্তি নেই। উটকে সাজাবার জন্যে গোরবন্ধ এক ধরনের অলংকার। এক গ্রামবধূ বহু যত্ন করে একটা গোরবন্ধ বানিয়েছিল। কিন্তু সেটি চুরি যায়। তাই নিয়ে 'গোরবন্ধ' সংগীত। আর-একটি অনবদ্য নৃত্য 'তেরতালী'। এটি রাজস্থানের এক সম্প্রদায়ের বিশেষ আরাধনা পদ্ধতি। তেরোটি তালে সম্পূর্ণ। যেমন একান্তরূপে গ্রাম্য তেমনই একান্তরূপে শাস্ত্রীয়। এখানেও লোকনৃত্যের সঙ্গে ক্রপদী নৃত্যের পার্থক্য করা কঠিন। নৃত্যশিল্পী ছিলেন কুসুমবাঈ।

গীতশিল্পীদের মধ্যে আল্লাদিন খান, সুবার খান, নূর মহম্মদ ও পওরী দেবী ছিলেন। আল্লাদিন খানের নাম শুনেই মনে পড়ে ওস্তাদ আলাদিন খাঁয়ের কথা। নৃত্য-গীত-বাদ্য—সংগীতের এমন দিক নেই যেখানে আল্লাদিন খানের কর্তৃত্ব অনিন্দিত। মানুষটি এত ছোটখাটো যে দেখলে হাসি পায়। কিন্তু সংগীতে কী অসাধারণ প্রতিভা। শুধু আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠেরই অধিকারী নন, সেই কণ্ঠকে নিয়ে যা-খুশী-তাই করতে পারেন। আর তেমনই খেয়ালী। কখনও মোরচাং বাজাচ্ছেন, কখনও খঞ্জনী, কখনও এসুরাজ, কখনও ঢোল। যাতে হাত দেন তাতেই যাদু খেলে যায়। আবার মধ্যে মধ্যে লাফিয়ে উঠে এক চক্কর নাচ দেখিয়ে দিলেন। সুবার খান ও নূর মহম্মদ বংশ-পরম্পরাতে গীতশিল্পী। তাঁদের ঢোলা-মারু, গীতটি তাঁদের রাজস্থানের অত্যন্ত প্রিয়। অবশ্য 'ঢোলা-মারু' তাঁরা গাননি, গেয়েছেন 'কুরজাঁ' ও 'হিঁচকি'। 'কুরজাঁ' কথ করে পাঁচ শো বছরের পুরনো। এ এক ধরনের মেঘদূত। কুরজা এক রকম পাখী, কিন্তু এলোমেলো ভাবে ওড়ে না, বিশেষ একটি দিক থেকে আর একটি দিকে উড়ে যায়। তাকে দিয়ে প্রোষিতভর্তৃকা বিদেশে পতিতের কাছে সংবাদ পাঠাচ্ছে। ভাষা বোঝা গেল না, কিন্তু সুর দিয়ে মর্মে বিঁধল। দুটি গানেরই কারুকাজ অত্যন্ত সূক্ষ্ম। এঁরা যে-এসুরাজ বাজালেন তার প্রচলন শুধু এঁদেরই পরিবারে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ নৃত্য যেমন একই সঙ্গে লোক ও ক্রপদী তেমনই পওরী দেবীর মুখর গীত। এটি 'ঢোলা-মারু'র মতো রাজস্থানের একটি বিখ্যাত প্রেমোপাখ্যানের ভিত্তিতে রচিত। যদি বলা যায় এটি ক্রপদী গান তবে কিন্তু এর প্রাণনির্যাস করা দুঃসাধ্য। একই সঙ্গে অনেকগুলি রাগের আভাস এই গীতটির পেছনে আলোছায়ার ঝিলিমিলি রচনা করেছিল।

বাদ্যের মধ্যে রাবণহাট্টা, মোরচাং ও সারঙ্গীর কথা বিশেষ করে বলা দরকার। রাবণহাট্টা অদ্ভুত দেখতে একটা তারের যন্ত্র। যেমন আমাদের চারণ তেমনই এক গায়ক সম্প্রদায় এটা বাজিয়ে দরজায় দরজায় বীরগাথা গেয়ে বেড়াত। মোরচাংকে বলা যায় অসুরপনদন্ত ইস্পাতের জিহ্বা। যন্ত্রটি এত ছোট যে যখন কাম্বো খান সেই উচ্চ টংকারী

বাজটি বাজাচ্ছিলেন তখন মনে হচ্ছিল আমরা কোনও অদৃশ্য ঝর্ণা-নির্ঝরের পাশে বসে আছি। সাতারাও কাশ্মো খানই বাজালেন। সাতারা দোতরা বাঁশির মতো একটা যন্ত্র—একটাতে সুর বাজানো হয়, আর-একটা শ্রুতি ধরে রাখা হয়। এটা বাজাতে বুকের উপর অত্যন্ত চাপ পড়ে, একটানা বেশিক্ষণ বাজানো অসম্ভব। স্বাধীনভাবে ও সংগত হিসেবে—দু ক্ষেত্রেই সাতারা অনন্য ও অনবদ্য। সাতারা বাজনা দিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়েছিল এবং শুরুতেই বোঝা গিয়েছিল যে রাজস্থানী লোকসংস্কৃতি সাধারণ মানুষের সহজ স্ফূর্তি হলেও ধ্রুপদী সংগীতের নৈপুণ্য ও গভীরতা তার স্বভাবগত। ধ্রুপদীকে এঁরা তরল করেননি, লোক-সংস্কৃতিকে জটিল করেননি, কিন্তু দুয়ের মধ্যে যে একটা সরল সম্পর্ক থাকতে পারে তা এই অনুষ্ঠানটিতে যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের কারও কারও পক্ষে অনুধাবন করা নিশ্চয়ই সম্ভব হয়েছে।

সফরের অভিযান : ১৫১ পৃষ্ঠার পর

সংগ্রহে অসুবিধা দেখা দিলে লাইফ ইন্সিওরেন্স করপোরেশন প্রভৃতি পাবলিক অর্থ সংস্থার সাহায্যে এই নূতন সংগ্রহে সহায়তা করা হবে। অর্থাৎ, বিদেশী ও দেশী ব্যক্তিগত মালিকানারই অবাধ সুযোগ সার উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রসারিত হবে—যার মূলে রয়েছে বিশ্বব্যাঙ্ক তথা আমেরিকার চাপ। অতএব, খাদ্যসাহায্যের শর্ত যাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণতা, যাতে স্বয়ং-সম্পূর্ণতার সর্ত সারের বহুল প্রয়োগ, সার উৎপাদনের সর্ত ভারতে কারখানা নির্মাণে মার্কিনী মূলধনের মুখ্যভূমিকার স্বীকৃতি : বিশ্বব্যাঙ্কের তথা মার্কিনী মূলধনের এই অদৃশ্য শৃঙ্খলে ভারতীয় অর্থনীতি বাঁধা পড়েছে। আমেরিকার পররাষ্ট্র সচিব ডীন রাস্কের বিশেষ সহকারী রিচার্ড রুটারের গত ৬ই এপ্রিল প্যারিসে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে এ-বিষয়টি সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে : "But it is only fair to say that U. S. food aid will henceforth have strings attached, although not political strings. The recipient countries would be urged to pay more attention to agricultural development."

মাদ্রাজের একটি সারের কারখানার উৎপাদিত সারের কন্টন ও মূল্যনির্ধারণের অবাধ অধিকার সংশ্লিষ্ট মার্কিনী লগ্নী কারকদের উপর ন্যস্ত হবার ফলে ভারতীয় আর্থিক নীতির উপর বৈদেশিক আর্থিক স্বার্থের হস্তক্ষেপ অভিব্যক্ত হয়েছে। শ্রীমতী গান্ধীর সফর এই হস্তক্ষেপের রাজপথ অবারিত করবে কিনা সে-প্রশ্নই আজ দেখা দিয়েছে সার উৎপাদন সম্পর্কে পারস্য উপসাগরস্থিত পেট্রোলিয়াম কারখানা থেকে আমদানী করা এমোনিয়ার ভিত্তিতে ভারতে সার উৎপাদনের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সাম্প্রতিক প্রস্তাবে। যদিও ভারতে মোট চতুর্থ পরিকল্পনার আমলে 'ন্যাপথা'র (Naptha) ভিত্তিতে সার উৎপাদনের উপযোগী প্রচুর ন্যাপথা রয়েছে। এই প্রস্তাব ভারত সরকার সরাসরি অগ্রাহ্য করতে সাহস পায় নাই! বরং, এই প্রস্তাবের অর্থনৈতিক তাৎপর্য নির্ণয়ে সরকার সম্মত হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরিকল্পনা মন্ত্রী শ্রীঅশোক মেহতার বৈদেশিক ঋণের জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের সঙ্গে আলোচনা ও আমেরিকা সফর বিচার করতে হবে। চতুর্থ পরিকল্পনার জন্য যে ৪১০০ কোটি টাকা বৈদেশিক সাহায্য প্রয়োজন তার মধ্যে ৪০০০ কোটিই বিশ্বব্যাঙ্ক ও তৎ-সাহায্যকারীগোষ্ঠীভুক্ত দেশের সূত্রে এবং অবশিষ্ট টাকা সোভিয়েত রুশ ও তার সহযোগী দেশগুলির যোগাযোগে পাবার আশা। এই অঙ্কের মধ্যে পুরাতন ঋণের পরিশোধ্য ১৪০০ কোটি টাকার হিসাবও যোগ দেওয়া রয়েছে। শ্রীঅশোক মেহতার উপর ইতিমধ্যেই চাপ এসেছে টাকার মূল্য হ্রাস করবার জন্য যদিও ভারত সরকার এ-পর্যন্ত এ-বিষয়ে সকল চাপ প্রতিরোধ করে এসেছেন। ভারতীয় অর্থনীতিতে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা প্রত্যাহারের চাপেরও শ্রীঅশোক মেহতাকে নূতন করে সম্মুখীন হতে হবে। এ-ছাড়া ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যয়ের সীমা নির্ধারণ কিম্বা সঙ্কোচন সম্পর্কেও প্রবল চাপের মোকাবিলা করতে হবে শ্রীমেহতাকে। শ্রীমতী গান্ধীর সফর ভারতীয় অর্থনীতিকে এক সঙ্কটের সন্ধিক্ষণ থেকে আর এক সঙ্কটের সন্ধিক্ষণে পৌঁছে দিয়েছে। স্তুতির কোলাহল ভেদ করে সফরের এর চাইতে উজ্জ্বল বিবরণ খুঁজে পাওয়া দুঃসাধ্য!

বিশ্বাবর্ত

ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচন

গত ৩১শে মার্চ তারিখে ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে শ্রমিকদল অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। ১৯৬৪-র তিন আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবারকার নির্বাচনে ৮১ আসনের সংখ্যাগরিষ্ঠতায় উন্নীত হয়ে পাঁচবছরের জন্য শ্রমিক দলের ক্ষমতাকে স্থায়িত্ব দিল। শ্রমিক দলপতি উইলসন এই জয়কে "The greatest political victory for any political party in Britain, since 1906" বলে অভিহিত করেছেন। এবারকার জয় ১৯৬৪ সনের শ্রমিক বিজয়ের মত চমকপ্রদ না হলেও, নির্বাচনের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই শ্রমিকদলের সম্ভাব্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কেই কল্পনা-জল্পনা সীমাবদ্ধ ছিল, তাদের জয় সম্পর্কে কোনো সন্দেহের অবকাশ ছিল না। পার্লামেন্টের ৬৩০টি আসনের মধ্যে শ্রমিক দল ৩৬৩, রক্ষণশীল দল ২৪৩, লিবারেল ১২, আইরিশ রিপাবলিকান সেবার ১ ও নির্বলীয় ১ (স্পীকার) আসন পেয়েছে। ১৯৬৪ সালের নির্বাচনে শ্রমিক, রক্ষণশীল ও লিবারেল দলগুলি ভোট ভোটের যথাক্রমে শতকরা ৪৫'২, ৪৩'৪ ও ১১'১ ভাগ পেলেও এবার ভোটের শতকরা ভাগ যথাক্রমে ৪৮, ৪১৯ ও ৮'৪। রক্ষণশীল দল থেকে শ্রমিকদলে শতকরা ২'৮ ভাগ ভোট এবার সঞ্চারিত হয়েছে। শ্রমিক দলের প্রাক্তন পররাষ্ট্র মন্ত্রী গতবার স্মেথউইক ও লেটনে ক্রমান্বয়ে পরাজিত হয়েছিলেন। এবার তিনি জয়ী হয়েছেন শুধু নয়, বর্ণবিদ্বেষে আচ্ছন্ন স্মেথউইক কেন্দ্রেও এবার অপর এক শ্রমিক প্রতিনিধি জয়ী হয়েছেন। অক্সফোর্ড ও কেম্ব্রিজের আসন শ্রমিক দলের দখলে এসেছে, অক্সফোর্ড এই প্রথম শ্রমিক দলের আয়ত্তে এলো।

রক্ষণশীল নেতা হীথের ১৯৬৪ সালের ৫৮৮ ভোটের সংখ্যাগরিষ্ঠতা এবার ২৩৩-এ নেমে এলেও পরাজয়ের কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে প্রত্যুত্তরে বলেছেন: "The Labour Party has been fighting on the past, we have fought on the present and the future." এই নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর রক্ষণশীল দলের নেতা-পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী। মডলিং কিথ বা থ্যাচারিয়ড হয়তো পরবর্তী নেতৃপদ প্রার্থী।

লিবারেল দলের ভোটের সংখ্যাও হ্রাস পেয়েছে। রক্ষণশীলদের প্রতি বিরূপতা ভোটারদের লিবারেলদল মুখীন করে না তুলে শ্রমিকদলের শক্তিবৃদ্ধি করার যুক্তিতে হবে তারা শ্রমিকদলকে তাদের কর্মসূচীর ভিত্তিতে সক্রিয় সমর্থন জানিয়েছে। অবশ্য লিবারেল দলের নেতা গ্রিমণ্ড হাল ছাড়েন নাই। নির্বাচনের পর তিনি বলেছেন: "but I hardly think that this is the end of the Liberal Party."

১৯৬৪ সনের নির্বাচনের পর উইলসনের সময় ও শ্রম শ্রমিক সরকারের পতনরোধেই ব্যয়িত হয়েছে। এবারকার নিশ্চিত সংখ্যাধিক্য ব্রিটেনের অর্থনীতির পুনর্গঠন, মুদ্রাস্ফীতি রোধ, বালান্স অফ পেমেন্টের পৌনঃপুনিক সঙ্কটমোচনে দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সহায়তা করবে। অবশ্য উইলসনকে আর একটি নূতন সমস্যারও সম্মুখীন হতে হবে। রক্ষণশীল প্রার্থীদের পরাজিত করে প্রান্তিক আসন-গুলি থেকে যে সকল শ্রমিক সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন, তাদের অনেকেই বামপন্থী গোষ্ঠিভুক্ত। এদের সামলানো উইলসনের পক্ষে সহজসাধ্য হবে না। বিশেষ করে প্রতিরক্ষা

যাহও, ভিয়েৎনামে মার্কিননীতির সমর্থনকে কেন্দ্র করে দলের অভ্যন্তরে অনেক কড় উঠবে। উইলসনের রাজনৈতিক কুশলতার পরীক্ষা হবে সে সময়। 'নিউ ষ্টেটসম্যানের' সম্পাদক পল জনসন এই নির্বাচন সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন: "Just as Britain found Churchill in 1940 so, by some intervention of democratic providence, we have got Wilson now." পল জনসন আরও বলেছেন যে শ্রমিকদল সম্পর্কে প্রচলিত ধারণা হচ্ছে এরা ক্ষমতার সামনে দাঁড়িয়ে পলায়নীবৃত্তি গ্রহণ করে; কিন্তু উইলসন সে ভুল ভাঙতে সুরু করেছে: "There is some truth in Tory Jibe that Labour 'runs away' from power. Perhaps Harold Wilson's greatest contribution to the Labour movement is that he is gradually exorcising this fear."

কিন্তু রোডেশিয়ার শ্বেত বিদ্রোহ দমনে উইলসনের দ্বিধা ও দুর্বলতা এবং ভারত-পাক সংঘাতে আক্রমণকারী পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন শ্রমিক দলের প্রগতির আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছে। রক্ষণশীল ও শ্রমিক ব্রিটেনের প্রশাসনের এপিঠ ও ওপিঠ মাত্র—উপরোক্ত দুইটি ঘটনা তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির ত্রয়োবিংশতিতম কংগ্রেস

গত ২৯শে মার্চ থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত মস্কোতে সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির যে ত্রয়োবিংশতিতম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়ে গেল, তা সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টির নীতি-পরিবর্তনেরও ইসারা বহন করে এনেছে। এই কংগ্রেসে চীনা কম্যুনিষ্ট পার্টি উপস্থিত হতে অস্বীকার করে হয়তো বা চীন-রুশ সম্বোতার পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে। চীনের অভিযোগ: রুশ একদিকে আমেরিকা আনিয়ে অন্য দিকে চীন-বিরোধী প্রচারপত্র বিলি করেছে এবং আমেরিকা নেহাতই লোক দেখান। তাছাড়া চীনের মতে নূতন নেতৃত্ব ক্ষমতায় আসীন হবার পর থেকে সোভিয়েট রুশের শোধনবাদ বিভেদবাদ' এবং বৃহৎশক্তির ক্ষমতামত্ততার পিচ্ছিল পথে আরও নিম্নগামী হয়েছে এবং আমেরিকার সহিত চক্রান্ত করে গোটা পৃথিবীর ক্ষমতা করায়ত্ত করতে ব্যস্ত—এ-সম্বন্ধে চীনের সন্দেহ নাই। ভিয়েৎনামকে আমেরিকার হাতে তুলে দেবার সোভিয়েট মতলবেও চীন নিঃসন্দেহ।

কংগ্রেসে কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রধান সেক্রেটারী ব্রেজনেভের রিপোর্টে চীন ও আমেরিকার সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি কামনা করে যে পূর্বসর্ত আরোপ করা হয়েছে, তা চীন কিম্বা আমেরিকা কারও পক্ষেই গ্রহণীয় নয়। চীনের সঙ্গে বিরোধ মীমাংসার জন্য ব্রেজনেভের চীনকে আলাপ-আলোচনার আহ্বান করেছেন। ব্রেজনেভের মতে কম্যুনিষ্ট বিশ্বসম্মেলনে আলাপ-আলোচনার মধ্য দিয়ে বিরোধ মীমাংসার উপযুক্ত স্থান বিবেচিত হলেও, চীন এ বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরূপ। রুশ-মার্কিন সম্পর্কের উন্নতির জন্য ভিয়েৎনামে মার্কিনী সামরিক অভিযান প্রত্যাহারের সর্তটিও অবাস্তব। কংগ্রেসের সমাপ্তি অধিবেশনে আমেরিকাকে তীব্রভাবে ভিয়েৎনাম পরিত্যাগের জন্য আহ্বান জানিয়ে সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টি এই বলে সতর্ক করে দিয়েছে যে অন্যথায় আমেরিকাকে বিপুল সোভিয়েট সমরাস্ত্রের সম্মুখীন হতে হবে।

সোভিয়েট কম্যুনিষ্ট পার্টির ত্রয়োবিংশতিতম কংগ্রেস ক্রুশ্চেভের নাম উল্লেখ না করেও গত দশবছরে সোভিয়েতের সকল ব্যর্থতার জন্য ক্রুশ্চেভকে দায়ী করে ক্রুশ্চেভ অনুসৃত নীতিকে বিসর্জন দিয়েছে। ক্রুশ্চেভ স্টালিন-নীতির বিরুদ্ধে যেমন মূর্তিমান প্রতিবাদরূপে ইতিহাসে প্রতিষ্ঠালাভ করে সেই আমলের ক্রূরতা, পুলিশীসন্ত্রাস ও নির্মমতার অবসান ঘোষণায় উদার মানবতার প্রবাহ সকলে সোভিয়েৎবাসীদের জীবনে যে নূতন প্রাণের আবেগ সৃষ্টি করেছিলেন, যার ফলে

শিল্প-সাহিত্যেও নূতন যুগের দেখা দিয়েছিল, অয়োবিংশ কংগ্রেসে ক্রুশ্চেভ-বিদায়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই উদার মানবতার আবেদনেও অবশ্যম্ভাবীরূপে ছেদ পড়বে। এই পরিবর্তনের ফলে ক্রুশ্চেভোত্তর নেতৃত্বের পক্ষে ষ্টালিনের আমলে পুরোপুরি প্রত্যাবর্তন সম্ভব না হলেও, ষ্টালিন ও তাঁর আমলের প্রতি ক্রুশ্চেভী-আমলের বৈপরীত্য দূর হয়ে নূতন মনস্তত্ত্ব দেখা দেবে। সেই আমলের অনাচার, অবিচার ও নির্মমতার আলোচনা স্তিমিত হয়ে তার স্থলবর্তী হবে সেই আমলে সোভিয়েত জনসাধারণের সার্থক কীর্তির বহুল প্রচার। এই পরিবর্তন লক্ষ্য করেই কংগ্রেসের একজন মুখপাত্র বলেন "what is happening is an effort to accentuate the positive and to de-emphasize the negative." নূতন পরিস্থিতিতে শিল্পী ও লেখকদের নিকট পার্টি লাইনের প্রতি নিরঙ্কুশ আনুগত্যের দাবী আসবে।

তবুও, ষ্টালিনের আমলে প্রত্যাবর্তনের প্রত্যক্ষ স্বাক্ষর অয়োবিংশতিতম কংগ্রেস বহন করছে। সোভিয়েত কম্যুনিষ্ট পার্টিতে ষ্টালিন যেদিন সর্বময় ক্ষমতার শীর্ষে আসীন ছিলেন সেদিন দলের সম্পাদককে সাধারণ সম্পাদক বলা হত। ১৯৩৪ সালে এই পদটি খারিজ করে দলের ক্ষমতাশালী পদাধিকারীকে প্রধান সম্পাদক (First Secretary) বলা হত। ব্রেজনেভ ষ্টালিনের আমলের সাধারণ সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেছেন এবং লেনিন-ষ্টালিনের আমলের দলের কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেসিডিয়ামের নাম পলিটবুরোতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। পলিটবুরোর সদস্য সংখ্যা এগারোয় সীমাবদ্ধ করা হয়েছে এবং মাইকোয়ান এই সদস্যপদ থেকে বাদ পড়েছে। ষ্টালিন উৎসাদনে মাইকোয়ানই ক্রুশ্চেভের বিশিষ্ট সহকারীর ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।

নূতন ব্যবস্থায় বৈদেশিক নীতির কোনো গুরুতর পরিবর্তন সূচিত না হলেও আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ষ্টালিনী গোঁড়ামীর সূত্রপাত হবে।

আগামী প্রকাশ

সাম্প্রতিক কালের সাহিত্য সংকলন

উত্তরণ

পরবর্তী দুটি খণ্ড বাংলা দীর্ঘ কবিতার সংকলনরূপে প্রকাশিত হচ্ছে। প্রথম খণ্ডে জীবনানন্দ দাশ থেকে চল্লিশ দশকের তরুণতম কবির কবিতাবলী। দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের শক্তিমান প্রতিনিধিস্থানীয় কবিদের কবিতা।

এ ছাড়া থাকছে প্রতি খণ্ডে তথ্যবহুল ভূমিকা ও কবি-পরিচিতি।

সম্পাদনা : কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

পরিবেশক : ইণ্ডিয়ানা : কলিকাতা-১২

কার্যালয় : ২।৮২ নাকতলা গভর্ণমেণ্ট স্কীম, কলিকাতা-৪৭

পুস্তক পরিচয়

কাব্যনাট্য-যযাতি —চিত্রভানু রচিত। রুচিরা প্রকাশন। ৪০, সন্তোষপুর এভিনিউ, কলকাতা-৩২, মূল্য : তিন টাকা।

বইয়ের নিবেদনে লেখক জানিয়েছেন, 'এই সর্বব্যাপী গদ্য-নাটকের যুগে একটি সর্বজ্ঞাক কাব্যনাট্যের পরিবেশন হয়তো দুঃসাহসিক মনে হবে।' একথা একদিক থেকে অনস্বীকার্য। বর্তমান যুগমানসিকতার পরিপ্রেক্ষিতে নাটক একমাত্র বাস্তবের প্রতিরূপ বলেই গণ্য। কিন্তু ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্রে নাটককে বলা হয়েছে 'দৃশ্যকাব্য' —জীবনের কাব্যময় দৃশ্যরূপ। এই দৃষ্টিতে নাটককে বলা যেতে পারে বাস্তবের জীবনায়ন। এ হিসেবে নাট্যপ্রয়াসের বহিরঙ্গেও কাব্যপ্রকরণের ব্যবহার অনপেক্ষিত নয়। উনবিংশ শতাব্দীতে ছন্দোময় নাট্যরচনা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছিল। এ ছাড়া কাহিনী কাব্য এবং সাহিত্যিক মহাকাব্যের (Literary Epic) মধ্যেও নাট্যগুণ সঞ্চারিত ক'রে কাব্য এবং নাটকের মধ্যে বিস্ময়কর পরিণয়বন্ধন ঘটিয়েছেন গত যুগের শক্তিমান কবিরা। মধুসূদনের তিলোত্তমাসম্ভবকাব্য, মেঘনাদবধকাব্য, হেমচন্দ্রের বৃত্রসংহার, নবীনচন্দ্রের ত্রয়ী মহাকাব্য এ শ্রেণীর অন্তর্গত। বিশেষতঃ মধুসূদন অমিত্রাক্ষর ছন্দের গতিবিভঙ্গ এবং ধ্বনিতরঙ্গের মধ্য দিয়ে এক নতুন জীবনের সন্ধান পেয়েছেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ নাট্য এবং কাব্যের সমন্বিত প্রয়াসে অনুপম চরিত্রার্থতা অর্জন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কাহিনী' নাট্য এবং কাব্যের সুসমন্বিত প্রকাশ। এ ছাড়া ছন্দোময় নাট্যরচনায় তিনি কবিপ্রাণতার শিল্পলোক রচনা করেছেন। 'কাহিনী' নাট্যকাব্যের পৌরাণিক চরিত্রগুলিতে তিনি চিরন্তন জীবনাদর্শের সঙ্গে আধুনিক মানবতাবোধের দ্বন্দ্ব চমৎকার দেখিয়েছেন। গান্ধারীর শাশ্বত ধর্মচেতনা, ধৃতরাষ্ট্রের স্নেহ এবং ধর্মবোধের দ্বন্দ্ব, কর্ণের মানবিক স্নেহবুভুক্ষা এবং অসামান্য ত্যাগ সুনিপুণ নাট্যসম্ভাবনায় বিধৃত হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালে এই শ্রেণীর নাট্যকাব্যরচনার প্রয়াস প্রায় দুর্লভ। এই হিসেবে 'যযাতি' কাব্যনাট্য রচনা করে চিত্রভানু বাস্তবিক দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

মহাভারতের যযাতি-পুরু-দেবযানী-শর্মিষ্ঠার কাহিনী অবলম্বনে এই নাট্যকাহিনী রচিত হয়েছে। দৈত্যকুলগুরু শুক্রাচার্যের অভিশাপে মহাপরাক্রম অনিন্দ্যকান্তি নৃপতি যযাতি নিদারুণ জরাভারগ্রস্ত হয়েছেন। অভিশাপের কারণ, শুক্রাচার্যকন্যা দেবযানীকে রাজমহিষীরূপে গ্রহণ করেও রাজা যযাতির শর্মিষ্ঠার প্রতি আকর্ষণ। দেবযানীর অভিযোগে ক্রুদ্ধ শুক্রাচার্য জামাতার প্রতি নিদারুণ অভিশাপ-বাণী উচ্চারণ করলেন। অভিশাপের কঠোরতায় স্বয়ং দেবযানী পর্যন্ত বিচলিত হলেন। তাঁর অনুনয়ে কুলিশ কঠোর ঋষি বললেন, যদি কেউ স্বেচ্ছায় নিজ যৌবনের বিনিময়ে রাজার জরাভার গ্রহণ করেন, তবে রাজা তাঁর জীবনকালের পরিসরে সেই বিনিময় লব্ধ যৌবনকে উপভোগ করতে পারবেন। রাজার চারপুত্র যদু, তুর্বসু, অনু, দ্রুহ্য এই বিনিময়ে অসম্মত হলেন। বিমর্ষ রাজার সান্ত্বনাস্থল

একমাত্র তাঁর প্রতি অনুরক্তা শর্মিষ্ঠা। শর্মিষ্ঠা নৃপকে আবাস দিয়ে বললেন যে, পঞ্চম পুত্র পুরু নিশ্চয় পিতার জরাভার গ্রহণে দ্বিধা করবেন না। হলোও তাই। পুরু স্বয়ং উপযাচক হয়ে এসে তাঁর যৌবনের বিনিময়ে পিতার জরাভার গ্রহণে সম্মত হলেন। প্রথমে পুরুর বাগ্‌দত্তা কুমারী অপিতা এই বিনিময়ে বাধা দেন। কিন্তু শেষে পুরুর আত্মহাতিশয্য শর্মিষ্ঠা ও রাজার অনুনয়ে তিনি তাঁর আপত্তি তুলে নিলেন।

রাজা পুত্রের যৌবনে যৌবনান্বিত হয়ে অনিঃশেষ ভোগলীলায় নিজেকে নিয়োজিত করলেন। রাজপুরোহিত শুক্রহোত্রের নির্দেশে শর্মিষ্ঠা অন্যান্য প্রধানিকা রাজার তৃপ্তিবিধানে আত্মনিয়োগ করলেন। কিন্তু সীমাহীন ভোগের বাধাহীন আনন্দে যযাতি তৃপ্তি পেলেন না। পেতে চাইলেন প্রবালিকার হৃদয়। বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়ে রাজার অতৃপ্তি বেড়েই যায়। স্বেচ্ছাবৃত জরা কিন্তু কুমার পুরুর মনে কোন অবসাদ আনেনি। বিশ্বের সীমাহীন আনন্দ-ধারায় স্নাত হয়ে কুমার তৃপ্ত। শাশ্বত প্রেমের উপলব্ধিতে কুমার আর অপিতা পরিপূর্ণ। ছদ্মবেশে যযাতি পুত্রের প্রজ্ঞাবন শান্তি প্রত্যক্ষ করে এসে নিজের হীনতায় মর্মপীড়িত হলেন। শেষে তিনি আবার স্বেচ্ছায় জরাভার গ্রহণ করলেন। কারণ এবার তিনি প্রেমের কল্যাণরূপটি উপলব্ধি করেছেন, মর্ত্য লৌকিক জীবনের অন্তরালবর্তী শাশ্বত জীবনবোধের সাধনায় তিনি হলেন বানপ্রস্থ-প্রধানী। রাজার পূর্বে অনুতপ্তা দেবযানী ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন যযাতি শর্মিষ্ঠা দেবযানীর একসঙ্গে বানপ্রস্থ প্রস্থানের মৃদু নাটকীয়তায় সমাপ্ত।

এ নাটকে আমরা দেখেছি প্রেম ও প্রজ্ঞা, ত্যাগ ও তিতিক্ষার কল্যাণময় রূপ। আবার দেখেছি ভোগ এবং ত্যাগ, কামনা এবং প্রেমের নিত্যকালীন দ্বন্দ্ব। সেই দ্বন্দ্ব উপস্থাপিত হয়েছে আধুনিক মানবতাবোধ এবং বিজ্ঞান-চেতনার বিশ্লেষণ ভূমিতে। নাটকটি ভাবপ্রধান। কিন্তু সেই ভাবের প্রতিষ্ঠাভূমিকে লেখক নাটকীয় মুহূর্তের ক্ষণোদ্ভাসে আলোকিত করেছেন। এই ভাবপ্রতিমার লক্ষ্য কবি রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্যের, প্রতিমার বহিরঙ্গে লক্ষ্য কবি মধুসূদনের নাটকীয় অনুসরণ। ত্রুটিহীন অভিনয়ের উদ্যোগে সমগ্র নাটকটির গতি অব্যাহত।

ভাববিগ্রহ হিসেবে প্রধানতঃ পুরুর চরিত্র উজ্জ্বল। আদর্শ এবং বাস্তবের সংঘাতে যযাতির চরিত্র খুব জীবন্ত। প্রবালিকা এবং অপিতা চরিত্র দুটিও সার্থক সৃষ্টি। এক কথায় বলা যায়, অপরিচিত নাট্যকার চিত্রভানু যে শীঘ্রই রসিকসমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করবেন, তার স্বাক্ষর বহন করছে তাঁর এই প্রথম রচনা 'যযাতি'।

মুদ্রণের ব্যাপারে আরেকটু সতর্কতা প্রয়োজন ছিল। বেশ কিছু মুদ্রণ এবং বানান-প্রমাদ চোখে পড়লো। পরবর্তী সংস্করণে এ দিকে গ্রন্থটির সংস্কার কামনা করি।

রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার

নিঃসঙ্গ নায়ক। মৃত্যুঞ্জয় সাইতি। রূপা। কলিকাতা-১২ তিন টাকা।

নতুন লেখকের উপন্যাস স্বভাবতই আগ্রহ জাগায়। তাছাড়া বইখানির ছাপা ও বাঁধাই ভালো। এবং প্রকাশন সংস্থাও ছাপে নাম করেছেন। কিন্তু আদ্যন্ত পড়ে মনে হল না লেখক কোন নতুন কথা বলেছেন, কিংবা পুরনো কথাও কোন নতুন বা নিপুণ ভঙ্গিতে বলেছেন। কথাবস্তু একটি অপিসকে ঘিরে। সেখানকার কবি-কবি পি. আর. ও দিগন্ত সেন ভীষণ ভালো লোক। তিনি উগ্র কোন আধুনিক পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিতে সঙ্কুচিত হন, কিন্তু স্টাফের সামনে বসে নিজের কবিতা পাঠ করতে দ্বিধাগ্রস্ত হন না। তিনি ডেসপ্যাচ ক্লার্কের বিরুদ্ধে প্রসিডিওর (প্রসিডিংস নয়) রুজু করার জন্যে ডাইরেক্টরকে লেখেন (পৃঃ ২০)।

মোট কথা, তিনি খুব ভাল লোক—এবং সে কারণেই অন্যান্য দুষ্ট প্রকৃতির সহকর্মীদের চক্রান্তের ফলে টিকতে পারেন না, এবং পদত্যাগ করে তিনি স্বস্তিরোদ্গম করেন বহুবা নাম্নী সেই মহিলা কেরানির সঙ্গে তাঁর কয়েকটি মুহূর্ত, যার সঙ্গে তাঁর নাকি অনুরাগের সূচনা ঘটেছিল। উপন্যাস বলতে কী বোঝায় না তা এই গ্রন্থপাঠে বোঝা যাবে। প্রেম, আশা, আশা সবই দেখাবার ইচ্ছা আছে, কিন্তু কোন কিছুই বিশ্বাস উদ্রেক করে না, কনভিন্সিং নয়। বিশ বছরের এই দশকে দাঁড়িয়ে আমরা এরকম উপন্যাসকে সাদুবাদ জানাতে পারছি না।

রেবতী কুণ্ডু

উত্তরণ। স্টেফান ৎসভাইগ। রূপা। কলকাতা। তিন টাকা। অনুবাদ : দীপক চৌধুরী

সুপরিচিত কথাশিল্পী দীপক চৌধুরীকৃত স্টেফান ৎসভাইগের Fear and Transfiguration' গ্রন্থের এই অনুবাদ বাংলা অনুবাদসাহিত্যে একটি নাম বৃদ্ধি করলো মাত্র। প্রথম গল্প 'ভয়'। ব্যাভিচারিণী আইরিন, তার প্রেমিক শিল্পী ব্রাস্টমান, একটি পিছু-লাগা স্ত্রীলোক ও আইরিনের স্বামী মিঃ ভাসনারকে নিয়ে এই কাহিনী। ব্যাভিচারিণীর স্বামীর কাছে প্রকাশিত হয়ে পড়ার ভয়, এবং শেষে সত্যসত্য স্বামীর ক্ষমার ফলে আইরিনের উত্তরণ গল্পটিকে নাটকীয় বৈশিষ্ট্য দান করেছে। ভাল লাগতো, যদি অনুবাদ হত ঝরঝরে। প্রথম পাতাতেই "মনের এই ভয় প্রকাশক অনুভূতির সঙ্গে পরিচয় ওর নতুন নয়" এই বাক্যটি পড়ে মনে হয় নতুন শিক্ষার্থীর অনুবাদের খাতা দেখছি। দ্বিতীয় গল্প 'উত্তরণ'। একটি লোক একদিন অন্তের একটা লটারির টিকিট কিনে ঘোড়দৌড়ে আরো টাকা পেয়ে সেই টাকা দাতব্য করলো—সেই মনোজ্ঞ কাহিনীই এখানে বিবৃত হয়েছে। কিন্তু যে ঢালা চাল এমন ধরণের গল্প বলার জন্যে প্রয়োজন তা একেবারেই পাওয়া যায় না, বরং মাঝে মাঝে আড়ষ্ট মনে হয়। অনুবাদকে শিল্পকর্ম করতে গেলে ভাষান্তরকে সেই ভাষার, এক্ষেত্রে বাংলা ভাষার, মেজাজ না দিলে অনুবাদ অনাকর্ষণীয় থেকে যায়। শুধু গল্প শুনেই পাঠক পরিতুষ্ট হন না, শিল্পশৈলীও প্রত্যাশা করেন, কারণ অনুবাদ একটি শিল্পকর্ম। এই অনুবাদগ্রন্থের গল্প দুটি ভোরালো, কিন্তু অনুবাদে নিখিল প্রবন্ধ খুব বেশি চোখে পড়ে।

রেবতী কুণ্ডু

শ্বেতচন্দনচর্চিতকে—শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়। রূপা এণ্ড, কোং। তিনটাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

'কল্লোল' 'কালিকলম' 'উত্তরা' 'প্রগতি' প্রভৃতি পত্রিকা যে সময় বাঙলাদেশের উত্তরণ সাংস্কৃতিক জীবনের ছাত্র রচনার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছিল সেই সময়পর্বের অগ্রণী লেখকের মধ্যে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। সেদিনকার ভ্রাতা, অকিঞ্চন অবহেলিত মানুষ এবং নিষ্প্রবিত্ত বাঙালী সমাজের অন্তঃস্বরূপ উদ্ঘাটনে শৈলজানন্দ অত্যন্ত পারদর্শিতা ঔপন্যাসিক এবং ছোট গল্পকাররূপে নিজেকে চিহ্নিত করেছিলেন। তাঁর সেই লেখনী আজও অক্লান্ত এবং বাঙালী পারিবারিক জীবনের প্রতি তাঁর আগ্রহ যে আজও অত্যন্ত জাগ্রত তার প্রমাণ বর্তমান উপন্যাসটিতেও বিধৃত। 'অশোক' নামক বর্তমান উপন্যাসের নায়ক বৈবাহিকসূত্রে নির্ধনমামী সহসা বিত্তবান শ্বশুরোপরিবারে খুব মেয়েকে বিয়ে করে তাদের ঘরজামাই-এর প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। কিন্তু ভাগ্যচক্রের বিচক্রে এবং শ্বশুরের তিরস্কারে কেমন করে সে কোলকাতায় গেল, নানা অবস্থান্তরের মধ্য দিয়ে রেজার্সের লটারী পাওয়ার সূত্রে প্রচুর অর্থলাভ করে, ইতোমধ্যে তার শ্বশুর এবং শ্যালকদের

কিভাবে অবস্থা বিপর্যয় ঘটে এবং সে যখন নতুন বাড়ী তৈরী করে তার স্ত্রীকে খড়গপুর থেকে নিয়ে আসতে যায় তখন তার মৃত্যু ঘটে, তারপর সে তার বাড়ি এবং সম্পত্তি তার করিণতিকে এবং তার কোলকাতার আশ্রয়দাতার কন্যার বিবাহের জন্য দান করে কেমন করে এই সংসারের রঙ্গভূমি থেকে নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমায় তারই একটি পারিবারিক আলেখ্য বর্তমান উপন্যাসটিতে তুলে ধরেছেন। এখন যখন একটি জটিল সময়ের পরস্পরবিরোধী নানা দুর্বহ সমস্যায় আমাদের জীবন অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, তখন পাঠক হিসেবে শৈলজানন্দের কাছে আমাদের প্রত্যাশা হয়তো আর একটু বেশী, আশা করবো আমাদের সময়ের কিছু ছবি তিনি আঁকুন, কেননা রেজার্সের লটারী-পাওয়া 'হঠাৎ নবাব,' ব্যতিক্রম হিসেবে সত্যি হলেও, একটি মানুষের জীবনসংগ্রাম তার আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং পরিণামী ব্যর্থতার উপকরণ হিসাবে সত্যি করে তোলবার পক্ষে পর্যাপ্ত বিশ্বাস্য কারণরূপে গ্রাহ্য নাও হতে পারে। এ ধরণের আবেগনির্ভর নাটকীয়তা বাঙলাদেশের তথাকথিত 'উপন্যাসের' লক্ষণ হতে পারে, কিন্তু 'কল্লোল' 'কালিকলমের' শৈলজানন্দ এবং অচিন্ত্যের শৈলজানন্দ তাঁদের স্বজনকে খোঁজাতে পারলেই আমরা খুশী হই।

শ্রীমন্ত সরকার

বোরিস পাস্তেরনাকের কবিতা—নচিকেতা ভরদ্বাজ। বৈকালিক প্রকাশনী। চারটাকা।

বিগত কিছুকালের মধ্যবর্তী রুশ সাহিত্যে বোরিস পাস্তেরনাক একটি বিতর্কিত নাম। তাঁর রচিত উপন্যাস ডাক্তার জিভাগোর সাহিত্যমূল্য নিয়ে দেশে বিদেশে নানা বাদানুবাদ ঘটে গেছে। আমাদের বাঙলাদেশেও এ প্রসঙ্গে প্রচুর বিতর্ক দেখা গেছে বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকায়। তৎসত্ত্বেও বাঙালী পাঠকের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ এই গ্রন্থটির প্রতি আজও উচ্চকিত। তার প্রমাণ বাঙলা ভাষায় এই গ্রন্থটির অনুবাদের দুটি সংস্করণ। যদিও নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত এই উপন্যাসটিই তাঁর বিশ্বব্যাপী পরিচিতির প্রধান পরিচায়িকা তবুও পাস্তেরনাক যে মূলতঃ একজন কবি এই উপন্যাসের অন্তর্ভুক্ত কবিতাবলী থেকেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। এবং সে কবিতা যে অত্যন্ত তীব্রভাবে আমাদের চেতনার আলোড়ন তোলে, কাব্যানুরাগী প্রত্যেক সৎ পাঠকই তার সাক্ষ্য দেবেন। সোভিয়েট রাশিয়ার দুই প্রধান বিশ্ববরেণ্য কবি এসেনিন এবং মায়াকভস্কির পাশাপাশি পাস্তেরনাকও যে একটি স্মরণীয় ভূমিকায় চিহ্নিত একথা রুশ সাহিত্য চিন্তার পর্যায়ে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃত। মায়াকভস্কি তাঁর অন্তর্লীন গীতিপ্রাণতার দিকে লক্ষ্য রেখেই সম্ভবতঃ তাঁকে 'কবির কবি' আখ্যায় চিহ্নিত করেছিলেন, ইলিয়া এরেনবুর্গের উক্তিতে; তিনিই সোভিয়েটের প্রকৃত ভিত্তিপ্রস্তর রচয়িতা। অত্যন্ত তীক্ষ্ণ, সংবেদনশীল এই কবি উত্তরাধিকার-সূত্রে সংগীত-শিল্পী জননী এবং চিত্রশিল্পী জনকের শিল্পচেতনার অধীকার বহন করেছেন নিজের রক্তে, সেক্সপীয়রের নাটকগুলির রুশ অনুবাদসূত্রে রুশ সাহিত্য সমাজে নিজের স্থিরতর একটি পরিচয়কে তুলে ধরেছেন, এছাড়া বীরবোধ সান্ত্রস্তিকতার মাতৃখানেও একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘুষ্টানুরক্তির দিয়া বিশ্বাসের দীপশিখাটিকে নিজের হৃদয়ে রেখেছেন অনির্বাণ। অনুবাদ যে কোনও ভাষার সার্বজনীনতার একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। আধুনিক রুশ কবিতার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের 'প্রতিধ্বনি' বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল,' বুদ্ধদেব বসুর 'ব্যোমলেয়র : তাঁর কবিতা' আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং সমর সেন সম্পাদিত 'সপ্ত সিন্ধু : রুশ দিগন্ত' ইত্যাদি স্মরণীয় অনুবাদকর্মগুলির কথা বাদ দিলে কোনও বিশেষ কবির একক কবিকর্মের ভাষান্তর একমাত্র মনীন্দ্র রায় এবং তারপর সুবোধ রায়চৌ-

কৃত শেক্সপীয়র অনুবাদ গ্রন্থটির কথা বাদ দিলে আর মনে পড়ে না। যদিও কিছুদিন আগেকার 'দুই আমার্গের কবিতা' এলিয়টের 'কবিতা' আরাকুরির 'কবিতা কিংবা পালিয়া লরকার কবিতার কথা আমাদের মনে আছে। তবুও নচিকেতাবাবুকে ধন্যবাদ, তিনি তাঁর কারুকৃতিনিপুণ কবিধর্মকে একালের এক প্রসিদ্ধ কবিমানসের উন্মোচনে নিয়োজিত করেছেন, এবং সে দুরূহ পরীক্ষায় তাঁর সাফল্যও মনে রাখার মত। আমরা কেবল 'ডাক্তার কিত্তাগো'র কবি পাস্তেরনাককে আংশিক ভাবে জানতাম, কিন্তু নচিকেতাবাবু ১৯১২ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত লেখা পাস্তেরনাকের 'মেঘের কোলে মিথুন', 'যখন যেমনে পারে হবে,' 'যোনটি আমার,' 'জীবন' 'রাগ ও ছন্দ' 'কাব্যবিচিত্রা' 'দ্বিতীয় জন্ম' 'ভোরের গাড়ীতে' 'বিশাল পৃথিবী' 'তাঃ জিভাগোর কবিতা' 'আকাশ যখন পরিষ্কার' এবং 'শেষ কবিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে সত্তরটি নির্বাচিত কবিতা অনুবাদ করে পাস্তেরনাকের সমগ্র কবিচারিত্রাটি আমাদের সামনে উদ্ঘাটিত করার প্রয়াসী হয়েছেন। নচিকেতাবাবু ছন্দোবদ্ধের উপস্থাপনায় সতর্কতার পরিচয় দিয়েছেন, কিন্তু শব্দপ্রযুক্তির ক্ষেত্রে মাঝে মাঝে ভারী ওজনের তৎসম শব্দের পাশাপাশি অত্যন্ত লৌকিক কথ্যরূপ কবিতার ভাষাকে রক্ষার ব্যাঘাত ঘটিয়েছেন বলে আমার মনে হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ১১ পৃষ্ঠার এবং 'সহর্ষ নিমজ্জিত অঙ্গন চিত্রিত হবে,' ১৫ পৃষ্ঠার এবং স্বর্গ-মর্ত্য সমবে ভেদী চূর্ণ বিচূর্ণ বেদনা' ২৬ পৃষ্ঠার "জোপবাড় এবং বৃক্ষরাজগুলি পক্ষিদের ভাষণের নিপুণ নির্বাণে ভণায়িত"—ইত্যাদি অনুদ্ধৃত পংক্তি কিংবা পংক্তিখণ্ডগুলি স্মরণ করা যেতে পারে। কিন্তু এর বাইরে খুঁজে বের করা ত্রুটির তুলনায় শ্রীযুক্ত তরফদারের কৃতিত্ব অনেক অনেক বেশী প্রশংসনীয়। একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকায় পাস্তেরনাক প্রসঙ্গিত উল্লেখযোগ্য সমস্ত তথ্যও তিনি এই গ্রন্থে নিবেশিত করেছেন। গ্রন্থটির মুদ্রণ এবং প্রকাশনার ব্যাপারে প্রকাশকের শৈথিল্য বড় চোখে লাগে।

শ্রীমন্ত সরকার

অনিল ব্রাদার্সের
সময়োপযোগী দুইটি বই

সমাজতন্ত্রীর দৃষ্টিতে মার্ক্সবাদ : ৩·৫০ টাকা

"...সমাজতন্ত্রের সহিত মার্ক্সবাদ বা কম্যুনিজমের পার্থক্য পরিস্ফুট করাই এই পুস্তকের উদ্দেশ্য। সমাজতন্ত্র অর্থ-নৈতিক মতবাদ এবং সর্বতগ্রাহ্য। কিন্তু ইহার সহিত মার্ক্স যে দর্শনতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও বিবর্তন ব্যাখ্যা যোগ করিয়াছেন, তাহা যে অগ্রহণীয় তাহাই মূল প্রতিপাদ্য।" ... (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনবাদ : ১·২৫

"...নেতাজীর জীবনদর্শন একদিন ভারতবর্ষকে গ্রহণ করতে হবে। যে ideology বা চিন্তাধারাকে নেতাজী নিজের জীবনে গ্রহণ করেছেন, যে আদর্শ ও মতবাদ নেতাজীর অপূর্ব জীবন ও ব্যক্তিত্ব গড়ে তুলেছে, ভারতবর্ষের জন-সাধারণকে সেই আদর্শ ও মতবাদকে অবলম্বন করতে হবে। নেতাজীর পথই ভারতবর্ষের সম্মুখে একমাত্র পথ। এ-ছাড়া 'নান্য পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।' (ভূমিকা)

নেতাজীর জীবনদর্শন বা ideology সংক্ষেপে এই বইয়ে বিবৃত করা হয়েছে।

পাওয়া যাবে :

জয়শ্রী—৩১২, গাবুলী বাগান, কলিঃ-৪৭ (ডাকে)

জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী,

২০৯বি বিধান সরণি, কলিকাতা-৬

২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটস্থিত গোবর্ধন প্রেস হইতে শ্রীকিরণচন্দ্র দিয় এন্ডসন্সের কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

বর্ষ-সূচী

জয়শ্রী : ১৩৭২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
অ		
অনিল রায়	হেমেনীয় দর্শন [ধারাবাহিক প্রবন্ধ]	১৮, ১৭৩, ২৪৩, ৫১২, ৫৯৫, ৬১১, ৮১৮, ৮৮৭
	চতুর নিসর্গ এক (কবিতা)	২
	হিমবহ্নি (কবিতা),	৩৬০
	তুমি আছো (কবিতা)	৭১৪ (ক)
অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়	বাংলা সাময়িক পত্র : কল্লোল পর্ব (আলোচনা)	
অশ্রুকুমার সিকদার	ক্লিশের ক্লেশ এবং উৎসর্জেও (সমালোচনা), আমরা কজন	১৩৬
	লৌহলোকের বাসন (আলোচনা)	
অমিতাভ দাশগুপ্ত	এলিয়ট, এডিথ সিটোএল ও কবিতার ঝড় (প্রবন্ধ)	
	টেঁড়োপাড়া ঘুড়ে হয়েছে মহোৎসব (কবিতা)	৫০০
অন্নদাশঙ্কর রায়	পটভূমিকা	৩২৪
অনাথবন্ধু দত্ত	আমেরিকায় নিগ্রো বিদ্রোহ	১৪২
অচিন্ত্যেশ ঘোষ	কলকাতা : নগর বিস্তারের সামাজিক দিক (প্রবন্ধ)	
অরুণকুমার সরকার	বিশ বছর পরে, গ্রামে (কবিতা)	৩৫৮
অপরাজিতা গোয়ী	অবরুদ্ধ কান্না (কবিতা)	৩৬৮
অমূল বসু	পরিপূর্ণ চৈতন্যের সাগর সংগমে (আলোচনা)	৪৫৩
আ		
আর্যদেব	হৃদয়ের ঘরে (গল্প)	৫৩১
আশিষভূষণ বসুমজুমদার	কমিউন (গল্প)	৮২৩
অরবিন্দ ভট্টাচার্য	শীতভাল (কবিতা)	৮৯৬
ক		
কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত	ঝড়োই আশ্চর্য লাগে (কবিতা)	১০৭
	পাখিরা আসে না আর (কবিতা)	৩৪৯
	ভ্যাবলু বি-য়েটস শরণে (অনুবাদ : কবিতা)	৬৪৫
	ক্রমেই বয়স বাড়ে (কবিতা)	৮০৬গ
জেনারেল কাওয়াবে	ভারতের স্বাধীনতা ও সুভাষচন্দ্র বসু (অনুবাদ)	৩০৬
কৃষ্ণধর	পরার অন্ত মন কেমন করে (কবিতা)	৫৬৮
কালীচরণ ঘোষ	অবোধ-জীবন-পথ যাত্রী	৭৩১
কালিদাস নাগ	রমাঁ্যা রলাঁ (জীবন-আলেখ্য)	৮০৪
কৃষ্ণলাল মুখোপাধ্যায়	কাব্যরূপকার : মাইকেল মধুসূদন (প্রবন্ধ)	১১৫
গ		
গোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	চৈত্র চিন্তন (কবিতা)	১০৮
	শিল্পীর বীক্ষা (কবিতা)	১০৮
	অদ্ভুত খেলা (কবিতা)	৩৬২
	ভালবাসার দুঃখ (অনুবাদ : (কবিতা)	৬৪৭

বর্ষ সূচী

জয়শ্রী : ১৩৭১

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	দ্বিতীয় ইন্দ্র নয় (অনুবাদ) (কবিতা)	৬৪৭
গিরীন্দ্রমোহিনী দেবী	কান্তকবির স্মৃতি স্মরণে (আন্তরিক চিত্র)	৫৬৭
গোপাল ভৌমিক	পকাশে পা দিয়ে (কবিতা)	৩৫৮
চ		
চিত্রভানু	মিল (কবিতা)	৮৯৬
জ		
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ মজুমদার	সামান্য শান্তি (মূল্য রচনা)	২১৩
	কবিকা, একটুকরো সাবান (কবিকা)	৪১০, ৬৬৬
ত		
ত্রিপুরাশঙ্কর সেন	কান্তকবি রজনীকান্ত (প্রবন্ধ)	২৪৫
দ		
দেবেন্দ্রনাথ মিত্র	রামানন্দ স্মরণে (স্মৃতিকথা)	১৫
দেবদাস জোয়ারদার	বিচিত্র চিন্তায় ও কর্মে রামানন্দ (প্রবন্ধ)	৩০
দুর্গাদাস সরকার	কোন বৃক্ষ নাই (কবিতা)	১৯১
	খালাসী ইব্রাহিম শেখের মৃত্যুর পর (কবিতা)	৩৬২
দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়	খুকের মধ্যে (কবিতা)	৩৬৭
	দেয়াল (গল্প)	৬০১
	মৃতপথে (কবিতা)	৯৬৩
দিব্যেন্দু পালিত	বাসিলা (গল্প)	৩৮৫
দেবীপ্রসাদ সেন	আচার্য ব্রজেন্দ্রনাথের প্রতিভা (প্রবন্ধ)	৪৭২
বিজেশ দত্ত মজুমদার	ভারত-পাক সংঘর্ষ ও আন্তর্জাতিক পটভূমিকা (প্রবন্ধ)	৫০৯
ধ		
ধীরেন্দ্রনাথ পাড়ুই	দহ (কবিতা)	
ন		
নচিকেতা ভরদ্বাজ	সুখ, দুঃখ আশা ইচ্ছা (কবিতা)	১০৭
	প্রথাবদ্ধ (কবিতা), জলের মধ্যে	৩৬৪
	একটি দ্বীপ (কবিতা)	৬৫৮
নির্মল দাশ	'পঞ্চভূত' প্রসঙ্গ (প্রবন্ধ)	১৯৭
নীরেন সেন	জিও-পলিটিক্সের দৃষ্টিকোণে আন্তর্জাতিক রাজনীতি (প্রবন্ধ)	৩৩৭
নিরঞ্জন হালদার	কলিকাতার সমস্যা (প্রবন্ধ)	৩৫১
নরেন্দ্রনাথ মিত্র	ক্ষমা (গল্প)	৩৮১
নীলিমা দাশগুপ্ত	একটি ঠোঙা (গল্প)	৪৩৯
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী	আরনাবতী (কবিতা)	৮০৬৮
প		
পবিত্রকুমার ঘোষ	রাজনৈতিক চেতনা বিকাশে সংবাদ ও সাময়িক পত্রের ভূমিকা (প্রবন্ধ)	

বর্ষ সূচী

জয়শ্রী : ১৩৭২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	সুভাষচন্দ্র (ধারাবাহিক রচনা) ১৬৫, ২০৭, ৩০৯, ৪৯৩, ৫৬৯, ৬৪১, ৭১৫, ৭৯৮, ৮৭১, ৯৩৯	
প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়	উল্লাসকর স্মরণে (প্রবন্ধ)	২৪
প্রবোধবন্ধু অধিকারী	ধলেশ্বরী (ধারাবাহিক উপন্যাস) ১১০, ২১৫, ২৮০, ৫৪৫, ৬৯৫	
	রৌদ্র রেখা (বড়গল্প)	৩৮১
প্রতিমা সেনগুপ্ত	সংশয় (কবিতা)	১৯১
প্রফুল্লকুমার দত্ত	উপকরণ (কবিতা)	২৪৪
প্রভাকর মাঝি	সমুদ্রকন্যাকে (কবিতা)	২৮০
প্রদ্যোৎ সেনগুপ্ত	রজনীকান্ত : কবি ও গীতিকার (প্রবন্ধ)	২৫০
প্রীতিভূষণ চাকী	মুখে করে রাখি (কবিতা)	৫৯৩
পৃথ্বীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথের জীবন-দর্শন (প্রবন্ধ)	৭৪৮
প্রফুল্লচন্দ্র রায়	স্মৃতির পৃষ্ঠায় নেতাজী (স্মৃতিকথা)	৭৫৮
পঞ্চচারী	হিরোশিমা (অনুবাদ : গল্প)	৮৯৩
	লিলি-রোড (অনুবাদ : গল্প)	৯৬৬
	পুস্তক পরিচয় ১৪৭, ৫৫৫, ৬২৫, ৭৮৩, ৮৫৩, ৯১৯	
ব		
বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়	স্বাধীনতার পূজারী রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (স্মৃতিচারণ)	
বিজয়কুমার দত্ত	অদৃশ্য (কবিতা)	৯৬৪
বিজনকুমার ঘোষ	শান্তিলতা (গল্প)	৪১৩
	জোয়ার (ধারাবাহিক উপন্যাস) ১২১, ২০৯ ২৬৯, ৪৩৮, ৬০৩, ৬৮৭, ৩৬৯, ৯০৩, ৯৭১	
বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	অঘোরে মেঘেছে বৃষ্টি (কবিতা)	৩৫৭
	আমার ভারতবর্ষ (কবিতা)	৮০৬খ
বিমল কর	খাঁচড় (গল্প)	৫৭১
বিমলকুমার ঘোষ	মেঘের প্রহর (গল্প)	৫৩৭
বিকাশ রায়	সনেট (কবিতা)	৫৯৭
বিজয় দেব	ইয়েটস্ : সেই নিঃসঙ্গ দুর্গ (শতবর্ষ রচনা)	৬৪০
বিশ্বনাথ রায়	কলিকাতার বিপদ (কবিতা)	৮৯৭
বিনোদ বেরা	বিনাশে (কবিতা)	৪৯৯
ভ		
ভোলানাথ মুখোপাধ্যায়	মনে হচ্ছে প্রেম নেই (কবিতা)	৫৯৪
ম		
মোহিত চট্টোপাধ্যায়	তিনটি কবিতা (কবিতা)	১০৯
	মহাপ্রস্থান (কবিতা)	৫৬৯
মিহির মুখোপাধ্যায়	মুক্তাবাদের টমসন সাহেব (গল্প)	১৪১
	ছোট বিবির রওয়ানি (বড়গল্প)	৩৯৭
	শঙ্খমালা (গল্প)	৬৭৯
মোহিত চক্রবর্তী	এবার তুমুল-স্নানে (কবিতা)	২৪৩
মধুর বাগচী	তোমার জন্য (কবিতা)	২৪৩
	বকুল তলার ফুল (কবিতা)	৩৬১
	সর্বরীকে (কবিতা)	৯৬৪

বর্ষ সূচী

জয়ন্তী : ১৩৭২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শশিভূষণ ভট্টাচার্য	শাশ্বত (কবিতা)	৫৬০
শান্তশীল দাশ	অনুলিখন (কবিতা)	৫৬৩
শফুদিকা দাশ	সোনার পুতুল তুমি (কবিতা)	৩৬৬
	অপ্রকাশিত কবিতা (কবিতা)	৮৯৫
ষ		
যোগেশচন্দ্র বাগল	প্রবাসী (স্মৃতিচারণ)	
বিপ্লবী যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়	আশীর্বাদ (কবিতা)	
র		
রামপদ মুখোপাধ্যায়	স্মৃতির আলোয় রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় (আন্তরিক চিত্র)	১
রমেন্দ্রনারায়ণ সরকার	বাংলা সাময়িক পত্র : আদি ও যুগযুগ (১৮১৮-১৮৭২)	৪৩
	সমকালীন বাংলা কবিতা (আলোচনা)	৫১৭
রজনীকান্ত সেন	অপ্রকাশিত কবিতা (কবিতা)	৩৪৫
রমেশচন্দ্র মজুমদার	ঘোষিত মৃত্যুর সত্যাসত্য বিচার (আলোচনা)	৭১১
রমা দাশ	অমৃত-কুম্ভ (ভ্রমণ)	
ল		
লীলা রায়	বৈশাখ	
	তোমার বিধান	
শ		
শান্তি লাহিড়ী	যাদুঘর (কবিতা), সামুদ্রিক	২৪৪
	আলো জলে (কবিতা)	৩৬৭

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়	অরণ্য আমাকে জানে (কবিতা)	৩৬৪
শান্তশীল দাস	বন্ধুত্ব শৃঙ্খল (কবিতা)	৫৬৬
	২৫শে জানুয়ারী (কবিতা)	৭১৪খ
শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়	বসবাইল সহর (কবিতা)	৩৮৭
	বোকার গান (কবিতা)	৬৪৮
	পার্কে (কবিতা)	৮৯৬
	জীবন সঙ্গীত (অনুবাদ কবিতা)	৪৯৯
শোভন সোম	হিম অনুভবগুলি (কবিতা)	৩৭০
শচীন্দ্রনাথ বসু	ছুটি (গল্প)	৪৩২
শক্তি মুখোপাধ্যায়	হৃদয় আমার (কবিতা)	৪৯০
শংকরীপ্রসাদ বসু	সুভাষচন্দ্র ও ভাগনাল প্ল্যানিং (প্রবন্ধ)	৭৩৩
শংকরী ঘোষ	অয়ন ছাত্রদল (কবিতা)	২৩৫
স		
সুধাকান্ত রায়চৌধুরী	শান্তিনিকেতনে রামানন্দবাবু (আন্তরিক চিত্র)	৩
সচ্চিদানন্দ মুখোপাধ্যায়	রামানন্দ : রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্ব-ভারতী (প্রবন্ধ)	১৭
	শান্তিনিকেতনের স্মৃতিকথা (স্মৃতিকথা)	৪১১
	রবীন্দ্র স্মৃতিকথা (স্মৃতিকথা)	৬৭৮
সুখময় মুখোপাধ্যায়	বাংলা সাময়িক পত্র কল্লোল থেকে সাম্প্রতিককাল (আলোচনা)	৬৫
	কথার আড়ালে (কবিতা)	৩৭০
সুনীল দাস	ভিয়েৎনাম (প্রবন্ধ)	১০৫

বর্ষ সূচী

অগ্রহায়ণ : ১৩৭২

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
	কাশ্মীর-আক্রমণ : ভারত বিভাগের অন্তিম পরিচ্ছেদ (প্রবন্ধ)	৫২১
	মৈত্রীর পুনর্বিচার (প্রবন্ধ)	৫৭৭
	খাদ্য সংকট ও আন্দোলন (প্রবন্ধ)	৮৭১
	সফরের খতিয়ান (প্রবন্ধ)	৯৫১
সুশান্ত ঘোষ	বীণা (কবিতা)	১৯২
সুনীল বসু	তোরণ (কবিতা), স্মৃতির শব্দ (কবিতা)	১৯২, ৩৩১
সমর গুহ	কলঙ্কিত কক্ষ চুক্তি (প্রবন্ধ)	১৯৩
	স্বাধীন পূর্ববাংলা আন্দোলন (প্রবন্ধ)	৬৫৫
	তাসখণ্ড ঘোষণা : শান্তির মরীচিকা (প্রবন্ধ)	৭৯৪
সরোজেন্দ্রনাথ রায়	বাংলায় স্বরেন্দ্র যুগ (প্রবন্ধ)	৩১৫
সুভাষ মুখোপাধ্যায়	কাছে ঘুরে (কবিতা)	৩৫৭
স্নেহাকর ভট্টাচার্য	যখন ঘুমায়ে পড়ি (কবিতা)	৩৫৯
সমরেন্দ্র সেনগুপ্ত	অপেক্ষা (কবিতা)	৩৬২
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়	রূপালী যানবী (কবিতা)	৩৬৫
সমেশরঞ্জন দত্ত	প্রত্যহ কেন যে এত রক্তপাত (কবিতা)	৩৮৮
সুশান্ত বসু	বাংলা সাময়িক পত্র : বঙ্গোদয় থেকে সাম্প্রতিকাল	৩৫
	কথার আড়ালে (কবিতা)	৩৭০
সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়	অপরাহ্নের গল্প (গল্প)	৪৯৬
সুবোধ বসু	বৈরাগ্য (গল্প)	৪৪৭
সত্যব্রত বসু	শরৎচন্দ্র স্বয়ং (আলোচনা)	৪৬১
	দাদু : বহুবাংলী লেখক (আলোচনা)	৭৬৯
	শরৎচন্দ্র (পুস্তক সমালোচনা)	৮৯৮
সুরজিৎ দাশগুপ্ত	ঘাসে (প্রবন্ধ)	৫৮১, ৬৫৫
	সংস্কৃতির বিনিময় (আলোচনা)	৯৮৭
সুনীল হাজরা	মিনতি (কবিতা)	৫৯৩
সম্পাদকীয়	৬৭, ৮৯, ১৫৭, ২২৯, ৪৯৩, ৬০১ ৭৮৯, ৭৯১, ৮৬৩, ৯০১	
বিশ্ববর্ত	১৫০, ২২৩, ২৯৯, ৬২১, ৭০৪, ৮৫৭, ৯৯০	

ঋ

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা
ঋতপ্রসাদ মিত্র	বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন ও সাময়িক পত্রপত্রিকা (আলোচনা)	৫২
ঋতেন্দ্রনাথ সিংহ	প্রেমের মূরতিধ্যানে পাখের আনন	৩৭০
ঋতো ছাপদার	সূর্যমুখী জীবনের (কবিতা)	৬১৬